দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-প্রতিষ্ঠিত

সচিত্র মাসিকপত্র

দশম বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড

পৌষ ১৩২৯—জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০

সম্পাদক—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

প্রকাশক—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভারতবর্ষ

সূচিপত্র

দশম বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড, পৌষ ১৩২৯—জ্যৈষ্ঠ

বিষয়ানুসারে বর্ণানুক্রমিক

চিত্র-সূচি

চিত্র-সূচি—পৌষ—১৩২৯

বহুবর্ণ চিত্র

চিত্র-সূচি—মাঘ—১৩২৯

বহুবর্ণ চিত্র

চিত্র-সূচি—ফাল্গুন—১৩২৯

বহুবর্ণ চিত্র

বহুবর্ণ চিত্র

চিত্র-সূচি—বৈশাখ—১৩৩০

বহুবর্ণ চিত্র

চিত্র-সূচি—জ্যৈষ্ঠ—১৩৩০

বহুবর্ণ চিত্র

পৌষ, ১৩২৯

দ্বিতীয় খণ্ড | দশম বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

স্বপ্ন

ডাঃ শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু, ডি-এস্ সি, এম্-বি

স্বপ্ন দেখেন না, এমন লোক খুব কমই আছেন। জিজ্ঞাসা করিলে অনেকে হয় ত বলিবেন, তাঁহারা স্বপ্ন দেখেন না। স্বপ্নের প্রকৃতিই এই, তাহা মনে থাকে না। তাই সারা রাত স্বপ্ন দেখিয়াও সকালবেলা মনে হইতে পারে, কোনই স্বপ্ন দেখি নাই। অবশ্য এমন কতকগুলি স্বপ্ন আছে, যাহা কিছুতেই ভোলা যায় না। আমি এমন লোকও জানি, যিনি তিন বৎসর বয়সের দেখা স্বপ্ন ৫৬ বৎসর বয়সেও মনে রাখিতে পারিয়াছেন। স্বপ্ন-জগতের সহিত বাস্তব-জগতের পার্থক্য সময় সময় এতই বেশী, আর স্বপ্ন এতই উদ্ভট রকমের হয় যে, সকলেই অল্পবিস্তর স্বপ্ন কি ও কেন হয়, ভাবিয়া থাকেন। অসভ্য জাতিরা স্বপ্ন দেখিয়া অনেক সময় [illegible] করে। ইতিহাসেও দেখা যায়, স্বপ্ন দেখিয়া [illegible] করিয়াছেন। চিতোরের মহারাণা লক্ষ্মণ সিংহ স্বপ্নে উবর দেবীর আদেশ পাইয়া আলাউদ্দীনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিয়াছিলেন। বাদ্‌শাহ জাহাঙ্গীর স্বপ্নে পিতার আদেশ পাইয়া, আজিজ্ কোকার গুরুতর অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছিলেন। স্বপ্নে ঘোড়ার নাম পাইয়া অনেকে ঘোড়দৌড়ে বাজী ধরেন। কখন কখন স্বপ্ন দেখার ফলে পাটের ভিতর-বাজারের তেজী মন্দী বা পাটের দর কমে বাড়ে। কোন ধনী মাড়ওয়ারী স্বপ্ন দেখিলেন, বাজার তেজী হইবে। তাঁহার সেই স্বপ্নের কথা শুনিয়া আর পাঁচজনের মনেও সেই ধারণাটা বদ্ধমূল হইল। বাজার সত্যই তেজী হইল। এই সকল অবস্থায় মানুষ যে স্বপ্নকে নিতান্ত অমূলক চিন্তা বলিয়াই মনে করে নাই, তাহা না বলিলেও চলে। অধিকাংশ লোকেরই ধারণা, "স্বপ্ন অমূলক নহে—তাহার একটা-না-একটা অর্থ আছে। তাই

আমাদের দেশে সুস্বপ্ন দুঃস্বপ্ন লইয়া এত বিচার। যদিও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বলে আমরা স্বপ্নকে 'কিছুই নয়' বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করি, তবুও স্বপ্ন যে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের হৃদয়ে উদ্দীপনা আনিয়া দেয়, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুসভ্য পাশ্চাত্য দেশেও স্বপ্নবিষয়ক গ্রন্থের অভাব নাই। এই-সব কেতাবে নানা রকমের স্বপ্ন ও তাহার ফলাফল লেখা আছে। সাপের স্বপ্ন দেখিলে ছেলে হয়, ইহা আমাদের দেশের প্রাচীন কথা। এইরূপ স্বপ্নে জলপূর্ণ পাত্র দেখিলে ধনলাভ, লাল ফুল দেখিলে বরাতে কষ্ট ভোগ, ইত্যাদি বিবরণ আমাদের সংস্কৃত-শাস্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায়।

আধুনিক স্বপ্ন-তত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায়, বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে স্বপ্নের কারণ নির্দ্দেশের চেষ্টার দুইটি ধারা আছে। এক দল স্বপ্নের Physiological বা শারীরিক কারণ অনুসন্ধানে ব্যস্ত। আর এক দল অনুমান করেন, স্বপ্নের কারণ মনের মধ্যেই আছে। ঘুমন্ত অবস্থায় আমার গায়ে এক ফোঁটা জল পড়িল, আমি স্বপ্ন দেখিলাম বৃষ্টি হইতেছে, অথবা স্নান করিতেছি। এক্ষেত্রে প্রথম দলের বৈজ্ঞানিকেরা বলিবেন, গায়ে জল পড়ার শারীরিক অনুভূতিই আমার স্বপ্ন-দর্শনের কারণ; দ্বিতীয় দল আপত্তি করিবেন, জল পড়ার অনুভূতি স্বপ্ন সৃষ্টি করিলেও, বৃষ্টির স্বপ্ন দেখিব, কি স্নানের স্বপ্ন দেখিব, তাহা এরূপ অনুভূতির দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় না। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে মানসিক কারণেরই অনুসন্ধান করিতে হইবে। নিমন্ত্রণে গুরু আহার করিয়া রাত্রে ভয়ের স্বপ্ন দেখিলাম; স্বপ্নে বাঘ দেখিব, চোর দেখিব, কি ভূত দেখিব, তাহা আমার মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। এজন্য শারীরিক কারণ অনুসন্ধান অপেক্ষা, মানসিক বিশ্লেষণেই অধিক ফল লাভের সম্ভাবনা।

কোন কোন শারীরক্রিয়াবিদ্ (physiologist) মনে করেন, আমাদের মস্তিষ্ক-মধ্যস্থিত cells বা কোষের আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তনের ফলেই মানসিক চিন্তার উৎপত্তি হয়। বিভিন্ন কোষগুলি পরস্পর সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। নিদ্রাকালে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়, এই জন্যই চিন্তাধারার শৃঙ্খলা নষ্ট হইয়া স্বপ্নের সৃষ্টি করে। আশ্চর্য্যের কথা এই, আর একদল শারীরক্রিয়াবিদ্ (physiologist) ঠিক ইহার বিপরীত কথাই বলেন। তাঁহাদের মতে নিদ্রাবস্থায় cells বা কোষগুলির সংযোগ বিচ্ছিন্ন না হইয়া বরং আরও ঘনিষ্ট হয়; আর এই জট পাকাইবার ফলে স্বাভাবিক চিন্তার শৃঙ্খলা নষ্ট হয়,—আমরা স্বপ্ন দেখি। আবার কেহ কেহ বলেন, নিদ্রাকালে শরীরের মধ্যে বিষাক্ত পদার্থ জন্মিয়া কোষগুলির ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মায়, আর তাহাতেই আমরা স্বপ্ন দেখিয়া থাকি। স্বপ্নের কারণ-নির্ণয়ের জন্য এরূপ কত প্রকার শারীরক্রিয়ামূলক মতবাদ যে চালান হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। মোট কথা, এই সমস্ত মতবাদের কোনটাই প্রকৃত বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। কেহই চাক্ষুষ এরূপ সংযোগ-বিয়োগ বা বিষক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেন নাই; আর এরূপ মতবাদ বা অনুমানের সাহায্যে স্বপ্ন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানও কিছুমাত্র বাড়ে নাই।

আমাদের সংস্কৃত শাস্ত্রেও স্বপ্ন সম্বন্ধে নানা রকমের বিচার আছে। বৃহদ্ আরণ্যক উপনিষদে স্বপ্নের দুইটি মতবাদ দেখিতে পাওয়া যায়! (১) আত্মা বহির্জগতে দৃষ্ট দ্রব্যাদির অনুকরণে স্বপ্নে নূতন জগত সৃষ্টি করে। (২) আত্মা শরীর হইতে বাহির হইয়া, ইচ্ছামত পৃথিবীতে ঘুরিয়া বেড়ায়। 'চরক' স্বপ্নকে সাতভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—দৃষ্ট, শ্রুত, অনুভূত, প্রার্থিত, কল্পিত, ভাবিক (ভবিষ্যৎ-নির্দেশক) ও দোষজ। ইহাদের মধ্যে প্রথম ৫টি অমূলক—অর্থশূন্য। বেদান্ত বলেন, স্বপ্নে দেখা কোন কিছুই আমাদের অজানিত নয়। কিন্তু ইহার কোনটিকেই বৈজ্ঞানিক মতবাদ বলা চলে না।

আশ্চর্য্যের বিষয়, স্বপ্নতত্ত্ব জানিবার জন্য সাধারণ লোকের আগ্রহের অভাব না থাকিলেও, খুব কম বৈজ্ঞানিকই ইহার আলোচনা করিয়া থাকেন। বৈজ্ঞানিকদের কারবার নির্দ্দিষ্ট জিনিষ লইয়া। তাই বোধ হয়, তাঁহারা অবাস্তব, অদ্ভুত আজগুবী স্বপ্ন-রাজ্যে যাইতে নারাজ। মনস্তত্ত্ববিদেরা অন্যান্য মানসিক ক্রিয়ার বিশ্লেষণে যে পরিমাণ সময় ও শক্তি ব্যয় করিয়াছেন, তাহার তুলনায় স্বপ্ন সম্বন্ধে তাঁহারা কিছুই করেন নাই। তাই কিছুদিন আগেও এ সম্বন্ধে আমাদের কোনই নিশ্চিত জ্ঞান ছিল না। প্রায় ২৫ বৎসর হইতে চলিল প্রফেসর সিগমুণ্ড ফ্রয়েড (Prof. Sigmund Freud) অশেষ অধ্যবসায় ও অদ্ভুত যুক্তিবলে স্বপ্নের রহস্য উদ্ঘাটিত করেন। সেই অবধি তাঁহার

পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অনেক মনস্তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতই স্বপ্নের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তবুও বলিতে হইতেছে, স্বপ্ন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এখনও অসম্পূর্ণ। তবে আমরা স্বপ্নের রহস্য যে ক্রমেই অধিকতর স্পষ্টভাবে বুঝিতেছি, সন্দেহ নাই। আমি এই প্রবন্ধে, স্বপ্ন সম্বন্ধে ফ্রয়েডের গবেষণার ও অপরাপর মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের মতামতও কিছু কিছু আলোচনা করিব। সেই সঙ্গে আমার নিজের মন্তব্যও দিব।

স্বপ্ন-তত্ত্ব আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই আমাদের মনে কতকগুলি প্রশ্নের উদয় হয়। স্বপ্ন কি, কেন হয়, ইহার অর্থই বা কি?—স্বপ্ন সত্য কি না? ইহা কি আমাদের ভূত ভবিষ্যতের সন্ধান বলিয়া দিতে পারে? স্বপ্ন-সাহায্যে কি আমরা পরজগতের কথা জানিতে পারি? মৃত আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের আত্মা বাস্তবিকই কি স্বপ্নে আসিয়া দেখা দেয়? অনেক সময়, স্বপ্নে আমরা পূর্ব্ব হইতেই কাহারও কাহারও মৃত্যুর ইঙ্গিত পাই—ইহাই বা কিরূপে সম্ভব? স্বপ্নে কোন অচেনা যায়গা, বা অজানা বিষয় দেখিয়া পরে তাহা প্রত্যক্ষ করি,—ইহারই বা কারণ কি? এই সকল প্রশ্ন কখন কখন আপনা হইতেই আমাদের মনে স্থান পায়। ইহার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা সর্ব্বত্র সম্ভবপর না হইলেও, যথাসাধ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

স্বপ্ন কি?

নিদ্রাকালে আমাদের মানসিক বৃত্তিগুলি একেবারে নিস্তেজ হয় না বটে, কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় যে শৃঙ্খলা মানসিক বৃত্তিতে লক্ষিত হয়, তাহা নষ্ট হইয়া যায়; নানারূপ অদ্ভুত চিন্তা ও দৃশ্য মনোমধ্যে উদিত হয়। ইহাকেই স্বপ্ন বলে। শাস্ত্রকারেরা যাহাকে সুষুপ্তি বলেন, নিদ্রার সেই গাঢ় অবস্থায় স্বপ্ন-দর্শন হয় না। অন্ততঃ আমরা এইরূপই মনে করিয়া থাকি। স্বপ্নের একটি বিশেষত্ব আছে। জাগ্রত চিন্তাধারার [illegible] দর্শন (visual) শ্রবণ (auditory), ও স্পর্শেন্দ্রিয় (tactual) ইত্যাদি প্রত্যক্ষের প্রতিরূপ (image) বর্ত্তমান আছে। কিন্তু স্বপ্নের ভিতর দার্শন প্রতিরূপের (visual imagery) প্রাধান্যই বেশী। স্বপ্নে [illegible] [illegible] অপেক্ষা দেখার ভাগই অধিক। তাই [illegible] কথায় আমরা বলি—'স্বপ্ন দেখা'। স্বপ্নের এই [illegible] [illegible] ইহার অর্থ বা কি [illegible] [illegible]।

জাগ্রত ও সুপ্ত অবস্থার মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা-রেখা নাই। এই কারণে জাগ্রত ও নিদ্রিত চিন্তাধারার মধ্যেও সকল সময়ে বিশেষ কোন সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায় না। কখন কখন আবার জাগ্রত অবস্থায় চিন্তা করিতেছি, কি স্বপ্ন দেখিতেছি, বুঝা মুস্কিল হইয়া পড়ে। বাস্তবিক পক্ষে সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থাতেও অনেক সময় স্বপ্নের ন্যায় চিন্তাধারা লক্ষিত হয়;—ইহাকে আমরা দিবা-স্বপ্ন বলি। জাগ্রত অবস্থায় আমরা চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রিত করি—এইরূপ মনে হয়। স্বপ্নের সময় চিন্তাধারা আমাদের ইচ্ছামত চালিত হয় না,—ইহাও স্বপ্নের একটা বিশেষত্ব। দিবা-স্বপ্নেও চিন্তাধারা এইরূপ ইচ্ছা ব্যতিরেকে চলিয়া থাকে,—আপনা আপনি মনোমধ্যে বিভিন্ন ভাব বা চিন্তার উদয় হয়। নিজের স্বপ্ন ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে, দেখা যাইবে যে, তাহা সময়-সময় আমরা ইচ্ছামত চালনা করিয়া থাকি। আমি অনেক সময়েই নিজ ইচ্ছামত স্বপ্নের গতি ফিরাইতে পারিয়াছি; আমার মত আরও অনেকেই বোধ হয় ইহা পারেন। ইহা যেন কতকটা ইচ্ছা করিয়া স্বপ্ন দেখা। অনুভূতি ছাড়া এ অবস্থার ধারণা করা কঠিন। উপরে যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে বুঝা যাইবে, সাধারণতঃ স্বপ্ন ও জাগ্রত চিন্তাধারা পৃথক হইলেও, এমন অনেক অবস্থা আছে, যেখানে জাগরণ কি স্বপ্ন বুঝিয়া উঠা মহা মুস্কিল। স্বপ্নে দার্শন (visual) ব্যতীত অন্য প্রতিরূপের (imagery) অভাব হইলেও সুখ-দুঃখ-বোধের (feelings) কোনই অভাব নাই। শোক দুঃখ, সুখ আনন্দ, ক্রোধ ভয় ইত্যাদি সব রকম রাগ-বিকারই স্বপ্নে পাওয়া যায়;—যদিও অনেক সময়েই এগুলি নিতান্তই অসঙ্গত। ধরুন, স্বপ্নে বাঘ দেখিলাম; কিন্তু ভয় পাওয়া দূরের কথা, তাহার সহিত স্ফূর্ত্তিতে গল্প জুড়িয়া দিলাম। আবার স্বপ্নে কোন পরিচিত বন্ধুকে দেখিয়া হয় ত খুব ভয় করিতে লাগিল। আপাতঃ দৃষ্টিতে এই দুই ক্ষেত্রেই আমার স্ফূর্ত্তি ও ভয় অসঙ্গত। স্বপ্নের ঘোরে সময়ে-সময়ে কথা কহিতে বা চলিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। ইহাকে 'নিশিতে পাওয়া' বলে। আমার এক বন্ধু আছেন। তিনি ঘুমাইলেই কথা কহিতে থাকেন। এই কারণে তিনি বাসর-ঘরে বড়ই অপ্রতিভ হইয়াছিলেন। স্বপ্নাবস্থায় সব সময়েই যে চিন্তা-ধারা বিশৃঙ্খল হয়, তাহা নহে—অনেকে স্বপ্নে কঠিন অঙ্ক কষিয়াছেন, ইহা খুবই

জানা কথা। Coleridge স্বপ্নে তাঁহার বিখ্যাত কবিতা Kubla Khan লেখেন। দুঃখের বিষয় ইহা অসম্পূর্ণ। শুনিতে পাই, আমাদের রবীন্দ্রনাথও না কি স্বপ্নে কোন কোন কবিতা লিখিয়াছেন।* অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও স্বপ্নে প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বপ্নকে আমরা সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। (১) যে-সব স্বপ্নে কোনরূপ অসংলগ্নতা বা অস্বাভাবিকতা নাই। সাধারণ জাগ্রত চিন্তাধারার সহিত এই শ্রেণীর স্বপ্নের বাস্তবতঃ কোনই পার্থক্য দেখা যায় না। যেমন স্বপ্নে দেখিলাম আমি গড়ের মাঠে বেড়াইতে গিয়াছি। ইহাতে কোন অসম্ভব বা অস্বাভাবিক ভাব নাই। (২) যে সকল স্বপ্নে ভাবের অসংলগ্নতা না থাকিলেও বাস্তব-জীবনের সহিত কোন মিল নাই। ধরুন, স্বপ্নে দেখিলাম, আমি মরিয়া গিয়াছি। (৩) যে-সব স্বপ্ন একেবারে অস্বাভাবিক ও অদ্ভুত। যেমন, স্বপ্নে দেখিলাম একটা তিন-পা-ওয়ালা সাপ আমার সহিত কথা কহিতেছে। এই ধরণের স্বপ্ন ঘুম ভাঙ্গিবার পর অদ্ভুত ঠেকিলেও স্বপ্ন দেখার সময় তাহার অস্বাভাবিকত্ব প্রায়ই ধরা পড়ে না। ছোট ছেলের স্বপ্ন সাধারণতঃ প্রথম প্রকারের। অনেকে বলেন, অসভ্য জাতিদের মধ্যে বয়স্ক লোকের স্বপ্নও নাকি এইরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু এ বিষয়ে আমার নিজের কোনই অভিজ্ঞতা নাই। মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে, স্বপ্নকে আমরা নিদ্রাবস্থার চিন্তাধারা বলিতে পারি। এই চিন্তাধারার সহিত জাগ্রত চিন্তাধারার প্রভেদ কি, তাহা 'স্বপ্নের বিশিষ্টতা' প্রসঙ্গে আলোচনা করিব।

স্বপ্ন কেন হয়?

বৈজ্ঞানিক-জগতে 'কেন'র সদুত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। আগেই বলিয়াছি, স্বপ্ন নিদ্রাবস্থার চিন্তামাত্র। ঘুমন্ত অবস্থায় কেন আমরা চিন্তা করি, এ কথা জানিতে হইলে, জাগ্রত অবস্থার চিন্তার কারণও বুঝা দরকার। কিন্তু, এ প্রশ্নের সন্তোষজনক কোন উত্তরই আমার জানা নাই। সাধারণের বিশ্বাস, আমরা স্বপ্নে ভূত-ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পাই এই ইঙ্গিত আমাদের ব্যবহারিক জীবনে কার্যাকরী হয় সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিরা কিন্তু এ কথা মানিতে চাহেন না তাঁহাদের মতে স্বপ্ন অমূলক চিন্তামাত্র;—তাহার কোন কারণ থাকিতে পারে না। স্বপ্নের এই অমূলকতার জন্য অনেক মনস্তত্ত্ববিদ্‌ও ইহার কোন কারণ মানিতে রাজি নন। আমরা কেন স্বপ্ন দেখি, বোধ হয় ফ্রয়েডই তাহার একমাত্র সঙ্গত কারণ দেখাইতে পারিয়াছেন। তাঁহার মতে, আমাদের দৈনন্দিন অনেক কাজ, আর সেই সঙ্গে অনেক চিন্তাধারা সম্পূর্ণতা লাভ করে না; এই অসম্পূর্ণ চিন্তাধারাই স্বপ্নে পূর্ণতালাভের চেষ্টা করে। আমাদের যে-সকল ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই, বা হইবার পথে বাধা আছে, সেই-সব ইচ্ছা স্বপ্নে কাল্পনিকভাবে পরিতৃপ্ত হয়। কোন ইচ্ছা বা চিন্তা অসম্পূর্ণ থাকিলে মনে যে অশান্তির উদ্রেক হয়, স্বপ্নে কাল্পনিক উপায়ে তাহারই শান্তি হয়। মনের অশান্তি দূর করে বলিয়া স্বপ্ন নিদ্রার সহায়ক। ফ্রয়েড তাই স্বপ্নকে guardian of sleep বলিয়াছেন। সাধারণের ধারণা, স্বপ্ন দেখিলে নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। কিন্তু ফ্রয়েড-এর মত ঠিক উল্টা;—তিনি বলেন, নিদ্রার ব্যাঘাত থাকিলেই স্বপ্নের সৃষ্টি হয়, আর এই স্বপ্ন দেখার ফলেই সুনিদ্রা সম্ভব হইয়া থাকে। ধরুন, রামবাবু আপিসের কেরাণী। হাতে অনেক কাজ জমায় তাঁহাকে সাহেবের বকুনি ও লাঞ্ছনাভোগ করিতে হইয়াছে। তিনি ঘুমাইবার চেষ্টা করিলে কি হয়, আপিসের কাজকর্মের চিন্তাই বার-বার মনে আসিয়া, তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাইল। এই অবস্থাতেই তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, আপিসের সব কাজই তিনি সারিয়া ফেলিয়াছেন। সাহেব খুসী হইয়া তাঁহার মাহিনা বাড়াইয়া দিয়াছেন। এইরূপ স্বপ্ন দেখার ফলে রামবাবুর মনে শান্তি আসিল—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিদ্রাও সুগভীর হইল। তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি, এ ক্ষেত্রে স্বপ্নই সুনিদ্রার সহায়তা করিল। দারুণ গ্রীষ্মে নিদ্রা গিয়াছি; নিদ্রিত অবস্থায় বড়ই পিপাসা পাইল। ইহাতে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা; কিন্তু স্বপ্নে দেখিলাম, আমি আকণ্ঠ সরবৎ খাইতেছি। ইহার ফলে যে কাল্পনিক তৃপ্তি হইল, তাহাতে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিল না। অতএব এই কাল্পনিক [illegible] পারে। এই [illegible] স্বপ্ন

* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 'রাজর্ষি' উপন্যাসে মন্দির-সোপানে রক্তের কাহিনী ও শিশুর মুখে "এত রক্ত কেন?" কথাটি পরিচয় স্বপ্ন-দৃষ্ট। তাঁহার সর্বজন-পরিচিত 'বাজিছে বাঁশী, [illegible] [illegible] উপাখ্যানভাগ, এমন কি কাব্যাংশ পর্যন্ত স্বপ্নে প্রাপ্ত।

হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, স্বপ্ন নিদ্রার সহায়ক। অনেকে হয় ত বলিবেন, এমন অনেক স্বপ্ন আছে, যাহা দেখিলে ভয়ে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। এ অবস্থায় আপাতঃ দৃষ্টিতে স্বপ্নকে নিদ্রার ব্যাঘাতের কারণ বলিয়াই মনে হয়। ভয়ের স্বপ্ন সম্বন্ধে আমরা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিব। অনেক স্বপ্নেই আমাদের অতৃপ্ত ইচ্ছা সোজাসুজি ভাবে—যেমন তৃষ্ণায় জল খাওয়ার স্বপ্ন—চরিতার্থ না হইয়া, গুপ্তভাবে পরিতৃপ্ত হয়;—যথা রসগোল্লা খাইবার ইচ্ছা হওয়ায় স্বপ্নে দেখিলাম বাগবাজারে বেড়াইতে গিয়াছি। এরূপ স্বপ্নে কি ইচ্ছা পূর্ণ হইতেছে, তাহা বিশ্লেষণ ভিন্ন ধরা পড়ে না। ফ্রয়েড্ বলেন, আমাদের প্রত্যেক স্বপ্নেই কোন না কোন ইচ্ছা পূর্ণতা লাভের চেষ্টা করিতেছে। তাঁহার মতে, স্বপ্ন দেখার ফলে আমাদের দুইটি লাভ হয়। (১) মনের অনেক অসম্পূর্ণ ইচ্ছা কাল্পনিকভাবে পরিতৃপ্ত হইয়া মনে শান্তি আনে, ও (২) নিদ্রার ব্যাঘাত ঘুচাইয়া দেয়।

স্বপ্নের অর্থ কি?

স্বপ্নের অর্থ লইয়া অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা আছে। আগেই বলিয়াছি, কাহারও কাহারও মতে স্বপ্ন একেবারেই নিরর্থক। আমাদের দেশে কেহ কোন স্বপ্ন দেখিলে, তাহা গণকের নিকট ব্যক্ত করেন, আর গণক মহাশয় পাঁজিপুঁথি উল্‌টাইয়া তাহার অর্থ করিয়া দেন। সংস্কৃত গ্রন্থে স্বপ্নের ফলাফল ও অর্থ-নির্ণয়ের জন্য অনেক শ্লোক পাওয়া যায়। ঋগ্‌বেদ, অথর্ব্ববেদ, ও সামবেদের কোন কোন শ্লোকে স্বপ্নের বিবরণ পাওয়া যায়। আয়ুর্ব্বেদের মতে কতকগুলি স্বপ্ন নিরর্থক; আবার কতকগুলির শুভাশুভ ফল আছে। শাস্ত্রকারেরা বলেন, শুভ স্বপ্ন দেখিলে সে রাত্রে আর নিদ্রা না যাওয়াই উচিত। এরূপ করিলে স্বপ্নের শুভফল ফলিয়া থাকে। অশুভ স্বপ্ন দেখিয়া ঘুম ভাঙ্গিলে, পুনরায় না ঘুমানই ভাল। ঘোড়ায় চড়া, হাতিতে চড়া, বা পাহাড়ে উঠিবার স্বপ্ন দেখিলে ফল—অর্থলাভ। মানুষের মাংস আহার করার স্বপ্ন দেখিলে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ফলবতী হয়। স্বপ্নে পরিপূর্ণ জলপাত্র দেখিলে ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ। স্বপ্নে হাসিলে বরাতে দুঃখভোগ। মহিষে চড়িয়া দক্ষিণদিকে যাইবার স্বপ্ন দেখিলে মৃত্যু সুনিশ্চিত। দাঁত ভাঙ্গিবার স্বপ্ন দেখিলে অর্থনাশ [illegible]
[illegible]

আছে। বিলাতেও স্বপ্ন-তত্ত্ব লইয়া অনেক পুস্তক রচিত হইয়াছে; এই সব কেতাবে স্বপ্নের অর্থ দেওয়া আছে। বলা বাহুল্য, বৈজ্ঞানিক হিসাবে এরূপ ব্যাখ্যার বিশেষ কোনই মূল্য নাই।

ফ্রয়েড্‌ই সর্ব্বপ্রথম স্বপ্নের সঙ্গত ব্যাখ্যা নির্ণয়ের পন্থা আবিষ্কার করেন। বৈজ্ঞানিক ও মনস্তত্ত্ববিদ্ মহলে স্বপ্ন-ব্যাখ্যার এই উপায়ই ক্রমশঃ আদৃত হইতেছে। এই উপায়ের নাম Free Association Method বা অবাধ ভাবানুবন্ধ-প্রণালী। স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্ন দেখিবার পরই যত-শীঘ্র সম্ভব স্বপ্নটি লিখিয়া রাখেন। স্বপ্নের একটি বিশেষত্ব এই, তাহা অতি সহজেই আমরা ভুলিয়া যাই; তাই লিখিয়া রাখা দরকার। স্বপ্নদ্রষ্টাকে একটি নির্জ্জন ঘরে বিছানার উপর শোয়ান হয়। ব্যাখ্যাকারী তাঁহার মাথার কাছে কাগজ পেন্সিল লইয়া বসেন। প্রথমে স্বপ্নসম্বন্ধে দ্রষ্টা যে সকল সংবাদ দিতে পারেন, সেগুলি লেখা হয়। স্বপ্ন-সংক্রান্ত কোন ঘটনা বাস্তবিক ঘটিয়াছিল কি না, কেন স্বপ্নদর্শন হইল, স্বপ্নে দৃষ্ট ব্যক্তি কে কে, আর তাহাদের সহিত দ্রষ্টার সম্বন্ধই বা কি—এই সব সংবাদ এইরূপে প্রথমে জানা যাইবে। স্বপ্নদ্রষ্টাকে তারপর চোখ বুজিয়া একেবারে নিশ্চেষ্টভাবে শুইতে বলা হয়। স্বপ্নটি বড় হইলে, তাহাকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করা দরকার। দ্রষ্টাকে প্রথম হইতে এক একটি অংশ পর-পর শোনান হইয়া থাকে। প্রত্যেক অংশ শুনিবার পর, তাঁহার মনে কি কথা, বা কি ভাবের উদয় হয়, তাহা তাঁহাকে বলিতে হয়। দ্রষ্টাকে বিশেষ করিয়া বলা হয়, তিনি যেন কোন ভাব বা কথা রাখিয়া-ঢাকিয়া না বলেন; শ্লীল-অশ্লীল, উচিত-অনুচিত, আবশ্যক-অনাবশ্যক, সব কথাই যেমন মনে আসবে অকপটে বলিয়া যাইবেন। ব্যাখ্যাকারী সকল কথাই লিখিয়া লন। অনেক সময়ে দ্রষ্টার মনে এমন সব ভাব বা কথার উদয় হয়, যাহার সহিত আপাতঃ দৃষ্টিতে স্বপ্নের কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না। বিশেষ অভ্যাস না থাকিলে মনের এইরূপ নিশ্চেষ্টভাব আনা সহজ নহে। দ্রষ্টা ইচ্ছা করিয়া কোন কিছুই ভাবিতে পারিবেন না; যাহা মনে আসিবে, তাহাই বলিতে হইবে। মনের লাগাম একেবারে আলগা করিয়া দেওয়া দরকার। মনকে এরূপভাবে ছাড়িয়া দেওয়া যে কতটা শক্ত, পাঠক তাহা একবার

পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। মনের নিশ্চেষ্টতা না আসিলে স্বপ্নের ব্যাখ্যা পাওয়া অসম্ভব। স্বপ্নদ্রষ্টার জীবনের সমস্ত ঘটনা জানা না থাকিলে, অনেক সময়ে স্বপ্নের অর্থ বাহির করা কঠিন হইয়া পড়ে। মোট কথা, স্বপ্ন ব্যাখ্যা করা নিতান্ত সোজা নহে। দ্রষ্টার সম্বন্ধে সমস্ত খবর ও তাঁহার স্বপ্নের খাঁটি বিবরণ লইয়া, পরে অবাধ-ভাবানুবন্ধের (Free Association Method) সাহায্যে বিশ্লেষণ করিতে হইবে। এই প্রক্রিয়ায় বিশেষ ধৈর্য্য ও সময়ের দরকার।

পাঠকের হয় ত ধারণা, সঙ্কেত জানা থাকিলেই স্বপ্নের অর্থ করা সহজ ; আর স্বভাবতঃই তিনি এরূপ গোলমেলে প্রক্রিয়ার মধ্যে যাইতে রাজি হইবেন না। কিন্তু ধৈর্য্য-সহকারে কিছুদিন বন্ধুবান্ধবের স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিলে, তিনি যে মানুষের মনের অনেক নূতন নূতন তত্ত্ব জানিতে পারিবেন,—এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি। স্বপ্ন-বিশ্লেষণে অভ্যস্ত হইলে, এই কঠিন প্রক্রিয়ার সাহায্য ব্যতিরেকেও অনেক সময় স্বপ্নের মোটামুটি অর্থ বুঝা যায় সত্য ; কিন্তু ইহাতে ভুলের সম্ভাবনাই বেশি। দুইজন লোকের একই রকমের স্বপ্নের দুই রূপ অর্থ হওয়া বিচিত্র নয়।

ফ্রয়েড্ বলেন, অবাধ-ভাবানুবন্ধের (Free Association Method) সাহায্যে আমাদের মনের অনেক লুকানো ভাব ফুটিয়া বাহির হয় ; আর তাহা হইতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা সহজেই মনের ধারা ও স্বপ্নের অর্থ বুঝিয়া লইতে পারেন। স্বপ্ন খুব ছোট হইলেও তাহার সহিত মনের অনেক চিন্তাই যে বিজড়িত থাকে, তাহা এই উপায়ের সাহায্যে বেশ বুঝা যায়। স্বপ্নে যাহা দেখা যায়, ফ্রয়েড তাহার নাম দিয়াছেন—(Manifest Content) অর্থাৎ ব্যক্ত অংশ ; আর স্বপ্নের সহিত সংশ্লিষ্ট মনের যে সব চিন্তা বা গোপন ভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহাই (Latent Content) বা স্বপ্নের অব্যক্ত অংশ। এই অব্যক্ত অংশের সন্ধান না মিলিলে স্বপ্নের অর্থ বাহির করা অসম্ভব।

আমি একটি বাস্তব উদাহরণ দিয়া এই অবাধ-ভাবানুবন্ধ (Free Association Method) এবং স্বপ্নের ব্যক্ত ও অব্যক্ত অংশ (Manifest এবং Latent Content) ব্যাপারটা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

"ক" বাবু আমার বিশেষ বন্ধু। তিনি চিত্র-শিল্পী ও ফোটোগ্রাফার। তাঁহার পিতা সঙ্গতিপন্ন লোক। "ক" বাবুকে পয়সা রোজগারের কোন ভাবনাই ভাবিতে হয় না। কাজের মধ্যে কেবল খোস্‌খেয়ালে ফটোগ্রাফ্-তোলা, আর ছবি-আঁকা। তাঁহার একটি ষ্টুডিয়ো (Studio) আছে। "ক" বাবুর প্রকৃতি অতি নিরীহ ;—আমরা তাঁহাকে কখনও রাগিতে দেখি নাই। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমাকে তাঁহার একটা স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিতে বলেন। স্বপ্নটি জানিতে চাহিলে, তিনি বলিলেন,—'সম্প্রতি কোন স্বপ্ন দেখেছি বলে মনে হয় না। তবে মাস-তিনেক আগে একবার স্বপ্ন দেখেছিলাম—তা'র খানিকটা এখনও মনে আছে।' নিম্নে স্বপ্নটি ও তাহার বিশ্লেষণ দিলাম। কিন্তু এই বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ। বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিলে হয় তো স্বপ্নের আরও অনেক অর্থ বাহির করা সম্ভব হইত। "ক" বাবু আগে কখনও অবাধ-ভাবানুবন্ধ অভ্যাস করেন নাই। কাজেই প্রথম চেষ্টায় তাঁহার মনের গভীর প্রদেশের ভাব ধরা একরূপ অসম্ভব।

স্বপ্ন ঃ—"তে-তালার ষ্টুডিয়োর (চিত্রশালা) পশ্চিম দিক ভেঙ্গে পড়ে গেল।"

স্বপ্নটি খুবই ছোট ; কাজেই বিশ্লেষণের পক্ষেও সুবিধা-জনক। স্বপ্নের এই অংশটুকুই (Manifest Content) বা ব্যক্ত অংশ।

"ক" বাবুকে নিশ্চেষ্টভাবে শুইয়া, মন হইতে অন্য সব চিন্তা দূর করিয়া—কেবল স্বপ্নের দিকেই মন দিতে বলিলাম। তাঁহাকে আরও জানাইলাম, স্বপ্নের এক এক অংশ আমি তাঁহাকে শুনাইব ; আমার কথায় তাঁহার মনে যে যে ভাবের উদয় হইবে, তাহা যেন তিনি নির্বিচারে বলিয়া যান। আমি তাঁহার মাথার কাছে বসিয়া সব কথাই লিখিয়া লইলাম।

স্বপ্নটি আমি এই কয়টি ভাগে বিভক্ত করিয়া লইলাম ঃ—

(১) তেতালা
(২) ষ্টুডিয়ো
(৩) পশ্চিমদিক
(৪) ভেঙ্গে পড়ে গেল।

এক একটি অংশ তাঁহাকে শুনান হইলে তিনি যাহা-যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ ঃ—

(১) তেতালা ঃ—আমার বাড়ী; অ-বাবুর তিন-তালা বাড়ী; ফ-র বাড়ী; মুরারিপুকুর; দেশের বাড়ী; ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি; হাইকোর্ট, এস্প্লানেড, জল খাওয়া হয় নাই।

(২) ষ্টুডিয়ো ঃ—স্কাইলাইট্; বড়দাদার ছেলে; বড়দাদার স্ত্রী; টেবিল; কেমেরা; টালির ছাদ; সিঁড়ি; ঘোরান সিঁড়ি; বাবা; নদী; চরণ; বিনোদ দালাল; পূর্ণবাবু।

(৩) পশ্চিমদিক ঃ—ষ্টুডিয়ো; বাইরের দেওয়াল; কার্নিশ; ষ্টুডিয়োর পাশে রান্নার জায়গা; উত্তরদিকে ভাঙ্গা অর্দ্ধেক-তৈয়ারী বাড়ী: ক্রিশ্চানদের গোরস্থান; ডাক্তার ঘোষ, সারকুলার রোড; জে, সি, বোসের বাড়ী।

(৪) ভেঙ্গে পড়ে গেল ঃ—গোরস্থান বাড়ীর সামনে; ভাঙ্গা কবর; ছেলেগুলা খেলছে; ছাদের ওপর খোলা জায়গা; ফ—র বাড়ীর পাশে; বাবা দেশের বাড়ীতে।

সমস্ত স্বপ্ন :—"তেতালার ষ্টুডিয়োর পশ্চিমদিক ভেঙ্গে পড়ে গেল" :—দেখ্‌ছি যেন পড়ে গেছে। নীচের ঘরে বাবা আছেন—ঠিক নীচের ঘরে; পার্টিসান্ বারান্দায় ভেঙ্গে গেছে; উই-য়ে খেয়ে ফেলেছে; চৌবে নীচে বসে আছে; মাসীমার অসুখ; দিদিমার ঘর খালি; "ক"; ঢাকা; ওয়ারি; ধূলা; রাস্তা।

অবাধ-ভাবানুবন্ধের সাহায্যে এই ভাবগুলি পাইলাম বটে, কিন্তু আপাতঃ দৃষ্টিতে ইহা হইতে স্বপ্নের মানে বুঝার কোনই সুবিধা হইল না। পাঠক কিন্তু পরে দেখিবেন, এই সকল চিন্তা-ধারা প্রথম দৃষ্টিতে অসম্বদ্ধ ঠেকিলেও তাহার সমস্তটারই অর্থ আছে।

"ক"—বাবুকে চোখ খুলিতে বলিয়া যে ভাবগুলির সন্ধান পাইয়াছি, তাহার কতকগুলি লইয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলাম। এই প্রশ্নের ফলে এইরূপ জানা গেল :—

(১) আমার বাড়ী ঃ—বাবা বলিতেছেন, বাড়ী ভাড়া দিয়া দেশে চলিয়া এস। আমার যাইতে ইচ্ছা নাই। এই লইয়া বাবার সঙ্গে মনোমালিন্য হইয়াছে।

অ-বাবুর তেতালা বাড়ী ঃ—ইহাতে কারখানা হওয়ায় পাড়ায় একটা জঞ্জাল-বিশেষ হইয়াছে। আমাদের ঘর-দুয়ার, কাপড়-চোপড় ধোঁয়ায় ময়লা হয়। অ-বাবুকে বলিয়াও কোন প্রতীকার হয় না।

ফ-র বাড়ী ঃ—তুমি ত জান, এই বাড়ী আমি তৈরী করি; আর এই ব্যাপারে ফ-র সহিত পয়সা-কড়ি লইয়া আমার মনোমালিন্য ঘটে। আমাদের মধ্যে এখন এক রকম কথা বন্ধ।

মুরারিপুকুর ঃ—এখানে 'বোমা' হইয়াছিল। সে বাগান আমি দেখিয়াছি। ইহার নিকটে একটা জমি বায়না করিবার চেষ্টা করিতেছি। বেচিতে পারিলে কিছু লাভ হইবে।

দেশের বাড়ী ঃ—এর আর কি বলিব?

জল খাওয়া হইল না ঃ—আজ সারা দুপুর বেলা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি ও হাইকোর্টে কাটিয়াছে। সারাটা দিন কিছুই খাওয়া হয় নাই,—বড়ই কষ্ট হইয়াছে।

(২) ষ্টুডিয়ো, স্কাইলাইট্ ঃ—ঠিক অবস্থায় নাই। মেরামত করিতে হইবে।

বড় দাদার ছেলে ঃ—দুষ্টামি করিয়া টেবিল ফেলে জিনিষ ভাঙ্গিয়াছে।

বড়দাদার স্ত্রী ঃ—বাবার ও বাড়ীর আর সকলের অমতে বড়দাদা বিবাহ করিয়াছেন।

কেমেরা ঃ—বিক্রয় করিতে চাই।

টালির ছাদ ঃ—কিছু মনে পড়ে না।

সিঁড়ি, ঘোরান সিঁড়ি, বাবা ঃ—উঠিতে বড় কষ্ট; বাবা পড়িয়া না যান।

চরণ, বিনোদ দালাল, পূর্ণবাবু ঃ—জমির বায়না লইয়া বড়ই গোল বাধিয়াছে।

(৩) ষ্টুডিয়ো, বাইরের দেওয়াল ঃ—মেরামত করা দরকার।

ষ্টুডিয়ো, পাশে রান্নার জায়গা, উত্তরদিকে ভাঙ্গা অর্দ্ধেক-তৈয়ারী বাড়ী, ক্রিশ্চানদের গোরস্থান, ডাক্তার ঘোষ, ইত্যাদি :—কিছুই মনে পড়ে না।

(৪) "ভেঙ্গে পড়ে গেল"—বাবা ঠিক নীচের ঘরেই থাকেন, ষ্টুডিয়ো ভাঙ্গলে তিনিই চাপা পড়বেন;

গোরস্থান, বাড়ীর সামনে ভাঙ্গা কবর ; ইত্যাদি :—বিশেষ কিছু মনে পড়ে না।

উপরে যতগুলি ভাব পাওয়া গেল, তাহার সমস্তটাই স্বপ্নের Latent Content বা অব্যক্ত অংশ। অনেকে বোধ হয় এখনও স্বপ্নের অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু স্বপ্নদ্রষ্টার মনের যে ইচ্ছা এই স্বপ্নে ফুটিয়াছে, তাহা অনেকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণে অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট তাহার অর্থ সহজেই ধরা পড়ে। পাঠক অবাধ-ভাবানুবন্ধে (১) চিহ্নিত অংশ পুনরায় পাঠ করিলে দেখিবেন, তাহার সমস্তটার মধ্যেই একটা ঝগড়া, গোলমাল ও কষ্টের ভাব বর্ত্তমান। বাপের সঙ্গে গোলমাল; ফ-বাবু, ম-বাবু, ইত্যাদির সহিত গোলমাল; হাইকোর্ট ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে কষ্ট ইত্যাদি।

২য় অংশে বিরোধের ইঙ্গিত। দাদার সহিত বাবার বিবাদ ; দালালের সহিত মতভেদ ইত্যাদি। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, এই অংশে বাবার সিঁড়ি হইতে পড়িয়া যাইবার আশঙ্কার কথা আছে।

৩য় অংশে ভাঙ্গা দেওয়াল, ভাঙ্গা বাড়ী ও কবরের কথা। ইহাতে একটা মৃত্যুর ইঙ্গিত রহিয়াছে।

৪র্থ অংশে "ক" বাবুর চিন্তা-ধারা বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। "বাবা ঠিক নীচের ঘরেই থাকেন, ষ্টুডিয়ো ভাঙ্গিলে চাপা পড়িবেন।' ইহার পরেই পুনরায় "কবরের" কথা। এই চিন্তাধারার মধ্যে বাপের মৃত্যুর ইঙ্গিত বর্ত্তমান।

প্রথম অংশে বাপের সহিত কলহ, দ্বিতীয় অংশে দাদা বাবার বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিয়াছেন, তৃতীয় অংশে কবরের ইঙ্গিত, চতুর্থ অংশে বাবা চাপা পড়িয়াছেন এবং পুনরায় কবরের কথা।

ফ্রয়েডের মতে আমাদের প্রত্যেকের ভিতর অনেক অসামাজিক ও অন্যায় ইচ্ছা আছে। এই সকল ইচ্ছা রুদ্ধ অবস্থায় থাকায় সহজে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। আমরা তাহাদের অস্তিত্বও জ্ঞাত নহি। এই রুদ্ধ ইচ্ছাগুলিই স্বপ্নে কাল্পনিক পরিতৃপ্তি লাভের চেষ্টা করে। বাপের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসার ইচ্ছাও যেমন আমাদের সকলের মধ্যে আছে, সেই সঙ্গে আবার বাপের উপর একটা বিরুদ্ধভাবও আমাদের মনের মধ্যে থাকে। বড় লোকের মধ্যে 'বাপ মরুক' এই ভাবটা অনেক সময় ফুটিয়া বাহির হয়। পিতাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন লাভের দৃষ্টান্তও ইতিহাসে বিরল নহে। জানোয়ারদের মধ্যেও বাপ-বেটায় ঝগড়া স্বাভাবিক। আদিম যুগ হইতে মানুষ মাত্রেরই মধ্যে এই বিরোধের ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে; কেবল সুযোগ-সুবিধা পাইলেই তাহা আত্মপ্রকাশে সচেষ্ট হয়। এই বিরোধ-ভাবটা মনের মধ্যে রুদ্ধ থাকায়, তাহার অস্তিত্ব আমরা সহজে ধরিতে পারি না; আর কেহ ধরাইয়া দিলেও সহজে মানিতে চাহি না। কিন্তু ইহার অস্তিত্বের পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়াও কঠিন নহে। বাপের প্রতি যথেষ্ট ভালবাসা থাকা সত্বেও মনের অজ্ঞাতে তাঁহার প্রতি শত্রুভাব থাকা যে বিচিত্র নহে, "ক" বাবুর স্বপ্নে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। স্বপ্নে তিনি পিতার মৃত্যু কামনা করিতেছেন। এরূপ সোজা স্বপ্নের যে এমন বাঁকা অর্থ হইতে পারে, তাহা কেহই চট্ করিয়া বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না। কিন্তু বিভিন্ন স্বপ্ন হইতে এরূপ চিন্তাধারার অস্তিত্ব বারবার বাহির করিতে পারিলে, স্বপ্নের ঐরূপ অর্থ অস্বীকার করিবার আর উপায় থাকে না। "ক" বাবুও স্বপ্নের এইরূপ অর্থ শুনিয়া ঘোর আপত্তি করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—'ইহা গাঁজাখুরী, বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য।' তিনি আবার না কি বাপের মৃত্যু কামনা করিতে পারেন। আমি তাঁহাকে বুঝাইলাম, জ্ঞাতসারে এইরূপ ইচ্ছা তাঁহার মনে উঠিতেছে না—অজ্ঞাতসারেই উঠিতেছে। "ক" বাবু খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—'আশ্চর্য্য! আমার এখন বেশ মনে পড়িতেছে, আমি আগে একবার বাবার মৃত্যুস্বপ্ন দেখিয়াছি।" আমি তাঁহাকে আরও স্মরণ করাইয়া দিলাম, স্বপ্নের কথা উঠিতেই তিনি প্রিয়জনের মৃত্যুর স্বপ্ন দেখি কেন—তাহার কারণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এই প্রশ্নের পরই ষ্টুডিয়ো স্বপ্নের কথা তাঁহার মনে পড়িয়াছিল। ভাবিয়া দেখিলে পাঠক বুঝিবেন, অবাধ ভাব-প্রভাবে যে সকল ভাব আগে একেবারেই অসংলগ্ন ঠেকিতেছিল, তাহার সবগুলিই একই চিন্তার দ্বারা চালিত। পাঠক আপত্তি করিতে পারেন, এইরূপ মিল আকস্মিক। কিন্তু তিনি গুটিকয়েক স্বপ্ন এই উপায়ে বিশ্লেষণ করিলে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এইরূপ আশ্চর্য্য মিলের সন্ধান পাইয়া, স্বপ্নের অর্থকে আর গাঁজাখুরি বলিতে ভরসা করিবেন না।

আমাদের মনের মধ্যে যে সব বৃত্তি রুদ্ধ আছে, সেগুলির সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকিলে তবে স্বপ্ন-বিশ্লেষণের সুবিধা হয়। সুপ্ত চিন্তার ইঙ্গিত না পাইলে স্বপ্নের অর্থ বাহির করা দুরূহ।

প্রসঙ্গ কিছু অবান্তর হইলেও অবাধ-ভাবানুবন্ধ-প্রণালী সম্বন্ধে আমি আরও কিছু বলিতে চাহি। মনের অনেক অজ্ঞাত ভাব যে এই উপায়ে জানা যাইতে পারে, এ কথা প্রথমে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু যে কেহ পরীক্ষা করিয়া, ইহার সত্যাসত্য যাচাই করিতে পারেন। কোন বিষয় ভুলিয়া যাইলে, বা কোন বিশেষ ঘটনা মনে করিতে না পারিলে, অবাধ-ভাবানুবন্ধের সাহায্যে সময়ে-সময়ে তাহা বাহির করা যাইতে পারে; তাহার ফলে এই প্রক্রিয়ার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধেও সন্দেহ থাকে না। অবাধ চিন্তায় যে সকল ভাব পর-পর মনে উদিত হয়, আপাতঃ-দৃষ্টিতে সেগুলি বিচ্ছিন্ন বোধ হইলেও, মনে রাখিতে হইবে, সঙ্গত কারণ ভিন্ন উহা মনে আসে নাই। একটি উদাহরণ দিতেছি। কিছুদিন আগে বোলপুরে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার একটি চাকর ছিল। নামটা তাহার অদ্ভুত। নামটা আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকিলেও খানিকক্ষণ পরেই আমি তাহা ভুলিয়া যাই। রাত্রে কথাপ্রসঙ্গে চাকরটির কথা উঠিলে, কিছুতেই তাহার নাম মনে আসিল না। আমি অবাধ চিন্তার সাহায্যে নামটা বাহির করিব—সাব্যস্ত করিলাম। মনকে নিষ্ক্রিয় করিয়া, যাহা কিছু মনে আসিতে লাগিল, লিখিয়া লইলাম। প্রথমে মনে পড়িল—'বশিষ্ঠ', তাহার পর 'ইন্দ্রজিৎ'। এই দুইটা নাম মনে আসিলেও বুঝিলাম, দুইটার একটাও ঠিক নাম নহে। কিন্তু তবুও কথা দুইটি লিখিয়া রাখিলাম। তাহার পর মনে আসিল—'যোগেশ্বরী'। কেন যে এরূপ অদ্ভুত কথা মনে উদিত হইতেছে বুঝিতে না পারিলেও, সব নামগুলিই কিন্তু বারবার মনে আসিতে লাগিল। এত করিয়াও চাকরের নাম স্মরণ করিতে না পারায়, বিরক্ত হইয়া চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইলাম। ঠিক করিলাম, কাল নামটা জিজ্ঞাসা করিয়া লইব। পরদিন সকাল-বেলা নামটা শুনিবামাত্রই মনে হইল—হাঁ, মুনিশ্বরই বটে। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, প্রথমেই আমার মনে পড়িয়াছে,—'বশিষ্ঠ'—মুনিদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ মুনি। মুনিশ্বরের 'নি'-এর অভাব ইন্দ্রজিতের 'ইন'-এ আছে। কেবল উল্টাইয়া গিয়াছে মাত্র। তারপর 'মুনিশ্বরের' 'ঈশ্বর' 'যোগেশ্বরীতে' আসিয়া পড়িয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, যে সব চিন্তা প্রথমে অসম্বদ্ধ মনে ঠেকিয়াছিল, তাহার মধ্যেও একটা শৃঙ্খলা আছে। পাঠক ইহাকে আকস্মিক মনে করিতে পারেন; কিন্তু যদি বারবার এরূপ ঘটিতে দেখা যায়, আর বহুসংখ্যক লোক যদি এ বিষয়ের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেন, তবে জিনিষটাকে আর হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না; আর এরূপ অর্থ বাহির করাকেও কষ্টকল্পনা বলা চলে না। এই কারণেই স্বপ্নের অর্থ বাহির করিতে হইলে অবাধ-ভাবানুবন্ধের আবশ্যকতা। কখনও কখনও দেখা যায়, এই প্রক্রিয়ায় ব্যাপৃত হইলে চিন্তার ধারা আর থামিতে চায় না। এরূপ ক্ষেত্রে জোর করিয়া চিন্তাকে থামাইয়া দিতে হয়। কিন্তু, কি অবস্থায় থামাইতে হইবে, তাহা অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ। সাধারণতঃ, যখনই পরীক্ষাধীন ব্যক্তির চিন্তা পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে চালিত হয়, তখনই বন্ধ করা উচিত। আমার একটি বন্ধুকে 'কুকুর' কথাটি শুনাইলাম। তাঁহাকে অবাধ ভাবপ্রবাহে মনকে ছাড়িয়া দিতে বলিলাম। নিম্নে তাঁহার চিন্তার ধারার নমুনা দেওয়া গেল :—

"ব্যাঙ খায়, নেমন্তন্ন যায়, গঙ্গার ঘাটে, সূর্য্যগ্রহণ, খুব ভিড় হয়েছে, গাড়ী গিয়েছিল, ঠাকুরের কাছে ভিড় হয়েছিল; আপিস সাইকেল করে আসছে, সুকিয়া ষ্ট্রীট, এমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়, ঘোড়ার গাড়ীর আড্ডা—অনেক গাড়ীর আস্তানা; জল জমেছে রাস্তায়। 'বরফ বিক্রী', আলোটা মিটমিটে; সাপে ব্যাঙ খায়, কাবাব রুটী, জুতার দোকান, জুতা কিনতে হবে।"

উপরিলিখিত, বন্ধনী-মধ্যগত 'বরফ বিক্রী' কথাটি মনে পড়িবার কারণ—সেই সময় রাস্তা দিয়া কুল্পি-বরফওয়ালা হাঁকিয়া যাইতেছিল। চোখ বন্ধ—কাজেই ঘরের আলো পরীক্ষাধীন ব্যক্তির কাছে ম্লান বোধ হওয়ায় তিনি সেইরূপই বলিয়াছিলেন। এই পরীক্ষার একটু আগেই আমার আর এক বন্ধু বলিয়াছিলেন যে, বারান্দায় ব্যাঙ আসিয়াছে। আমরা দেখিতেছি, 'বরফ' কথার পর হইতেই পরীক্ষাধীন ব্যক্তির চিন্তাধারা আশপাশের জিনিষ ও সেই সময়কার প্রত্যক্ষের দিকে

গিয়াছে। সুতরাং এইখানেই ভাব-প্রবাহ থামান উচিত। বেশির ভাগ জায়গায় পরীক্ষাধীন ব্যক্তি নিজেই চুপ করেন; বলেন, আর কিছুই তাঁহার মনে আসিতেছে না। অভিজ্ঞ ব্যক্তি অবাধ-ভাবানুবন্ধের সময় অবান্তর বিষয় আসিলেই তাহা ধরিতে পারেন। এখানে পরীক্ষাধীন ব্যক্তির প্রথম চিন্তাই 'ব্যাঙ খায়'—এই পরীক্ষার পূর্ব্বেই ব্যাঙের কথা হইতেছিল; দেখা যাইতেছে তিনি তাহা তখনও ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার মন তখনও সম্পূর্ণ নিস্ক্রিয় হয় নাই। পরীক্ষাধীন ব্যক্তির এই প্রথম অবাধ ভাবানুবন্ধের চেষ্টা। তিনি খবরের কাগজে একটু আগেই সূর্য্যগ্রহণ ও বন্যার কথা পড়িতেছিলেন, এই সকল চিন্তাই মনে উঠিয়াছে। অবাধ-ভাবানুবন্ধ হিসাবে এই পরীক্ষাটীর মূল্য অল্প, কারণ পরীক্ষাধীন ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট হন নাই দেখা যাইতেছে। দিনকতক অভ্যাসের পর এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে মনের অন্তঃস্থলের অনেক সুপ্ত চিন্তা-ধারারই সন্ধান পাওয়া যায়। নূতন ব্রতীর প্রথম অবাধ-চিন্তায় বিশেষ ফললাভ নাও হইতে পারে।

এইবার ক-বাবুর স্বপ্নে পুনরায় ফিরিয়া আসিব। আমরা তাঁহার স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলাম, তিনি পিতার মৃত্যুকামনা করিতেছেন। অন্যান্য স্বপ্ন-বিশ্লেষণের ফলেও দেখা যায়, তাহার ভিতর একটা না একটা রুদ্ধ ইচ্ছা চরিতার্থ হওয়ার চেষ্টা আছে। অবশ্য এ পরিতৃপ্তি কাল্পনিক। ফ্রয়েড বলেন, সকল স্বপ্নেই কোন না কোন ইচ্ছার কাল্পনিক পরিতৃপ্তি-সাধন দেখিতে পাওয়া যায়। স্বপ্নের অর্থ কি, এতক্ষণে আমরা তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ পাইলাম। তৃষাতুর জল খাওয়ার স্বপ্ন দেখে, অজীর্ণরোগী দেখে—ভোজ খাওয়ার স্বপ্ন। ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া আমরা সময়ে সময়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখি। সব সময় কিন্তু সোজাসুজি ভাবে এই সকল রুদ্ধ ইচ্ছার কাল্পনিক তৃপ্তি হয় না। "ক" বাবু যদিও একবার পিতার মৃত্যু-স্বপ্ন সোজা-সুজি ভাবে দেখিয়াছেন, তথাপি আমাদের আলোচ্য উদাহরণে সেই ইচ্ছা বিকৃত ভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে। এই বিকৃতি কেন হয়, কিরূপে হয়—ফ্রয়েড তাহারও আলোচনা করিয়াছেন। বারান্তরে সে কথা বলিব।

অমূল তরু

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(৬)

প্রত্যহই বৈকালে সুবোধের মন ঝামাপুকুরের বদ্ধ মেস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া বাগবাজারের গৃহবিশেষে উপনীত হইত। তথায় সুনীতি তাহার অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য লইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইত, এবং তাহার সুমিষ্ট হাস্যে এবং সুমধুর বাক্যে বিমুগ্ধ হইয়া সুবোধ বসিয়া থাকিত। এইরূপ একটা কল্পিত দিবাস্বপ্নে তাহার কাব্য-ভূষিত হৃদয় প্রত্যহ মগ্ন হইয়া যাইত—এবং সন্ধ্যা-সমাগমের সহিত অবাস্তব কল্পনার অসারতায় যখন তাহার মনে সূক্ষ্ম নৈরাশ্য ব্যথা দিত, তখন কিন্তু এ কথা ভাবিয়া সে মনে-মনে সান্ত্বনা লাভ করিত যে, সেদিন বাগবাজারে যাওয়া হইল না বলিয়া পরদিন তথায় যাইবার পক্ষে তাহার অধিকার বাড়িয়া গেল।

পাঁচ-ছয় দিন পরে একদিন অপরাহ্নে সুবোধ প্রত্যহেরই মত মনে-মনে সঙ্কল্প করিতেছিল যে, আজ নিশ্চয়ই সমস্ত লজ্জা এবং সঙ্কোচ অতিক্রম করিয়া বাগবাজারে বেড়াইতে যাইবার জন্য বিনোদকে অনুরোধ করিবে। এমন সময়ে বিনোদ স্বয়ং উপস্থিত হইল, এবং হাসিয়া কহিল, "তোমার নিমন্ত্রণ এসেছে সুবোধ—পড়ে দেখ।" বলিয়া খামে মোড়া একখানা চিঠি সুবোধকে দিল।

সুবোধ উদ্বেগ-ব্যাকুল হৃদয়ে তাড়াতাড়ি চিঠিটা খুলিয়া উল্টাইয়া দেখিল, লেখিকা সুনীতি।

"পড়ব ?"

সস্মিত মুখে বিনোদ কহিল, "পড়বার জন্যই ত' দিলাম,—তোমার ত' অধিকার আছে পড়বার।"

সুবোধ একবার ত্বরিতবেগে চিঠিটার উপর দৃষ্টি বুলাইয়া গেল। তাহার পর ধীরে-ধীরে সমস্তটা পাঠ করিয়া বিনোদের হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "সত্যি বলছি বিনোদ, তোমার ওপর হিংসা হয়—এমন শ্যালী পাওয়া অনেক সৌভাগ্যের কথা—এঁরি বোন ত' তোমার স্ত্রী!"

বিনোদ সহাস্য মুখে কহিল, "তা বটে। কিন্তু তোমাকে হিংসা করবারও ত' কম কারণ নেই, সুবোধ! বন্ধুর শ্যালী পাওয়াও ত' কম সৌভাগ্যের কথা নয়। এমন ত' আমার অনেক বন্ধু——"

বিনোদকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই সুবোধ কহিল, "না,—না, বিনোদ, ফাজ্‌লামী কোরো না। তোমার শ্যালী এ সব রসিকতার অনেক ওপরে।"

বিনোদ একটু শান্ত অথচ দৃঢ় ভাবে কহিল, "ফাজ্‌লামী নয় সুবোধ, এ বাস্তবিকই সত্যি কথা। এখন বেশ বুঝতে পারছি, তোমার কাব্য-চর্চ্চা একটুও বৃথা যায় নি—তপস্বীর অযত্ননিহিত শক্তির মত তোমার মধ্যেও কাব্য-তপস্যার ফলে এমন একটা অলক্ষ্য শক্তি জন্মগ্রহণ করেছে, যার সমুখে আমার শ্যালীর মত এমন একটি দৃঢ় হৃদয়ও শিথিল হয়ে আস্‌ছে।"

সুবোধ মনে-মনে যথেষ্ট আপ্যায়িত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দৃঢ় কেন ?"

বিনোদ হাসিয়া কহিল, "কেন, তা বলতে পারি নে। কিন্তু সে ভারি দৃঢ়। অনেক তীক্ষ্ণ অস্ত্র বর্ষণ করা হয়েছে, কিন্তু কেউ তাকে ভেদ করতে পারে নি,—এখন তুমি যদি পার। তা সে সব বাজে কথা যাক্—তুমি যাচ্ছ কি না বল ?"

মনের দুর্দ্দমনীয় আবেগ অতি কষ্টে রোধ করিয়া সুবোধ বলিল, "চিঠিখানা আর একবার দেখি—আমার যাবার কথা স্পষ্ট ভাবে লেখা আছে কি ?"

বিনোদ পত্রখানা প্রদান করিয়া কহিল, "স্পষ্ট কি অস্পষ্ট বিচার করেই দেখ।"

কোন একটা বিশেষ কথা এবং পরামর্শের জন্য রতনময়ী বিনোদকে ডাকিয়াছেন, ইহাই পত্রের প্রধান মর্ম্ম। অপরাপর দুই-একটা কথার মধ্যে পত্রের শেষদিকে সুবোধের বিষয় দুই-তিন ছত্র এইরূপ লেখা ছিল;—"আপনার বন্ধু সুবোধবাবু বোধ হয় ভাল আছেন। ভারি চমৎকার লোক! এমন সুমার্জ্জিত রুচির ভদ্রলোক কদাচিৎ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তাঁর যদি অসুবিধা না হয় ত' আস্‌বার সময়ে তাঁকেও ধরে নিয়ে আসবেন।" পত্রের শেষে সুবোধকে চিঠি দেখাইবার বিষয়ে নিষেধ-আদেশও ছিল।

সুবোধ উল্লিখিত অংশ বারম্বার পড়িতেছে দেখিয়া বিনোদ কহিল, "মুখস্থ করে আর কি হবে? সার্টিফিকেটটা না হয় তুমিই রেখে দাও, ভবিষ্যতে সময়ে-অসময়ে কাজে আস্‌তে পারে।"

সুবোধ উৎফুল্ল হইয়া কহিল, "আমি রাখব ?"

"রাখ, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা যেন কোরো না। চিঠির শেষে দেখেছ ত' তোমাকে দেখাবার পক্ষেও কি রকম কড়া হুকুম আছে।"

সুবোধ আর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া চিঠিখানা পকেটে পুরিয়া ফেলিল, এবং অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে উভয়ে সজ্জিত হইয়া বাহির হইয়া গেল।

শ্বশুরালয়ে পৌঁছিয়া পূর্ব্বদিনের মত সুবোধকে বাহিরের ঘরে বসাইয়া বিনোদ ভিতরে প্রবেশ করিল। সেদিনকার মত বৈঠকখানার দ্রব্য-সামগ্রী আজ অবিন্যস্ত ছিল না। সুবোধ চাহিয়া-চাহিয়া দেখিল, আজ সর্ব্বত্রই একটা পারিপাট্য এবং যত্নের ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। টেবিলের উপর দ্রব্যাদি অসজ্জিত নাই; তথায় একটি সুদৃশ্য ফুলদানীতে সদ্য-প্রস্ফুটিত গোলাপের তোড়া শোভা পাইতেছে। ফরাসের উপর একটি পরিচ্ছন্ন চাদর পরিষ্কার করিয়া পাতা। তাহার উপর তিন-চারিটি সদ্য-ধৌত আচ্ছাদন-পরিহিত তাকিয়া। আলমারীতে বইগুলি শৃঙ্খলার সহিত সজ্জিত। সর্ব্বত্র যত্ন ও মনোযোগের চিহ্ন পরিস্ফুট। এ সকল যে তাহারই আগমনের আশায় হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সুবোধের কোন সন্দেহই হইল না। এমন কি, এ আশ্বাসও তাহার মনে-মনে হইল যে, শুধু গৃহের দাসদাসীর দ্বারাই এ রূপান্তর ঘটে নাই,—বিশেষ দুটি পদ্মহস্তের স্পর্শেই এগুলি এমন সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে।

এইরূপ সরস কল্পনা-স্রোতে সুবোধের মন মগ্ন হইবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময়ে বালিকাবেশী যোগেশকে লইয়া বিনোদ কক্ষে প্রবেশ করিল।

যোগেশ যুক্ত-করে সুবোধকে নমস্কার করিয়া স্মিত মুখে কহিল, "ভাল আছেন সুবোধবাবু?"

সুবোধ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিয়া কহিল, "আপনি ভাল আছেন ত?"

যোগেশ কোনও উত্তর দিবার পূর্ব্বেই বিনোদ কহিল, "এ নিরর্থক প্রশ্নোত্তরের কোনও প্রয়োজন নেই; যেহেতু উভয়ের মধ্যে কারুকেই অসুস্থ দেখাচ্ছে না।"

সুবোধ হাসিয়া কহিল, "চোখে কি সব জিনিসই ঠিক দেখা যায় বলে তুমি মনে কর? জ্ঞানার্জ্জনের জন্যে চোখের দ্বারা আমরা একটা স্থূল সাহায্য পাই মাত্র।"

বিনোদ বলিল, "কিন্তু এই রক্তমাংসের স্থূল দেহের জন্যে স্থূল চক্ষুই যথেষ্ট। শুধু যথেষ্ট নয়, প্রচুর। তবে তিন শ্রেণীর জীব আছে যারা চর্ম্মচক্ষুর উপর একটি মর্ম্মচক্ষু বসিয়ে অনেক বেশী জিনিস দেখ্‌তে পায়; তারা হচ্ছে কবি, প্রেমিক আর দার্শনিক। তুমি হচ্ছ প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত; দ্বিতীয় শ্রেণীতেও হয়ত' প্রবেশ কর্‌তে সুরু করেছ, অতএব তুমি কতকটা অন্ধ, এবং সেই জন্যই সাধারণ চক্ষুর উপর তোমার আস্থা নেই।"

বিনোদের কথার শেষাংশ শুনিয়া সুবোধের মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল, কিন্তু তখনি সম্বৃত হইয়া সে কহিল, "তোমার যুক্তিটা ত' ঠিক হোল না ভাই। অসাধারণ চক্ষু আমার নেই বলেই ত' ওঁর মুখ থেকে ওঁর শারীরিক কুশল জেনে নিতে চাচ্ছিলাম। অতএব দেখা যাচ্ছে, তোমার তিন শ্রেণীর মধ্যে কোনও শ্রেণীতেই আমি পড়ি নে।"

বিনোদ সহাস্য মুখে যোগেশকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিল, "তুমি এ কথার সাক্ষী রইলে সুনীতি। আমি বলছি, সুবোধ আমার শ্রেণীগুলির মধ্যে একটিতে নয়, দুটিতে নয়, তিনটিতেই পড়ে। আর একটু ঘনিষ্ঠতা হলেই তুমি দেখ্‌বে, সে একজন মস্ত কবি। তার পর আরও কিছুদিন ঘনিষ্ঠতার পর দেখ্‌বে, সে আমার দ্বিতীয় শ্রেণীতেও অধিষ্ঠিত হয়েছে। তার পর যেদিন জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হবে, সে দিন সে দেখবে, কিছুই কিছু নয়,—সমস্তই মায়া। সে দিন দেখবে সুবোধ একজন সুগম্ভীর দার্শনিক।"

এবার সুবোধের মুখ আরও রঞ্জিত হইয়া উঠিল; কিন্তু সে শুধু লজ্জা এবং সঙ্কোচে নহে, বিরক্তিতেও। এক-জন বয়স্কা বালিকাকে জড়িত করিয়া তাহারই সম্মুখে এরূপ রসিকতা করা অতিশয় অসমীচীন বলিয়া তাহার মনে হইল। কিরূপ ভাবে প্রতিবাদ করিলে অশোভনতাকে আরও পরিস্ফুট করা হইবে না, তাহা বুঝিতে না পারিয়া সুবোধ নিরুত্তর হইয়া রহিল। যোগেশ লজ্জাহত বালিকার মত নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল এবং দ্বারান্তরালে অবস্থান করিয়া যে দুইটি প্রাণী প্রচ্ছন্ন থাকিয়া গৃহাভ্যন্তরের অভিনয় দর্শন ও শ্রবণ করিতেছিল, তাহারা সকৌতুক বিস্ময়ে পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

সুমতি বলিল, "বিনোদ বলতে আর বাকি রাখলে কি? সবই ত' বলে দিলে! সুবোধ বাবুকে বিনোদ যে অন্ধ বলেছিল, তা মিছে বলে নি দেখছি!"

সুনীতি কহিল, "শুধু কি অন্ধই? বধিরও! শেষের কথাগুলো কি কাণেই গেল না!"

সুমতি হাসিয়া কহিল, "তৃতীয় গুণটিও আছে। এখন একেবারে বোবা!—মুখে কথাটি নেই।"

সুবোধকে নির্ব্বাক থাকিতে দেখিয়া বিনোদ হাসিয়া কহিল, "কি হে, ভাবছ কি? আমি যা বলেছি, তা একেবারে অকাট্য। তার আর জবাব নেই।"

সুবোধ হাসিয়া কহিল, "আমি তার জবাব ভাবছি নে ভাই। আমি ভাবছি তোমার জন্যে একটা চতুর্থ শ্রেণী তৈরী করা দরকার। কবিদের কথার সংযম নেই শোনা যায়। কিন্তু তোমার মত অকবির যখন কথার এত অসংযম, তখন তোমাকে চতুর্থ শ্রেণীতে ফেলা গেল,—অর্থাৎ তুমি একটা পাগল।"

বিনোদ হাসিয়া কহিল, "এ চতুর্থ শ্রেণী তুমি আজ করনি সুবোধ,—এ তুমি অনেক দিন আগেই করেছ; আর এর ভেতর শুধু আমাকেই পোর নি—সারা দেশটা পুরেছ!"

দ্বারান্তরালে মৃদু হাস্যধ্বনি শুনা গেল।

যোগেশের দিকে চাহিয়া সুবোধ স্মিত মুখে কহিল, "আমাদের দুই বন্ধুর বকযা লড়াইয়ে আপনি অনেক কথা জানতে পারবেন। এ কথা বোধ হয় আপনি জানতেন না যে, আপনাদের জামাইটী কবিতা লিখে থাকেন?"

যোগেশ মৃদু হাসিয়া কহিল, "না; তা ত জানতাম না।"

বিনোদ কহিল, "কবিতা শুনলে ক্ষেপি নে, কবিতা কামড়ালে ক্ষেপি। আমার একটি বিলাত-ফেরৎ বন্ধু আছে—মিষ্টার চ্যাটার্যি! তার সঙ্গে তোমার যদি আলাপ হয়, তা'হলে বোধ হয় একদিন হাতাহাতি হয়ে যায়। সে কি বলে জান? সে বলে, শিক্ষিত লোকের প্রলাপ হচ্ছে কবিতা। সে বলে, ফুলোর বাতাস দিয়ে পৃথিবী থেকে যদি কোন জিনিস বিদায় করতে হয়—ত সে কাব্য-সাহিত্য।"

সুবোধ উৎফুল্ল হইয়া কহিল, "তোমার বিলেত-ফেরৎ বন্ধুর আর বেশী পরিচয়ের দরকার নেই; যা দিয়েছ, তাই যথেষ্ট।"

বিনোদ কহিল, "কিন্তু মনে করো না, সে একটা যা' তা' লোক। সে কেম্‌ব্রিজের এম-এ। তার মত শিক্ষিত, মার্জ্জিত লোক আমাদের দেশে খুব বেশী নেই।"

সুবোধ হাসিয়া কহিল, "সেটা আমাদের দেশের পরম সৌভাগ্য! তাঁর মত একগণ্ডা লোক আমাদের দেশে থাকলে, দেশের জল বাষ্প হয়ে আকাশে উবে যেত।"

বিনোদ কহিল, "আচ্ছা, একদিন তার সঙ্গে তোমার পরিচয় ঘটিয়ে দিই। তার পর যা বলতে ইচ্ছা হয়, বোলো। কিন্তু দোহাই, দুজনে যেন গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ কোরো না।" বলিয়া যোগেশের দিকে চাহিয়া কহিল, "কি বল সুনীতি, একদিন মিষ্টার চ্যাটার্যিকে না হয় তোমাদের বাড়ীতেই চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ করা যাক্। তোমার সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দোব। তা'হলে কবি আর অকবির লড়াই দেখতে পাবে।"

যোগেশ মৃদু হাসিয়া সঙ্কুচিত ভাবে কহিল, "নিমন্ত্রণ করতে ইচ্ছা হয় করুন, কিন্তু—" কথা অসমাপ্ত রাখিয়া যোগেশ থামিয়া গেল।

বিনোদ ঔৎসুক্যের ভান করিয়া কহিল, "কিন্তু—কি?"

যোগেশ মৃদু হাসিয়া কহিল, "আমার সঙ্গে আলাপ না-ই করিয়ে দিলেন।"

"কেন?"

যোগেশ তেমনি সস্মিত মুখে একটু ইতস্ততঃ ভাবে কহিল, "তিনি বিলাত-ফেরৎ, আর আমরা অশিক্ষিত, অমার্জ্জিত। তিনি হয় ত' আমাদের চাল-চলন অপছন্দ করবেন।"

বিনোদ হাসিয়া কহিল, "এই তোমার আপত্তি? তা'হলে কোনও ভয় নেই। সে মোটেই সে হিসাবে বিলাত-ফেরৎ নয়,—ঠিক আমাদেরই মত বাঙ্গালী।"

যোগেশ হাসিয়া কহিল, "ঠিক আমাদের মত হলে মিষ্টার চ্যাটার্যি বলে তাঁকে ডাকতেন না। সে যাই হোক, তিনি হয় ত' খুব ভাল লোক; কিন্তু বিলাত-ফেরতদের ওপর আমার কেমন একটা আতঙ্ক আছে। আমি কিছুতেই তাঁদের কথা সহ্য করতে পারি নে। তা ছাড়া, কবির সঙ্গে যিনি লড়াই করেন, তিনি শুধু অকবি নন, তিনি অকরুণ।" বলিয়া যোগেশ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

যোগেশের কথা শুনিয়া সুবোধ শ্রদ্ধা, আশা ও আনন্দে একেবারে বিহ্বল হইয়া উঠিল। প্রকাশের ভালক সুরেনের বৈরী মূর্ত্তি তাহার অনির্ণীত আকাঙ্ক্ষা ও অনির্দ্দিষ্ট আশার পথ ছাড়িয়া সহসা যেন সরিয়া গেল। একটা অকারণ গুরুভার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সে যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে জানিল না বা বুঝিল না যে, একজন বিলাত-ফেরৎ মিষ্টার চ্যাটার্যিকে লইয়া বিনোদ এবং যোগেশের মধ্যে উপরিউক্ত আলোচনা তাহাকে প্রবঞ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে একটি পরিকল্পিত কৌশল মাত্র,—এবং বিনোদের কথার উত্তরে যোগেশের বাক্যগুলি অতিশয় যত্নের সহিত গত দুই দিন ধরিয়া কাগজে লিখিয়া যোগেশকে কণ্ঠস্থ করান হইয়াছিল।

বিনোদ সস্মিত মুখে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া যোগেশকে কহিল "তবে তাই ভাল, অকবিকে এখানে এনে কাজ নেই; কবির হাতে তোমাকে সমর্পণ করে আমি চল্‌লাম,—মা কি জন্যে ডাকছেন শুনে আসি।" তাহার পর সুবোধের দিকে ফিরিয়া কহিল, "তুমি বলছিলে, চ্যাটার্যি দেশের জল বাষ্প করে উবিয়ে দিতে পারে; কিন্তু সুনীতির কাছে তুমি যে রকম প্রশ্রয় পেতে আরম্ভ করেছ,—দেখো যেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে, তার হৃদয়খানি তুমি জল করে গলিয়ে দিয়ো না!" বলিয়া হাসিতে-হাসিতে বিনোদ অন্দরে প্রবেশ করিল।

সবিস্ময় সঙ্কোচে সুবোধ ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর আরক্ত মুখ যোগেশের প্রতি স্থাপিত করিয়া কহিল, "বিনোদের সঙ্গে আপনার সম্পর্কের হিসাব ধরে, আর বিনোদের প্রগল্‌ভতার উপর আমার কোন হাত

নেই বিবেচনা করে, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। রামের দোষে শ্যামকে মারবেন না।"

যোগেশ মৃদু হাসিয়া কহিল, "রামের দোষে শ্যামকে ত মারবই না; তা ছাড়া রামেরও দোষ নেই।"

সুবোধ স্মিতমুখে কহিল, "রামের সুমুখে কিন্তু রামকে এমন করে প্রশ্রয় দেবেন না,—তাহলে তার আর সীমা-পরিসীমার জ্ঞান থাকবে না।"

দ্বারান্তরালে সুমতি ও সুনীতির নিকট উপস্থিত হইয়া বিনোদ সকৌতুকে যোগেশ ও সুবোধের কথোপকথন শুনিতেছিল। সুবোধের কথা শুনিয়া সে সহাস্যে কহিল, "সীমা-পরিসীমার জ্ঞান কার থাকবে না, সেটা দু' চার দিনেরই মধ্যে সকলে বুঝতে পারবে। তখন শ্যামের দোষে রামকেই মার খেতে না হয়!"

সুমতি স্মিত মুখে মৃদু স্বরে কহিল, "আমি অভয় দিচ্ছি, রামকে মার খেতে হবে না, রসগোল্লাই খেতে হবে।"

সুনীতির প্রতি বিনোদ চাহিয়া সহাস্যে কহিল, "তুমিও কি সেই অভয় দিচ্ছ সুনীতি?"

সুনীতি হাসিয়া কহিল, "আমি উপদেশ দিচ্ছি, রাম যেন অতটা আশা না করেন।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বিনোদ কহিল, "তবে রাম মার খেতেও পারেন বলে আশঙ্কা করবেন না কি?"

সুনীতি মৃদু হাসিয়া কহিল, "আমি বলছি, রাম হয় ত মার বা রসগোল্লা খাওয়ার অবস্থাতেই উপস্থিত হবেন না।"

সুমতি নিবিষ্ট মনে যোগেশ ও সুবোধের কথোপকথন শুনিতেছিল; ফিরিয়া বিনোদ ও সুনীতিকে ব্যগ্রভাবে কহিল, "শোন, শোন, আসল কথা আরম্ভ হয়েছে!"

সুবোধ বলিতেছিল, "আপনি ঠিক বলেছেন,—এই তলিয়ে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়ার যুগে এখন কিছুদিন আমাদের বিলাত যাওয়া বন্ধ রাখা উচিত। চোখ যার খারাপ হতে সুরু হয়েছে, প্রখর সূর্য্যালোকে গেলে সে যে ভাল দেখবেই,—সব সময়ে তা ঠিক নয়। বরং ক্রমশঃ সে একেবারে অন্ধ হয়ে যেতে পারে। বিলাত গিয়ে সেখানকার সভ্যতার চাকচিক্যে আমরা আমাদের ভারতবর্ষের সভ্যতা আর জ্ঞানের বিষয়ে অন্ধ হয়ে যাই; মনে করি, এটা বিলিতি নয় বলেই নিকৃষ্ট। সেইজন্য আমাদের দৃষ্টিশক্তি যতদিন সতেজ না হচ্ছে, ততদিন বিলাত যাওয়া উচিত নয়।"

সুমতি সহাস্য মুখে মৃদু স্বরে কহিল, "গরজ বড় বালাই এখন বিলাত যাওয়াটাও অন্যায় হয়ে দাঁড়াল!"

বিনোদ কহিল, "আর দৃষ্টিশক্তিটাও একেবারে নিস্তেজ হয়ে গেল! সতেজ হবে সেদিন, যেদিন যোগেশের আসল মূর্ত্তিটি ওঁর চোখের সামনে ব্যক্ত হবে।"

সুমতি ও সুনীতি অস্ফুট হাস্যধ্বনি করিয়া উঠিল।

সুনীতি কহিল, "মেজ জামাই বাবু, একেই বলে ঘোড়া দেখে খোঁড়া হওয়া।"

বিনোদ হাসিয়া কহিল, "টাট্টু-ঘোড়া দেখেই! তবু ত সাদা আরবটি এখনও দেখে নি। আদৎ জিনিসটি দেখলে না জানি আরো কি হোত! কিন্তু অন্ধের কাছে কাঁচই বা কি আর হীরেই বা কি।"

সুনীতি ঈষৎ আরক্ত মুখে মৃদুকণ্ঠে কহিল, "তা নয় মেজ জামাইবাবু, আসল জিনিসের চেয়ে নকল জিনিসই বেশী প্রবল হয়। আপনার থিয়েটেরে শালা যে নির্লজ্জতার অভিনয় করছে, তা আপনার কোন শালীই পারত না।"

বিনোদ মাথা নাড়িয়া কহিল, "উঁহু, আমি তা স্বীকার করি নে। আতর-মাখান পশমের ফুলের চেয়ে আসল ফুলের মৃদু গন্ধই বেশী মন মাতায়। গলার চেয়ে গ্রামোফোন কখনই ভাল হয় না।"

বাহিরের ঘরে সুবোধ বলিতেছিল, "স্বদেশী সাহেবদের প্রতি আপনার ঘৃণা দেখে এখন বুঝতে পারছি, কেমন করে আপনার স্বদেশ বইখানির নোটগুলি অমন সুন্দর হয়েছিল। আপনি দয়া করে আপনার বইখানি একদিনের জন্যে আমাকে দেবেন, আমি আমার বইয়ের পাশে-পাশে নোট-গুলি লিখে নোব।"

শুনিয়া সুমতি অতি কষ্টে হাস্যধ্বনি রোধ করিয়া কহিল, "এ যে একেবারে চট্‌পট্ সুবোধ বালক হয়ে দাঁড়াল দেখছি! গুরু-শিষ্য সম্পর্ক পাতিয়ে ফেললে!"

বিনোদ সুনীতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সহাস্যমুখে কহিল, "দেখো সুনীতি,—গুরু হয়েই নিরস্ত থেকো—ক্রমশঃ যেন গুরুতর হয়ে উঠো না।"

সুনীতি মৃদু হাসিয়া কহিল, "না, আমাকে অত লঘু মনে করবেন না।"

সুমতি হস্ত সঞ্চালনের দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া কহিল, "শোন, শোন, ভারি মজার কথা হচ্ছে।"

তিনজনে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল। যোগেশ নত নেত্রে কহিতেছিল, "আমি কিছুমাত্র বিরক্ত হব না সুবোধবাবু,—আপনি যা বলতে চান, অনায়াসে বলুন।"

সুবোধ একটু ইতস্ততঃ ভাবে আরক্ত মুখে কহিল, "দেখুন, যখন দরকার হচ্ছে, আপনি আমাকে সুবোধবাবু বলে নাম ধরে সম্বোধন করছেন; কিন্তু আমি প্রয়োজন হলে কি বলে আপনাকে ডাকতে পারি, তা ত ভেবে পাচ্ছি নে।"

যোগেশ বিস্মিত হইয়া কহিল, "কেন, আমারও ত' নাম আছে। আপনি কি আমার নাম ভুলে গেছেন?"

সুবোধের ধমনীর মধ্যে রক্ত-প্রবাহ দ্রুত হইয়া উঠিল। একটা কথা ওষ্ঠাগ্রে আসিয়া ফিরিয়া গেল। যথাসম্ভব নিজেকে সম্বৃত করিয়া লইয়া সে বলিল, "আপনার নাম আমি এক মুহূর্তের জন্যও ভুলি নি; কিন্তু শুধু নাম ধরে ত' ডাকতে পারি নে। অথচ আপনার নামের সঙ্গে কোন্ কথা যোগ করলে আপনাকে নাম ধরে ডাকা চলতে পারে, তাও বুঝতে পারছি নে। চলিত প্রথামত আপনার নামে 'দি' যোগ করা ত' চলবেই না।"

যোগেশ স্মিত মুখে কহিল, "না, তা চলবে না। কিন্তু শুধু সুনীতি বলে ডাকলেই ত' পারেন!"

সুবোধ কুণ্ঠা-কম্পিত স্বরে কহিল, "আপনি বলে সম্বোধন করার সঙ্গে শুধু সুনীতি ত' বলা যায় না।"

যোগেশ হাসিয়া কহিল, "তারও ত' সহজ উপায় আছে। আমাকে তুমি বলে ডাকতে আরম্ভ করুন, তা'হলে শুধু সুনীতি বলে ডাকা চলবে।"

দ্বারান্তরালে সুনীতির মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। বিনোদ ক্ষণকালের জন্য অন্যত্র গিয়াছিল। সুমতির দিক চাহিয়া সুনীতি কহিল, "ডেঁপো ছেলেটা আমাকে কি রকমে নাকাল করবে! আমার নাম ধরেও ওকে ডাকাবে দেখছি! যে রকম হ্যাংলা মানুষ—একবার ডাকতে আরম্ভ করলে, মুখ আর বন্ধ থাকবে না।"

সুমতি হাসিয়া কহিল, "যোগেশ যে রকম করে তোমাকে লোভ দেখাচ্ছে, হ্যাংলা না হয়ে আর কি করে? যোগেশ কিন্তু চমৎকার অভিনয় করছে।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সুনীতি কহিল, "মাগো, একটুও নয়। সুবোধবাবু বাস্তবিকই অন্ধ। অন্য লোক হলে, যোগেশের ডেঁপোমীতে এতক্ষণ বিরক্ত হয়ে যেত। ও যে রকম করে কথাবার্তা কইছে,—একজন পনের-ষোল বছরের মেয়ে দুদিনের পরিচয়ে কখন তা করতে পারে না। একেবারে অস্বাভাবিক, অসম্ভব!"

বিনোদ প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কতদূর এগুলো দিদি?"

সুমতি হাসিয়া কহিল, "তা বেশ এগুচ্ছে। তোমার শালা সুবোধকে সুনীতির নাম জপ করাবার চেষ্টায় আছে।"

বিনোদ উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "চলুন, চলুন, শুনি।" তিনজনে দ্বারের নিকটে আসিয়া মনঃসংযোগ করিল।

সুবোধ বলিতেছিল, "আজ তুমি আমাকে যে অধিকার দিলে সুনীতি, আমি যেন তার উপযুক্ত হতে পারি। এ অধিকারের অপব্যবহার করবার প্রবৃত্তি আমার যেন কখন না হয়। কিন্তু কি জানি কেন, আজ আমার ভারি আনন্দ হচ্ছে সুনীতি! আমার কেবলি মনে হচ্ছে, তোমাকে নাম ধরে ডাকি, সুনীতি, সুনীতি, সুনীতি——"

যোগেশ নত নেত্রে কহিল, "কেন বলুন দেখি সুবোধবাবু?"

সুবোধ চেয়ার হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল, "তা জানি নে। তুমি হয় ত' গত জন্মে আমার নিতান্ত আপনার কেউ ছিলে; কিম্বা হয় ত' তুমি—"সুবোধের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল; তাহার দেহের অর্দ্ধেক রক্ত তাহার মুখমণ্ডলে আসিয়া উপস্থিত হইল।

"কিম্বা হয় ত' আমি—কি, সুবোধবাবু?"

সুবোধ ত্রস্ত হইয়া কহিল, "আমাকে ক্ষমা কর সুনীতি, আমি কি বলতে কি বলছি, কি করতে কি করছি! আমার মাথা ঠিক থাকছে না!"

যোগেশ আর্দ্র কণ্ঠে কহিল, "আপনি অমন কচ্ছেন কেন সুবোধবাবু? একটু স্থির হয়ে বসুন!"

বিনোদ দ্বারের নিকট হইতে সরিয়া আসিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "কি সর্ব্বনাশ! এ যে একেবারে উন্মাদ হয়ে উঠল! সুনীতি, সুনীতি, সুনীতি! বাস্তবিকই যে জপ করতে সুরু করলে!"

সুমতি স্মিত মুখে সুনীতির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া কহিল, "আর বোলো না, সুনীতি আবার এখনি ক্ষেপে উঠবে হাতের লেখা আর নামের জন্যে একেই ত' ক্ষেপে রয়েছে।"

বিনোদ সুনীতির দিকে চাহিয়া সহাস্ত মুখে বলিল, "লক্ষ্মী সুনীতি, তুমি আর ক্ষেপো না ভাই। সুবোধ ত' ক্ষেপেইছে,—তার ওপর আবার তুমি যদি ক্ষেপ, তা হলে ব্যাপারটা মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে!"

সুনীতি তাহার বিরক্তি-বিরস মুখে জোর করিয়া মৃদু হাস্তের রেখা আনিয়া কহিল, "মারাত্মক যদি হয়, তার জন্যে আপনারাই দায়ী হবেন। আপনারাই ক্রমে-ক্রমে আমার নাম, আমার লেখা, এমন কি আমাকে দিয়ে চিঠি লেখান পর্য্যন্ত আরম্ভ করেছেন। এখন যদি কেঁচো খুঁড়তে-খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ে, তাতে আমার দোষ কি বলুন?"

সুনীতির করুণ মুখ এবং কাতর কণ্ঠস্বরে ব্যথিত হইয়া বিনোদ স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, "না, তোমার কোন দোষ নেই। কিন্তু একটা কথা সুনীতি,—এ আমি বেশ জানি ভাই, নিতান্তই যদি কেঁচো খুঁড়তে-খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ে, তার জন্যে কেউ মারা যাবে না। এ মিথ্যা খেলা যদি ক্রমশঃ সত্যি হয়ে দাঁড়ায়,—এ আমি জোর করে বলতে পারি, তার জন্যে কাউকে পরিতাপ করতে হবে না; তোমাকেও না, আমাকেও না।"

সুনীতির মুখ পুনরায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে হাসিয়া কহিল, "সে ত' খুব ভাল কথা। কিন্তু এ মিথ্যা খেলা যদি সত্যি-সত্যিই মিথ্যা থেকে যায়, তা হলে আপনার বন্ধুটিকে পরিতাপ করতে হবে কি না, সে কথা ভেবেছেন কি?"

বিনোদ উৎফুল্ল ভাবে কহিল, "কোন ভয় নেই ভাই। আমার বন্ধুর ওপর যদি কোন করুণাময়ীর করুণা ক্রমশঃ গাঢ় থেকে প্রগাঢ় হয়ে ওঠে, তা হলে তাকেও পরিতাপ করতে হবে না।"

বিনোদের এ কথার মধ্যে সত্যের কোন সংশ্রব উপস্থিত দৃষ্টিগোচর না হইলেও, সুনীতির হৃদয় যেন অদৃষ্ট ভবিষ্যতের অপরিজ্ঞাত সম্ভাবনায় কাঁপিয়া উঠিল। এই নির্ব্বিচার, নির্ব্বিকল্প উক্তিকে যেন মুনি-মুখ-নিঃসৃত অভিশাপ বা বরের মত অমোঘ বলিয়া তাহার মনে হইল। তাই পরিহাস প্রত্যুত্তরে অক্ষমা না হইলেও, এবার সহসা তাহার মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না।

সুমতি হাসিয়া কহিল, "ঈশ্বর করুন তাই যেন হয়। আমার ত' ছেলেটিকে ভারি পছন্দ হয়েছে।"

সুনীতির নীরব-নিরুদ্ধ ভাব লক্ষ্য করিয়া বিনোদ এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া অন্য কথা পাড়িল। বলিল, "পরের কথা পরে হবে; উপস্থিত তোমাকে আমার আর আমার বন্ধুদের হয়ে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি সুনীতি। চিঠিখানি তুমি চমৎকার লিখেছিলে। ভবিষ্যতেও মাঝে-মাঝে লিখতে হবে। তোমার লেখাটা যখন চলে গিয়েছে, তখন শেষ পর্য্যন্ত তোমারই লেখা চালান ভিন্ন আর উপায় নেই। বেশী দিন তোমাকে কষ্ট করতে হবে না। মাস খানেকের মধ্যেই আমরা মালা-বদল করতে চাই। তার পর তোমার অব্যাহতি।"

এমন সময়ে যোগেশ প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিল যে, সুবোধ সহসা চলিয়া গিয়াছে। বিনোদকে ডাকিয়া আনা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে সে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতেও সে স্বীকৃত হয় নাই।

সবিস্ময়ে বিনোদ কহিল, "কিছু বলে গেল?"

"বল্লেন, শরীরটা ভাল মনে হচ্ছে না। তোমার জামাই-বাবুর আসতে দেরী হবে, আমি চল্লাম। আপনাকে ডাকবার কথা বলায় বল্লেন, সে এলে আর যেতে দেবে না; বলেই উঠে পড়লেন। আমি তাঁকে আট্‌কাবার জন্যে সদর দরজা পর্য্যন্ত গিয়েছিলাম, কিন্তু ফিরলেন না, চলে গেলেন।"

সুনীতি কহিল, "কোনও অভদ্রতা করিস নি ত? রেগে চলে গেলেন না ত?"

প্রসন্ন মুখে একগাল হাঁসি হাসিয়া যোগেশ কহিল, "রাগ বলছ কি সেজ দিদি? আমার উপর খুব খুসী হয়েছেন।"

যোগেশের কথায় সুমতি ও বিনোদ হাসিয়া উঠিল।

সুনীতি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সবিদ্রূপে কহিল, "খুসী আর হবেন না কেন! যে রকম করে আমার মস্তকটি তুমি চর্ব্বণ করছ, তাতে কে না খুসী হয়?"

বিনোদ বালিকাবেশী যোগেশের পৃষ্ঠে সস্নেহে হস্তার্পণ করিয়া কহিল, "না—না সুনীতি, যোগেশকে আজ বোকো না। ও আজ যা অভিনয় করেছে, তা চমৎকার! আমার বন্ধুরা স্থির করেছে যে, বিয়ের রাত্রে তারা যোগেশকে একটা সোণার মেডেল গড়িয়ে দেবে।" (ক্রমশঃ)

"কথা কয়ে দেখবে কি গো? বাড়ী পাঠাতে হয় পাঠিয়ে দেও,—কিন্তু এই কথা নিয়ে ওর সঙ্গে আলোচনা ক'রলে সর্ব্বনাশ হ'বে। এমন কাজও করো না।"

"কেন? কি সর্ব্বনাশটা হ'বে শুনি?"

"সর্ব্বনাশ নয়? যদি তার মনে এ কথা নাই উঠে থাকে, এমনো তো হ'তে পারে। তোমার কথাটা কইলেই হয় তো তা'র মনটা টলে যাবে। তাহ'লে ঠিক পাগলাকে নৌকা ডোবান'র কথা মনে করে দেওয়া হ'বে। আর তা' ছাড়া, কথাটা যদি মনে উঠে থাকে, তবে সে লজ্জায় সেটা চেপেই যাবে হয় তো। কিন্তু যদি টের পায় যে কথাটা প্রকাশই হ'য়ে গেছে, তবে তো আর লজ্জা-সরমের বাধা থাকবে না। মেয়েমানুষের মন বড় ঠুনকো জিনিষ,—ওকে ভারি সমঝে চ'লতে হয়।"

এ যুক্তিতে ইন্দ্র হাসিল। সে কোনও কথা না বলিয়া, সেইদিনই মনোরমাকে তার পড়িবার ঘরে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মনো, তুই তোর স্বামীর ছবি সরিয়ে ফেলেছিস্ কেন?"

মনোরমার বুকটা একটু কাঁপিয়া উঠিল। সত্য কথাটা বলিতে তার ভয়ানক সঙ্কোচ বোধ হইল; কিন্তু হৃদয়ের সমস্ত বল সংগ্রহ করিয়া সে সঙ্কোচকে জয় করিয়া বলিল, "ওটা যে মিথ্যা দাদা!"

এমন সাদামাটা নগ্ন সত্যটা ইন্দ্রকে একটু আঘাত করিল। সে ইহার পর কি বলিবে, কিছুক্ষণ ভাবিয়া পাইল না। শেষে অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা দিদি, একটা কথা আমায় বলবি? তোর কি বিয়ে ক'রতে ইচ্ছা হয়?"

মনোরমার মুখটা এবার একটু লাল হইয়া উঠিল। এ সত্যটা সে স্বীকার করিয়া পরাজয় মানিয়া লইবে না স্থির করিয়াছিল; কাজেই সে একটু থামিয়া বলিল "না, দাদা।"

"দেখিস দিদি, লজ্জা করে' আমায় কিছু বলিস না,—আমি তোর ঠিক খাঁটি মনের কথাটা জানতে চাই। বিয়েতে তোর যদি ইচ্ছা থাকে, তবে আমি তোর বিয়ে দেব।"

মনোরমা জোর করিয়া বলিল, "কিছুতেই না,—বিয়ে আমি ক'রবো না।"

ইন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিল না; কিন্তু স্ত্রীর উপদেশ স্মরণ করিয়া সে আর মনোরমাকে এ বিষয়ে ঘাঁটাইল না।

মনোরমার কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অব্যাহত ভাবে চলিতে লাগিল। কেবল ছেলে ও ভাইঝিদের লইয়া আমোদ-প্রমোদ করা ছাড়া, সকল সুখ-সম্ভোগ হইতে সে নিজেকে জোর করিয়া দূরে রাখিতে লাগিল। অনীতা এখন আর আসিয়া প্রায়ই তাহার দেখা পায় না। অমল আসিলে মনোরমা ছাদের উপর দিয়া পাশের বাড়ী চলিয়া যায়। এই দুটি ভাই-বোন অল্পদিনের মধ্যেই যেন তার অকারণ বিরাগের কারণ হইয়া উঠিল। তার রকম-সকম অনীতা বেশ বুঝিতে পারিয়া, এ বাড়ীতে যাওয়া-আসা অনেকটা কমাইয়া দিল।

(১৯)

অনীতার মোটর চড়িয়া যাইবার ইচ্ছা ছিল ইন্দ্রনাথেরই বাড়ী। দাদার ব্যবহারে ক্রোধে অন্ধ হইয়া সে এই সঙ্কল্প করিয়াছিল। কিন্তু কিছুদূর গিয়াই তার মনে হইল যে, সেখানে যাওয়া তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব! বাড়ী ফিরিবার পথও তো সে বন্ধ করিয়াছে। এখন যাইবে কোথায়? তার সকল দুঃখ, সকল বেদনা ছাইয়া এই দারুণ দুর্মীমাংস্য প্রশ্ন তাহার মন ছাইয়া ফেলিল।

আজ সন্ধ্যাবেলার সমস্ত ঘটনায় তার মনের ভিতর একটা প্রবল ঘূর্ণাবর্ত্ত বহাইয়া দিয়াছিল। কি সর্ব্বনাশ সে করিয়া বসিল তার অসংযত হৃদয়ের মত্ততায়! এতদিন, এত বৎসর সে যে বেদনা বুকের ভিতর চাপিয়া রাখিয়াছে, আজ সে তাহাকে এমন করিয়া ছাড়িয়া দিল কেমন করিয়া? দীর্ঘ সাধনায় সে মনের ভিতর যে ধৈর্য্যের সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহা এক মুহূর্ত্তে অদৃষ্টের নিষ্ঠুর ফুৎকারে উড়িয়া গেল! আর তার ফল হইল কি? এ জগতে সে যে দুইটি লোককে সবচেয়ে বেশী ভালবাসে, যাহাদের সুখ-সৌভাগ্যের জন্য তার সব দিতে পারে, সে তাদের মনের ভিতর বিষের ছুরী বসাইয়া দিয়াছে। আর সবচেয়ে বেশী সর্ব্বনাশ করিয়াছে তারই, যার এক ফোটা সুখের জন্য সে নিজের হৃদ্‌পিণ্ডটাকে অনায়াসে কাটিয়া দিতে পারে! ইন্দ্রনাথ—নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ, দেবচরিত্র ইন্দ্রনাথ আজ অনীতার দোষে, অর্থ-সম্পত্তির চেয়ে হাজার-গুণ দামী যে সম্মান, তাহা হারাইতে বসিয়াছে। তারই

অঙ্গ নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র সে এতবড় কুৎসিত কলঙ্কের বোঝা মাথা পাতিয়া লইয়া গেল! এই যে আ'ল সে আজ বাধাইয়া বসিয়াছে, ইহা ভাঙ্গিবে কি করিয়া?

তার পর তার মনে হইল নিজের কথা! তার কি হইবে? তার জীবনের সকল সম্পদ তো আজ সে বিলাইয়া দিয়া আসিয়াছে। যশঃ, মান, চরিত্র-গৌরব—যা লইয়া নারীর জীবন, সব তো সে ভাসাইয়া দিয়া আসিয়াছে। এখন সে বাঁচিবে কি লইয়া? যাদের লইয়া সে সংসারের সঙ্গে গাঁথিয়া ছিল, তাদের সে তো জন্মের মত ছাঁড়িয়া আসিয়াছে। ইন্দ্রনাথের কাছে আর তার যাইবার উপায় নাই, অমলের কাছেও সে যাইবে না। তবে কাহাকে লইয়া সে বাঁচিয়া থাকিবে? এত-বড় বিশ্ব-সংসারটার মধ্যে যে সে নিতান্তই একা! সংসারের অকূল সাগরের চারিদিকে চাহিয়া সে একবিন্দু দৃঢ় আশ্রয় বা বন্ধনের স্থান খুঁজিয়া পাইল না। উদ্দেশ্যবিহীন, নিরবলম্ব, কলঙ্কিত জীবন লইয়া সে এখন কি করিবে?

তার মোটর তখন আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। নববিধানের ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে একটা বড়গোছের সঙ্কীর্ত্তনের দল তাহার মোটরের সামনে পড়িল। গানের ধুয়াটা অনীতার বড় মধুর লাগিল। সে শোফারকে গাড়ী আস্তে চালাইয়া সঙ্কীর্ত্তনের পিছু-পিছু যাইতে বলিল। সঙ্কীর্ত্তনের দল গাহিতেছিল,

আমার 'যা' কিছু সব আপন ছিল,
সকলি নিলে কেড়ে!
ঘর বাড়ী সব উজাড় করে'
আনলে বাহিরে!
ওগো দয়াল প্রভু, তোমার নামে
আনলে বাহিরে।
আকাশের নীল চন্দ্রাতপে
দক্ষিণ হাওয়ায়, আতপতাপে,
ভবের নৃত্য আসর মাঝে
দিয়েছ ছেড়ে!
তোমার প্রেমের সুধাধারে
শূন্য হৃদয় গেছে ভরে!
ওগো কূল নাহি পাই সুখ-সাগরে
প্রেমের পাথারে।

গানটা অনীতার হৃদয়ের একটা নূতন তন্ত্রীতে আঘাত করিল। তার কম্পনে তার সমস্ত হৃদয়ে সে একটা নূতন জীবনের সাড়া পাইল। গান শুনিতে-শুনিতে সে তন্ময় হইয়া তার সঙ্গে-সঙ্গে মদুস্বরে গাহিতে লাগিল। কীর্ত্তনীয়ারা একবার মুগ্ধচিত্তে গাড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল,—গদগদ চিত্তে অশ্রুমুখে অনীতা গাহিতেছে,

ওগো, কূল নাহি পাই সুখ-সাগরে
প্রেমের পাথারে।

তার ভাবের ঘোর সবাইকে পাইয়া বসিল,—সকলে নাচিয়া নাচিয়া গাহিল,

কূল নাহি পাই সুখ-সাগরে
প্রেমের পাথারে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের কাছে আসিয়া সঙ্কীর্ত্তনের দল যখন মন্দিরে প্রবেশ করিল, তখন অনীতা মোটর হইতে নামিয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করিল।

সেদিন আচার্য্য সুকুমার বাবু উপাসনা করিলেন। সুকুমার ঘোষ সুপুরুষ নন, কিন্তু সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষ। বয়স তাঁর পঞ্চাশের উর্দ্ধে। তাঁর চক্ষু দুটি যেন একটা স্নিগ্ধ, শান্ত আলোকে উদ্ভাসিত; মুখ আনন্দ-উজ্জ্বল; ওষ্ঠাধরে হাসি লাগিয়াই আছে। সাধারণ ধর্ম্ম-প্রচারকেরা যে রকম একটা গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকেন, সুকুমার বাবুর মধ্যে তাহার কিছুই নাই। তিনি রহস্যপ্রিয়, লঘুভাষী, এবং কতকটা চঞ্চল। কিন্তু বেদীতে আরোহণ করিলে সেই চঞ্চলতার ভিতর দিয়া যেন আগুনের ফুলকি ছুটিয়া বাহির হয়;—তাঁর প্রত্যেকটি কথায় যেন চোখের উপর বিষয়টা জীয়ন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠে। তিনি যখন পাপের কথা বলেন, তখন সেটা যেন ক্রিমি-কীটের মত কদর্য্য ঘৃণার্হ হইয়া চোখের সামনে কিলকিল করিতে থাকে, ভগবানের কথা তুলিলে যেন আশে-পাশে তাঁর পুণ্যস্পর্শ অনুভব করা যায়।

অনীতা কলিকাতার একজন শ্রেষ্ঠ গায়িকা বলিয়া সর্ব্বজন-পরিচিতা। তাহাকে আজ মন্দিরে উপস্থিত দেখিয়া, সকলে তাহাকেই প্রথম গানটা গাহিতে বলিলেন। সে গাহিল—

কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই।
ইত্যাদি—

হৃদয়ের সমস্ত আবেগ ঢালিয়া দিয়া অনীতা তার বিশ্ব-বিমোহন কণ্ঠে গানটি গাহিয়া যখন থামিল, তখন তার সমস্ত মুখ চোখের জলে ভাসিয়া গিয়াছে। গান শেষ করিয়া সে হাতের ভিতর মাথা গুঁজিয়া ধ্যানস্থ হইল, প্রার্থনায় মুখে যোগ দিতে পারিল না। সুকুমারবাবুও গান শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। প্রার্থনার পর তাঁর বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন ধীর, শান্ত, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে। ক্রমে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, চক্ষু জ্বলিতে লাগিল,—তীব্র উজ্জ্বল রজতধারার মত তাঁর বক্তৃতা-লহরী ছুটিল। লোকটা যেন আবিষ্ট হইয়াছে—যেন কি একটা দেখিয়াছে,—তাই শতমুখে লোককে শুনাইবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িয়াছে।

ঈশ্বরের মাতৃত্বের কথা বলিতেছিলেন—"মায়ের স্নেহ-ভরা হৃদয় লইয়া তিনি তাঁর পথ-ভ্রান্ত পুত্রদের জন্য পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন; বুক-ভরা তাঁর ক্ষমা, প্রাণ-ভরা তাঁর করুণা—ওরে আয় রে তোরা ছুটে আয়, পাপী, তাপী, শ্রান্ত ও ক্লান্ত; এ অমৃতের ধারায় ধুয়ে তোদের সব ক্লেশ, সব ক্লান্তি দূর ক'রে ফেল। ভয় কি তোদের? ভুল হ'য়ে থাকে, তাঁর অনন্ত জ্ঞানের আশ্রয় নে, আর ভুল হবে না! দোষ করেছিস, ওই যে মায়ের পতিত-পাবন, ক্ষমা-সরল বুক খোলা র'য়েছে,—ওখানে আশ্রয় নিলেই সব ক্লেদ ধুয়ে যাবে! পাপের ভয়! একটা মিথ্যাকে এত ভয়! প্রবল জল-প্রপাতের মুখে একটা বালির ঢিপি যতটা সত্য, এই বিশ্বব্যাপী করুণাধারার কাছে পাপ তো তার চেয়ে বেশী কিছু সত্য নয়। তবে ভয় কিসের?—মা যে তোদের, তাঁর স্নেহের হস্ত বাড়িয়ে, মা ভৈঃ রবে তোদের অনন্ত অভয় দিচ্ছেন। সব ভাবনা-চিন্তা চুকিয়ে দিয়ে একবার তাঁর অঞ্চলের শান্ত ছায়ার তলে দাঁড়ালেই, আর কোনও চিন্তার, কোনও ভাবনার, কোনও দুঃখেরই তো অবসর থাকবে না।"

মুখ, চোখ, কাণ সম্পূর্ণ খুলিয়া দিয়া অনীতা কথাগুলি যেন বুভুক্ষিতের মত গ্রাস করিতে লাগিল। সমস্ত বিশ্ব-সংসার তার চোখের সামনে লুপ্ত হইয়া গেল—সে যেন প্রত্যেকটি কথায় বিশ্ব-জননীর সেই স্নিগ্ধ, পুণ্যাঞ্চলের বাতাস তার অন্তরের ভিতর অনুভব করিতে লাগিল।

উপাসনা শেষ হইলে অনীতার মনটা একেবারে শান্ত হইয়া গেল। সে উৎফুল্ল হৃদয়ে সুকুমার বাবুর কাছে গিয়া মাথা নোয়াইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। অনীতার মত মেমসাহেব যে কাহাকেও প্রণাম করিতে পারে, তাহা এতদিন কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই।

সুকুমারবাবু হাত ধরিয়া তাহাকে উঠাইয়া বলিলেন, "কি রে বেটী, এতদিনে বুঝি মায়ের কথা মনে পড়েছে?"

অনীতা মাথা নীচু করিয়া রহিল। সুকুমারবাবু বলিলেন, "আর বলতে হবে না,—তোমার মনের ভিতর যে কিসের ঢেউ বইছে,—তোমার গানেই সব টের পাওয়া গেছে। সার্থক গান শিখেছিলে অনীতা, আর সার্থক হ'ল তোমার শিক্ষা আজ! ওই গলায় যদি ওই গানই না গাইলে, তবে গলা থাকলেই বা কি, না থাকলেই বা কি।"

অনীতা বলিল, "আমি আজ আপনার ওখানে যাব,—আপনার বাড়ীতে আমার স্থান হ'বে কি?"

সুকুমার বাবু হাসিয়া বলিলেন, "না। তোমাদের যে প্রকাণ্ড শরীর, তোমাদের অতবড় বাড়ীটাতে মাত্র দুটী বই লোক ধরে না। আমার ছোট ঘরে তোমার দেহ আঁটবে কেমন ক'রে?"

অনীতা বলিল, "ঠাট্টা নয় কাকা। আমি সুধু আজ রাত্রের জন্য থাকতে যাচ্ছি না,—কতদিনের জন্য জানি না। হয় তো চিরদিনের জন্য।"

বিস্মিত হইয়া সুকুমার বাবু তার মুখের দিকে চাহিলেন। বুঝিতে পারিলেন কিছু গোলোযোগ হইয়াছে, কিন্তু কি গোলযোগ? বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "সে কি কথা মা?"

অনীতা মুখ নত করিয়া বলিল, "সে অনেক কথা।"

সুকুমার বাবু আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। অনীতার মোটরে চড়িয়া তাহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। তার পর নিকটে এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া অমলকে টেলিফোঁ করিলেন, "অনীতা আমার কাছে আছে, কোনও চিন্তা করো না।"

অমল বলিল, "আমার তার জন্যে আর কোনও

চিন্তাই নেই, সে যেখানে ইচ্ছা থা'ক।" বলিয়া রিসীভার ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সুকুমার বাবু আরও আশ্চর্য্য হইলেন। এই দুইটী ভাই-ভগিনীর সঙ্গে, খুব ঘনিষ্ট না হইলেও, তাঁর বেশ আলাপ ছিল। তাদের সৌভ্রাত্র একটা দৃষ্টান্তের বিষয় ছিল। তাদের মধ্যে হঠাৎ এমন ছাড়াছাড়ি কেমন করিয়া হইল? তিনি মাথা চুলকাইতে-চুলকাইতে বাড়ী চলিয়া গেলেন।

অনীতা শোফারকে বিদায় করিয়া দিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, কখন আবার গাড়ী আনিতে হইবে। অনীতা বলিল, আর গাড়ীর দরকার নাই। সে গাড়ী বাড়ীতে পৌছাইয়া সাহেবের কাছে মাহিনা চুকাইয়া লইয়া চলিয়া যাইতে পারে। শোফার বিব্রত লইয়া গাড়ী লইয়া চলিয়া গেল।

পরের দিন বিকাল বেলায় অনীতা একটা সলিসিটারের পত্র পাইল। তিনি লিখিয়াছেন যে, ৫ লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ ও পার্ক ষ্ট্রীটের একখানা বাড়ীর দখল অনীতাকে বুঝাইয়া দিতে তিনি অমল কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছেন। অনীতা শীঘ্র দখল লইবার বন্দোবস্ত করিলে ভাল হয়।

অনীতা সে পত্রের উত্তর দিল না। (ক্রমশঃ)

একপেশে!

আর্থিক অবস্থার সেতুর উপর দিয়ে দেউলিয়া নদী পার হ'তে গিয়ে য়ুরোপ আজ আয়ের চেয়ে ব্যয়ের ভারে এক-পেশে হয়ে পড়ে, পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে "আমায় বাঁচাও! ওগো বাঁচাও!"

আমেরিকা দূর থেকে বল'ছে "আগে নিজের বোঝা সামলাও, তবে ত বাঁচবে!"

(San Francisco Chronicle)

ঠাকুর রক্ষে কর!

আয়ার্ল্যাণ্ডে আজ ঘরোয়া বিবাদ বেধে গেছে। স্বাধীন (Republican) ও সামন্তদের (Free State) দলে যুদ্ধ চলেছে। আয়ার্ল্যাণ্ড এই বিপদে কাতর হ'য়ে যেন ভগবানকে ডেকে বলছে, "ঠাকুর রক্ষে কর! আমার এই দুর্দ্দান্ত ছেলেরা দেখছি কেউই আমাকে ভালবাসে না। নইলে মা'র চখের সামনে তারা কি ভাই বোনের উপর গুলি চালায়?"

(The People, London)

বেদ ও বিজ্ঞান

অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম-

গতবার হইতেই ঋগ্‌বেদের মন্ত্র উদ্ধার করিয়া বিজ্ঞানের তরফ হইতে তাহাদের একটা রহস্যোদ্‌ভেদ আমরা আরম্ভ করিয়া দিয়াছি। প্রথম মণ্ডলের প্রসিদ্ধ "ত্রেধা নিদধে পদং" ইত্যাদি মন্ত্রে আদিত্যরূপী বিষ্ণুর যে মহিমা কীর্ত্তন করা হইয়াছে, সেইখানে, "তস্য পাংসুরে" এই বাক্যাংশটি দ্বারা যে ঠিক কি বুঝিব, তাহা হালের বিজ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। "আদিত্য ধূলিবিশিষ্ট পদ দ্বারা জগৎ আচ্ছন্ন করেন"—এ বাক্যে ধূলি কথাটার ঠিক রহস্য কি? ইহাই ছিল আমাদের প্রশ্ন। ওটা কবিত্বের অতিরঞ্জন বা অতিশয়োক্তি বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলে কি? কবি ঠিক পাগল নহে,—জগতের মহাকবি কবি ও পাগলের মধ্যে যতই কুটুম্বিতা দেখাইয়া দেন না কেন। কাজেই, কবির মুখে একেবারে নিরর্থক ও অসম্বদ্ধ বাক্য শুনিতে আমরা প্রত্যাশা করি না। আদিত্যের মহিমা বর্ণনা করিতে যাইয়া, ঠিক ধূলিবিশিষ্ট পদের কথাই বা কবি বলিতেছেন কেন? আমাদের মনে হয়, পাংসু বা ধূলি কথাটা ওখানে একটা মস্ত বড় প্রচ্ছন্ন তথ্য বাহির করিয়া লইবার চাবি-কাটি। বেদের কেবল মাত্র একটা থাকে 'পাংসুরে' দেখিয়াই ভিতরে একটা লুকান কথার আঁচ করিলে হয় ত হঠকারিতা হইত; কিন্তু যে কথাটা এখানে লুকান, সে কথাটা অপর নানা যায়গায় একরকম খোলসা করিয়াই দেখান হইয়াছে। তার প্রমাণ আমরা ক্রমশঃ দিতে থাকিব। ঋগ্‌বেদের ১০।৭২ সূক্তে দেবতাগণের জন্ম-বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ঐ সূক্তে অদিতির অনেক কথাও আছে; সুতরাং সূক্তটির বিশেষ আলোচনা আমাদিগকে করিতে হইবে। আপাততঃ ঐ সূক্তের ৬ ঋকটির বাঙ্গালা আপনারা শুনুন:—"দেবতারা এই বিশ্বব্যাপী জল মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া, মহোৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যে নৃত্য করিতে লাগিলেন, সেই কারণে প্রচুর ধূলির উদয় হইল।" এখানেও সেই ধূলির কথা। এ ধূলির হাত এড়ান দায়!

মন্ত্রটা শুনিয়াই আপনাদের মনে হইল না কি যে, ইহা উপমা দ্বারা, রূপকের দ্বারা, সৃষ্টির গোড়ার কথা বলিতে চাহিতেছে? যে সর্ব্বব্যাপী গোড়ার জিনিষটা হইতে সবই হইয়াছে, যেটাকে আধুনিক বিজ্ঞান 'ঈথার'

বলিয়া কতকটা ধরিতে-ছুঁইতে চেষ্টা করেন, সেই জিনিষটাকে বেদের ঋষিরা অনেক যায়গাতেই 'সমুদ্র' বলিয়া সঙ্কেতে কহিয়া গিয়াছেন। পুরাণে আসিয়া এই বৈদিক সমুদ্র 'কারণ বারি' হইয়াছেন। এই অখণ্ড, অসীম পদার্থটিই যে আবার অদিতি, তাহা আমরা সেদিন আভাসে জানাইয়া রাখিয়াছি। এই যে সমুদ্র, তাহাকে আমরা দুই মূর্ত্তিতে ভাবিতে পারি। একটা অখণ্ড, একটানা (continuous) রূপ; অপরটা খণ্ডিত, টুক্‌রা-টুক্‌রা (discrete)। বিজ্ঞানও জগতের উপাদান-বস্তুটিকে লইয়া ঠিক দুই ভাবেই ভাবনা-চিন্তা করিতেছেন। সর্ব্বথা না হউক, কতকটা একটানা জিনিষ তাঁহার ঈথার। আর টুক্‌রা-টুক্‌রা জিনিষ তাঁহার মলিকিউল, এটম্, করপাস্‌ল প্রভৃতি। এই অখণ্ড জিনিষ আর এই টুক্‌রা-টুক্‌রা জিনিষ—এই দুইটির সাহায্যে বিজ্ঞান সম্প্রতি জগতের বিবরণ দিতেছেন। মূল জিনিষটা শুধু নির্ব্বিশেষ ভাবে, একটানা ভাবে পড়িয়া থাকিলে, তাহা হইতে বিশ্বের উদয় হয় না। এটা-সেটা নানা জিনিষ হইতে গেলে, সেই নির্ব্বিশেষ পদার্থের মধ্যে কোনও রকমে বিশেষ বা বৈষম্য দেখা দেওয়া চাই; আবার সেই জিনিষগুলার চলাফেরা, পরিণতি (এক কথায় জগৎ) হইতে গেলে, সেই মূল বস্তুটা টুক্‌রা-টুক্‌রা হওয়া চাই। যে সর্ব্বব্যাপী বিভু পদার্থ, সে চলিবে কোথায়, কি ভাবে? টুক্‌রা, অংশ বা অবয়বগুলার নড়াচড়া, অদল-বদল মানেই বস্তুর অবস্থান্তর প্রাপ্তি বা পরিণতি। দুধ যখন দই হয়, তখন দুধের কণিকাগুলি আগন্তুক কতকগুলি কণিকার সাহায্যে নিজেদের মধ্যে ঠাঁই অদল-বদল করিয়া লয়। রাসায়নিক প্রক্রিয়া বলুন আর যাই বলুন, ব্যাপারটা আসলে ইহাই। জল যখন বরফের চাপ বাঁধে, তখনও তাহার কণাগুলার একটা অভিনব বিন্যাস, (re-arrangement) হইয়া থাকে। আমাদের ভুক্ত দ্রব্যে যে রস রক্ত প্রভৃতি হইতেছে, সে ব্যাপারটাও মূলতঃ ইহাই। এক কথায়, এই বিশ্ব ঠিক একটানা, অখণ্ড একটা জিনিষ হইলে, ইহার মধ্যে চলাফেরা পরিণতির নাম-গন্ধও থাকিত না,—কাজেই জগৎ জগৎ হইত না। এই জন্য বলিতেছিলাম যে, মূল বস্তুটির দানাদার রূপে অভিব্যক্ত হওয়া চাই-ই। ইহা শুধু যে যুক্তির কথা, এমন নহে। আমরা পরীক্ষাতেও সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতেছি যে, আমাদের অনুভবের বিষয়ীভূত কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থ-গুলি সবই দানাদার। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বক্তৃতায় আমরা এ কথার অনেক প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া রাখিয়াছি। আমাদের সাধারণ প্রত্যক্ষ যেখানে হারি মানে, সেখানে বিজ্ঞান তাঁহার যন্ত্রপাতি ও হিসাবের খাতা লইয়া বসিয়া যান। এ ক্ষেত্রেও বিজ্ঞান যে কি ভাবে ছোটোর ছোট তারও ছোট, এইভাবে খুঁজিতে-খুঁজিতে পার্টিকেল, মলিকিউল, এটম্, করপাস্‌ল অবধি পৌঁছিয়াছেন, তাহার সমাচার আমরা পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়া রাখিয়াছি। ইলেকট্রিসিটি জিনিষটা দানাদার বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে, এবং সেই দানার নাম দেওয়া হয় 'করপাস্‌ল'; এবং করপাস্‌ল বা ইলেকট্রণকে রেডিয়াম-জাতীয় পদার্থের তেজোবিকীরণে হাতে-পাতে ধরিতে পারা গিয়াছে, এ সংবাদ আমার পাঠকবৃন্দের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় রাখেন। আমরা অবশ্য এই ইলেকট্রণকেই চরম সূক্ষ্ম জিনিষ বলিয়া মনে করি নাই। তবে সেই চরম সূক্ষ্ম জিনিষকে বুঝিবার পক্ষে ইলেকট্রণকে শিষ্ট, সমাদৃত প্রতীক বা সঙ্কেত ভাবে লইলে দোষের হইবে না। এখন, সেদিন বলিয়াছিলাম, আজ আবার বলিতেছি যে, বেদ-মন্ত্রে যে 'পাংসু' বা ধূলি শব্দ আমরা পাইতেছি, তাহার লক্ষ্যার্থ এই ইলেকট্রণ বা না তৎসদৃশ সূক্ষ্ম জিনিষ। অবশ্য আমরা আপাততঃ আধিভৌতিক পক্ষেই ব্যাখ্যা দিতেছি। আদিত্যের যে কিরণজাল, তাহাকে তাঁহার পদ না হয় মানে করিলাম। কিন্তু সে পদ যে আবার 'পাংসুর' বা ধূলিযুক্ত, এ কথাটার অর্থ গ্রহণ করিতে হইলে, আমাদের তলাইয়া দেখিতে হয়, কি রূপে ও কি ভাবে রশ্মিজাল উৎপন্ন ও সমন্তাৎ প্রসারিত হয়। আমরা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সেদিন দেখিয়াছিলাম যে, রশ্মিজাল (radiation) দ্বিবিধ—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট (luminous and non-luminous); তাড়িত-কণা বা করপাস্‌লগুলিই এই র‍্যাডিয়েসনের মূলে রহিয়াছে। এই তাড়িত-কণাগুলিই পাংসুরাজি বলিয়া খুব সম্ভবতঃ বেদ-মন্ত্রে কল্পিত হইয়াছে। এইরূপ না ভাবিলে, ঐ মন্ত্রের বেশ লাগ-সই ও সহজ অর্থ দেওয়া যায় বলিয়া আমার ত মনে হয় না। তার পর দশম মণ্ডল হইতে যে 'ধূলির' কথা আমি আপনাদিগকে শুনাইলাম, সে ধূলিই কি সাধারণ ধূলি? সে ধূলি সাক্ষাৎ ব্রজের রজঃ—ব্রজ মানে এই নিখিল বিশ্বটা। দেবতাগণ মহোৎসাহে নৃত্য করিয়া যেন সেই বিরাট ব্রজধামকে ধূলি-ময় করিয়া দিলেন,—এই রকম একটা কথা বেদ-মন্ত্র

বলিতেছেন। ঋকে প্রথমে বিশ্বব্যাপী জলরাশির কথা, তার পর মহোৎসাহে নৃত্যের কথা, শেষ কালে ধূলির কথা। বিশ্বব্যাপী জল যে কিসের সঙ্কেত, তাহা আমরা দেখিলাম; কিন্তু তাহার মধ্যে নৃত্যটি বস্তুতঃ কি, এবং সেই নৃত্যের ফলে ধূলি উড়িল, এ কথারই বা সঙ্কেত কি? আবার বলিয়া লই যে, আমরা এ প্রবন্ধগুলিতে আধিভৌতিক ব্যাখ্যা (বা physical interpretation) দিতেই প্রয়াস পাইতেছি। এ ছাড়া উচ্চ অঙ্গের কোনরূপ ব্যাখ্যা যে দেওয়া যায় না, অথবা ঋষিদের অন্তর্নিগূঢ় ছিল না, এমন কথা আমি আদৌ বলিতে চাই না। যিনি যে ভাবে দেখিতে, বুঝিতে চান বুঝুন; তবে পরস্পর দাঙ্গা করিবেন না—ইহাই আমার সেদিনকার একটা বড় কথা ছিল।

আচ্ছা, নৃত্য ও ধূলির আধিভৌতিক ব্যাখ্যাই বা কি দিব? মোটামুটি ভাবে, এখানে 'ধূলি' শব্দটা যে বিশ্বব্যাপী একটানা জিনিষের মধ্যে কোনও রকমে দানার উৎপত্তি বুঝাইতেছে, সে পক্ষে আপনাদের আর বোধ হয় সন্দেহ নাই। এই রকম দানা বা অংশ না পাইলে যে চলা-ফেরা হয় না, সুতরাং জগৎ হয় না, তাহা ত পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি। আপনারা সে কথাটায় বিশেষ ভাবে খেয়াল রাখিবেন। ধরুন, সেই বিশ্বব্যাপী একটানা জিনিষের কাজ-চালান গোছ প্রতিনিধি বা প্রতীক মনে করি আমরা বিজ্ঞানের ঈথারকে; কারণ-সলিল ও ঈথারকে একান্ত ভাবে মিলাইয়া দিতে আমি চাহিতেছি না। এখন, এই ঈথার যদি অক্ষুব্ধ, অবিকৃত ঈথার হইয়াই পড়িয়া থাকে, তবে জগৎ জন্মে না,—জগতের মসলা স্বরূপ অণু-পরমাণুগুলার আবির্ভাব হয় না। এটা অক্সিজেনের অণু, ওটা হাইড্রোজেনের অণু; দুইটা মিশিয়া জলের দানা হইতেছে—আবার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করিয়া "বায়ুভূত নিরাকার" হইয়া যাইতেছে—এই রকম একটা অবস্থাই সম্ভবে না, যদি ঈথার-অক্ষুব্ধ, নিস্তরঙ্গ, একটানা ভাবেই পড়িয়া থাকে। ঈথার-সাগরে যায়গায়-যায়গায় কেন্দ্র করিয়া এক-একটা পাক বা ঐ রকম কোন-রকম ক্ষোভের (strainএর) সৃষ্টি হওয়া চাই। প্রফেসার লারমরের ভাষায় কতকগুলা centres of intrinsic strain দরকার। লারমর সাহেবের বচন আর একদিন বিস্তারিতভাবে উদ্ধার করিয়া শুনাইয়াছিলাম। এটম্‌গুলা যে সাব্-এটম বা প্রাইম্-এটমের মসলায় গঠিত; সেই প্রাইম্-এটম্ খুব সম্ভবতঃ ঈথারের মধ্যে একটা centre of intrinsic strain, একটা বিক্ষোভ-কেন্দ্র। হেল্‌মহোল্‌জ ও লর্ড কেল্‌ভিন যেরূপ মনে করিতেন, তাহাতে প্রাইম্-এটম্ ঈথারের মধ্যে এক রকমের পাক বা আবর্ত্ত। আমরা যাঁহাকে কর্‌পাস্‌ল বলিয়া আসিতেছি, তিনি স্বরূপতঃ হয় ত ঈথারের মধ্যে এক রকমের পাক হইবেন। যে দুইজন বৈজ্ঞানিক-ধুরন্ধরের নাম করিলাম, তাঁহারা আঁকেও খুব মাথা দেখাইয়া গিয়াছেন। হাইড্রো-ডাইনামিক্স নামক মিশ্র-গণিতের শক্ত বিভাগটাকে ইঁহারা দুইজনে গড়িয়া-পিটিয়া কলাও করিয়া তুলিয়াছেন, বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ইঁহারা আঁক কষিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, ঈথার এহেন চিজ্ (অর্থাৎ perfect fluid) যে, তাহাতে অলৌকিক শক্তি ছাড়া পাক সৃষ্টি করা যায় না; কিন্তু যদি কোনও অভাবনীয় কারণে তাহাতে পাকের সৃষ্টি হইয়া যায়, তবে দ্রব্যগুণে, সে পাক কায়েমি হইয়া বাহাল রহিয়া যাইবে। লাঠি ঘুরাইয়া জলে পাক জন্মাইতে আমি সহজেই পারি; কিন্তু সে পাক বেশীক্ষণ টিকে না; কারণ, জলের দানাগুলার পরস্পরের বেগ থামাইয়া দিবার একটা ঝোঁক (friction) আছে; জলের দানাগুলা পাক খাইতে সুরু করিলে, আশে-পাশের দানারা যেন হাত ধরিয়া টানিয়া থামাইয়া দিতে চায়। এই টেবিলের উপর একটা মার্বেল গড়াইয়া দিলে, সে কিছুদূর হাঁটিয়া থামিয়া যায় অনেকটা এই কারণেই। পাক খাওয়ার বা ছুটাছুটি করার প্রতিবন্ধক এই হেতুটিকে (friction) ফ্রিক্‌সন্ বলে। এই হেতুটি বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া নিউটনের গতি সম্বন্ধে প্রথম আইনটি (First Law of Motion) কে আমরা প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ মনে করিয়া প্রথমে উড়াইয়া দিতে যাই। যাহা হউক, ঈথার কিন্তু জলের মত জিনিষ নহে। তাহার মধ্যে একটা দানা নাচিতে সুরু করিলে তাহাতে আর পাঁচজনের কোনই আপত্তি নাই। হাত ধরিয়া টানিয়া থামাইয়া দিতে কেহ আসে না। ইংরাজিতে যাহাকে fluid বলে, আমরা তাহার পরিভাষা করি 'সলিল' বা 'অপ্'। শুনিয়াই জল ভাবিবেন না। তাহা হইলে ঈথার এমনধারা এক 'সলিল', যাহার দানাগুলা পরস্পরের গায়ে-গায়ে বেশ অবাধে মোলায়েম ভাবে গড়াইয়া যাইতে

পারে। বৈজ্ঞানিকের খোদ লক্ষণাটাই উদ্ধৃত করিতেছি :—"The fluid which offers absolute resistance to compression and no resistance at all to slide of its parts—or the parts of which slip over each other without anything of the nature of frictional action * * * is termed a *perfect fluid.*" ইহা যেন চরম সলিল বা সলিলের নিরতিশয় মূর্ত্তি। এই চরম সলিলে পাক উৎপন্ন সহজে হইবে না,—হইলে, ইহার মধ্যে দানাগুলি পরস্পরের গায়ে-গায়ে বেশ মোলায়েম ভাবে গড়াইয়া যায় বলিয়া, সে পাক আর থামিবে না। কথাটা আন্দাজি নহে। গণিতশাস্ত্রে ইহার প্রমাণ আছে। লর্ড কেল্‌ভিন্ মনে করিতেন যে অণুগুলি (অন্ততঃ পক্ষে প্রাইম্ এটম্‌গুলি) ঐরূপ একটা চরম সলিলে অভাবনীয় এবং অতিপ্রাকৃত ক্রিয়া দ্বারা উৎপাদিত পাক বা Vortex ring। P. G. Tait ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যাহা লিখিতেছেন, তাহা আপনাদিগকে শুনাই :—

"Thus, if we adopt Sir William Thomson's supposition that the universe is filled with something which we have no right to call ordinary matter (though it must possess inertia), but which we may call a perfect fluid; then, if any portions of it have vortex-motion communicated to them, they will remain for ever stamped with that vortex-motion; they cannot part with it; it will remain with them as a characteristic for ever, or at least until the creative act which produced it shall take it away again. Thus this property of rotation may be the basis of all that to our senses appeals as matter." তারের মধ্যে এই জাতীয় যে পাক, তাহার নাম gyrostatic strain; আমাদের নব-পরিচিত কর্‌পাস্‌ল্-গুলি চরম সলিলে gyrostatic strain বলিয়া মনে করিলে বোঝাপড়ার অনেক সুবিধাই হয়। Sir William Thomson (লর্ড কেল্‌ভিন্) রসায়ন-বিদ্যার এটম্‌গুলাকেই ঐ রকম চরম সলিলে আবর্ত্ত মনে করিয়াছিলেন; এবং এটমের অনেক ধর্ম্মের ও ব্যবহারের বেশ সুন্দর কৈফিয়ৎ আমাদিগকে যুটাইয়া দিয়াছিলেন। এখন অবশ্য রসায়ন-বিদ্যার এটম্ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে; এবং তাহার মধ্যে কর্‌পাস্‌ল্ বা ইলেক্‌ট্রণগুলা কেমন পাক খাইতেছে তাহার বিবরণ, মায় নাচের ছন্দোমঞ্জরী সমেত, Sir Williamএর ভ্রাতা Sir James Thomson আমাদিগকে শুনাইয়া চমৎকৃত করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠে—এই কর্‌পাস্‌ল্ আবার কি? তাহাকে Sir Williamএর নির্দ্দেশমত চরম-সলিলে আবর্ত্ত মনে করিলে ভাল হয় না কি? কর্‌পাস্‌লগুলি অবিনাশী; আমরা তাহাদিগকে এখনও গড়িতে ভাঙ্গিতে পারি না। তাহারা যদি perfect fluidএ আবর্ত্তের মতন দ্রব্য হয়, তবে তাহাদের অমর হইবারই কথা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হেল্‌মহোল্‌জ ও কেল্‌ভিন্ গণিতের দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাহাদের উৎপত্তি বা ধ্বংস করিতে গেলে, supernatural agency বা অলৌকিক শক্তি দরকার,—এ কথা কেল্‌ভিন্ নির্ভয়েই বলিয়া গিয়াছেন। বিজ্ঞানের তরফ হইতে ব্যাপারখানা দাঁড়াইল এইরূপ। এইবার দশম মণ্ডলের মন্ত্রটি আবার পড়িয়া দেখুন; "দেবতারা মহোৎসাহে নৃত্য করিতে লাগিলেন" ইত্যাদি; রূপকের পিছনে ঠিক এই রকমের কথাগুলিই আমরা ধরিতে পারি না কি? লর্ড কেল্‌ভিনের ঈথার বা perfect fluid বেদের বিশ্বব্যাপী জলের (চরম-সলিলের) প্রতীক; প্রতীক বলিতেছি, হুবহু মিলাইয়া দিতেছি না। দেবগণের নৃত্য সেই কারণ-সলিলে পাক বা rotational strains সৃষ্টি করিতেছে; 'দৈব' বলিতে এমন একটা চেতনশক্তি বলা হইতেছে, যাহা কেল্‌ভিনের supernatural agencyর মত চরম-সলিলে পাক উৎপাদন করিতে সমর্থ; "দেবগণের মহোৎ-সাহে নৃত্যের ফলে যেন ধূলিরাশির উদয় হইল"—এ ধূলিরাশিকে বিজ্ঞানের কর্‌পাস্‌ল্ বা প্রাইম্-এটম্ প্রতীক রূপে বুঝাইতে পারে না কি? বিজ্ঞান যেমন বলিতেছেন, বেদও সেইরূপ বলিতেছেন—চরম-সলিলে অনির্ব্বচনীয় চেতন-শক্তির ক্রিয়া দ্বারা ঘূর্ণন জন্মিতেছে (অবশ্য ঠিক ঘূর্ণন কি অপর কোনও রকম ব্যাপার তাহা এখনও কেহ হলফ করিয়া বলিতে পারে না; সম্ভবতঃ ঘূর্ণন; অন্য

"কথা কয়ে' দেখবে কি গো? বাড়ী পাঠাতে হয় াঠিয়ে দেও,—কিন্তু এই কথা নিয়ে ওর সঙ্গে আলোচনা 'রলে সর্ব্বনাশ হ'বে। এমন কাজও করো না।"

"কেন? কি সর্ব্বনাশটা হ'বে শুনি?"

"সর্ব্বনাশ নয়? যদি তার মনে এ কথা নাই উঠে াকে, এমনো তো হ'তে পারে। তোমার কথাটা কইলেই তো তা'র মনটা টলে যাবে। তাহ'লে ঠিক পাগলাকে ৌকা ডোবান'র কথা মনে করে দেওয়া হ'বে। আর ' ছাড়া, কথাটা যদি মনে উঠে থাকে, তবে সে লজ্জায় টা চেপেই যাবে হয় তো। কিন্তু যদি টের পায় যে াটা প্রকাশই হ'য়ে গেছে, তবে তো আর লজ্জা-সরমের া থাকবে না। মেয়েমানুষের মন বড় ঠুনকো জিনিষ,— ক ভারি সমঝে চ'লতে হয়।"

এ যুক্তিতে ইন্দ্র হাসিল। সে কোনও কথা না বলিয়া, দিনই মনোরমাকে তার পড়িবার ঘরে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা ল, "মনো, তুই তোর স্বামীর ছবি সরিয়ে ফেলেছিস্ ?"

মনোরমার বুকটা একটু কাঁপিয়া উঠিল। সত্য কথাটা তে তার ভয়ানক সঙ্কোচ বোধ হইল; কিন্তু হৃদয়ের বল সংগ্রহ করিয়া সে সঙ্কোচকে জয় করিয়া বলিল, যে মিথ্যা দাদা!"

এমন সাদামাটা নগ্ন সত্যটা ইন্দ্রকে একটু আঘাত । সে ইহার পর কি বলিবে, কিছুক্ষণ ভাবিয়া না। শেষে অনেকক্ষণ ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা , একটা কথা আমায় বলবি? তোর কি বিয়ে ত ইচ্ছা হয়?"

মনোরমার মুখটা এবার একটু লাল হইয়া উঠিল। টা সে স্বীকার করিয়া পরাজয় মানিয়া লইবে না করিয়াছিল; কাজেই সে একটু থামিয়া বলিল দাদা।"

দেখিস দিদি, লজ্জা করে' আমায় কিছু বলিস না,— তোর ঠিক খাঁটি মনের কথাটা জানতে চাই। তোর যদি ইচ্ছা থাকে, তবে আমি তোর দেব।"

নোরমা জোর করিয়া বলিল, "কিছুতেই না,—বিয়ে ক'রবো না।"

ইন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিল না; কিন্তু স্ত্রীর উপদেশ স্মরণ করিয়া সে আর মনোরমাকে এ বিষয়ে ঘাঁটাইল না।

মনোরমার কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অব্যাহত ভাবে চলিতে লাগিল। কেবল ছেলে ও ভাইঝিদের লইয়া আমোদ-প্রমোদ করা ছাড়া, সকল সুখ-সম্ভোগ হইতে সে নিজেকে জোর করিয়া দূরে রাখিতে লাগিল। অনীতা এখন আর আসিয়া প্রায়ই তাহার দেখা পায় না। অমল আসিলে মনোরমা ছাদের উপর দিয়া পাশের বাড়ী চলিয়া যায়। এই দুটি ভাই-বোন অল্পদিনের মধ্যেই যেন তার অকারণ বিরাগের কারণ হইয়া উঠিল। তার রকম-সকম অনীতা বেশ বুঝিতে পারিয়া, এ বাড়ীতে যাওয়া-আসা অনেকটা কমাইয়া দিল।

(১৯)

অনীতার মোটর চড়িয়া যাইবার ইচ্ছা ছিল ইন্দ্রনাথেরই বাড়ী। দাদার ব্যবহারে ক্রোধে অন্ধ হইয়া সে এই সঙ্কল্প করিয়াছিল। কিন্তু কিছুদূর গিয়াই তার মনে হইল যে, সেখানে যাওয়া তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব! বাড়ী ফিরিবার পথও তো সে বন্ধ করিয়াছে। এখন যাইবে কোথায়? তার সকল দুঃখ, সকল বেদনা ছাইয়া এই দারুণ দুর্মীমাংস্য প্রশ্ন তাহার মন ছাইয়া ফেলিল।

আজ সন্ধ্যাবেলার সমস্ত ঘটনায় তার মনের ভিতর একটা প্রবল ঘূর্ণাবর্ত্ত বহাইয়া দিয়াছিল। কি সর্ব্বনাশ সে করিয়া বসিল তার অসংযত হৃদয়ের মত্ততায়! এতদিন, এত বৎসর সে যে বেদনা বুকের ভিতর চাপিয়া রাখিয়াছে, আজ সে তাহাকে এমন করিয়া ছাড়িয়া দিল কেমন করিয়া? দীর্ঘ সাধনায় সে মনের ভিতর যে ধৈর্য্যের সৌধ গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহা এক মুহূর্ত্তে অদৃষ্টের নিষ্ঠুর ফুৎকারে উড়িয়া গেল! আর তার ফল হইল কি? এ জগতে সে যে দুইটি লোককে সবচেয়ে বেশী ভালবাসে, যাহাদের সুখ-সৌভাগ্যের জন্য তার সব দিতে পারে, সে তাদের মনের ভিতর বিষের ছুরী বসাইয়া দিয়াছে। আর সবচেয়ে বেশী সর্ব্বনাশ করিয়াছে তারই, যার এক ফোঁটা সুখের জন্য সে নিজের হৃদ্‌পিণ্ডটাকে অনায়াসে কাটিয়া দিতে পারে! ইন্দ্রনাথ—নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ, দেবচরিত্র ইন্দ্রনাথ আজ অনীতার দোষে, অর্থ-সম্পত্তির চেয়ে হাজার-গুণ দামী যে সম্মান, তাহা হারাইতে বসিয়াছে! তারই

জন্য নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র সে এতবড় কুৎসিত কলঙ্কের বোঝা মাথা পাতিয়া লইয়া গেল! এই যে আঁধার সে আজ বাধাইয়া বসিয়াছে, ইহা ভাঙ্গিবে কি করিয়া?

তার পর তার মনে হইল নিজের কথা! তার কি হইবে? তার জীবনের সকল সম্পদ তো আজ সে বিলাইয়া দিয়া আসিয়াছে। যশঃ, মান, চরিত্র-গৌরব—যা লইয়া নারীর জীবন, সব তো সে ভাসাইয়া দিয়া আসিয়াছে। এখন সে বাঁচিবে কি লইয়া? যাদের লইয়া সে সংসারের সঙ্গে গাঁথিয়া ছিল, তাদের সে তো জন্মের মত ছাড়িয়া আসিয়াছে। ইন্দ্রনাথের কাছে আর তার যাইবার উপায় নাই, অমলের কাছেও সে যাইবে না। তবে কাহাকে লইয়া সে বাঁচিয়া থাকিবে? এত-বড় বিশ্ব-সংসারটার মধ্যে যে সে নিতান্তই একা! সংসারের অকূল সাগরের চারিদিকে চাহিয়া সে একবিন্দু দৃঢ় আশ্রয় বা বন্ধনের স্থান খুঁজিয়া পাইল না। উদ্দেশ্যবিহীন, নিরবলম্ব, কলঙ্কিত জীবন লইয়া সে এখন কি করিবে?

তার মোটর তখন আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। নববিধানের ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে একটা বড়গোছের কীর্ত্তনের দল তাহার মোটরের সামনে পড়িল। গানের সুরটা অনীতার বড় মধুর লাগিল। সে শোফারকে গাড়ী আস্তে চালাইয়া সঙ্কীর্ত্তনের পিছু-পিছু যাইতে বলিল। কীর্ত্তনের দল গাহিতেছিল,

আমার যা' কিছু সব আপন ছিল,
সকলি নিলে কেড়ে!
ঘর বাড়ী সব উজাড় করে'
আন্‌লে বাহিরে!
ওগো দয়াল প্রভু, তোমার নামে
আন্‌লে বাহিরে।
আকাশের নীল চন্দ্রাতপে
দক্ষিণ হাওয়ায়, আতপতাপে,
ভবের নৃত্য আসর মাঝে
দিয়েছ ছেড়ে!
তোমার প্রেমের সুধাধারে
শূন্য হৃদয় গেছে ভরে!
ওগো কূল নাহি পাই সুখ-সাগরে
প্রেমের পাথারে।

গানটা অনীতার হৃদয়ের একটা নূতন তন্ত্রীতে আঘাত করিল। তার কম্পনে তার সমস্ত হৃদয়ে সে একটা নূতন জীবনের সাড়া পাইল। গান শুনিতে-শুনিতে সে তন্ময় হইয়া তার সঙ্গে-সঙ্গে মন্দ্রস্বরে গাহিতে লাগিল। কীর্ত্তনীয়ারা একবার মুগ্ধচিত্তে গাড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল,—গদগদ চিত্তে অশ্রুমুখে অনীতা গাহিতেছে,

ওগো, কূল নাহি পাই সুখ-সাগরে
প্রেমের পাথারে।

তার ভাবের ঘোর সবাইকে পাইয়া বসিল,—সকলে নাচিয়া নাচিয়া গাহিল,

কূল নাহি পাই সুখ-সাগরে
প্রেমের পাথারে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের কাছে আসিয়া সঙ্কীর্ত্তনের দল যখন মন্দিরে প্রবেশ করিল, তখন অনীতা মোটর হইতে নামিয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করিল।

সেদিন আচার্য্য সুকুমার বাবু উপাসনা করিলেন। সুকুমার ঘোষ সুপুরুষ নন, কিন্তু সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষ। বয়স তাঁর পঞ্চাশের উর্দ্ধে। তাঁর চক্ষু দুটি যেন একটা স্নিগ্ধ, শান্ত আলোকে উদ্ভাসিত; মুখ আনন্দ-উজ্জ্বল; ওষ্ঠাধরে হাসি লাগিয়াই আছে। সাধারণ ধর্ম্ম-প্রচারকেরা যে রকম একটা গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকেন, সুকুমার বাবুর মধ্যে তাহার কিছুই নাই। তিনি রহস্যপ্রিয়, লঘু-ভাষী, এবং কতকটা চঞ্চল। কিন্তু বেদীতে আরোহণ করিলে সেই চঞ্চলতার ভিতর দিয়া যেন আগুনের ফুল্‌কি ছুটিয়া বাহির হয়;—তাঁর প্রত্যেকটি কথায় যেন চোখের উপর বিষয়টা জীয়ন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠে। তিনি যখন পাপের কথা বলেন, তখন সেটা যেন ক্রিমি-কীটের মত কদর্য্য ঘৃণার্হ হইয়া চোখের সামনে কিলকিল করিতে থাকে, ভগবানের কথা তুলিলে যেন আশে-পাশে তাঁর পুণ্যস্পর্শ অনুভব করা যায়।

অনীতা কলিকাতার একজন শ্রেষ্ঠ গায়িকা বলিয়া সর্ব্বজন-পরিচিতা। তাহাকে আজ মন্দিরে উপস্থিত দেখিয়া, সকলে তাহাকেই প্রথম গানটা গাহিতে বলিলেন। সে গাহিল—

কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই।

ইত্যাদি—

হৃদয়ের সমস্ত আবেগ ঢালিয়া দিয়া অনীতা তার :শ্ব-বিমোহন কণ্ঠে গানটি গাহিয়া যখন থামিল, তখন ার সমস্ত মুখ চোখের জলে ভাসিয়া গিয়াছে। গান াষ করিয়া সে হাতের ভিতর মাথা গুঁজিয়া ধ্যানস্থ হইল, ার্থনায় মুখে যোগ দিতে পারিল না। সুকুমারবাবুও ন শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। প্রার্থনার পর তাঁর ৃতা আরম্ভ করিলেন ধীর, শান্ত, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে। ক্রমে র মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, চক্ষু জ্বলিতে লাগিল,—তীব্র বল রজতধারার মত তাঁর বক্তৃতা-লহরী ছুটিল। লোকটা : আবিষ্ট হইয়াছে—যেন কি একটা দেখিয়াছে,—তাই মুখে লোককে শুনাইবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িয়াছে।

ঈশ্বরের মাতৃত্বের কথা বলিতেছিলেন—"মায়ের স্নেহ- হৃদয় লইয়া তিনি তাঁর পথ-ভ্রান্ত পুত্রদের জন্য পথ ়য়া বসিয়া আছেন; বুক-ভরা তাঁর ক্ষমা, প্রাণ-ভরা করুণা—ওরে আয় রে তোরা ছুটে আয়, পাপী, তাপী, ও ক্লান্ত; এ অমৃতের ধারায় ধুয়ে তোদের সব ক্লেশ, ান্তি দূর ক'রে ফেল। ভয় কি তোদের? ভুল হ'য়ে ;, তাঁর অনন্ত জ্ঞানের আশ্রয় নে, আর ভুল হবে না! করেছিস, ওই যে মায়ের পতিত-পাবন, ক্ষমা-সরল খোলা র'য়েছে,—ওখানে আশ্রয় নিলেই সব ক্লেদ ধুয়ে ! পাপের ভয়! একটা মিথ্যাকে এত ভয়! জল-প্রপাতের মুখে একটা বালির ঢিপি যতটা সত্য, বিশ্বব্যাপী করুণাধারার কাছে পাপ তো তার চেয়ে কিছু সত্য নয়। তবে ভয় কিসের?—মা যে তোদের, স্নেহের হস্ত বাড়িয়ে, মা ভৈঃ রবে তোদের অনন্ত অভয় া। সব ভাবনা-চিন্তা চুকিয়ে দিয়ে একবার তাঁর ার শান্ত ছায়ার তলে দাঁড়ালেই, আর কোনও , কোনও ভাবনার, কোনও দুঃখেরই তো অবসর : না।"

, চোখ, কাণ সম্পূর্ণ খুলিয়া দিয়া অনীতা কথাগুলি ভুক্তিতের মত গ্রাস করিতে লাগিল। সমস্ত বিশ্ব-সংসার তার চোখের সামনে লুপ্ত হইয়া গেল—সে যেন প্রত্যেকটি কথায় বিশ্ব-জননীর সেই স্নিগ্ধ, পুণ্যাঞ্চলের বাতাস তার অন্তরের ভিতর অনুভব করিতে লাগিল।

উপাসনা শেষ হইলে অনীতার মনটা একেবারে শান্ত হইয়া গেল। সে উৎফুল্ল হৃদয়ে সুকুমার বাবুর কাছে গিয়া মাথা নোয়াইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। অনীতার মত মেমসাহেব যে কাহাকেও প্রণাম করিতে পারে, তাহা এতদিন কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই।

সুকুমারবাবু হাত ধরিয়া তাহাকে উঠাইয়া বলিলেন, "কি রে বেটী, এতদিনে বুঝি মায়ের কথা মনে পড়েছে?"

অনীতা মাথা নীচু করিয়া রহিল। সুকুমারবাবু বলিলেন, "আর বলতে হবে না,—তোমার মনের ভিতর যে কিসের ঢেউ বইছে,—তোমার গানেই সব টের পাওয়া গেছে। সার্থক গান শিখেছিলে অনীতা, আর সার্থক হ'ল তোমার শিক্ষা আজ! ওই গলায় যদি ওই গানই না গাইলে, তবে গলা থাকলেই বা কি, না থাকলেই বা কি।"

অনীতা বলিল, "আমি আজ আপনার ওখানে যাব,—আপনার বাড়ীতে আমার স্থান হ'বে কি?"

সুকুমার বাবু হাসিয়া বলিলেন, "না। তোমাদের যে প্রকাণ্ড শরীর, তোমাদের অতবড় বাড়ীটাতে মাত্র দুটী বই লোক ধরে না। আমার ছোট ঘরে তোমার দেহ আঁটবে কেমন ক'রে?"

অনীতা বলিল, "ঠাট্টা নয় কাকা। আমি সুধু আজ রাত্রের জন্য থাকৃতে যাচ্ছি না,—কতদিনের জন্য জানি না। হয় তো চিরদিনের জন্য।"

বিস্মিত হইয়া সুকুমার বাবু তার মুখের দিকে চাহিলেন। বুঝিতে পারিলেন কিছু গোলোযোগ হইয়াছে, কিন্তু কি গোলযোগ? বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "সে কি কথা মা?"

অনীতা মুখ নত করিয়া বলিল, "সে অনেক কথা।"

সুকুমার বাবু আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। অনীতার মোটরে চড়িয়া তাহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। তার পর নিকটে এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া অমলকে টেলিফোঁ করিলেন, "অনীতা আমার কাছে আছে, কোনও চিন্তা করো না।"

অমল বলিল, "আমার তার জন্যে আর কোনও

চিন্তাই নেই, সে যেখানে ইচ্ছা থা'ক।" বলিয়া রিসীভার ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সুকুমার বাবু আরও আশ্চর্য্য হইলেন। এই দুইটী ভাই-ভগিনীর সঙ্গে, খুব ঘনিষ্ট না হইলেও, তাঁর বেশ আলাপ ছিল। তাদের সৌভ্রাত্র একটা দৃষ্টান্তের বিষয় ছিল। তাদের মধ্যে হঠাৎ এমন ছাড়াছাড়ি কেমন করিয়া হইল? তিনি মাথা চুলকাইতে-চুলকাইতে বাড়ী চলিয়া গেলেন।

অনীতা শোফারকে বিদায় করিয়া দিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, কখন আবার গাড়ী আনিতে হইবে। অনীতা বলিল, আর গাড়ীর দরকার নাই। সে গাড়ী বাড়ীতে পৌছাইয়া সাহেবের কাছে মাহিনা চুকাইয়া লইয়া চলিয়া যাইতে পারে। শোফার বিব্রত লইয়া গাড়ী লইয়া চলিয়া গেল।

পরের দিন বিকাল বেলায় অনীতা একটা সলিসিটারের পত্র পাইল। তিনি লিখিয়াছেন যে, ৫ লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ ও পার্ক ষ্ট্রীটের একখানা বাড়ীর দখল অনীতাকে বুঝাইয়া দিতে তিনি অমল কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছেন। অনীতা শীঘ্র দখল লইবার বন্দোবস্ত করিলে ভাল হয়।

অনীতা সে পত্রের উত্তর দিল না। (ক্রমশঃ)

একপেশে!

আর্থিক অবস্থার সেতুর উপর দিয়ে দেউলিয়া নদী পার হ'তে গিয়ে য়ুরোপ আয়ের চেয়ে ব্যয়ের ভারে এক-পেশে হ'য়ে পড়ে, পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে "আমায় বাঁচাও! ওগো বাঁচাও!"

আমেরিকা দূর থেকে বল'ছে "আগে নিজের বোঝা সাম্‌লাও, তবে ত বাঁচ্‌বে!"

(San Francisco Chronicle)

ঠাকুর রক্ষে কর!

আয়ার্ল্যাণ্ডে আজ ঘরোয়া বিবাদ বেধে গেছে। স্বাধীন (Republican) ও সামন্তদের (Free State) দলে যুদ্ধ চলেছে। আয়ার্ল্যাণ্ড এই বিপদে কাতর হ'য়ে যেন ভগবানকে ডেকে বলছে, "ঠাকুর রক্ষে কর! আমার এই দুর্দ্দান্ত ছেলেরা দেখছি কেউই আমাকে ভালবাসে না। নইলে মা'র চখের সামনে তারা কি ভাই বোনের উপর গুলি চালায়?"

(The People, London)

বেদ ও বিজ্ঞান

অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম- এ

গতবার হইতেই ঋগ্‌বেদের মন্ত্র উদ্ধার করিয়া বিজ্ঞানের তরফ হইতে তাহাদের একটা রহস্যোদ্‌ভেদ আমরা আরম্ভ করিয়া দিয়াছি। প্রথম মণ্ডলের প্রসিদ্ধ "ত্রেধা নিদধে পদং" ইত্যাদি মন্ত্রে আদিত্যরূপী বিষ্ণুর যে মহিমা কীর্ত্তন করা হইয়াছে, সেইখানে, "তস্য পাংসুরে" এই বাক্যাংশটি দ্বারা যে ঠিক কি বুঝিব, তাহা হালের বিজ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। "আদিত্য ধূলিবিশিষ্ট পদ দ্বারা জগৎ আচ্ছন্ন করেন"—এ বাক্যে ধূলি কথাটার ঠিক রহস্য কি ? ইহাই ছিল আমাদের প্রশ্ন। ওটা কবিত্বের অতিরঞ্জন বা অতিশয়োক্তি বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলে কি ? কবি ঠিক পাগল নহে,—জগতের মহাকবি কবি ও পাগলের মধ্যে যতই কুটুম্বিতা দেখাইয়া দেন না কেন। কাজেই, কবির মুখে একেবারে নিরর্থক ও অসম্বদ্ধ বাক্য শুনিতে আমরা প্রত্যাশা করি না। আদিত্যের মহিমা বর্ণনা করিতে যাইয়া, ঠিক ধূলিবিশিষ্ট পদের কথাই বা কবি বলিতেছেন কেন ? আমাদের মনে হয়, পাংসু বা ধূলি কথাটা ওখানে একটা মস্ত বড় প্রচ্ছন্ন তথ্য বাহির করিয়া লইবার চাবি-কাটি। বেদের কেবল মাত্র একটা থাকে 'পাংসুরে' দেখিয়াই ভিতরে একটা লুকান কথার আঁচ করিলে হয় ত হঠকারিতা হইত ; কিন্তু যে কথাটা এখানে লুকান, সে কথাটা অপর নানা যায়গায় একরকম খোলসা করিয়াই দেখান হইয়াছে। তার প্রমাণ আমরা ক্রমশঃ দিতে থাকিব। ঋগ্‌বেদের ১০।৭২ সূক্তে দেবতাগণের জন্ম-বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ঐ সূক্তে অদিতির অনেক কথাও আছে ; সুতরাং সূক্তটির বিশেষ আলোচনা আমাদিগকে করিতে হইবে। আপাততঃ ঐ সূক্তের ৬ ঋকটির বাঙ্গালা আপনারা শুনুন :—"দেবতারা এই বিশ্বব্যাপী জল মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া, মহোৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যে নৃত্য করিতে লাগিলেন, সেই কারণে প্রচুর ধূলির উদয় হইল।" এখানেও সেই ধূলির কথা। এ ধূলির হাত এড়ান দায় !

মন্ত্রটা শুনিয়াই আপনাদের মনে হইল না কি যে, ইহা উপমা দ্বারা, রূপকের দ্বারা, সৃষ্টির গোড়ার কথা বলিতে চাহিতেছে ? যে সর্ব্বব্যাপী গোড়ার জিনিষটা হইতে সবই হইয়াছে, যেটাকে আধুনিক বিজ্ঞান 'ঈথার'

বলিয়া কতকটা ধরিতে-ছুঁইতে চেষ্টা করেন, সেই জিনিষটাকে বেদের ঋষিরা অনেক যায়গাতেই 'সমুদ্র' বলিয়া সঙ্কেতে কহিয়া গিয়াছেন। পুরাণে আসিয়া এই বৈদিক সমুদ্র 'কারণ বারি' হইয়াছেন। এই অখণ্ড, অসীম পদার্থটিই যে আবার অদিতি, তাহা আমরা সেদিন আভাসে জানাইয়া রাখিয়াছি। এই যে সমুদ্র, তাহাকে আমরা দুই মূর্ত্তিতে ভাবিতে পারি। একটা অখণ্ড, একটানা (continuous) রূপ; অপরটা খণ্ডিত, টুক্‌রা-টুক্‌রা (discrete)। বিজ্ঞানও জগতের উপাদান-বস্তুটিকে লইয়া ঠিক দুই ভাবেই ভাবনা-চিন্তা করিতেছেন। সর্ব্বথা না হউক, কতকটা একটানা জিনিষ তাঁহার ঈথার। আর টুক্‌রা-টুক্‌রা জিনিষ তাঁহার মলিকিউল, এটম্, কর্‌পাস্‌ল প্রভৃতি। এই অখণ্ড জিনিষ আর এই টুক্‌রা-টুক্‌রা জিনিষ—এই দুইটির সাহায্যে বিজ্ঞান সম্প্রতি জগতের বিবরণ দিতেছেন। মূল জিনিষটা শুধু নির্ব্বিশেষ ভাবে, একটানা ভাবে পড়িয়া থাকিলে, তাহা হইতে বিশ্বের উদয় হয় না। এটা-সেটা নানা জিনিষ হইতে গেলে, সেই নির্ব্বিশেষ পদার্থের মধ্যে কোনও রকমে বিশেষ বা বৈষম্য দেখা দেওয়া চাই; আবার সেই জিনিষগুলার চলাফেরা, পরিণতি (এক কথায় জগৎ) হইতে গেলে, সেই মূল বস্তুটা টুক্‌রা-টুক্‌রা হওয়া চাই। যে সর্ব্বব্যাপী বিভু পদার্থ, সে চলিবে কোথায়, কি ভাবে? টুক্‌রা, অংশ বা অবয়বগুলার নড়াচড়া, অদল-বদল মানেই বস্তুর অবস্থান্তর প্রাপ্তি বা পরিণতি। দুধ যখন দই হয়, তখন দুধের কণিকাগুলি আগন্তুক কতকগুলি কণিকার সাহায্যে নিজেদের মধ্যে ঠাঁই অদল-বদল করিয়া লয়। রাসায়নিক প্রক্রিয়া বলুন আর যাই বলুন, ব্যাপারটা আসলে ইহাই। জল যখন বরফের চাপ বাঁধে, তখনও তাহার কণাগুলার একটা অভিনব বিন্যাস, (re-arrangement) হইয়া থাকে। আমাদের ভুক্ত দ্রব্যে যে রস রক্ত প্রভৃতি হইতেছে, সে ব্যাপারটাও মূলতঃ ইহাই। এক কথায়, এই বিশ্ব ঠিক একটানা, অখণ্ড একটা জিনিষ হইলে, ইহার মধ্যে চলাফেরা পরিণতির নাম-গন্ধও থাকিত না,—কাজেই জগৎ জগৎ হইত না। এই জন্য বলিতেছিলাম যে, মূল বস্তুটির দানাদার রূপে অভিব্যক্ত হওয়া চাই-ই। ইহা শুধু যে যুক্তির কথা, এমন নহে। আমরা পরীক্ষাতেও সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতেছি যে, আমাদের অনুভবের বিষয়ীভূত কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থ-গুলি সবই দানাদার। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বক্তৃতায় আমরা এ কথার অনেক প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া রাখিয়াছি। আমাদের সাধারণ প্রত্যক্ষ যেখানে হারি মানে, সেখানে বিজ্ঞান তাঁহার যন্ত্রপাতি ও হিসাবের খাতা লইয়া বসিয়া যান। এ ক্ষেত্রেও বিজ্ঞান যে কি ভাবে ছোটোর ছোট তারও ছোট, এইভাবে খুঁজিতে-খুঁজিতে পার্টিকেল, মলিকিউল, এটম্, কর্‌পাস্‌ল অবধি পৌঁছিয়াছেন, তাহার সমাচার আমরা পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়া রাখিয়াছি। ইলেক্‌ট্রিসিটি জিনিষটা দানাদার বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে, এবং সেই দানার নাম দেওয়া হয় 'কর্‌পাস্‌ল'; এবং কর্‌পাস্‌ল বা ইলেক্‌ট্রণকে রেডিয়াম-জাতীয় পদার্থের তেজোবিকীরণে হাতে-পাতে ধরিতে পারা গিয়াছে, এ সংবাদ আমার পাঠকবৃন্দের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় রাখেন। আমরা অবশ্য এই ইলেক্‌ট্রণকেই চরম সূক্ষ্ম জিনিষ বলিয়া মনে করি নাই। তবে সেই চরম সূক্ষ্ম জিনিষকে বুঝিবার পক্ষে ইলেক্‌ট্রণকে শিষ্ট, সমাদৃত প্রতীক বা সঙ্কেত ভাবে লইলে দোষের হইবে না। এখন, সেদিন বলিয়াছিলাম, আজ আবার বলিতেছি যে, বেদ-মন্ত্রে যে 'পাংসু' বা ধূলি শব্দ আমরা পাইতেছি, তাহার লক্ষ্যার্থ এই ইলেক্‌ট্রণ বা বা তৎসদৃশ সূক্ষ্ম জিনিষ। অবশ্য আমরা আপাততঃ আধিভৌতিক পক্ষেই ব্যাখ্যা দিতেছি। আদিত্যের যে কিরণজাল, তাহাকে তাঁহার পদ না হয় মানে করিলাম। কিন্তু সে পদ যে আবার 'পাংসুর' বা ধূলিযুক্ত, এ কথাটার অর্থ গ্রহণ করিতে হইলে, আমাদের তলাইয়া দেখিতে হয়, কি রূপে ও কি ভাবে রশ্মিজাল উৎপন্ন ও সমন্তাৎ প্রসারিত হয়। আমরা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সেদিন দেখিয়াছিলাম যে, রশ্মিজাল (radiation) দ্বিবিধ—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট (luminous and non-luminous); তাড়িত-কণা বা কর্‌পাস্‌লগুলিই এই র‍্যাডিয়েসনের মূলে রহিয়াছে। এই তাড়িত-কণাগুলিই পাংসুরাজি বলিয়া খুব সম্ভবতঃ বেদ-মন্ত্রে কল্পিত হইয়াছে। এইরূপ না ভাবিলে, ঐ মন্ত্রের বেশ লাগ-সই ও সহজ অর্থ দেওয়া যায় বলিয়া আমার ত মনে হয় না। তার পর দশম মণ্ডল হইতে যে 'ধূলির' কথা আমি আপনাদিগকে শুনাইলাম, সে ধূলিই কি সাধারণ ধূলি? সে ধূলি সাক্ষাৎ ব্রজের রজঃ—ব্রজ মানে এই নিখিল বিশ্বটা। দেবতাগণ মহোৎসাহে নৃত্য করিয়া যেন সেই বিরাট ব্রজধামকে ধূলিময় করিয়া দিলেন,—এই রকম একটা কথা বেদ-মন্ত্র

বলিতেছেন। ঋকে প্রথমে বিশ্বব্যাপী জলরাশির কথা, তার পর মহোৎসাহে নৃত্যের কথা, শেষ কালে ধূলির কথা। বিশ্বব্যাপী জল যে কিসের সঙ্কেত, তাহা আমরা দেখিলাম; কিন্তু তাহার মধ্যে নৃত্যটি বস্তুতঃ কি, এবং সেই নৃত্যের ফলে ধূলি উড়িল, এ কথারই বা সঙ্কেত কি? আবার বলিয়া লই যে, আমরা এ প্রবন্ধগুলিতে আধিভৌতিক ব্যাখ্যা (বা physical interpretation) দিতেই প্রয়াস পাইতেছি। এ ছাড়া উচ্চ অঙ্গের কোনরূপ ব্যাখ্যা যে দেওয়া যায় না, অথবা ঋষিদের অন্তর্নিগূঢ় ছিল না, এমন কথা আমি আদৌ বলিতে চাই না। যিনি যে ভাবে দেখিতে, বুঝিতে চান বুঝুন; তবে পরস্পর দাঙ্গা করিবেন না—ইহাই আমার সেদিনকার একটা বড় কথা ছিল।

আচ্ছা, নৃত্য ও ধূলির আধিভৌতিক ব্যাখ্যাই বা কি দিব? মোটামুটি ভাবে, এখানে 'ধূলি' শব্দটা যে বিশ্বব্যাপী একটানা জিনিষের মধ্যে কোনও রকমে' দানার উৎপত্তি বুঝাইতেছে, সে পক্ষে আপনাদের আর বোধ হয় সন্দেহ নাই। এই রকম দানা বা অংশ না পাইলে যে চলা-ফেরা হয় না, সুতরাং জগৎ হয় না, তাহা ত পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি। আপনারা সে কথাটায় বিশেষ ভাবে খেয়াল রাখিবেন। ধরুন, সেই বিশ্বব্যাপী একটানা জিনিষের কাজ-চালান গোছ প্রতিনিধি বা প্রতীক মনে করি আমরা বিজ্ঞানের ঈথারকে; কারণ-সলিল ও ঈথারকে একান্ত ভাবে মিলাইয়া দিতে আমি চাহিতেছি না। এখন, এই ঈথার যদি অক্ষুব্ধ, অবিকৃত ঈথার হইয়াই পড়িয়া থাকে, তবে জগৎ জন্মে না,—জগতের মসলা স্বরূপ অণু-পরমাণুগুলার আবির্ভাব হয় না। এটা অক্সিজেনের অণু, ওটা হাইড্রোজেনের অণু; দুইটা মিশিয়া জলের দানা হইতেছে—আবার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করিয়া "বায়ুভূত নিরাকার" হইয়া যাইতেছে—এই রকম একটা অবস্থাই সম্ভবে না, যদি ঈথার-অক্ষুব্ধ, নিস্তরঙ্গ, একটানা ভাবেই পড়িয়া থাকে। ঈথার-সাগরে যায়গায়-যায়গায় কেন্দ্র করিয়া এক-একটা পাক বা ঐ রকম কোন-রকম ক্ষোভের (strainএর) সৃষ্টি হওয়া চাই। প্রফেসার লারমরের ভাষায় কতকগুলা centres of intrinsic strain দরকার। লারমর সাহেবের বচন আর একদিন বিস্তারিতভাবে উদ্ধার করিয়া শুনাইয়াছিলাম। এটম্‌গুলা যে সাব্-এটম বা প্রাইম্-এটমের মসলায় গঠিত; সেই প্রাইম্-এটম্ খুব সম্ভবতঃ ঈথারের মধ্যে একটা centre of intrinsic strain, একটা বিক্ষোভ-কেন্দ্র হেলমহোলজ্ ও লর্ড কেল্‌ভিন যেরূপ মনে করিতেন তাহাতে প্রাইম্-এটম্ ঈথারের মধ্যে এক রকমের পাক বা আবর্ত্ত। আমরা যাঁহাকে করপাস্‌ল বলিয়া আসিতেছি তিনি স্বরূপতঃ হয় ত ঈথারের মধ্যে এক রকমের পাক হইবেন। যে দুইজন বৈজ্ঞানিক-ধুরন্ধরের নাম করিলাম তাঁহারা আঁকেও খুব মাথা দেখাইয়া গিয়াছেন। হাইড্রো-ডাইনামিক্স নামক মিশ্র-গণিতের শক্ত বিভাগটাকে ইঁহারা দুইজনে গড়িয়া-পিটিয়া ফলাও করিয়া তুলিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ইঁহারা আঁক কষিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, ঈথার এহেন চিজ্ (অর্থাৎ perfect fluid) যে, তাহাতে অলৌকিক শক্তি ছাড়া পাক সৃষ্টি করা যায় না; কিন্তু যদি কোনও অভাবনীয় কারণে তাহাতে পাকের সৃষ্টি হইয়া যায়, তবে দ্রব্যগুণে, সে পাক কায়েমি হইয়া বাহাল রহিয়া যাইবে। লাঠি ঘুরাইয়া জলে পাক জন্মাইতে আমি সহজেই পারি; কিন্তু সে পাক বেশীক্ষণ টিকে না; কারণ, জলের দানাগুলার পরস্পরের বেগ থামাইয়া দিবার একটা ঝোঁক (friction) আছে; জলের দানাগুলা পাক খাইতে সুরু করিলে, আশে-পাশের দানারা যেন হাত ধরিয়া টানিয়া থামাইয়া দিতে চায়। এই টেবিলের উপর একটা মার্বেল গড়াইয়া দিলে, সে কিছুদূর হাঁটিয়া থামিয়া যায় অনেকটা এই কারণেই। পাক খাওয়ার বা ছুটাছুটি করার প্রতিবন্ধক এই হেতুটিকে (friction) ফ্রিক্‌সন্ বলে। এই হেতুটি বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া নিউটনের গতি সম্বন্ধে প্রথম আইনটি (First Law of Motion) কে আমরা প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ মনে করিয়া প্রথমে উড়াইয়া দিতে যাই। যাহা হউক, ঈথার কিন্তু জলের মত জিনিষ নহে। তাহার মধ্যে একটা দানা নাচিতে সুরু করিলে তাহাতে আর পাঁচজনের কোনই আপত্তি নাই। হাত ধরিয়া টানিয়া থামাইয়া দিতে কেহ আসে না। ইংরাজিতে যাহাকে fluid বলে, আমরা তাহার পরিভাষা করি 'সলিল' বা 'অপ্'। শুনিয়াই জল ভাবিবেন না। তাহা হইলে ঈথার এমনধারা এক 'সলিল', যাহার দানাগুলা পরস্পরের গায়ে-গায়ে বেশ অবাধে মোলায়েম ভাবে গড়াইয়া যাইতে

পারে। বৈজ্ঞানিকের খোদ লক্ষণাটাই উদ্ধৃত করিতেছি :—"The fluid which offers absolute resistance to compression and no resistance at all to slide of its parts—or the parts of which slip over each other without anything of the nature of frictional action * * * is termed a *perfect fluid.*" ইহা যেন চরম সলিল বা সলিলের নিরতিশয় মূর্ত্তি। এই চরম সলিলে পাক উৎপন্ন সহজে হইবে না;—হইলে, ইহার মধ্যে দানাগুলি পরস্পরের গায়ে-গায়ে বেশ মোলায়েম ভাবে গড়াইয়া যায় বলিয়া, সে পাক আর থামিবে না। কথাটা আন্দাজি নহে। গণিতশাস্ত্রে ইহার প্রমাণ আছে। লর্ড কেল্‌ভিন্ মনে করিতেন যে অণুগুলি (অন্ততঃ পক্ষে প্রাইম্ এটম্‌গুলি) ঐরূপ একটা চরম সলিলে অভাবনীয় এবং অতিপ্রাকৃত ক্রিয়া দ্বারা উৎপাদিত পাক বা Vortex ring। P. G. Tait ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যাহা লিখিতেছেন, তাহা আপনাদিগকে শুনাই :—

"Thus, if we adopt Sir William Thomson's supposition that the universe is filled with something which we have no right to call ordinary matter (though it must possess inertia), but which we may call a perfect fluid; then, if any portions of it have vortex-motion communicated to them, they will remain for ever stamped with that vortex-motion; they cannot part with it; it will remain with them as a characteristic for ever, or at least until the creative act which produced it shall take it away again. Thus this property of rotation may be the basis of all that to our senses appeals as matter." ঈথারের মধ্যে এই জাতীয় যে পাক, তাহার নাম gyrostatic strain; আমাদের নব-পরিচিত কর্‌পাস্‌ল-গুলি চরম সলিলে gyrostatic strain বলিয়া মনে করিলে বোঝাপড়ার অনেক সুবিধাই হয়। Sir William Thomson (লর্ড কেল্‌ভিন্) রসায়ন-বিদ্যার এটম্‌গুলাকেই ঐ রকম চরম সলিলে আবর্ত্ত মনে করিয়াছিলেন; এবং এটমের অনেক ধর্ম্মের ও ব্যবহারের বেশ সুন্দর কৈফিয়ৎ আমাদিগকে যুটাইয়া দিয়াছিলেন। এখন অবশ্য রসায়ন-বিদ্যার এটম্ ভাঙ্গিয়া চুরমার্ হইয়া গিয়াছে; এবং তাহার মধ্যে কর্‌পাস্‌ল বা ইলেক্‌ট্রণগুলা কেমন পাক খাইতেছে তাহার বিবরণ, মায় নাচের ছন্দোমঞ্জরী সমেত, Sir Williamএর ভ্রাতা Sir James Thomson আমাদিগকে শুনাইয়া চমৎকৃত করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠে—এই কর্‌পাস্‌ল আবার কি? তাহাকে Sir Williamএর নির্দ্দেশমত চরম-সলিলে আবর্ত্ত মনে করিলে ভাল হয় না কি? কর্‌পাস্‌লগুলি অবিনাশী; আমরা তাহাদিগকে এখনও গড়িতে ভাঙ্গিতে পারি না। তাহারা যদি perfect fluidএ আবর্ত্তের মতন দ্রব্য হয়, তবে তাহাদের অমর হইবারই কথা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হেল্‌মহোল্‌জ ও কেল্‌ভিন্ গণিতের দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাহাদের উৎপত্তি বা ধ্বংস করিতে গেলে, supernatural agency বা অলৌকিক শক্তি দরকার,—এ কথা কেল্‌ভিন্ নির্ভয়েই বলিয়া গিয়াছেন। বিজ্ঞানের তরফ হইতে ব্যাপারখানা দাঁড়াইল এইরূপ। এইবার দশম মণ্ডলের মন্ত্রটি আবার পড়িয়া দেখুন; "দেবতারা মহোৎসাহে নৃত্য করিতে লাগিলেন" ইত্যাদি; রূপকের পিছনে ঠিক এই রকমের কথাগুলিই আমরা ধরিতে পারি না কি? লর্ড কেল্‌ভিনের ঈথার বা perfect fluid বেদের বিশ্বব্যাপী জলের (চরম-সলিলের) প্রতীক; প্রতীক বলিতেছি, হুবহু মিলাইয়া দিতেছি না। দেবগণের নৃত্য সেই কারণ-সলিলে পাক বা rotational strains সৃষ্টি করিতেছে; 'দেব' বলিতে এমন একটা চেতনশক্তি বলা হইতেছে, যাহা কেল্‌ভিনের supernatural agencyর মত চরম-সলিলে পাক উৎপাদন করিতে সমর্থ; "দেবগণের মহোৎসাহে নৃত্যের ফলে যেন ধূলিরাশির উদয় হইল"—এ ধূলিরাশিকে বিজ্ঞানের কর্‌পাস্‌ল বা প্রাইম্-এটম্ প্রতীক রূপে বুঝাইতে পারে না কি? বিজ্ঞান যেমন বলিতেছেন, বেদও সেইরূপ বলিতেছেন—চরম-সলিলে অনির্ব্বচনীয় চেতন-শক্তির ক্রিয়া দ্বারা ঘূর্ণন জন্মিতেছে (অবশ্য ঠিক ঘূর্ণন কি অপর কোনও রকম ব্যাপার তাহা এখনও কেহ হলফ করিয়া বলিতে পারেন না; সম্ভবতঃ ঘূর্ণন; অন্য

রকমও কোন ব্যাপার হইতে পারে); সেই ঘূর্ণনের ফলে চরম-সলিল যেন স্থানে-স্থানে বিষম (heterogeneous) হইয়া দানা বাঁধিয়া যাইতেছে; এই দানাগুলি (corpuscles) দেবতাদের মহানৃত্যে উত্থিত সর্ব্বতঃ প্রসারিত ধূলি। এই ধূলিতেই জগতের 'ধূলার শরীর' গঠিত; এ ধূলি না পাইলে এ বিশ্ব-মহাব্রজ ব্রজই হয় না। এ আধিভৌতিক ব্যাখ্যান (physical interpretation) আপনাদের কাছে কষ্ট-কল্পনা বলিয়া ঠেকিল কি? 'বিশ্বব্যাপী জল,' 'দেবগণের নৃত্য' এবং 'ধূলি' এ কথা কয়টা কি এবম্বিধ একটা গূঢ় রহস্য আমাদিগকে সঙ্কেতে জানাইতেছে না? এ রকম একটা রহস্যের আভাস না পাইলে, আমার ত মনে হয়, শুধু এই একটা ঋকে কেন, বেদের অনেক স্থলেই আমাদের গোঁজামিল দিয়া বা তা-না-না-না করিয়া সারিয়া দিতে হয়।

এক্স-রে

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-বি

(১)

এটা হয় ত অনেকেই জানেন যে, একটা প্রশস্ত-মুখ অথচ খর্ব্বাকার কাচের বোতলে খানিকটা গন্ধকদ্রাবক (sulphuric Acid) মিশ্রিত জলের ভিতর দুই পার্শ্বে একটা তামার ও একটা দস্তার পাত অর্দ্ধ-নিমজ্জিত অবস্থায় রাখিয়া, ঐ পাত দুইটী তামার তার দিয়া বাহিরের দিকে সংযুক্ত করিলে, মৃদু-মৃদু তড়িৎ-তরঙ্গ প্রবাহিত হয়। এইরূপে সাজান যন্ত্রকে তড়িৎ-কুণ্ড (Simple cell) বলে। তামার তার দিয়া তামার ও দস্তার পাত দুইটী সংযুক্ত করিলে, তড়িৎ-শক্তি (Electricity) দস্তার পাতের নিম্নভাগ হইতে তামার পাতের নিমজ্জিত অংশে গমন করে। তার পর তামার পাত অবলম্বন করিয়া তামার তার দিয়া পুনরায় দস্তার পাতে আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপে ঘূর্ণায়মান তড়িৎ-প্রবাহকে তড়িৎ-চক্র (Complete circuit) বলে। দুই তিন বা ততোধিক তড়িৎ-কুণ্ড একত্র যোগ করিলে, এক তড়িৎ-কুণ্ডাবলী বা ব্যাটারি প্রস্তুত হয়। এই তড়িৎ-কুণ্ডগুলি এক নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে সংযুক্ত হয়। অর্থাৎ একটার দস্তার পাত অপরটীর তাম্র পাতের সহিত সংযুক্ত হয়। অবশেষে সর্ব্বপ্রথম কুণ্ডের তাম্রপাত ও সর্ব্বশেষ কুণ্ডের দস্তার পাত অসংযুক্ত অবস্থায় থাকে। এই দুই অসংযুক্ত প্রান্তকে মেরু কহে। তাম্রপাতের প্রান্তের নাম অনুলোম মেরু (Positive pole); আর দস্তার পাতের প্রান্তের নাম প্রতিলোম মেরু (Negative pole)। এই মেরুদ্বয় যতক্ষণ না একত্র সংযুক্ত হয়। ততক্ষণ কোন তড়িৎ-তরঙ্গই প্রবাহিত হইবে না।

এইরূপে যে তড়িৎ তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহার শক্তি এতই কম যে, উহা দ্বারা প্রকৃত পক্ষে কোন বৃহৎ যন্ত্রই পরিচালিত হয় না। মৃদু-মৃদু তড়িৎ-শক্তিকে অত্যন্ত প্রবল শক্তিতে পরিণত করিবার জন্য ইন্‌ডাক্‌সান্ কয়েল (Induction coil) বা ঐরূপ অনেক যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। আজকাল ইন্‌ডাক্‌সান্ কয়েলের সাহায্যে প্রায় সকল প্রকার যন্ত্রেই মৃদু শক্তিকে প্রবল শক্তিতে পরিণত করা হয়। উহা এত প্রবল হয়, যে ইন্‌ডাক্‌সান কয়েলের উভয় মেরু পরস্পর ১২ ইঞ্চি ব্যবধানে থাকিলেও, তড়িৎ-প্রবাহ এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়। এক্ষণে মনে করুন, একটা প্লেট-মোটা কাচের নলের দুই পার্শ্বে দুইটী তামার তার পরস্পর অসংলগ্ন অবস্থায় প্রবেশ করাইয়া ছিদ্রমুখ দুটী উত্তমরূপে বন্ধ করা হইয়াছে। বাহিরের কোন বায়ু এখন নলের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। তার পর কাচের নলটী কোনও তড়িৎ-কুণ্ডাবলি কিংবা ইন্‌ডাক্‌সান্ কয়েলের সহিত সংযুক্ত করিয়া নলের ভিতর প্রবল তড়িৎ-তরঙ্গ প্রবেশ করাইলে কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই যে, তড়িৎ-তরঙ্গ নল-মধ্যস্থিত

তারের এক প্রান্ত হইতে বায়ু ভেদ করিয়া ভীষণ শব্দে অপর প্রান্তে তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ রূপে প্রবাহিত হইতেছে। এইবার কাচের নলটী বায়ু নিষ্কাশণ-যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত করিয়া সামান্য বায়ু নলের ভিতর হইতে অপসারিত করা যাউক। তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গ বন্ধ হইয়া নলটীর ভিতরটা আলোকিত হইয়াছে। এইরূপে ক্রমশঃ বায়ু নিষ্ক্রামণ করিলে পর-পর কতকগুলি বিভিন্ন প্রকার দৃশ্য দেখিতে পাই। প্রথমতঃ, নলের ভিতর দুইটী তারের মধ্যবর্ত্তী স্থানটী রক্তবর্ণে রঞ্জিত হয়। কিয়ৎকাল পরে রক্তবর্ণ অদৃশ্য হইয়া, নলের ভিতরটী খণ্ড-খণ্ড গোলাকার আলোকিত চক্রে পরিপূর্ণ হয়, ও প্রতিলোম মেরুর চারিপাশে খানিকটা স্থান অন্ধকারে আবৃত হয়। কিন্তু ঐ অন্ধকারের চতুষ্পার্শ্বেও অস্পষ্ট আলো বিরাজ করে। ক্রমে-ক্রমে গোলাকার চক্রগুলি অধিকতর আলোকিত হয়; এবং প্রতিলোম মেরুর চারিপাশের অন্ধকার স্থানকে আবৃত করিয়া যে অস্পষ্ট আলো ছিল, তাহা ক্রমশঃ অনুলোম মেরুর দিকে সরিয়া আসে; এবং প্রতিলোম মেরুর চারিপাশ অধিকতর অন্ধকার হইয়া যায়। ক্রমে যতই অধিক পরিমাণে নলের ভিতরের বায়ু নিষ্ক্রামণ করা হয়, ততই আলো অদৃশ্য হইয়া নলটী অন্ধকারে পরিপূর্ণ হয়; কিন্তু দেখিতে-দেখিতে আর এক প্রকার আশ্চর্য্যজনক উজ্জ্বল সবুজবর্ণের আলো কাচের নলের উপরিভাগে ছড়াইয়া পড়ে। এই আলো সকল সময় সবুজ থাকে না,—কাচের প্রস্তুতোপকরণ অনুযায়ী নীল বর্ণেরও হয়।

এই প্রকারে যে সমস্ত তড়িতালোক উৎপন্ন হয়, তাহার কেবল কতকগুলি আমরা দেখিতে পাই; এবং অবশিষ্ট সকল রশ্মিই দৃষ্টি-শক্তির বহির্ভূত। অদৃশ্য আলোক-রশ্মির মধ্যে আবার কতকগুলি মিলিত হইয়া "এক্স-রে বা রঞ্জেন রশ্মি" উৎপাদন করে। এই রঞ্জেন-রশ্মি অতি আশ্চর্য্যভাবে আবিষ্কৃত হয়। উইলিয়ম্ কোনার্ড রঞ্জেন নামক একজন জার্ম্মাণ দেশীয় পদার্থবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে একদিন পরীক্ষাগারে বায়ুশূন্য কাচের নলের ভিতর তড়িৎ প্রবেশ করাইয়া, তাহার গুণাগুণ পরীক্ষা করিতে-করিতে, অজ্ঞাতসারে কক্ষের এক পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করেন। সেই পার্শ্বে বেরিয়াম্ প্লাটিনো সায়ানাইড্ (Barium platino cyanide) নামে এক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য-মাখান একখানি মোটা কাগজ পড়িয়া ছিল। রঞ্জেন সাহেব ঐ পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র দেখিতে পাইলেন যে, কাগজটী অতি উজ্জ্বল ভাবে জ্বলিতেছে; অথচ বায়ুশূন্য নলটী এরূপ ভাবে কাগজ দ্বারা আবৃত ছিল যে উহার ভিতর হইতে কোনও ক্রমে আলো বাহিরে আসিতে পারে না। তিনি এই অজ্ঞাত রশ্মির নামকরণ করিলেন "এক্স-রে"; এবং বহু অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিলেন যে, অদৃশ্য আলোক-রশ্মি নলের কাচের গায়ে ধাক্কা লাগিয়া ছড়াইয়া পড়াতে, উক্ত আলোকের সৃষ্টি হইয়াছে। অতি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এক্স-রে বা রঞ্জেন-রশ্মি হইতে কোন দৃশ্য আলোকের উৎপত্তি হয় না; কিন্তু যে সমস্ত দ্রব্যের ভিতর সাধারণ আলো প্রবেশ করিতে পারে না, রঞ্জেন-রশ্মি তাহাদের ভিতর অনায়াসে প্রবেশ করে। রঞ্জেন সাহেব এই অদৃশ্য আলোকের সাহায্যে অনেক পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি পরীক্ষা করিতেছিলেন। কক্ষের এক কোণে একটী কাঠের বাক্সের ভিতর কতকগুলি লৌহাদি পদার্থ এবং কাল কাগজে উত্তম রূপে জড়ান একখানি ফটোগ্রাফি কাচ বাক্সের গায়ে হেলান ছিল। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, বাক্সের ভিতর যে সমস্ত ধাতু ছিল, ফটোগ্রাফি কাচের উপর তাহাদের ছবি পড়িয়াছে,—অথচ বাক্স বা ফটোগ্রাফি কাচের ভিতর বাহিরের কোন আলো প্রবেশ করিবার উপায় ছিল না। আরও দেখিলেন যে, তাঁহার হস্ত পূর্ব্বোক্ত কাচের নল এবং বেরিয়াম প্লাটিনো সায়ানাইড্ মাখান কাগজটীর মধ্যে স্থাপন করিলে, কাগজের উপর হাতের হাড়ের প্রতিমূর্ত্তি মাংসের অপেক্ষা অধিক স্পষ্টরূপে পড়িয়াছে। তিনি কাগজের পরিবর্ত্তে কাল কাগজে জড়ান একখানি ফটোগ্রাফি কাচ হাতের উপর রাখিলেন; এবং পরে যখন সেটীকে ক্রমবিকাশ (develop) করা হইল, তখন দেখা গেল যে, ফটোগ্রাফি কাচের উপর হাতের হাড়ের প্রতিমূর্ত্তি অতি স্পষ্ট ভাবে পড়িয়াছে (১নং চিত্র)। তিনি এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাবলী দর্শনে যারপর নাই আনন্দিত হইয়া, এবং অস্ত্রচিকিৎসকগণের পক্ষে ইহা অত্যন্ত উপকারী বুঝিতে পারিয়া, অবিলম্বে স্থানীয় চিকিৎসালয়ে তাঁহার এই নব আবিষ্ক্রিয়ার বিশদ বিবরণ প্রেরণ করিলেন। তার পর ক্রমে-ক্রমে সভ্য জগতের সর্ব্বত্রই রঞ্জেন-রশ্মির অভাবনীয় ক্রিয়ার পরীক্ষা হইতে লাগিল।

১ নং। হাড়ের প্রতিমূর্ত্তি

উইলিয়ম কোনার্ড রঞ্জেন ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ্চ জার্ম্মান দেশে রাইন প্রদেশের অন্তর্গত লেনিপ্ সহরে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকাল হইতেই তাঁহার অলৌকিক স্মৃতিশক্তি, প্রবল অধ্যবসায় ও বিদ্যাশিক্ষায় তীব্র অনুরাগ ছিল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি সম্মানের সহিত জুরিচ বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে দর্শনশাস্ত্রে বি-এ উপাধি প্রাপ্ত হইলে, হোয়েন্‌হিম্ নগরস্থ কৃষি-বিদ্যালয়ে গণিত ও পদার্থ-বিজ্ঞান শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কয়েক বৎসর পরে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি উসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ-পদে উন্নীত হন। তিনি তথায় একাগ্র চিত্তে কেবল তড়িৎশক্তির বিষয়েই গবেষণা করিতেন। এইরূপে বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইলে, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তিনি এই অত্যাশ্চর্য্য রঞ্জেন-রশ্মি আবিষ্কার করতঃ জগতের একজন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত বলিয়া অশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। পরিশেষে এই জনহিতকর পরিশ্রমের বিনিময়ে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি জগদ্বিখ্যাত 'নোবেল প্রাইজ' প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(২)

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, প্রায় এমন কোন পদার্থ নাই, যাহার ভিতর রঞ্জেন-রশ্মি প্রবেশ করিতে পারে না। তবে কাষ্ঠ বা কাগজের ন্যায় নরম পদার্থের ভিতর অনায়াসেই প্রবেশ করে। এমন কি, উক্তপ্রকার নরম পদার্থের ভিতর যদি লৌহাদি কঠিন পদার্থ থাকে, তাহা হইলে লৌহাদি দ্রব্যের প্রতিমূর্ত্তি অতি স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়; এবং কাষ্ঠ বা কাগজের ছবি লৌহাদি দ্রব্যের প্রতিমূর্ত্তির চারিপাশে ছায়ার ন্যায় প্রতীয়মান হয়; কখন-কখনও তাহাও দৃষ্ট হয় না। যে দ্রব্য যত অধিক শক্ত হইবে, তাহার ভিতর রঞ্জেন-রশ্মি তত কম প্রবেশ করিবে: সুতরাং তাহার ছবি তত স্পষ্ট দেখা যাইবে।

মানবের দেহেও নরম, শক্ত সকল প্রকার দ্রব্যই বিদ্যমান আছে। প্রধানতঃ হাড়ই শরীরের ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা শক্ত। হাড়ের চতুঃপার্শ্বের মাংসপেশী অপেক্ষাকৃত নরম বলিয়া, রঞ্জেন-রশ্মি মাংসের ভিতর অনায়াসে প্রবেশ করে; কিন্তু হাড়ের ভিতর তত শীঘ্র প্রবেশ করিতে পারে না; সেই-জন্য আমরা মাংসাপেক্ষা হাড়ের ছবি স্পষ্ট রূপে দেখিতে পাই। বক্ষের পঞ্জরাস্থি যদিও হস্তপদাদির হাড়ের ন্যায় শক্ত নহে, তথাপি উহা বক্ষের অভ্যন্তরস্থ অন্যান্য দ্রব্য অপেক্ষা শক্ত; সেইজন্য উহার ছবি বেশ স্পষ্টই দৃষ্ট হয়। এমন কি, হৃৎপিণ্ড (heart) ফুস্‌ফুস্ (lungs) অপেক্ষা অনেক শক্ত ও মোটা বলিয়া, তাহার একটা স্পষ্ট ছায়া দেখিতে পাই।

একদা একটী শিশু একটী পয়সা খাইয়া ফেলে। উহা বাহির না হওয়ায়, তাহাকে 'এক্‌স্-রে' দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার ফলে দেখা যায় যে, পয়সাটী পাকস্থলীর মধ্যে অবস্থিত ছিল। ২নং চিত্রে পাকস্থলী দেখা যাইতেছে না; কারণ, ইহা অত্যন্ত কোমল পদার্থ,—এক্স-রে অতি সহজে উহা ভেদ করিয়া যাইতে পারে। চিত্রে দেখা যাইতেছে যে, পয়সাটী মেরুদণ্ডের পার্শ্বে শেষ-পঞ্জরাস্থির সম্মুখে অবস্থিত। ঐ চিত্র দেখিলে আরও বুঝিতে পারা যাইবে যে, হাড়ের প্রতিমূর্ত্তি মাংস
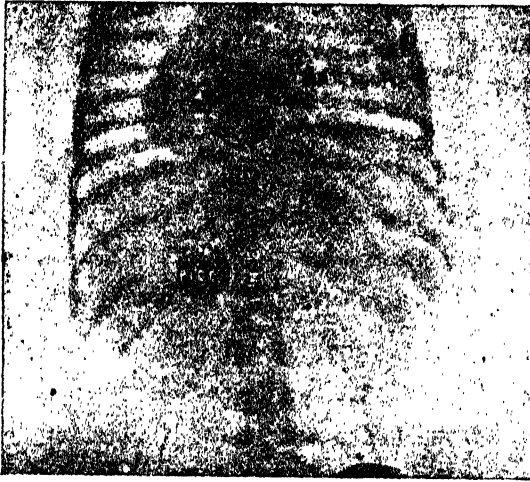
২ নং। পাকস্থলী

অপেক্ষা কিরূপ স্পষ্ট দেখা যায়। মাংসের ছবি যেন ছায়ার ন্যায় অতি অস্পষ্ট ভাবে হাড়ের চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে; এবং কখন-কখন মাংসের ছবি আদৌ দেখা যায় না। আরও বিশেষত্ব এই যে, পেটের ভিতর যে পয়সাটী রহিয়াছে, তাহা তামার অর্থাৎ হাড়ের অপেক্ষাও শক্ত বলিয়া, উহার ছবি অতি স্পষ্ট ভাবে দেখা যাইতেছে। তাম্র অপেক্ষা হাড় কথঞ্চিৎ নরম, সেই জন্য বক্ষের পঞ্জরাস্থি, পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড ইত্যাদি কিয়ৎ পরিমাণে অস্পষ্ট। হৃদয় একটী ত্রিকোণ ছায়া বিশিষ্ট দেখা যাইতেছে; কারণ, ইহা অস্থি অপেক্ষা নরম, এবং ফুস্‌ফুস্ আদৌ দেখা যাইতেছে না। মানুষের উদরের ভিতর হাড়ের ন্যায় শক্ত পদার্থ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই জন্য রঞ্জেন রশ্মি দ্বারা উদর পরীক্ষা করিলে, কেবল পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। সুতরাং উদর পরীক্ষাকালে উহাকে কোনও বাহ্যিক উপায়ে এমন করিতে হইবে যে, রঞ্জেন-রশ্মি উদর ভেদ করিয়া যাইতে না পারে। সেই জন্য সাধারণতঃ চিকিৎসকগণ রোগীকে বেরিয়াম্ বা বিস্‌মা নামক পদার্থ-জাত কোন রাসায়নিক দ্রব্য ভক্ষণ করান। বেরিয়াম্ বা বিস্‌মাথ্ ভক্ষণ করিলে যে যে স্থানে উক্ত রাসায়নিক দ্রব্য থাকিবে, সেই-সেই স্থানের ভিতর রঞ্জেন-রশ্মি প্রবেশ করিতে পারে না; এবং সেই-সেই স্থানের ছবি স্পষ্ট রূপে দেখা যায়। রঞ্জেন-রশ্মি দ্বারা কিরূপে উদর পরীক্ষা করিতে পারা যায়, তাহার বিশদ বিবরণ আমরা পরে বিবৃত করিব। উদরের ন্যায় অন্যান্য স্থানে অন্য প্রকার উপায়ে পরীক্ষা করা হয়। মূত্রনালীর ভিতর যদি কোনও প্রস্তর জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে উহা অনায়াসেই দৃষ্ট হয়; কেন না, প্রস্তর পার্শ্ববর্ত্তী মাংস অপেক্ষা অনেক শক্ত। এই প্রস্তর বা পাথুরী প্রায় হাড়ের ন্যায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, 'এক্স-রে' বা রঞ্জেন-রশ্মি চিকিৎসকগণের কিরূপ প্রয়োজনীয়। বেশী দিনের কথা নহে, ৩০ বৎসর পূর্ব্বে চিকিৎসকগণ স্বপ্নেও মনে ভাবেন নাই, যে একদিন এরূপ এক যন্ত্র আবিষ্কৃত হইবে, যদ্দ্বারা তাঁহারা বাহিরের ন্যায় শরীরের ভিতরের সকল দ্রব্যই অতি স্পষ্ট ভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে পাইবেন। শরীরের যে কোন স্থানের হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে, বা স্থানান্তরিত হইলে. পূর্ব্বে চিকিৎসকগণকে তাহার যথার্থতা প্রমাণ করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইত। এমন কি, এরূপ শোনা গিয়াছে যে, চিকিৎসক ভুল ক্রমে ভগ্ন অস্থিকে কেবল স্থানান্তরিত হইয়াছে মনে করিয়া, সেইরূপ চিকিৎসা করাতে রোগী চিরদিনের জন্য অঙ্গহীন হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু অধুনা 'এক্স-রে' দ্বারা যে কেবল কোথাও কিরূপ ভাবে হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে জানিতে পারা যায় তাহা নহে, হাড়ের সূক্ষ্ম গঠন-প্রণালীও বেশ জাজ্জ্বল্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। অধিক কি, হাড়ের ভিতর এমন কতকগুলি রোগ হয়, যাহা পূর্ব্বে চিকিৎসকগণ অতি বিরল বলিয়া জানিতেন, কিন্তু এখন 'এক্স-রে' দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, সেই সমস্ত রোগ বিরল নহে। ৩নং চিত্র দেখিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, 'এক্স-রে' দ্বারা পরীক্ষা করিলে, ভাঙ্গা হাড় কিরূপ স্পষ্ট দেখা যায়। পাঠক এখন জানিতে পারিয়াছেন যে, শরীরের হাড়ের স্বাভাবিক স্থান এবং অবস্থার কোনও প্রকার ব্যতিক্রম হইলেই, 'এক্স-রে' দ্বারা পরীক্ষা করতঃ আমরা তাহার কিরূপ সত্য ও নিখুঁত প্রমাণ নাই; এবং তৎসঙ্গে চিকিৎসা-প্রণালী নির্দ্ধারণ করিবার কিরূপ সুবিধা হয়। ইহাতে যে কেবল চিকিৎসকের সুবিধা হয় তাহা নহে,—রোগীরও যথেষ্ট পরিমাণে সুবিধা। 'এক্স-রে' দ্বারা পরীক্ষাকালে শরীরে যে রশ্মি প্রবেশ করে, তাহাতে রোগী কোনও প্রকার কষ্ট বা যন্ত্রণা অনুভব করে না।

৩ নং। ভাঙ্গা হাড় দর্শন

অনেক সময় দেখা যায় যে, হাত ভাঙ্গিয়া যাইবার পর, রোগীর সেই স্থান এত বেশী ফুলিয়া গিয়াছে যে, রোগ-নির্ণয় কালে চিকিৎসকের বড়ই অসুবিধা হয়; সুতরাং স্ফীতি কমাইবার জন্য রোগীকে কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হয়। তাহাতে রোগ বৰ্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু 'এক্স রে' দ্বারা পরীক্ষাকালে রোগীর ভগ্ন স্থান যতই স্ফীত হউক না, তাহাকে এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করিতে হয় না। এমন কি রোগীর ভগ্ন স্থানে যে সকল কাঠ এবং ব্যাণ্ডেজ বাঁধা থাকে, পরীক্ষাকালে তাহাও খুলিতে হয় না। কাজেই, রোগী বিন্দুমাত্র কষ্ট অনুভব করে না। 'এক্স-রে' দ্বারা পরীক্ষা করিয়া ভগ্ন স্থানের ফটোগ্রাফ ছবি তুলিয়া লওয়া হয়। তাহাতে হাড়টী কিরূপ ভাবে (লম্বায়, পার্শ্বে বা কোণা-কোণিভাবে) ভাঙ্গিয়াছে, কোন্ স্থানে ও কিরূপ পরিমাণে ভাঙ্গিয়াছে, হাড়টী ভাঙ্গিয়া কত খণ্ড হইয়াছে, খণ্ডগুলি কত বড়, কিরূপ আকার, ভাঙ্গিয়া কোথায় স্থানান্তরিত হইয়াছে, একটী হাড় অন্যটীর উপর আসিয়া পড়িয়াছে কি না, ইত্যাদি যত কিছু ব্যাপার, সবই বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। রোগীর আত্মীয়-স্বজন সকলেই ভগ্ন হাড়ের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আশ্বস্ত হইতে পারেন। এমন কি, রোগী নিজেও স্থানবিশেষে আপনার হাড়ের প্রকৃত ছবি দেখিতে পারেন। আরও সুবিধা এই যে, চিকিৎসক স্বচক্ষে হাড় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করিয়া রোগের অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই করিতে পারেন; এবং কিছু দিন পরে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করতঃ, হাড় যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়া পরস্পর সংযুক্ত হইয়াছে কি না বা কিরূপ ভাবে হইয়াছে, এবং রোগের কতদূর উন্নতি হইতেছে, ইত্যাদি সমস্ত বিষয় অতি স্বচ্ছন্দে, বিনাক্লেশে দেখিয়া পুনরায় তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে পারেন।

৩

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, 'এক্স-রে' দ্বারা ভগ্ন হাড়ের অবস্থা, বিশেষতঃ কোন্ স্থানে কিরূপ পরিমাণে, কত খণ্ডে হাড়টি বিভক্ত হইয়াছে তাহার বিবরণ এবং তাহাদের অবস্থিতি সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ সম্যক্ রূপে জ্ঞাত হওয়া যায়। কতকগুলি চিত্রে তাহার কতক আভাস প্রদত্ত হইল।

৪ নং চিত্রে একটী ছোট ছেলের হাতের ফটোগ্রাফ্

৪ নং। ছোট ছেলের হাতের ফটোগ্রাফ্

প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা আঘাতের ফল? আঘাতের পর

তাহার হাড় দুইখানি ভাঙ্গিয়া যায়; কিন্তু ডাক্তারের কাছে যাইবার পূর্ব্বে ইহা এত ফুলিয়া যায় ও বেদনাযুক্ত হয় যে, উহা পরীক্ষা করা একরূপ অসম্ভব হওয়ায়, চিকিৎসকগণ ঐ স্থানের প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় করিতে পারেন নাই। পরে 'এক্স-রে' দ্বারা পরীক্ষা করতঃ, উহার সম্যক্ বিবরণ জানিতে পারা যায়। তখন ঠিক ভাবে বসানর পর উহা এখন স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। উহা ঠিক ভাবে বসানর সময় রোগীকে 'এক্স-রে' আলোকের সাহায্যে লক্ষ্য করা হইতেছিল যে, উহা ঠিক হইতেছে কি না, এবং কাষ্ঠফলকে (Splint) বাঁধিবার পর পুনরায় দেখা হয় যে, আর কোনও দোষ আছে কি না।

৫ নং চিত্রও একটী হাতের ফটোগ্রাফ্। উহাতে দেখা যাইতেছে যে হাতের সম্মুখের দুইটা হাড়ই (Radius ও Ulna) ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রত্যেকটীই ভাঙ্গিয়া তিন টুক্‌রা হইয়াছে। ছবির ডান দিকের হাড়খানার (Radius) ছোট টুকরাটী একটুও নড়িয়া যায় নাই; বাম দিকেরটীতে উহা একটু সরিয়া গিয়াছে। "এক্স-রের" সাহায্য ব্যতীত

৫ নং। আর একখানি হাত

এরূপ টুক্‌রা হাড়ের সন্ধান করা অসম্ভব। এরূপ অবস্থা পূর্ব্বেই 'এক্স রে' ফটোগ্রাফ্ না লইয়া হাতখানা বাহি হইতে টিপাটিপি করিয়া দেখিতে গেলে, ছোট টুক্‌রা গুলি স্থানান্তরিত হওয়া খুবই সম্ভব ছিল; এবং একবা স্থানচ্যুত হইলে পুনরায় তাহাদের ঠিক করিয়া বসানো প্রা অসম্ভব হইত।

৬ নং ছবিখানি একটী হাতের ছবি। ছবির বাম দিকের হাড়খানা (ulna) একেবারে ভাঙ্গিয়া যায় নাই,

৬ নং। অন্য একখানি হাত

কেবল কিয়ৎ পরিমাণে কাটিয়া গিয়াছে। আর একটু নাড়াচাড়া করিলেই একেবারে দুইখানা হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। এই রোগীর বাহির হইতে হাতখানা দেখিয়া হাড়ের এইরূপ অবস্থা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। হাড় এইরূপ কতক পরিমাণে ভাঙ্গার জন্য রোগীর হাত কোনও রূপ বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই; সেইজন্য উপযুক্ত সময়ে আবশ্যক মত চিকিৎসা না করিলে উহা পরে বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইত।

৭ নং ছবিখানিও একটী হাতের ছবি। দুইটা হাড়েরই নীচের দিক্‌টা একেবারে ক্ষত (Necrosis) হইয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

৭ নং। ক্ষত হাত

৮ নং চিত্রখানি দুই হাতের আঙ্গুলের ছবি। ছবির ডান দিকের হাতখানির বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগের ছোট হাড়টী ফুলিয়া মোটা হইয়া গিয়াছে; এবং উহার মাথাটা ক্ষত (Necrosis) হইয়া গিয়াছে। ক্ষত স্থানটী তুলনা করিবার জন্য দুই হাতের ছবি তোলা হইয়াছে।

৮ নং। হাতের আঙ্গুল

৯ নং চিত্রটী পায়ের ছবি। ইহাতে উরুদেশের হাড়খানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; এবং নূতন হাড় (callus)
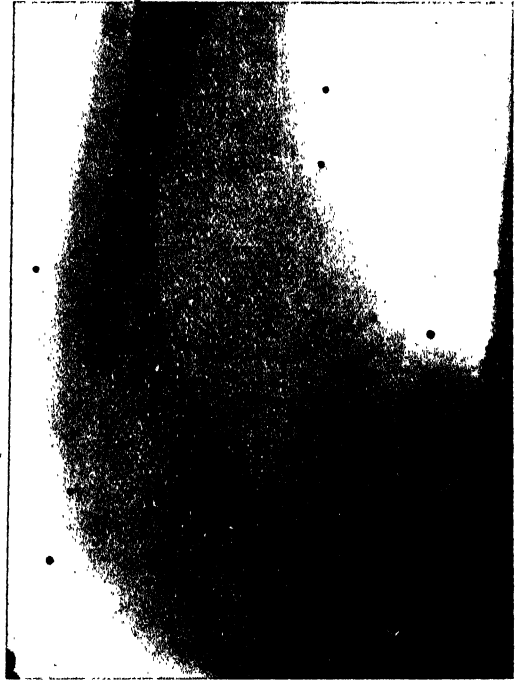
৯ নং। পায়ের ছবি

গজাইয়া ভাঙ্গা টুকরা দুইটা জুড়িয়া যাইবার চেষ্টা হইতেছে। ছবি হইতেই স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, টুকরা দুইটা ঠিক বসান হয় নাই। হাড় দুখানি ঠিক বসান না হওয়ায় পাখানি অনেক ছোট হইয়া গিয়াছে। এই ছবিতে আরও দেখা যাইতেছে যে, হাড় জুড়িয়া যাইবার জন্য নূতন হাড় (callus) জন্মিতে আরম্ভ করিয়াছে।

১০নং চিত্রখানি একটী কনুইয়ের ছবি। ইহাতে কনুইয়ের উপর কতক পরিমাণে নূতন হাড় (Callus) জন্মিয়াছে। তাহার ফলে ঐ সন্ধিস্থলের সঞ্চালন-ক্রিয়া অনেক পরিমাণে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে। উহা সম্পূর্ণ রূপে কুঞ্চিত

বা প্রসারিত করিতে পারা যায় না,—নূতন হাড় জন্মিবার জন্য হাতখানি কিয়ৎ পরিমাণে বাকিয়া থাকে।

১০ নং। কনুইয়ের ছবি
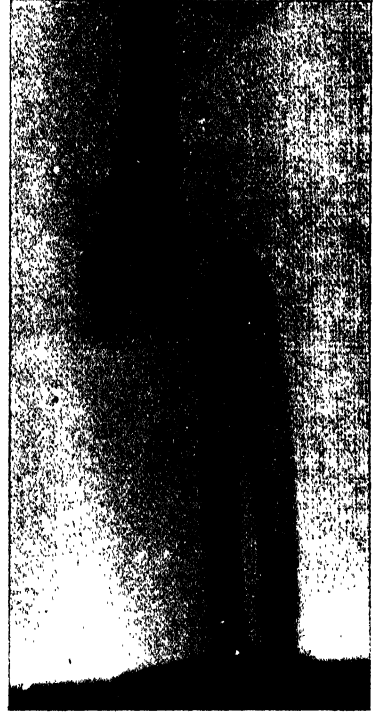
১১ নং। আর একখানি কনুইয়ের ছবি

৪

পূর্ব্ব অধ্যায়ে কয়েকটী বিভিন্ন প্রকার ভগ্ন হাড়ের বিবরণ বলা হইয়াছে। এক্ষণে এমন হইতে পারে যে, আঘাত লাগিয়া হাড় প্রকৃত-পক্ষে ভগ্ন হয় নাই; কিন্তু অল্প-বিস্তর স্থানচ্যুত হইয়াছে। আমরা এই অধ্যায়ে কতকগুলি হাড়ের স্থানান্তরিত অবস্থার (Dislocation) বিষয় বর্ণনা করিব।

১১ নং চিত্রখানি একটী কনুইয়ের ছবি। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, হাতের নীচের লম্বা হাড় দুইখানা (Radius ও ulna) উপরের হাড়খানি হইতে কতকটা পিছনে চলিয়া গিয়াছে। ঠিক ভাবে বসানো না হইলে এই অবস্থায় হাতখানি সোজা করা বা মোড়া যাইবে না; একই ভাবে থাকিবে। সেইজন্য 'এক্স-রে'র সাহায্যে প্রকৃত অবস্থা দেখিয়া ঠিক ভাবে বসাইয়া বাঁধিয়া রাখা আবশ্যক।

১২ নং চিত্রখানিও একটী কনুইয়ের ছবি। ইহাতেও হাড়গুলির অবস্থা ঠিক ১১ নং চিত্রের মত। এই ছবিখানি দেখিয়া মনে হয়, ঘটনার অনেকক্ষণ পরে এই ছবি লওয়া হইয়াছিল। উপরের হাড়খানার নীচের ভাগটা বোধ হয় ঐ একই আঘাতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এখন জুড়িয়া গেলেও, ঠিক বসান না হওয়ায় মোটা হইয়া গিয়াছে। নীচের হাড় দুইটা পিছনে সরিয়া গিয়াছে; এবং উপরের হাড়টা ঠিক-ভাবে জোড়া না লাগায়, হাতখানা এখন আর পূর্ব্বেকার মত হওয়া অসম্ভব। ঘটনার পরই ছবি লইয়া ঠিক করিয়া বসাইয়া দিলে, হাতখানিকে ঠিক পূর্ব্বেকার মতই করা যাইতে পারিত। ছবিতে যে স্ক্রুগুলি দেখা যাইতেছে, উহা, যে কাষ্ঠফলকে (Splint) হাতটী বাঁধা হইয়াছিল, তাহাতে লাগান ছিল।

১৩ নং চিত্রখানি একটী উরুদেশের সন্ধিস্থলের ছবি। অসাবধানতা বশতঃ পড়িয়া যাওয়ায় রোগী কুঁচকীতে এমনই বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, তাহাতেই কুঁচকীর হাড়

১২ নং। অন্য একটা কনুইয়ের ছবি

স্থানান্তরিত হইয়াছে। ছবিটা দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, উরুদেশের সন্ধিস্থলের গোলাকার অগ্রভাগটা কতখানি উপর দিকে সরিয়া গিয়াছে। ১৪ নং চিত্রে কুঁচকীর স্বাভাবিক অবস্থার একখানি ফটোগ্রাফিক ছবি প্রদত্ত হইয়াছে। পাঠক এই দুইখানি চিত্র পাশাপাশি রাখিয়া তুলনা করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, ১৩ নং চিত্রে কুঁচকীর হাড় কিরূপ স্থানান্তরিত হইয়াছে। আঘাত প্রাপ্তির অব্যবহিত কাল পরেই 'এক্স-রে' দ্বারা পরীক্ষা করতঃ ঐ স্থানের হাড়টা উপযুক্ত স্থানে না বসাইলে, রোগী চিরদিনের জন্য পঙ্গু হইয়া যাইবে।
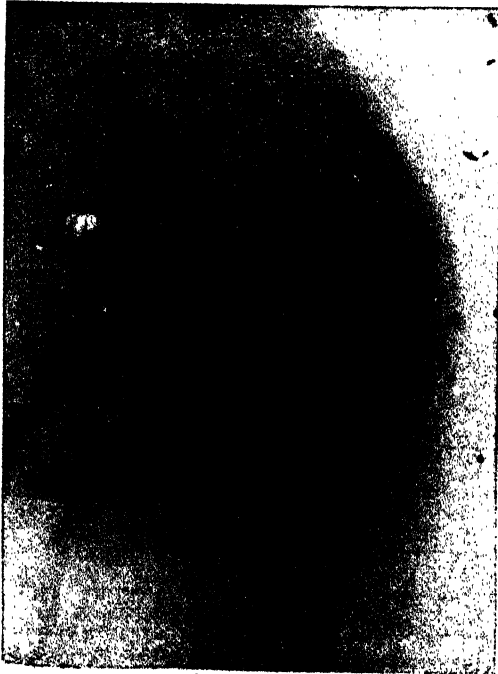
১৩ নং। উরুদেশের সন্ধিস্থলের ছবি
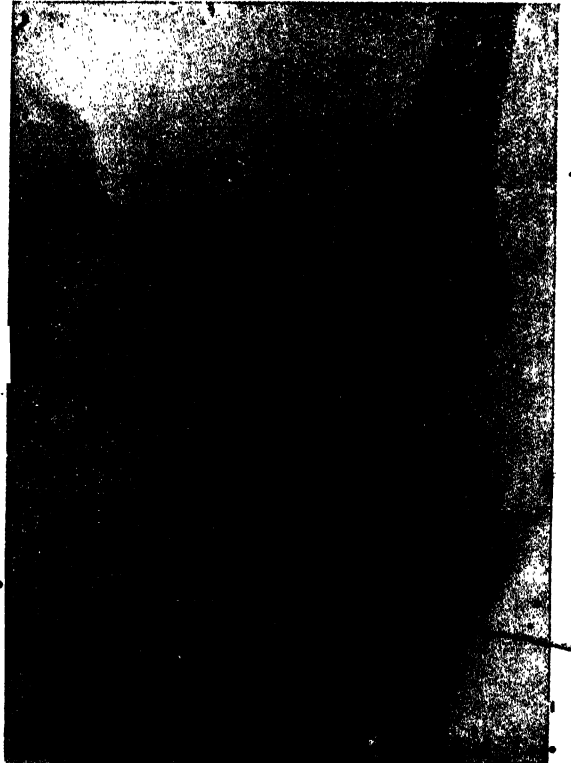
১৪ নং। কুচকির স্বাভাবিক অবস্থার ছবি

একটা দিক

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

বন্ধু সমী-র ঘরে বসে কথা হচ্ছিল।

আষাঢ়ের মেঘেঢাকা সন্ধ্যা। বাইরে একটা গুমোট ভাব; ঘরের ভিতরের আবহাওয়াটাও মোজেল, চুরুট এবং বেলফুলের গন্ধে বাইরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেছিল।

সমী-র হাতে একখানা ছোট ছবি ছিল। রূপোর ফ্রেমে বাঁধা হাতীর দাঁতের উপর দিল্লীর পটুয়ার আঁকা নারী-মূর্ত্তি। সমী-র একাগ্র দৃষ্টি তারির উপরেই নিবদ্ধ ছিল।

ঘরে ঢুকতেই সমী জিজ্ঞাসা করলে—মণি, ফিজিঅ'নমি জানা আছে তোমার?

—না, তবে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব কিছু জানা আছে।......দেখতে পারি ছবিখানা?

সমী ছবিটা আমার হাতে দিয়ে বললে—এটা কোন্ টাইপের বলতে পার?......

—কোন্ টাইপের?—বুঝলুম না। একটু বিশদ করে বললে ভাল হয়।

ছবিখানা যথাস্থানে রেখে সমী বললে—একজন বিদেশী পণ্ডিত নারীদের বিষয় নিয়ে সম্প্রতি একখানা বই লিখেছেন। তাঁর সিদ্ধান্তগুলো আমাদের শাস্ত্রকারগণের স্বপক্ষে।......সে যাই হোক, তিনি নারীজাতটাকে মোটা-মুটি দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। একটা হচ্ছে mother type, আর একটা যা সেটা উচ্চারণ করে তোমার শুচি-বাইগ্রস্ত কর্ণে আঘাত দিতে ইচ্ছা করি না। অতএব সেটাকে other type বলেই জেনে রাখ।......ছবিখানি যার, তাকে কোন্ টাইপে ফেলবে?

ছবিখানা আর একবার ভাল করে দেখলুম। সুন্দরী বটে। সৌন্দর্য্যের ধরণটা নিখুঁৎ, তীক্ষ্ণ, আর তার জলুষটা পুরুষকে অন্ধ করিয়ে দেবার মত। কোমলতার চেয়ে ঔজ্জ্বল্যের দিকটাই ছবিতে বেশী পরিস্ফুট।

একটুও দ্বিধা না করে বললুম—এ নিশ্চয়ই other typeএর।

সমী খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—ওর ব্যবসাও ছিল তাই।—কিন্তু আমি অন্য রকম মনে ক'রতুম একদিন।...সমস্ত গল্পটা না শুনলে তুমি বুঝতে পারবে না।' শোন।

সমী গলাটা একটু ভিজিয়ে নিলে; আরাম-কেদারাতেই শুয়ে ছিল; একটা নতুন চুরুট ধরিয়ে অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে বলে যেতে লাগল।

* * *

লাহোরের বসন্তোৎসব ছেড়ে সেবার এসেছিলুম রাওল-পিণ্ডিতে—বাকী শীতটুকু উপভোগ করবার জন্যে এবং বন্ধু লেনা সিং-এর নিমন্ত্রণ রাখবার জন্যেও বটে।

লেনা সিং-এর মত দিলওয়ালা লোক পাঞ্জাবে আমার আলাপীদের মধ্যে কেউ ছিল না—যদিও বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ তার চালচলনে এবং কথাবার্ত্তায় একটা গর্ব্বিতভাবের পরিচয় পেত, যা আমার নজরে একেবারেই পড়ত না।

গর্ব্বিত সে একটু ছিল হয় তো—কেননা, সে তার নিজের মূল্য বুঝত এবং তার শরীরে যে রক্ত ছিল তা একেবারে তাজা—পুরোনো বলেই তাজা। ইতিহাসে হরি সিং নলুয়ার নাম পড়েছ তো? রণজিতি-আমলের কাবুলের শাসনকর্ত্তা হরি সিং—যার নামে এখনো পাঠানেরা কাঁপে—সেই গোষ্ঠির এক শাখার বংশধর ছিল সর্দ্দার লেনা সিং।

যেদিন গিয়ে পৌছলুম, সেদিন লেনা সিং-এর বাগান বাড়ীতে গানের মজলিশ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

দিল্লী থেকে এসেছিল ঝিন্দন কৌয়ার মুজ্‌রা করতে। উত্তর-ভারতের কোন বড় মজলিশই সে না হলে সম্পূর্ণ হত না। শারেঙ্গী এসেছিল লক্ষ্ণৌ থেকে। আর রাত্রে শোবার আগে শানাইয়ে যে বেহাগ রাগিনী আলাপ করবে—তাকে আনা হয়েছিল সুদূর বেনারস থেকে। লেনা সিং-এর অতিথিদের অনুযোগ করবার কিছুই ছিল না।

মজলিশ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—কিন্তু গানের ধুয়াটা তখনো সুরে বাজছিল—বাইজীর কণ্ঠে এবং শারেঙ্গীর সুরে—

"রনজা হটাও দিলদার
মেরে ইয়ার—মেরে ইয়ার—মেরে ইয়ার—"

ঘরের মেজ বোখ্‌রাই গাল্‌চেতে ঢাকা, তাতে মোগ্‌লাই ছবির মত সূক্ষ্ম কাজ করা—চারপাশে তুর্কী দিবান।

পানপাত্র শূন্য—অভ্যাগতদের হাতে তখন কফির পেয়ালা। লেনা সিং-এর সামনে কিন্তু তখনো ছিল শ্যাম্পেনের অর্দ্ধশূন্য গ্লাস, আর হাতে ছিল সিগারেট।

লেনা সিং জাতীয় পদ্ধতির ধার ধারত না কখনো। শিখদের যা নিষিদ্ধ—পান এবং চুরুট—তাই তার অতীব প্রিয় ছিল; এবং তাদের যা অবশ্য কর্ত্তব্য—লম্বা চুল এবং দাড়ী রাখা—তা তার কাছে অতীব হেয় বলেই মনে হত। ছেলেবেলা থেকে ইংরাজ-সংস্রবে থাকার ফল আর কি।

লেনা সিং-এর মুখ দেখলুম বিষণ্ণ-গম্ভীর—বর্ষণোন্মুখ মেঘের মত, আর তারই উপর এসে পড়েছিল ঝিন্দনের বিদ্যুৎ-কটাক্ষ। ঝিন্দনের চোখে একটু উদ্বিগ্ন ভাবও ছিল। সে যেন লেনা সিং-কেই লক্ষ্য করে গাইছিল—

"রনজা হটাও দিলদার—
মেরে ইয়ার—মেরে ইয়ার—মেরে ইয়ার—"

ওগো বন্ধু, ওগো প্রিয়, রাগ দূর কর।

প্রিয় যে কে তা বুঝতে পারলুম; কিন্তু তার রাগটা যে কেন, তা কিছুই বুঝলুম না।

ঝিন্দনের পরণে ছিল চুড়ীদার পায়জামার উপর চুম্‌কির কাজ করা পেশোয়াজ; কিংখাবের কাঁচুলির উপর জরির আঙ্গরাখা, আর সূক্ষ্ম ওড়নাটা পিঠের উপর দিয়ে নগ্নবাহুর উপর এসে পড়েছিল। ছবিতে যা দেখছ ঠিক সে রকমটা নয়—তার চাইতেও সুন্দর। গালে সিঁদূরের আভা, কপালে শ্রমজনিত ঘর্ম্ম, তাতে কতকগুলো অলকগুচ্ছ জড়ানো, মদালস নয়নে একটু উদ্বিগ্ন ভাব। অনেক মজলিশে ঝিন্দনকে দেখেছি, কিন্তু এমন সুন্দর তাকে কথনো দেখি নি!

লেনা সিং-এর বাড়ীতে কিন্তু সেই তার সঙ্গে প্রথম দেখা।

দ্বিতীয়বার দেখা তার পরদিন সকালেই।

ভোরবেলা বাগানে বেড়াচ্ছিলুম, ঝিন্দন বন্দেগি জানিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। বললে—একবার মেহেরবানি করে বাঁদীর ঘরে পদার্পণ করলে ছুটো কথা কইতে পারি—অনেক দিন পরে দেখা।

যাবার ইচ্ছা ছিল না, তাই পরিহাস করে বললুম—বান্দা সামান্য লোক, খবরের কাগজে বাজে কথা লিখে কোনো রকমে দিনপাত করে। তার কি তোমার ঘরে তস্‌রিফ্‌ রাখবার মতন দুঃসাহস হতে পারে?

চোখের উপর ভুরু টেনে ঝিন্দন বললে—বেৎমিজ্‌, এমনি করেই কথা কইতে হয়?

তারপর একেবারে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল।

একটু অপ্রতিভ হয়েছিলুম, তাই ঘরে ঢুকেই কোমল সুরে বললুম—শহরবান, (ঝিন্দনের আর একটা নাম ছিল শহরবানু বেগম, যদিও কোনটাই ওর আসল নাম নয়) শহরবান, বেয়াদফি মাফ্‌ কোরো। জানই তো বাঙলা দেশের পুরুষরা বড়ই রূঢ়ভাষী হয়ে থাকে।

ফর্সীর নলটা মুখের কাছে এগিয়ে দিয়ে ঝিন্দন বললে—সে কথা কি ঠিক?......আমি জানি, বাঙলা দেশের মাঝখান দিয়ে একটা নদী বয়ে গেছে—তার পূর্ব্বপারের লোকেরা রূঢ়ভাষী কিন্তু হৃদয়বান; আর তুমি যে দিকের, সে দিককার লোকের ভাষায় মিষ্টত্বের অভাব নেই বটে, কিন্তু হৃদয়টা বড় সংকীর্ণ।

বাঙলা দেশের এত খবর যে রাখে, তার সঙ্গে তর্কে পারব না জানতুম, তাই কথা না বাড়িয়ে বললুম—মিষ্ট ভাষার সঙ্গে উদার হৃদয়ের মিলন হয় তো অসম্ভব না-ও হতে পারে।

—তার পরখ্‌ হবে এখনই।

আমাকে বসিয়ে রেখে ঝিন্দন পাশের ঘরে চলে গেল।

খানিকক্ষণ বাদে সামনে এসে যে দাঁড়াল, সে তো দিল্লীর সুন্দরী-প্রধানা ঝিন্দন কোঁয়ার নয়—সে এক শুচিস্নাতা বঙ্গনারী। শিথিল অলক, পরণে চওড়া কালা-পাড় মিহিন সাড়ী, কপালে সিঁদুরের টিপ। মুখে শান্ত স্নিগ্ধ ভাব; চাহনি কোমল, নম্র।

চেয়ার ছেড়ে উঠতেই সে আমায় প্রণাম করলে; তারপর আমারই পায়ের কাছে বসে পড়ে একেবারে খাঁটি বাঙালায় বললে—আমি বাঙালী। সেই কথাই আজ বলতে এসেছি।

খুব বেশী আশ্চর্য্য হইনি, কেন না স্ত্রীলোক সম্বন্ধে

আশ্চর্য্য হওয়াটা নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করতুম। তার পর যা কথা হল, তা সংক্ষেপেই বলব।

তার নাম ছিল রমা। বাড়ী মাণিকগঞ্জ, শ্বশুরবাড়ী কলিকাতা।

স্বামীর অনাদর আর শ্বশুরবাড়ীর লাঞ্ছনায় সে যখন গৃহত্যাগ করে পথে এসে দাঁড়িয়েছিল, তখন সে এতটুকুও জানত না যে, অসংযমে তার প্রেমটা কখনো অবসন্ন হয়ে পড়বে এবং তার প্রেমাস্পদও তাকে ছেড়ে চলে যাবে। মাস কয়েকের মধ্যেই—যেমন হয়ে থাকে—সে দেখলে যে পৃথিবীতে সে নিতান্তই একা।

তার পরেকার কাহিনীগুলো শুনে কাজ নেই। এই-টুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, সে সময় থাকতেই ফিরতে পেরেছিল এবং তার প্রতিভার জোরে উত্তর ভারতে ভাল-মন্দের মাঝখানে যে একটা সমাজ আছে, তার মধ্যে নিজের একটা প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিল।

কিন্তু তাতে সে সন্তুষ্ট ছিল না এবং এইখানেই আসল কথাটা এসে পড়ল।

সেটা হচ্ছে এই।

দিন দুয়েক হল লেনা সিং তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করেছে। লেনা সিং-এর বন্ধুদের ভিতর আমিই একমাত্র তার স্বদেশবাসী; তাই আমার কাছে আত্মপরিচয় দিয়ে সে পরামর্শ চায়—কি করা কর্ত্তব্য।

অনেক কথা হয়েছিল; কিন্তু বলে রাখা ভাল, আমি কোন পরামর্শই দিই নি।

যখন উঠে চলে এলুম—রমা আমায় কোন বাধা দিলে না। মুখ নীচু করে বসে রইল, আর চোখ দিয়ে জল পড়ছিল।

স্ত্রীলোকের অশ্রু চোখ দিয়েই পড়ে, হৃদয় থেকে তো ওঠে না—তাই রমার অশ্রু আমায় বিশেষ বিচলিত করতে পারে নি।

লেনা সিং-এর হাত থেকে কিন্তু অত সহজে পার পাই নি। বিকেলের দিকে সে আমায় পাকড়াও করে তর্ক করতে উদ্যত হয়েছিল। রমা কিন্তু তর্ক করে নি। লেনা সিং-কে জিজ্ঞাসা ক'রলুম—তাকে কি তুমি সত্যিই ভালবাস? সে বললে—ও কি একটা জিজ্ঞেস করবার কথা?

তাই তাকে গম্ভীর হয়ে উপদেশ দিলুম—যাকে ভালবাস, তাকে কখনো বিবাহ করো না—দুঃখ পাবে।

লেনা সিং রেগে গিয়ে বললে—তোমার মত cynic-এর উপযুক্ত কথাই হয়েছে।

লাহোরে ফিরে এসে সপ্তাহ বাদে শুনলুম তাদের বিবাহ হয়ে গেছে। শিখেদের মধ্যে যে আনন্দ বিবাহ পদ্ধতি প্রচলিত আছে—সেই অনুসারেই বিবাহটা সুসম্পন্ন হ'য়েছে।

* * *

সমী গল্প শেষ করে সেই আগেকার কথায় ফিরে এল। জিজ্ঞাসা করলে—রমাকে কোন্ শ্রেণীভুক্ত বলে মনে হয় এখন?.........একটা কথা মনে রেখো—মাতৃ-হৃদয়ের অতৃপ্ত ক্ষুধার প্রেরণাতেই সে এত কাণ্ড করেছিল—অন্ততঃ তার কথা থেকে আমি তাই বুঝেছিলুম। তার যদি একটি সন্তানও থাকত; তা হলে বোধ হয় সে অত সহজে গৃহত্যাগ করতে পারত না। লেনা সিং-কে সে ভাল বেসেছিল, কিন্তু সে ভালবাসার মূলেও মনে হয় না কি যে তার মা হবার ইচ্ছাটাই প্রবল ছিল?

একটু ভেবে বললুম—তা হলে তোমার কথাই মেনে তাকে mother type-এর ভিতরেই ফেলতে হয়।

সমী বললে—তাই বা কি করে হবে? এই চিঠিখানা পড়লে বোধ হয় মত বদলাবে।

চিঠিখানা সেই দিনই এসেছিল। পড়ে দেখলুম, লেনা সিং-এর চিঠি। পড়ে জানলুম—লেনা সিং এবং রমার ভিতরে চিরন্তন বিচ্ছেদ হয়ে গেছে—এই দেড় বছরের মধ্যেই।

হতাশ হয়ে বললুম—তা হলে আমার আগেকার কথাই ঠিক—ও হচ্ছে other type-এর।

সমী বললে—তাই বা কি করে বলবে? সে এখন সন্তানের জননী। এমনও তো হতে পারে যে, তার মাতৃ-হৃদয়ের ক্ষুধা মিটে গেছে, তাই লেনা সিং-এর উপর থেকে তার ভালবাসাটাও চলে গেছে—যেমন সচরাচর হ'য়ে থাকে।

আমি বললুম—কিন্তু এমনও হতে পারে যে, তার মাতৃত্বের ক্ষুধা মেটবার সঙ্গে-সঙ্গে তার পূর্ব্ব অভ্যাস আবার ফিরে এসেছে। এখন বহুপুরুষ-প্রণয়িনী হওয়া তার পক্ষে আশ্চর্য্য নয়।

—সে তা' কোন কালেই ছিল না এবং এখনো হ'তে পারবে ব'লে বোধ হয় না।

—তা হলে তুমি কি বলতে চাও যে, সে শুধুই একটা খেয়ালের বশে স্বামীকে ত্যাগ ক'রেছে এবারেও ?

সমী ধীর গম্ভীর ভাবে বললে—আমি কিছুই বলতে চাই নে। যে জর্ম্মাণ পণ্ডিতের কথা বলেছি, তিনি বলেন যে, স্ত্রীলোকের ভিতর positive জিনিষ কিছু নেই। তারা না-ভাল, না-মন্দ। তারা হচ্ছে যাকে বলে non-moral ; তাদের দায়িত্ব কিছুই নেই, তা' সে যে type-এরই হোক্।......কিন্তু তা' হলেও সে যে কোন্ type-এর, তার তো কিছুই সাব্যস্ত হ'ল না।

এ সব বিষয়ে আমি কখনো মাথা ঘামাই নি। তাই এই মতামতগুলো মাথার ভিতরে একটা গোলমাল পাকিয়ে তুলেছিল। কিন্তু সমী-র মস্তিষ্কের উপর আমার অগাধ বিশ্বাস ছিল। তাই জিজ্ঞাসা করলুম—তোমার মতে ও কোন্ টাইপের ?

সমী-র চোখ মুদে এসেছিল ; কোনো উত্তর পেলুম না। বোধ হয় সেদিন মাত্রাটা একটু বেশী হয়েছিল।

সার্কাসের বিভ্রাট !
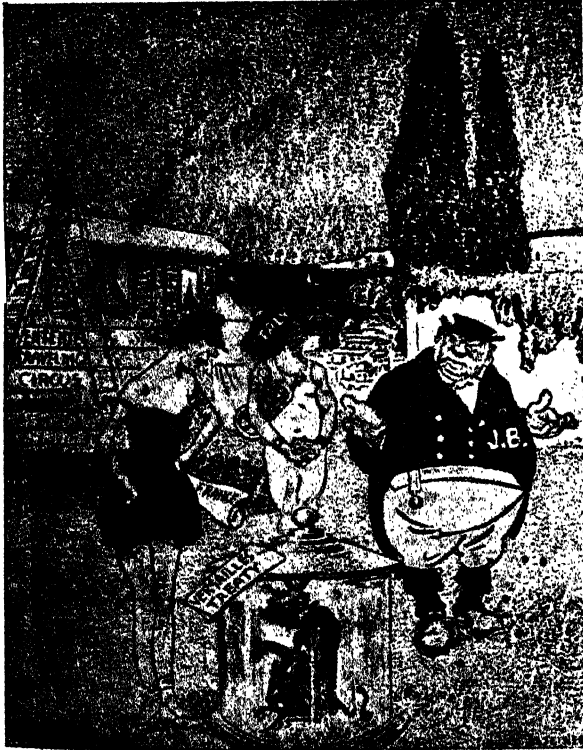
মাঝে-মাঝে এখানে-ওখানে মিত্রশক্তির যে পরামর্শ-সভা বস্‌ছে, জার্ম্মানী তাকে সার্কাসের অভিনয় ব'লে বিদ্রূপ ক'রে দেখাচ্ছে যে, এই সার্কাসের দলে প্রধান বিভ্রাট ঘটিয়েছে 'ভার্সেল্ সন্ধি'-রূপী—ঐ বদ্‌খদ্ জানোয়ারটা।

(Wahre Jacob, Stuttgart.)

রাজ্যলোভ !

নিরুপায় জার্ম্মানী আর অষ্ট্রীয়া অসন্তোষের সঙ্গে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছে রাজমুকুটের লোভে সিংহের বানরবৃত্তি !

(—Simplicissimus, Munich)

স্ত্রীশিক্ষা-সমস্যা

শ্রীতরলাবালা দেবী

আজকাল প্রায় সকল পত্রিকায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, শিক্ষিতা মহিলাগণ নারী-জাতির দুর্গতির বিষয় আলোচনা করিয়া থাকেন। আর ঐ আলোচনার মধ্যে একমাত্র পুরুষ জাতিকেই স্ত্রীজাতির এই অবনতি বা দুর্দ্দশার মূল কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, ঐ সকল শিক্ষিতা মহিলাগণ বিদ্যাবতী হইলেও উঁহাদিগের মধ্যে স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে সমাজগত অভিজ্ঞতা নাই; থাকিলে তাঁহারা একমাত্র পুরুষ জাতিকে এক-বাক্যে দোষী সাব্যস্ত করিতেন না।

অবশ্য এখনো এমন সহস্র বরাহ বর্ত্তমান আছেন, যাঁহারা খনার জিহ্বা কাটিতে সদাই প্রস্তুত। তাঁহারা স্ত্রীজাতির সকল প্রকার উন্নতি-মূলক কার্য্যের দোষ ধরিয়া থাকেন ও যথাসাধ্য বাধা-বিঘ্ন প্রদান করেন। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে ঐরূপ বরাহ জাতির সংখ্যা সমাজে অধিক নাই। এই শ্রেণীর লোকেরা স্ত্রীজাতির শিক্ষা বা তাঁহাদিগের কোন প্রকার মতামত থাকা ইচ্ছা করেন না। যে কোন স্ত্রীলোককে তাঁহারা বিদ্যাচর্চ্চা করিতে দেখিলে, অথবা কোন পুস্তক প্রকাশ করিতে দেখিলে অতিমাত্র বিরক্ত হয়েন। এবং এক্ষণে খনার ব্যাপারের পুনরভিনয়ের কোন সুবিধা বা সুযোগ না থাকায়, আইন-আদালতের প্রতি গভীর অভি-সম্পাত ঝাড়িয়া গাত্রজ্বালা নিবারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু এ সকল বরাহ মহাপ্রভুগণের উপস্থিতি সত্ত্বেও আমাদিগের সমাজে বয়স্থা রমণীগণের যেরূপ আধিপত্য আছে, তাহা স্বাধীনা শিক্ষিতা মহিলাকুল অপেক্ষা কম নহে। পাশ্চাত্য সমাজে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই স্বাধীন বটে, কিন্তু পুরুষ-দিগের সামাজিক কার্য্যে স্ত্রী বাধা দিতে প্রায় অগ্রসর হয়েন না। আমাদিগের সমাজে যদি কোন সহৃদয় পুরুষ কাহারও কোন উপকারার্থ অগ্রসর হয়েন, তবে সে স্থলে অন্তঃপুরবাসিনীগণ, তাহাতে প্রবল বাধা দিয়া পুরুষগণকে সে কার্য্যে নিরস্ত করাইয়া থাকেন। ইহার অসংখ্য প্রমাণ আছে।

রমণী মাতৃজাতীয়া। এদিকে কিন্তু মাতার প্রথম কন্যা সন্তান হইলে, ঐ সন্তানের মাতা, মাতামহী পিতামহী প্রভৃতি অন্যান্য রমণীগণ অতিমাত্র বিরক্ত ও দুঃখিত হয়েন। অবশ্য তাহার ভবিষ্যৎ বিবাহের বিষয় ভাবিয়া। কিন্তু এরূপ ভবিষ্যৎ ভাবিয়া—পরে কন্যা উত্তম বরে বা উত্তম ঘরে পড়িবে কি না, অথবা বর কিরূপে যোগাড় করা হইবে, এই চিন্তায় শিশুকাল হইতেই তাহাকে অবহেলা করা উচিত কি না, তাহা রমণীগণই জ্ঞাত আছেন। পুত্র-সন্তানের জন্য যেরূপ খাদ্যের ব্যবস্থা হয়, সেরূপ খাদ্য কন্যাদিগকে অনেক বাটীতে দেওয়া হয় না। এ বিষয়ে পুরুষদিগের দোষ দেওয়া যায় না।

পুরুষজাতি শিশুকাল হইতেই মাতা, মাতামহী, পিতামহীর নিকট শিক্ষা পায়, যে স্ত্রীজাতি অর্থাৎ বালিকারা মনুষ্যের মধ্যেই গণনীয় নহে, তাহারা কেবল মাত্র সংসারের প্রয়োজনীয় বস্তু হিসাবে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। এ ক্ষেত্রে তাহারা ভবিষ্যতে কিরূপ ভাবে গঠিত হইয়া উঠে, তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।

ইহার পর মেয়েটি যৎকালে (অতি কষ্টে) বিবাহিতা হইয়া শ্বশুরালয়ে গমন করে, তখন শ্বাশুড়ী ও ননন্দার অধীনে তাহাকে কিছুকাল ক্রীতদাসী অপেক্ষা ও হীন ভাবে কাটাইতে হয়। পরে সন্তানাদি হইলে, ৫।৭ বৎসর পরে, তাহারা স্নানাহারের বিষয়ে কিছু-কিছু স্বাধীনতা পাইয়া থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ বধূটি আবার যথাসময়ে অতিমাত্র বৌ-কাঁটকি শ্বাশুড়ীতেপরিণত হয়। এসম্বন্ধে ধনবানের সংসার বা দরিদ্রের সংসারের মধ্যে কোন বিভিন্নতা নাই।

এক্ষণে বক্তব্য এই যে, যাঁহারা কাগজে-কলমে লেখা মাত্র প্রয়োজন বিবেচনা না করিয়া, যথার্থ নিজ জাতির (নারী জাতির) উপকার বা উন্নতি ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সমাজের মধ্যে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া, যাহাতে প্রকৃত কার্য্য হয়, তাহার প্রয়াস পাইবেন। কেবল মাত্র কাগজে-কলমে কতকগুলি অভিযোগ বা গালাগালি প্রকাশিত হইলেই সকল দুঃখ দূরে যায় না।

ইহা সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নারীজাতির শিক্ষা ও উন্নতি-সাধন করিতে হইলে, তাঁহাদিগের নিজের যত্ন, চেষ্টা ও ইচ্ছা আবশ্যক। পুরুষজাতির সাহায্য লইতে হইবে। পুরুষজাতির সাহায্য না পাইলে, অগ্রসর হওয়া কষ্টকর বটে, কিন্তু নারীজাতির জন্য স্বয়ং নারীজাতি প্রয়াস না পাইলে কোন প্রকার উন্নতি সম্ভবপর নহে।

জামাই বাবু

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

(এক)

ঝম্ ঝম্! গাঢ় আঁধারভরা রাত্রি। দ্বিপ্রহর বোধ হয় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

আট নম্বরের ডাউন এক্সপ্রেসখানা ঝাঁঝাঁ শব্দে আসিয়া আলোকোজ্জ্বল দানাপুর ষ্টেশনে ঢুকিল। গাড়ীর একটা তৃতীয়শ্রেণীর কাম্‌রা হইতে একটি তরুণী মুখ বাড়াইল। নিদ্রাবেশ-জড়িত চক্ষু মুছিয়া, ষ্টেশনের নাম-পরিচয়টা জানিবার জন্যই বোধ হয়, ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিল।

সহসা একটা দম্‌কা ঝাঁকুনি দিয়া, ক্রমশঃ মন্থর-গতিশীল গাড়ীখানি ঘচাং ঘচ শব্দে থামিল। তৃতীয় শ্রেণীর সেই কাম্‌রাখানি একটা আলোক-স্তম্ভের সামনে আসিয়া পড়িয়াছিল। তরুণী ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া আলোক-স্তম্ভের গায়ে লেখা ষ্টেশনের নামটা পড়িল। নিশ্চিন্তের নিঃশ্বাস ফেলিয়া জানালার পাশে বসিয়া, পড়িল। অলস দৃষ্টিতে চাহিয়া-চাহিয়া সেই বিপুল জনাকীর্ণ কোলাহল-মুখর ষ্টেশনের শোভা দেখিতে লাগিল।

সামনে দিয়া ফিরিওয়ালা হাঁকিয়া গেল, পান সিগ্রেট্, বাবু,—পান সিগ্রেট্।"

দায়ে পড়িয়া তরুণী উদাস ভাবে সরিয়া বসিল। লোকটা অদৃশ্য হইতেই, আবার স্বস্থানে আসিয়া, প্লাটফরমে লোকজনের ছুটাছুটি দেখিতে লাগিল।

অদূরে থামের নীচে চশমা-চোখে সৌখীন ধরণের সজ্জা পরিহিত একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া ছিলেন। এক হাতে কোঁচা, এক হাতে গ্লাডষ্টোন ব্যাগ ধরিয়া তিনি চঞ্চল দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক চাহিতেছিলেন,—বোধ হয় মনের মত কোন একটা কাম্‌রা খুঁজিতেছিলেন। সহসা তরুণীর দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়িল। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বারকতক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া, হঠাৎ দ্রুতপদে সেই তৃতীয় শ্রেণীর কাম্‌রার সামনে

আসিয়া দাঁড়াইলেন। জানালার দিকে ঝুঁকিয়া যেন অতি কষ্টেই খানিকটা কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমাদেরই মহালক্ষ্মী যে!"

তরুণী অন্য দিকে চাহিয়া ছিল—হঠাৎ এই আকস্মিক সম্ভাষণে চমকিয়া উঠিল! সবিস্ময় দৃষ্টিতে মুহূর্ত্তের জন্য ভদ্রলোকের দিকে চাহিয়া রহিল,—সম্ভবতঃ চিনিতে পারিল না। ভদ্রলোকটি ততক্ষণে প্রচ্ছন্ন শ্লেষের সহিত ব্যঙ্গস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ও বাবা! অবস্থা শোচনীয়! আজকাল কাউকে চিন্‌তে-টিন্‌তে পার না দেখ্‌ছি!"

পরিচিত মুখ এবং ততোঽধিক পরিচিত সেই শ্লেষ-ই বটে!—মুহূর্ত্তে তরুণী সসৌজন্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে নমস্কার করিল; সবিনয়ে বলিল, জামাই বাবু! আসুন, আসুন,—অনেক দিনের পর দেখা। গাড়ীতে আসবেন না কি?"

"তবু ভাল! দয়া করে চিন্‌তে পেরেছ, এই ঢের! যা গৈবি চাল সুরু করেছ—আত্মা খাঁচা-ছাড়া হয়ে গিয়েছিল!"

অপ্রস্তুত এবং কতকটা ক্ষুণ্ণ হইয়াই তরুণী বলিল, "মাপ করুন, সত্যিই চিন্‌তে পারি নি! আমার ভয়ানক মন্দ অভ্যাস,—চেনা-লোকদের মুখ ভুলে যাই। গরীবের ত্রুটি ক্ষমা করুন, অনুগ্রহ করে। তা'পর, কোথা যাচ্ছেন?"

"আসানসোল। তোমরা?"

"হুগলী।"

"একলা?"

"উহুঁ,—এলাহাবাদ বালিকাবিদ্যালয়ের এক শিক্ষয়িত্রী সঙ্গে আছেন। ওঁকে বাড়ী পৌছে দিতে যাচ্ছি, উনি অসুস্থ।"

গাড়ীর ভিতর উঁকি দিয়া, নিদ্রিতা ভদ্রমহিলার দিকে চাহিয়া, প্রৌঢ় ভদ্রলোকটী বলিলেন, "তবে ত এ কাম্‌রায় ওঠা হয় না। তাতে আবার থার্ড ক্লাস।"

"আপনার ইণ্টারের টিকিট বুঝি? আচ্ছা, তা'হলে আসুন। আসানসোলে আবার—তা'হলে—"

"ঐ যাঃ! হুইস্‌ল দিচ্ছে যে! ধর—ধর ব্যাগটা! পরের ষ্টেশনে নাম্‌ব না হয়।"—জানালার ভিতর দিয়া ব্যাগটা পার করিয়া, ভদ্রলোক একটানে দুয়ার খুলিয়া উঠিলেন পর মুহূর্ত্তে গাড়ী "চলি চলি পা পা" সুরু করিল।

ছোট কাম্‌রা। দুখানি মাত্র বেঞ্চি। একটিতে রুগ্না ঘুমাইতেছিলেন,—অন্যটি জিনিসপত্র, মোট-পুঁটুলিতে পূর্ণ। তরুণী তাড়াতাড়ি জিনিস সরাইয়া লইল। ভদ্রলোক ব্যাগটি পাশে রাখিয়া বসিলেন। বিনা ভূমিকায় শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তা'পর নিরলা দেবি! তুমি না কি কোন্ স্কুলের মাষ্টারণী হয়েছ? খুব না কি সুখ-সম্পদ ভোগ কর্‌ছ?"

তরুণী জিনিসপত্র গুছাইতে গুছাইতে উদাসভাবে বলিল "তা হবে!"

"হবে কি রকম? শুনলুম, ভাগ্নের ভাত তোমার পছন্দ হয় নি; তাই মাষ্টারী করে, কুলোজ্জ্বল করতে গেছ! বলিহারি বাবা, যা'হোক্।"

গম্ভীর হইয়া তরুণী বলিল, "কি কর্‌ব? অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা তো মেটাতে হবে?"

"কেন? ভাগ্নের সংসারে থাক্‌লেই তো হোত।"

"ছিলুম ত অনেক দিন। ঝি-গিরি, রাঁধুনীগিরি, সবই তো করেছি। কিন্তু বড়লোক আত্মীয় তাঁরা,—গরীবের ভার নিয়ে কত আর জ্বালাতন হবেন? তাই নিজের ভার নিজেই বইবার চেষ্টা দেখ্‌ছি।"

অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বিশেষ বিজ্ঞ ভাবে জামাইবাবু বলিলেন, "ত্যাখো, আর যা কর তা কর—মেয়েমানুষ হয়ে কখনও ঐ কাজটি কোর না। শক্ত শাসনে না থাক্‌লে মেয়েমানুষ কখনও নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। স্বাধীন হলেই মেয়েমানুষ উচ্ছন্নে যায়।"

নিরলা ধীর ভাবে বলিল, "উচ্ছন্ন যাবার পথে স্বাধীনতা চাইলে—শুধু মেয়েমানুষ কেন জামাইবাবু, পুরুষমানুষেরাও উচ্ছন্ন যায়। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, সে রকম দুর্ম্মতি ঘট্‌বার আগেই যেন ভগবান আমার মাথায় বজ্রাঘাত করেন। কিন্তু, অমানুষিক অত্যাচারের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যও একটা স্বাধীনতার দাবী কর্‌বার অধিকার মেয়ে মানুষেরও আছে।"

"আহা-হা, স্বাধীনতার দাবী কর্‌বার অধিকার মানুষের আছে বটে,—কিন্তু 'মেয়েমানুষ' যে আলাদা জাত গো!"

নিরলা বলিল "অর্থাৎ?—তারা মনুষ্যত্ব-বর্জ্জিত?"

জামাইবাবু উষ্ণ হইয়া বলিলেন "ত্যাখো, আমাদের শাস্ত্র বলেছে 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যম্ অর্হতি!'—"

নিরলা অধিকতর ধীর ভাবে বলিল, "মনুসংহিতাখানা জামাই বাবুর সমস্তটা পড়া আছে কি? "শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনাশ্যত্যাশু তৎকুলম্" এ কথাও মনু বলে গেছেন,—দেখেছেন কি?"

উত্তেজিত হইয়া জামাইবাবু বলিলেন, "মনুসংহিতা ফংহিতা বুঝি না বাপু,—শাস্ত্র ঐ কথা বলে গেছে, তাই জানি। সীতাদেবী লক্ষ্মণের নিষেধ এড়িয়ে স্বাধীন হবার চেষ্টা করেছিলেন, তাই রাবণ তাকে হরণ কর্‌তে পেরেছিল। শুনেছ?"

ঈষৎ হাসিয়া তরুণী বলিল, "শুনি নি,—এই শুনলুম। এমন ভাবে কুতর্কের জের টান্‌লে, আমায় যোড়হাত করে বল্‌তে হবে,—'পরাভব মানিলাম মূর্খের নিকটে!—' কিছু মনে করবেন না। শাস্ত্র সম্বন্ধে আপনারা যে ভাবে নজীর উদ্ধার করেন,—সে ভাবগুলো যেন একটু 'কেমন কেমন' লাগে। আমিও শাস্ত্রের ক খ-গুলোর একটু খবর রাখি। রাগ করবেন না তাতে—"

বাধা দিয়া ক্রুদ্ধ স্বরে জামাইবাবু বলিলেন, "কর্‌বৈ কি! মেয়েমানুষ শাস্ত্রের মাহাত্ম্য কি বোঝে যে শাস্ত্রের খবর রাখ্‌বে? দু কলম লেখাপড়াই না হয় শিখেছ,—তাই বলে শাস্ত্রের খবর তুমি রাখ্‌বে? বড় আস্পর্দ্ধা হয়েছে তোমাদের।—মেয়েমানুষের এত 'বাড়' হওয়া ভাল নয়।"

"তা হতে পারে। কিন্তু তাতে আপনাদের বিদ্বেষ-ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠ্‌বার কোন কারণ নেই। কেন না, জ্ঞানের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী,—তিনি স্বয়ং মেয়েমানুষ। আর সুলভা যোগিনী—যিনি যোগ-শক্তি-বলে জনক রাজা-হেন মহাযোগীকেও একদা বিস্মিত, চমৎকৃত করে দিয়েছিলেন,—তিনিও মেয়েমানুষ! গার্গী, লোপামুদ্রাও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান চর্চ্চা করে গিয়েছিলেন। তাতে ঋষিরা কেউ ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিলেন কি না জানি নে,—তবে জ্ঞানচর্চ্চা অপরাধের জন্যে তাঁদের যে ফাঁসির হুকুম হয় নি,—সেটা বোধ হয় সত্যি। আর লীলা, খনা প্রভৃতি মেয়েরাও জ্যোতিষশাস্ত্র নাড়াচাড়া করে গেছেন,—শুনে থাকবেন বোধ হয়। লীলার অদৃষ্ট ভাল। ভাস্করাচার্য্য নিজে পণ্ডিত ছিলেন, সত্যিকার পণ্ডিত-ই তিনি। তাই লীলার হিংসে করে,—নিজের পাণ্ডিত্য-প্রতাপ জাহিরের চেষ্টা করেছিলেন বলে শোনা যায় না। কিন্তু খনা বেচারার বরাৎ জোর এম্নি চমৎকার ছিল যে, খনার জ্ঞানচর্চ্চা অপরাধের জন্যে, তাঁর জ্যোতিষ-জ্ঞানাভিমানী শ্বশুর—হিংসায় অন্ধ হয়ে,—না—না, মাপ করুন জামাইবাবু! এত বড় শক্ত সত্যকে সহ্য করা, আপনাদের 'কোমল-ধাতে' সইবে না হয় ত। বরাহ ঠাকুর হিংসায় অন্ধ হয়ে নয়,—আহ্লাদে গদগদ হয়েই, পরম স্নেহভরে পুত্রবধূর জিভ্‌টি কেটে ফেলেন! ঠিকই করেছিলেন! পুত্রবধূর সাধন-শক্তি যদি শ্বশুরের পাণ্ডিত্য-গৌরবকে ছাড়িয়ে উঠ্‌ত,—তা হলে কি সর্ব্বনাশ হত বলুন দেখি,—এই জগৎটার! দুনিয়া-শুদ্ধ মানুষের জাত-ধর্ম্ম তা হলে রসাতলেই যেত আর কি! খনা যদি জগতে আরো জ্ঞান প্রচারের সুযোগ পেত,—তা হলে শুধু বিদ্যাভিমানী বরাহের কেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের জ্ঞানের আয়রণচেষ্টগুলো পর্য্যন্ত নীলেমে চড়িয়ে দিয়ে ছাড়্‌ত! কেন না, আপনাদের মতে জ্ঞান-রাজ্যের জমিদারীখানা এতই ছোট, যে, দৈবাৎ কোন মেয়ে ওর দু'পয়সা এক পয়সার সরিকদার হলেই,—পুরুষদের ষোল আনা ইজ্জৎ নষ্ট হয়ে যায়! হায় রে ভগবানের জ্ঞান-রাজ্য, আর হায় রে সে রাজ্যের জরিপি-মাপের চৌহদ্দী!—"

জামাইবাবু এসব কথার অর্থ কি বুঝিলেন বলা যায় না। তবে তাঁর মুখ-ভাবে স্পষ্টই বোঝা গেল,—যা বুঝিলেন—তার ভাষাগত সংজ্ঞার নাম 'সমস্তই অস্পষ্ট দুর্বোধ্য!—'

খানিক ভাবিয়া-চিন্তিয়া,—বলিবার মত কথা কিছু খুঁজিয়া লইয়াই বোধ হয়,—তিনি হঠাৎ বলিলেন, "মেয়েদের গুণের বড়াই সবই জানা আছে! বিশ্বামিত্রের ধ্যান ভাঙাবার জন্যে মেনকা—"

বাধা দিয়া নিরলা বলিল, "তাতে মেনকার কোন স্বার্থই ছিল না জামাইবাবু,—ছিল স্বার্থপর ইন্দ্রের নীচ ঈর্ষা! ইন্দ্র যত ডিগ্রী সাধনের জোরে ইন্দ্রত্ব লাভ করেছিল, বিশ্বামিত্রের সাধনার ডিগ্রী তার ওপরে যাচ্ছে দেখেই না,—ইন্দ্র মেনকার ওপর হুকুমজারী করে বসেন? মেনকা পরাধীনা। তার স্বাধীনতা থাক্‌লে সে কি করত বলা যায় না এ ক্ষেত্রে। কিন্তু পরাধীন ভাবেই সে আসরে নেমেছিল। তার পর পবন দেবতার বজ্জাতির কথা মনে করুন। কিন্তু আপনাদের বিচার এম্নি চমৎকার যে,—কেলেঙ্কারীটা আসলে কর্‌লেন যাঁরা, তাঁদের নাম ধামাচাপা

পড়ল্, কেন না তাঁরা পুরুষ! কিন্তু তাঁদের হুকুম তামিল করে,—তাঁদের স্বার্থের জন্যে যে আত্মবলি দিয়ে মরল, তার অখ্যাতি জগৎ জুড়ে রইল! কেন না—সে মেয়েমানুষ! রাবণের রাক্ষুসে বজ্জাতির কথাটাও তেমন তীব্র ভাবে আলোচিত হয় না, যেমন সীতার—ধর্ম্মের খাতিরে গণ্ডির বাইরে পা বাড়ানোর কথাটার ছল খোঁজা হয়! উঠুন বড়দি—ওষুদ খান।"—হঠাৎ প্রৌঢ়া শিক্ষয়িত্রীকে জাগাইয়া তরুণী ঔষধ খাওয়াইতে ব্যস্ত হইল, জামাইবাবুর কোন মন্তব্য শুনিবার অপেক্ষা করিল না।

জামাইবাবু ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া দেখিলেন, দুজনে নিম্নস্বরে কি কথাবার্ত্তা হইল। ঔষধ খাইয়া প্রৌঢ়া গায়ে ঢাকা দিয়া জড়সড় হইয়া শুইলেন। তরুণী হাই তুলিয়া বলিল, "জামাইবাবু, বাঙ্কে উঠে ঘুমের চেষ্টা দেখুন-না।—"

মস্ত জোরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রৌঢ় হতাশ ভাবে বলিলেন "আর ঘুম! আজ একমাস ঘুম কাকে বলে জানি না। তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীটি মারা গেছে! আহা, মেয়েগুলো যদি যেত, তার বদলে!"

"সে কি! আপনার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীও মারা গেছেন! মোটে চার বছর বিয়ে করেছেন নয়? আহা! কি হয়েছিল?"

"বহুদিন থেকে ভুগছিল। দ্বিতীয় মেয়েটা হবার পর থেকেই সূতিকা ধরেছিল,—তার ওপরেই ছোট মেয়েটা হোল—"

তরুণী বাধা দিয়া বলিল "তার ওপরই?"

প্রৌঢ় উগ্র বিরক্তিভরে বলিলেন, "হ্যাঁ—হাঁ। ভগবানের দেওয়া! মানুষের ত হাত নয়। না হলে বারণ করতুম। ওই মুখপোড়া মেয়ে তিনটের জন্যেই সে অসময়ে মারা গেল!"

তরুণী অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া গম্ভীর ভাবে বলিল "বটে। তার পর,—ছোট মেয়েটি কত বড়?"

"তা মাস ছয়েক'এর হবে। সেও আজ মরে কাল মরে, পুঁয়ে-পাওয়া চেহারা। মরে'ত আপদ যায়, তা মরছে না ত!"

"অন্যায়!—আশ্চর্য্য স্পর্দ্ধাও বটে! তাকে মানুষ করছে কে?"

তাচ্ছল্যভরে প্রৌঢ় বিরক্ত স্বরে বলিলেন "কে আর করবে? ওর বোনগুলোই করছে।"

"তারাও ত বাচ্ছা! কচি বোনটাকে সামলাতে পারে?"

"না পারলে চলবে কেন?" প্রৌঢ় ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তরুণীর দিকে চাহিলেন। যেন তরুণীর প্রশ্নটা ভয়ানক নীতি-বিগর্হিত, ভীষণ অমঙ্গল-দুষ্ট! সুতরাং তার উত্তরটা কঠিন শাস্তিযুক্ত না হইলে ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাইবে! অতএব রুক্ষ স্বরে বলিলেন, "তোমরা কেউ এসে মানুষ করবে কি? তার দিকে কেউ এগোয় না! একটা বিধবা শালী ছিল,—তাকে বললুম; সে বললে চরকা কেটে দিন গুজরাণ করছি,—ছেলে 'মানুষ' করতে পারব না।" একটু থামিয়া অধিকতর উত্তেজিত ভাবে তিনি তীব্র শ্লেষ ভরে পুনশ্চ বলিলেন, "সব আপ্ত-সয়ালীর দল! বুঝেছ, মেয়েগুলো সব আপ্ত-সয়ালী! ওদের জুতোর তলায় পিষে রাখাই ঠিক,—না-হলেই ওরা উচ্ছন্নে যায়!"

তরুণী স্তব্ধ!

(দুই)

জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া প্রৌঢ় সশব্দে "থাক্ থুঃ" করিয়া থুতু ফেলিলেন। মুখ ফিরাইয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "আর এই মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো! দুচক্ষে দেখ্‌তে পারি না এ সব ফ্যাসান! লেখাপড়া জানা মেয়েমানুষ দেখ্‌লে আমার শরীর জ্বলে যায়!"

ঈষৎ হাসিয়া তরুণী বলিল, "অর্থাৎ—আমায় দেখে আপনার ভয়ানক রাগ হচ্ছে,—আর সেই রাগের ঝালটা এম্নি ভাবেই নানা ছুতোয় বর্ষণ করছেন! বুঝতে পারছি সব জামাইবাবু। এ সবের জবাব স্পষ্ট করে সত্যি কথায় বলতে হলে,—সকলের আগে বলতে হয়,—হে মা দুষ্টু সরস্বতি, খানিকক্ষণের জন্যে দয়া করে কাঁধে ভর দাও। যেন মিথ্যা আর ভণ্ডামির অত্যাচারকে একহাত ঠুকতে পারি মা, এইটুকু কর।—"

প্রৌঢ়ের দু'চক্ষু কপালে উঠিল! হুঙ্কার করিয়া বলিলেন, "নিরু! তোমায় 'হতে' দেখেছি আমি, জানো? গুরুজনদের সঙ্গে কি রকম করে কথা কইতে হয়, সেটা শিক্ষা কোরো।—গুরুজনদের সম্মান রেখে কথা বল।"

তরুণী স্মিতমুখে, বিনীত ভাবে বলিল, "দেখুন জামাইবাবু, রাগ করবেন না। সত্যের খাতিরে একটা কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি—কথাটা মনে রাখবেন। গুরুজনরা যদি নিজেদের গুরুত্ব-সম্মানটা বাঁচিয়ে চলতে না জানেন, তা

হলে কোন লঘুজনের ঠাকুর্দ্দারও সাধ্যি নেই,—তাঁর সম্মান বাঁচিয়ে রাখে! অনেকক্ষণ থেকেই বসে-বসে অনেক রকম ডেঁপোমি কর্‌ছেন, চুপ্‌-চাপ্‌ বসে-বসে শুন্‌ছি সবই—"

"কি! ডেঁপোমি কর্‌ছি?—"

"তবে কি বল্‌ব? ভণ্ডামি, না ন্যাকামি? কোন্‌ বিশেষণটা শুন্‌লে আপনি খুসী হবেন বলুন, তাই বল্‌ছি। কিন্তু মাপ করুন, আপনার সঙ্গে ঝগড়া কর্‌তে আমার মোটেই ইচ্ছে নেই। ঝগড়া বা রাগারাগির চেষ্টা ছেড়ে দেন। কিন্তু সত্যের খাতিরে যদি সত্য আলোচনায় একটু এগিয়ে আসেন,—তা হলে বড় বাধিত হই।—আপনি শিক্ষিত লোক—আপনার শিক্ষার সম্মানটা একেবারে ভুলে গেছেন, এ কথাটা মনে কর্‌তে পারি না, পারি কি?"

জামাইবাবু একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসিলেন। অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলিলেন, "অত ভনিতার দরকার কি? মেয়েদের বেশী জ্যাঠামো আমি বরদাস্ত করিতে পারি না, জানো? ও সব আস্পর্দ্ধা দেখে আমার ইচ্ছে করে, পা থেকে জুতো খুলে পটাং পটাং মুখে বসিয়ে দিই!—"

"বাহবা! বাহবা! এমন না হলে ইউনিভার্সিটির বি-এ, ডিগ্রীর বাহার খোলে! বাঃ জামাইবাবু! দিন্‌ আপনার পা দুখানা এগিয়ে—পেন্নাম করে একটু পায়ের ধুলো নিই!"—তরুণী সত্য-সত্যই গল-বস্ত্রে হেঁট হইয়া ভদ্রলোকটির পায়ের কাছে টিপ্‌ করিয়া মাথা ঠুকিল; সবিদ্রূপ-হাস্যে বলিল, নিন্‌, জুতা খুলুন, পায়ের ধুলো নিই।"

অটল গাম্ভীর্য্যে উত্তর হইল, "তোমার ভক্তি থাকে, নিজ হাতে জুতা খুলে পা'র ধুলো নাও!"

"তা'হলে ভক্তির মাত্রা হ্রাস করে হাত গুটোতে হচ্ছে!"—

শ্লেষ ভরে প্রশ্ন হইল, "কেন? গুরুজনদের পায়ে হাত দিলে তোমার জাত যাবে?"

"আজ্ঞে না। আপনি আমার পূজনীয় গুরুজন সেটা সত্যি! তা বলে আপনার জুতোটাও যে আমার পূজনীয় গুরুজন এ কথা মনে করা যায় না। বিশেষ,—আপনার ঐ জুতোর তলায় 'কুটে-রোগীর রক্ত-পুঁজ-মিশানো ধুলো থেকে সুরু করে, রাজ্যের সমস্ত নোংরামির বিষ জমা হয়ে রয়েছে। আপনার ওপর ভক্তি দেখাতে গিয়ে,—ও বিষকে দুহাতে তুলে ভক্তিভরে মাথায় স্থাপন করলে, আমার কল্যাণের চাইতে অকল্যাণ ঘটাই বেশী সম্ভব! আপনাকেও তাতে সম্মানের নামে অপমান করাই হয়! নয় কি?"

কদর্য্য মুখ-ভঙ্গী করিয়া, দাঁত খিঁচাইয়া মান্যবর জামাই বাবু ভেঙচাইয়া বলিলেন, "নয় কি? অ-হ-হ! কি কথাই বল্‌লেন! আমার অপমান! আপনার অপমান কিসে হবে শুনি? আমি পুরুষ মানুষ! আমি এইখানে দাঁড়িয়ে......!"

অতি অশ্লীল, ইতর ভাষায় তিনি এমন কদর্য্য উক্তি উচ্চারণ করিলেন, যা ভদ্র-সমাজে অকথ্য! তরুণীর আপাদ-মস্তকে উগ্র-বিদ্যুৎ-ঝঞ্চনা বহিয়া গেল! রুগ্না, নিদ্রাচ্ছন্না শিক্ষয়িত্রী হঠাৎ তীরবেগে উঠিয়া বসিলেন!—তীব্র কণ্ঠে বলিলেন, "শিক্ষিত ভদ্রলোক না কি আপনি? কেমনই যে আপনার শিক্ষা, কেমনই যে আপনার ভদ্রতা,—বুঝ্‌তে পারছি নে! নেমে যান গাড়ী থেকে, নামুন এখুনি!—ইতর সমাজে গিয়ে আপনার ও ইতরামো প্রকাশ করুন গে, যথেষ্ট আদর লাভ করবেন!"

উঞ্ছ-প্রবৃত্তি শৃগালের অন্তঃসারশূন্য গর্ব্বচাতুর্য্য-আস্ফালন যেন অকস্মাৎ—কোন তেজস্বিনী সিংহিনীর দৃপ্ত হুঙ্কারে—স্তব্ধ হইল! মাথা হেঁট করিয়া জামাই বাবু হঠাৎ নিস্পন্দ হইলেন!

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তরুণী বলিল "জামাই বাবু, গুরুজন আপনি সত্যিই। কিন্তু আপনার এই নীচতা আমাকে কতটা আঘাত দিলে, বল্‌তে পার্‌ছি নে! ছিঃ, এত জঘন্য ইতর অন্তঃকরণ আপনার! ইতর কাপুরুষদর্পের নাম আপনাদের কাছে 'পৌরুষ'? আপনার জিভ আড়ষ্ট হয়ে গেল না নিজেকে এতটা অপমান করতে?"

জড়িত স্বরে, তোৎলাইয়া-তোৎলাইয়া জামাই বাবু বৃদ্ধা শিক্ষয়িত্রীর উদ্দেশে বলিলেন "কথাটা......কথাটা... ঠাট্টা মাত্র। ঠাট্টা......সিন্‌সিয়ারলি বল্‌ছি......কিছু মনে করবেন না। মাপ করুন আমায়—"একটু থামিয়া, গলা পরিষ্কার করিয়া, উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "নিরুর বড়......... আমার প্রথমপক্ষের স্ত্রী—"

বাধা দিয়া নিরলা—অর্থাৎ তরুণী বলিল, "তার জন্য আমার মাথাটা আপনি এমন করে কিনে রাখেন নি, যাতে

আমার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করবার মত 'বোল' ঝাড়্তে পারেন! অপ্রিয় সত্যকে চেপে যাওয়াই মঙ্গল। দুঃখময় অতীত স্মৃতির যন্ত্রণা ভুলে যাওয়াই ভাল। কিন্তু আত্মীয়তা সম্পর্কের দম্ভটা যখন বড় দম্ভভাবেই উচ্চারণ করলেন,—তখন বড় দুঃখেই স্মরণ করিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি জামাই বাবু,—সম্পর্কটা মনে আছে। আর সে সম্পর্ক-দম্ভের শাস্তি লাঞ্ছনাটা চিরদিন খুব ভাল করেই মনে থাক্‌বে!"

সৎপরোনাস্তি আশ্চর্য্য হইয়া, পরম নিরীহ ভাবে জামাই বাবু বলিলেন, "কেন? কিসের শাস্তি-লাঞ্ছনা?"

ম্লান বেদনার হাসি হাসিয়া তরুণী বলিল, "আর সে পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ কি? আপনার অনুগ্রহে আমার বাপ-মার চার চৌদ্দং ছাপান্ন পুরুষ উদ্ধারটা বহুদিনই হয়ে গেছে! বাপ-মাও আজ স্বর্গে। দিদিও আপনার পাশব নির্য্যাতনের অনুগ্রহে অকালে দেহরক্ষা করে বেঁচেছে!—আজ কার জন্যে বলব, আর—"

চোখ লাল করিয়া জামাই বাবু ধমকাইয়া বলিলেন, "কি? পাশব নির্য্যাতন? জানো, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটায় পশুভাবের কথা আসতেই পারে না,—হিন্দুর ঘরে সেটা পবিত্র দেবভাব পূর্ণ!"

বৃদ্ধা শিক্ষয়িত্রী তীক্ষ্ণ স্বরে বলিলেন "শুধু পবিত্র নয়, অতি পবিত্র, সুন্দর—আদর্শ, স্বর্গীয় গৌরব পূর্ণ—মহা পবিত্র দেব-ভাব! একটু অনধিকার-চর্চ্চা কর্‌তে বাধ্য হচ্ছি,—ক্ষমা করবেন আমায়। আপনাকে আঘাত করা আমার উদ্দেশ্য নয়,—কিন্তু যা নির্লজ্জ ভণ্ডামি সুরু করেছেন, অত নির্লজ্জতা সহ্য করা সম্ভব নয়। পবিত্র দেব-ভাবের নামে মস্ত জাঁক-জমকের বক্তৃতা তো দিলেন,—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,—এত পবিত্রতা-জ্ঞানই যদি মনে আছে, এত দেব-ভাবই যদি হিন্দুর ঘর উজ্জ্বল করে রেখেছে,—তা'হলে কার্য্যক্ষেত্রে তিন-তিন দফায় আপনি স্বয়ং কসাইয়ের ব্যবসা কর্‌লেন কেন?"

ব্যথিত স্বরে নিরলা বলিল, "কসাইয়ের ব্যবসা এর চাইতে ঢের ভাল বড় দি—ঢের ভাল! কসাইয়েরা দাম দিয়ে জানোয়ার কিনে এনে জবাই করে। কিন্তু এই যে বাংলার হতভাগা মেয়ে জবাই কর্‌বার ব্যবসা,—যে ব্যবসা বাংলার বাবার দল ভিটে-মাটি উচ্ছন্ন করে চালাচ্ছেন,—এ নৃশংস ব্যবসার তুলনা কোথাও নাই। বাংলার বাবাদের বুক হাতুড়ীর ঠোকরে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে,—প্রতিদিন হাজার হাতুড়ীর ঘা সে বুকে বাজছে,—কিন্তু এমন অগাধ আলস্যপরায়ণ, উদার ধর্ম্মশীল 'বাবার দল' আর কোন দেশে নাই! ধর্ম্মের নামে এত অধর্ম্মের অত্যাচার আর কোন-খানে এমন অবাধে চলেনি, যেমন বাংলার বাবারা চালিয়েছেন! না জামাই বাবু, আপনাকে আমি কিছু দোষ দিচ্ছি নে—কিসের দোষ আপনার? লাথির ওপর লাথি, ঝাঁটার ওপর ঝাঁটা, জুতোর ওপর জুতো বর্ষণে, করায়ত্ত অসহায় দুর্ব্বল নারীর ওপর নৃশংস শাসন-ক্ষমতা প্রচারের নাম যদি দেবত্ব-মহিমা হয়—তবে একবার কেন, এক লাখ্‌বার আপনি দেবতা!—আপনাদের এ দেবত্ব, এ-হেন স্বর্গীয় দেবভাব......" নিদারুণ যন্ত্রণা-নিষ্পেষণে নিরলার কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল। ঠোঁটে তার অসাধারণ সংযমশীল পরিহাসের হাসি এখনও জাগিতেছিল,—কিন্তু চোখ দিয়া উচ্ছল উচ্ছ্বাসে সহসা দরদর জলস্রোত বহিয়া সে হাসির উপর ঢেউ খেলিয়া গেল!

চট্ করিয়া জামার আস্তিনে চোখের জল মুছিয়া সে আবার সোজা হইয়া বসিল। অনুত্তেজিত ধীর কণ্ঠে বলিল, "জামাই বাবু, বুঝি সব, জানি সব—কিন্তু আছি—'বোকা হয়ে'! জানি নে কি জামাই বাবু, যেখানে আপনার মত মহৎ, উন্নত-রুচি-সম্পন্ন, মহাপৌরুষমস্ত, বীরের দল দাঁড়িয়ে আছেন—সেখানে আপনাদের মা, বোন, স্ত্রী, কন্যার সম্বন্ধে,—সমস্ত ন্যায় জুতোর তলায় গুঁড়ো হয়ে গেছে! আপনাদের কাছে সত্যি-সত্যিই কুলটাদের মূল্য আছে, কুলবালার মূল্য নাই!—ভদ্র, মহৎ, স্বাধীন, উদার, পূজার্হ দেবতা আপনারা! আপনাদের ঘরের পবিত্র দেবভাব—সেই লাথি-ঝাঁটা-জুতোর সম্বন্ধটার মধ্যে পশুভাবের গন্ধ আছে বলে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করলে,—রাগে আপনাদের চোখ লাল হয়ে উঠবে বৈ কি? কিন্তু যখন আমার বড় বোন, ঐ পবিত্র দেব-ভাবের মাহাত্ম্যে সিফিলিসের বিষে জর্জ্জরিত হয়ে পড়্‌ল,—পবিত্র দেব-ভাবের মহত্ত্ব-হানির অজুহাতে যখন তাকে জ্যান্ত কবরস্থ করার মত [illegible] মাসের পর মাস ধরে ছুটি বচ্ছর ভুগিয়ে মারা হোল,—তখন? না,—দেবতা আপনি সত্যিই! এই ত নির্জ্জলা দেবত্বের আদর্শ! পৃথিবীর কোন দেশ এ আদর্শের জুড়িদার আদর্শ দিতে পারবে না!—তার পর,—আরও একটু

…………ক্ষণ পরে মৃদুহাসি
হেলাইয়া বাম বাহুখানি, হেলাভরে
এলাইয়া দিলা কেশপাশ…………
অঞ্চল খসায়ে দিয়ে হেরিল আপন
অনিন্দিত বাহুখানি……………… ।—চিত্রাঙ্গদা

শিল্পী—শ্রীমান্ সুধাংশুভূষণ ঘোষের সৌজন্যে]

['Bharatvarsha Halftone & Printing Works.'

বলছি,—অতিশয় ক্লেশের সঙ্গেই বলছি,—আমার দিদি আপনাকে জ্যান্ত দেবতা বলেই মনে করতেন, সেটা সত্যি। আপনাদের ভণ্ডামির সম্মোহন মন্ত্রে তিনি এমন নিখুঁত দীক্ষালাভ করেছিলেন, যে, আপনার সমস্ত পশুত্ব তাঁর কাছে দেবত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল; আপনার সমস্ত অন্যায় তাঁর চোখে ন্যায় ছিল। এমন ন্যায় যে—আপনি আপনার ভাজ, ভাইপো,—সেই নাবালক আর বিধবাদের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায়টুকু জাল জোচ্চুরির সাহায্যে ঠকিয়ে নিলেন, দিদি আমার সেটাও 'দেবত্ব' বলে অকপট চিত্তে মেনে নিলেন, এবং সেই সূত্রে পাড়ায়-পাড়ায় কোঁদল করে আপনার পক্ষ সমর্থন করে এলেন! আদর্শ সহধর্ম্মিণী তিনি, সন্দেহ নেই। তা'পর, সে সম্পত্তি আপনি যখন বদ্‌মাইসিতে ফুঁকে দিলেন, তখন দিদি সেটাও দেবলীলা বলে মেনে নিলেন; এবং পাতিব্রত্যের মহিমা প্রচার করবার জন্যে,—না—না, ভুল হোল! আপনার ঐ দেবভাবের মহিমা-বলেই, আপনার কুৎসিত ব্যাধির অংশভাগিনী হোলেন! পুরুষ আপনি, স্বাধীন! পয়সার থলি আপনার নিজের হাতে!—তাতে আপনি স্বয়ং দেবতা! আপনি নিজের চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ হলেন, কিন্তু আপনার স্ত্রী? না,—সে স্ত্রীলোক, পরাধীনা; তার অর্থ-সঙ্গতিহীনা, আপনার-অনুগ্রহ প্রত্যাশী। তার ওপর দেবতার সহধর্ম্মিণী 'দাসী' সে! সুতরাং তার চিকিৎসার কথাটা কেউ মুখেও আনলে না! সে যখন বিছানায় পড়ে শুষছে, তখন অন্য স্ত্রী সংগ্রহের সশব্দ আয়োজন-উৎসব সুরু হয়ে গেল! সে শুনতে পেয়ে গভীর বেদনাভরে কাঁদলে! মূর্খ সে! বুঝলে না, দেবভাবের চরমোৎকর্ষই ফলই ফলছে! এ মধুরোজ্জ্বল দেবত্ব, এ মহামহিম দেবভাব,—এই পশুভাবপূর্ণ প্রকাণ্ড পৃথিবীটার আর কোথাও নাই! যা আছে, শুধু আপনাদের ঘরেই! ঠিক কথা!"

ঝাঁ-ঝাঁ শব্দে গোটাকতক ষ্টেশন পার হইয়া, গাড়ী সেই সময় আর একটা ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। অপ্রসন্ন মুখে বিড়্-বিড়্ করিয়া বকিতে-বকিতে জামাইবাবু মোরিয়া রকমের এক লাফ দিলেন!—দুয়ার ঠেলিয়া দ্রুত নামিয়া পড়িলেন। কোন সৌজন্যের খাতিরে বিদায়-সম্ভাষণসূচক একটা শব্দও উচ্চারণ করিলেন না।

(তিন)

জামাই বাবু প্লাটফরমে পা দেওয়া মাত্র, সহসা পিছন হইতে আর এক প্রৌঢ় আসিয়া তাঁর কাঁধ ধরিলেন। সহাস্যে বলিলেন, "কি হে অনিল বাবু যে! দাঁত বাঁধিয়ে, চুলে কলপ লাগিয়ে, দানাপুর যাওয়া হয়েছিল! চতুর্থ পক্ষ ঠিক হোল দাদা? কবে বিয়ের দিন?"

তীরবেগে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, তৃতীয় শ্রেণীর সেই কামরার ভিতর একটা জ্বলন্ত অগ্নিবর্ষী কটাক্ষ ক্ষেপ করিয়া, জামাইবাবু প্রায় তার স্বরে চীৎকার করিয়াই বলিলেন, "এই মেয়েগুলোকে লেখাপড়া শেখানো, বুঝলে অমৃত!—সাত ঝাঁটা মারো এই লেখাপড়া-জানা মেয়ে-মানুষের মুখে!"

ঈষৎ হাসিয়া অমৃতবাবু বলিলেন, "তার চাইতে এক ঘুসিতে তোমার বাঁধানো দাঁতগুলোর বংশ ধ্বংস করেই ফেলি না! ইউনিভার্সিটির আহাম্মক! বিয়ের বাজারে মোটা ঘুস খাবার জন্যে বি-এ, পাশ করে কি সেই আদিম বর্ব্বরত্ব—তোমার মধুর জানোয়ারত্বটা এক ইঞ্চিও ছাড়তে পার নি দাদা! লজ্জা করে না তোমার?"

তৃতীয় শ্রেণীর জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া, দুহাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া, হাসিমুখে তরুণী বলিল "নাতির গলার আওয়াজ যে! কি বলছেন বাবাজি? ওঁর লজ্জা করে কি না জানতে চাইছেন? না, না, না! লজ্জা কিসের? নির্লজ্জ ইতর বর্ব্বরতা প্রকাশের নামই যে এদেশের বাজারে 'পৌরুষ-প্রকাশ!"

গর্জ্জিয়া জামাই বাবু বলিলেন, "কি! নিরু!—তুমি আমার সাক্ষাতে পরপুরুষের সঙ্গে আলাপ করছ? এর নাম তোমার শিক্ষা? দাঁড়াও, তোমার আত্মীয়দের কাছে তোমার বিদ্যের পরিচয় জানাচ্ছি! এই সব খ্যামটা-উলী-পনা করবার জন্যে তোমাদের শিক্ষে চাই, স্বাধীনতা চাই, কেমন?"

প্রৌঢ় অমৃতবাবু বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "দিদিমা, ভদ্রলোকটি আপনার কোন আত্মীয় হন কি?"

তরুণী হাসিমুখে বলিল "নিশ্চয়! আত্মীয় না হলে এমন জেল-কিপারের শাসন-গৌরব কেউ দেখাতে পারে কি? উনি আমার বড় ভগিনীপতি। তবে সৌভাগ্যের বিষয়-বড় বোনটি আজ দশবছর হল দেহত্যাগ করে, ওঁর হাত থেকে মুক্তিলাভ করেছেন!"

"তা হলে কুকুর-শাসন একটু করব না কি ?"

হঠাৎ ট্রেণ ছাড়িল ! অমৃত বাবু, জামাই বাবুর মতামতের কোন অপেক্ষা না রাখিয়াই, তাঁহাকে টানিয়া লইয়া সেই তৃতীয় শ্রেণীর কামরার ভিতর উঠিলেন।

তরুণী জিনিসপত্র সরাইয়া তাঁহাদের স্থান দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল,—অমৃত বাবু বাধা দিলেন। নিজ হাতেই জিনিসপত্র সরাইয়া, জামাই বাবুকে পাশে টানিয়া লইয়া বসিলেন। প্রৌঢ়া শিক্ষয়িত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এই যে, বড় দিদিমাও রয়েছেন ! নমস্কার ! আজ মার চিঠিতে আপনার অসুখের খবর পেলুম। এখন একটু ভাল আছেন ত ?"

সংক্ষেপেই উভয় পক্ষে কুশল-বিনিময় হইল। প্রৌঢ়া শিক্ষয়িত্রী স্মিতমুখে বলিলেন, "মাঝ রাস্তায় হঠাৎ আপনার দেখা পাব, জানতুম না। কোথা যাচ্ছেন ?"

অমৃত বাবু বলিলেন "কলকাতা। পশু নাগাদ এলাহাবাদে ফিরব। আমার মা কেমন গিন্নিপনা করছে, বলুন দেখি ?"

হাসিয়া শিক্ষয়িত্রী বলিলেন "খুব ! এই সব মোটঘাট বাঁধা-ছাঁদা থেকে সুরু করে, গাড়ী ডাকিয়ে আমাদের বিদেয় করা পর্য্যন্ত,—সব কর্ত্তৃত্বই তাঁর হাতে। আপনার ম্যানেজার মশাইকে সঙ্গে দিলেন, তিনি টিকিট্‌ করে গাড়ীতে তুলে দিয়ে গেলেন।"

নিরলা স্নেহময় স্বরে বলিল, "সার্থক মা পেয়েছেন আপনি ! শিক্ষিত পিতা ঢের আছেন ; কিন্তু মেয়েকে এমন শিক্ষায় গড়ে তুলতে মনোযোগ খরচ করবেন,—এমন সা-খরচে পিতা এ দেশে খুব কম ! আপনার মত একটি পিতার মুখ দেখতে পেলেও, আনন্দ-গৌরবে আমাদের বুক দশহাত হয়ে ওঠে বাবা !"

আর্দ্র কণ্ঠে অমৃত বাবু বলিলেন, "আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন মা,—আমার 'মা'টাকে আমি যেন 'জগতের মা' হবার যোগ্যতায় গড়ে রেখে যেতে পারি ! এই অধঃপতিত দেশে মাতৃশক্তির যে লাঞ্ছনা ঘটেছে আর ঘটছে,—তার বিরুদ্ধে আমার মা-টাকে যেন মূর্ত্ত তিরস্কারের মতই,— উদ্যত বজ্রের মতই,—উগ্র কঠিন হয়েই দাঁড়াতে দেখি ! লক্ষ্মীছাড়া দেশ ! লক্ষ্মী-শক্তিকে নির্য্যাতন করে তুমি লক্ষ্মী-শ্রী লাভ করবে ? ভগবানের বিচার এতই বে হিসেবী ভেবেছ ?"

প্রৌঢ়া শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, "হাঁ,—এদেশ তাই ভেবে রেখেছে ! এদের বিচারে তাই ভগবান শুধু বেহিসাবী নন, - তিনি রীতিমতই ভণ্ড, জোচ্চোর, প্রতারক ! এদের সুখ-সম্পদ ভোগের অধিকারটা ভগবান শুধু জোচ্চুরি করেই কেড়ে নিয়েছেন, তা নয় ; তিনি নেহাৎ শয়তানী করেই এদের শক্তিগুলা চুরি করে নিয়েছেন ! নইলে— শক্তি থাকলে এরা, মানুষগুলোর—অর্থাৎ 'মানুষ' বললে যাদের বোঝায়—তাদের মাথা হাতে কাটত !"

তরুণী হাসিল ! বেদনাভরে, বলিল "বড় দুঃখ হয় বাস্তবিকই ! এ দেশের মানুষদের মন, বুদ্ধি, হৃদয়কে বিচার করতে গেলে, বড় মর্ম্মান্তিক দুঃখেই আমাদের প্রাণটা পিষে যায় ! ছিঃ, এদের বিচার-বুদ্ধি এত জঘন্য নীচ হয়ে পড়েছে ! এত ইতরতা মানুষের ! "সত্যঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াৎ এষ ধর্ম্ম সনাতনঃ" শুনেছি বাবাজী ;—কিন্তু কুপৌরুষ-দম্ভ-বলে, কদর্য্য মিথ্যাকে এমন নির্লজ্জ ইতরামোর সঙ্গে প্রচার করাও যে 'সনাতন ধর্ম্ম', তা জানতুম না !"

জামাই বাবু এতক্ষণ ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টিতে চাহিয়া রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসিতেছিলেন। এবার হঠাৎ হাত-পা ছুঁড়িয়া মহাক্রোধে গর্জ্জিয়া বলিলেন, "ছ্যাথো নিরো ! পরপুরুষের সঙ্গে ঢলাঢলি করবার জন্যে যে তোমরা লেখাপড়া শিখেছ, তা ও জানতুম না ! কি 'খেয়াতি'ই রাখলে তোমরা লেখাপড়া শিখে !—ঐ এক জন,—বুড়ী..." প্রৌঢ়ার উদ্দেশে তিনি কি বলিতে উদ্যত হইলেন। মুহূর্ত্তে অমৃত বাবু উঠিয়া বিনাবাক্যে জামাই বাবুর গলাটি টিপিয়া ধরিলেন ; দৃপ্ত কণ্ঠে বলিলেন, "জিভ্‌ সামালো ! নইলে তোমার জিভ আমি টেনে ছিঁড়ে ফেলব ! কাপুরুষ, পশু ! তোমার গুণের কাহিনী আমি কি কিছু জানি নে ? পীরের কাছে মামদো-বাজী করতে এসেছ ?"

জামাই বাবু গাঁক-গাঁক শব্দে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন—"ছাড়, ছাড়,—তোমার পায়ে পড়ি গো !"

"এইবার পায়ে পড়ি ! পথে এস !" অমৃত বাবু গলা ছাড়িয়া দিলেন। উগ্র কণ্ঠে বলিলেন "লম্পট ব্যাভিচারীর দল ! ব্যাভিচারের দাসখতে নাম লিখিয়ে,—মনুষ্যত্বকে দেউলে করে বসে আছ,—ছাগল-ভেড়ার সামিল হয়ে

দাঁড়িয়েছে,—আবার বন-গাঁয়ে শেয়াল রাজা সাজ্‌বার সখ্! জানো না, তোমাদের ঘাড় ভাঙ্‌বার সিংহগুলো এখনো মরে নি সবাই? তোমাদের মূর্খতার অত্যাচার চুপ করে সয়ে যাই বলে বড্ডই বাড়-বাড়ন্ত হয়েছে, নয়?"

ফোঁশ-ফোঁশ করিয়া হাঁপাইতে-হাঁপাইতে জামাই বাবু সক্রোধে বলিলেন, "তোমায় আমি কিছু বলি নি,—তুমি কেন অপমান কর্‌লে? আমি মানহানির দাবীতে নালিশ কর্‌ব!"

"এই মুহূর্ত্তে কর গে। এই নাও, আমি খরচ দিচ্ছি।" পকেট হইতে তিনখানা নোট বাহির করিয়া জামাই বাবুর সামনে ফেলিয়া দিয়া, অমৃত বাবু বলিলেন, "যাও, মামলা রুজু করগে। আর যা খরচ লাগে জানিও, পরে দেব। আপাততঃ 'তিন শত্রু' দিয়ে রাখলুম!"

তিনি গম্ভীর হইয়া বসিলেন।

(চার)

মিনিট কতক সব চুপচাপ।

প্রৌঢ়া শিক্ষয়িত্রী ক্ষুণ্ণ ভাবে বলিলেন "বড় দুঃখিত হচ্ছি—"

বাধা দিয়া অমৃত বাবু ধীর ভাবে বলিলেন, "কিসের দুঃখ? মানুষকে সম্মান করার নামে, মানুষের ইৎরামো-ব্যাধিকে আমি পূজা করি নি বলে? ভুল আপনাদের! মারাত্মক ভুল এই—মানুষকে খাতির করার নামে মানুষের মনুষ্যত্ব-গ্লানিকে খাতির করা!"

"কে সে সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝ্‌ছে বলুন? মাঝখান থেকে এই কথাটা দাঁড়াবে যে, আমাদের সম্পর্ক নিয়ে আপনাদের বন্ধুত্বের মাঝে একটা অপ্রিয় বিচ্ছেদ—"

হাসিয়া অমৃত বাবু বলিলেন, "এই কৃষ্ণের জীবটির সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে,—চিরকাল থাক্‌বেও—আমি এটুকু অন্ততঃ মনে জানি। কিন্তু ওঁর অন্যায়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব কোন কালেই ছিল না, কোন কালেই থাকবে না। সেই অন্যায়টার আমি গলা টিপে ধরেছি মাত্র! বন্ধুকে কিন্তু আমি চিরদিন যেমন ভালবেসেছি,—এখনো তেম্‌নি ভালবাস্‌ছি!—"

উৎকট মুখভঙ্গী করিয়া জামাইবাবু বলিলেন, "যাও, যাও! ঢের হয়েছে! তোমার ভালবাসাও আমার দরকার নেই, তোমার বন্ধুত্বেও আমার কায নেই। অসময়ে তুমি একদিন আমার ঢের উপকার করেছিলে, আজ তার শোধ নিলে। যাও, আজ থেকে তোমার সঙ্গে সব দেনা-পাওনা চুকল!—"

হাসিমুখে অমৃত বাবু বলিলেন, "মনেও কোর না সেটি! তোমার প্রকৃতির ব্যাধি,—তোমার অন্যায়, তোমার নীচতা, তোমার জঘন্য ঈর্ষাকে তুমি যতক্ষণ না ছাড়্‌ছ, ততক্ষণ আমার পাওনা শোধ হবার নয়! ভূতের ওঝারা রোগীকে পিটিয়ে ভূত তাড়ায়, জানো বোধ হয়?—বন্ধু তুমি! ভূতের হাতে তুমি মরবে, এটা সহ্য করা যায় না। বন্ধুকে বাঁচাবার জন্যে বন্ধুর ঘাড়ের ভূতকে আমি—"

অমৃত বাবু হাসিমুখে থামিলেন। নিরলা সহাস্যে বলিল "কথাটা শেষ করেই ফেলুন না!"

"ও-কথা,—'শুধু কথায়' শেষ কর্‌লে ত হবে না দিদিমা,—ওর জন্যে কায চাই যথেষ্ট! আপনারা মা-দিদিমার দল, আপনাদের এই কুসন্তান, কুপৌত্র, কুদৌহিত্রগুলোকে সায়েস্তা কর্‌বার কাযে লাগুন দেখি,—দেশটার একটা মহৎ উপকার হয় তা' হলে!"

প্রৌঢ়া শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, "হয়েছে তা' হলেই! মা-সরস্বতীর মন্দিরের ধূলো মাথায় তুলে নিলে, যে দেশের মেয়েদের জাত-ধর্ম্ম রসাতলে যায়, ইতরামি আর মূর্খতার পূজায় আত্ম-নিবেদন না করলে যে দেশের মেয়েরা 'দেবী' হতে পারে না,—সেই দেশের মেয়ে হয়ে আমরা ওসব কায করব? ব্যবস্থা খুব ভাল বটে, কিন্তু অবস্থা আমাদের কি হয়ে রয়েছে, চেয়ে দেখছেন কি? ঐ যে এক ভগবানের জীব আপনার পাশে বসে রয়েছেন,—ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন, নারীর বিশেষত্ব কি?—ক্ষমা কর্‌বেন আমায়,—" তিনি মুদ্রিত চক্ষে নতশিরে নমস্কার করিয়া বলিলেন "তিক্ত-কঠোর সত্য আমি প্রকাশ কর্‌ছি, মার্জ্জনা করবেন আপনাদের এই দুর্ভাগা মায়ের অপরাধ!—নারী আজ ওঁদের বিচারে কি হয়ে দাঁড়িয়েছে জানেন?—শুধু দেহেন্দ্রিয় মাত্র! এই, ইতর দেহেন্দ্রিয়গত সংজ্ঞা ছাড়া নারীর আর কোন অস্তিত্ব, কোন স্বাতন্ত্র্য, কোন মৌলিকতা নাই! শরীর-মনঃ-শক্তি ওঁদের বিচারে মনুষ্যত্বহীন, নারীর বুদ্ধিমত্তা ওঁদের কাছে ধোবার বোঝা-বহনকারী গাধা মাত্র। নারীর আত্মাকে জুতোর চাপে পিষে গুঁড়ো করাই ওঁদের কাছে মহা পৌরুষের পরিচয়!

কারণ কি জানেন? ওঁরা অন্নবস্ত্রের মূল্যে, নারীর হৃদয়, মন, বুদ্ধি,—আত্মার সমস্ত শক্তি, সমস্ত স্বাধীনতা কিনে নিয়েছেন। শুধু অন্নবস্ত্রের ঋণে ঐ দেশের নারী-শক্তি 'দেউলে' হয়ে গেছে!—এই তাদের প্রকৃত অবস্থা!"

অমৃত বাবু তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, "ঠিক বলেছেন! একবর্ণও অত্যুক্তি নয়। এই অন্ন-বস্ত্রের ঋণকে যে নারী এড়িয়ে চলেছেন, তিনিই সমাজের বিচারে সমাজচ্যুতা! কেন না, যাকে হাতে মারবার বা ভাতে মারবার না থাকে, তার ওপর অবাধ অত্যাচারটা চলে না। চলে শুধু—কুৎসিত দুর্ব্বাক্যের অত্যাচার! কিন্তু এই প্রতারক, ভণ্ড, নীচ, ক্রুরচেতা কাপুরুষদের বিধান শিরোধার্য্য করে চল্‌বার দিন আর আপনাদের নাই মা। এ সমাজের কাছে সম্মান চাইবেন না। এ সমাজে কুক্কুরী-শূকরীদের সম্মান আছে, কিন্তু সিংহবাহিনীদের সম্মান নাই। আপনাদের জন্যে এখানে আছে শুধু অবজ্ঞা, ঘৃণা, কুৎসা, অপবাদ, লাঞ্ছনা, নির্য্যাতন! আপনাদের অবস্থার পক্ষে এইটেই ন্যায্য প্রাপ্য বলে মনে করুন। ডাকুন আজ বজ্র-নির্ঘোষে রুদ্র-আহ্বানে নিজের অন্তরাত্মাকে,—আর দেশের অত্যাচার-নিপীড়িত, নির্জ্জীব নারী-শক্তিকে! বলুন তাদের—'ওরে চিরলাঞ্ছিত, চির-প্রতারিতের দল! তোরা মিথ্যাবাদী কাপুরুষদের কথাকে ভয় করে মাথা নোয়াস্ নে! কথার অত্যাচারকে যতই ভয় করবি, অত্যাচার ততই বেড়ে উঠ্‌বে; কেন না, এ দেশ শুধু কথার দেশ! এ দেশ কায করতে জানে না, কিছু বুঝতে চায় না, শুধু নির্ভাবনায়—যা খুসী তাই—কথা কইতে জানে! এ কথা গ্রাহ্য করবার নয়! তোরা ভয়কে আজ জয় করে নেবার জন্যে প্রস্তুত হ। বিবেকের হাতে আত্মসমর্পণ করে,—আজ তোরা মনুষ্যত্বের গ্লানিকর সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে, রুদ্র-শক্তিতে বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়া! ভগবানের জাগ্রত রূপের পূজায় আজ তোরা আত্মোৎসর্গ কর!"

গাড়ী আর এক ষ্টেশনে ঢুকিল। বাহিরে কুলির দল চীৎকার করিল, "আসান্‌-সোল! আসান্‌-সোল!"

সকলে চমকিয়া উঠিল! কেউ এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই—বাহিরে রাত্রির আঁধার কখন ধীরে-ধীরে কাটিয়া গিয়াছে,—অজ্ঞাতেই কখন ভোরের আলো বাহিরের উদার, উন্মুক্ত আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে! গাড়ীর বাতির আলো ম্লান করিয়া, দিনের আলো ভিতরে আসিয়াপড়িয়াছে।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে তিনজন বাহিরের আলোকোজ্জ্বল আকাশের দিকে চাহিলেন। গাড়ীর গতি ধীরে থামিয়া গেল।

হঠাৎ সশব্দে গাড়ীর দুয়ার বন্ধ হইল! তিনজন দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিলেন জামাই বাবু নিঃশব্দে কখন অন্তর্ধান করিয়াছেন। খোলা দুয়ারটা একজন টিকিট কালেক্টার বন্ধ করিয়া দিতেছে।

অমৃত বাবু হাসিমুখে বলিলেন, "ঐ যাঃ! চতুর্থ পক্ষের নিমন্ত্রণটা চাওয়া হোল না যে!"

প্রৌঢ়া বলিলেন, "ও সব অভিশপ্ত নিমন্ত্রণের লোভ ছেড়ে দেন বাবা! ওগুলো ভদ্রলোকের ধাতে সহ্য হবে না!"

স্থল-কমলের প্রতি

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম-এ

অয়ি স্থল-কমলিনি! হেরি তোমা' আজিকে প্রাঙ্গণে
ঊর্দ্ধস্ফুট অনুরাগে আছ চাহি' তপন বদনে।
প্রভাতে তুষার-শুভ্র শিশু-হিয়া-সম সুকোমল
নাহি ছিল বর্ণ-ভাতি, দুলেছিলে পবন-চঞ্চল।
যেমনি অরুণ-রশ্মি পূর্ব্বাকাশে পাইল প্রকাশ
অমনি সর্ব্বাঙ্গে তব রাঙিমার লাগিল আভাস।
রবি যত উচ্চতর—খরতর কিরণ-নিকরে
লাবণ্য ততই দীপ্ত—দীপ্ততর তব স্তরে-স্তরে।
তাই বসি' বসি' ভাবি এ কি লীলা ধরণী-গগনে
বিকাশে ভাস্কর-ভাতি কি মাধুরী ও পুষ্প-জীবনে!
দুঃসহ যে খরতাপে সিক্ত ধরা শুকাইয়া উঠে
অবিশীর্ণা কমলিনী কি লাবণ্য-রসে তাহে ফুটে!
পুষ্প-কুল-রাজ্ঞি! তুমি পেয়েছ যে রসের সন্ধান
দাও তা'রি এক বিন্দু,—ধন্য হোক্ এ শুষ্ক পরাণ।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

বাঙ্গলায় তূলার চাষ

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার বি-এল

এখন দূরদর্শী স্বদেশবৎসল ব্যক্তিমাত্রেই চরকা প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন। বাস্তবিক ঘরে-ঘরে চরকা স্থাপন করিতে পারিলে যে অনেক পরিমাণে আমাদের দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান হইতে পারিত, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সর্ব্বত্র চরকা প্রচলন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রচুর পরিমাণে তুলার সংস্থান করা আবশ্যক। বাঙ্গলার অনেক স্থানেই তুলার অভাব অল্লাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। কোন-কোন অঞ্চলে অল্প মূল্যে উপযুক্ত পরিমাণে তুলা না পাওয়ায় সূতা কাটা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন তুলার অভাব পূরণ করিতে না পারিলে চরকা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা একবারে পণ্ড হইয়া যাইবে।

তুলার চাষ সম্বন্ধে অনেক মাসিক পত্রে প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে। আমি যে কয়েকটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছি, উহাদের কোন-কোনটীতে উদ্ভিদ-বিদ্যার জ্ঞান ও গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রবন্ধোল্লিখিত তথ্য সকল বাঙ্গলায় কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে কি না, সে সম্বন্ধে লেখক মহোদয়গণ বিচার করেন নাই। কোন-কোন লেখক আমেরিকার সি-আইল্যাণ্ড (Sea Island) তুলা, কেহ ইজিপ্টের তুলা, কেহ 'ব্রোচ' কেহ বা 'ধারওয়ার' তুলার বীজ বপন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এই সকল তুলার আঁশ বেশ দীর্ঘ, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু এই সকল তুলার বীজ বাঙ্গলার জলবায়ুর উপযোগী কি না তাহা অনেকেই বিবেচনা করেন নাই। ম্যানচেষ্টারে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অবধি ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডের কলওয়ালাদের নির্দ্দেশানুসারে ভারতবর্ষে তুলার চাষ বিস্তারের চেষ্টা করিতেছেন। ম্যানচেষ্টারের বস্ত্রের কলওয়ালাদিগকে আমেরিকা হইতে তুলা কিনিয়া আনিতে হয়। আমেরিকা স্বাধীন দেশ, এবং তথাকার অধিবাসীরাও ইংরেজদিগের ন্যায় ধনী এবং তীক্ষ্ণ ব্যবসায়-বুদ্ধি-সম্পন্ন। এইজন্য ইংরেজ ব্যবসায়ীরা ইচ্ছামত কম মূল্যে আমেরিকা হইতে তুলা কিনিতে পারে না। ভারতবর্ষে উৎকৃষ্ট তুলা উৎপাদন করিতে পারিলে যে ইংরেজ বণিকদিগের সুবিধা হইত, তাহা বাঙ্গলার পাটের ও নীলের ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা হইতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার সহিত যখন ইংলণ্ডের যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন ইংরেজ বণিকদিগকে কয়েক বৎসরের জন্য ভারতবর্ষের তুলার উপরই নির্ভর করিতে হইয়াছিল। সেই অবধি ভারতবর্ষে উৎকৃষ্ট তুলা উৎপাদন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিতেছেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকগণ (Directors of the East India Company) ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলায় কার্পাস চাষের উন্নতি সাধনের জন্য ভারতের বড়লাট বাহাদুরকে আদেশ করেন। সেই আদেশ অনুসারে সুবিখ্যাত ঢাকার তুলা (Dacca cotton) বাঙ্গলার অন্যান্য অঞ্চলে উৎপাদন করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। তখন কৃষি-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ বিবেচনা করিলেন, উৎকৃষ্ট বিদেশী তুলার বীজ রোপণ করিলে অধিকতর সুফল পাওয়া যাইবে। তাই অতঃপর বিদেশী বীজ দ্বারা পরীক্ষা আরম্ভ হইল। 'বোরবন' (Bourbon) তুলার বীজ ভারতের নানা স্থানে রোপণ করা হইল। কিন্তু তাহা করমণ্ডলের শুষ্ক ভূমিতে বাঙ্গলার চেয়ে অনেক ভাল ফল প্রদান করিল।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট কার্পাসের চাষের জন্য বিশেষ যত্নশীল হন, এবং তজ্জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করেন। তুলার চাষের জন্য গবর্ণমেণ্ট এককালীন বিশ হাজার টাকা ও বার্ষিক দশ হাজার টাকা মঞ্জুর করিলেন; এবং গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য সাড়ে চার হাজার টাকা কৃষি-বিভাগের হস্তে অর্পণ করিলেন। কলিকাতার ৮ মাইল দক্ষিণে আখরা নামক স্থানে পাঁচশত বিঘা জমি লইয়া একটী কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত হইল। তথায় আপলেণ্ড (Upland) সি আইলেণ্ড (Sea Island) জর্জ্জিয়া (Georgia) এবং ডেমেরেরা (Demerora) তুলার বীজ লইয়া পরীক্ষা হইতে লাগিল। পাঁচবৎসর পরীক্ষার পর ভাল ফল না পাওয়ায় চাষের কাজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অকৃতকার্য্যতার কারণ নির্দ্ধারণ করিলেন—স্থানটী তুলার চাষের অনুপযুক্ত।

"The plants are stated to have grown luxuriantly and to have produced an abundance of vegetative growth but little cotton. In other words the soil was too rich and moist. It is noteworthy that exactly the same results are achieved at the present day when American cottons are grown under similar conditions." (A brief History of Experimental Cotton Cultivation in the Plains of Bengal, by G. Evans M. A., C. I. E., Director of Agriculture.)

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে কার্পাসের চাষের পুনরায় চেষ্টা হয়। মিঃ প্রাইস্ (M. Price) নামক এক ব্যক্তি এইবার পরীক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। আমেরিকার তুলার চাষ সম্বন্ধে মিঃ প্রাইসের বিশেষ

অভিজ্ঞতা ছিল। বাঙ্গলার বহু স্থানে কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত হইল। প্রধান পরীক্ষার স্থান হইল ঢাকা জেলার অন্তর্গত 'টোক্'। টোক পূর্ব্ববঙ্গের একটী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের অতি অল্প লোকই টোকের প্রাচীন ইতিবৃত্ত অবগত আছেন। টোক ব্রহ্মপুত্রের শাখা বানার নদীর তীরে ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার সীমান্তে অবস্থিত। টোকের নিকটেই শিশুপাল নামক এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজার রাজধানী ছিল। ঢাকার ইতিহাস-লেখক ডাক্তার টেলার লিখিয়াছেন—

Toke or Tugma was in all probability the port of Seessoopal's country and from its advantageous situation on the bank of the Berhampootra was in former times no doubt a place of considerable trade."

(Topography of Dacca)

এই টোক্‌কেই টোলেমি (Ptolemy) টোগ্‌মা (Tugma) এল্ এড্রিসি (El Edrissi) টৌক্ (Tauka) এবং খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে মুসলমান ভ্রমণকারীগণ 'টকেক্' নামে অভিহিত করিয়াছেন। টোলেমি যখন 'ভারত-বিবরণ' লিপিবদ্ধ করেন, তখনও টোক্ একটী বিস্তৃত বাণিজ্য-স্থান ছিল। এই স্থান হইতে সূক্ষ্ম কার্পাস-বস্ত্র বিদেশে রপ্তানি হইত। টোকের ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধির জন্য এত কথা লিখি নাই। টোক কাপাসিয়া নামক পরগণার অন্তর্গত ছিল। কাওরাইদ রেলষ্টেশন হইতে জয়দেবপুর ষ্টেশন পর্য্যন্ত এই কাপাসিয়া পরগণা বিস্তৃত ছিল। সমস্ত ভাওয়াল পরগণাটী কাপাসিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই কাপাসিয়া পরগণাতে প্রাচীন কালে কার্পাসের বিস্তৃত চাষ ছিল। উৎকৃষ্ট কার্পাসের চাষ হইত বলিয়াই এই স্থানটী "কাপাসিয়া" নামে পরিচিত হইয়াছিল।

It derives its name from the word *"Kapass"* cotton and was the part of the country in which this article was chiefly cultivated and where the finest muslins were woven in former times. It has been distinguished by its present name from time immemorial and it contains places apparently of the highest antiquity in this part of the country."

(Topography of Dacca)

এই কাপাসিয়া পরগণায় সেকালে উৎকৃষ্ট তুলার চাষ হইত। সেই তুলা দ্বারা মসলিনের সূতা নির্ম্মিত হইত। অতি সূক্ষ্ম মসলিন-বস্ত্রও এই স্থানে প্রস্তুত হইত। কাপাসিয়ার ভূমি উচ্চ; বৃষ্টি হইবামাত্র ইহার [illegible]রিয়া যায়। আর বানার নদী হইতে ঢাকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমি খণ্ডের মাটি লাল এবং বালুকাময়। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, এই স্থানের মাটি তুলার চাষের অতিশয় উপযোগী—The soil here, it may be remarked, possesses the different constituents, that are supposed to be essentially necessary to the formation of good cott[on] ground in America, and it is perhaps to this circum[s]tance, that the superiority of the Dacca cotton ov[er] that grown in other parts of Bengal is to be attribute[d]

(Topography of Dacca

এই সকল কারণেই বোধ হয় ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে মিঃ প্রাইস্ টো[ক] তুলার চাষের পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। নিউ অর্লিন্স (Ne[w] Orleans) ও বোরবন্ (Bourbon) তুলার বীজ রোপণ করা হই[ল।] কোন্ মাস তুলা-বীজ-বপনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, তাহা নির্দ্ধা[রণ] করিবার জন্য বৎসরের প্রত্যেক মাসেই বীজ রোপণ করা হইয়াছি[ল।] কিন্তু পরীক্ষার শ্রম ও অর্থব্যয় নিষ্ফল হইল। এই অকৃতকার্য্যত[ার] প্রধান কারণ হইয়াছিল—কীট। বিদেশী তুলার চাষেই কীটে[র] অধিকতর উপদ্রব হয়; দেশী তুলার চাষ করিলে তত উপদ্রব হয় ন[া।] ইহা সেই পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। দেশী তুলার গাছে সহজে কীট আক্রমণ করিতে পারে না।

"It is noteworthy, however, that mention is mad[e] of the fact that—' the indigenous cotton being hardi[er] and more hairy is less attacked by insects.'' A bri[ef] History of Experimental Cotten Cultivation in th[e] Plains of Bengal.)

১৮৪১ ও ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে রংপুরে মেক্সিকো ও নিউ অর্লিন্সের তুলা চাষ করা হইয়াছিল। কিন্তু কীটে (Boll worns) দুই বারই ফস[ল] নষ্ট করিয়া ফেলে। যে কাপাসিয়া তুলার জন্য বিখ্যাত ছিল, মসলিনে[র] তুলা যে স্থানে উৎপন্ন হইত, সেই স্থানেও যখন বহু চেষ্টা করি[য়া] আমেরিকার তুলা চাষে সুফল পাওয়া গেল না, তখন বাঙ্গলায় বিদে[শী] তুলার চাষের চেষ্টা পরিত্যক্ত হইল। অতঃপর দেশী তুলার চাষে[র] পরীক্ষায় কৃষিবিভাগ (Agricultural Society) মনোনিবেশ করিলেন ঢাকার লাল মাটি অপেক্ষাকৃত শক্ত বলিয়া কতকগুলি নদীর চর-ভূ[মি] কৃষিক্ষেত্রের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। তথায় 'পাটনা', 'ব্রোচ' ও 'অমরাবতী' তুলার বীজ রোপিত হইল। বেশ ভাল ফসল হইবার সম্ভাবনা দেখ[া] গেল; কিন্তু ফল তুলিবার পূর্ব্বে শিল ও ঝড়বৃষ্টি কার্পাস ক্ষেত একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিল।

১৯০৬ সনে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্ট রংপুরে তুলার চা[ষ] প্রবর্ত্তনের জন্য চেষ্টা করেন; কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। অতঃপ[র] রাজসাহীর সরকারী কৃষিক্ষেত্রে ১৯১৮ হইতে ১৯২১ সন পর্য্যন্ত বিবি[ধ] ভারতীয় তুলার চাষের পরীক্ষা হইয়াছিল; কিন্তু আশানুরূপ ফ[ল] পাওয়া যায় নাই।

'বুড়ি' ও "ধারওয়ার' তুলা আমেরিকার তুলার বীজ হইতে উৎপন্ন (acclimatised American cotton); বাঙ্গলার বাহিরে ইহার বেশ ভাল ফসল জন্মে। বোম্বাই, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশে এই জাতীয় তুলা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়; এবং আঁশও বেশ লম্বা হয়।

'কাম্বোডিয়া' তুলার বীজ কোচিন চায়না হইতে আনিয়া এদেশের আবহাওয়ার উপযোগী করা হইয়াছে। মান্দ্রাজে এই তুলা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কিন্তু বাঙ্গলায় পূর্ব্বোক্ত জাতীয় কোন তুলার চাষ করিয়াই সুফল পাওয়া যায় নাই। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২১ সন পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ ১৩৩ বৎসর বাঙ্গলায় উৎকৃষ্ট তুলার চাষ প্রবর্ত্তনের জন্য চেষ্টা করিয়া গবর্ণমেণ্ট অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ নিরাশ হইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বাঙ্গলার জলবায়ু তুলার চাষের অনুকূল নহে।

The cotton growing areas of India, such as the Deccan, Berar, Guzerat, Central India and the Punjab, all have a ranifall of not more than 35" and the best cotton soils are all well-drained. In Bengal we have exactly opposite conditions. The average rainfall is somewhre about 80" and soils waterlogs very badly, because natural drainage is deficient. No wonder, therefore, that all attempts to grow cotton as a monsoon crop in this part have been failures."—(A Brief History of Experimentel Cotton Cultivation in the Plains of Bengal.)

ভারতবর্ষে দাক্ষিণাত্য, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব প্রভৃতি যে সকল প্রদেশে তুলার চাষ হইয়া থাকে, ঐ সকল অঞ্চলে ৩৫ ইঞ্চির অধিক বৃষ্টি হয় না। কিন্তু বাঙ্গলার অনেক স্থানেই ৮০ ইঞ্চি পর্যান্ত বৃষ্টি হয়। এইরূপ অতি বৃষ্টিতে তুলার চাষ হইতে পারে না।

বঙ্গদেশ এককালে বস্ত্র-শিল্পের জন্য জগদ্বিখ্যাত ছিল। তখন বাঙ্গলার বস্ত্র ভারতবাসীর অভাব ত পূরণ করিতই; এতদ্ব্যতীত বহু কোটি টাকার বস্ত্র আরব, পারস্য, মিশর, তুরস্ক, গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হইত। তখন মেসালিয়া (মসুলিপটাম), টেপ্রোচেস (সিংহল) বাইরেগারা (ব্রোচ্) পূর্ব্ববঙ্গের পণ্যসম্ভারের সুবিস্তৃত বন্দর ছিল। ১৫০৩ খৃঃ ভ্রমণকারী ভারটো মেনাস্ (Vertomannus) লিখিয়াছিলেন

"The manufactures of this part of Bengal were exported to Turkey, Syria, Arabia, Etheopia and Persia. He states that in the city of Bengala were many merchant strangers who purchased precious stones and that 50 ships laden with cloth of Bombasin silk were despatched annually to the countries above meutioned." Topography of Dacca.

প্রতি বৎসর পঞ্চাশখানি জাহাজ বোঝাই করিয়া বাঙ্গলার 'বোম্বে ছিন' * (কার্পাস) ও রেশম নির্ম্মিত বস্ত্র বিদেশী বণিকগণ কর্ত্তৃক তুরস্ক সিরিয়া, আরব, ইথিওপিয়া এবং পারস্য দেশে রপ্তানি হইত। রাল্ফ ফিচ্ (Ralph Fitch) ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের দূত স্বরূপ মোগল সম্রাটের নিকট আগমন করিয়াছিলেন। তিনি ১৫৮৬ খৃঃ সোনার গাঁর কথা লিখিয়াছেন—"Great store of cotton cloth goeth from hence and much rice wherein they serve all India, Ceylon, Pegu, Malacca, Sumatra and many other places." সেকালে সোণার গাঁ হইতে প্রচুর পরিমাণ কার্পাস বস্ত্র ও চাউল রপ্তানি হইত তাহাতে ভারতবর্ষ, সিংহল, পেগু, মলক্কা, সুমাত্রা প্রভৃতি বহু দেশের অভাব পূরণ হইত। ১৭৮৭ সনে ঢাকার কালেক্টর মিঃ ডে (Mr. Day) হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, তথাকার ইংরেজ ফ্যাক্টরিতে য়ুরোপে রপ্তানি করিবার জন্য প্রতি সন ৩০ হইতে ৪০ লক্ষ টাকার কার্পাস-বস্ত্র ক্রয় করা হইত। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, সেকালে যে এত বস্ত্র বাঙ্গালায় প্রস্তুত হইত, এই বস্ত্রের সুতার জন্য তুলা কি বাঙ্গলায় উৎপাদন করা হইত, না অন্য কোন স্থান হইতে আমদানি করিতে হইত? তুলার চাষ সম্বন্ধে ডাক্তার টেলার, তৎপ্রণীত Topography of Dacca গ্রন্থে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই প্রামাণিক এবং বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ডাঃ টেলার যখন ঢাকায় অবস্থিত ছিলেন, তখনও মসলিন-বয়ন-শিল্প বিলুপ্ত হয় নাই। তখনও মসলিনের সুতার জন্য পূর্ব্ববঙ্গে তুলার চাষ হইত। তিনি নিজ অভিজ্ঞতা এবং পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকদিগের গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার ঢাকার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

ডাঃ টেলার লিখিয়াছেন,—যে তুলা দ্বারা মসলিনের সুতা প্রস্তুত হইত, তাহা দেশী তুলা। ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট স্থানে এই তুলার চাষ হইত। সোণার গাঁও, কাপাসিয়া, টোক, ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত জঙ্গলবাড়ী এবং মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্ত্তী উচ্চ ও বালুকাময় কয়েকটী স্থানে মসলিনের কাপাসের চাষ হইত। কাপাসিয়া, টোক, জঙ্গলবাড়ী ও সোণার গাঁর তুলাই অত্যুৎকৃষ্ট ছিল। ডাঃ টেলারের সময়ে এই অঞ্চলে পূর্ব্বের ন্যায় উৎকৃষ্ট তুলা উৎপন্ন হইত না বটে, তথাপি ঢাকাই তুলাই (Dacca cotton) তখন পর্য্যন্তও ভারতবর্ষে অতুলনীয় ছিল।

অনেকের ধারণা এই যে, যে তুলা দ্বারা মসলিনের সুতা কাটা হইত তাহা গাছ কার্পাস (tree cotton) ছিল। অনেক গৃহস্থের বাড়ীতে গাছ কার্পাস দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণের পৈতা গাছ কার্পাসের তুলা দ্বারা কাটা হইয়া থাকে। গাছ কার্পাস ৬।৭ বৎসর জীবিত থাকে। স্থানবিশেষে গাছ তুলা "দেব কার্পাস" "ব্রাহ্মণী কার্পাস" ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক, মসলিনের সুতা গাছ কাপাসের তুলা হইতে প্রস্তুত হইত না। মসলিনের তুলা ক্ষেতে বুনা হইত এবং বৎসর দুইবার উহার চাষ হইত। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ক্ষেত ভাল করিয়া ৮।১০ বার লাঙ্গল দিয়া চাষ করিয়া, এক হাত দূরে-দূরে সমান্তরাল লাইন করিয়া বীজ বপন করা হইত।

* Bombosin ইটালীয়ান শব্দ, কার্পাস অর্থে ব্যবহৃত হয়।

আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে ফল পাকিলে তূলা সংগৃহীত হইত। আবার কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে তূলা বুনিয়া চৈত্র বৈশাখ মাসে তূলা সংগ্রহ করা হইত। শেষোক্ত তূলাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল। এই জন্য কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে অধিক পরিমাণ তূলার চাষ হইত। ডাঃ টেলার লিখিয়াছেন,—পূর্ব্বে প্রতি তিন বৎসর পর এক বৎসর তূলার ক্ষেত পতিত রাখা হইত; এইজন্য তখন আরও ভাল তূলা জন্মিত। তূলা ক্ষেত হইতে তুলিয়া আনিয়া কৃষকেরা বপনের জন্য উৎকৃষ্ট বীজগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিত। তৈল কিম্বা ঘৃতের শূন্য ভাণ্ডে বীজ রাখিয়া বায়ু প্রবেশ না করিতে পারে এইরূপ ভাবে পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া দিত। বীজ পূর্ণ পাত্র উনানের উপর রক্ষিত হইত। এইরূপে বীজ রক্ষিত হইত বলিয়া বীজ ভাল থাকিত এবং উহাতে কীট প্রবেশ করিতে পারিত না।

দুঃখের বিষয় বহু অনুসন্ধান করিয়াও বর্ত্তমানে মসলিনের তূলার (Dacca cotton) একটী গাছও কোথাও পাওয়া যাইতেছে না। ঢাকাই তূলার বীজ পাওয়া গেলে আবার দীর্ঘ আঁশ-বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট তূলার চাষ হইতে পারিত।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার রক্সবার্গ (Dr. Roxburgh) কলিকাতা "বোটানিকেল গার্ডেনের" সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। তিনি সুবিখ্যাত ঢাকাই মসলিনের তূলার গাছের একটী সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই বর্ণনা ব্যতীত এতৎ সম্পর্কে অন্য কোন বিবরণই পাওয়া যায় না। মসলিনের তূলার গাছকে তিনি Gossipium Herbaceum শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। (১) উহার শাখা অল্পসংখ্যক, এবং শাখাগুলি সোজা উপরের দিকে উঠে। পাতার ফলকগুলি অধিকতর সূক্ষ্ম। (২) সমস্ত গাছের রং লালবর্ণ, পাতার বোঁটা এবং শিরাগুলিও রক্তবর্ণ; (৩) ফুলের পাপ্‌ড়িগুলির কিনারা রক্তাভ। (৪) তূলার আঁশ খুব লম্বা, কোমল এবং মসৃণ। মসলিনের তূলা তিন প্রকার ছিল; যথা "কুটি" "নরমা" ও "বৈরাটি"।

বাঙ্গালার বস্ত্র-শিল্পের চরম উন্নতির দিনেও অন্য প্রদেশ হইতে তূলা আমদানি করিতে হইত। মসলিনের তূলা কেবলমাত্র ঢাকা অঞ্চলেই উৎপন্ন হইত; কিন্তু অন্য প্রকার বস্ত্রের জন্য মধ্য ও পশ্চিম ভারতবর্ষ হইতে তূলা কিনিয়া আনিতে হইত। উইলিয়াম বোল্টস্ (William Bolts) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। শেষে তিনি কলিকাতা মেয়র কোর্টের (Mayor Court) জজের পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার প্রণীত Consideration of the India Affairs নামক গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, 'কম্পানির' কর্ম্মচারীরা সুরাট পঞ্জাব মিরজাপুর প্রভৃতি স্থান হইতে নৌকাযোগে বাঙ্গলায় তূলা আমদানি করিয়া বিক্রয় করিত। মিঃ বোল্টসেরও বহু লক্ষ টাকার তূলার কারবার ছিল। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার টেলার লিখিয়াছেন—

"All the fine muslins are made of the 'desee' or indigenous cotton of the district. The cotton imported from Mirzapore yields the thread for the baftas, hummums and other assortments of cloth of an inferior quality. The Arakan Cotton ranks next to the Mirzapore; it is imported in small quantities but is never used as has been represented, in the manufacture of the fine muslins. Bhoga cotton the produce of the Garrow and Tipperah hills is employed exclusively for the manufacture of the coarsest description of clothes which are worn by the poorer classes"

(Topography of Dacca)

"দেশী অর্থাৎ ঢাকা জেলার তূলা দিয়া মসলিন প্রস্তুত হয়। মিরজাপুরের তূলা দিয়া 'বাপ্‌তা' হামাম, এবং মসলিন হইতে স্থূলতর বহুবিধ বস্ত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে। মিরজাপুরের তূলার পরই আরাকানের তূলা। এই তূলা অল্প পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। গারো ও ত্রিপুরার পাহাড়ের তূলা প্রচুর পরিমাণে আমদানি হইয়া থাকে। এই তূলাকে "ভোগা" তূলা কহে। ভোগা তূলা দ্বারা গরীব লোকদিগের জন্য অতিশয় মোটা কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। বিলাতি সূতার আমদানির পর হইতে ঐ সকল স্থান হইতে তূলার আমদানি বন্ধ হইয়া যায়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গলায় কখনও প্রচুর পরিমাণ তূলার চাষ ছিল না। গারো পাহাড়ে, ত্রিপুরার পাহাড়ে এবং পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ব্বেও নিকৃষ্ট শ্রেণীর তূলা জন্মিত, এখনও জন্মে। পশ্চিম বঙ্গের বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর অঞ্চলে কতক পরিমাণ তূলা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন স্থানে তূলার চাষ পূর্ব্বেও ছিল না, এখনও নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাঙ্গলায় তূলার চাষ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়া গবর্ণমেণ্ট অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। ইতিহাসও সাক্ষ্য দিতেছে কোন কালেই বাঙ্গলায় তূলার বিস্তৃত চাষ ছিল না; এবং ঢাকা জেলা ব্যতীত অন্যত্র ভাল তূলা উৎপন্ন হয় নাই। এ অবস্থায় জনসাধারণকে সর্ব্বত্র তূলার চাষের জন্য উৎসাহিত করা সঙ্গত নহে। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ তূলার চাষ প্রবর্ত্তনের জন্য চেষ্টা করুন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করা অসাধ্য নহে। কৃতকার্য্য হইলে বৈজ্ঞানিকদিগের অভিজ্ঞতার ফল জনসাধারণ ভোগ করিতে পারিবে। বর্ত্তমানে বাঙ্গলার কৃষকদিগের তূলার চাষ না করাই উচিত। মহাত্মা গান্ধীর চরকার আন্দোলনের পর নানা স্থানের কৃষকগণ মাঠে তূলার চাষ করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের শ্রম সার্থক হয় নাই। "বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কর্ত্তৃক প্রচারিত তূলার চাষ" শীর্ষক একটী পুস্তিকা (সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের স্বাক্ষরিত) বিতরিত হইতেছে। তাহাতে লিখিত হইয়াছে—"বাঙ্গলা দেশের সকল মাটিতেই কার্পাসের চাষ হইতে পারে;

কিন্তু দোআঁশ মাটিতেই খুব ভাল হয়।" অন্যত্র "হিসাব করিলে বেশ বুঝা যায় যে, পাটের চাষ অপেক্ষা তুলার চাষে লাভ বেশী, অথচ পরিশ্রম কম।.…পাটের চাষ একেবারে ছাড়িয়া দিয়া তুলার এবং ধানের চাষ করাই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। কথায় বলে—

পাট ছাড়িয়া তুলা কর নয় ত কর ধান
সাধে যেয়ে পরের কাছে হারাও কেন মান।"

এইরূপ উপদেশ যে বাঙ্গলার কৃষকদিগের পক্ষে হিতকর নহে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পাট বিক্রয় করিয়া বাঙ্গালার কৃষক প্রতি বৎসরে গড়ে প্রায় ত্রিশকোটী টাকা প্রাপ্ত হয়। এই পাট একবারে তুলিয়া দিয়া তুলার চাষ করিলে কৃষকদিগের সর্ব্বনাশ হইবে। কেবল ধানের চাষ করিলেও ধানের মূল্য অতিশয় হ্রাস পাইবে। পাট বিক্রয় দ্বারাই বিদেশ হইতে বাঙ্গালায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক টাকা আইসে। পাটের চাষ হ্রাস করিয়া উহার মূল্য বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা যাইতে পারে বটে; কিন্তু পাটের পরিবর্ত্তে ধানের চাষ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য হইবে না। পাট না করিয়া তুলার চাষ করা ত একবারে অসম্ভব। কারণ যে জমিতে পাট হয়, সেই জমিতে তুলার চাষ হইতে পারে না।

বাঙ্গলার তুলার চাষের যে সকল বাধা বিঘ্ন আছে, তাহা দূর করিবার ভার শিক্ষিত লোক গ্রহণ করুন। গবর্ণমেণ্টের কৃষিক্ষেত্রে তুলার চাষের পরীক্ষা হইতেছে বেশ ভাল কথা; কিন্তু তজ্জন্য আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকের নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা সঙ্গত নয়। তাঁহাদেরও ব্যক্তিগত ভাবে তুলার চাষ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমার অনুরোধ, দরিদ্র কৃষকগণ যেন তুলার চাষের জন্য শ্রম ও অর্থব্যয় না করে।

সন	বৈশাখী বা আমন তুলা		কার্ত্তিকী বা আউস তুলা		মোট	
	একর	মণ	একর	মণ	একর	মণ
১৯১৯-২০	৬৬৬৯৩	১১৮০৬৫/	২১৫৯	৪৯৯৫/	৬৮৮৫২	১২৩০৬০/
১৯২০-২১	৬৮৪৩৫	৯৯৮৯০/	১৭০৭	৪৪৬০/	৭০১৪২	১০৪৩৫০

(Bulletin no 1. Department of Agriculture, Bengal)

বঙ্গদেশে ১৯১৯-২০ সনে মোট ৬৮৮৫২ একর ভূমিতে এবং ১৯২০-২১ সনে মোট ৭০১৪২ একর ভূমিতে তুলার চাষ হইয়াছিল। ১৯১৯-২০ সনে মোট ১২৩০৬০ মন ও ১৯২০-২১ সনে মোট ১০৪৩৫০ মণ তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল। গড়ে দুই বৎসরে বাঙ্গালায় মোট ১৯৩৩ একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে এবং তুলা উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে গড়ে একলক্ষ মণের কিছু বেশী তুলা ত্রিপুরাও চট্টগ্রামের পাহাড়ে উৎপন্ন হইয়াছে। আর প্রায় ৪৫০০ মণ তুলা পশ্চিম বঙ্গের বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় নানা স্থানের উচ্চ ভূমিতে উৎপন্ন হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বাঙ্গলার পনর আনারও বেশী পরিমাণ তুলা পার্ব্বত্য প্রদেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতিবৃষ্টি বশতঃ বাঙ্গালার সমতলক্ষেত্রে তূলা উৎপন্ন হয় না।

সমগ্র ভারতবর্ষে কত জমিতে তূলার চাষ হয় এবং কি পরিমাণ তূলা উৎপন্ন হয় তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	একর জমি	মণ তুলা
১৯১৭-১৮ সনে	১৫৪০৩০৮৮	২০৩২৫০০০
১৯১৮-১৯	১৪৪৩৫০৮৪	১৮৩৫৫০০০

গড়ে এই দুই বৎসরে ১৪৯১৯০৮৬ একর জমিতে ১৯৩৪৮০০০ মণ তুলা উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব দেখা যায়, গড়ে সমগ্র ভারতবর্ষে যত তুলা জন্মে, তাহার মাত্র ১/১৮৬ ভাগ তুলা বঙ্গদেশে উৎপন্ন হয়।

সন	প্রদেশ	উৎপন্ন তুলার পরিমাণ		
১৯১৯-২০	বোম্বাই—	প্রায়	৭৫,১৫০০০	মণ
”	মধ্যপ্রদেশ বেরার	”	৬৪,২৫০০০	”
”	হায়দরাবাদ	”	৩৭,৪৫০০০	”
”	পাঞ্জাব	”	৩৩,৮৫০০০	”
”	যুক্তপ্রদেশ			
”	মাদ্রাজ		২০,৫৫০০০	”
”	বঙ্গদেশ		২০,৬৫০০০	”
	(ত্রিপুরাসহ)		১,২২০৮০	”

পাট বিক্রয় করিয়া যেমন বাঙ্গলার কৃষকগণ বিদেশ হইতে টাকা প্রাপ্ত হয়, তেমনি অন্যান্য প্রদেশের কৃষকগণ তুলা বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ পায়। গড়ে ৫৮ কোটী টাকার তুলা প্রতি বৎসর জাপান, ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হয়। বাঙ্গলার আবহাওয়া তুলার চাষের উপযোগী হইলে, বাঙ্গলার কৃষকগণও প্রচুর পরিমাণে তুলার চাষ করিয়া লাভবান্ হইতে পারিত।

আমার মনে হয়, বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে মাঠে তুলার চাষ না করিয়া বাড়ীতে-বাড়ীতে অথবা উচ্চ ভূমিতে গাছ কার্পাস (Perennial) রোপণ করাই সঙ্গত। গাছ কার্পাস ৬।৭ বৎসর কাল জীবিত থাকে। সুতরাং প্রতি বৎসর তুলার চাষের জন্য পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতে হইবে না। গাছ কার্পাসের আঁশ সাধারণতঃ ৳" হইতে ১" ইঞ্চি লম্বা হয় এবং আঁশগুলি বেশ শক্ত ও মসৃণ থাকে। নানাজাতীয় গাছ কার্পাস আছে। মোটামুটি ইহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণীর গাছ কার্পাসের তুলা বীজের সহিত দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকে। 'কেরকি' ব্যতীত ইহাদের তুলা হইতে বীজ ছাড়ান যায় না। 'সিরজ' কাপাস এই শ্রেণীর। আর এক শ্রেণীর গাছ কার্পাস আছে,—তুলা হাতে টানিয়া অতি সহজেই উহাদের তুলা হইতে বীজ ছাড়ান যায়,—কেরকির প্রয়োজন হয় না। পূর্ব্ববঙ্গে এই শ্রেণীর কার্পাসকে কোন-কোন স্থানে "শিবের জটা" 'আর কোন-কোন স্থানে কেবল "জটা" কার্পাসও বলে। ইহাদের বীজগুলি কোষের মধ্যে চুলের জটার আকারে একত্র গাঁথা থাকে বলিয়া এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। জটা কার্পাসের এক-একটী কোষে সাধারণতঃ ৬টী হইতে ৮টী বীজ থাকে। জটা কার্পাসের গাছই পূর্ব্ববঙ্গের লোকে অধিক পছন্দ করে। ইহার আঁশ প্রায় ১" ইঞ্চি লম্বা হয় এবং আঁশও বেশ শক্ত। এই তুলা দ্বারা অতিশয় মিহি সূতা প্রস্তুত হইয়া থাকে। তুলার বীজ ছাড়ান বড় কঠিন কাজ। 'জটা' কার্পাসের বিশেষত্ব এই যে, ইহা তুলা বীজের সহিত দৃঢ় ভাবে সংলগ্ন থাকে না। জটাকার্পাসের বীজ অল্পবয়স্ক বালক বালিকারাও শুধু হাতে অনায়াসে ছাড়াইতে পারে। বীজের সঙ্গে একটুও তুলা থাকে না। জটা কার্পাসের এক-একটী গাছ ৮।১০ হাত উচ্চ হয়। এক-এক গাছে বহু সংখ্যক শাখা থাকে। ইহা ফলগুলিও অন্য সকল প্রকার কার্পাসের ফল হইতে প্রায় দ্বিগুণ বড় হয়। এই শ্রেণীর একটী গাছে সারা বৎসরে বীজ শুদ্ধ প্রায় তিন সের তুলা হয়। তিন সেরের মধ্যে প্রায় দুই সের হয় বীজের ওজন, আর এক সের হয় তুলা। বীজ ছাড়ান এইরূপ একসের তুলার মূল্য ময়মনসিংহ সহরে একটাকা হইতে পাঁচসিকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। গাছ কার্পাসের তুলা দ্বারা সূতা কাটা খুব সহজ এবং ইহার সূতাও বেশ শক্ত হয়। এই সূতা টানা ও পোড়েন উভয়েই ব্যবহৃত হইতেছে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, গাছ কার্পাসের তুলার চৌদ্দ ছটাক সূতায় একখানি ৪৪" ইঞ্চি ১০ গজ ধুতি প্রস্তুত হইতে পারে। সূতা মিহি হইলে আরও কমে হইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, একটী গাছ তুলার সূতায় ন্যূনকল্পে একখানি প্রমাণ ধুতি অনায়াসেই প্রস্তুত হইতে পারে। বাড়ীতে ১০।১২টী 'জটা' কার্পাসের গাছ রোপণ করিলে, একটী ক্ষুদ্র পরিবারের বস্ত্রাভাব সহজেই দূর হইতে পারে। ময়মনসিংহ জেলার অনেক স্থানেই তাঁতি এবং জোলারা কাপড় বুনার মজুরী প্রতি হাত এক আনা হিসাবে লইয়া থাকে। বাড়ীতে যদি তুলা গাছ থাকে, আর মেয়েরা যদি অবসর সময়ে সূতা কাটে, তাহা হইলে তাঁতি ও জোলাদের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া অতি সামান্য ব্যয়েই পরিবারের বস্ত্র সংস্থান হইতে পারে। মহাত্মা গান্ধীও এই ভাবে বস্ত্র-সমস্যার সমাধান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আসাম অঞ্চলে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ছোট-বড় সকলের গৃহেই তাঁত প্রতিষ্ঠিত আছে। বাড়ীর মেয়েরা অবসর কালে সেই তাঁতে নানাবিধ কাপড় বুনিয়া থাকে। বাঙ্গলায় যেমন মেয়েদের লেখাপড়া ও গান-বাজনা জানা বিশেষ গুণ বলিয়া বিবেচিত হয়, আসামের মেয়ের পক্ষে তাঁতে কাপড় বুনাও তেমনি।

পূর্ব্বোক্ত কারণে দেখা যাইতেছে, এখন সাধারণ ভাবে তুলার চাষে সময় ও অর্থ ব্যয় না করিয়া, নিজ-নিজ অভাব পূরণের জন্য প্রত্যেকের বাড়ীতে গাছ কার্পাস রোপণ করা বিধেয়। যাঁহাদের অধিক পরিমাণ উচ্চ ভূমি আছে, তাঁহারা গাছ কার্পাসের বিস্তৃত চাষ করিতে পারেন। এক বিঘা জমিতে অন্যূন দেড়শতটী কার্পাসের গাছ লাগান যাইতে পারে। প্রতি গাছে তিন পোয়া তুলা হইলেও এক বিঘায় ৩/০ মণ তূলা উৎপন্ন হইতে পারে। এই তূলার প্রতি সেরের মূল্য ১৲ টাকা হইলেও বিঘা প্রতি ১২০৲ টাকা পাওয়া হইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি গাছ কার্পাস একবার লাগাইলে ৬।৭ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। এই সময়ের মধ্যে ইহারের জন্য বিশেষ পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিতে হইবে না।

গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগ হইতে ১৯২১ সনে যে পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে গাছ কার্পাস সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে—

"Experiments made in many parts of India during the last twenty years, show that individual plants have often given good results when grown singly. When grown on a field scale, however, these perennial cottons have always failed, because they have been attacked continuously and with disastrous effects by insect pests and to a less extent by fungoid diseases."

বিশ বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষের নানা স্থানে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, গাছ কার্পাস স্বতন্ত্র ভাবে লাগাইলে ভাল ফল পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ক্ষেতে ঘন বিন্যস্ত করিয়া লাগাইলে কীট ইত্যাদিতে সব নষ্ট করিয়া ফেলে—ফসল একেবারেই জন্মে না। এই কথা আংশিক ভাবে সত্য। এক শ্রেণীর গাছ কাপাস আছে ইহাতে কীট জন্মে না। এই শ্রেণীর কার্পাসের গাছের পাতা ছোট ছোট এবং তূলা বীজের সহিত সংযুক্ত থাকে, 'কেরকি' ব্যতীত বীজ ছাড়ান যায় না। পূর্ব্বে যে ২ জটা কাপাসের কথা উক্ত হইয়াছে, উহাদের গাছে সময়-সময় কীট ধরে বটে, কিন্তু বেশী দিন থাকে না; এবং কীটের উপদ্রবে ফসলের বিশেষ হানি হয় না। আমি গাছ কার্পাসের বিস্তৃত চাষ দেখিয়াছি। সরকারী রিপোর্টে যেরূপ কীটের উপদ্রবের কথা লেখা হইয়াছে, তত উপদ্রব এদেশে হয় না; এবং কীটে ফসলের তত ক্ষতি করিতে পারে না। পূর্ব্ববঙ্গের অনেকেই গাছ কার্পাসের বিস্তৃত চাষ করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস তাঁহারা সকলই সরকারী রিপোর্টের মন্তব্য অতিরঞ্জিত বলিয়া স্বীকার করিবেন।

চণ্ডীদাসের পদ

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

বীরভূমের সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি-এ মহাশয় চণ্ডীদাসের ভনিতাযুক্ত প্রায় নয়শত পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ "চণ্ডীদাস" নাম দিয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে সংগৃহীত প্রায় ছয়শত পদ সম্পূর্ণ নূতন; বাকী তিনশত 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি প্রাচীন সংগ্রহ-গ্রন্থে পাওয়া যায়। ইহার পর পরিষদ কর্ত্তৃক চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া "শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন" নামে আর একখানি বিরাট গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় ইহার সম্পাদক। গ্রন্থের লিপিতত্ত্ব বিচারে ঐতিহাসিক রাখালদাসের সহিত একমত হইয়া বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় ইহাকে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পরম শ্রদ্ধেয় রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি, এম-এ, পদাবলী সাহিত্যে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়, এম-এ, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম-এ, সি-আই-ই মহাশয় প্রভৃতি অনেকেই এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত সেই সমস্ত প্রবন্ধের আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; নীলরতন বাবুর "চণ্ডীদাসই" অদ্যকার এই প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয়। তবে প্রসঙ্গক্রমে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম-এ, মহাশয়ের অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীর ভূমিকায় উল্লিখিত চণ্ডীদাস সম্বন্ধে নূতন মন্তব্যের কিয়দংশ, এবং শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন সম্বন্ধে দুই-চারিটী কথা এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করিতে হইয়াছে।

নীলরতন বাবুর সংগৃহীত পদগুলি আমরা খাঁটী চণ্ডীদাসের পদাবলী বলিয়াই মনে করি। অবশ্য সমস্ত পদই যে চণ্ডীদাসের, এমন কথা বলিতেছি না। বিশেষ, দুইটী পদ সম্বন্ধে আমাদের গুরুতর আপত্তি আছে, এবং এই প্রবন্ধে প্রধানতঃ সেই কথাই বলিব। প্রাচীন সংগ্রহ-গ্রন্থে এই পদ দুইটীর উল্লেখ আছে। কিন্তু সে কথা বলিবার পূর্ব্বে, চণ্ডীদাস এ শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন সম্বন্ধে দুই-এক কথা বলা উচিত মনে করিতেছি। নীলরতন বাবুর পদাবলী পাঠে আমাদের ধারণা হইয়াছে চণ্ডীদাস মূর্খ ছিলেন না; অপিচ, ভাগবত প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্রে তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। এমন কি, সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া যে চণ্ডীদাসের উল্লেখ পাওয়া যায়,—এখন আমাদের অনেকে তাঁহাকেই বিশ্রুতনামা পদাবলী-রচয়িতা মহাকবি চণ্ডীদাস বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন। অনেকেই—কালীয় দমন যাত্রার প্রবর্ত্তক পরমানন্দ অধিকারী ছিলেন বীরভূমের অধিবাসী বলিয়া মত প্রকাশ করেন। আমাদের অনুমান হয়, যাত্রার পালা রচনায় অধিকারী মহাশয় চণ্ডীদাসের পদাবলী হইতে—"নাপিতানী প্রভৃতি বেশে মিলন," "অক্রুরাগমন ও যশোদা প্রভৃতির বিলাপ," "মাথুর ও

কুবলয়াদি বধ", এবং "নন্দবিদায়" প্রভৃতি বিষয়ে বহু সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন সম্বন্ধে বক্তব্য—চণ্ডীদাসের রজকিনী সম্বন্ধীয় প্রবাদ বীরভূমে প্রায় সর্ব্বজন-পরিচিত। পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভূমিকায়—নিজে বাঁকুড়ার অধিবাসী হইয়াও শালতোড়া প্রবাদ উপেক্ষা করিয়া, চণ্ডীদাসকে বীরভূম নান্নুরের অধিবাসী ছিলেন বলিয়াই মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের পদগুলির মধ্যে এই রজকিনী ও নান্নুরের নাম-গন্ধও পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে সমালোচকগণ কেহই কোন উচ্চ-বাচ্য করেন নাই। এদিকে বসন্ত বাবুর সংগৃহীত, মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়-লিখিত, পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত "চণ্ডীদাস" প্রবন্ধে গৌড়েশ্বর কর্ত্তৃক চিত্রবধদণ্ডে দণ্ডিত চণ্ডীদাসের মৃত্যু বিষয়ক যে প্রাচীন কবিতার উল্লেখ দেখিয়াছি, তাহা হইতে রজকিনী ও চণ্ডীদাসের বীরভূম-প্রচলিত-প্রবাদ-কথিত পরিচয় বেশ সুস্পষ্ট রূপেই পাওয়া যায়। সুতরাং জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় না কি, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদেও রজকিনীর প্রসঙ্গ পাওয়া গেল না কেন? অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলীর পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ ভূমিকায় রায় মহাশয়—সুপ্রসিদ্ধ "বৈষ্ণবতোষণী"-টীকাকার সনাতন গোস্বামীর "কাব্য শব্দেন পরম বৈচিত্রীতাসাং সূচীতাশ্চ গীতগোবিন্দাদি প্রসিদ্ধাস্তথা শ্রীচণ্ডীদাসাদি দর্শিত দানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদি প্রকারাশ্চ জ্ঞেয়া" এই উক্তি উদ্ধৃত করিয়া, পদামৃত-সমুদ্র, পদকল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহ-গ্রন্থে চণ্ডীদাসের দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের কোন পদ নাই, অথচ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রথমেই দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের বহু পদ সন্নিবেশিত আছে, অতএব শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন খাঁটী চণ্ডীদাসের—এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসে দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের যে সমস্ত পদ রহিয়াছে, সেগুলি কি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই? দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের পদই যদি প্রাচীনত্ব ও খাঁটী চণ্ডীদাসত্বের প্রমাণ হয়,—তবে তো নীলরতন বাবুর 'চণ্ডীদাস'ই তাহা সর্ব্বাগ্রে দাবী করিতে পারে। "চণ্ডীদাসে" দানখণ্ডের ৪০টী এবং নৌকাখণ্ডের ৭টী পদ রহিয়াছে। পদগুলির প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোনরূপ অসামঞ্জস্য বা অসঙ্গতি নাই। সুতরাং সেগুলিকেও দুইটী স্বতন্ত্র পালা রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। দানখণ্ডের "পশরা নামাও রাধা" এবং "সোণার বরণখানি, মলিন হয়েছে তুমি" পদ দুইটী এতই কবিত্বপূর্ণ, যে, পাঠ করিয়া কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের "ওগো পশারিণী দেখি আয়" কবিতাটী মনে পড়ে। রায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "শ্রীচৈতন্য প্রভুর প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের সহিত সহজিয়াদিগের পরকীয়া সাধনা মিশিয়া বাঙ্গালায় যে অজ্ঞাতনামা কবিসম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছিল, আমাদিগের বিশ্বাস তাঁহারাই আদি ও শ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তা চণ্ডীদাসের নামে এই পদগুলি চালাইয়া গিয়াছেন।" এই ভয়াবহ বিশ্বাস যে রায় মহাশয়ের কিরূপে হইল, তিনি তাহার কোন প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই। আমরা তাঁহার ন্যায়-প্রাচীন পণ্ডিত ব্যক্তিকে এইরূপ দায়িত্বহীন মত প্রকাশ করিতে দেখিয়া বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছি। যে সূত্রের বলে তিনি পদাবলী-সাহিত্যের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন, এখানে তাহার কোন্‌টীর প্রয়োগ চলিতে পারে? শ্রীচৈতন্যের প্রেম-ধর্ম্ম প্রচারের পর উদ্ভূত ঐ তথাকথিত অজ্ঞাতনামা কবি সম্প্রদায়ের কোন্ পরিচয় উহাতে পাওয়া যায়? রাগাত্মিকা পদগুলি ভিন্ন নীলরতন বাবুর সংগৃহীত পদে সহজিয়ার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় কি? উহা ভক্তভাব অথবা সখীভাব, কোন্ ভাবের দ্যোতনা প্রকাশ করে, এবং সে হিসাবে পদগুলি শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী না পরবর্ত্তী কালে রচিত? পণ্ডিত ও রসজ্ঞ কীর্ত্তনীয়ার হাতে পড়িয়া ক্রমশঃ মার্জ্জিত হওয়ার যে মন্তব্য রায় মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন, সব ক্ষেত্রেই কি তাহা প্রয়োগ করিতে পারি? নীলরতন বাবুর সংগৃহীত প্রায় ছয়শত পদ তো ইতঃপূর্ব্বে অপ্রকাশিতই ছিল; সুতরাং পণ্ডিত ও কীর্ত্তনীয়ার হাতে সেগুলি যে ক্রমশঃ মার্জ্জিত হয় নাই, ইহা ত স্বীকার করিতেই হইবে। এখন প্রাচীন গ্রন্থে সংগৃহীত তথাকথিত ক্রমশঃ মার্জ্জিত ঐ পদগুলির সঙ্গে নীলরতন বাবুর সঙ্কলিত পদাবলীর অন্ততঃ অধিকাংশেরও যদি ভাষা ও ভাবের একটা সামঞ্জস্য পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেগুলিকে উক্ত অজ্ঞাতনামা কবি-সম্প্রদায়ের—একটা দলের রচনা না বলিয়া একজন কবির রচনা বলা যাইতে পারে কি না? চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল প্রভৃতি যে কোন বিষয়েই একাধিক কবি লেখনী চালনা করিয়া গিয়াছেন, সেই-সেই বিষয়েই একজন আর একজনের অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়াছেন, ইহা সত্য। তথাপি মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরাম, ক্ষমানন্দ, কেতকাদাস ও বিষ্ণুপাল, ময়ূরভট্ট, মাণিক গাঙ্গুলী ও ঘনরাম প্রভৃতির পার্থক্য নির্ণয় করা যায় না, এমন কথা বোধ হয় কেহই বলিবেন না। দেশ ও কালগত পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সমসাময়িক সাহিত্য, কবির জীবন-কথা ও রচনার ধারা ইত্যাদি বিষয় একটু অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করিলেই মৌলিকতার, কবিত্বের এবং অনুসরণ-অনুকরণের মীমাংসা হইতে পারে। এই হিসাবে চণ্ডীদাসের বৈশিষ্ট্য নির্ণীত হইতে পারে কি না? আরও জিজ্ঞাস্য—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মত বিরাট গ্রন্থের সমস্ত পদই বিলুপ্ত হইয়া গেল কখন এবং কি প্রকারে? শ্রীচৈতন্য প্রভুর প্রেম-ধর্ম্ম প্রচারের পর সহজিয়া ও পরকীয়ায় মিলিয়া যদি তথাকথিত চণ্ডীদাস ছদ্ম-নামধেয় কবি-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়া থাকে, তাহা হইলে জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতির পদাবলী ক্রমশঃ মার্জ্জিত না হইয়া একা চণ্ডীদাসের পদগুলির ক্রমশঃ মার্জ্জিত হইবার কারণ কি? শ্রীচৈতন্যদেব চণ্ডীদাসের পদাবলী শ্রবণ-কীর্ত্তনে আনন্দলাভ করিতেন। সুতরাং ইহা অনুমান করা অন্যায় নহে যে, তিনি যে চণ্ডীদাসের পদের অনুরাগী ছিলেন, তাঁহার ভক্তগণের পক্ষে সেই চণ্ডীদাসের প্রতি প্রীতি প্রকাশই স্বাভাবিক। এবং এই ভক্ত-পরম্পরায় সেই চণ্ডীদাসের দুই-চারিটী সংগীতও যে সুপ্রচলিত হইয়া আসিতেছিল, এ অনুমানও বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। সুতরাং প্রাচীন পদকর্ত্তাগণ যে খাঁটী চণ্ডীদাসের পদই সংগ্রহ করিয়াছিলেন, ইহা একরূপ দৃঢ়তার সহিতই বলিতে পারা

যায়। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের একটী পদও আমাদের এই অনুমানের সমর্থন করিতে পারে। নীলরতন বাবুর পদাবলীর ২৬৬ সংখ্যক পদের এক স্থানে আছে—

"মিলাইছে শিলারাজি চকিত হইল শশি
মোর কাছে নাচিছে আসিয়া।
নারীর যৌবন ধন তাতে তার আছে মন
ভেঁই পুরে হাসিয়া হাসিয়া"।

এইবার শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের "নারীর যৌবনধন যাতে কৃষ্ণের হরে মন" স্মরণ করুন। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের একটীও পদ প্রাচীন সংগ্রহ-গ্রন্থে স্থান লাভ করিল না কেন? পদাবলীর দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের পদের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের পদের এত পার্থক্য কেন? ইহার মধ্যে কোন্ রচনা আসল চণ্ডীদাসের বলিয়া মনে হয়? আশা করি, সুপণ্ডিত রায়মহাশয় এবং শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের সমর্থকগণ আমাদের জিজ্ঞাসার সদুত্তর দানে অনুগৃহীত করিবেন।

(২)

এইবার আমাদের আপত্তিজনক পদ দুইটীর কথা বলিব। এই পদ দুইটীকে বাদ দিলে, নীলরতন বাবুর সঙ্কলিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর পদগুলির মধ্যে বিশেষ কোন অসামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পদাবলী সাহিত্যের স্বরূপ নির্ণয়ে—শ্রীযুক্ত রায়মহাশয় "ছন্দ, ভাষা ও ভাব বৈশিষ্ট্য"—এই তিনটী প্রধান সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। ভাব-বৈশিষ্ট্য বলিতে তিনি "ভক্তভাব ও সখীভাব,"—এই দুইটী ভাবের উল্লেখ করিয়াছেন। রায় মহাশয় বলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের রচনায় ভক্তভাব এবং পরবর্ত্তী কবিগণের রচনায় সখীভাবের প্রাধান্য পরিদৃষ্ট হয়। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয়, "চরিত্রগত সামঞ্জস্য"ও এই সূত্রের মধ্যে উল্লিখিত হইতে পারে। আমাদের আরও মনে হয়—কোন বিষয়ের সমালোচনা করিতে হইলে, সমালোচ্য বিষয়ের একটা অধিষ্ঠান-ভূমি" নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। কোন্ স্থানে দাঁড়াইয়া, কেমন ভাবে দেখিয়া বিচার-বিশ্লেষণ করিতে হইবে, কেমন পদ্ধতিতে কবিকে, কবির দেশ ও কাল, রুচি ও সংস্কারকে ওজন করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে সমালোচকের একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। এ কথা সর্ব্ববাদীসম্মত যে, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের রচনার "অধিষ্ঠান-ভূমি "প্রেম," এবং সে ভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রেমের মূর্ত্তিমতী প্রতিমা শ্রীমতী রাধা। বিশেষ করিয়া চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে এ কথা বেশ ভাল রূপেই প্রযুক্ত হইতে পারে। এক্ষণে যদি দেখিতে পাওয়া যায়, চণ্ডীদাসের পূর্ব্বরাগ, সম্ভোগ-স্মৃতি, মান, আক্ষেপানুরাগ, মাথুর, আত্মনিবেদন প্রভৃতির অধিকাংশ পদে শ্রীমতীর যে চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে, দুই-একটী বা কয়েকটী পদে তাহা বিকৃত হইয়াছে, আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত সূত্রানুযায়ী চরিত্র-চিত্রের কোন অসঙ্গতি ঘটিয়াছে, তাহা হইলে সেই পদ বা পদগুলি যে চণ্ডীদাসের নহে, ইহাই কি সিদ্ধান্ত করিতে হইবে না? এরূপ ক্ষেত্রে, পদকল্পতরু অথবা পদামৃত-সমুদ্র প্রভৃতি হইতে পাওয়া গিয়াছে বলিয়াই যে তাহা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিতে হইবে, এমন কি কথা আছে? আদি সংগ্রহ-কারগণের নিজের হাতের লেখা পুঁথি যখন পাওয়া যায় নাই, তখন লিপিকর-প্রমাদের কথা ভুলিয়া গেলেই বা চলিবে কেন?

দেখিতে হইবে, চণ্ডীদাস তাঁহার পদাবলীতে শ্রীমতীকে কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের রাধিকা,—রাজার নন্দিনী—রাজ-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বিলাসের কোলে আদরে-সোহাগে পালিতা হইয়াও সংসারের সুখ-বিলাসে অনভ্যস্তা। সারল্যে, মাধুর্য্যে, পবিত্রতায়, ঔদার্য্যে, একনিষ্ঠ প্রেমের মহিমময় সৌন্দর্য্যে তাঁহার অন্তর-বাহির সমুজ্জ্বল—দিব্য লাবণ্যে পরিপূর্ণ। সংসারের ধুলামাটী তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ভালবাসিতেই তাঁহার সৃষ্টি,—ভালবাসাময় তাঁহার জীবন,—ভালবাসিয়া,—নিঃস্বার্থ ভাবে আপনাকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়াই তাঁহার আনন্দ, এবং জনম ও জীবনের চরম সার্থকতা। ভালবাসা ভিন্ন তিনি যেন আর কিছু জানেন না, আর কিছু চাহেন না। এই ভালবাসার বস্তুকে না পাওয়ায়—ভালবাসিতে গিয়া বাধা পাওয়ায়—তিনি ক্ষোভে, দুঃখে, মর্ম্মপীড়ায় অধীরা হইয়াছেন, কিন্তু তবু সেই ভালবাসার বস্তুকে—সেই প্রিয়তমকে ছাড়িতে পারিতেছেন না,—

"না বল' না বল' সই না বল' এমনে,
পরাণ বাঁধিয়া আছি সে বঁধুর সনে"।

তিনি বলেন বরং "এদেশে না রব সই দূরদেশে যাব," তথাপি কানুকে কি ত্যাগ করা যায়? ত্যাগ তো দূরের কথা—তিনি তাঁহার প্রিয়তমের কোন দোষ পর্য্যন্ত দেখিতে পান না। বলেন, দোষ তাঁহার আপন কর্ম্মের, দোষ দৈবের, দোষ যত পর-সুখ-কাতর লোকের। না জানি সে কোন্ অজানিত শুভক্ষণে সুমধুর শ্যাম নাম তাঁহার কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়াছে, শ্যামের অনিন্দ্য-সুন্দর বিশ্ব-বিমোহন মূর্ত্তি বিশাখা তাঁহাকে নিপুণ তুলিকায় আঁকিয়া আনিয়া দেখাইয়াছে, প্রাণ তাঁহার আকুল হইয়াছে, তিনি কে জানে কখন,—হয়ত বা নিজের অজ্ঞাত-সারেই—সেই জীবনাধিককে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছেন। চণ্ডীদাসের এই আপন-ভোলা রাধা-প্রকৃতিতে ছলাকলা, চাতুরী, প্রগল্‌ভতার লেশমাত্রও নাই। তাই এই ভালবাসাই তাঁহার কাল হইল। কিন্তু উপায় ছিল না যে! চণ্ডীদাস বলিতেছেন—

"এক কাল হইল মোর নয়নি যৌবন।
আর কাল হইল মোর বাস বৃন্দাবন॥
আর কাল হইল মোর কদম্বের তল।
আর কাল হইল মোর যমুনার জল॥
আর কাল হইল মোর রতন ভূষণ।
আর কাল হইল মোর গিরি গোবর্দ্ধন॥
এত কাল সঙ্গে আমি থাকি একাকিনী।
এমন ব্যথিত নাই শুনয়ে কাহিনী।
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে না কহ এমন।
কার কোনো দোষ নাই সেই একজন।

এক দিকে "যৌবন নিকুঞ্জে পাখী গাহিতেছে—সখী জাগো,—জাগো!" অন্য দিকে সারাটা বৃন্দাবন রূপে, রঙ্গে, গানে, গন্ধে তাঁহাকে যেন পাইয়া বসিয়াছে! এক দিকে এই দেহ-গেহ, স্বজন-পর-জন সকল স্মৃতি ডুবাইয়া দেওয়া, ভুবন-ভাসানো আপন-ভোলা ভালবাসা,—অন্য দিকে কুলশীল গৌরব-গরবিত গুরুজনের গঞ্জনা,—পোড়া লোকের পর-চর্চ্চা! মাঝখানে কোমলা কিশোরী—চণ্ডীদাসের শ্রীমতী রাধা। নিতান্ত নিরুপায়— সংসারে যেন শরণ নাই, সুহৃদ নাই, আশ্রয় নাই, সহায় নাই! "আনিয়া অমৃত পানা বিষে মিশাইয়া" তিনি পান করিয়াছেন,—অন্তর জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইয়া যাইতেছে। কিন্তু উগারিবার কোন উপায় নাই, প্রতীকারের কোন পন্থা নাই! চণ্ডীদাসের রাধিকাকে যদি কেহ বলেন—

"শুনইতে কানু মুরলীরব মাধুরী
শ্রবণে নিবারলু তোর।
হেরইতে রূপ নয়ন যুগে ঝাঁপনু
তব মোহে রোখলি ভোর॥
সখি তৈখন কহলম্ তোয়।
ভরমহি তা সএ লেহ বাঢ়ায়লি
জনম গোঁয়ায়বি রোয়।
বিনি গুণ পরখি পরখ সুখ লালসে
কাহে সঁপলি নিজ দেহা।
দিনে দিনে খোঁয়ায়লি ইহ রূপ লাবণি
জীবইতে অবহুঁ সন্দেহা॥" (গোবিন্দ দাস)

তিনি উত্তর শুনিতে পাইবেন, শ্রীমতী বলিতেছেন—

"যত নিবারিয়ে চিতে নিবার না যায় গো।
আন পথে যাই, পদ কানু পথে ধায় গো॥
এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম।
যার নাম না লইব লয় তার নাম॥
এ ছার নাসিকা মুই কত করু বন্ধ।
তবু ত দারুণ নাসা পায় শ্যাম গন্ধ॥
সে কথা না শুনিব করি অনুমান।
পর সঙ্গে শুনিতে আপনি যায় কাণ॥
ধিক রহু এ ছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব॥"

কত উদাহরণ দিব। চণ্ডীদাসের পদাবলীর পরতে-পরতে এই সুর। "ঘরের বাহিরে দণ্ডে শত বার" "রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা," এবং আক্ষেপানুরাগের প্রায় সমস্ত পদে রাধিকার এই চিত্র! এইবার এই চিত্রের সঙ্গে একবার নিম্নোদ্ধৃত পদ দুইটীর তুলনা করুন।

১

"নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরী
চমকি চাহিয়ে গেল।
* * *
রঙ্গিম ভঙ্গিমে ঘন সে চাহনি
গলে সে মোতিম হারি।
* * *
অঙ্গের বসন ঘুচায়ে কখন
সঘনে ঝাঁপয়ে তাই।
* * *
হাসির চাহনি দেখালে কামিনী
পরাণ হারানু তাই॥"
(নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাস, ৪ সংখ্যক পদ)

থির বিজুরী বরণ গৌরী
পেখনু ঘাটের কূলে।
কানাড়া ছান্দে কবরী বাঁধে
নব মল্লিকার মালে॥
সই মরম কহিয়ে তোরে।
আড় নয়নে ঈষৎ হাসিয়া
বিকল করিল মোরে॥
ফুলের গেরুয়া লুফিয়া ধরয়ে
সঘনে দেখায় পাশ।
উচ কুচ যুগ বসন ঘুচায়ে
মুচকী মুচকী হাস॥
চরণ যুগলে মল্ল তোড়ল
সুন্দর যাবক রেখা।
কহে চণ্ডীদাস হৃদয়ে উল্লাস
পালটী হইবে দেখা॥
(নীলরতন বাবুর পদাবলী ১২ সংখ্যক)

এইস্থলে "অঙ্গের বসন ঘুচাইয়া সঘনে তাহা আবৃত করা," "আড় নয়নে ঈষৎ হাসিয়া চাওয়া," "ফুলের গেরুয়া লুফিয়া পুনরায় তাহা ধরিবার ছলে পার্শ্বদেশ প্রদর্শন," "বক্ষের বসন অপসারিত করিয়া মুচকী মুচকী হাসি" ইহা কি চণ্ডীদাসের রাধিকার পক্ষে সম্ভব? আমরা এই পদ দুইটীর ভালমন্দ বিচার করিতেছি না। স্থল বিশেষে কোন কোন নায়িকার পক্ষে ইহা স্বাভাবিক হইলেও, ইহা যে চণ্ডীদাসের রাধিকার পক্ষে একেবারেই অস্বাভাবিক, আমরা শুধু সেই কথাই বলিতেছি। নীলরতন বাবুর সঙ্কলিত প্রায় নয় শত পদের অপর একটীরও সঙ্গে এই পদ দুইটীর কোন সামঞ্জস্য আছে বলিয়া মনে হয় না। এবং চণ্ডীদাস-সৃষ্ট রাধিকা-চরিত্রের সহিত ইহার বিন্দুমাত্রও সঙ্গতি নাই। এই ছলাকলা, এই প্রগলভতা বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস অথবা গোবিন্দ দাসের রাধিকারই উপযুক্ত।

"কেলি রভস যব শুনে।
আনত হেরি ততহি দেই কাণে।
ইথে যদি কোই করয়ে পরচারি।
কাঁদন মাখি হাসি দেই গারি।" (বিদ্যাপতি

এই চিত্রের সঙ্গেই ইহার সামঞ্জস্য হয়। অথবা—

"খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরি মাঝ॥ (জ্ঞানদাস)

প্রভৃতি পদের সঙ্গেই ইহা এক শ্রেণীতে উল্লিখিত হইতে পারে। চণ্ডীদাস—

"যমুনা যাইয়া শ্যামেরে দেখিয়া
ঘরে আইলা বিনোদিনী।
বিরলে বসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ধেয়ায় শ্যাম রূপ খানি॥
নিজ করোপর রাখিয়া কপোল
মহাযোগিনীর পারা।
ও দুটী নয়ানে বহিছে সঘনে
শ্রাবণ মেঘেরি ধারা"॥

প্রভৃতি পদের সঙ্গে ঐ পদ দুইটীর কি কোন ঐক্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়? শ্যামকে দেখিয়া ঘরে আসিয়া যে বালিকা কাঁদিয়া আকুল হয়, দুই হাত তুলিয়া মেঘপানে চাহিয়া হাসে, থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠে, আপনার বসনভূষণ দেখিয়া অবধি যে রাধিকার—

"বিরতি আহারে, রাঙ্গাবাস পরে
যেমন যোগিনী পারা"

ঐ লাস্যবিলাস, ঐ প্রগলভতা না কি তাহার পক্ষে সম্ভব হয়? এই জন্যই আমাদের ধারণা হইয়াছে, ঐ পদ দুইটী চণ্ডীদাসের নহে। আমাদের অনুমান হয়, ঐ পদ দুইটী—বিশেষ, ২য় পদটী জ্ঞানদাসের। জ্ঞানদাসের রচনার সঙ্গে ইহার বিশেষ সামঞ্জস্য রহিয়াছে। জ্ঞানদাস মুরলী শিক্ষা, নৌকাখণ্ড, আক্ষেপানুরাগ প্রভৃতি পদ রচনায় চণ্ডীদাসের অনুসরণ করিলেও, পূর্ব্বরাগে তিনি বিদ্যাপতিকেই আদর্শ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। আশা করি, সুধিগণ আমাদের যুক্তির প্রামাণিকতা একবার বিচার করিয়া দেখিবেন। এবং আমাদের এই সন্দেহ যদি সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয়, তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহারা—এই দিগ্‌দর্শনকেই ভিত্তি করিয়া অতঃপর চণ্ডীদাসের পদাবলীর আলোচনা চলিবে কি না—সে বিষয়েও একটু বিবেচনা করিবেন। চণ্ডীদাস-বর্ণিত রাধিকার চিত্রটী আর একবার স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য আর একটী পদ উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই নিবেদনের উপসংহার করিতেছি

"এক জ্বালা ঘরে হইল আর জ্বালা কানু।
জ্বালাতে জ্বলিল দে' সারা হইল তনু॥
কোথা কারে যাব সই কি হবে উপায়।
গরল সমান লাগে বচন হিয়ায়॥
কাহারে কহিব আমি কে যাবে প্রতীত।
মরণ অধিক ভেল কানুর পীরিত॥
জারিলেক তনুমন কি করে ঔষধে।
জগত ভরিল মোর কানু পরিবাদে॥
লোক মাঝে ঠাঁই নাই অপযশ দেশে।
বাশুলী আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডিদাসে॥

বিজিতা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১৫)

[ব]াড়ীতে পা দিয়াই শৈলেন নানা ফেঁসাদে এমন জড়াইয়া [প]ড়িয়াছিল যে, তাহার একটু হাঁফ ফেলিবার অবকাশ হয় [না]ই। সে বই দু'খানাও প্রতিভাকে সে দিতে পারে [না]ই। যে মুহূর্ত্তে প্রতিভা তাহার সম্মুখে আসিয়াছিল, [সে]ই মুহূর্ত্তে যদি বই দু'খানা সে তাহাকে দিতে পারিত, [তা]হা হইলেই ভাল হইত; কিন্তু প্রতিভার লজ্জিত সশঙ্ক [ভা]ব দেখিয়া শৈলেন পিছাইয়া গেল, বই দু'খানা তাহাকে [দে]ওয়াও ছেলেমানুষি বলিয়া তাহার মনে হইল।

সন্ধ্যার একটু আগে শৈলেন চুপ করিয়া বাঁধানো পুষ্করিণীর ঘাটের উপর বসিয়া ছিল। বকুল ফুলগুলি তখন সবে ফুটিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিল, একটু-একটু গন্ধ বাতাসে ছুটিতেছিল। সারি দিয়া যুঁই গাছগুলি পুষ্করিণীর চারিধার ঘেরিয়া, সাদা ফুলে আপাদ মস্তক ঢাকিয়া দণ্ডায়মান। আকাশের পশ্চিম দিকে নিবিড় কালো মেঘ সাজিয়া আসিয়াছিল; তাহারই মাথার উপরকার ফাঁক দিয়া অস্তগামী সূর্য্যের আরক্তিম আভা ছুটিয়া কেবল মাত্র নীলাকাশটাকেই রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছিল।

শৈলেন একদৃষ্টে সেই কালো মেঘখানার পানে

চাহিয়া ছিল। তাহার পার্শ্বে প্রতিভার জন্য আনীত বই হু'খানা পড়িয়া ছিল। এই বই হু'খানাই সেই বৈকাল হইতে এইখানে বসিয়া সে পড়িতেছিল। সাবিত্রী-সত্যবানখানা পড়িতে-পড়িতে কখন যে তাহার মন তাহাতে নিবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তাহা সে জানে না। এখন সহসা তাহার বাহ্য-জ্ঞানটা ফিরিয়া আসিয়াছিল, তাই সে বইখানা পার্শ্বে রাখিয়া আবার সংসারের ভাবনায় ডুবিয়াছিল।

হঠাৎ ঝনাৎ করিয়া চাবির গোছা পৃষ্ঠে ফেলিবার শব্দ শুনিয়া সে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, প্রতিভা। সমস্ত দিনের কাজ সারিয়া প্রতিদিনকার অভ্যাস মত আজও সে গা ধুইতে আসিয়াছে।

শৈলেনকে সেখানে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া প্রতিভাও থতমত খাইয়া দাঁড়াইল। তাহাকে সে যে আজও এমন নির্জ্জন যায়গায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিবে, তাহা সে ভাবে নাই। সে ভাবিয়াছিল, শৈলেন বাহিরে যোগেন্দ্রের নিকটে আছে।

এ সঙ্কোচ কিছু দিন আগে তাহার ছিল না। সে নিঃসঙ্কোচে শৈলেনের কাছে যাইত, ভগিনীর মতই আবদার করিত। শৈলেনও সঙ্কোচ করিবার কোনও কারণ পায় নাই। ছোটবেলা হইতে যাহার সহিত একত্র থাকা যায়, তাহাকে সঙ্কোচ করিবার কি কারণ থাকিতে পারে? প্রতিভা এ সঙ্কোচ ঠেকিয়া শিখিয়াছে,—পূর্ণিমা ও সুলতার ব্যঙ্গোক্তি তাহাকে বড় সচেতন করিয়া দিয়াছে। সুষমাও তাহাকে তাহার অবস্থা বুঝাইয়া দিয়াছেন। বুঝাইয়া দিয়াছেন, তাহাকে অতি সন্তর্পণে, লোক-চক্ষুর অন্তরালে বেড়াইতে হইবে, কারণ সে বিধবা। জগতের সহিত তাহার যা সম্পর্ক ছিল, তাহা বাল্যেই ছিঁড়িয়াছে।

প্রতিভা এতদিন পরে নিজেকে বুঝিতে পারিল। হৃদয়ের পানে একবার সে চাহিল,—শূন্য, কেবল শূন্য! জগতের পানে সে চোখ তুলিয়া চাহিল,—কেবল অন্ধকার, সীমাহীন অনন্ত অন্ধকার। সে যে বিধবা! কি আছে তাহার, যাহা লইয়া লোকের মাঝে সে দণ্ডায়মান হইতে পারে? কবে সে দিন আসিল, যেদিন সে সিঁথায় সিঁদূর দিয়া জগতের মধ্যে সৌভাগ্যবতী পদে বরিত হইল, আবার কবে সেদিন আসিল যে দিন সিঁথার সিঁদূর মুছিয়া সে বাস্তবিকই অভাগিনী হইল! সে যে কিছুই জানে নাই। বিবাহকে যেমন ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, বৈধব্যকেও তেমনি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। সুখ বা দুঃখ—কাহাকে যে সে বরণ করিয়া লইল, তাহাও সে জানে নাই।

হঠাৎ যখন সে শুনিতে পাইল বিধবা সে—কিছুর মধ্যেই তাহার অধিকার নাই, তখন প্রথমটা সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কি এক খেয়ালে সে মাতিয়া থাকিত যে নিজের পানে চাহিবার অবকাশও তাহার হয় নাই। ছোটকালের মতই সে সঙ্কোচহীন হইয়া বেড়াইত; লজ্জার প্রয়োজনীয়তা সে বুঝিতে পারে নাই। অকস্মাৎ যখন তাহার স্বরূপটা তাহার সামনেই প্রকাশ হইয়া পড়িল, তখন ঘৃণায় সে বলিয়া উঠিল "ছি, ধিক!"

কিন্তু এ ধিক্কার কাহাকে দিল সে? যে সেদিন সন্ধ্যার অরুণিমা অনিন্দ্য-সুন্দর মুখে মাখিয়া সুন্দর গোলাপটী তাহাকে অর্পণ করিয়া প্রাণে পরমানন্দ লাভ করিয়াছিল তাহাকেই, না নিজেকে, অথবা যাহারা তাহার নাম শৈলেনের নামের সহিত জড়িত করিল তাহাদিগকে? যাহাকেই দিক, সে কিন্তু সেই কথাতেই নিজেকে সামলাইয়া লইল। হাতের চুড়ী, পরনের কাপড়খানি খুলিয়া ফেলিয়া সে যখন পিসীমার পরিত্যক্ত একখানি থান পরিয়া সকলের সম্মুখে আসিল, তখন পিসীমা বলিয়া উঠিলেন "এ কি প্রতিভা?"

সুষমা সজল নয়নে বলিলেন, "এই বেশ হয়েছে পিসীমা। আমিও ভেবেছিলাম, ওর এখন ব্রহ্মচর্য্য পালন করবার সময় এসেছে, এখন ওকে শিক্ষা দেওয়া খুব দরকার। চিরদিন কি মানুষের ছেলেখেলা নিয়ে কাটালে চলে পিসীমা? এতদিন এটা করান খুব উচিত ছিল আমাদের। এবার হতে তুমি ওর ভার নাও পিসীমা।"

পিসীমা এই বিধবার তরুণ মলিন মুখখানা দেখিয়া কোনও মতে সেদিন অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। নিজের হৃদয়ের শূন্যতাকে পূর্ণ করিবার জন্য প্রতিভা প্রাণপণে সাধনা করিতেছিল,—সারা হৃদয়খানা ঢালিয়া দিয়া সে প্রার্থনা করিতেছিল।

আজ হঠাৎ শৈলেনকে সেখানে দেখিয়াই তাহার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। কোথায় কোন কৌতূহলাবিষ্ট দুটি চোখ জাগিয়া আছে, কে জানে! যদি সেই দুটি চোখে এই দৃশ্যটা পড়িয়া যায়?

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া প্রতিভা একটুখানি দাঁড়াইয়া আস্তে-আস্তে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছিল,—শৈলেন ডাকিল, "প্রতিভা!"

বুকটা আবার কাঁপিয়া উঠিল। বিবর্ণ মুখে ফিরিয়া প্রতিভা কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "আমায় ডাকছ ছোড়দা?"

তাহার এই কুণ্ঠিত ভাবটা শৈলেনকে যেন কশাঘাত করিল। কোথা হইতে সঙ্কোচ আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহার মুখখানা নিমেষে আরক্তিম হইয়া উঠিল। সে কি বলিবে তাহা ভাবিয়া না পাইয়া, ফুটন্ত ফুলগাছগুলির পানে চাহিল। মনে পড়িয়া গেল, গত বৎসর এমন সময়ে প্রতি দিন প্রতিভা রাশি-রাশি ফুল কুড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। সে নিজেই প্রতিভাকে কত ফুল তুলিয়া দিয়াছে। সেদিন উভয়ের মধ্যে সঙ্কোচ ছিল না, লজ্জা ছিল না। হায়! সে দিন কোথায়!

সে একটু ভাবিয়া বলিল, "তুমি আর ফুল নিয়ে যাও না প্রতিভা?" কথাটা বলিয়াই সে অসংযত জিহ্বাটাকে দন্তে চাপিয়া ধরিল। এ অনাবশ্যক প্রশ্ন করিবার হেতু সে নিজেই খুঁজিয়া পাইল না।

প্রতিভা মৃদু কণ্ঠে উত্তর করিল, "না, ফুল নিয়ে কি হবে? পিসীমার পূজোর ফুল তিনি নিজেই তুলে নেন।"

শৈলেন একটু সাহস পাইয়া বলিল, "তুমিও তো পূজা কর প্রতিভা, ফুল নাও না কেন?"

প্রতিভা একটু হাসিল, "আমার ফুলের কোনও দরকার হয় না।"

শৈলেন নিঃশব্দে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ফুল নইলে কি পূজা হয় প্রতিভা? যদি তোমরা নাই নেবে, তবে এত কষ্ট করে ফুলগাছগুলো করবার কি দরকার ছিল আমার?"

প্রতিভা বলিল, "তুমি যে কাউকেই ফুল তুলতে দিতে না ছোড়দা?"

শৈলেন চুপ করিয়া গেল। এই সময়ে পার্শ্বের দিকে চাহিতে বই দু'খানা তাহার চোখে পড়িয়া গেল। সে বলিল, দু'খানা বই তোমার জন্যে এনেছি প্রতিভা। তুমিই আনতে বলেছিলে। তোমায় দেবার মত অবসর পেলুম না কো সারাদিনের মধ্যে। ভাবছিলুম, এবার গিয়ে দেব। নিয়ে যাও এ দু'খানা।"

প্রতিভা এক পা পিছাইয়া গেল; শঙ্কিত ভাবে বলিল, "আমার জন্যে এনেছ?"

বিস্মিত হইয়া শৈলেন বলিল, "হ্যাঁ, তোমার জন্যেই তো! তুমিই তো লিখেছিলে।"

প্রতিভা একটুখানি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, "এখন ফেরৎ দেওয়া যায় না?"

আরও বিস্মিত হইয়া শৈলেন বলিল, "ফেরৎ দিতে যাব বলে তো আমি কিনি নি! আর সে অচেনা দোকান, একবার বিক্রি করে তারা আবার ফেরৎ নেবে কেন?"

প্রতিভা বলিল, "তোমার কাছেই তবে থাক না ছোড়দা!"

রুষ্ট ভাবে শৈলেন বলিল, "যদি নাই নেবে প্রতিভা, তবে আমাকে আনতে বলবার মানে কি ছিল? আমার পয়সা খরচ করানোই তোমার অভিপ্রায় বুঝি? আমি যখন তোমার জন্যেই এনেছি, তখন আমিই বা আমার কাছে রাখতে যাব কেন? এই রইল তোমার বই, নিতে ইচ্ছা হয় নাও, না হয় টান মেরে ওই পুষ্করিণীর কালো জলে ফেলে দাও গে।"

বই দুখানা তুলিয়া লইয়া সশব্দে সামনে ফেলিয়া দিয়া শৈলেন রাগ ভরে উঠিয়া গেল।

তাহার রাগ দেখিয়া প্রতিভা নির্ব্বাক ভাবে শুধু চাহিয়া রহিল। শৈলেন কখনো তাহার উপর রাগ করে নাই। প্রতিভা তাহাকে অনেক জ্বালাইয়াছে, কিন্তু কোনও দিনই তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি হয় নাই।

সামনে পড়িয়া আছে সেই অনাদৃত বই দু'খানা। প্রতিভা বই দু'খানার পানে চাহিয়া রহিল। নীরবে তাহার বড়-বড় দুটি চোখ দিয়া ধারার পর ধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। নীরবেই সে চোখ মুছিয়া বই দু'খানা তুলিয়া লইল।

বই দু'খানি সে খুলিয়া দেখিল। ওগো, এ কি দান করিয়া গেলে? স্বামীর যে ছবিটি সে হৃদয়ে গাঁথিয়া পূজা করিবে, সে ছবি কই? স্বামীর কথাই যে তাহার মনে নাই। কবে কোন দিনে সে সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আবার কবে সে সরিয়া গেল, প্রতিভা তাহা জানে না। তবু—তবু তোমার দান সে মাথা পাতিয়া লইবে। তুমি যে উপদেশ এই বইয়ের দ্বারা প্রেরণ করিলে, সেই উপদেশ

সে সাদরে গ্রহণ করিবে। আশীর্ব্বাদ কর, যেন সে যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া যাইতে পারে।

কাপড় কাচা আর হইল না,—বই দু'খানা সন্তর্পণে কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া সে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

সম্মুখেই সুষমা। প্রতিভাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "কি রে, কাপড় কাচলি নে আজ?"

প্রতিভা মাথা নাড়িয়া শুষ্ক মুখে বলিল, "না, ঘাটে ছোড়দা রয়েছে দেখে আমি চলে এলুম।"

প্রফুল্ল মুখে সুষমা বলিলেন, "তা বেশ করেছিস। আমি যা বলে দিয়েছি, তা মনে করে রাখিস। ঠাকুরপোকে বিষধর সাপের মতই জ্ঞান করবি। মনে করিস, সে তোর পরম শত্রু—তার মত শত্রু তোর এ জগতে আর কেউ নেই। এ বাড়ীতে আরও অনেক শত্রু তোর আছে বটে, কিন্তু তারাও তেমন শত্রুতা করতে পারবে না ঠাকুরপো যেমন করবে। যে দিকে সে থাকবে, সে দিকে যাওয়া তোর নিষেধ, এইটি মনে রাখিস।"

প্রতিভা নিশ্চল প্রতিমার ন্যায় খানিক দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার বিষাদ-মলিন মুখখানা আরও মলিন হইয়া গেল। আস্তে-আস্তে বই দু'খানি বাহির করিয়া সুষমার পায়ের কাছে রাখিল।

চকচকে মলাট বাঁধানো বই দু'খানা দেখিয়াই সুষমা তাড়াতাড়ি তুলিয়া লইলেন। নাম দুইটা দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন "এ বই দু'খানা পেলি কোথায় রে? নতুন দেখছি।"

প্রতিভা অবনত মুখে বলিল "ছোড়দা দিয়েছে।"

সুষমার মুখখানা অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া উঠিল। একটুখানি নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন, "তুই চেয়েছিলি বুঝি?"

প্রতিভা মৃদুস্বরে বলিল "হ্যাঁ, অনেক দিন আগে চেয়েছিলুম। সে কথা আমার মোটেই মনে ছিল না, আজ বই দু'খানা দেখে মনে পড়ে গেল। আমি এখন নিতে চাই নি কিছুতে,—ছোড়দা রাগ করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেল। আমি তাই এ বই দু'খানা কুড়িয়ে আনলুম। তা— বইয়ে আমার কি দরকার দিদি, তুমি নাও।"

সুষমা বই দু'খানা তাহাকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, আমার নেবার কি দরকার বোন? তোমার কাছে রেখে দাও। এ বই সব মেয়েরই পড়া খুব ভাল। যাই হোক, আমি তোমায় বলে দিচ্ছি, আর কখনও তার কাছ হতে কোনও জিনিস নিয়ো না। নিজের কপাল নিজে বুঝে যদি চলতে না শেখো, তা হলে তোমায় অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে। সর্ব্বদাই মনে জাগিয়ে রেখো—তুমি বিধবা, সংসারে সবাই তোমার শত্রু।"

প্রতিভা মাথা নীচু করিয়া বই দু'খানা লইয়া সরিয়া গেল।

(১৬)

প্রভাতেই গ্রামের মাতব্বর লোকেরা আসিয়া জমা হইলেন। বিষয়-সম্পত্তির এষ্টিমেট ধরিয়া চার ভাইয়ের মধ্যে সমান ভাগ হইয়া গেল।

যোগেন্দ্র চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। মাতব্বর লোকদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মতি বাবু। ভাগ-বখরা করিয়া দিতে তিনি যেমন মজবুত ছিলেন, এমন আর কেহ ছিল না। তিনি এমন সূক্ষ্ম ভাবে ভাগ করিয়া দিলেন যে, কাহারই একটা কথা কহিবার যো রহিল না। কলিকাতার আড়তটা নিজে লইবার জন্য নৃপেন অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করায়, মতি বাবু যোগেন্দ্রের মত কি তাহা জানিতে চাহিলেন।

যোগেন্দ্র উদাস ভাবে বলিলেন, "আমার মত কিছুই নেই। যে যা নিতে চায়, তাকে তাই দিন।"

নিরপেক্ষ, বাক্‌হীন যোগেন্দ্রের ভাগে পড়িল সুদূর বম্বের আড়ত; রমেন্দ্র দিল্লীর এবং শৈলেন এলাহাবাদের আড়ত পাইল। যোগেন্দ্র এ বাড়ী ছাড়িয়া পুরাতন বাড়ীতে উঠিয়া যাইবেন বলিলেন। নৃপেন সে কথা কাণে তুলিয়াও তুলিল না।

শৈলেন চুপ করিয়া এক পার্শ্বে বসিয়া সব দেখিতেছিল। বিষয় ভাগের সময় সে একটা কথাও বলে নাই; কিন্তু যখন দেখিল, যোগেন্দ্র পুরাতন বাড়ীতে উঠিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়া লইলেন, তখন সে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কেন, এত বড় বাড়ীটাতে তোমার জায়গা হতে পারে না কি বড়দা? তাই যদি হয়, এতদিন ছিলে কি করে?"

যোগেন্দ্র তাহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া একটু হাসিয়া বলিলেন "তা নয় রে পাগল! জায়গা যথেষ্ট আছে তা জানছি। বাড়ীটাতে তিনটে মহল আছে, এ তিনটে আমি তোদের তিন ভাইকে ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি। আমার কি ভাই! যেখানে-সেখানে একরকম করে দিন কাটিয়ে

দিতে পারলেই হল। দিন তো ফুরিয়ে এসেছে-ই ভাই, আর কেন ?"

শৈলেনের বুকের মধ্যে রুদ্ধ রোদন ফুলিয়া-ফুলিয়া উঠিতেছিল। সে বলিল, "আমাকেও আপনি এমন করে তফাৎ করে দিলেন বড়দা ? আমি তো বরাবরই বলেছি, আমি পৃথক হব না, আপনার সঙ্গে থাকব।"

যোগেন্দ্র বলিলেন, "আমি কি তাতে আপত্তি করেছি ভাই ?"

শৈলেন বলিল, "তবে আলাদা বাড়ীতে যাচ্ছেন কেন ? আমায় যে মহল দিলেন, তাতেই তো আপনি থাকতে পারবেন। আমায় যা দিলেন, আমি তা অমিয়কে দেব। আপনি আমাকেও এমনি স্বার্থপর ভাবলেন বড়দা, যে—"

তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। যোগেন্দ্র তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া, স্নেহভরে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিলেন, "না ভাই, আমি তোমায় স্বার্থপর ভাবি নি। আমি তো আগেই আমার স্ত্রী-পুত্রের ভার তোমায় দিয়ে রেখেছি। আমি আলাদা বাড়ীতে যেতে চাই অনেক কারণে। এ বাড়ীতে পৃথক হয়ে আমি কখনই থাকতে পারব না,—তাই আমি একটু তফাতে সরে যেতে চাই। তোমার সম্পত্তি এখনই অমিয়কে লিখে দেবার দরকার কি ভাই ? কে জানে, সে কি রকম হবে। হয় তো দু'হাতে সব উড়িয়ে দিয়ে শেষে পথের ভিখারী হবে। আমি তোমাকে অনেক ভেবে আলাদা করে দিয়েছি। যদিই সে দিন হয় ভাই, আমি বেশ জানি, তুমি তাকে কোলে টানবে।"

শৈলেনের চোখ হইতে খানিকটা জল উপচাইয়া যোগেন্দ্রের হাতের উপর পড়িল। নিজেকে সামলাইবার জন্য তাড়াতাড়ি উঠিয়া সে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

সুষমা তখন তরকারী কুটিতেছিলেন, প্রতিভা মসলা বাটিয়া দিতেছিল। শৈলেন সেখানে যাইবামাত্র সে উঠিয়া চলিয়া গেল। শৈলেনের মনটা তখন এমন অবস্থায় ছিল যে, সে সেদিকে নজরই করিল না।

সুষমা তাহার সজল চোখ দুটির পানে চাহিয়া বলিলেন, "কাঁদছিলে বুঝি ?"

আর সকলের কাছে শৈলেন নিজেকে গোপন করিয়া রাখিতে পারে, পারে না কেবল মাতৃস্বরূপা বড় বউদির কাছে। এখানে সে শিশু হইয়া যাইত,—এখানেই তাহার আবদার পূর্ণমাত্রায় চলিত,—আর কোথাও সে নিজেকে এমন ভাবে মুক্ত করিতে পারিত না। বড় বউদির কি যে গুণ ছিল,—তিনি সকলকেই আপনার করিতে পারিতেন।

তাঁহার কথা শুনিবামাত্র শৈলেনের চোখ দিয়া হু হু করিয়া জলধারা ছুটিল। বড়দাদার কাছে সে যে অভিমানকে জাগাইয়া তুলিতে পারে নাই, বউদির কাছে সেই অভিমান জাগিয়া উঠিল।

ব্যস্ত ভাবে বঁটিখানা কাত করিয়া রাখিয়া, সুষমা শৈলেনের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন; নিজের অঞ্চলে তাহার মুখ-চোখ মুছাইয়া দিতে-দিতে বলিলেন, "ছি ভাই, মেয়েদের মত করে কাঁদা তোমার উচিত নয়, কারণ তুমি যে পুরুষ। বুকটা তোমার লোহা দিয়ে বাঁধতে হবে যে। এত হালকা তুমি—ছি !"

শৈলেন লজ্জিত ভাবে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "হালকা নই বউদি, বড়দা যে আমায় পর করে দিলেন, তাই ভেবেই আমি কিছুতে নিজেকে সামলাতে পারছি নে। বড়দা আমায় মেজদা সেজদার মত বলে ভেবে নিলেন ? বড় বউদি, তোমায় মায়ের মত ভাবি, তোমার পা ছুঁয়ে বলছি—"

শশব্যস্ত হইয়া সুষমা সরিয়া গেলেন, "ও কি ভাই ঠাকুরপো, পা ছুঁয়ে আর বলতে হবে না। আমি কি তোমায় চিনি নে—না জানি নে ? আমি তোমার বড়দাকে যখন তোমায় পৃথক না করে দেবার কথা বললুম, তখন তিনি আমায় বুঝালেন, এ না কি শুধু অমিয়ের ভালর জন্যেই করছেন।"

শৈলেন একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তা তো আমাকেও বললেন। যাই বল বড় বউদি, আমি এবার পাশ দিয়েই একটা কাজ নিয়ে বেরিয়ে যাব, আর যদি কখনও এ দেশে আসি। এই যে যাব,—এই শেষ।"

সুষমা বলিলেন "অমন কথা মুখেও এনো না ভাই। বাড়ী আসবে না এমন কথা কি হতে পারে ?"

শৈলেন মলিন হাসিল "হুঁ, বাড়ীই বটে। তোমরা থাকবে সেই পুরানো বাড়ীতে, এ বাড়ীর দুই মহলে দুই বউদি জমকে বসবেন। আর আমার নির্জ্জন মহলে আমি প্রেতের মত এসে ঘুরব। ঠিক কথাই বলেছ বউদি, সত্যি কথাই বলেছ।"

সুষমা বলিলেন "কেন ঠাকুরপো, আমাদের কাছে থাকবে। আমরা কি তোমায় একলাটী এখানে থাকতে দেব? যখন বাড়ী আসবে আমাদের কাছে যাবে।"

শৈলেন বলিল "তবে এ মহলটা আমায় দেবার মানে কি? এ মহলে কেউ থাকবে না যখন—"

সুষমা বলিলেন "এটা ভবিষ্যতের জন্যে রইল ভাই। তোমরা ছেলেমানুষ এখন, সংসার যে কি, তা জান না। তোমার বড়দার বয়স অনেক হয়েছে, তিনি সব বোঝেন। ভবিষ্যতে পাছে কোনও গোল বাধে, তাই তিনি সময় থাকতেই সব আলাদা করে দিচ্ছেন। তোমার সব তোমার নামেই থাকবে, অথচ উনিই সব দেখবেন শুনবেন। তোমাকে সে ভার বইতে হবে না, ভয় নেই।"

শৈলেন চুপ করিয়া রহিল। পার্শ্বে একটা পিঁড়ি পড়িয়াছিল, সেটা টানিয়া শান্ত ভাবে তাহার উপর বসিয়া পড়িল। সুষমাও আবার তরকারী কুটিতে মনোযোগ দিলেন।

শৈলেন বলিল "যাক গে, যা হবার তাতো হয়েই গেল, কি বল বউদি? আর ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু দরকার নেই আমার। আমার যতদূর ক্ষমতা, বন্ধ করবার চেষ্টা করেছি। কিছুতেই কিছু হল না যখন, তখন আর ভেবে দরকার কি? আচ্ছা বউদি, তুমি যে এত উপদেশ দাও, এ সব শিখলে কোথা হতে? তুমি আমার চেয়ে বয়সে ছোট। আমি রইলুম ছেলেমানুষ, আর তুমি হলে কি না খুব বড় একটা প্রবীণা মেয়ে। আমি কিছুতেই ভেবে পাই নে, এই বয়সে তুমি এত অভিজ্ঞতা পেলে কোথায়।"

সুষমা হাসিয়া উঠিলেন। শৈলেন ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "এত হাসি যে পাও কোথা তুমি—আমি তাই ভাবি। তোমার মুখের হাসি যেন কিছুতেই আর মিলাতে চায় না।"

সুষমা বলিলেন "ভগবানের কাছে দিনরাত তাই প্রার্থনা করি ঠাকুরপো, আমার হাসি যেন চিরকালই আমার ঠোঁটে লেগে থাকে। মেয়েরা কত ছোট বয়সে অভিজ্ঞতা লাভ করে, সে হিসাব দেখছি একটুও রাখ নি। এখন আমার যে বয়স, এ তো ঠিক অভিজ্ঞতা লাভের সময়। তুমি একটা বার-তের বৎসরের ছেলের সঙ্গে একটা ওই বয়সেরই মেয়ের তুলনা করে দেখ, দুজনের মধ্যে কতদূর পার্থক্য, স্পষ্ট তা তোমার চোখের সামনে ফুটে উঠবে। ছেলেটা তখনও গাছে ওঠে, ঢিল ছোড়ে, কিছুমাত্র বোধ-জ্ঞান নেই,—মেয়েটী সে সময় সংসারের অর্দ্ধেকটা চিনে ফেলে গম্ভীর হয়ে পড়ে। ছেলে মেয়েতে প্রভেদ অনেক আছে ভাই। সতের-আঠার বছরের ছেলেটী যখন বই পড়ছে, আর মাথায় কেবল বদমায়েসী বুদ্ধি আঁটছে, সেই বয়সের মেয়ে তখন মা হয়ে সন্তান প্রতিপালন করছে। তোমাদের সঙ্গে আমাদের অনেক প্রভেদ আছে ভাই।"

শৈলেন গুম হইয়া বসিয়া রহিল। সুষমা বলিলেন "ভাবছ কি ঠাকুরপো?"

শৈলেন বলিল "ভাবছি, আজ তো সব পৃথক হয়ে গেল, তবে এত তরকারি কুটছ কেন? অন্য দিন যা কোটা হয়, আজও তাই কোটা হচ্ছে দেখছি।"

সুষমা আলুর খোসা ছাড়াইতে-ছাড়াইতে বলিলেন, "আজই কি পৃথক খাওয়া-দাওয়া হয়? সব যোগাড় করবে, তবে তো আলাদা রাঁধবে? এ বেলাটা একত্রই হোক, ও বেলা যা হোক হবে।"

মেজবাবুর খানসামা রাখাল কয়েকটা মুটের মাথায় হাঁড়ি, সরা, তরকারী, তৈল ইত্যাদি চাপাইয়া ঠিক সেই সময়েই ফিরিল। শৈলেন বলিয়া উঠিল "ওই দেখ বউদি, ভোর হতে না হতে দেখছি মেজবউদি একে বাজারে পাঠিয়েছিল। যাই হোক, কাজের লোক বটে; হিসেবটী ঠিক আছে।"

সুষমা রাখালকে ডাকিয়া বলিলেন "কি রে? ওসব কোথা থেকে কিনে আনলি?"

রাখাল একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল; বলিল, "মেজ-মা টাকা দিছলেন কিনে আনবার জন্যে, তাই—"

বাধা দিয়া সুষমা বলিলেন "ঘরে কি হাঁড়ি, কড়া, সরা নেই? অনর্থক এ পয়সাগুলো ব্যয় করা কেন? আর এ বেলা তো এখানেই খাওয়া-দাওয়া হবে'খন,—এত ভোরে বাজারে পাঠানোরই বা কি দরকার ছিল মেজ-বউয়ের? ওসব ফেরৎ দিয়ে আয় রাখাল। এ বেলা খাওয়া-দাওয়াটা মিটে যাক,—আমি দুপুরে গৃহস্থালীর যা-যা দরকার দেব'খন।"

রাখাল মাথা চুলকাইতে-চুলকাইতে বলিল "আজ্ঞে—"

সুষমা বলিলেন "আবার কি বল্‌তে চাস তুই—বল তো ?"

রাখাল বলিল "মেজমা যদি—"

সুষমা বলিলেন "মেজবউ বকবে বলে ভয় পাচ্ছিস ? কিছু ভয় নেই তোর, আমি তাকে বলে আসছি এখনি।" প্রসন্ন মুখে কুলীদের লইয়া রাখাল ফিরিতেছিল ; সেই সময় দ্বিতলের বারাণ্ডা হইতে তীব্রকণ্ঠে সুলতা ডাকিল "রাখাল !"

সে সুষমার সব কথাই শুনিতেছিল। সুষমার এ দয়াটুকু লইতে কোনমতেই সে রাজী ছিল না। সুষমা উপর পানে তাকাইয়া দেখিলেন, সুলতা বারাণ্ডার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সুষমা মিষ্ট স্বরে বলিলেন "এ সব জিনিস এখনি বাজার হতে আনবার কি দরকার ছিল ভাই মেজবউ ? এ বেলা তো এখানেই খাবে, তবে—" বাধা দিয়া সুলতা বলিল "তোমায় আগেই তা কে বললে বড়দি ?" আহত হইয়া সুষমা বলিলেন "কেউ বলে নি ভাই, আমি কিন্তু এ বেলা তোমাদের এখানেই খাবার যোগাড় করছিলুম।"

সুলতা মাথা নাড়িয়া বলিল "না ভাই বড়দি, তা হতে পারবে না। তোমার মেজ দেওর কিছুতেই তাতে রাজি হবেন না। তুমি বুঝি ভাবছ, এ বেলা ওখানে খাবার কথাটা আমি তাঁকে বলি নি ? তিনি বললেন, তা হতে পারবে না। যখন ভাগ হয়ে গেছে সব, তখনই আমরা আলাদা হয়ে গেছি। তিনিই যখন খেতে রাজি নন ভাই বড়দি, আমি কি করব বল দেখি ?"

সুষমা সবই বুঝিলেন ; একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "বেশ, তবে তাই হোক। কিন্তু—সেজবউ—"

সুলতা বলিল "সে একলা মানুষ, আর তার একটা ঝি বই কেউ নেই। আমার ওখানেই চলে যাবে'খন তাদের।"

সুষমা বলিলেন "যাক সে কথা। এ সব কিনে আনবার কি দরকার ছিল ? ঘরে চাল, তেল, মুন, ডাল যা কিছু আছে, এসো তুমি, আমি সমান ভাগে ভাগ করে দিচ্ছি। অনর্থক এ সব কিনে আনবার তো কোনই দরকার নেই ভাই। আমি তাই রাখালকে বলছি, ওসব ফিরিয়ে দিয়ে আসতে।"

সুলতা আবার মাথা নাড়িয়া বলিল "না ভাই বড়দি, তা হবে না। আমি সে কথাও তোমার মেজ দেওরকে বলেছিলুম, তিনি তাতেও রাজি নন। আমি কি করব ভাই বড়দি, আমার হাত যদি থাকত এতে, আমি কক্ষনও পৃথক হতুম না। কি করব ভাই ? কিছুর মধ্যে না থেকেও আমার নাম হয়ে গেল আমিই বজ্জাত, আমিই সব করেছি। ভগবান তো আছেন বড়দি, তিনিই সব দেখছেন ; আমি আর কি বলব।" সুষমা আর একটা কথাও বলিলেন না। সুলতা আর একবার রাখালকে ডাকিয়া সেখান হইতে সরিয়া গেল। রাখাল বড় বধূর পানে তাকাইয়া, আবার মাথা চুলকাইয়া বলিল "বড় মা—" সুষমা বলিলেন "নিয়ে যাও তোমার মেজমার কাছে।" রাখাল মুটেদের লইয়া চলিয়া গেল। শৈলেন মাথা নাড়িয়া বলিল "কিছু জানে না বউদি, বড্ড ভালমানুষটাকে আমরা সব দোষ দিচ্ছি। বাস্তবিক বউদি, এই সব দেখে-শুনে আমার এক-একবার ইচ্ছে হয়, বিয়ে করি। বউকে শিক্ষা দিয়ে এমন ভাবে গড়ে তুলব, যে লোকে একেবারে অবাক হয়ে যাবে।"

সুষমা মলিন মুখে একটু হাসি ফুটাইয়া বলিলেন, "বাস্তবিক তাই করে ফেল না ঠাকুরপো। সংসারে আদর্শ স্ত্রীর অভাব ঘটেছে বলেই তো সংসার দিন-দিন রসাতলে যাচ্ছে। তোমরা সবাই জাগো, মেয়েরাও জাগুক। আবার আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ মা হবার জন্যে তারাও প্রাণপণে চেষ্টা করবে। কিন্তু আগে জাগতে হচ্ছে ভাই তোমাদের, কারণ প্রথমটা গড়ে তুলবে তোমরা। বাস্তবিক তুমি শিগগির করে একটা বিয়ে করে ফেল। এই তো সামনেই এক মাস বাদে অগ্রহায়ণ মাস, বল যদি তার মধ্যেই আমি সব ঠিক করে ফেলি।" শৈলেন যেন নিজের ফাঁদে নিজেই জড়াইয়া পড়িল। বউদির হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল "এত তাড়াতাড়ির দরকারই বা কি বড় বউদি। বিয়ে তো এখনই পালিয়ে যাচ্ছে না যে তাড়াতাড়ি তাকে চেপে ধরতে হবে।"

সুষমা বলিলেন "বিয়ে তাড়াতাড়ি পালাচ্ছে না বটে ঠাকুরপো, কিন্তু তোমায় আমি বিশ্বাস করতে পারি নে।"

শৈলেন অপ্রতিভের হাসি হাসিল, "না, সত্যি বলছি বউদি, বিয়ে আমি করব, আমায় তুমি অনায়াসে বিশ্বাস করতে পার। তবে এত তাড়াতাড়ি করে লাভটা কি ? দুদিন বাদেই হোক না কেন। একজামিনে আগে অ্যাপিয়ার হই, ফুলমার্ক পেয়ে পাস হয়ে যাই, তার পরে।"

সুষমা বলিলেন "ঠিক বলছ ?"

"ঠিক, ঠিক" বলিয়া শৈলেন তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িল।

বাদ্‌শাহী কথা *

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আত্মকাহিনী

আত্মকাহিনী এবং ঘটনার কালানুক্রমিক বিবরণ (chronicles) লেখাটা যেন মুসলমান্‌-প্রতিভার একটা বিশেষত্ব ছিল। মুসলমান-সম্রাট্‌দের অনেকেই এই রচনা-অনুরাগের পরিচয় দিয়াছেন। আমরা মধ্য-এশিয়া হইতে তাইমুর, বাবর ও হায়দর মীর্জ্জার আত্মকাহিনী, এবং আবুল-ঘাজির কালানুক্রমিক ইতিহাস পাইয়াছি; পারস্য হইতে পাইয়াছি—শাহ্‌ তহ্‌মাস্পের আত্মকাহিনী; আর ভারত হইতে পাইয়াছি—শাহ্‌জাদী গুল্‌বদন ও জহাঙ্গীরের আত্মজীবনী। বাদশাহ্‌দের মধ্যে কেহ কেহ আবার নিজের জীবন-কাহিনী নিজে না লিখিয়া কর্ম্মচারীদের দ্বারা লেখাইতেন; যেমন—আবুল-ফজল্‌ আকবরের আদেশে 'আকবর-নামা', এবং আবদুল-হমীদ্‌ লাহোরী ও মুহম্মদ ওয়ারিস্‌ শাহ্‌জহানের আদেশে 'পাদিশাহ্‌-নামা' রচনা করেন। মুসলমানদের এই ইতিহাস লিখিবার ঝোঁক—পূর্ব্বাপর ঘটনার বিবরণ লিখিয়া রাখিবার প্রবৃত্তি—শুধু যে সেকালেই ছিল তাহা নহে, একালেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কিছুদিন হইল আমরা আফ্‌ঘানিস্থানের পরলোকগত আমীর আবদুর রহমানের ও ভূপালের বেগমের জীবনচরিত, আর পারস্যের শাহ্‌র রোজনামচা পাইয়াছি। ইহাতে বোধ হয় যে, তাহাদের এই প্রবৃত্তিটা জাতিগত।

মোগল-বাদশাহ্‌দের মধ্যে আকবরকে বাদ দিলে, সম্রাট্‌ বাবরের প্রতিই সর্ব্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়; তাঁহাকেই বিশেষ করিয়া আমাদের মন শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিতে চায়। ইহার প্রধান কারণ, তাঁহার পারিবারিক জীবন-সম্বন্ধে আমরা যতটা জানিতে পারি, আর কোন বাদশাহ্‌র সম্বন্ধে ততটা পারি না। তা ছাড়া তাঁর জীবন-কথা বৈচিত্র্যপূর্ণও বটে। বাবর তুর্ক ভাষায় তাঁহার এই জীবন-কথা—'বাবর-নামা'—লিখিয়া গিয়াছেন। জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতি ভুলচুক্‌ দোষগুণ জয়-পরাজয়—সকল কথাই তিনি অকপটে ব্যক্ত করিয়াছেন। এইজন্য তাঁহার আত্মকাহিনী অমূল্য—ইতিহাসের স্থায়ী সম্পদ্‌। বেভরিজ বলেন,—

বাবর

'বাবরের আত্মজীবনীকে সেণ্ট অগষ্টাইন্‌ ও রুসোর আত্মকথা, বা গীবন্‌ ও নিউটনের আত্মকাহিনীর সমান সম্মান দেওয়া যায়।'

বাবরের আত্মকথা বহু তথ্যপূর্ণ; তবে ইহার দোষও যে নাই, একথা সাহস করিয়া বলা চলে না। বাবর-নামার প্রথম অংশটা অপূর্ব্ব, অতুলনীয়; কিন্তু বাকি অংশ পড়িতে নীরস—অবসাদজনক। ইহার অনেকস্থলে অসংলগ্নতা ও পুনরুক্তি-দোষ আছে, আর আছে—ঘটনা-বিন্যাসের ত্রুটি।

বাবরের পুত্র হুমায়ুন্‌ বা পৌত্র আকবর কেহই আত্ম-কাহিনী রাখিয়া যান নাই। তবে আবুল-ফজলের লেখা 'আইন্‌-ই-আক্‌বরীর' শেষে (iii. 380-400) আমরা আক্‌বরের কতকগুলি 'বচন' দেখিতে পাই। এগুলি তেমন তথ্যপূর্ণ না হইলেও বেশ চিত্তাকর্ষক।

* 'দীপালী সম্মিলনে'র প্রথম অধিবেশনে পঠিত

হুমায়ূন
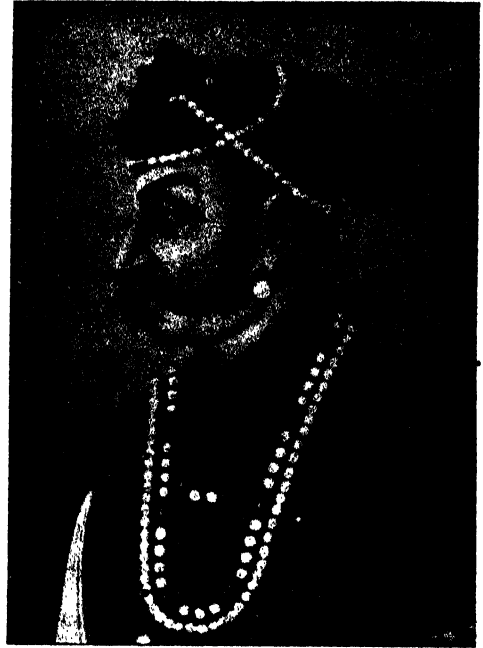
জহাঙ্গীর

আকবরের পুত্র জহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী—'তুজুক্-ই-জহাঙ্গীরী।' লোকটি দোষেগুণে মিশ্রিত; শান্তিপ্রিয়—অসির ঝন্ঝনা তাঁহার প্রাণে বিরক্তির সঞ্চার করিত। ন্যায়বিচারের জন্য তাঁহার খ্যাতি ছিল। খুনের অপরাধে একবার তিনি একজন প্রতিপত্তিশালী লোকের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এই উপলক্ষে তিনি লিখিয়াছেন, 'এরূপ অপরাধে আমি আমীর তো দূরের কথা—রাজকুমারদেরও রেহাই দিতে রাজি নই।' এই ন্যায়বিচারের গুণটা বোধ হয় তাঁহার পৈতৃক। আকবরও বলিতেন, 'আমি নিজেও যদি অন্যায় করি, শাস্তি লইতে কুণ্ঠিত হইব না।' (*Ain*, iii. 387). কিন্তু জহাঙ্গীর ন্যায়বিচারের পক্ষপাতী হইলেও মাতাল, আফিংখোর, মহাবিলাসী এবং কতকটা খামখেয়ালী। কাজেই কোথাও কোথাও তাঁহার বিচার-বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। তাঁহার আত্মকাহিনী হইতেই একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।—একবার তিনি শিকারে যান। একটা নীলগাইকে গুলি করিতে যাইতেছেন, এমন সময় একটা সহিস ও দুইটা চাকর হঠাৎ তাঁহার সামনে আসিয়া পড়ে, আর সেই সুযোগে শিকার হাতছাড়া হইয়া যায়। জহাঙ্গীর তো রাগিয়া আগুন; তখনি হুকুম দিলেন,—'বধ করো সহিসটাকে এখনি। আর শিরা কেটে লোক দুটোকে খোঁড়া করে দাও, তারপর গাধার পিঠে চড়িয়ে ঘোরাও তাদের শিবিরের চারপাশে। তাদের সাজার বহর দেখলে আর কেউ কখনো এমন কাজ করবে না।' কিন্তু বাহাদুরী এই যে, এরূপ ঘৃণা ও বিরক্তি-উদ্দীপক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই।

জহাঙ্গীরের লেখার আরও একটি বিশেষত্ব এই,—তিনি শুধু 'নিজের কথাই পাঁচকাহন' করেন নাই,—পিতা আকবর শাহ্‌রও একটা অমূল্য চিত্র আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। অবশ্য একথাও ঠিক, তিনি নিজের বিষয়েও যাহা লিখিয়াছেন তাহারও একটা মূল্য আছে;—তাহার ভিতর দিয়াই আমরা তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে পারি। জহাঙ্গীরের রাজ্যকাল কোন বিশিষ্ট যুদ্ধ বা সদনুষ্ঠানের জন্য তেমন প্রসিদ্ধিলাভ করে নাই। তাঁহার একমাত্র উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান—আগ্রা হইতে লাহোর পর্য্যন্ত ছায়াশীতল তরুবীথিকা-নির্ম্মাণ।

জহাঙ্গীরের চরিত্রের একটা বিশেষত্ব—প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ফুলের প্রতি অনুরাগ। বাবরেরও তাই। পশ্চাতে

শত্রু—বাবর ঘোড়া ছুটাইয়াছেন। হঠাৎ এক যায়গায় প্রকৃতির পুষ্পপত্রের শোভা দেখিয়া বাবর আত্মহারা হইয়া থামিয়া গেলেন। পিছনে যে শত্রু—সে' খেয়ালই নাই। তারপর যখন ঘোড়ার পায়ের শব্দ খুব নিকটবর্ত্তী হইল, তখন তাঁহার চট্‌কা ভাঙিল!—তিনি চকিতে ঘোড়া ছুটাইলেন।

বাবর কিন্তু হিন্দুস্থানে (উত্তর-ভারতে) অনেক জিনিষেরই অভাব বোধ করিয়া জন্মভূমির জন্য উতলা হইয়া উঠিতেন। বলিতেন, 'এদেশের লোকগুলার দেহে রূপলাবণ্য নাই। * * * তার উপর তাহারা স্নেহসৌজন্যহীন, অসামাজিক। এখানে আঙুর নাই, খেজুর নাই; বরফ, ঠাণ্ডাজল, ভাল ঘোড়া প্রভৃতি কিছুই নাই। বাজারে রুটি বা খাবার মেলে না। এখানে না-আছে স্নানাগার (হামাম্), না-আছে কালেজ, না-আছে মশাল, আর না-আছে ঝাড়লণ্ঠন মোমবাতি!' (*Baburnama*, iii. 518). আর এক যায়গায় বাবর বলিতেছেন,—'সেদিন আমি একটা খর্ম্মুজা পাইলাম। খর্ম্মুজাটা কাটিতেই দেশের জন্য আমার মন কেমন করিতে লাগিল। আমি যে গৃহহারা—জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত—এই কথাটাই তখন আমার মনে জাগিয়া উঠিল। আমি না-কাঁদিয়া থাকিতে পারিলাম না।'

কিন্তু সুদূর জন্মভূমির প্রতি এইরূপ মনের ভাব সত্ত্বেও হিন্দুস্থানের উপর বাবরের যে আকর্ষণ ছিল না, তাহা নহে। সে আকর্ষণের প্রধান কারণ রাজ্য ঐশ্বর্য্য, এবং অপ্রধান কারণ, শোভাসম্পদের প্রতি অজ্ঞাত অনুরাগ বলিয়াই মনে হয়। নতুবা হিন্দুস্থানের জীবজন্তু, ফলফুলের কথা তিনি এত যত্ন করিয়া—এত বেশি করিয়া—লিখিলেন কেন? *

এদেশ জয় করিবার পর, আগ্রার অসহ্য উত্তাপে অতিষ্ঠ হইয়া সৈন্যসামন্তেরা যখন কাবুলের ঠাণ্ডা বাতাসে ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করে, তখন বাবর তাহাদের উপর বিরক্ত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। তিনি তাহাদের স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, 'দুর্দ্ধর্ষ শত্রু পরাজিত—ধনধান্যপূর্ণ বিশাল সাম্রাজ্য পদতলে। এত দুঃখকষ্টের পর কাম্যফল লাভ করিয়া, শেষে পরাজিত শত্রুর মত ম্লানমুখে কাবুলে ফিরিব? তোমাদের মধ্যে যারা আমার বন্ধুত্বের দাবী করে, তাদের মুখে আর কখনো যেন এমন প্রস্তাব না শুনি। মর্জ্জী হয়, দেশে ফিরিতে পার—আমি কিন্তু হিন্দুস্থান হইতে এক পাও নড়িব না।' সৈন্যগণ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিল; বুঝিল না কেবল বাবরের পুরাণো বন্ধু—খাজা কিলান্। তিনি দেশে ফিরিলেন। ফিরিবার মুখে দিল্লী শহরের এক দেওয়ালে লিখিয়া গেলেন,—

'সুখেস্বাস্থ্যে যদি আমি
পার হতে পাই সিন্ধু,
হিন্দুস্থানের জন্যে আমার
দুঃখ নেই একবিন্দু।'

বাবর উত্তরে বন্ধুকে এই কবিতাটি লিখিয়া পাঠান,—

'বাবর! বলো হৃদয় খুলি, 'ধন্য খোদা তোমার দান,
যাঁহার তরে সিন্ধু পেলে, বিশাল রাজ্য হিন্দুস্থান;—'
উষ্ণ বলে, ঠাণ্ডা পাহাড় করলে যাঁদের উন্মনা,
ভাবুন তাঁরা, তুষার হিমে ঘাজ্‌নী কেমন কন্‌কনা!'

জহাঙ্গীর কিন্তু পুরাদস্তুর ভারতীয়। এদেশের বকুল-চাঁপার গন্ধে তাঁহার মন মাতাল হয়। কাশ্মীরের বনফুল তাঁহার মন ভুলায়, মুকুলিত লালে লাল পলাশের গুচ্ছ দেখিয়া বলেন, 'নেহারি, নয়ন আর না পারি ফেরাতে।' এদেশের আম খাইতে খাইতে বলেন, 'এর সঙ্গে আফ্‌ঘানিস্থান বা মধ্য-এশিয়ার কোন ফলের তুলনাই হয় না!' আবার হিন্দু-পণ্ডিত ও যোগীদের সঙ্গে আলাপ করিয়া তিনি আনন্দ পান।

আত্মকাহিনীর দোষগুণ

ইতিহাসের দিক্ হইতে এই সব আত্মকাহিনীর মূল্য যে কত বেশি, তাহা না বলিলেও চলে। প্রাচ্য-ইতিহাসের বেশির ভাগই অতি-প্রশংসাদোষে দুষ্ট। এমন কি, যেখানে খোশামোদ বা সত্য গোপন করিবার কোনই কারণ নাই, সেখানেও বর্ণিত বিষয়ের গৌরবে আত্মহারা হইয়া লেখক প্রভুর এমন এক কাল্পনিক চিত্র খাড়া করেন, যাহা তাঁহার প্রকৃত চরিত্রের পরিপন্থী। কিন্তু বাদশাহ্‌দের আত্মকাহিনীগুলির সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। কাহারও ভয়ডর, বা কৃপাকণালাভের কোন কারণ তাঁহাদের ছিল না; তাই, তাঁহারা সমসাময়িক রাজা বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ক্রটিবিচ্যু[illegible]

* Babur's Opinion of India—H. Beveridge, *Asiatic Quarterly Review*, April, 1907.

স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিতে পারিয়াছেন। বাবর আত্ম-কাহিনীতে যাহারই কথা লিখিয়াছেন, তাহাদের প্রায় সকলের সম্বন্ধেই রাখিয়া-ঢাকিয়া কোন কথা বলেন নাই—এমন কি নিজের বাপের সম্বন্ধেও নয়। তবে নিজের অখ্যাতি, দোষ ত্রুটি—গোপন করাই মনুষ্য-চরিত্রের পক্ষে স্বাভাবিক, আর বাদশাহ্‌দেরও যে সে দুর্ব্বলতা ছিল, তাহা অস্বীকার করা চলে না। শাহ্‌ ইস্‌মাইলের অধীনতা-স্বীকার, ঘাজ্‌দাওনের পরাজয়, আলাম লোদীর [সুলতান আলাউদ্দীনের] প্রতি অন্যায় আচরণ—এসব কথা বাবর তাঁহার আত্মকাহিনীতে একেবারে গোপন করিয়াছেন। জহাঙ্গীরও নিজ 'তুজুকে' বাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও শের আফ্‌কনের মৃত্যুর কারণ যথাযথ উল্লেখ করেন নাই। এমন কি স্নেহময়ী গুল্‌বদনও স্নেহের আতিশয্যে ভ্রাতা হুমায়ন্‌ ও হিন্দালের দোষত্রুটি 'হুমায়ন্‌-নামা'য় ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

শৈশব-শিক্ষা

মোগল-আমোলে গজল-রচনা, হাতের লেখা, ফার্সী পুঁথি ভাল করিয়া নকল করা, সঙ্গীতের সাধনা, উপস্থিত উত্তর-দান (হাজির জবাব) প্রভৃতি—রাজপরিবারের নিকট, অস্ত্রবিদ্যা অপেক্ষা কোন অংশে কম আদরের বা গর্ব্বের সামগ্রী ছিল না। তাই আমরা দেখি, শৈশবে রাজবংশের ছেলেমেয়ে সকলকেই শিক্ষালাভ করিতে হইত, এবং শিক্ষালাভের ব্যবস্থা সকলেরই ছিল।* কোরাণ সকলকেই পড়িতে হইত; তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই উহা কণ্ঠস্থ ছিল। নানা ধরণের (শিকস্তা, নসখ্‌, নস্তালিক্‌) হাতের লেখার উৎকর্ষের দিকে খুব নজর রাখা হইত। জহাঙ্গীর, দারা শুকো, আওরংজীব প্রভৃতির সুন্দর হাতের লেখাই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। বাদশাহ্‌ ও কুমারদের প্রায় সকলেরই আরবী, ফার্সী, এমন কি হিন্দী ভাষাতেও অধিকার ছিল। কেহ কেহ আবার তুর্ক ভাষাতেও পারদর্শী ছিলেন।

সাহিত্য ও শিল্পানুরাগ

মোগল-বংশের বাদশাহ্‌ ও শাহ্‌জাদারা প্রায় সকলেই খুব কাব্যামোদী ও রসগ্রাহী ছিলেন, অনেকে কবিতাও লিখিতেন। হাফিজ, ওমর খায়াম্‌, সাদী, রুমী, জামী প্রভৃতির কাব্যরস তাঁহাদের উপভোগের প্রধান উপকরণ ছিল। শুধু কাব্যামোদী ছিলেন বলিলে ঠিক বলা হয় না—মোগল-বাদশাহ্‌রা সকল প্রকার বিদ্যারই কদর করিতেন; তাই তাঁহাদের দরবারে দেশ-বিদেশ হইতে ভাল ভাল কবি, দার্শনিক, চিকিৎসাবিদ্‌ ও পণ্ডিতেরা আসিয়া মিলিতেন।

বাবর, হুমায়ন্‌ ও জহাঙ্গীর—তিনজনেই পুরামাত্রায় কবি। কাবুলের কাছে এক পাহাড়ের গায়ে বাবরের নির্ম্মিত লাল পাথরের ছোট একটি চৌবাচ্চা ছিল। সময়ে সময়ে সেটি টুক্‌টুকে লাল মদিরায় ভরিয়া দেওয়া হইত। বাবর এইখানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেন; সুন্দরী তরুণীরা গান গাহিয়া তাঁহার চিত্তবিনোদন করিত, পিয়ালা ভরিয়া মদ্য পান করাইত। চৌবাচ্চার গায়ে বাবরের এই কবিতাটি খোদিত আছে:—

"মধুর হচ্ছে ধরার পরে নববর্ষ-আগমন,
মধুর হাসি মধুমাসের দেখ্‌লে ভোলে দু'নয়ন;
আঙুর-পাকা ফলের সেরা, রসটি তাহার সুমধুর।
তাহার চেয়ে অতি মধুর, হচ্ছে প্রেমের কোমল সুর।
বাবর, তোমার তিয়াস মিটাও, উড়ে পালায় সুখপাখী;
উড়লে পরে ফিরবে না আর, হবে তোমার সব ফাঁকি।"

(Lane-Poole's *Babar*, p. 152).

তুর্ক ও ফার্সী ভাষায় গদ্য ও পদ্য-রচনায় *বাবর সমান কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার আত্মীয় মীর্জ্জা হায়দর লিখিয়াছেন,—'তুর্ক ভাষায় কবিতা-রচনার কৃতিত্বে একমাত্র আমীর আলি শীরের পরই বাবরের নাম করা যাইতে পারে।' (*T-i-Rashidi*, Ross & Elias, 173). সঙ্গীতেও বাবরের বেশ অধিকার ছিল। তিনি এক নূতন ধরণের হাতের লেখার প্রবর্ত্তক। তাঁহার এই লেখার ধরণটা 'খৎ-ই-বাবরী' নামে পরিচিত।

হুমায়ুনের 'দিউয়ান্‌' বা কবিতাবলী আক্‌বরের

* মোগল-অন্তঃপুরিকাদের সুশিক্ষা, সুরুচি ও সাহিত্যালোচনার বিস্তৃত বিবরণ, আমার "মোগল-যুগে স্ত্রীশিক্ষা" পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

* বাবরের কবিতার নমুনা যাঁহারা দেখিতে চান, তাঁহারা এইগুলি পড়িবেন:—Divan-i-Babur Padshah, E. Denison Ross, Extra No. J. *A.S.B.* 1910; Some Verses by the Emperor Babar, *Asiatic Quarterly Review*, Jany. 1911, pp. 98-101; *Akbarnama*, tr. by H. Beveridge, vol. i; *Baburnama* tr. & ed. by A. S. Beveridge, vols. i-iv.

রাজপাঠাগারে রক্ষিত ছিল। তিনি শুধু কবি ন'ন—নানা জটিল শাস্ত্রেও তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল; যেমন দর্শন, জ্যোতিষ, গণিত ও ভূগোল।

হুমায়ুনের বৈমাত্রেয় ভাই—শাহ্জাদা কামরান্ও একজন উঁচুদরের কবি। তাঁহার লেখা দিউয়ান্ পাটনা খুদাবখ্শ লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে।

কবি ও কাব্যের সম্বন্ধে বাদশাহ্ আক্বরের মনের ভাব কিরূপ ছিল, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা শক্ত। আবুল-ফজল্ তাঁহার আক্বর-নামায় লিখিয়াছেন যে, বাদশাহ্ কবিদের বড় একটা আমোল দিতেন না। আক্বরও বলিতেন,—'দড়ির উপর যে বাজীকর বাজী করে তাহাতে, আর একজন কবিতে তফাৎ এই,—একের বাহাদুরী হাতে আর পায়ে; আর একজনের—বাক্যের ছটায়।' (*Ain*, iii. 386). কিন্তু ইহা সত্ত্বেও দেখা যায়, ফৈজী-প্রমুখ কবিরা তাঁহার দরবারে আদর পাইয়াছেন। কবি ওমর খাইয়াম্ সম্বন্ধে বাদশাহ্র ধারণা এতই উচ্চ ছিল যে, তিনি বলিতেন—"মদের সঙ্গে 'চাট্' না হইলে মদ যেমন সুপেয় হয় না, তেম্নি হাফিজের কাব্যরস সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করিতে হইলে, সঙ্গে সঙ্গে ওমর খাইয়ামের চতুষ্পদী কবিতাগুলি পড়া চাই।" (*Ain*, iii. 392). রাজা-বাদ্শাহ্দের মধ্যে বোধ হয় তিনিই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ্যভাবে ওমর খাইয়ামের গুণকীর্ত্তন করেন।

বাদশাহ্ আকবরের বিদ্যানুরাগ ছিল আশ্চর্য্য রকমের। তাই দেখা যায়, তাঁহার রাজ্যকালে সাহিত্য ও কলার বিশেষ পরিপুষ্টি হইয়াছে—বাদশাহ্ও উৎসাহ দিতে কসুর করেন নাই। আবুল-ফজল, নিজাম্-উদ্দীন্, বদায়ুনী ও আরও অনেকে ফার্সীতে ভাল ভাল ইতিহাস রচনা করেন। সুপ্রসিদ্ধ 'আইন্-ই-আক্বরী' আবুল-ফজলের ৭ বৎসর পরিশ্রমের ফল। তাঁহাকে সে যুগের Sir William Hunter বলিলে অন্যায় হয় না। ফার্সীতে যাঁহারা কবিতা বা কাব্য লিখিতেন, তাঁহাদের মধ্যে আবুল-ফজলের ভ্রাতা ফৈজীরই খ্যাতি ছিল সব চেয়ে বেশি।

এক কথায়, আকবরের যুগকে ভারতের স্বর্ণ-যুগ বলা যাইতে পারে। রাজ্যের চারিদিকেই বাদশাহ্র বিজয়-ডঙ্কা বাজিতেছে—চারিদিকেই উন্নতির লক্ষণ পরিস্ফুট। এহেন গৌরবময় মোগল-দরবারের আকর্ষণে যে দেশ-বিদেশের জ্ঞানীগুণী এখানে আসিয়া সমবেত হইবেন, তাহা কিছু বিচিত্র নয়। আকবর তাঁহাদের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া 'নৌরতন্' বা নবরত্ন সভা * গড়িয়াছিলেন।

কিন্তু অনেকে হয় তো শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, মোগল-গৌরব বাদশাহ্ আক্বরের অক্ষর-জ্ঞান ছিল না। তবে প্রাচ্য-ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত কিছু নূতন নহে। আলাউদ্দীন্ খিল্জী, হায়দর আলী, ছত্রপতি শিবাজী, পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহও বর্ণমালায় অভিজ্ঞ ছিলেন না; কিন্তু জ্ঞানে-গুণে শাসনদণ্ড-পরিচালনায় ইঁহারা সকলেরই স্মরণীয় ও বরণীয়। অক্ষর-জ্ঞানের অভাবের জন্য আকবর এতটুকু লজ্জিত ছিলেন না; বরং সেটা সমর্থন করিবার জন্যই
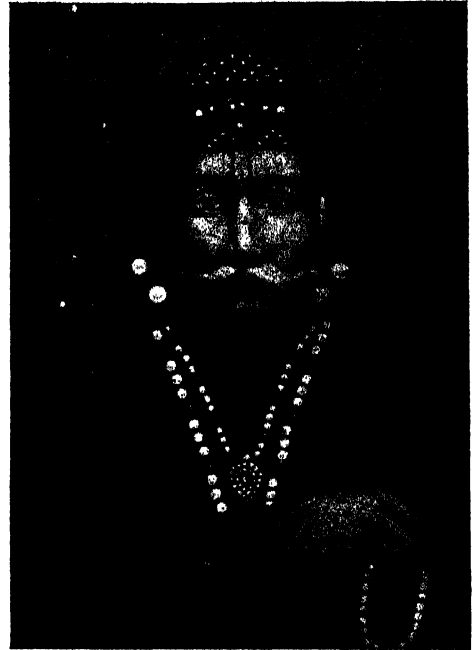
আকবর

বোধ হয় বলিতেন,—'প্রেরিতপুরুষেরা সকলেই নিরক্ষর; তাঁহাদের ভক্তদেরও উচিত—নিজ নিজ পুত্রদের মধ্যে একটিকে নিরক্ষর করিয়া রাখা।' (*Ain*. iii. 385) শৈশবে পাঠে বীতশ্রদ্ধ হইলেও, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আকবরের কৌতূহল ও জ্ঞানপিপাসা বাড়িয়া উঠে। বেতনভোগী

* (১) রাজা বীরবল, (২) রাজা মানসিংহ, (৩) রাজা টোডর মল্, (৪) হকীম্ হুমাম্, (৫) মুল্লা দু'পিয়াজা, (৬) ফৈজী, (৭) আবুল-ফজল্, (৮) মীর্জ্জা আবদুর-রহিম খান্ খানান্, (৯) মিঁয়া তান্সেন্।

নবরত্ন সভা

পাঠকেরা তাঁহাকে নিয়মিতরূপে ইতিহাস, ধর্ম্মগ্রন্থ, সুফী-কবিদের কবিতাদি পাঠ করিয়া শুনাইত। অসাধারণ স্মরণশক্তি বলে তিনি বহু বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন, আর এইজন্যই নানা জটিল বিষয় লইয়াও তর্কবিতর্ক করিতে পারিতেন। চোখে না পড়িয়া হউক, কানে শুনিয়া তিনি জ্ঞানভাণ্ডার হইতে প্রচুর সম্পদ্ আহরণ করিয়াছিলেন। আগ্রায় তাঁহার বিরাট্ পুস্তকালয় ছিল। এই পুস্তকালয়ে ছাপা বই ছিল না;—ছিল, প্রায় ৬৪৷৷০ লাখ টাকা দামের ৪ হাজার সুন্দর বাঁধান, ছবিওয়ালা হাতের লেখা পুঁথি। (The Treasure of Akbar—V. A. Smith, *J. R. A. S.*, April 1915).

সঙ্গীত-শাস্ত্রে বাদশাহ্‌র বেশ জ্ঞান ছিল। তিনি বাইতেও জানিতেন, বিশেষ নাকারায় তাঁর বেশ ওস্তাদি ত ছিল। ভারতের অদ্বিতীয় সঙ্গীত-শাস্ত্রবিশারদ্ মিঁয়া তান্‌সেন তাঁহারই দরবারের একটি গৌরব। অঙ্কন-বিদ্যাতেও আকবরের পটুত্ব ছিল। তাঁহার রণনৈপুণ্যের কথা কে না জানে? আবার যুদ্ধের অনেক সাজ-সরঞ্জামও তিনি নিজে তৈয়ার করাইতেন। স্থাপত্যে বাদশাহ্‌র রুচির নিদর্শন—ফতেপুর সিক্রীর অপূর্ব্ব সৌধাবলী। আকবরী-আমোলের স্থাপত্যের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। সে বৈশিষ্ট্য হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতির কলা-পদ্ধতির একটা মিশ্রণ। দেখিলেই মনে হয়, বাদশাহ্ আকবর যেন তাঁহার চরিত্রের উদারতা—সামঞ্জস্যের ভাব—পাষাণে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

দর্শন শাস্ত্রেও আকবরের প্রগাঢ় অনুরাগ দেখা যায়। তিনি বলিতেন, 'দর্শনের উপর আমার এমন একটা মোহ আছে যে, তাহার আলোচনা পাইলে আমি সব ভুলিয়া যাই। পাছে দৈনন্দিন কর্ত্তব্যের ত্রুটি হয়, এই ভয়ে আমাকে জোর করিয়া দর্শনের আলোচনা হইতে দূরে থাকিতে হয়।' (*Ain*, iii. 386).

আকবরের যত্নচেষ্টায় সংস্কৃত, গ্রীক, আরবী ও তুর্কী হইতে অনেক সদ্‌গ্রন্থ ফার্সীভাষায় অনূদিত হয়;—যেমন, মহাভারত, রামায়ণ, অথর্ব্ববেদ, হরিবংশ, লীলাবতী ইত্যাদি। (*Ain*, i. 103-6).

মুসলমান-আমোলে কাব্যের ও ভদ্রসমাজের ভাষা ছিল—ফার্সী; তার উপর বাদশাহ্‌দের মন্ত্রীদের বেশির ভাগই পারস্য দেশের শিক্ষিত লোক। এইজন্য ইতিহাস ও চিঠি-পত্র ফার্সীতেই লেখা হইত। ধরিতে গেলে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হইতেই ভারতে (ধর্ম্মভিন্ন অন্য ক্ষেত্রে) আরবী ভাষার ব্যবহার উঠিয়া গিয়া ফার্সীর প্রচলন

হয়। ভারতে অনেক তুর্কী-সৈন্য ছিল সত্য ; কিন্তু ভদ্র মুসলমানদের মধ্যে তুর্কভাষার পাঠক ছিল কম ; তাই আক্‌বরের রাজ্যকালে, আগেকার আমোলের তুর্ক ও আরবী ভাষায় লেখা ইতিহাসগুলি ফার্সীতে ভাষান্তরিত করা হয় ; যেমন, বাবরের আত্মকাহিনী। ইহা অনুবাদ করেন—আকবরের অভিভাবক বয়রাম খাঁর ছেলে আব্দুর-রহিম * খান্ খানান্। (*Ain*, i. 105).

আকবরী-আমোলের সর্ব্বপ্রধান গৌরব একজন হিন্দু ভক্ত-লেখক। সে যুগের কোন মুসলমানী গ্রন্থে তাঁহার নামোল্লেখ্ নাই। ইনি অমর কবি তুলসীদাস। তাঁহার রচিত হিন্দী-রামায়ণ—রামচরিতমানস—কোটি কোটি নরনারীর হৃদয়মন জয় করিয়াছে। সে বিজয়-কীর্ত্তি অনেক রাজা-বাদশাহ্‌র যুদ্ধজয়ের কীর্ত্তির তুলনায় ঢের বেশি স্থায়ী —ঢের বেশি গৌরবজনক। কিন্তু বাদশাহ্ আকবরের সহিত এই ভক্ত কবির সাক্ষাৎ-পরিচয় ছিল বলিয়া মনে হয় না। সত্য কথা বলিতে কি, সে যুগে হিন্দী সাহিত্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। কবি তুলসীদাসের সঙ্গে আর একজন হিন্দী-কবির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি সুরদাস। অনেকে বলিত, তিনি হিন্দী কাব্য-জগতের 'সূর্য্য' স্বরূপ।

আকবরের পুত্র জহাঙ্গীরও সুকবি। কবি আমীর একটি কবিতার চরণ এইরূপ,—

'গোলাপ যদি তুল্‌তে চাহ
  করবে নাকো কাঁটার ভয়,—
একটি ফুলের তরেও বঁধু
  শতেক কাঁটা সইতে হয়।'

কবিতাটি শুনিবামাত্র জহাঙ্গীর নিজে যোগ করিয়া দেন,—

'সরাব চাহি, আরো সরাব
  আন্‌রে সাকী ফুলবাগান,
মেঘের আঁধার অনেক যখন
  খুশীর ঝলক চাই সমান।'

(*Iqbalnama*, Bib. Ind. p. 114).

* বেভরিজ এ মত সমর্থন করেন না। তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন, যে ফার্সী-অনুবাদ এতকাল আবদুর-রহিমের নামে চলিয়া আসিতেছে, তাহা তাঁহার জন্মের ২৭ বৎসর পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল! (*Asiatic Review*, 1900, pp. 114-24 ; 310-17).

জহাঙ্গীরের রচিত অন্যান্য কবিতা তাঁহার আত্মকাহিনীর স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

জহাঙ্গীর অঙ্কন ও চিত্রণের একজন প্রকৃত রসজ্ঞ ; চিত্রশিল্পীরা তাঁহার নিকট যথেষ্ট উৎসাহ পাইত। তুলিকা-

শাহ্‌জহান্

পাতেও তাঁহার কম পটুত্ব ছিল না। আগ্রা-প্রাসাদের দেওয়ালে যে-সব বাহারের কাজ আছে, তাহার কতকটা তাঁহার নিজেরই আঁকা। তাঁহার গান-বাজনার বিলক্ষণ রসবোধ ছিল। স্থাপত্য বিদ্যায়ও তাঁহার সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারই নির্দ্দেশমত, আকবরের অপূর্ব্ব সমাধিমন্দির—সিকান্দ্রার নক্‌শা তৈয়ার হয়। (Smith's *Oxford Hist. of India*, p. 388).

আকবরের মত, জহাঙ্গীরের পুত্র শাহ্‌জহান্‌ও সুদক্ষ মুন্‌শী রাখিয়া নিয়মিতরূপে নানা পুস্তকের পাঠ শুনিতেন। তিনি কাব্যের উপাসক, কবির ভক্ত এবং সঙ্গীতে অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার রাজ্যকালের সরকারী ইতিহাস-লেখক আবদুল হমীদ্ লাহোরী লিখিয়াছেন,—হিন্দি গানে শাহ্‌জহান্ ওস্তাদ। তাঁহার [illegible] মধুর গান শুনিয়া অনেক সাধু ও পণ্ডিতের [illegible] হইত। (*Padishah-nama*, I. A., 153). শাহ্‌জহানের রাজ্যকাল

উচ্চাঙ্গের স্থাপত্য ও কলাবিদ্যার অন্যান্য বিভাগের নিদর্শনের জন্য প্রসিদ্ধ। জগদ্বিখ্যাত তাজমহল তাঁহারই অমর কীর্ত্তি।

শাহ্‌জহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারা শুকো একজন পণ্ডিত লোক। আরবী, ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বেশ দখল ছিল। তিনি সুফী-মতের পক্ষপাতী। সুফীবাদ সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকখানি বই আছে। সুফী-মতের আলোচনা করিয়া দারার ধারণা হইয়াছিল, অদ্বৈতবাদ ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে হিন্দুর উপনিষদ্ পড়া চাই। তাই তিনি নানাস্থান হইতে হিন্দুপণ্ডিত আনাইয়া সংস্কৃত শিক্ষা করেন। তারপর 'সির-উল্-আস্‌রার' নাম দিয়া কতকগুলি উপনিষদ্ ফার্সীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। * উপনিষদ্ আদি পাঠ করিয়া দারার বিশ্বাস হয়, হিন্দুযোগী ও মুসলমান-সুফীদের মধ্যে মতবিরোধ নাই—যে বিরোধের কথা শোনা যায়, তাহা কথার কথা। এই দুই মতের যে মিল আছে, তাহা দেখাইবার জন্য তিনি 'মজমা-উল্-বহ্‌রাইন্'—অর্থাৎ 'দুই সমুদ্রের মিলন' নামে একখানি গ্রন্থ লেখেন।

ময়ূরসিংহাসন—তক্ত-ই-তাউস্

শাহ্‌জহানের পুত্র আওরংজীব্ একেবারে নীরস কঠোর লোক। চিত্রকলা, সঙ্গীত ও কাব্যে (নীতিপূর্ণ কবিতা ছাড়া) তাঁহার রুচি ছিল না। শাহ্‌জহান্ ছিলেন সঙ্গীতের পরম অনুরাগী, কিন্তু আওরংজীব্ ঠিক তাহার বিপরীত। তাঁহার কড়া হুকুমে রাজ্যের সব বড় বড় নগরে নাচগান বন্ধ হইয়া যায়। রাজদরবারে কলাবন্তদের অন্ন বন্ধ। তাহারা দিল্লীতে একদিন এক মজার কাণ্ড করিল। সেদিন শুক্রবার—বাদশাহ্ জুমা মসজিদে যাইতেছেন। প্রায় শ'খানেক লোক একসঙ্গে কুড়িটা সুসজ্জিত শবাধার কাঁধে, শোক করিতে করিতে রাস্তা দিয়া আসিতেছে দেখিয়া, বাদশাহ্ থমকিয়া দাঁড়াইলেন। কারণ জানিতে চাহিলে কলাবন্তেরা বলিল,—'বাদশাহ্ আমাদের মা সঙ্গীতকলাকে হত্যা করিয়াছেন; তাই আমরা শোক করিয়া তাঁকে কবর দিতে যাইতেছি।' বাদশাহ্ আওরংজীবের নীরস প্রাণ ইহাতেও ভিজিল না, তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন—'হুশিয়ার, ভাল করিয়া কবর দিও। যেন তাঁর স্বরের ধ্বনি বা প্রতিধ্বনিটুকুও বাহির হইতে শুনিতে না পাওয়া যায়। (Khafi Khan, ii. 213; *Storia*, ii. 8).

* দারা অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। আবদুল্ মুক্তাদীর তাঁহার প্রবন্ধে দারার গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা দিয়াছেন। (*J. Moslem Instt.* Jany.—March 1907; p. 173). ইহা ছাড়া দারার আরও তিনখানি পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায়;—ভগবদ্গীতা ও যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের অনুবাদ, এবং সুফীবাদ সম্বন্ধে 'রিসালা-ই-হক্‌নুমা।' (N. Law's *Promotion of Learning in India*, pp. 185-6).

কলম ও তলোয়ারের খোঁচায় বাদশাহ্ আওরংজীবের সমান দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে গ্রন্থপাঠ তাঁহার নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের মধ্যে গণ্য ছিল। নানা দেশের প্রাচীন জ্ঞানী পণ্ডিতদের আরবী ও ফার্সীতে লেখা দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় রচনাগুলি তিনি যত্নের সহিত

আওরংজীব্

পাঠ করিতেন। (*Alamgirnama*, 1092-95; 1103-4). তাঁহার গ্রন্থপ্রীতি, ও পুঁথি-সংগ্রহে আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়—তাঁহার লেখা চিঠিপত্র হইতে। এই পত্রগুলি আওরংজীবের গদ্য-রচনায় কৃতিত্বের বিশিষ্ট প্রমাণ।

শেষ শয্যায় শুইয়া বাদশাহ্ আওরংজীব্ কয়েকখানি পত্র লেখেন। পত্রগুলি বৃদ্ধ সম্রাটের শ্রান্ত ক্লান্ত অন্তিম জীবনের অনুশোচনার অশ্রুতে পরিপূর্ণ। তিনখানি পত্রই প্রায় একই রকমের;—ইহার কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

"জানি না আমি কে, যাইব কোথায়, এ পাতকীর দশাই বা কি হইবে! সকলকে খোদার জিম্মায় রাখিয়া, এ জগতের কাছে বিদায় লইবার সময় উপস্থিত। আমার পুত্রেরা ঘরোয়া বিবাদ-বিসম্বাদ বাধাইয়া শেষে যেন ভগবানের সেবক—মানুষের—রক্তপাতের কারণ না হয়।......সারা জীবনটাই আমার ব্যর্থ হইয়াছে। খোদা তো আমার অন্তরেই নিহিত, অন্ধ চক্ষু তবু তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই।... পরকালের সম্বল আমার কিছুই নাই।......সৈন্যদল হতভম্ব, আমারই মত উৎসাহ-উদ্যমবিহীন; খোদা হইতে বিচ্ছিন্ন আমি,—মনে শান্তি নাই।......যখন নিজেরই উপর আমার আস্থা নাই, তখন পরের উপর ভরসা রাখি কি করিয়া?......মুসলমান-হত্যা রাজ্যে যেন না হয়, আর তাদের হত্যার জন্য এ অকিঞ্চনকে যেন দায়ী করা না হয়। ......জীবনে পাপ করিয়াছি অনেক—জানি না আমার জন্য কি গুরুদণ্ডের আয়োজন হইয়াছে। তোমার ও তোমার সন্তানদের আশ্রয়স্থল—খোদা। বিদায়! খোদার শান্তিপূর্ণ আশীর্ব্বাদ তোমার উপর বর্ষিত হউক।"

(*Letters of Aurangzebe*, Bilimoria.)

আওরংজীবের রাজ্যকালেই মোগল-সাম্রাজ্যের শুধু নৈতিক অবনতি কেন, জীবনী-শক্তিরও হ্রাস হয়। তাঁহার পরবর্ত্তীকালের বাদশাহ্‌রা কতকটা ভাঙা হাটের বাদশাহ্। বিদ্যাবত্তায় তাঁহারা তেমন কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। বিলাসেই তাঁহাদের বেশির ভাগ সময় কাটিত।

প্রথম বহাদুর শাহ্‌র (প্রথম শাহ-আলম্ ১৭০৭-১৭১২) আরবী ও ফার্সীতে জ্ঞান ছিল।

দ্বিতীয় আলমগীরের পুত্র দ্বিতীয়শাহ্ আলম্ (১৭৫৯-১৮০৬) সুশিক্ষিত লোক। ফার্সী ও উর্দ্দু ভাষায় তাঁহার দখল ছিল অসাধারণ। ভনিতায় 'আফ্‌তাব্'—এই ছদ্মনাম লইয়া তিনি কবিতা লিখিতেন। 'দিউয়ান্-ই-আফ্‌তাব্' নামে তাঁহার একখানি কবিতার বই আছে। কোরাণ তাঁহার রীতিমত পড়া ছিল। বিদ্রোহী রোহিলা-সর্দ্দার গোলাম কাদির হঠাৎ দিল্লী আক্রমণ করিয়া, আশানুরূপ ধনদৌলৎ না পাওয়ায় রাগিয়া সম্রাটকে অন্ধ করিয়া দেয়। অন্ধ হইবার পূর্ব্বক্ষণে তিনি বলিয়াছিলেন,—'কি! কি! কি বল্‌লি! যে চোখ আজ ৬০ বৎসর ধরে অনবরত পবিত্র কোরাণ পড়ে আস্‌ছে, সেই চোখ আজ তুই অন্ধ করে দিতে চাস্?' (Francklin's *Shah-Aulum*, p. 176). কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত তবু শাহ্ আলমের পবিত্র চক্ষু দু'টি নষ্ট করিয়া

দিতে ইতস্ততঃ করে নাই। অন্ধ হইয়াও কিন্তু শাহ্ আলমের সাহিত্য-চর্চ্চা অব্যাহত ছিল—ঐ সময় তিনি কতকগুলি প্রাণস্পর্শী কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাঁহার কবিতার নমুনা আমরা *Shah Aulum* গ্রন্থে (pp. 240-3) ও এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে (Augt 1911, pp. 471-73). দেখিতে পাই। *

দ্বিতীয়-শাহ্ আলমের দুই পুত্র—দ্বিতীয়-আক্‌বর শাহ্ (১৮০৬-১৮৩৭) ও জহান্দার (মীর্জ্জা জুয়ান বখ্ত) উভয়েই কাব্যের উপাসক। আক্‌বর শাহ্ 'শুয়া,' আর জহান্দার 'জহান্দার' ভনিতায় মাঝে মাঝে কবিতা লিখিতেন। Garcin de Tassy জানাইয়াছেন জহান্দারের লেখা 'বায়াজ্-ই-ইনায়েৎ মুর্শিদজাদা' ইণ্ডিয়া হাউসে রক্ষিত আছে। (Beale-Keene's *Or. Bio. Dic.* p. 128).

দ্বিতীয় আক্‌বর শাহ্‌র পুত্র শেষ দিল্লীশ্বর দ্বিতীয় বহাদুর শাহ্ ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত ও উঁচু দরের উর্দ্দূ কবি। 'জাফর' এই ছদ্মনামে তিনি কবিতা লিখিতেন। তাঁহার 'দিউয়ানের' অনেকগুলি সংস্করণ বাজারে চলিতেছে।

এদেশে ফার্সী ভাষার চর্চ্চা অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে উঠিয়া যায়। ফার্সীতে আর এদেশের মুসলমানদের মন উঠিল না, মন মাতিল উর্দ্দূতে। কাজেই বেশির ভাগ ইতিহাস উর্দ্দূতেই লেখা সুরু হইল। তবে পদ্যে উর্দ্দূর প্রতিষ্ঠা অনেক আগেই হইয়াছিল। প্রথমে ওয়ালী নামে আওরঙ্গাবাদের একজন কবি উর্দ্দূ-পদ্য রচনা করিয়া সাহসের পরিচয় দেন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুঁথি দিল্লী পৌঁছায়। এই উর্দ্দূ-কাব্য পড়িয়া রাজধানীর কবিরা একেবারে মজিয়া গেল। ইহার পরেই রাজধানীতে উর্দ্দূ-পদ্য লেখার ধুম পড়িয়া যায়। তাই আমরা দেখি, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর মোগল-বাদশাহ্‌রা অনেকে উর্দ্দূতে কবিতা লিখিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। *
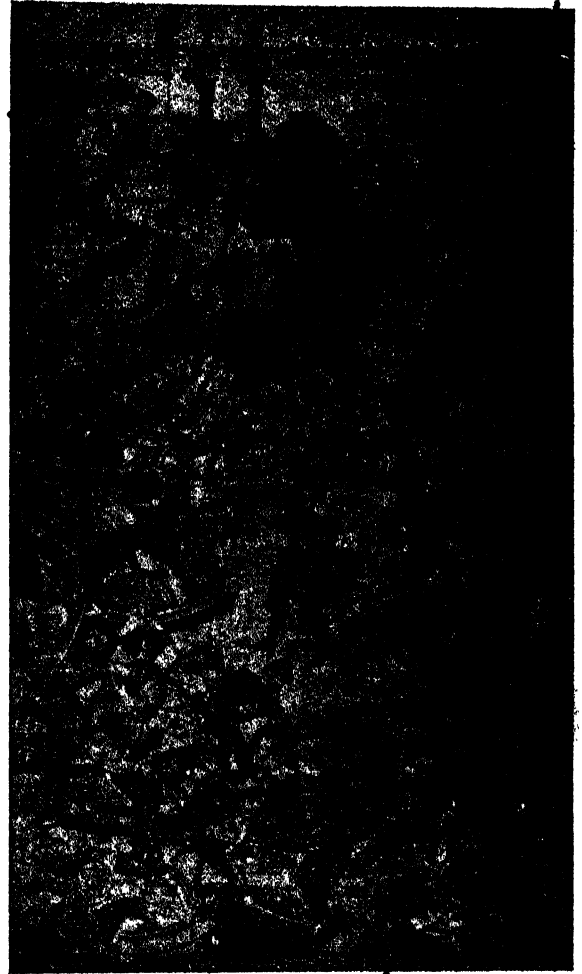
লড়াই

* Shah-Aulum had improved a very good ducation by study and reflection ; he was a complete aaster of the languages of the east, and, as a writer, ttained an eminence seldom acquired by persons in is high station. His correspondence with the different rinces of the country, during a very long and iequered reign, exhibits proofs of a mind highly iltivated ; and if we may judge by an elegiac essay omposed after the cruel loss of his sight, he appears have great merit in pathetic composition. (*Shah-ulum*, p. 192.).

* পাদটীকায় উল্লিখিত বইগুলি ছাড়াও প্রবন্ধ-রচনাকালে বিশেষ-ভাবে এইগুলির সাহায্য পাইয়াছি :—*Baburnama*—tr. & ed. by A. S. Beveridge ; Gulbadan's *Humayun-nama*, tr. & ed. by A. S. Beveridge ; *Ain-i-Akbari*, iii ; Rogers' *Tuzuk-i-Jahangiri*, ed. by H. Beveridge ; Prof. Sarkar's *Aurangzib*, and *Studies in Mughal India* ; Learning of the Mughal Emperors—Muqtadir—*Journal of the Moslem Instt.* 1907 ; V. A. Smith's *Akbar.*

প্রবন্ধে উদ্ধৃত কবিতাগুলি বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সেনের তর্জ্জমা হইতে গৃহীত।

বন্ধ্যা

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

ষোল বৎসর বয়সেও যখন প্রতিমার সন্তান হইল না, তখন তাহার শাশুড়ী হৈমবতী সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলেন যে, বৌমা বাঁজা। এবং এই অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত-কথা পাড়ায় রাষ্ট্র হইতেও বিলম্ব হইল না,—দুই-চারি দিনের মধ্যে পাড়ার মেয়ে-মহলে সকলেই এবং মেয়েলী স্বভাবের কোন-কোন পুরুষও, জানিতে পারিল যে, চাটুয্যেদের বউ বাঁজা; তাহার সন্তানাদি হইবার আদৌ সম্ভাবনা নাই।

এই বিষয় লইয়া কিছুদিন মেয়ে-মজলিসে বিলক্ষণ আলোচনা চলিল। নবীনারা নাক সিঁটকাইয়া বলিল, "বাঁজা কেন হতে যাবে! বৌ-কাটকি শাশুড়ী, ছেলের আবার বিয়ে দেবার মতলব,—তাই ছুতো খুঁজ্ছে। বিধাতা-পুরুষ ওর কাণে ধরে বলে গেছে—বৌ বাঁজা।"

প্রবীণার দল কিন্তু হৈমবতীর বাক্য বেদবাক্য স্বরূপ গ্রহণ করিল, এবং বিনা প্রতিবাদে বিশ্বাসও করিল। তাহাদের মধ্যে এইরূপ আলোচনা চলিল যে, শাশুড়ী যখন নিজে বল্ছে তার বৌ বাঁজা, তখন সে কথা কি মিথ্যা হইতে পারে! অনেকেই হৈমবতীকে পরামর্শ দিল, "দেখ শৈলর মা, এক কাজ কর—তোমার ব্যাটার আবার বিয়ে দাও। বাঁজা বৌকে দিয়ে'ত বংশ-রক্ষা হবে না!"

কথাটা হৈমবতীর মনঃপূত হইল। সত্যই ত! শাস্ত্রেই ত বলেছে,—পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা! বৌ যদি বাঁজা হয়, তা'হলে ছেলের আবার বিয়ে দিতে হবে বই কি!

কিন্তু স্বয়ং পুত্রই বাঁকিয়া বসিল। সে একালের ছেলে—এক স্ত্রী সত্ত্বে পুনরায় বিবাহ করিতে রাজী হইল না।

মাতা পুত্রকে বুঝাইলেন, বিয়ে না করলে চল্বে কেন? বংশলোপ হবে যে! বংশ ত রক্ষা করা চাই। নহিলে তাঁহার শ্বশুর-কুলের চৌদ্দ পুরুষ এক ফোঁটা জল পাইবে না, উপরন্তু নরকস্থ হইবে। কিন্তু পুত্র কিছুতেই বাগ মানিতে চাহিল না। অবশেষে জননী চক্ষের জল ছাড়িয়া দিলেন, অন্নজল ত্যাগ করিলেন। অগত্যা সত্যেনকে দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহে স্বীকৃত হইতে হইল। হৈমবতীর আর আনন্দ ধরে না। কিন্তু প্রতিমার মুখখানি শুকাইয়া গেল।

স্বামীকে একটু নিরিবিলিতে পাইয়া প্রতিমা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি সত্যি-সত্যি আবার বিয়ে করবে?"

"না করে নিস্তার পাচ্ছি কই?"

"আমার অপরাধ?"

"সে মা জানে।"

"কেন, তুমি বিয়ে করে এনেছ আমাকে, এই সাত বছর তোমার সঙ্গে ঘর করলুম,—তুমি জান না, আমার অপরাধ কি?"

এবার সত্যেন বিরক্ত হইয়া কহিল, "আমি কি নিজে যেচে আবার বিয়ে করব বলেছি? তুমি কি দেখ্তে পাচ্ছ না, মা কি কাণ্ড-কারখানা আরম্ভ করেছে?"

"তুমি পুরুষমানুষ, তুমি একটু শক্ত হতে পার না? পুরুষ মানুষ অত নরম হলে কি চলে?"

"আমি কি শক্ত হতে কসুর করেছি? কিন্তু মার চোখের জল আর আমি দেখ্তে পার্ব না। মা এই যে দু'দিন জলটুকু পর্য্যন্ত খায় নি—তুমি এত সাধ্য-সাধনা করেও কি খাওয়াতে পেরেছিলে? আমি আর কি করতে পারি?"

"আচ্ছা, না হয় ছেলে হল না বলে আমারই মস্ত অপরাধ হল। কিন্তু যাকে বিয়ে করবে, তার অপরাধ কি?"

সত্যেন এবার হাসিয়া কহিল, "সে তার বাপ-মা জানে। সতীনের গলায় গেঁথে দেবার মত মেয়ে যদি জোটে, তা'হলে নিশ্চয়ই তার মস্ত কিছু অপরাধ একটা থাক্বেই; আর, সে অপরাধের কথা তার বাপ-মা, আপনার জন ছাড়া আর কে জানবে বল?"

প্রতিমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে হাল ছাড়িয়া দিয়া কহিল, "আমাকে তা'হলে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও।"

"তোমাকে তাই থাক্তে হবে দেখ্ছি। নইলে ষগি-

বিন্দীর ঝগড়ায় বাড়ীতে কাক-চীল বস্‌তে পারবে না ; আর আমারও পদ্মলোচনের দশা ঘটবে—মার খেতে-খেতে প্রাণটা যাবে।"

অভিমানিনী প্রতিমা এ রসিকতার কোন জবাব না দিয়া চঞ্চল পদে কক্ষান্তরে গমন করিল।

(২)

সত্যেন আশা করিয়াছিল, সতীনের গলায় মেয়ে দিতে কোন মেয়ের বাপই আজকালকার বাজারে রাজী হইতে পারে না। সুতরাং তাহাকে এক স্ত্রী সত্ত্বে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে না ; এবং "কনে' না পাইলে মাও নিরস্ত হইবেন না।

কিন্তু সত্যেন ভুলিয়া গিয়াছিল, এটা বাঙ্গালা দেশ। এখানে সতীনের গলায় মেয়ে দিবার মত কন্যাদায়গ্রস্ত বাপের কোনকালেই অভাব হয় না। পুত্রের সম্মতি পাইয়া, আহ্লাদে আটখানা হইয়া, হৈমবতী কনের সন্ধানে প্রবৃত্তা হইলেন। অচিরে পৌত্র-মুখ দর্শনাশায় তিনি ঘটক-ঘটকীদের বলিয়া দিলেন, একটু ডাগর, চালাক-চতুর ও সুন্দরী মেয়ে চাই,—দেনা-পাওনা লইয়া তিনি বিশেষ পীড়াপীড়ি করিবেন না। প্রথম-প্রথম ঘটক-ঘটকীরা যেরূপ সংবাদ আনিতে লাগিল, তাহা বড় আশাপ্রদ নহে। রূপ-গুণবান ধনী-সন্তানের সঙ্গে সকলেই প্রথমে কন্যার বিবাহ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করে বটে,—দোজবরে বরেও তাহাদের আপত্তি নাই বটে,—কিন্তু প্রথমা স্ত্রী বর্ত্তমান শুনিয়া প্রায় সকলেই পিছাইয়া যায়। সতীনের সঙ্গে ঘর করিতে হইবে শুনিয়াও যে দুই-একজন তখনও নিরুৎসাহ না হয়, দেখা যায়, তাহাদের কন্যা আদৌ সত্যেনের বধূ হইবার যোগ্যা নহে। কিন্তু ঘটক-ঘটকীরা হাল ছাড়িল না। তাহারা প্রচুর ঘটকালী, ওরফে দালালি, ওরফে উৎকোচের লোভে দ্বিগুণ উৎসাহে সত্যেনের জন্য দ্বিতীয় পক্ষের 'কনের' সন্ধানে লাগিয়া গেল। এবং কিছুদিনের মধ্যে একটী মনের মত পাত্রীও আনিয়া হাজির করিল।

মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মেয়ে ; অর্থাভাবে তাহার বিবাহ হইতেছিল না বলিয়া, বয়স তাহার পোনেরো উত্তীর্ণ হইয়া ষোলয় পড়িয়াছিল। দেখিতেও সে মন্দ নয়, রংটাও ফর্সা। গৃহকর্ম্ম প্রায় সবই জানে। কিঞ্চিৎ লেখাপড়াও শিখিয়াছে। একটু আধটু গান করিতে এবং হারমোনিয়ম ও এসরাজ বাজাইতেও পারে। তাহার চেহারা দেখিলে তাহাকে চতুরা ও চট্‌পটে—এক কথায়, smart বলিয়া বোধ হয়। ভগিনীর অনুরোধে সত্যেনের মাতুল কন্যা দেখিয়া পছন্দ করিয়া আসিলেন। এবং এক সুলগনে সত্যেন তাহাকে গাঁটছড়া বাঁধিয়া ঘরে লইয়া আসিল। হৈমবতী মহানন্দে বধূ বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন।

(৩)

বিবাহের সময় সুশীলাকে যতটা চালাক-চতুর বলিয়া বোধ হইয়াছিল,—সে শ্বশুর-ঘর করিতে আসিবার পর, দুই-চারি দিনের মধ্যেই হৈমবতী বুঝিলেন,—সে তদপেক্ষা অনেক বেশী চালাক,—তাঁহাকে এক হাটে বেচিয়া আর এক হাটে কিনিতে পারে। প্রতিমার মুখে কথা ছিল না। তাহাকে হাজার বকিলেও সে 'রা' কাড়িত না। সুশীলার মুখে যেন খই ফোটে। তাহাকে এক কথা বলিলে সে পাল্টা জবাবে দশ কথা শুনাইয়া দেয়। অল্প দিনের মধ্যে সে সত্যেনকে এমন বশীভূত করিয়া ফেলিল যে, হৈমবতী প্রমাদ গণিলেন। সুশীলা ও সত্যেনের ভয়ে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে না পারিলেও, মনে-মনে তিনি বিলক্ষণ বুঝিলেন যে, সতীলক্ষ্মী বড় বৌমাকে বিদায় করিয়া দিয়া তিনি এক কালসাপিনীকে গৃহে আনিয়াছেন। যাহা হউক, এ সকলই তিনি সহ্য করিয়া যাইতে লাগিলেন, যদি বধূর ছেলে হয়,—যদি তাঁহার পৌত্র-মুখ দর্শনের সাধ মিটে।

কিন্তু বিধাতার ধনুর্ভঙ্গ পণ—তিনি হৈমবতীর পৌত্র-মুখ দর্শনের সাধ কিছুতেই মিটাইবেন না। দেখিতে-দেখিতে তিন বৎসর কাটিয়া গেল ; তথাপি ছোট বৌমার সন্তান হইবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। তখন তাঁহার মনে হইতে লাগিল, এ বৌটাও বোধ করি বাঁজা। নইলে ছেলে হয় না কেন ? ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল, তাঁহার মনে এই ধারণা ততই দৃঢ় হইতে লাগিল! অবশেষে প্রতিমার বেলায় তিনি যেমন করিয়াছিলেন,—সুশীলার বেলাতেও তিনি ঠিক সেই ভাবে পাড়ার বর্ষীয়সী মহিলা-সমাজে তাঁহার ছোট বৌমার বন্ধ্যাত্বের কথার প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। এরূপ মুখরোচক প্রসঙ্গ কোন ক্রমে একজনের কাণে উঠিলেই, তাহা শত পল্লবিত হইয়া এক হইতে শত কর্ণে, এবং শত হইতে সহস্র কর্ণে উঠিতে

বিলম্ব হয় না। অচিরে পাড়াশুদ্ধ লোকে জানিতে পারিল, সত্যনের কপালে এবারও বাঁজা বৌ জুটিয়াছে।

(৪)

কি রকম অবস্থায় সত্যেনের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছিল,—বিবাহের পূর্ব্বেই সুশীলা তাহা জানিতে পারিয়াছিল। শ্বাশুড়ী তাহার সতীনের বিরুদ্ধে যে বন্ধ্যাত্বের অভিযোগের আরোপ করিয়াছিলেন, এখন তাহারই বিরুদ্ধে সেই একই অভিযোগের আরোপের কথা শুনিয়া, তাহার পরিণাম-ফল কি হইতে পারে, তাহা অনুমান করা সুশীলার ন্যায় সেয়ানা মেয়ের পক্ষে একটুও কঠিন নহে। সে যখন শুনিল যে হৈমবতী পাড়ায় বাড়ী-বাড়ী বলিয়া বেড়াইতেছেন যে, কপাল-দোষে তাঁহার ছোট বৌমাও বাঁজা হইল, তখন দুই-এক দিন পরে তিনি যে আবার পুত্রের বিবাহ দিবার প্রয়োজন অনুভব করিবেন, ইহাও সে সহজেই প্রত্যাশা করিতে লাগিল; এবং আত্মরক্ষার্থ প্রতিকারের উপায় অবলম্বনেও মনোযোগ দিল।

স্বামী তাহার হাত-ধরা—সে উঠিতে বলিলে উঠে, বসিতে বলিলে বসে। একদিন সে স্বামীকে পাকড়াও করিয়া কথাটা পাড়িয়া ফেলিল; কহিল, "মা পাড়ার লোকদের বাড়ী-বাড়ী কি বলে বেড়াচ্ছেন, শুনেছ?"

সত্যেন সবই জানিত; তবু সে ন্যাকা সাজিয়া বলিল, "না,—কি বলে বেড়াচ্ছেন?"

সুশীলা মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, "কিছু জানেন না যেন! ওসব ন্যাকামি রাখো—স্পষ্ট জবাব দাও। এ সব ন্যাকামির কথা নয়। আমাকে দিদির মতন নিরীহ গোবেচারী ভালমানুষটি পাও নি যে, যা বোঝাবে তাই বুঝব। দিদি যেমন বোকা! শ্বাশুড়ী বললেন তিনি বাঁজা, অমনি দিদিও বুঝলেন তিনি বাঁজা। শ্বাশুড়ী বললেন, ছেলের আবার বিয়ে দেব। দিদিও অমনি তথাস্তু বলে সায় দিয়ে সুড়সুড় করে বাপের বাড়ী গিয়ে বসে রইলেন। আমাকে তোমরা দিদির মতন বোকা মনে করলে ভুল করবে। আমি নিজের অধিকার একটুও ছাড়ছি না—এটা বেশ ভাল করে জেনে রেখো।"

সত্যেন বিরক্তির ভান করিয়া কহিল, "খুব ত লম্বা লক্‌চার ঝাড়লে। কিন্তু আসল কথাটাই বললে না। মা পাড়ার লোকের বাড়ী-বাড়ী কি বলে বেড়াচ্ছেন?"

শ্লেষ-জড়িত স্বরে সুশীলা বলিল, "দেখো, যে সত্যি-সত্যি ঘুমোয়, তাকে জাগানো যায়। কিন্তু যে জেগে ঘুমোয়, তাকে জাগানো যায় না। সব জেনেশুনে যে ন্যাকা সাজে, তাকে আবার বোঝাব কি? আচ্ছা, তুমি আমার গা ছুঁয়ে ধর্ম্মতঃ বল দেখি, তুমি কি কিছুই জান না?"

এই ভাবে আক্রান্ত হইয়া, আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া, সত্যেনকে অবশেষে স্বীকার করিতে হইল যে, সে একটু-আধটু আভাষ মাত্র পাইয়াছে—বিশেষ কিছু শুনে নাই।

সুশীলা মুখখানা এমন বিকৃত করিল, এবং তাহাতে এমন ঘৃণার ভাব প্রকাশ পাইল যে, সত্যেন লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল।

ঘৃণার আতিশয্যে সুশীলা কিছুক্ষণ কথাই কহিতে পারিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে মুখে একটা অব্যক্ত শব্দ করিয়া কহিল, "আমি তোমাকে এখনই বলে দিচ্ছি যে, দিদির মতন তোমার এই জবরদস্তি হুকুম মাথায় পেতে নিয়ে বাপের বাড়ী গিয়ে বসে থাক্‌ব না, এটা স্থির জেনে রেখো।" এই বলিয়া সুশীলা সত্যেনের উত্তর শুনিবার অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে দুপদাপ শব্দ করিতে-করিতে সেখান হইতে চলিয়া গেল। আর সত্যেন হতভম্ভ হইয়া সেইখানেই কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

(৫)

সত্যেনদের বাড়ীর ঠিক পাশের বড় বাড়ীটা বৎসর কয়েক হইল দেনার দায়ে বিক্রী হইয়া গিয়াছিল। এই বাড়ীর বর্ত্তমান মালিক রায় হৃদয়কৃষ্ণ বসু বাহাদুর—অবসরপ্রাপ্ত সিবিল সার্জ্জন। সত্যেনদের বাড়ী ও রায় বাহাদুরের বাড়ী ঠিক পাশাপাশি অবস্থিত ছিল বলিয়া, উভয় বাড়ীর মধ্যে যাতায়াতের বন্দোবস্ত ছিল। এবং উভয় পরিবারের মহিলারা এবাড়ী-ওবাড়ী যাতায়াত করিতেন। হৃদয় বাবুর সর্ব্বজ্যেষ্ঠা পৌত্রীর সঙ্গে সুশীলার খুব ভাব হইয়াছিল।

সত্যেন পড়াশুনায় বেশ ভাল ছিল। তাহার স্বভাবও বেশ নম্র ও বিনয়ী। সে হৃদয় বাবুর পৌত্রগণের সমবয়সী বলিয়া তাঁহাকে দাদা মহাশয় বলিয়া ডাকিত, এবং তিনিও তাহাকে দাদা, দাদা, বলিয়া বিলক্ষণ স্নেহ করিতেন।

হৈমবতী যখন প্রতিমাকে বাঁজা বলিয়া প্রচার করিয়া সত্যেনের আবার বিবাহ দিলেন, তখন হৃদয় বাবু একটু-আধটু আপত্তি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রতিবাসীর সঙ্গে মনান্তর ঘটিবার আশঙ্কায় এবং স্বভাবতঃ নির্ব্বিরোধ লোক ছিলেন বলিয়া, 'পরের' কথা লইয়া বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করিতে ইচ্ছা করেন নাই। কিন্তু সত্যেন দ্বিতীয়বার বিবাহ করায় তিনি বড় প্রীতি লাভ করেন নাই।

কয়েক দিন ধরিয়া তিনি শুনিতে পাইতেছিলেন যে, হৈমবতী সুশীলাকেও বন্ধ্যা বলিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শুনিয়া অবধি তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন, এবং ইহার পরিণাম যে কি হইবে, তাহাও তিনি অনুমান করিয়া লইয়াছেন।

তিনি নিজে প্রবীণ, বিজ্ঞ, বহুদর্শী চিকিৎসক। জেলার সর্ব্বপ্রধান মেডিক্যাল অফিসার রূপে কাজ করিবার উপলক্ষে তাঁহাকে নব্য-তন্ত্রের বহু যুবকের চিকিৎসা করিতে হইয়াছে। এবং এই চিকিৎসা ব্যপদেশে, তাহাদের প্রধান দোষটা যে কি, তাহাও জানিতে তাঁহার বাকী ছিল না।

তিনি দেখিয়াছিলেন, আজকালকার স্কুল কলেজের ছেলেরা পড়াশুনা করে ভাল। তাহারা বেশ শান্ত, শিষ্ট, বিনয়ী, নম্র ও সভ্যভব্য। পড়াশুনায় তাহাদের অত্যন্ত অনুরাগ—পাশের পর পাশ করিয়া যাইতে বিলক্ষণ নিপুণ। ডানপিটে বৃত্তি তাহাদের মধ্যে খুবই কম। কিন্তু এ সকল গুণ সত্বেও তাহাদের স্বাস্থ্য অতি ক্ষীণ। চোখ হইতে চসমা খুলিয়া লইলে, অনেকে একেবারে অন্ধ বলিলেও চলে। এতটুকু শারীরিক শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিতে হইলেই তাহাদের গলদ্‌ঘর্ম্ম অবস্থা উপস্থিত হয়। তাহারা যখন চলাফেরা করে, তখন সামনের দিকে ঝুঁকিয়া চলে এবং মনে হয় যেন কুঁজো। সাধারণতঃ তাহাদের চোখ বসা, চোখের কোলে কালি-পড়া। যুবকদিগের স্বাস্থ্যের অবস্থা এমন হীন হইবার একবার কারণ, তাহাদের যৌবন-সুলভ চপলতা। শরীরের উপর অত্যধিক অত্যাচারের ফলে তাহাদের মধ্যে অনেকেই এমন অকর্ম্মণ্য হইয়া যায় যে, তাহাদের বন্ধ্যাত্ব দোষ ঘটে। হৃদয় বাবুর মনে এইরূপ বিশ্বাস জন্মিল যে, সত্যেনও হয় ত এই শ্রেণীর বন্ধ্যা। তাই, সত্যেনের তৃতীয়বার বিবাহের সম্ভাবনা দেখিয়া, তিনি তাঁহার স্ত্রীকে দিয়া হৈমবতীকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, বৌমা ছেলের যতই বিবাহ দিন না কেন, তাঁহার পৌত্র-মুখ দর্শনের সাধ মিটিবে না—তাঁহার শ্বশুরের বংশরক্ষাও হইবে না।

এই কথা শুনিয়া হৈমবতী তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন! বৃদ্ধা, সম্মানার্হা প্রতিবেশিনীকে অনেক কড়া-কড়া কথা শুনাইয়া দিলেন যে, "এ্যাঁ! আমার এমন গুণবান্ ছেলে! যে কি না বাঁজা! পুরুষ মানুষেও না কি আবার বাঁজা হয়! বুড়োর ভীমরতি হয়েছে; না হয় বৌমার বাপের বাড়ী থেকে ঘুষ খেয়েছে। তাই আমার ছেলের নিন্দে করে!" বসু-গৃহিণীকে বিদায় করিবার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি উভয় বাড়ীর মধ্যবর্ত্তী যাতায়াতের পথ বন্ধ করিয়া দিলেন, এবং মহা উৎসাহে পুত্রের তৃতীয় পক্ষের 'কন্যার' সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। পুত্রের তৃতীয় পক্ষের বিবাহের আয়োজন কিন্তু খুব গোপনেই চলিতে লাগিল,—কারণ, পোড়ারমুখো শত্তুররা পাছে ভাঙ্‌চি দিয়া বিবাহ পণ্ড করিয়া দেয়, এ ভয়টাও বিলক্ষণ ছিল।

সুশীলা কিন্তু শাশুড়ীর শাসন মানিল না। সে হৃদয় বাবুদের বাড়ীতে যাইতে পাইল না বটে, কিন্তু দ্বিতলের ছাদে উঠিয়া তাহার সখীর সঙ্গে আলাপ চালাইতে লাগিল।

হৃদয় বাবু সহৃদয় ব্যক্তি। সত্যেন্দ্রের মায়ের রূঢ় বাক্য শুনিয়া তিনি দুঃখিত হইলেন না, বা অপমান-বোধও করিলেন না। সত্যেনকে তিনি যথার্থই স্নেহ করিতেন; তাই সত্যেনের প্রকৃত মঙ্গলকামনা করিয়া তিনি তাহাকে একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন।

(৭)

দুই একদিন পরে হৃদয়বাবু আপনার বৈঠকখানায় বসিয়া গুড়গুড়িতে তামাক খাইতেছেন আর একখানি নব-প্রকাশিত ইংরেজী স্বাস্থ্য বিষয়ক গ্রন্থ পড়িতেছেন, এমন সময়ে সত্যেন সেই কক্ষ প্রবেশ করিল।

সত্যেনকে আসিতে দেখিয়া হৃদয়বাবু বইখানি মুড়িয়া রাখিয়া দিলেন, এবং গুড়গুড়ির নলটি গুড়গুড়ির গায়ে জড়াইয়া রাখিয়া, সত্যেনের দিকে ফিরিয়া হাসিতে-হাসিতে কহিলেন, "কি হে ভায়া, আজকাল আর তোমার দেখাই পাওয়া যায় না! ব্যাপারখানা কি? তৃতীয় পক্ষের

ভাবনায় বড় ব্যস্ত না কি ?” নাতি-ঠাকুর্দ্দায় মধুর সম্পর্কের খাতিরে উভয়ের মধ্যে দিব্যি রসিকতা চলিত।

সত্যেনও একগাল হাসিয়া কহিল, “ঠাকুর্দ্দার যেমন কথা!”

“কেন, মন্দ কি বলেছি ভায়া? তৃতীয় পক্ষের কথাটা কি তা হলে সত্য নয়?”

এই প্রসঙ্গের আলোচনায় সত্যেন মনে-মনে ভয় পাইতেছিল। কথাটা চাপা দিবার অভিপ্রায় সে কহিল, “আপনি কি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন?”

“তেমন কিছু নয়। অনেক দিন তোমায় দেখা পাই নি, তাই। সে যাক, কথা ওল্টালে চল্‌বে না।”

সত্যেন উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, “এই জন্যেই কি আমায় ডেকেছিলেন দাদামশায়?”

“না ভায়া,—সত্যিই তোমার সঙ্গে দুটো কথা ছিল। যাক এ সব বাজে কথা—চল, ও-ঘরে যাই।”

ও-ঘরটা ছিল হৃদয় বাবুর খাস-কামরা। সে ঘরে তাঁহার দরকারী কাগজ ও জিনিস-পত্র থাকিত, এবং সে ঘরে যার-তার প্রবেশেরও অধিকার ছিল না। হৃদয়বাবু এখন আর রীতিমত প্র্যাকটিস করিতেন না। তবে কঠিন-কঠিন রোগে তাঁহার কোন-কোন ধনী মক্কেল মধ্যে-মধ্যে তাঁহার পরামর্শ লইতে আসিতেন; এবং গোপন পরামর্শের আবশ্যক হইলে, তিনি এই ঘরে বসিয়াই তাঁহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতেন। সত্যেনকে সঙ্গে করিয়া এই ঘরে আনিয়া বসাইয়া, তিনি চাকরকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, সে ঘরে কেহ যেন না আসে।

সত্যেনকে একখানি চেয়ারে বসাইয়া হৃদয় বাবু আর একখানি চেয়ারে বসিয়া কহিলেন, “তোমার সঙ্গে সত্যি-সত্যিই একটা কাজের কথা কইবার জন্যে তোমাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলে পাঠিয়েছিলুম।”

“কি কথা ঠাকুর্দ্দা?”

এবার হৃদয়বাবু রহস্য পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, “তোমার তৃতীয় পক্ষেরই কথা। আমার মনে হয়, তুমি এবং তোমার মা,—তোমরা দুজনেই একটা ভুল করছ। তোমার দ্বিতীয়বার বিবাহ করাটাই ঠিক হয় 'নি। তৃতীয়বার বিবাহ করলে কাজটা মোটেই ভাল হবে না। দুটী স্ত্রীলোকের জীবন তুমি ব্যর্থ করে দিয়েছ। এখন আবার আরও একটীর কর্ত্তে যাচ্চ। তুমি জান, তোমার শান্ত, শিষ্ট, নম্র, বিনীত, ভদ্র স্বভাবের দরুণ আমি তোমাকে যথার্থই একটু বেশী স্নেহ করি। তুমি নিজে বুদ্ধিমান, সুশিক্ষিত,—এম-এ পাশ করেছ। আমার দুটো কথা একটু মনোযোগ দিয়ে শুন্‌লে, তুমি অনায়াসে নিজেই বুঝ্‌বে, আর স্বীকার কর্ত্তে বাধ্য হবে,—আমি ঠিক কথা বলছি কি না।”

তাহাদের পারিবারিক ব্যাপারের ন্যায়-অন্যায়ের সমালোচনা একজন তৃতীয় ব্যক্তির মুখে শুনিয়া সত্যেন মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল; এখন হৃদয় বাবুর মুখে নিজের কতকগুলি প্রশংসাসূচক বিশেষণ শুনিয়া তাহার মন অনেকটা নরম হইয়া আসিল। সে কহিল, “বলুন।”

“আমি তোমার ঠাকুমাকে দিয়ে তোমার মাকে যা' বলে পাঠিয়েছিলুম, তোমাকেও তাই বল্‌ছি—আমার নাত্‌-বোয়েরা কেউই বাঁজা নয়,—আসল বাঁজা তুমি নিজে। তোমার মা এ কথাটা সহজেই বুঝবেন না। তার কারণ, তিনি স্ত্রীলোক, পুত্র-স্নেহান্ধ। বিশেষতঃ তিনি মনে করেছিলেন, এটা তাঁর পুত্রের পক্ষে নিন্দার কথা। এ রকম স্থলে কোন মা-ই ছেলের এ রকম নিন্দার কথা বিশ্বাস করতে পারেন না। কিন্তু কথাটা বোঝা তোমার পক্ষে একটুও কঠিন নয়।”

এই প্রসঙ্গের আলোচনায় সত্যেন একটু লজ্জা অনুভব করিয়া বলিল, “কিন্তু এসব বিষয়ে আপনার ও আমার মধ্যে আলোচনা হওয়া সঙ্গত হবে কি?”

“কেন হবে না? ঠিক হবে। তোমার আমার সঙ্গে যে নাতি-ঠাকুর্দ্দা সম্পর্ক আছে, সে কথা তুমি এখন ভুলে যাও। শুধু মনে কর, আমি চিকিৎসক, আর তুমি রোগী—কারণ, তুমি রোগী নিশ্চয়ই, সে বিষয়ে আমার একটুও সন্দেহ নেই। তুমি হয় ত মনে ভাবচ, বিষয়টা খুব গোপনীয় ব্যাপার। আমিও তা অস্বীকার করছি না। আর সেই জন্যেই আমি বৈঠকখানায় বসে তোমার সঙ্গে এ বিষয়ের আলোচনা না করে, তোমাকে আমার খাস-কামরায় এনে বসিয়েছি। প্রাইভেসী স্বীকার করি বলেই—ফস্‌ করে কেউ যাতে এ-ঘরে এসে না পড়ে—সেই জন্যে চাকরটাকে সেই রকম হুকুমও দিয়ে দিলুম, তা তুমি নিজেই ত দেখ্‌লে। সুতরাং আমার সঙ্গে তোমার এ বিষয়ে

আলোচনা হতে কোন দোষ নেই,—আপত্তির কোন কারণ নেই।"

"কিন্তু আমার যে বড় লজ্জা করছে, দাদা মশায় ?"

"লজ্জার কথা অবশ্যই। কিন্তু লজ্জা কোরো না। তুমি অবশ্যই এ কথা শুনে থাকবে যে, খৃষ্টানদের ধর্ম্মশাস্ত্রে কন্‌ফেশন অর্থাৎ পাপ-স্বীকার বলে একটা কথা আছে। খৃষ্টান পাদরীদের পদোন্নতি হতে-হতে অনেক পাদরী কন্‌ফেসরের পদ লাভ করে থাকেন। সেই রকম ক্ষমতা-প্রাপ্ত কোন না কোন পাদরীর কাছে স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে খৃষ্টান মাত্রকেই তার জীবিত-কালের মধ্যে কোন না কোন সময়ে অন্ততঃ একবার কন্‌ফেশ করতে অর্থাৎ পাপ-স্বীকার করতে হয়। পাপ-স্বীকারের পর পাদরী তাকে ছাড়পত্র দেন, অর্থাৎ এ্যাব্‌সল্‌ভ্‌ করেন। পাদরীর কাছ থেকে এই ছাড়পত্র না পেলে কোন খৃষ্টানেরই মুক্তি অর্থাৎ স্বর্গ নেই। খৃষ্টান মাত্রকেই এই ভাবে নিজের সমস্ত পাপ অকপট ভাবে ক্ষমতা-প্রাপ্ত পাদরীর কাছে স্বীকার করতে হয়। কন্‌ফেশরের সঙ্গে সাধারণ খৃষ্টানের যে সম্বন্ধ, চিকিৎসকের সঙ্গে রোগীরও ঠিক সেই সম্বন্ধ বলা যেতে পারে। কোন খৃষ্টান যত ভয়ঙ্কর পাপই করুক না কেন, যে পাদরীর কাছে তা স্বীকার করে, সে পাদরী সে সব গুপ্ত কথা প্রাণান্তেও কখনও কারুর কাছে—এমন কি অপর কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত পাদরীর কাছেও প্রকাশ করেন না। তেমনি রোগী তার রোগের কথা—সে রোগ যতই কুৎসিত আর গোপনীয় হোক না কেন,—অক্লেশে, অকপটে চিকিৎসকের কাছে প্রকাশ করতে পারে। সুতরাং আমার কাছে তোমার কিছুমাত্র লজ্জা-সঙ্কোচ করবার দরকার নেই। তুমি অকপটে তোমার রোগের কথা আমার কাছে প্রকাশ করতে পার। অথবা, লজ্জার খাতিরে যদি তুমি মুখ ফুটে আমাকে কোন কথা বলতে না পার,—আমিই বলে যাচ্ছি—তুমি শুনে যাও। কোথাও যদি আমার ভুল হয়, তুমি সেখানটায় আমাকে শুধ্‌রে দিতে পার। কিন্তু বোধ হয় তোমাকে কোন কথাই বলতে হবে না,—কারণ, আমার ভুল বোধ হয় হবেই না।"

পরম আশ্বস্ত হইয়া সত্যেন বলিল, "আপনিই বলুন দাদা মশায়—আমি আপনার কথা শুনে যাচ্ছি।"

(৮)

হৃদয়বাবু তখন খুব গম্ভীর হইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, "ছেলেবেলায় তুমি যখন ইস্কুলে পড়তে, তখন তোমাদের ক্লাসের কিম্বা ইস্কুলের কোন ছেলের কাছে, অথবা, তোমার প্রতিবাসী কোন বন্ধুর কাছে, কিম্বা তোমাদের কোন ঝি বা চাকরের কাছে একটী কুশিক্ষা পেয়েছিলে। সেই কু-অভ্যাস বল্‌তে আমি কি mean করচি, তা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ।

"তোমার চেহারা দেখেই আমার মনে হচ্চে, খুব ছেলেবেলাতেই বোধ হয় তোমার এ শিক্ষাটি হয়েছিল। তোমার অভিভাবকেরা যদি গোড়া থেকে সাবধান হতেন,—তোমার উপর যদি নজর রাখতেন,—ঝি-চাকরের হাতে তোমাকে সম্পূর্ণ ভাবে ছেড়ে না দিতেন,—তোমার পাড়ায় বা ইস্কুলে তোমার বন্ধু নির্ব্বাচনের সম্বন্ধে যদি সতর্ক হতেন,—তা'হলে বোধ হয় তুমি এই কুশিক্ষাটি লাভ করবার সুযোগ পেতে না। তার পর, তোমার এই কুশিক্ষাটি হয়েছে, এ কথা যদি তাঁরা জান্‌তে পারতেন,—জেনে যদি সাবধান হতেন,—অভ্যাস বদ্ধমূল হবার আগে এর কুফল তোমাকে বুঝিয়ে দিয়ে তোমার স্বভাব শোধরাবার চেষ্টা করতেন,—তা' হলেও, সময়ে সাবধান হয়ে তুমি রক্ষে পেয়ে যেতে পারতে। এটা এখন বোধ হয় তোমার সংস্কার হয়ে পড়েছে,—এখনও বোধ হয় তুমি এ অভ্যাস ছাড়তে পার নি। কেমন, ঠিক কি না ?"

সত্যেন লজ্জাবনত বদনে শুধু ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিল; সে মুখ তুলিতে পারিল না, কথাও কহিতে পারিল না।

হৃদয় বাবু সস্নেহে তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে-দিতে কহিলেন, "তোমায় আমি গোড়াতেই বলেছি,—আমার কাছে লজ্জা কোরো না। তোমায়-আমায় নাতি-ঠাকুর্দ্দা সম্পর্ক এখন ভুলে যাও। এখন কেবল মনে কর তুমি রোগী, আর আমি চিকিৎসক। এ বিষয়ে আমার কাছে লজ্জা করলে আমি তোমাকে বিশেষ কোন সাহায্য করতে পারব না।"

সত্যেন তথাপি চুপ করিয়া রহিল।

হৃদয় বাবু বলিলেন, "কই, কথা কচ্ছ না যে ? মুখটা তোল দেখি !"

সত্যেন মুখ তুলিয়া সলজ্জ মৃদু হাসিয়া কহিল, "আপনি যা বলছেন, তা ঠিক।"

"ঠিক না হবার যো আছে! তোমার চেহারায় যে সমস্ত স্পষ্টাক্ষরে লেখা রয়েছে। বাজে লোককে তুমি ফাঁকি দিতে পার; কিন্তু ডাক্তারের চোখে ধূলো দেবে কেমন কোরে? যাক্। তোমার caseটা খুব rare। এ রকম বন্ধ্যাত্ব খুব কম লোকের হয়ে থাকে; তুমি সেই কম লোকের দলের একজন। এখন বোধ হয় কেবল অভ্যাসের দরুণই এটা ছাড়তে পারছ না। এটা একটা নেশার মতন। Habit is the second nature। তোমার অবস্থা এখন সেই রকম দাঁড়িয়েছে। এ অভ্যাস ছাড়ানো খুব কঠিন। তবে একেবারে হতাশ হবার মতন অবস্থা এখনও হয় নি। আমার prescription মত যদি চল,—যা বলব, ঠিক মত যদি তা পালন কর, তা' হলে আমি তোমার বন্ধ্যাত্ব আরাম করে দিতে পারি। কেমন, রাজী আছ?"

হৃদয় বাবুর এই আশ্বাস বাক্য শুনিয়া, স্বস্তির একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সত্যেন কহিল, "আপনি যদি আমাকে আরাম করে দিতে পারেন, তা হলে আমি চিরকাল আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকব।"

হৃদয় বাবু হাসিয়া সত্যেনের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "অতটা তোমাকে করতে হবে না,—তুমি আরাম হয়ে সহজ মানুষ হয়ে উঠলেই আমি সুখী হব। আমি কাল সকালে তোমাকে একবার examine করতে চাই। তার পর ব্যবস্থা দোবো। আর, আজ তুমি এই বইখানি নিয়ে যাও, রাত্রে পোড়ে দেখো। আমি তোমার জন্যে আনিয়ে রেখেছি।" বলিয়া, সত্যেন আসিবার সময় যে বইখানি তিনি পড়িতেছিলেন, এবং এ ঘরে আসিবার সময় যে বইখানি তিনি হাতে করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন, সেই বইখানি সত্যেনকে দিলেন। সত্যেন বইখানি কৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করিল।

হৃদয় বাবু বলিলেন, "বইখানি পড়লে তুমি খুব উপকার পাবে।" সত্যেন বলিল, "আচ্ছা।"

(৯)

হৃদয় বাবুর চিকিৎসা-গুণে সত্যেন পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছে। ছয় মাসের চেষ্টায় সে একজন নূতন মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। সে প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম করে,—নিত্য তিন চার মাইল পথ পদব্রজে ভ্রমণ করে। কোনরূপ কুচিন্তা তাহার মনে স্থান পায় না। সে সর্ব্বদা নিজেকে কোন না কোন কর্ম্মে নিযুক্ত রাখে—কুচিন্তার অবসরও সে পায় না। তাহার শরীরে এখন আর একটুও অবসাদ নাই,—কোন কর্ম্মে সে আলস্য বোধ করে না। অবসর সময় সে সদ্‌গ্রন্থ পাঠে অতিবাহন করে।

পৃথিবী আজ তাহার চোখে বড় সুন্দর ঠেকিতেছে। প্রথম যৌবনে একদিন নব বসন্তের মৃদু মধুর হাওয়া গায়ে লাগিয়া তাহার মনে যেমন সুখোদয় হইয়াছিল, আজ যেন তাহার সেই নবযৌবন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার চোখে আজ পৃথিবী সুন্দর, আকাশ সুন্দর, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্র সুন্দর, গাছপালা সুন্দর, বাড়ীঘর সুন্দর—চারিদিকে সৌন্দর্য্য মূর্ত্তিমান হইয়া তাহার চোখের সম্মুখে নৃত্য করিতেছে।

আজ তাহার হৃদয় পূর্ণ। হৃদয়ের পূর্ণতায় কাহারও প্রতি তাহার মনে আজ এতটুকু বিরাগ নাই। সে জননীর অনুরোধে দ্বিতীয় পক্ষে সুশীলাকে বিবাহ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাকে সে একদিনের জন্যও ভালবাসিতে পারে নাই। বিশেষতঃ সুশীলার ক্ষুরধার রসনাকে সে রীতিমত ভয় করিত। আজ তাহার অন্তর পরিপূর্ণ। সেই পরিপূর্ণ হৃদয়ে আজ সুশীলার স্থান হইয়াছে। সুশীলাও স্বামীর এই ভাবান্তর চট্ করিয়া বুঝিয়া ফেলিয়াছিল। সুখ দুঃখ সংক্রামক। স্বামীকে সুখী দেখিয়া সুশীলা নিজেও সুখিনী হইয়াছিল। তাহার সে মুখরতা, সে বাচালতা, ভাষার সে তীব্রতা, সে ঝঙ্কার আজ আর নাই। সে আজ শান্ত, গম্ভীর, সদা হাস্যময়ী—স্বামীর মনোরঞ্জনে সদা সচেষ্টা।

প্রতিমাকে সত্যেন যথার্থই ভালবাসিয়াছিল। প্রথম যৌবনে প্রতিমার সঙ্গে তাহার বিবাহ হয়; বয়সের গুণে,—প্রতিমার মধুর শান্ত স্বভাবের গুণে, তাহাদের মনের খুব মিল হইয়াছিল। সুশীলাকে বিবাহ করিবার সময় যখন প্রতিমাকে বিদায় দিতে হয়, তখন সত্যেন মনে-মনে বিলক্ষণ দুঃখিত হইয়াছিল; কেবল মায়ের ভয়ে সে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে নাই। কিন্তু এই সাড়ে তিন বৎসর প্রতিমা অন্তরালে থাকিয়াও তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। একদিনের জন্যও সে প্রতিমাকে

ভুলিতে পারে নাই। এই দীর্ঘ সাড়ে তিন বৎসরের মধ্যে কতদিন তাহার মনে হইয়াছে, একবার গিয়া প্রতিমাকে দেখিয়া আসে। কিন্তু জননীর অপ্রীতির ভয়, সুশীলার বিদ্রূপ ও হিংসার ভয়,—নিজের লজ্জা ও অভিমান, তাহাকে বাধা দিত। তাই সে একদিনও প্রতিমাকে দেখিতে যাইতে পারে নাই। এই দীর্ঘ কালের মধ্যে উভয়ের মধ্যে একখানিও পত্র-ব্যবহার হয় নাই।

কয়দিন ধরিয়া প্রতিমার কথা কেবলই তাহার মনে হইতেছিল। সে কেবলই ভাবিতেছিল, প্রতিমার প্রতি বড় অন্যায় অবিচার, অত্যাচার করা হইয়াছে। সে নিরপরাধিনী। বিনা দোষে তাহাকে পরিত্যাগ করায় মহাপাপ হইয়াছে, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক। তাহার এই পরিপূর্ণ সুখের সময়ে প্রতিমার প্রতি তাহার আচরণটা তাহাকে কাঁটার মত বিঁধিয়া-বিঁধিয়া তাহাকে কেবলই বেদনা দিতেছিল। প্রতিমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া উচিত; তাহাকে আদর করিয়া এ বাটীতে ফিরাইয়া আনা কর্ত্তব্য—এ কথা সে বেশ বুঝিতেছিল। কিন্তু লজ্জা, ভয় আসিয়া তাহাকে বাধা দিতেছিল। কিন্তু এমন করিলে ত চলিবে না। লজ্জা, ভয় না কাটাইতে পারিলে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় কই?

আচ্ছা, না হয় সে কোন রকমে লজ্জা ভয় কাটাইয়া প্রতিমার বাপের বাড়ীতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। কিন্তু তাহাকে এ বাটীতে আনার উপায় কি? ফস করিয়া তাহাকে এ বাটীতে আনাও যায় না—যে পথে মস্ত এক কাঁটা—সুশীলা। প্রতিমার এ বাড়ীতে আসা সে কি পছন্দ করিবে? সুশীলা যদিও জানিত, তাহার একটী সতীন আছে, তথাপি, বিবাহ হইয়া অবধি সে একাই স্বামীর ঘর করিতেছে। এখন সে কি আবার সতীনকে স্বামীর ভাগ দিতে রাজী হইবে? আবার সুশীলার সহিত তাহার এখন একরকম মিটমাট হইয়া গিয়াছে—সুশীলার সঙ্গ এখন আর তাহার ততটা অপ্রীতিকর নহে। এরূপ অবস্থায় প্রতিমাকে এ বাড়ীতে আনিয়া সে কি আবার সাধ করিয়া নিজের দুঃখ নিজেই ডাকিয়া আনিবে না? সত্যেন কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

(১১)

বাপের বাড়ীতে প্রতিমা বড় স্বচ্ছন্দে ছিল না। ধনীর আদরের কন্যা সে,—পিতৃগৃহে তাহার কোন অভাবই ছিল না। স্বামী-পরিত্যক্তা, দুর্ভাগিনী বলিয়া তাহাকে বাড়ীর লোকে একটু অতিরিক্ত মাত্রায়ই স্নেহ, আদর, যত্ন করিত। কিন্তু এই অতিরিক্ত স্নেহ-যত্নই তাহার আরও অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সে ভাবিত, তাহার দুর্ভাগ্যে আদর-যত্নের আবরণে তাহার পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনীরা তাহাকে অনুকম্পা করে,—কৃপাপাত্রী বলিয়া মনে করে। নিজেকেও সে ক্ষমা করিতে পারিত না। এমনই দুর্ভাগিনী সে, যে, ধনবান পিতার বড় আদরের কন্যা হইয়াও আজ সে পতি কর্তৃক পরিত্যক্তা! তাহার এ ঘোর অপরাধের মার্জ্জনা নাই। অপমানে, আত্মগ্লানিতে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিত। এই তিন বৎসর সে সকল রকম সুখ, বিলাসিতা, প্রাচুর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও কি ভীষণ মানসিক কষ্টে কাটাইয়াছে, তাহা কেবল সেই জানে,—আর জানে তাহার সমসুখদুঃখভাগিনী তাহার মেঝদি। তাহার জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে—বাঁচিবার আর তাহার সাধ নাই। তিন বৎসরব্যাপী দুর্ভাবনায় তাহার শরীরও যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তাহার শরীর এখন অতি ক্ষীণ, দুর্ব্বল। তাহার সে অনুপম সৌন্দর্য্য ম্লান হইয়া আসিয়াছে। উনিশ বৎসরের ভরা যৌবনেই তাহার দেহ অবসাদগ্রস্ত।

কয় দিন ধরিয়া তাহার মনটা উড়ু উড়ু করিতেছিল;—শ্বশুরবাড়ীর কথা, বিবাহের পর প্রথম-প্রথম শাশুড়ী, স্বামীর আদর-যত্নের কথা কেবলই তাহার মনে পড়িতেছিল। তাহার আবার শ্বশুরবাড়ীতে ফিরিয়া যাইবার সাধ যাইতেছিল। সে ভাবিতেছিল, স্বামী তাহাকে গ্রহণ না করিলেও, যদি শুধু কেবল দাসীর ন্যায় তাহাকে সেখানে থাকিতে দেন, তবে সে তাহাও করিতে প্রস্তুত। শাশুড়ী তাহাকে যতই অবজ্ঞা, অনাদর, তিরস্কার করুন,—সপত্নী তাহাকে যতই গঞ্জনা দিক, তাহার যতই লাঞ্ছনা করুক,—তবুও, শ্বশুরবাড়ীতে বাস করিতে পারিলে তাহাই তাহার পক্ষে স্বর্গের তুল্য। তাহার মনের এখনকার অবস্থা কেবল তাহার মেঝদি বুঝিত, এবং দুই বোনে নীরবে বসিয়া বসিয়া মনের ভাব-বিনিময় করিত।

সেদিন প্রতিমার শরীর একটু খারাপ বোধ হইতেছিল। সর্ব্বাঙ্গ ভার-ভার। কিছুতেই তৃপ্তি নাই—কোন কাজে উৎসাহ নাই,—সেইজন্য সে সকাল-সকাল খাইয়া আসিয়া, নিজের ঘরে বিছানায় শুইয়া পড়িয়া ঘুমাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিল। ঘরের দরজা মেঝদির জন্য খোলা ছিল। দুই বোনে একসঙ্গে শুইত। সেদিন তখনও মেঝ্‌দির সাংসারিক নিত্যকর্ম্ম সারা হয় নাই। তাই সে এখনও শুইতে আসে নাই—খানিকটা পরে আসিবে। ঘরে একটা প্রদীপ জ্বলিতেছিল,—তাহার আলো বড় মৃদু,—উজ্জ্বল গ্যাস বা বিজলীর আলো প্রতিমার চোখে সহ্য হইত না। সেই আধো-আলো, আধো আঁধারে প্রতিমা একাকিনী দিদির প্রতীক্ষায় শুইয়া-শুইয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল,—ঘুম আজ তাহার চোখে কিছুতেই আসিতে চাহিতেছিল না।

"প্রতিমা!"

এ কি! এ যে তাহার স্বামীর চির-পরিচিত আদরের সম্বোধন! এখানে—বাপের বাড়ীতে তাহাকে কই কেহ ত এমন মধুর স্বরে ডাকে না! সে কি স্বপ্ন দেখিতেছে না কি? না, এ তাহার অবসন্ন, চিন্তাক্লিষ্ট, চিত্তের ভ্রান্তি মাত্র? সে যে কয়দিন ধরিয়া এই ডাকটিরই প্রত্যাশা করিতেছিল! তাই বুঝি তাহার মনে হইতেছে, তাহার স্বামী আসিয়া তাহাকে সেই আগেকার দিনের মত আদর করিয়া ডাকিতেছে!

প্রতিমা চোখ বুজিয়া পড়িয়া ছিল,—চোখ মেলিতে তাহার ভরসা হইতেছিল না,—পাছে তাহার এই মধুর স্বপ্ন টুটিয়া যায়,—তাহার ভ্রান্তি ঘুচিয়া গিয়া পাছে প্রত্যাশিত বাঞ্ছিতকে চর্ম্মচক্ষে চোখের সামনে দেখিতে না পাইয়া নিরাশ হইতে হয়। সে সচকিতে দ্বিতীয় ডাকের প্রতীক্ষায় তেমনি করিয়া চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল,—যদি তাহার স্বামী সত্য-সত্যই আসিয়া থাকেন! যদি সত্য-সত্যই তিনিই তাহাকে ডাকিয়া থাকেন! আজিকার এ ডাক যদি তাহার কল্পনামাত্রে পর্য্যবসিত না হয়!

উত্তর না পাইয়া সত্যেন মনে করিল, প্রতিমা বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাই সে এবার একটু জোরে ডাকিল, "প্রতিমা! প্রতি!"

প্রতিমা ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িল। এবার তাহার মনে আর কোন সন্দেহ রহিল না। সে চোখ মেলিয়া চাহিল। দেখিল, ঈষদালোকিত কক্ষের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া, তাহারই চির-আরাধ্য দেবতা সত্যেন! এ স্বপ্ন নয়, কল্পনা নয়, ভ্রান্তি নয়। এ মূর্ত্তিমান সত্য। আবেগে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল; অব্যক্ত আনন্দ তাহার হৃদয়ের কানায়-কানায় ভরিয়া উঠিয়া, উছলিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। কিন্তু আনন্দের এই আতিশয্য তাহার রুগ্ন, ক্ষীণ, দুর্ব্বল দেহ সহ্য করিতে পারিল না। সে কোন কথা না কহিয়া নীরবে সত্যেনের মুখের দিকে মিনিট খানেক চাহিয়া রহিল। তার পর ধীরে-ধীরে মূর্চ্ছা আসিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিল—সে শয্যার উপর পড়িয়া গেল।

সত্যেন ব্যস্ত হইয়া উদ্বেলিত কণ্ঠে "মেঝদি!" বলিয়া ডাকিয়াই তাড়াতাড়ি খাটের উপর উঠিয়া প্রতিমার মাথাটি নিজের কোলের উপর তুলিয়া লইয়া বসিল। তার পর আবার ডাকিল, "মেঝদি, শীগ্‌গীর আসুন!"

মেঝদি নিকটেই একটু অন্তরালে ছিলেন,—তিনি সত্যেনের সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের কাছ পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। তিনি ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে?"

সত্যেন কহিল, "একখানা পাখা, আর খানিকটা জল। মূর্চ্ছা গেছে—"

মেঝদি তাড়াতাড়ি একখানা পাখা আনিয়া সত্যেনকে কহিলেন, "তুমি একটু সরে বস, আমি বাতাস কচ্ছি। ভেবে-ভেবে বড় কাহিল হয়ে পড়েছে। তার পর হঠাৎ তোমাকে দেখে সামলাতে পারে নি। ভয় নেই, এখ্‌খুনি সেরে উঠ্‌বে 'খন।"

তাহাই হইল। মিনিট পাঁচের মধ্যেই প্রতিমা মিটমিট করিয়া চারিদিকে চাহিয়া কি যেন খুঁজিতে লাগিল। মেঝদি সত্যেনকে বলিলেন, "তুমি এগিয়ে এসে সামনে বস,—তোমায় খুঁজচে।" সত্যেন অগ্রসর হইয়া সামনে আসিতেই চারি চোখে মিলন হইল। প্রতিমা আবার চোখ বুজিল। তার পর মাথায় কাপড় টানিয়া দিবার চেষ্টা করিতে, মেঝদি বলিলেন, "যেমন আছিস, তেমনি থাক। আমি এখন যাচ্চি—আমার ঢের কাজ রয়েছে।" সত্যেনকে বলিলেন, "আর ভয় নেই। তোমরা দুজনে কথা কও, আমি একটু পরেই আসছি। তোমার খাবার

দিতে বলিগে।" সত্যেন বলিল, "অত ব্যস্ত হবেন না মেজদি।" "না,—ব্যস্ত আমি হইনি।"

মেজদি চলিয়া গেলে প্রতিমা উঠিয়া বসিতে উদ্যত হইল। সত্যেন বাধা দিয়া কহিল, "উঠ্‌তে হবে না, শুয়ে থাক।" তার পর তার হাত দুটী নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া, অতি স্নেহভরে নিপীড়ন করিয়া কহিল, "প্রতি, আমায় মাপ কর।" প্রতিমা তখনও ভাল করিয়া সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার বুকের ভিতর কত কথা ঠেলিয়া-ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। সে কোন কথাই কহিতে পারিল না। জবাব না পাইয়া সত্যেন কাতর কণ্ঠে কহিল, "আমায় মাপ করতে পারবে না প্রতি? জানি আমি, আমার অপরাধের মার্জ্জনা নাই—কেবল তুমি নিজগুণে যদি আমাকে মাপ কর।" প্রতিমা এবারও কোন কথা কহিল না; কিন্তু জোর করিয়া নিজের হাত ছাড়াইয়া লইয়া, সত্যেনের পায়ে হাত ঠেকাইয়া, সেই হাত নিজের মাথায় স্পর্শ করাইল। মার্জ্জনা লাভ করিয়া পরম পুলকিত হইয়া সত্যেন প্রতিমার লজ্জারক্ত গণ্ডে একটী প্রগাঢ় চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিল, এবং ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই ঘরের দরজার চৌকাঠের উপর মেজদির কণ্ঠ শুনা গেল, "খাবে এস সত্যেন, তোমার খাবার দেওয়া হয়েছে।" লজ্জায় প্রতিমা সামনে হাতের কাছে সত্যেনের চাদরখানা পাইয়া তাহা টানিয়া লইয়া নিজের মুখ ঢাকিয়া ফেলিল; আর সত্যেন নতমুখে খাট হইতে নামিয়া পড়িল।

যমুনা

রায় শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বাহাদুর বিদ্যালঙ্কার

এম-এ, বি-এল, এম-এল্-সি

হায় যমুনে উদাসিনি,
তোর চরণ-তলে, জগৎপতি—
নাইক মুখে করুণ বাণী।
প্রেমের বন্যা হ'লে শুষ্ক
কোথায় যাবে নীরস প্রাণী;
বিরাগ ভরে ধূলায় প'ড়ে
ব্রজেশ্বর আর রাধারাণী।
যা না ছুটে রে তটিনি,
আন্‌ না টেনে প্রাণের টানে,—
ভাসিয়ে দে না বুকে বুকে,
যুগল রূপে প্রেমের বানে।
যার প্রেমেতে জগৎ নাচে,
পীযুষ-ভরা মায়ের স্তনে,
যার প্রণয়ের ছায়ার ছায়ে
প্রাণ প্রেয়সী এ ভুবনে;
যার প্রণয়ের জ্যোতিঃ পেয়ে
ভুলায় শশী ঐ গগনে,
কুমুদিনী রয় বিভোরা
লক্ষ যোজন প্রাণের টানে;
যে প্রেমের মহিমা বুঝে
শিব নাচে ঐ ঘোর শ্মশানে,
শিবের বুকে সীমন্তিনী,—
রে যমুনে যাস্‌ উজানে।
ডাক্‌ রে ব'সে রাধা রাধা,
আন্‌রে সাধি ব্রজধনে,
মিলন-স্রোতে মিলিয়ে দিয়ে,
মিলিয়ে দে রে বিশ্বজনে।

নায়েব মহাশয়

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

নবম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। বসন্তকালের সন্ধ্যা। সমস্ত দিন প্রখর রৌদ্রের পর সায়ংকালের সুমন্দ সুখস্পর্শ বসন্তানিল বড়ই মধুর ও উপভোগ্য। কিন্তু মন চঞ্চল থাকিলে তাহাও ভাল লাগে না। আজ নায়েব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সান্যালের কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। এত বড় কানসারণের নায়েব হইয়াও আজ তাঁহার মন উৎকণ্ঠাকুল। অন্য দিনের অপেক্ষা আজ তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা-আহ্নিক শেষ করিয়া তাঁহার বৈঠকখানায় আসিয়া বসিয়াছেন। কেন বলা যায় না—চাকর বৈঠকখানায় আলো জ্বালিয়া, তাঁহাকে তামাক দিয়া চলিয়া যাইবার অব্যবহিত পরেই, তিনি প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া সর্ব্বসন্তাপহারিণী হুক্কাসুন্দরীর শরণ গ্রহণ করিয়াছেন; তিনি বর্ত্তুল উদরটি সম্পূর্ণ রূপে উদ্ঘাটিত করিয়া খালি গায়ে ফরাসে বসিয়া একাকী অন্ধকারে "ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ" করিয়া তামাক টানিতেছেন, আর এক-একবার আগ্রহ-পূর্ণ দৃষ্টিতে সমুখস্থ পথের দিকে চাহিতেছেন। অদূরবর্ত্তী সহকারশাখা হইতে প্রচুরোদ্গত আম্র-মুকুলের সুমিষ্ট গন্ধ দক্ষিণা বাতাসে ভাসিয়া আসিয়া বায়ুস্তর সুরভিত করিতেছে; কিন্তু আজ নায়েব মহাশয়ের সে মাধুর্য্য উপভোগ করিবার শক্তি নাই; তিনি তামাক টানিতে-টানিতে এক-একবার অস্ফুট স্বরে বলিতেছেন, "বেটা নেড়ের এখনও দেখা নেই কেন? এত দেরী হবার ত কথা নয়! কাউকে দিয়ে ডাক্‌তে পাঠালেও ত সুবিবেচনার কায হবে না। এতো চুণো পুঁটী নয়,—রুই-কাতলা যা'ল।"

আবার 'ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ' হুঁকার শব্দ হইতে লাগিল। প্রায় মিনিট পাঁচেক পরে কে একজন লোক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে-চাহিতে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে চোরের মত সতর্ক ভাবে নায়েবের বৈঠকখানার বারান্দায় উঠিল; এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঘরের ভিতর চাহিয়া 'খুক্ খুক্' করিয়া কাশিল। সেই কাশির অর্থ সাড়া দেওয়া। নায়েব মহাশয় তৎক্ষণাৎ হুঁকা নামাইয়া রাখিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন, "কে রে, আবেদ না কি?"

আবেদ হালসানা অন্ধকারেই সেলাম ঠুকিয়া সেইরূপ নিম্নস্বরে বলিল, "জ্বে!"

নায়েব বলিলেন, "আয়, ভিতরে আয়। আমি একাই আছি, এত দেরি করলি কেন?"

আবেদ হালসানা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া, পাছে নায়েব মহাশয়ের হুঁকা মারা যায় এই ভয়ে ফরাস স্পর্শ না করিয়া একটু দূরে দাঁড়াইল। তাহার পর কণ্ঠস্বর আরও নামাইয়া বলিল, "সাবধানের বিনেশ নেই কত্তা! সাঁজ না বাঁউড়ালে কি ক'রে আসি? কেউ যদি দেখে ফ্যালে ত সন্দো করতে পারে। সাঁজের ঘুলি হ'লো, আমিও বেরিয়ে পলাম।"

নায়েব মহাশয় বলিলেন, "কাজ ত হাসিল করেছিস্? ওসব কাজে তুই খুব পোক্ত তা জানি,—কিন্তু যখম করে যখন তুই স'রে পড়িস্, তখন কেউ তোকে দেখেছিল কি?"

আবেদ বলিল, "জ্বে না, ডাণ্ডা কষে আমি য্যাখোন দোড় মেরে পালাই, ত্যাখোন মুকুরপুরের ছুটো মেয়্যা-মানুষ আমাকে দেখ্‌তে পেয়েলো। আমাকে চিন্‌তেও পেরেলো। আমি মনে-মনে ঠেউরে দেখ্‌লাম, মেয়্যামানুষ ছুটো যদি কারু কাছে কথাটা পেরকাশ করে, তা হলি আমার ওপর সন্দো আস্‌তিও পারে। এত আর হেঁজি-পেঁজি লোক নয়, আদালতের প্রেধান উকীল! তাই ভাব্‌লাম, মাগী ছুটোর মুখ বন্দো করতি হবে। তা সে বেবস্তা করেচি কর্ত্তা,—আমার সঙ্গে পীরিত-পেরণয় আছে এমন লোক দিয়ে তাদের খুব ভয় দেখিয়ে দিয়েছি, পরাণ থাক্‌তে আর তারা রা কাড়্‌বে না। সাক্ষী-টাক্ষি আর যোগাড় করতে হ'বে না; সাক্ষীর মুখে ত মাম্‌লা। হুজুরের হুকুমে ডাণ্ডা মেরে কত মাথা কাটালাম, কোন্‌টা পেরকাশ হয়েচে যে এটাও হবে?"

নায়েব আশ্বস্ত চিত্তে বলিলেন, "বেশ বাবা! তোর

হাতযশের তারিফ করতে হয়। আর কাকে সঙ্গে নিয়েছিলি?"

আবেদ হালসানা বলিল, "নিশ্চিন্তিপুরের নবুনে হালসানা হুজুর! সে খুব পাকা লোক। আখেরে পস্তাতে হয়, ত্যামোন কাম কি এ বান্দা কখনো করেছে হুজুর! নবীন হালসানা তেনাকে ডাকঘরের পানে যাতি দেখে, তেনার পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়ে কি সব মামলা-মকোদ্দমার শলা-পরামশ করতে নাগ্‌লো। উকীলের কাছে গিয়ে কোন মক্কেল যদি মামলার কথা তুল্‌তে পারে, তা হলি হুজুর, সে উকীলের সাম্‌নে গোখ্‌রো সাপ ফণা তুলে গজ্‌রাতে থাক্‌লিও তেনার সেদিকে খেয়াল থাকে না। আমি সেই ফাঁকে ডাকঘর থেকে নেমে তেনার পেছোনে এসেই তেনার মাথায় ঝাড়লাম এক দাণ্ডা। বাবু তো সেই দাণ্ডা খেয়ে বাপ্ বাপ্ ক'রে ডাক ছেড়ে সড়কের ওপর এক্কিবারে চোদ্দপোয়া। আর আমিও এক লহমার মদ্দি পগার পার।"

নায়েব আবেদ হালসানার কার্য্যদক্ষতার পরিচয় পাইয়া পরদিন তাহাকে খুসী করিবেন—এই আশ্বাস দিয়া বিদায় করিলেন। তাহার পর তিনি জামা-চাদরে সজ্জিত হইয়া ম্যানেজার সাহেবের সহিত সাক্ষাতের জন্য কুঠির দিকে চলিলেন। পথে বঙ্কিমবাবু ডাক্তারের সহিত তাঁহার দেখা হইল। ডাক্তারের নিকট ভবতোষ বাবুর অবস্থা সম্বন্ধে সংবাদ লইবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ হইল; কিন্তু নিজে কথাটা পাড়িতে তিনি সাহস করিলেন না। কথায়-কথায় বঙ্কিম বাবুই প্রথমে এ কথা তুলিলেন; বলিলেন, "এতদিন আমার ধারণা ছিল, কলকাতার পথে-ঘাটেই দিন-দুপুরে গুণ্ডার দল টাকার লোভে নিরীহ পথিকদের মাথা ফাটায়। কিন্তু এখন দেখ্‌চি, মুচিবেড়ের মত পল্লীগ্রামেও গুণ্ডা এসে দিনের বেলা ভদ্রলোককে আক্রমণ করে। পকেট থেকে কিছু টাকা-কড়ি পাবার আশা না থাক্‌লেও তাঁর মাথায় লাঠি মেরে চম্পট দেয়। এ যায়গা যে দিন-দিন মগের মুলুক হয়ে উঠ্‌লো নায়েব মশায়! এখানে যে ভদ্রলোকের মান-সম্ভ্রম রক্ষা হওয়া ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠ্‌লো! নবাবী আমোলেও যে প্রজার ধনপ্রাণ এর চেয়ে ঢের বেশী নিরাপদ ছিল!"

নায়েব মহাশয় বুঝিলেন, এক্ষেত্রে অজ্ঞতার ভান করিলে সুচতুর ডাক্তারের নিকট তাঁহাকে ধরা পড়িতে হইবে; কারণ, এই অল্প সময়ের মধ্যে যে দুর্ঘটনার কথা বিদ্যুদ্বেগে পল্লীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছে, সে কথা মুচিবাড়িয়ার ডেপুটী গবর্ণরের কর্ণগোচর হয় নাই, এরূপ অসম্ভব ব্যাপার কে বিশ্বাস করিবে? এইজন্য নায়েব মহাশয় বিপুল সহানুভূতিতে কণ্ঠস্বর আর্দ্র করিয়া বলিলেন, "আমিও ঠিক ঐ কথাই বল্‌তে যাচ্ছিলাম ডাক্তার বাবু! বৈকালবেলা সদর রাস্তায় ভবতোষ বাবুর মত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মাথা ফাটানো! এ যে ভয়ঙ্কর কথা! চাষা প্রজাগুলা ভয়ঙ্কর বেতরিবৎ আর 'দুদ্দারিষ' হয়ে উঠেছে। ঐ যে সব মানুষ সমান—এই সর্ব্বনেশে জ্ঞান আজকাল 'ভারত উদ্ধারের' দল তাদের মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে—এতে আর ভদ্রলোকের 'মান-সম্ভ্রম' বজায় থাকে না দেখ্‌চি! আগে যে বেটারা ভদ্রলোক দেখ্‌লে দশহাত তফাৎ দিয়ে যেতো, কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে মুখ তুলে জবাব দিতে সাহস করতো না, এখন তারা সাম্‌নে এসে লম্বা লম্বা 'ইস্পিচ' ঝাড়ে। আমাদের ত গ্রাহ্যিই করে না—আমাদের মনিব ম্যানেজার সাহেবকেই দশ কথা শুনিয়ে যায়। দুই এক ঘা 'ওসুদ' পিঠে পড়লে, তাঁকেও রাস্তায় ধ'রে 'কুঁৎকিয়ে' দিতে কসুর করে না,—তা উকীল-মোক্তারদের তারা যে 'ডোণ্ট্ কেয়ার' করবে, এ ত জানাই আছে। কোন্ আকাট্ গোঁয়ারের বিরুদ্ধে ক্রোধ করি, ভবতোষ ভায়া মামলা নিয়েছিলেন, প্রতিবাদী সেই মামলায় হেরে গিয়ে বাদীকে ছেড়ে বাদীর উকিলকেই ধরে বসান দিয়েছে! হাকিমকে যে দু'ঘা দেয় নি—এই আশ্চর্য্যি! তা ভবতোষ ভায়া এখন আছেন কেমন? মারটা ত সাংঘাতিক হয় নি? খবরটা শুনে অবধি মনটা এমন বিগ্‌ড়ে গিয়েছে যে, কিছু ভাল লাগ্‌চে না; তাই পথে একটু হাওয়া খেতে বেরিয়েছি।"

ডাক্তার বলিলেন, "সৌভাগ্যক্রমে আঘাত সাংঘাতিক হয় নি। আশা করি, শীঘ্রই সেরে উঠ্‌তে পারবেন। কিন্তু আপনি যে বল্লেন, তিনি কোন প্রজাকে মামলা হারিয়ে দেওয়াতে সে রাগের বশে বাদীকে ছেড়ে বাদীর উকীলের মাথা ফাটিয়েছে—এ কোন কাযের কথা নয়। বিশেষতঃ ভবতোষ বাবুর ধারণা অন্য রকম। আক্রমণকারীকে দেখে আবেদ হালসানা বলেই তাঁর সন্দেহ হয়েছে।"

নায়েব ডাক্তারের কথা শুনিয়া যেন আকাশ হইতে পড়িলেন! দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন, "আবেদ হাল্‌সানা! কোন্ আবেদের কথা বল্‌ছেন?"

ডাক্তার বলিলেন, "মুচিবেড়েতে কয়জন আবেদ হালসানা আছে? আপনাদের কুঠীর আবেদ হালসানা।"

নায়েব মহাশয় যেন অকূল-সমুদ্রে কূল পাইলেন, এইরূপ ভঙ্গিতে হাঁপ ছাড়িয়া বলিলেন, "রাধামাধব! এও কি একটা কথা? আবেদ হালসানা আজ সকালে সূর্য্যোদয় না হ'তে সাহেবের একখান জরুরি চিঠি নিয়ে সহরে আমাদের মোক্তারের কাছে রওনা হয়েছে। ভবতোষ বাবুর মাথাটা তখন ত আর স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না, মাথায় লাঠি পড়লে দৃষ্টিশক্তিটা তীক্ষ্ণ থাক্‌বে—এ কি কখন প্রত্যাশা করা যায়?' "বিশেষতঃ আবেদ অতি নিরীহ বেক্তি, বিড়ালকে সে 'হেই' বল্‌তে জানে না। যদিস্যাৎ সে এখানে থাক্‌তোই—তা হলেও তাকে দিয়ে এ প্রকার কাজ কখন সম্ভব হতো না। আর এত লোক থাক্‌তে সে ভবতোষ বাবুর মত মান্যমান বেক্তির গায়ে হাত তুল্‌বে, এও কি একটা কথা? তাঁর মত লোকের এ রকম ভুল ধারণার কথা শুনে বড়ই দুঃখিত হ'লাম ডাক্তার বাবু!"

ডাক্তার বাবু নায়েবের সহিত এ সম্বন্ধে আর কোন তর্ক না করিয়া বাসার দিকে চলিলেন। নায়েব মহাশয় সেই স্থানে কয়েক মিনিট পায়চারি করিয়া, ডাক্তার অদৃশ্য হইলে, সাহেবের কুঠি অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডল ভ্রূকুটী-কুটিল হইয়া উঠিল।

ভবতোষ বাবুর প্রহারের সংবাদ হাম্‌ফ্রি সাহেবেরও কর্ণগোচর হইয়াছিল। তিনি সুপরামর্শের জন্য উৎকণ্ঠাকুল চিত্তে নায়েবেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। নায়েবের আগমন সংবাদ পাইয়াই তিনি তাঁহার খাসকামরায় আসিয়া নায়েবের সহিত পরামর্শ করিতে বসিলেন।

সাহেব দুই-চারি কথার পর হাসিয়া বলিলেন, "বজ্জাত উকীলটা এবার দস্তুরমত সায়েস্তা হইয়া যাইবে। জলে বাস করিয়া আর কুম্ভীরের সঙ্গে লড়াই করিতে তাহার সাহস হইবে না, সাণ্ডেল! আমাদের বিরুদ্ধে ওকালতি করিবার ফল হাতে-হাতে পাইলো। প্রহার বহুৎ আচ্ছা চিজ আছে, উহার চোটে ভুট পলায়ন করে।"

নায়েব চিন্তিত ভাবে বলিলেন, "তা বটে সাহেব, কিন্তু আইন ঘাঁটাই উহার পেশা। একবার নাড়িয়া-চাড়িয়া না দেখিয়া যে সে কিল খাইয়া কিল চুরি করিবে—এমন ত আমার মনে হয় না। বিশেষতঃ মাথা ফাটিয়া রস গড়াইয়াছে। আবার আর একটা মুস্কিলের কথা—সে না কি আবেদ হালসানাকে চিনিতে পারিয়াছে!"

সাহেব আস্ফালন করিয়া বলিলেন, "চিনিটে পারিয়া সে কচু করিবে! কে তাহার পক্ষে সাক্ষী হইবে? আমি গোড়া বান্ধিয়া কাজ করিবার বেবস্থা করিতেছি। নলিনী ডারোগা আমার নিমক খাইটেছে। সে আলবট্ আমার হুকুম টামিল করিবে। আমি তাহাকে এখনই অর্ডার পাঠাইতেছি,'পুলিশ কেস'না হয় তাহা সে নিশ্চয় করিবে।"

সাহেব তৎক্ষণাৎ দোয়াত কলম লইয়া 'মাই ডিয়ার নলিনী'কে একখানি 'কন্‌ফিডেন্সিয়াল' পত্র লিখিয়া 'কোন্ হ্যায়' বলিয়া হুঙ্কার দিলেন।—'হুজুর' বলিয়া গরিবুল্লা পেয়াদা তৎক্ষণাৎ খাস-কামরায় প্রবেশ করিয়া, তাহার আধ হাত লম্বা সাদা দাড়ি মাটীর দিকে হাত দুই নামাইয়া সেলাম করিল। সাহেব পত্রখানি তাহার দাড়ির উপর নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "দারোগা বাবু, জল্‌দি।"

গরিবুল্লা আর এক দফা সেলাম করিয়া, তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষের বাহিরে গিয়া দ্বার ঠেলিয়া দিল।

নায়েব বলিলেন, "হাঁ, দারোগাটা হাতে আছে, এ একটা সুবিধার কথা বটে। সে হুজুরের আদেশ তামিল করিবে এ বিষয়েও সন্দেহ নাই। কিন্তু পুলিশের নিকট সাহায্য না পাইলেও, সে কি নিরীহ চাষী প্রজার মত লাঠী হজম করিবে? আমার ত তা বোধ হয় না। সে ফৌজদারীর আইনখানা একবার ওলট্‌-পালট করিয়া, একটা না একটা ধারা খাটাইবার চেষ্টা করিবে।"

সাহেব বলিলেন, "বোধ হয় করিবে। যদি সে একটা ফৌজদারী মামলা আরম্ভ করে—তখন কি উপায় অবলম্বন করা যাইবে—তাহাও ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। সে যাহাতে সাক্ষী জোগাড় করিতে না পারে—তুমি তাহার বেবস্থা নিশ্চয়ই করিবে। কিন্তু রোগের আক্রমণ নিবারণ অপেক্ষা রোগের মূল উৎপাটন করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।"

নায়েব বলিলেন, "হাঁ সাহেব, রোগের মূলই উৎপাটন করিব। উকিল যদি নাছোড়বান্দা হইয়া ফৌজদারী মামলা দায়ের করে—তাহা হইলে সর্ব্বাঙ্গ সাক্ষাল মুচিবাড়িয়া

কান্‌সারণের নায়েব থাকিতে সে নির্ব্বিবাদে মামলা চালাইতে পারিবে মনে করিতেছে? সে এখানে থাকিতে না পারে, আমি তাহার বন্দোবস্ত করিব। তাহাকে ভিটা-ছাড়া করিব। লাঠিতে যে কার্য্য না হইয়াছে, একটা দেশলাইয়ের কাঠিতে সেই কার্য্য হইবে; কোন চিন্তা নাই হুজুর!"

নায়েবের পৈশাচিকতার বহর দেখিয়া দুর্জ্জন হাম্‌ফ্রি সাহেবকে পর্য্যন্ত বিস্মিত হইতে হইল; তিনি অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'ফায়ার? মাই গড্!'—কিন্তু মুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং নায়েবের পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া বলিলেন, "উট্টম মট্‌লব করিয়াছ সাণ্ডেল; তুমি বহুৎ 'ক্লেবর' আদমী আছ। তোমার প্রস্তাব শুনিয়া আমি অট্যান্ট খুসী হইয়াছি। রাত্রি অধিক হইল, এখন যাইতে পার।"

সাহেবের প্রশংসায় নায়েব সশরীরে স্বর্গলাভ করিয়া মনের আনন্দে বাসায় প্রস্থান করিলেন। সাহেব মনে মনে বলিলেন, "উঃ, বাঙ্গালী কি শয়তান! চাকরীর খাতিরে ইহারা স্বজাতির ঘরে আগুন পর্য্যন্ত দিতে পারে! এই সকল কুকুর একমুঠা ভাতের জন্য যখন সকলই করিতে রাজি, তখন আমাদের এক-একজন যদি ইহাদের সাহায্যে লক্ষ-লক্ষ কালা নিগার প্রজাদের বুটের নীচে থেঁৎলাইয়া তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব শোষণ করিতে না পারে ত সে আমাদেরই দুর্ভাগ্য! জগতে এমন সুযোগ আর কোথায় মিলিবে?"

* * * *

পরদিন প্রভাতে নায়েব মহাশয় তাঁহার চিরদিনের অভ্যাসানুযায়ী গ্রামের সকলেরই খোঁজ-খবর লইলেন; এবং পূর্ব্বদিনের দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ উঠিলে সকলেরই নিকট ভবতোষ বাবুর মাথা ফাটার জন্য যেরূপ দুঃখ ও আক্ষেপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, নিজের মাথা ফাটিলেও ততখানি কাতরতা প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না। তাঁহাকে গায়ে পড়িয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিতে দেখিয়া—'ঠাকুর ঘরে কে? 'আমি কলা খাই নাই'—এই প্রাচীন প্রবাদটি কাহার-কাহারও মনে পড়িল। তবে নায়েব মহাশয় যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন—এই ব্যাপার লইয়া গ্রামে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইবে, তাঁহার সে আশঙ্কা অমূলক বলিয়াই এখন তাঁহার মনে হইল। তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, সকলেই চুপচাপ্! ইহাতে তিনি একটু উৎকণ্ঠিত হইলেন। তাঁহার ধারণা হইল, তাঁহাদের বিরুদ্ধে কুঠির এলাকার বাহিরে ভদ্রসমাজে কি একটা ষড়্‌যন্ত্র চলিতেছে। বিশেষ, স্থানীয় মুন্সেফবাবু এই অত্যাচারের কথা শুনিয়া, কুঠির সহিত এই ব্যাপারের যোগ আছে সন্দেহ করিয়া, জমীদারী কুঠির উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন, এবং ভবতোষ বাবুর বিপদে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন—এই সংবাদ নায়েব মহাশয়ের কর্ণগোচর হওয়ায়, তিনি একটু দমিয়া গেলেন। কিন্তু বাহ্যিক ব্যবহারে কাহাকেও তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে দিলেন না।

ক্রমে এক মাস চলিয়া গেল, ভবতোষ বাবু কাহারও বিরুদ্ধে নালিশ করিলেন না, এবং ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু লগুড়াহত হইয়াও আশ্রিত প্রজার পক্ষ ত্যাগ করিলেন না দেখিয়া, নায়েব মহাশয়ের সাহসও অনেকটা বাড়িয়া গেল। ম্যানেজার সাহেবের আশ্রয়ে তিনি যে সকল দুষ্কর্ম্ম করিয়াই হজম করিতে পারেন—এ ধারণা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইল।

এক মাস পরে মনিরুদ্দীনের মামলা উঠিলে, প্রতিবাদী পক্ষ মামুলী প্রথায় সময়ের প্রার্থনায় দরখাস্ত দাখিল করিলেন। মুন্সেফ সেই দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন বটে, কিন্তু তিনি 'অর্ডার-সীটে' হুকুম লিখিলেন, 'এক মাস সময় দেওয়া গেল। নির্দ্দিষ্ট দিনে মামলার বিচার হইবে। অতঃপর কোন কারণে মামলা মুলতুবি থাকিবে না।' নায়েব এই আদেশে সুখী হইলেন, এবং এক মাস সময়ই তাঁহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট মনে করিলেন।

অতঃপর ম্যানেজার সাহেবের সহিত নায়েব মহাশয়ের ঘন-ঘন পরামর্শ চলিতে লাগিল। পরামর্শটা গোপনে চলিলেও, তাহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে ভবতোষ বাবু বা তাঁহার বন্ধুগণের বিলম্ব হইল না। কুঠির অনুগ্রহ-প্রত্যাশী অথচ ভবতোষ বাবুর হিতৈষী কোন-কোন বন্ধু ভবতোষ বাবুকে অনুরোধ করিলেন, মনিরুদ্দীন সেখের ভাগ্যে যা থাকে হইবে, মামলার দিন তিনি যেন তাহার পক্ষ সমর্থন না করেন। মুচিবাড়িয়াতে যখন ব্যবসায় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, তখন সর্ব্বশক্তিমান প্রবল পক্ষের ক্রোধানলে ইন্ধন প্রয়োগ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।

কিন্তু ভবতোষ বাবুর সঙ্কল্প অটুট। তিনি মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তোমরা আমাকে বুদ্ধিমানের দলে ফেলিয়া আমার অপমান করিও না। তোমাদের ঐ পাটোয়ারি বুদ্ধি অপেক্ষা আমার নির্ব্বুদ্ধিতা শতগুণে ভাল।" কিন্তু তিনি তাঁহার এই নির্ব্বুদ্ধিতার ফল হাতে-হাতেই পাইলেন। কয়েক দিন পরে তাঁহার বাসার ঝি তাঁহাকে কোন কথা না বলিয়াই অদৃশ্য হইল; এমন কি, সে তাহার প্রাপ্য বেতনের দাবী করিতেও তাঁহার বাসায় আসিল না। আরও দুই-চারি দিন পরে ধোপা তাঁহার কাপড়গুলি কাচিয়া আনিয়া বলিয়া গেল, সে আর তাঁহার কাপড় কাচিতে পারিবে না। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, প্রথমে সে কিছুই বলিতে সম্মত হইল না; শেষে বিস্তর পীড়াপীড়িতে বলিল, তাঁহার কাপড় কাচিলে জলের অভাবে তাহার ব্যবসায় বন্ধ হইয়া যাইবে। কোন জলাশয়ে সে কাপড় কাচিবার অনুমতি পাইবে না।

ভবতোষ বাবু তথাপি দমিলেন না। তিনি নূতন ঝি সংগ্রহের জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন; নির্দ্দিষ্ট বেতনের দ্বিগুণ বেতন দিতে চাহিলেন; কিন্তু পরিচারিকা-শ্রেণীর কোন স্ত্রীলোক তাঁহার বাসায় কাজ করিতে সম্মত হইল না। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল, তাহাদের চাকরী করিবার দরকার নাই। অথচ তাহাদের কেহ-কেহ, তিনি যে বেতন দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহার অপেক্ষা অনেক অল্প বেতনে অন্য বাসায় চাকরী লইল! অতঃপর কোন ধোপাকেই তাঁহার কাপড় কাচিতে সম্মত করিতে পারিলেন না। সাবান দিয়া বাসায় কাপড় কাচিয়া কোন রূপে ভদ্রতা রক্ষা করা সম্ভব হইলেও, পরিচারিকার অভাবে তাঁহার স্ত্রীর কষ্ট ও অসুবিধার সীমা রহিল না। অবশেষে তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া পরিবার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন; কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও পাচক ব্রাহ্মণ মিলাইতে পারিলেন না। তাঁহার মুহুরী ব্রাহ্মণের ছেলে,—অগত্যা তাহাকেই পাক-শালার ভার লইতে হইল! এইরূপ অশেষ কষ্ট ও অসুবিধা সহ্য করিয়াও তিনি আশ্রিত মনিরুদ্দীনকে ত্যাগ করিলেন না। তাঁহার হিতৈষীরা মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিল—"ভায়া হে, জলে বাস করে কুমীরের লেজে খোঁচা দেওয়ার মজা টের পাচ্ছ কি?"—

ভবতোষ বাবু বলিলেন, 'হাঁ, বিলক্ষণ টের পাচ্ছি। কিন্তু আরও মজা এই যে, এমন মনুষ্যত্বহীন, ইতর, অপদার্থ বর্ব্বরের সমাজের মধ্যে বাস করচি, যাদের মগজে গোবর ছাড়া আর কিছুই নেই। তাই আজ ঘুঁটেকে পুড়তে দেখে গোবরগুলা মনের আনন্দে দাঁত বের করে হাস্‌চে! আমাদের এই দেশ ভিন্ন এমন বীভৎস দৃশ্য পৃথিবীর আর কোন দেশে দেখা যায় কি না সন্দেহ।"—কোন-কোন নির্লজ্জ জীব অসঙ্কোচে মন্তব্য প্রকাশ করিল, "বল কি হে ভায়া,—নিজে বাঁচলে বাপের নাম!" ভবতোষ বাবু ঘৃণার সহিত বলিলেন, "এ ভাবে মনুষ্যত্ব খোয়াইয়া বেঁচে থাকার চেয়ে বাপের নাম লোপ হওয়া অনেক ভাল।"

এক মাস পরে নির্দ্দিষ্ট দিনে মনিরুদ্দীনের মামলার 'ডাক' হইল। মামলা একতরফা নিষ্পত্তি হওয়ায় মনিরুদ্দীন জয় লাভ করিল। তাহার এই জয়লাভের সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে কানসারণের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। সুবিস্তীর্ণ মুচিবাড়িয়া কানসারণের এলাকার মধ্যে সেদিন একটি স্মরণীয় দিন! সহস্র-সহস্র প্রজা দুই হাত তুলিয়া প্রাণ ভরিয়া মুক্তকণ্ঠে ভবতোষ বাবুকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। ভবতোষ বাবুর ধারণা হইল, এত লাঞ্ছনা ও উৎপীড়নের পর এই সাফল্য যেন তাঁহার গর্ব্বোন্নত শিরে কণ্টকের মুকুট! এ সাফল্য অমূল্য। মুচিবাড়িয়া কান্‌সারণের প্রজাদের—লক্ষ-লক্ষ নিরুপায়, দরিদ্র, মূর্খ, মূক কৃষক-সাধারণের ধারণা ছিল 'জাহাজী গৌরাঙ্গী কিবা ভেকধারী' সবাই সম্রাট! ইংরাজ এক মূর্ত্তিতে এদেশে রাজদণ্ড পরিচালিত করেন, আর এক মূর্ত্তিতে তুলাদণ্ড বহন করেন, আর এক মূর্ত্তিতে নীলের চাষ ও জমীদারীর প্রজাদের দোহন করেন! এ দেশের লাটসাহেব ও ম্যানেজার হাম্‌ফ্রি সাহেবের মধ্যে কোন তফাৎ নাই! কালা আদমীর শাসনের জন্যই তাঁহাদের এ দেশে আগমন। সকল ইংরাজই আইন-আদালতের ঊর্দ্ধে। তাঁহারা আইন করিয়াছেন—আদালত গড়িয়াছেন এ দেশের লোকের বিচারের জন্য। সেই আদালতে কেবল এ দেশের প্রজাদেরই বিচার হয়, শাস্তি হয়। সে বিচার তাঁহাদেরই সুবিধার জন্য। তাঁহারা বেপরোয়া বেআইনি কাজ করিতে পারেন; তাঁহাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করা বৃথা,—তাহাতে কোন ফল হয় না। তাঁহাদের হুকুমই আইন,

সে হুকুমের আপীল নাই।—কিন্তু মনিরুদ্দীনের মামলার বিচার-ফলে প্রজাদের এই ভ্রম ঘুচিয়া গেল। তাহারা বুঝিতে পারিল, হাম্‌ফ্রি সাহেবের বেআইনী হুকুমও রদ হয়। রাজার আইনের কাছে হাম্‌ফ্রি সাহেবে ও সামান্য প্রজা মনিরুদ্দীন শেখে কোন তফাৎ নাই। বাঙ্গালী মুন্সেফ এজলাসে বসিয়া যে রায় দিলেন, সর্ব্বশক্তিমান মহাপরাক্রান্ত 'মুলুকে মালিক' হাম্‌ফ্রি সাহেব সেই রায় অনুসারে মনিরুদ্দীনের জমি তাহাকে ফেরৎ দিতে—মুখের গ্রাস ছাড়িয়া দিতে বাধ্য। এই একটি মাত্র মামলার বিচারে তাহাদের অন্ধ নয়ন উন্মুক্ত হইল; নিরপেক্ষ আইনের মহিমা তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইল। এই একটিমাত্র মামলার বিচারে ইংরাজের 'প্রেষ্টিজ' লক্ষ-লক্ষ প্রজার হৃদয়ে যে প্রভাব বিস্তার করিল, শত হাম্‌ফ্রির লক্ষ অত্যাচারও তাহা করিতে পারিত না। দুঃখের বিষয়, হাম্‌ফ্রির মত স্বার্থপর, ক্ষমতা-দর্পিত, স্বেচ্ছাচারী, উৎপীড়ক ইংরেজ তাহা বুঝিতে পারেন না।

সুতরাং এই পরাজয়ের সংবাদে হাম্‌ফ্রি সাহেবের ক্রোধের মাত্রা কিরূপ বর্দ্ধিত হইল, পাঠককে তাহা অনুমান করিয়া লইতে হইবে। তাঁহার সাধ্য হইলে তিনি সেই নিগার মুন্সেফটাকে রাস্তায় ধরিয়া চাবকাইয়া দিয়া সকলকে দেখাইতেন, ইংরেজ ভারতে নিজের প্রেষ্টিজ কি করিয়া বজায় রাখে! সুবিচারে, ন্যায়ের সম্মানে, নিরপেক্ষ শাসন-নীতির প্রতিষ্ঠাতেই পরাধীন দেশে শক্তিশালী জাতির প্রেষ্টিজ নির্ভর করে—হাম্‌ফ্রির মত ধর্ষণপ্রিয়, বাহুবলের প্রতি নির্ভরশীল, হাঁদা ইংরেজের ইহা বিশ্বাস করিবার শক্তি নাই। কারণ, অপদার্থ জড়ের উপর পশুবলের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাই জীবন-সংগ্রামে সাফল্য লাভের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বল বলিয়া তাঁহারা ধারণা করিয়া রাখিয়াছেন। হঠাৎ মুন্সেফের গায়ে হাত দিতে না পারিয়া, এই পশু-বলে ভবতোষ বাবুকে চূর্ণ করিবার জন্য অধিকতর উৎসাহের সহিত হাম্‌ফ্রি সাহেব তাঁহার বাহন সর্ব্বাঙ্গ সাণ্ডেলের সহিত পরামর্শ আরম্ভ করিলেন।

সাহেব বলিলেন, "ওয়েল সাণ্ডেল, রাস্কেল মুন্সেফটা প্রজার পক্ষ লইয়া আমাদের হারাইয়া দিল। দলিল অস্বীকার করিবার উপায় নাই বলিয়া আমরা তদ্বির করিলাম না। কিন্তু মুন্সেফের ডিক্রির বলে যদি সেই হারামখোর বেটা মুন্সেফের পেয়াদার সাহায্যে বেদখলি জমীতে দখল লয়, তাহা হইলে আমার প্যাঁজপয়জার দুই-ই হইবে! কি উপায় অবলম্বন করিলে এই বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ লাভ করা যায়?"

নায়েব বলিলেন, "এত ব্যস্ত হইবেন না হুজুর! আমি থাকিতে মনিরুদ্দীন ও-জমি দখল করিতে পারিবে না,—মুন্সেফের নাজির বা পেয়াদা উহা দখল দিতে যাইতে পারিবে না।"

সাহেব অসহিষ্ণু ভাবে বলিলেন, "তুমি কি বলিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি কি মাথায় ফ্যাটা বাঁধিয়া, পাইক-বরকন্দাজ লইয়া আদালতের নাজীর ও পেয়াদাদের হাঁকাইয়া দিবে স্থির করিয়াছ?—From frying pan to fire—দেওয়ানী হইতে এক নম্বর ফৌজদারীতে গিয়া পড়িতে চাও? তোমার ছেলের দোস্ত নলিনী দারোগা কিন্তু সে ধাক্কা সামলাইতে পারিবে না।"

নায়েব মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "হুজুর, এ নায়েবী বুদ্ধির মধ্যে আপনি প্রবেশ করিতে পারিলে কি আর নায়েবী-ভার আমার হাতে দিতেন? আমি ও-সব কিছুই করিব না। ক্রোকী পরোয়ানা বাহির হইলে তবে ত নাজির বা পেয়াদা গিয়া বিবাদী জমীতে দখল দিবে। সেই পরোয়ানা যাহাতে বাহির হইতে না পারে, আমি তাহার ব্যবস্থা করিব।"

সাহেব বলিলেন, "সে আবার কি কথা! তুমি কি আমলাদের ঘুস দিয়া পরোয়ানা গার্ফ্ করিবে?"

নায়েব বলিলেন, "হুজুর, ঘুসে অনেক কাজে সুবিধা হয় বটে, কিন্তু ঘুস দিয়া সকল কাজ উদ্ধার করিতে পারা যায় না। আর পরোয়ানা গাফ্ করিলে, নূতন পরোয়ানা বাহির হইতে কতক্ষণ? ঢাকিশুদ্ধ বিসর্জ্জন দিতে না পারিলে সুবিধা নাই। আমি ঢাকিশুদ্ধ বিসর্জ্জন দিতে চাই।"

হাম্‌ফ্রি সাহেব খুব ভাল বাঙ্গলা বুঝিলেও, এই ঢাকিশুদ্ধ বিসর্জ্জনটা কি বস্তু, তাহা তিনি জানিতেন না: তাই তিনি প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে নায়েবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

নায়েব বলিলেন, "আমি স্থির করিয়াছি, মুন্সেফী আদালত আর ভবতোষ উকীলের বাসা,—এ দুই-ই আগুন দিয়া পোড়াইয়া দিব। ইহাতে মামলার কাগজপত্র রায়

কয়লালা হইতে মনিরুদ্দির দাখিলী সেই পাট্টা সমেত সমস্ত নথি পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। মামলার যদি কোন প্রমাণই না থাকিল, তবে নাজির আর তার পেয়াদারা কিসের বলে জমি দখল দিতে যাইবে ?"

সাহেব আনন্দে করতালি দিয়া বলিলেন, "ব্রেভো ! সাণ্ডেল ! সাণ্ডেল—তুমি অদ্বিতীয় ! সত্যই কূট বুদ্ধিতে ইণ্ডিয়ায় তোমার জোড়া নাই ! তুমি ঠিক উপায় বাৎলাইয়াছ। এজন্য তোমাকে আমি সহস্র ধন্যবাদ দিতেছি।"

এই প্রশংসায় নায়েব গলিয়া জল হইয়া, আনন্দাশ্রু-প্লাবিত নেত্রে সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি হুজুরের গোলাম মাত্র, ধন্যবাদের পাত্র নহি। হুজুরের নিমক আহার করিতেছি,—ন্যায় হোক, অন্যায় হোক, যেরূপে পারি, হুজুরের মান-সম্ভ্রম ও স্বার্থ রক্ষা করিব। কাজটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ করিতে হইবে।"

সাহেব বলিলেন, "না, বিলম্ব করা হইবে না। কিন্তু খুব সাবধান, আগুন লইয়া খেলা ! বিশেষতঃ গবর্মেণ্টের সংস্রব আছে। এ কার্য্য কবে করিবে মনে করিতেছ ?"

নায়েব বলিলেন, "যত শীঘ্র সুযোগ ঘটে। দুই তিন দিনের মধ্যেই সব ফরসা করিয়া দিব।"

যে রাত্রে এই পরামর্শ শেষ হইল—তাহার দুই দিন পরে তৃতীয় দিন মধ্যাহ্ন কালে ভবতোষবাবু মুন্সেফের এজলাসে দাঁড়াইয়া একটি মামলায় একজন সাক্ষীর জেরা করিতেছেন, এমন সময় একজন পেয়াদা হাঁপাইতে-হাঁপাইতে এজলাসে প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিল—ভবতোষ বাবুর কাছারী-ঘরের মট্‌কায় আগুন। হঠাৎ ঘরের মট্‌কায় কিরূপে বৈশ্বানরের আবির্ভাব হইল, তাহা কেহই অনুমান করিতে পারিল না। কিন্তু নায়েব মহাশয়ের অপূর্ব্ব উদ্ভাবনী-শক্তিতে ইহা অতি সহজেই সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহার কোন বিশ্বস্ত দূত একখানি টিকেতে আগুন ধরাইয়া, তাহার অন্যদিকে একটি ছিদ্র করিয়া, সেই ছিদ্রে একহাত লম্বা একটি সূতা প্রবেশ করাইয়াছিল। সূতার সেই মুড়ায় একটি গ্রন্থি দিয়া অন্য মুড়ায় একখানি বাতাসা বাঁধিয়া সে সেই বাতাসা-সংযুক্ত জলন্ত টিকাখানি ভবতোষ বাবুর কাছারী-ঘরের সম্মুখে ফেলিয়া রাখিয়াছিল। মধ্যাহ্নকাল, সেখানে তখন লোকজনের গতিবিধি ছিল না। কিন্তু মুচিখাড়িয়ায় কাকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ; পাঁচ মিনিটের মধ্যে একটা কাক বাতাসাখানি মুখে করিয়া ভবতোষ বাবুর কাছারী-ঘরের মট্‌কায় বসিল। সঙ্গে-সঙ্গে জলন্ত টিকা-খানিও মট্‌কা দাখিল হইল। জ্যৈষ্ঠমাসের প্রচণ্ড রৌদ্রে চালের খড় বারুদের মত হইয়াছিল ; কয়েক মিনিটের মধ্যেই জলিয়া উঠিল। 'আগুন আগুন' শব্দে চতুর্দ্দিকে মহাকোলাহল উত্থিত হইল ; কাছারী ভাঙ্গিয়া সকল লোক সেইদিকে দৌড়াইল। ভবতোষ বাবুর বাসা ও মুন্সেফী আদালতের মধ্যে ব্যবধান অতি সামান্য। ভবতোষবাবু দুই চারিজন ভিন্ন গ্রামবাসীর সাহায্যে আগুন নিবাইবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। কুঠির পাইক-বরকন্দাজ অনেকেই সেখানে উপস্থিত ছিল ; কিন্তু তাহারা কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া হুতাশনের গগনব্যাপী লোল-জিহ্বার লহরী-লীলা দেখিতে লাগিল। কেহ-কেহ তাহাদিগকে অগ্নি-নির্ব্বাপনের চেষ্টা করিতে বলিলে, তাহারা বলিল, "বাপ্‌রে, এই দুপুর বেলায় আগুন, জোষ্টিমাস, রোদে চারি দিক খা-খা করচে, কার ধড়ে তিনটে জান আছে যে ঐ আগুনের কাছে যাবে ?" পরোপকারী রাসবিহারী পণ্ডিত একটি কলসী লইয়া জল আনিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ একজন বরকন্দাজ তাঁহার নিকট হইতে কলসী কাড়িয়া লইয়া বলিল, "পণ্ডিত মশায়, নিজের চরকায় তেল দেওগে ! পরের ছেলে কেন পুড়ে মরবা ! ভাল চাও তো সরে পড়, ও-কাজে তোমাকে যেতে হবে না।"

নিরুপায় হইয়া পণ্ডিত মহাশয় বেকুবের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইতিমধ্যে ঘরখানি পুড়িয়া গেল। সেই সময় মহাশব্দে কয়েকটা 'ক্রয়ো' ছুটিয়া ভবতোষবাবুর রান্নাঘরে এবং মুন্সেফের কাছারীর আটচালায় পড়িল। ভবতোষ বাবুর অবশিষ্ট দুইখানি ঘর এবং মুন্সেফের কাছারী একই সময়ে অগ্নিময় হইয়া উঠিল। ধূমে চতুর্দ্দিক অন্ধকারপূর্ণ হইল। মুন্সেফের কাছারীর প্রকাণ্ড আটচালা বিসুবিয়স শৃঙ্গের মত ধূম ও অগ্নিশিখা উদ্গীরণ করিতে লাগিল। কেহই সেই অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে পারিল না। দেখিতে-দেখিতে ভবতোষ বাবুর বাসা ও মুন্সেফী আদালত ভস্মস্তূপে পরিণত হইল। দলিলপত্রাদি কিছুই রক্ষা পাইল না।

(ক্রমশঃ)

ধ্যানরতা

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

১

তরুণ আকাঙ্ক্ষা-ভরা আমার প্রভাত
কেন রহিল না ভরি' স্নিগ্ধ আঁখিপাত ;
মধুর অধরস্পর্শ অতি সন্তর্পণে
ললাটের পরে মোর ; নিবিড় বেষ্টনে
বাঁধি লওয়া বক্ষমাঝে, হে বন্ধু আমার !
এরি মাঝে মিটেনি ত শিখা বাসনার,
কাঙাল বুকের মোর মিটেনি পিপাসা—
নিবেদন ক'রে দিতে সব ভালবাসা
হিয়াপুটে ভরি তব চরণের তলে
আবেগ চুম্বন আর নয়নের জলে,
দুইখানি বাহু-পাশে ধরণীর সব
স্পন্দিত হৃদয়ে মোর করি' অনুভব।
স্বপনের মত কেন হ'য়ে আকস্মিক
এলে আর চ'লে গেলে, হে মোর ক্ষণিক !

২

কবে তুমি এসেছিলে, গিয়াছ কখন,
আবাহন করিনি কো—বিদায়-বরণ
তাও করিনিকো—আমি মেলিনি নয়ন,
অনাহুত পান্থ মোর, ও গো পুরাতন !
রূপার কাঠিটী কার করায়ে পরশ
চেতনা রাখিলে ঘিরে সারাটী বরষ ;
তন্দ্রায় শিথিল দেহ, অলস, বিবশ—
মোহিয়া রাখিয়াছিলে নিশীথ দিবস।
স্বপনের মাঝে—সেই পশেছিল কানে
কোলাহল ক্ষণেকের—তোমার আহ্বানে ;
আবার বিদায়-গীতি বর্ষ-অবসানে
সুখে-দুঃখে গুঞ্জরিত ভেসে আসে গানে।
হয়নি ত পরিচয় মোর তব সাথে—
পথিকের মত চলি গিয়াছ অজ্ঞাতে !

৩

আজো যেন কোন্‌খানে র'য়ে গেছে বাকী
সেই যে কামনাটুকু—যাহা বেঁধে রাখি'
আপনার প্রিয়জনে বুকের মাঝারে
পরিতৃপ্ত হ'তে চায় মৌন হাহাকারে।
ক্ষণে-ক্ষণে তাই ভরে আকাশ বাতাস,
পরাণ ব্যাকুল করি ভুবন উদাস।
সেদিন ছিলাম ভেবে বুঝি অকস্মাৎ
সব গেল হ'য়ে ছাই মোর তব সাথ,
আশাহীন, উদাসীন, ক্লান্তিভরা বুক
এমনি করিয়া যাবে যুগান্তের যুগ,—
মাঝে মাঝে সুরভিত সুদূর অতীত
স্বপনের মত বুকে হবে জাগরিত।
আজিকে সহসা দেখি—সজল দু' আঁখি—
একটী চুম্বন পাওয়া র'য়ে গেছে বাকী !

৪

তোমার চুম্বনখানি মাধবী নিশির
বহিয়া আনিয়াছিল পাগল সমীর
কুসুম সৌরভ সাথে ধূলি রেণু রেণু
মিলায়ে বাজায়ে ফিরে বনে বনে বেণু,
অতিক্রমি দুরান্তর দূর কত মাঠ
পরশিয়া গিয়াছিল আমার ললাট।
গগনে ছিল না তারা জাগিয়া তখন,
মেঘহীন মলিনিমা সারাটী গগন
ঘিরেছিল পঞ্চমীর ক্ষীণ চন্দ্রকর,
স্বপনে ভরিয়াছিল সুপ্ত-চরাচর।
আমি দেখিলাম জাগি ব্যাকুল পরাণ—
শুভ্র শয্যাখানি মোর ; আমার শিথান
পাগল দিয়াছে ভরি ধূলি রেণু শুধু—
পরশের ব্যথা—হরি' চুম্বনের মধু !

চোর

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

দিননাথ দিন-ভিখারী। লোকের দোরে গান গেয়ে, সে প্রায় পঁচিশ বছর দুঃখের সহস্র নিষ্পেষণ অগ্রাহ্য করে, হাসিমুখে দিন কাটিয়ে আসছে। সে জানত, ঐশ্বর্য্য লাভ করাও যেমন অদৃষ্ট, আবার চঞ্চলা কমলাকে ধরে রাখাও তেমনি অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে। একদিনও সে নিজের দুরদৃষ্টের ওপর অপ্রসন্ন হয় নি। যখন দুঃখের পীড়ন অসহ্য বোধ হত, তখন, সে তার মনকে তার প্রিয় গানটি গেয়ে প্রবোধ দিত——

'অদৃষ্টের ফল কে খণ্ডাবে বল,
তার সাক্ষী দেখ মহারাজা নল।'

বিশ্ব-সংসারের মধ্যে তার আপনার বলতে ছিল—একটা মেয়ে, যাকে তার স্ত্রী মরবার সময় তার কোলে তুলে দিয়ে গেছল। তখন সে মোটে দু'তিন মাসের। সেই অবধি এই মেয়েটার বাপ-মায়ের স্থান একাই অধিকার করে, সে তাকে এত বড় করে তুলেছে। মেয়েটার ভবিষ্যৎ সুখের চিন্তাও সে অনেক করেছিল ;—মনে করেছিল যে, মেয়েটাকে সৎপাত্রস্থ করে, সে সংসারের কাছে ছুটি নেবে। কিন্তু মায়াময় তাকে কঠিন নিগড়ে বেঁধে ফেললেন। অনেক চেষ্টা করে একটি ভাল ঘরের ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে দিলেও, অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় তার সকল যত্নই ব্যর্থ হয়েছিল। ভাল ঘরের ছেলে হলেও, ছেলেটার স্বভাব-চরিত্র ভাল ছিল না। বিয়ের দু'বছর পরেই স্ত্রীরের উপর নানা অত্যাচার করে সে মারা গেল।

মেয়েটা আবার দিনুর গলায় এসে পড়ল। দিনু কন্যার মন্দভাগ্যে নীরবে দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলে, মেয়েকে বুকে তুলে নিয়ে আবার সংসার পেতে বসল। সেই থেকে দিনুর মেয়ে ভানুমতী, ওরফে ভানী, বাপের সুখ-দুঃখের সাক্ষী হয়ে রইল। দিনু ভিক্ষা করে, আর ভানী লোকের বাড়ী কাজ ক'রে এবং বুড়ো বাপের সেবা-শুশ্রূষা ক'রে দিন কাটিয়ে যেত।

(২)

নবীন পোদ্দার ছিল গ্রামের একজন বড় রকমের মহাজন। তিনপুরুষ না খেয়ে, না পোরে, তারা তাদের যক্ষের ধন বাড়িয়েই চলেছিল। গাঁয়ে খুব কম লোকই ছিল—যার সুদের পয়সা নবীন পোদ্দারের ভাণ্ডারের হাঁড়া না ভরিয়েছে। তাকে না হলেও লোকের চলত না, আবার সকালবেলা তার নামও কেউ করত না। ঋণের দায়ে ও সুদের ভয়ে লোকে তাকে বাইরে ভয় করলেও, মনে-মনে সকলে ঘৃণা করত। এ হেন দুর্দান্ত ও অসাধারণ মানুষটি, যিনি গ্রামের বুকের ওপর আসন পেতে বসে বামুন-শূদ্দুরের নিকট সমান খাতির আদায় করে আসচেন, তিনি জব্দ ছিলেন কেবল একজনের কাছে ;—সে তাঁর উপযুক্ত পুত্র শ্রীমান ক্ষেত্রমোহন। ক্ষেতু ছেলেবেলায় গ্রামের মাইনর স্কুলে দিনকতক পড়ে, জেলার স্কুলে পড়তে গিয়েছিল। বছর কয়েক সহরে থাকবার পর তার পিতা যখন বুঝতে পারলেন যে, অনেকগুলি টাকার সুদ শ্রীমানের লেখাপড়ায় মাসে-মাসে খরচ হচ্ছে, এবং শ্রীমান ব্যয়ের অনুপাতে বিদ্যার্জ্জনে নারাজ, তখন ক্ষেতুকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিতার কড়া চিঠি পেয়ে, মা সরস্বতীর নিকট চিরবিদায় নিয়ে বাড়ী ফিরতে হল। সহরে গিয়ে লেখাপড়ায় দুরস্ত হতে না পারলেও, ক্ষেতু সহরের কায়দা-কানুন আর অর্থ-ব্যয়ের পন্থাগুলো বেশ ভাল রকম অভ্যাস করে এসেছিল। নবীন পোদ্দার যখন দেখলেন যে, ছেলে সহরে থেকে একেবারে লায়েক হয়ে এসেছে, তখন যথাসম্ভব ধমক-চমক দিয়ে পুত্রকে শাসন করতে চেষ্টা করলেন ; কিন্তু বিশেষ কিছুই ফল হল না। বিশেষতঃ, ক্ষেতু যখন পূর্ব্বেকার ছিটের মেরজাই এবং আট হাত কাপড়ের অসভ্যতা প্রমাণ করতে বাপকেও দু'কথা শোনাতে ছাড়ল না, তখন বাধ্য হয়েই নবীন পোদ্দারকে পুত্রের সংশোধনের বিষয়ে হাল ছাড়তে হ'ল।

ক্ষেতুর অনেক দিন থেকে দিননাথের মেয়ে ভানীর ওপর নজর পড়েছিল। চেষ্টাও যে সে না করেছিল তা নয় ; কিন্তু নানারকম প্রলোভন এবং ভয় দেখিয়েও

কিছুতেই সেই ভিখারীর মেয়েটাকে বশে আনতে পারে নি। তবে সেও নাছোড়বান্দা—শিকারির মত জাল ফেলে সুযোগের অপেক্ষায় বসে ছিল। সুযোগ আসতেও বেশী বিলম্ব হল না,—দুর্ভিক্ষের মর্ম্মভেদী পীড়নে দিনু শীঘ্রই বিব্রত হয়ে পড়ল। ক্ষেতুর মনের দুরভিসন্ধিটা দ্বিগুণ উৎসাহে আবার মাথা নাড়া দিয়ে উঠ্‌ল। ভানীকে সে আকার-ইঙ্গিতে দু' একদিন তার মনোভাব জানাল; কিন্তু অনাহার-ক্লিষ্ট ভানী, এত কষ্টের মধ্যেও আগেকার মতনই ঘাড় উঁচু করে, তার ঘৃণিত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে একটুও ইতস্ততঃ করল না। এই প্রত্যাখ্যান-জনিত অপমান মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করে, ক্ষেতু বেশী চটে উঠেছিল দিনুর ওপর। কারণ তারই ত' মেয়ে! সে যদি মেয়েকে অতিরিক্ত আস্‌কারা দিয়ে এমন দাম্ভিকা না করত, তা হলে ভানীর সাধ্য কি যে, এই দুর্দ্দিনেও তার চকচকে টাকার তোড়া পায়ে ঠেলে দেয়। ভিখারীর এত আত্মমর্য্যাদা এবং তার মেয়ের এত দেমাক একেবারেই অসহ্য। এ দম্ভ ভাঙতে কৃতসঙ্কল্প হয়ে, সে গাঁয়ের সেরা শঠ ও সবজান্তা মেয়েমানুষ কামিনীকে ভানীর দেমাকের পেছনে লেলিয়ে দিল।

কামিনী প্রথমটা কিছু না করতে পারলেও, শেষে অনেক সুরাহা করে এনেছিল। পেটের দায় বড় দায়,—সুবিধা বুঝে কামিনী এ সুযোগ পরিত্যাগ করল না। দুঃখে, কষ্টে ভানীর মনের অবস্থা বিকৃত হয়ে পড়েছিল; সংসারের ওপর বিতৃষ্ণায় সে কামিনীকে আত্মীয়া জ্ঞানে বিশ্বাস করল।

(৩)

দিননাথ অতি কষ্টে তার শতচ্ছিন্ন বস্ত্রখানা, কোন রকমে লজ্জা নিবারণের মত কোমরে জড়িয়ে ভানীকে বলল "দে ত' মা আমার লাঠিখানা, একবার দেখি, যদি কোথাও কিছু পাই। নইলে এমন করে না খেয়ে, ঘরে পড়ে যমকে ডেকে লাভ কি?" পিতার এই মর্ম্মান্তিক কথায় ভানীর চোখে জল এল। বাষ্পরুদ্ধ স্বরে সে বলল, "তুমি আর কষ্ট করে কোথায় যাবে বাবা—কে ভিক্ষে দেবে? যারা এতদিন দিয়ে এসেছে, তারাই যে ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে করে পেটের জ্বালায় দোর-দোর ঘুরে বেড়াচ্ছে;—কিছু দরকার নেই বাবা। বড়লোকের দোরে গিয়ে রোজ-রোজ কুকুর-বেড়ালের মত ঝাঁটা খাওয়ার চেয়ে ঘরে পড়ে থেকে না খেয়ে শুকিয়ে মরাও ভাল।"

"কিন্তু তুই দুধের মেয়ে—তোর যে আজ তিন দিন খাওয়া হয় নি! দিক মা তারা দূর করে, তবু বাপ হয়ে"—দিনু আর কিছু বল্‌তে পারল না। দুর্ব্বল পা দুটোকে জোর করে সোজা দাঁড় করিয়ে সে বাড়ীর বাইরে চলে গেল। অদৃষ্টের এই নিষ্ঠুর নির্য্যাতনে ভানী দাঁতে দাঁত চেপে মনে-মনে ভাবতে লাগল—দুনিয়ার এই অবিচার, এই অনিয়ম। কেন সে সংসারের এই দারুণ কষ্ট চুপ করে সহ্য করবে? কেন তার বাবা—যে একদিনও একটা অন্যায়, একটা কুকাজ করে নি, যে চিরদিন সংসারের শত অত্যাচারের ঝঞ্ঝা মাথায় বহন করেও, ভগবানের ওপর অটল বিশ্বাস রেখে আস্‌ছে—সে এত কষ্টে দিন কাটাচ্ছে! আর সে—সে কি ভগবানের সৃষ্টি নয়! এমন কি মহাপাতক সে করেছে, যার জন্যে তার এই বয়সে কপাল পুড়ে গেল, যার জন্য সব সাধ-আহ্লাদের গলা টিপে ধরে, পরের মুষ্টি-ভিক্ষার ওপর সে জীবন-ধারণ করছে! গরীব যদি স্বস্তির গ্রাস মুখে তুলতে যায়, অমনি লোকে পাপ পুণ্যের বিচার করতে বসে! আর যারা সম্পদের শিখরে দাঁড়িয়ে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসীর এই সংহার-লীলা দেখছে, পাপ তাদের স্পর্শও করতে পারে না। যত আচার-বিচার এই দীন-দরিদ্রের জন্য। জীবনের পরপারে গিয়ে সুখ ভোগ করবে বলে, এজন্মে সে কি এমনি দগ্ধে-দগ্ধে মরবে? কেন? কিসের জন্য। এই ত' ক্ষেতু তাকে কত খোসামোদ করছে, কত সুখ-ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন দেখাচ্ছে,—কেন সে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে তা ছেড়ে দেবে? এই যে তারা মানুষ হয়েও শূকরের মতন অখাদ্যে উদর পূরণ করছে, কৈ কেউ ত' একমুঠো ভিক্ষা দিয়েও খোঁজ করে নি। অথচ সে যদি ক্ষেতুর প্রস্তাবে স্বীকৃত হয়—না—সে আর ভাবতে পারে না, তার দুর্ব্বল মস্তিষ্ক ঘুরে ওঠে।

(৪)

লাঠিতে ভর দিয়ে দিনু তার দুর্ব্বল পা দুখানা অতি কষ্টে টেনে, বাজারের মধ্যে এসে পৌঁছিল। ক্ষিধে, তেষ্টায় তার শরীর একেবারে মুসড়ে পড়েছিল। বাজারে আসবার পূর্ব্বে সে পাড়ার ভেতর একমুঠো চালের জন্য অনেক দোর ঘুরে এসেছিল;—কিন্তু যারা নিজেরা আধবেলা

আধপেটা খেয়ে মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করছে, তারা অপরের প্রাণরক্ষা করবে কি করে? ক্ষুধার তাড়নায় যারা নিজের অতি আদরের নয়নমণি সন্তানকে কোল থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে, তারা পরের মুখের দিকে কোন্ চোখ দিয়ে চাইবে? অভাবের প্রচণ্ড কশাঘাতে জর্জ্জরিত হয়ে, মানুষ হয়েও আজ তারা কুকুর-শেয়ালের মত স্বাচ্ছন্দ্যের দোরে এঁটো পাত খুঁটে পেটের জ্বালা নিবাচ্ছে। কাজেই দিনু হতাশ হয়েই পাড়া থেকে বেরিয়ে এসেছিল। শ্রান্ত শরীরকে একটু শান্ত করবার আশায় সে বাজারের বট-তলায় শুয়ে পড়ল।

নিজের ও কন্যার দুরদৃষ্টের কথা ভাবতে-ভাবতে কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, কিছুই টের পায় নি। যখন তার ঘুম ভাঙ্গল, তখন সূর্য্যদেব অনেকখানি পশ্চিমে ঢলে পড়েছিল। চেতনার সঙ্গে-সঙ্গে, চিন্তার রাশি আবার দল বেঁধে তার বুকের মাঝে ভীড় করে তুল্‌ল। আর সেই ভীড়ের মধ্যে ধীরে-ধীরে একখানি শুষ্ক, মলিন ঝরে-পড়া গোলাপের মত মুখ ভেসে উঠ্‌ল। ভানীর কথা মনে হতেই তার অনাহারের কথা মনে হল। সে ভাবল—তাই ত, মেয়েটাকে খাবার আনছি বলে বসিয়ে রেখে এসে নিজে দিব্যি ঘুমুচ্ছি! ছিঃ ছিঃ!

দিনু অতি কষ্টে উঠে দাঁড়াল। সমস্ত পৃথিবী তার পায়ের তলায় টলমল করে উঠ্‌ল,—তবু সে লাঠিতে ভর করে অতি কষ্টে বাজারের মধ্যে ঢুকলো। এ-দোর, সে-দোর করে সে যখন হতাশ হয়ে ফিরছিল, তখন তার চোখের সুমুখে ফুটে উঠল—ভোঁদা ময়রার দোকানের থালা-ভরা মিষ্টান্নের রাশি। তারা না খেয়ে মরতে বসেছে, আর ভোঁদা ময়রা অত খাবার সাজিয়ে রেখেছে তাদের জন্য—যাদের কোন অভাব নেই, কিছু মাত্র ক্ষুধা নেই! হা অদৃষ্ট! দিনুর কোটরগত চোখ দুটো জলে ভরে উঠ্‌ল। হাতের চেটোয় চোখ মুছে, সে বাড়ীর দিকে পা ফেলল। দু'পা যেতে না যেতেই, ভানীর অনাহার-ক্লিষ্ট মুখখানা তার মনে উদয় হয়ে একটা বিপ্লব বাধিয়ে দিল। শুধু হাতে সে কেমন করে ঘরে ফিরবে; কেমন করে সে ভানীকে গিয়ে বলবে, কিছু নেই—কিছু পাই নি। পেছন ফিরে সে দোকানের দিকে চাইল; দেখল, দোকানে কেউ নেই—শুধু খাবারগুলো তার দিকে চেয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসছে। এ দৃশ্য তার অসহ্য বোধ হল। খাবার এত কাছে থাকতেও সে অনাহারী ভেবে, ম্লান চোখ দুটো দপ্ দপ্ করে জলে উঠ্‌ল; কিন্তু ছি!—চুরি! না—না—সে তা পারবে না, যাক্ তার মেয়ে মরে—তবু সে চুরি করতে পারবে না। এতখানি বয়স হল,—যে কথা একদিনও তার মনে উদয় হয় নি; আজ সেই কথাটা ভগবান তার প্রাণের ভেতর এত জোরে ধাক্কা দিয়ে মনে করিয়ে দিলেন কেন—তা সে বুঝতে পারল না। একটা বুকফাটা দীর্ঘনিঃশ্বাস তার জীর্ণ পঞ্জর কখানা কাঁপিয়া দিল, সে বাড়ী ফিরে চলল। দু'পা গিয়েই কিন্তু তার পা আর উঠ্‌তে চাইল না। সে আবার দোকানের দিকে চেয়ে দেখল—তখনও কেউ নেই! নিজের অজ্ঞাতসারে দোকানের দিকে সে অনেকটা এগিয়ে গেল। দোকানের সুমুখে পৌঁছে আর একবার তার মনের মধ্যে বিবেকের দ্বন্দ্ব আরম্ভ হল। কিন্তু ক্ষুধার তাড়না, কন্যার কাতর মুখ, তিন দিন অনাহার, মানুষের তাচ্ছিল্য—ভগবানের অবিচারের কথাগুলো তার হৃদয়ে এক-একটা দৈত্যের মত উদয় হয়ে যখন বিবেকের গলা টিপে ধরল, তখন বুকের চঞ্চল রক্ত-স্রোত তার মাথায় উঠে সব বিবেক-বুদ্ধি ভাসিয়ে নিয়ে গেল! সে আর অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করতে পারল না,—হাত বাড়িয়ে থালা থেকে মিষ্টান্ন নিয়ে ঝুলিতে পুরতে গেল। কিন্তু মিষ্টান্ন ঝুলিতে রাখবার আগেই, এক বজ্রমুষ্টি তার মাথার ওপর যমদণ্ডের মত পড়ল। আকস্মিক আঘাতে তার মাথা ঘুরে উঠ্‌ল,—পেছন ফিরে দেখল, ভোঁদা ময়রার ষণ্ডা ছেলেটা তার চুরি ধরে ফেলেছে। কিছু বলবার আগেই, আরও দু'চার ঘা কিল-চড়ের আঘাতে দিনু রাস্তার ওপর পড়ে গেল। গোলমাল শুনে বাজারের অনেক লোক সেখানে জড় হল; এবং চুরির কথা শুনে, আর হাতে-হাতে প্রমাণ দেখে, সহানুভূতির বদলে তারাও দু'চার ঘা কিল-চড় দিয়ে দিনুকে জর্জ্জরিত করে তুল্‌ল। দিনু এত মার খেয়েও একটা কথা বলে নি! সে কেবল ভাবছিল—তার অদৃষ্ট, আর মানুষের নির্ম্মমতা!

এত নির্য্যাতন করেও বাজারের লোক সন্তুষ্ট হতে পারল না; অবশেষে তারা দিনুকে চৌকীদারের হাতে ধরিয়ে দিল। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় দিনু একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। চোরের ওপর দয়া দেখান অনাবশ্যক বিবেচনায় চৌকীদার তাকে থানার দিকে টেনে নিয়ে গেল।

গু—নীতির মধ্যে পলিটিক্স ম্লেচ্ছ বলে সে সকল নীতির রাজা হয়ে উঠেছে।

শি—এ একটা নূতন তত্ত্ব বটে।

গু—অপর দেশে নূতন হতে পারে, কিন্তু এ দেশে বহু পুরাতন। কাদম্বরী পড়ে দেখ, বাণভট্ট বলেছেন যে—"রাজনীতির মত অনার্য্য জিনিষ ভূ-ভারতে আর দ্বিতীয় নেই।"

শি—রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম্মনীতির প্রভু-দাসের সম্বন্ধের কারণ বোঝা গেল। কিন্তু রাজনীতির সঙ্গে সাহিত্যের দিবারাত্র খিটিমিটি হয় কেন?

গু—ও দুয়ের পরস্পরের স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ বলে। এটা কি জানো না, যে রাজনীতি পুংলিঙ্গ আর সাহিত্য স্ত্রীলিঙ্গ?

শি—আজ্ঞে সব জিনিষের গূঢ়-তত্ত্ব আমার জানা নেই। একটা উদাহরণের সাহায্যে উক্ত লিঙ্গ ভেদটা আমাকে বুঝিয়ে দিন ত।

গু—উদাহরণ ত হাতের গোড়াতেই পড়ে রয়েছে। যে যুগে রাজনীতির বিষয় হয় গণতন্ত্র—সে যুগে সাহিত্যের বিষয় হয় গণিকাতন্ত্র।

শি—রাজনীতি যদি পুংলিঙ্গ আর সাহিত্য স্ত্রীলিঙ্গ হয় ত ক্লীব কি?

গু—দর্শন।

শি—এ একটা নূতন তত্ত্ব বটে।

গু—অপর দেশে নূতন হতে পারে, কিন্তু এ দেশে বহু পুরাতন। তন্ত্র-শাস্ত্রে বেদান্ত-দর্শনকে নপুংসক ধর্ম্ম বলে।

শি—তন্ত্র জিনিষটে কি?

গু—আধা মন্ত্র আর যন্ত্র মিলে যা হয় তাই।

শি—ব্যাপার কি বুঝলুম না। সে যাই হোক, তন্ত্রের কথা আপনি কি বেদবাক্য বলে মানেন?

গু—তা মানি আর না মানি, এ সত্য আমরা সবাই মানতে বাধ্য যে তন্ত্রের এ কথা ব্যাকরণ-সঙ্গত।

শি—কেন?

গু—বেদান্তের ব্রহ্ম "তৎ সৎ" বলে।

শি—বাক্য ব্যাকরণ-সঙ্গত হলেও কি সত্য হয়?

গু—মোটেই না। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।

"এই গোল পদার্থটি চতুষ্কোণ"। এই বাক্যটি ষোল আনা ব্যাকরণ-সঙ্গত কিন্তু ষোল আনা মিথ্যে।

শি—কিন্তু এমন কথাও কেউ কখনো বলে?

গু—শুধু যে বলে তাই নয়। লক্ষ লক্ষ লোক তা মানে। এই রকম কথাকেই লোকে বলে মহাবাক্য।

শি—কিন্তু যে কথা সত্য নয়, সে কথা লোকে কেন মানে?

গু—মানুষে সত্য কথা চায় না, চায় কাজের কথা।

শি—তা যেন হল। "এই গোল পদার্থটি চতুষ্কোণ" এই মহাবাক্যটি কোন্ কাজে লাগানো যায়?

গু—উক্ত পদার্থটি ভাজবার কাজে।

শি—কি করে?

গু—ধর, এই মুহূর্ত্তে এ ঘরে দু'টি লোক প্রবেশ করলে। তাদের একজনের মনও আছে, চোখও আছে, আর একজনের চোখও নেই মনও নেই, আছে শুধু হৃদয় ও কর্ম্ম-প্রবৃত্তি। এখন আমি যদি বলি যে, আমার এই শিষ্যটির "গোল মাথাটি চতুষ্কোণ", তাহলে চক্ষুষ্মান লোকটি হেসে উঠবে, আর হৃদয়বান লোকটি এক লাঠিতে তোমার মাথা ভেঙ্গে দেবে।

শি—কেন ভাঙ্গবে? আমার মাথা যদি এক সঙ্গে গোল ও চতুষ্কোণ হয়, তাতে তাঁর কি ক্ষতি, আর তা ভেঙ্গেই বা তাঁর কি লাভ?

গু—শতপথ ব্রাহ্মণ পড়েছ?

শি—না। তার নাম শুনেছি।

গু—তার একটি গল্প বলি। তষ্টার এক তিন-মাথাওয়ালা ছেলে হয়েছিল। সে একটি মুখ দিয়ে স্থূল, আর একটি মুখ দিয়ে তরল, আর বাকি মুখটি দিয়ে বাষ্পীয় পদার্থ গলাধঃকরণ করত। এই দেখে ইন্দ্র মহা চটে উঠে বললেন, "ও বেটার মাথা তিনটে আমি কেটে ফেলব।"—তষ্টা উত্তরে বললেন—"আমার ছেলে যদি তার এক মুখে সিগারেট, আর এক মুখে মদ ও তৃতীয় মুখে মাংস খায়, তাতে তোমার কি?" ইন্দ্র বললেন "আমার কি? বটে। এখনি দেখাচ্ছি"—এই বলে তিনি বজ্রের এক ঘায়ে তার মাথা তিনটি কেটে ফেললেন।

শি—এর থেকে কি প্রমাণ করতে চান?

গু—ইন্দ্রতুল্য লোক অন্যায় সহ্য করতে পারে না। কোন্ ক্ষেত্রে কিংকর্ত্তব্য, হৃদয় তাদের তা বলে দেয়।

শি—এ রকম সহৃদয়তা দেখছি মারাত্মক জিনিষ।

গু—তোমার পক্ষে তাই, কিন্তু জাতির পক্ষে ভাল।

শি—কি হিসেবে?

গু—এই হিসেবে যে ব্যক্তির পক্ষে যা বিপদ, জাতির পক্ষে তাই সম্পদ!

শি—তা'হলে যত বেশি লোকের যত বেশি বিপদ ঘটবে, জাতির সম্পদ তত বাড়বে?

গু—আধ্যাত্মিক মতে তাই।

শি—আপনি আধ্যাত্মিকতা মানেন না?

গু—আমি জার্ম্মান আধ্যাত্মিকতা মানি নে, কেন না সে আধ্যাত্মিকতার ভাষা আমি জানি নে।

শি—জার্ম্মান আধ্যাত্মিকতা না মানেন, সংস্কৃত আধ্যাত্মিকতা ত মানেন?

গু—যা প্রত্যক্ষ তা না মেনে ত উপায় নেই। মানুষের মনের গতির যে দুটো দিক আছে—একটা perpendicular আর একটা horizontal, অর্থাৎ একটা আধ্যাত্মিক আর একটা সাংসারিক, এ সত্য যার মনও আছে, চোখও আছে, সে কি করে অস্বীকার করবে?

শি—তা'হলে আপনি এও মানতে বাধ্য যে জাতীয় উন্নতি করতে হলে জাতির আধ্যাত্মিক উন্নতিও করতে হবে।

গু—আমার মতে প্রথমত ও প্রধানত তাই করতে হবে। কিন্তু তা করবার উপায় নিয়েই ত যত গোল।

রিপোর্ট পড়িয়াছি। সেই রিপোর্টের প্রস্তাবানুযায়ী যদি কাজ হয়, তাহা হইলে যে সংস্কার আমরা চাই, সে সংস্কার আরও সুদূরপরাহত হইবে। প্রায়ই দেখা যায় যে, যখন কোন ব্যাপারে সাধারণের আন্দোলনে গবমেণ্ট ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন, তখন তাঁহারা একটা কমিশন বা বৈঠক বসান; এবং সেই বৈঠককে দেশ-দেশান্তর ঘুরাইয়া আনেন। দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সাক্ষ্য লওয়া হয়, এবং বহু দেশ ঘুরিয়া, বহু লোকের সহিত আলোচনা করিয়া, লিখিত এবং কথিত সাক্ষ্যের বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া, তাঁহারা রিপোর্ট বাহির করেন। রিপোর্টে বড়-বড় প্রস্তাব করা হয় এবং সেই প্রস্তাবের মূল কথাই হয় মোটা মাহিনার পদের সৃষ্টি। পূর্ব্বেও রিপোর্ট বাহির হইত, এখনও রিপোর্ট বাহির হয়; তবে প্রভেদ এই—পূর্ব্বেকার রিপোর্ট কেহ পড়িত না, সরকারী দপ্তরে বস্তাবন্দী হইয়া থাকিত। আজকালকার রিপোর্ট পাঁচজনে পড়ে এবং রিপোর্টের প্রস্তাব প্রায়ই সত্বর কার্য্যে পরিণত করা হয়। মুখে যাহাই বলি না কেন, মোটা মাহিনার পদ সকলেরই পক্ষে লোভনীয় বস্তু। সুতরাং এক দল লোক উহার প্রশংসা করিতে থাকে, এবং অপর দল উহার নিন্দা করে। ইনডাষ্ট্রীয়াল কমিশন, রেলওয়ে কমিশন, ফিস্কাল কমিশন এবং ইউনিভার্সিটি কমিশন—সকল কমিশনের রিপোর্টেরই একই ধুয়া—নূতন পদ সৃষ্টি কর এবং ঐ পদের মোটা মাহিনা ঠিক করিয়া দেও। ঐ সকল পদে বিদেশী নিযুক্ত হইলে, সংবাদপত্রে তীব্র প্রতিবাদ হয়; এবং উহাতে দেশীয় লোকের নিয়োগের কথা থাকিলে দেশীয় কাগজে প্রশংসাও হয় এবং নিন্দাও হয়। প্রশংসা করেন তাঁহারা, যাঁহাদের ভাগ্যে ঐ পদ লাভের সম্ভাবনা থাকে; আর নিন্দা করেন তাঁহারা, যাঁহাদের আশা নাই। আমাদের ইউনিভার্সিটির সব দোষ না কি ঘুচিয়া যাইবে, যদি চার হাজার টাকা মাহিনার ভাইস চ্যান্সেলার, দেড় হাজার টাকা মাহিনার রেজিষ্ট্রার এবং হাজার দেড়-হাজার টাকা মাহিনায় প্রফেসর অনেকগুলি নিযুক্ত হন্! (হিন্দুস্থান)

গুরু-শিষ্য সংবাদ

[বীরবল]

শি—এবার এত বর্ষা হল কেন?

গু—রবীন্দ্রনাথের "বর্ষামঙ্গল" অভিনয়ের জন্য।

শি—কেন? তিনি ত "শারদোৎসব"ও অভিনয় করেছেন।

গু—কিন্তু সে গদ্য। যে শক্তি পদ্যের অন্তরে আছে, গদ্যের অন্তরে তা নেই।

শি—সে শক্তি কি?

গু—সৃষ্টিকরী শক্তি।

শি—আপনি বলতে চান বৃষ্টিকরী শক্তি।

গু—এ ক্ষেত্রে অবশ্য তাই।

শি—এখন আসছে বছর বর্ষার হাত থেকে শরৎকে রক্ষা করা য কিসে?

গু—৺বেহারী চক্রবর্ত্তীর "শারদামঙ্গল" অভিনয় করে।

শি—আপনি সাহিত্যের এ হেন অলৌকিক শক্তিতেও বিশ্বা করেন?

গু—আমি সাহিত্যের লৌকিক শক্তিতেও বিশ্বাস করি নে।

শি—কি কারণ?

গু—সাহিত্য লৌকিক নয় বলে।

শি—তবে কে করে?

গু—দেশের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতারা।

শি—তাঁরা হন্ কে?

গু—দেশের বর্ত্তমান শাসন-কর্ত্তারা, ভবিষ্যৎ শাসন-কর্ত্তারা আ সনাতন শাসন-কর্ত্তারা।

শি—প্রমাণ?

গু—গভর্ণমেন্ট, কংগ্রেস আর হিন্দুসমাজ এ তিনই নিত্য-নিয়মি সিডিসানের দোহাই দিয়ে সাহিত্য পীড়ন করতে উৎসুক।

শি—সিডিসান কাকে বলে?

গু—সেই কথাকে, যাকে শাসনকর্ত্তারা লোক হিতার্থ গলা-টিপে মার্ত্তে চান।

শি—সরস্বতীর বাক্‌রোধ করতে এঁরা এত উৎসুক কেন?

গু—এই বিশ্বাসে যে সাহিত্যের ভিতর হয় সত্য আছে, নয় সুন্দ আছে, নয় শিব আছে, আর সম্ভবতঃ এক সঙ্গে ও তিনই আছে।

শি—যদি বা থাকেই, ত তার উপর মহাত্মাদের খড়্গহস্ত হবা কারণ কি?

গু—কারণ এই যে, মানুষে সব চাইতে ভয় করে সত্যকে, স চাইতে অবজ্ঞা করে সুন্দরকে, আর সব চাইতে উপেক্ষা করে শিবকে।

শি—মানুষে যে শিবকে উপেক্ষা করে, এ কথা বিলেত সম্বন্ধে খাটতে পারে, কিন্তু বাঙলা সম্বন্ধে খাটে না। বাঙলার সাহিত্য-সমালোচনা পড়ে দেখুন, তার ভিতর শুধু একই বিষয়ের বিচার আছে। লেখাটা শিব কি অশিব, এই হচ্ছে সমালোচকদের একমাত্র ভাবনা। এই কারণেই বাঙলায়, "সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা" বই বেরিয়েছে।

গু—এর কারণ জানো। সাহিত্যে যারা শিব গড়তে বাঁদর গড়ে তারাই হচ্ছে সব সাহিত্য-রাজ্যে মহা শিবভক্ত।

শি—সে যাই হোক। সিডিসন ত আমি জানি শুধু পলিটিক্সে শাস্তি পায়।

গু—না হে না, সব রকম সিডিশনেরই শাস্তি আছে, তবে তা এক শাস্তি নয়। গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে সিডিসান করলে মার খেতে হয়, আর কংগ্রেস কিম্বা সমাজের বিরুদ্ধে সিডিসান করলে গাল খেতে হয়। একটা শাস্তি হচ্ছে violent আর একটা non-violent, এই যা তফাৎ।

শি—ভাল কথা! পলিটিক্সকে কেন রাজনীতি বলে?

পাই না। যৌবনের ছবিতে রূপের মধ্যেই অরূপের লীলা, ইন্দ্রিয়ের ভিতরেই অতীন্দ্রিয়ের খেলা, সসীমের মধ্যেই অসীমের টান প্রস্ফুট হইয়া থাকে। এইজন্যই বিশুদ্ধ ও প্রস্ফুট যৌবনকে দেবতার বিগ্রহ বলিয়া প্রণাম করিতে ইচ্ছা হয়।

(নব্যভারত)

বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষা

বাঙ্গালায় একটি বাক্য প্রচলিত আছে। বাক্যটি এই—

"লেখাপড়া করে যেই,
গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই।"

শুধু স্কুল-পাঠশালার ছেলে ভুলাইবার জন্য যে এই প্রবচনটি ব্যবহার হয় তাহা নহে,—উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে কলেজ-ইউনিভার্সিটির যুবকদের মনের কথা যে কি তাহাও প্রকাশ করিয়া দেয়। উচ্চ শিক্ষা এখন আমরা কলেজ এবং ইউনিভার্সিটির মারফতে পাই। পূর্ব্বে কেবল কলেজই ছিল উচ্চ শিক্ষার একমাত্র দ্বার—ইউনিভার্সিটি তখন শিক্ষার ভার হাতে লয় নাই। কিন্তু আগেও যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে। অর্থাৎ গাড়ী-জুড়ী চড়িবার ইচ্ছা চরিতার্থ হইতে পারে, এই আশায় আমরা উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে ব্যগ্র হই। অন্য দেশের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, বাঙ্গালায় উচ্চ শিক্ষা পাইবার আগ্রহ যুবকদিগের ভিতর খুব ব্যাপক ভাবেই আছে; বিলাতেও না কি এতটা নাই। ইহার কারণ কি? ইহার একমাত্র কারণ, দেশের দারিদ্র্য, এবং জনসাধারণের মধ্যে বিশ্বাস যে, লেখাপড়া শিখিলে দারিদ্র্য ঘুচিবে—উচ্চ শিক্ষা পাইলেই গাড়ী-ঘোড়া চড়িতে পারিব।

আমরা এ কথা বলি না যে, অন্য দেশে যুবকদের মধ্যে গাড়ী জুড়ী চড়িবার আকাঙ্ক্ষা মোটেই নাই; কিন্তু এ কথা আমরা বলি যে, যেমন অন্য দেশে শতকরা ১০।১২ জন যুবকও জ্ঞানলাভ এবং বিদ্যাচর্চ্চার জন্য ইউনিভার্সিটিতে প্রবেশ করেন, এখানে সেই রকমের ছাত্র বোধ হয় শতকরা দু-পাঁচ জনও পাওয়া যায় না। যে-যে পথ ধরিলে টাকা রোজগার করা সহজ হয়, বাঙ্গালী যুবক উচ্চ শিক্ষায় মন দেয় শুধু সেই পথের যাত্রী হইবার জন্য। যদি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিলেই গবর্মেণ্টের চাকুরী লাভ করিবার যোগ্যতা জন্মিত, তাহা হইলে কলেজ এবং ইউনিভার্সিটির ক্লাসগুলি কেবল খালি বেঞ্চ লইয়াই পড়িয়া থাকিত।

অনেকে জোর গলায় বলেন, আজকালকার যুবকেরা অন্য আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র অঙ্গনে সমবেত হন। প্রবন্ধে এবং বক্তৃতায় এরূপ ব্যাখ্যা আমরা যে পড়ি নাই, তাহা নহে। কিন্তু একটু মনোযোগ করিলেই বুঝা যাইবে, কেন সরকারী (সুতরাং মোটা মাহিনার) চাকুরীর বিরুদ্ধে বা অর্থকরী বৃত্তির বিরুদ্ধে আজকাল এত ঝাঁজাল মন্তব্য দেখিতে পাই। গ্রাজুয়েটের সংখ্যা এখন খুব বাড়িয়াছে, কিন্তু চাকুরীর সংখ্যা তেমন বাড়ে নাই। ইউনিভার্সিটির প্রথম গ্রাজুয়েট বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ ঘোষ বিনা আয়াসে গবর্মেণ্টের দপ্তরে ঢুকিয়াছিলেন; কিন্তু আজ দুইটি ডেপুটি বা ঐরূপ পদের জন্য অন্ততঃ হাজার দরখাস্ত পড়ে—হাজার বাঙ্গালী যুবক বিপুল চেষ্টা করেন। পরে যখন দুইজন মনোনীত হন, তখন বিফল-মনোরথ শত-শত যুবকের মনের অবস্থা প্রকাশ হয়। লেখায় ও বক্তৃতায় তাহারই স্বরূপ ফুটিয়া উঠে।

ইউনিভার্সিটি যাঁহারা স্থাপন করেন, তাঁহাদেরও বোধ হয় ইহাই অভিপ্রেত ছিল—কিসে শিক্ষিত চাকুরের দল গড়িয়া তোলা যায়; ফলও ইচ্ছানুরূপ হইল। যতটুকু শিক্ষা পাইলে বাঙ্গালী ভাল চাকুরের হয়, ঠিক ততটুকু শিক্ষাই বাঙ্গালী আয়ত্ত করিল এবং তাহার নাম হইল "উচ্চ শিক্ষা"। স্বর্গগত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইউনিভারসিটির প্রথম এম্-এ। তিনি এণ্ট্রান্স, এফ্-এ, বি-এ, এম-এ ও বি-এল্ সকল পরীক্ষায় প্রথম হন। তিনিও মোটা মাহিনার সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন। আজ পর্য্যন্ত উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত সকল বাঙ্গালীই বড় মাহিনার চাকুরীর দিকে ঝোঁক দিয়াছেন। সকলের নাম করিতে গেলে স্থানে কুলাইবে না, কয়েক জনের নাম দিলাম; উমেশ বটব্যাল, সূর্য্যকুমার অগস্তি, নিত্যকৃষ্ণ বসু, আশুতোষ গুপ্ত, হইতে সুরু করিয়া উপেন্দ্রলাল মজুমদার, কিরণচন্দ্র দে প্রভৃতি সকলেই বড় মাহিনার চাকুরী করিয়াছেন। তখনকার দিনে গবর্মেণ্টের চাকুরী ছাড়া বেশী রোজগারের পথ ছিল—কেবল আইনের ব্যবসায়ে। তাই উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত বাঙ্গালী যুবক ঐ দুই পথই লইতেন। শাসন বা বিচার বিভাগে উচ্চপদ পাইবার সম্ভাবনা থাকিতেও, অথবা উকিল-ব্যারিষ্টার হইবার সুবিধা সত্বেও, কয় জন বাঙ্গালী বিদ্যা অর্জ্জন বা বিদ্যা দান যাহার ব্রত, সেই শিক্ষকের কার্য্য বরণ করিয়া লইয়াছেন?

বিশ্ববিদ্যালয়ের যিনি সর্ব্বময়কর্ত্তা—ভাইস্-চ্যান্সেলার, তাঁহার পদে কখনও বাঙ্গালী শিক্ষককে বসিতে দেখি নাই। হাইকোর্টের জজ এবং রোজগারী এটর্নী ও ডাক্তার ঐ পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। কিন্তু কোন গরীব ও বিদ্বান শিক্ষক আজ অবধি নীত হন নাই। কর্ত্তাদের মনে যা ছিল, ফলিয়াছেও তাহাই। রোজগার যে পথে বেশী, সেই পথেই গ্রাজুয়েটরা ছুটিয়াছেন। কারণ, তাঁহারাও দেখিতেছেন, তাঁহাদের শিক্ষকেরা এবং তাঁহাদের অভিভাবকেরা উচ্চ শিক্ষা অর্থে সেই বস্তু বুঝেন, যাহা গাড়ী-ঘোড়া চড়িবার সামর্থ্য আনিয়া দেয়।

এই যখন অবস্থা, তখন হার্ডিঞ্জ হোষ্টেলের পাঁচতলার উপর আরও পাঁচতলা উঠাইলে, বা ভাইস-চ্যান্সেলারের মাহিনা ৮ হাজার টাকা করিয়া দিলে ছেলেদের এবং ছেলেদের শিক্ষকদের mentality বদলাইবে না। মন্ত্রী মহাশয় তাঁহার বিলে কি বন্দোবস্ত করিয়াছেন জানি না; তবে বড় বাড়ী, মোটা মাহিনা এবং দামী আসবাবপত্র আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষার নূতন আদর্শ আনিতে পারিবে না।

মন্ত্রী মহাশয়ের বিল পড়ি নাই; কিন্তু ইউনিভার্সিটি কমিশনের

তাহার নিজের স্বভাবের উপরে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই সেই বস্তুর ধর্ম্ম রক্ষিত হয়। স্বভাবের বিপর্য্যয় ঘটিলেই ধর্ম্মহানি হইয়া থাকে। ধর্ম্মাধর্ম্মের আলোচনায় ইহাই প্রথম কথা। সুতরাং যৌবনের ধর্ম্মাধর্ম্ম কি, ইহা বিচার করিতে হইলে, সকলের আগে যৌবনের প্রকৃতিটা কি, ইহা বোঝা প্রয়োজন। এ কথাটা যুবক-মণ্ডলীর ধর্ম্মোপদেষ্টারা মনে রাখেন না। তাঁরা যুবকদিগের উপরে বার্দ্ধক্য ধর্ম্মের বোঝা চাপাইতে যাইয়া, সর্ব্বদাই নিরীহ যুবকদিগের সর্ব্বনাশ করেন; এবং যাদের ভিতর সত্য যৌবন আছে, তাদের সঙ্গে বিরোধ বাধাইয়া নিষ্ফলতা আহরণ করিয়া থাকেন।

৩

"যৌবন বিষম কাল"। যৌবনে পা দিতে না দিতে চারুপাঠে এ কথা পড়িয়াছিলাম। কথাটা এক দিকে সত্য বটে। কত সত্য, যাঁহারা যৌবনের আগুনে নিজেদের হাত মুখ পোড়াইয়া বসিয়াছেন, তাঁরাই ভাল করিয়া জানেন। আগুনমাত্রেরই একটা আপদ্ ঘটাইবার শক্তি ও সম্ভাবনা আছে; নৈসর্গিক আগুনেরও আছে, যৌবনের আগুনেরও আছে। আগুনে ঘর-দোর পোড়ায়, আবার এই আগুন দিয়াই মানুষ অন্ধকারে পথ দেখিয়া চলে, নিজের খাদ্য রন্ধন করে, শীতে কাঁপিতে-কাঁপিতে এই আগুনের ধারে যাইয়াই নিজের হিমাঙ্গ গরম করিয়া লয়। আগুনে পোড়াইয়া মারে বলিয়া মানুষ আগুনকে দুষমন বলিয়া নিঃশেষে নিভাইয়া দেয় না, কেবল তাহার সম্ভাবিত আপদের পথটাই বন্ধ করিবার চেষ্টা করে। বাহিরের আগুনের সম্বন্ধে যাহা সত্য, যৌবনের আগুনের সম্বন্ধেও তাই সত্য। যৌবনকে চাপিয়া মারিবার চেষ্টা করিলে চলিবে না। যৌবনের সহজ প্রবৃত্তিগুলিকে নিষ্পেষণ করিলে চলিবে না, সে সকল প্রবৃত্তির অমর্য্যাদা করিলেও চলিবে না। আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকালে সাগ্নিকেরা যেমন শুদ্ধ মনে যজ্ঞের অগ্নি চয়ন করিতেন, এবং চিরদিন উপাসনা বুদ্ধিতে সেই আগুনকে জাগাইয়া রাখিতেন, সেই ভাবে শ্রদ্ধাসহকারে পবিত্র দেহ মনে এই যৌবনের আগুন চয়ন করিতে হয়; এবং সেইরূপ উপাসনা-বুদ্ধিতেই এই আগুনকে আমরণ অন্তরের মণিকোঠায় জাগাইয়া রাখিতে হয়। কিন্তু মামুলী-নীতিবাদীরা এবং মতবাদী ধার্ম্মিকেরা এ কথাটা এখনও বুঝেন না। এই জন্যই তাঁহারা সর্ব্বদাই যৌবনের সম্মুখে কেহ বা বেত্রদণ্ড আর কেহ বা লাল-নিশান হাতে লইয়া দিনরাত দাঁড়াইয়া রহেন। তাঁহাদের পক্ষে যৌবন বিষম কালই ত বটে।

শিশুরা নির্ম্মল। যৌবনের উন্মাদনা তাহাদের মধ্যে এখনও জাগে নাই। কুমার-কুমারীরাও মিষ্ট, কোমল নূতন গাছের পাতার মত ফুলও ফুটিতে আরম্ভ করে নাই, কাঁটাও গজাইয়া উঠে নাই। এদেরও আদর করিতে পারা যায়। কিন্তু যৌবন! সর্ব্বনাশ! তাতে ফুল ফুটে বটে, কিন্তু কাঁটাও গজায়। আর ঐ ফুলের ভিতরে সাংঘাতিক কীটও প্রবেশ করিয়া থাকে। যৌবন সয়তানের ফাঁদ, পাপের জন্মভূমি। তাই ত যৌবন বিষম কাল। এই কালেই মানুষের ভিতরে পাপ-প্রবৃত্তি সকল প্রবল হইয়া উঠে। এই কালেই ইন্দ্রিয়ের বাগচাল ডাকিয়া মানুষকে বিপথে-কুপথে ঠেলিয়া লইয়া যায়। অতএব যৌবনকে চারি দিকে শাসনের বেড়া দিয়া রাখিতে হয়। ইহাই পুরাতন নীতিবাদী মতবাদী ধার্ম্মিকদিগের কথা। প্রথম যৌবনে এঁদের দশআজ্ঞা উপদেশই শুনিয়াছিলাম। সারাজীবন ভরিয়া দেখিলাম, দশ-আজ্ঞা দ্বারা প্রকৃতির স্রোতকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না।

৪

প্রথম যৌবনে চারুপাঠে পড়িয়াছিলাম—যৌবন বিষম কাল। বার্দ্ধক্যের দরজায় আসিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্য কথা দেখিলাম—

বয়ঃ কৈশোরকং বয়ঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ বয়সকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান? ইহার উত্তরে রায় রামানন্দ কহিলেন—বয়ঃ কৈশোরকং বয়ঃ। আধুনিক বাংলা অভিধানে কিশোর এবং কৈশোর এর একটা কদর্থ করিয়াছে। বাংলা ভাষায় এখন কৈশোর বলিতে বাল্যই বুঝায়। চতুর্দ্দশবর্ষকাল পর্য্যন্ত কৈশোরকাল। কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যে কৈশোর বলিতে প্রস্ফুট যৌবনই বুঝিতেন। বাল্য ও যৌবনের মধ্যবর্ত্তী সময়কে কবিগণ বয়ঃসন্ধি বলিয়াছেন। যৌবনকালই লীলার কাল। আর এই লীলাকে লক্ষ্য করিয়া রায় রামানন্দ কিশোর বয়সকে বয়সের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কাল বলিয়া কহিয়া গিয়াছেন। এমন কথা কেন কহিলেন, ভাবিতে লাগিলাম।

ভাবিয়া দেখিলাম যে এই কৈশোর বা যৌবনকালেই ত মানুষের পূর্ণ বিকাশের ইঙ্গিতটা ফুটিয়া উঠে। শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া যৌবন পর্য্যন্ত মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশ হইয়া থাকে। কিন্তু শিশুর মধ্যে পূর্ণ মনুষ্যত্বের সাড়া পাই নাই। শিশুতে এ পর্য্যন্ত বুঝি যে এ আরও ফুটিবে। কিন্তু সে ফুটিয়া যে কি হইবে, ইহার পূর্ব্বাভাষ দেখিতে পাই না। মনুষ্য-প্রকৃতির পরিপূর্ণ পরিণতির আভাস শিশুর মধ্যে মিলে না। এই আভাস মিলে কেবল প্রস্ফুট যৌবনের ভিতরে। যৌবন ফুরাইলে আবার এ আলো নিভিয়া যায়। তখন মনুষ্যের মধ্যে মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ স্বরূপের প্রতিবিম্ব আর প্রতিফলিত হয় না। এই জন্যই মহাপ্রভু কৈশোর বয়সকে বা যৌবনকে মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠতম অংশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। যে যৌবন কালে মানুষের মধ্যে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সম্ভাবনার সন্ধান মিলে,—পরিপূর্ণ মানুষ কিরূপ, যে যৌবনে ইহার পূর্ব্বাভাস প্রাপ্ত হই, তাহাকে উপেক্ষা করিতে বা তাহার উপর হাত চালাইতে সাহস হয় না।

৫

আর এ সাহস হয় না এইজন্য,—মানুষই যে দেবতার প্রতিচ্ছবি। এই মানুষকে না পাইলে দেবতাকে পাইতাম না। মানুষের মধ্যেই অনাদিকাল হইতে দেবতা আত্মপ্রকাশ করিতেছেন ও করিয়াছেন। দেবতার প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম আধার পরিপূর্ণ মানুষ। আর এই পরিপূর্ণ মানুষ যে কি বস্তু, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারি, বিশুদ্ধ ও প্রস্ফুট যৌবনের মধ্যে। শিশুতেও তাহা দেখি না, বৃদ্ধতেও তাহা দেখিতে

বয়ঃ কৈশোরকং বয়ঃ

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল

কিছুদিন পূর্ব্বে বাংলার যুবকদিগের এক বৈঠক বসিয়াছিল। এই যুবক-সম্মিলনীর উদ্দেশ্য ও কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে আমার মতামত জানিতে চাহিয়াছ। এ বিষয়ে কিছু না লিখিতে চাহিলে অন্ততঃ সাধারণ ভাবে আজিকালিকার বাঙ্গালী যুবকদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটা কিছু লিখিয়া পাঠাই, তোমার বড়ই ইচ্ছা।

প্রথম কথা, যুবক-সম্মিলনী সম্বন্ধে। এ সম্মিলনীর কথা আমি বিশেষ কিছুই জানি না। শরীরের বর্ত্তমান অবস্থায় কর্ম্মকর্ত্তাদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারি নাই। খবরের কাগজেও তাঁহাদের আলোচনার বিশেষ কোনও বিবরণ পড়ি নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে কোনও কথা বলা সম্ভব নহে; সম্ভব হইলেও বলিতাম কি না সন্দেহ। শুনিবে কে?

বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং আপদ্‌কালমুপস্থিতে—বিষ্ণু শর্ম্মার জ্ঞানগর্ভ কথাটা ত জান; আমিও ভুলি নাই। আপদ্‌কাল যে উপস্থিত হয় নাই, এমন কথা বলা কঠিন। কিন্তু উপস্থিত হইয়া থাকিলেও তার অনুভব আছে কি? আর কোন বিপদের অনুভব থাকিলেই লোকে বৃদ্ধের উপদেশ গ্রহণ করিতে চাহে না। সকল অবস্থাতেই পরের উপদেশ লইবার একটা যোগ্যতা লাভ করা আবশ্যক। মানুষ যতক্ষণ নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি এবং শক্তি-সাধ্যের উপর নির্ভর করিয়া চলিবার ভরসা রাখিতে পারে, ততক্ষণ সত্য ভাবে অপরের উপদেশ লইতে চাহে না। আর সে যাহা চাহে না, জোর করিয়া তাহার উপরে সেগুলি চাপান শাস্ত্র ও সদাচারবিরুদ্ধ। বাংলার যুবকেরা নিজেদের হালে পানি পাইতেছেন না, এ কথাটা কি সত্য? তাঁদের ভিতরে কি কোনও গভীর জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে, বলিতে পার? আর অন্তরে জিজ্ঞাসা না জাগিলে, খামকা তাহার আলোচনা করা পণ্ডশ্রম মাত্র।

শেষ কথা, আরসীর কাছে দাঁড়াইলে বৃদ্ধ যে হইয়াছি, এ কথা প্রত্যক্ষ করি। জন্মপত্রিকার সাক্ষ্যে বয়স গুণিলে বার্দ্ধক্য কেন, কলিকালের ওজনে জরাগ্রস্ত হইয়াছি, এ কথাটাও অস্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু বাহিরের চেহারা ও দৈবজ্ঞের কোষ্ঠিপত্র যাহাই বলুক না কেন, ভিতরে এখনও সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ যৌবনের সাড়া পাইয়া থাকি। সুতরাং নিজেকে যুবক-পর্য্যায়ের বাহিরে ফেলিতে রাজী নহি। নাতি-নাতিনীরা এ কথা শুনিয়া উপহাস করিবে জানি। কিন্তু তাহাদের উপহাসের ভয়েও অন্তরে যাহা অনুভব করি না, বাহিরে তাহা বলিতে রাজী নহি। সুতরাং বৃদ্ধ বলিয়া নহে, বার্দ্ধক্যের বয়সোচিত জ্ঞান-গরিমার দাবীর উপরেও নহে, কিন্তু ভিতরে প্রাণের মধ্যে আমিও সত্যসত্যই তোমাদের যুবকদলের একজন, এই ভাবিয়া যদি আমার কথা কেহ শুনিতে চাহে, তাহা বলিতে রাজী আছি।

২

কোনও বিষয় বা বস্তু সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, সকলের আগে সে বস্তুটা কি, ইহা ভাল করিয়া বুঝিতে হয়। আমাদের দেশে চিরদিন ধর্ম্ম বলিতে কোনও বাহিরের বিধি নিষেধ কেহ বুঝেন নাই। এইজন্য আমাদের পরিভাষায় কেবল মানুষের ধর্ম্ম আছে, এ কথা বলে না। সৃষ্টির প্রত্যেক পদার্থেরই নিজের-নিজের এক একটা ধর্ম্ম আছে। সেই ধর্ম্ম তাহাদের প্রকৃতির ভিতরেই ফুটিয়া রহে। এই জন্য আগুনের ধর্ম্ম আছে—দাহন-শক্তি, জলেরও ধর্ম্ম আছে—শৈত্য। কোনও বস্তু

বন্যা-দায়ে

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

দেশ গিয়েচে কবেই চ'লে প্রেতের ডাঙা করচে ধূ-ধূ,
মানুষগুলো রইল বেঁচে, এটিই ছিল দুঃখ সুধু।
এই শ্মশানে থাকত যারা চিতার বুকে শয়ন করি,
তাদের স্মৃতি ঘুচিয়ে দিতে বন্যা জাগে ভয়ঙ্করী!

বন্যা জাগে ভয়ঙ্করী—ধরলে যে বেশ সর্ব্বনাশী—
মৃত্যু-বেণী এলিয়ে দিয়ে হাসলে বিকট অট্টহাসি!
বিপুল কেশের ঝাপটা খেয়ে লুপ্ত হোলো গ্রাম-নগরী,
দেশ জুড়ে আজ কান্না ওঠে, বন্যা ভাবে—কি রগড়ই!

বন্যা নাচে, বন্যা নাচে,—নাচের তালে কাঁপচে মাটি,
ভাসচে মানুষ, ভাসচে গরু, ভাসচে চালের খড়ের আঁটি!
বনবনিয়ে ঘোরণ-পাকে ফেনিয়ে উঠে এঁকে-বেঁকে—
যেন রে কোন্ সলিল-রূপা উন্মাদিনী চলল হেঁকে!

এম্নি ক'রে মরণ-দোলা দেয় দুলিয়ে বছর বছর,
দুর্ভিক্ষ আর মড়ক-ব্যাধি সঙ্গীরাও সব দিচ্ছে নজর!
বাংলা-মশান মাতিয়ে দিয়ে নাচন একি চলছে তাথৈ—
এমন কারেও দেখছিনা তো, এগিয়ে এসে বলবে মাভৈ!

মাভৈ দেবার শক্তি কোথায়? চাঁদ-প্রতাপের বাংলাতে হায়,
আজকে খালি শক্তি আছে পুঁথি-পড়ায়, কলম-ঠেলায়!
যে বাঙালী পেরিয়ে সাগর হারিয়ে দিলে লঙ্কা-রাজে,
"হীন কাপুরুষ" ব'লেই আজি তাদের নামে ডঙ্কা বাজে!

দাসের জাতি! অস্তিমেতেও উঞ্ছ-সমান ভিক্ষা মাগে!
ভিক্ষা ক'রেও বাঁচবে ক'দিন? অদৃষ্ট যে ঐ দাঁড়িয়ে আগে!
আজ বাদে কাল আবার যখন আসবে মরণ আর এক বেশে,—
ভিক্ষা-ঝোলা ভরবে কে ফের? ফিরবি কাহার দ্বারদেশে?

ভিক্ষা ক'রে কেউ বাঁচে-নি,—মরবি তোরা হাড়-ভিখিরী!
নোয় না যাদের উচ্চ মাথা, জীবন থাকে তাদের ঘিরি!
এই প্রকৃতি রাজ্য তাদের, বন্যা তাদের শাসন মানে,
বিজলী তাদের কাজের দাসী,—জলদ তাদের আসন আনে।

পাশেই তোদের রয়েছে চীন, মরদ তারা দৃঢ় জাতি!
লক্ষ লক্ষ পুরুষ-নারী জলেই আছে গৃহ পাতি।
হায়রে তোরা ডাঙায় থেকেও, ঠেকিয়ে জলে রাখতে নারিস্
জলের জঠর যেম্নি ডাগর, অম্নি শুধুই কাঁদতে পারিস্!

শুনে শুনে কান্না তোদের অশ্রু যে সব শুকিয়ে গেছে,
মুখ থেকে হায় সদয় কথা বুকের ভেতর লুকিয়ে গেছে!
সবাই যেথায় করছে হা হা, কান্না সেথায় শুনবে কে রে—
তার চেয়ে ঐ ঝাঁপিয়ে জলে, রোদন তোদের থামিয়ে দে রে!

বাঁচার মতন বাঁচলে পরে, পেতাম তবু সান্ত্বনা যে,
বঙ্গে এখন জীবন মানে মরণ-বাড়া লাঞ্ছনা যে!
চরণ ফেলে চলতে গেলে বাজবে বিষম শিকলিগুলো—
কইলে কথা ফাটবে পিলে, বুটের তলায় মাখবি ধূলো!

কঙ্কালেরি ছায়ার মতন বাঁচতে তোদের এতই মায়া!
নিজের পেটের ভাত জোটেনা— ঘরে বছর-বিউনি জায়া!
শরীরগুলো ব্যাধির আলয়, নকরি করাই কেবল পেশা,—
জ্যান্তে সবাই থাকবি ম'রে,— হা-ধিক্ তবু প্রাণের নেশা!

দিন গুণে এই মৃত্যু-ভয়ে ব'সে থাকা পথের পাশে!
তার চেয়ে ভাই, নিজের মরণ এগিয়ে যদি নিতে আসে—
রোগে-দুখে জীর্ণ হয়ে, বেঁচেই খাবির হেঁচকি খেয়ে
মরার চেয়ে,—মরণ ভালো একদিনেতেই বানের চেয়ে!

জীবন্মৃত থাকার ব্যথা একদিনেতেই মুছে যাবে—
পায়ের শিকল, প্রাণের আগল ক্ষণেকপরেই ঘুচে যাবে!
বন্যা এসে ভাঙবে না ঘর, ভিক্ষা নিতে হবে না আর—
দুষ্ট ব্যাধির ভরবে না পেট, শিকার কোথায় রবে না তার।

শ্যামল বসন ভিজিয়ে কোথায় বঙ্গমাতা তলিয়ে যাবেন,
অতল জলের শীতল কোলে নয়ন মুদে শান্তি পাবেন;
জানবে না কেউ, দেখবে না কেউ, আসবে না কেউ
মারতে লাথি,-
স্মরণ ক'রে কাঁদবে কেবল সজল-নয়ন বাদল-রাতি।

"এই যে—" বলে বাবুটি একটা ফলের টুকরি দেখিয়ে দিলেন। দিনু ঝুড়ি মাথায় করে বাবুর পেছন-পেছন চলল। কিছুদুর গিয়ে তারা একটা প্রশস্ত গলির মধ্যে ঢুকল। গলিতে ঢুকে দিনু অবাক্ হয়ে গেল। সে দেখল, এইটুকু গলি,—তাও বাড়ীর ওপর বাড়ীতে একেবারে বাতাসটুকু পর্য্যন্ত ঢোকবার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। অথচ এত গাড়ী-ঘোড়া, হাওয়াগাড়ীর ঢেউ লেগেছে যে, দেখে বোধ হয় যেন এ রাস্তায় লোকের হেঁটে যাবার হুকুম নেই।

বাবুর সঙ্গে বাড়ীর ভেতর ঢুকে, অনেকগুলা সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতে, একজন বাবু একটা ঘর দেখিয়ে বলল "ঐ ঘরে নিয়ে যা।" ঘরের দরজার সুমুখে মাথার ঝুড়িটা নামিয়ে, ঘরের ভেতর দৃষ্টিপাত করতে, দিনুর চোখে ধাঁ-ধাঁ লেগে গেল। ইন্দ্রভবন তুল্য সজ্জিত ঘরের মেঝের ওপর মস্ত বড় ফরাস পাতা। চারধারে রকম-বেরকমের পোষাকপরা বাবুর দল বসে স্ফূর্ত্তি করছে। সে ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারল না যে, সে কোথায় এসেছে। কিন্তু শীঘ্রই তার ভুল ভেঙ্গে গেল। অশ্লীল সঙ্গীত ও আমোদ-প্রমোদ দেখে তার বুঝতে একটুও বাকি রইল না যে, সে নরকের একটা নাগরদোলায় উঠেছে। যেমনই তার এই কথাটা মনে হল, অমনি সে পয়সার কথা, ক্ষুধার কথা ভুলে গিয়ে, সেখান থেকে পালাবার জন্য পা বাড়িয়ে দিল। কিন্তু পেছন ফিরে সে যে দৃশ্য দেখল, তাতে তার শরীরের সমস্ত রক্ত জল হয়ে, পিল্ পিল্ করে তার সারা গা দিয়ে বেরুতে লাগল। সে এক পা নড়তে পারল না—সমস্ত পৃথিবীটা যেন দুলে উঠ্‌ল। এ কি! সে কি স্বপ্ন দেখ্‌ছে! ভাল করে চোখ দুটো রগড়ে সে আবার চেয়ে দেখল! তার সর্ব্বশরীর ঠক্‌ঠক্ করে কেঁপে উঠ্‌ল! সে চীৎকার করে বলল, "অ্যাঁ—এ কি—ভানী—তুই এখানে? আর নবনে পোদ্দারের ছেলেটা"—সে আর কিছু বলতে পারল না,—রাগে-দুঃখে রুদ্ধবাক্ অবস্থায় সেইখানে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল।

হঠাৎ মুটেটার মুখে ভানীর নাম শুনে, ভানী ও ক্ষেতু উভয়েই চমকে উঠে, ভাল করে মুটেটার পানে চেয়ে শিউরে উঠ্‌ল। ক্ষেতু চেঁচিয়ে বলল "বেয়ারা—বেয়ারা—শীগ্‌গির মুটেটার গলা ধরে বের করে দে।" বাইরে গোলমাল শুনে ইয়ারের দলের দু'চারজন বেরিয়ে এসেছিল। তারা ক্ষেতুর কথায় বেয়ারার অপেক্ষা না করে দিনুকে আক্রমণ করতে উদ্যত হল। পূর্ব্বের ঝোঁকটা সামলে দিনু তার লাঠি গাছটা শক্ত করে ধরে বলল, "আমি ত' মরতে চলেছি। কিন্তু তার আগে তোদের যমের বাড়ী পাঠিয়ে তবে যাব।" দিনু লাঠি তুলে ভানী ও ক্ষেতুকে আক্রমণ করল। লাঠি তোলার সঙ্গে-সঙ্গেই, দু'তিনজন লাফিয়ে পড়ে দিনুর লাঠি চেপে ধরল। তার পর কিল, চড়, লাথি বেচারীর ওপর নির্দ্দয় ভাবে পড়ে একেবারে তাকে গুঁড়িয়ে ফেলল। ভানী এই ব্যাপারের জন্য একটুও প্রস্তুত ছিল না। এই আকস্মিক ঘটনায় তার মাথা ঘুরে উঠল; সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। ভানীকে তুলে নিয়ে, ক্ষেতু ঘরের ভেতর ঢুকে, তার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হল। ক্ষেতুর একজন ইয়ার মুটেটার ঘাড় ধরে বাইরে নিয়ে গিয়ে, চুরি করেছে বলে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিল।

পুলিশের সঙ্গে দিনু যখন থানায় পৌঁছিল, তখন তার আর সোজা হয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল না। তাকে দেখে দারোগা বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "এই শালা, তুই চুরি করেছিস্?" দারোগা বাবুর কথায় দিনু সেই অসহায় অবস্থাতেও একবার বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "চুরি আমি করি নি, তবে আমি চোর বটে।" তখন একজন কনেষ্টবল দিনুর গলায় ধাক্কা দিতে দিতে হাজত ঘরে নিয়ে গিয়ে ঠেলে দিল। দিনুর দুর্ব্বল পা দুখানা সে ধাক্কা খেয়ে সোজা হয়ে আর দাঁড়াতে পারল না,—মুখ থুবড়ে দিনু শক্ত মেঝের ওপর পড়ে গেল।

পরদিন সকালে ভানীর নিতান্ত পীড়াপিড়ীতে ক্ষেতু গত রাত্রের মুটেটার খবর নিতে থানায় গিয়ে দারোগা বাবুকে তার কথা জিজ্ঞাসা করায়, দারোগা বাবু একজন কনেষ্টবলকে চোরটাকে হাজত থেকে আন্‌তে বললেন। কনেষ্টবল হাজত-ঘরের দরজা খুলে দেখল যে, চোরটা তখনও মেঝের ওপড় উপুর হয়ে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। ঘরের ভেতর ঢুকে কনেষ্টবল চোরটার পিঠে গোটাকতক লাথি মেরে যখন তাকে সজাগ করতে গেল, তখন দেখল, চোর যে, সে পালিয়েছে,—কেবল তার প্রাণহীন দেহটা শাস্তি গ্রহণের জন্য তখনও পড়ে আছে।

(৫)

ভানী যখন শুনল, তার অনাহারী, দুর্ব্বল পিতাকে বাজারের লোক সামান্য অপরাধে মেরে পুলিসে ধরিয়ে দিয়েছে, এবং তাকে রক্ষা করা দূরের কথা, মেরে আধমরা করে দিয়েছে, তখন সংসারের ওপর বিতৃষ্ণায় ও নিজের দুরদৃষ্টের যন্ত্রণায় সে অতিষ্ঠ হয়ে, ক্ষেত্রমোহনের সঙ্গে কলকাতায় চলে গেল। ক্ষেত্রমোহন সুযোগ বুঝে ভানীর চোখের সুমুখে ভবিষ্যতের এমন রঙিন ছবি ধরেছিল যে, ভানী সহস্র চেষ্টাতেও তার বিদ্রোহী মনের রাস টেনে রাখতে পারে নি। বালকের ঘুড়ির সূতায় জোট পাকানর মত, সে তার চিন্তার খেই খুঁজে পায় নি। জলমগ্নের আশ্রয়ের মত, বিষধর সর্প জেনেও, সে ক্ষেতুকেই এই বিপদের সহায় মনে করে জড়িয়ে ধরেছিল।

কলকাতায় এসে ক্ষেতুর-দেওয়া ঐশ্বর্য্য-সুখের মাঝে ভানী এমনই একটা বেদনা অনুভব করছিল যে তার যাতনা তাকে এত সুখের মধ্যেও একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে দিল না। নিজের সুখ-স্বচ্ছন্দতায় দিনরাতই তার পিতার কাতরতা ও যন্ত্রণার কথা মনে করিয়ে দিত। যে পিতা এতটুকু বেলা থেকে আপন বুক দিয়ে আগলে তাকে এত বড় করেছে, সেই পিতা অদৃষ্টের কঠোরতায় জেলখানায় হাহাকার করছে, আর সে সুখের স্রোতে গা ভাসিয়ে চলেছে! মাঝে-মাঝে তার মনে হত—আত্মঘাতী হয়ে এই মর্ম্মন্তুদ অনুভূতির হাত হতে মুক্তি লাভ করে। কিন্তু আজন্ম দুঃখ-কষ্টে বঞ্চিত সে—সুখের নেশায় ক্রমেই বিভোর হয়ে উঠছিল!

(৬)

দিননাথের সেই চুরির অপরাধ পুলিশের কৃপায় অতি-রঞ্জিত হয়ে, আদালতের বিচারে তার ছয় মাস জেল হয়েছিল। ছয় মাস কারাবাসের পর মুক্তিলাভ করে, আবার সে খোলা বাতাসে এসে দাঁড়িয়েছে। দুর্ভিক্ষের তাড়নায় চুরি-ডাকাতির অতি-বাহুল্যে খুলনার জেলে স্থানাভাব হওয়ায়, অনেকগুলি কয়েদী কল্‌কাতায় চালান হয়েছিল। দিনুও তাদের মধ্যে ছিল। চুরির অপরাধে ধরা পড়ে, সে নিজের অদৃষ্ট এবং ভগবানের অবিচারের বিপক্ষে ধিক্কার না দিয়ে থাকতে পারে নি। কিন্তু যখন জেলে এসে সে দুবেলা পেট ভরে খেতে পেল, তখন বুঝল, ভগবান কেন তাকে জীবনের শেষ সীমায় অমন কুমতি দিয়েছিলেন। ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় সেদিন সে ভগবানকে প্রাণভরে ডেকে বলেছিল "ঈশ্বর! তোমার করুণা অনুভব করবার ক্ষমতা মানুষের নেই।" নিজে দুর্ভিক্ষের কবল হতে মুক্তিলাভ করেও সে প্রাণে শান্তি পেত না,—ভানীর চিন্তা মাঝে-মাঝে তাকে ক্ষিপ্ত করে তুলত। দুর্ব্বল শরীরে সেই চিন্তার তুষানল সহ্য করতে না পেরে, কলকাতায় এসে দিনু অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। দু' মাস হাসপাতালে থেকে যখন জেল-খানায় ফিরে গেল, তখন সে এত দুর্ব্বল হয়েছিল যে, তার চিন্তা করবার শক্তিও লোপ পেয়েছিল। অতীতের কথা শুধু আবছায়ার মত তার মনে পড়ত। আর সেই আবছায়ার মধ্যে যখন ভানীর মলিন মুখখানা তার মনে উদয় হত, তখন সে ভাবত,—সে কি আর বেঁচে আছে—করে হয় ত না খেতে পেয়ে মরে গিয়েছে। তাই সে মেয়াদের শেষ কটা মাস মুখ বুজে কাটিয়ে দিয়েছিল।

জেলখানা থেকে দিনু তার সেই ছিন্ন বস্ত্র আর লাঠিখানা নিয়ে বেরিয়ে এসে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে বুঝতে পারল না—সে কোথায়। জেলের মধ্যে সে শুনেছিল যে, সে কলকাতায় এসেছে। কলকাতার কথা সে দেশে শুনেছিল বটে, তবে কোথায় কি বৃত্তান্ত তা জানত না। সশরীরে কলকাতার রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে অবাক্ হয়ে গেল,—বাইরের এত বড় কাণ্ড জেলখানার গণ্ডির ভেতর থেকে সে একদিনও টের পায় নি। হাতে একটি পয়সা নেই,—তার ওপর দুর্ব্বল শরীরে বেশী দূর চলবারও ক্ষমতা নেই। উপায়ান্তর না দেখে, অবশেষে সমস্ত দিন রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে সে ভিক্ষে করে পাঁচটা পয়সা সংগ্রহ করে, দোকান থেকে কিছু কিনে খেয়ে, সেদিনকার মত গাছের তলায় শুয়ে কাটিয়ে দিল।

পরদিন শনিবার। ঘুরতে-ঘুরতে সে নতুনবাজারের সুমুখে এসে দাঁড়িয়ে ভাবছিল কি করবে। সমস্ত দিন খাওয়া হয় নি; কারণ, সে দিন একটা পয়সাও সে সংগ্রহ করতে পারে নি। মনে-মনে যখন সে পাঁচ রকম তোলাপাড়া করছিল, তখন একজন বাবু এসে তাকে বলল "এই—একটা মোট নিয়ে যেতে পারবি? বেশী দূর নয়—এই সোণাগাছির মধ্যে।" ক্ষুধায় দিনুর শরীর তখন ঝিম্‌ঝিম্ করছিল। ভগবানের করুণা মনে করে সে বলল, "আজ্ঞে যাব বৈ কি বাবু,—কি নিয়ে যেতে হবে?"

শি। আপনার মতে তার উপায় কি?

গু—দুটি উপায় আছে। প্রথমটি হচ্ছে নিজের আধ্যাত্মিক আর সেই সঙ্গে অপরের সাংসারিক উন্নতি করবার চেষ্টা করা, আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে নিজের সাংসারিক আর সেই সঙ্গে অপরের আধ্যাত্মিক উন্নতি করবার চেষ্টা করা।

শি—এ দুটির মধ্যে কোন্‌টি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য?

গু—প্রতি লোক নিজের প্রকৃতি অনুসারে তা স্থির করবে।

শি—বেশীর ভাগ লোক কোন্ পথটি অবলম্বন করবে?

গু—অবশ্য দ্বিতীয়টি।

শি—তা'হলে আমিও ঐ দ্বিতীয় পথটিই ধরব।

গু—তুমি যে তা করবে তা আমি আগে থাকতেই জানি।

শি—কি করে জান্‌লেন?

গু—তোমার প্রকৃতি spiritual, এই থেকে।

শি—তবে একটি কথা বলি, আপনার মত ঘোর materialist পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই।

গু—দেখো, গুরুভক্তি খুব ভাল জিনিস, কিন্তু তাতে অন্ধ হয়ে, কারও অতি-প্রশংসা করা উচিত নয়।

শি—আজ তবে আসি।

গু—এসো। (বিজলী)

আবহাওয়া বদলাইতে হবে

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যের সমালোচনা করিতে যাইয়া উহার দোষ ত্রুটি দেখাইলে উহার শত্রু বলিয়া আমরা যে অভিহিত হইব, দশের মুখে গালি খাইব ইহা ত স্বাভাবিক। কর্ত্তাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রধান অভিযোগ এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবা বিশ্ববিদ্যামন্দিরে যে আবহাওয়ার সৃষ্টি হওয়া উচিত তাহা হয় নাই। Advancemert of Learning কথাটি ইহার দ্বার-দেশে খোদিত থাকিলেও, advanced learning-এর প্রতি ইঁহাদের অনুরাগের তেমন পরিচয় আমরা কখনও পাই নাই। অন্য লোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে যে অভিযোগ উপস্থিত করেন, আমরা সে অভিযোগ আনি না। কেহ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় 'গোটা মানুষ' গড়িতে পারে নাই; আবার কেহ বলেন ডিগ্রীর সহিত বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালী গ্রাজুয়েটের মনে জাতীয় ভাব জাগাইতে পারে নাই; আবার কেহ-কেহ বলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা জীবিকা অর্জ্জনের অনুকূল হয় না—কাজেই বলিতে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যর্থ হইয়াছে। আমাদের অভিযোগ কিছু স্বতন্ত্র।

যখন দেখি, তোমাদের গ্রাজুয়েটরা বিদ্যার বাজারেও সামান্য প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে পারে না, অর্থাৎ বাঙ্গালীর ছেলেরা শুধু লেখাপড়াতেও পশ্চিম দেশের ছাত্রদের অপেক্ষা অনেক পিছনে, তখন তোমাদের কার্য্যের দোষ না ধরিয়া পারা যায় না। তোমরা বলিবে—কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কা মারা বাঙ্গালীর ছেলে বিদেশে গিয়া বেশ নাম করিতেছে; সুতরাং তাহাদের শিক্ষাও যে উচ্চ ধরণের, এ কথা মানিয়া লইতে হইবে। এ তর্কের ভিতর একটা মোটা রকম গলদ রহিয়াছে। মেধাবী ছেলে সকল প্রকার বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও যে খ্যাতি লাভ করে, ইহা আশ্চর্য্যের কথা নহে; এবং বাঙ্গালায় মেধার যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, এ কথা কেহই বলিবে না। সুতরাং সকল প্রকার বাধা সত্ত্বেই জনকয়েক মেধাবী ছাত্র বিদ্যা-বুদ্ধিতে যে সুনাম অর্জ্জন করিবে, ইহা ত স্বাভাবিক। ব্রজেন্দ্র শীল বা আশু মুখোপাধ্যায় ইউনিভার্সিটির পুরাতন আমলের ছাত্র। তাঁহাদের পাণ্ডিত্য ও মনীষার জন্য সেই সময়কার ইউনিভার্সিটির সুখ্যাতি করা চলে কি? তেমনি এখনকার মেঘনাথ সাহা বা জ্ঞান ঘোষ পাষ্ট গ্রাজুয়েট বৃক্ষের অপূর্ব্ব ফল, এ কথা মানিয়া লইব কেন? আমরা দেখিব, সাধারণ বুদ্ধি লইয়া যে বাঙ্গালী তোমাদের কাছে যায় তাহাকে কতটুকু লেখাপড়া তোমরা শিখাইতে পার? তোমরা চোখ বুজিয়া ছাত্রদিগের পিঠে রঙ বেরঙের ছাপ লাগাইয়া দেও। সে ছাপের কোন মানেই নাই। তোমাদের গোল্ড মেডালিষ্ট, তোমাদের পি-আর-এস, তোমাদের ডি-এসসিরা বিদ্যার জাহাজ হইয়াও পাশ্চাত্য দেশে বিদ্যা লাভের জন্যই যায়। শুধু বিজ্ঞানে নয়, শুধু আইনে নয়, এমন কি ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য, দর্শন এ সকল বিষয়ও শিখিবার জন্য, তোমাদের ছেলেরা সকল পাঠ শেষ করিয়া, সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, পশ্চিমের বিদ্যালয়গুলিতে প্রবেশ করে। সুতরাং এ কথা বলিলে মিথ্যা হয় না যে, কোন বিষয়েই তোমরা এমন ব্যবস্থা করিতে পার নাই, যাহাতে পশ্চিমের পাশ করা ছেলেরা তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়া পড়িতে চায়। আর দ্বিতীয় কথা এই যে, তোমরা চোখ বুজিয়া যাহার পিঠে একবার সেকেণ্ড বা থার্ড ক্লাসের ছাপ মার, তোমরাই তাহাকে জন্মের মত অপাংক্তেয় করিয়া দাও। তাহারও যে বুদ্ধি থাকিতে পারে—সেও যে সুশিক্ষা পাইলে বিদ্যার্জ্জন করিতে পারে, বিদ্বান হইতে পারে, তোমরা এই সহজ সত্যটা ত মান না। তোমাদের সকলের চেয়ে বড় দোষ এই, এবং সকলের চেয়ে লজ্জার কথাও এই যে, যাহাকে তোমরা একবার পতিত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছ, সে যদি কোন রকমে পাঁচ মাস পশ্চিমের কোন স্কুলে পড়িতে পায়, সেও জাতিতে উঠে; এবং তোমরাই তাহাকে আবার মাথায় করিয়া রাখ।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতেছি বলিয়া 'টাইম্‌স্'-এর সুরে সুর মিলাইতে পারিব না। অতিব্যয়ের অভিযোগ যাহা 'টাইম্‌স্' করিয়াছেন, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি যতটা খাটে, তাহার দশগুণ খাটে গবর্মেণ্টের পক্ষে। এ বিষয়ে গবর্মেণ্ট যত পটু, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা ততটা ওস্তাদ নহেন। আমাদের কড়া নজর রাখিতে হইবে দুইয়েরই উপর। বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়ার সংস্কার চাই, এবং গবর্মেণ্টের অতি-ব্যয়ও বন্ধ করা চাই। এ কথা খাটি সত্য ঘরের ছেলে যাহাতে ঘরে থাকিয়াই advanced learning আয়ত্ত করিতে শিখে, তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। (হিন্দুস্থান)

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীনরেন্দ্র দেব

১। মায়াবী বেতারের যাদু

আমেরিকার সংবাদপত্রসমূহ আজকাল রেডিয়ো টেলিগ্রাফের সঙ্গে রেড়িয়ো টেলিফোনেরও ব্যবহার ক'রে হাজার হাজার মাইল দূরে সংঘটিত ব্যাপারের বিশদ বর্ণনা

বেতার আলাপের শিঙা (এই শিঙার সাহায্যে বেতার আলাপের ধ্বনি বহু লোকের কর্ণগোচর হয়।)

সেই দিনই তাঁদের কাগজে ছাপতে পারছেন! বেতার-বার্ত্তাবই মুহূর্ত্তের মধ্যে দূরদেশে ঘটিত যে ঘটনার সংবাদটুকু মাত্র এনে দিত, বেতার আলাপ (Radio Telephone) আজ ততটুকু সময়ের মধ্যেই সেই ব্যাপারের বিস্তারিত বিবরণ এনে দিচ্ছে! সেদিন দুপুর রাত্রে আটলান্টায় আগুন লেগে প্রায় তিরিশ লক্ষ টাকার ক্ষতি হ'য়ে গেল। নিউ ইয়র্কের সংবাদপত্র-আপিসে তৎক্ষণাৎ বেতার বার্ত্তাবহ সে সংবাদ এনে পৌঁছে দিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে বেতার আলাপে তাঁরা সেই ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের সমস্ত

ইস্কুলের মেয়েরা (ছাত্রীরাও বেতার আলাপের রহস্য অবগত হ'চ্ছে।)

ব্যাপার সেই মুহূর্ত্তে অবগত হয়ে ভোরের কাগজে সেই দুর্ঘটনার আদ্যোপান্ত বিবরণ ছাপিয়ে প্রকাশ করে দিলেন! এই যে সুবিধাটুকু, এটা বেতার বার্ত্তাবহও এতদিন তাদের দিতে পারছিল না; কিন্তু 'বেতার আলাপ' সে অভাব দূর ক'রে দিয়েছে। এখন আমেরিকার কয়েকটা বড় বড় সহরে এক একটা 'বেতার' সংবাদ প্রচারের

কুমারী যৌবানী প্রীতেম। (ইনি একজন বিখ্যাত ফরাসী গায়িকা; ইনি দূর থেকে প্যারী সহরের অনেক লোককে বেতার আলাপে গান শুনিয়েছিলেন। এখন বেতার-আলাপ-কক্ষের অধ্যক্ষ খবর নিচ্ছেন কে কেমন গান শুনতে পেয়েছেন।।)

বন-ভোজনে বেতার

মোটর-গাড়ীতে বেতার (২)

বেতার 'লাইট্-হাউস' ('লাইট হাউস' বা বাতিঘর যেমন আলোক রশ্মি দ্বারা সমুদ্রে জাহাজকে পথ-নির্দ্দেশ করে, এখন থেকে সেইরূপ আলোক-রশ্মির পরিবর্ত্তে বেতার বিদ্যুৎ-প্রবাহ দূর থেকে জাহাজকে সাহায্য ক'রবে।)
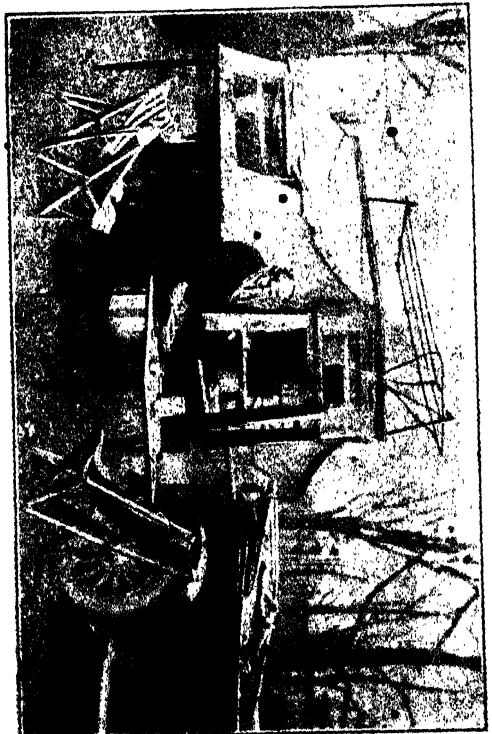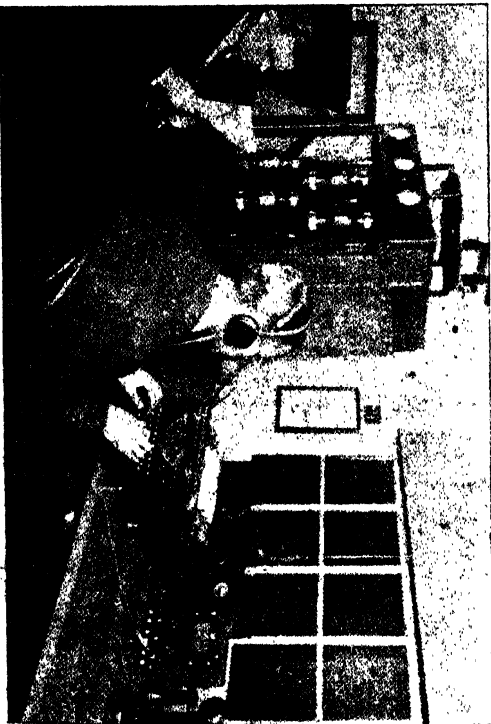
রিপোর্টার (সংবাদপত্রের রিপোর্টার বেতার আলাপে সংবাদ শুনে লিপিবদ্ধ করে নিচ্ছে।)

বেতার চিত্রকর (১) (ডাঃ আর্থার করন এমন একটী বেতার যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন যার সাহায্যে শুধু কথা নয়—মুহূর্ত্তের মধ্যে বহুদূরে একজনের চিত্রও পাঠানো যেতে পারে।)
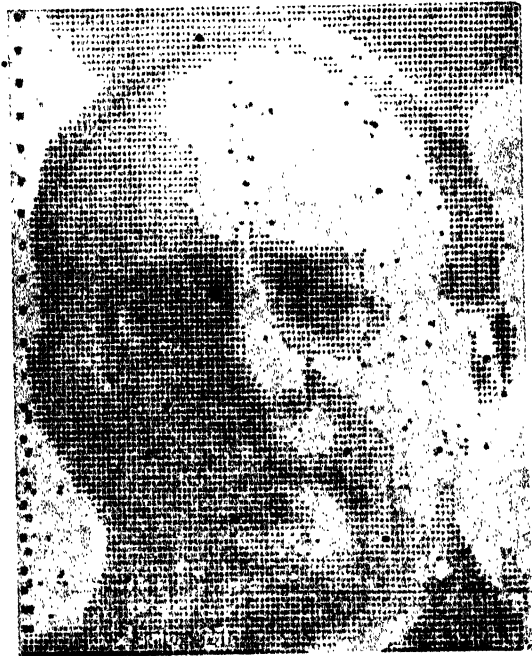
বেতার চিত্রকর (২)
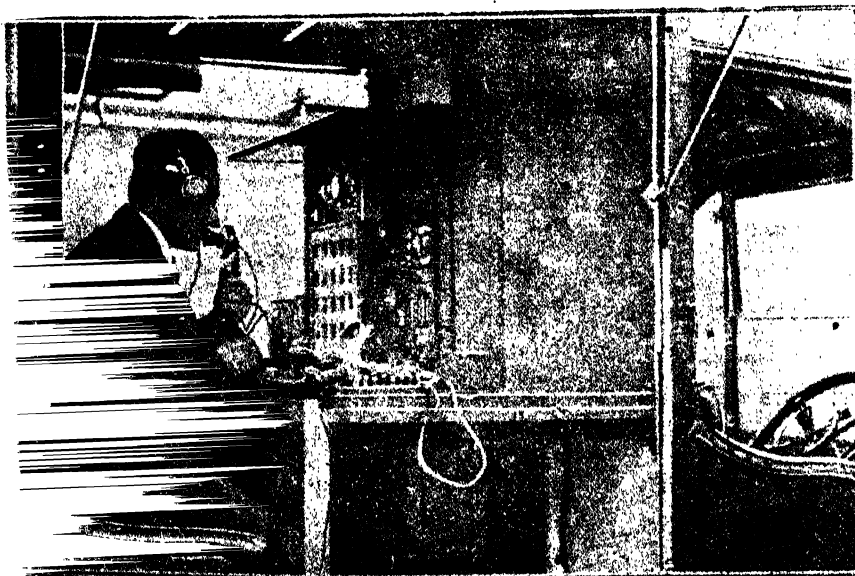
বিমান-যানে বেতার (আকাশের ওপর থেকে বিমান-যানে শত্রুর গতিবিধি নিরীক্ষণ করে বেতার আলাপে স্বপক্ষের শিবিরে সে সংবাদ পাঠানো হচ্ছে।)

ঘাঁটি (Radio Broad casting Station) হয়েছে! তারা ঘোড়-দৌড়, সবরকম খেলা, থিয়েটার, নাচ, গান বক্তৃতা থেকে আরম্ভ করে যুদ্ধ-বিগ্রহ, চুরি-ডাকাতি, খুন, দুর্ঘটনা, মৃত্যু প্রভৃতি জগতের চারিদিকের সমস্ত বিশেষ বিশেষ ঘটনা। ঘটবামাত্র বেতার-বার্ত্তা-যন্ত্রে সংবাদ পেয়ে চতুর্দ্দিকের
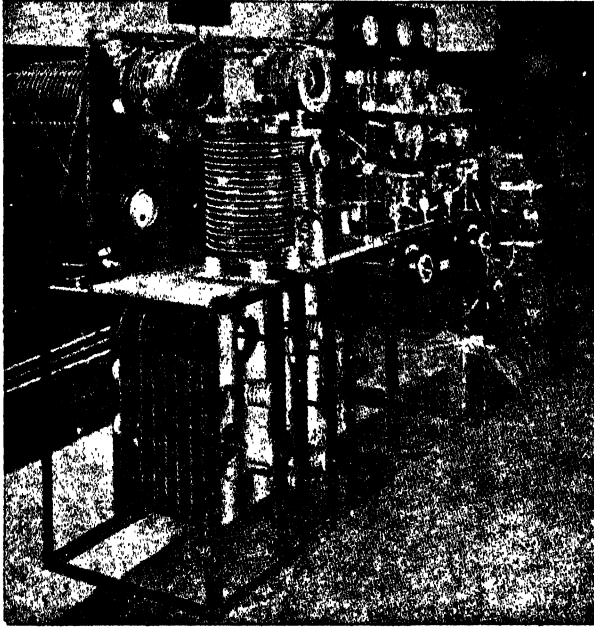
মার্কণীর সবচেয়ে বড় বেতার বার্ত্তা প্রচারের যন্ত্র

গৃহ-কর্ম্মে বেতার (ঘরের কাজ করতে করতে গৃহিণী বাইরের আমোদ টুকুও উপভোগ ক'রতে পারছেন।)

সংবাদপত্র আপিসে বেতার-আলাপে জানিয়ে দিচ্ছেন। বেতার-সংবাদ-প্রচার আপিসে বসে একজন লোক বেতার-আলাপ-যন্ত্রে ঘটনার বিবরণ বল্‌তে থাকেন বটে; কিন্তু সেই সংবাদ-প্রচার-কেন্দ্রের সঙ্গে যাদের যাদের যোগ আছে, তারা সকলেই একসঙ্গে সেই খবর শুনতে পায়। হয়ত বোষ্টনের কোনও বড় সভায় একজন প্রসিদ্ধ বক্তা বক্তৃতা দিচ্ছেন বা শীকাগোর রঙ্গমঞ্চে কোনও খ্যাতনামা গায়িকা সঙ্গীত করছেন, বেতার-আলাপের কল্যাণে নিউইয়র্কের অসংখ্য ধনকুবের আজ নিজের ঘরে বসে তা উপভোগ ক'রতে পার্‌বেন এমন সুবিধা হ'য়েছে।

প্রেতাত্মার বাণী

কেট্‌লীর আত্মকাহিনী

"হুদিনী" প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত যাদুকরেরা এই বেতার আলাপের সুযোগ নিয়ে তাঁদের দর্শকবৃন্দকে অনেক নূতন খেলা দেখিয়ে বিস্মিত ও চমৎকৃত করে দিচ্ছেন। ধাতু-নির্ম্মিত প্রাণহীন বুদ্ধমূর্ত্তি আজ দর্শকদের সঙ্গে জীবন্ত মানুষের মত কথা ব'ল্‌ছে, (চিত্র দেখুন) চায়ের কেট্‌লী

গোয়েন্দার কাণে (ইনি পুলিশের লোক,—একজন পলাতক আসামীর পেছু নিয়েছেন; সেই খবরটা থানায় পাঠাচ্ছেন।)
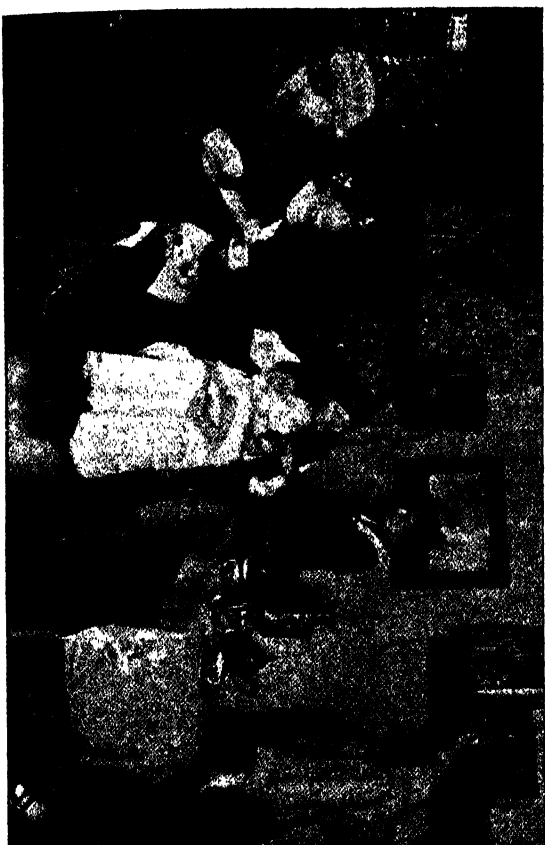
কলেজে বেতার (মফস্বলের যে সব ছেলের নিত্য কলেজে উপস্থিত হবার অসুবিধা আছে তাদের জন্য বেতার আলাপে কলেজের পড়া শেখাবার ব্যবস্থা হ'য়েছে।)

পকেট বেতার (এই ক্ষুদ্রতম বেতার যন্ত্রটি ফ্র্যাঙ্ক্ কোপমান তৈরি করেছেন। এটা পকেটে ফেলে নিয়ে যাওয়া যায়— অথচ এই যন্ত্রের সাহায্যে পঁচিশ মাইল তফাতের লোকের সঙ্গেও আলাপ করা যায়।)

শিশু মহলে (ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েরা বেতার আলাপ-যন্ত্রের সাহায্যে গল্প শুনছে।)

হাসপাতালে (রোগীরা হাসপাতালে থেকেও বেতার-আলাপের সাহায্যে রঙ্গমঞ্চের গীত-বাদ্য শুনচে।)
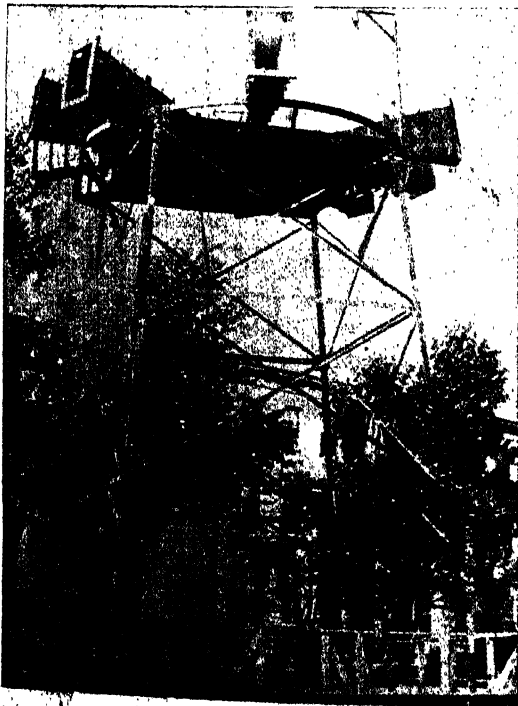
বৃক্তেরী (এই যন্ত্রের সাহায্যে আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের একটা ,বক্তৃতা এক ক্রোশের মধ্যে যত লোক ছিল, সকলে শুনতে পেয়েছিল।)
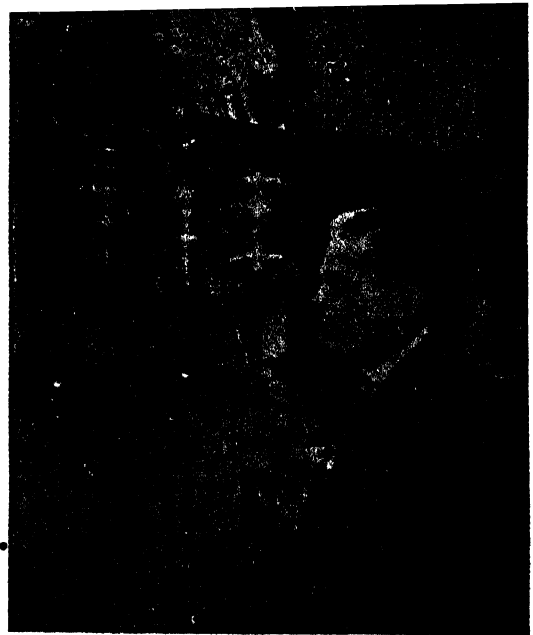
বেতার মাঝা

(ইনি বেতার কার্য্যালয়ে ব'সেই কেবলমাত্র বেতার শক্তি প্রবাহের জোরে সমুদ্রে জাহাজ পরিচালনা ক'রছেন।)
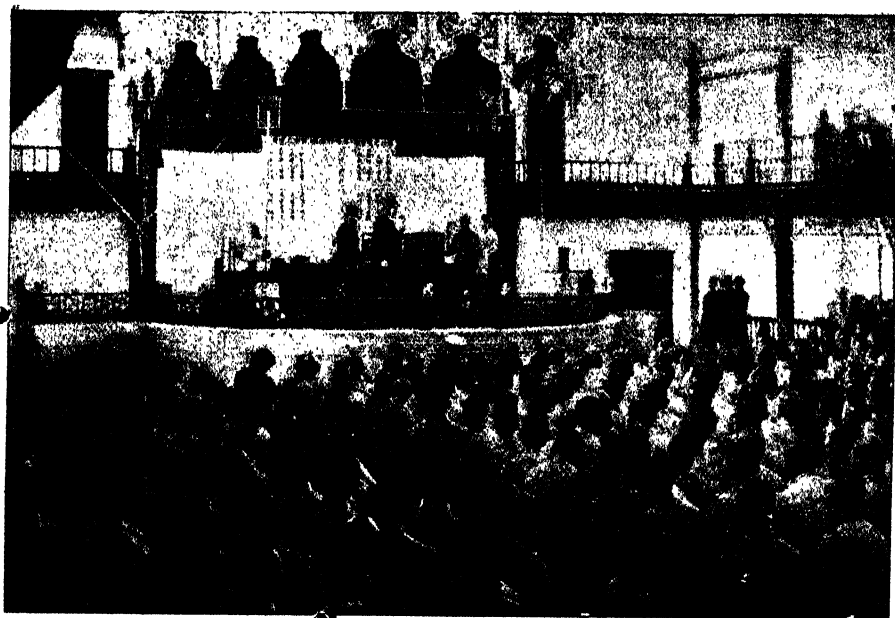
বেতার-আলাপে বক্তৃতা (প্রায় দেড় হাজার ছাত্র একত্র বসে আজ বহু ক্রোশ দূরে থেকে বেতার-আলাপে একটি বক্তৃতা শুনছে)

বাক্সবন্দী বেতার

যেখানেই যান না কেন, এই বেতার বাক্স সঙ্গে থাকলে সদাসর্ব্বদা সহরের সব খবর শুনতে পাবেন।

রেলে বেতার (চলন্ত ট্রেনে ব'সে দূরে ছেড়ে আসা স্বজনের সঙ্গে বেতারে আলাপ ।)
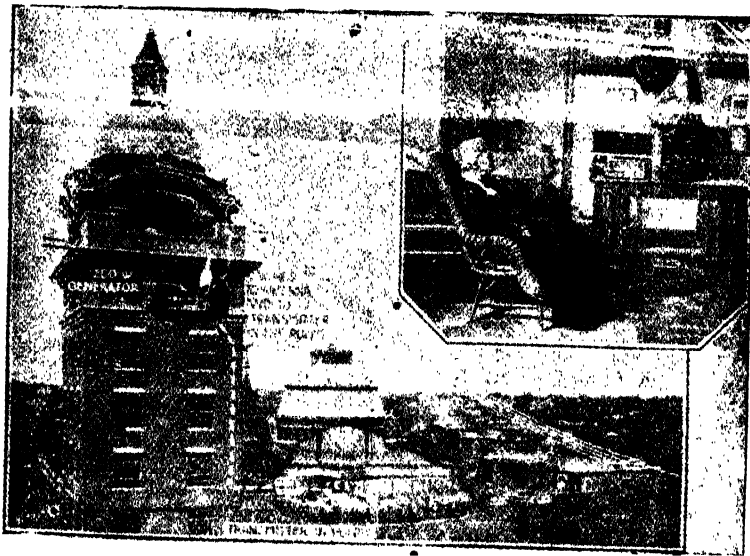
বেতার আলাপ-কেন্দ্র

(য়ুরোপের বড়-বড় সহরে আজকাল এক-একটা বেতার আলাপ-কেন্দ্র স্থাপিত হচ্ছে। এখান থেকে গীত, বাদ্য, বক্তৃতা, গল্প, কবিতা, ানা বিচিত্র সংবাদ প্রতিদিন চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। প্রত্যেক বেতার-বার্ত্তা-প্রচার কেন্দ্রের এক একটা সীমা নির্দ্দেশ করা ই পাঁচশ' মাইল, হাজার মাইল বা দশ হাজার মাইল ;—যে কেন্দ্রের যতদূর পর্য্যন্ত প্রচার করবার শক্তি আছে সেই দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত কানও লোক বেতার আলাপ-যন্ত্রের সাহায্যে এখান থেকে প্রেরিত গীত, বাদ্য, বক্তৃতা বা সংবাদ অনায়াসে শ্রবণ ক'রতে পারে।)

জেলে বেতার (কারাগারে দিনের কাজের শেষে সন্ধ্যাবেলায় বন্দীদের আমোদ প্রমোদের জন্য বেতার-আলাপে গীতবাদ্য শোনাবার ব্যবস্থা হ'য়েছে।)

পুলিশ অনুচরের সঙ্গী (পুলিশ অনুচর পথে যেতে-যেতেও থানার সমস্ত খবর পাঠাচ্ছে।)

ইস্কুলের ছেলেরা (ছাত্রের দল বেতার আলাপ যন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হ'চ্ছে।)
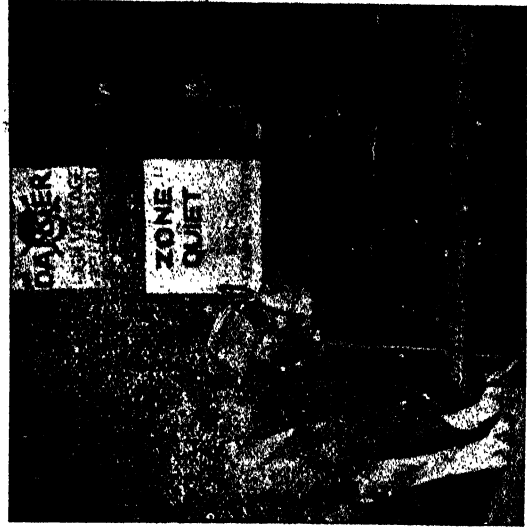
বেতার আলাপের কুকুর

অন্ধের কাছে (বেতার আলাপ আজ অন্ধেরও আনন্দ বর্দ্ধন ক'র্‌ছে।)

থানায় বেতার

পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেতার যন্ত্রী

(থিওডোর ম্যাক্‌এল্‌রয় বেতার বার্ত্তা ও বেতার আলাপ যন্ত্র ব্যবহারে এমন অভ্যস্ত যে তিনি এই বিদ্যায় নিপুণতার জন্য নিখিল জগতের প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার স্বরূপ একটী রৌপ্য নির্ম্মিত 'সম্পূট' (Cup) উপহার পেয়েছেন।)

সবাক্ বুদ্ধমূর্ত্তি

লণ্ডনের সব চেয়ে বড় বেতারবার্ত্তা প্রচার ও বেতার আলাপের যন্ত্র

মোটর গাড়ীতে বেতার (২)

(মোটর-গাড়ীতে যেতে বা সহরের বাইরে কোথাও তাঁবু গেড়ে ব'সলেও বেতার আলাপে সহরের সঙ্গে যোগ রাখা)
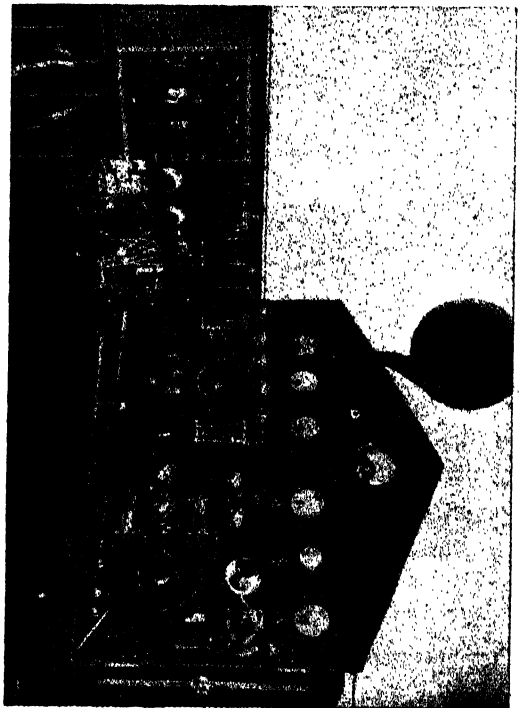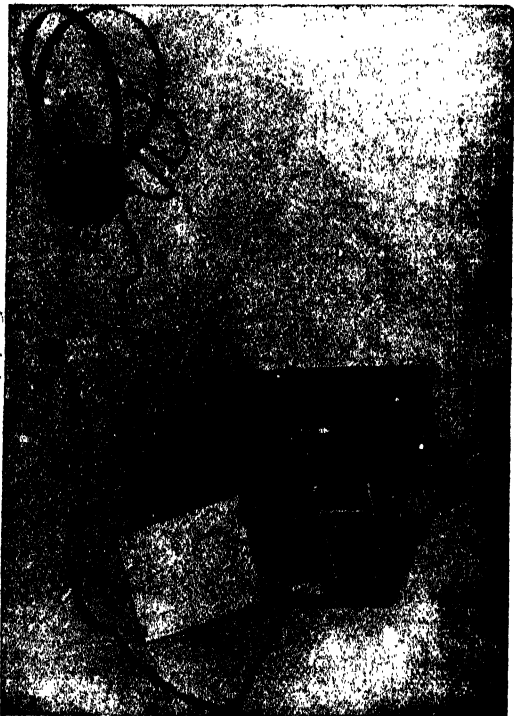
'ভ্যাক্‌টুফোন্‌'

আজ হঠাৎ সজীব হ'য়ে উঠে সকলকে তার মনের কথা খুলে ব'লছে, (চিত্র দেখুন) অশরীরী আত্মা আজ সবার অগোচরে থেকেও সকলকে প্রেতলোকের সংবাদ এনে দিচ্ছে। যাদুকরেরা বেতার আলাপের সাহায্যে এই সব অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়ে মফঃস্বলের দর্শকদের কাছে আজ প্রচুর বাহবা নিচ্ছেন।

বেতার আলাপে শব্দের ধ্বনিকে বহুগুণ বাড়ানো যায় বলে বধির লোক এর সাহায্যে অনায়াসেই শুনতে পায়। তাদের সদাসর্ব্বদা ব্যবহারের জন্য একটা বিশেষ
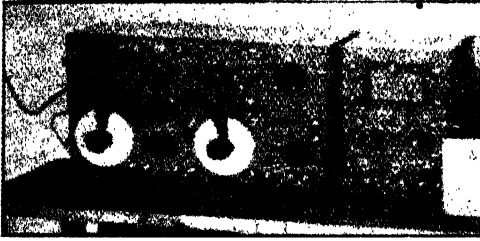
বেতার আলাপের লিপিযন্ত্র (এই যন্ত্রের সাহায্যে বেতার আলাপ আপন শক্তি-বেগেই লিপিবদ্ধ হ'য়ে যায়, কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা রাখে না।)

চিকিৎসায় বেতার।

(দুর্ব্বল রোগীর হৃদ্‌যন্ত্রের শব্দ এতই ক্ষীণ যে চিকিৎসক শুনতে না পেয়ে শেষে বেতার আলাপের সাহায্য নিয়েছেন। 'বেতার আলাপ যন্ত্রের গুণে সেই ধ্বনি উচ্চতর হয়ে তাঁর কানে আসছে।)

রেডিয়ো সংবাদদাতা।

(ইনি সংবাদ প্রচার কেন্দ্রে বসে মধ্যরাত্রে আটলাণ্টার অগ্নিকাণ্ডের ব্যাপার জানালা থেকে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করে প্রধান প্রধান সংবাদপত্র আপীসে 'বেতার আলাপ' সংযোগে জানিয়েছিলেন।)
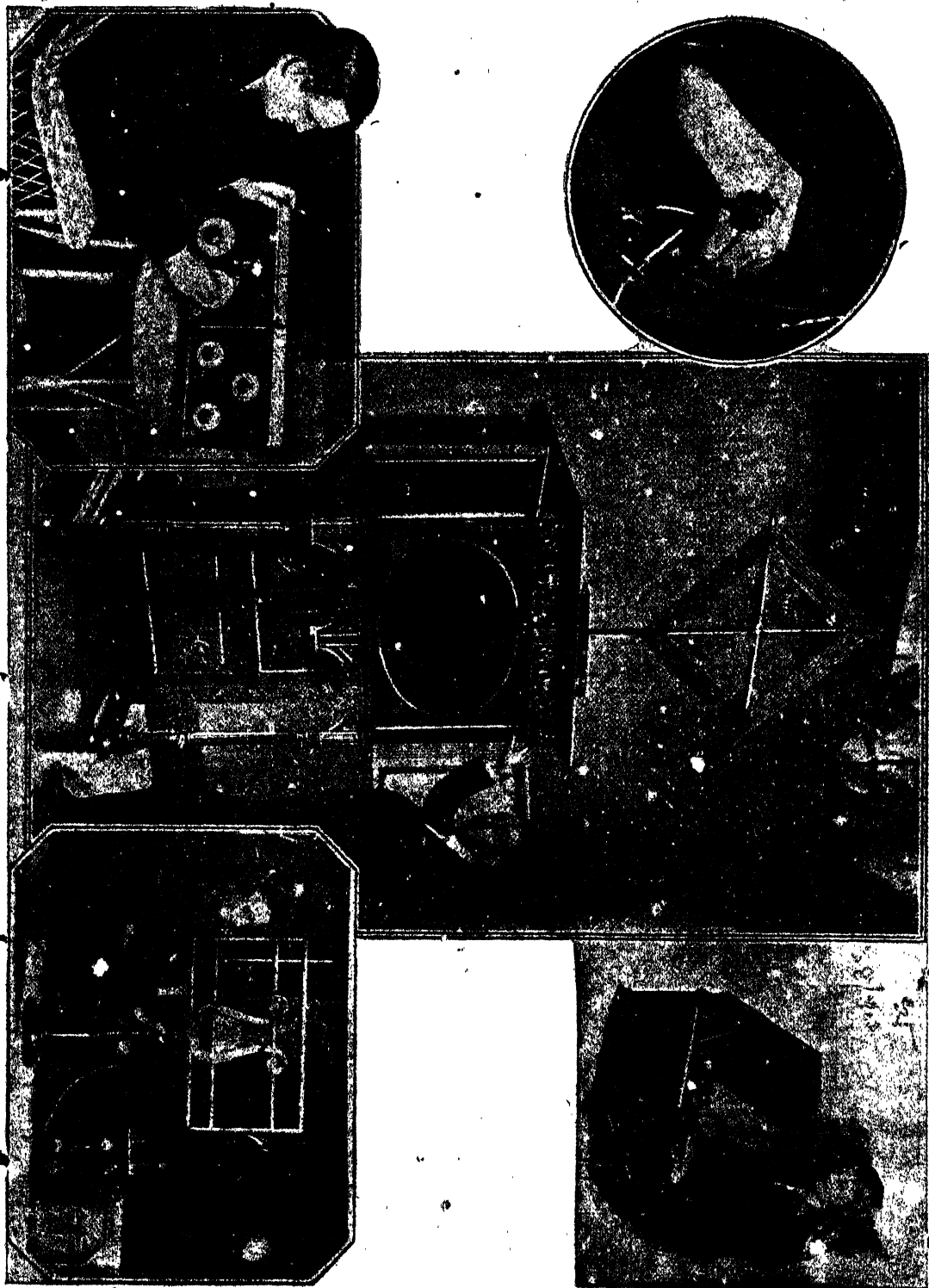
বেতারের ছদ্মবেশ :—আংটিতে বেতার। খেল্‌নার বাক্সে বেতার। চায়ের তেপায়ায় বেতার। পোষাকের আলমারীতে বেতার। বাদ্যযন্ত্রে বেতার।

প্রকারের বেতার-আলাপযন্ত্র উদ্ভাবিত হ'য়েছে ; তার নাম 'ভ্যাক্টুফোন্'।

বেতার শক্তি-প্রবাহের সাহায্যে দূর থেকে মানুষ যে কত অসাধ্য সাধন ক'রতে পারে, তার আর ইয়ত্তা নেই। বড় বড় রণপোত পরিচালনা থেকে আরম্ভ ক'রে ক্ষুদ্র লিপিযন্ত্রের (Type writer) চাবিগুলো পর্য্যন্ত শত শত মাইল দূরে বসেও সে অনায়াসে ইচ্ছামত ব্যবহার ক'রতে পারে। এ ব্যাপারটা শুধু হ'তে পারে নয়, কার্য্য-ক্ষেত্রে অনেকটা সম্ভব হয়েছে। উড়ো জাহাজের ওপোর থেকে বেতার বার্ত্তা যে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রবাহ নিয়ে নীচেয় ছুটে আসে, তার গতি-বেগ আজ লিপিযন্ত্রের চাবি টিপে বক্তব্য সংবাদ-টুকু কাগজে লিপিবদ্ধ ক'রে দিয়ে যাচ্ছে, এমন কি প্রয়োজন মত ব্যক্তি-বিশেষের অবিকল প্রতিকৃতিও এঁকে দিয়ে যাচ্ছে। পলাতক আসামীর সন্ধানে পুলিশকে সে আজ এই জন্যে সবচেয়ে বেশী সাহায্য ক'রতে পারছে।

বেতার আলাপের সেতার

সঙ্গিনীর অভাবে যে সব গৃহিণীর গৃহ কারাগার হ'য়ে উঠেছে এবং সংসারের কাজ আর ছেলেপিলের দেখাশুনো ক'রতে হয় ব'লে যাঁরা কোথাও একদণ্ডের জন্য বেরুতে পারেন না, ঘরের মধ্যেই বন্দিনী হয়ে থাক্‌তে হয়, 'বেতার আলাপ' আজ তাঁদের নিঃসঙ্গ জীবন মধুময় করে তুলেছে।

আটলাণ্টার অগ্নিকাণ্ড
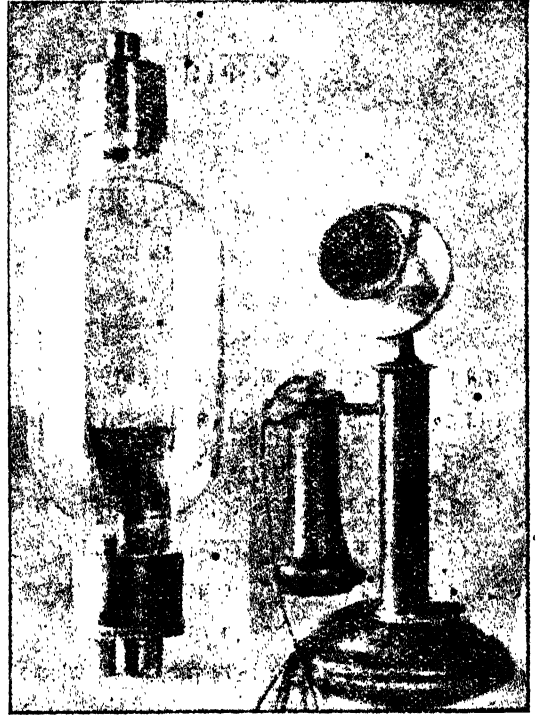
অন্ধ, রুগ্ন অথবা অশক্ত ও স্থবির, যারা তাদের শোচনীয় অবস্থার জন্যে সদাসর্ব্বদাই গৃহ-কোণে আবদ্ধ হ'য়ে থাক্‌তে বাধ্য হয়, বেতার-আলাপ আজ তাদেরও বিষণ্ণ চিত্তকে উৎফুল্ল করবার জন্য প্রতিদিন দিগ্বিদিক থেকে তাদের আনন্দ সরবরাহ ক'র্‌ছে।

নৌবিহারে বা বন-ভোজনে সহরের বাইরে গেলেও সহরের সব খবর সেখানে পৌঁছে দেয় ঐ 'বেতার-আলাপ', যদি কেউ তাকে সঙ্গের সাথী ক'রে নে যায়।

এই বহুগুণসম্পন্ন বেতার শক্তি-প্রবাহ আজ মানুষের জীবনকে সব দিক দিয়ে সম্পূর্ণ সফল করে তোলবার যে সুযোগ ও সন্ধান এনে দিয়েছে, চীন জাপান থেকে আরম্ভ ক'রে য়ুরোপ ও আমেরিকার সকল লোকই আজ সেই সুযোগ ও সন্ধান তাদের কাজে লাগিয়ে ধন্য হ'য়ে যাচ্ছে ; কেবল ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী সেইদিকে দীন-নেত্রে চেয়ে আপন অক্ষমতার জন্য দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌ছে।

অস্কার ওয়াইল্‌ড্‌ বিরচিত সালমে

(একাঙ্কের বিয়োগ-নাটিকা)

(মূল ফরাসী হইতে বঙ্গানুবাদ)

শ্রীসুরেন্দ্র কুমার

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

সালমে। চাঁদ দেখে কত আনন্দ হয়! ছোট টাকাটির মত। রূপর ছোট একটি ফুলের মত। ও শীতল আর পবিত্র। আমি নিশ্চয় জানি যে ও কুমারী, কুমারীর সৌন্দর্য্যই ওর আছে। ও কথনও আপনাকে অপবিত্র করেনি। অপর দেববালাদের মত ও কথনও পুরুষকে আত্মদান করে নি।

ইওকানানের স্বর। প্রভু এসেচেন। মানবপুত্র এসেচেন। অর্দ্ধঘোটকরূপী দৈত্যগণ নদীতে লুকিয়েচে। জলরাক্ষসীরা নদী ছেড়ে বনের পাতার নিচেয় শুয়ে আছে।

সালমে। ও কে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল?

দ্বিতীয় সৈনিক। উনি সেই সিদ্ধ পুরুষ, রাজকুমারি!

সালমে। ওঃ, সেই সিদ্ধপুরুষ, যাঁকে টেট্রার্ক ভয় করেন?

দ্বিতীয় সৈনিক। সে বিষয় আমরা কিছু জানি না, রাজকুমারি! যিনি চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন তিনি সিদ্ধপুরুষ ইওকানান।

সীরীয় যুবক। রাজকুমারি! আদেশ করুন, আপনার তাঞ্জাম আন্‌তে বলি। আজ রাত্রি বাগানে বড় চমৎকার।

সালমে। উনিই ত আমার মায়ের বিষয়ে অনেক ভীষণ কথা বলে থাকেন, নয় কি?

দ্বিতীয় সৈনিক। উনি যা বলেন তা আমরা একেবারেই বুঝতে পারি না, রাজকুমারি!

সালমে। হাঁ উনি তাঁর বিষয়ে অনেক ভয়ানক কথা বলেন।

[একজন দাসের প্রবেশ।]

দাস। রাজকুমারি, টেট্রার্ক আপনাকে উৎসবে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ করচেন।

সালমে। আমি ফিরে যাব না।

সীরীয় যুবক। ক্ষমা করবেন রাজকুমারি, আপনি ফিরে না গেলে কোনও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

সালমে। ইনি কি বৃদ্ধ, এই সিদ্ধপুরুষ?

সীরীয় যুবক। রাজকুমারি, ফিরে যাওয়াই ভাল আজ্ঞা করুন, আমি আপনাকে সঙ্গে করে ভিতরে নিয়ে যাই

সালমে। এই সিদ্ধপুরুষ...ইনি কি বুড় মানুষ?

প্রথম সৈনিক। না রাজকুমারি, ইনি পূর্ণ যুবা।

দ্বিতীয় সৈনিক। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চয় করে কিছু বল্‌তে পার না। এমন অনেকে আছেন যাঁরা বলেন যে উনি এলিয়াস।

সালমে। এলিয়াস কে?

দ্বিতীয় সৈনিক। এই দেশের একজন অতি প্রাচীন সিদ্ধপুরুষ।

দাস। টেট্রার্ককে কি উত্তর দিতে রাজকুমারীর আজ্ঞা হয়?

ইউকানানের স্বর। হে পালেস্তিনভূমি, তোমার প্রহারকের দণ্ড ভেঙ্গে গেছে বলে আনন্দ কর না। কারণ সাপের বীজ থেকে রাজসাপ উৎপন্ন হবে, আর তা হতে যা জন্মাবে সে পাখীগুলোকে খেয়ে ফেলবে।

সালমে। কি অদ্ভুত স্বর! আমি ওঁর সঙ্গে কথা কইব।

প্রথম সৈনিক। বোধ হয় তা সম্ভব নয়, রাজকুমারি! টেট্রার্কের ইচ্ছা নয় যে কেউ ওঁর সঙ্গে কথা কন। তিনি এমন কি প্রধান যাজককেও ওঁর সঙ্গে কথা কইতে বারণ করে দিয়েচেন।

সালমে। আমি ওঁর সঙ্গে কথা কইতে ইচ্ছা করি।

প্রথম সৈনিক। তা সম্ভব নয়, রাজকুমারি!

সালমে। আমি ওঁর সঙ্গে কথা কইব-ই।

সীরীয় যুবক। ভোজে ফিরে গেলে ভাল হয় না?

সালমে। এই সিদ্ধপুরুষকে বাহিরে নিয়ে এস।

[দাসের প্রস্থান।]

প্রথম সৈনিক। আমাদের সাহস হয় না, রাজকুমারি!

সালমে। [জলাধারের নিকট আসিয়া এবং তাহার ভিতরে দেখিয়া] ঐ নিচেটা কি অন্ধকার! এইরকম একটা অন্ধকূপে আবদ্ধ থাকা বড় ভয়ানক। এটা কবরের মত।...[সৈন্যগণের প্রতি] তোমরা কি আমার কথা শুন্‌লে না? এই সিদ্ধপুরুষকে বাহিরে নিয়ে এস। তাঁকে আমি দেখ্‌তে ইচ্ছা করি।

দ্বিতীয় সৈনিক। রাজকুমারি, আপনার কাছে প্রার্থনা কর্‌চি যে আপনি এ রকম আজ্ঞা আমাদের কর্‌বেন না।

সালমে। আমার বিলম্ব করিয়ে দিচ্চ তোমরা।

প্রথম সৈনিক। রাজকুমারি, আপনি আমাদের জীবনের মালিক, কিন্তু আপনি আমাদেরর যে আজ্ঞা কর্‌চেন তা আমরা পালন করতে অক্ষম। আর বাস্তবিক এ রকম আজ্ঞা আপনার আমাদের প্রতি করা ঠিক হয় নি।

সালমে। [সীরীয় যুবকের প্রতি চাহিয়া] আঃ!

হেরদিআসের অনুচর। ওঃ! কি হতে চল্‌লো? নিশ্চয়ই একটা কিছু দুর্ঘটনা ঘটবে।

সালমে। [সীরীয় যুবকের নিকট গিয়া] তুমি এ কাজটা আমার জন্য কর্‌বে, কর্‌বে না কি, নারাবথ? তুমি এটি আমার জন্যে কর্‌বে। আমি সর্ব্বদাই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট, তুমি এটি আমার জন্য কর্‌বে। আমি এই অপূর্ব্ব সিদ্ধপুরুষটিকে কেবল একবার দেখ্‌ব। লোকে এঁর বিষয়ে এত কথা বলে! টেট্রার্ককে অনেকবার এঁর কথা বল্‌তে শুনেছি। বোধ হয় টেট্রার্ক এঁকে ভয় করেন। তুমিও কি এঁকে ভয় কর, নারবথ?

সীরীয় যুবক। আমি ওঁকে ভয় করি না, রাজকুমারি, আমি মানুষকে ভয় করি না। কিন্তু টেট্রার্ক যথাবিধি বারণ করে দিয়েচেন যে যেন কোনও লোক এই কূপের ঢাকাটা না খোলে।

সালমে। তুমি এটা আমার জন্য কর্‌বে, নারাবথ! আর কাল যখন আমি তাঞ্জামে করে দেববিক্রেতাদের দ্বারের নিচে দিয়ে যাব, আমি তোমার জন্য একটি ছোট ফুল, একটি ছোট হরিদ্বর্ণের ফুল ফেলে দেব।

সীরীয় যুবক। আমি তা পার্‌ব না, রাজকুমারি, আমি তা পার্‌ব না।

সালমে। [স্মিত মুখে] তুমি এটি আমার জন্য কর্‌বে, নারাবথ! তুমি জান যে তুমি এটুকু আমার জন্য কর্‌বে। আর কাল যখন আমি দেবক্রেতাদের সেতুর উপর দিয়ে যাব, আমি আমার সচ্ছাংশুক অবগুণ্ঠনের ভিতর থেকে তোমার পানে চাইব, তোমার পানে চাইব, নারাবথ, হয়ত তোমার পানে চেয়ে মুচ্‌কে হাস্‌ব। আমার পানে চেয়ে দেখ, নারাবথ, আমার পানে চেয়ে দেখ। আঃ! তুমি জান যে আমি যা তোমাকে কর্‌তে বল্‌ব, তা তুমি কর্‌বে। তুমি তা বেশ জান।...আমি জানি যে তুমি এটুকু আমার জন্য কর্‌বে।

সীরীয় যুবক। [তৃতীয় সৈনিককে ইঙ্গিত করিয়া] এই সিদ্ধপুরুষকে বাইরে আস্‌তে দাও।...রাজকুমারী সালমে তাঁকে দেখ্‌তে ইচ্ছা করেন।

সালমে। আঃ!

হেরদিআসের অনুচর। ওঃ! চাঁদটাকে কি রকম অদ্ভুত দেখাচ্চে! তোমার মনে হবে যেন সে একটা মৃতা রমণীর হাত; যেন সে রমণী মৃতচ্ছদ দিয়ে আপনাকে ঢাক্‌বার চেষ্টা কর্‌চে।

সীরীয় যুবক। বড় অদ্ভুত রকমেরই দেখাচ্চে বটে। যেন একটি ছোট রাজকুমারী, যেন তার চোখদুটি চন্দ্রকান্তের —স্বচ্ছাংশুকের মত মেঘের আড়াল থেকে ক্ষুদ্র একটি রাজবালার ন্যায় সে হাস্‌চে। [সিদ্ধপুরুষ জলাধার হইতে বাহিরে আসিলেন। সালমে তাঁহার দিকে চাহিয়া ধীরে পশ্চাদ্‌গামিনী হইলেন।]

ইওকানান। সে কোথায় যার পাপের পাত্র এখন পূর্ণ হয়েচে? সে কোথায় যে রূপলী আংরাখা পরে একদিন জন-সমাজের সাম্‌নে মর্‌বে? তাকে বাইরে আস্‌তে বল, যেন সে তাঁর স্বর শুন্‌তে পায়, যিনি এতদিন মরুভূমিতে ও রাজার প্রাসাদে চীৎকার করেচেন।

সালমে। কার কথা বল্‌চেন উনি?

সীরীয় যুবক। তা আপনি কখনই বুঝ্‌তে পারবেন না, রাজকুমারি!

ইওকানান। সে রমণী কোথায়, যে মানুষের ছবি দেওয়ালে আঁকা দেখে, কাল্‌ডীয়দের রঙ্গীন প্রতিমূর্ত্তি

দেখে চোখের নেশায় বিভোর হয়ে কাল্‌ডীয়ায় দূত পাঠিয়েছিল।

সালমে। আমার—মায়ের কথাই উনি বল্‌চেন।

সীরীয় যুবক। না, রাজকুমারি, তা নয়।

সালমে। হাঁ, আমার মায়ের কথাই উনি বল্‌চেন।

ইওকানান। সে নারী কোথায় যে চিকন কোমরবাঁধ আঁটা, রঙ্গীন্ শিরপেঁচ পরা আসীরীয় সেনানায়কদেরকে আত্মদান করেছিল? কোথায় সে নারী যে মিশরের নীলাভ লোহিত সুক্ষ্মবসনধারী যুবকদের নিকট আপনাকে উৎসর্গ করেছিল। তাদের হাতে ছিল সোনার ঢাল, মাথায় ছিল রূপার শিরস্ত্রান্, আর তাদের দেহ সুবিপুল। তাকে তার পাপের শয্যা থেকে, তার অগম্য-গমনের শয্যা থেকে উঠে আস্‌তে বল, যেন সে তাঁর উপদেশ শুন্‌তে পায়, যিনি ভগবানের নিকট যাবার পথ প্রস্তুত করেচেন;—যেন সে তার পাপের জন্য অনুতাপ কর্‌তে পারে। কিন্তু সে কখনও অনুতাপ কর্‌বে না, সে তার পাপে লিপ্ত থাক্‌বে। তাকে তাঁর কাছে আস্‌তে বল, কারণ ঈশ্বরের পাখা তাঁর হাতে আছে।

সালমে। কিন্তু ভয়ঙ্কর দেখ্‌বে ওঁকে,—বড় ভীষণ!

সীরীয় যুবক। আপনি এখানে থাক্‌বেন না, রাজকুমারি, আমি আপনাকে মিনতি কর্‌চি।

সালমে। ওঁর চোখই সবচেয়ে ভয়ানক। যেন টায়ারের চিত্রিত কাপড়ে জ্বলন্ত মশাল দিয়ে পুড়িয়ে দুটো কাল কাল ছেঁদা করে দিয়েচে। যেন দুটো কৃষ্ণবর্ণ গুহা—অজগরের বাসস্থান—অজগর নিবেসিত মিশরের কৃষ্ণবর্ণ গুহার মত। খেয়ালী চাঁদের দ্বারা বিক্ষুব্ধ কাল হ্রদের ন্যায়... উনি কি আবার কথা কইবেন? কি মনে হয় তোমার?

সীরীয় যুবক। আপনি এখানে থাক্‌বেন না, রাজকুমারি! আমি আপনাকে অনুনয় কর্‌চি—আর এখানে থাক্‌বেন না আপনি।

সালমে। কি শীর্ণ উনি! যেন হস্তীদন্তনির্ম্মিত একটি কৃশ প্রতিমূর্ত্তি। একটি রূপার দেবমূর্ত্তির মত। আমি নিশ্চয় জানি যে উনি চন্দ্রমারই ন্যায় পবিত্র। উনি জ্যোৎস্নার একটি রেখার মত। একটি রূপার দণ্ডের মত। ওঁর দেহ নিশ্চয় হাতীর দাঁতেরই মত শীতল হবে। আমি ওঁকে আর একটু কাছে গিয়ে দেখি।

সীরীয় যুবক। না, না, রাজকুমারি!

সালমে। আমি নিশ্চয়ই ওঁকে আরও কাছে গিয়ে দেখ্‌ব।

সীরীয় যুবক। রাজকুমারি! রাজকুমারি!

ইওকানান। কে এই নারী যে আমার পানে চেয়ে আছে? আমি চাই না যে ও আমার পানে চেয়ে থাকে। ও কেন ওর সুবর্ণরঞ্জিত চোখের পাতার নিচে থেকে ওর সোনালি চোখ দিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে? ও কে আমি তা জানি না। ও কে আমি তা জান্‌তে চাই না। ওকে চলে যেতে বল। আমি ওর সঙ্গে কথা কইতে ইচ্ছা করি না।

সালমে। আমি সালমে, হেরদিআসের কন্যা, ইহুদার রাজকুমারী।

ইওকানান। দূর হও! বাবীলনের কন্যা! প্রভুর অনুগৃহীতের কাছে এস না। তোমার মা পৃথিবীকে অনাচারের মদ্যে পূর্ণ করেচে! তার পাপের কথা ঈশ্বরের কাণে পঁহুছেচে।

সালমে। আবার কথা কও, ইওকানান! তোমার স্বর আমার কাছে মদিরার মত।

সীরীয় যুবক। রাজকুমারি! রাজকুমারি! রাজকুমারি!

সালমে। আবার কথা কও! আবার কথা কও, ইওকানান! বল আমাকে কি কর্‌তে হবে।

ইওকানান। সদমের কন্যা, আমার কাছে এস না! অবগুণ্ঠনে তোমার মুখ আবৃত কর, মাথায় ভস্ম মাখ, আর মরুদেশে গিয়ে মানবপুত্রের অনুসন্ধান কর।

সালমে। কে সেই মানবপুত্র, ইওকানান? সে কি তোমারই মত সুন্দর?

ইওকানান। আমার সম্মুখ থেকে দূর হও! আমি প্রাসাদে মৃত্যুর দূতের পাখার পট্ পট্ শব্দ শুন্‌তে পাচ্চি।

সীরীয় যুবক। রাজকুমারি, আমি আপনাকে অনুনয় কর্‌চি, আপনি ভিতরে যান।

ইওকানান। হে মহান্ ঈশ্বরের দূত, তুমি তরবারি হাতে এখানে কি কর্‌চ? এই পাপের প্রাসাদে তুমি কার অনুসন্ধানে ফির্‌চ? যে রূপলী আংরাখা পরে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হবে, তার দিন এখনও আসে নি।

সালমে। ইওকানান!

ইওকানান। কে কথা কইচে?

সালমে। ইওকানান, আমি তোমার দেহের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়েচি। তোমার দেহ চিরাকর্ষিত শস্যক্ষেত্রের লিলির মত শ্বেতবর্ণ। তোমার দেহ পর্ব্বত শিখরের তুষারের মত, যে তুষার শিখরদেশ থেকে উপত্যকায় নেমে আসে। আরবের রাণীর বাগানের গোলাপ তোমার দেহের ন্যায় শ্বেতবর্ণ নয়। আরবের রাণীর গন্ধদ্রব্যের সুবাসিত বাগানের গোলাপও এমন নয়। বৃক্ষপত্রের উপর অর্পিত উষার পা-দুখানিও এমন নয়। সাগরের বুকের উপর চাঁদ যখন শুয়ে থাকে, তখন তার বুকের রংও এত বিমল শুভ্র হয় না...জগতে তোমার দেহের মত এত অমল গৌর আর কিছুই নাই। আমি তোমার দেহ স্পর্শ করি।

ইওকানান। দূর হও, বাবীলনের কন্যা! নারী হতেই জগতে অমঙ্গল এসেচে। আমার সঙ্গে কথা কয়ো না! আমি তোমার কথা শুন্‌ব না। আমি কেবল পরমেশ্বরের স্বর শুনি।

সালমে। তোমার দেহ বড় বিশ্রী। যেন কুষ্ঠরোগীর দেহ; যেন বালিচূণের প্রলেপযুক্ত দেওয়ালের উপর দিয়ে বিষধর সাপ চলে গিয়েচে। যেন বালিচূণের প্রলেপযুক্ত দেওয়ালে বিছা বাসা করেচে। ঘৃণ্য পদার্থসমূহে পূর্ণ বিগতবর্ণ শ্বেতায়মান্ সমাধিস্তূপ। বড় ভয়ানক তোমার দেহ, বড় ভয়ানক! তোমার চুলগুলি দেখে আমি ভুলেচি, ইওকানান। তোমার চুলগুলি আঙ্গুরের স্তবকের মত, এদমিৎদের দেশের এদমের দ্রাক্ষালতায় দোদুল্যমান কৃষ্ণবর্ণ দ্রাক্ষাগুচ্ছের মত। তোমার চুলগুলি লেবাননের সেদার বৃক্ষসমূহের মত, লেবাননের বিপুলকায় সেদার বৃক্ষসকলের মত, তারা সিংহ ও দস্যুগণকে ছায়া দান করে, দিনের বেলায় এরা এই সকল গাছতলাতেই লুকিয়ে থাকে। দীর্ঘ মসীমলিন রজনী, যখন চাঁদ তার মুখ লুকিয়ে থাকে, আর তারাগুলো সভয়ে আকাশের গায়ে বিলীন হয়ে যায়—সে নিশিথের অন্ধকারও এত কাল নয়। বনের নীরবতাও এত কাল নয়। জগতে তোমার চুলের মত কাল আর কিছুই নাই...তোমার চুলগুলি স্পর্শ করে দেখি।

ইওকানান। দূর হও, সদমের কন্যা! আমাকে স্পর্শ কর না! পরমেশ্বরের মন্দিরকে অপবিত্র কর না!

সালমে। তোমার চুলগুলো ভয়ানক।—ধূলো-কাদা মাখা।—যেন তোমার মাথায় কে কাঁটার মুকুট পরিয়ে দিয়েচে। যেন কতকগুলো কাল কাল সাপ তোমার ঘাড়ের চারিদিকে জড়িয়ে রয়েচে। এ চুলগুলো তোমার আমি ভালবাসি না।...তোমার মুখটির প্রতিই আমার লালসা, ইওকানান। তোমার মুখটি হাতীর দাঁতের বুরুজের উপর একটি লাল পটির মত। কে যেন একটি দাড়িমকে হাতীর দাঁতের ছুরি দিয়ে কেটেচে। টায়ারের বাগানে যে দাড়িম ফুলগুলি ফোটে, তারা গোলাপের চেয়েও লাল, কিন্তু তারা তোমার মুখটির মত লাল নয়। লোহিত তূর্য্যধ্বনি যা রাজাদের আগমন সূচনা করে, আর শত্রুদের প্রাণে ভয়ের সঞ্চার করে—তাও এত লাল নয়। মন্থনিষ্পেষণীতে যারা মদ মাড়ায়, তাদের পায়ের চেয়েও তোমার মুখ লাল। যে সকল কপোতিকা মন্দিরে বাসা করে, আর যাজকেরা যাদের খাবার দেয়, তাদের পায়ের চেয়েও তোমার মুখটি লাল। বনে সিংহ বধ করে যে সুবর্ণ ব্যাঘ্র দেখে এসেচে, তার পায়ের চেয়েও তোমার মুখটি লাল। প্রদোষে সাগর হতে মৎস্যজীবীগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত সেই প্রবাল খণ্ডের মত মুখটি তোমার, যে প্রবালখণ্ড তারা রাজাদের জন্য রেখে দেয়।...এ সেই সিঁদুরের মত, যে সিঁদুর মোআবের খনি থেকে মোআববাসীগণ উদ্ধার করে, আর যা রাজারা তাদের কাছ থেকে নেয়। এ পারস্য দেশের রাজার প্রবালখচিত সিন্দূররঞ্জিত ধনুকের মত। তোমার মুখের মত লাল জগতে আর কিছুই নাই।...আমি তোমারি মুখটি চুম্বন করি।

ইওকানান। কখনও না! বাবীলনের কন্যা! সদমের কন্যা! কখনও না!

সালমে। আমি তোমার মুখটি চুম্বন করবই, ইওকানান! আমি তোমার মুখচুম্বন করবই।

সীরীয় যুবক। রাজকুমারি, রাজকুমারি, আপনি মূর গুল্ম সুশোভিত উপবনের মত, আপনি কপোতিকাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কপোতিকা, আপনি এই লোকটার পানে চেয়ে দেখ্‌বেন না, ওর পানে আপনি চাইবেন না। এ রকম কথা ওকে বলবেন না। আমি তা সইতে পারব না... রাজকুমারি, রাজকুমারি, এ সব কথা বলবেন না।

সালমে। আমি তোমার মুখচুম্বন করবই, ইওকানান!

সীরীয় যুবক। আঃ! [আত্মহত্যা করিল এবং সালমে ও ইওকানানের মধ্যে পড়িয়া গেল।]

হেরদিআসের অনুচর। সীরীয় যুবক আত্মহত্যা করেচে। যুবা সেনানায়ক আত্মহত্যা করেচে। আমার বন্ধু আত্মহত্যা করেচে। আমি তাকে গন্ধদ্রব্যপূর্ণ একটি ছোট বাক্স আর রূপার কয়েকটি কর্ণবলয় উপহার দিয়েছিলাম। আর এখন সে আত্মহত্যা কর্‌ল। হায়! সে ত বলেছিল যে একটা দুর্ঘটনা ঘটবে। আমিও তাই বলেছিলাম, আর হলও তাই। আমি জান্‌তে পেরেছিলাম যে চাঁদটা কোনও মৃত বস্তুর অনুসন্ধানে ফির্‌ছিল, কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি যে ও তারই সন্ধান কর্‌ছিল। হায়! কেন আমি তাকে চাঁদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখিনি? যদি আমি কোনও একটা গিরিগুহায় তাকে লুকিয়ে রাখ্‌তাম, তা হলে চাঁদ আর তাকে দেখ্‌তে পেত না।

প্রথম সৈনিক। রাজকুমারি, যুবা সেনানায়ক এইমাত্র আত্মহত্যা কর্‌লেন।

সালমে। ইওকানান, তোমার মুখটি আমাকে চুম্বন কর্‌তে দাও!

ইওকানান। হেরদিআসের কন্যা, তুমি কি ভীতা নও? আমি কি তোমায় বলিনি, যে আমি প্রাসাদে মৃত্যুর দূতের পক্ষের আঘাত-শব্দ শুনেছি? আর এখনও কি তিনি আসেন নি, সেই মৃত্যুর দূত?

সালমে। তোমার মুখটি আমাকে চুম্বন কর্‌তে দাও!

ইওকানান। পাপের কন্যা! কেবল একজন তোমাকে ত্রাণ কর্‌তে পারেন; তাঁরই কথা আমি তোমাকে বলেছিলাম। যাও, তাঁর সন্ধানে! তিনি এখন গালিলী সমুদ্রবক্ষে নৌকায় শিষ্যদের উপদেশ দিচ্চেন। সেই সমুদ্রের তীরে জানু পেতে বস, আর তাঁর নাম ধরে তাঁকে ডাক! তিনি তোমার কাছে এলে (আর যে তাঁকে ডাকে তাঁরই কাছে তিনি আসেন), তাঁর পায়ে মাথা নুইয়ে, তোমার অগণিত পাপানুষ্ঠানের জন্য তাঁর কাছে ক্ষমা চেও।

সালমে। আমাকে তোমার মুখটি চুম্বন কর্‌তে দাও।

ইওকানান। তুমি অভিশপ্তা হও! অগম্যগমনকারিণীর কন্যা, তুমি অভিশপ্তা হও!

সালমে। আমি তোমার মুখচুম্বন কর্‌ব, ইওকানান।

ইওকানান। আমি তোমাকে দেখ্‌তে চাই না! আমি তোমার মুখ দেখব না। তুমি অভিশপ্তা, সালমে, তুমি অভিশপ্তা!

[জলাধারের মধ্যে নামিয়া গেলেন।]

সালমে। আমি তোমার মুখচুম্বন কর্‌ব, ইওকানান, আমি তোমার মুখচুম্বন কর্‌ব। [ক্রমশঃ]

নরকার্ণবে

কবিশেখর শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ

চৌদিকে নরক হেরি হে বিশ্ব-জননি!
নাচিছে পিশাচ-প্রেত করি' কোলাহল;
কর্ম্ম-বৃক্ষ-ফল ঘোর বিষাক্ত এমনি,
তীব্র অশান্তির জ্বালা জ্বলিছে কেবল।
মনুষ্যত্ব-লেশ-হীন যত জীবচয়,
যাপিছে উদ্‌ভ্রান্ত, হেয়, পঙ্কিল জীবন;
সতত কৃতঘ্ন ক্রূর নির্ম্মম নির্দ্দয়,
নিরন্তর পরস্পরে করে নির্য্যাতন।
আত্ম-সুখান্বেষী দেখি যত নরনারী,
ঘৃণ্য স্বার্থ বিনা তারা কিছু নাহি জানে;
ধর্ম্ম-অনুরাগ-শূন্য সবে ব্যভিচারী,
ন্যায়ের মুরতি চির সমাধি শ্মশানে।
এ ঘোর নরক হ'তে উদ্ধারি' আমায়,
লহ গো আমারে দেবি, স্বর্গের ছায়ায়।

আব্‌হাওয়া

ছাত্রগণের নিকট আলোয়ারের মহারাজার বক্তৃতা—গত ১ই নবেম্বর তারিখে লাহোর নগরীতে সনাতন ধর্ম্ম সংস্কৃত কলেজের হোষ্টেলের উদ্বোধন কার্য্য আলোয়ারের মহারাজা সমাধা করেন এবং তিনি পারিতোষিক বিতরণ করেন। সেই উপলক্ষে তিনি ছাত্রগণের নিকট একটা বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতায় তিনি প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম ও দর্শন বিজ্ঞানের তত্ত্বের কথা বলেন এবং মুনিঋষিগণ যে জ্ঞানের সমুদ্রের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে নিমগ্ন হইয়া রত্ন উদ্ধার করিবার জন্য ছাত্রগণকে উপদেশ দেন। তিনি আরও বলেন,—আমি তোমাদের ন্যায়ই এক দেশমাতৃকার সন্তান, তোমাদের ন্যায়ই আমি সম্মানের অধিকারী এবং তোমাদের যাহা কর্ত্তব্য আমারও সেই কর্ত্তব্য আছে। পাশ্চাত্য দেশের নিকট প্রাচ্য দেশেরও অনেক শিখিবার বিষয় আছে। তাহা শিক্ষা করিবার সুযোগই আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে,—অকৃতজ্ঞতার পাপে যেন আমাদের হৃদয় কলুষিত না হয়। আমাদের জাতীয় জীবন গঠনের জন্য যাহা যতটা পরিমাণে পাশ্চাত্যের নিকট হইতে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, তাহাই কেবল আমাদিগকে আয়ত্ত করিতে হইবে। কিন্তু একটা কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, যতদিন তোমরা ভিক্ষুক থাকিবে, কেবল গ্রহণই করিতে থাকিবে, প্রত্যর্পণ করিতে পারিবে না, ততদিন তোমরা ভাবের, আত্মার ও রীতি প্রকৃতির বিকাশে অন্যের সমান হইবার দাবী করিও না। ধর্ম্মে আস্থা রাখিয়া সহিষ্ণু হইতে হইবে, এবং পরস্পরের সহিত বিরোধের ভাব পরিহার করিতে হইবে। তোমাদের অন্তরাত্মার যতই বেশী উন্মেষ বাহিরে দেখাইতে সমর্থ হইবে, বহিরাত্মা ততই তোমাদিগকে অন্তরের দিকে টানিয়া লইবে। তাহার পর প্রধান কথা এই যে, হিন্দু-মুসলমানের একতার প্রতিষ্ঠা করা নিতান্তই দরকার। সিদ্ধান্ত পাস করিলেই কেবল সেই কার্য্য সমাধা করিতে পারা যায় না। স্বার্থপরতার অন্ধকারের আবরণ হইতে আত্মাকে মুক্ত করিতে হইবে, ভালবাসার বেদীতে দাঁড়াইয়া পরস্পরকে পরস্পরের জন্য স্বার্থ ত্যাগ করিতে হইবে। তাহা করিতে পারিলেই তোমাদের একতা এতটা দৃঢ় হইবে যে, বজ্রাঘাতে বা ভূমিকম্পে পর্য্যন্ত তাহা বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। সেই একতাই পরিপুষ্টি লাভ করিয়া হিন্দু মুসলমান শিখ-জৈন খৃষ্টানের একতায় পরিণত হইবে। আত্মাবধারণের পরিপুষ্টি লাভ হইলেই আত্মবিশ্বাসের উন্মেষ হইবে। যখন আত্ম-প্রত্যয়ের উপর দৃঢ় ভাবে দাঁড়াইতে পারিবে, তখন আর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে না। কারণ তখন সকলেই হাতধরাধরি করিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইবে এবং পরস্পরকে সাহায্য করিবে। সেই দিন যাহাতে সত্বর সমাগত হয়, তাহার চেষ্টা করিতে এক মিনিটও দেরী করিও না। গায়ে পড়িয়া কোন রকম আক্রমণের ভাব যখন থাকিবে না, তখনই তোমাদের ঈপ্সিত স্বরাজ লাভ হইবে। তাহা লাভ করার তোমাদের বংশগত ন্যায্য অধিকার আছে। স্বরাজ তোমাদের গৃহের বাহিরেই তোমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তোমরা যদি তোমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও এবং প্রতি পদক্ষেপে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হও তাহা হইলে তোমাদের শীঘ্রই ঈপ্সিত লাভ হইবে।— (নায়ক)

উপনিবেশে ভারতবাসী—কেনিয়ার ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের অবস্থা লইয়া যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন সন্তোষ-জনক ব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। সম্প্রতি সার ফ্রেডারিক লাগার্ড এই সম্পর্কে যে প্রস্তাবটী করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবেই ভাবিয়া দেখিবার। সার ফ্রেডারিক উপনিবেশ-গুলিতে অনেক কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, কাজেই এই সম্পর্কে তাঁহার প্রস্তাবটা উপেক্ষার বস্তু নহে। তাঁহার প্রস্তাবের মর্ম্ম হইতেছে এই যে, কেনিয়ার ভারতীয় ঔপনিবেশিকেরা সকলেই ব্রিটিশ গায়নার উচ্চ ভূমিতে গিয়া বাস করুক। তাহা ছাড়া, ভারত হইতে যাহারা বিদেশে গিয়া বস-বাস করিতে চাহে, তাহাদিগকেও তিনি সেখানে যাইতে বলিয়াছেন। ব্রিটিশ গায়নার ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের সংখ্যা ১,০০,০০০ এরও অধিক; সুতরাং ভারতবাসীদের পক্ষে সেখানে গিয়া বসবাস করা তেমন কঠিন ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না। এই সম্পর্কে সার ফ্রেডারিক ব্রিটিশ গায়নার শাসন-পদ্ধতিরও পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছেন। ভারতবাসীরা অধিক সংখ্যায় গিয়া সেখানে বসবাস করিলে, ভারত সরকারের সেখানকার শাসন ব্যাপারে কিছু কর্ত্তৃত্ব থাকা আবশ্যক। তাই তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন, সেখানকার ভারতবাসীদের ভারত সরকারের অধীনে স্বায়ত্ত শাসন প্রদান করা হউক। এই প্রস্তাব লইয়া আলোচনাও আরম্ভ হইয়াছে। ইহার সপক্ষে ও বিপক্ষে অনেকেই অনেক কথা বলিতেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে কেনিয়ার ভারতীয় ঔপনিবেশিকেরা যদি সেখানে বাস করিতে অসমর্থই হয়, তবে তাহাদের পক্ষে সেস্থান ত্যাগ করিয়া যাওয়া শুধু সম্মানজনক নহে, উচিত। কাজেই এদিক দিয়া বিচার করিতে গেলে, তাহাদের ব্রিটিশ গায়নার গিয়া বসবাসের প্রস্তাবের সমর্থন করা যায়। কিন্তু একটী সমস্যা হইতেছে তাহাদের ভূসম্পত্তি লইয়া। কেনিয়ায় তাহারা বাড়ী ঘর জোতজমা করিয়াছে। অনেকে হয় ত জীবনের দীর্ঘ সময় কেনিয়াতেই কাটাইয়াছে। তাহাদের পক্ষে উহা গৃহতুল্য। এরূপ অবস্থায় ভারত-বাসীদের পক্ষে হঠাৎ কেনিয়া ত্যাগ করিয়া যাওয়া আর্থিক হিসাবে যথেষ্ট পরিমাণেই ক্ষতিকর। এই সম্পর্কে এ কথাটা বিশেষ করিয়াই ভাবিয়া দেখিবার। তাহার পর ভারত হইতে গিয়া ব্রিটিশ গায়নাতে উপনিবেশ স্থাপনের কথা। এ যুক্তির সারবত্তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রতি বৎসরই বহু সংখ্যক ভারতবাসী উপনিবেশগুলিতে

গিয়া থাকে। বসবাসশূন্য স্থানে গিয়া বাস করা অবশ্যই কতকটা ক্লেশসাধ্য, কিন্তু তাহাতে পৌরুষ আছে। তাহার পর যদি সার ফ্রেডারিকের প্রস্তাব অনুসারে স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হয়, তবে সেদিক দিয়া ভারতবাসীরা একটা নূতন পরীক্ষায় পড়িয়া এবং তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়া কৃতিত্ব দেখাইতে পারে। (সময়)

সুরার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা—নরওয়ে দেশ হইতে সুরা বিদূরিত করিবার জন্য যেরূপ আপ্রাণ চেষ্টা চলিয়াছে, সেরূপ খুব কম দেশেই হইয়াছে। নরওয়েতে কেবল দেশের লোকেরাই এ পাপ ব্যাধি দূর করিতে সচেষ্ট নহে, দেশের রাজসরকার পর্য্যন্ত ইহাতে বিশেষ করিয়া মনোযোগ দিয়াছেন।

ঐ দেশে মাতালদিগকে রুগ্নব্যক্তির ন্যায় চিকিৎসা করা হয়, এবং যে জাতীয় সুরাপানেই অভ্যস্ত থাকুক না কেন, ঔষধ ব্যবহার করাইয়া তাহাদের সুরাপানের সুদীর্ঘ দিনজাত অভ্যাসকে সুস্থ করা হইতেছে।

রোগীকে প্রথম প্রথম সকল খাদ্যই সুরা মিশ্রিত করিয়া খাইতে দেওয়া হয়। প্রথম প্রথম এ জাতীয় খাদ্যে রোগী কোনরূপ অসুবিধাই মনে করে না, কিন্তু দুই এক দিন খাইতেই তাহাদের আহার্য্যের উপর শ্রদ্ধা কমিয়া যায়, এবং ক্রমশঃ সুরা-মিশ্রিত খাদ্য তাহারা স্পর্শ করিতেও চাহে না; এমন কি, সুরার গন্ধ পর্য্যন্ত তখন তাহাদের অসহ্য হইয়া পড়ে।

প্রকাশ, যে পাঁড় মাতাল, যে অনেক দিন হইতে দিনরাত মদে চুর হইয়া থাকে, যার এক মুহূর্ত্তও মদ না হইলেও চলে না, সেই জাতীয় মাতালকে এই উপায়ে মদ ছাড়িতে বাধ্য করা গিয়াছে, এবং ছাড়িতেও সাত দিনের বেশী লাগে নাই। এই উপায়টি নূতন নহে, কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, স্কেণ্ডেনেভিয়াতে এই উপায়টির দ্বারায় আশ্চর্য্য ফললাভ হইয়াছে।

সুরাপানের পাপ অভ্যাস এখন পৃথিবীর সকল জাতিই ছাড়িতে পারিলে বাঁচে, অন্ততঃ তাহাদের মধ্যে চেষ্টা চলিতেছে, আমাদের দেশে কি তাহার কোন চেষ্টাই হইবে না? (সময়)

গণিতে বাঙালীর কৃতিত্ব—দু'চার জন বন্ধু মিলে আপিসে বসে গল্প করছিলুম, এমন সময় একটি যুবক ঢুকলেন এবং অতি বিনয়ের সঙ্গে জানালেন যে, সম্পাদকের সঙ্গে তাঁর গোটা দুই কথা আছে। তাঁকে বসতে বলে তাঁর বক্তব্য শুনতে চাইলুম। কিছুকাল চুপ করে বসে থেকে তিনি ধীরে ধীরে বল্লেন যে, মানস-অঙ্কে তিনি সামান্য কৃতিত্ব লাভ করেচেন, আমাদের তার পরিচয় দিতে চান। অঙ্কে নিজের বিদ্যার বহর আমার জানা ছিল, তাই বল্লুম—"খবরের কাগজের সম্পাদকেরা সব-জান্তা হয় বটে; কিন্তু আমি নবীন সম্পাদক, সকল রকম যোগ্যতা এখনও অর্জ্জন করতে পারি নি। মানস-অঙ্কের মানেই জানি নে; সুতরাং তাঁর পরীক্ষা আমি করতে পারব না।"

যুবকটি কিছুমাত্র দমে না গিয়ে বল্লেন—"যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের যত বড় অঙ্ক আমায় দেবেন, আমি খুব অল্প সময়ের মাঝে মুখে মুখে তার ফল বলে দিতে পারব।"

কথাটা শুনে আমাদের কৌতুহল জাগল। আমাদেরই একজন কাগজ কলম নিয়ে এই আঁকটির ফল বলে দিতে বল্লেন—৩৫১৭৫২ × ৩৫২৬৫৪ × ৭১৭৮৫—৩২৫। আঁকটি দিয়েই আমরা গল্প করতে লাগলুম—আধ মিনিটের মাঝেই তিনি আঁকটির ফল কাগজে লিখে দিলেন, অনেক কালি আর অনেকখানি কাগজ খরচ করে আমরা আঁকটি কষে মিলিয়ে দেখলুম ঠিক হয়েচে।

এই স্বল্পভাষী যুবকটির ওপর আমাদের শ্রদ্ধা হ'ল। আমরা জিজ্ঞাসা করলুম—"আপনি আর কি পারেন?"

যুবকটি জবাব দিলেন—"আমি পঞ্চম বর্গমূল মুখে মুখে বার করতে পারি, কখনো কখনো সপ্তম বর্গমূলও বার করে থাকি।"

আবার ফ্যাসাদে পড়লুম। বর্গমূল আবার কিরে বাবা! মাতৃজাতি-সেবক সমিতির সম্পাদক পুলিন-দা উপস্থিত ছিলেন, তাঁর দেখলুম আঁকটা বেশ আসে। তিনি কাগজ কলম নিয়ে বসে চুপি চুপি একটি আঁক ঠিক করে বল্লেন—এঁর পঞ্চম বর্গমূল (fifth root) বার করুন তো!

আমরা আবার গল্প করতে লাগলুম—ভদ্রলোকটি বিড় বিড় করতে লাগলেন, আর ডান হাত দিয়ে কপাল ঘসতে লাগলেন; এক মিনিটের ভেতর প্রদত্ত আঁকের পঞ্চম বর্গমূলের সংখ্যা কটি কাগজে লিখে দিলেন। পুলিন-দা বল্লেন, ঠিক হয়েচে।

আমরা তখন তার পরিচয় জানতে চাইলুম। তাঁর নাম হচ্চে শ্রীব্রহ্মদাস বৈষ্ণব গোস্বামী। বাড়ী ঢাকা জেলার কাওরাইদ গাঁয়ে। তিনি কখনো কোন স্কুল কলেজে পড়েন নি, বাড়ী থেকে তাঁর পিতার কাছেই শিক্ষা লাভ করেচেন। বয়স চব্বিশ বছর।

আমরা বড়ই বিস্মিত হলুম। ইস্কুল কলেজে না পড়ে লোকে একটা বিদ্যা এমন করে অর্জ্জন করতে পারে! তিনি বল্লেন যে, শুভঙ্করীর সমস্ত আর্য্যা তিনি আরো সংক্ষিপ্ত করেচেন এবং উচ্চ গণিতের আঁক কষবার কতকগুলি সহজ পদ্ধতি তিনি আবিষ্কার করেচেন। তাঁর অর্থ-সঙ্গতি নেই বলে তিনিই সেগুলি সাধারণ্যে প্রচার করতে পারচেন না, আর সেই জন্যই সম্পাদকদের শরণ নিয়েছেন।

আঁকে বাঙালী মান্দ্রাজীর পাশে দাঁড়াতে পারে না, এইরূপ একটা কথা শুনে তিনি বেদনা অনুভব করেন। বাঙালী সোমেশ বাবু বিলেতে মানস-অঙ্কের শক্তি দেখিয়ে অনেককে বিস্মিত করেচেন। ব্রহ্মদাস বাবু বলেন যে, তিনিও তাঁর আবিষ্কৃত পদ্ধতি দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারেন যে, বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক অনুর্ব্বর নয়।

ব্রহ্মদাস বাবু ১২৮এ বহুবাজার ষ্ট্রীটে থাকেন। মাত্র একদিনের আলাপে তাঁর যতটুকু পরিচয় আমরা পেয়েচি, তা পাঠক পাঠিকাদের জানালুম। অঙ্কে যাঁদের অনুরাগ আছে তাঁরা তাঁর সঙ্গে আলাপ করলে আনন্দ পাবেন; আর গুণগ্রাহী কোন ধনী বাঙালী যদি অর্থ সাহায্য করেন, তা'হলে দেশ নতুন আবিষ্কারের ফল লাভ করে দাতার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।

(বিজলী)

ভূমিকম্পে প্রচণ্ড প্রলয়—১৮ শতের জীবন নাশ, দুই হাজার জখম। ১৫ই নবেম্বর তারিখের লণ্ডনের তারের সংবাদে প্রকাশ, সান্টিয়াগো হইতে যে টেলিগ্রাম পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ চিলি ভূমিকম্পে ১৮ শত লোকের মৃত্যু হইয়াছে এবং ২ হাজার লোক জখম হইয়াছে। (হিন্দুস্থান।)

সর্প-বিষের প্রতিষেধক—সর্পাঘাতে এ দেশের বহুলোক প্রাণত্যাগ করে, অথচ ইহার প্রতিষেধক বিশেষ কোন ঔষধ আজ পর্য্যন্তও আবিষ্কৃত হয় নাই; অথবা, হইলেও তাহা সাধারণের আয়ত্তের বাহিরেই রহিয়া গিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সাপের বিষকেই সাপের ঔষধ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করিয়া সর্পাঘাতের যে ঔষধটা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাও এই সাপের বিষ। সাপের বিষের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল প্রতিষেধক হইতেছে না কি সাপের "সিরাম"। সাপে কামড়াইলে এই "সিরাম" দেহের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। এই "সিরামে"র দ্বারা সাপের বিষ নষ্ট করিতে হইলে, যাহাতে উহা সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়, তাহারও ব্যবস্থা করা দরকার। এই জন্য ব্রেজিলে এই "সিরাম" সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নানা রকমের বিষধর সাপ ধরিয়া তাহাদের দেহ হইতে বিষ লইয়া এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উহা তৈয়ারী হইতেছে। সম্প্রতি ভারত গভর্ণমেণ্টেরও এদিকে নজর পড়িয়াছে। ভারতবর্ষেও যাহাতে এই "সিরাম" তৈয়ারী হইতে পারে, সেই চেষ্টা চলিতেছে। এদেশে সর্পাঘাতে মৃত্যুর সংখ্যা যেরূপ বেশী, তাহাতে উহার প্রতিষেধক সহজলব্ধ করিয়া তোলা যে এদেশের পক্ষেও বিশেষ ভাবেই প্রয়োজন, তাহা বলাই বাহুল্য।

(স্বরাজ।)

বাঙ্গালার স্বাস্থ্য; সংক্রামক রোগে মৃত্যু—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য বিভাগ বাঙ্গালা প্রদেশের সংক্রামক রোগে মৃত্যু সম্বন্ধে যে শেষ রিটার্ণ পাইয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ যে, গত ১১ই নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে নয়টী জেলাতে ওলাউঠা রোগে মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাইয়াছে। বগুড়াতে ২ জন এবং নোয়াখালিতে ৫ জন এই রোগে মরিয়াছে; কিন্তু পূর্ব্বসপ্তাহে এই দুই স্থানে ওলাউঠায় কেহ মরে নাই। আলোচ্য সপ্তাহে চব্বিশ পরগণায় ৩ জন, খুলনায় ২২ জন এবং মালদহে ২ জন ওলাউঠায় মরিয়াছে। কলিকাতায় ৭ জন নদীয়ায় ১৩ জন, ঢাকায় ৩ জন ও যশোহরে ৮১ জন মরিয়াছিল। বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ এবং রাজসাহীতে আলোচ্য সপ্তাহে এই রোগে কাহারও মৃত্যু হয় নাই, তৎপূর্ব্ব সপ্তাহে ১ জন করিয়া মরিয়াছিল। আলোচ্য সপ্তাহে দিনাজপুরে এই রোগে কেহ মরে নাই, ফরিদপুরে ১৫ জন মরিয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে দিনাজপুরে ২ জন এবং ফরিদপুরে ১৬ জন মরিয়াছিল।

আলোচ্য সপ্তাহে বসন্ত রোগে মৃত্যুর হার সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। খুলনায় ১ জন, দিনাজপুর, বগুড়া ও চট্টগ্রামে ২ জন করিয়া এবং ময়মনসিংহে ৩ জন মরিয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে বর্দ্ধমান, চব্বিশ পরগণা এবং খুলনাতে ইনফ্লুইঞ্জা জ্বরে ১ জন করিয়া, ফরিদপুরে ২ জন এবং কলিকাতায় ১১ জন মরিয়াছে।

প্লেগে আলোচ্য সপ্তাহে বাঙ্গালাতে কোথাও কাহারও মৃত্যু হয় নাই। (নায়ক।)

প্লাবন প্রসঙ্গ—মঙ্গলবারের সার্ভ্যাণ্ট লিখিয়াছেন, উত্তরবঙ্গের প্লাবনের জন্য রেলের বাঁধ কতখানি দায়ী—এখন দেশময় সেই তর্ক চলিতেছে। এখন জানা গিয়াছে যে সান্তাহার ও নসরৎপুরের মাঝখানে কোন সেতু কি সাঁকো না থাকায় স্থানীয় লোকেরা বরাবরই অসুবিধা বোধ করিয়া আসিতেছিলেন। গত অক্টোবর, মাসে সিহরি ও আদমদীঘির নিকটবর্ত্তী স্থানের লোকেরা ই, বি, রেলের এজেণ্টের কাছে আবেদন করেন, এবং তাঁহাদের অসুবিধার কথা জানান। এই আবেদনের এজেণ্ট যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—(চিঠিখানি বগুড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে লেখা হইয়াছিল)। আপনার মারফৎ সিহরী এবং আদমদীঘির নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলির অধিবাসী উমেরউদ্দীন জোয়ারদার ও অপর ব্যক্তিগণের যে দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে, তদুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, তদন্ত করিয়া দেখা গেল, আদমদীঘি ও নসরৎপুরের মধ্যে রেল লাইনের নীচে কোন সেতু তৈয়ার করিবার কোন দরকার নাই।

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, অনেক কাল আগেই এই বিষয়টা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মারফত রেলের এজেণ্টকে জানানো হইয়াছিল। কিন্তু এজেণ্ট দেশবাসীর ন্যায় সঙ্গত প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন নাই। এখন নিঃসন্দেহ সপ্রমাণ হইল যে, রেলের কর্ত্তারা ইচ্ছা পূর্ব্বক সকল সতর্কতা-বাণী অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এই জন্য বর্ত্তমান প্লাবনে যে ক্ষতি হইয়াছে, সেজন্য তাঁহারাই দায়ী। ইহার জবাবে এজেণ্টের কি বলিবার আছে আমরা তাহা জানিতে চাই। (নায়ক)

খলিফা নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আগা খাঁর অভিমত—লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ "ডেইলি এক্সপ্রেস" পত্রিকার পারিসস্থ সংবাদদাতা মহামান্য আগা খাঁর সহিত দেখা করিয়াছিলেন। মহামান্য আগা খাঁর মত এই যে খলিফার পদ কোন দিনই বংশানুক্রমিক ছিল না। সকল সময়েই খলিফা নির্ব্বাচিত হইয়াছে। গত ৩০ বৎসরের মধ্যে তিনজন খলিফাকে পদচ্যুত করা হইয়াছে। ভারত হইতে যে সব প্রতিবাদ হইতেছে তাহার কোন গুরুত্ব আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না। তিনি আশা করেন ভারত হইতে ইউরোপে একটা ডেপুটেশন পাঠাইয়া সত্য বিষয়টীর নির্দ্ধারণ করাই আবশ্যক। খেলাফৎ সম্বন্ধে বিধিব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য মিশরে একটী সাধারণ সভা আহূত হওয়ার সম্ভাবনা। খেলাফতের প্রাচীন পদ্ধতি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। (জ্যোতিঃ)

অনাথ শিশুদিগের ব্যবস্থা—বরাহনগরের রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সম্পাদক বঙ্গীয় রিলিফ কমিটিকে জানাইয়াছেন যে তাঁহারা ১০টী অনাথ বালকের ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন। লাহেরিয়া সরাইএর জজকোর্টের হেড ক্লার্ক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দশ পনেরটী অনাথ শিশুর ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন। তিনি তথায় এক অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় আছেন।

(২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ)

বৃদ্ধা রাণীর চরকা কাটা—ময়মনসিংহ রামগোপালপুরের রাণী গত ৭ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৩ বৎসর। তিনি বৃদ্ধ বয়সেও চরকায় সুতা কাটিতেন। মৃত্যুর প্রাক্কালেও তিনি চরকায় সুতা কাটিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। রাণী এই জেলার নাটোরের নিকট হরিশপুরের রায় মহাশয় দিগের দুহিতা ছিলেন।

(হিন্দুরঞ্জিকা)

অবিবাহিতা বালিকার আত্মহত্যা—পাবনা ক্ষেতুপাড়া গ্রামের শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র রায় মহাশয়ের একটী ষোড়শ বর্ষীয়া অবিবাহিতা কন্যা গত অষ্টমী পূজার দিন নাইট্রিক এসিড সেবনে আত্মহত্যা করিয়াছে। বালিকার পিতা বহু চেষ্টা করিয়াও কন্যাটীর বিবাহ দিতে পারেন নাই। পরিবারিক এইরূপ দুশ্চিন্তা ও অভাবই বালিকার মন বিচলিত করিয়া তাহার এই শোচনীয় অকাল মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। হৃদয়হীন সমাজ এই নিদারুণ দৃশ্য এখনও নীরবে দেখিতেছে।

(হিন্দুরঞ্জিকা)

আড়াই লক্ষ মণ চাউল রপ্তানি:—"সম্মিলনী" জানাইতেছেন যে নোয়াখালী জেলা হইতে আড়াই লক্ষ মণ চাউল শীঘ্রই কোচিন দেশে চালান দেওয়া হইবে। ইতিমধ্যে ৬৫০০০ মণ চালান হইয়া গিয়াছে। চৌমুহনী প্রভৃতি স্থানে দালালগণ খুব জোরে চাউল ক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে। চাউলের এরূপ অবাধ রপ্তানীতে দেশময় অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে। সত্বর চাউলের রপ্তানি বন্ধ করিয়া দিতে আমরা কর্ত্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি।

(নোয়াখালি হিতৈষী)

লস্কর দ্বারা হিন্দু যুবতীর প্রাণরক্ষা—একদিন কাশীপুর ঘাট হইতে "নলিনী" নামে ফেরী ষ্টিমারখানি চলিয়া যাইবার পর দেখা যায় যে, একটি হিন্দু যুবতী সলিল সমাধি হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। যুবতীর এই নিমজ্জমান অবস্থা দেখিয়া দৌলা মিঞা নামে একজন লস্কর তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে ও অনেক পরিশ্রমের পর স্ত্রীলোকটির মাথার চুল ধরিয়া তাহাকে আসন্ন-মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করে। তৎকালে ষ্টিমার-ঘাটে ও ষ্টিমারে যদিও বহু লোকজন ছিল বটে, তথাপি কাহারও দৃষ্টি এদিকে পড়ে নাই। সুতরাং দৌলা মিঞা না থাকিলে সেদিন যে সেই হতভাগিনী অপমৃত্যুর হাত হইতে নিস্কৃতি লাভ করিতে পারিত না, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

(সময়)

আরদালী বাবু *

শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার

১

স্থান—রিষ্‌ড়াকাল—অকাল-বর্ষা। নিবিড় কালো কাদম্বিনী আকাশ ছেয়ে ফেলেছে—ডাক্‌ডোক্ সোর্‌গোল যথেষ্টই, তবে বর্ষণে কিছু বিলম্ব আছে। সকালে রৌদ্রের মুখ দেখ্‌বার আশায় যাঁরা অতি প্রত্যুষেই কাপড়-চোপড় ছেড়ে, লাঠী ঘাড়ে প্রাত্যহিক ভ্রমণের পোষাকে 'এই বেরুই—এই বেরুই' কচ্ছিলেন, তাঁরা হতাশ হ'য়ে বৈঠক্‌খানায় ব'সে হুঁকো ধরেছেন; তাঁরা অবসরপ্রাপ্ত প্রৌঢ়, জমি নিলেন,—অবলম্বন তামাক আর খোস্‌গল্প।

ছেলেদের ভ্রূক্ষেপ নেই,—সেটা বর্ষাসিক্ত কি বসন্ত-সুন্দর প্রভাত, তা তাদের ব্যবহারে কিছু তফাৎ বোঝা যাচ্ছে না। আর জোয়ান যারা, তারা শয্যা ত্যাগ করেনি—এখনও পাশ-বালিশ আঁক্‌ড়ে ভোরের সুখময় আবেশে স্বপ্ন দেখ্‌ছে—সে কি ছাড়া যায়! দু'একটা বাতিকগ্রস্ত চোয়াড় ষণ্ডাগুণ্ডা ব্যায়ামের খাতিরে তত সকালে উঠেছে—লাফালাফি জুড়ে দিয়েছে।—ক্রমে ৭টা প্রায় বাজে।

একটা গোল উঠ্‌লো—কানাইদের বাছুর জলে প'ড়ে গেছে। একটা বুড়ী বিষম চীৎকার ও হাত-পা আছ্‌ড়ে পাড়া মাৎ ক'রে দিয়ে গেল যে, সাক্ষাৎ কলি—হিন্দুর ধর্ম্ম আর থাকে না! বাস্তবিকই ত গো-মাতা! কতকগুলো কচি ছেলে পাড়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখ্‌ছে, আর হাততালি দিচ্ছে। দু'একটা ঝী-মাগি একটা বংশদণ্ড হাতে বাছুরটিকে টান্‌তে গিয়ে আরও ঠেলে দেওয়ার সাহায্য ক'র্‌ছে।

"—আরে, রজনী যে! এসো এসো—মুখুয্যে-পুকুরে কানাইদের বাছুরটা প'ড়ে গেছে শুন্‌লুম, এসো তোলা যাক্।" একটি যুবক আর একটি যুবককে ধ'রে টান্‌তে লাগ্‌লো।

রজনীকান্ত—বয়স ৩৫, মুখে খোঁচাখোঁচা দাড়ি,

* ডেলি প্যাসেন্‌জারকে মফঃস্বলের হিন্দুস্থানী গাড়োয়ান, রেলের খালাসী প্রভৃতি লোকেরা "আর্‌দালীবাবু" বলে।

কোঁচার খুঁট গায়ে, খালি পায়ে গয়লার বাড়ী খোকার দুধের তাগাদায় গেছ্লো ;—পায়নি, ফিরে আস্‌ছে ; পেলে খোকারও হ'ত, আর 'পোর নামে পোয়াতি বর্ত্তায়'—নিজেরও একটু চায়ের হ'ত—যে বাদ্‌লা ! তা গেল মাসে টাকা দিতে পারেনি, কাজেই গয়লার গরজ নেই। কি করে,—বিষণ্ণ মনে ফিরছে, না হয় নুন-চা-ই হ'বে, তবুও একটু চাই, নইলে প্রাণটা টাঁ টাঁ ক'র্‌বে—যে পাপ নেশায় প'ড়েছে।

অমূল্য হাতটায় ঝাঁকানি দিল,—"কি রে, তুই যে ক্রমে জুজু-ব্রাকেট মেরে যাচ্ছিস ; আফিসে কি আর কেউ কাজ করে না বাবা ?"

রজনী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িল,—গয়লার কড়া কড়া কথাগুলো তখনও তার কানে বাজছিল। আর ও-রকম কম-বেশী আঘাত তাকে ত প্রায়ই সহ ক'র্‌তে হয়—সে যে কেরাণী। বার মাসের তের পার্ব্বণে বক্‌শিস যোগাতে পারে না ব'লে আফিসের বেহারা-দপ্তরীরা মুখ বেঁকায়—'এঁঃ ! ভারী বাবু !' বড়দিন ছোটদিনে বড় বাবুর বাড়ী ভেট পাঠাতে পারে না—অথচ তু'পয়সা চুরি করারও অভ্যাস নেই যে, টাকায় সেটা তাঁকে পুষিয়ে দেবে ; কাজেই বড় বাবুর রোষকষায়িত লোচন, আর 'কেয়ারলেস', 'ওয়ার্থলেস' গর্জ্জন ; ওদিকে সাহেবের কাছে নিয়ত 'রিডাক্‌সনের' ভয়—বেচারী একেবারে সসেমিরা !

তার উপর অভাব—দারুণ অভাব। অভাবে জোটে না,—যা জোটে তাও তাড়াতাড়িতে খাওয়া হয় না, খেলে দুশ্চিন্তায় হজম হয় না, রাত্রে অনিদ্রা ;—বেচারী জ্যান্তে মরা !

—"আঃ ! আঃ ! লাগ্‌ছে, লাগ্‌ছে।"—রজনী হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে, কাতরভাবে করুণ নয়নে চেয়ে ব'ল্লে,—ভাই ! সাতটা বাজলো, আর ত দাঁড়াবার সময় নেই—এর ভেতর নাওয়া, খাওয়া, যাওয়া—আমায় মাপ কর ভাই।"

অমূল্য জিভ কাটিয়া ব'ল্লে,—"সে কি রে ! গোরু মরে ! গোমাতা জলে প'ড়েছে—অধর্ম্ম—" রজনী ততোধিক কাতর হ'য়ে ব'ল্লে,—"লেট' হবে ভাই আফিসে ; জানি যে আর্‌দালী—গাড়ী পাব না···আটটা-বাইশ। তাই কি ব'ল্‌চো ভাই—বুড়ী মা জলে প'ড়লে টেনে তোল্‌বার ভার তোদেরই ওপর দিয়ে আমায় ছুটতে হবে।"

হু হু শব্দে রজনী ছুটিয়া চলিয়া গেল—নিঃশব্দে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস অমূল্যর নাক দিয়ে বেরিয়ে জানিয়ে গেল—হায় হতভাগা ! জীবনটা একেবারে বেচে ফেলেছ ! অভিশপ্ত বাংলার কেরাণী !

২

"মা, হুঁসোটা কোথা গেল ? বাবুর কি একদণ্ড বাড়ী থাক্‌বার অবসর নেই।"—পিঁড়ের উপর পা দিয়েই রজনীকান্ত হাঁকিলেন।

মাথায় এক ঘটী জল দিয়ে, দেহটা অর্দ্ধেক মুছে, তার উপর একটা আধ-ময়লা পিরাণ ও তদ্বৎ কাপড় চড়িয়ে—তার তিন জায়গায় কালীর দাগ, তু'জায়গায় সূক্ষ্মসূচীশিল্পের কারুকার্য্য—সে খাইতে বসিবে।

পাশের ঘরে খোকাবাবু ; তাঁর চীৎকারে বাড়ীটি মুখরিত। স্ত্রী বেচারী রান্নাঘরে তাড়াতাড়ি মায়ের সঙ্গে জোগাড় দিচ্ছে, আর খাবারের কৌটা ও পানের সরঞ্জাম করছে।

রজনীকান্ত আবার হাঁকিলেন,—"হুঁসোটা কোথায় মা—হুঁসো ? দূর ক'রে দোব কাল বেটাচ্ছেলেকে বাড়ী থেকে।" মা এসে অনুনয়ের সঙ্গে পুত্রকে ভাতে বসালেন,—তার বেলা হচ্ছে। তাও ত বটে।

রজনীকান্ত রাগ ক'রে পুত্র অনিলকে 'হুঁসো' ব'ল্‌তেন। টাকার অভাবে পুত্রকে শিক্ষা দিতে পারেন নি—সময়ের অভাবে নিজেও তাকে দেখ্‌তে পারেন নি ; গণ্ডায় এণ্ডা দিয়ে সে আর কত কাল কাটাবে ?—কাজেই স্কুল ছেড়ে সে এখন লর্ড বেকার !

মা ব'ল্‌লেন,—"তুই খা বাবা ! খা, তাড়াতাড়ি করিস্ নি। সে বোধ হয় ঐ বিশ্বেসদের বাড়ী গেছে। ওরা বড় লোক—একটু চাকরীর ভরসা দিয়েছে ; আর যত ভদ্দর লোক সব ওখানে বসে ;—ভালই ত তবু ভদ্দর-ঘেঁষা—"

রাগিয়া রজনীকান্ত ফুলিতে লাগিল। "হাঁ, সবাই চাকরী দেয়—নাও না। যত বেটা ভবঘুরের আড্ডা ওটা—খালি বচন, আর পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গা ! মর্‌বে বেটা নিজের দুঃখে—" হাত গুটাইতে দেখিয়া মা আসিয়া হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন,—"খা, বাবা, ও-কটি মেখে নে—বৌমা, আর একটু ঝোল দাও ত মা।"

প্রাঙ্গণ হইতে হঠাৎ একটা কর্কশ কণ্ঠের তীব্র চীৎকার

মাতা-পুত্রের এ স্নেহের লীলা চুরমার করিয়া দিল।—"যদি পয়সা না জোটে ত না খেলেই হয়—অমন মাছ খাওয়া কেন ?"—মেছুনী একেবারে বাড়ীর উঠানে ; মুখে সহস্র ক্ষুরধার, কথায় তুবড়ী—হাতে সোণার ফাঁদালো তাগা।

বিবর্ণ মুখে রজনীকান্ত ভাতের থালা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। "হাঁ, হাঁ—কর্‌লি কি, আর কি"—মাতার কথা শেষ না হ'তেই পোঁ ক'রে বাঁশী বেজে উঠ্‌লো।

এ সে বাঁশী নয়, মনচোর শ্যামচাঁদের সে ডাক্ নয়—যা অতীতের কোন এক ফাল্গুন দিনের প্রসন্ন প্রভাতে, শারদ পূর্ণিমার অনাবিল জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীতে, বরষার অশ্রান্ত ধারা ও গুরুগম্ভীর গর্জ্জনের মধ্যে ব্রজবাসীদের ডেকে ডেকে আকুল—উদাস ক'র্‌তো,—তারা ক্রমে তাদের ঘর ছেড়ে ছুটে পথে বেরিয়ে প'ড়তো;—যমুনা পোড়ারমুখী নাকি উজান বইতেন, কেলিকদম্ব শিউরে উঠ্‌তেন—ফুলে ফুলে রোমাঞ্চ বিকাশ হ'ত। যাক্ সে কথা।

হেষ্টিং জুট-মিলের গলাভাঙ্গা মোটা আওয়াজ পোঁ পোঁ ক'রে জানিয়ে দিলে যে, আটটা বাজলো। আর ত ঘরে থাকা যায় না—থাকা দায়! খাওয়া দাওয়া, কাপড় চোপড়, স্ত্রীপুত্রের স্নেহের বাঁধন কিছুই আর ভাল লাগে না—কিছুই তাকে ঘরে ধরে রাখার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়। এখনই তাকে ঘর থেকে বেরিয়ে প'ড়তে হবে—ছুট্‌তে হবে। অশন-বসন, স্ত্রীপুত্র, ভদ্রতা, সামাজিকতা—লোকলৌকিকতা—এসব এখন গৌণ কর্ম্মের মধ্যে প'ড়েছে ; মুখ্য কর্ম্ম—উপার্জ্জন,—পয়সা আনা। "উঃ দেরী হ'য়ে গেল! যাঃ"—ছুট্ ছুট্! জামার বোতাম দিতে দিতে, কাঁধের চাদর সাম্‌লাতে না সাম্‌লাতে, গণেশ-জননীর নামটা ভাল ক'রে উচ্চারণ হ'তে না হ'তে রজনীকান্ত চৌকাঠের বাইরে পা দিল।

আটটা বেজে গেল, আজ আর গাড়ী পাওয়া যাবে না,—আফিসে 'লেট' হবে ;—তাঁর হৃদ্‌কম্প হ'তে লাগলো!—দে ছুট, দে ছুট। পিছনে শিশু-কন্যা খাবারের কৌটো নিয়ে এসে, তার বাবার ব্যাপার দেখে হতভম্ব—ন যযৌ ন তস্থৌ ; কৌটোটা তার হাত থেকে প'ড়ে গেছে! বুড়ো পতিত হালদার কল্‌কাতা থেকে কি আন্‌বার ফরমাস ক'র্‌তে বোধ হয় এসেছিল ;—অর্দ্ধ পথে অবাক—না রাম, না গঙ্গা! দে ছুট, দে ছুট! রজনীকান্ত কেরাণী—তার উপর আয়্দালী বাবু,—লক্ষ্য আটটা বাইশ ; গন্তব্য—আফিস ; পরিণাম—মোক্ষ!

৩

টং টং ক'রে ঘণ্টা হ'ল, বাঁশী বাজ্‌লো, নিশান উড়্‌লো—এক-পা এক-পা ক'রে মন্থর গমনে গাড়ী চলেছে—আট্‌টা বাইশ। একজন ছুট্‌তে ছুট্‌তে 'প্লাট্‌ফরমে' হাজির।—পাগলের ন্যায় বেশ, মাতালের মত ভঙ্গি—আরক্ত মুখের চারিদিক্ দিয়ে ঘাম ঝর্‌ছে, ঝড়ের ন্যায় নিঃশ্বাস, বুক্‌টা যেন ফেটে যাবে—হাত পা লট্ পট্ ক'র্‌ছে, সর্ব্বাঙ্গ অবশ—ভেঙ্গে প'ড়্‌তে চায় ;—সে আমাদের রজনীকান্ত!

"হাঁ, হাঁ! বাবু কি কর, কি কর!"—একজন খালাসী তার হাত টেনে ধর্‌লো, কিন্তু চোখের সাম্‌নে আট্‌টা বাইশ পালিয়ে যায়!—মুহূর্ত্তের মধ্যে রজনীকান্তের মানস-নেত্রে অফিসের চিত্র—দেরী হইলে বড়বাবুর সাম্‌নে গিয়া লেট এটেন্‌ডান্‌সের সহি—বড়বাবুর সেই গম্ভীর মূর্ত্তি—আড় নয়নের ঘৃণাব্যঞ্জক চাহনি—বিদ্যুত চম্‌কাইয়া গেল!—দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া, অমানুষিক বলে খালাসীকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া, লাফ দিয়া সে পাদানিতে উঠিতে চেষ্টা করিল।

"গেল, গেল"—চারিদিক্ থেকে হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ! বহুতর খালাসী কুলি জমা হ'ল—কয়েকজন মিলে জোর ক'রে চলন্ত গাড়ীর পাদানি থেকে রজনীকান্তকে টেনে নামালে। বেতস লতার ন্যায় তার শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ কাঁপতে কাঁপতে সেই কাঁকরের উপর লুটিয়ে পড়্‌লো—হাত মুখ হাঁটু ছ'ড়ে গেল—জামা কাপড় ধূলি-ধূসরিত, রক্তসিক্ত!

হুস্ হুস্ শব্দে দ্রুততর বেগে ট্রেণ সীমানা ছাড়িয়ে চলে গেলে—রজনীকান্ত সেই দিকে চাহিয়া এবং নিজের অবস্থার কথা ভাবিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।—ততক্ষণে রেল পুলিশ কোমরে বেল্ট জড়াইতে জড়াইতে আসিয়া জাঁকিয়া বসিয়াছে—"আরে মাতোয়ারা হ্যায়—আসামী ভাগ্‌তা হ্যায়, চলো থানেমে।"

দয়ালু ষ্টেশন মাষ্টারের দয়ায় কোনও রকমে পুলিশ-বাবার হাত থেকে অব্যাহতি লাভ ক'রে পরের ট্রেণে রজনীকান্ত অফিসে এসেছে, কিন্তু ঢুক্‌তে সাহস হচ্ছে না;—

এক বৃন্তে দুটী ফুল

শ্রীযুক্ত তারকব্রহ্ম চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী মহাশয়ের শিল্প সংগ্রহ হইতে—

শিল্পী—ভ্যান-ইরেকেন]

[Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

কি ক'রে বড়বাবুর ঘরে যাবে ? দেরী হ'লে বড়বাবুর ঘরে গিয়ে হাজিরা-বইতে সই করতে হয়—১০টার পরই শ্রীখাতা তাঁর ঘরে—তাঁর সম্মুখে বিরাজ করেন !

* * * *

বেলা প্রায় সাড়ে পাঁচটা। বৃহৎ অফিস-ঘর প্রায় নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে। একটির পর একটি কেরাণীবাবু নিজের নিজের কাগজপত্র গুছাইয়া, কলমগুলি ধুইয়া মুছিয়া—হাতেমুখে জল দিয়া, ঝাড়নখানি লইয়া উঠি উঠি করিতেছেন। কেহ বা ডেস্ক বন্ধ করিয়া, বেহারা ডাকিয়া দিয়া আফিসের দ্বারে একটু দাঁড়াইয়া যেন বাহিরের মুক্ত বাতাসে দেহমন তাজা করিতেছে। কেহ অবশিষ্ট পানটি কৌটা হইতে মুখে দিয়া, কেহ বা বিড়িটি ধরাইয়া লইয়া, কেহ একটিপ নস্য নাকে গুঁজিয়া পথে পা বাড়াইতেছে। বাস্—পরক্ষণেই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ও স্বচ্ছন্দতার হিল্লোলের সঙ্গে তারা আরামে পথে পা দিতেছে, আর অসীম, চঞ্চল জনস্রোতে মিশাইয়া যাইতেছে। সে সময় কলিকাতার পথের দৃশ্য সংক্ষুব্ধ সাগরবৎ উদ্বেল—চঞ্চল—অনমুমেয়।

বেহারারা বাতি জ্বালিয়া দিল। আফিসের এক কোণে টুলের উপর বসিয়া, টেবিলের উপর সাগ্রহে উপুড় হইয়া পড়িয়াছে, সম্মুখে কাগজের স্তূপ!—সে রজনীকান্ত। সহি করিবার সময়ে আজ সে বড়বাবুর কাছে যথেষ্ট বকুনি খাইয়াছে। সহানুভূতি পাইবার আশায় ট্রেণ ফেল আর পড়িয়া যাওয়ার কথা বলিতে গিয়া, তার উপরন্তু লাভ হইয়াছে, কতকগুলি বিলাতী উপাধি—ওয়ার্থলেস, কেয়ারলেস ইত্যাদি।

বড়বাবুর রোষ-কষায়িত লোচন বেত্রহস্ত গুরুমহাশয়ের মত তার পশ্চাতে যেন তীব্র তাড়না করিতেছে। আজ এখনও 'ক্যাস' মিলান হয় নাই; তার কাজ শেষ না হওয়ায় হিসাব মিলে নাই; কাজেই ক্যাস মিলাইয়া দিবার প্রত্যাশায় বড়বাবু অধীর হইয়া বসিয়া আছেন। "আঃ, আজ শনিবার! একটু যে সকাল-সকাল বাড়ী যাব তার আর যো নেই! এ সব ওয়ার্থলেস ইডিয়ট্ নিয়ে,—হ'ল হে, হ'ল ?"

রজনীকান্ত যতই তাড়াতাড়ি করিতেছেন, ততই হিসাব আরও জটিলতর হইয়া উঠিতেছে। হেমন্তের সন্ধ্যায় রজনীকান্ত ঘামিয়া উঠিল; আকর্ণবিস্ফারিত চক্ষেও সে ভুল ধরিতে পারিতেছে না, বড়বাবুকেই বা সে কথা বলে কি করিয়া। তার ভাবনার কূলকিনারা নাই!

বাড়ীতে কচি ছেলেটীর সর্দ্দি-জ্বর; সমস্ত দিন ঔষধ প'ড়লো না; বড় ছেলেটী আড্ডাধারী, বাড়ী থাকে না। যদি পাড়ার লোক দয়া ক'রে ডাক্তার-বাড়ী যায় তবেই! হায়, কেরাণী-জীবন! সকাল সাতটা থেকে রাত্রি নয়টা অবধি এই দীর্ঘ সময়ের একটি মুহূর্ত্তও এমন নেই, যখন তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজন, সমাজ-সংসার, দশের বা নিজের কোনও প্রয়োজনের জন্য কিছু ক'রতে পার। মাসিক ৩০।৪০্ টাকায় তোমার জীবনব্যাপী এই সুদীর্ঘ সময় চাকরীর পায়ে বাঁধা! এর ভেতর তোমার ধর্ম্ম নেই, সমাজ নেই, স্বাস্থ্য নেই, সুখ নেই, শান্তি নেই, লোক-লৌকিকতা, আচার-ব্যবহার, এমন কি আত্মচিন্তা দূরে থাক, ঈশ্বর-চিন্তারও অবসর নেই! নিশা যাপনের জন্য বাড়ীতে কেবল-মাত্র কয়েকঘণ্টা অবস্থান। অবলম্বন স্ত্রী, তাও রুগ্না, ক্লিষ্টা, অত্যধিক শ্রমকাতরা, অর্দ্ধাশনা, তিন চারিটি কচিকাচার মা; পেটে খাওয়া নেই, চোখে ঘুম নেই সারারাত ওঠ্-বোস্; কেউ হাগ্‌ছে, কেউ মুত্‌ছে, কেউ জল খাচ্ছে, কেউ অনর্থক বায়না নিয়ে কাঁদ্‌ছে, আর ছোট খুকীর ত দুধ-তোলা সারারাত লেগেই আছে! প্রদীপে তেল নেই, মলিন শয্যায় শিশুর মূত্রের তীব্রগন্ধ-সম্পৃক্ত রুদ্ধ বাতাসে কেরাণীর নিশা-যাপন!

"——হ'ল, রজনীবাবু? না তোমার জন্য সারারাত এখানে ব'সে থাকব ? যাক্ এখন রাখুন, কাল রবিবার, বেরিয়ে ঠিক ক'রে দিয়ে যাবেন। আমি আর বস্‌তে পারি নি, আট্‌টা বাজ্‌লো।" বড়বাবুর কর্কশ কণ্ঠস্বরে তার চমক ভাঙ্গলো। সে ভাব্‌তে ভাব্‌তে অনেক দূর গিয়ে পড়েছিল; কোথায় লৌহ-বেষ্টনির মধ্যে আফিসের গারদ, আর কোথায় বাংলার অন্তঃপুরে স্নেহ ভালবাসার সুখ-বেষ্টনে পত্নীপুত্রের সুখচ্ছবি!

যখন সে জন্মেছিল, কত আশা আনন্দের মধ্যে যখন একটু একটু ক'রে বাপমার চোখের উপর বড় হ'ল, তখন কত উল্লাস-তরঙ্গ! বাপ-মা কত কষ্টের পয়সা খরচ ক'রে, কত মুখের গ্রাস নিজেরা না খেয়ে তাকে খাইয়েছেন; ভবিষ্য ভালোর কত সুখচিত্র তাঁদের

সূর্য-দীপ্ত ক'রতো। বাবা ব'লতেন, ছেলে মহাপুরুষ হবে; মা ব'লতেন হাকিম হবে, গণকে ব'লতো রাজা হবে। হয়েছে কিন্তু সে একটা আস্ত কেরাণী। কঠোর সত্য! দু' ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া হিসাবের খাতার উপর পড়িল। বেহারা হাঁকিল, "উঠিয়ে বাবু, দরোয়াজা বন্ধ করেগা।"

৪

আরদালী বাবুরা হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর, বুকের রক্ত জল ক'রে বাড়ী ফিরছেন—বারো ঘণ্টা পরে।

রজনী তমোময়ী। কোম্পানীর গাড়ী তাদের নামিয়ে দিয়ে, পেট খালি ক'রে, হুস হুস শব্দে, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চলে গেল। বাবুরা পদব্রজে চলেছেন ঠোক্কর খেতে খেতে, আর মনে মনে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের মুণ্ডপাত ক'রতে ক'রতে। সারবন্দী চলেছেন,—শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে, অবিরামগতিতে; একের পিছনে আর একটী—আরবের মরুভূমিতে ভারবাহী উষ্ট্র-যুথের ন্যায় চলেছেন। পেটে ভাত নেই, দেহে বল নেই, মনে উৎসাহ নেই, মুখে ভাষা নেই,—অথচ চলেছেন!

বাড়ীতে পা দিয়েই রজনীকান্ত শুনিল, খোকার প্রবল জ্বর, অথচ সারাদিন ঔষধ পড়েনি; বড় ছেলেটা বিশ্বাস-বাবুদের বাড়ী থিয়েটারে মেতেছে, সারাদিনই বাড়ী আসে নি। ক্ষণিক রাগের উত্তেজনায় সে তখনই ডাক্তারের উদ্দেশে ছুটে চলে গেল। বৃথাই বুড়ো মায়ের আহ্বান পশ্চাতে প্রতিধ্বনি তুলতে লাগলো "হাতে-মুখে জল দিয়ে যা বাবা! রজনী ও রজু, রজু!"

* * *

উত্তেজনার পর অবসাদ আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়াছে। রাত্রি সাড়ে নয়টা; ডাক্তার পায় নাই। একে সমস্ত দিনের ক্লান্তি, তার উপর মানসিক অশান্তি, গৃহে শিশু-পুত্রের অসুখ,—বিচলিত-মস্তিষ্ক রজনীকান্ত কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া সেই অন্ধকারের মধ্যে বার-কতক এ-রাস্তায় ও-রাস্তায় বৃথা ঘোরাঘুরি করিয়া স্থির করিল হেষ্টিং মিলের ডাক্তারকেই ডাকিয়া আনিবে, হোক ক্যাম্বেল-পাশ। সারা রাতটা এমনি যাইবে? জ্বর-তপ্ত শীর্ণ শিশুর পার্শ্বে সেবানিরতা পত্নীর পাণ্ডুর মুখখানি তার স্মৃতিপথে আসিয়া উঠিল। রজনীকান্ত ছুটিল, কারণ থানার ঘড়ীতে দশটার ঘা দিতেছে।

গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের দু'ধারে প্রকাণ্ড বটের শ্রেণী দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া তমোময়ী রজনীর গভীরতা আরও বাড়াইতে-ছিল; কোলের মানুষ দেখা যায় না। রজনীকান্ত কলের 'সাইডিং'এর পাতা রেলের বিষম ঠোক্কর খাইয়া ছিটকাইয়া পড়িল। অকস্মাৎ ভোঁ ভোঁ শব্দ। চারিদিক্ বিজলী-আলোয় উদ্ভাসিত করিয়া সাহেবদের শনিবারের হাওয়ার গাড়ী হাওয়ায় উড়িতে-উড়িতে ভোঁ ভোঁ শব্দে আসিয়া পড়িল। বেচারা রজনীকান্ত ভীত, চকিত, ত্রস্ত! তীব্র আলোকে চক্ষু ঝলসাইয়া গেল, পা নড়িল না, দেহ একেবারে অনড় অসাড়। "হটো, হটো, হট্ যাও" সবেগে গাড়ী তাহার উপর আসিয়া পড়িল। রজনীকান্ত ধূলায় মিশাইয়া গেল! সখেদে গাড়ীর বাঁশীটি 'ওঃ, ওঃ' করিয়া উঠিল; বটবৃক্ষশিরে, একটা কাল পেঁচা কর্কশ কণ্ঠে চীৎকার করিল, 'আঃ হাঃ হাঃ' ত্রিযামা রজনীর নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া প্রতিধ্বনি বলিল 'আহা! আহা! আহা!'

* * *

পরদিন অতি প্রত্যূষে রজনীর গুণধর পুত্র শ্রীমান অনিলকুমার থিয়েটার করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। তখনও তাহার মুখে পেণ্টের রং, পায়ে আল্‌তা। বাড়ীর কাছে মোড় ফিরিতেই বাধা পাইল। সম্মুখেই কয়জন প্রতিবেশী ও পিতৃবন্ধুর চক্ষু অশ্রু-সজল; অনিলকুমার জিজ্ঞাসা করিল 'কি হয়েছে কাকা?' একজন উত্তর দিল, "তোর বাবা কাল রাত্তিরে মটর-চাপা প'ড়েছিল; এই একটু আগে খবর পেয়ে মিলের হাসপাতাল থেকে মৃতদেহ বাড়ী আনা হয়েছে।"

সোমবার। বেলা দশটা দশ মিনিট। হাজিরা বই হাতে বড়বাবু সমাসীন।—"এ কি, রজনীবাবু এখনও আসে নি! ষ্টুপিডকে নিয়ে জ্বালাতন! রোজ লেট, রোজ লেট!" পিছন হইতে একজন নিম্নকণ্ঠে বলিল,—"রজনী-বাবু শনিবার রাত্তিরে মারা গেছেন!"

—"শনিবার রাত্তিরে? মারা গেছে? বল কি? তবে ক্যাস বই মিলিয়ে যায় নি? অ্যাঁ! তা হ'লে আমায় মেরে গেছে!"

সম্পাদকের বৈঠক

প্রশ্ন

১। আধুনিক হার্ম্মোনিয়াম্ যন্ত্রের উদ্ভাবক কে? তাঁহার জীবিত কাল কোন্ শতাব্দী? এই যন্ত্রের উদ্ভাবন কিরূপ? সঙ্গীত শাস্ত্রে সমধিক উন্নত, প্রাচীন ভারতবর্ষে, এই জাতীয় কোন যন্ত্র ছিল কি না? এদেশে হার্ম্মোনিয়াম্ কবে আসিল? শ্রীনন্দনন্দন ব্রহ্মচারী

২। কৃত্তিবাসী রামায়ণ হইতে আমরা নিঃসংশয়িতরূপেই জানিতাম যে ভরতই লক্ষ্মণ অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। কিন্তু কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে আমরা ইহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মতও পাইয়া থাকি। আদি কবি বাল্মীকি ভরতকেই বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি হইতে ইঁহাদের জন্মপ্রকরণ আলোচনা করিলেই আমরা তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারি।

"ভরতো নাম কৈকেয্যাং জজ্ঞে সত্যপরাক্রমঃ।
সাক্ষাদ্বিষ্ণোশ্চতুর্ভাগঃ সর্ব্বৈঃ সমুদিতো গুণৈঃ॥
অথ লক্ষ্মণশত্রুঘ্নৌ সুমিত্রাঽজনয়ৎ সুতৌ।
বীরৌ সর্ব্বাস্ত্রকুশলৌ বিষ্ণোরর্দ্ধ সমন্বিতৌ॥
পুষ্যে জাতস্তু ভরতো মীনলগ্নে প্রসন্নধীঃ।
সর্পে জাতৌ তু সৌমিত্রী কুলীরেঽভ্যুদিতেঽরবৌ॥"

রামায়ণ, আদি, ১৮ সর্গ। শ্লোক, ১৩—১৫

কিন্তু কালিদাস লক্ষ্মণকেই জ্যেষ্ঠের পদ দিয়াছেন। নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটী হইতে আমরা তাহার স্পষ্ট আভাস পাই—

"পার্থিবীমুদবহদ্ রঘূদ্বহো লক্ষ্মণস্তদনুজামথোর্ম্মিলাম্।
যৌ তয়োরবরজৌ বরোজসৌ তৌ কুশধ্বজ সুতেসুমধ্যমে॥"

রঘু, ১১সর্গ, শ্লোক ৫৪

"সৌমিত্রিণা তদনু সংসসৃজে স চৈনম্
উৎথাপ্য নম্রশিরসং ভৃশমালিলিঙ্গ।
রূঢ়েন্দ্রজিৎ প্রহরণ ব্রণকর্কশেন
ক্লিশ্যন্নিবাস্য ভুজমধ্যমুরঃস্থলেন।" রঘু, ১৩সর্গ, শ্লোক ৭৩

আবার উত্তররামচরিতে কবি ভবভূতি ভরতকেই জ্যেষ্ঠ বলিয়াছেন। চিত্রদর্শনে লক্ষ্মণ সীতাকে, সীতা, মাণ্ডবী, ও শ্রুতকীর্ত্তির আলেখ্য দেখাইয়া বলিতেছেন,—

'ইয়মার্য্যা, ইয়মপি আর্য্যা মাণ্ডবী, ইয়মপি বধূঃশ্রুতকীর্ত্তিঃ।'

উত্তররামচরিত প্রথম অঙ্ক।

সুতরাং এখানে মাণ্ডবীকে 'আর্য্যা' বলাতে ভরতের বয়োজ্যেষ্ঠত্বই নিঃসংশয়রূপে প্রমাণ হইতেছে।

এখন, আমাদের শ্রেষ্ঠ বিশ্বাসস্থল এই তিনজন মহাকবির মধ্যেই পরস্পর মতভেদ! কিন্তু মতের এইরূপ সম্পূর্ণ বিসমতায় জন্য কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব। এ ক্ষেত্রে আমরা ভরত ও লক্ষ্মণের মধ্যে কাহাকে বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া মানিয়া লইব? ইহার মীমাংসাই বা কি? শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বাক্‌চি

৩। Petrol ও Kerosine Lightএর 'Mantle' কোন্ জিনিষ হইতে তৈয়ারি? উহা কি ভারতবর্ষে পাওয়া যায়? ঘরে তৈয়ার করিবার কি কোন উপায় নাই?

শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায়

৪। দেবমন্দিরে, তুলসীতলায় ও পূজাদির সময়ে পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণ মুখ করিয়া প্রদীপ দেওয়া হয়; কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে উত্তর দিকে দেবলোক নির্দ্দেশ থাকা সত্ত্বেও উত্তর মুখ করিয়া প্রদীপ দানের প্রথা নাই। ইহার শাস্ত্রসিদ্ধ কারণ কি?

৫। প্রসিদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ 'ক্রিয়াযোগ সার'-প্রণেতা অনন্তরাম দত্তের নিবাস কোথায় ছিল?

শ্রীদিগেন্দ্রনাথ পালিত

৬। ভারতে কোথাও মৎস্যের চাষ শিক্ষার বন্দোবস্ত (Agricultural, Industrial, Mining College বা Institute) আছে কি না, যেখানে উত্তম শিক্ষা দেওয়া হয়, অথচ ছাত্রদের ভর্ত্তি হইতে কোন প্রকার University Qualification দরকার হয় না? সে স্থান হইতে শিক্ষালাভ করিয়া ছাত্রেরা কতটুকু উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হইবে? সে স্থান কোথায়, কি নিয়মে শিক্ষা দেওয়া হয়, কি কি পাঠ্য, প্রভৃতি সবিস্তারে জানাইবেন।

শ্রীপ্রাণতোষ রায়

৭। মাখন ও ঘি কিপ্রকারে বেশী দিন রাখা যায়?

শ্রীএইচ বসু

৮। অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে কোনও কোনও কলাগাছ 'ফুলিবার' কিছুদিন পূর্ব্বে মরিয়া যায়। এইরূপ কলাগাছের যে চারা উত্থিত হয় তাহাতেও কদাপি কলা হয় না। 'ছোপকে ছোপ' নষ্ট হইয়া যায়। চলতি ভাষায় ইহাকে 'আইত্যা-মরা' বলে। কলাগাছের এইরূপ দোষ নিবারণ করা যায় কিরূপে?

৯। কাপড় হইতে কলার কষ, গাবের কষ ও আলকাতরার দাগ উঠান যায় কিরূপে?

১০। বল্লাল সেনের রাজত্বের পূর্ব্বে আর কোনও রাজবংশ বিক্রমপুরে রাজত্ব করিয়াছে কি না? বিক্রমপুর নামটীর সঙ্গে বিক্রমাদিত্যের কোনও সম্বন্ধ আছে কি না? বিক্রমপুর নামটীর ইতিহাস কি?

শ্রীকিরণচন্দ্র সেনগুপ্ত

১১। ১৫৮০ হইতে ১৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ময়ূরভঞ্জের রাজাগণের নাম জানা আবশ্যক। কেহ অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইলে বাধিত হইব। ঐ সময়ের মধ্যে ময়ূরভঞ্জের কোনও রাজা বা "রাউৎরাও ভঞ্জের

(রাজভ্রাতা ও যুবরাজ) নাম সূর্য্যভঞ্জ ছিল কি না? খৃষ্টাব্দ হিসাবে কোন্ সময়ে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন? আমি Imperial Libraryতে এ সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারি নাই। Gagetteer of the Feudatory States of Orissaতে ময়ূরভঞ্জের সমস্ত রাজার নাম পাই নাই। ময়ূরভঞ্জের মহারাজা বাহাদুরের রাজকীয় লাইব্রেরীতে ("ডায়মণ্ড লাইব্রেরীতে") অনুসন্ধান করিয়া এবং প্রাইভেট সেক্রেটারি মহাশয়ের দ্বারা মহারাজা বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোনও সন্ধান পাইতে পারি নাই। এ সম্বন্ধে দয়া করিয়া কেহ সংবাদ জানাইলে একটা ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধানে সাহায্য করা হইবে।

১২। সাগু (Sago Palm—Cycas Revoluta) গাছের মজ্জার পালো হইতে সাগুদানা প্রস্তুত হয়। উহা বাহির করিবার প্রক্রিয়া কি? গাছের কিরূপ অবস্থায় মজ্জা গ্রহণীয়?—প্রতি গাছে কত পরিমাণ সাগু হইতে পারে?

১৩। খদ্দরের কাপড়ের পাড়ে যে স্থায়ী কাল রংএর ছাপ দেওয়া হইতেছে—(যাহা পূর্ব্বে বৃন্দাবনি কাপড়ে ব্যবহৃত হইত) ঐ রং কোথায় প্রাপ্তব্য বা উহা প্রস্তুত করিবার উপায় কি? ঐ কার্য্যে ব্যবহৃত কাঠের ছাপ কোথায় পাওয়া যায়?

১৩। নিম্নবঙ্গে জিরার চাষ করিবার উপায় কি? আমি গয়া জেলার কোনও বন্ধুর নিকট হইতে বীজ জিরা আনিয়া বপন করিয়াছিলাম,—অসংখ্য চারা উৎপন্ন হইয়াছিল কিন্তু ফল অত্যন্ত কম হইয়াছিল। জিরা চাষ সম্বন্ধে কেহ তাঁহার অভিজ্ঞতা জানাইলে বাধিত হইব। শ্রীমহেন্দ্রনাথ করণ

১৪। "ছুলি"র দাগ একেবারে নির্ম্মূল হইয়া উঠিয়া যায়, এমন কোন ঔষধ আছে কি? দুই এক প্রকার ঔষধ ব্যবহার করিলে কিঞ্চিৎ উপশম হয় মাত্র; একেবারে নির্ম্মূল হয় না।

১৫। হিন্দুগণ কোন তীর্থে গমন করিলে পর, তত্রস্থ প্রধান দেবতার নামে কোন এক প্রকার ফল উৎসর্গ করিয়া আসেন, এবং জীবনে আর কখনও সে ফল আহার করেন না। ইহা কি কেবল ত্যাগেরই নিদর্শন? এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় কারণ কি?

শ্রীবিষ্ণুপদ দে

১৬। এণ্ডি পোকা গুটী হইতে প্রজাপতিরূপে বাহির হইলে কত দিন বাঁচে, এবং প্রজাপতি হইলে তাহাদের আহারীয় দ্রব্য কি? একবার ডিম দিলে আর তাহারা ডিম দেয় কি না এবং তখন তাহাদের কি ভাবে রাখিতে হয়? শ্রীপ্রফুল্ললতা ঘোষ

১৭। হাজা কিসে ভাল হয়? সচরাচর জল ঘাঁটিলে যে হাজা হয় ইহা সে জাতীয় হাজা নহে; ইহাকে শুক্না হাজা বলে। প্রায় ১।১২ বৎসরের পুরাতন। যদি কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ইহার ঔষধ জানেন তবে অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব।

১৮। মুখে মেচেতা পড়িলে, বিশেষ শিশুদের কোমল মুখে, উঠাইবার উপায় কি? ছুলি ও আঁচিল তুলিবার সহজ উপায় যদি কেহ জানেন তবে অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন।

১৯। হার্নিয়া হইলে ট্রাশ ব্যবহার না করিয়া অন্য কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে রোগ শীঘ্র কাটিয়া যায়?

২০। মোটা হইলে রোগা হইবার উপায় কি? এবং রোগা হইলে মোটা হইবারই বা সহজ উপায় কি?

শ্রীপ্রমদাকান্ত বসুচৌধুরী

উত্তর

পোড়া দাগ

দগ্ধ স্থানে মাখন নিয়মিত ঘষিয়া ঘষিয়া দিলে সাদা দাগ সারিয়া যায়।

চুলের আগা

চুলের আগা চিরিয়া গেলে আগা একটু কাটিয়া দিতে হয়।

শ্রীউষারাণী ঘোষ

লক্ষ্মী দেবী

লক্ষ্মী ভৃগুর কন্যা ও দেবদেব নারায়ণের পত্নী। ইনি খ্যাতির গর্ভে উৎপন্না।

"দেবৌ ধাতাবিধাতারৌ ভৃগোঃ খ্যাতিরসূয়ত।
শ্রিয়ঞ্চ দেবদেবস্য পত্নী নারায়ণস্য যা॥"

শ্রীঅতুল্যচরণ ঘোষ

যুগ-পরিচয়

সত্যযুগ গত হইলে ত্রেতা যুগেরই আবির্ভাব, ইহাই পৌরাণিক প্রমাণ স্বরূপ। পরন্তু, সত্যযুগের পর যে দ্বাপর যুগ আসিবার কথা ছিল এ কথা এই নূতন শুনিতেছি।

"দিব্যৈর্ব্বর্ষসহস্রৈস্তু কৃতত্রেতাদিসংজ্ঞিতম্।
চতুর্যুগং দ্বাদশভিস্তদ্বিভাগং নিবোধমে॥"

উক্ত শ্লোকে দেখিতে পাই যে, পরে-পরে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ সমূহের আবির্ভাব ও যথাক্রমে মনুষ্য পরিমাণে ১৭২৮০০০ ১২৯৬০০০, ৮৬৪০০০ ও ৪৩২০০০ বৎসর স্থায়ী।

শ্রীঅতুলচরণ ঘোষ

আরশোলার উপদ্রব নিবারণের উপায়

গৃহে অধিক সংখ্যায় ন্যাপথলিন রাখিলে আরসুলা বা তেলাপোকার উপদ্রব হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। আমাদের গৃহে একবার আরসুলার উপদ্রব হইয়াছিল; তাহাতে ন্যাপথলিন দ্বারা ফল পাইয়াছি। ন্যাপথালিন অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ—খুব সাবধানে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

শ্রীবিভূতিশেখর মজুমদার বি, এ

গোলাপ গাছের পোকা ও তাহার প্রতিকার

যে সমস্ত পোকা গোলাপ গাছ নষ্ট করে, তাদের greenfly এবং Caterpillar বলে। এরা সচরাচর ফুলের পাপড়ির চারিদিকে দল বেঁধে থাকে; এবং নূতন পল্লব ও পাতাগুলি খেয়ে গাছের বড়ই ক্ষতি করে। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত উপায়ে এর প্রতিকার করা যেতে পারে।

৪ আউন্স (আধপোয়া) quassia chips ১ গ্যালন (সাড়ে তিন সের) জলে ১০।১৫ মিনিট ফুটাইয়ে নিতে হয়। তারপর সেই জল বেশ করে ছেঁকে তার সঙ্গে আবার ১ গ্যালন জল মিশিয়ে নিয়ে তার মধ্যে ৪ আউন্স পরিমাণ নরম সাবান গুলে নিতে হয়। কেবল মাত্র সকালে অথবা সন্ধ্যায় অর্থাৎ সূর্য্য যখন না থাকে তখন এই Solution দিয়ে গাছে পিচ্‌কারী করলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

শ্রীপ্রমোদনাথ আচার্য্য

পোড়া দাগ

শরীরের কোন স্থান দগ্ধ হইবার পর বা কাটিয়া যাইবার পর আরোগ্য হইলে একটা সাদা দাগ থাকিয়া যায়। ঐ সাদা দাগ চামড়া নয়; উহা Cicatricial fibrous tissue. যদি ফাইব্রোলাইসিন্ (Fibrolysin, which consists of thiosinamin and Sodii Salicylas in Solution) ইনজেক্‌সন্ করা হয় ত উক্ত দাগ মিলাইয়া যাইতে পারে।

—শ্রীচৈতন্য।

টাকের ঔষধ

অকালে শিশুদের মাথায় টাক পড়িলে, ঝুমকো জবা ফুলের কতকগুলি পাতা ও কিঞ্চিৎ কাশীর চিনি একত্রে হাতের তালুতে রগড়াইয়া তাহা হইতে রস বাহির করিবেন। পাতাগুলি হইতে যখন রস নির্গত হইতে দেখিবেন তখন তাহা টাকের উপর ৩।৪ মিনিট কাল ঘসিতে থাকিবেন। দিবসে ঐরূপ ৩।৪ বার করিলে ৪।৫ দিনের মধ্যে টাকে চুল গজাইবে।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আমাদের (হিন্দুদের) স্ত্রীলোকগণের ধারণা যে আমাদের অলক্ষ্যে গৃহলক্ষ্মী আমাদের গৃহে যাতায়াত করেন। সেই জন্য চৌকাঠে বসিতে নিষেধ। শীল ষষ্ঠী ও তাঁহার পূজা হইয়া থাকে, সেই হেতু তাহার উপর বসিতে নাই। ঢেঁকি দেবর্ষি নারদের বাহন এবং তাহার বিশ্রাম সময় খুবই অল্প, সেই জন্য তাহার উপর বসিতে নিষেধ।"

"পাতি ডুমুরের পাতার উল্টা দিক টাক বিশিষ্ট স্থানে ২।৩ দিন ঘষিয়া দিলে ভাল হয়। মাথার চুল পাতলা বা টাক ধরিবার উপক্রম হইলে ক্যান্‌থার আইডিন তৈল ব্যবহার করিলে ভাল হয়।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বারোমেসে কাগজী লেবুর গাছে ফল উৎপাদন

এই মহার্ঘ্যতার দিনে বারোমাস যাহাতে কাগজী লেবুর টাটকা রস খাইতে পারা যায়, তাহার একটী অতি সহজ প্রক্রিয়া নিম্নে লিখিলাম। ঐ প্রক্রিয়ায় আমি তিন বৎসর হইতে প্রতিদিনই লেবু খাইয়া থাকি।

২।৩টী শাখা আছে এরূপ সতেজ কাগজীর কলম এরূপ স্থানে বসাইতে হইবে যে, সব সময়ে রোদ এবং বাতাস পায়। যখন দেখা যাইবে যে ৮।১০টী শাখা বাহির হইয়া গাছটী ক্রমশই বড় হইতেছে, তখন প্রতি মাসের ২৫শে তারিখে গাছের গোড়ায় অন্ততঃ আট আঙ্গুলী ফাঁক রাখিয়া তাহার চারিদিকে টাটকা গোবরের ৮।১০ ইঞ্চি পুরু একটী গোলাকার বেষ্টনী দিতে হইবে। প্রতিমাসের ২৫ তারিখে মাত্র একদিন ঐরূপ প্রক্রিয়া ঠিক বারোমাসই করিতে হইবে। ৫।৭ দিন অন্তর গাছের গোড়ায় জল দিতে হইবে এবং বৈশাখ হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত তুলসী গাছে যেমন জলের ঝারা দেয়, ঐরূপ ভাবে ৮।১০ দিন ঝারা দিতে হইবে তাহা হইলেই বারোমাস কাগজী হইতে থাকিবে। মাঝে-মাঝে মশা ও মাকড়সার বাসা ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র সরকার

নাটা করঞ্জ বনাম দেশী কুইনাইন

বিগত ইউরোপীয় মহা সময়ের পর হইতে অনেক জিনিষের মূল্যই ত্রিগুণ চতুর্গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। বিলাতী ঔষধের মূল্যের তো কথাই নাই। পূর্ব্বে পোষ্টাফিসে কুইনাইনের চাক্‌তি পূর্ণ নল চারি আনা মূল্যে পাওয়া যাইত, এখন তাহার মূল্য দ্বিগুণ হইয়াছে। গবেষণা-কুশল, বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ স্থির করিয়াছেন যে, কুইনাইন একমাত্র ম্যালেরিয়া বিষনাশের অমোঘ মহৌষধ। বাস্তবিক পক্ষে পরীক্ষা দ্বারাও দেখা যায় যে কুইনাইনের কাছেই ম্যালেরিয়া রাক্ষসী হার মানে।

কুইনাইন, ম্যালেরিয়ার অব্যর্থ মহৌষধ বটে, কিন্তু উহার মূল্য যেরূপ বাড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে গরীব গৃহস্থের পক্ষে বিশুদ্ধ কুইনাইন ব্যবহার করা অতি দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে।

নাটা করঞ্জের ফলের শাঁস রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা বিশোধন করিয়া কুইনাইনের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যায় কি না, তাহা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রমুখ রসায়নতত্ত্বজ্ঞগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন কিনা জানি না। যদি না করিয়া থাকেন, তবে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ভাল হয়। যদি পরীক্ষা সফল হয়, তবে এই গরীব দেশের বিশেষ উপকার হইতে পারে। কোনো কোনো গ্রাম্য চিকিৎসকের নিকট শুনিয়াছি, নাটার শাঁস কুইনাইনের মত কাজ করে। আমি নিজেও কোন চিকিৎসককে একটী জ্বরের ঔষধের তালিকা দিয়াছিলাম। উহাতে নাটার শাঁস ছিল। চিকিৎসক ঔষধটি তাঁহার রোগীদের উপর ব্যবহারে বিশেষ ফল পাইয়াছেন বলিয়া আমার নিকট স্বীকার করিয়াছিলেন। আমারও ধারণা যে নাটার শাঁস কুইনাইনের মত উপকারী হইতে পারে। বঙ্গদেশের অনেক স্থলে বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গে রঙ্গপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি জিলায় বন জঙ্গলে, রাস্তা ঘাটে, প্রকৃতি দেবীর ক্রোড়ে প্রচুর পরিমাণ নাটা করঞ্জ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার চাষ করিতেও বোধ হয় বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হইবে না। সিন্‌কোনার উচ্চতম পরিণতি যেমন কুইনাইন সেইরূপ নাটার শাঁসকে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা কুইনাইনের সমগুণে পরিণত করিতে পারিলে, আবিষ্কর্তার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষলাভ এবং অপরের জীবন রক্ষা হইতে পারে।

আরও এক রকম চারা গাছের ডগার রস কুইনাইনের মত জ্বর প্রতিষেধক এই কথা শুনা গিয়াছে। এই চারা গাছও বঙ্গের অনেক স্থলেই বহুল পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ইহার নাম ভাঁটু। বিজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞ চিকিৎসকগণের পরীক্ষা প্রার্থনা।

শ্রীরামদুলাল বিদ্যানিধি

ইঙ্গিত

শ্রীবিশ্বকর্ম্মা

ধাতুশিল্প

আপনাদের অনুমতি পাইলে আজ একটু ঘরকন্নার কথার আলোচনা করিব,—শুনিবেন কি?

কয়েক বৎসর হইতে এদেশে এ্যালুমিনিয়মের বাসনের বেশ চলন হইয়াছে,—পিতল-কাঁসার বাসনের স্থলে এখন অনেক গৃহেই এ্যালুমিনিয়মের বাসন যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু একটা অসুবিধাও উপস্থিত হইয়াছে। পিতল-কাঁসার বাসন ব্যবহারে ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে, কিম্বা দৈবাৎ ভাঙ্গিয়া গেলে, একেবারে লোকসান হয় না। পুরাতন পিতল-কাঁসার বাসন ক্ষয় পাইয়া বা ভাঙ্গিয়া অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িলে, অন্ততঃ সেগুলা বাসনের দোকানে বিক্রয় করা চলে, এবং কিছু পাওয়াও যায়। ভাঙ্গা বাসন যদি যোড়াতাড়া দিয়া লইয়া আবার ব্যবহারের সুযোগ থাকে, তবে যোড়াতাড়া দিবারও উপায় আছে। পুরাতন ঘটিবাটী-মেরামতকারীরা ঝাল দিয়া ভাঙ্গা বাসন কাজ-চালানো গোছ যুড়িয়া দিয়া থাকে। এ্যালুমিনিয়মের বাসনের এই সুবিধাটুকু নাই। ইহাতে গৃহস্থের বড় লোকসান বোধ হয়। শুনিয়াছি, পুরাতন এ্যালুমিনিয়মের বাসন বিক্রী করে চলে। এ্যালুমিনিয়মের বাসনের ব্যবসা যাহারা করে, তাহারা বিজ্ঞাপনে ঐ কথার প্রচার করে দেখিয়াছি। দুই-একজন দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি, তাহারা পুরাতন এ্যালুমিনিয়মের বাসন কিনিতে প্রস্তুত আছে বটে, কিন্তু যে দাম দিতে চায়, তাহাতে ঐ বাসন বিক্রয় করিতে গৃহস্থের উৎসাহ হয় না। দোকান-দাররা যদি নূতন বাসনের মূল্য লয় প্রতি সের দশটাকা হিসাবে, তবে পুরাতন বাসনের মূল্য দিবে প্রতি সের এক টাকা করিয়া। এ্যালুমিনিয়মের বাসন এত হাল্‌কা যে, ঐ দামে বিক্রয় করিয়া প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। আর যে সব ফেরিওয়ালা এ্যালুমিনিয়মের বাসন ফেরী করিয়া বিক্রয় করে, তাহারা পুরাতন বাসন আদৌ লইতে চায় না। এ দিকে পুরাতন পিতল-কাঁসার বাসন-মেরামত-কারীরা এ্যালুমিনিয়মের বাসন মেরামত করিতে পারে না; উহার ঝালাইবার মশলা কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহাও জানে না। পিতল-কাঁসার বাসন ঝালাইবার মসলায় এ্যালুমিনিয়মের বাসন ঝালানো যায় না। সে চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি; কিন্তু তাহা হয় না। সম্প্রতি আমি একখানি পুস্তকে দেখিলাম, ফরাসী দেশে এ্যালুমিনিয়মের বাসন ঝাল দিবার মসলা প্রস্তুত হইয়াছে। ফরাসীরা যে পাঁচ প্রকার ঝালাইবার মসলা প্রস্তুত করিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটিরই উপাদান দস্তা, তাম্র ও এ্যালু-মিনিয়ম—ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে মিশ্রিত। সে অনুপাতগুলি ওজন হিসাবে এইরূপ—

১। দস্তা ৮০ ভাগ, তাম্র ৮ ভাগ, এ্যালুমিনিয়ম ১২ ভাগ
২। দস্তা ৮৫ ভাগ, তাম্র ৬ ভাগ, এ্যালুমিনিয়ম ৯ ভাগ
৩। দস্তা ৮৮ ভাগ, তাম্র ৫ ভাগ, এ্যালুমিনিয়ম ৭ ভাগ
৪। দস্তা ৯০ ভাগ, তাম্র ৪ ভাগ, এ্যালুমিনিয়ম ৬ ভাগ
৫। দস্তা ৯৪ ভাগ, তাম্র ২ ভাগ, এ্যালুমিনিয়ম ৪ ভাগ

প্রথমে তাম্র গলাইয়া তাহার সহিত এ্যালুমিনিয়মের অংশটুকু তিন-চার বারে মিশাইতে হইবে। সর্ব্ব শেষে দস্তা মিশাইতে হইবে। কারণ, তাম্র গলাইতে যে পরিমাণ তাপ যতক্ষণ ধরিয়া প্রয়োগ করিতে হয়, দস্তা গলাইতে তদপেক্ষা কম তাপ কম সময় প্রয়োগ করিতে হয়। দস্তা বেশী ক্ষণ আগুণের উপর থাকিলে তাহার কিয়দংশ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবে; সুতরাং অনুপাত ঠিক থাকিবে না। তামার সঙ্গে এ্যালুমিনিয়ম মিশাইবার সময় একটা লোহার কাটি দিয়া দুইটা জিনিস উত্তম রূপে নাড়িতে হইবে; নচেৎ মিশ্রণ ভাল হইবে না। কেন না, তামা ও এ্যালুমিনিয়মের ঘনত্ব (density) সমান নহে। এ্যালু-মিনিয়মের শেষ অংশটুকু দিবার অব্যবহিত পরেই সবটুকু দস্তা দিতে হইবে। অমনি সঙ্গে-সঙ্গে কিছু চর্ব্বি বা রজন দ্রবীভূত মিশ্রণে নিক্ষেপ করিয়া উত্তম রূপে নাড়িয়া দিতে

হইবে। তাহা হইলে তিনটি জিনিস উত্তম রূপে মিলিত হইয়া যাইবে। এবং যত শীঘ্র সম্ভব, মিশ্রধাতুটিকে আগুন হইতে নামাইয়া, লোহার ছাঁচে ঢালিয়া ফেলিতে হইবে। তৎপূর্ব্বে লোহার ছাঁচটিতে কিছু কয়লার তৈল বা বেন-জাইন মাথাইয়া রাখিতে হইবে। দস্তা মিশাইবার পর কাজটি যত শীঘ্র সম্ভব শেষ করিয়া ফেলিতে হইবে। নহিলে মিশ্রণটি ঠিক কাজের উপযুক্ত হইবে না। দস্তাটি খুব বিশুদ্ধ হওয়া দরকার; উহাতে যেন লৌহের অংশ আদৌ না থাকে। মিশ্রণের সঙ্গে চর্ব্বি বা রজন দিবার কারণ এই যে, দ্রবীভূত দস্তা বড় শীঘ্র বায়ু হইতে অম্লজান আকর্ষণ করিয়া রূপান্তরিত হইয়া যায়।

এই ঝালাইবার মশলাটি তৈয়ার করিতে পারিলে গৃহস্থের যে অনেকটা সুবিধা হইতে পারে, এবং লোকসান নিবারিত হইতে পারে, তাহা বলাই বাহুল্য। এইখানে একটু সতর্ক করিতেছি যে, যাঁহারা ধাতুদ্রব্য ঢালাইবার কাজ করেন, সেইরূপ অভ্যস্ত ও অভিজ্ঞ লোকেরাই যেন এই মশলা তৈয়ার করেন। আনাড়ী লোকে করিতে গেলে, হয় ত বিপদাপদ হইতে পারে। এই উপায়ে পুরাতন এ্যালুমিনিয়মের বাসনের কতকটা ঝালাইয়ের মসলা নির্ম্মাণের কার্য্যে লাগিবে। অর্থাৎ যে বাসন ঝালাইয়া লইয়াও ব্যবহার করা যাইবে না এমন ভাবে অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে, এই রকম বাসন হইতেই ঝালাইবার মসলা প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে। বাকী বাসনগুলি মেরামত করিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারিবে।

এ্যালুমিনিয়মের বাসন ক্ষয় পাইয়া বা ভাঙ্গিয়া অব্যব-হার্য্য হইয়া পড়িলে গৃহস্থের যে ক্ষতি হয়, তাহা আর একটা উপায়ে নিবারিত হইতে পারে। যখন দেখা যাইবে যে, এ্যালুমিনিয়মের পুরাতন বাসন বিক্রয় করিবার সুবিধা নাই, বা বিক্রয় করিয়া লাভ নাই, এবং তাহা অন্য রূপে ব্যবহার করিবারও উপায় নাই, তখন তাহার সহিত তাম্র মিশাইয়া গলাইয়া এক প্রকার মূল্যবান মিশ্রধাতু প্রস্তুত করা যায়। তাম্র শতকরা ৮০ ভাগ হইতে ৯০ ভাগ লইয়া তৎসহ শতকরা ২০ হইতে ১০ ভাগ এ্যালু-মিনিয়ম মিশাইতে হইবে। ৯০ ভাগ তাম্র ও ১০ ভাগ এ্যালুমিনিয়মের মিশ্রণে যে মিশ্রধাতু উৎপন্ন হয়, তাহাতে গিল্‌টীর গহনা খুব উজ্জ্বল হয়। ইহার সহিত শতকরা ১ কি ২ ভাগ স্বর্ণ মিশাইলে গহনা আরও ভাল হয়। পিতল বা তামার গিল্‌টীর গহনার মত এই গিল্‌টীর গহনা তত শীঘ্র মলিন হয় না।

এই মিশ্রধাতু প্রস্তুত করিবার জন্য প্লম্বেগো নির্ম্মিত মুচি চাই। সাধারণ মুচি যেরূপে নির্ম্মিত হয়, প্লম্বেগোর মুচিও সেই রূপে প্রস্তুত করিতে হইবে। সাধারণ মুচির কয়লার গুঁড়ার পরিবর্ত্তে প্লম্বেগো ব্যবহার করিতে হইবে মাত্র। ব্রোঞ্জধাতু নির্ম্মিত পাত্রেও এই মিশ্রধাতু প্রস্তুত করা যাইতে পারে। তামা গলাইবার সময়, তাহার উপর কাঠ কয়লা চাপা দিতে হইবে; এবং তামা গলিয়া গেলে, কাঠ কয়লার ভিতর দিয়াই এ্যালুমিনিয়ম প্রয়োগ করিতে হইবে। এ্যালুমিনিয়ম গলিয়া গেলে, একটা লোহার কাটি দিয়া নাড়িয়া দিয়া মিশ্রন সম্পূর্ণ করিতে হইবে। তার পর ছাঁচে ঢালিয়া লইতে হইবে। এই মিশ্র ধাতুটিকে পুনঃ পুনঃ তিন কি চার বার গলাইয়া লইলে, ধাতু দুইটী সম্পূর্ণ রূপে মিলিয়া যাইবে।

সোণা রূপার ন্যায় এই মিশ্র ধাতুকে পিটিয়া বা দুইটী রোলারের মধ্য দিয়া চালাইয়া পাত প্রস্তুত করিয়া ডাইসের সাহায্যে নক্সা কাটিয়া গহনা প্রস্তুত করা যায়। ইহার পালিসও বেশ খোলে। শতকরা ৯৫ ভাগ তামার সঙ্গে শতকরা ৫ ভাগ এ্যালুমিনিয়ম মিশাইলে যে মিশ্র ধাতু উৎপন্ন হয়, মরা সোণার সঙ্গে তাহার পার্থক্য বেশী নয়। কষ্টিপাথরে কষিয়া না দেখিলে, সাদা চোখে এই পার্থক্য সহজে ধরা যায় না। ৭৮ ভাগ সোণার সঙ্গে ২২ ভাগ এ্যালুমিনিয়ম মিশাইয়া যে মিশ্র ধাতু উৎপন্ন হয়, তাহার বর্ণ অতি সুন্দর।

দুই ভাগ এ্যালুমিনিয়ম ও এক ভাগ রূপা মিশাইয়া বাসনের জন্য এক প্রকার উৎকৃষ্ট মিশ্র ধাতু প্রস্তুত হয়। ইহার পালিস খুব উজ্জ্বল হয়।

নকল পেপিয়ার মেশি

পেপিয়ার মেশির কথা একবার বলিয়াছি। সে সময়ে অনেকে অভিযোগ করিয়াছিলেন যে, কাগজ চূর্ণ করা অতি কঠিন ব্যাপার। সে কথা সত্য। যন্ত্রের সাহায্য ভিন্ন বেশী পরিমাণে কাগজ চূর্ণ করা সুবিধাজনক নয়। সেইজন্য পেপিয়ার মেশি লইয়া কাজ করার আশা আপাততঃ ছাড়িয়া দিতে হইতেছে। তবে আর এক উপায়ে ছেঁড়া

কাগজ ব্যবহার করা যাইতে পারে। পুরাতন ছেঁড়া খবরের কাগজ বা অন্য কাগজ কিছু সংগ্রহ করুন। এই কাগজ যেন মাজা-ঘষা (glaze করা বা ivory finish করা) না হয়। অর্থাৎ rough কাগজ হইলেই চলিবে। এই কাগজগুলিকে টুক্‌রা-টুক্‌রা করিষা ছিঁড়িয়া লউন। কাঁচি কি ছুরি দিয়া কাটিবেন না, শুধু ছিঁড়িয়া লইবেন। কাগজের টুক্‌রাগুলি দীর্ঘে-প্রস্থে দুই ইঞ্চি করিয়া হইলেই যথেষ্ট হইবে। একটু ছোট-বড় হইলেও হানি নাই। এই কাগজের টুক্‌রাগুলিকে কিছুক্ষণ জলে রাখিয়া ভিজাইয়া লউন। কাগজ ভিজিতে থাকুক, ইতোমধ্যে কিছু ময়দার কাই তৈয়ার করুন। কাই খুব ঘন না হয়, আবার জলের মত পাতলাও না হয়। ইহাতে তুঁতে দিবার দরকার নাই। যখন ময়দা সিদ্ধ হইয়া কাই তৈয়ার হইয়া আসিতেছে, এমনই সময় বরাবর তাহাতে কিছু ফটকিরি চূর্ণ দিয়া মিশাইয়া লউন।

এখন একটী বাটী কি গেলাস কিম্বা চা খাইবার ডিস কি পেয়ালা লউন। তাহার ভিতরের দিকের গায়ে ভিজা কাগজের টুক্‌রাগুলি এক-একখানি করিয়া পাশাপাশি রাখিয়া পাত্রটির ভিতরের দিকটা ঢাকিয়া ফেলুন। ভিজা কাগজ সহজেই পাত্রের গায়ে লাগিয়া যাইবে। কাগজ-গুলি এমন ভাবে পাশাপাশি রাখিবেন, যেন একটুও ফাঁক না থাকে, অথচ যেন একখানি কাগজের উপর অপর কাগজখানির অতি সামান্য অংশই পড়ে। জল হইতে কাগজ তুলিয়া রাখিবার সময় পাত্রের ভিতর যদি কিছু জল জমিয়া যায়, তাহা হইলে পাত্রটি কাত করিয়া জলটুকু ঝরাইয়া ফেলুন। পাত্রের উপর কাগজের একটী সম্পূর্ণ স্তর পড়িলে, একটী নরম ব্রাসে করিয়া আস্তে আস্তে সাবধানে ঐ কাইয়ের পাতলা এক স্তর কাগজগুলির উপর লাগাইয়া দিন—দেখিবেন, কাই মাথাইবার সময় যেন কাগজগুলি সরিয়া না যায়। তার পর উহার উপর আর একস্তর ভিজা কাগজ স্থাপন করুন, এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জল ঝরাইয়া আর এক প্রস্ত কাই মাথাইয়া দিন। এই রূপে কয়েক স্তর কাগজ ও কাই উপরি উপরি-স্থাপিত হইলে বেশ পুরু হইবে। সাত-আটটি স্তর, কিম্বা আপনার ইচ্ছামত ইহার অপেক্ষা পুরু করিতে হইলে আরও দুই-চারি স্তর কাগজ লওয়া যাইতে পারে। সর্ব্বশেষের স্তরের উপর আর কাই মাথাইবার দরকার নাই। এখন এই পাত্রটিকে উনানের পাশে কিছুক্ষণ রাখিয়া শুকাইয়া লউন। ভিজা কাগজগুলি যখন শুকাইয়া আসিবে, তখন, অর্থাৎ অল্প ভিজা থাকিতে-থাকিতেই, উহাকে ছাঁচের ভিতর হইতে বাহির করিয়া লউন। দেখিবেন, কাগজগুলি এ সময়ে বেশ যুড়িয়া গিয়াছে, এবং একটু টানিলেই বেশ সহজেই পাত্র হইতে উঠিয়া আসিবে। তখন দেখিবেন, যে আকারের পাত্র লওয়া হইয়াছিল, তাহার অবিকল নকল একটী কাগজের পাত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। এই কাগজের পাত্রটিকে রৌদ্রতাপে বা অগ্নিতাপে সম্পূর্ণ শুকাইয়া লইলে উহা খুব কঠিন ও মজবুত হইয়া উঠিবে। এই কাগজের বাটীর প্রান্তভাগ কাঁচি দিয়া ছাঁটিয়া বেশ সমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। তার পর শিরিশ কাগজ দিয়া ঘষিয়া মসৃণ করিয়া লইলে, দেখিতে বেশ সুন্দর হইবে। ইহার উপর বেশ পুরু করিয়া এক পোঁচ কি দুই পোঁচ রঙ্গীন গালার বার্ণিস মাথাইয়া লইলে উহা দেখিয়া কাগজের বাটী বলিয়া বুঝা যাইবে না। বার্ণিসের উপর, ইচ্ছা করিলে রঙ্গীন কিম্বা সোণালী চিত্রও অঙ্কিত করা যাইতে পারিবে। এই পাত্র ভাল করিয়া তৈয়ার করিতে পারিলে, দেখিতে এমন সুন্দর হইবে যে, উহাকে ঘর সাজাইবার উপকরণ স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে; অথচ জিনিষটি অতি সামান্য।

ময়দার কাইয়ের বদলে আর এক প্রকার মশলা দিয়া উহা তৈয়ার করা যায়। ইহাতে সামান্য কিছু বেশী খরচ পড়িতে পারে বটে, কিন্তু জিনিষটি আরও ভাল ও মজবুত এবং ওয়াটার-প্রুফ হইবে। পেপিয়ার মেশির প্রসঙ্গে একবার বলিয়াছিলাম, সোহাগার জলে লাক্ষা গলাইয়া এক প্রকার তরল আঠা প্রস্তুত করা যায়। কাগজগুলি জলে বেশ ভিজিয়া উঠিলে, পাত্রের জল ফেলিয়া দিয়া কাগজগুলি হইতে যথাসম্ভব জল ঝরাইয়া ফেলিয়া, ঐ গালার পাতলা আঠার মধ্যে রাখুন। তার পর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে এক-একখানি করিয়া কাগজের টুক্‌রা তুলিয়া, জল ঝাড়িয়া, ছাঁচের ভিতরের দিকে গায়ে-গায়ে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সাজাইয়া যান। ৮।১০ স্তর সাজাইবার পর একটু চাপ দিয়া অতিরিক্ত জল ঝরাইয়া ফেলুন। অল্পক্ষণ পরে উহা শুকাইয়া আপনা-আপনি জমিতে আরম্ভ করিবে।

সম্পূর্ণ শুকাইবার আগে—একটু-একটু ভিজা থাকিতে-থাকিতেই, কাগজের নকল পাত্রটিকে ছাঁচ হইতে বাহির করিয়া লইয়া ধার ছাঁটিয়া ফেলুন। পরে শিরিশ কাগজের সাহায্যে মাজিয়া-ঘষিয়া পুরু করিয়া বার্ণিশ মাখাইয়া লইলে, ঐ পাত্রে জল রাখিলেও তাহার কোন ক্ষতি হইবে না; উহা সম্পূর্ণ রূপে ওয়াটার-প্রুফ হইবে। তবে অবশ্য তাহা ফায়ার-প্রুফ বা অদাহ্য যে হইবে না, সে কথা বলা বাহুল্য।

গালার বদলে সোহাগায় রজন গলাইয়াও আঠা প্রস্তুত করা যায়, এবং তাহাতেও ঐ একই কাজ হয়। রজন গালা অপেক্ষা সস্তা বলিয়া ইহাতে খরচ কিছু কম পড়িতে পারে।

এই উপায়ে কাগজের বেশ শক্ত ট্রে, ছোট-ছোট বাক্স, নস্যের ডিপে এবং নানা প্রকার সৌখিন জিনিষ তৈয়ার করা যায়। ভিজা কাগজ খুব পাতলা এরারুটের আঠা বা যে কোন শ্বেত স্বারের আঠা মাখাইয়া, কয়েক স্তর উপরি উপরি রাখিয়া, প্রবল চাপ দিলে যে কার্ড বোর্ড প্রস্তুত হইবে, তাহা সাধারণ পেষ্টবোর্ড অপেক্ষা বহুগুণে শক্ত হইবে। শ্বেত স্বারের আঠার বদলে গালা বা রজনের আঠা ব্যবহার করিলে, বোর্ডটি ওয়াটার-প্রুফ হইবে। ঢেউ-খেলানো ছাঁচের ভিতর দিয়া তাহাকে ঢেউ খেলাইয়া লইলে, দামী কাচের শিশি-বোতলের প্যাকিং বোর্ডের কাজ হইবে। এই বোর্ড যেমন লঘু, তেমনি শক্ত হইবে। পোষ্ট কার্ড প্রস্তুত করিতে হইলে অনেক বড়-বড় কল-কালখানা নির্ম্মাণ করিতে হয়: কিন্তু ছেঁড়া কাগজ হইতে এই উপায়ে পোষ্ট কার্ড প্রস্তুত করিতে বড়-বড় কল-কারখানা নির্ম্মাণ করিতে হইবে না,—ইহাই ইহার একটা মস্ত সুবিধা।

স্ব

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

মন্-টানা তার দৃষ্টি এমন
মেটায় প্রেমের ক্ষুধা গো;
কথাটি তার মিষ্টি যেমন
দ্রাক্ষা-দলা সুধা গো।
ভ্রমর-কেশের নেইকো কসুর
এলায় যে সে চরণ পেতে;
পদ'ক্ষেপের শুন্‌লে সে সুর
আমারও প্রাণ ওঠে মেতে।
বিজন দেশের পাওয়া রতন
কি জন আমার বঁধু গো!
কোজাগরীর পূর্ণিমাটি
প্রিয়ার মুখের মধু গো!

নয় দু'দিনের, নয়ন বলে
চিরদিনের ও যে চেনা,
জিনিনি' তার হৃদয়, ছলে—
প্রেমের মূল্যেই হঠাৎ কেনা
দুঃখ-সুখের সখী আমার
রামের সে যে সীতা গো,
দিবস-রাতের শান্তি আমার
ভক্ত প্রাণের গীতা গো,
পরশে তার ধন্য ভুবন,
দরশে তাঁর পুণ্য আসে;
নইকো তাহার যোগ্য, তবু
ভালোবাসে—খুবই বাসে।

দেনা-পাওনা

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(২০)

সেদিন প্রাতঃকালটা হঠাৎ একটা ঘন কুয়াশায় সমস্ত অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল; রায় মহাশয় সেইমাত্র শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন; একজন ভদ্র ব্যক্তিকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কহিলেন, কে ও?

আমি নির্ম্মল, বলিয়া জামাতা কাছে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। এই আকস্মিক আগমনে তিনি কোনরূপ বিস্ময় বা হর্ষ প্রকাশ করিলেন না। চাকরদের ডাকিয়া বলিলেন, কে আছিস্ রে, নির্ম্মলের জিনিষপত্রগুলো সব হৈমর ঘরে রেখে আয়। তা' গাড়ীতে কষ্ট হয়নি ত বাবা? খোকা, হৈম, এরা সব ভাল আছে ত?

নির্ম্মল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল সকলে ভাল আছে।

রায় মহাশয় কহিলেন, কিন্তু, একা এলে কেন নির্ম্মল, মেয়েটাকে সঙ্গে আন্‌লে ত আর একবার দেখা হোতো।

নির্ম্মল বলিল, দু'চার দিনের জন্যে আবার—

রায় মহাশয় ঈষৎ হাস্য করিলেন, বলিলেন, এ কি দু'চার দিনের ব্যাপার বাবা, দু'চার মাসের দরকার। যাও, ভেতরে যাও,—মুখ হাত ধোওগে।

নির্ম্মল ভিতরে আসিয়া দেখিল এখানেও সেই একই ভাব। যে প্রকারেই হোক তাহার আসার সম্ভাবনা কাহারও অবিদিত নয়, এবং, সেজন্য কেহই প্রসন্ন নহেন। মুখ হাত ধোয়া, কাপড় ছাড়া প্রভৃতি সমাধা হইলে গরম চা এবং কিছু জলখাবার শ্বশ্রূঠাকুরাণী স্বহস্তে আনিয়া জামাতাকে নিজে খাওয়াইতে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হৈম কি আস্‌তে চাইলে না?

নির্ম্মল কহিল, না।

তারা জানে তুমি কেন আস্‌চ?

নির্ম্মল মাথা নাড়িয়া বলিল, জানে বই কি, সমস্তই জানে।

তবু মানা করলেনা?

তাঁহার প্রশ্ন ও কণ্ঠস্বরে নির্ম্মল পীড়া অনুভব করিয়া বলিল, মানা কেন করবে মা? সে তো জানে আমি অন্যায় কাজে কোন দিনই হাত দিইনে।

আর তার বাপই কেবল অন্যায় কাজে হাত দিয়ে বেড়ায়, এই কি সে জানে নির্ম্মল? এই বলিয়া তিনি ক্ষণকাল নতমুখে স্থির থাকিয়া অকস্মাৎ আবেগের সহিত বলিয়া উঠিলেন, তা সে যাই কেন না জানুক, বাছা, এ তুমি করতে পারবেনা,— এ কাজে তোমাকে আমি কোনমতেই নাম্‌তে দিতে পারবনা। শ্বশুর-জামাইয়ে লড়াই করবে, গাঁয়ের লোক তামাসা দেখ্‌বে, তার আগে আমি জলে ডুব দিয়ে মরব তোমাকে বলে রাখ্‌লাম বাবা।

নির্ম্মল আস্তে আস্তে বলিল, কিন্তু, যে পীড়িত, যে অসহায়, তাকে রক্ষা করাই ত আমাদের ব্যবসা মা।

শাশুড়ী কহিলেন, কিন্তু ব্যবসাই ত মানুষের সমস্ত নয় বাছা। উকিল-ব্যারিষ্টারেরও মা-বোন আছে, স্ত্রী আছে, শ্বশুর-শাশুড়ী আছে—গুরুজনের মান-মর্য্যাদা রাখার ব্যবস্থা সংসারে তাদের জন্যেও তৈরি হয়েছে।

নির্ম্মল ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হয়েছে বই কি মা, নিশ্চয় হয়েছে। তাহার পরে সমস্ত ব্যাপারটা লঘু করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে একটু হাসিয়া বলিল, আর শেষ পর্য্যন্ত হয়ত লড়াই-ঝগড়া কিছুই না হতে পারে মা।

গৃহিনীর মুখ তাহাতে প্রসন্ন হইল না, কহিলেন, পারে, কিন্তু সে শুধু তোমার শ্বশুরের সর্ব্ব রকমে হার হলেই পারে। কিন্তু, তার পরে আর তাঁর রায় মশাই হয়ে এ গ্রামে বাস করা চলবেনা। তা ছাড়া ষোড়শী দুর্ব্বলও নয়, অসহায়ও নয়। তার ঠ্যাঙাড়ে ডাকাতের দল আছে, তাকে জমিদার ভয় করে, একখানা চিঠির জোরে তার মানুষ পাঁচশ ক্রোশ দূর থেকে ঘর-দোর ছেলেপুলে ফেলে চলে আসে, আমরা যা একশখানা চিঠিতে পারিনে। তারা হল ভৈরবী, তুক-তাক, মন্ত্র তন্ত্র কত কি জানে। তা' সে থাক্ ভাল, যাক্ ভাল আমার ক্ষতি নেই,—তার পাপের

ভরা সেই বইবে, কিন্তু চোখের ওপর আমার নিজের মেয়ের সর্ব্বনাশ আমি হতে দেবনা নির্ম্মল, তা লোকে যাই বলুক আর যাই করুক।

নির্ম্মল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। যে ভাবেই হোক, এ দিকে জানাজানি হইতেও কিছু বাকি নাই, এবং ষড়যন্ত্রেরও কোন ত্রুটী ঘটে নাই। তাহার শ্বশুর সকল আটঘাট বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, ছিদ্র বাহির করিবার যো নাই। তাহার চুপ-চাপ প্রকৃতির শাশুড়ীঠাকুরাণী যে এমন মজবুত করিয়া কথা কহিতে জানেন, ইহা সে মনে করে নাই, এবং যাহা কিছু কহিলেন সে যে তাঁহার নিজের কথা তাহাও সে মনে করিলনা, কিন্তু জবাব দিবারও কিছু খুঁজিয়া পাইলনা। এই আর্জ্জি যিনি মুসাবিদা করিয়া আর একজনের মুখে গুঁজিয়া দিয়াছেন, তিনি সকল দিক চিন্তা করিয়াই দিয়াছেন, এবং ইহাও তাঁহার অবিদিত নাই, যে নিছক পরোপকার মানসেই সে যে পশ্চিমের একপ্রান্ত হইতে স্ত্রী-পুত্র ফেলিয়া চলিয়া আসিয়াছে, এ উত্তর সে কোনমতেই মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিবে না।

ঘণ্টা দুই বিশ্রাম করার পরে নির্ম্মল যখন বাটীর বাহির হইল, তখন কর্ত্তা সদরে বসিয়া ছিলেন। তিনি কোথায়, কি বৃত্তান্ত ইত্যাদি নিরর্থক প্রশ্নে সময় নষ্ট করিলেননা, শুধু, একটু সকাল সকাল ফিরিবার অনুরোধ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, এই শ্রান্ত দেহে অধিক বেলায় স্নানাহার করিলে অসুখ করিতে পারে।

শিরোমণি মহাশয় পাশে বসিয়া কি বলিতেছিলেন, উঁকি মারিয়া দেখিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন, বাবাজী—ভায়া না?

রায় মহাশয় বলিলেন, হাঁ। শিরোমণি ডাকিয়া আলাপ করিবার উদ্যম করিতেই জনার্দ্দন বাধা দিয়া বলিলেন, নির্ম্মল পালাচ্চেনা, খুড়ো, তোমার কথাটা শেষ কর, আমাকে উঠ্‌তে হবে।

নির্ম্মল নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিল। তাহার শ্বশুর য তাহাকে অতি-কৌতূহলী প্রতিবেশীর কঠিন জেরার ায় হইতে দয়া করিয়া অব্যাহতি দিলেন, ইহা অনুভব রিয়া তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

ষোড়শীর সহিত সে দেখা করিতে চলিয়াছিল। দিন ই পূর্ব্বে যে উৎসাহ লইয়া, মনের ভিত্তিগাত্রে যে ছবি আঁকিয়া লইয়া সে তাহার প্রবাস-গৃহ ত্যাগ করিয়াছিল, সে আর ছিলনা। যে স্বপ্ন সুদীর্ঘ যাত্রা-পথের সকল দুঃখ তাহার হরণ করিয়াছিল, শ্বশুর ও শাশুড়ীর অব্যক্ত ও ব্যক্ত অভিযোগের আক্রমণে এইমাত্র তাহা লণ্ডভণ্ড হইয়া গিয়াছিল। সমবেত ও প্রবল শক্তি সমূহের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাহার একক পৌরুষ নিরাশ্রয়ের অবলম্বন, দুর্ব্বল, পরিত্যক্ত, নির্জ্জীত নারীর নিঃস্বার্থ বন্ধুরূপে এই গ্রামে পদার্পণ করিতে চাহিয়াছিল। তাহার কত না বল, কত না শোভা, কিন্তু আসিয়া দেখিল তাহার সকল কার্য্যেরই ইতিমধ্যে একটা কারণ প্রকাশ হইয়া গেছে। তাহা যেমন কদর্য্য; তেম্‌নি কালো। কালিতে লেপিয়া একাকার হইতে আর বাকি কিছু নাই। শ্বশুরকে সে কোনদিনই আদর্শপুরুষ মনে করে নাই; তিনি পল্লীগ্রামের বিষয়ী লোক, সামান্য অবস্থা হইতে যথেষ্ট সঞ্চয় করিয়াছেন—অতএব, পরলোকের খরচের পাতাটাও শাদা পড়িয়া থাকিবার কথা নয়, ইহা সে বেশ জানিত, এবং মনে মনে ক্ষমাও করিত; কিন্তু আজ যখন সে মন্দিরের প্রাচীর ঘুরিয়া পায়ে-হাঁটা সেই সরু পথ ধরিয়া ষোড়শীর কুটীর অভিমুখে পা বাড়াইল, তখন সংক্ষুব্ধ চিত্ততলে তাহার এই মানুষটির বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও ঘৃণা অত্যন্ত নিবিড় হইয়া দেখা দিল। এবং বিশেষ কিছু না জানিয়াও ষোড়শীর প্রতি অভিমান ও বিরক্তিতে মন তিক্ত হইয়া উঠিল। মনে মনে বারবার করিয়া বলিতে লাগিল, যে স্ত্রীলোক অনাত্মীয় অপরিচিত-প্রায় পুরুষের কৃপাভিক্ষা করিয়া পত্রদ্বারা আহ্বান করিবার সঙ্কোচ পর্য্যন্ত অনুভব করেনা, নির্লজ্জ দাম্ভিকার ন্যায় পথে ঘাটে প্রচার করিয়া বেড়ায়, তাহাকে আর যাহাই হোক সম্মানের উচ্চ আসনে বসানো চলেনা! কিন্তু অকস্মাৎ অসম্মানের আসন ষোড়শীর এইখানে বাধা পাইয়া থামিল। পত্রবহুল মনসা গাছের বাঁক ফিরিতেই নির্ম্মলের উৎসুক দৃষ্টি সন্নিকটবর্ত্তিনী ষোড়শীর আনত মুখের উপরে গিয়া পড়িল। সে প্রাঙ্গণের বাহিরে দাঁড়াইয়া একমনে বেড়ার দড়ি বাঁধিতেছিল, আগন্তুকের পদশব্দ শুনিতে পাইল না, এবং ক্ষণকালের জন্য নির্ম্মল না পারিল নড়িতে, না পারিল চোখ ফিরাইতে। এই ত সেদিন, তবুও তাহার হঠাৎ মনে হইল এ সে ভৈরবী নয়। অথচ কোথাও কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পারিলনা। সেই রাঙা-পাড়ের গৈরিক শাড়ীপরা, তেম্‌নি রুক্ষ এলো চুল, গলায় তেম্‌নি রুদ্রাক্ষের

মালা, তেম্‌নি মুখের উপরে উপবাসের একটা শীর্ণ ছায়া,—সিঁদুর মাখানো ত্রিশূলটি পর্য্যন্ত তেম্‌নি হাতের কাছে ঠেস দিয়ে রাখা,—কিছু বদলায় নাই,—তবুও অপরিচিত, অজানা মোহে তাহাকে মুহূর্ত্ত কয়েকের নিমিত্ত স্তম্ভিত করিয়া দিল। দড়ির গ্রন্থি টানিয়া দিয়া ষোড়শী মুখ তুলিয়াই হঠাৎ একটু চমকিত হইল, কিন্তু পরক্ষণেই দড়ি ছাড়িয়া দিয়া স্নিগ্ধমধুর হাসিয়া সুমুখে আসিয়া কহিল, আসুন, আমার ঘরে আসুন।

নির্ম্মল অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, কিন্তু আপনার কাজে যে বাধা দিলাম।

ষোড়শী সকৌতুকে মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, বেড়া বাঁধা বুঝি আমার কাজ? আর, হোলই বা কাজ, কুটুম্বকে খাতির করাটা বুঝি কাজ নয়? শ্বশুরবাড়ীতে জামাইয়ের আদর হয়নি, কিন্তু শালীর কুঁড়ে ঘরে থেকে ভগিনীপতিকে অনাদরে ফির্‌তে দিবনা। আসুন ঘরে গিয়ে বস্‌বেন চলুন। খোকা, হৈম, চাকর-বাকর সব ভাল আছে? আপনি নিজে ভাল আছেন?

নির্ম্মল কেমন যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সবাই ভাল আছে, কিন্তু আজ আর বোস্‌ব না।

ষোড়শী কহিল, কেন শুনি? তার পরে কণ্ঠস্বর নত করিয়া আরও একটু কাছে আসিয়া বলিল, একদিন হাত ধরে অন্ধকারে পার করে এনেছিলাম মনে পড়ে? দিনের বেলায় ওতে আর কাজ নেই, কিন্তু চলুন বল্‌চি। যে এত দূর থেকে টেনে আন্‌তে পারে, সে এটুকুও টেনে নিয়ে যেতে পার্‌বে।

নির্ম্মল লজ্জা বোধ করিল, আঘাত পাইল। এই আচরণ, এই কথা ষোড়শীর মুখে কেবল অপ্রত্যাশিত নয়, অচিন্তনীয়। বিদুষী, সন্ন্যাসিনী ভৈরবীকে সে শান্ত, সমাহিত, দৃঢ় এমন কি কঠোর বলিয়াই জানিত। সংসারে রমণীয় পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া কল্পনা করিতেও যেন তাহার বাধিত। তাঁহাকে অনেক ভাবিয়াছে,—কর্ম্মের মধ্যে, বিশ্রামের মধ্যে এই ষোড়শীকে সে চিন্তা করিয়াছে,—সমস্ত অন্তর রসে ভরিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কখনও সেই চিন্তাকে তাহার সে পদ্ধতি দিবার, শৃঙ্খলিত করিবার সাহস পর্য্যন্ত করে নাই। কিন্তু সেই ষোড়শী আজ যখন অপ্রত্যাশিত আত্মীয়তার অতি-ঘনিষ্ঠতায় অকস্মাৎ আপনাকে ছোট করিয়া, মানবী করিয়া, সাধারণ মানবের কামনার আয়ত্তাধীন করিয়া দিল, নির্ম্মল অন্তরের একপ্রান্তে যেমন বেদনা বোধ করিল, তেম্‌নি আর এক প্রান্ত তাহার কি এক প্রকার কলুষিত আনন্দে এক নিমিষে পরিপ্লুত হইয়া গেল।

নির্ম্মলকে ঘরে আনিয়া ষোড়শী কম্বল পাতিয়া বসিতে দিল, জিজ্ঞাসা করিল, পথে কষ্ট হয়নি?

নির্ম্মল বলিল, না। কিন্তু মন্দিরে আজ আপনার কাজ নেই?

ষোড়শী কহিল, অর্থাৎ আজ মন্দিরের রবিবার কিনা? তাহার পরে বলিল, কাজ আছে, সকালে একদফা করেও এসেচি। যেটুকু বাকি আছে, সেটুকু বেলাতে কর্‌লেও হবে। হাসিয়া কহিল, জামাই বাবু, এ আপনাদের কোর্ট কাছারী নয়, মন্দির। ঠাকুর দেবতারা তাঁদের দাস-দাসীদের কখনো মুহূর্ত্তের ছুটি দেন না, কানে ধরে চব্বিশ ঘণ্টা সেবা করিয়ে নিয়ে তবে ছাড়েন।

কিন্তু এ চাকরি ত আপনি ইচ্ছে করেই নিয়েছেন।

ইচ্ছে করে? তা হবে। এই বলিয়া ষোড়শী সহসা একটুখানি হাসিয়া কহিল, আচ্ছা, আসার একটু খবর দিলেন না কেন?

নির্ম্মল কহিল, সময় ছিলনা। কিন্তু তার শাস্তি স্বরূপ শ্বশুর বাড়ীতে যে খাতির পাইনি, অন্ততঃ, তাঁরা যে আমাকে দেখে খুসি হননি, এ কথা আপনি জান্‌লেন কি করে? এবং আমার আসার সম্বাদ আসার পূর্ব্বেই কে প্রচার করে দিলে বল্‌তে পারেন?

ষোড়শী কহিল, বলতে পারিনে, কিন্তু, আন্দাজ করতে পারি।

নির্ম্মল বলিল, আন্দাজ করতে ত আমিও পারি, কিন্তু সত্যি কে করেছে, এবং কোথায় সে খবর পেলে, জানেন ত আমাকে বলুন। আশা করি আপনার দ্বারা এ কথা প্রকাশ হয়নি?

ষোড়শী হাসিল, কহিল, কোন আশা করতেই আমি কাউকে নিষেধ করিনে। কিন্তু, জেনে আপনার লাভ কি? আপনি এসেছেন এ খবরও সত্যি, আমারই জন্যে এসেছেন এ কথাও ঠিক। তার চেয়ে বরঞ্চ বলুন—আসা সার্থক হবে কি না? আমাকে উদ্ধার করতে পারবেন কি না?

নির্ম্মল কহিল, প্রাণপণে চেষ্টা কোরব বটে।

যদি কষ্ট হয় তবুও ?

নির্ম্মল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, যদি কষ্ট হয় তবুও।

ষোড়শী হাসিয়া ফেলিল। নির্ম্মল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া নিজেও একটু হাসিয়া বলিল, হাস্‌লেন যে ?

ষোড়শী কহিল, হাস্‌চি,—আগেকার দিনে ভৈরবীরা বিদেশী মানুষদের ভেড়া বানিয়ে রাখ্‌ত। আচ্ছা, ভেড়া নিয়ে তারা কি কোরত ? চরিয়ে বেড়াত, না, লড়াই বাধিয়ে দিয়ে তামাসা দেখ্‌ত ? বলিতে বলিতেই সে একেবারে ছেলেমানুষের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া হাসিতে লাগিল।

নির্ম্মলের দেহ-মন পুলকে নৃত্য করিয়া উঠিল। এই কঠিন আবরণের নিচে যে রহস্যপ্রিয় কৌতুকময়ী চঞ্চল নারীপ্রকৃতি চাপা দেওয়া আছে,—তাহার অপর্য্যাপ্ত হাসির প্রস্রবণ যে ব্রতোপবাসের সহস্রবিধ কৃচ্ছ্র-সাধনায় আজও শুখায় নাই,—ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় সে তেম্‌নি জীবন্ত—এই কথা স্মরণ করিয়া সর্ব্বশরীরে তাহার কাঁটা দিল। পরিহাসে নিজেও যোগ দিয়া হাসিয়া কহিল, হয়ত বা মাঝে মাঝে মায়ের স্থানে বলি দিয়ে যেতো। অর্থাৎ, আমার শ্বশুর কিম্বা শাশুড়ীঠাকরুণ ইতিমধ্যে আপনার কাছে এসেছিলেন, এবং অনেক অপ্রিয় অসত্য শুনিয়ে গেছেন।

ষোড়শী কহিল, না, তাঁরা কেউ আসেননি। আমি যে মন্ত্রে-তন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করেচি, এটা অসত্য হতে পারে, কিন্তু অপ্রিয় হবে কেন নির্ম্মলবাবু ? তা' ছাড়া আপনার আসার ধরণ দেখে নিজেরই সন্দেহ হচ্চে হয়ত বা নিতান্ত অসত্যও না হতে পারে। তাহার মুখে হাসির আভাস লাগিয়াই রহিল, কিন্তু গলার শব্দ বদ্‌লাইয়া গেল। ওষ্ঠপ্রান্তে ও কণ্ঠস্বরে সহসা যেন আর সঙ্গতি রহিল না।

নির্ম্মল আশ্চর্য্য, অবাক্ হইয়া রহিল। ইহার কতটুকু পরিহাস এবং কতখানি তিরস্কার, এবং কিসের জন্য তাহা, সে কিছুতে ভাবিয়া পাইলনা। ষোড়শী নিজেও আর কিছু কহিলনা, কিন্তু তাহার আনত মুখের পরে যে অপ্রত্যাশিত লজ্জার আরক্ত আভা পলকের নিমিত্ত ছায়া ফেলিয়া গেল, ইহা তাহার চোখে পড়িল। কিন্তু, সে ঐ পলকের জন্যই। ষোড়শী আপনাকে সামলাইয়া লইয়া মুখ তুলিয়া হাসিমুখে কহিল, কুটুমের অভ্যর্থনা ত হ'ল। অবশ্য হাসি-খুসি দিয়ে যতটুকু পারি, ততটুকুই,—তার বেশি ত সম্বল নেই ভাই,—এখন আসুন, বরঞ্চ, কাজের কথা কওয়া যাক্।

তাহার ঘনিষ্ঠ সম্ভাষণকে এবার সে সংশয়ের সহিত গ্রহণ করিতে চাহিল, তবুও তাহার মন ভিতরে ভিতরে উল্লসিত হইয়া উঠিল। কহিল, বলুন।

ষোড়শী কহিল, দু'টি লোক দেবতাকে বঞ্চিত করতে চায়। একটি রায় মহাশয়, আর একটি জমিদার—

নির্ম্মল বলিল, আর একটি আপনার বাবা। এঁরাই ত আপনাকেও বঞ্চিত করতে চান্।

বাবা ? হাঁ, তিনিও বটে। এই বলিয়া ষোড়শী চুপ করিয়া রহিল।

নির্ম্মল বলিল, আমার শ্বশুরের কথা বুঝি, আপনার বাবার কথাও কতক বুঝ্‌তে পারি, কিন্তু পারিনে এই জমিদার প্রভৃতিকে বুঝ্‌তে। তিনি কিসের জন্য আপনার এত শক্রতা করেন ?

ষোড়শী বলিল, দেবীর অনেকখানি জমি তিনি নিজের বলে বিক্রী করে ফেলতে চান, কিন্তু আমি থাক্‌তে সে কোনমতেই হবার যো নেই।

নির্ম্মল ঈষৎ হাসিয়া কহিল, সে আমি সাম্‌লাতে পারব। এই বলিয়া সে কটাক্ষে ভৈরবীর মুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিল ষোড়শী নীরব হইয়া আছে, কিন্তু তাহার মুখের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। খানিক পরে মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে কহিল, কিন্তু আরও অনেক জিনিস আছে, যা আপনিও হয়ত সাম্‌লাতে পারবেন না।

কি সে সব ? একটা ত আপনার মিথ্যে দুর্নাম ?

ষোড়শী কোনরূপ উত্তেজনা প্রকাশ করিলনা; শান্তস্বরে বলিল, সে আমি ভাবিনে। দুর্নাম সত্যি হোক মিথ্যে হোক, তাই নিয়েই ত ভৈরবীর জীবন নির্ম্মল বাবু। আমি এই কথাটাই তাঁদের বল্‌তে চাই।

নির্ম্মল স্তম্ভিত হইয়া কহিল, এই কথা নিজের মুখে বল্‌তে চান্ ? সে যে স্বীকার করার সমান হবে ?

ষোড়শী চুপ করিয়া রহিল।

নির্ম্মল সসঙ্কোচে কহিল, ওরা যে বলে—

কারা বলে ?

অনেকেই বলে সে সময়ে আপনি-

কোন্ সময়ে ?

নির্ম্মল ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া অত্যন্ত-সঙ্কোচ সবলে দমন করিয়া বলিল, সেই ম্যাজিষ্ট্রেট আসার দিনে। তখন আপনার কোলের উপরেই নাকি—

ষোড়শী একটু আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, তারা কি দেখেছিল না কি? তা' হবে, আমার ঠিক মনে নাই,—যদি দেখে থাকে, তা সত্যি। জমিদারের মাথা আমিই কোলে কোরে বসেছিলাম।

নির্ম্মল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে কহিল, তার পরে?

ষোড়শী শান্ত মুখখানি হাসির আভাসে একটু উজ্জ্বল করিয়া বলিল, তার পরে দিন কেটে যাচ্চে। কিন্তু কিছুতেই আর মন বসাতে পারিনে। সবই যেন মিথ্যে বলে ঠেকে।

কি মিথ্যে?

সব। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ব্রত, উপবাস, দেবসেবা, এতদিনের যা কিছু সমস্তই—

তবু ভৈরবীর আসন চাই?

চাই বই কি। আর আপনি যদি বলেন চাইনা—

না, না, আমি কিছুই বলিনে,—এই বলিয়া নির্ম্মল তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, বেলা হয়ে যাচ্চে,—এখন আমি চোল্‌লাম।

ষোড়শীও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, আমারও মন্দিরে কাজ আছে। কিন্তু আবার কখন্ দেখা হবে?

নির্ম্মল অনিশ্চিত অস্ফুট কণ্ঠে কি একটা কহিল, ভাল শোনা গেলনা। ষোড়শী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, ভাল কথা, সন্ধ্যার পর আজই ত আমাকে নিয়ে মন্দিরে একটা হাঙ্গামা আছে, আসবেন?

নির্ম্মল ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া বাহির হইয়া গেল। ষোড়শী মুচকিয়া একটু হাসিল, তার পরে কুটীরের দ্বারে শিকল তুলিয়া দিয়া মন্দিরের অভিমুখে বহির্গত হইল। (ক্রমশঃ)

৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

শোক-সংবাদ

৺আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্যিক জগতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ "জীবনী-সন্দর্ভ" "সেতুবন্ধ যাত্রা" ইত্যাদি বহুবিধ গ্রন্থ-প্রণেতা আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বহুমূত্র রোগাক্রান্ত হইয়া গত দুই বৎসর যাবৎ জীবন-ভার বহন করিতেছিলেন। গত ২০শে আশ্বিন রাত্রি ৯৷৷০ ঘটিকার সময় তিনি বন্ধু ও স্বজনদিগকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া একপঞ্চাশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে মানবলীলা সম্বরণ পূর্ব্বক অমরধামে গমন করিয়াছেন। আশু বাবুর বৃদ্ধ পিতা শ্রীযুক্ত নীলমণি মুখোপাধ্যায় মহাশয় এখনও জীবিত আছেন। আশু বাবুর এই আকস্মিক শোকাবহ মৃত্যুতে আমরা তাঁহার বৃদ্ধ পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের শোকে গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

সাময়িকী

আমরা 'কোন পত্রিকা সম্বন্ধে 'ভারতবর্ষে' বড় একটা আলোচনা করি না; এবার কিন্তু একখানি কাগজের পরিচয় দিব। কাগজখানি দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক বা ত্রৈমাসিক হইলে আমরা কোন কথাই বলিতাম না; কাগজখানি 'অসাময়িক' অর্থাৎ যখন সময় বা সুযোগ হইবে, সম্পাদকমণ্ডলী তখনই কাগজখানি ছাপিবেন। তাই আমরা আমাদের এই 'সাময়িকী'তে পত্রখানির পরিচয় দিতেছি। এই পত্রখানির নাম 'বেপরোয়া'। সময় সম্বন্ধে বেপরোয়া, মূল্য সম্বন্ধে বেপরোয়া, লেখা সম্বন্ধে বেপরোয়া; এদের কথা—'উড়িয়ে যাব সমাজ, পাঁজি, পদীপিসীর যুক্তি রে, অট্টহাসের জোর বাতাসের ঘায়'। ভাল কথা। প্রথম সংখ্যায় জন্মদিনের নির্ঘণ্ট দেখিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন, এ দলটা সত্যসত্যই বেপরোয়া; অর্থাৎ ২রা অগ্রহায়ণ, অমাবস্যা, ত্র্যহস্পর্শ, শনিবার, বারবেলায় ইহার জন্ম। তা হোক, তবুও আমরা এই 'অসাময়িক' সহযোগীকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি।

সুধু এইটুকু বলিয়াই 'বেপরোয়া'কে ছাড়িতে পারিতেছি না। ইহার 'প্রকাশকের নিবেদন'টী আদ্যন্ত উদ্ধৃত করা আজকালকার দিনে বিশেষ প্রয়োজন মনে করিতেছি। আমাদে পাঠক-পাঠিকা এবং সুশীল সহযোগিগণ এই 'নিবেদনে' অবহিত হইবেন বলিয়া আশা করিতে পারি কি? 'নিবেদন'টি এই—"(১) বেপরোয়া বাহির হইল,—কপালের লিখন! (২) এখন হইতে ইহা নিয়মিত বাহির হইতে থাকিবে। তবে কতদিন পরে পরে, বলা কঠিন। (৩) অগ্রিম বার্ষিক মূল্য চাহিব না, কারণ চাহিলে পাইব না। (৪) প্রতি সংখ্যার মূল্য তিন আনা হইতে কুড়ি টাকা। অধিক দিতে আসিলে আপত্তি করিব। (৫) লেখকগণ যত ইচ্ছা লেখা পাঠাইতে পারেন। কোনোটী অমনোনীত হইলে ফেরৎ যাইবে না,—ছাপা হউক আর না হউক! লেখার সঙ্গে বেশী পরিমাণে ডাক-টিকিট আসিলে সুখী হইব। এইগুলিই আমাদের ভরসা। (৬) আমরা পরচর্চ্চা করিব। তবে বিশেষ বেগতিক দেখিলে apology চাহিতেও পশ্চাৎপদ হইব না। (৭) আমরা বেপরোয়া। ত্রিসংসারে কাহারও পরোয়া করিব না। তবে একটী জায়গায় পরোয়া রাখিলাম, কারণ সেখান হইতে যে পরোয়ান্না। প্রাপ্তিস্থান—আপাততঃ ১নং কালুঘোষের লেন; কিছুদিন পরে ছিন্নাবস্থায়,—মুদীর দোকান, শিশিবোতল-ওয়ালার থলি, টিটাগড় পেপার মিলস্ ও ডাষ্টবিন্।" 'বেপরোয়া'র আর অধিক পরিচয়ের প্রয়োজন আছে কি?

এবার গয়াধামে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে, এই বড় দিনের ছুটীর সময়। এক দিকে গদাধরের পাদপদ্ম, আর এক দিকে বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুম;—এক দিকে শ্রাদ্ধ, আর এক দিকে শ্রদ্ধা,—এই দুইয়ের মাঝখানের বিস্তৃত প্রান্তরে অন্তঃসলিলা ফল্গুতীরে 'স্বরাজ-পুরী' নির্ম্মিত হইয়াছে; সেইখানে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। চারিদিকে কিন্তু ঢাকঢোল বড়ই উচ্চ নিনাদে বাজিয়া উঠিয়াছে। কয়েক বৎসর হইতে মডারেট দল কংগ্রেস হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন; কংগ্রেস এতদিন ছিল এবং এখনও রহিয়াছে 'নন-কো'-দিগের দখলে। এইবার গয়াতে এই 'নন-কো'-দলভুক্তগণের মধ্যে যে দলাদলি হইবে, তাহার স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এই দলাদলির উপলক্ষ হইয়াছে কাউন্সিলে প্রবেশ লইয়া। এক দল বলিতেছেন, না, কাউন্সিলে যাওয়া হইবে না। মহাত্মা গান্ধী যে আদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা বর্ণে-বর্ণে প্রতিপালন করিতে হইবে। আর এক দল বলিতেছেন, কংগ্রেসের বিধান মত চরকা, খদ্দর চলুক; পিকেটিং চলুক; কিন্তু 'নন-কো'র একটু রদ-বদল করিতে হইবে, অর্থাৎ কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অচল বা অব্যবহার্য্য করিয়া দিতে হইবে; আবহাওয়া কেমন নরম হইয়া গিয়াছে; তাহাকে একটু বেশী সচেতন করিতে হইবে; একটা উন্মাদনার

সঙ্কার করিতে হইবে। এবারকার গয়ার অধিবেশনের সভাপত দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়, এই শেষোক্ত দলভুক্ত। দুই দলই তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন; তাহার ফলে অনেক স্থলে কথা-কাটাকাটি, বচসা, ব্যক্তিগত আক্রমণ ও কুৎসা প্রচার আরম্ভ হইয়াছে; দুই-এক স্থলে অহিংসার গণ্ডী অতিক্রান্ত হইয়া হাতাহাতি, পুলিশ ডাকাডাকি পর্য্যন্তও হইয়া গিয়াছে। তাই মনে হইতেছে, গয়ায় একদিকে গদাধরের পাদপদ্ম, আর এক দিকে নির্ব্বাণ মুক্তির জলন্ত সাক্ষ্য বোধিদ্রুমের মাঝখানে দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্র-সমর আরম্ভ হইবে কি না? বিশেষ ভয়ের কারণ, এবার সভাপতি বাঙ্গালী। কংগ্রেস যেবার জন্মগ্রহণ করেন, সেবারকার অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন বাঙ্গালী ডবলিউ, সি, বানার্জ্জি; তাহার পর যেবার সুরাটে দক্ষযজ্ঞের অভিনয় হয়, সেবারও সভাপতি ছিলেন বাঙ্গালী সার রাসবিহারী ঘোষ; আর এবার গয়ার এই অধিবেশনেও সভাপতি বাঙ্গালী চিত্তরঞ্জন। চারিদিকে যে রকম 'সাজ, সাজ' রব উঠিয়াছে, তাহাতে এই সংক্ষুব্ধ, হিংস-অহিংস নন-কো মহাসাগরের উর্ম্মিমালা অতিক্রম করিয়া কংগ্রেস-জাহাজ স্বরাজ-বন্দরে লঙ্গর করাইবার মত পাকা মাঝি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কি না, তাহার পরীক্ষা হইবে। আমরা উৎকণ্ঠিত চিত্তে গয়ার দিকে চাহিয়া একবার বলিতেছি 'গয়াগঙ্গা গদাধর,' আবার বলিতেছি 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' 'ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি' 'সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি!'

গত ১৬ই অগ্রহায়ণ শনিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভায় এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যানসেলার স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। গত ২৩শে আগষ্ট তারিখে গবর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে কতকগুলি সর্ত্তে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়া সাহায্য করিবেন বলিয়া এক পত্র দিয়াছেন। গত ২৪শে জুলাই বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ সম্বন্ধে একটী রিপোর্ট দিয়াছিলেন। এই রিপোর্ট পড়িয়া গবর্ণমেণ্ট মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় সন্তোষজনক নহে। এই দুইটী রিপোর্ট সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য এবং গবর্ণমেণ্টের সেই দান গ্রহণ করা উচিত কি না, তাহা স্থির করিবার জন্য একটী কমিটি গঠিত হইয়াছিল। কমিটি বিবেচনা করিয়া একটি রিপোর্ট দাখিল করেন। গত শনিবারের সভায় স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই কমিটির মন্তব্য গ্রহণ করিবার জন্য এক প্রস্তাব পেশ করেন। সেনেট সভা এই মন্তব্য গ্রহণ করিয়াছেন।

এই উপলক্ষে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস্-চেন্সেলর মাননীয় শ্রীযুক্ত স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহোদয় যে বক্তৃতা করেন, আমরা 'হিন্দুস্থান, হইতে তাহার সারমর্ম্ম উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। স্যর আশুতোষ বলিয়াছেন—

"আজ চৌত্রিশ বৎসর কাল আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যে নিযুক্ত আছি। কিন্তু আমার মনে হয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন সঙ্কটাপন্ন অবস্থা কখনও হয় নাই। একই জিনিষকে প্রত্যেকে তাহার নিজের মত অনুসারে বিচার করে; আমি এই ব্যাপারটিকে যে ভাবে দেখিয়াছি তাহা স্বাধীন ভাবে ব্যক্ত করিব। আশা করি কেহ তাহাতে দোষ ধরিবেন না। আমার মনে হইতেছে যে, এ সম্বন্ধে যদি আমি স্বাধীন মত ব্যক্ত না করি, তাহা হইলে আমার বিশ্ববিদ্যালয় ও আমার দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে। গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি নয়টার সময় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গৃহে ফিরিয়া দেখি যে, বাঙ্গালার শিক্ষা-মন্ত্রীর নিকট হইতে আমার নিকট একখানি পত্র আসিয়াছে। চিঠির উপরে "Confidential" লেখা ছিল। চিঠির মধ্যে লেখা ছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আগামী ১৫ই তারিখের মধ্যে যেন বাঙ্গালা গবর্মেণ্টের নিকট অর্থ-সাহায্য চাওয়া হয়। তাহার মধ্যে ইহাও লেখা ছিল যে, টাকা যেন কম চাওয়া হয়। মধ্যে একদিন মাত্র সময় ছিল; সেনেটে সভা আহ্বান করিবার আর সময় ছিল না। চিঠি পাইয়া প্রথমেই আমার মনে হয় যে, অর্থ-সাহায্যের জন্য গবর্মেণ্টকে কোন চিঠি লিখিব না। কারণ স্যর নীলরতন যখন ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন, তখন রেজিষ্ট্রার গবর্মেণ্টের নিকট অর্থ-সাহায্য চাহিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্মেণ্টের সে সময়কার

উত্তর মোটেই আশাপ্রদ হয় নাই। গবমেণ্ট বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট টাকা নাই। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষেই টাকা না থাকা পাপ। গবমের্ণ্টের নিকট অর্থ-সাহায্য চাওয়ার পরে ডিসেম্বর মাসে যে জবাব আসে তাহাতে গবমেণ্ট আবার জানুয়ারী মাসে আবেদন করিতে বলেন। এই আবেদনের ফলেই যত গোলমালের সূত্রপাত হইয়াছে।

অপেক্ষা করিতে করিতে অনেক দিন অতিবাহিত হইল। বজেট স্থির হইয়া গেল, কিন্তু তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি সাহায্যের জন্য কোনো টাকা ধরা হইল না। পরে জানা গেল 'অতিরিক্ত বজেট' হইবার সময় শিক্ষা-মন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্য আড়াই লক্ষ টাকা চাহিবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের দেনা মিটাইতে লাগিবে পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা, কিন্তু আড়াই লক্ষ টাকা দিয়া কি হইবে? অবশেষে স্থির করা হইল যে, পাওনাদারদের কিছু কিছু করিয়া পরিশোধ করা হইবে। ইহার অনেক পরে গবমেণ্ট আড়াই লক্ষ টাকা দিবেন বলিয়া পত্র লেখেন এবং একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেলের রিপোর্ট পড়িয়া উক্ত মন্তব্য করেন। এই মন্তব্য যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা। সেনেটের সভ্যেরা কি করিবেন তাহা স্থির করিবার পূর্ব্বেই তাহা সংবাদপত্রের মারফতে ভারতবর্ষময় ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকদের বিরুদ্ধে এই কুৎসা রটনা কি হঠাৎ হইয়া গিয়াছে? না এই ব্যাপারটি পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করা ছিল? সেই মন্তব্য ছয় হাজার মাইল সাগর পার হইয়া ইংলণ্ডে গিয়া পৌছিল। "টাইম্‌স্‌" পত্রে এই সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, তাহাতে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সেই প্রবন্ধ ভারতবর্ষ হইতেই সেখানে গিয়াছে। 'টাইম্‌সে'র শিক্ষা-বিষয়ক অতিরিক্ত পত্রের বিশ হাজার গ্রাহক আছে এবং সেই বিশ হাজার লোক সেই "দেউলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়" প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছে। প্রবন্ধ ভারতবর্ষে আসিয়া পৌছিবার পর সেটিকে এখানকার সংবাদপত্রে চালাইবার কি প্রকার চেষ্টা চলিয়াছিল, তাহা আপনারা জানেন।

ইহার পর স্যার আশুতোষ বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম রক্ষা করিতেই হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধীরা প্রমাণ করিতে চাহেন যে, বাঙ্গালীরা স্বায়ত্ত-শাসনের উপযুক্ত নহে। প্রশ্ন উঠিবে, বাঙ্গালীর মধ্যে যাহারা শ্রেষ্ঠ লোক, তাহারাই যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় সম্বন্ধে এই গণ্ডগোল করিল, তখন অন্য লোকেরা যে গণ্ডগোল করিবে না, তাহা কি করিয়া বলা যাইতে পারে? পরে আশুতোষ সিনেট সভার প্রত্যেককে কমিটির এই রিপোর্ট ভাল করিয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়া বলিয়াছেন, আপনারা সত্য চিন্তা করিতে, সত্য কথা বলিতে প্রস্তুত হউন। সত্য বলিলে যদি কেহ মনে আঘাত পায়, সেজন্য কোন চিন্তা করিবেন না। ইহার পর তিনি এই অর্থ-সঙ্কটের কারণ বিবৃত করেন।

পরে তিনি বলিয়াছেন যে, আমরা ব্যয়-সংক্ষেপ করিব। আমাদের ক্ষমতা অনুসারে আমরা ব্যয় করিব। আমরা অনাহারে থাকিয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করিব। বাঙ্গালাদেশের প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে গিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ভিক্ষা করিব। স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগকে অনাহারে থাকিতে অনুরোধ করিব এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে অনাহারে রাখিতে বলিব। ঈশ্বর নাই এ কথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্বাস করিবেন না। বাঙ্গালা দেশ হইতে উচ্চশিক্ষা উঠিয়া যাক, ইহাই যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হইয়া থাকে—তবে তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক। ঈশ্বরের প্রতি আমার অটল বিশ্বাস আছে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যদিগকে নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য সজাগ হইতে অনুরোধ করিতেছি। বাঙ্গালা গবর্মেণ্ট আছে কি না, এ কথা আপনারা ভুলিয়া যান। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আপনাদের যে কর্ত্তব্য আছে, তাহা পালন করুন। স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছুতেই আমি সন্তুষ্ট নহি।" ইহার পর স্যার প্রফুল্লচন্দ্রের প্রস্তাবের জন্য ভোট লওয়া হয়। ভোটে তাঁহার প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে। ডাক্তার চুনীলাল বসু ও অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র কোনো দিকেই ভোট দেন নাই।

এই ব্যাপার লইয়া দেশের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে; কেহ কেহ উচ্চৈঃস্বরে সার আশুতোষের নির্ভীকতা, স্পষ্টবাদিতা ও সত্যনিষ্ঠার প্রশংসা করিতেছেন; কেহ কেহ বা তাঁহার এই কার্য্যকে অবিমৃষ্যকারিতা, হঠকারিতা প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিতেছেন। আমরা এইমাত্র বলিতে পারি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান রক্ষার উপায়ান্তর থাকিলে মনস্বী স্যর আশুতোষ এমন কার্য্য করিতে সেনেটকে প্রবুদ্ধ করিতেন না। ইহার ফল ভাল হইবে কি মন্দ হইবে, তাহা স্যর আশুতোষ-প্রমুখ নেতৃবৃন্দের ভবিষ্যৎ কার্য্য-প্রণালীর উপর নির্ভর করিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক লক্ষ টাকা ঋণ শোধের জন্য দেশের নেতৃবৃন্দ ভিক্ষাপাত্র হস্তে দেশবাসীর দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। এখনই দেখিতেছি, টাকা উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে! আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, আগামী মাসেই আমরা সংবাদ দিতে পারিব, দেশবাসীর প্রদত্ত অর্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঋণ শোধ হইয়া গিয়াছে, এবং ভবিষ্যতে যাহাতে আয় বুঝিয়া ব্যয় হয়, তাহারও ব্যবস্থা হইয়াছে।

পুস্তক-পরিচয়

চক্র।—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত, মূল্য আড়াই টাকা।

এই উপন্যাসখানি দুই বৎসর পূর্ব্বে 'ভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়; কিন্তু কয়েক পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হইবার পরই বন্ধ হইয়া যায়। এখন সেইখানি সম্পূর্ণ ভাবে পুস্তকাকারে প্রচারিত হইল। বাঙ্গালা দেশে স্বদেশী আমলে যুবক-মণ্ডলে যে উন্মাদনার সঞ্চার হইয়াছিল, যাহার ফলে কত অমূল্য জীবন বলি-প্রদত্ত হইয়াছিল, কতজনকে সুদীর্ঘ কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহারই একটী শোচনীয় ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই সুবৃহৎ উপন্যাস-খানি রচিত হইয়াছে। শ্রদ্ধেয়া লেখিকা মহোদয়া উপন্যাস-রচনা-ক্ষেত্রে যশস্বিনী; তাঁহার তুলিকাপাতে বর্ণনীয় চরিত্রগুলি সমুজ্জ্বল হইয়াছে; বিনয়, উর্ম্মিলা, কৃষ্ণা, মিঃ লাহা প্রভৃতি যে চরিত্র দেখি, তাহাই সুন্দর, তাহাই উদ্ভাসিত। স্বদেশী ঘটনার উপন্যাস, তাই বইখানি খদ্দরে বাঁধাই।

মুদ্রা-দোষ।—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত, মূল্য এক টাকা।

'নীলাম্বরী' 'কানের ভুল' প্রভৃতির লেখক খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীমান খগেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁহার এই 'মুদ্রা-দোষ' লইয়া বঙ্গীয় পাঠক-সমাজে উপস্থিত। তাঁহার সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা জানেন, শ্রীমান খগেন্দ্রনাথের 'মুদ্রা-দোষ' একটুও নাই; যিনি তাঁহার সুকণ্ঠ-নিঃসৃত কীর্ত্তন গান শুনিয়াছেন, তিনিও এ কথার সাক্ষ্য দিবেন। তবে তিনি পাকা দর্শক; তাই যেখানে যে মুদ্রা-দোষ দেখিয়াছেন, তাহা তাঁহার সরস সুমিষ্ট ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; পূর্ণিমা-সম্মিলন, সঙ্গত প্রভৃতিতে এই মুদ্রা-দোষের দুই চারিটী আমরা শুনিয়াছি এবং বিশেষভাবে উপভোগ করিয়াছি; এখন বই বাহির হইল, এখন যখন-তখনই এই বইয়ের মধ্য দিয়া শ্রীমান খগেন্দ্র-নাথের সরস, সুন্দর পরিহাস আমরা অধিকতর উপভোগ করিতে পারিব।

পরমহংস দেব।—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত, মূল্য এক টাকা।

শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের অপূর্ব্ব জীবন-কথা অনেকেই লিখিয়াছেন, অনেকেই পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। এতদিন পরে প্রবীণ সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবাবুও 'পরমহংসদেব' প্রকাশিত করিলেন কেন, এ কথা যদি কেহ [illegible]সা করেন, তাহা হইলে আমাদের একমাত্র উত্তর, বইখানি পড়িলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। আমরা অসঙ্কুচিত চিত্তে বলিতে পারি, এমন একখানি বইয়ের প্রয়োজন ছিল; সেই প্রয়োজন সাধনের জন্যই দেবেন্দ্রবাবু বইখানি লিখিয়াছেন। ইহার অধিক পরিচয়—দেবেন্দ্রবাবুর লিপিচাতুর্য্য, তাঁহার ভাষার ওজস্বিতা, তাঁহার গুরুভক্তি, তাঁহার একাগ্রতার পরিচয় দেওয়া একে-বারেই অনাবশ্যক,—তাহা সর্ব্বজনবিদিত। একটা কথা শুধু বলিবার আছে,—এই পুস্তকের সমস্ত স্বত্ব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভক্ত-জননীর পুণ্যস্মৃতি-মন্দিরকল্পে উৎসৃষ্ট হইয়াছে।

পল্লীচিত্র।—শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত, মূল্য আড়াই টাকা।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্র বাবুর 'পল্লীচিত্রের' তৃতীয় সংস্করণ দেখিলাম। 'সৌভাগ্য' কেন বলিলাম তাহার একটা কৈফিয়ৎ দিতে হইতেছে। বহুদিন পূর্ব্বে, ১৩১১ সালে আমাদেরই আগ্রহে এবং বলিতে কি, তাড়নায় দীনেন্দ্রবাবু এই 'পল্লীচিত্র' পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন; এক বৎসরের মধ্যেই ইহার দুইটী সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়। তাহার পর এ সুদীর্ঘকাল সময়ে-অসময়ে অনুরোধ, তাড়না, ভৎর্সনা করিয়াও এই অতুলনীয় চিত্রখানির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করিবার জন্য তাঁহাকে প্রণোদিত করিতে পারি নাই। 'আর কেন?' 'আর ক হইবে?' ইহাই ছিল তাঁহার হেতুবাদ। যাহা হউক, এতকাল পরে ভগবান তাঁহাকে সুমতি দিয়াছেন, 'পল্লীচিত্র' প্রকাশিত হইয়াছে। এক বৎসরের মধ্যে যে পুস্তকের দুইটী সংস্করণ সেই ১৩১১ সালে উড়িয়া গিয়াছিল, সে পুস্তকের পরিচয় কি দিব?

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার বাবুর পরিচয় দীনেন্দ্রকুমার বাবু, আর পরিচয় তাঁহার পল্লীচিত্র, পল্লী-বৈচিত্র্য।

বঙ্কিমচন্দ্র।—শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত প্রণীত, মূল্য দুই টাকা।

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্প কয়েকখানি পুস্তকই প্রকাশিত হইয়াছে; ইহা আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা। বঙ্কিমচন্দ্র যদি ইউরোপখণ্ডে জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে এতদিনে তাঁহার জীবন-কথা, তাঁহার গ্রন্থসমালোচনাপূর্ণ এত অধিক পুস্তক প্রকাশিত হইত যে, তাহাতেই একটা লাইব্রেরী হইত। আমাদের দেশ, তাই সে আশা সুদূর-পরাহত। তবুও যে সামান্য কয়েকজন সুধী মনস্বী লেখক এ সম্বন্ধে লেখনী চালনা করিয়াছেন, বর্ত্তমান পুস্তক-লেখক মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। তিনি শ্রীযুক্ত শচীশবাবুর লিখিত বঙ্কিম-জীবনী অবলম্বন করিয়াই প্রধানতঃ জীবন-কথা লিখিয়াছেন; গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনায় তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তবে তাঁহার ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ, মনস্বী সুলেখকের নিকট হইতে আমরা আরও বেশী আশা করিয়াছিলাম; তিনি অতি সংক্ষেপেই এত বড় বিষয়টা শেষ করিয়াছেন, ইহাই যা আমাদের অভিযোগ। গ্রন্থের মধ্যে দুই চারিটী যে ভুল-ভ্রান্তি আছে, তাহা লেখক মহাশয় ভূমিকায় স্বীকার করিয়াছেন। আমরা এই গ্রন্থখানির সাদর অভিনন্দন করিতেছি।

সৌন্দরনন্দ কাব্য।—শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম-এ, বি-এল্ কর্তৃক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত, মূল্য এক টাকা।

মহাকবি অশ্বঘোষ-বিরচিত 'সৌন্দরনন্দ' মহাযান-বৌদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে একখানি সুন্দর কাব্য। ইহা এতকাল কোন ভাষাতেই অনূদিত হয় নাই; শ্রীযুক্ত বিমলা বাবুই প্রথম ইহার অনুবাদ করিলেন। বলা বাহুল্য, এই অনুবাদে বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদ্ বৃদ্ধি হইয়াছে; এজন্য বিমলাবাবু আমাদের ধন্যবাদভাজন। অনুবাদের ভাষা অতি সুন্দর হইয়াছে। আমরা এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

টেটুল।—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত বি-এ প্রণীত, মূল্য ছয় আনা।

এখানি ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিত কয়েকটী গল্পের সংগ্রহ। গল্পগুলি বেশ লেখা হইয়াছে; যাহাদের জন্য লিখিত, তাহারা বেশ বুঝিতে পারিবে; ছাপা, কাগজ, ছবিও ভাল। কার্ত্তিক বাবুর এই চেষ্টা সার্থক হউক, ইহাই আমাদের বাসনা।

গৌড়-পাণ্ডুয়া।—শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র এম-এ,বি-এল্ প্রণীত, মূল্য ৸৹।

এখানি দুর্গাচরণ গ্রন্থাবলির দ্বিতীয় গ্রন্থ। গ্রন্থকার গৌড় পাণ্ডুয়ার ঠিক ইতিহাস লেখেন নাই; তাহা হইলে গ্রন্থখানি বিপুল-কলেবর হইত; তিনি গৌড় পাণ্ডুয়া ভ্রমণ সময়ে যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহারই ইতিহাস অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গৌড়পাণ্ডুয়া সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় অনেক বড় বড় গ্রন্থ আছে; বাঙ্গালা ভাষায় তেমন কিছুই নাই; তাই ছোট হইলেও আমরা ইহাকেই সাদরে বরণ করিতেছি। এখানিতে অনেকগুলি ছবি আছে; আর লেখা,—শ্রীমান চারুচন্দ্রের নামের সহিত বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের পাঠকগণ পরিচিত।

পঞ্চকন্যা।—শ্রীশরৎকুমার রায় প্রণীত, মূল্য বার আনা।

শ্রীযুক্ত শরৎবাবু বিদ্যালয়-পাঠ্য এবং অন্যান্য বিষয়ে অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার লেখার বিশেষত্ব এই যে, তাঁহার ভাষা সুমার্জ্জিত, সরল, সুবোধ্য। এই পঞ্চ কন্যাতেও তাহা সুপ্রকাশিত। এ পঞ্চকন্যা কিন্তু অহল্যা দ্রৌপদী তারা ইত্যাদি নহেন, ইঁহারা সীতা, ভগবতী দেবী, রাবেয়া, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, ভগিনী ডোরা। আমাদের কন্যা ভগিনীগণের হস্তে এই পুস্তকখানি দেখিলে আমরা সুখী হইব।

খেলা ঘর।—শ্রীযামিনীকান্ত সোম প্রণীত, মূল্য এক টাকা।

যশস্বী লেখক হেনরিক্ ইবসেনের বিখ্যাত নাটক 'A Doll's House' কে যামিনীবাবু বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদ সুন্দর হইয়াছে; যাঁহারা ইংরাজী জানেন না অথচ কাগজপত্রে ইবসেনের নাম সর্ব্বদাই দেখিতে পান, তাঁহারা এই অনুবাদ পড়িয়া ইবসেনের পরিচয় লাভ করিতে পারিবেন।

মণ্টুর মা।—শ্রীচরণদাস ঘোষ প্রণীত, মূল্য আট আনা।

এখানি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ প্রকাশিত আট-আনা-সংস্করণ গ্রন্থমালার অশীতিতম গ্রন্থ। এই ছোটখাটো গল্প-সংগ্রহখানি আমরা পরম আগ্রহে পাঠ করিয়াছি। লেখক শ্রীমান্ চরণদাস নবীন লেখক হইলেও তাঁহার লেখার ভঙ্গী, বিভিন্ন গল্পের আখ্যান-ভাগ ও রচনা-চাতুর্য্য সর্ব্বথা প্রশংসনীয়; তাঁহার অঙ্কিত চরিত্রগুলিও বেশ চিত্রিত হইয়াছে। এই বইখানি পাঠ করিয়া সকলেই বিশেষ প্রীতিলাভ করিবেন; প্রথম গল্প 'মণ্টুর মা' বড়ই সুন্দর হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।—শ্রীমন্মথনাথ সিংহ কর্তৃক পদ্যে অনূদিত, মূল্য এক টাকা।

গীতার গদ্য-পদ্য অনুবাদ অনেক প্রকাশিত হইয়াছে, শ্রীযুক্ত সিংহ মহাশয় আর একখানি লিখিলেন। গীতার অমৃতময় বাণী যিনি যেমন করিয়া বলুন, তাহাই ভাল লাগে। এখানির অনুবাদ ভালই হইয়াছে।

আমাদের গ্রাম।—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার বি-এ প্রণীত, মূল্য ১৲

শ্রীযুক্ত সুবোধবাবু ভারতবর্ষের পাঠকগণের নিকট সুপরিচিত। তাঁহার অনেকগুলি পল্লীচিত্র 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহারই কয়েকটী এবং দুই তিনটী নূতন চিত্র দিয়া এই সংগ্রহ পুস্তক-প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিলাম। চিত্রগুলি সুলিখিত; পড়িলে দৃশ্যগুলি চক্ষের সম্মুখে যেন দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা আশা করি, এই পুস্তকখানি যথেষ্ট জনাদর লাভ করিব।

ভজ্জার বাঁশী।—শ্রীগুরুসদয় দত্ত আই-সি-এস্ প্রণীত, মূল্য ১।৹।

ছেলেদের জন্য লিখিত এই ছবিওয়ালা বইখানি দেখিয়াই আনন্দ হইল; তাহার পর পড়িয়া আরও বেশী আনন্দলাভ করিলাম। আনন্দের প্রধান কারণ, শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয় বিলাতী সিবিলিয়ান, তাহার পর তিনি একটা জেলার হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা; কাজ অনেক; তাহার পর সরকারী কাজ ছাড়া তিনি দেশহিতকর কাজে একজন অগ্রণী, কর্ম্মবীর। এত কাজ করিয়াও যে তিনি বাঁশী বাজাইবার জন্য (তাও বিলাতী ফ্লুট নহে, দিশী বাঁশী) অবকাশ করিয়া লইয়াছেন, ইহাতে

আনন্দিত হইতেই হয়। ভজার বাঁশীর মিষ্ট স্বরে আমরাই মুগ্ধ হইয়াছি; ছেলেমেয়েরা যে এই বইখানি হাতে পাইয়া আনন্দে করতালি দিবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

কাফ্রিদের দেশ আফ্রিকায়।—শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত, মূল্য দশ আনা।

এই বহুচিত্রশোভিত ছেলেদের বইখানি আমরা পরম আগ্রহে পাঠ করিয়াছি। ইহা William H. G. Kingston প্রণীত Adventures in Africa নামক ইংরাজী পুস্তক অবলম্বনে রচিত। বাঙ্গালীর ছেলে যে শিকার করিতে সহসা অগ্রসর হইবে, তাহা মনে হয় না; তাহারা এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে বনে-জঙ্গলে বাঘ-ভালুকের সম্মুখীন না হইয়াও শিকারের আনন্দ উপলব্ধি করিতে পারিবে। বইখানির রচনা অতি সরল ও সুন্দর।

মানব-প্রকৃতি।—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের "বিষ-বৃক্ষ" অবলম্বনে এই পুস্তকখানি লিখিত। ইহা বিষবৃক্ষের কেবল একটি দার্শনিক তথ্যের কিয়দংশ আলোচিত হইয়াছে। সেই সকল আলোচনা প্রাঞ্জল, সুখকর ও হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য বিষবৃক্ষ বর্ণিত চরিত্র হইতে ঘটনা তুলিয়া বুঝান হইয়াছে। স্ত্রীলোকের প্রকৃতি ও কার্য্যের উপর যে জাতির বিশেষত্ব নির্ভর করে এবং সেই বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে আমাদের স্ত্রীলোককে যে অতি সতর্কতা ও বিবেচনার সহিত শিক্ষা দেওয়া দরকার, তাহা এই পুস্তকে দেখান হইয়াছে। স্ত্রীলোকই সংসারের প্রকৃত শক্তি। যাহাতে সে শক্তির অপচয় না হয় এবং যে ভাবে সে শক্তি প্রযুক্ত হইলে সংসারে উন্নতি ও সুখ হইতে পারে, সে সম্বন্ধেও সুন্দর আলোচনা ও আদর্শ এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

দন্ত-বিকাশ।—শ্রীউদ্‌ভ্রান্ত চৈতন্য গোস্বামী প্রণীত। ব্যঙ্গ-কবিতা, হাসির গান ও চুটকি কথার বই, ৩২ পৃষ্ঠা, মূল্য।০ 'উদ্‌ভ্রান্ত চৈতন্য' এই উদ্ভট নামটি সুরসিক গ্রন্থকারের ছদ্মনাম। তাঁর প্রকৃত নাম শ্রীমান রামরঞ্জন গোস্বামী। এই রামরঞ্জন ওরফে 'উদ্‌ভ্রান্ত চৈতন্য' বাংলা দেশের সর্ব্বজন পরিচিত হাস্যাবতার শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর কনিষ্ঠ সহোদর। দাদার লোক হাসাইবার শক্তি ভায়ার মধ্যেও যে কতটা আছে, দন্তবিকাশের "ম্যালেরিয়াবধ" কাব্যাংশ পড়লে সে পরিচয় বেশ পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যে অধুনা হাসির একান্ত অভাব। আশা করি—এই তরুণ হাস্যরসিক কবি শীঘ্রই নিজের প্রতিভার দ্বারা দেশের সে অভাব দূরকরিবেন।

সাহিত্য-সংবাদ

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্-এ ডি-এল্ প্রণীত 'রক্তের ঋণ' আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার ৮২ সংখ্যা চিহ্নিত হইয়া প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত নূতন নাটক মেবার গৌরব প্রকাশিত হইল; মূল্য ১।০।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত সচিত্র "কাটার বা পরিচ্ছদ প্রণেতা" প্রকাশিত হইল; মূল্য ৩৲।

শ্রীরামচন্দ্র মিত্র দাস প্রণীত "শ্রীমৎ হরনাথ গীতা" প্রকাশিত হইল, মূল্য ১॥০।

অধ্যাপক শ্রীবিধুভূষণ দত্তের 'কার্পাসে স্বাবলম্বন' প্রকাশিত হইল, মূল্য।৫ আনা।

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত "বেদবাণী" দ্বিতীয় প্রচার প্রকাশিত হইল; মূল্য ১॥৶০।

শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী প্রণীত "বৃন্তচ্যুত" প্রকাশিত হইল, মূল্য ১।০।

কুমারী নীহারনলিনী দত্ত প্রণীত নূতন উপন্যাস 'পূজার কথা' প্রকাশিত হইল; মূল্য ১৲।

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত নূতন উপন্যাস "ফুলশয্যা" প্রকাশিত হইল; মূল্য ১॥০।

শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মজুমদার প্রণীত "আমাদের গ্রাম" গল্পপুস্তক প্রকাশিত হইল; মূল্য ১৲।

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত নূতন উপন্যাস 'ভাগ্য নিরূপিতা' প্রকাশিত হইল; মূল্য ১॥০।

শ্রীযুক্ত অসিতারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নূতন উপন্যাস 'প্রেম বা প্রবঞ্চনা' প্রকাশিত হইল; মূল্য ১।০।

Publisher—Sudhanshusekher Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Narendranath Kunar,
The Bharatbarsa Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street, CALCUTTA.

"যেথায় গোলাপ ফুটে রক্তবর্ণ, মনে লয় মোর,
মাটিতে মিশেছে রক্ত-রাঙা কামনা কাহার;
সরমে কুণ্ঠিত লতা লজ্জাবনত নাচাইছে, তার
পরশ-পুলক-স্পর্শে ঝরেছিল কার আঁখি-লোর।"

(ওমর-গীতি—শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়—অনূদিত)

শিল্পী—শ্রীযুক্ত রামেশ্বর প্রসাদ বর্ম্মা] [Bharatvarsha Halftone & Printing Works

ভারতবর্ষ

মাঘ, ১৩২৯

দ্বিতীয় খণ্ড দশম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা

স্বপ্ন

ডাক্তার শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু, ডি-এস্‌সি, এম-বি

(২)

দ্ধ ইচ্ছাই যে স্বপ্নে কাল্পনিক পরিতৃপ্তিলাভের চেষ্টা রে—এ কথা গতবারে বলিয়াছি। এই রুদ্ধ ইচ্ছা কি, ার তাহার উৎপত্তিই বা কিরূপে হয়, এবার তাহারই ালোচনা করিব। আমাদের দৈনন্দিন কার্য্যগুলি ালোচনা করিলে দেখা যাইবে, তাহার বেশীর ভাগই ামাদের ইচ্ছাকৃত। এই সকল কার্য্যে আমাদের ইচ্ছার স্তিত্ব বেশ পরিস্ফুট আকারে বর্ত্তমান। যেমন, ক্ষুধার দ্রেক হওয়ায় ভাত খাইতে ইচ্ছা হইল—খাইবার জন্য সনেও বসিলাম। এই রকম কাজ ছাড়া আমরা এমন রও অনেক কাজ করি, যাহাতে আমাদের ইচ্ছার অস্তিত্ব উভাবে ধরা যায় না। পায় মশা বসিল, অন্যমনস্কভাবে ও দিয়া তাড়াইয়া দিলাম। ইহা যে ঠিক ইচ্ছার বশেই করিয়াছি, এ কথা বলা চলে না। চোখে ধূলা পড়িল—চোখ বুজিলাম। এই চোখ-বুজা আমার ইচ্ছাধীন নহে। ধূলা পড়ায় আমার ইচ্ছার অপেক্ষা না রাখিয়াই চোখ আপনা হইতেই বুজিয়া যায়। অন্যমনস্ক-অবস্থায় আমরা যে-সব কাজ করি, তাহাতেও ইচ্ছা পরিস্ফুট থাকে না। সাধারণের ধারণা, সকল কাজেই বুঝি আগে হইতে আমাদের ইচ্ছা জন্মে, পরে সেই ইচ্ছার ফলে কাজ হয়। কথাটা সত্য হইলেও, অনেক কাজেই ইচ্ছা ও তদনুরূপ কার্য্যের পৌর্ব্বাপর্য্য ভাল রকম বুঝা যায় না। ইচ্ছার ফলেই যে কাজটি ঘটিয়াছে, ইহা বুঝিতে হইলে আগে মনকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা দরকার। আমাকে কেহ গালাগালি করিল। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাকে এক চড়

মারিলাম। এই চড় মারা আমার ইচ্ছাকৃত বটে, কিন্তু মারিবার সময় আমার মনে যে সে ইচ্ছার উদ্রেক হইয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এইরূপ চড় মারা, মশা-তাড়ান, অন্যমনস্কভাবে কাজ করা প্রভৃতিতে ইচ্ছার অস্তিত্ব বুঝিতে হইলে মানসিক বিশ্লেষণের আশ্রয় লইতে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইচ্ছার অনেক প্রকার-ভেদ আছে। যথা—

(১) যে-সকল ইচ্ছা একেবারে পরিস্ফুট,—যাহার অস্তিত্ব বুঝিতে কোনই কষ্ট পাইতে হয় না। ধরুন, ইডেন গার্ডেন্সে যাই, কি পরেশনাথে বেড়াইতে যাই, এই লইয়া গোলে পড়িয়াছি; শেষে ঠিক হইল পরেশনাথেই যাইব। এক্ষেত্রে পরেশনাথে যাইবার ইচ্ছা সুপরিস্ফুটভাবে মনের মধ্যে উদিত হইল।

(২) যে-সব ইচ্ছা মনে জাগরুক না থাকিলেও তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা সন্দিহান নহি। যেমন, প্রতিদিনের নিয়ম মত সকালে উঠিয়া মুখ ধুইলাম। এরূপ স্থলে ইচ্ছা হইয়াছিল বলিয়াই যে মুখ ধুইয়াছি, তাহা মনে থাকে না। কিন্তু কেহ জিজ্ঞাসা করিলেই সে কথা বুঝিতে পারি। সকল রকম অভ্যস্ত কাজেই এইরূপ ইচ্ছার অস্তিত্ব বর্তমান। প্রথম পর্য্যায়ের ইচ্ছা চেতনার কেন্দ্রস্থানে অবস্থিত বলিলে এই দ্বিতীয় পর্য্যায়ের ইচ্ছাকে চৈতন্যের অধিকারের প্রান্তে অবস্থিত বলিতে পারি।

(৩) যে-সকল ইচ্ছা অপরিস্ফুট, অথচ সহজেই তাহাদের অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায়। যেমন, রাগের মাথায় চড় মারা। এই ইচ্ছা যে চৈতন্যের অধিকারের একেবারে বাহিরে, তাহা বলা যায় না। চৈতন্যের অধিকার এই প্রদেশ পর্য্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় বিস্তৃত না থাকিলেও, চেষ্টার ফলে এই পর্য্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে। এইরূপ ইচ্ছার অস্তিত্ব বুঝিতে হইলে মনকে কতকটা বিশ্লেষণ করা দরকার।

(৪) যে-সকল ইচ্ছার অস্তিত্ব কেবল অনুমান-সাপেক্ষ। মনকে বিশ্লেষণ করিয়াও এই শ্রেণীর ইচ্ছার অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না। কেবল কাজ দেখিয়া, বা পূর্ব্বে ঐরূপ ইচ্ছা মনে উদিত হইয়াছে জানিয়া, তাহার অস্তিত্ব অনুমান করিয়া লইতে হয়। যেমন, পানের উপর আমার খুব লোভ, অথচ ঠিক করিলাম আজ আর পান খাইব না। আমি একমনে বই পড়িতেছি, পাশেই পান-ভরা ডিবা,—পড়িতে পড়িতে পড়িতে কখন যে অন্যমনস্কভাবে ডিবা হইতে পান মুখে পূরিয়াছি, জানিতে পারি নাই। খেয়াল হইলে দেখিলাম পান চিবাইতেছি। এ ক্ষেত্রে পান লওয়া আমার ইচ্ছাকৃত হইলেও, সে ইচ্ছার অস্তিত্ব আমি বুঝিতে পারি না। কখন যে মনে ঐ ইচ্ছার উদ্রেক হইয়াছিল, চেষ্টা করিয়া তাহা ধরিবার উপায় নাই। তবে কার্য্যের ফল দেখিলে কোনই সন্দেহ থাকে না যে, পান খাইবার ইচ্ছা মনে উঠিয়াছিল।

লক্ষ্য করিতে হইবে, এই ইচ্ছা কেবলমাত্র অনুমানসাপেক্ষ হইলেও ইহার অস্তিত্ব অথবা সত্যতা সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। আরও লক্ষ্য করা দরকার, এইরূপ ইচ্ছা অপরিস্ফুট হইলেও পরিস্ফুট ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদিগকে কার্য্য করাইতে পারে। পান খাইব না—মনস্থ করিয়াছিলাম। কিন্তু পান খাইবার ইচ্ছা আমাকে অন্যমনস্ক-অবস্থায় পাইয়া চরিতার্থতা লাভ করিল।

(৫) যে-সকল ইচ্ছার অস্তিত্ব কেবল অনুমানসাপেক্ষ। বিশ্লেষণের সাহায্যে তাহাদের প্রকৃতি ধরিতে পারিলেও মনে যে ঐরূপ ইচ্ছা আছে, এ কথা সহজে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। মনে করুন, আমি ব্যবসাদার। পাওনাদার টাকার বিল পাঠাইয়াছে। আমার মধ্যে সততার একটা অভিমান আছে। অথচ রোজই পাওনাদারের পাওনার টাকা পাঠাইতে আমার ভুল হয়। এ ক্ষেত্রে টাকা দিবার ইচ্ছা যে আমার নাই,- এরূপ অনুমান বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। আমার পাওনাদার ত এ অনুমান করিয়াই থাকেন, আর তাই আমাকে গালি দিতেও কসুর করেন না। আমি তাঁহাকে বুঝাইলাম, কাজের ঝঞ্ঝাটে ভুল হইয়া গিয়াছে। তিনি তখনই চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন, আমার নিজের পাওনা টাকা আমি ত লোকজনের কাছে আদায়ের চেষ্টা করিতে ভুলি নাই। সুতরাং কাজের ঝঞ্ঝাটে ভুল হওয়াটা একটা অজুহাত মাত্র। অজ্ঞাতসারে আমার মনের মধ্যে টাকা দিবার ইচ্ছা না থাকায় যে এইরূপ ঘটিয়াছে, এ কথা মানিয়া লইতে অনেকেরই আপত্তি হইবে;—বিশেষতঃ দেনদারদিগের। এখানে একটা বড় কথা উঠিতেছে। এইরূপ অনুমান করা যুক্তিযুক্ত কি না? কেবলমাত্র একটি ঘটনার উপর নির্ভর

করিয়া, যদি এইরূপ অনুমান করিতে হয়, তবে তাহা ঠিক না-ও হইতে পারে ; কিন্তু যদি দেখা যায় বারবার আমার টাকা দিতে ভুল হইতেছে, আর টাকা না দিবার ইচ্ছা আমার অন্যান্য আচরণেও প্রকাশ পাইতেছে, তখন টাকা না দিবার ইচ্ছাই যে মনের মধ্যে রহিয়াছে, এরূপ অনুমান অন্যায় হইবে না। কি ধরণের প্রমাণ পাইলে এইরূপ ইচ্ছার অস্তিত্ব মানিব, সে কথা পরে আলোচনা করা যাইবে। এই প্রকার ইচ্ছা আমাদের অজ্ঞাত ত বটেই, তা ছাড়া কেহ তাহার অস্তিত্ব দেখাইয়া দিলেও আমরা সহজে মানিতে চাহি না। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, এরূপ ইচ্ছার বশে আমরা যে-সব কাজ করি, তাহারও অন্য একটা কারণ দেখাইয়া থাকি। যেমন, কাজের ঝঞ্ঝাটে ভুল হইয়াছে। এরূপ কারণ-দেখানটা এতই স্বাভাবিক যে, মনোবিজ্ঞানবিদেরা ইহার নামকরণ পর্য্যন্ত করিয়াছেন—Rationalization. বাঙ্গালায় ইহাকে যুক্ত্যাভাষ বলা যাইতে পারে। এই যুক্ত্যাভাষ হঠাৎ শুনিতে ন্যায়সঙ্গত যুক্তিরই মত, কিন্তু যুক্ত্যাভাষ-প্রদর্শনকারী স্বীকার করিতে না চাহিলেও বিচারে তাহা টেকে না। যেমন, বিলের টাকা না দেওয়ার কারণ—বলিতেছি কাজের ঝঞ্ঝাটে ভুল হইয়াছে। অথচ, নিজের পাওনা আদায়-ব্যাপারে আমার একেবারেই ভুল হয় না। তর্কে পরাস্ত হইলেও যুক্ত্যাভাষ-প্রদর্শনকারী বলিবেন, ভুল হইয়াছে—অন্যমনস্ক হইয়া করিয়াছি—এরূপ সকলেরই হয়—ইত্যাদি। পাঠক দেখিবেন, এই সকল ভুল বা অন্যমনস্কতার একটা বৈশিষ্ট্য আছে।

(৬) আগেই যে ইচ্ছার কথা বলিলাম, তাহা চৈতন্যের অধিকারের বহির্ভূত হইলেও, অনুমান দ্বারা তাহার অস্তিত্ব নিরূপিত হইলে, সেই ইচ্ছা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কোন না কোন সময় এইরূপ ইচ্ছা আমাদের চেতনায় উঠিতে পারে। পরকে ঠকানোর ইচ্ছা এমন কিছু অদ্ভুত নহে যে, তাহা একেবারে আমাদের অস্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এইবার আমরা যে ধরণের ইচ্ছার কথা আলোচনা করিব, তাহা হঠাৎ শুনিতে অদ্ভুত ও অসম্ভব বোধ হইবে। বলা বাহুল্য এরূপ ইচ্ছা আমাদের চৈতন্যের অধিকারের বহির্ভূত হওয়ায় কেবলই অনুমানের সাহায্যে তাহার অস্তিত্ব বুঝিতে হয়। ধরুন, যদি আমি বলি, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই মরিবার ইচ্ছা আছে, তাহা হইলে কথাটা সকলেই অসম্ভববোধে হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। আমরা ত সর্ব্বদাই 'প্রাণ রাখিতে প্রাণান্ত' ; মরিতে যে চাই—এ কথাটা ত মন একেবারেই মানিতে চায় না। এইরূপ ইচ্ছার অস্তিত্ব কিরূপে নির্ণীত হইতে পারে, উদাহরণ দিয়া বুঝাইব। মনে করুন, রামবাবু নানা দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়া সংসারে বীতস্পৃহ হইয়াছেন। তিনি আত্মহত্যা করিবার মানসে গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। এ ক্ষেত্রে রামবাবুর যে মরিবার ইচ্ছা হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই এবং এই ইচ্ছা প্রথম পর্য্যায়ের ইচ্ছার ন্যায় তাঁহার চৈতন্যের কেন্দ্রস্থলেই অবস্থিত। আমরা সকলেই বৃদ্ধ বয়সে মরিবার জন্য উৎসুক হইতে পারি ; কিংবা দুঃখকষ্টের জ্বালায় যৌবনেও মৃত্যু-কামনা করিতে পারি। ইহা হইতে বুঝা যায়, মরিবার ইচ্ছা আমাদের সকলের মনের মধ্যেই সুপ্তভাবে রহিয়াছে ; কেবল সুবিধা-সুযোগ পাইলেই তাহা আত্মপ্রকাশ করে মাত্র। যে ইচ্ছার অস্তিত্ব একেবারেই নাই, তাহা কখনো ফুটিতে পারে না। আমাদের সকলেরই প্লীহা আছে, সুস্থ অবস্থায় তাহার অস্তিত্ব আমরা টের পাই না। কিন্তু যিনি ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছেন, তাঁহার পক্ষে প্লীহার অস্তিত্ব বুঝা খুবই সহজ। ম্যালেরিয়া নূতন করিয়া প্লীহা সৃষ্টি করে না,—যে প্লীহা আছে, তাহারই বৃদ্ধিকল্পে সহায়তা করে মাত্র। সেইরূপ দুঃখকষ্টে বা বার্দ্ধক্যে আমাদের মৃত্যু-ইচ্ছা প্রকটিত হয় মাত্র। আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যাক,—হরিবাবু সাঁতার একেবারেই জানেন না। জলে পড়িলে 'পিলসুজে'র মত ডুবিয়া যাইবেন,—এ কথা তাঁহার বেশ জানা আছে। কালবৈশাখী ; আকাশ মেঘে ভরা ; তিনি একা নৌকায় চড়িলেন ; বলিলেন, গঙ্গাবক্ষে কিছু স্ফূর্ত্তি করিয়া আসা যাক। এমন সময়, দমকা বাতাসে নৌকাডুবি হইয়া তিনি প্রাণ হারাইলেন। এ ক্ষেত্রে যদি বলা যায়, হরিবাবুর ভিতরে-ভিতরে মরিবার একটা ইচ্ছা ছিল, তাহা হইলে কথাটা নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। অবশ্য মরিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে উদিত হয় নাই, এ কথা সত্য। মৃত্যুর সম্ভাবনা সত্ত্বেও যখন আমরা কোন বিপদজনক কাজ করিতে যাই, তখন আমরা যে মৃত্যু-ইচ্ছার বশেই চলিতেছি,—এ কথা বলিলে অন্যায় হয় না। অবশ্য এই মৃত্যু-ইচ্ছা মনের মধ্যে সুপ্ত থাকায় আমরা

কৃত কার্য্যের আর পাঁচটা কারণ দেখাইয়া থাকি। এইরূপ মৃত্যুভাব পূর্ব্ব পর্য্যায়ের ইচ্ছার বশে চালিত কার্য্যে দেখা গিয়াছে। Shellyর মৃত্যু অনেকে আকস্মিক মনে করেন। আমার মতে ইহা একরূপ আত্মহত্যা। ঝড় আসন্ন জানিয়াও শেলী দুইজন আনাড়ি লোকের সহিত নৌকায় বাহির হইয়া সমুদ্রে ডুবিয়া মরেন। যাহারা স্বেচ্ছায় লড়ায়ে যায়, তাহাদের মধ্যেও এইরূপ মরিবার ইচ্ছা বর্ত্তমান। এই মৃত্যু-ইচ্ছার প্রেরণা সকল ক্ষেত্রে সমান নহে। যিনি জানিয়া-শুনিয়া আত্মহত্যা করিতে যাইতেছেন (যেমন রামবাবু) তাঁহার মরিবার ইচ্ছা অপেক্ষা হরিবাবু—যিনি সাঁতার না জানিয়া ঝড়ের মধ্যে নৌকা চড়িয়াছেন—তাঁহার মরিবার ইচ্ছার প্রেরণা অপেক্ষাকৃত কম। যাঁহারা লড়ায়ে যান, তাঁহাদের মৃত্যু-ইচ্ছা আরও অপ্রকাশ বলিতে পারি। যাঁহারা গাড়ী-ঘোড়ার ভিড়ের মধ্যে যান, তাঁহাদেরও এইরূপ মরিবার ইচ্ছা আছে বলা চলে। আমরা দৈনন্দিন কার্য্যে কত না বিপদের মধ্যে যাইতেছি। অতএব প্রতিদিনই আমাদের এই মৃত্যু-ইচ্ছা নানা কার্য্যে প্রকাশ পাইতেছে। এই ইচ্ছার অস্তিত্ব কিন্তু শুধু যুক্তি ও অনুমানের বলেই নির্ণয় করিতে হয়। এইরূপ ইচ্ছার একটা বিশেষত্ব এই, আমাদের চেতনায় তাহা ইচ্ছা বলিয়া ত প্রকাশ পাই-ই না, বরং ভয়-রূপে দেখা দেয়। ভিতরের ইচ্ছা মরিবার, কিন্তু বাহিরে ভয় হয়—পাছে মরি। ইচ্ছার ভয়রূপে প্রকাশ আমরা অনেক সময়েই দেখিতে পাই। চোরের চুরি করিবার ইচ্ছা,—পাছে তাহা কার্য্যে প্রকাশ পাইয়া পাঁচজনের নজরে পড়ে, সেজন্য সে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত। ইচ্ছাকে লুকাইতে গেলে আমাদের পদে-পদে ভয় হয়, বুঝি বা তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। আগেকার উদাহরণে মৃত্যু-ইচ্ছার অস্তিত্ব বুঝিতে পারিলেও চেতনায় বাঁচিবার ইচ্ছাটাই প্রবল। এক্ষেত্রে মনের মধ্যে বাঁচিবার ও মরিবার দুইটি বিরুদ্ধ ইচ্ছাই রহিয়াছে বলিতে হইবে। দুইটি বিরুদ্ধ ইচ্ছা কখনও একই সঙ্গে প্রকাশ পাইতে পারে না। এই কারণে সুপ্ত ইচ্ছা আত্মপ্রকাশে বাধা পাইলে ভয়রূপে চেতনায় দেখা দেয়। ইচ্ছার ভয়রূপে রূপান্তরিত হওয়া একটা অতি অদ্ভুত ব্যাপার। এ সম্বন্ধে পরে বিস্তৃত আলোচনা করিব। গতবারে স্বপ্নের উদাহরণে "ক" বাবুকে যে পিতার মৃত্যু-কামনা করিতে দেখা গিয়াছিল, এখানে সে সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। আমাদের মনের অগোচরে যেরূপ মৃত্যু-ইচ্ছা লুক্কায়িত আছে, "ক" বাবুরও পিতার মৃত্যু-কামনা সেইরূপ মনের অজ্ঞাতে লুকান ছিল। চেতনায় তিনি ইহার কোনই আভাষ পান নাই। বরং আমি যখন তাঁহাকে এইরূপ ইচ্ছার অস্তিত্ব দেখাইয়া দিলাম, তখন তিনি তাহা সহজে স্বীকার করিতে রাজি হন নাই। বাপের মৃত্যু-কামনা ত দূরের কথা, পাছে বাপের মৃত্যু হয়—এই আশঙ্কাই তাঁহার চেতনায় বর্ত্তমান ছিল।

আমাদের মনের অগোচরে নানা অজানা ইচ্ছা থাকিতে পারে, আর এই সকল ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা অনেক কাজও করিয়া থাকি। এই সকল ইচ্ছা কেন যে চৈতন্যের অধিকারের বহির্ভূত, এবার তাহাই বলিব। মনোবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা এ সম্বন্ধে একমত নহেন, আর এই প্রশ্নের সবিস্তারে আলোচনাও করেন নাই। আমি এখানে আমার নিজের মতই প্রকাশ করিব। আমি সাইকেল চড়িতে শিখিতেছি। যাহাতে পড়িয়া না যাই, এইজন্য আমাকে বিশেষ সচেষ্ট থাকিতে হইতেছে—পদে পদে যথেষ্ট ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগ করিতে হইতেছে। দিনকতক অভ্যাসের পর পতন নিবারণের জন্য আমাকে আর কোনরূপ চেষ্টাই করিতে হয় না। এ কাজটা আপনা-আপনি হইয়া থাকে। সকল প্রকার অভ্যস্ত কাজের মজাই এই, ইহাতে ইচ্ছার অস্তিত্ব মোটেই টের পাওয়া যায় না। অভ্যস্ত হইবার পূর্ব্বে যে ইচ্ছা চেতনার কেন্দ্রস্থানে ছিল, অভ্যস্ত হইবার পর সে ইচ্ছার অস্তিত্ব ধরা যায় না,—ধরিতে হইলে অনুমানের আশ্রয় লইতে হয়। ইচ্ছা করিয়া কোন কাজ করিতে গেলেই তাহার সহিত একটা চেষ্টার সংশ্রব থাকে। আর বারবার এইরূপ চেষ্টায় মনে অবসাদ আসিতে পারে। অবশ্য কার্য্যে অভ্যস্ত হইয়া গেলে এরূপ চেষ্টার আর কোনই আবশ্যকতা থাকে না; সেজন্য অভ্যস্ত কাজে ক্লান্তিও অনেক কম। অতএব দেখা গেল, ইচ্ছা চৈতন্যের বাহিরে যাইলে একটা লাভ আছে। কাজ যত অনায়াস-সাধ্য হইবে, ততই তাহার বাধাও কমিয়া যাইবে। আর এই বাধা কমিবার সঙ্গে-সঙ্গে ইচ্ছাও চৈতন্যের অধিকারের বহির্ভূত হইবে। সুতরাং বলা যায়, কার্য্যে বাধা থাকিলেই ইচ্ছা পরিস্ফুট হয়। যে কার্য্য বাধাহীন, সে কার্য্যে

ইচ্ছার অস্তিত্ব অপ্রকাশ থাকে। অভ্যাসই বাধা দূর করে, সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছাকে অপ্রকাশ করে। অনেক মনোবিজ্ঞান-বিদের মতে আদিম জীবের প্রত্যেক কার্য্যই ইচ্ছা-সম্ভূত ছিল। বিবর্ত্তনের ফলে হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি ক্রিয়া ক্রমে ক্রমে ইচ্ছার বহির্ভূত হইয়াছে। এরূপ কার্য্যেও একটা অজ্ঞাত ইচ্ছা মানিয়া লওয়া যাইতে পারে।

কোন কার্য্যে যদি বাধা বেশী থাকে, তবে সে কার্য্য করিবার কোন প্রকার চেষ্টাই সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রেও ইচ্ছা দেখা দেয় না। একেবারে বাধাহীন কার্য্যে যেমন ইচ্ছা অপ্রকাশ থাকে, বাধা অলঙ্ঘনীয় হইলেও, সেইরূপ ইচ্ছা ফুটিতে পায় না। মনের মধ্যে যখন দুইটি বিরুদ্ধ ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকে,—যেমন মরিবার ও বাঁচিবার—তখন একটির পক্ষে অপর ইচ্ছা কর্ত্তৃক প্রদত্ত বাধা অলঙ্ঘনীয়, আর সেইজন্যই এই ইচ্ছাটিকে একেবারে চেতনার অধিকারের বাহিরে যাইতে হয়। ইহাই আমার মত। বাধা যেখানে লঙ্ঘনীয়, সেখানে চেতনার আবির্ভাব হয়। অন্যথা নহে।

আমরা—চেতনার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ইচ্ছা হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে অজ্ঞাত ইচ্ছা পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্তরের ইচ্ছার অস্তিত্বের কথা বলিলাম। আমি যে ছয়টি পর্য্যায়ের ইচ্ছার উল্লেখ করিয়াছি, তাহা কেবল বুঝাইবার সুবিধার জন্য। বস্তুতঃ একেবারে পরিস্ফুট হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে অজ্ঞাত ইচ্ছা পর্য্যন্ত অসংখ্য স্তর আছে। ইহার যে রকম বিভাগই করা যাক না কেন, তাহা কাল্পনিক হইবে। ফ্রয়েড্ ইচ্ছার তিনটি মাত্র বিভাগ করিয়াছেন—Conscious, Foreconscious, এবং Unconscious। Conscious অর্থাৎ চেতনার অধিকারের অন্তর্গত। Foreconscious—যেখানে চেষ্টার ফলে চেতনার অধিকার বিস্তার করা যায়, এবং Unconscious—যেখানে চেতনার অধিকার নাই। আমি কিন্তু চারিটি বিভাগের পক্ষপাতী :—

(১) Conscious—চেতনার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

(২) Foreconscious—অর্থাৎ চেষ্টার ফলে যেখানে চেতনার অধিকার বিস্তার করা যায়।

(৩) Subconscious—চেতনার অধিকারের বহির্ভূত হইলেও কোন না কোন দিন যে ইচ্ছা মনে উঠা সম্ভব।

(৪) Unconscious—যে ইচ্ছা কোনদিন মনে উঠিতে পারে না; অস্তিত্ব যাহার কেবলই অনুমানসাপেক্ষ।

স্বপ্নে পূর্ব্বোল্লিখিত সকল প্রকার ইচ্ছার অস্তিত্বই দেখা যায়। ফ্রয়েডের মতে চৈতন্যের অধিকারের বহির্ভূত ইচ্ছাই মূলতঃ স্বপ্নে কাল্পনিক পরিতৃপ্তিলাভের চেষ্টা করে এবং তাহা অন্যান্য পর্য্যায়ের ইচ্ছার সহিত সংযুক্ত হওয়ার ফলে অন্য প্রকারের ইচ্ছাও স্বপ্নে দেখা যায়। তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া স্বপ্ন দেখিলাম জল খাইতেছি। পাঠক মনে করিতে পারেন ইহাতে পরিস্ফুট ইচ্ছাই পরিতৃপ্ত হইল। কিন্তু ফ্রয়েডের মতে এই ধরনের স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিলেও ইহার মধ্যে চৈতন্যের বহির্ভূত কোন-না-কোন প্রকার ইচ্ছার অস্তিত্ব দেখা যাইবে।

অজ্ঞাত ইচ্ছা কি প্রকারে পরিতৃপ্তিলাভের চেষ্টা করে, আগামীবারে তাহারই আলোচনা করা যাইবে। *

* দীপালী সম্মিলনে পঠিত

প্রভুর ঠাঁই

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর বি-এ

রবি কিরণের প্রতি বিন্দুটি যথায় পশে না কভু
পারাবার বলে গুরু গর্জ্জনে, সেথায় রহেন প্রভু।
তুঙ্গ শৃঙ্গ-অঙ্গুলি তুলি ইঙ্গিতে গিরি কহে
ঊর্দ্ধে ঊর্দ্ধে বিশ্বেশ্বর, অন্য কোথাও নহে।

দিশি দিশি ছুটি সদাগতি অতি ধীরে ধীরে সদা কয়
দিকে দিকে ঐ দূরে দূরে বিভু, নয়ন আড়ালে রয়।
সাধক বলেন 'দূরে ন'ন তিনি, হ'ন নাক কাছ-ছাড়া,
বুকে বুকে তাঁর সদা অভিষেক, আঁখে আঁখে তাঁর ধারা

অমূল তরু

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(৭)

কয়েকদিন হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া অবিশ্রান্ত টিপিটিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল। কলিকাতার পথ কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠিয়াছে; তাহার উপর শীতকালের দিনে বর্ষায় অত্যধিক ঠাণ্ডা পড়ায়; ক্লিষ্ট পথিকগণ অতিশয় কষ্টে পথ চলিতেছিল। সুনীতি তাহার কক্ষে বসিয়া দুঃখার্দ্র চিত্তে পথচারীদের কষ্ট দেখিতেছিল। এমন সময়ে খামে-মোড়া একখানা চিঠি লইয়া প্রবেশ করিয়া যোগেশ বলিল, "সেজদিদি, তোমার একখানা চিঠি আছে।"

সুনীতি জানালার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "কার রে?"

"তা জানি নে,—এই নাও।" বলিয়া চিঠি দিয়া যোগেশ চলিয়া গেল।

খামের উপর অপরিচিত হস্তাক্ষর দেখিয়া সুনীতি একটু বিস্মিত হইল,—তাহার পর চিঠি খুলিয়া লেখকের নাম দেখিয়া তাহার মুখ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। চিঠি লিখিয়াছে সুবোধ।

এ কয়েক দিন সুবোধের সহিত রঙ্গ-কৌতুকের মধ্যে তাহার কতকটা অংশ থাকিলেও, প্রত্যক্ষ যোগ বিশেষ কিছু ছিল না। আজ সহসা সুবোধের নিকট হইতে তাহার সম্বোধনে পত্র আসিয়া তাহারই নিকট একেবারে উপস্থিত হওয়ায়, সুনীতি হৃদয়ের মধ্যে একটা অনির্ব্বচনীয় সঙ্কোচ বোধ করিল। সুবোধের সম্মুখে সহসা তাহাকে দাঁড় করাইয়া দিলে, তাহার যেমন লজ্জা করিত, তাহার নামে সুবোধের পত্র হস্তে লইয়া, নির্জ্জন কক্ষেও সুনীতির ঠিক তেমনি লজ্জাই করিতে লাগিল। সুবোধ লিখিয়াছিল;—

শ্রীমতী সুনীতিবালা দেবী,

কল্যাণীয়াসু,

সেদিন সন্ধ্যায় তোমাদের বাড়ী থেকে হঠাৎ ও-রকম করে চলে আসায়, তুমি নিশ্চয় খুব আশ্চর্য্য ও বিরক্ত হয়েছিলে। এসে পর্য্যন্ত আমার ইচ্ছা হচ্ছিল যে, আমার সেই অদ্ভুত আচরণের একটা কৈফিয়ৎ দিই; কিন্তু কি রকম করে দিই, তার উপায় ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না। আজ অনেক ভেবে-চিন্তে তোমাকে চিঠি লেখাই স্থির করলাম,—বিশেষতঃ, বিনোদ যখন আশ্বাস দিলে যে, তোমাকে চিঠি লিখলে অন্যায় কিছু হবে না। তবুও এই চিঠি লেখার জন্য প্রথমেই তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি। তুমি যে সেদিন তোমাকে সুনীতি বলে ডাকবার অধিকার আমাকে দিয়েছিলে, আশা করি, এই চিঠি লেখার স্পর্দ্ধাকেও সেই অধিকারের অনুবর্ত্তী অধিকার বলে গ্রহণ করবে।

কৈফিয়ৎ ত দিতে ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু কি কৈফিয়ৎ যে

দাব, তা বুঝে উঠতে পাচ্ছি নে। কারণ, সেদিন অমন করে কন পালিয়েছিলাম, তা আমি নিজেই এখনও ঠিক করতে ারি নি। আমার বোধ হয়, তুমি আমাকে যে অধিকার িয়েছিলে, পাছে তার মর্য্যাদা না রাখ্‌তে পারি সেই াশঙ্কায় পালিয়েছিলাম। এ আমার বেশ মনে আছে য, তোমার সহজ, সুন্দর, ভদ্র ব্যবহারের প্রত্যুত্তরে আমি িক সঙ্গত ব্যবহার করতে পারছিলাম না। তোমার রিমিত আচরণের কাছে আমার আচরণটা বাড়াবাড়ি কমই হয়ে উঠছিল,—যেটা আমি পছন্দও করছিলাম না, াটকাতেও পারছিলাম না। কাজেই রণে ভঙ্গ দিয়ে ালিয়েছিলাম। সেদিন আমার বাক্যে ও ব্যবহারে যদি ান অসঙ্গতি বা অভদ্রতা প্রকাশ পেয়ে থাকে, তা হলে ার জন্যে আমি বাস্তবিকই দুঃখিত; এবং আশা করি, তুমি ামার সহৃদয়তায় আমার অপরাধ ক্ষমা করবে।

কিন্তু সেদিন তোমাকে যত অসঙ্গত কথাই বলে থাকি না ন, তার মধ্যে অন্ততঃ একটা সত্য কথা বলেছি। বাস্ত-কই আমার মনে হয় সুনীতি, তুমি আমার বহু জন্ম-ান্তরের আপনার জন! এই যে দুদিনের পরিচয়— হয় ত এ জীবনে আর একটুও বাড়বার সুযোগ পাবে , এমন কি অদূর ভবিষ্যতে একদিন লুপ্তই হয়ে যাবে,— মার মনে হয় তোমার সঙ্গে আমার কেবল এইটুকুমাত্রই াগ নয়। এর চেয়ে ঢের বড় যোগ তোমার-আমার া ছিল, যার আকর্ষণ এখনও আমার মধ্যে প্রবল হয়ে াছে। তোমার মধ্যে আছে কিনা তুমিই জান।

তোমার কাছ থেকে সেদিন যে রকম অভদ্র ভাবে চলে াছি, যতক্ষণ না সে অপরাধের জন্য তোমার ক্ষমা পাচ্ছি, ক্ষণ তোমার কাছে যাবার আমার অধিকার নেই, এই স্ত আমি নিজে গ্রহণ করেছি।

অবশেষে একটা কথা বলে চিঠি শেষ করি। বিনা িততে অপরের চিঠি পড়ার কুপ্রথা তোমাদের বাড়ীতে , বিনোদের কাছ থেকে এই সংবাদটি জানতে পেরে, তোমাকে এই চিঠি লিখতে বসেছি। এই চিঠির ্যার সঙ্গে তুমি ছাড়া আর কারো সম্পর্ক নেই,—সেই তুমি ছাড়া আর কারও পড়বার কারণও নেই। া করি, তোমরা সকলে ভাল আছ। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সুবোধের চিঠিখানি সুনীতি একবার, দুইবার, তিনবার পড়িল; এবং যতবারই পড়িল, চিঠির মধ্যে সুপ্রকাশ, সহজ, সরল, ভদ্রতা উত্তরোত্তর অনুভব করিয়া, সুবোধের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি বাড়িয়া গেল। প্রথম যেদিন এই চক্রান্ত কল্পিত হয়, সেই দিনই ইহার নির্ম্মমতা সুনীতিকে পীড়ন করিয়াছিল। তাহার পর নানা প্রকার অবস্থা ও অনুরোধে বাধ্য হইয়া ক্রমশঃ তাহাকে এই চক্রান্তের মধ্যে কতকটা লিপ্ত হইয়া পড়িতে হইয়াছে সত্য; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহাকে মুখ্যতঃ এমন কোন অংশই গ্রহণ করিতে হয় নাই, যেমন আজ সুবোধের পত্র পাইয়া করিতে হইল, এবং তাহার উত্তর দিতে গিয়া করিতে হইবে। এ পর্য্যন্ত এ চক্রান্তে যোগেশই ছিল প্রধান চক্রী; কিন্তু আজ হইতে এই যে পত্র-পত্রোত্তরের ব্যাপার আরম্ভ হইল, ইহা হইতে যোগেশ একেবারে অপসৃত হইয়া গেল এবং তাহার স্থান অধিকার করিল সে।

স্পষ্ট নিষেধ না থাকিলেও, সুবোধের পত্র সুনীতি কাহাকেও দেখাইবে না—পত্র-মধ্যে সে ইঙ্গিত এবং বিশ্বাস ছিল। তাই সুমতিকে পত্র দেখাইবে কি না এবং সুবোধকে পত্রের উত্তর দিবে কি না, সমস্ত দিন ভাবিয়া ভাবিয়াও সুনীতি স্থির করিতে পারিল না; এবং সেই কথা ভাবিতে-ভাবিতে ক্রমশঃ তিন-চার দিন কাটিয়া গেল।

সুবোধ সুনীতিকে পত্র লিখিয়াছিল—বিনোদ যে শুধু তাহা জানিত তাহা নহে, সে পত্র সে পাঠও করিয়াছিল। তিনচারি দিনেও তাহার কোন উত্তর আসিল না দেখিয়া, অবশেষে একদিন সে তাহার শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইল। সুমতি সবিস্ময়ে বলিল, "সুবোধ বাবুর চিঠি এসেছে, কই, আমি ত কিছু জানি নে!"

সুমতি ও বিনোদ তখন সুনীতির নিকট উপস্থিত হইয়া চিঠির কথা জিজ্ঞাসা করিল।

সুনীতি কহিল, "হ্যাঁ, এসেছে।"

সুমতি সবিস্ময়ে কহিল, "এসেছে? কবে এসেছে? আজ?"

সুনীতি মৃদু হাসিয়া কহিল, "আজ নয়; দু' তিন দিন হোল এসেছে।"

সুমতি অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিল, "দু' তিন দিন হোল! আমাকে দেখাস্ নি কেন?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া স্মিতমুখে সুনীতি কহিল, "দেখাতে মানা বলে দেখাই নি।"

সুমতি একবার বিনোদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "কার মানা? সুবোধবাবু চিঠিতে মানা করেছেন?"

"হ্যাঁ।"

সুমতি পুনরায় বিনোদের দিকে চাহিয়া বলিল, "একবার আক্কেলটা দেখ! সুবোধবাবু মানা করেছেন, তাই আমাদের চিঠি দেখাবে না! হঠাৎ যে সুবোধবাবুর এমন বাধ্য হয়ে উঠলি?"

সুনীতি তেমনি হাসিয়া কহিল; "বাধ্য আবার কি মেজদিদি? একজন ভদ্রলোক একটা অনুরোধ করেছেন, সেটা রাখাই ত' ভাল।"

এবার বিনোদ কথা কহিল; সে বলিল, "অনুরোধ করেছেন সত্যি; কিন্তু কাকে অনুরোধ করেছেন সুনীতি? তোমাকে করেছেন কি?"

ঈষৎ বিমূঢ় ভাবে এক মুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া সুনীতি বলিল, "আমাকেই অনুরোধ করেছেন; কারণ, এ চিঠি লেখালেখির সঙ্গে যোগেশের ত কোন সম্বন্ধ নেই।"

বিনোদ সহাস্য মুখে কহিল, "নিশ্চয়ই আছে। যার সঙ্গে সুবোধের পরিচয় হয়েছে, সেই যোগেশকেই সে চিঠি লিখ্‌ছে, আর কাউকে নয়।"

অসতর্ক তর্কের পথ দিয়া সুনীতি অজ্ঞাতসারে কোন্ দিকে চলিয়াছিল, তাহা না বুঝিয়া সবেগে বলিল, "আপনি কি বলতে চান, আমাদের বাড়ীতে যোগেশ নামে একটি যে ছেলে আছে, সুবোধবাবু তাকেই চিঠি লিখ্‌ছেন?"

বিনোদ মৃদু-মৃদু হাসিয়া, বক্র দৃষ্টিতে সুমতির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া কহিল, "তুমি কি বল্‌তে চাও, এ বাড়ীতে সুনীতি নামে একটি যে মেয়ে আছে, সুবোধবাবু তাকেই চিঠি লিখ্‌ছেন?"

এবার সুনীতি ঈষৎ রক্তিম হইয়া উঠিল। তাহার প্রশ্নের দ্বারা সে যে বিনোদকে এমন একটি প্রশ্ন করিবার সুযোগ দিতেছিল, তাহা সে পূর্ব্বে কিছুমাত্র বুঝিতে পারে নাই; তাই প্রথমটা সে বিমূঢ় হইয়া নিরুত্তর রহিল। কিন্তু পরক্ষণেই সামলাইয়া লইয়া সহাস্য মুখে বলিল, "নিশ্চয়ই। বিশ্বাস না হয় ত' আপনি সুবোধবাবুকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন, তিনি চিঠি লিখ্‌ছেন এ বাড়ীর মেয়ে সুনীতিকে, না ছেলে যোগেশকে।"

বিনোদের মুখ কৌতুকের নীরব হাস্যে ভরিয়া উঠিল। কহিল, "শুধু এ কথা কেন? সুবোধকে জিজ্ঞাসা করলে, সে এখন অনেক কথাই ত' বলবে। সে বলবে, এ বাড়ীতে সুনীতি নামে যে মেয়ে আছে, তারই জন্যে সে দিন-দিন পাগল হয়ে উঠ্‌ছে; এ বাড়ীর ছেলে যোগেশের জন্যে তা কখনই বলবে না। আর চিঠিকে যেমন প্রশ্রয় দিচ্ছ, তার পাগলামীকেও কি তেমনি প্রশ্রয় দেবে সুনীতি?"

বিনোদের কথা শুনিয়া সুমতি বিশেষ কৌতুক অনুভব করিল। হাসিয়া কহিল, "তা যদি দিস্ সুনীতি, তা'হলে তোর চিঠি আর একবারও দেখ্‌তে চাব না। তোর মেজ-জামাইবাবুর চিঠি তোর মেজ-দিদি যেমন লুকিয়ে রাখে, তোর সেজ-জামাইবাবুর বন্ধুর চিঠি তুই ঠিক তেমনি ক'রে লুকিয়ে রাখিস্।"

সুনীতির মুখ ঈষৎ কঠিন এবং রঞ্জিত হইয়া উঠিল। সুবোধের অনুরোধ মত সুবোধের চিঠি কাহাকেও না দেখাইতে যে সে ন্যায়তঃ বা বাস্তবতঃ বাধ্য, তদ্বিষয়ে সে মনে-মনে নিঃসন্দেহ ছিল না। এমন কি, চিঠিখানা সুমতিকে দেখাইবে বলিয়াই সে মনে মনে স্থির করিয়াছিল,—কতকটা আলস্যবশতই কয়েক দিন তাহা হইয়া উঠে নাই। কিন্তু এই কথা-কাটাকাটি ও পরিহাস-কৌতুকের খোঁচাখুঁচিতে তাহার প্রবল মন সহসা বিরূপ হইয়া দাঁড়াইল। মুখে কিন্তু হাস্য আনিয়া সে কহিল, "যেমন করে লুকিয়ে রাখা উচিত, ঠিক তেমনি করেই লুকিয়ে রাখব; সেজন্যে দিদি কিম্বা মেজ-দিদির উদাহরণের দরকার নেই।" তাহার পর বিনোদকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "সুবোধবাবুর পাগলামীকে প্রশ্রয় দিতে বাকি আর কি থাক্‌ছে, সেজ-জামাইবাবু? আপনারা মেস শুদ্ধ যেমন দিচ্ছেন, আমরা বাড়ী শুদ্ধ ঠিক তেমনি দিচ্ছি। কিন্তু এখনও যদি আমার প্রশ্রয় দেওয়ার দরকার থাকে, তা'হলে চিঠি-পত্র সম্বন্ধে ৩টি বিষয়ে আমাকে স্বাধীনতা দিতে হবে।"

বিনোদ কহিল, "কি, খুলে বল!"

সুনীতি কহিল, "প্রথমতঃ, আমার লেখা চিঠি আমি

একটিও আপনাদের দেখাব না,—আর সুবোধবাবুর লেখা চিঠি দেখান না দেখান আমার ইচ্ছা আর বিবেচনার উপর নির্ভর করবে।"

"দ্বিতীয়তঃ?"

"দ্বিতীয়তঃ, আপনারা আমাকে যা লিখতে বলবেন, নির্ব্বিচারে তা-ই লিখ্‌তে আমি বাধ্য থাকব না। যেটা লেখা অন্যায় বা অনুচিত বলে আমার মনে হবে, তা আমি কখনই লিখ্‌ব না।"

এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া বিনোদ কহিল, "এ বিষয়ে আমার তা'হলে দুটি কথা আছে। প্রথমতঃ তোমাদের দুজনের চিঠি-পত্রগুলোর মর্ম্ম জানা না থাকলে, সুবোধের সঙ্গে যখন যোগেশের কথাবার্ত্তা হবে, তখন যে সে ভারি অসুবিধায় পড়তে পারে।"

সুনীতি কহিল, "সে ঠিক বলেছেন। কিন্তু সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন,—চিঠি-পত্রের বিষয়ে আমি যোগেশকে ঠিক তালিম করে দোব। তা ছাড়া, সেজ-জামাই-বাবু, আমি যে চিঠিগুলো লিখব, অন্ততঃ সেগুলো যোগেশের কখনই দেখা উচিত নয়। আপনার দ্বিতীয় কথা কি?"

"আমার দ্বিতীয় কথা, তোমার পক্ষে অন্যায় বা অনুচিত কথা লিখতে যেমন তুমি বাধ্য থাকবে না, আমাদের পক্ষে অন্যায় বা অনুচিত কথা লিখতেও তেমনি তোমার কোন অধিকার থাকবে না। অর্থাৎ তুমি এমন কোনও কথা লিখবে না, যা আমাদের ফন্দীর পক্ষে হানিকর হ'তে পারে।"

সুনীতি দৃঢ় ভাবে কহিল, "নিশ্চয়ই নয়; সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন। আমার চিঠি লেখবার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে, আপনাদের ফন্দীটি সফল করবার চেষ্টা করা। তা ভিন্ন চিঠি লেখার সঙ্গে আমার কোন সংশ্রবই ত' নেই।"

অবশেষে বিনোদ ও সুমতিকে সুনীতির প্রস্তাবেই স্বীকৃত হইতে হইল। তাহারা উভয়েই সুনীতিকে বিলক্ষণ চিনিত; তাই অধিক পীড়াপিড়ি করিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করিবার কোন প্রয়োজন দেখিল না।

সুনীতি একটু দ্বিধাভরে হাস্য মুখে কহিল, "আমার আর একটা অনুরোধ আছে সেজ-জামাইবাবু।"

বিনোদ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "আবার কি অনুরোধ?"

সুনীতির উপর সুমতি একটু বিশেষরূপই ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। চিঠি পড়িবার আনন্দ হইতে বঞ্চিত হওয়ায়, তাহার অর্দ্ধেক উৎসাহই চলিয়া গিয়াছিল। তাই সে ব্যঙ্গ স্বরে কহিল, "অনুরোধ আর কেন বলছ? তোমারই হুকুম! আবার কি হুকুম বল? বাপ রে কি একগুঁয়ে মেয়ে!"

শুধু একটু মৃদু হাস্যে সুমতির কথার উত্তর দিয়া সুনীতি বলিল, "এক মাসের মধ্যে আপনাদের এ ব্যাপারটা শেষ করতে হবে। এক মাস পরে বাবা আসবেন, তখন কিন্তু আমি আর এর মধ্যে থাকব না।"

বিনোদ কহিল, "তথাস্তু। এক মাস কেন; যে রকম ভাবে ব্যাপারটা এগুচ্ছে, আমার আশা হয় পনের দিনের মধ্যেই সুবোধের নকল বিয়ে আমরা দিতে পারব। কেবল অভিনয়ের পঞ্চমাঙ্কে তোমরা বিশেষ ভাবে একটু সাহায্য করে দিয়ো।"

সুনীতি হাসিয়া কহিল, "আমি শুধু চিঠি লিখেই খালাস। নকল বিয়েতে আমার কোন যোগ থাকবে না, তা আগে থেকে বলে রাখলাম।"

বিনোদ একটু হাসিল। তাহার পর স্নেহার্দ্র স্বরে কহিল, "সে আমি তোমারও আগে ভেবে রেখেছি সুনীতি, তোমার যোগ থাকবে শুধু আসল বিয়েতে। লক্ষণ দেখে বুঝতে পাচ্ছ না? লেখালেখির ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত ভাবে পড়ে গেল তোমারই উপর! লেখাপড়া করে যে জিনিসটা দাঁড়ায়, সেইটেই ত' পাকা জিনিস হয়।"

সুমতির মুখে-চক্ষে নিমেষের জন্য সরক্ত আভা খেলিয়া গেল। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই হাসিয়া বলিল, "আবার অনেক সময়ে লেখাপড়ার দোষে পাকা জিনিসও কাঁচা হয়ে যায় মেজ-জামাইবাবু।"

বিনোদ কহিল, "সে বিশ্বাসটুকু তোমার উপর আমার আছে। তোমার লেখার গুণে কাঁচা জিনিসই পাকা হয়ে যাবে—তুমি স্থির জেনো।"

সুনীতি হাসিয়া কহিল, "আমার লেখার গুণে ভাবনায় আপনার বন্ধুর মাথার কাঁচা চুল পাকা না হয়ে যায় দেখবেন।"

বিনোদ কহিল, "তা যদি হয়, আবার একদিন আনন্দের—কলপে তুমিই তা কাঁচিয়ে দিয়ো।"

সুমতি আনন্দে হাসিতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

ভাষার কাহিনী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ

যে সমস্ত ভাষা-জাতির সন্ধান মিলিয়াছে, তাহাদের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় অধ্যাপক F. Miiller এর গ্রন্থের (Grundriss der Sprachwissenschaft) ১ম খণ্ডের ১ম অধ্যায়ের সাতাত্তর নং পৃষ্ঠায়। Syce সাহেবের গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ১ম অধ্যায়ের শেষেও একটা তালিকা পাওয়া যায়। তা' ছাড়া অন্যান্য প্রামাণ্য গ্রন্থের ত' কথাই নাই। কিন্তু এই সমস্ত ভাষার ভিতর একা ইন্দো-য়ুরোপীয় জাতি ছাড়া, আর কোনটারই সম্যক্ কুল-পরিচয় হয় নাই। কতক স্থলে শুধু ভৌগোলিক পরিচয় মাত্র মিলে। তবে এখনও অধ্যয়ন ও গবেষণা চলিতেছে। কাজেই ভাষা-বিজ্ঞানের উৎকর্ষের পরিসর ক্রমশঃই বাড়িতেছে। যতদুর অগ্রসর হওয়া গিয়াছে, তাহাতে বুঝা গিয়াছে যে, এ বিজ্ঞানের সত্যগুলিও আশাতীত রকমে নির্ভুল।

ভাষার গোত্র-নির্ণয় অবশ্য বড় সোজা কাজ নয়। বোধ করি Babelএর ভতর তাহা একেবারে দুষ্প্রাপ্য হইয়া হারাইয়া গিয়াছে। তা' ছাড়া, এই গোত্র-নির্ণয় কাজটা এতদিন পরে করা হইতেছে যে, অতীতের মৃত পুরুষদের নামও লুপ্ত-প্রায়। বংশ-পরিচয় কিছু কিছু পাওয়া যায়, আর সেগুলি আধুনিক ভাষারই। সেইটুকুর উপর নির্ভর করিয়াই এই গোত্র-নির্ণয়ের কাজ কেহ-কেহ করেন। বাঙ্‌লা, হিন্দী, গুজরাটী, উড়িয়া, ইত্যাদি ভাষার বিচার করিয়া দেখা যায় যে, তাহারা নানা প্রদেশীয় প্রাকৃত হইতে সম্ভূত হইয়াছে। আবার সেই নানা রূপের প্রাকৃতের অতীত ইতিহাস আলোচনা করিয়া, হয় ত' নানাবিধ লৌকিক সংস্কৃতের ভিতর দিয়া, একটা বা ততোধিক বৈদিক সংস্কৃতে পৌছান যাইতে পারে। সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, টিউটনীক, শ্লাভণিক প্রভৃতি ভাষার তুলনামূলক বিচার করিয়া পণ্ডিতগণ দেখিয়াছেন যে, তাহারা সব এক সাধারণ কাণ্ড হইতে উদ্ভূত; তাঁহার নাম কল্পনা করিয়াছেন—ইন্দোয়ুরোপীয় ভাষা-জননী। এইরূপে ভাষার মূল, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, ইত্যাদি সমস্ত দিয়া এক-একটা ভাষা-গোষ্ঠীর অনুমান করা যাইতে পারে। এই প্রথার বিলাতী নাম Geneological Classification; আর জার্ম্মাণ ভাষায় ইহাকে বলে "Stammbaum" থিওরী। জার্ম্মাণী নামটাই ঠিক আসল ভাষাটিকে সমর্পণ করে। আমরা বাংলায় তা'কে গোত্র-নির্ণয় বলিতে পারি।

এই উপায় সর্ব্বত্র ভাষার উপাদান-ঘটিত ধাতু-শব্দ-সমষ্টির উপর নির্ভর করে। দু'টি ভাষার ভিতরেই যদি একটি ধাতু ধ্বনির ও অর্থের সাদৃশ্য অক্ষুণ্ণ রাখে, তবে সে দুটিকে আত্মীয় বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ কিছু সন্ধি না থাকিলে যে এতটা সাদৃশ্য অসম্ভব-প্রায় হয়, তাহা স্বীকার করা চলিতে পারে। কিন্তু তাহাতে যে ভুলের সম্ভাবনা নাই, তাহা নহে। কেন না ঐরূপ সাদৃশ্য দৈব-ঘটিতও হইতে পারে। দু'টি বিভিন্নধর্ম্মী ভাষার ভিতর এরূপ সাদৃশ্য দেখা যায়, এবং তাহা একেবারে অস্বাভাবিক কাণ্ড নহে। Humboldt সাহেবের "Travels" নামক গ্রন্থে (ইং অনুবাদ) Incaদের ভাষার যে বিবরণ আছে, তাহাতে এই কথার প্রমাণ মিলিতে পারে। তা' ছাড়া, এক ভাষা অন্য ভাষার নিকট হইতে শব্দ ঋণ গ্রহণ করিয়া নিতান্ত আত্মীয়ের মত তাহার ব্যবহার করিতে পারে। হয় ত' এই ঋণ গ্রহণ দূর অতীতে হওয়াতে, কোনও প্রকার দলিলপত্র পাওয়া যায় না। কিন্তু তা'ই বলিয়া ঋণ-গ্রহণকে ত' পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ লাভ বলা চলে না। বাংলা ও তামিলের ভিতর এই ব্যাপার প্রাগৈতিহাসিক যুগে হইয়াছিল। এ দুটি বিভিন্ন-ধর্ম্মী ভাষা,—আত্মীয় নহে। আর বংশ-নির্ণয় করিতে হইলে, পুরুষ বা পর্য্যায় ঠিক করিতে হয় সময়ের হিসাবে। ভাষা সম্বন্ধে এই সময়ের হিসাবে ঘণ্টা মিনিট ত' অচলই, এমন কি শতাব্দীও অনেক সময় অচল হয়। চীন ভাষা শতাব্দীর পর শতাব্দী একই পথে চলিতেছে, খুব কমই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। Accadian বা Egyptian ভাষায় যে সমস্ত প্রস্তর-খোদিত স্মৃতি আছে, তাহারা কোন বিশিষ্ট যুগের সাক্ষী হইলেও, ভাষার

বয়সের কোনও সাক্ষ্য তাহারা দেয় না; সুতরাং নিতান্ত আধুনিক ভাষাগুলি ছাড়া, আগের গুলির কোন্‌টি কি হইতে উৎপন্ন, তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য। সেই জন্য Brugmann সাহেব মন্তব্য করিয়াছেন যে, শব্দ-সাদৃশ্য ঘটনাটি যদি খুব দূর-দূর দুটি দেশের ভাষার ভিতর ঘটে, তবে অধিকতর নির্ভুল ফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা। আরও দু' একটি উপদেশ Brugmann সাহেব দিয়াছেন; সেগুলি পরে আমরা বিবৃত করিব। সবগুলিই অবশ্য সাধারণ বুদ্ধি ও চিন্তারই গণ্ডীর ভিতর আছে।

তবু পণ্ডিতেরা এই প্রথা অবলম্বন করেন। কেন না, অন্য উপায়ে সন্তোষজনক ভাবে গোত্র-নির্ণয় হয় না। কিন্তু কেহ আবার এই পথে এতদূর অগ্রসর হন যে, সমস্ত ভাষাকেই জ্ঞাতি ঠিক করিয়া, এক সর্ব্বসাধারণ ভাষা-জননীর কল্পনা করেন। এই কল্পনা—বাইবেলের আদাম ও ইভ হইতে মনুষ্য-জগতের উদ্ভব হইয়াছে, সেই কল্পনার মত। আপাততঃ যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, ধাতুগত বিভেদেও ভাষার সহিত ভাষার বিভেদ যথেষ্ট আছে। তা' ছাড়া, ভাষার উৎপত্তি যে শুধু কতকগুলি ধাতু-শব্দ হইতে হইয়াছিল, এই ধারণাও ক্রমশঃ লুপ্ত হইতেছে। শেমীতিক ভাষার ধাতু "ক্-ত্-ব্" কি "ক্-ত্-ল্" প্রভৃতি লইয়া ভাষা নির্ম্মাণ যে অসাধ্য, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। আর্য্য ভাষা-সমূহের আবার যে সমস্ত ধাতু-শব্দ কল্পিত হইয়াছে, তাহা দিয়া ভাষা নির্ম্মিত হইতে পারে; তবে সেটা ঠিক মনুষ্যোচিত ভাষা হইবে না, ইতর শ্রেণীর ভাষার মতই হইবে। মানুষ প্রথম ভাষার ব্যবহার করিতে প্রথে বাক্য দিয়া। কতকগুলি শব্দকে একত্র করিয়া গোটা করিয়া আপনার মনোভাবকে সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করে। আর এই মনোভাব কেবল একটি মাত্র concept লইয়া নহে। খুব কম হইলেও দু'টি হইবে,—একটি মুখ্য, আর একটি গৌণ।

তাই Steinthal সাহেব প্রথম বলিলেন যে, ধাতু-শব্দের দিকে লক্ষ্য না করিয়া, পদ নির্ম্মাণ ও বিন্যাসের দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত। পদ-ঘটিত বাক্যই ভাষার প্রথম সূত্রপাত,—ধাতু নহে। ধাতু-পদ লইয়া বিচার করিলে, এমন সমস্ত ভুল-ভ্রান্তির পথে আসিয়া পড়িতে হয় যে, তাহাদিগকে কিছুতেই এড়াইয়া চলা যায় না। তা' ছাড়া, ধাতুগত সৌসাদৃশ্য দেখিয়া গোত্র-নির্ণয়ের ব্যবস্থার মত অর্ব্বাচীনতা আর কিছুই নাই। কারণ, ধাতুগত সৌসাদৃশ্য, ইচ্ছা করিলে, খুব নির্ভুল রকমে সব ভাষারই ভিতর দেখান যাইতে পারে। কেন না, মানুষের স্বরগ্রাম নির্দ্ধারিত। পক্ষান্তরে, বাক্য-নিবদ্ধ পদ লইয়া বিচার করিলে বুঝিতে পারা যাইবে, কোন্ ভাষা কিরূপে মুখ্য ও গৌণ ভাবকে প্রকাশ করে। এই দুটি ভাবের অন্বয় প্রকাশ-বিধিই জাতীয়ত্বের হেতু। কেন না, এই প্রকাশ-বিধি জাতির মনস্তত্ত্বের পরিচায়ক। Steinthal সাহেব বিচার করিয়া, এই পথে যাইয়া, সমস্ত ভাষাকে ভাগ করিলেন দু'টি প্রধান শ্রেণীতে—Formless বা ব্যাকরণ হীন, আর "Formal" বা বৈয়াকরণিক। ইদানীং ভাষাবিদ্‌গণ এই পথেই চলিতেছেন। Max Muller সাহেব তাই তাঁর ভাষা-বিজ্ঞান-বিষয়ক বক্তৃতা-সমষ্টির অষ্টম বক্তৃতায় লিখিলেন যে, ভাষার জাতি-নিরূপণের ব্যবস্থা তিনটি সূত্র ধরিয়া হইবে; সেইগুলি এই :—

১। কোন্ কোন্ ভাষা ধাতু-শব্দগুলিকে পাশাপাশি অবিকৃত ও অসংলগ্ন রাখিয়া বাক্য-বিন্যাস করে ও মনোভাব প্রকাশ করে।

২। কোন্ কোন্ ভাষায় মুখ্য ভাবের পরিচায়ক ধাতুকে গোটা রাখিয়া গৌণভাব পরিচায়ক ধাতুকে ছোট করিয়া, কাটিয়া, বিকৃত করিয়া দুটিকে একত্র যুক্ত করিয়া বাক্য-বিন্যাস করে।

৩। কোন্ কোন্ ভাষা মুখ্য ও গৌণ দুটি ধাতু-শব্দকেই ছোট করিয়া, ক্ষুণ্ণ করিয়া, সুবিধামত এমন একটা সংযুক্ত পদার্থে পরিণত করে যে, তাহার ভিতর হইতে মূল দুটিকে খুঁজিয়া বাহির করা শিবের বাপেরও সাধ্যাতীত।

অধ্যাপক সাহেবের সময় বোধ করি বিচার-বুদ্ধি বেশী থাকে নাই; কারণ, তাঁর ব্যবস্থার ভিতর যথেষ্ট গলদ্ রহিয়া গিয়াছে। এত সোজা উপায়ে যে ভাষার জাতি-বিচার হয় না, তাহা তিনি ভাবেন নাই। কেন না, এই তিনটি বিধির ভিতর প্রভেদ এত কম, এবং এই সমস্ত লক্ষণযুক্ত তিন জাতির ভাষার এমন ঘনিষ্ঠতা আছে যে, একই ভাষার ভিতর এই তিনটি লক্ষণকে বেশ পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথম যে ব্যক্তি এই বিধিকে বৈজ্ঞানিক সত্য রূপে প্রকাশ করিলেন, তিনি Schleicher সাহেব। Schleicher সাহেব ভাষাকে Scelegel সাহেবের অনুমতে Inorganic ও Organicএ ভাগ করিয়া, ভাষার পদবিন্যাস রীতিকে বিধিমত সঙ্কেত চিহ্নাদি দিয়া, এই অধ্যায়কে পুরামাত্রায় বিজ্ঞানের ভিতর টানিয়া আনিলেন। আমরা তাঁর পথে যাইয়া দেখি, ভাষার কিরূপ জাতি-বিচার হইতে পারে।

বাংলা "আম-রা"কে চীনাভাষায় বলিবে "আমি-সকল", উহা বর্ম্মী ভাষায় বলিবে "আমি-সমষ্টি"। "আমি" ধাতুর সহিত বাংলায় একটা অবোধ্য প্রত্যয় "রা" সংযুক্ত হইয়া কর্ত্তৃপদ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। চীনা কি বর্ম্মী ভাষায় কিন্তু দুইটি অসংলগ্ন ও স্বাধীন ধাতু দিয়াই এই কর্ত্তৃপদ অন্বিত-পদ নির্ম্মিত হইয়াছে। বাংলা "আমি হাতে করিয়াছিলাম" চীনাভাষায় দাঁড়াইবে "আমি-হাত-দিয়া-অনেক-সময়-আগে-করা"। এখানে বাংলা ও চীনার ভিতর প্রভেদটা বেশ বুঝা যাইতেছে। এই চীনা জাতীয় ভাষাকে বলা হইল Inorganic আর Asotaling বা এক-ধর্ম্মী। ইহাতে ধাতু একেবারে প্রায় গোটা থাকে,—অসংলগ্ন ও অবিকৃত থাকে। যদি এই ধাতুকে ক, খ, গ, ইত্যাদি চিহ্ন দিয়া সমর্পণ করা যায়, তবে এইরূপ ভাষার বাক্যবিধি হইবে;—"ক+খ+গ..."। বাং "আম-রা" আবার তুর্কীতে হইবে "সমস্ত-আমি"; বাং "আমাদের", তুর্কীতে "সমস্ত-আমি" এইরূপ, (তুর্কী "উম্" আর "লার্-উম্", কি"লের উম")। অর্থাৎ তুর্কীতে মুখ্য পদের সহিত গৌণ পদ যুক্ত হয়; কিন্তু গৌণ-পদের মূলটা অবিকৃত না থাকিলেও একেবারে দুর্ব্বোধ্য হয় না। তুর্কীতে "মারা বা প্রহার করাকে "ডগ্-মাক্" বলে, কিন্তু "মারি" হইবে "ডগ-উ-রুম্"। বাং "মার্-ই"র-"-ই"র অর্থ বুঝা দেবের অসাধ্য। কিন্তু তুর্কী "উম্" এর অর্থ ও প্রকৃতি বুঝা সহজ-সাধ্য, এইটুকু প্রভেদ। এ-দু'টি ভাষাকে একশ্রেণীর বলিলেও, মাত্রাভেদ রহিয়াছে। পণ্ডিতেরা বাংলা-জাতীয় ভাষার নাম দেন "Amalgamating" আর তুর্কী জাতীয় ভাষাকে "Agglutinating" ভাষা বলেন। আর দু'টিকেই বলেন Oganic।

যদি সূত্র তৈ'রি করিতে হয়, তবে Agglutinating ভাষাজাতীয় বাক্যকে প্রকাশ করা যায় ক ১ ২ ৩, বা ১ ক ২ ইত্যাদি দিয়া। অবশ্য ক বলিতে মুখ্য মূল-ধাতুকে বুঝাইবে, আর ১,২,৩, গৌণ অন্বয়বাচক ধাতুকে বুঝাইবে। Amalgamating ভাষাকে সমর্পণ করিতে হইলে, আর একটু প্রভেদ করিতে হইবে; কেন না এক্ষেত্রে মূল মুখ্য শব্দের ও পরিবর্ত্তন ও বিকৃতি ঘটে। তাই "আমর ১"=ক'; মারি =ক' "মারিতেছি"=ক ১ ইত্যাদি। এইরূপ সঙ্কেত দিয়া আদিম আমেরিকাবাসীদের কিম্বা Basque জাতির ভাষাকেও সমর্পণ করা যায়। সে ভাষার নাম "Polysynthetic ভাষা," আর তার বাক্যের আকৃতি অনেকটা "দশকুমারচরিতের" পাঠকগণ শব্দ-সন্ধি-সমাস-বহুল পঙ্‌ক্তি-ব্যাপী পদ হইতে পাইতে পারেন। "Archaeoloegia Americana"র ভিতরে ইহার পরিচয় যথেষ্ট আছে। আমাদের নিত্য-ব্যবহার্য্য বিলাতী Encyclopaedia"তেও আছে। পাঠকের অবগতির জন্য একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। "উই-নি-তয়-তি-গে-গি-না-লি-স্ক-লুঙ্-তা-ন-নে-লি-তি-সে-স্তি"। দৃষ্টান্তটি Whitney সাহেবের গ্রন্থ হইতে গৃহীত। যে কয়টি শব্দ দিয়া বাক্যটি রচিত, সেগুলি প্রায়ই মূল শব্দ। আর সে গুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করিয়া কাটিয়া একত্র সংযুক্ত করিয়া ফেলা হইয়াছে। তাহার ভিতর হইতে সমস্ত পদ ও সম্বন্ধকে বিশ্লেষণ করিয়া বাহির করিতে হইবে। Basqueদের ভাষাও এইরূপ; কেবল তফাতের মধ্যে এই যে, Basqueএ ক্রিয়া সর্ব্বনামের সহিত অবিচ্ছিন্ন। এই ভাষাকে সাঙ্কেতিক চিহ্নে ব্যক্ত করিতে হইলেও, Schleicher সাহেবের পথ উন্মুক্ত আছে। যদি মূল ধাতুকে ক, খ, ইত্যাদি সংজ্ঞা দেওয়া যায়, আর সংক্ষিপ্ত ধাতুকে র্ক, র্খ, ইত্যাদি বলা যায়, তবে ইহা দাঁড়াইবে—"র্খ-র্গ-র্ঘ—" বা "ক-র্ক-র্ক—" ইত্যাদি।

মোটামুটি ভাষাকে এইরূপে তিন শ্রেণীতে সুসংবদ্ধ করিলেও, সমস্ত কথা বলা হইল না। তাহাদের আকৃতিগত অনেক বৈশিষ্ট্যই অনুক্ত রহিয়া গেল। তা' ছাড়া, তুর্কী-জাতীয় ভাষার ভিতর এমন অনেক ভাষা আছে, যাহাদের প্রত্যয় ও উপসর্গ সব ঠিক সময়ে মূল ধাতুর আগে-পিছে বসে না। যতই কেন নূতন নূতন অন্বয় ও গৌণ পদ সংযোজনা করা হউক না, তামিল প্রভৃতি দ্রাবিড়ী ভাষাতে তাহা শেষের দিকেই যুক্ত হইবে। সুতরাং তাহাদের সঙ্কেত

হইতে ক ১, ক ১ ২, ক ১ ২ ৩ এইরূপই। আবার মধ্য-আফ্রিকার কতকগুলি ভাষা আছে, তাহাদের ভিতর পদ-সংযোগ ঘটে মূল মুখ্য শব্দের পূর্ব্বে। "ও-উম-উ-স্তু" (=লোকটির সঙ্গে), "ও-অব-স্তু" (=লোকগুলির সঙ্গে)। যাভা, মলয়উপদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের ভাষায় আবার সব রকমই —আগে, পিছে, মাঝে,—পদ ও প্রত্যয় ঘটিতে পারে। এ ছুটিকে সাঙ্কেতিক চিহ্নে প্রকাশ করিতে হইলে, ১ক, ১ ২ ক, ও ১ ক, ১ ক ক, ইত্যাদি দিয়া ব্যক্ত করিতে হয়।

এই প্রথার ভিতর ত্রুটী আছে কি না, তাহার বিচার এখনও সমাপ্ত হয় নাই। কতক ত্রুটী ছিল, তাহার সংশোধন হইয়াছে। তুর্কীতে বহুবচনাত্মক "লার্" ও "লের্" দুই-ই আছে। যে মুখ্য পদের সহিত সংযুক্ত হইবে, তাহারই স্বরবর্ণের প্রাধান্য হেতু "harmony of vowels" এর খাতিরে, গৌণ পদের স্বরবর্ণের প্রকৃতি-ভেদ ঘটে। "বাবা-লার" (=পিতাসকল), "দাদে-লে'র" (=পিতামহ সকল)। Amalgamating জাতীয় ভাষার ভিতরও এরূপ হয়। Schleicher সাহেবের ব্যবস্থাতে এই স্বর-বিকৃতির কোনও প্রকৃতি নাই—এইরূপ একটা প্রতিবাদ করা যাইতে পারে। কিন্তু এই প্রতিবাদের মূল্য নাই। কেন না, যখন সঙ্কেত ব্যবহার করা হইবে, তখন ধাতু বিকৃত কি অবিকৃত আছে, তাহা দেখিয়া সঙ্কেত ব্যবহার করা ত যাইতে পারে। সেটা যখন হাতের ভিতর, তখন বৃথা তর্ক করিয়া ফল নাই।

এ সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা সাংঘাতিক প্রতিবাদ যা, তা' এই যে, এই আকৃতি-ঘটিত শ্রেণী-বিভাগ করিয়া ঠিক গোত্র-নির্ণয় হয় কি না, তাহা বলা যায় না। একা বাংলাতেই সমস্ত রকম লক্ষণ পাওয়া যাইবে। তাহার কারণ এই যে, বাংলা ভাষা চুপ করিয়া বসিয়া নাই, আর বাঙালীর মনও জড় পদার্থ নহে। নূতন-নূতন ভাব প্রকাশের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া, ভাষা সমস্ত রূপই ধারণ করিতে পারে। চীনা ভাষাতেও অসংলগ্ন পদ ক্রমশঃই প্রতীকে পরিণত হইতেছে। তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভাষাতেও তাহা ঘটিতেছে। আবার এই চীনা ভাষাকে যদি খুব দ্রুতগতিতে উচ্চারণ করা যায়, তবে চীনা ভাষা হইতে আদিম আমেরিকার ভাষার বিশেষ পার্থক্য ঘটিবে না। এমন কি, আধুনিক ইংরাজী ও বাঙলার সম্বন্ধেও এই কথা বলা চলিতে পারে। "আমি কলকাতা যাব—" কি আরও সরল "তুই দিল্লী যা"কে একত্র সংযুক্ত করিয়া বলিলে, Basque জাতীয় ভাষা পাওয়া যাইবে; আর অসংলগ্ন রাখিলে, চীনা-জাতীয় ভাষায় দাঁড়াইবে। এ প্রতিবাদ সত্য; এবং ইহার ঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে উত্তরে যে কিছুই বলা যায় না, তাহা নহে। বলা যায় যে, ভাষার ভিতর এরূপ গণ্ডগোল থাকিলেও, বাক্যের পদ-রচনার মূল ধারাটা খুব বেশী পরিবর্ত্তিত হয় না। দু' একটা দৃষ্টান্তে এক শ্রেণীর ভাষায় অপর শ্রেণীর ভাষার অনুকৃতি থাকিলেও, কোন ভাষাই নিতান্ত দায়ে না পড়িলে একেবারে আপনার জাতীয়ত্ব বিসর্জ্জন দেয় না, দিতে পারে না। অবশ্য কোন শ্রেণীর ভাষা উৎকৃষ্ট কি নিকৃষ্ট, তাহা বলা যায় না। কিন্তু এটা বলা যায় যে, পদ-বিন্যাসের রীতিটা মোটামুটি ঠিক থাকে। তার ক্বচিৎ-কদাচিৎ পরিবর্ত্তন ঘটে। আর সত্য ঘটনাও অনেকটা তাই।

তবুও এখনি বোধ করি এই প্রথার এই সামান্য ত্রুটিটুকুও সংশোধন করিয়া লওয়া যায়। তা'র উপায় বিভিন্ন জাতীয় ভাষায় বাক্য-গঠন; অর্থাৎ অন্বিত পদের নিবন্ধ দেখিয়া বিচার করা হইতেছে, যে কোন্ ভাষার বাক্য-নির্ম্মাণ প্রণালী কিরূপ। Schleicher সাহেব শুধু অন্বয়-প্রকাশটাই দেখিয়াছিলেন; এইবার Delbriick সাহেব দেখিয়াছেন পদ-বন্ধন-বিধি। এই পদ-বন্ধন-বিধিকেও কাজে লাগান চলিতে পারে। সেদিকে চেষ্টা চলিতেছে কি না, আমি ঠিক জানি না। পরিপূর্ণ বাক্য কি ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, ও মুখ্য ও গৌণ ভাবকে কি বিধিতে একত্র সংবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহার ইতিহাসই আকৃতি-মূলক বিচারের প্রথম অবলম্বন হওয়া উচিত। বাংলা "আমি করিয়াছি" ও ইংরাজি "I have done"এর ভিতর কতটা প্রভেদ ও কেন প্রভেদ, জানা চাই। আর এই অনুপাতে অন্যান্য ভাষা-জাতির ভিতর পদ-বন্ধন-রীতির বিশ্লেষণ ও গবেষণার প্রয়োজন আছে।

বাক্য-বিষয়ক তুলনামূলক বিচার, যাহা এই পদ-বন্ধন-বিধির ভিতর দিয়া অগ্রসর ও বর্দ্ধিত হইয়াছে, বোধ করি ভাষার জাতীয়ত্বকে খুব সাধারণ ভাবে নির্দ্দেশ করিবে। কিন্তু সেই সাধারণ ইঙ্গিতকেই আবার পদ-বিন্যাস ও অন্বিয়-বাচক পদের রচনার বিচার দ্বারা পাকা ও সুস্পষ্ট করিতে

হইবে। অবশ্য ভাষার সাহায্যে ভাবপ্রকাশ করার কাজ সুসম্পন্ন হইলেই, ভাষার সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়া যায়। চীনা ভাষায় Isolating আকৃতি দিয়া যেমন ভাব প্রকাশ করা যায়, Basque ভাষায়ও তদ্রূপ করা যায়। কিন্তু এই ভাব প্রকাশ কাজটি কেহ বা যথাতথা উপায়ে নিষ্পন্ন করে, আর কেহ বা ঠিক মত, প্রত্যেক অন্বয়কে সুস্পষ্ট করিয়া বলে। চীনা ভাষায় এই অন্বয় সুস্পষ্ট নহে, যদিও ইহাতে তাহাদের কাজ চলিয়া যায়। যতির সাহায্যে, হ্রস্বদীর্ঘাদি স্বরপাতের সাহায্যে, অন্বয়কে প্রকাশ করা যে যায় না, তাহা নহে। তবে তাহাতে ভাষা শিখিতে বিলম্ব হয়। তাই চীনা পণ্ডিতকে শুধু পদ মুখস্থ করিয়া পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিতে হয়। তেমনই কিন্তু তুর্কী জাতীয় ভাষা ব্যবহার করিতে ঐ সমস্ত জাতিদের কোন ক্লেশ হয় না; কিন্তু ইহাদের ভিতরও ভাব প্রকাশের সমস্ত উপকরণ পূর্ণরূপে পরিবর্দ্ধিত হয় নাই। বিশেষ্যকে ক্রিয়া করিয়া ব্যবহার করিবার জন্য অনেকটা বাজে শক্তি ও উৎসাহ খরচ করিতে হয়। আবার সংস্কৃত জাতীয় ভাষার ত কথাই নাই; তাহার ভিতর অসুবিধা যথেষ্টই আছে। অবশ্য দেবভাষা বলিয়া তাহার ভিতর এত বেশী সমাস ও সন্ধির বিধি, যে, সেই সমস্ত সন্ধি ও সমাসের বিশ্লেষণ করিয়া অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা সময়-সাপেক্ষ।

তবুও ভাষার বাক্য-নিবদ্ধ পদ-বন্ধন-বিধি দেখিয়া বুঝা যায় যে, কোন্ জাতির ভাষা কিরূপে ভাব প্রকাশের শক্তি লইয়া অগ্রসর হইয়াছিল; আর সেই শক্তির কতটা পরিমাণ এখনও বাঁচিয়া আছে। পদ-বন্ধনের ভিতর প্রধান স্থির পদার্থ—কর্ত্তৃপদ ও ক্রিয়াপদ। অর্থাৎ এ দু'টি না হইলে ভাষার ব্যবহারই অসম্ভব ও ভাবের প্রকাশই অচিন্তনীয়। তবে কোন ভাষায় ক্রিয়ার ভাব কর্ত্তার সহিত এমন ভাবে জড়াইয়া থাকে যে দু'টির আলাদা প্রকাশ হয় না, একত্র জড়িত থাকিয়া যায়। সেই ভাষাতে ক্রিয়াপদ আর কর্ত্তৃপদ সংযুক্ত হইয়া যায়, ও ক্রিয়াপদের উপর ঝোঁক না থাকিলে, ক্রিয়াপদ প্রতীকমাত্রে পর্য্যবসিত হয়।

ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষার ভিতর আদিম অবস্থা তাই। এমন কি সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন প্রভৃতির ভিতরও সেইরূপ। অতঃপর কর্ম্মপদ, ও অন্যান্য কারক-বাচক পদের আবির্ভাব কিরূপে হয়, তাহা দেখা যাইতে পারে। যে ভাষায় কারক-বাচক পদ নাই, সে ভাষা কিরূপে কারককে নির্দ্দেশ করে, তাহা দেখিতে হয়। অবশ্য কার কয়টি ক্রিয়া-ধাতু আছে, কয়টি বিশেষ-নাম-ধাতু আছে, তাহা লইয়া বিচার করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। Polynesian-দের আটটি ক্রিয়া-বাচক ধাতু আছে, যেটার জন্য তারা সর্ব্বতঃ দায়ী ও দোষী নাও হইতে পারে। কেন না, সেই আটটির অতিরিক্ত ক্রিয়া-বাচক ধাতুর তাহাদের প্রয়োজন হয় নাই। শুধু দেখা উচিত যে, সেই আটটি ধাতু ও অন্যান্য ভাষার উপকরণ লইয়া কি প্রথাতে, কি বিধিতে তাহাদের কাজ চলিতেছে।

অবশ্য পদবন্ধন-বিধির কোনও স্থিরতা নাই। বাংলা পদ্যে ও গদ্যে বিভিন্ন রকমের বিধি দেখা যায়। প্রশ্ন-বাচক বাক্যের পদ-বন্ধন-বিধি সাধারণ বিধি হইতে পৃথক। কিন্তু এই পার্থক্যের পরিসর খুব বেশী নহে। কেন না, বিধির অত্যধিক উচ্ছৃঙ্খলতা হইলে, ভাব প্রকাশের কাজ ঠিক সরল ভাবে হইবে না। "তুমি কি করিতেছ?" "কি করিতেছ তুমি?" ও "করিতেছ কি তুমি?" "কি তুমি করিতেছ?" ইত্যাদি পদ-বন্ধনের ভিতর উচ্চারণের ফল এমন হইতে পারে যে, বক্তার মনোভাব বুঝা দায় হইয়া উঠিতে পারে। আর নানাবিধ পদ-বন্ধনে উচ্চারণের সমতা রক্ষা করা একটু কঠিন কাজ। কেন, তাহা আমরা পরে ধ্বনি-বিচারের সময় ব্যক্ত করিব। সুতরাং সামান্য ত্রুটিকে বাদ দিলে, পদ-বন্ধন-বিধিকে অপরিবর্ত্তনীয় জাতীয়ত্বের হেতু বলিয়া ধরিয়া লইয়া, মনোভাব প্রকাশের ধারাটিকে কতকতা ঠিক পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে। আর এই প্রসঙ্গে ভাষা-জাতিদের "Logical" ও "Informal" এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা চলিতে পারে বলিয়া বোধ হয়। যে ভাষার পদ-বন্ধন-বিধিতে মুখ্য ও গৌণ ভাবগুলি ঠিক সুবোধ্য,—অর্থের গুরুত্বের ক্রম অনুসারে সাজান,—তাহাকে "logical," ও অন্যার্থে "Informal" বলায় বোধ করি বেশী ভুল হইবে না।

ভাষার জাতি-পরিচয় দিতে গিয়া, চিত্র-সাহায্যে তাহা বুঝাইবার একটা প্রথা আছে। ভাষা-বিজ্ঞান-বিষয়ক বহু গ্রন্থে এই সমস্ত জাতির ইতিহাস চিত্রে ও রেখায় দেওয়া আছে। যেমন ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীকে কখনও বৃক্ষ দিয়া, কখনও বৃত্তাকারে diagram দিয়া

বর্ণনা করা হয়। মনে রাখিবার পক্ষে এই সমস্ত উপায় খুবই সুবিধাজনক বটে, কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধে বিচার যখন সর্ব্বথা সম্পন্ন হয় নাই, তখন তাহা দিয়া কোনও উপকার বিজ্ঞানের দিক দিয়া হইবে না। তা' ছাড়া এত বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভাষা আছে যে, তাহাদের সম্যক ইতিবৃত্ত ও নাম দিতেই অনে ময় ও স্থানের প্রয়োজন হইবে।

এই প্রবন্ধগুলির উদ্দেশ্য ে. .ার একটা সাধারণ ইতিবৃত্ত প্রদান হইলেও, সেটা মাত্র গৌণ উদ্দেশ্য,—মুখ্য নহে। মুখ্য উদ্দেশ্য, বাঙ্‌লা ভাষারই একটা যথাসম্ভব ইতিহাস বিবৃত করা। সুতরাং সেই প্রসঙ্গে দু' একটি ভাষা-গোষ্ঠীর কথা পরে বলা হইবে। আপাততঃ ভাষার সাধারণ গতি, বৃদ্ধি, চরিত্র সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ যে সমস্ত তথ্য অনেক পরিশ্রম ও অধ্যয়নের ফলে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহারই কিছু পরিচয় দেওয়া হইবে মাত্র। কেন না, এই তথ্যগুলির সহিত পরিচয় না হইলে, ভাষার বিবর্ত্তন-কাণ্ডটি অবোধ্য হইয়াছে ও হইবে। তবে ভাষা-গোষ্ঠীর কথা যাহা বলা হইল, তাহাতে আর কিছু লাভ হউক বা না হউক, ভাষা-বিজ্ঞানের একটি খুব আনন্দপ্রদ অধ্যায়ের সহিত কিছু পরিচয় হইল।—ভবিষ্যতে প্রয়োজন হয় ত, এই পরিচয়কে আমাদের কাজে প্রয়োগ করিয়া কিছু ফল লাভ করাও যাইতে পারে। কেন না, বাঙ্‌লার সহিত এমন সমস্ত ভাষার সংঘাত ঘটিয়াছে, এবং ইহার ইতিহাসের ভিতর এমন সমস্ত বিভিন্নধর্ম্মী ভাষার চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে, যে, বাঙ্‌লার জাতি-পরিচয় যে নিতান্ত সোজা, তাহা মনে হয় না।

তবু প্রধান-প্রধান ভাষা-গোষ্ঠীর নাম কিছু জানিয়া রাখা উচিত; তাই কয়েকটীর কথা নিম্নে দেওয়া গেল :—

(ক) ইন্দো-য়ুরোপীয়।

(খ) শেমীটিক—আরবী, হিব্রু, আসিরিয়া-ব্যাবিলোনিয়া-সিরীয় ইত্যাদি।

(গ) (১) উরাল-আল্‌টিক :—তুর্কী, তাতার, মোঙ্গল, তুঙ্গু, ইত্যাদি।

(২) ফিন-উগ্রিয়ান :—হুঙ্গেরীয়, ফিন, লাপ ইত্যাদি।

(ঘ) দ্রাবিড়ী—তামিল ও মলয়উপদ্বীপের ভাষা; তেলেগু ওরানো, ইত্যাদি।

(ঙ) তিব্বতী—চীন, শ্যামদেশীয়।

(চ) মধ্য আফ্রিকার Bantu ও আদিম আমেরিকায় Polysynthetic ভাষা। এইগুলির ভিতর (ক), (খ) ও (গ) (২) এর কোনও আত্মীয়তার সম্বন্ধ আছে কি না, তাহার বিচার চলিতেছে। আর একা "চীন—তিব্বতী" জাতি, (ঘ), একধর্ম্মী। অন্যান্য সকলেই কমবেশী "সংযোগধর্ম্মী।"

বিপর্য্যয়

ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম্-এ, ডি-এল্

(২০)

ইন্দ্রনাথ যখন অমলদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল, তখন সে কিছুতেই সোজা বাড়ী যাইতে পারিল না। পথে সে ট্রাম হইতে নামিয়া ওয়েলিংটন পার্কে একটা নির্জ্জন স্থানে বসিয়া পড়িল।

এই সম্পূর্ণ নির্জ্জন স্থানেও সে মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইতে পারিল না। কি লজ্জা! কি ঘৃণা! কি তার লাঞ্ছনা! তার প্রাণের বন্ধু অমলের কাছে সে চিরদিন এ কি কলঙ্কভাগী হইয়া রহিল! বেশ হইয়াছে! তার মনের পাপের উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে!

কিন্তু কি ভীষণ শাস্তি! এ কথা তো ছাপা থাকিবে না। লোকে যখন জিজ্ঞাসা করিবে, তার অভিন্নহৃদয় বন্ধু অমলের সঙ্গে আর তার দেখাশুনা হয় না কেন, তখন সে কি বলিবে? লোকেই বা কি ভাবিবে? আজই রাত্রে সরযূ যখন জিজ্ঞাসা করিবে যে, অনীতা আসিবে

না কি, তখন তাহাকে কি বলিয়া বুঝাইবে? মনোরমা যখন অমল ও অনীতার কথা জিজ্ঞাসা করিবে, তখন কি বলিবে? টম লিগুলে যখন তার দৌত্যের ফল জিজ্ঞাসা করিবে, তখন সে কোন্ মুখে তার সঙ্গে কথা কহিবে? কোন্ মিথ্যার মায়াজাল রচনা করিয়া সে আপনাকে এই ঘোর কলঙ্কপঙ্ক হইতে রক্ষা করিবে? ইন্দ্রনাথ কোনও দিন মিথ্যা কথা বলিতে জানে না। মিথ্যা কথা বলিতে সে যেখানেই চেষ্টা করিয়াছে, সেখানেই সে তাহার কথায়-বার্ত্তায়, ব্যবহারে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। কাজেই নিছক মিথ্যার বলে সে এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারিবে, এমন আশা তার হইল না।

হঠাৎ একটা মোটরের ভোঁ ভোঁ শব্দে সে চাহিয়া দেখিল অনীতার সুপরিচিত মোটরখানা,—তার মনে হইল যেন তারই বাড়ীর দিকে চলিল। দেখিয়া তার সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়া যেন এক ঝলক রক্ত জোরে ছুটিয়া গেল। সে চট্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আনন্দে তার প্রাণ নাচিয়া উঠিল; সে দুই পা অগ্রসর হইল। পর মুহূর্ত্তে দুই হাতে বুক চাপিয়া সে বসিয়া পড়িল। না, সে কিছুতেই এখন যাইতে পারে না!

অনেক রাত্রে সে বাড়ী ফিরিল। মনোরমা তখন ঘরে বসিয়া পড়িতেছিল; সরযূ তার ছোট মেয়েকে ঘুম-পাড়াইতে গিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। যখন নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া ইন্দ্রনাথ দেখিতে পাইল যে সরযূ ঘুমাইয়াছে, তখন সে আশ্বস্ত হইয়া কাপড় ছাড়িতে লাগিল—যাক, অন্ততঃ আজ রাত্রে তা'র কোনও জবাবদিহি করিতে হইবে না।

পাশের ঘর হইতে শব্দ শুনিয়া মনোরমা আসিয়া বলিল, "দাদা, এত রাত্রি ক'রলে যে?"

চমকিয়া উঠিয়া ইন্দ্রনাথ থতমত খাইয়া বলিল, "হাঁ খেতে-টেতে দেরী হয়ে গেল।" সে একটা জামা খুলিয়া আলনায় রাখিতে যাইতেছিল, হাত হইতে ফস্কাইয়া পড়িয়া তাহা একটা জুতার কালীর বোতল ও একটা টিনের কৌটা উল্টাইয়া ফেলিল। সে শব্দে সরযূর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে ত্রস্তে উঠিয়া বসিয়া স্বামীর খাওয়ার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

শুইবার ঘরেই একখানা টিপায়ার উপরে খাবার সাজাইয়া দিতে, ইন্দ্রনাথ অন্যমনস্ক ভাবে খাইতে বসিয়া গেল। তার খুব ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল, খাইল মন্দ নয়।

মনোরমা বলিল, "দাদা, তুমি না বল্লে, তুমি খেয়ে এসেছ?"

ইন্দ্রনাথের সে কথা মোটেই মনে ছিল না, সে বলিল, "কই, না?" তার পরেই মনে পড়িয়া তার কর্ণমূল পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল।

সরযূ সেটা লক্ষ্য করিল।

সরযূ জিজ্ঞাসা করিল, "অনীতাকে কাল নেমন্তন্ন করেছ?"

এ কথার জবাব মুসাবিদা করা ছিল; ইন্দ্র বলিল, "বলেছি, কিন্তু সে আসতে পারবে না।"

কথাটা কিন্তু সরযূর মুখের দিকে চাহিয়া বলিতে পারিল না।

বিস্মিত সরযূ জিজ্ঞাসা করিল "কেন?"

"সে কাল এখানে থাকবে না।"

"কোথায় যাবে?"

কোথায়? এ কথার উত্তর তো ইন্দ্রনাথ ভাবিয়া রাখে নাই। তবে বলিল, "সিমলা পাহাড়।"

"তার দাদাও যাবে অবিশ্যি?"

"বলতে পারি না, সম্ভব নয়।"

"বাঃ রে! এ কথাটা জিজ্ঞাসা কর নি?"

ইন্দ্রনাথ এ কথায় এমন লজ্জিত ও বিব্রত হইয়া পড়িল, যেন সে ভীষণ একটা অপকার্য্য করিয়াছে।

তার সমস্ত কথাবার্ত্তার ধরণে সরযূর মনে সন্দেহ হইল যে, ইন্দ্রনাথ কি একটা কথা যেন চাপিয়া যাইতেছে। কি যেন একটা আজ হইয়াছে, যাহা ইন্দ্রনাথ তাহার কাছে গোপন করিতেছে। সে কথাটা কি, তাহা সে অনুমান করিয়া লইল—তাহার কান্না পাইল। কিন্তু সে তখনি তার অভিমান মুছিয়া ফেলিল; ভাবিল, সে এমন একটা কি, যার জন্য তার এই দেবীদুর্ল্লভ স্বামী তাহাকে লইয়া সুখী হইবে, আর অনীতার মত মেয়েকে হাতের ভিতর পাইয়া লোভ সংবরণ করিয়া যাইবে। সে যে স্বামীকে সুখী করিতে পারিল না, এইটা তার মনের বড় দুঃখ;—স্বামী যদি অনীতাকে লইয়া সুখী হন, তবে সে তাঁর পথের কণ্টক হইবে না স্থির করিল।

মনোরমা চলিয়া গেলে সে দুয়ার বন্ধ করিয়া স্বামীকে বলিল, "অনীতা কাল কখন যাবে?"

"কি জানি, বোধ হয় বৈকাল বেলায়।"

"তবে কাল সকালে একবার আমাকে সেখানে নিয়ে যেও, আমার তার সঙ্গে দেখা হওয়া চাই-ই চাই।"

কি সর্ব্বনাশ! এ কথার কি উত্তর দিবে ইন্দ্রনাথ! সে বলিল, "সকাল বেলায় আমার ভয়ানক দরকার আছে, আমি কিছুতেই যেতে পারবো না।"

সরযূ একটু ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা কাল সকালে সতীশ আসবে,—আমি তাকেই নিয়ে যাবো, সেই ভাল হ'বে।"

শঙ্কিত ইন্দ্রনাথ ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, "না,—না, কাল তুমি যেয়ো না। সে কাল সকালে বাড়ী থাকবে না।"

সরযূ তার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি স্বামীর মুখের উপর রাখিল। সে দৃষ্টির ভিতর ছিল তার বুকভরা অভিমান।

সে দৃষ্টিতে ইন্দ্রনাথ দমিয়া গেল। সে খানিকক্ষণ মুখ ফিরাইয়া, জানালার ভিতর দিয়া গ্যাসের আলোর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তার পর সে সরযূর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "সরযূ, আমি তোমাকে মিথ্যা কথা ব'লেছি। অনীতা কোথায় যাবে, কি ক'রবে, তা' আমি জানি না। এই জানি যে, তার সঙ্গে ও অমলের সঙ্গে আমাদের সকল সম্বন্ধের আজ শেষ হ'য়ে গেছে। তোমার বা আমার আর সে বাড়ী যাবার অধিকার নেই।"

সরযূ স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে বলিল, "সে কি!"

"আর আমায় জিজ্ঞাসা করো না সরযূ," বলিয়া হাতের ভিতর মাথা গুঁজিয়া ইন্দ্রনাথ কাঁদিয়া ফেলিল।

সরযূর বুক ঠেলিয়া কান্না আসিতে লাগিল। দারুণ উৎকণ্ঠায় অধীর হইলেও, সে এখন কিছু না বলিয়া, ইন্দ্রনাথের পাশে বসিয়া তাহার মাথাটা বুকের কাছে টানিয়া লইল। ইন্দ্রনাথ কতকটা শান্ত হইলে, সে ক্রমে তাহার কথা হইতে এইটুকু সংগ্রহ করিল যে, অমল তাহাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে; এবং অনীতা-ঘটিত কোনও সন্দেহই ইহার হেতু।

রাগে সরযূর ব্রহ্মতালু জ্বলিয়া উঠিল। সেও যে স্বামীর সম্বন্ধে ঠিক এমনি একটা সন্দেহ করিতেছিল, সে কথা স্মরণ হইল না। এখন তাহার মনে হইল কেবল যে, তার স্বামীকে অমল অপমান করিয়াছে। তার হৃদয়ের সমস্ত আক্রোশ ও ক্ষোভ অমলের উপর উদ্যত হইয়া উঠিল। সে চোখ দুটি বড়-বড় করিয়া নাক ফুলাইয়া বলিতে লাগিল, "এত বড় আস্পর্দ্ধা! হতভাগা ভেবেছে কি? তোমাকে এমন অপমান ক'রতে যায় সে কি সাহসে? বামন হ'য়ে চাঁদে হাত! বাপের দুটো পয়সার জোরে ওর এত দেমাক! তোমার যাই ক্ষমা! আমি হ'লে ও পাপিষ্ঠের মুখে থুথু দিয়ে চলে' আসতাম!"

অক্ষম রোষে গজরাইতে-গজরাইতে সে প্রতিহিংসার নানা অসম্ভব কল্পনা করিতে লাগিল; কোনও উপায় বাহির করিতে পারিল না।

(২১)

পরের দিন টম ইন্দ্রকে গ্রেপ্তার করিল। ইন্দ্র তাহাকে যতদূর সম্ভব এড়াইয়া চলিয়াছিল, কিন্তু টম তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

আশা-নিরাশায় উদ্বেলিত হৃদয়ে টম জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর?"

ইন্দ্রনাথ মিথ্যা বলিবার কোনও চেষ্টা করিল না। সে বলিল, "খবর ভাল নয়। অনীতা বল্লে, সে তোমাকে বন্ধুভাবে খুব পছন্দ করে; কিন্তু তোমাকে স্বামী বলে' কল্পনা ক'রতে পারে না।"

টমের মুখখানা একটু গম্ভীর হইল; সে বলিল; "কেন? আমার কি অপরাধ?"

"অনীতার একটু সেকেলে মত! সে বলে, যাকে বিয়ে ক'রবো, তাকে নিজের চেয়ে যদি বড় ব'লে জানতে না পারি, তাকে আশ্রয় করে নির্ভরের সঙ্গে যদি আত্মসমর্পণ ক'রতে না পারি, তবে বিয়ে করা নিস্ফল!"

খানিক ভাবিয়া টম বলিল, "তোমাকে ধন্যবাদ! আমি এ কথায় আশা ছাড়তে চাই না। আমি তাকে ভাল বলাবই!"

ইন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া, শেষে মুখখানা একটু লাল করিয়া বলিল, "আর দেখ লিওলে, তোমাকে আর একটা কথাও বাধ হয় বলা চ ; আমি জানতে পেরেছি যে, অ ং একজ কে ভালবাসে!"

লিওলে ঠিক যেন এই থাটাই আশঙ্কা করিতেছিল,

এবং এই কথারই প্রতীক্ষায় ছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কে সে?"

ইন্দ্রনাথ বলিল, "সে কথা তোমাকে বলবার অধিকার আমার নেই। তুমি অমলকে কিম্বা অনীতাকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পার।"

সেই দিনই সন্ধ্যা বেলায় টম অমলদের বাড়ী গেল। অমলকে দেখিয়া সে স্তম্ভিত হইল। এ যেন সে লোকই নয়। যে ভয়ানক গম্ভীর, প্রবীণ, ক্লিষ্ট ব্যক্তি তাকে দূর হইতে নীরব নমস্কার করিয়া সম্ভাষণ করিল, তাহাকে সেই হাস্যময়, চঞ্চল, শিশু-প্রতিম অমল বলিয়া মনেই হইল না।

অনীতার কথা জিজ্ঞাসা করিতেই অমল বলিল, "সে এখানে নেই।"

"এখানে নেই! তবে কোথায়?"

"আমি জানি না।"

"তুমি জান না? কি বলছো তুমি?"

"টম, যা জানি, আমি তা তোমায় ব'লতে চাই না,—কেন না, তুমি কষ্ট পাবে। কিন্তু এখন সে কোথায় আছে, তার কোনও সংবাদ আমি রাখি না,—কোনও দিন সংবাদ রাখতেও চাই না। দেখ লিগুলে, তুমি পার তো তাকে ভুলে যেও, সে তোমার ভালবাসার যোগ্য নয়।"

নিজের ভগ্ন আশার বেদনা সবলে অন্তরে দমন করিয়া, টম অগ্রসর হইয়া অমলের হাত ধরিয়া বলিল, "অমল, তুমি বড় দুঃখ পেয়েছ! আমাকে সে দুঃখের ভাগ দেও, আমরা পরস্পরকে সাহায্য করে পুরুষ মানুষের মত আমাদের দুঃখ জয় ক'রবো।" এই স্নেহ-সম্ভাষণে অমল একেবারে গলিয়া গেল।

অনীতা চলিয়া যাওয়ার পর, এই প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা কাল অমল অসহ্য যন্ত্রণা কেবল নিজের বুকের ভিতর চাপিয়া বহিয়া বেড়াইতেছে,—তাহাতে তাহার সমস্ত হৃদয় যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে! এ কি সহজ দুঃখ! তার প্রাণের ভগিনী অনীতা আজ অপরাধী—তাকে অমল নিজে বাড়ী হইতে একরকম বাহির করিয়া দিয়াছে। জীবনে আর তার কি বন্ধন আছে, যার জোরে সেই প্রকাণ্ড ক্ষতিটা অনুভব না করিয়া পারিবে? আর একটিমাত্র তার স্নেহের পাত্র ছিল ইন্দ্র! সেই ইন্দ্র তার বুকে এত বড় একটা ঘা দিয়া গিয়াছে! তার অপরাধের জন্য ক্রোধে অমল অন্ধ হইয়াছিল, তখন তাকে প্রহার করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা দমন করিতে তার অনেকটা বেগ পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু যাইবার সময় ইন্দ্র "না, কোনও কথা নাই" বলিয়া বেদনা-কাতর মুখে যে বিদায়-দৃষ্টি তাহাকে দিয়া গিয়াছিল, তাহা তার পরক্ষণেই তাহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। এই কি তার উচিত হইয়াছে? আজ তার মনে পড়িল, ইন্দ্রনাথের সঙ্গে তার কৈশোর-সৌহার্দ্দ্যের অভ্যুদয়ের কথা। তার পর একটি-একটি করিয়া তাদের দু'জনের জীবনের সকল কথা খুঁটিয়া-খুঁটিয়া সে ইন্দ্রের অপরিসীম প্রীতি ও অমলের জন্য ত্যাগের লক্ষ দৃষ্টান্ত বাহির করিল। প্রত্যেকটি ঘটনা জলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত তাহার হৃদয় দগ্ধ করিতে লাগিল! সেই ইন্দ্র আজ তার কাছে অপরাধী! কি গুরুতর, কি ভীষণ, কি সর্ব্বনাশকর সে অপরাধ! তার সমস্ত জীবন এই একটা ক্ষুদ্র কার্য্য একেবারে ছাই করিয়া দিয়াছে! অনীতাকে সে হারাইয়াছে! কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশী দুঃখ,—অনীতা কলঙ্কিতা হয়েছে! আর ইন্দ্রনাথ সে কলঙ্কের কর্ত্তা! বিশ্বাসঘাতক! নরাধম!

এই কথাটা ঘুরিয়া-ফিরিয়া নানা আকারে সমস্ত রাত্রি দিন ধরিয়া তাহার হৃদয় ঢেঁকি-কোটার মত করিয়া পিষিয়াছে। একবার সে ভাবিল, সে তো ভুল করে নাই। ইন্দ্র যে কি বলিতে গিয়া বলিল না, অনীতা যে বলিতেছিল "দেবতাকে তাড়িয়ে পাপকে"—এ সবের মানে কি? তার শোনা উচিত ছিল। পরক্ষণেই মনে হইল সেই দৃশ্যের কথা, যাহা তার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত বৃশ্চিক দংশনের জ্বালায় ভরিয়া দিয়াছিল! সেই চুম্বন—সেই অঙ্গস্পর্শ! নাঃ! ভুলের কোনও অবসরই এখানে নাই।

একটা কথা তাহাকে সব চেয়ে বেশী পীড়া দিতেছিল। সে কেন মূর্খের মত অনীতাকে এমন ভাবে বাড়ী হইতে বিদায় করিল? এই কি তার কর্ত্তব্য হ'য়েছে? তার বাপ-মা যে অনীতাকে তার হাতে নিশ্চিন্ত ভাবে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন! সে কি তাঁদের সে বিশ্বাসের উপযুক্ত কাজ করিয়াছে? অনীতাকে সে রাত্রে যাইতে না দেওয়াই তার উচিত ছিল। না হয় তার অনীতার অনুসরণ করিয়া তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনা উচিত ছিল। আর যাই করুক না কেন, তাকে বাড়ী ফিরিতে বারণ করা তার উচিত হয় নাই।

এখন অনীতা কোথায়? কে জানে কোথায়! কেমন করিয়া সে খোঁজ পাইবে? ইন্দ্রনাথের কাছে? কেমন করিয়া অমল সেখানে যাইবে? অমল ভাবিয়া থই পাইল না। তার মনটা ছটফট করিতে লাগিল, অনীতার সন্ধানের জন্য। অনীতা যদি আর একবার ফিরিয়া আসিত। যদি আসিয়া বলিত, "দাদা, আমি ফিরে এসেছি" তবে সব অপরাধ ভুলিয়া অমল তাহাকে বুকের ভিতর লইতে পারিত।

টিং টিং করিয়া টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সুকুমার বাবুর কথা শুনিয়া অমলের সমস্তটা রাগ আবার জ্বলিয়া উঠিল। এতবড় তেজ! সুকুমার বাবুর কাছে গিয়া অনীতা আশ্রয় লইয়াছে! তাহাদের কলঙ্কের কথা সুকুমার বাবুর কাছে সে লইয়া গিয়াছে।

সুকুমার বাবুকে অমল দু'চক্ষে দেখিতে পারিত না। ধর্ম্মব্যবসায়ী মাত্রই তা'র দু'চক্ষের বিষ ছিল। সে বলিত যে, ইহারা তাহাদের ব্যবহার দ্বারা ভদ্রলোকদের অপমান করিতে চাহে। তাদের অতিরিক্ত ধর্ম্মনিষ্ঠা দিয়া যেন তারা সমস্ত লোককে বুঝাইতে চাহে যে, তাহারা পাপিষ্ঠ, আর ইহারা নিজেরা পুণ্যাত্মা। এইটা তাহাদের অন্যায় স্পর্দ্ধা! এইখানেই তাদের ঠকামি। তা'ছাড়া আত্ম-বিলোপনমূলক ধর্ম্মমাত্রই অমল একটা দুর্ব্বল, নারীসুলভ চরিত্রের নিদর্শন বলিয়া বিবেচনা করিত। দৃঢ়-চরিত্র "মদ্দা" ছেলের পক্ষে এমন ঈশ্বরের উপর একান্ত নির্ভর, ঈশ্বরের প্রেমে গলিয়া যাওয়া প্রভৃতি ছেলেখেলা একে-বারেই অসম্ভব। আর অমল ছিল এই "মদ্দা" মানুষের পরাকাষ্ঠা! তার আগাগোড়াই ছিল জোর – সে ষোল-আনা আত্মপ্রতিষ্ঠ ও আত্মনির্ভরশীল। কাহারও উপর ভর করিয়া থাকা সে দু'চক্ষে দেখিতে পারে না—ঈশ্বরের উপরও না। তাই অনীতা যে অমলকে ঠেলিয়া সুকুমার বাবুর কাছে আশ্রয় লইয়াছে, ইহাতে তাহার সমস্ত চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

সে চটিল, কিন্তু তবু এক বিষয়ে তার মনটা শান্ত হইল। অনীতা নিরাশ্রয় হয় নাই। সুকুমার বাবু আর যাই হউক, সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য ভদ্রলোক। এ কথা ভাবিয়া সে একদিক দিয়া স্বস্তি বোধ করিল। আবার, সুকুমার বাবুর কাছে যখন সে আশ্রয় পাইয়াছে, তখন যে অনীতাকে দায়ে পড়িয়া অমলের কাছে ফিরিয়া আসিতে হইবে না—সে যে সত্য-সত্যই জন্মের মত পর হইয়া গেল, তাই ভাবিয়া তা'র কান্না পাইল।

এই রকম সম্পূর্ণ পরস্পর-বিরুদ্ধ হাজার-হাজার চিন্তার ভিতর দিয়া সে একরাত্রি একদিন কাটাইয়াছে। যখন সে সলিসিটারকে অনীতার সম্পত্তি বুঝাইয়া দিল, তখন তার মনে হইতে লাগিল, যেন সে আপনার হৃদ্‌পিণ্ডটা নিজের হাতে টানিয়া ছিঁড়িতেছে। আবার একটা দারুণ দুর্জ্জয় অভিমান চাবুক মারিয়া তাহার মনকে এই দুর্ব্বলতা হইতে নিবৃত্ত করিল।

টমের সহানুভূতিতে অমল গলিয়া গেল। সে তাহার কাছে তার সকল বেদনা প্রকাশ করিয়া যেন একটা বিষম বোঝা হইতে নিষ্কৃতি পাইল।

সমস্ত কথা শুনিয়া টম কিছুক্ষণ মুখটা অত্যন্ত অন্ধকার করিয়া বসিয়া রহিল। তার পর সে বলিল, "অমল, আমি এখন দেখছি, অনীতাকে ভালবাসা দেখাতে গিয়ে আমি কেবলই তাকে পীড়ন ক'রেছি। এখন যখন নিষ্ঠুর সত্যটা জানতেই পেরেছি, তখন তা নিয়ে বসে কাঁদলে তো চলবে না। তুমি আমাকে তোমার বন্ধুত্ব হ'তে বঞ্চিত ক'রবে না আশা করি।"

"নিশ্চয়ই নয়! আমার সব বন্ধন গেছে,—তোমাকে বন্ধু রূপে যদি রাখতে পারি, তবু জীবনে একটা বন্ধন থাকবে।"

"তা' হ'লে তুমি আমাকে বন্ধুর অধিকার নিয়ে তোমাদের ভাই-বোনকে একত্র করতে দেবে? আর, যদি আমি তা পারি, আমার কাছে শপথ কর অমল, যে, তুমি অনীতাকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করে গ্রহণ ক'রবে?"

অমল নীরব রহিল। টম বলিল "Nonsense, অমল, তুমি তোমার বোনকে ক্ষমা ক'রতে পারবে না—যাকে তুমি চিরদিনই নিজের চেয়ে বেশী ভাল বেসেছ, আর এখনো সমান ভালবাস!"

অমল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "সত্য টম, আমি তা'কে এখনো খুব বেশী ভালবাসি—ভালবাসি বলেই আমি তাকে ক্ষমা ক'রতে পারছি না। সে আমায় বড় দাগা দিয়েছে।"

"আমার চেয়ে বেশী কি? আমার সমস্ত জীবনটা

অনীতা নিরর্থক ক'রে দিয়ে গেছে। কিন্তু তুমি-আমি ক্ষমা না ক'রবার কে? আমাদের রাগ করবার কি অধিকার আছে? আমাদের রাগের মানে এই যে, আমরা অনীতাকে কতকটা নিজেদের সম্পত্তির মত দেখতে চাই। অনীতার যে একটা স্বাধীন সত্তা আছে, তার ভাল ক'রবার বা মন্দ করবার সমান অধিকার আছে, এ কথা স্বীকার ক'রলে ক্ষমা করাটা তত কঠিন নয়। তা' ছাড়া, আমরা কেই বা সম্পূর্ণ নির্দোষ যে, পরের অপরাধ ক্ষমা ক'রতে অস্বীকার ক'রতে পারি। মনে কর যীশু খৃষ্টের কথা। যখন মেরী মতলীনকে সবাই ঢিল ছুঁড়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, তখন তিনি ব'লেছিলেন, 'যে নিজে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ, সেই ইহার প্রতি প্রথম ঢিল ছুঁড়ুক'!"

কথাটা অমলের মনের ভিতর বিষম খোঁচা দিল। সে দীনতার সহিত স্মরণ করিল যে, সে নিজে মোটেই নিষ্পাপ নয়। ইন্দ্রনাথের যে অপরাধ সে ক্ষমা করিতে অস্বীকার করিয়াছে, ঠিক এমনি অপরাধ সে নিজের মনের ভিতর করিয়া বসিয়াছে, সে কথা তাহার স্মরণ হইল। সুযোগ পাইলে তার মনের পাপ যে ঠিক এমনি ভাবেই প্রকাশ হইত না, কে বলিল?

এ কথা ভাবিতে তার মনটা অনেকটা নরম হইয়া আসিল। সে টমের কথায় সম্মত হইল। (ক্রমশঃ)

পোষা ভেড়া!

ঠাকুর্দা ('আমেরিকান সেনেট্')। "ও আবার কি আপদ পেছুতে ক'রে আন্‌ছিস্? জ্বালাতন!"

নাত্‌নী (আমেরিকা)। আমি কি কর্ব্ব? আমার ব্যাগে ছোলা আছে মনে করে আমার পেছু ছাড়্‌ছে না যে!

ভেড়া। (য়ুরোপীয় দেউলিয়া শক্তিপুঞ্জ) হাম্বা! হাম্বা!

সিংহাসনের ভিত্তি!

সাম্রাজ্য লোভে যাঁহারা দেশের পর দেশ জয় ক'রে নিজ রাজ্যের অধীন ক'রে নেন, তাঁদের সিংহাসনের ভিত্তি কিসের উপর, এই ছবিখানিতে তাই দেখানো হয়েছে!

(Whitehall Gazette, London)

য়ুরোপে (শান্তি-সভা)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

অনেক দিন আগে রোমাঁ্যা রোলাঁ মহোদয় রবীন্দ্রনাথকে একখানি পত্র লিখেছিলেন—বিশ্বমানবত্ব ও শান্তির প্রচারার্থ গতের আদর্শবাদীদের জন্য মনোজগতে অপিচ বহির্জগতে একটা আস্তানা স্থাপনার্থ তাঁর সাহায্য চেয়ে। বর্ত্তমান রোপে এতদর্থে প্রতি বছর একটি করে বিশ্বজাতীয় সভা য়। কোনবার সুইজর্লণ্ডে, কোনবার জর্ম্মানিতে, কানবার অষ্ট্রিয়াতে। এটিকে এ বৎসর আমার একটি ারি মনোজ্ঞ প্রতিষ্ঠান বলে মনে হয়েছিল। বর্ত্তমান বন্ধে আমার এ সম্পর্কে কিছু নিতান্তই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা াথ্‌বার ইচ্ছা। এ বৎসর এ সমিতিতে রোমাঁ্যা রোলাঁ জর্জ্জ দুহানেল (ফরাসীদেশ), বার্টরাণ্ড রাসেল (ইংলণ্ড) রমান হেসে ও ফন কেস্‌লার (জার্ম্মানি) ফ্রেডেরিক ন এদেন (হলাণ্ড) বিরুকফ (রুষদেশ) প্রমুখ মনীষিগণ াগদান করেছিলেন। তা'ছাড়া সেখানে দু'সপ্তাহ ধরে ায় শতাধিক প্রতিনিধি একত্রে শান্তি, ইতিহাস, জনীতি, সঙ্গীত প্রভৃতি সার্ব্বভৌম প্রশ্নাদি আলোচনা রেছিলেন। স্থান—সুইজর্লণ্ডের অন্তর্গত রমণীয় লুগানো র। সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ আমোদপ্রমোদ, ভ্রমণ, নৃত্য ভৃতিরও বন্দোবস্ত ছিল—যেটা য়ুরোপে নিতান্ত গম্ভীর লোচনাদির সঙ্গেও চলে থাকে। আমাদের দেশে হ'লে এ সব চাপল্য গম্ভীরাত্মা লোকের কাছে প্রগল্‌ভতা বলে অবজ্ঞাত হ'ত; কিন্তু য়ুরোপে খুব গম্ভীর বিষয়াদির আলোচনার সঙ্গে সঙ্গেও এরূপ চাপল্যের স্থান থাকে। এটা তাদের প্রাণশক্তিরই দ্যোতনা। এবং গম্ভীর ও তরলের এই একত্র সংমিশ্রণে এ সমিতিটি সমধিক উপভোগ্যই হয়েছিল।

এ সমিতিটির বিশেষত্ব এই যে, এটি সম্পূর্ণ মেয়েদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত ও নির্ব্বাহিত। অর্থাৎ office-bearer সবই মহিলা। জগতের প্রায় সব দেশেরই শিক্ষিতা মহিলা এ সমিতির প্রতিনিধি হয়েছেন দেখ্‌লাম। এ পক্ষে এঁদের উদ্যম ও যত্নের প্রশংসা না করেই থাকা যায় না। এঁরাই সব নিমন্ত্রণ-পত্রাদি ছাপান, হোটেলাদি নির্ব্বাচন করেন, বক্তৃতা আলোচনাদির বিষয় স্থির করেন,—এক কথায় এ সুন্দর যজ্ঞটির মেয়েরাই হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা। এবং জগতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও কলাবিদ্‌গণও যে এঁদের নিমন্ত্রণকে মেয়েদের নিমন্ত্রণ বলে উপেক্ষা করেন না, তার প্রমাণ যে এঁদের অনেককেই এ সমিতির বাৎসরিক অধিবেশনে যোগদান কর্ত্তে বড় কম অসুবিধা স্বীকার কর্ত্তে হয় না। য়ুরোপের মেয়েদের এই সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রচেষ্টা দেখে আমাদের দেশের অনেক সমাজ-সংরক্ষকেরা হয় ত গালে হাত দিয়ে বসে

পড়বেন :—"আজকালকার মেয়েদের হোল কি ?" কিন্তু আজকালকার মেয়েদের যে একটা সুশৃঙ্খল ও স্বাধীনভাবে কাজ কর্ব্বার ক্ষমতা হয়েছে, ও সে ক্ষমতা ক্রমেই বিবর্দ্ধমান, এজন্য আমি মনে-প্রাণে য়ুরোপকে অভিনন্দন করি। য়ুরোপের সভ্যতার অনেকগুলি তথাকথিত সভ্যতার চিহ্নকে (যেমন স্বাচ্ছন্দোপকরণের বৃদ্ধির চেষ্টা, বিলাসের আতিশয্য, লৌকিক ভদ্রতার অভিচার প্রভৃতি) আমি নিছক্ উন্নতির চিহ্ন বলে মনে করি না। কিন্তু য়ুরোপের নারীজাতির স্বাধীনতা ও স্বীয় ন্যায্য অধিকার দাবী করার সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টাই অভিনন্দনীয়। কারণ, এটা পুরুষের অহঙ্কারের ও বিজ্ঞন্মন্যত্বের একটা মস্ত বড় প্রতিষেধক বলে আমি বিশ্বাস করি। আমার মনে হয়, প্রতীচ্যের এটা একটা শ্রেষ্ঠ সম্পৎ। এতে অনেক সমস্যা এসেছে, অনেক স্থানে অনেক কুফল ফলেছে ও কলুষতার বৃদ্ধি হয়েছে ; এ কথা আমি মানি ; কারণ, এটা সত্য কথা ; কিন্তু তা সত্বেও আমি মনে করি যে, স্ত্রীজাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকার যে য়ুরোপে আজ প্রায় সর্ব্বত্র স্বীকৃত হয়ে এসেছে, এটা দাসত্ব-প্রথার নির্ব্বাসনের পর প্রতীচ্যের একটা শ্রেষ্ঠ দান। এই সত্যটি আমি এই মহিলাদের দ্বারা নির্ব্বাহিত সমিতিতে যেন আরও বেশী করে উপলব্ধি করেছিলাম।

এই সভায় বিভিন্ন প্রদেশের অনেক তরুণ-তরুণীই এসেছিলেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা পিতামাতা বা অভিভাবকগণ কর্ত্তৃক নিষেবিত হয়ে আসেন নি। তাই এখানে স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশাটা সচরাচরের চেয়েও একটু বেশী অবাধ হয়ে উঠেছিল। কি রকম অবাধ ছিল, তার একটা দৃষ্টান্ত দেই। একদিন রাত্রে জনদশেক তরুণ-তরুণী পাহাড়ে গিয়ে রাত্রিযাপন করেন ও প্রত্যূষে সূর্য্যোদয়কে একত্র নৃত্যগীতের দ্বারা অর্চ্চনা করেন। এতটা স্বাধীনতা য়ুরোপেও বিরল। কারণ, বর্ত্তমান য়ুরোপেও বিশেষতঃ কুমারীরা অভিভাবকদের হাত হ'তে সম্পূর্ণ ছাড়া পান নি, যদিও বিবাহিতা রমণীর স্বাধীনতা কুমারীর চেয়ে ঢের বেশী। কিন্তু সে যাই হোক্, আমার মনে হয় যে, এরূপ খোলাখুলি ভাবে একত্রে মেলামেশাতে কলুষতার বৃদ্ধি না হয়ে বরং উপশমই হয়। যদিও আমি নিজে যে সেদিন এ নৈশ বনভোজনে যোগদান করি নি, তা puritanism রূপ মনোভাবটার বশবর্ত্তী হয়ে নয়। কিন্তু আমার বোধ হয় যে আমাদের মধ্যে অধিকাংশ "ভাল-ছেলেরা" এতটা স্বাধীনভাবে স্ত্রীপুরুষের মেলামেশাকে ঠিক্ যথাযথভাবে বিচার কর্ত্তে পার্ত্তেন না—ঐ মনোভাবটিরই প্রভাবে। এই সূত্রে আমার মনে হয় যে, আমরা বৃথা puritanismএর চাপে পড়ে অনেক সময়ে কতখানি নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদ হতেই না বঞ্চিত থাকি। এটা একটা সামান্য দৃষ্টান্ত মাত্র।

সে যাই হোক্, এ সমিতিতে স্ত্রী-পুরুষের এরূপ ভাবে নিকট সংস্পর্শে আসাটা যে নিতান্ত সহজসাধ্য হয়ে পড়েছিল—(নিয়ম ছিল যে, এখানে যে যার সঙ্গে ইচ্ছে আলাপ কর্ত্তে পারে, পরিচয়-লৌকিকতার দরকার নেই)—সেটা আমি সব জড়িয়ে একটা লাভ বলেই গণ্য করি, যদিও আমাদের দেশের নীতিস্তম্ভগণ এর বিপজ্জনকত্ব ভেবে খুব সম্ভবতঃ শিউরে উঠ্বেন। স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশার এরূপ অবাধ স্বাধীনতার ফল যে অনেক সময় দুঃখময় হয়, এ সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা পরে উল্লেখ করে, এ সমস্যাটির সমালোচনা করার ইচ্ছা আছে ;—কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য যখন স্বতন্ত্র, তখন এ সম্পর্কে এইটুকু মাত্র বলেই ক্ষান্ত হওয়া ভাল যে, খোলা আকাশ ও মুক্ত বায়ুর নীচে মেলামেশাটা যতটা বিপজ্জনক, প্রতিষেধ, সামাজিক ছি-ছি-র ভয়ে ও সঙ্কোচের চাপে এই সংস্পর্শটা তার চেয়ে অনেক বেশী বিপজ্জনক হয়ে উঠে,—কারণ, এরূপ স্থলে সহজ ও সরল ভাবে পরস্পরের মুখের দিকে চাইবার সুযোগ না পাওয়ার দরুণ, স্ত্রী-পুরুষের সহজ ও দুর্দ্দম্য সংস্পর্শ লাভের আকাঙ্ক্ষা-রূপ প্রবৃত্তিটি উভয়েরই মনে এমন একটা অস্বাস্থ্যকর কৌতূহল জন্মিয়ে দেয়, যেটা স্ত্রী-পুরুষের সহজ সম্বন্ধ বিষয়ে কোনও উদ্দেশ পেতেই অক্ষম হয়ে পড়ে।

যা বল্‌ছিলাম, স্ত্রীজাতি যে এমন একটা বৃহৎ অনুষ্ঠান এতটা সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহ কর্ত্তে পারে, এ দু'সপ্তাহ-ব্যাপী সুন্দর যজ্ঞটিতে এই সত্যটির যেন আমি নূতন করে পরিচয় পাই। আমাদের মনে অনেক সময় অনেক সম্ভাবনার ধারণা বদ্ধমূল থাকৃতে পারে, যা বহুদিন ধরে মনে পোষণ কর্লেও হয় ত আমাদের কাছে সত্য হয়ে ওঠে না। এই সম্ভাবনাকে আমরা তখনই উপলব্ধি বা পরিপাক করি, যখন সে থিওরিটিকে কার্য্যক্ষেত্রে প্রতিপন্ন হতে দেখি।

এবং তখন আমরা বুঝি যে, এতদিন ধরে যাকে আমরা আমাদের সত্য মত বা দৃঢ় বিশ্বাস বলে ধরে নিয়ে এসেছি, তা বাস্তবিক আমাদের কাছে ছিল—না সত্য, না দৃঢ়। কারণ, কার্য্যক্ষেত্রে তাকে বাস্তবীভূত হয়ে যখন ফুটে উঠ্‌তে দেখি, তখন সে একটা সম্পূর্ণ নূতন রূপ নিয়ে আমাদের কাছে ধরা দেয়। উদাহরণতঃ, পুরুষে যেরূপ ভাবে organize কর্ত্তে পারে, স্ত্রীলোকের তা না পারার কোনই সঙ্গত কারণ নেই—এ ধারণা আমাদের মধ্যে অনেক উদারপন্থীরই আবছায়া ভাবে থাকে; কিন্তু এ ধারণাটিকে অন্ততঃ আমি ত যখন এ সমিতিতে দেখে শুনে উপলব্ধি করেছিলাম, তখন তাকে যে ভাবে গ্রহণ করেছিলাম, উপপত্তিক (theoretical) বিচারে শত চেষ্টায়ও এ সত্যটিকে ঠিক্ তেম্‌নিতর ভাবে গ্রহণ কর্ত্তে পারি নি, এটা খুব ভাল রকমই বোধ করেছিলাম। কারণ, চোখে দেখ্‌তে না পেলে, শুধু উদার-পন্থার বশবর্ত্তী হয়ে চল্‌লে, অনেক সময়েই স্ত্রী-পুরুষের দৈহিক গঠনের বৈসাদৃশ্য তাদের মনেরও বিভিন্নতার প্রমাণ কি না, এ বিষয়ে মনের শেষ কোণায় একটু সংশয়ের খোঁচ থেকেই যায়, ও আমরা চিন্তাকুল হয়ে উঠি যে, বাস্তবিক পুরুষে যা পারে তা স্ত্রীলোকের দ্বারা সত্যই সুসাধ্য হতে পারে কি না, বা তা তাদের আদর্শ হওয়া উচিত কি না। কিন্তু য়ুরোপে নারী-জাতির বহুধা স্বতন্ত্র প্রচেষ্টার দৃষ্টান্তে অনেক সময়েই আমাদের চোখ ফুটে যায় যে, এ দৈহিক গঠনের বিভিন্নতাকে আমরা যতটা প্রাধান্য দিয়ে থাকি, কার্য্যক্ষমতা-বিচার কর্ত্তে গেলে তার দাম ততটা অবধারিত নয়। *

তা ছাড়া, এ সমিতিতে এসে এ সম্পর্কে আরও একটা কথা আমার মনে উদয় হয়েছিল। বিশুদ্ধ বুদ্ধি জগতে ও মৌলিকতায় (originality) হয় ত' বংশ-পরম্পরা-গত বিকাশের সুযোগ ও সুবিধা পেয়ে বর্ত্তমান সময়ে পুরুষ শ্রেষ্ঠ—(এমন কি উদারমনা Einsteinএরও না কি এই মত, যদিও একে ধ্রুব সত্য বলে মেনে নেওয়া চলে না, যেহেতু স্ত্রীজাতির স্বাতন্ত্র্য জগতে কয়দিনই বা স্বীকৃত হয়েছে, অপিচ এখনও কতটুকুই বা হয়েছে?)—কিন্তু স্নেহ দয়া ও মায়া-মমতায় যে নারী সচরাচর শ্রেষ্ঠ, এ কথা বোধ হয় প্রায় সর্ব্বজনসম্মত। তাই আমার মনে হয় যে, শান্তি, বিশ্বমানবত্ব ও ঐক্যের প্রচারে নারী-জাতি খুবই অগ্রণী হতে পারেন, যেহেতু এ সব নীতির বীজ বুদ্ধির দ্বারা ততটা উপ্ত হয় না, যতটা হয় অনুভূতি বা রাগাত্মিকা প্রবৃত্তির (emotion) দ্বারা। কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করে বলি। জগতে আজ পর্য্যন্ত যত কলহ বিবাদের সৃষ্টি হয়েছে, তার অনেকখানিরই সৃষ্টি ও সমর্থন হয়েছে যে বুদ্ধি ও মিথ্যা যুক্তি-তর্কের সাহায্যে, তাতে বোধ হয় সন্দেহ নেই। এই তর্কের সাহায্যেই প্রতীচ্য প্রমাণ কর্ত্তে প্রয়াস পায় যে, সে প্রাচ্যের চেয়ে বিকাশের দিক্ দিয়ে উৎকৃষ্টতর; এই তর্কের সাহায্যেই জার্ম্মানির সামরিক দল প্রমাণ কর্ব্বার চেষ্টা পেয়েছিলেন যে, যেহেতু তাঁদের Kultur বা মনোজগতের সভ্যতা অন্য সব য়ুরোপীয় জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সেহেতু তাঁদের Kulturকে জোর করে অপরের গলদেশে প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার অধিকার তাঁদের আছে। এই বুদ্ধি-প্রণোদিত যুক্তির বশবর্ত্তী হয়েই পারিস মিউজিয়ামের একজন খ্যাতনামা নৃতত্ত্ববিৎও বিস্‌মার্কের সঙ্গে আদিম অসভ্য মানুষের শিরঃকঙ্কালের সাদৃশ্য দেখিয়ে জার্ম্মান জাতিকে হেয় প্রমাণ কর্ব্বার উৎসাহে অধীর হয়ে উঠেছিলেন * ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এ বিষয়ে বোধ হয় আমরা বুদ্ধির চেয়ে রাগাত্মিকা-প্রবৃত্তির সাহায্যে বেশী সহজে এই গভীর সত্যটির পরিচয় পাই যে, বিশ্ব-মানব মূলতঃ সর্ব্বত্রই সমান।—দোষে ও গুণে গড়া, প্রীতি ও ঐক্যে সে আনন্দ পায় ও উন্নত হয়, এবং বিদ্বেষে ও অনৈক্যে সে দুঃখ পায় ও অবনত হয়। ঠিক্ এই কারণেই হোক্ বা না হোক্, য়ুরোপে আজকাল এক সম্প্রদায় যুক্তির প্রতি একটু বেশী বিমুখই হয়ে পড়েছেন।

* এই সমিতিতে মহামতি Bertrand Russel মহোদয় আমাকে একদিন বলেছিলেন, "স্ত্রী-পুরুষের অনেক তথাকথিত বৈষম্য যে পুরুষের দ্বারাই প্রচারিত মাত্র, তা রুষদেশে গেলে বড় বেশী স্পষ্ট হয়ে ওঠে; যেহেতু, সেখানে স্ত্রীজাতির সামাজিক অবস্থা য়ুরোপের মধ্যে সব চেয়ে বেশী উন্নত বলে সেখানে এ সত্যটির সব চেয়ে বেশী পরিচয় পাওয়া যায় ও আমরা দেখি যে এ বৈষম্যের অনেকখানিই অতিরঞ্জিত।"

* রোমাঁ রোলাঁ মহোদয় তাঁর "Au dessus de la metee" বা "যুদ্ধের যূথমতের বাহিরে" নামক বিখ্যাত বইখানিতে জার্ম্মানির শ্রেষ্ঠ নাট্যকার Gerard Hauptmannকে যে খোলা চিঠি লিখে-ছিলেন তাতে এই কথাটির উল্লেখ করেছেন।

তাঁরা বলেন emotionএর বা impulseএর সত্য নির্দ্ধারণের ক্ষমতার আমরা যথেষ্ট দাম দেই না। সেদিন য়ুরোপের একজন মহা প্রতিভাবান্ ব্যক্তি আমাকে বলেছিলেন যে, "আমরা প্রায়ই বুদ্ধির বিকাশ কর্ত্তে গিয়ে রাগকে (emotion) দেউলে করে বসি, এবং এইখানেই জগতের শ্রেষ্ঠ কলাবিদের বিশেষত্ব যে তাঁরা এই দুয়েরই সামঞ্জস্যের ওজন কোনও অজ্ঞাত উপায়ে ভেতর থেকে পেয়ে থাকেন।" তাই আমার মনে হয় যে, আমাদের হৃদয়ের রাগাত্মিক দিক্‌টাতে নারী জাতি আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে প্রীতি শান্তির প্রচারে তাঁরা সঙ্ঘবদ্ধ হ'লে পরে, এ আন্দোলনের কার্য্য-ক্ষেত্রেও অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করার সম্ভাব্যতা সুদূর নয়। কারণ, নারী-জাতির রাগাত্মিকা সংস্কার তাঁদের যে পুরুষ জাতির চেয়ে বেশী সহজে আলো দেখাতে পারে, এ সম্ভাবনা আমার খুবই মনে হয়। এ বিষয়ে আমার কেবল একটা সংশয় মনে জাগ্‌ত; কিন্তু আমার একটি গভীর-হৃদয় ফরাসী বান্ধবী—যাঁর সম্বন্ধে আমি পরে লিখবো—এর বড় সুন্দর উত্তর দিয়েছিলেন। কথাটা একটু বিস্তৃত ভাবেই বলি। আমি তাঁকে বলেছিলাম "দেখ, তোমাদের হৃদয়ের কোমল প্রবৃত্তিগুলি আমাদের চেয়ে বেশী বিকশিত হয়ে উঠেছে বলেই যে তোমরা সর্ব্বদা কলহ ও বিদ্বেষের বিরুদ্ধে প্রচার-কার্য্যে আমাদের চেয়ে বেশী কাজ কর্ত্তে পার্ব্বে, এমন কথা বোধ হয় জোর করে বলা চলে না। কারণ, বিজাতি-বিদ্বেষ ও স্বজাতি-অর্চ্চনের প্রবৃত্তি যে অন্ততঃ যুদ্ধের সময়ে তোমাদের মনে আমাদের চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে, এ কথা আর যারই থাক্, তোমার ত' অবিদিত থাক্‌তেই পারে না।" উদাহরণতঃ আমি তাঁকে আমার পরিচিত এক ফরাসী মহিলার দৃষ্টান্ত দিয়েছিলাম—যেটা এ সম্পর্কে খুবই typical বলে আমার মনে হয়েছিল। এই মহিলার মাতা ছিলেন জর্ম্মান—জাতিতে জর্ম্মান, যদিও ইনি রক্তে অর্দ্ধেক ফরাসী অর্দ্ধেক জর্ম্মান মাত্র। তিনি বার্লিনে আমাকে দুঃখ করে বলেছিলেন যে, তাঁর কন্যা জনৈক পদস্থ ফরাসী ভদ্রলোককে বিবাহ করে এমন জর্ম্মান-বিদ্বেষী হয়ে উঠেছেন যে, তিনি এমন কি নিজের মাকে দেখ্‌তেও জর্ম্মান মাটি মাড়াতে রাজি নন। আমাকে তিনি পারিসে তাঁর কন্যাকে এ সম্বন্ধে দু'চারটে স্নিগ্ধ যুক্তি-তর্কের সাহায্যে বার্লিনে আস্‌তে রাজী কর্ত্তে চেষ্টা কর্ত্তে বলেন। আমি পারিসে গিয়ে তাঁদের পরিবারে স্বামী-স্ত্রী দুজনের সঙ্গে তর্ক করে দেখি যে, স্বামী বরং এ বিষয়ে একটু ঠাণ্ডা হয়েছেন, কিন্তু স্ত্রী জর্ম্মান জাতির বিরুদ্ধে একেবারে অগ্নি-মূর্ত্তি। বর্ব্বর জর্ম্মান-জাতির দেশে কোনও সুসভ্য ফরাসী মহিলার পদার্পণ করা যুদ্ধাবসানের তিন বছরের পরেও যে অসম্ভব, এ তত্ত্বের মর্ম্মার্থ অনুধাবন করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়েছিল, এ কথা বেশ মনে আছে। এ দৃষ্টান্তটি শুনে আমার বান্ধবী মহোদয়া ধীরভাবে উত্তর দিয়াছিলেন, "স্ত্রীজাতির বিরুদ্ধে এ অভিযোগটির অনেকখানি সত্য বটে; কিন্তু এর কারণ নির্দ্দেশ কর্ত্তে গেলে দেখা যায় যে, এজন্যও পুরুষ জাতিই বেশী দায়ী। কারণ, এরূপ ক্ষেত্রে আমরা বিদ্বেষ-মন্ত্র জপি মূলতঃ স্বামী-পুত্রের অনুমোদন পাবার তরল প্রবৃত্তিটির বশবর্ত্তী হয়ে,—বিদ্বেষে বেশী সাড়া পাই বলে নয়। কারণ, য়ুরোপে স্ত্রীজাতির বাইরের স্বাধীনতার একটা বাহার দেখে তুমি এ ভুল করে বোসো না যে, তারা আজ তাদের অন্তরেও এতটা সহজ ভাবে স্বাধীনতা খুঁজে পেয়েছে। আমরা খুব বেশীর ভাগ সময়েই প্রতিবাদ কর্ত্তে ইতস্ততঃ করি—প্রিয়-পরিজনরা ব্যথা পাবে বলে; ও শুধু তাই নয়, পাছে তারা ভাবে যে আমরা দেশকে যথেষ্ট ভালবাসি না, এই ভয়ে আমরা আরও একটু বেশী দূর যাই ও শত্রুর দোষ কীর্ত্তনে শতমুখ কণ্ঠভরা-বিষ হ'য়ে উঠি—সেটা তাতে যে বিরাট্ আনন্দ পাই বলে, তা নয়।" কথাটা হয় ত' সম্পূর্ণ সত্য নয়; কিন্তু এটা যে একটা গভীর কথা তাতে সন্দেহ নেই। আমরা যুগযুগ ধরে নারী-জাতিকে যে ভাবে চেপে রেখে এসেছি, তাতে দু-এক পুরুষে তাদের মনোজগতের এরূপ খর্ব্বতার আমূল নিরাকরণ হওয়া বোধ হয় আকাশ-কুসুম। কিন্তু বিদ্বেষে নারী-হৃদয় যুদ্ধের সময়ে পুরুষের হৃদয়ের চেয়ে বেশী সাড়া পাক্ বা না পাক্, শান্তির সময়ে তাদের নৈতিক ভারকেন্দ্র (centre of gravity) যে পুরুষের চেয়ে সহজে স্বস্থ থাকে, এ কথা বোধ হয় অসত্য নয়। এই সব কারণে আমার বোধ হয় যে জগতে সর্ব্বত্র স্ত্রীজাতির এরূপ একটা সঙ্ঘ স্থাপিত হওয়া খুবই ভাল। কারণ, কে বল্‌তে পারে যে, ৫০ বৎসর বাদে এ সঙ্ঘ পুরুষের কুটিল রাজনীতির উপরও একটু প্রভাব বিস্তার কর্ব্বে না? স্ত্রীজাতির সঙ্ঘবদ্ধ

হয়ে কাজ কর্ব্বার শক্তি বিবর্দ্ধমান। তাই, পরে যে তারা কোনও যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পার্ব্বে, এটা এখন একটু অত্যধিক আশা বলে মনে হ'লেও পরে হয় ত' এতটা মূঢ় স্বপ্ন বলে প্রতীয়মান হবে না।—Prince Kropotkinএর Memoirs of a Revolutionist পড়লে দেখতে পাই যে, গত শতাব্দীতে যারা প্রথম প্রথম দাস-প্রথার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে প্রচারাদি কার্য্যে ব্রতী হয়েছিল, তাদের এ প্রচেষ্টাকে অনেকেরই মূঢ়তা বলে মনে হ'ত। কারণ, ত্রিশ চল্লিশজন দাস ব্যতীত যে কোনও ভদ্র-অভিজাতের চল্‌তে পারে, এটা তখন প্রায় একটা অভাবনীয় ব্যাপার ছিল। কিন্তু দেখতে দেখ্‌তে এই প্রচেষ্টা বলীয়ান্ হয়ে উঠে, শেষে অশিক্ষিত রুষদেশেও দাসত্ব-প্রথাকে নির্ব্বাসিত কর্ত্তে কৃতকার্য্য হয়েছিল। ইতিহাসে দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, প্রায় সর্ব্ব-প্রকার আদর্শ-পন্থী আন্দোলনই প্রারম্ভে উপহসিত ও অবজ্ঞাত হয়ে থাকে। এমন কি বৎসর কয়েক পূর্ব্বেও যে সব উদারপন্থিগণ স্ত্রীজাতির ভোটাধিকার পাওয়ার সমর্থন করেছিলেন, তাঁরাও বড় কম বাধা ও অবজ্ঞা ও উপহাস লাভ করেন নি। এ সব দেখে-শুনে আমার মনে হয় যে, মেয়েদের এরূপ একটা স্বতন্ত্র সঙ্ঘের কার্য্য-কারিতা আছে, ও এতে আমাদের দেশের মেয়েদেরও যোগদান করা বাঞ্ছনীয়। *

এ প্রবন্ধটিতে এই সমিতির একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি কেবল আমার ব্যক্তিগত দুচারটি অবান্তর অভিজ্ঞতা লিখেই ক্ষান্ত হব, অর্থাৎ এমন দুচারটি দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা যা থেকে মাত্র যে আমি নিজে রস সঞ্চয় করেছি তাই নয়, যা থেকে আরও পাঁচজন যে একটু-আধটু রস পেতে পারেন, এ আশা করা হয় ত' দুরাশা না হ'তেও পারে। কিন্তু ব্যক্তিগত impression চিরকালই একটু বেশী স্বার্থপর বলে যদি আমি অজ্ঞাতে একটু বেশীই আত্মকেন্দ্র হয়ে পড়ি, তবে আশা করি সেটা কেউ-ই গুরুতর অপরাধ বলে গণ্য কর্ব্বেন না। প্রারম্ভেই এইটুকু সাফাই গেয়ে আমি এ সমিতিতে যে নানান্ রকমের মানুষের সঙ্গে একটু অপেক্ষাকৃত নিকট সংস্পর্শে এসেছিলাম তাঁদের সম্বন্ধে দু'চারটে কথা লিখ্‌বার উদ্যোগ করি। তবে গোড়াতেই বলে রাখা ভাল যে, আমি নিতান্তই অসম্বদ্ধ ভাবে বিদেশী ও বিদেশিনীদের মন সম্বন্ধে কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লিখ্‌বার চেষ্টা করব মাত্র। তাই যাঁদের মনে বিদেশীর মনের একটা পরশ কোনও সাড়া তোলে না, তাঁদের জন্য এ প্রবন্ধ নয়। এর পরের প্রবন্ধ থেকে এরূপ দু'চারজন মানুষের কথা লিখ্‌ব।

* যদি কোনও ভারতীয় মহিলা এ অনুষ্ঠানের সভ্য হতে চান, তবে তিনি যেন Miss Balch, Secretary, 6 rue de vieux college, Geneve, Suitzerland ঠিকানায় পত্র লেখেন। এঁরা খুবই চান যে ভারতীয় নারী এ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

বিজিতা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১৭)

[রা]ত অনেক হইয়া গিয়াছে। কাল প্রাতেই পুরাতন বাটীতে [উ]ঠিয়া যাইতে হইবে বলিয়া, সুষমা আজ সারাদিন ধরিয়া [জি]নিসপত্র গুছাইয়া লইতে ব্যস্ত ছিলেন। অনেক জিনিস-[প]ত্র আজ পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, কতকগুলি এখনও [প]ড়িয়া আছে।

আজ একাদশী ছিল। সুষমা প্রতিভাকে সন্ধ্যার অনেক আগেই ছুটি দিয়াছিলেন; কিন্তু প্রতিভা ইচ্ছাপূর্ব্বক সে ছুটি গ্রহণ করে নাই। সে আজকাল একাদশীর দিনে সম্পূর্ণ অনশনে থাকিতে পারে। তাহাকে জল খাওয়াইবার জন্য পিসীমা অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে শুধু কাঁদিয়া

বলিয়াছিল, "আমায় মাপ কর পিসীমা। এতদিন না জেনে-শুনে অনেক মহাপাপ মাথায় তুলে নিয়েছি। এখন জ্ঞানতঃ সে পাপ আর মাথায় নেব না। আমায় এমনিই থাক্‌তে দাও,—আমি বেশ থাকতে পারব, কোনও কষ্ট হবে না।"

ধরিতে গেলে এই তাহার প্রথম উপবাস। দুপুর বেলাটায় একবার অসহ্য জল-পিপাসায় বুকটা তাহার ফাটিয়া যাইতেছিল; সে একটীও কথা তখন শুষ্কমুখে উচ্চারণ করিতে পারে নাই। প্রাতে স্নান করা সত্বেও সে খানিকটা তৈল আবার মাথায় ঢালিয়া পুষ্করিণীতে স্নান করিবার জন্য ছুটিয়া গেল। দেড় ঘণ্টা জলে পড়িয়া থাকিয়া যখন সে ফিরিল, তখন পিপাসা মিটিয়া গিয়াছিল।

সুষমা কেবল তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিতেছেন দেখিয়া সে বড় সঙ্কুচিতা হইয়া উঠিল। এই বাংলা দেশে তাহার চেয়ে কত ছোট মেয়েরা একাদশীর দিনে অনশনে পড়িয়া আছে। সে তো বড় হইয়াছে, সে তো সকল কষ্টই সহ্য করিতে সমর্থ; তবে কেন সুষমা তাহার পানে এমন করিয়া চাহিতেছেন? কই, তাহার মুখ তো শুকায় নাই।

বৈকালে সুষমা বলিলেন, "এখন তুই যা প্রতিভা। সারাদিন উপোস করে আছিস। ভূতের মত একঘেয়ে খেটে যাচ্চিস, এখন গিয়ে একটু বসগে যা।"

প্রতিভা একটু হাসিয়া বলিল, "আমার কিছু কষ্ট হচ্ছে না দিদি। অন্যদিনের চেয়ে শরীরটা বরং আজ হাল্‌কা বলে ঠেকছে। দুপুর বেলা একটু জলতেষ্টা পেয়েছিল, চান করতেই তা সেরে গেল। আঃ, রোজ-রোজ বেশ এমনি করে একাদশী হয়, তা হলে বেশ ভাল হয় কিন্তু।"

সুষমা একটু হাসিবার চেষ্টা করিলেন; সে চেষ্টায় হাসি ফুটিল না, ফুটিল চোখের জল; ঝর ঝর করিয়া তাহা তাঁহার গণ্ডদুটি ভাসাইয়া দিয়া গেল। সুষমার মলিন মুখ এ পর্য্যন্ত কেহ বোধ হয় এ বাড়ীতে দেখে নাই,—চোখের জল দেখা তো দূরের কথা। তাঁহার সর্ব্বদা হাসিমুখ দেখিয়া পিসীমা তাঁহাকে 'মা আনন্দময়ী' বলিতেন।

প্রতিভাকে আবেগভরা বুকে টানিয়া লইয়া, সুষমা নীরবে নির্নিমেষে তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানার পানে চাহিয়া রহিলেন। ভগবান! এ ক্ষুদ্র বালিকা কি মহাপাপ করিয়াছিল, যাহার জন্য তাহাকে এমন করিয়া দগ্ধ করিতেছ? যে বয়সে মেয়েরা শিশু,—পুতুল খেলে মাত্র, সেই বয়সেই সে বিবাহিতা, সঙ্গে-সঙ্গেই বিধবা। এই যে মাত্র পঞ্চদশ বর্ষ বয়স তাহার, এ সময়ে যে কত মেয়ের বিবাহই হয় না। তাহাদের হৃদয় কত না আশায় ভরা; তাহাদের সম্মুখে জগৎ কত না সুন্দর রঙ্গে চিত্রিত হইয়া জাগিয়া আছে! কত না সুখের চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া তাহারা উৎসাহিত হইয়া উঠে। আর এই ক্ষুদ্র বালিকা! আহা, এখনই জীবনের সকল আশা-আনন্দ সে বিসর্জ্জন দিয়াছে। তাহার চক্ষু এই বয়সেই সসীম ছাড়িয়া অসীমের পথে ন্যস্ত। এই চেষ্টার ফলে তাহার হাসি, আনন্দ সব শুকাইয়া গেছে। সুষমা কি বুঝিতে পারিতেছেন না, সে প্রাণপণে তাঁহার কথা পালন করিতে সচেষ্ট; এজন্য অহনিশ তাহাকে নিজের হৃদয়-বৃত্তির সহিত যুদ্ধ করিতে হইতেছে। হৃদয় তাহার ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যাইতেছে, তথাপি বাহিরে সে বড় শান্ত, বড় স্থির।

নীল আকাশে চাঁদ হাসিয়া ভাসিয়া উঠিল। ছোট-ছোট তারাগুলি চারিদিকে চিক্‌মিক করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সুষমা সকলকে আহার করাইয়া, নিজে স্বামীর পাতে বসিলেন। তখনও প্রতিভা দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। পিসীমা একাদশীর দিন বড় একটা নীচে আসিতেন না; সন্ধ্যা হইবামাত্র আহ্নিক সারিয়া তাড়াতাড়ি শুইয়া পড়িতেন। সন্ধ্যার পরে প্রতিভাকে মহাভারতখানা পড়িয়া শুনাইবার জন্য একবার ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিভা নড়ে নাই।

সুলতার দুইটী দাসী, তিনজন ভৃত্য ও পাচিকা ঠাকুরাণী তাহার দিকে গিয়াছে। এদিকে একজন দাসী, বহু পুরাতন ভৃত্য অভয় ও একজন পাচিকা আছে। একাদশীর দিন সে শুধু একবেলা রন্ধন করিত; বিকালের রন্ধন ও পরিবেশনের ভার সুষমা নিজেই লইয়াছিলেন।

দণ্ডায়মানা প্রতিভার পানে চাহিয়া সুষমা বলিলেন, "এখনও দাঁড়িয়ে আছিস যে প্রতিভা, শুতে যাস নি?"

প্রতিভা বলিল "এই যাচ্চি। তোমার আর কিছু লাগবে কি না—"

বাধা দিয়া সুষমা বলিলেন, "কিছু লাগবে না আর,—তুই যা, শুয়ে পড় গিয়ে।"

আজ তিনি কিছুতেই আহারে বসিতে চান নাই।

পিসীমা যখন তীব্র কণ্ঠে তিরস্কার করিলেন, তখন বাধ্য হইয়া আহারে বসিতে হইল। এক গাল ভাত মুখে দিলেন মাত্র, তাহা গলাধঃ করিবার শক্তি তাঁহার আর ছিল না। এখন প্রতিভাকে কোন ক্রমে সরাইয়া দিয়া, তিনি উঠিয়া পড়িতে পারিলে বাঁচেন।

প্রতিভা অনিচ্ছা সহকারে বলিল, "তোমার খাওয়াটা হোকই না দিদি, দুজনে একসঙ্গে যাব'খন।"

সুষমা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "আমার খাওয়া হতে যদি একঘণ্টা লাগে, তা বলে সেই একঘণ্টা সমানে এমনি করে তুই দাঁড়িয়ে থাকবি সামনে? বলছি হাজার বার করে শুতে যেতে, কিছুতেই যদি যাস। এত অবাধ্য হয়েছিস কবে হতে প্রতিভা? আগে তো এমন ছিলি নে।"

প্রতিভার স্বভাবতঃ আরক্ত মুখখানা টকটকে লাল হইয়া উঠিল। তখনি তাহার মনে পড়িয়া গেল, বিধবাকে একাদশীর দিনে সম্মুখে রাখিয়া সধবার হয় তো খাইতে নাই। ওবেলাও তো ঝি তাহাকে সুষমার আহারের সময় সে গৃহে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছিল।

প্রতিভা তাড়াতাড়ি সরিয়া গেল। কোন ক্রমে চোখের জল চাপিয়া রাখা তাহার পক্ষে সাধ্যাতীত হইয়া দাঁড়াইল। সে বিধবা, তাহার স্নেহময়ী দিদিও তাহাকে তফাৎ রাখিয়া চলেন। এত দিন কেন তাঁহারা প্রতিভাকে কুমারীর অধিকার দিয়াছিলেন? কেন প্রথম হইতে তাহাকে বুঝান নাই,—সে বিধবা, সে ব্রহ্মচারিণী?

অশ্রুজলে তাহার দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া আসিয়াছিল। দুই হাতে চোখ মুছিতে-মুছিতে সে দুপদাপ করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। তাহার সেই পদশব্দেই সুষমা তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। তিনি তখন আচমন সমাপ্ত করিয়া হাত-মুখ মুছিতেছিলেন। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া ডাকিলেন "প্রতিভা—"

প্রতিভা দাঁড়াইল।

সুষমা উপরে উঠিতে-উঠিতে স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "তুই কি রাগ করে যাচ্ছিস না কি রে?"

প্রতিভা একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল। তাহাকে বাম বাহু দ্বারা জড়াইয়া ধরিয়া, দক্ষিণ হস্তে তাহার ললাটের চূর্ণ অলকদাম সরাইয়া দিতে-দিতে সুষমা বলিলেন, "তুই কি ভেবে যাচ্ছিলি, সত্য করে বল তো লক্ষ্মী বোনটী আমার?"

প্রতিভা চোখ মুছিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমি ভাবছিলুম, বিধবার সামনে একাদশীর দিন সধবার বুঝি খেতে নেই,—তাই তুমি আমায় তাড়িয়ে দিলে।"

সুষমা হাসিয়া বলিলেন "দূর পাগলি, তাও কি কখনও হতে পারে? তাই যদি হবে, তবে এত দিন আমরা একত্রে খেয়েছি কেন? কত দিন তো মুখের এঁটোটাও যে আমি খেয়েছি। নির্জ্জলা একাদশী না হয় আজই প্রথম করেছিস তুই,—বিধবা হয়েছিস তো আজ ছয়-সাত বছর। এত দিন কেমন করে কাটালুম তোকে নিয়ে? কত লোকে কত কথা বলেছে,—তোর দিদি কি কখনও তা শুনে পেছিয়ে গেছে রে পাগলি?"

প্রতিভা বলিল "কিন্তু মঙ্গল-অমঙ্গল—"

সুষমা বলিলেন, "মঙ্গল-অমঙ্গল কোনও দিন বাছতে দেখেছিস তোর দিদিকে? হ্যাঁ রে, কপালে যা থাকে, কিছুতেই কি তা খণ্ডান যায়? লোকে যে হাজার বেছে চলে, অমঙ্গলের হাত কি তারা এড়াতে পেরেছে। আমি কিছু বাছি নে বোন, কিছু বাছি নে। যেটুকু নেহাৎ নইলে নয়, সেইটুকুই কেবল মেনে চলি। আমার মন যেটা বলে মঙ্গল, আমি জানি সেই মঙ্গল, অথচ সেইটেই লোকে অমঙ্গল বলে মনে নেয়। নিজে খাঁটী থাকলে কিছু বাছতে হয় না প্রতিভা —কিছু না! যা আমার ভবিষ্যৎ বহন করে আনবে, তা আনবেই,—কিছুতেই কাটানো যাবে না তা। লোকে বলে, সদ্য বিধবার মুখ দেখতে নেই,—নিজের সর্ব্বনাশ সঙ্গে-সঙ্গে হয়। আমার মা যখন বিধবা হলেন, আমিই যে তাঁকে স্নান করালুম, গয়না খুলে নিলুম, কই, কিছুই তো হয় নি আমার বোন। তার পরে আমার মা মরে গেলেন, ছয় বছর কেটে গেছে, কি হয়েছে আমার? ও সব মানুষের মনগড়া কথা, কল্পনা মাত্র। একটা কিছু নতুন রকম করতে বাধা পেয়ে, কাপুরুষেরাই এসব কথা রটায়—এই কাজটা করলে এই হয়, সুতরাং যে করবে তারও এই রকম হবে। লোকের মুখে-মুখে সে কথাটা ছড়িয়ে পড়ে, আমরাও বিনা বিচারে সেটা বিশ্বাস করে ফেলি।"

প্রতিভা প্রশংসমান নেত্রে দিদির পানে চাহিল। দিদি তাহার চোখে বাস্তবিকই দেবী। দিদির কথা যাহাই সে শুনুক, তাহাই তাহার মনে হইত চমৎকার। সে আর

কিছু বিশ্বাস করিত না, বিশ্বাস করিত কেবল দিদিকে ও দিদির সেই কথাগুলিকে।

খোলা ছাদের দুইদিকে সারি সারি কক্ষশ্রেণী। ইহারই মধ্যে একটী কক্ষে প্রতিভা পিসীমার কাছে শয়ন করিত। সুষমা বলিলেন "ঘরে আলো নেই বুঝি? আমার ঘরে চল, আলো দি।"

প্রতিভা বলিল "আলো দিতে হবে না দিদি, আমি অন্ধকারে গিয়েই শুয়ে পড়ব'খন। আমার গা, মাথা বড় জলছে।"

সুষমা ব্যস্ত ভাবে বলিলেন, "আর খোলা ছাদে বসে থাকতে হবে না, শো গিয়ে বলছি।"

অনুনয়ের সুরে প্রতিভা বলিল, "তোমার পায়ে পড়ি দিদি, আধঘণ্টা এখানে বসে থেকেই আমি গিয়ে শুয়ে পড়ব'খন। তুমি যাও না দিদি, শোওগে। আজ সারাদিন ধরে খাটছ।"

অনেক বলিয়াও সুষমা তাহাকে উঠাইতে পারিলেন না; খোলা ছাদে সে সটান শুইয়া পড়িল। অগত্যা সুষমা নিজের কক্ষে চলিলেন। তাঁহার শরীরটাও আজ ভাল ছিল না, রাতও প্রায় বারটা বাজে। বলিয়া গেলেন "বেশী রাত আর বসে থাকিস নে প্রতিভা,—ঝাঁ করে অসুথ হয়ে পড়বে।"

প্রতিভা চুপ করিয়া জ্যোৎস্নালোকিত প্রকৃতির পানে চাহিয়া রহিল। কি শান্ত ছবিখানি। সব নীরব, নিথর। পুষ্করিণীর ধারে ফুটন্ত বকুল গাছে বসিয়া একটা পাপিয়া চীৎকার করিয়া কি মর্ম্মব্যথা জানাইতেছিল,—বহুদূর হইতে আর একটা পাপিয়া তাহার উত্তর দিতেছিল। নীচে হেনা গাছে ফুল ফুটিয়া মৃদু বায়ু-স্পর্শে কাঁপিতেছিল; উন্মত্ত বাতাস হেনা, বকুল ও যুঁয়ের গন্ধ একত্র মিশাইয়া একটা অভিনব গন্ধের সৃষ্টি করিয়া, তাহাই বহন করিয়া ছুটাছুটি করিতেছিল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস প্রতিভার বক্ষ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল।

কি সুন্দর রজনী! ওই নীল আকাশ সুন্দর যেমন, উহার মধ্যস্থলে ভাসমান চাঁদখানি তেমনি সুন্দর; চারিদিকে হীরক-টুকরার মত যে তারাগুলি ইতস্ততঃ ছড়ানো রহিয়াছে, তাহাও সুন্দর; শুভ্র কৌমুদী-ধারা যাহার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাও সুন্দর; ওই যে পুষ্করিণীর কালো জলটী জ্যোৎস্নাধারায় সিক্ত হইয়া শুভ্র বর্ণ ধারণ করিয়াছে, তাহাও তেমনি সুন্দর।

প্রতিভা চোখ ফিরাইয়া পার্শ্ববর্ত্তী গৃহটীর পানে একবার চাহিল; সে গৃহে আলোক এখনও উজ্জ্বল ভাবে জ্বলিতেছে। প্রতিভার বক্ষ কাঁপিয়া উঠিল; সে বদ্ধ দৃষ্টিতে সেই গৃহটীর পানে চাহিয়া রহিল।

কতক্ষণ কাটিয়া গেল, তাহা সে জানে না। যখন তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন সে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পড়িল; তখনি সেখানে সে আছড়াইয়া পড়িল।

দিদি, দিদি, বল দাও, বল দাও। প্রতিভা যে আর ভাবিতে পারে না, তাহার মাথা যে ঘুরিয়া উঠে, তাহার বক্ষ যে চিন্তার গুরু ভারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। দিদি, বল দাও, বল দাও!

সেই সময় কে তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। কে স্নেহকোমল কণ্ঠে ডাকিল "প্রতিভা!"

এই যে দিদি! দিদির কাণে কি প্রতিভার আকুল আহ্বান গিয়া পৌঁছিয়াছে?

"দিদি" বলিয়া সে সুষমার পা দুখানা জড়াইয়া ধরিল। তাহার চোখের ধারায় সুষমার পা দুখানা সিক্ত হইয়া গেল।

"ও কি করছিস পাগলি, ও কি করছিস? ছি—ছি, অমন করতে নেই।"

বলিতে-বলিতে সুষমা পা ছাড়াইয়া লইয়া সেখানে বসিয়া পড়িলেন।

তাঁহার কোলের মধ্যে মুখ লুকাইয়া আর্ত্ত কণ্ঠে প্রতিভা বলিয়া উঠিল, "তোমার কাছে কোনও কথা কোন দিন লুকাই নি দিদি, আমার সব কথা তো জানো তুমি। বল, কেন আজ আমার প্রাণ এত শূন্যতা অনুভব করছে, কেন আজ এ হাহাকার করে কাঁদতে চাচ্ছে। তোমার পায়ে পড়ি দিদি, আমায় সব বল। আমি জানি, সত্যি যা—তা তুমিই বলতে পারবে।"

সুষমা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার সম্মুখে যে সত্যটা কুয়াসার অন্তরালে গোপন ছিল, যে আবরণকে তিনি প্রস্তরে পরিণত করিবার চেষ্টায় ছিলেন, আজ সে সত্য অকস্মাৎ বাহির হইয়া পড়িল,—সে আবরণ একেবারেই মিথ্যা হইয়া গেল। তিনি সময়োপযোগী উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না।

তাঁহার কোলের মধ্যে মুখ লুকাইয়া রোরুদ্যমানা বালিকা। তিনি একবার তাহার পানে চাহিলেন ; আবার চোখ তুলিয়া শান্ত নিশীথ-আকাশের পানে চাহিলেন ; পার্শ্বে উজ্জ্বলালোকিত গৃহখানির প্রতি একবার তাকাইলেন।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন, "তবে সত্যি কথাই বলবি প্রতিভা, একবিন্দু মিথ্যে বলবি নে?"

প্রতিভা তেমনি ভাবেই পড়িয়া থাকিয়া মাথা নাড়িল।

সুষমা বলিলেন, "তুই ঠাকুরপোকে ভালবাসিস?"

প্রতিভা মুখ তুলিল না, একেবারে নিথর হইয়া গেল।

উত্তেজিত কণ্ঠে সুষমা বলিলেন, "সত্যি কথা বলা বুঝি এই? আমার কাছে কিছু লুকানো তোর মিছে। আমি অনেক দিন হতেই তোর মুখ-চোখ দেখেই তোর ব্যাপার কতকটা বুঝতে পেরেছি। আজও ওখানে দাঁড়িয়ে দেখছিলুম, তুই কি করিস। তুই মনে ভাবছিলি, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে শুতে গেছি। তা কি আমি পারি রে? আমার চোখ সর্ব্বদা তোর ওপর ন্যস্ত। রাত্রে তোকে শুইয়ে রেখে তবে আমি শুতে যাই। তোর মুখ দেখেই লোকে তোর চরিত্রে সন্দেহ করবার অবকাশ পেয়েছে। সত্যি যদি তুই অকলঙ্কা হতিস, সাধ্য কি লোকের—একটা কথা বলতে সাহস করে তোকে? তোর মনটাই যে অপবিত্রতায় ভরে উঠেছে রে, তারই আভাস একটু ছুটে বেরিয়ে পড়েছে তোর মুখে-চোখে। তুই ঢাকবার চেষ্টা করেছিলি, কিন্তু পারিস নি। আমি তোর মন বুঝতে পেরেছি বলেই তোকে ব্রহ্মচর্য্য শেখাচ্ছি। তোর কাপড়-গহনা খুলে তোকে থান পরিয়েছি,—তোর দুবেলা নানা তরকারী দিয়ে খাওয়ার পরিবর্ত্তে একবেলা হবিষ্য বন্দোবস্ত করেছি। একাদশী করাবার জন্যে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়েছি ; যাতে তোর মন ভাল হয়—তার জন্যে—"

রুদ্ধ কণ্ঠে প্রতিভা বলিল, "কিছুতেই কিছু করতে পারলে না দিদি, কিছুতেই কিছু হল না। অবাধ্য মনটাকে বশে আনবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছি,—অবিরত যুদ্ধ করেছি,—ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছি। যদি দেখাবার হতো, তা হলে দেখাতুম দিদি, আমার বুকটা কি হয়ে গেছে। কি করব দিদি? কি করলে আমি চিত্তকে জয় করতে পারব আমায় বলে দাও, নইলে আমি বিষ খেয়ে মরব।"

সে ক্ষুদ্র বালিকার ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। সুষমা শান্ত ভাবে বলিলেন, "আত্মহত্যা মহাপাপ বোন, সে করো না, করো না।"

প্রতিভা মুখ তুলিল। শুভ্র চাঁদের আলো তাহার অশ্রুজলে ভাসমান মুখখানির উপরে মুক্ত ভাবেই আসিয়া পড়িল। সে বলিয়া উঠিল "ধর্ম্ম রক্ষার জন্যে যে আত্মহত্যা করা যায়, তাতে কোনও পাপই হতে পারে না, এ কথা তো তুমিই কতদিন বলেছ দিদি। আমি যে অন্যকে মনে-মনে চিন্তা করি, এটা বড় অধর্ম্ম। এ মহাপাতক হতে নিস্তারের জন্যে, আমার ধর্ম্ম রক্ষার জন্যে আত্মহত্যা করাই আমার উচিত নয় কি দিদি? সেকালে রাজপুত মেয়েরা যে ধর্ম্ম রক্ষার জন্যে আত্মহত্যা করতেন, তাতে তো কোনও পাপ হ'ত না দিদি। আমি যদি আমার ধর্ম্ম রক্ষার জন্যে আত্মহত্যা করি, তা হলে আমারও কোনও পাপ হবে না।"

সুষমা বলিলেন "সে কথা সত্যি। ধর্ম্ম রক্ষার্থে আত্ম-হত্যা করলে পাপ হয় না। রাজপুত মেয়েরা আত্মহত্যা করতেন, কিন্তু সে কোন্ সময়ে? কোনও দিক হতে যখন সাহায্য পেতেন না রক্ষা পাবার, তখনই তাঁরা মৃত্যুর সাহায্যে রক্ষা পেতেন। তোমার তো সে সময় এখনও আসে নি প্রতিভা। তোমার অন্তর শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে বটে, বাইরের দিক তো নিরাপদই আছে। তোমাকে সাহায্য করবার জন্যে তো আমি আছি। আমি তোমার বাইরের দিক রক্ষা করব, অন্তরও ক্রমে কঠিন করে তুলব। তোমায় তুমি একেবারেই আমার হাতে তুলে দাও, নিজের পানে তাকিয়ো না। আমি যখন যা বলব, তাই শুনে যেতে হবে ; যে পথে চলতে বলব, সেই পথে চলতে হবে। দেখ্, পারবি কি আমার কথা রাখতে?"

প্রতিভা বলিল "পারব দিদি, নিশ্চয়ই পারব। কিন্তু আগে কিছু দিনের জন্যে আমায় অন্যত্র পাঠিয়ে দাও।"

সুষমা বলিলেন "কোথায় যাবি? কোন্ এমন স্থান আছে, যেখানে তোকে পাঠিয়ে দিয়ে আমি শান্তি পেতে পারি?"

প্রতিভা বলিল, "আমার ভাসুর তো আছেন, তিনি কি নিতে পারবেন না আমাকে?"

স্থির দৃষ্টি তাহার মুখের উপর ন্যস্ত করিয়া সুষমা বলিলেন, "সত্যিই কি তুই পালাতে চাস এখান হতে প্রতিভা?"

সজল চোখ দুটি তুলিয়া প্রতিভা বলিল "সত্যিই আমি পালাতে চাই দিদি,—এখানে থাকা আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে।"

সুষমা একটু থামিয়া বলিলেন, "সেই বিধবা হওয়া থেকে শ্বশুরবাড়ীর সঙ্গে তোর আর কোনই সম্পর্ক নেই। তারাও তো তোর নামও করে না। এখন যদি আমরা নিজে সেধে তোকে সেখানে নিয়ে যাবার জন্যে পত্র লিখি, তাহ'লে নিশ্চয়ই তারা ভাববে, এখানে একটা কিছু বিসদৃশ কাণ্ড ঘটেছে, যার জন্যে তোকে আমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুই যে ভাল, তা কি তারা কেউ বিশ্বাস করবে? তারা কি তোকে নেবে প্রতিভা?"

প্রতিভা চুপ করিয়া রহিল। ভাবিয়া দেখিল সুষমা যাহা বলিতেছেন, তাহা অসম্ভব নহে।

সুষমা একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আমি এ বিষয়ে ওঁকে বলছি, উনি যা ভাল বিবেচনা করেন—"

"তোমার পায়ে পড়ি দিদি; যদি এ সব কথার একটাও দাদাবাবুকে বল তুমি, তা হ'লে আমি ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে মরব। একটী মিনিটও তুমি আমায় দেখতে পাবেনা।"

প্রতিভার সমস্ত দেহটা ঘামিয়া উঠিল।

সুষমা বলিলেন "পাগল হয়েছিস প্রতিভা! এ সব কথা তাঁকে আমি বলতে পারি কখনও? আমি এমন ভাবে বলব, যাতে তিনি কিছু বুঝতে না পারেন। আর সে তো আজকাল হবে না। ওবাড়ীতে গিয়ে একটু সুস্থ হলে আস্তে-আস্তে বলা যাবে। তোর যখন এত ভয়ই করে এখানে থাকতে, আমি জোর করে এখানে রাখব না তোকে। নে, হ'ল তো, যা এখন শুতে। তোকে দরজা দিতে দেখলে তবে আমি যাব।"

প্রতিভা উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "আমি এই যাচ্ছি, তুমিও যাও দিদি।"

সে গৃহমধ্যে গিয়া দরজা বন্ধ করিতে গিয়া দেখিল সুষমা তখনও সেই স্থানে দাঁড়াইয়া আছেন। সে দরজা না বন্ধ করিলে তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া নিজের গৃহে যাইতে পারিতেছেন না।

প্রতিভা দরজা বন্ধ করিল। সেই শব্দে গাঢ় নিদ্রিতা পিসীমার ঘুমটা একটু সজাগ হইয়া গেল। পাশ ফিরিয়া একটা হাই তুলিয়া আড়মোড়া দিয়া বলিলেন "কে ও?"

প্রতিভা নিজের বিছানায় শুইয়া পড়িয়া বলিল "আমি পিসীমা।"

"কে, রামের মা? খুব যা হোক আক্কেল তোর বাছা। সেই সকালে বাজার করতে গেছিস, ফিরলি কি না এই বেলা দশটার সময়ে। আস্কারা দিয়ে-দিয়ে বড় বউমা ঝি-চাকরদের মাথা একেবারে খেয়ে দিয়েছে। মরুক গে, হরি বল—হরি বল।"

তিনি আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন। প্রতিভা হাসিয়া নিজের বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। (ক্রমশঃ)

ভূপর্য্যটক মার্টিনেট

কবিশেখর শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ

নব মহাদেশ-বাসী, সাধু, পান্থবর!
ভ্রমিলে পৃথিবী সৌম্য সন্ন্যাসীর বেশে
পদব্রজে! কি সাধনা, ব্রত দৃঢ়তর!
হেন মহাশ্রম বল কিবা সে উদ্দেশে?
শার্দ্দূল গতিতে ভ্রমি পর্ব্বত-কান্তার,
নারিলে সাধিতে সেই লক্ষ্য সুমহান;
নিঃসঙ্গ প্রবাস-ভূমে ত্যজিলে সংসার,
বুঝি বা লভিয়া কোন পথের সন্ধান?
দরিদ্র বঙ্গের সেই আতিথ্য সরলে,
মোহিল মহান হিয়া—চিত্র করুণার—
সে দূর প্রাচীন চীনে পল্লীর অঞ্চলে,
ছিল কি হে স্মৃতি তার মানসে তোমার?
শেষ সাধ,—পণ্যশালা হউক নির্ম্মাণ,
মৃত্যু-স্পর্শে দেহ-রজে পূত যেই স্থান।

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীনরেন্দ্র দেব

১। আর্থার গ্রিফিথ্।

আয়ার্ল্যাণ্ডের অন্যতম নেতা আর্থার গ্রিফিথের শোচনীয় মৃত্যু আয়ার্ল্যাণ্ডের বুকে যতটা বেজেছে, তেমন ব্যথা আর কারও বাজ্‌বে না! আয়ার্ল্যাণ্ড স্বাধীনতার জন্য নিজের হাতে তার এই অসাধারণ শক্তিমান সন্তানকেও হত্যা ক'রতে বাধ্য হ'য়েছে। গ্রিফিথের অপরাধ, সে শান্তি ও শৃঙ্খলার পক্ষ নিয়ে ইংলণ্ডের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হ'য়েছিল। সন্ধি-সর্ত্ত অনুসারে আয়ার্ল্যাণ্ডকে ইংরেজ যেটুকু স্বাধীনতা দিয়েছিল, স্বদেশের মুক্তিকামী সিন্‌ফেনের দল তাতে সন্তুষ্ট হ'তে পারেনি। তারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চায়! আর্থার গ্রিফিথ্‌কে তার বিরুদ্ধে যেতে দেখে চরমপন্থীয় দল তাঁকে বধ ক'রে ফেল্‌লে। স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে এ কাজটাকে সমর্থন করা যেতে পারলেও কাজটা যে একেবারেই সুবিবেচনার হয়নি, এ কথা ব'লতেই হবে। কারণ গ্রিফিথ্ দেশের শত্রু বা স্বদেশদ্রোহী হওয়া দূরে থাক, তাঁর মত মাতৃভূমির ভক্ত সন্তান অন্য কোন দেশেও বিরল। সমস্ত জীবন ধরে তিনি আয়র্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতার জন্যেই পরিশ্রম ক'রেছেন। আয়ার্ল্যাণ্ডের অসংখ্য লোক তাঁকে দেবতার মত ভক্তি ক'রতো। তাঁর প্রগাঢ় স্বদেশ-প্রেমে লোকের এমন অগাধ বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর নেতৃত্বে আয়ার্ল্যাণ্ডের একদল লোকে তাদের স্বদেশ বাসীর বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ কর'তে ইতস্ততঃ করেনি! কিন্তু দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ গ্রিফিথের এই এক গুঁয়েমীই তাঁর অকাল-মৃত্যুর কারণ হ'লো। লোকে এই স্বদেশ-বৎসল মহাপুরুষের উদ্দেশ্য ঠিক বুঝ্‌তে পারলে না; রাজশক্তি ও পদমর্য্যাদার লোভেই গ্রিফিথ্ তাঁর স্বদেশবাসীর বুকে গুলি মারছেন মনে ক'রে তাঁকে তারা মেরে ফেল্‌লে; কিন্তু গ্রিফিথ্ প্রকৃত পক্ষে স্বদেশের স্থায়ী কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্যই যে অতবড় অপ্রীতিকর কার্য্যেও পশ্চাৎপদ হয় নি, এ কথাটা তারা একবার ভেবে দেখ্‌লে হয়ত' তাঁকে হত্যা ক'রতে পারতো না! কারণ যে জন্যে সিন্‌ফেনের দল গ্রিফিথ্‌কে বধ ক'রলে, ঠিক সেই একই উদ্দেশ্যে গ্রিফিথও তাদের রক্তপাত ক'রতে বাধ্য হ'য়েছিল।

আর্থার গ্রিফিথ্

(Review of Reviews)

মাইকেল কলিন্স্

২। মাইকেল কলিন্স্।

অধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী আয়াল্যাণ্ডের এই অসম সাহসিক পরিচালক মাইকেল কলিন্স্‌কে প্রবল প্রতাপশালী ইংরেজ বহু চেষ্টা ক'রেও ধ'রতে পারেন নি; তারপর সন্ধির সূত্রপাত হ'তে কলিন্স্ সিন্‌ফেন আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রতিনিধি স্বরূপ গ্রিফিথের সহকারী রূপে সন্ধি-সর্ত্ত অনুমোদন করেছিল; কিন্তু ডি, ভ্যালেরার নেতৃত্বে দেশের অপর একদল তাদের সন্ধি মঞ্জুর ক'রলে না। তখন গ্রিফিথের সঙ্গে যোগ দিয়ে কলিন্স্ সন্ধির সম্মান রাখবার জন্যে সন্ধি-বিরোধী দলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল। যে কলিন্স্ এতদিন সিন্‌ফেনের সর্দ্দার হ'য়ে নিষ্ঠুর ভাবে ইংরেজ-সৈন্য বিধ্বস্ত করছিল, সেই আবার আজ তার বন্দুক ফিরিয়ে ধরে অবুঝ সিন্‌ফেনের বিনাশ সাধনে বদ্ধ-পরিকর হয়েছিল, ফলে গ্রিফিথের হত্যা-ব্যাপারে আয়াল্যাণ্ডের আকস্মিক চমক ভাঙ্‌তে না ভাঙ্‌তে শোনা গেল মাইকেল কলিন্স্‌ও খুন হ'য়েছে! ঠিক যে উপায়ে কলিন্স্ নিজে অসংখ্য ইংরেজ সেনাধ্যক্ষকে বধ ক'রেছিল—সেই কলিন্সেরই শিক্ষিত তার স্বদেশবাসীর হাতে তাকেও ঠিক সেই ভাবেই প্রাণ দিতে হ'লো! দেশ যখন স্বাধীনতার জন্য ক্ষেপে ওঠে তখন এমনি করেই সে নিজের সন্তানকেও স্বহস্তে বধ করে পথের কণ্টক নির্ম্মূল করতে এতটুকু ইতস্ততঃ করে না। স্বদেশ-প্রেমিক মাইকেল কলিন্স্ মৃত্যুকালে বলেছিল "আমায় যারা হত্যা করলে তাদের তোমরা ক্ষমা কোরো!

(Review of Reviews)

৩। লর্ড নর্থক্লিফ্।

১৮৬৫ সালে ১৫ই জুলাই তারিখে ডাব্‌লিনের নিকটবর্ত্তী চ্যাপলাইজোদ গ্রামে আলফ্রেড্ হার্ম্মস্‌ওয়ার্থের জন্ম হয়। আপন প্রতিভাবলে আলফ্রেড্ হার্ম্মস্‌ওয়ার্থ পরে লর্ড উপাধিতে ভূষিত হ'য়ে ভাইকাউন্ট্ নর্থ-ক্লিফ্ নামে পরিচিত হ'য়েছিলেন। আয়ার্ল্যাণ্ড তাঁর জন্মভূমি এবং তাঁর মা আইরীশ নারী ছিলেন ব'লে মাতৃভক্ত নর্থ-ক্লিফ্ বরাবর আয়ার্ল্যাণ্ডের ন্যায্য দাবী সমর্থন করে এসেছেন। তিনি যে কেবল 'ডেলি মেল' 'টাইমস্' প্রভৃতি একাধিক বিশ্ববিশ্রুত সংবাদপত্রের পরিচালক ও মালিক ছিলেন তা নয়; ইংলণ্ডে মোটর গাড়ী, বিমানতরী তিনিই সর্ব্বপ্রথম প্রচলিত করেন, এবং এই দুই নূতন-সৃষ্ট শক্তির সর্ব্বপ্রকার উন্নতি ও পরিণতির জন্যে তিনি প্রচুর অর্থব্যয় ও অসাধারণ পরিশ্রমও ক'রেছিলেন। সংবাদপত্র-পরিচালন-কার্য্যে তিনি একেবারে অদ্বিতীয় ছিলেন। কেউ কেউ বলেন যে, বিগত জার্ম্মান যুদ্ধে লর্ড নর্থ-ক্লিফ্‌ই তাঁর খবরের কাগজের জোরে ইংরেজকে জিতিয়ে দিয়েছেন। কথাটা একেবারে যে মিথ্যা, তা নয়; তাঁর কাগজ ও কলমের জোরে বিগত মহাযুদ্ধে ইংরেজের অনেক সুবিধাই হয়েছিল। আমরা ন্যায় যুদ্ধের পক্ষ নিয়েছি বলে দেশ-বিদেশের নানা সংবাদপত্রে প্রচার করা এবং জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে তাদের উত্তেজিত করে তোলার ভার নর্থ-ক্লিফ্ স্বয়ং গ্রহণ করেছিলেন এবং কাজটিও বেশ দক্ষতার সঙ্গে সুসম্পন্ন ক'রেছিলেন।

ছোট ছেলেদের পড়বার মত খবরের কাগজ তিনিই

লর্ড নর্থ-ক্লিফ.

র্ব্বপ্রথম প্রচার করেন এবং স্ত্রীলোকদের মধ্যেও যাতে সংবাদ-পত্র পাঠ করাটা খুব বেশী প্রচলিত হয়, সে বিষয়েও তিনি বিশেষ যত্নবান ছিলেন।

লর্ড নর্থ-ক্লিফের বয়স যখন মাত্র সতেরো বৎসর, তখনই তিনি সমস্ত য়ুরোপ পর্য্যটন করে এসেছিলেন। ১৮৮৮ সালে, অর্থাৎ যখন তাঁর বয়স সবে তেইশ বৎসর, তখন তিনি বিবাহ করেন। তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা অনেক এবং ব্যবসায়-বুদ্ধিও অসাধারণ ছিল। সংবাদপত্র-পরিচালনের তিনি নানা নূতন উপায় ও কৌশল উদ্ভাবন ক'রেছিলেন। বিজ্ঞাপন প্রচারে তাঁর আশ্চর্য্য দক্ষতা ছিল। এই যে আজকাল খবরের কাগজ ফেরিওয়ালাদের হাতে বড় বড় হরফে ছাপা প্রতিদিনের প্রধান প্রধান সংবাদের একটা তালিকা দেখা যায়, লর্ড নর্থ-ক্লিফই উহা সর্ব্বপ্রথম প্রচলিত করেন।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ ক'রে গেছলেন বটে, কিন্তু ভারতবাসীর তিনি কোনদিনই মিত্র ছিলেন না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতবাসীর উচ্চ আকাঙ্ক্ষার তিনি চিরদিন ঘোরতর শত্রু ছিলেন। লর্ড নর্থ-ক্লিফের মুঠোর মধ্যে এতগুলো বড় বড় সংবাদপত্র ছিল যে, তিনি ইচ্ছা করলে কেবল মাত্র তাঁর কলমের খোঁচায় যে কোনও লোকের ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটাতে পারতেন। এই জন্য ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে সকলেই তাঁকে ভয় করে চলতো।

অর্জ্জুন যেমন দ্বারকায় গিয়ে পাণ্ডব পক্ষের হ'য়ে শ্রীকৃষ্ণকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নামিয়েছিলেন, লর্ড নর্থ-ক্লিফও অনেকটা তেমনিভাবে আমেরিকায় গিয়ে মিত্র-শক্তির পক্ষ নিয়ে আমেরিকাকে যুদ্ধে নাম্‌বার জন্য উত্তেজিত করে এসেছিলেন। খবরের কাগজের শক্তি বা প্রভাবে যে কত অসাধ্য-সাধন করা যায় তা লর্ড নর্থ-ক্লিফ একাধিকবার সপ্রমাণ করে দিয়ে সংবাদপত্রের মর্য্যাদা বাড়িয়ে দিয়ে গেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স মাত্র সাতান্ন বৎসর হ'য়েছিল। (Literary Digest)

৪। দীপক-অঙ্গ

রাত্রেও অনেক সময় ছুতর মিস্ত্রীদের কাজ ক'রতে হয়। তাদের আবার এমন সব কাজ আসে যে, একটা আলো সেখানে না তুলে ধরলে সে কাজ হবার উপায় নেই। যেমন ধরুন দরজার গায়ে স্ক্রুপের জন্য ছিদ্র করা। ঠিক জায়গাটি মেপে নিয়ে দাগ দিয়ে তার পর সেই চিহ্নিত স্থানে ছিদ্র করতে হবে: সুতরাং সে ক্ষেত্রে
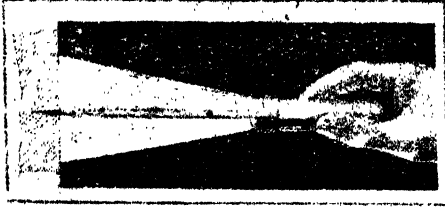
দীপক যন্ত্র

একটা বাতি একেবারে না হ'লেই নয়। কিন্তু সেই বাতি ধরে থাক্‌বার জন্যে অনর্থক আর একটা লোককে কাজ কাম'ই দিয়ে তাকে সাহায্য ক'রতে হয় ব'লে আজকাল একরকম দীপসংযুক্ত যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে। ব্রিজ্‌ বা তুরপুণের বাঁটের সঙ্গে ব্যাটারীর ইলেক্‌ট্রিক আলো আঁটা থাকে। কাজ করবার সময় বাঁটের গায়ের বোতাম টিপে ধরলেই তা' থেকে আলোক-রশ্মি নির্গত হ'য়ে মিস্ত্রীর অভিপ্রেত স্থানটি আলোকিত করে দেয়।

দীপক রিভলভার

ঠিক এই উপায়েই আজকাল আমেরিকায় 'দীপক-রিভল্‌ভার' নাম দিয়ে এক রকম রিভল্‌ভার তৈরি হয়েছে। রাত্রে অন্ধকারে আততায়ীকে দেখে এবং তার দেহের বিশেষ কোনও অংশ লক্ষ্য ক'রে গুলি করবার পক্ষে এই অস্ত্র একেবারে বন্ধুর মত উপকার করে! এস্থলেও ঐ রিভলভারের বাঁটের সঙ্গে ব্যাটারীর ইলেক্‌ট্রিক 'টর্চ্চলাইট' সংযুক্ত করা আছে। ঘোড়া টেপবার সময় বুড়ো আঙ্গুলটি যেখানে গিয়ে পড়ে, ঠিক সেই জায়গায় বাতির বোতামটি লাগানো থাকে সুতরাং আলো জ্বালার সঙ্গে-সঙ্গেই রিভলভারও ছোঁড়া চলে।

৫ সাইকেলে ছুরি কাঁচি শান!

এক ভদ্রলোক ছুরি কাঁচি শান দিয়ে জীবিকা অর্জ্জন করেন। ছুরি কাঁচি শান দেবার যন্ত্রটা ঘাড়ে করে সহরের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে বড়ই তাঁর কষ্ট হতো ব'লে তিনি শেষে অনেক বুদ্ধি করে একখানি বাইসাইকেল কিনে তার সঙ্গে সেই ছুরি কাঁচি শান দেবার যন্ত্রটি এমন ভাবে এঁটে নিলেন যে, যন্ত্রটিকে ঘাড়ে ক'রে এখন আর পদব্রজে তাঁকে সহরের পথে পথে ঘুরে কষ্ট পেতে হয় না। সাইকেল চড়েই সর্ব্বত্র যাতায়াত করেন এবং যখন ইচ্ছা সাইকেলের

সাইকেলে শান

প্যাডেলের সঙ্গে একটি চেন সংযুক্ত করে দিয়ে তিনি তাঁর ছুরি-শানের যন্ত্রটিও চালাতে পারেন। আমাদের দেশের ছুরি-কাঁচি-শানওয়ালারা এঁর পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রলে তাদের পরিশ্রম অনেকটা লাঘব হয়। আর যখন এ কাজের এতটাই সুবিধা হয়ে গেল, তখন আমার বোধ হয় ভদ্রবংশের অল্প-শিক্ষিত ছেলেরাও এই ব্যবসাটা অবলম্বন করে জীবিকা উপার্জ্জন করতে পারেন। এতে যে কেরাণীগিরির চেয়ে ঢের বেশী রোজগার হবে, তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই।

(Popular Science)

রাস্তা ঝাঁটের গাড়ী

৬। রাস্তা ঝাঁট দেওয়া।

প্যারিসের মিউনিসিপ্যালিটির ধাঙড়দের আর পায়ে হেঁটে রাস্তা ঝাঁট দিতে হয় না। ট্রাইসিকেলের পেছনে রাস্তা ঝাঁট দেবার উপযুক্ত বড় বুরুশ এঁটে নিয়ে প্যারিসের ধাঙড়েরা সেই ট্রাইসিকেলে চড়ে অতি সত্বর সহরের সমস্ত পথ পরিষ্কার করে ফেলে।

৭। ঝড়ের পাইপ।

ঝড়বৃষ্টির দিনে চুরুটের পাইপ ধরাতে ভারি বেগ পেতে হয়; বিশেষ জাহাজের ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে ও কাজ করাটা তো একরকম অসাধ্য-সাধন ব্যাপার! পাইপে তামাক খাওয়া যাদের অভ্যাস, তাদের অসুবিধা দূর করার জন্যেই পাইপের একরকম ঢাক্‌না বেরিয়েছে। এই ঢাক্‌নার গায়ে একটি দেশলাইয়ের কাঠি যেতে পারে এমন একটা ছিদ্র আছে। সেই ছিদ্রের মধ্যে দেশালাইয়ের কাঠি প্রবেশ করিয়ে দিয়ে ঢাক্‌নির ভিতর দিকে কাঠি ঘসে জ্বালবার জন্য যে স্থানটুক নির্দ্দিষ্ট করা আছে, সেইখানে আঁচড় মারলেই ঝড়ের হাওয়াকেও বিদ্রূপ করে ভিতরে দেশালাই জ্বলে ওঠে। দেশালায়ের কাঠিটি বার ক'রে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢাক্‌নার গায়ের ছিদ্রটি আপনিই বন্ধ হয়ে যায়। (Popular Science)

ঝড়ের পাইপ
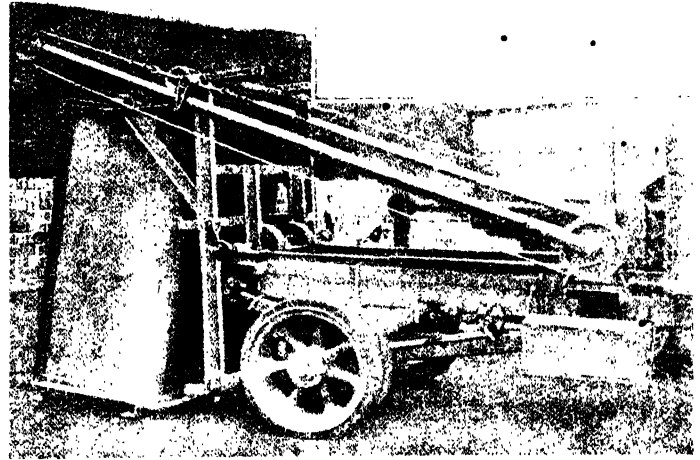
ইঁটের গাড়ী

৮। ইঁটের গাড়ী।

বাড়ী গাঁথবার সময় এদেশে গরুর গাড়ীতে ক'রে ইঁট আনাতে হয়। প্রত্যেক গাড়ীতে দেড়শ' দুশোর বেশী ইঁট আসে না; আর গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানরা যেরকম বেপরোয়া-ভাবে গাড়ী থেকে ইঁটগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যায়, তাতে প্রায় অর্দ্ধেক ইঁটই ভেঙে যায়। তারপর মজুরদের রোজ দিয়ে সেই ইঁট আবার থাক দিয়ে সাজিয়ে রাখাতে হয়। কিন্তু আমেরিকায় আজকাল ইঁট বহন করবার জন্যে এক-রকম মটর-লরী প্রচলিত হয়েছে; তাতে প্রত্যেক গাড়ীতে একেবারে আড়াই হাজার ইঁট এক সঙ্গে এসে পৌঁছয় এবং গাড়ীর খোলটি এমন কৌশলে উল্টে গিয়ে ইঁটগুলি নামিয়ে দেয় যে, একখানি ইঁট তো ভাঙা দূরে থাক, সঙ্গে সঙ্গে সেইখানেই আড়াই হাজার ইঁটের একটি পরিপাটি থাক সাজিয়ে রেখে যায়। (Popular Science)

৯। অদৃশ্য সিঁড়ি।

দ্বিতলে বা ছাদে ওঠবার সিঁড়ি অনেকটা স্থান অধিকার করে রাখে বলে অধিকাংশ ছোট বাড়ীতে ছাদে ওঠবার সিঁড়ি তৈরি করতে পারা যায় না। একজন মেমসাহেব তাঁর
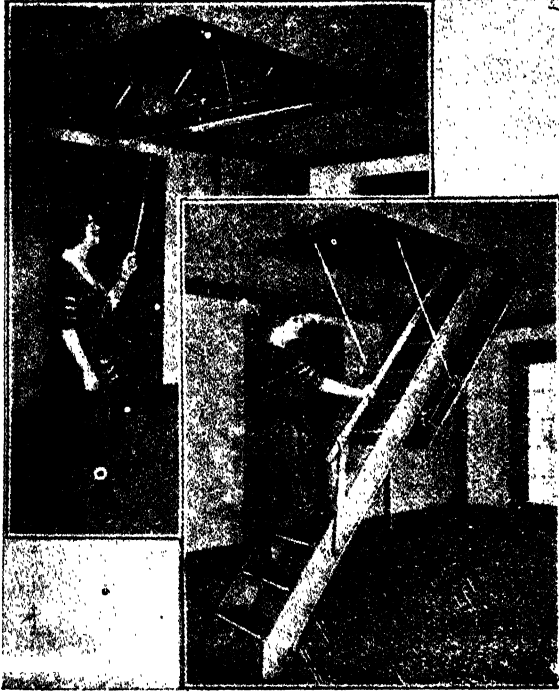
অদৃশ্য সিঁড়ি

ছোট্ট বাংলো-বাড়ীর ছাদটা ব্যবহার করবার জন্যে বুদ্ধি করে একটি অদৃশ্য সিঁড়ি তৈরি করিয়েছেন। তাঁর বাংলো-বাড়ীর একখানি ঘরের কড়িকাঠ থেকে একটা শিকল ঝুলছে; সেই শিকলটা ধরে টানলেই কড়িকাঠের ভিতর দিকের একটা স্প্রীংয়ের দরজা খুলে আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছাদে ওঠবার একটি চমৎকার কাঠের সিঁড়ি সেখান দিয়ে নেমে আসে। সিঁড়ির মাথার দিকটা ছাদের ওধারে এমন ভাবে সংলগ্ন থাকে যে, সমস্ত সিঁড়িটি কোনও দিনই খুলে ঘরের মেঝেয় সড়কে এসে পড়বার উপায় নেই। ছাদে যাওয়া-আসার কাজ শেষ হলেই সিঁড়িটি আবার ছাদের সেই গড়ানে দরজার উপর দিয়ে ঠেলে দিতে হয়। খানিকটা ঠেলে দিলেই সিঁড়ির ওদিকের ভার বেশী হবামাত্র স্প্রীংয়ের দরজাটি সিঁড়িটিকে তুলে নিয়ে আপনিই বন্ধ হয়ে যায়। এই অদৃশ্য সিঁড়ির সাহায্যে তিনি বাংলোর ছাদটি ব্যবহার ক'রতে পারছেন; অথচ সেজন্য তাঁর ঘরের মধ্যে কোনও স্থান জোড়া থাকার অসুবিধা ভোগ করতে হয় না।

(Popular Science)

১০। দুজনের-মোটর দ্বিচক্রযান।

এই মোটর-দ্বিচক্রযানে পাশাপাশি দুজনের বসবার আসন আছে। দুই বন্ধু এই একখানি গাড়ীতেই যেখানে
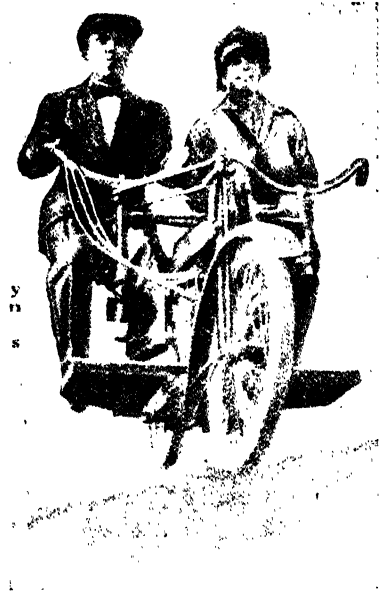
মোটর-দ্বিচক্র-যান। (যুগলের)

ইচ্ছা যেতে পারবেন এবং গাড়ীখানি চালাবার জন্যে দুজনকেই সমানভাবে পরিশ্রম করতে হবে। পাছে গাড়ী-সংলগ্ন মোটর সাইকেলে একজনকে নিতান্ত নিশ্চেষ্টভাবে বসে থাকতে হয় বলে এই নূতন ধরণের মোটর সাইকেল উদ্ভাবিত হয়েছে। (Popular Science)

১১। বাতায়ন প্রদর্শনী।

অনেক বড় বড় ইংরাজী দোকানে জানালার ধারে বিক্রেয় দ্রব্যাদির এক একটি ছোট-খাট প্রদর্শনী থাকে। বোষ্টন সহরের একজন দোকানদার তাঁর এই বাতায়ন-প্রদর্শনীটি এমন কায়দা ক'রে সাজিয়েছিলেন যে, প্রত্যেক পথিককে একবার সেখানে দাঁড়িয়ে দেখে যেতেই হ'তো। তিনি ক'রেছিলেন কি, তাঁর দোকানের প্রকাণ্ড জানালার পেছনদিকে একখানি পৃথিবীর বিরাট মানচিত্র ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাঁর দোকানে যে যে জিনিস বিক্রয়ের

বাতায়ন-সজ্জা
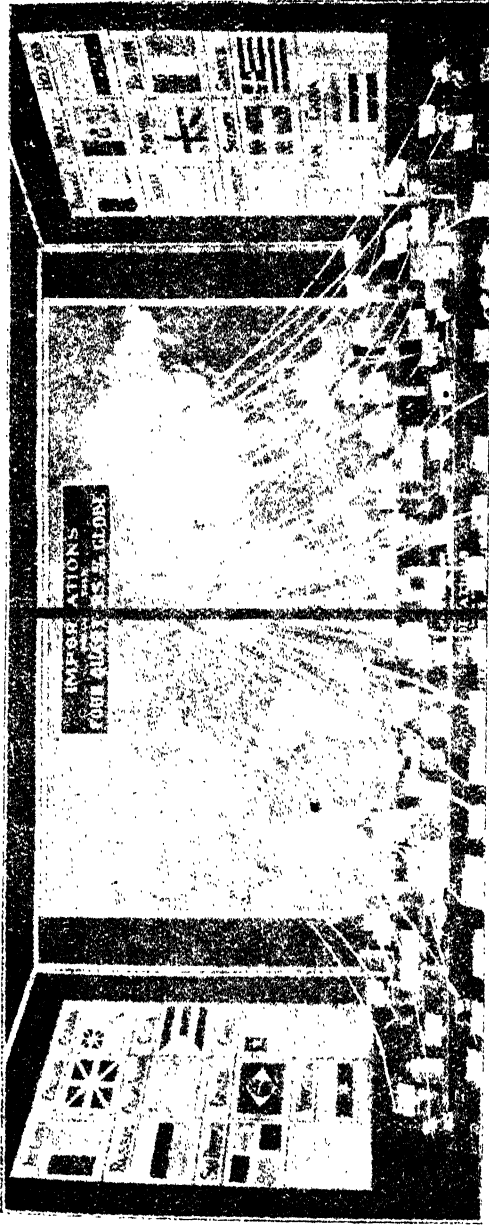
জন্য থাক্‌ত, সেগুলি যে দেশের তৈরী, মানচিত্রে প্রদর্শিত সেই দেশের সঙ্গে একটি ফিতে সংলগ্ন করে তদ্দেশজাত দ্রব্যের এক-একটি নমুনার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং জানালার দু'পাশে জগতের সমস্ত জাতির রণপতাকা এঁটে রেখেছিলেন। লোকে তাঁর দোকানের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তো, সেখানে ব্রেজিল থেকে কফি আনিয়ে রাখা হয়েছে; চায়না, জাপান, ভারতবর্ষ ও সিংহলদ্বীপ থেকে চা আনিয়ে রাখা হ'য়েছে; যবদ্বীপ থেকে চিনি আনিয়ে রাখা হ'য়েছে; কানাডা থেকে চুরুট আনিয়ে রাখা হয়েছে; স্পেন থেকে রন্ধনের মশলা আনিয়ে রাখা হয়েছে; সান্‌ডমিঙ্গো থেকে নেবু ও নেবুর চাট্‌নী আনিয়ে রাখা হয়েছে! এই ভাবে পৃথিবীর যেখানে যে ভালো জিনিসটি পাওয়া যায়, সে সমস্তই তাঁর দোকানে সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। এই বিজ্ঞাপনটাই জানালার ধারের অসংখ্য দর্শককে তাঁর দোকানের ক্রেতা ক'রে টেনে নিয়ে আসতো।

(Popular Science)

১২। নকল মাংসপেশী।

যুদ্ধে আহত সৈনিকদের জন্যে নকল হাত পা তৈরি হয়েছিল বটে, কিন্তু সে সকল তাদের অঙ্গহানির কদর্য্যতাটাই দূর ক'রতে পেরেছিল মাত্র, তাদের অভাবটা সম্পূর্ণ মেটাতে পারে নি। ডাক্তার বিদো এবার নকল মাংসপেশীর সৃষ্টি করে তাদের সে অভাব পূরণ ক'রেছেন। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়;—মাংসপেশীর পরিবর্ত্তে তিনি কৃত্রিম হস্ত-পদাদির মধ্যে স্প্রীং সংযুক্ত করে দিয়েছেন এবং সেটা তিনি এমন কৌশলে করেছেন যে, শরীরের ঈষৎ চাপে সেই স্প্রীং ঠিক মাংসপেশীর মতই কাজ ক'রবে।
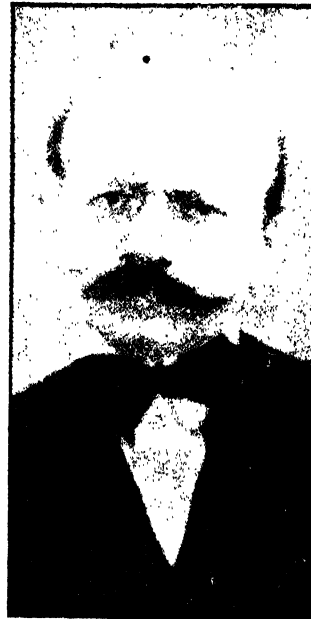
ডাঃ বিদো

যাঁরা পক্ষাঘাত-রোগগ্রস্ত, তাঁদের হস্তপদাদি থাকা সত্বেও তাঁরা ইচ্ছামত তার ব্যবহার করতে পারেন না। ডাক্তার গ্রেবিয়েল বিদোর উদ্ভাবিত এই স্প্রীংয়ের মাংসপেশী তাঁদেরও যথেষ্ট

সাহায্য করছে। দু'টি পা-ই একেবারে অবশ হ'য়ে গেছে যার, সে লোকও আজ ডাঃ বিদোর অনুগ্রহে পথে হেঁটে বেড়াতে পারছে। পক্ষাঘাতে পঙ্গু কারিকর আজ আবার তার অসাড় হাতে যন্ত্র-পাতি ধরে উপার্জ্জন করে খাচ্ছে। অঙ্গহীন ও অবশাঙ্গ উভয়েই আজ পরনির্ভরতার দুর্ব্বিসহ লজ্জা থেকে মুক্তি পেয়ে গেল!
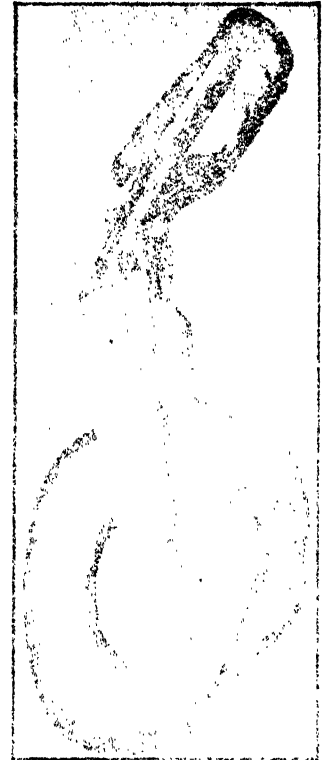
পক্ষাঘাতগ্রস্ত। (ইঁহার দক্ষিণ অঙ্গ পক্ষাঘাতে অকর্ম্মণ্য হ'য়ে যাওয়ায় ইনি অসহায় হ'য়ে প'ড়েছিলেন; সম্প্রতি ইনি নকল মাংসপেশীর সাহায্যে চলা-ফেরা ক'রে বেড়াচ্ছেন এবং ডান হাতের কাজও বেশ চল্‌ছে।)

কারুকর। (এই কারুকর মিস্ত্রীর একখানি হাত নষ্ট হ'য়ে যাওয়ায় সে নিরুপায় হয়ে পড়েছিল। নকল মাংসপেশীর কল্যাণে সে আবার কার্য্যক্ষম হয়ে উঠেছে।)

নকল মাংসপেশী। (বামহস্তের)
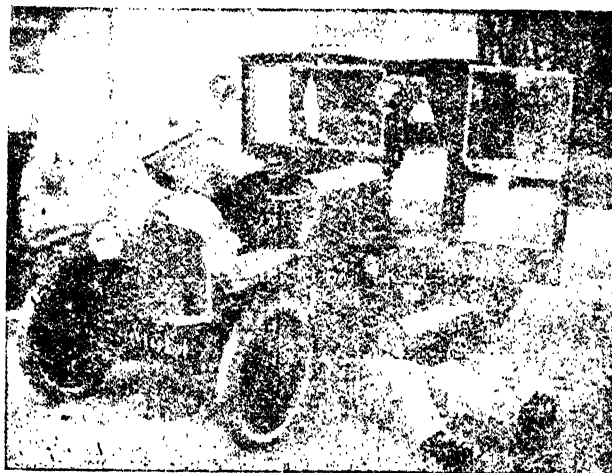
চরণ-হীন। (এই মোটর-রক্ষকের প দুটি কাটা পড়েছিল: কিন্তু নকল মাংসপেশীর গুণে সে এখন হামাগুড়ি দিয়ে গাড়ীর তলায় পর্য্যন্ত ঢুকতে পারছে)

বেদ ও বিজ্ঞান

অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্‌-এ

ে ঋকের আলোচনা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে করিয়াছি তার পরের ঋকে আছে—"মেঘসমূহের ন্যায় দেবতারা সমস্ত ভুবন আচ্ছাদন করিলেন।" এ কথাটারই বা মানে কি? ভেড়ার পালের মত দেবতারা সমস্ত ভুবনে ছড়াইয়া পড়িতেছেন,—এ কথাটা শুনিলে আমার ত ঐ বালখিল্য তৈজসবিগ্রহ বা Corpusclesদের কথাই মনে উদিত হয়। অবশ্য বিজ্ঞান এখন পর্য্যন্ত এই বামনাবতারগুলিতে চৈতন্য-শক্তির প্রতিষ্ঠা করে নাই; অর্থাৎ বিজ্ঞান এখনও লিতে সাহস করে নাই যে, করপাস্‌লগুলা চিচ্ছক্তির ারাই উৎপাদিত এবং চিচ্ছক্তির দ্বারাই সঞ্জীবিত। চতন্যের কথায় বিজ্ঞান এখনও বড়ই ফাঁপরে পড়িয়া াকে। ঋষিরা কিন্তু দেখিতেন ও ভাবিতেন অন্যরূপ। তন্যই এই বিশ্বের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে। যেখানে ড়, সেইখানেই তাহাতে অভিমানী চৈতন্য—এমন কথা শিচম দেশের স্পিনোজা প্রভৃতি দার্শনিকেরা বলিয়া ালেও, বিজ্ঞান এখন পর্য্যন্ত সে কথায় সায় দিতে প্রস্তুত হয় নাই। কাজেই, বেদের কথা বিজ্ঞানের ভাষায় তরজমা করিতে যাইয়া, আমরা যেন প্রয়োজন মত সূত্রগুচ্ছ হাতের মধ্যে পাই। বেদ বলিতেছেন—দেবতারা মেঘ-সমূহের মত সমস্ত ভুবন আচ্ছন্ন করিলেন; আর বিজ্ঞান বলিতেছেন—Strain forms are flitting through the sea of aether—ঈথার-সাগরে হ্রস্বকায় মূর্ত্তিবিশেষ-গুলি ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে, করপাস্‌লগুলি সাঁতার কাটিয়া বেড়াইতেছে। বিজ্ঞান বেদের কথাই রকমারি করিয়া বলিতেছেন। বিজ্ঞানের পুরোহিত মহাশয়েরা এখন পর্য্যন্ত তাঁহাদের বিগ্রহগুলির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন নাই; তাই তাঁহাদের বিগ্রহ এখনও দেববিগ্রহ বা দেবতা নহে। বেদের কথায় ও বিজ্ঞানের কথায় তফাৎ ঐখানে। বেদের ও বিজ্ঞানের কথা বলিবার ভঙ্গী অনেক সময় আলাহিদা; কিন্তু ভঙ্গী আলাদা হইলেও, বক্তব্য বিষয়ে অনেক সময়ই অনেকাংশে মিল আছে। বেদ রূপকে দেবতাদের বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়া বুঝাইলেন; বিজ্ঞানও

যখন ইলেকট্রনদের প্রবাহ (stream) বা অভিযান বলেন, তখন, 'ভেড়ার পালের' উপমা না হউক, সেনাবাহিনীর উপমা প্রায়ই দিয়া থাকেন। বেদ streams of radiation প্রভৃতি ব্যাপার বলিতে অনেক সময়ই ঘোড়া, গরু, ভেড়া, হরিণ প্রভৃতি জানোয়ারদিগকে উপমায় জুড়িয়া দিয়াছেন। ইহারা ইন্দ্র, আদিত্য, অগ্নি, মরুৎগণ প্রভৃতি দেবতাদের রথ বেশ স্বচ্ছন্দে টানিতেছে। ঘোড়া প্রভৃতি দ্বারা রথ টানান ব্যাপারটা যে ঋষিদের কাছে রূপক ছিল, এ সকল রূপকের ভিতর দিয়া তাঁহারা যে অন্তঃ-প্রকৃতির ও বহিঃ-প্রকৃতির অনেক রহস্যের পরিচয় আমাদের দিতে চাহিতেন, যে পক্ষে সন্দেহ করা চলে না। এই আদিত্যের 'হরিৎ' নামক অশ্বগুলীর কতই না বাখানি হইল,—শুনিয়া মনে হইতেছিল, ঋষিরা বুঝি সত্য-সত্যই সূর্য্যকে রথে বসাইয়া ঘোড়দৌড় করাইতেছেন। কিন্তু মাঝখানে ১।১৫২।৫ ঋকে এ আবার কি শুনিতেছি?—"আদিত্যের অশ্ব নাই, প্রগ্রহ নাই, তথাপি তিনি শীঘ্র গমন করিতেছেন," ইত্যাদি। রথের কথা, অশ্বের কথা তবে সবই রূপ-কথা! এ সব কথার মধ্যে তবে রহস্য লুকাইয়া আছে! আবার বেদের অনেক উপাখ্যানের মূলে যে প্রাকৃতিক বা আধ্যাত্মিক রহস্য নিহিত আছে, এ কথা খুবই মনে করা চলিতে পারে। ১।৬।৫ বলিতেছেন, "হে ইন্দ্র! দৃঢ়স্থানের ভেদকারী ও বহনশীল মরুৎদিগের সহিত তুমি গুহায় লুক্কায়িত গাভী সমুদায় অন্বেষণ করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলে।" বেদে উপাখ্যান আছে (নানা যায়গায়, ১০।১০৮ সূক্তে বিশেষতঃ) যে পণি নামক অসুরেরা দেবলোক হইতে গাভীগণ চুরি করিয়া আনিয়া অন্ধকার গুহায় রাখিয়াছিল, ইন্দ্র মরুৎদিগের সহিত তাহাদের উদ্ধার করিয়াছিলেন। গাভীদের সন্ধান বাহির করিবার জন্য ইন্দ্র সরমাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গল্পটা মোটামুটি এইরূপ। Max Muller প্রভৃতি গল্পের যে প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন, সেটা একেবারে ফেলিয়া দিবার নহে। তিনি বলিতেছেন—"The bright cows, the rays of the Sun or the rain clouds, for both go by the same name, have been stolen by the powers of darkness, by the Night and her manifold progeny. Gods and men are anxious for their return; but where are they to be found? They are hidden in a dark and strong stable or scattered along the ends of the sky, and the robbers will not restore them. At last in the farthest distance the first signs of the Dawn appear; she peers about, and runs with lightning quickness, it may be like a hound after a scent, across the darkness of the sky. She is looking for something and following the right path. She has found it; she has heard the lowing of the cows." তাহা হইলে দাঁড়াইল যে, পণি প্রকৃত প্রস্তাবে রাত্রির অন্ধকার; দেবগণের গাভীগণ প্রকৃত প্রস্তাবে সূর্য্যরশ্মিসমূহ; রাত্রির অন্ধকার সূর্য্যরশ্মিসমূহ হরণ করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছে; সরমা ঊষা; তিনি দেখা দিয়া অপহৃত সূর্য্যরশ্মিসমূহের সন্ধানে বাহির হইয়াছেন। ইন্দ্র আলোক বা প্রকাশের দেবতা। ম্যাক্সমূলার আরও বলিতে চাহিতেছেন যে, গ্রীক মহাকবি হোমর যে ট্রয়ের যুদ্ধ লিখিয়া গিয়াছেন, সে গল্পের মূলেও এই বৈদিক উপাখ্যান এবং এই প্রাকৃতিক রহস্য। "The siege of Troy is but a repetition of the daily siege of the east by the solar powers that every evening are robbed of their [brightest treasures in the west. That siege in its original form is the constant theme of the hymns of the Veda." সরমা না কি গ্রীস দেশে যাইয়া Helena হইয়াছেন; পাণিস্ নাকি Paris হইয়াছেন; ইত্যাদি। ম্যাক্সমূলারের এই অনুমান হয় ত ঠিকই হইয়াছে; আমরা আপাততঃ আর সে বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। ১০।৯৫ সূক্তে উর্ব্বশী ও পুরুরবার কথা আছে; হয় ত সেখানেও উর্ব্বশী ঊষা এবং পুরুরবা সূর্য্য মাত্র; ঊষা ও সূর্য্যের পরস্পরের প্রণয়ের কথা ঋগ্বেদের অনেক যায়গাতেই শুনিতে পাই। ইন্দ্র বজ্র দ্বারা বৃত্রের নিধন করিয়াছিলেন—এ কথাও ঋগ্বেদে বহু স্থানে রহিয়াছে; ইহাও সম্ভবতঃ একটা প্রাকৃতিক রহস্যেরই রূপকচ্ছলে বর্ণনা। এ সমস্ত উপাখ্যানের প্রকৃত

মর্ম্ম বা অভিপ্রায় কি, তাহা আমরা আপাততঃ আলোচনা করিব না; তবে যে কথাটি বলিতে চাহিতেছি, তাহা এই :—বেদ অনেক যায়গাতেই রূপকের মধ্য দিয়া অথবা গল্প বলিয়া আমাদিগকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের রহস্যগুলি শুনাইয়াছেন। গল্প না গল্প বলিয়া সে সব উড়াইয়া দিলে চলিবে না। গল্পের তাৎপর্য্য বুঝিয়া লইবার সূত্রও অনেক স্থলে বেদের মধ্যেই দেওয়া আছে। সতর্ক হইয়া সেই সূত্রগুলি বাছিয়া লইতে হইবে। সেই জন্য বলিতেছিলাম যে, বেদ ও বিজ্ঞানের মধ্যে কথা কহিবার ভঙ্গীর তফাৎ আছে; ভঙ্গী আলাদা হইলেও মূল কথাটী একই হইতে পারে। এই ত গেল বৈদিক রূপক, উপাখ্যান প্রভৃতির ব্যাপার। যেখানে রূপক বা গল্প নয়—যেমন সোমরসের কথা, যজ্ঞের কথা—সেখানেও মন্ত্রের মর্ম্ম ঠিক বুঝিতে হইলে আমাদের একটা দরকারি কথা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে। ঋষিরা সত্য-সত্যই যজ্ঞাদি করিতেন এবং সোমরসও পান করিতেন, সন্দেহ নাই; যজ্ঞের ও সোমরসের গুণকীর্ত্তন তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু যজ্ঞ, সোমরস ইত্যাদিকে 'প্রতীক' (Symbol ভাবে লইয়া তাঁহারা যে অনেক প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক রহস্য বুঝিয়া গিয়াছেন এবং বুঝাইয়া গিয়াছেন, এ কথা ভুলিলে বেদ পড়া পণ্ডশ্রম হইবে। একটা স্থূল, পরিচিত জিনিসকে ধরিয়া তাহারই সাহায্যে একটা সূক্ষ্ম, অপ্রতীয়মান জিনিসকে বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা আমাদের ঋষিদের ও শাস্ত্রকারদের খুবই ছিল বলিয়া আমার মনে হয়। স্থূল ভাবে গোড়াতে বুঝিবার চেষ্টা কর, তাহাতে দোষ। মনে কর, সোম লতা-বিশেষের [illegible]—নিষ্পীড়ন করিয়া সেই রস বাহির করা হইতেছে—[illegible]ই রসের দ্বারা যজ্ঞে অভিষেক হইতেছে; ইত্যাদি। কিন্তু ইহা মনে করিয়াই বসিয়া থাকিলে চলিবে না; [illegible]দমন্ত্রের তাৎপর্য্য ঐখানেই পর্য্যবসিত হয় নাই। [illegible]রও তলাইয়া বুঝিতে হইবে। তলাইয়া বুঝিবার সঙ্কেত [illegible]দের মধ্যেই দেওয়া আছে। তলাইয়া বুঝাটাই উদ্দেশ্য, [illegible]ব গোড়ায় উপরের খোসাতেই আরম্ভ করিতে হয়। [illegible]ম যে একটা ব্যাপনশীল তেজোময় ও তেজস্কর পদার্থের [illegible]তীক (Symbol), তাহা আমরা গতবারে দু একটা ঋক্ [illegible]ার করিয়া দেখাইয়া রাখিয়াছি। ফল কথা, ইহাকে শুধু লতার রস ভাবিলে, ঋষিদের অভিপ্রায় বোঝা গেল না। যেখানেই সোমের কথা, সেইখানেই 'দীপ্যমান' 'উজ্জ্বল' 'দীপ্ত' এই রকম একটা না একটা তেজোবাচক বিশেষণ প্রায়ই রহিয়াছে। তার পর সেদিন ১।৯১ সূক্তের ৪, ২২ ঋক্ উদ্ধার করিয়া শুনাইয়াছি যে, সোম এমন একটা বস্তু, যাহার তেজ দ্যুলোকে, পৃথিবীতে, পর্ব্বতে, ওষধিতে এবং জলে আছে; যাহা সমস্ত ওষধি, বৃষ্টির জল, গাভী সৃষ্টি করিয়াছে; এবং যাহা বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষকে বিস্তীর্ণ করিয়াছে ও তাহার অন্ধকার জ্যোতিঃ দ্বারা দূর করিয়াছে। আধ্যাত্মিক ভাবে দেখিলে, সোম হয় ত সর্ব্বব্যাপী প্রাণ বা ঐরকম একটা কিছু। আপাততঃ তাহা বুঝিতে যাইব না। আধিভৌতিক ভাবে দেখিলে, ইহা সেই ইলেক্‌ট্রন বা কর্পাস্‌লগুলির সচল (free), ব্যাপনশীল, স্পন্দনশীল (mobile) অবস্থা বলিয়া আমার মনে হয়। উজ্জ্বল সোম-বিন্দুর কথা মন্ত্রের মধ্যেই পাই। বিজ্ঞানের মতে ইলেক্‌ট্রন-গুলা বদ্ধ ও মুক্ত এই দুই অবস্থায় রহিয়াছে। বেদের ঐ বিবৃত এই সূক্ষ্ম তৈজস-পদার্থগুলি সম্বন্ধে অনায়াসেই লাগাইয়া দেওয়া যায়। বিজ্ঞানও বলে, এই atoms of electricityগুলি দ্যুলোকে, পৃথিবীতে, পর্ব্বতে, ওষধিতে, জলে—সর্ব্বত্রই আছে; পরস্পর আবদ্ধ হইয়া ঘরকন্না করিতেছে; আবার সন্ন্যাসীদলের মত মুক্ত স্বাধীন ভাবে ব্রহ্মাণ্ডময় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। অতএব বেদের ১।৯১।৪ ঋক্ শুনিয়া বিজ্ঞান বলিতেছেন—তথাস্তু! আমার সর্ব্বব্যাপী ইলেক্‌ট্রিসিটির দানাগুলি তোমার দেওয়া লক্ষণ মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছে। তারপর ২২এর ঋক্? ইলেক্‌ট্রনেরা এখানেও পেছপাও নয়। জোনাকি-পোকার মত ওষধিদেরও না কি রাত্রিতে এক রকম দীপ্তি (glow, phosphorescence) আছে। কালিদাস এই ওষধিদের আলোককে কোন নৈসর্গিক অনুষ্ঠান-বিশেষে প্রদীপ বা রোস্‌নাই রূপে কল্পনা করিয়াছেন। Sir Oliver Lodge বলেন, জোনাকি-পোকাদের সম্ভবতঃ এমন একটা স্বাভাবিক শক্তি আছে, যাহা দ্বারা তাহারা নিজেদের মধ্যে ইলেক্‌ট্রন-সমূহকে আলোকোৎপাদন কর্ম্মে লাগাইয়া দিতে পারে; ওষধিদের মধ্যেও সেইপ্রকার একটা স্বাভাবিক বন্দোবস্ত থাকা বিচিত্র নহে। অতএব ওষধিতে যে সোমের কথা তুমি বলিলে, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে ইলেক্‌ট্রিসিটির ঐ

দানাগুলাই। বিজ্ঞানের এই এক দফা ব্যাখ্যা। তার পর বেদ বলিতেছেন—সোম বৃষ্টির জল সৃষ্টি করিয়াছে। বিজ্ঞান বলেন—আমারও ইলেক্‌ট্রন সম্বন্ধে সেই কথা। বৃষ্টি-বিন্দুসমূহ যখন পতিত হয়, তখন তাহারা অন্তরীক্ষের সঞ্চরণশীল electric chargeগুলিকে জড়াইয়া টানিয়া লইয়া আসে। শুধু ইহাই নহে; অর্থাৎ বৃষ্টি-বিন্দুগুলি গগনের বিজলিকণা-রাশির শুধু যে বাহন হইয়া থাকে, এমন নহে; বিজলিকণাই বৃষ্টি-বিন্দুর প্রসূতি। আকাশে বিজলিকণা (electron)কে কেন্দ্র করিয়াই জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া মেঘের দানা বাঁধে। এই রহস্যময় নৈসর্গিক ব্যাপারটাকে বেদের ঋষিগণ বলিয়াছেন—মেঘের বা জলের গর্ভরচনা। সে কথা আমরা বিশেষ ভাবে পরে আলোচনা করিব। এখন দেখুন, 'সোম বৃষ্টি রচনা করে' এই কথার তরজমা (interpretation) বিজ্ঞান করিলেন এই ভাবে—বিজলিকণা বৃষ্টি-বিন্দুর ঘনীভাব কেন্দ্র (Centre of condensation) হইয়া তাহাকে জমাইয়া থাকে। তার পর বেদ বলিতেছেন—সোম গাভী সৃষ্টি করিয়াছে। 'গাভী' শব্দটা বেদের অনেক স্থলেই রশ্মি (বা radiation) এর রূপক। ধরুন, এখানে তাহাই। তাহা হইলে বিজ্ঞান বলিবেন—আমিও ঠিক ঐ কথাই বলিতে চাহি। তোমার সোম যদি বিজলিকণা হইতে সম্মত হন, তবে তিনি যে সকল প্রকার রশ্মি বিকিরণ (radiation)-এর মূলে, সে পক্ষে আর বড় একটা সন্দেহ নাই! সেদিন আদিত্যের সপ্তরশ্মি ও সপ্তচ্ছন্দঃ বুঝিতে গিয়া আমরা এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের নূতন কথা শুনিয়া রাখিয়াছি। তার পর, বেদ বলিতেছেন—"হে সোম! তুমি বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষকে বিস্তীর্ণ করিয়াছ।" বিজ্ঞান শুনিয়া বলেন—সত্যই তাহাই। 'অন্তরীক্ষ' মানে যদি বল—একটা দ্রব্য এবং অপর একটা দ্রব্যের মধ্যে ফাঁক বা ব্যবধান, তবে ইলেক্‌ট্রনেরাই পরস্পর ঠেলাঠেলি করিয়া জগতের পদার্থগুলিকে (এমন কি মলিকিউল, এটমগুলিকেও) এখানে-সেখানে-ওখানে ফাঁক-ফাঁক করিয়া রাখিয়াছে। নহিলে সব জমাট বাঁধিয়া যে ব্যাপার দাঁড়াইত, তাহা কল্পনা করিতে পারি না। জিনিসগুলা যে জমাট বাঁধে নাই, গা-হাত-পা ছড়াইয়া আছে, ইহার মানে তাহাদের মধ্যে অন্তরিক্ষ আছে; এবং এই প্রকার অন্তরিক্ষ বাহাল করিয়া রাখিয়াছে সর্ব্বব্যাপী ইলেক্‌ট্রিসিটির দানাগুলার ঠেলাঠেলি। ইলেক্‌ট্রিসিটি এই ম্লেচ্ছ নামটায় যদি আপত্তি থাকে ত, তাহাকে বেদের ভাষায় অগ্নি বল। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক দৃষ্টিতে অগ্নি যাহাই হউন, আধিভৌতিক (physical) দৃষ্টিতে, ইনি সেই বিভু পদার্থ, যাঁহার অভিব্যক্তি জগতে বিচিত্র রূপে হইয়া থাকিলেও, যাঁহাকে বিজ্ঞান ইলেক্‌সিটি নামে ডাকেন, কিন্তু যাঁহার নাড়ীর সমাচার (nature) বিজ্ঞান এখনও পান নাই। 'অন্তরিক্ষ' কথাটার যে অর্থ বিজ্ঞান দিলেন, তাহা যে শ্রুতি-সম্মত, তাহা ১০।৮২।১ ঋক্‌টি শুনিলে আপনারাও মনে করিবেন। বাঙ্গলা অনুবাদ দিতেছি—"সেই সুধীর পিতা (বিশ্বকর্ম্মা) উত্তম রূপ দৃষ্টি করিয়া, মনে মনে আলোচনা করিয়া জলাকৃতি পরস্পর সম্মিলিত এই দ্যাবা পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। * * তারপর দ্যুলোক ও ভূলোক পৃথক্ হইয়া গেল।" বিশ্বকর্ম্মা গোড়ায় যে কর্ম্ম করিলেন, তাহাতে জলের মত একটানা (continuous) একটা জিনিস হইল; ইহাই আমাদের পূর্ব্বে আলোচিত অদিতি বা অখণ্ড বস্তু। দ্যাবা পৃথিবী ইঁহার গর্ভে বাস করিতেছে, কিন্তু এখনও যেন তাহারা পরস্পর হইতে পৃথক্ হয় নাই। বিশ্বকর্ম্মাকে যদি বলি প্রজাপতি দক্ষ, তবে অদিতি হইলেন দক্ষ-দুহিতা। শুধু পুরাণ যে এ কাহিনী আমাদের শুনাইয়াছেন, এমন নহে; ১০।৭২।৫ বলিতেছেন—"হে দক্ষ! অদিতি যে জন্মিলেন, তিনি তোমার কন্যা।" অদিতির মহিমা আমরা পরে ভাল করিয়া শুনিব। এখন দেখুন, গোড়ায় একটা অখণ্ড জিনিস; তার পর সেই অখণ্ড বস্তুটি যেন দুইটা হইল; এবং সেই দুইটা জিনিস (যাহাদের সঙ্কেত দ্যৌঃ এবং পৃথিবী) পরস্পর হইতে তফাৎ হইয়া পড়িল। এই তফাৎই হইতেছে অন্তরিক্ষ। অবশ্য আমি আধিভৌতিক ভাবেই বুঝিতে চাহিতেছি। যিনি পুরুষ-প্রকৃতি প্রভৃতি লইয়া ব্যাখ্যা করিবেন, তাঁহার সঙ্গে আমার বিবাদ নাই; তবে আমার আলোচনার স্তর আপাততঃ অত উঁচু নহে। দ্যৌঃ এবং পৃথিবী এ দুইটি প্রতিনিধি-স্থানীয় মাত্র। যে কোন দুইটি বস্তু যাহারা পরস্পরকে ব্যাবৃত্ত করিয়া সরাইয়া বা ঠেলিয়া দিতেছে, তাহাদেরই প্রতিনিধি দ্যৌঃ এবং পৃথিবী। দুইটী ইলেক্‌ট্রন যদি পরস্পরকে ঠেলিয়া তফাৎ করিয়া রাখে, তবে তাহারাই দ্যৌঃ এবং পৃথিবী, এবং তাহাদের মধ্যে যে তফাৎ তাহাই অন্তরিক্ষ। একটা পজিটিভ্ চার্জ

আর একটা নেগেটিভ্ চার্জের সঙ্গে যদি মিলিয়া থাকে, তবে পাইলাম "দ্যাবা পৃথিবীর সম্মিলিত অবস্থা। এটা যেন অভিভূত অবস্থা বা অব্যক্ত অবস্থা—neutral state। এই টেবিলের মধ্যে সংযোগ তাড়িত ও বিয়োগ তাড়িত উভয়ই অবশ্য বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু পরস্পরকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে; কাজেই বিজলি ইহার মধ্যে থাকিয়াও ঘুমাইতেছেন, অব্যক্ত রহিয়াছেন। কিন্তু যে তারের মধ্য দিয়া বিজলি বহিয়া আসিয়া ঐ কাঁচের মধ্যে আলো জ্বালিয়া দিতেছেন, সে তারের মধ্যে তিনি কেবল যে সুব্যক্ত এমন নহে; বে-কায়দায় কেহ তাঁহাকে স্পর্শ করিলে তিনি সদ্য প্রাণ কাড়িয়াও লইতে পারেন। ঐ তারের মধ্যে ইলেক্ট্রনগুলা বাহিনীর মত ভীমবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। টেবিলের মধ্যে, এ হিসাবে, দ্যাবা পৃথিবী যেন সম্মিলিত; তারের মধ্যে তাঁহারা আলাদা হইয়াছেন। দ্যাবা পৃথিবীর কথা ভবিষ্যতে আবার বলিব—দেখিব কেমন করিয়া তাঁহারা শ্রুতি-পরিচয় মত নিখিল জগতের পিতা ও মাতা!

বিজ্ঞান ও আধুনিক সভ্যতা

ডাক্তার শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, এম-এ, পি এইচ্-ডি, আই-ই-এস্

সভ্যতার পরিমাণ করিবার কোনরূপ নিক্তি আছে কি? য়ুরোপ ও আমেরিকার শ্বেতজাতি-বৃন্দের অভিমত এই যে, তাহারাই সুসভ্য; এশিয়ার পীত ও আমাদের মত ব্রাউন জাতি অর্দ্ধ-সভ্য; এবং আফ্রিকা ও আমেরিকার নিগ্রো প্রভৃতি কৃষ্ণ জাতি অসভ্য। অপর দিকে ভারতবাসী কখনও স্বীকার করিবে না যে, তাহারা অসভ্য বা অর্দ্ধ-সভ্য। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে জাপানীরা অর্দ্ধ সভ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল; কিন্তু গত রুষ-জাপান যুদ্ধে রুষ জাতিকে যুদ্ধে পরাস্ত করিবার পর হইতে তাহারা সুসভ্য জাতিবৃন্দের মধ্যে উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছে। জানি না, আফ্রিকা ও আমেরিকার নিগ্রো জাতি আপনাদিগকে অসভ্য না সুসভ্য মনে করে। সেইজন্য বলিতেছিলাম, সভ্যতার একটা সর্ব্ববাদিসম্মত সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন কাজ।

প্রাচীন কালের ইতিহাস পাঠে দেখিতে পাই যে, যখন কোন জাতি শৌর্য্যে, বীর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে, জ্ঞান বিজ্ঞানে, শ্রেষ্ঠ বড় হইয়াছে, তখন সেই জাতি একটা বিশিষ্ট সভ্যতার অধিকারী হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন—প্রাচীন কালের গ্রীক সভ্যতা, রোমীয় সভ্যতা, আরব সভ্যতা, ভারতীয় সভ্যতা, মিশরীয় সভ্যতা ইত্যাদি। আজকালকার দিনে য়ুরোপীয় বা পাশ্চাত্য সভ্যতাই পৃথিবীর জাতিবর্গের ইচ্ছা অনিচ্ছায় আদর্শ হইয়া উঠিয়াছে। য়ুরোপ ও আমেরিকার শ্বেতজাতিবৃন্দের মধ্যে এই সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এশিয়ার জাতিবৃন্দের মধ্যে জাপান গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এই পাশ্চাত্য সভ্যতা বহু পরিমাণে তাহাদের নিজস্ব করিয়া লইয়াছে। এই আদর্শ ভারতবাসীর সম্মুখে গত শত বৎসরের উপর বিদ্যমান। কিন্তু উহা ভারতের প্রাচীন আদর্শের সহিত বহুল পরিমাণে ভিন্ন বলিয়া ভারতবাসী এখনও পর্য্যন্ত এই পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছে। চীন, মিসর, পারস্য, আরব, তুরস্ক, প্রভৃতি স্থানের জাতিদের মধ্যে এই নূতন-পুরাতন সভ্যতার সংঘর্ষ বেশ জোরেই চলিতেছে। এই সংঘর্ষের ফলে প্রাচীন ও নবীন সভ্যতার মধ্যে কাহার জয় হইবে, সে কথা বলা বড় শক্ত।

এই নবীন সভ্যতার সু-কু, ভাল-মন্দ, উপযোগিতা-অনুপযোগিতা প্রভৃতি সকল দিক দেখাইবার স্থান ইহা নহে। এখানে আলোচ্য বিষয় এই সভ্যতার একটা দিক মাত্র। বোধ হয় সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, এই আধুনিক সভ্যতার মধ্যে এমন একটা শক্তি আছে, যাহার প্রভাবে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ও অর্দ্ধ-মৃত জাতি উন্নত ও সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত জাপান। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এই নবীন সভ্যতা জাপানে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে—জাপান এশিয়াখণ্ডের এক প্রান্তে,

একটা পর্ব্বতময় ক্ষুদ্র রাজ্য মাত্র ছিল। আর এখন? এখন জাপান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতিবৃন্দের অন্যতম হইয়া উঠিয়াছে। জাপানের বিস্তৃত নৌ-বাহিনী সুনীল সাগরাম্বু ভেদ করিয়া জাপানের "উদীয়মান সূর্য্যাঙ্কিত" জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র জাপান-জাত শিল্প-সম্ভার বণ্টন করিতেছে। যুদ্ধ-বিদ্যায়, কল-কারখানায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, জাপান এখন অন্য কোনও জাতির অপেক্ষা হীন নহে। এই পঞ্চাশ বৎসরে জাপান দলে-দলে তাহার পুত্র-কন্যাকে য়ুরোপ ও আমেরিকায় প্রেরণ করিয়া তাহাদের দেশের নবীন সভ্যতার ভিতর এই গুপ্ত-শক্তির অনুসন্ধান করিয়াছিল। ইহারাই স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া এই শক্তি কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করাতে, এখন জাপানের রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, যুদ্ধনীতি, নৌ-গঠন-বিদ্যা, শিক্ষাপদ্ধতি আর মধ্যযুগের সভ্যতার অনুগামী নহে। এখন এ সকল আধুনিক সভ্যতানুযায়ী হওয়াতে জাপান এখন পৃথিবীর তাবৎ জাতির মধ্যে অতি উচ্চ স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। জাপানে এই শক্তির এখন পূর্ণ বিকাশ দেখিতেছি; ইহার আংশিক বিকাশ চীন, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, ভারতবর্ষ, পারস্য, তুর্কিস্থান প্রভৃতি এসিয়ার অন্যান্য দেশসমূহেও উপলক্ষিত হইতেছে। এ স্থলে এটা স্পষ্ট বলা প্রয়োজন মনে করি যে, সভ্যতার বাহিরের পরিচ্ছদ ও চাকচিক্য অনুকরণ করাকে সেই সভ্যতাকে বরণ করা বলে না। উহার মধ্যে যাহা সার, যাহা সত্য, যাহা নিত্য, তাহাই দেশের ও জাতিবৃন্দের মঙ্গলদায়ী।

এখন কথা হইতেছে এই যে, এই নবীন সভ্যতার অন্তরালে নিহিত এই শক্তিটা কি? আমার মনে হয় বিজ্ঞানই এই শক্তি। আধুনিক সভ্যতার মূলে বিজ্ঞানের প্রভাব সম্যকভাবে বিদ্যমান। দুইয়েরই বয়ঃক্রম শত বৎসর। বিজ্ঞান আধুনিক সভ্যতাকে পরিপুষ্ট করিতে কিরূপ সাহায্য করিয়াছে, তাহা নিম্নে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি।

প্রথমতঃ বিজ্ঞান সার্ব্বজনীন। আজ পর্য্যন্ত কোনও ধর্ম্ম সার্ব্বজনীন বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই—উহা জাতি ও দেশ-বিশেষে বিভিন্ন। বোধ হয় কোনও দর্শন (Philosophy) সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। কিন্তু বিজ্ঞান সর্ব্ববাদিসম্মত। উহার রাজ্য সমগ্র মানব-সমাজ। বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্য দেশ ও জাতি-নির্ব্বিশেষে সত্য। অমুক বলিয়াছেন বলিয়া কোনও বৈজ্ঞানিক তথ্য সত্য নহে। সত্য বলিয়াই বৈজ্ঞানিক তথ্য সত্য। সেই জন্য বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কৃত তথ্য, যন্ত্রাবলী, নবাবিষ্কৃত নানা শিল্পসম্ভার, সকল দেশ ও জাতিই গ্রহণ করিতে পারে। সেই জন্যই আবার বিজ্ঞানের চর্চ্চা ও শিক্ষা মানবের চিন্তাশক্তিকে কূপমণ্ডূকের বদ্ধ সীমানার মধ্য হইতে বাহির করিয়া উহাকে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে শক্তি দান করে। ঐরূপ শিক্ষায় কুসংস্কার, বিনা বিচারে কেবলমাত্র প্রাচীনত্বের দাবীতে সত্য বলিয়া স্বীকৃত অসত্যের সেবা প্রভৃতি অকল্যাণ সমাজ হইতে ক্রমশঃ দূরীভূত হইবার অবকাশ জন্মে। সেইজন্য দেখা যায় যে, যে সমাজে বিজ্ঞানের সার্ব্বজনীন সত্যের প্রচার সমধিক, সে সমাজে প্রকৃতির সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের গূঢ় রহস্যের আবিষ্কৃত জ্ঞান অধিকতর সুস্পষ্ট ও পরিব্যাপ্ত; এবং সেই সঙ্গে—সেই সমাজে চিন্তাশক্তি সমধিক স্বাধীনতা লাভ করাতে, নানা কুসংস্কারের মোহ হইতে সেই সমাজ অধিকতর মুক্ত। উপরন্তু এইরূপ সমাজে সকল অনুষ্ঠানের মধ্যেই একটা শৃঙ্খলা,—যাহাকে সচরাচর ইংরাজিতে scientific method বলা হয় দেখা যায়। এই শৃঙ্খলা শুধু যে যুদ্ধক্ষেত্রে বা সৈন্যশিবিরেই দেখা যায়, তাহা নহে,—উহা কল-কারখানায়, হাসপাতালে, ধর্ম্মাধিকরণে, স্কুল-কলেজে, আহারে বিহারে, এমন কি ধর্ম্মকর্ম্মেও অত্যন্ত পরিস্ফুট। সকলেই জানেন যে, এলোমেলো ভাবে কাজ করিতে গেলে শক্তির কত অপচয় ঘটে। বাস্তবিক সকল কাজে এই বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলা পাশ্চাত্য জাতিবৃন্দের কৃতকার্য্যতার অন্যতম কারণ।

দ্বিতীয়ত, আধুনিক বিজ্ঞান এক দিকে যেমন অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ ও নিয়মাবলীর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত, অপর দিকে বৈজ্ঞানিক এই সকল বিষয়ের আবিষ্কারের ফলে ক্রমশঃ প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়কে জয় করিয়া মনুষ্যের সুখ ও কল্যাণের জন্য উহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন। গত শত বৎসরের মধ্যে পাশ্চাত্য জাতি-বৃন্দের শত-শত বৈজ্ঞানিকের জীবনব্যাপী গবেষণা ও পরিশ্রমের ফলে এখন তাপ, আলোক, শব্দ, চৌম্বকতত্ত্ব, বিদ্যুৎ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তিনিচয় ভৃত্য-ভাবে মানবের সেবা করিতেছে। যে বিদ্যুৎ পূর্ব্বে কেবল আকাশপটে

সন্ধিক্ষণ — নিশা ও উষা

নিবিয়া আসিল নিশার প্রদীপ উষার বাতাস লাগি — রবীন্দ্রনাথ

শিল্পী — শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

বিচিত্র সৌদামিনী রূপে মানবের চক্ষু ঝল্‌সাইয়া নিবৃত্ত হইত, এখন উহাই প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড কল চালাইতেছে, বড়-বড় সহরকে আলোক-মালায় সাজাইতেছে, ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর পরিশ্রান্ত কর্ম্মীকে বীজন করিতেছে; আবার সতার বা তারহীন যন্ত্রের সাহায্যে সুদূরস্থিত প্রিয়জনের মঙ্গলামঙ্গল সংবাদ নিমেষে জ্ঞাপন করিতেছে। এখন আর কাশী, কাঞ্চী, দ্রাবীড় যাইবার জন্য পর্য্যটককে গোযানে বা পাল্কীতে যাইতে হয় না, এখন মানুষ বাষ্পীয় রথে "ছয় ঘণ্টায় চলে যায় ছ' দিনের পথ।" শীঘ্রই আবার মানুষ আকাশ-পথে ছয় দিনের পথ ছয় ঘণ্টার বদলে ছয় মিনিটেই যাহাতে চলিয়া যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা চলিতেছে। বৈজ্ঞানিক জল, স্থল, পাতাল, অন্তরীক্ষ জয় করিয়া ফেলিতেছে। ব্যবধান, দূরত্ব আর থাকিতেছে না। ফলে জাতিবর্গের মধ্যে সামাজিক, নৈতিক, গুণরাশি পরস্পরকে আকৃষ্ট করিতেছে। সামাজিক আদান-প্রদানের দ্বারা সভ্যতার একীকরণ ক্রমশঃ সাধিত হইতেছে; স্ত্রী-পুরুষের অধিকারে সাম্য লাভ ঘটিতেছে; লোক-শিক্ষা সার্ব্বজনীন হইতেছে; এবং এই শিক্ষার ফলে পতিত অন্ত্যজ জাতিবর্গ ক্রমশঃ মাথা তুলিতেছে। ধর্ম্মের গোঁড়ামি ও একদেশদর্শিতা কমিতেছে; আহার-বিহারের বৈষম্য অনেকটা কাটিতেছে; জাতিবর্গের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য বর্দ্ধিত হইতেছে। যন্ত্র-চালিত শক্তির সাহায্যে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বস্তু অনায়াসে ও সুলভে প্রস্তুত হওয়াতে, দরিদ্রের পক্ষে ঐ সকল বস্তু সহজ-প্রাপ্য হইতেছে। শিল্প-বাণিজ্যে দেশগুলি সমৃদ্ধিশালী হইতেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সীমা বাড়িতেছে; খণ্ড জাতিগুলি এক বিশাল মানব-সমাজের অঙ্গীভূত হইতে চাহিতেছে।* ইহাই আধুনিক সভ্যতার লক্ষণনিচয় এবং বিজ্ঞানই এই সভ্যতার মূল।

সকল দেশেই (বিশেষতঃ আধুনিক ভারতবর্ষে) এক দল ভাবুক ও কর্ম্মী আছেন, যাঁহারা আধুনিক সভ্যতা ও বিজ্ঞানকে ভয় এবং অবিশ্বাস করেন। তাঁহারা বলেন "আমরা কলকারখানা চাই না, আধুনিক সভ্যতা চাই না, আধুনিক শিক্ষা চাই না, আমরা আবার প্রাচীন যুগে ফিরিয়া যাইব, হাতে সূতা কাটিব, তাঁতে কাপড় বুনিব, পাশ্চাত্য জগতের আমরা কিছুই লইব না।" কবির ভাষায় ইঁহাদের কাছে আমার বিনীত জিজ্ঞাস্য—এই আধুনিক সভ্যতার ভাব তরঙ্গ "কে রোধিবে রে, কে রোধিবে রে?" আপনি আমি হাজার চেষ্টা করিলেও এই বিজ্ঞান ও সভ্যতা রোধ করিতে পারিব কি? ইহার উত্তাল তরঙ্গে অন্যত্র ঐরাবতও যে ভাসিয়া গিয়াছে।

সে দিন কি আর আছে যে, ভারতবাসী ভারতের চতুঃ-সীমানার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারিবে? এমন দিন কি আছে, যেদিন ভারতবাসী বিদ্যার্জ্জনের বা ব্যবসার জন্য সমুদ্র-পারে গেলে তাহার জাতি যাইতে পারে? এখন সমুদ্র-পারের ঐ বিশাল মানব-সমাজ ও বিভিন্ন জাতি যে ভারতবাসীকে অহরহঃ ডাকিতেছে। যখন জগতের আধুনিক সভ্যতায় পরিপুষ্ট জাতিবর্গ বাণিজ্যার্থ বা দেশ-জয়ের আকাঙ্ক্ষায় সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়া ফেলিতেছে, তখন ভারতবাসী সমুদ্র-পারে গেলে তাহার কি জাতি যাইবার সম্ভাবনা আছে? চাই না বলিলেও কম্‌লী ছাড়ে কৈ? হাতে সূতা কাটা, হাতে কাপড় বোনা শিল্প-শিক্ষানবীশ ভাবে বা অক্ষমের কিছুকালের উপায় রূপে চলিতে পারে। কিন্তু পরিণামে বা উত্তরকালেও আমরা কলকারখানা চাহি না, এ বলিলে ত' চলিবে না। পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে, কলের সহিত প্রতিযোগিতায় হাতে সূতা কাটা, হাতে তাঁত চালান কিছুকাল পরে বন্ধ হইবেই হইবে—ইহাতে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইংলণ্ডেও এমন দিন গিয়াছে—যখন ষ্টীম এঞ্জিন সবে মাত্র বাহির হইয়াছে,—হাতের চরকার বদলে কলে চালিত চরকা ও তাঁত আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ সময়ে শ্রমজীবীর দল এই সকল কল ভাঙ্গিয়াছে, কারখানা নষ্ট করিয়াছে। কিন্তু বিলাতে কলকারখানার সারি কি এখন কমিয়াছে, না সহস্র গুণে বাড়িয়াছে? তাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম—এই বৈজ্ঞানিক সভ্যতা "কে রোধিবে রে, কে রোধিবে রে?"

এ হয় না। বিজ্ঞানের এই নিত্য নূতন অসম্ভব আবিষ্কারের দিনে গরুর গাড়ীতেও দিল্লী যাওয়া চলে না, নৌকা করিয়াও বিলাত যাওয়া চলিবে না। আমি যদি মামুলি গরুর গাড়ীতেই সন্তুষ্ট থাকি, তাহা হইলে যাঁহার ঘণ্টায় দুইশত মাইলগামী এরোপ্লেন আছে, তিনি ত' নিশ্চয়ই আমাকে দুই শত মাইল পিছনে রাখিয়া যাইবেনই।

* য়ুরোপের মহাযুদ্ধের পরে প্রতিষ্ঠিত "জাতিসঙ্ঘ" (League of Nations) এই ভাবেরই একটা অভিব্যক্তি।

পিছাইবার মন্ত্র কি জাতিবর্গকে উন্নত করিতে পারিবে? জাপান কি পিছাইবার বা ফিরিবার মন্ত্র জপ করিয়াছিল? আমার এত মনে হয় না। আমার এই মনে হয়—জাপান ঠিক বিপরীত মন্ত্রের উপাসক। জাপান বিজ্ঞানকে বরণ করিয়া লইয়াছে, কলকারখানায় দেশ ছাইয়া ফেলিতেছে, আধুনিক সভ্যতার মধ্যে যাহা সত্য ও শিব তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছে ও করিতেছে। তাই জাপানের এত উন্নতি।

এই আধুনিক সভ্যতার মূল স্বরূপ অসংখ্য বৈজ্ঞানিক প্রয়োগের মধ্যে কোন্‌টা যে জাতির ও দেশের মঙ্গলের জন্য প্রয়োজনীয় নহে, তাহা ত' জানি না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন—যানবাহনের জন্য রেলগাড়ী, মোটর, বৈদ্যুতিক, ট্রাম, এরোপ্লেন চান কি না? সমুদ্র-পারে যাইবার জন্য জাহাজ, সিপ্লেন চান না? বার্ত্তাবহনের জন্য সতার ও বেতার টেলিগ্রাফ, টেলিফোন চান না? কাপড়-চোপড়ের জন্য কলকারখানা চান না? হাতে সূতা কাটা ও কাপড় বোনা কত দিন চলিবে? নিশ্চয়ই চাই। কোটী-কোটী নর-নারীর জন্য সুলভে সুশোভন আচ্ছাদন প্রস্তুত করিতে সর্ব্বত্রই কল চলিতেছে। দুই-এক দেশে না চলিলে সেই দেশেরই ক্ষতি।

কাগজ ত' চানই। খোলে, চট ত চাইই। তবে কাগজের কল, জুট মিলের নাম করিলেই কি ভয় পাইতে হইবে! রসগোল্লা সন্দেশ ত' ভালবাসিই। কিন্তু চিনি সরবরাহ করে ত' কল। আমরা রসগোল্লার রসেই বেশ সন্তুষ্ট আছি,—চিনির কল আবার কে করে?

চা খান ত'। কিন্তু চায়ের কারখানা দেখিয়াছেন কি? কত বড়-বড় কল আজকালকার চায়ের কারখানায় লাগে, একবার দেখিয়া আসুন না।

লোহা, তামা, পিত্তল, স্বর্ণ, রৌপ্য ত' বৎসরে-বৎসরে কোটী কোটী টাকার আবশ্যক হয়। এগুলি বিনা আয়াসে পয়সা ফেলিলেই পাওয়া যায় বলিয়া, কিরূপে এই সকল ধাতু ও তাহা হইতে নির্ম্মিত বিবিধ তৈজস প্রভৃতি প্রস্তুত হয়, তাহার সন্ধান এক বিশেষজ্ঞ ভিন্ন অপর কেহ লয় না। কবি ঠিকই বলিয়া গিয়াছেন—"ভোজনে নিপুণ বটে অন্ন রুটি ডাল, কিসে জন্মে জিজ্ঞাসিলে ঘটিবে জঞ্জাল।" আমাদেরও হইয়াছে তাই। লোহার কড়ি, বরগা, ইস্পাত, গ্যাল্‌ভানাইজ্‌ড্ লোহার পাত প্রভৃতি টাকা ফেলিলেই পাই; কিন্তু কি সুবৃহৎ চেষ্টায় এই সকল তৈয়ারি হয়, তাহা জানেন কি? *

ভূতত্ত্ববিৎ লৌহের খনি, কয়লার খনি, চূণের খনি আবিষ্কার করিয়াছেন। রাসায়নিক উহা হইতে লৌহ, ইস্পাত প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি বাহির করিলেন। ইঞ্জিনিয়ার কলকারখানা, বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি দিয়াছেন। মহাজন টাকা ঢালিলেন। ম্যানেজার সহস্র-সহস্র শ্রমজীবী লইয়া, কত সুশৃঙ্খলার সহিত প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড ব্যাপার সুন্দর ভাবে চালাইতেছেন। ইহাতে কি আমাদের শিক্ষার কিছুই নাই? এইরূপ কত সুবৃহৎ কারখানা পৃথিবীর কোটী-কোটী টাকার মূল্যের লৌহ প্রভৃতির অভাব ঘুচাইতেছে। যাহারা বলেন, আমরা কল-কারখানা চাই না, তাঁহারা অপরের প্রস্তুত ও প্রদত্ত জিনিস বিদেশ হইতে পয়সা ফেলিলেই পান বলিয়াই, তাঁহাদের এ বিষয়ের গুরুত্বের অনুভূতি বড় কম; এবং সেই জন্যই তাঁহারা ঐরূপ মতের পোষকতা করেন বলিয়া সন্দেহ করিলে, আশা করি, তাঁহাদের উপর অবিচার করা হইবে না। কিন্তু বিজ্ঞান বলিতেছে যে, এ মন্ত্র ত্যাগ করিতেই হইবে; নহিলে পতিত জাতি চিরকাল যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকিয়া যাইবে।

আর কত উদাহরণ দিব। আধুনিক বৈজ্ঞানিক-সভ্যতা-পুষ্ট দেশসমূহের যে দিকেই চাহিবেন, সেই দিকেই দেখিবেন, বিজ্ঞানের নানা বিভাগে লব্ধ তথ্যের অসংখ্য প্রয়োগ। ভারতের কৃষি সেই মান্ধাতার আমলের হল-চালনাতেই আবদ্ধ। বায়োস্কোপে য়ুরোপ ও আমেরিকার প্রচলিত কৃষিপ্রণালী একবার দেখিয়াছেন কি? প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড মোটর ট্র্যাক্‌টার, মোয়ার, হো, ড্রিল প্রভৃতিতে কৃষিকার্য্য কত দ্রুত সম্পাদিত হইতেছে—তাহা একটা দেখিবার (এবং সেই সঙ্গে ভাবিবার) জিনিস।

ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, জাহাজ তৈয়ারী করিবার ডক, রং তৈয়ারির কারখানা, সাবান, বাতি, দেশালাই, চামড়া, ঔষধ, কাচ, পোর্সিলেন, সিমেণ্ট, ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি শত, সহস্র, লক্ষ জিনিস তৈয়ারি করিবার বৈজ্ঞানিক কারখানার

* তাহার নমুনা যদি দেখিতে চান, একবার সাক্‌চিতে টাটার লৌহের কারখানা দেখিয়া আসুন না। কি সুবৃহৎ কারখানা—কি প্রকাণ্ড অনুষ্ঠানই না সেখানে দেখিতে পাইবেন।

মধ্যে বোধ হয় দুই-একটা ছাড়া আমাদের দেশে আর কিছুই নাই। অথচ এই সমস্ত জিনিসের বহুল ব্যবহার আধুনিক সভ্যতার অপরিহার্য্য অঙ্গ।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতার বিরোধী বলিবেন, "বাপু হে, আমরা তোমার এই সকল জিনিসই চাই না, তবে কল-কারখানারই বা দরকার কি?" বাস্তবিকই কি চান না? দেশলাই ছাড়িয়া চক্‌মকি ঠুকিয়া আলো জ্বালাই কি চরম মনুষ্যত্ব? কাচের বাসনে বা গ্লাসে নাই খাইলাম; কিন্তু কাচ বাদ দিলে দূরবীক্ষণ যন্ত্র, অনুবীক্ষণ যন্ত্র, প্রভৃতি শত-সহস্র জ্ঞানবৰ্দ্ধক যন্ত্র পাইব কোথায়? রসায়নাগারে যে শত শত প্রকার কাচের তৈজস লাগে—সেগুলি কি বিলাসের জিনিস, না জ্ঞানার্থ সেগুলির প্রয়োজন? ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা না রাখিয়া রেলে, মোটরে না হয় না চড়িলাম—গরুর গাড়ীতেই না হয় ছয়মাসে কাশী পঁহুছিলাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—এই ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা কি শুধু বিলাসের সামগ্রী? এই রেল, মোটর কি দেশের, জাতির, সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে না?

তার পর দেখুন, আধুনিক সভ্যতার অপরিহার্য্য অঙ্গ—সার্ব্বজনীন শিক্ষা,—স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে শিক্ষা,—ধনী-নির্ধনের জন্য শিক্ষা। তা ত চাই-ই। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞানাগার, রসায়নাগার, মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, টেক্‌নলজিক্যাল কলেজ, মাইনিং কলেজ, কমার্সিয়াল কলেজ, স্ত্রীলোকের জন্য কলেজ—এই সবই চাই। আর্ত্তের সেবার জন্য আধুনিক হাসপাতাল, মাতৃসেবার জন্য মেটার্নিটি হোম, এক্স-রে ইন্‌স্‌টিটিউট, কুষ্ঠাগার, রেডিয়াম ইন্‌স্‌টিঠিউট, পাষ্টুর ইন্‌স্‌টিটিউট, প্রভৃতির কোন্‌টা যে চাই না, তা ত বুঝি না। এই সকল প্রতিষ্ঠানের মূলে বিজ্ঞান সর্ব্বত্র বিরাজমান। দাঁত-বাধানোর বিশেষজ্ঞ বা আধুনিক চক্ষু-চিকিৎসকের পরীক্ষাগার দেখিয়াছেন কি? সেখানকার যন্ত্রপাতিতে চক্ষু ঝল্‌সিয়া যায়। স্ত্রীচিকিৎসক বা অস্ত্র-চিকিৎসকের যন্ত্রপাতি ও আসবাব দেখিলে ত ভয়ই হয়। আধুনিক সভ্যতার এই সকল অঙ্গের মূল কিন্তু বিজ্ঞান।

অনেকে মনে করেন, আধুনিক সভ্যতা কেবলমাত্র জড়মূলক—উহার মধ্যে হৃদয়, ত্যাগ বা ধর্ম্ম নাই। কথাটা কি খাটি সত্য? কার্ণেগী, রক্‌ফেলার প্রভৃতি ধনীগণ বৈজ্ঞানিক কলকারখানার মালিক রূপে যেমন এক দিকে অতুল সম্পত্তির অধিকারী, সেই সঙ্গে তাঁহাদের দানও অতুলনীয় এবং জগতের আদর্শ। বিলাতী খবরের কাগজ পাঠে দেখিবেন, কত হৃদয়বান ব্যক্তি কত সহস্র-সহস্র-লক্ষ-লক্ষ মুদ্রা প্রায় প্রতিদিনই শিক্ষার জন্য, বিজ্ঞানাগার প্রতিষ্ঠার জন্য, হাসপাতালের জন্য, গির্জ্জা নির্ম্মাণের জন্য, আতুরসেবার্থ দান করিতেছেন। আর্ত্তের সেবার জন্য, রেডক্রস সোসাইটী, সেণ্টজন্স এম্বুলান্স, স্যাল্‌ভেশন আর্মী, সিস্‌টারস্‌ অব দি পুওর প্রভৃতি বহু ত্যাগী নরনারীসঙ্ঘ দিবারাত্রি ব্যস্ত আছে। য়ুরোপের মহাসমরের সময় আমাদের চক্ষে বিলাসমগ্ন পাশ্চাত্য জাতিবৃন্দের মহা-মহিমান্বিত সম্রাট হইতে দীনতম তাবৎ নরনারী দেশসেবার জন্য যে সুমহৎ ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে, তাহা জগতে অতুলনীয়। মদ্যপান নিবারণের জন্য, এমন কি পশুর ক্লেশ নিবারণের জন্যও প্রতিষ্ঠানের প্রাচুর্য্য সর্ব্বত্র দেখা যায়। পৃথিবীর নিভৃত কোণ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য যে অসংখ্য গির্জ্জা ও ধর্ম্মমন্দির দেখা যায়—মনে রাখিতে হইবে যে, ইহার প্রায় সমস্তই পাশ্চাত্য জাতির বহু ধর্ম্মপ্রাণ নরনারীর দানসম্ভূত। সেইজন্য বলিতেছিলাম দান, ত্যাগ, ধর্ম্ম ও নীতি বিজ্ঞানের বিরোধী নহে, এবং বিজ্ঞানপুষ্ট আধুনিক সমাজে সুপ্রচলিত আছে।

আধুনিক বিজ্ঞানপ্লাবিত সভ্যতার একটা কলঙ্ক সর্ব্ববাদি-সম্মত। সেটা হইতেছে শ্রমজীবীদের অবস্থা। কিন্তু শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে ইহাদের অবস্থার ক্রমিক উন্নতি হইতেছে ও অদূর ভবিষ্যতে আরও হইবে। শ্রমজীবীর দল এখন নিজেদের ক্ষমতা বুঝিয়াছে, দলবদ্ধ ভাবে নিজেদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করিতে সমর্থ হইতেছে। তাহাদের বাসস্থান, আহার-বিহার, আমোদ-প্রমোদ, শিক্ষা, ধর্ম্মচর্চ্চার সুব্যবস্থা সর্ব্বত্র হইতেছে। * রাষ্ট্রীয় জীবনে তাহাদের প্রতিনিধিগণ এখন সর্ব্বত্র বিরাজিত ও শক্তিসম্পন্ন। ইহাতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র একটা অশান্তির ভাব দেখা যাইতেছে সত্য; কিন্তু ক্রমশঃ যখন শ্রমজীবিবর্গের দাবী সম্পূর্ণ গ্রাহ্য হইবে, তখন এই অশান্তি বহু পরিমাণে কমিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। অধিকার প্রাপ্তিই শান্তির প্রকৃষ্ট উপায়।

* নবপ্রতিষ্ঠিত "লিগ অব নেশান্স" এর একটি বিভাগ পৃথিবীর শ্রমজীবিবর্গের সুখস্বাচ্ছন্দ্য দেখিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছে।

মোট কথা এই, আধুনিক সভ্যতা হইতে বিজ্ঞানকে বাদ দিলে, উহা প্রাচীন, বড় জোর মধ্যযুগের সভ্যতায় দাঁড়ায়, এবং বিজ্ঞানমূলক এই নবীন সভ্যতাকে যে জাতি নিজস্ব করিয়া লইতে না পারিবে, সে জাতি স্বভাবতই মৃত বা অৰ্দ্ধ-মৃত থাকিয়া যাইবেই ; কারণ, বিজ্ঞানই প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়কে জয় করিয়াছে, আহার-বিহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, সামাজিক প্রথা ধৰ্ম্মভেদে, দেশভেদে, জলবায়ু-ভেদে ভিন্ন হইয়া থাকে। সেগুলির অন্ধ অনুকরণ করাকে সভ্যতাকে আপন করিয়া লওয়া বলে না। ইহাতে অনেক স্থলেই ইষ্ট না হইয়া অনিষ্টই হইবার সম্ভাবনা। তবে এস্থলেও গোঁড়ামি, অধৈর্য্য ও বিদ্বেষ থাকাও বিশ্বমৈত্রী ও জাতিবর্গের মিলনের পরিপন্থী। প্রচলিত সামাজিক প্রথা প্রাচীন হইলেও, যদি উহা কোনও জাতির উন্নতির অন্তরায় হয়, তাহা হইলে উহাকে ত্যাগ করিতেই হইবে। অপর পক্ষে ভিন্ন দেশের প্রচলিত সামাজিক নিয়ম যদি নিজ দেশের উন্নতির সহায়ক হয়, তাহাকেও গ্রহণ করিতে হইবে। এ বিষয়ে দেশের ও জাতির উন্নতি ও মঙ্গলই একমাত্র নিয়ামক।

যদি পৃথিবীর সকল জাতি একত্র মিলিত হইয়া একযোগে আধুনিক বিজ্ঞানকে অগ্নিসাৎ করিতে সম্মত হয়, তবেই আবার সেই আদিম যুগের সভ্যতা—যে যুগে Adam delved and Eve span—পৃথিবীতে আনয়ন করা সম্ভব। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানের উপাসক, তাঁহারা বিজ্ঞানের অসীম জ্ঞান-ভাণ্ডারকে এইরূপে নষ্ট করিতে স্বীকৃত হইবেন কি? ইহার সুদূর সম্ভাবনা ত দেখা যায় না। অতএব প্রত্যেক জাতিকে এই বৈজ্ঞানিক সভ্যতা বরণ করিয়া লইতেই হইবে—ইহা ভিন্ন জাতির সামাজিক উন্নতির দ্বিতীয় পন্থা ত দেখিতেছি না।

সব শেয়ালের এক ডাক!

ফিলিপাইনকে আমেরিকা স্বাধীনতা দেবে বলে প্রতিশ্রুত হ'য়েছিল। পরে তারা যোগ্য হয় নি ব'লে সে কথা কাটিয়ে দিয়েছে; তাই হতাশায় ক্ষুব্ধ ফিলিপাইন ব'লছে "সব শেয়ালেরই কি এক ডাক!" (St Louis Star)

দু'হাততা দোয়া!

ধনী-মজুরের দ্বন্দ্বে ব্যবসা গাভীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'চ্ছে!

(Sydney Bulletin)

বিবিধ-প্রসঙ্গ

স্ব-পাক ভোজন

শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্, এম্-এস্

বাঙ্গলা দেশে, বিধবা ও নিতান্ত নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ব্যতীত, স্বপাক ভোজন করার প্রথা আর বড় একটা কাহারো মধ্যে দেখা যায় না। বাঙ্গালার বাহিরে, স্বপাক-ভোজন খুবই প্রচলিত। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের সংসারে, আজকাল অর্থের অভাব ঘটায়, স্বপাক-ভোজনের ব্যবস্থা পুনরায় শনৈঃ শনৈঃ প্রচলিত হইতেছে। স্বপাক-ভোজন ভাল কি মন্দ, সেই কথাটারই আলোচনা করা, এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথমেই, "স্ব-পাক" ভোজনের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। আপনারই উদরান্ন আপনার হস্তে আহরণ করিয়া, স্বয়ংই তাহাকে রন্ধন করিয়া ভোজন করাকে, যথার্থ "স্বপাক ভোজন" কহে। কিন্তু আমাদের দেশে, এত কড়াকড়ি করিয়া ধরিলে, স্বপাক ভোজীদের সংখ্যা নিতান্তই কম হইবে। এদেশে, "স্ব-পাক"-ভোজন বলিলে, স্ত্রী, মাতা বধূ বা ভ্রাতাদ্বারা, অথবা জ্ঞাতিদ্বারা রন্ধন করা অন্ন ভোজন করাকেই স্বপাক ভোজন ধরিতে হইবে। এদেশে স্বপাক ভোজনের খাদ্য আহার্য্য সামগ্রী সংগ্রহ কার্য্যটাও, অধিকাংশ স্থলে, স্বহস্তে না হইয়া, স্বজন কর্তৃকই হইয়া থাকে।

স্বপাক-ভোজনের বিপরীত,—পরহস্তে প্রস্তুত করা খাদ্য ভোজন। পাচক ব্রাহ্মণ, খানসামা প্রভৃতির প্রস্তুত করা খাদ্য-দ্রব্য ভোজন, বিস্কুট, সোডা-লেমনেড, চা প্রভৃতি ভোজন-পান করা পরহস্তে প্রস্তুত করা খাদ্য ভোজনের পর্য্যায়ভুক্ত। আমাদের দেশে, বর্ত্তমানকালে, কি কি খাদ্য স্বপাক ব্যবহৃত হয়, এবং কি কি খাদ্য পরকীয় প্রস্তুত করা হইয়া ব্যবহৃত হয়, তাহার মোটামুটি তালিকা এই :—

স্বপাক ভোজ্য।—ভাত, ডাল, মাছের ও অপরাপর ব্যঞ্জন, দুধ, ঘৃত, দধি, ক্ষীর, ডাল-মটর প্রভৃতি সিদ্ধ, মোরব্বা, চা, লুচি, রুটি, মোহন-ভোগ, পাঁপর, বড়ি, বড়া।

পরকীয় প্রস্তুত ভোজ্য দ্রব্য :—(১) দধি, ক্ষীর, রাবড়ী, (২) মিষ্টান্ন ও কচুরি সিঙ্গাড়া প্রভৃতি "নোন্তা"-খাবার, (৩) আচার, মোরব্বা, (৪) বিস্কুট, কেক, জেলি, জ্যাম, লজেঞ্জ, প্যাটি (patty) কাটলেট, (৫) ডিম, কাঁকড়া, মাংস, (৬) পাঁপর, বড়ি, "পাকৌড়ি" (৭) মাখন, (৮) সরবৎ, চা, কফি, ছাড়ান ফল মূল, মেওয়া ফল, (৯) পান, (১০) হোটেলের ভোজ্য দ্রব্য।

স্বপাক ভোজনের উদ্দেশ্য কি? এ কথার উত্তর এক কথায় দেওয়া যায় না। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে, এক হিন্দু ছাড়া, অপর কোনও ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে স্ব-পাক ভোজনের ব্যবস্থা নাই। এই একটি কথা হইতে স্বপাক-ভোজনের উদ্দেশ্য কতকটা বুঝা যায়,—সম্পূর্ণ কিন্তু-রূপে নহে। হিন্দুরা জীবনটাকে ভোগের জিনিষ মনে করেন না—তাঁহারা মনে করেন যে, অনেক রকমের সু ও কু কর্ম্মের ফলে, নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া, মানব-জন্ম পাওয়া যায়। কাজেই, হিন্দুদিগের মতে, মানব জন্মটা বাস্তবিকই দুর্লভ জন্ম। পৃথিবীর সকল জাতীয় মানুষেই বলে—"বিদায় দেমা, ঘুরে আসি," কারণ, অ-হিন্দুর কাছে মানবজন্ম বৃথা জন্ম এবং যতদিনই বাঁচা যায়, ততই বিড়ম্বনা ভোগ করিবার সম্ভাবনা। ইংরাজীতে একটি প্রবাদ-বচন আছে—Life protracted is protracted woe (যত বেশী দিন বাঁচা যায় তত বেশী "কর্ম্মভোগ" করিতে হয়,—দীর্ঘায়ুঃ দুঃখেরই মূল)। কিন্তু হিন্দু এই মানবজন্মকে সার্থক ও দুর্লভজন্ম বলিয়া মনে করেন, এবং এইজন্য, হিন্দুর সকল প্রার্থনার প্রথম কথা—"আয়ুর্দেহি"। হিন্দু আয়ুঃই প্রথমে কামনা করেন,—দুর্লভ মানবজন্মের দিনগুলাকে এক নিঃশ্বাসে যত বাড়াইয়া লওয়া যাইতে পারে, হিন্দু তাই চাহেন; তাহার কারণ, হিন্দু মনে করেন যে, কত পুণ্য কায করিয়া মানুষ হইয়া, বিবেকী হইয়া, জন্মাইতে পারিয়াছি। যত বেশী দিন পাইব, ততই ভগবানের আরাধনা করিবার সুযোগ পাইব। একই জন্মে যতটা "কাম" (ভগবদাভিমুখী) করিয়া যাইতে পারি, ততই ভাল—এই-ই হিন্দুর মুখ্য উদ্দেশ্য। "অহঙ্কার"-জ্ঞানকে লোপ করিবার জন্য, প্রতি কাযে ভগবানকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য, শয্যাত্যাগে, মুখ প্রক্ষালনে, স্নানে, আহ্নিকে, লেখাপড়া করিতে, শুইতে, বসিতে, আহারে—প্রত্যেক কাযেই হিন্দু ভগবানকে স্মরণ করিয়া থাকেন। জীবন-ধারণের জন্যই আহার—এই মনে করিয়া, অতি পবিত্রভাবে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া, ভগবানকে খাদ্যদ্রব্য নিবেদন করিয়া, তবে হিন্দু তাহাকে ভগবানের প্রসাদস্বরূপ আহার করেন। শ্রীভগবানকে নিবেদন করিতে হইলে, অতি পবিত্রভাবে খাদ্যদ্রব্যকে আহরণ, রন্ধন ও পরিবেশন করিতে হয়; অতি শুচিচিত্তে, সংযতবাক্ হইয়া ভোজন করিতে হয়; কাযেই, ভোগ-বিলাসের সম্ভাবনা সেরূপ আহারে আদৌ থাকে না। ভগবানকে নিবেদন করিবার খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করিবার সময়ে, ধূলি বা ময়লা, মক্ষিকা বা কীট পতঙ্গাদি নাই এমন স্থানে পরিবেশন করিতে হয়। ভগবানের প্রসাদ ভোজন করিতে হইলে, খাইতে খাইতে চাহিয়া কোনও জিনিষ আর লওয়া চলে না।

এদেশে যে লোকদের মধ্যে স্বপাক ভোজন প্রচলিত আছে, তাঁহাদের দ্বারা স্বপাক ভোজনের যথার্থ মর্য্যাদা এখন কেমন ভাবে রক্ষিত হইতেছে? এ কথার আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এখন প্রায়ই দেখা যায় যে, প্রকৃত "ধর্ম্ম" মানুষ হইতে বহুদূরে গিয়া

পড়িয়াছে;—ধর্ম্মের খোলস ও "আচার" নামে কতকগুলি আবর্জ্জনার পূজাই হইয়া থাকে। যাঁহারা ধর্ম্মার্থে স্বপাক ভোজী, তাঁহারা হয়ত দিনে লক্ষবার ইষ্টমন্ত্র জপ করেন, কিন্তু কাম ক্রোধ লোভাদি রিপুর ষোল আনা বশবর্ত্তী। ধর্ম্মার্থীরা দিনে দশবার কাপড় পরিবর্ত্তন করিতে পারেন, কিন্তু এক কাপড় অপর কাপড়ের চেয়েও হয় ত দুর্গন্ধময় ও ময়লা। এই মন লইয়া, এই বেশ পরিয়া, "স্বপাক ভোজন" কিরূপ বিড়ম্বনার ব্যাপার, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাহার পর, জানিয়া-শুনিয়া (অথচ যমকে চোখ ঠারিয়া), চর্ব্বিমিশ্রিত ঘৃত, পালোমিশ্রিত দুধ, জিলেটিন মিশ্রিত মধু, নিরাপত্তিতে ঠাকুরকে আমরা নিবেদন করিয়া দিতেছি! রাস্তার ধূলি মিশ্রিত হইলেও বাসি মিষ্টান্ন নির্ব্বিঘ্নে ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া দিতেছি, তবু নারিকেল নাড়ু দিই না।

একদিকে স্বপাক-ভোজনের উপহাস বা ব্যঙ্গ-চিত্র এই, অপর দিকে ভোজনের কালাপাহাড়ী নীতি (অর্থাৎ যথেচ্ছাচারিতার) অন্য রূপ দেখান প্রয়োজন। আমার মনে হয়, এগুলি বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য :—

(১) বরফের মধ্যে "গয়ার"।—আমার পরিচিত তালতলা নিবাসী কোনও চিকিৎসক কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, একদা তদীয় সহপাঠী অপর চিকিৎসকের সঙ্গে, হ্যারিসন রোডের কোনও ডিস্পেন্সারীতে বসিয়া একত্রে বরফ-জল পান করিতে করিতে দেখেন যে, বন্ধুটির গ্লাসের বরফের ভিতর হইতে গলিয়া "গয়ার" ভাসিয়া উঠিয়াছিল! আরো একটি দৈনিক-পত্রের সম্পাদক বন্ধুর নিকট ঠিকএই কথাই শুনিয়াছি।

(২) "সোডার" বোতলে মূত্র।—কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "ইণ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেটে" জনৈক সাহেব-ডাক্তার লিখিয়াছিলেন :—যে লোকের টাইফয়েড রোগ (বাতশ্লেষ্মাবিকার) হয়, তাহার প্রস্রাবে ঐ রোগের বিষ যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। কলিকাতার কথা বলিতে পারি না, মফস্বলে বহু লোকে খালি সোডা-ওয়াটারের বোতলে প্রস্রাব ধরিয়া আনিয়া, ডাক্তারকে দেখায়—এবং ঐ সকল বোতল বাজারে বিক্রীত হইয়া, অথবা অন্য প্রকারে হস্তান্তরিত হইয়া, সোডা ওয়াটারে ভর্ত্তি হইয়া বহুজন কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয়; এইরূপেও, টাইফয়েড্ জ্বর বিস্তৃতি লাভ করে। এ কথাটি সোডা ও লেমনেড পানকারী বাবুদিগের স্মরণ রাখিবার উপযুক্ত।

(৩) দুধে ঘর্ম্মাক্ত ও ময়লা হাত ডুবান।—দুষ্টবুদ্ধি ও নিরক্ষর গোয়ালারা দুধ বিক্রয় করিবার আগে, তাহার মাটা তুলিয়া লয় এবং তাহাতে বাসী দুধ মিশায়। পরে যে-সে পুকুরের জল ও পালো মিশায় এবং যে-সে অবস্থায় প্রাপ্ত বিচালি বা খেজুর পাতা দুধের মধ্যে ফেলিয়া রাখে, এ কথা সকলেই জানেন এবং গোয়ালারা মূর্খ ও ধূর্ত্ত বিধায় সেজন্য কেহ কিছু বলেন না। কিন্তু কলিকাতার বৈঠকখানার হাটে ও শিয়ালদহ ষ্টেশনে, ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর স্বাস্থ্যের-ধ্বজাধারী সরকারী ফুড-ইন্সপেক্টার মহাপ্রভুরা কি রকম ভাবে দুধে হাত ডুবাইয়া দুধ পরীক্ষা করেন, তাহা দেখিবার জিনিষ। তাঁহাদের দেখাদেখি হয়ত কুষ্ঠ ও অপরাপর দুষ্ট রোগগ্রস্ত অথবা অপরাপর লোকেরা যে-সে অবস্থায়, ময়লা হাত ডুবাইয়া, দুধের ভালমন্দ অবস্থা পরীক্ষা করে।—এইরূপে এতটুকু দুধে বহুলোকে হাত ডুবায়, কিন্তু সেই দুধ একজনে কিনিয়া লয়। এ রোগের প্রতিকার কি নাই? কতদিন ধরিয়া এ ভীষণ পাপ কার্য্য সহরবাসীরা করিতে দিবেন?

(৪) কুল্পি বরফে রক্তামাশয়।—আজ হঠাৎ কলিকাতার স্বাস্থ্য কর্ম্মকর্ত্তা কুল্‌পি বরফের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু যে পচা অবিক্রীত ক্ষীর ও ময়লা জলের সংযোগে কুল্পি (বিশেষতঃ মালাইয়ের কুল্পি) প্রস্তুত হয়, তাহাতে কুল্‌পি খাইয়া কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড্ যে হইতে পারে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে? ছয়বৎসর পূর্ব্বে, একটি সদ্যো মাতৃহীন বালক (৬ বৎসর বয়স্ক), বৈকালে একটি মালাইয়ের কুল্পি খাইয়া, রাত্রে রক্তমল ত্যাগ করিয়া, পরদিন মারা পড়ে। ভবানীপুরে বিশ্বাস-ভবনে কুল্পি ভোজনে যে সর্ব্বনাশ হয়, তাহা অনেকেই জানেন।

ইহা ছাড়া অপর প্রকারের কয়েকটি জিনিষের তালিকা দিব :—

(১) যে কাঠগুঁড়ায় বরফ ঢাকিয়া রাখা হয়, তাহা প্রকাশ্যভাবে রাস্তায় শুকাইতে দেওয়া হয় এবং যে-সে লোকে তাহা বিষ্ঠা-লিপ্ত পদে বা জুতায় সারাদিন ধরিয়া মাড়াইয়া যায়। ময়রার দোকানে খাবারের জন্য যে শালপাতা ব্যবহৃত হয়, তাহাও কম অপরিষ্কার নয়।

(২) চা'য়ের দোকানের ব্যবহৃত চা-পাতাগুলি একটি কোণে জমা করিয়া রাখা হয়। সেই পাতা হইতে সস্তার চায়ের দোকানের চা তৈয়ারি হয়।

(৩) চানাচুরের চানা (ছোলা) অধিকাংশস্থলে সহিসদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত হয়। তাহার মধ্যে কতগুলি যে ঘোড়ার মুখ হইতে আহৃত, তাহা বলা কঠিন।

(৪) "পাঁঠার" ঘুঘ্‌নি—পাঁঠার নাড়ীভুঁড়ি সিদ্ধ-করা জলে পাক করা হয়।

(৫) মাংসের হোটেলে মাংস আসিলে তাহাকে সিদ্ধ করিয়া যে জল বাহির করিয়া লওয়া হয়, সেটাতে "সুপ" (Soup) হয়। সেই অর্দ্ধসিদ্ধ মাংসকে মসলা-সংযোগে ভাল করিয়া রাঁধিয়া "কারি" (curry) তৈয়ারি করা হয়। এ বেলার "কারি"-কে পুনরায় সাঁতলাইয়া ওবেলা "টাট্‌কা" করা হয়। পরদিনে তাহাতে রকমারি মসলাসংযোগে, "কাবাব" তৈয়ারি করা হয়। অবিক্রীত কাবাব হইতে "চপ্" এবং অবিক্রিত "কাট্‌লেট্" হইতেও "চপ্" তৈয়ারি করা হয়।

(৬) "র-মিট যুষ" (raw meat juice) কি ছাগ বা মেষ মাংস হইতে হয়? এ কথার সত্যতার প্রমাণ চাই। গো-মাংস ব্যবহার না করিলে, লাভ যতটুকু থাকে, কেহ খতাইয়া দেখাইবেন কি?

(৭) হোটেলে ও চায়ের দোকানের বাসন-ধোয়া জল ও "ন্যাতা" খানি কি কেহ দয়া করিয়া পরীক্ষা করিবেন? অনেক গৃহস্থের হেঁসেলের "ন্যাতার" অবস্থাও তদ্রূপ শুনিয়াছি। কোনও কোনও "ভদ্রলোকদিগের আহারের স্থানে" পাতের অভুক্ত অন্নাদি তুলিয়া রাখিয়া, পরবর্ত্তী "ভদ্রলোক"-কে তাহা দেওয়া হয়। সরবৎ ও চায়ের দোকানে ছত্রিশ জাতি একই গ্লাসে চুমুক দেন!

(৮) ঘত বাজারের বেশ্যারা দিনের বেলায় সহরের পথের ধারে পান বিক্রয় করিতেছে—আর আজ সেই পানের বিক্রয় দিন দিন অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাইতেছে। ছেলেকে জলশৌচ করাইয়া, কোনও গতিকে হাত ধুইয়া, এবং নিজ দেহ ও মুখমোছা গামছার উপরে সাজাইয়া তাহারা যে পান সাজে না, তাহা কে বলিতে পারেন?

(৯) রাস্তার ধারে ময়রার দোকানে যে সকল খাবার সাজান থাকে (মিষ্টান্ন, তেলের খাবার, ইত্যাদি) তাহাতে রাস্তা ঝাঁট দেওয়া কত ধূলা জমাট হইয়া থাকে, তাহা ভাবিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। যে লোকেরা সে সকল খাবার তৈয়ারি করে এবং যে অপরিষ্কার হাতে তাহা বিক্রয় করে এবং রাস্তার আস্তাকুড় হইতে উড়িয়া আসিয়া যে মক্ষিকারাশি সেই খাদ্যের উপরে বসে—তাহাও ছুঁৎমার্গী, আচার ও নিষ্ঠার কড়াইকারী হিন্দুর ভাবিবার বিষয়। অথচ এসকল দোকানের খাবারই অবাধে ঠাকুরকেও নিবেদন করা হয়, এবং আদর করিয়া অতিথি, অভ্যাগত ও কুটুম্বকেও দেওয়া হয়।

(১০) মিছরির কুঁদো, মধু, গুড়—ইহাতে পড়ে না এমন কীট পতঙ্গ নাই। অথচ আমরা অসঙ্কোচে এ সকলকে ব্যবহার করি। বিলাতী লবণের স্তূপের মধ্যে মানুষের দাঁত পাওয়া গিয়াছে বলিয়া একটি বন্ধুর মুখে সংবাদ পাইয়াছি।

(১১) গৃহস্থের ভাণ্ডারে যে যে হাঁড়িতে মসলাদি রক্ষিত হয়, তাহাতে আরশুলা ও ইঁদুরের বিষ্ঠা পর্ব্বত প্রমাণে সঞ্চিত হয়, এবং অনেক সময়ে সে সকল গলাধঃকরণও হইয়া থাকে।

(১২) পাচক ব্রাহ্মণেরা এত অপরিষ্কার, এবং শতকরা একশত জন পাচক ব্রাহ্মণ এমন কুৎসিৎ রোগগ্রস্ত এবং অস্থানে বাস করে, এবং অপরিচ্ছন্নতা তাহাদিগের এত বেশী মাত্রায় মজ্জাগত, যে কেমন করিয়া ঐ সকল "বামুন ঠাকুরের" হাতে আমরা খাই, তাহা ভাবিয়া পাই না। ইহা ছাড়া যাহারা কলিকাতায় পাচকতা করে, তাহাদের মধ্যে প্রসত্যই যে কত জন ব্রাহ্মণ, তাহাও বিবেচ্য। কলিকাতার কোনও পরিবারে একাধিকবার তরকারীর সঙ্গে নেংটি ইঁদুর রাঁধা হইয়া গিয়াছে—সন্ধান পাইয়াছি! কোনও ধনীর গৃহে চাকরেরা চা-তৈয়ারি করিয়া দিবার সময়ে পাত্রস্থিত বিছাকে সেই সঙ্গে সিদ্ধ করিয়া দিয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি! পাচক ঠাকুরেরা এমনিই হুঁসিয়ার, অথচ "বামুন" হইলে, (অর্থাৎ ব্রাহ্মণেতর লোকের হাতে) খাইলে জাতি যায়!

পূর্ব্বে যখন এই কথাটা শুনিতাম ("অমুক জিনিষ খাইলে বা অমুকের স্পৃষ্ট খাদ্য খাইলে জাতি যাইবে") তখন অবজ্ঞার হাসি হাসিতাম। বলিতাম—"জাতি"-টা কি এতই ক্ষণভঙ্গুর, এতই কি ক্ষুদ্র, হেয় বা হীন যে, কথায়-কথায় নষ্ট হয়? ক্রমে যত বয়স বাড়িতেছে, ততই বুঝিতেছি যে কথাটা বড় শক্ত, বড় ঠিক্। "জাতি যায়" বলিলে ব্যক্তিগত ক্ষতি বুঝায় না—সমাজের, দেশের, একটা জাতির, ক্ষতি বুঝায়। ইংরাজ এদেশে দেড় শত বৎসর আছে, তবুও এদেশীয় বেশ-ভূষা আহারাদি লয় নাই—তাহাতে তাহাদের জাতি (জাতীয়তা) যায়। ইংরাজ এদেশে আসিয়া, এদেশের মত কাযকর্ম্ম করিবার সময়ও লয় নাই—পাছে তাহাতে তাহাদের জাতি যায়। অথচ আমরা এক্ কথায় ছত্রিশ জাতিকে অনুগ্রহ করিয়া জাতীয় বিশিষ্টতা হারাইয়া ফেলিতেছি। বিধবারা বলেন "ইংরাজী ঔষধ খাইব না—উহাতে আমার জাতি যাইবে।" বাস্তবিক আজ যদি সমস্ত হিন্দুজাতি ঐ কথা বলিত তাহা হইলে এ দেশের কত ধন এদেশেই থাকিয়া যাইত। আমরা যদি এত সহজে স্বজাতি সুলভ আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ না করিতাম, তাহা হইলে আমাদের জাতিটা আজ এত মেরুদণ্ডহীন হইয়া পড়িত না। এই জাতীয় একতা ছিল বলিয়াই, আজ সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দু বাঁচিয়া আছে। স্বপাক ভোজন এই জাতীয়তা রক্ষা করিবার একটি প্রধান অস্ত্র।

স্বপাক ভোজনের আরো একটি মস্ত কারণ আছে,—সেটি স্বাস্থ্য-রক্ষার দিক দিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। ক্ষয়কাশ বা থাইসিস্ ব্যারামের বিষ ঐ রোগীর কাশে থাকে। যদি পাচক-ঠাকুর ক্ষয়কাশ-গ্রস্ত হন, তবে তিনি যতবার পরিবেশন বা রন্ধন করিতে করিতে কাশিবেন, ততবারই খাদ্যদ্রব্যে ঐ রোগের বিষ ছড়াইবেন। যে লোক সম্প্রতি টাইফয়েড্ জ্বরে ভুগিয়াছে বা যাহার টাইফয়েড্ জ্বর সবে মাত্র ধরিয়াছে, সে ব্যক্তির থুথুতে ঐ ব্যারামের জীবাণু থাকে। পাচক ঠাকুর অনেক সময়ে দোক্তা ও পানভরা মুখ বা ঠোঁট শুধু আঙ্গুলিদ্বারা মুছিয়া, হাত না ধুইয়া, খাদ্যদ্রব্যে হাত দেন—এবং এইরূপে বাড়ীতে টাইফয়েড্ রোগের আমদানী করেন। যে লোকের কলেরা বা ওলাউঠা হইয়াছিল, বহুকাল ধরিয়া তাহারও মুখের লালায় ঐ রোগের বিষ বর্ত্তমান থাকে। কাযেই বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত অকস্মাৎ ও অলক্ষিতে "পাচক ঠাকুর" কর্ত্তৃক সংসারে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইতে পারে। যাঁহারা উপদংশ বা গর্ম্মীর ব্যারামে পীড়িত, তাঁহাদের এঁটো করা বাসনে চা বা হোটেলে খানা খাইয়া ঐ ব্যারাম হওয়া বিচিত্র নয়।

সমস্ত হিন্দুস্থানের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু অনেক বাঙ্গালীর কথা বলিতে পারি যে—তাঁহারা স্বজাতীয় লোকের সনির্ব্বন্ধ উপরোধ ত্যাগে সমর্থ হইলেও অধিকাংশস্থলে সাহেবের খাতির এড়াইতে পারেন না। হয় ত কোনও বাঙ্গালীর অনুরোধে কোনও হিন্দু কুক্কুট ভক্ষণে অসম্মত হইতে পারেন, কিন্তু সাহেবের পাল্লায় পড়িয়া, তাঁহার গরম-গরম বুলি ও শ্লেষমাখান কথা ঠেলিয়া সাহেবের খানা প্রত্যাখ্যান করিবার সৎসাহস অনেক বাঙ্গালীরই হইবে না। এই সকল অনুরোধ এড়াইবার জন্যও স্বপাক ভোজন করা উচিত।

স্বপাক ভোজনের শাস্ত্রীয় যুক্তিও আছে। আমরা ইংরাজী পড়িয়া "পাপ" বলিলে Sin বুঝি। হিন্দুদিগের মতে, যাহা হইতে দুঃখের উৎপত্তি হয়, তাহাই পাপ। এমন অবস্থায়, পাপ একজন হইতে অপর জনে সংক্রমিত হইতে পারে। শাস্ত্রীয় পুস্তকে পড়িয়াছি যে চৌর্য্যবৃত্তি-দ্বারা আহৃত অন্ন ভোজন করিয়া সাধুব্যক্তি চৌর্য্যভাবাপন্ন হইয়াছেন; অসাধুর অন্ন ভোজন করিয়া সাধু কষ্টে পড়িয়াছেন—অর্থাৎ অন্নদ্বারা পাপও সংক্রমিত হইয়াছে।

স্বপাক ভোজন করিলে, বেশী রমকারি করা চলে না—মোটামুটি

ভাবেই রন্ধন করিতে হয়। আমরা অন্নভোজী এবং শারীরিক শ্রম-বিমুখ। কাযেই আমরা আহারে বাহুল্য করিতে গেলে, মধুমেহ (ডায়াবিটিস) অবশ্যম্ভাবী। এই জন্য, মিতাচারের সুযোগ আছে বলিয়াও স্বপাকভোজী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, স্বপাক ভোজন করিলে, ব্যক্তিগত-ভাবে—স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, সংযম-অভ্যাস হয়, ভগবদ্ভক্তির বৃদ্ধি হয় ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয়। সামাজিক হিসাবে—জাতীয়তা সংরক্ষিত হয়।

গোঁড়ামি করা আদৌ আমার অভ্যাস নয়—অথচ আমি স্বপাক ভোজনের সপক্ষে ওকালতি করিতেছি। তাহার কারণও উপরে দিয়াছি। পূর্ব্বাপেক্ষা আমাদের মধ্যে ক্ষয়কাশ, টাইফয়েড্ প্রভৃতি অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে; পূর্ব্বাপেক্ষা, জাতি হিসাবে, আমরা ক্রমশঃই মেরুদণ্ডহীন হইয়া পড়িতেছি; খাদ্যে ভেজালও যে মাত্রায় বাড়িতেছে, শ্রমজীবিকুলেরও সেই মাত্রায় অত্যাচার বাড়িয়াছে। এই সব দেখিয়া-শুনিয়া স্বপাক ভোজনের অতীব উপকারিতা ক্রমশঃই হৃদয়ঙ্গম করিতেছি। স্বপাক ভোজনে যে সময়টুকু ব্যয়িত হয়, তাহা অতি সামান্য। এক একটা ব্যারামে ভুগিয়া যে সময় যায়, স্বপাক ভোজনে তাহা অপেক্ষা অনেক কম সময় লাগে। যেখানে সুযোগ ও সুবিধা হইবে, সেখানেই ইহা প্রবর্ত্তিত হইলে ভাল হয়। "ভাজা মাছখানি উল্টাইয়া খাইতে জানে না"—ইহা নিন্দারই কথা; ইহার ব্যতিক্রম ঘটনাই শ্রেয়ঃ। "মেসে," "হোটেলে" ছেলেরা দাসদাসীর ষোল আনা দয়ার উপরে নির্ভর করে। পাঁচ দশ জন যদি মিলিয়া পালাক্রমে রান্নার ভার লয়েন, তবে তাঁহারা খাইতেও পান ভাল এবং সৌহার্দ্দ্য, সম্প্রীতিও তাঁহাদের মধ্যে বাড়িয়া যায়। শুধু games and sportsই যে discipline, sprit de crops শিখায় তাহা নহে, এক সঙ্গে থাকিয়া games and sports না খেলিয়াও টোলের ছাত্রেরাও ঐ জিনিষ বেশী করিয়া শিখিত।

সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের কথা ও কার্য্য

অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

সম্রাট্ জাহাঙ্গীর আত্ম-জীবনীতে স্বকৃত দ্বাদশটী সংকার্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই সকল উক্তির সত্যতা ঐতিহাসিক প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। বরং সমসাময়িক বৈদেশিক ভ্রমণ-কারিগণের লিখিত বিবরণ ও অন্যান্য ঐতিহাসিক প্রমাণ জাহাঙ্গীরের উক্তির ঠিক বিপরীত। ঐতিহাসিক ইলিয়ট্ এই বিষয়ের সমস্ত প্রমাণ একত্র করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধটী বহু তথ্য-পূর্ণ; এবং বোধ হয় এ বিষয়ে আর অধিক তথ্য-সংগ্রহ সম্ভবপর নহে (১)। বর্ত্তমান প্রবন্ধটীর অধিকাংশ ইলিয়ট্ সাহেবের প্রবন্ধের অনুবাদ হইলেও, বাঙ্গালা ইতিহাস-পাঠকগণের নিকট চিত্তাকর্ষক হইবে বলিয়া মনে হয়। নিম্নে জাহাঙ্গীরের উক্তিগুলি একটী-একটী করিয়া বিপরীত প্রমাণ সহ উদ্ধৃত হইল।

জাহাঙ্গীরের তোষামোদকারিগণ তাঁহার স্ব-লিখিত সংকর্ম্মগুলির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন; এখন দেখা যাউক, নূতন সংকার্য্যের প্রবর্ত্তন অথবা নিজ আদেশ কার্য্যে পরিণত করার জন্য তিনি কত প্রশংসা পাইতে পারেন।

প্রথম উক্তি।

"তম্‌ঘা ও মির বাহরী এই নামের করসকল আমি উঠাইয়া দিলাম; এবং উহার সহিত প্রত্যেক সুবা ও সরকারের জায়গীরদারেরা নিজেদের জন্য যে সমস্ত কর আদায় করিয়া আসিতেছিল, সেগুলিও উঠাইয়া দিলাম।"

টীকা।

পূর্ব্বোক্ত ঘোষণা দ্বারা জাহাঙ্গীর তাঁহার পিতার শাসনকার্য্যের উপর অন্যায় দোষারোপ করিতেছেন। আকবর তম্‌ঘা ও মির বাহরী নামক উভয়বিধ কর উঠাইয়া দিবার জন্য কঠোর আদেশ দিয়াছিলেন (২)। জাহাঙ্গীরের উক্তি হইতে বোধ হয়, তাঁহার মনের ভাব এই যে, তিনিই প্রথম ঐ করগুলি তুলিয়া দেন; কিন্তু ইহা সত্য নহে।

মুসলমানগণের উপর তম্‌ঘা আদায় বিষয়ে বাবরের আদেশও কঠোর ছিল। এ বিষয়ে তাঁহার উক্তি এই:—"আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে কোন নগরে, রাজপথে, ঘাঁটীতে অথবা অন্য কোন স্থানে যেন তম্‌ঘা আদায় করা না হয় (৩)। তম্‌ঘা এক প্রকার বাণিজ্য-শুল্ক।

এই কর উঠাইয়া দেওয়া সম্বন্ধে আইন-ই-আকবরি বলেন:—"সম্রাট্ আকবর পরোপকার উদ্দেশ্যে এই কর তুলিয়া দিয়াছেন, ইহার পরিমাণ একটী রাজত্বের রাজকরের সমান। অধুনা আমদানি বা রপ্তানির উপর কোন কর লওয়া হয় না। কেবল বন্দরে যৎকিঞ্চিৎ শুল্ক লওয়া হয়, উহার পরিমাণ শতকরা ২॥০ আড়াই টাকা। এই কম শুল্ক লওয়াকে মহাজনেরা শুল্ক-রেহাই বলিয়া মনে করে।" (Gladwin's Ain-i-Akbari vol. I p. 233.)

জাহাঙ্গীরও আত্মজীবনীর অন্যত্র শতকরা আড়াই টাকা শুল্কের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অথচ নিজের কীর্ত্তি-ঘোষণার সময় বলিয়াছেন যে, তিনি তম্‌ঘা বা বাণিজ্য-শুল্ক একেবারেই তুলিয়া

(১) Elliot and Dowson, vol VI. Note C.

(২) Bird's History of Gujrat p 407, এবং Gladwin's Ain-i-Akbari, vol. I, p. 288, 3, 9,

(৩) Erskine's Memoirs of Babar pp. 355-357। তম্‌ঘা বা বাণিজ্য-শুল্ক সম্বন্ধে একাধিক রাজার পুনঃ-পুনঃ একই আদেশ প্রচার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আদেশ যিনি প্রচার করিয়াছেন, তাঁহার ক্ষমতা খুব কমই ছিল; অথবা তাঁহার বংশধরেরা পূর্ব্বপুরুষের কৃতকার্য্যের গৌরব নিজেরা গ্রহণ করিবার জন্য একই আদেশ পুনঃ প্রচার করিয়াছেন।

দিয়াছেন। জাহাঙ্গীরনামায় সম্রাট্ নিজে বলিতেছেন :—"গুজরাটে মুলতানী আমলে যে তম্‌ঘা অর্থাৎ বাণিজ্য শুল্ক মহাজনদের নিকট আদায় করা হইত, তাহার পরিমাণ খুব বেশী ছিল। কিন্তু এখন আদেশ দেওয়া হইতেছে যে, চল্লিশের মধ্যে এক অংশের বেশী যেন আদায় করা না হয়। অন্যান্য দেশে বাণিজ্যসম্বন্ধীয় রাজকর্ম্মচারীরা দশমাংশ অথবা বিংশতিতম অংশ গ্রহণ করে এবং ব্যবসাদার ও পথিকগণকে সকল রকম ক্লেশ ও বিরক্তি প্রদান করে—(Wakiat-i-Jahangiri, Elliot vol. VI, p. 354)

জাহাঙ্গীর যে তম্‌ঘা একেবারে তুলিয়া দেন নাই, তাহা বৈদেশিক পর্য্যটকগণের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে জানা যায়।

কাপ্তেন হকিন্স বলেন—"মুথরাব্ খাঁ (যিনি কাম্বে প্রদেশের শাসন কর্ত্তা এবং রাজকীয় বাণিজ্য-শুল্ক আদায় করা ছাড়া সুরাট বন্দরে যাঁহার আর কোন কার্য্য ছিল না) আমার সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী হস্তগত করিয়া, যাহা ইচ্ছা নিজে লইলেন, এবং যাহা ইচ্ছা হইল রাখিয়া দিলেন। উহার পরিবর্ত্তে তাঁহার বর্ব্বরতাপূর্ণ বিবেকে যাহা লইল সেই দাম তিনি দিলেন; যথা—পঁয়ত্রিশ টাকা ঠিক করিয়া আঠার টাকা দিলেন"—(Captains Hawkin's Narrative in Purchas's Pilgrims vol. I, p. 208)।

আর দুইজন ইয়োরোপীয় ভ্রমণকারী বলেন :—"প্রত্যেক মহাজন-দলকেই মুলতানে দশ কি বার দিন থাকিতে হয়; ইহার পর শাসন-কর্ত্তার নিকট হইতে যাত্রা করিবার অনুমতি পাওয়া যাইতে পারে। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য এই যে, মহাজনদিগের নিকট হইতে কিছু লাভ করা। আমরা পাঁচ দিন ছিলাম; তার পর একটী উপহার দিয়া, তথা হইতে যাত্রা করিবার অনুমতি পাইয়া আনন্দিত হইলাম।" (Journey of R. Steel and J. Crowther—Purchas, vol. I, p. 2521).

সমসাময়িক পর্য্যটক সার টমাস্ রো বলেন :—"আমি দেখিলাম যে, যে সকল ইংরাজ আমেদাবাদে বাস করিতেছিল, তাহারা শাসনকর্ত্তার হাতে শারীরিক ও আর্থিক নানা রকম অত্যাচার সহ্য করিত। তাহাদিগকে জরিমানা করা হইত, যথেচ্ছ অর্থ তাহাদিগের নিকট হইতে জোর করিয়া আদায় করা হইত এবং তাহাদিগকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত; এবং প্রত্যেক নগরে বন্দর অভিমুখে প্রেরিত দ্রব্যসামগ্রীর উপর নূতন-নূতন কর আদায় করা হইত (Sir. T. Roe in Kerr's Collection of Voyages and Travels, vol. IX, p. 264).

দ্বিতীয় উক্তি।

"আমি আদেশ দিলাম যে, যে সকল রাজপথে দস্যুর উৎপাত হয়, সেই সকল রাস্তার পার্শ্বে যে যে স্থান জনশূন্য, সেখানে একটী সরাই ও একটী মসজিদ নির্ম্মাণ করা হউক; এবং একটী কূপ খনন করা হউক। ইহা দ্বারা পতিত জমি বাসোপযোগী হইবে, এবং ঐস্থানে লোকের বাস আরম্ভ হইবে। যদি কোন জায়গীরে ঐ কার্য্য করা আবশ্যক হয়, তবে জায়গীরদারেরা নিজ ব্যয়ে ঐ সকল ব্যবস্থা করিবে; কিন্তু যদি খালসা জমিতে হয়, তবে সরকার হইতে ঐ কার্য্য করা হইবে।"

টীকা।

জায়গীরদারগণের উপর এই ভার চাপাইয়া দেওয়ার ফলে, পিতার সময়ের যে-যে জায়গীরের অধিকারিগণকে জাহাঙ্গীর দশম উক্তি দ্বারা স্ব-স্ব সম্পত্তিতে বহাল রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্পত্তির মূল্য অনেক কমিয়া গিয়াছিল। উত্তরকালে যে সকল রাজপথের পার্শ্বে জন-বসতি আছে, সেখানেও খালসা জমির উপর সরাই নির্ম্মাণের ভার সরকার নিজে না লইয়া মন্দভাগ্য ভূম্যধিকারীগণের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াছিলেন (See Price's Memoirs of Jahangir, p. 90)। উক্ত সরাই-নির্ম্মাণকার্য্য জাহাঙ্গীরের পূর্ব্ব হইতেই সাধারণ ভাবে আরম্ভ করা হইয়াছিল। কারণ সেরশাহ এবং সেলিমশাহ ঐ কার্য্য করিয়াছিলেন; এবং জাহাঙ্গীর যত দূরে দূরে সরাই নির্ম্মাণ করার কথা মনে করিয়াছিলেন, উঁহারা তার অপেক্ষা আরও কাছাকাছি সরাই প্রস্তুত করাইয়াছিলেন (Tarikh-i-Badauni, Elliot, vol. V p. 486)।

কিন্তু দস্যুর উৎপাত চলিতে লাগিল। সমসাময়িক ইয়োরোপীয় পর্য্যটক কাপ্তেন পেটন বলেন :—"সার. এইচ্. সার্লি (Sir H. Shirley) থাটা নগরে (Thatta) রহিলেন; পরে সুবিধামত আগ্রা যাত্রা করিলেন। এই দীর্ঘপথ ভ্রমণ ক্লান্তিজনক, এবং পথে বরাবর চোরের উৎপাত ছিল"। (Captain Walter Peyton, in Purchas' Pilgrims, vol. II p. 530)

রাজপথ সকল সুব্যবস্থামত রাখিবার জন্য জাহাঙ্গীরের পিতাও আদেশ দিয়াছিলেন। আইন-ই-আকবরীতে সিপাহ-সলারগণের প্রতি এই আদেশ আছে :—"জলাশয়, কূপ, ও খাল খনন করা, বাগান তৈয়ারী করা, সরাই-নির্ম্মাণ এবং অন্যান্য পুণ্য-কর্ম্ম করার প্রতি তাহাকে মনোযোগ দিতে হইবে; এবং ঐ গুলির মেরামত করাও তাহার কর্ত্তব্য। (Gladwin's Ain-i-Akbari, vol. I, p. 297)।

সরাই-সম্বন্ধে সমসাময়িক পর্য্যটক টেরি বলেন :—"এই দেশে ভ্রমণকারী ও বিদেশী লোকের জন্য পান্থশালা (inns) অথবা বিশ্রাম-গৃহ নাই। কিন্তু বড় বড় সহরে, পথিকগণের জন্য বড় বড় সুন্দর বাড়ী আছে, উহাদিগকে সরাই বলে" (Rev. E. Terry, in Purchas vol. II, p. 1470)

ঐ সমস্ত সরাই সাধারণ লোকেও প্রস্তুত করাইত :—"অনেক হিন্দু তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি সৎকার্য্যে ব্যয় করে, যথা, কূপ খনন, সরাই নির্ম্মাণ অথবা সাধারণ পথের পার্শ্বে পুষ্করিণী খনন"। (Rev. E. Terry in Purchas, vol. II p. 1475)।

বিদেশী পর্য্যটকেরা দেশের যে অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে বোধ হয় যে, শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা অতি শোচনীয় ছিল :—সমস্ত দেশ চোর ও দস্যুতে এত পরিপূর্ণ ছিল যে, প্রহরীদল না লইয়া ঘরের বাহির

হওয়া যায় না ; কারণ সমস্ত লোক বিদ্রোহী হইয়াছে।"—Narrative of William Hawkins in Purchas, vol I, p. 230)।

সার টমাস্ রো বলেন :—"আমার কাগজপত্রগুলি নিরাপদে পাঠাইবার জন্য আগ্রা হইতে সুরাটগামী বণিকদলের (caravan) আগমন প্রত্যাশায় আমি এই মাসের অবশিষ্ট ভাগ কাটাইলাম।" (Sir T. Roe in Kerr's Collection of Voyages and Travels vol. IX, p. 320)।

আর একটী জনবহুল রাজপথ সম্বন্ধে একজন ইংরাজ পর্য্যটক বলেন :—"কাম্বে হইতে আহমেদাবাদ ৩৮ ক্রোশ ; মরুভূমি ও জঙ্গলের মধ্য দিয়া রাস্তা গিয়াছে। এই রাস্তায় খুব চোরের উৎপাত আছে।" (Observations of William Finch, Purchas vol. I, p. 230)

আর একজন বলিতেছেন :—"পথিমধ্যে আমার পোষাক ও আমার আর যাহা কিছু ছিল সবই অপহৃত হইল। আগ্রা হইতে সিন্ধু ও সুরাট যাইতে একই সময় লাগে ; কিন্তু সিন্ধু-পথেই চোরের উৎপাত বেশী।"—(Nicholas Whittington, in Kerr's Collection, vol. IX, p. 131)।

এমন কি আগ্রা হইতে লাহোর পর্য্যন্ত যে রাজপথ ছিল, যাহার দুই পার্শ্বে তুঁতগাছ (mulberry) রোপিত ছিল, সেই পথ সম্বন্ধে দুইজন বণিক্ বলিয়াছেন :—"রাত্রে এই রাস্তায় এত চোরের উৎপাত যে, ভ্রমণ করা বিপজ্জনক ; কিন্তু দিনের বেলায় নিরাপদ।" (Journey from Ajmere to Ispahan in Purchas's Pilgrims, vol. I, p. 520)।

অতএব, সেকালে সরাই নির্ম্মাণ করা বিশেষ আবশ্যক ছিল ; নচেৎ যাতায়াত অথবা ব্যবসা মোটেই হইতে পারিত না। অথচ জাহাঙ্গীর ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীগণের চেষ্টার ফলে চোর ডাকাতের উৎপাত বন্ধ হয় নাই।

তৃতীয় উক্তি।

"পথিমধ্যে কোন ব্যক্তি মালিকের স্পষ্ট সম্মতি ব্যতীত কোন লোকের বাণিজ্য-দ্রব্যের মোট খুলিতে পারিবে না। আমার সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র, কোন সরকারী কর্ম্মচারী কোন মৃত বিধর্ম্মী (যথা, হিন্দু) অথবা মুসলমানের সম্পত্তি দাবী করিতে পারিবে না.; মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি তাহার উত্তরাধিকারীরা পাইবে। যদি কোন উত্তরাধিকারী না থাকে, তবে ঐ কার্য্যের জন্য নিযুক্ত কর্ম্মচারীরা ঐ সম্পত্তির ভার গ্রহণ করিবে। ঐ সম্পত্তির আয় সরাই নির্ম্মাণ, পোল মেরামত এবং পুষ্করিণী ও কূপ খননে ব্যয়িত হইবে।"

টীকা।

উত্তরাধিকারীর সম্পত্তি পাওয়া তায়মুরের ব্যবস্থার অন্তর্গত (Davy and White's Institutes of Timur) ; এস্থলে তাহারই পুনরুক্তি করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থামত কতটুকু কার্য্য করা হইয়াছিল, তাহা ইহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, জাহাঙ্গীরের পৌত্র আওরঙ্গজেবও এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। রাজা কর্ত্তৃক মৃত প্রজার সম্পত্তি আত্মসাৎ করণ রূপ নিয়ম তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা বরাবর করিয়া আসিতেছেন, এ কথা আওরঙ্গজেব বলিয়াছেন (Mirat-ul-Alam. See also Aurangzib's letter to Shah Jahan on this point in Bernier's Travels, edited by Constable and Smith)।

প্রজার সম্পত্তি আত্মসাৎ করার কথা জাহাঙ্গীর অন্যত্র নিজ মুখেই বলিয়াছেন :—"আমার পিতার অন্তঃপুরের খোজাদিগের সর্দ্দার ছিলেন দৌলত খাঁ, এবং এই চাকুরী করিয়া ইনি নাজির-উদ্দৌলা এই উপাধি প্রাপ্ত হন। আমি এ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, ঘুস লওয়া এবং কর্ত্তব্যের প্রত্যেক নিয়ম অমান্য করা সম্বন্ধে, সাম্রাজ্যের মধ্যে ইহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। মৃত্যুর পর ইনি যে সোণারূপা রাখিয়া যান, তাহার মূল্য পাঁচ মিৎকল ওজনের আসরফির দশকোটী আসরফি। ইহা ব্যতীত তাঁহার জহরতের মূল্য তিন কোটী (১২ কোটী পাউণ্ড, অর্থাৎ এখনকার প্রায় ১৮০ কোটী টাকা)। এই সমস্ত সম্পত্তি আমার পিতার ধনাগারভুক্ত হইল।" (Price's Memoirs p. 34), কিন্তু দৌলত খাঁ জাহাঙ্গীরের রাজত্বের সপ্তম বর্ষে মারা যান ; অতএব তাঁহার সম্পত্তি পিতা না পাইয়া পুত্রই পাইয়াছিলেন।

উত্তরাধিকারীর সম্পত্তি পাওয়া সম্বন্ধে জাহাঙ্গীরের পিতার আদেশ অপেক্ষাকৃত উদারতাপূর্ণ। এ বিষয়ে রাজকর্ম্মচারীর প্রতি আকবরের আদেশ এই :—"তিনি মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এবং মৃত ব্যক্তির আত্মীয় ও উত্তরাধিকারীকে উহা দিবেন। কিন্তু যদি কেহ সম্পত্তির দাবী না করে, তবে তিনি উহা যত্নে রক্ষা করিবেন এবং সরকারে উহার একটি বিবরণ প্রেরণ করিবেন, যেন প্রকৃত উত্তরাধিকারী উপস্থিত হইলে সে সম্পত্তি পাইতে পারে। মোট কথা, তিনি সততার সহিত এবং বিবেকমত কার্য্য করিবেন, যেন কনষ্টাণ্টিনোপল সাম্রাজ্যে যেরূপ হয় এখানে সেরূপ না হয়।" (Bird's History of Gujrat p' 403, এবং Gladwin's Ain-i- Akbar, voll I, p. 302)।

প্রজার সম্পত্তি-গ্রহণ সম্বন্ধে উইলিয়ম হকিন্স বলেন :—"মোগল রাজার নিয়ম এই যে, মৃত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্পত্তি তিনি গ্রহণ করেন, এবং মৃত ব্যক্তির সন্তানগণকে যাহা ইচ্ছা দিয়া থাকেন। তবে সাধারণতঃ তিনি উহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন। আমার সময়, রাজা গগিনাথ (গোপীনাথ ?) নামক এক সম্ভ্রান্ত পৌত্তলিকের (হিন্দুর) মৃত্যু হয় ; তাহার সম্পত্তি রাজা আত্মসাৎ করিলেন। ইহা ব্যতীত জহরৎ, সোণা-রূপা এবং অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদিও রাজা গ্রহণ করিলেন। কেবল সোণার পরিমাণই ছিল ৬০ খাট 'মণ'। প্রত্যেক 'মণের' ওজন ২৫ পঁচিশ পাউণ্ড (Narrative of William Hawkins in Purchas's Pilgrims, vol. I, p. 220)।

সার টমাস্ রো বলেন ;—"গত রাত্রিতে গোসলখানায় লাহোরের শাসনকর্ত্তা সেখ ফরিদের জহরত সকল তাঁহাকে (জাহাঙ্গীরকে) উপহার দেওয়া হইল। সেখ ফরিদের সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে।" (Sir T.

Roe in Kerr's Collection of Voyages and Travels, vol. IX, p. 283)।

"সম্প্রতি তাঁহার (জাহাঙ্গীরের) ভৃত্য হরগোবিন্দের মৃত্যু হইয়াছে এবং তাহার দ্রব্যসামগ্রী রাজা গ্রহণ করিয়াছেন।" (Sir T. Roe in Kerr's Collection, vol. IX, p. 346)।

"এই সাম্রাজ্যের কোন প্রজা উত্তরাধিকার সূত্রে ভূ-সম্পত্তি ভোগ করিতে পারে না; এবং রাজার ইচ্ছা ভিন্ন কোন প্রজার এ বিষয়ে কোন দাবী নাই। এই কারণে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি জীবদ্দশায়ই ধনসম্পত্তি নিঃশেষে ভোগ করিয়া থাকেন। পাছে একেবারে বঞ্চিত হইতে হয়, এই আশঙ্কায় বণিক এবং অন্যান্য লোকেরা অতি সাবধানে নিজ নিজ সম্পত্তি গোপন করিয়া রাখেন। সম্ভ্রান্ত লোকদের পুত্রগণকে রাজা জীবনযাপনের জন্য অল্প কিছু বৃত্তি দিয়া থাকেন; তাহাদের পিতারা যে রাজানুগ্রহ ভোগ করিতেন, ইহারা যদি সেই অনুগ্রহ লাভ করিতে সমর্থ না হয়, তবে অবস্থার উন্নতি করিতে পারে না"। (Sir T. Roe in Kerrs' Collection vol. IX, p. 414)।

এখন বণিকগণের দ্রব্যসামগ্রীতে তাহাদের সম্মতি না লইয়া কিরূপে হস্তক্ষেপ করা হইত, তাহা দেখা যাউক।

সহরে মহাজনদের জিনিষপত্রের মোট খুলিয়া ফেলা সম্বন্ধে খুব কমই বাধা ছিল। লাহোরের অধিবাসীগণকে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল যে, যুবরাজের অভ্যর্থনা যতদূর সম্ভব জাঁকজমকের সহিত করিতে হইবে এবং এই বিষয়ে নাগরিকগণ সর্ব্বরকম সাহায্য করিবে; সুবর্ণ-ময় গালিচা, নানারকম প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত কারুকার্য্য-বিশিষ্ট পর্দ্দা এবং সুবর্ণ-নির্ম্মিত সামিয়ানা, ইয়োরোপ ও চীনদেশে প্রস্তুত এই সকল দ্রব্য দ্বারা রাজপথ, বাজার, সহরের মধ্যে এবং বাহিরে প্রায় চারিক্রোশ পর্য্যন্ত পথ সুসজ্জিত করিতে হইবে। এবং কোতোয়ালকে আদেশ দেওয়া হইল যে, চারি বা পাঁচ দিন পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত জিনিষ তিনি যেন প্রস্তুত রাখেন। (Prices' Memoirs, p. 130)।

ঐতিহাসিক এলফিনষ্টোন বলেন:—"সমুদ্রের বন্দরসমূহে এবং বাণিজ্য-শুল্ক বিভাগে ভীষণ দুর্নীতি প্রচলিত ছিল। শাসনকর্ত্তারা মহাজনদের জিনিষপত্র ইচ্ছামত গ্রহণ করিয়া যাহা ইচ্ছা দাম দিতেন। এমন কি রো সাহেব অন্য বিষয়ে সসম্মান ব্যবহার পাইলেও, তাঁহার জিনিষপত্র খানাতল্লাসী করা হইয়াছিল এবং শাসনকর্ত্তা কতকগুলি জিনিষ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন।" (Elphinstone's History of India, vol. II, p. 323) রো সাহেবের নিজের উক্তি এই:—"আমরা শেষে অক্টোবর পর্য্যন্ত এখানে রহিলাম; শাসনকর্ত্তার হাতে আমরা কষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করিলাম। ইনি বলপূর্ব্বক আমাদের বাক্স, পেঁটরা খানাতল্লাসী করিলেন, এবং যাহা পছন্দ হইল আত্মসাৎ করিলেন।" (Sir T. Roe in Kerrs' Collection, vol. IX, p. 255)।

"যুবরাজ নিজের নীচ লোভ চরিতার্থ করিবার জন্য উপঢৌকনগুলি ও অন্য দ্রব্য সামগ্রী পথিমধ্যে হস্তগত করিয়াছেন। এদেশের লোকদের নিয়ম এই যে, রাজার কাছে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সমস্ত বণিক্‌দিগের জিনিষপত্র ইঁহারা দেখিয়া থাকেন; উদ্দেশ্য এই যে প্রথমেই ইঁহারা নিজেদের পছন্দমত জিনিষ আত্মসাৎ করিতে পারেন।" (Ibid. p 327)।

"ইতিমধ্যে রাজা গোপনে বাক্সগুলি নিজের কাছে আনাইয়া খুলিয়া দেখিয়াছেন" (Ibid 329)।

'তিনি (বাদশাহ) সিন্দুকটী খুলিয়াছেন এবং চিঠিখানি পড়াইবার জন্য পাদ্রীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। পরে বাক্সগুলির মধ্যে যাহা কিছু আছে সব খুলিয়া দেখিলেন, কিন্তু পছন্দ মত কোন জিনিষ না পাইয়া, সবগুলি ফেরত দিলেন।" (Ibid p. 341)।

রো সাহেবের উপরিউক্ত উক্তিগুলি দ্বারা ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, জাহাঙ্গীর এবং প্রত্যেক রাজপুরুষ বণিক্‌দিগের দ্রব্য-সামগ্রীতে যখন তখন ইচ্ছামত হস্তক্ষেপ করিতেন এবং মনোনীত জিনিষ বরাবরই বলপূর্ব্বক আত্মসাৎ করিতেন। রো সাহেব একবার এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন:—

"আমি বলিলাম যে, যদি অনবরতই আমাদের দ্রব্যসামগ্রী বলপূর্ব্বক গ্রহণ করা হয়, এবং ঐ সমস্ত দ্রব্য আমরা ফেরতও না পাই, এবং উহার মূল্যও না পাই, তবে আমাদের এদেশে থাকা অসম্ভব হইবে। আমি এই কথাগুলি একটু ক্রোধের সহিতই বলিলাম। রাজা "বলপূর্ব্বক" এই কথাটি ধরিয়া বসিলেন এবং পুত্রকে ঐ কথাটি শুনাইয়া তাঁহাকে তীব্র ভর্‌ৎসনা করিলেন। যুবরাজ বলিলেন যে, আমাদের যে যে জিনিষ লওয়া হইয়াছে, তাহার মূল্য যাহাতে দেওয়া হয়, তাহা তিনি করিবেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও বলিলেন, তিনি কিছুই আত্মসাৎ করেন নাই, কেবল উপহার দ্রব্যগুলি শীলমোহর করিয়াছেন; এবং তাঁহার কর্ম্মচারীরা ঐ সকল দ্রব্যের জন্য কোন শুল্ক না পাওয়ায় তিনি নিজের সম্মুখে ঐগুলি খুলিয়া দেখিয়াছেন।" (Sir T. Roe in Kerr's Collection, vol. IX, p. 381)।

বণিক ও পথিকগণের দ্রব্যসামগ্রী খুলিয়া দেখা এবং তাহাদের গায়ের কাপড় চোপড় পর্য্যন্ত খানাতল্লাসী করা এই সময় পুরামাত্রায় চলিত। সুতরাং জাহাঙ্গীরের ঘোষণা ভ্রমপূর্ণ বলিয়াই বোধ হয়। এ সম্বন্ধে আর একজন ঐতিহাসিক বলিয়াছেন:—

"এই অপমান-জনক শরীর-খানাতল্লাসীর (personal search) প্রথা স্থানীয় শাসনকর্ত্তাদের বড়ই প্রিয় ছিল; ইহার সহিত লোকের গাঁটরি, বোঁচ্‌কা, খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করার প্রথাও বর্ত্তমান ছিল, এবং ইহা দ্বারা উহারা মূল্যবান্ দ্রব্যসামগ্রী নামমাত্র দামে পাইতেন; শাসনকর্ত্তাদের অনুচরেরাও এই সুবিধায় কিছু স্বর্ণ (অর্থাৎ ঘুষ) অথবা সমমূল্যবান্ কোন জিনিষ না লইয়া ছাড়িত না। এই সকল ক্ষেত্রে অর্থলোভ, ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি ও রুচির প্রভাব দেখা যাইত; এবং পূর্ব্বতন সকল ভ্রমণকারীরাই নিগ্রহ করিয়া অর্থ গ্রহণ করিবার এই কুপ্রথার কথা বলিয়া গিয়াছেন।" (Briggs, Cities of Gujarastra)

ঐতিহাসিক এলফিনষ্টোন্ জাহাঙ্গীরের সময়ের এই দুর্নীতি সম্বন্ধে বলেন:—"একদা সুরাট হইতে রাজদূতের (রোর) নিকট প্রেরিত

দ্রব্যসম্ভারবাহী একদল লোককে তিনি মধ্যপথে আটক করেন; এই দ্রব্যসম্ভার তাঁহার (জাহাঙ্গীরের) নিজের এবং সভাসদ্গণের মনস্তুষ্টির জন্ম উপঢৌকন দেওয়া হইবে, এই জন্মই প্রেরিত হইয়াছিল, এবং যে কতিপয় মহাজন এই রক্ষীদলের আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাদের জিনিষ-পত্রও এই সঙ্গে ছিল। তিনি (জাহাঙ্গীর) নিজে (বালকের মত কৌতূহলী হইয়া) মোটগুলি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিলেন; এবং রো (Roe) এই সাধারণ ভদ্রতাবিরুদ্ধ কার্য্যে রুষ্ট হওয়ায়, অতি দীন ভাবে ক্ষমা চাহিয়াছিলেন।" (Elphinstons, vol. II, p. 326)।

ভারতীয় কয়লা

শ্রীপ্রমোদচন্দ্র গুপ্ত বি-এস্-সি

আপনারা বোধ হয় সবাই জানেন যে, আজকাল সমস্ত জগতের শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে দুইটী জিনিষের উপরে। একটী ইলেকট্রিসিটি, অপরটী উত্তাপ। ইলেকট্রিসিটি তৈরী করতে কয়লার দরকার হয় খুব কম। আর বাষ্পীয় এঞ্জিনগুলির একমাত্র শক্তি উৎপাদক হচ্ছে কয়লা। তাই আজকাল জগতের মধ্যে কয়লা একটা প্রসিদ্ধ জিনিষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশে দুর্ভিক্ষ হলে যত না লোকের ভয় হয়, কয়লার অভাবে তার চেয়ে ভয় অনেক বেশী হয়। এজন্মই বিগত য়ুরোপীয় মহাসময়ে গভর্ণমেণ্ট প্রথমেই কয়লার উপরে Control বসাইয়াছিলেন। সেদিন যখন ই, আই, রেলে ধর্ম্মঘট হল, সঙ্গে-সঙ্গে অনেক রেল কোম্পানীকে বাধ্য হয়ে অনেক ট্রেণ গুটাতে হ'ল; কারণ, এসব এঞ্জিনের শক্তি দেবে কে? আর তখন দরিদ্র গৃহস্থের যে কি দুর্দ্দশা হয়েছিল, তা বোধ হয় ভুক্তভোগীরা অনায়াসেই বুঝতে পারেন।

আমাদের ভারতবর্ষে অনেক কয়লা আছে; অথচ আমাদেরই দেশে বিদেশী কয়লা রেল কোম্পানীর অনুগ্রহে অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে বিক্রীত হয়। আমরা ছোট বেলায় গল্প শুনেছি, কোথায় না কি বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি পাওয়া যেত! রেল কোম্পানী কিন্তু আমাদের তার চাক্ষুষ প্রমাণ দিয়ে দিচ্ছেন। রাণীগঞ্জে আজকাল সাধারণ কয়লার দর টন প্রতি ৭।৮৲ টাকা; লাহোরে এই কয়লা পাঠাতে হলে টন প্রতি কয়লার মাশুলই দিতে হবে ১।১৪৲ টাকা। বোম্বে হলে ত কথাই নাই; সেখানে হয় ত মাশুল সহ কয়লার টন পড়বে ২৬।২৭৲ টাকা—অথচ বিলাত থেকে বোম্বেতে এসে কয়লার টন এর চেয়ে খুব বেশী পড়ে না। আমাদের দেশে ঝরিয়া ফিল্ডের ১৪ সিম (Seam) ও ডিসারগড় সিমের কয়লাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; কিন্তু ওয়েলসের কয়লার কাছে আমাদের এই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কয়লাও দাঁড়াতে পারে না; ২॥০ টন ভারতীয় কয়লা ১ টন ওয়েলস্ কয়লার সমান কাজ দেয়। কাজেই বড়-বড় মিলে ভারতীয় কয়লার চেয়ে ওয়েলস্ কয়লারই আদর বেশী। এতে যেমন এক দিকে পয়সা কম লাগে, অপর দিকে মজুরীও তেমনি কম লাগে; কারণ, যেখানে একজন লোক ওয়েলস্ কয়লায় কাজ চালাতে পারবে, ভারতীয় কয়লায় সেখানে ২॥০ জন লোকের দরকার। বোম্বে ও আমেদাবাদ অনেক মিলের আড্ডা। সেখানে অনেক কয়লার দরকার হয়। যদি সেখানে বৈদেশিক কয়লা ভারতীয় কয়লার চেয়ে সস্তাদরে পাওয়া যায়, তবে কোন মিলই আর নিজের ক্ষতি করে ভারতীয় কয়লা কিনবে না। এই বোম্বে বাজার বন্ধ হলে ভারতীয় কয়লারও আর টান থাকে না। ফলে দাঁড়ায়, ছোট-ছোট কলিয়ারীগুলি সহজেই মারা পড়ে; কারণ, ভারতে অন্যান্য কল-কারখানার কয়লা বড়-বড় কোম্পানীরই একচেটিয়া। সেবার যখন যুদ্ধ লাগলো, বিদেশী কয়লার আমদানী বন্ধ হ'ল, তখন কয়লার বাজার চড়ে গিয়ে দাঁড়াল ৩০৲ হতে ৩৫৲ টাকা। আবার এই কয়লাই আজকাল ৭।৮৲ টাকা দরে বিক্রীত হচ্ছে। ৩ বছরের মধ্যে এ রকম দর পড়ে যাওয়ার মানে—বিদেশীরা কয়লার রপ্তানীটা খুব সহজ করে দিয়েছে; আর আমাদের দেশী কয়লা ঠিক আগের রাশ মেনেই চলেছে।

আমাদের এখন দেখতে হবে, কি উপায়ে ভারতীয় কয়লা পুনরুজ্জীবিত করা যায়। যুদ্ধের সময়ে বৈদেশিক কয়লা না আসাতে, বাধ্য হয়ে সকল মিলে ভারতীয় কয়লা ব্যবহার করে; কিন্তু যখনই যুদ্ধ থেমে যায়, আর এ কয়লার দর থাকে না। এত বড় একটা ব্যবসা এ রকম অনিশ্চিতের মধ্যে থাকা উচিত নয়। এক যদি গভর্ণমেণ্ট নিয়ম করে বিদেশী কয়লার আমদানী বন্ধ করে দেন, তবে হয় ত ভারতীয় কয়লা কোন রকমে চালান যেতে পারে; নতুবা বিদেশী বাজারের সহিত ভারতীয় কয়লাকে সমান ভাবে পাল্লা দিয়ে চলতে হবে, অর্থাৎ ওয়েলস্ কয়লার দামের চেয়ে ২॥০ ভাগ কম দরে ভারতীয় কয়লা বিক্রয় করতে হবে। Pit's mouth-এ যে কোন ভারতীয় কয়লার উত্তোলন খরচ টন প্রতি ২।০ হতে ২॥০ টাকার মধ্যে। এ দিক দিয়ে বেশী টানাটানি করলে হয় ত দু আনা কি চার আনা টন-প্রতি কম হতে পারে;—কিন্তু এ সামান্য ধাক্কায়ও শ্রমজীবীদের অনেক অনিষ্ট করবে। বাকী পথ থাকে রেল কোম্পানী। রেলের মাশুল যদি কমে যায়, তবে ভারতীয় কয়লা বেশ অনায়াসেই বাজারে চলে যেতে পারে। মাশুল না কমালে ভারতীয় কয়লা কিছুতেই বিদেশী কয়লার কাছে দাঁড়াতে পারবে না। উত্তোলন খরচ আমাদের দেশের চাইতে বিদেশে যে কম তা নয়; শুধু রপ্তানির সুবিধার জন্যই আমাদের দেশের কয়লার আজকাল এ দুরবস্থা। ভারতীয় কয়লার দাম যুদ্ধের সময়ের দামের চেয়ে ৬।৭ ভাগ কমে গেছে, আর কিছুদিন থাকলে যে কি দাঁড়াবে বলা যায় না। দেশের এত বড় একটা ব্যবসায় যদি পঙ্গু হয়ে থাকে, তবে দেশের পক্ষেই অমঙ্গল।

আসামের কয়লার মজা হয়েছে—ভারতের অন্যান্য স্থানে এ কয়লা পাঠান কষ্টকর। ব্রহ্মপুত্র নদ আসামকে ভারতীয় অন্যান্য রেলপথ হতে বিযুক্ত করেছে;—যদি আমিনগাঁও কি ও রকম স্থানে সেতু হয়ে যায়, তখন আসাম কয়লার কিছু আদর বাড়বে। এ কয়লা একটু ভাল; তবে এর দোষও খুব আছে—এ কয়লা বেশ জ্বলনশীল (Combustible)।

তাই অনেক সময়ে আসাম কয়লা ব্যবহার করা নিরাপদ নহে। আজকালকার আসাম রেলের সঙ্গে পূর্ববঙ্গ রেলের যে ভাবে সংযোগ আছে, তাতে আসাম কয়লা দিল্লী লক্ষ্ণৌর চেয়ে সিঙ্গাপুর কলম্বোতে পাঠান অনেক সোজা। রেলে একদম চাটগাঁ এসে জাহাজ বোঝাই হতে এ কয়লার বেশী ওঠা-নাবা করতে হয় না। কিন্তু কলকাতায় আসতে হলেও রেলপথে এর একটা চেঞ্জ নেওয়ার দরকার পড়ে। কাজেই আমাদের দেশে আসাম কয়লা জাগতে পারে নি।

তার পর বোম্বে কি আমেদাবাদে স্থানীয় কয়লার ব্যবহারের কোন উপায় নাই; কারণ ওখানে কয়লাই পাওয়া যায় না। বেলুচিস্থানে কি পঞ্জাবে যে কয়লা পাওয়া যায়, তা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। গত ১৯১৯ ও ১৯২০ সনে কোন্ প্রদেশে কত কয়লা উঠেছে, তা চিফ্ মাইনিং ইনস্পেক্টরের রিপোর্ট দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন।

প্রদেশ	১৯২০		১৯১৯	
আসাম	৩২৪৯৬৫	টন	২৯১১৩৪	টন
বেলুচিস্থানে	২৭,৬৭২	”	২৯১২৪	”
বাংলা	৪,২০৭,৪৫২	”	৫,৭৭৭,৬৩২	”
বিহার-উড়িষ্যা	১১,৯৭৩,৩৫৯	”	১৫,১১৭,৯৫২	”
মধ্য ভারত	৪৯১২০৫	”	৪৯৭০২১	”
পাঞ্জাব	৫৮০৭৮	”	৪৬৮৯৩	”
মোট	১৭০৮২৭১১	টন	২১৭৫৯৭২৭	টন

রাণীগঞ্জ কি ঝরিয়ার যে কোন একটা সাধারণ বড় কলিয়ারীর বাৎসরিক raising, বেলুচিস্থান কি পঞ্জাবের সমস্ত বছরের raising এর সমান। মধ্য-ভারতেও কয়লা খুব বেশী নাই, কাজেই বাণিজ্যের লম্বা দৌড়ে এ সব কয়লা টিকবে না। বাকী থাকে বিহার ও বাংলার কয়লা। এক দিকে রাণীগঞ্জ অন্য দিকে ঝরিয়া, এই লইয়াই ভারতের কয়লার ডিপো। এখানে নানা রকমের কয়লা পাওয়া যায়, আর এই কয়লা-মাঠের মধ্য দিয়া ভারতের দুইটী শ্রেষ্ঠ রেলপথ চলে গিয়ে যাতায়াতের সুবিধা করে দিয়েছে। ই, আই, আর, রাণীগঞ্জ আর ঝরিয়ার ঠিক বুকের উপর দিয়া দৌড়িয়াছে, ও আশপাশে একটা জাল বুনে প্রায় সমস্ত কয়লা-মাঠে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেছে। বি, এন, আর একটু পাশ কাটিয়ে কাট্রাসগড়ে ও ঝরিয়ায় মাথা সেঁধিয়াছে। তাই এ ও একটা কয়লার বড় পথ বলে পরিগণিত হয়েছে। এ দুটা বড় রেলপথের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য বড় বড় রেলপথের সংযোগ থাকায় transportationএ আসামের মত এ কয়লার তত ভাবতে হয় না। কিন্তু হলে কি হবে? এক রেলমাসুলে একে পঙ্গু করে দিয়েছে। একখানা বিশটনের গাড়ীর কয়লার দাম হবে ১২৫৲ টাকা; কিন্তু তার মাসুলই যদি দিতে হয় ৩০০৲ টাকা, তবে কিছুতেই এ ব্যবসার উন্নতি হতে পারবে না। ৩ বছর আগে যেখানে এতটুকু কয়লা নিয়ে মারামারি হ'ত, ইট্ পাট্‌কেল, কালো রংয়ের ছাই যেখানে কয়লা নামে অনায়াসেই মুক্তি পেত—এবার হাজারে হাজারে টন সেখানেই চালানের অভাবে পড়ে আছে; আর ঝরে গিয়ে ময়লার সৃষ্টি হচ্ছে।

বড় বড় মিলে সস্তাদরে খারাপ কয়লার ব্যবহারের চেয়ে ঢের বেশী দাম দিয়া ভালো কয়লা ব্যবহার করাই প্রশস্ত। কারণ খারাপ কয়লা খুব জমাট বাঁধে—ফায়ার-ম্যানেরা এগুলো খুঁচতে খুঁচতে আর পেরে ওঠে না। একে ত আগুনের কুণ্ডের কাছে ৭।৮ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে গাধার মতন খাটতে হয়; তার পর যদি কয়লাই খারাপ হয়—ফ্যায়ার-ম্যান কিছুতেই সেখানে টিকবে না। আর সেই মিলেরও খুব বদনাম হয়। আর একটা মস্ত কথা—খারাপ কয়লার উত্তাপজনক শক্তি ভালো কয়লার চেয়ে অনেক কম। যেখানে বেশী ষ্টীম পাওয়ারের দরকার, খারাপ কয়লা সেখানে কিছুতেই ব্যবহার করা যায় না। এ সব কারণে, প্রথম শ্রেণীর কয়লার খুব টানাটানি পড়েছে; এখন গুজবও উঠেছে, পঞ্চাশ বছরের মধ্যে প্রথমশ্রেণীর কয়লা নিঃশেষ হয়ে যাবে। এ জন্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কয়লাকে বাছাই করার প্রস্তাবও সেদিন বোম্বের এক কাগজে উঠেছে। যদি বাছাই ই করতে হয়, তবে কলিয়ারীতে প্রথমশ্রেণীর কয়লার দাম অনেক বেড়ে যাবে—ওয়েলস্ কয়লার সঙ্গে Competitionএ দাঁড়ান তখন একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়বে।

আর একটা কথা আজকাল এসে পড়েছে,—মজুরের দাম। জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের খরচ আজকাল বেড়ে গেছে, কাজেই মজুরের মাহিনাও আজকাল আর আগের মত নাই। কয়েক বছর আগে টন-প্রতি (১ টন ১২ হতে ১৪ হন্দর) কয়লা কাটার দাম ছিল চার আনা কি পাঁচ আনা,—আজকাল সেখানে আট আনা হতে দশ আনা হয়েছে। যেখানে উপরের কুলি চার আনা রোজে আনন্দের সহিত খেটে যেত, আজকাল তা দিগে দশ আনা দিলেও তারা সন্তুষ্ট নয়। তাইতে কয়লার তোলন খরচও প্রায় ডবল হয়ে গেছে। এ দিকে এখন হাত দিলে ত কয়লা তোলাই হবে না, বরং যাতে এরা ঠিক মত কাজ করে, এ জন্য আরো বেশী মজুরী এদের দিনদিনই দিতে হবে। আমাদের দেশে মজুর এখনও এত সস্তা আছে যে, মেসিন দিয়া কয়লা কাটার চেয়ে হাতে কাটাতে দাম অনেক কম পড়ে। এ সব সত্ত্বেও বাজারে ভারতীয় কয়লা আমাদের সস্তাদরে দিতে হবে। রেলে যদি মাশুল কমান না হয়, তবে আর একটা পথ আছে, যাতে কয়লা এর চেয়ে অনেক সুবিধা দরে দিতে পারা যায়। ঠিকমত চালাতে পারলে সর্ব্ব-সমেত এক টন-কয়লার দাম ৩।০ টাকার বেশী আজকাল পড়তে পারে না। যদি টন-করা এক টাকা লাভ রেখে। মহাজনেরা কয়লাটা বাজারে ছেড়ে দেয়, তবে কিছুদিনের মধ্যেই বিদেশী মালের কতকাংশ আমদানী বন্ধ হয়। শেষে দাম চড়ায়ে লাভের অংশ বাড়ান বেশী কষ্টকর নয়। এ কাজ একজন মহাজনে করলে চলবে না—সমস্ত ভারতের মহাজনেরা একত্র হয়ে এ কাজ করতে পারেন। নতুবা ভবিষ্যতে ভারতের কয়লার বাজার যে কি হয়ে দাঁড়াবে বলা যায় না।

বাজারে আজকাল খুব ইণ্টারমিডিয়েট্ পার্টি ও দালালের অস্তিত্ব

দেখা যায়। বাজারের দুরবস্থা হলে এগুলো থাকা ঠিক নয়। এমন দেখা যায়, কলিয়ারী প্রোপ্রাইটার অল্প দামে কয়লা ছাড়লেও দালাল ও ইণ্টারমিডিয়েট পার্টির জন্য গ্রাহকদের অনেক বেশী দাম দিয়া কয়লা কিনতে হয়। যত হাত ঘুরে গ্রাহকদের কাছে কয়লা পৌঁছিবে, কয়লার দাম তত বেশী হবে। কলিয়ারীতে সস্তা দাম হলেও গ্রাহকদের কাছে দামটা বেশ পুরাপুরিই থাকে। অথচ বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গে এই দাম বাড়াটাও vital হয়ে দাঁড়ায়। যখন কোন ব্যবসা জোরে চলতে থাকে, ইণ্টারমিডিয়েট পার্টি থাকাতে সে ব্যবসার বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না—কিন্তু আজকালকার বাজারে এগুলোও খুব ক্ষতি করে।

আমাদের দেশের কলকারখানার উন্নতি করতে হলেও কয়লা খুব সস্তা হওয়া দরকার। Motive power যত সস্তা হবে, কারখানার প্রস্তুত জিনিষ পত্তরও তদ্রূপ সস্তা হবে। বাষ্পীয় এঞ্জিনের motive power হয় কেরোসিন তেল, নতুবা কয়লা। আমাদের দেশে কেরোসিন এত বেশী পাওয়া যায় না যদ্দারা দেশস্থ সকল এঞ্জিনের ব্যয় সঙ্কুলান হয়। বিশেষতঃ বিদেশীয় কেরোসিন তেল এদেশে খুব আসে। আমাদের দেশে কয়লাকে এঞ্জিনের motive power বলেই ধরতে হবে। এ দিকে দৃষ্টি দেওয়া দেশের অন্যান্য কলকারখানাওয়ালা মহাজনদেরও কর্ত্তব্য। ইলেকট্রিসিটি যদিও আজকাল বড় বড় কারখানায় ষ্টীম পাওয়ারকে বরখাস্ত করছে, তা হ'লেও অন্ততঃ আমাদের দেশে কয়লা সস্তা হলে ষ্টীম পাওয়ারকে একেবারে নষ্ট করতে পারবে না। নায়েগ্রার মত জলপ্রপাত আমাদের দেশে নাই; কাজেই Hydro-electric Scheme আমাদের দেশে তত সুফল দেবে না। ফলে ইলেকট্রিসিটি অত সস্তাদরে আমরা পাবো না এবং ষ্টীম পাওয়ার আমাদের দেশে অনেকদিন চলতে পারবে। কিন্তু যদি কয়লার বাজার এ রকম থাকে, তবে বাধ্য হয়ে ষ্টীম এঞ্জিনকে হাত পা গুটাতে হবে।

আইনস্তাইনের তত্ত্বপ্রচার

শ্রীক্ষেত্রমোহন বসু এম-এস্‌সি

আগে সাধনা পরে সিদ্ধি
তবে জাতের হবে ঋদ্ধি॥

প্রতীচির আইনস্তাইন (Einstein) বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞান-যজ্ঞে প্রধান হোতারূপে প্রাকৃত তত্ত্বকে নব-গৈরিকে শোভা-মণ্ডিত ক'রে আজ সভ্য-জগতে অধিষ্ঠিত। বিশ্বের এ যজ্ঞে আমন্ত্রিত লক্ষ ব্যক্তিত্বকে খর্ব্ব ক'রে ইনি বিশিষ্ট অর্ঘ্য পেয়েছেন। ইঁহার বিচিত্র তত্ত্বনিচয় যে সুষ্ঠু উপাদানে গঠিত, যে অভিনব বৈশিষ্ট্যাসনে প্রতিষ্ঠিত, তাতে প্রলুব্ধ হয় নি, এমন বিজ্ঞান-সেবী এ বিশ্বের মধ্যে দেখা যায় না। এ যুগ বিজ্ঞান-তত্ত্বের একটা renaissanceএর যুগ। এই নবজাগরণে অনুপ্রাণিত হ'য়ে সব বিজ্ঞানবিৎ নব্যপন্থী বাণীর প্রীতি-নির্ম্মাল্য পাবার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের সর্ব্বশীর্ষে আইনস্তাইনের বালারুণলেখার স্নাত-অরুণিমা প্রকৃতই এ নবযুগের নববোধনমন্ত্রে বৈজ্ঞানিক জগতকে এক নবপ্রেরণার মহোল্লাসে আন্দোলিত করিয়াছে!

আইনস্তাইন জাতিতে জার্ম্মাণ; ইনি ব্যাভেরিয়ার উল্‌মা নগরে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সুইজারল্যাণ্ডের যুরেরিখ (Zurich) বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনি ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অবৈতনিক অধ্যাপকের (privat-dozeut) কার্য্যে থাকিয়াই বিজ্ঞানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন; তৎপরে বোহেমিয়াস্থ প্রাগুর জার্ম্মাণ বিদ্যালয়ে সহযোগী অধ্যাপকরূপে প্রবেশ করেন। ১৯১৪ অব্দে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামখ্যাত অধ্যাপক প্লাঙ্কের (M. Planck) উদ্যোগে তত্রত্য জাতীয় প্রুসিয়-বিজ্ঞান-পরিষদের অন্যতম বেতনভোগী সদস্যরূপে অষ্টাদশ সহস্র মার্ক বেতনে নির্ব্বাচিত হন। এই পদাভিষিক্ত হওয়ায় তাঁহার উপর কেবল গবেষণা-পরিচালন-ভার ন্যস্ত হয়। তাঁহার ন্যায় পরিষদের দ্বিতীয় সদস্য ছিলেন তখন প্রসিদ্ধ প্রাকৃত-রাসায়নিক ফ্যানৎ-হফ্ (Van't Hoff)।

গত ১৯১৯ খ্রীঃ অব্দের ২৯ মে পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণ কালে সৌর মাধ্যাকর্ষণ-ক্ষেত্র প্রভাবে আলোকরশ্মির মার্গচ্যুতি ঘটিবে, তাঁহার এ ভবিষ্যদ্বাণী কার্য্যতঃ তার পোষকতা করায়, তদায় যশঃ প্রশস্তি দিকে-দিকে মুখর হ'য়ে উঠেছিল। তাঁর সর্ব্বপ্রথম সুনাম হয় ব্রাউন-গতির (Brownian movement) একটা আবিষ্কারে,—তাতে মারুত-কণিকা বিজ্ঞানের (Kinetic theory of gases) একটা মীমাংসার ধারার মধ্য দিয়ে তিনি তরল পদার্থে সঞ্চরমান অতি-ক্ষুদ্র জড়কণিকার গড়-স্পন্দনমিতি-নিরূপক একটা সঙ্কেত (Formula) প্রতিপাদনে সক্ষম হ'য়েছিলেন। সেটায় প্রকৃতি-বিজ্ঞানের একটা প্রয়োজনীয় সংখ্যার সম্বন্ধে বেশ জ্ঞান জন্মে। সেই সংখ্যাটিকে 'আভোগাড্রো রাশি' (Avogadro's number) এই অভিধান দেওয়া হ'য়েছে; অর্থাৎ মরুতের (gas) এক গ্রাম অণুতে (gram molecule) কত অণুসংখ্যা বিদ্যমান আছে, সেই রাশিটে।

প্লাঙ্কের প্রৈতিনিঃসার ও শোষণ-সম্বন্ধী মাত্রাবিধি (quantum theory of energy emission and absorption) আইনস্তাইনই পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন। যদিও এ থিওরিটা তাঁহার কাল ও পরমাকাশ (time and space) বিষয়িণী পরিকল্পনার ন্যায় অতটা লোকপ্রীতি আকর্ষণ করে নাই; তত্রাচ এটার প্রসার যুগযুগস্থাপিত তথাকথিত প্রাচীন তথ্যকে (classical concepts) নিরঞ্জন-নৌয়েই বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। প্রাচীন প্রৈতিসম্বন্ধী যে ধারাবাহিক নিঃস্রাবণ ও বিস্তার-থিওরি (continuous emission and propagation) আছে, তাহা হ'তে যে একটা সঙ্কেতে উপনীত হওয়া যায়, সেটায় উত্তপ্ত কৃষ্ণ-পদার্থের (black-body) আলোক-নিঃস্রাবণ সমস্যাটার ব্যাখ্যা হয় না; এ জন্য ১৯০০ অব্দে অধ্যাপক প্লাঙ্ক একটা নব্য অনুমান গঠিত করিয়া দেন। অনুমানটি বিস্ময়কর। আলোকের ধারাবাহিক নিঃস্রাবণের পরিবর্ত্তে পরিমাণ-গুচ্ছে (bundles of quanta) নিষ্ক্রমণএ সিদ্ধান্ত কার্য্যকর হইয়াছে। বস্তু-অণু

সমুদয় যে প্রেতি নিঃস্রাবণ ও শোষণ (emission and absorption of energy) করে, তাহার পরিমাণ যে আলোক বিকিরিত হয়, সেই আলোকের কম্পন-সংখ্যার (frequency) সাধারণ অনুপাতেই হ'য়ে থাকে। প্লাঙ্কের এই পরিমাণ-গুচ্ছ পদ্ধতিটা প্রথমে অনেকেরই অগ্রাহ্যের বিষয় হ'য়েছিল; তাঁদের মধ্যে কেহ-কেহ বিদ্রূপচ্ছলে বলেও ছিলেন,—according to Planck energy flies out of a radiator (বিকীরণ-যন্ত্র) like a swarm of gnats !

তেজের স্বরূপকথা বড় সে মজার
শুন ওহে সুধীগণ,
প্ল্যাঙ্কের অভ্রান্ত যুক্তি বিজ্ঞানের সার ;—
পুঞ্জীভূত তেজঃ যেন মৌমাছির চাক
বাহিরায় একে একে
বিকীরণ-যন্ত্র হ'তে মশকের ঝাঁক।

এই নবপ্রসূত ধারণাটার আইনস্টাইন একটা পোষকও খুঁজে পেয়েছেন। এটা জানাই ছিল যে, যদি পীত বা অদৃশ্য-ভায়লেট ultra-violet) আলোক-রশ্মি কোন সর্জ্জি বা ক্ষার ধাতুর পাতের (plate) উপর গিয়া পড়ে, এই ধাতুর পাত্র থেকে ইলেক্‌ট্রন (ঋণ-তাড়িতময় তাড়িত-রেণু) বেরিয়ে প'ড়বে ; সে-সব ইলেক্‌ট্রন বিভিন্ন গতিবিশিষ্ট। তবে বেগমাত্রার একটা উর্দ্ধতন সীমা আছে। লেনার্ড ও লেদেনবার্গের আবিষ্ক্রিয়ায় অবগতি হ'য়েছে যে, এই বেগমাত্রার উর্দ্ধসীমা আলোকের তীব্রতার উপর নির্ভর করে না,—আলোকের তরঙ্গমাত্রার (wave length) উপর নির্ভর করে। তরঙ্গমাত্রার কম্পন-সংখ্যার বিপরীত অনুপাতে হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, এই একটা নিয়ম আছে। কাজেই আলোকের তরঙ্গমাত্রার ক্রম হ্রাস অনুসারে ইলেক্‌ট্রন-গতির ক্রমবর্দ্ধন হবে ; অর্থাৎ আলোকের স্পন্দন-সংখ্যা যত বাড়বে, পাত-নিঃসৃত ইলেক্‌ট্রনের গতিও তত বেড়ে যাবে। এই ধারণার অনুকূলগামী হ'য়ে আইনস্টাইন একটা বেশ সরল সমীকরণ-সঙ্কেত দাঁড় করিয়ে দিলেন ১৯০৫ খ্রীঃ অব্দে,—সেটা এই ইলেক্‌ট্রন-গতি ও আলোকের স্পন্দন-সংখ্যা-সম্বন্ধীয়, আর সে সমীকরণটা বিভিন্ন ধাতু-পাতের বেলায়ও প্রযুজ্য, এরূপভাবে গঠিত। এই সঙ্কেতটার যাথার্থ্য প্রমাণিত হ'য়েছিল, দশ বৎসর পরে, অধ্যাপক মিলিকানের কতকগুলো উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায়। তার পর থেকেই আইনস্টাইনের এই বিধিটা গতিবিজ্ঞানের একটা মূলবিধি ব'লেই পরিগণিত হ'য়ে আসছে। বর্ত্তমানে এক্স-রে বা রনজেনরশ্মি আলোকের গণ্ডীভুক্ত হওয়ায় আইনস্টাইনের সঙ্কেতটার প্রসারও বেড়ে গেছে। তাঁহার এই তড়িৎ-চিত্র-গ্রাহী (photo-electric) সঙ্কেতটা উপর্য্যুক্ত প্রাকৃত-বৈজ্ঞানিক ধারণাটার কি সুন্দর সাফল্যই প্রসব ক'রেছে !

আইনস্টাইন তৎপরে এই মাত্রাবিধিটা (quantum law) বস্তুর স্বল্পতাপজনিত বিশিষ্ট তাপের (specific heat) যে হ্রাস হয়, তাপ-বিজ্ঞানের এই সমস্যাটায় প্রয়োগ ক'রে বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। আইনস্টাইনের অবস্থা-সমীকরণ সম্বন্ধী (equation of state), শূন্যবিন্দু-প্রেতিক (null-point energy) ও আলোক-রাসায়নিক (photo-chemical) গবেষণা তাঁহার তীক্ষ্ণ প্রতিভাসঞ্জাত।

তাড়িত-প্রবাহ-সঞ্চারী ধাতব কুণ্ডলীর (coil) মধ্যপ্রদেশে লৌহ বা লৌহ-কল্প ধাতু রাখলে সেটা চৌম্বকধর্ম্মী হইয়া থাকে। উক্ত চৌম্বক ধর্ম্ম যে উক্ত ধাতু-কোরকস্থ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র তাড়িতাবর্ত্তজনিত, অ্যাঁপিয়ার এ কথা বলে গেছেন। তবে কথাটার প্রামাণ্যতা খুব বলিষ্ঠ হ'লেও, কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ছিল না। ইলেক্‌ট্রন আবিষ্কার হবার পর সকলেরই বিশ্বাস ছিল, অণুজাবর্ত্তের (molecular currents) মূলে ধাতুগর্ভস্থ মুক্ত ইলেক্‌ট্রন সমুদায়ের বিঘূর্ণন-গতি ; কেন না যদি ধাতুগর্ভস্থ কোন মুক্ত ইলেক্‌ট্রন-গুচ্ছ আবর্ত্তিত হয়, সমগ্র ধাতুটি একটা আবর্ত্তিত যুগ্ম-বল (turning couple) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। এই পরিকল্পনাটার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় এতাবৎকাল কেহই সিদ্ধকাম হন নাই ; কিন্তু আইনস্টাইন হাজের (Haas) সহকারিতায় এক নব প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া সুচারু-রূপে পরীক্ষা সম্পন্ন করেন ও অ্যাঁপিয়ার সিদ্ধান্তের সত্য প্রতিপাদনে প্রকৃষ্ট রূপে সমর্থ হন।

১৯০৫ খ্রীঃ অব্দে আইনস্টাইন সম্বন্ধবাদ বা আপেক্ষিক তত্ত্বের (relativity) অনুধাবনে মনোনিবেশ করিয়া, তদীয় তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেন ; ও অদ্যাবধি তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ অনুশীলনে ব্রতী আছেন। তাঁহার এই আদি-মধ্য-অন্তবিহীন কাল ও মহাকাশ-তত্ত্ব মৌলিকতায় সুপুষ্ট, পরিকল্পনায় অদ্বিতীয়, মীমাংসায় অকাট্য, সত্যে ধ্রুব, উপপত্তিতে অনবদ্য। প্রখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ লরেঞ্জ (Lorenz) ও মিন্‌কোস্কী (Minkowski) তাঁহার ন্যায় এই আপেক্ষিক তত্ত্বের বহু মৌলিক অনুসন্ধান করিয়াছেন। বিশিষ্ট সম্বন্ধবাদ ও সাধারণ সম্বন্ধবাদ উভয় বিষয়েই তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য দেখিয়েছেন ও বহুবিধ গবেষণা করিতেছেন। জর্ম্মানীর নানা বিজ্ঞানবিষয়িণী পত্রিকা তাঁহার পরিপূর্ণ আলোচনার বিপুল তত্ত্বসম্ভারে সমাহিত ও অলঙ্কৃত।

আইনস্টাইনের বয়স সবে পঁয়তাল্লিশ। যে-সব মূল সিদ্ধান্ত তিনি দিনে-দিনে গড়ে তুলছেন, তাদের এমন সব প্রতিষ্ঠান-গঠিকা-শক্তি র'য়েছে যে, তাতে জাগতিক সত্যের অভিব্যক্তি আমরা পর্য্যাপ্তভাবে উপলব্ধি ক'রছি ; এবং তাঁর সুদীর্ঘ বিপুল কর্ম্মজীবন কামনা ক'রে তাঁর ভাস্বর প্রতিভার দিকে চেয়ে এই কথাটাই বার-বার মনে প্রতিধ্বনি ক'রছে,—প্রকৃতিদেবীর স্বর্ণদেউল খুলে গেছে এক নবীন পূজারির চাবিকাঠিতে।

———

আল্‌প্‌স পাহাড়

অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম-এ

(১)

ব্যাভেরিয়ার বড় সহর মিন্‌থেন (মিউনিক)। জার্ম্মাণ শিল্প, সাহিত্য ও সভ্যতার কেন্দ্ররূপে মিন্‌থেনের ইজ্জত এমন কি বার্লিনের চেয়েও বেশী। মিউনিকের পথে অষ্ট্রিয়ায় চলিতেছি।

সকাল হইয়াছে। রেলে বসিয়া দেখিতেছি দুইধারের জমিতে শরৎকালের শস্য কাটার চিহ্ন। কোথাও-কোথাও বলদের বা ঘোড়ার লাঙ্গলে ভূমি চষা হইতেছে। সর্ব্বত্র সবুজ পাইনের আবেষ্টন। পাইনকে বোধ হয় সংস্কৃতে বলা হয় সরলদ্রুম,—বর্ত্তমানে হিন্দীনাম চীড় কা পেঁড়। পল্লীগ্রামের ঘরগুলার ছাদে লাল ইটের টালি। কুঁড়ে ঘর সব ছোট-ছোট। দেয়ালগুলা সাদা।

রেল-যাত্রীদের মধ্যে ইতালীয়ান নর-নারীর ভিড় অনেক। জার্ম্মাণ সহযাত্রীদের অনেকেই ইতালীয় ভাষায় কথা কহিতে পারে। গাড়ীর ভিতরকার আসবাব বেশ আরামদায়ক। রাত্রিকালের শয়ন-কামরা ইয়াঙ্কিদের পুলম্যান-কারের চেয়েও সন্তোষজনক। জার্ম্মাণরা সুখে-স্বচ্ছন্দে চলা-ফেরা করিতে অভ্যস্ত।

গরু-বলদের গলায় ঘণ্টার আওয়াজ ভারতীয় পল্লীর কথা মনে করাইয়া দিতেছে। ক্ষেতে-ক্ষেতে যীশুখৃষ্টের অথবা "মা-মেরী"র অথবা ঋষি-সাধু "সেইন্টে"র মূর্ত্তি খুঁটার উপর আঁকা। ঘর-বাড়ীর দেওয়ালেও এই সব চেহারা অঙ্কিত।

দক্ষিণ জার্ম্মাণির (ব্যাভেরিয়ার) লোকেরা ক্যাথলিক মতাবলম্বী খৃষ্টান। এই জনপদের নর-নারী হিন্দুদের মতনই মূর্ত্তি-পূজার অনুষ্ঠান করে। বার মাসে তের পার্ব্বন, দেবতার "মানত", সাষ্টাঙ্গে প্রণাম, উপোস, তীর্থ ভ্রমণ, কথায়-কথায় মা-মেরীর আরাধনা, কম্‌-সে-কম "বোধিসত্ত্ব" স্বরূপ সেইন্ট মহাপ্রভুদের নাম স্মরণ করা ক্যাথলিকদের নিত্য-কর্ম্ম-পদ্ধতি। ক্যাথলিকরা বলে, হিন্দুরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন, পুতুল-পূজক, ধর্ম্মহীন "হীদেন"; আর হিন্দুমতে দুনিয়ার অহিন্দু সবলোক ত পশু, ম্লেচ্ছ, কদাচারী বটেই!

ক্রমশঃ অদূরে পাহাড় দেখা যাইতেছে। পাহাড়ী সবুজ পাইনের আওতায় মাঝে-মাঝে "লালায়মান" লিণ্ডেন ও কাষ্ঠানিয়েন গাছের সোণালী বাহার চোখ দুটো টানিয়া রাখিতেছে। শীঘ্রই এই সব গাছের পাতা ঝরিয়া পড়িবে। কিন্তু শীতেও পাইনগুলা সবুজই থাকে।

পাহাড়ের পায়ে-পায়ে রেলপথ। জার্ম্মাণির সীমানা পার হইয়া, অষ্ট্রিয়ার ভিতর প্রবেশ করিলাম। অষ্ট্রিয়ার এই জনপদের নাম টিরোল।

(২)

টিরোল পাহাড়ী দেশ। যেদিকে তাকাই, সেইদিকেই পাইন-ঢাকা পাহাড় দেখিতেছি। কোথাও-কোথাও ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী বহিয়া যাইতেছে। আল্‌প্‌স পর্ব্বতের আবেষ্টনে রহিয়াছে।

লোকজনের কথাবার্ত্তায় বুঝিতেছি, টিরোলবাসীরা জার্ম্মাণ ভাষাই ব্যবহার করেন। কিন্তু ইহা বুঝিয়া উঠা বোধ হয় জার্ম্মাণদের পক্ষেও সুকঠিন। যুক্তপ্রদেশ বা বিহারের লোকেরা যে হিন্দীতে কথা বলে, ঠিক সেই হিন্দীতেই হিমালয়ের নর-নারীরা কথা বলে কি? কুমায়ুন-গাঢ়ওয়ালের হিন্দী হইতে কাশী-প্রয়াগের হিন্দী যত ফারাক, টিরোলের পাহাড়ী-জার্ম্মাণ হইতে বার্লিন, মিউনিক ভিয়েনার জার্ম্মাণও তত ফারাক।

"কথ্য" ভাষার কথাই বলিতেছি। কেতাবের ভাষা সর্ব্বত্রই একপ্রকার। বার্লিন-মিউনিক-ভিয়েনার বালক-বালিকারা ইস্কুলে যে সকল জার্ম্মাণ বই ব্যবহার করিয়া থাকে, টিরোলের পাঠাশালায়-পাঠশালায়ও সেই সব বই-ই চলে।

টিরোল একটা প্রদেশ বা জেলার নাম। এই মুল্লুকের সর্ব্বপ্রসিদ্ধ সহর ইন্‌স্‌ব্রুক্‌। এই সহরের তিনদিকে ইন্‌ দরিয়া প্রবাহিত। "ব্রুক" শব্দে পুল বুঝায়। ইনের দুই ধারে সহরটা গড়িয়া উঠিয়াছে। নদীর উপর কতকগুলা পুল আছে, বলাই বাহুল্য।

চারিদিকেই পাহাড়ের দেওয়াল। চূড়াগুলি পাঁচ-ছয়

হাজার ফিট উঁচু। কোন-কোন শৃঙ্গে একটু আধটু বরফ দেখা যাইতেছে। অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ,—এখনো শীত জমে নাই। নদীর এক পার হইতে অপর পারে প্রায় আড়াই হাজার ফিট উঁচু পাহাড়ে যাইবার জন্য একটা তারে-টানা রেলগাড়ীর সাহায্য পাওয়া যায়। একটা গাড়ী উঠে আর একটা গাড়ী নামে একই টানার জোরে। পাহাড়ের নাম হুঙ্গারবুর্গ।

পাহাড়গুলার পায়ে ও কোমরে সবুজ পাইনের বন দেখিতেছি। কিন্তু মাথাগুলা সবই একদম ন্যাড়া। শুক্‌না পাথরের চাপ ছাড়া আল্‌প্‌সের ঘাড়ে ও শিরে আর কিছু দেখা যায় না। ইন্‌স্‌ব্রুকের বালক-বালিকারা গ্রীষ্মকালে এই সব পাথরের চূড়ায়-চূড়ায় দিনরাত কাটাইতে ভালবাসে।

আল্‌প্‌সের অতি উচ্চদেশের বিষম বিপদজনক ঠাঁইয়ে একপ্রকার পাহাড়ী ফুল ফুটে। সেই ফুল লুঠিতে যাওয়া টিরোলী নর-নারীর জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা। ফুলের নাম এডেলহ্বাইস। দেখিতে তারার মতন। সাদা বা ধূসর মখমলের মতন নরম ও মোলায়েম। এই ফুলের নিশানাই টিরোলী পল্টনের গৌরব-চিহ্ন। সাহস, ধৈর্য্য, দৃঢ়তা, অধ্যবসায় এবং মৃত্যুকে "কলা দেখানো", ইত্যাদির পরিচয় স্বরূপ এডেলহ্বাইস "যুবক টিরোলের" বহু সমিতি কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া থাকে।

(৩)

চারিদিকে অত্যুচ্চ পাহাড়, মধ্যে সুবিস্তৃত সমতল ভূমি। দরিয়ার কোথাও ঝোরা বা জলপ্রপাত নাই,—ঠিক এই ধরণের প্রাকৃতিক আবেষ্টনে কোন বৃহদায়তন ভারতীয় নগর আছে কি না জানি না। হিমালয়ের আলমোড়া, নৈনিতাল, শিমলা, দার্জ্জিলিং ইত্যাদি সহর এইরূপ নয়। কারণ, এইগুলা সবই খাঁটি "পাহাড়ী সহর।" এক মোকাম হইতে অপর মোকামে যাইতে হইলে পাহাড় ভাঙিতে হয়। কিন্তু ইন্‌স্‌ব্রুক প্রায় আগাগোড়াই ময়দানের উপর অবস্থিত। ইন নদী যতখানি এই সহরে দেখিতেছি,সবটাই শোয়া গড়ানো। সবুজ রংয়ের স্বচ্ছ জলে তেজ পাইতেছি, কিন্তু কোথাও উন্মাদ গর্জ্জন ও লাফালাফি নাই।

ইন্‌স্‌ব্রুকের লোকেরা ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বীর নেপোলিয়নকে লড়াইয়ে হারাইয়াছিল। সেই বিজয়ের কাহিনী শতাধিক বৎসর ধরিয়া টিরোলীদের গৌরব রহিয়াছে। বস্তুতঃ, গোটা ইয়োরোপেই তখনকার দিনে টিরোলের পাহাড়ীদের যশঃ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কারণ, নেপোলিয়ন টিরোলে ধাক্কা খাইবার পূর্ব্বে কখনো কাহারো নিকট পরাজিত হন নাই।

যে টিরোল-বীর ইয়োরোপীয়ানদিগকে নেপোলিয়নকে হারাইবার পথ দেখাইয়াছেন, তাঁহার নাম আণ্ড্রিয়াস হোফার। হোফার এক সামান্য সরাইওয়ালা চাষীর সন্তান মাত্র ছিলেন। অষ্ট্রিয়ার সরকার হোফারকে সাহায্য করেন নাই। হোফারের অনুগত স্বদেশ-ভক্ত "যুবক টিরোল" দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ানের পথ রুধিয়াছিল। একমাত্র ভাবুকতার দ্বারাই অনেক সময়ে কেল্লা মাত করা যায়। বর্ত্তমান জগতেও ইহা অসম্ভব নয়।

অল্পকালের ভিতরেই হোফার নেপোলিয়নের হাতে ধরা পড়েন। ধরাইয়া দিয়াছিল এক স্বদেশদ্রোহী, অর্থ-পিশাচ টিরোলী অষ্ট্রিয়ান! নেপোলিয়নের বিচারে হোফারের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। ইতালীর মাণ্টুয়া নগরে হোফারকে গুলি করিয়া মারা হয়।

বীর হোফার টিরোলীদের স্বদেশ-সেবার প্রতিমূর্ত্তি রূপে চিরকাল পূজা পাইয়া আসিতেছেন। ইন্‌স্‌ব্রুকের লাগা অনুচ্চ "বার্গ-ইজেল" পাহাড়ের মাথায় হোফারের বিরাট মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত দেখিলাম। আজকাল যখনই টিরোলের লোকেরা স্বদেশ-সেবার কোন অনুষ্ঠান সুরু করে, তখনই ইহারা বার্গ-ইজেলের হোফার-মূর্ত্তির সম্মুখীন হয়। হোফারের নাম স্মরণ করা ইহাদের "বন্দেমাতরম্‌" স্বরূপ। বর্ত্তমান দুর্দ্দশার সময়ে টিরোলের নানা সহরে ও গ্রামে "আণ্ড্রিয়াস হোফার বুণ্ড" নামক পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে। অষ্ট্রিয়ার অন্যান্য জেলায়, জার্ম্মাণিতে এবং আমেরিকায়ও এই পরিষদের শাখা-সমিতি কায়েম হইতেছে।

ইন্‌স্‌ব্রুক প্রাচীন কালেও প্রসিদ্ধ ছিল। রোমান সম্রাটেরা ইন্‌স্‌ব্রুক হইতে রোম পর্য্যন্ত শড়ক তৈয়ারি করাইয়াছিলেন। সেই রোমান শড়ক আজও পাহাড়ের গায়ে নিরেট রহিয়াছে। হোফারের আমলে টিরোল প্রধানতঃ চাষী, মেষপালক ইত্যাদি জাতীয় নর-নারীর সামান্য জনপদ মাত্র বিবেচিত হইত। আজও ইন্‌স্‌ব্রুককে জার্ম্মাণরা অপেক্ষাকৃত সাদাসিধে জীবনের কেন্দ্র সমঝিয়া থাকে। বর্ত্তমান যুগের ফ্যাক্‌টরি, চিম্‌নি, মোটরগাড়ী

ইত্যাদি চোখে পড়িতেছে না। ভারতীয় মফস্বলের একটা ছোট-খাটো সহরে আমরা যে ধরণের জীবন যাপন করি, ইন্‌স্‌ব্রুকের টিরোলীরাও সেইরূপ উদ্বেগবিহীন, শান্তিপূর্ণ, পাড়াগেঁয়ে চালে চলিয়া থাকে।

(৪)

দক্ষিণ জার্ম্মানির গ্রামে-গ্রামে ক্যাথলিক ধর্ম্মের আওতা পাইয়াছি। সেই আওতা পাইতেছি চরম মাত্রায় ইন্‌স্‌ব্রুকে। বস্তুতঃ ইন্‌স্‌ব্রুক রোমান ক্যাথলিক সমাজের এক বড় আড্ডা। রোমের ধর্ম্ম-গুরু পোপ এই সহরকে জার্ম্মাণ মুল্লুকের অন্তর্গত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্যাথলিক কেন্দ্র বিবেচনা করিয়া থাকেন। রাইণ প্রদেশের কোল্‌ন্ সহর আর আল্প্‌স্ পাহাড়ের এই ইন্‌স্‌ব্রুক জার্ম্মাণ ভাষা-ভাষীদের সমাজে বিদেশী পোপের প্রতাপ বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

এই কারণেই উত্তর জার্ম্মানির (প্রুশিয়ার) প্রট-ষ্টাণ্ট খৃষ্টানদের হিসাবে ইন্‌স্‌ব্রুক "কু-সংস্কারের" বাথান। প্রুশিয়ানদের চিন্তায় টিরোল ও অষ্ট্রিয়ার অন্যান্য জনপদ, ব্যাভেরিয়া ও রাইন প্রদেশ সবই জার্ম্মাণ সমাজে অধোগতি ও দুর্ব্বলতার কারণ। তথাকথিত ধর্ম্মের দৌরাত্ম্য যেখানে বেশী, বর্ত্তমান জগতে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও ক্ষমতার শত্রু সেখানে প্রচুর। রাষ্ট্রীয় উন্নতির পাণ্ডারা এই জন্য "আধ্যাত্মিকতা"র পাণ্ডাদিগকে চক্ষুঃশূল জ্ঞান করিতে অভ্যস্ত।

বার্গ-ইসেল হইতে সমতল ভূমির দিকে নিম্নে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিলাম, ইন্‌স্‌ব্রুকের সর্ব্বত্রই মন্দির, গির্জ্জা, মঠ বিরাজ করিতেছে। মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি দস্তুর মাফিক যথাসময়ে সহরের নর-নারীকে তাহাদের নিত্য কর্ত্তব্য জানাইয়া দেয়। কোন-কোন মঠ বিরাট জমিদারীর মালিক। কোন কোন মঠ-জমিদারী এত বড় যে, সহরের প্রায় চার আনা ইহার তাঁবে শাসিত হয়। ভারতীয় মঠ, মোহন্ত, দেবোত্তর ইত্যাদি যে বস্তু, টিরোলের "ক্লোষ্টার" জমিদারীও সেই বস্তু।

কোন মঠে সন্ন্যাসী পুরোহিতরা জীবন যাপন করেন। ক্যাথলিক মতে পুরোহিত মাত্রেই অবিবাহিত থাকিতে বাধ্য। হিন্দু সমাজে ক্যাথলিক সমাজে এইখানে প্রভেদ। কোন কোন মঠ সন্ন্যাসিনীদের জন্য গঠিত। ক্যাথলিক ধর্ম্মের নিয়মে বৌদ্ধ ভিক্ষুনীদের মত চির-কুমারী মঠ-বাসিনীদের জীবন-যাত্রার ব্যবস্থা আছে। ক্যাথলিকরা স্ত্রীজাতিকে পুরোহিতের কার্য্য করিতে দেয় না।

মঠ হইতে লোকালয়ে বাহির হইয়া আসা,—এমন কি কয়েক ঘণ্টার জন্যও, নেহাৎ সোজা নয়। মঠের জীবন অতি কঠোর নিয়মে শাসিত হয়। শাস্ত্র-পাঠ, পূজা, আরাধনা, প্রার্থনা ইত্যাদি এই জীবনের একমাত্র কার্য্য। কোন কোন মঠে চব্বিশ ঘণ্টা-ব্যাপী উপাসনা, প্রার্থনার রেওয়াজ আছে। প্রহরে-প্রহরে পূজারী অথবা পূজারিণী বদল হইয়া থাকে। প্রত্যেক দলে দশজন করিয়া বাহাল হন। এক দল পূজা শেষ করিতে না করিতে, আর এক দল হাজির হইতে বাধ্য।

খৃষ্টানরা আধ্যাত্মিকতায় বড় কি হিন্দুরা বড়? কেহ-কেহ হয় ত' বলিবেন, এই তুলনায় সময় নষ্ট করাটাই আহাম্মুকি! কিন্তু যাঁহার সমাজ সম্বন্ধে "বিজ্ঞান"-রবিতে অন্ততঃ বুঝিতে চান, তাঁহাদের পক্ষে প্রশ্নটা উঠিবা মাত্রেই মাথা চুলকাইতে হইবে। কারণ কোন একদিকে ঝুঁকিয়া "রায়" দিলে, অন্যায় বিচার করিবারই সম্ভাবনা।

মঠ, মন্দির, মোহন্ত, দেবোত্তর ইত্যাদির সুফল, কুফল ভারতেও যেমন, টিরোলেও সেইরূপ। কাশী, মথুরা, পুরীর আবহাওয়ায় যে সকল হিন্দুর জীবন গঠিত হইয়াছে, তাহারা ইন্‌স্‌ব্রুকে আসিলে, একটা "নূতন কিছু" পাইবে না। এখানকার সকল কাহিনীই আমাদের সুপরিচিত।

(৫)

লড়াইয়ের ফলে অষ্ট্রিয়ার দুর্দ্দশা অত্যধিক। অষ্ট্রিয়া দেশটাকে ভাঙিয়া পাঁচ-পাঁচটা নয়া স্বাধীন দেশ কায়েম করা হইয়াছে। ইন্‌স্‌ব্রুকের লোকেরও কষ্টের শেষ নাই। বার্লিনে যে জিনিষ কিনিতে একশ মার্ক লাগে, ঠিক সেই জিনিষ ইন্‌স্‌ব্রুকে খরিদ করিতে লাগে সাতশ মার্ক।

তবে এক মজার কথা। লক্ষপতি হইবার সাধ জীবনে একবার মিটাইয়া লইলাম। ট্যাঁকে দুই চারখানা লাখ ক্রোণের নোট লইয়া সদর্পে ঘুরিতেছি। এক পিঠ, দুই পিঠ, তিন পিঠ ঘুরাইয়া নোটগুলা দেখিতেছি, আর তলাইয়া মজাইয়া বুঝিতেছি, সত্যিই লাখ ক্রোণ বটে! রেষ্টরাণ্টে খাইতে বসিয়া দেখি, দুইবেলা এক পেট খাইতেই একলাখ প্রায় উজাড় হইয়া যায়। সমস্যায় পড়া গেল। ত্রৈরাশিকের অঙ্ক কষিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া সাব্যস্ত করিলাম, লাখ

ক্রোণের দাম পৌণে-পাঁচ ভারতীয় সিক্কা। হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম!

ইন্‌স্‌ব্রুকে অনেক বিদ্যার্থী ভিক্ষা করিয়া অন্ন সংগ্রহ করে। এক যুবকের সঙ্গে আলাপ হইল। ইনি আইন-বিদ্যায় "ডাক্তার" উপাধি পাইবেন। এক মঠে ইহাকে বিনা ভাড়ায় ঘর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু দুইবেলা আহার করিবার জন্য সহরের ভিন্ন-ভিন্ন গৃহস্থের ঘরে ইনি অতিথি হইয়া থাকেন। এই ধরণের ছাত্র সহরে অনেক। ইন্‌স্‌ব্রুক হাজার হইলেও তীর্থক্ষেত্র। কাশীর কথা আবার মনে পড়িতেছে।

কতকগুলা মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করা গেল। দেখিলাম, অতি সুন্দর সোণার মূর্ত্তি অথবা চিত্র। এই সমুদায়ের ফটোগ্রাফ লইতে গেলে, পুরোহিতেরা আসিয়া মাথা ফাটাইয়া দিবে। কিন্তু হিন্দু মন্দিরাদির অভ্যন্তরে ফটো তোলায় বাধা দিলে, ব্রাহ্মণেরা পশ্চিমাদের নজরে নেহাৎ পৌত্তলিক, অজ্ঞ ও কুসংস্কার-পূর্ণ বিবেচিত হয়! অট্টালিকাগুলা অতুল ঐশ্বর্য্যের সাক্ষ্য দিতেছে।

"মারিয়া থেরেসা ষ্ট্রাসে" ইন্‌স্‌ব্রুকের নামজাদা বড় রাস্তা। দ্বিপ্রহরের সময়ে এই সড়কে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা দলে-দলে মিছিল করিয়া পায়চারি করে। ভিন্ন-ভিন্ন দলের ভিন্ন-ভিন্ন টুপি ও গোষ্ঠীচিহ্ন। এই বৎসর না কি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রায় দুই হাজার ছাত্র। সহরের লোক-সংখ্যা সত্তর-আশী হাজার।

(৬)

ইন্‌স্‌ব্রুকে লোকের বস্তি বেশী নয়। কিন্তু এখানে উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য, শিল্প ও শিক্ষার কেন্দ্রের সংখ্যা গুণতিতে অনেক।

বাদশাহী আমলে সম্রাট বাহাদুর মাঝে-মাঝে ইন্‌স্‌ব্রুকে আসিয়া বাস করিতেন। কাজেই নগরের এক ধারে 'হোফ-বুর্গ' বা প্রাসাদ-নগর দেখিতেছি। প্রাসাদের বাগিচা নয়ন রঞ্জক বটে। সম্মুখেই থিয়েটার। সহরের অন্যান্য মহাল্লায় আরও দু'একটা রঙ্গালয় আছে। সেই সব মঞ্চে প্রধানতঃ টিরোলীদের পল্লী-নাট্য অভিনীত হয়। টিরোলী পোষাক এবং টিরোলী উপভাষার ব্যবহার সেথায় অনিবার্য্য।

মিউজিয়ামটা এই ক্ষুদ্র নগরের এক গৌরব। ব্যবসায়-কলেজে উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যা বিতরণ করা হইয়া থাকে। চিত্র, সঙ্গীত, রন্ধন ইত্যাদি শিখাইবার জন্য নানা বিদ্যাপীঠ আছে।

মারিয়া থেরেসা ষ্ট্রাসের দুইধারকার বাড়ী-ঘরগুলা কথঞ্চিৎ পুরানা আমলের কথা মনে করাইয়া দেয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করিতেছি,—নয়া অঞ্চলে ত' বটেই। রেষ্টরাণ্ট, কাফে ইত্যাদির অভাব নাই। পাদ্রী, পুরোহিত, সন্ন্যাসী, মোহন্তদের সঙ্গে গলি-ঘোঁচের মোড়ে যেখানে-সেখানে দেখা হয়। সহরের যে কোনও ঠাঁইয়ে দাঁড়াইলেই অত্যুচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গের ঢেউ নজরে আসে।

পার্ব্বত্য পথে কয়েক মাইল হাঁটিয়া একটা পুরানা "শ্লোস" দুর্গ দেখিয়া আসিলাম। নাম শ্লোস আম্‌ব্রাস্। প্রায় নয় শত বৎসর পূর্ব্বে এই শ্লোস প্রথম তৈয়ারী হয়। দুর্গের এক অংশে লড়াইয়ের অস্ত্রশস্ত্রের সংগ্রহ দেখিলাম। সবগুলাই মান্ধাতার আমলের জিনিষ। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বর্ম্ম, কিরীচ, তলোয়ার, বন্দুক, দেখিয়া "প্রাগৈতিহাসিক" যুগটার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। কতকগুলা রোমান সড়কের কিনারায় গাথা দূরত্বজ্ঞাপক পাথরের খুঁটাও এক স্থানে দেখিতে পাওয়া গেল। শ্লোস আম্ব্রাসের সংগ্রহ অষ্ট্রিয়ায় বিখ্যাত।

ইন্‌স্‌ব্রুকের হোফ-কির্খে বা রাজ-মন্দিরকেও এক প্রকার মিউজিয়াম বলা চলে। এখানে পুরানা রাজ-রাজড়াদের সমাধি আছে। তাহাদের ধাতু-মূর্ত্তিগুলা প্রধান দ্রষ্টব্য। খানিকটা প্যারিসের নিকটবর্ত্তী সাঁদেনি পল্লীর গথিক মন্দিরের আব হাওয়া পাওয়া গেল।

চিমনীর ধোঁয়া ইন্‌স্‌ব্রুকে একদম নাই। দুই দিককার পাহাড়ের দেওয়ালের ভিতর সহর অবস্থিত। সমতল ক্ষেত্র বিস্তারে বোধ হয় কোথাও এক মাইলের বেশী হইবে না।

(৭)

সেনাপতি হট্‌স্‌ ডোর্ফ বলিতেছেন:—"টিরোল—বস্তুতঃ, সমগ্র অষ্ট্রিয়াই জার্ম্মাণির সঙ্গে সংযুক্ত না হইলে, অষ্ট্রিয়ার জার্ম্মাণদের ভবিষ্যৎ বিষম অন্ধকারময় থাকিবে।" হট্‌স্‌ ডোর্ফ ছিলেন কাইজারি আমলে অষ্ট্রিয়ানদের হিণ্ডেনবুর্গ বা লুডেন ডোর্ফ।

টিরোলে চাষ-আবাদ অতি সামান্য দেখিতেছি। ভাত খাওয়া এখানকার লোকদের অভ্যাস। চাউল আসে

এশিয়া হইতে—হয় ত' খানিকটা ভারত হইতেও। ভূট্টার ক্ষেতই অনেক ঠাঁইয়ে চোখে পড়িয়াছে। সাধারণ শাক-শব্জী ছাড়া প্রায় সকল খাদ্যদ্রব্যই নয়া অষ্ট্রিয়াকে ইতালী হইতে অথবা জার্ম্মাণি হইতে আমদানি করিতে হয়। বাদশাহী অষ্ট্রিয়ার যে-যে অঞ্চলে চাষ-বাস চলিত, তাহার প্রায় সমস্তটাই এক্ষণে ভিন্ন-ভিন্ন স্বাধীন দেশের অন্তর্গত। খাওয়া-পরার সমস্যাই নয়া অষ্ট্রিয়ার এক মাত্র সমস্যা।

এক বিলাতী পাউণ্ডে পাওয়া যাইতেছে প্রায় তিন লাখ ত্রিশ হাজার ক্রোণ। শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি না হইলে, রিপাব্লিকান অষ্ট্রিয়ার মুদ্রা-সমস্যার মীমাংসা হইবে না। অথচ ভার্সাইয়ের সন্ধির বিধানে অষ্ট্রিয়ার চতুঃসীমা এত সঙ্কীর্ণ যে এদেশের শিল্প-সুযোগ নিতান্ত কম। আর দেশ-বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা চলিবে কোথা হইতে? বিদেশে পাঠাইবার উপযোগী কোনও মাল স্বদেশে উৎপন্ন হইলে ত'!

(৮)

অষ্ট্রিয়ার উপর ইতালীর জুলুম লাগিয়াই আছে। দক্ষিণ টিরোলের অধিকাংশই ইতালীর অধীনস্থ হইয়াছে। এই জনপদের শতকরা নব্বই জন লোক জার্ম্মাণ ভাষায় কথা কহে। মাত্র দশজন ইতালীয় ভাষা ব্যবহার করে। তা সত্ত্বেও ভার্সাই সন্ধির কর্ত্তারা দক্ষিণ টিরোলকে ইতালীর হাতে সঁপিয়া দিয়াছে। ইতালীকে জার্ম্মাণির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামাইবার জন্য ইংল্যাণ্ডের-রাষ্ট্র-ধুরন্ধরেরা ইতালীয় ডিপ্লোম্যাটগণের সঙ্গে দক্ষিণ টিরোল সম্বন্ধে এইরূপই একটা গুপ্ত সমঝোতা করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই পরাধীন টিরোলের কাহিনী প্রতিদিনই "ইনস্‌ব্রুকোর নাখরিখ্‌টেন" কাগজে পড়িতেছি। "আণ্ড্রিয়াস হোফার বুণ্ডের" স্বদেশ-সেবকগণ দক্ষিণ টিরোলের স্বাধীনতা ফিরাইয়া আনিতে সচেষ্ট। এই জন্য এই বুণ্ডের গন্ধ মাত্র পাইলে ইতালীয়ানরা তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠে।

দক্ষিণ টিরোলের এক বড় সহরের নাম বোৎসেন। অতি সৌন্দর্য্যময় গোলাপী গিরির আভা-মণ্ডলে এই নগরের অবস্থান। অধিকন্তু অঞ্চলটা "ধান-ধান্য-পুষ্পে ভরা।" এতদিন ধরিয়া একজন জার্ম্মাণের হাতে এই নগরের শাসনভার ছিল। ইতালিয়ানরা জোর-জবরদস্তি করিয়া বুড়া বিচক্ষণ জার্ম্মাণকে বরখাস্ত করিয়াছে। তাঁহার স্থানে বসিয়াছে এক ইতালীয়ান।

এশিয়ায় এবং আফ্রিকায় বর্ণহীন চামড়াওয়ালা জাতিরা স্থানীয় নর-নারীর উপর অত্যাচার করিয়া আসিতেছে। ইহা দুনিয়ার সর্ব্বত্রই জানা কথা। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সাদা চামড়াওয়ালা খৃষ্টান জাতি ইয়োরোপের বুকের উপর সাদা চামড়াওয়ালা অন্য এক খৃষ্টান সুসভ্য সুশিক্ষিত এবং অনেকটা গুরু-স্থানীয় জাতির উপর অবিকল সেইরূপ অত্যাচার করিতেছে। মনিবে গোলামে সম্বন্ধ দুনিয়ার সর্ব্বত্রই এক। পরাধীনতার বাজারে বর্ণভেদ, জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ, শিক্ষাভেদ নাই। জগতের সকল স্বাধীনতা-হীন জাতিই তাহাদের প্রভু-জাতির নিকট এই প্রকার লাঞ্ছনা সহিয়া থাকে।

(৯)

ইতালীতে এক নয়া আন্দোলন দেখা দিয়াছে। ইয়োরোপে যখন লড়াই থামে, তখন ইতালীয় সমাজে ছোট, বড়, মাঝারি কতকগুলা "ফাসি" অর্থাৎ সমিতি বা দল ছিল। এই ফাসিসমূহের সাহায্য পাইয়াই কবি-সেনাপতি দানুন্‌ৎসিও জুগো-স্লাভিয়ার ফিউমে বন্দরের উপর হামলা করিতে উৎসাহী হন। কয়েক বৎসরের ভিতর ফাসি-ওয়ালারা প্রবল শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। ফাসিষ্টদিগকে সংক্ষেপে ন্যাশন্যালিষ্ট ভলান্টিয়ার বলিতে পারি।

ফিউমেতে যে কাণ্ড সুরু হইয়াছিল, সেই কাণ্ড ফাসিষ্টরা আজকাল ইতালীর প্রত্যেক সীমান্ত প্রদেশে চালাইবার ফিকির ঢুঁড়িতেছে। এ এক উৎপাত-বিশেষ। ইতালীর প্রসার-বৃদ্ধি ইহাদের মূল-মন্ত্র স্বরূপ। ইতালীকে "জননী" বলিয়া সম্বোধন করা ফাসিষ্টদের এক লক্ষণ।

টিরোলের ইতালীয় জেলাগুলা ফাসিষ্টদের অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত! আণ্ড্রিয়াস হোফার বুণ্ডের সভ্যেরা সর্ব্বত্র নির্য্যাতিত হইতেছে। এই নির্য্যাতন বহু ক্ষেত্রেই অমানুষিক আকার ধারণ করিয়াছে। কোন বিদেশী কাগজে সেই সংবাদ প্রকাশ করা ইতালীর মিত্র ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের স্বার্থ নয়। নীরবে সকল যন্ত্রণা সহ্য করা আজ দক্ষিণ টিরোলের জার্ম্মাণদের দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হইতেছে। রাইণ প্রদেশের ফরাসী-ইংরেজ-শাসনেও জার্ম্মাণদের এরূপ দুর্গতি ঘটে নাই।

পরাধীন টিরোলের দুঃখ ঘুচাইবার জন্য বার্লিনে, মিউনিকে এবং জার্ম্মাণির অন্যান্য সহরে কেন্দ্র স্থাপিত
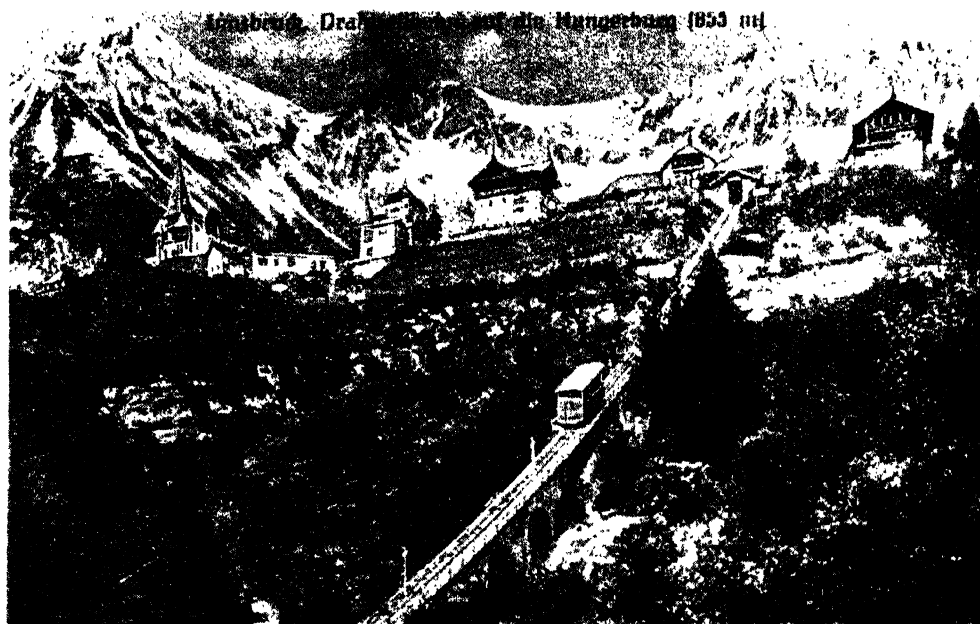
তারে টানা রেল—ইনস্‌ব্রুক

ইনস্‌ব্রুকের এক দৃশ্য

টিরোল বীর আণ্ড্রিয়াস হোকার (বার্গ ইজেল পাহাড়ে)

স্লোস্ আম্রাস (ইনস্‌ব্রুকের এক পুরান দুর্গ)
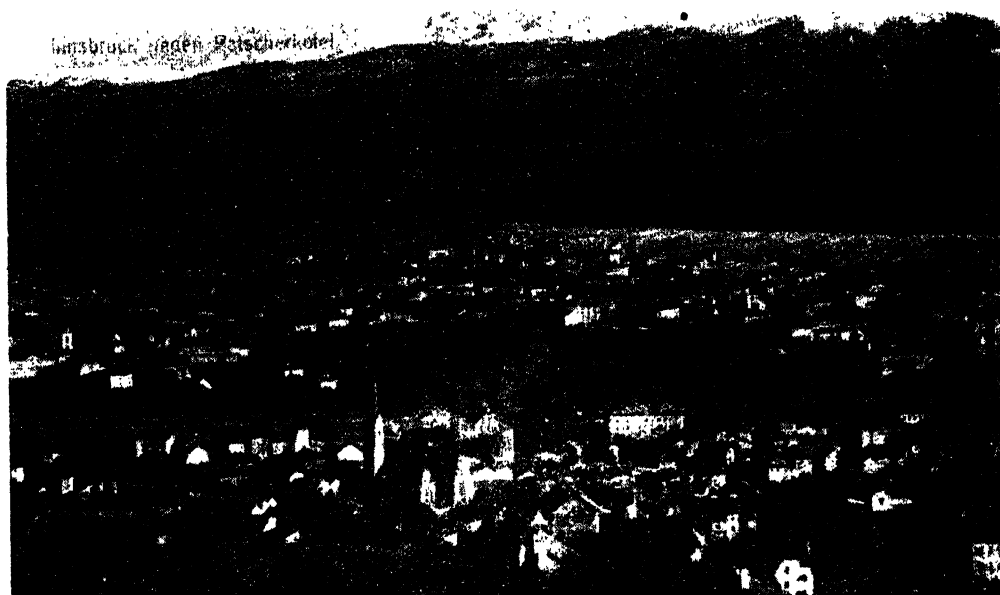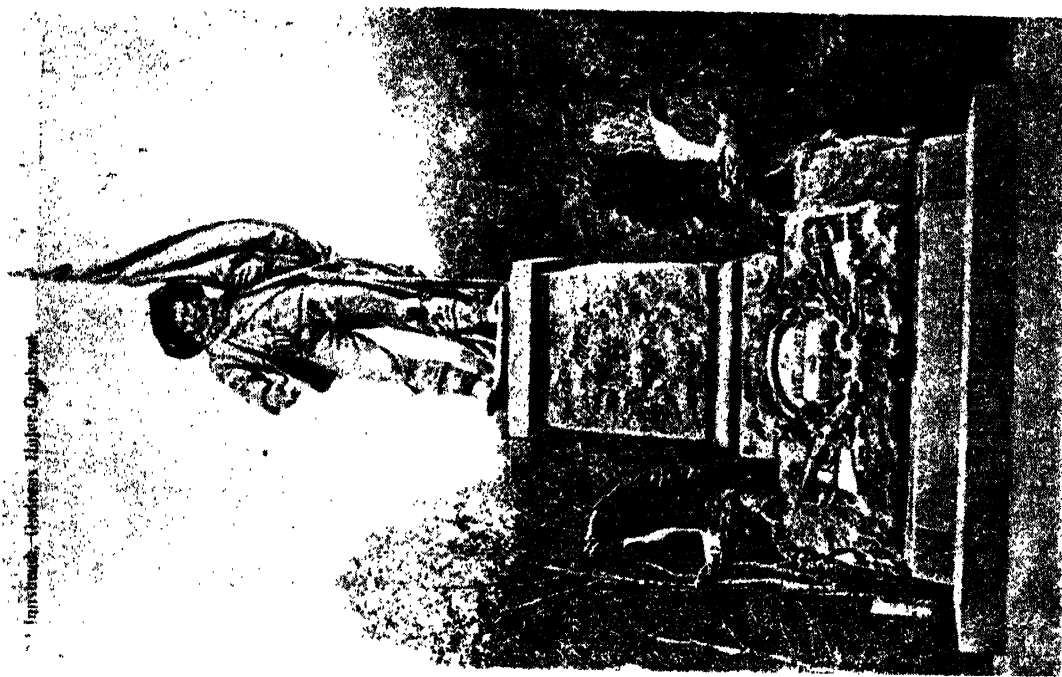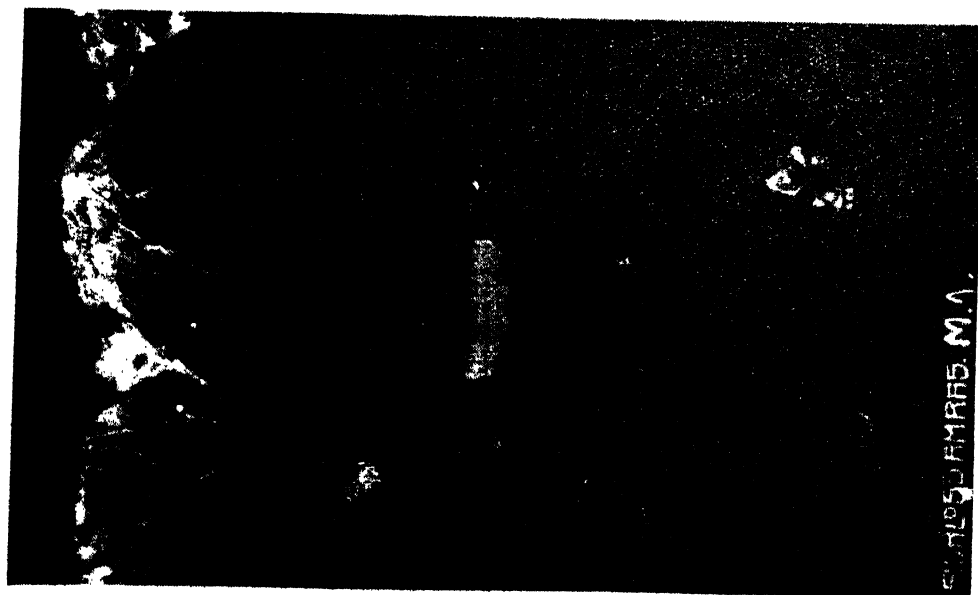
মারিয়া থেরেসা ষ্ট্রাসে (ইন্‌সব্রুকের বড় শড়ক)
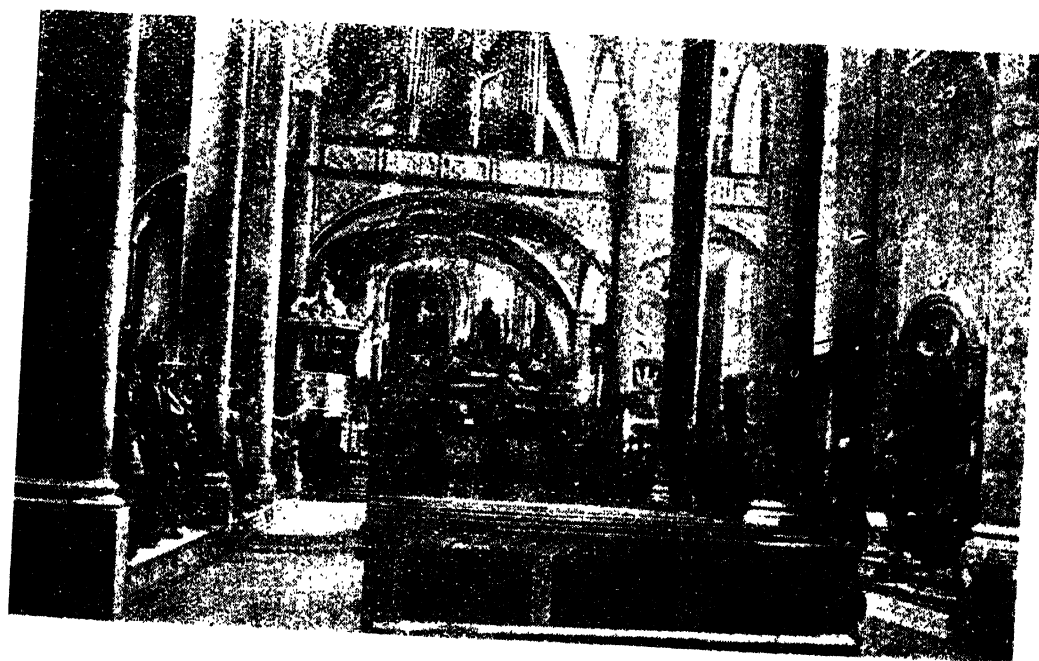
ইন্‌সব্রুকের হাফ্‌ কির্খে

হইতেছে। অষ্ট্রিয়ার টিরোল-সমস্যা একদিন ইয়োরোপে বড় রকমের আগুন জ্বালাইয়া ছাড়িবে। আল্‌সাস-লোরাণ লইয়া ফরাসীদের হিংসা-প্রবৃত্তি জার্ম্মাণদের বিরুদ্ধে যতটা জাগিত, দক্ষিণ টিরোলের জেলাগুলা সম্বন্ধে জার্ম্মাণ জাতির ইতালী-বিদ্বেষ তাহা অপেক্ষা বেশী জমিবার কারণ স্বাভাবিক।

জুগোস্লাভিয়ার আড্রিয়াটিক জেলাগুলায়ও ফাসিষ্টরা হাত বাড়াইতেছে। ইতালীর বিরুদ্ধে জুগোস্লাভিয়া প্রথম হইতেই ক্ষেপিয়া আছে। এখন আবার কাটার উপর নুনের ছিটা। ইতালীকে একবার একা পাইলে স্লাভরা ইতালীয়ানদিগকে বেশ উত্তম-মধ্যম লাগাইয়া দিবে। ইতালীর সমর-পিপাসা মিটাইবার জন্য যুবক স্লাভের হাত সুর্‌সুর করিতেছে। তবে এখনো ইতালীর পশ্চাতে আছেন "আঁতাঁত"।

ইতালীয়ানদের বাড়াবাড়ি দেখিতেছি অন্যত্রও। এমন কি সুইট্‌জার্ল্যাণ্ডের লোকেরাও ফাসিষ্টদের উৎপাতে বিব্রত। কোন কোন সুইস ক্যান্টনে ইতালীয় ভাষার ব্যবহার হইয়া থাকে। এই জেলাগুলাকে ইতালী নিজের পকেটস্থ করিতে উদ্‌গ্রীব। ফাসিষ্ট বাহাদুরেরা "জয় ইতালী মায়ী কী জয়!" বলিয়া সীমানায় আসিয়া হাজির। সুইস গবমেণ্টকে বাধ্য হইয়া এই ইতালীয় প্রচেষ্টায় বাধা দিবার জন্য ফৌজ তৈয়ারি রাখিতে হইতেছে।

(১০)

একটা পাহাড়ী পল্লীতে প্রায় আড়াই হাজার ফিট উঁচু ঠাঁইয়ে উঠিয়া আসিয়াছি। "পায়দল" নয়, রেলে। দুইধারে দেখিয়াছি কেবল পাইন-ঢাকা পাহাড়,—অদূরে উচ্চ গিরিশৃঙ্গ। প্রায়ই দরিয়ার জলের স্রোতের ডাক। আকাশ কখনো-কখনো সাদা কুয়াশায় ঢাকা।

কোথাও-কোথাও দু' একটা কুমড়ার ক্ষেত দেখা গেল। চাষ-আবাদের জমিন একপ্রকার নাই বলা চলে। গরু ছাগল গলার ঘণ্টা বাজাইয়া ঘাস খাইতেছে। যে দু-চারটা চষা জমি দেখিলাম, তাহার সকলগুলায়ই কাটা ভুট্টার স্তূপ।

টিরোলীরা খোসা-ছাড়ানো ভুট্টাগুলা ঘরের বাহিরে দেওয়ালে ঝুলাইয়া রাখে। ভুট্টাগুলা শুকাইবার এই রীতি রেলপথের দুইধারে ত দেখিয়াছিই,—ইন্‌স্‌ব্রুক সহরেও চোখে পড়িয়াছে। সাধারণতঃ ভুট্টাগুলা হল্‌দে রংয়ের। কিন্তু তাহার ভিতর লাল ভুট্টা এমন ভা[illegible] সাজানো থাকে, যাহাতে খৃষ্টধর্ম্মের সুপরিচিত "ক্রশ তৈয়ারি হয়। টিরোলের যেখানে-সেখানে ক্রশ-চী[illegible] প্রতিষ্ঠিত। জাপানী পল্লীপথেও সেইরূপ হয় শিন্তো দেউ[illegible] না হয় বৌদ্ধমূর্ত্তি পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

গ্রামের পোষ্ট-মাষ্টারের ঘরে অতিথি হইয়াছি। ডাকঘরের এক কামরায় আমার ডেরা। প্রত্যেক গ্রীষ্মে এই গ্রামে সত্তর-আশীজন বিদেশী পর্য্যটক স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আসিয়া থাকে। সরাই-জাতীয় ঘরবাড়ী পাওয়া যায়। জার্ম্মাণ ভাষায় "গাষ্ট হাফ" বা অতিথিশালা বলে। হোটেল রেষ্টরাণ্টের প্রায় সকল আরামই অতিথিরা এই সকল "হাফে" পাইয়া থাকে। জাপানেও সরাইয়ের আরাম আছে। কিন্তু চীনে ও ভারতে মোসাফিরি করা খাঁটি কর্ম্মভোগ।

গ্রামে লোকজন বোধ হয় গুণতিতে দেড়শ বা দুশ। কিন্তু একটা সরকারী ইস্কুল আছে। ছয় বৎসরে পড়িবামাত্র প্রত্যেক শিশু এই ইস্কুলে যাইতে বাধ্য। গির্জ্জা ত আছেই। পাড়ার লোকেরা সবাই চাষী বা মেষপালক। সরকারী ডাক্তার গ্রামের স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য বাহাল আছেন। ইঁহার উপরওয়ালা বড় ডাক্তার মাইল বিশেক দূরের এক গ্রামে মোতায়েন। এখানকার ডাকঘর হইতে আশে-পাশের দশ বার গ্রামের ডাক জোগানো হয়।

আমার ঘরের দুয়ারে খাঁচার ভিতর মুরগী পোষা হইতেছে। পাশের বাড়ীতে গরুর বাথান দেখিতেছি। অনতিদূরে ঘোড়ার আস্তাবল। জানালার নিকট দিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে একটা ঝরণা লাফাইয়া পড়িতেছে।

পোষ্ট-মাষ্টারের পত্নী উচ্চশিক্ষিতা মহিলা। রান্না-বাড়ার বিদ্যায় গ্রাজুয়েট। রন্ধন-বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। এক-এক বেলা এক-এক প্রকার নয়া টিরোলী রান্না খাওয়া যাইতেছে। ডাকঘরের কাজে স্বামীকে প্রতিদিন ঘণ্টা তিনেক সাহায্য করাও পত্নীর কাজ। এইজন্য ইঁনি বেতনও পান।

(১১)

একজন অষ্ট্রিয়ান ইলেক্‌ট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারের নিকট শুনিলাম, এই গ্রামের পাশ দিয়া যে ঝরণা বহিয়া যাইতেছে, সেইটাকে বিদ্যুতের কাজে লাগাইবার জন্য জার্ম্মাণ,

লাণ্ডেক (ইনতালের এক সহর)
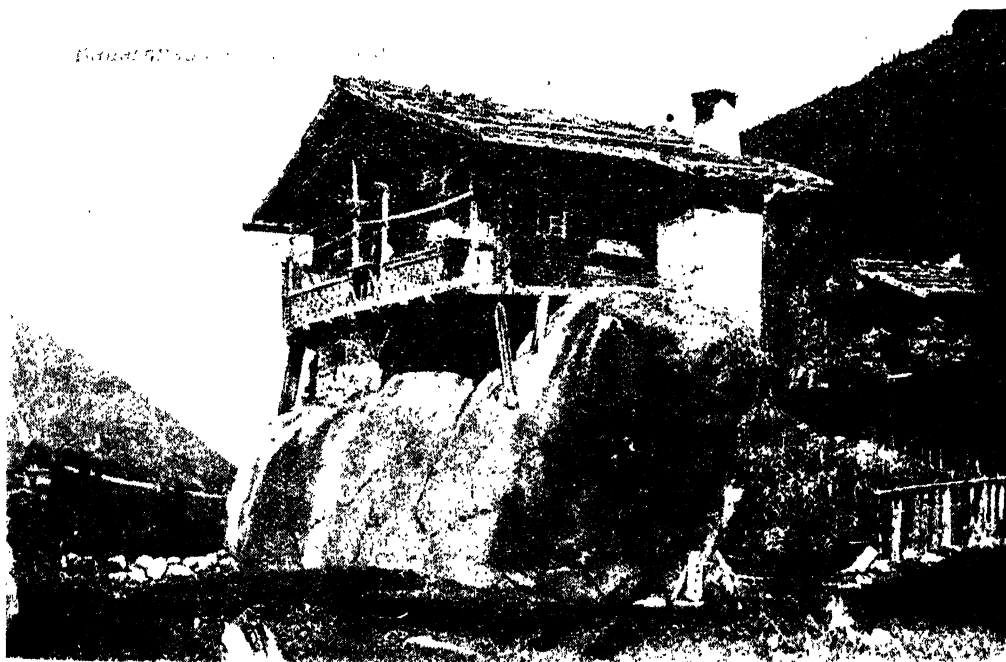
কিষাণ-কুটীর (আল্‌প্‌স পাহাড়ে

ইতালীয়ান, মার্কিন ও অষ্ট্রিয়ান মহাজনেরা মোসাবিদা করিতেছেন। আজ বার্লিনের সুপ্রসিদ্ধ জীমেন-শুকার্ট তড়িৎ-ফ্যাকটরির এক প্রতিনিধি আবেষ্টনটা পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন।

টিরোলের নানা পাহাড়ে নানা ধাতুর খনি আছে। এ যাবৎ কাল খনিতে কোন প্রকার কাজ সুরু করা হয় নাই। যুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারির অন্যান্য প্রদেশে শিল্পকর্ম্ম সুবিস্তৃত হইয়াছিল। টিরোল ছিল "হাতের পাঁচ" স্বরূপ। এক্ষণে সেই সকল শিল্পপ্রধান জনপদ অষ্ট্রিয়ার জার্ম্মাণদের হাতছাড়া হইয়াছে। কাজেই অষ্ট্রিয়াকে তাহার "স্বদেশী" জেলাগুলা হইতে ধন-সম্পদের নয়া সুযোগ বাহির করিতে হইবে। এই কারণে টিরোলের আল্প্স পাহাড়-শ্রেণীকে শিল্পের তরফ হইতে যাচাই করিয়া দেখিবার দিকে ধনবান ও বৈজ্ঞানিক লোকজনের ঝোঁক দেখা যাইতেছে।

শ পাঁচেক ফিট পাহাড় ভাঙিয়া এক পল্লীতে দেখিলাম, প্রায় সাতশ বৎসরের পুরান এক পাথরের বাড়ীতে লোহার মিস্ত্রীরা কাজ করিতেছে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই মোকামেই কম্মকার—"শ্রেণীর" পঞ্চায়ৎ বসিত। এক যুবা চিত্রকর নিকটবর্ত্তী ঝরণার কিনারা হইতে বাড়ীটার ছবি আঁকিতেছে। খানিক দূরে আর একটা বাড়ী দেখাইয়া প্রদর্শক বলিলেন—"এইটা ছিল টিরোলের শেষ জমিদারের গ্রীষ্মভবন।"

আল্পসের পল্লীতে-পল্লীতে হিমালয়েরই নানা দৃশ্য দেখিতেছি। শিমলা-আলমোড়ার লোকেরা টিরোলের গিরি-শৃঙ্গে অথবা গিরি-গাত্রে কোন নয়া জন-সমাজ অথবা কোনো নয়া প্রাকৃতিক গড়ন পাইবে না। বিশেষতঃ যাঁহারা ভারতীয় পাহাড়ের গোয়ালা, চাষী, ছাগপালক ইত্যাদির ধরণ-ধারণ, আদব-কায়দা এবং দৈনিক জীবনের সঙ্গে সুপরিচিত, তাঁহারা খৃষ্ট-ভক্ত টিরোলী আল্পসের চূড়ায় ও উপত্যকায় হিন্দু নর-নারীর সংস্কার, কু-সংস্কার, এক কথায় ভারতের সনাতন জীবন-ধারাই অহরহঃ স্পর্শ করিবেন।

(১২)

পাহাড়ে উঠা, পাহাড়ে বেড়ানো, পাহাড়ের শির টপ্‌কাইতে চেষ্টা করা আজ কাল ইয়োরামেরিকায় অতি মামুলি কথা। ভারতেও এই খেয়াল অল্পে-অল্পে দেখা দিতেছে। কিন্তু এই সব ঝোঁক জগতে মাত্র একশ-দেড়শ বৎসরের বেশী পুরানা মাল নয়। বর্ত্তমান জগৎ বাস্তবিকই সকল ক্ষেত্রেই—নেহাৎ কচি শিশু।

এত বড় আল্‌প্স পাহাড় ইয়োরোপের বুকের উপর দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু কি প্রাচীনকালে, কি মধ্য-যুগে পশ্চিমারা আল্‌প্সের শিখরে-শিখরে টো-টো করিতে প্রয়াসী হয় নাই। লড়াইয়ের সময় মাঝে-মাঝে কোন কোন দুর্গম পাহাড়ী-পথে ফৌজ চলা-ফিরা করিয়াছে সত্য। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের পাহাড়-"দেখা" সখ, খেয়াল, বাতিক বা ঝোঁক নিতান্তই কা'লকার কথা।

ইয়োরোপের কাব্য-সাহিত্য বিশাল। নানা কণ্ঠে পশ্চিমারা বাগ্‌দেবীর আরাধনা করিয়া আসিতেছে। মস্ত-মস্ত দিগগজ মহাকবি ইয়োরোপে জন্মিয়াছেন। কিন্তু ১৭২৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইয়োরোপের কোন ভাষায় আল্পস সম্বন্ধে কোন কবিতা লেখা হইয়াছিল কি না সন্দেহ। বিশেষ কষ্ট-কল্পনা করিয়া প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা সুরু করিলে হয় ত' বাহির হইবে যে, ইতালীর কবিবর দান্তে দুই এক ছত্র ঝাড়িয়াছিলেন। ইতালীর চিত্রকর দা ভিঞ্চিও বোধ হয় শিল্পে আল্পাস সম্বন্ধে এক আধ আঁচড় মারিয়াছিলেন। ঐ পর্য্যন্তই। ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে দুই ভাই সুইস পর্য্যটক পাহাড়ে "বেড়াইতে" আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভ্রমণ-কাহিনী "আল্‌প্স" নামে কবিতার আকারে জার্ম্মাণ ভাষায় প্রকাশিত।

ফরাসী সাহিত্যের যুগ-প্রবর্ত্তক রুসো মানব-জীবনকে প্রকৃতির আদর্শে গড়িতে চাহিয়াছিলেন। প্রকৃতির পথে ফিরিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা তাঁহার রচনার প্রাণ। রুসোর খেয়াল পশ্চিমা মুল্লুকে ঘটনা-চক্রে এক "প্রপাগাণ্ডা"য় পরিণত হয়। শিক্ষিত নর-নারীরা রুসোকে বগলদাবা করিয়া পাহাড়ে, বনে, জঙ্গলে ভ্রমণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। সেই প্রপাগাণ্ডা, উন্মাদনা, আন্দোলন বা উৎসাহের ফলে আল্পসের শ্রী ও বিভূতি লুটিবার জন্য রোমাণ্টিক রসরাজেরা ফ্রান্স হইতে, সুইট্‌জারল্যাণ্ড হইতে, ইতালী হইতে, ইংল্যাণ্ড হইতে, জার্ম্মাণি হইতে শিখরে-শিখরে অভিযান পাঠাইয়াছে। মহাকবি গ্যে'টেও এই হিড়িকেই আল্পসে মোসাফিরি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গদ্যসাহিত্যে তাহার পরিচয় আছে, "ফাউষ্টে"ও ঢুঁড়িলে পাওয়া যায়।

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে জেনেভার সুইস্ বৈজ্ঞানিক দে সোস্থির আল্পসের উচ্চতম শিখর ডিঙাইতে সমর্থ হন। মাউণ্ট ব্লাঙ্কের নাম পাঠশালায় শুনিয়াছি। এই সময় হইতেই আল্পসে-"নেশা" ইয়োরোপে যথার্থ রূপে দেখা দেয় বলিতে পারি। পরে সেই ঝোঁক ইয়োরোপের বাহিরের পাহাড়-গুলায় আসিয়া ঠেকে। রকি, আণ্ডিজ্, আমাদের হিমালয়, আফ্রিকার শৈলশ্রেণী, একে-একে সবই পশ্চিমা বৈজ্ঞানিক টুরিষ্ট পাহাড়-"প্রেমিক"দের আওতায় আসিয়া পড়িয়াছে।

গৌরী-শৃঙ্গ আক্রমণের যে প্রয়াস আজ দেখা যাইতেছে, তাহা এই "আল্পিনিস্ মুস্" অর্থাৎ আল্পস-বিজ্ঞানেরই এক শেষ নিদর্শন। ভারতের সিম্‌লা-দার্জ্জিলিংও পশ্চিমাদের আল্পসে-প্রেমেরই অন্যতম ফল। আর আজ যে যুবক-ভারতে পাহাড়ী নেশা মালুম হইতেছে, তাহাও নব্য ইয়োরামেরিকান "আধ্যাত্মিকতা"রই জের। বস্তুতঃ গোটা যুবক-এশিয়ার সকল প্রকার প্রাণ-স্পন্দনের পশ্চাতেই বিদেশী অথবা বিজাতীয় দস্তুর বিরাজ করিতেছে। প্রাচ্যের "স্বদেশী ও স্বরাজ" আন্দোলনে বিদেশী-প্রেমই গোড়ার কথা।

(১৩)

ইয়োরোপের নানা ভাষায় আল্পস সম্বন্ধে পত্রিকা আছে। অল্পস লইয়া ইয়োরামেরিকার নামজাদা চিত্র-শিল্পীরা বহুবিধ ছবি আঁকিয়াছেন। আল্পস-ভ্রমণ-ঘটিত নানা প্রকার তথ্য ও তত্ত্ব জানিবার জন্য ও জানাইবার জন্য পশ্চিমারা দেশে-দেশে নানা ক্লাব, "ফারাইন্" বা পরিষৎ কায়েম করিয়াছেন। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান সবই পাহাড়গুলাকে নর-নারীর ঘরের কোণে আনিয়া ধরিতেছে।

ফটোগ্রাফের ত' অন্তই নাই। যতবার পাহাড়ে-পাহাড়ে অভিযান গিয়াছে, ততবারই শত-শত ফটো লওয়া হইয়াছে। ফটোগুলায় প্রকৃতির অসীম রূপ-গরিমা হাতে-হাতে পাকড়াও কবিতে পারি। অপর দিকে পর্য্যটকদের সাহস, অধ্যবসায়, শারীরিক শক্তি, মরণাভিযানের ভাবুকতা এবং অসাধ্য সাধনের সংস্পর্শে আসিয়া চিত্ত বিস্ফারিত হয়।

ইয়োরামেরিকার লোকেরা হিমালয়ে অভিযান পাঠাইতেছে। ভারত-সন্তান চুপ করিয়া বসিয়া আছে কেন? ভারতবাসী বর্ত্তমান জগতের নয়া-নয়া বিজ্ঞানে নয়া-নয়া খেয়ালে একে-একে কিছু হাত দেখাইতেছে। পাহাড়-বিজ্ঞানের দিকে যুবক ভারত ঝুঁকিবে না কি?

হিমালয়-বিন্ধ্যের নানা নিভৃত অঞ্চল ভারতীয় সাহস, শক্তি ও পরিশ্রমের যাচাই হওয়া আবশ্যক। যাঁহারা যুবক-ভারতের ভাবুকতা ও আধ্যাত্মিকতার জন্য নয়া-নয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্র ঢুঁড়িতেছেন, তাঁহারা ভারতীয় শৈল-শ্রেণীর চূড়ায়, উপত্যকায় ভারতীয় নর-নারীর নয়া-নয়া কর্ত্তব্য-পথ দেখাইতে প্রবৃত্ত হউন।

মান্ধাতার আমলের বাল্মীকি কালিদাস "হিমাচলো নাম নগাধিরাজঃ" সম্বন্ধে যে কাব্য রচিয়া গিয়াছেন, একমাত্র সেইগুলা আওড়াইলে ভারত-সন্তানের এখন আর ইজ্জত রক্ষা হইতে পারে না। তাহাতে আমাদের দারিদ্র্য, অকর্ম্মণ্যতা, আলস্য ও দেউলিয়া অবস্থাই প্রমাণিত হইবে।

বর্ত্তমান ভারতের নর-নারীকে বিন্ধ্য-হিমালয়ের প্রস্তর-স্তূপে, বরফ-স্তূপে "লাভা-স্তূপে" দিন-রাত কাটাইতে অভ্যস্ত হইতে হইবে;—খন্তা হাতে, শাবল হাতে, বোমা হাতে, গাছ-পাথর চুরমার করিবার জন্য, লুকানো ঐশ্বর্য্য খুলিয়া দিবার জন্য, উপনিবেশ গড়িবার জন্য, মানুষের ঐশী সৃষ্টি-শক্তিকে কাজে লাগাইবার জন্য। এই মূর্ত্তিতেই মধুচ্ছন্দা অগস্ত্য বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র অমর ঋষি-কাব্য গড়িয়াছিলেন।

আর আজও,—এইরূপ পাহাড়ী-জীবনেই যে অভিজ্ঞতা পয়দা হইবে, সেই অভিজ্ঞতার চিত্র-শিল্প, সেই অভিজ্ঞতার স্থাপত্য, সেই অভিজ্ঞতার কাব্য বিশ্ব-জাতির হাটে-বাজারে জাহির করিতে পারিলেই যুবক-ভারত দুনিয়ার আসরে পান, সুপারী ও কল্কে পাইবার যোগ্য বিবেচিত হইবে। পাহাড়ের ডাক যুবক-ভারতের সাড়া অপেক্ষা করিতেছে।

(১৪)

জার্ম্মাণিতে দেখিয়াছি, অষ্ট্রিয়াতেও দেখিয়াছি, জার্ম্মাণরা সর্ব্বদাই বলে,—"জার্ম্মাণ জাতের ধাতে রিপাব্লিক বা গণতন্ত্র সহিবে না। আমরা রাজ-ভক্ত জাত,—রাজ-তন্ত্র আমাদের মজ্জাগত। রাজ-রাজাড়ার শাসন, ফৌজ-পল্টনের জাঁক-জমক, পুলিশের এক্তিয়ার ইত্যাদি লুপ্ত হইলে জার্ম্মাণ সমাজ রসাতলে যাইবে। ইতিমধ্যেই বুঝিতেছেন না, জার্ম্মাণ মুল্লুকে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা, যথেচ্ছাচার, মাৎস্য ন্যায় দেখা দিয়াছে!"

স্থালস্ বুর্গ

সোশ্যালিষ্টরা বিশেষতঃ ইহুদিরা জার্ম্মাণিতে এবং অষ্ট্রিয়াতে শান্তি-প্রিয়তা এবং গণতন্ত্র আনিতেছে। ইহাদের প্রোপাগাণ্ডার ফলে পুরান শক্রদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা লইবার প্রবৃত্তি জার্ম্মাণ-সমাজে পুষ্ট হইতে পারিতেছে না। ইহাঁদের উপর খাঁটি স্বদেশী জার্ম্মাণরা মহা খাপ্পা। অষ্ট্রিয়ান যুবক বলিতেছেন,—"আরে মশায়! সোশ্যালিষ্টগুলার পাল্লায় পড়িয়া জার্ম্মাণ নর-নারী মুসড়িয়া রহিয়াছে। ইহারা বাস্তবিক পক্ষে ইংরেজ ও ফরাসীদেরই নুন-খাওয়া স্বদেশ-দ্রোহী গুপ্তচর। ইহঁদের বিরুদ্ধে আমরা এক্ষণে কিছুই করিতে পারিতেছি না। কিছু করিলেই অমনি আঁতাত আসিয়া বার্লিন-মিউনিকের উপর দাঙ্গা করিবে। বিদেশী ও দেশী শক্রদের অত্যাচার নীরবে হজম করিতে করিতে জার্ম্মাণরা সৎ-সাহস ও কর্ত্তব্য-জ্ঞান, স্বাভাবিক কর্ম্ম-তৎপরতা, সমাজ-সেবার আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি গুণগুলা একে-একে খোয়াইয়া বসিতেছে। নৈতিক অধোগতির চরম-সীমায় আসিয়া আমরা ঠেকিতেছি। ইহাকে বলে পরাধীনতার প্রথম যুগ।"

কমাল পাশার জয়-গান চলিতেছে জার্ম্মাণ-সমাজে বেশ আন্তরিক ভাবে। লোকেরা বলাবলি করিতেছে :—"স্বাধীনতা লাভ বক্তৃতা, পরামর্শ, কন্‌ফারেন্সের কাজ নয়। সেই জন্য চাই লড়াই, পণ্টন, প্রাণ দিবার আন্দোলন। সেভর্ সন্ধি রদ্ করাইবার জন্য গণ্ডা-গণ্ডা সভা-সমিতি ডাকিলে শক্তির অপব্যয় হইত মাত্র। পরন্তু দুই মাসের লড়াইয়ের ফলে কাজ হাঁসিল হইল অতি সহজে। কমাল পাশা এশিয়াকে তাহার কর্ত্তব্যের সোজা পথ দেখাইয়া দিয়াছেন।"

বাস্তবিক পক্ষে জার্ম্মাণরা কমাল পাশার সফলতায় অনেকটা গরম হইয়া উঠিয়াছে। আশার রেখা ও প্রফুল্লতা ইহাদের চিন্তায় দেখা যাইতেছে। কমাল পাশার পক্ষে যদি সেভর্ সন্ধি উল্টাইয়া দেওয়া সম্ভব হইল, তাহা হইলে জার্ম্মাণদের পক্ষেই বা ভার্সাই সন্ধি রদ করা সম্ভব হইবে না কেন? "অতএব লাগাও ধাক্কা—যা থাকে কপালে,"—এইরূপ ধারণা যুবক জার্ম্মাণি ও অষ্ট্রিয়ার মহলে-মহলে প্রসার লাভ করিতেছে।

নায়েব মহাশয়

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

দশম পরিচ্ছেদ

জ্বলন্ত টিকে-বাঁধা বাতাসা মুখে লইয়া লুব্ধ বায়স ভবতোষ বাবু উকীলের উলুখড়-মণ্ডিত আটচালার মট্‌কায় আশ্রয় গ্রহণ করায় যে 'লঙ্কাকাণ্ড' সংঘটিত হইল, তাহার জের সহজে মিটিল না। ভবতোষ বাবুর যথাসর্ব্বস্ব ভস্মীভূত হইল; তাঁহার মূল্যবান আইনের কেতাবগুলি খাট-বিছানা, তৈজসপত্রাদি কোন সামগ্রীই রক্ষা পাইল না। এমন কি, ঘর কয়খানিরও চিহ্নমাত্র রহিল না। মুন্সেফী আদালতের প্রকাণ্ড আট্‌চালারও সেই অবস্থা হইল। নাজীর পেয়াদাদের সাহায্যে 'মহাফেজ্‌খানা' (Record room) ও মালগুদাম হইতে মূল্যবান দলীল-পত্রাদি ও ক্রোকী অস্থাবর সম্পত্তিগুলি উদ্ধারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। খড়ের চালে দাউ-দাউ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে,—যে-কোন মুহূর্ত্তে জ্বলন্ত চাল ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে,—নিবিড় ধূমে গৃহকক্ষ অন্ধকারাচ্ছন্ন; তাহার উপর অসহ্য উত্তাপ,—প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া কে সেই ঘরের ভিতর হইতে জিনিসপত্র উদ্ধার করিতে যাইবে? আর সেই অবস্থায় সেই ঘরে প্রবেশ করিতে আদেশ করিবে—সরকারের এরূপ খয়ের-খাই (কে আছে? সুতরাং সকলেই দূরে দাঁড়াইয়া হতাশ ভাবে হুতাশনের প্রচণ্ড বিক্রম নিরীক্ষণ করিতেছিল। ঘণ্টা-দুই পরে চারিদিকের প্রাচীর ভিন্ন সকলই ব্রহ্মার উদরসাৎ হইল। ভস্মের স্তূপ ব্যতীত আর কিছু অবশিষ্ট রহিল না।

অতঃপর মুন্সেফ বাবুর যাহা কর্ত্তব্য, তিনি তাহাই করিয়া চাকরী বজায় রাখিলেন। এই অগ্নিকাণ্ডের এক বিস্তীর্ণ 'রিপোর্ট' লিখিয়া তিনি তাঁহার উপরওয়ালা জজ সাহেবের নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি যদিও অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ স্থির করিতে পারেন নাই, এবং বায়সের বাতাসা-প্রীতির সহিত ইহার সম্বন্ধ আবিষ্কার করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইলেও, তিনি এইটুকু বুঝিয়াছিলেন যে, ভবতোষ বাবুর কোন শত্রু দ্বারা এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। তিনি রিপোর্টে এইটুকুমাত্রই উল্লেখ করিলেন; কে এই কার্য্যের উৎসাহদাতা, তাহা তাঁহার বা স্থানীয় কোন ভদ্রলোকেরই অনুমান করা কঠিন হইল না। কিন্তু অনুমান প্রমাণ নহে। অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া রিপোর্টে তিনি তাঁহার সন্দেহের কথা লিখিলেন না; এবং অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা পুলিশের সাধ্যায়ত্ত নয়, ইহা জানিয়াও তিনি যথানিয়মে তাঁহার রিপোর্টের একটি নকল থানার ভার-প্রাপ্ত দারোগার নিকট তদন্তের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। নলিনী দারোগাকে সাক্ষী করিয়া কেহ জ্বলন্ত টিকে ও গুড়ে-বাতাসা একসূত্রে বাঁধিয়া ভবতোষ বাবুর গৃহপ্রান্তে নিক্ষেপ করে নাই, এবং লুব্ধ কাকও পুলিশের তদন্তের সুবিধার জন্য তাহাদের সাক্ষাতে তাহা মুখে লইয়া ভবতোষের আটচালার মট্‌কায় উড়িয়া বসে নাই; সুতরাং নলিনী দারোগার তদন্তে অপরাধীর কোন সন্ধান হইল না, এ কথা বলাই বাহুল্য। তবে এ কথা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, নলিনী দারোগা প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিলেও, তাহার উপরওয়ালার নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিবে, তাহাকে এতদূর নির্ব্বোধ মনে করিবার কারণ নাই।

নলিনী দারোগা তদন্ত আরম্ভ করিলে, তাহার পূজনীয়া 'বৌদিদি' লক্ষ্মী ঠাকুরাণী একদিন সায়ংকালে তাহাকে কথায় কথায় বলিলেন, "তুমি যাই বল, আর যাই কও ঠাকুর-পো, এ কিন্তু দেওয়া 'আগুন! ভবতোষ বাবুকে খুন করবার চেষ্টা বিফল হওয়ায়, তাঁকে উদ্বাস্ত করবার জন্যেই এই লঙ্কাকাণ্ড ঘটেছে, এ সোজা কথাটা আমি মেয়েমানুষ হয়ে বুঝ্‌তে পারচি, আর তুমি অতবড় বুদ্ধিমান দারোগা হয়ে তা বুঝ্‌তে পারচ না,—এইটাই আমার বড় আশ্চর্য্যি বোধ হচ্ছে!"

নলিনী হাসিয়া বলিল, "বৌদি, আপনারা হচ্ছেন সেই

জাত—দশ হাত কাপড়েও যাদের কাছা নেই। আপনারা অনুমানের জোরে সব রকম অসম্ভব কথাই বল্‌তে পারেন; কিন্তু অনুমানটা যে প্রমাণ নয়, তা জানেন? ভবতোষ উকীলের উপর যে লাঠীবাজি করেছিল, তাকে যদি ভবতোষ সনাক্ত করতে পারতো, তা'হলে কি ফৌজদারী করতে ছাড়তো? তা সে যেই হোক, ভবতোষকে উদ্বাস্ত করে তার লাভ কি যে, সে তার ঘরের মট্‌কায় উঠে দেশলাই ধরিয়ে দেবে?"

লক্ষ্মী ঠাকুরাণী তাহার বিদ্রূপে আহত হইয়া বলিলেন, "তার লাভ আছে কি না, কি ক'রে বলি? তুমিই ত বল্লে অনুমান প্রমাণ নয়। তবে কারও যে এতে স্বার্থ আছে, তার প্রমাণ অন্ততঃ তোমার দাদা এক-আধটু পেয়েছেন। আমার কথা সত্যি কি না, তা ঐ ত উনি সাম্‌নেই বসে আছেন, ওঁকে জিজ্ঞাসা কর। ওঁর ত দশ হাতে কাছা আছে।"

লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর স্বামী মুচিবাড়িয়ার বাঙ্গালা স্কুলের প্রধান শিক্ষক রাসবিহারী বাবু তখন তাঁহার শয়ন-কক্ষের এক প্রান্তে একটি মোড়ায় বসিয়া ধূমপানের আয়োজন করিতেছিলেন। তিনি দীপশিখায় টিকেখানি ধরাইতে-ধরাইতে বলিলেন, "ভবতোষ বাবুর কাছারী-ঘর তখন ধূ-ধূ করে জল্‌ছিল,—সকলেই কাঠের পুতুলের মত হাঁ করে দাঁড়িয়ে মজা দেখ্‌চে দেখে আমার বড় রাগ হ'লো। ভাব্‌লাম, ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ হয়,—দু'ঘড়া জল এনে আগুন নিবোবার জন্যে আমার যতটুকু সাধ্য চেষ্টা করে দেখি। কিন্তু আমাকে আর সে চেষ্টা করতে হলো না; আমাদের কুঠীর বরকন্দাজ রামভজন সিং তার পাকা বাঁশের লাঠী উঁচিয়ে আমাকে বল্লে, আমি আগুন নিবুতে গেলে এক লাঠীতে আমার মাথা ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দেবে। তার পরেই সে ঘড়াটা আমার হাত থেকে কেড়ে নিলে। এতে ভবতোষের উদ্বাস্ত হওয়ায় কারও স্বার্থ আছে কি না বুঝে নাও।"

নলিনী বলিল, "দাদা, আপনাকে বড় ভাইয়ের মত শ্রদ্ধা করি,—তাই বল্‌চি, আপনি আমার কাছে যা বল্লেন, বল্লেন,—এ কথা আর কারও কাছে প্রকাশ করবেন না। আপনি সাহেব সরকারের চাকর,—হাম্‌ফ্রি সাহেবের অনুগ্রহেই আপনার চাকরীটুকু বজায় আছে। আপনি নিতান্ত সরল প্রকৃতির লোক,—কিসে কি হয়, বুঝতে পারেন না। এ কথা প্রকাশ হলে, আপনার বিপদের সীমা থাক্‌বে না; চাকরী ত যাবেই,—শেষে প্রাণ নিয়ে পালাবার পথ পাবেন না! সাহেবের কাণে উঠা চুলোয় যাক্, যদি নায়েব মহাশয়ও কারও মুখে শুন্‌তে পান—রামভজন সিং আপনাকে আগুন নিবোতে দেয় নি,—এই কথা প্রকাশ করেছেন, তাহলে আপনার এখানে পণ্ডিতি করা শিকেয় উঠ্‌বে।"

রাসবিহারী বাবু সহজ স্বরে বলিলেন, "দরকার কি ভাই আমার খুঁচিয়ে ঘা করার? আমি আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর নিতে যাওয়া আমার অনধিকার-চর্চ্চা, সে জ্ঞান আমার আছে। আমি নিজে থেকে-ও কথা কাউকে বল্‌তে যাচ্ছি নে। কিন্তু যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে,—আগুন নিবোতে গেলে কেউ আমাকে বাধা দিয়েছিল কি না, তা'হলে আমি ভাই মিথ্যে কথা বল্‌তে পারবো না,—তা আমার ভাগ্যে যাই থাক। চাকরী ত কচুর পাতার জল, এই আছে এই নেই; জীবনও চিরস্থায়ী নয়। কিন্তু সত্য সকলের উপর। মাথার উপর নারায়ণ আছেন,—প্রাণ গেলেও আমি মিথ্যে বল্‌বো না। সত্য কথা আমাকে বল্‌তেই হবে,—তাতে আমার অন্নদাতা ম্যানেজার সাহেবের অনিষ্ট হয়, উপায় কি? একমুঠো ভাতের জন্যে আমি মিথ্যাবাদী, অধার্ম্মিক হতে পারবো না।"

নলিনী হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিল, "যে সত্য কথা বল্‌লে বিপদ ঘটে, সে সত্য গোপন করাই ভাল। আমার এত টন্‌টনে ধর্ম্মজ্ঞান নেই; কিন্তু পুলিশে চাকরী করে আমার ভালমন্দ বিচারের শক্তি হয়েছে। আপনি আগুন নিয়ে খেলা করবেন না; আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি। এ ব্যাপারের শেষ কোথায়, বলা কঠিন। দেওয়ানী আদালত পুড়ে ছাই হয়ে গেছে; অনেক দলীল, নথিপত্র নষ্ট হয়েছে। এদিকে গবর্ণমেণ্টের নজর পড়বেই। হয় ত জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট, এমন কি, কমিশনর সাহেব পর্য্যন্ত এখানে তদন্তে আস্‌তে পারেন। সরেজমিনে তাঁরা স্থানীয় ভদ্র-লোকদের জবানবন্দীও নিতে পারেন। আপনারই যদি জবানবন্দী হয়, তখন কি আপনি বল্‌বেন, রামভজন সিং আপনাকে আগুন নিবোতে দেয় নি, আপনার হাত থেকে ঘড়া কেড়ে নিয়েছিল, লাঠি উঠিয়ে আপনাকে মারতে উদ্যত হয়েছিল?"

রাসবিহারী বাবু দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "নিশ্চয়ই বল্‌বো। আমি ত বলেছি, ভাগ্যে যা থাকে হবে,—আমি মিথ্যা কথা বল্‌তে পারবো না। না হয় আমার চাকরী যাবে, এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে। সত্য, ধর্ম্ম, এ কি শুধু সৌভাগ্যের সময় নিজের সুবিধে বুঝে রক্ষা করতে হবে, আর বিপদ দেখলেই তা ত্যাগ করে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে? তোমার ভালমন্দ বিচার তোমাতেই থাক। আমি তোমার উপদেশ গ্রহণ করতে পারবো না।"

"তা'হলে এখানে আপনার পণ্ডিতি করা বোধ হয় আর বেশী দিন ঘটে উঠ্‌বে না; আপনার এই রকম সাংসারিক বুদ্ধির অভাবের জন্যে ঘোর বিপদে পড়ে নাস্তানাবুদ হবেন, তা কিন্তু বলে দিয়ে যাচ্ছি।"—নলিনী দারোগা এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে উঠিয়া গেল।

নলিনী প্রস্থান করিলে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী তাঁহার স্বামীকে বলিলেন, "ঠাকুর-পো বোধ হয় তোমার কথা শুনে রাগ করে গেল! তুমি বল্লেই পার্‌তে-ও কথা আর কারুর কাছে বলবে না। একটা কথা গোপন করলে যদি বিপদের হাত থেকে এড়ানো যায়, তবে সে কথা গোপন কল্লেই বা?"

রাসবিহারী বাবু গম্ভীর ভাবে ধূমপান করিতেছিলেন। তিনি হুঁকা হইতে মুখ নামাইয়া বলিলেন, "আমি কি লোককে বলে বেড়াব—ওগো তোমরা শোন—রামভজন সিং বরকন্দাজ আমাকে বাধা দিয়ে আগুন নিবোতে দেয় নি। সে কথা বলবার কোন দরকার নেই। কিন্তু যদি সরকারের কোন কর্ম্মচারী এসে এ সম্বন্ধে আমাকে জেরা করতে আরম্ভ করে, তা'হলে আমি মিথ্যা কথা বলে আমার রুজি বজায় রাখ্‌বার চেষ্টা করবো না। চিরকাল কেউ একজায়গায় থাকতে পায় না। পাঁচ বৎসর এখানে আছি, অনেকের সঙ্গে ভাব-প্রণয় হয়েছে। আমি সত্য কথা বল্লে সাহেব যদি চাকরী থেকে বরখাস্ত করে, তাড়িয়ে দেয়, ত উপায় কি? ভগবান এত দিন সুখে রেখেছিলেন,—এর পর যদি দুঃখ-কষ্ট, অপমান সহ্য করতে হয়,—তা তাঁরই দান বলে মাথা পেতে নেব। আর সত্য কথা বল্‌তে কি, সাহেব আর নায়েবের অত্যাচার দেখে আমার মনে ঘৃণা জন্মে গেছে। এই সকল দুর্জ্জনের সহবাস যদি ত্যাগ করতেই হয়, তাতে দুঃখ নেই গিন্নি!"

লক্ষ্মী ঠাকুরাণী স্বামীকে চিনিতেন,—তিনি তাঁহাকে তাঁহার সঙ্কল্প হইতে বিচলিত করিবার চেষ্টা করিলেন না।

এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। এই কয়দিনের মধ্যে কুঠীর ছোট-বড় সকল আমলার সহিতই রাসবিহারী বাবুর একাধিকবার সাক্ষাৎ হইল; কিন্তু ভবতোষ বাবুর গৃহদ্বারে আগুন নিবাইতে গিয়া তিনি বাধা পাইয়াছিলেন কি না, এ কথা কেহই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল না। ইহাতে তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন,—তাঁহার আশা হইল, নলিনী দারোগা এ কথা লইয়া কাহারও সহিত আলোচনা করে নাই। কিন্তু সপ্তাহ পরে যে দিন সায়ংকালে হাম্‌ফ্রি সাহেব রাসবিহারী বাবুকে তাঁহার খাসকামরায় ডাকিয়া পাঠাইলেন, সেই দিন তিনি বুঝিতে পারিলেন, এ-যাত্রা তাঁহার আর পরিত্রাণ নাই। তিনি কুঠীর কর্ম্মচারী নহেন, সাহেবের সহিত প্রত্যক্ষতঃ তাঁহার কোন সম্বন্ধ ছিল না; এবং সাহেব কখন তাঁহার মত সামান্য প্রাণীর খোঁজ-খবরও লইতেন না। এত লোক থাকিতে সাহেব তাঁহাকে কুঠীতে ডাকিয়া পাঠাইলেন কেন? ব্রাহ্মণ ভয়ে দুর্গা নাম জপ করিতে লাগিলেন। অপমানকে তিনি বড় ভয় করিতেন।

হাম্‌ফ্রি সাহেব যখন রাসবিহারী বাবুকে তাঁহার কুঠীতে ডাকিয়া আনিতে বরকন্দাজ পাঠাইলেন, তাহার ঘণ্টা-খানেক পূর্ব্বে তাঁহার আদেশে নলিনী দারোগা তাঁহার কামরায় উপস্থিত হইয়াছিল। নলিনী কামরায় প্রবেশ করিয়া সাহেবের ইঙ্গিতে একখানি চেয়ারে উপবেশন করিলে, সাহেব বলিলেন, "ওয়েল দারোগা, তুমি ত এ এলাখার সকল খবরই দস্তুরমত রাখিয়া থাক। জজ সাহেব এখানকার মুন্সেফী আদালতের অগ্নিকাণ্ডের তদন্তে আসিতেছেন, এ সংবাদ জানিতে পারিয়াছ কি?"

নলিনী দারোগা সবিস্ময়ে বলিল, "জজ সাহেব তদন্তে আসিতেছেন! না হুজুর, সে খবর আমি পাই নাই, আপনার মুখেই এই প্রথম শুনিতেছি! তিনি কবে আসিবেন? এ সংবাদ আপনি কোথায় পাইলেন?"

সাহেব বলিলেন, "তিনি কাল সকালে এখানে আসি-বেন। মুন্সেফী আদালত আগুন লাগিয়া পুড়িয়া যাওয়ায়, মুন্সেফ সেই ঘটনার কথা তাঁহার নিকট রিপোর্ট করিয়াছিল। সেই রিপোর্ট অনুসারে তিনি সরেজমিনে তদন্তে আসিতে-ছেন। তিনি একা গোপনে আসিবেন; এমন কি, তাঁহার

নাজীর ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন আমলাই এ কথা জানে না। তিনি নাজীরকে গোপনে পাল্কী বেহারার বন্দোবস্ত করিতে বলায়, নাজীর ইহা জানিতে পারিয়াছে; নাজীর আমাদের অনুগত লোক। সে আমাদের সদরের মোক্তারকে সংবাদ দেওয়ায়, মোক্তার তাড়াতাড়ি আমার কাছে লোক পাঠাইয়াছে। মোক্তারের পত্রেই এ কথা জানিতে পারিয়াছি। তিনি-প্রয়োজন মত যে দুই একদিন এখানে থাকিবেন—তোমার থানাতেই বাস করিবেন স্থির করিয়াছেন।"

নলিনী অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিল, "জজ সাহেবের এ আবার কি রকম নূতন খেয়াল হুজুর! স্থানান্তর হইতে সাহেব-সুবো যিনি যখন এখানে আসেন, হুজুরেরই আতিথ্য গ্রহণ করেন, কুঠীতেই বাস করেন। জজ সাহেব এখানে আসিয়া থানায় আড্ডা ফেলিবেন—এ যে নূতন কথা!"

সাহেব বলিলেন, "কিন্তু বিস্ময়ের কথা নহে। আমার বিশ্বাস, এই অগ্নিকাণ্ডের সহিত আমাদের সংস্রব আছে বলিয়াই জজ সাহেবের সন্দেহ হইয়াছে। আমাদের বিরুদ্ধে যদি কোন প্রমাণ পান, তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য নিশ্চয়ই তিনি চেষ্টা করিবেন। এ অবস্থায় তিনি আমার আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারেন না। এই জন্যই বোধ হয় তিনি আমার কুঠীতে না উঠিয়া থানায় আশ্রয় লইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন তাঁহার থানায় বাসা লইবার অন্য কোন কারণ থাকিতে পারে না। তিনি স্থানীয় দুই চারিজন ভদ্র লোককে ডাকাইয়া তাহাদের জবানবন্দী লইবেন, হয় ত জেরাও করিবেন। আমাদের উপর দোষ আসিতে পারে, এরূপ কোন কথা কেহই বলিতে সাহস করিবে না, তাহা জানি; কিন্তু তথাপি আমাদের সতর্ক থাকা আবশ্যক। এ জন্য আমি কি করিতে চাই জান?"

দারোগা বলিল, "না হুজুর, আপনি না বলিলে আপনার মনের কথা কিরূপে জানিব? হুজুরের আশ্রয়ে থাকিয়া সামান্য দারোগা-গিরি করিয়া অতি কষ্টে পরিবার প্রতিপালন করিতেছি। হুজুরের মনের কথা অনুমান করিবার শক্তি থাকিলে, এতদিন পুলিশের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইতাম,—ষাট টাকা বেতনের চাকরী লইয়া কনষ্টেবলের রাখালী করিতাম না!"

সাহেব প্রীত হইয়া বলিলেন, "দেখ নলিনী, আমার আশ্রয়ে তুমি কি সুখে নাই? তুমি নিমকের খাতির রাখিতে জান, আমিও তোমার প্রতি 'ফেবর' দেখাইতে কসুর করি নাই। কোন্ শা—'ডেপুটী সুপ্রেন্‌ডেণ্ট অফ্ পোলিস্' তোমার চেয়ে বেশী পয়সা উপার্জ্জন করে? আমরা যে অকৃতজ্ঞ নই—তা বারেণ হেষ্টিংসের সময় হইতে এ দেশের লোক দেখিয়া আসিতেছে। আমরা বিদেশী, বিধর্ম্মী,—তোমাদের রাজার জাত। তথাপি কোন্ লোভে পদানত তোমরা আমাদের অনুগত, অনুরক্ত থাক? রূপচাঁদের পয়জারই কি তার একমাত্র কারণ নয়? যাহা হউক, এবার তুমি আমার পরামর্শ অনুসারে কাজ কর—কার্য্যোদ্ধার হইলে তোমাকে পেট ভরিয়া 'সোণার পয়জার' আহার করাইব।"—সাহেব বড়ই রসিকতা করিলেন ভাবিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। 'সোণার পয়জার' লাভের ইঙ্গিত শুনিয়া, লোভে নলিনীর দু'পাটী দাঁতই উদ্ঘাটিত হইয়া, সাহেবের রসিকতার সমর্থন করিল! তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

চতুর নলিনী মুহূর্ত্তে মানসিক উল্লাস সংযত করিয়া বলিল, "হুজুর আমার মুরুব্বি, পয়জারের লোভ দেখান নিষ্প্রয়োজন। কি আদেশ বলুন, আমার অসাধ্য না হইলে হুকুম তামিল করিতে বিলম্ব হইবে না।"

সাহেব খুসী হইয়া বলিলেন, "তা আমি জানি। একদিন শুনিয়াছিলাম, তুমি থানার ঘর মেরামত করাইবে, তাহার আর বিলম্ব কত?"

নলিনী দারোগা সাহেবের এই প্রশ্নের মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না। সে মুহূর্ত্তকাল ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "হাঁ, শীঘ্রই মেরামতের কাজ আরম্ভ করিবার কথা আছে। আপনার কাছে শুনিতেছি, জজ সাহেব কালই এখানে আসিয়া থানায় আড্ডা লইবেন। তিনি চলিয়া যাইবার পর লোক লাগাইব।"

সাহেব বলিলেন, "না, তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই কাজ আরম্ভ কর। আমি লোক দিতেছি,—আজ রাত্রেই।"

নলিনী বলিল, "এখন ত রাত্রি প্রায় আটটা; এমন কি দরকার যে আজ রাত্রেই—"

সাহেব বাধা দিয়া বলিলেন, "হাঁ, লোক লইয়া গিয়া এই রাত্রেই থানার ঘরের মেঝে এমন ভাবে খুঁড়াইয়া রাখিবে যেন তিনি সেখানে এক রাত্রিও বাস করিতে

না পারেন। এরূপ গভীর করিয়া মেঝে খুঁড়াইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহাকে বলিবে, মেঝেতে একটা গর্ত্ত ছিল, তাহার ভিতর একটা গোখ্‌রো সাপ প্রবেশ করায় মেঝে খুঁড়িয়া দেখা গিয়াছে, কিন্তু সাপ পাওয়া যায় নাই! একে ঐ রকম মেঝে, তাহার উপর গোখ্‌রো সাপের কথা,—জজ সাহেব বাপ্‌ বাপ্‌ বলিয়া পলাইবে।"

দারোগা হাসিয়া বলিল, "হুজুর কান্‌সারণের ম্যানেজার না হইয়া আমাদের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল হইলে খুব মানাইত। এ রকম চমৎকার ফন্দী তাঁহার মাথাতেও গজায় কি না সন্দেহ! আপনার হুকুম আজ রাত্রেই তামিল করিব। কিন্তু আমি আর একটা কথা ভাবিতেছি। জজ সাহেব না হয় থানায় বাস না-ই করিলেন; কিন্তু তিনি যদি অগ্নিকাণ্ডের তদন্ত উপলক্ষেই এখানে আসেন, তাহা হইলে কি মাথালো-মাথালো দুই-চারি-জন লোককে ডাকাইয়া এই দুর্ঘটনার বিবরণ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না? বিশেষতঃ যদি আপনার সন্দেহ সত্য হয়—অর্থাৎ অগ্নিকাণ্ডের সহিত আপনাদের সংস্রব আছে, এ সন্দেহ তাঁহার মনে স্থান পাইয়া থাকে—তাহা হইলে তিনি কি তাহার দুই-একটা প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা না করিয়াই ফিরিবেন?"

হাম্‌ফ্রি সাহেব বলিলেন, "তা করুন না। কাহার ঘাড়ে তিনটে মাথা যে, সে মুচিবাড়িয়ায় বাস করিয়া আমাদের বিরুদ্ধে জজ সাহেবের কাছে ঠকামী করিবে? ভবতোষ উকীল আমাদের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে পারে,—কিন্তু সে কোন্‌ প্রমাণে আমাদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিবে? আমি জানি সে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিলেও মিথ্যা কথা বলিবে না। তাহার যত দোষই থাক সে মিথ্যাবাদী নহে। তাহার মনুষ্যত্ব আছে।"

নলিনী বলিল, "মিথ্যাবাদী অপেক্ষা সত্যবাদীকেই বেশী ভয়। আমি অন্ততঃ একজনকেও জানি, যে প্রাণ গেলেও মিথ্যা কথা বলিবে না। জজ সাহেব যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে সে বলিবে, সে জলের কলসী লইয়া ভবতোষ বাবুর ঘরের আগুন নিবাইবার চেষ্টা করিতে গিয়াছিল; কিন্তু আপনার বরকন্দাজ রামভজন সিং তাহাকে নিষেধ করিয়াছিল, তাহাকে এই কার্য্যে বাধা দেওয়ার জন্য লাঠী দিয়া মারিতেও উদ্যত হইয়াছিল। হুজুরের একজন ভদ্রনামধারী চাকরের মুখে এ কথা শুনিলে জজ সাহেবের মনে ধারণা হইবে, এই অগ্নিকাণ্ডে আপনাদের স্বার্থ আছে। সম্ভবতঃ তিনি বিশ্বাস করিবেন—অগ্নিকাণ্ডটা আপনাদেরই ষড়যন্ত্রের ফল।"

দারোগার কথা শুনিয়া হাম্‌ফ্রি সাহেবের লাল মুখ আরও বেশী লাল হইয়া উঠিল; তিনি সক্রোধে টেবিলে মুষ্টাঘাত করিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "আমার চাকর! কে সেই নিমকহারাম শয়তান শুয়ার-কা-বাচ্চা, যে জজ সাহেবের কাছে আমাদের বিরুদ্ধে এ রকম চুক্‌লামি করিতে সাহস করিবে? শীঘ্র তাহার নাম বল।"

নলিনী মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "লোকটা নিরীহ ও আমার অনুগত। হুজুর হয় ত তাহার সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন, এই আশঙ্কায়, তাহার সম্বন্ধে কোন কথা হুজুরকে বলি,—আমার এরূপ ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু সে আমার যতই অনুগত হোক, হুজুরের চাকর হইয়া সে যে আপনার অনিষ্ট করিবে,—ইহা অসহ্য। হুজুরকে সতর্ক করিবার জন্যই তাহার অনিষ্টের আশঙ্কা সত্ত্বেও কথাটা প্রকাশ করিতে হইতেছে।"

সাহেব অধীর ভাবে বলিলেন, "কে সে? কেন তাহার নাম বলিতে বিলম্ব করিতেছ?"

নলিনী বলিল, "সে হুজুরের একজন নগণ্য চাকর। হুজুরের ইস্কুলের হেড্‌ পণ্ডিত রাসবিহারী চক্রবর্ত্তী। কয়েকদিন পূর্ব্বে তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে কথায়-কথায় আমাকে বলিয়াছিল—এই অগ্নিকাণ্ডে আপনাদের স্বার্থ আছে—ইহার প্রমাণ সে পাইয়াছে। ভবতোষ উকীলের বাড়ীর আগুন নিবাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া সে কিরূপে বাধা পাইয়াছিল—তাহা আমার নিকট প্রকাশ করায়, আমি তাহাকে সতর্ক করিবার জন্য বলিলাম, এ কথা যেন সে আর কাহাকেও না বলে। আমার অনুরোধ শুনিয়া সে বলিল, নিজের ইচ্ছায় সে এ কথা কাহাকেও বলিবে না বটে, কিন্তু যদি গবর্মেণ্টের তরফ হইতে কেহ তদন্তে আসে, আর তাহাকে জিজ্ঞাসা করে—তাহা হইলে যেরূপে তাহাকে বাধা দেওয়া হইয়াছিল—তাহা বলিতে কুণ্ঠিত হইবে না। আমি পুনঃপুনঃ নিষেধ করিলেও, সে আমার অনুরোধে কর্ণপাত করিতে সম্মত হয় নাই; বলিয়াছিল—অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক—সে সত্য

কথা গোপন করিতে পারিবে না। তাহার বিশ্বাস, সত্য কথা গোপন করিলে অধর্ম্ম হয়! পণ্ডিতের ধর্ম্মজ্ঞান ইহার অধিক আর কি হইবে? আমি ত চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। এখন হুজুর যদি লোভ দেখাইয়া তাহার মুখ বন্ধ করিতে পারেন—তাহা হইলেই মঙ্গল। নতুবা মজুর লইয়া গিয়া এই রাত্রিকালে থানার মেঝে খুঁড়িয়া সাপ খুঁজিবার অভিনয়ে কোন ফল হইবে না।"

সাহেব বলিলেন, "তাহার ধর্ম্মজ্ঞান দুই চাবুকেই লোপ পাইবে। আমি বরকন্দাজ দিয়া এখনই তাহাকে ধরিয়া আনাইতেছি। তোমার সাক্ষাতেই তাহাকে সায়েস্তা করিতেছি দেখ।"

নলিনী ব্যস্ত ভাবে বলিল, "না সাহেব, যাহা করিতে হয়, আমার অসাক্ষাতে করিবেন; আর এ কথা আপনি আমার কাছে শুনিয়াছেন, তা প্রকাশ করিবেন না।—আমরা পুলিশের লোক, পরম বন্ধুও যদি আমাদের স্বার্থ-নাশে উদ্যত হয়—তাহাকেও ছাড়ি না। কিন্তু অল্পদিন 'সার্ব্বিসে' ঢুকিয়াছি—এখনও চক্ষুলজ্জা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে পারি নাই। আমি এখন চলিলাম, আমার অসাক্ষাতে যাহা করিতে হয় করিবেন।"

সাহেবকে অভিবাদন করিয়া নলিনী থানায় ফিরিয়া গেল। হাম্‌ফ্রি সাহেব থানার ঘরের মেঝে খুঁড়িবার জন্য চারিজন লোক পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া, রাসবিহারী বাবুকে কুঠীতে ধরিয়া আনিবার জন্য তাঁহার বাসায় একজন বরকন্দাজ পাঠাইলেন। সে কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

পণ্ডিত মহাশয় সাহেবের কুঠীর বারান্দায় উঠিয়া, তাঁহার চটিজোড়াটা এক পাশে খুলিয়া রাখিয়া, হাম্‌ফ্রি সাহেবের কামরায় প্রবেশ করিলেন; ব্যাঘ্রের গুহায় প্রবেশ করিবার সময় ছাগশিশুর যেমন অবস্থা হয়—তাঁহার অবস্থাও তখন প্রায় সেইরূপ। নলিনী দারোগাকে বিদায় করিয়া সাহেব তখন কি একটা কাগজ দেখিতেছিলেন। পণ্ডিত তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইলে, সাহেব মুখ তুলিয়া চাহিলেন। তাহার পর তাঁহাদের যে কথা হইল, ভাষা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া আমরা তাহা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

সাহেব। তুমিই আমার বাঙ্গলা ইস্কুলের পণ্ডিত রাসবিহারী চক্রবর্ত্তী।

পণ্ডিত। হাঁ হুজুর!

সাহেব। এখানে কত দিন চাকরী করিতেছ?

পণ্ডিত। গত পাঁচ বৎসর হইতে।

সাহেব। কয় টাকা দরমাহা পাও?

পণ্ডিত। কুড়ি টাকা।

সাহেব। শুনিয়াছি তুমি খুব ভাল পণ্ডিত। তুমি অনেক গাধা পিটিয়া ঘোড়া করিয়াছ! এতদিন তোমার বেতন বৃদ্ধি হওয়া উচিত ছিল। কুড়ি টাকা বেতনে তোমার সংসার চলে?

পণ্ডিত। চলে, হুজুর! আমি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ। সংসারে আমি, আর আমার স্ত্রী। আমার কোন ব্যয়-বাহুল্য নাই। কুড়ি টাকা বেতনই আমার পক্ষে যথেষ্ট মনে করি। আমার পূর্ব্বপুরুষেরা অধ্যাপনা কার্য্যে দেহপাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বহু শিষ্য প্রতিপালন করিতেন, তাহাদিগকে বিদ্যাদান করিতেন। আমি তাঁহাদের কুলাঙ্গার বংশধর, পেটের দায়ে চাকরী করিতে বাধ্য হইয়াছি, ছেলে পড়াইয়া পয়সা লইতেছি! আমার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট হীনতা; আমি আর বেতন বৃদ্ধির কামনা করি না।

সাহেব দেখিলেন, এরূপ নির্ব্বোধ বর্ব্বরকে লোভ দেখাইয়া কোন ফল নাই। তখন তিনি সুর বদল করিয়া কাজের কথা পাড়িলেন; বলিলেন, "ভবতোষ বাবু উকীলের ঘরে যখন আগুন লাগে, তখন তুমি সেখানে ছিলে?"

পণ্ডিত। আগুন লাগিতে দেখি নাই। যখন তাঁহার কাছারী ঘর হু হু করিয়া জ্বলিতেছিল—সেই সময় আমি সেখানে গিয়াছিলাম।

সাহেব। আগুন নিবাইবার চেষ্টা করিয়াছিলে?

পণ্ডিত। হাঁ, হুজুর, চেষ্টা করিয়াছিলাম বটে; কিন্তু বাধা পাওয়ায় সে চেষ্টা ত্যাগ করিতে বাধ্য হই।

সাহেব। কে তোমাকে বাধা দিয়াছিল?

পণ্ডিত। জমীদার সরকারের বরকন্দাজ রামভজন সিং। সে আমার নিকট হইতে জলের ঘড়া কাড়িয়া লইয়া, লাঠী বাগাইয়া ধরিয়া ভয় দেখাইয়াছিল। আমি ক্ষান্ত না হইলে, দুই-এক ঘা বোধ হয় আমার পিঠে পড়িত।

সাহেব। বরকন্দাজ তোমাকে বাধা দিল কেন?

পণ্ডিত। তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই।

সাহেব। তোমার কিরূপ অনুমান ?

পণ্ডিত। আমার অনুমান হুজুরের না শোনাই ভাল। তাহা শুনিলে হুজুর সুখী হইবেন না।

সাহেব। তোমার ধারণাটা কি, আমি শুনিতে চাই, বল।

পণ্ডিত। আমার অনুমান, উকীল ভবতোষ বাবুর বাসা পুড়িয়া ছাই হইয়া যাউক, কেহ তাহা রক্ষা করিতে না যায়—এই উদ্দেশ্যেই বরকন্দাজ আমাকে বাধা দিয়াছিল। ভবতোষ বাবু জলে বাস করিয়া কুমীরের সঙ্গে বিবাদ আরম্ভ করিয়াছেন ; সুতরাং, রামভজন সিংএর ব্যবহার দেখিয়া আমি বিস্মিত হই নাই। আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, কানুসারণের কারপরদাজেরা আরও দুই-চারি জনকে এই ভাবে বাধা দেওয়ায় তাহারা আগুন নিবাইবার চেষ্টা ত্যাগ করিয়াছিল।

সাহেব। সেই দুই-চারিজনের নাম বলিতে পার ?

পণ্ডিত। না, হুজুর ! আমি তাহাদের চিনিয়া রাখি নাই ; এখানকার বাসেন্দা নহে, বোধ হয় তাহারা ভিন্ন গ্রামের লোক—আদালতে মামলা করিতে আসিয়াছিল।

সাহেব। রামভজন সিং তোমাকে বাধা দিয়াছিল, তোমার এ কথা আমি অবিশ্বাস করি না ; কিন্তু তুমি তাহার যে কারণ অনুমান করিয়াছ, তাহা সত্য নহে। সেই জ্বলন্ত আটচালায় আগুন নিবাইতে গিয়া অনর্থক কেন পুড়িয়া মরিবে, দুই চারি ঘড়া জলে সে আগুন নিবিবার সম্ভাবনা ছিল না ; এই জন্য—তোমারই মঙ্গলের জন্য বরকন্দাজ তোমাকে বাধা দিয়াছিল। কিন্তু তুমি তাহার সদুদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া, দুরভিসন্ধি আরোপ করিতেছ। তুমি অতি বদ্ লোক।

পণ্ডিত বলিলেন, "সেই জন্যই হুজুর আমার বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এ বুড়া বয়সে আমি যে ভাল লোক সাজিয়া হুজুরকে খুসী করিতে পারিব, সে আশা নাই।"

সাহেব। গবর্মেণ্টের কোন পদস্থ কর্ম্মচারী—পুলিশ সাহেব, ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বা জজ সাহেব যদি এখানে এই অগ্নিকাণ্ডের তদন্তে আসিয়া তোমাকে জেরা করেন, তাহা হইলে আমাকে যে সকল কথা বলিলে, তাঁহার সাক্ষাতেও কি তাহাই বলিবে ? রামভজন সিং তোমাকে বাধা দিয়াছিল সে কথাও বলিবে না কি ?

পণ্ডিত। জিজ্ঞাসা করিলে নিশ্চয়ই বলিব। ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া মিথ্যা কথা ত বলিতে পারিব না।

সাহেব। তুমি 'ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির' হইয়াছ ! নিমক হারাম, বেইমান !

পণ্ডিত। গালি দিবেন না সাহেব ! আপনার মত মহতের মুখে ইতর গালাগালি শোভা পায় না। আমি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির হইলে আপনার স্কুলে কুড়ি টাকার পণ্ডিতি করিতে আসিতাম না। ধর্ম্মপুত্র না হইলেও পরম ধার্ম্মিক, সত্যনিষ্ঠ অধ্যাপকের বংশে আমার জন্ম। আমার পিতৃ-পুরুষেরা মিথ্যাবাদী ছিলেন না, আমিও কোন কারণে মিথ্যা কথা বলিতে পারিব না।

সাহেব। কে তোমাকে মিথ্যা কথা কহিতে বলিতেছে ? কোন লোক তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, বাধা দেওয়ার কথাটা গোপন করিবে। অপরকে বাধা দিতে দেখিয়াছ কি না তাহাও বলিবার আবশ্যক নাই।

পণ্ডিত। মিথ্যা কথা বলা, আর জানিয়া-শুনিয়া সত্য গোপন করা—একই কথা। জিজ্ঞাসা না করিলে আমি আপনা হইতে কিছু বলিব না ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে প্রকৃত ঘটনার কথা গোপন করিব না।

সাহেব উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, আলবৎ করিবে ! তুমি ত তুমি,—তোমার বাপ্ আমার হুকুম তামিল করিবে।

পণ্ডিত। বাপ তুলিবেন না সাহেব ! আমি আপনার স্কুলে পণ্ডিতি করি, সুতরাং আপনার চাকর। আপনি মনিব, এই অধিকারে অন্যায় আদেশ করিলে, তাহা পালন করিতে পারিব না।

সাহেব। তোমার বড় আস্পর্দ্ধা হইয়াছে। তোমার মত ধার্ম্মিক লোকের এখানে চাকরী করা পোষাইবে না। আমি তোমাকে 'ডিস্‌মিস্' করিলাম।

পণ্ডিত। উত্তম, তাহাতে আমার কোন দুঃখ নাই। পাঁচ বৎসর আপনার চাকরী করিতেছি। তাহার পূর্ব্বে ভগবান আমাকে অনাহারে রাখেন নাই। যিনি সামান্য কীট-পতঙ্গকে পর্য্যন্ত আহার দান করিতে ভুলেন না, তিনি ভবিষ্যতেও আমাকে অনাহারে রাখিবেন না। কালই আমি আপনার রামরাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব।

সাহেব মনে করিয়াছিলেন, দাম্ভিক পণ্ডিতটা তাঁহার কথায় ভয় পাইয়া নরম হইবে; তাঁহার আদেশ পালনে সম্মত হইবে। চাকরীজীবী বাঙ্গালীর চাকরী যাওয়ার ভয় মৃত্যুভয় অপেক্ষা প্রবল! চাকরী বজায় রাখিবার জন্য সে সকল প্রকার হীনতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত। কিন্তু বরখাস্ত হইবার কথা শুনিয়াও সে দমিল না; অবলীলাক্রমে বলিল, চাকরী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে প্রস্তুত! সাহেবের বিস্ময় মুহূর্ত্তে দুর্দ্দমনীয় ক্রোধে পরিণত হইল; তিনি বিকৃত স্বরে বলিলেন, "কাল নয়,—আজ এই রাত্রেই যদি তুমি মুচিবাড়িয়া ছাড়িয়া চলিয়া না যাও,—যদি কাল সকালে তোমাকে তোমার বাসায় দেখিতে পাওয়া যায়—তাহা হইলে আমার মেথর তোমার স্ত্রীর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া, তাহাকে পথে রাখিয়া আসিবে। জল্‌দি ভাগো হিঁয়াসে।"

রাসবিহারী বাবু সাহেবকে সেলাম করিয়া বলিলেন, "সেলাম সাহেব, চলিলাম; কিন্তু আজ আপনি মনুষ্যত্ব ও শিষ্টাচারের যে নমুনা দেখাইলেন, তাহা আপনার স্বজাতির—ইংরাজ জাতির পক্ষে অত্যন্ত গৌরবজনক!"

হাম্‌ফ্রি সাহেব আরক্ত বদনে, ক্রোধ কম্পিত স্বরে হুঙ্কার দেওয়ার পূর্ব্বেই, রাসবিহারী বাবু সাহেবের কামরা হইতে অদৃশ্য হইলেন। তিনি সেই রাত্রেই অনেক চেষ্টায় একখানি নৌকা সংগ্রহ করিয়া, সেই নৌকায় সপরিবারে মুচিবাড়িয়া পরিত্যাগ করিলেন। পরদিন সকালে নলিনী দারোগা তাহার 'দাদা' ও 'বৌদি'র সংবাদ লইতে রাসবিহারী বাবুর বাসায় আসিয়া দেখিল—বাসাখানি পড়িয়া আছে! সে সকলই বুঝিতে পারিল। সে পূর্ব্বরাত্রে হাম্‌ফ্রি সাহেবের হুকুম তামিল করিয়াছে,—থানা-ঘরের মেঝে কোদাল দিয়া খুঁড়িয়া মনুষ্য-বাসের অযোগ্য করিয়া রাখিয়াছে,—সাহেবকে এই সংবাদ দিতে কুঠীর দিকে যাইতেছে, এমন সময় সে দেখিল, বার জন বেহারা জজ সাহেবের পাল্কী লইয়া থানার দিকে অগ্রসর হইতেছে! জজ সাহেবের দুই জন আর্দ্দালী চাপকানের উপর চাপড়াস্ আঁটিয়া, লম্বা লাঠী ঘাড়ে লইয়া, পাল্কীর আগে-আগে দৌড়াইয়া আসিতেছে। সুতরাং নলিনী দারোগার আর তাহার মুরুব্বি সাহেবের সহিত দেখা করিতে যাইবার ফুরসৎ হইল না।

নলিনী দারোগা যথাসাধ্য দ্রুত চলিয়া হাঁপাইতে-হাঁপাইতে থানার হাতায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই, জজ-সাহেব পাল্কী হইতে নামিয়া থানার ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। হেড্ কনষ্টেবল মেহের আলি মল্লিক তখন থানাতেই ছিল। মেহের আলি নলিনী দারোগার প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি ও উৎকোচের বহর দেখিয়া মনের আগুনে জ্বলিয়া মরিত; কিন্তু প্রকাশ্যে উপরওয়ালার বিরুদ্ধাচরণে সাহসী হইত না। জজ সাহেব থানায় আশ্রয় লইবেন স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু ঘরের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার বিস্ময় ও বিরক্তির সীমা রহিল না! দারোগার অনুপস্থিতিতে তিনি হেড্ কনষ্টেবলকে থানা-ঘরটি অব্যবহার্য্য করিয়া রাখিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইলেন, "হুজুর সফরে আসিয়া থানায় থাকিবেন, এ সংবাদ পূর্ব্বেই রাষ্ট্র হইয়াছিল। দারোগা বাবু তাহা শুনিয়া কাল গভীর রাত্রে কুঠীর মজুরের সাহায্যে হুজুরের অভ্যর্থনার এই সুব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন! কুঠীর মজুর আনিয়া রাত্রিকালে তাড়াতাড়ি এ কার্য্য করিবার উদ্দেশ্য কি, তাহা এ বান্দার অজ্ঞাত। দারোগা বাবু সকালে উঠিয়াই বোধ হয় কুঠীতে ম্যানেজার সাহেবকে সেলাম দিতে গিয়াছিলেন, ঐ আসিতেছেন! উনিই 'থানা-আফিসার, উঁহার নিকট হুজুর সকল কথা জানিতে পারিবেন।"

হেড কনষ্টেবলের এই সংক্ষিপ্ত উত্তরেই জজ সাহেব প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। তিনি নলিনী দারোগাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক মনে করিলেন না। দারোগা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া 'মিলিটারী' কেতায় কুর্ণিস্ করিয়া, গোখ্‌রো সাপের কাহিনী বলিতে উদ্যত হইয়াছিল; কিন্তু জজ সাহেবের সাদা মুখের ভীষণ ভ্রূকুটীভঙ্গী দেখিয়া তাহার মুখে আর কথা সরিল না। জজ সাহেব তাহার কুর্ণিস্ নামঞ্জুর করিয়া পাল্কীতে উঠিয়া 'মুন্সেফের বাঙ্গলো'য় চলিলেন।

পাল্কী থানার হাতা পার হইলে, নলিনী বলিল, "জমাদার, সাহেব এলো আর চলে গেলো যে! পথ থেকে দেখ্‌লাম, সাহেব ঘরে ঢুক্‌চে,—আমি থানায় আস্‌তে-আস্‌তে ঘর থেকে বেরিয়েই পাল্কীতে উঠ্‌লো। আমার সেলাম পর্য্যন্ত নিলে না! ঘর দেখে তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে না কি?"

হেড্ কন্‌ষ্টেবল বলিল, "হাঁ, ঘর খোঁড়া দেখে আমাকে বল্লে, 'এ কি ব্যাপার !' আমি বল্লাম, 'হুজুর, কাল সাঁজের ওক্তে একটা পেল্লাই গোখ্‌রো সাপ ফণা তুলে ফোঁস্ ফোঁস্ করতে-করতে ঘরের মেঝেতে একটা ইঁদুরের গর্ত্তে ঢুকেছিল। তাই তাড়াতাড়ি দু' জন বেদে ডাকিয়ে ঘর খুঁড়ে সাপটাকে খুঁজে বের করবার চেষ্টা হয়েছিল; কিন্তু সাপটাকে পাওয়া যায় নি,—সে ঘরের মধ্যেই আছে। আমাদের ত ঘরে ঢুক্‌তেই সাহস হচ্ছে না, সাহেব !' আমার কথা শুনে সাহেব এক লাফে ঘর থেকে বেরিয়ে নীচে নেমে পড়লো, তার পরই পাল্‌কীতে উঠে প্রস্থান ! দেখ্‌লেন না, ভয়ে সাহেবের মুখ শুকিয়ে আম্‌চুর হয়ে গিয়েচে !"

কিন্তু দারোগা জমাদারের কথা শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। ভয় ও সন্দেহে তাহার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। জজ সাহেব স্থানাভাবে মুন্সেফ বাবুর বাঙ্গলার বারান্দায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; মুন্সেফ বাবু অতিথি-সৎকারের ত্রুটি করিলেন না। অগ্নিকাণ্ড সম্বন্ধে জজ সাহেবের সহিত তাঁহার কি কথা হইল, তাহা অন্য কেহ জানিতে পারিল না।

জজ সাহেব আহার ও বিশ্রামের পর সেইদিন অপরাহ্নে ভবতোষ বাবুকে ডাকাইয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার পর রাসবিহারী বাবুকে ডাকিয়া আনিবার জন্য একজন পেয়াদা পাঠাইলেন। পেয়াদা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "কাল রাত্রি হইতে তিনি সপরিবারে নিরুদ্দেশ !" তখন আরও কয়েকজন স্থানীয় লোককে ডাকাইয়া তাহাদের জবানবন্দী লওয়া হইল; কিন্তু জজ সাহেব তাহাদের নিকট কিছুই জানিতে পারিলেন না। অগ্নিকাণ্ডের রহস্যভেদ হইল না। জজ সাহেব কোন প্রকারে সেখানে রাত্রিবাস করিয়া, পরদিন প্রভাতে সদরে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার আসা-যাওয়া নিষ্ফল হইল; তদন্তে কোন ফল হইল না।

জজ সাহেব সদরে ফিরিয়া গিয়া 'রিপোর্ট' করিলেন, ঘটনাস্থলে স্থানীয় জমীদার-সম্প্রদায়ের শাসনপ্রণালী এরূপ কঠোর, ও তাহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি এরূপ অধিক যে, রাজশাসন-শৃঙ্খলা সেখানে অক্ষুণ্ণ থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এরূপ স্থলে মুন্সেফী আদালত রাখিলে, আদালত স্থাপনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। সুতরাং পুনর্ব্বার সেখানে নূতন করিয়া আদালত-গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক 'চৌকী' রাখিবার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না।

জজ সাহেবের এই রিপোর্টের অনুমোদনে সেই যে মুচিবাড়িয়া হইতে মুন্সেফী-'চৌকী' উঠিয়া গেল,—আজও গেল, কালও গেল ! একাল পর্য্যন্ত আর সেখানে মুন্সেফী 'চৌকী'—প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মুচিবাড়িয়া অঞ্চলের অনেক ভদ্রলোকের মুখে শুনা গিয়াছে—এই ঘটনার বহুদিন পর পর্য্যন্ত হাম্‌ফ্রি সাহেব যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া, এমন কি, স্বব্যয়ে পাকা ইমারত নির্ম্মাণ করাইয়া দিবেন, এরূপ অঙ্গীকার করিয়াও পুনর্ব্বার সেখানে মুন্সেফী আদালত স্থাপন করাইতে পারেন নাই। অবশেষে তিনি ও সান্যাল নায়েব দুর্নাম ঢাকিবার জন্য অনেক চেষ্টায় মুচিবাড়িয়ায় একটি এন্ট্রেন্স স্কুল ও একটি সবরেজেষ্ট্রী আফিস স্থাপন করিয়াছিলেন। এখনও তাহা বর্ত্তমান।

মুন্সেফী আদালত উঠিয়া যাওয়ায় ভবতোষ বাবু উকীল জেলার সদরে গিয়া ওকালতি আরম্ভ করিলেন। থানার ঘর 'অস্বাভাবিক ভাবে' খুঁড়িয়া রাখার জন্য নলিনী দারোগার কৈফিয়ৎ তলপ করা হইলে, সে তাহার কৈফিয়তে গোখ্‌রো সাপের দোহাই দিয়াছিল; কিন্তু পুলিশ সাহেব তাহার সেই কৈফিয়ৎ সন্তোষজনক বলিয়া গ্রাহ্য করেন নাই। সে ক্রমাগত হাম্‌ফ্রি সাহেবের 'পেটেলী' করিয়া সুবিচারে বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে—এ সংবাদ যে কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হয় নাই—ইহা বিশ্বাস হয় না। কারণ এই ঘটনার অল্পদিন পরেই তাহার বদলীর হুকুম আসিল !

এই সংবাদে নলিনী দারোগার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল ! এমন 'লুটের মহাল' সে আর কোথায় পাইবে ? সে তাহার মুরুব্বি হাম্‌ফ্রি সাহেবকে ধরিয়া, বদলীর হুকুম রদ করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু যাঁহার অনুগ্রহে সে সার্ব্বিস-সৌধের শিখর-দেশে আরোহণের স্বপ্ন দেখিয়াছিল,—তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহার বদলী রদ করিতে পারিলেন না; অগত্যা সে ক্ষুণ্ণ মনে, ভগ্ন-হৃদয়ে মুচিবাড়িয়া হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিল। মুচিবাড়িয়া এলাকার প্রজাদের বুকের উপর হইতে যেন পাষাণ-ভার নামিয়া গেল !

আঁধারে আলো

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু বি-এস্‌সি

আমার হীনতার আবরণের ভেতর যে নারী-প্রকৃতিটা এতকাল আড়ষ্ট হয়ে পড়ে ছিল, জীবনের অতিবড় ঝড়-তুফানেও যে নিমেষের জন্য চোখ মেলে চায় নি,—আজ যে কত ছোট স্পন্দনে সে চম্‌কে উঠে আর্ত্তনাদে আমার নিখিল-ভুবন আকুল করে তুলেছে, কেউ তা কল্পনা কর্ত্তে পার্ব্বে না,—এর আগে আমিও পারি নি। নারীর মাধুর্য্য, কোমলতা ধুয়ে-মুছে ফেলে, ছলনার হীন ঠাটে নিজেকে ঘিরে রেখেছিলেম; নারী যা কল্পনা কর্ত্তে শিউরে ওঠে, তার চেয়েও কত কত জঘন্য কাজ এতকাল করেচি, এবং তাতেই জীবনটা পরম উপভোগ্য বলে বোধ হয়েচে; কিন্তু আমার নিবিড় আঁধারের মাঝে নিমেষের ঐ আলোর চমক আমার জীবনটা কি বীভৎস করেই দেখিয়েচে,—আমার সারা বুক ঘৃণায়, বিতৃষ্ণায় ছি ছি করে উঠেচে।..আজ আমার রূপ-যৌবন, অর্থ-বিভব, ছলনা-চাতুরী আমারি কাছে বিষাক্ত সাপের করাল বেষ্টন বলে বোধ হচ্ছে! আজ প্রথম মনে হচ্ছে, রূপের এ হীন অভিনয়, এ দেহ বিক্রয় আর নয়। কিসের জন্য এ ব্যবসা, যাতে পবিত্র নারীত্বটাকে পথের ধূলোয় বিলিয়ে দিয়ে, যুগ-যুগান্তরে নরক-জ্বালা কুড়িয়ে নিতে হয়!...

কিন্তু যে ক্ষুদ্র স্পন্দনের ঘায়ে আমার আবাল্য সংস্কারের কঠোর আবরণ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল তারই অপূর্ব্ব শক্তির কথা ভেবে আমি অবাক্ হয়ে যাই। এ পথ ত আমাদের নতুন নয়। যারা আমায় পৃথিবীতে বয়ে এনেছিল, তাদের জীবনও এম্নি অভিনয়ে কেটে গেছে, এবং তারা আমাকে তাদের ছলনার হীন ঠাটে সুরক্ষিত করে রেখে যেতে ভোলে নি। তাদের 'সুনাম' বজায় রাখ্‌বার উপযোগী সমস্ত ছলাকলাই আমি আয়ত্ত করেছিলেম। কেমন করে বুকের কোমলতাগুলোকে পায়ের তলায় থেৎলে ফেলে ছলনার মুখোসে পুরুষের অর্থ শুষে নিতে হয়, এ নরক-পথের কোনও যাত্রীর চেয়েই আমি কম শিখি নি। আমিও বুঝে নিয়েছিলেম, পুরুষেরা আমাদের নরক-যজ্ঞের আহুতি; এবং সেই আগুনের তাতে তাদের ছট্‌ফটিয়ে মর্ত্তে দেখে আনন্দ একেবারে উপ্‌চে পড়েচে; বিবেক এতটুকু চোখ রাঙ্গায় নি; বুকে এতটুকু খোঁচা লাগে নি,—বুকের অনুভূতিগুলোকে এম্নি প্রাণহীন করে ফেলেছিলেম! কিন্তু সেই মৃত প্রাণটাকে অপূর্ব্ব সঞ্জীবনী-শক্তিতে বাঁচিয়ে তুল্‌বার জন্যই বুঝি অপেক্ষা কচ্ছিল ক্ষুদ্র ঐ আলোক-স্পন্দনটুকু—আমারি প্রাসাদ-তুল্য ভবনের পাশের কুঁড়েটিতে,—ঐশ্বর্য্যমত্তা পতিতার দীক্ষার অভিনব উপযুক্ত স্থানে!...

সেখানে যে পবিত্র অভিনয় আমারি অগোচরে প্রতিদিন হ'ত, প্রথম যে-দিন তা আমার গোচরে এল, সে দিন আমিই নিজ হাতে আয়োজন করছিলেম নরকোৎসবের! চাকরকে দিয়ে রেতের বীভৎস অভিনয়ের উপকরণগুলো গুছিয়ে, যৌবনটাকে রঙ্গিন্ কর্ব্বার জন্য যে ঘরটিতে দাঁড়িয়ে রূপের প্রসাধন করছিলেম, ঠিক তারি খোলা জানালা দিয়ে ও-বাড়ীর সমস্ত পরিষ্কার দেখা চলে। দেখ্‌লেম, একটি তরুণী—গেরস্ত ঘরে কেন, রূপের ব্যবসায়ে যাদের জীবন কাটে, তাদের ভেতরও সচরাচর অমন রূপ দেখা যায় না,—কাপড় কেচে, ভিজে কাপড়ে, জলভরা একটা বাল্‌তি ঘরের দাবায় বয়ে আন্‌চে। ভিজে কাপড় ভেদ করে তার লাল্‌চে রং ফুটে বেরুচ্ছে,—পরিপুষ্ট রাঙ্গা গাল দুটির পাশ বেয়ে মেঘের মত কাজুরী চুল ছড়িয়ে পড়ায় মুখখানি পাতাঘেরা গোলাপটির মত দেখাচ্ছে। সবচেয়ে সুন্দর তার পরিপূর্ণ যৌবনের ওপর যে বিপুল আনন্দের প্রলেপ ছিল সেইটুকু।...তার অপূর্ব্ব রূপই আমায় অত আকৃষ্ট করেছিল।

সে বাল্‌তি রেখে, তার সাম্‌নে ছোট্ট একটি জলচৌকী, সোণার মত চক্‌চকে পেতলের ঘটি, দুধের মত ধব্‌ধবে গাম্‌ছা রেখে, ঘরে গিয়ে কাপড় ছাড়ল। তার পর তাক থেকে একটা মাটির ভাঁড় নামিয়ে ময়দা মাখ্‌তে বস্‌ল। ময়দার ছোট-ছোট তাল পাকিয়ে রেখে, বিছানা পাতল, রোদের কাপড় কুচিয়ে দড়ির আল্‌নায় গুছিয়ে রাখ্‌ল। কলতলা থেকে বড় ঘড়ায় জল পুরে রান্নাঘরে রেখে এল। পরিশ্রমে তার সুন্দর গালদুটো পাকা ডালিমের মত রাঙ্গা

হয়ে উঠেছিল,—বোধ করি সে হাঁপাচ্ছিলও। আমি ভাবতে লাগলেম সুন্দরী মেয়েটার দুঃখের কথা। অমন পুরুষ-ভুলান রূপ যার,—কোথায় কত পুরুষ তার টুকটুকে পায়ের তলায় গড়িয়ে পড়ার কথা,—কোথায় সে চকমিলান দালানে ফুলের বিছানায় পাখার হাওয়া খেয়েও হাঁপিয়ে উঠবে,—না, তার বরাতে এই রান্নাবান্না, গেরস্থালীর হীন কাজ!… আমি সমস্ত দোষটা চাপিয়ে দিলেম মেয়েটার বুদ্ধির ওপর। অমন অপূর্ব্ব রূপের সদ্ব্যবহার যে জানে না, তার অদৃষ্টে এর চেয়ে সুখ কি করে সম্ভব? মূর্খ,—অকাট মূর্খ সে!…

আমার চিন্তায় বাধা পড়ে গেল, কড়া নাড়ার শব্দে মেয়েটির উৎকর্ণ ভাব দেখে। ভাবলেম, অমন রূপসী তরুণী হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর ভেতরও উৎফুল্ল মনে যার প্রতীক্ষা করে থাকে, না জানি সে কেমন সুন্দর! লোকটাকে দেখবার আগ্রহে জানালার ওপরে একেবারে ঝুঁকে পড়লেম। পরক্ষণে ঘৃণায় একেবারে আঁৎকে উঠলেম—মাগো, কি বিশ্রী চেহারা! মানুষ এত কুৎসিত হয়! যেমি কালো, তেমি রোগা, ঢেঙ্গা। পরনে একটা আধময়লা কাপড়, গায়ে ছেঁড়া জামা, হাঁটু অবধি ধুলো, ডান হাতে ভাঙ্গা পুরনো ছাতা, বাঁ হাতে একটা মাছ। তখুনি মনকে বোঝালেম, হয় ত বা বাড়ীর গোমস্তা, বা অপর কেউ। কিন্তু খুট করে দরজা খুলে গেল, এবং তারি আড়াল থেকে একরাশ যুঁই ফুলের মত শুভ্র হাসি ছড়িয়ে তরুণীটি বল্লে, "ঠিক এখুনি আসবে ভেবেছিলেম।"

কুৎসিত লোকটা ভেতরে ঢুকে দোর বন্ধ করে দিল। তার কণ্ঠ শোনা গেল, "মস্ত গণৎকার হয়েচ যে তৃপ্তি!"

তৃপ্তির বীণাধ্বনি শোনা গেল "তোমার সব আমি গুণে রাখি।"

ততক্ষণে তারা এদিককার ঘরটিতে এসে দাঁড়িয়েছিল। ই কুৎসিত ও সুন্দরীর অপূর্ব্ব সম্ভাষণ দেখবার লোভে নালার পাখী তুলে নুয়ে বসলেম।

যুবক হেসে বল্লে, "আচ্ছা বল দিকিন্ পথে কোন্ পসীর কথা ভাবতে-ভাবতে এসেচি?"

তৃপ্তি বল্লে "তোমার বরাতে রূপসী থাকলে ত ভাববে। রে ত এই পেঁচাপানা—"

যুবক বল্লে "উপমায়ও যদি এ মুখের সাথে পেঁচার কথা উঠত, তা হলে কিন্তু দুনিয়ার লোক ঘর ছেড়ে ডালে বাসা বাঁধত।"

তৃপ্তি বল্লে "নাও, নাও, কালিদাস ঠাকুর, উপমা পরে হবে। আগে কাপড়-চোপড় ছেড়ে হাত-পা ধোও। ও কি, মাছ কেন? আফিসের খাটুনীর পর—"

"কি আর, পথেই ত—"

"ঘাট হয়েচে তোমাকে হেঁসেলে ঢুকতে দিয়ে। আমার ভাগে কি থাকে না থাকে, তুমি খোঁজ কর্ত্তে যাও কেন? ফের যদি হেঁসেলে ঢোক, দেখবে তা হলে—"

"কিন্তু দণ্ড দিয়ে হাকিমকেও ঠকতে হবে, তাও বলে দিচ্ছি," বলে কুৎসিত লোকটা হাসতে লাগল।

"যাও, ভারি দুষ্টু তুমি," বলে তৃপ্তি স্বামীর একেবারে বুকের কাছে ঘেঁসে, তার মুখপানে চেয়ে মুচকি হাসল। তার কুৎসিত স্বামী তার আঙ্গুরের মত নরম ঠোঁটের ওপর নুয়ে পড়তেই, আমি ঘেন্নায় ছি ছি করে উঠলেম। মনে হল, গোলাপের পাপড়ীর ওপর যেন একটা কালো কালীর দোয়াত উপুড় করে ঢালা হল। কিন্তু পরক্ষণেই অবাক্ হয়ে গেলাম, ঐ কালো কালীর দাগে সোণার ঝিকিমিকি দেখে! মেয়েটি সলাজ আনন্দে বল্লে "আফিসে বুঝি এর রিহার্সেল চলে?"

"হাঁ, সেখানে রিহার্সেল কল্পনার, এখানে অভিনয় বাস্তবের।"

"দিনকে দিন তুমি লোভী হয়ে যাচ্ছ" বলে স্বামীর পানে স্নিগ্ধ কটাক্ষ করে, তৃপ্তি মাছ হাতে রান্না-ঘরে চলে গেল। যেতে যেতে বল্লে, "হাত-পা ধোও, ততক্ষণ আমার চা, লুচি হয়ে যাবে।"

যুবক জামা খুলতে-খুলতে বল্লে, "কিছু দরকার নেই, মুড়ি আছে, চারটি দাও।"

উত্তর শোনা গেল "শোন কথা। খাটুনীর পর মুড়ি খেলে কলজে শুকিয়ে যায়। লুচি ভাজতে আমার দশ মিনিটের বেশী লাগবে না।"

যুবক বল্লে, "না, না, লুচি ভেজ না। আমায় এখুনি বেরুতে হবে। ওগো শুনচ।"

তৃপ্তি কপাটের আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে বল্লে, "না খেয়ে যদি বেরোও, আমার অতিবড় দিব্বি রইল, একটুকরো মাছ যদি দাঁতে কাটি।"

"আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে," বলে যুবক হাত-পা ধুয়ে, জামার পকেট থেকে একটা পুঁটুলী বার করে খাটের ওপর রাখ্‌ল।

ছোট ছেলেরা রূপকথার রাজকন্যা ও দানবের গল্প যেমন আগ্রহে শোনে, এ বয়সেও এদের অভিনয় তার চেয়ে আমার কম আগ্রহ জাগায় নি। যদি ঐ লোকটার প্রতি রূপসী মেয়েটার আকর্ষণের এতটুকুও হেতু থাকত, তা হলে হয় ত বা এ দৃশ্য দেখবার মত কিছু বলে মনে হত না। কিন্তু বাইরের মেকী জিনিষ নিয়ে কারবার করে-করে, সমস্ত সংসার সম্বন্ধেও এম্নি মেকী ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে, তার মাঝে এইটুকু খাঁটি আসল দৃশ্য আমার চোখ যেন ধাঁধিয়ে দিল।...

অতি অল্প সময়ের ভেতরই পরিষ্কার থালায় ফুল্‌কো লুচি, আলুর তরকারি খানচারেক ভাজা মাছ এবং চা এনে, পিঁড়ি পেতে, আঁচল দিয়ে মুছে তৃপ্তি ঠাঁই কর্ত্তে-কর্ত্তে বল্লে "পালিয়ে যাবে ভয়ে হালুয়া করা হোল না।"

যুবক পিঁড়িতে বসে বল্লে, "আবার হালুয়া। তোমার গরজে ত আমার পেটে রাক্ষস ঢোকে নি। আচ্ছা, এখন খেয়ে রাত্তিরে খাব কি করে?"

"যেমন করে অপর দশজনে খেয়ে থাকে। ক'টিই বা,—নাও, খুব পারবে।"

যুবক একটুক্‌রো লুচি মুখে পূরে বল্লে, "বলি পেটটি ত আমার।"

তৃপ্তি মাথা দুলিয়ে বল্লে, "নামে শুধু, নৈলে আমায় তার খোঁজ রাখ্‌তে হবে কেন? দেখ, একটুক্‌রো পাতে রাখ্‌তে পার্ব্বে না বলে দিচ্ছি। সারাদিন আফিসের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পরও খিদে পায় না, এ কথা তুমি আর সবাইকে বোঝাতে চেষ্টা ক'রো, আমাকে নয়।"

তার পর হঠাৎ পুঁটুলীটাতে নজর পড়ায়, তা খুলে একেবারে জ্বলে উঠে বল্লে, "দেখ, এরি জন্য বুঝি সকালে-বিকেলে তোমার অক্ষুধা। আমিও বল্‌চি, যদি তুমি এ রকম কর, আমি হাতের নোয়া আর শাঁখা ছাড়া আর সব জানালা গলিয়ে রাস্তায় ফেলে দোব। কেন, কিসের অভাব আমার শুনি, যে, নিজের আত্মাটাকে বঞ্চিত করে তুমি—" বল্‌তে-বল্‌তে তার চোখ চক্‌চকে হয়ে উঠ্‌ল।

যুবক ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বল্লে, "আঃ, এম্নি ছিঁচকাঁদুনে তুমি! আরে কোথায় আত্মা-ফাত্মাকে বঞ্চিত করা হয়! বরং লুচি খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গেল। ভারি ছেলেমানুষ তুমি—" বলে পত্নীর আধখানা চাঁদের মত সুন্দর কপোলে যুবক সস্নেহে বাঁ হাতের টোকা মেরে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

তরুণী তাকে বাতাস কর্ত্তে-কর্ত্তে বল্লে, "কালই ফিরিয়ে দেবে এ-সব, বল আমার গা ছুঁয়ে।" যুবক বল্লে,—"দেখ, তোমার সাধটাই সব, আমারটা কি কিছুই নয়? আমার জন্য এই যে বেছে-বেছে খাবার তুলে রাখা, এই অনটনের ভেতরও নিত্য লুচি-হালুয়ার বন্দোবস্ত,—এ যে তোমার নিজেকে কত বঞ্চিত করে, পুরুষ বলে আমি কি তার কোনও খোঁজই রাখি না? তবু ত তোমার তৃপ্তির জন্য আমি নীরব থেকে যাই। আর, আমার যদি সাধ হয়ে থাকে তোমার নিটোল হাতদুটি সামান্য আভরণে সাজাবার,—তোমার কি তাতে বাধা দেওয়া উচিত? তুমিই বল?"

তৃপ্তি মাথা নেড়ে বল্লে, "কিন্তু এ অন্যায় সাধ। স্বামীর স্নেহের আভরণের বড় কিছু স্ত্রীলোকের নেই,—থাক্‌তে পারে না, এ দেশের সবাই এ কথা জানে। তা ছাড়া, তোমার নিজের কিছু নেই,—অথচ তোমার দশজনের কাছে বেরুতে হয়,—আমি ঘরের কোণে থাকি।"

"কিন্তু জান, মনের আনন্দের দাম কত।"

"নিজেকে বঞ্চিত করে অমন আনন্দ আমার বরদাস্ত হয় না।"

"হওয়া উচিত, যদি সে আনন্দ নির্দ্দোষ হয়। ওগো শোন, তর্ক জুড়ে সুখবর শোনাতে ভুলে গেছি। আমার পনর টাকা মাইনে বেড়েছে, আর সে বাড়তি মাইনে পেয়েচি পেছনের ছ মাস থেকে।"

তৃপ্তির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। সে বল্লে, "সত্যি? কালকে সত্যনারাণের সিন্নি দিতে হবে।"

"তা দিও। এ খবর পেয়ে আমার কি মনে হয়েছিল জান?"

স্বামীর মুখের ওপর স্নিগ্ধ দৃষ্টি রেখে তৃপ্তি বল্লে, "কি?"

"মনে হয়েছিল, ভগবান তাঁর সৃষ্টির সূচনা থেকেই তার আহারের ব্যবস্থা করেন, অর্থাৎ—"

তৃপ্তির টেবা-টেবা গাল দুটিতে গোলাপ ফুটে উঠ্‌ল। সে বল্লে "যাও!"

স্বামী তার লজ্জারুণ নত মুখের পানে চেয়ে, হেসে,

স্নেহকোমল স্বরে বল্লে, "কি খেতে ইচ্ছে হয় আমায় বোল। সমবয়সী কেউ ত নেই, আমায় বল্‌তে লজ্জা করো না।"

"যাও, কিছু ইচ্ছে করে না" বলেই তৃপ্তি চোখ তুল্‌তে, তাদের চোখাচোখি হল; এবং একসঙ্গেই দুজনে হেসে ফেল্‌ল। স্বামী বল্লে, "কাল আফিস-ফেরতা বড়বাজার হয়ে আস্‌ব। মারোয়ারী দোকানে মেলাই চাট্‌নী, টক পাওয়া যায়।"

তৃপ্তির মুখ সিঁদুর-মাখা হয়ে উঠ্‌ল। সে তাড়াতাড়ি বল্লে, "না,—না, কিছু দরকার নেই, এনো না ও-সব।...ও কি, পাতে রইল যে। বাঃ রে, খেয়ে ফেল। •কি হবে পাতে রেখে।"

"শিষ্যাটি প্রসাদ পাবে।"

"অত গুরুভক্তি নেই শিষ্যার, সে পাতে খায় না।"

"সঙ্গে খায় ত" বলে, চট্ করে বাঁ হাতে শিষ্যার গলা জড়িয়ে ধরে, গুরুটি অপর হাতে তার মুখে লুচি গুঁজে দেবার উদ্যোগ কর্ত্তেই, তৃপ্তি অস্ফুট শব্দ করে উঠ্‌ল "উহুহু লাগে, ছাড়ো, ছাড়ো।"

যুবক ব্যস্ত হয়ে তাকে বাহুপাশ থেকে মুক্ত করে বল্লে, "দেখি, দেখি, কোথায় লাগ্‌ল? ঈ, যে নরম শরীর তোমার, যেন একরাশ শিউলী ফুল।"

তৃপ্তি রাঙ্গা মুখে বল্লে, "যাও, ভারি ঠাট্টা কর্ত্তে শিখেচ।"

স্বামী দাঁড়িয়ে বল্লে, "প্রসাদ অমান্য কর না যেন।"

তৃপ্তি হেঁট হয়ে এঁটো থালাটি তুলে নিয়ে রান্নাঘরে যাবার উদ্যোগ কর্ত্তেই, স্বামী ডেকে বল্লে "তৃপ্তি, শোন।"

তৃপ্তি তার চোখে চেয়ে বল্লে, "আবার কি জুলুম?"

"দেখ, মান্দ্রাজী বাজ্‌না তুমি খুব পছন্দ কর, নয়?"

তৃপ্তি অবাক হয়ে বল্লে "কেন?"

"আমাদের কুঁড়েতে নীল-সায়রের পার থেকে একটি নূতন অতিথি আস্‌চে কি না, তারি আবাহনের জন্য—"

আরক্তমুখী তৃপ্তি বল্লে "যাও—"

"হাঁ, এখুনি ত যাচ্ছি।"

"বাঃ রে, কোথায় যাচ্ছ এখুনি?"

"বায়না কর্ত্তে। এই যে বল্লে তুমি।"

"কখন বল্লেম আমি?"

"তোমার স্মৃতিশক্তি কমে গেছে, ডাক্তারের ব্যবস্থার দরকার।"

"আমার ভালো ডাক্তার আছে।...কিন্তু তুমি যেতে পাবে না।"

"কোথায়?"

"সেখানে।"

যুবক নষ্টামী করে বল্লে "আফিসে? তা হলে লুচি খাবার টাকা আস্‌বে কোত্থেকে?"

"না গো, আফিসের কথা নয়। অন্য কোথাও।"

"কোথায় আবার, পাশের বাড়ীতে?"

"ছি, ওখানে যেতে যাবে কেন তুমি? ওখানে কি ভদ্রলোক যায়?"

বায়োস্কোপের ছবির মত তাদের অভিনয় আমি আগ্রহভরে দেখ্‌ছিলেম। তাদের প্রসঙ্গে হঠাৎ আমার কথা এসে পড়ায়, আমি আরও সজাগ হয়ে উঠ্‌লেম। যুবক বল্লে, "কেন, ঢের ভদ্রলোক সেখানে যায় ত।" তৃপ্তি মাথাটি সবেগে দুলিয়ে বল্লে "ভালো কাপড়-চোপড় পর্‌লেই মানুষ ভদ্র হয় না। মানুষের ভদ্রতা তার ব্যবহারে। তারা ধনী হতে পারে, কিন্তু ভদ্র নয়।" যুবক হেসে বল্লে, "আর আমি? খুব ভদ্রলোক?"

"তার চেয়ে ঢের বেশী,—তুমি দেবতা।" বলে তৃপ্তি এমন চোখে চাইল যে, চোখের দৃষ্টিতে অমন বিশ্বাস, নির্ভরতা আমি দেখি নি।

তার স্বামী• বল্লে, "ওরে বাস্‌রে, একেবারে দেবতার আসন। বড্ড উঁচু সে।"

"হাঁ, পাহাড়ের চেয়ে, আকাশের চেয়ে, কল্পনার চেয়েও—"।

"কিন্তু পড়লে যে হাত-পা গুঁড়িয়ে যাবে।"

"আমি আসন মাথায় করে আছি, পড়্‌তে দোব কেন?"

"হাঁ, তাইতেই হয় ত পড়ি নি," বলে যুবক বেরিয়ে পড়ল। তৃপ্তি দোর বন্ধ কর্ত্তে-কর্ত্তে বল্লে "শিগ্‌গির এসো। পার ত আজকেই তোমার ওষুধটা কিনে এনো।"

তারা যে যার কাজে চলে গেল; কিন্তু আমি নিজের অজ্ঞাতেই খানিকক্ষণ সেখানটায় দাঁড়িয়ে রইলেম। তখন সন্ধ্যা নিবিড় হয়েছিল; আকাশের রঙ্গের মেলা ভেঙ্গে গিয়েছিল; কিন্তু আমার বুকের ভেতর যেন অপূর্ব্ব রঙ্গের হাঠ বসে গিয়েছিল,—তার প্রত্যেকটি রং টাট্‌কা, নতুন। সেই রংগুলো যেন আমায় হাতছানি দিয়ে ডেকে

কোথায় নিয়ে চল্‌ল, যেখানকার শেষ নেই, সীমা নেই, অন্ত নেই।...

ঝির ডাকে যখন হুঁস হল, তখন পাশের সাজানো ঘরে বাবুদের সোরগোল সুরু হয়েচে। উৎসব পুরো-দস্তুর হোল,—কিন্তু কি জানি কেন ঠিক তেমনটি জম্‌ল না। বাবুদের অনুরোধে মদ খাওয়া, গান-বাজনা—সব হোল; কিন্তু গভীর রাতে যখন নেশা কাট্‌ল, তখন পা দুটো আমার অজ্ঞাতেই আমাকে ও-ঘরে টেনে নিয়ে গেল। নীল আকাশে তখন চাঁদ দুরন্ত মেয়ের মত জ্যোৎস্নার ধব্‌ধবে রূপোলি আঁচলখানি উড়িয়ে ভেসে চলেচে। তারি আঁচলের খানিকটা ঐ কুঁড়েঘরের জানালা দিয়ে যে বিছানায় তৃপ্তি আর তার স্বামী শুয়েছিল, সেখানটিতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। আমার চোখ আপ্‌না-আপ্‌নি ঐ জানালা ভেদ করে গেল। দেখ্‌লেম, একরাশ যুঁই ফুলের অঞ্জলির মত তৃপ্তি তার স্বামীর বুকে ছড়িয়ে আছে। তাদের দুজনের চোখে-মুখে-গায়ে জ্যোৎস্না মাখামাখি কচ্ছে। যেন তারা দুটিতে গলা ধরে জ্যোৎস্না-সাগরে সাঁতার কেটে চলেচে।

একটু কাণ পেতেই বুঝ্‌লেম, তখনো তারা ঘুমোয় নি। বুঝ্‌লেম, আমাদের হল্লায় তারাও ঘুমুতে পারে নি, এবং তাদের আলাপও হচ্ছে আমাকেই কেন্দ্র করে। তৃপ্তি বল্‌ছিল, "তুমি যাই বল, আমার কান্না পায় ওর জন্য। হোক পতিতা, ওর মুখ দেখে আমার মনে হয়, পবিত্র ঝরণার খোঁজ পেলে ও কখনো এ-সব নোংড়া ঘোলাটে জল অঞ্জলি ভরে পান কর্ত্ত না।—ওর বুকের ভেতর যে একটা আর্ত্তনাদ লুকিয়ে আছে, ওর আজকের গানের ভেতর আমি শুনতে পেয়েচি।"

আমি অবাক্ হয়ে নিজের পানে তাকালেম। আমার ভেতর আর্ত্তনাদ! পরের আর্ত্তনাদটাকে অপমান করেই যার গৌরব, তার পাষাণ প্রাণে আর্ত্তস্বর! তৃপ্তির কল্পনার দৌড় দেখে আমার প্রথমটা ভারি হাসি পেল; কিন্তু তার স্বামীর উত্তর শুনে মনে হল, তার কল্পনা তারি উপযুক্ত।

তার স্বামী বল্লে "মানুষ সংসারকে নিজের প্রকৃতির কাচ দিয়ে দেখে। তাই যখন সে নেশায় ভোর হয়ে উৎকট উল্লাসে গেয়েচে, সেই উল্লাসই তোমার কাণে বয়ে এনেচে আর্ত্তনাদ! যে সব দিয়ে তোমার জীবন সত্য, তার অভাবটাই তার জীবনটাকে তোমার কাছে মিথ্যা বলে দাঁড় করিয়েচে। কিন্তু তার কাছে ঠিক এর উল্টো। স্বামীকে নিয়ে তোমাদের জীবনের যেটুকু সার্থক, ওদের কাছে সেটুকুই একেবারে বিফলতা, দাসীবৃত্তি, হীনতা।...রূপ-যৌবন, ছলা-কলা, যা নিয়ে পতিতার গর্ব্ব, সে সবই ওর আছে। কেন তবে ও আর্ত্তনাদ কর্ব্বে?"

তৃপ্তি বল্লে, "কি হবে ও-সবে, যদি সে নিজেকে স্বামীর পায়ে নিবেদন কর্ত্তে না পেল? দেবতার পূজোয় না লাগ্‌লে যে ফুলের জন্মই বৃথা।"

তার স্বামী বল্লে, "কেন সে একজনকে নিবেদন কর্ত্তে যাবে, যদি দশজন আপ্‌নি নিবেদিত হতে আসে?"

"ফুল দিয়ে দেবতার পূজো হয়, দেবতা দিয়ে ফুলের নয়। আর একফুলে দশটি—ছিঃ।"

"অন্ততঃ দ্বিচারিণী না হলে ত ওদের লিষ্টিভুক্ত হতে পারে না। তার পর যত বেশী-চারিণী হয়, ওদের সমাজে মুখও তত উঁচু হয়।"

"ওদের সমাজের মুখে আগুন। আচ্ছা মান্‌লেম, হয় ত ভুল করে এ পথে এসে পড়েচে; কিন্তু কেন ভুলের সংশোধন না করে মাত্রা খালি বাড়িয়েই যায়?" "সে দোষটা ওদের চেয়ে আমাদের সমাজেরও কম নয়। এ সমাজ যে শুধু পাপীকে ঘাড় ধরে বার করে দিতেই জানে, হাত বাড়িয়ে কোলে নিতে জানে না।" "সমাজ কঠোর বলে সে নিজেকে শুধ্‌রে নেবে না, এটা কি সুযুক্তি? এ যে শুধু নিজের ওপর প্রতিশোধ।...আচ্ছা, সমাজ না হয় তুলে না নিল; যাকে ওরা ভালবাসে, তাকে নিয়েই ত একটা সংসার পাতাতে পারে,—তাতে দশজনের সর্ব্বনাশ হয় না।"

"তা হলে সব পতিতা যে স্ত্রী হয়ে যেত। কিন্তু স্ত্রী হওয়াটাই ওদের সবচেয়ে না-পছন্দ। ভালবাসা বলে কোমল বৃত্তিগুলো ওদের ছলনার ছাপে একেবারে পিষে যায়। তাই সব্বাইকেই ওরা সমান ভাবে গ্রহণ করে, কিন্তু ভালোবাসে না কাকেও।"

"তবে এ পথে আসে কেন?"

"প্রবৃত্তির তাড়নায়, এবং সেটা যে ভালোবাসা নয়, তা ধ্রুব কথা। কারণ ভালোবাসা মানুষকে উর্দ্ধে বয়ে নেয়, আর প্রবৃত্তি ধাপে-ধাপে নাবিয়ে দেয় নরকের অতল গুহায়। এদের প্রবৃত্তি ভাঙন নদীর মত উন্মাদ প্রবাহে খালি

নিজকেই ঘোলাটে করে দেয় না, দুধারের সুন্দর পাড়ও ধ্বংস করে।"

"কিন্তু ভালোবাসা ছাড়া জীবনের সার্থকতা কোথায় ?"

"কোথাও না। ওদের জীবন একটা প্রকাণ্ড বিফলতা। প্রবৃত্তির নীচ তাড়নায় অন্ধ হয়ে, পেছনের সমস্তগুলো দুয়ার বন্ধ করে এসে, যখন এরা সাম্‌নের প্রকাণ্ড অন্ধকার ভবিষ্যতের পানে তাকায়, তখন সেই বিপথে পথ করে চলবার জন্য এদের প্রয়োজন হয়ে পড়ে মেকী কারবার চালাবার। তখন ছলনা-চাতুরীর সাথে বিক্রয় কর্ত্তে আরম্ভ করে দেহটাকে, যা ভগবান ফুলের সৌন্দর্য্য, সৌরভ দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর সৃষ্টির মাধুর্য্য বাড়াবার জন্য..."

তৃপ্তি শিউরে উঠে এম্‌নি কণ্ঠে ছি ছি করে উঠ্‌ল যে, তার প্রতিধ্বনি আমার বুকের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে গিয়ে পৌছাল। সে বল্লে, "আচ্ছা, ওদের ঘেন্না করে না ?" তার স্বামী বল্লে, "প্রথমটা হয় ত বা তার নারী-প্রকৃতি আর্ত্তনাদ করে ওঠে; কিন্তু নীচ প্রবৃত্তি ও ছলনার চাপে তা একেবারে আড়ষ্ট হয়ে যায়। তখন তাকে সচেতন কর্ব্বার আর কিছুই থাকে না।"

"জীবনের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য পথের ধূলোয় মিশিয়ে দিয়ে কোন্ লজ্জায় এরা বেঁচে থাকে ? বেশভূষা কর্ত্তে, গান গাইতে ওদের ঘেন্না হয় না ? আচ্ছা, এ-সবে কি ওরা সুখ পায় ?"

"তা ওরাই জানে। কিন্তু খাঁটি সুখ যে ওদের নেই, তা ওদের সারাক্ষণের অসোয়াস্তি, আশঙ্কা, অবিশ্বাস থেকে টের পাওয়া যায়। এই বুঝি বার্দ্ধক্য, জরা, রোগ হাড়গোড়-বার-করা কুৎসিত হাত বাড়িয়ে তাদের যৌবন-শ্রীটাকে ধর্ত্তে এল, এই ভয়ে রূপটাকে কত আটঘাটে এরা আগ্‌লে রাখে! এই বুঝি কোন লম্পট নেশার সুযোগে হত্যা করে তার পাপের সঞ্চিত ধন আত্মসাৎ কর্ব্বে, এই ভয়ে প্রত্যেক অভ্যাগতকে কত ভাবে এরা যাচাই করে নেয়।...পাপের এই যে সদা-সন্ত্রস্ত ভাব, তার ভেতর এদের হাসি গান ঠিক হাসি গান নয়,—দুর্ব্বহ জীবনটাকে বয়ে নেবার একটা পচা পাথেয়।......"

তৃপ্তি শিউরে উঠে বল্লে, "থামো, থামো, আর বোলো না।...উঃ, কি জীবন এদের!"

এর আগে এমন করে আর কেউ আমাদের জীবনের বীভৎসতাগুলো এঁকে দেখায় নি। তৃপ্তির উক্তি আমার অন্তরের সমস্ত পর্দ্দাগুলোয় ঘা দিল 'উঃ, কি জীবন এদের!'

তার স্বামী বল্‌তে লাগ্‌ল, "শুধু কি এই! ওদের শেষ পরিণাম জান ? আগুন যেমন তার তাপে অপরকে পুড়িয়ে নিমেষে নিজেও কালো হয়ে যায়,—এদের যে রূপশিখা অপরকে দহন করে, তা তাদের কুৎসিত করে দেয় তার চেয়ে ঢের বেশী, তাই দুদিনেই এরা হয়ে যায় রোগজীর্ণ রমণীর একটা পচা কঙ্কাল। তখন যে দাসীগিরিটায় ওদের অত ঘৃণা, সেইটেই বরণ করে নিতে হয় জীবনধারণের জন্য।"

তৃপ্তি বল্লে, "অথচ, যেখানে দাসীগিরি রাণীগিরির চেয়েও গৌরবের, সে স্থান এড়াবার জন্যই ত অনেকে এ পথে পা বাড়ায়। আচ্ছা কেন ওরা সুরুতে এ কথা বোঝে না ?"

তার স্বামী বল্লে, "বোঝে না এইটেই আশ্চর্য্য। প্রবৃত্তির মোহে অন্ধ হয়ে ওরা পৃথিবীর পানে চেয়ে দেখে না—কি মধুর টানে বিশ্বটা গান গেয়ে চলেচে। যে সুরের স্পর্শে বুকের কুঁড়ির পাপ্‌ড়ীগুলো মেলে যায়, মানুষ আপনাকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে চায়, সে সুরটিই ওরা সবচেয়ে অবহেলা করে। তাই ওরা পবিত্রতার চরণে নিজেকে উৎসর্গ কর্ত্তে শেখে না,—বিক্রয় কর্ত্তে শেখে দেহটাকে, প্রথমে প্রবৃত্তি, তার পর অর্থের বিনিময়ে! কিন্তু ভগবান তার সৃষ্টির ভেতর যে পবিত্রতার মাধুর্য্য দিয়েছিলেন, তার অমর্য্যাদায় স্রষ্টার উদ্যত অভিশাপ কি জলন্ত আগুন রচনা করে, অভাগিনীরা একবারও ভেবে দেখে না।"

তৃপ্তি বল্লে "কেউ এদের এ সব বলে সাবধান করে না কেন ?"

স্বামী বল্লে, "ভগবান ত তারও ক্রটী করেন নি। প্রত্যেক মানুষের বুকের ভেতর তিনি এমন একটি উপদেষ্টা বসিয়ে রেখেচেন, যে প্রতিক্ষণ ঘড়ির কাঁটার মত বলে দিচ্ছে, কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ। আচ্ছা, এই তুমি সংসারের সকল সুখ-দুঃখের বড় বলে যে বস্তুটিকে বরণ করেচ, বাইরের কে তোমাকে শিখিয়েচে এইটিকেই আঁক্‌ড়ে ধর্ত্তে ?......"

তৃপ্তি বল্লে "পথ চিনে চল্‌তে শিশুও আলো খুঁজে নেয়। আমি বলি, যে পথ হারিয়ে ফেলেচে, অথচ পথ পাচ্ছে না, তাকে অপর কেউ পথ না দেখালে, তার ত বিঘোরে মারা যাওয়া ছাড়া গতি নেই।"

স্বামী বল্লে, "কিন্তু পথহারাকেও পথ-প্রদর্শক ডেকে

খুঁজে নিতে হয়, অথবা লোকালয়ের অস্পষ্ট আলো লক্ষ্য করে চল্‌তে হয়। এরা ত তা করে না, তাই পতিতাই থেকে যায়; এবং আজীবন অপরকে পোড়ায়, নিজেও পুড়ে-পুড়ে ছাই হয়।...অভাগিনীরা বোঝে না, সংসারের সমস্ত স্নেহ, সহানুভূতি, দেনা-পাওনা থেকে ওরা একেবারে বঞ্চিত। ওরা জানে না, জগৎকে ছলনা কর্ত্তে গিয়ে সবচেয়ে বঞ্চনা করে নিজেদের।......"

তৃপ্তি বল্লে, "আহা বেচারা!"

তার স্বামী অনেক পতিতার জীবনের করুণ ইতিহাস বল্‌তে লাগ্‌লেন। সমস্ত আমার বুকের ভেতরটায় হাহাকারের মন্থন জাগিয়ে তুল্‌ল। নিজের চোখে নিজেকে ত কখনো যাচাই করে দেখি নি! আজ তারা আমায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, যৌবনের পেয়ালায় বিষ ভরে সুধা ভ্রমে এতদিন তাই চুমুক দিয়ে খেয়েছি; এবং এই ভাবে শুধু মরণটাকেই বুকের কাছে টেনে এনেচি। সঙ্গে-সঙ্গে তৃপ্তির জীবনটা সহসা আমার অন্তরের গোপন ক্ষুধা জাগিয়ে দিল; এবং তা আমার বাইরের মুখোসগুলোকে ঠেলে ফেলে দিয়ে, পানীয়ের জন্য চেঁচিয়ে উঠ্‌ল;—কিন্তু হায়, আমার সঞ্চিত পানীয়কে বিষ জেনে তৃষিত অন্তর যে কিছুতেই তা পান কর্ত্তে চায় না। আজ মনে হল, পরকে বঞ্চনা কর্ত্তে গিয়ে, এতদিন সব-চেয়ে বঞ্চনা করেচি নিজেকে! জীবনে যা কিছু পাওয়া উচিত ছিল, আমি সে সমস্তই সাধ করে হারিয়েচি; এবং যা হারানো দরকার ছিল, পেয়েচি খালি সে বিষগুলো। যে যৌবন যে ভাবে উৎসর্গ কল্লে তা পবিত্রতায় সার্থক হত, আমি তা না করে বিক্রয় করেচি যৌবনের সঙ্গে আমার নারীত্বটুকুও; এবং এ ভাবে নিজেকে গন্ধহীন, কীটদষ্ট, শুষ্ক ফুলের মত পথের ধূলোয় মিশিয়ে দিয়েচি; অথচ ঐ ফুলে তৃপ্তি জীবনের শ্রেষ্ঠ পূজা সম্পন্ন কচ্ছে।...আমার মত অনেক অভাগিনীই ত এ ভাবে জীবনটা ব্যর্থ করে ফেলেচে; এবং হঠাৎ যেন তাদের যুক্ত আর্ত্তনাদ আমার কাণে বয়ে এলো, "ওগো, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে গেল!"...আমার বুকের সঙ্গে গলাটাও শুকিয়ে উঠেছিল, ঘরে ঢুকে এক চুমুক খেলাম; কিন্তু মনে হল সুখ নেই, এতেও সুখ নেই।...আবার বদ্ধ আত্মার মত এই দিকেই ছুটে এলাম। স্বামীর বুকে তৃপ্তি লতিয়ে পড়ে ঘুমুচ্ছিল, তার মুখে ঘুমের ভেতরও আনন্দ উপ্‌চে পড়্‌ছিল। সে যে দরিদ্র, কুৎসিত স্বামীর বুকে ঘুমিয়ে আছে, সে কথা ভুলে গিয়ে, আমার মনে হতে লাগ্‌ল, ঐ কুৎসিত, দরিদ্রের বুকের ভেতর সে যে মহামূল্য ঐশ্বর্য্য পেয়েচে, তারি কথা। কি সে কুবেরের ঐশ্বর্য্য, যা বাইরের সমস্ত দীনতা, রিক্ততা ছাপিয়ে এমন অতুলনীয় হয়ে ওঠে,—যার পায়ের তলায় জীবনের সমস্তটুকু নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েও আশ মেটে না।......

তাহলে কি ওর জীবনটাই সফল, সত্য,—আর আমারটা বিফল, মিথ্যা? জীবনটা আগাগোড়া বারবার যাচাই করে দেখ্‌লেম,—শুধু ফাঁকি, শুধু বিষ। এ জীবনে যত লোকের সাথে পরিচয়,—একে-একে সকলকার কথা ভেবে দেখ্‌লেম,—কেউ ত আমার হৃদয়ের জন্য স্নিগ্ধ আবেদন লয়ে আসে নি! তারা এসেচে শুধু দেহটার জন্য কুৎসিত কামনা লয়ে। আর আমিও তা পণ্যের মত বিকিয়ে দিয়েচি অর্থের বিনিময়ে!

আমার নারীত্ব ঘৃণায়, অপমানে তাই কেঁদে উঠেচে। আমি জান্তেম না, আমার ভেতর একটি মর্য্যাদাময়ী প্রেমিকা এতদিন গোপন মর্ম্মবেদনায় কাঁদছিল। আজ যখন সে তার বিফল আবেদন লয়ে এসে দাঁড়াল, আমি তার সাধ মেটাবার মত কিছুই দিতে পাল্লেম না। তার বিফলতার কি সান্ত্বনা দেব আমি?·· তাকে দেবার মত আমার কিছু নেই। কিন্তু হয় ত তাকে অপমান থেকে আমি বাঁচাতে পারি। আমি জানি না, আমার ধর্ম্মহীন, লক্ষ্যহীন, হেয় জীবনে অত দৃঢ়তা আছে কি না; কিন্তু যে মুক্তিদাতা পাষাণী অহল্যাকে জড়তা-মুক্ত করেছিলেন, তিনি দয়া করে আমার আঁধারের মাঝে আজ যে আলোর রশ্মিটুকু দেখিয়ে-ছেন,—আমার বিশ্বাস সে সত্যের জ্যোতিঃ একবার যার চোখের সাম্‌নে চম্‌কে ওঠে, হাজার মিথ্যার আবরণ তার চার পাশ থেকে আপনি খসে পড়ে। সেই আলোর দেবতার পায়ে আজ এই নিবেদন জানাচ্ছি যে, তাঁর আলোর জ্যোতিঃতে আমার অতীতের অন্ধকারগুলোকে দূর করে, আমি যেন সত্যের পথে, তৃপ্তির পথে এগিয়ে যেতে পারি;—তোমরাও আমাকে এই আশীর্ব্বাদ কর।......

শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড

শ্রীপরশুরাম-বিরচিত—শ্রীনারদ-চিত্রাঙ্কিত
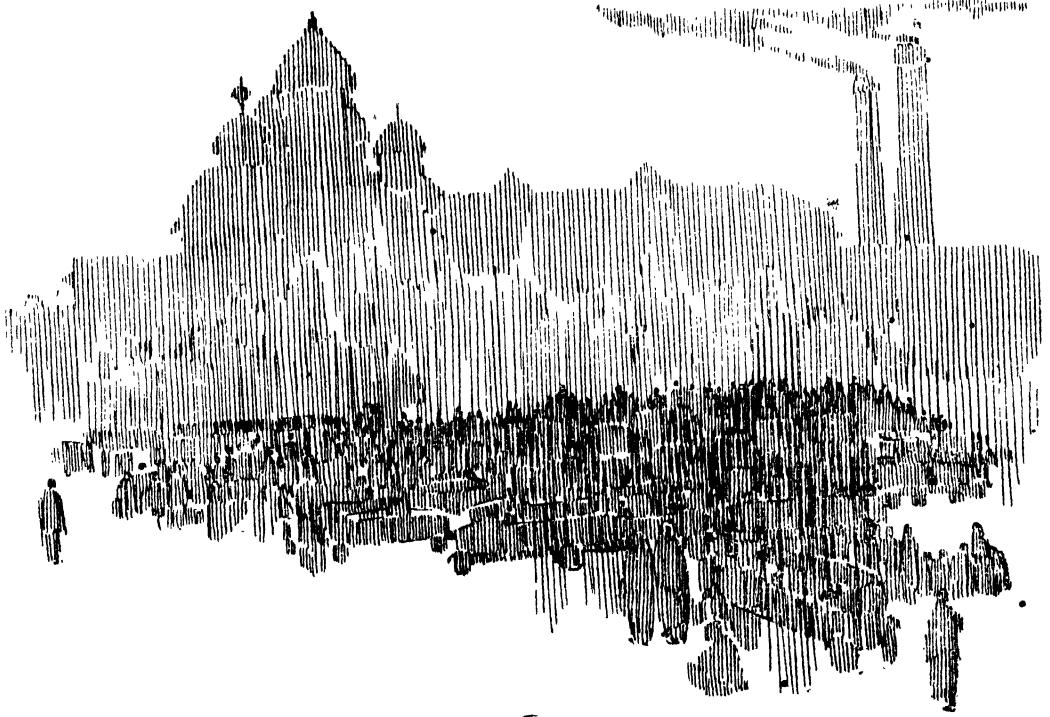
১। আদিকাণ্ড।

াঘ মাস, ১৩২৬ সাল। এই মাত্র আর্ম্মানি গির্জ্জার ়ড়িতে বেলা এগারটা বাজিয়াছে। শ্যামবাবু চামড়ার ব্যাগ াতে ঝুলাইয়া জুডাস্ লেনের একটি তেতলা বাটীতে প্রবেশ রিলেন। বাড়ীটি বহু পুরাতন,—ক্রমাগত চুণ ও রংএর ালেপে লোলচর্ম্ম কলপিত-কেশ বৃদ্ধের দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। ীচের তলায় অন্ধকারময় মালের গুদাম। উপরতলায় মুখভাগে অনেকগুলি ব্যবসায়ীর অফিস, পশ্চাতে ভিন্ন জাতীয় কয়েকটি পরিবার পৃথক-পৃথক অংশে বাস রেন। প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখেই তেতলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত কাঠের াড়ি। সিঁড়ির পাশের দেওয়াল আগাগোড়া তাম্বুলরাগ-চিত,—যদিও নিষেধের নোটিস লম্বিত আছে। কতিপয় ংটে ইন্দুর ও আরসোলা পরস্পর অহিংস ভাবে স্বচ্ছন্দে তস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। ইহারা আশ্রম-মৃগের ন্যায় নিঃশঙ্ক,—সিঁড়ির যাত্রীগণকে গ্রাহ্য করেনা। অন্তরালবর্ত্তী সিন্ধি পরিবারের রান্নাঘর হইতে নির্গত হিংএর তীব্র গন্ধের সহিত নরদামার গন্ধ মিলিত হইয়া সমস্ত স্থান আমোদিত করিয়াছে। অফিসসমূহের মালিকগণ তুচ্ছ বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকিয়া, কেনা-বেচা, তেজী-মন্দী, আদায়-উসুল ইত্যাদি মহৎ ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া দিন যাপন করিতেছেন।

শ্যামবাবু তেতলায় উঠিয়া একটি ঘরের তালা খুলিলেন। ঘরের দরজার পাশে কাষ্ঠফলকে লেখা আছে—'ব্রহ্মচারী এণ্ড ব্রাদারইন্‌ল, জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্।' এই কারবারের স্বত্বাধিকারী স্বয়ং শ্যামবাবু (শ্যামলাল গাঙ্গুলী) এবং তাঁহার শ্যালক বিপিন চৌধুরী, বি-এস্‌সি। ঘরে কয়েকটি পুরাতন টেবিল, চেয়ার, আলমারী প্রভৃতি অফিস-সরঞ্জাম।

শ্যাম বাবু

এ পর্য্যন্ত নানাপ্রকার কারবার করিয়াও বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। ই-বি-রেলওয়ে অডিট অফিসের চাকরীই তাঁহার জীবিকা-নির্ব্বাহের প্রধান উপায়। দেশে কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি এবং একটি জীর্ণ কালীমন্দির আছে; কিন্তু তাহার আয় সামান্য। চাকরীর অবকাশে ব্যবসায়ের চেষ্টা করেন,—এ বিষয়ে শ্যালক বিপিনই তাঁহার প্রধান সহায়। সন্তানাদি নাই, কলিকাতার বাসায় পত্নী এবং শ্যালক সহ বাস করেন। ব্যবসায়ের কিছু উন্নতি হইলেই চাকরী ছাড়িয়া দিবেন, এইরূপ সংকল্প আছে। সম্প্রতি ছয় মাসের ছুটি লইয়া, নূতন উদ্যমে 'ব্রহ্মচারী এণ্ড ব্রাদারইন্‌ল' নামে অফিস প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

শ্যামবাবু ধর্ম্মভীরু লোক, পঞ্জিকা দেখিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন এবং অবসর মত তান্ত্রিক সাধনা করিয়া থাকেন। বৃথা—অর্থাৎ ক্ষুধা না থাকিলে—মাংস ভোজন, এবং অকারণে কারণ পান করেন না। কোন্ সন্ন্যাসী সোণা করিতে পারে, কাহার নিকট দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ বা একমুখী রুদ্রাক্ষ আছে, কে পারদ ভস্ম করিতে জানে, এ সকল সন্ধান প্রায়ই লইয়া থাকেন। কয়েক মাস হইতে বাটীতে গৈরিক বাস পরিধান করিতেছেন এবং কতকগুলি অনুরক্ত শিষ্যও সংগ্রহ করিয়াছেন। শ্যামবাবু আজকাল মধ্যে-মধ্যে নিজেকে 'শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী' আখ্যা দিয়া থাকেন; এবং অচিরে এই নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হইবেন, এরূপ আশা করেন।

শ্যামবাবু তাঁহার অফিস-ঘরে প্রবেশ করিয়া, একটি সার্দ্ধ-ত্রিপাদ ইজিচেয়ারে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ডাকিলেন—"বাঙ্গা, ওরে বাঙ্গা।" বাঙ্গা শ্যামবাবুর অফিসের বেহারা,—এতক্ষণ পাশের গলিতে টুলে বসিয়া ঢুলিতেছিল,—প্রভুর ডাকে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিল। শ্যামবাবু বলিলেন, "গঙ্গাজলের বোতলটা আন্—আর খাতাপত্রগুলো একটু ঝেড়ে-মুছে রাখ্, যা ধূলো হয়েচে।" বাঙ্গা একটা তামার কুপী আনিয়া দিল। শ্যামবাবু তাহা হইতে কিঞ্চিৎ গঙ্গোদক লইয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক গৃহমধ্যে ছিটাইয়া দিলেন। তার পর টেবিলের দেরাজ হইতে একটি সিন্দূরচর্চ্চিত রবার ষ্ট্যাম্পের সাহায্যে ১০৮ বার দুর্গানাম লিখিলেন। ষ্ট্যাম্পে ১২ লাইন 'শ্রীশ্রীদুর্গা' খোদিত আছে; সুতরাং ৯ বার ছাপিলেই কার্য্যোদ্ধার হয়। এই

টেবিলের উপর নানা প্রকার খাতা, বিতরণের জন্য ছাপানো বিজ্ঞাপনের স্তূপ, একটি পুরাতন থ্যাকার্স ডিরেক্টরি, একখণ্ড ইণ্ডিয়ান কম্পানিজ য়্যাক্ট্, কয়েকটি বিভিন্ন কোম্পানির নিয়মাবলি বা articles, এবং অন্যবিধ কাগজপত্র। দেওয়ালে সংলগ্ন তাকের উপর কতকগুলি ধূলি-ধূসর কাগজমোড়া শিশি এবং শূন্যগর্ভ মাদুলী। এককালে শ্যামবাবু পেটেণ্ট ও স্বপ্নাদ্য ঔষধের কারবার করিতেন, এগুলি তাহারই নিদর্শন।

শ্যামবাবুর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি,—গাঢ় শ্যামবর্ণ, কাঁচা-পাকা দাড়ি,—আকণ্ঠলম্বিত কেশ, স্থূল লোমশ বপু। অল্পবয়স হইতেই তাঁহার স্বাধীন ব্যবসায়ে ঝোঁক; কিন্তু

শ্রমহারক যন্ত্রটির আবিষ্কর্তা শ্রীমান বিপিন। তিনি ইহার নাম দিয়াছেন—'দি অটোম্যাটিক শ্রীদুর্গাগ্রাফ' এবং পেটেণ্ট লইবার চেষ্টায় আছেন।

উক্ত প্রকার নিত্যক্রিয়া সমাধা করিয়া, শ্যাম বাবু প্রসন্ন চিত্তে ব্যাগ হইতে ছাপাখানার একটি ভিজা প্রুফ বাহির করিয়া লইয়া সংশোধন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে জুতার মশ্-মশ্ শব্দ করিতে-করিতে অটল বাবু ঘরে আসিয়া বলিলেন—"এই যে শ্যামদা, অনেকক্ষণ এসেচেন বুঝি? বড় দেরী হয়ে গেল,—কিছু মনে করবেন না,—হাইকোর্টে একটা মোশন ছিল। ব্রাদারইন্‌ল কোথায়?"

শ্যাম বাবু।—বিপিন গেছে বাগবাজারে তিনকড়ি বাঁড়ুয্যের কাছে। আজ পাকা কথা নিয়ে আসবে। এই এল বলে।

অটল বাবু চাপকান-চোগাধারী সম্ভ্রান্ত এটর্ণি। পিতার অফিসে সম্প্রতি জুনিয়ার পার্ট্‌নার রূপে যোগ দিয়াছেন। গৌরবর্ণ, সুপুরুষ,—বিপিনের বাল্যবন্ধু। বয়সে নবীন হইলেও চাতুর্যে পরিপক্ক। জিজ্ঞাসা করিলেন—"বুড়ো রাজি হ'ল? আচ্ছা ওকে ধরলেন কি করে?"

শ্যাম।—আরে তিনকড়ি বাবু হলেন গে শরতের খুড়শ্বশুর। বিপিনের মাস্তুতো ভাই শরৎ। ঐ শরতের সঙ্গে গিয়ে তিনকড়ি বাবুকে ধরি। সহজে কি রাজি হয়? বুড়ো যেমন কঞ্জুষ, তেমনি সন্দিগ্ধ। বলে—আমি হলুম রায় সাহেব, রিটায়ার্ড ডেপুটি, গবরমেন্টের কাছে কত মান। কোম্পানির ডিরেক্টার হয়ে কি শেষে পেন্‌শন খোয়াব? তখন নজীর দিয়ে বোঝালুম—কত রিটায়ার্ড বড় বড় অফিসার ত ডিরেক্টরি কচ্ছেন,—আপনার কিসের ভয়? শেষে যখন শুনলে যে, প্রতি মিটিংএ ৩২ টাকা ফি পাবে, তখন একটু ভিজ্‌ল।

অটল।—কত টাকার শেয়ার নেবে?

শ্যাম।—তাতে বড় হুঁসিয়ার। বলে—তোমার ব্রহ্মচারী কোম্পানি যে লুঠ করবে না, তার জামিন কে? তোমরা শালা-ভগ্নিপতি মিলে ম্যানেজিং এজেণ্ট হয়ে কোম্পানিকে ফেল করলে, আমার টাকা কোথায় থাকবে? বল্লুম—মশায়, আপনার মত বিচক্ষণ সাবধানী ডিরেক্টর থাকতে কার সাধ্য লুঠ করে। খরচপত্র ত আপনাদের চোখের সামনেই হবে। ফেল হতে দেবেন কেন? মন্দটা যেমন ভাবচেন, ভালর দিকটাও দেখুন। কি রকম লাভের ব্যবসা। খুব কম করেও যদি ৫০ পারসেণ্ট ডিভিডেণ্ড পান, তবে দু' বছরের মধ্যেই ত আপনার ঘরের টাকা ঘরে ফিরে এল। শেষে অনেক তর্কাতর্কির পর বল্লে—আচ্ছা, আমি শেয়ার নোবো, কিন্তু বেশী নয়; ডিরেক্টর হতে হ'লে যে টাকা দেওয়া দরকার, তার বেশী দোবো না। আজ মত স্থির করে জানাবেন; তাই বিপিনকে পাঠিয়েচি।

অটল।—অমন খুঁতখুঁতে লোক নিয়ে ভাল করলেন না শ্যামদা। আচ্ছা, মহারাজাকে ধল্লেন না কেন?

শ্যাম।—মহারাজকে ধরতে বড় শীকারি চাই,—তোমার আমার কর্ম্ম নয়। তা'ছাড়া, পাঁচ ভূতে তাঁকে শুষে নিয়েচে,—কিছু আর পদার্থ রাখে নি।

অটল।—খোট্টাটা ঠিক আছে ত? আসবে কখন?

শ্যাম।—সে ঠিক আছে, এই রকম দাঁও মারতেই ত সে চায়। এতক্ষণ তার আসা উচিত ছিল। প্রস্‌পেক্টস্‌টা তোমাদের শুনিয়ে আজই ছাপাতে দিতে চাই। তিনকড়ি বাবুকে আসতে বলেছিলুম,—বাতে ভুগচেন, আসতে পারবে না জানিয়েচেন।

২। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

"রাম রাম বাবুসাহেব"!

আগন্তুক মধ্যবয়স্ক, শ্যামবর্ণ, পরিধানে সাদা ধুতি, লম্বা কাল বনাতের কোট, পায়ে বার্ণিস-করা জুতা, মাথায় পীতবর্ণ ভাঁজকরা মখমলের পাগড়ি, হাতে অনেকগুলি আংটি, কাণে পান্নার মাকড়ি, কপালে ফোঁটা।

শ্যাম বাবু বলিলেন—"আসুন, আসুন—ওরে বাঞ্ছা, আর একটা চেয়ার দে। এই ইনি হচ্চেন অটল বাবু, আমাদের সলিসিটর দত্ত কোম্পানির পার্টনার। আর ইনি হলেন আমার বিশেষ বন্ধু—বাবু গণ্ডেরীরাম বাটপারিয়া।"

গণ্ডেরী।—নোমোস্কার, আপনের নাম শুনা আছে, জান পহ্‌চান হয়ে বড় খুস্ হ'ল।

অটল।—নমস্কার, এই আপনার জন্যই আমরা বসে আছি। আপনার মত লোক যখন আমাদের সহায়, তখন কোম্পানির আর ভাবনা কি?

গণ্ডেরী।—হেঁ হেঁ—সোকোলি ভগবানের হিচ্ছা। হামি একেলা কি করতে পারি? কুছু না।

শ্যাম।—ঠিক, ঠিক। যা করেন মা তারা দীনতারিণী।

'রাম রাম বাবুসাহেব'

দেখ অটল, গণ্ডেরী বাবু যে কেবল পাকা ব্যবসাদার, তা মনে কোরো না। ইংরিজি ভাল না জানলেও, ইনি বেশ শিক্ষিত লোক, আর শাস্ত্রেও বেশ দখল আছে।

অটল।—বাঃ, আপনার মত লোকের সঙ্গে আলাপ হওয়ায় বড় সুখী হলুম। আচ্ছা মশায়, আপনি এমন সুন্দর বাংলা বল্‌তে শিখলেন কি করে?

গণ্ডেরী।—বহুত বঙ্গালীর সঙে হামি মিলা মিশা করি। বংলা কিতাব ভি অনেক পঢ়েচি। বঙ্কিমচন্দ, রবীন্দর নাথ, আউর ভি সব।

এমন সময় বিপিন বাবু আসিয়া পৌঁছিলেন। ইনি একটু সাহেবী মেজাজের লোক,—এককালে বিলাত যাইবা চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরিধানে সাদা প্যাণ্ট,

কাল কোট, লাল নেকটাই, হাতে সবুজ ফেল্ট্ হ্যাট। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, ক্ষীণকায়, গোঁফের দুই প্রান্ত কামানো। শ্যাম বাবু ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হল ?"

বিপিন।—ডিরেক্টর হবেন বলেচেন; কিন্তু মাত্র দু'হাজার টাকার শেয়ার নেবেন। তোমাকে, অটলকে, আমাকে পরশু সকালে ভাত খাবার নিমন্ত্রণ করেচেন। এই নাও চিঠি।

অটল।—তিনকড়ি বাবু হঠাৎ এত সদয় যে ?

শ্যাম।—বুঝলুম না। বোধ হয় ফেলো ডিরেক্টরদের একবার বাজিয়ে যাচাই করে নিতে চান।

অটল।—যাক্, এবার কাজ আরম্ভ করুন। আমি মেমোরাণ্ডম্ আর আর্টিকেল্‌সের মুসবিদা এনেচি। শ্যামদা প্রস্‌পেক্টস্‌টা কি রকম লিখলেন পড়ুন।

শ্যাম।—হাঁ, সকলে মন দিয়ে শোনো। কিছু বদলাতে হয় ত এই বেলা। দুর্গা—দুর্গা—

জয় সিদ্ধিদাতা গণেশ।

১৯১৩ সালের ৭ আইন অনুসারে রেজিষ্টৃত।

শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড।

মূলধন—দশ লক্ষ টাকা, ১০৲ হিসাবে ১০০,০০০ অংশে বিভক্ত। আবেদনের সঙ্গে অংশ পিছু ২৲ প্রদেয়। বাকী টাকা ৪ কিস্তিতে তিন মাসের নোটিসে প্রয়োজন মত দিতে হইবে।

অনুষ্ঠান-পত্র

ধর্ম্মই হিন্দুগণের প্রাণস্বরূপ। ধর্ম্মকে বাদ দিয়া এ জাতির কোন কর্ম্ম সম্পন্ন হয় না। অনেকে বলেন—ধর্ম্মের পুরস্কার পুণ্য। ইহা আংশিক সত্য মাত্র। বস্তুতঃ ধর্ম্মবৃত্তির উপযুক্ত প্রয়োগে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয়বিধ উপকার হইতে পারে। এতদর্থে চতুর্ব্বর্গ লাভের উপায়স্বরূপ এই বিরাট ব্যাপারে দেশবাসীকে আহ্বান করা হইতেছে।

ভারতবর্ষের বিখ্যাত দেবমন্দিরগুলির কিরূপ বিপুল আয়, তাহা সাধারণের জানা নাই। রিপোর্ট হইতে জানা গিয়াছে যে, বঙ্গদেশের একটি দেবমন্দিরের দৈনিক যাত্রীসংখ্যা গড়ে ১৫ হাজার। যদি লোক-পিছু চার আনা মাত্র আয় ধরা যায়, তাহা হইলে বাৎসরিক আয় প্রায় সাড়ে তের লক্ষ টাকা দাঁড়ায়। খরচ যতই হউক, যথেষ্ট টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। কিন্তু সাধারণে এই লাভের অংশ হইতে বঞ্চিত।

দেশের এই মহৎ অভাব দুরীকরণার্থ 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' নামে একটি জয়েণ্টষ্টক কোম্পানি স্থাপিত হইতেছে। ধর্ম্মপ্রাণ শেয়ার-হোল্‌ডারগণের অর্থে একটি মহান্ তীর্থক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হইবে, এবং জাগ্রত দেবী সমন্বিত সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত হইবে। উপযুক্ত ম্যানেজিং এজেণ্টের হস্তে কার্য্য-নির্ব্বাহের ভার ন্যস্ত হইয়াছে। কোনো প্রকার অপব্যয়ের সম্ভাবনা নাই। শেয়ার-হোল্‌ডারগণ আশাতীত দক্ষিণা বা ডিভিডেণ্ড পাইবেন এবং একাধারে ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ লাভ করিয়া ধন্য হইবেন।

ডিরেক্টরগণ।—(১) অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ বিচক্ষণ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। (২) বিখ্যাত ব্যবসাদার ও ক্রোরপতি শ্রীযুক্ত গণ্ডেরীরাম বাটপারিয়া। (৩) সলিসিটর্স দত্ত এণ্ড কোম্পানির অংশীদার শ্রীযুক্ত অটলবিহারী দত্ত M. A. B. L. (৪) বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মিষ্টার বি, সি, চৌধুরী, B. Sc. A. S. S. (U. S. A.) (৫) কালীপদাশ্রিত সাধক ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ শ্যামানন্দ (ex-officio)।

অটল বাবু বাধা দিয়া বলিলেন—"বিপিন আবার নূতন টাইটেল পেলে কবে ?"

শ্যাম।—আরে বল কেন। পঞ্চাশ টাকা খরচ করে আমেরিকা না কামস্কাট্‌কা কোত্থেকে তিনটে হরফ আনিয়েচে।

বিপিন।—বা, আমার কোয়ালিফিকেশন না জেনেই তারা শুধু শুধু একটা ডিগ্রি দিলে? ডিরেক্টর হতে গেলে একটা পদবী থাকা ভাল নয় ?

গণ্ডেরী।—ঠিক বাত। ভেক বিনা ভিখ মিলে না। শ্যাম বাবু, অপ্‌নিও এখন্‌সে ধোতি উতি ছোড়ে লঙোটি পিন্‌হুন।

শ্যাম।—আমি ত আর নাগা সন্ন্যাসী নই। আমি হলুম শক্তিমন্ত্রের সাধক,—পরিধেয় হল রক্তাম্বর। বাড়ীতে ত গৈরিকই ধারণ করি। তবে অফিসে পরে আসি না; কারণ, ব্যাটারা সব হাঁ করে চেয়ে থাকে। আর একটু লোকের চোখ-সহা হয়ে গেলে, সর্ব্বদাই গৈরিক পর্‌ব। যাক্, পড়ি শোনো—

মেসার্স ব্রহ্মচারী এণ্ড ব্রাদারইন্‌ল এই কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্সি লইতে স্বীকৃত হইয়াছেন—ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। তাঁহারা লাভের উপর শতকরা দুই টাকা মাত্র কমিশন লইবেন, এবং যতদিন না—

অটল বাবু বলিলেন—"কমিশনের রেট অত কম ধরলেন কেন? দশ পার্সেণ্ট অনায়াসে ফেলতে পারেন।"

গণ্ডেরী।—কুছু দরকার নেই। শ্যাম বাবুর পরবস্তি অপ্‌নেসে হোয়ে যাবে। কমিশনের ইরাদা থোড়াই করেন।

এবং যতদিন না কমিশনে মাসিক ১০০০৲ টাকা পোষায়, ততদিন শেষোক্ত টাকা এলাউন্স রূপে পাইবেন।

গণ্ডেরী।—শুনেন, অটল বাবু, শুনেন। আপনি শ্যাম বাবুকে কি শিখ্‌লাবেন?

হুগলী জেলার অন্তঃপাতী গোবিন্দপুর গ্রামে ৺সিদ্ধেশ্বরী দেবী বহু শতাব্দী যাবৎ প্রতিষ্ঠিতা আছেন। দেবীমন্দির ও তৎসংলগ্ন দেবোত্তর সম্পত্তির স্বত্বাধিকারিণী শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী সম্প্রতি স্বপ্নাদেশ পাইয়াছেন যে, উক্ত গোবিন্দপুর গ্রামে অধুনা সর্ব্বপীঠের সমন্বয় হইয়াছে এবং মাতা তাঁহার মাহাত্ম্যের উপযোগী সুবৃহৎ মন্দিরে বাস করিতে ইচ্ছা করেন। শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী অবলা বিধায়, এবং উক্ত দৈবাদেশ স্বয়ং পালন করিতে অপারগা বিধায়, উক্ত দেবোত্তর সম্পত্তি মায় মন্দির, বিগ্রহ, জমি, আওলাত আদি এই লিমিটেড কোম্পানিকে সমর্পণ করিতেছেন।

অটল।—নিস্তারিণী দেবী আবার কোত্থেকে এলেন? সম্পত্তি ত আপনার বলেই জান্‌তুম।

শ্যাম।—উনি আমার স্ত্রী। সেদিন তাঁর নামেই সব লেখাপড়া করে দিয়েচি। আমি আর এ সব বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত থাকতে চাই না।

গণ্ডেরী।—ভাল বন্দবস্ত্‌ কিয়েচেন। অপ্‌নেকো কোই ছুঁস্‌বে না। নিস্তার্‌নী দেবীকো কোন্‌ পহ্‌চানে। দাম কেতো লিচ্চেন?

অতঃপর তীর্থ-প্রতিষ্ঠা, মন্দির-নির্ম্মাণ, দেবসেবাদি কোম্পানী কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইবে; এবং এতদর্থে কোম্পানি মাত্র ১৫০০০৲ টাকা পণে সমস্ত সম্পত্তি খরিদার্থে বায়না করিয়াছেন।

গণ্ডেরী।—হদ্দ্‌ কিয়া শ্যাম বাবু। জঙ্গল কি ভিতর পুরানা মন্দিল, উস্‌মে দো চার শোও ছুছুন্দর, ছটাক ভর জমীন, উস্‌পর দো-চার বাঁশ ঝাড়,—বস্‌, ইসিকা দাম পন্দ্র হাজার!

শ্যাম।—কেন, অন্যায়টা কি হল? স্বপ্নাদেশ, বাহান্ন-পীঠ এক ঠাঁই, জাগ্রত দেবী,—এসব বুঝি কিছু নয়? গুড়্‌-উইল হিসেবে পনর হাজার টাকা খুবই কম।

গণ্ডেরী।—আচ্ছা। যদি কোই শেয়ার-হোল্ডার হাইকোর্ট মে দরখাস্ত্‌ পেশ করে—সপন উপন সব ঝুট্‌, ছক্‌লায়কে রুপেয়া লিয়া,—তব্‌?

অটল।—সে একটা কথা বটে, কিন্তু ঐ সব দৈব ব্যাপার বোধ হয় অরিজিনেল সাইডের জুরিস্‌ডিক্‌শনে পড়ে না। আইন বলে—caveat emptor, অর্থাৎ ক্রেতা, সাবধান! সম্পত্তি কেনবার সময় যাচাই করোনি কেন? যা হোক একবার expert opinion নোবো।

শীঘ্রই নূতন দেবালয় আরম্ভ হইবে। তৎসংলগ্ন প্রশস্ত নাটমন্দির, নহবৎখানা, ভোগশালা, ভাণ্ডার প্রভৃতি আনুষঙ্গিক গৃহাদিও থাকিবে। আপাততঃ দশ হাজার যাত্রীর উপযোগী অতিথিশালা নির্ম্মিত হইবে। শেয়ার-হোল্ডারগণ বিনা খরচায় সেখানে সপরিবারে বাস করিতে পারিবেন। হাট, বাজার, যাত্রা, থিয়েটার, বায়োস্কোপ ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদের আয়োজন যথেষ্ট থাকিবে। যাঁহারা দৈবাদেশ বা ঔষধ প্রাপ্তির জন্য হত্যা দিবেন, তাঁহাদের জন্য বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা থাকিবে। মোট কথা, তীর্থযাত্রী আকর্ষণ করিবার সর্ব্বপ্রকার উপায়ই অবলম্বিত হইবে। স্বয়ং শ্রীমৎ শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী ৺সেবার ভার লইবেন।

যাত্রিগণের নিকট হইতে যে দর্শনী ও প্রণামী আদায় হইবে, তাহা ভিন্ন আর নানা উপায়ে অর্থাগম হইবে। দোকান, হাট, বাজার, অতিথিশালা, মহাপ্রসাদ বিক্রয়, প্রভৃতি হইতে প্রচুর আয় হইবে। এতদ্ভিন্ন by-product recoveryর ব্যবস্থা থাকিবে। ৺সেবার ফুল হইতে সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত হইবে, এবং প্রসাদী বিল্বপত্র মাদুলীতে ভরিয়া বিক্রীত হইবে। চরণামৃতও বোতলে প্যাক করা হইবে। বলির জন্য নিহত ছাগসমূহের চর্ম্ম ট্যান করিয়া উৎকৃষ্ট কিড্‌স্কিন্‌ প্রস্তুত হইবে এবং বহুমূল্যে বিলাতে চালান যাইবে। কিছুই ফেলা যাইবে না।

'হদ্দ কিয়া শ্যাম বাবু'

গণ্ডেরী।—বকড়ি মারবেন? হামি ইস্‌মে নেহি, রামজি কিরিয়া। হামার নাম কাটিয়ে দিন।

শ্যাম।—আপনি ত আর নিজে বলি দিচ্চেন না। আচ্ছা, না হয় কুমড়ো বলির ব্যবস্থা করা যাবে।

অটল।—কুমড়োর চামড়া ত ট্যান হবে না। আয় কমে যাবে। কিহে বৈজ্ঞানিক, কুমড়োর খোসার একটা গতি করতে পার?

বিপিন। কষ্টিক পটাশ দিয়ে বয়েল কল্লে বোধ হয় ভেজিটেব্‌ল্‌ শু হ'তে পারে। এক্সপেরিমেণ্ট করে দেখ্‌ব।

গণ্ডেরী। যো খুসী করো। হামার কি আছে। হামি থোড়া রোজ বাদ অপ্‌না শেয়ার বিলকুল বেচে দিব।

হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে যে, কোম্পানির লাভ বাৎসরিক অন্ততঃ ১২ লক্ষ টাকা হইবে; এবং অনায়াসে ১০০ পারসেণ্ট ডিভিডেণ্ড দেওয়া যাইবে। ৩০ হাজার শেয়ারের আবেদন পাইলেই allotment হইবে। সত্বর শেয়ারের জন্য আবেদন করুন। বিলম্বে এই স্বর্ণ-সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবেন।

গণ্ডেরী। লিখে লিন—ঢাই লাখ টাকার শেয়ার বিক্রি হ'য়ে গেছে। হামি এক লাখ লিব, বাকী দেঢ় লাখ শ্যাম বাবু, বিপিন বাবু, অটল বাবু সমান হিস্‌সা লিবেন।

শ্যাম। পাগল আর কি। আমি আর বিপিন কোথা থেকে পঞ্চাশ-পঞ্চাশ হাজার বার করব? আপনারা না হয় বড় লোক আছেন।

গণ্ডারী। হামি শালা রুপেয়া ডালবো আর তুমি লোগ্‌ মৌজ করবে? সো হোবে না। সব্‌কো ঝোঁখি লেনা পড়েগা। শ্যাম বাবু, ইঠো সমঝলেন না? টাকা কেহি দিব না। সব্‌ হাওলাতি থাকবে। মানেজিং এজেণ্ট্‌ মহাজন হোবে।

অটল। বুঝলেন শ্যাম-দা? আমরা সকলে যেন ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌দের কাছ থেকে কর্জ্জ ক'রে নিজের-নিজের শেয়ারের টাকা কোম্পানিকে দিচ্চি; আবার কোম্পানি ঐ টাকা ম্যানেজিং এজেণ্টসের কাছে গচ্ছিত রাখচে। গাঁট থেকে এক পয়সাও কেউ দিচ্চেন না।

শ্যাম। তার পর তাল সামলাবে কে? কোম্পানি ফেল হ'লে আমি মারা যাই আর কি!

গণ্ডেরী। ডরেন কেনো? শেয়ার পিছু তো অভি দো টাকা দিতে হবে। ঢাই লাখ টাকার শেয়ারে সিরিফ্‌ পচাশ হাজার দেনা হোয়। প্রিমিয়ম্‌ মে সব্‌ বেচে দিব—সুবিস্তা হোয় ত আউর ভি শেয়ার ধরে রাখবো। বহুত মুনাফা

মিল্‌বে। চিম্‌ড়িমল্‌ ব্রোকার সে হামি বন্দোবস্ত কিয়েছি। দো চার দফে হম্‌ লোগ অপ্‌না অপ্‌নি শেয়ার লেকে খেল্‌বো, হাঁথ বদ্‌লাবো, দাম চড়বে, বাজার গরম হোবে। তখন সব্‌ কোই শেয়ার মাংবে, দামকা বিচার করবে না। কবীরজি কি বচন শুনিয়ে—

ঐসী গতি সন্‌সার মে যো গাড়র কি ঠাট।
এক পড়া যব্‌ গাড়মে সবৈ যাত তেহি বাট॥

তুমিই উদ্ধার ক'রে দাও মা—অধম সন্তানকে যেন মের না।"

গণ্ডেরী। শ্যামবাবু, মন্দিল উন্দিল কা কোম্পনি যো করণা হ্যায় কিজিয়ে। উস্‌কি সাথ ঘই-এর কারবার ভি লাগায় দিন। টাকায় টাকা লাভ।

অটল। ঘই কি চিজ্‌?

গণ্ডেরী। ঘই জানেন না? ঘিউ হোচ্ছে অস্‌লি চিজ্‌,—

'ঐসী গতি সন্‌সার মে যো গাড়র কি ঠাট
এক পড়া যব্‌ গাড়মে সবৈ যাত তেহি বাট'

মানি হচ্ছে—সন্‌সারের লোক সব্‌ যেন ভেড়ার পাল। এক ভেড়া যদি খাদ্দেম্নে গির্‌ পড়ে তো সব্‌ কোই উসিমে ঘুসে।

শ্যামবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—"তারা ব্রহ্মময়ি, তুমিই জান। আমি ত' নিমিত্ত মাত্র। তোমার কাজ

যো গায় ভঁইস বকড়িকা দুধসে বনে। আউর নকলি যো হ্যায় সো ঘই কহ্‌লাতা। চর্ব্বি, চীনাবাদাম তেল ওগায়রহ্‌ মিলা কর্‌ বনায়া যাতা। পর্‌সাল হামি ঘই-এর কামে পচিশ হাজার লাগাই, সাঢ়ে চৌবিশ হাজার মুনাফা মিলে।

অটল। উঃ! বিস্তর সাপ মেরেছিলেন বলুন!

গণ্ডেরী। আরে সাঁপ কাঁহাসে মিল্‌বে? উ সব ঝুট বাত।

অটল। আচ্ছা গণ্ডার জি—

গণ্ডেরী। গণ্ডার নেহি, গণ্ডেরী।

অটল। হাঁ হাঁ, গণ্ডেরী জি। বেগ্ ইওর পার্ডন। আচ্ছা, আপনি ত' নিরামিষ খান, ফোঁটা কাটেন, ভজন পূজনও করেন।

গণ্ডেরী। কেনো করব না? হামি হর্‌রোজ গীতা আউর রাম-চরিত-মানস পঢ়ি, রাম-ভজনভি করি।

অটল। তবে অমন পাপের ব্যবসাটা করলেন কি বলে?

গণ্ডেরী। পাঁপ? হামার কেনো পাঁপ হোবে? বেব্‌সা ত করে কাসেম আলি। হামি রহি কলকত্তা, ষই বনে হাথরস্‌মে। হামি ন আঁখ্‌সে দেখি—ন নাকসে শুংথি—কালী মায়ী কিরিয়া। হামি ত শ্রিফ্ মহাজন আছি—রুপেয়া দে কর্ খালাস। সুদ লি, মুনাফার আধা হিস্‌সা ভি লি। যদি হামি টাকা না দি, কাসেম আলি দুস্‌রা ধনিসে লিবে। পাঁপ হোবে ত শালা কাসেম আলিকা হোবে। হামার কি? যদি ফিন্ কুছ দোষ লাগে,—জানে রণ্‌ছোড়্‌জি—হামার পুণ্‌ভি থোড়া বহুত জমা আছে। একাদ্‌সি, শিউরাত, রামনওমীমে উপবাঁস, দান খয়রাত ভি কুছু করি। আট আটঠো ধরমশালা বানোআয়া,—লিলুয়ামে, বালিমে, শেওড়াফুলিমে—

অটল। লিলুয়ার ধর্ম্মশালা ত' আসর্ফিলাল ঠুনঠুন-ওয়ালা করেচে।

গণ্ডেরী। কিয়েছে ত কি হইয়েছে। সভি ত ওহি কিয়েছে। লেকিন্ বানিয়ে দিয়েছে কোন্? তদারক কোন্ কিয়েছে? ঠিকাদার কোন্ লাগিয়েছে? সব্ হামি। আসর্ফি হামার চাচেরা ভাই লাগে। হামি সলাহ্ দিয়েছি তব্ না রুপেয়া খরচ কিয়েছে।

অটল। মন্দ নয়,—টাকা ঢাললে আসরফি, পুণ্য হ'ল গণ্ডেরীর।

গণ্ডেরী। কেনো হোবে না? দো দো লাখ রুপেয়া হর্ জগেমে খরচ কিয়া। জোড়িয়ে ত কেত্‌না হোয়। উস্ পর কম্‌সে কম্ সঁয়কড়া পাঁচ রুপেয়া দস্তরী ত হিসাব কিজিয়ে। হম্ ত বিলকুল ছোড় দিয়া। আসর্ফিলালকা পুণ্ যদি সোলহ্ লাখকা হোয়, মেরাভি অস্‌সি হজার মোতাবেক হোনা চাহ্‌তা।

অটল। চমৎকার ব্যবস্থা! পুণ্যেরও দেখচি দালালী পাওয়া যায়। আমাদের শ্যামদা গণ্ডেরীদা যেন মাণিকজোড়।

গণ্ডেরী। অটলবাবু, অপ্‌নি দো চার অংরেজী কিতাব পঢ়িয়ে হামাকে ধরম কি শিখ্‌লাবেন? বঙ্গালি ধরম জানে না। তিস রুপেয়ার নোকরি করবে, পাঁচ পইসার হরিলুঠ দিবে। হামার জাত রুপেয়া ভি কামায় তেজ্‌সে, পুণ্ ভি করে তেজসে। অপ্‌নেদের রবীন্দর নাথ কি লিখচেন—

বৈরাগ্ সাধন মুক্তি সো হমার নেহি।

হামি এখন চল্‌ছি, রেস খেলনে। কোঁন্টি গেরিল ঘোড়ে পর্ আজ দো চারশও লাগ্যাওয়েঙ্গে।

অটল। আমিও উঠি শ্যামদা। আর্টিকেলের মুসবিদা রেখে যাচ্ছি, দেখে রাখবেন। প্রস্‌পেক্টস্ ত' দিব্বি হয়েচে। একটু-আধটু বদ্‌লে দেবো এখন। পরশু আবার দেখা হবে। নমস্কার!

৩। সুন্দরকাণ্ড।

বাগ-বাজারে গলির ভিতর রায় সাহেব তিনকড়ি বাবুর বাড়ী। নীচের তলায় রাস্তার সম্মুখে নাতিবৃহৎ বৈঠকখানা ঘরে গৃহ-কর্ত্তা এবং নিমন্ত্রিতগণ গল্পে নিরত;—অন্দর হইতে কখন ভোজনের ডাক আসিবে, তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছেন। আজ রবিবার, তাড়া নাই, কিন্তু বেলা অনেক হইয়াছে।

তিনকড়ি বাবুর বয়স ষাট বৎসর, ক্ষীণ দেহ, দাড়ি কামানো। শীর্ণ গোঁফে তামাকের ধোঁয়ায় পাকা খেজুরের রং ধরিয়াছে,—কথা কহিবার সময় আরসোলার দাড়ার মত নড়ে। তিনি দৈব-ব্যাপারে বড় একটা বিশ্বাস করেন না। প্রথম পরিচয়ে শ্যামবাবুকে বুজরুক সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, কেবল লাভের আশায় কোম্পানিতে যোগ দিয়াছেন। কিন্তু আজ কালীঘাট হইতে প্রত্যাগত সদ্যস্নাত শ্যামবাবুর অভিনব মূর্ত্তি দেখিয়া কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হইয়াছেন। শ্যামবাবুর পরিধান লাল চেলী, গেরুয়া রংএর আলোয়ান, পায়ে বাঘের চামড়ার শিং-তোলা জুতা। দাড়ি এবং চুল সাজি-মাটি দ্বারা যথাসম্ভব ফাঁপাইয়াছেন; এবং কপালে মস্ত একটি সিন্দূরের ফোঁটা পরিয়াছেন।

তিনকড়ি বাবু তামাক টানার অন্তরালে বলিতেছিলেন—"দেখুন স্বামীজি, হিসেবই হল ব্যবসার সব। ডেবিট ক্রেডিট যদি ঠিক থাকে, আর ব্যালান্স যদি মেলে, তবে সে বিজনেসের কোনো ভয় নেই।"

শ্যামবাবু। আজ্ঞে, বড় যথার্থ কথা বলেচেন। সে জন্যই ত' আমরা আপনাকে চাই। আপনাকে আমরা মধ্যে-মধ্যে এসে বিরক্ত করব, হিসেব সম্বন্ধে পরামর্শ নোবো—

তিনকড়ি। বিলক্ষণ, বিরক্ত হব কেন। মিটিংগুলো একটু ঘন-ঘন করবেন। আমি সমস্ত accounts ঠিক করে দোবো। দেখুন, অডিটার ফডিটার আমি বুঝি না। আরে বাপু, নিজের জমা-খরচ যদি নিজে না বুঝলি, তবে বাইরের একটা অর্ব্বাচীন ছোকরা এসে তার কি বুঝবে? ভারি আজকাল সব বুক-কিপিং শিখেছেন। সে কি জানেন,—একটা গোলোকধাঁধা, কেউ যাতে না বোঝে তারই চেষ্টা। আমি বুঝি—রোজ কত টাকা এল, কত খরচ হল, আর আমার মজুদ রইল কত। আমি যখন আমাড়গাছি সব-ডিভিশনের ট্রেজারির চার্জে, তখন এক নতুন কলেজে-পাশ গোঁফ-কামানো ডেপুটি এলেন আমার কাছে কাজ শিখতে। সে ছোকরা কিছুই বোঝে না, অথচ অহঙ্কারে ভরা। আমার কাজে গলদ ধরবার আস্পর্দ্ধা। শেষে লিখলুম কোল্ডহ্যাম সাহেবকে, যে হুজুর, তোমরা রাজার জাত, দু' ঘা দাও তাও সহ্য হয়, কিন্তু দিশি ব্যাঙাচির লাথি বরদাস্ত করব না। তখন সাহেব নিজে এসে, সমস্ত বুঝে নিয়ে, আড়ালে ছোকরাকে ধমকালেন। আমাকে পিঠ চাপড়ে হেসে বল্লেন—ওয়েল তিনকড়ি বাবু, তুমি হলে কত কালের সিনিয়র অফিসর, একজন ইয়ং চ্যাপ তোমার কদর কি বুঝবে? তার পর দিলেন আমাকে নওগাঁয়ে গাঁজা গোলার চার্জে বদলী করে। যাক্ সে কথা। দেখুন, আমি বড় কড়া লোক। জবরদস্ত হাকিম বলে আমার নাম ছিল। মন্দির-টন্দির আমি বুঝি না,—কিন্তু একটি আধলাও কেউ আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না। রক্ত-জল-করা টাকা আপনার জিম্মায় দিচ্ছি, দেখবেন যেন—

শ্যাম। সে কি কথা! আপনার টাকা আপনারই থাকবে, আর শতগুণ বাড়বে। এই দেখুন না—আমি আমার যথাসর্ব্বস্ব পৈত্রিক পঞ্চাশ হাজার টাকা এতে ফেলেচি। আমি না হয় সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী,—অর্থে প্রয়োজন নেই,—লাভ যা হবে মায়ের সেবাতেই ব্যয় করব। বিপিন আর এই অটল ভায়াও প্রত্যেকে পঞ্চাশ হাজার ফেলেচেন। গণ্ডেরী আড়াই লাখ টাকার শেয়ার নিয়েচে। সে মহা হিসেবী লোক,—লাভ নিশ্চিত না জানলে কি নিত?

তিনকড়ি। বটে, বটে? শুনে আশ্বাস হচ্চে। আচ্ছা, একবার কোল্ডহ্যাম সাহেবকে কনসণ্ট্ করলে হয় না? অমন সাহেব আর হয় না।

"ঠাঁই হয়েচে"—চাকর আসিয়া খবর দিল।

"উঠিতে আজ্ঞা হোক ব্রহ্মচারী মশায়, আসুন অটল বাবু, চল হে বিপিন।" তিনকড়ি বাবু সকলকে অন্দরের বারান্দায় আনিলেন।

শ্যাম বাবু বলিলেন—"করেছেন কি রায় সাহেব, এ যে রাজসূয় যজ্ঞ। কই, আপনি বস্‌লেন না?"

তিনকড়ি।—বাতে ভুগ্‌চি, ভাত খাইনে, দুখান সুজির রুটি বরাদ্দ।

শ্যাম।—আমি একটি ফেৎকারিণী তন্ত্রোক্ত কবচ পাঠিয়ে দোবো, ধারণ করে দেখবেন। শাক ভাজা, কড়াইএর ডাল,—এটা কি দিয়েছ ঠাকুর, এঁচোড়ের ঘণ্ট? বেশ, বেশ। শোধন করে নিতে হবে। সুপক্ক কদলী আর গব্যঘৃত বাড়ীতে হবে কি? আয়ুর্ব্বেদে আছে—পনসে কদলং কদলে ঘৃতং। কদলী ভক্ষণে পনসের দোষ নষ্ট হয়, আবার ঘৃতের দ্বারা কদলীর শৈত্যগুণ দূর হয়। পুঁটিমাছ ভাজা,—বাঃ। রোহিতাদপি রোচকাঃ পুণ্টিকাঃ সত্তভর্জ্জিতাঃ। ওটা কিসের অম্বল বল্লে,—কামরাঙা? সর্ব্বনাশ, তুলে নিয়ে যাও। গত বৎসর শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে ঐ ফলটি জগন্নাথ প্রভুকে দান করেচি। অম্বল জিনিষটা আমার সয়ও না,—শ্লেষ্মার ধাত কি না। উস্‌প্, উস্‌প্, উস্‌প্। প্রাণায় অপানায় সোপানায় স্বাহা। শয়নে পদ্মনাভঞ্চ ভোজনেতু জনার্দ্দনঃ। আরম্ভ কর হে অটল।

অটল।—(জনান্তিকে) আরম্ভের ব্যবস্থা যা দেখচি, তাতে বাড়ী গিয়ে খুন্নিবৃত্তি করতে হবে।

তিনকড়ি।—আচ্ছা ঠাকুরমশায়, আপনাদের তন্ত্রশাস্ত্রে এমন কোনো প্রক্রিয়া নেই, যার দ্বারা লোকের—ইয়ে—মানমর্য্যাদা বৃদ্ধি পেতে পারে?

শ্যাম।—অবশ্য আছে। যথা কুলার্ণবে—অমানিনাং

মানদেন। অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হলে অমানী ব্যক্তিকেও মান দেন। কেন বলুন ত ?

তিনকড়ি।—হাঃ হাঃ, সে একটা তুচ্ছ কথা। কি জানেন, কোল্‌হ্যাম সাহেব বলেছিলেন, সুবিধা পেলেই লাটসাহেবকে ধরে আমায় বড় খেতাব দেওয়াবেন। বার-বার ত রিমাইণ্ড করা ভাল দেখায় না, তাই ভাবছিলুম, যদি তন্ত্রে মন্ত্রে কিছু হয়। মানিনে যদিও, তবু—

শ্যাম।—মানতেই হবে। শাস্ত্র মিথ্যা হতে পারে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এ বিষয়ে আমার সমস্ত সাধনা নিয়োজিত করব। তবে সদ্‌গুরু প্রয়োজন, দীক্ষা ভিন্ন এ সব কাজ হয় না। গুরুও আবার যে সে হলে চলবে না। খরচ—তা আমি যথাসম্ভব অল্পেই নির্ব্বাহ করতে পারব।

তিনকড়ি।—হুঁ। দেখা যাবে এখন। আচ্ছা, আপনাদের অফিসে ত বিস্তর লোকজন দরকার হবে, তা— আমার একটি শালীপো আছে, তার একটা হিল্লে লাগিয়ে দিতে পারেন না ? বেকার বসে-বসে আমার অন্ন ধ্বংস করচে,—লেখাপড়া শিখলে না,—কুসঙ্গে মিশে বিগ্‌ড়ে গেছে। একটা চাকরী জুটলে বড় ভাল হয়। ছোকরা বেশ চটপটে আর স্বভাব-চরিত্রও বড় ভাল।

শ্যাম।—আপনার শালীপো ? কিছু বলতে হবে না। আমি তাকে মন্দিরের হেড পাণ্ডা করে দোবো। এখনি গোটা পনর দরখাস্ত এসেছে। তা আপনার আত্মীয়ের ক্লেম সবার ওপর।

তিনকড়ি।—আর একটি অনুরোধ। আমার বাড়ীতে একটি পুরানো কাঁসর আছে,—একটু ফেটে গেছে, কিন্তু আদত খাঁটি কাঁসা। এ জিনিসটা মন্দিরের কাজে লাগানো যায় না ? সস্তায় দোবো।

শ্যাম।—নিশ্চয়ই নেবো। ওসব সেকেলে জিনিষ কি এখন সহজে মেলে ?

* * * *

৪। লঙ্কাকাণ্ড।

গণ্ডেরীর ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হইয়াছে। বিজ্ঞাপনের জোরে এবং প্রতিষ্ঠাতৃগণের চেষ্টায় সমস্ত শেয়ারই বিলি হইয়া গিয়াছে। লোকে শেয়ার লইবার জন্য অস্থির, বাজারে চড়া দামে বেচা-কেনা হইতেছে।

অটল বাবু বলিলেন—“আর কেন শ্যামদা, এইবার নিজের শেয়ার সব ঝেড়ে দেওয়া যাক। গণ্ডেরী ত খুব একচোট মারলে। আজকে ডবল দর। দুদিন পরে কেউ ছোঁবেও না।”

শ্যাম।—বেচতে হয় বেচ, মোদ্দা কিছু ত হাতে রাখতেই হবে, নইলে ডিরেক্টর হবে কি করে ?

অটল।—ডিরেক্টরি আপনি করুন গে। আমি আর হাঙ্গামায় থাকতে চাইনে। সিদ্ধেশ্বরীর কৃপায় আপনার ত কার্য্যসিদ্ধি হয়েচে।

শ্যাম।—এই ত সবে আরম্ভ। মন্দির, ঘরদোর, হাট-বাজার সবই ত বাকী। তোমাকে কি এখন ছাড়া যায় !

অটল।—থেকে আমার লাভ ? পেটে খেলে পিঠে সয়। এখন ত ব্রাদারইন্‌ল কোম্পানির মরশুম চল্ল। আমাদের এইখানেই শেষ।

শ্যাম।—আরে ব্যস্ত হও কেন, এক যাত্রার কি পৃথক ফল হয় ? সন্ধ্যেবেলা যাব এখন তোমাদের বাড়ীতে,—গণ্ডেরীকেও নিয়ে যাব।

* * * *

দেড় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মচারী এণ্ড্ ব্রাদার ইন্‌ল কোম্পানির অফিসে ডিরেক্টরগণের সভা বসিয়াছে।

‘অ’—আ—আমি জান্‌তে চাই’

সভাপতি তিনকড়ি বাবু টেবিলে ঘুসি মারিয়া বলিতেছিলেন—“আ—আ—আমি জান্‌তে চাই, টাকা সব গেল কোথা। আমার ত বাড়ীতে টেকা ভার,—সবাই এসে তাড়া দিচ্চে। কয়লাওলা বলে তার পঁচিশ হাজার টাকা পাওনা,—ইঁটখোলার ঠিকাদার বলে বারো হাজার,—

তারপর ছাপাখানাওলা, শার্পার কোম্পানি, কুণ্ডু মুখুয্যে, আরো কত কে আছে। বলে আদালতে যাব। মন্দিরের কোথা কি তার ঠিক নেই—এর মধ্যে দু'লাখ টাকা ফুঁকে গেল? সে ভণ্ড জোচ্চোরটা গেল কোথা? শুনতে পাই ডুব মেরে আছে, অফিসে বড় একটা আসে না।

অটল।—ব্রহ্মচারী বলেন, মা তাঁকে অন্য কাজে ডাকচেন,—এদিকে আর তেমন মন নেই। আজ ত মিটিংএ আসবেন বলেচেন।

বিপিন বলিলেন—"ব্যস্ত হচ্চেন কেন সার, এই ত ফর্দ্দ রয়েচে, দেখুন না—জমি কেনা, শেয়ারের দালালী, Preliminary expense, ইঁট তৈরি, establishment, বিজ্ঞাপন, অফিস-খরচ—"

তিনকড়ি।—চোপরও ছোকরা। চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা।

এমন সময় শ্যাম বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন—"ব্যাপার কি?"

তিনকড়ি।—ব্যাপার আমার মাথা। আমি হিসেব চাই।

শ্যাম।—বেশ ত, দেখুন না হিসেব। বরঞ্চ একদিন গোবিন্দপুরে নিজে গিয়ে কাজকর্ম্ম তদারক করে আসুন।

তিনকড়ি।—হ্যাঃ, আমি এই বাতের শরীর নিয়ে তোমার ধ্যাধোড়ে গোবিন্দপুরে গিয়ে মরি আর কি। সে হবে না,—আমার টাকা ফেরৎ দাও। কোম্পানি ত যেতে বসেছে। শেয়ার-হোল্ডাররা মার-মার কাট-কাট করচে।

শ্যাম বাবু কপালে যুক্তকর ঠেকাইয়া বলিলেন—"সকলি জগন্মাতার ইচ্ছা। মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। এতদিন ত মন্দির শেষ হওয়ারই কথা। কতকগুলো অজ্ঞাতপূর্ব্ব কারণে খরচ বেশী হয়ে গিয়ে, টাকার অনাটন হয়ে পড়ল,--তাতে আমাদের আর অপরাধ কি? কিন্তু চিন্তার কোনো কারণ নেই, ক্রমশঃ সব ঠিক হয়ে যাবে। আর একটা Callএর টাকা তুললেই সমস্ত দেনা শোধ হয়ে যাবে, কাজও এগোবে।"

গণ্ডেরী বলিলেন—"আউর টাকা কোই দিবে না। আপ্‌নেকো থোড়াই বিশোয়াস্ করবে।"

শ্যাম।—বিশ্বাস না করে, নাচার। আমি দায়-মুক্ত,—মা যেমন করে পারেন, নিজের কাজ চালিয়ে নিন। আমাকে বাবা বিশ্বনাথ কাশীতে টানচেন, সেখানেই আশ্রয় নোবো।

তিনকড়ি।—তবে কি বলতে চাও, কোম্পানি ডুবলো?

গণ্ডেরী।—বিশ হাঁথ পানি।

শ্যাম।—আচ্ছা তিনকড়ি বাবু, আমাদের ওপর যখন লোকের এতই অবিশ্বাস, বেশ ত, আমরা না নয় ম্যানেজিং এজেন্সি ছেড়ে দিচ্চি। আপনার নাম আছে, সম্ভ্রম আছে, লোকেও শ্রদ্ধা করে; আপনিই ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে কোম্পানি চালান না?

অটল।—এইবার পাকা কথা বলেচেন।

তিনকড়ি।—হ্যাঃ, আমি বদ্‌নামের বোঝা ঘাড়ে নিই, আর ঘরের খেয়ে বুনো মোষ তাড়াই।

শ্যাম।—বেগার খাটবেন কেন? আমিই মিটিংএ প্রস্তাব করব যে, রায়সাহেব শ্রীযুক্ত তিনকড়ি ব্যানার্জ্জি মহাশয়কে মাসিক ১০০০৲ পারিশ্রমিক দিয়ে কোম্পানি চালাবার ভার অর্পণ করা হোক। এমন উপযুক্ত কর্ম্মদক্ষ লোক আর কোথা? আর—আমরা যদি ভুলচুক করেই থাকি, তার দায়ী ত আর আপনি হবেন না।

তিনকড়ি।—তা—তা—আমি এখন চট্ করে কথা দিতে পারি নে। ভেবে চিন্তে দেখব।

অটল।—আর দ্বিধা করবেন না রায়সাহেব। আপনিই এখন ভরসা।

শ্যাম।—যদি অভয় দেন ত আর একটি নিবেদন করি। আমি বেশ বুঝেচি, অর্থ হচ্চে সাধনের অন্তরায়। আমার সমস্ত সম্পত্তিই বিলিয়ে দিয়েচি—কেবল এই কোম্পানির ষোলশ খানেক শেয়ার আমার হাতে আছে। তাও সৎপাত্রে অর্পণ করতে চাই। আপনিই সেটা নিয়ে নিন। প্রিমিয়ম চাই না--আপনি কেনা দাম ৩২০০৲ মাত্র দিন।

তিনকড়ি।--হ্যাঃ, ভাল করে আমার ঘাড় ভাংবার মতলব।

শ্যাম।—ছি ছি। আপনার ভালই হবে। না হয় কিছু কম দিন,—চব্বিশ শ—দু'হাজার—হাজার—

তিনকড়ি।—এক কড়াও নয়।

শ্যাম।—দেখুন, ব্রাহ্মণ হতে ব্রাহ্মণের দান প্রতিগ্রহ নিষেধ, নৈলে আপনার মত লোককে আমার অমনিই দেবার কথা। আপনি যৎকিঞ্চিৎ মূল্য ধরে দিন। ধরুন—

'কুছ ভি নেহি'

পাঁচশ টাকা। Transfer-form আমার প্রস্তুতই আছে,—নিয়ে এস ত বিপিন।

তিনকড়ি।—আমি এ—এ—আশী টাকা দিতে পারি।

শ্যাম।—তথাস্তু। বড়ই লোকসান হল, কিন্তু সকলি মায়ের ইচ্ছা।

গণ্ডেরী।—বাহ্বা তিনকৌড়ি বাবু, বহুৎ কিফায়ৎ হুয়া।

তিনকড়ি বাবু পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিয়া সদ্যপ্রাপ্ত পেন্‌শনের টাকা হইতে আটখানা আনকোরা দশ টাকার নোট সন্তর্পণে গণিয়া দিলেন। শ্যাম বাবু পকেটস্থ করিয়া বলিলেন—"তবে এখন আমি আসি। বাড়ীতে সত্য-নারায়ণের পূজা আছে! আপনিই কোম্পানির ভার নিলেন এই কথা স্থির। শুভমস্তু—মা দশভূজা আপনার মঙ্গল করুন।"

শ্যাম বাবু প্রস্থান করিলে, তিনকড়ি বাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"লোকটা দোষে-গুণে মানুষ। এদিকে যদিও হম্‌বগ্, কিন্তু মেজাজটা দিলদরিয়া। কোম্পানির ঝক্কিটা ত এখন আমার ঘাড়ে পড়ল। ক'মাস বাতে পঙ্গু হয়ে পড়ে ছিলুম, কিছুই দেখতে পারি নি,—নৈলে কি কোম্পানির অবস্থা এমন হয়? যা হোক, উঠে পড়ে লাগতে হল,—আমি লেফাফা-দুরস্ত কাজ চাই,—আমার কাছে কারো চালাকী চলবে না।"

গণ্ডেরী।—আপ্‌নের কুছু তক্‌লিফ্ করতে হোবে না। কম্প্‌নি ত ডুব গিয়া। অপ্‌কোভি ছুট্টি।

তিনকড়ি।—তা হলে কি বল্‌তে চাও আমার মাসহারাটা—

গণ্ডেরী।—হাঃ হাঃ, তুম্‌ভি রূপেয়া লেওগে? কাঁহাসে মিল্‌বে বাত্‌লাও। তিনকৌড়ি বাবু, শ্যামবাবুকে কার্‌বার নহি সমঝা? নব্বে হজার রূপেয়া কম্পনিকা দেনা। দো রোজ বাদ লিক্‌ইডিশন। রিসিভর সিকিণ্ড কল আদায় করবে, তব দেনা শুধবে।

তিনকড়ি।—অ্যাঁ, বল কি? আমি আর এক পয়সাও দিচ্চি না।

গণ্ডেরী।—আলবৎ দিবেন। গবরমিণ্ট কাণ পকড়্‌কে আদায় করবে। আইন এইসি হ্যায়।

তিনকড়ি।—আরও টাকা যাবে? সে কত?

অটল।—আপনার একলার নয়। প্রত্যেক অংশীদারকেই শেয়ার-পিছু ফের দু'টাকা দিতে হবে। আপনার পূর্ব্বের ২০০ শেয়ার ছিল, আর শ্যামদার ১৬০০ আজ নিয়েচেন। এই ১৮০০ শেয়ারের উপর আপনাকে ছত্রিশ শ টাকা দিতে হবে। দেনা শোধ, রিসিভারের খরচা—সমস্ত চুকে গেলে শেষে সামান্য কিছু ফেরৎ পেতে পারেন।

তিনকড়ি।—তোমাদের কত গেল?

গণ্ডেরী বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সঞ্চালন করিয়া বলিলেন—"কুছ্‌ ভি নেহি, কুছ্‌ ভি নেহি! আরে হামাদের ঝড়তি-পড়তি শেয়ার ত সব্‌ শ্যাম বাবু লিয়েছিল—আজ আপনেকে বিক্‌করি কিয়েছে।"

তিনকড়ি।—চোর—চোর—চোর। আমি এখনি বিলেতে কোল্ডহ্যাম সাহেবকে চিঠি লিখচি।

অটল। তবে আমরা এখন উঠি। আমাদের ত আর শেয়ার নেই, কাজেই আমরা এখন ডিরেক্টর নই। আপনি কাজ করুন। চল গণ্ডেরী।

তিনকড়ি।—অ্যাঁ—

গণ্ডেরী।—রাম রাম।

অন্ধকারের অন্দরে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

১

ছায়ার পুরে নিত্য ঘোরে রাত-ভিখারীর দলগুলি
পথহারারা সেথায় জমে সন্ধ্যাতে,
সেথায় পাতায় গৃহস্থালী সয় না আলোর ঝল্‌মলি
সন্ধ্যামণি, শিউলি নিশিগন্ধাতে।

২

সেথায় রহে যুগের যুগের সব রহস্য সঞ্চিত
অস্ফুটদের গোপন-কথার ভাণ্ডারা,
সেথায় থাকে সর্ব্বহারা, সেথায় রহে বঞ্চিত,
সেথায় রহে অলক্ষ্মীর ওই পাণ্ডারা।

৩

সেথায় যত আশার বাসা, অনন্তেরি অর্চ্চনা,
সেথায় মিলন অসম্ভব ও সম্ভবে,
সামের ঋকের সঙ্গে সেথা প্রেমের গানের মূর্চ্ছনা,
কঠোর সেথায় কান্ত মনোরম হবে।

৪

চঞ্চল এবং অচঞ্চলে মিলন সেথায় নিত্য হে,
রয় যে ধ্রুব আঁধার ছায়ার অন্তরে;
সেথায় রাজে মুক্তা মাণিক যক্ষ রাজার বিত্ত হে
আবছায়াতে স্বর্ণ-মরাল সন্তরে।

৫

অলক্ষ্যেতে যক্ষবালা রয় সেখানে সজ্জিতা
স্বয়ম্বরের স্বর্ণ-থালায় পুষ্পহার,
চকিত এসে ঈষৎ হেসে প্রণাম করে লজ্জিতা,
বরণ-মালা পরায় বালা কণ্ঠে কার।

৬

অন্তবিহীন অন্ধকারের ফণার মণির দীপ্তিতে
সরিয়ে দেবে কুহেলিকার কুজ্ঝাটি;
মিলন-মধুর কোন্ লগনে নিবিড় গভীর তৃপ্তিতে
মিল্‌বে কাছে আকাঙ্ক্ষিতের শয্যাটি।

থুকজে-ছে

শ্রীঅনুকুলচন্দ্র সান্যাল এম-এ, বি-এল্

(১)

সে অনেক দিনের কথা। আমি তখন জলপাইগুড়ির জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরিয়াই বেড়াই। কাজ—প্রবেশনারী একষ্ট্রা অ্যাসিষ্টাণ্ট কনসারভেটর। হঠাৎ খেয়াল চাপিল, তিব্বতী ভাষা শিখিতে হইবে। দাৰ্জ্জিলিংএ ছিলেন আমার এক বন্ধু। তাঁহার চেষ্টায় শিক্ষক জুটিতেও বিলম্ব হইল না। একদিন তাঁহার নিকট হইতে মধ্যাহ্নে তার পাইলাম, "Tibetan teacher going meet station evening" দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ক'টা ঘণ্টা যেন কাটিতে চাহে না। ভাবিলাম, না জানি কি এক কিম্ভূতকিমাকার জীবেরই দেখা পাইব। সন্ধ্যাবেলা প্ল্যাটফরমে গিয়া পায়চারী করিতেছি, এমন সময় ষ্টেসন-মাষ্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ। তিনি আমার পূর্ব্ব-পরিচিত। একটু হাসিয়া বল্লেন "আপনাদের ত' টিকিই দেখতে পাই নে'। যা'ক, আজ সকালে কার মুখ দেখেই বা উঠেছিলাম। আজ শুধু দেখতে পাওয়া নয়,—অনেকক্ষণ গল্প না করে আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি না।" আমি বাধা দিয়া বলিলাম "না, না,—এই ট্রেণে একজন লোক আসবে, আমি তা'কে নিতে এসেছি।" তিনি বল্লেন "এই ট্রেণে ত'? আচ্ছা বেশ। তবে চলুন, আপনার জন্য একটা মজার খবর আছে।" আমি বল্লুম, "কি, কি?" "কি বক্‌শিশ দেবেন, আগে বলুন। আপনার ত' গল্প করার সময় নাই।" আমি ত' অবাক। আমাকে কি মজার খবর ষ্টেসন-মাষ্টার দিতে পারে, এবং আমি যে এই সন্ধ্যাবেলা ষ্টেসনেই আসব, তাই বা ষ্টেসন-মাষ্টার জানলে কি করে। "এই দেখুন" বলিয়া একখানা কাগজ আমার হাতে দিলেন। পড়িলাম "D. H. Railway Train derailed between Kurseong and Toong. Our 25 Down running six hours late." তখন হতাশ হইয়া বলিলাম, "যা'ন মশাই, ঠাট্টা ভাল লাগে না।" মনে-মনে ভাবিলাম, "আরম্ভেই এ কি বাধা!"

(২)

তিন মাস চলিয়া গিয়াছে। আমি এখন তিব্বতী ভাষায় পুরাদস্তুর লায়েক। আমার তিব্বতী বুক্‌নির চোটে বাসার লোকেরা ও আফিসের লোকেরা সমান ভাবে উত্যক্ত ও অস্থির। এমন সময়ে একদিন প্রভাতে রান্নাভাত-খাওয়া থেকে আমার এক সহকর্ম্মী বন্ধু এসে উপস্থিত। বন্ধু-মহলে তাঁহার স্পষ্টবক্তা বলিয়া একটা সুখ্যাতি কিম্বা অখ্যাতি ছিল। তা' ছাড়া, মুদ্রাদোষও তাঁহার নানা রকম ছিল। তিনি বল্লেন, "ওহে, তোমার এই তিব্বতীর চোটে আমার একটা গল্প মনে পড়ল। সে আমলে কুপার্স হিল থেকে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে সাহেবরা এ দেশে আসত, জান ত'। ওর নাম কি, এক সাহেবের উর্দ্দু শেখবার ইচ্ছা হ'ল। অমনি ডাক এক কনট্রাক্টরকে। তার এক ভায়রাভাই না কে ছিল,—বসে-বসে অন্নধ্বংস কচ্ছিল। দিলে তাকে লাগিয়ে। তার উর্দ্দু বিদ্যার দৌড় ওর নাম কি, আমারি মত। সে ত' আর একটা সাদী বা হাফেজ নয়।" আমি বাধা দিয়া বলিলাম, "ভাই, মাফ করো, সাদী বা হাফেজ উর্দ্দু ভাষায় কখনও কবিতা লেখেন নাই।" বন্ধুবর অল্পেই উত্তেজিত হ'ন, এবং অল্পেই শান্ত হ'ন। হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "যাও, আর গল্প বলব না। ওর নাম কি, তোমার মত pedant ত' দুনিয়ায় দেখি নাই। গল্প—গল্প, তার আবার জেরা।" আমি বল্লুম "ভাই, রাগ কেন? গল্পটা শেষ কর। শোনা যা'ক।" তিনি তখন আবার বলতে আরম্ভ করলেন, "বুঝলে ত', ইঞ্জিনীয়ার সাহেব ঐ বিদ্যাদিগ্‌গজ শিক্ষকের কাছে বিদ্যালাভ করে গেলেন উর্দ্দু ভাষার পরীক্ষা দিতে। ওর নাম কি, পরীক্ষক এক ইংরেজ। সেও এক মস্ত পণ্ডিত—তারই মতন আর এক বিদ্যাদিগ্‌গজ ইঞ্জিনীয়ারকে বল্লে, "There is a contractor who has supplied bad bricks. Just chastise him in Urdu and threaten him that you would

cut down his bills" ইঞ্জিনীয়ারের ত' চক্ষু স্থির। দু' এক মিনিট আমতা-আমতা, করে, মনে-মনে কি ভেবে বল্লেন, "Yes, I am coming in a minute"। তার পর বাহিরে গিয়ে ফেরবার সময় ঘোড়ার চাবুকখানা সঙ্গে নিয়ে এলেন। তখন আবার কনট্রাক্টরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা আরম্ভ হ'ল। সেই উর্দ্দুর একটু নমুনা দিচ্ছি। "Look here, contractor তুম, তুম, তুম।" আর সাহেবের' বিদ্যায় কুলোয় না। তখন চাবুকখানি 'কনট্রাক্টরের দিকে তুলিতেই সে বেচারী ত একদম দৌড়। পরীক্ষক ত' মহা সন্তুষ্ট। "Oh, yes, oh, yes, that's all right. You have made yourself quite intelligible to the fellow. You have passed with credit." গল্পটা শেষ হ'লে ঘরে হাসির রোল পড়ে গেল। তিব্বতী শিক্ষকও সেই হাসিতে যোগ দিলেন। বলা বাহুল্য, গল্পের তিনি মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে আমার ছোট মেয়ে সবিতা দৌড়ে এসে বল্লে, "বাবা, বাবা, সো-ছা শে, সো-ছা শে"। পিছন ফিরিয়া দেখি, চাকর ট্রেতে করিয়া চা, চিনি, দুধ, কেক, বিস্কুট লইয়া আসিতেছে। বন্ধুবর আমার দিকে চেয়ে বল্লেন "সো-ছা কি বাবা, এ দেখছি মেয়েটা শুদ্ধ contagion catch করেছে। ধন্যি ব্যতিক বাবা তোমার!" আমি হাসিয়া বলিলাম "সো-ছা মানে চা, আর শে মানে পান করুন।" চা পান শেষ হইল। বন্ধুর দিকে তাকাইয়া আমার মেয়ে বলিল "কই, কাকা বাবু, তুমি ত' থুকজে-ছে বল্লে না"। বন্ধু বলিয়া উঠিলেন "রক্ষে কর, মা, তোমার বাবার চোটেই অস্থির, তার উপর আবার তুমি।" আমার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা কল্লেন "ওহে থুকজে-ছে মানে আবার কি, আরও চা, কেক বিস্কুট চাই, কেমন ত' ?" আমি হাসিয়া বলিলাম, "না ভাই, ওর মানে হচ্ছে বহু ধন্যবাদ। যেমন ইংরাজীতে বল না, many thanks।" আমাদের নানা গল্প চলিতে লাগিল। তিব্বতী শিক্ষকের দিকে তাকাইয়া বলিলাম "খোং কো-কে চা নে শেনথি মিন্দুক।" তিনি খুব হাসিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে পিয়ন ডাক লইয়া আসিল। শিক্ষকের নামে একখানা চিঠি ছিল। তাঁহার হাতে দিলাম। দেখিলাম, চিঠি পড়িতে-পড়িতে তাঁহার মুখখানা যেমন কেমন হইয়া গেল। ক্রোধ ও বিরক্তি এক সঙ্গে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে, ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করিলাম; কিন্তু কোনই সদুত্তর পাইলাম না। সেই দিনই তাঁহাকে দার্জ্জিলিং যাইতে হইবে—কেবলমাত্র এই বলিলেন। যে কথা সেই কাজ। সেই দিনই দ্বিপ্রহরে তিনি দার্জ্জিলিং চলিয়া গেলেন। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, তাঁহার নাম ছিল দাওয়া ছেরিং।

(৩)

তার পর বহু বৎসর চলিয়া গিয়াছে। আমার তিব্বতী পড়ার বাতিক থামিয়া গিয়াছে। সেবার পূজার ছুটীতে সপরিবারে দার্জ্জিলিং গিয়াছি। সেদিন রবিবার। সকালে Mallএ বেড়াইয়া, হাট দেখিবার জন্য Mount Pleasant রোড দিয়া বাজারে নামিলাম। সঙ্গে কন্যা সবিতা। এ-দোকান সে-দোকান ঘুরিয়া, এক দোকানে কমলালেবু দেখিয়া, মেয়ের আমার সাধ হইল কিনিবার। দোকানী পরমাসুন্দরী যুবতী। কিন্তু চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে। যুবতীর একটি চোখ কানা। বয়স অনুমান ত্রিশ বৎসর। অর্থাৎ বাঙ্গালীর মেয়ে যে বয়সে দৌহিত্র-মুখ দর্শন করিয়া দিদিমা পদবীতে উন্নীত হয়, এর সেই বয়স। অথচ তাহাকে বলিতেছি যুবতী। পাঠক তথা পাঠিকা আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। যুবতীকে দেখিয়া সে শিকিমী কি তিব্বতী, ঠাহর করিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, যদিও শিকিমী হয়, তবুও তিব্বতী কথা অনেকটা বুঝিতে পারিবে। জিজ্ঞাসা করিলাম "দিছোহি খোং খাছোরে?" একজন বাঙ্গালী বাবুর মুখে তিব্বতী কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল। "দর্জ্জন আনা সময়ে" এই কথা বলিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কুশো, খেরাং খাপা ফোকে লাপ্পা নাঙ্গা? খেরাংথি গেগেনথি ছেনলা খারে শুথি ইয়ো?" আমি শেষ প্রশ্নের উত্তর দিলাম "দাওয়া ছেরিং।" হঠাৎ যেন স্ত্রীলোকটির ভাবান্তর উপস্থিত হইল। কোথায় সে হাসি, কোথায় সে প্রফুল্লতা,—কর্পূরের মত উবিয়া গিয়াছে। এদিকে মেঘে কুয়াশায় একাকার হইয়া গিয়াছে; অল্প-অল্প বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। বাধ্য হইয়া সেই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র দোকানের ভিতর ঢুকিতে হইল। স্ত্রীলোকটি একটি ছোট মাদুরের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া আমাকে বলিল, "কুশো, শুদেন জা" অর্থাৎ মহাশয়, বসুন। তখন সে অত্যন্ত করুণ সুরে, তাহার ততোধিক করুণ জীবনের কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল।

(৪)

"আমার পিতা ছিলেন ফারী জোংএর জোং পোন। বিশ বৎসর বয়সে আমার বিবাহ হয় এক দা-পোনের ছেলের সঙ্গে। বিবাহের অল্প দিন পরেই চীনে আম্বানের সঙ্গে কি এক গোলযোগে আমার শ্বশুর কারারুদ্ধ হ'ন। আমার স্বামী আমাকে লইয়া গিয়াঘর (ভারতবর্ষে) পলাইয়া আসেন। সঙ্গে একটিমাত্র অনুচর। নাম তার লোবসাং। আমার স্বামীর চেয়ে দু' এক বছরের ছোট। তাঁহারই আশ্রয়ে প্রতিপালিত। অল্প বয়সে লোব-সাংএর মা মারা যান। তার বাবা যে কে ছিল, তাহা জানা যায় নাই। জানবার বিশেষ চেষ্টাও বোধ হয় হয় নাই। যা'ক, আমরা দার্জ্জিলিং আসিয়া, ঐ যে নীচে দেখছেন ছাং খাংএর ওপাশে চীনা লেন, ঐখানে ঘর ভাড়া করিলাম। স্বামী আমার যাহা কিছু অর্থ সঙ্গে আনিয়াছিলেন, ধীরে-ধীরে কয়েক বৎসরের মধ্যে নিঃশেষিত হইল। কুশো, বুঝতেই পারেন, বসিয়া থাইলে কুবেরের ভাণ্ডারও নিঃশেষ হয়। ইতিমধ্যে আমার এক কন্যা জন্মিল। রবিবারে জন্মিয়াছিল বলিয়া নাম রাখা হ'ল, নিমা হলামো।" এই বলিয়া স্ত্রীলোকটি একবার চোখের জল মুছিল। তার পর আবার বলিতে আরম্ভ করিল, "অসচ্ছলতার সংসারে নিত্য কলহ, নিত্য অশান্তি। বাবুজি, এখন ভাবি, এ হতভাগিনীর তখন মৃত্যু হইল না কেন? আমি স্বামীকে বলিলাম, লোবসাংকে এখন নিজের পথ দেখিতে বল না কেন? স্বামী বলিলেন, "ছিঃ ছিঃ, অমন কথা মুখে এনো না, কোন ছোথ সুমের (ত্রিরত্নের) দয়ায় যদি আমাদের একমুটো চাম্পা (ছাতু) জোটে, তবে ওরও জুটবে।" সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় বাজার থেকে ফিরে এসে আমায় বল্লেন, "এতদিন পর সাংগিয়ে (বুদ্ধদেব) মুখ তুলে চেয়েছেন। আমাকে যেতে হবে নীচে। এক বাবুকে ফো-কে শেখাতে হবে। কালই ভোরের ট্রেনে যেতে হ'বে। তোমার কোন ভয় নাই, লোবসাং রইল, ও নামেও লোবসাং কাজেও লোবসাং (যাহার হৃদয় নির্ম্মল)"।

(৫)

স্বামী চলিয়া গেলেন। মাসে-মাসে লোবসাংএর নামে মনিঅর্ডারে টাকা আসিতে লাগিল। সে টাকার অধিকাংশ ব্যয় হইতে লাগিল ঐ ছাংখাংএ (মদের দোকানে)। ধীরে-ধীরে আমার চিত্তে কেমন একটা মোহ আসিয়া পড়িল। বাবুজি, এ ঘৃণ্য জীবনের কলঙ্ক-কাহিনী আর বলিতে ইচ্ছা করে না। যা'ক। কিছু দিন পরে একদিন বাহির হইয়া পড়িলাম। কোথায় পড়িয়া রহিল আমার সোণার সংসার, কোথায় পড়িয়া রহিল বালিকা নিমা। কিন্তু আমার ভুল ভাঙ্গিতে বড় বিশেষ দেরী হইল না। দার্জ্জিলিং-এ বাস করা অসম্ভব হইল। গেলাম কা-লোন-পুংএর এক বস্তিতে। একদিন লোবসাং অত্যন্ত মদ খাইয়া আসিয়া আমাকে গালাগালি করিতে লাগিল। আমিও মুখরা। উত্তর দিতে ত্রুটী করিলাম না। শেষে রাগান্বিত হইয়া আমার এই চোখে এক ঘুষি মারিল। জন্মের মত চোখ হারাইলাম। আর বাবুজি, যখন সব হারাইয়াছি, তখন চোখ হারাইয়া আর দুঃখ কি?" হঠাৎ স্ত্রীলোকটির দিকে তাকাইয়া দেখি, চোখের জলে বুক ভাসিয়া গিয়াছে। নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া বলিল "কুশো থুক গোং থাক শুথি ইন (মহাশয়, ক্ষমা করুন)।" তার পর জিজ্ঞাসা করিল "আচ্ছা, আপনার এই মেয়ের নাম কি?" খুকী আমাকে উত্তর দিবার অবসর না দিয়াই বলিল, "সবিতা দেবী"। তখন আমার দিকে চাহিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "এ নামের অর্থ কি, বাবুজি।" আমি বলিলাম "নিমা হলামো"। শুনিবামাত্র আবার স্ত্রীলোকটির চোখ দিয়া দরদর ধারে অশ্রু বাহিয়া পড়িল। খুকীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "মা, মা আমার, তুমি এই কমলা-লেবুগুলি লও।" আমাকে বলিল "বাবুজি, দোহাই আপনার। পতিতার দান গ্রহণ করিতে মা'কে আমার বাধা দেবেন না। আমি আপনার গুরুপত্নী— না, না, ও পুণ্য নাম নেবার অধিকার আমার আর নাই।" "থুকজে-ছে" বলিয়া গ্রহণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

তখন মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। কুয়াশা অন্তর্হিত হইয়াছে। দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষারশ্রেণী রৌদ্রে ঝিকমিক করিতেছে।

অস্কার ওয়াইল্ড্ বিরচিত সালমে

(একাঙ্কের বিয়োগনাটিকা)

(মূল ফরাসী হইতে বঙ্গানুবাদ)

শ্রীসুরেন্দ্র কুমার

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

প্রথম সৈনিক। এই মৃত দেহটাকে এখান থেকে সরিয়ে ফেল্‌তে হবে। টেট্রার্ক স্বহস্ত-নিহতদের দেহ ছাড়া অপর মৃতদেহ দেখতে চান না।

হেরদিআসের অনুচর। সে আমার ভাই ছিল, অথবা ভাইয়ের চেয়েও আপনার ছিল। তাকে আমি গন্ধদ্রব্য-পূর্ণ একটি ছোট বাক্স আর একটি বৈদুর্য্যের আংটি দিয়েছিলাম; সেই আংটিটি সে সর্ব্বদা হাতে পরে থাক্‌ত। সন্ধ্যায় নদীতীরে আক্রোট্‌কুঞ্জের মধ্যে আমরা বেড়াতাম, আর সে তার দেশের কথা আমাকে বল্‌ত। সে বড় নম্র স্বরে কথা কইত। তার স্বর বংশী-বাদকের বংশীধ্বনির মত ছিল। নদীবক্ষে তার আপনার প্রতিবিম্বের প্রতি চেয়ে থাক্‌তে সে বড় ভালবাস্‌ত। এর জন্যে আমি তাকে ভৎর্সনা কর্‌তাম।

দ্বিতীয় সৈনিক। তুমি ঠিক বলেচ, এই লাসটাকে লুকোতে হবে। টেট্রার্ক এটা যেন দেখতে না পান।

প্রথম সৈনিক। টেট্রার্ক এখানে আস্‌বেন না। তিনি চত্বরে কখনও আসেন না, তিনি এই সিদ্ধ পুরুষকে বড় ভয় করেন।

[হেরদ, হেরদিআস ও সভাসদ্‌গণের প্রবেশ।]

হেরদ। সালমে কোথায়? রাজকুমারী কোথায়? আমার আদেশ মত সে ভোজে ফিরে যায় নি কেন? আঃ! ঐ যে সে!

হেরদিআস। তুমি অমন করে ওর দিকে চেও না! তুমি কেবলই ওর দিকে চেয়ে আছ!

হেরদ। চাঁদটা আজ দেখ্‌তে অদ্ভুত রকম। তাই না? কেমন ধারা দেখাচ্চে না? যেন পাগলিনী, যেন কোনও পাগলিনী তার প্রেমাস্পদকে সর্ব্বত্র খুঁজে বেড়াচ্চে। সে ত উলাঙ্গিনী, একেবারে বিবস্ত্রা। মেঘগুলি তার নগ্নতাকে আবৃত করে দেবার চেষ্টা কর্‌চে, কিন্তু সে তা তাদের কর্‌তে দেবে না। সে আকাশে আপনার নগ্নতাকে প্রকাশ কর্‌চে। আসবোন্মত্তা রমণীর মত সে টল্‌তে টল্‌লে মেঘের মধ্য দিয়ে চলেচে।...আমি নিশ্চয় জানি যে, সে তার প্রেমাস্পদদের অনুসন্ধান কর্‌চে। পানোন্মত্তা নারীর মত সে টল্‌চে নাকি? সে পাগলিনীর মত নয় কি?

হেরদিআস। না; চাঁদ চাঁদেরই মত, তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। চল আমরা ভিতরে যাই।...তোমার আর এখানে থাক্‌বার দরকার নেই।

হেরদ। আমি এইখানেই থাক্‌ব। মানাস্সেঃ, এইখানে গাল্‌চে পাত। মশাল জ্বাল, হাতীর দাঁতের ও য়াস্পিনের টেবিলগুলো বার করে নিয়ে এস। এখানকার বাতাস বড় স্নিগ্ধ। আমি আমার অভ্যাগতদের সঙ্গে বসে আরও মদ খাব। সিজারের দূতগণের প্রতি আমাদের যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন কর্‌তে হবে।

হেরদিআস। তুমি তাঁদের জন্য এখানে থাক্‌বে না।

হেরদ। হাঁ, বাতাসটা বড় স্নিগ্ধ। এস, হেরদিআস, আমাদের নিমন্ত্রিতেরা আমাদের জন্য অপেক্ষা কর্‌চেন। আঃ! আমার পা পিছ্‌লে গেল! রক্তে আমার পা পিছ্‌লে গেল! এটা একটা অশুভ লক্ষণ! এটা একটা বড়ই অশুভ লক্ষণ! এ রক্ত এখানে কেন?...আর এ লাসটা, এটাই বা এখানে কেন? তোমরা কি মনে কর যে আমি মিশরের রাজার মত অভ্যাগতদের ভোজ না দিয়ে মৃতদেহ প্রদর্শন করব? এটা কার দেহ? আমি এটাকে দেখতে ইচ্ছা করি না।

প্রথম সৈনিক। মহারাজ, ইনি আমাদের নায়ক

ছিলেন। ইনি সেই সীরীয় যুবক, যাঁকে আপনি তিন দিন মাত্র পূর্ব্বে সেনানায়কের পদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

হেরদ। আমি ত তাকে বধ কর্‌বার কোনও আদেশই দিই নি।

দ্বিতীয় সৈনিক। উনি আত্মহত্যা করেচেন, মহারাজ!

হেরদ। কি জন্য? আমি ত তাকে সেনানায়ক করেছিলাম।

দ্বিতীয় সৈনিক। তা আমরা জানি না, মহারাজ! তবে তিনি আত্মহত্যা করেচেন।

হেরদ। এটা বড় অদ্ভুত রকমের বলে আমার মনে হচ্চে। আমি ভাব্‌তাম যে কেবল রোমান্ দার্শনিকেরাই আত্মহত্যা করে থাকে। তাই নয় কি, টিজেল্লিনুস? রোমের দার্শনিকেরা আত্মহত্যা করেন না?

টিজেল্লিনুস। কতগুলি লোক আছে যারা আত্মহত্যা করে থাকে, মহারাজ! তারা ষ্টোইক। ষ্টোইকেরা বড় অসভ্য, বড় হাস্যজনক। আমি নিজে তাদের একেবারে পূর্ণমাত্রায় উপহাসাস্পদ বলে মনে করি।

হেরদ। আমিও। আত্মহত্যা করা বড় উপহাসাস্পদ।

টিজেল্লিনুস। রোমে সকলেই তাদের উপহাস করে। সম্রাট্ তাদের উপর একটি ব্যঙ্গকবিতা লিখেচেন। সেটি সকলেই সকল জায়গায় আবৃত্তি করে।

হেরদ। বটে? তাদের উপর তিনি একটি ব্যঙ্গ-কবিতা লিখেচেন? সিজারের অদ্ভুত ক্ষমতা। তিনি সবই কর্‌তে পারেন।...এই সীরীয় যুবকের আত্মহত্যা বড় বিসদৃশ ব্যাপার। তার আত্মহত্যার জন্য আমি দুঃখিত;—আমি অত্যন্ত দুঃখিত; কারণ সে দেখ্‌তে সুন্দর ছিল—বড়ই সুন্দর ছিল। তার বড় বড় অলস দুটি চোখ ছিল। আমার মনে আছে যে,সে অলসদৃষ্টিতে সালমের দিকে চেয়ে থাকৃত। বাস্তবিক আমার মনে হত যে সে যেন বড় বেশী রকম তার দিকে চেয়ে থাকৃত।

হেরদিআস। আরও অনেকে আছে যারা তার দিকে বড় বেশী রকম চেয়ে থাকে।

হেরদ। তার পিতা একজন রাজা ছিল। আমি তাকে রাজ্যচ্যুত করে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আর তার মা, যে রাজরাণী ছিল, তাকে তুমি তোমার দাসী করে রেখেছিলে, হেরদিআস! তাইত সে আজ নিমন্ত্রিতের মত এখানে এসেছিল, আর সেইজন্যই ত আমি তাকে আমার সেনানায়কের পদপ্রদান করেছিলাম। তার মৃত্যুর জন্য আমি দুঃখিত। ওহে! এই মৃতদেহটা তোমরা এখানে ফেলে রেখেচ কেন? আমি এটাকে দেখ্‌তে ইচ্ছা করি না—এটা এখান থেকে নিয়ে যাও!

[সৈনিকগণ মৃতদেহটাকে সরাইল]

এখানে বড় ঠাণ্ডা। জোর বাতাস বইচে। বইচে না কি?

হেরদিআস। না; বাতাস ত নেই।

হেরদ। আমি তোমাকে বল্‌চি যে জোরে বাতাস বইচে।...পক্ষপুটের আঘাতের মত কি যেন একটা বাতাসে শুন্‌তে পাচ্চি, বিশাল পক্ষপুটের আঘাতের মত। তুমি কি তা শুন্‌তে পাচ্চ না?

হেরদিআস। আমি কিছুই শুন্‌তে পাচ্চি না।

হেরদ। আমিও আর সে শব্দটা শুন্‌তে পাচ্চি না। কিন্তু আমি তা শুনেছিলাম। এটা বাতাস বহে যাওয়ার শব্দ, নিশ্চয়ই। এখন ত আর নেই। না, ঐ যে আবার শুন্‌তে পাচ্চি। তুমি কি তা শুন্‌তে পাচ্চ না? ঠিক যেন পক্ষপুটের আঘাতের শব্দ।

হেরদিআস। আমি তোমাকে বল্‌চি যে এ সব কিছুই নয়। তুমি অসুস্থ। এস আমরা ভিতরে যাই।

হেরদ। আমি অসুস্থ নই। তোমার কন্যাই অসুস্থ। তার মুখ দেখ্‌লে তাকে অসুস্থ বলেই বোধ হয়। তাকে এত বিবর্ণ আমি আর কখনও দেখিনি।

হেরদিআস। আমি ত তোমাকে ওর দিকে চাইতে বারণ করেচি।

হেরদ। আমাকে মদ ঢেলে দাও [মদ্য আনীত হইল] সালমে, এস, আমার সঙ্গে একটু মদ খাও। এ মদ বড় চমৎকার। সিজার আমাকে এই মদ পাঠিয়েচেন। তোমার ছোট ছোট লাল ঠোঁট দুটি এতে একবার ডুবিয়ে দাও, তারপর আমি এই পাত্রটা নিঃশেষ করে ফেল্‌ব।

সালমে। আমি পিপাসিত নই, টেট্রার্ক!

হেরদ। [হেরদিআসের প্রতি] শুন্‌লে, কেমন উত্তর দিলে তোমার মেয়ে?

হেরদিআস। ও ঠিকই করেচে। তুমি ওর দিকে সর্ব্বদা চাইচ কেন?

হেরদ। আমার জন্য সুপক্ক ফল নিয়ে এস [ফল আনীত

হইল]। সালমে, এস আমার সঙ্গে ফল খাও। ফলের উপর তোমার ছোট ছোট দাঁতের দাগ আমি দেখ্‌তে ভালবাসি। এই ফলটির একটুখানি কাম্‌ড়ে নাও, আর তারপর বাকীটা আমি খাই।

সালমে। আমি ক্ষুধিত নই, টেট্রার্ক!

হেরদ। [হেরদিআসের প্রতি] দেখ্‌চ কি রকম শিক্ষা দিয়েচ তুমি তোমার মেয়েকে?

হেরদিআস। আমার মেয়ে আর আমি রাজবংশের। আর তুমি? তোমার বাবা ত ছিলেন উট্‌চালক! আবার তিনি ডাকাতিও কর্‌তেন।

হেরদ। তুমি মিথ্যা কথা বল্‌চ।

হেরদিআস। তুমি বেশ জান যে আমি যা বল্‌চি তা সত্য।

হেরদ। সালমে, এস, আমার পাশে বস। আমি তোমাকে তোমার মায়ের সিংহাসন দেব।

সালমে। আমি ক্লান্ত হইনি, টেট্রার্ক!

হেরদিআস। [হেরদের প্রতি] তুমি বুঝ্‌তে পার্‌চ, ও তোমাকে কি ভাবে।

হেরদ। আমার কাছে নিয়ে এস—ঐ যে আমি কি ভালবাসি?—আঃ! ঐ যে ভুলে গেলুম গা। হাঁ! হাঁ! মনে হয়েচে।

ইওকানানের স্বর। চেয়ে দেখ, সময় এসেচে। প্রভু ঈশ্বর বল্‌চেন "যা আমি বলেছিলাম তা ঘটেচে। চেয়ে দেখ, আজ সেইদিন যে দিনের কথা আমি বলেছিলাম।"

হেরদিআস। চুপ কর্‌তে বল ওকে। আমি ওর স্বর শুন্‌তে চাই না। এই লোকটা ক্রমাগত আমার বিরুদ্ধে অপমান-জনক কথা বল্‌চে।

হেরদ। উনি ত তোমার বিরুদ্ধে কিছু বলেন নি। তারপর উনি একজন বড়-দরের সিদ্ধ পুরুষ।

হেরদিআস। আমি সিদ্ধ পুরুষদের কথা বিশ্বাস করি না। মানুষ কি কখনও বল্‌তে পারে যে কি হবে? কোনও মানুষ তা জানে না। আরও, বরাবর ও আমার অপমান কর্‌চে। কিন্তু আমার মনে হয় যে তুমি ওকে ভয় কর।... আমি বেশ জানি যে তুমি ওকে ভয় কর।

হেরদ। আমি ওঁকে ভয় করি না। আমি কোনও মানুষকে ভয় করি না।

হেরদিআস। আমি বল্‌চি তুমি ওকে ভয় কর। যদি তুমি ওকে ভয় না কর্‌বে, তবে কেন তুমি ইহুদীদের হাতে ওকে সমর্পণ কর্‌চ না? তারা ত' ওর জন্যে আজ ছমাস ধরে গোলমাল কর্‌চে।

জনৈক ইহুদী। বাস্তবিক, মহারাজ, ওকে আমাদের হাতে সমর্পণ কর্‌লে ভাল হয়।

হেরদ। যথেষ্ট হয়েচে এ বিষয় সম্বন্ধে। আমি ত আগেই এর উত্তর দিয়েচি। আমি ওঁকে তোমাদের হাতে সমর্পণ কর্‌ব না। উনি একজন সাধু পুরুষ, উনি ভগবদ্দর্শী।

জনৈক ইহুদী। তা হতে পারে না। সিদ্ধ পুরুষ এলিআসের পর আর কেউ ঈশ্বরকে দেখেন নি। ভগবদ্দর্শীদের মধ্যে তিনিই শেষ ব্যক্তি। আজকালকার দিনে ঈশ্বর দেখা দেন না। তিনি অব্যক্ত থাকেন। সেই জন্যেই ত' দেশে এত অমঙ্গল এসে পড়েচে।

অপর একজন ইহুদী। আর নিঃসন্দেহে এ কথা বল্‌তে পারা যায় যে, কেউ জানে না যে এলিআস যথার্থই ঈশ্বরকে দেখেছিলেন কি না। হয় ত' যা তিনি দেখেছিলেন তা কেবল ঈশ্বরের ছায়া মাত্র।

তৃতীয় ইহুদী। ঈশ্বর কোনও কালেই অব্যক্ত নন। সকল সময়ে সকল বস্তুতে তিনি আপনাকে ব্যক্ত করেন। মঙ্গলামঙ্গলের মধ্যে তিনি সমান ভাবেই ব্যক্ত থাকেন।

চতুর্থ ইহুদী। ও কথা বল্‌বেন না। এটা বড় বিপত্তি-জনক মতবাদ। এ মতটা আলেক্‌জান্দ্রিআর দার্শনিক-দলের। তারা আবার সেখানে গ্রীক্ দর্শন শিক্ষা দেয়। গ্রীকেরা বিধর্ম্মী। তাদের সুন্নৎ পর্য্যন্তও হয় না।

পঞ্চম ইহুদী। ঈশ্বর যে কেমন করে কি করেন, তা কেউ বল্‌তে পারে না। তাঁর বিধান বড়ই রহস্যময়। হয় ত' যে সকল ব্যাপারকে আমরা অমঙ্গলজনক বলি, সেগুলি মঙ্গলময়; আর আমরা যে গুলিকে শুভ বলে মনে করি সেগুলি অশুভ। কোনও বিষয়েরই সম্যক্ জ্ঞান আমাদের নাই। সব বিষয়েই আমাদের মাথা নিচু করে গ্রহণ কর্‌তে হবে, কারণ ঈশ্বর বড় শক্তিমান্। তিনি বলবান্‌কে দুর্ব্বলের সঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ভেঙ্গে ফেলেন, কারণ তিনি কোনও মানবের খাতির করেন না।

প্রথম ইহুদী। আপনি ঠিক বলেচেন। ঈশ্বর ভয়ানক। তিনি বলবান্ ও দুর্ব্বলকে হামামদিস্তের শস্যের মত নিষ্পেষিত

করেন। কিন্তু এ ব্যক্তি কখনও ঈশ্বরকে দেখে নি। সিদ্ধপুরুষ এলিআসের পর আর কোনও মানব ঈশ্বরকে দেখে নি।

হেরদিআস। ওদের চুপ করাও। ওরা আমাকে বড় বিরক্ত করচে।

হেরদ। কিন্তু আমি শুনেছি যে ইওকানান স্বয়ং হচ্ছেন তোমাদের সিদ্ধ পুরুষ এলিআস।

ইহুদী। তা হতে পারে না; সিদ্ধ পুরুষ এলিআসের সময় থেকে আজ তিনশ বৎসর অতীত হয়ে গেচে।

হেরদ। কেউ কেউ বলে যে ইনিই হচ্চেন সিদ্ধ-পুরুষ এলিআস।

জনৈক নাজারৎবাসী। আমি নিশ্চয়ই জানি যে ইনিই সিদ্ধ পুরুষ এলিআস।

ইহুদী। না, এ কখনই সিদ্ধ পুরুষ এলিআস নয়।

ইওকানানের স্বর। আজ তা হলে সেই দিন এসেচে, ভগবানের সেই দিন, আর আমি পর্ব্বতের উপর তাঁর পদ-শব্দ শুনতে পাচ্চি, যিনি জগতের ত্রাণকর্ত্তা হবেন।

হেরদ। এ কথার মানে কি? ঐ যে বল্লেন জগতের ত্রাণকর্ত্তা।

টিজেল্লিনুস্। এ উপাধি ত সিজার গ্রহণ ক'রে থাকেন।

হেরদ। কিন্তু সিজার ত ইহুদায় আস্‌চেন না। আমি কাল মাত্র রোম থেকে চিটি পেয়েচি। তাতে এ বিষয়ের কিছু নেই। আর তুমি টিজেল্লিনুস্, তুমি ত' শীতকালে রোমে ছিলে, তুমি কি এ বিষয়ের কিছুই শোন নি?

টিজেল্লিনুস্। মহারাজ, আমি এ বিষয়ের কিছুই শুনি নি। আমি উপাধির কথা বল্‌ছিলাম। এটা সিজারের একটা উপাধি।

হেরদ। কিন্তু সিজার ত আর আস্‌তে পারেন না! তিনি ত বাতে পঙ্গু হ'য়ে পড়েচেন! লোকে বলে যে তাঁর পা দুটি হাতীর পায়ের মত হয়েচে। আর, তার পর, রাজ-নৈতিক কারণও আছে। রোম ছাড়্‌লেই রোমকে হারাতে হয়। তিনি আস্‌বেন না। যাই হক, সিজার আমাদের প্রভু। তিনি ইচ্ছা করলেই আস্‌বেন। তবুও আমার ত মনে হয় না যে তিনি আস্‌বেন।

প্রথম নাজারৎবাসী। সিদ্ধপুরুষ সিজার সম্বন্ধে এ সকল কথা বলেন নি, মহারাজ!

হেরদ। সিজার সম্বন্ধে নয়?

প্রথম নাজারৎবাসী। না, মহারাজ!

হেরদ। তবে কার বিষয় তিনি বল্লেন?

প্রথম নাজারৎবাসী। তিনি মেস্‌সিআর আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করচেন।

জনৈক ইহুদী। মেস্‌সিআ ত' আসেন নি!

প্রথম নাজারৎবাসী। এসেচেন বৈ কি! সর্ব্বত্রই তিনি অলৌকিক কার্য্যসমূহ সম্পাদন করচেন।

হেরদিআস। হো! হো! অলৌকিক কার্য্যসমূহ! আমি অলৌকিক ক্রিয়ায় বিশ্বাস করি না। আমি অনেক দেখেচি। [অনুচরের প্রতি] আমার পাখা!

প্রথম নাজারৎবাসী। ইনি যথার্থই অলৌকিক ক্রিয়া-সমূহ সম্পাদন করেন। এই ধরুন না কেন, গালিলী নামে একটি সুবিখ্যাত ক্ষুদ্র নগরের একটা বিয়ে-বাড়ীতে তিনি জলকে মদে পরিণত করেছিলেন। কতকগুলি লোক যারা সেখানে উপস্থিত ছিল তারাই এ কথা আমাকে বলেচে। তারপর কাপর্‌নাউমের ফটকের পাশে দুট কুটে বসে ছিল, তিনি তাদের কেবল ছুঁয়ে আরাম করেচেন।

দ্বিতীয় নাজারৎবাসী। না, কাপর্‌নাউমে তিনি অন্ধ-দের আরাম করেচেন।

প্রথম নাজারৎবাসী। না, তারা কুটে। তিনি অন্ধ-দেরও আরাম করেচেন, আর তাঁকে পর্ব্বতের উপর দেব-দূতগণের সঙ্গে কথা কইতে দেখা গেচে।

জনৈক সদ্দ কী। দেব-দূতের অস্তিত্ব নাই।

জনৈক ফারিসী। দেব-দূতের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু এই লোকটা যে তাঁদের সঙ্গে কথা কয়েচে, তা আমি বিশ্বাস করি না।

প্রথম নাজারৎবাসী। অনেকেই তাঁকে দেব-দূতের সঙ্গে কথা কইতে শুনেচে।

জনৈক সদ্দ্‌কী। দেব-দূতেদের সঙ্গে নয়।

হেরদিআস। এ লোকগুলো কি বিরক্তই আমাকে করচে! কি উপহাসাস্পদ এরা! [অনুচরের প্রতি] কৈ? আমার পাখা? [অনুচর তাঁহার হাতে পাখা দিল] তোমার মুখের ভাব স্বপ্নাবিষ্টের মত, অত স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে থেক না। অসুস্থ যারা, রুগ্ন যারা, তারাই কেবল স্বপ্ন রচনা করে। [তিনি অনুচরকে পাখার দ্বারা আঘাত করিলেন।]

দ্বিতীয় নাজারৎবাসী। তার পর জারিউসের কন্যা সম্বন্ধে আর একটি অলৌকিক ক্রিয়াও হয়েছে।

প্রথম নাজারৎবাসী। হাঁ, নিশ্চয়ই! কেউ তা মিথ্যা বল্‌তে পারবে না।

হেরদিআস। এই লোকগুলো সব পাগল। এরা অনেকক্ষণ ধরে চাঁদের পানে চেয়ে ছিল। এদের চুপ করতে আদেশ কর।

হেরদ। জারিউসের কন্যা সম্বন্ধে কি অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়েচে?

প্রথম নাজারৎবাসী। জারিউসের কন্যা মরে গিয়েছিল। তিনি তাকে সঞ্জীবিত করেচেন।

হেরদ। তিনি মৃতকে সঞ্জীবিত করেন?

প্রথম নাজারৎবাসী। হাঁ, মহারাজ! তিনি মৃতকে সঞ্জীবিত করেন।

হেরদ। আমি ইচ্ছা করি না যে তিনি তা করেন। আমি তাঁকে এ রকম কাজ থেকে বিরত হতে আদেশ করচি। আমি কোনও ব্যক্তিকে মৃতকে সঞ্জীবিত করতে অনুমতি প্রদান করি না। এই ব্যক্তিকে আপনারা খুঁজে বার করে বলুন যে আমি তাঁকে মৃতসঞ্জীবন কাজ থেকে বিরত হতে আদেশ করচি। তিনি এখন কোথায়?

দ্বিতীয় নাজারৎবাসী। তিনি সর্ব্বত্রই আছেন, কিন্তু তাঁকে খুঁজে বার করা বড় শক্ত।

প্রথম নাজারৎবাসী। সকলে বল্‌চে যে তিনি এখন সামারিআয় আছেন।

জনৈক ইহুদী। এতেই বেশ বুঝা যাচ্চে যে যদি তিনি সামারিআয় থাকেন ত তিনি মেস্‌সিআ নন। সামারিআবাসীদের কাছে মেস্‌সিআ যাবেন না—তারা অভিশপ্ত। তারা মন্দিরে কোনও নৈবেদ্য আনয়ন করে না।

দ্বিতীয় নাজারৎবাসী। তিনি দিন-কয়েক হল সামরিআ ছেড়ে গেচেন। আমার বোধ হয় তিনি এখন জেরুসালেমের নিকট কোথাও আছেন।

প্রথম নাজারৎবাসী। না, এখন তিনি সেখানে নাই। আমি সবে মাত্র জেরুসালেম থেকে আস্‌চি। দু মাস হল জেরুসালেমবাসীরা তাঁর কোনও সংবাদ পায় নি।

হেরদ। তাতে কিছু যায় আসে না। তারা তাঁকে খুঁজে বার করুক, আর আমার নাম করে তাঁকে বলুক যে মৃতকে সঞ্জীবিত করবার স্বাধীনতা আমি তাঁকে দেব না। জলকে মদে পরিণত করা, অন্ধ আর কুষ্টেকে আরাম করা... তা তিনি সে সব ইচ্ছা করলে করতে পারেন। সে সকলের বিরুদ্ধে আমি কিছু বল্‌চি না। বাস্তবিক, কুষ্টেকে আরাম করা আমি ভাল কাজ বলেই মনে করি। কিন্তু মৃত-সঞ্জীবনে আমার অনুমতি নাই। মৃত ব্যক্তি ফিরে এলে ত ভয়ানক ব্যাপার হবে।

ইওকানানের স্বর। হায়! উচ্ছৃঙ্খলা ব্যাভিচারিণি! হায়! স্বর্ণাভনয়না, সুবর্ণ-রঞ্জিত আঁখি-পত্র সুশোভিতা বাবিলন-কন্যা! প্রভু পরমেশ্বর বল্‌চেন "তার বিরুদ্ধে বৃহৎ জনসংঘ এসে দাঁড়াক, আর লোকগুলো পাথর ছুড়ে তাকে মারুক।..."

হেরদিআস। ওকে চুপ করতে আদেশ কর।

ইওকানানের স্বর। "যুদ্ধের সেনানীগণ তাদের অসি দিয়ে তাকে বিদ্ধ করুক, তাদের চর্ম্মের নিচেয় তাকে নিষ্পেষিত করে ফেলুক।"

হেরদিআস। না, এটা বড় ঘৃণ্য।

ইওকানানের স্বর। "এইরূপে আমি পৃথিবী থেকে পাপ মুছে ফেল্‌ব, আর রমণীগণ তার অনাচারবৃত্তির অনুসরণ করবে না।"

হেরদিআস। তুমি শুনচ ও আমার বিরুদ্ধে কি বল্‌চে? তুমি তোমার স্ত্রীর উপর গালাগালি করতে ওকে দিচ্চ?

হেরদ। উনি তোমার নাম করেন নি ত।

হেরদিআস। তাতে কি হয়েচে? তুমি বেশ জান যে ও আমাকে নির্দ্দেশ করে গালাগালি করচে। আর আমি তোমার পত্নী, তা নই কি?

হেরদ। সত্য কথা, আমার প্রিয়তমা ও গরিয়সী হেরদিআস, তুমি আমার পত্নী, আর তার পূর্ব্বে তুমি আমার ভাইয়ের পত্নী ছিলে।

হেরদিআস। তুমিই ত আমাকে তাঁর বাহু-বন্ধন ছিন্ন করে নিয়েচ।

হেরদ। সত্য কথা, আমি তার চেয়ে বলশালী ছিলাম।...কিন্তু সে কথায় আর কাজ নেই। আমি সে বিষয় সম্বন্ধে আর কিছু বলতে ইচ্ছা করি না। যে সকল ভয়ানক কথা এই সিদ্ধ পুরুষ বল্‌লেন, এই তার কারণ।

হয় ত এ থেকে একটা দুর্ঘটনা ঘট্‌বে। এ বিষয় নিয়ে আর আলোচনা করে কাজ নেই। গরিয়সী হেরদিআস, আমরা আমাদের অতিথিদের যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা কর্‌চি না। প্রিয়তমে, তুমি আমার পাত্র পূর্ণ কর। কাঁচের আর রূপর পান-পাত্রগুলি মদ্যে পূর্ণ কর। আমি সিজারের উদ্দেশ্যে পান কর্‌ব। এখানে রোমান্‌রা আছেন, আমরা সিজারের উদ্দেশ্যে পান কর্‌ব।

সকলে। সিজার! সিজার!

হেরদ। তুমি তোমার কন্যাকে দেখ্‌চ না? সে কত বিবর্ণ?

হেরদিআস। সে বিবর্ণ হোক্ বা না হোক্, তাতে তোমার কি?

হেরদ। তাকে আমি কখনও এত বিবর্ণ দেখিনি।

হেরদিআস। তুমি ওর পানে চেও না।

ইওকানানের স্বর। "সে দিন সূর্য্য কৃষ্ণকেশনির্ম্মিত শোকাম্বরের ন্যায় হবে, চাঁদ রক্তের মত হবে ও আকাশের তারাগুলো বৃক্ষচ্যুত পক্ক ডুম্বুরের মত পৃথিবীর উপর পড়্‌বে, আর পৃথিবীর রাজারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠ্‌বে।"

হেরদিআস। বাঃ! বাঃ! যে দিনের কথা ও বল্‌চে সে দিনটা ত' আমার দেখা চাই, যে দিন চাঁদ রক্তের মত হবে, আর তারাগুলো পাকা ডুমুরের মত ধরার উপর পড়্‌বে। এই সিদ্ধ পুরুষটা মাতালের মত কথা কইচে... কিন্তু ওর স্বর আমার সহ্য হয় না। আমি ওর স্বরকে ঘৃণা করি। ওকে চুপ কর্‌তে আদেশ কর!

হেরদ। তা আমি কর্‌ব না। উনি কি বল্‌চেন আমি তা বুঝ্‌তে পাচ্চি না, কিন্তু হ'তে পারে যে এ একটা ভাবী শুভাশুভের পূর্ব্ব সূচনা।

হেরদিআস। পূর্ব্ব সূচনায় আমি বিশ্বাস করি না। ও মাতালের মত কথা বল্‌চে।

হেরদ। হতে পারে উনি ভগবদ্‌মদ্য পান করে প্রমত্ত হয়েচেন।

হেরদিআস। সেটা আবার কি রকম মদ, এই ভগবদ্ মদ্যের কথা যা তুমি বল্লে? কোন দ্রাক্ষাক্ষেত্র থেকে সে মদ উদ্ধৃত হয়? কোন মদ্য নিষ্পেষণীতে তা পাওয়া যায়?

হেরদ। [এখন হইতে সালমের দিকে বরাবর চাহিয়া রহিলেন।] টিজেল্লিনূস, যখন তুমি সম্প্রতি রোমে ছিলে, তখন কি সম্রাট্ তোমাকে এ বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলেছিলেন...?

টিজেল্লিনূস। কি বিষয় সম্বন্ধে, মহারাজ?

হেরদ। কি বিষয় সম্বন্ধে? ওঃ! আমি তোমাকে কি জিজ্ঞাসা করেচি না? আমার জিজ্ঞাস্য আমি ভুলে গিয়েচি।

হেরদিআস। তুমি আবার আমার মেয়ের দিকে চেয়ে আছ। তুমি ওর দিকে অমন করে চেও না! আমি তোমাকে এ কথা আগেই বলেচি।

হেরদ। তোমার আর কোনও কথা নেই।

হেরদিআস। আমি আবার বল্‌চি।

হেরদ। আর এই মন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, যার জন্যে এরা এত চেঁচামেচি কর্‌চে—সে সম্বন্ধে কি কিছু করা যাবে? ওরা ত বল্‌চে যে গর্ভগৃহের পর্দাখানা অদৃশ্য হয়েচে, তাই বল্‌চে না?

হেরদিআস। তুমি নিজেই তা চুরি করেচ। তুমি আবোল তাবোল বক্‌চ। আমি এখানে থাক্‌ব না। এস আমরা ভিতরে যাই।

হেরদ। সালমে, তুমি আমার সাম্‌নে নাচ!

হেরদিআস। আমি ওকে নাচ্‌তে দেব না।

সালমে। আমার নাচ্‌বার ইচ্ছা নাই, টেট্রার্ক!

হেরদ। সালমে, হেরদিআসের কন্যা, আমার সাম্‌নে নাচ!

হেরদিআস। ছেড়ে দাও ওকে!

হেরদ। সালমে, আমি তোমাকে নৃত্য কর্‌তে আদেশ কর্‌চি।

সালমে। আমি নৃত্য কর্‌ব না, টেট্রার্ক!

হেরদিআস। দেখ ও কেমন তোমার আদেশ পালন করে।

হেরদ। ও নাচুক বা না নাচুক তাতে আমার কি? তাতে আমার কিছুই আসে যায় না। আজ রাত্রিতে আমি বড় সুখী, আমি আজ অপরিমেয় সুখ অনুভব কর্‌চি, আর কখনও আমি এত সুখ অনুভব করিনি।

প্রথম সৈনিক। টেট্রার্কের মুখখানা বিষণ্ণ নয় কি?

দ্বিতীয় সৈনিক। হাঁ, ওঁর মুখখানা বিষণ্ণ। [ক্রমশঃ]

বিধবা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

মহা-ষষ্ঠীর দিন, দ্বিপ্রহরে গৃহ-সংলগ্ন উদ্যানে তিনটি বালিকা ক্রীড়া করিতেছিল। অষ্টম-বর্ষীয়া গৌরী গৃহ-স্বামীর একমাত্র সন্তান। অপর দুইটি বালিকা লক্ষ্মী ও সাবিত্রী দুই ভগিনী,—প্রতিবেশী-কন্যা। লক্ষ্মী গৌরীর সমবয়সী, সাবিত্রী মাত্র ছয় বৎসরের।

আমরা ঠাকুর দেখ্‌তে যাবো।

কোথায় সাবিত্রী ?

রায় বাবুদের বাড়ী।

চল্ না ভাই লক্ষ্মী, আমিও যাই।

এখনই বুঝি।

তবে কখন ?

বাড়ী গিয়ে, চুল বেঁধে, গয়না কাপড় পোরে তবে ত'।

তবে যাই, আমিও মার কাছে গিয়ে সাজি গে।

বালিকারা খেলা-ধূলা ছাড়িয়া, যে যার ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

অবসর সময়ে মাতা চরকায় সূতা কাটিতেছিলেন। গৌরী আসিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল।

মা, আমি লক্ষ্মীদের সঙ্গে ঠাকুর দেখ্‌তে যাবো।

আচ্ছা যেও।

ভাল কোরে সাজিয়ে দাও মা আমায়, গয়না কাপড় পরিয়ে।

মাতা চরকা ঠেলিয়া রাখিয়া, কন্যাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন।

মা, ভাল কোরে সাজিয়ে দেবে ? ওরা কত সাজবে।

তোমায় যে সাজ্‌তে নেই মা—বলিয়া মাতা সজল নেত্রে কন্যাকে চুম্বন করিলেন।

কেন মা ?

মাতা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না,—কন্যাকে জোরে জড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। গৌরী মাতার ক্রোড়ের মধ্যে আড়ষ্ট হইয়া রহিল।

পিতা অধ্যাপক ব্রাহ্মণ, চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া প্রিয় ছাত্রের নিকট শক্তি-পূজার ব্যাখ্যা করিতেছিলেন :—

মহামায়ার কল্পিত মূর্ত্তি পূজা করিয়া, কেবল ভক্তিতে পূজা শেষ করিলে, পূজা সম্পূর্ণ হইবে না। চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিতে হইলে মহামায়ার পূজা ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ দ্বারা সম্পূর্ণ করিতে হইবে। কেবল ভাবযজ্ঞে ও ভক্তিযজ্ঞে মহামায়ার উপাসনা সম্পূর্ণ হইতে পারে না। এই সম্পূর্ণ উপাসনার অভাবে শক্তি-উপাসক বঙ্গবাসী আজ শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে।

গৌরী সম্মুখে আসিয়া বলিল—বাবা, আমায় সাজ্‌তে নেই ?

না মা !

কেন বাবা ?

পিতা খানিকক্ষণ কন্যার দিকে চাহিয়া থাকিয়া, উত্তর দিলেন—তুমি যে বিধবা হয়েচ মা।

গৌরী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ব্রাহ্মণ ছাত্রের দিকে ফিরিয়া বলিতে লাগিলেন—আমরা শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠের সময় বলিয়া থাকি :—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তি-রূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

মার শক্তিতে অনুপ্রাণিত আমরা অত্যন্ত শক্তিশালী। কিন্তু আমরা এই শক্তির অবমাননা করিতেছি। এই শক্তির দান প্রত্যাখ্যান করিতেছি। মোহ-নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছি। আমরা মনে করিতেছি যে, আমরা মা মা বলিয়া ডাকিব, আর কেবল ঘুমাইব,—আর মহাশক্তি আমাদের জন্য সব করিয়া দিবেন। কিন্তু মা আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে শক্তি-স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন। সেই শক্তির ব্যবহার না করিয়া, আমরা মার অবমাননা করিতেছি।

গৌরী ক্রন্দনের সুরে বলিয়া উঠিল—বাবা, আমার বিধবা হোতে ভাল লাগে না।

ব্রাহ্মণ আর আত্ম-সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কন্যাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া—মা, নারায়ণ যে তোমাকে বিধবা করেচেন—বলিয়া বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ভাসিয়া গেল।

অষ্টম বর্ষ পূর্ণ না হইতেই কন্যাকে সৎ-পাত্রে অর্পণ করিয়াছিলেন। অদৃষ্টের ফলে বিবাহের তিন মাসের মধ্যেই কন্যা বিধবা হইয়াছে।

পিতার বাহু-বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া, গৌরী ধীরে-ধীরে অন্দরের দিকে চলিয়া গেল।

ছাত্র সজল নেত্রে জিজ্ঞাসা করিল—ধর্ম্মের কি এত কঠোর বিধি ?

অধ্যাপক ধীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন—ধর্ম্মের নয়, সমাজের।

সমাজ-বিধির কি পরিবর্ত্তন নেই ?

আছে বৈ কি, কিন্তু করে কে ?

কেন, আপনারাই ত' সমাজের শিরোমণি !

আমাদের সে শক্তি কই ?

তবে চিরকাল অন্যায় বিধি মেনে চল্‌তে হবে ?

উপায় কি ? সমাজ ত' ছেড়ে যেতে পারবো না !

এ সমাজ ত্যাগ করাই ভাল।

সে ইচ্ছে, সে সাহস ত' নেই,—এই রকম করেই কাটাতে হবে।

একখানা পরিষ্কার কাপড় পরিয়া আসিয়া গৌরী লক্ষ্মীদের ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইল। লক্ষ্মীর মাতা তখন লক্ষ্মীর কুন্তলে স্বর্ণ-বাঁধাই চিরুণি পরাইয়া দিতেছিলেন।

লক্ষ্মী বলিল—এই বুঝি তোমার ঠাকুর দেখা সাজ-গোজ হো'ল ?

গৌরী উত্তর করিল—আমায় কি সাজতে আছে, আমি যে বিধবা।

আরতি-বন্দনা

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী

উজ্জ্বল জাহ্নবী-বক্ষে আপনারে দিলাম বিছায়ে।
অস্তকাম রক্ত সূর্য্য অসীম আকাশে—মেঘে-মেঘে
রচি স্বর্ণ ইন্দ্রজাল, এ সলিলে দিলেন ছড়ায়ে ,—
গরিমা রোমাঞ্চি' জাগে গঙ্গাজলে রূপ-স্পর্শ লেগে' !
আহা ! শিব-সুন্দরের এ যে স্নেহোদ্বেল আশীর্ব্বাদ !
অথবা এ অরূপের অপরূপ তরল আহ্লাদ !
কিম্বা স্বপ্নময়ী মায়া হেম তনু রেখেছে এলায়ে
সৌন্দর্য্যের শয্যা'পরে ! বর্ণময়ী ত্রিদিব-সুন্দরী
দলে-দলে শান্তি-জলে অবগাহি' ধন্য হতে চাহে ;
—হিরণ্ময়ী বালাগুলি করে কেলি স্বর্গ পরিহরি'
জুড়ায়ে ত্রিতাপ-দাহে ভেসে রহে এ পুণ্য প্রবাহে !
সম্ভোগ শান্তিরে লয়ে আনন্দের স্তব-গান গাহে !

জ্বলিল দিগন্ত চিতা দিবসের পশ্চিম আকাশে,
অস্তমিল দিনমণি বাষ্পাকুল সায়াহ্ন নিঃশ্বাসে।
অভিমানী সন্ধ্যা-রাণী ভালে পরি' সন্ধ্যাতারা টিপ,
দ্রুত কাঁপি' হেম অঙ্গ স্তরে স্তরে কম কৃষ্ণাম্বরে
নামিল নিঃশব্দ পদে।
একে একে অগণ্য প্রদীপ
জ্বলে' উঠে' ভেসে যায় হার-সম লহরে-লহরে ;
প্রেম-ফুল ফোটে যথা এ আঁধার জীবনের গাছে।
আশা দিয়া আশ্বাসিয়া, এ তিমির-প্রবাহে উজ্জ্বলি'
মিলাল এ আলোগুলি ধীরে-ধীরে মুক্তি-নীর মাঝে !
সহসা রোমাঞ্চ তুলি' সমীরণে, অম্বর আন্দোলি'
উঠিল অযুত কণ্ঠে "হর হর ব্যোম্ ব্যোম্" রোল ;
অগণ্য মন্দিরমধ্যে বাজে ঘণ্টা, ঝাঁঝর-ঝনঝনা
দদ্রুম দামামা বাদ্য। উদ্বেলিত ভক্তির হিল্লোলে,—
শিব-শম্ভু-বিশ্বেশ্বর-সদ্‌গুরুর আরতি-বন্দনা !
অন্ধকারে ডুবে' গেল এ সংসার-স্বপ্ন প্রহেলিকা ;
ভাতিল অতল ত্রাহি চিদম্বরে একান্তের শিখা !

ইঙ্গিত

শ্রীবিশ্বকর্ম্মা

কার্ব্বন (Carbon)

রসায়ন-শাস্ত্রে কার্ব্বন (Carbon) একটা মস্ত বড় জিনিস। রসায়ন-শাস্ত্রের আলোচনার গোড়ার অবস্থায় রাসায়নিকেরা মনে করিতেন, উদ্ভিদ এবং প্রাণি-দেহ বিশ্লেষণ করিয়া যে সকল যৌগিক পদার্থ পাওয়া যায়, সেগুলা এক শ্রেণীর জিনিস; আর মাটী এবং খনির ভিতর হইতে যে সব যৌগিক পদার্থ পাওয়া যায়, সেগুলা আর এক শ্রেণীর, এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস। গোড়ার অবস্থায় রাসায়নিকেরা প্রথম শ্রেণীর জিনিসগুলির নাম দিলেন, অর্গ্যানিক বস্তু (organic substances); কারণ, সেগুলা (organised bodies বা) সুশৃঙ্খলাবদ্ধ বস্তু হইতে পাওয়া যাইত। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর বস্তুগুলার তাঁহারা নাম দিলেন inorganic substances; অর্থাৎ যাহা organic substance নয়, তাহাই inorganic substance। বস্তুর এই দুই শ্রেণী-বিভাগ হইতে রসায়ন-শাস্ত্রকেও তাঁহারা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন; এক ভাগের তাঁহারা নাম দিলেন organic chemistry; অপর ভাগের নাম দেওয়া হইল inorganic chemistry। রসায়ন-শাস্ত্রে এই দুইটী নাম এখনও চলিত আছে বটে, কিন্তু তাহাদের অর্থ উল্টাইয়া গিয়াছে। Organic Chemistry বলিতে এখন কেবল কার্ব্বন-ঘটিত যৌগিক পদার্থগুলির রাসায়নিক ব্যবহার বুঝায়। সুতরাং বুঝুন, কার্ব্বন রসায়ন-শাস্ত্রের কতখানি অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

রসায়ন-শাস্ত্রে কার্ব্বন বলিতে যাহা বুঝায়,—সেই জিনিস বুঝাইতে পারে, বাঙ্গলায় এমন কোন প্রতিশব্দ নাই। বাঙ্গালায় কার্ব্বনের "অঙ্গারক" নামটি অত্যন্ত কষ্টকল্পিত। চল্‌তি কথায় কার্ব্বন বলিতে বাঙ্গলায় কয়লা বলা হয় বটে, কিন্তু রাসায়নিক পরিভাষার হিসাবে, কয়লা কার্ব্বন-ঘটিত একটী মাত্র যৌগিক পদার্থ। রসায়ন-শাস্ত্রে কয়লার ন্যায় কার্ব্বন-ঘটিত শত শত যৌগিক পদার্থ আছে।

প্রায় সমুদায় জীবিত প্রাণীর দেহের একটা প্রধান অংশ কার্ব্বন। এখানে জীবিত প্রাণীর পর্য্যায়ে উদ্ভিদকেও ধরা হইতেছে; কারণ, তাহাদেরও জীবন ও মৃত্যু আছে। কাষ্ঠ, মাংস, চিনি, ময়দা প্রভৃতির প্রধান রাসায়নিক উপাদান—কার্ব্বন। এক কথায়, যে সকল পদার্থ উত্তপ্ত করিলে কালো হইয়া যায়, তাহাতেই কার্ব্বন আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। কারণ, কার্ব্বন-ঘটিত যৌগিক পদার্থগুলির সাধারণ বর্ণ কালো। কালো হইবার পরও যদি পদার্থ-গুলিকে খোলা হাওয়ায় আরও পোড়ানো হয়, তাহা হইলে কার্ব্বনের অংশ সমস্তই পুড়িয়া যায়; এবং কার্ব্বন অম্লজানের সঙ্গে মিলিত হইয়া যৌগিক গ্যাসে পরিণত হয়। কার্ব্বন সম্পূর্ণ রূপে পুড়িয়া যাইবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা ধাতব পদার্থ (mineral matters)। কাঠ পুড়িয়া গেলে যে ছাই অবশিষ্ট থাকে, তাহা এই জিনিস।

কেবল যে পোড়াইলেই কালো রঙের কার্ব্বন উৎপন্ন হয়, তাহা নহে। মাটীর নীচে গভীর খনির গর্ভে পাথুরিয়া কয়লা আছে। এই কয়লার রং কালো। ইহাও কার্ব্বন,—অবশ্য যৌগিক অবস্থায়। পাথুরিয়া কয়লা মাটীর অনেক নীচে থাকে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, প্রাচীন কালে বড় বড় জঙ্গল কোন না কোন প্রাকৃতিক ঘটনা বশতঃ হঠাৎ বসিয়া গিয়াছিল। সেই জঙ্গলের উপর স্তরে-স্তরে মাটী জমিতে থাকে। পাথুরিয়া কয়লার খনির উপর এইরূপ অনেক মাটীর স্তর থাকে। সেই মাটীর স্তরের বিলক্ষণ ভার আছে। জঙ্গলের গাছ পালা পচিয়া গিয়া, ভারী মাটীর স্তরগুলির প্রবল চাপে রূপান্তরিত হইয়া, মিশ্‌মিশে কালো রঙের পাথুরিয়া কয়লায় পরিণত হইয়াছে। কাঠ পোড়াইলে যেমন কালো রঙের কাঠ কয়লা (char coal) পাওয়া যায়, পচিয়া এবং মাটীর প্রবল চাপে, গাছ-পালা সেইরূপ কালো হইয়া, পাথুরিয়া কয়লায় পরিণত হয়। বস্তুতঃ, মূলে দুই-ই একই জিনিস; অর্থাৎ উভয়েরই প্রধান

উপাদান কার্ব্বন। কেবল প্রক্রিয়া ভেদে দুইটী জিনিসের রূপ-গুণের কিছু প্রভেদ হয়।

যতটা চাপে উদ্ভিজ্জ পদার্থ পাথুরিয়া কয়লায় পরিণত হয়, তদপেক্ষা আরও অনেক বেশী চাপ পাইলে পাথুরিয়া কয়লা আবার হীরকে পরিণত হয়। নিখুঁত খাঁটি হীরা বিশুদ্ধ কার্ব্বন ছাড়া আর কিছুই নয়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, হীরা দগ্ধ করিলে উহা সম্পূর্ণ রূপে পুড়িয়া যায়; অর্থাৎ তাহার কার্ব্বন অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হইয়া গ্যাস হইয়া যায়, কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। হীরকের ন্যায় গ্রাফাইট বা প্লাম্বেগোও (graphite or plumbago) বিশুদ্ধ কার্ব্বন।

কার্ব্বন হাজার-হাজার জিনিসের প্রধান উপাদান হইলেও, পাথুরিয়া কয়লাই তাহার প্রধানতম রূপ। এবং পাথুরিয়া কয়লা ও তাহার আনুষঙ্গিক পদার্থগুলি লইয়াই আজ আমাদের প্রধান কারবার।

পাথুরিয়া কয়লা কি-কি কাজে লাগে, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। ইহা প্রধানতঃ তাপ উৎপাদন কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। পাথুরিয়া কয়লা পোড়াইয়া বয়লারে জল গরম করিয়া বাষ্প তৈয়ার করিয়া লইয়া, সেই বাষ্পের শক্তিতে কলকারখানা, রেলের গাড়ী, ষ্টীমার, ইলেকৃট্রিক কারখানার 'ডাইনামো' (বিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্র) প্রভৃতি চালানো হয়। ইহা ছাড়া পাথুরিয়া কয়লায় আর একটা বড় কাজ হয়। সেটা গ্যাস উৎপাদন। এই গ্যাসকে কোল গ্যাস (coal gas) বলে। কলিকাতার রাস্তায়-রাস্তায় এবং অনেক বাড়ীতে, কলকারখানায়, সাহেবদের বাড়ীর রান্না ঘরে উনুনে কোল গ্যাস জ্বলে। পাথুরিয়া কয়লা হইতে গ্যাস তৈয়ার করার কাজটা প্রধানতঃ রসায়ন-শাস্ত্রের অধিকারভুক্ত। কারণ, গ্যাস তৈয়ার করিবার সময় যে প্রণালী অবলম্বন করা হয়, তাহার ফলে অনেক রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয়। ক্রমে ক্রমে সেই সকল পদার্থের কথা আসিয়া পড়িবে।

খনিতে যেমন পাথুরিয়া কয়লা পাওয়া যায়, সেইরূপ কোল অয়েল (coal oil) বা পেট্রোলিয়মও (petroleum) পাওয়া যায়। ইহা কার্ব্বনের এক প্রকার যৌগিক পদার্থ। যে প্রণালীতে জঙ্গলের গাছ-পালা রূপান্তরিত হইয়া পাথুরিয়া কয়লার সৃষ্টি হয়, খুব সম্ভব সেই প্রণালীতে অথবা তাহার অনুরূপ কোন প্রণালীতে পেট্রোলিয়মও উৎপন্ন হয়। আমরা আলো জ্বালিবার জন্য যে কেরোসিন ব্যবহার করি, তাহা এই পেট্রোলিয়ম হইতে প্রস্তুত করা হয়।

পাথুরিয়া কয়লায় অগ্নি সংযোগ করিলে, তাহা জ্বলিতে থাকে। কিছু শিখা ও কিছু ধূম উৎপাদন করিয়া কয়লা পুড়িয়া গিয়া ছাই মাত্র অবশিষ্ট থাকে। গ্যাসের কারখানায় পাথুরিয়া কয়লা উত্তপ্ত করিয়া গ্যাস বাহির করিয়া লওয়া হয়। আবৃত পাত্রের ভিতর পাথুরিয়া কয়লা রাখিয়া, তাহার নীচে তাপ প্রয়োগ করিলে, উত্তপ্ত কয়লা আয়তনে বাড়িতে থাকে, এবং তাহা হইতে গ্যাস বাহির হইতে থাকে। এই গ্যাস অবিশুদ্ধ। ইহাকে বিশুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। গ্যাস যেমন পাথুরিয়া কয়লা হইতে বাহির হইয়া আসে, অমনি তাহাকে কয়েকটি নলের ভিতর দিয়া চালাইয়া দেওয়া হয়। এই নলগুলি সর্ব্বদা শীতল অবস্থায় রাখিবার জন্য, ইহার উপর শীতল জলের ধারা প্রবাহিত রাখা হয়। এই নলের ভিতর দিয়া যাইবার সময় গ্যাস কতকটা শীতল হয়। গ্যাসের যে অংশ সর্ব্বাগ্রে শীতল হয়, তাহা ঐ নলের ভিতর ঘনীভূত অবস্থায় জমিতে থাকে। সেই জিনিসটি আল্‌কাতরা। গ্যাসের যে অংশ শীতল হইয়া জমিয়া যাইতে পারে না, তাহা কয়েকটি চৌবাচ্ছার জলের ভিতর দিয়া লইয়া যাওয়া হয়। গ্যাসের মধ্যে এ্যামোনিয়া নামক একটী পদার্থ থাকে। সেই পদার্থটি জলের সঙ্গে মিশিয়া যায়; অর্থাৎ চৌবাচ্ছার জল এ্যামোনিয়াকে খাইয়া ফেলে (absorbs)। এই উপায়ে পাথুরিয়া কয়লার অবিশুদ্ধ গ্যাস হইতে আল্‌কাতরা ও এ্যামোনিয়া পৃথক হইয়া পড়িলে। অবশিষ্ট গ্যাসটিকে আরও কয়েকটি পদার্থের ভিতর দিয়া লইয়া গিয়া, তাহা হইতে অপর কয়েকটি উপকরণ বাদ দেওয়া হয়, সর্ব্বশেষে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই জ্বালাইবার উপযুক্ত কোল গ্যাস (coal gas)।

বাল্যকালে আমরা খেলাচ্ছলে কতকটা এই উপায়ে কোল গ্যাস প্রস্তুত করিয়া বাড়ীতে জ্বালাইয়াছি। আমাদের বাড়ীতে রন্ধনের জন্য যে কয়লা আসিত, তাহা হইতে আমরা বাছিয়া বাছিয়া ছোট ছোট কাঁচা কয়লা অর্থাৎ পাথুরিয়া কয়লা সংগ্রহ করিতাম। একটী মাটীর হাঁড়ীর অর্দ্ধাংশ এই কয়লায় পূর্ণ করিয়া, আমরা একটী উনুনে আগুন দিয়া উনুনের উপর হাঁড়ীটি বসাইয়া দিতাম। হাঁড়ীর মুখে

একটী সরা চাপা দিয়া মাটী দিয়া বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া দিতাম। সরার কাছ বরাবর হাঁড়ীর গায়ে একটী ছিদ্র করিয়া, সেই ছিদ্রে তামাক খাইবার একটী গুড়-গুড়ির নল লাগাইয়া দিয়া, মাটী দিয়া বেশ করিয়া আঁটিয়া দিতাম। উনুন হইতে দুই তিন হাত তফাতে একটী বিড়ের উপর একটী কলসী বসাইয়া তাহাতে আধ-কলসী জল রাখিতাম। কলসীর মুখে একটী খুরি চাপা দিয়া মাটী দিয়া আঁটিয়া দিতাম। কলসীর কানার কাছে একটী ছিদ্র করিয়া, গুড়-গুড়ির নলটি সেই ছিদ্র-পথে কলসীর ভিতরে জল ভেদ করিয়া তলা পর্য্যন্ত চালাইয়া দিতাম। কলসীর কানার কাছে আর একদিকে আর একটী ছিদ্র করিয়া অপর একটী গুড়-গুড়ির নল লাগাইয়া তৃতীয় একটী কলসীর ভিতর তলা পর্য্যন্ত চালাইয়া দিতাম। এই তৃতীয় কলসীর ভিতর গুঁড়া চুণ থাকিত। তাহার কানার কাছে অপর একটী ছিদ্র করিয়া তাহাতে আর একটী সরু-মুখ ছোট নল লাগাইয়া দিতাম। কিছুক্ষণ পরে একটী দেশলাই জ্বালিয়া সর্ব্ব-শেষ নলটির সরু মুখের কাছে ধরিলেই দপ্ করিয়া জ্বলিতে আরম্ভ হইত। বাড়ীর লোকেরা বিশেষতঃ মহিলারা অবশ্য প্রথম প্রথম খুবই বিরক্ত হইতেন। কিন্তু যখন গ্যাস জ্বলিতে আরম্ভ হইত, তখন আমাদের উৎসাহ উল্লাস আনন্দে তাঁহারাও যোগ না দিয়া পারিতেন না। এবং বহুক্ষণ ধরিয়া নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া, আমাদের সেই বাল্য-কীর্ত্তি দেখিতেন।

কার্ব্বনের সঙ্গে হাইড্রোজেনের বড় বেশী ঘনিষ্টতা। দুইটি মূল পদার্থের মধ্যে এত বেশী ঘনিষ্টতা অন্য কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় না। বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রিত হইয়া এই দুইটি মূল পদার্থ এত বেশী ভিন্ন-ভিন্ন রকমের জিনিস উৎপাদন করে যে, রাসায়নিকেরা সেই শ্রেণীর পদার্থগুলিকে হাইড্রো-কার্ব্বন (hydro-carbons) এই সাধারণ নামে অভিহিত করিয়াছেন। পাথুরিয়া কয়লা হইতে জ্বালাইবার গ্যাস (illuminating gas) তৈয়ার করিবার সময় এই শ্রেণীর অনেকগুলি পদার্থ স্বতঃই (by products হিসাবে) উৎপন্ন হইয়া পড়ে। খনি হইতে সদ্য উদ্ধৃত পেট্রোলিয়ম বিশোধিত করিবার সময়েও ঠিক এই ভাবে অনেকগুলি হাইড্রো-কার্ব্বন পাওয়া যায়।

আল্‌কাতরায় ভিন্ন-ভিন্ন মাত্রায় তাপ প্রয়োগ করিয়া Benzene Series নামক এক শ্রেণীর হাইড্রো-কার্ব্বন বাহির করিয়া লওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে Benzene প্রথম। ইহাতে কার্ব্বন ৬ অংশ, হাইড্রোজেন ৬ অংশ $C_6 B_6$ থাকে। তার পরবর্ত্তী পদার্থগুলির নাম ও মিশ্রণের অনুপাত এইরূপ—toluene $C_7 H_8$, xylene $C_8 H_{10}$, naphthalene $C_{10} H_8$, anthracene $C_{14} H_{10}$ ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে ন্যাফথালিন জিনিসটির সঙ্গে বোধ হয় আপনাদের খুবই পরিচয় আছে।

আপনারা জানেন, ফুলের স্বাভাবিক সুবাসকে পরাজিত করিয়া, রাসায়নিকের ল্যাবরেটরীতে অতি তীব্র সুগন্ধি দ্রব্য কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হইতেছে। আপনারা রুমালে আজ-কাল যে এসেন্স ও আতর মাখেন, তাহার অধিকাংশই প্রধানতঃ এই কৃত্রিম সুগন্ধি দ্রব্য। রসায়ন-বৈজ্ঞানিকের ভাষায় এই শ্রেণীর সুগন্ধি দ্রব্যের নাম Aromatic Compounds। পূর্ব্বোক্ত Benzene Seriesএর hydro-carbonগুলি এই সমুদায় কৃত্রিম সুগন্ধি দ্রব্য উৎপাদনের মূল উপাদান।

Benzeneএর সহিত nitric acid মিশ্রিত করিলে, nitro-benzene নামক একটী তরল পদার্থ পাওয়া যায়। ইহার বর্ণ পীত। ইহা কৃত্রিম তিতো বাদামের তেল নামে বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রীত হয়।

Nitro-benzeneএর সঙ্গে এমন একটী দ্রব পদার্থ মিশাইতে হয়, যাহার ভিতর হইতে হাইড্রোজেন বাহির হইয়া আসিয়া nitro-benzeneএর সঙ্গে মিলিত হয়, এবং অক্সিজেন বিশ্লিষ্ট করে। এই যোগাযোগ ক্রিয়ার ফলে aniline নামক যে পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাই ম্যাজেণ্টা রঙের জননী। এই anilineএর সহিত mercuric chloride অর্থাৎ corrosive sublimate, অথবা arsenic acid মিশাইলে magenta পাওয়া যায়। Magenta হইতে নানা প্রকার রঙ প্রস্তুত হয়।

Aniline আরও নানা বস্তু হইতে প্রস্তুত হইতে পারে। তন্মধ্যে নীলবড়ি বা indigo অন্যতম। এই নীলবড়ি বঙ্গদেশজাত একপ্রকার উদ্ভিজ্জ রঙ। বৈজ্ঞানিকেরা রসায়নাগারে কৃত্রিম উপায়ে nitro-benzene হইতে নীলবড়ি প্রস্তুত করিতেছেন। এই synthetic indigoর প্রস্তুত-প্রণালী যেমন সহজ, মূল্যও তদ্রূপ সস্তা।

আলকাতরা হইতে অন্য উপায়েও aniline প্রস্তুত করা যাইতে পারে। আলকাতরা চুয়াইলে ন্যাপথা নামক একপ্রকার তরল তৈলবৎ পদার্থ পাওয়া যায়। সেই ন্যাপথার সহিত hydrochloric acid মিশাইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া নাড়িলে, উভয় দ্রব্য উত্তম রূপে মিলিয়া যায়, এবং তাহাদের মধ্যে একটা রাসায়নিক যোগ-বিয়োগ হয়। এই দ্রব্যটিকে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে রাখিয়া দিলে, উপরে একটা পরিষ্কার স্বচ্ছ পদার্থ ভাসিতে থাকে। সাবধানে এই পদার্থটি তুলিয়া লইয়া, অন্য পাত্রে রাখিয়া, অগ্নি-তাপে ঘন করিয়া লইলে, একটা উগ্র গন্ধবিশিষ্ট ধূম বাহির হয়। তৎপরে দ্রব্যটিকে তাপ হইতে সরাইয়া লইয়া কিয়ৎক্ষণ স্থির ভাবে রাখিয়া দিতে হয়। তখন উপরে আবার একটা পরিষ্কার পদার্থ ভাসিতে থাকিবে। এই জিনিসটির সহিত কিছু বেশী পরিমাণে চূণের জল মিশাইয়া চুয়াইলে এনিলিন বাহির হইয়া আসে। কিন্তু ইহা বিশুদ্ধ এনিলিন নয়। ইহাকে পর্য্যায়ক্রমে কয়েকবার hydrochloric acid ও চূণের জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া চুয়াইয়া লইলে ক্রমে এনিলিন বিশুদ্ধ হইয়া আসে।

এনিলিন তৈলের ন্যায় তরল পদার্থ; আস্বাদ তীব্র, গন্ধ সুরার ন্যায়। এনিলিন উদ্বায়ী (volatile); অনাবৃত পাত্রে দীর্ঘকাল রাখিলে কর্পূরের ন্যায় উবিয়া যায়। সুরা ও ঈথারের সঙ্গে এনিলিন বেশ সহজে মিশে, কিন্তু জলের সঙ্গে মিশে না।

ভূগর্ভ হইতে পেট্রোলিয়ম নামক যে পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা চুয়াইয়াও নানা জিনিস পাওয়া যায়। এই পেট্রোলিয়মের কিয়দংশ উদ্বায়ী (volatile)। বিনা তাপেই অর্থাৎ বায়ুর সাধারণ তাপেই ইহা বাহির হইয়া আসে। এই পদার্থটির নাম marsh gas। এই জিনিসটি অতীব দাহ্য পদার্থ। পেট্রোলিয়মকে ভিন্ন-ভিন্ন ডিগ্রির তাপে চুয়াইলে প্রথমে gasoline, তার পর naphtha, তৎপরে benzine এবং তাহার পর কেরোসিন বাহির হইয়া আসে। আরও তাপ প্রয়োগ করিলে paraffin নামক একপ্রকার পদার্থ পাওয়া যায়।

ব্রহ্মদেশের খনি হইতে যে পেট্রোলিয়ম উত্তোলিত হয়, তাহা হইতে কেরোসিন বাহির করিয়া লইবার পর যে paraffis অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইতে বাতি প্রস্তুত হয়। Paraffin দুই প্রকার, কঠিন ও কোমল বা তরল। কঠিন প্যারাফিন হইতেই বাতি প্রস্তুত করা হয়। এই কঠিন প্যারাফিন আর একটা কাজে লাগানো যায়।

প্যারাফিনের বাতি কিরূপ কঠিন, তাহা সকলেই হয় ত দেখিয়া থাকিবেন; কারণ, আজকাল এই বাতি বাজারে খুব চলিতেছে। ইহাকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করা যায়। এই কঠিন প্যারাফিনের সঙ্গে সামান্য জলপাইয়ের তেল মিশাইয়া, একটু নরম করিয়া লইতে হইবে। এক সের প্যারাফিনে অর্দ্ধ ছটাক, কিম্বা প্রয়োজন বুঝিয়া কিছু কম অথবা বেশী জলপাইয়ের তেল মিশাইলেই চলিবে। একটা পাত্রে প্যারাফিন অগ্নি-তাপে গলাইয়া, তাহাতে তৈল দিয়া নাড়িলেই বেশ মিশিয়া যাইবে। মিশ্র পদার্থটি আগুনের উপর হইতে নামাইয়া, তরল থাকিতে-থাকিতেই তাহার সহিত গোলাপী, হেনা, কিম্বা অপর কোন একটী বা দুইটী, অথবা তিনটি আতর ৬০ ফোঁটা হইতে ১২০ ফোঁটা পর্য্যন্ত তাড়াতাড়ি মিশাইয়া লইবেন। পাত্রটি ঠাণ্ডা হইবার সঙ্গে-সঙ্গে মিশ্র জিনিসটিও জমিয়া শক্ত হইয়া আসিবে। একেবারে সম্পূর্ণ কঠিন অবস্থায় আসিয়া পড়িবার পূর্ব্বে, ইহাকে সাবানের ন্যায় ছাঁচে ঢালিয়া, মার্কা মারিয়া, ট্যাবলেটের আকারে, অথবা কৌটায় পুরিয়া ব্যবহার করা যায়। এই জিনিসটি ব্যবহার করিবার বিশেষ সুবিধা। একটী ট্যাবলেট পকেটে রাখিয়া দিলে, বহু কাল পর্য্যন্ত ইহার গন্ধ উপভোগ করা যাইবে। এসেন্সের অপেক্ষা ইহা অধিক সুবিধাজনক। কৌটায় পুরিয়া ঢাকনি বন্ধ করিয়া রাখিলে, এবং প্রয়োজনের সময় ঢাকনি খুলিয়া ব্যবহার করিলে, ইহার গন্ধ আরও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে। প্যারাফিনের রঙ্গীন বাতিও অনেকে দেখিয়া থাকিবেন। প্যারাফিনের এসেন্সের ট্যাবলেটও রঞ্জিত করিয়া লইতে পারা যায়। রং দিতে হইলে, আতর মিশাইবার পূর্ব্বে তরল অবস্থায় রং উত্তম রূপে মিশাইয়া লইবেন। রং না করিতে চাহেন, ট্যাবলেটগুলি প্যারাফিনের স্বাভাবিক বর্ণানুসারে তুষার-শুভ্র থাকিবে। রঞ্জিত বা সাদা দুইই দেখিতে পরম সুন্দর হইবে।

শুভ লক্ষণ।

পূর্ব্ববঙ্গের যুবকেরা শিল্প-সাধনায় মাতিয়া উঠিয়াছেন। ইহা শুভ লক্ষণ নিশ্চয়ই। দেশলাইয়ের দিকেই আপাততঃ

অনেকের ঝোঁক পড়িয়াছে দেখিতেছি। দেশালাইয়ের কারখানা গৃহশিল্পের হিসাবে মন্দ নয়, লাভজনকও বটে—এবং এখনও যখন অনেক টাকার দেশালাই জাপান-সুইডেন হইতে আমদানী হইতেছে, তখন আরও অনেক দেশালাইয়ের কারখানা স্থাপিত হইবার প্রয়োজনও রহিয়াছে স্বীকার করি; কিন্তু দেশালাই ছাড়া আরও অনেক শিল্প রহিয়াছে, যাহা গৃহশিল্পের হিসাবে চলিতে পারে, লাভও হইতে পারে, এবং চালানও উচিত; কেন না বিদেশীরা এখনও আমাদের সেই সকল শিল্পদ্রব্যের অভাব মিটাইতেছেন। ক্রমে-ক্রমে সেই সকল বিষয়েই আমাদের হাত দিতে হইবে।

ত্রিপুরা, সাহাতলী হইতে সূর্য্য-শীর্ষ ভারতমাতা মার্কা স্বদেশী দেশালাইয়ের নমুনা পাইয়াছি। দেশালাই বেশ ব্যবহারোপযোগী হইয়াছে।

ফরিদপুর, মাদারীপুর হইতে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষ এম-এ, বি-এল মহাশয় মাদারিপুর ম্যাচ ফ্যাক্টরীর হাতী মার্কা দেশালাইয়ের নমুনা লইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। এ দেশালাইও বেশ ব্যবহারোপযোগী হইয়াছে। বিশেষতঃ এই দেশালাইটী impregnated হইয়াছে; সুতরাং দেশালাই-শিল্পে এই কারখানার দেশালাই আরও এক ধাপ উপরে উঠিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, লেবেল তেমন সুদৃশ্য হইতেছে না। সাহাতলীর দেশালায়ের লেবেল চলনসই গোছের; কিন্তু মাদারিপুরের দেশালাইয়ের লেবেল একেবারে খারাপ। ইহা ভাল কথা নয়। শিল্পের সহিত সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। সৌন্দর্য্যকে বাদ দিয়া শিল্প হইতেই পারে না। কেবল ব্যবহারোপযোগী হওয়া শিল্পের একমাত্র লক্ষ্য নয়, এবং লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। শিল্পের সৌন্দর্য্য অগ্রাহ্যের বিষয় নয়। বস্তুতঃ সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি শিল্পীর মুখ্য সাধনা; ব্যবহার্য্যতা শিল্পের গৌণ উদ্দেশ্য। সৌন্দর্য্যই শিল্পের প্রধান বিজ্ঞাপন; খরিদদারদের পক্ষে প্রধান আকর্ষণ। এ পর্য্যন্ত যতগুলি দেশালায়ের নমুনা দেখিলাম, তাহার একটারও লেবেল যত্নসহকারে প্রস্তুত নয়। অনেকের বাক্সও দেখিতে বিশ্রী। উপরের আবরণ ও টানা উভয়ের মধ্যে এত ফাঁক যে, সব কাটি পড়িয়া যায়। কোন-কোন দেশালাইয়ের বাক্স বাঁকা, দেখিতে বিশ্রী। কোন কোনটার টানা বাক্স অপেক্ষা এত বড় যে, দেশালাইয়ের কাটি বাহির করিবার জন্য টানা খুলিতে গেলে, দেশালাই ভাঙ্গিয়া যায়। এই সকল দোষ নিশ্চয়ই পরিহার করিতে হইবে।

মনোরঞ্জন বাবু ওকালতির মায়া কাটাইয়া শিল্প সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া বড় সুখী হইয়াছি। তাঁহার উৎসাহ খুব দেখিলাম। তিনি কেবল দেশালাই প্রস্তুত করিয়াই নিরস্ত হন নাই। আমাকে দুই প্রকার অয়েল ক্লথ, ওয়াটারপ্রুফ ছাতার কাপড় ও অনেক প্রকার সূতার উপর পাকা রঙের নমুনাও দেখাইলেন, এবং আমার মতামতও লইলেন। হ্যাটার্সলের পেটেণ্ট ডোমেষ্টিক লুম কয়েকটি বসাইয়াছেন বলিলেন। বাজার হইতে সূতা কিনিয়া পাকা রং করিয়া ঐ তাঁতে কাপড় বোনা হইবে। প্রার্থনা করি, মনোরঞ্জন বাবুর শুভ সাধনা সফলতামণ্ডিত হউক।

অল-ইণ্ডিয়া এক্‌জিবিসন।

বন্ধুজনের পীড়াপীড়িতে (নিজেরও কৌতূহল কম ছিল না) বড়দিনের দিনে ভবানীপুরে শিল্প-প্রদর্শনী দেখিতে গিয়াছিলাম। ১৯০৬-৭ সালে ঐ ভবানীপুরে কংগ্রেসের সঙ্গে যে অল-ইণ্ডিয়া একজিবিসন দেখিয়া আসিয়াছিলাম, তাহার তুলনায় বর্ত্তমান প্রদর্শনী কিছুই নয় বলিয়া মনে হইল। ষোল বৎসর পূর্ব্বের শিল্প প্রদর্শনীতে যে সকল শিল্প-দ্রব্যের সমাবেশ দেখিয়াছিলাম,—ষোল বৎসরে তাহার পরিণতি কি এই! কিন্তু প্রকৃত অবস্থা ত তাহা নহে; ভারতীয় শিল্পের, আশানুরূপ না হইলেও, যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, ভারতের শিল্পীরা এই অনুষ্ঠানের সহিত সাগ্রহে সহানুভূতি প্রকাশ করেন নাই—অনেকেই প্রদর্শনীতে যোগ দান করেন নাই।

প্রদর্শনী-স্থলে যে সকল জিনিস উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হইল, তাহাদের মধ্যে কয়েকটির নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার চেষ্টা করিতেছি।

ঘটক কোম্পানীর দেশালাইয়ের কলের পরিচয় একবার দিয়াছি। প্রদর্শনীতে তাঁহাদের দেশালাইয়ের কল, চাউল ছাঁটা কল ও অপর কয়েকটি কল দেখিলাম। ইঁহারা হাতে চালানো ও ইঞ্জিনে চালানো ধান ভানা কল, ময়দার কল, দেশলায়ের কল, তেলের কল, আখ-মাড়া কল, কৃষি-যন্ত্র, জল তুলিবার কল বা পাম্প, ও নানা প্রকার কল প্রস্তুত করিয়া থাকেন। গোয়ালিয়র ও দিল্লীর

মাটীর জিনিস। জিনিসগুলি মন্দ নয়। কয়েক প্রকার লিখিবার কালি। চাতরা কটেজের তাঁতের কাপড়। ইঁহারা প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে তাঁত বসাইয়া টার্কিস্ তোয়ালে, বিছানার চাদর প্রভৃতি বুনিতেছেন। কতকগুলি কেশ-তৈল, সাবান ও সুগন্ধি দ্রব্য। ওরিয়েণ্টাল মেসিনারী সাপ্লাইং এজেন্সীর কয়েকটি যন্ত্র। বেঙ্গল ক্যানিং এণ্ড কণ্ডিমেণ্ট ওয়ার্কস্ লিমিটেডের সংরক্ষিত ফল, চাটনী, মোরব্বা প্রভৃতি। চিকন চারু কার্য্যালয়ের চন্দন কাঠের কৌটা ও পাখা, মালা ও অন্যান্য দ্রব্য। কয়েকখানি বইয়ের দোকান। বেঙ্গল স্মল ইণ্ডাষ্ট্রিজ কোম্পানীর দেশলাইয়ের কল। এই কল অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে কিছু বেশী মূলধন লাগে বটে, কিন্তু উৎপন্ন মালের পরিমাণও তেমনি খুব বেশী। কলগুলি হাতেও চালানো যায়, পায়েও চলে। কুমিল্লার ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ নন্দীর দেশালায়ের কলও দেখিলাম। ওরিয়েণ্ট ফায়ার ওয়ার্কস্ কোম্পানীর অতি অদ্ভুত রকমের সব বাজী। সেরূপ আশ্চর্য্য রকমের বাজী বড় দেখা যায় না। ইঁহাদের বাজী দুই রকম; (১) দিনের বেলার, (২) রাত্রির বেলার। রাত্রির বাজী নানা রকম আলোর খেলা, যেমন ইলেক্ট্রিক তুবড়ী প্রভৃতি। আর দিনের বেলার বাজীতে একটু আওয়াজের সঙ্গে আকাশে হাতী, ঘোড়া, উট, গণ্ডার, সাপ, ব্যাঙ প্রভৃতি জীব-জন্তুর সৃষ্টি। বনবনিয়ার কোম্পানীও প্রদর্শনীতে বাজীর ষ্টল খুলিয়াছেন। পি, সেট কোম্পানীর বিস্কুটগুলি চমৎকার হইয়াছে। বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কসের ঔষধ, ইণ্ডিয়ান ড্রাগ্স্ লিমিটেড ও ডাক্তার বোসের ল্যাবরেটরী লিমিটেডের ঔষধ, বটকৃষ্ণ পাল কোম্পানীর ঔষধ, প্রভৃতিও দেখা গেল।

প্রদর্শনীর কর্ত্তারা এবার কয়েক রকম নূতন আমোদ-প্রমোদের, ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহারই পরিচয় দিলাম। গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, এতদিনের চেষ্টায় যে প্রদর্শনী হইয়াছিল, গত ২রা জানুয়ারী অপরাহ্ণকালে যখন প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে উদ্যান-সম্মেলন হইতেছিল, তখন অগ্নিতে এই প্রদর্শনী ভস্মীভূত হইয়াছে। প্রায় দশ লক্ষ টাকার দ্রব্য নিমিষে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। এমন ব্যাপার এদেশে আর কখনও হয় নাই।

গুলিসুতার কল।

সুতার গুলি (Thread-ball) প্রস্তুত করা একটী মূলধনের ব্যবসায়। ১৫০ হইতে ২০০৲ টাকা মূল ধনে এই ব্যবসায় সুচারু-রূপে চলিতে পারে এবং একটী লোক ৭।৮ ঘণ্টার পরিশ্রমে দৈনিক ১।০ হইতে ২৲ অনায়াসে উপার্জ্জন করিতে পারে। ঐরূপ একটী গুলি প্রস্তুত করিতে ১ পয়সার বেশী খরচ কোন ক্রমেই লাগিতে পারে না। দেশী গুলি একটা ২ পয়সা করিয়া বিক্রয় করিতে পারা যায়। ঐরূপ ২টী গুলি অনায়াসে ১ মিনিটে তৈয়ারী হয়। গুলি প্রস্তুত করিবার প্রণালীও অতি সরল এবং অতি অল্প পরিশ্রমেই এক কল চলে। সুতরাং ঘরের মেয়েরা এমন কি ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও অবসর মত চালাইয়া বেশ দু'পয়সা রোজগার করিতে পারে।

সম্পাদকের বৈঠক

প্রশ্ন

১। সূতার নম্বর কিরূপে স্থির করা যায়?

২। কত রকমের সূতা আছে, এবং পৃথক-পৃথক কোন্-কোন্ নম্বরের সূতা আছে?

৩। কোন্-কোন্ নম্বর সূতা দ্বারা সাধারণতঃ কোন্-কোন্ কাজ হয়। কাপড় কোন্-কোন্ নম্বরের সূতা দ্বারা হয়?

৪। সূতা চিনিবার সহজ উপায় কি?

৫। সাঁতৈল রাজবংশের বিশেষ বিবরণ কোন্-কোন্ পুস্তক হইতে জানা যায়?

৬। উক্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাপক কে? কাহার সময়ে ধ্বংস হয়। ধ্বংসের কারণ কি?

৭। কত বৎসর ঐ রাজত্ব স্থায়ী হয়?

৮। সাঁতৈল বারভূঞা কিনা?

৯। হরিপুর সাঁতৈল রাজার সামন্ত রাজা কি না? কোন্ সময়ে সাঁতৈল রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়?

১০। রেজা মহম্মদ কর্ত্তৃক সাঁতৈল আক্রমণ ঠিক কি না এবং জল-যুদ্ধে রাজার প্রাণবিয়োগ হয়, তাহা ঠিক কি না?

১১। হরিপুরের কোন-কোন্ জমিদার ঐ দরবারে কার্য্য করিতেন?

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী।

১২। কাচের জিনিস সকল গৃহস্থ-ঘরেই আছে। একটু-আধটু ভাঙ্গিয়া গেলেই, অনেক সময় পুরা জিনিসটাই মাটী হইয়া যায়। ভাঙা কাচ জুড়িবার কোন সহজ উপায় জানা থাকিলে, সেটুকু জুড়িয়া লইয়া জিনিসটীকে পূর্ব্ববৎ করিতে পারা যায়। কাচ জুড়িবার কোন সহজ, practical উপায় নাই কি? একখানি কাগজে একবার পড়িয়াছিলাম, sodium silicate দিয়া কাচ জোড়া যায়। পরীক্ষা করিয়া দেখি, উহাতে জুড়ে বটে, কিন্তু জল ত দূরের কথা, জলো বা ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিলেই জোড় খুলিয়া যায়। সুতরাং এ উপায়কে practical বলা যাইতে পারে না। কাচ জুড়িবার practical উপায় কি?

শ্রীঅনিলপ্রকাশ সোম।

১৩। 'মগের মুলুক' প্রবাদ কি জন্য হইল? ইহার ঐতিহাসিক ঘটনা কি?

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়।

১৪। শুষ্ক খড়ে উই ধরে না কেন! কুকুর বা বিড়ালের অসুখ হইলে তাহারা কচি ধান্যের গাছ খায় কেন? অন্য শুষ্ক যে কোনও জিনিষ জল পাইলে, তাহাতে উই ধরে; কিন্তু খড়ে জল পাইলে উই ধরে না। ইহার কারণ কি?

শ্রীরামকালী ঘোষাল।

১৫। আমেরিকায় যে "Radiophone" আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার দাম কত? এবং তাহা কোথায় পাওয়া যায়?

শ্রীহাজারিদাস চৌধুরী।

১৬। বিনামা (পাদুকার্থ) কোন্ ভাষার শব্দ? ব্যুৎপত্তি কি?

১৭। বঙ্গভাষার সর্ব্বপ্রথম ব্যঙ্গ-কাব্য কি?

১৮। অনেকে উপাস্য দেবতার নামের পূর্ব্বে ৺ এই চিহ্নটি বসাইয়া থাকেন। ইহার অর্থ কি এবং মূল কোথায়? এই রীতি কত দিনের?

১৯। "মৃত্যুরিম" শব্দের অর্থ কি? কোন্ ভাষার শব্দ? বুৎপত্তি কি? যেমন:—"মৃত্যুরিম ঠোঁট"—প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩২৯; ২৩৭ পৃঃ।

শ্রীরাধাচরণ দাস।

২০। যাঁহারা অজন্তার গুহাতে বা বদ্রিনাথের পর্ব্বত-গাত্রে বিস্ময়কর শিল্পকার্য্যাদি করিয়াছিলেন, তাঁহারা কোন্ দেশের লোক ছিলেন? তাঁহাদের জাতি কি?

২১। কতদিন পূর্ব্বে চীনদেশ হইতে আমাদের দেশে চীনা সিন্দূরের আমদানি হইয়াছে?

শ্রীসুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য্য।

প্রশ্ন

২২। একাধিকবার দীক্ষা (দীক্ষামন্ত্র) লইতে নিষেধ কেন? শাস্ত্রসঙ্গত যুক্তি চাই।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ পালিত

২৩। গাল কিরূপে পরিষ্কার করিতে হয়?

শ্রীহীরালাল বন্দোপাধ্যায়।

উত্তর

ভরত ও লক্ষ্মণের মধ্যে বড় কে?

গত পৌষ মাসের ভারতবর্ষের ২ নং প্রশ্নের উত্তর আমি এই সঙ্গে পাঠাইতেছি।

প্রশ্নকর্ত্তা দেখাইয়াছেন যে, বাল্মীকির রামায়ণ, উত্তর-রামচরিত প্রভৃতি গ্রন্থে ভরতকেই লক্ষ্মণের বয়োজ্যেষ্ঠ বলা হইয়াছে—"কিন্তু কালিদাস লক্ষ্মণকেই জ্যেষ্ঠের পদ দিয়াছেন। ইহার মীমাংসা কি?"

বস্তুতঃ রামায়ণ ও উত্তর-রামচরিত ব্যতীত আরও অনেক সংস্কৃত গ্রন্থে ভরতকেই জ্যেষ্ঠ বলা হইয়াছে, যথা:—

(১) "ততো দাশরথির্বীরো ধর্ম্মজ্ঞো লোকবিশ্রুত
ভরতো লক্ষ্মণশ্চৈব শত্রুঘ্নশ্চ মহাবলঃ ॥" কূর্ম্মপুরাণ।

(২) "অস্তেভ্যুঃ পাঙ্কজস্বাত্মা কৈকেয্যাং ভরতোৎভবৎ।
তদন্তেভ্যুঃ সুমিত্রায়াম্ অনন্তাত্মা চ লক্ষ্মণঃ
সুদর্শনাম্না শত্রুঘ্নো যৌ জাতৌ যুগপৎ প্রিয়ে" ॥ পদ্মপুরাণ।

(৩) "কৌশল্যাসাবি সুখেন রামঃ প্রাক্ কৈকেয়ীতঃ ভরতস্ততোঽভূৎ
প্রাসোষ্ট শত্রুঘ্ন মুদারচেষ্ট মেকা সুমিত্রাসহলক্ষ্মণেন" ॥ "ভট্টি" ইত্যাদি।

কালিদাস রঘু গ্রন্থারম্ভে পূর্ব্ব কবি বাল্মীকি প্রভৃতি নির্দশিত পথানুসর করিতেছেন, ইহা বলিয়াছেন। যথা—

"অথবা কৃতবাগ্দ্বারে বংশেঽস্মিন পূর্ব্বসূরিভিঃ
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ।"

কাজেই তিনি বাল্মীকির মত এবং জনপ্রবাদের (Tradition) বিরুদ্ধ মত প্রচার করিবেন, এমন বোধ হয় না; বস্তুতঃ, প্রশ্নকর্ত্তার উদ্ধৃত দুইটী শ্লোকের ব্যাখ্যা, পূর্ব্ববর্ত্তী বাল্মীকি প্রভৃতি গ্রন্থকার এবং স্বকীয় পুস্তকের পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রাখিয়া করিতে হইবে। জৈমিনী ও ব্যাস প্রভৃতি এ কথা বলিয়াছেন—

"সন্দিগ্ধেষু বাক্যশেষাৎ" (১।৪।২৯)
"অসদ্ব্যপদেশান্নেতিচেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্য শেষাৎ" (২।১।১৭)

আমরা রঘুবংশের দশম সর্গে ভরতের পর লক্ষ্মণের জন্মের আভাস [পা]ই (শ্লোক—৬৬-৭২)। অতএব প্রশ্নকর্ত্তার উদ্ধৃত শ্লোক দুইটীতে [আ]পাত-বিরোধ দৃষ্ট হইলেও, প্রকৃত পক্ষে বিরোধ নাই। কারণ, লক্ষ্মণ [ক]নিষ্ঠ হইলেও, জ্যেষ্ঠ ভরতের পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হইতে কোনও [বা]ধা নাই। কারণ, লক্ষ্মণ বৈমাত্রেয় ভাই। মল্লিনাথও শাস্ত্রের বচন [তু]লিয়া এ কথা বলিয়াছেন:—

"নাত্র ব্যুৎক্রম বিবাহদোষঃ, ভিন্নোদরত্বাৎ" তদুক্তম্,—
পিতৃব্যপুত্রে সাপত্ন্যে পরনারী সুতেষুচ"
বিবাহ-ধান-যজ্ঞাদৌ পরিবেত্তাদ্যদূষণম্ ॥"

আবার যদিও ভরত শত্রুঘ্নকে "তয়োঃ অবরজৌ" বলা হইয়াছে, [ত]পি "পর্য্যায়ক্রমে" অবরজত্ব গ্রহণ করিলেই বিরোধ তিরোহিত হয় [অ]র্থাৎ রামের অবরজ ভরত, লক্ষ্মণের অবরজ শত্রুঘ্ন।)

২য় শ্লোকটীর দ্বারা ভরতের "অনুজত্ব" প্রতিপন্ন করিতে হইলে, [এ]ভাবে অন্বয় করিতে হইবে—

তদনু (ভরতঃ) সৌমিত্রিণা সংমসৃজে সঃ। (লক্ষ্মণঃ) চ নম্রসিরসম্ (ভরতম্) ইত্যাদি।

কিন্তু ইহাতে দুইটী দোষ হয়।

(১) প্রথম বাক্যে কর্ত্তার অভাব।

(২) 'সঃ' শব্দ পূর্ব্বশ্লোকস্থ কর্ত্তা ভরতের বিশেষণ না হইয়া, [কে]বল লক্ষ্মণের বিশেষণ হয়। কাজেই মল্লিনাথ ভরতের অগ্রজত্ব [গ্রহ]ণ করিয়া, ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যদিও সে ব্যাখ্যা নিতান্ত [সর]ল নহে, তথাপি তাহা সামঞ্জস্য রক্ষা করে বলিয়া শ্রেষ্ঠ।

কেহ-কেহ "ততো লক্ষ্মণমাসাদ্য বৈদেহীঞ্চ পরন্তপ।
অভিবাদ্য ততঃ প্রীতঃ ভরতো নাম চাব্রবীৎ॥"
(লঙ্কাকাণ্ড, ২২৭।৪১)

এই রামায়ণের বচন তুলিয়া, ভরতের কনিষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে চাহেন। কারণ, এখানে ভরত লক্ষ্মণকে নমস্কার করিতেছেন। কিন্তু গোবিন্দরাজের মতে এই শ্লোকটীর পাঠ অন্য রকম—

"ততো লক্ষ্মণম্ আসাদ্য বৈদেহীকাভ্যাবাদয়ৎ।
অভিবাদ্য ততঃ প্রীতিঃ ভরতোনামচাব্রবীৎ।"

অতএব বিরোধ নাই।

যাঁহার প্রথম প্রকার পাঠ গ্রহণ করেন, তাঁহাদেরও রামায়ণস্থ রামাদির জন্ম-বিবরণের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করিতে হইবে। তাই রামানুজ বলিয়াছেন, "আসাদ্য" ক্রিয়ার সহিত "লক্ষ্মণের" সম্বন্ধ, আর "অভিবাদ্য" ক্রিয়ার সহিত বৈদেহীর সম্বন্ধ, মল্লিনাথের মতে "আসাদ্য" ক্রিয়ার সহিত "লক্ষ্মণ" ও বৈদেহীর সম্বন্ধ থাকিলেও, "অভিবাদ্য" ক্রিয়ার সহিত কেবল বৈদেহীর সম্বন্ধ। কাজেই কোনও বিরোধ দৃষ্ট হয় না।

এই হেতু আমরা বাল্মীকি, ভবভূতি, ভট্টিকাব্য-কার, কালিদাস, প্রভৃতি সকলের মতেই ভরত লক্ষ্মণের অগ্রজ, ইহা স্থির করিলাম।

—শ্রীরামেন্দ্রমোহন বসু এম-এ,

মেচেতা উঠাইবার উপায়।

১। সোহাগা ও শ্বেতচন্দন জলে ঘষিয়া মেচেতাযুক্ত স্থানে ৩।৪ দিন লাগাইলে সারিয়া যায়।

২। রক্তচন্দনের সঙ্গে পাতি লেবুর রস মিশাইয়া প্রলেপ দিলে দাগ উঠিয়া যায়।

৩। গাভী দোয়ার সময়ে দুধের যে ফেনা উঠে, সেই ফেনা ৪।৫ দিন মুখে মাখিলে, দাগ থাকিতে পারে না।

৪। শ্বেত-সরিষা ও তিল একত্র দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া মুখে প্রলেপ দিলে, এক সপ্তাহের মধ্যে দাগ উঠিয়া মুখের কান্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

আচুলি সারিবার কৌশল।

আচুলি কাটিবার একটী উপায় আছে। সরু এক গাছি চুল লইয়া তাহা দ্বারা আচুলিটী জড়াইয়া তার.পর বিপরীত দিকে টান দিলে সহজেই কাটিয়া যায়।

কাপড়ের আলকাতরার দাগ উঠাইবার প্রণালী।

১। দাগযুক্ত স্থানটী কিছুক্ষণ জামিরের রসে ভিজাইয়া রাখিলে দাগ উঠে।

২। জল না লাগাইয়া কতকগুলি আমরুলের পাতা লইয়া দাগের উপর ৫।৭ মিনিট ঘষিয়া পরে সাবান দিয়া ধুইয়া লইলে দাগ উঠিয়া যাইবে।

৩। কেরোসিন তেল লাগাইলেও দাগ উঠে।

কাপড় হইতে কলার কষ উঠান।

১। দাগের স্থানে পাতিলেবুর রস বার-বার ঘষিয়া ছায়ায় শুকাইয়া লইতে হয়; পরে ভাল সাবান দ্বারা কাপড় কাচিয়া লইলে দাগ থাকিতে পারে না।

ঘরের খুটায় উই না ধরিবার উপায়।

খুটি লাগাইবার পূর্ব্বে খুটির গোড়ার কতক অংশ (যতদূর পর্য্যন্ত পোতা হইবে, ততদূর পর্য্যন্ত) দিবারাত্র লবণের জলে ভিজাইয়া রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ লবণ ভিজান নেকড়া দ্বারা ঘসিয়া দিতে হইবে। পরে তুঁত ভিজান জল দ্বারা খুটিটী মাথাইয়া ঘরে লাগাইলে উইতে তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

১৭। সমপরিমাণ খয়ের (যাহা পানের সহিত ব্যবহার করা হয়) ও চাথড়ি জল দিয়া ঘ'টিয়া হাজাযুক্ত স্থানে লাগাইতে হইবে। যে কোন প্রকারের "হাজা"তে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

শ্রীসুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য্য।

মাখন কিম্বা ঘি একটু কড়া করিয়া গলাইয়া রাখিলে শীঘ্র নষ্ট হয় না। Sulpholine lotion নিয়মিত ভাবে ব্যবহার করিলে, ছুলি ও মেচেতার দাগ একেবারে উঠিয়া যায়। আমি ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছি। আঁচলির গোড়ায় এক থি চুল বাঁধিয়া দিলে, উহা আপনা হইতে খসিয়া যায়।

নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম করিলে রুগ্ন ব্যক্তি সবল, ও মোটা লোক দোহারা চেহারা বিশিষ্ট হইবেন। শ্রীনারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পাল-বংশ সেন-বংশের পূর্ব্বে বিক্রমপুরে রাজত্ব করেন। "বিক্রমভূপ বাসত্বাং বিক্রমপুরমতো বিদুঃ।" ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, বিক্রমাদিত্যের বাস হেতু বিক্রমপুর নাম হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে, "উজ্জয়িনী-পতি রাজা বিক্রমাদিত্য এখানে আসিয়া নিজ নামে একটি নগর পত্তন করিয়া যান। তাহাই আদি বিক্রমপুর।" কিন্তু বিক্রমাদিত্য নামক অপর কোন নৃপতি কর্ত্তৃক বিক্রমপুর প্রতিষ্ঠিত হউক বা না হউক, উজ্জয়িনী পতির সহিত এই পূর্ব্ববঙ্গীয় বিক্রমপুরের কোন সম্বন্ধ নাই। "বিক্রমপুর নামটি প্রাচীন পাল বংশের সময়ের। বিক্রমপুর অতি প্রসিদ্ধ জনপদ বলিয়া গণ্য ছিল।" শ্রীঅমূল্যগোবিন্দ মৈত্র।

মাখন বেশী দিন রাখিবার উপায়।

১। টিনের মধ্যে মাখন রেখে তার ওপর কিছু Tartaric Acid ও সোডা মিশান জল ঢেলে দিতে হয়। তার পর পাত্রটি ঝালাই করে রেখে দিন।

২। পাত্রে এমন ভাবে মাখন রাখুন, যাতে ঢাকনা থেকে ১ ইঞ্চি জায়গা খালি থাকে। সেই জায়গাটার আধ ইঞ্চি কি পৌণে এক ইঞ্চি মোটা দানাবিশিষ্ট লবণে ঢেকে দিয়ে, তার ওপর একটা বেশ পুরু কাগজ রেখে দিয়ে, ঢাকনা ভাল করে বন্ধ করুন। এতে কিছু দিন পরে নুণটা গলে গিয়ে সব্‌টা মাখনে মিশে যাবে। মাখনের ১/৬ ভাগ নুণ দেওয়া চাই।

৩। Petrol ও Kerosine Lightএর mantle, 'asbestos' হইতে প্রস্তুত হয়। এই asbastas এক প্রকার অদাহ্য দ্রব্য। এক প্রকারের Hornblende।

সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের কোথাও ইহা উৎপন্ন হয় না। পৃথিবীর মধ্যে কানাডাতে সব চেয়ে বেশী asbestos উৎপন্ন হয়। আগে রাসিয়াতেও পাওয়া যেত। এখন আর সেখানে হয় না। কানাডার পরে asbestosএর জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার Rhodesia উল্লেখযোগ্য। সেখানে সাবি নদীর নিকটবর্ত্তী Mashaba এবং Shabani নামে দুটো জায়গায় যথেষ্ট asbestos পাওয়া যায়। ট্রান্সভালের Barbarton district এবং Western Australiaতেও এই মূল্যবান জিনিষটি পাওয়া যায়।

অনেক chemical উপায়ে asbestos থেকে Mantle তৈরী হয় বলে, ঘরে তৈরী করা সুবিধাজনক হবে বলে মনে হয় না।

শ্রীভবানীচরণ ভট্টাচার্য্য।

'ছুলি'র দাগ।

'ছুলি'র দাগ একেবারে নির্ম্মূল হইয়া উঠিয়া যাইবার উপায় এই যে, স্নানের পূর্ব্বে লঙ্কা বাটা ও দধি একত্র মিশাইয়া 'ছুলি'র স্থানে মাথাইয়া এক ঘণ্টা রাখিতে হইবে। তাহার পর স্নান করিতে হইবে। এই প্রকার ৪।৫ দিন মাখিলেই ছুলির দাগ একেবারে উঠিয়া যাইবে।

আঁচিল।

আঁচিল তুলিবার সহজ উপায় আঁচিলের উপরে একগাছি চুল বাঁধিয়া রাখিলেই আঁচিল কাটিয়া পড়িয়া যাইবে। তজ্জন্য ঐ স্থানে কোনরূপ ঘা হইবার আশঙ্কা নাই।

'হাজা' ভাল হইবার উপায়।

বট গাছের সরু ডালে যে ফুলের মত একটি পদার্থ থাকে, তাহা ভাঙ্গিলেই যে আটা বা দুধ বাহির হয়, সেই দুধ 'হাজা' স্থানে দিলেই যত দিনের হাজা হউক সারিয়া যাইবে। শ্রীসুধীরকুমার ঘোষ।

হাজার ঔষধ।

হাজায় একটু চিনি বা একটু হলুদ লাগাইলে ভাল হইতে পারে। তাহা না হইলে বোরিক্ এ্যাসিড্, জিঙ্ক্ অক্সাইড্ ও এ্যামাইলাম (acid Boric, Zinc oxide and amylum) সমান-সমান ভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া লাগাইবেন।

ছুলী ও মেচেতার ঔষধ।

ছুলী ও মেচেতার ঔষধ হইতেছে সেডিয়াম্ সালফাইট্। ছুলীতে উক্ত ঔষধ রেক্‌টিফায়েড স্পিরিটের সহিত (Spiritus Rectificatus) এবং মেচেতায় মিল্ক্ অব্ রোজের (Milk of Roses) সহিত লাগাইতে হয়। মাত্রা জানিতে হইলে, চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।

আঁচিল তোলা।

আঁচিলে কষ্টিক্ লাগাতে পারেন। অনেক বলেন, আঁচিলের বোঁটায় ঘোড়ার লেজের চুল খুব শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে, উহা আপনা হইতে খসিয়া যায়।' পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। —শ্রীচৈতন্য।

কবীরের প্রেমসাধনা

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

(১)

কবীরের যদি পরিচয় দিতে আমি চেষ্টা করি, তাহলে একটু আগে থেকে বল্‌তে হবে। পূর্ব্বে রামানুজের সময় হতে আচারি সম্প্রদায় চলে আস্‌ছিল। আচারি বৈষ্ণব-সম্প্রদায় খুব আচার মেনে চলতেন, তাঁদের আচারের বন্ধন খুব বেশী ছিল। যেমন, খাওয়ার সময় কেউ দৃষ্টি দিলে তাদের খাওয়া বন্ধ হোত, "দৃষ্টি-দোষ" হত। যিনি প্রথম অনাচারী হন, তিনি হলেন গুরু রামানন্দ। কাহারও-কাহারও মতে তিনি রামানুজের ৫ "পীঢ়ি" অর্থাৎ ৫ জন গুরুর পরে। আচার নিয়েই রাঘবানন্দের সঙ্গে তাঁর লাগল। বিরোধ এতদূর বেড়ে উঠ্‌ল যে, রাঘবানন্দ তাঁকে বললেন যে, "তোমার ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে যদি বাধে, তাহলে তুমি তোমার নতুন দল গড়ে তোল। আমাদের এতকালকার পুরানো সম্প্রদায়ের উপর আঘাত করো না। দোহাই তোমার, এত কালের জিনিসটার উপর হাত চালিও না। নতুন কিছু যদি করতে হয় তো তুমি নিজে আলাদা করে নেও।"

রামানন্দ বেরিয়ে এলে পরে, রামানুজ সম্প্রদায়ের মধ্যে রাঘবানন্দই অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হয়ে উঠলেন। রামানন্দের মনের মধ্যে এই যে নতুন একটি বিপ্লব উপস্থিত হয়েছিল, বোধ হয় রাঘবানন্দের সঙ্গে ভাগ হয়ে যাবার অনেক দিন পূর্ব্বেই সেটার সূত্রপাত হয়েছিল। কারণ, দেখ্‌তে পাই, রামানন্দ সমস্ত ভারত ঘুরে এলে, তাঁর দলের লোকেরা তাঁকে আর গুরু বলে গ্রহণ করতে রাজী হলেন না। কেন না তিনি তার আগেই আচার ভঙ্গ করেছিলেন।

আরো দেখ্‌তে পাই, রামানন্দের প্রধান শিষ্যেরা সবাই প্রায় অন্ত্যজ। সেই সময় নারীদের হীন বলে মনে করা হোত। তিনি তাঁদেরও শিষ্য করে নিয়েছিলেন। নারী সাধিকাদের মধ্যে রামানন্দের শিষ্যা পদ্মাবতী আমাদের এমন অনেক জিনিস দিয়ে গেছেন, যার মূল্য হয় না। তা ছাড়া, তাঁর আর একটি শিষ্যার নাম ক্ষেমশ্রী। তিনি জাতে ছিলেন গোয়ালা। শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ক্ষেমশ্রীর একটি কবিতা তাঁর Personality নামক গ্রন্থে অনুবাদ করবার প্রলোভন ছাড়তে পারেন নি।

কবীরও গুরু রামানন্দের অন্ত্যজ শিষ্য। তবে কেমন করে তিনি রামানন্দের শিষ্য হলেন, তার নানা রকম ব্যাখ্যা চলিত আছে। এ বিষয়ে গুরু রামানন্দের মান বাঁচাতে গিয়ে, অনেক ভক্তি-গ্রন্থ অদ্ভুত সব গল্প চালিয়েছেন। গল্প আছে, একদিন কবীর অন্ধকারে রামানন্দের স্নানের পথে শুয়েছিলেন। কবীরের গায়ে রামানন্দের পা লাগে। তাতে রামানন্দ "রাম" "রাম" বলে উঠেন। কবীর বললেন, "তবেই ত তুমি আমার গুরু হলে। আমি তোমার কাছে 'রাম' নাম মহামন্ত্র পেলাম।" এই রকম করে কবীরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও শিষ্যত্ব হয়। রামানন্দের ৭২ জন অপ্রধান শিষ্যের মধ্যে প্রায় ৫৩ জন হীনজাতি বা অন্ত্যজ। প্রধান শিষ্যদেরও অধিকাংশই অতি নীচ ও ছোট জাতির লোক।

কবীর সন্ন্যাসীও ছিলেন গৃহস্থও ছিলেন। তিনি বলতেন, সংসার ও সন্ন্যাসের মধ্যে প্রাচীরের মত কোন ব্যবধান নাই। যিনি

সংসারী তিনিও সন্ন্যাস হবেন, এই তাঁর মত ছিল। কারণ তিনি বলতেন :—

"কহৈ কবীর অস উদ্যম কীজৈ।
আপ জীয়ে ঔরনকো দী জৈ॥"

অর্থাৎ এতটা শ্রম তোমার করা দরকার, যাতে তুমি আপনি জীবনধারণ করে আরও দুচার জনকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করতে পার।

যাঁর সংসারের ভার আছে ও পরিশ্রম করার শক্তি আছে, তিনি অন্তের পরিশ্রমের ফলের ভাগ নিতে পারেন না। যতক্ষণ শক্তি আছে, কেন পরিশ্রম করবে না? তাই তিনি তাঁত বুনে শেষ পর্য্যন্ত নিজের জীবিকা নিজে উপার্জ্জন করেছেন। তিনি সন্ন্যাসী, অথচ তিনি বিবাহ করলেন। শত্রুরা নিন্দা করতে লাগল। তারা বলতে লাগল—"যা হোক, বিয়ে করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর সন্তান হবে না।" পরে যখন তাঁর সন্তান হল শত্রুরা খুব খুসী হল। তারা বলল "ডুবা বংশ কবীরকা জবহি উপজা পুত্র কমাল" অর্থাৎ কবীরের পুত্র কমাল যে জন্মাল তাইতেই কবীরের বংশ, অর্থাৎ গুরু-শিষ্য ক্রমে সন্ন্যাসীর যে সম্প্রদায়ের ধারা তা ডুবল।

যেদিন তাঁর সন্তান হবে সেদিন তিনি আগে থাকতে তা বুঝতে পারেন নি। বাজারে গিয়াছিলেন সুতা কিনতে। নিন্দুকের দল ভিড় করে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল, তাঁকে খবর দিয়ে জব্দ করবে বলে। তিনি কাপড় বিক্রি করে, সুতার বোঝা মাথায় নিয়ে ফিরে আসছিলেন, পথে জনতা দেখে অবাক হলেন। বড় আনন্দে তারা সবাই বললে—কবীর, তোমার পুত্র হয়েছে। তারা ভেবেছিল, কবীর বুঝি কথাটী শুনে মুষড়ে যাবেন। কবীর প্রসন্ন হয়ে সুতোর বোঝাটি কাঁধ থেকে নামিয়ে ছয়টি পংক্তি উচ্চারণ করিলেন। মানবশিশুর জন্ম সম্বন্ধে এই রকম কথা আর কোথাও বলা হয়েছে কি না জানি না। টেনিসন De Profundis নামে যে কবিতাটি লিখেছেন, সে এর চেয়ে অনেক দীর্ঘ অথচ তাতেও যে গভীর কথাটুকু এবং মানব-জীবনের যে রহস্যটুকু তিনি বুঝিয়ে বলতে পারেন নি, কবীর ছয়টি মাত্র পংক্তিতে তা অনায়াসে বলে গেছেন। তিনি বললেন :—

অহদ মুসাফির পহুনা আয়া ধরো ম ল থার
ঘর আংগনকী কদর ভয়ী হৈ রাহ্ হ্বৈ গুলজার॥
জনম মরণমেঁ কদম তুমহারা অবস ভরাহয় কাল।
মেরা ঘরমেঁ ডেরা লাগায়া পায়া হাম কমাল॥
কৌনসী সেবা করিহোঁ তুমকো কোন করিহোঁ পূজা।
পংথ পংথী ঘর একহি হৈজী ভাব মিটা অব দুজা॥"

এই যে আমার পুত্র সে অসীমের যাত্রী। অসীমযাত্রার সাধনা করবার জন্ত দুচার দিনের জন্ত সে আমার ঘরে অতিথি এসেছে। তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্ত শুভ অর্ঘ্যের থালিটি সাজিয়ে ধর। আজকে আমার ঘর, আমার আঙ্গিনা অর্থাৎ আমার ঘরের ভিতর-বাহির আজ তার যথার্থ কদর পেয়েছে। এই ক্ষুদ্র যাত্রীটি তার যাত্রাপথখানিকে একেবারে পুষ্পিত করে আমার ঘরে এসেছে। "হে অসীমের যাত্রী আমার পুত্র, জন্ম ও মৃত্যু তোমারই অসীম যাত্রার এক একটি পা ফেলা ও তোলা। জন্ম মৃত্যুর মধ্যে পা ফেলে তুমি চলেছ, কাল তোমার কাছে হার মেনেছে। আমার ঘরেতে যে তুমি এসে আশ্রয় নিলে, আমি তাতে কমাল অর্থাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হলাম। কেমন সেবা বল ত তোমায় আমি করি? সেবা আবার কি? তোমাকে আমি কোন্ পূজা দিয়ে ধন্য হব? আজ আমার সব দ্বৈত-ভাব ঘুচে গেছে। আজ প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি যিনি অসীম লক্ষ্য হয়ে বিরাজমান, তিনিই অসীমের যাত্রী হয়ে সেই লক্ষ্য লাভের সাধনায় যাত্রা করেছেন। আর তিনি পথ হয়ে অসীম-যাত্রীকে অসীম লক্ষ্যের দিকে উপনীত করে দিচ্ছেন।" শত্রুরা নিস্তব্ধ হয়ে চলে গেল। এই যে কমাল অর্থাৎ পরিপূর্ণতা লাভ করেছেন বলে কবীর বললেন, তাতেই পুত্রের নাম হল "কমাল"। এবং পরে যখন তাঁর কন্যা হল তারও নাম রাখলেন "কমালী"।

কবীরের যে কি প্রভাব উত্তর-ভারতে আছে, তা যাঁরা উত্তর-ভারতে ভ্রমণ করেছেন, তাঁরা ছাড়া কেউ জানেন না। তিনি ভগবানকে নিজের গুরু মেনে নিয়েছিলেন! তিনি বলেছেন, আমি অসীমের বার্ত্তা এনেছি, গুরু রামানন্দ আমায় চৈতন্য দিয়াছেন। কিন্তু আমার গুরু বলতে এক ভগবান।

"প্যাস অহদকা সাথ হাম লায়া রামানন্দ চেতায়ে"।

অসীমের তৃষ্ণা নিয়ে আমি এই জগতে এসেছি। রামানন্দ আমার চেতনাকে জাগিয়ে দিয়েছেন; কারণ, আমি যে কিসের তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে বেড়াচ্ছিলাম, সে আমি নিজেই বুঝতে পারছিলাম না। সে তৃষ্ণা যে অসীমের তৃষ্ণা, জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে যে এই তৃষ্ণার সূত্র ধরেই আমি চলেছি, এ কথা ভুলেই গিয়াছিলাম। চেতনা যিনি দিলেন, তিনি গুরু রামানন্দ। তবে সত্য গুরু যদি বলতে হয়, তবে সে স্বয়ং ভগবান। তিনি এই অসীমের তৃষ্ণা দিয়েছেন, তিনি প্রতিদিন আমার সেই বন্ধন ক্ষয় করে, তাঁর দিকে আমাকে অগ্রসর করে নিচ্ছেন। তাঁরই উপলক্ষ্য হয়ে রামানন্দ আমার গুরু হয়েছেন। একজন ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ দার্শনিক তাঁকে তাঁর সাধনার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। বলেছিলেন, "তোমার সাধনার পথটি আমায় বুঝিয়ে বলতে পার?"

কবীর বল্লেন "পথ কি আমি দেখেছি? রাত্রি ছিল অন্ধকার। তাঁর বাঁশীর সুর শুধু কাণে আসছিল। মন আমার উদাস যখন হোলো, তখন কি আর পথের খোঁজ খবর নিয়েছি? পাগলের মত সুর শুনেই এগিয়ে চলেছিলাম।"

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন "কে তোমার গুরু?" তখন কবীর গান গাইলেন—

"বাঁসুরী জব মোহে ডগরা ধরাঈ।
রৈন অন্ধেরী রহী কারী বাদরনসে,
ডগরা মোহে কৌন দিখাঈ।
ঠাড়ী কোঈ দেখত অপনে অংগনসে,
জিনহে কভী বাঁসুরী বুলাঈ।
ডগরা মোহে কৌন দিখাঈ।

ডর নাহি কুছো, ডগরা ন পুছো
বাঁসুরী সুনত কবীরা বঢ় জাঈ।
আজি বালম বুলাবত আন্হর কে পারসে
কৌন বেসরম আজ তোর সাথ জাঈ॥

পথ আমি জানি না। সেই বাঁশরী যখন আমায় রাস্তায় বের করল, যখন বাঁশরী আমাকে পথে ডাক দিলে, তখন রাত্রি ছিল অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন। আমার ভীত প্রাণ বলতে লাগল, "কে আমাকে পথ দেখাবে?"

যে সমস্ত পূর্ব্ব-পূর্ব্ব ভক্তেরা (বশিষ্ঠ, নারদ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি, যাঁরা বাঁশী শুনতে পেয়েছিলেন, তাঁরা, নিজের নিজের আঙ্গিনার দরজা খুলে এসে দাঁড়ালেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে আমাকে পথ বলে দেবে? তাঁরা বললেন, যিনি তোমায় এবং আমাদেরও বাঁশীতে ডাকছেন, তিনিই পথ বলে দেবেন। পথ জিজ্ঞাসা করো না। বাঁশী শুনে আজ বেরিয়ে পড়; সোজা চলে যাও। জীবনবল্লভ অন্ধকারের পার হতে আজ তোমায় ডেকেছেন; প্রেমের মিলন-বাসরে তোমার সঙ্গে তাঁর আজ গভীর মিলন হবে। কে এমন নির্লজ্জ আছে, আজ যখন তুমি প্রিয়তমের কাছে বাসর-ঘরে চলেছ, তখন সাথে সাথে পথ দেখাবার জন্যে সেও সেখানে যাবে।

আজ রাত্রি বাদল অন্ধকার। বাঁশী দিয়ে তিনি ডাক্‌ছেন। তিনি দিনে ডাক্‌লে আলো দিয়ে ডাক্‌তেন; কিন্তু রাত্রে ডেকেছেন যে, পথ দেখতে পাবে না, শুধু বাঁশী শুনে নির্জ্জনে অন্ধকারে তাঁর প্রেমস্বরূপের ভিতরে ডুবে যাবে। যিনি গুরু তিনি এ ভাবেই পথ দেখাচ্ছেন। রামানন্দ শুধু আমার মনের মধ্যে এই ভাবটিকে সচেতন করে দিয়েছেন।"

এর পরেই সেই পণ্ডিতটীর সঙ্গে কবীরের যে প্রসঙ্গ হল (কবীর-পন্থীদের সাধনার শাস্ত্রে এই সব প্রসঙ্গকে "বহস্" বলে)—কবীরের প্রেম সম্বন্ধে প্রসঙ্গের মধ্যে এটী একটি উল্লেখযোগ্য "বহস্"। এই প্রসঙ্গে কবীর বললেন যে, ভগবানকে প্রেম দিয়েই সাধনা করতে হবে। সেই পণ্ডিতটী জিজ্ঞাসা করলেন—যাঁকে প্রেম দিয়ে তুমি সাধন করবে, তাঁর স্বরূপ কি? কোথায় তাঁর নিবাস? কেমন তাঁর প্রকাশ?" কবীর বললেন—

ঐসা লো নহি তৈসা লো।
মৈঁ কেহি বিধি কহো গম্ভীরা লো।
ভীতর কহুঁ তো জগময় লাজৈ, বাহর কহুঁ তো ঝুটা লো॥
বাহর ভিতর সকল নিরন্তর চিত অচিত দউ পীঠা লো।
দৃষ্টি ন মুষ্টি পরগট অগোচর বাতন কহা জাঈ লো॥

তিনি কোন একটী জায়গায় আছেন, এ কথা ভাবলে ভুল হবে। যদি বলি, তিনি এমন নয়, তিনি তেমন, তাহলে ভুল হবে। তিনি যে কেমন, তা আমি কি করে, কি কথা দিয়ে বুঝিয়ে বলব? এ বড় গভীর কথা। যদি আমি বলি যে, তিনি ভিতরে আছেন, তাহলে বাইরের বিশ্বজগৎ লজ্জায় মরে যাবে। যেমন, যদি কোন স্ত্রীকে তার স্বামী চিন্‌তে না পারেন, তাহলে সে স্ত্রীর তো আর লজ্জা রাখবার জায়গা হয় না। তেম্নি তিনি যদি বলেন, এই বাহিরের বিশ্বজগতে আমি নাই, তাহলে এত বড় বিরাট ব্রহ্মাণ্ড এক পল কাল কোন লজ্জায় বেঁচে থাকে? যদি বলি, তিনি বাইরে আছেন, তাহলে আবার আমার অন্তরাত্মা লজ্জিত হয়—এবং সে কথা মিথ্যাও হয়। বাহির এবং ভিতর সকলকে নিরন্তর করে তিনি এক করেছেন। বাহির ও অন্তর, অচেতন সচেতন, তাঁর পাদপীঠ। তিনি দৃষ্ট এ কথা বলতে পারি না, আবার তিনি অপ্রকাশিত এ কথাও বলতে পারি না। তিনি অপ্রকাশিত বটে, অগোচরও বটে; বাক্যে ইহা বুঝিয়ে বলা অসম্ভব। তবে বাইরে আচার-অনুষ্ঠানের ভিতর তাঁকে পাই না, এ কথা বলতে পারি না, কিন্তু পাই তাও বলতে পারি না। তিনি একটা উদাহরণ দিয়াছেন যে, জলে ভরা কুম্ভ জলের মধ্যে রেখেছি; তার বাহিরেও জল, ভিতরেও জল; এমনি আমার বাহিরে ও অন্তরে তিনি বিরাজিত।

"জল ভর কুম্ভ জলৈ বীচ ধরিয়া বাহর ভীতর সোই।
উনকা নাম কহনকো নাহি দুজা ধোখা হোই॥"

বাহিরেও তিনি, ভিতরেও তিনি। তবে সব জিনিসেই যদি তিনি প্রকাশিত, তবে তিনি স্বতন্ত্র হয়ে প্রকাশিত হন না কেন? তিনি বাহির ও ভিতর উভয় স্থানই পূর্ণ করে আছেন, তাই আলাদা করে তাঁকে জানি না। তিনি বিশ্বের আত্মা, বিশ্বের জীবনেশ্বর; তাই তাঁর নাম নাই। যদি কেহ তাঁর নাম দেয়, তবে তিনি আমাদের হতে আলাদা হয়ে যান। মানুষ নাম দিয়ে পরকেই ডাকে; নিজেকে তো নাম দিয়ে কেউ ডাকে না। যেমন স্ত্রী স্বামীর নাম ধরে না। নাম ধরলে স্বামী স্ত্রী হতে আলাদা হয়ে যান, কিন্তু স্ত্রী ও স্বামী যে এক। তাই তাঁর নাম ধরতে নাই। তিনি বিশ্বনাথ, বিশ্ব যদি তাঁর নাম নেয়, তবে তিনি যে বিশ্ব হতে আলাদা হয়ে যান। তিনি কি বাইরের আলাদা জিনিস?

উনকা নাম কহনকো নাহি দুজা ধোখা হোই॥

পণ্ডিতটী কবীরকে বললেন, "এসম্বন্ধে যে তত্ত্বটী আপনার মনে প্রত্যক্ষ হয়েছে, তা আপনি সকলের কাছে প্রচার করেন না কেন?" তিনি বললেন, "এ ভাবে ধর্ম্মপ্রচার আমার কাজ নয়।" অতি তীব্র ভাষায় বলেছেন যে, জলের কলসী নিয়ে সকলকে "জল খাও, জল খাও" বলে বেড়ানটা কারুর উপকার করা নয়।

"পানী প্যাবত ক্যা ফিরো ঘর ঘর সাগর বারি।
তৃষাবংত জো হোবৈগা পীবেগা ঝখ মারি॥"

আর এমন জল খাইয়ে ফিরবার দরকারই বা কি আছে? প্রত্যেকের অন্তরে-অন্তরেই অনন্ত রসের সাগর। যে দিন পরমাত্মার জন্য তৃষ্ণা জাগবে, সে দিন সকলের নিজের মধ্যে যে অমৃতরস আছে, তৃষ্ণার দায়ে ঠেকে সেই জল পান করতেই হবে।

"পিবৈগা ঝখমারি"।

তৃষ্ণা জাগাও, অন্তরে তৃষ্ণা জাগাও। যে দিন প্রেম জাগ্রত হবে, সে দিন আপনি তৃষ্ণা আসবে। প্রেম জাগাও। এই প্রেম যে দিন জাগবে,

সেই দিন বৈরাগ্যও আসবে; অথচ, সংসারের প্রতি যে বিরাগ, বিতৃষ্ণার নামান্তর, তা আসবে না। সংসারের মধ্যে কবীর প্রেমে পূর্ণ হয়ে থাকতেই বলেছেন। তিনি বলেছেন, সংসার আমার বাপের বাড়ী, ব্রহ্মধাম স্বামীর বাড়ী। স্বামীর বাড়ীকে ভালবাসতে হবে বলে যে বাপের বাড়ীর প্রতি বিদ্বেষ জন্মাতে হবে, এ কথা ভেবো না। এই সংসারেই তাঁকে জানতে পেরেছি। স্বামীর বাড়ী না গেলে যেমন নারীর জীবন সার্থক হয় না, তেমনি পরমাত্মাকে না জানলে জীবাত্মার কোন সার্থকতাই হয় না। যে দিন স্বামীকে চিনেছি, সে দিন বাপের বাড়ীর সকল আকর্ষণ সহজে ছেড়ে গেছে,—বিদ্বেষ থেকে নয়, ঘৃণা থেকে নয়; এই প্রেমেরই বলে। এই প্রেমকে জাগ্রত কর। এই প্রেমের বলেই বালিকা মা হয়। একটি ছোট বালিকা যে সন্ধ্যাতেই ঘুমিয়ে পড়ত, আজ সে মা হয়ে রাত দুটোতেও না ঘুমিয়ে বসে আছে; কেন না তার ছেলে ঘুমুচ্ছে না। ভগবান এই প্রেমই সকলের মধ্যে দিয়েছেন। বালিকাকে শুধু মা করে দিয়েছেন; আর কোন উপদেশ দিতে হয় নি। অথচ শিশুর দাসীকে সহস্র উপদেশ দিয়েও, ঢের কথা বাকী থেকে যায়; এবং পদে-পদেই তার সেবার ত্রুটি হয়ে যায়। মাকে বিধাতা শুধু প্রেম দিয়েই নিশ্চিন্ত আছেন। প্রেম দিয়েছেন বলে আর কিছুই তাঁকে শেখাতে হয় নি। ভগবান তাঁর ভবিষ্যৎ-সাধক শিশুদিগকে ঘরে-ঘরে মায়েদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। টাকা পাঠান নি, রসদ পাঠান নি, মায়ের হৃদয়ে শুধু প্রেম দিয়েছেন। এই প্রেমের বলেই মা কি তার নিজ সব সুখ ত্যাগ করতে পারবে? পারবে। স্বামীর জন্য নিজের দেহ পর্য্যন্ত তো এই প্রেমের বলেই সে জ্বালিয়ে দেয়!

"সতী কো কৌন শিখাব তা হৈ
সঙ্গ স্বামীকো তন জারনা জী।
প্রেম কো কৌন শিখাবতা হৈ
ত্যাগমাহি ভোগকা পানা জী॥"

"সতীকে প্রেম দিয়েই বিধাতা নিশ্চিন্ত হয়েছেন, স্বামীর জন্য তাকে যে পুড়ে মরতে হয় এ শিক্ষা কে তাকে দিলে? ত্যাগের মধ্যেই যে ভোগকে পেতে হবে এই শিক্ষা প্রেমকে কে দিলে?"

একটিমাত্র পংক্তিতে কবীর প্রেমের একটী পরিপূর্ণ সংজ্ঞা (definition) দিয়াছেন। প্রেম কি? না "ত্যাগের মধ্য দিয়া ভোগকে পাওয়া।" প্রেমের এই মজা,—সে ত্যাগ করে, অথচ ভোগও করে; সে কিছুই রাখে নি, অথচ সবই পেয়েছে।

ত্যাগের মধ্য দিয়ে যে পরমানন্দ মেলে, তা যে কত গভীর, কত মধুর ও সুন্দর, তা কেবল সেই বৈরাগীই জানেন, যিনি বৈরাগ্য দিয়ে প্রেমকে গভীর ও মধুর করে ভোগ কচ্ছেন। ভগবান এই বৈরাগী-প্রেমের রহস্য জানেন; তাই বিশ্বে যেমন তাঁর প্রেমের বন্যা বয়ে যাচ্ছে, তেমনি সর্ব্বত্র বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ রয়েছে।

এই প্রেমের মধ্যে কামনার স্থান নাই। যে অমৃত দেবতার পানীয়, তা দানব এসে খেতে চাইলে হবে কি? সে অমৃতের আনন্দই ত সে জানে না।

"সুর পরকাস তঁহ রৈন কঁহ পাইয়ে
রৈন পরকাস নহি সুর ভাসৈ।
জ্ঞান পরকাস অজ্ঞান কঁহ পাইয়ে
হোয় অজ্ঞান তঁহ জ্ঞান নাসে॥
কাম বলবান তঁহ প্রেম কঁহ পাইয়ে
প্রেম জঁহ হোয় তঁহ কাম নাহী।
কহেঁ কবীর যহ সত্ত বিচার হৈ
সমঝ বিচার দেখ মাহী॥

"সূর্য্য যেখানে প্রকাশিত, সেখানে রাত্রি পাবে কেমন করে? রাত্রি যেখানে বিরাজমান, সেখানে সূর্য্য নাই। যেখানে জ্ঞানের প্রকাশ, সেখানে অজ্ঞানের স্থান কই? অজ্ঞান যদি থাকে, তবে জ্ঞানকে পালাতে হয়। কাম যেখানে বলবান, সেখানে প্রেম কোথায় থাকে? প্রেম যেখানে বিরাজমান, কাম সেখানে নাই। কবীর বলেন, এই আমার সত্য সিদ্ধান্ত। এ কথা আমি বাইরে থেকে বলছি না; অন্তরের মধ্যে বিচার করে দেখ, তুমি তোমার অন্তরেই এ কথার সাক্ষ্য পাবে। বাইরে থেকে পাবার কোন দরকার নেই।" (নব্যভারত)

সামাজিক স্বাস্থ্য ও প্রাণরক্ষার পথ কোন্ দিকে?

(বিশ্ব-ভারতী সম্মিলনীতে মিঃ এল, কে, এলমহার্ষ্টের "মাটীর উপর উপর দস্যুবৃত্তি" প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আলোচনা)।

আজকার বক্তৃতার গোড়াতে বক্তা মহাশয় বলেছেন যে, আমরা মাটি থেকে উৎপন্ন আমাদের যা কিছু প্রয়োজনীয় পদার্থ যে পরিমাণে লাভ করছি, মাটিকে সে পরিমাণে ফিরিয়ে না দিয়ে তাকে দরিদ্র করে দিচ্ছি। আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে, সংসারটা একটা চক্রের মত। আমাদের জীবনের, আমাদের সংসারের গতি চক্রপথে চলে। মাটি থেকে যে প্রাণের উৎস উৎসারিত হচ্ছে, তা যদি চক্রপথে মাটিতে না ফেরে, তবে তাতে প্রাণকে আঘাত করা হয়। পৃথিবীর নদী বা সমুদ্র থেকে জল বাষ্পাকারে উপরে উঠে; তার পর আকাশে তা মেঘের আকার ধারণ করে বৃষ্টি রূপে আবার নীচে নেমে আসে। যদি প্রকৃতির এই জল-বাতাসের গতি বাধা পায়, তবে চক্র সম্পূর্ণ হয় না; আর অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি উৎপাত এসে জোটে। মাটিতে ফসল ফলানো সম্বন্ধে এই চক্ররেখা পূর্ণ হচ্ছে না বলে, আমাদের চাষের মাটির দারিদ্র্য বেড়ে চলেছে; কিন্তু এই প্রক্রিয়াটি যে কত দিন থেকে চলছে, তা আমরা জানি না। গাছপালা, জীব-জন্তু প্রকৃতির কাছ থেকে যে সম্পদ পাচ্ছে, তা তারা ফিরিয়ে দিয়ে আবর্ত্তন গতিকে সম্পূর্ণতা দান করছে; কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে মানুষকে নিয়ে। মানুষ তার ও প্রকৃতির মাঝখানে আর একটি

জগৎকে সৃষ্টি করেছে, যাতে প্রকৃতির সঙ্গে তার আদান ও প্রদানের যোগ-প্রতিযোগে বিঘ্ন ঘটছে। সে ইঁটকাঠের প্রকাণ্ড ব্যবধান তুলে দিয়ে মাটির সঙ্গে আপনার বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। মানুষের মত বুদ্ধিজীবী প্রাণীর পক্ষে এই সকল আয়োজন-উপকরণ অনিবার্য্য, সে কথা মানি। তবুও এ কথা ত ভুললে চলবে না যে, মাটির প্রাণ থেকে যে তার যে প্রাণময় সত্তার উদ্ভব হয়েছে, গোড়াকার এই সত্যকে লঙ্ঘন করলে সে দীর্ঘকাল টিঁকতে পারে না। মানুষ প্রাণের উপকরণ যদি মাটিকে ফিরিয়ে দেয়, তবেই মাটির সঙ্গে তার প্রাণের কারবার ঠিক মত চলে; তাকে ফাঁকি দিতে গেলেই, নিজেকে ফাঁকি দেওয়া হয়। মাটির খাতায় যখন দীর্ঘকাল কেবল খরচের অঙ্কই দেখি, আর জমার বড় একটা দেখতে পাই নে, তখন বুঝতে পারি, দেউলে হতে আর বড় বেশি বাকি নেই।

বক্তা মহাশয় বলেছেন, প্রাচীন কালে পৃথিবীর বড়-বড় সভ্যতা আবির্ভূত হয়ে, আবার নানা বাধা পেয়ে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সভ্যতাগুলির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ জনতাবহুল সহরের প্রাদুর্ভাব হয়েছে; এবং তাতে করে পূর্ব্বে যে মাটিতে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হ'ত, অথচ তা দরিদ্র হ'ত না, সে মাটি সহরে মানুষদের দাবী-দাওয়া সম্পূর্ণরূপে মিটাতে পারল না। এমনি করে সভ্যতাগুলির ক্রমে-ক্রমে পতন হ'তে লাগল। অবশ্য আধুনিক কালে অন্তর্বাণিজ্য হওয়াতে সহরবাসীদের অনেক সুবিধা হয়েছে। এক জায়গাকার মাটি দেউলে হয়ে গেলেও, অন্য যায়গার অতিরিক্ত ফসলের আমদানী হচ্ছে। এমনি করে খাওয়া-দাওয়া স্বচ্ছন্দে চলছে; কিন্তু মাটিকে অবহেলা করলে, মানুষকে নিশ্চয়ই এক দিন কোনোখানে এসে ঠেকতে হবে।

যেমন প্রাণের চক্র আবর্ত্তনের কথা বলা হয়েছে, তেমনি মনেরও চক্র আবর্ত্তন আছে। সেটাকেও অব্যাহত রাখতে হবে, সে কথা মনে রাখা চাই। আমরা সমাজের সন্তান। তার থেকে যে দান গ্রহণ করে মনকে পরিপুষ্ট করছি, তা যদি তদনুরূপ না ফিরিয়ে দিই, তবে খেয়ে-খেয়ে সব নষ্ট করে ফেলব। মানুষের সমাজ কত চিন্তা, কত ত্যাগ, কত তপস্যায় তৈরী; কিন্তু যদি কখনো সমাজে সেই চিন্তা ও ত্যাগের স্রোতের আবর্ত্তন অবরুদ্ধ হয়ে যায়, মানুষের মন যদি নিশ্চেষ্ট হয়ে প্রথার অনুসরণ করে, তাহলে সমাজকে ক্রমাগত সে ফাঁকি দেয়; এবং সে সমাজ কখনো প্রাণবান প্রাণপ্রদ হতে পারে না,—চিত্ত-শক্তির দিক থেকে সে সমাজ দেউলে হতে থাকে। ভারতবর্ষে সমাজের ক্ষেত্রও বিস্তৃত হচ্ছে পল্লীগ্রামে। যদি তার পল্লীসমাজ নূতন চেষ্টা, চিন্তা ও অধ্যবসায়ে না প্রবৃত্ত হয়, তবে তা নির্জীব হয়ে যাবে।

বক্তা মহাশয় বলেছেন যে, ধানের খড় গাড়ী বোঝাই হয়ে গ্রাম থেকে সহরে চলে যাচ্ছে; আর তাতে করে কৃষকের ধানক্ষেত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং সহরের উচ্ছিষ্ট গঙ্গা বেয়ে সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছে বলে, তা মাটির থেকে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের মনের চিন্তা ও চেষ্টা ঠিক এমনি করেই সহরের দিকেই কেবল আকৃষ্ট হচ্ছে বলে, আমাদের পল্লী-সমাজ তার মানসিক প্রাণ ফিরে পাচ্ছে না। যে পল্লীগ্রামের অভিজ্ঞতা আমার আছে, তাতে আমি দেখেছি, সেখানে কি নিরানন্দ বিরাজ করছে। সেখানে যাত্রা, কীর্ত্তন রামায়ণ গান সব লোপ পেয়েছে, কারণ যে লোকেরা তার ব্যবস্থা করত তারা গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছে। তাদের শিক্ষা-দীক্ষা এখন সে পন্থায় চলে না, তার গতি অন্য দিকে। পল্লীবাসীরা আমাদের লব্ধ জ্ঞানের দ্বার প্রাণবান হতে পারছে না; তাদের মানসিক প্রাণ গানে, গল্পে, গাথায় সজীব হয়ে উঠছে না। প্রাণরক্ষার জন্য যে জৈব পদার্থ দরকার, মনের ক্ষেত্রে তা পড়ছে না। প্রাণের সহজ সরল আমোদ-আহ্লাদই হচ্ছে সেই জৈব পদার্থ,—তাদের দ্বারাই চিত্তক্ষেত্র উর্ব্বর হয়। অথচ সহরে যথার্থ সামাজিকতা আমরা পাই নে। সেখানে গলিতে-গলিতে, ঘরে-ঘরে কত ব্যবধানের প্রাচীর তাকে নিরন্তর প্রতিহত করে। সহরের মধ্যে মানুষের স্বাভাবিক আত্মীয়তা-বন্ধন সম্ভবপর হয় না,—গ্রামেই মানবসমাজের প্রাণের বাধাহীন বিকাশ হতে পারে। আজকাল ভদ্রলোকদের পক্ষে গ্রামে যাওয়া না কি কঠিন হয়ে পড়েছে; কারণ, তাঁরা বলেন যে, সেখানে খাওয়া-দাওয়া জোটে না, আর মনের বেঁচে থাকবার মত খোরাক দুষ্প্রাপ্য। অথচ যাঁরা এই অনুযোগ করেন, তাঁরাই গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করাতে, তা মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে।

গ্রামের এই দুর্দ্দশার কথা কেউ ভাল করে ভাবছেন না; আর ভেবে দেখলেও স্পষ্ট আকারে ব্যক্ত করছেন না। কেবল বিদেশীর সঙ্গ ত্যাগ করার মধ্যে বাঁচনের রাস্তা নেই। বাঁচতে হলে পল্লীবাসীদের সহবাস করতে হবে। পল্লীগ্রামে যে কি ভীষণ দুর্গতি প্রশ্রয় পাচ্ছে, তা খুব কম লোকেই জানেন। সেখানে কোন-কোন সম্প্রদায়ের কাছে প্রাচীন ধর্ম্ম এমন বিকৃত, বীভৎস আকার ধারণ করেছে যে, সে সব কথা খুলে বলা যায় না।

এলম্‌হার্ষ্ট সাহেব আজকার বক্তৃতায় প্রশ্ন করেছেন, যে প্রাণরক্ষায় উপায় বিধান কোন্ পথে হওয়া দরকার। আমারও প্রশ্ন এই যে, সামাজিক স্বাস্থ্য ও প্রাণরক্ষার পথ কোন্ দিকে? একটা কথা ভেবে দেখা দরকার যে, গ্রামে যারা মদ খায়, তারা হাড়ি ডোম মুচি প্রভৃতি দরিদ্র শ্রেণীরই লোক। মধ্যবিত্ত লোকেরা দেশী মদ তো খায়ই না, বিলাতি মদও খুব অল্পই খেয়ে থাকে। এর কারণ হচ্ছে যে, দরিদ্র লোকদের মদ খাওয়া দরকার হয়ে পড়ে, তাদের অবসাদ আসে। তারা সারা দিন পরিশ্রম করে। সঙ্গে কাপড়ে বেঁধে যে ভাত নিয়ে যায়, তাই ভিজিয়ে দুপুর বারটা একটার সময় খায়। তার পর ক্ষিদে নিয়ে বাড়ী ফেরে। যখন দেহ-প্রাণে অবসাদ আসে, তখন তা প্রচুর ও ভাল খাদ্যে দূর হতে পারে; কিন্তু তা তাদের জোটে না। এই অভাব পূরণ হয় না বলে, তারা ৩৪ পয়সার ধেনো মদ খায়। তাতে কিছুক্ষণের জন্য অন্ততঃ তারা নিজেদের রাজা-বাদশার মত মনে করে সন্তুষ্ট হয়। তার পর তারা বাড়ী যায়। আচার ও চরিত্রের বিকৃতির মূলেও এই তত্ত্ব।

আমি যে পল্লীর কথা জানি, সেখানে সর্ব্বদা নিরানন্দের আবহাওয়া বইছে; সেখানে মন পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যকর খোরাকের দ্বারা সতেজ হতে পারছে না। কাজেই নানা উত্তেজনা ও দুর্নীতিতে লোকের মন নিযুক্ত

থাকে। মন যদি কথকতা, পূজা, পার্ব্বণ, রামায়ণ-গান প্রভৃতি নিয়ে সচেষ্ট থাকে, তবে তাতে করে তার আনন্দরসের নিত্য যোগান্ হয়; কিন্তু এখন সে সকলের ব্যবস্থা নেই। তাই মন নিরন্তর উপবাসী থাকে; এবং তার ক্লান্তি দূর করবার জন্য মানসিক মত্ততার দরকার হয়ে পড়ে। মনে করবেন না যে, জবরদস্তি করে, ধর্ম্ম উপদেশ দিয়ে, এই উভয়রূপ মদ বন্ধ করা যাবে। চিত্তের মূলদেশে আত্মা যেখানে ক্ষুধিত হয়ে মরতে বসেছে, সেই গোড়াকার দুর্ব্বলতার মধ্যেই যত গলদ রয়েছে; তাই বাইরেও নানা রোগ দেখা দিচ্ছে। পল্লীগ্রাম চিত্ত ও দেহের খাদ্য থেকে আজ বঞ্চিত হয়েছে। সেখানে এই উভয় খাদ্যের সরবরাহ করতে হবে।

অপর দিকে আমরা সহরে অন্যরূপ মত্ততা ও উন্মাদনা নিয়ে আছি। আমাদের এই বিকৃতির কারণ হচ্ছে যে, আমরা দেশের সমগ্র অভাব উপলব্ধি করি না। তাই অল্প পরিসরের মধ্যে, উন্মাদনার আশ্রয়ে, কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে শান্ত করি। উচ্চৈঃস্বরে রাগ করি; ভাষায়, লেখায় বা অন্য আকারে তাকে প্রকাশ করি। কিন্তু আমরা যতক্ষণ যথার্থ ভাবে দেশের লোকের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে না পারব, তাদের জ্ঞানের আলোক বিতরণ না করব, তাদের জন্য প্রাণপণ ব্রত গ্রহণ না করব, পূর্ণ আত্ম-ত্যাগ না করব, ততক্ষণ মনের এই গ্লানি ও অসন্তোষ দূর হবে না। তাই ক্ষুব্ধ কর্ত্তব্য-বুদ্ধিকে প্রশান্ত করবার জন্য আমরা নানা উন্মাদনা নিয়ে থাকি, বক্তৃতা করি, চোখ রাঙাই—আর আমার মত যাঁরা কাব্য-রচনা করতে পারেন, তাঁরা কেউ-কেউ স্বদেশী গান তৈরী করি। অথচ নিজের গ্রামের পঙ্কিলতা দূর হল না; সেখানে চিত্তের ও দেহের খাদ্য-সামগ্রীর ব্যবস্থা হল না। তাই হাড়ি ডোমেরা মদ খেয়ে চলেছে; আর আমাদেরও মত্ততার অন্ত নেই।

কিন্তু এমন ফাঁকি চলবে না। প্রতিদিন আপনাকে দেশে ঢেলে দিতে হবে, পল্লীবাসীদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। আমি একদল ছেলেকে জানি, তারা নন্-কো-অপারেশনের তাড়নায় পল্লীসেবা করতে এসেছিল। যত দিন তাদের কলকাতার সঙ্গে যোগ ছিল, কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল, তত দিন কাজ চলেছিল। তার পর সব বন্ধ হয়ে গেল।

তাঁরা হাড়ি-ডোমের ঘরে কি তেমন করে সমস্ত মন দিয়ে ঢুকতে পেরেছেন? পাড়াগাঁয়ের প্রতি দিনের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে, তাঁরা কি দীর্ঘকাল-সাধ্য উদ্যোগে প্রবৃত্ত হতে পেরেচেন? এতে যে উন্মাদনা নেই, মন লাগে না। কিন্তু কর্ত্তব্য-বুদ্ধির কোনো রূপ খাদ্য ... খাদ্য প্রতি দিন জোগাবার সাধ্য যদি আমাদের না ... ই মত্ততা নিয়ে নিজেদের বীরপুরুষ মহাপুরুষ বলে

মধুর ও সুন্দর,
প্রেমকে গভীর ও মধু
প্রেমের রহস্য জানেন;
তেমনি সর্ব্বত্র বৈরাগ্যে প.
এই প্রেমের মধ্যে কাম.
তা দানব এসে খেতে চাই
জানে না।

আজকাল আমরা সমাজের তিনস্তরে তিন রকমের মদ খাচ্ছি,—সত্যিকারের মদ, দুর্নীতির মানসিক মদ, আর কর্ত্তব্য-বুদ্ধি প্রশান্ত করবার মত মদ। হাড়ি-ডোমদের মধ্যে এক রকম মদ, গ্রামের উচ্চস্তরের মধ্যে আর এক রকম মদ, আর সহরের শিক্ষিত সাধারণের মধ্যেও এক প্রকারের মদ। তার কারণ সমাজে সব দিকেই খাদ্যের জোগানে কম পড়েচে। (শান্তিনিকেতন)

শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এল

বোধন শঙ্খ উঠেছে বাজিয়া মন্দির-তলে আজ;
ছুটেছে ভক্ত পূজার লাগিয়া ফেলিয়া সকল কাজ।
ডাকিছে পূজারী, কে কোথায় আছ, এস গো অর্ঘ্য নিয়া,
সাজাও মায়েরে নূতন করিয়া, যার যাহা কিছু দিয়া।
রিক্ত করিয়া সকল বিত্ত দাও গো চরণে ঢালি;
মুছে ফেল আজি কাঙ্গালিনী মা'র দৈন্যের যত কালি।
লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল জননীর জয় রব,—
দাও দাও আজি মায়ের পূজায়, যার যাহা কিছু সব।
ধনী কেহ দিল কত না রত্ন চরণের তলে আনি;
নারী কেহ দিল খুলি আভরণ কণ্ঠের মালাখানি।
ধন্য ধন্য করিল সকলে দেখিয়া অর্ঘ্যরাশি;
জনতা ঠেলিয়া ভিখারী জনেক দাঁড়াল তথায় আসি।
মলিন বসনে শতেক গ্রন্থি, কঙ্কাল-সার দেহ;
বুঝি কোন দিন দুনিয়ার কেহ করে নি তাহারে স্নেহ।
প্রত্যূষে উঠি ক্লান্ত চরণে দুয়ারে দুয়ারে ফিরি'
তণ্ডুলে তবু ভরে নি আঁচল, আঁধার এসেছে ঘিরি।
সারাদিন পেটে পড়ে নি অন্ন, কিছুই নাহিক ঘরে;
শীর্ণ গণ্ড বাহিয়া তবু সে পুলক অশ্রু ঝরে।
ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলকণা উজাড় করিয়া দিয়া,
কহে, দান মোর লহ গো পূজারি, তৃপ্ত হউক হিয়া।
সোনার থালায় সাজায়ে অমনি চরণে রাখিল আসি.
মুগ্ধ জনতা রহিল চাহিয়া, জননী উঠিল হাসি।

(মাধবী)

কাবুলীওয়ালার দেশে

শ্রীনরেন্দ্র দেব

আফগানিস্থানের মানচিত্র

সপুত্র হাজারা সৈনিক
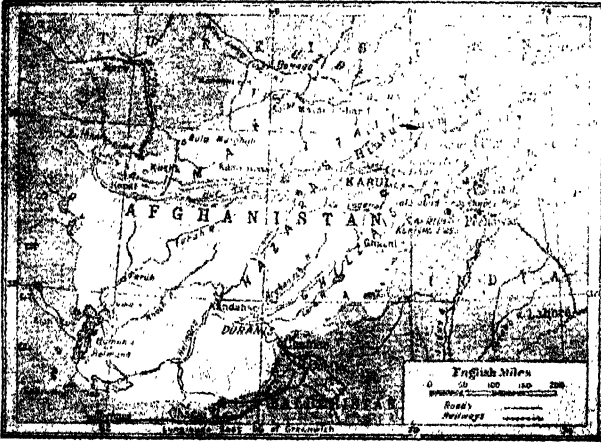
আফ্গান বাহিনী

(আমীরের এই সৈন্য-দলের মধ্যে এরা জনে-জনে মহা যোদ্ধা হ'লেও, এদের মধ্যে কোনও একটা সামরিক শৃঙ্খলা নেই। যে যেমন ভাবে ইচ্ছে দাঁড়িয়েছে, যার যে দিকে ইচ্ছে বন্দুক ধরেছে। বন্দুকগুলোও কোনটাই এক রকমের নয়। সৈন্যদের পোষাকও রকম-রকম। কারুর পায়ে জুতো আছে, কারুর পায়ে নেই; কিন্তু এ সব অভাব সত্ত্বেও এদের মত দুর্দ্ধর্ষ সেনা অতি অল্প জাতের মধ্যেই আছে। কেবল এদের একটা মহৎ দোষ এই যে, একবার যুদ্ধে পরাস্ত হ'লেই এরা চট্ ক'রে হতাশ হ'য়ে পড়ে।

আফগান কর্ম্মকার

(এরা তামা পিতলের লোটা বদ্‌না ডেকৃচি প্রভৃতি গৃহস্থের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ করে।)
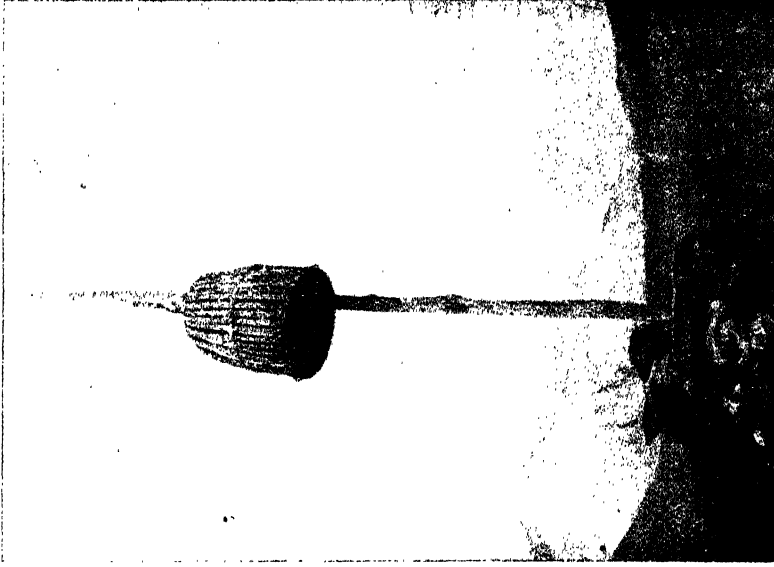
মৃত্যু পিঞ্জর

(কোনও গুরুতর অপরাধীকে চরম দণ্ড দিতে হ'লে আফ্‌গানরা তা'কে এই রকম একটা লোহার খাঁচায় পুরে কোনও নির্জ্জন গিরি-বর্ত্মের ধারে একটা খোঁটা পুঁতে তারই চূড়াগ্রে ঝুলিয়ে দিয়ে যায়। দণ্ডিত ব্যক্তি অল্প দিনের মধ্যেই অনাহারে খাঁচার মধ্যে মরে যায় এবং তার দেহও ক্রমে সেই পিঞ্জরাভ্যন্তরে শুষ্ক হ'য়ে ধূলায় পরিণত হয়।)

বৃদ্ধ পাঠান

(এই বৃদ্ধ আফ্গানের আকৃতি বেশ লক্ষ্য ক'রে দেখলে, হিব্রু গঠন ও চিত্র সাদৃশ্য সহজেই ধরা পড়ে। এই অশীতিপর পাঠান এখনও তার লাঠিতে ভর দিয়ে সারা দিন পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করে ঘুরে বেড়ায়।)
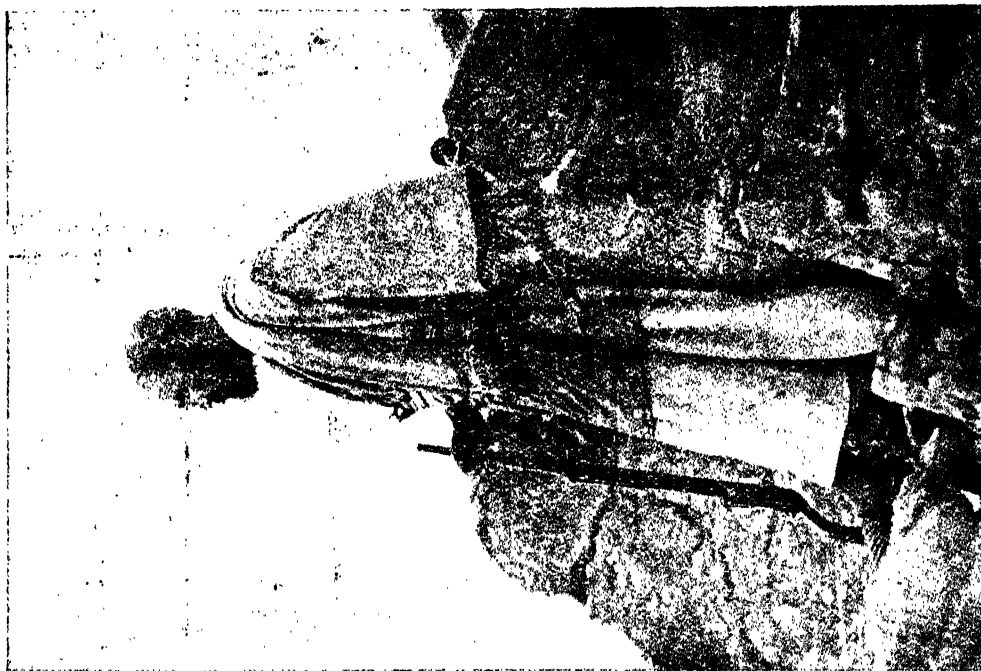
আফ্গান চৌকীদার

(জালালাবাদের পথে আমীরের এই দু'জন চৌকীদার দিন-রাত পাহারা দিচ্ছে। এদের পরিধানে যে পুরাতন পোষাক রয়েছে, সরকার থেকেই ওদের তা দেওয় হয়েছে। আমীর তাঁর চৌকীদার ও সৈন্যদের পুরাতন পরিচ্ছদই কিনে দেন।)

আফ্রিদী প্রহরী।—(ভারত ও আফ্‌গানীস্থানের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে খাইবার গিরিবর্ত্ম ও কোহাটের সান্নিধ্যে এই নিষ্ঠুর হিংস্র পাঠান জাতির বাস। অর্দ্ধ জগতের অধীশ্বর প্রবল প্রতাপশালী ইংরেজকে এরা এখনও উদ্ব্যস্ত ক'রে রেখেছে। এদের জন্য ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অশান্তি এখনও দূর হয় নি। তুচ্ছ কারণে এরা লোককে গুলি করে।)
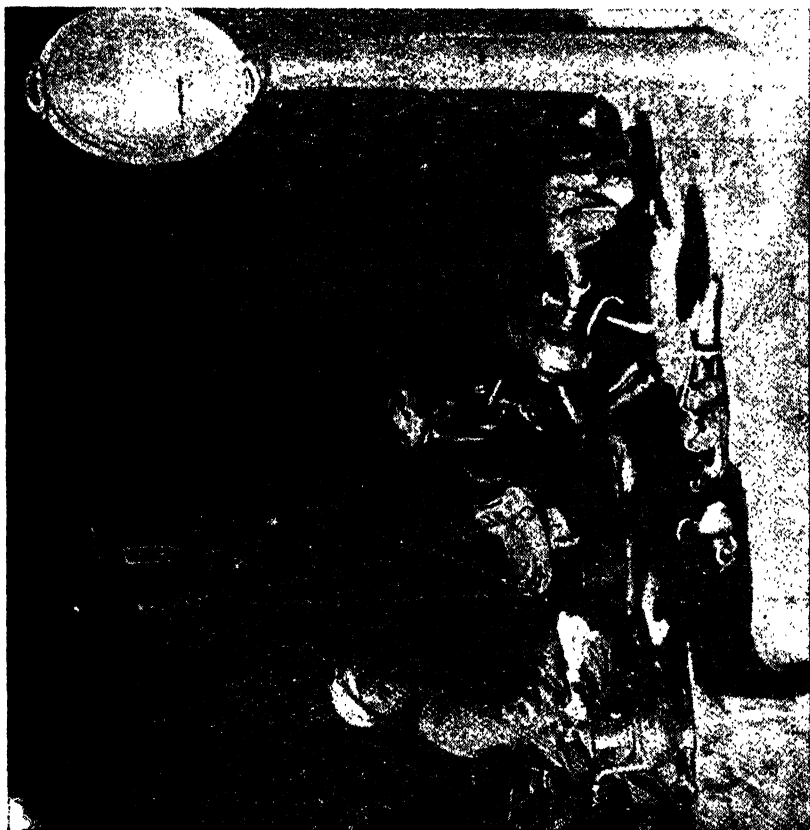
কান্দাহারের কারিগর

(এরা তামা পিতলের সৌখীন তৈজসপত্র নির্ম্মাণ করে। এদের কারুকার্য্য-খচিত ধাতুনির্ম্মিত জিনিস দেখতে অতি সুন্দর।)

বেলুচীর দল

(এরা বোলান গিরি-বর্ত্ম থেকে কোয়েটার বাজারে মালপত্র খরিদ করতে এসেছে। এই বেলুচীরা এক সময় ইংরেজকে শশব্যস্ত করে' তুলেছিল। অনেক দিন ধরে' অনেক কষ্টে ইংরেজ এদের বাগ মানিয়েছে।)

কাবুলের পথে

(ক্যামেরায় ফটো তোলা হ'চ্ছে দেখে, কাবুলের পথে কৌতূহলী আফগানদের এই জনতা জমে আছে। এরা সকলেই ইতর শ্রেণীর লোক। এদের খেলো পোষাক-পরিচ্ছদ দারিদ্র্যের পরিচায়ক।)

আফগান রাজকর্ম্মচারীবৃন্দ

আফগান গুপ্তচর—। এরা ভিক্ষুকের বেশে হাটে-বাজারে ঘুরে, পথে-ঘাটে বসে

কাবুলীওয়ালারা যে কাবুল থেকে আসে, এ কথা সবাই জানে, তবে 'কাবুল' জায়গাটা কোথায় এটা হয়ত' ভূগোলানভিজ্ঞ কেউ কেউ না জানতে পারেন। কাবুল হচ্ছে আফ্‌গানীস্থানের রাজধানী। আফ্‌গানীস্থান নাম শুনেই অনেকে বুঝ্‌তে পারবেন যে সেটা আফ্‌গানদের দেশ। 'আফ্‌গান্' কথাটার উৎপত্তি ফার্শী থেকে, মানে হচ্ছে উচ্চভূমি বা পার্ব্বত্যদেশ! এই দেশটা ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম কোণের ওপারে। তার একদিকে ভারতের পার্ব্বত্য সীমান্ত একদিকে বেলুচিস্থানের মরুভূমি, একদিকে পারস্যদেশ, আর একদিকে তুর্কীস্থান। এই আফ্‌গানিস্থানের ভিতর দিয়েই বহিশক্তি এসে বার বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে গেছে। নাদীরশা, আমেদ খাঁ, তৈমুর এই পথেই এসে এদেশে হানা দিয়েছিল।

কাবুলীওয়ালার চেহারার সঙ্গে এদেশের লোকের পরিচয়

আফ্‌গান যুবকদ্বয়

(এরা পাহাড়ের অধিবাসী দরিদ্র গৃহস্থ-সন্তান। ছিন্ন বস্ত্র-পরিহিত হ'লেও এদের সুস্থ সবল সুগঠিত দেহের সৌন্দর্য্য দৃষ্টিকে মুগ্ধ করে দেয়। ধনী অভিজাত বংশের যুবকদের আকৃতিতে এ লাবণ্যটুকু দেখা যায় না। দেহের উপর অপরিমিত অত্যাচারে তাদের চোখে-মুখে একটা কদর্য্য ছাপ এঁকে দিয়ে যায়।)

কাবুলীর সখের পাখী

(আফ্‌গানরা অনেকে সখ করে বাজপাখী পোষে। বাজের লড়াই, বাজের খেলা তাদের একটা আমোদের অঙ্গ। শিখেরা অনেকে আফ্‌গানদের কাছে বাজপাখী বেচে জীবিকা অর্জ্জন করে।)

আছে সুতরাং সেই শালপ্রাংশু, বৃষস্কন্ধ, দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, বিশাল বীরত্বব্যঞ্জক, সুগঠিত, সুন্দর অথচ ভীষণ মূর্ত্তির সবিশেষ বর্ণনা অনাবশ্যক। তাদের সেই ঢিলে পায়জামা, ঝল্‌ঝলে পিরাণ এবং কারুকার্য্য-খচিত গরম ফতুয়া-আঁটা পোষাক সকলেই দেখেছেন; কিন্তু এই দেশটার ঘনিষ্ঠ পরিচয় বোধ হয় অনেকেরই অবিদিত। কাবুলীওয়ালারা সকলেই ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী। জাতি হিসাবে তাদের মধ্যে যেরূপ একটা প্রবল একতা দেখ্‌তে পাওয়া যায়, এমন আর অন্য কোনও দেশে বিরল। অথচ ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কোনও বাদ-বিসম্বাদে পরস্পরের প্রতি অত প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতাও অন্য কোনও জাতের মধ্যে দেখা যায় না। প্রাচীন সভ্যতার সংস্পর্শে এবং ইস্‌লাম অনুশাসনের অধীন হওয়ায় তাদের মধ্যে বীরত্বাভিমান, আতিথেয়তা প্রভৃতি অনেকগুলি সদ্‌গুণের আবির্ভাব হ'য়েছে; কিন্তু তবুও যখন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে

আফ্‌গান সুন্দরী

(যে দেশের পুরুষ এত সুন্দর, সেখানে রমণীরাও যে অপরূপ সুন্দরী হবে, এ কথা বলাই বাহুল্য। তবে সেই রূপকে তারা অলঙ্কারের ভারে অনেকটা সঙ্কুচিত করে' ফেলে। প্রকাণ্ড এক নাকছাবি এবং তার চেয়েও বড় আংটী, মণিবন্ধ-জোড়া বলয়-কঙ্কণ এবং অতিরিক্ত ভারি কণ্ঠহার যেন তাদের কমনীয় সৌন্দর্য্যকে আড়ষ্ট করে রাখে। মেহদীমাখা টুক্‌টুকে পায়ে জরীর নাগরা জুতো, পরিধানে পায়জামা, পেশওয়াজ, উড়্‌নী ও উড়্‌না তাদের দীর্ঘ ঋজু সুশ্রী সুকান্ত অঙ্গে অতি সুন্দর মানায়। স্ত্রীলোকেরা সকলেই পর্দ্দানশীন; সুতরাং ভাগ্যবান ছাড়া সহজে কেউ তাদের দেখতে পায় না। এত সাবধানতা সত্ত্বেও কিন্তু আফ্‌গান হারেমে পাপ ও ব্যাভিচারের স্রোত কোনও দিনই প্রতিহত হয় নি।)

কাবুলী সওদাগর
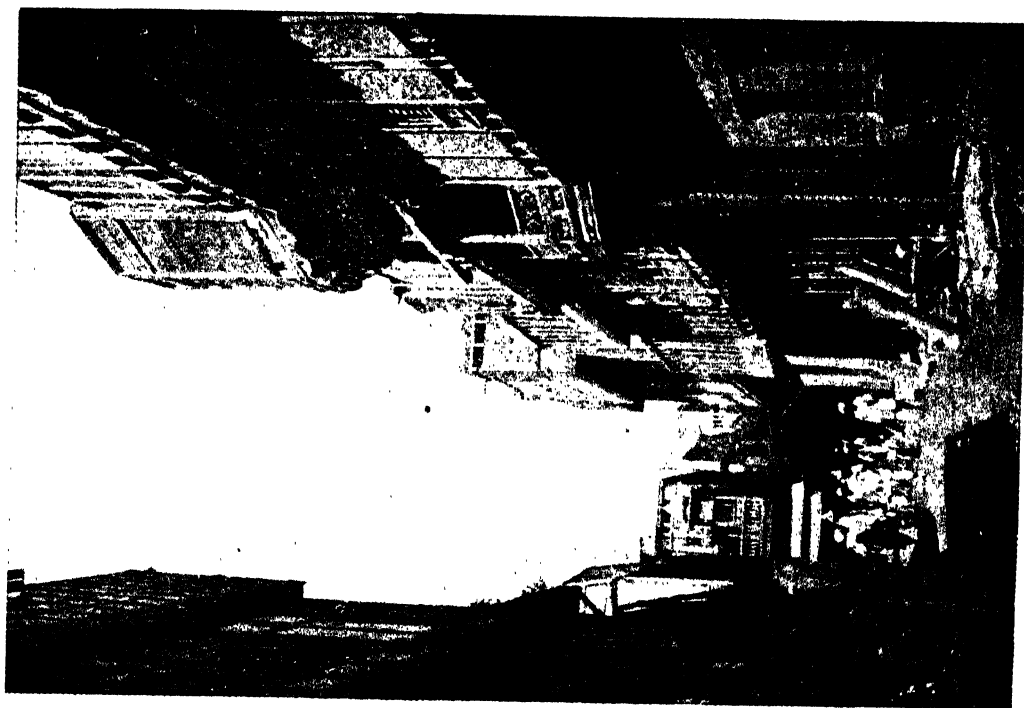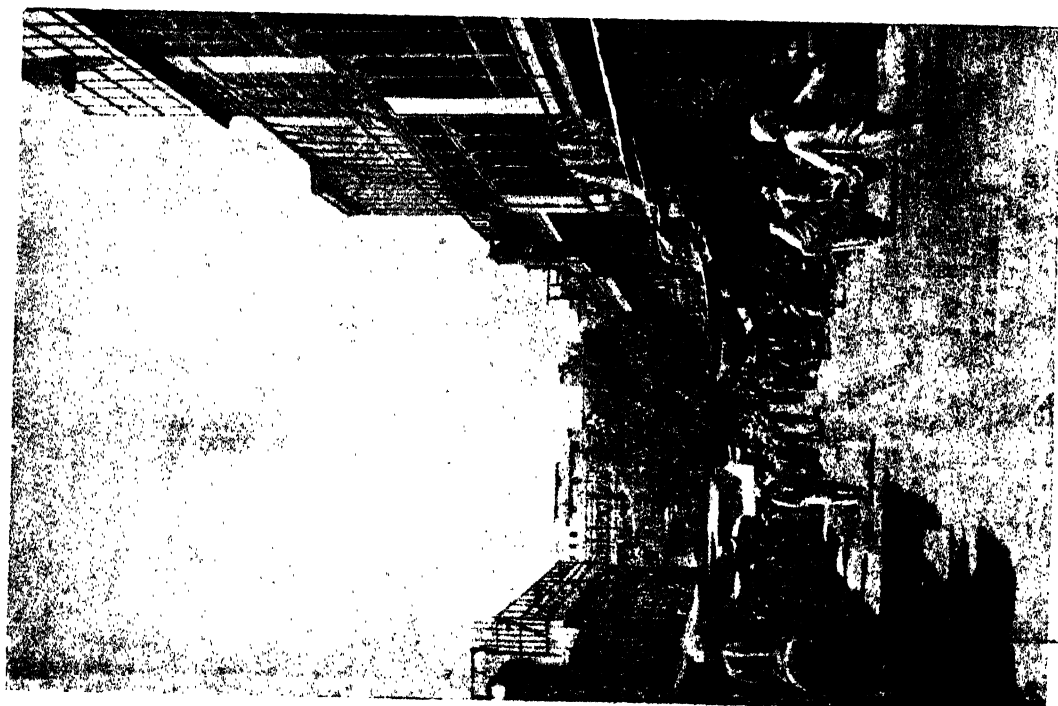
গজ্নী সহরের রাজপথ

হিরাট সহরের রাজপথ

সিংহাসনের অধিকার নিয়ে দেশের লোকের মধ্যে দলাদলি বেধে যায়, তখন একদল তাদের বিপক্ষদলকে জব্দ করবার জন্যে এমন কোনও অন্যায়, এমন কোনও নিষ্ঠুরতা, এমন কোনও অত্যাচার, এমন কোনও বিশ্বাসঘাতকতা নেই যা বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হ'য়ে অনায়াসে না ক'রতে পারে! এইখানে তাদের সেই আদিমকালের বর্ব্বরতা যেন তার ভয়াল হিংস্রমূর্ত্তি ধারণ ক'রে তাণ্ডব নৃত্য ক'রতে থাকে। আবার শান্তির দিনে তাদের মত ভদ্র

সুসজ্জিত আফ্রিদী যোদ্ধাগণ

বোলান গিরিবর্ত্ম
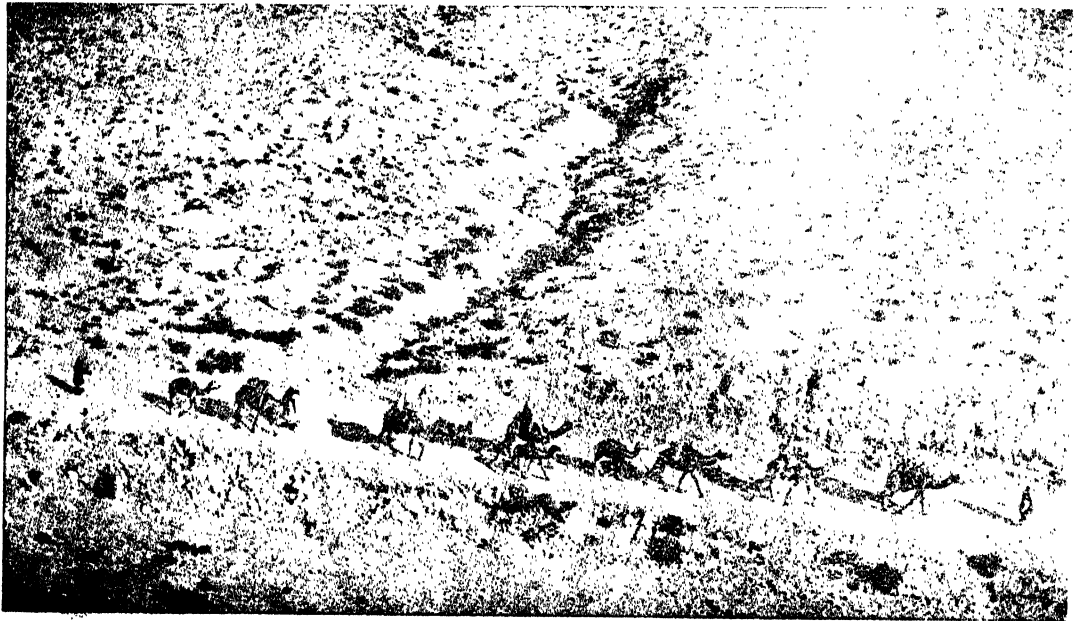
(উটের পিঠে মাল বোঝাই দিয়ে এই পার্ব্বত্য পথে আফগান ব্যবসায়ীরা বহু কষ্টে ভারতে যাতায়াত করে।)

শিষ্ট আত্মসম্মানজ্ঞানী দাস দাসী ও পরিচারকবর্গের প্রতি স্নেহপরায়ণ প্রভু বড় একটা দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।

খাস্ আফগানীস্থানের এই যে সব কাবুলীওয়ালা এদের সঙ্গে আফগানীস্থান ও ভারতবর্ষের মধ্যবর্ত্তী সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসীদের অনেক প্রভেদ। মোমান্দ, আফ্রিদী, ওয়াজিরী এদের অনেকেই আফ্‌গান্ বলে ভুল করেন; কিন্তু এরা প্রকৃত পক্ষে ওদের কেউ নয়। এরা অনেক কালের পুরাণো জাত বটে, কিন্তু এখনও বর্ব্বরতার দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয় নি। ভারত বা আফ্‌গানীস্থান কেউ কোনও দিন এদের জয় করতে পারেনি। এরা সকলেই স্ব স্ব প্রধান।

আফগানীস্থানের কোনও সমুদ্রবন্দর নেই, কারণ এই উচ্চ পার্ব্বত্য প্রদেশ সমুদ্রের নিকট হ'তে বহুদূরে। দৃষ্টিপথে কেবল আকাশস্পর্শী হিন্দুকুশের বিরাট মূর্ত্তি চিরকাল মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। হিন্দুকুশের পাদমূলে অপেক্ষাকৃত নিম্ন পর্ব্বতশ্রেণীর ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে উর্ব্বর ভূমির চিহ্ন দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আফগানীস্থানের তিনভাগের মধ্যে দু'ভাগ একেবারেই পর্ব্বতাকীর্ণ; কেবল অক্ষ, কাবুল, হেলমুন্দ্ এবং হার-ই-রুদ এই কয়টী প্রধান প্রধান নদীর বিস্তৃত উপত্যকা উর্ব্বর শস্যক্ষেত্রে সম্পদশালী। পার্ব্বত্য আফগানীস্থানের এই দুর্লভ শস্যক্ষেত্রে জল সরবরাহের জন্য যে চমৎকার ব্যবস্থা করা আছে, তা দেখ্‌লে মনে হয় যে স্থাপত্য-বিজ্ঞানে এই বর্ব্বর জাতি কোনও দিন কাহারও অপেক্ষা হীন ছিল না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ওই জংলী কাবুলীরা বহুকাল পূর্ব্বেই কেমন ক'রে নদীর সমস্ত জলটুকু ক্ষেতের মধ্যে ছড়িয়ে যেতে পারে, তার উপায় অবগত ছিল। পর্ব্বতের অভ্যন্তরস্থ নালার মধ্যে সঞ্চিত জল কি কৌশলে মৃত্তিকাগর্ভস্থ সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে ক্ষেতের মধ্যে গিয়ে পড়তে পারে, সেই প্রকার সুড়ঙ্গ কাটারও সন্ধান জান্‌তো।

বসন্তকালে উত্তর আফগানীস্থান একেবারে সবুজের শোভায় শ্যামল হ'য়ে ওঠে! নদীনালা আর খালের পাড় দিয়ে যে অসংখ্য পথ চলে গেছে, তার দু'ধারের তরুলতা ফলে ফুলে বিকশিত হয়ে ওঠে! আর তারই সুগন্ধে ফুরফুরে বাতাস ভরে উঠে দিগ্‌দিগন্ত আমোদিত করে তোলে! গ্রীষ্মারম্ভের প্রভাত বেলায় কুহেলী আচ্ছন্ন পর্ব্বতশ্রেণীর অস্পষ্ট ছায়া এবং তারই গড়ানে বুকের উপর প্রতিষ্ঠিত গ্রামগুলির ক্ষীণরেখা ছায়া-চিত্রের মত প্রতিভাত হয়; আবার প্রচণ্ড শীতের দিনে যখন আশেপাশের পর্ব্বত-চূড়া বরফ ও তুষারাবৃত হ'য়ে হিমানী-কিরীট পরিশোভিত শুভ্র সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে, তখন ভূস্বর্গ কাশ্মীরের চেয়ে তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য একটুও কম বলে মনে হয় না।

কাবুল-নদী-বিধৌত প্রদেশে যারা বাস ক'রে, তাদের মধ্যে কাফীর জাতটাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খৃঃ পূঃ তিন শতাব্দী থেকে তারা আফ্‌গানীস্থানের সান্নিধ্যে বসবাস ক'রছে। তাদের বাসভূমির নাম কাফিরীস্থান; তবে জাতি হিসাবে তারা এখন প্রায় ধ্বংস হয়ে এসেছে, খাঁটি কাফীর আর অতি অল্প মাত্রই অবশিষ্ট আছে। হিন্দুকুশ পাহাড়ের দুধারেই এদের কিছু কিছু দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কাফিরীস্থান আফ্‌গানীস্থানের অন্তর্ভুক্ত হলেও আফ্‌গানরা তাদের এই দুর্দ্ধর্ষতর পাহাড়ী প্রতিবেশীদের উপর প্রভুত্ব করবার দুঃসাহস মনের কোণেও স্থান দেয় না। তারা তাদের দুর্ভেদ্য গিরিদুর্গ আশ্রয় করে নির্ব্বিঘ্নে স্বাধীনভাবে আফগানীস্থানের বুকের উপর বাস ক'রছে। গ্রীকসম্রাট আলেকজান্দার যখন ভারত-বিজয়ে অগ্রসর হয়ে আফগানী-স্থানের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন এই কাফীররা তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য ক'রেছিল।

কাফিরীস্থানের উত্তরে অক্ষ নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের নাম বাদাকৃশান। এই বাদাকৃশানই যে ভূতপূর্ব্ব গ্রীকরাজ্য ব্যাক্‌ট্রিয়া সেটা ঐতিহাসিকেরা প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন। এই ব্যাক্‌ট্রিয়ার, রাজধানী বাল্‌খ্ সহরের ভিত্তিমূলে যে সব প্রমাণ মৃত্তিকাশায়ী হ'য়ে রয়েছে, তাকে মৃত্তিকার গহ্বর থেকে টেনে বার ক'রলে হয়ত এখনও প্রমাণ হয়ে যেতে পারে যে, এই সহরটাই হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে পুরাতন।

কাফিরীস্থান আর বাদাকৃশানের পরও আফগানীস্থানের কতকটা অংশ চলে গেছে একেবারে পামীর ও চীন সীমান্ত পর্য্যন্ত। এই প্রদেশের নাম ওয়াক্কান। এখানকার অধিবাসীরা মিশ্রজাত। কতক কীরগীজ নোমাদ, কতক প্রাচীন পারস্য জাতির অন্তর্ভুক্ত। তারপরই আফ্‌গান তুর্কীস্থান। এখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশই তুরস্ক জাতির শাখা। এরা যেমন চাষের কাজে কোদাল পাড়তে

মজবুত, তেমনি লড়ায়ের সময় শর্কীর খোঁচা দিতেও ওস্তাদ। দক্ষিণ আফগানীস্থানেও তুরস্ক জাতির শাখা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তারা খিলিজী নামেই প্রসিদ্ধ, এদের মধ্যে অনেকেই ভারতে এসে বসবাস করছে। আফগানীস্থান ও ভারতের মধ্যে স্থলবাণিজ্য পরিচালনা করাই এদের ব্যবসা। বড় বড় উটের গাড়ী করে মাল বোঝাই দিয়ে এরাই পেশওয়ার থেকে কাবুল পর্য্যন্ত ক্রমাগত যাতায়াত ক'রে। এদের শরীর খুব বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যও অটুট। এদের মত সাহসী যোদ্ধা খুব অল্পই দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

পাহাড়ের ওপর খুব উচুঁতে যারা থাকে, তাদের বলে হাজারা। তারা খাঁটি মোঙ্গলীয়। খুব কষ্টসহিষ্ণু এবং পরিশ্রমী। পাহাড়ের চুড়োর ওপর সেই কন্‌কনে ঠাণ্ডা নির্জ্জন দেশে বাস ক'রে তাদের প্রকৃতি অত্যন্ত কঠোর হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু তাদের শরীরের গঠন অতি সুন্দর। মোঙ্গলীয় জগতের মধ্যে সমস্ত পূর্ব্বাঞ্চলে বোধ হয় এদের মত শক্তিমান জাত আর নেই। এদের গুণের মধ্যে অতিথি-পরায়ণতা আর বন্ধু-বাৎসল্য বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আফগান্‌দের চেয়ে এদের লোকে অনেক বেশি বিশ্বাস করে। প্রবাদ যে সেই চেঙ্গীজ্ খাঁর আমল থেকে এরা এসে আফগানীস্থানে বাস ক'রছে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে তিন চার রকম বিভিন্ন জাত এক ধর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে আফগান নামে আফগানীস্থানে বাস ক'রছে। সকলেই তারা ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী এবং সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য ক'রে দেখ্‌লে দুরাণী-আফ্‌গান প্রভৃতি কয়েকটা শাখার মধ্যে একটু হিব্রু প্রভাব চ'খে প'ড়ে এবং তাদের ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্যেও নানা হিব্রুপদ্ধতি এখনও বিদ্যমান আছে দেখা যায়। পামীর থেকে পারস্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত আফ্‌গানীস্থানের মধ্যে এখনও কোথাও না কোথাও সেই প্রাচীন আর্য্যজাতির বংশধরদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এবং সে দেশের ভাষাও এখনও সেই সেকালের পুস্তু ভাষাই রয়ে গেছে। পুস্তু ভাষাটাকে অনেকটা ফার্শীর প্রাকৃত্ বলা যেতে পারে বোধ হয়।

হিরাট, কাবুল আর কান্দাহার এই তিনটী আফ্‌গানীস্থানের প্রধান সহর একেবারে হুবহু পারস্য দেশের বড় বড় সহরের অনুকরণে স্থাপিত বলা যেতে পারে। দক্ষিণ পশ্চিম আফগানীস্থানে কেবল পাহাড় আর অনুর্ব্বর প্রান্তর। মাঝে মাঝে বালুকাময় মরুভূমিরও অস্তিত্ব আছে। এই মরুভূমির মাঝখানে প্রাচীন কৈয়াণী রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের দু'একটা চিহ্ন এখনও দেখ্‌তে পাওয়া যায়। মরুভূমির তপ্ত ঝড় ও বালির ঢেউ খেয়েও শ্মশানের মাঝখানে প্রেতের মত এক একটা ভাঙাচোরা থাম এখনও দাঁড়িয়ে আছে।

হিরাট সহরটী আর তার চার পাশ অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে একেবারে মনোরম। সহরের বাইরে চাষবাস হয় বটে, তবে খুব বেশি নয়। ফলের জন্যে হিরাট একেবারে বিখ্যাত। হিরাটের তরমুজ আফগানীস্থানের একটা গর্ব্বের জিনিস। মোগল সম্রাট বাবর তাঁর রোজনাম্‌চায় হিরাটের ফলের শত মুখে প্রশংসা ক'রে গেছেন। ফলই হচ্ছে আফগানীস্থানের প্রধান বাণিজ্য-দ্রব্য। ফলের মধ্যে আঙুরটাই সেখানে সবচেয়ে বেশি জন্মায়।

আফগানীস্থানের বিস্তৃতি প্রায় দু'লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার মাইল। লোকসংখ্যা প্রায় তেষট্টি লক্ষ আটত্রিশ হাজার পাঁচশ'। তার মধ্যে বাইশ লক্ষ প্রায় দুরাণী আর খিলজী আফ্‌গান। বাকি হাজারা, আয়মাক্, উজবেগ, তাজিক প্রভৃতি। আফগানীস্থানের শাসন-কার্য্য রাজতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমীর সে দেশের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। আমীর পদটাও সেখানে বংশানুগত। সমস্ত আফগানীস্থান আটটি প্রদেশে বিভক্ত;—কাবুল, হিরাট, কান্দাহার, আফগান তুর্কীস্থান, বাদাকশান, কাফিরীস্থান, কোহিস্থান আর ওয়াক্কান। প্রত্যেক প্রদেশ এক একজন হাকীমের অধীন। তারা আমীরের প্রতিনিধি স্বরূপ প্রত্যেক প্রদেশ শাসন করে। প্রত্যেক হাকীমের অধীনে তাদের নিজস্ব সেনা আছে। আভিজাত্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সেখানে তিনটী শ্রেণী আছে। সর্দ্দার (বংশানুগত খেতাব) খাঁ এবং মোল্লা। মোল্লা খেতাবটা সাধারণতঃ মুসলমান ধর্ম্মযাজক এবং বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ পেয়ে থাকেন। ফৌজদারী মামলার সেখানে দারোগারাই বিচার করে, কেবল দেওয়ানী মকর্দ্দমা কাজীর আদালতে নিষ্পত্তি হয়। কোরাণের নির্দ্দেশ সেখানের ধর্ম্মমন্দিরে এবং বিচারালয়ে সমান ভাবেই প্রতিপালিত হয়। ঘুষ, চুরি, প্রবঞ্চনা তঞ্চকতা এ সবও সেখানে যথেষ্ট চলে।

আমীরের সৈন্যসংখ্যা প্রায় একলক্ষ, তার মধ্যে বিশ হাজার অশ্বারোহী। প্রায় চার পাঁচশ' কামান আছে। আজকাল উড়োজাহাজও তারা সংগ্রহ ক'রেছে। কামান বন্দুক অধিকাংশই বিদেশ থেকে আমদানী ক'রে; কেবল কিছু কিছু এখন সেখানে তৈরী হ'চ্ছে।

চাষারা সেখানে প্রায়ই বছরে দু'দফা করে শস্য পায়। ধান, গম, বার্লি, মটর-শুঁটী, জনার, জই প্রভৃতি সেখানকার প্রধান শস্য। ফলমূলও সেখানে পর্য্যাপ্ত পাওয়া যায়। কতক তারা কাঁচা খায়, কতক পাকা খায়, কতক আবার শুখিয়ে খায়। শুখনো ফলের কারবার সে দেশে খুব বেশী। মাংসর মধ্যে দুম্বা ভেড়ার মাংসটাই সেখানে খুব চলে। দুম্বা আফগানীস্থানে মেলাই পাওয়া যায়। তারা দুম্বার মাংস খায়, দুম্বার চর্ব্বিভরা নধর ল্যাজটি তাদের মাখনের কাজ করে, দুম্বার লোম থেকে তাদের যা কিছু পশমী পোষাক তৈরী হয়; আবার কাবুলী ব্যবসায়ীরা প্রচুর পরিমাণে দুম্বার লোম রপ্তানী ক'রে বেশ দুপয়সা উপার্জ্জনও ক'রে। রেশমী জিনিসও সেখানে যথেষ্ঠ প্রস্তুত হয়। কার্পেট, গাল্‌চে, উট ও ছাগলের লোমে প্রস্তুত দ্রব্যাদি এবং মেষ-চর্ম্মের পরিচ্ছদ প্রভৃতি সেখানকার প্রধান শিল্প-সামগ্রী।

যাতায়াতের জন্য সেখানে এখনও রেলপথ বি[ং] হয়নি, তবে খাইবার বা বোলন গিরিবর্ত্মের ভিতর [দি] কাবুল ও কান্দাহার যাবার পায়ে-হাঁটা পথ আছে ব[টে] হাল্কা দু'চাকার কি চার চাকার গাড়ীও সে পথে যে[তে] পারে। ব্যবসায়ীরা মালপত্র সমস্তই উট কিম্বা ঘোড়[ার] পিঠে বোঝাই দিয়েই এখনও যাতায়াত করে। আ[ফ]গানীস্থানের একটা নদীও জাহাজ চলাফেরা কর[বার] উপযোগী নয়।

কাবুল সহরই হ'চ্ছে আফগানীস্থানের রাজধানী[।] তা ছাড়া কান্দাহার, হিরাট, গাজনী, জালালাবাদ এই কা[টি] ও-দেশের প্রধান সহর। কাবুলি টাকাই সেখানকার প্রচ[লিত] মুদ্রা। ওদের এক টাকা আমাদের আট আনার সমা[ন]। বিভিন্ন দরের তিন রকম রৌপ্যমুদ্রা ছাড়া দুরকম তাম্র মুদ্র[া] আমীরের টাঁকশালে প্রস্তুত হয়। গত ১৯২০ সাল থে[কে] আফগানীস্থানে সর্ব্বপ্রথম 'নোট' প্রচলিত হ'য়েছে। [এক] টাকা থেকে একশ' টাকার পর্য্যন্ত 'নোট' উপস্থিত সেখা[নে] চল্‌ছে। কাবুলীদের সামাজিক আচার-ব্যবহার, রীতি-নী[তি] বিবাহ-পদ্ধতি প্রভৃতি সমস্তই মুসলমান প্রথানুযায়ী প্রব[র্ত্তিত] ব'লে সে সম্বন্ধে আর সবিশেষ বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

খোকা

শ্রীইন্দুমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়

ও তোর, খেয়াল-খুসী, কান্না-হাসি, মানের ফিকির-ফন্দীতে,
ছন্দে আমি পারছি না ক কোনই মতে মন্ দিতে।
ও তুই, ফিরিস্ নেচে নেত্রপথে নৃত্য-চপল কুরঙ্গ;
আমি চেয়েই থাকি অবাক্ হয়ে, উন্মনা মন-বিহঙ্গ।
ও তুই, নবীন্ গোরা, মাখন্-চোরা নগ্ন শিশু-অনঙ্গ;
এই, তুষার-কারা বক্ষটাতে তুল্লি রে তুই তরঙ্গ।
ও তোর, চাঁপার কলি আঙুলগুলি কি যে বলিস্ ইঙ্গিতে;
ছন্দে আমি পারিই না ক কোনই মতে মন্ দিতে।
ওরে ও, দুষ্ট দামাল, সামাল-সামাল, অস্ফুট-বুলি চন্দনা;
ও তোর, উই উঃ উঃ এটা-সেটা বায়না সদা—মন্দ না;

ও তোর, মনোহরণ নটন নাটন—কোন্ নটেশের চেলা তু[ই];
ও তোর, দীপ্ত ভালে বিজয়-টীকা, সব্যসাচী জগজ্জয়ী।
তুই মায়াবী বাহুর ডোরে আজ করেছিস্ বন্দী [মোরে];
কেমন করে বল্ না ওরে, ছন্দে আমি মন্ দি' [তোরে];
মন্দারেরই মাল্য রে তুই চন্দনেরি গন্ধসার;
ও তোর, হাল্কা হাসির ফুল্কি লাগি ঘুচল বিকার অন্ধকার
শোক-মরুভূর ধূসরতায় তুই বহালি জাহ্নবী।
শ্যামলতার স্বপন-ছাওয়া ফুল ফুটালি কোন্ কবি
দেব-দেউলে সন্ধ্যারাতি, সামের গাথা বন্দনায়;
তুই রে কাহার ধ্যানের নিধি মূর্ত্ত প্রভাত-অর্চ্চন[া]

শোক-সংবাদ

৺রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর

আমাদের সর্ব্বজনপ্রিয় রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর আর ইহ জগতে নাই,—অকস্মাৎ হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় তিনি অকালে পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি স্বনামখ্যাত পুরুষ

৺রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর

; তবুও বলিতে হইতেছে তিনি উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন——তিনি পরলোকগত খ্যাতনামা কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরের পুত্র। পিতারই ন্যায় তিনি ও দশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন; দেশের সকল অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের সহিতই রাধাচরণ যোগ ছিল;—সুধু যোগ নহে, তিনি অগ্রণীবৃন্দের ছিলেন। সুদীর্ঘ দুই যুগ তিনি কলিকাতা মিউনি-টীর কমিশনর ছিলেন, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার তিনি লেন। তাঁহার দ্বার সকলের কাছেই অবারিত ছিল; যথাসাধ্য লোকের উপকার করিতেন। তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি; আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পুত্র ও আত্মীয়গণের গভীর শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

৺পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, সুলেখক পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৺পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মহাশয় এতদিন পরে চির-অবসর গ্রহণ করিলেন। শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, তিন ভাই একে একে চলিয়া গিয়াছিলেন—ছিলেন পূর্ণচন্দ্র; তিনিও গেলেন। বঙ্গদর্শনের প্রথম আমলে বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রের ন্যায় তিনিও বঙ্গ-সাহিত্যের সেবায় অগ্রসর হইয়াছিলেন; বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত তাঁহার উপন্যাস 'শৈশব সহচরী' ও ছোট গল্প 'মধুমতীতে' তাঁহার পরিচয় আমরা পাইয়াছিলাম। তাঁহাকে আমরা বঙ্কিমমণ্ডলীর অন্যতম বলিয়া গৌরব অনুভব করিয়া আসিতেছিলাম। এখন তাহাও গেল। আমাদের সান্ত্বনা এই যে, দীর্ঘকাল পরে তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইলেন।

৺অম্বিকাচরণ মজুমদার

এই এক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা দেশের, সুধু বাঙ্গালা দেশেরই বা কেন, ভারতবর্ষের তিনটী জননায়ক পরলোকগত হইলেন। প্রথমে গেলেন রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর; তাহার পর গেলেন মতিলাল ঘোষ, আর সেদিন গেলেন অম্বিকাচরণ মজুমদার। যাঁহারা প্রথম হইতে অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও বাঙ্গালীর মধ্যে কনগ্রেসের স্তম্ভস্বরূপ

৺অম্বিকাচরণ মজুমদার

ছিলেন, স্বর্গগত অম্বিকাচরণ তাঁহাদের অন্যতম। তিনি কলিকাতাবাসী ছিলেন না; তাহার জন্মস্থান ফরিদপুর জেলায় ছিল; তিনি ফরিদপুরেই ওকালতী করিতেন; কিন্তু তাঁহার কর্ম্মস্থান ভারতব্যাপী ছিল; তাই তিনি মফস্বলবাসী হইয়াও লক্ষ্ণৌ কন্‌গ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি সার সুরেন্দ্রনাথের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। রাজনীতি-ক্ষেত্রে মধ্যপন্থী হইলেও তাঁহার দেশানুরাগ অকৃত্রিম ছিল। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ নেতার অভাব সকলেই বিশেষভাবে অনুভব করিবেন। তাঁহার পরলোকগমনে বাঙ্গালা দেশের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবে না।

৺কুমার রমেন্দ্রলাল মিত্র

সর্ব্বজনবরেণ্য, সুবিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক, পরলোক রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র কু রমেন্দ্রলাল মিত্র সেদিন দেহত্যাগ করিয়াছেন। পি ন্যায় ইনিও বিদ্যানুরাগী ছিলেন; ফরাসী, জর্ম্মাণ প্র

৺কুমার রমেন্দ্রলাল মিত্র

বহুভাষায় ইঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। গবর্ণমেণ্ট ১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ইঁহাকে 'কুমার' উপাধি প্রদ করেন। কিছুদিন সরকারী কার্য্য করিবার পর ই অবসরগ্রহণ করিয়া জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সাহিত্য পুরাতত্ত্ব-চর্চ্চায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত আত্ম স্বজনগণের শোকে আমরা সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি

৺যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত

মুঙ্গেরের প্রসিদ্ধ উকিল, 'বেহার চিত্র' 'হিন্দুনারী কর্ত্তব্য' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক, যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত মহাশয়ে অকালে পরলোক-গমনে আমরা বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছি যতীন্দ্র বাবু আমাদের একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহার নিকট অনেক আশা করিয়াছি সকলই অপূর্ণ রাখিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। তাঁহার পরিবা বর্গের এই বিষম শোকে আমরা সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি

৺রায় অবিনাশচন্দ্র সেন বাহাদুর সি-আই-ই

৺রায় অবিনাশচন্দ্র সেন বাহাদুর সি-আই-ই

জয়পুরের পরলোকগত তাজিম-ই-সর্দ্দার রাও বাহাদুর সংসারচন্দ্র সেন সি-আই-ই মহোদয়ের সুযোগ্য পুত্র রায় অবিনাশচন্দ্র ৫২ বৎসর বয়সে অকালে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি জয়পুরের ষ্টেট কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। পরলোকগত সংসার বাবু যেমন জয়পুর রাজ্যের কল্যাণের জন্য জীবনপাত করিয়াছিলেন, অবিনাশ বাবুও তাহাই করিলেন; আমরা জানি রাজকার্য্যে অত্যধিক পরিশ্রম এবং অল্পদিন পূর্ব্বেই জয়পুরের মহারাজের পরলোকগমনের শোকেই তিনি অকালে চলিয়া গেলেন। জয়পুরে সংসারচন্দ্র-অবিনাশচন্দ্রের গৃহ বাঙ্গালী অতিথির জন্য সর্ব্বদাই উন্মুক্ত ছিল। তিনি সুদূর জয়পুরে থাকিয়াও বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁহারই উৎসাহে তাঁহার মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী 'ভারতবর্ষে' মাতৃ-মঙ্গল সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অবিনাশ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান ধৃতিন্দ্রনাথ সেন এখন জয়পুরের একাউনটেণ্ট জেনারেল; পিতার মৃত্যুতে তিনি বংশগত তাজিম-ই-সর্দ্দার পদবীতে অধিষ্ঠিত হইলেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি ধৃতিন্দ্রনাথ পিতার ন্যায় যশস্বী হইয়া বংশের মুখ উজ্জ্বল করিবেন।

উদয়-রহস্য

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

স্নিগ্ধ নীল সিন্ধু-নীরে ধীরে-ধীরে সন্ধ্যা-অন্ধকার
নীরবে নামিল আসি', ধরণীরে ঘেরি চারিধার
কে যেন টানিয়া দিল তিমিরের ঘন যবনিকা,
মিলা'ল অম্বর-ভালে সবিতার সুবর্ণ কণিকা,
সিন্দুরের বিন্দু যথা বিধবার বিবর্ণ ললাটে;
বেচা-কেনা, লেনা-দেনা সারাদিন সংসারের হাটে
কলরবে করি' সমাপন, এ সন্ধ্যায় আপনারে—
ভাবি অসহায়, শ্রদ্ধানত মন তাই বারে-বারে
তাঁরে চায়, কর্ম্ম-অন্তরালে যিনি সঙ্গোপনে থাকি'
ভুলায়ে আলোর ঘোরে দিনে মোরে দিয়াছেন ফাঁকি।

সায়াহ্নে ধরণী ধন্যা, প্রেম-গঙ্গা নামে স্বর্গ হ'তে,
চিত্তের সকল গ্লানি ধুয়ে যায় সে অমৃত-স্রোতে,
কোমল, শ্যামল-শান্ত, সৌম্য-কান্ত, মৌন-অন্ধকারে
প্রাণের নীরব বীণা সঙ্গীহীনা আপনি ঝঙ্কারে;
দিবসের জাগরণ দিবসের পরমায়ু-শেষে
করুণায় যেন, হায়, নামে চোখে সুখ-নিদ্রা বেশে,
এ নিদ্রা অক্ষয় হোক্, শর্ব্বরীর সর্ব্বজয়ী কালো
আমরা বাসিব ভাল,—চাহি না ক দিবসের আলো;
ভঙ্গুর এ জীবনের দুদণ্ডের মিলনের মেলা—
মৃত্যু-সিন্ধু উত্তরিতে কোন্ মূঢ় বাঁধি' তাহে ভেলা
পার হ'বে মহা-পারাবার! এস তবে এস অন্ধকার
আমার সর্ব্বস্ব হ'রে মোরে তুমি কর আপনার।

* * * *

সমগ্র রজনী বিশ্বে সর্ব্বপ্রাণী নিদ্রা অচেতন,
তমসা-নিরাশ চিত্ত-চিত্রপটে সহসা কখন
উদ্ভাসিত সঞ্জীবনী চৈতন্য-রূপিণী মহা দ্যুতি,
—অমনি মানসে জাগে, নব রাগে, কর্ম্ম-অনুভূতি।
ফুটিল উষার আলো, টুটিল সে নিশার স্বপন,
মানব নয়ন মেলে পূর্ব্বাচলে হেরিল তপন!

বাঙ্গলার কলা-শিল্প

(কলিকাতা ফাইন আর্ট সোসাইটীর ২য় বার্ষিক চিত্র-সম্মিলন)

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদার

শিল্পশূন্য দেশ আর জনশূন্য গ্রামের মধ্যে তুলনায় বিচারে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। দেশের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প জিনিসটাকেও সমভাবে উপরে টানিয়া না তুলিলে, সে দেশ যে প্রকৃত উন্নতি হইতে বঞ্চিত হইবে, তাহার উদাহরণ সুপ্রচুর। অনেকের ধারণা, শিল্পটা সৌখীনতার পুষ্টি সাধন করে; কিন্তু বাস্তবিক কথাটা আদৌ ঠিক নয়। অতি সূক্ষ্ম মানসিক অনুভূতিগুলিকে জাগাইয়া দেওয়াই কবি-শিল্পীর কাজ। কিন্তু আমি আজ শিল্প-দর্শন বা কাব্য-কলার কথা না বলিয়া, মানুষের জাতীয় উন্নতির সহায়ক, কল্পনার অতি নিম্নস্তরের জিনিস—ব্যবসা-বাণিজ্যেও শিল্পের যে কি প্রয়োজন, সেই সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলিব। ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতিতে শিল্পের কাজ—রুচির সৃষ্টি করা। একটা দোকানে গায়ের একটা কাপড় কিনিতে গেলে, প্রথমেই দেখি, কোন্ রংটা আমার চোখে লাগে ভাল; চকচকে লাল, বা হলদে, অথবা নীল কাপড়টাতে ঝোঁক না দিয়া, কিনিতে ইচ্ছা হয় ছাই রং বা কালচে সবুজ, বা কাল-লাল, কিম্বা খয়েরি। অর্থাৎ মিশ্র রংএর কাপড়টী হলে পছন্দ হয়। পরবার কাপড়টী কিনিতেও দোকানদারকে বলি, কাল'র নীচে সামান্য একটু লালের রেখা, বা খয়েরী-চিরুণী ইত্যাদি। কই কেহ ত হর-গৌরী গোছ সাদা-হলদে কাপড়টি পছন্দ করলেন না। আরও একটা কথা—বাজারে কুমোর একটা কলসী বেচে পায় ছ' পয়সা, নয় আট পয়সা, বড় জোর চার আনা। কিন্তু সেই মৃত্তিকা-ব্যয়ে ও পরিশ্রম-যোগে কৃষ্ণনগরের একটা পুতুলের দাম ২৲।২।৹। উভয়ের স্থান যথাক্রমে একটী রান্নাঘরের মেজেতে, অন্যটী বাবুর সদর টেবিলের শীর্ষ-প্রদেশে। মূলে—শিল্প। যথাযথ ভাবে সন্নিবিষ্ট রংএর একটা সামান্য মাটীর ফলও গৃহিণীদের আলমারীর সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায়। এখন হয় ত পাঠকগণ বুঝিবেন, বাস্তবিক, ললিতকলা কেবল ধনীর প্রাসাদের জন্য নয়। দেশের উন্নতিকল্পে ললিত-কলার নিত্য-প্রয়োজন আছে। এ ছাড়া, কাঠের কাজে, ধাতু দ্রব্যের কাজে, গৃহ-নির্ম্মাণে, আসবাব গঠনে শিল্পীর সহায়তা অপরিহার্য্য।

বহু দিন ধরিয়া এতবড় কলিকাতা সহরে ললিত-কলার 'জাগ্রত' চেষ্টা হয় নাই; সুপ্ত,লুপ্ত, গুপ্ত ভাবে দুই একজন শিল্পি এ-গলি ও-গলিতে রং-তুলির ব্যবহার করিতেছিলেন। অথচ আজ ৩০।৩২ বছর ধরিয়া বোম্বাই, মান্দ্রাজ, সিমলা প্রভৃতি স্থানে শিল্প-প্রদর্শনী হইয়া আসিতেছে। বাঙ্গলা দেশে গত বৎসরের পূর্ব্বেও শিল্প-দর্শনের সুযোগ বাঙ্গালীর ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। এই গুরু অভাবের নিরাকরণের জন্য গত বৎসর কলিকাতার কয়েকজন শিল্পী প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া, দেশের গণ্য-মান্য লোকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তখন বাস্তবিক মনে হইয়াছিল যাক্ এত দিন পরে বুঝি অন্যান্য দেশের মত বাঙ্গলাও তাহার শিল্প-গৌ[রব] রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। প্রদর্শনীর স্থান নির্দ্দেশ হইল—চৌরং[গী] আর্ট স্কুলের ত্রিতলস্থ কক্ষসমূহ। বিজ্ঞাপনের সাহায্যে বহু চিত্র দে[শ] বিদেশ হইতে আসিয়া কক্ষসকল উজ্জ্বল করিল। ভাল-মন্দ বিচা[রের] অপেক্ষায় উদীয়মান শিল্পিগণ উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন। ইংরেজ, বাঙ্গা[লী,] পার্শী, মারহাটি প্রভৃতি সকল জাতির চিত্র-শিল্পিগণই প্রদর্শনী[তে] যোগদান করিলেন। যে মহৎ অপবাদের কল্যাণে আমরা অ[...] মিথ্যাবাদী, অবিশ্বাসী প্রভৃতি নামের অধিকারী হইয়াছি, [...] সকল গুণই প্রদর্শনীতে দেখা দিল। কর্তৃপক্ষকে চিত্র-শি[ল্প] প্রদর্শনীর দুইটী বিষয়ের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। এক[—] চিত্রগুলিকে যথাযথ-ভাবে, উপযুক্ত আলোতে সন্নিবেশিত কর[া;] আর—তাহাদের ন্যায্য বিচার করা। অবশ্য প্রদর্শনীতে প্রত্যে[ক] চিত্রই উপযুক্ত স্থানে রাখা যাইতে পারে না। তবে চিত্র-প্রদর্শনীর সাধা[রণ] নিয়ম—যে সকল চিত্র গুণে বড় হয়, তাহা দর্শকের আনন্দ বৃদ্ধির জ[ন্য] শ্রেষ্ঠ স্থানেই রাখা হয়। স্থানের ব্যাপার এইরূপ। বিচারকের তালিক[া] দেখা গেল, বিচারক একজন শ্বেতাঙ্গ ও একজন নামজাদা বাঙ্গা[লী] শিল্পী। পরিণাম হইল—শ্বেতাঙ্গ তাঁহার স্বজাতীয়বর্গকে সম্মান দ[ান] করিলেন; এবং বাঙ্গালীও কিঞ্চিৎ মোলায়েম ভাবে তাঁহার প্রিয়-শিল্পি[-] গণের অনুকূল সিদ্ধান্ত করিলেন। এই ভাবে চিত্র প্রদর্শন ও বিচার শে[ষ] হইল। তার পর চিত্রগুলিকে সাধারণের কিনিবার জন্য রা[খা] হইল। ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে একটী অপূর্ব্ব ব্যাপার দৃষ্ট হইল যথা—গণ্যমান্য ব্যক্তিরা যখন প্রদর্শনীতে পদার্পণ করিতে লাগিলে[ন] প্রদর্শনীর কতিপয় কার্য্যকারক তখন তাঁহাদিগকে উপযুক্ত রক[মে] আপ্যায়িত করিয়া, নিজ-নিজ চিত্র সৌষ্ঠবের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন; এবং সর্ব্বশেষে অনুরোধ করিলেন 'গরীবের একখা[না] কিনিলে ভাল হয়' ইত্যাদি। এই গেল প্রথমবারের কীর্ত্তি। উপরিউ[ক্ত] কাণ্ডকারখানায় কয়েকজন শিল্পী, একটু মর্ম্মাহত হইয়া কার্য্য[-] কারকগণকে কারণ জিজ্ঞাসা করায়, সকলে বলিলেন, এগুলি "অতি উঁচুদরের চিত্র; এর ভাব গ্রহণ করিতে না পারিলে কি করিব?"

প্রথম বৎসরের অনিয়মে ভাবিয়াছিলাম স্বকীয় কর্ম্মের জ[ন্য] কর্ম্মচারীগণ হয় ত একটু লজ্জিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন! কিন্তু এবা[র] যাহা দেখিলাম, তাহাতে মনে হইল, প্রদর্শনীর কলেবর যত বৃদ্ধি পাইতে

থাকিবে, শিল্পী ও শিল্পের অপমান ক্রমশঃ তত অধিক পরিমাণে পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

প্রকৃত চিত্র-বিচার সম্পর্কে দু'একটা কথা বলিতেছি। কোন চিত্রকে বিচার করিতে হইলে, প্রথমে তাহার ভাব (original conception) দেখিতে হইবে; অর্থাৎ দেখিতে হইবে, শিল্পীর মৌলিক কল্পনার প্রসার কতদূর। দ্বিতীয়তঃ, ভাবের বিকাশ উপযুক্ত উপাদানের যথার্থ সন্নিবেশ (Harmonising composition); এবং তৃতীয়তঃ, ঐ সন্নিবিষ্ট উপাদানসমূহের নিপুণ ব্যবহার (Technique) শিল্পিবিশেষে উপরোক্ত তিনটী অবস্থার বিভিন্ন ব্যবস্থা হয়; অর্থাৎ কাহারও চিত্রে কাব্যাংশ অধিক দৃষ্ট হয়; কেউ বা চিত্রে বহু উপাদানের বাহুল্য সৃষ্টি করেন; আর কেউ বা বর্ণ-তুলিকার বিচিত্র ব্যবহারে যশঃ অর্জ্জন করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে ভাবুক শিল্পীর স্থান সর্ব্বোচ্চে। তাঁহার চিন্তা জড়জগৎ ছাড়িয়া অনেক উর্দ্ধে অবস্থান করে। তিনি আদর্শ-প্রিয়; (Idealist) অর্থাৎ মায়িক প্রকৃতির অপূর্ণ রূপগুলিকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া মানস-চক্ষে তাহার পূর্ণত্ব প্রদান করাই তাঁহার কাজ। দ্বিতীয় স্তরের শিল্পী জড়-জগতের কোন একটী ঘটনাকে হুবহু রূপটী প্রদান করিতে সদাই ব্যস্ত; অর্থাৎ প্রাণহীন দেহ রচনায় তাহার অপূর্ব্ব কৌশল দৃষ্ট হয়। আর তৃতীয় স্তরের শিল্পীর কাজ বিষয়-রচনা ছাড়িয়া দিয়া কি করিয়া গাছটীকে অবিকল গাছ দাঁড় করান যায়। মানুষের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিতে গিয়া, প্রকৃত চরিত্রের অনুশীলন ছাড়িয়া, তাঁহারা মুখের ক্ষুদ্র ব্রণটী পর্য্যন্ত আঁকিয়া বসিবেন। এবং তাঁহাদেরও চিত্র রচনার শক্তি আছে তাহা তাঁহারা প্রমাণ করেন চিত্রে মোটা-মোটা রংএর স্তর সাজাইয়া। তাহাতে শিব গড়িয়া উঠিল কি অযোধ্যাপতির চেলা গড়িয়া উঠিল কে বলিবে। এই শ্রেণীর শিল্পীই উক্ত প্রদর্শনীতে এই দুই বৎসর যাবৎ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আসিতেছেন। ভাবশূন্য—যুক্তিশূন্য রংএর "কসরত"কে তাঁহারা বলেন 'বড়দরের 'Technique' বা "অঙ্কন-নৈপুণ্য"। ইহার যথার্থ প্রমাণ এই বারের প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ চিত্র। ইহা জনৈক শ্বেতাঙ্গ-অঙ্কিত। চিত্রে মাত্র কয়েকটা পাহাড়ী গাছের গোড়ালী ও কয়েক খণ্ড প্রস্তর দেখান হইয়াছে। স্বীকার করি, চিত্র দেখিতে ভালই হইয়াছে এবং হুবহু স্থানটী বোঝা যায়। কিন্তু চিত্রটী এত নীচ অঙ্গের যে তাহাতে শিল্পীর কবিত্ব-শক্তির চিহ্ন নাই—লোকশিক্ষার নীতি নাই—মাধুর্য্যের রেখাটীও নাই;—আছে কেবল—'অবিকলত্ব'। তবে যে কেহ একটীমাত্র গোলাপ 'অবিকল' অঙ্কিত করিলেই ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী হইয়া দাঁড়াইলেন! কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বর্দ্ধমানের শিল্পী শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র নাগ মহাশয় ১৯১১ সালের বিলাতের 'রয়েল একাডেমী অব আর্ট' নামক চিত্র; পুস্তকদ্বারা প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষদিগকে দেখাইয়া দিয়াছেন, যে প্রদর্শনীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদকপ্রাপ্ত শ্বেতাঙ্গ-অঙ্কিত চিত্রখানা এ, ষ্টোকস্ নামক জনৈক বিলাতের শিল্পীর একখানি চিত্রের হুবহু নকল! এই সকল ব্যাপারের মীমাংসা কে করে? আমার বিবেচনায়, সুবর্ণ-পদকটী নাগ মহাশয়কে দিলে গুণের আদর করা হইত। প্রদর্শনীর বিচারের দিক দিয়া জিজ্ঞাসা করি, প্রদর্শনীতে শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহার 'গঙ্গার ঘাটে' চিত্র অপেক্ষা 'ত্রস্তা'-তে কি অধিক শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে? শ্রীযুক্ত পরেশ মজুমদারের প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি কি শ্বেতাঙ্গ হইতে মূল্যহীন ছিল? শ্রীযুক্ত যামিনীরায়ের 'বনফুল' কি গন্ধহীন ছিল? তাঁহার "বিধবা" কিম্বা 'বন্ধ্যা' চিত্র কি ভাবহীন ছিল? আর কালি-কলমের চিত্রে শ্রীযুক্ত সতীশ সিংহের 'সাজান' ছবি অপেক্ষা যোগ্যতার রেখা-চিত্র কি আর ছিল না? ভারতীয় চিত্র-প্রদর্শনীতে ভারত-বিবর্জ্জিত শ্রীযুক্ত বামারাওএর পদ্ধতিহীন চিত্র-গুলি কি যথার্থ ভারতীয় চিত্রকলা? নানা রংএর সাজান কতগুলি কাগজ বা ক্যান্‌ভাস্ একত্র হইলে কি তাহাকে শিল্প-প্রদর্শনী বলিতে হইবে?

আব-হাওয়া

সভা-সমিতি

গবর্ণমেণ্ট শিক্ষক-সম্মিলনী।—গত ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে হিন্দুস্কুল গৃহে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট-স্কুল শিক্ষক-সম্মিলনীর এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ রায় কুমুদিনী-কান্ত ব্যানার্জ্জি বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রায় ১৫০ জন শিক্ষক এই সম্মিলনীতে যোগদান করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বলেন, ছাত্রগণের শারীরিক স্বাস্থ্য ও ধর্ম্মশিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। সভাপতি মহাশয় বাঙ্গালার জনসাধারণের অত্যন্ত দুরবস্থার কথার উল্লেখ করিয়া বলেন, শিক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তিনি বলেন, প্রতীচীর পক্ষে যাহা কিছু মঙ্গলকর, তাহা গ্রহণ করিয়া আমাদের প্রাচীন জাতীয় আদর্শে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। শিক্ষামন্ত্রী পি, সি মিত্র সভা শেষে শিক্ষকগণকে লক্ষ্য করিয়া একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা প্রদান করেন। আনন্দবাজার পত্রিকা

নিখিলভারত খৃষ্টান বৈঠক।—লক্ষ্ণৌ নগরে গত ২৭শে ডিসেম্বর হইতে মিষ্টার এস, কে, দত্তের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত খৃষ্টান বৈঠকের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অভ্যর্থনা-সভার

সভাপতি শ্রীযুক্ত জে, আর, চিতম্বর তাঁহার অভিভাষণে দেশের বর্ত্তমান অবস্থার উল্লেখ করিয়া বলেন—অসহযোগ আন্দোলন কোন-কোনও দিক দিয়া বিফল হইলেও, মোটের উপর উহা একেবারে মরিয়া যায় নাই এবং উহা মরিবার মতও নহে। মহাত্মা গান্ধির প্রবর্ত্তিত কার্য্য-প্রণালীর মধ্যে মাদকদ্রব্য বর্জ্জন, অস্পৃশ্যতা পরিহার, শিক্ষা-বিস্তার প্রভৃতি বিষয়ে খৃষ্টানগণেরও সম্পূর্ণ সহানুভূতি বর্ত্তমান। তিনি জোর করিয়া বলেন যে, দেশীয় খৃষ্টানগণকেও এই আন্দোলনে যোগদান করিতে হইবে, অন্যান্য স্বদেশ প্রেমিকদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে হইবে। অন্যথায় খৃষ্টানগণ দেশের সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হইবে। খৃষ্টান সমিতির যে সব শাখা-প্রশাখা আছে, সেগুলিকে জীবন্ত করিয়া তুলিতে হইবে। তিনি বলেন খৃষ্টান যুবকগণের জীবন এমন ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে যে, তাহারা যেন ভাবী জীবনে বুঝিতে পারে যে, দেশমাতৃকার সেবার মত এমন গৌরবময় কার্য্য আর নাই।

সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে বলেন, একদিক দিয়া বিচার করিতে গেলে মহাত্মা গান্ধিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় খৃষ্টান বলা চলে। তিনি যে অহিংস নীতির প্রচার করিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ খৃষ্টানধর্ম্ম-সঙ্গত এবং উহাই নব্য বাঙ্গালীর বিপ্লব আন্দোলনকে প্রতিহত করিয়াছে। তাঁহার মতে মহাত্মা গান্ধিকে অবিলম্বে কারামুক্ত করাই সমস্ত সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান অসহযোগ আন্দোলনে খৃষ্টানগণেরও স্থান আছে। বর্ত্তমানে তাহাদিগকে রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগদান করিতেই হইবে। দেশীয় খৃষ্টানদের কার্য্যপ্রণালী কোনও সম্প্রদায়-বিশেষে আবদ্ধ থাকিবে না। খৃষ্টানরা বিশেষভাবে কারাগার সংস্কার ও শিল্পবাণিজ্য-বহুল স্থানে ব্যাভিচার দূর করিবার দিকে বেশী মনোযোগ প্রদান করিবে।

অতঃপর বারদলির সিদ্ধান্তগুলির উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, অস্পৃশ্যতা পরিহার, মাদকদ্রব্য বর্জ্জন, বেগার দূর করা প্রভৃতি বিষয়ে খৃষ্টানগণকেও মনোযোগী হইতে হইবে। সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, তিনি কোনও ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত স্বাতন্ত্র্যের বিরোধী; কারণ উহা সমষ্টিগত জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী।

স্বরাজ সম্বন্ধে তিনি বলেন—ইহা নানা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। সেজন্য নেতাগণকে উহার প্রকৃত সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হইবে।

মাননীয় চিন্তামণিও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন যে, মিষ্টার দত্ত ও চিতম্বরের সঙ্গে তিনি সম্পূর্ণ একমত। সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, এই নীতি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের উপকার না করিয়া বরং অপকারই করে; কেন না উহা দ্বারা তাহারা অপরাপর সম্প্রদায়ের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হয়। পরদিনের কনফারেন্সে কুমারী মায়া দাসী একটী প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, ভারতের গৃহ-শিল্পের যাহাতে উন্নতি হয়, এবং যাহাতে স্বদেশী জিনিস প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সেইজন্য উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। কো-অপারেটিভ সোসাইটী প্রভৃতি গঠন করা আবশ্যক; গবর্ণমেণ্টকে এজন্য অনুরোধ করা হউক। আর যাহাতে ভারতীয় খৃষ্টানদিগের গৃহে-গৃহে চরকা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার জন্যও চেষ্টা করা আবশ্যক। এ প্রস্তাবটী গৃ[illegible] হইয়াছে।

আনন্দবাজার পত্রিকা

পাঞ্জাবে প্রথম মহিলা সম্মিলনী।—বিগত ডিসেম্বর লাহোরে পাঞ্জাব মহিলাদিগের প্রথম সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। প্রায় দুই হাজার ভদ্রমহিলা এই সম্মিলনীতে যোগ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সুদূর মফঃস্বল হইতেও অনেকে আসিয়াছিলে[ন]। গত ৬ই ডিসেম্বর বেলা ১২টার সময় সম্মিলনীর কার্য্য আরম্ভ হ[য়]। মহাত্মা গান্ধীর সহধর্ম্মিণী সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর প্রথ[মে] "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত গীত হয়। সভামণ্ডপের কথা ছাড়িয়া দি[লে] শুধু মণ্ডপের বহির্ভাগেই হাজার হাজার ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলে[ন]। আশে-পাশের ঘরের ছাদে বসিয়া অনেক মহিলাকে ১০॥০ হই[তে] বেলা ৪॥টা পর্য্যন্ত সভার কার্য্যাবলী নিরীক্ষণ করিতে দে[খা] গিয়াছিল। হিন্দিতে 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের পর ঐ গানটি বাংলা[য়] গীত হয়।

অতঃপর লালা লজপত রায়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী রাধা দেবী (অভ্যর্থনা কমিটীর সভাপতি) লিখিত প্রবন্ধ তদীয় কন্যা শ্রীম[তী] পার্ব্বতী দেবী পড়িয়া শুনান। দেশের প্রকৃত অবস্থা ঐ প্রব[ন্ধে] সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। দেশের এ দুর্দ্দিনে তাঁহাদের সম্মিলি[ত] হইবার প্রধান উদ্দেশ্য—আজও যাঁহারা ঘুমাইতেছেন তাঁহাদিগ[কে] জাগ্রত করিয়া দেশের কাজে নিয়োজিত করা। প্রবন্ধের শেষভা[গে] 'নারীধর্ম্ম' সম্বন্ধে সুন্দর ভাবে আলোচনা করা হয় এবং পাঞ্জাব মহিলা[] দিগকে পাঞ্জাবী বীরের ন্যায় স্বরাজ আন্দোলন চালাইবার ভার গ্রহ[ণ] করিতে উৎসাহিত করা হয়।

জ্যোতি[]

নিখিল ভারতের হিন্দু মহাসভা।—গয়ার ৩১[শে] ডিসেম্বর তারিখের তারের খবরে প্রকাশ:—নিখিল ভারতের হি[ন্দু] মহাসভাতে এইরূপ একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, হিন্দু সম্প্রদায়ে[র] বিরুদ্ধে অন্যায় ভাবে এবং গায়ে পড়িয়া যে সকল আক্রমণ চলিতে[ছে] সেই সকল আক্রমণ হইতে হিন্দু সম্প্রদায়কে রক্ষা করিবা[র] উদ্দেশ্যে, সমস্ত গ্রামে ও নগরে হিন্দু মহাসভাসমূহ প্রতিষ্ঠা করা ও হিন্দু স্বেচ্ছাসেবক দলসমূহ গঠন করার ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের বিখ্যাত হিন্দু প্রতিনিধিগণকে লইয়া একটী কমিটী নিযুক্ত করা হউক। এই বিশ্বাসে নিখিল ভারতবর্ষের হিন্দু মহাসভা এই প্রস্তাবটী গ্রাহ্য করিলেন যে, হিন্দু, মুসলমান এবং অন্যান্য সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার একমাত্র প্রকৃত বনিয়াদ এই ভাবে স্থাপিত হইবে; হিন্দু সম্প্রদায় বর্ত্তমান অবস্থায় যে ভাবে আছে, তাহাতে অন্যান্য সম্প্রদায়গুলি দুষ্ট উপাদানসমূহ দ্বারা হিন্দুসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইবার সুযোগ পায়। তাহাতে একতার পথ রুদ্ধ হয়। এই প্রস্তাব অনুযায়ী হিন্দু সভাসমূহ এবং হিন্দু স্বেচ্ছাসেবক দলসমূহ গঠিত হইলে হিন্দু সম্প্রদায় আক্রমণকারীদিগকে বাধা দিয়া প্রতিহত করিতে পারিবে এবং আক্রমণকারীরাও বুঝিতে পারিবে যে, হিন্দু সম্প্রদায়কে আক্রমণ করিলে মহা অসুবিধায় পড়িতে হইবে। তাহা

দ্বারা আক্রমণ রুদ্ধ হইবে, উৎপাত উপদ্রব ও জুলুম বন্ধ হইবে, এবং তাহার ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাবের প্রতিষ্ঠা হইবে।—নায়ক

নিখিল ভারতের ভলাণ্টিয়ারগণের কন্‌ফারেন্স।—গয়াতে নিখিল ভারতের ভলাণ্টিয়ারগণের একটী কন্‌ফারেন্স হইয়াছিল। সেই কনফারেন্সে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু সভাধিষ্ঠাত্রীর পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে ভলাণ্টিয়ারগণের প্রতি নিবেদন জানাইয়া তাঁহাদিগকে আহম্মদাবাদ কংগ্রেসের শপথ মানিয়া কার্য্য করিতে এবং একতার প্রতিষ্ঠা ও অহিংস নীতির জন্য কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। ভারতে ভলাণ্টিয়ারগণের কার্য্যের বন্দোবস্তের জন্য তিনি একই রকমের বিধি গঠন করিতে অনুরোধ করেন। এই উদ্দেশ্যে মিঃ ডি, এ, দেশাই (চেয়ারম্যান), মিঃ নাগেশ্বরী প্রসাদ এবং মিঃ কাসিমকে (সেক্রেটরী) লইয়া একটী কমিটি গঠিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া কার্য্য পরিচালনার জন্য একটী ওয়ার্কিং কমিটিও গঠিত হইয়াছে। সেই কার্য্যপরিচালক সমিতিতে প্রত্যেক প্রদেশ হইতে পনের জন প্রতিনিধি এবং খেলাফৎ কাউন্সিল হইতে একজন প্রতিনিধি গ্রহণ করা হইয়াছে। —নায়ক

ভারতের জাতীয় সঙ্গীত কনফারেন্স।—গত ২৮শে ডিসেম্বর রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় স্বরাজ্যপুরীতে কংগ্রেসের প্যাণ্ডালে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত কনফারেন্সের দ্বিতীয় বাৎসরিক বৈঠক বসিয়াছিল। সেই কনফারেন্সে বহু কংগ্রেস-নেতা উপস্থিত ছিলেন। একটী প্রার্থনার পর গন্ধর্ব্ব বিদ্যালয়ের পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বর কনফারেন্সের উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। কংগ্রেসের উদ্দেশ্যগুলি গানে ঢালিয়া সেই জাতীয় সঙ্গীতের সাহায্যে ভারতের সর্ব্বত্র কংগ্রেসের উদ্দেশ্য প্রচার করা এই কনফারেন্সের একটী উদ্দেশ্য। তৎপরে তিনি পণ্ডিত জগন্নাথ প্রসাদ চতুর্ব্বেদীকে কনফারেন্সের সভাপতির পদ গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করেন। তিনি সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া কনফারেন্সের উদ্দেশ্যের অনুকূলে একটী বক্তৃতা করেন এবং সেই বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, জাতীয় জীবন গঠনের পক্ষে জাতীয় সঙ্গীতের প্রয়োজনীয়তা খুব আছে। মিঃ রাপদিয়ারা এবং ভাগলপুরের বাবু উপেন্দ্রচন্দ্রও জাতীয় জীবনের গঠনে জাতীয় সঙ্গীতের আবশ্যকতার কথা বলেন; এবং কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষকে কংগ্রেসের সকলগুলি প্রস্তাব সঙ্গীতের আকারে সাজাইয়া তাহা জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করিতে অনুরোধ করিয়া এই কনফারেন্সে যে কয়েকটী প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাঁহারা সেই প্রস্তাবগুলির সমর্থন করেন। তাহার পর গান-বাজনার বৈঠক বসে। তাহাতে বিষ্ণু দিগম্বর, পাঞ্জাবের মাষ্টার বিজলী, যুক্তপ্রদেশের মাষ্টার মদন, কলিকাতার সঙ্গীত সঙ্ঘের দল এবং অন্যান্য খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞগণ যোগ দিয়াছিলেন। নায়ক

ভারতীয় মুসলমান শিক্ষা কন্‌ফারেন্স।—আলিগড়ের ২৮শে ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, তৎপূর্ব্বদিন ভারতীয় মুসলমান শিক্ষা কন্‌ফারেন্সের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন হয়। ভূপালের মহামান্যা বেগম সাহেবা ও স্যর মহম্মদ সফী প্রাতঃকালেই সেখানে উপস্থিত হন। তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করা হয়। মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ষ্ট্রাচি-হল প্রতিনিধিবর্গ ও দর্শকবৃন্দে পরিপূরিত হইয়াছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নবাব মোজাম্মিলুল্লা খাঁ সমাগত প্রতিনিধিগণকে সংবর্দ্ধনা করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি যখন তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিতেছিলেন, তখন মহামান্যা বেগম সাহেবা সভায় আসেন এবং দুই ঘণ্টা কাল অবস্থান করেন। সভাপতি মিঞা ফজলে হোসেন উর্দ্দু ভাষায় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তাঁহার অভিভাষণ পাঠের সময়ে ঘনঘন করতালি ও জয়ধ্বনি হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে স্যার সামশুল, হুদা, নবাব স্যর কায়াজ আলি খাঁ, মৌলানা এইচ্ এম্ মালিক, অমৃতসরের নিজামুদ্দীন ও বিহারের ব্যবসায়ী নুরী মিঞার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়।

হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর মুসলমানদের শিক্ষা-বিস্তারকল্পে দানের পরিমাণ বৎসরে আরও ১২ হাজার টাকা বর্দ্ধিত করায়, ভূপালের জেনারেল ওবেদুল্লা খাঁ বাহাদুর দেড় লক্ষ টাকা মুসলমান টেক্‌নিকল শিক্ষার জন্য দেওয়ায় এবং ঐ টেক্‌নিকাল শিক্ষার্থে নবাব মোজাম্মিলুল্লা খাঁ একলক্ষ টাকা দেওয়ায় তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়। তার পর কন্‌ফারেন্সের অনারারি প্রেসিডেণ্ট বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করিলে কন্‌ফারেন্স ভঙ্গ হয়। হিন্দুস্থান

জামিয়াত-উল-উলেমা কন্‌ফারেন্স।—গয়ার ২৮শে ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, জামিয়াত-উল উলেমা কন্‌ফারেন্সে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব পাশ হইয়াছে। (১) স্বাধীনতার জন্য দেশের বিরুদ্ধে মরক্কোবাসীরা যে চেষ্টা করিতেছে তাহাদের সেই চেষ্টায় সহানুভূতি। (২) জেলে রাজনৈতিক কয়েদীদিগকে ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি করিতে দেওয়া হইতেছে কি না তাহার অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি গঠন (৩) ব্রিটিশজাত যাবতীয় দ্রব্য পরিহার (৪) মৌলানা আবুল কালাম আজাদের প্রতি সহানুভূতি ও তাঁহার লিখিত জবানবন্দী বাজেয়াপ্ত করিয়া গবমেণ্ট ইস্‌লাম ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়া গবর্মেণ্টের কার্য্যে ঘৃণা প্রকাশ। গত রাত্রে জামিয়াত-উল-উলেমার একটী বৃহতী সভায়, জামিয়াতে যতগুলি প্রস্তাব পাশ হইয়াছে তাহা পড়িয়া শুনান হয় এবং প্রস্তাবগুলির উদ্দেশ্যও বর্ণনা করা হইয়াছে। জামিয়াত উল-উলেমার বর্ত্তমান অধিবেশন শেষ হইয়াছে। হিন্দুস্থান

নিখিল বঙ্গ কেরাণী সমিতির ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশন—ময়মনসিংহ।—গত ২৮শে ও ২৯শে ডিসেম্বর ময়মনসিংহ জেলা স্কুল হলে বঙ্গীয় কেরাণী সমিতির ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলা হইতে প্রায় ১২৫ জন হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধি অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন।

প্রথমে আবাহন সঙ্গীত, সংস্কৃত, উর্দ্দু স্তোত্র ও বাঙ্গালা কবিতা পাঠের পর ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হপ্‌কিন্‌স্ একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা

দ্বারা সমিতির উদ্বোধন করেন। কেরাণীগণ যে দেশের শাসন-যন্ত্রের এক বিশেষ অংশ এবং তাহাদের সন্তুষ্টির উপর যে গবর্ণমেণ্টের সুনাম অনেকটা নির্ভর করে, তাহা তিনি স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেন। সমিতির পক্ষ হইতে ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের সেরেস্তাদার বাবু রমেশচন্দ্র সেন বি-এ ও ঢাকার কালেক্টারের কনফিডেন্‌সিয়েল ক্লার্ক বাবু দেবেন্দ্রনাথ রায় তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলে, তিনি ও অন্যান্য নিমন্ত্রিত দর্শকগণ সভাস্থান পরিত্যাগ করেন। অতঃপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্থানীয় কালেক্টরীর সেরেস্তাদার বাবু উপেন্দ্রনাথ বসু সমাগত প্রতিনিধিগণকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া, তাঁহাদের অভাব অভিযোগ সংক্ষেপে বর্ণনা করিলে পর, কুমিল্লার জজকোর্টের নাজির বাবু কামিনীকুমার ব্যানার্জ্জির প্রস্তাবে ও আলিপুরের এডিঃ জজের সেরেস্তাদার বাবু নগেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জির সমর্থনে, ভারতীয় আইনসভার সদস্য বর্দ্ধমানের মৌলবী আবুল কাসিম সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার স্বাভাবিক বাগ্মিতা দ্বারা সভার উদ্দেশ্য ও বঙ্গীয় কেরাণীগণের অবস্থা বর্ণনা করেন। তৎপর বিষয় নির্ব্বাচন কমিটীর অধিবেশন হয় এবং রাত্রি প্রায় ১০ টার সময় কার্য্য শেষ হয়।

২৯শে ডিসেম্বর প্রাতে ৮টায় সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হয়। প্রথমেই রাজভক্তিসূচক প্রস্তাব গৃহীত হয়। অন্যান্য প্রস্তাবাবলীর মধ্যে কেরাণীদিগের বর্ত্তমান বেতন বৃদ্ধি যে সমীচীন নহে, তাহা উল্লেখ করিয়া গবর্ণর বাহাদুরের নিকট প্রথম টেলিগ্রাম প্রেরণ করা হয়। শিক্ষাবিভাগের কেরাণীদিগের বেতন বিষয়ে কোনও হুকুম বাহির না হওয়ায় তাহাদের অশেষ কষ্ট হইতেছে বলিয়া, তাহাদের সম্বন্ধেও সত্বর আদেশ প্রদান জন্য গবর্ণরের নিকট দ্বিতীয় টেলিগ্রাম প্রেরণ করা হয়।

ময়মনসিংহ-সমাচার

দেশ

চট্টগ্রাম মেডিকেল স্কুল।—নোয়াখালী উকিল-বাবুরা চট্টগ্রাম মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠার সাহায্যার্থ উক্ত স্কুল কমিটির হস্তে একশত টাকা প্রদান করিয়াছেন। নোয়াখালী জিলা বোর্ড পূর্ব্বোক্ত স্কুলের প্রতিষ্ঠার জন্য ৭০০০৲ সাতহাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

দেশের বাণী

ইন্দোরে নূতন কাপড়ের কল।—ইন্দোরে ইতিপূর্ব্বেই তিনটী কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সেই তিনটী কলে পূরা দমে কার্য্য চলিতেছিল। সম্প্রতি তাহা ছাড়া আরও তিনটী নূতন কাপড়ের কল ইন্দোরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পনের বৎসর পূর্ব্বে ইন্দোরের অধিবাসীগণের ব্যবহারের জন্য বোম্বাই এবং আহম্মদাবাদ হইতে মোটা কাপড় আমদানী করিতে হইত। বর্ত্তমান সময়ে ইন্দোর হইতে বহু কাপড় রপ্তানী হয় এবং পাঞ্জাব ইত্যাদি ভারতের সুদূরবর্ত্তী স্থানসমূহে ইন্দোরের প্রস্তুত বস্ত্র বিক্রয় হয়। এই মিলগুলি হইতে ইন্দোর ষ্টেট প্রায় তের লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় করেন। মিলওয়ালাগণ পক্ষান্তরে কার্য্যের সকল সুবিধা ষ্টেট হইতে প্রাপ্ত হয়েন।

নায়ক

অন্ধ বালিকার বিবাহ।—সম্প্রতি কলিকাতা শোভাবাজারে রসিকলাল ঘোষের গলিতে একটী অন্ধ বালিকার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রটী ই, বি, রেলের স্যানিটারী ইন্সপেক্টার। পাছে সাংসারিক কাজে অসুবিধায় পড়িতে হয়, এই আশঙ্কায় তিনি তাঁহার কনিষ্ঠের সহিত অন্ধ বালিকার কনিষ্ঠা ভগ্নীরও বিবাহ দিয়াছেন। উভয় বিবাহই এক রাত্রে নিষ্পন্ন হইয়াছে। পাত্রপক্ষ বিবাহে পণ গ্রহণও করেন নাই। ইহাদের নিবাস ঢাকা-সোণারঙ্গে। পাত্র দুইটীর জ্যেষ্ঠের নাম—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, কনিষ্ঠের নাম শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত। অন্ধ বালিকার নাম শ্রীমতী আশালতা দেবী—তাঁহার কনিষ্ঠার নাম শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী। এ বিবাহে শৈলেন্দ্র বাবু যে মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বঙ্গীয় যুবকগণের আদর্শস্থানীয়।

২৪-পরগণা বার্ত্তাবহ

মৎস্য ক্ষিয়ান বিদ্যালয়।—কৃষি বিভাগের ডাইরেক্টার মিঃ আর, এস, ফিনলো ফিসারী বিভাগেরও কর্ত্তা। সম্প্রতি তিনি ঢাকা জেলার ফিসারী বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী মিঃ আর বসুকে সঙ্গে লইয়া রোহিতপুর ফিসারী স্কুল পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। মিঃ ফিনলো স্কুলের সফলতা দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। বিশেষতঃ তিনি ব্যবসায়-সংক্রান্ত বিভাগের কার্য্য দেখিয়া বিশেষ পুলকিত হইয়াছেন। ডিষ্ট্রীক্ট ফিসারী অফিসার ঢাকা জিলায় আরও দশটী ফিসারী প্রাইমারী স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ৫টা গভর্ণমেণ্ট সাহায্য পাইতেছে।

২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ

নূতন পান্থনিবাস।—লালগোলার রাজা রায় যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর সি-আই-ই, কাঁদাতে দুটি পান্থনিবাস তৈয়ার করিয়া দিতেছেন। তিনি যে কোম্পানীর কাগজ গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিবেন, তাহার আয় হইতে ঐ দুই পান্থনিবাসের খরচ চলিবে। একটিতে মুসলমান পথিকগণ থাকিবেন। পান্থনিবাসের নাম "রামেন্দ্রসুন্দর পান্থনিবাস"। পরলোকগত শ্রদ্ধাস্পদ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর স্মৃতি রক্ষার জন্য রাজা বাহাদুর এই সৎ কীর্ত্তি করিয়া সকলের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

হিন্দুরঞ্জিকা

ভারতের খনিজ দ্রব্য।—গত ১৯২১ সালে কোটি মণ কয়লা ঝরিয়ার খনি হইতে এবং বায়ান্ন লক্ষ মণ রাণীগঞ্জ খনি হইতে উত্তোলন করা হইয়াছে। ১৯২০ সাল হইতে ঝরিয়াতে শতকরা ৮।০ ভাগ এবং রাণীগঞ্জে ৪।০ ভাগ বেশী কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে। আসামে তিন লক্ষ মণ কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে। উহা পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা কম। মধ্য প্রদেশে পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা শতকরা পয়তালিশ ভাগ অধিক কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে। বিদেশে কয়লা রপ্তানি হয় নাই এবং সমগ্র বৎসর ধরিয়া কয়লার মূল্য বেশী আছে।

গত বৎসর উনত্রিশ হাজার হন্দর অভ্র বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে।

১৯২০ সালে চুয়াল্লিশ হাজার হন্দর রপ্তানি হইয়াছিল; অর্থাৎ—শতকরা চৌত্রিশ ভাগ কমিয়াছে। ইহার ফলে অনেক খনি বন্ধ আছে। বিলাতে অনেক অভ্র মজুত আছে; সেজন্য বর্ত্তমানে আর বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা কম।

সিসা ও রৌপ্যের খনি বর্ম্মার উত্তর শান প্রদেশে আছে। তথা হইতে তেত্রিশ হাজার মণ সিসা এবং পঁয়ত্রিশ লক্ষ আউন্স রৌপ্য পাওয়া গিয়াছে।

মূল্যবান চুণি, পান্না প্রভৃতি প্রস্তর পূর্ব্বাপেক্ষা শতকরা ২৮ ভাগ অধিক উত্তোলিত হইয়াছে; এবং উহার অধিকাংশ ভারতে বিক্রীত হইয়াছে।

দশ হাজার আউন্স স্বর্ণ গত বৎসর উত্তোলিত হইয়াছে; অর্থাৎ—পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা শতকরা ছাব্বিশ ভাগ কম।

সিংহভূম জেলা হইতে বত্রিশ হাজার টন তামা উত্তোলিত হইয়াছে; অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা শতকরা ষোল ভাগ বেশী। প্রতি টনের মূল্য ১১৫৫৲ টাকা ছিল।

লৌহ দুই লক্ষ মণ উত্তোলিত হইয়াছে; অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা একানব্বই ভাগ বেশী। ইহার অধিকাংশ ভাগ সিংহভূম জেলা হইতে। তথায় ঐ লৌহ রপ্তানি করিবার ব্যবস্থা নাই। সেই জন্য খনির নিকটে সকল লৌহ একত্র করা হইতেছে, এবং রেল লাইন তৈয়ারী হইলে চালান দেওয়া হইবে।

জেমশেদপুরের লৌহ দেশীয় রাজ্য হইতে আসে, সেজন্য উহার জন্য উত্তোলিত লৌহ উপরিউক্ত হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নাই। সঞ্জীবনী

মাড়ওয়াড়িদিগের একচেটিয়া ব্যবসায়।—মাড়ওয়াড়িদিগের কারবার এতকাল কলিকাতা এবং বঙ্গের প্রধান প্রধান বাণিজ্য স্থানে ও চা বাগানসমূহেই সীমাবদ্ধ ছিল। এক্ষণে তাহারা মফঃস্বলের প্রায় সমস্ত কারবারই হাত করিয়া ফেলিতেছে। ধান, চাউল, পাট, সর্ব্বপ্রকার ভূষি মাল প্রভৃতির কারবারে তাহারা পূর্ণ উদ্যমের সহিত লাগিয়া গিয়াছে। দেশের সমস্ত রপ্তানীর জিনিষ তাহারা হাত করিয়া ফেলিতেছে। হিমালয়ের তরাই প্রদেশে—অতি দুর্গম স্থানেও গিয়া গোয়ালাদিগকে টাকা দাদন দিয়া সমস্ত ঘৃত একচেটিয়া করিয়া ফেলিয়াছে। তাই দেশের সর্ব্বপ্রকার জিনিস দুর্ম্মূল্য, আর দেশীয় ব্যবসায়ীদের ব্যবসা মাটী। এদেশে প্রধানতঃ তিলি ও সাহা জাতীয় বৈশ্যগণই ব্যবসা-বাণিজ্যে অগ্রণী ছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের অনেকে জমীদার হইয়া পড়িয়াছেন; অনেকে বিলাসিতায় ও আলস্যে অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন; অনেকে সুদখোর মহাজন হইয়া লোকের সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিতেছেন। সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্যে তাঁহাদের শৈথিল্য দৃষ্ট হইতেছে। এই সুযোগে মাড়ওয়ারিগণ অতি সহজে বঙ্গদেশে বহু ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার লাভ করিয়াছে। যাঁহারা বিদেশীয় শোষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছেন, তাঁহারা এই মাড়ওয়ারির শোষণ ব্যাপারে কি বলিতে চান? বাঙ্গালার ব্যবসা-বাণিজ্য সমস্তই মাড়ওয়ারিদিগের হস্তে যাওয়া কি বাঞ্ছনীয়? তদ্দ্বারা কি বঙ্গদেশের সচ্ছলতা রক্ষা পাইবে? অর্থনীতির হিসাবে কি ইহা বাঙ্গালী দেশবাসীর স্বার্থের অনুকূল? নবযুগ

বেঙ্গল রিলিফ কমিটির রিপোর্ট।—কমিটী মেডিক্যাল সাহায্য, অন্ন-বস্ত্র-বিতরণ, বীজশস্য বিতরণ, কুটীর-নির্ম্মাণ ও দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য স্থায়ী সাহায্য—এই পাঁচ ভাগে কাজ করিতেছেন। মেডিক্যাল বিভাগে মৃতদেহগুলির সংকার ও কূপ-সংশোধন এবং চিকিৎসা ইত্যাদি কার্য্য হইয়াছে। অন্ন-বস্ত্র-বিতরণ বিভাগে কমিটী এই পর্য্যন্ত ২৬০০ মণ চাউল এবং ২০ হাজার টাকা ও অন্যান্য জিনিষও বিতরণ করিয়াছেন। কমিটি এক লক্ষেরও উপর বস্ত্র ইত্যাদি পাইয়াছিলেন; তাহাও বিতরিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরও ২৩ হাজার খণ্ড কম্বলও বিতরিত হইয়াছে। বীজ বিতরণ বিভাগে প্রায় ১৫ হাজার টাকার বিভিন্ন শস্যের বীজ ক্রয় করিয়া বিতরিত হইয়াছে। কমিটী ১০ হাজার গৃহ-নির্ম্মাণ করিবেন স্থির করিয়াছেন; কিন্তু উহার মধ্যে৩ হাজার নির্ম্মিত হইতেছে। উহাতে মোট দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় পড়িবে। ইতিমধ্যে ৬০ হাজার টাকা খরচ হইয়াছে; এখনও সপ্তাহে ২০ হাজার টাকা করিয়া খরচ হইবে। এস্থলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ১ হাজার বর্গ মাইল পরিমিত স্থানে মাত্র ১০ হাজার কুটীর নির্ম্মিত হইবে। ইতিপূর্ব্বে আরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বন্যাস্থলে কাজ করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন সকলে বন্যাস্থান পরিত্যাগ করাতে সমস্ত কার্য্যভার কমিটীর উপর পড়িয়াছে।

কমিটি গত ২১শে তারিখ পর্য্যন্ত ৪ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা পাইয়াছেন; উহার মধ্যে ১ লক্ষ ৯২ হাজার খরচ হইয়াছে। গৃহ-নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইলে কমিটির হাতে লক্ষ টাকার অধিক জমা থাকিবে। এই অর্থ দুর্ভিক্ষ-নিবারণ কার্য্যে নিতান্ত অপ্রচুর। কমিটি এই জন্য আরও গৃহনির্ম্মাণের প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও উহাতে হাত দিতে পারিতেছেন না।

মেসার্স এস্ কে দে এণ্ড কোং এবং মিঃ চারুচন্দ্র ঘোষ হিসাব পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত হিসাব পরীক্ষা হইলে উহা প্রকাশিত হইবে।

বর্ত্তমান জানুয়ারী মাসের শেষ পর্য্যন্ত সাহায্য দান কার্য্য চলিবে। উহার পর ৮ হইতে ১২ মাস পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতদের জন্য কাজ করিতে হইবে। —আনন্দবাজার পত্রিকা

সতীদাহের অভিযোগ।—"লীডার" সংবাদ দিতেছেন যে,—কিছুদিন পূর্ব্বে যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত এটোয়া জিলায় একটী গ্রামে একটী সতীদাহ হইয়া গিয়াছে। গঙ্গাদীন আহীর নামক এক ব্যক্তি ১৭।১৮ দিনের অসুখে ২৭ বৎসর বয়সে মারা যায়। তাহার ২৪।২৫ বৎসরের স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন দিবে বলিয়া জানায়। ইহাতে বাটীর লোকজন এবং না প্রতিবেশিগণ স্ত্রীলোকটীকে অনেক করিয়া বোঝায়। সে তখন কিছু বলিয়া চুপ করিয়া গেল। পরে যখন তাহার স্বামীর শবদেহ চিতার উপর উঠান হইবে, তখন সে বিবাহের কনের ন্যায় কাপড় চোড়প

পরিয়া স্বামীর চিতার নিকট আসে এবং মৃত স্বামীর মস্তক কোলের উপর লইয়া সে চিতার উপর বসিয়া থাকে এবং স্বামীর শবদেহের সহিত একই চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করে। এইজন্য ছয় জন লোককে অভিযুক্ত করা হয়। এই ছয় জন আসামীর মধ্যে তিন জন খালাস পাইয়াছে। অন্য তিন প্রতি জনের চারি বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। —আনন্দবাজার পত্রিকা

বিদেশ

আয়র্লণ্ড।—অবস্থা ক্রমেই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। গণতন্ত্রী ৪ জন নেতাকে হত্যা করার পর তাহারা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে ও প্রতিশোধ লইবে বলিতেছে। ফ্রি ষ্টেট গবর্ণমেণ্টের সৈন্য বিভাগের কর্ত্তা ঘোষণা করিয়াছেন—বিনা লাইসেন্সে কেহ অস্ত্র ব্যবহার করিলে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। আবার গণতন্ত্রীরা ঘোষণা করিয়াছে—আইরিশ গবর্ণমেণ্টের শ্রমিক সভ্যেরা সদস্য পদ পরিত্যাগ না করিলে প্রাণ হারাইবেন। আবার ডি, ভেলেরা কোন অজ্ঞাত স্থান হইতে ঘোষণা করিতেছেন, গণতন্ত্রীরা কিছুতেই ভীত হইবেন না—তাঁহারা দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। যতদিন এই শাসনতন্ত্রের বিনাশ না হয় ততদিন শান্তির আশা নাই। —হিন্দুরঞ্জিকা

আয়ারল্যাণ্ডের অবস্থা।—বৃটিশ পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক আয়ালণ্ডের নূতন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার আইন বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সম্রাট বাকিংহাম প্রাসাদে প্রিভী কাউন্সিলের এক বৈঠকে আয়ার্লণ্ডকে স্বাধীন রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করিবার ইস্তাহারে স্বাক্ষর এবং মিঃ টাইমোথী হিলীকে আয়ার্লণ্ডের প্রথম গবর্ণর জেনারাল নিযুক্ত করিয়াছেন। বিগত ৭ই ডিসেম্বর তারিখে মিঃ হিলী দবলিন সহরে গবর্ণর জেনারালের পদ ও শপথ গ্রহণ করেন; তাহার পর আইরিশ প্রতিনিধি সভার বৈঠক বসে। সম্ভবতঃ মিঃ কসগ্রেভই আইরিশ প্রতিনিধি সভা দেল ইরিনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবেন। ইনিই মন্ত্রিসভা ও সিনেট নির্ব্বাচন করিবেন। ফলে আয়ার্লণ্ড এখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইল। কেবল আলষ্টারই এখন ইংলণ্ডের সামিল হইয়া থাকিল। শুনা যাইতেছে স্বয়ং সম্রাটই দবলিনের নূতন পার্লামেণ্ট খুলিবেন। আজ শতাধিক বৎসরব্যাপী উগ্র চেষ্টার পর আইরিশ জাতি স্বাধীনতা লাভ করিল। ১১৭১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের নর্ম্মান রাজা দ্বিতীয় হেনরীর আমলে আয়ার্লণ্ড বিজিত হইয়াছিল, আজ সেই আয়ার্লণ্ড প্রায় পূর্ণ স্বাধীনতা পাইল। অনেকের বিশ্বাস ইতঃপূর্ব্বেই ইংরেজদিগের আয়ার্লণ্ডকে স্বাধীন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল। যাহা হউক, সে বিষয় লইয়া আর আলোচনা বা অনুশোচনা করিয়া লাভ নাই। আয়ার্লণ্ডে এখন দুই দল লোক আছেন; এক দল এই নূতন শাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী, আর এক দল তথায় প্রজাতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াসী। শেষোক্ত দলের নেতা হইতেছেন ডি ভ্যালেরা। ইহারা এখনও আইরিশ ভূমিকে তাহাদের স্বদেশবাসীর রক্তে রঞ্জিত করিতেছে। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে ইহারা দেল ইরিনের মিঃ হেল্স নামধেয় জনৈক সদস্যকে নিহত এবং ডেপুটী মিঃ ওমালীকে আহত করিয়াছে। আইরিশ ফ্রিষ্টেট প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে কাউন্টি ককে দুই শত বিদ্রোহী মিলিত হইয়া এক হাঙ্গামা বাধাইয়াছে। তাহারা একটা সেনাবাস দখল করিয়া লইয়াছে। আইরিশদের এখন শান্ত হওয়াই উচিত। নবযুগ

ইংরাজ-তুরস্কে মিলন।—রেঙ্গুনের ২৮ শে ডিসেম্বর তারিখের সংবাদে প্রকাশ, জনৈক সংবাদপত্রের প্রতিনিধি মহামান্য আগা খাঁর সহিত সাক্ষাৎকারের ফলে তিনি বলিয়াছেন যে, সুলতানকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার উত্তরাধিকারী নিয়োগে কোন দেশের মুসলমানগণের উত্তেজিত হইবার সত্যই কোন কারণ নাই। এঙ্গোরা গবর্মেণ্টের এই কার্য্য সুন্নি-মুসলমান সম্প্রদায়, মরোক্কো, আলজিরিয়া এবং টিউনিস প্রভৃতি বিভিন্ন দেশীয় মুসলমানগণ এবং তাঁহার যতদুর বিশ্বাস ভারতের মুসলমানগণও সমর্থন করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, ইসলাম শক্তি যেরূপ দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে প্রধাবিত হইতেছে, তাহাতে সত্বরই পাশ্চাত্যের বিভিন্ন জাতির সহিত তাহার মিলন হইবে। প্রায় ৫০ বৎসর কাল ধরিয়া অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং ইংরাজের সহিত তুরস্কের মিলন অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। তিনি আশা করেন, ব্রিটিশ জনসাধারণ যে ইসলামের প্রতি অনুকূল, ব্রহ্মদেশ ও ভারতের জনসাধারণ এই মহান সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য চেষ্টা করিবে। হিন্দুস্থান

হাঙ্গেরীর করুণ কাহিনী।—বিগত ইউরোপীয় মহা-সমরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হাঙ্গেরী প্রদেশ অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। সেই মহা আহবের অবসানে মিত্রশক্তিগণ অষ্ট্রিয়াকে একেবারে শক্তিহীন করিয়া ফেলিবার জন্য সেই বিশাল সাম্রাজ্যটীকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ছোট ছোট কতকগুলি বিভিন্ন রাষ্ট্রে পরিণত করিয়াছেন। হাঙ্গেরী অষ্ট্রিয়ান সম্রাটদিগের অধীনে নেহাৎ সুখে ছিল না। তাই এই ভাঙ্গাগড়া তাহার পক্ষে শাপে বর হইল। ক্ষুদ্র হইলেও হাঙ্গেরী স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইল! কিন্তু এই স্বাধীনতার বিনিময়ে হাঙ্গেরীকে যাহা হারাইতে হইয়াছে, তাহার মর্ম্মন্তুদ বেদনায় হাঙ্গেরিয়ানরা আজ মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। জেকোস্লোভাকিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়া নামক যে দুইটী স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে, তাহার উভয়েই হাঙ্গেরীর কিয়দংশ আত্মসাৎ করিয়াছে। এদিকে আবার মিত্রশক্তিগণও রুমানিয়াকে বিগত মহা-সমরের পুরস্কারস্বরূপ হাঙ্গেরীর কিয়দংশ প্রদান করেন। মোটের উপর অদৃষ্টের ফেরে সাড়ে ত্রিশ লক্ষ হাঙ্গেরিয়ানকে তাহাদের স্বজাতি ও সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় আইন কানুনের মধ্যে বসবাস করিতে হইতেছে। অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে সন্ধি করিবার সময় মিত্রশক্তিগণ তাড়াতাড়ি নিজেদের ইচ্ছামত সব ব্যবস্থা ঠিক করিয়া

লইয়াছেন। হাঙ্গেরীর প্রার্থনায় কেহই কর্ণপাত করেন নাই। তারপর যুদ্ধের শেষভাগে রুমানিয়ান, জেক ও সার্ভিয়ানরা হাঙ্গেরী আক্রমণ করিয়া এই হতভাগ্য দেশের ততোধিক হতভাগ্য জাতির সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে। বুডাপেষ্ট হইতে প্রকাশিত 'পেষ্টি হিরলাপ' নামক একখানা পত্রিকা লিখিয়াছেন—বোলশেভিকরা যা কিছু পারিয়াছে, দুহাতে লুঠিয়া লইয়া গিয়াছে। তারপর যা কিছু সৈনিক বাহিনীর কৃপায় উহার কিছুই রক্ষা পায় নাই। যন্ত্রপাতি, শস্যাদি এমন কি গরু ঘোড়া পর্য্যন্ত তাহাদের কবল এড়াইতে পারে নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বে হাঙ্গেরী যে সব রাষ্ট্রে শস্যাদি প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল, তাহারাই অবসর বুঝিয়া ক্ষুৎপিপাসা-খিন্ন হাঙ্গেরিয়াবাসীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া, তাহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া তাহাদিগকে পথে বাহির করিয়া দিয়াছে। অথচ সমগ্র সভ্য জগৎ অম্লানবদনে এই নির্ম্মম বর্ব্বরতা উপেক্ষা করিয়া যাইতেছে। আনন্দবাজার পত্রিকা

আফগানিস্থানের আমীর।—ইটালীর অধিবাসী ডাঃ স্কার্পা বহুদিন আফগানিস্থানে আমীরের সহিত বসবাস করিয়া সম্প্রতি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। আমীর সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা অতিশয় উচ্চ। তিনি বলেন আমীর বিলাসিতা বিষবৎ পরিত্যাগ করেন। অতি সাধারণ ভাবে কাল যাপন করিয়া যাহাতে তাঁহার প্রজাগণের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহাই তাঁহার একমাত্র চেষ্টা। কোন রকম পোষাক পরিচ্ছদের আড়ম্বর বা রাজপ্রাসাদের জাঁকজমক তাঁহার একেবারেই নাই। আমীর মাত্র এক বিবাহ করিয়াছেন। পূর্ব্ব পুরুষগণের ন্যায় বহুবিবাহ তিনি আদৌ পছন্দ করেন না। শোনা যায় পূর্ব্বপুরুষগণের প্রাসাদের পুঞ্জীকৃত বিলাস-সামগ্রী বিক্রয় করতঃ বিক্রয়লব্ধ অর্থদ্বারা দেশে শিক্ষা-বিস্তারের প্রয়াসী হইয়াছেন। তাঁহার স্বদেশপ্রীতিও অসাধারণ। কোন প্রকার বিদেশী দ্রব্য নাকি তিনি ব্যবহার করেন না।

পূর্ব্বে ব্যবহার-বৈষম্য হেতু হিন্দুগণ আফগানিস্থানে যাওয়া অনেক সময়ই পছন্দ করিত না। কিন্তু বর্ত্তমান আমীর হিন্দু ও মুসলমানের প্রতি সমানভাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন। যাহাতে হিন্দুগণ সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার রাজ্যে সুখশান্তিতে বাস করিতে সুবিধা পায়, তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি আছে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম আফগানিস্থানে হিন্দুর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। —মৈমনসিংহ সমাচার

দেনা পাওনা

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(২১)

শ্বশুর জামাতা একত্রে আহারে বসিয়াছিলেন। শাশুড়ী-ঠাকুরাণী দধি ও মিষ্টান্ন আনিতে স্থানান্তরে গেলে রায় মহাশয় কহিলেন, ষোড়শীর সঙ্গে তোমার দেখা হল নির্ম্মল?

নির্ম্মল মুখ না তুলিয়াই কহিল, আজ্ঞে, হাঁ।

কি বলে সে?

এরূপ একটা সাধারণ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন। সে ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিসের সম্বন্ধে?

মন্দিরের সম্বন্ধে। বেটি ভৈরবী-গিরী ছাড়বে, না, চণ্ডীগড়ের নাম পর্য্যন্ত ডোবাবে? দেশের লোক ত আর বাইরের দশজনের কাছে মুখ দেখাতে পারে না এম্‌নি হয়ে উঠেচে।

নির্ম্মল চুপ করিয়া রহিল। চণ্ডীগড়ের ভৈরবীদিগের বিরুদ্ধে এ অপবাদ আবহমান কাল প্রচলিত আছে। এবং, সে জন্য গ্রামের কেহ কোনদিন লজ্জায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে বলিয়া প্রবাদ নাই। স্বয়ং চণ্ডীমাতাও কখনো আপত্তি করিয়াছেন বলিয়া জনশ্রুতি নাই। ইহাদিগের রীতি-নীতি, আচার-অনাচার সমস্তই সে শুনিয়া গিয়াছিল বলিয়া এ সম্বন্ধে মন তাহার নিরপেক্ষ ভাবেই ছিল। বিশেষতঃ, ষোড়শীর অপবাদ সে বিশ্বাস করে নাই, সুতরাং, ইহা মিথ্যা প্রমাণিত হইলেই সে খুসি হইত; কিন্তু এই প্রমাণকেই তাহার ভৈরবী পদের একমাত্র দাবী বলিয়া সে একদিনও গ্রাহ্য করে নাই। তাহার শ্বশুরের ইঙ্গিত নূতনও নয়, ভীষণও নয়, অথচ, এই কয়টা কথাতেই অকস্মাৎ আজ তাহার মন যখন চমকিয়া সজাগ হইয়া উঠিল, তখন নিজের মনের বিক্ষিপ্ততা অনুভব করিয়া সে যথার্থই অবাক হইয়া গেল। তাহাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া রায় মহাশয় পুনশ্চ কহিলেন, কি বল হে?

নির্ভুল ও সময়োপযোগী উত্তর দিবার সময় ও অবস্থা

নির্ম্মলের ছিলনা, সে শুধু পূর্ব্ব কথারই পুনরুক্তি করিয়া কহিল, ভৈরবীদের দুর্নাম ত চিরদিনই আছে।

রায় মহাশয় অস্বীকার করিলেননা, বলিলেন, আছে। কিন্তু দুর্নাম জিনিসটা ত মন্দ, চিরকালের দোহাই দিয়েও মন্দটাকে চিরকাল চালানো চলেনা। কি বল?

কিন্তু সে যে মন্দ এ কি নিশ্চিত প্রমাণিত হয়ে গেছে?

রায় মহাশয় অসংশয়ে কহিলেন, গেছে।

নির্ম্মল ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, কি কোরে গেল! নিশ্চয় প্রমাণ কে দিলে?

রায় মহাশয় বলিলেন, যে দিয়েছে সে আজও দেবে। সন্ধ্যার পরে মন্দিরে যেয়ো, তারপরে বোধ হয় শ্বশুর-জামাই দু'জনকে দু'দিকে দাঁড়িয়ে আর সমস্ত গ্রামের হাসি তামাসা কুড়োতে হবেনা। এই ত তোমার ব্যবসা, অতএব, নিশ্চয় প্রমাণ যে কা'কে বলে সে আমাকে আর তোমাকে বলে দিতে হবেনা।

গৃহিণী পাথরের থালে মিষ্টান্ন ও বাটিতে দধি লইয়া প্রবেশ করিলেন, কহিলেন, কই বাবা, খাচ্চোনা যে?

এই যে খাচ্চি, বলিয়া নির্ম্মল আহারে মনোনিবেশ করিল। কর্ত্তা কহিলেন, নির্ম্মলকে দিয়ে আমার জন্যে একটু দুধ এনে দাও,—শরীরটা ভাল নেই, দই আর খাবোনা।

গৃহিণী প্রস্থান করিলে রায় মহাশয় বলিলেন, অন্ধকার দুর্য্যোগের রাত্রে সে তোমাকে হাতে ধরে বাড়ী পৌঁছে দিয়েছিল, তার জন্যে শুধু তুমি কেন বাবা, আমরা পর্য্যন্ত কৃতজ্ঞ;—যে উপকার করে, তার অপকার করতে মন চায়না—কিন্তু, এ তো আমাদের নিজের কথা নয় নির্ম্মল, এ গ্রামের কথা, সমাজের কথা, দেব-দেবতার কথা,—সুতরাং, যা বড় কর্ত্তব্য তা' আমাকে করতেই হবে।

সে রাত্রের ঘটনা যে অপ্রকাশ নাই তাহা সে শুনিয়াছিল, অথচ, নিজে গোপন করিয়াছিল বলিয়া লজ্জিত মুখে চুপ করিয়া রহিল। কর্ত্তা বলিতে লাগিলেন, দেব-দেবীরা ত কথা কননা, কিন্তু তাঁরা শোধ নেন। গ্রামের ভাল যে কখনো হয়নি, উত্তরোত্তর অবনতি হয়েই আসচে, মনে হয় এও তার একটা কারণ। প্রমাণের কথা বলছিলে, কিন্তু, তুমি যে আসচো এই বা আমরা জানলাম কি করে? তুমি সন্তান-তুল্য, তোমার কাছে সব কথা খুলে বলতে আমার বাধে, কিন্তু না বল্লেও নয়। জমিদার বাবু সে রাত্রে বোধ করি খেয়ে যাবার ফুরসৎ পাননি, ষোড়শী খাবার আনতে ঘরের বাইরে যেতে তাঁর চোখ পড়ল একটা চিঠির টুকরোর পরে। বোধ হয় তোমাকে লিখে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে শেষে হৈমকেই লিখেছিল। সেখানাও আজ দেখতে পাবে, তিনি সকালবেলা আস্‌বার সময় সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন।

নির্ম্মল ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল, বলিল, মিথ্যে কথা। যে নির্লজ্জ নিজে অপরাধী, সেই মাতাল পাজি বদমাইসটার কথা আপনারা বিশ্বাস করেন? হতেই পারেনা।

রায় মহাশয় শুধু একটু মৃদু হাসিলেন। অবিচলিত স্বরে কহিলেন, হতে পারে, এবং হয়েছে। জমিদার লোকটা যে নির্লজ্জ, মাতাল, পাজি, বদমাইস তাও জানি। বোধ হয় আরও ঢের বেশি, নইলে এ কথা মুখে আনতেও পারতনা। ওর নিষ্ঠুরতার অবধি নেই। গ্রামের মঙ্গলের জন্যও এ কাজে হাত দেয়নি, ঠাকুর দেবতাও মানে না। জোর করে মন্দিরে খাসি বলি দিয়ে খেয়েছিল। আবশ্যক হলে ও পাষণ্ড মুরগী শুয়োর এমন কি গো-বধ করেও খেতে পারে।

তবুও তাকে আপনি সাহায্য করতে চান?

না, আমি কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চাই।

নির্ম্মল অনেকক্ষণ স্থির থাকিয়া কহিল, আপনার কাঁটা উঠবে কি না জানিনে, কিন্তু সে নিষ্কণ্টক হবে। দেবীর যে সম্পত্তিটা সে বিক্রী করতে চায়, ষোড়শী ভৈরবী থাকতে তার সুবিধে হবেনা।

রায়মহাশয় কহিলেন, সে গেলেও সুবিধে হবেনা,—আমি আছি।

তিনি আছেন এতবড় ঘটনাটা নির্ম্মল বিস্মৃত হইয়াছিল, তাহার তৎক্ষণাৎ মনে হইল, জমিদারের সুবিধা না হইতে পারে, কিন্তু দেবীরও সুবিধা হইবেনা। তবে সে সুবিধাটা যে কাহার হইবে তাহাও মুখ দিয়া বাহির করিল না।

রায়মহাশয় স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, বাবা নির্ম্মল, তুমি বড় আইন-ব্যবসায়ী, অনেক বোঝ, কিন্তু, সংসারে এসে খালি হাতে আমাকে যখন লড়াই সুরু করতে হয়েছিল, তখন শুধু কেবল বিষয়-সম্পত্তি জমা করেই কাটাইনি,

মাথার ভেতরেও কিছু কিছু সঞ্চয় করে রেখেচি। তোমাকে লোকে বলেচে ওই জমিটুকুর ওপরেই জমিদারের লোভ,—ষোড়শী কড়া মেয়ে, ও থাক্‌তে কিছু হবার নয়, তাই যাহোক একটা কলঙ্ক রটিয়ে তাকে তাড়াতে চায়। আচ্ছা বাবাজী, বীজগাঁর জমিদারের কাছে ওটুকু কতটুকু সম্পত্তি? তার টাকার দরকার, একটা না হলে আর একটা বিক্রী করবে—তার আট্‌কাবে না। কিন্তু যেখানে তার সত্যিকার আট্‌কেচে, সে সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। এই জঙ্গলের মাঝে মাসের পর মাস সে আর পারেনা, সহরের মানুষ সহরে যেতে চায়। নির্ম্মল, হৈমর মত তুমিও আমার ছেলে, তোমাকে বল্‌তে সঙ্কোচ হয়, কিন্তু, ওই ছুঁড়িটার ভালই যদি কর্‌তে চাও ত বলে দিয়ো তার ভয় নেই। চণ্ডীগড়ের ভৈরবীগিরীর মুনাফা বেশি নয়,—যা তার যাবে, জমিদার তার চতুর্গুণ পুষিয়ে দেবে, এ আমি শপথ করে বল্‌তে পারি। সে তাকে কষ্ট দিতেও চায়না,—কষ্ট দেবেও না, দু' নৌকোয় পা' দিয়ে থাক্‌বার অসম্ভব লোভটা যদি সে একবার ত্যাগ করে।

নির্ম্মল নিরুত্তরে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। শ্বশুরকে সে অনেকটা জানিত,—এতটা জানিতনা। এই শ্বশুর ষোড়শীর কল্যাণের পথ যাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন তাহাতে তর্ক করিবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত আর তাহার রহিলনা।

শাশুড়ীর দুধ গরম করিয়া আনিতে বিলম্ব হইল, তিনি ঘরে ঢুকিয়া স্বামীর পাতের কাছে বাটি নামাইয়া রাখিয়া আহারের স্বল্পতার জন্য জামাতাকে মৃদু ভৎর্সনা করিলেন, এবং এই ত্রুটি সংশোধন করিবার ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া অদূরে উপবেশন করিলেন।

কর্ত্তা দুধের বাটি মুখ হইতে নামাইয়া রাখিয়া কহিলেন, কিন্তু মেয়েটার একটা প্রশংসা না করে পারা যায়না,—বেটি বিদ্যের যেন সরস্বতী। জানেনা এমন শাস্ত্রই নেই।

গৃহিণী তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া কহিলেন, তা' আর বল্‌তে। দেখেচ ত, কাজে কর্ম্মে সে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে তোমার শিরোমণি ঠাকুর ভয়ে যেন কেঁচো হয়ে যান। চলে গেলে বুড়োর মুখ সহস্র ধারে ফোটে,—কিন্তু সুমুখে নিন্দে কর্‌বার ভরসা পাননা।

কর্ত্তা কহিলেন, না না নিন্দে করবেন কেন, তিনি বরঞ্চ সুখ্যাতিই করেন।

গৃহিণী নাকের মস্ত নথে একটা নাড়া দিয়া ততখানিই প্রতিবাদ করিলেন। বলিলেন, হাঁ, বুড়ো সেই পাত্র কি না! হিংসেয় ফেটে মরেন, আবার সুখ্যাতি করবেন! মনে নেই সেই অন্তর বোনের প্রাশ্চিত্তের ব্যবস্থা নিয়ে কি কাণ্ডই না দিন কতক করে বেড়ালেন! তা' ছাড়া ছুঁড়ি এদিকে যাই করে থাক্, শোকে দুঃখে, আপদে বিপদে গরিব দুঃখীর এমন মা-বাপও গ্রামে কেউ নেই। যখনি যে কাজেই ডাকো, মুখে হাসিটি যেন লেগে আছে, না বল্‌তে জানে না।

কর্ত্তা খুসি হইলেন না, বলিলেন, হুঁ, সব ভৈরবীই ওসব করে থাকে।

গৃহিণী বলিলেন, সব? কেন, মাতঙ্গী ঠাকরুণকে কি আমি চোখে দেখিনি না কি?

দেখে থাক্‌লেও ভুলে গেছ।

গৃহিণী রাগ করিয়া জবাব দিলেন, ভুলিনি কিছুই। আজও তাঁর কাছে একশ' টাকা পাই,—না বলে উড়িয়ে দিলেন। ষোড়শী কখনো কাউকে ঠকিয়ে খায়নি, মিছে কথাও বলেনি।

কর্ত্তা অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইয়া কহিলেন, না,—যুধিষ্ঠির। এই বলিয়া তিনি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গৃহিণী জামাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আমি ত ভাবি এঁর কল্যাণেই নাতীর মুখ আমরা দেখ্‌তে পেলাম। না বাবা, যে যাই বলুক, ঠক জোচ্চোর সে মেয়ে নয়। তাই ত যখনি শুনতে পেলাম ঠাকুরের পূজো করাটি সে ছেড়ে দিয়েছে, তখনি সন্দেহ হল এ আবার কি! নইলে কারও কথায় আমি সহজে বিশ্বাস করিনি। হৈম ত আজও করেনা।

কর্ত্তা চৌকাটের বাহিরে পা বাড়াইয়াছিলেন, কান খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, বলি তার কল্যাণে ত নাতি পেলে, কিন্তু নাতির কল্যাণে মানস পূজোটি তিনি কেন অস্বীকার করলেন একবার ডেকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারোনা। এই বলিয়া তিনি প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেলেন।

নির্ম্মলের খাওয়া শেষ হইয়াছিল, সেও উঠিয়া দাঁড়াইল; কহিল, ষোড়শীর ওপর থেকে দেখ্‌চি মায়ের ভক্তি আজও একেবারে যায়নি।

না বাবা, মিছে কথা কেন বল্ব, তার মুখখানি মনে হলেই আমার যেন কান্না পায়। এঁরা সকলে মিলে কেন যে তার বিপক্ষে এত লেগেছেন আমি ভেবেই পাইনে।

নির্ম্মল একটুখানি মৃদু হাসিয়া কর্ত্তার খোঁচার অনুসরণ করিয়া কহিল, কিন্তু মা তার মন্ত্রতন্ত্রের বিদ্যের কথাটাও একটু ভেবো—

শাশুড়ী কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, দাসী আসিয়া দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইয়া কহিল, কে একজন জামাই বাবুকে ডাক্তে এসেছে,—বাবু খবর দিতে বল্লেন।

নির্ম্মল হাতমুখ ধুইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল ইতিমধ্যে গ্রামের অনেকেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এবং সন্ধ্যার পরে মন্দিরে যে বৈঠক বসিবে তাহারই আলোচনা সুরু হইয়া গেছে। শিরোমণি মহাশয়ের আজ অমাবস্যার উপবাস, তিনি নির্ম্মলকে ডাকিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং ভায়াকে হঠাৎ চিনিতে পারেন নাই বলিয়া নিজের বৃদ্ধত্বের প্রতি দোষারোপ করিলেন। যে লোকটা থামের পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, সে নমস্কার করিয়া জানাইল যে, ভৈরবীঠাকরুণ অপেক্ষা করিয়া আছেন, তাঁহার সহিত বিশেষ কথা আছে।

নির্ম্মলের হঠাৎ অত্যন্ত লজ্জা করিয়া উঠিল; সে পিছনে না চাহিয়াও স্পষ্ট অনুভব করিল সকলে উৎসুক কৌতুকে তাহার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ইহার অভ্যন্তরে যে গোপন বিদ্রুপ আছে, তাহা তাহাকে অপমানিত করিল; অন্য সময়ে হয়ত সে ইহাকে অত্যন্ত সহজে অবহেলা করিতে পারিত, কিন্তু আজ সে নিজের মধ্যে সে জোর খুজিয়া পাইল না, কিছুতেই মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিল না, চল, আমি যাচ্ছি। বরঞ্চ, যেন লজ্জিত হইয়াই লোকটাকে বলিয়া ফেলিল, বলগে, আমার এখন যাবার সুবিধে হবে না।

শিরোমণি কহিলেন, ওকে জিরোবার একটু সময় দাও তোমরা, কি বল হে? এই বলিয়া তিনি চোখের একটা ইসারা করিয়া অকারণে হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। কেহ বা সে হাসিতে প্রকাশ্যে যোগ দিল, কেহ বা শুধু একটু মুচকিয়া হাসিল। নির্ম্মল সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া ভিতরে যাইতেছিল, শিরোমণি ডাকিয়া কহিলেন, বলি ভায়াকে কি ও বেটি কৌঁসুলি খাড়া করেছে নাকি?

নির্ম্মল উদ্দীপ্ত ক্রোধ দমন করিয়া শান্তভাবে কহিল, মকদ্দমা বাধলে সে কাজ করতে হবে বোধ হয়।

শিরোমণি এ উত্তর আশা করেন নাই, একটু থতমত খাইয়া বলিলেন, তা' যেন করলে, কিন্তু, বলে রাখি ভায়া, এ পুঁটি মাছের প্রাণ নয়, বাঘা-ভাল্কোর সঙ্গে লড়াই,— মকদ্দমা হাইকোর্টে না গড়িয়ে থাম্বেনা, তা নিশ্চয় জেনো।

নির্ম্মল কহিল, মাম্লা-মকদ্দমা কোথায় গিয়ে থামে এ তো আমার জান্বার কথা শিরোমণি মশায়।

শিরোমণি কহিলেন,সে তো বটেই, ভায়া, এ হোল তোমার ব্যবসা, তুমি আর জান্বেনা। কিন্তু, আরও ত ঢের খরচপত্র আছে, সে দেবে কে? এই বলিয়া তিনি মুখ টিপিয়া হাসিলেন। কিন্তু এ হাসিতে এবারে কেহ যোগ দিল না।

নির্ম্মল কহিল, অভাব হলে আমি দেব।

তাহার জবাব শুনিয়া শুধু শিরোমণি নয়, উপস্থিত সকলেই অবাক হইয়া গেলেন, রায় মহাশয় নিজেও ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না; রুক্ষকণ্ঠে বলিলেন, তোমাদের ঠাট্টা-তামাসার সম্পর্ক বটে, কিন্তু শিরোমণি মশায় প্রাচীন এবং সম্মানিত ব্যক্তি,—এ রকম উপহাস করা তোমার সাজে না।

নির্ম্মল চুপ করিয়া রহিল; শিরোমণি সামলাইয়া লইয়া একটু হাসিবার প্রয়াস করিয়া কহিলেন, টাকা ত দেবে, কিন্তু দেবার গরজটা কি, একটু শুন্তে পাইনে ভায়া?

নির্ম্মল বলিল, আমার গরজ শুধু আপনাদের অন্যায় অত্যাচার। আমি যেখানে থাকি সেখানে যদি একবার খোঁজ নেন, ত শুন্তে পাবেন জীবনে এমন অনেক গরজই আমি মাথায় তুলে নিয়েচি।

যে লোকটা ডাকিতে আসিয়াছিল, সে তখনও যায় নাই; কহিল, আপনার কখন যাবার সুবিধে হবে তাঁকে জানাবো?

আমার সময় মত দেখা কোরব বোলো। এই বলিয়া সে বাটীর ভিতর প্রস্থান করিল।

সায়াহ্ন বেলায় জনার্দ্দন রায় প্রস্তুত হইয়া আসিয়া প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া ডাক দিয়া কহিলেন, মন্দিরে সকলে উপস্থিত হয়েছেন, তোমাকে তাঁরা ডাক্তে পাঠিয়েছেন, যদি যাও ত আর বিলম্ব কোরো না।

নির্ম্মল বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার যাওয়া কি আপনি প্রয়োজন মনে করেন?

জনার্দ্দন কহিলেন, যাঁরা ডাক্‌তে পাঠিয়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই করেন, এই বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই দেবীর আরতি সুরু হইল। মাতার বহুবিধ গৌরবের বস্তুই কালক্রমে বিরল হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু তাঁহার শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁশর, ঢাক, ঢোল, সানাই প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ও যন্ত্রীর সংখ্যা প্রাচীনকাল হইতে অদ্যাবধি তেম্‌নি বজায় আছে। সেই সম্মিলিত তুমুল বাদ্যনিনাদ নির্ম্মল ঘরে বসিয়াই শুনিতে পাইল। কথা ছিল, আরতি শেষ হইলে পঞ্চায়েত বসিবে, অতএব সেই সুপবিত্র ধ্বনি থামিবার পরে সে গৃহ হইতে যাত্রা করিল। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিল আলোর বন্দোবস্ত বিশেষ কিছু নাই, প্রাঙ্গন-মধ্যস্থিত নাট বাঙ্গালায় গোটা দুই লণ্ঠন মাঝখানে রাখিয়া একটা কোলাহল উঠিয়াছে এবং তাহাই বহুলোকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছে। সেই অন্ধকারে নির্ম্মলকে কেহ চিনিল না, সে জন দুই লোকের কাঁধের উপর দিয়া উকি মারিয়া দেখিল তথায় কে একজন বাবু-গোছের ভদ্রলোক হাত মুখ নাড়িয়া কি সব বলিতেছেন। কিছুই শুনা গেলনা, কিন্তু মানুষের আগ্রহ দেখিয়া এ কথা বুঝা গেল তিনি অত্যন্ত শ্রুতিমধুর কাহারও নিন্দা ও গ্লানি করিতেছেন। এই ব্যক্তিই যে জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী তাহা সে আন্দাজ করিল, অতএব বক্তব্য বস্তু যে ষোড়শীর জীবন-চরিত তাহাতেও সন্দেহ রহিলনা। ভিড় ঠেলিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইতে যদিচ তাহার প্রবৃত্তি হইল না, কিন্তু দুই-এক কথা শুনিবার লোভও সে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে না পারিয়া পায়ের দুই আঙুলে ভর দিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া দাড়াইল। কয়েক মুহূর্ত্তেই মন লাগিয়া গেল,—তখনও জীবানন্দ চৌধুরী আসল বস্তুতে অবতীর্ণ হন নাই,—ষোড়শীর মায়ের ইতিবৃত্তেরই আখ্যান চলিতেছিল,—অবশ্য সমস্তই শোনা কথা, সাক্ষী তারাদাস অদূরে বসিয়া—এই সকল অসচ্চরিত্র স্ত্রীলোকদিগের সংস্রবে কিরূপে এই পীঠ-স্থান ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অপবিত্র হইয়া উঠিতেছে, এবং সমস্ত দেশের কল্যাণ তিরোহিত হইতেছে—

পিছনে পিঠের উপর একটু চাপ পড়িতে ফিরিয়া দেখিল কে একজন অন্ধকারে আগাগোড়া মুড়ি দিয়া তাহাকে বাহিরের দিকে ইসারা করিল, এবং তাহাকেই অনুসরণ করিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইতে নির্ম্মল স্পষ্ট বুঝিতে পারিল এই সুগঠিত দীর্ঘ ঋজু দেহ ষোড়শী ভিন্ন আর কাহারও নহে। সে দ্বারের বাহিরে আসিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, এবং ঈষৎ একটু হাসিয়া অনুযোগের কণ্ঠে কহিল ছি, কি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে যা'-তা শুনচেন। কতকগুলো কাপুরুষ মিলে দু'জন অসহায় স্ত্রীলোকের কুৎসা রটনা করচে,—তাও আবার একজন মৃত, আর একজন অনুপস্থিত। চলুন আমার ঘরে, সেখানে ফকির-সাহেব বসে আছেন, আপনাকে পরিচিত করে দিইগে।

তিনি কবে এলেন?

কি জানি। বিকাল-বেলা ফিরে গিয়ে দেখি আমার ঘরের সুমুখে দাঁড়িয়ে। আনন্দ আর রাখ্‌তে পারলাম না, প্রণাম করে নিয়ে গিয়ে আমার ঘরে বসালাম, সমস্ত ইতিহাস মন দিয়ে শুন্‌লেন।

শুনে কি বল্‌লেন?

শুধু একটুখানি হাস্‌লেন। বোধ হল যেন সমস্তই জান্‌তেন। কিন্তু, হাঁ নির্ম্মল বাবু, আপনি নাকি বলেছেন আমার মামলা-মকদ্দমার সমস্ত ভার নেবেন? এ কি সত্য?

নির্ম্মল ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ, সত্য।

কিন্তু কেন নেবেন?

নির্ম্মল একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, বোধ করি আপনার প্রতি অন্যায় অত্যাচার হচ্চে বলেই।

কিন্তু আর কিছু বোধ করেননা ত? বলিয়াই ষোড়শী মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, থাক্,— সব কথার যে জবাব দিতেই হবে এমন কিছু শাস্ত্রের অনুশাসন নেই। বিশেষ করে এই সব কূট-কচালে শাস্ত্রের,—না?আসুন, আমার ঘরে আসুন।

তাহার কুটীরে প্রবেশ করিয়া দেখিল ফকির-সাহেব নাই। কহিল, কোথায় গেছেন, বোধ হয় এখনি ফিরে আস্‌বেন। প্রদীপ স্তিমিত হইয়া আসিয়াছিল, উজ্জ্বল করিয়া দিয়া পাতা-আসনখানি দেখাইয়া দিয়া কহিল, বসুন। হাঙ্গামা, হৈ-চৈ, গণ্ডগোলের মাঝে এমন সময় পাইনে যে বসে দুদণ্ড গল্প করি। আচ্ছা, মকদ্দমার যেন সকল ভারই নিলেন, কিন্তু, যদি হারি, তখন ভার কে নেবে? তখন পেছবেন না ত?

নির্ম্মল জবাব দিতে পারিল না, তাহার কান পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল। খানিকক্ষণ পরে কহিল, হারবার কোন সম্ভাবনা আমাদের নেই।

তা' বটে। বলিয়া একবার একটুখানি যেন ষোড়শী বিমনা হইয়া পড়িল। কিন্তু, পলকমাত্র। সহসা চকিত হইয়া প্রশ্ন করিল, ছেলে কেমন আছে নির্ম্মল বাবু? কি করে তাকে ছেড়ে এলেন বলুন ত? আমি ত পারিনে।

অকস্মাৎ এই অসংলগ্ন প্রশ্নে নির্ম্মল আশ্চর্য্য হইল। ষোড়শী একবার এদিকে একবার ওদিকে বার দুই তিন মাথা নাড়িয়া হাসিমুখে বলিল, আমি কিন্তু হৈম হলে এই সমস্ত পরোপকার করা আপনার ঘুচিয়ে দিতাম। অত ভালমানুষ নই,—আমার কাছে ফাঁকি চল্‌ত না,—রাত্রিদিন চোখে চোখে রাখতাম।

ইঙ্গিত এত সুস্পষ্ট যে নির্ম্মলের বুকের মধ্যেটা বিস্ময়ে, ভয়ে ও আনন্দে একই সঙ্গে ও একই কালে তোলপাড় করিয়া উঠিল। এবং সেই অসম্বৃত অবসরে মুখ দিয়া তাহার বাহির হইয়া গেল, চোখে চোখে রাখ্‌লেই কি রাখা যায় ষোড়শী? এর বাঁধন যেখানে সুরু হয় চোখের দৃষ্টি যে সেখানে পৌছয় না, এ কথা কি আজও জান্‌তে তুমি পারোনি?

পেরেছি বই কি, বলিয়া ষোড়শী হাসিল। বাহিরে হঠাৎ একটা শব্দ শুনিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিয়া কহিল, এই যে ইনি এসেছেন।

কে? ফকির সাহেব?

না, জমিদার বাবু। বলে পাঠিয়েছিলাম সভা ভাঙ্‌লে যাবার পথে আমার কুঁড়েতে একবার একটু পদধূলি দিতে। তাই দিতেই বোধ হয় আস্‌চেন। সঙ্গে লোকজন বিস্তর, স্ত্রীলোকের ঘরে একাকী আস্‌তে বোধ করি সাধু পুরুষের ভরসায় কুলোয়নি। পাছে দুর্নাম হয়। এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

ব্যাপারটা নির্ম্মলের একেবারেই ভাল লাগিল না। সে বিরক্তি ও সঙ্কোচে আড়ষ্ট হইয়া বলিল, এ কথা আমাকে আপনি বলেননি কেন?

বেশ! একবার তুমি একবার আপনি? বলিয়া সে হাসিয়া কহিল, ভয় নেই, উনি ভারি ভদ্রলোক; লড়াই করেন না। তা'ছাড়া আপনাদের ত পরিচয় নেই,—সেটাও ত একটা লাভ। এই বলিয়া সে দ্বারের বাহিরে অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা করিয়া কহিল, আসুন,—আমার কুঁড়ে আর একবার পবিত্র হল।

জীবানন্দ চৌকাটে পা দিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, ইনি? নির্ম্মল বাবু বোধ হয়?

ষোড়শী হাসিমুখে জবাব দিল, হাঁ, আপনার বন্ধু বলে পরিচয় দিলে খুব সম্ভব অতিশয়োক্তি হবে না। (ক্রমশঃ)

সাময়িকী

বড়দিনের বড় অবকাশ-সময়ে হিন্দুর পবিত্র তীর্থ গয়াধামে কন্‌গ্রেসের বিরাট অধিবেশন অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গেল; তবে 'সুসম্পন্ন' হইল কি না, এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলিতেছেন, যে পরিমাণ অর্থব্যয় হইল এবং যে পরিমাণ উৎসাহ উদ্যম ব্যয় হইল, কাজ তেমন কেন, সে অনুপাতে কিছুই হয় নাই। আবার কেহ কেহ বলিতেছেন, যথেষ্ট কাজ হইয়াছে, কন্‌গ্রেসের পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। প্রসিদ্ধ বাগ্মী, স্বদেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় 'ইংলিশম্যান' সংবাদ-পত্রে স্পষ্ট-বাক্যেই বলিয়া দিয়াছেন যে, এতকালের কন্‌গ্রেস এবার গয়ায় গদাধরের পাদপদ্মে লীন হইয়াছে; যাহা থাকিল, তাহা আর পূর্ব্বেকার সে কন্‌গ্রেস নহে। কন্‌গ্রেসের ভাগ্যে এমন মরণ-বাঁচন আরও দুই-তিন বার হইয়া গিয়াছে; সুতরাং কথাটা নূতন নহে। যে ভাবেই হউক, বৎসরান্তে বড়দিনের সময় আর দশটা ব্যাপারের মত কন্‌গ্রেসের অধিবেশন হইবেই, মরিবার কোন সম্ভাবনাই নাই; বরঞ্চ পূর্ব্বে দেখিতাম, তিন দিন কন্‌গ্রেস-মণ্ডপে বক্তৃতা-চ্ছটা প্রদর্শন করিয়াই নেতৃবর্গের কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি হইত; এখন তাহা হয় না,—সারা বৎসর ধরিয়াই কন্‌গ্রেসের উপসর্গগুলি হাত-পা নাড়িয়া থাকেন; এবং তাহার ফলে দেশের মধ্যে (দশের মধ্যে কি না, বলা যায় না) একটা জাগ্রত ভাব থাকিয়া যায়; বিশেষতঃ বিগত দুই বৎসর নন-কো-অপারেসন-মন্ত্র প্রচারিত হওয়ায় এই জাগরণের ভাবটা বেশ প্রকট হইয়াছিল; কিন্তু সকল ব্যাপারেরই যেমন নরম-গরম আছে, এই নন-কো-অপারেসন ব্যাপারেও তাহার অন্যথা

হয় নাই। যে বিপুল বিক্রমে নন-কো আরম্ভ হইয়াছিল এবং তাহার ফলে যে দেশব্যাপী আন্দোলন, কারাবরণ প্রভৃতি দেখা দিয়াছিল, তাহা নরম হইয়া পড়িয়াছিল; এখনও নরমই চলিতেছে। মহাত্মা গান্ধির প্রস্তাবিত ও অনুসৃত চরকা ও খদ্দর সে উন্মাদনাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে নাই। তাই এবারের কনগ্রেসের সভাপতি দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় নানাভাবে দেশের মধ্যে আবার একটা উন্মাদনার সঞ্চারের ব্যবস্থা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইল না; গরম দলের মধ্যেও নরম-গরম দুই মত হইল; দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ভোটে হারিয়া গেলেন; শত্রু-মিত্র সকলেই বলিতেছেন, বাঙ্গালীই এতকাল ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব করিয়া আসিতেছিল, এতদিনে তাহা লোপ পাইল।

—

এবারের কংগ্রেসে প্রধান বিবেচ্য ও বিচার্য্য বিষয় ছিল দুইটী;—(১) যাঁহারা নন-কো-অপারেসনবাদী তাঁহারা আগামী বৎসরের ব্যবস্থাপক সভাসমূহের প্রবেশ-প্রার্থী হইবেন কি না, (২) বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন করা হইবে কি না। এতদ্ব্যতীত যে সমস্ত প্রস্তাব কংগ্রেসে উপস্থাপিত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই মামুলি ধরণের। আসল আন্দোলন উপরিউক্ত দুইটা কথা লইয়াই; তাহার মধ্যেও আবার 'বয়কট' ব্যাপারটা ব্যবস্থাপক সভায় গোলমালে অনেকটা চাপা পড়িয়াছিল। এবারের যত কিছু মতান্তর, কথান্তর এবং (কংগ্রেসওয়ালারা না বলিলেও সকলে বুঝিতে পারিয়াছেন) মনান্তর ঐ ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের কথা লইয়াই। সভাপতি দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের পক্ষে; অপর একদল তাহার বিপক্ষে। সভাপতির অভিভাষণে দেশবন্ধু মহাশয় তাঁহার পক্ষ সমর্থনের জন্য যাহা কিছু বলা যাইতে পারে, সমস্তই বলিয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণের সার মর্ম্ম এই যে বিগত বৎসরে যে ভাবে কনগ্রেসের কার্য্য চলিয়াছে, তাহা অভীষ্টসিদ্ধির পক্ষে আশানুরূপ নহে। বিদ্যালয় বর্জ্জন, আদালত বর্জ্জন ও কাউন্সিল বর্জ্জন অতি সামান্যই সফলতা লাভ করিয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন, কেবলমাত্র চরকার উপর নির্ভর করিয়াই স্বরাজলাভ সম্ভবপর হইবে না। নন-কো-অপারেসনবাদীদের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও ব্যবস্থাপক সভাসমূহ গঠিত হইয়াছে; এবং যে ভাবেই হোক্ কার্য্য পরিচালিত হইতেছে। তাঁহার মতে এই ব্যবস্থাপক সভাগুলিকে অচল করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। বাহির হইতে অচল করিবার চেষ্টা আংশিক সফলতা লাভ করিয়াছিল। সুতরাং, কাউন্সিলগুলিকে অচল বা অকর্ম্মণ্য করিতে হইলে যেমন বাহির হইতে চেষ্টা করিতে হইবে, তেমনি ভিতর হইতেও চেষ্টা করিতে হইবে। সুতরাং নিরপেক্ষ, স্বদেশহিতৈষী, নির্ভীক কংগ্রেসওয়ালাদের ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করা কর্ত্তব্য। অপরপক্ষ এ প্রস্তাবে সম্মত নহেন; তাঁহারা বলেন, মহাত্মা গান্ধি যে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহারই অনুসরণ করিতে হইবে; তিনি যে কার্য্য-পদ্ধতি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে পদমাত্র বিচলিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। চরকা, খদ্দর ও অহিংস প্রতিরোধই স্বরাজ লাভের একমাত্র পথ হইবে। ইহাই মতান্তরের মূল কথা। এবং কংগ্রেসের বিগত অধিবেশনে এই প্রস্তাবই গৃহীত হইয়াছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং তাঁহার অনুবর্ত্তী দল ভোটের সংগ্রামে পরাজিত হইয়াছেন।

—

সকলেই মনে করিয়াছিল, গয়ার অধিবেশনে এই মতান্তর এমনই বিষম আকার ধারণ করিবে যে, হয় ত কংগ্রেসের অধিবেশনই হইতে পারিবে না—সুরাট ব্যাপারের পুনরভিনয় হইবে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহা হয় নাই; কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ অধিকাংশের মতই গ্রহণ করিয়া কংগ্রেসের কার্য্য শেষ করিয়াছেন। যাঁহারা ভোটে পরাজিত হইয়াছেন, তাঁহারা কংগ্রেসমণ্ডপে অধিকাংশের সিদ্ধান্ত শিরোধার্য্য করিলেও সেই কার্য্যপদ্ধতি সম্যক্ প্রতিপালন করিবেন না, এ কথা কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই গয়াতীর্থে বসিয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং তাঁহার অনুবর্ত্তীগণ স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারা নূতন একটী দল গঠন করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন,—আমরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধবাদী হইব না, অথচ সমস্ত ব্যবস্থাও মানিয়া চলিব না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দল শীঘ্রই তাঁহাদের কার্য্যপদ্ধতি প্রকাশ করিবেন। যতদূর জানা গিয়াছে, কাউন্সিল প্রবেশ, বয়কট, পিকেটিং প্রভৃতি কার্য্য তাঁহারা বিশেষ দৃঢ়তার সহিত আরম্ভ করিবেন। ইহার ফল কি হইবে, ভবিষ্যৎই বলিতে পারেন,

কিন্তু কংগ্রেসের নেতৃবর্গ যে দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিলেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

এই জানুয়ারী মাসের 'মডার্ণ রিভিউ'-পত্রে শ্রীযুক্ত সন্ত নিহাল সিং একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটীর নাম—(What India should expect from Britain) অর্থাৎ ভারতবর্ষ ব্রিটেনের কি আশা করিতে পারেন, সেই সম্বন্ধে নিহাল সিং মহোদয় তাঁহার মত স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা নিম্নে তাঁহার প্রবন্ধের একটী অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তিনি বলিয়াছেন,—

"It needs a stouter heart than I possess to believe that, in this circumstance, India can look to Parliament—to the British nation—to take, of its own accord, steps to accelerate the pace of constitutional reforms, when such acceleration involves the progressive "Indianisation" of the Services, and the industrialisation of India, which inevitably would mean fewer Indian jobs for the British Youth and greater competition for the British industrial countries, and the loss of power to manipulate Indian tariffs for the benefit of import trade. Some British friends of India in and out of Parliament may prove to be sufficiently altruistic to aid us in our fight for power over national affairs. We may however be sure that their number will be few, and, that they will find the majority of their own countrymen opposed to them."

ইহার ভাবার্থ এই—ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট তথা ব্রিটিশ জাতি ভারতবর্ষের প্রকৃত উন্নতিমূলক যে সমস্ত কার্য্য, তাহাতে সর্ব্বতোভাবে অগ্রসর হইতে কিছুতেই পারেন না। তাঁহারা বিলাতী কর্ম্মচারিবৃন্দের অন্নসংস্থানের দিকে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া এ দেশের শাসনকার্য্যে উপযুক্ত ভারতবাসীদিগকেই ষোল আনা নিযুক্ত করিতে পারেন না। ইহা তাঁহাদের স্বার্থের বিরোধী। দ্বিতীয়তঃ, এদেশের শিল্পবাণিজ্যের প্রসার ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া বিলাতী বাণিজ্যের প্রসার কমিয়া যায় অথবা একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়, ইহা তাঁহাদের স্বার্থের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। সুতরাং, যে প্রকারেই হউক, বিলাতী শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি-সাধন তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য। এ অবস্থায় ভারতবর্ষ কি শাসন-ব্যাপার, কি শিল্পবাণিজ্য কোন বিষয়েই ইংলণ্ডের নিকট সম্পূর্ণ সহানুভূতি লাভের প্রত্যাশা করিতে পারেন না; ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট বা ব্রিটিশ জাতি তাঁহাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সর্ব্বাগ্রে চেষ্টা করিবেন, ইহা স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রদত্ত অধিকারের দিকে চাহিয়া থাকিলে স্বায়ত্তশাসনই বলুন, বা স্বরাজই বলুন বা আর যাহা কিছুই বলুন, তাহার প্রাপ্তি সুদূর-পরাহত। অর্থাৎ সন্ত নিহাল সিং মহাশয় বলিতেছেন, দেশের সর্ব্বাঙ্গীন্ উন্নতি করিতে হইলে আমাদিগকে স্বাবলম্বী হইতে হইবে। তাহা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। আমাদের দেশের লোককে এই কথাটী স্পষ্ট ভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্যই নিহাল সিংহ মহাশয় তাঁহার সুচিন্তিত প্রবন্ধটী প্রকটিত করিয়াছেন।

বর্ত্তমান রাজনীতি ক্ষেত্রে যাঁহার যাহা কথা, তাহা ত বলিলাম; কিন্তু কেহই যে এ সকল ভাবের প্রকৃত প্রতীকারের কথা ভাল করিয়া বলেন না এবং তাহার জন্য যাহা কর্ত্তব্য, একনিষ্ঠ ভাবে তাহাতে উঠিয়া পড়িয়া লাগেন না। আমাদের এক দৈনিক সহযোগী এ সম্বন্ধে কয়েকটী নিরপেক্ষ সত্য কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—এ অবস্থা হইল কেন? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের চিন্তার ও কর্ম্মের আড়ষ্টতা যে এত বেশী পরিমাণে আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার কারণ পাশ্চাত্য ধারানুগত শিক্ষা এদেশে বহুবিস্তৃত হয় নাই। আজ যাহারা বিনা জিজ্ঞাসায় সত্য মিথ্যা সব কিছু কর্ত্তাভজা হইয়া মাথা পাতিয়া নিতে চান না—কথায় কথায় 'কেন'র জবাব চান, সত্যানুসন্ধিৎসার পরিচয় দেন, তাঁহারা সকলেই পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনুপ্রাণিত, ইংরেজী শিক্ষিত। সনাতন পদ্ধতি অনুসারে দ্বাদশ বৎসর ব্যাকরণ পাঠ করিয়া বা স্মৃতির বিধানকে সাক্ষাৎ ভগবানের কথা বলিয়া মানিয়া, অর্থহীন লোকাচার এবং সমাজ ও ধর্ম্মের বিধিনিষেধে দেহ-মনকে পঙ্গু করিয়া—আমাদের দেশ যেরূপ মানবতার প্রকৃত আদর্শ ও অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, আর তাহাতে তাহাদের যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে—পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষা বিস্তার হইলে তাহা হইত না। পাশ্চাত্যের বাহিরের বেশভূষা বা আহার-বিহারের রীতি-নীতি আমাদের পক্ষে নির্ব্বিচারে গ্রহণীয় না হইতে পারে; কিন্তু তাহাদের মনে ও জীবনে আমরা যে স্বাধীনতা, শক্তি ও স্বাস্থ্য দেখিতে পাই তাহাকে নির্ব্বাসিত করিলে আমাদের মঙ্গল হইতে পারে বলিয়া আমরা কিছুতেই ভাবিতে পারি না। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে আমাদের অনিষ্ট হইবে—ইহা কেহ সন্দেহ করেন না; যে উপায়ে পাশ্চাত্য আজ মনোজগতে ও জড়জগতে বিজয়ীর শক্তি ও গৌরব লাভ করিয়াছে, আমাদেরও তাহাই অবলম্বন করিতে হইবে। আজ সত্যশিক্ষা ও শক্তিসাধনা এ দেশে আনিতেই হইবে,—আজ এই অবনত ভারতের সনাতন আচার-নিয়ম, শাস্ত্রজ্ঞানের মধ্যে যদি সে শিক্ষা এবং সে

সাধনার অভাব হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ সকলকে আমাদের নির্ম্মমভাবে পরিহার করিতে হইবে,—আর পাশ্চাত্য যদি সত্যজ্ঞানের আলোক-বর্ত্তিকা ধরিয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার সাহায্যেই আমাদের গৃহদীপ জ্বালাইতে হইবে, এ দেশের এই ঘন অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিতে হইবে। এমনই করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বের দিকে অগ্রসর হইলেই আমাদের মঙ্গল হইবে, সত্যশিক্ষা ও শক্তিসাধনা আমাদিগকে করিতে হইবে; ইহার জন্য যথারীতি সাধনা করিতে হইবে। আমরা কত বার বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, মানুষ হইতে হইবে; বাক্য ছাড়িয়া কার্য্যে মন দিতে হইবে; প্রকৃত সাধনা যাহাকে বলে, তাহাই করিতে হইবে। তাহাই জাতির মেরুদণ্ড। বৃথা বক্তৃতায় স্বরাজলাভ দূরে থাকুক, তৃণ-গাছিও লাভ হইবে না।

বিগত ১৩ই ডিসেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটের ৫০নং অতিরিক্ত পত্রে একটী প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে। প্রস্তাবটী এ দেশের বালক-বালিকাদিগের বর্ণশিক্ষা সম্বন্ধে। এ প্রস্তাব প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে প্রচারিত মন্তব্যের অতিরিক্ত-পত্র। এই অতিরিক্ত-পত্রে বলা হইয়াছে যে, এ দেশের অর্থাৎ বাঙ্গালী বালকবালিকাদিগের বর্ণপরিচয় হইতে বড়ই বেশী সময় ব্যয় হয় এবং তাহা অতিরিক্ত আয়াস-সাপেক্ষ। হিন্দুর তেত্রিশ কোটী দেবতার মত, তাহার বর্ণমালাও সংখ্যায় অত্যধিক; স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, যুক্তাক্ষর প্রভৃতি শিক্ষা করিতে সুকুমারমতি বালকবালিকাদিগের হয়রাণ হইতে হয়, যথেষ্ট সময় অপব্যয় হয়, হয় ত বা লেখাপড়ার উপর বিতৃষ্ণাও জন্মিয়া থাকে। সময় অমূল্য ধন; বিশেষ শিশুদিগের প্রথম শিক্ষার সময় আরও অমূল্য। এই সময় যাহাতে স্বর, ব্যঞ্জন, যুক্তাক্ষরের বিপুল বাহিনীর মধ্যে পড়িয়া অপব্যয় না হয়, তাহার জন্য কলিকাতা গেজেটের ঐ অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, বাঙ্গালা বর্ণমালা আর শিক্ষা দিয়া কাজ নাই; তাহার বদলে ইংরাজী বর্ণমালার ছাব্বিশটী অক্ষর শিখিতে সামান্য সময়ের দরকার; যুক্তাক্ষরের হাঙ্গামা নাই, বানান-বিচার নাই, ষত্ব-ণত্বের বিভীষিকা নাই; ছেলেরা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বর্ণজ্ঞান তথা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। 'আমি' লিখিতে হইলে 'ami' লেখা সহজ। ইহাতে হ্রস্ব দীর্ঘ কিছুরই প্রয়োজন হইবে না, বেশ সহজ পন্থা। এই পন্থা অবলম্বিত হইলে আমরা সম্পাদকমণ্ডলী প্রুফ দেখার দায় হইতে অনেকটা অব্যাহতি লাভ করিতে পারি; বাঙ্গালা ব্যাকরণের হাত হইতে পরিত্রাণ পাই। ১৩ই জানুয়ারীর মধ্যেই এ সম্বন্ধে সাধারণের মন্তব্য গবর্ণ-মেণ্ট জানিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু, সাধারণ ত দূরে থাকুক, অসাধারণ যে সকল বাঙ্গালা সাহিত্য-সমিতি, তাঁহারাও বোধ হয় এতদিনে এ সংবাদটী অবগত হইতে পারেন নাই। আমরা বাঙ্গালা দেশের লোকদিগকে এই অতিরিক্ত-পত্রের কথা জানাইলাম। এখন তাঁহারা তাঁহাদের অভিমত prakas karun.

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত নূতন স্বরলিপি গ্রন্থ 'গীতিগুচ্ছ' প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ২৷০

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত নূতন জ্যোতিষ গ্রন্থ বৃদ্ধ বোধ বর্ণপরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ।৶০

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত নূতন নাটক "রত্নেশ্বরের মন্দিরে" প্রকাশিত হইল; মূল্য ৸০

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকৃষ্ণ তালুকদার প্রণীত 'অসাধ্যসাধন' প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১৷০

৷৷০ আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার ৮৩ সংখ্যক পুস্তক শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত 'ছোড়দি' প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত প্রণীত নূতন বালকপাঠ্য পুস্তক 'বরফের দেশ' ও 'দেশবিদেশের ছেলেমেয়ে' প্রকাশিত হইল; মূল্য প্রত্যেক খানি ৷০

Publisher—Sudhanshusekher Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Narendranath Kunar,
The Bharatbarsa Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street. CALCUTTA.
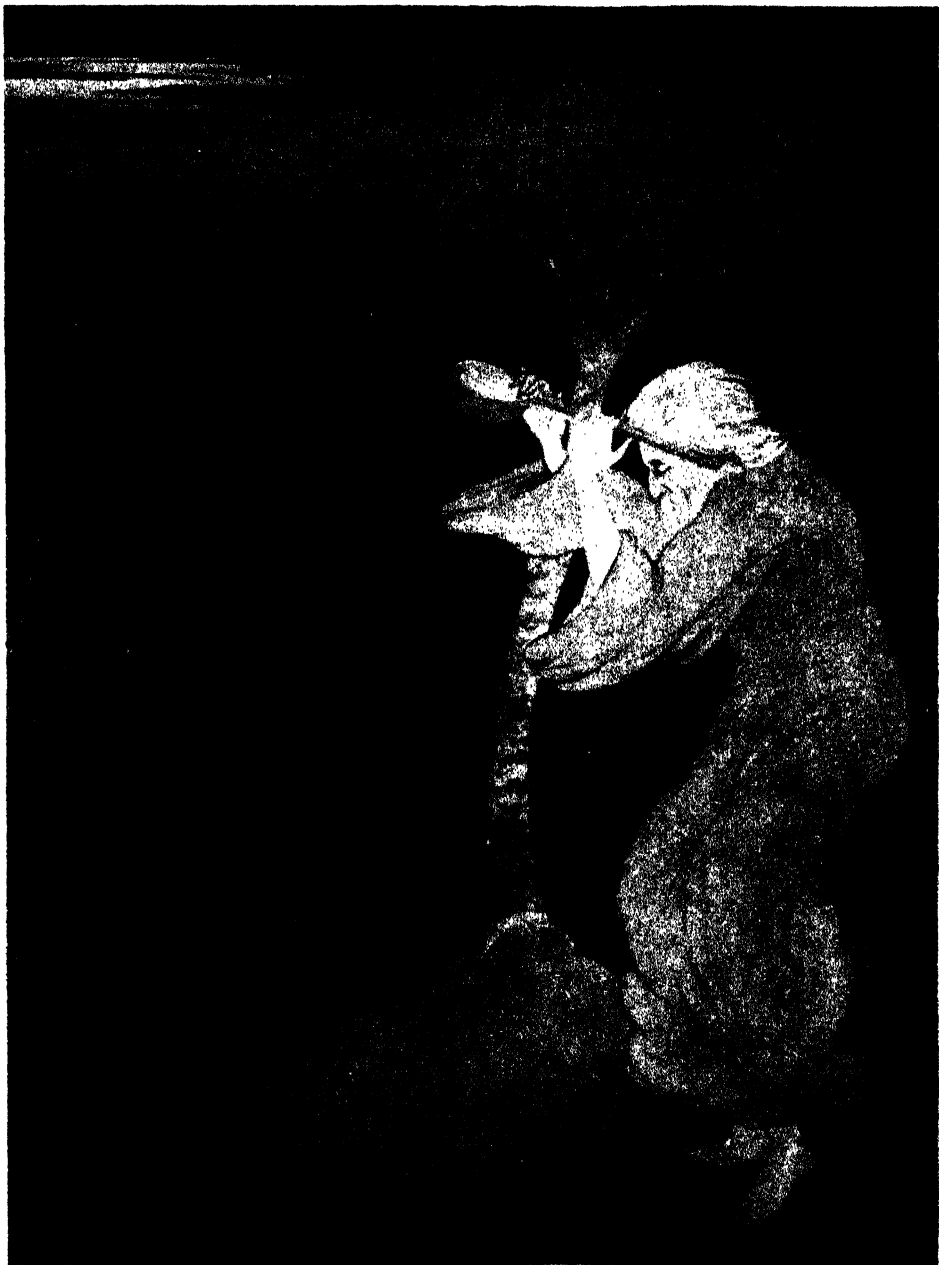
অন্ধ বাউল

শিল্পী—শ্রীঅসিতকুমার হালদার

চিত্রাধিকারী—শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষ

BHARATVARSHA HALFTONE & PRINTING WORKS.

ভারতবর্ষ

ফাল্গুন, ১৩২৯

দ্বিতীয় খণ্ড | দশম বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

ভারত-শিল্পচর্চ্চার নববিধান

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি-আই-ই

প্রবৃত্তি র্বা নিবৃত্তি র্বা নিত্যেন কৃতকেন বা।
পুংসাং যেনোপদিশ্যতে তচ্ছাস্ত্রমিতি কথ্যতে॥

সুনির্দ্দিষ্ট শাস্ত্র-শাসনই ভারত-সভ্যতার সর্ব্বপ্রধান বিশিষ্ট লক্ষণ। ভাল হউক, মন্দ হউক, তাহাই প্রকৃত ঐতিহাসিক পরিচয়। সেই চিরপুরাতন শাস্ত্র-শাসনের "অতিক্রম-ব্যতিক্রম" ঘটাইয়া, অধুনা যে সকল নববিধান প্রচলনের চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তাহার মূলে পুরাতনের উপর অপরিস্ফুট অনাস্থা। ইহা ভারতবাসীর বংশপরম্পরাগত নহে; পর-প্রভাবপ্রসূত এক আগন্তুক উন্মাদনা;—স্বদেশী নহে; বিদেশী।

তাহার উত্তেজনায় কেহ সংহারকে "সংস্কার" নাম দিয়া, স্বেচ্ছাচারের পক্ষসমর্থনে বদ্ধপরিকর; কেহ বা, পরোক্ষভাবে তুল্য ফল লাভ করিবার আশায়, শাস্ত্রবচনের নানা মনঃকল্পিত ব্যাখ্যায় নবসংহিতা রচনায় অগ্রসর। এই পদ্ধতি প্রথমে সমাজ-সংস্কারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল; এখন ইহা নানা বিষয়ে অল্লাধিক অনধিকার-প্রবেশ করিয়া, ভারত-চিত্রচর্চ্চার প্রাচীন পদ্ধতির মধ্যেও অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করাইয়া দিতেছে। প্রাচীন শাস্ত্র-শাসনের এরূপ অর্ব্বাচীন "অতিক্রম-ব্যতিক্রম"-চেষ্টার আলোচনা আবশ্যক।

যাঁহারা ভারত-শিল্প-পদ্ধতির "অতিক্রম-ব্যতিক্রম" সংসাধনের জন্য অগ্রসর, তাঁহারা প্রথমে ভারত-শিল্প-শাস্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াই বিদেশীয় পদ্ধতিতে রচনা-কার্য্যে পরিপকতা লাভ করিয়াছিলেন। ভারত-

শিল্পকে সেই বিদেশীয় ছাঁচে ঢালাই করিবার জন্য তাঁহারাই আবার কিঞ্চিৎ পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিয়া, ভারত-শিল্পশাস্ত্রের সুনির্দ্দিষ্ট বিধিনিষেধের মধ্যে তাঁহাদিগের নববিধান-সমর্থক রচনাবলীর আবিষ্কার-কামনায় অনুসন্ধানকার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। ভারত-শিল্পপদ্ধতি এইরূপে আপন বিশিষ্ট লক্ষণ হারাইবার পথে সবলে আকর্ষিত হইলেও, আকর্ষণ-কারিগণ পূর্ব্বতন নাম-গৌরব পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইতেছেন না। কারণ, এই অর্ব্বাচীন নববিধানকে ভারত-শিল্পের পুরাতন নামে চালাইয়া লইতে পারিলে, পুরাতন কৌলিন্যের খাতিরে ইহা কাহারও না কাহারও কৃপাকটাক্ষ লাভ করিতে পারিবে; অন্যথা নববিধান হিসাবে সভ্য-সমাজের আধুনিক অগণ্য শিল্পবিধানের মধ্যে ইহাকে নিতান্ত অনুল্লেখযোগ্য নিম্নস্তরেই মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে! তজ্জন্য ইঁহারা পুরাতন নাম পরিত্যাগ করিতে অসম্মত, অথচ পুরাতন পদ্ধতির "অতিক্রম-ব্যতিক্রম"-সাধনের জন্যও লালায়িত। এরূপ আচরণ অপরিহার্য্য। এক পথে দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান থাকা অসম্ভব। কারণ, বিশিষ্টতার অভাবই এই নববিধানের বিশিষ্টতা,—তাহার অপর নাম "স্বৈরাচার"। তাহা এখনও স্বাধীনতার এবং স্বেচ্ছাচারের সীমানির্দ্দেশ করিবার অবসর প্রাপ্ত হয় নাই।

স্বৈরাচারিগণ ভারত-শিল্পপদ্ধতি যথাযথরূপে অধিগত করিয়া, রচনাকার্য্যে সিদ্ধহস্ত হইয়া, পুরাতন রচনা-রীতির "অতিক্রম-ব্যতিক্রম" সাধনের প্রয়োজন বুঝাইয়া দিয়া, নববিধান প্রচলনের চেষ্টা করিলে, সে চেষ্টা সুসংযত সুনির্দ্দিষ্ট সুসঙ্গত "সংস্কার" নামে মর্য্যাদা লাভ করিতে পারিত। সে পথ অবলম্বন না করায়, যাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে, তাহা অ-প্রচ্ছন্ন শাস্ত্র-বিদ্বেষ। তাহাই প্রথম শিক্ষার্থীর সাধারণ লক্ষণ। বিধিনিষেধের অবতারণা করিয়া, শাস্ত্র স্বৈরাচার সুসংযত করে; এবং তাহাতেই মানব-সভ্যতা বিকাশ-লাভ করে। ব্যাকরণ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সময় নষ্ট করিব কেন, এই শাস্ত্র-বিদ্বেষের উত্তরে মহর্ষি পতঞ্জলি মহাভাষ্যের উপোদ্‌ঘাতে কেবল একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন:—"ম্লেচ্ছ (অসভ্য) হইয়া না পড়ি, ইহার জন্যই ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে হইবে।" সকল শাস্ত্র সম্বন্ধেই ইহা তুল্যভাবে উল্লিখিত হইতে পারে। এ বিষয়ে কেহ কখন ভারতবর্ষকে অতিক্রম করিতে পারে নাই; বরং সমগ্র প্রাচ্য ভূমণ্ডলেই সময়ে সময়ে ইহার অনুকরণ-চেষ্টা প্রচলিত হইয়াছিল। তাহা প্রমাণ প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেও, অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই।

শিষ্ট হইতে হইলেই শাসন স্বীকার করিতে হইবে;—তাহারই নাম শাস্ত্র। বিশ্বকর্ম্মা অসাধারণ শিল্প-প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি শাস্ত্রশাসন অস্বীকার করিয়া, প্রথমে স্বাধীন ভাবে কৃতিত্ব প্রদর্শনের আশায়, আপন পুত্রের একটি দারুমূর্ত্তি রচনায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। কোনরূপ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধিনিষেধ স্বীকার না করিয়া, দারুখণ্ড চাঁছিয়া ফেলিতে ফেলিতে যাহা দাঁড়াইল, তাহা মনুষ্যমূর্ত্তি হইল না;—হইল একটি চামচিকা! এই আখ্যায়িকার চামচিকাও একটি "সৃষ্টি"; কিন্তু তাহা শিল্প-সাফল্যের দৃষ্টান্তরূপে সমাদর লাভ না করিয়া, উপহাস লাভ করিল! ভারত-শিল্পের সুনির্দ্দিষ্ট বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করিয়া, নববিধানমতে যাহা "সৃষ্ট" হইতেছে, সে "সৃষ্টিও" সকলের "দৃষ্টিতে" তৃপ্তি সঞ্চারিত করিতে পারিতেছে না; অনেকে রাজসভায় দণ্ডায়মান হইয়া, প্রকাশ্য ভাবেও তাহাকে উপহাস করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন না। প্রত্যুত্তরে স্বৈরাচারিগণ পুরাতন শিল্প-শাস্ত্রের মধ্যে অনুকূল প্রমাণের আবিষ্কার ঘোষণা করিয়া তাহার ব্যাখ্যাকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন। তাহা কতদূর শাস্ত্রসঙ্গত, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক।

পূর্ব্বপরিচয়শূন্য অসম্পূর্ণ অভিনব শিল্প-পদ্ধতি, কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিতে পারিলে, অবশ্যই সমাদর লাভের অধিকারী হইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বনাম রক্ষা করিয়া, পূর্ব্বরীতির "অতিক্রম-ব্যতিক্রম"-সাধন করিতে চাহিলে, কৈফিয়ৎ দিতেই হইবে। নচেৎ, তাহাতে কোনরূপ কৃতিত্বের আভাস ফুটিয়া উঠিলেও, স্থিতিশীল জনসমাজ সহসা তাহাকে পুরাতনের মর্য্যাদা দান করিতে সম্মত হইবে না। যাহা গিয়াছে, তাহা শাস্ত্রাধীন ছিল। আঁকিতে আঁকিতে যাহা দাঁড়ায় দাঁড়াইয়া যাউক, তাহার পর দেখিয়া শুনিয়া, পরামর্শ করিয়া, একটা যাহা কিছু নাম-করণ করিয়া লওয়া যাইবে,—পুরাতনের মধ্যে এরূপ অনিশ্চিত নিরুদ্দেশ-যাত্রা প্রচলিত ছিল না। এই ঐতি-হাসিক সত্য অস্বীকার করিয়া, অধুনা কেহ যে

চাহিতেছেন—সেকালের শাস্ত্রেও ব্যক্তিগত ভাল লাগা না লাগাই রমণীয়ত্বের মাপকাঠিরূপে স্বীকৃত ও অবলম্বিত হইয়াছিল। ইহার একটি প্রমাণও উল্লিখিত এবং ব্যাখ্যাত হইতেছে।

প্রমাণ :—

"লগ্নং যত্র চ যস্য হৃৎ।"

অন্বয়ার্থ :—

যস্য (যাহার) যত্র (যাহাতে) হৃৎ (হৃদয়) লগ্নং (লাগে)।

ব্যাখ্যা :—

সকল দেশেই শিল্পসম্বন্ধে কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রচলিত আছে। তাহাতে কোনরূপ মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। একটি স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত এই যে,—শিল্পকে "রম্য" (রমণীয়) হইতে হইবে। কাহাকে "রম্য" বলিয়া স্বীকার করিব? যাহা যাহার নিকট রমণীয় বলিয়া অনুভূত হয়, তাহার পক্ষে তাহাই রমণীয়। উদ্ধৃত রচনাংশের ইহাই নির্গলিতার্থ। কিন্তু ইহাই শাস্ত্রার্থ হইলে, শাস্ত্রের প্রয়োজন নিরস্ত হইয়া যায়। ব্যক্তিগত ভাল লাগা না লাগাই শাস্ত্রের স্থান অধিকার করে। তাহাকে কোনরূপ নিয়মের অধীন করিয়া, শাস্ত্র-মর্য্যাদা দান করিবার সম্ভাবনা থাকে না।

এই বচনাংশ কোন্ শাস্ত্রের কোন্ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত, শিল্পসাধকগণ তাহার উল্লেখ না করায়, ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন রহিয়া গিয়াছে। সমগ্র বচনটি কি; তাহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, উদ্ধৃত অংশটির কিরূপ ব্যাখ্যা করা কর্ত্তব্য; তৎসম্বন্ধে কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে হইলে, তথ্যানুসন্ধান অপরিহার্য্য। তাহাতে প্রবৃত্ত হইলে, দেখিতে পাওয়া যাইবে,—ইহা "শুক্রনীতিসারের" চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ প্রকরণের একটি বচনের একাংশ; এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরস্পরের পরিমাণ কিরূপ হওয়া আবশ্যক, তদ্বিষয়ক বিধিনিষেধের অন্তর্গত। সমগ্র বচনটি এই :—

"শাস্ত্রমানবিহীনং যদরম্যং তদ্বিপশ্চিতাম্।
একেষামেব তদ্রম্যং লগ্নং যত্র চ যস্য হৃৎ॥"

যৎ (যাহা) শাস্ত্রমান-বিহীনং (শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিমাণহীন) তৎ (তাহা) বিপশ্চিতাং (পণ্ডিত-গণের নিকট) অরম্যং (অরমণীয়) একেষামেব (কেবল এক দলের নিকটেই) তৎ (তাহা) রম্যং (রমণীয়) যত্র (যেথানে) যস্য (যাহার) হৃৎ (হৃদয়) লগ্নং (লাগে, আসক্ত হয়, আনন্দ লাভ করে)।

ব্যাখ্যা :—

রম্য কি? অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যেরূপ পরিমাণ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট, তাহাই রম্য; অথবা তাহার "অতিক্রম-ব্যতিক্রম" রম্য? এই প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্র বলিতেছেন,—যাহার পক্ষে রম্য, তাহার উপরেই উত্তরটি নির্ভর করে। একদিকে "শাস্ত্র-মান", আর এক দিকে "লগ্নং যত্র চ যস্য হৃৎ";—ইহার মধ্যে কোন্‌টি রম্য, তাহা বুঝিতে হইলে, অধিকারী-বিচার আবশ্যক। অধিকারী দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—বিপশ্চিত (পণ্ডিত), অ-বিপশ্চিত (মূর্খ)। যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহাদের নিকট শাস্ত্র-মানই রম্য;—যাহারা সেরূপ নহে, সেই এক দলের নিকটে তাহাই রম্য, "যাহাতে যাহার হৃদয় আনন্দ লাভ করে।" এখানে "একেষামেব" বলিয়া "বিপশ্চিতাম্"-পদের তুলনা করায়, সমগ্র বচনটি স্বৈরাচারের নিন্দা এবং শাস্ত্র-বিধির প্রশংসাই প্রকাশিত করিতেছে। তাহাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করিবার জন্য একাংশ মাত্র উদ্ধৃত করায়, যাহা আপাততঃ অনুকূল প্রমাণ রূপে প্রতিভাত হয়, সমগ্র বচনের বিচারে তাহাই প্রতিকূল প্রমাণে পরিণত হইতেছে। শাস্ত্রবচনের আংশিক আলোচনাই এইরূপ বিড়ম্বনার কারণ। "লগ্ন যত্র চ যস্য হৃৎ"—ইহা পণ্ডিতবর্গের সিদ্ধান্ত নহে,—শাস্ত্রসম্মত "বিকল্প মত" বলিয়াও কথিত হইতে পারে না। ইহা কেবল একদলের মত; সে দল "বিপশ্চিৎ" নহে।

অজ্ঞতা দূর করিয়া, বিজ্ঞতা দান করাই শাস্ত্রের মুখ্য প্রয়োজন। প্রকৃত পক্ষে তাহা শাসন নহে; উপদেশ—প্রবৃত্তির এবং নিবৃত্তির উপদেশ;—বিধি এবং নিষেধ। তজ্জন্য শাস্ত্রের পঠনপাঠনের ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছিল। * তাহার অভাবে, ব্যাকরণ-অভিধানের সাহায্যে পুরাতন টীকাহীন শাস্ত্রবচনের মর্ম্মার্থ আধুনিক টীকাকারগণের চেষ্টায় সকল স্থলে যথাযথরূপে প্রকাশিত হইতে পারে

* এই প্রবন্ধের শিরোভাগে যে ভট্টোক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেই শাস্ত্র কাহাকে কহে তাহা সুব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে।

নাই। এখানেও সেইরূপ টীকা-বিভ্রাটই অনর্থ উৎপাদিত করিয়াছে। শাস্ত্র তাহার বক্তব্য বিশদ ভাবে ব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে বিধিনিষেধের অবতারণা করিয়াই নিরস্ত হয় নাই; তাহার "অতিক্রম-ব্যতিক্রম" নিরস্ত করিবার জন্য নানারূপ শাসন-বাক্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছে। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-পরিমাণ-সামঞ্জস্য লঙ্ঘন করিয়া কি কি ইহ-লৌকিক ক্ষতি হইতে পারে, তাহার উল্লেখ করিয়া, ভয় প্রদর্শন করিয়াছে। তাহা সমূলক হউক অমূলক হউক, তাহাই শাস্ত্রের শাসনধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। "লগ্নং যত্র চ যস্য স্যৎ"—এই মত যে শাস্ত্রসঙ্গত নহে, এবং ইহা যে কেবল অ-বিপশ্চিৎগণের মত, তাহা বুঝাইবার জন্যই ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাকে শাস্ত্রাভিপ্রেত "বিকল্প-বিধি" বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না।

পুরাতন অশনবসন-ব্যবস্থা আমাদিগকে এখন আর তৃপ্তি দান করিতে পারিতেছে না। পুরাতন শিল্প-ব্যবস্থা যে তৃপ্তি দান করিতে থাকিবে, তাহার সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং তাহার "অতিক্রম-ব্যতিক্রম" সাধনের প্রয়াস অনিবার্য্য। তজ্জন্য যাঁহারা বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন, তাঁহারা "ভারত-শিল্পসমিতি" নাম গ্রহণ না করিয়া, "ভারত শিল্প-সংস্কার সমিতি" নাম গ্রহণ করিলে কাহাকেও কিছু বলিবার থাকিত না। সংস্কার সংহার মাত্রে পর্য্যবসিত হইবে কি না, ভবিষ্যৎ তাহার বিচার করিবার অবসর লাভ করিবে।

ভারত-শিল্পপদ্ধতির নামে শিল্প-সাঙ্কর্য্যের অভ্যুদয় হইতেছে বলিয়া, তাহার কৌলিন্য রক্ষার জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক। ভাল হউক, মন্দ হউক, তাহা ইতিহাসে একটি রচনাধারার প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়াছে। তাহাকে সহসা বিলুপ্ত হইতে দিলে, ভারত-শিল্পপদ্ধতির বিশিষ্টতা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহাকে রক্ষা করিবার পথ বড়ই বন্ধুর,—তাহা খেয়ালসাপেক্ষ নহে, শিক্ষাসাপেক্ষ। তাহার চেষ্টা করিতে হইলে, খেয়ালীগণকে ছাড়িয়া দিয়া, শিক্ষার্থিগণকে লইয়া কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে। কারণ, খেয়ালীগণ শিখিবার জন্য সময় নষ্ট করিতে অসম্মত, শিখাইবার জন্যই অবসরশূন্য। তাঁহারা যে উন্মাদনা লাভ করিয়াছেন তাহার নিদান—"নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ।" শিল্পিগণ রচনা করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহারাও কবি-পদবাচ্য। তজ্জন্য তাঁহারাও নিরঙ্কুশ। কথাটা এ যেখানে সেখানে প্রচারিত হইতেছে। সুতরাং তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক।

কবে কোন্ সূত্রে এই কথার উৎপত্তি হইয়াছি তাহার ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; এখন কে কথাটা মুখে মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সকলেই যা জানে, কেহই তাহার তাৎপর্য্যের সন্ধান লাভ করিবা জন্য প্রয়োজন স্বীকার করে না। কিন্তু এই নিরঙ্কুশত্বে "ব্যাপ্তি" অর্থাৎ দৌড় কতদূর, তাহার সন্ধান লইবার চে করিবামাত্র দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাও বিধি-নিষেধাত্ম সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ;—স্বৈরাচার নহে, শাস্ত্রা চার। ইহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ,—

"অপি মাষং মষং কুর্য্যাচ্ছন্দোভঙ্গং ন কারয়েৎ।"

ছন্দই কবিতার বিশিষ্ট লক্ষণ; তাহাকে রক্ষা করিয় রচনা-ব্যবস্থা স্থির করিতে হইবে। যদি ছন্দোভঙ্গে আশঙ্কা উপস্থিত হয়, তখন (তন্নিবারণার্থ) বিশুদ্ধ "মাষ শব্দকে অশুদ্ধ "মষ" শব্দরূপেও ব্যবহার করিতে হইবে ছন্দোভঙ্গের আশঙ্কা না থাকিলে, এই "অতিক্রম-ব্যতি ক্রম" চলিবে না। ইহা কবি-কুলের নিরঙ্কুশত্বের একটি উদাহরণ। কোথায় ইহা চলিবে, কোথায় চলিবে না ইহার মধ্যেই তাহার সীমা সুনির্দ্দিষ্ট।

"ছন্দোবৎ কবয়ঃ কুর্ব্বন্তি।"

ভারতবর্ষে বৈদিক ও লৌকিক নামক দুই শ্রেণী ভাষা দুই শ্রেণীর ব্যাকরণ-সূত্রের অধীন ছিল। লৌকিক সাহিত্যে কাব্যাদি রচনা করিবার সময়ে লৌকিক ব্যাকরণ সম্মত পদ প্রয়োগ করাই সাধারণ রীতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। কিন্তু মহর্ষি পতঞ্জলি মহাভাষ্যে লিখিয়া গিয়াছেন,—কবি-কুল সর্ব্বত্র তাহা মানিয়া চলিতেন না,—তাঁহারা ছন্দোবৎ (বৈদিক প্রয়োগবৎ) প্রয়োগের ব্যবহার করিতেন। ইহার আর এক নাম "আর্ষ প্রয়োগ"—বেদ-বিজ্ঞাপক ঋষি শব্দের উত্তর "তত্র ভব" এই অর্থে অন্-প্রত্যয়ে ইহা সিদ্ধ বলিয়া কুল্লুক ভট্ট স্বকৃত মনুটীকায় ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহার অর্থ "বৈদিক-প্রয়োগ"। এখানেও নিরঙ্কুশত্ব ব্যাকরণ-শৃঙ্খল মুক্ত নহে,—লৌকিক ব্যাকরণসম্মত না হইলেও, বৈদিক ব্যাকরণসম্মত;—স্বৈরাচার নহে, শাস্ত্রাচার।

অধিক উদাহরণের উল্লেখ না করিয়া সাধারণ ভাবে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে,—কবি-কুলের কোনও শ্রেণীর নিরঙ্কুশত্বই সীমাশূন্য স্বেচ্ছাচার নহে,—তাহা সুনির্দ্দিষ্ট বিষয়-বিশেষের সুনির্দ্দিষ্ট অধিকার মাত্র। তাহার দোহাই দিয়া শিল্পিগণকে শিল্পশাস্ত্রের "অতিক্রম-ব্যতিক্রম" সাধনে নিরঙ্কুশ বলিয়া বর্ণনা করিবার উপায় নাই। শিল্প-শাস্ত্রেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না।

যাহা ভাল লাগে তাহাই ভাল, শিল্পিগণ তজ্জন্য শিল্পশাস্ত্রের "অতিক্রম-ব্যতিক্রম" সাধনে নিরঙ্কুশ,— এই দুইটি সিদ্ধান্তই ভারত-শিল্পের পক্ষে অপ-সিদ্ধান্ত। ভারত-শিল্পশাস্ত্র শিল্প-প্রতিভাকে পঙ্গু করিয়া শিল্পের অবনতি সাধন করিয়াছিল কি না, তাহা শিল্পের কথা নহে, ইতিহাসের কথা। সুতরাং এতৎ সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হইবার পূর্ব্বে প্রমাণ আবশ্যক। ভারত-শিল্পপদ্ধতির লক্ষ্য কি, তাহার উৎপত্তির হেতু কি, তাহার পরিণাম কি, এখনও তাহার যথাযোগ্য আলোচনার সূত্রপাত হয় নাই। সুতরাং তাহার "অতিক্রম-ব্যতিক্রম" সাধনের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে কি না, তাহা এখনও সুনির্দ্দিষ্ট হয় নাই। যদি সত্যসত্যই প্রয়োজন উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে "শিল্প-সংস্কারসমিতি" গঠিত করিতে হইবে; কিন্তু তাহাকে "ভারত-শিল্প-সমিতি" বলা চলিবে না। ভারত-শিল্প-সমিতির নিকট জিজ্ঞাসুগণ দুইটি বিষয় জানিতে চাহেন,—(১) ভারত-শিল্পের বিশিষ্ট লক্ষণ কি, এবং (২) তাহার উদাহরণ কিরূপ? প্রথমটি এখনও অনালোচিত; দ্বিতীয়টি আধুনিক শিল্পচর্চ্চার যে সকল উদাহরণ উপস্থিত করিতেছে, তাহার সকলগুলিই কৌলিন্য-হীন সাঙ্কর্য্য-প্রসূত "অতিক্রম-ব্যতিক্রমের" লীলা-পুত্তল। তাহাও এক শ্রেণীর শিল্প; কিন্তু তাহার সর্ব্বাঙ্গে আত্ম-প্রভাব অপেক্ষা পর-প্রভাব অধিক সুব্যক্ত। তাহাকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া, শিল্পে "স্বরাজ" লাভ করিতে হইলে, শাস্ত্র-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া, শাস্ত্র-মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য যত্নশীল হইতে হইবে। তাহার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

বিদুষী স্তেলা ক্রামরীশ অল্পদিন হইল এই পথে পদার্পণ করিয়া, (বিগত ডিসেম্বর মাসের 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রে) ভারত-শিল্পপদ্ধতির মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি উপাদেয় তথ্যের আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বিদেশিনী হইয়াও, ভারত-সভ্যতার মূলানুসন্ধানে ব্যাপৃতা এবং ভারত-শিল্পের বিশিষ্ট লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে কৃতসঙ্কল্পা হইয়া লিখিয়াছেন :—

The evolution of Indian art is organised by the rhythm which organises the work of art, and nothing is left to chance, and little to extraneous influence. * * * Its movements are strictly regulated. In no other civilisation, therefore, we find such minute prescriptions for proportions and movements. The relation of the limbs, every bent and every turning of the figures represented, are of the deepest significance. This dogmatism, far from being sterile, conveys regulations how to be artistically tactful, so that no over-strain, no inadequate expression, and no weakness ever will become apparent. The regulations are a code of manners. * * * Tradition thus is the life-elixir of the East. It secures steadiness, and keeps the channels smooth where intuition is moulded into proper form. The quality of Eastern art, therefore, never sinks below a certain level, while utmost concentration and imtensity find their realisation within those limits without effort and without struggle."

ইহার প্রত্যেক কথাই ধীরভাবে প্রণিধানযোগ্য। "অতিক্রম ব্যতিক্রম"-স্পৃহা ভারত-শিল্পের নাম দিয়া যে সকল সৃষ্টিলীলার পরিচয় প্রদান করিতেছে, তাহার মধ্যে ভারত-শিল্পের এই সকল সুপরিচিত বিশিষ্ট লক্ষণ ফুটিয়া উঠিতেছে না। তাহার সকল উদাহরণেই কিছু না কিছু চেষ্টা-কৃচ্ছ্রতা (over-strain);—অস্ফুট বিকাশ (inadequate expression);—চিত্রদৌর্ব্বল্য (weakness) দেদীপ্যমান। একটি উদাহরণও এই সকল ত্রুটিশূন্য হইলে, নববিধান সুশোভনরূপে তাহার জয়ঘোষণা করিতে পারিত। তাহা

এখনও জয়লাভ করে নাই; যাহা পাইয়াছে, তাহা কাহারও কাহারও কৃপা-কটাক্ষ!

ভারত-সভ্যতা কাহারও আকস্মিক সৃষ্টি বলিয়া কথিত হইতে পারে না। তাহা যুগযুগান্তরের অসংখ্য ঘটনাবলীর সমষ্টিগত অভিব্যক্তি। সেই প্রাচীন সভ্যতার অঙ্গীভূত শিল্পাদির অবস্থাও সেইরূপ। তাহার "অতিক্রম-ব্যতিক্রম" ভারত-সভ্যতার মূল আদর্শের "অতিক্রম-ব্যতিক্রম"। সুতরাং তাহাতে যে পরিমাণে ভারতীয় ধ্যান-ধারণার পরম্পরাগত ঐতিহাসিক ধারা প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, তাহাকে ভিন্নপথে পরিচালিত করিতে হইলে, তাহার বিশিষ্ট লক্ষণেরও "অতিক্রম-ব্যতিক্রম" সংঘটিত হইবে;—তাহা যাহা, তাহা থাকিবে না; কেবল তাহার নাম থাকিবে "ভারত-শিল্প";—এরূপ পরিণতি সকলের নিকট সমান স্তুতি লাভ করিতে পারে না। "লগ্ন" যাত্র চ যন্ত হৃৎ"—এই ছিন্নমূল বচনাংশ ধরিয়া, কেহ যদি আত্মতৃপ্তি সাধনের জন্য "অতিক্রম-ব্যতিক্রম"-সাধনের আয়োজন করেন, তাহাতে কাহারও কিছু আসিয়া যায় না। কিন্তু তাহাকে পুরাতন শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবস্থা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহা চিত্রবিদের অধিকার অতিক্রম করিয়া, শাস্ত্রবিদের অধিকারে অনধিকার-প্রবেশ করে,—ইতিহাসের সহিত শিল্পের সামঞ্জস্য আঘাত প্রাপ্ত হয়। গান্ধার-পদ্ধতি উত্তর পশ্চিমপ্রান্তের ভারত-সীমান্তে কোটরাবদ্ধ থাকিয়া অল্পকালেই বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছিল;—মোগল-রাজপুত-পদ্ধতি রাজসভার উন্নতি-অবনতির সহযাত্রী হইয়া, দরবারী পদ্ধতিতে পরিণত হইয়াছিল;—এই সকল আগন্তুক পদ্ধতি ভারত-শিল্পপদ্ধতির মূলপ্রস্রবণকে স্থানভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। আধুনিক শিল্পসাধকগণ সংযমশূন্য নিরঙ্কুশত্বের দাবী দরপেশ করিয়া, শিল্পসাধনা করিতে থাকিলে, তাহার পরিণাম কিরূপ হইবে? অল্পদিনের মধ্যে যতগুলি অ-ভারতীয় রীতি প্রশ্রয়লাভ করিয়াছে, তাহার বিশ্লেষণ-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেই, প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িবে।

অমূল তরু

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[৮]

কলেজ হইতে সেদিন সুবোধ সকাল-সকাল ফিরিয়াছিল। সিঁড়িতে উঠিবার সময় প্রত্যহ যেমন চিঠির বাক্সটা দেখিয়া যায়, তেমনি দেখিতে গিয়া দেখিল, নীলাভ রংএর পুরু কাগজের খামে তাহার নামে একটা চিঠি রহিয়াছে। পরিচ্ছন্ন, সুগঠিত, অর্দ্ধ-পরিচিত হস্তাক্ষর দেখিয়া একটা, অধীর উল্লাসে তাহার হৃদয়টা নাচিয়া উঠিল; এবং সহসা পথমধ্যে মণি-রত্ন কুড়াইয়া পাইলে লুব্ধ পথিক যেমন লুকাইয়া অন্তরালে লইয়া গিয়া সোৎসাহে তাহা নিরীক্ষণ করে—তেমনি সে তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া চিঠিখানা লইয়া বসিল। সন্দেহ প্রায় কিছুই না থাকিলেও, সুবোধ চিঠি খুলিয়া প্রথমেই নামটা দেখিতে ব্যস্ত হইল; এবং পত্রের তলদেশে নিবদ্ধ বর্ণমালার তিনটি বর্ণ, মুগ্ধ-চকিত দৃষ্টি-পথ দিয়া, তাহার হৃদয়কে একেবারে আলোড়িত করিয়া তুলিল।

প্রথমে তাড়াতাড়ি, তাহার পর ধীরে-ধীরে, তাহার পর আরও কয়েক প্রকারে পাঠ করিয়া, সুবোধ আর একবার চিঠিখানা পড়িতে যাইতেছিল, এমন সময়ে দ্বারে করাঘাত পড়িল, "দোর বন্ধ করে কে হে? খোল, খোল, দোর খোল।"

তস্করের কক্ষ-দ্বারে সহসা পুলিশ আসিয়া উপস্থিত হইলে সে যেমন ব্যস্ত হইয়া পড়ে, দ্বার-দেশে কণ্ঠস্বর শুনিয়া সুবোধের অবস্থা ঠিক সেইরূপ হইল; এবং পর-মুহূর্ত্তেই "খুলচি" বলিয়া সাড়া দিয়া, তাড়াতাড়ি চিঠিখানা বাক্সর মধ্যে পুরিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

নীরদ ও প্রকাশ ঘরে প্রবেশ করিল। ইতস্ততঃ

দৃষ্টিপাত করিয়া সন্দিগ্ধ ভাবে প্রকাশ কহিল, "দোর বন্ধ ক'রে কি কচ্ছিলে হে? নায়িকার ধ্যান করছিলে না কি?"

প্রথমে সুবোধ একটু বিমূঢ় হইয়া গেল। তাহার পরই হাসিয়া কহিল, "তোমাদের মত অরসিকরা যেখানে উপদ্রব ক'রে বেড়ায়, সেখানে কি ধ্যান করবার যো আছে? দোর ভাঙ্গতে যেখানে দেরি হয় না, যোগ ভাঙ্গতে সেখানে আর কত দেরী হয় বল?"

নীরদ হাতের বহিগুলা টেবিলের উপর ফেলিয়া, ও গাত্র-বস্ত্রখানা আল্‌নায় রাখিয়া বলিল, "মেসের বাসায় কি দোর বন্ধ ক'রে যোগ করে সুবোধ? এই রকম ক'রে কর্‌তে হয়।" বলিয়া সে সটান লেপের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল।

প্রকাশ কহিল, "তা ছাড়া যোগ-তপস্যার পক্ষে এখানকার আবহাওয়া একেবারেই অনুকূল নয়। চাঁদের আলো, ফুলের হাসি, এই সব সূক্ষ্ম জিনিস না খেয়ে যারা পাঁঠার মাংস, ছানার পায়েস প্রভৃতি স্থূল জিনিস খায়, তাদের সংস্পর্শে যোগ বিয়োগ হয়ে যায়।"

সুবোধ মৃদু হাসিয়া কহিল, "তোমাদের যোগী ত' পাঁঠার মাংস, ছানার পায়েস—এ সব স্থূল জিনিসের চেয়ে, আরও স্থূল জিনিস, যেমন চিংড়ির কাট্‌লেট্, ডিমের ডেভিল্ প্রভৃতি খেয়ে থাকেন। প্রমাণ চাও ত' ভোলা ঠাকুরকে ডেকে পাঠাও।"

নীরদ লেপের ভিতর হইতে মাথা বাহির করিয়া বলিল, "সে তোমার স্থূল মুখ খায় ভাই; সূক্ষ্ম মুখ খায় না। তোমার স্থূল মুখ পাখীর মাংস খায়, আর সূক্ষ্ম মুখ পাখীর গান খায়।"

সুবোধ কহিল, "তোমাদের অবস্থাও ঠিক তাই নীরদ! তোমাদেরও সূক্ষ্ম মুখ পাখীর মাংস না খেয়ে পাখীর গান খায়।"

নীরদ বলিল, "আমাদের সূক্ষ্ম মুখই নেই, তা' আবার পাখীর গান! সে যাক্ সুবোধ, তুমি কয়েক দিন থেকে গম্ভীর হ'য়ে গেছ কেন হে? আর কবিতা আওড়াও না, আমাদের ওপর কাব্য ইন্‌জেক্‌সন্ কর না—দোর বন্ধ ক'রে একা বসে থাক,—ব্যাপারখানা কি হে? প্রকাশ, তুমি কিছু আন্দাজ কর্‌তে পার?"

প্রকাশ সুবোধের প্রতি মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "আন্দাজ কেন?—সঠিক বলে দিতেই পারি। কি বল সুবোধ, বল্‌ব?"

সুবোধের সন্দেহ হইল যে, প্রকাশ হয় ত' কোন প্রকারে প্রকৃত কথা জানিতে পারিয়াছে। সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য সে বলিল, "জ্যোতিষ শাস্ত্রের ওপর যদি তোমার এতটা দখল হ'য়ে থাকে, তা হলে বল। আমিও ঠিক ক'রে বুঝে নিই, ব্যাপারখানা কি।"

সস্মিত মুখে প্রকাশ বলিল, "মাছ ধরা দেখেছ নীরদ? প্রথমে যখন চুঁনো-পুঁটি টোপ ঠুকরোতে আরম্ভ ক'রে, তখন ফাৎনাটা অস্থির, চঞ্চল হ'য়ে কি রকম নাচতে থাকে। কিন্তু যখন ষোল-সেরী লাল টক্‌টকে রুই মাছ এসে টোপটা একেবারে গিলে ফেলে, তখন একেবারে নিঃশব্দে ফাৎনাটা জলের মধ্যে অন্তর্হিত হয়। এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছ কি, সুবোধের কাব্য-ফাৎনা হঠাৎ কেন অদৃশ্য হয়েছে।"

লেপখানা সজোরে দূরে নিক্ষেপ করিয়া, খাটের উপর উঠিয়া বসিয়া নীরদ কহিল, "রূপকের ভাষা ত্যাগ না করলে ঠিক বুঝ্‌তে পারছি নে। তুমি সাদা কথায় বল, কি হয়েছে।"

"সাদা কথায় বল্‌তে গেলে, আর একবার সুবোধের অনুমতি নিতে হয়। কি বল সুবোধ? অভয় দাও ত' বলি।" বলিয়া প্রকাশ মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিল।

কথাটা পরিষ্কার করিয়া না জানিয়া, সুবোধও সুস্থির হইতে পারিতেছিল না। বলিল, "বল।"

পূর্ব্ববৎ হাসিতে-হাসিতে প্রকাশ বলিল, "ফাৎনা ত' বলেইছি সুবোধের কাব্য-রুচি—টোপ হচ্ছে, সুবোধের প্রেম কিম্বা সুবোধ সশরীরেই নিজে; বঁড়শী হচ্ছে, আমাদের বন্ধু বিনোদচন্দ্র; আর ষোল-সেরী টক্‌টকে রুই হচ্ছে, তার ষোড়শী ফুট্‌ফুটে শ্যালী সুনীতি।"

"সত্যি?" বলিয়া সজোরে বালিশ চাপড়াইয়া নীরদ গান ধরিল "প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে—প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে।"

এক মুহূর্ত্ত নিঃশব্দ থাকিয়া সুবোধ ধীরে-ধীরে বলিল, "অন্যায়, ভারি অন্যায় প্রকাশ! আর একদিন—"

সুবোধকে কথা শেষ করিতে না দিয়া প্রকাশ কহিল, "তোমারই অন্যায় সুবোধ,—আমার অন্যায় একটুও নয়।

আর একদিন যখন এ কথা বলেছিলে, তখন তার মধ্যে বিশেষ না থাক্‌লেও কতকটা অর্থ ছিল। আজ তোমার কথার মধ্যে কোন অর্থই নেই। বন্ধুর ভাবী পত্নীর উল্লেখে একটু পরিহাস-কৌতুক করবার অধিকার বন্ধুদের আছেই। তুমি অবন্ধুর মত কথা বোলো না।"

সুবোধ বলিল, "সে পরিহাস করবার অধিকার নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু অকারণে একজন ভদ্র-ঘরের মেয়েকে জড়িত করে প্রলাপ বকবার অধিকার কারও নেই।"

প্রকাশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুবোধের প্রতি চাহিয়া বলিল, "মিথ্যে ছলনা করছ সুবোধ,—মিথ্যে লুকোবার চেষ্টা করছ। আমার ত' কোন কথা জানতে বাকি নেই।"

ক্রুদ্ধ স্বরে সুবোধ বলিল, "কি জান্‌তে বাকি নেই?"

মৃদু হাসিয়া প্রকাশ কহিল, "জানতে বাকি নেই যে, তুমি সুনীতিকে ভালবেসেছ, আর খুব সম্ভবতঃ সুনীতিও তোমাকে ভালবেসেছে। অস্বীকার করছ?"

সুবোধের মুখ-মণ্ডল ক্রোধে রক্তিম হইয়া উঠিল। সে অধিকতর কুপিত কণ্ঠে বলিল, "বিনোদ বুঝি এ সব কথা বলেছে?"

প্রকাশ শান্ত-কণ্ঠে কহিল, "হ্যাঁ, বিনোদই বলেছে। কিন্তু কেন বলেছে তা শুন্‌লে, তার ওপর ত' রাগ থাক্‌বেই না—আমার ওপরও থাক্‌বে না। বিনোদ যে তোমার কত বড় হিতৈষী, তা তোমাকে একটু বুঝিয়ে দেওয়া দরকার হয়েছে। প্রথমে তোমাকে দুখানা চিঠি দেখাই।" বলিয়া প্রকাশ উঠিয়া তাহার বাক্স হইতে দুইখানা চিঠি আনিয়া, একখানা সুবোধের হস্তে দিয়া বলিল, "আমার শালা সুরেনের চিঠি। সবটা পড়বার তোমার ধৈর্য্য থাক্‌বে না—এইটুকু পড়।" বলিয়া প্রকাশ পত্রের মধ্যে বিশেষ একটা স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিল।

তথায় এইরূপ লেখা ছিল। "তোমার চিঠি পেয়ে লুব্ধ হয়ে বিনোদবাবুর শ্যালী সুনীতির সংবাদ নিয়েছি। আমার এক দূর সম্পর্কের বউদিদি সুনীতিদের বাড়ীর কাছেই থাকেন। তাঁকে সংবাদ নেবার জন্যে লিখে-ছিলাম। তিনি লিখ্‌ছেন, ছেলেবেলা থেকেই তিনি সুনীতিকে জানেন; আর তাঁদের মধ্যে সর্ব্বদাই যাতায়াত চলে। তাঁর দীর্ঘ চিঠি পড়ে বেশ বুঝ্‌তে পারছি যে, সুনীতি বাংলা দেশের মেয়েদের মধ্যে একটি রত্ন—রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি—সব বিষয়েই। তোমার কথার যথার্থতা সম্বন্ধে আর তা'হলে কোন সন্দেহ নেই। ভেবেছিলাম, বিলাত থেকে ফিরে এসে বিবাহ করব—কিন্তু এ সুযোগটা ছাড়তেও ভরসা হচ্ছে না। ধ্রুব ত্যাগ করে অধ্রুবের মধ্যে গেলে প্রায় ঠকতে হয়। বাবার বিশেষ ইচ্ছা, বিবাহ করে বিলাত যাই। তাই হ'ক—এক ঢিলে দুই পাখী মারা যাক্‌—পিতৃ-ইচ্ছাও পালন করি, আর নিজের জীবনও সৌভাগ্যে মণ্ডিত করে নিই। তুমি পত্র পাঠ তাঁদের মত নিয়ে আমাকে জানাবে। তার পর সব ব্যবস্থা ঠিক্ করে ফেলা যাবে। আর তার পরেই মাঘে মাসি, শুক্লে পক্ষে, পূর্ণিমাংতিথৌ। বউদিদি লিখেছেন যে, বিনোদ-বাবুর শ্বশুর-বাড়ীতে বিনোদবাবুর কথা আইনের মত চলে। তবে আর বাধা কোথায়? তোমার পত্রের আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলাম। আমি মার্চ্চ মাসে বিলেত যাচ্ছি। অতএব মনে রেখো, সময় বেশী নেই।"

সুবোধ চিঠিখানা প্রকাশকে প্রত্যর্পণ করিয়া কহিল, "এ ত' বেশ কথা—তা এ আর আমাকে দেখাচ্ছ কেন?"

প্রকাশ কহিল, "হ্যাঁ, বেশ কথা। তার পর শোন কি হোল। এ চিঠি আমি বিনোদকে দেখিয়ে, সুনীতির সঙ্গে সুরেনের বিয়ের প্রস্তাব কর্‌তে অনুরোধ করি। তখন বিনোদ বাধ্য হয়ে আমাকে জানায় যে, তোমার সঙ্গে সুনীতির পরিচয় হয়েছে—আর তোমাদের উভয়ের পরি-চয়টা এমন একটা বিশেষ ভাবে পরিণত হবার উপক্রম কর্‌ছে যে, আরও কিছুদিন তার গতি না দেখে, সে কিছুতেই তার মধ্যে একটা হাঙ্গামা বাধাতে রাজি নয়। আমি সে কথা শুনেই সুরেনের চিঠির উত্তর দিই। তার উত্তরে সুরেন কি লিখেছে দেখ।" বলিয়া অপর পত্রখানা সুবোধের হস্তে দিল।

সুরেন লিখিয়াছিল, "তোমার চিঠি পেয়ে সব কথা অবগত হলাম। যেখানে এমন একটি প্রেম গড়ে উঠ্‌ছে,—এমন হৃদয়-হীন কেউ নেই যে, তার মধ্যে প্রবেশ কর্‌তে চাইবে—আমি ত' নই-ই। অতএব এ কথার এইখানেই শেষ। কুমার অবস্থাতেই বিলাত যাব—কিন্তু তোমরা নিশ্চিন্ত থেকো, সেখান থেকে মেম ঘাড়ে করে ফির্‌ব না।"

পত্র পাঠ করিয়া সুবোধ নীরবে চিঠিখানা প্রকাশকে ফিরাইয়া দিল।

প্রকাশ স্মিত মুখে কহিল, "কি সুবোধ, এখনও কি বিনোদের উপর, আর আমার উপর তোমার রাগ হচ্ছে ?"

সুবোধ একটু ভাবিয়া বলিল, "তোমাদের সহৃদয়তার জন্যে তোমাদের দুজনের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু বিনোদের শ্যালীর সঙ্গে আমার যতটুকু পরিচয় হয়েছে, তাতে এ রকম পরিহাস কোন মতেই সঙ্গত নয়। সে যাই হ'ক, আমি যদি কোন রূঢ় কথা তোমাকে বলে থাকি, তার জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি প্রকাশ।"

প্রকাশ কহিল, "না—না, সুবোধ, আমাদেরই তোমার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। তুমি যখন কাব্য-সাধনা করতে, আর বলতে যে, তোমার সাধনা কখনই বৃথা যাবে না—একদিন তোমার মানস-প্রতিমা মূর্ত্তিমতী হ'য়ে ধরা দেবে,—ফুলের গন্ধ ফলের রসে পরিণত হবে,—তখন আমরা হাসতাম, আর ভাবতাম যে, তোমার জন্যে চাঁদা করে এক শিশি মধ্যমনারায়ণ তেল কিনলে ভাল হয়। এখন দেখ্‌চি বাস্তবিকই তোমার মধ্যে একটা দুর্নিবার শক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল—যা একটুও নিষ্ফল হল না। আমাদেরই তোমার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত।"

নীরদ পূর্ব্বের মত সজোরে বালিস্ চাপড়াইয়া কেবলই গাহিতে লাগিল, "প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে।"

সন্ধ্যার সময়ে বিনোদকে একা পাইয়া সুবোধ বলিল, "প্রকাশকে সব কথা বলেছ বিনোদ ?"

বিনোদ শান্ত ভাবে কহিল, "সব বলিনি, যতটুকু বলা দরকার, তাই বলেছি। কিন্তু কেন বলেছি, তা ত' তুমি আজ সব শুনেছ।"

"তা শুনেছি।" বলিয়া সে প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সুবোধ হাসিমুখে বলিল, "আজ সুনীতির চিঠি পেয়েছি বিনোদ।" তাহার চক্ষুদুটি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া নাচিতেছিল।

"পেয়েছ ? কই, দেখি ?" সুবোধকে সুনীতি কি পত্র লিখিল, দেখিবার জন্য বিনোদের যৎপরোনাস্তি আগ্রহ হইল।

সুবোধ মৃদু মৃদু হাসিয়া একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল, "বড় সমস্যায় প'ড়ে গেছি ভাই। সুনীতির চিঠি তোমাকে দেখাব না তা' ত ভাবতেই পারি নে—অথচ চিঠি কাউকে দেখাতে সুনীতি এমন করে নিষেধ করেছে যে, সে নিষেধ অগ্রাহ্য করাও অনুচিত। তুমি যদি দয়া করে না দেখাবার অনুমতি দাও, তা হলে বিপদ থেকে বাঁচি।"

একটু পীড়াপীড়ি করিয়া বিনোদ যখন বুঝিল যে, অনুমতি না দিলে বিনা অনুমতিতেও চিঠি দেখিবার সম্ভাবনা কম, তখন অগত্যা অনুমতি দেওয়াই উচিত বলিয়া সে মনে করিল।

সুবোধ হাসিয়া কহিল, "শুধু তাই নয়। আমি যে চিঠি সুনীতিকে লিখব, সে চিঠিও কাউকে দেখান বারণ।"

বিনোদ স্মিত মুখে কহিল, "বেশ! বেশ! একেবারে রীতিমত গুপ্ত ভাবে চিঠিপত্র লেখালিখি আরম্ভ হল। আর বাজে লোকেরা বাইরে পড়ে গেল! তোমার কিন্তু বাহাদুরী আছে সুবোধ!—এত অল্প সময়ের মধ্যে এত উন্নতি! তুমি বোধ হয় যাদু জান!"

সুবোধ আত্ম-প্রসাদে নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল।

[৯]

প্রকাশ ও নীরদ নিদ্রিত হইলে, সুবোধ সুনীতির পত্রখানা বাহির করিয়া, পুনরায় দুই-তিনবার পড়িয়া ফেলিল।

সুনীতি লিখিয়াছিল, "শ্রদ্ধাস্পদেষু, তিন-চার দিন হোল আপনার একখানি স্নেহলিপি পেয়েছি। উত্তর দিতে বিলম্ব হোল বলে অনুগ্রহ করে ক্ষমা করবেন।

আপনার চিঠি পেয়ে অতিশয় আনন্দিত হয়েছি। কিন্তু আমাকে চিঠি লিখতে আপনি সঙ্কোচ বোধ করছিলেন, এবং চিঠি লিখেছেন তার জন্যে ক্ষমা চেয়েছেন,—এ সকল কথায় বাস্তবিকই দুঃখিত হয়েছি। সঙ্কোচ কিসের, আর ক্ষমা চাওয়া কেন, তা বুঝতে পারলাম না।

তার পর আপনার কৈফিয়ৎ চাওয়ার কথা। আপনার আচরণ সে দিন কিছুমাত্র অসঙ্গত বা অপরিমিত হয় নি, যার জন্যে আপনার কৈফিয়ৎ দিতে হয়। অত শীঘ্র কেন চলে গিয়েছিলেন, শুধু সেই বিষয়েই আপনি কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য। আমরা ঠিক করেছি, এবার যে দিন আপনি আসবেন, সে দিন আপনাকে দুই ঘণ্টা বেশী আটকে রেখে ক্ষতিপূরণ করা হবে।

আমাদের মধ্যে জন্মজন্মান্তরের আত্মীয়তার কথা আপনি যা লিখেছেন, আমারও মনে হয় তা সত্যি। নইলে প্রথম

সাক্ষাতেই এত আপনাআপনি ভাব কেমন করে হতে পারে। এমন ত' আমাদের বাড়ীতে অনেকেই আসেন, কিন্তু কারো সঙ্গে ত' এমনতর এ পর্য্যন্ত হয় নি। কিন্তু এই বন্ধনকে আপনি এত ক্ষণভঙ্গুর মনে কচ্ছেন কেন, যে, অদূর-ভবিষ্যতে একদিন লুপ্ত হয়ে যাবে বলে আপনার আশা হচ্ছে? আমারও মনে হয়, এ বন্ধন আমাদের মধ্যে ক্রমশঃ দৃঢ়তরই হয়ে উঠবে।

আপনি লিখেছেন যে, আপনার সেদিনের অভদ্র আচরণ যতক্ষণ আমি ক্ষমা না করছি, ততক্ষণ আমাদের বাড়ী আসবার আপনার অধিকার থাকবে না। আশ্চর্য্য কথা! এত ভদ্র আর মার্জ্জিত ব্যবহারকে যে কি করে ক্ষমা করতে হয়, তা আমি বুঝতেই পারি নে! এ বিষয়ে আমার এইমাত্র নিবেদন যে, ক্ষমা, অনুমতি প্রভৃতির কোন কথাই নেই। এ বাড়ীতে আপনার আসবার অধিকার অপ্রতিহতই আছে। আপনার যেদিন সুবিধা হয়, যখন ইচ্ছা হয় আসবেন। তার জন্য কাহারও অনুমতির প্রয়োজন নেই, যখন সে বিষয়ে সকলের অনুরোধই রয়েছে।

আপনার আদেশ নিশ্চয়ই প্রতিপালিত হবে; আপনার চিঠি আমি কাউকে দেখাব না। আমারও কিন্তু আপনার প্রতি এই অনুরোধ রহিল যে, আমার লিখিত চিঠি বা আমাকে লেখা চিঠি আপনি কাউকে দেখাবেন না। আমি জানি, আমারও অনুরোধ রক্ষিত হবে।

আশা করি আপনি ভাল আছেন। আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি—

বিনীতা—
শ্রীমতী সুনীতি দেবী।

তিন-চারিবার সুনীতির চিঠি পাঠ করিয়া, সুবোধ তাহার উত্তর লিখিতে উদ্যত হইল। অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র-পথে সহসা অনেকখানি জল আসিয়া পড়িলে, তাহা যেমন নিষ্ক্রান্ত হইতে পারে না—আটকাইয়া যায়, তেমনি সুবোধের লেখনী-মুখে সহসা একেবারে অনেকগুলি চিন্তা আসিয়া পড়ায়, কিছুক্ষণের জন্য সুবোধের লেখনী নিরুদ্ধ হইয়া রহিল; কিন্তু পরে যখন চলিতে আরম্ভ করিল, তখন দেখিতে-দেখিতে অল্প সময়ের মধ্যে একেবারে চিঠির কাগজের চারি পৃষ্ঠাই ভরিয়া গেল। দুইবার পাঠ করিয়া চিঠিখানা মুড়িয়া খামে ভরিয়া সুনীতির ঠিকানা লিখিয়া সুবোধ শয়ন করিল।

পরদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে চিঠিখানা যখন সুনীতির হস্তে পৌঁছিল, তখন সুমতি নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল, "কি রে? কার চিঠি? তোর বরের না কি?"

সুনীতি আরক্তমুখে চিঠিখানা দেখিয়া বলিল, "হ্যাঁ।"

"দে না, দেখি। দেখাবিনে?"

"না।"

সুমতি হাসিয়া কহিল, "ও রে, আমরা যে বরের চিঠি সকলকে সেধে দেখাই,—আর তোর এ কি কাণ্ড বল দিখিনি?"

সুনীতি হাসিয়া কহিল, "বিয়ে-করা বরের চিঠি দেখান যায় দিদি, পাতান বরের চিঠি দেখান যায় না।"

"তা হলে বিয়ের আগে দেখাবি নে?"

"না।"

"বিয়ে হলে দেখাবি ত?"

সুনীতি হাসিয়া কহিল, "তা দেখাব।"

চিঠিখানা তখনই খুলিয়া না পড়িয়া সুনীতি তাহার বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল। কিন্তু কাজে-কর্ম্মে, চলিতে-ফিরিতে একটা অনির্দ্দিষ্ট অকারণ শক্তি কেবলই যেন তাহাকে সেই চিঠিটার দিকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিল। সেই খামের মধ্যে আবদ্ধ ভাষার বাহনে একটি উচ্ছ্বসিত কিন্তু প্রতারিত হৃদয়ের যে আবেগ ও আবেদন নিঃসন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার জন্য আগ্রহ ও কৌতূহল সুনীতিকে নিরন্তর পীড়ন করিতে লাগিল। অবশেষে রাত্রে দ্বার বন্ধ করিয়া যখন সে সুবোধের পত্রখানা লইয়া টেবিলের সম্মুখে বসিল, তখন আবেগে তাহারই ভিতরে হৃদয়, এবং বাহিরে হস্ত, কাঁপিতে লাগিল। আজ ত' এ সুবোধের নিকট হইতে অনাহূত পত্র নহে,—আজ এ যে তাহারই পত্রের প্রত্যুত্তর,—ইহার জন্য সে দায়ী।

নিশীথের অসতর্ক অবসরে, সুবোধ তাহার সমস্ত হৃদয়-খানি ব্যক্ত করিয়া ধরিয়াছিল; কিছুই প্রচ্ছন্ন বা অস্পষ্ট রাখে নাই। সে লিখিয়াছিল, জীবনে যখন কোন বিষয়েই সে ছলনা কিম্বা লুকোচুরী করে নাই, তখন আজ তাহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং মহৎ এই যে প্রেম, তাহা লইয়াও করিবে না। তাই সে অবিসম্বাদী ভাষায় তাহার হৃদয়-কাহিনী সুনীতির নিকট ব্যক্ত করিয়াছিল। সে

লিখিয়াছিল "আমার এ প্রেম বিচার-বিবেচনা বা প্রীতি-পরিচয়ের ফল নয়, রূপজও নয় এবং গুণজও নয়। বীজ হতে অঙ্কুরের উৎপত্তির মতই আমার এ প্রেমের উৎপত্তি। এর জন্যে কারো সৎ পরামর্শ নেবার দরকার হয় নি, পাঁজি-পুঁথিও দেখতে হয় নি। সূর্য্য-কিরণে আকাশ যেমন লাল হয়ে ওঠে, সুনীতি-কিরণে সুবোধের হৃদয়ও তেমনি লাল হয়ে উঠেছে!"

আর এক জায়গায় সুবোধ লিখিয়াছিল—"এই বন্ধনকে ক্ষণভঙ্গুর বলে ভয় করেছি বলে তুমি আমাকে ভৎর্সনা করেছ; বলেছ, তোমার মনে হয় যে, আমাদের মধ্যে এ বন্ধন ক্রমশঃ দৃঢ়তর হয়ে উঠবে। আমি একান্তমনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে, তোমার এই ভবিষ্যৎ-বাণী যেন সত্য হয়। তোমার-আমার মধ্যে এ বন্ধন যেন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর এবং শেষে দৃঢ়তম হয়ে ওঠে। যেন অবিচ্ছিন্ন পাশে তোমার সহিত আমি আবদ্ধ হই। এর বড় মঙ্গল-কামনা আর আমার হতে পারে না সুনীতি।"

আর একস্থানে সুবোধ লিখিয়াছিল, "তোমার চিঠি কাউকে দেখাতে নিষেধ করে তুমি লিখেছ, 'আমি জানি, আমার এ অনুরোধ রক্ষিত হবে।' এ অধিকারের বিশ্বাস তোমার কোথা থেকে এল সুনীতি? কেমন করে তুমি জানলে যে রক্ষিত হবে? কে তোমাকে বললে? আমি বলব, কে বললে? যে প্রেম যুগ-যুগান্তর জন্ম-জন্মান্তর থেকে তোমার-আমার মধ্যে জেগে রয়েছে, সেই তোমাকে বলেছে। যে বাতাসে আমি নিরন্তর কাঁপছি সুনীতি, তুমিই কি তাতে স্থির আছ? কখনই নয়! এই জগতের সমস্ত মাধুর্য্য আমার চক্ষের সামনে নৃত্য করতে-করতে বলছে, কখনই নয়—তুমিও কাঁপছ! তুমিও কাঁপছ!"

পত্রের শেষে সুবোধ লিখিয়াছিল, "আমি সমস্ত কথাই তোমাকে জানালাম—কোন কথাই আমার অ-বলা থাকল না। আমার সমস্ত সাক্ষী-সাবুদ, আইন-নজির নিয়ে তোমার কাছে দাঁড়িয়েছি। তোমার বিচারে যদি তোমার কাছে আমার যাবার অধিকার এখনও অপ্রতিহত থাকে, তাহলে ভক্ত যেমন করে তীর্থদর্শনে যায়, আমিও ঠিক তেমনি করে তোমার বাড়ী যাব। আর তা যদি না হয়, তাহলে আজ থেকেই বিদায়! তবুও তোমাকে ধন্যবাদ; কারণ, যে মাধুরীতে তুমি আমার হৃদয় ভরে দিয়েছ, তোমার অপেক্ষায় এ জীবন কাটিয়ে দেবার জন্যে মৃত্যু পর্য্যন্ত সে আমাকে আনন্দ দান করবে।"

ঘরের একটা জানালা উন্মুক্ত ছিল। তাহা দিয়া শীতের হিম-স্নাত আকাশে একটা উজ্জ্বল তারা দেখা যাইতেছিল। সুবোধের চিঠিটা হাতে করিয়া সুনীতি তাহার দিকে অপলকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল সে যেন তারা নয়,—সুবোধের বহু জন্ম-জন্মান্তরের প্রেম ব্যাকুল ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। একটা তীক্ষ্ণ শীতল কম্পন সুনীতির দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে মুহুর্মুহু কাঁপাইতে লাগিল।

তাহার পর ধীরে-ধীরে সুনীতির মনের মধ্যে একটা অনির্দ্দেশ্য ক্ষোভ ও কোপ জাগিয়া উঠিল। কেন সে তাহার পত্রমধ্যে সুবোধকে এমন প্রশ্রয় দিয়াছিল, যাহাতে সুবোধ তাহাকে এরূপ পত্র লিখিতে সাহসী হইল। সুবোধেরই বা এ কি অন্যায় আচরণ যে, সে অবলীলাভরে তাহার প্রেমের কাহিনী তাহাকে লিখিয়া জানাইল,—একটু দ্বিধা সঙ্কোচ বোধ করিল না! সে একজন ভদ্রঘরের কন্যা—মানমর্য্যাদা সকলই তাহার আছে; বয়সও তাহার নিতান্ত অল্প নহে;—এ সকল গুরুতর কথা, সুবোধের উদ্ধত হৃদয়োচ্ছ্বাসকে একটুও সংহত করিতে পারিল না—এতই কি সুবোধ দুর্ব্বল! একটা দুর্জ্জয় অভিমানে সুনীতির দুই চক্ষে অশ্রু ভরিয়া আসিল। কিন্তু পরক্ষণেই সহসা একটা কথা মনে পড়ায়, তাহার চিন্তা-স্রোত একেবারে ভিন্ন পথে ফিরিয়া আসিল। সে কে, যে একটা অলীক কল্পনায় সে এতক্ষণ আপনাকে পীড়ন করিতেছিল? একটা চক্রান্তের কয়েকজন চক্রীর মধ্যে সে-ও একজন,—ইহার বেশী সে ত' কিছুই নহে। তবে তাহার এ সকল মান-অভিমানের অনধিকার-চর্চ্চা কেন? সুবোধের প্রেমপত্র লইয়া সে যদি এরূপভাবে কলহ করিতে পারে, তাহা হইলে থিয়েটারের অভিনেত্রীও ত' তাহার অভিনয়ের নায়কের সহিত ঠিক তদ্রূপ করিতে পারে। সুনীতির মনে হইল, সুবোধের এই যে মিথ্যা-গঠিত প্রেম, যাহার কোন ভিত্তি, কোন মূল্য নাই, তাহাকে একেবারে মিথ্যা বলিয়া না ধরিলেই—সে মূল্যবান হইয়া উঠিবে। সুখ-দুঃখ, ক্রোধ-অভিমান—এ সকল লইয়া তাহার সহিত খেলা করিলেই জীবনহীনকে সজীব করিয়া তোলা হইবে।

তখন সুনীতি আর একবার সুবোধের পত্রখানা আদ্যন্ত পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইল। পড়িতে-পড়িতে আবার সে অন্যমনস্ক হইয়া গেল। আবার সে ভুলিয়া গেল যে, সুবোধের এ প্রণয়োচ্ছ্বাস একেবারে অলীক এবং ইহার সহিত তাহার প্রকৃত-পক্ষে কোন সম্পর্কই নাই। এই প্রাণভরা ভালবাসা, এই মুগ্ধ-বিহ্বল হৃদয়ের ঐকান্তিক উপাসনা, এই সুনীতি সুনীতি বলিয়া ছত্রে-ছত্রে আকুল আহ্বান - ইহা কি একেবারেই মিথ্যা এবং ইহার বিন্দুমাত্রও কি তাহার প্রাপ্য নহে ? এ তবে কাহার পূজা ? কাহাকে আবাহন ? বিনোদ হয় ত বলিবে যোগেশকে। হবে ! পুনরায় সুনীতির দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল।

অদূরে পালঙ্কের উপর যোগেশ শয়ন করিয়া ছিল। চক্ষু মুছিয়া সুনীতি উঠিয়া তাহার পার্শ্বে গিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকিল "যোগেশ!" যোগেশ নিদ্রা গিয়াছিল, সাড়া দিল না। দুই-তিন মিনিট সুনীতি নিদ্রিত বালকের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার পরে ফিরিয়া আসিয়া সুবোধের পত্রখানা বাক্সে তুলিয়া রাখিয়া, এই সঙ্কল্প করিয়া শয়ন করিল যে. এই নিষ্ঠুর, প্রাণহীন ছলনার খেলা হইতে সে নিজেকে সরাইয়া লইবে—এবং সে বিষয়ে কাহারও অনুরোধে উপরোধে কর্ণপাত করিবে না।

শয্যায় আশ্রয় লইয়া কিন্তু সুনীতি চিন্তার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইল না। সে যতই এই কথাটা মনে-মনে স্থির করিয়া লইতে চেষ্টা করিতে লাগিল যে, বাস্তব অবস্থাটা একেবারেই অপ্রকৃত; সুবোধের প্রেমেরও কোন সত্য কারণ নাই; এবং কয়েকখানা কল্পিত চিঠি লেখা ছাড়া তাহারও আর কোন হাঙ্গামা পোহাইবার কথা ছিল না,—ততই একটা সূক্ষ্ম নৈরাশ্যের সূচী তাহার হৃদয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিল। যতই সে মনে-মনে সঙ্কল্প করিতে লাগিল যে, এই অবৈধ অভিনয় হইতে নিজেকে সে মুক্ত করিয়া লইবে, ততই একটা বিরস মাধুর্য্যহীন দিনাতিপাতের নিরুৎসাহে তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে বহুবিধ পরস্পর-বিসম্বাদী চিন্তা ও যুক্তি অতিক্রম করিয়া হঠাৎ যখন তাহার মনে হইল যে, সে বিনোদের নিকট এই সত্যে আবদ্ধ যে, এমন কোন আচরণ করিবে না, যদ্দারা কল্পিত চক্রান্তের কোন প্রকার ক্ষতি হইতে পারে এবং তাহার সহিত একথাও মনে হইল যে, সুবোধের পত্রের কোন উত্তর না দিলে সুবোধ আর এ গৃহে হয় ত আসিবে না, তখন সুনীতি স্থির করিল যে, অন্ততঃ এ চিঠিটার উত্তর সে দিবে; এবং তাহার কিছুক্ষণ পরে যখন সে বুঝিল যে চিঠির উত্তর আজই না লিখিলে নিদ্রা হওয়ার আশা অল্প, তখন অগত্যা সুনীতি শয্যাত্যাগ করিয়া সুবোধের চিঠির উত্তর লিখিতেই বসিল।

সংক্ষেপে এবং কতকটা সহজেই চিঠি শেষ হইয়া গেল; কিন্তু আজ "শ্রদ্ধাস্পদেষু" লিখিতে সুনীতির শ্রদ্ধা না হওয়ায়, শ্রীচরণেষু লিখিল এবং পত্রের শেষে 'বিনীতা'র স্থানে অন্যমনস্ক হইয়া লিখিল 'অনুগতা'। (ক্রমশঃ)

গান

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

তোমার আকাশ-ছাওয়া গানের মাঝে কি গান আমি গাব বল।
তোমার সুরের ধারে প্রাণের ভাষা চোখের জলে ডুবে গেল।

সুরের সাথে সুর মেলে না, তারের সাথে তার,
আমি কেমন করে তোমায় দেব ভাষা-সুরের হার;
ওগো, হার মেনেছি, সার বুঝেছি, শান্তি-ধারাই চোখের জল।

নিত্য নতুন রূপটী প্রাণে জাগায় মোহন সুর,
আমার মিলন-মাগা চিত্ত কাঁদে বিরহ-বিধুর,
আমি অধীর হ'য়ে উধাও ছুটি, এইটে আমার লাগে ভাল।

মিলন-স্মৃতির মদির নেশার চিত্ত আপন-হারা,
সে যে বিত্ত বিহীন, কলুষ-মলিন, ভাবনা ভয়ে সারা,
ওগো, শ্রাবণ-ধারায় প্রেমের ধারা, বন্ধু, তুমি কেবল ঢাল।

স্বপ্ন

ডাঃ শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু ডি-এস্‌সি, এম-বি

(৩)

রুদ্ধ ইচ্ছার প্রকাশ

আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেও যে মনের মধ্যে নানাপ্রকার ইচ্ছা উঠিতে পারে, সে কথা গতবারে বলিয়াছি। এই সকল ইচ্ছার বশে আমরা অনেক রকম কাজ করি বটে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে তাহার ঠিকমত কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি না ;—একটা মন-গড়া কারণ বা যুক্ত্যাভাষ দিই মাত্র। এই ধরণের ইচ্ছা কেন যে চেতনায় আসিতে পারে না, তাহাও ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। মনের এই সব রুদ্ধ ইচ্ছা নানা উপায়ে কেমন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে, এবার তাহারই আলোচনা করিব। স্বপ্নতত্ত্ব-আলোচনায় ইহা প্রথমটা অবান্তর ঠেকিতে পারে ; কিন্তু মনের রুদ্ধ ইচ্ছাই স্বপ্নে কাল্পনিক পরিতৃপ্তি লাভ করে বলিয়া ইহার আলোচনা আবশ্যক।

রুদ্ধ ইচ্ছা বাধা পায় বলিয়াই চেতনায় আসিতে পারে না ; এইজন্য রুদ্ধ ইচ্ছার অভিব্যক্তি বুঝিতে হইলে, চেতন-ইচ্ছা বাধা পাইলে কি হয়, তাহা আগে জানা দরকার। চেতন-ইচ্ছা বাধা পাইয়া যে যে উপায়ে সপ্রকাশ হইবার চেষ্টা করে, রুদ্ধ-ইচ্ছাও আত্মপ্রকাশের জন্য প্রায় সেই সকল উপায়ই অবলম্বন করিয়া থাকে। অবশ্য আত্ম-প্রকাশকালে চেতন-ইচ্ছার রূপান্তর ঘটিলে তাহার কারণ আমরা বুঝিতে পারি ; যেমন, দুধের সাধ ঘোলে মিটাইতে হইলে কেন ঘোল খাইতেছি, তাহা কাহারও অজানা থাকে না। কিন্তু অজ্ঞাত ইচ্ছা যখন রূপান্তরিত আকারে প্রকাশ পায়, তখন কাজ দেখিয়া হঠাৎ বুঝা যায় না যে, তাহা ঐরূপ ইচ্ছারই ফল। কেবল বিশ্লেষণের দ্বারাই এরূপ কার্য্যের যথার্থ কারণ নির্ণয় করা সম্ভব।

মনে করুন, আমি রোগী ; চিকিৎসক আমাকে চিনি খাইতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু চিনি আমার বড়ই মুখরোচক। কাজেই এই নিষেধ-বাক্য আমায় মহাগোলে ফেলিল। একদিকে চিনি খাইবার ইচ্ছা, অন্যদিকে চিকিৎসকের নিষেধ। অন্য অবস্থায় আমি এরূপ নিষেধ-বাক্য মানিতাম কি না সন্দেহ। এখন কিন্তু না মানিলে রোগ বৃদ্ধি পাইয়া মৃত্যুর সম্ভাবনা। কাজেই বাধ্য হইয়া চিকিৎসকের নিষেধ মানিতে হইতেছে। পাঠক এখানে লক্ষ্য করিবেন, বাহিরের বাধা বা নিষেধ আমরা তখনই মানি—যখন আমাদের কোন ইচ্ছার সহিত তাহার মিল থাকে। এখানে বাঁচিবার ইচ্ছা মনে রহিয়াছে, তাই চিকিৎসকের নিষেধ মানিতেছি। সেইরূপ পাছে জেলে কষ্ট পাইতে হয়, আর তাহার ফলে আমার সুখের ব্যাঘাত জন্মে, এই কারণেই পুলিসের নিষেধ মানি। তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত দাড়াইল এই, মনের কোন ইচ্ছাকে বাধা দিতে বা নষ্ট করিতে হইলে দরকার—অপর একটি ইচ্ছা। বাহিরের কোন বাধাই আমার চিনি খাইবার ইচ্ছাকে নষ্ট করিতে পারে না ; পারে কেবল—আমার ইচ্ছার পূর্ণতালাভের পথে (যেমন আমার চিনি খাওয়াকে) বাধা দিতে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, সে বাধা আমার ইচ্ছার বাধা নহে,—ইচ্ছানুযায়ী কার্য্যের। চিনি খাইবার পয়সা না জুটিলে, বা জোর করিয়া কেহ চিনি খাওয়া বন্ধ করিয়া দিলে,আমার চিনি খাইবার ইচ্ছা নষ্ট হইবে না। উপরের উদাহরণে আমার চিনি খাইবার ইচ্ছাকে বাধা দিতেছে,—রোগ হইতে পরিত্রাণলাভের ইচ্ছা। এরূপস্থলে আমার ব্যবহার কত রকমের হইতে পারে, তাহার একটু আভাস দিব :—

(১) ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও চিনি খাইব। এখানে চিনি খাওয়ার আপাতঃ সুখের ইচ্ছা, আমার বাঁচিবার ইচ্ছাকে পরাস্ত করিয়াছে। দুইটি বিভিন্ন শক্তি বিরোধী হইয়া যেমন পরস্পর পরস্পরকে বাধা দেয়, সেইরূপ দুইটি বিরুদ্ধ ইচ্ছাও পরস্পরকে বাধা দিতে, বা একটি অপরটিকে পরাস্ত করিতে পারে।

(২) পাছে চিনি দেখিলে খাইতে ইচ্ছা হয়, তাই

নিষেধ করিয়া দিলাম, 'খবরদার, চিনি যেন আমার বাড়ীর ত্রিসীমাতে না আসে।' ইহা যেন কতকটা 'কাল বরণ রাধা হেরিবে না বলেছে'র মত। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, ভিতরে যাহা চাই, বিরুদ্ধ ইচ্ছার ফলে বাহিরে তাহাই প্রত্যাখ্যান করিতেছি।

(৩) বন্ধুর বাড়ী গিয়াছি। তিনি ছানা চিনি ফলমূল ইত্যাদি খাইতে দিলেন। তাঁহাকে বলিলাম, 'চিনি খাই না।' অথচ গল্প করিতে করিতে অন্যমনস্কভাবে চিনি খাইয়া বসিলাম।

(৪) চিনি খাইবার দারুণ ইচ্ছা, অথচ খাইবার উপায় নাই। মনে মনে ভারি রাগ হইল, অনর্থক হাত পা ছুঁড়িয়া চাকর-বাকরকে বকাবকি করিলাম।

(৫) চিনি খাইবার ইচ্ছা হইল। মনকে বুঝাইলাম, 'চিনি দুনিয়ার এমনই কি চিজ্ যে না খাইলে চলিবে না। চাকরকে বলিলাম, 'মুড়ি আন্'—এক পেট মুড়িই খাইয়া বসিলাম।

(৬) চিনি খাইতে না পাওয়ায়, স্যাকেরিন্ (saccharine) খাইয়া দুধের সাধ ঘোলে মিটাইলাম, অথবা মিষ্ট ফল-মূলের ভক্ত হইয়া পড়িলাম।

পূর্ব্বোক্ত ছয় প্রকার দৃষ্টান্তে চিনি খাইবার ইচ্ছা কোন-না-কোনরূপ কার্য্যে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু এইবার যে উদাহরণগুলি দিব, তাহাতে ইচ্ছার অভিব্যক্তি কাজে নয়—কল্পনায়।

(৭) চিনি খাইবার ইচ্ছা হইল। মনে মনে কল্পনা করিলাম, খুব চিনি খাইতেছি। ইহা যেন আকাশ-কুসুমের কল্পনা—গরীবের পক্ষে কল্পনার রথে চড়িয়া বড়লোক হওয়া!

(৮) চিনি খাইবার ইচ্ছাটাকেও যদি অন্যায় বলিয়া ধারণা হয়, তবে মনে মনে চিনি খাইবার কল্পনাতেও ব্যাঘাত জন্মে। তখন ভাবিব, খুব মিষ্ট ফলমূল বা স্যাকেরিন্ খাইতেছি। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে, যেখানে বাধা অতিরিক্ত, সেখানে নিষিদ্ধ ইচ্ছাকে সোজা-সুজিভাবে কল্পনাতেও আনা যায় না।

(৯) বাধা আরও বেশি হইলে, কল্পনার সাহায্যে মিষ্ট দ্রব্য খাইতে সাহস হইবে না। মুড়ি বা অন্য কিছু খাইব, মনে মনে এইরূপ ভাবিয়া চিনি খাইবার ইচ্ছাকে ভুলিতে চেষ্টা করিব।

(১০) নিজে চিনি খাইতে পাই না। তাই আর পাঁচজনকে চিনি খাওয়াইয়া মনে মনে যথেষ্ট আত্মতৃপ্তি লাভ করিলাম। এক্ষেত্রে কল্পনার সাহায্যেও নিজের চিনি খাইবার সাহস নাই। পরের চিনি খাওয়ার তৃপ্তি দেখিয়া, নিজের ইচ্ছার কাল্পনিক চরিতার্থতা লাভ করি মাত্র। যদি বলি, বিধবাদের পরকে মাছ খাওয়াইবার তৃপ্তি এই প্রকারের, তাহা হইলে অনেকেই হয় ত আমার উপর খড়্গহস্ত হইবেন। শরৎবাবুর কোন উপন্যাসে এই কথাটির আভাস আছে। পরের সুখে নিজে সুখী হওয়ার অর্থই তাহার সহিত তাদাত্ম্য হওয়া (Identification).

(১১) চিনি খাইবার উপায় নাই। মনকে বুঝাইলাম, চিনি বড় মহার্ঘ দ্রব্য—না খাওয়াই ভাল। নিকটের বাজারেও ভাল চিনি মেলে না; কেই বা কষ্ট করিয়া দুর হইতে আনে, ইত্যাদি। এখানে চিনি খাইবার স্বাভাবিক বাধাগুলি অতিরঞ্জিত আকারে দেখিতেছি।

(১২) চিনি খাইবার স্বাভাবিক বাধাগুলিই যে কেবল অতিরঞ্জিত আকারে দেখিতেছি, তাহা নহে। পরন্তু চিনিতে পেট গরম করে, পেটে কৃমি হয়, ইত্যাদি চিনির নানা দোষ বাহির করিতেছি। ইহা যেন 'কথা-মালার' শিয়ালের গল্পের 'আঙুর টক' কথাটার মত।

(১৩) চিনি অতি খারাপ জিনিষ। আমি ত খাই-ই না, অমুক বড় চিনি ভালবাসে—ইহার ফলে তাহাকে একদিন ভুগিতেই হইবে। তাহাকে দেখিলে মনে বড় কষ্ট হয়, বেচারী চিনি খাইয়া শরীরটা নষ্ট করিতেছে,—ইত্যাদি। এখানে নিজের ইচ্ছা পরের ঘাড়ে চাপাইয়াছি, আর সেটা যে খারাপ, ইহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছি। এইরূপ নিজের ইচ্ছা পরের ঘাড়ে চাপাইয়া, তাহার দোষ দেখিবার চেষ্টাকে আরোপ (Projection) বলা হয়।

(১৪) দেবতাকে চিনি দান করিলাম। যে জিনিষ দেবতাকে দিয়াছি, আর কি তাহা খাইতে পারি? এরূপ ইচ্ছা মনে আনাই পাপ,—সুতরাং পরিত্যাজ্য।

(১৫) দেশের কত দীনদরিদ্র চিনি খাইতে পায় না। তাহারা চিনি খাইতে পাইবে না, আর আমি মজা করিয়া চিনি খাইব? এ যে ঘোর স্বার্থপরতা। অতএব

চিনি খাইবার পাপ-ইচ্ছা আর মনেও স্থান দিব না।—ইত্যাদি।

অপর এক ইচ্ছা আমার চিনি খাইবার ইচ্ছার অন্তরায় না হইলে, তাহা সোজাসুজিভাবে পরিতৃপ্তিলাভের চেষ্টা করিত। কিন্তু বাধা পাইলে, ইচ্ছা যে নানা উপায়ে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে, উপরে তাহার কিছু কিছু আভাস দিলাম মাত্র।

(১৬) পূর্ব্বে যতগুলি চেষ্টার বিবরণ দিয়াছি, তাহা আমাদের জাগ্রত অবস্থার। মনে রাখিতে হইবে, রুদ্ধ ইচ্ছা কেবল যে জাগ্রত অবস্থাতেই আত্মপ্রকাশে সচেষ্ট হয় তাহা নহে, স্বপ্নেও তাহা নানা আকারে প্রকাশিত হইবার চেষ্টা করে। উপরিউক্ত উদাহরণের সবগুলিই স্বপ্নে দেখা সম্ভব। স্বপ্নে রুদ্ধ ইচ্ছা পূর্ব্বোক্ত নানা প্রকারে বিকৃত হইয়া প্রকাশ পায়। এই প্রবন্ধের প্রথম কিস্তিতে স্বপ্নের উদাহরণে 'ক' বাবুর পিতার মৃত্যু-কাম ও বিকৃত অবস্থাতেই প্রকাশ পাইয়াছে।

অজ্ঞাত ইচ্ছার প্রকাশ

এখন আমরা দেখিতেছি যে, চেতন-ইচ্ছা বাধা পাইলে নানা প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রকাশের চেষ্টা করে। মনের রুদ্ধ ইচ্ছাগুলি সোজাসুজিভাবে চরিতার্থ হওয়ার সম্ভাবনা দূরে থাক, তাহাদের চেতনায় আসিবার পক্ষেই বিস্তর বাধা। তাই এই সকল অজ্ঞাত রুদ্ধ ইচ্ছা পূর্ব্বোক্ত নানা উপায়ে মনের প্রহরীকে ফাঁকি দিয়া বিকৃত অবস্থায় প্রকাশ পায়। রুদ্ধ ইচ্ছাগুলির আত্মপ্রকাশে বাধা দেয়—তাহাদের বিরুদ্ধ ইচ্ছা; যেমন মৃত্যু-ইচ্ছাকে চেতনায় আসিতে দেয় না— বাঁচিবার ইচ্ছা।

যখনই মরিবার ইচ্ছা আমাদের মনে ফুটিয়া উঠিবার চেষ্টা করে, তখনই বাঁচিবার ইচ্ছা আসিয়া তাহাকে বাধা দেয়। এই বাধার ফলে মরণের ইচ্ছা সোজাসুজিভাবে মনে না উঠিয়া ভিন্ন আকারে প্রকাশ পায়। বিপদের মধ্যে যাইয়া বাহাদুরী লইবার ইচ্ছা—মৃত্যু-ইচ্ছারই রূপান্তর মাত্র। ইচ্ছার এইরূপ রূপান্তরিত আকার দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি না যে, তাহাই প্রকৃতপক্ষে মরণের ইচ্ছা, সুতরাং তাহা মনে ফুটিতে বাধা পায় না। বাঁচিবার ইচ্ছাকে প্রহরীর সহিত তুলনা করিলে আমরা বলিতে পারি যে, এই প্রহরী আছে বলিয়াই মৃত্যু-ইচ্ছা সোজাসুজিভাবে প্রকাশ পাইতে পারে.না। কিন্তু মৃত্যু ইচ্ছা বিপদসঙ্কুল কাজে বাহাদুরী লইবার ইচ্ছা-রূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিলে প্রহরীকে সহজেই এড়াইয়া আসিতে পারে। এইরূপ আমাদের অনেক অন্যায় ইচ্ছাকে মনে ফুটিতে দেয় না—আমাদের ধর্ম্মজ্ঞান, নৈতিক-জ্ঞান, সামাজিকতা প্রভৃতি। এরূপস্থলে এগুলি প্রহরীর কাজ করিয়া থাকে। ধরুন, আমার মনের মধ্যে কাহাকেও মারিবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু পরকে মারা অন্যায়, ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও নিন্দনীয় বলিয়া আমি এরূপ ইচ্ছাকে মনে উঠিতেই দিই না, আর এই মারিবার ইচ্ছা যে মনের মধ্যে আছে, তাহাও আমাদের নিকট অজ্ঞাত থাকে। এক্ষেত্রে অনেক মনোবিজ্ঞানবিদ্ বলিবেন, পরকে মারিবার মত অন্যায় ইচ্ছাকে মনে পরিস্ফুট হইতে দেয় না—আমাদের ধর্ম্মজ্ঞান প্রভৃতি। আমার মতে এই ব্যাখ্যা যথেষ্ট নহে। কেন আমরা পরকে মারা অন্যায় বলিয়া মনে করি, তাহার কোনই সদুত্তর পাই না। বিবেকের (conscience) জন্য ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান হয়, একথা মানিলেও বিবেকের উৎপত্তি কোথা হইতে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। আমার মতে, বিরুদ্ধ ইচ্ছা হইতেই বিবেকের উৎপত্তি। পরকে মারিব এই ইচ্ছার বিরুদ্ধ ইচ্ছা— নিজে মার খাওয়া। মার খাইবার ইচ্ছা মনে সুপ্ত থাকায়,তাহার অস্তিত্ব আমরা জানিতে পারি না; কিন্তু ইহাই 'পরকে মারিব'— এই ইচ্ছাকে বাধা দেয়। আর এইজন্যই আমাদের মনে পরকে মারা অন্যায় বলিয়া জ্ঞান জন্মে। সকল প্রকার নৈতিক বিধি-নিষেধের মধ্যে এইরূপ বিরুদ্ধ ইচ্ছার অস্তিত্ব বিদ্যমান। এ বিষয়ে পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব। অতএব আমার মতে শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইল এই যে, সকল প্রকার অজ্ঞাত ইচ্ছার আত্ম-প্রকাশে যে বাধা থাকে, সেই বাধার মূলে—তাহার বিরুদ্ধ ইচ্ছা বর্ত্তমান। এই বিরুদ্ধ ইচ্ছাকে ফাঁকি দিয়া বাহির হইতে না পারিলে, অজ্ঞাত ইচ্ছার পক্ষে চরিতার্থতালাভের আর কোনই উপায় নাই। এই কারণে অজ্ঞাত ইচ্ছাকে ছদ্ম-বেশে বাহির হইতে হয়। এই ছদ্মবেশ কত প্রকারের হইতে পারে, তাহা আমরা পূর্ব্বের ষোলটি উদাহরণে দেখাইয়াছি।

পরিভাষা

এইখানে আমি কতকগুলি পরিভাষার বিবরণ দিব। এগুলি জানা থাকিলে পাঠককে স্বপ্নতত্ত্ব বুঝান সহজসাধ্য হইবে।

(১) যে ইচ্ছা অজ্ঞাত থাকিয়া স্বপ্নে প্রকাশিত হইবার চেষ্টা করে, তাহাকে আমরা অজ্ঞাত রুদ্ধ ইচ্ছা (Complex বা Unconscious wish) বলিব।

(২) এই রুদ্ধ ইচ্ছার আত্মপ্রকাশের যে অন্তরায়, তাহাকে বলিব বাধা (resistance)।

(৩) মনের যে যে ভাবগুলি রুদ্ধ ইচ্ছার প্রকাশলাভে বাধা দেয়, সেগুলির সমষ্টিকে প্রহরী (Censor) বলিব। আমার মতে, এই প্রহরীই হইতেছে মূলতঃ রুদ্ধ ইচ্ছার বিরুদ্ধ ইচ্ছা। অন্যান্য মনোবিজ্ঞানবিদেরা বলেন—ধর্ম্মজ্ঞান, নৈতিক-জ্ঞান, সামাজিকতা প্রভৃতি হইতেই প্রহরীর উদ্ভব।

(৪) রুদ্ধ ইচ্ছা ছদ্মবেশে যে কার্য্যের সাহায্যে চরিতার্থতা-লাভের চেষ্টা করে, সেই কার্য্যকে আমরা প্রাতীক-ক্রিয়া (Symbolic action), আর যে আকারে রুদ্ধ ইচ্ছা প্রকাশ পায়, তাহাকে প্রাতীক-রূপ (Symbolic manifestation) বলিব। দুধের সাধ ঘোলে মিটাইবার সময় ঘোল খাওয়াকে প্রাতীক-ক্রিয়া এবং ঘোল খাওয়ার ইচ্ছাকে দুধ খাওয়ার ইচ্ছার প্রাতীক-রূপ বলিব।

রুদ্ধ ইচ্ছার সম্পর্কিত-বস্তু প্রকাশের সময় যে ছদ্মবেশ ধারণ করে, তাহাকে আমরা প্রতীক (Symbol) বলিব। যেমন, ঘোল দুধের প্রতীক। চিনি খাইতে ইচ্ছা, কিন্তু খাইবার উপায় নাই; তাহার বদলে স্যাকেরিন্ খাইলাম। এক্ষেত্রে স্যাকেরিন্ চিনির প্রতীক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্যাকেরিন্ বা ঘোলকে, চিনি বা দুধের প্রতীক বলা চলে না। কেন যে স্যাকেরিন্ বা ঘোল—চিনি বা দুধের বদলে খাইতেছি, একথা আমরা জানি, কিন্তু যদি আমি চিনি খাইতে না পাইয়া, মিষ্ট ফলের ভক্ত হইয়া পড়ি, অথচ মিষ্ট ফল কেন আমার প্রিয়, তাহা বুঝিতে না পারি, তবেই মিষ্ট ফলকে চিনির প্রতীক বলা চলে। প্রতীক প্রকৃতপক্ষে কোন্ বস্তু নির্দ্দেশ করিতেছে, তাহা আমাদের অজানা থাকে। বিশ্লেষণ ছাড়া প্রতীকের স্বরূপ নির্ণয় করা অসম্ভব। স্বপ্নে আমি গৃহ দেখিলাম। বিশ্লেষণে বুঝা গেল, গৃহ আমার নিজ দেহ। এখানে গৃহই দেহের প্রতীক। অধিকাংশ প্রতীকই বিশ্লেষণেও ধরা পড়ে না,—অন্য উপায়ে প্রতীকের অর্থ বাহির করিতে হয়। এরূপ স্থলে ভাষাজ্ঞান, পুরাণ, জনশ্রুতি, প্রবাদ, ইত্যাদি প্রতীকের স্বরূপ-নির্ণয়ে যথেষ্ট সহায়তা করে। আমরা দেহকে 'নবদ্বার গৃহ' বলি। দেহতত্ত্বের অনেক গানেই গৃহকে দেহের রূপক রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। সাধারণ কথাতেও যখন আমরা বলি 'বাড়ীর অসুখ', তখন বুঝি 'স্ত্রীর অসুখ'। এক্ষেত্রে স্ত্রীর দেহের সহিত বাড়ীর তুলনা করা হইয়াছে। সংস্কৃতেও বলে,—'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।' এইরূপ নানা বিষয়ের আলোচনা দ্বারা অনেক সময় প্রতীকের যথার্থ অর্থ বাহির করিতে হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রতীকগুলির অর্থ প্রায় সকল দেশেই এক। প্রতীক সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট জ্ঞান থাকিলে, স্বপ্নের প্রকৃত অর্থ বাহির করা অনেক সময় সোজা হইয়া পড়ে।

স্বপ্নের বিশেষত্ব

প্রহরীকে ফাঁকি দিবার মতলবে যে রুদ্ধ ইচ্ছা কেবলমাত্র ছদ্মবেশেই প্রকাশিত হইয়া ক্ষান্ত হয়, তাহা নহে; আরও অনেক উপায়ে প্রহরীর নিকট আত্মগোপনের চেষ্টা করে। স্বপ্নে আমাদের দার্শন-প্রতিরূপই (visual imagery) বেশি। স্বপ্নদর্শনকে আমরা বায়োস্কোপ-দেখার সহিত তুলনা করিতে পারি। আমাদের কোন ইচ্ছা সোজাসুজিভাবে বায়োস্কোপে দেখাইবার চেষ্টা করিলে পাঠক দেখিবেন, তাহা দর্শককে বুঝান কত শক্ত। মনে করুন, দর্শককে বুঝাইতে চাহি যে, আমি গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাইব। এক্ষেত্রে বায়োস্কোপে দেখাইতে হইবে যে, আমি গড়ের মাঠে যাইতেছি। বায়োস্কোপে অন্য কোন প্রকারে ইহা বুঝাইবার উপায় নাই। স্বপ্নেও ঠিক এইরূপ ঘটে,—ভবিষ্যৎ কাল বর্ত্তমানে পরিণত হয়। 'রাম আসিলে যদু যাইবে'—এই ভাবটা বায়োস্কোপে দেখাইতে গেলে প্রথমে রামের আসা দেখান চাই, পরে যদুর যাওয়া দেখাইতে হইবে। এত করিয়াও কিন্তু বিনা ব্যাখ্যায় দর্শককে প্রকৃত ঘটনা বুঝান যাইবে না। প্রথম উদাহরণে আমরা দেখিলাম যে, বর্ত্তমান ভিন্ন স্বপ্নে অন্য কোন কালের ঘটনা দেখান যায় না; সেইরূপ এই উদাহরণে দেখিলাম যে, সাপেক্ষ ব্যাপার—অর্থাৎ, অমুক হইলে অমুক হইবে—স্বপ্নে দেখিবার উপায় নাই। পুনরায় মনে করুন, রাম গড়ের মাঠে যাইবে না। ইহা বায়ো-

স্কোপে দেখাইতে হইলে, প্রথমে রামের যাওয়া দেখাইয়া, তাহা মুছিয়া দিতে হইবে। নতুবা ইহা বুঝাইবার পক্ষে অন্য কোন সুবিধা নাই। সেইরূপ স্বপ্নে 'যাওয়া' ও 'না-যাওয়া' একই প্রকারের হইবে। স্বপ্নে 'না' দেখান অসম্ভব। বাহুল্য ভয়ে আর কোন উদাহরণ না দিয়া বলিতে পারি, স্বপ্নে আমরা কোন বিষয়, অথবা ঠিক তাহার বিপরীত বিষয়টি, একই রকমে দেখি। স্বপ্নে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ থাকিলে, প্রথমে কাজটি, পরে তাহার কারণটি, দেখি। ঘৃণা বা হাস্যরসের প্রকাশ স্বপ্নে ব্যঙ্গচিত্রের অনুরূপ। কোন লোকের বুদ্ধি কম দেখিতে হইলে, স্বপ্নে দেখিব তাহার মাথায় গোবর পোরা আছে। কাহারও মনের কুটিলতা,—শরীরের বক্রতা হিসাবে দেখিতে পারি, ইত্যাদি।

পাঠক দেখিবেন, স্বপ্নে সকল জিনিষ দৃশ্যরূপে প্রকাশিত হয় বলিয়া স্বপ্নের অর্থ নির্দ্ধারণ করা কতটা দুরূহ। কিন্তু এত করিয়াও সব সময়ে মনের প্রহরীকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। সেইজন্য স্বপ্নে আরও কতকগুলি পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। একজনের উপর রাগ, স্বপ্নে ঠিক তাহার উপর প্রকাশ না পাইয়া স্বপ্নে দৃষ্ট অপর একজন লোকের উপর প্রকাশ পাইতে পারে। এই 'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে' চাপাইবার ফলে স্বপ্নের অর্থ সাধারণের পক্ষে একেবারে দুর্ব্বোধ্য হয়। স্বপ্নে যথার্থ ভীতিজনক কোন একটা ব্যাপার দেখিয়া ভয় হইল না, অথচ ভয় হইল—সামান্য একটা জিনিষ দেখিয়া। এ ক্ষেত্রে এক বিষয়ের ভয় অপর একটা বিষয়ে আরোপিত হইয়াছে। ইহাকে **বিষয়ান্তর সংক্রমণ** (Displacement) বলা হয়। ইহা ছাড়া স্বপ্নে দেখা একই বস্তু—দুই বা ততোধিক বস্তুকে বুঝাইতে পারে। আমি হয় ত দেখিলাম নিজের ঘরে রহিয়াছি, কিন্তু ঘরের আসবাবপত্রের সহিত কলেজের আসবাবপত্রের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য রহিয়াছে। এ ক্ষেত্রে কলেজ ও নিজের ঘর দুইটাই—একই বস্তুর দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। ইহাকে **সংক্ষেপ পরিণতি** (Condensation) বলা হয়। এই সংক্ষেপ পরিণতির ফলে অতি বৃহৎ ব্যাপারও অতি ক্ষুদ্র আকারে স্বপ্নে প্রকাশিত হইতে পারে—একই ব্যক্তি অনেক ব্যক্তির পরিজ্ঞাপক হইতে পারে, ইত্যাদি। আবার এমনও হয় যে, এক ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যগুলি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির উপর আরোপিত হইয়া, সেই ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয় গোপন করিতে পারে। ধরুন, স্বপ্নে দেখিলাম এক যায়গায় চারিজন লোক বসিয়া আছে। তাহাদের একজনের মাথার চুল সাদা, একজন দাড়িওয়ালা, একজন খঞ্জ, আর একজন খর্ব্বকায়। এস্থলে চারি ব্যক্তির প্রকাশ পৃথক পৃথক না হইয়া একটি খর্ব্বকায় বৃদ্ধ খঞ্জকে নির্দ্দেশ করিতে পারে। অবাধ-অনুবন্ধ প্রণালীর সাহায্য ব্যতীত এই-সকল ক্ষেত্রে স্বপ্নের অর্থ নির্ণয় করা অসম্ভব। কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন কারণের সমবায়ে কোন একটি বিশেষ ঘটনা ঘটিলে স্বপ্নে দৃষ্ট সেই ঘটনা সকল কারণ-গুলিরই পরিচায়ক। যেমন, বাগবাজারে আমার কোন প্রিয় ব্যক্তি থাকেন, আর বাগবাজারে রসগোল্লাও পাওয়া যায়। স্বপ্নে বাগবাজার দেখার অর্থ এরূপ ক্ষেত্রে আমার প্রিয় ব্যক্তির নিকট যাওয়াও বটে, এবং রসগোল্লা খাওয়াও বটে। ইংরাজীতে ইহাকে Over-determination বা **বহুনির্দ্দেশ** বলে।

উপন্যাসের বর্ণিত কোন ঘটনা দৃশ্যরূপে দেখাইতে হইলে, তাহাকে নাট্যাকারে পরিবর্ত্তিত করা দরকার। আর এই পরিবর্ত্তনের ফলে অনেক সময় উপন্যাস-বর্ণিত ঘটনা-সমাবেশের অল্পবিস্তর ওলটপালট করিতে হয়। কখন কখন উপন্যাস-বর্ণিত বিষয়ের অর্থ বুঝাইবার সুবিধা হয় বলিয়া নূতন ঘটনাও যোগ করিতে হয়। স্বপ্নেও ঠিক এই ধরণের ব্যাপার দেখা যায়। ইহাকে **নাট্য-পরিণতি** (Dramatization) বলা হয়।

আমরা দেখিলাম যে, কতকগুলি উপায়ে স্বপ্নের প্রকৃত অর্থ বিকৃত আকারে প্রকাশিত হয়। যেমন,—

(১) **দর্শন-পরিণতি**—Visualization
(২) **বিষয়ান্তর সংক্রমণ**Displacement
(৩) **সংক্ষেপ-পরিণতি**—Condensation
(৪) **নাট্য-পরিণতি**—Dramatization

ইহা ছাড়া জাগ্রত অবস্থায় বর্ণনাকালে স্বপ্নের বিকৃতি অসম্ভব নহে। স্বপ্নে দেখা কোন অসংলগ্ন ঘটনা বর্ণনা করিবার সময় আমরা অজ্ঞাতসারে তাহাতে রং ফলাইয়া বর্ণনার উপযোগী করিয়া তুলি। যে-সকল স্বপ্ন একে-বারেই খাপছাড়া, তাহা বর্ণনাকালে বাস্তবিক পক্ষে স্বপ্নে

যাহা দেখি নাই, এমন দুই-চারিটি কথাও আমাদের অজ্ঞাতসারে আসিয়া পড়ে। ইহাকে Secondary Elaboration বা অনুযোজনা বলে।

মনের প্রহরী

মূল ইচ্ছার আত্মপ্রকাশের পথে বাধা আছে বলিয়াই তাহা বিকৃত আকারে স্বপ্নে দেখা দেয়। সেই রূপান্তরিত ইচ্ছা মনের প্রহরীকে এড়াইয়া চেতনায় আসিতে পারে। প্রহরী স্বপ্নের অর্থ বুঝিতে পারে না বলিয়াই স্বপ্নকে প্রকাশিত হইতে দেয়। যে মুহূর্ত্তে স্বপ্নের অর্থ ধরা পড়ে, সেই মুহূর্ত্তে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়;—সঙ্গে সঙ্গে মনেও ভয়ের সঞ্চার হয়। যে-সকল ভাব আমরা মনের মধ্যে জাগ্রত অবস্থায় আনিতে চাহি না—অন্যায় বা ভয়ঙ্কর বলিয়া রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি,—তাহাই স্বপ্নে প্রকাশ পাইলে মন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। পাঠক দেখিলেন যে, ভয়ের স্বপ্নতেও ইচ্ছার পূর্ণতালাভের চেষ্টা রহিয়াছে। এ বিষয় পরে আরও বিশদভাবে আলোচনা করিব।

মনের প্রহরী যত সজাগ থাকিবে, স্বপ্ন ততই বিকৃত আকারে প্রকাশ হইবে। প্রহরী কাজে ঢিলা দিলে স্বপ্নের মূল ইচ্ছা অবিকৃত অবস্থায় মনে উঠিতে পারে। এইরূপ অবিকৃত স্বপ্ন দেখিলে সাধারণতঃ মন দারুণ ঘৃণা, লজ্জা, ভয়ে ভরিয়া উঠে। জাগ্রত অবস্থায় মনের প্রহরী সদাই সজাগ। নিদ্রাকালে প্রহরীর কার্য্যে শৈথিল্য ঘটে; কেন ঘটে, সে বিষয়ে মনোবিজ্ঞানবিদেরা একমত নহেন। এ সম্বন্ধে আমার নিজের মত পরে ব্যক্ত করিব। যে কারণেই হউক, প্রহরীর সতর্কতা কমিলেই স্বপ্নের উদ্রেক হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্বপ্ন ভুলিয়া যাওয়াই আমাদের স্বভাব। পাঠক এখন ইহার কারণও বুঝিতে পারিলেন। এই ভুলিয়া যাওয়ার মূলে প্রহরীর কার্য্যকরী শক্তি বর্ত্তমান। স্বপ্নটি ভুলাইয়া দিতে পারিলে প্রহরী নিশ্চিন্ত হয়—সঙ্গে সঙ্গে মনেও শান্তি আসে।

চণ্ডীদাসের ভিটে

শ্রীভোলানাথ সেনগুপ্ত

নান্নুর গাঁয়ের একপাশে ঐ ভাঙা মাটীর ভিটে,
হয়তো তাহার সকল ধূলি গানের রসেই মিঠে;
একটা প্রাচীর—একখানা ইঁট, চিহ্ন কিছুই নাই,—
পথিক, তুমি নজর রেখে সামলে যেও ভাই!
হয়তো দলি যাবে চলি কবির আসনখান,
অসাবধানে করবে তুমি স্মৃতির অসম্মান!

নান্নুর গাঁয়ের একপাশে ঐ বিজন বনের ধারে,
গাইত কবি কোন্‌খানে যে, কেউতা জানে না রে!
হয়তো কবি গানের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন কোথা,
পথিক, তুমি গোল ক'রনা আস্তে বল কথা;—
হয়তো তোমার পায়ের ধ্বনি ভাঙবে কবির ধ্যান,
অসাবধানে করবে তুমি গানের অপমান!

নান্নুর গাঁয়ের একপাশে ঐ মস্ত মাঠের মেলা,
কদমডালে দুলত বসি দোয়েল-দোয়েলা;
হয়তো কবি তাদের পানে থাকত চেয়ে চেয়ে,
সেই পীরিতে আপনি মজে উঠত নিজেই গেয়ে;
পথিক, তোমার হাতে ধরি—একটা কথা রাখ,
আর যেওনা, অবাক্ হয়ে ঐখানেতেই থাক!

গান গেয়ে সেই ভিটের পাশে নান্নুর গাঁয়ের চাষী
গড় ক'রে সেই জায়গাটিকে ভাবত গয়া কাশী;
পয়সা কোথায় পাবে তারা, তুলবে সেথায় মঠ,
মনের মনে সাবধানে তাই রাখচে স্মৃতির পট;
পথিক ধনি! এই মিনতি—আর কিছু না চাই,
সাবধানে ঐ জায়গাটিতে চরণ ফেল' ভাই!

বিপর্য্যয়

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল

(২২)

অনীতা সুকুমার বাবুর বাড়ী আসিয়া দুই-চারি দিন পরম শান্তিতে কাটাইল। তাহার দগ্ধ হৃদয় ভগবৎ-সাধনায় একটা আশ্চর্য্য রকম শান্তিলাভ করিল। সে সদাসর্ব্বদা সুকুমার বাবুর সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করিয়া তাহার ক্ষুব্ধ তৃষিত, চিত্তকে নিযুক্ত ও শান্ত রাখিত।

একদিন টম লিণ্ডলে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিল।

টম বলিল, "অনীতা, আমি তোমার কাছে তোমার প্রেমের জন্য আসি নি,—আমার নিজের ভালবাসা জানাতেও আসি নি। আমার ভালবাসা মরে' গেছে, সে যে কোনও দিন ছিল, তা' ভেবেও আমার লজ্জা বোধ হ'চ্ছে।"

মর্ম্মান্তিক বেদনা লইয়া টম আসিয়াছিল, তাই খোঁটাটা না দিয়া পারিল না।

অনীতা যখন প্রথম শুনিল টম তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে, তখন তার বুক কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। টম যে সব কথা শুনিয়া আসিয়াছে, সে বিষয়ে তাহার কিছু মাত্র সন্দেহ ছিল না। তাই সে লজ্জায় মরিয়া গিয়াছিল। টমের প্রাণে ব্যথা দিয়াছে ভাবিয়া সে পীড়িত হইয়াছিল। কেমন করিয়া টমের সঙ্গে কথা কহিবে ভাবিয়া অস্থির হইয়াছিল! যতদূর সম্ভব মিষ্ট কথায় টমকে বুঝাইবার জন্য, আর নিজের লজ্জা ঢাকিবার জন্য তাহার বক্তব্যের মুসাবিদা করিতেছিল। কিন্তু টম যে আসিয়া বিচারকের ঔদ্ধত্য লইয়া তাহার উপর সরাসরি রায় দিয়া বসিল, ইহাতে তার মনের সকল সঙ্কোচ কাটিয়া গেল; সে ক্ষেপিয়া উঠিল। দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "মিষ্টার লিণ্ডলে, আপনি আমাকে অপমান করতে এসেছেন? যদি ভদ্র ভাবে কথা ব'লতে না পারেন, তবে ঐ দুয়ার খোলা র'য়েছে জানবেন।"

টম কষ্টে ক্রোধ দমন করিয়া বলিল, "অনীতা"—

"মিস মিত্র বলে সম্বোধন ক'রলে আমি সুখী হব।"

"না, মিস মিত্র নয়, অনীতা, তোমার lover বলে নয়, অমলের বন্ধু ব'লে তোমাকে আমি এই নামে ডাকবো। তুমি জান অনীতা, আমি তোমাকে কেমন পাগলের মত ভালবেসেছিলাম; তোমার জন্য আত্মীয়-স্বজন, জাতি, সমাজ সব বিসর্জ্জন দিতে চেয়েছিলাম। তুমি সে ভালবাসার অপমান ক'রেছ—তুমি কি একটিবারও ভাব অনীতা, যে, কি দারুণ কষ্ট তুমি আমায় দিয়েছ?"

অনীতা নীরব রহিল।

টম আবার বলিল, "যা'ক সে সব কথা। আমার জন্যে তোমার যদি একটুও বেদনা-বোধ না থাকে, তবু তোমার ভাইয়ের জন্য কি এতটুকুও ব্যথা মনের ভিতর হয় না?

অমল তোমার যেমন-তেমন ভাই নয়,—সে কি স্নেহ দিয়ে তোমাকে শৈশব থেকে ঘিরে রেখেছে! আর তাকে তুমি একটা পাপিষ্ঠের জন্য একটিবার একটা কথা না বলে, ফেলে চ'লে এলে! জান অনীতা, অমল এতে কত বেদনা পেয়েছে? এই ক'দিনে সে এমন হ'য়ে গেছে যে, তাকে আর চেনা যায় না। তার কি অপরাধ যে, তুমি তাকে এই ভীষণ শাস্তি দিলে? সেই হতভাগা scoundrel, যে ভদ্রতার পর্য্যন্ত ধার ধারে না, সে তোমার অপমান ক'রেছে, তোমার দাদার অপমান ক'রেছে। অমল তাকে দয়া করে উচিত শাস্তি না দিয়ে, কেবল বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছে মাত্র!"

অনীতার চোখ ফাটিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল। সে কষ্টে নিঃশ্বাস রোধ করিয়া বলিল, "লিওলে, তুমি যার জুতার ফিতা খুলিবার যোগ্য নও, তার অপবাদ করে পাপ বাড়িও না। Scoundrel বটে, না? ইন্দ্রনাথের মত দেবত্বের অংশ মাত্র যদি তোমার ভিতরে থাকতো, তবে তোমাকে আমার কাছে প্রার্থী হ'তে হ'ত না, আমি তোমার পায়ে লুটিয়ে প'ড়তাম।

"সেদিন বাস্তবিক কি হ'য়েছিল তুমি জান না, দাদাও জানে না। আমি ছাড়া আর যে জানে, সে দেবতা; প্রাণ গেলেও সে এ কথা আর কাউকে ব'লবে না। তাই আমারই লজ্জার মাথা খেয়ে এ কথা জগতে প্রচার ক'রতে হ'বে। তবে শোন।

"সেদিন ইন্দ্রনাথ তোমার পক্ষ হ'য়ে আমার সঙ্গে তর্ক করেছিলেন। আমি বলেছিলাম, আমি তোমাকে ভালবাসতে পারি না। ইন্দ্রনাথ সে জন্য আমাকে তিরস্কার ক'রেছিলেন,—শতমুখে তোমার গুণের, তোমার ভালবাসার ব্যাখ্যা ক'রে আমাকে শোনাচ্ছিলেন। আমি তার মুখে এ সব কথা শুনে আত্ম-সম্বরণ করতে পারলাম না। এত বৎসর ধ'রে যে কথা আমি প্রাণের ভিতর লুকিয়ে রেখেছিলাম, তা' প্রকাশ ক'রে ফেললাম।

"ইন্দ্রনাথ চমকে উঠলেন। আমি তাঁকে থামিয়ে বল্লুম, 'তোমায়-আমায় এই শেষ দেখা,—আর আমি তোমার সামনে আসবো না। কিন্তু আমার জীবনের সম্বল তুমি আমাকে একটা কথা দেও—বল, তুমিও আমায় একটু ভালবাস।' দেবতার মত নির্ম্মম ভাবে ইন্দ্রনাথ বল্লেন, 'না।' তা'র পর তিনি উঠলেন। আমি কি ক'রবো! আমার যথাসর্ব্বস্ব জন্মের মত আমার কাছছাড়া হয় দেখে আমি কাণ্ডজ্ঞান হারালুম। বুভুক্ষিতের মত গিয়ে তার হাত চেপে ধ'রলুম। বুকের ভিতর হাতখানা চেপে ধ'রে, আমি হায়, লজ্জার মাথা খেয়ে এ কথাও আমায় ব'লতে হ'বে—আমি সেই হাত থেকে জন্মের শোধ দুটো অপরাধী চুম্বন চুরি ক'রে নিলাম। ইন্দ্রনাথ একটা নিষ্ঠুর পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে রইলেন—এক মুহূর্ত্ত! সঙ্গে-সঙ্গে দাদা তাঁকে ডাকলেন। তিনি পিছু-পিছু বেরিয়ে গেলেন। দাদা জিজ্ঞাসা ক'রলেন 'তোমার কিছু ব'লবার আছে?' দেবতা আমার প্রতি মমতায় কিছুই বল্লেন না। 'কিছুই ব'লবার নেই' বলে এই মিথ্যা অপবাদের বোঝা মাথায় নিয়ে তিনি তাঁর প্রিয়তম বন্ধুকে বিসর্জ্জন দিয়ে চলে গেলেন—

"হায় লিওলে—একে তুমি বল Scoundrel!"

অনীতা চোখের জলে ভাসিয়া এ কাহিনী শেষ করিল। তার পর কাপড়ে মুখ লুকাইয়া ফুঁপাইতে লাগিল। লিওলে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। রুমালে চক্ষু মুছিয়া কিছুক্ষণ মাটীর দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে অনীতা আবার বলিল, "টম, আমি তোমাকে শক্ত কথা ব'লেছি,—আমায় ক্ষমা করো! আমি তোমার যে ভালবাসার অপমান ক'রেছি, তা'র খাতিরে আমায় ক্ষমা করো। আমার মত দীনা নারী, আমার মত নিঃস্ব দরিদ্র এ জগতে আর নেই, তাই ভেবে দয়া ক'রে ক্ষমা করো। আমি তোমার ভালবাসার যোগ্য নই, তাই জেনে তোমার ভালবাসা ভুলে যাও! আমায় ক্ষমা কর। আর, যদি আমায় দয়া কর, তবে আমার এই পাপের কথা লোকের কাছে প্রকাশ ক'রে আমার অভাগ্য দেবতা ইন্দ্রনাথকে অন্যায় কলঙ্কের বোঝা থেকে মুক্ত করো।"

লিওলে আর একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। সে বুঝিল, কি দারুণ লজ্জা ও বেদনা বোধ করিতেছিল অনীতা—কি বিষম কর্ত্তব্যের দায়ে সে তার এই কলঙ্কের কথা মুখ ফুটিয়া তাহার কাছে বলিল। কোনও নারীই তার এমন লজ্জা, এমন অপমানের কথা সহজে নিজমুখে বলিতে পারে না, এ অভিজ্ঞতা তাহার ছিল। তাই সে

গভীর সহানুভূতির সহিত অনীতার প্রাণের সমস্ত বেদনা গ্রহণ করিল।

সে বলিল, "অনীতা, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমি ইন্দ্রনাথকে অযথা দুর্ব্বাক্য বলেছি বলে অনুতপ্ত। যা'ক, তুমি আমায় ভাল না বাসতে পার; তোমার পরিবারের বন্ধু বলে গ্রহণ ক'রতে বোধ হয় তোমার কোনও আপত্তি নেই। বন্ধুর একটা অনুরোধ শুনবে?"

অনীতা অশ্রু-প্লাবিত মুখ তুলিয়া বলিল, "যদি সম্ভব হয়, সাধ্য হয়, তবে অনুরোধ রক্ষা ক'রতে চেষ্টা অবশ্যই করবো।"

"তুমি বাড়ী ফিরে চলো।"

"মাপ কর টম, এত বড় শাস্তি তুমি আমায় দিও না। সে বাড়ী যে আমার অপরাধের লীলাক্ষেত্র,—সেইখানে আমার জন্য আমার দেবতা অপমানিত হ'য়েছেন—সেখানে আমি ফিরতে পারি না।"

"অনীতা, তুমি বুদ্ধিমতী! ভেবে দেখ, সমস্ত ব্যাপারটা একটা বোঝবার ভুলে হ'য়েছে। তোমার দাদা ভুল বুঝে ইন্দ্রনাথকে অপমান ক'রেছেন। তোমাদের তিনজনের ভিতর একটা বোঝাপড়া মোটেই কঠিন হ'বে না। তা' হ'য়ে গেলে আর তো তোমার সে বাড়ীতে থাকতে কোনও বাধা নেই।"

"বাধা আছে। আমি ইন্দ্রনাথের কাছে শপথ ক'রেছি, আর আমি তার সামনে দাঁড়াব না। দাদা যদি ইন্দ্রনাথের কাছে ক্ষমা চান, তবে সে ক্ষমা ক'রবে, আগ্রহের সঙ্গে তার পুরাতন বন্ধুর কাছে ফিরে আসবে। কিন্তু আমি যদি সে বাড়ীতে থাকি, তবে সে আসবে না।"

"অবশ্যই না; ইন্দ্রনাথ বুদ্ধিমান, সে কখনই তোমাকে আবার পরীক্ষায় ফেলবে না।"

"তবে আর আমার প্রায়শ্চিত্ত কি হ'ল বল। লিওলে, তুমি ফিরে যাও। দাদাকে সব কথা খুলে বলগে'। তিনি ইন্দ্রনাথের কাছে মাপ্ চেয়ে, তাকে তা'র পুরাতন বন্ধুত্ব ফিরে দিন। আমার আশা ত্যাগ কর—আমি আর তাদের জীবনের ভিতর যেতে পারবো না—আমার জীবনের পথ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র!"

টম অনীতাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল,—সে কিছুতেই তা'র গোঁ ছাড়িল না।

শেষে টম বলিল, "দেখ, এ ব্যাপারটা আর যাতে বেশী জানাজানি না হয়, সেটা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য! তোমার নিজের মান-ইজ্জতের জন্যও যেমন কর্ত্তব্য, ইন্দ্রনাথের সম্মানের জন্যও ঠিক তেমনি কর্ত্তব্য। এখন পর্য্যন্ত এ বিষয় তোমরা ও আমি ছাড়া কেউ জানে না। এখনি যদি সব মিটমাট হ'য়ে আগের মত হয়ে যায়, তবে আর কারও জান্‌বার সম্ভাবনাও থাক্‌বে না। সে দিক দিয়ে দেখলেও, অন্ততঃ তোমার আর ইন্দ্রনাথের সুনামের খাতিরে তোমার ফিরে যাওয়া উচিত। তা' না হ'লেই লোকে নানা কথা জিজ্ঞাসা ক'রবে, কাণাঘুষা ক'রবে।"

অনীতা বলিল, "আমার নামে লোকে কাণাঘুষা ক'রবে,—তা' ক'রবেই তো। তাই করাই তো চাই! আমি অপরাধী—আমার এতে কি বলবার আছে! আর আমি লোকের চোখে ধুলোই বা দিতে যাব কেন? তবে ইন্দ্রনাথের নামে যদি লোকে কলঙ্ক রটায়, তবে সেটা আমার পক্ষে বড়ই কষ্টকর হ'বে। সে কলঙ্ক দূর করা দাদার হাত। দাদা যদি তার সঙ্গে সব মিটিয়ে তাঁদের বন্ধুত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন, তবেই তো লোকের মুখ একদম বন্ধ হ'য়ে যা'বে।"

আরও অনেকক্ষণ তর্কাতর্কির পর টম যখন হাল ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল, তখন অনীতা তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "তোমাকে আমার শত-শত ধন্যবাদ। আমার মত পাপিষ্ঠার জন্য যে তুমি ভাবছ, চেষ্টা ক'রছ, সে জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু যদি তুমি ইন্দ্রনাথের সঙ্গে দাদার ভাব করিয়ে দিতে পার, তবে আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাক্‌বো।"

টম বলিল, "আমি সে চেষ্টা সাধ্যমত করবো অনীতা। কিন্তু সেটায় আমার চেয়ে তোমার হাত বেশী—তোমার মধ্যস্থতা ছাড়া কি এ বিবাদ মিটবে?"

"আমি এ কালামুখ নিয়ে তো ইন্দ্রনাথের কাছে যেতে পারি না টম!"

"ইন্দ্রনাথের কাছে না পার, তোমার দাদার কাছে?"

অনীতা সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "দাদার কাছে ইন্দ্রনাথ অন্যায় রূপে অপমানিত হ'য়েছে। সে অপমান যে পর্য্যন্ত দাদা মুছে না নেবেন, সে পর্য্যন্ত আমি তাঁর মুখ দেখতে পারি না,—দেখলে আমি ধর্ম্মে পতিত হ'ব।"

টম বলিল, "তবেই তো মুস্কিল!" শেষে খানিকক্ষণ মুশাবিদা করিয়া টম বলিল, "আর এক উপায় আছে অনীতা,—সে কথা ব'লতে আমার সাহস হ'চ্ছে না। তুমি যদি ভরসা দেও তো বলি।"

"কি উপায়?"

মাটীর দিকে চাহিয়া টম বলিল, "যদি দয়া কর অনীতা, যদি ঘৃণা না কর আমাকে, তবে তুমি এখান থেকে আমার গৃহের অধিষ্ঠাত্রী হ'য়ে ফিরে চল, আমাদের মিলন-মন্দিরে তোমার ভাইকে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলিয়ে দেব।"

গম্ভীর ভাবে অনীতা বলিল, "টম, আমি হিন্দুর মেয়ে—অসতী নই! তুমি এমন কথা আর মুখেও এনো না।"

টম ঘাড় হেঁট করিয়া চলিয়া গেল।

(২৩)

টম বিবেচনা করিল যে, যদিও অনীতা এখন তার উপর ষোলআনাই বিমুখ, তবু যদি তাহার দৌত্যে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে অমলের ভাব হইয়া যায়, তবে সে কৃতজ্ঞতা আশ্রয় করিয়া ক্রমে অনীতার মনের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে। এই ভরসায় সে অমলের কাছে গিয়া তার দৌত্যের ফল জানাইল।

অনীতা সেদিনকার বিবরণ যেমন বলিয়াছিল, তাহা শুনিয়া অমল স্তম্ভিত হইল। এই বৃত্তান্ত যে ঠিক, তাহা স্থির করিতে তাহার কোন দ্বিধা হইল না; কেন না, সমস্ত অবস্থা আলোচনা করিয়া সেও এখন ঠিক এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইল।

লিগুলে বলিল, "অমল, অনীতাকে ফিরে পেতে হ'লে, তোমার ইন্দ্রনাথের সঙ্গে ভাব ক'র্‌তে হ'বে। তা না হ'লে সে কিছুতেই ফিরবে না।"

অমল কথা কহিল না। অনেকক্ষণ নীরবে অধোমুখে থাকিয়া সে বলিল, "আমি অনীতার সঙ্গে দেখা ক'রবো।"

লিগুলে বলিল, "সে তোমাকে দেখা দেবে না। যদি ইন্দ্রনাথের সঙ্গে তুমি মিটিয়ে না ফেল, তবে সে তোমার মুখ দর্শন ক'রবে না, ব'লেছে।"

অমল আবার নীরব হইল। লিগুলে বলিল, "এতে তোমার কুণ্ঠিত হবার কিছু নেই অমল। ইন্দ্র মহানুভবতা দেখিয়েছে। তুমিও কোন ইতরতা কর নি। তুমি যা ভেবেছিলে, তা' যদি সত্য হ'তো, তবে তোমার ব্যবহারই একমাত্র সমীচীন কাজ হ'ত। কিন্তু তুমি ভেবেছিলে ভুল। এখন যখন ভুল বুঝতে পেরেছ, এখন as an honourable man তোমার তা'র কাছে ক্ষমা চাওয়া সম্পূর্ণ সঙ্গত ও স্বাভাবিক। এতে তোমার অপমান নেই, বরং এতে তোমার সম্মান বাড়বে।"

অমল লিগুলের মুখের দিকে রূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "কি বলেছো লিগুলে? তুমি কি বুঝছো না, এমন ক'রলে কি দাম দিয়ে আমাকে ইন্দ্রনাথের ক্ষমা কিনতে হবে? সে আমার ভগিনীর মান! অনীতার মান বিলিয়ে দিয়ে আমি ইন্দ্রনাথের সঙ্গে ভাব ক'রবো? প্রাণ থাকতে আমি তা পারবো না।"

লিগুলে অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে কেবল বলিল, "তবে কি কেবল একটা দারুণ মিথ্যাই জয়ী হবে?"

অমল বলিল, "সত্য-মিথ্যা জানি না টম, ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝি না—নিজের মান-অপমান, কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য আমি সব অতল জলে ভাসিয়ে দেব। কিন্তু আমি আমার মাতৃহীনা ভগিনীর সম্মান পণ্যের মত বিক্রয় করব না। হতভাগিনী নিজের মান নিজে খুইয়েছে সত্যি, কিন্তু আমার মুখ দিয়ে সে কথা যদি বেরোয়, আমার কোনও কাজে যদি আমি তৃতীয় ব্যক্তির কাছে সে কথা স্বীকার করি, তবে যেন সেই মুহূর্ত্তে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হয়। আমি তা পারবো না টম।"

এ ব্যাপারটার এও যে একটা দিক আছে, তাহা লিগুলের এতক্ষণ খেয়াল হয় নাই। কিন্তু এখন সে স্পষ্টই অনুভব করিল যে, এ বাধাটা একটা গুরুতর বাধা বটে। এটা অমলের একটা অন্যায় খেয়াল নয়। এ ভাব যে কাটিবে, তাহা সে আশা করিতে পারিল না। হতাশ হৃদয়ে সে ফিরিয়া গেল।

লিগুলে চলিয়া গেলে, অমল যে ইজি চেয়ারের উপর বসিয়া ছিল, সেইখানে চিৎ হইয়া শুইয়া, দেয়ালে টাঙান তার মায়ের ছবির দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

কত কথা তার মনে হইল—কি দারুণ যাতনা, কি কঠোর বেদনায় তাহার হৃদয় পীড়িত হইল! লিগুলে যাহা বলিল, তাহাতে সে মর্ম্মে মরিয়া গেল! এ কি

দারুণ অপমান। তা'র ভগিনী হইয়া অনীতা নিজের মান উপযাচক হইয়া এমনি করিয়া বিলাইয়া দিয়াছে! আপনি যাচিয়া ইন্দ্রনাথের কাছে প্রেমভিক্ষা করিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে ;—কি লজ্জা! কি দারুণ মর্ম্মভেদী অপমান! এর চেয়ে যে মিথ্যা কল্পনা সে করিয়াছিল, সেও যে শতগুণে ভাল ছিল। ইন্দ্রনাথের কাছে সে যে এ জন্মে আর মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। এত দিন তার তবু আশা ছিল যে, অনীতার সঙ্গে হয় তো এক দিন বোঝা-পড়া হইয়া মিটমাট হইতে পারে। আজ তার মনে হইল তার ও অনীতার মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড ব্যবধান গড়িয়া উঠিয়াছে, যা' কোনও জন্মেই হয় তো দূর হইবে না।

লিওলেও বিষণ্ণ মনে বাড়ী ফিরিয়া গেল। তার মনে হইল যে, এ আল ভাঙ্গিবার সাধ্য তাহার নাই। কিন্তু এ কথা ভাবিতে তার ভয়ানক অস্বস্তি বোধ হইল। একটা মিথ্যা আসিয়া দুই বন্ধুর ভিতরে, আর প্রাণাধিক প্রিয় ভাই-ভগিনীর ভিতরে এই ব্যবধান সৃষ্টি করিবে, আর সে কেবলি চাহিয়া দেখিবে! এও কি হয়?

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একদিন সে ইন্দ্রনাথের কাছে কথাটা পাড়িল। ইন্দ্রনাথ নিবিষ্ট চিত্তে তাহার সমস্ত কথা শুনিয়া, অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

লিওলে বলিল, "তুমি অনেকটা মহানুভবতা দেখিয়েছ বোস! তোমার মহত্বটা পরিপূর্ণ করে, তুমি এদের ভাই-বোনে মিল করে দেও!"

ইন্দ্রনাথ বলিল, "আমি কি ক'রতে পারি বল?"

লিওলে। অমল যখন বুঝতে পেরেছে যে, তারই দোষ, তখন তুমি যদি অগ্রসর হ'য়ে তার সঙ্গে সব মিটিয়ে নিতে চাও, তা' হ'লে সে কখনই মেটাতে অস্বীকার ক'রবে না। আর অনীতা তোমাকে যে রকম শ্রদ্ধা করে, তা'তে তুমি যদি তাকে বল, তবেই সে তার দাদার কাছে ফিরে যাবে।"

ইন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া শেষে বলিল, "অমলের কাছে ক্ষমা-প্রার্থনা ক'রতে আমার কোনও বাধা নেই, যদি অমলের তা'তে কোনও আপত্তি না থাকে! কিন্তু অনীতার কাছে আমি মুখ দেখাতে পারবো না।"

"কেন?"

"কেন? তবে শোন লিওলে! অনীতা যা' ব'লেছে, তা' সম্পূর্ণ ঠিক নয়। অমল আমাকে যে অপমান ক'রেছে, আমি তার যোগ্য অপরাধই ক'রেছিলাম—আমি পাপিষ্ঠ!"

লিওলে চমকাইয়া উঠিল! এ আবার কি কথা! এক মুহূর্ত্তে তার সমস্ত সত্তা ইন্দ্রনাথের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল। সে ক্ষিপ্ত হইয়া বলিল, "তবে অনীতা যা' ব'লেছে, তা' মিথ্যা!"

"মিথ্যা কি সত্য, সেই ব'লতে পারে! তার কাছে হয় তো সেই কথাটাই সত্য। কিন্তু আমি জানি, সে কথা আসল সত্য নয়।"

লিওলে বিষম চটিয়া গেল। সে বলিল, "দেখ বোস, হেঁয়ালী রাখ। তোমার কথা যদি সত্য হয়, তবে তুমি আমার ভয়ানক অনিষ্ট ক'রেছ। এর জন্য satisfaction আমি আদায় না ক'রে ছাড়বো না জেনো। এখন ওসব হেঁয়ালী রেখে, সাদামাটা সত্য কথাটা বল। ব্যাপার কি হ'য়েছিল, স্পষ্ট করে আমায় বল, তার পর তোমায়-আমায় বোঝা-পড়া হ'বে।" তার মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল।

ইন্দ্রনাথ একবার তার মুখের দিকে চাহিয়া, দৃষ্টি নত করিয়া মাটির দিকে চাহিল। ধীরে-ধীরে সে বলিল, "সেদিন কি হ'য়েছিল, তা' আমিই এখন পর্য্যন্ত ঠিক করে ঠাউরে উঠতে পারি নি। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে কতকগুলি ঘটনা বিদ্যুদ্বেগে ঘটে গেল—আমি তখন মাত্র অর্দ্ধ-চেতন —কি ক'রেছি না ক'রেছি—তা' ভাল ক'রে আমারই মনে নাই। তোমাকে যদি সে কথা খুব স্পষ্ট করে' ব'লতে যাই, তবে হয় তো আমার কতকগুলো মনগড়া কথা জুড়ে দিতে হ'বে। তবে এইটুকু খাঁটি সত্য যে, এক মুহূর্ত্তের জন্য আমি সম্বিৎ হারিয়েছিলাম। অনীতা যখন এক মুহূর্ত্তের জন্য আমার বুকের কাছে লতিয়েছিল, তখন আমি যেন স্বপ্ন দেখছিলাম—আমার সমস্ত শরীরের ভিতর একটা তীব্র বিদ্যুৎ-প্রবাহ ব'য়ে গিয়েছিল; —আমি তাকে বুকে করে যেন স্বর্গের পথে ভেসে বেড়াচ্ছিলাম—"

"যথেষ্ট হ'য়েছে—তোমার কাছে এ কথা নিয়ে কাব্য শোনবার আমার অবসর নেই। তোমার সম্বন্ধে আমার

মত কি শুনতে চাও ?—তুমি কুকুরের অধম, ঠিক কুকুরের মত শাস্তি তোমাকে দেওয়া উচিত। এখন এস, তুমি ভদ্রলোকের মত লড়তে চাও, না কুকুরের মত মার খেতে চাও ?” বলিয়া লিণ্ডলে আস্তিন গুটাইয়া দাঁড়াইল।

ইন্দ্রনাথ তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, “তোমার সঙ্গে আমি লড়বো না।”

লিণ্ডলে রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, “তবে এই নেও—এই নেও—” বলিয়া তাহার নাকের উপর এবং কাণের উপর দুই প্রচণ্ড ঘুসি লাগাইয়া দিল,—ঝর্‌ঝর্ করিয়া ইন্দ্রনাথের নাক দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সে বেহুঁস হইয়া পড়িল।

ব্যাপারটা ঘটিয়া গেল কলেজের প্রফেসারদিগের বসিবার ঘরে। সে সময়ে সেখানে আর কেউ উপস্থিত ছিল না। কিন্তু শব্দ শুনিয়া পাশের ঘর হইতে একজন ইংরেজ প্রফেসার আসিয়া পড়িলেন। তার পর খবর পাইয়া প্রিন্সিপ্যাল প্রভৃতি আরও অনেকে আসিয়া পড়িলেন। অনেক কষ্টে ইন্দ্রনাথের জ্ঞান-সঞ্চার হইলে, সে লিণ্ডলেকে ডাকিয়া বলিল, “লিণ্ডলে, এখন বোধ হয় তুমি আমাকে ক্ষমা ক'রতে পারবে ?”

লিণ্ডলে অবাক্! রাগের মাথায় ঘুসি মারিয়াই, তার মনে দারুণ অনুশোচনা উপস্থিত হইয়াছিল। ইন্দ্রনাথ যে আত্মরক্ষার চেষ্টামাত্র না করিয়া, তার কাছে অত্যন্ত দীন ভাবে পড়িয়া মার খাইল, ইহাতেই তাহাকে বিষম আঘাত করিল। কারণ, ইন্দ্রনাথ কাপুরুষও নয়, মুষ্টিযুদ্ধে অক্ষমও নয়,—তাহা সে জানিত। একবার কলেজের ছেলেদের ফুটবল খেলা লইয়া ময়দানে একটা ইংরেজদলের সঙ্গে ঝগড়া হয়—গোরার দল বাঙ্গালী ছেলেদের অযথা আক্রমণ করে। লিণ্ডলে ও ইন্দ্রনাথ দুজনেই সেখানে ছিল। তা'রা দুজনে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল,—ইন্দ্রনাথের হাতে কয়েকটা ষণ্ডা-ষণ্ডা ইংরেজ যে কি লাঞ্ছনা খাইয়া গিয়াছিল, তাহা লিণ্ডলে দেখিয়াছিল। সেই ইন্দ্রনাথ যে তার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার চেষ্টামাত্র করিল না, ইহাতে তার মনের ভিতর বড় খট্‌কা লাগিয়া গেল। সে মনে-মনে বুঝিল যে, এই যুদ্ধে সে আঘাত করিয়াই, ইন্দ্রনাথের কাছে মর্ম্মান্তিক ভাবে পরাজিত হইয়া গেল। যখন সকলে মিলিয়া ইন্দ্রনাথের জ্ঞান-সম্পাদনে যত্নবান হইল, প্রিন্সিপ্যাল আসিয়া লিণ্ডলেকে তিরস্কার করিলেন, বাঙ্গালী প্রফেসারগণ খুব উত্তেজিত ভাবে পরস্পরের মধ্যে কথা কহিতে লাগিলেন, তখন সে মর্ম্মে মরিয়া, ঘরের এক কোণে বসিয়া, তাহার নৈতিক পরাজয়ের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতেছিল। ইন্দ্রনাথের এই কথায় সে একেবারে বসিয়া পড়িল! সে ইন্দ্রনাথের হাত ধরিয়া আবেগ-পূর্ণ স্বরে বলিল, “বোস, বোস,—অনীতা ঠিক ব'লেছিল,—তুমি মানুষ নও দেবতা—তুমি আমায় ক্ষমা কর।”

“সর্ব্বান্তঃকরণে! তুমি যা' ক'রেছ, আমি তোমার স্থলবর্ত্তী হ'লে তার চেয়ে কম কিছু ক'রতাম না। তোমার হাতে মার খাওয়া আমার অন্যায় হয় নি!”

“তুমি আমাকে যে লজ্জা দিয়েছ, তা' আমি জন্মে ভুলবো না। তুমি এখন বেশ সুস্থ বোধ ক'রছো তো।”

ইন্দ্র হাসিয়া বলিল, “সম্পূর্ণ!”

বাড়ী ফিরিবার সময় লিণ্ডলে ভাবিল, ইহার পর আর তার অনীতার কাছে মুখ দেখান অসম্ভব। আজ তার সব আশার সমাধি হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

তক্ষশিলা

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত

প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা সার জন মার্শাল সাহেব ইতঃপূর্ব্বে তক্ষশিলার একখানি পথ-প্রদর্শিকা প্রকাশ করিয়া দর্শকদিগের খনিত স্থানসমূহ দেখিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। তৎপরে তিনি গত বৎসরের Memoirs of the Archæological Survey of Indiaর ৭ম সংখ্যায় তক্ষশিলা সম্বন্ধ নানা পুরাকাহিনী কীর্ত্তিত করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি The Illustrated London News পত্রে—'ভারতবর্ষে গ্রীকেরা যেখানে

একসময়ে রাজ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন' শীর্ষক একটি চিত্র-বহুল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া, দুই হাজার বৎসরের বিস্মৃত কাহিনী লোক-লোচনের গোচর করিয়াছেন। খননকালে গ্রীসদেশীয় দ্রব্য-সম্ভার যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহারও অনেকগুলি চিত্র দিয়াছেন। আমরা সেগুলির ভিতর হইতে কয়েকখানি চিত্রও উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধটীর সার সংগ্রহ করিয়া বঙ্গানুবাদ করিয়া দিতেছি।

বৃহৎ রাজকীয় ধর্মস্তূপ (The Great Stupa of the Royal Law)

প্রাচীন ব্যাকট্রিয়ার ন্যায় তক্ষশিলা স্মরণাতীত কাল হইতে নানা ভাষা-ভাষী বিভিন্ন জাতীয় লোকের মিলনকেন্দ্র ছিল। মহাবীর আলেকজান্দারের সৈন্যগণ গ্রীসদেশীয় উচ্চারণ পদ্ধতিতে ভারতের তক্ষশিলাকে 'ট্যাক্সিলা' বলিত। এই স্থানের নাম উচ্চারিত হইবামাত্রই, পাঞ্জাবের সমতল-ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে যে সকল সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদের চিত্র মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকে। পারস্যাধিপতি মহাপরাক্রমশালী দেরায়স এক সময়ে তক্ষশিলা অধিকৃত করিয়া ইহাকে পারস্য-সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। ম্যাসিডোনিয়ার অধিপতি আলেকজান্দার, দুর্দ্ধর্ষ পুরুরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিবার সময় সসৈন্যে এখানে একবার বিশ্রাম করিয়া-

ছিলেন। এইখানেই মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাস নিকেতরকে বিধ্বস্ত ও পরাজিত করেন। ইহার পরবর্ত্তী যুগে প্রাচ্য হইতে ভারকেন্দ্র প্রতীচ্যে ঘুরিয়া যায়। মহাবীর এণ্টিয়কাসের জামাতা দিমেত্রিয়াস, ব্যাক-টি্রয়া হইতে এখানে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। সেই সময় হইতে শতাধিক বর্ষ ধরিয়া গ্রীসদেশীয় কুমারগণ এখানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তৎপরে সীথিয়া ও পার্থদেশ হইতে পাশ্চাত্য আক্রমণকারীরা আসিয়া তক্ষশিলায় আপনাদের প্রভাব বিস্তার করে। তাহাদের মধ্যে পরাক্রমশালী শাসক আজেস ও গণ্ডোফ্রেরের অধিনায়কত্বে তাহারা পাঞ্জাব প্রদেশ একরূপ উৎখাত করিয়াছিল। তার পর খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে চীন দেশের সুদূর প্রান্তসীমা হইতে কুশানগণ
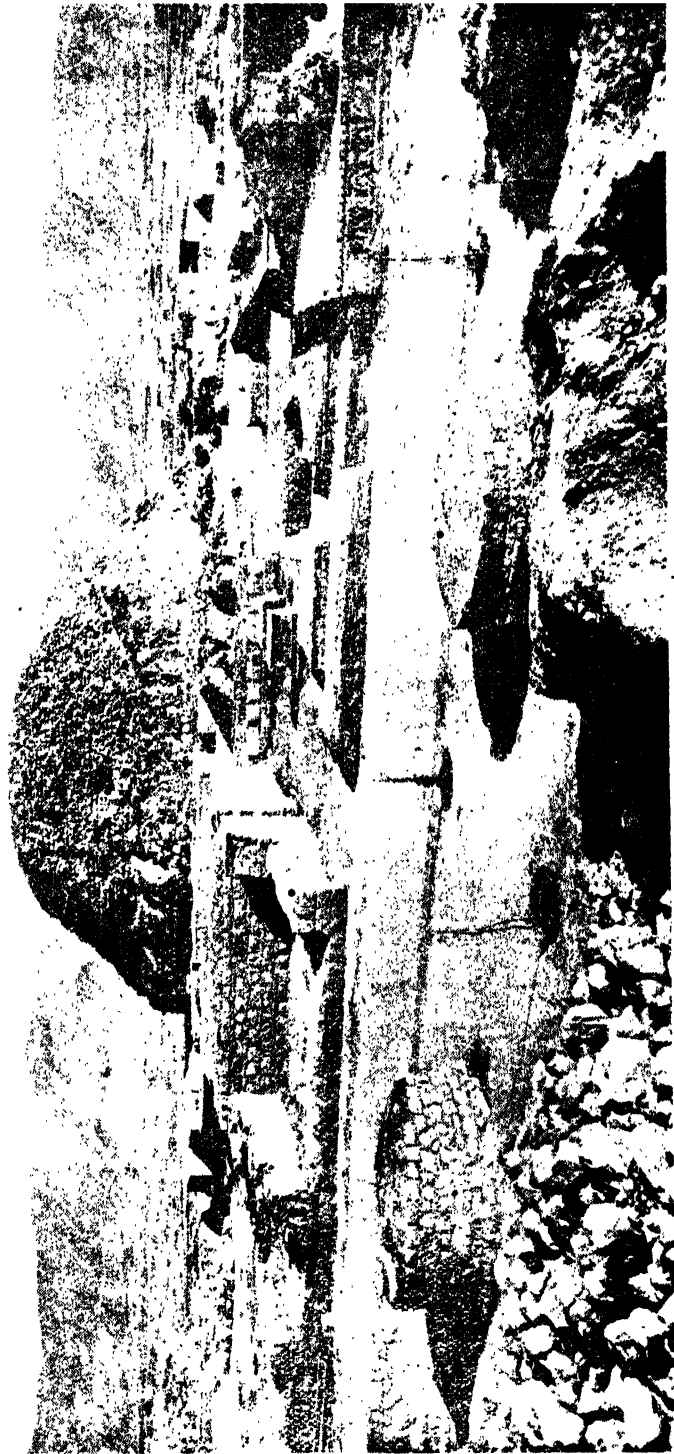
আসিয়া পাশ্চাত্য বলদৃপ্ত জাতিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। কুশানবংশীয় সম্রাট্ কনিষ্কের বাহুবলে প্রায় সমগ্র হিন্দুস্থান অধিকৃত হয়। পরিশেষে শ্বেতকায় হুণেরা আসিয়া তক্ষশিলাবাসীদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল, তাহার তুলনায় আটিলাবাসীদের অনুষ্ঠিত অত্যাচার-সমূহ যৎসামান্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তক্ষশিলার ধ্বংস-কার্য্যের যেটুকু বাকী ছিল তাহারাই সেটুকু সম্পূর্ণ করিয়া যায়।

ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও বড় কম ছিল না—মনোমুগ্ধকর পার্ব্বত্য উপত্যকার মধ্যে তক্ষশিলা অবস্থিত। এখানকার পর্ব্বতমালা নগরটাকে বিদেশীয় আক্রমণ হইতে কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষা করিত। এখানকার মৃত্তিকার উর্ব্বরাশক্তি প্রখর; পানীয় জলও প্রচুর। এই সহরের আয়তন ৪০ বর্গ মাইল, এবং ইহার মধ্যে তিনটী বিভিন্ন সহরের ভগ্নাবশেষ প্রোথিত আছে, কারণ প্রথম সহর সংস্থাপনের পর দুইবার ইহা স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল।
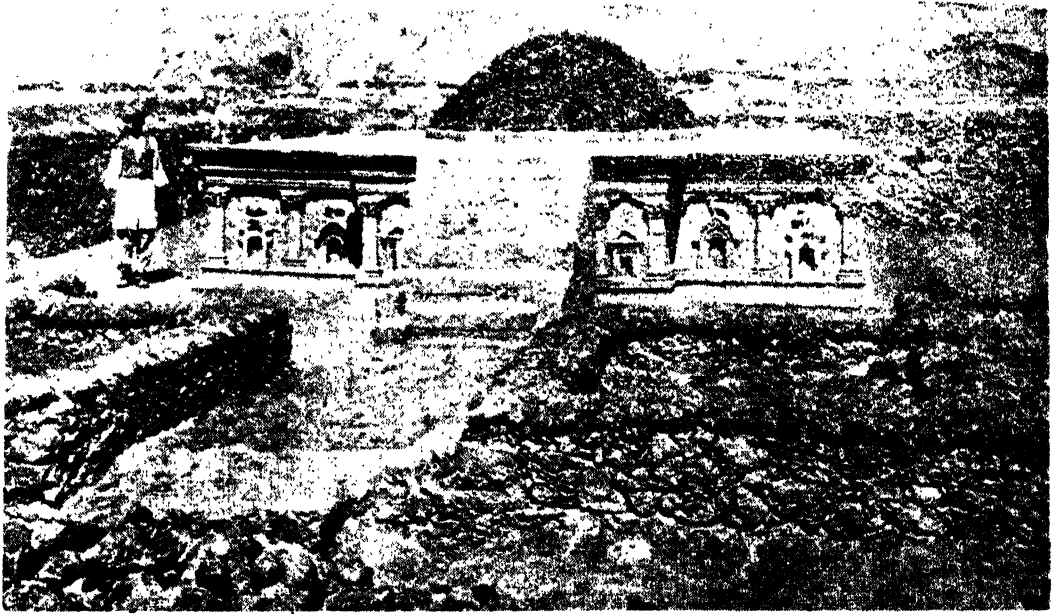
অন্য একটী জৈন স্তূপ

তক্ষশিলা রাওয়ালপিণ্ডির কুড়ি মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এইখানেই আফগানিস্থান ও পশ্চিম এসিয়ার পুরাতন বাণিজ্য-পথের সহিত কাশ্মীর ও হিন্দুস্থানের বাণিজ্য-পথ মিলিত হইয়াছে। বণিকগণ এই উভয় পথ দিয়া পণ্যদ্রব্য লইয়া ব্যবসার জন্য যাতায়াত করিত। এই নগরের অবস্থান বাণিজ্যের পক্ষে সুবিধাজনক ও অর্থাগমের সহায়ক ছিল বলিয়া, ক্রমে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে ব্যাকট্রিয়ার গ্রীকেরা ও খৃষ্টীয় প্রথম শতকে কুশানেরা সহরটাকে অন্যস্থানে স্থাপিত করে। তিনটী নগরের ধ্বংসাবশেষই উপর্য্যুপরি পাওয়া গিয়াছে। ভারতের ভিতর এমন একটাও পুরাতন সহর নাই, যাহার বুকের উপর দিয়া এত অধিক সংখ্যক বিভিন্ন জাতির আধিপত্য বিস্তার হইয়াছিল। অন্য কোনও সহরের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ও এত অধিকবার সংঘটিত হয় নাই। অন্য কোন

সহরের বুকের ভিতর প্রাচীন স্মৃতির নিদর্শনও এত অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় না।

পুরাতন সহরটী এখনও ভীর স্তূপের বহু নিম্নে প্রোথিত আছে। জানি না কবে ভূগর্ভ হইতে ইহা বাহির হইয়া পড়িয়া অতীত-কাহিনী বিবৃত করিয়া দিবে। এক্ষণে যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, দ্বিতীয় সহরটী ভীর-স্তূপের উপরই পুরাতন সহরের অবস্থিতি স্থানেই নির্ম্মিত, এবং ইহার ধ্বংস-কার্য্য আলেকজান্দারের সৈন্যদের আগমনের বহু পূর্ব্বে সাধিত হইয়াছিল। এই ভগ্নাবশেষের উপর তৃতীয় সহরটী খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতকে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কালক্রমে ইহা ভূগর্ভশায়ী হয়। দুই হাজার বৎসর পরে ইহা পুনরায় খনিত হইয়া লোক-লোচনের গোচর হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, গ্রীস দেশীয় পরিকল্পনায় নির্ম্মিত যে ভগ্ন পাত্রটী পাওয়া গিয়াছে, তাহার উপর আলেকজান্দারের মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। বিজয়ী বীর আলেকজান্দারের কোন সৈন্য কর্ত্তৃক এই পাত্রটী যে পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তাহাও মনে হয় না; কারণ, তখনও আলেকজান্দারের মূর্ত্তি
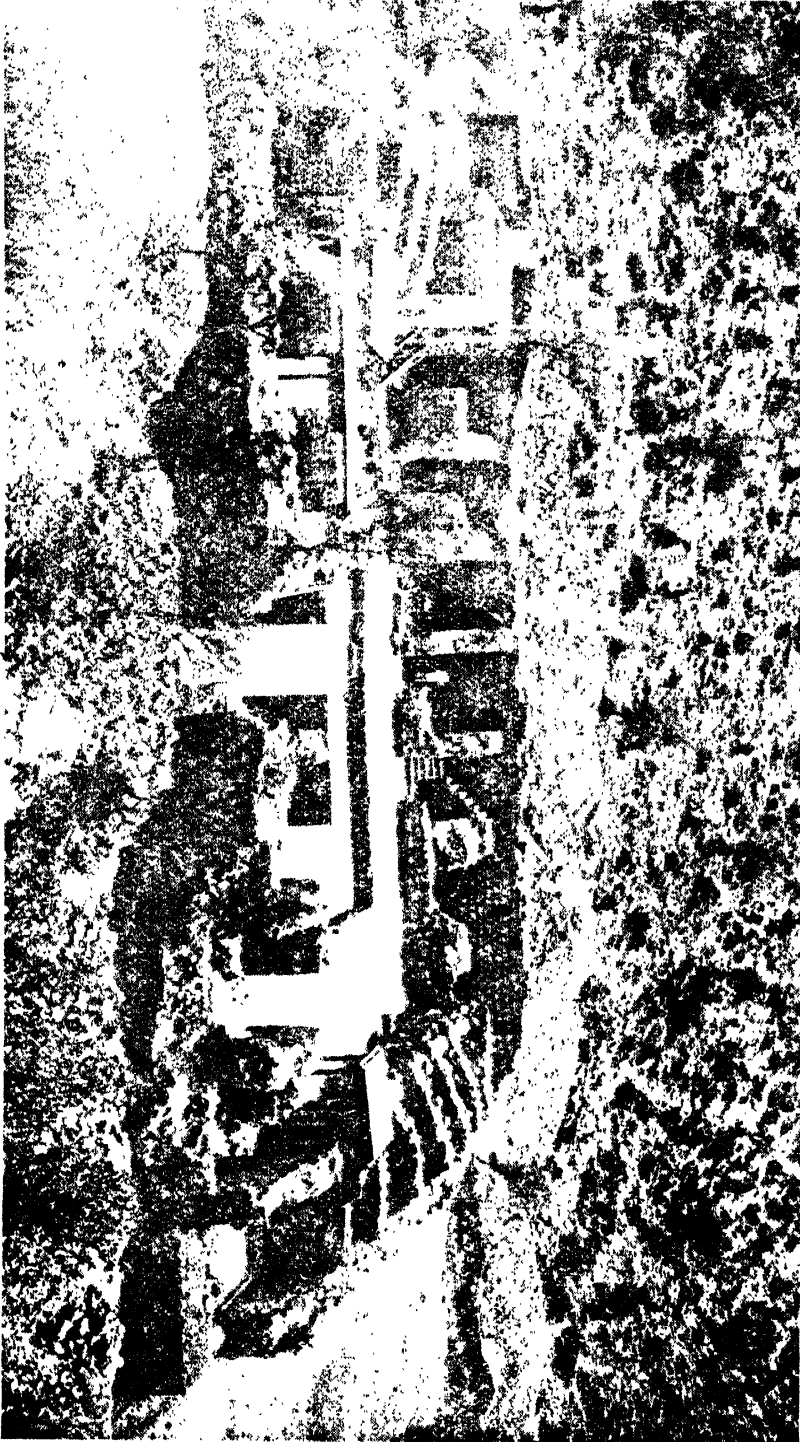
মোহর-মোরাড় বিহার

কোন স্থানেই উৎকীর্ণ হয় নাই। গ্রীস-অভিযানের ফলে ভারত আলেকজান্দারের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিল, ঐ চিত্র ইহাই সূচিত করিয়া দেয়। সহরের বাড়ীগুলির পরিকল্পনা, প্রচলিত গৃহ-নির্ম্মাণ-পদ্ধতির রীতি অনুসারে নির্ম্মিত হয় নাই। অসমঞ্জস প্রস্তর দ্বারা এগুলি নির্ম্মিত। পাঞ্জাবে এ পর্যান্ত ভূগর্ভ হইতে যে সমস্ত বাটীর ভগ্নাবশেষ বাহির হইয়াছে, তাহার ভিতর এগুলি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এগুলির কোন কোনটীর ভিতর আবার একটু বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। সে বিশেষত্ব হইতেছে, যজ্ঞবেদীর ন্যায় স্তম্ভ। কেন যে প্রাচীন কালে এগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার সুনিশ্চিত কারণ এখনও অবধারিত হয় নাই। পয়ঃনালী সাহায্যে উদ্বৃত্ত জল ও অপরিষ্কৃত দ্রব্য সকল বাহির করিয়া দিবার জন্য কতকগুলি কূপ ব্যবহৃত হইত, তাহাদেরও অস্তিত্ব পাওয়া গিয়াছে। ভূগর্ভোদ্ধৃত নিদর্শনগুলির ভিতর একটী মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার ভিতর তিনটী সমচতুষ্কোণ-বিশিষ্ট যজ্ঞবেদী পাশাপাশি অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে বহুবিধ মৃন্ময় পাত্র, দগ্ধ মৃত্তিকানির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি,

খৃষ্ট পূর্ব্ব প্রথম শতকের জানদিয়ালের আইওনিয়াবাসীদের সূর্য্য-উপাসনা-মন্দির

'টেরা কোটা' মূর্ত্তি

প্রাচীন বৌদ্ধ-শিল্পের নমুনা

মুদ্রা, উজ্জ্বল মণিমাণিক্য ও রত্নাদি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে আমরা কয়েকটীর চিত্র দিলাম।

তাম্‌রা নদীর অপর তীরে ও প্রাচীন তক্ষশিলার কিছু উত্তর-পূর্ব্বে সিরকাপ নামক দ্বিতীয় সহরটী ব্যাকট্রিয়ার গ্রীসগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এক শতাব্দী পরে শকেরা নূতন করিয়া নগর নির্ম্মাণ করে, এবং পরে-পার্থিয়াবাসীরা আবার নূতন করিয়া সহর গঠিত করে। শক
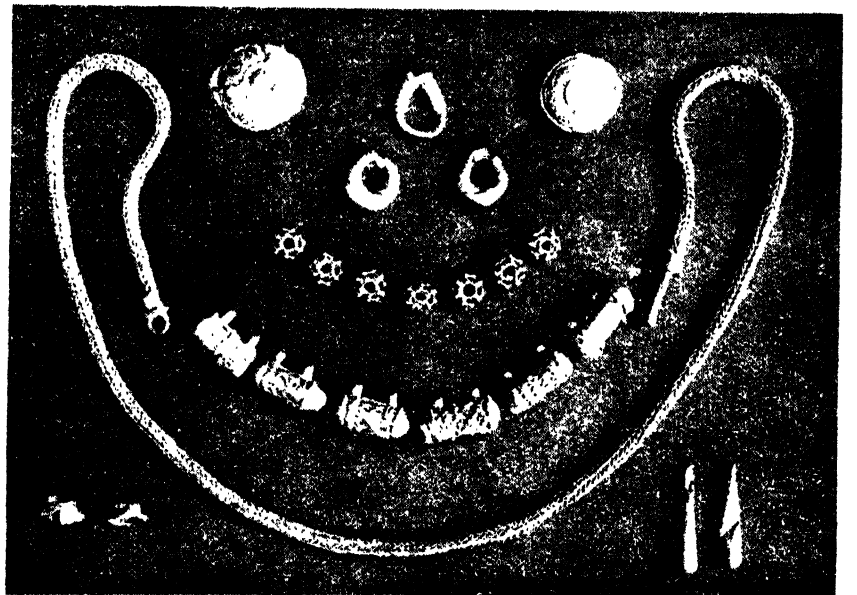
তক্ষশিলায় প্রাপ্ত অলঙ্কার

ও গ্রীকদের সহরের ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন এখনও পর্য্যন্ত কিছুই বাহির হয় নাই; কিন্তু পার্থিয়ান সহরের বহু অংশ খনিত হইয়া বাহির হইয়াছে। দর্শকেরা এক্ষণে প্রাচীর ও বুরুজের উপর উঠিয়া প্রাচীন রাস্তায় ভ্রমণ এবং তাহাদের পরিকল্পিত গৃহাদির নির্ম্মাণ-কৌশলের বিষয় অনুশীলন করিতে পারেন।

মোহর-মোরাড় বিহারের পঙ্ক-ভাস্কর্য্যের নমুনা
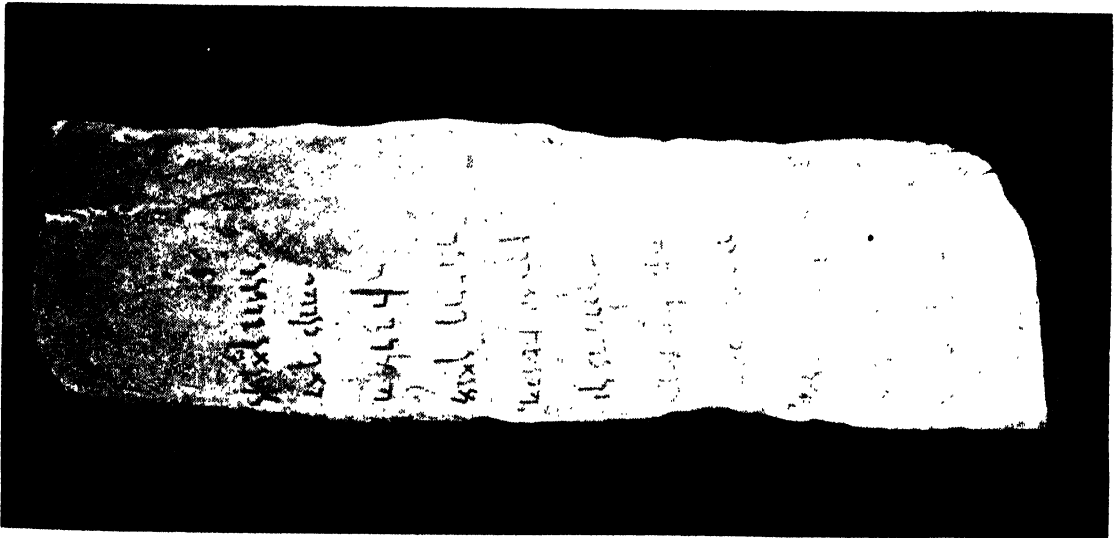
খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫ম শতকে যখন তক্ষশিলা পারস্যের একিমিনিয়ান রাজাদিগের অধীনে ছিল, তখনকার আরেমিক ভাষায় লিখিত প্রস্তরলেখ

এই অট্টালিকাগুলির ভিতর একটা বেশ সুদৃঢ় ভাবে নির্ম্মিত। ইহা প্রস্থে ও দৈর্ঘ্যে তিন শ ফিটের অধিক। সম্ভবতঃ ইহা পার্থিয়ান শাসনকর্ত্তার প্রাসাদ ছিল। ইহার সহিত খোরশাবাদের আসীরিয় রাজপ্রাসাদের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। অপেক্ষাকৃত ছোট-ছোট গৃহগুলির আভ্যন্তরিক দ্রব্য সকল দেখিয়া বোধ হয় যে, উহারা বৌদ্ধ, জৈন, অগ্নি উপাসক ও হিন্দুদিগের অধিকৃত ছিল। যদিও এই বাড়ীগুলি পূর্ব্বোক্তরূপে অসমঞ্জস প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা প্রস্তুত, তথাপি, প্রাচীন সহরের বাড়ীগুলি অপেক্ষা এগুলি সুদৃঢ় ভাবে গঠিত ও শ্রেণীবদ্ধ ভাবে অবস্থিত; এগুলির আবার
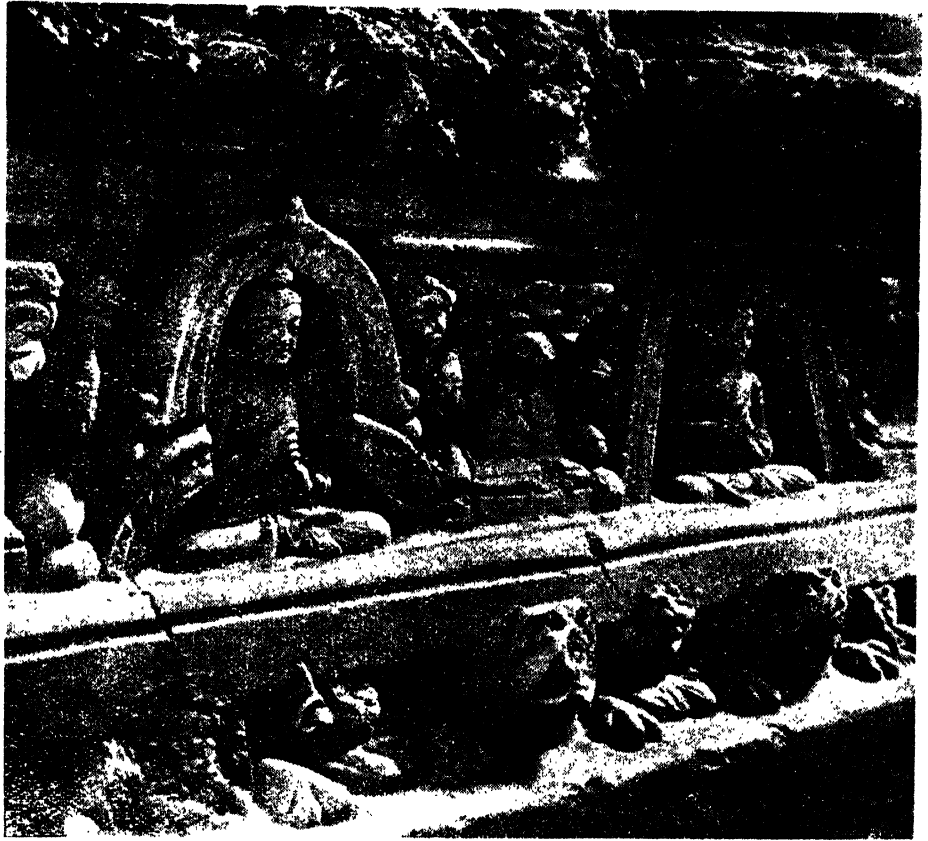
জৌলিয়ান বিহারের পঙ্খ-ভাস্কর্য্যের নমুনা

তক্ষশিলায় প্রাপ্ত পাত্র

তক্ষশিলায় প্রাপ্ত স্বর্ণবলয়

তক্ষশিলায় প্রাপ্ত জলাধার

আর একটু বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ঘরগুলির দরজা আদৌ নাই; ইহাদের ভিতর দিয়া ভূগর্ভে যাওয়া যায় এবং সেখানেও অনেকগুলি ঘর আছে। এগুলি সম্ভবতঃ খাদ্য সামগ্রী রক্ষার্থ ভাণ্ডার বা তহখানা রূপে ব্যবহৃত হইত। Philostratus ও এই বিশেষত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন; প্রথম-দর্শনে

বাটীগুলিকে একতলা বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ইহার ভিতরে মৃত্তিকার নিম্নে আর একশ্রেণী ঘর আছে। এই বাড়ীগুলির আর একটী বিশেষত্ব ইহাদের বিস্তৃতি। বাড়ীগুলিতে একটা পরিবারের পক্ষে যত ঘর থাকা আবশ্যক তাহার চেয়ে অনেক বেশী ঘর ছিল। বোধ হয় ঘরগুলি কয়েকটী পরিবারের বাসোপযোগী ছিল; কিংবা কোন পরিবারের প্রজাদের দ্বারা অধিকৃত থাকিত। কিন্তু এ অনুমান অপেক্ষা আমাদের মনে হয়, যে তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, এই স্থানেই তাহার সংস্থিতি ছিল। ছাত্রগণসহ অধ্যাপকদিগের বাস গৃহ ছিল বলিয়া গৃহগুলি এত বিস্তৃত। অপর একটী বিশেষত্ব এই যে, বাড়ীগুলির মধ্যে অনেক উঠানেই ক্ষুদ্র মন্দির বা ভজনালয় দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা ঐরূপ একটী মন্দিরের চিত্র প্রকাশ করিলাম। সম্ভবতঃ এটী জৈন মন্দির। খৃষ্টীয় ৭ম শতকে বা তাহার কিছু কাল পূর্ব্বে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার নির্ম্মাণ-কৌশল ভাল করিয়া দেখিলে, ইহাতে স্পষ্টই ভারতীয়, গ্রীস দেশীয় ও শক-দিগের স্থাপত্য-প্রথার অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য যে দ্বি-মুখাকৃতি ঈগল পক্ষীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, সেটী শকদিগের স্থাপত্য-প্রথায় সজ্জিত। সিরকাপ সহরে প্রাপ্ত দ্রব্য-সম্ভার হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, প্রাচীন ভারতে গ্রীক-আধিপত্য কত দূর বিস্তৃত হইয়াছিল। তক্ষশিলায় শক ও পার্থিয়ান আধিপত্যের ফলে ভারতীয়-কলায় পাশ্চাত্য গ্রীক প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

সহরের অভ্যন্তরের খনন কার্য্য অপেক্ষা, এখন প্রাচীরের বাহিরের দিক কি ভাবে অবস্থিত ছিল, তাহা জানিবার জন্য বহু চেষ্টা হইতেছে; এবং এই চেষ্টার ফলে—সিরকাপ সহরের উত্তর দ্বারের বহির্ভাগে একটী উচ্চ বেদী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ ইহা অগ্নি-উপাসকদিগের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মন্দিরের গঠন-প্রণালী গ্রীস দেশীয় আইওনিয়ান পদ্ধতি অনুযায়ী। বোধ হয় ইহাই সেই ফিলোস্ট্রেটাস-বর্ণিত মন্দির; এইখানেই এপোলোনিয়াস তাঁহার সঙ্গী দামিয়াসের সহিত পার্থিয়ান-রাজের সাক্ষাতের অনুমতি পাইবার অপেক্ষায় বসিয়াছিলেন। এই মন্দিরের প্রাচীর-গাত্রে পিতলের ফলকে আলেকজান্দার ও পুরুর যুদ্ধের চিত্র সকল উৎকীর্ণ ছিল।

অন্যান্য স্মৃতি-স্তম্ভের অধিকাংশই বৌদ্ধদিগের। পাঞ্জাবে যতগুলি বৌদ্ধ বিহার ও চৈত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এগুলির গঠন কার্য্য অনিন্দ্য-সুন্দর। সর্ব্বা-পেক্ষা সুন্দর কারুকার্য্যযুত "রাজকীয় ধর্ম্মস্তূপের" (Great Stupa of the Royal Law) চিত্র এখানে প্রদর্শিত হইল। খৃষ্টীয় ৭ম শতকে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন হয়। তার পর পঞ্চ শতাব্দী ধরিয়া ইহার সৌষ্ঠব-সাধন ও সুসজ্জীকরণ হইয়াছিল। মধ্যস্থিত স্তূপের চারি পার্শ্বের বহু চৈত্যগাত্রে অঙ্কিত মূর্ত্তি, তক্ষণ-কার্য্য, পূজোপকরণ দ্রব্যসম্ভার প্রভৃতি দেখিয়া তৎকালের অনেক রীতিনীতি জানিবার সুবিধা পাওয়া গিয়াছে। মৃত আত্মীয় স্বজনের স্মৃতি রক্ষার্থ স্তূপ নির্ম্মাণ করা বৌদ্ধদিগের একটী প্রিয় অনুষ্ঠান ছিল। এরূপ স্মৃতি-চিহ্নসূচক অনেকগুলি স্তূপের নিদর্শনও পাওয়া গিয়াছে। এগুলির মধ্যে মোহরা মোহাদু ও জোলিয়ানের স্মৃতিস্তূপ সুন্দর সুরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। এই স্তূপদ্বয়ের প্রাচীর-গাত্রে খোদিত যে অসংখ্য প্রস্তরনির্ম্মিত চিত্তাকর্ষক প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিই গ্রীস-বৌদ্ধ পরিকল্পনার অপূর্ব্ব সম্মিলনে নির্ম্মিত। পরবর্ত্তী গুপ্ত-ভাস্কর্য্যের রীতিতে এই দুই রীতি অনুসৃত হইয়াছে। আবার এই গুলির ভিতর অনেক-গুলি পঙ্খে (stucco relief) কাজ করা; আর কতকগুলি মৃন্ময় মূর্ত্তি। এই শেষোক্ত নিদর্শনগুলি ভারতীয় বিশেষত্বের পরিচায়ক। মৃত্তিকা অল্পকাল স্থায়ী হয় বলিয়া প্রাচীন যুগের মৃন্ময় মূর্ত্তি কিছুই অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও নাই। তবে যে এগুলিকে পাওয়া গিয়াছে, তাহা শ্বেতকায় হূণদিগের কৃপায়। তাহারা মন্দির ও স্তূপগুলিকে পোড়াইয়া দিয়াছিল। জোলিয়ান বিহার জ্বালাইয়া দিবার পর যে সুন্দর মূর্ত্তিটী পাওয়া যায়, তাহা 'টেরা কোটা' মূর্ত্তির চিত্রে প্রদর্শিত হইল। পঙ্খের চিত্র একটু ভাল করিয়া দেখিলে, গ্রীক-বৌদ্ধ পদ্ধতির ভাস্কর্য্য যে কিরূপ ছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। এই দুই চিত্রের পঙ্খের কাজ (Stucco Sculpture) খুব সূক্ষ্ম।

বিজিতা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১৮)

যোগেন্দ্র ও শৈলেন আগেই চলিয়া গিয়াছেন ; প্রতিভা গাড়ীতে উঠিয়াছে ; সুষমা উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন,—সেই সময় পিছন হইতে ডাক পাড়িল "দাঁড়াও ভাই বড়দি।"

সুষমা পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, সুলতা। সুলতা সুষমার পায়ের কাছে খুব ভক্তিভরে একটা প্রণাম করিয়া বলিল, "যাই বল ভাই বড়দি, এটা কি তোমার মত লোকের উচিত কাজ হচ্ছে ?"

বিস্মিতা সুষমা বলিল "কি উচিত হচ্ছে না মেজবউ ?"

মেজবউ বলিল, "কিছু না বলে চলে যাওয়া। আমি এখনি সবে শুনতে পেলুম, তোমরা বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছ। যাই হোক, ঠিক সময়েই এসে পড়েছি। না ভাই বড়দি, তোমায় আমরা দুজনে কক্ষনো যেতে দেব না। তুমি ভাই, না থাকলে আমাদের কিছু ভাল লাগবে না। যাবেই যদি নেহাৎ, আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাও।"

"তা ঠিক, ঝগড়াটা না করতে পেলে কি থাকতে পারা যায় গা ? মেজবউ-মাকে নিয়ে চল বড়বউমা,—নইলে ঝগড়া না করতে পারলে পেট ফেঁপে বেচারা মারা পড়বে যে !"

পিসীমা তাঁহার তামাক-পোড়ার কৌটাটী ভুলিয়া গৃহমধ্যে ফেলিয়া আসিয়াছিলেন। গাড়ীতে উঠিবার সময় অভ্যাস-বশে মুখে দিতে গিয়াই তাঁহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। তিনি এই অপূর্ব্ব জিনিসটীর বড় ভক্তা ছিলেন। নিজের হরি-নামের মালাটী তিনি বিসর্জ্জন দিতে পারেন, এটী কোনও মতে পারেন না। একঘণ্টা এই ছাইটুকু মুখে না দিলে, তাঁহার চোখে জগৎ অন্ধকার হইয়া যাইত।

ছুটিতে-ছুটিতে কক্ষে গিয়া দেখিলেন, মেজবউয়ের দাসী সবেমাত্র কৌটাটী লইয়া কাপড়ের মধ্যে লুকাইবার উপক্রম করিতেছে। সে কতদিন একটু এই ছাই চাহিয়াও পায় নাই। আজ কৌটাসুদ্ধ পাইয়া সে দিনটাকে অত্যন্ত শুভ বলিয়া সে মনে করিতেছিল, তাহাতে একটুও সন্দেহ নাই। চিলে ছোঁ দিয়া যেমন বালকের হাত হইতে খাবার কাড়িয়া লয়, তেমনি করিয়া পিসীমা তাহার হাত হইতে কৌটাটী কাড়িয়া লইলেন, এবং তাহাকে খুব তিরস্কার করিতেও ছাড়িলেন না।

মেজাজটা তখন খুব গরম ছিল। ফিরিয়া আসিয়া আবার মেজবউয়ের মন-যোগানি কথাগুলি যখন শুনিতে পাইলেন, তখন তাঁহার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল ; রাগের মুখে কড়া কথাগুলিও বাহির হইয়া পড়িল।

এই বুড়িটাকে দেখিলেই সুলতার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিত। সে ফিরিয়া তীব্র নেত্রে পিসীমার পানে চাহিয়া, তীব্র কণ্ঠেই বলিয়া উঠিল "তোমাকে কে ডেকেছে গা পিসীমা ? কথা বলবার মত শক্তি ত বড়দিরও আছে !"

তেমনি ঝাঁজের সঙ্গেই পিসীমা উত্তর দিলেন, "কেউ বলে নি গা বাছা, কেউ বলে নি। তোমার ওই চিঁড়ে-ভিজানো কথাগুলো বড় অসহ্য বলেই ঠেকল আমার কাছে,—তাই কথাগুলো বললুম। বড়বউমার কি কথা বলবার ক্ষমতা আছে ? ও যদি কথা বলতেই পারত,—তোমাদের মত আপন গণ্ডা কড়া-ক্রান্তি হিসাবে গণে নিতে পারত,—তবে আজ এই বাড়ী ছেড়ে অন্য বাড়ীতেই বা যাবে কেন ? তোমাদেরই ঝগড়ার জ্বালায় ও এ বাড়ী ছেড়ে পালাচ্ছে, তা জান ?"

সুষমা তাঁহার হাতখানা টানিয়া ধরিয়া বিনয়ের সুরে বলিলেন, "চুপ কর পিসীমা, চুপ কর। যাবার সময় মিথ্যে আর ঝগড়া-বিবাদ কোরো না।"

পিসীমা জোর করিয়া হাতখানা ছাড়াইয়া লইয়া,

মুখ ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "যাও বাছা, তোমাকে আর বুঝাতে আসতে হবে না আমায়। এত ভয়টা কিসের? আমি ওদের খাই না পরি, যে হাত যোড় করে থাকব? রাগ করে ভালই,—ঝগড়ার পথ বন্ধ,—ঘরের ভাত বেশী করে খাবে। ফিট করে পড়ে থাকে,—ঘরেই পড়ে থাকবে,—তার জন্য আমাদের মাথা ঘামাতে হবে না। এত দর্প, এত তেজ কিসের? যা রয়-সয়, তাই কি ভাল নয়? মেয়েমানষের তেজ, দর্প কোনও কালেই খাটে না,—এটা মনে রাখতে পারে না? এখন আবার এসেছেন নাকে কাঁদুনি গাইতে! ওটা ওদের বাঁধা গৎ। ডুবে-ডুবে জল খান,—লোককে জানান আমরা বড় সাধু। ওই যে কথায় বলে, কাক বলে ডালে বসে ডাকি, নীচের লোক টের পায় না—ওর হয়েছে তাই। নিজে টিপনি কেটে-কেটে এই ভাগ-ভেন্নটা করালেন,—এখন আবার ন্যাকা সাজছেন। কোন্ লজ্জায় যে এক রকম করে, তা তো আমি ভেবে পাই নে। আর এই যে সেজবউ, ইনি একটী আসল জিনিস। দিন-রাত ফিসফিস হচ্ছেই মেজ যা'র সঙ্গে। আরে আমি না জানি কি? তোরা তো সেদিনকার ছুঁড়ি সব,—কত বুদ্ধি আছে পেটে,—যে, আমার চোখে ধুলো দিতে চাস?"

সুলতা রাগে থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল। সে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেই পূর্ণিমা তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

মুখ বিকৃত করিয়া সানুনাসিক স্বরে পিসীমা বলিলেন, "ওঁরে আমার ফিট রে! সব ন্যাকামো, সব ন্যাকামো! মরে যাই আর কি! একটু রাগ হ'ল, অমনি নেতিয়ে পড়লেন। ভগবান সত্যি-সত্যি এমন একটা কঠিন রোগ দেন,—তা হলে পুজো দেই তাঁকে।"

আজ মনের সাধে পিসীমা মুখ ছুটাইয়া লইলেন। সুষমা পূর্ণিমার সাহায্যার্থ যাইতেছিলেন, এমন সময়ে নৃপেন আসিয়া পড়িল। রুদ্ধকণ্ঠে গর্জ্জিয়া বলিল "থাক বড়-বউদি, আর অতটা কষ্ট স্বীকার করে দরকার নেই তোমার। যাবার সময়টাতেও বেশ গরল উগরিয়ে গেলে।"

কুণ্ঠিত কণ্ঠে সুষমা বলিলেন "আমায় মিছে দোষ দিয়ো না ঠাকুরপো। জিজ্ঞাসা কর বরং মেজবউকে, আমি কিছু বলেছি কি না।"

নৃপেন দাসীকে ডাকিয়া পাখা ও জল আনিবার আদেশ দিয়া, সুষমার পানে ফিরিয়া বলিল, "সত্যি কথা বল দেখি বউদি, এখন আমরা তোমাদের খাচ্ছিও না, পরছিও না,—তবে আবার ওর সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করবার মানেটা কি? তুমিও যেমন স্বাধীন, এও তো তেমনি!"

নম্রভাবে সুষমা বলিলেন "তা কে অস্বীকার কচ্ছে ভাই?"

নৃপেন মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "কত যে স্বীকার করছ বউদি, তা দেখতেই পাচ্ছি। যাক, তোমাকে বলা আর নিষ্প্রয়োজন। যাও যাও, ঝগড়া-বিবাদের হাত হতে আমিও বাঁচি। পারিবারিক ঝগড়ার মত আপদ যত দূরে যায় ততই ভাল।"

সুষমা বলিলেন "আমিও তাই ভেবে যাচ্ছি ঠাকুরপো। তোমরা সুখে থাক এই ভগবানের কাছে প্রার্থনা।"

পিসীমার পানে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "গাড়ীতে ওঠো পিসীমা।"

পিসীমা বলিলেন "তুমি ওঠো বাছা। আমার অত মান-অপমান জ্ঞান নেই। পায়ে হেঁটেই সারা গাঁখানা ঘুরে আসি। আমি এখানকার মেয়ে,—তোমরা বউ,—তোমাদের সঙ্গে আমার ঢের প্রভেদ আছে।"

সুষমা গাড়ীতে উঠিতে-উঠিতে বলিলেন "তাতো জানিই পিসীমা। গাড়ীতে যথেষ্ট জায়গা আছে, এস না।"

পিসীমা বিকৃত মুখে বলিলেন "না বাছা। এই গুমট গরমে গরুর গাড়ীর মধ্যে প্যাক হয়ে আমি যেতে পারব না। বাপ রে, গাড়ীর মধ্যে কি অসহ্যি গরম, ও কি আমাদের সহ্যি হয় বাছা।"

তিনি পদব্রজে সঙ্গে-সঙ্গে চলিলেন।

পুরাতন বাড়ীটি ছোট। এটী যোগেন্দ্রের খুল্লতাতের বাড়ী ছিল। তিনি নিঃসন্তান থাকা হেতু, তাঁহার মৃত্যুর পরে যোগেন্দ্র এই বাড়ীটি পাইয়াছিলেন। ইহাতে মাত্র চারিটী কক্ষ ও একখানি রন্ধনগৃহ ছিল। একতালা, কিন্তু বড় পরিষ্কার ঝর-ঝরে।

সুষমা আগে প্রায়ই এ বাড়ীতে আসিয়া বেড়াইয়া যাইতেন। আজও সমস্ত বাড়ীটা ভাল করিয়া দেখিয়া বেড়াইলেন। তাহার পর পিসীমার কাছে আসিয়া বসিয়া বলিলেন "খাসা বাড়ীটি কিন্তু পিসীমা।"

পিসীমা তখন চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলেন। ঘণ্টা খানের জন্য বেড়াইতে আসার পক্ষে বাড়ীটি খুব ভাল বটে, বাস করার পক্ষে কোন মতেই নহে। কোথায় সেই দ্বিতলের সুসজ্জিত গৃহে বাস, আর কোথায় এই একতালা গৃহে আসা। যোগেন্দ্রের মূর্খতার কথা ভাবিয়া তিনি বিলক্ষণ রুষ্ট হইয়া উঠিতেছিলেন। কেন বাপু, নিজের বাড়ী, নিজের ঘর, সব ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিবার কি দরকারটা ছিল? এত দর্পই বা কেন? তাহারা তো বলে নাই, বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাও।

সুষমার কথা শুনিয়া তিনি ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ, বড় ভাল বাড়ী। এ বাড়ীতে কখনও আজীবন কাটান যায় বাছা?"

অথচ তিনিই এই বাড়ীতে আসিবার জন্য আর খানিক পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অদম্য উৎসাহ প্রকাশ করিতেছিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া সুষমা বলিলেন "কেন কাটান যাবে না পিসীমা?"

পিসীমা তাহার উত্তর দিতে না পারিয়া চুপ করিয়া গেলেন। সুষমা তাঁহার মনের কথা বুঝিলেন; বলিলেন, "যদিও এ বাড়ীটাতে বেশী ঘর-দোর নেই,- তাতেই বা কি এসে গেল পিসীমা? চারটে ঘর আছে,—একটাতে তুমি আর প্রতিভা থাকবে,—একটাতে আমি থাকব,—আর একটাতে ছোট-ঠাকুরপো যখন বাড়ী আসবে তখন শোবে। বাকিটায় চাকর থাকবে, আর জিনিসপত্র রাখা যাবে। এই তো বেশ কুলিয়ে গেল পিসীমা। কয়জন মানুষ আমরা—কতগুলো ঘরেরই বা দরকার।"

গলার মধ্যে অব্যক্ত একটা শব্দ করিয়া পিসীমা বলিলেন, "না পেলেই তাই বটে বাছা। 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল' বলে আমাদের দেশে একটা কথা আছে না, তোমার হয়েছে তাই। তখন তো বাছা, অতগুলো ঘরেও কুলোত না।"

সুষমা বলিলেন "থাকলে কুলায় না পিসীমা, না থাকলেই কুলিয়ে যায়। চিরকাল যে দোতলাতে তেতালাতেই বাস করতে হবে, এমন কিছু ভাগ্যি নিয়ে আসি নি তো আমরা—"

বাধা দিয়া পিসীমা রাগত ভাবে বলিলেন, "এসো নি তো কি বাছা? নিজেই তো সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে চলে এলে এ বাড়ীটাতে।"

শান্ত-কণ্ঠে সুষমা বলিলেন, "আমার কাছে এই তে ভাল লাগছে সে বাড়ীর চেয়ে। দিনের মধ্যে একশবা- সিঁড়ি ভেঙ্গে ওঠা-নাবা করতে-করতে পা যেন ভেঙে পড়ত। বাবুগিরি করা তো নয়, হাড়ভাঙ্গা খাটুনি ছি- তাতে। এ কেমন সুন্দর হবে। বাড়ীর চারিদিকে বাগান,- ইচ্ছে হল, নিজেরাও চারদণ্ড গিয়ে বেড়াতে পারব, স- দেখতে-শুনতে পারব। টাটকা তরকারী-পাতিও পাওয় যাবে'খন। এবার পিসীমা তোমার জন্যে খানিকটে জায়গায় আমি নিজের হাতে সাদা মটর আর লঙ্কাগা- দেব। বাজার হ'তে না আনলে তুমি সেই কাঁচা লঙ্ক খেতে পাও না। আর তাও সে শুকনো মত, মিষ্টি স্বাদ কিছু তাতে থাকে না। এ বেশ হবে। যখন ইচ্ছে হবে, তখনি গাছ থেকে তুলে আনব। আর মটরশুঁটি খেতে তুমি বড্ড ভালবাস পিসীমা! আমার বড্ড ইচ্ছে তোমায় আশ মিটিয়ে মটরশুঁটি খাওয়াই।"

সুষমা ভাবিয়াছিলেন, এই দুইটী প্রিয় খাদ্যের নাম শুনিলে পিসীমা নরম হইয়া যাইবেন; কারণ, মনোমত খাদ্যের নাম শুনিলে সকলেই নরম হইয়া যায়। কিন্তু পিসীমা নরম হইলেন না। তিনি হাতখানা সবেগে নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন "চুলোয় যাক তোমার মটরশুঁটি আর কাঁচা লঙ্কা। পয়সা থাকলে অভাব কিসের গা? বাঘের দুধও তোমায় আমি আধেক রাতে আনিয়ে দিতে পারি। মরণ আর কি,—মটরশুঁটি আর কাঁচা লঙ্কা খাবার জন্যে আমি থাকি এখানে?"

তিনি সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সুষমা বলিলেন "তবে তুমি মেজ-ঠাকুরপোর কাছে যাও না পিসীমা! তোমার বড় ছেলে বলে-কয়ে ঠিক করে দেবে'খন তাকে।"

পিসীমা উত্তর করিলেন, "সাতজন্ম না খেয়ে মরি বাছা, তাও আমার ভাল, আমি নীপের বাড়ীতে কখ্‌খনো যাব না। সে আমায় কি না বউয়ের কথা শুনে যা না বলবার তাই বলে গালাগালি দেয়? আমি যে না খেয়ে-দেয়ে, রাত জেগে, হাতে করে মানুষ করলুম, হতভাগা কি না সব ভুলে গেল? এ কথা কি কখনও ভুলতে পারব বড়-বউমা? যতকাল বাঁচব, ততকাল বুকে আঁকা থাকবে আমার। তার বাড়ীতে, তার কাছে, তার ভাত খেয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরণ ভাল,—বনবাসে গিয়ে একলা বাস

করি তাও ভাল। না বাছা, এমন কথা যেন যোগেশকে বল না যে, আমি সেই বাড়ীতেই ফিরে যেতে চাই। একে সে মাথা-পাগলা লোক, তাতে তার মনটা ভেঙ্গে রয়েছে। এখন যদি একটু কোনও রকমে শুনতে পায়, আমি তার এখানে থাকতে চাই নে, তা'হলে জোর করে আমায় সেখানে পাঠিয়ে দেবে।"

তাঁহার ব্যস্ত ভাব দেখিয়া সুষমা হাসিলেন "না পিসীমা, এ কথা বলব কেন? সব কথা পুরুষদের কাণে কি তুলতে আছে? যেটা আমাদের মধ্যেই মিটমাট হয়ে যায়, তার মধ্যে আবার ওদের ডাকতে যাব কেন?"

পিসীমা অত্যন্ত প্রীতা হইয়া, এখন একবার বাড়ীখানা ভাল করিয়া দেখিবার জন্য উঠিলেন। তিনি এই গুণের জন্যই সুষমাকে বড় ভালবাসিতেন। বাস্তবিক এইটী স্ত্রীলোকের একটী মহৎ গুণ। আপনাদের মধ্যে যে সব কথাবার্ত্তা হয়, তাহা অনেকে পুরুষের কাণে তুলিয়া দিতে বড় ভালবাসেন। ইহাতে সময় সময় সংসারে অনর্থক বড় বিবাদ বিসম্বাদ আসিয়া উপস্থিত হয়। সুষমা এ নীতির বিরুদ্ধ-বাদিনী ছিলেন। তিনি কোনও কথা কখনও কাহারও নিকট বলিতেন না। শৈলেনও কখনও সংসারের কোনও কথা তাঁহার নিকট হইতে শুনিতে পায় নাই, এজন্য শৈলেন ভারি আনন্দিত ছিল। অন্য বউয়েরা—সংসারে যেখানে যাহা ঘটিত সকল কথাই স্বামীর নিকটে বলিত। সুষমা কাহারও কোনও দোষ দেখিলে নিজে তাহা সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতেন; স্বামীর কাণে কোনও কথা তুলিয়া তাঁহার কাণ ভারি করিয়া দিতেন না।

(১৯)

শৈলেন দিন দুই নূতন বাড়ীতে থাকিয়া সব বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া দিয়া, কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যেমন তেমন করিয়া একজামিন দিয়া পাঠ্য জীবনটা কাটাইয়া দিতে পারিলেই সে এখন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়া যায়।

সেদিন রবিবার ছিল,—অমিয়ের আজ স্কুল ছিল না। তখন বেলা বোধ হয় দশটা হইবে, শৈলেনের গৃহে শৈলেন অমিয়কে পড়াইতেছিল। যোগেন্দ্র প্রাতে কোথায় বাহির হইয়াছিলেন। পাচিকা ঠাকুরাণী রন্ধন-গৃহে মহা ব্যস্ত,—কারণ, সুষমা নিকটে বসিয়া নূতন প্রণালীতে মোচার ঘণ্ট রন্ধন করিতে শিখাইয়া দিতেছিলেন। পিসীমা নিজের রন্ধন লইয়া বিব্রত এবং প্রতিভা তাঁহার মশলা পিষিয়া দিতেছিল।

মোচার ঘণ্ট শেষ হইয়া গেলে, সুষমা সে গৃহ ত্যাগ করিয়া পিসীমার গৃহদ্বারে আসিয়া উঁকি দিলেন, "পিসীমার রান্না হল কি?"

পিসীমা ঝালের ঝোলে কাঁচা লঙ্কা ভাঙ্গিয়া ফোড়ন দিয়া তখন হাঁচিতে ব্যস্ত ছিলেন। খুব গোটাকত সজোরে হাঁচিয়া, অঞ্চলে মুখ-চোখ মুছিতে-মুছিতে রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "এই হল আর কি। চড়চড়িটে হলেই সব শেষ হয়ে যায়। গরমও অসহ্যি পড়েছে বাছা, ঘেমে নেয়ে মলুম। পোড়ারমুখো দেবতা নিত্যি মেঘ করছে, জলও হবে না, কিছুই না। যেমনটী মেঘ করবে, অমনি বাতাস হয়ে সব উড়ে যাবে। খুব জলটা আসে—আঃ!"

খুন্তিটা দিয়া তিনি সজোরে তরকারী নাড়িতে লাগিলেন। সুষমা শৈলেনের গৃহে গিয়া দেখিলেন "অমিয় তখন মহা উৎসাহের সহিত পড়িতেছে "দে গ্রু ইন বিউটি সাইড বাই সাইড, দে ফিলড্ ওয়ান হোম উইথ্ গ্লি"। মাতাকে দেখিয়াই সে মহা-আনন্দে বলিয়া উঠিল "শোন মা, পদ্যটা একবার শোন। ছোটকাকা বলছে আমি যদি পদ্যটা মুখস্থ বলতে পারি বিকেলের মধ্যে, তাহলে ছোটকাকা আমায় ওই সোণার ব্রোচটা প্রাইজ দেবে। না ছোটকাকা?"

শৈলেনের মুখটা আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে বলিল "তা তো দেব। কিন্তু এই চারটে লাইনই এখনো মুখস্থ করতে পারলিনে, এখনো এতগুলো বাকি। বিকেলের মধ্যে যে কয় লাইন হবে, আমি তাই ভাবছি কেবল।"

ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া অমিয় বলিল "তুমি তো চারটে প্যারা মুখস্থ করতে দেছ, সবটা তো দাও নি।"

শৈলেন বলিল "আচ্ছা রাখ ওটা, আর একটা পৈটি নে দেখি। এই 'জোন্স হাউয়ার্ড পাইনের' সুইট হোম নে। এটা ভারি সুন্দর কিন্তু। আমি যে এত বড় হয়েছি, তেইশ চব্বিশ বছর বয়েস হল আমার, তবু আজও ইচ্ছে হয়, তোদের মত গলা ছেড়ে একবার চেঁচিয়ে বলে উঠি

হোম—হোম, সুইট—সুইট হোম!
দেয়ার'স্ নো প্লেস লাইক হোম।
দেয়ার'স্ নো প্লেস লাইক হোম।

বলিতে বলিতে সে এতদূর উৎসাহিত হইয়া উঠিল যে, সুরই ধরিয়া দিল "দেয়ার'স্ নো প্লেস-লাইক হোম।"

সুষমা হাসিয়া বলিলেন "তুমিই যে মিঃ পাইন হয়ে গেলে ঠাকুরপো। অতটা ভাব ভাল নয়।"

সুর থামাইয়া শৈলেন বলিল "ভাল নয়, বল কি বউদি? আচ্ছা, তুমিও তো ইংরাজি জানো, আমার তো মনে হয় এসব তুমিও পড়েছ।"

সুষমা হাসিমুখে শশব্যস্ত ভাবে বলিলেন "মাপ কর ভাই, আমি ইংরাজি জানিই নে, ও-সব জানব কি করে?"

শৈলেন মাথা নাড়িয়া বলিল, "ও-সব কথা বলো বড়দার কাছে। তোমার কথার মধ্যে এমন এক-একটা ভাব ফুটে ওঠে, যেটা খাঁটি ইংরাজিরই ট্র্যানশ্লেট করা মাত্র। বাংলায় সে রকম ভাব খুঁজেই পাওয়া যাবে না।"

সুষমা বলিলেন "ঢের জোটে। আজকাল একরকম ইংরাজি-বাংলা তৈরি হয়েছে, যা ছেলে-মেয়ে সবাই ব্যবহার করছে—যেটা বাংলায় শুনতে বিসদৃশ বলেই ঠেকে, অথচ ইংরাজিতে ঠিক মানিয়ে যায়। আমি যদি সেইগুলোই শিখে ব্যবহার করি—"

শৈলেন জেদের সহিত বলিল, "উহু, তা কখ্খনো হতে পারে না। বউদি, তুমি যে পুরাণে বর্ণিতা গান্ধারীর মতই চলছ, এতে আমি তোমায় নিন্দে করতে পারি নে। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন বলে গান্ধারী স্বেচ্ছায় অন্ধতা বরণ করে নিয়েছিলেন। দাদা ইংরাজি জানেন না বলে তুমি ইংরাজী শিখেও প্রাণপণে সেটাকে এড়িয়ে চলেছ। এতে লজ্জা করবার কারণ কি বউদি? তুমি তোমার কর্ত্তব্য পালন করে যাচ্ছ, আমাদের সে কথা বলে গর্ব্ব প্রকাশ করবার পথ কেন বন্ধ করছ?"

সুষমা একটু হাসিয়া বলিলেন, "সে যে আমার পূর্ব্ব জীবনের শিক্ষা ভাই। আমার নূতন জীবন গ্রহণ করেছি সেই দিন, যে দিন আমার বিয়ে হয়েছে। তোমরা আমায় যেমন পেয়েছ, তেমন ব্যবহার কর আমার সঙ্গে। আমি যে শিক্ষিতা ছিলুম, সে ধারণা আমি বিসর্জ্জন দিয়েছি। তোমাদেরও সে কথা বলে গর্ব্ব করতে দেব না। এখন আমি যা, এই তোমাদের।"

শৈলেন স্তব্ধভাবে খানিক সুষমার জ্যোতির্ম্ময় মুখখানার পানে চাহিয়া রহিল; তাহার পর বলিল, "বেশ, তাই ভাল। কিন্তু বউদি, ছেলেটাকে যদি বাড়ীতে পড়াও একটু, তা হলে কাজ হয়। মায়ের কাছে সন্তানের শিক্ষা যেমন সর্ব্বাঙ্গীন হয়, স্কুলে কি প্রাইভেট টিউটরের কাছে সে রকম হতে পারে না। তারা ঘণ্টা হিসাবে টাকা নিয়ে পড়াবে—উন্নতি অবনতি কিছুই দেখবে না।"

সুষমা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আর আমার দ্বারা কিছু হবে না ভাই। আমি তো বলিছিই, আমার শিক্ষা আমি বিসর্জ্জন দিয়েছি। সত্যি, মেয়েদের এটা কি লজ্জার কথা নয়, পূজ্যপাদ স্বামী থাকবেন অশিক্ষিত, আর আমরা উঠব তাঁদের ছাড়িয়ে? উন্নতি যদি হতে হয়, দুজনেরই হওয়া উচিত। আমি এই বুঝি ভাই, দু জনে সমান ভাবে যেন দুজনকে পায়,—মাঝখানে কিছুর আড়াল যেন না থাকে। যদি না হয়, এক সঙ্গে দুজনেরই নিরক্ষর হওয়া উচিত। আমায় অশিক্ষিতা ভেবে তোমার দাদা যেমন অকুণ্ঠিত ভাবে তাঁর মনের কথা আমার কাছে ব্যক্ত করেন, যদি আমায় শিক্ষিতা বলে জানতেন, তা হলে কি কোনও কথা আমার কাছে বলতেন? নিজের দীনতা কি প্রতি পদে তাঁকে আহত করত না?"

গভীর শ্রদ্ধায় শৈলেনের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে নীরবে বইয়ের পাতা উল্টাইয়া যাইতে লাগিল। অমিয় কোন্ পৈটি্টা মুখস্থ করিয়া পাথর-বসানো সোণার ব্রোচটা আদায় করিবে, তাহা ভাবিয়া না পাইয়া, ভারী অস্থির হইয়া পড়িতেছিল। সুষমা তাহার অস্থিরতার পানে লক্ষ্য করিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "তা বলে দাও এখন ঠিক করে ওকে কোন্‌টা পড়বে। তোমার ব্রোচটা তবে ঠিকই ওকে দেবে ঠাকুর-পো?"

শৈলেন মুখ তুলিয়া বলিল, "দেব বই কি। ওই সুইট হোম-টা মুখস্থ কর। বউদি আমি তাহলে কাল সকালেই যেতে চাই কলকাতায়।"

সুষমা বলিলেন, "তোমার একজামিন কবে?"

শৈলেন বলিল, "আর পাঁচটা দিন মাত্র আছে। ভেবেছি বউদি, একজামিন দেওয়া শেষ হলে, একবার মাস-দুইয়েকের মত দেশ-ভ্রমণে বেরুব। দেশগুলো দেখবার ভারি ইচ্ছে হয়েছে, আর দেখাও তো কর্ত্তব্য, কি বল বউদি? ভারতের ছেলে হয়ে ভারতকে দেখলুম না, চিনলুম না,—এ একটা কত বড় কলঙ্ক বল দেখি। শুধু বইয়ের দ্বারা পরিচিত

হয়ে লাভ কি ? আর তোমাদের জন্যে একটা ভাবনা ছিল, এবার সেটা মিটে গেল,—আর ভাবনা নেই। নিশ্চিন্ত হয়ে কিছুদিন এখন বেড়ানো যাক।"

অমিয় লাফাইয়া উঠিল,"আমি যাব ছোট কাকা! সেবার প্রভাতেরা পুরী গেছল,—এসে সমুদ্রের কত গল্প করলে। সেখানে না কি কেমন সাদা ঢেউ আসে,আবার মাথারও ওপর দিয়ে চলে যায়। সমুদ্রের বুকের ওপরে কেমন রাঙ্গা হয়ে সূর্য্য ওঠে, আবার কেমন ডুবে যায়। আমি সত্যি তোমার সঙ্গে যাব ছোটকাকা, তুমি পুরীতেও যাবে তো ?"

শৈলেন তাহাকে থামাইবার জন্য বলিল, "হ্যাঁরে হ্যাঁ, যখন যাবো তখন তোকে নিয়ে যাব। সে এখনও অনেক দেরী আছে। এখন মন দিয়ে লেখা পড়া কর ত। আমি দু দিন পরে পরে তোকে পত্র দেব। ঠিক সময়ে তার উত্তর দেওয়া চাই-ই। নইলে দেশ বেড়াতে যাবার সময় কখ্‌খনও তোকে সঙ্গে নিয়ে যাব না।"

অমিয় লক্ষ্মী ছেলেটীর মত বইখানা কোলের উপর তুলিয়া লইয়া গড় গড় করিয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল।

সুষমা বলিলেন,"দেশ বেড়াতে যাবে, সে ত ভাল কথাই। তোমার বড়দাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যেয়ো ঠাকুর পো। দিন-কত নানা দেশ বেড়ালে, আর হাওয়াটা বদলে এলে, ওঁর মনটাও একটু ভাল হতে পারে, শরীরটাও ভাল হতে পারে। মানুষটির কি চেহারা হয়ে গেছে, দেখেছ একবার ?"

শৈলেন মুহূর্ত্ত মধ্যে গম্ভীর হইয়া পড়িল। উদ্বেগের সুরে বলিল, "তা তো দেখছি বড়বউদি। আচ্ছা, জ্বর-টর হয় না তো ? এক-একবার টেম্পারেচারটা নিতে পারলে কিন্তু খুবই ভাল হয়। ঘরে থার্ম্মোমিটার নেই কি ?"

সুষমা শুষ্কমুখে বলিলেন,"তাতো আছে। কাল সন্ধ্যাবেলা বললুম একবার থার্ম্মোমিটারটা দি ; তাতে এমন করে হাসতে লাগলেন যে, আমি একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে গেলুম, আর যে কোনও কথা বলব, সে পথ রইল না। আস্তে-আস্তে তাঁর সামনে হতে পালিয়ে বাঁচি তখন !"

শৈলেন মাথা নাড়িয়া বলিল, "উঁহু, ও অপ্রস্তুত হবার কাজ নয়,—ওখানে দিব্য সপ্রতিভ হওয়া চাই। তিনি যেমন হো হো করে হেসে উঠলেন, তেমনি তোমারও হি হি করে হাসা উচিত ছিল,—যাতে তাঁর গম্ভীর হাসিটা তোমার কনকনে হাসির তলায় পড়ে চাপা পড়ে যায়। তবেই কাজটা হতে পারত বটে,—তিনিও আর হাসতে সাহস করতেন না।"

সুষমা একটু হাসিয়া বলিলেন, "সে ভাই পার তুমি, আমার ক্ষমতায় তা কুলোবে না। তাঁর সেই বিষাদ-ভরা হাসি শুনে আমার মনে হল, ও হাসি নয়, কান্নারই একটা রূপান্তর মাত্র। বুকের মধ্যে যে কান্নার ঢেউটা অবিরত গড়িয়ে-গড়িয়ে বেড়াচ্ছে, সেইটেকেই তিনি হাসির আকারে পরিবর্ত্তিত করে খানিকটে বার করে ফেললেন। সত্যি ভাই ঠাকুর-পো, এই কথাটা মনে করতেই আমার চোখ ফেটে আপনিই জল বেড়িয়ে পড়ল,—আমি তাই তাড়াতাড়ি সরে পড়লুম।"

সুষমার চোখ ছলছল' করিয়া উঠিল। শৈলেন সে মুখের পানে চাহিয়া, কি বলিবে তাহা ভাবিয়া ঠিক পাইল না। নীরবে কেবল মাথা চুলকাইতে লাগিল। একটু পরে সে বলিল, "আজ আমি তাঁর টেম্পারেচার নেব'খন বউদি। আমি যখন আছি, তখন কোনও ভয় করো না। আমার জীবন একদিকে, দাদা একদিকে। আমি একজামিনটা দিয়ে এসেই দাদাকে নিয়ে বেরুব। দিন-কত ওয়াল্‌টেয়ারে থাকলেই বড়দা আবার স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরে পাবেন। তোমরা এ-বাড়ীতে থাকতে পারবে তো, ভয় করবে না ?"

সুষমার বিষণ্ণ মুখখানা আবার কৃত্রিম হাসিতে ভরিয়া উঠিল ; তিনি বলিলেন, "ভয়টা কিসের ঠাকুর-পো ? আমি, পিসিমা, অমিয় তিনজনে বেশ থাকব। বামুনঠাকরুণ, তিনটে চাকর, দুটো ঝি, এতগুলো লোক থাকতে আবার ভয় !" প্রতিভার নাম তো সে মুখে ফুটিল না ; কিন্তু সে কথা শৈলেন জিজ্ঞাসাও করিতে পারিল না। সে প্রাণপণে প্রতিভাকে দূরে রাখিয়া চলিয়াছে ; কারণ, সে যথার্থই নিজকে ভয় করে। প্রতিভার মনের ভাব বুঝি সে একটু জানিতে পারিয়াছিল, তাই তাহার এত সাবধানতা।

তাহার মনের কথা অমিয় ব্যক্ত করিয়া দিল। সে পুরী যাইবার চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল ; তাই কাণ উঁচু করিয়া কথা শুনিতেছিল ; মুখেও বিড়বিড় করিয়া পড়া মুখস্থ করিতেছিল। সে বলিয়া উঠিল "বাঃ, মাসীমা থাকবে না বুঝি ?"

সুষমা আড় ভাবে তাকাইয়া দেখিলেন, শৈলেনের মুখ-

খানা হঠাৎ আরক্ত হইয়া আবার স্বাভাবিক হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "মাসিমা কি তোদের এখানে চিরকাল বাস করবে বলে এসেছে না কি? তার কি আর জায়গা নেই যাবার? পরের বাড়ী চিরকালই যে কাটাতে হবে, তার এমন কোনও কথা নেই, —কি বল ঠাকুরপো।"

শৈলেন অনর্থক ঘামিয়া উঠিয়াছিল; বলিল "তা তো ঠিক কথাই বড়বউদি। কিন্তু কোথা যাবে সে?"

সুষমা অবহেলার ভাব দেখাইয়া বলিলেন, "কি জানি, কোথা যাবে। আমায় তো সে কোন কথাই বলতে রাজি নয়,—কেবল বলছে সে আর এখানে থাকবে না। তার ভাসুর আছে ব্যারাকপুরে, সেখানে যেতে চায়।"

অমিয় হাততালি দিয়া বলিয়া উঠিল, "হোঃ, হোঃ. এই তো ব্যারাকপুর,—আমাদের নৈহাটী হ'তে তো বেশী দূরে নয়। যখনই ইচ্ছে হবে, তখনই মাসীমার কাছে যাব। আচ্ছা মা, ক' পয়সা ভাড়া দিলে ব্যারাকপুরে যাওয়া যায়?"

সুষমা গম্ভীর মুখে বলিলেন, "যে কয় পয়সাই হোক না কেন, তা বলে তুই যাবি না কি? সে জায়গা তোর মাসীমারই আপন,—তোর কি? তারা কি তোকে আদর করবে, না যত্ন করবে? দেখ দেখি ঠাকুরপো, ছেলের অন্যায় আব্দার দেখ একবার।"

অমিয় সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "হুঁ, আমি কি যেতে চাচ্ছি না কি? একটু বললুম বলেই মা অমনি বকলে।"

শৈলেন নীরবে বইখানা নাড়িতে লাগিল। সুষমা বলিলেন, "যাক ভাই, যার যেখানে ইচ্ছে হয়, সেইখানেই চলে যাক। তুমি ভাই, শিগ্‌গীর ক'রে বিয়েটা ক'রে বউ এনে দাও, তা হলেই হল। পিসীমার কাজগুলো তো ছুটো বউ-ই করে দিতে পারবে।"

শৈলেন নিবিষ্ট ভাবে বই পড়িতে-পড়িতে বলিল, "দেখা যাক।"

বাহিরে যোগেন্দ্রের কণ্ঠ-স্বর শুনিবামাত্র সুষমা তাড়াতাড়ি গৃহ ত্যাগ করিতেছিলেন; কিন্তু যোগেন্দ্র নিজেই দ্রুতপদে সেই গৃহে আসিয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখ-চোখ তখন লাল হইয়া উঠিয়াছে,—ঘামে গায়ের সার্টটা ভিজিয়া গেছে,—মাথা দিয়া ঘামের ধারা মুখ বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। প্রবেশ করিয়াই তিনি ডাকিলেন "শৈলেন!"

শৈলেন ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, "দাদা!"

যোগেন্দ্র পার্শ্বস্থ তক্তপোষের উপর বসিয়া পড়িয়া শ্রান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "উঠতে হবে না, বস। বড় বউ, তুমি যেয়ো না, দাঁড়াও,—কথা আছে।"

গায়ের সার্টটা খুলিয়া তিনি পার্শ্বে রাখিলেন। শৈলেন নিজের গামছাখানা তাঁহার হাতে দিল। তিনি সেখানা পার্শ্বে রাখিয়া বলিলেন "থাক্, একেবারে গা মুছব'খন। একটা কথা শুনে এলুম, এমন ভয়ানক যে—"

শৈলেন বলিল, "একটু শান্ত হয়েই না হয় বলো। অমিয়, অভয়কে বলগে যা, দাদাকে তামাক দিয়ে যেতে। বড়বউদি, এই পাখাখানা—"

বলিতে না বলিতেই সুষমা অর্দ্ধাবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়া পাখাখানা দেখিতে পাইয়া, টানিয়া লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। যোগেন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, "তামাকের এখন দরকার নেই, আমি যা বলতে এসেছি সেটা বলে নেই।"

ততক্ষণে অমিয় দৃষ্টির বাহিরে গিয়াছে।

যোগেন্দ্র শৈলেনের পানে চাহিয়া বলিলেন, "আজকে একটা কথা শুনলুম শৈলেন, যে, প্রথমটা আমার কিছুতেই বিশ্বাস হল না। আমাদের উপেন রায়কে তো চেন? সে বললে, নৃপেন না কি মেজ-বউমার নামে আলাদা একটা ব্যবসা খুলেছে, —এটাতে প্রায় তিন লাখ টাকা খাটছে। যেদিন আমাদের বিষয় সম্পত্তি ভাগ হয়ে গেল, সেই দিনই বিকেলে নৃপেন কল্‌কাতায় গেছল, ফিরতে তার সাত আট দিন দেরী হয়েছিল। শুনলুম, সে কলকাতায় গিয়ে দিল্লী, এলাহাবাদ, আর বম্বের আড়ত হ'তে সব শুদ্ধ এক লাখ টাকা এনে, মেজ-বউমার নামে যে আড়ত হয়েছে, তাতে লাগিয়েছে। আমাদের আড়ত সব খালি, দু চার দিনে একেবারে ফেল পড়ে যাবে, তার আড়ত পূরো দমে চল্‌ছে।"

উত্তেজিত হইয়া শৈলেন বলিয়া উঠিল "উঃ, মেজদার মাথায় এত বদমায়েসী বুদ্ধি খেলছে, তা তো জানি নে।"

যোগেন্দ্র হতাশ ভাবে বলিলেন "তা আর জানবি কি তুই? ব্যবসা-বাণিজ্য সবই আমি তার হাতে তুলে দিছলুম। ভাই যে ভাইয়ের এমন শত্রুতা করবে, তা তো জানি নে; কাজেই আজ কয়েক বছর ওদিকে তাকাই নি। এখন—কাল সকালের মেলেই আমায় রওনা হ'তে

হবে। দেখতে হবে; কোথায় কি ভাবে কাজ করেছে সে। উঃ, আমার ইচ্ছে হচ্ছে যে, আমি এখনই আত্ম হত্যা করে মরি। ভাইয়ের এ শক্রতার কথা আমি বলি কারে ?"

শৈলেন তাড়াতাড়ি গায়ের জামাটা লইয়া বাহির হইতেছিল,—সুষমা পাখা ফেলিয়া তাহার হাত ধরিলেন, "কোথা যাচ্ছ তুমি ?"

শৈলেন রুক্ষ কণ্ঠে বলিল, "মেজদার কাছে।"

সুষমা বলিলেন, "আর সেখানে গিয়ে কি ফল হবে ভাই, অনর্থক একটা ঝগড়া করা বৈ ত নয়।"

শৈলেন উত্তেজিত ভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইল, "কি বলছ বউদি ? সব রকমে শক্রতা করবে,—আর আমরা নীরবে সব সহ্য করে যাব,—একটা প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করব না ? আমাদের সব কেড়ে নিয়ে পথের ভিখারী করবে, আমরা নীরবে সেই বেশ গ্রহণ করব ? আমি রীতিমত আমাদের ন্যায্য জিনিস আদায় করব, তবে ছাড়ব। আমায় সে নিরীহ বড়দা পায় নি, যে, এই কথা শুনেও চুপ করে বাড়ী ফিরে আসব। হাত ছেড়ে দাও বউদি,—আজ যা হয় একটা হবে।"

যোগেন্দ্র বলিলেন, "তুমি কি ভাবছ আমার মাথা তখন প্রকৃতিস্থ ছিল শৈলেন ? আমি তখনি ছুটে যাচ্ছিলুম তার কাছে।"

শৈলেন তেমনি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "কি বলতে তুমি ?"

যোগেন্দ্র বলিলেন "জিজ্ঞাসা করতুম, সে কেন আমার এ সর্ব্বনাশ করলে ? আমারই জিনিস আমাকেই কেন সে ঠকিয়ে নিলে ? আমি তার কি করেছি, যার জন্যে সে আমায় পথের ভিখারী করলে ?"

"এই শুধু, আর কিছু নয় ?" শৈলেন দাঁতের উপর দাঁত রাখিয়া এই কয়েকটা কথা বলিল।

যোগেন্দ্র বলিলেন "তুমি হলে আর কি করতে, বল ভাই ?"

শৈলেন বলিয়া উঠিল "তার গলাটা টিপে ধরে, মেরে—"

বাধা দিয়া যোগেন্দ্র শিহরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "অমন কথা মুখে এন না শৈলেন। সে যাই করুক, সে আমাদের ভাই। একই মায়ের বুকের রক্ত দুধ হয়ে এই মুখগুলোতে পড়েছে,—একই মা আমাদের চারটী ভাইকে সেই স্নেহময় বুকে চেপে ধরে চুমো খেয়েছেন। আমরা চারটী ভাইয়ে পাশাপাশি ঘুমিয়ে পড়তুম,- একই মা সারারাত আমাদের জন্যে শান্তি পেতেন না; ঘুমিয়ে তাঁর বিশ্রাম ছিল না; সব কটির মুখের পানে বিনিদ্র চোখে চেয়ে থাকতেন। সে যথাসর্ব্বস্ব প্রবঞ্চনা করে নেছে, তবু আমাদের মুখ ফুটে কিছু বলবার যো নেই, কারণ তার গোড়ায় বাধা— সে আমাদের ভাই।"

শৈলেন স্তব্ধ হইয়া এই উদার, মহান জ্যেষ্ঠ সহোদরের পানে চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "কিছুই বলবে না মেজদাদাকে তবে ?"

যোগেন্দ্র বলিলেন "বলব। এখনই যে না গেছি, ভালই হয়েছে। রাগের মাথায় কি বলে বসতুম, ঠিক কি তার ? উপেন বাবু ভাগ্যক্রমে আমায় ধরেছিলেন, তাই রক্ষা। বিকেলে গিয়ে যা হয় তাই বলা যাবে। এটা ঠিক, এখন সে আমাদের কোনও কথা কাণে তুলবে না; সে এখন জয়ী হয়েছে, আমরাই পরাজিত হয়েছি শৈলেন।"

অনেক কষ্টে আত্ম-সংবরণ করিয়া শৈলেন বলিল, "তোমার যাবার দরকার কি বড়দা, আমিই যাব। মেজদা এখন অন্ধ হয়েছে; হয় তো কি কথা বলে বসবে, তোমাকেই বা খুব বেশী রকম আহত করে যাবে। আমায় অনুমতি দাও, আমি গিয়ে যা হয় তাই বলব।"

যোগেন্দ্র শৈলেনের মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিলেন, "তুই গিয়ে একটা ঝগড়া বাধিয়ে বসবি, আর কি করবি।"

ক্রুদ্ধ হইয়া শৈলেন বলিল, "বাধে বাধবে ঝগড়া, তাতে এত ভয়টা কি তোমার ?"

যোগেন্দ্র একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ভয় ? ভয় অনেক আছে ভাই। পাছে আমাদের ঘরের ছোট-খাট কথাগুলোও বাইরে যায়, গ্রামের মেয়ে-পুরুষদের গল্পের একটা জিনিস হয়ে ওঠে,—আমি কেবল সেই ভয়ই করি। যখন পৃথক হ'বার কথা হয়, কেন যে আমি তখন একটা কথাও বলি নি, সবই নৃপেনের বিবেচনার পরে নির্ভর করলুম, তা কি তুই বুঝতে পারবি শৈলেন ? পাছে বাধা পেয়ে নৃপেন রমেন আরও দুর্দ্ধর্ষ হয়ে ওঠে, পাছে আমাদের ঘরের কথা বাইরে যায়, তাই ভেবে আমি বসে

রইলুম ঠিক পুতুলের মতই। বুঝতে পারছিস্ শৈলেন, কেন আমি ঝগড়াকে ভয় করি, কেন এড়িয়ে যেতে চাই ?"

শৈলেন অবহেলার ভাবে বলিল "ভারি তো বাকি আছে ঘরের কথা বাইরে যেতে,—তাই এত সাবধান হ'চ্ছ ? এদিকে সারা গ্রামখানা জুড়ে যে আমাদেরই কথা চলছে, তা কিছু জানছ ? যেমন তুমি, তেমনি বৌদি। ভয়েই গেলে সব,—অথচ কিসের এত ভয়, তা জানি নে। এই ভয়েই তো তোমাদের সর্ব্বনাশ হ'ল।"

কথাটা শেষ করিয়া গোঁ-ভরে সে বাহির হইয়া গেল। যোগেন্দ্র স্ত্রীর পানে চাহিয়া বলিলেন "নাও, আবার একখানা কাণ্ড বুঝি বাধিয়ে বসে। আমার চেয়ে ও তোমাকে মেনে চলে বড়বউ, যদি তুমি পার ওকে কোন রকমে বুঝিয়ে রাখতে। একটু চেষ্টা করে দেখ দেখি, আমায় আর বাতাস দিতে হ'বে না।"

জামাটা হাতে লইয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ-প্রসঙ্গ

জ্বরের কথা

ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্, এম্, এস্

"জ্বরের" কথা উঠিলেই, স্বতঃই জ্বর মাপিবার থার্ম্মোমিটারের কথা মনে উদয় হয়। আর অনেকে সেই থার্ম্মোমিটার নামক তাপমান যন্ত্রের গোড়ার কথাগুলিই জানেন না বলিয়া, এই প্রসঙ্গে তাহার সম্বন্ধে দু'চারটি কথা প্রথমেই বলিব। এদেশে যত রকমের থার্ম্মোমিটার ব্যবহৃত হয়, সে সবগুলিই ফারেনহীট্ মাপের অনুযায়ী (Farnheit scale) প্রস্তুত—সেন্টিগ্রেড্, রোমার প্রভৃতির মাপের ব্যবহার এদেশে নাই। সাধারণতঃ, প্রচলিত সকল থার্ম্মোমিটারে, সব চেয়ে কম তাপ ৯৫° এবং সব চেয়ে বেশী তাপ ১১০°, এই পর্য্যন্ত দেওয়া থাকে। ৯৫° হইতে ১১০° এই ষোলটি বড় দাগ বা ডিগ্রি মার্কা থাকে, প্রত্যেক দুইটির ডিগ্রি মাঝে ছোট ছোট চারিটি দাগ থাকে; সেই প্রত্যেক ছোট দাগকে ·২ (পয়েন্ট দুই বা দুই-দশমিক) বলিয়া পড়িতে হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ৯৫° হইতে ৯৬°, এই দুই বড় দাগের পাঠগুলি যথাক্রমে—৯৫° (পঁচানব্বুই ডিগ্রি), ৯৫·২ (পঁচানব্বুই পয়েন্ট দুই), ৯৫·৪ (পঁচানব্বুই পয়েন্ট চার), ৯৫·৬ (পঁচানব্বুই পয়েন্ট ছয়), ৯৫·৮ (পঁচানব্বুই পয়েন্ট আট), ৯৬° (ছিয়ানব্বুই ডিগ্রি)। অপরাপর দাগও এই ভাবে পড়িতে হয়।

বাজারে যত রকমের থার্ম্মোমিটার পাওয়া যায়, তাহাদের আকার প্রকার ভেদ ব্যতীত ও কেহ বা "আধ-মিনিট", কেহ "এক-মিনিট" কেহ "দুই-মিনিট" বলিয়া লেখা থাকে; বাকী থার্ম্মোমিটারে কিছুই লেখা থাকে না। যেগুলিতে কিছুই লেখা থাকে না, সেগুলি সাধারণতঃ "পাঁচ মিনিটের" এই বলিয়া খ্যাত। রোগী নিতান্ত শিশু বা চঞ্চল না হইলে, "আধ" মিনিটের থার্ম্মোমিটারকে ২ মিনিট, ১ ও ২ মিনিটের থার্ম্মোমিটারকে ৩ মিনিট এবং বাকী থার্ম্মোমিটারকে গড়ে পাঁচ মিনিট রাখা উচিত। ডাঃ রবার্টের মতে, প্রত্যেক থার্ম্মোমিটারকে অন্যূন এগার মিনিটকাল বগলে রাখা উচিত। থার্ম্মোমিটারকে বেশীক্ষণ রাখিলে যে উত্তাপ বেশী উঠিবেই, এমন কথা নাই; সামান্য দু চার পয়েন্টের তফাৎ হয় মাত্র। এমন অবস্থায়, মোটামুটি যেমন বলিলাম, ঐভাবে থার্ম্মোমিটার রাখিলেই, কায চলিয়া যায়; জ্বর দেখিবার সময়ে, অত চুল-চেরা বিচারের প্রয়োজন হয় না। কতকগুলি থার্ম্মোমিটার "ম্যাগ্নিফায়িং" বা লেন্স-ফ্রন্ট (Lens-front); অর্থাৎ, তাহাদের লেখাগুলি বড় দেখায়; অপরগুলি non-magnifying (নন-ম্যাগ্নিফায়িং বা সাধারণ)। কোন্ মেকারের বা দোকানদারের থার্ম্মোমিটার "ভাল",—এ সম্বন্ধেও আমরা প্রায়ই জিজ্ঞাসিত হই। বিলাতের Kew Observatory Certificate (কিউ-মানমন্দিরের চাপরাস্) যে যে থার্ম্মোমিটারের সঙ্গে থাকে, একমাত্র সেইগুলিই প্রামাণ্য। এই সার্টিফিকেট যে থার্ম্মোমিটারের সঙ্গে নাই, সেই থার্ম্মোমিটার "বাজে মার্কা"। কিন্তু সাধারণ জ্বর পরীক্ষার্থে, অত চুলচেরা বা নিখুঁতভাবে উত্তাপ পরীক্ষা করিবার কোনও প্রয়োজন হয় না বলিয়া, যে কোনও থার্ম্মোমিটার ব্যবহার করা চলে—তা' সে হিক্সেরই হউক, আর রাম-শ্যামেরই হউক—বিলাতিই হউক, আর জাপানীই হউক। ক্রয়কালীন, এইটুকু কেবল দেখা চাই যে, ক্রীত থার্ম্মোমিটার দুই তিন জন ভদ্রলোকের বগলে দিলে, তাহার পর ৯৬°০৪ হইতে ৯৮° এর মধ্যে যে কোনও উত্তাপের মাপ দেখায় এরূপ হইলেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, সে থার্ম্মোমিটার বিশ্বাস্য।

জ্বর পরীক্ষা করিতে হইলে, থার্ম্মোমিটারের পারদকে ৯৫° পর্য্যন্ত নামাইয়া দিতে হয়। এদেশে রোগীর "বগলে" থার্ম্মোমিটার দেওয়ার বিধি। অন্যত্র, "জিহ্বার" নিচে থার্ম্মোমিটার দেওয়া হয়। বগলে থার্ম্মোমিটার দিতে হইলে, বগলটিকে বেশ করিয়া মুছিয়া, তবে থার্ম্মোমিটার লাগাইতে হয়। থার্ম্মোমিটার লাগান কালীন, বাহুটীকে চাপিয়া ধরিয়া থাকা ভাল, যেন বগলে কোথাও ফাঁক না থাকে। ঐ সময়ে, রোগীর গায়ে ঠাণ্ডা বা ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিলে, থার্ম্মোমিটার শীতল হওয়ায়, পারাটি যথেষ্ট না উঠিতে পারে, এটুকু স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। দেখা গিয়াছে যে, একই সময়ে, একই লোকের দুই বগলে উত্তাপের তারতম্য থাকিতে পারে। এইজন্য, বরাবর, একই বগলে একই থার্ম্মোমিটার লাগান উচিত। জিহ্বার নিচে থার্ম্মোমিটার দিতে হইলে প্রত্যেকবারে, ব্যবহারের পূর্ব্বে ও পরে টিংচার-আইয়োডিন মিশ্রিত জলে উহাকে ধৌত করা উচিত। বগলে যত জ্বর উঠে, জিহ্বার নীচে থার্ম্মোমিটার লাগাইলে, তাহার চেয়ে প্রায় এক ডিগ্রি বেশী পারাটি উঠে; অর্থাৎ, মুখে ৯৯° হইলে, বগলে ৯৮° হইবার কথা।

অনেকের ধারণা আছে যে, ৯৮·৪ (অষ্টনব্বুই পয়েণ্ট চার) সকল মানুষের দেহের স্বাভাবিক উত্তাপ। এ ধারণাটি ভুল। আমাদের দেশে ৯৬°৪ হইতে ৯৮° পর্য্যন্ত যে কোনও উত্তাপই স্বাভাবিক উত্তাপ। সুধু বিলাত-বাসীদেরই পক্ষে ৯৮·৪ স্বাভাবিক উত্তাপ। কাস্মিন্‌কালে আমাদের দেশে উহা প্রয়োজ্য নয়। এদেশের হিসাবে—

৯৫	হইতে	৯৬·৪	দৌর্ব্বল্যের লক্ষণ (কোল্যাপ্‌স্)
৯৬·৪	"	৯৮	সুস্থদেহের লক্ষণ
৯৮	"	১০১	সামান্য জ্বর জ্ঞাপক
১০১	"	১০৫	বেশী জ্বর ,,
১০৫	"	১০৭	অত্যধিক জ্বর ,,
১০৭	"	১১০	সাংঘাতিক জ্বর ,,

ম্যালেরিয়া, প্লেগ, বাতজ্বর (acute rheumatic fever) ও রক্ত-দুষ্টি ঘটিলে (acute sepsis) অকস্মাৎ ১০৬° কি ১০৭° জ্বর হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু অত জ্বর বেশীক্ষণ হইলে, সাংঘাতিক হইতে পারে।

রোগীর জ্বর যদি আস্তে আস্তে (অর্থাৎ গড়ে ঘণ্টায় এক বা তাহারও কম ডিগ্রি করিয়া) ৯৫° উত্তাপ পর্য্যন্তও কমিয়া আসে, তাহাতে ভয়ের কোনও কারণ থাকে না। কিন্তু যদি অতি দ্রুত জ্বর নামে, তবে ভয়ের কারণ যথেষ্ট থাকে। ৯৫° ডিগ্রি উত্তাপ হইলেই যে রোগীর "কোল্যাপ্‌স্" (Collapse) হইয়াছে ধরিতে হইবে, তাহাও নহে। একত্রে এই পাঁচটি লক্ষণ থাকিলে; তবে ভয়ের কথা—অর্থাৎ রোগীর "কোল্যাপ্‌স্" হইয়াছে, বুঝিতে হইবে:—(১) খুব বেশী-জ্বর কম হইয়া, অতি দ্রুতবেগে রোগীর উত্তাপ ৯৫° ডিগ্রিতে দাঁড়ায়। (২) রোগী ঘামিয়া "নাইয়া উঠে", অর্থাৎ প্রবল ধারায় ও অনবরত ঘাম হইতে থাকে এবং সেই সঙ্গে তাহার হাত, পা কাণ, নাক "বরফের মত ঠাণ্ডা" হয় এবং তাহার মুখ "শাকবর্ণ" (অথবা ঈষৎ নীলাভ) হয়; (৩) তাহার নিঃশ্বাস বায়ু তেমন উষ্ণ বোধ হয় না। (৪) তাহার দৃষ্টি স্থির হয় (ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকান) এবং তাহার চক্ষের তারা বড় দেখায়। (৫) সে কোনও কিছু বলিতে পারে না, অথচ এ-পাশ ও পাশ করিয়া হাত পা ছুড়িতে থাকে এবং অনবরত হাওয়া চাহে। এতগুলির সমাবেশকে কোল্যাপ্স বলে—সুধু ৯৫° ডিগ্রি উত্তাপ নামাকে কোল্যাপ্স বলে না।

কখন কখন রোগীর জ্বর দেখা উচিত—এ সম্বন্ধেও এমন কি শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যেও অজ্ঞতা কম নয়। প্রত্যহ, নিয়ম করিয়া, সকালে ও সন্ধ্যায় (অন্ততঃ বারো ঘণ্টা অন্তর, এবং যথাসম্ভব প্রত্যহ একই সময়ে), "জ্বর দেখা" উচিত। তাহা ছাড়া, যখনিই মনে হয় যে, রোগীর জ্বর বাড়িতেছে অথবা কমিতেছে, তখন, ৩ ঘণ্টা অন্তর জ্বর দেখা উচিত। ঔষধ খাওয়াইবার সময়ে, "স্পঞ্জ" করিবার আগে ও পরে, কোনও নূতন লক্ষণ দেখা দিলে—এই সকল সময়েও জ্বর দেখা উচিত। এদেশে, এমন খাম-খেয়ালির বশে রোগীর জ্বর দেখা হয় যে, কি বলিব! সকলের কর্ত্তব্য গড়-পড়তা তিন ঘণ্টা অন্তর জ্বর দেখিয়া, একই কাগজে লিখিয়া রাখা। অনেকে জ্বর দেখেন, কিন্তু আলস্য করিয়া তাহা লিখিয়া রাখেন না—লেখার আবশ্যকতাও বোধ করেন না। রোগকে এরূপ অগ্রাহ্য করা নিতান্ত দূষণীয়। এদেশে, আত্মীয় স্বজনের বা নিজের অসুখ হইলেই তাহার চিকিৎসা করান দূরের কথা, প্রথম-প্রথম তাহা গ্রাহ্যও করা হয় না,—অন্ততঃ যতক্ষণ একটা কিছু বাড়াবাড়ি লক্ষণ না ঘটে, ততক্ষণ ত নহেই। তাহা ছাড়া, ডাক্তার ডাকিয়া দেখানর চেয়ে, এদেশে ডাক্তারের বাড়ীতে রোগীকে লইয়া যাইয়া এ দরিদ্রদেশে খবর দেওয়ার প্রথাই বেশী। পক্ষান্তরে, ডাক্তার বেচারিকে পয়সার জন্য বহু রোগীর সমাগম খোঁজেন। কাযেই, এ রকম অবস্থায়, "রোজে কাম" করার মত, বা মোট ফেলার মত, "ধরা ও জবাই করা" ছাড়া, ডাক্তারের বেশী কিছু করিবার সামর্থ্য নাই। গৃহস্থ, ও এমন কি সুশিক্ষিত ব্যক্তিরাও, ভুলিয়া যান যে, মাত্র পাঁচ-দশ মিনিটের জন্য রোগীর সঙ্গে ডাক্তারের সম্বন্ধ। বাকী ২৩ ঘণ্টা ৫০ মিনিটকাল ধরিয়া, রোগীর কি হয় বা কি না হয়, তাহা রীতিমত ও প্রত্যহ লিখিয়া না রাখিলে, ডাক্তারের দুর্নাম ত ঘটেই, পরন্তু রোগীরও সমূহ ক্ষতি হয়। এইজন্য প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখন হঠাৎ গৃহস্থের ঘরে একটা বাড়াবাড়ি লক্ষণযুক্ত রোগ হয়, তখন মেয়েদের একরাশ "বোধ হয় এই হইয়াছিল," "বোধ হয় তাই করিয়াছিল," ইত্যাকারের হেঁয়ালি কথা, বাড়ীর সকলের নিজ নিজ রুচি ও বুদ্ধি অনুযায়ী পর্ব্বতপ্রমাণ অনুমান-সন্দেহের বোঝা এবং ব্যারামের প্রথমকার ধোঁয়াটে-ধোঁয়াটে ইতিহাস—এই সকল আবর্জ্জনার মধ্য হইতে, তাড়াতাড়ি, সত্যের সন্ধান করিয়া, ডাক্তার বেচারী ঔষধ দিতে বাধ্য হন—তাহাতে "লাগে ত তাক্, আর না লাগে ত তুক্!" ডাক্তার চাহেন, মোট ফেলিয়া "ফি"-টা পকেটস্থ করিতে; রোগী চাহে এক নিঃশ্বাসে রোগমুক্ত হইতে; গৃহস্থের সকলেই চায়, নিজ নিজ বুদ্ধিমত্তা, পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও আত্মীয়তার বাহুল্য দেখাইতে। ইহাকে চিকিৎসার ভণ্ডামী বলিতে পার, কিন্তু ইহা চিকিৎসা নয়। অথচ এই

ভাবেই এদেশে চিরকাল কায চলিয়া আসিতেছে, অন্ততঃ কলিকাতাতে ত বটেই! ব্যারামের অতি বড় জটিল অবস্থাতেও চার্টি খবর কয়টা বাড়ীতে পাওয়া যায়?

এক্ষণে, জ্বর হইলে কি কর্ত্তব্য তাহা একটু বলিব। "অত্যধিক জ্বর" (১০৫° উপরে) বেশীক্ষণ স্থায়ী হইলেও যে কুফল, "বেশী জ্বর" দীর্ঘ স্থায়ী হইলেও তদ্রূপ কুফল। জ্বর হইলেই রোগীকে শায়িত রাখা বুদ্ধিমানের কায—তা সে যেমনই জ্বরই হউক না কেন। জ্বরে দ্বিতীয় কর্ত্তব্য, পথ্য লঙ্ঘন দেওয়া—জল বা তরল পানীয় দেওয়া। জ্বরে তৃষ্ণা বাড়ে, ঘর্ম্ম মূত্র কমে; অতএব, রোগীকে প্রচুর পরিমাণে পানীয় দেওয়া উচিত—শীতল জল দিতে কোনও বাধা নাই—বরং জ্বর রোগীকে যথেষ্ট পানীয় না দেওয়াই দূষণীয়। জ্বরে তৃতীয় কর্ত্তব্য—মাথার রক্তউঠা প্রশমিত করা; চক্ষু লাল হইলে, অত্যন্ত শিরঃপীড়া থাকিলে ত মাথায় জল সকলেই দেন; কিন্তু, ঐ সকল লক্ষণ না থাকিলেও, ১০৩° উপরে উঠিলেই, মাথায় বরফ বা জল দেওয়া উচিত। মাথায় বরফ দিলে, মাঝে মাঝে তাহা তুলিয়া লইতে নাই—যতক্ষণ জ্বর বেশ করিয়া না কমে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অনবরত বরফ দিতে হয়। ১০৫° বা তদূর্দ্ধে জ্বর উঠিলে, রোগীকে "স্পঞ্জ" করা অথবা cold pack (অর্থাৎ বরফজলে চাদর ভিজাইয়া তদ্দ্বারা রোগীকে ঢাকিয়া দেওয়া) উচিত—যতক্ষণ জ্বর অন্ততঃ ১০১ ডিগ্রি না কমে। সাহিত্যসেবীদিগকে এতদ্‌সম্বন্ধে বেশী বিবরণ দিয়া বিরক্ত করিব না—এমন কি যে কয়েকটি কথা বলিয়াছি, তাহাও সাহিত্য পত্রিকায় না করিয়া, চিকিৎসাবিষয়ক পত্রিকাতেই দেওয়া উচিত ছিল; কিন্তু, দুর্ভাগ্য বশতঃ, এদেশে চিকিৎসাবিষয়ক পত্রিকার সংখ্যা ও পাঠক কম,—এবং সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যেও দৈনন্দিন এ সকল ব্যাপারে এত বেশী অজ্ঞতা ও এত কুসংস্কার আছে যে, বাধ্য হইয়া, চিকিৎসাবিষয়কে সং-সাহিত্যর পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত করিতে হইল—তজ্জন্য সকলের ক্ষমা চাহি।

এক্ষণে, কোল্যাপ্স হইলে বা উহার উপক্রমে, কি কি কর্ত্তব্য, তাহা একটু বলিব। প্রকৃত কোল্যাপ্স তাবৎ দৈহিক ক্রিয়ার অবসাদ জ্ঞাপক—বিশেষ করিয়া হৃৎপিণ্ডের। কাযেই, ঐ রকম হইলে, রোগীকে শোয়াইবে, ও হাওয়া দিবে—সে হাওয়া যেন গায়ে মোটে না লাগে, মাথায় ও মুখে, চোখে দিবে; কারণ, রোগী যত বিশুদ্ধ ও যথেষ্ট পরিমাণে হাওয়া (অক্সিজেন) পাইবে, ততই তাহার মঙ্গল। ঘাম হইলে ঘাম মুছাইয়া দিবে। কিন্তু গা খুলিয়া হাওয়া খাইতে দিবে না; বরং, রোগীর হাত ও পা গরম বোতলের বা উত্তপ্ত কাপড়ের তাপে গরম করিবার চেষ্টা করিবে। উত্তপ্ত শুঁঠ ও বার্লি বা শঠি চূর্ণ মালিশ করিয়া, ঘাম বন্ধ করিয়া, দেহে উত্তাপ সঞ্চিত করিবার চেষ্টা পাইবে। পেট ফাঁপা না থাকিলে, গরমদুধ, ব্র্যাণ্ডের এসেন্স অফ্ চিকেন, অতিসামান্য জলের সঙ্গে ব্র্যাণ্ডি বা স্পিরিট অ্যামোনিয়া এরোম্যাটিক প্রভৃতি খাইতে দিবে—যতক্ষণ সুচিকিৎসক না আসেন। (পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে, আধ-আউন্স ব্র্যাণ্ডি ঘণ্টায় ঘণ্টায়; ত্রিশ ফোঁটা স্পিরিট অ্যামোনিয়া অ্যারোম্যাটিক, আধ ঘণ্টা অন্তর; টিংচার বেলাডোনা, ২।৩ ফোঁটা আধ ঘণ্টা অন্তর, দশ ফোঁটা পর্য্যন্ত; সলিউসান্ অ্যাডরেনালিন্ হাইড্রোক্লোর ১০ ফোঁটা, ঘণ্টা অন্তর, তিনবার পর্য্যন্ত এই সবগুলি একত্রে বা স্বতন্ত্র ভাবে দেওয়া চলে)।

এইবার জ্বরের "চিকিৎসার" কথা বলিব। গোড়াতেই একটা সত্য কথা বলি—জ্বরের সকল তথ্য এখনো আমরা ঠিক জানি না। যাহার সকল কথা ঠিক জানি না, তাহার সুচিকিৎসাও জানি না, একথাটা স্বতঃসিদ্ধ। যদি পাঠক পাঠিকারা বলেন যে, জ্বরের সকল কথাই যদি না জানি, এবং সুচিকিৎসাও না জানি, তবে কি ছাই-ভস্ম লিখিতেছি? এ কথার উত্তরে এই বলিব:—জ্বর সম্বন্ধে, আমরা এতকাল পরে বুঝিয়াছি যে—(১) তরুণ জ্বর মাত্রেই মোটামুটি তিন শ্রেণীভুক্ত—জীবাণুজ ও গুটিকা সংযুক্ত জ্বর (যেমন হাম, বসন্ত, ডেঙ্গু, ইত্যাদি); মেয়াদী (self-limited) জ্বর (ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড্ জ্বর, নিউমোনিয়া ইত্যাদি); কোনও বিশেষ এবং প্রকারের জীবাণুঘটিত জ্বর (প্লেগ, ইত্যাদি)। এতদ্ভিন্ন যত রকমের জ্বর আছে, তাহাদের কারণ, স্থিতিকাল প্রভৃতি সম্বন্ধে আমরা একরকম কিছুই জানি না। (২) জ্বরটা ব্যারাম নয়—অপর ব্যারামের বা শারীরিক গোলযোগের লক্ষণ মাত্র। (৩) জ্বরকে হাতে করিয়া তুলিয়া লওয়াও যায় না, এবং জ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে জবরদস্তি তাড়াইতে চেষ্টা করাও বাতুলতা; তাহাতে কুফলের সম্ভাবনা। জ্বর সম্বন্ধীয় এই স্থূল তথ্যগুলি স্মরণ রাখিলেই বেশ বুঝা যাইবে যে, জ্বরের চিকিৎসা—তাহার নির্দ্দিষ্ট কারণ জানিতে পারিলে, সেই কারণের মূলচ্ছেদ করা; আর, যেখানে জ্বরের কোনও কারণ ঠিক বুঝা যায় না, সেখানে একটা সময়োপযোগী "ফিভার মিকশ্চার" দিয়া দিন কাটান—যখন শরীরাভ্যন্তরস্থ গোলযোগ মিটিয়া যাইবার ফলে দয়া করিয়া জ্বর ছাড়িবে তখন ছাড়িবে—জোর জুলুম কিছুই করিবার যো নাই। এ কথাগুলি এত স্পষ্ট করিয়া সর্ব্বসাধারণ্যে বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথম কারণ এই যে, রোগীর আত্মীয়েরা প্রায়ই জ্বরের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। সত্য কথা বলিতে গেলে, অনেক জ্বরেরই কারণ আমাদিগের মধ্যে মহামহোপাধ্যায়েরাও এখনো জানেন না। কবিরাজেরা "বায়ু ঘটিত," "পিত্ত ঘটিত" "কফ ঘটিত" প্রভৃতি দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কথা বলেন—লোকেরা ভাবে, না জানি কি গূঢ় রহস্যের কথাই বলিলেন; ডাক্তারেরা গম্ভীর বদনে "ঠাণ্ডা লাগিয়া" জ্বর, "বাতের জ্বর," "ঋতু পরিবর্ত্তনের জন্য জ্বর," "শরীরে রস হওয়ার জন্য জ্বর" "রিমেটেণ্ট জ্বর" প্রভৃতি গালভরা কত কথাই বলেন—রোগীরাও ঢোক গিলিয়া "হুঁ" বলেন এবং পাণ্ডিত্যের অভিমানে গদগদ হইয়া নির্ব্বাক ও কতকটা শান্তি অনুভব করেন। এই সকল লোককে সোজা কথায় সত্য কথা জানান দরকার—অথচ যে বেচারি ডাক্তার রোগী চিকিৎসা করিতে যাইয়া সরল প্রাণে খোলাখুলি রোগীকে বলে—"কি জানি মশাই, কি জ্বর ও কেন হইল, তাহা ত বুঝিতে পারিলাম না" পত্রপাঠ সে ডাক্তার "মূর্খ" বিবেচিত ও বিতাড়িত হন। অথচ আমরা নাচার। জনসাধারণে মিথ্যা-ধাপ্পা চান, ও মিথ্যার অভিনয়

করিতে আমাদিগকে বাধ্য করেন। প্রকৃত সত্য কথাটা তাঁহাদিগকে শুনাইয়া দেওয়া প্রয়োজন হইয়াছে। দ্বিতীয় কারণ, লোকে "ফিভার মিকশ্চারের" বড় পক্ষপাতী। ফিভার মিকশ্চারে যদি "ক্ষার" (alkali) যথেষ্ট থাকে, তবে তাহাতে রক্তের শ্বেত কণিকার উত্তেজনা সাধিত হইয়া দেহের রোগ-প্রতিরোধক-শক্তি বাড়াইয়া যায় (alkalies increase leucocytosis and thereby augment the resisting power of the body) যে সুচিকিৎসক এই ধারা ধরিয়া "ফিভার মিকশ্চার" দেন, তিনি রোগের উপশম করিতে সক্ষম না হইলেও, রোগীর উপকার ছাড়া অপকার করেন না। কিন্তু, ফেনাসেটিন্, অ্যান্টিপাইরীণ্, অ্যাস্‌পিরিণ্, থাইয়োকল প্রভৃতি অবসাদকর কতকগুলি তীব্র জ্বরঘ্ন ঔষধ ফিভার মিকশ্চার রূপে ব্যবহারের ফলে, রোগীর সমূহ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। ফলকথা—এক শ্রেণীর ঔষধে প্রস্তুত করা ফিভার মিকশ্চার" সেবনে উপকার না হউক, অপকার হয় না, অপর শ্রেণীর ঔষধ ব্যবহারে সম্পূর্ণ অপকারেরই সম্ভাবনা। কাজেই, ফিভার মিকশ্চারকে "টোঁড়" ঔষধ, সময় কাটান বা মনবোঝান ঔষধ ছাড়া বড় একটা আর কিছু বলা যায় না। অথচ লোকের ফিভার মিকশ্চারের উপরে অগাধ শ্রদ্ধা—কারণ, এটি যে "গড্ডালিকার" দেশ, "একটা-যা-হোক কিছু কর"র দেশ, লোককে ঘুমপাড়ানর দেশ। যেখানে রোগী একটা "প্রেস্ক্রপসান" না পাইলে মনে করে ডাক্তার তাহাকে ঠকাইল, অথবা যেখানে চতুর চিকিৎসক ব্যারামের সঠিক "হদীশ" না পাওয়ায়, সময় কাটাইতে চাহেন, নিজের অজ্ঞতা চাপিয়া রাখিতে চাহেন, সেখানেই "ফিভার মিকশ্চারের" বড় আবশ্যকতা। তৃতীয় কারণ, এদেশে "টনিকের" বড় আদর। "টনিক" কথাটি "টোন" কথা হইতে হইয়াছে। যাহার দ্বারা "দেহ কড়া হয়," যে ঔষধ খাইলে ক্ষুধা বাড়ে, হজম ভাল হয়, শরীরে স্ফূর্ত্তি ও কার্য্যকুশলতা ফিরিয়া আসে, সেই ঔষধকেই টনিক কহে। সেকালের (২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বের) ডাক্তারেরা জ্বরের প্রথমাবস্থায় "ফিভার মিকশ্চার" এবং শেষে দু চার শিশি "টনিক" খাওয়াইয়া দেশকে দীন ও আপনাকে ধনী করিতেন বলিয়া, একালেও নাকি তাহার প্রয়োজন আছে! বিলাতী-মোহান্ধ বাঙ্গালীকে এ কথা বুঝান বড় শক্ত যে—ঔষধ খাইয়া দেহ কড়া হয় না। যতক্ষণ দেহ রোগমুক্ত না হয়, ততক্ষণ দেহ কড়া হইতে পারে না; সম্পূর্ণরূপে দেহ রোগমুক্ত হইলে সুপথ্যই দেহকে কড়া করিবার অমোঘ উপায়। কিন্তু বাঙ্গালী অনায়াসে একটা টাকা ব্যয় করিয়া টনিক ঔষধ ক্রয় করিয়া ধন্য হইবে, তবু সেই একটা টাকা সুপথ্যে ব্যয় করিবে না। চতুর্থ কারণ, জ্বর হইলেই অনেকেই আপনার ইচ্ছায় জোলাপ খাইয়া বসেন। কিন্তু যদি সেটা টাইফয়েড্ জ্বর হয়, তবে জোলাপ সেবনে সমূহ অপকারের সম্ভাবনা। এই সকল কারণেই, আমরা খোলসা করিয়া বলিয়া দিতেছি যে—জ্বরচিকিৎসা অধিকাংশ স্থলেই গো—চিকিৎসা বিধায়, খুব সন্তর্পনে, খুব বুঝিয়া সুঝিয়া জ্বরের চিকিৎসা করা উচিত। চিকিৎসকেরা উপকার করিতে না পারুন, অপকার করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের যথেষ্টই আছে। একটি সুবিজ্ঞ জ্বর-চিকিৎসক বলিয়াছেন:—We would rather be known as fever *guiders* than as fever *curers*. What do you think of a pilot, who, instead of trying to steer his vessel clear of storm, rather tries to quell it?" অর্থাৎ, জ্বর চিকিৎসাকালীন, ধীরতা ও বিচক্ষণতার সহিত জ্বরের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই সুফল পাওয়া যায়;—হঠকারিতা করিয়া, কড়া ঔষধ দ্বারা তাহাকে দমন করিতে চেষ্টা করিলে, অনেকস্থলে, কুফল ফলে। তুফানের সময়ে, তুফানকে শান্ত করিবার ব্যর্থ চেষ্টায় কালক্ষেপ না করিয়া, যে কর্ণধার নৌকাকে নিরাপদে কূলে ভিড়াইবার চেষ্টা করে, সেই প্রসংশার্হ। এই প্রবীণ লোকের উপদেশ বচন সত্যই অমূল্য। কি চিকিৎসক, কি গৃহস্থ, সকলেরই ইহা স্মরণ রাখা উচিত।

দুই একটি বিশেষ-বিশেষ জ্বরের সম্বন্ধে সার সত্য কথা এইবারে বলিয়া, এ দীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

ম্যালেরিয়া জ্বরে—কুইনাইনের ব্যবহার ছাড়া, আর উপায় নাই। অন্ততঃ কলিকাতার কবিরাজেরাও গুলঞ্চ প্রভৃতির সঙ্গে রাশি রাশি কুইনাইন লুকাইয়া ব্যবহার করিতেছেন; হোমিওপ্যাথিকেরাও "স্বাদ-হীন ইউকুইনিন" ব্যবহার করিতেছেন। জ্বরঘ্ন যত রাজ্যের পেটেণ্ট ঔষধেও রাশি রাশি কুইনাইনই আছে। জ্বরঘ্ন কোনও "পেটেণ্ট" ঔষধের বিশেষ কোনও মাহাত্ম্য নাই; অতএব, নামজাদা পেটেণ্ট ঔষধ খাইয়া, ঘোরা পথে, বেশী দাম দিয়া, মনকে চোখ ঠারিবার কোনও প্রয়োজন নাই—সোজাসুজি, ম্যালেরিয়া হইলেই, জ্বরে-বিজ্বরে, সরাসরি কুইনাইনই ব্যবহার করাই জ্ঞানীর কাজ। কবিরাজ ও হোমিওপ্যাথেরা যে কুইনাইনকে "সর্ব্বনাশকারী" বলিয়া প্রকাশ্যে প্রচার করে, লুকাইয়া সেই কুইনাইনই ব্যবহার করিয়া পয়সা উপার্জ্জন করে, এ সার কথাটি স্মরণ রাখিবার উপযুক্ত।

টাইফয়েড জ্বর।—ইহাকে পূর্ব্বে "রিমিটেণ্ট ফিভার" বা "বাত শ্লেষ্মা বিকার" বলিত, বর্ত্তমানে, ইহাকে "এণ্টারিক" বা "টাইফয়েড্" জ্বর বলে। সাধারণতঃ ইহা একাদিক্রমে তিন সপ্তাহকাল স্থায়ী হয়। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, বাঙ্গালীদের মধ্যে এ জ্বর দেখা যাইত না,—এখন এ ব্যারাম প্রায় ঘরে-ঘরে! মাংসভোজী জাতিদের পক্ষে এ ব্যারাম বড়ই মারাত্মক। দুধ, পানীয় জল ও খাবারের সঙ্গে এই ব্যারামের বিষ উদরস্থ হইয়া রোগের সৃষ্টি করে। যে ক্ষেত্রে, রোগীর জ্বর একেবারে ছাড়ে না, বরং ক্রমশঃই বাড়িয়া যায়, জ্বর তিন সপ্তাহকাল থাকে, পেট ফাঁপা, সামান্য সর্দ্দি, ভুল বকা, জিবে খুব ময়লা পড়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়, তাহাই টাইফয়েড্। এই ব্যারাম অনেক স্থলে মারাত্মক হয়। এই ব্যারামের প্রকৃতপক্ষে চিকিৎসা নাই—শুধু সতর্ক সেবাই এ ব্যারাম সারানর অনুকূল-বিধি। এ ব্যারামের পক্ষে চারটি জিনিষ মারাত্মক বিধায়ে, কখনো ভুলিয়াও সে চারটির অনুষ্ঠান যেন না হয়, তাহা স্মরণ রাখা আবশ্যক। সে চারিটি জিনিষ এই:—টাইফয়েড্ রোগের গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত ভুলিয়াও, একদিনের জন্যও—

কড়া, জ্বরঘ্ন ঔষধ দিবে না,

কোনও রকমের জোলাপ দিবে না,

কঠিন খাদ্য (Solid food) ও মাংস দিবে না,
বসিতে বা উঠিতে দিবে না।'

এই চারটি জিনিষ বাঁচাইয়া চলিতে পারিলে, টাইফয়েড্ রোগে বিশেষ ভয় নাই।

নিউমোনিয়া রোগে—নিদান-কালে অক্সিজেন (oxygen) প্রয়োগ না করিয়া, রোগের গোড়া হইতেই, ঘর-দ্বার খুলিয়া রোগীকে মুক্ত বায়ু সেবন করিতে দিতে হয়। একে ব্যারামের স্বধর্ম্মে রোগীর বুকের (শ্বাসগ্রহণ) কায খুব সামান্যই হয়। তাহার উপরের ঘরে দরজা জানালা বন্ধ করিয়া, ঘরে দশটা কেরোসিনের আলো জ্বালিয়া এবং দশজনে মিলিয়া ঘরের হাওয়া কলুষিত করিয়া, তাহার জীবনকে বিপন্ন করা উচিত নয়; রোগী যত প্রচুর বিশুদ্ধ বায়ু পায় তাহার পক্ষে ততই মঙ্গল।

আমাদের দেশে শয্যায় থাকিয়া রোগীরা মলমূত্র ত্যাগ করিতে চাহে না। সর্ব্ববিধায়ে এইরূপ অনিচ্ছা স্বাভাবিক। কিন্তু অনেকে জানেননা যে, এই সামান্য নড়াচড়ার ফলে, কত রোগী মূর্চ্ছা যায় (ভির্ম্মি যায়), কত রোগী মরিয়াও যায়। যে কারণেই জ্বর হউক, জ্বর ক্রিয়ার ফলে, রক্তে প্রচুর পরিমাণে জ্বরের বিষ চলাচল করে। এবং রক্তের সর্ব্বপ্রথম অংশ হৃদ্‌পিণ্ডেরই পোষণে ব্যয়িত হয়; কাযেই, জ্বরের বিষ প্রথমেই প্রচণ্ডবেগে হৃদ্‌পিণ্ডকেই আক্রমণ করে। এমত অবস্থায়, জ্বরে "হার্ট ফেলিওর" (Heart failure) বা হৃদ্‌পিণ্ডের কাজ বন্ধ হওয়া বিচিত্র নয়—এবং অনেকস্থলে গৃহস্থের অমনোযোগিতার ফলে কত লোকে উঠিয়া শৌচপ্রস্রাব ত্যাগ করিতে যাইয়া, ফলে তৎক্ষণাৎ অথবা অনতিবিলম্বে মারা পড়ে।

উপসংহারে, একটি আবশ্যক কথা গৃহস্থকে স্মরণ করাইয়া দিব। আমরা "শিক্ষিত" হইয়া বিশ্বপণ্ডিত হইতে চাই; কিন্তু নিজ নিজ দেহতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকায় দোষ দেখি না। দোষ না দেখিলেও, বোকামির মাশুল কিছু কম দিই না। কত পিতামাতার সামান্য দোষ ত্রুটি ও অজ্ঞতার জন্য, কত পুত্রকন্যা অকালে মারা যায়, তাহার হিসাব নাই। যমরাজাকে এত টেক্স দিয়াও ত আমরা চৈতন্য লাভ করি না। মোকদ্দমা করিবার সময়ে, যেমন জিদ্ করিয়া, সবচেয়ে বড় কৌন্সুলিকে খুব মোটা ফি দিই, এবং দিনরাত সকল কায ফেলিয়া, স্বয়ংই মোকদ্দমার তদ্বির করি, ছেলেমেয়েদের অসুখের সময়ে, হাঁক-পাক করিয়া দৌড়াদৌড়ি করা ছাড়া, আর কিছু করি কি? তখন "হাত-পা আস্‌ছে না" বলিয়া ন্যাকা সাজি, সাংখ্যের ঠাকুরদাদা সাজিয়া অদৃষ্টের উপরে ঠেস্ দিয়া বসি, চোখ থাকিতে কাণা হই—আর পরামর্শের জন্য দৌড়াই—নিরক্ষরা, কূপমণ্ডূক, ভয়বিহ্বলা স্ত্রীর নিকটে, অথবা নানা-অভিসন্ধিযুক্ত পাড়া প্রতিবেশীর নিকট! যাহাদের প্রাণপ্রতিম আত্মীয়কে বসজ্জন করিয়া চেতনা হয় না, যাহাদের চতুর্দ্দিকে অদ্ধমৃত অথবা জীবন্মৃত আত্মীয়বর্গের করুণ অবস্থা দেখিয়াও তাহার প্রতিকারকল্পে জ্ঞান-তৃষা জন্মে না—ভগবান তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন!

ঘ্রাণ ও সৌরভ

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম-বি এ-সি

আমরা যে সকল বস্তুর ঘ্রাণ লই, তাহা কেবলমাত্র ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে। ঘ্রাণেন্দ্রিয় বলিলে চলিত কথায় নাসিকাই বুঝায়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আসল ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসিকারন্ধ্রের পশ্চাদ্ভাগে স্থিত কতকগুলি সূক্ষ্ম স্নায়ুমণ্ডলী মাত্র। ইহাকে ইংরাজিতে Olfactory nerves কহে। সৌরভের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেণুসকল বায়ু বা বাষ্প চালিত হইয়া যখন আমাদের নাসিকা মধ্যস্থ ঐ সকল স্নায়ুমণ্ডলে আঘাত করে, তখনই একরূপ রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা উহা মস্তিষ্কে প্রেরিত হয়; এবং ভিন্ন-ভিন্ন প্রকার ক্রিয়ায় ভিন্ন-ভিন্ন ঘ্রাণের তারতম্য বুঝিতে পারি। য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ ঘ্রাণের নয় প্রকার * শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন, তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

১। পক্ব ফল জাতীয় সৌরভ (Fruity or etherial); ইহা প্রায় সকল প্রকার সুমিষ্ট পক্ব ফলেই বিদ্যমান।

২। তীব্র সৌরভযুক্ত (Aromatic); ইহার মধ্যে কয়েকটি শাখা আছে, যথা—

(ক) কর্পূর জাতীয়, যথা কর্পূর, ইউক্যালিপ্‌টস্ প্রভৃতির সৌরভ।

(খ) মশলা জাতীয়, যথা আদা, গোলমরিচ, দারুচিনি প্রভৃতির সৌরভ।

(গ) মৌরি-ল্যাভেণ্ডার জাতীয়, যথা, মৌরি, জোয়ান, পিপারমিণ্ট প্রভৃতির সৌরভ।

(ঘ) লেবু ও গোলাপফুল জাতীয়, যথা, চন্দন, citral, geraniol প্রভৃতির সৌরভ।

(ঙ) বাদাম জাতীয়, যথা, Prussic acid, Benzoldehyde, প্রভৃতির সৌরভ।

৩। মনোমুগ্ধকর কুসুম সৌরভ ও ধূপাদির সৌরভ জাতীয়—(Fragrant and balsamic); ইহার ভিতরও কয়েকটি শাখা আছে, যথা—

(ক) কুসুম সৌরভ, যথা মল্লিকা, চামেলি, প্রভৃতির সৌরভ।

(খ) বকুলফুল জাতীয়, যথা, Narcissus, Lily, বকুলফুল, Violet, Orris root প্রভৃতির সৌরভ।

(গ) ধূপাদির সৌরভ, যথা Vanillin, Balsam of Peru and Tolu, ধূনা, ধূপ প্রভৃতির সৌরভ।

৪। মৃগনাভি জাতীয়, যথা মৃগনাভি, খট্টাশী, অম্বুরী, লতা-কস্তুরী প্রভৃতির সৌরভ।

৫। রসুন জাতীয় (alliaceous)—ইহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—

* Zwaardemaker, Physiologie des Geruchs, 1895, 233.

(ক) রসুন জাতীয়, যথা রসুন, পলাণ্ডু, Mercaptan প্রভৃতির সৌরভ।

(খ) ক্যাকডিল ও মৎস্য জাতীয় (Cacodyl-fish odour) যথা, Cacodyl compounds, $(CH_3)_3N$, Hydrides of Phosphorus and arsenic.

(গ) ব্রোমিন নামক রাসায়নিক পদার্থের গন্ধ জাতীয়—যথা, Bromine, chlorine, Iodine, Quinone, প্রভৃতির গন্ধ।

৬। দগ্ধ দ্রব্যাদির গন্ধ জাতীয় (Empyreumatic) যথা, পোড়া রুটি, শুষ্ক তামাক পাতা, কফি, প্রভৃতির গন্ধ।

৭। ছাগগাত্র গন্ধ জাতীয় (Hirline), যথা. Caproic and Caprylic esters.

৮। অপ্রীতিকর গন্ধ (Repulsive), যথা, acanthus, এবং নানাবিধ অহিফেন ও তামাক জাতীয় লতা গুল্মাদির গন্ধ।

৯। পূতি গন্ধ, যথা, পচা মৎস্য মাংসাদির ও মলমূত্রাদির দুর্গন্ধ এবং arum dracunculus জাতীয় পুষ্পের দুর্গন্ধ।

উপরিউক্ত তালিকা কিঞ্চিৎ বাহুল্য বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক পক্ষে ছয় প্রকার ঘ্রাণই মৌলিক, অপরগুলি উহাদের সংমিশ্রণ মাত্র।

১। মনোমুগ্ধকর কুসুম সৌরভ।

২। পক্কফল জাতীয় সৌরভ।

৩। মশলা জাতীয় সৌরভ।

৪? ধূপাদি জাতীয় সৌরভ

৫। দগ্ধদ্রব্যাদির গন্ধ

৬। পূতিগন্ধ।

কণ্ঠস্বর এবং আলোকরশ্মি বিশ্লেষণে যেমন উহাদিগকে সপ্ত প্রকারে বিভিন্ন করা যায়, সৌরভকে কিন্তু তাহা করা যায় না। Dr. Septimius Piesse কিন্তু বলেন যে, বিভিন্নপ্রকার সুরভির দ্বারা মানব-হৃদয়ে বিভিন্নপ্রকার ভাবের উদয় হয়, যেরূপ বিভিন্নপ্রকার স্বরগ্রামের দ্বারা হয়; সেই কারণ, তিনি বলেন যে, স্বরগ্রামের ন্যায় ঘ্রাণগ্রামও তৈয়ার হইতে পারে; এবং তিনি ঐরূপ একটি ঘ্রাণগ্রামও তৈয়ার করিয়াছেন। তবে তাহা এখনও পর্য্যন্ত জগতে গ্রাহ্য হয় নাই। অনেকে বলেন যে ইথার (ether) নামক অতি সূক্ষ্ম পদার্থের কম্পনে যেরূপ আলোক এবং শব্দের উপলব্ধি হয়, সৌরভেরও উপলব্ধি সেই রূপেই হয়. কিন্তু ইহা এখনও প্রমাণসাপেক্ষ।

সাধারণতঃ আমরা কেবলমাত্র দুইটি গন্ধ বিচার করি—সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ; কিন্তু একজনের নিকট যাহা মনোমুগ্ধকর সৌরভ, অপরজনের নিকট তাহা নাও হইতে পারে,—ইহা রুচির উপর অনেকটা নির্ভর করে। তবে অনেক কুসুম-সৌরভের যে মদমত্তকরী শক্তি আছে, তাহা বোধ হয় অপর আর কিছুতেই নাই। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের ন্যায় সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় আর মানব-দেহে দ্বিতীয় নাই। অনেকে গীত-বাদ্য শ্রবণ করিয়া মোহিত নাও হইতে পারেন; কিন্তু কুসুম-সৌরভে মোহিত হন না, এরূপ ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। বহুকাল-বিস্মৃত সুদূর অতীতে ব্যবহৃত কোনও সূক্ষ্ম সৌগন্ধ হঠাৎ নাসিকা-রন্ধ্রে প্রবেশ করিলেই, সেই সময়ের কত-শত না পুরাতন কাহিনী মানস-চক্ষে ভাসিতে থাকে। এই নিমিত্তই বোধ হয় সকল দেশেই বিবাহে পুষ্পের ও পুষ্পশয্যার ব্যবস্থা আছে। ফুলশয্যা রজনীতে ব্যবহৃত সৌরভের ন্যায় কোনও রূপ অবিকল সৌরভ বহু দিবস পরেও যদি নাসিকায় প্রবেশ করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই শুভ রজনীর কত-শত না কথা হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকে! মনোমুগ্ধকর সৌরভ মানবের পুরাতন স্মৃতি যত শীঘ্র আনয়ন করে, এমত আর কিছুতেই করে না। এই কারণেই বোধ হয় Rudyard Kipling লিখিয়াছেন, "Smells are surer than sounds, to make the heart-strings crack."

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের এত সূক্ষ্ম ক্ষমতা যে, মৃগনাভির সৌরভ ১: ৮,০০০, ০০০, ভাগেই জানিতে পারা যায়; কর্পূরের সৌরভ ১: ৪০,০০০ ভাগে জানিতে পারা যায়; গোলাপী আতরের সৌরভ ১: ১,২০,০০০ ভাগেই জানিতে পারা যায়। Vanillin নামক পদার্থের সৌরভ ১: ১,০০০,০০০ ভাগেই জ্ঞাত হওয়া যায়। জার্ম্মান রাসায়নিক পণ্ডিত Fischer এবং Pentzoldt বলেন যে mercaptan নামক রাসায়নিক পদার্থের ঘ্রাণ ১: ৩,০০০,০০০,০০০,০ গ্রেণ থাকাতেই তাঁহাদিগের নাসিকায় প্রবেশ করিয়াছিল।

সকল মানবের ঘ্রাণশক্তি সমান নহে। অনেকে আছেন যাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ঘ্রাণের তারতম্য বুঝিতে সমর্থ নহেন। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষদিগের ঘ্রাণশক্তি অধিকতর তীক্ষ্ণ। অভ্যাস এবং অবস্থায় উহার তারতম্য হইয়া থাকে। উত্তর আমেরিকার আদিমবাসীদিগের এবং আফ্রিকা দেশের কতক অসভ্য জাতির ঘ্রাণশক্তি এত তীক্ষ্ণ যে, তাহারা প্রায় কুকুরের ন্যায় ঘ্রাণশক্তিদ্বারা তাহাদিগের শত্রুদিগকে চিনিতে পারে। যাহারা সুগন্ধি দ্রব্যাদির কারখানায় কার্য্য করে, তাহারা বিচক্ষণ হইলেই মিশ্রিত ও অমিশ্রিত সৌরভের তারতম্য বুঝিতে পারে; সাধারণ লোকে তাহা পারে না। মানব অপেক্ষা জীবজন্তুদিগের ঘ্রাণশক্তি অধিকতর তীক্ষ্ণ। কুকুরের ঘ্রাণশক্তির বিষয় প্রায় সকলেই অবগত আছেন। অনেক দেশে Bloodhound জাতীয় কুকুরের দ্বারা চোর-ডাকাত ও খুনে আসামীকে ধৃত করা হয়। মৃত্তিকায় প্রোথিত মৃত জীবজন্তুর ঘ্রাণ শকুনিগণ গগনমার্গে কয়েক ক্রোশ উচ্চে বিচরণ করিতে করিতেই জ্ঞাত হয়। প্লাইনী (Pliny) বলেন যে, যে সকল দাঁড়কাক মানবের মৃতদেহ খায়, তাহারা মানবের দেহত্যাগের দুই তিন দিবস অগ্রেই তাহা জানিতে পারে, এবং অনেক সময় ঘরের দ্বার বা জানালার উপর উড়িয়া আসিয়া বসিয়া থাকে। ইহাই সকল দেশের কুসংস্কারের ভিত্তি যে ঐরূপ কাক জানালা দরজার উপর আসিয়া বসিলে সে রোগী আর বাঁচে না, এবং ঐ কাককে যমদূত বলিয়া থাকে। অনেক পোকা মাকড় আছে যাহাদিগের গাত্র হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়। মক্ষিকারা ঘ্রাণ দ্বারা নিজ নিজ আহার সংগ্রহ করে। বিছানায় কেহ শয়ন করিয়াছে কি না, এবং কোন্ দিক হইতে ঘ্রাণ আসিতেছে, ছারপোকারা

ঘ্রাণের দ্বারা তাহা জানিতে পারে। এই নিমিত্ত তাহারা অনেক সময় মশারির চালের ঠিক মধ্যখানে আসিয়া হাত পা ছাড়িয়া দিয়া ঘুমন্ত ব্যক্তির উপর আসিয়া পড়ে। মশারা দূর হইতেই শোণিতের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া জীবজন্তুর নিকট আসে এবং শোণিত শোষণ করে। পিপীলিকার ঘ্রাণশক্তি* অতি অদ্ভুত। তাহারা জীবনের অধিকাংশ কালই মৃত্তিকাগহ্বরে আঁধার মধ্যে বাস করে বলিয়া, নানাবিধ ঘ্রাণের স্বরূপ চিনিতে পারে। ইহারা ঘ্রাণের দ্বারা জ্ঞাত হয় যে কতদূর এবং কোন্ দিক হইতে গন্ধ আসিতেছে। এই শক্তি দ্বারা তাহারা আপন আপন শ্রেণী, জাতি, স্ত্রী বা পুরুষ এবং বয়স জ্ঞাত হয়; এমন কি বৃদ্ধত্বের আগমনে দেহের গন্ধের যে তারতম্য হয়, তাহা দ্বারা তাহারা জরার আগমন জ্ঞাত হয়। মানবের এরূপ শক্তি থাকিলে জগতের অনেক উপকার হইতে পারিত। হিংস্র জন্তুরা ঘ্রাণের দ্বারা আপন আপন আহার সংগ্রহ করে। অনেক সামুদ্রিক জীবজন্তুর এবং মৎস্যাদির তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তি আছে। হাঙ্গরের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সূক্ষ্ম স্নায়ুমণ্ডলী বিস্তৃত করিলে প্রায় ১২ বর্গ ফুট হয়। জীবজন্তুরা অনেক সময় ঘ্রাণের দ্বারা যৌন-নির্ব্বাচন ক্রিয়া করিয়া থাকে। দেহতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাই প্রমাণিত করিয়াছেন যে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ই সকল ইন্দ্রিয় অপেক্ষা প্রাচীন।

জগতের মধ্যে সুগন্ধি দ্রব্যাদির প্রচলন যে কত প্রাচীন কাল হইতে হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা যায় না। তবে উহা যে সকল দেশেই দেবভোগ্য সামগ্রী ছিল, তাহা ধর্ম্মপুস্তকাদি হইতেই প্রমাণিত হইতেছে। আমাদের দেশে সকল পূজা পদ্ধতিতেই গন্ধপুষ্প ও চন্দনাদির ব্যবস্থা আছে। পারস্য দেশ হইতে উহা য়ুরোপে প্রচলিত হয়। পৃথিবীর সকল উপাসনা-মন্দিরে ধূপ-ধুনার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। Alexander the Great যখন পারস্য-সম্রাট Dariusকে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন, সেই সময় তাঁহার তাম্বুর ভিতর হইতে নানাবিধ সৌগন্ধ দ্রব্যাদি ও মলমাদি তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গ্রীস দেশেও অতি প্রাচীনকাল হইতে সুগন্ধ দ্রব্যাদির প্রচলন আছে। তাহাদিগের সকল দেবদেবীই সৌরভময়। গ্রীক রমণীরা প্রসাধনের সময় ভিন্ন-ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার গন্ধ দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতেন। তাঁহারা গণ্ডদ্বয়ে এবং বক্ষে সুগন্ধি তালের তৈল (palm oil) ব্যবহার করিতেন; চিবুকে এবং গলদেশে টাইম্ (Thyme) নামক গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করিতেন; হস্ত পদাদিতে মিণ্ট্ (mint) ব্যবহার করিতেন, কেশে এবং ভ্রূদ্বয়ে মারজোরাম তৈল (marjoram oil) ব্যবহার করিতেন এবং পোষাক পরিচ্ছদের উপর ভায়লেট্ (violet) পুষ্পসার ব্যবহার করিতেন। আমাদিগের প্রাচীন হিন্দুললনাগণও গ্রীক রমণীদিগের ন্যায় সুগন্ধি তৈলাদি, অগুরু চন্দনাদি ও পুষ্পমাল্য ব্যবহার করিতেন। আধুনিক কালেও আমাদিগের রমণীদের মধ্যে সুগন্ধি তৈলাদি, এসেন্স এবং সাবান মাখার প্রচলন এত অধিক যে, সময়ে-সময়ে আমাদিগের ন্যায় ক্ষুদ্র চাকুরে পুরুষদের অর্থের অনাটনে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। প্রাচীনকালে এথেন্স নগরীতে সুগন্ধি-দ্রব্য বিক্রেতাদের দোকানে সন্ধ্যার সময় যত যুবক-যুবতীদের বৈঠক বসিত; এবং সেইখানেই তাহাদের প্রেমালাপ প্রভৃতি চলিত; আজকাল য়ুরোপ ও আমেরিকা দেশে এই সকল ব্যাপার হোটেলে হইয়া থাকে। গ্রীসদেশে আমোদ-আহ্লাদের সময় গৃহের মধ্যে সুগন্ধি-দ্রব্যাদিতে স্নাত কপোতদিগকে উড়াইয়া দেওয়া হইত, এবং তাহাদের ডানা হইতে সুগন্ধি দ্রব্যাদি অতিথিদিগের উপর বর্ষিত হইতে থাকিত। Solon আইন করেন যে, পুরুষদিগকে কোনও প্রকার সুগন্ধি দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে না। Socrates মহাদুঃখ করিয়াছিলেন যে আতর গোলাপ মাখিয়া বাহিরে বহির্গত হইলে, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও ক্রীতদাসের মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকে না। গ্রীসদেশ হইতে ইটালির রোম নগরীতেও সুগন্ধি দ্রব্যাদির অত্যধিক প্রচলন হইয়াছিল। রাণী পপিয়ার (Poppaea) মৃত্যুতে সম্রাট নীরো (Nero) তাঁহার কবরের সময় এত অধিক পরিমাণে সুগন্ধি দ্রব্যাদি ব্যবহার করিয়াছিলেন যে, তাহা আরব দেশ হইতে এক বৎসরের মধ্যেও আমদানি হয় না। Pliny ইহাতে এত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহার চেষ্টায় একটী আইন পাশ হইয়াছিল, যাহার দ্বারা সুগন্ধি দ্রব্যাদির অত্যধিক ব্যবহার সম্পূর্ণরূপেই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। রোমের পতনের পর য়ুরোপ হইতে সুগন্ধি দ্রব্যাদির প্রচলন প্রায় একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। পরে যখন মুসলমান মুর (Moor) জাতি আসিয়া দক্ষিণ য়ুরোপ দখল করে, সেই সময় পুনরায় সুগন্ধি দ্রব্যাদির ব্যবহার প্রচলিত হয়। ভারতবর্ষে প্রায় সকল প্রাচীন গ্রন্থাদিতেই সুগন্ধি দ্রব্যাদির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় প্রত্যেক প্রাচীন কবিই তাঁহাদের রচনায় পুষ্প, অগুরু, চন্দন, চুয়া প্রভৃতি সুগন্ধি পদার্থের ব্যবহারের উল্লেখ করিয়াছেন। দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতেই সুগন্ধি দ্রব্যাদির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। খৃঃ ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে তাহারা আপন রাজাদের দেহে সুগন্ধি দ্রব্যাদি লেপন করিয়া পিরামিডের (Pyramid) ভিতর সংরক্ষণ করিত। ইহাদিগকে ইংরাজিতে Mummy কহে। অদ্যাপি কলিকাতার যাদুঘরে ঐরূপ একটী Mummy সংরক্ষিত আছে।

খৃঃ ১০ম শতাব্দীতে অভিসেন্না (Avicenna) নামক জনৈক আরববাসী বৈদ্য সর্ব্বপ্রথম পুষ্পাদি হইতে বকযন্ত্রের সাহায্যে বাষ্প দ্বারা চুয়াইয়া সুগন্ধি জল প্রস্তুত করেন। খৃঃ ১২ শতাব্দীতে সালাদিন (Saladin) যখন জেরুসালেম নগর দখল করেন, সেই সময় ওমরের মসজীদের (Mosque of Omar) সমগ্র প্রাচীর গোলাপজলের দ্বারা ধৌত করাইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের মুসলমান বাদশাহদিগের সুগন্ধি দ্রব্যাদি ব্যবহারের বিষয় কাহারও অবিদিত নাই। তৎকালে সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীরা অধিক পরিমাণে সুগন্ধি-দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতেন বলিয়া মুসলমান বাদশাহরা তাঁহাদিগকে 'বাবো' নাম দিয়াছিলেন। উহা পারস্য কথা; 'বা' মানে 'সহিত' এবং 'বো' মানে 'সুবাস'। 'বাবো' শব্দই কালে 'বাবু' শব্দে পরিণত হইয়াছে এবং আধুনিক ইংরাজদিগের আমলে 'বাবু'

* W. M. Wheelers—"Ants."

মানে মাছিমারা কেরাণী হইয়াছে। আগে ইহা সম্মানসূচক কথা ছিল, আজকাল ইহা অপমানসূচক হইয়াছে। মুরজাতিদের নিকট হইতে ফরাসীরা সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবহার শিক্ষা করে। ফরাসী সম্রাট পঞ্চদশ লুইর সময়েই ইহার ব্যবহার চরমে উঠে। তাঁহার রক্ষিতা বারবিলাসিনী মাডাম্ ডি পম্পাডুর (Madame de Pompadour) বৎসরে ৪০,০০০ টাকা কেবল মাত্র গন্ধ-দ্রব্যাদিতেই—খরচ করিতেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে প্রতিদিন রাজসভাগৃহ ভিন্ন-ভিন্ন রকমের সুগন্ধের দ্বারা সুবাসিত করা হইত। ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের সময় ডিউক অফ অক্সফোর্ড সর্ব্বপ্রথম ফরাসী দেশ হইতে সুগন্ধি দ্রব্যাদি আনয়ন করিয়া তাহার প্রচলন করেন। ইংলণ্ডেও উহার ব্যবহার অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই কারণে ১৭৭০ খৃঃ ঐ দেশের পার্লামেণ্ট নামক মহা সভা আইন করেন যে, "যে কোনও সম্ভ্রান্ত বা নিম্ন শ্রেণীর, দরিদ্র বা চাকুরে, যুবতী, প্রৌঢ়া বা বিধবা স্ত্রীলোক, এই আইন প্রচারের পর কোনও পুরষ মানুষকে সুগন্ধ দ্রব্যাদি ব্যবহারের দ্বারা বা পরচুল পরিধানের দ্বারা বা উচ্চ গোড়ালী যুক্ত জুতা ব্যবহারের দ্বারা বশীভূত করিয়া বিবাহ করিবে, তাহার সেই বিবাহ আইন সঙ্গত বা মঞ্জুর হইবে না। এবং তৎকালে প্রচলিত আইন অনুসারে যাদুকরীদের যেরূপ কঠিন দণ্ড হয়, তাহাদিগের সেইরূপ দণ্ড হইবে।" আজকাল কিন্তু এমন সভ্য দেশ নাই, যেখানে সুগন্ধ দ্রব্যাদির প্রচলন নাই। ইহার প্রস্তুত করিবার জন্য কত দেশে কত-শত কল-কারখানা নির্ম্মিত হইয়াছে। কত-শত রসায়নবিদ্ পণ্ডিত নূতন-নূতন সৌরভ আবিষ্কার করিবার নিমিত্ত আপন জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। স্বভাবজাত সুগন্ধি দ্রব্যাদি ব্যতীত 'নকল উপায়ে আল্‌কাৎরা হইতে উৎপন্ন কত প্রকার সুগন্ধি দ্রব্যাদি বাজারে বিক্রীত হইতেছে।

সুগন্ধি দ্রব্যাদি প্রায় নিম্নলিখিত উপায়ে সকল দেশে প্রস্তুত হয়।

১। বাষ্প সাহায্যে চুয়াইয়া গন্ধসার বাহির করিয়া লওয়া হয়। কোনও বদ্ধ পাত্রের মধ্যে সুগন্ধ কুসুমাদি রাখিয়া তাহার ভিতর বাষ্প প্রবিষ্ট করাইলে, ঐ বাষ্প বাহিরে আসিয়া জলে পরিণত হইয়া গেলে পর, তাহা হইতে পুষ্পসার বা আতর এবং গন্ধজল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

২। কোনও দ্রবকারী বস্তুর, যেমন পেট্রোলিয়ম্, ঈথার, বেন্‌জিন্ প্রভৃতি দ্রব্যাদি সাহায্যে গন্ধ দ্রব্যাদির সৌরভ আহরণ করিয়া লইয়া, পুনরায় ঐসকল দ্রবকারী পদার্থকে অল্প উত্তাপে পৃথক করিয়া লইয়া সুগন্ধি বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়; এইরূপে প্রাপ্ত সুগন্ধি বস্তু হইতে স্পিরিট্ সাহায্যে আতর বা গন্ধসার বাহির করিয়া লওয়া হয়।

৩। তপ্ত তৈল বা চর্ব্বি প্রভৃতিতে সুগন্ধ পুষ্পাদি ভিজাইয়া রাখিয়া তাহা হইতে স্পিরিট্ সাহায্যে গন্ধসার দ্রব্যটুকু আহরণ করিয়া লওয়া হয়। এইরূপ চর্ব্বি বাজারে 'পমেটম্' নামে অভিহিত। শীতল তৈল ও চর্ব্বির দ্বারাও কয়েক প্রকার পুষ্পাদি হইতে ঐ প্রকরে গন্ধসার আহরণ করা যায়। আমাদের দেশে জৌনপুর, কনৌজ প্রভৃতি সহরে যে ফুলেল তৈল প্রস্তুত হয়, তাহা কেবল ধৌত তিলের সহিত সুগন্ধ পুষ্পাদি রাখিয়া দিয়া সেই তিল হইতে তৈলটা বাহির করিয়া লওয়া মাত্র। যতদিন ধরিয়া যত অধিক পুষ্প ব্যবহার করা যাইবে তৈলের সুবাসও তত অধিক হইবে। এ দেশে প্রায় তৈলের জন্য চামেলী ও মতিয়া পুষ্পই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চামেলী তৈল ব্যবহারে মস্তিষ্ক খুব ঠাণ্ডা থাকে। গাজীপুর ও হাত্রাস্ সহরে গোলাপী আতর ও গোলাপজল অধিক পরিমাণে তৈয়ার হয়।

অজড় রসায়ন শাস্ত্রে পণ্ডিতগণ স্বভাবজাত সৌগন্ধের কারণ নির্ণয় করিতে পারিয়াছেন। সেই নিমিত্ত আজকাল নকল উপায়ে নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতেছে। য়ুরোপ মহাসমরে যে মারাত্মক ফস্‌জিন্ গ্যাস (Phosgene) ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা হইতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা সুন্দর ভায়লেট্ পুষ্পের সৌরভ প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার রাসায়নিক নাম Methye heptine carbonate.

পুষ্পাদি হইতে গন্ধসার বাহির করা ফরাসীদেশে একটা খুব বড় ব্যবসা। জার্ম্মানদেশে আল্‌কাৎরা হইতে রাসায়নিক উপায়ে নকল সৌরভ প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয়। দক্ষিণ ফ্রান্সদেশে গোলাপ ফুল, যুঁই ফুল, কমলালেবুর ফুল প্রভৃতি নানাবিধ সুরভি কুসুম হইতে গন্ধসার বা আতর প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত অনেক কলকারখানা আছে। বুলগেরিয়া ও তুরস্কদেশে গোলাপী আতর যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হয়। সুরভি কুসুম হইতে কি পরিমাণে আতর প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার কথঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত দেখান গেল:—

১। অর্দ্ধসের গোলাপী আতর প্রস্তুত করিতে ২২০/ মণ গোলাপ ফুল আবশ্যক। ২২০/ মণ গোলাপ ফুল সংখ্যায় প্রায় ২৫০০০০০।

২। অর্দ্ধসের নিরোলির আতর (oil Neroli petal) প্রস্তুত করিতে ১২/ মণ কমলালেবুর কুসুম আবশ্যক। ইহা সংখ্যায় প্রায় ৫,০০,০০০ লক্ষটী পুষ্প হইবে।

ঐরূপ সকল প্রকার সুরভি কুসুম হইতে অতি অল্প পরিমাণে আতর প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কারণে বিশুদ্ধ আতর বা পুষ্পসার এত মহার্ঘ্য। আমাদের দেশে উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে পুষ্পসারাদি প্রস্তুতের কোনও কল কারখানা নাই। একা জার্ম্মান দেশে প্রতি বৎসর তিন কোটী টাকার নকল সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত হয়। এই নিমিত্ত আমাদের দেশের লোকদের এ বিষয়ে মনঃসংযোগ করা বিশেষ আবশ্যক। আমাদের দেশে এত প্রকার সুগন্ধি পুষ্পাদি থাকিতেও আমাদের যে বৎসরে বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকার বিদেশীয় সুগন্ধি দ্রব্যাদি আমদানী করিয়া ব্যবহার করিতে হয়, ইহা বড় লজ্জার কথা।

রসায়ন-শিল্প

শ্রীআশুতোষ দত্ত বি-এস্‌সি

জম্বীর দ্রাবক; (CITRIC ACID)

প্রায় সকল প্রকার লেবুর রসে অল্পাধিক জম্বীর দ্রাবক আছে। আমাদের ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই প্রচুর পরিমাণে লেবু উৎপন্ন হয়। এমন

অনেক স্থান আছে, যেখানকার উৎপন্ন লেবুর সামান্য অংশ মাত্র মানুষের ব্যবহারে লাগে ও অবশিষ্ট পচিয়া নষ্ট হয়। কিন্তু এই সকল লেবু হইতে জম্বীর দ্রাবক, লেবুর গন্ধসার (essence of lemon) ও তৈল (oil of lemon) প্রস্তুত করিতে পারিলে, আর বিদেশ হইতে এ সকল জিনিস আমদানী করিবার প্রয়োজন হয় না। উপরন্তু কয়েকজন স্বদেশবাসীর অন্ন-সংস্থান হয় ও দেশের অর্থ দেশে থাকিয়া যায়। আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকগণ যাঁরা চাকরীর মোহে অন্ধ হইয়া দ্বারে-দ্বারে উমেদারী করিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁরা যদি সেই মোহ-আবরণ অপসারিত করিয়া এরূপ ছোট-ছোট শিল্পে আত্মনিয়োগ করেন, তাহা হইলে আর তাঁদের চাকরীর হীনতা স্বীকার করিতে হয় না ও অভাবের তাড়নায় পিষ্ট হইতে হয় না।

অম্লরস যুক্ত যে কোনও প্রকার লেবুর রস হইতে জম্বীর দ্রাবক প্রস্তুত করা যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতের প্রতি প্রদেশে, অরণ্যে ও উপত্যকায় প্রচুর পরিমাণে লেবু জন্মে। বড় সহর বা সহরের উপকণ্ঠে লেবু কিছু মহার্ঘ বটে, কিন্তু পল্লীগ্রামসমূহে ইহা অতি অল্প মূল্যে পাওয়া যায়। পাতি, কাগজী, গোঁড়া, চীনা গোঁড়া, কমলা, রংপুরী টাবা, আরবী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের লেবু বাংলা দেশের সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন পঞ্জাব প্রদেশে গলগল বা কর্ণ নামে একপ্রকার লেবু হয়। ইহার এক-একটীর ওজন ১০ছটাক হইতে পাঁচপোয়া পর্য্যন্ত হয়। ইহার খোসা খুব পুরু। অপরিপক্ক অবস্থায় ইহার রস বেশ অম্ল। এই লেবুর শতকরা ৪৫ হইতে ৫০ ভাগ রস ও সেই রসে শতকরা ৬ হইতে ৭ ভাগ জম্বীর দ্রাবক থাকে। শিয়ালকোট, গুজরানওয়ালা, শেখপুরা, লাহোর, জলন্ধর, পাতিয়ালা, কুমায়ুন, সাহারণপুর ও নেপালের পাদদেশে এই লেবু প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। জলন্ধর সহরের নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে ও পাতিয়ালা ষ্টেটের অন্তর্গত সিরহিন্দ নামক স্থানে এই লেবু এত অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে যে, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে সেখানে উহা ২॥০।৩৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় হয়। স্থানীয় আচার ব্যবসায়িগণ এই সকল লেবু ক্রয় করিয়া থাকে। যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত এটোয়া, আগ্রা, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেনারস প্রভৃতি সহরের নিকট ও পঞ্জাব প্রদেশের লুধিয়ানা অঞ্চলে খাটাই বা বেহারী খাটাই নামে এক প্রকার তীব্র অম্লরস বিশিষ্ট লেবু পাওয়া যায়। এই লেবু দেখিতে ঠিক কমলালেবু বা গোঁড়া লেবুর ন্যায়। সম্ভবতঃ ইহা গোঁড়া লেবুর প্রকারভেদ মাত্র। ইহার খোসা পাতলা হয়। ইহাতে শতকরা ৫০—৫৫ ভাগ রস থাকে এবং ঐ রস হইতে শতকরা ৭·৩ হইতে ৮·৬ ভাগ জম্বীর দ্রাবক পাওয়া যায়। লুধিয়ানার নিকট এই লেবু ২॥০ টাকা মণ দরে বিক্রয় হয়। বাংলা দেশের গোঁড়া লেবুর রসে শতকরা ৬·২ হইতে ৬·৮ ভাগ ও পাতি লেবুর রসে ৫·৮ ভাগ হইতে ৬·৩ ভাগ জম্বীর দ্রাবক থাকে। এখন দেখা যাক্ কি উপায়ে লেবুর রস হইতে দ্রাবক প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

ছুরির সাহায্যে লেবুর খোসা ছাড়াইয়া, উহাকে দুই খণ্ড করিয়া কাটিয়া, কোনও কাঠের টবে রাখিতে হয়; খোসাগুলিও পৃথক পাত্রে সঞ্চয় করিতে হয়। কারণ, এই খোস হইতে লেবুর গন্ধসার বা তৈল প্রস্তুত হইবে। অতঃপর আরক-চাপযন্ত্র (Tincture Press) বা সেই প্রকারের কোনও যন্ত্র-সাহায্যে চাপ দিয়া লেবুর রস বাহির করিতে হয়। সাধারণতঃ লেবুর তাজা রসে উহার মিষ্টতা হিসাবে শতকরা ৭ হইতে ৯ ভাগ দ্রাক্ষ-শর্করা (Glucose), ০·২ হইতে ০·৪ ভাগ ইক্ষুশর্করা (Cane Sugar), ৪·৬ হইতে ৯ ভাগ জম্বীর দ্রাবক ও ০·৫ হইতে ০·৭ ভাগ বিবিধ অজৈব বা ধাতব লবণ (Inorganic Salts) পাওয়া যায়। ধাতব লবণ ও শর্করাদি থাকার জন্য লেবুর রস গাঢ় করিয়া জম্বীর দ্রাবকের দানা (Crystals) জমান যায় না, এজন্য লেবুর রস হইতে এই সকল দ্রব্য পৃথক করিতে হয়।

যেখানে লেবু খুব সস্তা অথচ জম্বীর দ্রাবক প্রস্তুতের উপকরণের বিশেষ অভাব, সেখানে লেবুর রস আগুনের তাপে জ্বাল দিয়া ১·২৪ হইতে ১·২৮ আপেক্ষিক গুরুত্ব পর্য্যন্ত গাঢ় করিয়া মোটা কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া কাঠের পিপায় ভরিয়া সুবিধামত স্থানে প্রেরণ করা যায়। এরূপ অবস্থায় ইহার রং ঝোলা গুড়ের মত কাল হয় ও ইহার প্রতি গ্যালনে প্রায় ৮।৯ পাউণ্ড জম্বীর দ্রাবক থাকে। এই গাঢ় রস বহুদিন পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায়। সিসিলি, ক্যালেব্রিয়া প্রভৃতি স্থান হইতে এই প্রকার গাঢ় রস প্রচুর পরিমাণে ইংলণ্ড, জার্ম্মানি প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হয় ও সেখানে উহা হইতে জম্বীর দ্রাবক প্রস্তুত হয়। ইহাকে agrocotto বলে। দ্রাবকের অনুপাতে agrocotto র মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু যেখানে লেবু সুলভ ও দ্রাবক প্রস্তুত করিবার আসবাবের অভাব নাই, সেখানে লেবুর রস অত গাঢ় করিবার প্রয়োজন হয় না। রসটা আধঘণ্টা কাল ফুটাইয়া ছাঁকিয়া লইলেই চলে। এই প্রক্রিয়ায় শ্বেতসার প্রভৃতি কয়েকটী পদার্থ পৃথক হয়।

একটী কাঠের টবের মধ্যে ২০ গ্যালন পরিষ্কার জল রাখিয়া উহার সহিত ৪ গ্যালন গাঢ় রস প্রায় আধঘণ্টা কাল মিশাইয়া ৭।৮ ঘণ্টা রাখিতে হয়। রসস্থ শর্করা পচিয়া (fermented) সুরায় পরিণত হয় ও রসের অন্যান্য ময়লা কাটিয়া গিয়া বেশ পরিষ্কার হয়। এখন ঐ টবের মধ্যে একটা কুণ্ডলাকার সীসার নালী (lead coil) রাখিয়া তাহার মধ্য দিয়া শীতল জল চালিয়া দ্রব্যটীকে সেন্টিগ্রেডের ৫° ডিগ্রি তাপ পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা করিতে হয়। এই অবস্থায় রসের মধ্যস্থ অধিকাংশ আটাবৎ পদার্থ (Mucilaginous Matter) পৃথক হয়। অতঃপর উহার সহিত সামান্য ট্যানিক দ্রাবক অথবা হরিতকী ভিজান জল মিশাইলে এই আটাবৎ পদার্থ ঘনীভূত হয় ও আর দ্রাবকে দ্রব হয় না। পরে এই দ্রবটী চাপছাঁকন্ যন্ত্র (Filter Press) অথবা মোটা কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া অপর একটী কাঠের টবের মধ্যে ঢালা হয়। এই টবের মধ্যে একটী সচ্ছিদ্র কুণ্ডলাকার সীসার নালীর (Perforated leadcoil) থাকে ও সেই নালীর মধ্য দিয়া জলীয় বাষ্প (Steam) চালিত করিয়া দ্রবটীকে উত্তপ্ত করা হয়। উপযুক্ত যন্ত্র-সাহায্যে এই দ্রব্য হইতে সুধাসার বাহির করিয়া লওয়া যায়। বাষ্প সহযোগে দ্রব্যের সুরাসার

বাষ্পে পরিণত করিয়া বাষ্প ঘনীকরণ যন্ত্রের (condenser) মধ্য দিয়া চালিত করিতে হয়। এই বাষ্প ঘনীকরণ যন্ত্রটী সর্ব্বদা শীতল জল দ্বারা ঠাণ্ডা রাখিতে হয়। সুরাসারের বাষ্প শীতল হইয়া ঘনীভূত হয় ও উপযুক্ত আধারে সঞ্চিত হয়।

এখন ঐ ফুটন্ত দ্রবের সহিত গাঢ় চূণ গোলা (milk of lime) অথবা চা খড়ির মিহি গুঁড়া মিশাইয়া ঠিক ঠিক ভাবে উহার অম্লত্ব নষ্ট করিতে হইবে। চা খড়ির সাহায্যে অম্লনাশ (Neutral) করিলে অধিক ফেনা হয় ও উপচিয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু এই প্রকারে যে জম্বীর চূর্ণক (calcium citrate) পাওয়া যায়, তাহা বিশুদ্ধ। অন্যদিকে চূণের গোলা বা আহক (Quick lime) দিয়া অম্লনাশ (Neutral) করিলে উহার সহিত অন্যান্য ধাতব পদার্থ থাকায় জম্বীরচূর্ণকের বর্ণ ময়লা হয় ও অনেক অসুবিধা উৎপন্ন হয়। কখন-কখনও ১ভাগ চা-খড়ি ও ২ভাগ চূণের গোলা মিশাইয়া তদ্দারা অম্লনাশ (Neutral) করা হয়। প্রতি একশত ভাগ জম্বীর দ্রাবকে ৪৫ ভাগ পাথুরের চূণ অথবা ৫৭ ভাগ আহক বা ফোটান চূণ অথবা ৮০ ভাগ চা-খড়ি মিশাইবার প্রয়োজন হয়। চূণ বা খড়ি মিশাইয়া কিয়ৎকাল উত্তমরূপে নাড়াচাড়া করিয়া উহা থিতাইতে দিলে অদ্রবনীয় (insoluble) জম্বীর চূর্ণক টবের তলায় জমে। এখন এই জম্বীর চূর্ণক চাপ ছাঁকন যন্ত্র অথবা মোটা কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া ১০ মিনিট ফুটন্ত জলে, ১০ মিনিট ঈষদুষ্ণ ও ১০ মিনিট শীতল জলে ধুইতে হইবে। ধৌতজল যেন বর্ণহীন হয়; নতুবা পুনরায় উহা শীতল জলে ধৌত করিতে হয়। অতঃপর একটি সীসার চাদরে মোড়া কাটের টবের মধ্যে জম্বীর চূর্ণক রাখিয়া উহার সহিত প্রায় ১৫ গ্যালন শীতল জল মিশাইতে হয়। অপর একটী সীসার চাদরে মোড়া টবে এক ভাগ গন্ধক দ্রাবক (sulphuric acid) ও ৪ ভাগ জল মিশাইয়া ১৬ গ্যালন করিতে হইবে। এই তরলিত দ্রাবক ধীরে ধীরে জম্বীর চূর্ণক দ্রাবকের সহিত মিশাইতে হয়। প্রতি মিনিটে পাঁচ পাউণ্ডের অধিক দ্রাবক মিশান উচিত নয়। এইরূপে গন্ধক দ্রাবক মিশাইতে-মিশাইতে জম্বীর চূর্ণক হইতে সমস্ত চূণ দ্রাবকের সহিত মিশিয়া অধঃনিক্ষিপ্ত হয় ও জম্বীর দ্রাবক জলের সহিত মিশিয়া থাকে। সাধারণতঃ ৪ গ্যালন গাঢ় দ্রাবকরসে অথবা ৩৫ গ্যালন অল্প ফুটান পাতলা রসে প্রায় ১৪ হইতে ১৬ গ্যালন গন্ধক দ্রাবক দ্রব প্রয়োজন হয়। গন্ধক দ্রাবক সামান্য বেশী মিশান বাঞ্ছনীয়। কম হইলে অপরিবর্ত্তিত জম্বীর চূর্ণক দানা জমিবার পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ হয়। গন্ধদ্রাবক মিশাইবার সময় দ্রবটী বাষ্প দ্বারা গরম করিতে ও নাড়িয়া চাড়িয়া দিতে হয়। প্রায় ১৫ মিনিটকাল ফুটাইবার পর চাপ ছাকনযন্ত্র বা কাপড় দিয়া ছাকিয়া কাপড়ের উপরস্থ চূর্ণকগন্ধক (Calcium Sulphate) গরম জলে ধুইতে হয়। এই ধোয়ানী জল জম্বীর দ্রাবক দ্রবের সহিত মিশাইতে হয়। চূর্ণকগন্ধকটী পুনরায় ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ধোয়ানী জলটী পৃথক পাত্রে রাখিতে হয়। এই ধোয়ানী জলে জম্বীরচূর্ণক দ্রব করা হয়। ৪ ফুট লম্বা ২॥০ ফুট প্রস্থ ও ১০ ইঞ্চি গভীর একটী সীসার কড়ায় জম্বীর দ্রাবক দ্রবটী বাষ্পতাপে শুখাইতে হয়। শুখাইবার কালে দুইটী বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। প্রথমতঃ উহার তাপ যেন সেন্টিগ্রেডের ৭০° ডিগ্রীর অধিক না হয়। দ্বিতীয়তঃ এই শুকান কার্য্য সত্বর শেষ করিতে হয়। এইরূপে জল শুকাইয়া যখন ঐ দ্রবের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১·৩ হয়, তখন আরও চূর্ণক-গন্ধক (Calcium Sulphate) পৃথক হইয়া তলায় পড়ে। অতঃপর পরিষ্কার দ্রবটী বক্রনল (syphon) সাহায্যে পৃথক করিয়া, পূর্ব্বোক্ত প্রকারের আর একটা সীসার কড়ায় গাঢ় করিতে হয়। গাঢ় করিতে-করিতে যখন দ্রবের উপরে সর পড়িবে, তখন দ্রবটী একটী কাঠের চৌকষ পাত্রে ঢালিয়া দানা বাঁধিতে দেওয়া হয়। এই কাঠের পাত্রটির ভিতর দিকটা সীসার চাদরে মোড়া থাকে; অথবা কালসীসা (Graphite বা Plumbago) দ্বারা মাজা বা পালিশ করা হয়। প্রায় ২।৩ দিন পরে জম্বীর দ্রাবকের দানাগুলি পাটকিলে রংএর দ্রব হইতে উঠাইয়া লইয়া কেন্দ্রাপসারিণী-জল নিষ্কাষণ যন্ত্র (centrifugal Hydroxtreator) দ্বারা শুকাইয়া লওয়া হয়। অবশিষ্ট দ্রব হইতে দ্রবীভূত লৌহ পৃথক করিতে হইলে, ঐ দ্রবের সহিত কিঞ্চিৎ পীত লোহাঙ্গার (Potassium Ferocyanide বা yellow prussiate of Potash) মিশাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হয়। দুই-তিনবার দানা বাঁধাইবার পর অবশিষ্ট দ্রবটী তাজা লেবুর রসের সহিত মিশাইয়া দিতে হয়। অধুনা ইয়োরোপের প্রায় সকল জম্বীর দ্রাবকের কারখানাতে ও আমেরিকায় চূর্ণক-গন্ধক পৃথক করিবার পর দ্রবটী শূন্যীকৃত কটাহে (vacuum pan) গাঢ় করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় অতি অল্প তাপে সত্বর গাঢ় করা যায়। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে দানা পাওয়া যায়, উহার রং পাটকিলে। সুতরাং উহা বাজারে চলে না। এই পাটকিলে রংএর দানা বর্ণহীন করিতে হয়। এজন্য হাড়ের কয়লা দরকার। খানিকটা হাড়ের কয়লা লবণ-দ্রাবক (Hydrochloric acid) দিয়া ধুইয়া, পরে পরিষ্কার জলে ভাল করিয়া ধুইতে হয়। এক ভাগ জম্বীর দ্রাবকের দানার সহিত দুই ভাগ জল মিশাইয়া, উহার সহিত এই হাড়ের কয়লা মিশাইয়া ফুটাইয়া ছাঁকিতে হয়। পরে পরিষ্কার দ্রবটী অতি অল্প বাষ্প-তাপে অথব শূন্যীকৃত কটাহে গাঢ় করিয়া দানা বাঁধান হয়।

উল্লিখিত প্রক্রিয়া ব্যতীত আর এক প্রকারে জম্বীর দ্রাবক ও জম্বীরের গন্ধসার (essence of lemon) প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এ প্রক্রিয়ায় খোসা সমেত লেবু টুকরা-টুকরা করিয়া কাটিয়া জলচাপ-যন্ত্র (Hydraulic Press) অথবা আরকচাপ-যন্ত্র (Tincture Press) সাহায্যে উহার রস বাহির করা হয়। এই রস সেন্টিগ্রেডের ৬০° ডিগ্রী তাপে শূন্যীকৃত বকযন্ত্রে (vacuum still) রাখিয়া চুয়ান হয়। এইরূপে উহা হইতে গন্ধতৈল চুয়াইয়া নির্দ্দিষ্ট পাত্রে সঞ্চিত হয়। এখন উহাকে ৭০° তাপে গাঢ় করিয়া, উহার ওজনের দশমাংশ থাকিতে নামাইয়া ঠাণ্ডা করা হয়। ঠাণ্ডা হইলে উহার সহিত সুরাসার ও ইথার মিশাইয়া ভাল করিয়া নাড়াচাড়া করিলে সুরাসার মিশ্রিত ইথারে জম্বীর দ্রাবক দ্রবীভূত হয় ও অন্যান্য পদার্থ অদ্রব অবস্থায় থাকে। এই

সব ছাঁকিয়া লইয়া বকযন্ত্র সাহায্যে সুরাসার ও ইথার চুঁয়াইয়া লইলে যে অবশিষ্টাংশ থাকে, তাহা জলে গুলিয়া পুনরায় ছাঁকিয়া শুষ্কীকৃত কড়ার গাঢ় করিয়া একদিন রাখিয়া দিলে পাটকিলে রং-এর দানা জন্মে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে এই দানা বর্ণহীন করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় লেবুর রসস্থ জম্বীর দ্রাবকের শতকরা ৮০।৭০ ভাগ পাওয়া যায়; অবশিষ্ট জম্বীর দ্রাবক চূণের সহিত মিশাইয়া প্রথম প্রণালীতে প্রস্তুত করিতে হয়।

লেবুর রস ব্যতীত দ্রাক্ষা-শর্করা (Glucose), শ্বেতসার প্রভৃতি হইতে সংশ্লেষণ প্রণালীতে (Synthetically) জম্বীর দ্রাবক প্রস্তুত করা যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভবপর নহে।

সেণ্টিগ্রেডের ১৩৫° তাপে জম্বীর দ্রাবক দ্রবীভূত হয় ও ১৫৫° তাপে বিশ্লিষ্ট হইয়া এ্যাসিটোন (acetone), এ্যাকো-নাইটিক এ্যাসিড (aconitic acid), Itaconic acid, citraconic anhydride ও অঙ্গার ম্বাম্লে পরিণত হয়। প্রতি ১০০ ভাগ জলে ১৫° তাপে ১৩৩ ভাগ ও ফুটন্ত জলেরতাপে ২০০ ভাগ জম্বীর দ্রাবক দ্রবীভূত হয় এবং প্রতি ১০০ ভাগ সুরাসারে ৫৩ ভাগ ও ১০০ ভাগ ইথারে ৯ ভাগ দ্রব হয়। জলের সহিত দীর্ঘকাল ফুটাইলে, ইহার সামান্য অংশ aconitic acidএ পরিণত হয়। জম্বীর দ্রাবক অতি সহজেই অম্লজান যুক্ত হইয়া acetone, আমরুল দ্রাবক (oxalic acid) ও অঙ্গার ম্বাম্লে পরিণত হয়।

রঞ্জন-শিল্প (Dying), ঔষধ, রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও সরবং প্রভৃতি স্নিগ্ধকর পানীয় প্রস্তুত করিবার জন্য জম্বীর দ্রাবক ব্যবহৃত হয়।

জম্বীর দ্রাবক প্রস্তুত করিবার আয় ব্যয়ের হিসাবের আভাষ নিম্নে লিখিত হইল।

প্রাথমিক ব্যয়

একটী ৫০ পাউণ্ড চাপের বয়লার———	১২০০৲
একটী আরকচাপ যন্ত্র——	৭০৲
৮টা সীসার কড়া——	২৫০৲
২টা সীসার চাদরে মোড়া কাঠের টব——	১৫০৲
৪টা কাঠের টব——	৪০৲
সীসার নালী——	১২০৲
অন্যান্য সরঞ্জাম——	১৩০৲
মোট—	১৯৬০৲

দৈনিক কার্য্য চালাইবার খরচ

১০ মণ বিহারী খাটাই লেবু প্রতি মণ	
৩৲ হিঃ—	৩০৲
রস প্রস্তুত করিবার খরচ—	২।০
১২। সের চা খড়ি প্রতি মণ	
৫৲ হিঃ—	১৸/০
১২॥ সের গন্ধক দ্রাবক	
প্রতি মণ ১০৲ হিঃ—	৩৵০
৪/০ মণ পাথুরে কয়লা	
প্রতি মণ ৸০ হিঃ—	৩৲
১জন মিস্ত্রী মাসিক ৬০৲ হিঃ	
একদিনে—	২৲
৪ জন মজুর দৈনিক ।।০ হিঃ—	২৲
আনুসঙ্গিক খরচ—	১।।০
মোট—	৪৫।।৵০

দৈনিক উৎপন্ন মাল ও [illegible]

১০ মণ লেবু হইতে প্রায় ৫/০ মণ রস" উহার শতকরা ৬ ভাগ দ্রাবক হিসাবে মোট ১২ সের দ্রাবক পাওয়া যায়। এই দ্রাবক প্রতি সের ৫৲ হিসাবে বিক্রয় করা যায়। সুতরাং ১২ সের দ্রাবক হইতে ৬০৲ পাওয়া যাইবে।

লেবুর খোসাতে শতকরা ০.২৬ হইতে ০.৩৫ ভাগ গন্ধ তৈল আছে। খোসাগুলি চাপযন্ত্র দ্বারা নিংড়াইয়া উহার তৈল বাহির করা হয়। ১০ মণ লেবু হইতে প্রায় এক পাউণ্ড তৈল পাওয়া যায় ও উহা প্রায় ৩৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইবে।

এখন মোট আয় হইল—	৬৩৲ টাকা
ব্যয়—	৪৫।।৵০
দৈনিক লাভ	২০।/০

মাসে ২৪ দিন কাজ করিলে মাসিক লাভ—২০।/০ × ২৪ = ৪৮৭।।০ এইরূপে একজন লোক মাসে প্রায় ৫০০৲ টাকা উপায় করিতে পারে। যখন লেবুর ফসল হয়, তখন উহার রস গাঢ় করিয়া অথবা জম্বীর চূর্ণকে পরিণত করিয়া রাখিলে, সারা বৎসর কাজ চালান যায়।

প্রতি বৎসর পৃথিবীতে প্রায় ৪০০০ টন বিশুদ্ধ জম্বীর দ্রাবক উৎপন্ন হয়। উহার মূল্য প্রায় ২।। কোটি টাকা। ইহার মধ্যে

আমেরিকা প্রায়—	১২০০ টন
জার্ম্মানী—	৭০০ টন
ফ্রান্স—	৩০০ টন
ইটালী—	৮০০—১২০০ টন
ইংল্যাণ্ড—	৮০০—১০০০ টন

প্রস্তুত করিয়া থাকে। আমেরিকা ব্যতীত সকল দেশেই সিসিলি ও স্পেন হইতে জম্বীর চূর্ণক ও agrocotto আমদানী করিয়া দ্রাবক প্রস্তুত করে। কেবল সিসিলি হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ১০০০ টন জম্বীর চূর্ণক বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়। বিগত মহাসমরের সময় এই জম্বীর চূর্ণক প্রতি টন ৫০০০৲ হিসাবে বিক্রয় হইয়াছিল।

১৯২০ খৃঃ এপ্রিল হইতে ১৯২১ খৃঃ জানুয়ারী পর্য্যন্ত ১০ মাসে ভারতে ৭৪৫ হন্দর জম্বীর দ্রাবক ১২৩১৫৫৲ টাকার বিনিময়ে আমদানী হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষের এপ্রিল ও মে এই দুই মাসে ৬২৩৪ টাকার মাত্র ২৭ হন্দর জম্বীর দ্রাবক ভারতে আমদানী

নায়েব মহাশয়

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

একাদশ পরিচ্ছেদ

জ্যোৎস্না রায়ের কথা পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে— যে 'তায়েননবিশ' ঘোড়ায় চড়িয়া, সেই ঘোড়ার ল্যাজের দিকে শ্রীনাথ আমিনকে তুলিয়া লইয়া আমিনী কার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইত। এই 'শিক্ষানবীশ আমিনের' পিতা গোলোক রায় ও পিতৃব্য ভুবন রায় উভয়েই দুইটি ক্ষুদ্র নীলকুঠির দেওয়ান ছিল। নীলকুঠির দেওয়ানেরা কি প্রকৃতির লোক, তাহার অনতিরঞ্জিত অথচ উজ্জ্বল চিত্র চিরস্মরণীয় চিত্রকর দীনবন্ধুর অতুলনীয় তুলিকায় অঙ্কিত হইয়া 'নীলদর্পণে'র অঙ্কে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ইহারা সকলেই এক ছাঁচে ঢালা! দীনবন্ধু শ্লীলতার অনুরোধে নররূপী পিশাচের চরিত্রের যে অংশ পরিস্ফুট করিয়া দেখাইতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন, তাহার বর্ণনা দ্বারা বীভৎস রসের অবতারণার লেখনী কলঙ্কিত করিবার আগ্রহ আমাদের নাই; তবে এই দেওয়ান-ভ্রাতৃদ্বয়ের চরিত্রের একটা মোটামুটি পরিচয় না দিলেও আমাদের চিত্র অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। কদর্য্য রোগে আক্রান্ত রোগীর গোপন অঙ্গের বিষাক্ত ক্ষতে ছুরিকা চালনা করিবার সময় চিকিৎসককে শ্লীলতার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে হইলে তাঁহার কর্ত্তব্য অসম্পন্ন থাকিয়া যায় না কি?

ইঙ্গিতে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, গোলোক রায় ম্যানেজার হাম্‌ফ্রি সাহেবের স্বার্থসিদ্ধি ও মনোরঞ্জনের জন্য কোন অপকার্য্যেই কুণ্ঠিত হইত না, বরং অসঙ্কোচে সর্ব্ব প্রকার কুকর্ম্ম করাই সে কার্য্যদক্ষতার নিদর্শন মনে করিয়া স্বকৃত কার্য্যে গৌরব অনুভব করিত! একবার সে অম্লান বদনে গোহত্যা করিয়া কৈফিয়ৎ দিয়াছিল, গোরু ও ভেড়ায় কোন প্রভেদ নাই; ছাগল ভেড়া বধ করিলে যখন পাপ হয় না, তখন গোহত্যা পাপের কার্য্য, এরূপ মনে করা নিতান্তই কুসংস্কার! যাহার মনিবের এই কুসংস্কার নাই, তাঁবেদার হইয়া তাহার এরূপ কুসংস্কার থাকা বড়ই দোষের কথা। গোলোক রায় গো-ব্রাহ্মণকে সমশ্রেণীর জীব মনে করিত; এইজন্য প্রভুর কার্য্যোদ্ধারের উদ্দেশ্যে একবার একটি ব্রাহ্মণকেও ইহলোক হইতে অপসারিত করিতে বাধ্য হইয়াছিল! তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লিখিতে হইলে পুঁথি বাড়িয়া যাইবে—এই আশঙ্কায় আমরা সেই লোমহর্ষণ কাহিনীর অবতারণায় বিরত হইলাম। এতদ্ভিন্ন মিসেস্ হাম্‌ফ্রি ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য যে সময় মুচিবাড়িয়া ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিতেন, সে সময় ধর্ম্মাবতারের মনস্তুষ্টির জন্য গোলোক রায় বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত হাড়ী, বাগদী ও 'বুনো'দের পল্লীতে ঘুরিয়া যেরূপ দক্ষতার সহিত 'নীলদর্পণের' পদী ময়রাণীর প্রতিনিধিত্ব করিত, তাহার পরিচয় পাইয়া নীলকর-কুলতিলক হাম্‌ফ্রি তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্যপাত্র ও অনুগ্রহভাজন মনে করিবেন—এ বিষয়ে কাহারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। দাদা কিরূপে সাহেবকে বশ করিয়াছে, তাহা জানিতে পারিয়া অনুজ ভুবন রায়ও অগ্রজের অনুষ্ঠিত অনিন্দ্যসুন্দর পন্থার অনুসরণ করিল। তখন সাহেবের কৃপা-কটাক্ষের অধিক বখরা পাইবার জন্য উভয় ভ্রাতা যেন প্রতিযোগিতা করিয়াই, ইতরতা, হীনতা ও নীচতার দুর্গন্ধময় পঙ্ক অধিকতর উৎসাহে মুখে লেপিয়া স্ব স্ব জীবন ধন্য করিতে লাগিল! স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষ যে কতদূর পশু হইতে পারে, এই গোলোক ও ভুবন তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সুতরাং ক্ষুদ্র নীলকুঠির দেওয়ান হইলেও ইহারা দুই ভাই মোসাহেবীর জোরে সুদক্ষ নায়েব সর্ব্বাঙ্গসুন্দরের প্রভাব অনেকটা খর্ব্ব করিয়া ফেলিল। নায়েবের প্রভাব প্রতিপত্তি দেখিয়া তাঁহাকে একটু খর্ব্ব করিবার জন্য সাহেবেরও আগ্রহ হইয়াছিল; কিন্তু তিনি সে ভাব প্রকাশ না করিয়া কোন জটিল বিষয়ের আলোচনা, বা কোন গুপ্ত পরামর্শ করিতে হইলেই গোলোক রায় ও ভুবন রায়কে কুঠিতে ডাকাইয়া আনিতেন।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সান্যাল তাঁহার প্রিয়পাত্র শ্রীনাথ

গোঁসাইকে সদর আমিনের কার্য্যে নিযুক্ত করিলে জ্যোৎস্না রায় শিক্ষানবিশ ত্যাগ করিয়া বাড়ীতে বেকার বসিয়া থাকিল। নায়েব তাহার চাকরীর জন্য কোন চেষ্টাই করিলেন না দেখিয়া গোলোক রায় পুত্রের একটি চাকরীর জন্য সাহেবকে ধরিয়া বসিল। হাম্ফ্রি সাহেব তখন গোলোক রায়ের বাসগ্রামের সন্নিহিত জমিদারী-কাছারীতে গোমস্তা-গিরির কাজে জ্যোৎস্নাকে নিযুক্ত করিবার জন্য সে সাহেবকে অনুরোধ করিলে, সাহেব তৎক্ষণাৎ তাহাকে সেই পদে বাহাল করিলেন। এ বিষয়ে তিনি নায়েবের মত জিজ্ঞাসা করাও আবশ্যক মনে করিলেন না! নায়েব এই নিয়োগের কথা শুনিয়া হাসিয়া একবার মাথা নাড়িলেন মাত্র, কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না।

উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র মহা উৎসাহে গ্রাম্য কাছা-রীতে গোমস্তাগিরি করিতে করিতে একটি প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ-যুবকের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিল। সে সর্ব্বদাই তাহার বন্ধুর গৃহে যাইত, এবং বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ তাহাকে ও তাহার সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে নানা উপহার প্রদান করিত। কিছুদিন পরে তাহার এই বন্ধুটি রেলে চাকরী লইয়া বিদেশে চলিয়া গেল; বন্ধুর বিরহে কাতর হইয়া জ্যোৎস্না বন্ধুর বিরহিনী পত্নীকে সান্ত্বনা দানের জন্য আরও ঘন ঘন তাহার গৃহে যাতায়াত করিতে লাগিল! কিছুদিন পরে জ্যোৎস্নার বন্ধু তাহার স্ত্রীকে চাকরীস্থানে লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে কয়েকদিনের ছুটী লইয়া বাড়ী আসিল। সেই সময় জ্যোৎস্না একদিন রাত্রে তাহাকে পানাহারের নিমন্ত্রণ করিল; কিন্তু আহারের পর আর তাহার গৃহে ফিরিবার সামর্থ্য রহিল না। তীব্র বিষ-মিশ্রিত সুধাপানে বিভোর হইয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সে বন্ধুর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিল। জ্যোৎস্না পরম বন্ধুর শোকে আকুল হইয়া তাহার মৃতদেহ গৃহপ্রাঙ্গনস্থ কূপে বিসর্জ্জন করিল, এবং বন্ধু সেই-রাত্রেই কার্য্যানুরোধে চাকরী-স্থানে চলিয়া গিয়াছে—এই সংবাদ রটাইয়া বন্ধুপত্নীর ভরণ-পোষণের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিল। এই সুব্যবস্থায় তাহার গুণে মুগ্ধা বন্ধুপত্নীরও আপত্তি না থাকায় ব্যাপারটা অতি সহজে আপোষেই মিটিতে পারিত; কিন্তু কোন কোন পরছিদ্রান্বেষী মিথ্যাবাদী দুর্জ্জন থানায় সংবাদ দিল—জ্যোৎস্নাই গোপনে তাহার প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ যুবককে হত্যা করিয়াছে! যদি এই লোমহর্ষণ কাণ্ডের যথারীতি অনুসন্ধান ও বিচার হইত তাহা হইলে জ্যোৎস্নাকে তাহার প্রিয়বন্ধুরই অনুসরণ করিতে হইত; কিন্তু গোলোক রায়ের স্তবস্তুতিতে ধর্ম্মান্ধ হাম্ফ্রি সাহেবের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল! তাঁহার জমিদারীতে ব্রহ্মহত্যা হয়, ইহা তিনি কি করিয়া সহ্য করেন? তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ও তদ্বিরের কৌশলে জ্যোৎস্না সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল। এবং সকল সংবাদ জানিতে পারিয়াও ভক্তবৎসল হাম্ফ্রি সাহেব জ্যোৎস্নার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন না; বরং সে যে কার্য্য করিয়াছে তাহা নায়েবেরই উপযুক্ত, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া গুণগ্রাহী উদার হাম্ফ্রি কিছুদিন পরে তাঁহার এলাকাস্থিত আর একটি কুঠিতে জ্যোৎস্নাকে নায়েব নিযুক্ত করিলেন! এ দেশের নীলকর ও কুঠিয়াল সাহেবেরা কিরূপ প্রশংসাপত্র ও কার্য্যদক্ষতার উপর নির্ভর করিয়া উমেদারগণকে নায়েবী পদে নিযুক্ত করিতেন, তাহার নিদর্শনস্বরূপ আমরা এই পিশাচের লোমহর্ষণ পাশ-বিক অনুষ্ঠানের যৎসামান্য পরিচয় প্রদান করিলাম।

চিরজীবন নানা গুরুতর পাপ ও অশেষ দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়াও দুর্জ্জনেরা নির্ব্বিঘ্নে সুখ শান্তি উপভোগ করিতে পারে, ইহলোকে তাহাদিগকে পাপের ফলভোগ করিতে হয় না,—এইরূপ যাঁহাদের ধারণা, তাঁহাদিগকে আমরা মহাপাপিষ্ঠ, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ নরপিশাচ সর্ব্বাঙ্গ সান্ন্যালের জীবনাপরাহ্ণের দৃশ্য দর্শন করিতে অনুরোধ করি। তাঁহার এই চরিত্র-চিত্রের একটি রেখাও অতিরঞ্জিত নহে। তিনি যে উপরওয়ালার স্বার্থসিদ্ধি ও সন্তোষবিধানের জন্য অম্লান-বদনে, অকুণ্ঠিতচিত্তে ধর্ম্মে ও মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়া, সকল প্রকার গর্হিত আচরণে বহু প্রজার সর্ব্বনাশ করিয়া, এইরূপ অখণ্ড প্রতাপে নায়েবী করিলেন, তাঁহার সেই উপরওয়ালা হাম্ফ্রি সাহেব কোনও দিন কি তাঁহাকে মানুষ বলিয়া শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস করিয়াছেন? মিঃ হাম্ফ্রি চিরদিনই তাঁহাকে কার্যোদ্ধারের যন্ত্র বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছেন; অবশেষে তাঁহার প্রভুত্ব ও ক্ষমতাপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হইয়া হাম্ফ্রি যখন গোলোক রায় ও তস্য ভ্রাতা ভুবন রায়কে বিশ্বাসের পাত্র মনে করিয়া সকল গুরুতর বিষয়েই তাহাদের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন, মুক্তহস্তে তাহাদিগকে অনুগ্রহ বিতরণ করিয়া প্রকাশ্যভাবে নায়েবের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হইলেন না, তখন সর্ব্বাঙ্গ সান্ন্যাল নিজের

ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তাঁহার দেহ ও মন উভয়ই কি এক দারুণ আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িল। শত শত কুকর্ম্মের স্মৃতি তাঁহার নিদ্রাহীন রাত্রে যে বিভীষিকার চিত্র চিত্তপটে অঙ্কিত করিতে লাগিল, মনশ্চক্ষে তাহা নিরীক্ষণ করিয়া তিনি নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। তথাপি তিনি প্রভুর মনোরঞ্জন-চেষ্টায় বিরত হইলেন না; কিন্তু তাঁহার দেহ ও মন আর অধিক দিন অত্যাচার সহ্য করিতে পারিল না। তিনি একদিন প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিতে গিয়া উঠিতে পারিলেন না; সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হওয়ায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দরের উত্থানশক্তি রহিত হইল! অবিলম্বে চিকিৎসক তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। তিনি নায়েবের রোগ পরীক্ষা করিয়া গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িলেন। তিনি নায়েবের সম্মুখে কোন মতামত প্রকাশ না করিলেও কান্‌সারণের সর্ব্বত্র বিদ্যুদ্বেগে প্রচারিত হইল- নায়েবের পক্ষাঘাত হইয়াছে! সকলেই স্তম্ভিত হইয়া বলিল, ভগবানের কি সূক্ষ্ম বিচার; তাঁহার দণ্ড অমোঘ!

চিকিৎসা চলিতে লাগিল। রোগমুক্তির জন্য নায়েব জলের মত অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন, শান্তি স্বস্ত্যয়নেরও ত্রুটি হইল না; কিন্তু সকলই অনর্থক হইল। নায়েব রোগ শয্যায় জীবন্মৃতবৎ পড়িয়া থাকিয়া অনুশোচনানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব প্রতাপ, প্রতিপত্তি, দর্প, সমস্তই বিলুপ্ত হইল। একদিন যাহারা তাঁহার বিন্দুমাত্র কৃপার জন্য তৈলপাত্র হস্তে লইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে ধরণা দিয়া পড়িয়া থাকিত,—তাহারাই তাঁহাকে দেখিয়া অবজ্ঞাভরে মুখ ফিরাইতে লাগিল। যাহারা তাঁহাকে এক সিলিম তামাক সাজিয়া দিতে পাইলে কৃতার্থ হইত, তাহারা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া তামাক টানিতে টানিতে অসঙ্কোচে তাঁহার মুখের উপর ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল! তিনি ক্ষোভে দুঃখে অধীর হইয়া মুখ ফিরাইয়া মনে মনে বলিতেন, "ভগবান! যথেষ্ট হইয়াছে; আর কেন? এ যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার কর।"

যে শ্রীনাথ গোঁসাই তাঁহার কৃপাকটাক্ষে কঠোর দারিদ্র্য-দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিল, তাঁহার অনুগ্রহে চাকরী পাইয়াছিল, তাহার কৃতঘ্নতার পরিচয়ে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি যখন তাহাকে সদর আমিনের পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য হাম্‌ফ্রি সাহেবকে অনুরোধ করেন, তখন সাহেব রহস্যচ্ছলে শ্রীনাথ সম্বন্ধে কি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, রোগশয্যাশায়ী জীর্ণদেহ অকর্ম্মণ্য নায়েবের তাহা মনে পড়িল। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া চক্ষু মুছিলেন। ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিবঞ্চিত নায়েব মনে মনে বলিলেন, "হাতী পাঁকে পড়লে তাকে ব্যাঙে লাথি মারে; শ্রীনাথ ত এখন আমাকে অবজ্ঞা করবেই।—দেখি তার দৌড় কতদূর!"

শ্রীনাথও বুঝিল, নায়েব যদি আরোগ্যলাভ করিয়া ভবিষ্যতে পুনর্ব্বার ক্ষমতা প্রতিপত্তি বজায় করিতে পারেন – তাহা হইলে তাহার অবস্থাও ভূতপূর্ব্ব আমিন রসরাজ বিশ্বাসের মতই শোচনীয় হইবে; নায়েব পদাঘাতে তাহাকে কান্‌সারণের এলাকা হইতে দূর করিয়া দিবেন। অথচ নায়েব জীবিত থাকিতে হাম্‌ফ্রি সাহেবের সাধ্য নাই তাঁহাকে পদচ্যুত করেন! সুতরাং শ্রীনাথ গোঁসাই দিবারাত্রি নায়েবের মৃত্যু কামনা করিতে লাগিল। সাহেব ও মেমসাহেব উভয়েই নানা কারণে গোলোক রায়ের বশীভূত হইয়াছেন দেখিয়া শ্রীনাথ গোলোক রায়ের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল; তাহাদের ষড়যন্ত্রে নায়েবের সুচিকিৎসায় দারুণ বাধা উপস্থিত হইল। মুচিবাড়িয়ার যে ডাক্তার নায়েবের চিকিৎসা করিতেছিলেন, সাহেব ও তাঁহার প্রিয়পাত্রগণের ইঙ্গিতে তিনি নায়েবের চিকিৎসায় বিরত হইলেন! সাহেবের ডিস্‌পেন্সারিতে সুপ্রসিদ্ধ ঔষধবিক্রেতা বাথ্‌গেটের দোকানের নানা উৎকৃষ্ট ঔষধ সর্ব্বদা সঞ্চিত থাকিত, কুঠির কর্ম্মচারীরা রোগাক্রান্ত হইলে সেই ঔষধ পাইত; নায়েব তাহাতেও বঞ্চিত হইলেন। সুতরাং সকলেই বুঝিল নায়েব অচিরে শিঙায় ফুৎকার প্রদান করেন, ইহাই সাহেবের আন্তরিক কামনা। নায়েবেরও তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

শ্রীনাথ গোঁসাই নায়েব সর্ব্বাঙ্গ সান্যালের বাড়ীর অদূরে একখানি খড়ের ঘরে বাস করিত। একদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ তাহার সেই খোড়ো ঘরে বৈশ্বানরের আবির্ভাব হইল! কুঠির ও গ্রামের অনেক লোক জুটিয়া যথাসাধ্য চেষ্টায় আগুন নিবাইয়া দেওয়ায় শ্রীনাথের 'আস্তানা' ব্রহ্মার কবল হইতে অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় রক্ষা পাইল, তাহার তেমন গুরুতর ক্ষতি হইল না; কিন্তু শ্রীনাথ সন্দেহ করিল ইহা রোগশয্যাশায়ী নায়েবেরই কাজ; নায়েব মুচিবাড়িয়া হইতে তাহার বাস উঠাইবার জন্য কোন

বিশ্বস্ত অনুচরের সাহায্যে তাহার ঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়াছে। যাঁহার অনিন্দ্যসুন্দর চক্রান্তে ভবতোষ উকীলের বাসা ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছিল, ভবতোষকে চিরদিনের জন্য মুচিবাড়িয়া ত্যাগ করিতে হইয়াছে; যাঁহার অপূর্ব্ব উদ্ভাবনী শক্তিতে মুচিবাড়িয়া হইতে দেওয়ানী আদালতের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছিল, মুচিবাড়িয়ার মুন্সেফী চৌকী উঠিয়া গিয়াছে; শ্রীনাথকে গৃহহীন করিবার জন্য ইহা যে তাঁহারই ষড়যন্ত্রের ফল,—এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীনাথ নায়েবকে প্রতিফল দানের সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। কয়েক দিনের মধ্যেই তাহার আশা পূর্ণ হইল। মুচিবাড়িয়ায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সান্যালের একটি প্রকাণ্ড কাঠের গোলা ও একটি খড়ের 'পালা' ছিল; এই খড়ের পালায় ও কাঠের গোলায় বিস্তর টাকার খড় ও উৎকৃষ্ট কাঠ সঞ্চিত ছিল। একদিন রাত্রে তাহাতে আগুন লাগিল। সেই আগুন কেহই নির্ব্বাপিত করিতে সমর্থ হইল না। ক্রমাগত সাত দিন ধরিয়া সেই গোলা ও পালা জ্বলিয়া অবশেষে তাহা ভস্মস্তূপে পরিণত হইল। এই সর্ব্বনাশের সংবাদ শুনিয়া নায়েব কাঁদিয়া বলিলেন, "ভগবান! তুমি সত্যই আছ; তোমাকে ফাঁকি দিয়া কেহই তোমার নিরপেক্ষ বিচার এড়াইয়া যাইতে পারে না; তাই তোমার বজ্রে আমি চূর্ণ হইলাম! পরদুঃখকাতর, ধার্ম্মিক, তেজস্বী ভবতোষ জমিদারের অন্যায়াচরণের বিরুদ্ধে দরিদ্রের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিল; মনিবের মনস্তুষ্টির জন্য ব্রাহ্মণ হইয়া আমি চণ্ডাল অপেক্ষাও অধমের কাজ করিয়াছি, ব্রাহ্মণের ঘর-বাড়ী জ্বালাইয়া দিয়াছি,—তাহাকে ভিটাছাড়া, উদ্বাস্তু করিয়াছি; তাহারই দীর্ঘ-নিঃশ্বাসে আমার সব জ্বলিয়া গেল, আমি সর্ব্বস্বান্ত হইলাম! কিন্তু আমি এই বিশ্বাসঘাতক কৃতঘ্ন গোঁসাইএর এই শয়তানীর, এই নিমকহারামীর কথা ভুলিব না। যদি কোন দিন আরোগ্য লাভ করিতে পারি—তাহা হইলে সুস্থ হইয়া সর্ব্বাগ্রেই তাহাকে চূর্ণ করিব; দেখিব গোলোক রায় আর তার মুরুব্বি হাম্‌ফ্রি সাহেব কিরূপে তাহাকে রক্ষা করে।"

কিন্তু নায়েবের এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল না; ক্ষোভে, দুঃখে, অশান্তিতে ও অনুতাপে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল; রোগের যন্ত্রণাও ক্রমে বর্দ্ধিত হইল। অল্পদিন পরেই তিনি ভগ্নহৃদয়ে সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পরলোকে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদে মুচিবাড়িয়া কান্‌সারণের লক্ষ লক্ষ প্রজা আনন্দে অধীর হইয়া বলিতে লাগিল, "এত দিনে আমাদের ঘাড় থেকে ভূত নাম্‌লো!" ইহা শুনিয়া কেহ কেহ বলিল, "জমিদারের সেরেস্তায় ভূতের অভাব নেই রে ভাই! একটা নাম্‌লো বলেই কি আমরা রেহাই পাব? আর একটা আমাদের ঘাড়ে চেপে রক্ত শুষবে।"

কথাটা মিথ্যা নয়। নায়েবের মৃত্যুতে প্রজাদের হাড়ে বাতাস লাগিবার কোনও সম্ভাবনা দেখা গেল না; তবে তাড়াতাড়ি কাহাকেও নায়েব নিযুক্ত করা হইল না। অনেক দিন পর্য্যন্ত নায়েবের পদ খালি থাকিল। অতঃপর কে নায়েব হইবে, এই প্রসঙ্গ লইয়া কান্‌সারণের ছোট বড় সকল আমলার মধ্যে বিস্তর আলোচনা ও জল্পনা-কল্পনা চলিতে লাগিল। গোলোক রায় ও ভুবন রায় তখন হাম্‌ফ্রি সাহেবের এতই প্রিয়পাত্র যে, ভুবন রায় কিছুদিন অসুস্থ হইয়া বাড়ীতে শয্যাগত থাকায়, হাম্‌ফ্রি সাহেব স্বীয় পদ ও বর্ণ-গৌরবের অভিমান ত্যাগ করিয়া, মেম সাহেবের সহিত তাহার বাড়ীতে গিয়া তাহাকে মধ্যে মধ্যে দেখিয়া আসিতে লাগিলেন! বিশেষতঃ, হাম্‌ফ্রি সাহেবের অনুগ্রহে, তাহাদের বংশের যে যেখানে ছিল, প্রত্যেকেই এই সুবিস্তীর্ণ কান্‌সারণের অধীনে কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। সুতরাং অনেকেরই ধারণা হইল—এই কান্‌সারণের চাকরীগুলিতে গোলোক রায়ের গোষ্ঠীরই যখন একচেটে অধিকার, তখন এই বংশের প্রধান পুরুষ গোলোক রায়ই সর্ব্বাঙ্গ সান্যালের পরিত্যক্ত গদীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

বস্তুতঃ গোলোক রায়েরই নায়েবী-প্রাপ্তির ষোল আনা সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু বিধাতার বিধান অন্যরূপ হইল! কয়েক মাসের মধ্যেই গোলোক রায় অতি ভীষণ গলিত-কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হইল। রোগের আক্রমণ এতই প্রবল হইল যে, দুর্গন্ধে তাহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যাগণ পর্য্যন্ত তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিতে পারিত না! কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, স্ত্রী কন্যাও যাহাকে স্পর্শ করিতে ঘৃণা বোধ করিতেছিল, নীচ জাতীয়া একটি পতিতা রমণী অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহারই পরিচর্য্যাভার গ্রহণ করিল! গোলোক

রায় যে নীলকুঠিতে দেওয়ানী করিত, সেই কুঠির অদূরে যামিনী জেলেনী বাস করিত। জেলেনী ট্যাংরা, পুঁটি, ধরিতে ধরিতে তাহার রূপের জালে গোলোক দেওয়ানের মত কাতলাকে আবদ্ধ করিয়াছিল! নেশা ছুটিলে গোলোক দেওয়ান ছেঁড়া জুতার মত অবজ্ঞা-ভরে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই নীচ-বংশীয়া, গত-যৌবনা, ঘৃণিতা কুলটা যে মুহূর্ত্তে সংবাদ পাইল, যে দেওয়ানজি তাহাকে অস্পৃশ্যা জানিয়াও তাহার সাহচর্য্য বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছিল—সে আজ জীবনসন্ধ্যায় দুর্গন্ধ-দুষ্ট গলিত ক্ষতে জীবন্মৃত, স্ত্রী কন্যা পর্য্যন্ত তাহাকে স্পর্শ করিতে ঘৃণা বোধ করিতেছে, ক্লেদ ও পুরীষ-লিপ্ত দেহে সে রোগশয্যায় পড়িয়া নিজ গৃহে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে,—সেই মুহূর্ত্তেই যামিনী জেলেনী গোলোক রায়ের গৃহে আসিয়া তাহার পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিল; দুর্গন্ধের জ্বালায় নাকে কাপড় বাঁধিয়া, প্রেমময়ী সাধ্বী পত্নীর ন্যায় দিবা-রাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রমে তাহার সেবা করিতে লাগিল!—বিধাতার কি অপূর্ব্ব বিধান! মানব-চরিত্রের কি বিচিত্র রহস্য! পাপিষ্ঠা ব্যভিচারিণীর পাপ মলিন ঘৃণিত জীবনের পুঞ্জীভূত কলঙ্ক-রাশির অন্তরালে এই যে নিস্বার্থ সেবাপরায়ণতা ভগবানের করুণাকণার ন্যায় বিরাজ করিতেছিল, তাহা কি পুণ্যবতী সতী সীমন্তিনী-গণেরও গৌরবের বস্তু নহে?—কিন্তু সে অস্পৃশ্যা, পাপিষ্ঠা কুলটা মাত্র; তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করাও পাপ!

সকলেই বুঝিল গোলোক রায় এইরূপ কদর্য্য ব্যাধি-গ্রস্ত না হইলে হাম্‌ফ্রি সাহেব তাহাকেই নায়েবের পদ প্রদান করিতেন। ইত্যবসরে শ্রীনাথ গোঁসাই যে চাল চালিতে লাগিল, কুঠির কূট বুদ্ধি বিচক্ষণ আমলারাও তাহার মর্ম্মাবধারণ করিতে পারিল না; এমন কি, হাম্‌ফ্রি সাহেব পর্য্যন্ত তাহার চাতুর্য্য ভেদ করিতে পারিলেন না! এই সুবিস্তীর্ণ কান্‌সারণের মধ্যে কেবল একজন মাত্র তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিল; সে গোলোক রায়? কিন্তু গোলোক রায় তখন রোগ-শয্যায় জীবন্মৃত; কর্ম্ম-জগতের অশ্রান্ত কল্লোল ও জীবন-যুদ্ধের অবিরাম ঝঞ্ঝনা দূর হইতে তাহার নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিত বটে, কিন্তু সে তাহাতে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া রিক্তহস্তে ভব-পারাবারের পারপণ্য সংগ্রহের উপায় চিন্তা করিতেছিল।

জ্যোৎস্না রায় মুচিবাড়িয়া কান্‌সারণে আমিনের কার্য্যে শিক্ষানবিশী করিবার সময় আমিন শ্রীনাথ গোসাঁইকে তাহার ঘোড়ার পিঠে ল্যাজের দিকে চড়াইয়া লইয়া মাঠে মাঠে ঘুরিয়া কাজ শিখিত, সে কথা পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে। দরিদ্র মেঠো আমিন শ্রীনাথ সেই সময় হইতেই জ্যোৎস্না রায়ের পিতা ও পিতৃব্যের অত্যন্ত অনুগত হইয়া উঠিয়াছিল; সেই আনুগত্য ক্রমেই প্রগাঢ় হইয়া আত্মীয়তায় পরিণত হইয়াছিল। শ্রীনাথ গোলোক রায় ও ভুবন রায়কে 'খুড়ো' বলিয়া সম্বোধন করিত, এবং তাহাদিগকে পিতার সহোদরের ন্যায় শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করিত। এমন কি, তাঁহাদের প্রতি শ্রীনাথের ব্যবহার দেখিয়া বাহিরের লোকে মনে করিত, সে গোলোক ও ভুবন রায়ের কোন সহোদরেরই পুত্র! গোলোক ও ভুবন রাঢ়ী-শ্রেণীভুক্ত ব্রাহ্মণ হইলেও বারেন্দ্র-সমাজ-ভুক্ত শ্রীনাথ তাহাদের সহিত যে ভাবে মিশিত ও তাহাদের সাংসারিক সকল কার্য্যে যোগদান করিত, তাহা দেখিয়া কেহই মনে করিতে পারিত না যে, তাহারা ভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। কিন্তু কপট প্রকৃতি সঙ্কীর্ণচেতা লোক সর্ব্বত্রই আছে; রায় পরিবারের সহিত শ্রীনাথের মাখা-মাখি দেখিয়া তাহারা গোপনে বলাবলি করিত, "শ্রীনাথের এই অতিভক্তি সাধুর লক্ষণ নয়; এটা তার 'বারিন্দে' চাল! গোলোক রায় ও ভুবন রায় যদি ম্যানেজার সাহেবের এত প্রিয়পাত্র না হ'ত, তাহ'লে শ্রীনাথ জ্যোৎস্না রায়ের বাপ-খুড়োর পায়ের ধুলো চাট্‌তো কি না দেখা যে'ত।"

যাহা হউক, গ্রহবৈগুণ্যে গোলোক রায়ের নায়েবী পদ লাভের সম্ভাবনা এই ভাবে বিলুপ্ত হইলে, মুচিবাড়িয়া কান্‌সারণের আমলাবর্গের এবং স্থানীয় জনসাধারণের ধারণা হইল নায়েবী পদটা ভুবন রায়ের 'অদৃষ্টেই নাচি-তেছে!' এই ধারণা লোকের মনে বদ্ধ-মূল হইবার কারণ পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

কিন্তু অনেক দিন নায়েবের পদে কোন লোক নিযুক্ত না হওয়ায়, ম্যানেজার সাহেবের কাজকর্ম্মের অত্যন্ত অসুবিধা হইতে লাগিল। ভূতপূর্ব্ব নায়েব পরলোক-গত, গোলোক রায় কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত, ভুবন রায় তখন অসুস্থ; কুঠিতে এমন কোন দক্ষ কর্ম্মচারী নাই যে, সাহেব কোন

বৈষয়িক পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে সদুত্তর দিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে। শ্রীনাথ মূর্খ হইলেও অত্যন্ত চতুর, জমিদারী-সংক্রান্ত কোন বিষয়ে অভিজ্ঞতা না থাকিলেও, সাহেবের কোন প্রশ্নের সে বোকার মত উত্তর দিত না, বা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নির্ব্বাক্ ভাবে মাথা চুল্‌কাইত না। তাহার আমিনী কার্য্যের অভিজ্ঞতায় যাহা সদুত্তর বলিয়া মনে হইত, তাহাই বলিয়া সাহেবকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিত। সাহেব কোন জটিল বিষয়ের প্রশ্ন করিলে, শ্রীনাথ ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর দিবে বলিয়া দুই একদিনের সময় লইত, এবং ভুবন রায়ের সহিত পরামর্শ করিয়া সাহেবকে যথাযোগ্য উত্তর দিত। এইরূপে 'ভেড়ার মধ্যে বাছুর পরামাণিক' হইয়া, ম্যানেজার সাহেবের কাছে শ্রীনাথের বেশ 'পসার প্রতিপত্তি' হইল। সাহেব বুঝিলেন, তাঁহার কর্ম্মচারীগণের মধ্যে যদি কাহারও উপর নির্ভর করিতে পারা যায়—সে শ্রীনাথ গোঁসাই।

শ্রীনাথ দেখিল তাহার উচ্চাভিলাষের পথে এক প্রচণ্ড বাধা বর্ত্তমান। এই বাধা ভুবন রায়। ভুবন রায় বর্ত্তমান থাকিতে, তাহার নায়েবী লাভের আশা 'নিশার স্বপন সম' নিষ্ফল। অথচ তাহার সর্ব্বপ্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ভুবন রায়ের সহায়তা ভিন্ন তাহার ন্যায় দরিদ্র, সহায়-সম্পত্তিহীন নিঃসম্বল নগণ্য ব্যক্তির নায়েবী লাভের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই। সুতরাং শ্রীনাথ তাহার দুরাশা গোপন করিয়া, সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য ভুবন রায়ের সহিত অভিন্নহৃদয় সুহৃদের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিল। সে প্রত্যহ একবার ভুবন রায়ের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক তাহার চরণ-রেণু গ্রহণ করিত, এবং ভক্তি-ভরে তাহা ওষ্ঠে ও মস্তকে স্পর্শ করিয়া তাহার পদতলে আসন গ্রহণ করিত। ভুবন রায় স্নেহে গদ্‌গদ্ হইয়া তাহার উপযুক্ত 'ভাইপো'কে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিত। কিছুদিন ধরিয়া এই অভিনয় চলিল। ভুবন রায়কে জিজ্ঞাসা না করিয়া শ্রীনাথ গোসাই কোন কাজই করিত না। ক্রমে তাহাদের ঘনিষ্ঠতা এরূপ প্রগাঢ় হইল যে, তাহা দেখিয়া সকলেই অসঙ্কোচে দৈব-বাণী করিতে পারিত, ভুবন রায়ের আদেশ পাইলে শ্রীনাথ আমিন সকালে বিকালে দুই বেলা নিজের গলায় ছুরী দিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারে, তাহার উপর 'ফাউ' আছে।

এই দারুণ সমস্যার সময় শ্রীনাথ আমিন তাহার উর্ব্বর মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া, মন্দরমন্থিত সমুদ্র-মধ্যবর্ত্তী সুধাভাণ্ডের ন্যায় সুধার আধারস্বরূপিনী এক রূপসী চণ্ডালিনীকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া কুঠির অদূরে একটি পর্ণকুটীরে সংস্থাপিত করিল! শ্রীনাথ ভুবন রায়ের চরিত্র নখদর্পণে পাঠ করিয়াছিল, সুতরাং সে বিলক্ষণ বুঝিয়াছিল রাঘব-বোয়াল ভুবন রায় প্রাচীন হইলেও, রূপ-যৌবন-সম্পন্না, পদ্ম-পলাশনেত্রা ক্ষুদী চাঁড়ালনী রূপ মাংস-পিণ্ডের টোপ গিলিবেই; তখন আর সে মুখের বঁড়সী খুলিতে পারিবে না। শ্রীনাথের দীর্ঘ কালের আশা সফল হইবার ইহাই একমাত্র উপায়।

ভুবন রায় তখন বার্দ্ধক্য-সীমায় পদার্পণ করিয়াছিল; তাহার প্রৌঢ়া পত্নী একটি মাত্র সন্তান রাখিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে পরলোকে প্রস্থান করিয়াছিল। পুনর্ব্বার বিবাহের বয়স না থাকায়, এবং কতকটা চক্ষু-লজ্জাতেও বটে, ভুবন রায় দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহের চেষ্টা না করিলেও তাহার ভোগসুখেচ্ছা বিন্দুমাত্র প্রশমিত হয় নাই। শ্রীনাথ তাহাকে 'খুড়ো' বলিয়া সম্বোধন করিলেও ভুবন রায় সময়ে-সময়ে কথাপ্রসঙ্গে তাহার হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বাস তাহার উপযুক্ত 'ভাইপো'র নিকট প্রকাশ করিয়া হা হুতাশ করিত। শ্রীনাথও উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া 'খুড়ো'র উৎকট বিরহানলে শান্তিবারি সেচন করিয়া, তাহার মনের আগুন নির্ব্বাপিত করিবার ব্যবস্থা করিল। খুড়ো সেই মাংস-পিণ্ডের টোপ অম্লান-বদনে গলাধঃকরণ করিল! শ্রীনাথ হাসিয়া মনে মনে বলিল, "আর যাবে কোথা বাপধন! এবার তোমাকে বঁড়সীতে গেঁথেছি; এখন খেলিয়ে তুল্‌তে পারলে হয়! বাবা, ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখ নি; এ ফাঁদ আমি তোমার জন্যেই পেতে রেখেছি।"

বৃদ্ধ ভুবন রায়ের মনবিহঙ্গ তখন লাবণ্যবতী চণ্ডালিনীর প্রেম-ফাঁদে বন্দী! কান্‌সারণের নায়েবী ত তুচ্ছ, রাজার সিংহাসন পাইলেও চণ্ডালিনীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়া মোহান্ধ ব্রাহ্মণ তাহা গ্রহণ করিতে চাহিত না! সে ভাবিল, "ম্যানেজার সাহেবের ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া অনুমান হইতেছে কান্‌সারণের নায়েবীটা আমিই গ্রহণ করি—ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। কোন্ দিন হয় ত' আমার নিকট তিনি এই প্রস্তাব উথাপন করিবেন; কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত

হইলে আমার এই জীর্ণ জীবনতরীর কাণ্ডারী মনোমোহিনী ক্ষুদীসুন্দরীকে ছাড়িয়া কান্‌সারণের গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যেই জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে, ইচ্ছামত প্রেম-লীলার অবসর পাইব না। বিশেষতঃ, নায়েবী লইলে কন্‌সারণের কুঠিতেই থাকিতে হইবে; ক্ষুদী যেরূপ অলোকসামান্য রূপসী, তাহাকে কুঠির আঙ্গিনার ভিতর আশ্রয় দিতে সাহস হয় না; তাহাকে দেখিয়া শেষে হয় ত' হাম্‌ফ্রি সাহেবই— না থাক্, এ রত্ন যখন শ্রীনাথ বাবাজীবনের আন্তরিক চেষ্টা, যত্ন ও আগ্রহে লাভ করিয়াছি, তখন তুচ্ছ নায়েবীর লোভে এই সাগর-ছেঁচা মাণিক ত্যাগ করিতে পারিব না। ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, সম্মান, আকর্ষণের বিষয় বটে, কিন্তু সে আর কয় দিনের জন্য? আমি যে দেওয়ানী করিতেছি, তাহাই বজায় থাক; আমার অর্থের অভাব নাই, আর নায়েবীর লোভ করিব না। তবে এই দেওয়ানী কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে আমাকে নূতন নায়েবের অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু নায়েবকে যদি মুঠোর মধ্যে রাখিতে পারি, তাহা হইলে নির্ব্বিঘ্নে প্রেয়সীর প্রেম-সরোবরে সাঁতার দিতে পারিব। শ্রীমান্ শ্রীনাথ বাবাজী আমার নিতান্ত অনুগত, বিশেষতঃ আমার প্রজ্জ্বলিত বিরহানল তাহার চেষ্টাতেই নির্ব্বাপিত হইয়াছে; আমি তাহার নিকট কৃতজ্ঞ। নায়েবীটা তাহাকে দিতে পারিলে তাহার নিকট আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইবে; তাহাকেও আমার মুঠোর মধ্যে রাখিতে পারিব। ভবিষ্যতে সে কোন বিষয়ে আমার প্রতিকূলতা করিতে না পারে, আমি তাহার ব্যবস্থা করিব। অন্য কেহ নায়েবী পাইলে আমার কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না। যেরূপে হউক, নায়েবীটি তাহাকেই দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে; একঢিলে দুই পাখী মারিবার এমন সুযোগ ত্যাগ করা হইবে না।"—ভুবন রায় মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিলেও তাহার মনের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিল না। এমন কি 'ভাই-পো' শ্রীনাথও জানিতে পারিল না!

অবশেষে সত্যই একদিন সুযোগ উপস্থিত হইল। নায়েবের অভাবে কাজকর্ম্মের নানা অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া হাম্‌ফ্রি সাহেব ভুবন রায়কে কুঠিতে ডাকাইয়া, তাহার অভিজ্ঞতা ও কার্য্যদক্ষতার প্রশংসা করিয়া কান্‌সারণের নায়েবী গ্রহণের জন্য তাহাকে অনুরোধ করিলেন।

দেওয়ান ভুবন রায় ম্যানেজার সাহেবের এই অযাচিত অনুগ্রহে অভিভূত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে আবেগকম্পিত স্বরে বলিল, "হুজুর, আপনার এই অনুগ্রহে আমি যে কতদূর সম্মানিত হইলাম, তাহা মুখে বলিয়া প্রকাশ করি, সে শক্তি আমার নাই। আমি হুজুরের নিমকের চাকর, হুজুরের কার্য্যে দেহপাত করা ভিন্ন অন্য উচ্চাভিলাষ আমার নাই। যদি আমার পক্ষে সম্ভব হইত, তাহা হইলে হুজুরের এই আদেশ আমি নতশিরে পালন করিতাম। কিন্তু আমি প্রাচীন হইয়াছি; নায়েবী কার্য্য পরিচালনে যে উৎসাহ, উদ্যম ও পরিশ্রমের শক্তি অপরিহার্য্য, তাহা আমার নাই। সুতরাং নায়েবীর গুরুভার বহন করা আমার পক্ষে সুকঠিন। হুজুর যতদিন কান্‌সারণে আছেন, আর যে কয়দিন আমার কিঞ্চিৎ সামর্থ্য আছে, সে কয়দিন আমি আমার দেওয়ানী কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াই হুজুরের সেবা করিব। নায়েবীর যোগ্য লোক হুজুরের সেরেস্তাতেই আছে; তাহাকে নায়েবের পদে নিযুক্ত করিলে হুজুর-সরকারের কার্য্য বেশ শৃঙ্খলার সঙ্গেই চলিবে; তাহার পর যদিস্যাৎ কোন জটিল বিষয়ে সলা-পরামর্শের আবশ্যক হয়, আমার সামান্য বিদ্যাবুদ্ধিতে যেটুকু সাহায্য হইতে পারে—আমি তাহার ত্রুটি করিব না।"

সাহেব নিস্তব্ধভাবে 'হুজুরের নিমকের চাকর' ভুবন রায়ের এই সুদীর্ঘ বক্তৃতা শ্রবণ করিলেন; তাহার পর গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "ওয়েল ডেওয়ান, টুমি বূড্‌ঢ হইয়াছ বটে, কিন্তু টোমার সকল শক্‌টি হ্রাস হইয়াছে, ইহা বিশ্বোয়াস না করিবার যটেষ্ট কারণ আছে। যডি টুমি কান্‌সার্ণের নায়েবী লইটে সম্মট্ না হও, টবে সেজন্য আমি টোমাকে পীড়ন (press) করিটে ইচ্ছা করি না। কিন্তু টুমি কান্‌সার্ণের আর কোন্ আম্‌লাকে নায়েবীর যোগ্য বলিয়া ঠাহর করিয়াছ?"

দেওয়ান পুনর্ব্বার কুর্ণিশ করিয়া বলিল, "হুজুরের নিকট নায়েবী পদের নিমিত্ত কাহারও জন্য সুপারিস করিব, এরূপ ধৃষ্টতা আমার নাই; তবে হুজুর যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন আমার সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে যাহাকে উপযুক্ত বলিয়া মনে করি—তাহার নাম হুজুরের গোচর না করা আমার পক্ষে গোস্তাকি। হুজুরের আমিন শ্রীনাথ গোঁসাই এই পদের উপযুক্ত ব্যক্তি। সে বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ,

ও কার্যদক্ষ আমলা; হুজুরের কার্য্যকে সে নিজের কার্য্য মনে করিয়া প্রাণপণ যত্নে তাহা সম্পাদন করে। বিশেষতঃ শ্রীনাথ নিরহঙ্কার, নির্লোভ আমলা; ভূতপূর্ব্ব নায়েবের ধারণা ছিল—সেরেস্তার কাজ হুজুরের অপেক্ষাও সে বেশী বোঝে! এই জন্য কখন কখন তাহাকে 'ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইবার' চেষ্টা করিতে দেখা যাইত; স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য হুজুরের অনভিমতে ও অজ্ঞাতসারে অনেক কাজ করিতে গিয়া সে হুজুরের অসাধারণ বুদ্ধির কাছে ধরা পড়িয়া যাইত ও হুজুরকে বিরক্ত করিয়া তুলিত। হুজুরের দয়া ও ধৈর্য্যগুণের সীমা নাই, তাই সে শেষ পর্য্যন্ত নায়েবী করিতে পারিয়াছে। কিন্তু শ্রীনাথ কখন হুজুরের নিকট সেরূপ গোস্তাকি প্রকাশ করিবে না; হুজুরের স্বার্থ সে তাহার দেহের রক্তের মত মনে করে। আমাকে ত' সে গুরুর মতই ভক্তি-শ্রদ্ধা করে; আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন কাজই করে না। সে আমার নিতান্ত আপনার জন; এই জন্য মনে হয়, আমাকে নায়েবী দেওয়া আর শ্রীনাথকে নায়েবী দেওয়া সমানই কথা।"

সাহেব ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "টোমার প্রস্টাব অসঙ্গট্ নহে ডেওয়ান! আমার অফিসে যে সকল আম্লা আছে—টাহাডের মডো গোঁসাই বুদ্ধিমান ও—ও—'এক্সপিরিয়েন্‌ষ্ট' ইহা লক্ষ্য করিয়াছি; কিন্টু 'হ্বাট্ বেগার' ডরিড্রের সন্টান, টাহার বিষয় সম্পট্টি দূরের কটা—চাল-চুলা আছে কি না সণ্ডেহ! সে কি প্রকারে জামিন ডিয়া এই কার্য্য লইবে? বিনা-জামিনে টাহাকে আমার নায়েব নিযুক্ত করিবার শক্তি নাই। এ বিষয়ে টোমার কি বলিবার আছে ডেওয়ান!"

দেওয়ান আর এক দফা সেলাম বাজাইয়া বলিল, "হুজুর সকল দিক বিবেচনা করিয়াই কথা বলিয়াছেন। বিনা-জামিনে কেহ দায়িত্বপূর্ণ নায়েবী পদ পাইতে পারে না, ইহা আমারও অজ্ঞাত নহে হুজুর! কিন্তু হুজুর যদি শ্রীনাথের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে নায়েবী পদে বাহাল করেন, তাহা হইলে আমি তাহার পক্ষে দুই হাজার টাকার জামিন হইতে প্রস্তুত আছি। ইহাতেই হুজুরের ধারণা হইবে—শ্রীনাথ আমার কিরূপ বিশ্বাসের পাত্র।"

শ্রীনাথের প্রতি দেওয়ানের নিস্বার্থ ভালবাসার পরিচয় পাইয়া সাহেব মুগ্ধ হইলেন, এবং দুই এক মিনিট চিন্তা করিয়া তাহাকে বলিলেন, "আচ্ছা, টুমি এখন যাইটে পার; আমি বিবেচনা করিয়া ডেখি।"

ম্যানেজার সাহেব দুই দিন ধরিয়া 'বিবেচনা' করিয়া শ্রীনাথকেই নায়েবী দেওয়া স্থির করিলেন। অনন্তর ভুবন রায় তাহার দাদা গোলোক রায়ের সহিত পরামর্শ না করিয়াই, এমন কি, তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে জামিন-নামা স্বাক্ষরিত করিয়া, স্থানীয় সব্‌রেজেষ্টারী আফিসে তাহা যথারীতি রেজেষ্টারী করিয়া দিল। পরদিন সাহেব সকল আমলাকে ডাকিয়া তাহাদের সমক্ষে শ্রীনাথকে নায়েব নিযুক্ত করিবার হুকুমনামা পাঠ করিলেন। সেই দিন হইতে শ্রীনাথ গোসাই কান্সারণের নায়েবী পদে প্রতিষ্ঠিত হইল। এতদিনে তাহার দীর্ঘকালের চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম ও ষড়যন্ত্র সফল হইল। শ্রীনাথ নায়েবী সনন্দ লাভ করিয়া, কুঠির দরবারে কৃতজ্ঞতাভরে অবনত-মস্তকে সাহেবকে অভিবাদন করিল, অন্যান্য আমলা-গণকেও যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিল।

রোগ-শয্যাশায়ী গোলোক রায় এই সংবাদে বিচলিত হইয়া মুহূর্ত্তের জন্য দুঃসহ রোগ যন্ত্রণাও বিস্মৃত হইল! সে ভুবনকে নিভৃতে ডাকিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ ভাবে বলিল, "ভাই, এত বড় ভুল ক'রে বস্‌লে! অথচ মরতে পড়েছি দেখে আমাকে একবার কথাটা জিজ্ঞাসাও করলে না? যা করেছ, তা ভালই করেছ; কিন্তু সাবধান! মনে রেখ, তুমি খাল কেটে কুমীর আন্‌লে! বুড়ো হ'য়ে গেলে, এখনও 'বারেন্দ' কি চিজ্—চিন্‌তে পার্‌লে না?"

ভুবন হাসিয়া বলিল, "দাদা, আপনি অনর্থক ভয় কর্‌চেন! শ্রীনাথকে নায়েবী দেওয়া, আর আমার নায়েবী নেওয়া—সমান কথা। শ্রীনাথকে দিয়ে যদি কখন আমাদের কোন অনিষ্ট হয়—তবে দিন-রাত সকলই মিথ্যা! পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উঠ্‌বে, কিন্তু শ্রীনাথ কখনও বিশ্বাস-ঘাতকতা কর্‌বে না, এ ঠিক জেনো।"

গোলোক রায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিল, "দেখে নিও ভাই!" (ক্রমশঃ)

———

সোমরস

(প্রথম অংশ)

শ্রীব্রজলাল মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

আপনি নিশ্চয়ই অনেক রকম রস পান করিয়াছেন ; কিন্তু আপনি কি সোমরস পান করিয়াছেন ? কবিগণ প্রকার-ভেদে সোমরস পান করিয়া থাকেন, এবং বলিয়া থাকেন, হে সোম, তুমি কি মধুর ; তুমি আমারই তুমি আমারই। ইহাতেই সোমের সোমত্ব। যাহা কিছু মধুর তাহাই সোম। যাহা মধুর নহে, তাহা বৃত্র। সোমই আমাদের প্রাণে বাঁচাইয়া রাখেন। সুতরাং সোম অমৃত। কবির মধ্যে যে প্রাণভরা ভাব জাগিয়া উঠে, আমার প্রাণকে অনুপ্রাণিত করে, তাহাই সোম। দেবতারা এই সোম জানিতেন। এই সোমকে সর্ব্বত্র পাইতেন। তাহা দ্বারা জ্যোতিষ্মান্ হইতেন। তাহাতেই দেবগণের দেবত্ব। এ সোম এক ভাবের সোম। কিন্তু শুদ্ধ এই ভাবে ত' দেবগণের সংসার চলে নাই। আমাদেরও চলে না। ভাবে বিভোর হইয়া তন্ময় হইয়া থাকা কোনও দেবতার ভাগ্যে ঘটে নাই। দেবতারা এবং ঋষিরা দেখিলেন (এবং আমিও দেখিতেছি) যে, চাঁদ বড় মিষ্ট। বায় বড় মিষ্ট। মধু বাতা ঋতায়তে। আকাশে চাঁদের মত মিষ্ট আর কিছুই নাই। সুতরাং আকাশের চাঁদ সোম,—যাহা ছেলেবেলায় হাত বাড়াইয়া পাইবার চেষ্টা করিতাম, এবং যাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া এখনও কাঁদি—এই সব মিষ্ট। এই চাঁদের নাম সোম। যে ফুরফুরে হাওয়ায় মাতাইয়া তুলে,—সেই হাওয়া সোম। চাঁদ দ্যুলোকের অর্থাৎ আকাশের সোম। হাওয়া তার নীচেকার অর্থাৎ অন্তরিক্ষের সোম। এইরূপ নানা কথা সোমের তো জানাই ছিল। কিন্তু এক ঘটনা ঘটিল। এ সব সোম লইয়া ত মনস্তুষ্টি হইল না। খাদ্যাদির মধ্যে এমন কোন দ্রব্যের কথা জানা ছিল না, যাহাকে সোম বলা চলিত। খাদ্য ছিল ত' ছাতু। তাহাতে এমন কিছু নাই, যাহাকে সোম বলা চলে। পানীয়ের মধ্যে ত সুরা। সে ত' দেবগণও খাইয়াছেন, ঋষিরাও খাইয়াছেন (অর্থাৎ পান করিয়াছেন) ;

আর আমিও—(কেবল ব্যাকরণটা একটু তফাৎ করিয়া লইবেন)। যাহাই হউক, সুরার স্বাদে এমন কিছু মিষ্টতা নাই যে তাহাকে সোম বলিয়া নৃত্য করিতে থাকিব। এখন, এক সময়ে দেবতারা কেহ হাতীতে চড়িয়া, কেহ ঘোড়ায় চড়িয়া, কেহ যণ্ডে চড়িয়া (?), কেহ মহিষে চড়িয়া, কেহ গাধায় চড়িয়া দেশ-পর্য্যটন করিতে-করিতে এক অজানা দেশে গিয়া পড়িলেন। সে দেশের লোকেরা দেবতাদের খুব আদর-অভ্যর্থনা করিল; এবং এক রকম গাছের রস হইতে প্রক্রিয়া-বিশেষে এক প্রকার পানীয় প্রস্তুত করিয়া দেবতাদিগকে পান করিতে দিল। তাহা পান করিয়া দেবতারা ত' অবাক্। বিশেষতঃ, তাঁহাদের যিনি রাজা (তাঁর নাম ইন্দ্র) তিনি এই পানীয় বড় তারিফ্ করিলেন। পানীয়ের মধ্যে কি এমন জিনিষ আর আছে? না,—না, ইহাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। এই বলিয়া মহা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দেবতারা এতই মাতোয়ারা হইয়া পড়িলেন যে, সে গাছটা কি, কোন্ জাতীয়, বা তাহার বৈজ্ঞানিক নাম লাটিন ভাষায় কি হওয়া উচিত, তাহার কিছুই অনুসন্ধান করিলেন না। কেবল রস পানেই বিভোর। সে গাছেরও নাম হইল সোম।

দেবতারা সেই দেশে থাকিবার সময় নজর করিলেন যে, সেই দেশের লোকগুলি সুগায়ক এবং ধনুর ব্যবহারে খুব পটু। সেই দেশ হইতে নিজদেশে ফিরিয়া আসিয়া, দেবতারা সকলে পরামর্শ আঁটিয়া গায়ত্রী দেবীকে অনেক অনুরোধ করিয়া বলিলেন, হে দেবী! তুমি একবার পক্ষ বিস্তার কর (তখন গায়ত্রী দেবীর ডানা ছিল, এখন আছে কি?), ঐ দেশে একবার যাও। তুমি স্ত্রীলোক,—তুমি উহাদের ভুলাইয়া, গান শুনাইয়া, সোমের গাছ সংগ্রহ করিতে পারিবে। কি আশ্চর্য্য!—অতগুলো গাধা-চড়া, হাতী-চড়া সোণার বর্ম্ম-পরা মরদ, তাঁহারা কেহ তীরন্দাজদের সঙ্গে লড়াই করিয়া সোম আনিতে সাহস করিলেন না। বোধ হয় বুঝিলেন যে, বর্ম্মের ভারে যুদ্ধ করা একেবারেই অসম্ভব। যাহাই হউক, দেবতারা অনেক মিনতি করাতে, গায়ত্রী দেবী পক্ষ বিস্তার করিয়া আকাশ-মার্গে উড্ডীয়মানা হইলেন এবং অচিরেই সেই দেশে অবতীর্ণা হইলেন। সেই দেশের রাজা বা সেনাপতি ছিলেন কৃশানু। গায়ত্রী কৃশানুকে নানা রকম ছলে মোহিত করিতে অক্ষম হইয়া, চুপি-চুপি একটি গাছ তুলিয়া আকাশে উড়িলেন। তখনই সোমের ক্ষেতের চৌকীদার কৃশানুকে খবর দিল; এবং কৃশানু এক তীর ছুড়িয়া গায়িত্রীর একটা ডানা কাটিয়া ফেলিল; সোমের গাছটাও পড়িয়া গেল। সোমও পাওয়া গেল না, বরং গায়ত্রীর ডানা কাটা হইয়া গেল (বোধ হয় সেই অবধি গায়ত্রী দেবীর ডানা লুপ্ত হইয়াছে)। তার পর দেবগণ কৃশানুর দলের সঙ্গে একটা সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। তাহার সর্ত্ত এই যে কিরাত ও গন্ধর্ব্বগণ দেবতাদের রাজ্যে ঢুকিতে পারিবেন, কিন্তু কেবল ব্যবসায় চালাইবার জন্য। সোমের মূল্যও স্থির হইয়া গেল। কিরাতগণ শকটে করিয়া সোম হইয়া আসিবেন, এবং দেব-রাজ্যের লোকেরা নধর গাভী দিয়া সোম ক্রয় করিবেন। ঋষিরাও এই সর্ত্ত অনুসারে কার্য্য করিতে থাকিলেন। তাঁহারা দেবগণের সোমের ভাগ যথারীতি বজায় রাখিলেন; এবং কত গান বাঁধিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, হে ইন্দ্র, তুমি মর্ত্ত্যলোকে কত সোম পান করিয়া গিয়াছ। আমাদের বিপদের সময় তুমি কোথায়? এস পুনঃ পুনঃ সোম পান কর। আমাদের রক্ষা কর। এই সোম লইয়া শেষ কালে একটা বৃহৎ যজ্ঞ আরম্ভ হইল। তাহার নাম সোমযাগ। সেই যজ্ঞের আবার প্রকার-ভেদ করা হইল। কতকগুলি একাহনিষ্পাদ্য। এইগুলি একদিনের মধ্যে, কিন্তু তিনবারে, সমাপ্ত হয়। ঠিক যেন শ্রীশ্রী৺জগদ্ধাত্রী পূজা। আর এক রকম সোম যাগ হইতেছে অহীন। এইগুলিতে দুই দিন হইতে এগার দিন পর্য্যন্ত সময় লাগে। যেমন শ্রীশ্রী৺দুর্গা পূজা। আর এক রকম হইল সত্র। ইহাতে অন্যূন তের দিন লাগে, এবং একটু বাড়াইয়া তুলিলে যত কাল ইচ্ছা হয়, তত কালই করা যাইতে পারে। এই রকম কতকগুলি জটিল যজ্ঞ প্রচলিত হইয়া উঠিল। শ্বেতকেতু ঔদ্দালকি দেখিলেন যে, গাড়ী-গাড়ী সোম আসিতেছে; কিন্তু ভাবিলেন, যাহাদের দেশের গাছ, তাহাদের ভাষায় ঐ গাছের নাম কি? অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন, ঐ গাছের নাম অশনা-উশনা। এই ব্যাপারটী তিনি আর পাঁচজনকে জানাইয়া রাখিলেন। যখন 'শতপথ ব্রাহ্মণ' নামক গ্রন্থ সংগৃহীত হয়, তখন তন্মধ্যে

এই সংবাদটুকু নিবদ্ধ করা হইল। সুতরাং অশনা বা উশনা শব্দটী কিরাতদের ভাষার শব্দ। কিরাতদের ভাষার একটী বৈচিত্র্য এই যে, উহারা কথা কহিবার সময় শব্দের পুর্ব্বে অ বা উ যোগ করিয়া দেয়—যেমন উপ। উহাদের ভাষায় প অর্থে পিতা। কিন্তু উচ্চারণ করিবার সময় উহারা বলে উপ। এই রকমে "অ" যোগের দৃষ্টান্তও যথেষ্ট পাওয়া যায়। সুতরাং কিরাত ভাষার অশনা বা উশনা শব্দটীর মূল হইতেছে 'শনা'। এই শনা শব্দটীর "ন" সংস্কৃত ভাষার "ণ" হয়। এ বিষয়ে হজসন ও গ্রিয়ার-সন উভয়েই যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। শেষের "আ" কেবল উচ্চারণ জন্য। এই সকল নিয়মে অশনা বা উশনা শব্দটী বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায় যে, এই শব্দের সংস্কৃত শব্দ হইবে "শণ"। শণ শব্দের অনুরূপ অর্থবাচক প্রাচীন গ্রীক ভাষার প্রতিশব্দ হইতেছে Kanna। এই শব্দের প্রাচীন অর্থ ভাঙ্গ বা সিদ্ধির গাছ। ভাষাতত্ত্বের নিয়মানুসারে Greek শব্দ kanna এবং সংস্কৃত ভাষার শণ একই শব্দ বটে। এবং এই দুইটি শব্দের অর্থও একই বটে। (S. B. E. 32-233) তাহা হইলে এ পর্য্যন্ত বুঝা যাইতেছে যে, সোম=অশনা (উশনা)=শণ=সিদ্ধির গাছ। সোম আর শণ যে একই বস্তু, তাহার প্রমাণ শতপথ ব্রাহ্মণেও পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থে (৬।৬।১।২৪) দেখা যায় যে, ধ্রুবায়ু ও উম্বনের মধ্যে যেমন একটা সম্বন্ধ আছে, সেই রকম শণ ও উমার মধ্যে একটী সম্বন্ধ আছে। সোম বলিলেই বুঝিতে হইবে যে উমার সহিত বর্ত্তমান (উমায়াসহ বর্ত্তমানঃ)। এবং শণের সম্বন্ধে এই গ্রন্থ বলিয়াছেন যে, সোমের নাম শণ এবং শণের ভিতরটাই উমা। সোম শব্দটী সিদ্ধি বা ভাঙ্গ অর্থে বৈদিক ভাষা ব্যতীত অন্য অনেক ভাষায়ও পাওয়া যায়; যথা, তাংগতদিগের মধ্যে সিদ্ধির গাছের নাম ছিল সোম (Dschoma); তিব্বতী ভাষায় সিদ্ধির গাছের নাম সোমরস। ডাহুরিয়ার মোগলেরা সিদ্ধির গাছকে বলিত সিম। চীন ভাষায় সিদ্ধির গাছের নাম সিম, সুম। সিম পুরুষবৃক্ষের নাম ও সুম স্ত্রীবৃক্ষের নাম। Sir George Watt বলেন যে, সুম (স্ত্রীবৃক্ষ) মাদক রসের আধার। এই প্রমাণেও দেখা যায় যে, সোম অতি প্রাচীন শব্দ। নানা দেশে এই শব্দ বা এতদনুরূপ শব্দের অর্থ সিদ্ধির গাছ। চীনা, তিব্বতীয় ইত্যাদি জাতিদিগের ভাষা ও বৈদিক ভাষা এক বংশীয় বলিয়া বিবেচনা হয় না; এবং গ্রীক ও সংস্কৃত ভাষার মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, চীন, তিব্বত ইত্যাদির মধ্যে সে রকম সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ সব ভাষার মধ্যে একই শব্দের যে একই অর্থ, তাহাও প্রমাণ করা যায় না। সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে যে, সোম শব্দটী কিম্বা ঐ শব্দের অনুরূপ শব্দগুলির অর্থ সামান্য হওয়ার একই মাত্র কারণ থাকিতে পারে। এবং সে কারণটি এই; যথা—যে জাতিদিগের নিবাস-স্থানে এই গাছের আদিম জন্মস্থান, সেই জাতির ভাষায় সোমশব্দের একটী অর্থ হইতেছে সিদ্ধির গাছ। এবং সিদ্ধির গাছ ঐ দেশ হইতে যখন অন্য দেশে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখনও ত তত্তদ্দেশীয় লোকেরা ঐ গাছের প্রাচীন নাম বজায় রাখিয়াছেন। ঋষিরাও কিরাত ও গন্ধর্ব্বগণের ভাষার সোম শব্দটী নিজেদের ভাষার অন্তর্গত করিয়া লইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বিবেচ্য সোম শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে একটা গোলমাল আছে। সু ধাতু হইতে যদি বাস্তবিক এই শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে পানীয় রস (সোমরস) প্রস্তুত করিবার প্রণালী হইতেই এই গাছের নাম দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহা সম্ভবপর বিবেচনা হয় না। পুনশ্চ, মন্ প্রত্যয়টীও বোধ হয় উণাদির অন্তর্গত। "উময়া সহ বর্ত্তমান" এই বাক্য হইতেও এই পর্য্যন্ত বুঝা যায় যে, সোম নামের বিশ্লেষণ করিবার জন্যই এই ব্যাখ্যা করা হয়। এই ব্যাখ্যা হইতে যে সোম নামের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা নহে। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, সোম শব্দটী যে মৌলিক বৈদিক ভাষার শব্দ, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। সোম শব্দটী ভাষান্তর হইতে গ্রহণ করিবার পর, এই শব্দের অর্থ-প্রসার হয়। তৎপরে ঋষিগণ মন্ত্রের মধ্যে 'মধুর' এই অর্থে এই শব্দ ব্যবহার করেন। নিরুক্তকার যাস্ক দেবগণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন; যথা—দ্যুস্থানাঃ, মধ্যস্থানাঃ, ভূস্থানাঃ। অর্থাৎ আকাশের দেবতা, মধ্যস্থানের দেবতা ও ভূস্থানের দেবতা। সোম দেবতা তিন স্থানেই আছেন; সুতরাং তাঁহার তিন যায়গায় তিন রূপ আবশ্যক। দ্যুলোকের রূপ চাঁদ। মধ্যস্থানের রূপ মৃদুমন্দ বায়ু। ভূস্থানের রূপ সোম গাছ। বৈদিক মন্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইলে, মন্ত্র ও প্রকরণ বিবেচনা করিয়া অর্থ বুঝিতে হইবে। যাস্কের মত স্বকপোল-কল্পিত নহে। শতপথ ব্রাহ্মণ নামক গ্রন্থে (৩।৯।৪।১২) বিশদ রূপে বলা

হইয়াছে যে, সোমের তিন মূর্ত্তি ; যথা—আকাশে, মধ্যস্থানে ও পৃথিবীতে। প্রথম দুই মূর্ত্তির সহিত তাঁহাদের পরিচয় ছিল। কিন্তু তৃতীয় মূর্ত্তি—যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা গুপ্ত ভাবে ছিল।

বেদে সোমের বর্ণনা কিছু পাওয়া যায় কি না ? শব্দ শাস্ত্রের ও ভাষাতত্ত্বের প্রমাণে আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, সে সিদ্ধান্ত প্রমাণান্তরে সিদ্ধ হয় কি না ? একটা মন্ত্রে পাওয়া যায় (ঋ ৯।৪১।১) যে, সোমের ত্বক কৃষ্ণবর্ণ, অথবা ঘোরবর্ণ। ইহা শীঘ্রই ইহার ত্বক্ ত্যাগ করে। ইহার রস পাৎলা হরিদ্বর্ণ, অথবা বভ্রুবর্ণ বা পিশঙ্গ বর্ণ বলা যাইতে পারে। ইহাকে 'ঊধঃ'ও বলা যায় (ঋ ৯।১০৭।৫)। ঊধঃ শব্দের অর্থ ঘোর বর্ণ (নিঘণ্টু ১।৭।২০)। সোমরস প্রস্তুত হইবার পর একটু ঘোলাটে সাদা বর্ণ দেখায়। মন্ত্রবিশেষে সোমকে "হরি" বলা হইয়াছে। নিরুক্তকার বলেন, "হরি সোমো হরিতবর্ণঃ (৪।১৯)। মন্ত্রগুলির অর্থ বিচার করিয়া দেখা যায় যে সোমরস যখন পানের উপযুক্ত হয়, তখন তাহাকে "বৃষাশোণঃ" বলা যায় (ঋ ৯।৯৭।৩) ; অর্থাৎ বেশ মনোরম্ উজ্জ্বল বর্ণ। দুগ্ধ ও দধি মিশ্রণের পূর্ব্বে ইহাকে বভ্রুবর্ণ (৯।৯৮।৭) বলা যায়। দুগ্ধ, মধু ইত্যাদি মিশণের পূর্ব্বে, অর্থাৎ সোম যখন কলসে থাকেন, তখন অরুষঃ (ঋ ৯।৮।৬) সোমকে বরাহ বলা হইয়াছে। নিরুক্তকার বলেন যে, এ স্থলে বরাহ অর্থে জল টানে। ইহাকে অংশুমান্ বলে ; অর্থাৎ ইহার খুব সূক্ষ্ম রশ্মির ন্যায় শোঁয়া থাকে। সোম গোজাতির প্রিয় খাদ্য। ইহাকে ঔষধীনাংপতিঃ ও বীরুধাংপতিঃ বলা হয়। সোমের শৃঙ্গ আছে এবং পর্ব্ব আছে। ইহার সরু-সরু ডাল আছে। সোম পাহাড়-পর্ব্বতে ফাটলের মধ্যে জলের নিকটে খুব প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ইহার গন্ধ বড় উগ্র এবং ঐ গন্ধে বমনের বেগ আইসে। জলে ভিজিলে ডালপালাগুলি খুব হৃষ্ট-পুষ্ট হইয়া ফুলিয়া উঠে। ঋষিরা যখন প্রথমে সোম পান করিতে শিখিলেন, তখন কড়া গন্ধে বমি করিয়া ফেলিতেন। ক্রমশঃ দুগ্ধ ও মধু মিশ্রিত করিয়া সভ্য ভাবে নেশা চালাইতে লাগিলেন। সোমকে বনস্পতি বলা হইয়া থাকে। বনস্পতি শব্দের অতি প্রাচীন অর্থ বননীয়ানাং পতিঃ, অর্থাৎ যাহাদের প্রশংসা করা হয়, তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু কালক্রমে এই শব্দের অর্থ-সঙ্কোচ হইয়া পড়ে, এবং এই শব্দের অর্থ হয় দণ্ডায়মান বৃক্ষ (ঋ ৯।১২।৭) ঐ ব্রা ২।১।১০, শত, ৩।৮।৩।৩৩, হলায়ুধ ২১২২)। সোম গাছ যে দাঁড়া গাছ তাহার প্রমাণস্বরূপ আরও অনেকগুলি ঋক পাওয়া যা যথা—৭।১।৬৬।৫ ; ৮।২০।৫, ৯।১১।৭ ইত্যাদি। সোম যদিও দাঁড়া গাছ বটে, কিন্তু কত বড় যে হয়, তাহার বর্ণনা আমি পাই নাই ; বরং এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সোম গাছ ঝোপের মতন হইয়া থাকে। সোমের পত্রগুলির আকার যে কি রকম, কিম্বা কত বড় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। যাহাও বা উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহার অর্থবোধ হওয়া সুকঠিন। যথা, একটা কথা শতপথ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, পলাশপত্র সোমের পত্র হইতে জাত। আমি এই বাক্যের রহস্য ভেদ করিতে পারি নাই। এ পলাশ বৃক্ষ যে আমাদের পরিচিত পলাশ, তাহারও প্রমাণ নাই। আর তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে এই বাক্যের অর্থ কি ? সোম ও পলাশ যদি উভয়ই অজানা গাছ হয়, তাহা হইলে ঐ বাক্য হইতে কোনও প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। এই বর্ণনা হইতে যে সোমের উপযুক্ত পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাও নহে। কিন্তু একেবারে যে কোনও পরিচয় পাওয়া গেল না, এমনও নহে। মোট এই পর্য্যন্ত বুঝা গেল যে, সোম এক রকম ঝোপের মত দাঁড়া গাছ ; বর্ণ কিছু ঘোর ; তাহার গাত্রে অংশু বিদ্যমান্, ডালগুলি নরম, অল্প আয়াসেই ছাল ছাড়িয়ে ফেলা যায়, ভয়ানক কড়া গন্ধ, তাহার রস পান করিলে খুব নেশা হয়। রসটা দুগ্ধ ও মধু মিশাইয়া খাইলে গন্ধ একটু কম অনুভূত হয়। বেশী পান করিলে বমন হয়। ইহা একটি খুব প্রয়োজনীয় ঔষধ। ইহা ওষধি-বিশেষ।

সোমের আদি নিবাস কোথায় ? অর্থাৎ বৈদিক দেবগণ বা ঋষিগণ ইহাকে কোথায় প্রথম দেখেন ? এ বিষয়েও কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। সোমের নিবাস মুঞ্জবান্ পর্ব্বত। এই পর্ব্বত কৈলাসের নিকটে এবং গন্ধর্ব্বগণের দেশে অবস্থিত। সোম ও কুষ্ঠার বাসস্থান এক স্থানেই। কুষ্ঠার (Saussurea) বাসস্থান হিমালয় পর্ব্বত বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে। সুতরাং মুঞ্জবান্ পর্ব্বতও হিমালয়ের অংশবিশেষ। এ বিষয়ে পুরাণের বর্ণনায় দেখা যায় যে, মেরুর দক্ষিণে হিমবান্, হেমকূট ও নিষদ্ পর্ব্বত। উত্তরে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গী। এই প্রদেশের

দক্ষিণে ভারতবর্ষ, কিংপুরুষবর্ষ ও হরিবর্ষ এবং উত্তরে রম্যক, হিরন্ময় ও কুরুবর্ষ। মেরুর পার্শ্বে ইলাবৃতবর্ষ। ইহার পূর্ব্বে মন্দর, ও দক্ষিণে গন্ধমাদন; পশ্চিমে বিপুল এবং উত্তরে সুপার্শ্ব। এই স্থানের নাম জম্বুদ্বীপ। এখানে জম্বু নামে একটী নদ আছে। এই নদ গন্ধমাদন হইতে উঠিয়াছে। এখানে স্বর্ণ পাওয়া যায়। মেরুর পূর্ব্বে ভদ্রাশ্ব এবং পশ্চিমে কেতুমালবর্ষ এবং ইহার মধ্যস্থিত স্থানের নাম ইলাবৃতবর্ষ। ইহার পূর্ব্বে চৈত্ররথ বন, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমে বৈভ্রাজ এবং উত্তরে নন্দনকানন। এই স্থলে চারিটী বড় হ্রদ আছে; যথা অরুণোদয়, মহাভদ্র, অসিতোজ ও মানস। এখানে কতকগুলি ছোট পাহাড় আছে,—সীতান্তক, মুঞ্জ, কুরবী ও মাল্যবান্। এই সকল নামের মধ্যে কতকগুলি আমাদের পরিচিত; যথা, জম্বু নদ অর্থাৎ River Sanpo; ইহার উৎপত্তি Gurla Mandhata নামক পর্ব্বতে। সুতরাং Gurla Mandhata ও গন্ধমাদন একই পর্ব্বতের নাম। ঐ স্থানের মানচিত্র দেখিলেই এ বিষয় বিশদ ভাবে বুঝিতে পারা যাইবে। মান্ধাতা ও Mariam pass একই। ইহার নিকটে যে স্থানে সোণা পাওয়া যায়, তাহার নাম Thak Jahung gold field। মানস সরোবর প্রসিদ্ধ। সুতরাং মুক্তবান্ এই স্থানের নিকেট এবং কৈলাসের দক্ষিণে। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, men—nam—nyim নামক যে পর্ব্বত আছে, তাহাই মঞ্জুবান্। নাম দুইটির মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য ও আছে। যে স্থানের উল্লেখ করা হইল, সেই স্থান ভঙ্গা ও কুষ্ঠার নিবাসস্থান। শতপথ ব্রাহ্মণে দেখা যায় যে, ঐ স্থান হইতে উত্তরদেশবাসী অসভ্য জাতিগণ সোম (=সিদ্ধি) আনিয়া বৈদিক ঋষিগণকে বিক্রয় করিত।

সোমের যে বর্ণনা বৈদিক গ্রন্থসকলে পাওয়া যায়, এবং ভাষাতত্ত্বের যে সকল প্রমাণ একত্র করা হইয়াছে, তাহা বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বৈদিক ভাষায় যাহাকে সোম বলা যায়, তাহার বাংলা নাম ভঙ্গা, ভাঙ্গ বা সিদ্ধি। কিরাত বা গন্ধর্ব্ব দেশ হইতে বৈদিক জাতি যখন দূরে যাইতে লাগিলেন, বা সোম (অর্থাৎ ভাঙ্গ) সংগ্রহ করা যখন কঠিন হইয়া পড়িল, তখন সোমের অভাবে অন্যান্য বস্তুর ব্যবহার আরম্ভ হইল। মীমাংসা-শাস্ত্রের একটী পুরাতন বচন আছে—সোমাভাবে পূতিবিধিঃ। এ বচনের প্রকৃত মীমাংসা করিতে আমি অক্ষম; কারণ, এই বচনের উল্লিখিত পূতি যে কি পদার্থ, তাহা আমি অবগত নহি। ইহা যে পুঁই শাক, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায় না। অন্যান্য বস্তুর ব্যবহারে ক্রমশঃ মূল বস্তুর পরিচয়ে সন্দেহ হইতে লাগিল; এবং ঐতিহাসিক সমালোচনার অভাবে ব্রাহ্মণগণ ক্রমশঃ সোমের মূল পরিচয় ভুলিয়া গেলেন। কিন্তু সোম সম্বন্ধে কতকগুলি প্রাচীন প্রবাদ তাঁহারা এখনও বলিয়া থাকেন; এবং সোমযজ্ঞে (যদি কখনও হয়) ঐ প্রবাদ অনুসারে কার্য্যও করেন। সে প্রবাদটী এই যে, সোম দাঁড়া গাছ, ঝোপের মত হয় এবং উচ্চে সাধারণতঃ ৪।৫ ফিট হইয়া থাকে। এই প্রবাদ অনুসারে, দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণগণ সোম যজ্ঞ করিবার সময়, পুণার নিকটে পাহাড়জাত ঐ প্রবাদানুরূপ একরকম গাছের রস ব্যবহার করিয়া থাকেন। দাক্ষিণাত্য প্রদেশের ব্রাহ্মণগণের এই রীতি সম্বন্ধে আমি স্বয়ং অবগত নহি। কিন্তু Prof. Hang সাহেবের গ্রন্থে এই বিবরণ পাওয়া যায়। Prof. Hang এর মত যাহাই হউক, দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণগণের প্রথা সম্বন্ধে তিনি যে সংবাদটুকু দিয়াছেন, সেই সংবাদটুকুই আমাদের আবশ্যক। উঁহাদের উক্তরূপ প্রথা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, উঁহাদের মতে সোম ৪।৫ ফিট উচ্চ দাঁড়া গাছ ছিল। প্রাচীন পারশী জাতির মধ্যেও প্রবাদ ছিল যে, সোম দাঁড়া গাছ; এবং সেই প্রবাদানুসারে Houtum Schindler সাহেবকে এক জাতীয় দাঁড়া গাছ সোম বলিয়া দেখান হইয়াছিল। আর একটী কথা জানা আবশ্যক। লতা শব্দের বৈদিক ভাষার শব্দ নিবৃত্মা, কিন্তু সোমকে নিবৃত্মা বা ব্রততি বা বল্লী বলিয়া কোথাও বর্ণনা করা হয় নাই। প্রবাদকে কি প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যায়? এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যদি কোনও প্রবাদের সপক্ষে প্রমাণান্তর থাকে, তবেই সেরূপ প্রবাদকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। প্রবাদ কিন্তু যথার্থ ভিত্তিমূলক কি না, সে বিষয়ে সর্ব্বদাই সাবধান থাকিতে হইবে। জনরব যে, আমি যেখানে বসিয়া লিখিতেছি, এই যায়গার সম্মুখে যে গাছ আছে, তাহাতে ভূত আছে। প্রবাদগুলির মধ্যে অধিকাংশই এই প্রকারের হইয়া থাকে। কিন্তু আপনি কি এই প্রকার প্রবাদ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিবেন? নিশ্চয়ই করিবেন না।

না করার কারণ এই যে, এই রকম ব্যাপারের প্রমাণান্তর পাওয়া যায় নাই। কিন্তু যদি কোনও প্রকার অলৌকিক ঘটনার প্রমাণান্তর দেখি, তাহা হইলে এইরূপ প্রবাদকে প্রমাণ বলিয়া গণ্য করি। মূল কথা, এই প্রবাদ সম্বন্ধে যদি প্রমাণান্তর থাকে, তাহা হ'লে সেই প্রবাদকে প্রমাণ বলিয়া গণ্য করিব, নচেৎ করিব না। এমন অনেক প্রবাদ আছে যে, তাহার মূলে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই। যেমন, একটা অন্ধকার ঝুপ্‌সী বাড়ী জঙ্গলের কাছে আছে; সে বাড়ীর সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, সে বাড়ীতে ভূত বাস করিয়া থাকে। ভূত বাস করে, কি করে না, এ বিষয়ে কোনও প্রমাণ না থাকিলেও, ঐ বাড়ীতে কোন অজ্ঞাত অনিশ্চিত কারণে লোকের মনে ভয়ের উদ্রেক হয়। সেই অজ্ঞাত কারণের একটা মৌলিকত্ব আছে বটে, এবং সে কারণটী কি তাহা অনুসন্ধান করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে ভূতের অস্তিত্বের প্রমাণ না থাকায়, ভূতই যে এই প্রবাদের কারণ, তাহা প্রমাণ হয় না। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, ভূত না থাকিলেও, ভূতের প্রবাদ হইতে পারে। লোক মুখে শুনিলাম, আমার মাতুলের বিয়োগ হইয়াছে। ইহা প্রবাদ। এই প্রবাদ প্রামাণ্য কি না, সেটা বিবেচনা করিতে হইলে, মূল ঘটনার বিশেষ প্রমাণ লওয়া আবশ্যক, এবং যদি ঐ সকল প্রমাণের সহিত প্রবাদটা মিলে, তাহা হইলে প্রবাদটা কতকটা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে পারিব। যথা, মামার বাড়ী যাইব, মাতুলানী- * (ঐ ভঙ্গা আসিয়া পড়িল)কে জিজ্ঞাসা করিব, ইত্যাদি।

যদি প্রবাদ থাকে যে সোম নিষ্পত্র, তাহা হইলে কি করিতে হইবে? ঋষি-কথিত বা লিখিত গ্রন্থগুলিতে দেখিতে হইবে যে, এই প্রবাদটী প্রমাণমূলক কি না। অর্থাৎ আমার জানিতে হইবে যে, যাঁহারা সোমকে জানিতেন, তাঁহারা ইহাকে সপত্র বা নিষ্পত্র বলিয়াছেন? তাঁহারা যদি নিষ্পত্র বলিয়া থাকেন, তবে বুঝিব এই প্রবাদটীও ঠিক। যদি সপত্র বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে নিষ্পত্র প্রবাদ অগ্রাহ্য করিতে হইবে। কি কারণে নিষ্পত্র প্রবাদ আরম্ভ হয়, সে বিষয়ের আলোচনা এ প্রবন্ধের পক্ষে আবশ্যক হইবে না। Prof Hang বলিয়াছেন যে, যে গাছের রস হইতে সোম প্রস্তুত করা হইয়াছিল, সে গাছের পাতা নাই। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, সম্ভবতঃ ঐ সকল ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রবাদ ছিল যে, সোম নিষ্পত্র। কিন্তু এ প্রবাদের প্রামাণ্য বিচার করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, বৈদিক গ্রন্থ সোমের পত্র সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন। দেখা যায়, বেদে অনেক স্থলেই সোমের পত্রের উল্লেখ আছে; সুতরাং নিষ্পত্র প্রবাদ আমরা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। আরও এক কথা এই যে, Houtum Schindlerকে পার্শীগণ যে গাছ সোম বলিয়া দেখাইয়াছিল, সেই গাছ সপত্র। সুতরাং নিষ্পত্র প্রবাদ অগ্রাহ্য। আর একটা প্রবাদ সম্বন্ধে দেখুন। একটী প্রবাদ আছে যে, সোম লতা। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, সোম দাঁড়া গাছ। আমাদের এই সিদ্ধান্তমূলে বৈদিক প্রমাণ ও ভাষাতত্ত্বের প্রমাণ রহিয়াছে; যথা সোম—বনস্পতি; এবং নানা ভাষায় ঐ সোম শব্দের অর্থ ভাঙ্গ গাছ; এবং ভাঙ্গ গাছ নিশ্চয়ই দাঁড়া গাছ; সুতরাং সোম দাঁড়া গাছ। আরও একটী উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, সোমকে কখনও লতা বলা হয় নাই। এমন স্থলে যদিও একটা প্রবাদ থাকে যে, সোম লতা বিশেষ (লতাত্মক), সে প্রবাদের প্রামাণ্য উপরিলিখিত নিয়মানুসার অগ্রাহ্য। দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণগণ Prof. Hangকে যে গাছ দেখাইয়াছিলেন, তাহা লতা-বিশেষ নহে; সেটী দাঁড়া গাছ। Hautum Schindlerকে পার্শীগণ যে গাছ দেখাইয়াছিলেন, সেটীও দাঁড়া গাছ-বিশেষ; লতা নহে। বৈদিক প্রমাণ ও প্রবাদ মধ্যে এ সম্বন্ধে প্রভেদ দেখা যায় না। সুতরাং যদি অন্য একটী প্রবাদ শুনা যায় যে, সোম লতা বিশেষ, তবে সে প্রবাদটী অগ্রাহ্য হইবে। সায়নাচার্য্য বোধ হয় শুনিয়াছিলেন যে, সোম লতা বিশেষ; কিন্তু তিনি এই প্রবাদের মূলে কিছু প্রমাণ আছে কি না, কিম্বা প্রবাদটীই ঠিক কি না, তাহার বিচার করেন নাই। যাহাই হউক, এ কথাটী বেশ বুঝা যাইতেছে যে, সায়নাচার্য্যের পূর্ব্বেই এই প্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছিল। কোথা হইতে কি ভাবে এই প্রবাদের উৎপত্তি হইল, তাহার নির্দ্ধারণ করা আমাদের আবশ্যক নহে; এবং যে কারণ হইতেই এই প্রবাদের উৎপত্তি হইয়া থাকুক না কেন, তাহাতে আমাদের সিদ্ধান্তের কোনও ব্যাঘাত ঘটিবে না। যাহাই হউক, এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায় যে, আয়ুর্ব্বেদে নানারকম

* ভঙ্গা মাতুলানী ইতি।

সোমের উল্লেখ আছে। সে সবগুলির আলোচনা এ প্রবন্ধের মধ্যে আবশ্যক; কিন্তু দেখা যায় যে, তন্মধ্যে সোমলতা বা সোমবল্লীর উল্লেখ আছে। সেই সোমলতার বা সোমবল্লীর যতটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বৈদিক সোমের বর্ণনার সহিত মিলে না। ঐ সকল বর্ণনা যে প্রকৃত সোমের বর্ণনা নহে, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। একটী বচন আরও পাওয়া যায়, যেটী লইয়া সুবিখ্যাত Prof. Max Muller এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই কিছু-কিছু বিচার করিয়াছেন। সে বচনটী যে কোন্ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত, তাহা পণ্ডিতগণ অবগত নহেন। সে বচনটী এই ;—যথা

শ্যামলাম্না চ নিষ্পত্রা ক্ষীরিণী ত্বচি মাংসলা।
শ্লেষ্মলা বমনী বল্লী সোমাখ্যা ছাগভোজনম্॥

এই বচনটী বৈদিক গ্রন্থের নহে। ইহা আয়ুর্ব্বেদের বচন বলিয়াই স্বীকৃত। এই বচনে যে বৈদিক সোমের পরিচয় আছে, তাহার প্রমাণ নাই। কিন্তু এই শ্লোকটী লইয়া য়ুরোপ-খণ্ডের পণ্ডিতগণ এমনই হৈ-চৈ লাগাইয়া দিয়াছিলেন যে, যেন বাস্তবিকই ঐ শ্লোকে সোমের পরিচয় আছে। সোমলতা বলিতে যে লতা বুঝায়, তাহার পরিচয় সম্ভবতঃ এই শ্লোকে আছে। কিন্তু তাহাতে আমাদের কিছু আসে-যায় না। এই শ্লোক সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই শ্লোক কোন্ গ্রন্থের, তাহা জানা যায় নাই; সুতরাং আমাদের মতে এই শ্লোকের কোন প্রামাণিকতা নাই। এই শ্লোকে সোমবল্লীর কথা বলা হইয়াছে। ইহাকে সোম সম্বন্ধে প্রবাদ বলিয়াও গণ্য করা যায় না; কারণ—আমাদিগের সন্ধান সোম; কিন্তু ঐ শ্লোকের সন্ধান সোমবল্লী। যদি বা কেহ এমন বলেন যে, এ স্থলে সোমকেই বল্লী বলা হইয়াছে, তাহার উত্তরে আমরা বলি যে, সোম যে বল্লীবিশেষ, তাহার কোনও রূপ বৈদিক প্রমাণ না থাকায় (বরং বিরুদ্ধ প্রমাণ থাকায়) উক্তরূপ প্রবাদটীকে আমরা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। সোম শ্যামল, তাহা স্বীকার করি; কারণ, বৈদিক মন্ত্রে তাহাকে কৃষ্ণবর্ণ বলা হইয়াছে। অম্লাস্বাদ স্বীকার করি না; কারণ, প্রমাণান্তর পাই নাই। নিষ্পত্র—এ প্রবাদও অগ্রাহ্য; এতৎ সম্বন্ধে প্রমাণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। ক্ষীরিণী—অর্থ বুঝিলাম না। ইহার কোন্ অংশ-বিশেষে ক্ষীর আছে? ক্ষীর শব্দে কি অর্থ বুঝিতে হইবে? ত্বচি মাংসলা ও শ্লেষ্মলা এ কয়টী কথায় ত ঘৃতকুমারীর গাছও বুঝা যাইতে পারে। বমনী—সোমের এই গুণ বিশ্বাসযোগ্য; কারণ, বেদে প্রমাণ আছে। ছাগভোজনম্—ছাগলের ভক্ষ্য। এই শ্লোক হইতে মাত্র এইটুকু জানা গেল যে, ছাগভক্ষ্য সোমবল্লী নামক লতাবিশেষ আয়ুর্ব্বেদে বর্ণিত হইয়াছে। এই শ্লোক মধ্যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনেক প্রকার লতার আবিষ্কার করিয়াছেন; যথা—(১) Asclepias Acida, (২) Sarcostemma Brevistigma, (৩) Ephedra Vulgaris, (৪) Periploca aphylla। এগুলি ভিন্ন-ভিন্ন জাতীয়। এবং এই শ্লোকার্থের সহিত কোনটীরই সম্পূর্ণ ভাবে মিল নাই। সম্প্রতি একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, সোম বোধ হয় রাগি ধান্যবিশেষ। এই সকল পরিচয় অপ্রামাণিক অনুমান ভিন্ন আর কিছুই নহে। Professor Roth সোম সম্বন্ধে কতকটা অনুসন্ধান করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হয়েন নাই। তাঁহার অকৃতকার্য্য হইবার প্রধান কারণ এই যে, তিনি বৈদিক প্রমাণ ও ভাষাতত্ত্ব অনুসন্ধান না করিয়া, মাত্র উপরি-লিখিত শ্লোকটীর উপর নির্ভর করিয়াছিলেন।

এ কথাটা সকলেই জানেন যে, শিবের আর একটী নাম সোম। বস্তুতঃ, যে সময়ে দেবদেবীর মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া প্রতিমা বা প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করা হইল, সে সময়ে যেমন অন্য দেবদেবীর প্রিয় বস্তু, বা তাঁহাদের গুণ প্রকাশক বস্তুবিশেষ দ্বারা তাঁহাদিগকে অলঙ্কৃত করা হয়, তদ্রূপ স্বয়ং শিবেরও প্রতিমূর্ত্তি ও প্রিয় বস্তু বর্ণনা করা হয় এবং তদনুসারে দেবতাদিগের আকৃতি গঠনে তাঁহাদের বৈদিক পরিচয়ের কিছু চিহ্ন রাখা হয়। শিবের নামান্তর সোম। অর্থাৎ সোম-দেবতার গুণ ইত্যাদি একত্র করিয়া শিবের আকৃতি গঠন করা হইল। তাঁহার প্রিয় বস্তুও বর্ণিত হইল; সেটী উক্ত নিয়মানুসারে সোমাত্মক হইবেই। শিবের প্রিয় খাদ্য বা পানীয় ভঙ্গা বলিয়া বর্ণিত হইল। সুতরাং ইহা বুঝা যাইতেছে যে, সোমই শিবের ভঙ্গা বটে।

সোমযজ্ঞ সদৃশ আধুনিক কালের যাগাদিতে, অর্থাৎ দুর্গাপূজা ইত্যাদি পূজাতে, ভঙ্গার এত আদরের কারণ কি, পাঠক অনুমান করিতে পারেন?

এই সঙ্গে ভঙ্গা শব্দের অভিধান একটু আলোচনা করিয়া দেখুন। শব্দকল্পদ্রুম ভঙ্গা শব্দে বলেন শণামাশস্যম্। যথা ভঙ্গা শব্দে শণাহ্বায়। এই মতের প্রমাণও দিয়াছেন। তৎপরে আরও দেখেন—

ত্রৈলোক্যবিজয়া ভঙ্গা বিজয়েন্দ্রাশনং জয়া। ইতি শব্দচন্দ্রিকা।

এই বচনে দেখা যায় যে, ভঙ্গার আর একটী নাম ইন্দ্রাশন। ইন্দ্রাশন অর্থে বুঝায়, ইন্দ্রের প্রিয় খাদ্য (বা পানীয় ইত্যাদি) ইন্দ্রের প্রিয়তম খাদ্য সোম। সুতরাং সোমই কি ভঙ্গা নহে?

অন্যান্য প্রমাণ মধ্যে একটা কথা সহজ ভাবে বলি।

উশনা (অশনা) = সোম (শত ব্রা ৪।২।৫।১৫)
সোম = শণ (শত ব্রা ৬।৬।১।২৪)
শণ = ভঙ্গা (অভিধান)
সোম = ভঙ্গা

জাতি-বিজ্ঞান

(৮)

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

অনেক নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত করোটীর গঠন, ইহার দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও উচ্চতার পরিমাণ হিসাব করিয়া জাতিগত বৈশিষ্ট্য নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সেই চেষ্টার ফলে মাথার খুলির মাপ ও গঠন সম্বন্ধে বিশেষরূপ আলোচনা হইয়াছে।

মানুষের কঙ্কালের অধিকাংশই অন্য জন্তুর শরীরের অস্থি হইতে স্বতন্ত্র ধরণের। মানুষের অস্থি দেখিলেই তাহা যে অন্য জন্তুর অস্থি নয়—মানুষের অস্থি, ইহা বেশ বোঝা যায়; কিন্তু মানুষের বৈশিষ্ট্য-সূচক সকল ভাব যেন একত্র পুঞ্জীভূত হইয়া মাথার খুলির ভিতর কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। এই জন্যই মানব-করোটীর গঠন-বৈচিত্র্য নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের এতটা মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে।

মানুষের একটী প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, মানুষ দুই পায়ের উপর ভর দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়ায়। মানুষকে এইভাবে দাঁড়াইতে হয় বলিয়া মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এক বিশেষ ভাবে পরিণত হইয়াছে। মানুষের পক্ষে দুই পায়ের উপর ভর দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়ান ও চলা-ফেরা করা মানুষের করোটীর গঠন-বৈচিত্র্যের একটী প্রধান কারণ।

মানুষের তলপেটের হাড়গুলি পরীক্ষা করিলে সহজে এই অনুমান হয় যে, তাহার পদাস্থি, তাহার মেরুদণ্ডাস্থি ও বাহুদ্বয়ের অস্থি-সংস্থান, এগুলি মানুষের সোজা হইয়া দাঁড়াইবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কিন্তু কোন কোন নৃতত্ত্বকুশল পণ্ডিতের মতে, মানুষের সোজা হইয়া দাঁড়াইবার অভ্যাসের ফলেই ঐ হাড়গুলি পরিণাম-বিশেষ প্রাপ্ত হইয়াছে ও শরীরমধ্যে বিশেষভাবে সংস্থাপিত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, মানুষের করোটিতলস্থ যে ছিদ্র দিয়া মেরুদণ্ড মস্তিষ্কমধ্যে প্রসারিত হইয়াছে, সেই ছিদ্রের অবস্থান ও মেরুদণ্ডাস্থির স্তম্ভের উপর মস্তকের ভারসাম্য মানুষের সোজা হইয়া দাঁড়াইবার অভ্যাসের ফলস্বরূপ। পদদ্বয়ের তুলনায় মানুষের হস্তদ্বয় যে অধিকতর কোমল ও ইচ্ছানুরূপ সঞ্চালনোপযোগী হইয়াও বুদ্ধিবিমুখ হইয়াছে, তাহাও তাহার সোজা হইয়া দাঁড়াইবার অভ্যাসের ফলে। এই একই অভ্যাসের ফলে মানুষের হস্তদ্বয়ের স্বাধীনতা ও তৎফলে তাহার কার্য্যদক্ষতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। হস্ত কর্ম্ম-কুশল হওয়ায় চোয়ালের অনেক কাজ কমিয়া গিয়াছে। ফলে মানুষের চোয়াল ছোট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, মানুষের করোটীর গঠনবিশেষে পরিণাম মানুষের সোজা হইয়া দাঁড়াইবার ফলেই ঘটিয়াছে।

হংসদূত

শিল্পী—লর্ড লেটন, পি, আর, এ

Bharatvarsha Halftone & Ptg. Works.

Printed on a Phoenix Platen Press. Agents Indo-Swiss Trading Co.

মানুষের করোটীকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক ভাগ করোটিকা বা cranium, আর এক ভাগ মুখমণ্ডল (face)। করোটিকা মস্তিষ্কাধার। মানবের সর্ব্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য করোটিকা মধ্যস্থিত মস্তিষ্ক মধ্যেই সন্নিহিত। বৃহদায়তন মানব-মস্তিষ্ক এককালে অন্য সকল প্রাণী হইতে মানবকে সম্পূর্ণ পৃথক্ করিয়া দিয়াছে। কেবল মস্তিষ্কের আয়তনের তুলনা করিলে higher Apeকে আর মানবশ্রেণীভুক্ত করা যায় না। তার পর মুখমণ্ডল। চোখ, কান ও চোয়াল লইয়া মুখমণ্ডল। মুখমণ্ডলকে করোটিকা হইতে পৃথক্ করা গেলেও মুখমণ্ডলের সহিত করোটিকার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। ইহাদের মধ্যে একটা আর একটীর উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। করোটিকার গঠনবৈচিত্র্যের উপর মুখমণ্ডলের বিশেষতঃ চোয়ালের বিলক্ষণ প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের চোয়াল কি ভাবে করোটিকার গঠনের উপর প্রভাব বিস্তার করে সে সম্বন্ধে দু'এক কথা বলাদরকার।

নিম্নজাতীয় মনুষ্যের চোয়াল আমরা সাধারণতঃ বৃহদাকারেরই দেখিয়া থাকি; তাহাদের চোয়াল প্রায়ই তাহাদের ললাট-রেখা ছাড়াইয়া অনেক প্রসৃত বা উদ্গত হইয়া থাকে। এই প্রকারের করোটীকে প্রলম্ব (Prognathous) করোটী বলা হয়। নিগ্রোর মাথার খুলি এই প্রলম্বতারএকটা উদাহরণ।

এই সকল বড় বড় চোয়ালের সহিত বড় বড় দাঁত ও মজবুত পেশী সকল সংযুক্ত থাকে। মাসিটার পেশী (Masseter Muscles) করোটীর পার্শ্ব বহিয়া উত্থিত হয়, এবং নিম্নগতিতে এই পেশী নিম্নচোয়ালে সন্নিবিষ্ট হয়। পেশীগুলি যত বেশী মজবুত বা দৃঢ় হয়, ইহারা করোটীর পার্শ্ব দিয়া ততই উচ্চে উঠিয়া থাকে। ইহাদের উত্থান-সীমা একটী বক্ররেখাদ্বারা চিহ্নিত হয়। ইংরেজিতে এই রেখাটীকে temporal crest বলা হয়। পেশীসকল অধিকতর শক্তিশালী ও মজবুত হইলে তাহারা করোটীর পার্শ্ব বহিয়া অধিকতর উর্দ্ধে উঠিয়া অক্ষিকোটরের ঠিক পশ্চাতে করোটীকে আরও বেশী চাপিয়া ধরে। রগের পাশের এই চাপ স্বভাবতঃ অল্পবয়স্কদিগের করোটীর উপর সমধিক প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, তাহাদের করোটী তখনও অপেক্ষাকৃত কোমল থাকে। অপক্ব (uncooked) ও কঠিন খাদ্য চোয়ালের পরিশ্রম বৃদ্ধি করে, তাহার ফলেও মাসিটার পেশী অধিকতর শক্ত হয়। সভ্যতার ফলে খাদ্যাদি ও রন্ধন-প্রণালীর উন্নতি হয়, তাহার ফলে চোয়ালও ছোট হয় এবং ললাট-রেখা অতিক্রম করিয়া তাহার প্রসৃতিও কমিতে থাকে। খাদ্যের কাঠিন্যের হ্রাস বশতঃ দাঁতগুলি আয়তনে ছোট ও সংখ্যায় কমিতে থাকে এবং মাসিটার পেশীর পরিশ্রম কমিয়া যাওয়ায় তাহারাও আকারে ছোট ও অল্প শক্তিশালী হয়। ইহার ফলে তাহারা করোটিকার পার্শ্বদেশে বেশী চাপ দিতে পারে না; সুতরাং মাথার খুলি (বিশেষতঃ সম্মুখ ভাগে) ততটা সরু হয় না। নেরিঙ্ (Nehring) অনেক মাথার খুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া বুঝিয়াছেন যে, চোয়ালের মাংসপেশী মাথার খুলির উপর বিশেষরূপ প্রভাব বিস্তার করে।

নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা চোয়ালের মাংসপেশীর দুর্ব্বলতার সহিত মানসিক শ্রমের আধিক্যের সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাঁহারা মানসিক শ্রমের বৃদ্ধির সহিত মস্তিষ্ক-বৃদ্ধির সম্বন্ধেরও পরিচয় পাইয়াছেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মানব-মিতি শালায় (anthropometric laboratory) ভেন-(Venn) ও গ্যাল্টন্ (Galton) সংগৃহীত সাংখ্যিক বিবরণ (statistics) পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, যে-সকল বালক অধ্যয়ন পরিত্যাগ করে তাহাদের তুলনায় অধ্যয়ন-শীল বালকদের মস্তিষ্কবৃদ্ধির কাল অনেক দীর্ঘ হয়। মোটের উপর স্বীকার করা যাইতে পারে যে, অনুশীলনের ফলে মস্তিষ্কের আয়তনের যে বৃদ্ধি হয়, তাহা অনুপাতে দৈর্ঘ্য অপেক্ষা প্রস্থ ও উচ্চতায় বেশী হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, অনুশীলন দুই ভাবে করোটীর উপর প্রভাব বিস্তার করে; প্রথমতঃ, ইহা প্রত্যক্ষভাবে মস্তিষ্কের আয়তনকে বাড়ায় এবং তাহার ফলে করোটীর আয়তন বর্দ্ধিত হয়; দ্বিতীয়তঃ গৌণভাবে চোয়ালকে ছোট করিয়া ফেলে এবং তাহার ফলে অন্য দিকে করোটীর গঠনের পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে নিম্ন-জাতীয় লোকদিগের অপেক্ষা উচ্চজাতীয় লোকদিগের করোটীর শঙ্খদেশের সম্মুখভাগের (anterior temporal region) বিস্তার (breadth) যে বেশী হয়, সে বিষয়ে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই।

চোয়ালের আয়তনের এবং চোয়ালপেশীর শক্তির হ্রাস মুখের অবশিষ্টাংশের অনুরূপ পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত করে। উপরিস্থিত চোয়ালের উপর নিম্নচোয়ালের কার্য্য, নেহাইয়ের উপর হাতুড়ির কার্য্যের সমতুল্য। চোয়ালের মাংসপেশী মজবুত হইলে, নিম্নচোয়াল উপর চোয়ালের উপর খুব জোরে আনীত হয়, এবং তাহার ফলে উপরচোয়ালকে করোটিকার সহিত সংযোজক আর্চগুলি (arch) সেই অনুপাতে পরিপুষ্ট করে। চোয়ালপেশীর দুর্ব্বলতার ফলে, অক্ষিকোটর (orbit) এবং জিগোম্যাটিক আর্চের (zygomatic arch) বহিঃস্থ নেমির (outer rim) গঠন অধিকতর কোমল হয়।

মস্তিষ্কের বর্দ্ধন ললাটকে উচ্চ ও প্রসারিত করে। এই তথ্যটীর প্রতি প্রাচীন গ্রীসের ভাস্করদিগের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এই তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ দেবতা জেউসের (Zeus) উপচিকীর্ষা ও মানসিক প্রাধান্য সূচিত করিবার জন্য তাঁহার ললাটের উচ্চতাকে যথোচিত বর্দ্ধিত করিয়াছেন। *

যাহা হউক আধুনিক নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ করোটী পরীক্ষাদ্বারা জাতিতত্ত্ব বিনির্ণয়ের এক অভিনব প্রণালী উদ্ভাবিত করিয়াছেন। তাঁহারা মানব-করোটীকে এক অভিনব প্রণালীতে মাপিয়া করোটীর অঙ্ক (index) বাহির করিয়া সেই অঙ্ক অনুসারে মানব-করোটীকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। করোটীর অঙ্ক বা index বাহির করিবার প্রণালী এইরূপ :—

প্রথমে করোটীর দৈর্ঘ্য ও বিস্তার মাপিয়া, তার পর বিস্তারকে ১০০ দিয়া গুণ করা হয়। বিস্তারকে ১০০ দিয়া গুণ করিয়া যে সংখ্যা হয়, তাহাকে দৈর্ঘ্য দিয়া ভাগ করিলে যে সংখ্যা হয়, তাহাই করোটীর অঙ্ক (index)।

$$\frac{\text{বিস্তার} \times ১০০}{\text{দৈর্ঘ্য}} = \text{অঙ্ক (index)}$$

অর্থাৎ দৈর্ঘ্যকে শত সংখ্যায় পরিণত করিয়া তাহার সহিত বিস্তারের যে অনুপাত হয়, তাহাকে উচ্চতাঙ্ক (altitude index) বলে :—

$$\frac{\text{উচ্চতা} \times ১০০}{\text{দৈর্ঘ্য}} = \text{অঙ্ক (index)}$$

$$\frac{\text{উচ্চতা} \times ১০০}{\text{বিস্তার}} = \text{অঙ্ক (index)}$$

করোটিকার অঙ্ককে (cranial index) সাধারণতঃ নিম্নলিখিত তিনটী আনুক্রমিক শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় :—

কোন করোটীর 'অঙ্ক' ৭৫ সংখ্যা অতিক্রম না করিলে সেই করোটীকে দীর্ঘকপালিক (dolichocephalic) শ্রেণীভুক্ত করা হয়। ৭৫ হইতে ৮০ সংখ্যা পর্য্যন্ত অঙ্কের করোটী মধ্যকপালিক (mesaticephalic) শ্রেণীভুক্ত, এবং অঙ্ক ৮০ সংখ্যা অতিক্রম করিলে করোটীকে প্রশস্তকপালিক (brachycephalic) শ্রেণীভুক্ত করা হয়।

কোন কোন নৃতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত নিম্নলিখিত রূপে করোটীর শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন :—

ব্যতি-দীর্ঘকপালিক............৬০—৬৪·৯
(ultra-dolichocephalic)
অতি-দীর্ঘকপালিক... ....৬৫—৬৯·৯
(hyper-dolichocephalic)
দীর্ঘকপালিক... ....৭০—৭৪·৯
(dolichocephalic)
মধ্যকপালিক... ....৭৫ ৭৯·৯
(Mesaticephalic)
প্রশস্তকপালিক......... .... ৮০—৮৪·৯
(brachycephalic)
অতি-প্রশস্তকপালিক...........৮৫—৮৯·৯
(hyper-brachycepholic)
ব্যতি-প্রশস্ত কপালিক.. .... ৯০—৯৪·৯
(ultra-brachycepholic)

কোন কোন পণ্ডিত প্রশস্ত কপালিকতার (dolichocephaly) সীমাকে ৭৭·৯ পর্য্যন্ত বাড়াইয়া (mesaticephaly) মধ্যকপালিকতার সীমাকে ৭৮ হইতে ৮০ পর্য্যন্ত করিয়াছেন। যাহা হউক, প্রথমোক্ত শ্রেণী-বিভাগই সাধারণতঃ প্রচলিত।

ভারতবর্ষে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে আর্য্যেরা এক শ্রেণীর এবং ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীরা এক শ্রেণীর। আর্য্যেরা গৌরবর্ণ ও সমুন্নত-কলেবর; আদিম অধিবাসীরা খর্ব্বাকার ও কৃষ্ণদেহ। ইহাদের মাথার চুল কাল ও প্রচুর।

* এরূপ স্থলে করোটী পরীক্ষাদ্বারা জাতিতত্ত্ব নির্ণয় কতদূর সম্ভব তাহা বিশেষ বিবেচনা সাপেক্ষ।

নৃতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতে, ইয়ুরোপের দক্ষিণাঞ্চলের ভূমধ্যসাগরতীরবাসী মানব-বংশের (Mediterranian stock) মেলানোক্রই (Melanochroi) বা কৃষ্ণশ্রেণীর মানবদিগের ও অষ্ট্রেলিয়দিগের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ আছে। ভারতবর্ষের এই আদিম অধিবাসীদিগকে দ্রাবিড় বলা হয়। বলা বাহুল্য, ইহারা আর্য্যদিগের সমজাতীয় নহে। কিন্তু করোটিকাঙ্ক (cranial index) উভয় জাতিরই সমান; কারণ, উভয় জাতিই দীর্ঘকপালিক। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এখানে অঙ্ক (index) অনুসারে জাতি-নিরূপণ-কার্য্য ফলদায়ক হইল না। আধুনিক দ্রাবিড়েরা প্রতি-দ্রাবিড়দিগের ("Proto Dravidian") উত্তর পুরুষ। প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, সিংহলের বেদ্দারাও প্রতি-দ্রাবিড় জাতি হইতে উদ্ভূত। তবে ইহাদের শরীরে কতকটা বিজাতীয় শোনিতও মিশ্রিত আছে।

এসিয়াবাসী জাতিরা প্রধানতঃ প্রশস্তকপালিক; ইহাদিগের মধ্যে নিগ্রিটো জাতীয় লোকও দেখিতে পাওয়া যায়।

ডক্টর হাডন নিগ্রিটোদিগকে প্রশস্তকপালিক শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। ইঁহার মতে আন্দামানী মিনকোপীরা, মলয় উপদ্বীপের সেমাঙ্, সাকাই, সেনোয়ারা এবং ফিলিপাইন্‌সের এটারা নিগ্রিটো শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র রায় তাঁহার গ্রন্থে নিগ্রিটো ও সাকাই-দিগকে দীর্ঘকপালিক শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। তবে রায় বাহাদুর বলেন নিগ্রিটোদিগের কতক দীর্ঘকপালিক শ্রেণীভুক্ত। হাডনের মতে সকল নিগ্রিটোই প্রশস্তকপালিক শ্রেণীর অন্তর্গত। হাডন একস্থানে জাপানীদিগকে মধ্য-কপালিক (mesaticephalic) শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন; আবার আর একস্থানে তাহাদিগকে প্রশস্তকপালিক শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। হাডন বলেন, নিগ্রিটোদিগকে করোটিকাঙ্ক অনুসারে মোঙ্গলাভাস জাতিভুক্ত (Mongoloid) জাপানী শ্রেণীতে ফেলা যায়। কিন্তু হাডনের মতে জাপানীরা যদি মধ্যকপালিক (mesaticephalic) হয় ও নিগ্রিটোরা প্রশস্তকপালিক হয়, তাহা হইলে করোটিকাঙ্ক অনুসারে নিগ্রিটোরা কেমন করিয়া জাপানীর সমজাতীয় মানব হইতে পারে তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। শারীরিক অন্যান্য লক্ষণে যে নিগ্রিটোরা জাপানীর সমজাতীয় নয় তাহা হাডন স্বীকার করেন। হাডনের এক হিসাব অনুসারে আন্দামানী পুরুষের উচ্চতা ৪ ফুট ৮·৩ ইঞ্চি (১৪৩১ mm.), সেস্থলে জাপানী পুরুষের উচ্চতা ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি (১৬৫০ mm.)। আন্দামানীর গাত্রবর্ণ ঘোর কৃষ্ণ, জাপানীর গায়ের রঙ্ পীতাভ; আন্দামানীর কেশ—কাল, ছোট ও কুঞ্চিত, জাপানীর কেশ—কাল, দীর্ঘ ও সরল; আন্দামানী পুরুষের করোটিকার প্রস্থি (cranial capacity) ১২৮১, সেস্থলে জাপানীর ১৬০৫। সুতরাং আন্দামানী ও জাপানীকে একজাতীয় মানব বলা যাইতে পারে না। অথচ উভয়ের করোটিকাঙ্ক প্রায় সমান আন্দামানীর করোটিকাঙ্ক ৮১·১; জাপানীর করোটিকাঙ্ক ৮০.৪। হাডনের (Haddon) এই হিসাব যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে এস্থলেও অঙ্ক অনুসারে জাতিবিভাগ ফলদায়ক হইল না। রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র রায় মহাশয়ের মতে ককেসীয় মনুষ্যেরা যেমন দীর্ঘকপালিক নিগ্রো, নিগ্রিটো, অষ্ট্রেলিয়, সকাই, ও বেদ্দা প্রভৃতি জাতিও সেইরূপ দীর্ঘকপালিক। কিন্তু শেষোক্ত জাতীয় মনুষ্য-দিগকে ককেসীয় জাতির শ্রেণীভুক্ত করিতে কেহই সাহসী হন না। সুতরাং রায় বাহাদুরের হিসাবেও করোটিকাঙ্ক অনুসারে জাতি-বিভাগ সমীচীন পদ্ধতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

ডক্টর বোয়াস (Dr. Boas) বলেন, ইয়ুরোপ-জাত কোন পরিবারের দৈহিক মাপ যেরূপ হয়, সেই পরিবারেরই আমেরিকাজাত সন্তানের দৈহিক মাপ ঠিক সেইরূপ থাকে না, বদলাইয়া যায়। তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, ইয়ুরোপের পূর্ব্বাঞ্চলের ইয়ুরোপ-জাত সন্তানের মাথা আমেরিকা-জাত সন্তানের মাথা অপেক্ষা ছোট হয়, কিন্তু অধিকতর চওড়া হয়; আর আমেরিকায় যাহারা জন্মগ্রহণ করে, তাহারা ইয়ুরোপ-জাতদিগের অপেক্ষা সমুন্নত-কলেবর হয়। এইরূপ হইবার ফলে, একই পরিবারের করোটিকাঙ্ক ইয়ুরোপে জন্মিবার জন্য একরূপ হয় এবং আমেরিকায় জন্মিবার জন্য অন্যরূপ হয়। ডক্টর বোয়াস পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ইয়ুরোপের কোন পরিবারের আমেরিকায় পৌছিবার কয়েকমাস পরেই যদি সন্তান হয়, সেই সন্তানের মস্তক আমেরিকা-জাত সন্তানের মস্তকের ন্যায় হয়। তিনি পরীক্ষা দ্বারা আরও দেখিয়াছেন যে, ইয়ুরোপ-জাত কোন

মানব-সন্তান যত অল্প বয়সে আমেরিকায় যায়, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে ততই সমুন্নত-কলেবর হয়।

ডক্টর বোয়াসের পরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, করোটিকাঙ্ক দেশ-বিশেষের বিশেষ বিশেষ জল হাওয়ার প্রভাবের অধীন,—ইহা জাতি-বিশেষের বৈশিষ্ট্য-সূচক নয়। একই জাতির এমন কি একই পরিবারস্থ সন্ততির একদেশে জন্ম হইলে তাহাদের করোটিকাঙ্ক যত সংখ্যক হয়, অন্য দেশে জন্মগ্রহণ করিবার ফলে তাহাদের করোটিকাঙ্কের সংখ্যা তাহা হইতে বিভিন্ন হইয়া পড়ে। অধিকন্তু বিশেষ বিশেষ জাতিগত ভাব লইয়া পৃথিবীতে যে বিশেষ বিশেষ জাতির উদ্ভব হইয়াছিল, এবং বিভিন্ন জাতির জাতিগত বিভিন্ন ভাব যে স্থায়ী, এবং কতকগুলি জাতির উপর প্রাধান্য যে পুরুষানুক্রমিক- ডক্টর বোয়াসের পরীক্ষার পর এই পুরাতন ধারণা আধুনিক নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইতেছে।

ডক্টর ওয়ালচার (Dr. Walcher) কতকগুলি যমজশিশুর মস্তক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কোমল বালিশের উপর মাথা রাখিয়া চীৎ করিয়া শুয়াইয়া রাখিবার ফলে তাহাদের মস্তক ক্রমশঃ প্রশস্তকপালিক হইয়া পড়ে, এবং কঠিন উপাধানের উপর মস্তক রাখিয়া কাৎ করিয়া শায়িত মস্তক ক্রমশঃ দীর্ঘকপালিক হইয়া পড়ে। রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র রায় মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, ভারতবর্ষে ও অপর কতকগুলি দেশের কতিপয় জাতি ইচ্ছানুরূপ মাথার গঠন সম্পাদন করিবার উদ্দেশ্যে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে [Report of the Census of India, 1911, vol I, Pt I, pp 382-384, এবং J. B. O. R. S vol I, pp 27-30]।

আমেরিকা ও এসিয়ার কতিপয় আদিম জাতির মাথা প্রশস্তকপালিক। দেখা গিয়াছে যে, এই সকল জাতির মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে মস্তকের পশ্চাদ্‌ভাগকে চেপ্‌টা করিবার প্রথা বিদ্যমান। সেইরূপ আফ্রিকার নিগ্রোজাতির মস্তক দীর্ঘকপালিক; ইহারাও মস্তকের দীর্ঘকপালিক ভাবকে একটু বাড়াইয়া তুলিবার জন্য কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করে।

গিডিঙসের (Giddings) মতে যখন কোন জাতি তাহাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য বুঝিবার ক্ষমতা লাভ করে, তখন সেই জাতি তার জাতিগত বৈশিষ্ট্যের চরমোৎকর্ষ সাধনের জন্য সচেষ্ট হয়। গিডিঙসের ভাষায় ইহাকে "Consciousness of mind" বলে। কিন্তু ডক্টর বোয়াসের পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হয় যে, মানুষের শারীরিক গঠন ভিন্ন ভিন্ন দেশের জল হাওয়ার প্রভাবে পরিবর্ত্তনশীল।

এই সমস্ত কারণে, কেবলমাত্র করোটিকাঙ্ক অনুসারে জাতিবিনির্ণয় বিশেষ নিরাপদ প্রথা নয়।

জয়-পরাজয়

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

সীমান্তে শত্রু দমনের জন্য রাণা স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার জয়-কামনায় রাণী প্রত্যহ বিজয়-ভৈরবের মন্দিরে পূজা দিতেছেন। তিন সপ্তাহের অধিক কাল ধরিয়া যুদ্ধ চলিতেছে; এখনও পার্ব্বত্য-সর্দ্দার রাণার নিকট পরাজয় স্বীকার করে নাই। বিরহ, ভাবনা ও ভয়ে রাণী মলিন হইয়া রহিয়াছেন। প্রধানা সহচরী মাধবী তাঁহার মলিনতা দূর করিবার চেষ্টা করিতেছে।

আর দু একদিনের মধ্যেই সর্দ্দারকে হার মান্‌তে হবে।

তাই যেন হয় মাধবী। আমার ত ভাবনার অন্ত নেই।

বাবা বিজয়-ভৈরব সহায়, তখন আবার ভাবনা কি।

বাবাই ত আমাদের একমাত্র ভরসা মাধবী।

আচ্ছা, রাণা কি সেখানে এমনি কোরে তোমার কথা ভাবচেন?

নিশ্চয়ই, তাঁর মন কি আমায় ছেড়ে থাকতে পারে।

তা ঠিকই, এমন স্বামীলাভ ভাগ্যের কথা।

আমিও তাই ভাবি মাধবী, যে আমার কি সৌভাগ্য!

আর ত কোন রাণাকে দেখি না যে এক রাণী নিয়েই সন্তুষ্ট।

ঐটেই যে আমার সকলের চেয়ে গর্ব্বের বিষয় মাধবী।

আচ্ছা, রাণা যদি আর একটা রাণী করেন ?

সে যে হবার নয় মাধবী !

কখন কি হবার আশাও নেই ?

আমি যে রাণার মনকে একেবারে জয় কোরে রেখেচি।

তা ঠিক, একেবারেই জয় যাকে বলে।

মাধবী, তোর সেই গানটা একবার শোনা না !

কোন্‌টা, যেটা রাণা শুনতে ভালবাসেন, সেইটে ?

তা আবার বোলে দিতে হবে ?

শোনাচ্চি, কিন্তু ভাল রকম বক্‌শিস্ চাই !

যা চাইবি তাই দেবো।

যা চাইবো তাই ?

হাঁ্যা, তাই-ই।

যদি রাণাকে চাই ?

ঐটি কেবল বাদ। প্রাণ থাকতে তা দিতে পারবো না ; পরে যদি পারিস নিস্—বলিয়া, রাণী সহচরীর গলা জড়াইয়া ধরিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে উভয় তরুণীর মধুর-হাস্যে কক্ষ ভরিয়া উঠিল।

রাজধানীতে সংবাদ আসিল—রাণা জয়লাভ করিয়াছেন। নগর জুড়িয়া উল্লাসের ঢেউ বহিয়া গেল। প্রাসাদে, দুর্গে জয়পতাকা উড়ান হইল। বিজয়ী রাণাকে সমুচিত অভ্যর্থনা করিবার বিপুল আয়োজন হইতে লাগিল। নাগরিকগণ নগর সজ্জায় ব্যস্ত হইল। রাণী নিজ মনোমত করিয়া রাণী-মহল সাজাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

যথাসময়ে মুহুর্মুহু কামান গর্জ্জনের সঙ্গে রাণা রণবীর রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। জয়-কোলাহলে নগর ভরিয়া গেল। রাণী সহচরীগণ সঙ্গে প্রাসাদ-শীর্ষে উপস্থিত হইলেন। আনন্দে ও স্বামীর গৌরবে আত্মহারা রাণীকে উপযুক্ত স্থানে বসাইয়া মাধবী তাঁহার পার্শ্বে রহিল। বিজয়ী সৈন্য-বাহিনীর মধ্যে হস্তিপৃষ্ঠে স্বর্ণসিংহাসনে তেজদীপ্ত হাস্য-বদন রাণাকে দেখিয়া জনমণ্ডলী "জয় রাণা রণবীরের জয়" বলিয়া গগনভেদী চীৎকার করিয়া উঠিল। স্বামী-দর্শনের আনন্দ-আতিশয্যে রাণী মাধবীকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিলেন। সহচরীদের মধ্যে হাসির বন্যা বহিয়া গেল। রাণা-মহলের তোরণে রাণার হাতী প্রবেশ করিল দেখিয়া, রাণী প্রাসাদ-শীর্ষ হইতে অবতরণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাণীর সহিত সহচরীরা সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। বিপুল সৈন্য-বাহিনীর শেষে একখানি শিবিকা আসিতে দেখিয়া রাণী থমকিয়া দাঁড়াইলেন। শিবিকায় কে আসিতেছে, সহচরীরা কেহই বলিতে পারিল না। রাণী মাধবীকে শিবিকার সংবাদ লইতে বলিয়া নিজ কক্ষে উপস্থিত হইলেন।

সন্ধ্যায় সমস্ত নগর সজ্জিত, দীপমালায় আলোকিত হইয়া উঠিল। রাণী-মহলের আলোকমালার শোভা সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম। রাণা আসিবার পূর্ব্বে মাধবীর নিকট হইতে সংবাদ শুনিবার জন্য রাণী উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছেন। মাধবী সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিল। রাণী তাহার নিকট হইতে শুনিতে লাগিলেন।

শত্রুর দুর্গ অবরোধের সময় রাণা সর্দ্দার-কন্যা পার্ব্বতীকে দেখিয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। চতুর সর্দ্দার রাণার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে কন্যাদানের প্রার্থনা জানাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে। রাণা পার্ব্বতীকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। শুভদিন দেখিয়া বিবাহ করিবেন। পার্ব্বতীর এক ভ্রাতাও সঙ্গে আসিয়াছে। উভয়ের আপাততঃ আনন্দ-ভবনে বাসের ব্যবস্থা হইয়াছে।

রাণীর আদেশে রাণী-মহলের সজ্জিত আলোকমালা নিবাইয়া দেওয়া হইল। জয়-উৎসবের গীত, বাদ্য, আনন্দ-কোলাহল সমস্ত বন্ধ হইয়া গেল।

রাণা রাণী-মহলে আসিলেন। আলোকহীন পুরী,—উৎসবের কোন চিহ্নই নাই।

চিত্রা আমি এসেছি—রাণা রাণীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

রাণী ধীরে অগ্রসর হইয়া স্বামীকে প্রণাম করিলেন।

রাণা রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—রাণী-মহলে জয় উৎসবের কোন আয়োজন নেই কেন চিত্রা ?

আমার যে পরাজয় রাণা—বলিয়া রাণী মুখ নত করিলেন।

য়ুরোপে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(জর্জ্জ দুহামেল সম্বন্ধে)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে যে সমিতির কথা বলেছি, সেই সমিতিতে একটি লোককে আমার বিশেষ রকম ভাল লেগেছিল।

জর্জ্জ দুহামেল (Georges Duhamel)

তাঁর নাম জর্জ্জ দুহামেল (Georges Duhamel)। দুহামেল মহোদয় বর্ত্তমান ফরাসীদেশে একজন খ্যাত সাহিত্যিক ও ডাক্তার। যুদ্ধের সময়ে হতাহতের সেবা-শুশ্রূষায় নিরত থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন বলে, তিনি তার ভীষণ হৃদয়হীনতার ও অপচয়ের খবর সাধারণের চেয়ে একটু বেশিই রাখতেন। তাই ইনি এঁর একটি বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন; "যুদ্ধের সময় আমার ভাগ্যবলে আমাকে এমন একটি স্থানে থাকতে হয়েছিল ও এমন কাজে ব্রতী থাকতে হয়েছিল, যেখানে মানুষের ব্যথাই ছিল আমার একমাত্র দৃশ্য, ও ব্যথার সঙ্গে যুদ্ধ করা ও তাকে বোঝাই ছিল আমার একমাত্র কর্ত্তব্য। তাই যদি এ বইখানিতে আমি মানুষের বেদনা নিয়ে একটু বেশি ভাবিত বলে প্রতীয়মান হই, তবে আশা করি, সেটা গন্তব্য।" * সংসারে এক একজন লোক থাকেন, যাঁদের স্থির ও শান্ত বুদ্ধিকে প্রায় কোন বিপৎপাতই বিচলিত করে তুলতে পারে না। দুহামেল মহোদয় এই শ্রেণীর লোক। স্বনামধন্য রোম্যাঁ রোলাঁর ইনি একজন বিশেষ বন্ধু। তিনি আমাকে শ্রীযুত দুহামেল সম্বন্ধে ভূমিকাচ্ছলে একদিন বলেছিলেন "দুহামেল বিচার- ও বিশ্লেষণ-প্রবণ; তত টা রাগ-প্রবণ (emotional) নন। যুদ্ধের সময়ে ও বিশেষতঃ তার কেন্দ্রের মধ্যে থেকেও তিনি যে ভাবে তাঁর মতি- ও বিচার-স্থৈর্য্য বজায় রাখতে পেরেছিলেন, সেটা তার প্রমাণ"।

দুহামেল মহোদয়কে এই সমিতিতে আমি যেদিন প্রথম দেখি, তখন তাঁকে আমি জানতাম না, কিন্তু তাঁর প্রথম দর্শনেই তাঁর সৌম্য, বুদ্ধি-উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ শান্ত মুখটি আমার একটু বেশিরকমই ভাল লেগেছিল। আমি তখন একজনকে বলেছিলাম: "বোধ হয় ইনিই

* Le sort m'a, pendant la guerre, assigné une place et une tache telles que la douleur est mon unique spectacle, mon étude, et mon adversaire de tous les instants. Que l'on m'excuse d'y songer avec une persévérance qui ressemble à de l'obsession.—La Possession du Monde (জগতের সম্পৎ)......Georges Duhamel প্রণীত।

জর্জ্জ দুহামেল; কারণ এঁর মুখ চোখে একট অসাধারণত্ব আছে।" মহৎ লোক মাত্রেরই মুখে যে সব সময়ে একটা আকর্ষণী শক্তি থাক্‌তে বাধ্য, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। অনেকে প্রথম দর্শনেই আমাদের মনের উপর একটা চমৎকার প্রভাব বিস্তার করেন; আবার অনেকের মুখ চোখে এমন কোনও বিশেষত্বই দেখা যায় না। লোকখ্যাত শ্রীযুত বার্টরাণ্ড রাসেলের সঙ্গে যেদিন প্রথম পরিচয় হয়, সেদিন যেন তাঁর চেহারা দেখে একটু নিরাশ হয়েছিলাম মনে আছে; কিন্তু দুহামেল মহোদয় একজন সত্যকার আর্টিষ্ট বলেই হোক্ বা না হোক্—(যেহেতু ইনি শুধু যে সাহিত্যিক তাই নয়, তার ওপর সঙ্গীত-রসের একজন সত্যকার রসিক)—তাঁর মুখমণ্ডলের ও প্রশস্ত সৌম্য ললাটের এমন একটা মনোজ্ঞ আকর্ষণী শক্তি ছিল, যা আমাদের অনেককে তাঁর কাছে টান্‌ত। পরে আমার এঁর সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ কর্ব্বার সৌভাগ্য হয়েছিল, এবং এ সমিতিতে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই এঁকে ও এঁর স্ত্রীকে আমাদের অনেকেরই ভারি ভাল লেগে গিয়েছিল। আমরা প্রায়ই আহারের সময় দুহামেল-দম্পতীর সঙ্গে এক টেবিলে বস্‌তাম। এর স্ত্রীও ছিলেন এমন মধুর প্রকৃতির মানুষ যে, তিনি অল্প পরিচয়েই অপরের মনের ওপর একটা ভাল impression রেখে যেতে পার্ত্তেন। ইনি বর্ত্তমান ফ্রান্সে একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী। মলিয়েরের (Molière) "মানববিদ্বেষী" (Misanthrope) নামক বিখ্যাত নাটকটি যখন পারিসের একটি শ্রেষ্ঠ থিয়েটারে অভিনীত হতে দেখি, তখন এঁর Arsinoe'র ভূমিকা যে আমাদের খুব ভাল লেগেছিল, তা মনে আছে। তাই হঠাৎ এরূপ একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রীর সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের সুযোগ পেয়ে মনটা বেশ খুসি না হয়েই পারে নি। তাছাড়া, এই সূত্রে য়ুরোপে অভিনয়কলার যে এতখানি সম্মান—যাতে দুহামেলের মতন লোকও একজন অভিনেত্রীকে বিবাহ কর্ত্তে ব্যগ্র হতে পারেন—তা ভেবে মনে আনন্দ হয়েছিল ও পক্ষান্তরে আমাদের দেশে অভিনয়কলার সামাজিক মানের কথা ভেবে মনটা একটু বিকল হয়ে পড়েছিল। তবে যাক্ এ কথা, যা বল্‌ছিলাম।

দুহামেল মহোদয় এ সমিতিতে "ব্যক্তিত্ব ও মানবতন্ত্রতা" (L'individualisme et l'internationalisme) সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। নিতান্ত ধীরে ধীরে, বিনা আড়ম্বরে, গল্পচ্ছলে। এঁর বক্তৃতার মধ্যে লম্বা-চওড়া আস্ফালনের একান্ত রাহিত্য আমাদের বেশ চমৎকার লেগেছিল। ইনি বলেছিলেন: "বক্তাকে আমি কখনও বিশ্বাস করি না, তবে কথককে করি। আমি তোমাদের কাছে কথা বল্‌তে এসেছি বক্তা-হিসেবে নয়, বন্ধুভাবে। আমার উদ্দেশ্য—বক্ষ্যমান বিষয়টি নিয়ে নিতান্তই বন্ধুভাবে একটু তর্ক করা, একটু আলোচনা করা।" এরূপ আড়ম্বরহীনতা ও নম্রতা মহত্বেরই পরিচায়ক। এঁর এ বক্তৃতার ভাবার্থ দেওয়াও অসম্ভব, কারণ সেটি এতই সুচিন্তিত ও সুকথিত যে তার আমি যথাযথ সারাংশও দিতে পার্ব্ব না।—আর তা ছাড়া আমি এ স্থলে একটু বেশী রকম ভাবে দৈনিক অভিজ্ঞতা লিখতেই বসেছি, এ সমিতির একটি বিবরণ দিতে বসি নি।

এঁর মধ্যে ছিল—কথার বর্ণে ও আলো ছায়ায় নিজেকে প্রকাশ কর্ব্বার একটি চমৎকার ক্ষমতা, যেটা সাহিত্যিক হলেই যে সব সময়ে থাকে, তা নয়। বরং কোনও কোনও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককেও অনেক সময়ে কথাবার্ত্তায় অস্পষ্ট হয়ে পড়তে দেখেছি। কিন্তু কথাবার্ত্তায় সরলতা ও স্ফুটতা একটি গভীর গুণ না হলেও যে মনোজ্ঞ গুণ, এ বিষয়ে বোধ হয় দু'মত নেই। এঁর কথালাপ চল্‌ত ঝরণারই মতন তর তর করে, ও তার মধ্যে একটা বৈচিত্র্য ও কমনীয়তা সহজেই শ্রোতাকে মোহিত করে রাখ্‌তে পার্ত্ত। ফরাসী ভাষার একটা স্বতঃ সরসতার জন্যই কি না জানি না, কথাবার্ত্তায় ফরাসী জাতির ক্ষমতা বোধ হয় অন্যান্য অনেক জাতির চেয়ে বেশি। এই সূত্রে আমার অনেকবার মনে হয়েছে যে, ফরাসী জাতির পাশে থেকেও জার্ম্মাণ জাতি কেমন করে জার্ম্মাণ ভাষার মতন একটা অসুন্দর ভাষা গড়ে তুলেছে, ও কেনই বা তারা ফরাসী জাতির কাছ থেকে কেমন করে কথা বল্‌তে হয় শেখে নি!

দুহামেল মহোদয়ের দৈনিক কথাবার্ত্তা কেমন একটা সূক্ষ্ম রসিকতা-ধারায় রঞ্জিত ছিল, তার একটা উদাহরণ দেওয়া বোধ হয় মন্দ নয়। এ সমিতিতে এক আমেরিকান পাদ্রী মহোদয়ের একটু অত্যধিক জলদগম্ভীর-স্বরে কথা বলার ও উত্তেজিত ভাবভঙ্গীর মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করার চেষ্টা আমাদের মধ্যে অনেকেরই ভাল লাগে নি। দুহামেল মহোদয়কে কৌতুকচ্ছলে এ কথা বলাতে তিনি

একটু হেসে উত্তর দেন : "রায় মহাশয়! যখন দেখবে কোনও বক্তা তার-স্বরে ও সজোরে কোনও মতামত প্রকাশ কর্চ্ছেন, তখন বুঝবে যে তিনি যা জোর করে বলছেন তার সম্বন্ধে নিজে যথেষ্ট সন্দিগ্ধচিত্ত। আর যখন দেখবে যে, তিনি টেবিলে ভীম মুষ্ট্যাঘাত দ্বারা নিজের কোনও বিশেষ মতকে অভ্রান্ত প্রতিপন্ন কর্ব্বার চেষ্টা পাচ্ছেন, তখন নিশ্চয় জেনো যে, তিনি যা বলছেন তা নিজেই অণু মাত্রও বিশ্বাস করেন না।"

ভারতীয় সঙ্গীত শুনে ইনি আমাকে বলেছিলেন যে, এ সম্পূর্ণ অভিনব সঙ্গীত তাঁর হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব সাড়া তুলেছে এবং সঙ্গীতের এ নূতন এক রাজ্যের অস্তিত্বও তিনি অবগত ছিলেন না। তিনি আমাকে আরও বলেছিলেন "তোমাদের দেশের সঙ্গীত তোমাদের উচ্চ সভ্যতার যে একটা মহা প্রমাণ, এ বিষয়ে এক অন্ধ ছাড়া আর কেউই সন্দেহ কর্ত্তে পারে না। এখন যদি কোনও বিজ্ঞম্মন্য ইংরেজ আমার কাছে এসে ভারতীয় সভ্যতার হীনতা প্রমাণ কর্ব্বার প্রয়াস পান, তবে যে আমি তাঁর মুখের উপরই হেসে তাঁকে অপ্রস্তুত করে দেব * এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।" য়ুরোপে এক সঙ্গীত-রসের উদার ও প্রকৃত রসিক ছাড়া অন্য কারুর মনে আমাদের সঙ্গীত যে বড় একটা সাড়া তোলে না, এটা লক্ষ্য করে আমি প্রথম প্রথম একটু আহত বোধ কর্ত্তাম; তাই আমাদের সঙ্গীতের এরূপ আন্তরিক তারিফে যে আমার মনটা খুসিতে ভরে গিয়েছিল, এ কথা বোধ হয় বলাই বেশি। এ বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম বিখ্যাত রোম্যাঁ রোলাঁ মহোদয় আমাকে ভরসা দেন যে, য়ুরোপে যারা সঙ্গীত বোঝে, তারা নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গীতের মহত্ব বুঝবে, যদিও অশিক্ষিত লোক হয় ত তাকে অদ্ভুত বলে প্রত্যাখ্যান কর্ত্তে পারে। তারপরে দু-চারজন সত্যকার সঙ্গীত-বোদ্ধার সংস্পর্শে এসে এ কথাটির যাথার্থ্য অনুভব করেছিলাম, যাঁদের মধ্যে জর্জ্জ দুহামেল ছিলেন অন্যতম। রোলাঁ মহোদয় আমাকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন :—

"তুমি ইংরাজ ও আমেরিকানদের দেখে য়ুরোপীয়দের সঙ্গীত-রস-গ্রাহিতা সম্বন্ধে মত পোষণ করেছ, অথচ ঠিক এই দুটি জাতিই হ'চ্ছে জগতের মধ্যে সব চেয়ে কম সঙ্গীতজ্ঞ (তাদের সঙ্গীত নেই বললেই হয়)। কিন্তু তুমি যদি ফ্রান্স ও জার্ম্মাণির—রুষ দেশের ত' কথাই নেই—শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-রসিকদের সংস্পর্শে আসতে, তা'হলে দেখতে পেতে যে তারা তোমাদের সঙ্গীতের সৌন্দর্য্য থেকে কতখানি রস গ্রহণ কর্ত্তে পারে। অবশ্য অনেক জিনিষ হয় ত' তারা ধর্ত্তে-ছুঁতে পার্ব্বে না * * * কিন্তু তোমাদের সঙ্গীতের মধ্যে যে বিশ্ব-জনীন ও গভীর সার আছে, তা নিশ্চয়ই আমাদের মনে সাড়া তুলবে।" †

ভারতীয় সঙ্গীত যে দুহামেল মহোদয়ের একটু বেশী রকম ভাল লেগেছিল, তা থেকে উপরোক্ত কথাটির যাথার্থ্য অন্ততঃ আংশিক ভাবেও সপ্রমাণ হয়। কারণ দুহামেল মহোদয় আমাকে পরে বলেছিলেন: "দেখ, আমি সঙ্গীত বিনা বাঁচতে পারি না। যুদ্ধের সময়ে আহতদের চিকিৎসা করার সময়ে সঙ্গীত শুনতে না পেয়ে আমি বাঁশী বাজাতে শিখেছিলাম এবং তা থেকে যে কতটা আনন্দ পেতাম, তা আর তোমাকে কি বলব? এখনও মাঝে-মাঝেই আমার বাড়ীতে আমি আমার দু'চারজন বন্ধু-বান্ধবকে ডেকে এনে একত্রে রীতিমত concert (ঐকতান বাদ্য) দিয়ে থাকি।" এ থেকে বোঝা যায় যে, ইনি সঙ্গীতকে সত্যসত্যই ভালবেসে এসেছেন ও সে ভালবাসা—"O I love music-রূপ সামাজিক ভালবাসা নয়—সত্যকার সঙ্গীতানুরাগ। ভারতীয় সঙ্গীত যে তাঁর মনে কিরূপ সাড়া তুলেছিল, তা তিনি আমাকে পরে একটী দীর্ঘ পত্রে লিখেছিলেন—"Il ne se passe pas de jour ou je ne m'efforce de chanter dans mon coeur

---

* এস্থলে "rire au nez" বাক্যটি তিনি ব্যবহার করেছিলেন; তার হুবহু বাঙ্গলা অনুবাদ হবে "নাকের ওপর হেসে দেওয়া"।

† Vous jugez du temperament musical europeén d'apres les anglais et les americains qui sont les races europeénnes les moins musicales : (leur musique est presque inexistante). Mais si vous aviez affaire à une elite musicale de France ou d' Allemagne (sans parler de la Russie) vous verriez comme elle est capable de gouter la beauté de vos chants. Certainement bien des choses lui échapperont * * *; mais l'essence profondément universellement humaine de cette musique sera sentie par nous.

les chants extraordinaires que vous nous avez fait entendre le dernier soir" এর ভাবার্থ এই :—এমন দিন বোধ হয় যায় না, যে দিন আমি মনে মনে তোমাদের অসাধারণ ভারতীয় সঙ্গীত, যা আমি সেদিন সন্ধ্যায় শুনেছিলাম, গাইতে চেষ্টা না করি।"

দুঃখময় জগতে, যেখানে মানুষের বাস্তব দারিদ্র্য প্রভৃতি সামাজিক অবিচারের কষ্ট এত বেশী, সেখানে সঙ্গীত রূপ ললিত কলার চর্চ্চা কি একদিক্ দিয়ে হৃদয়-হীন কাজ নয়, এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে, ইনি উত্তর দেন "জগতে সঙ্গীতের দুঃখ কষ্ট লাঘব করার ক্ষমতা কি কম? আরও দেখ, সত্যকার সঙ্গীতকার তাঁর সঙ্গীতের চর্চ্চায় জগতের যতটা হিত সাধন কর্ত্তে পার্ব্বেন, অন্য কোনও সমাজ-হিতকর কাজেও তিনি ততখানি কাজ কর্ত্তে পার্ব্বেন কি না, এ বিষয়ে সংশয় পোষণ করার খুবই কারণ আছে।" পরে সঙ্গীতের মানুষের মধ্যে ঐক্য সাধনের ক্ষমতা সম্বন্ধে ইনি একটি ছোট্ট হৃদয়স্পর্শী ঘটনা বিবৃত করেন। সেটি এখানে উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ কর্ত্তে পার্লাম না, কারণ; এ ঘটনাটি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু তার অর্থ অনেকখানি। তা ছাড়া, এতে দুহামেল মহোদয়ের হৃদয়ের সুকুমার দিক্‌টার (refinement) একটা মনোজ্ঞ বিকাশেরও বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ অনেক স্থলেই এ সব ছোট-খাট দৈনিক ঘটনাকে বিশেষ ভাবে গ্রহণ কর্ত্তে পারা-না-পারার উপর মানুষের হৃদয়ের গভীরতা বা অসারতা বড় কম ফুটে ওঠে না। তা'ছাড়া, প্রায় কোনও ঘটনাই সংসারে তুচ্ছ নয়, যদি তাকে যথাযথ ভাবে দেখ্‌তে শেখা যায়। তাই মানুষের প্রাত্যহিক কথাবার্ত্তার ও ছোট-খাট গল্পালাপের বা মতামতের ধরণটিকে তুচ্ছ মনে না করাই বোধ হয় ভাল। এ ঘটনাটি বিগত যুদ্ধের সময়ের কথা। একটি জার্ম্মাণ সৈনিক আহত হ'য়ে ফরাসী হাঁসপাতালে ছিল। দুহামেল মহোদয় ছিলেন সেখানকার ডাক্তার। রোজই তিনি আসেন, যান, ও তার সঙ্গে মৃদুভাবে ও বন্ধুভাবে কথাবার্ত্তা কইবার চেষ্টা করেন; কিন্তু জার্ম্মাণ বন্দী তাঁকে শত্রু বলে শতহস্ত দূরে রাখ্‌বার চেষ্টা ক'র্ত্ত। "হাঁ-না" ছাড়া কোনও কথাই বল্‌ত না। দুহামেল মহোদয় বল্লেন "কোনও মতেই তার মনটির নাগাল পেয়ে, আমি একটু দুঃখিত হয়েছিলাম; কিন্তু শত্রু-বিদ্বেষ তার মনে এতই প্রবল ছিল যে, কোনও উপায়ও ছিল না। একদিন আমি তার কাছে বসে অন্যমনস্ক ভাবে Beethoven-এর একটি Symphonyর * একটুখানি সুর আস্তে আস্তে শীষ দিচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি, সেই আহত জার্ম্মাণ বন্দীর মুখের কঠিন ভাবটা যেন কেমন অকস্মাৎ মিলিয়ে গেছে ও সেখানে একটা মানুষ ও কোমল ভাব দেখা দিয়াছে। সে আমাকে যেন একটু হৃদ্যতার সঙ্গেই জিজ্ঞাসা কর্ল, 'Beethovenএর অমুক Symphony নয়?' আমি একটু হেসে বল্‌লাম 'হাঁ'। কিন্তু তার পরেই বোধ হয় তার আবার মনে হ'ল যে আমি তার দেশের শত্রু; কাজেই আমার সঙ্গে হৃদ্যতা করা তার পক্ষে অকর্ত্তব্য ও পরমুহূর্ত্তেই তার মুখে সেই দুরন্তের ও কাঠিন্যের পর্দ্দা এসে তার সহজ-প্রীতির ভাবকে দূরে সরিয়ে দিল।" এই তুচ্ছ ঘটনাটি আমার হৃদয় স্পর্শ করেছিল ও তা দুইটি কারণে। প্রথম কারণ এই যে, এটা সঙ্গীতের একটা সত্য ও বিশ্বজনীন স্পর্শের সুন্দর দৃষ্টান্ত, যে স্পর্শ অনেক সময়ে মানুষের পরে মানুষের কঠোরতম শত্রুতাকেও ভুলিয়ে দিতে পারে ও তাকে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও মিত্রের কোঠায় এনে ফেল্‌তে পারে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, এতে দুহামেল মহোদয়ের স্বভাব-কোমল সহানুভূতির ও সহৃদয়তার পরিচয় পাওয়া যায়, যার প্রভাব তাঁর মনকে যুদ্ধের সময়েও বিদ্বেষের হাত হ'তে বাঁচিয়েছিল ও যার বশবর্ত্তী হ'য়ে তিনি লিখ্‌তে পেরেছিলেন—"মানুষের সব চেয়ে বড় আনন্দ হচ্ছে, অপরকে সুখ দিতে পারা; এবং যারা এ কথাটি জানে না, তারা জীবনের কিছুই জানে না।" † যুদ্ধের সময়েও এবং বর্ত্তমান সময়ে গোঁড়া জাতীয়তায় অন্ধ ফরাসী জাতির লোক হয়েও যে ইনি মানুষের মনুষ্যত্বকে সব চেয়ে বড় মনে করে আস্‌তে পেরেছেন, এজন্য এঁর অন্তরের গভীরতার সুখ্যাতি না করেই পারা যায় না। এঁর এই সমদর্শিতার

* Beethoven ছিলেন জার্ম্মাণ দেশের ও প্রতীচ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-রচয়িতা; আর অনেকগুলি যন্ত্রের কোনও বিশেষ শ্রেণীর ঐক্যতান বাদ্যকে বলে symphony.

† La plus grande joie, elle est de donner le bonheur, et ceux qui l'ignorent ont tout a apprendre de la vie...... Possession du Monde.

জন্য ফরাসী গভর্মেণ্ট যে এঁকে সুনজরে দেখেন না, তা বোধ হয় বলাই বাহুল্য। আরও বিশেষতঃ যখন ইনি দেশদ্রোহী রোমাঁ্যা রোলাঁ মহোদয়ের বন্ধু।

আমাদের এ সমিতিটি যে অনেকের কাছেই উপভোগ্য হয়েছিল, সে সম্বন্ধে ইনি আমাকে পূর্ব্বোক্ত পত্রের এক স্থলে লিখেছিলেন "আমি প্রায়ই মনে কর্‌তাম যে, এই সব সভা-সমিতি করা বৃথা, যেহেতু সেখানে হয় কেবল বাজে গল্প—কাজ নয়। এখানে আমার ভুল হয়েছিল।" * ইনি যে এ সমিতিতে আনন্দ পেয়েছিলেন, তা কিন্তু এ সমিতির বক্তৃতাদির জন্য নয়, কারণ ত' আমি লিখেই ছি যে এঁর কলাবিতের হৃদয়কে লম্বা-চওড়া বক্তৃতা বড় একটা স্পর্শ কর্ত্তে পার্ত্ত না। তবে তা হ'লে এ সমিতিতে কেন এসেছিলেন, জিজ্ঞাসা করাতে ইনি ভারি সুন্দর উত্তর দিয়েছিলেন :—"আমি এসেছি মানুষের সঙ্গে বাস্তব হৃদ্যতার মধ্য দিয়ে একটু পরিচয়লাভ কর্ত্তে। আমি যখন এমন কি দূর থেকেও "অমুকের" হাস্যোজ্জ্বল তৃপ্ত চক্ষু দুটি বা "অমুকের" গল্পনিরত রঞ্জিত মুখখানি দেখি, তখন আমার মনটা বেশ্ একটা পরম খুসিতে কানায় কানায় ভরে ওঠে। এই ত' মানুষের সঙ্গে মানুষের আসল সম্পর্ক—অর্থাৎ সহজ প্রীতির সম্পর্ক। আবার কি ? বক্তৃতা ? না, বক্তৃতা দিতে বা শুনতে আমি আসি নি।"

দুহামেল মহোদয় সচরাচর খুব সরস ও দ্রুত কথা বল্‌লেও, অপরের কথা সর্ব্বদাই মনোযোগ দিয়ে শুন্‌তেন। বার্টরাণ্ড রাসেল মহাশয়ের চীন জাতির একটি মহৎ গুণের কথা মনে পড়ে আমার দুহামলের কথা মনে হয়েছিল। রাসেল চীনদের সম্বন্ধে যা লিখেছেন অর্থাৎ, "কোনও চীনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইবার সময়ে বেশ অনুভব করা যায় যে, সে অপরের সঙ্গে কথা কয় তাকে বোঝ্‌বার চেষ্টা নিয়ে, তার কোনও পরিবর্ত্তন বা অঙ্গহানি ঘটাবার অভিপ্রায় নিয়ে নয়" † তা দুহামেল মহোদয়ের সম্বন্ধে হুবহু খাটে। বাস্তবিক আমরা কত সময়েই না তর্ক করি, অপরকে নিজের মতে টেনে আনার অভিপ্রায় নিয়ে, যেখানে নিজের মত সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া সংসারে এত কঠিন! এ বিষয়ে দুহামেল মহোদয় যে কতটা উদারমনাঃ, তা তাঁর এই কয়টি কথা থেকে প্রতীয়মান হয় : "যদি কখনও কেউ তোমাকে আশ্চর্য্য কিছু বলে অর্থাৎ এমন কোনও কথা যা তুমি কখনও শোননি, তাহ'লে তাতে হেসো না, মন দিয়ে শুনো। তাকে না হয় বোলো তার কথাটি আরও দু'চারবার বল্‌তে বা বোঝাতে। কারণ তার এ অভিনব কথার মধ্যে কিছু না কিছু শেখার থাক্‌বেই।" ‡ দুঃখের বিষয় এরূপ মনোভাব জগতের মধ্যে বেশী লোকের মনে স্থায়ী হয় না। তা যদি হ'ত, তা হ'লে আজ জগতে এত গোঁড়ামি ও বিরুদ্ধ-মতাহিষ্ণুতা থাক্‌ত না।

একদিন আমরা এই লুগানো শান্তি-সমিতিতে এক টেবিলে আহাররূপ প্রয়োজনীয় কাজটিতে নিরত ছিলাম। দুহামেল মহোদয় হঠাৎ একটি পরিচারিকাকে "মাদাম" (মহাশয়া) সম্বোধন করে কি একটি আহার্য্য আন্‌তে অনুরোধ করেন। য়ুরোপে পরিচারক পরিচারিকা-সম্প্রদায়ের সামাজিক অবস্থা আমাদের দেশের পরিচারকদের অবস্থার চেয়ে ঢের উন্নত হলেও আমি ইতঃপূর্ব্বে কোনও পরিচারিকাকে "মাদাম" আখ্যায় অভিহিত হতে দেখি নি; হয় ত অনেকের মনে হতে পারে যে, দুহামেল মহোদয়ের এ শিষ্টতাটা একটু বাড়াবাড়ি, যেহেতু 'নামে কি আসে যায়!' কিন্তু আমার মনে হয় যে এ সামান্য সম্বোধনের মধ্যে যে মনোভাবটির পরিচয় পাওয়া যায়, তা নিতান্ত অগভীর নয়। কারণ আমাদের মধ্যে কয়টা লোকের একজন হীনাবস্থার লোককে অসামাজিক সম্মান প্রদর্শনের সাহস আছে? অথচ কত স্থলে হয় ত এরূপ একটা সহজ সম্মান ও সাম্যের সম্বোধন এই দৈন্যক্লিষ্ট, নিঃস্ব সম্প্রদায়ের মনে একটা সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে পারে!

* J'ai souvent pensé que les congrès et tous les endroits où l'on bavarde n'avaient pas grande utilité ; j'avais tort.

† In talking with a Chinese, you feel that he is trying to understand you, not to alter you or interfere with you.

The Problem of China (p. 84) Bertrand Russel.

‡ Si quelqu'un vous dit sur le monde une chose étrange, une parole que vous n'avez point encore entendue, ne riez pas, mais écoutez attentivement ; faites répéter, faites expliquer : il y a sans doute quelque chose à prendre là.........La Possession du Monde.

অবশ্য এ মৌখিক ভদ্র-ব্যবহারে দুঃস্থ লোকের দুরবস্থার আকাশ-পাতাল তারতম্য হওয়ার সম্ভাবনা নেই; আমি বল্‌তে চাই শুধু এই কথা যে, এরূপ শীলতার যতটুকু দাম, তাকে তার চেয়ে কম দাম না দেওয়াই বোধ হয় ভাল। কারণ আমি শুধু দেশেনয়, য়ুরোপেও দেখেছি যে, এই দুস্থ সম্প্রদায় অনেক স্থলেই সমাজের অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থার লোকের কাছে একটু সমবেদনা পেলে আনন্দিত হয়, ও তাদের কঠিন ভাগ্যের উপহাস-সত্ত্বেও একটু সান্ত্বনা পেয়ে থাকে। য়ুরোপে আমি অনেক ক্ষেত্রেই এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে একটু যেচে গল্পালাপ করার চেষ্টা করে দেখ্‌তে পেয়েছিলাম যে, আমরা এই মৌখিক ভদ্র-ব্যবহার সর্ব্বদা পেয়ে পেয়ে তাকে যে চোখে দেখি, তারা না-পাওয়ার দরুণ একে একটু বড় করেই দেখে থাকে। কারণ এদের সঙ্গে ভদ্র য়ুরোপীয়গণ সচরাচর নিতান্ত আবশ্যকীয় হুকুম উপলক্ষ ছাড়া বড়-একটা কথাবার্ত্তা বলেন না। অথচ আমি অনেক স্থলেই দেখেছি যে, এদের সঙ্গে একটু সমান সমান ভাবে কথাবার্ত্তা কইলে এরা নিতান্তই আপনার মতন ব্যবহার করে এবং অনেক স্থলে ভদ্রগৃহস্থের সঙ্গে চেষ্টা করেও যে সহজ প্রীতির নাগাল না পাওয়া যায়, এদের সঙ্গে সামান্য ভদ্র-ব্যবহারেই তা পাওয়া যায়। আমার নিজের সামান্য অভিজ্ঞতাতেও এটা অনেক-বার ঘটেছে যে, কোন হোটেল বা pension এ (বোর্ডিং) অনেক দিন থাকার পরেও তত্রত্য বাসিন্দার মধ্যে যাকে সব চেয়ে আপনার মনে হয়েছে, সে একজন সামান্য পরি-চারিকা মাত্র, যারা অনেক ক্ষেত্রে আমার সঙ্গে এমন কি আত্মীয়ের মতনই ব্যবহার করেছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ যে হুকুম ও হুকুম-তামিলের মাত্র নয়, তা আমার এ সম্পর্কে প্রায়ই মনে হ'ত; বিশেষতঃ তখন, যখন দেখ্‌তাম যে মাত্র একটা সামান্য সমবেদনার কথাও এদের কাছ থেকে কত গভীর দুঃখের কাহিনীই না টেনে আন্‌তে পারে! এ সম্পর্কে একটা উদাহরণ মাত্র দিয়েই আমি এ অবান্তর প্রসঙ্গটি চাপা দেব। এই লুগানোর হোটেলটিতেই আমার ঘরের তদারকের ভার ছিল একটি ২৯।৩০ বৎসরের ফরাসী পরিচারিকার ওপর। অনেক সময়ে আমি ঘরের মধ্যে থাক্‌লেও সে নীরবে ঘরের কাজকর্ম্ম সমাধান করে চলে যেত। দুচার দিন বাদে আমি তার সঙ্গে নানারকম সাধারণ কথাবার্ত্তা কইবার চেষ্টা কর্ত্তাম, কারণ দেখ্‌তাম যে তাতে তার দুঃখরেখাবহুল মুখেও একটা খুসির উদয় হ'ত। এ-কথায় সে-কথায় একদিন সে তার দুঃখের যাবতীয় কাহিনী বর্ণনা করা সুরু করে দিলে। বল্‌ল যে, তাকে যে কখনও দাসীবৃত্তি কর্ত্তে হবে, তা সে কখনও স্বপ্নেও ভাবে নি; কারণ সে ভদ্রগৃহের মেয়ে, যুদ্ধের আগে তাদের অবস্থা ভাল ছিল, যুদ্ধের সময় Alsace এ তাদের বাড়ী ও কারখানা গোলাবৃষ্টিতে ভেঙ্গে একাকার হয়ে যায়; তাই আজ ইত্যাদি ইত্যাদি। বল্‌তে বল্‌তে সে আরও নানান্ দুঃখের কথা বল্‌তে আরম্ভ করে দিলে যে, অবসরের চিত্তবিনোদন যে কি বস্তু, তা সে জানে না, কারণ সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি কাজ করে যখন সে অবসর পায়, তখন তার শ্রান্ত দেহে এমন ঘুম ছেয়ে আসে যে কোনও আমোদ-আহ্লাদের কথা তার মনেও আসে না। সে আমাকে আরও বলেছিল "দেখ, তোমরাই সুখী, কারণ তোমরাই অবসর পাও ও সে সময়ে নানান চিত্তরঞ্জক আমোদ-প্রমোদের কথা ভাব্‌তে পার। আর আমরা? আমরা কেমন করে জীবন ধারণ করব সেই চেষ্টায়ই সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি ব্যস্ত।" দারিদ্র্য-দুঃখে মানুষকে নিষ্পিষ্ট করে ফেলার চিরন্তন ও পুরাতন কাহিনী লেখা বা সে সমস্যার সমাধান করার উদ্দেশ্য নিয়ে অবশ্য আমি এ সব কথা লিখি নি। আমার এতগুলি কথা বলার উদ্দেশ্য শুধু এই কথাটি মাত্র জ্ঞাপন করা যে, এই যে ভদ্র-গৃহস্থের মেয়েটি আমার সামান্য দুই চারিটি কথা শুনে এতটা খুসি এমন কি কৃতজ্ঞও হয়ে পড়েছিল, লক্ষ্য করেছিলাম, তাতে আমার পুনরায় মনে হয়েছিল যে, অনেক ক্ষেত্রে সামান্য কথাকে নিতান্ত সামান্য বলে মনে না কর্‌লে তাতে মোটের উপর বোধ হয় লোকসানের চেয়ে লাভের সম্ভাবনাই বেশি। এইজন্যই দুহামেল মহোদয়ের পরিচারিকাকে এই সামান্য "মাদাম" সম্বোধনটিও আমার কাছে একটু অসামান্য বলে মনে হয়েছিল। কারণ, আমার মনে হয়েছিল যে, সহৃদয় ও সুকুমার মনাঃ (refined) দুহামেল মহোদয় এই সত্যটি বুঝেছিলেন যে, আমরা অধিকাংশ স্থলেই দাসদাসীর পরিচারণ গ্রহণ কর্ত্তে বাধ্য হলেও তাদের দুঃস্থ ভাগ্যকে একটা সমবেদনার বা সম্ভ্রমের কথায় অন্ততঃ খানিকটা সান্ত্বনাও দিতে পারি।

জর্জ্জ দুহামেল যুদ্ধের সময়ে অনেকগুলি সুচিন্তিত পুস্তক লিখে একজন উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যিক বলে বিশেষ খ্যাতি

অর্জ্জন করেন। তার মধ্যে La Civilization, Les Hommes Abandonnes, La Possession du Monde প্রভৃতি পুস্তকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম দুটি বই আমি পড়িনি, কিন্তু আমার অনেক ফরাসী বন্ধু-বান্ধবীর কাছে এ দুইটি বইয়ের আমি বিশেষরূপই প্রশংসা শুনেছি। শেষোক্ত বইখানির দুই এক স্থল থেকে যা উদ্ধৃত করেছি, তাতে বোধ হয় তার সারগর্ভতা অনেকটা প্রতীয়মান হবে। বর্ত্তমান ফরাসী দেশে যে একটা আদর্শপন্থী বিশ্বমানবত্বের আন্দোলন ফল্গুধারার মত চলেছে, দুহামেল সে আন্দোলনের এক জন অন্যতম অগ্রণী। এঁর মধ্যে একটি দুর্জ্জয় আদর্শবাদ আছে ও ধীর বিচার আছে, যার দাম বর্ত্তমান জাতীয় অহঙ্কারের যুগে খুবই বেশী। দুহামেল নিজে বিশ্বাস করেন যে, মানুষের মুক্তি মিল্‌তে পারে কেবল তখনই, যখন প্রত্যেকেই সব সময়ে নিজের স্বাধীন বুদ্ধি বজায় রেখে চল্‌তে শিখবে, অপরের মতামতের দ্বারা অভিভূত হয়ে পড়বে না। তাই ইনি কতিপয় নেতা দ্বারা যে জগতের সমস্যার সমাধান হতে পারে, এমন কথা মনে করেন না। কিন্তু প্রত্যেকের পক্ষে একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা আশু সুসাধ্য নয় বলে ইনি বিশ্বাস করেন না যে, মানুষের পাশবিকতার হাত হতে নিস্তার পাওয়া শীঘ্র সম্ভবপর।

এঁর সঙ্গে নানান্ বিষয়ের আলোচনাই করা গিয়েছিল এবং এঁর সব মতের মধ্যেই একটা শান্ত অথচ দৃঢ় ব্যক্তিগত ছাপ আমাদের ভারি তৃপ্তি দিত। ভারতের প্রতি এঁর শ্রদ্ধা ছিল - সত্য ও সুচিন্তিত; যদিও ভারতকে ইনি যে ভাবে idealise কর্ত্তেন, তাতে অনেক সময় আমার ভয় হ'ত পাছে এঁর ক্ষেত্রে "Distance lends enchantment to the view" গোছের হয়ে থাকে। সে যাই হোক্, একদিন আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেন তা'হলে তিনি ভারতবর্ষে আসেন না। তাতে ইনি একটু হেসে বলেছিলেন "ফরাসী গভর্মেণ্টের সঙ্গে সদ্ভাব থাক্‌লে তোমাদের দেশে একটা রিসার্চ্চ বা অম্‌নি কিছু একটার জন্য টাকা যোগাড় করে হয় ত যেতে পার্ত্তাম; কিন্তু তা কর্ত্তে হলে আমার অন্য-রকম বই লেখা উচিত ছিল; যেহেতু আমি যা লিখেছি, তার দরুণ আমার ও ফরাসী গভর্মেণ্টের মধ্যে সম্বন্ধটা অনেকটা আদার সহিত অপক্ক কদলীর সম্বন্ধের সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই তোমাদের দেশে যাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে কিছু অর্থ সঞ্চয় করা। তবে একটা কথা নিশ্চয় জেনো যে, যদি সে সুযোগ কখনও আমার সাম্‌নে উপস্থিত হয়, তবে তার সদ্ব্যবহার কর্ত্তে আমাকে কারুর বল্‌তে হবে না।"

ফাগুনে

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর বি-এ

আজ ফাগুনে বাউল বাতাস
বেণুর বনে বাজায় বাঁশী,
ও তার—ঝাঁক্‌ড়া চুলে ঠিক্‌রে পড়ে
কিষণ চূড়া রাশি রাশি॥
খোলামাঠের তলাট ভরে
গোঠের পথে ধূলোট করে
ও সে—বেবাক উলট পালট করে।
গোধন হারায় রাখাল চাষী॥
বাউল বাতাস হয়েছে আজ
মউলবনে মাতোয়ালা,
আম বউলের বৌলি কাণে,
গলায় দোলে অশোক মালা।

ঐ দেখ তার পাগল নাচে
আট্‌কে গেল পলাশ গাছে
ও তার—গেরুয়া আলখাল্লাখানি;
বনবাগানে ছুট্‌ল হাসি॥
পানকৌড়ী ডুব দিয়ে ঐ
ডুবকি বাজায় তালে তালে,
গাবগুবাগুব বাজায় ঘুঘু
রঙীন গাবের ডালে ডালে,
চরণে তার হাজার ভ্রমর
ঘুঙুর বাজায় ঝমর ঝমর,
শুনে—উদাস বিভোর পরাণ আমার
চায় হতে তার সেবাদাসী॥

আত্মরক্ষার কৌশল

শ্রীহরিহর শেঠ

আত্মরক্ষার জন্য আদিম কাল হইতে পৃথিবীর সকল দেশেই যেমন বহুবিধ অস্ত্রের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে, এককালে এ দেশেও তেমনিই বহুবিধ অস্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। পৃথিবী সভ্যতার পথে যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই ভয়ানক-ভয়ানক প্রাণঘাতী অস্ত্রের প্রয়োজন হইতেছে; সুতরাং তাহাদের আবিষ্কারও হইতেছে। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য এখন একমাত্র বংশদণ্ডই ভারতবাসীদের প্রধান অবলম্বন। এরূপ অবস্থায়, অস্ত্র ব্যতীত শত্রুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষার কোন সহজ উপায় জানা থাকিলে সময়ে বিশেষ উপকার হইতে পারে।

বারটন্ রাইট্ নামক কোন ব্যক্তি শুধু হাতে আকস্মিক আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বহু প্রকার কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা আমাদের কখন কখনও কোন না কোন উপকারে আসিতে পারে, এই মনে
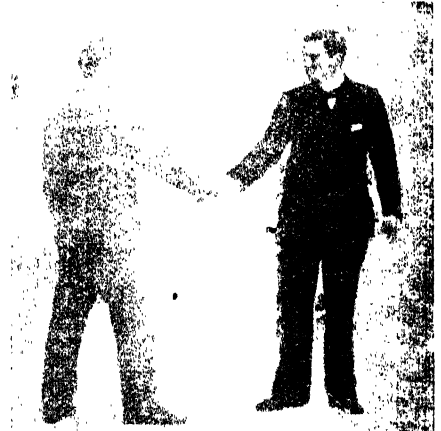
১ম—ক, চিত্র   ১ম—খ, চিত্র

২য়—ক, চিত্র   ২য়—খ, চিত্র

৪র্থ—ক, চিত্র

৪র্থ—খ, চিত্র

৪র্থ—গ চিত্র

৩য়—ক, চিত্র

৩য়—খ, চিত্র

করিয়া তন্মধ্য হইতে কয়েকটী কৌশল এখানে বিবৃত হইতেছে।

বারটল্ রাইটের বিবরণীতে কশরৎগুলি যে ভাবে লেখা আছে, তাহাতে উহা শিক্ষা করা কঠিন নহে; এবং সাধারণ বলসম্পন্ন অনেকের পক্ষেই সহজসাধ্য। কিন্তু উহা কাজে লাগাইতে হইলে কৌশলগুলি অভ্যাস করা দরকার। বিষয়টী কেবল মাত্র লিখিয়া বুঝান সহজ

৬ষ্ঠ—ক, চিত্র

৫ম—ক, চিত্র

৬ষ্ঠ—খ, চিত্র

৫ম—খ, চিত্র

৬ষ্ঠ—গ, চিত্র

৬ষ্ঠ—ঘ, চিত্র

৭ম—ক, চিত্র

৭ম—খ, চিত্র

৭ম—গ, চিত্র

৭ম—ঙ, চিত্র
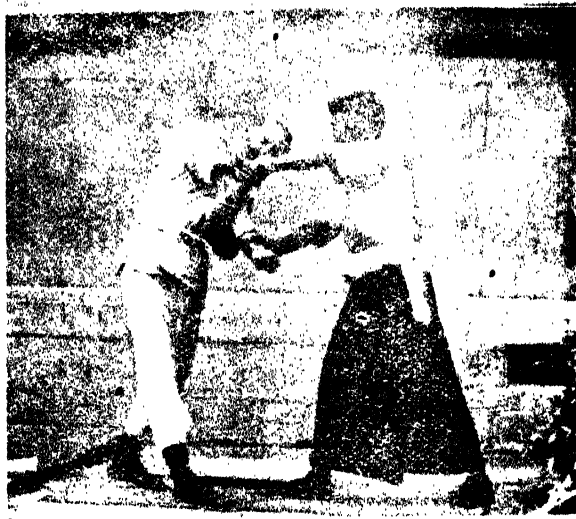
ফটোগ্রাফগুলি হইতে প্রবন্ধে বর্ত্তমান কয়েকখানি চিত্রও উদ্ধৃত হইল।

(১) দুষ্ট লোককে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিবার উপায়।

প্রথমেই দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আগন্তুকের দক্ষিণ হস্তের কব্জি দৃঢ় ভাবে ধরিতে হইবে। তৎপরে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া ১ম-খ চিত্রানুযায়ী বাম পদের উপর জোর দিয়া, বাম হস্ত তাহার দক্ষিণ হস্তের বগলের ভিতর দিয়া তাহার জামার বোতামের কাছে এমন করিয়া ধরিতে হইবে, যাহাতে হাতটাতে বেশ জোর পায় এবং পিছলাইয়া না যায়। এইবার তাহার দক্ষিণ হস্ত সজোরে নিম্নদিকে আকর্ষণ করিয়া, বাম হস্তের জোরের দ্বারাই তাহাকে গৃহদ্বারের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া আর কিছু মাত্র দুঃসাধ্য মনে হইবে না। যদি সে ব্যক্তি কোনরূপ বাধা দিবার প্রয়াস পায়, তবে তাহার দক্ষিণ হস্তের কনুই-য়ের কাছে ভাঙ্গিবার চেষ্টা করা আবশ্যক।

(২) পশ্চাৎ হইতে কোন লোককে সহজে ভূপাতিত করিবার প্রণালী।

৭ম—ঘ, চিত্র

পশ্চাৎ হইতে অকস্মাৎ কোন লোকের জামার কলার
ক্ষিণ হস্ত দ্বারা জোরে ধরিয়া তাহার হাঁটুর পশ্চাৎ দিকে
ক্ষিণ পদ দ্বারা জোরে চাপ দিলেই, তৎক্ষণাৎ তাহাকে

ভূপতিত হইতে হইবে। এই রূপে ভূপাতিত করার পর তাহাকে ক্ষমতাশূন্য করিতে হইলে, সেইরূপ ধৃত অবস্থায় তাহার গলার নীচেয় হাত প্রবেশ করাইয়া জড়াইয়া ধরিলে, তাহার জোর করিবার আর কোন ক্ষমতা থাকিবে না। ২য় ক ও খ চিত্রে এই উভয় অবস্থাই দেখান হইয়াছে।

(৩) ভূপাতিত ব্যক্তি যাহাতে একেবারে নড়িতে না পারে তাহার কৌশল।

প্রথমেই যত শীঘ্র সম্ভব পতিত ব্যক্তির একটা পা একটু উঁচু করিয়া তাহা ৩য় ক চিত্রে আঁকা মত দুই হাতে ধরিয়া জোর দিলেই যে দিকে ইচ্ছা ফিরান যাইবে। এইরূপে উল্টাইয়া ফেলিয়া নিজের দক্ষিণ হস্তের কবজি হাঁটুর পশ্চাৎ দিকে স্থাপিত করিয়া পায়ের আঙ্গুলের কাছ ধরিয়া পিছন দিকে উল্টাইয়া ধরিলে, তাহার আর জোর করিবার ক্ষমতা থাকে না। (৩য় খ চিত্র)

(৪) পশ্চাৎ হইতে কেহ পিচমোড়া করিয়া ধরিলে আক্রমণকারী হইতে নিষ্কৃতি পাইবার ও তাহাকে ফেলিয়া দিবার উপায়।

হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে কেহ জাপটাইয়া ধরিলে, বিশেষ বলশালী না হইলে নিষ্কৃতি পাওয়া কঠিন মনে হইলেও, নিম্নলিখিত কৌশল জানা থাকিলে, স্বাভাবিক বলসম্পন্ন ব্যক্তিও আক্রমণকারীকে পরাস্ত করিতে পারে।

এরূপ ঘটিলে প্রথমেই সজোরে দক্ষিণপদ দ্বারা তাহার দক্ষিণ পায়ে আঘাত করিতে হইবে। ইহা দ্বারা, যাহাতে পুনরায় আঘাত প্রাপ্ত হইতে না হয়, এই মনে করিয়া সাবধান হইবার জন্য আক্রমণকারীকে নিশ্চয় তাহার পা সরাইয়া লইতে হইবে। (৪র্থ-খ চিত্র) তৎপরে দক্ষিণ হস্তের দ্বারা তাহার পায়ের উরুদেশ সাধ্যমত জোরে টিপিয়া ধরিলেই, বেদনায় তাহাকে হাত আলগা করিতে বাধ্য হইতে হইবে। (৪র্থ-গ চিত্র) এইবার সে যেমন হাত ছাড়িয়া দিবে, তৎক্ষণাৎ দক্ষিণ বাহু দ্বারা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া, দক্ষিণ পদ হাঁটুর পশ্চাতে দিয়া জোর দিলেই, তাহাকে সজোরে চিৎ হইয়া পড়িতে হইবে। (৪র্থ-খ চিত্র)

(৫) কেহ হঠাৎ দুই হাতের কব্জি চাপিয়া ধরিলে, হাত ছাড়াইয়া আক্রমণকারীকে নিক্ষেপ করিবার কশরৎ।

এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ আক্রমণকারী সম্মুখ হইতেই

৯ম—ক, চিত্র ৯ম—খ, চিত্র ৯ম—গ, চিত্র
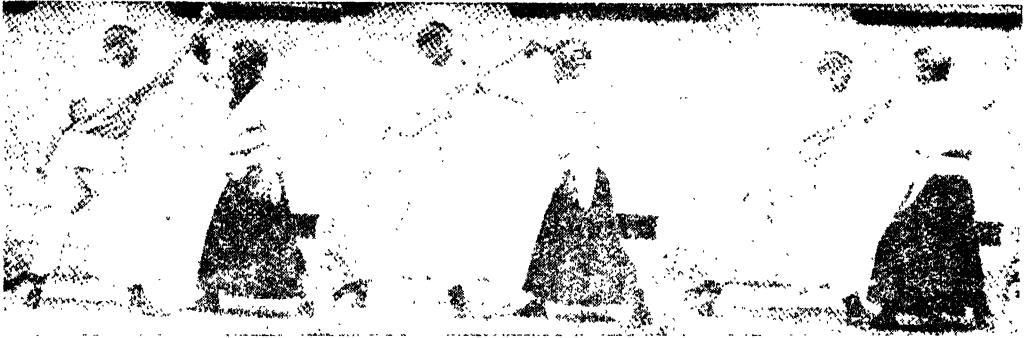
৯ম—ঙ, চিত্র ৯ম—চ, চিত্র ৯ম—ছ, চিত্র

বাড়াইয়া দেয়। আক্রান্ত ব্যক্তিরও দক্ষিণ পা একটু আগাইয়া দিতে হয়। প্রথমে ধৃত অবস্থাতেই একটু জোর করিয়া হাত ঘুরাইয়া লইয়া, বাম হস্তের দ্বারা আক্রমণকারীর বাম হস্তের কব্জি ধরিতে হয়। তৎপরে হঠাৎ সজোরে ডান হাত নীচের দিকে আকষণ করিয়া ছাড়াইয়া লইয়াই, তাহার ডান হাতের কব্জি চাপিয়া ধরিয়া ৫ম খ চিত্রের মত করিয়া, তাহার বাম হাতের উপর দক্ষিণ হস্তের কনুই আসিয়া পড়ে এই রূপ ভাবে অবস্থান করা আবশ্যক। এই রূপে উভয় হস্ত বিপরীত দিকে জোর করিলেই তাহাকে ভূপাতিত করা যাইতে পারিবে।

(৬) কেহ হঠাৎ বুকের কাছে জামা ধরিলে, তাহাকে ছাড়াইয়া ভূমিতে ফেলিয়া দিবার উপায়।

সম্মুখ হইতে জামা ধরিবার সময়, সাধারণতঃ আক্রমণ-কারী—তাহার নিজের মুখে কেহ আঘাত করিতে পারে, এ কথা ভাবে না; সুতরাং মুখে স্বল্প আঘাত করিলেই [illegible]। যদি ইহাতেও না ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে তাহার উভয় হাতের ভিতর দিয়া দক্ষিণ হাতটী প্রবেশ করাইয়া দিয়া, বাম হস্তের সহায়তায় ধরিয়া জোরে মোচড় দিলেই সে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবে। তৎপরে ৬ষ্ঠ-গ চিত্রানুরূপভাবে বাম পা তাহার পশ্চাতে দিয়া এবং বাম হস্তের দ্বারা তাহার বুক জড়াইয়া ধরিয়া সহজেই তাহাকে ফেলিয়া দিতে পারা যাইবে। যদি শত্রু বলবান হয়, তবে এ সকল কার্য্য খুব তৎপরতার সহিত করাই দরকার।

৭ম চিত্রগুলিতে অন্য প্রকার উপায় প্রদর্শিত হইল। এস্থলেও প্রথম মুখে ঘুষি মারিয়া অকৃতকার্য্য হইলে, ৭ম-ক চিত্রের মত উভয় হস্তের কনুই দ্বারা আক্রমণকারীর কব্জির উপর জোর দিলে, সে হাত ছাড়িয়া দিবে। তাহার পর বাম হস্তে চিবুক ও ডান হস্তে মাথা ধরিয়া, পদ দ্বারা অনায়াসে তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া যায়।

যদি কেহ পশ্চাৎ হইতে অকস্মাৎ জামার কলার ধরে, তবে তাহাকে পরাস্ত করিতে হইলে, অবিলম্বে মুখ ফিরাইয়া আক্রমণকারীর কনুয়ের সংযোগ-স্থলের মধ্যের শিরা বাম

হস্তের অঙ্গুলির দ্বারা টিপিয়া ধরিলেই, যন্ত্রণায় অধীর হইয়া সে দিতে বাধ্য হইবে (৮ম-খ চিত্র)। মোটা জামা গায়ে থাকিলে, তাড়াতাড়ি যথাস্থানটা টিপিয়া ধরা কঠিন বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু অভ্যাস করিলে এ কার্য্য তাদৃশ কঠিন নহে। যদি ইহাতে না ছাড়িয়া দেয়, হঠাৎ কনুয়ের তলায় জোরে ধাক্কা দিলেই ছাড়িয়া দিবে। যে উপায়ই অবলম্বিত হউক, বাম হস্তের দ্বারা তাহার দক্ষিণ হস্ত কনুয়ের কাছে ধরা চাই-ই এবং ৮ম-গ চিত্রানুযায়ি তাহার হাতটা তুলিয়া ধরিয়া ডান হাতের দ্বারা ঘাড় ধরিয়া এবং ডান পায়ের সাহায্যে আক্রমণকারীকে চিৎ করিয়া ফেলা যায়।

১০ম—ক চিত্র

১০ম—খ চিত্র

(৭) কেহ মুখে আঘাত করিতে উদ্যত হইলে, তাহাকে বাধা দিবার বিবিধ উপায়ের মধ্যে একটা।

প্রথমেই দক্ষিণ হস্ত দ্বারা শত্রুর ঘুষি আটকান উচিত। তৎপরে ঐ হাতেই তাহার দক্ষিণ হস্তের কব্জি ধরিয়া, বাম কনুয়ের তলায় ধরিয়া, সম্মুখ দিকে তাহাকে আকর্ষণ করিতে হইবে। এই সময় সে ব্যক্তি তাহার দক্ষিণ হস্তের দ্বারা বাধা দিবার চেষ্টা করিলে, তখন ৯ম খ চিত্রের মত হাতটা মুচড়াইয়া দিতে দিতে ডান পায়ের দ্বারা তাহার পা জড়াইয়া দিতে পারা যাইবে।

(৮) কেহ দুই হস্ত দ্বারা দক্ষিণ হস্ত ধরিলে, তাহা ছাড়াইবার ও আক্রমণকারীকে ভূপাতিত করিবার কায়দা।

হাত ধরিবামাত্র, যদি ক্ষমতায় পারা যায়, তাহা হইলে ১০ম-খ চিত্রের ন্যায় বুকের কাছে বাম কাঁধের দিকে হাতটা তুলিয়া মোচড় দিয়া ছাড়াইবার চেষ্টাই স্বাভাবিক। কিন্তু যদি আক্রমণকারী বলবান হয়, তাহা হইলে এ উপায়ে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব হইবে না। সে ক্ষেত্রে তাহার দিকে ডান পা বাড়াইয়া দিয়া, হাঁটু

১০ম—গ, চিত্র

১০ম—ঘ, চিত্র

ইয়া, ধৃত হস্ত বাম কাঁধের সহিত প্রায় সমোচ্চ করিয়া, তৎপরে হাঁটু সোজা করিয়া আক্রমণকারীর পার্শ্বে ঘুরিয়া দাঁড়াইলেই তাহার নিকট হইতে নিষ্কৃতি পাইবার সামর্থ্য লাভ হইবে। এই অবস্থায় কোনরূপ জোর প্রকাশের পূর্ব্বে আপন পদদ্বয় সুবিধামত অবস্থায় স্থাপিত করা আবশ্যক। তৎপরে জোর করিলেই হাত ছাড়ান যাইবে। এইবার চকিতে তাহার মাথার পশ্চাৎদিক ও চিবুকের তলায় হাত দিয়া পায়ের সহায়তায় তাহাকে নিপাতিত করা কঠিন নহে। (১০ম গ চিত্র)।

যে কয়টা কৌশলের কথা বলা হইল, উহা সকল স্থানে সকলের পক্ষে বেশ বুঝিবার মত করিয়া লিখিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বর্ণনার অপেক্ষা কোন কোন ক্ষেত্রে চিত্রগুলির দিকেই অধিক মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

মুকুর

শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

এক

ভাই অনিলা, চিঠি লিখি নে বলে তুমি অনুযোগ করেছ। কিন্তু ভাই, তুমি তো জান, অন্ধের পক্ষে নিয়মিত চিঠি লেখান কত মুশ্‌কিল!

ভাই, তোমরা কত সুখী, তোমরা চোখ চেয়ে এই সুন্দর পৃথিবীটা প্রাণভরে দেখতে পাও। দেখা,—হায় এই অসীম নীল আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র, তাদের বিভিন্ন রঙের খেলা চোখে দেখতে পাওয়া কত সৌভাগ্যের কথা! একদিন সত্যসত্যই সেই সৌভাগ্য আমার হয়েছিল; কিন্তু যখন এ পৃথিবীর অপরূপ সৌন্দর্য্য থেকে ভগবান আমায় বঞ্চিত করেন, তখন আমার বয়স বড়জোর আট বছর। সে বয়সে দেখবার শক্তিটাও প্রবল হতে পায় না। এখন আমার বয়স আঠারো। গত সুদীর্ঘ দশ বছর ধরে আমার চারপাশের সব কিছুই গাঢ় জমাট অন্ধকারে আবৃত! প্রকৃতির দেওয়া সৌন্দর্য্য কল্পনার বলে উপভোগ করবার কত ব্যর্থ চেষ্টাই না আমি করেছি! আজ আমি প্রকৃতির সকল বর্ণ, সকল সৌন্দর্য্য—সব ভুলে বসেছি। আজ আমি গোলাপের গন্ধই শুধু শুঁকতে পাই, নেড়ে-চেড়ে তার আকৃতিও অনুমান করতে পারি, কিন্তু প্রাণ-ভোলানো তার সেই অপরূপ সৌন্দর্য্য থেকে চিরদিনকার জন্যে আমি বঞ্চিত হয়েছি। এক-এক সময় এই গাঢ় কৃষ্ণ যবনিকার মধ্যেও আমার ক্ষুধিত প্রাণ সৌন্দর্য্য উপভোগের ব্যর্থ চেষ্টায় গুমরিয়ে ওঠে। ডাক্তাররা বলেন, এটা রক্ত-চলাচলের লক্ষণ, এবং একদিন আমার অন্ধত্ব দূর হতে পারে। হায় রে আশা! যে লোক আজ সুদীর্ঘ দশ বছর ধরে জগতের সমস্ত আলো সমস্ত সৌন্দর্য্য থেকে বঞ্চিত, সে যে আর পরলোকে যাওয়ার আগে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে, এও কি সম্ভব!

সেদিন কেন জানি নে, হাত্‌ড়াতে-হাত্‌ড়াতে আমি একখানা অব্যবহার্য্য আয়না খুঁজে পেলুম। সেই আয়নাখানা সুমুখে রেখে বসে পড়ে, আমার আলু-থালু চুলগুলি সুবিন্যস্ত করতে লেগে গেলুম। আমার তখনকার মনের অবস্থা যে কিরূপ, তা আজ আর তোমায় খুলে বলবার শক্তি আমার নেই। আমার মুখাবয়ব আয়নায় প্রতিফলিত দেখব,—কেমন আমার মুখখানা, চোখ দু'টো, ভ্রূ, সব কিছু দেখবার আমার সে কি উন্মাদ আগ্রহ! তখন সত্যিই আমার মাথা ঠিক ছিল না,—নইলে কেউ কি জেনে শুনে ওরূপ উন্মাদের মত কাজ করতে উদ্যত হয়!

ওঁরা আমায় তোমার চিঠিখানা পড়ে শোনালেন। তুমি জানতে চেয়েচ, আমার বাবার কারবার যে ফেল পড়েছে বলে প্রকাশ তা সত্য কি না। এ সম্বন্ধে আমি তো কিছুই জানি নে। ওঁরা আমায় কিছুই বলেন নি। কারবার ফেল পড়লে আমি বুঝতে পারতুম; কিন্তু আমার

মনে হয়, ওা সত্য নয়। কেন না আমার বিলাস-ব্যসনের এতটুকু কম্‌তি হয় নি। আমার কাপড়, জামা, শাড়ী – সবই দামী। প্রতি দিন নানাপ্রকার উপাদেয় খাদ্য, ফলমূল আমি খেতে পাই। এর থেকেই বুঝতে পারি যে, বাবার আর্থিক অবস্থার এতটুকু বিপর্য্যয় হয় নি।

মধ্যে-মধ্যে আমায় চিঠি লিখো। তোমাদের চিঠি পেলেও তবু আমার এ ব্যর্থ দুর্ব্বহ জীবনে ক্ষণকালের জন্য তৃপ্তি লাভ করে থাকি। আশা করি, এ অন্ধ হতভাগিনীকে তুমি অন্ততঃ ঘৃণা করবে না। ইতি—

দুই

ভাই অনিলা, তোমার চিঠি পেয়ে অত্যন্ত খুশী হয়েছি। আজ তোমায় যে সংবাদ দিতে যাচ্ছি, তা শুনে তুমি নিশ্চয়ই হাস্য সম্বরণ করতে পারবে না। ভাববে, আমি নিশ্চয়ই উন্মাদ হয়ে গেছি। দৃষ্টিশক্তির সঙ্গে-সঙ্গে আমার বিচার-বুদ্ধিও আমি হারিয়েছি। শুনে আশ্চর্য্য হবে নিশ্চয় যে, আমায় একজন ভালবেসেছেন!

হাঁ, সত্যি বলছি ভাই, অন্ধ আমি, আমাকেও আবার ভালবাসতে চায়! এর পর আর কি বলা চলে? প্রেম যে অন্ধ, সে কথাটি আজ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করছি। নইলে আমার ন্যায় রিক্ত নিঃস্ব যে, তাকেও আবার কেউ শুধু ভালবাসতে নয়—বিয়ে করতে চায়।

কি করে যে তিনি বাবার সঙ্গে পরিচিত হলেন জানি নে। এমন কি, তিনি কে, কি করেন,—তাও আমার জানবার সুবিধা হয় নি। তবে সেদিন বাবাতে আর মা'তে আমার বিয়ে নিয়ে কথা হচ্ছিল,—আমি একখানা লাঠিতে ভর করে তখন গুটি-গুটি বারান্দায় এসে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ছিলুম। তাঁরা আমার উপস্থিতি টের পান নি,—অথচ, আমি তাঁদের সব কথাই শুনতে পেয়েছিলুম। বাবা বল্লেন, প্রশান্ত বাবু কালই আমায় পাকা দেখা দেখতে চান। অনেক কথা-কাটাকাটির পর মা রাজী হলেন।

পরদিন তিনি আমায় দেখতে এলেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁর চেহারা কিরূপ—কালো না ফর্সা, বেঁটে কি ঢেঙা,—কিছুই আমার জানবার জো নেই। তিনি বিয়ে সম্বন্ধে আমার মতামত নেওয়া সঙ্গত মনে করে, বিয়ের কথা উত্থাপন করলেন।

আমি তাঁকে বল্লুম, "তা কি করে সম্ভব? অন্ধ আমি, আমায় বিয়ে করে লাভ কি?"

তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লেন, "চক্ষুষ্মান কি অন্ধ—তা নিয়ে আমি কি করব? হও না তুমি অন্ধ, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। তোমার সৌন্দর্য্য—তোমার দেহের গঠন, আকৃতি, তোমার প্রকৃতি—আমায় মুগ্ধ করেছে। এটাই কি আমার তোমায় বিয়ে করবার কারণ হতে পারে না?" তাঁর স্বরে একটা দৃঢ়তা, সরল স্বাভাবিকতা ছিল।

তিনিই আমার অন্ধত্বকে বাদ দিয়ে আমার সৌন্দর্য্য সৌষ্টবের প্রশংসা করলেন। এরূপ প্রশংসায় অপরে কিছু বিশেষত্ব না পাক, আমার ন্যায় অন্ধের কাছে তা শুধু প্রেমিকের প্রেম জ্ঞাপন ছাড়া আরো কিছু বলে মনে হয় না।

আমি আবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলুম, "আমি কি সত্যিই ওরকম প্রশংসার যোগ্য?"

—"নিশ্চয়ই, আমি শপথ করে বলছি।"

—"তবে এখন আমায় কি করতে বলেন?"

—"তুমি আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হও। আমি তোমায় আমার সহধর্ম্মিণীরূপে পেতে চাই।"

এ কথা শুনে আমি অবশ্য হাসব কি কাঁদব ভেবে পাই নি। একটু পরেই তাকে উত্তেজিত স্বরে বল্লুম, "আপনি কি এটা সত্যই মনে করেন যে, এক দৃষ্টিহীনার সঙ্গে এক চক্ষুষ্মানের, অর্থাৎ—দিনের সঙ্গে রাত্রির বিয়ে সম্ভব? আমি কেন আপনার জীবনটাকেও ব্যর্থ করে দেব? না, না, না, তা হতে পারে না। আর আমার বাবার অবস্থা এত খারাপ নয় যে, আমার একার ভার তিনি বইতে পারবেন না। না, তা হতেই পারে না!"

তিনি আর কিছু না বলেই চলে গেলেন। তিনিই আমায় জানালেন, যে, আমি সুন্দরী। কেন না, এ জ্ঞান আমার কোন কালেই ছিল না। আমি তখন এটা ভেবে পাই নি যে, তিনি আমার জীবনে দর্পণের কাজ করচেন। কিন্তু পরে তা অন্তরে-অন্তরে অনুভব করেচি। তাই অজ্ঞাতে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা-ভক্তিটা বেড়ে গেছে।

ইতি—

তিন

ভাই অনিলা, তোমায় আজ কি লিখব? কি অপ্রত্যাশিত দুঃখভার যে আমার জীবনে এসে গেছে, তা আর কি বলব। আমার যে কি হয়েচে, সে কথা লিখতে গিয়ে আমার চির-অন্ধ চোখ দুটি থেকেও জল ঝরে পড়ছে!

সেদিন প্রশান্তবাবুর সঙ্গে আলাপের পর একটা অজ্ঞাত কারণে আমার মনটা কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেল। ভাল কথা, বলতে ভুলে গেছি, প্রশান্ত বাবুই এখন আমার বাইরের জগতের দর্পণ। সে যাই হোক, আমি সেদিন থেকে আর বড়-একটা ঘরের বাহির হই নে। আপনার মন নিয়ে আমার চির-অন্ধকার ঘরের এক কোণে বিছানায় পড়ে থাকি। সেদিনও আমি আমার ঘরে বসে-বসে আপনার অদৃষ্টের কথা ভাবছিলুম,—এমন সময়, আমার ঘরের জানালার দিকে যে পাশের বাড়ী, তারই একটা ঘরে দু'জনায় বসে যে কথাবার্ত্তা হচ্ছিল, তাই আমার কানে এল। বলা বাহুল্য, তাঁদের কথাবার্ত্তা যে কেউ শোনে, এটা অবশ্য তাঁদের ইচ্ছা নয়। তাঁরা ফিসফিস করেই কথা কইছিলেন। তুমি এটা সম্ভবত বেশ জান,—যার একটা ইন্দ্রিয় নেই, তাকে তার সে লোকসান পুষিয়ে দেবার জন্যে সৃষ্টিকর্ত্তা তার অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি একটু অস্বাভাবিক প্রখর করেই তৈরী করে দেন। তাই যারা চোখে দেখতে পায়, তাদের চাইতে, যারা তা না পায়, তাদের শ্রবণ-শক্তিটা অস্বাভাবিক প্রখর হয়েই থাকে।

তারা বলছিল।—"কি আশ্চর্য্য, মেয়েটাকে সুখী করবার জন্য মা-বাপের কি না চেষ্টা! মেয়েটা এখনো বুঝতে পারে নি যে, তার বাপের অবস্থা কত খারাপ! তাঁরা না খেয়েও অন্ধ মেয়ের খাওয়া-দাওয়া, পোষাক-পরিচ্ছদে কত টাকাই না ব্যয় করেন।"

—"এর অর্থ?"

—"এর আবার অর্থ কি? মেয়েটা তার অন্ধত্বের দুঃখের উপর যেন দারিদ্র্যের দুঃখ না বুঝতে পারে, এজন্য পারিবারিক দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা তার কাছ থেকে গোপন রাখা হয়েছে।"

ভাই অনিলা, এখন তুমি অবশ্যই আমার মানসিক দুঃখের কারণ স্পষ্টই বুঝতে পেরেচ। মা, বাবা আমাকে সুখী করবার জন্যে কি ত্যাগই না করছেন! আমি অন্ধ, তাই কত দুঃখ কষ্ট সয়েই না তাঁরা আমার বিলাসিতার সামগ্রী জোগচ্ছেন। সন্তান-স্নেহ কি অসীম! পিতামাতার এ ঋণ কখনো কোন সন্তান পরিশোধ করিতে পারে কি? ইতি—

চার

আমি যে এ গোপন কথা জানতে পেরেছি, তা অবশ্য কাউকেই জানতে দিই নি। কেন না, তা হলে আমাদের দারিদ্র্যের খবর আমার কাছ থেকে লুকোবার আপ্রাণ চেষ্টা তাঁদের ব্যর্থ হবে। ফলে মা, বাবা উভয়েই বিশেষ পীড়িত হবেন। তখনো আমার এ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আমাদের পারিবারিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। কিন্তু এ সংবাদ শুনে আমি মনে-মনে স্থির করলুম, তাঁদের মুক্তি দিতেই হবে যে করেই হোক।

কালও আবার তিনি এসেছিলেন। আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ হল। কথায়-কথায় আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলুম, "এখনো কি আপনার আমায় ভাল লাগে?"

—"নিশ্চয়। আমি আগেই বলেছি যে, তোমার মধ্যে যে স্বর্গীয় সুষমা ও মাধুর্য্য আছে, তাতেই আমি মুগ্ধ; আর সেই কারণেই আমি আমাদের বিবাহ প্রস্তাব উপস্থিত করেছি।"

—"কিন্তু আমার আকার?"

—"সেও তো বলেছি আমায় মোহিত করেছে।"

এ কথা শুনে আমি হেসে উঠলুম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "হাসছ যে?"

—"এটা ভেবে হাসছি যে, আপনি যেন আমার কাছে ঠিক একখানি আয়না। আপনার কথায় আমি আমার আকারটি যেন সত্যসত্যই প্রতিফলিত দেখতে পাই।"

—"আমিও তো চাই চিরদিনের জন্যে তোমার দর্পণ হয়েই থাকতে। সে অধিকার কি পাব?"

—"আপনি তবে সত্যিই—"

—"হাঁ, তোমার দর্পণ হতেই চাই। তোমার পিতামাতার সম্মতি পেয়েছি, এখন তোমার সম্মতি পেলেই হয়। আমার কিছু পৈত্রিক সম্পত্তি আছে। আমাদের কিছুরই অভাব হবে না। আমরা দিব্য সুখে-শান্তিতেই থাকতে

পারব, আশা করি। তোমায় সুখী করতে পারলে আমিও সুখী হব।"

কথাগুলি শুনে ভাবলুম, এঁর প্রস্তাবে সম্মতি দিলেই তো আমার মাতা-পিতাকে দারিদ্র্যের দুর্ভোগ থেকে কতকটা অব্যাহতি দিতে পারি। আমি বল্লুম, "কিন্তু আমাদের এ বিয়ে হলে আপনার যে ভারী লোকসান,—আমি যে অন্ধ!"

—"লাভ-লোকসানের কথা কি বলছ,—আমি যে তোমায় ভালবাসি। তোমায় প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আমি—।"

—"বলুন।"

—"জগতে ব্যর্থতার ভার নিয়েই জন্মেছি। আমার আকারে কোনরূপ মাধুর্য্য নেই, গাড়ি ঘোড়া ঐশ্বর্য্যও নেই। এক কথায় আমি কুৎসিত, তার উপর মধ্যবিত্ত,—অর্থের প্রাচুর্য্য কোনকালেই ছিল না। তার উপর সম্প্রতি আমার বসন্ত হয়েছিল,—তাতে করে সর্ব্ব দেহে বসন্তের দাগ রয়ে গেছে। সুতরাং অন্ধকে বিয়ে করতে আমার অমত হওয়া তো ঠিক নয়ই, পরন্তু তাতে স্বার্থ-ত্যাগও এতটুকু নেই।"

বলা বাহুল্য, এর পর আমি আমার সম্মতি জানালুম।

তিনি বল্লেন, "তুমি আমায় কুৎসিত দরিদ্র জেনেই গ্রহণ করো। তবে আমার ব্যবহার যে কিছুতেই অন্য রূপ হবে না, এ কথা আমি তোমায় জোর করেই বলতে পারি। আমার জীবনটা একটানা মরুভূমি,—তোমার ভালবাসা সে মরুভূমির মধ্যে ওয়েসিসের কাজ করবে।"

তিনি চলে গেলেন। ভাই, বুঝতে পারছি নে যে, বিয়েতে সম্মতি দিয়ে ভাল করলুম কি মন্দ করলুম। সে যাই হোক, মাকে বাবাকে তো নিষ্কৃতি দেওয়া হবে—তাতেই আমার শান্তি। আমার মনে হয়, আমি ঠিক পথেই পা দিয়েছি। আজ আসি। ইতি

পাঁচ

তোমার প্রীতিপূর্ণ চিঠিখানার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি তা'ছাড়া, আমাদের বিয়েতে তোমার আন্তরিক সম্মতি আছে জেনে আরো প্রীত হয়েছি।

হাঁ, ছ'মাস হোল আমাদের বিয়ে হয়েছে। আজ আমার মনে হয়, আমার চাইতে ভাগ্যবতী খুব কমই আছে। আমি সুখেই আছি। কিছুই আমার চাইতে হয় না। কল্পনা থেকেই স্বামী আমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সব দিয়ে থাকেন। আমার মাকে বাবাকেও তিনি তাঁর বাড়ীতে এনে রেখেছেন,—যথেষ্ট শ্রদ্ধাও করেন। আগেই লিখেছি, তাঁর কিছু বিষয় সম্পত্তি আছে,—তার আয় থেকেই আমাদের একপ্রকার বেশ চলে যাচ্ছে। এখন আর আমার অন্ধত্বের জন্য কোন দুঃখ নেই; কেন না, আমি স্বামীর অফুরন্ত ভালবাসা একান্ত করেই পাচ্ছি।

আমাদের বাড়ীতে ছোট একটি বাগান আছে। প্রতি দিন বিকেলে তিনি আমার হাত ধরে আমায় নিয়ে বেড়িয়ে বেড়ান। আমি নানারকম ফুলের গন্ধ পাই। কিন্তু তাদের সে অপরূপ সৌন্দর্য্য চোখে দেখার সৌভাগ্য আমার নেই। তা নাই থাকুক, স্বামী আমায় সমস্ত ফুলের সৌন্দর্য্য এমনি করে বুঝিয়ে দেন, যাতে না দেখার দুঃখ আর আমার থাকে না,—আমার মনশ্চক্ষের সুমুখে তারা স্পষ্ট হয়েই ওঠে। পাখীরা ডাকে আমি কাণ খাড়া করে থাকি,—সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি তাদের পরিচয়, রূপ, গুণ, সব জলের মত বুঝিয়ে দেন। কোন-কোন দিন আমরা থিয়েটারে যাই,—দেখার যা কিছু, তা আমি ওঁর চোখ দিয়েই দেখে থাকি। তাঁর কুরূপে আমার তো কিছুই এসে-যাচ্ছে না। সুন্দরই বা কি কুৎসিতই বা কি, আজ আমার মনে আর তা কোন ভাবই এনে দেয় না। তবে প্রেম ও প্রীতির পরিচয় আমি বেশ ভাল করেই পেয়েছি।

আজ আর না। আশা করি, তোমাদের খবর সব ভাল। পত্র দিয়ো। ইতি—

ছয়

ভাই, অনিলা, শুনে খুশী হবে, আমাদের একটি খুকী হয়েছে। কিন্তু দুঃখ এই, তাকে দেখতে পেলুম না! সকলে বলে, খুকী খুব সুন্দর। সে না কি দেখতে ঠিক আমারই মত; কিন্তু আমি তো তাকে দেখতে পেলুম না। মাতৃস্নেহ কত অসীম, আজ তা বেশ বুঝতে পারছি। আজ বুঝতে পারছি, আমি অন্ধ,—নীলাকাশের অসীম অনন্ত রূপ, ফুলের অপরূপ সৌন্দর্য্য, পিতা-মাতা প্রিয়জন, এমন কি স্বামীর চেহারাও যে দেখতে পাই নে, সে কষ্টও বরং সহ্য করা সম্ভব, কিন্তু—কিন্তু আমার খুকীকে, যে আমার বুকের রক্ত থেকে বেরিয়ে এল, তাকে যে দেখতে পেলুম না, এ কষ্ট, এ বেদনা একেবারে অসহ্য! হায়, যদি এক মুহূর্ত্তের জন্যে আমার দৃষ্টি-শক্তি একবার বিদ্যুৎ-প্রকাশের মত শুধু একবার ফিরে

পেতুম,—যদি সেই একটি মুহূর্ত্তের জন্য একবার খুকীর চাঁদমুখখানা দেখতে পেতুম—তা'হলে সেই ক্ষণিকের তৃপ্তিতে সেইটুকু সুখেই আমি এ ব্যর্থ জীবনটা স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দিতে পারতুম!

এবার আর স্বামী আমার দর্পণের কাজ করতে পারলেন না। খুকীকে আমার মনশ্চক্ষের সুমুখে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হল না। তিনি খুকীর আকৃতি-প্রকৃতি যতই কেন না বর্ণনা করতে চেষ্টা করুন, আমার ক্ষুধিত মাতৃ-হৃদয় তাতে এতটুকু তৃপ্তি পায় না। খুকীর না কি একমাথা কালো মিশমিশে কোঁকড়া কোঁকড়া চুল হয়েছে! কেমন সে পুটপুট করে তার ডাগর কালো-কালো চোখে সকলের দিকে হাসি-মুখে চেয়ে থাকে। এ শুনে আমার তৃপ্তি কোথায়! হায় অদৃষ্ট! হায় অন্ধত্ব! ইতি

সাত

স্বামী আমার দেবতুল্য লোক। আজকাল তিনি কি করছেন জান? তিনি আমাকে না জানিয়ে আমার জন্য কত অর্থব্যয়, কত কষ্টই না সহ্য করেছেন। দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনবার জন্যে কত প্রাণপাত পরিশ্রমই না করছেন। আমার চক্ষু-চিকিৎসার জন্যে তিনি নিজে বিশেষ করে চক্ষুরোগের চিকিৎসা-বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন। ইতিপূর্ব্বেই তিনি স্বয়ং মেডিক্যাল কলেজের শেষ পরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন—এ সব খবর আমি এতদিন জানতে পারি নি!

কাল কথায়-কথায় তিনি আমায় বল্লেন, "আমার কি আশা জান?"

আমি উত্তর করলুম, "কি শুনি!"

—"আমি তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনতে চাই। তোমার মুখের সৌন্দর্য্য বাড়বে বলে যে ঔষধ তোমায় এতদিন ব্যবহার করিয়েছি, তা তোমার অস্ত্রোপচারে কাজে আসবে।"

—"কিসের অস্ত্রোপচার?"

—"তোমার চোখে যে ছানি পড়েছে তা সারাবার জন্যে চোখে অস্ত্রোপচার আবশ্যক হবে।"

—"তুমি অস্ত্র করতে পারবে? তোমার হাত কাঁপবে না?"

—"না, কাঁপবে না। আমি যে মনে-প্রাণে একান্ত করে তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে চাই।"

আমি উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠলুম, "আমার ন্যায় নগণ্য হতভাগিনীর প্রতি তোমার এত করুণা! তিনি আমায় আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে, আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে উঠলেন, "না, না, ও কথা বলো না গো। এ যে আমার স্বামীর কর্ত্তব্য, এ তো আমায় করতেই হয়। আশা করছি, শীঘ্র ভগবানের দয়ায় দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে পাবে।"

—"কিন্তু তার পর—"

আমার কথা শেষ না হতেই তিনি সরল হাসি হেসে বলে উঠলেন, "তার পর আমার কুরূপ দেখতে পাবে।"

কথা কয়টা যেন বন্দুকের গোলার ন্যায় আমার বুকে এসে বিঁধল। ওঁর এ কথাগুলিতে যেন আমার বুকে শত বৃশ্চিক একসঙ্গে এসে দংশন করলে। আমি তাঁকে বল্লুম, "আমার ভালবাসায় যদি তোমার এতটুকু সন্দেহ জন্মে থাকে, তো আমি যেন চিরকাল অন্ধ হয়েই থাকি। তোমার কুরূপ আমার মনে কল্পনায়ও এতটুকু পীড়াও দিতে পারে না। নগণ্য দাসীর প্রতি এত করুণা তোমার!"

তিনি কথা বল্লেন না,—কেবল আমার গালটা একটু জোরে টিপে দিলেন।

মা বলেছেন এক মাসের মধ্যেই আমার চোখে অস্ত্রোপচার হবার সম্ভাবনা আছে।

আমার স্বামীর সম্বন্ধে যাকে জিজ্ঞাসা করি, সে-ই স্বামীর কথায় সায় দেয়। মা বলেন, তিনি কুৎসিত কালো; বাবা বলেন, ওঁর মুখে বসন্তের দাগ আছে, মাথায় টাক; মোক্ষদা ঝিও বলে যে, ওঁর বয়স অনেক।

বসন্তের দাগ—একটা আকস্মিক ব্যাপার, তাতে কারো হাত নেই; মাথায় টাক—জ্ঞানবানের লক্ষণ। এ কথা সেদিন মামা বলছিলেন। কিন্তু যদি সত্য-সত্যই তাঁর বয়স বেশী হয়, তা'হলে দুঃখের বিষয় সন্দেহ নেই। তার পর যদি তিনি আগেই চলে যান, তা'হলে যে তাঁকে ভাল করে ভালবাসবারও সুযোগ পাব না!

সত্য বলতে কি ভাই, তোমার হয় তো মনে আছে, স্কুলে আমরা একটা গল্প পড়েছিলুম। তুমি পড়েছিলে চোখ দিয়ে স্বর দিয়ে, আর আমি মনে প্রাণে। সেই "সৌন্দর্য্য ও পশুর" গল্প। আমার অবস্থাটাও ঠিক সেইরূপ নয় কি? ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো যে, তাঁর দয়ায় যেন শীঘ্রই আমি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাই। ইতি—

শেষ

অনিলা, এ চিঠিটা আগাগোড়া না পড়ে আমার উপর অবিচার করো না। আর জীবনের দুঃখ, সুখ, পরিবর্ত্তন—পর পর বুঝতে চেষ্টা করো, তা'হলেই তা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে।

এক পক্ষ কাল আগে আমার চোখে অস্ত্রোপচার হয়ে গেছে। একখানা কম্পিত হস্ত আমার চোখের উপর রক্ষিত হয়েছিল, তা বুঝতে পেরেছি। আমি দুবার প্রাণপণে চীৎকার করে উঠি; তার পরেই যেন দিনের আলো, তার রং সমস্ত আমার কাছে প্রতিভাত হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ আমার চোখ বেঁধে দেওয়া হল। সেই দিনই আমি সুদীর্ঘ এক যুগ পরে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছি। একটু ধৈর্য্য ও সাহস আবশ্যক হয়েছিল। স্বামী আমার, আমাকে সংসারের সাররত্ন—চক্ষুরত্ন দান করেছেন।

কিন্তু আমি একটা বোকামী করে বসেছিলুম, অবশ্য প্রাণের দায়ে। আমি তাঁর, আমার ডাক্তারের আদেশ অমান্য করেছিলুম! তিনি অবশ্য তা জানেন না। তা'ছাড়া আমার বোকামীতে অবশ্য তেমন ক্ষতিও হয় নি। সেদিন মোক্ষদা ঝি খুকীকে নিয়ে আমায় কাছে এল। খুকু আমার "মা" বলে ডাকতেই, আমি আর চোখের বাঁধন না খুলে পারলুম না।

আমি চীৎকার করে উঠলুম, "খুকুমণি, এই যে আমি, দেখতে পেয়েছি, দেখতে পেয়েছি তোমায়—"মোক্ষদা তাড়াতাড়ি আমার বাঁধন এঁটে দিলে। তা'হলেও তখন আর আমার মনে অন্ধত্বের কোন ব্যথাই রইল না। আমার মনে হল, আমার দৃষ্টির সকল সৌন্দর্য্য যেন আমি ফিরে পেয়েছি। যে মুহূর্ত্তে খুকুর মুখখানা দেখতে পেয়েছি, সেই মুহূর্ত্ত থেকেই আমার জীবনের অন্ধকার কালরাত্রির অবসান হয়েছে।

কাল মা আমায় বেশ করে সাজিয়ে-গুজিয়ে দিলেন; একখানা সুন্দর শাড়ী পরিয়ে দিয়ে বল্লেন, "এবারে তোমার চোখের বাঁধন খুলে ফেলতে পার।"

মায়ের আদেশমত আমি বাঁধন খুলে ফেল্লুম। সে সময় সূর্য্য অস্ত যাচ্ছিলেন,—প্রায় অন্ধকার হয়ে আসছে। একবার চারিদিকে চেয়ে দেখে আমার মনে হোল, এর চাইতে সুন্দর কিছু আমি কখনো দেখি নি। আনন্দের আতিশয্যে মাকে বাবাকে খুকীকে আমার বুকে চেপে ধরলুম। বাবা বল্লেন, "তুমি নিজেকে ছাড়া আর সকলকেই তো দেখতে পেলে।"

—"উনি কোথায়?"

মা বল্লেন, "লুকিয়ে রয়েছেন।" মার কথায় ওঁর কুরূপ, টাক, মুখে বসন্তের দাগ—সব মনে পড়ে গেল।

—"তাঁকে ডেকে দাও। তাঁর চাইতে সুরূপ কি কিছু আছে!"

মা আমায় একটিবার দর্পণে আমার চেহারাখানা দেখতে বল্লেন। অদূরেই একখানা প্রকাণ্ড দর্পণ। আমি সেই দিকে ঝুঁকে পড়লুম; তাতে কতকটা কৌতূহল, আর কতকটা গর্ব্বও যে ছিল না, এমন কথা বলা চলে না। তাঁরা সঙ্গে-সঙ্গে আমার সঙ্গে দর্পণের সুমুখে এসে দাঁড়ালেন। আমি দর্পণের দিকে একবার চেয়েই আনন্দের আতিশয্যে চীৎকার করে উঠলুম। যদিচ আমি কতকটা কৃশকায়ই ছিলুম, কিন্তু আমার গায়ের রঙ্, চোখ, ভ্রূ, গঠন—অনিন্দনীয়। এক কথায়, সত্যি বলতে গেলে, আমি প্রকৃতই সুন্দরী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দর্পণে আমার প্রতিকৃতিটা বেশ আরামের সঙ্গে দেখতে পারি নি,—কেন না, দর্পণখানা ক্রমাগত কেবলি কাঁপছিল। তা দেখে মনে হচ্ছিল যেন, আনন্দে আমার প্রতিকৃতিও দর্পণে নৃত্য করছে।

দর্পণখানা কেন নড়ছে, তা দেখবার জন্য আমি দর্পণের পিছন দিকে চাইতেই, সেখান থেকে একটী অপরিচিত যুবক বার হয়ে এলেন। তিনি যে বেশ সুপুরুষ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; তা'ছাড়া, তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদও বেশ মানানসই ও দামী। আগন্তুককে দেখে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছিল।

ভদ্রলোককে লক্ষ্য না করেই মা আমায় বল্লেন, "দেখ, তোমার আকৃতি কেমন সুন্দর!'

—"মা!—" আমার স্বরে একটা তীব্র ভৎর্সনার সুর বেজে উঠ্ল।

মা সে দিকে মোটেই মন দিলেন না,—আপনার মনে আমার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করতে লাগলেন।

আমি মাকে বল্লুম, "আচ্ছা মা, তোমার কি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান থাকতে নেই? তুমি ভাবছ কি বল দেখি, একজন অপরিচিত ভদ্রলোকের সুমুখে—"

—"অপরিচিত ভদ্রলোক! বলিস কি? এ যে তোর দর্পণ!"

—"আমি দর্পণের কথা বলছি নে, আমি বলছি এই ভদ্রলোকের কথা।"

বাবা রেগে গিয়ে বল্লেন, "দূর হাবা মেয়ে, এ যে প্রশান্ত,—জামাই!"

এঁ্যা!......খানিকক্ষণ আমি আর কিছু বলতে পারলুম না, এক দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। তিনি এত সুন্দর! আমার এত সৌভাগ্য! অন্ধ আমি, বিশ্বাসের উপরই তাঁকে ভালবেসেছি। এই দেবতা, তিনি আমার জন্য সুখশান্তি সকল বিসর্জ্জন দিয়ে, এমন কি পাছে আমি দুঃখ পাই এই ভয়ে আপনার সুরূপকে কুরূপ বলে এতকাল আমার কাছে প্রকাশ করে এসেছেন। আমার অন্ধত্বে সান্ত্বনা দেবার জন্যই না তিনি এ উপায় অবলম্বন করেছিলেন!

মা আঁচলে চোখ মুছে ঘর থেকে চলে গেলেন,—বাবা আগেই চলে গিয়েছিলেন!

স্বামী আমার গদ্‌গদস্বরে বল্লেন, "কি সুন্দর তুমি!" *

* Les Lespe's-এর ফরাসী গল্প অবলম্বনে।

সদুপদেশ!

পিতা। "দেখ্‌ছো তো বাপ্‌ আমার অবস্থা—খবর্দ্দার যেন আর ঐ খবরের কাগজের ভাঁওতায় ভুলে লড়ায়ে বীর হ'তে যেও না!"

পুত্র। "সে কি বাবা! দেশের জন্যে—"

পিতা। (বাধা দিয়া) এই মরেছে! ওরে, ওই বলে আমাকেও ভুলিয়েছিল! এখন বুঝ্‌তে পার্চ্ছি ও-সবই বাজে কথা। কেবল জনকতক লোক দু'পয়সা ক'রে নেবার মতলবে এই সব যুদ্ধ বাধায়। লাভের মধ্যে আমাদের মত বোকা লোকের প্রাণ যায়। নয় ত' হাতটা-পাটা বাদ পড়ে। (Baltimor)

মেয়েদের জাগা

জনৈক বৃদ্ধা—

আমি একজন বৃদ্ধা, অশিক্ষিতা, অন্তঃপুর-মহিলা। আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। চারিদিকে যে স্ত্রীলোকদের জাগার সাড়া পড়েছে শুনতে পাচ্ছি, বিদুষী মাতাদের কাছ থেকে জান্‌তে চাই—তার স্বরূপটা কি? আমি বৃদ্ধা,—আমার চক্ষু-কর্ণের ক্ষমতা কম; আমি অশিক্ষিতা,—বিশুদ্ধ ভাষা আয়ত্ত করবার ক্ষমতাও নাই। মাতাদের নিকট তাই করুণ প্রার্থনা জানাচ্ছি যে, মেয়েদের জাগার বিষয়টা একটু সহজ ভাষায় ব্যক্ত করবেন। অবশ্য আমার এ দেহে, এ প্রাণে আর নতুন করে জাগা হয়ে উঠবে না। তবে পুত্রবধু, কন্যা, নাতনি—এদের জাগার পথে যদি কিঞ্চিৎ সাহায্য করতে পারি, তা'হলে নিজেকে ধন্য মনে কর্ব্বো।

শুনছি না কি মেয়েরা শীঘ্রই জেগে উঠ্‌বেন বা উঠ্‌ছেন বা উঠেছেন। এই জাগাটা কোথায়, কোন্ দিক দিয়ে, কেমন ভাবে হচ্ছে, তা জানবার জন্য ব্যাকুল হয়েছি। যে শহরে আমার বাস, সেখানে ভদ্রঘরের মেয়েরা জুতা পায়ে দেন, স্বচ্ছন্দে বেড়ান, ক্লাবে যান, বিলিয়ার্ড খেলেন। স্ত্রী-পুরুষে ভেদ এখানে সামান্য,—নাই বল্‌লেও হয়। দেখে মনে হচ্ছে, মেয়ে পুরুষ সমান হয়ে যাবে। হোলে ত খুব আনন্দের কথা। এ সব কি জাগার লক্ষণ?

কিন্তু মেয়েদের বালাই যে অনেক। মস্ত সমস্যা,—সন্তান প্রসব—সন্তান-পালন। বছর-বছর পালনে না হোক, সন্তান ধারণ ও প্রসবে যে শক্তি ক্ষয় হচ্ছে ও হবে, মেয়েরা তা স্বীকার করবেন ত? সন্তান প্রসব ও পালনে যদি জীবনের বারো আনা ভাগ কেটে যায়, তা' হলে তাঁদের জেগে ওঠার সময় কখন হবে? তার পর সংসারের কথা। আমার মনে হয়, আজকালকার মেয়েরা স্বামী-পুত্রকে স্বহস্তে রেঁধে খাইয়ে তৃপ্তি পান না। সম্ভবমত যেটুকু যত্ন করতে পারেন, তা করেন না। সংসারে পূর্ব্বেকার মত শান্তি নাই,—স্ত্রী-পুরুষে সে মিল নাই। মেয়েরা সব জাগলে সংসারে শান্তি ফিরে আসবে তো? আমি সেকেলে বৃদ্ধা; উচ্চ শিক্ষা পাই নি—মনের ভাব ঠিক ব্যক্ত করতে পারছি না। অন্যায় কিছু লিখে থাক্‌লে, বিদুষী মাতারা মার্জ্জনা কর্ব্বেন। একটা কথা কিন্তু আমি বুঝেছি। মেয়েদের অর্থ উপার্জ্জন করা বিশেষ আবশ্যক হয়েছে। বিদুষী ভদ্রমহিলারা এই দিকে একটু দৃষ্টি দিয়ে মেয়েদের অর্থ উপার্জ্জনের উপায় উদ্ভাবন করুন। আমি সেই প্রত্যাশায় রইলুম।

ভয়ে-ভয়ে লিখ্‌তে হচ্ছে। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা দেবীর আদর্শ। তাঁরা ক্ষিপ্ত হলে উপায় নাই। ছেলেবেলাকার ব্রতের মন্ত্র মনে পড়লো—'পৃথিবীর মত ভার সই হব, দ্রৌপদীর মত রাঁধুনি হবো'—ইত্যাদি। যখন অসুরের

দৌরাত্ম্য অধিক হয়, তখন দেবী রণচণ্ডী মূর্ত্তি ধরেন। আর দেবাদিদেব মহাদেবকেও জব্দ করতে ছাড়েন না। আবার পৃথিবীর অন্ন হরে নিয়ে অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে যখন অন্ন বিতরণ করেন, তখন মহাদেবকেও তাঁর কাছে হাত পেতে অন্ন ভিক্ষা করতে হয়। দেবীরা কখন যে কোন্ ছলা ধরেন—সাধারণ মানুষের তা বোঝা অসাধ্য। তখন বোধ হয়, সেই রকম একটা যুগ আসছে—যখন স্ত্রীকে পুরুষে ভয় করে চলবে। সব কি উল্টো-পাল্টা হয়ে যাবে? এ অবস্থায় আমার মত নারীর স্থান নাই জানি? তবে যদি ঠিক-ঠিক পথের সন্ধান পাই,—ত বৌ-ঝিদের সেই পথে চালাবার চেষ্টা কর্ব্বো। আমি মা মূল কথা জানতে চাই—মেয়েরা কি করে, কি ভাবে জাগবে। সোজা কথায় এর জবাবের আশা করি,—ভাবের ঘোরাল আলোকে, আর ভাষার চক্‌মকিতে আমার ধাঁধাঁ লাগিয়ে দিও না।

হিন্দু নারীর কর্ত্তব্য

শ্রীপদ্মাবতী দেবী চৌধুরাণী

সেবার যখন "সবুজ পত্রে" কবি-সম্রাট শ্রীযুক্ত ডাক্তার স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় জনৈকা মহিলা-লিখিত একখানি পত্রের উত্তরে নারীজাতির শিক্ষা ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, তখন বড় আশা করিয়াছিলাম, তিনি আমাদের বর্ত্তমান জীবন-যাত্রার পথ-নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত এত আড়ষ্ট ও ভাসা-ভাসা যে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না; অথবা আমাদের মত গোঁড়া হিন্দু-ঘরের মেয়ের পক্ষে তাহা বোঝা অসম্ভব। বর্ত্তমানে সকলেই নারী-শিক্ষার কথা বলেন; নারীর কর্ত্তব্য কি-কি হওয়া উচিত, তাহার আলোচনা করেন; অথচ, আমাদের মত "কাদার পুতুলকে" কি ভাবে গড়িয়া তুলিলে, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে, তাহা কেহ ভাবিয়া ঠিক করিতে পারেন না, অথবা কষ্ট স্বীকার করিয়া বলেন না।

কয়েকজন বিদুষী ভগিনীকে দেখিতেছি,—তাঁহারা "আলো" "আলো," নারীর অধিকার, শিক্ষা, শিক্ষা করিয়া চেঁচাইতেছেন। কেহ তাঁহাদের কথা কাণ পাতিয়া শুনে, কেহ বা শুনেও না। আমার মনে হয়, আমাদের ধর্ম্মশিক্ষা না হইলে, কোনো শিক্ষাই হইবে না,—সব শিক্ষা পণ্ড হইবে। এম-এ, বি-এ পাশকরা শিক্ষিতা মহিলা দেশে অনেক আছেন; কিন্তু সীতা-সাবিত্রীর মত নারী দেশে কয়জন বর্ত্তমানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? এই শিক্ষায় বিদেশীভাবাপন্ন হওয়া ছাড়া আর আমি ত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।

সমাজের গৃহ পল্লী,—সহর নহে। পল্লীগ্রামের কুঁড়েঘরের গৃহস্থের মেয়ে বেথুন কলেজে পড়িয়া এখন আর কুঁড়েঘরে থাকিতে, ঘর নিকাইতে, বাসন মাজিতে, পাক করিতে রাজি নহে। সাড়ী—সেমিজ—ব্রুচ—সেফটিপিন না হইলে তাহাদের চলে না। হারমনিয়ম্—পিয়ানো—অর্গ্যান ধার করিয়া, সর্ব্বস্ব খোয়াইয়াও কিনিতে হয়;—অথচ সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সব মেয়ের ঊর্দ্ধতন চৌদ্দপুরুষের মধ্যে কোনো মেয়ে উল্লিখিত কোনো জিনিষের ধার ধারিতেন না,—ব্যবহার করা ত দূরের কথা! কেহ যেন মনে না করেন যে আমি পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরোধী। আমি চাই, নারী-জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব মাতৃত্ব,—তাহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ লজ্জাশীলতা, বিনয়নম্রতা ও অন্যান্য সমস্ত গুণ বজায় রাখিয়া, কি প্রকারে এই ভাগ্যহত দেশে পুনরায় সতী, সাধ্বী, পতিব্রতা সীতা—সাবিত্রী—বেহুলার সৃষ্টি করা যায়। আমাদের ইবসেন্—ব্রাউনিং পড়িলে চলিবে না,—আমাদের পড়িতে হইবে মনুসংহিতা, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, তুলসীদাসী রামায়ণ, ভক্তমালগ্রন্থ। আমাদের বিনামা-গাউন, ব্রুচ-রিষ্টওয়াচ পরিলে চলিবে না; আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে শাঁখা-সিন্দুরের দিকে। স্বাধীনতা, স্বাধীনতা করিয়া চেঁচাইতেছি,—নারীর অধিকার

বাড়াও বলিতেছি,—ভালো কথা। জিজ্ঞাসা করি, আমাদের হিন্দু পরিবারে নারীর কি স্বাধীনতা মোটেই নাই? আমার মনে হয়, হিন্দু পরিবারের নারীর যে কর্ত্তব্য আছে বা পূর্ব্বে ছিল, তাহা অন্য কোনো দেশে কোনো পরিবারে আছে কি না সন্দেহ। হিন্দু পত্নীর আদর্শ ছিল না কি "স্নেহেষু মাতা, ধর্ম্মেষু পত্নী, ক্ষময়া ধরিত্রী" ইত্যাদি। আর এখন আমরা "শিক্ষিতা" হইয়া আকাশ-কুসুম ধরিতে যাইতেছি; আর সঙ্গে-সঙ্গে দেশের কতকগুলি লোক নারীজাতিকে অধঃপাতের দিকে লইয়া যাইতেছে। আমাদের জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট্-উকীল হইলেই জীবনের সার্থকতা হইবে না; আমাদের হইতে হইবে সতী, সাধ্বী গৃহিনী,—যাঁহারা আর্ত্তের সেবা করিতে জানেন, যাঁহারা অতিথি-সৎকার করিতে জানেন, আর যাঁহারা শ্মশান সংসারকে সোণার সংসার করিতে জানেন। আজকাল আমরা ধর্ম্মশিক্ষা পাই কই? শিক্ষা পাইতেছি—কি করিয়া পিতামাতার অর্থ-শোষণ করিয়া বিলাসিতা চরিতার্থ করিব। কয়জন এম-এ, বি-এ ছাপমারা মেয়েরা সন্তান-পালন, আত্মীয়-স্বজনের সেবা, গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম কি করিয়া করিতে হয় জানেন? আমাদের অর্গ্যান বাজাইলে চলিবে না। আমরা যদি "পাঁচ জনের পাতে পাঁচ পদ রাঁধিয়া" খাওয়াইতে পারি, তাহাতে আমাদের কাজ হইবে। আমরা ভারতের নারী, ভারতের নারীই থাকিব;—বিলাতী নকলনবীশ হইতে চাই না। শিব পূজা—পতি-সেবাই আমাদের ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম পালন করিয়া যদি আমরা অবসর মত সাহিত্য, কাব্য, দেশের রাজনীতির আলোচনা করিতে পারি, তাহা হইলে আরো উত্তম। সূচীর কায, গৃহস্থালীর কায, চরকাকাটা, উলবোনা ও অন্যান্য গৃহশিল্পের কাযে মনোনিবেশ করিলে দেশের স্থায়ী উন্নতি সাধিত হইবে।

জানি এমন সঙ্কীর্ণমনা অনেক লোক দেশে আছেন, যাঁহারা, আমাদের শিক্ষা ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কথা উঠিলেই, যেন তেন প্রকারেন একটা ব্যবস্থা করিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন;—তাতে আমরা "জাহান্নমেই যাই আর স্বর্গেই যাই, তাঁহাদের কিছু আসে যায় না। স্বর্গীয় ভূদেব বা গুরুদাসের মত তেজস্বী সমাজসংস্কারক দেশে কই? আমি প্রত্যেক ভাই-ভগিনীকে "পারিবারিক প্রবন্ধ" পড়িতে বলি। যখনই কোনো বিষয়ের পরামর্শ না মীমাংসার আবশ্যক হইবে,—ঐ বহিখানি পড়িয়া দেখিলেই সব গোল মিটিয়া যাইবে। প্রবীণ সাহিত্যরথী রায় জলধর সেন বাহাদুর সত্যই বলিয়াছেন:—"সুদূর অতীতে এক ভূদেব ছিলেন, আর বর্ত্তমানে ছিলেন গুরুদাস,—বাঙ্গলা ইহাঁদের আদর্শের অনুকরণ করিলে আর কোনো ভাবনার আবশ্যকতা নাই।"

আমি একজন নগণ্য লেখিকা। আমাদের ভালো যাহাতে হয়, তাহার জন্যে দু'চারি কথা ভাই-ভগিনীগণের নিকট নিবেদন করিলাম। আমাদের দেশের শিরোভূষণ যাঁহারা, তাঁহাদের এখন ভাবিবার বিষয়।—চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না; কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হইবে,—এই দাবী অবশ্যই আমরা করিতে পারি।

মালাবার-স্মৃতি

কবিশেখর শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ

ত্রয়োবিংশ বর্ষ গত শ্যাম মালাবার!
পশিনু পথিকবেশে ও কুঞ্জ-ভবনে
পথের দু'ধারে কিবা মণ্ডপ ছায়ার,
বিচিত্র বিতান সৃষ্ট নারিকেল বনে!
সেই পত্র-ছায়া ক্ষুদ্র পান্থ-নিকেতন,
অতিথে প্রদানে কত আতিথ্য মধুর;
শুভ্র অন্ন,—নারিকেল তৈলের ব্যঞ্জন,
ভোজনে উপজে প্রাণে উল্লাস প্রচুর!
সেই কেতকীর ঝাড়—নায়ার কুটীর,
লবঙ্গ-লতার হাসি—গুবাকের বন;
চন্দন এলার বাস কি মৃদু-মদির,
নায়ার রমণী-রূপ মাধুর্য্যে শোভন!
সে কতকালের কথা তবু কি অতুল!
নিবিড় স্মৃতির বনে স্নিগ্ধ বনফুল!

আল্‌প্‌স-পাহাড়

অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম-এ

(১৫)

আল্পসের একাধিক "তাল" দেখা হইল। কথনো রেলে, কথনো হাঁটিয়া। তাল শব্দে জার্ম্মাণরা নদী বা ঝোরার দুই-ধারকার পাহাড়ী উপত্যকা বা সমতল-ভূমি বুঝিয়া থাকে। ভীমতাল, নৈনিতাল ইত্যাদি শব্দের "তাল"—অংশে আমরা বুঝি হ্রদ বা সাগর। কিন্তু সাধারণ হিসাবে আল্পসের তালগুলাকে হিমালয়ের তালই বিবেচনা করিতেছি।

পোষ্ট-মাষ্টারের পত্নী চব্বিশ-ঘণ্টাই খাটিতেছেন। ছোট-ছোট দুই কন্যা ও এক শিশু পুত্রের জননী-রূপে ইঁহাকে গৃহস্থালী চালাইতে হয়। দিনের অর্দ্ধেক অংশ স্বামীর সঙ্গে ইনি ডাকঘরে কেরাণীর কাজ করেন। জার্ম্মাণ সমাজে শিক্ষিতা মহিলারা যেরূপ শারীরিক পরিশ্রম করেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বার্লিনের বহু ভদ্র-ঘরের পরিবারেও এইরূপ লক্ষ্য করিয়াছি।

আঙিনা, মেজে পরিষ্কার করা, রান্নাবাড়ী সমস্ত সামলানো, কাপড় কাচা, বাগানের কাজ করা, তাহার উপর তিন শিশুর তদবির করা,—সবই এক ঘাড়ে বহিতে হইতেছে। পোষাক শেলাই ও মেরামত ত আছেই। তাহার উপর শীতকালের জন্য নানা-প্রকার শাক-সব্জী, ফল-মূল কাঁচের গ্লাসের ভিতর তাজা ভাবে পুঁজি করিয়া রাখা এক মস্ত মেহানৎ।

এই মহিলাই আবার লেখা-পড়ায় গ্রাজুয়েট, নাচে-গানে ওস্তাদ। উচ্চ শিক্ষায় স্ত্রীজাতির পরকাল ঝর-ঝরে হয় না দেখিতেছি! সংসার চালাইবার জন্য বিলাস বর্জ্জন করা, উচ্চ শিক্ষারই এক অঙ্গ বিবেচিত হইতেছে। অথচ বয়সে ইনি নেহাৎ মুরুব্বিও নন। ভারতবর্ষের মেয়েরা স্কুল-কলেজের বিদ্যাকে গৃহস্থালীর শত্রু বিবেচনা করেন কি?

(১৬)

দক্ষিণ টিরোল হইতে খবর আসিয়াছে,—দলে-দলে ইটালীয় ফাসিষ্টেরা বোৎসেন নগরে আসিয়া জুলুম করিতেছে। প্রায় দশ হাজার ফাসিষ্ট সেখানে মোতায়েন। ফাসিষ্টরা মুখোসে মাথা ঢাকিয়া বেড়ায়। গায়ে কালো কুর্ত্তা। কুর্ত্তার উপর মড়ার মাথার নিশানা আঁকা। কোমরে ছোরা। ফাসিষ্টরা ইটালীর সনাতন গুপ্ত-সমিতির সকল ধরণ ধারণ, আদব-কায়দা, আদর্শ ও লক্ষ্য বজায় রাখিয়া চলিতেছে। ইহারা স্বদেশবৎসল, "মাতৃভক্ত", মৃত্যুবরণকারী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ডাকাইত-বিশেষ।

"স্বদেশী" আন্দোলনের পাকা কারিগররূপ ইতালীয়ানরা এই সকল ডাকাইত বীরগণের তারিফ করিতেছে। কিন্তু বিদেশী লোকজনের নজরে ইহারা নৃশংস, অত্যাচারী বর্ব্বর ছাড়া আর কিছুই নয়। কালোকুর্ত্তা-পরা ফাসিষ্টরা বোৎসেনের জার্ম্মাণ পরিবারের ভিতর প্রবেশ করে। বাড়ীওয়ালা অথবা বাড়ীওয়ালীকে ছোরার ভয় দেখাইয়া ঘরের খাদ্য-দ্রব্য ছিনিয়া লয়। স্কুল-পাঠশালা হইতে ইহারা ছাত্র-ছাত্রীদিগকে খেদাইয়া দিয়া, সেখানে নিজেদের বস-বাসের আড্ডা গাড়ে।

ইতালীর গবর্মেণ্ট এই ন্যাশন্যালিষ্ট ভলাণ্টিয়ারদের উপদ্রব রুখিবার কোনো চেষ্টা করিতেছেন না। বরং শুনা যাইতেছে, ফাসিষ্টরা গবর্মেণ্টের নিকট হইতে জনপ্রতি দৈনিক ত্রিশ লিয়ার আদায় করিতেছে। ত্রিশ লিয়ার আজ-কালকার বিনিময়ের বাজারে প্রায় পাঁচ টাকা। দেখিতেছি, গবর্মেণ্ট স্বয়ংই ভলাণ্টিয়ারদের ভয়ে জড়সড়। অথবা ফাসিষ্টদিগকে ইতালীর গুপ্ত সেনাবিভাগ বলিব কি?

দক্ষিণ টিরোল আজকাল ইতালীর অধীনস্থ এক প্রদেশ মাত্র। ইতালীর গবর্মেণ্ট এই অঞ্চলে জোরজবরদস্তি করিয়া ইতালীয় ভাষা বসাইতেছে। জার্ম্মাণ তুলিয়া দেওয়া হইতেছে। মাতৃভাষা উপিয়া ফেলিবার প্রয়াস ইয়োরোপে যেখানে সেখানে যখন-তখন দেখা গিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে কথনো বোধ হয় জুলুম জিনিষটা এই আকারে প্রকটিত হয় নাই।

ইতালী হুকুম করিয়াছেন, হোটেলগুলার বিজ্ঞাপনে "আলবের্গো" শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। "হোটেল" শব্দটা বিদেশী, জার্ম্মাণ! বিদ্যাপিঠে-বিদ্যাপিঠে ইতালীয় রাজভক্তির সঙ্গীত মুখস্থ করানো হইতেছে। ফাসিষ্ট মহাশয়রা মাঝে-মাঝে পাঠশালায় উপস্থিত হইয়া, শিশুদিগকে জিজ্ঞাসা করে;—"তুমি ইতালীর জাতীয় গীত গাহিতে পার?" এক শিশু জবাব দিয়াছিল:—"আজ্ঞে না।" তৎক্ষণাৎ ফাসিষ্টের চপেটাঘাতে শিশুর দাঁত ভাঙিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল।

একজন বিচক্ষণ জার্ম্মাণ শিক্ষয়িত্রীকে বিনা বাক্যব্যয়ে ডিসমিস করা হইয়াছে। তাঁহার দোষ,—তিনি জার্ম্মাণ বালক-বালিকাদিগকে ইতালীর ইতিহাস ও সাহিত্য শিখাইতে নারাজ ছিলেন।

(১৭)

ইন্‌তাল, এ্যট্‌স্‌-তাল, নিজানাতাল ইত্যাদি ছাড়াইয়া রোজানাতালে পৌঁছিয়াছি। আসিয়াছি আর্লবার্গ পাহাড়ের পায়ে। এইখানে অষ্ট্রিয়ান আল্পসের উচ্চতম রেল-ষ্টেসন। পল্লীর নাম স্যাঙ্ক্‌ট্‌ আণ্টন। বিলাতী সেইণ্ট আর ফরাসী সাঁ মহাপ্রভুরা জার্ম্মাণদের স্যাঙ্ক্‌ট্‌। আণ্টন, অণ্টনি বা আণ্টনিও ঋষি খৃষ্টান শিশুদের "মা মঙ্গলচণ্ডী"। ছেলেপিলেদের অসুখ-বিসুখ হইলে, ক্যাথলিক নারীরা এই ঋষির শরণাপন্ন হয়। ঋষি মহোদয় মা মেরীর নিকট আর্জ্জিটা পেশ করিয়া জননীর মুখ রক্ষা করেন। শুনা যায়, অনেক সময়ে না কি স্যাঙ্ক্‌ট্‌ আণ্টনির কাছ মানত করিয়া খৃষ্টানরা সুফললাভও করিয়াছেন। খৃষ্টানদের আণ্টন জাপানী বৌদ্ধ দর জিজোদেব। পল্লীটা বার হাজার ফিটের চেয়ে কিছু বেশী উঁচু,—বাংলার কার্সিয়াঙের সমান।

স্যাঙ্ক্‌ট্‌ আণ্টন যে উপত্যকায় অবস্থিত, সেটা অন্যান্য উপত্যকার চেয়ে প্রশস্ত। চারিধার হইতে পাহাড়গুলা শির খাড়া করিয়া পল্লী পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। এক প্রকার নয়া পাইন কয়েকদিন ধরিয়া দেখিয়া আসিতেছি। জার্ম্মাণে বলে "ল্যার্খেন"। ইহার পাতাগুলা শরতে লিণ্ডনের মতন লাল, গোলাপী বা সোণালী রংয়ে রঞ্জিত হয়। শীতকালেও পাতাগুলা গাছেই থাকে। কিন্তু লিণ্ডেন, মেপ্‌ল্‌, কার্ষ্টানিয়েন ইত্যাদির পাতা লাল হইয়া শীতের প্রারম্ভেই ঝরিয়া পড়ে।

সবুজ পাইনের আবেষ্টনে লাল পাইন অপরূপ সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে। ভারতে সাধারণতঃ চির-সবুজ পাইনই নজরে পড়িয়াছে। হয় ত কোথাও কোথাও বা ল্যার্খেনও দেখা যায়। বসন্তে ও গ্রীষ্মে লাল পাইন আবার সবুজ হয়।
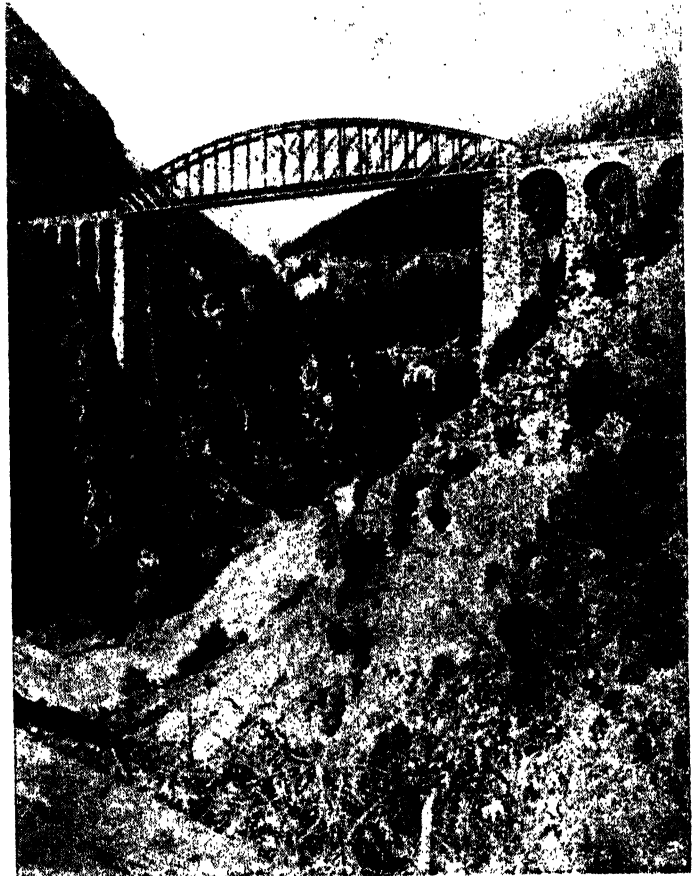
ত্রিজানা পুল

টিরোলীদের এক প্রকার খাস পাহাড়ী সুর আছে। তাহার নাম "য়োড্‌ল্‌"। অন্যান্য সাধারণ সুরের ফাঁকে-ফাঁকে য়োড্‌ল্‌ ব্যবহৃত হয়। শুনায় বিচিত্র, মন্দ নয়। যেন কোনো আওয়াজ এক পাহাড়ের ধাক্কা খাইয়া অপর এক পাহাড়ে গিয়া ঠেকিতেছে। ধ্বনিটা আবার সেই পাহাড়ে পথ না পাইয়া তৃতীয় কোনো পাহাড়ের আশ্রয় মাগিতেছে। আবার সেইখানেও হতাশ হইয়া দিশেহারা-ভাবে পাহাড়ের গায়ে-গায়ে অথবা গলি ঘোঁচে পথ ঢুঁড়িতে ঢুঁড়িতে চুপ মারিতেছে। প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি পার্ব্বত্য উপত্যকায় লহর তুলিতেছে, এই দৃশ্য কাণে দেখিতে পারিলে য়োডল শুনা যাইবে।

স্যাঙ্কট্‌ আণ্টনের ঘাঁটী

(১৮)
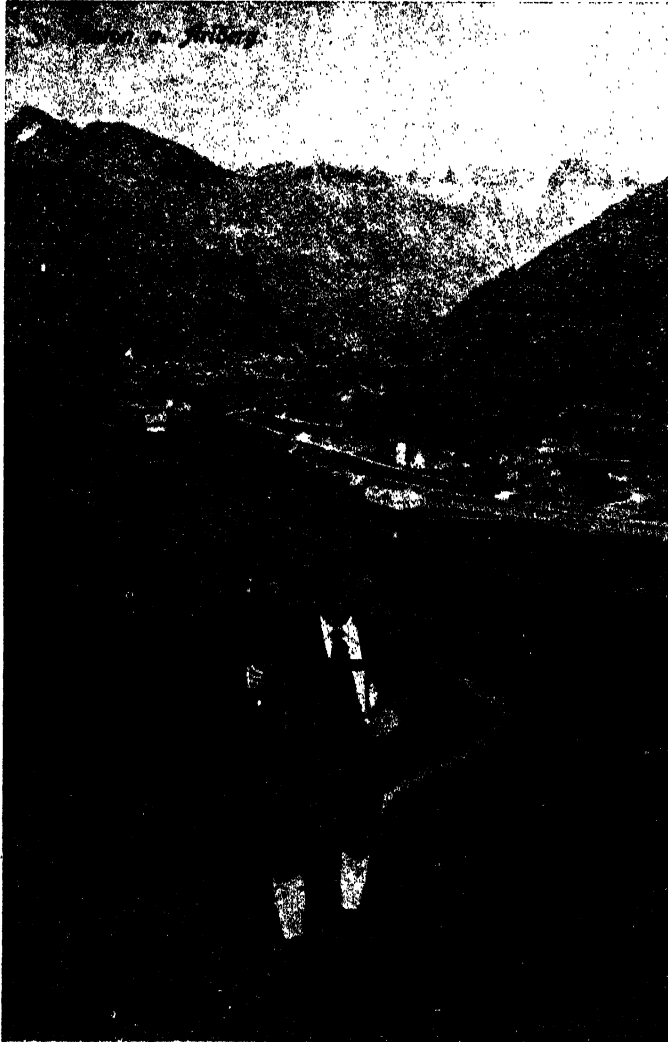
স্যাঙ্কট্‌ আণ্টন ষ্টেশনে এক লম্বা পাহাড়ী সুড়ঙ্গ সুরু হইয়াছে। টানেলটা রেলে ফুঁড়িয়া বাহির হইতে লাগে ষোল মিনিট। গোটা আর্লবার্গ পাহাড় ভেদ করিয়া যাইতে হয়। জীমেন শুকার্ট কোম্পানীর এক অষ্ট্রিয়ান ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে এইখানে দেখা হইল। ইনি তড়িতের রেলপথ নির্ম্মাণে বাহাল আছেন। ইঞ্জিনিয়ার মহাশয় বলিতেছেন :—"কয়লার ধোঁয়ায় মজুরদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়া আসিতেছে। শীঘ্রই ইহাদের দুঃখ ঘুচিবে। অষ্ট্রিয়ায় আজকাল কয়লার অভাব। রেল-কোম্পানী বাধ্য হইয়া সমস্ত পথেই তড়িতের ইঞ্জিন ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা করিতেছে। বিদ্যুতের গাড়ী বৎসর দু-একের ভিতরই আল্‌সের সর্ব্বত্র চলিতে থাকিবে।"

বাষ্পে আর তড়িতে হাজার তফাৎ আছে। তাহার ভিতর জনগণের স্বাস্থ্যের তরফ একটা মস্ত বিষয়। বাষ্প আনিয়াছিল শিল্প-বিপ্লব, নয়া ধনি-সমাজ, পল্লী-নগরের বিচিত্র সমাবেশ, অভিনব জাতিভেদ,—এক কথায়, "বর্ত্তমান জগৎ" এবং তাহার উপযোগী ধর্ম্ম ও দর্শন। বিদ্যুতে আনিবে আর এক বিপ্লব,—কিন্তু কোন্‌ আকারের বিপ্লব? কিরূপ নয়া জগৎ? তাহা "ফিউচারিষ্ট" বা ভবিষ্যপন্থী সমাজ-বিপ্লবী আদর্শবাদীদের ভাবুকতায় একটু-আধটু কল্পনা করা হয় ত সম্ভব।

তবে এশিয়ার ভাবুকদের এখন হইতেই সমঝিয়া রাখা আবশ্যক যে, সেই ভবিষ্য জগৎ ত আসিতেছে তথাকথিত ভোগপরায়ণ, আধ্যাত্মিকতাহীন, মেটিরিয়্যালিষ্ট, জড়বাদী পশ্চিমাদেরই সাধনার ফলে। ইয়েরামেরিকান জীবনের ক্রমবিকাশে এক নয়া স্তর, এক নয়া আদর্শ প্রকটিত হইতে চলিয়াছে,—নানা রূপে, নানা ভঙ্গীতে। তাহাতে এশিয়ার বাহাদুরি লইবার কিছুই নাই। সমসাময়িক জগতের বিপ্লব-মণ্ডলে একটা তথাকথিত "প্রাচ্যামী" আবিষ্কার করিতে বসিলে নিজেকে ঠকানো হইবে মাত্র। দুনিয়া চলিতেছে

একমাত্র পশ্চিম আধ্যাত্মিকতার জোরে। এই আধ্যাত্মিকতাকে হাজার উপায়ে দখল করিয়া তাহার নয়া-নয়া হাজার রূপ খুলিয়া দিতে পারিলেই যুবক এশিয়া জগতে টিকিতে পারিবে। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

(১৯)

এক বুড়ীর ঘরে অতিথি হইয়াছি। বৃদ্ধার বয়স ষাট্ বৎসর। ইনি একজন নামজাদা শিক্ষয়িত্রী। পুরানা বাদশাহী আমলে ইনি টিরোলের শিক্ষাবিভাগে অত্যুচ্চ সরকারী সম্মান পাইয়াছিলেন। রিপাব্লিকের আমলে পেন্সন ভোগ করিতেছেন। টিরোলের জনসাধারণ ইঁহাকে 'মাসী' বলিয়া ডাকে। ইনি চির-কুমারী। বলেন:—"আমার বিবাহ হইয়াছে ভগবানের সঙ্গে।"

বুড়ীর আসল নাম প্রায় কেহই জানে না। নিষ্কর্ম্মা ভাবে পেন্সন ভোগ করিতে ইনি অনিচ্ছুক। এই জন্য ঘরে একটা বে-সরকারী বিদ্যাপীঠ খুলিয়াছেন। স্যাঙ্কট্ আণ্টনের রেল-মজুরেরা তাহাদের পুত্র-কন্যাদের প্রাথমিক শিক্ষার ভার "মাসীর' হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত আছে।

শিশুদের নিকট কয়েকবার "ইন্‌স্‌পেক্টর" রূপে দেখা দিলাম। প্রায় পঞ্চাশজন শিশুর জন্য কিণ্ডারগার্টেন চলিতেছে। পাঠশালার এক ঘরেই আমার ঠাঁই।

আর্লবার্গ পাহাড়ের পিঠের উপর দিয়া হাঁটিতেছি। সোজা বাঁধানো শড়ক আছে। বিশেষ কোনো অভিযানের সমস্যায় পড়িতে হইতেছে না। যতদূর নজর যায়, দেখিতেছি কেবল পর্ব্বতের লহর। পাহাড়ের বুকে ও ঘাড়ে সবুজ ও সোণালী পাইনের বন। শিরে তুষারের মুকুটমালা।

টিরোলী আল্প্‌সের সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করিতেছি, মাঝে-মাঝে একচালা কেঠো ঘর। এই সকল কুঁড়ে ঘরে পর্য্যটকেরা বেড়াইতে আসিয়া রান্নাবাড়া করে। পাহাড়ের এদিক-ওদিক হইতে কাঠ কুড়াইয়া আনিতে হয়। গ্রীষ্মকালে এই ধরণের কুঁড়েতে বহু লোকই কয়েক ঘণ্টা কাটাইয়া যায়।

একদল পর্য্যটক কুঁড়ের কাঠগুলা ব্যবহার করিবার পর পাহাড়ের এপাশ-ওপাশ হইতে নয়া কাঠ কুড়াইয়া ঘরের ভিতর মজুদ করিয়া রাখে। পরবর্ত্তী মোসাফিরেরা এইরূপে বিনা কষ্টে শুক্‌না কাঠ পাইতে পারে। এই সমবায় পাহাড়ী পঞ্চায়তের রেওয়াজ। খাওয়া-দাওয়ার জিনিস ঘাড়ে বোঁচকা বাঁধিয়া আনা আল্প্‌স্-পর্য্যটকদের দস্তুর।

"আল্পেন-ফারাইন" বা পাহাড় পর্য্যটক-ক্লাব অথবা পর্ব্বত-সৌন্দর্য্যবিধায়িনী সমিতি এই সব কুটীর নির্ম্মাণ ও তদ্‌বির করেন। পর্য্যটকেরা কখনো বেশীক্ষণ কুঁড়েতে কাটায় না। সকলেই যার যার প্রিয় শিখরে উঠিবার জন্য ব্যগ্র। কখনো-কখনো সূর্য্যোদয় দেখিবার জন্য রাত কাটানো হইয়া থাকে।

(২০)

স্যাঙ্কট্ আণ্টন পল্লী টুরিষ্টদের সুপরিচিত। বড়-বড় হোটেল আছে। ইয়োরামেরিকার সকল দেশ হইতে পর্য্যটকের আমদানি হয়। অন্ততঃ হাজার বিদেশী ঠাঁই পাইতে পারে। শীতকালেই টুরিষ্টদের ভিড় বেশী। তখন গোটা জনপদ বরফে সাদা হইয়া যায়। পাহাড়ের মাথায় তখন শ্লেজ গাড়ীতে বসিয়া নীচে গড়াইয়া নামা এক প্রধান আমোদ। এই খেলাটা বিপদজনকও বটে। প্রতি বৎসরই দু-একজনের প্রাণনাশ ঘটিয়া থাকে।

আর্লবার্গ পাহাড়ের উপর দিয়া ঘণ্টা-দেড়েক হাঁটিয়া এক "পাস" পাইলাম। এই সঙ্কীর্ণ পথ প্রায় ছয় হাজার ফিট উঁচু। কন্‌কনে, ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছে,—বরফের উপর দিয়া মশ্‌মশ্ করিয়া কচকচাইয়া হাঁটিতেছি। এক পুরানা মন্দিরে আসিয়া হাজির হইলাম। জনপদের নাম স্যাঙ্ক্ট ক্রিষ্টোফ্।

মন্দিরে ক্রিষ্টোফ ঋষির সমাধি আছে। মন্দিরটার ভিতরে দেখিলাম, মহাপ্রভুর মূর্ত্তির হাতে লাঠি। ভাবার্থ:—মোসাফিরেরা লাঠি হাতে দেশভ্রমণে বাহির হইয়া থাকে। লাঠি পর্য্যটনের চিহ্ন। ক্রিষ্টোফ পর্য্যটকদের দেবতা ও রক্ষাকর্ত্তা। আপদ-বিপদের সময়ে মোসাফিররা "দোহাই ক্রিষ্টোফ অবতার!" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিলে, ইনি শরণাগতের জন্য ভগবানের নিকট সুপারিশ পাঠাইয়া থাকেন। বঙ্গোপসাগরে চীনা মোসাফির ফাহিয়ানের আর্ত্তনাদ মা-কাআন্নিন শুনিয়াছিলেন।

মান্ধাতার আমলে অর্থাৎ রেলগাড়ীর যুগের পূর্ব্বে এই পার্ব্বত্য গলিতে যে সকল ব্যাপারী সওদা লইয়া চলাফেরা করিত, তাহাদের অনেক সময়ে বরফের চাপে মারা পড়িবার

স্যাঙ্ক্ট ক্রিষ্টোফ্—টিরোল

আশঙ্কা ছিল। মুনি-ঋষি বা সাধু-সন্ন্যাসীরা এইরূপ পথিকদের জন্য একটা আশ্রয়ের ডেরা অথবা সেবাশ্রম কায়েম করিয়াছিলেন। এই ধরণের আশ্রয়স্থলকে জার্ম্মাণে বলে "হস্‌পিট্‌স্"। স্যাঙ্ক্ট ক্রিষ্টোফ হস্‌পিটস্ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে প্রথম গড়া হয়।

"বর্‌ফানে"র সাধুরা বাঘা কুকুর পুষিতেন। কুকুরের গলায় গরম দুধ, রুটি, মদ, মাংস ইত্যাদি বাঁধিয়া পার্ব্বত্য পথে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। কুকুরেরা বরফে ঢাকা-পড়া আধমরা পথিকদিগকে ঢুঁড়িয়া বাহির করিত। এই ধরণের কাহিনী সুইস্ বর্‌ফানের সেইণ্ট বার্ণার্ড হস্‌পিটস্ সম্বন্ধেও শুনা যায়। "শান্তমিদমাশ্রমপদম্" দেখিতেছি ভারতাত্মারই একচেটিয়া নয়!

হস্‌পিট্‌সে একটা সরাই আছে। প্রায় ত্রিশজন অতিথি একসঙ্গে বসবাস করিতে পারে। চারিদিক বরফ পড়ায় অন্ধকার দেখিতেছি। ঘরের পাথরের দেওয়ালের ভিতর দ্বিতীয় এক কাঠের দেওয়াল। নেহাৎ নিরিবিলি। নিকটে কোনো পল্লী নাই। "পাসে" বাহির হইয়া দেখি, তুষার-বালুর মরু তৈয়ারি হইয়া রহিয়াছে। অক্টোবর মাসের চতুর্থ সপ্তাহ,—শীত আসিতেছে।

(২১)

পাইনবনের ভিতর—অথবা রাস্তার কিনারায় কোথাও-কোথাও মন্দিরজাতীয় একচালা ঘর দেখিতেছি। সেখানে পথিকেরা খৃষ্ট, মা-মেরী অথবা কোনো সেণ্টকে পূজা করিবার অবসর পায়। মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে—হয় কাঠের গড়া অথবা চিত্রে আঁকা। সম্মুখেই একটা বাক্স। বাক্সের ছেঁদার ভিতর দক্ষিণা রাখিয়া যাইবার দস্তুর দেখিতেছি। "ফুল বেলপাতা" চড়াইবার রেওয়াজও আছে। অন্ততঃ "নমো বিষ্ণবে" উচ্চারণ করিয়া হাঁটিতে-হাঁটিতে হাঁটু বাঁকাইয়া মাথা নোওআনো ক্যাথলিক মাত্রেরই রীতি।

বৃষ্টি পড়িতেছে দিনরাত। রাস্তায় অকথ্য কাদা। পথে গরু চলিয়া-চলিয়া মানুষের পক্ষে হাঁটা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। আল্‌পসের সকল পল্লীতেই এই দৃশ্য। জল-বৃষ্টির দিনে আল্‌পসে মোসাফিরি করা ঝকমারি। তবে আমরা গরুর গাড়ী পাশ করা লোক। আমাদের পথ আটক্ কোথায়?

আমার কুঠুরির এক কোণে হাঁড়ির ভিতর কাগজে ঢাকা ঈষৎ হলদে রংয়ের কি একটা দেখিলাম। "মাসী"

বলিলেন,—"এই সামান্য আউস গেলাসেনে বুট্টার বা গলানো মাখন।" জার্ম্মাণে ইহাকে এক কথায় বলে "শ্মাল্‌ৎস।" রান্নাঘরে খাইতে বসিয়া দেখিতেছি, উনুনে খোলা চাপাইয়া বুড়ী শ্মাল্‌ৎস ঢালিতেছেন। শ্মাল্‌ৎসের সঙ্গে-সঙ্গে ছাড়া হইল এক বস্তু। নাম "গ্রীজ্" ওরফে সুজী!

লাফাইয়া উঠিয়া ভাবিলাম, এতদিন পরে ভারত-প্রসিদ্ধ, দুনিয়া-দুর্লভ ঘী আবিষ্কার করিয়াছি। গল্প সুরু হইয়া গেল। বুঝা গেল,—টিরোলী আল্প্‌সের প্রত্যেক পল্লী-শহরে ঘী চলিয়া থাকে। মাখনের রেওয়াজ পাহাড়ে অতি অল্প। অষ্ট্রিয়ার জার্ম্মাণ সমাজের অন্যান্য কেন্দ্রেও কম-বেশী ঘী ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মিশর, চীন, জাপান, আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণি এই সকল দেশের কোথাও ঘী মিলে নাই। ঘীর স্বরূপ বুঝাইতে হইলে এই সকল দেশের লোকের সম্মুখে একটা ছোট খাটো বক্তৃতা করা দরকার হয়।

ঘীয়ে সুজী ভাজা হইতেছে। ভাবিতেছি ইয়োরোপ,—একটা নতুন কিছুই বা তৈয়ারি হইতেছে বোধ হয়। রাধামাধব! খাইয়া দেখি, এ যে নিখিল-ভারত-মহা-মণ্ডলব্যাপী মোহনভোগ বা হালুয়া। বিলকুল হালুয়াই বটে। একদিনে দুইটা বড়-গোছের আবিষ্কার সাধিত হইল। কথাবার্ত্তায় বুঝা যাইতেছে, টিরোলীরা হালুয়াকে আল্প্‌সের খাঁটি স্বদেশী বস্তু বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত।

টিরোলের লোকেরা এক প্রকার নয়া বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে। বার্লিনের কোনো-কোনো দোকানে দু'একটা দেখিয়াছি। নাম "ৎসিথার"। আমাদের সেতার নয়! চ্যাপ্টা পাতলা টেবিলের মতন কাঠের উপর পঁয়ত্রিশ ছত্রিশটা তারের সমাবেশে এই যন্ত্র গঠিত। শোয়াইয়া বাজাইতে হয়।

একজন টিরোলী ওস্তাদের সঙ্গে কথা হইল। বীণাকে প্রচার করিলাম খাশ ভারতীয় যন্ত্র ভাবে। তৎক্ষণাৎ ওস্তাদ মহাশয় সঙ্গীতের একটা বড় জার্ম্মাণ বিশ্বকোষ বাহির করিয়া আনিলেন। ইনি বর্ণনাটা পড়িতে লাগিলেন। আমি ছোট অক্ষরের নোটটা পড়িয়াই স্তম্ভিত হইলাম। লেখা আছে:—"বীণা প্রাচীন মিশরের আবিষ্কার। মিশর হইতে হিন্দুরা এই যন্ত্র আমদানি করিয়া থাকিবে।"

(২২)

"মাসী"কে স্যাঙ্ক্‌ট আন্টনের লোকেরা খাতির করে খুব। ইঁহার কিণ্ডারগার্টেনে বালক-বালিকারা প্রতি দিন পাঁচঘণ্টা করিয়া কাটাইয়া থাকে। ইস্কুল বসে দুই বেলা। গান, গল্প, ছবি-দেখা, কাদা-মাটি দিয়া অথবা কাগজ ভাঁজ করিয়া খেলানা তৈয়ারি করা, নানা প্রকার আমোদজনক চলা-ফেরা করা বুড়ীর শিক্ষা-বিজ্ঞানের প্রাণ স্বরূপ।

সবচেয়ে ছোট শিশুর বয়স মাত্র দুই বৎসর। সর্ব্ব জ্যেষ্ঠের বয়স পাঁচ। লিখিতে অথবা বই পড়িতে শিখানো হয় না। "মাসী" বলিলেন:—"ছয় বৎসর বয়সে পড়িবা মাত্র শিশুরা গবর্মেণ্টের সরকারী পাঠশালায় ভর্ত্তি হইতে বাধ্য। সেই ইস্কুলে ইহাদের হাতে-খড়ি হইবে। আমার পাঠশালায় সদভ্যাস তৈয়ারি করা, বিদ্যার্জ্জনে আনন্দ গজানো, ইত্যাদি উপায়ে জীবনের গোড়াপত্তন হইয়া থাকে মাত্র।" টিরোলের বহু গণ্যমান্য, প্রসিদ্ধ লোক বুড়ীর হাতে মানুষ হইয়াছেন।

বুড়ীকে গ্রামের লোকেরা মাসিক বেতন দেয় অতি সামান্য। কিন্তু কোনো পরিবার হইতে আসে ফলমূল, কেহ পাঠাইয়া দেয় রুটি দুধ-মাখন, কেহ দেয় পশম কাপড়-চোপড় ইত্যাদি। মধ্যাহ্ণ-ভোজন আসে এক হোটেল হইতে। "সিধা" দেওয়ার রীতি পাশ্চাত্য সমাজেও চলিত।

ষাট বৎসরের বৃদ্ধাকে যেরূপ কর্ম্মঠ, উৎসাহী শিশুপ্রিয় এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ দেখিতেছি,—তাহাকে টিরোলের জন-সাধারণ কেন ইঁহাকে মাসী বলিয়া ডাকে,—বিনা "রিসার্চ্চেই" তাহা বুঝিতে পারিলাম।

(২৩)

মাঝে-মাঝে প্রায়ই বরফ পড়িতেছে। শীত আসে-আসে। কাজেই কাব্য-প্রসিদ্ধ "আল্প-গোলাপ" এ যাত্রায় দেখিতে পাইলাম না। "আল্প-রোজ"কে ইংরাজিতে বলে রোডোডেণ্ড্রন। হিমালয়েও প্রচুর।

আল্প্‌সের পা ও বুক নানা শ্রেণীর পাইনে ঢাকা। তাহার উর্দ্ধে দেখিতে পাই ঝোঁপ জাতীয় ছোট খাটো গাছ-গাছড়া। কোনো প্রকার উদ্ভিদ সেখানে আছে কি না সন্দেহ হইতেছে। বসন্তে ও গ্রীষ্মে ঐ অঞ্চলেই আল্প-রোজের লাল বাগান তৈয়ারি হয়। পাহাড়ের শিরগুলা একদম ন্যাড়া,—শক্ত পাথরের চাপ। নেহাৎ উঁচু না

হইলে—অর্থাৎ হাজার দশেক ফিট না ছুঁইলে—শিখরগুলা গ্রীষ্মে তুষারশুভ্র দেখায় না।

অষ্ট্রিয়াতে খোলাখুলি ভাবে রাজতন্ত্রের স্বপক্ষে একটা নয়া রাষ্ট্রীয় দল গঠিত হইল। এই দলে ইতিমধ্যে দুই লাখের বেশী মেম্বর দাখিল হইয়াছে। ইহারা পুরানা হ্যাব্‌সবুর্গ বংশকে রাজতক্তে বসাইতে চায়।

ইন্‌স্‌ব্রুকে একটা বিপুল "স্বদেশী" সভা হইয়া গেল। বার্গ ইজেলের হোফার মূর্ত্তির সম্মুখে এক বিরাট জন-সমাগম হইয়াছিল। টিরোলের "স্বদেশ-রক্ষক" সমিতি এই মিছিলের উদ্যোগকর্ত্তা। প্রায় দশ হাজার লোক সশস্ত্রে এই স্বেচ্ছাসেবকের দলে উপস্থিত ছিল।

এই দলে হাজির ছিল দক্ষিণ জার্ম্মাণি অর্থাৎ ব্যাহ্বেরিয়া জনপদের বহু প্রতিনিধি। এমন কি, গোটা জার্ম্মাণির "স্বেচ্ছাসেবক-পরিষদে"র ধুরন্ধর শ্রীযুক্ত এশেরিকও আসিয়াছিলেন। এশেরিক যুবক জার্ম্মাণির সমর-প্রাণ। অষ্ট্রিয়া এবং জার্ম্মাণির নরনারী ক্রমেই তাতিয়া উঠিতেছে।

(২৪)

আল্‌প্‌সের কোনো পল্লীতে এক শিশুর মৃত্যু হইল। মৃত্যু সন্নিকট বুঝিয়া চিকিৎসক মাতাকে বলিলেন :—"বালিকার হাতে ক্ষুদ্র গৃহ-ক্রুশটি পরাইয়া দিন।" পরে ঘরের দেওয়ালে ঝুলানো ভাঁড় হইতে তীর্থ জল আনিয়া শিশুর কপালে চোখে ও বুকে বুলাইয়া দেওয়া হইল। শিশুর জীবন-বাতীও জ্বালাইয়া রাখা হইল।

পুরোহিত আসিলেন। মৃত্যুকালে পুরোহিতের আশীর্ব্বাদ না পাওয়ার সমান দুঃখ ও পাপ কোনো ক্যাথলিকের চিন্তায় আর নাই। স্তব, প্রার্থনা, মন্ত্রপাঠ ইত্যাদি সবই পুরোহিত কর্ত্তৃক ঘণ্টাখানেক ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইল। অনেক পূর্ব্বেই বালিকার বাক্‌রোধ ও দৃষ্টি-লোপ হইয়াছে।

শিশুর কাণে পুরোহিত উচ্চকণ্ঠে বলিলেন :—"শীঘ্রই তুমি মা মেরীর কোলে যাইতেছ। প্রার্থনা কর, যেন তিনি তোমায় সাদরে গ্রহণ করেন।" একবার মাত্র তৎক্ষণাৎ সে চোখ খুলিয়া ঘরের লোকজনের দিকে তাকাইল। তাহার পরই শ্বাসরোধ।

জনক-জননী বহুকাল গির্জ্জায় যাওয়া-আসা বন্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু পুরোহিতের মন্ত্রপাঠের ফলে শিশু কন্যা মৃত্যুর মুহূর্ত্তে একবার চোখ খুলিয়া চাহিয়াছে, এই ঘটনায় তাঁহাদের গির্জ্জা-ভক্তি জাগিয়া উঠিল। সন্তান স্বর্গে গেল,—এই আশ্বাসে এখন ইহাঁদের চিত্ত অনেকটা দৃঢ় হইল।

পাড়ায় মাত্র শ দেড়েক লোক। বাড়ীর লাগাই গির্জ্জা। গির্জ্জায় ঘণ্টা বাজিতে থাকিল। গ্রামের সকল লোক আসিয়া মৃত্যু-গৃহে শিশুর জন্য প্রার্থনা করিল। শিশুর বয়স মাত্র পাঁচ বৎসর। এইজন্য বহু প্রবীণ-প্রবীণা শিশুর জনক-জননীকে আনন্দ জ্ঞাপন করিতে ত্রুটি করিল না।

কচি শিশুর মৃত্যুকে পাড়াগাঁয়ের লোকেরা—বিশেষতঃ আল্‌প্‌সের ক্যাথলিকরা সাধারণ মানুষের মৃত্যু বিবেচনা করে না। শিশু ত "এঞ্জেল"—স্বর্গের জীব,—মরিয়া সে ত স্বর্গে যাইবেই। তাহার স্বর্গ-যাত্রায় সকলের আনন্দিত হওয়াই উচিত। এইরূপ বুঝিয়া বহুদূরের উপত্যকা হইতে চাষী মেষ-পালকেরা মৃত শিশুর শব দেখিতে আসে। অনেক সময়ে তাহারা মৃত্যু-শয্যার সম্মুখে নাচ-গান পর্য্যন্ত করে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অতদূর গড়ায় নাই।

এক প্রতিবেশিনী আসিয়া শব ধোয়াইয়া নতুন পোষাক পরাইতে জননীকে সাহায্য করিল। ঘরের ভিতর বিছানা উঁচু করিয়া তাহার উপর শব শোয়াইয়া রাখা হইল। শব ও বিছানা ফুলে মালায় সাজানো হইল। ক্রুশ হাতেই আছে,—জপমালাও তাহার সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইল। বাতী জ্বলিতেছে। শিশুর জন্মের সময় যে মোমবাতীটা জ্বালানো হইয়াছিল, সেই মোমবাতীটাই মৃত্যুর সম-সমকালে আবার জ্বালানো হইয়াছে। আবেষ্টনটায় মন্দিরের বেদির আকার যেন দেখিতেছি।

সকালে-বিকালে, দুপুর-রাতে দলে-দলে পাড়ার লোক আসিয়া মৃতের জন্য প্রার্থনা করিল। ইস্কুলের বালক-বালিকারা স্তোত্র আওড়াইল। গির্জ্জাতেও যথারীতি পল্লীবাসীদের সমবেত ভজন-পূজন অনুষ্ঠিত হইল। চারজন যুবা রাত্রিকালে শবগৃহে পাহারা দিল। দুপুররাতে দলে ভিড়িয়া প্রার্থনা করা ইহাদের কাজ। অন্যান্য সময় উহারা কাটাইল চুরুট খাইয়া, তাস খেলিয়া, আর মদ টানিয়া। "কোজাগরের" ব্যবস্থায় এইরূপই ঘটিয়া থাকে।

দুই রাত এই ধরণে শবের পরিচর্য্যা চলিবার পর, কেওড়াতলায় যাইবার ব্যবস্থা। গ্রামের প্রত্যেক নরনারীই মিছিলে যোগ দিয়াছিল। বালক-বালিকারা ফুলে সাজিয়া

আসিয়াছিল। স্বর্গের জীবের স্বর্গ-যাত্রায় শিশুরা যথাসম্ভব নিষ্কলঙ্ক, নিষ্পাপ, শুভ্র পুষ্প-পোষাক পরিধান করে। শোভা-যাত্রার পথে এক মুহূর্ত্তও প্রার্থনা থামে নাই। যে চার যুবা রাত্রিকালে পাহারা দিয়াছে, তাহারাই ঘাড়ে করিয়া শব বহিয়াছে।

গির্জ্জার দুয়ারে পুরোহিত কেতাব হইতে স্তোত্রপাঠ করিয়া শবের বাক্স "শোধন" করিলেন। ধূপধূনার ব্যবহার দেখিলাম। তীর্থ-জলের ছিটা দেওয়াও হইল। কবরের জন্য গর্ত্ত ইতিপূর্ব্বেই খুঁড়িয়া রাখা হইয়াছে। সেই যুবা চতুষ্টয়ই এই কাজের "অধিকারী"। কবর শোধনের পর শব তাহার ভিতর নামাইয়া দেওয়া হইল। তাহার পর গির্জ্জায় উপাসনা,—পরে আবার কবর-শোধন।

আগন্তুক বুড়াবুড়ী, ছোঁড়া-ছুঁড়ীরা শিশুর জনক-জননীর চোখের দিকে দেখিতেছে। সকলের মুখেই এক প্রশ্ন :— "মা-বাপরা কাঁদিতেছে কি ?"

মহাবিদ্যা

শ্রীপরশুরাম—

বক্তৃতা-গৃহ। উচ্চ বেদীর উপর আচার্য্যের আসন। বেদীর নীচে ছাত্রদের জন্য শ্রেণীবদ্ধ চেয়ার ও বেঞ্চ।

প্রথম শ্রেণীতে আছেন—

হোমরাও সিং	মহারাজা
চোমরাও আলি	নবাব
খুদীন্দ্রনারায়ণ	জমিদার
মিষ্টার গ্র্যাব	বণিক
মিষ্টার হাউলার	সম্পাদক ইত্যাদি

দ্বিতীয় শ্রেণীতে—

মিষ্টার গুহা	রাজনীতিজ্ঞ
নিতাইবাবু	সম্পাদক
প্রফেসার গুঁই	অধ্যাপক
রূপচাঁদ	বণিক
লুটবেহারী	ইনসলভেণ্ট
গাঁট্টালাল	গেঁড়াতলার সর্দ্দার
তেওয়ারী	জমাদার ইত্যাদি

তৃতীয় শ্রেণীতে—

মিষ্টার গুপ্টা	বিশেষজ্ঞ
সরেশচন্দ্র	নূতন গ্রাজুয়েট
নিরেশচন্দ্র	ঐ
দীনেশচন্দ্র	কেরাণী ইত্যাদি

চতুর্থ শ্রেণীতে—

পাঁচু মিয়া	মজুর
গবেশ্বর	মাষ্টার
কাঙালীচরণ	নিষ্কর্ম্মা
আরো অনেক লোক।	

প্রথম শ্রেণীর কথা

মিষ্টার গ্র্যাব। হ্যাল্লো মহারাজা, আপনিও দেখচি ক্লাসে জয়েন করেচেন।

হোমরাও সিং। হাঁা, ব্যাপারটা জানবার জন্য বড়ই কৌতুহল হয়েচে। আচ্ছা, এই জগৎগুরু লোকটি কে ?

গ্র্যাব। কিছুই জানি না। কেউ বলে, এঁর নাম ভ্যাণ্ডারলুট্, আমেরিকা থেকে এসেছেন ; আবার কেউ বলে, ইনিই প্রফেসার ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন্। ফাদার ও'ব্রায়েন্ সেদিন বলছিলেন, লোকটি devil himself —সয়তান স্বয়ং। অথচ রেভারেণ্ড ফিগস্ বলেন, ইনি পৃথিবীর বিজ্ঞতম ব্যক্তি, একজন Superman. একটা কমপ্লিমেণ্টারি টিকিট পেয়েচি, তাই মজা দেখতে এলুম।

মিষ্টার হাউলার। আমিও একখান পেয়েচি।

হোমরাও। বটে ? আমরা ত টাকা দিয়ে কিনেচি, তাও অতি কষ্টে।

খুদীন্দ্রনারায়ণ। শুনেচি লোকটি না কি বাঙালি,

বিলাত থেকে ভোল ফিরিয়ে এসেচে। আচ্ছা, বলশেভিক নয় ত?

চোমরাও আলি। না না, তা হলে গভর্ণমেণ্ট এ লেক্‌চার বন্ধ করে দিতেন। আমার মনে হয়, জগৎগুরু তুর্কি থেকে এসেচেন।

হাউলার। দেখাই যাবে লোকটি কে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কথা

নিতাইবাবু। জগৎগুরু কোথা উঠেচেন জানেন কি? একবার ইণ্টারভিউ করতে যাব।

মিষ্টার গুহা। শুনেচি, বেঙ্গল ক্লাবে আছেন।

রূপচাঁদ। না—না, আমি জানি, পগেয়াপটিতে বাসা নিয়েচেন।

লুটবেহারী। আচ্ছা, উনি যে মহাবিদ্যার ক্লাশ খুলচেন, সেটা কি? ছেলেবেলায় ত পড়েছিলুম—কালী, তারা, মহাবিদ্যা—

প্রফেসার শুঁই। আরে, সে বিদ্যা নয়। মহাবিদ্যা—কি না সকল বিদ্যার সেরা বিদ্যা, যা আয়ত্ত হলে মানুষের অসীম ক্ষমতা হয়, সকলের উপর প্রভুত্ব লাভ হয়।

রূপচাঁদ। এখানে ত দেখচি হাজারো লোক লেক্‌চার শুনতে এসেচে। সকলেরই যদি প্রভুত্ব লাভ হয়, তবে ফরমাস খাটবে কে?

গাঁট্টালাল। এইজন্যে ভাবচেন? আপনি হুকুম দিন, আমি আর তেওয়ারী দুই দোস্ত্‌ মিলে সবাইকে হাঁকিয়ে দিচ্চি। কিছু পান খেতে দেবেন—

তেওয়ারী। না—না, এখন গণ্ডগোল বাধিও না,—সাহেবরা রয়েছেন।

তৃতীয় শ্রেণীর কথা

সরেশ। আপনিও বুঝি এই বৎসর পাশ করেচেন? কোন্ লাইনে যাবেন, ঠিক করলেন?

নিরেশ। তা কিছুই ঠিক করি নি। সে জন্যই ত মহাবিদ্যার ক্লাশে ভর্ত্তি হয়েচি,—যদি একটা রাস্তা পাওয়া যায়। আচ্ছা, এই কোর্স অফ লেকচার্স আয়োজন করলে কে?

সরেশ। কি জানি মশায়। কেউ বলে, বিলাতের কোন দয়ালু ক্রোরপতি জগৎগুরুকে পাঠিয়েচেন। আবার শুনতে পাই, ইউনিভার্সিটিই না কি লুকিয়ে এই লেক্‌চারের খরচ জোগাচ্চে।

মিষ্টার গুপ্টা। ইউনিভার্সিটির টাকা কোথা? যেই টাকা দিক, মিথ্যে অপব্যয় হচ্ছে। এ রকম লেকচারে দেশের উন্নতি হবে না। ক্যাপিট্যাল চাই, ব্যবসা চাই।

দীনেশ। তবে আপনি এখানে এলেন কেন? এই সব রাজা-মহারাজেরাই বা কি জন্য ক্লাশ অ্যাটেণ্ড্‌ করচেন? নিশ্চয়ই একটা লাভের প্রত্যাশা আছে। এই দেখুন না, আমি সামান্য মাইনে পাই তবু ধার করে লেকচারের ফি জমা দিয়েচি। যদি কিছু অবস্থার উন্নতি করতে পারি।

সরেশ। জগৎগুরু আসবেন কখন? ঘণ্টা যে কাবার হয়ে এল।

চতুর্থ শ্রেণীর কথা

গবেশ্বর। কিহে পাঁচুমিয়া, এখানে কি মনে করে?

পাঁচুমিয়া। বাবুজি, এক টাকা রোজে আর দিন চলে না। তাই থারিয়া-লোটা বেচে একটা টিকিট কিনেচি, যদি একটা হদিস পাই। তা আপনারা এত পিছে বসেচেন কেন হুজুর? সাম্নে গিয়ে বাবুদের সাথ বসুন না।

কাঙালীচরণ। ভয় করে।

গবেশ্বর। আমরা বেশ নিরিবিলিতে আছি। দেখ পাঁচু, তুমি যদি বক্তৃতার কোনো যায়গা বুঝতে না পার, ত আমাকে জিজ্ঞেসা কোরো।

ঘণ্টাধ্বনি। জগৎগুরুর প্রবেশ। তিনি আসিয়া সোণার মুকুট, চিত্রিত মুখোস ও গেরুয়া আলখাল্লা খুলিয়া ফেলিলেন। মাথা কামানো, গায়ে তেল, পরনে লেংটি, কোমরে শাবল ও চাবিকাঠি, হাতে বরাভয়। পট্‌-পট্‌ হাততালি।

হোমরাও। লোকটির চেহারা কি বীভৎস! চেনেন নাকি মিষ্টার গ্র্যাব?

গ্র্যাব। বিলক্ষণ চিনি।

জগৎগুরু। হে ছাত্রগণ, তোমাদের আশীর্ব্বাদ করচি, জগজ্জয়ী হও। আমি যে বিদ্যা শেখাতে এসেচি, তার জন্য অনেক সাধনা দরকার,—তোমরা একদিনে সব বুঝতে পারবে না। আজ আমি কেবল ভূমিকা মাত্র বলব। হে বালকগণ, তোমরা মন দিয়ে শোনো,—যেখানে খট্‌কা ঠেকবে, আমাকে নির্ভয়ে জিজ্ঞাসা করবে।

প্রফেসার শুঁই। আমি strongly আপত্তি করচি—

জগৎগুরু কেন আমাদের 'বালকগণ—তোমরা' বলবেন। আমরা কি স্কুলের ছোকরা? এই মহারাজা হোমরাও সিং, নবাব চোমরাও আলি রয়েছেন। পদমর্য্যাদা যদি না ধরেন, বয়সের একটা সম্মান ত আছে। আমাদের মধ্যে অনেকের বয়স ষাট পেরিয়েচে।

হাউলার। আপনাদের বাংলা ভাষার দোষ। জগৎগুরু বিদেশী লোক, 'আপনি তুমি' গুলিয়ে ফেলেচেন। আর 'বালক' কথাটা কিছু নয়, ইংরাজির ওল্ড বয়।

খুদীন্দ্র। বাংলা ভাল না জানেন ত ইংরাজিতে বলুন না।

গুঁই। যাই হোক, আমি আপত্তি করচি।

মিষ্টার গুহা। আমি আপত্তির সমর্থন করচি।

জগৎগুরু সহাস্যে। বৎস, উতলা হয়ো না। আমি বাংলা ভালই জানি। বাংলা, ইংরাজি, ফরাসী, জাপানী, সবই আমার মাতৃভাষা। আমি প্রবীণ লোক, দশ-বিশ হাজার বৎসর ধরে এই মহাবিদ্যা শেখাচ্চি। তোমরা আমার স্নেহের পাত্র, 'তুমি' বল্‌বার অধিকার আমার আছে।

লুটবেহারী। নিশ্চয় আছে। আপনি আমাদের 'তুমি-তুই' যা খুসী বলুন। আমি ওসব গ্রাহ্য করি না। মোদ্দা, শেষকালে ফাঁকি দেবেন না।

জগৎগুরু। বাপু, আমি কোনো জিনিষ দি না, শুধু শেখাই মাত্র। যা হোক, তোমাদের দেখে আমি বড়ই প্রীত হয়েচি। এমন সব সোণার চাঁদ ছেলে,—কেবল শিক্ষার অভাবে উন্নতি করতে পারচ না।

মিষ্টার গুপ্টা। ভণিতা ছেড়ে কাজের কথা বলুন।

জগৎগুরু। হে ছাত্রগণ, মহাবিদ্যা না জানলে মানুষ সুসভ্য, ধনী, মানী হতে পারে না,—তাকে চিরকাল কাঠ কাটতে, আর জল তুলতে হয়। কিন্তু এটা মনে রেখো যে, সাধারণ বিদ্যা আর মহাবিদ্যা এক জিনিষ নয়। তোমরা পদ্যপাঠে পড়েচ—

এই ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে,
যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।

এই কথা সাধারণ বিদ্যা সম্বন্ধে খাটে, কিন্তু মহাবিদ্যার বেলা নয়। মহাবিদ্যা কেবল নিতান্ত অন্তরঙ্গ-জনকে অতি সন্তর্পণে শেখাতে হয়। বেশী প্রচার হলে সমূহ ক্ষতি। বিদ্বানে-বিদ্বানে সংঘর্ষ হলে একটু বাক্যব্যয় হয় মাত্র; কিন্তু মহাবিদ্বানদের ভিতর ঠোকাঠুকি বাধলে সব চুরমার। তার সাক্ষী এই ইউরোপের যুদ্ধ। অতএব মহাবিদ্বানদের একজোট হয়েই কাজ করতে হবে।

হাউলার। আমি এই লেকচারে আপত্তি করচি। এ দেশের লোকে এখনো মহাবিদ্যা লাভের উপযুক্ত হয় নি। আর আমাদের মহাবিদ্বানরা দেশী মহাবিদ্বানদের সঙ্গে বনিয়ে চলতে পারবে না। মিথ্যা একটা অশান্তির সৃষ্টি হবে।

গ্রাব। চুপ কর হাউলার। মহাবিদ্যা শেখা কি এ দেশের লোকের কর্ম্ম? লেকচার শুনে হুজুকে পড়ে যদি মহাবিদ্যা নিয়ে লোকে একটু ছেলেখেলা আরম্ভ করে, মন্দ কি? একটু অন্যদিকে distraction হওয়া দেশের পক্ষে এখন দরকার হয়েচে।

হাউলার। সাধারণ বিদ্যা যখন এদেশে প্রথম চালানো হয়, তখনো আমরা ব্যাপারটাকে ছেলেখেলা মনে করে-ছিলুম। এখন দেখচ ত ঠেলা? জোর করে টেক্সট্ বুক থেকে এটা সেটা বাদ দিয়ে কি আর সামলানো যাচ্চে?

খুদীন্দ্র। মিষ্টার হাউলার ঠিক বলচেন। আমারো ভাল ঠেকচে না।

চোমরাও আলি। ভাল-মন্দ গবর্ণমেণ্ট বিচার করবেন। তবে মহাবিদ্যা যদি শেখাতেই হয়, মুসলমানদের জন্য একটা আলাদা—

হোমরাও। অর্ডার, অর্ডার।

জগৎগুরু। সাধারণ বিদ্যা মোটামুটি জানা না থাকলে, মহাবিদ্যায় ভাল রকম ব্যুৎপত্তি লাভ হয় না। পাশ্চাত্য দেশে দুই বিদ্যার মণিকাঞ্চন যোগ হয়েচে। এ দেশেও যে মহাবিদ্বান নেই, তা নয়—

গাঁট্টালাল। হুঁ—হুঁ, গুরুজি আমাকে মালুম কচ্চেন।

রূপচাঁদ। দূর, তোকে কে চেনে? আমার দিকে চাইচেন।

জগৎগুরু। তবে মুর্খ লোকে মহাবিদ্যার প্রয়োগটা আত্মসম্ভ্রম বাঁচিয়ে করতে পারে না। পাশ্চাত্য দেশ এ বিষয়ে অত্যন্ত উন্নত। জরীর খাপের ভিতর যেমন তলোয়ার ঢাকা থাকে, মহাবিদ্যাকেও তেমনি সাধারণ বিদ্যা দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। মহাবিদ্যার মূল সূত্রই হচ্চে—যদি না পড়ে ধরা।

প্রফেসার গুঁই। আপনি কি সব খারাপ কথা বলেচেন?

অনেকে। শেম্‌, শেম্‌।

জগৎগুরু। বৎস, লজ্জিত হয়ো না। তোমাদেরই এক পণ্ডিত বলেন—একাং লজ্জাং পরিত্যজ্য ত্রিভুবন-বিজয়ী ভব। যদি মহাবিদ্যা শিখতে চাও, তবে সত্যের উলঙ্গ মূর্ত্তি দেখে ডরালে চল্‌বে না। যা বল্‌ছিলুম শোনো।—এই মহাবিদ্যা যখন মানুষ প্রথমে শেখে, তখন সে আনাড়ী শিকারীর মত এ বিদ্যার অপপ্রয়োগ করে। যেখানে ফাঁদ পেতে কার্য্যসিদ্ধি হতে পারে, সেখানে সে কুস্তি লড়ে বাঘ মারতে যায়। দু'চারটে বাঘ হয় ত মরে; কিন্তু শিকারীও শেষে ঘাল হয়। বিদ্যাগুপ্তির অভাবেই এই বিপদ হয়। মানুষ যখন আর একটু চালাক হয়, তখন সে ফাঁদ পাত্‌তে আরম্ভ করে, নিজে লুকিয়ে থাকে। কিন্তু গোটাকতক বাঘ ফাঁদে পড়িলেই, আর সব বাঘ ফাঁদ চিনে ফেলে, আর সে দিকে আসে না, আড়াল থেকে টিট্‌কারী দেয়, শিকারীরও ব্যবসা বন্ধ হয়। ফাঁদটা এমন হওয়া চাই, যেন কেউ ধরে না ফেলে। মহাবিদ্যাও সেই রকম গোপন রাখা দরকার। তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয় ত নিজের অজ্ঞাতসারে, কেবল সংস্কারবশে মহাবিদ্যার প্রয়োগ কর। এতে কখনো উন্নতি হবে না। পরের কাছে প্রকাশ করা নিষেধ; কিন্তু নিজের কাছে লুকোলে মহাবিদ্যায় মরচে পড়বে। সজ্ঞানে ফলাফল বুঝে মহাবিদ্যা চালাতে হয়।

গুঁই। বড়ই গোলমেলে কথা।

লুটবেহারী। কিছু না, কিছু না। জগৎগুরু নূতন কথা আর কি বল্‌চেন। প্র্যাক্‌টিস আমার সবই জানা আছে, তবে থিওরিটা শেখবার তেমন সময় পাই নি।

গুহা। এত দিন ছিলে কোথা হে?

লুটবেহারী। শ্বশুরবাড়ী। সেদিন খালাস পেয়েচি।

গুহা। নাঃ, তোমার দ্বারা কিছু হবে না। এই ত ধরা দিয়ে ফেল্লে।

লুটবেহারী। আপনাকে বল্‌তে আর দোষ কি। দুজনেই মহাবিদ্বান—অন্তরঙ্গ মাস্‌তুতো ভাই।

হোমরাও। অর্ডার, অর্ডার।

গুহা। আচ্ছা গুরুদেব, মহাবিদ্যা শিখলে কি আমাদের দেশের সকলেরই উন্নতি হবে?

জগৎগুরু। দেখ বাপু, পৃথিবীর ধনসম্পদ যা দেখচ, তার একটা সীমা আছে, বেশী বাড়ানো যায় না। সকলেই যদি সমান ভাগে পায়, তবে কারোই পেট ভরে না। যে জিনিষ সকলেই অবাধে ভোগ করতে পারে, সেটা আর সম্পত্তি বলে গণ্য হয় না। কাজেই, জগতের ব্যবস্থা এই হয়েচে যে, জনকতক ভোগদখল করবে, বাকী সবাই যুগিয়ে দেবে। চাই গুটিকতক মহাবিদ্বান, আর একগাদা মহামূর্খ।

খুদীন্দ্র। শুনচেন মহারাজা? এই কথাই ত আমরা বরাবর বলে আসচি। আরিষ্টোক্রাসি না হলে সমাজ টিকবে কিসে? লোকে আবার আমাদের বলে মূর্খ—অযোগ্য। হুঁঃ!

জগৎগুরু। ভুল বুঝলে বৎস। তোমার পূর্ব্বপুরুষই মহাবিদ্বান ছিলেন, তুমি নও। তুমি কেবল অতীতে অর্জ্জিত বিদ্যার রোমন্থন করচ। তোমার আসে-পাশে মহাবিদ্বানরা ওৎ পেতে বসে আছেন। যদি তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিতে না শেখ, তবে শীঘ্রই গাদায় গিয়ে পড়বে।

প্রফেসার গুঁই। পরিষ্কার করেই বলুন না, মহাবিদ্যাটা কি।

তৃতীয় শ্রেণী হইতে। বলে ফেলুন সার, বলে ফেলুন। ঘণ্টা বাজতে বেশী দেরী নেই।

জগৎগুরু। তবে বলচি শোনো। মহাবিদ্যায় মানুষের জন্মগত অধিকার; কিন্তু একে ঘষে-মেজে, পালিশ করে, সভ্যসমাজের উপযোগী করে নিতে হয়। ক্রমোন্নতির নিয়মে মহাবিদ্যা এক স্তর হতে উচ্চতর স্তরে পৌঁছেচে। জানিয়ে-শুনিয়ে সোজাসুজি কেড়ে নেওয়ার নাম ডাকাতি—

ছাত্রগণ। সেটা মহাপাপ,—চাই না, চাই না।

জগৎগুরু। দেশের জন্য যে ডাকাতি, তার নাম বীরত্ব—

ছাত্রগণ। তা আমাদের দিয়ে হবে না, হবে না।

হাউলার। Bally rot.

জগৎগুরু। নিজে লুকিয়ে থেকে কেড়ে নেওয়ার নাম চুরি—

ছাত্রগণ। ছ্যা—ছ্যা, আমরা তাতে নেই, তাতে নেই।

লুটবেহারী। কিহে গাঁট্টালাল, চুপ করে কেন? সায় দাও না।

জগৎগুরু। ভালমানুষ সেজে কেড়ে নিয়ে, শেষে ধরা পড়ার নাম জুয়াচুরি—

ছাত্রগণ। রাম কহ, তোবা, থুঃ।

গুহা। কি লুটবেহারী চোখ বুঁজে কেন ?

জগৎগুরু। আর যাতে ঢাক পিটিয়ে কেড়ে নেওয়া যায়, অথচ শেষ পর্য্যন্ত নিজের মান-সম্ভ্রম বজায় থাকে, সেটা মহাবিদ্যা।

ছাত্রগণ। জগৎগুরু কি জয়! আমরা তাই চাই, তাই চাই।

গুঁই। কিন্তু ঐ কেড়ে নেওয়া কথাটা একটু আপত্তি-জনক।

লুটবেহারী। আপনার মনে পাপ আছে, তাই খট্‌কা বাধ্‌চে। কেড়ে নেওয়া পছন্দ না হয়, বলুন ভোগা দেওয়া।

গুঁই। কে হে বেহায়া তুমি? তোমার conscience নেই ?

জগৎগুরু। বৎস, কেড়ে নেওয়াটা রূপক মাত্র। সাদা কথায় এর মানে হচ্চে—সংসারের মঙ্গলের জন্য লোককে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কিছু আদায় করা।

লুটবেহারী। আমার ত সবে একটি সংসার। কিছু আদায় করতে পারলেই ছছল বছল। নবাব সাহেবের বরঞ্চ —

হোমরাও। অর্ডার, অর্ডার।

গুঁই। দেখুন জগৎগুরু, আমার দ্বারা বিবেক-বিরুদ্ধ কাজ হবে না। কিন্তু ঐ যে আপনি বল্লেন—সংসারের মঙ্গল জন্য, সেটা খুব মনে লেগেচে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—

লুটবেহারী। মশায়, ভগবান বেচারাকে নিয়ে যখন-তখন টানাটানি করবেন না,—চটে উঠবেন।

নিতাই। আচ্ছা, সকলেই যদি মহাবিদ্যা শিখে ফেলে, তা হলে কি হবে ?

জগৎগুরু। সে ভয় নেই। তোমরা প্রত্যেকে যদি প্রাণপণে চেষ্টা কর, তা'হলেও মাত্র দু'চারজন ওৎরাতে পার।

সরেশ। সার, একবার টেষ্ট্ করে নিন না।

জগৎগুরু। এখন পরীক্ষা করলে বিশেষ ভাল ফল পাওয়া যাবে না। অনেক সাধনা দরকার।

নিরেশ। কিছু মার্কও কি পাব না ?

জগৎগুরু। কিছু-কিছু পাবে বৈ কি। কিন্তু তাতে এখন করে খেতে পারবে না।

নিরেশ। তবে না হয় আমাদের কিছু হোম-এক্‌সার-সাইজ দিন।

জগৎগুরু। বাড়িতে ত সুবিধা হবে না বাছা। এখন তোমরা নিতান্ত অপোগণ্ড। দিনকতক দল বেঁধে মহা-বিদ্যার চর্চ্চা কর।

খুদীন্দ্র। ঠিক বলেচেন। আসুন মহারাজা, আপনি, আমি আর নবাব সাহেব মিলে একটা অ্যাসোসিয়েশন্ করা যাক।

প্রফেসার গুঁই। আমাকেও নেবেন,—আমি স্পীচ লিখে দেবো।

মিষ্টার গুহা। নিতাই বাবু, আমি ভাই তোমার সঙ্গে আছি।

লুটবেহারী। আমি একাই একশ। তবে রূপচাঁদ বাবু যদি দয়া করে সঙ্গে নেন।

রূপচাঁদ। খবরদার, তুমি তফাৎ থাক।

লুটবেহারী। বটে? তোমার মত ঢের ঢের বড়লোক দেখেচি।

গাঁট্টালাল। আমরা কারো তোয়াক্কা রাখি না—কি বল তেওয়ারিজি ?

মিষ্টার গুপ্টা। ভাবনা কি সরেশ বাবু, নিরেশ বাবু। আমি টেকনিক্যাল ক্লাশ খুলচি, ভর্ত্তি হোন। তরল আলতা, গোলাবী বিড়ি, ঘড়ি মেরামত, ঘুড়ি মেরামত, দাঁত বাঁধানো, ধামা বাঁধানো—সব শিখিয়ে দেবো।

দীনেশ। গুরুদেব, চুপি-চুপি একটা নিবেদন করতে পারি কি ?

জগৎগুরু। বল বৎস।

দীনেশ। দেখুন, আমি নিতান্তই মুরুব্বীহীন। মহা-বিদ্যার একটা সোজা তুকতাক্—বেশী নয়, যাতে লাখ-খানিক টাকা আসে,—যদি দয়া করে গরীবকে শিখিয়ে দেন।

জগৎগুরু। বাপু, তোমার গতিক ভাল বোধ হচ্চে না। মহাবিদ্বান অপরকেই তুকতাক্ শেখায়,—নিজে ওসবে বিশ্বাস করে না।

দীনেশ। টিকিটের টাকাটাই নষ্ট। তার চেয়ে ডার্ব্বির টিকিট কিনলে বরং কিছুদিন আশায়-আশায় কাটাতে পারতুম।

গবেশ্বর। আমার কি হবে প্রভু? কেউ যে দলে নিচ্চে না।

জগৎগুরু। তুমি ছেলে তৈরি কর। তাদের শেখাও—মহাবিদ্যা শেখে যে, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে।

পাঁচুমিয়া। আমার কি করলেন ধর্ম্মাবতার?

জগৎগুরু। তুমি এখানে এসে ভাল করনি বাপু। তোমার গুরু রুষিয়া থেকে আসবেন, এখন ধৈর্য্য ধরে থাক।

গুহা। দশহাজার টাকা চাঁদা তুলতে পারিস? ইউনিয়ন্ খুলে এমন হুড়ো লাগাব যে, এখনি তোদের পাঁচগুণ মজুরী হয়ে যাবে।

মিষ্টার গ্র্যাব। সাবধান, আমার চটকলের ত্রিসীমানার মধ্যে যেন এস না।

গুহা। (চুপি-চুপি) তবে আপনার বাড়ী গিয়ে দেখা করব কি?

কাঙালীচরণ। দেবতা, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?

জগৎগুরু। তোমার আবার কি চাই? বলে ফেল।

কাঙালী। যদি কখনো মহাবিদ্যা ধরা পড়ে যায়, তখন অবস্থাটা কি রকম হবে?

জগৎগুরু। (ঈষৎ হাসিয়া বেদী হইতে নামিয়া পড়িলেন।)

ঘণ্টা ও কোলাহল।

নাম-সঙ্কট!

ডি ভেলেরা। খোকার নাম 'মিত্ররাজ' রাখ্‌লে, আমি ওকে কোলে পিঠে ক'রে নিয়ে মানুষ করতে পারি।

লয়েড্ জর্জ্জ। সে হবে না, ওর নাম রাখ্‌বো শ্রীমান উপনিবেশ!

খোকা। (আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বায়ত্বশাসন) ট্যাঁ-ট্যাঁ!

(The Star, London)
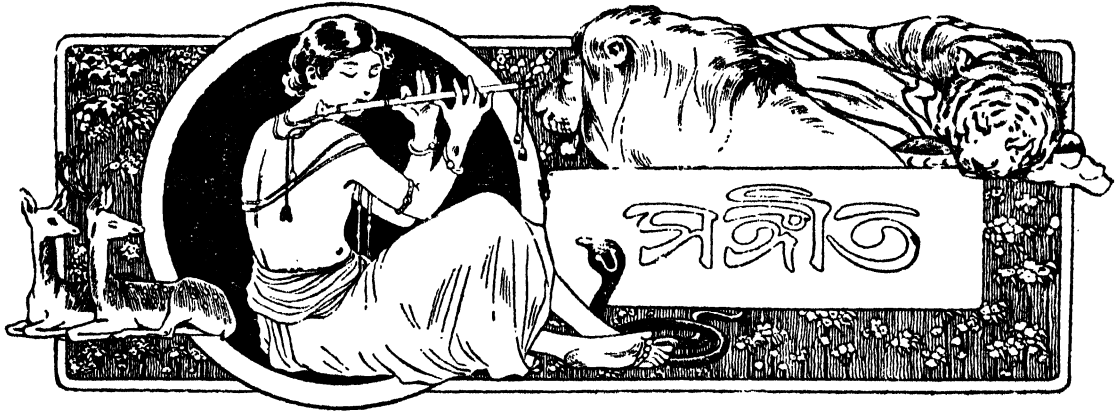
"সাজাহানে"র গান

নবম গীত।

[রচনা—স্বর্গীয় প্রেমিক-ভক্ত-মহাজন চণ্ডীদাস বগ্‌চী]

পিয়ারা।

কীর্ত্তন, (কামোদ)————————তাল ফের্ত্তা।

সই,————

কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম ?
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥
না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে ॥

নাম-পরতাপে যার, ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার, নয়নে দেখিয়া গো,
যুবতী-ধরম কৈছে রয় ॥
পাসরিতে করি মনে, পাসরা না যায় গো,
কি করিব কি হ'বে উপায় ?
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে, কুলবতী কুল নাশে,
আপনার যৌবন যাচায় ॥

[স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা]

আস্থায়ী,—একতালা।

II {	র্রা	পা	মা	|	[১] গমা	রা	ন্‌া	I	[২] সন্‌া	সা	গরা	¦	[৩] গমা	পমা	-পা
	স	ই	কে		বা॰	শু	না		ই॰	লে	শ্যা		ম॰	না॰	ম্

গুরু { } বন্ধনীর মধ্যে আবদ্ধ পংক্তিগুলি দু'বার করিয়া গেয়; কিন্তু বক্র ( ) বন্ধনীর মধ্যে স্থাপিত পংক্তিগুলি পুনরাবৃত্তিকালে ত্যাগ করিয়া, পরবর্ত্তী কলি ধরিতে হইবে। বক্তব্যটিকে স্পষ্টতর করিবার উদ্দেশ্যেই নম্বর দেওয়া গেল। নম্বর হিসাবে পর্‌-পর্‌ বাজাইলেও বন্ধনী দুইটির কাজ কেবল নম্বরগুলির দ্বারাই সাধিত হইবে।

০ ১ ২´ ৩
| মা -পা ধা | -না -র্সা -র্রা I -র্সা -না -ধা | -পা -মা -পা |
স • ই • • • • • • • • •

০ ১ ২´ ৩
| মধা· পা মা | গমা রা পা I মগা -মা রা | সা -ন্া -র্া} |
কে• বা শু না• ই লে শ্যা • ম না • ম্

০ ১ ২ ৩
(৪) | [ı পা -া | পধনসা ধনা পা I রা পা -া | ধা না -ধণা] |
(১) ı ı র্সা -া | নর্সা ধা পা I পা ম -পধা | না ধা -না |
কা • ণে• র ভি ত র • • দি য়া •

০ ১ ২ ৩
(৭) | [-ধা -পা র্সা | না ধা পা I পা ধনা -া | ধনা -ধা -পা] |
(২) | -ধা -া পা | মা গা রা I সা রা -পা | পা -মা -পা |
• • ম র মে প শি ল • গো • •

০ ১ ২´
(৩) | (র্সা -নর্সা ধনা | -পধা -মপা -গমা I -রা -সা -র্া | গা -মধা -পা)} |
স • • ই • • • • • • • • • • • • • •

• ১ ২ ৩
(৮) | [পা -পমা গা | রা রা রগরা I সা -া সা | রগা -মা -পা] II
(৬) | {পধা নর্সা র্সা | না র্সা নর্স I ধা -ণা ধপা | মপা -ধনা -ধনপা |
আ• • কু ল ক রি ল• মো • র• প্রা • • • •ণ্

• ১ ২´ ৩
(-) | (র্মা -র্গা -র্রা | -র্গা -র্রা -র্সা I -র্রা -র্সা -না | -র্সা -না -ধপা)} |
স • ই • • • • • • • • • •

অন্তরা,—ছুট্-দশ্‌কুশি।

১´ ২ ০ ৩ ০ ৪ ০
(১২) I [পা মগমা | রা -া | -া সা | রা -পা | পা -া | মা -ধা | পা -া] I
(৯) II { পা নধা | না -া | -র্সা র্সা | -র্সা -া | ধনা -র্সা | র্সা -না | র্সা -নর্সা I
না জা• নি • • ক তে • ক• • ম • ধু ••

১´ ২ ০ ৩ ০ ৪ ০
(১৩) I [র্সর্সা না | ধা -না | পা -া | মা -া | পা -া | ধা -না | -ধা -পা] I
(১০) I র্রর্গা র্মা | র্পা -া | র্মা -া | র্পা র্মা | র্রা -া | র্সা -র্রর্গা | -র্রা -র্সা I
শ্যা ম না • মে • আ • ছে • গো • • • •

১´ ২ ০ ৩ ০ ৪ ০
(১১) I (র্সা -র্রা | র্গা -র্মা | -র্মা -র্পা | -র্মা -র্গা | -র্রা -র্সা | -না -ধা | -না -র্সা) } I
স ০ ই ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

১´ ২ ০ ৩ ০ ৪ ০
(১৬) I [র্সা নর্সা | ধা -না | পা -ধা | মপা গমা | -রা গা | সরা রগা | -মধা পা] I
(১৪) I { রা পা | মা -া | পা -ধা | পা মগা | -মা রা | সা ন্‌সা | -রগা রা I
ব দ ন ০ ছা ০ ড়ি তে০ ০ না হি পা০ ০০ রে

১´ ২ ০ ৩ ০ ৪ ০
(১৫) I (রা -গা | মা -া | -পা -ধা | -না -র্সা | -র্রা -া | -র্সা -না | -ধা -পা) } I
স ০ ই ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

১´ ২ ০ ৩ ০ ৪ ০
(১৯) I [র্সা না | ধা -না | পা -মপা | মা -া | পা -া | ধনা -র্সনা | ধা -পধা] I
(১৭) I { পমা পা | পা -া | পা -া | পা -া | ধা -পধা | ধনা -ধনা | -পা -া I
জ পি তে ০ জ ০ পি ০ তে ০০ না০ ০০ ০ ম্‌

১´ ২ ০ ৩ ০ ৪ ০
(২০) I [র্সা না | ধা -পা | মা -গা | রা -া | সা -রা | গা -মা | -পা -মপা] I
(১৮) I পা পা | ধা -না | না -া | ধা -া | না -ধনা | ধর্সা -নধা | -পা -মপা } I
অ ব শ ০ ক ০ রি ০ ল ০০ গো০ ০০ ০ ০০

১´ ২ ০ ৩ ০ ৪ ০
(২১) I মপা -া | ধা -পা | -ধা -না | -ধা -না | -র্সা -া | -না -ধা | -নধা -পা I
স০ ০ ই ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০

১ ২ ০ ৩ ০ ৪ ০
(২২) I র্সা র্রা | র্গা -া | র্মা -া | র্পা -া | র্মা -া | র্গর্মা -র্রা | -নর্সা -া I
অ ব শ ০ ক ০ রি ০ ল ০ গো০ ০ ০০ ০

১´ ২ ০ ৩ ০ ৪ ০
(২৫) I [র্মা র্গা | র্রা -র্রর্সা | না -া | ধা পমা | পা -া | মা -পধা | না -পা] I
(২৩) I { পা ধা | র্সনা -র্সর্সা | না -া | র্সনা ধনা | পা -া | মপা -ধনা | ধা -পা I
কে ম নে০ ০পা ই ০ ব০ স০ ই ০ তা০ ০০ রে ০
(২৫)[আ০ মি ০]

১´ ২ ০ ৩ ০ ৪ ০
(২৪) I (র্পা -র্মা | র্গা -র্রা | -র্সা -া | -না -ধা | -পা -মা | গা -রা | -া -সা) } I
স ০ ই ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

সঞ্চারী—ঠুংরী।

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
(২৯) | [রা পা | পা পা I ধা ধা | ধনা -র্সনধা | র্রর্পা র্মর্গা | র্রা র্সা] I
(২৬) II {পা মা | গা রা I সা ন্সা | ধ্না ধ্প্া | ম্মা প্া | ধ্া ন্ধ্া I
না ম প র তা শে॰ যা॰ ॰র্ অই ছ ন ক॰

২´ ৩
(৩০) I [নধা নধা | র্সনা -র্সনর্সা] |
০ ১ ২´ ৩
(২৭) I ন্সা ন্সরা | ন্া -সা | (২৮) | (সা -ন্ধ্া | -প্া ম্গ্া I -ম্পা -ধ্া | -ন্রা -সা) } I
রি॰ ল॰॰ গো ॰ স ॰ই ॰ ॰॰ ॰॰ ॰ ॰॰ ॰

· ১ ২ ৩
(৩৪) | [পধা ধনা | র্সা র্রা I র্গা র্মা | র্গর্রা র্সনধপা |
০ ১
(৩১) | {পসা র্সর্সা | র্সা না I র্সা ধা | পমা পধনধপা | (৩২) | (পা -মগা | -রসা -রা I
অঙ্ গের প র শে কি বা॰ হ॰॰॰য় স ॰ই ॰॰ ॰

০ ১ ২´ ৩
| (৩৭) | [র্সা না | ধা পা I মা পধনা | ধনা -ধধা] |
২´ ৩
(৩৩) I -গা -মধা | -পা -মা) } | (৩৫) | {পা ধা | নর্সা র্রা I র্সনা র্সা | র্সধা -র্সসা |
॰ ॰॰ ॰ ॰॰ যে খা নে॰ ব স॰ তি তা॰ ॰র্

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
(৩৮) | [পা ধা | পমা গরা I সরা রগা | -ররা -া] | (৪২) | [র্সা র্রা | র্গা র্মা] I
(৩৬) | র্সনা র্সর্রা | র্গর্মা র্রর্পা I র্গর্মা র্রা | -নর্সা -র্রর্সা } | (৩৯) | { পা র্সা | র্সনা র্সা I
ন॰ য়॰ নে॰ দে॰ খি॰ য়া ॰গো ॰॰ যু ব তী॰ ধ

২´ ৩
(৪৩) I [র্পর্মা র্গর্গা | র্রর্গর্মর্গা র্রনর্সা] |
০ ১ ২´ ৩
(৪০) I র্রর্সা ননা | ধা পমপা | (৪১) | (পধা -পমা | -পমা -গা I -মগা -রা | -গা -রসা } I
রম্ কই ছে র॰য় স॰ ॰ই ॰॰ ॰ ॰॰ ॰ ॰ ॰॰

আভোগ—লোফা।

০ ৩ ১´ ২
(৪৬) | [-পা া র্সনর্সা | র্সা র্রা র্গা I র্রা -র্গা র্রা | না -র্সা না] |
(৪৭) | { া া পা | ধা র্সা র্রনর্সা I র্সা -র্রর্গা র্রা | না -র্সা র্সা |
॰ ॰ পা স রি তে॰॰ ক ॰॰ রি ম ॰ নে

· ৩ ১´ ২
(৪৭) | [-র্সা -া পা | মা গমা রা I সন্া -সরা -গা | রা -গা -রা] |
(৪৫) | -না -র্সা র্সা | মা মপা পা I মা -পমা -না | ধা -না -ধা } |
॰ ॰ পা স রা॰ না যা ॰॰ য় গো ॰ ॰

০ ৩ ১´ ২
(৪৮) | পা -ধা না | র্সা -না -ধা I পা মা গা | রা গমা পা |
স • ই • • • পা স রা না যায় গো

০ ৩ ১´ ২
(৪৯) | র্সা নর্সা র্সা | নর্সা র্সা না I ধা -পা মা | -পা -ধা -না |
ও গো• পা স• রা না যা য় গো • • •

০ ৩ ১´ ২
(৫২) | [-া া মা | গা রা সা I ন্‌া সা রা | গমা ধপা -া] |
(৫০) | {-না া পা | মা গমা রা I গা মা পা | ধনা ধপা -া |
• • কি ক রি• ব কি হ বে উ• পা• য়

০ ৩ ১´ ২
(৫১) | র্সা -না ধা | -না -ধা -পা I -ধা -পা -মা | -গা -মা -পা) } |
স • ই • • • • • • • • •

০ ৩ ১´ ২
(৪৩) | র্সধা -র্সা না | ধনা ধা পা I মা -ধা -নধা | -পা -া া |
হা• য় কি হ• বে উ পা • •• • য় •

০ ৩ ১´ ২
(৫৬) | [র্সা র্সা র্ | -া র্সা -ধা I র্সর্সা র্সা -া | না -র্সা নর্সা] |
(৫৪) | পা ধা না | -র্সা র্রা -র্গা I র্রর্রা র্গা -র্রা | না -র্সা র্সা |
ক হে দ্বি • জ • চন্ ডী • দা • সে

০ ৩ ১ ২
(৫৭) | [পা পা ধা--নধা র্সা নর্সা I না -ধা -না | -ধা পা -া] |
(৫৫) | না র্সা ধা | ধা পা ধা I ধা -না -র্সা | -না ধা -না } |
কু ল ব তী কু ল না • • • শে •

০ ৩ ১´ ২
(৫৮) | া া পা | পা ধা না I পপা না ধনা | ধা মপা -া |
• • আ প না র বউ ব ন• যা চা• য়

০ ৩ ১´ ২
(৫৯) | পা পা র্সা | র্সা র্সা র্সা I ননা র্সা ধা | ধা মপা -া |
ও গো আ প না র বউ ব ন যা চা• য়

০ ৩ ১´ ২
(৬০) | র্গর্রা র্রা র্সা | না ধনা পা I রপা ধা না | ধা গমা -পা II II
দে০ খ আ প না০ র যউ ব ন যা চা০ য়

১। এ গান খানিই 'সাজাহান' নাটকের শেষ গান। দুঃখের বিষয়, কলিকাতার কোনই প্রকাশ্য অভিনয়ালয়ে আজকাল এ গানটি গীত হয় না। অন্ততঃ আমি গীত হইতে শুনি নাই। তাই থিয়েটারী সুরে গানটির লিপি করিতে পারা গেল না। হয় ত নাটকখানির অভিনয়ারম্ভ-কালে গানটি কোন-এক সুরে গীত হইয়া থাকিবে; কিন্তু তখনকার সে থিয়েটারী চালের এ গানটির সুর যোগাড় করা, আমার পক্ষে অসম্ভব। তা ছাড়া, স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহোদয় কোন্ সুর যে অবলম্বন করিয়া এ গানটি গাহিতেন, সে সুরটিও বিশ্বাস-যোগ্য ভাবে শুনিবার আমার সুযোগ ঘটে নাই। জনৈক গায়ক একদিন আমার সম্মুখে গানখানি গাহিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি যে সুরে গাহিলেন, সেই সুরটিই তিনি স্বর্গীয় মহাত্মার খাস্ কণ্ঠ-নিঃসৃত সুর বলিয়া জানেন, কিন্তু দৃঢ়ভাবে বলিতে পারেন না। স্বর্গীয় মহাত্মার পুত্র, মাননীয় শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় মহাশয়ও 'বার্লিন' হইতে এক পত্রে আমাকে লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেব কোন্ সুরে যে এ গানখানি গাহিতেন, তাহা তাঁহার জানা নাই। অগত্যা এ গানখানির স্বরলিপি করা হইল মৌলিক সুরের ও তালের অনুসরণ করিয়া; অর্থাৎ অবিকল সেই আদি সুরে, যে সুরে সাঁকুলিপুর (নান্নুরের নিকট) গ্রাম নিবাসী জনৈক বৈষ্ণব কীর্ত্তন-গায়ক এ গানখানি গাহিয়া থাকেন।

২। 'ছুট্ দশকুশি'—কীর্ত্তনাঙ্গের গানের একটি প্রধান তালের নাম। ইহা ১৪ মাত্রার তাল, ধ্রুপদাঙ্গের প্রায় 'আড়া-চৌতালে'র মত; তবে চাল্ খুব বিলম্বিত। ঠেকা যথাঃ—

১´ ২ ০ ৩ ০
I ধা -ক্ | ধা ধা | খিটি তাক্ | তেটে তাক্ | দেন্ তা |
থা ক্ থাক্ থাক্ আর্ না পেট্ ভরে গেছে মাগো
৪ ০
| তেটে কতা | গদি ঘেনে
আর্ আমি পারি নেকো

—লেখিকা।

দীক্ষা

শ্রীযামিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত

সন্ন্যাসী বেশে ধনীর তনয় দাঁড়াল সাধুর কাছে,
দীক্ষার তরে যুড়ি দুই কর মিনতি করিয়া যাচে;
সাধু হেসে কয়, হয়নি সময় অভিমানে অনুরাগী
তোমার আঁখিতে পাই যে দেখিতে কামনা রয়েছে জাগি।
ফিরে গেল যুবা পাথেয় অর্থ সঁপিল দীনের তরে,
কৌপীন বাস করঙ্ক শেষ ফিরিছে ভিক্ষা করে'।
চলিল তীর্থে দেবদরশনে দুনয়নে প্রেম ধারা,
নিজ শিরে তুলি তীর্থের ধূলি হইয়ে আপনা-হারা;
দাঁড়াল আবার সাধুর দুয়ারে, তবু পুন হেসে কয়,
যাও ফিরে যাও, হয়নি সময় করনি আত্ম-জয়।
নির্ম্মল চিত্তে ভাবিতে ভাবিতে চকিতে দেখিলা তথা,
মসী দিয়ে আঁকা রয়েছে এখনো সেই চির-অরি কথা;
বহুদিন ধরি মামলা-মালীতে হয়েছে অর্থ ক্ষয়,
তবুও পিতার ভাই দুজনার এ জেদ কমার নয়।
গেছে কতদিন করিবারে খুন পাঠায়ে গুপ্তচর,
ছুটী চলে যুবা আকুল আবেগে সেই প্রতিবেশী ঘর;
শান্ত নয়নে দাঁড়াল দুয়ারে লইয়ে ভিক্ষা ঝুলি;
সাধু আসি কয়, হয়েছে সময়, নিলা তারে বুকে তুলি।

অস্কার ওয়াইল্ড্ বিরচিত সালমে

(একাঙ্কের বিয়োগ নাটিকা)

(মূল ফরাসী হইতে বঙ্গানুবাদ)

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

হেরদ। কেন আমি সুখী হব না? সিজার, যিনি সমস্ত জগতের প্রভু, সর্ব্বাধিপতি, তিনি আমাকে যথেষ্ট ভালবাসেন। সম্প্রতি তিনি আমাকে বহুমূল্য উপঢৌকন সমূহ প্রেরণ করেচেন। তার পর তিনি আমার কাছে প্রতিশ্রুত হয়েচেন যে, তিনি আমার শত্রু কাপ্পাডোকিআর রাজাকে রোমে ডাক্‌বেন। হয় ত রোমে তিনি তাকে ক্রুশে বিদ্ধ করে মেরে ফেল্‌বেন; তিনি যা ইচ্ছা তাই কর্‌তে পারেন ত? সিজার যথার্থই সর্ব্বাধিপতি। তাহলে দেখ্‌চ আমার সুখী হবার দাব আছে। বাস্তবিকই আমি আজ সুখী। এত সুখী আমি আর কখনও হইনি। জগতে এমন কিছুই নেই যাতে আমার সুখ নষ্ট কর্‌তে পারে।

ইওকানানের স্বর। সে রাজাসনে বস্‌বে। সে রক্তবর্ণ ও নীলাভলোহিত পরিচ্ছদ ধারণ কর্‌বে। তৎকৃত ঈশ্বরাবমাননায় পূর্ণ একটি স্বর্ণ পাত্র তার হাতে থাক্‌বে। প্রভুর প্রেরিত দেবদূত তাকে নিহত কর্‌বে। সে কীটের ভোজ্য হবে।

হেরদিআস। শোন, তোমার বিষয় ও কি বল্‌চে। ও বল্‌চে যে তুমি কীটের ভোজ্য হবে।

হেরদ। উনি আমার সম্বন্ধে কিছু বল্‌চেন না। উনি আমার বিরুদ্ধে কখনও কিছু বলেন না। উনি কাপ্পাডোকিআর রাজার বিষয় বল্‌চেন। কাপ্পাডোকিআর রাজা গো, যে আমার শত্রু। সেই কীটের ভোজ্য হবে। আমি না। আমি আমার ভ্রাতৃজায়াকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে যে পাপাচরণ করেছি, তা ছাড়া উনি আমার বিরুদ্ধে আর একটা কথাও বলেন নি। হয় ত উনি যথা কথাই বলেন। কারণ, সত্য কথা বল্‌তে কি, তুমি বন্ধ্যা।

হেরদিআস। আমি বন্ধ্যা? আমি? এ কথা তুমি বল্‌চ? আর আমার কন্যার দিকে তুমি বরাবর চেয়ে আছ! তোমার আনন্দের জন্য তোমার সম্মুখে আমার কন্যাকে নাচাতে চাইচ! এ রকম কথা বলা একেবারে পাগ্‌লামি। আমি ত সন্তানবতী। তোমার কোনও সন্তান নেই, না, এমন কি তোমার ক্রীতদাসীদের হতেও না। নিস্তেজ তুমি; আমি বন্ধ্যা নই।

হেরদ। চুপ্ কর নারি! আমি বল্‌চি যে তুমি বন্ধ্যা। আমার সন্তান তুমি গর্ভে ধারণ কর নি আর সিদ্ধ-পুরুষ বল্‌চেন যে আমাদের বিবাহ যথার্থ বিবাহ নয়। উনি বল্‌চেন যে এটা অগম্যাগমন বিবাহ, এ বিবাহে অমঙ্গল আনে।...আমার মনে হয় যে ওঁর কথাই ঠিক; আমি নিশ্চিত জানি যে উনি ঠিক বলেচেন। কিন্তু এখন আর এ সকল কথা বল্‌বার সময় নয়। এখন আমি আনন্দ উপভোগ কর্‌তে চাই। বাস্তবিক আমি সুখী। কোনও অভাবই আমার নেই।

হেরদিআস। আজ রাত্রিতে তোমার সরল ভাবটা দেখে আমি বড় আনন্দিত হলুম। এ ভাবটা সচরাচর তোমার থাকে না। কিন্তু রাত্রি বেশী হয়ে গেল। এস, ভিতরে যাই। ভুলে যেও না যেন, যে কাল সূর্য্যোদয়ে আমাদের শীকারে যেতে হবে। সিজারের দূতগণকে যথোচিত সংবর্দ্ধনা কর্‌তে হবে, তা নয় কি?

দ্বিতীয় সৈনিক। টেট্রার্কের মুখ কি বিষণ্ণ!

প্রথম সৈনিক। হাঁ, তাঁর মুখ বিষণ্ণ।

হেরদ। সালমে, সালমে, আমার সাম্‌নে নাচ। আমি তোমাকে অনুরোধ কর্‌চি, আমার সাম্‌নে নাচ। আজ এই নিশিথে আমার হৃদয় বিষাদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেচে। হাঁ; বিষাদে একেবারে কূলে কূলে পূর্ণ হয়ে উঠেচে। যথ

আমি আসি, তখন রক্তের উপর আমার পা পিছ্‌লে গিয়েছিল, এটা একটা কুলক্ষণ; আর আমি শুনেছিলাম, আমি নিশ্চয়ই শুনেছিলাম যেন আকাশে একটা পক্ষপুটের আঘাত-শব্দ হচ্ছিল, একটা সুবৃহৎ পক্ষপুটের আঘাতশব্দ। এর মানে কি আমি তা বল্‌তে পারি না।...আজ এই নিশিথে আমার হৃদয় বিষাদে পরিপূর্ণ। সেই জন্যে বল্‌চি আজ তুমি আমার সাম্‌নে নাচ। আমার সম্মুখে একবার নাচ, সালমে, আমি তোমাকে মিনতি করে বল্‌চি। যদি তুমি আমার সম্মুখে নাচ, তা হলে তুমি তোমার যা ইচ্ছা তাই আমার নিকট চাইতে পারবে, আর আমিও তোমাকে তাই দেব, এমন কি আমার অৰ্দ্ধেক রাজ্য পর্যান্তও।

সালমে। [উঠিয়া] টেট্রার্ক, আমি যা চাইব বাস্তবিকই কি আপনি আমাকে তাই দেবেন?

হেরদিআস। কন্যা, তুমি নৃত্য কর' না।

সালমে। আপনি কি তা শপথ করে বল্‌চেন, টেট্রার্ক?

হেরদ। আমি শপথ কর্‌চি, সালমে।

হেরদিআস। নৃত্য কর' না, কন্যা।

সালমে। আপনি কিসের উপর শপথ কর্‌চেন, টেট্রার্ক?

হেরদ। আমার জীবনের উপর, আমার মুকুটের উপর, আমার সকল দেবতার নাম নিয়ে শপথ কর্‌চি। তুমি যা স্বইচ্ছায় চাইবে আমি তোমাকে তাই দেব, এমন কি আমার অৰ্দ্ধেক রাজ্য পর্য্যন্তও, যদি তুমি আমার সাম্‌নে নাচ। ওঃ, সালমে, আমার সম্মুখে নাচ।

সালমে। আপনি শপথ করেচেন, টেট্রার্ক

হেরদ। আমি শপথ করেচি, সালমে।

সালমে। এই সকলই আমি চাই, এমন কি আপনার অৰ্দ্ধেক রাজ্য অবধি।

হেরদিআস। তুমি নৃত্য কর' না, কন্যা।

হেরদ। এমন কি আমার অৰ্দ্ধেক রাজ্য পর্য্যন্তও আমি তোমাকে দেব, আমি প্রতিশ্রুত হলাম। তুমি যদি আমার অৰ্দ্ধেক রাজ্য চাও, তা তার তুমি রাণী হবার উপযুক্ত সুন্দরী বটে। ওকি রাণীর মতই সুন্দরী নয়? আঃ! এখানে ঠাণ্ডা বোধ হচ্চে! বরফের মত ঠাণ্ডা বাতাস বইচে, আর আমি শুনতে পাচ্চি—যেন আমি বাতাসে পক্ষপুটের আঘাত শব্দ শুন্‌তে পাচ্চি? ওই যেন মনে হয় একটা পাখী, একটা প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণের পাখী এই চত্বরের উপর ঘুরে ঘুরে উড়ে বেড়াচ্চে। আমি ওটাকে দেখ্‌তে পাচ্চি না কেন?—ঐ পাখীটাকে? ওর পক্ষপুটের আঘাত শব্দটা বড় ভয়ানক। ওর পক্ষের বাতাসটাও ভয়ানক। বড় ঠাণ্ডা—না, না, ঠাণ্ডা নয়, গরম। আমার ত দম আট্‌কে যাচ্চে। আমার হাতে জল ঢেলে দাও। আমাকে বরফ দাও—খেতে। আমার আংরাখা আল্‌গা করে দাও। শীঘ্র! শীঘ্র! আল্‌গা করে দাও আমার আংরাখা। না, থাক্, ছেড়ে দাও। আমার মালাগাছটাই লাগ্‌চে, এই যে গো, এই গোলাপের মালাছড়াটা। ফুলগুলো আগুনের মত—আমার কপালটাকে পুড়িয়ে দিলে। [মালাটি মাথা হইতে লইয়া ছিঁড়িয়া টেবিলের উপর ফেলিয়া দিলেন।] আঃ! এখন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌লাম। কেমন লাল ঐ পাপ্‌ড়ীগুলো! ওগুলো যেন ঐ কাপড়ের উপর রক্তের দাগ লেগেচে। ছেড়ে দাও ওকথা। সব বিষয়ে লক্ষণ খুঁজ্‌তে গেলে চলে না। জীবন একেবারে অসম্ভব রকম দুর্ব্বহ হয়ে পড়ে। তার চেয়ে বরং বলা ভাল যে রক্তের দাগ গোলাপের পাপ্‌ড়ীর মত সুন্দর। হাঁ, এই কথা বলাই ঢের ভাল...কিন্তু আর ও কথা বলে কাজ নেই। এখন আমি সুখী, আমি এখন বড় সুখী। আমার কি সুখী হবার অধিকার নেই? তোমার মেয়ে আমার সম্মুখে নাচ্‌বে। আমার সাম্‌নে তুমি নাচ্‌বে না, সালমে? তুমি স্বীকার করেচ আমার সাম্‌নে নাচ্‌বে বলে।

হেরদিআস। আমি ওকে নাচ্‌তে দেব না।

সালমে। টেট্রার্ক, আমি আপনার সাম্‌নে নাচ্‌ব।

হেরদ। তোমার মেয়ে কি বল্‌চে শোন। সে আমার সাম্‌নে নাচতে চাচ্চে। বেশ, সালমে, বেশ, তুমি আমার সাম্‌নে নাচ্‌বে; ভাল। আর তোমার নৃত্য শেষে ভুলনা, তোমার যা ইচ্ছে হবে তাই তুমি আমার কাছে চাইবে। তুমি যা চাইবে তাই আমি তোমাকে দেব, এমন কি আমার অৰ্দ্ধেক রাজ্য পর্য্যন্তও। আমি তা শপথ করেচি, নয় কি?

সালমে। আপনি তা শপথ করেচেন, টেট্রার্ক।

হেরদ। আর আমি কখনও আমার কথার খেলাপ করিনি। আমি দিব্য করে কখনও তা ভঙ্গ করিনি। আমি মিথ্যা কথা জানি না। আমি আমার কথার দাস, আর আমার কথা হচ্চে রাজার কথা। কাপ্পাডোকিআর

রাজা সর্ব্বদাই মিথ্যা কথা বলে, কিন্তু সে ত আর যথার্থ রাজা নয়। সে কাপুরুষ। আরও, সে আমার কাছে টাকা ধারে, তা সে কখনও আর শোধ করবে না। এমন কি সে আমার দূতগণের অপমান করেচে। সে আমার প্রাণে ব্যথা দিয়ে অনেক কথাই বলেচে। কিন্তু যখন সে রোমে যাবে, তখন সিজার তাকে ক্রুশে বিদ্ধ করে মেরে ফেল্‌বেন। আমি নিশ্চয় জানি যে সিজার তাকে ক্রুশে বিদ্ধ করে মেরে ফেল্‌বেন। আর যদি তাও না হয়, তাহলেও সে কীটভোজ্য হয়ে মরবে। সিদ্ধপুরুষ এ বিষয় সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেচেন। বেশ! তবে দেরী করচ কেন, সালমে?

সালমে। আমি আমার দাসগণের জন্য অপেক্ষা করচি। তারা আমার জন্য গন্ধদ্রব্য ও সপ্তাবগুণ্ঠন আন্‌বে, আর আমার পাদুকা খুলে নেবে।

[দাসগণ গন্ধদ্রব্য ও সপ্তাবগুণ্ঠন আনয়ন করিল এবং সালমের পাদুকা খুলিয়া লইল।]

হেরদ। ওঃ, তুমি নগ্নপদে নৃত্য করবে। তা বেশ! তা বেশ! তোমার ছোট ছোট পা দুখানি দুটি শ্বেত কপোতিকার মত দেখাবে। গাছের উপর নৃত্যপর ক্ষুদ্র, শ্বেত পুষ্পগুলির মত তোমার পা দুখানি মনে হবে।... না, না, ও রক্তের উপর নৃত্য করতে যাচ্ছে। মেঝেয় রক্তের ছড়াছাড়ি। ও যেন রক্তের উপর নৃত্য না করে। সেটা একটা কুলক্ষণ।

হেরদিআস। ও যদি রক্তের উপরই নৃত্য করে, তাতে তোমার কি? তুমি ত যথেষ্ট গভীর রক্তের মধ্য দিয়ে পার হয়ে এসেচ।...

হেরদ। তাতে আমার কি? আঃ! চাঁদের পানে চেয়ে দেখ! চাঁদটা লাল হয়ে উঠেচে। চাঁদটা রক্তের মত লাল হয়ে উঠেচে। আঃ! সিদ্ধপুরুষ যথার্থই বলেচেন। তিনি ভবিষ্যদ্‌বাণী করেচেন যে চাঁদ রক্তের মত লাল হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী তিনি কি করেন নি? তোমরা সকলেই ত তাঁর কথা শুনেচ। আর এখন চাঁদটা রক্তের ন্যায় লাল হয়ে উঠেচে। তা তোমরা দেখ্‌চ না কি?

হেরদিআস। হাঁ, হাঁ, ঠিক; আমি তা বেশ দেখ্‌চি, আর তারাগুলো পাকা ডুমুরের মত পড়্‌চে, নয় কি? আর সূর্য্যটা কেশ নির্ম্মিত শোকাম্বরের মত কাল হয়ে আস্‌চে, আর পৃথিবীর রাজারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেচে।... এস, ভিতরে যাই। তুমি অসুস্থ। রোমে ফিরে গিয়ে সকলে বল্‌বে যে তুমি পাগল হয়েচ। এস, শোন, ভিতরে চল।

ইওকানানের স্বর। কে ইনি এদম থেকে আস্‌ছেন, কে ইনি বজরা থেকে আস্‌চেন, যাঁর পরিচ্ছদ নীলাভ-লোহিত বর্ণ, যিনি তাঁর বস্ত্রের সৌন্দর্য্যে ভাস্বর, যিনি তাঁর আপনার মহত্ত্বে শক্তিমান হয়ে বেড়াচ্চেন? কেন আপনার পরিচ্ছদে লাল দাগ লেগে রয়েচে?

হেরদিআস। চল, ভিতরে যাই। এই লোকটার স্বরে আমাকে পাগল করে দেয়। ও ক্রমাগত চিৎকার করতে থাক্‌লে আমি আমার মেয়েকে নাচ্‌তে দেব না। তুমি ওর দিকে অমন করে চেয়ে থাক্‌লে আমি ওকে নাচ্‌তে দেব না। এক কথায়, আমি ওকে নাচ্‌তে দেব না।

হেরদ। উঠ না, প্রেয়সি আমার, মহিষি আমার; তাতে তোমার কোনও লাভ নাই। ও না নাচ্‌লে আমি ভিতরে যাব না। নাচ, সালমে, আমার সাম্‌নে নাচ!

হেরদিআস। নৃত্য কর' না, কন্যা আমার।

সালমে। আমি প্রস্তুত, টেট্রার্ক।

[সালমে সপ্তাবগুণ্ঠনের নৃত্য করিলেন।]

হেরদ। আঃ! চমৎকার! চমৎকার! তুমি দেখ্‌লে তোমার কন্যা আমার সাম্‌নে নাচ্‌ল। কাছে এস, সালমে, কাছে এস, আমি তোমাকে পুরস্কার দেব। আঃ! আমি নর্ত্তক নর্ত্তকীদের যথেষ্ট পারিশ্রমিক দিয়ে থাকি। আমি মুক্ত হস্তে তোমাকে তোমার পারিশ্রমিক দেব। তোমার প্রাণের কামনা পূর্ণ করে তোমাকে আমি পারিতোষিক দেব। কি তোমার চাই? বল!

সালমে। [নতজানু হইয়া] আমি ইচ্ছা করি যে এখনই কেউ একখানি রূপার থালায় আমায় কাছে নিয়ে আসে...

হেরদ। [সহাস্যে] একখানি রূপর থালায়? হাঁ নিশ্চয়ই, একখানি রূপর থালায়। ও একেবারে মোহিনী, নয় কি? অয়ি মাধুর্য্যময়ি, সুন্দরি, সালমে, তুমি ইহুদার সকল কন্যাগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী; তুমি একখানি রূপর থালায় কি চাও, লাবণ্যময়ি? একখানি রূপার থালায় তোমার কাছে কি আন্‌বে? আমাকে বল। তা যাই

হক, তা তোমাকে দেওয়া হবে। আমার সমস্ত ধনরত্নই ত তোমার। কি আন্‌বে, সালমে?

সালমে। [উঠিয়া] ইওকানানের মাথা।

হেরদিআস। আঃ! বেশ বলেচ কন্যা।

হেরদ। না, না!

হেরদিআস। বেশ বলেচ, কন্যা।

হেরদ। না, না, সালমে। ও জিনিসটা তুমি আমার কাছে চেও না। তোমার মাএর কথা তুমি শুন না। ও বরাবর তোমাকে কুপরামর্শ দিচ্চে। ওর কথায় তুমি কান দিও না।

সালমে। আমার মাএর কথায় আমি কান দিচ্চি না। আমার ইচ্ছানুসারেই ইওকানানের মাথা একখানি রূপর থালায় আমি চাইচি। আপনি শপথ করেচেন, হেরদ। আপনি দিব্য করেচেন, এ কথা আপনি যেন ভুল্‌বেন না।

হেরদ। আমি তা জানি। আমি আমার দেবতাদের নামে শপথ করেচি। আমি তোমাকে অনুরোধ কর্‌চি, সালমে, তুমি আমার নিকট অন্য কিছু প্রার্থনা কর। আমার কাছে তুমি আমার অর্দ্ধেক রাজ্যই প্রার্থনা কর, আমি তাই তোমাকে দেব। কিন্তু যা চেয়েচ তা তুমি আর আমার কাছে চেও না।

সালমে। আমি আপনার কাছে ইওকানানের মাথা প্রার্থনা কর্‌চি।

হেরদ। না, না, আমার তা ইচ্ছা নয়।

সালমে। আপনি শপথ করেচেন, হেরদ।

হেরদিআস। হাঁ, তুমি শপথ করেচ। সকলেই তা শুনেচে। সকলের সাক্ষাতে তুমি দিব্য করে এটা অঙ্গীকার করেচ।

হেরদ। চুপ্‌ কর! তোমার সঙ্গে আমি কথা কইচি না।

হেরদিআস। আমার কন্যা ইওকানানের মাথাটা চেয়ে উত্তম করেচে। এই লোকটা অপমানে আর অপবাদে আমাকে ছেয়ে ফেলেচে। সে আমার বিরুদ্ধে অনেক ভীষণ কথা বলেচে। সকলেই বুঝ্‌তে পার্‌চে যে সালমে তার মাকে বড় ভালবাসে। তুমি ছেড় না, কন্যা। উনি শপথ করেচেন, উনি শপথ করেচেন।

হেরদ। চুপ্‌ কর, আমার সঙ্গে কথা কয়ো না!... শোন, সালমে, ন্যায়ানুগতরূপ প্রার্থনা কর। আমি কখনও তোমার প্রতি কঠোর ব্যবহার করিনি। আমি তোমাকে বরাবর ভালবেসেচি।...হয়ত আমি তোমাকে অতিরিক্ত ভালবেসেচি। সেই জন্যই বল্‌চি যে এ জিনিসটা আর তুমি আমার কাছে চেও না। নিশ্চয়ই আমার মনে হচ্চে যে তুমি উপহাস কর্‌চ। মানুষের দেহ থেকে মাথাটা কেটে নিলে খারাপ দেখায়,—নয় কি? কুমারীর চক্ষে এ রকম জিনিস দেখা উচিত নয়। এতে কি আমোদ তুমি পেতে পার?—কিছুই না। না, না, এটা ঠিক তোমার ইচ্ছা নয়। আমার কথা শোন। আমার একটি মরকত আছে, বেশ বড় গোল মরকত; এটা সিজারের প্রিয়পাত্র আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যদি তুমি এই মরকতের ভিতর দিয়ে দেখ ত বহুদূরের ঘটনা তুমি দেখ্‌তে পাবে। সিজার নিজে যখন সার্কাসে যান তখন এই রকমেরই একটা মরকত ধারণ করেন। কিন্তু আমার মরকত তাঁর টার চেয়ে বড়। আমি বেশ জানি যে এটা সিজারের মরকতের চেয়ে বড়। পৃথিবীর মধ্যে এই মরকতটাই সবচেয়ে বড়। তুমি সেটা পছন্দ কর্‌বে, তা নয় কি? সেটা তুমি আমার কাছে চাও, আমি তা তোমাকে দেব।

সালমে। আমি ইওকানানের মাথাটা চাই।

হেরদ। তুমি আমার কথা শুন্‌চ না। তুমি আমার কথা শুন্‌চ না। সালমে, আমাকে বল্‌তে দাও।

সালমে। ইওকানানের মাথা। [ক্রমশঃ]

নিখিল প্রবাহ

শ্রীনরেন্দ্র দেব

১। আর্স্কিন্ চাইল্ডার্স

ইনি ইংরেজ, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট্, সুপণ্ডিত এবং অসাধারণ বুদ্ধিমান। এত বড় স্বদেশ-প্রেমিক অতি অল্পই দেখ্তে পাওয়া যায়। মাতৃ-ভূমির মঙ্গলের জন্য ইনি দু'বার সাধারণ সৈনিকের মত রণক্ষেত্রে যুদ্ধ কর্তে গেছলেন এবং নিজের অকুতোভয় সাহস ও

আর্স্কিন্ চাইল্ডার্স্

বীরত্বের গুণে যশ ও সম্মান অর্জ্জন করেছিলেন। সামরিক বিভাগ এই জন্য এঁকে বিশিষ্ট পদকে ভূষিত ক'রেছিল। কিন্তু ১৯২০ সাল থেকে ইনি আয়ার্লাণ্ডের স্বাধীনতার জন্য নিজেকে কায়মনোবাক্যে উৎসর্গ করেছিলেন। এঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সবল বাহু আইরিশ অধিনায়ক ডি ভেলেরার প্রধান অবলম্বন ছিল।

সেদিন আয়ার্লাণ্ডের নূতন 'ফ্রীষ্টেট্' গভর্মেণ্ট এই স্বার্থ-ত্যাগী, পরার্থে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ মহাবীরের প্রাণ-দণ্ড করেছে। দণ্ডাজ্ঞায় লেখা ছিল যে 'স্বাধীন আয়ার্লাণ্ডের শান্তি-রক্ষার জন্য এবং তাকে নিরাপদ করবার উদ্দেশ্যে তোমার প্রাণদণ্ডের প্রয়োজন হ'য়েছে'!—অথচ আর্স্কিন্ চাইল্ডার্সের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই যে—তিনি বিনা অনুমতিতে পিস্তল সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলেন! এই লঘু-পাপে গুরু-দণ্ডের কারণ আর কিছুই নয় কেবল ডি ভেলেরাকে জব্দ করা! কারণ আর্স্কিন চাইল্ডার্স্ ডি ভেলেরার একেবারে ডান হাত ছিল। মাইকেল কলিন্স্ ও আর্থার গ্রিফিথের হত্যা ব্যাপারে নিশ্চয়ই চাইল্ডার্স জড়িত ছিল, এই সন্দেহও তাঁর প্রাণদণ্ডের আর একটা কারণ।

সহযোগীর প্রতি এই অবিচারে ডি ভেলেরা একেবারে ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠেছে এবং এই অন্যায়ের ভীষণ প্রতিশোধ নেবে বলে ঘোষণা করে দিয়েছে। মোটের উপর দেখা যাচ্ছে যে, আয়র্লাণ্ডের যে শক্তি একদিন ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র উন্মোচন ক'রে সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়েছিল, আজ তারা আপনারাই পরস্পরের প্রাণ বিনাশ করে, শুধু যে সেই শক্তির অপব্যয় ক'রছে তা নয়, সঙ্গে-সঙ্গে দেশেরও সর্ব্বনাশ ক'রছে!

২। খলীফা ও তুর্কীর সুলতান

মুস্তাফা কেমাল পাশা আজ তুর্কীর সিংহাসনে পলাতক সুলতানের জ্ঞাতি-ভ্রাতা আবদুল মজীদকে স্থাপন করেছেন। কিন্তু তাঁকে 'খেলাফৎ' দেন নি, অর্থাৎ যেমন নিয়ম ছিল যে, যিনিই রুমের বাদ্শা হবেন তিনিই সমস্ত মুসলমান জগতের প্রধান ধর্ম্মরাজও হবেন—সেই অধিকারটুকু এই বর্ত্তমান সুলতান আবদুল মজীদকে দেওয়া হ'য় নি। আঙ্গোরা গভর্মেণ্ট্ বলেন রাজ-তন্ত্র ও ধর্ম্ম-তন্ত্র দু'জন ভিন্ন ভিন্ন লোকের হাতে থাকাই বাঞ্ছনীয়; বিশেষ কোরাণের নির্দ্দেশ মত ধর্ম্ম-ভার কোনও ওসমান বংশীয় সৎপুরুষের

রূমের নূতন বাদশা ও বাদশাজাদী
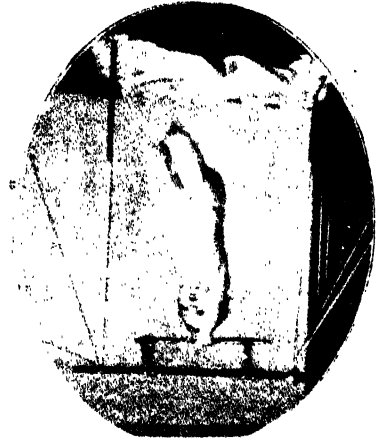
ম্যাথ্ জিউয়েট্

দেড় মাসের ছেলে একগাছা রূল ধরে দীর্ঘকাল শূন্যে ঝুলে থাকতে পারে।

পল বার্ণার হাম্‌ফ্রে

পাঁচ মাসের ছেলে, পায়ের কাছে ধ'রলে সমস্ত শরীরটা সাম্‌নে দিকে সমানভাবে ঝুকিয়ে রাখ্‌তে পারে।
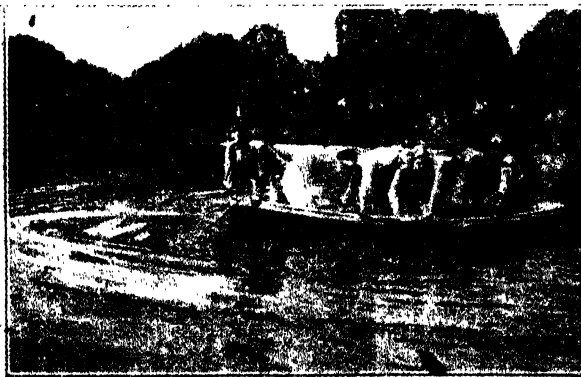
ফ্লোরেন্স্ ক্রাউদে

ছ'বছরের মেয়ে আমেরিকায় সবচেয়ে বড় অল্পবয়সী সাঁতারু।

সাঁতরে নৌকো টানা

ফ্লোরেন্স ক্রাউদে কোমরে দড়ী বেঁধে সাঁতরানো নৌকো টানছে

উপর দেওয়া উচিত। এদিকে ইংরাজের আশ্রয়ে এসে পলাতক সুলতান বল্‌ছেন আমি এখনও রাজ্যাধিকার পরিত্যাগ করি নি, এবং কারুর দ্বারা আমি এ পর্য্যন্ত সিংহাসনচ্যুতও হয় নি; অতএব আমিই এখনও মসলমান জগতের ন্যায়-

হামৃক্রের আরও কয়টি কীর্ত্তি

এদিকে এই যে সুলতান অদল বদল হ'য়ে গেল, নূতন বাদশা নির্ব্বাচিত হ'লেন, অথচ রাজ্য-ভারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাতে নিখিল মুসলমানের ধর্ম্ম-ভার দেওয়া হ'ল না, এই নিয়ে মুসলমান জগতে তেমন একটা কিছু হৈ চৈ পড়্‌ল না; সাবেক সুলতানের দল বর্ত্তমান সুলতানের দলের সঙ্গে একটা ছোট-খাটো দাঙ্গাও বাধালে না। কন্সটান্টিনোপলের রাজপথ মোটেই রুধিরাক্ত হ'য়ে উঠল না। এই দেখে তুর্কীর শত্রু-পক্ষরা বড়ই হতাশ হ'য়ে পড়েছেন। তাঁরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্‌ছেন, রুমের বাদ্‌শার প্রতি মুসলমানদের আর তেমন শ্রদ্ধা-ভক্তি নেই।

এখন তাই বিপক্ষ দল থেকে চেষ্টা চল্‌ছে এইটেই প্রমাণ কর্ব্বার যে, তুর্কীর সিংহাসন পেলেই সমস্ত মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বীর শাসনভার পাওয়া যায় না। রুমের বাদ্‌শা এতদিন যে অধিকার ভোগ করে আস্‌ছিলেন, সেটা

ভজিনীয়া ষ্টাম্‌
পাঁচ বছরের জিম্‌নাষ্টিক ওস্তাদ্‌

কেবল মাত্র গায়ের জোরে। মুসলমান-জগতের খলীফ হ'তে গেলে তাঁকে হজরত মহম্মদের নিকট আত্মীয় অথবা অন্ততঃ-পক্ষে দূর সম্পর্কের আত্মীয়ও হ'তে হবে এবং তাঁর অভিষেক হ'বে মক্কায়; আর শ্রীপাঠও হবে ওই মক্কাধাম!

পলাতক সুলতান, শোনা যায়, উপস্থিত মক্কায় অবস্থান ক'রছেন।

৩। শিশুপাল পালওয়ান

কচি ছেলেকে পালোয়ান ক'রে তোলা আজকাল আমেরিকার যেন একটা ফ্যাশান হ'য়ে উঠেছে। এক একটি শিশু এমন অদ্ভুত ব্যায়াম-চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়েছে যে, বৈজ্ঞানিকেরা চিন্তা ক'রতে আরম্ভ করেছেন যে শিশুর নিয়মিত ব্যায়ামের ব্যবস্থা করা উচিত কি না?

ম্যাথু হিউয়েট্‌ বলে একটী ছেলের বয়স যখন সবে পনেরো দিন, তখন থেকেই তার বাপ মা তাকে মেহনৎ

[illegible]মাসের [illegible] শিখেছে

আন্টোনীয়ে সান্‌রোম
আড়াই বছরের ছেলে, বাইসিকিল্
রেসে বাজী জিতেছে।

লেঅঁার্‌ শিন্ডার
তিন বছরের পালওয়ান। সর্ব্বাঙ্গের
মাংসপেশী ইচ্ছামাত্র ফোলাতে পারে।
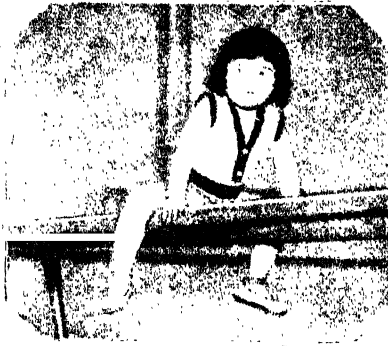
শিশু স্যামসন
এখনও পাঁচ বছর বয়স পূর্ণ হয় নি। রীতিমত ব্যায়াম অভ্যাস করে; দম দিয়ে ইচ্ছামাত্র আড়াই ইঞ্চিরও বেশী ছাতি ফোলাতে পারে।

করাতে আরম্ভ করেন। প্রথমে তার সামনে ছোট-খাটো হাল্‌কা জিনিস ধরে শিশুকে সেটা নিজের চেষ্টায় টেনে নিতে শেখান। এই রকম উপায়ে শিশুর হাতের মাংসপেশী এত সত্বর সবল হ'য়ে উঠেছিল যে, জিউয়েট্ যখন দেড় মাসের ছেলে, তখন সে একগাছা সরু রুল ধরে দীর্ঘকাল শূন্যে ঝুলে থাক্‌তে পারতো।

পল বার্ণার হাম্‌ফ্রে বলে আর একটি ছেলের ব্যাপার আরও আশ্চর্য্যজনক। বার্ণায় যখন দু'মাসের ছেলে, তখন থেকে প্রত্যহ ভোর ছটার সময় তাকে নিয়মিত ব্যায়াম অভ্যাস করানো হোতো। প্রথমে তাকে এক পা ধরে তারপর আর এক পা ধরে নীচের দিকে মাথা করে উল্টে ধরা [illegible]

প্রথমে উপুড় করে শুইয়ে পরে পা ধ'রে আস্তে আস্তে তোলা, যতক্ষণ না ছেলে শুধু হাতের উপর ভর দিয়ে থাকে।

ছেলের স্বাভাবিক অবস্থা—তিন মাসে মাথা তোলে ও রুল ধরে ঝুলতে পারে, আট মাসে উঠে বসে, দশ মাসে দাঁড়ায়, দেড় বছরে হাঁটবেই।

শিশুর ঘাড় ও বুকের ব্যায়াম
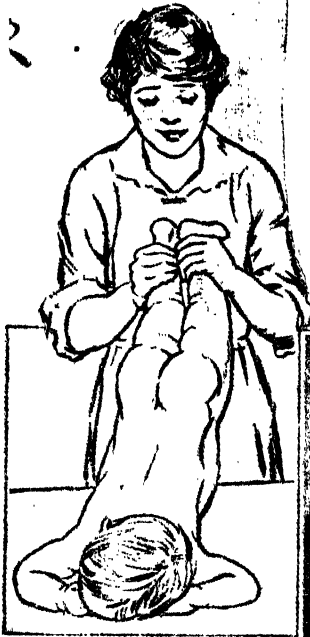
শিশুর বুকের ব্যায়াম

প্রথম চিৎ করে শুইয়ে, তারপর পা'দুটো ধরে আস্তে আস্তে তোলা, তারপর পিঠে একটা হাত দিয়ে ছেলেকে শুধু তার মাথার উপর ভর দিয়ে রাখা।
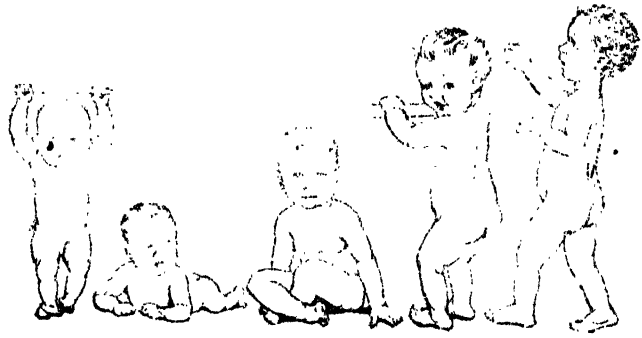
শিশুর শিরদাঁড়া ও বুকের ব্যায়াম

প্রথম উপুড় করে ফেলে হাত দুটো সাম্‌নে লম্বা করে দিতে হবে, তারপর দুই হাত ধরে আস্তে আস্তে টেনে তোলা, আবার নামিয়ে দেওয়া, পঁচবার করতে হবে।

শিশুর পায়ের ব্যায়াম

প্রথমে চিৎ করে শুইয়ে তারপর দুই পা ধ'রে ক্রমাগত দশ মিনিট কাল একবার হাঁটুর কাছে একবার কোমরের কাছে মুড়তে হবে, আবার খুলতে হবে।

মাংস-পেশী সবল করবার উদ্দেশ্যে তাকে হাতের তেলোয় চিৎ করে ফেলা হ'তো, আর তার ছোট্ট শরীরটি একেবারে ধনুকের মত বেঁকে থাক্‌তো। সে যখন পাঁচ মাসের ছেলে, তখন থেকে এক হাতে একটা রুল ধরে সমস্ত

এক্স্‌রে বিরোধী বর্ম্ম

এক্স্‌রের নিদারুণ অভিসম্পাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে এক্স্‌রে-কর্ম্মীরা আজকাল রবার ও শীষক মিশ্রিত মুখোস, দস্তানা ও আঙ্‌রাখা ব্যবহার করছেন।

শরীরের ভার অনেকক্ষণ শূন্যে ঝুলিয়ে রাখতে পারতো, কিম্বা তার পায়ের মাঝখানটা চেপে ধর্‌লে, সে হেঁট হ'য়ে সমস্ত শরীরটা সাম্‌নের দিকে লম্বা করে দিয়ে ঋজু ভাবে থাক্‌তে পারতো!

ফ্লোরেন্স্‌ ফ্রাউদে বলে একটি মেয়েকেও এই রকম ছেলেবেলা থেকে ব্যায়াম অভ্যাস করানো হ'য়েছিল। সে যেই হামা টান্‌তে সুরু করেছিল, তখন থেকেই তাকে বাইরে ছেড়ে রাখা হ'তো। সে সারাদিন সেই ধূলো-কাদায় হিমে-জলে খোলা মাঠের ওপর হামা টেনে বেড়াতো। দু' বছর বয়স থেকেই তাকে নদীতে স্নান করানো এবং সাঁতার অভ্যাস করানো হ'য়েছিল। এখন তার বয়স ছ' বছর, কিন্তু সমস্ত আমেরিকার ভিতর তার সমবয়সী ওস্তাদ সাঁতারু আর কেউ নেই।

ছেলেদের এই নিতান্ত শৈশবাবস্থা থেকেই ব্যায়াম অভ্যাস করানোর ফলে দেখা যাচ্ছে যে—ছ'মাসের ছেলে দাঁড়াতে শিখ্‌ছে; যার বুকের মাপ ছিল আঠারো ইঞ্চি, তার হ'য়েছে একুশ ইঞ্চি; যার ওজন ছিল সাত সের, সে হ'য়েছে আট সের। এই সব দেখে-শুনে এখন আর ছেলেদের সেই পাঁচ সাত বছর বয়স না হওয়া পর্য্যন্ত কোনও মেহনৎ ক'রতে দেওয়া উচিত নয়, কচি ছেলে কাঁথায় শুয়ে হাত পা ছুঁড়ে এপাশ ওপাশ উল্টে, উপুড় হ'য়ে, বুক পেছ্‌লা দিয়ে, হামা টেনে, কেঁদে, হেঁসে যথেষ্ট পরিশ্রম করে—এই সব আগেকার ধারণাকে নির্ভুল বলে বসে থাকা চলে না।

জার্ম্মাণিও শিশুর ব্যায়াম নিয়ে উঠে-পড়ে লেগেছে। অনেক বড় বড় ডাক্তার পরীক্ষা ক'রে শিশুর ব্যায়াম অভ্যাসের উপকারিতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হ'য়ে একমত

[illegible]
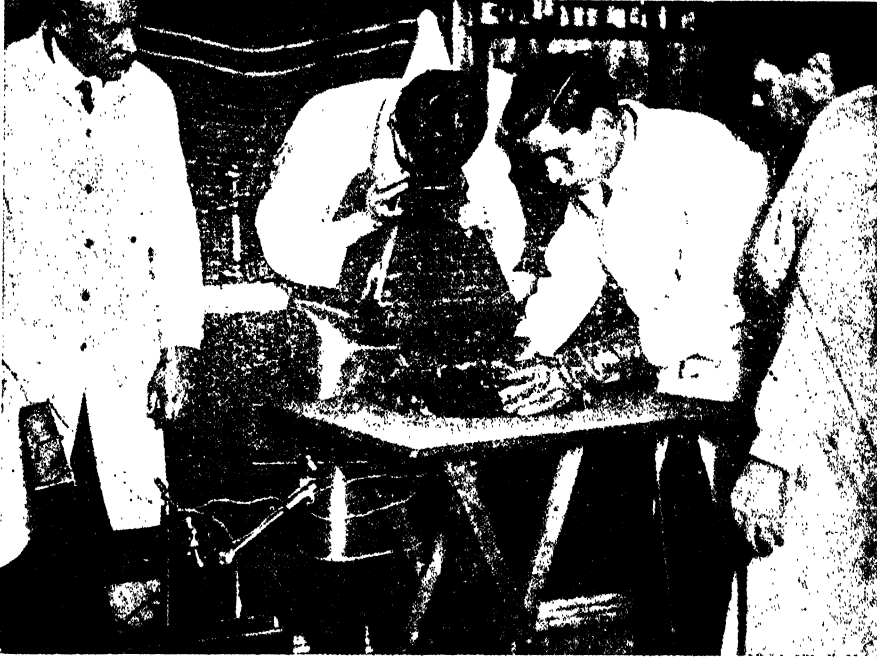
বিড়াল-ছানা পরীক্ষা

বিড়াল-ছানাটি গাড়ী-চাপা পড়েছিল, তাই দেখা হচ্ছে কোনও হাড়গোড় ভেঙেছে কি না ?

তাদের সঙ্গী হ'য়ে ওঠে! এ দেশের ছেলেরা কিছু না হ'ক, যদি অন্ততঃ গোটা কতক ক'রে ডন্ বৈঠকও দেয়, তা'হলেও তাদের স্বাস্থ্য অনেক ভাল হ'তে পারে; আর পিতা মাতারা যদি দয়া করে শিশু-অবস্থা থেকেই তাঁদের সন্তানদের, চিত্রে বর্ণিত উপায়ে ব্যায়াম শিক্ষা দেন, তা'হলে দশ বছরের ভেতর সব বাঙালীর ছেলে সুস্থ ও সবল হ'য়ে উঠ্‌তে পারে।

প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেন, শিশুকে ব্যায়াম অভ্যাস করালে শীঘ্রই সে বালক হ'য়ে উঠবে এবং এমন পরিপুষ্ট ও বলিষ্ঠ বালক সে হ'বে যে, ইস্কুলে তার জুড়ি পাওয়া যাবে না। তে'এঁটে মাথা, সরু বুক, পেট মোটা, হাত নলী-নলী, পা-রোগা বাঙালীর ছেলেরা আজন্ম রুগ্ন হ'য়েই বেঁচে থাকে; তারা শৈশব বাল্য কি যৌবন সম্পূর্ণ উপভোগ ক'রতে পার না। জরা বার্দ্ধক্য যেন

হাতীর পরীক্ষা

একটা প্রকাণ্ড হাতীর পরীক্ষা হতে পারে এত বড় এক্স্‌রে যন্ত্র এখনও নির্ম্মিত হয়নি; সেই জন্য এই সার্কাসের

৪ এক্স্‌রের অন্তর্ভেদী দৃষ্টির অভিসম্পাত

১৮৯৬ সালে ডাক্তার রোণ্টজেন যখন 'এক্স্‌রে' আলো প্রথম বা'র করেন, তার অল্প দিন পরেই সাউথ্‌ কেন্সিংটন যাদু-ঘরে কতকগুলি ছোট ছোট 'মমী' এসে পেঁছায়। সেগুলো নিশ্চয়ই কোনও পশু-পক্ষীর হবে, এটা বেশ বোঝা গেলেও সেগুলো কোন্‌ জাতীয়, সেটা বাইরে থেকে স্থির করা সম্ভব ছিল না। তাই মমীর আচ্ছাদন না খুলে তার জাতি-নির্ণয় করবার
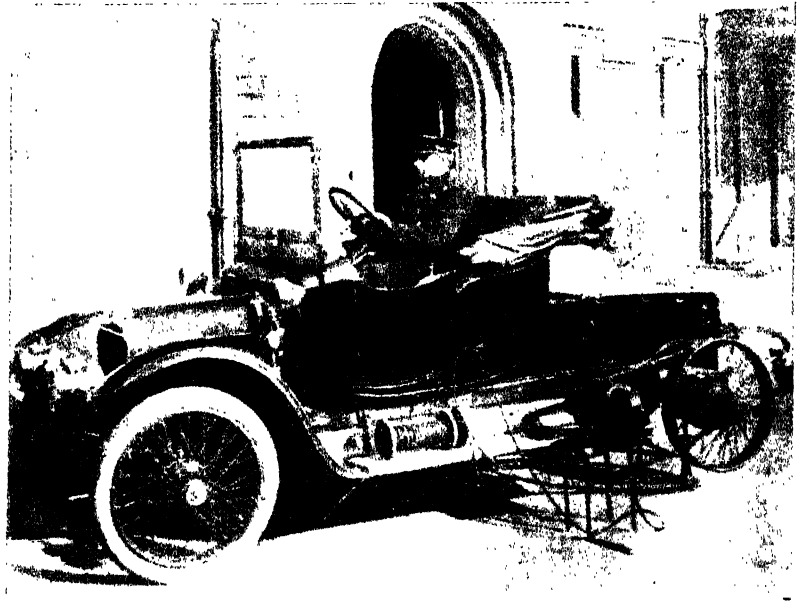
মোটরে এক্স্‌রে—তাড়াতাড়ি কোথাও এক্স্‌রে পরীক্ষায় প্রয়োজন হ'লে অ্যাম্বুলেন্স বা ফায়ার ব্রিগেডের মত এই মোটরকারে ফিট্‌ করা এক্স্‌রে সরঞ্জাম পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

জন্য সেই প্রথম যাদু-ঘরে এক্স্‌রে ব্যবহার সুরু হয়েছিল। কিন্তু এখন এক্স্‌রে হাজার রকম নূতন কাজে লাগছে। পোষ্ট আফিস এক্স্‌রের গুণে অনেক অদ্ভুত রহস্য উদ্ঘাটন ক'র্‌ছে। এ দেশে কোকেনের প্রচার ডাক্তারখানা যতটা না করুক, পোষ্ট-আফিসের মারফৎ তার চেয়ে বেশী চলেছিল; কারণ যারা গোপনে এই নিষিদ্ধ দ্রব্যের ব্যবসা করতো, তারা প্রায়ই পোঃ-পার্শেলে এই জিনিসটার আমদানী রপ্তানী চালাতো! অর্থাৎ কাউকে যেন কতকগুলি বই বুক-পোঃ করে পাঠানো হ'চ্ছে, এমনি ক'রে কতকগুলি পার্শ্বেলে মোটা মোটা বইয়ের মধ্যে কেটে ফুটো ক'রে মর্ফিয়া আর কোকেনের টিউব পুরে প্যাক্‌ ক'রে পাঠানো হ'তো। হঠাৎ পোঃ আঃ তার সন্ধান পেয়ে এক্স্‌রে দিয়ে পার্শেল পরীক্ষা ক'রে টপাটপ্‌ সব ধ'রে ফেল্‌তে লাগল! তখন নিষিদ্ধ দ্রব্যের জুয়াচোর ব্যবসায়ীরা বুদ্ধি করে কতকগুলি কাচের ফলকের মধ্যে তাদের মাল সাজিয়ে প্যাক্‌ করে তার ওপর "ফটোগ্রাফের কাচ" বলে বড় বড় করে লিখে চালান দিতে লাগল। পোঃ আঃ প্রথম দিন-কতক এ চালাকী ধরতে পারে নি, তারপর এও ধরে ফেল্‌তে লাগ্‌ল। এক্স্‌রে দিয়ে নয়, কতক সন্দেহজনক বোধ হ'লে ভেঙ্গে [illegible]

ডাক্তার হল এডওয়ার্ড—এক্স্‌রে অভিসম্পাতের একজন আসামী। কার্ণেজীর [illegible]

গ্রাফের প্লেট খারাপ হ'য়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। সাধারণের প্রেরিত মাল পোঃ আঃ নষ্ট করলে তাদের ক্ষতিপূরণ করে দিতে হয়।

বড় চুরুটের মধ্যে পুরেও অনেক নিষিদ্ধ বিষের চালান চল্‌ছিল, কিন্তু চুরুট আর চুরুটের বাক্স দুই-ই এক্স্‌রের মর্ম্মভেদী দৃষ্টির সম্মুখে এমন অকপটে আত্ম-প্রকাশ ক'রে ফেলে যে, সে উপায়ও আজকাল বন্ধ হ'য়ে গেছে।

হাঁসপাতালের কাজে এক্স্‌রে যে কি অমূল্য সাহায্য ক'রছে তা অনেকেই জানেন। হাড় গোড় ভেঙ্গেছে কিনা, শরীরের ভিতর দিকে কোথায় কি হয়েছে, বন্দুকের গুলি কোথায় গিয়ে বিঁধে আছে, এ সব তো সে প্রতিদিনই ডাক্তারদের জানিয়ে দিচ্ছে; কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় যে এতগুণ থাকা সত্ত্বেও এক্স্‌রের এক প্রকাণ্ড দোষ আছে—সে তার পরিচালক বা কর্ম্মীকে আহত করে ফেলে! প্রথমটা তাদের হাতে অল্প-সল্প পোড়া-পোড়া মত দাগ হতে দেখা যায়; তারপর ক্রমশঃ তাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। এই জন্য আজকাল এক্স্‌রে-কর্ম্মীদের আত্মরক্ষার জন্য রবার ও শীষক মিশ্রিত এক প্রকার বর্ম্ম পরিধান করতে হয়, কারণ শীষক ভিন্ন এমন আর কোনও অল্পমূল্যের ধাতু নেই যা এক্স্‌রের অন্তর্ভেদী দৃষ্টিকে বাধা দিতে পারে।

ডাক্তার হেল এডওয়ার্ড একজন পুরাতন এক্সে্‌রে-কর্ম্মী। তখন কাহারও জানা ছিল না যে এক্স্‌রে অনেক কাজ করে বটে কিন্তু অলক্ষ্যে কর্ম্মীর উপর ভীষণ প্রতিহিংসা গ্রহণ ক'রে তাই এডওয়ার্ড কোনও বর্ম্ম চর্ম্ম বা দস্তানা ব্যবহার করেন নি; ফলে তাঁর সমগ্র বাম হাতখানি আর দক্ষিণ হস্তের আঙুল এক্স্‌রে আলোর শিখায় পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তবে সৌভাগ্যক্রমে হেল এডওয়ার্ড তাঁর সহযোগীদের মত পঞ্চত্ব পাননি। তিনি এখনও বেঁচে আছেন, আর বেশ বর্ম্মাচ্ছাদিত হ'য়ে এখনও এক্সে্‌রেরই কাজ করছেন।

অচিন্-সখা

শ্রীচারুবালা দত্তগুপ্তা

অবোধ আঁখির তপ্ত অশ্রু মেখে
সকল দিনের গোপন ব্যাথা
বুকের মাঝে রেখে
জীবন আমার একা
যেতেছিল আপন মনে,
বিজন পথে সঙ্গোপনে
তোমার সনে দেখা!—
অম্‌নি বুকে লাগ্‌ল যেন এসে
রঙিন আশা-রেখা!

রইনু চেয়ে অচিন্ মুখপানে
কোন্ রাগিণী বাজিয়ে গেল
স্তব্ধ দু'টি কাণে
রইল আজো প্রাণে!
দুইটী আঁখি-তারা
শিশির ধোওয়া কুন্দ ফুল সম
স্নিগ্ধ বিমল হেসে অনুপম
ঢাল্‌ল সুধা-ধারা;
অন্তরে মোর চিহ্ন রেখে এঁকে
কোথায় হ'লে হারা!
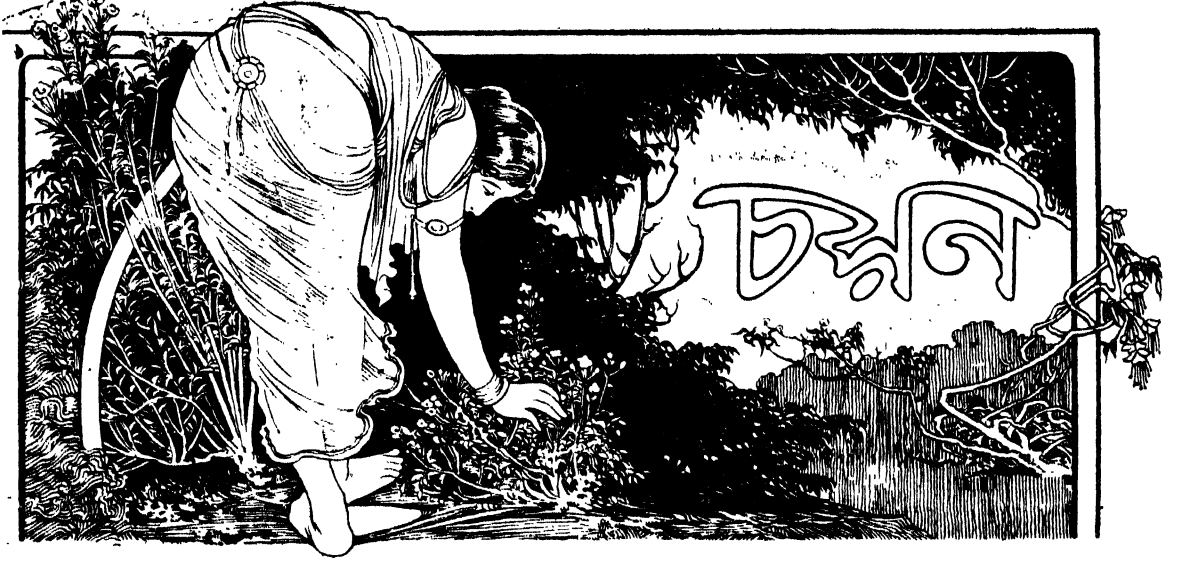
ফাশিস্তি আন্দোলন

Fascisti Movement.

শ্রীদিলীপকুমার রায়

ফাশিস্তি আন্দোলনটী বর্ত্তমান ইতালীতে এরূপ ভাবে শিকড় নিয়েছে যে, সেটা আমি দুঃখের বিষয় মনে করি। ইতালীতে এসে এ আন্দোলনটী আমার চোখে বিশেষ ভাবেই প'ড়েছিল, এবং যুবক ফাশিস্তি অত্যাচারে স্বাধীনতাপ্রিয় যে কোনও মানুষেরই যে লজ্জা পাওয়া উচিত, এ কথা আমার খুবই মনে হয়। এ প্রবন্ধে আমি ফাশিস্তি আন্দোলন সম্বন্ধে দু'চারটী কথা লিখবার জন্য অনুরুদ্ধ হয়েছি। আমি আশা করি, আমার এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নিতান্ত উপর-উপর নয়, এবং এ সম্বন্ধে আমার এত বেশী বলবার আছে যে, তা যদি নিতান্ত সংক্ষেপে ব'লতে না পারি, তবে আশা করি সেটা খুব মারাত্মক অপরাধ ব'লে গণ্য হবে না। এইটুকু সাফাই গেয়েই বর্ত্তমান বিষয়ের অবতারণা করা বিধেয়। এ সম্বন্ধে ইতালীর দু-চারজন শিক্ষিত লোকের মতামত উদ্ধৃত ক'রব। যে হেতু, তা থেকে আমি এ আন্দোলনটীর সম্বন্ধে বড় কম আলো পাইনি ব'লে, অন্য পাঁচজনকেও এ সম্বন্ধে যথার্থ মতামত গড়ে তোলার সহায়তা করার পক্ষে তাদের দাম আছে ব'লে আমি মনে করি।

ইতালীর বাইরে ফাশিস্তি আন্দোলনটি সম্বন্ধে মাঝে-মাঝে যা-যা প'ড়তাম, তাতে এ আন্দোলনটীর হীনতা ও নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে কিছুই খবর থাকত না ব'ললেই চলে। কারণ এই যে, বর্ত্তমান ফাশিস্তি আন্দোলন ইতালীর capitalist সম্প্রদায় দ্বারাই তাদের সুখ সুবিধা সংরক্ষণের জন্য নির্ব্বাহিত। অর্থাৎ এঁরা যুবক ইতালীকে cat's paw হিসেবে ব্যবহার ক'রে, নিজ সুখ-সুবিধার ষোলআনা বজায় রাখার চেষ্টা করতেই ব্যস্ত। এখন, জগতের অধিকাংশ সংবাদপত্র প্রভৃতিই Capitalist দ্বারা পরিচালিত ব'লে, socialist দুই-চারিটী কাগজ ছাড়া, (যেগুলির কাটতি যুদ্ধের পর সব দেশেই কমে গেছে) তারা স্বগঠিত যুবক সৈন্যদের দ্বারা অনুষ্ঠিত অত্যাচারের সংবাদ বাইরে প্রচার হ'তে দিতে যথেষ্ট বাধা দিয়ে থাকেন। এবং জগতের অন্যান্য স্থলেও অধিকাংশ Capitalist পত্রিকাগুলি এ বিষয়ে প্রশান্ত নিস্তব্ধতার আশ্রয়েই কাল কাটাতে গররাজী নন। কাজেই ইতালীর বাইরে ফাশিস্তি আন্দোলনের অত্যাচার সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কোনও খবর পেতাম না।

আমার সৌভাগ্যক্রমে আমি এ আন্দোলনটীর অনেক ভিতরকার খবর পেয়ে গিয়েছিলাম, ও তা এক নিতান্ত নিরপেক্ষ সম্প্রদায়ের কাছ থেকে। ব্যাপারটী এই :—য়ূরোপে বিগত যুদ্ধের পর থেকে, জগতে শান্তির প্রচারার্থ একটী বাৎসরিক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনটী সম্পূর্ণভাবে প্রতীচ্যের নারী জাতি দ্বারাই নির্ব্বাহিত হয়ে থাকে। এ বৎসর এই সমিতির কর্ত্তৃপক্ষগণ তার অধিবেশনটী ইতালীর অন্তর্গত Varese (ভারেসে) নগরীতে হবে, এইরূপ স্থির করেছিলেন।

এদের সম্পূর্ণ আদর্শপন্থী সভাটীর বিরুদ্ধেও ফাশিস্তি যুবকগণ খড়্গহস্ত হয়ে উঠে। কারণ তাদের ধারণা জন্মায় যে, এ সভায় প্রকারান্তরে Socialismএর প্রচার হবে। এখানে ফাশিস্তিদের দাবী সম্বন্ধে দু'চারটে ব্যবস্থা দেওয়া দরকার। ফাশিস্তিরা চায়—জগতে সর্ব্বত্রই Status Quo বজায় থাকবে, সর্ব্বত্রই দুর্ভাগ্য শ্রমজীবীদের অধিক মাহিনা প্রভৃতির দাবী অগ্রাহ্য হবে, capitalistরাই অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যের কর্ণধার থাকবে (যেহেতু এরা capitalistদের অর্থে সৃষ্ট ও পুষ্ট)—ও এক কথায় জগতে কোথাও নূতন কিছুর প্রচেষ্টা যেন কোনও মতেই পুরাতন আভিজাত্যের ও দুচারজন ভাগ্যবান ধনীর প্রশান্ত উপভোগের পথে কাঁটা-স্বরূপ না দাঁড়াতে পারে। এতদর্থে অবশ্যই তারা সর্ব্বপ্রকার socialismএর বিরুদ্ধেই খড়্গহস্ত, তা সে নরম socialismই হোক, বা গরমই হোক। এখানে আরও একটু ব'লে রাখা দরকার যে, প্রতীচ্যে socialismরূপ বিরাট আন্দোলনটীর নানান শাখা-প্রশাখা আছে,—কারুর দাবী খুব উচ্চাশী কারুর বা অল্লাশী। কিন্তু ফাশিস্তিরা সব রকম socialismএরই বিনাশরূপ অসাধ্যসাধনে প্রয়াসী; তাদের এ বিষয়ে socialismএর কোনও শাখা-বিশেষের প্রতি পক্ষপাত নেই। এখন যা বলছিলাম —এই শান্তি-সভার বাৎসরিক অধিবেশন ইতালীতে হবে এইরূপ চিঠি যাঁরা এ বৎসর এ সমিতিতে যোগদান করেছিলেন তাঁরা সকলেই পেয়েছিলেন। ফাশিস্তিরা প্রথম থেকেই এ আন্দোলনটীকে সন্দেহের চোখে দেখতে আরম্ভ করে—পাছে তাহাদের কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তে পাপ Socialismরূপ কলি ইতালীর অপাপবিদ্ধ দেহে প্রবেশ করে। কর্ত্তৃপক্ষ মহিলা সম্প্রদায় তাঁদের অনেক বুঝিয়েছিলেন যে, এ সভার সঙ্গে Socialismএর কোনও সম্বন্ধই নেই, যেহেতু এটা শুধু শান্তিরূপ মহৎ আদর্শের প্রচারার্থে। তারা প্রথমটা তাই বোঝে এবং এ সভার অধিবেশন ইতালীতে হ'তে দিতে রাজী হয়। কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে আমরা চিঠি পাই যে, ফাশিস্তিগণের অন্ধ ও গোঁড়া বিরুদ্ধাচরণে এ সমিতির অধিবেশন ইতালীর অন্তর্গত Vareseতে করা অসম্ভব হয়ে ওঠায়, কর্ত্তৃপক্ষ তাকে সুইজরলণ্ডের অন্তর্গত লুগানো সহরে নির্ব্বাহিত কর্ত্তে বাধ্য হয়েছেন। এ জন্য তাঁদের শেষ মুহূর্ত্তে অনেক অর্থক্ষতি স্বীকার কর্ত্তে হয়েছিল, কারণ সব বন্দোবস্ত এক স্থলে স্থির করে শেষ মুহূর্ত্তে তাড়াতাড়ি সে সব স্থানান্তরিত করা ব্যয়সাপেক্ষ, অসুবিধার ত কথাই নেই। এঁদের এটা যে কর্ত্তে হ'ল, তার আর একটা কারণ, ফাশিস্তিরা এই সর্ত্ত স্থাপন করে, যে কোন তর্কালোচনায় রাজতন্ত্রের সপক্ষে কেউ কোনও কথা বলতে পারবে না;—কেউ রাজনীতি-সংক্রান্ত কোনও গরম কথা বলতে পারবে না, যেহেতু তাতে Socialismএর বল বাড়ার সম্ভাবনা; আর রোমাঁ রোলাঁ মহোদয় ইতালীতে আসতে পারবেন না, যেহেতু তিনি স্বাধীন মত প্রকাশের পক্ষপাতী। শ্রীযুত রোমাঁ রোলাঁ আমাকে ফাশিস্তি আন্দোলন সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, ইতালীতে রাস্তাঘাটেও কোন ফাশিস্তির সহিত স্বাধীন ভাবে কোনও মত প্রকাশ করা

সঙ্গে মতে না মিললে, তারা না কি তৎক্ষণাৎ বাহুযুদ্ধে তর্কটীর মীমাংসা করতে একটু বেশি রকমই উৎসাহ দেখায়।

এরূপ অপমানকর প্রস্তাবে শান্তিসভার কর্ত্তৃপক্ষগণ রাজী হইতে পারেন নি, এবং এ জন্য তাঁদের ১০০ পাউণ্ডেরও (১৫০০৲ টাকা) বেশী লোকসান দিতে হয়েছিল। ফাশিস্তির মূঢ় অন্ধ অত্যাচার-প্রিয়তার এটী একটী সামান্য দৃষ্টান্ত মাত্র। আমাকে, এই শান্তিসভার একজন নিরপেক্ষ অষ্ট্রেলিয়ান্ রমণী (যিনি বৎসরাধিক কাল ইতালিতে ছিলেন) বলেছিলেন যে, এমন ঘটনা ইতালীতে প্রায়ই হয় যে, কোন socialistকে ফাশিস্তিরা দ্বিপ্রহর রাত্রে বিছানা থেকে তুলে, নিতান্ত শান্ত মূর্ত্তিতে, তার স্ত্রীর সামনে টেনে এনে গুলি করে মেরেছে। আত্মরক্ষার্থে অনেক মহৎহৃদয় socialist যুদ্ধাবসানের প্রথম প্রথম প্রকাশ্য পথে দল বেঁধে Fascistiদের সহিত যুদ্ধ কর্ত্তে বাধ্য হয়েছেন; কিন্তু ইতালীর পুলিশ ও রাজা অকর্ম্মণ্য বলে এ পথযুদ্ধ কেউ বন্ধ কর্ত্তে পারে নি। এই অষ্ট্রেলিয়ান রমণী আমাকে আরও বলেছিলেন যে, একদিন তিন-চারজন ফাশিস্তি একটী socialistএর পশ্চাদ্ধাবন করে। সে ভদ্রলোক বাধ্য হয়ে একটী বৃদ্ধা রমণীর ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কাণ্ডজ্ঞানহীন যুবকত্রয় সে বৃদ্ধা রমণীকে জিজ্ঞাসা করে, socialist ভদ্রলোক কোথায়? দয়ার্দ্র-হৃদয়া নারী উত্তর দিতে অস্বীকার করায়, তাঁকে তারা তৎক্ষণাৎ গুলি করে। আমি এরূপ লোমহর্ষক পাশবিকতার কাহিনী প্রথমটা বিশ্বাস কর্ত্তে পারি নি। কিন্তু তার পর ইতালীতে এসে অনেক লোকের কাছেই ফাশিস্তিদের লীলাখেলার অনেক আলোচনা শুনে, এ সব কথা বিশ্বাস কর্ত্তে বাধ্য হই। মানুষের মধ্যে যখন পশু ছাড়া পায়, তখন তরুণ হৃদয়েও সে বড় কম প্রভাব বিস্তার করে না। এখানে বলে রাখা ভাল যে, পূর্ব্বোক্ত অষ্ট্রেলিয়ান রমণী নিতান্ত তরুণী ছিলেন ও রাজনীতির বা Socialismএর কিছুই ধার ধার্ত্তেন না। তিনি ছিলেন গায়িকা এবং তিনি ওরূপ ব্যাপার যে ইতালীতে প্রায়ই সংঘটিত হয়, তার আরও দুচারটে উদাহরণ দিয়েছিলেন। আমি এ সম্বন্ধে আমার পরিচিত আর একটী মহিলার বিবৃত কাহিনী বলে, এ বিষয়ে আর বাস্তব দৃষ্টান্ত দেওয়া স্থগিত রাখব। এই মহিলাটীর স্বামী ছিলেন Socialist, ইনি ছিলেন চিত্রকরী। এঁর সঙ্গে একদিন সন্ধ্যায় রোমে ফাশিস্তিদের নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে অনেক কথা হয়। এঁর স্বামী তখন জেনোয়াতে ছিলেন, এবং তিনি যে-কোনও দিন নিহত হতে পারেন বলে ইনি আমার কাছে দুঃখ কচ্ছিলেন। স্ত্রীর এই উদ্বেগে আমারও দুঃখ বোধ হ'ল; আমি জিজ্ঞাসা কর্ল্লাম, "আপনারা তাহ'লে ইতালী ছেড়ে যান না কেন?" তাতে তিনি উত্তর দিলেন, "আমার স্বামীকে আমি অনেকবার বলেছি; কিন্তু তিনি বলেন যে, Socialistদের সকলেরই যখন জীবনাশঙ্কা, তখন আমার একার দেশ ছাড়া অকর্ত্তব্য।" পাছে এজন্য তাঁদের একমাত্র পুত্রও প্রাণ হারায়, এই ভয়ে ইনি কাপ্রি (Capri) ব'লে নেপলসের সামনে একটী ছোট দ্বীপে তাকে নিয়ে এক সঙ্গে থাকতে

তাঁর স্ত্রী-পুত্রের জীবনও অনর্থক বিপন্ন হতে পারে। এই ভদ্র মহিলা আমাকে এ সম্পর্কে আরও একটী কাহিনী বিবৃত কর্লেন। তাঁরা তখন একটু নিরাপদে বাস করার জন্য ইতালীর একটী দূর গ্রামে বাস কর্চ্ছিলেন। একদিন তাঁদের দরজায় ঘা পড়ল। "কে" জিজ্ঞাসা করায় উত্তর এল "তোমাদের বন্ধু"। তাঁরা দুয়ার খুলতেই দেখলেন, যে শতাধিক কৃষ্ণ-বেশ ও কৃষ্ণ-টুপি পরিহিত ফাশিস্তি দাঁড়িয়ে। স্বামীর প্রাণাশঙ্কায় স্ত্রীর মনোভাব বর্ণনা করার চেয়ে পাঠকদের অনুমান কর্ত্তে দেওয়াই শ্রেয়ঃ। তারা বলল, "তোমার স্বামীকে আমাদের সামনে আসতে বল।" তখন এঁর মনে একটা সাহস এল; এবং তিনি তাঁদের বল্লেন, "তোমরা কি মানুষ নও যে, আমার স্বামীর একটা স্বাধীন মতের জন্য তোমরা তাঁকে হত্যা করবে? তোমাদের কি ধর্ম্মভয় নেই? আর তিনি নিহত হলে আমাদের কি গতি হবে, সে চিন্তা কি তোমাদের হৃদয়ে এক বিন্দুও করুণা সঞ্চার করে না?' এই তরুণী আমাকে বল্লেন "সেদিনের ঘটনা আমার চিরকাল মনে থাকবে। মানুষকে যে নির্ভয়ে চোখের ধারে তাকিয়ে আন্তরিক ভাবে সত্য কথা বল্লে, তাকে পশুর ধাপ থেকে তুলে এনে কখন-কখনও মানুষের সিংহাসনে বসান যায়, তা আমি সেদিন স্বচক্ষে দেখলাম। কারণ, আমার এই আবেদন তাদের দলপতির হৃদয় স্পর্শ করেছিল ও তিনি আমার স্বামীকে নিষ্কৃতি দিলেন।" কিন্তু তাঁহার স্বামীর প্রাণ যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিরাপদ নয়, এ কথাও তিনি আমাকে বললেন। এরূপ ঘটনা সত্ত্বেও ইতালীর অনেক নির্ভীক Socialist দেশ ত্যাগ করেন নি;—যেখানে রাজশক্তি প্রকাশ্যতঃ না হোক, মনে মনে ফাশিস্তিদের অত্যাচারের অনুমোদন করেন সেখানে Socialistদের ভয়ে দেশত্যাগ কর্ত্তে চাওয়া অস্বাভাবিক নয়। পূর্ব্বে এখনকার মত রাজতন্ত্রে ফাশিস্তিদের কোনও হাত ছিল না, তারা বাইরে বাইরে চীৎকার কর্ত ও হত্যাদির দ্বারা আন্দোলন ক'রে ঘুরে বেড়াত। একটা আদর্শের জন্য এরূপ জীবন তুচ্ছ করাটা এই ফাশিস্তিদের পাশবিকতার পাশাপাশি আমার যে ভাল লেগেছিল, তা বলাই বাহুল্য। আমি ফাশিস্তিদের এরূপ আরও অনেক অভাবনীয় অত্যাচারের ঘটনা শুনেছি। তবে তার মধ্যে অনেকগুলি ঘটনা একটু অতিরঞ্জিত বলে আমার মনে হয়েছিল বলে, তার উল্লেখ করলাম না; যে কয়টী ঘটনা সত্য বলে বিশ্বাস হয়েছিল, মাত্র সেইগুলি লিখলাম।

এ সম্বন্ধে রোমের সংস্কৃত ও চীন ভাষার একজন যুবক অধ্যাপকের সহিত কথা হয়েছিল। তিনি বল্লেন, "Socialism যদি মন্দও হয়, তা হলেও শুধু এই মতাবলম্বী লোকদের আমরা শুধু শুধু হত্যা কর্ত্তে পারি না। তারা যদি বর্ত্তমানে শাসনতন্ত্রের বিপক্ষে কোনও আন্দোলন করে, তবে আমরা তাদের পীড়ন কর্ত্তে পারি; কিন্তু যদি শুদ্ধ তাদের একটা স্বাধীন মতের জন্য আমরা তাদের হত্যা করি, তবে আমরা সভ্য জাতি বলে যে কোথাও গণ্য হব না, এ কথা ধ্রুব।" তিনি আরও বলেছিলেন যে, ফাশিস্তিদের কাণ্ডজ্ঞানশূন্য আন্দোলনে কোনও ভদ্র-সন্তানের পক্ষে ইতালীতে বাস করা দুঃসহ হয়ে উঠেছে।

রোমে একজন শ্বেতশ্মশ্রু ডাক্তারের সঙ্গে এ সম্বন্ধে একদিন এক লেখকের বাড়ীতে অনেকক্ষণ আলোচনা হয়েছিল। তিনি নিরাশ ভাবে তাঁর শ্বেত দাড়ি নেড়ে বলেছিলেন "ইতালীর ত আমি কোন আশাই দেখছি না।" গভমেণ্ট এ-সব অত্যাচারের বিরুদ্ধে কিছু করে না কেন জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেছিলেন, "এখানে সব শাসক-গণই অন্তঃসারশূন্য, দুর্ব্বল ও ভীরু, তাই আমাদের আজ এ দুর্দ্দশা। আরও দেখুন, ইতালীর বর্ত্তমান অর্থ-সমস্যার দিনে এতগুলি কর্ম্মশূন্য যুবক পড়াশুনো ছেড়ে হৈ হৈ করে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, এতে কি দেশোদ্ধার হওয়া সম্ভব? দেশহিতৈষণা বহুদিনব্যাপী সাধনার বস্তু, দুগ্ধপোষ্য বালকের হুজুগে তা সাধিত হতে পারে না। তার জন্য চাই নিয়মিত শ্রমশীলতা, কর্ম্মানুরাগ ও ধীর বিবেচনা। জাতি হিসেবে আজ ইতালীর স্থান এত নীচে কেন? কারণ, আমরা শ্রমবিমুখ ও বিলাসপ্রিয়; অন্য কারণ, আমাদের মধ্যে মানুষ নেই। পক্ষান্তরে, ফরাসীজাতির সঙ্গে আমাদের তুলনা করলে বোঝা যায়, আমাদের গলদ্ কোথায়। তারা মিতব্যয়ী ও পরিশ্রমী; হুজুগে মেতে কখন-কখনও কাজের ক্ষতি কর্লেও, তার পরেই পুনরায় নিয়মিত কর্ম্মে মন দিয়া থাকে।"

ব্যাপারটা এই:—যুদ্ধের পর এই যুবকের দল আবার নীরস পড়াশুনায় মন দিতে রাজী হ'তে পাচ্ছে না এবং হুজুগকে চিত্তাকর্ষক দেখতে পেয়ে capitalistদের অর্থ-সাহায্য পেয়ে দেখছে যে, দেশ-হিতৈষণার নামে এ একটা মন্দ আরাম নয়। এর মধ্যে একটা উত্তেজনা আছে, তৃপ্তির মত কিছু ও আছে, নাই কেবল চিন্তার প্রয়োজন ও কোনও কিছু গড়ে তোলার কর্ম্মোদ্যমের অস্তিত্ব। তা ছাড়া ইতালিয়ানরা বরাবরই একটু বালকবৎ। আমার এক ইংরাজ বান্ধবী এই দুগ্ধপোষ্য বালকদের হৈ হৈ ক'রে "মুসোলিনীর জয়" ব'লে রাস্তায়-রাস্তায় সমারোহ করায় দুঃখে হেসে আমাকে বলেছিলেন যে, "এতে রাগ বা দুঃখের চেয়ে হাসিই বেশী আসে।" বাস্তবিক আমার নিজেরও একদিন দুই-তিনজন ১৫।১৬ বছরের ছেলেকে ইস্কুল ছেড়ে ফাশিস্তি বেশ পরে ঘোড়ায় চড়ে রাস্তা দিয়ে দেশোদ্ধারে যেতে ব্যগ্র দেখে হাসিও পেয়েছিল, দুঃখও হ'য়েছিল। তবে এরূপ ছেলেমানুষী যখন একটু বাড়াবাড়ি হয়ে ওঠে, ও capitalistদের অর্থসাহায্যে নির্ব্বিচারে নর-হত্যায় রত হয়, তখন এ আন্দোলনকে অন্ততঃ উৎপীড়িতদের চোখে যে নিতান্ত উপহাস্য বলে মনে হয় না, এ কথা বোধ হয় ধ্রুব। এরা কারখানা প্রভৃতি দল বেঁধে মাঝে-মাঝেই আক্রমণ করত। এদের উপদ্রবে ট্রেণ চলাচল প্রভৃতি মাঝে মাঝেই বন্ধ রাখতে হ'ত এবং শেষাশেষি (অক্টোবর মাসে) ইতালীর রাজাও যে এতে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন, তার প্রমাণ গত নবেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি সকল নষ্টের মূল মুসোলিনীকে আহ্বান ক'রে মন্ত্রীসভা নির্ব্বাচন কর্ত্তে নিমন্ত্রণ করেন। সে সময়ে আমি ইতালীতে। রোমের রাস্তায়-রাস্তায় কৃষ্ণবেশ পরিহিত ফাশিস্তির দেশোদ্ধারের সে কি উৎসাহ ও রাস্তায়-

কি ধূম! উদ্দেশ্য, ইতালীর গভর্মেণ্টকে ভয় দেখান। তবে আক্ষেপের বিষয় এই যে, এই সব দুদ্দশহাজার কাণ্ডজ্ঞানহীন ফাশিস্তির ভয়ে দুর্ব্বল রাজশক্তি রাজদণ্ড তাদের হাতে এনে দিতে বাধ্য হ'লেন।

ইতালীর বর্ত্তমান গভর্মেণ্ট যে ফাশিস্তি গভর্মেণ্টরূপে পরিণত হ'ল, এটা আমি মানুষের প্রগতির (Progress) একটা সাময়িক পরিপন্থী বলে মনে না করেই পারি না। তা ছাড়া, একটা অগ্রগামী আন্দোলনের আনুষঙ্গিক অবিচার ও অত্যাচারকে মনকে অনেকটা বুঝিয়ে অভিনন্দন কর্ত্তে রাজী কর্লেও করা যেতে পারে; কিন্তু একটা পশ্চাদ্গামী আন্দোলনের বাড়াবাড়িটা যে নিছক্ আক্ষেপেরই বিষয়, এ বিষয়ে বোধ হয় সন্দেহ করার কারণ নেই। মানুষের বর্ত্তমান সভ্যতার অনেক দোষ আছে; কিন্তু তার মধ্যে প্রত্যেকের স্বাধীন মত পোষণ করার ও কম-বেশী প্রকাশ করার অধিকার যে সভ্যজগতে ক্রমেই স্বীকৃত হয়ে আস্ছে, এটা যে তার একটা মস্ত সুফল, এ বিষয়ে বোধ হয় মতদ্বৈধ নেই। বৈচিত্র্যেই জগতের সৌন্দর্য্য ও সুষমা এবং ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যই বৈচিত্র্যের ভিত্তি। আজ যে মানুষ সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে তার স্বাধীন মত প্রকাশ কর্ত্তে পাচ্ছে না, তার কারণ মানুষ এখনও যথেষ্ট বিকাশ লাভ করে নি। যখন এ বিষয়ে সে যথেষ্ট বিকাশ লাভ কর্ব্বে, তখন জগৎ যে এখনকার চেয়ে ঢের শীঘ্র এগিয়ে যেতে থাক্‌বে, এরূপ মনে করার অনেক সঙ্গত কারণ আছে। পূর্ব্বে আর্টে বা ধর্ম্মে মানুষের স্বাধীন মত প্রকাশ করাও অসম্ভব ছিল। তাতে জীবন ও কলা যে কিরূপ একঘেয়ে হয়ে পড়েছিল, ও জীবনে মানুষের বিকাশের স্ফূর্ত্তি কিরূপ প্রতিহত হয়েছিল, তা য়ুরোপের ধর্ম্মে গোঁড়ামির যুগের সাহিত্য ও চিত্রকলায় খুব বেশী রকম উপলব্ধি করা যায়। চিত্রে সেই একই রূপ হাজার হাজার খৃষ্টের ও পরীর ও মাদোনার ছবি, সাহিত্যে সেই একই খৃষ্টগুণ কীর্ত্তন ও অন্য ধর্ম্মকে আক্রমণ, সঙ্গীতে সেই একই স্তোত্রসঙ্গীত ইত্যাদি। তখনকার দিনে এ সব বিষয়ে কেউ কোনও স্বাধীন মত বা চিত্র বা বই প্রকাশ কর্লে নিন্দাভারে ও অনেক সময়ে সামাজিক উৎপীড়নে তাকে অস্থির হয়ে পড়তে হ'ত। কিন্তু তখনকার দিনে লোকে মনে কর্ত্ত, সনাতনত্বের মহিমা কোনও মতেই খর্ব্ব হ'তে দেওয়া বিধেয় নয়। কিন্তু এখন দূরত্বের Perspectiveএ আমরা দেখতে পাই যে, তাতে মানুষের কত স্বাধীন প্রেরণা ও অভিনব সৃষ্টির দ্যোতনা নিষ্পিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এখনও রাজনীতি ও সমাজনীতির সংস্কারের বিষয়ে লোকমতের সম্বন্ধে জগতে সেই পুরাতন পূজার প্রবণতা রয়েছে, যেটা আগে ধর্ম্ম ও কলার ক্ষেত্রেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু রাজনীতি বা সমাজ-সংস্কারের (Socialism) ক্ষেত্রেও ঠিক হোক, ভুল হোক্, স্বাধীন মত প্রচারের অধিকার যে সকলেরই আছে, এটা ক্রমেই জগতে স্বীকৃত হয়ে আসছে। Socialismএর নানান্ শাখা আছে। তার মধ্যে অনেকগুলিকেই এক্ষণেই প্রবর্ত্তন করা হয় ত অসাধ্য-সাধনের চেষ্টা; এবং মানুষ এখনও ততটা বিকাশ লাভ করে নি ব'লে মনে করার অনেক কারণ আছে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে এরূপ কোনো ক্ষায় এখনই প্রবর্ত্তিত করা কেন বাঞ্ছনীয় নয়, সে আলোচনা এখন থাকুক,—আমি এখানে শুধু এই কথাটা বলতে চাই যে, মানুষের অসংখ্য দুঃখকষ্টের বহুল নিরাকরণ যদি কিছুতে সম্ভব হয়, তবে তা মানুষের স্বাধীনতার উত্তরোত্তর বিকাশে ও তার মধ্য দিয়েই একটা নূতন সামঞ্জস্য খুঁজে বাহির করার প্রচেষ্টাতেই মিলতে পারে। জগতে স্ত্রী-স্বাধীনতা, দাসত্বপ্রথা, নির্ব্বাসন প্রভৃতি যে দুই চারিটী সমাজ-সংস্কার সাধিত হয়েছে, তা মানুষের স্বাধীনতার দাবির জোরেই হয়েছে। তাই আমার মনে হয় যে, এ দাবিকে সব দেশেই অন্ততঃ আদর্শ হিসেবেও মেনে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। ইতালীতে আরও দুঃখের বিষয় এই যে, সেখানে যৌবন দাঁড়িয়েছে অবনতির ও উৎপীড়নের ধ্বজাবাহক হয়ে, যেখানে জগতে সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে যৌবনই দাঁড়ায় প্রগতির সপক্ষে ও অত্যাচারের বিপক্ষে। আদর্শবাদে অল্প সময়ের মধ্যেই স্বপ্নরাজ্য স্থাপনের উৎসাহে সর্ব্বত্র তরুণের মনই সব চেয়ে বেশী সহজে সাড়া দিয়ে থাকে, কিন্তু ইতালীতে আজ হয়েছে ঠিক তার বিপরীত। (বাঙ্গলার কথা।)

কবীরের প্রেমসাধনা

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

প্রেমের যে সাধক, তার খেলা যেমন সুন্দর, তেমনিই কঠিন। সতী যে আগুনে পুড়ে মরে, বীর যে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে,—তাও এই প্রেম-সাধনার কাছে কিছুই নয়।

সাধকা খেলতো বিকট বেঁড়া মতী
সতী ঔর সূরকা চাল আগে।
সূর ঘমসান হৈ পলক দো চারকা
সতী ঘমসান পল এক লাগে।
সাধ সংগ্রাম হৈ রৈন দিন জুঝনা
দেহ পর্য্যন্তকা কাম ভাঈ॥

সাধকের খেলা তো ভীষণ ও রমণীয়, সতী আর সূরের খেলা এর কাছে কি? বীরের লড়াই তো দুইচার পলকের, সতীর প্রচণ্ড সাধনা তো একটি পলের মাত্র। হয় জয় হবে তাদের, নয় জয় হবে মৃত্যুর। কিন্তু সাধকের? রাত্রি দিন তার যুদ্ধ। সতীর মত আগুনের মধ্যে একবার ঝাঁপিয়ে পড়লেই এক পলে তার খেলা শেষ হয়ে যায় না। কামনা তৃষ্ণা যা কত রমণীয়, যা একেবারে আপনার সঙ্গে এক হয়ে গেছে, তাও তাকে ক্ষয় করতে হয়। প্রতিদিন আপনাকে সর্ব্বাঙ্গে ক্ষতবিক্ষত করবার এ বেদনা। এ যে সব আপনার অঙ্গের সামিল হয়ে গেছে। যত দিন একটি পরমাণুও থাকবে, তত দিনই যুদ্ধ চলবে। বড় কঠিন এই লড়াই।

আপনাকে ক্ষয় করতে হবে অথচ সম্পূর্ণ ক্ষয় করলে চলবে না। তাহলে আর সাধনা হবে কাকে নিয়ে? সে তো সাধন নয়, সে হলো

"অমোয়া কোইলি ঘীসন রহলী
ঘীসত ঘীসত লাগা সুর"

শিশুরা আমের আঁটি যে বাজায়, তারা ঘসে, আর বাজায়। ঘস্‌তে ঘস্‌তে যখন সুরটি বেজে উঠে, তখন আর ঘসে না, আর ঘস্‌লে বাজবে কি? সাধকও আপনার অসার কামনা প্রভৃতি ক্ষয় করে যখন প্রেমের সুরে বিশ্বের রাগিণীতে বেজে ওঠেন, তখন তাঁর আর আত্মহত্যা করার দরকার হয় না।

এই কামকে ক্ষয় করে সেই প্রেমকে পেতে হবে, বিশ্বের সুর যাতে বাজচে।

কামকে ক্ষয় করে প্রেমকে লাভ করা বড় কঠিন সাধনা। তা'হোক। পৃথিবীতে এসে যদি সেই প্রেম না পেলাম, তবে হোল কি? আনন্দের সাগরে এসে যদি পিপাসায় মরবো এমন হয়, তবে পেলে কি? প্রেমরস যে ভরে আছে প্রতি শ্বাসে শ্বাসে, পান কর।

"সুখ সাগরমে" আয়কে মত্ত জারে প্যাসা।
নির্ম্মল নীর ভরের তেরে আগে পীলে স্বাঁসো স্বাঁসা॥
মৃগতৃষ্ণা জল ছাড় বাবরে করো সুধারস আসা।
ধ্রু পহ্লাদ শুকদেব পিয়া ঔর পিয়া রৈদাসা॥
প্রেম হি সংত সদা মতবালা এক প্রেমকী আসা।
কহৈ কবীর সুনো ভাই সাধো মিট গঈ ভয়কী বাসা॥

"অমৃতের সাগরে এসে পিপাসিত ফিরে যাস্‌ নে। নির্ম্মল সুধায় ভরে আছে এই সাগর। শ্বাসে শ্বাসে সেই পরমানন্দ রস পান কর্‌। পাগল হয়ে যে কামনার মৃগতৃষ্ণার পেছনে দৌড়ে বেড়াচ্ছিস, তা ছাড়্‌। অমৃতরসের তৃষ্ণা তোর জীবনে জেগে উঠুক। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, শুকদেব, রুইদাস সবাই এই প্রেমরসই তো পান করেছেন। সাধকেরা এক প্রেমরসেরই পিয়াসী, এতেই তাঁরা সদা মত্ত হয়ে আছেন।"

কবীর বল্‌ছেন—"এই প্রেম-রস-সাগরের সন্ধান পেয়েছি বলে আমার সব ভয়ের বাসা ভেঙ্গে গেছে। এই প্রেমকে জেনে আমি এখন নির্ভয় হয়েছি।"

এই প্রেম না পেলে মানব জীবনের মূল্যই বা কি! ভর্ত্তৃহরি লিখেছেন "যে মানব-জন্ম পেয়ে তা শুধু খেয়ে দেয়েই শেষ কল্লে, তাকে কি বোল্‌বো? সে সোণার লাঙ্গল দিয়ে আকন্দমূলের চাষ করে গেল। সে বৈদূর্য্যরত্নভাণ্ডে চন্দনের কাঠ জ্বালিয়ে তিল সিদ্ধ করলে। কর্পূর খণ্ড করে কুধান্যের ক্ষেতের বেড়া দিলে। মানবজন্ম পেয়ে শুধু এই ক্ষণস্থায়ী সুখ মাত্র আদায় করলি, আর কিছুই না?"

এত বড় আত্মা যে পেলে, তাতে কল্লে কি? পরমাত্মাকে লাভ করবে না? যদি না লাভ করে থাক, তবে বৃথা জন্ম তোমার। উপনিষদ বলেন "যে তাঁকে জেনে এই পৃথিবী থেকে চলে গেল, সে ধন্য হয়ে গেল। যে তাঁকে না জেনেই চলে গেল, সে কৃপার পাত্র হয়ে গেল।"

সামান্য যশ, সামান্য মান, ধন, গৌরব এই সবের জন্য এমন অমূল্য জীবন ফুঁকে দিলাম! সেই পরম সত্যকে জানবার জন্য কিছুই কল্লাম না?

"যহ জীয়রা অনমোল হৈ
ভয়ো কৌড়ীকা ফেকা রে॥"

"হায়, অমূল্য এই জীবন, এক কড়ার দানের জন্য ইহা বাজি রেখেছি।"

আমি তোমার সঙ্গে প্রেমের খেলায় দান খেলতে বসেছি। আমি যদি হারি, আমি তোমার; তুমি যদি হার, তুমি আমার; কোনও দিকে হার নেই। আমি অন্তরের মধ্যে যে প্রেম এনেছি, সেই বরণ-মালা যদি তাঁকে না দিই, তবে যে আমার সকল পবিত্রতাই নষ্ট হয়ে গেল। মনে কর দময়ন্তীর কথা। যে পরমাত্মার গলে মালা দিল, তার জীবাত্মা পবিত্র হল। তার মান রইল। যদি পরমাত্মাকে না চিনতে পেরে সংসারের গলে মালা দেয়, তবে জীবাত্মার পবিত্রতা সতীত্ব সবই গেল। এই যে জীবনস্বামী বিশ্বনাথের ঘরে এলাম, তাঁকে না দেখেই যদি গেলাম, তবে যে সবই বৃথা হল। যুগ যুগ তোমারই রাজত্ব; বিশ্ব তোমারই অধিকারে, কেন না জগন্নাথ যে স্বয়ংই তোমার। এই প্রেম জাগলে সব সার্থক হয়ে যাবে। তাঁর জন্যে যে বরণ-মালা, তা তাঁকে দিলে সংসার ধর্ম্ম সবই সার্থক হবে। তা নৈলে ত সব বৃথা।

"সাঁঈ সব কুছ দিন্হ দেত কুছ না রখো।
হমহী অভাগিন নার সুকৃথ ত্যজ দুকৃথ লখো॥
গঈ পিয়াকে মহল পিয়া সঙ্গ ন রচী।
কহৈ কবীর সমঝায় সমঝ হিরদে ধরো।
জুগন জুগন করো রাজ ঐসী তুম তি পরিহরো।"

"স্বামী সবই দিয়েছেন, কিছুই বাকী রাখেন নি। আমিই যে অভাগিনী নারী সুখ ছেড়ে দুঃখই বেছে নিয়েছি। প্রিয়ের ধামে এসেও তাঁর সঙ্গে মিলন হলো না। কবীর বলেন, হৃদয়ে সম্যক্‌ দেখ যুগ যুগ তোমারই তো রাজত্ব, এমন দুর্বুদ্ধি ছেড়ে দাও।" স্বামীকে এড়িয়ে আর সব পাবার চেষ্টাই তো যথার্থ দুর্বুদ্ধি!

প্রেমে জাগ্রত আমার যৌবন আজ আমাকে তাঁর খবর দিয়েছে। তাঁকেই বরণ-মালা দিতে হবে, জ্ঞান আমাকে সে খবর দিয়েছে। তাই ত তাঁর পত্র পেয়েছি। আজ আমি ব্যাকুল; হে অবিনাশী, হে প্রিয়তম, তোমার ত কালেতে কিছু আসে যায় না। হে অনাদি, অনন্ত, তুমি ত অপেক্ষা করতে পার, আমি ত পারি না।

"সখিয়োঁ হমহু ভঈ বলমাসী।
আয়ো জোবন বিরহ সতায়ো
অব মৈঁ জ্ঞান গলী অটিলাতি?
জ্ঞান গলীমেঁ খবর মিল গয়ে
হমেঁ মিলী পিয়াকী পাতী॥
বা পাতীমেঁ অজব সংদেসা
অব হম মরনেকো ন ডরাতী॥
কহত কবীর সুনো ভাই সাধো

"হে সখীগণ, আমিও বল্লভ-পিয়াসিনী হয়েছি। যৌবন যে এসেছে। যৌবন যে দুঃখ দিচ্ছে, এখন কি না আমি জ্ঞানগলি ঘুরে ঘুরে মরবো! তবে জ্ঞানও ধন্য, সেখানেই তো খবর পেলাম, প্রিয়তমের পত্র মিলে গেল। সেই পত্রে অপরূপ সংদেশ। কেমন করে ত বুঝিয়ে বলি? তবে এটা ঠিক যে এখন আমি মরতেও ভয় করি নে। কবির বলেন, এখন যে অবিনাশীকে বর পেয়েছি।"

হে অবিনাশী, তোমার হয় ত কালের অন্ত নাই, তাই তোমার কোন তাগিদ নাই। কিন্তু আমার যে কাল পরিমিত। এই জীবনটী আজ কমলের মত বিকশিত হয়ে উঠেছে। এই যে অস্থায়ী সৌন্দর্য্য এ জীবনটিকে ধরে ফুটে উঠেছে, তাকে তুমি যদি ধন্য না কর, তবে তোমার কোন তাড়া না থাকতে পারে, কিন্তু আমার তো আর উপায় নাই।

চল চলরে ভঁররা কমল পাস।
তেরা কমল গাবৈ অতি উদাস॥
খোজ করত রহ বার বার।
তন বন ফুলো ডার ডার॥
দিবস চারকা সুরংগ ফুল।
বহিলগ মনমেঁ লাগল শূল॥
পুহুপ পুরানে জৈবে সুখ।
তব ভোঁরা কহা সমাবে দুখ॥

"চল চল হে ভ্রমর, তোমার কমলের পাশে চল। তোমার কমল বড় উদাস সুরে গান কচ্চে। বার বার সে তোমার খোঁজ করুচে, তার তনুবনখানি যে ডালে ডালে পুষ্পিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু হায় সে সুন্দর মনোহর ফুল যে দিন চারেকের জন্য, সেই জন্যই তো মনের মধ্যে বেদনা লেগেই আছে। এই ফুল পুরোনো হলেই শুকিয়ে যাবে। তখন হে ভ্রমর, এই দুঃখ মিটবে কিসে! কোথায় এই দুঃখ রাখবার জায়গা হবে!"

এই জীবনটী যে শাখায় শাখায় পুষ্পিত হয়েছে, কিন্তু জীবনের ভ্রমর কোথায়? এই জন্যেই তার মনের মধ্যে ব্যথা। এই যে সে আজ বিকশিত হয়েছে, কালই ত সে পুরাতন হয়ে যাবে, শুকিয়ে যাবে, তখন হে ভ্রমর, আমি এ দুঃখ কোথায় রাখব? এই তো অসীমের জন্য সসীমের কান্না। তিনি যদি বৈরাগী অনাসক্ত হয়ে থাকতেন, তবে তো আশাই ছিল না। আমি সসীম, তিনি অসীম। কিন্তু এখানে তো ছোট বড়র কথা নয়, এ যে প্রেম। আমি ছাড়াও তো তাঁর চলে না।

তিনি তাঁর বিশ্ব-প্রকৃতিতে রাজা হলেও, আমি না হলে তাঁর প্রেমস্বরূপ অসম্পূর্ণ। এই যে আমাকে ছাড়া তাঁর চলে না, এই তত্ত্বটি মধ্যযুগের কবি জ্ঞানদাস বঘেলি চমৎকার কবিত্বে প্রকাশ করেছেন।

এই লোকলোকান্তরের অধীশ্বর মহোৎসব-রত। এই প্রকৃতি তাঁর দূত। আমি তাঁর একমাত্র অতিথি। অথচ দূত এত আড়ম্বরে আসচে যে আমি তার ঐশ্বর্য্যই দেখ্‌চি। যে হিরণ্ময় পাত্রটি সত্যকে ঢেকে রেখেছে, তাই দেখ্‌চি।

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্"

এই পাত্রখানি না সরালে দেখি কেমন করে? দূতের আড়ম্বরই যে বাধা হোলো।

"ফজরমেঁ জব আয়া য়লচি
পুষাক সুনহলী তেরী।
গমক ভর জব শ্বাঁস লগায়া
চিত জগায়া মেরী॥
ধূপমেঁ হমকো কিয়া উদাসা
ক্যা পীড় দুর সমায়া।
গায়া গেরুয়া সুর মঘরবী
মরনসা রৈন আয়া॥
কাগজ কালা হরফ উজালা
ক্যা ভারা খত পায়া।
ইত্তী রৌনক কোঁরে চলচী
তুহি যাদ ভুলায়॥
ভারী জলসা আজম দাবত
তুহী ইক মেহবান।
খক্ষ খক্ষমেঁ খত হৈ ফৈলী
মগরূর হম ফরমান॥"

প্রভাতে যখন এলে হে দূত, তখন তোমার সোনালী পোষাক। পুষ্পগন্ধে ভরা পবনের সুরভি নিশ্বাস লাগাইয়া আমার চিত্তকে জাগাইলে। মধ্যাহ্ন রৌদ্রে আমাকে উদাস করিলে। আকাশের দিগন্তের চক্রবালে কি এক ব্যথা যেন তুমি ভরে রেখেছ। (প্রভাতে তোমার সোনার পোষাকে, সুরভিগন্ধে মুগ্ধ হলাম, তোমার বার্ত্তা শুনবার অবসর আর হোল না। মধ্যাহ্নে তোমার উদাস আকাশই দেখতে লাগলাম। তাই আমার মন বৈরাগ্যে ভরে গেল)। সন্ধ্যার সময় গেরুয়া সান্ধ্য সুর পশ্চিমাকাশে গাইলে, মরণের মত রাত্রি এলো। তার পর একখানি পত্র দিলে—তার কাগজখানা কালো, তার উপর আগুনের মত জ্যোতিষ্কের অক্ষরগুলো জ্বলচে। কি বিরাট পত্রখানি পেলাম। হে দূত! এত আড়ম্বর কেন তোমার। তোমাকে দেখেই তো আমার মন ভুলে গেলো। তুমি যাঁর দূত, তাঁর বার্ত্তাটি আর বুঝতেই পেলাম না।

দূত (বিশ্ব-প্রকৃতি) বল্লেন "বিরাট তাঁর সভা, মহামহোৎসব তিনি করচেন, তুমি তাতে একমাত্র অতিথি। তাই লোকে-লোকান্তরে পত্রখানি আমি ছড়িয়ে ধরেছি। যেন তোমার নজরে পড়ে। আর একমাত্র অতিথির দূত আমি গর্ব্বিত। তাই আমার এই আড়ম্বর। তোমার কাছে কি আমি দীন বেশে আসতে পারি?

তাই বুঝতে পারি আমি ছাড়াও তাঁর বিশ্ব মহোৎসব অচল হয়ে রয়েছে। আমার জন্যও তিনি ব্যগ্র। আমাকে পাবেন বলেই তিনি ভিখারী হয়ে বেরিয়েছেন।

"তোহিঁ মোহি লগন লগায়ে রে ফকীরবা।
সোয়তহি মৈঁ অপনে মন্দিরমেঁ
শব্দমার জগায়ে রে ফকীরবা॥
বুড়তমী মৈঁ ভবকে সাগরমেঁ
বহিয়া পকড় সমঝায়ে রে ফকীরবা॥
এঁকৈ বচন দুজৈ বচন নহী
তুম মোসে বন্ধ ছুড়ায়ে রে ফকীরবা॥
কহৈঁ কবীর সুনো ভাই সাধো
প্রাণন প্রাণ লগায়ে রে ফকীরবা॥

হে ফকীর, তোমাতে ও আমাতে যে প্রেমের বাঁধন বেঁধেছ! আপন মন্দিরে শুয়েছিলাম, সুরের আঘাতে জেগে উঠেছি। ভবসাগরে ডুবে যাচ্ছিলাম, হাতখানি ধরে আমাকে বাঁচিয়ে দিলে, হে ফকীর! একটি মাত্র কথা কইলে আর দ্বিতীয় কোনো কথাই নেই, আমার সব বাঁধন অমনি ছুটে গেল, হে ফকীর! কবীর বলেন, হে ফকীর, আমার প্রাণে তোমার প্রাণ লাগালে।"

হয় তো তাঁকে দেখি নি, তবু তাঁর সুর শুনেই প্রাণ উদাসী। আমার ফকীর যিনি আমার জন্য ভিক্ষুক হয়ে বেরিয়েছেন, তাঁকে কি আমি ফেলতে পারি? তাঁকে আমার অদেয় কি হতে পারে?

"মোর ফকীরবা মাংগি জায়
মৈঁ তো দেখহুঁ ন পোলেঁয়া।
মংগনসে ক্যা মাংগিয়ে
বিন মাংগে জো দেয়।
কহৈঁ কবীর মৈঁ হৌঁ বাহী কো
হোনী হোয় সো হোয়॥"

"আমার ফকীর ভিক্ষা করে চলেছেন, আমি তো দেখতেও পেলাম না। ভিক্ষুকের কাছে আবার কিসের ভিক্ষা, না চাহিতেই যে দেয়? কবীর বলেন, আমি তাঁরি, যা হবার হয় হোক না কেন।"

তুমি আমার সব কেড়ে নিয়ে ভিখারী করে আজ আমার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছ। আজ আর আমার তো কিছু নেই, আজ আমাকেই দিতে হবে। তিনি কত যুগ ধরে জীবন দুয়ারে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাইছেন। আজ এখন গোলমাল করবার সময় নয়।

"জীব মহলমেঁ শিব পহুনয়া
কহাঁ করত উনমাদরে।
পহুঁছা দেরা করিলে সেয়া
রৈন চলী আবতরে॥
জুগন জুগন করৈ পতীছন
সাহবকা দিল লাগারে।
সুঝত নাহী পরম সুখ সাগর
বিনা প্রেম বৈরাগ রে॥
কহত কবীর সুনো ভাই সাধো
পায়া অচল সোহাগ রে॥"

"জীবন-মন্দিরে শিব আজ অতিথি। আজ কোথায় গোলমাল কচ্চিস্? দেবতা আজ পৌঁছেছেন, আজ সেবা করে নে, রাত যে হয়ে চলে এলো। যুগ যুগ তিনি যে প্রতীক্ষা করেছেন। তাঁর চিত্ত আমাকে চেয়েছে বলেই তো। বিনা প্রেম বৈরাগ্যে সেই পরম সুখ-সাগরকে দেখাই যায় না। কবীর বলেন, অচল সৌভাগ্য আজ মিলেছে।"

আজকে গোলমাল করবার সময় নয়। আজ তাঁকে সেবা কর। প্রেম-বৈরাগ্য বিনা সে পরমানন্দ সাগর দেখতে পাবে না। আজ তাঁকে সব দিয়ে ধন্য হও। প্রদীপ শিখাতে আত্মদান করে ধন্য। নদী সমুদ্রে আপনাকে ডুবিয়ে ধন্য, ফুল বিকশিত হয়ে সৌরভ লুটিয়ে দিয়ে ধন্য, সূর্য্য জ্বলতে জ্বলতে জ্যোতিঃ দান করে ধন্য। এই দান বিনা, এই জ্বালা বিনা জীবন ব্যর্থ। আজ সর্ব্বস্ব দিয়ে ধন্য হও।

"আজকে দিন মৈঁ জাঁউ বলিহারী।
পীতম সাহব আয়ে মেরে পহুনা।
ঘর আংগন লগৈ সুহৌনা॥
নব পাাস লগৈ মাংগন গাবন।
ভয়ে মগন লখি ছবি মন ভাবন॥
চরন পখারুঁ বদন নিহারুঁ।
তন মন ধন সব সাঈঁ পর বারুঁ॥
সুরত লগী সত্ত নামকী আসা।
কহৈ কবীর দাসনকে দাসা॥"

"বলিহারী যাই আমি আজকের দিনের। আজ প্রিয়তম আমার ঘরে অতিথি এসেছেন। ঘর বাহির (অঙ্গন) আজ কি শোভাই পাচ্ছে। সব তৃষা আজ তৃপ্ত হয়ে মঙ্গল গাইতে লেগেছে। মনোহর তাঁর রূপ দেখে মন কোথায় ডুবে গেছে! তাঁর চরণ ধোয়াবো, বদনখানি দেখবো, তনুমনধন সব তাঁকে উৎসর্গ করবো। প্রেম যে লেগেছে, সত্য নামের তৃষ্ণা জেগেছে। দাসের দাস কবীর এই কথা আজ বলছেন।"

এই তো সাধনা। আমার প্রেম তাঁর প্রেমে পূর্ণ। তাঁর প্রেমও আমার প্রেম ছাড়া অপূর্ণ। তাই তিনি অসীম ধৈর্য্যে আমার জীবন-মন্দিরের দ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন। একবার সেই ভিখারীর করুণ নয়ন দুটি যদি চেয়ে দেখ, তবে সব ছেড়ে দিয়ে ভিখারী হতে হবে। কত যুগ আর তাঁকে দাঁড় করিয়ে রাখবে? দেখ, আমার ফকির আজ আমাকেই ভিক্ষা করে উদাস গান গাইতে গাইতে চলেছেন। আমার অন্তরের অন্তরে সে সুর গিয়ে বেজেছে। (নব্যভারত)

শোক-সংবাদ

৺মহারাজ জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর

কুচবিহারের মহারাজ জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের অকালে পরলোক গমনের সংবাদে আমরা বিশেষ দুঃখানুভব করিয়াছি। মহারাজ বাহাদুর কিছুদিন পূর্ব্বে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও বিলাত গমন করিয়াছিলেন। সেখানেই তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন; অসুখের সংবাদ পাইয়া শ্রীযুক্তা মহারাণী ও পুত্র-কন্যাগণ বিলাতে চলিয়া যান। সেখানেই মহারাজের দেহাবসান হইয়াছে। তাঁহার ভস্মাবশেষ এদেশে আনীত হইয়াছে; শীঘ্রই কুচবিহার রাজধানীতে তাহা সমাহিত হইবে। আমরা মহারাজ বাহাদুরের পরলোকগমনের জন্য তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও প্রজাবর্গের শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

৺মহারাজ জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর

৺রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়

উত্তরপাড়ার জমিদার স্বনামখ্যাত ৺জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উপযুক্ত পুত্র রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় সেদিন ৮২ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন। মানুষ জীবনে যাহা কিছু কামনা করিতে পারে—বিদ্যা, ধন, মান, যশঃ, পুত্র-কন্যা, আত্মীয়স্বজন—রাজা প্যারীমোহন এ সকলই পাইয়াছিলেন, সুদীর্ঘকাল ভোগও করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের সকল হিতকর কার্য্যেরই অগ্রণী ছিলেন রাজা প্যারীমোহন; সামাজিক নেতৃবর্গের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন রাজা প্যারীমোহন। উপযুক্ত বয়সে আত্মীয়-স্বজন পরিবৃত হইয়া তিনি সুখের মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন; কিন্তু বাঙ্গালা দেশের যে একজন অগ্রণী চলিয়া গেলেন, সে অভাব আর পূর্ণ হইবে না।

৺রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী

শ্রীরামপুরের গোস্বামী-বংশের উজ্জ্বল রত্ন রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী আর ইহজগতে নাই। কোন রোগের যন্ত্রণা তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় নাই। বিষয়কর্ম্ম দেখিবার জন্য কলিকাতা হইতে শ্রীরামপুরে একদিনের জন্য গিয়াছিলেন; কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া রাত্রি দশটায় আহারান্তে শয়ন করিবামাত্র হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ধনী গৃহের সন্তান হইয়াও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, কয়েক বৎসর হাইকোর্টে ওকালতি করেন, তাহার পর বিষয়কর্ম্ম দেখিবার জন্য ওকালতি ত্যাগ করেন। তিনিই প্রথম বাঙ্গালা দেশের ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন। রাজা

কিশোরীলালের মৃত্যুতে বাঙ্গালা দেশ একজন মহৎ ব্যক্তি হারাইল।

৺রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়

৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুপণ্ডিত, সুধী, মহানুভব, বাঙ্গলা সাহিত্যের অকৃত্রিম সেবক সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আর পৃথিবীতে নাই, তাহার দিব্যাত্মা সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছে। বাঙ্গালী তাহার একটা পরম গৌরবের বস্তু হারাইয়াছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র, ঋষিকল্প শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সত্যেন্দ্রনাথ একজন মানুষের মত মানুষ ছিলেন; বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই সর্ব্ব প্রথমে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এ দেশে সিবিলিয়ান হইয়া আসেন, এবং বোম্বাই প্রদেশেই তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হয়। ১৯৯৫ অব্দে পেন্সন লইয়া তিনি দেশে আসেন এবং এতকাল দেশ হিতকর কার্য্যে সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। তাঁহার বোম্বাই-চিত্র, মেঘদূতের বঙ্গানুবাদ ও অনেক কি সারগর্ভ রচনা তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে। আমরা তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কন্যা শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর গভীর শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

৺কুমার ঘনদানাথ রায় চৌধুরী

আমরা শোকসন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, রাজসাহী দুবলহাটীর বড় রাজকুমার ঘনদানাথ রায় চৌধুরী বাহাদুর গত ১৯শে পৌষ শেষ রাত্রিতে ৩৮ বৎসর মাত্র বয়সে সেপ্টিসিমিয়া রোগে পরিবারবর্গ, আত্মীয়-স্বজন ও প্রজাদিগকে শোক সাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহাকে অধিককাল রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই; অল্প কয়েকদিন শয্যাশায়ী থাকিয়াই তাঁহার পবিত্র আত্মা অমর ধামে চলিয়া গিয়াছে। আমরা কুমার বাহাদুরের আত্মীয়-স্বজন-গণের এই গভীর শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

৺সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

বাঙ্গালা দেশে যাহারা গল্প উপন্যাস পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নাম জানেন। সেই স্বনামখ্যাত ভট্টাচার্য্য মহাশয় অকালে আত্মীয়-স্বজনকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। প্রায় পাঁচ ছয় মাস হইতে তিনি নানা রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন; অবশেষে চিকিৎসায় কোন ফল না হওয়ায় তিনি রাণাঘাটে চলিয়া যান; সেখানেই তাঁহার দেহাবসান হইয়াছে। তাঁহার অনেক ভক্ত পাঠক ছিল। আমরা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে মর্ম্মাহত হইয়াছি।

৺রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী

৺সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

৺অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপেথিক চিকিৎসক, পরলোকগত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র সুযোগ্য চিকিৎসক অমরেন্দ্রনাথ অতি অকালে, চল্লিশ বৎসর মাত্র বয়সে, কাল বসন্তরোগে সকলকে কাঁদাইয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে বিশেষ সন্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া অনেকদিন চিকিৎসা-কার্য্য করিয়া ইনি ১৯১৯ অব্দে বিলাত যান। সেখানে গলনালী, কর্ণ ও নাসিকার চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া অত্যল্প দিন হইল দেশে ফিরিয়াছিলেন, এবং এই অল্প সময়ের মধ্যেই চিকিৎসায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। অকালে সব ফুরাইয়া গেল। তাহার আত্মীয়গণের শোক অসহনীয়; সান্ত্বনার কথা যে কিছুই নাই!

৺নীলরতন মুখোপাধ্যায়

'বীরভূম' পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, সাহিত্য পরিষদের অকৃতিম সেবক চণ্ডীদাসের পদাবলীর সংগ্রহকার, নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক গমনে আমরা বড়ই ব্যথিত হইয়াছি। আমরা তাঁহার আত্মীয় স্বজনের এই শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

৺কুমার ঘনদানাথ রায় চৌধুরী

কলিকাতা ইউনিভারসিটী কোর

পল্টন কমাণ্ডার্স (বামদিক হইতে)

দাঁড়াইয়া—সার্জ্জেন্ট জ্যোতি বরাট, সার্জ্জেন্ট বিভূতি সরকার, কর্পোরাল রায় চৌধুরি ও কর্পোরাল সেন।

বসিয়া—কর্পোরাল নির্ম্মল ভট্টাচার্য্য, কর্পোরাল রাম চৌধুরি ও সার্জ্জেন্ট সূর্য্য ব্যানার্জ্জি।

ক্যাম্প

ক্যাম্প ভাঙ্গিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে

ক্যাম্প ভেঙ্গে যাবার পর

সম্পাদকের বৈঠক

প্রশ্ন

১। টাইপরাইটার, মালটিগ্রাফ ইত্যাদি মেসিনের পুরান রিবন re-ink করা যায় কি না? যদি করা যায় তা'হলে কি কি জিনিষ দ্বারা তৈয়ার করা যায় এবং সেই সমস্ত জিনিষের নাম কি এবং ঐ সমস্ত জিনিষের পরিমাণ কত? ঘরে তৈয়ার করিবার কি কোন উপায় নাই? Re-ink ছাড়া নুতন রিবন তৈয়ার করা যায় কি না? তাহলে কি কাপড়ের করা যায়? শ্রীঅনাদিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২। মেদিনীপুর জেলার কাঁথি-মহকুমার খেজুরী থানায় সাহাপুর গ্রামের জমিদার জনৈক প্রাচীন মুসলমানের গৃহে দুইখানি পারস্য-ভাষায় লিখিত সনন্দে দেখিলাম—একখানিতে "১৪ মহরম সন ৮ জলুস্ মোতাবেক ১৫ মাহা ভাদ্র সন ১১৩৩ সাল" ও অন্যটীতে "৯ রবিয়ল আউল ২১ জলুস্ মোতাবেক সন ১১৪৬ সাল" লিখিত আছে। সনন্দগুলি নবাবের কর্ম্মচারী ও জমিদারের সহিমোহর যুক্ত। উভয় সনন্দের দ্বারা জানা যায়—এই 'জলুস্' নামক সনের আরম্ভ ১১২৬ সাল। এই 'জলুস্' সন কাহার দ্বারা প্রচলিত বা কি অনুসারে গণনীয় কেহ জানাইলে বাধিত হইব। শ্রীমহেন্দ্রনাথ করণ

৩। কাচের উপর ছবি আঁকিতে হইলে যে যে রং দরকার, তাহা কি কি উপাদানে প্রস্তুত করিতে হয়? শ্রীনিখিলপ্রকাশ সোম

৪। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও সৎশূদ্রগণ লাঙ্গল ধরিয়া ভূমি কর্ষণ করিতে পারেন কি না? যদি হলকর্ষণ ও শকটযোজন ধর্ম্মশাস্ত্র সঙ্গত হয়, তাহা হইলে উহা অনুষ্ঠানের জন্য কি কি নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে? শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মল্লিক

৫। এতদঞ্চলে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে,—

"তিন ভাল, আঠারো দোষ, জেনে শুনে কবুতর পোষ।" গুণ ও দোষগুলি কি কি?

৬। আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন এতদঞ্চলে "গার্শী" নামক একটি পর্ব্ব প্রচলিত দেখা যায়। রাত্রি শেষে পাঁকাটি পোড়াইয়া উহার তাপ লইতে হয় এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ "জাগাইতে" হয় এবং "জাগ" "জাগ" এই শব্দ উচ্চারণ করিতে হয়। কুলা বাজানো এই উৎসবের আর একটি অঙ্গ। বঙ্গের আর কোন্ কোন্ জেলায় বা বঙ্গের বাহিরে অপর কোনো স্থানে এবমপ্রকার উৎসব প্রচলিত আছে কি?

৭। এতদঞ্চলে সাধারণতঃ শ্রীপঞ্চমীর দিন ইলিশমাছ বাস-গৃহের মধ্যে কুটিয়া তাহার আঁইস মেজেতে (অবশ্য মেটে ঘরে) পুঁতিয়া রাখে এবং পরে ঐ মাছ পূজা করা হয়। মীন পূজা প্রথা সম্বন্ধে শাস্ত্রে কোনোরূপ উল্লেখ আছে কি? ঐ পূজা আর কোন্ কোন্ দেশে প্রচলিত আছে? এবং ঐ প্রথা কত দিনের?

৮। ছেলেপিলেদের মুখে শীতের প্রভাতে এই ছড়াটি প্রায়ই শোনা যায়:—"সূর্য্য মামা, সূর্য্য মামা, রোদ দাও, তোর ছেলেটি জাড়ে (শীতে) ম'ল"—ইত্যাদি।

সূর্য্যদেবকে মাতুল বলিয়া সম্বোধন সংস্কৃত বা ইংরাজী সাহিত্যের কোথাও পাওয়া যায় কি? শ্রীরাধাচরণ দাস

উত্তর

কাচ জুড়িবার আঠা

Gelatine (Nelson's No 1 gelatine—যাহাতে photoর dryplate তৈয়ারী হয়) acetic acidএ ভিজাইয়া রাখিলে গলিয়া যায়। সেই আঠায় কাচ জুড়িলে জোড় সহজে খোলে না। কিন্তু জল লাগিলে নাও থাকিতে পারে। চিমনী প্রভৃতি জুড়িতে এই আঠা বিশেষ উপযোগী। শ্রীসুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য্য

হাঁসের ডিমের লালা চূণের সঙ্গে উত্তমরূপে ফেনাইয়া ভগ্ন কাচখণ্ড একত্র মিলাইয়া উহার উপরে একটী প্রলেপ দিলে ভগ্ন কাচ অতি সুন্দররূপে জুড়িয়া যায়। বহু টানাটানিতেও উহা আর খসিয়া বা ভাঙ্গিয়া যায় না। কাচের উপর শ্বেতবর্ণের সূক্ষ্ম একটী দাগ থাকে মাত্র। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

মগের মুলুক

পলাশীর যুদ্ধের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ এদেশে মুসলমান রাজত্ব তিরোহিত হইবার পর ও ইংরাজ রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে—এই মধ্যবর্ত্তী সময়ে আলাম্ প্রা নামক কোনও মগ বর্ম্মা দেশে (আভাতে) এক রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার অনুচরবর্গ রেঙ্গুন, আরাকান, মর্টাবান, টেনিসেরিম প্রভৃতি প্রদেশ জয় করিয়া আসাম, মণিপুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। তাঁহার অত্যাচার বঙ্গদেশের সুন্দরবন, নিম্নবঙ্গ প্রভৃতি স্থান রীতিমত অনুভব করিত। এই অমানুষিক অত্যাচার হইতেই "মগের মুলুক" নাম প্রচলিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে কোনও অত্যাচারিত বা অরাজক স্থানকে "মগের মুলুক" আখ্যা প্রদান করা যায়। (Vide The Oxford Student's History of India, By Vincent A Smith. Page 302, lines 26 to 34).

এক সময়ে আসাম রা[illegible] রাজহীন ও গৃহবিবাদে ব্যতিব্যস্ত হওয়ায় ব্রহ্ম দেশবাসী মগজাতীয় লোকেরা তথায় আসিয়া আধিপত্য স্থাপন ও যথেচ্ছ অত্যাচার করে। সে উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচারে দেশের অবস্থা অতি শোচনীয় হয়, এবং কেহই তাহার প্রতিকারে সমর্থ হয় নাই। তাই কেহ কাহারও উপর অন্যায় অত্যাচার করিতে গেলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। শ্রীঅতুল্যকুমার ঘোষ

সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা ব্যঙ্গ কাব্য

বঙ্গভাষার সর্ব্বপ্রথম ব্যঙ্গ-কাব্য শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ প্রণীত— হুতুম প্যাঁচার নক্সা।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ গুহ

অগ্রহায়ণ মাসের ভারতবর্ষের সম্পাদকের বৈঠকের প্রথম প্রশ্নের উত্তর ;—

শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রাদেবী অর্জ্জুনকে দেখিয়া মোহিত হন। কিন্তু তিনি ভাবিলেন, অর্জ্জুনকে এ কথা জানাইলে, অর্জ্জুন যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন তাহা হইলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে। আমি অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারিবনা। কেন না, তাহা হইলে আমাকে দ্বিচারিণী হইতে হইবে। ইহা ভাবিয়া তিনি রতিদেবীর শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে সমুদায় প্রকাশ করিয়া বলিলেন। রতিদেবী তাঁহার কথা শুনিয়া তাঁহাকে মন্ত্রপূত সিন্দুর প্রদান করেন এবং বলিয়া দেন, তুমি ইহা নাসিকাগ্রে পরিয়া সর্ব্বপ্রথমে অর্জ্জুনের গোচরীভূত হইবে। এই সিন্দুর তোমার নাসিকাগ্রে দেখিলেই অর্জ্জুন তোমাতে মুগ্ধ হইবে। সুভদ্রাদেবী উক্ত সিন্দুর নাসিকাগ্রে পরিয়া অর্জ্জুনের গোচরীভূত হইয়াছিলেন এবং উক্ত সিন্দুরের গুণে অর্জ্জুন তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিলেন। এই কারণে আজকাল স্ত্রীলোকগণ "নাসিকাগ্রে সিন্দুর পরিলে" তাহার স্বামী তাঁহাকে ভালবাসিবেন এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন।

শ্রীকালীপদ দত্ত

সূতার নম্বর

কলের সূতার নম্বর সূতার বাণ্ডিল দেখিলেই স্থির করা যায়। প্রতি বাণ্ডিলে যত মোড়া সূতা থাকে, সূতার নম্বর সাধারণতঃ তত। কিন্তু সূতার নানা রকম জুয়াচুরী চলে, সুতরাং এই পরীক্ষাই চরম নহে। সূতার নম্বর নিঃসংশয়িতরূপে বাহির করিবার প্রক্রিয়া এই— ৫৬ ইঞ্চি বেড়ের ৫৬০ পাক সূতায় এক ফেটী হয়। এক পাউণ্ড ওজনে এইরূপ যত ফেটী ধরে সূতার নম্বর তত। এইরূপ এক ফেটী সূতার ওজন বাহির করিয়া উহা দ্বারা এক পাউণ্ডকে ভাগ করিলেই মোটামুটী ভাবে ঐ ফেটীর নম্বর পাওয়া যাইবে।

সরকারী হিসাবে সূতাকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়—মোটা, মাঝারি ও সরু। ২৫ নং হইতে ৪০ নং পর্য্যন্ত মাঝারি। উহার নীচে মোটা, ও উপরে সরু। মোটা সূতা সাধারণ জামা কাপড় প্রভৃতিতে, মাঝারি সূতা সাধারণ ধুতি সাড়ীতে, ও সরু সূতা সরু কাপড় ও ধুতি সাড়ী প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া Single ও twist ভেদেও সূতাকে ভাগ করা হইয়া থাকে। দুই সূতা পাকাইয়া twist হয়। কাপড়ের পাড়, খাকী টুইল, ড্রিল ইত্যাদি ভাল ভাল জামার কাপড়ে twist ব্যবহৃত হয়।

শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র সেন

বিক্রমপুর নামের উৎপত্তি

বিক্রমপুরের নাম পূর্ব্বে "সমতট" বা "সমকট" অথবা "সঙ্কট" ছিল। "দিগ্বিজয় প্রকাশ" নামক সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে, "বিক্রমভূপবাসত্বাৎ বিক্রমপুরমতো বিদুঃ"। এই রাজা বিক্রম উজ্জয়িনী-পতি বিখ্যাত বিক্রমাদিত্য নহেন। তাঁহার সহিত আমাদের বিক্রমপুরের কোন সংস্রব নাই। যে বিক্রমের বসবাস নিবন্ধন প্রাচীন "সমতট" "বিক্রমপুর" নামে অভিহিত হইয়াছে, তিনি আমাদের বাঙ্গালার সেন বংশীয় নৃপতিবৃন্দের পূর্ব্বপুরুষ দাক্ষিণাত্যের অনেক নরপতি অশ্বপতি সেনের বংশধর ছিলেন। তাই অতি প্রাচীন ও প্রামাণিক "বিপ্রকুল কল্পলতা" বলিয়াছেন :—

> দাক্ষিণাত্যা বৈদ্যরাজবংশেকোঽশ্বপতি সেনকঃ।
> তদ্বংশে কনিতশ্চন্দ্র কেতুসেনো মহাধনঃ॥
> তস্য বংশে বীরসেনো ভূপঃ পরপুরঞ্জয়।
> তদ্বংশে বিক্রম সেনোজাতঃ পরম ধার্ম্মিকঃ॥
> কৃতবান বিক্রম পুরীং স্বনাম্নাভিহিতাং সুধীঃ।
> তস্য পুত্রঃ শুকদেব সেনঃ খ্যাত গুণোৎকরঃ॥

অতএব আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে বৈদ্যবংশীয় রাজা বিক্রমসেনের নামানুসারে এই বিক্রমপুর হইয়াছে। সুতরাং জনশ্রুতি যে রাজা ভর্তৃহরির সহিত কোন কারণে রাজা বিক্রমাদিত্যের মনোমালিন্য হইলে, তাহাতে তিনি দুঃখিত হইয়া সহোদরের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিয়া দেশ ভ্রমণে বহির্গত হন, এবং সাগর-তীরবর্ত্তী সমতট প্রদেশের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কিছুদিন তথায় বাস করেন, এ কারণ তাঁহার নামানুসারে ঐ স্থান বিক্রমপুর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে,—ইহার কোন ঐতিহাসিক মূল্য আছে কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Hunter মহোদয় এই জনপ্রবাদের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া লিখিয়াছেন :—

"There is a tradition that the celebrated Hindu Raja Bikramadatya held his court in the Southern portion of the District for some years and gave his name to the Purguna of Bikrampur," Hunter Statistical Account of Bengal, Page 11.

ইহাতে যে ঐতিহাসিক জগতের ক্ষতি হইয়াছে, তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি! আমরা "বিপ্রকুলকল্পলতার" উক্তিই ও সমীচান বলিয়া মনে করি। বিক্রমপুরের ইতিহাস-প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় তদীয় গ্রন্থে এবং শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার "বল্লাল মোহ মুদ্গার" নামক সুবৃহৎ গ্রন্থে ও বঙ্গের সেনরাজগণের আলোচনা প্রসঙ্গে উপরি উল্লিখিত "বিপ্রকুলকল্পলতার" উক্তিই ঐতিহ্যমূলক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীললিতমোহন রায়, বিদ্যাবিনোদ

কালিদাসের রঘুবংশে ভরত বড় কি লক্ষ্মণ বড় ?

বর্ত্তমান বর্ষের মাঘ সংখ্যার "ভারতবর্ষে" 'ভরত বড় কি লক্ষ্মণ বড়' এই প্রবন্ধলেখক যে বিচার করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য নিম্নে বিবৃত হইল।

রামায়ণ, ভট্টিকাব্য ও উত্তররামচরিতে লক্ষ্মণ অপেক্ষা ভরতের জ্যেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, ইহা আমরাও অবিসংবাদে স্বীকার করি।

কিন্তু আমাদের মতে রঘুবংশ মহাকাব্যে ভরত অপেক্ষা লক্ষ্মণেরই জ্যেষ্ঠত্ব কবির অভিপ্রেত। কালিদাসের ভাষার সহিত যাঁহারা বিশেষ পরিচিত, তাঁহারা ভাষার ভঙ্গী দেখিয়া সরল ভাবে কালিদাসের শ্লোক ব্যাখ্যা করিলে, লক্ষ্মণই ভরত অপেক্ষা বড় দাঁড়াইবেন। মল্লিনাথ কালিদাসের ভাষার সহিত অপরিচিত না হইলেও, রামায়ণের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য কয়েক স্থলে অনৃজু ব্যাখ্যা দিয়াছেন। "পার্থিবীমুদ-বহদ্রঘূদ্বহো লক্ষ্মণস্তদনুজামথোর্ম্মিলাম।" ইত্যাদি স্থলের এবং "বৃংক্রম্য লক্ষ্মণমুভৌ ভরতো ববন্দে" এই অংশের ব্যাখ্যায় মল্লিনাথ বিশেষ নিপুণতার সহিত ভরতের আপেক্ষিক জ্যেষ্ঠত্ব অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। তথাপি ঐ দুই স্থলেও তাঁহার ব্যাখ্যা অনৃজু। "বৃংক্রম্য লক্ষ্মণমুভৌ ভরতো ববন্দে" এখানে লক্ষ্মণ বন্দনার্হ হইলেও, তাঁহাকে বাদ দিয়া এইরূপ ব্যাখ্যাই সরল ও স্বাভাবিক। ভরতের পূর্ব্বে লক্ষ্মণের বিবাহের জন্য অত কৈফিয়ত এবং রাম-লক্ষ্মণ অপেক্ষা ভরত-শত্রুঘ্নের যথাক্রমে অবরজত্ব প্রতিপাদন এ সমস্তই রামায়ণের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা। ঐ দুই স্থলে মল্লিনাথের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা—অন্যত্র অসঙ্গতি না হইলে—অবশ্যই গ্রহণীয় হইত। কিন্তু "সৌমিত্রিণা তদনু সংসসৃজে স চৈন মুত্থাপ্য নম্রশিরসং ভৃস মালিলিঙ্গ। রূঢ়েন্দ্রজিৎ প্রহরণ ব্রণকর্কশেন ক্লিশ্যন্নিবাস্য ভুজমধ্যমুরঃস্থলেন।" এই শ্লোকের মল্লিনাথ কৃত অন্বয় ও ব্যাখ্যা কালিদাসের ভাষার রীতিবিরুদ্ধ বলিয়া সহৃদয়গণ গ্রহণ করিতে পারেন না। মল্লিনাথের মতে "সৌমিত্রিণা তদনু সংসসৃজে সঃ" এইখানে একটি বাক্য সমাপ্ত করিয়া "চৈনমুত্থাপ্য নম্রশিরসম" ইত্যাদি বলিয়া আর একটি বাক্য আরম্ভ করিতে হয়। বাক্যের আদিতে 'চ' এই পদের প্রয়োগ স্কুলের ছাত্রেরা করিতে পারে, কালিদাসের রঘুবংশে পাকা লেখায় উহা একান্ত অসম্ভব। মল্লিনাথ ঐ 'চ' টানিয়া লইয়া "আলিলিঙ্গ" এই পদের পরে আনিয়াছেন। কালিদাসের ভাষা এমন কি কাব্যের ভাষা যাঁহারা ভাল বুঝেন, তাঁহারা ঐ স্থলে "তদনু সৌমিত্রিণা সংসসৃজে" এই বলিয়া একটি বাক্য শেষ করিয়া "স চ নম্রশিরসম্ এনম্ উত্থাপ্য" ইত্যাদি বলিয়া আর একটি বাক্যের অন্বয় করিবেন। এইরূপ অন্বয়ই স্বাভাবিক। পূর্ব্ববাক্যে কর্ত্তৃপদের অভাব এখানে আদৌ দোষাবহ নহে; যেহেতু "তদনু" এই প্রয়োগে 'সংসসৃজে' ক্রিয়ার সহিত "বৃংক্রম্য লক্ষ্মণমুভৌ ভরতো ববন্দে" এই পূর্ব্ববাক্যের কর্ত্তা "ভরতঃ" এই পদের অন্বয় বোধগম্য হইতেছে। পূর্ব্ববাক্যের কর্ত্তার সহিত পরবাক্যের ক্রিয়ার অন্বয় কালিদাস অনেক স্থলে ঐরূপ চকারের দ্বারা এবং অথ শব্দের দ্বারা করিয়া থাকেন। তিনি এইরূপে রঘুবংশের ২।৪২ শ্লোকে ও ১৪।৩৫ শ্লোকে চকারের দ্বারা এবং ১১।৪৭ শ্লোকে 'অথ' শব্দের দ্বারা কর্ত্তৃপদের পুনরাবৃত্তি পরিহার করিয়াছেন; ঐ সকল স্থলে সর্ব্বনামের প্রয়োগও নাই। বলা বাহুল্য অথ শব্দের পরিবর্ত্তে আলোচ্য স্থলে 'তদনু'র প্রয়োগ মহাকবি ছন্দোঽনুরোধেই করিয়াছেন, তাহাতে অর্থের ব্যতিক্রম হয় নাই। "ক্লিশ্যন্নিবাস্য ভুজমধ্যমুরঃস্থলেন" এখানেও 'অস্য ভুজমধ্যম্ উরঃস্থলেন ক্লিশ্যন্' ইহাই কবির অভিপ্রেত স্বাভাবিক অন্বয়। রামায়ণের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য মল্লিনাথ এই শ্লোকে যে অতি কষ্টকল্পিত অন্বয় দিয়াছেন, তাহা আদৌ সহৃদয়গ্রাহ্য নহে। বোম্বের শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিত, নন্দার-গিকার প্রভৃতি তাঁহাদের সম্পাদিত রঘুবংশে ঐরূপ অন্বয়ের প্রতিকূলেই মত দিয়াছেন, কেহ কেহ প্রাচীন ব্যাখ্যাও উদ্ধৃত করিয়াছেন। ফলতঃ ঐ শ্লোকের সরল ও স্বাভাবিক অন্বয়—'তদনু (ভরতঃ) সৌমিত্রিণা সংসসৃজে। সঃ (সৌমিত্রিঃ) চ নম্রশিরসম্ এনম্ (ভরতম্) উত্থাপ্য রূঢ়েন্দ্রজিৎপ্রহরণ ব্রণকর্কশেন উরঃস্থলেন অস্য (ভরতস্য) ভুজমধ্যং ক্লিশ্যন্নিব ভৃশম্ আলিলিঙ্গ' এইরূপই কবির অভিপ্রেত এবং তাহা হইলেই লক্ষ্মণ ভরতের বড় হইয়া দাঁড়ান।

এখন বিচার্য্য—রামায়ণাদির সহিত সমন্বয়ের অনুরোধে কালিদাসের শ্লোক অনৃজু ভাবেই ব্যাখ্যা করা উচিত কি না? এবং কালিদাসই বা কেন রামায়ণাদিবিরোধে ভরত অপেক্ষা লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে গেলেন?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য প্রাচীন টীকাকারেরা এবং পণ্ডিত মহাশয়েরা সাধারণতঃ সমন্বয়ের বিশেষ পক্ষপাতী, তজ্জন্য ব্যাখ্যা কষ্ট-কল্পিত হইলেও তাঁহারা সেই পথেই চলেন। এইখানেই প্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথের অনৃজু ব্যাখ্যার সমর্থন। আমরা কিন্তু ভাষার দিক দিয়া কবির অভিপ্রেত অর্থ যাহা বোধগম্য হয়, তাহাই—সমর্থক যুক্তি থাকিলে সত্যের অনুরোধে গ্রহণীয় বলিয়া মনে করি। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে সমর্থক যুক্তির উল্লেখ এখানে করিতেছি। মহাকবি কালিদাস প্রাচীন কবি ভাসের নাটকাবলির অনুশীলনে তাঁহারই ভাবে অনেকটা অনুপ্রাণিত ছিলেন। এমন কি তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটকের অভিজ্ঞান শকুন্তল এই নামকরণ ভাসকৃত স্বপ্নবাসবদত্ত নাটকের নামের অনুকরণ বলিয়াই বোধ হয়। ভাসকৃত স্বপ্নবাসবদত্ত নাটকের ভূমিকায় মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় ভাসের নিকট কালিদাসের ঋণ দৃষ্টান্ত দ্বারা বিশেষ ভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন। মহাকবি ভাসের প্রতিমা নাটকে সপ্তম অঙ্ক দেখিতে পাই, ভরত লক্ষ্মণকে বলিতেছেন, "আর্য্য অভিবাদয়ে।" লক্ষ্মণ প্রত্যুত্তরে বলিতেছেন, "এহ্যেহি বৎস! দীর্ঘায়ুর্ভব। পরিষ্বজস্ব গাঢ়ম্।" এখানে বোধ হয় কোন কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যার অবসর নাই। ভাসের নাটকাবলি অনেককাল অপ্রচলিত থাকাতে মল্লিনাথ সম্ভবতঃ প্রতিমা নাটক দেখেন নাই। আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়, ভাসের অনুসরণেই মহাকবি কালিদাস রঘুবংশে ভরত অপেক্ষা লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। কালিদাসের কাব্যে আলোচ্য স্থলগুলি সরল ভাবে ব্যাখ্যা করিলে উহাই দাঁড়াইবে,—কোন কৈফিয়ৎ দিতে বা কষ্টকল্পিত অন্বয় করিতে হইবে না। জন্ম প্রকরণেও ভরতের জন্মের পরে লক্ষ্মণের জন্ম এরূপ স্পষ্ট নির্দ্দেশ নাই। ভরতের জন্ম পূর্ব্বশ্লোকে এবং লক্ষ্মণ শত্রুঘ্নের জন্ম একত্র তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে বর্ণিত আছে। তাহাতে আমাদের সিদ্ধান্তের কোন ব্যাঘাত হয় না।

শ্রীহেমচন্দ্র রায় এম্,এ

পুস্তক-পরিচয়

রণডঙ্কা।—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ৸০ আনা।

বইখানি বেশ লাগল। এই সব মানুষের জীবন ভারি অদ্ভুত ঠেকে আমার কাছে। আমাদেরই মতো মানুষ, অথচ কি তফাৎ সেকেলের মানুষের সঙ্গে আজকালের আমাদের! আমরাও কেউ গল্পের মানুষ হয়ে উঠতে পারছি নে, আর সেকালের তাঁদের জীবন কেমন সহজে গল্পের সঙ্গে মিলে গেছে। যাঁরা কথা কয়েছিলেন, তাঁরা নেই, কিন্তু তাঁদের মুখের কথা, তাঁদের জীবনের নানা সত্য ঘটনার কথা এখনও বেঁচে রয়েছে, এমন আশ্চর্য্য ঘটনা আজকালের আমাদের কজনের অদৃষ্টে ঘটেছে। আমরা ভয়ানক কাজের 'মানুষ' হয়ে উঠ্‌ছি, গল্পের মানুষ হয়ে উঠতে পারছিনে। আমাদের ছেলেমেয়েরা আমাদের ভুলে যাবে, কিন্তু যাদের কথা নিয়ে এই 'রণডঙ্কা' বইখানি লেখা, তাদের মনে রাখবে। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্মান্তরে।—শ্রীবিভা দেবী প্রণীত, মূল্য দুই টাকা। আমরা নবীনা লেখিকার এই প্রথম অর্ঘ্য সাদরে বরণ করিয়া লইতেছি। এই 'জন্মান্তরে' উপন্যাসখানি পড়িয়া আমরা তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। সনাতন দাদার মত দেওয়ান এখন আর মিলে না; নলিন, লালা লেখিকার প্রাণ দিয়ে আঁকা; আর প্রতিমা ও কুমার একালের ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের চিত্র। লেখিকার লেখা বেশ ঝরঝরে, কোথাও অকারণ বাগাড়ম্বর নাই।

অন্ধা।—শ্রীপ্রভাবতী দেবী প্রণীত, মূল্য আট আনা। এখানি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের আট-আনা-সংস্করণ গ্রন্থমালার একোনাশীতিতম গ্রন্থ। ইহা একখানি ছোট উপন্যাস। মৃদুল এই উপন্যাসের নায়িকা, তিনি অন্ধ। তাঁহারই জীবন-কথা অতি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় এই উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা এই সুন্দর উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছি। শ্রদ্ধেয়া লেখিকা মহোদয়া যে যে অচিরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন, তাহা আমরা তাঁহার এই অন্ধা পড়িয়াই বুঝিতে পারিয়াছি।

পুষ্পদল।—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বি-এ প্রণীত, মূল্য আট আনা। এই পুষ্পদল আট-আনা-সংস্করণ গ্রন্থমালার একাশীতিতম গ্রন্থ। ইহাতে কয়েকটী ছোট গল্প আছে;—রূপার বালা, প্রতীক্ষা, সন্ধ্যা, ব্যথা, মন্দির প্রতিষ্ঠা, এই কয়েকটী গল্প দিয়া এই পুষ্পদল সজ্জিত হইয়াছে। গল্প কয়টীই সুপাঠ্য; তাহার মধ্যেও প্রথম ও শেষ গল্প, রূপার বালা ও মন্দির প্রতিষ্ঠা আমাদের বড়ই ভাল লাগিয়াছে; পাঠক পাঠিকাদিগেরও ভাল লাগিবে। যতীন্দ্র বাবুর সরল সুন্দর লেখার আমরা বড়ই পক্ষপাতী।

রক্তের ঋণ।—শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল প্রণীত, মূল্য আট আনা। আট-আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার দ্ব্যশীতিতম গ্রন্থ এই 'রক্তের ঋণ'। লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক শ্রীযুক্ত নরেশ বাবু যে বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছেন, তাঁহার অধিকাংশ উপন্যাসেরই যাহা উদ্দেশ্য, সেই বংশানুক্রমের দোষগুণ লইয়াই এই রক্তের ঋণ লিখিত। অবশ্য এ গ্রন্থে নাগানন্দের মাতার চরিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া লেখক অনেক স্থানে বিশেষ কুণ্ঠায় পতিত হইয়াছেন, পুত্রের মুখে মাতার ব্যাভিচারের কাহিনীর বর্ণনা শুনিয়া মনে ব্যথার সঞ্চার হয়; কিন্তু আখ্যায়িকাকার নিতান্ত নাচার হইয়াই তাহা করিয়াছেন। রক্তের ঋণ শোধ দিতে যে কি করিতে হয়, তাহা নরেশ বাবু সুন্দর ভাবে বলিয়াছেন।

ছোড়্‌দি।—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার প্রণীত, মূল্য আট আনা। এখানি আট-আনা-সংস্করণ গ্রন্থমালার ত্র্যশীতিতম গ্রন্থ। লেখক শ্রীমান বিজয়রত্ন মজুমদার, উপন্যাসক্ষেত্রে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন; এই ছোড়-দি তাঁহার সেই প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। শ্রীমান বিজয়রত্ন যাহা বলেন, একেবারে মন খুলিয়া সাদা কথায় বলিয়া ফেলেন, কোন প্রকার ঘোরালো পেঁচালো ভাব তাঁহাতে একেবারেই নাই; এই জন্যই তাঁহার লেখা আমাদের এত ভাল লাগে। আর ভাল লাগে তাঁহার অকৃত্রিম সহানুভূতির জন্য; তিনি প্রাণ ঢালিয়া লেখেন। পাঠক-পাঠিকাগণ এই 'ছোড়-দি'তে তাহার প্রমাণ পাইবেন।

পল্লী-মঙ্গল।—শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য এক টাকা। 'পল্লী-মঙ্গলে'র লেখক বলিতেছেন "তোমার কর্ম্মক্ষেত্র তুমি নিজে, ও তোমারই বাসগ্রাম; ইহাতেই আত্মনিয়োগ কর। তোমার সর্ব্বপ্রধান কামনার বস্তু।" ইহাই এই গ্রন্থের পরিচয়। প্রত্যেক বাঙ্গালীর ঘরে এই পুস্তকখানি দিন-পঞ্জিকার মত বিরাজ করিলে, এবং প্রত্যেক পল্লীবাসী এই পুস্তকের নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিলে আমার বাঙ্গালা আবার সোণার বাঙ্গালা হইবে। এই রকমের বই-ই এখন চাই।

উমাকান্ত।—স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক বিরচিত; মূল্য দেড় টাকা। এই 'উমাকান্ত' উপন্যাসখানি পূজনীয় শাস্ত্রী-মহাশয় অসমাপ্ত রাখিয়াই পরলোকগত হন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেই অসমাপ্ত হাতের লেখা খাতাখানি একবার আমাকে দেখিতে দেন; আমি পড়িয়া দেখিয়া প্রিয়নাথ বাবুকেই উহার শেষাংশ লিখিতে অনুরোধ করি। তিনি তাহাই করিয়া এই বইখানি ছাপাইয়াছেন; পিতার লেখার সঙ্গে পুত্রের লেখা ঠিক মিলিয়া গিয়াছে, দুই হাতের লেখা বলিয়া ধরিবার যো নাই। পুস্তকের অধিক পরিচয় একেবারেই অনাবশ্যক—একমাত্র পরিচয়, ইহা শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের বাঙ্গালা উপন্যাস-সাহিত্যে শেষ দান।

শ্রীশ্রীবিজয়-কথামৃত।—শ্রীনবকুমার বাগচি প্রণীত, মূল্য দুই টাকা। পূজ্যপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের পবিত্র জীবন-কথা আরও কয়েকখানি প্রকাশিত হইয়াছে; তবুও আমরা এখানি সাদরে গ্রহণ করিলাম। মহাত্মাদিগের জীবন-কথা যত অধিক প্রচারিত হয়, ততই ভাল। যিনি যেমন করিয়াই লিখুন না কেন, মহাত্মাদিগের নামের মহিমাতেই তাহা পরম উপভোগ্য হইয়া থাকে।

বাগচি মহাশয়ের পুস্তকে নূতন কোন ঘটনার কথা না থাকিলেও, বইখানি সুপাঠ্য হইয়াছে।

যুগল-জীবন।—শ্রীজীবনভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় কাব্যালঙ্কার প্রণীত, মূল্য আট আনা। এখানি কবিতার বই। ইহার কতকগুলি কবিতা আমাদের ভাল লাগিয়াছে। নবীন লেখকের শক্তি আছে। আশা হয়, সাধনা করিলে তিনি যশঃ লাভ করিতে পারিবেন।

ভক্তির প্রাণ।—অধ্যাপক শ্রীভাগবতকুমার শাস্ত্রী এম এ প্রণীত, মূল্য চারি টাকা। প্রাণের মূল রহস্য দেখাবার জন্যই মানুষের দর্শন-শাস্ত্র; তবে দেখ্‌বার ও দেখাবার রীতি নানা রকমের। পরম ভক্ত শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রী মহাশয় ভক্তির আবেগে অতি সরল ও সুললিত ভাষায় প্রাণের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন, সুতরাং সে কথা ভক্তের প্রাণে না লেগেই পারে না। বইখানি বড়ই সুন্দর হইয়াছে; এই পাপতাপ-ক্লিষ্ট জগতের নরনারী এই পুস্তকের মধ্যে অনেক আশ্বাস বাণী লাভ করিতে পারিবেন।

কায়স্থ-পরিচয়।—শ্রীবসন্তকুমার বসু প্রণীত, মূল্য আড়াই টাকা। এখানি দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থদিগের পরিচয়-গ্রন্থ; গ্রন্থখানির এই প্রথম ভাগ। ইহাতে সুধু কলিকাতার অল্প কয়েকটী কায়স্থ পরিবারের ইতিহাস আছে। এই পরিচয়-গ্রন্থে বসু মহাশয়ে অনুসন্ধিৎসার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

স্বপন-পসারী।—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা। শ্রীমোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক; তাঁহার কবিতার প্রশংসা সকলেই করিয়া থাকেন। মাসিক পত্রাদিতে তিনি যে সকল হৃদয়গ্রাহী কবিতা লিখিয়াছেন, তাহারই কয়েকটী এই 'স্বপন-পসারী'তে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কবিতাগুলির সবই সুন্দর; কোনটা ফেলিয়া কোনটার নাম করিবার যো নাই। যিনি এখনও মোহিত বাবুর কবিতা পড়েন নাই, তাঁহাকে আমরা বিশেষ ভাবে এই স্বপন-পসারী পড়িতে অনুরোধ করিতেছি।

মধুসূদন।—অধ্যাপক শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন অমরকবি মাইকেলের কবিত্বের আলোচনা করিয়া এই 'মধুসূদন' লিখিয়াছেন। মাইকেলের কবিত্বের আলোচনা শ্রদ্ধেয় যোগীন্দ্রবাবু, দীননাথ সান্যাল মহাশয় ও কবিশেখর নগেন্দ্রনাথ সোম মহাশয় করিয়াছেন। তাহা হইলেও শশাঙ্ক বাবুর এই আলোচনা আমরা নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিয়াছি এবং অসঙ্কুচিতচিত্তে বলিতে পারি, 'মধুসূদন' শশাঙ্কবাবুর সাহিত্য কাব্যরসগ্রাহিতার প্রকৃষ্ট পরিচয়। আমরা এই পুস্তকখানি বহুল প্রচার কামনা করি।

শিখ গুরু।—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র বি-এ প্রণীত, মূল্য বার আনা। এই সুন্দর ও সুলিখিত পুস্তকখানিতে নবীন লেখক মহাশয় শিখগুরুদিগের ইতিহাস অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জীবন-কথা সংক্ষিপ্ত হইলেও সুখপাঠ্য হইয়াছে। ইহা পড়িয়া শিখগুরুদিগের জীবন-কথা জানিবার জন্য অধিকতর আগ্রহ জন্মে। পুস্তকখানির ভাষা অতি সুন্দর, কোনখানে অকারণ উচ্ছ্বাস নাই। আমরা সকলকেই এই পুস্তকখানি পড়িতে অনুরোধ করি।

সালোমে।—শ্রীশৈলেশনাথ বিশী বি-এল্ প্রণীত, মূল্য এক টাকা। সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার অস্কার ওয়াইল্ডের 'সালোমে' নাটিকাখানি শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত; এই বইখানি পৃথিবীর নানা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। আমাদের 'ভারতবর্ষে'ও সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র-নাথ কুমার মহাশয় মূল গ্রন্থ হইতে ধারাবাহিক অনুবাদ প্রকাশিত করিতেছেন। শ্রীযুক্ত শৈলেশবাবুও এই গ্রন্থ ছাপাইয়াছেন। মূলের ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য অনুবাদে রক্ষিত হওয়া বড়ই কঠিন; তবে যাঁরা সুধু বাঙ্গালাই জানেন, তাঁরা এই অনুবাদ থেকে নাটিকাখানির সৌন্দর্য্য কিছু অনুভব করিতে পারিবেন; অনুবাদকও তাহাই চান।

স্বরদ শিক্ষা ১ম ও ২য় ভাগ।—শ্রীনীরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র ও শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত; মূল্য ২ টাকা। ১ম ভাগে সাধনপ্রণালী এবং তানের নানারূপ বৈচিত্র্য প্রদর্শিত হইয়াছে; তাহার মধ্যে "ঝালা," "লড়ন্ত" এবং হালকা সম্পূর্ণ নূতন—২য় ভাগে আরোহী এবং অবরোহী-ভেদে রাগের যে বীর্য্য ও রাগরূপ দেখান হইয়াছে, তাহার মধ্যে চারিটি সুরে রাগরূপ প্রকাশই বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কারণ তাহা নূতন এবং সহজবোধ্য। শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক উভয়েরই এই পুস্তক দুইখানি বিশেষ প্রয়োজনীয়। পুস্তক দুইখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীত হইয়াছি।

আব-হাওয়া

সভা-সমিতি

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ:—বিগত ২০শে মাঘ ৩রা ফেব্রুয়ারী শনিবার অপরাহ্ণ ৬টার সময় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের নবম বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। এই অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম-এ, বি-এল্ এটর্ণি মহাশয় "সাঙ্খ্যদর্শন" সম্বন্ধে দ্বিতীয় বক্তৃতা করেন।

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব- সম্মিলনী:—বিগত ২০শে মাঘ (ইং ৩রা ফেব্রুয়ারী) শনিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় (তালতলা) ৫৬।১ ডাক্তার লেনে স্বর্গীয় নীলমণি দত্ত মহাশয়ের ভবনে শ্রীসম্মিলনীর বর্ত্তমান বর্ষের দশম অধিবেশন হইয়াছে। প্রসিদ্ধ-প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-বক্তাগণ "শ্রীগৌরাঙ্গ-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

ভারত-হিন্দু-সভা :—বিগত ২১শে মাঘ (৪ঠা ফেব্রুয়ারী) রবিবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শোভাবাজার, ৩৫নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, স্বর্গীয় রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের ঠাকুর-বাটীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে ভারত-হিন্দু-সভার এক মহাধিবেশন হয়। ঐ সভায় ভারত-প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম-এ, সি-আই-ই মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় বিরাট হিন্দু-সমাজের সর্ব্ববিধ উন্নতির বিষয় আলোচনা এবং ডাক্তার গৌরের প্রস্তাবিত বিবাহ-সংস্কার-আইনের প্রতিবাদ করা হয়। ইহার পূর্ব্ব শুক্রবারে উক্ত বিলের প্রতিবাদের জন্য সাহিত্য-পরিষদেও সভা হয়। কবিরাজ-প্রবর শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহোদয় সভাপতি হন। বহু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিলের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন।

বান্ধব-সমিতি :—বিগত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বেলা ৫ ঘটিকায় হুগলী টাউন হলে "বান্ধব-সমিতির" উদ্যোগে 'যুবক সম্প্রদায় ও বর্ত্তমানে তাহাদের কর্ত্তব্য' এই বিষয়ে একটি সভা হইয়া গিয়াছে। সিটি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমিয় সেন, বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্র রায় চৌধুরী ও 'প্রবাসীর' শ্রীযুক্ত প্রভাত গাঙ্গুলী বক্তৃতা করেন।

ন্যাশন্যাল হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ—গত ৩রা ফেব্রুয়ারী, শনিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকার সময় কলিকাতা ৩৩৬ নং অপার চিৎপুর রোডস্থ, ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী বিল্ডিংয়ে, উক্ত কলেজের পারিতোষিক বিতরণ ও বাৎসরিক উৎসব হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক এম-এ, বি-এল, এম-এল-সি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নোয়াখালী সম্মিলনী :—গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী রবিবার বেলা ৪ ঘটিকার সময় ২৫ নং স্কট লেনস্থিত বঙ্গবাসী কলেজ-গৃহে নোয়াখালী সম্মিলনীর একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছে। উক্ত সভায় বঙ্গীয় ব্যয়-সঙ্কোচ কমিটির ক্ষুদ্র জিলাগুলি বৃহত্তর জিলার সহিত একত্র হইবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং সম্মিলনীর অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল।

দেশ

গুণ্ডাবিল পাশ :—দুই দিন আলোচনার পর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গুণ্ডাবিল পাশ হইয়া গিয়াছে। মাননীয় মিঃ এইচ, এল, ষ্টিফেন্সনের উপর এই বিলের ভার ছিল। তিনি আশ্বাস দিয়াছেন যে, এখন হইতে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই গুণ্ডার অত্যাচার হইতে লোক রক্ষা পাইবে। বিলটার অনেক দফা সংশোধনের জন্য সভ্যদের মধ্যে অনেকেই অনেক সংশোধনমূলক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। মোটের উপর ৬৪টী সংশোধনমূলক প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু উহাদের দুইটা ভিন্ন সমস্তগুলিই নাকচ হইয়া গিয়াছে। দুই স্থলে একটু-একটু সংশোধিত হইয়া বিলটা অবশেষে সভায় পাশ হইয়া গিয়াছে। সময়

উত্তরবঙ্গে বন্যাপীড়িতগণের জন্য এখনও বিস্তর সাহায্যের আবশ্যক। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এ কথা পূর্ব্বেই দেশবাসীকে নিবেদন করিয়াছেন। এখন সেখানে দুর্ভিক্ষের খুবই আশঙ্কা। সময় থাকিতে সতর্ক হওয়াই সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। মহামতি এণ্ডরুজ স্বয়ং ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়া বেঙ্গল রিলিফ কমিটির কার্য্যে যেমন আনন্দ ও গৌরব প্রকাশ করিয়াছেন, তেমনই দুর্ভিক্ষ নিবারণে আন্তরিক সাহায্য দানের প্রার্থনা করিয়াছেন। বসুমতী।

মহিলা ব্যারিষ্টার :—বোম্বাইএর আর দশের টাটার কন্যা শ্রীমতী এম এ টাটা সম্প্রতি লিঙ্কোলন ইনসবারে ব্যারিষ্টারীর সনন্দ লাভ করিয়াছেন। ভারতবাসীদের ভিতর তিনিই প্রথম মহিলা ব্যারিষ্টার। কেবল মাত্র ব্যারিষ্টারীর দিক দিয়াই নহে, ভারতীয় মহিলাদের ভিতর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এসসি ডিগ্রিও সর্ব্বপ্রথমে তিনিই লাভ করিয়াছেন। ভারতের পুরুষদেরই কর্ম্মকেন্দ্র এত ছোট যে, তাহার জন্য জাতিকে অনেক দুঃখই সহ্য করিতে হইতেছে। ভারতীয় রমণীদের কর্ম্মক্ষেত্র ত অন্তঃপুর ছাড়া নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ দেশের রক্ষণশীলতার আবহাওয়াও এমনি জমাট যে, ঘরের বাহিরের কোনও কাজে রমণীকে হাত দিতে দেখিলে আমরা ভয়ে একবারে আঁৎকাইয়া উঠি। এ অবস্থায় শ্রীমতী টাটা যে এই সম্পূর্ণ নূতন ধরণের কর্ম্মক্ষেত্র বাছিয়া লইয়াছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে কম প্রশংসার বিষয় নহে। আমরা তাঁহাকে এই নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে অভিনন্দিত করিতেছি। সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার সাফল্যেরও কামনা করিতেছি। স্বরাজ।

নব-যৌবন লাভের জন্য অস্ত্র-প্রয়োগ :—নব যৌবন লাভের জন্য যে নূতন অস্ত্র-প্রয়োগ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদনুসারে শম্ভুনাথ হাসপাতালে একটি অস্ত্র-প্রয়োগ হইয়াছে। ভারতে এইরূপ ধরণের অস্ত্র-প্রয়োগ এই প্রথম। ডাক্তার কে, এস, রায় এই অস্ত্র-প্রয়োগটী করেন। রোগীর অবস্থা ভাল এবং তাহার জীবনী-শক্তি বৃদ্ধিরও লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

কলিকাতায় বাল-বিধবা :—কলিকাতা নগরে বাল-বিধবার সংখ্যা ১৮২৫৬। ১০ হইতে ১৫ বৎসর বয়সের বিধবার সংখ্যা ১৪৭৪৯। ১ হইতে ৪ বর্ষ বয়স্ক ২৬১৬টী বালিকা বিধবা। সমাজের অবস্থা কি শোচনীয়! ১৮২৫৬ জন বালিকাকে বৈধব্য-ক্লেশ সহিতে বলা হইতেছে। সময়

বিদেশ

ডুইসবার্গে গোলযোগ।—ডুইসবার্গের জর্ম্মণ কর্ম্মচারী-দিগকে ধরপাকড় করাতে জর্ম্মণেরা খুব আন্দোলন করে। কয়েক শত জর্ম্মণ রাস্তা দিয়া মার্চ্চ করিতেও থাকে এবং নিষিদ্ধ সঙ্গীত গান করিতে থাকে। অবশেষে বেলজিয়ান অশ্বারোহী সেনাদল তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। কুড়িজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। যে সব জর্ম্মণ কর্ম্মচারী বলিতেছে যে, বার্লিন গবর্ণমেণ্টের হুকুম ছাড়া তাহারা অন্য কাহারও কোন হুকুম মানিবে

না, তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইতেছে, এবং অনেককে অনধিকৃত অঞ্চলে বহিস্কৃত করিয়া দেওয়া হইতেছে।

ইউরোপে আর এক সমস্যা।—অবজারভার পত্রের ভিয়েনা শহরের সংবাদদাতা জানাইতেছেন, রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, জেকোস্লোভকিয়া প্রভৃতি ক্ষুদ্র মিত্রমণ্ডলী ফরাসীদের দেখাদেখি বুলগেরিয়া এবং হাঙ্গেরীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিবার জন্য আয়োজন করিতেছেন। এই সম্পর্কে সত্বরই বেলগ্রেডে অথবা বুখাপেষ্টে ক্ষুদ্র মিত্রমণ্ডলীর মন্ত্রিদের এক সভা হইবে। বুডাপেষ্টের সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশ—রুমেনিয়া হাঙ্গেরীর সীমান্তে নূতন সেনাদল সমবেত করিতেছে।

জর্ম্মণদের নিরস্ত্র ভাবে গরিলা যুদ্ধ।—২৯শে তারিখের তারের খবরগুলি পাঠে জানা যায়, জর্ম্মণীবাসী প্রায় সকলেই এখন নিস্ক্রিয় প্রতিরোধের পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা ফরাসীদিগের সংস্রব সম্পূর্ণ ভাবে ত্যাগ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। তাহারা ফরাসীদিগের দোকান, হোটেল প্রভৃতি বয়কট করিতে জনসাধারণকে উৎসাহিত করিতেছে। ফরাসীদিগের কাজে বাধা দিবার জন্য টেলিগ্রাফ টেলিফোঁ প্রভৃতির তার কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। জেনারল ওয়েগাণ্ড যে ট্রেণে যাইতেছিলেন, সেই ট্রেণখানা ডরেণে থামাইতে হইয়াছিল, কারণ যাহাতে ট্রেণ চালাইতে পারা যায়, সেইজন্য বিপক্ষ দল নানাপ্রকার ব্যবস্থা করিয়াছিল।

জর্ম্মণ সরকারের হুকুম।—প্যারিসের ৩১শে তারিখের খবরে প্রকাশ, জর্ম্মণ গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, কয়লার হিসাব সম্বন্ধে অথবা কয়লার বিক্রী সম্বন্ধে যে কেহ বিদেশী গবমেণ্টকে কোন খবর দিবে, তাহাকে দুই মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

রূঢ় অঞ্চল বিচ্ছিন্ন।—১লা ফেব্রুয়ারী তারিখ মধ্য রাত্রিতে রূঢ় অঞ্চল জর্ম্মণীর অন্য সমস্ত অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। ফরাসী ও বেলজিয়ান কর্ত্তৃপক্ষ সরকারী খনিসমূহের কর্ম্মচারীদিগকে ফ্রান্সে কয়লা সরবরাহের জন্য আদেশ দিয়াছেন। যে সব কর্ম্মচারী এই আদেশ অগ্রাহ্য করিতেছেন, তাঁহাদিগকে বহিস্কৃত করা হইতেছে। খনির শ্রমজীবীরা ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ ছাড়িয়াছে। ফরাসীরা জর্ম্মণদিগকে শাসাইয়া বলিয়াছেন, কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে কার্য্য না করিলে ব্যবসায়ীদের উপর নূতন কঠোর বিধি জারী করা হইবে। (নবযুগ)

রূঢ় অঞ্চল পৃথক করার ব্যবস্থা—প্যারিসের ২৪শে জানুয়ারীর একটী সংবাদে প্রকাশ যে, ফ্রান্স একেবারে সঙ্কল্প করিয়াছে যে, জর্ম্মণীর অন্যান্য প্রদেশ হইতে রূঢ়াঞ্চলকে একেবারে পৃথক করিয়া এই স্থান একজন ফরাসী গবর্ণর জেনারেলের শাসনাধীনে রাখিতে হইবে।

জর্ম্মণ খনিওয়ালাদের বিচার—হার আইসেন প্রভৃতি ছয় জন জর্ম্মণ খনিওয়ালাকে ফরাসীরা গ্রেপ্তার করিয়াছে। গত ২৪শে জানুয়ারী তাঁহাদের বিচার শেষ হইয়াছে। বিচারক অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রতি জরিমানার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আইসেনের প্রায় ২৬০০৲ টাকা, কেষ্টেনের প্রায় ৭৮৩৬৲ টাকা, হুকেয়ের প্রায় ৩০১০৲ টাকা, স্পিডলার প্রায় ২৩৮৭৬৲ টাকা, ও ওলোকের প্রায় ১,১২,১৫০৲ টাকা জরিমানা হইয়াছে।

মেয়েন্সে হাঙ্গামা—ইংলিশম্যানের বিশেষ সংবাদদাতার পত্রে প্রকাশ, সম্প্রতি মেয়েন্সেতে খনিওয়ালাদিগের বিচার শেষ হইবার পরেই এক ভীষণ হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। প্রায় চারিসহস্র লোক উত্তেজিত হইয়া একখান ট্রামগাড়ী উল্টাইয়া দেয়। ফলে বহুসংখ্যক সিভিলিয়ান ও সৈন্য আহত হইয়াছে। অতঃপর সেই উত্তেজিত জনসঙ্ঘ, এই স্থানের যে সকল হোটেলে ফরাসীরা অবস্থান করিতেছে, সেই সকল হোটেলগুলির উপর ইট পাটকেল ছুঁড়িতে আরম্ভ করে। বেগতিক দেখিয়া ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ অশ্বারোহী সৈন্যের সাহায্যে শান্তি রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করে। এক্ষণে সর্ব্বত্র ফরাসী অশ্বারোহী সৈন্য পাহারা দিতেছে।

ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ—ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ সম্প্রতি মেয়েন্সেতে ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন যে, এই স্থানে আবার কোনপ্রকার হাঙ্গামার সূত্রপাত হইলে, উহা নিবারণ করিবার জন্য প্রহরী সম্প্রদায় অস্ত্র শস্ত্রের ব্যবহার করিতে পারিবে।

জর্ম্মণ ব্যবসায়ীদের সম্বর্দ্ধনা—ফরাসী সামরিক আদালতে যে কয়েকজন খনিওয়ালার বিচার হইয়া গিয়াছে, মেয়েন্স হইতে রাইন প্রদেশে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য রেলপথ লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। নিষেধ সত্ত্বেও কলোনে প্রায় ৫০ হাজার লোক এই উদ্দেশ্যে জড় হইয়াছিল। তাহাদিগের জাতীয় সঙ্গীতে গগন মুখরিত হইয়াছিল। ইঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধিত করিবার জন্য এসেন এবং ডাসেলডর্ফেও শ্রমজীবীরা জড় হইয়াছিল। ফরাসী পদাতিক সৈন্য ডাসেলডর্ফে সমবেত জনমণ্ডলীকে ভয় দেখাইবার উদ্দেশ্যে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করিয়াছিল এবং অশ্বারোহী সৈন্যগণ তলোয়ার ব্যবহার করিয়াছিল। এই হাঙ্গামার পর ডাসেলডর্ফে ১২ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

নৌকার মাঝিদের ধর্ম্মঘট—প্যারিশের এক সংবাদে প্রকাশ, রাইন নদী-পথে আজকাল নৌকাদির চলাচল একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগের কাজের জন্য কতকগুলি নৌকা লইয়া যাওয়ায় নৌকার মাঝিরা উহার প্রতিবাদ স্বরূপ ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ করিয়াছে।

জাতীয় অবমাননা—বার্লিনের খবরে প্রকাশ, জর্ম্মণীর রাষ্ট্র-সভায় বক্তৃতাকালে জর্ম্মণীর অর্থসচিব হার হার্ম্মিস বলেন, জর্ম্মণরা ফরাসীদের জবরদস্তি নীতি ব্যর্থ করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করিবে। জর্ম্মণরা যদি সৈনাদলের জবরদস্তিতে পড়িয়া, ফরাসীরা যেমন ভাবে জোর করিয়া অধিকৃত অঞ্চল হইতে টাকা এবং মাল লইতে চেষ্টা করিতেছে, তাহা নির্ব্বিবাদে মাথা পাতিয়া লইয়া ফরাসীদের স্বেচ্ছাচারিতা এবং অত্যাচারের প্রশ্রয় দেয়, তাহা হইলে তেমন কার্য্য জর্ম্মণ জাতির পক্ষে অপরিসীম অবমাননাজনক হইবে।

জর্ম্মাণ যুবক-সমাজে চাঞ্চল্য—বার্লিনের একটি আধা সরকারী সংবাদে প্রকাশ, জর্ম্মণীর নানা অঞ্চল হইতে যুবকেরা বেসে-ওয়ার বাহিনীতে যোগদান করিতে চাহিতেছে। জর্ম্মণ গবর্ণমেণ্ট তাহা-দিগকে তাহাদের নিজেদের কাজ কর্ম্মেই থাকিতে পরামর্শ দিয়াছেন; কারণ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার অধিক বেসওয়ার বাহিনীতে সেনা লওয়া অসম্ভব।

আরও গ্রেপ্তার ও দণ্ড—লণ্ডন সহরের ২৬শে তারিখের একটি সংবাদে প্রকাশ, স্পেয়ার, মর্ণলাকেল এবং আয়াচেন সহরের কতকগুলি লোককে বহিষ্কার করা হইয়াছে। কলোনের অর্থ-বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী এবং টিভিসের তিনজন বড় কর্ম্মচারীকে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে। হার কুঙ্করাস এবং হার রেফেসিন মেঞ্জ দণ্ডিত হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে রুঢ় অঞ্চল হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে। তাঁহারা ডার্ম্মষ্টাডে পৌঁছিয়াছেন।

বাভেরিয়ায় সামরিক আইন—মিউনিকের তারের সংবাদে প্রকাশ, বাভেরিয়ান গবর্ণমেণ্ট ব্যাভেরিয়ার সর্ব্বস্থানে সামরিক আইন জারি করিয়াছেন। তবে সামরিক আইনের মধ্যে কিঞ্চিৎ বাদসাদ দেওয়া হইয়াছে।

চারিজন জর্ম্মাণের মৃত্যুদণ্ড—গত ২৭শে জানুয়ারী বেলজিয়ান সামরিক আদালতের বিচারে চারিজন জর্ম্মণ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। ছয়জনের প্রতি ২০ বৎসর হইতে তিন বৎসর কারাবাসের ব্যবস্থা হইয়াছে। একজন মাত্র জার্ম্মাণ অব্যাহতি লাভ করিয়াছে। তাহাদিগের অপরাধ, তাহারা গ্রীকের হত্যাকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট ছিল। (নবযুগ)

ছদ্মবেশে আমীরের পর্য্যবেক্ষণ।—আফগানি-স্থানের আমীর এখন জেলালাবাদে আছেন। পেশোয়ার হইতে মোটর গাড়ী এবং টোঙ্গাচালকেরা সদাসর্ব্বদা জেলালাবাদে যাতায়াত করিতেছে। আমীরের শ্রমশীলতা, তাঁহার বেশভূষার অনাড়ম্বর, এবং শাসনবিভাগের গলদ দূর করিবার জন্য তাঁহার প্রখর দৃষ্টি, এই সকল বিষয়ের জন্য আমীর সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন। বাজারে গুজব যে, আমীর তাঁহার অনুপস্থিতিতে কাবুলের কাজ কিরূপ চলে, দেখিবার জন্য, সাধারণ ভ্রমণকারীর ছদ্মবেশে একখানা টোঙ্গা ভাড়া করিয়া কাবুলে গিয়াছিলেন। তিনি যে আমীর, টোঙ্গা-ওয়ালা ইহা জানিত না। সে তাঁহাকে সহরের গেটের কাছে নামাইয়া দিয়া আসিতে চায়, আমীর টোঙ্গাওয়ালার সহিত অনেক বচসা করিয়া টোঙ্গাখানা গভর্ণরের প্রাসাদ পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে রাজী করাইতে পারেন। ছদ্মবেশে সমস্ত দেখাশুনার পর আমীর আত্মপ্রকাশ করেন। দেখিতেছি, কাবুলের আমীর দ্বিতীয় হারুণ অল্ রসিদ্ হইলেন।

(সময়)

পয়গম্বর-সমাধির রত্ন-সম্পদ।—১৯১৭ সালে তুর্কী সৈন্য যখন মদিনা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল, তখন তত্রত্য হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর সমাধিতে যত কিছু রত্নাভরণ ছিল তাহা সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। লসেনি কনফারেন্সে লর্ড কার্জ্জন মক্কার শরিফকে সেইগুলি ফিরাইয়া দিবার জন্য জিদ করিতেছেন। কিন্তু তুর্কী সৈন্য পবিত্র সমাধির রত্নসম্পদ মদিনা হইতে অপসারিত করিয়াছিল এই কারণে যে, তাহা না করিলে সেগুলি খৃষ্টান সৈন্যের হস্তগত হইত। এখনও সে কারণ বর্ত্তমান নাই কি? মক্কার শরিফের শক্তি-সামর্থ্য কাহাদের সৈন্য লইয়া? জগতের লোক তাহা সম্যকরূপে অবগত আছে। সুতরাং লর্ড কার্জ্জন যে বলিয়াছেন, তুর্কীরা বর্ণিত ধনসম্পদ শরিফকে প্রত্যর্পণ না করিলে জগতের, বিশেষতঃ ভারতের মুসলমানেরা আশ্চর্য্য বোধ করিবে, তাহা সত্য নহে। শরিফ আরব সৈন্যের বলে বলীয়ান এবং সম্পূর্ণরূপে বৈদেশিক-প্রভাব মুক্ত হইলে লর্ড কার্জ্জনের এ কথা বরং মানিয়া লওয়া যাইত। কিন্তু তিনি যখন তাহা নহেন, তখন তুর্কীরা হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর সমাধির রত্ন-সম্পদ ফিরাইয়া না দিলে জগতের মুসলমানেরা আশ্চর্য্য না হইয়া বরং আনন্দিতই হইবে।

কামাল পাশার বিবাহ।—মুস্তাফা কামাল পাশা স্মার্ণা-নিবাসী এক ধনীর উনবিংশ বর্ষীয়া কন্যা লতিফ হানুম বিবির সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। হানুম বিবি সুশিক্ষিতা। তিনি ফ্রান্সে থাকিয়া শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। কামাল পাশা তাঁহার দেশ ভ্রমণের সময় লতিফ হানুম বিবির পিতার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। সেই সময়েই তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই বিবাহের যৌতুক স্বরূপ কামাল পাশা প্রায় ২০ লক্ষ টাকা পাইয়াছেন।

(মোহাম্মদী)

ইঙ্গিত

শ্রীবিশ্বকর্ম্মা

ছাতা

দেশী ছাতার ব্যবসায়টা বেশ দাঁড়াইয়া গেল। অনেক-গুলি ছাতার কারখানা স্থাপিত হইয়াছে; অনেক ছাতা তৈয়ারী হইতেছে। লাভও বিলক্ষণ হইতেছে। যদিও ছাতার উপকরণগুলির মধ্যে কেবল বাঁটটামাত্র দেশী,

এবং শিক ও কাপড় ও কল বিদেশী, তথাপি নাই মামার চেয়ে কাণা মামার হিসাবে এরূপ কারখানাও মন্দ নয়। ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের উপকরণ তুলা, মাড়, পাড়ের সুতার রং—এ সবই বিদেশী; কেবল মজুরী ও কলকব্জাগুলা বিলাতের নিজের। তবুও ত বস্ত্রশিল্পটা ম্যাঞ্চেষ্টারেরই বটে! সে হিসাবে দেশী ছাতার কারখানায় উৎপন্ন ছাতাকে স্বচ্ছন্দে দেশী ছাতা বলা যায়। কারখানা এখানে না স্থাপিত হইলে, ছাতার বাঁটের বাঁশটা কোন কাজেই লাগিত না—মজুরীটাও এ দেশের লোক পাইত না। এখানে কারখানা স্থাপন করিয়া শিক, কাপড় ও কল আনাইয়া ছাতা তৈয়ার করায় ঐ দুইটা দিকে আমাদের লাভ থাকিয়া যাইতেছে। ছাতার বাঁট তৈয়ার করিবার জন্যও কতকগুলা কারখানা স্থাপিত হইয়াছে দেখিয়াছি; এবং সেই সকল কারখানাতেও মজুরী করিয়া অনেক লোক প্রতিপালিত হইতেছে। অতএব আশীর্ব্বাদ করিতেছি, দেশী ছাতার কারখানাগুলি বিভীষণের পরমায়ু লাভ করুক।

ছাতার কারখানার যে কয়টা উপকরণ বিদেশ হইতে আসে, তাহার মধ্যে যে কয়টা পারা যায়, এখানে তৈয়ার করিয়া লইলে মন্দ হয় না; তাহা হইলে দেশের আরও কিছু টাকা দেশেই থাকিয়া যাইতে পারে।

ধরুন কাপড়। বোম্বাই অঞ্চলে, এবং বঙ্গদেশে কাপড়ের কল কতকগুলি স্থাপিত হইয়াছে; এবং অধুনা অনেক তাঁতও চলিতেছে। তাহাতে কাপড়ও কিছু কিছু প্রস্তুত হইতেছে, যদিও তাহা দেশের প্রয়োজনের তুলনায় সুপ্রচুর, এমন কি, যথেষ্টও নয়। তথাপি ছাতার কাপড়টাও দেশের পক্ষে একটা প্রয়োজনীয় জিনিস। ইহাও বিদেশ হইতে আসিতেছে; এবং স্বরাজ লাভ করিতে হইলে এই শ্রেণীর জিনিসও বিদেশ হইতে যত কম আসে ততই ভাল।

অবশ্য কল বা তাঁত হইতে সোজাসুজি ছাতার কাপড় তৈয়ার হইয়া বাহির হইয়া আসিবে না। ভারতীয় কল ও তাঁতে উৎপন্ন বস্ত্রকে ছাতার কাপড়ে পরিণত করিতে হইবে।

ছাতার বিজ্ঞাপনে ছাতার কাপড়ের গুণ ব্যাখ্যার সময় বলা হয়—ওয়াটার-প্রুফ (Water proof) কাপড়। কোন জিনিস ফাঁয়ার প্রুফ (Fire Proof) বলিলে বুঝিতে হয়,—জিনিসটী অদাহ্য,—উহা আগুনে পোড়ে না। সেইরূপ ওয়াটারপ্রুফ বলিলে বুঝিতে হয় জলে ভিজে না, অর্থাৎ বস্তুটির ভিতর জল প্রবেশ করিতে পারে না। ম্যাকিণ্টশ কাপড়, বা বর্ষাতি জামার কাপড় অথবা রবার ক্লথ এই অর্থেই ওয়াটারপ্রুফ। কারণ, ঐ সকল কাপড়ের উপর রবারের একটী পাতলা আবরণ থাকে; কাপড়ের ছিদ্রগুলি পর্য্যন্ত বুজিয়া যায়; তাই উহা জলে ভিজেও না, উহার মধ্য দিয়া জল গলেও না। ছাতার কাপড় সে হিসাবে ওয়াটারপ্রুফ নয়। উহা জলে ভিজিয়াও যায়, এবং উহার ভিতর দিয়া জল গলিয়াও যায়। তবে যে বৃষ্টির সময় ছাতা খুলিয়া মাথার উপর ধরিলে মাথা ভিজিয়া যায় না, তাহার কারণ এই যে, খোলা ছাতার উপর কাপড়টি ঢালু ভাবে থাকায়, বৃষ্টির জল উহার উপর দিয়া গড়াইয়া ধার দিয়া মাটীতে পড়িয়া যায়। তবে কি গুণে ছাতার কাপড় ওয়াটারপ্রুফ হইতে পারে? ছাতির কাপড়টি একটু ঘন করিয়া বুনা হয়; তাহার উপর রং ও মাড় চড়ানো হয়; এইভাবে উহা কতকটা মোটা হইয়া পড়ে, উহার ছিদ্রগুলি কতকটা বুজিয়া যায়। সেই অবস্থায় উহা ঢালু ভাবে থাকায়, জল আর উহার ভিতর দিয়া গলিয়া মাথায় না পড়িয়া গড়াইয়া বাহিরে গিয়া পড়ে। এই হিসাবে তাঁবু এবং আমাদের দেশের পল্লী অঞ্চলের মৃৎকুটীরগুলির খড়ের চালও ওয়াটারপ্রুফ। কেন না, তাঁবুর ছাদের কাপড় বা কুটীরের চালের খড় ভেদ করিয়া বৃষ্টির জল ঘরের ভিতর পড়ে না, ঢালু ছাদের বা খড়ের চালের উপর দিয়া গড়াইয়া বাহিরে গিয়া পড়ে। ছাতির কাপড় কিম্বা তাঁবুর আচ্ছাদন কিম্বা খড়ো ঘরের খড়ের চাল যদি কোটা-দালানের ছাদের ন্যায় সমতল হইত, তাহা হইলে উহারা ওয়াটারপ্রুফ হইত না। উহাদের ভিতর দিয়া জল গলিয়া মাথার উপর ও ঘরের ভিতর পড়িত সুতরাং ছাতার কাপড়কে ওয়াটারপ্রুফ করা একটা ভয়ঙ্কর সমস্যা নয়। একটু ঠাস-বুনানি কাপড় বাছিয়া লইতে পারিলেই যথেষ্ট হয়।

কাপড় নির্ব্বাচিত হইলে তাহাকে রং করিয়া লইতে হইবে। রং করার প্রণালী একবার বলিয়াছি। ছাতার কাপড়ের কালো রংটা একটু বিশেষ রকমের। এসিটেট অব আয়রণের (Iron liquor) সঙ্গে যে কোন কষায় জিনিসের

কষ মিশাইয়া লইলেই বেশ কালো রং হইবে। একটা পিপার ভিতর কিছু আখের মাত গুড় ও যথেষ্ট পরিমাণে জল দিয়া তাহাতে কতকগুলি লোহার টুক্‌রা ফেলিয়া রাখিলে কিছু কাল পরে জলমিশ্রিত গুড়ে লৌহ গলিয়া গিয়া এসিটেট অব আয়রণ প্রস্তুত হইবে। তাহার সঙ্গে হরিতকী, মাজু-ফল, বহেড়া, বকম কাষ্ঠ, গরানের ছাল, বাবলার ছাল, প্রভৃতি ভিজানো জল মিশাইলেই ঘোর কালো রং পাওয়া যায়। সোডা লাইয়ের দ্বারা কাপড় উত্তমরূপে কাচিয়া লইয়া শুকাইবার পর কষ জলে ভিজাইয়া শুকাইয়া এসি-টেট অব আয়রণের জলে ভিজাইলে কাপড়ের উপর কালো রং পাকা হইয়া যাইবে। তারপর যে কোন এক প্রকার Starchএর পাতলা মাড়ে কালো রং মিশাইয়া কাপড়ে পাতলা করিয়া মাখাইয়া ইস্ত্রি করিয়া লইলে সুন্দর দেখিতে হইবে। এই ছাতার কাপড়টি তৈয়ার করিতে পারিলে ছত্রশিল্প আরও অনেকটা বেশী দেশী হইয়া পড়িবে।

বেশী দামের সৌখিন ছাতাতে যে নকল রেশমের মত কাপড় দেওয়া হয়, তাহাও তূলাজাত। যে তূলা হইতে ঐ কাপড় প্রস্তুত হয়, তাহার আঁইশগুলি রেশমের মত চিক্কণ বলিয়া কাপড়টিও দেখিতে রেশমের মত হয়। আগে সাধারণ মোটামুটি কম দামের ছাতার কাপড় প্রস্তুত হইলে সৌখিন ছাতার কাপড় প্রস্তুত করিবার ভাবনা ভাবিবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাইবে।

তার পর শিক। শিকটি এ দেশে তৈয়ার করা বোধ হয় ছাতাওয়ালারা সম্ভব বলিয়া মনে করেন না। ছাতার শিক তৈয়ার করিবার জন্য যে লোহার ও ইস্পাতের তার দরকার হয়, তাহা অবশ্য বাজার হইতে কিনিতে হইবে, এবং সেই তার এখনও বিদেশ হইতেই আমদানী হয়। তবে যদি টাটা কোম্পানী, কিম্বা সাহেবদের যে দুই একটা লোহা ঢালাইয়ের কারখানা হইয়াছে, তাঁহারা লোহার ও ইস্পাতের বিভিন্ন বেধ-বিশিষ্ট তার বাজারে বাহির করেন, তাহা হইলে অবশ্য দেশী তার হইতেই শিক প্রস্তুত করিতে পারা যাইবে। তবে এই কথাটি স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ছাতার শিক তৈয়ার করিবার জন্য লোহার ও ইস্পাতের তার ছাতাওয়ালাগণকে তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে না,—দেশীই হউক, বিদেশীই হউক এই তার তাঁহাদিগকে বাজার হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে, এবং তাহা হইতে মাত্র শিকগুলি তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে।

ছাতার শিক, কল, জোড়ের মুখের খিল প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য কল চাই। সেই সব কলের মূল্য অনুমান হয়, পাঁচ হাজার টাকার বেশী হইবে না। সেই কলে সমান মাপের তার কাটা হইবে, এবং তারের দুই প্রান্তে চেপ্টা করিয়া ছিদ্র প্রস্তুত হইবে। এই সব কল এখানে পাওয়া যায় না। জার্ম্মানী অথবা সুইডেন হইতে আনাইয়া লইতে হইবে। গত মাঘ মাসের "ভারতবর্ষে" আল্প্‌স্ পাহাড় নামে যেপ্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহার লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম-এ মহাশয় এখন বার্লিনে আছেন। তিনি সেখানে ব্যবসায় করিতেছেন; এবং সম্ভবতঃ কল-কব্জার খোঁজ খবর রাখিয়া থাকেন। ছাতার শিক তৈয়ার করিবার কলকব্জা বোধ হয় তিনি সরবরাহ করিতে পারি-বেন। সুইডেনের কলকব্জার খবর লইবার চেষ্টা আমিই করিতেছি। পাইলে যথাসময়ে পাঠকগণের গোচর করিতে ত্রুটি করিব না।

ছাতার গোল শিক, চৌকা শিক, খিল প্রভৃতি এই কলে হইতে পারিবে। শিক পরাইবার পিতলের কলও সম্ভবতঃ ইহাতেই হইতে পারিবে। অন্ততঃ কতকটা যে হইবে, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।

ছাতার বাঁশের বাঁট ছাতার কারখানায় প্রস্তুত হয় না;—তাহার স্বতন্ত্র কারখানা আছে; সেখানে কেবল বাঁটই হয়। সেই বাঁট ছাতাওয়ালারা কিনিয়া লইয়া যান, অথবা যোগান পাইবার বন্দোবস্ত করিয়া রাখেন। সেইরূপ কাপড়, শিক ও কল তাঁহারা বাজার হইতে ক্রয় করেন। সেই সকল জিনিসের যোগাযোগে তাঁহাদের কারখানায় ছাতা প্রস্তুত হয়। দেশী হারমনিয়ম নির্ম্মাণ প্রণালীও কতকটা এই রকম। হারমনিয়মের কাঠা-মোটি এখানে তৈয়ার হয়, এবং রীড বিদেশ হইতে আসে। রীড এখানে প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিলে হারমনিয়মও খাঁটি দেশী জিনিস হইতে পারে।

ছাতার শিক তৈয়ার করিবার জন্য বাঁশের বাঁটের ন্যায় স্বতন্ত্র কারখানা স্থাপিত হইতে পারে এবং ছাতাওয়ালারা তাহা ক্রয় করিতে পারেন। অবশ্য বিদেশী শিকের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে হইবে, এ কথাটি যেন স্মরণ থাকে।

ছাতার জন্য কেবল বাঁশের বাঁটই এখানে প্রস্তুত হইতে দেখিতে পাই। কিন্তু বাঁশের বাঁট ছাড়া অন্য রকমের বাঁটের ছাতাও এখানকার কারখানায় তৈয়ার হইতেছে। সেই বাঁট এখানে তৈয়ার হয় কি না, তাহা বলিতে পারিতেছি না। না হইলে, হওয়া উচিত। সেরূপ বাঁটও তৈয়ার করা কঠিন বলিয়া বোধ হয় না, এবং তৎসঙ্গে সৌখিন লোকদিগের ভ্রমণ যষ্টি, লাঠি, ছড়ি প্রভৃতিও প্রস্তুত করা চলিবে।

কাঠের বাঁটের ন্যায় সরু লোহার নলেরও এক রকম ছাতার বাঁট দেখা যায়। সেটী প্রস্তুত করিবার কোন সন্ধান আমি এখনও করিয়া উঠিতে পারি নাই। সুতরাং সেজন্য এখনও আমাদিগকে কিছু দিন বিদেশের মুখ চাহিয়া থাকিতে হইবে।

যৌবন-শ্রী

যৌবনকালে অনেক যুবক-যুবতীর মুখে ব্রণ জন্মে। সেগুলি যদি পাকে তবে পুঁজ বাহির হইয়া গিয়া ব্রণ ভাল হইয়া যায়; কিন্তু দাগ থাকে। কিন্তু যখন পাকে না, তখন সেগুলো ডুমো-ডুমো হইয়া উঁচু হইয়া থাকে। কখনও ইহাতে বেদনা ও যন্ত্রণা হয়, কখনও তাহা হয় না। যে দিক দিয়াই হউক, ব্রণগুলি মুখের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া ফেলে। তখন তাহাদের মুখ দেখিতে অতি বিশ্রী হয়। আয়নাতে নিজেদের মুখ দেখিয়া তাহারা নিজেরাও লজ্জা অনুভব করে এবং নানা উপায়ে নষ্ট সৌন্দর্য্য ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করে। যুবক-যুবতীর নষ্ট শ্রী ফিরাইয়া আনিয়া তাহাদের মুখে যৌবনোচিত স্বাভাবিক কমনীয় সৌন্দর্য্য পুনঃ প্রদান করিবার ঔষধ গন্ধক-চূর্ণ বা সোহাগা-চূর্ণ। শিল্পী এই সন্ধান পাইয়া, ইহাদিগকে ব্যবহারোপযোগী আকার দিয়া, ইহাদের সুরভিত করিয়া, শিশিতে ভরিয়া, সুন্দর লেবেল আঁটিয়া, milk of rose নামে বিপন্ন যুবক-যুবতীর সামনে ধরিলেন, এবং মাঝে হইতে দু'পয়সা কামাইয়া লইলেন। Sublimed বা precipitated sulphur বা গন্ধক-চূর্ণ ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়। উহাকে ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য ইহার সহিত গ্লিসারিণ মিশ্রিত হইল। এবং ইহাকে সুরভিত ও খরিদদারের প্রীতি উৎপাদনের জন্য ইহার সহিত গোলাপ জল যোগ করা হইল। ইহাকে যে কোন একটী মিষ্ট নাম দিন; ইহার গুণ ব্যাখ্যা করিয়া বিজ্ঞাপন দিন,—বাজারে পড়িতে পাইবে না।

গন্ধক-চূর্ণ ৫ তোলা, গ্লিসারিন ৪০ তোলা, উৎকৃষ্ট গোলাপজল ২০০০ তোলা। এই তিনটি জিনিস একত্র মিশাইয়া শিশিতে পূরিয়া ছিপি আঁটিয়া সুন্দর লেবেল লাগাইয়া দিন, এবং নীচে লিখিয়া দিন shake the bottle before using (ব্যবহারের পূর্ব্বে শিশিটি নাড়িয়া লইবেন)। ইহার সঙ্গে, ঔষধটি লাগাইবার জন্য যদি একটী তুলি ফাউ দেন, তাহা হইলে ত সোণায় সোহাগা। ঔষধটির গন্ধ আরও একটু মনোহর ও বিচিত্র করিতে চান ত উহার সহিত ফোঁটা কয়েক অয়েল অব জিরেনিয়াম বা অপর কোন গন্ধ-দ্রব্য মিশাইতে পারেন।

সোহাগা যদি ব্যবহার করিতে চান, তাহার উপায় এই—জলপাইয়ের তেল পাঁচ ছটাক ও ধবধবে সাদা মোম অথবা চর্ব্বি ১ ছটাক সামান্য তাপে গলাইয়া তাহার সহিত ১।৷০ আনা সোহাগা-চূর্ণ যোগ করুন। তৎপরে ৭৷৷০ ভরি গ্লিসারিণ ও ৫।৭ ফোঁটা অটো ডিরোজ বা উৎকৃষ্ট গোলাপী আতর উহার সহিত মিশাইয়া দিন। সামান্য কার্ম্মাইন দিয়া গোলাপী রং করিয়া লইলে গন্ধে ও বর্ণে উহা সর্ব্বপ্রকারে গোলাপের নাম রাখিতে পারিবে।

ইহা নিয়মিত ভাবে ব্যবহার করিলে সৌখিন যুবক-যুবতীদের মুখের লাবণ্য বর্দ্ধিত হইবে, চর্ম্মের কোমলতা ও কমনীয়তা সাধিত হইবে।

এই ধরণের সৌখিন জিনিস আজকাল হাজার হাজার রকম বাজারে বাহির হইতেছে। জমকালো, গালভরা, কবিত্বপূর্ণ নাম, সুদৃশ্য শিশি ও লেবেল এবং বিজ্ঞাপনের ভাষার ছটায় ইহারা বিকায়ও খুব। কিন্তু একটু অনুসন্ধান দেখা যাইবে, উপরে যার যতই "চাকন-চিকন" হউক, ভিতরে সেই "খ্যাড়গাছটা"। সেই থোড় বড়ি খাড়া, আর খাড়া বড়ি থোড়। সেই কতকগুলি মামুলী জিনিসের রূপান্তর ও প্রকারান্তর। সেই মান্ধাতার আমল হইতে একই জিনিস নূতন নূতন নামে মোহন সাজে সাজিয়া আসিয়া ক্রেতাদের ভুলাইতেছে। অথচ সকলেই নিজের নিজের জিনিসটিকে অত্যাশ্চর্য্য অভাবনীয় স্বর্গীয় আবিষ্কার বলিয়া বড় গলায় প্রচার করিতে ছাড়িতেছেন না!

দেনা-পাওনা

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(২২)

অনুমান যে ভুল নয়, লোকটি যে সত্য সত্যই নির্ম্মল বসু, তাহা বুঝিতে পারিয়া জীবানন্দ প্রথমে চমকিত হইল, কিন্তু যে-কোন অবস্থায় নিজেকে মুহূর্ত্তে সামলাইয়া লইবার শক্তি তাহার অদ্ভুত। সে সামান্য একটু হাসিয়া বলিল, বিলক্ষণ! বন্ধু নয় ত' কি? ওঁদের কৃপাতেই ত' টিকে আছি, নইলে মামার জমিদারী পাওয়া পর্য্যন্ত যে সব কীর্ত্তি করা গেছে, তাতে চণ্ডীগড়ের শান্তিকুঞ্জের বদলে ত' এতদিন আণ্ডামানের শ্রীঘরে গিয়ে বসবাস করতে হোতো।

নির্ম্মলের গোড়া হইতেই ভাল লাগে নাই, কিন্তু নিজের দুষ্কৃতির এই লজ্জাহীন, অনাবৃত রসিকতার চেষ্টায় তাহার গা জ্বলিয়া গেল। মুখ লাল করিয়া কি একটা বলিতেও চাহিল, কিন্তু বলিতে হইলনা। ষোড়শী জবাব দিল, কহিল, চৌধুরী মশায়, উকিল-ব্যারিষ্টার বড়লোক বলে বাহবাটা কি একা ওঁরাই পাবেন? আণ্ডামান প্রভৃতি মস্ত বড় ব্যাপারে না হোক্, কিন্তু ছোট বলে এ দেশের শ্রীঘরগুলোও ত' বসবাসের নিতান্ত মনোরম স্থান নয়,—দুঃখী বলে ভৈরবীরা কি সে জন্যেও একটু ধন্যবাদ পেতে পারেনা?

জীবানন্দ অপ্রস্তুত হইয়া হঠাৎ যাহা মুখে আসিল, কহিল। বলিল, ধন্যবাদ পাবার সময় হলেই পাবে।

ষোড়শী হাসিয়া কহিল, এই যেমন মন্দিরে দাঁড়িয়ে এই-মাত্র এক দফা দিয়ে এলেন।

জীবানন্দ ইহার কোন জবাব দিলনা। নির্ম্মলের প্রতি চাহিয়া কহিল, আপনার শ্বশুর মশায়ের মুখে শুন্‌লাম আপনি আস্‌চেন,—আশা করেছিলাম মন্দিরেই আলাপ হবে।

ষোড়শী বলিল, সে আমার দোষ চৌধুরী মশায়। উনি এসেও ছিলেন, এবং সদালাপে যোগ না দিন, ভিড়ের বাইরে দাঁড়িয়ে গলা বাড়িয়ে শোনবার চেষ্টাও করে-ছিলেন, কিন্তু আমি দেখ্‌তে পেয়ে হাত ধরে টেনে নিয়ে এলাম। বোল্‌লাম, চলুন, নির্ম্মলবাবু, ঘরে বসে বরঞ্চ দুটো গল্প সল্প করা যাক্।

জীবানন্দ মনের উত্তাপ চাপিয়া কতকটা সহজ গলাতেই কহিল, তা'হলে আমি এসে পড়ে ত ব্যাঘাত দিলাম।

ষোড়শী বলিল, দিয়ে থাক্‌লেও আপনার দোষ নেই,—আমিই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

জীবানন্দ কহিল, কিন্তু কেন? গল্প করতে নয় বোধ হয়?

ষোড়শী হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, না গো মশায় না,—বরঞ্চ, ঠিক তার উল্টো। আজ আপনাকে আমি ভারি বোকবো। তাহার সহাস্য কণ্ঠস্বর ও কথা কহিবার ভঙ্গী দেখিয়া নির্ম্মল ও জীবানন্দ উভয়েই আশ্চর্য্য হইয়া, চাহিয়া রহিল। ষোড়শী একটুখানি গম্ভীর হইয়া বলিল, ছি ছি, ওখানে আজ কি কর্‌ছিলেন বলুন ত? একটা সভার আড়ম্বর করে মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুজন অসহায় স্ত্রীলোকের কি কুৎসাই রটনা করছিলেন! এর মধ্যে একজন আবার বেঁচে নেই। এ কি কোন পুরুষের পক্ষেই সাজে? তা ছাড়া, কি প্রয়োজন ছিল বলুন ত? সেদিন এই ঘরে বসেই ত আপনাকে বলেছিলাম আপনি আমাকে যা আদেশ করবেন আমি পালন কোরব। আপনিও আপনার হুকুম স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন, আমিও আমার প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করিনি। এই নিন্ মন্দিরের চাবি, এবং এই নিন্ হিসাবের খাতা। এই বলিয়া সে অঞ্চল হইতে চাবির গোছা খুলিয়া এবং তাকের উপর হইতে একখানা খেরো-বাঁধানো মোটা খাতা পাড়িয়া জীবানন্দর পায়ের কাছে রাখিয়া দিয়া কহিল, মায়ের যা'কিছু অলঙ্কার, যত কিছু দলিল-পত্র সিন্দুকের ভিতরেই পাবেন, এবং আরও একখানা কাগজ পাবেন যাতে ভৈরবীর সকল দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য ত্যাগ করে আমি সই করে দিয়েছি।

জীবানন্দ বোধ করি ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিলনা, কহিল, বল কি। কিন্তু ত্যাগ করলে কার কাছে?

ষোড়শী বলিল, তাতেই লেখা আছে দেখ্‌তে পাবেন।

তাই যদি হয় ত, এই চাবিটাবিগুলো তাঁকেই দিলে না কেন?

তাঁকেই যে দিলাম। এই বলিয়া ষোড়শী মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। কিন্তু সেই হাসি দেখিয়া এইবার জীবানন্দর মুখ মলিন হইয়া উঠিল; সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সন্দিগ্ধ-কণ্ঠে কহিল, কিন্তু এ তো আমি নিতে পারিনে। খাতায় লেখা নামগুলোর সঙ্গে যে সিন্দুকে রাখা জিনিসগুলোও এক হবে, সে আমি কি করে বিশ্বাস কোরব? তোমার আবশ্যক থাকে তুমি পাচজনের কাছে বুঝিয়ে দিয়ো।

ষোড়শী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আমার সে আবশ্যক নেই। কিন্তু চৌধুরী মশায়, আপনার এ অজুহাতও অচল। একদিন চোখবুজে যার হাত থেকে বিষ নিয়ে খাবার ভরসা হয়েছিল, তার হাত থেকে আজ এটুকু চোখবুজে নেবার সাহস হওয়া আপনার উচিত। অপরকে বিশ্বাস করবার শক্তি আপনার সত্যসত্যই এত কম, এ কথা আমি কোনমতে স্বীকার করতে পারিনে। নিন্‌, ধরুন—এই বলিয়া সে খাতা এবং চাবির গোছা মাটি হইতে তুলিয়া একরকম জোর করিয়া জীবানন্দর হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, আজ আমি বাঁচ্‌লাম। আমার কোন ভারই ত কোন দিন নেন্‌নি, এতটুকুও না নিলে যে ধর্ম্মে পতিত হবেন। তা'ছাড়া পরকালে জবাব দেবেন কি? এই বলিয়া সে হাসিতে হাসিতে কহিল, পরকালের চিন্তায় ত আপনার ঘুম হয় না, সে আমি জানি, কিন্তু যা' হয়ে গেছে তা গেছে, ভবিষ্যতে কিছু কিছু চিন্তা করতে হবে, তা বলে দিচ্চি। তাহার মুখের হাসি সত্ত্বেও কণ্ঠস্বর যেন ইহার শেষ দিকে কোমলতায় বিগলিত হইয়া উঠিল। কহিল, আর একটিমাত্র ভার আপনাকে দিয়ে যাবো, সে আমার গরীব দুঃখী প্রজাদের ভার। আমি শত ইচ্ছে করেও তাদের ভাল করতে পারিনি,—কিন্তু আপনি অনায়াসে পারবেন। নির্ম্মলের প্রতি চাহিয়া কহিল, আমার কথাবার্ত্তা শুনে আপনি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছেন, না নির্ম্মল বাবু?

নির্ম্মল মাথা নাড়িয়া বলিল, শুধু আশ্চর্য্য নয়, আমি প্রায় অভিভূত হয়ে পড়েচি। ভৈরবীর আসন ত্যাগ করে যে আপনি ইতিমধ্যে ছাড়-পত্র পর্য্যন্ত সই করে রেখেছেন, এ খবর ত আমাকে ঘুণাগ্রে জানান্‌নি?

ষোড়শী হাসিমুখে কহিল, আমার অনেক কথাই আপনাকে জানানো হয়নি, কিন্তু একদিন হয় ত সমস্তই জান্‌তে পারবেন। কেবল, একটিমাত্র মানুষ সংসারে আছেন যাঁকে সকল কথাই জানিয়েচি, সে আমার ফকির সাহেব।

এ সকল পরামর্শ বোধ করি তিনিই দিয়েছেন?

ষোড়শী তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, না, তিনি আজ সকালে পর্য্যন্ত কিছুই জানতেন না, এবং ওই যাকে ছাড়পত্র বলচেন সে আমার কাল রাত্রের রচনা। যিনি এ কাজে আমাকে প্রবৃত্তি দিয়েছেন, শুধু তাঁর নামটিই আমি সংসারে সকলের কাছে গোপন রাখবো।

জীবানন্দ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, মনে হচ্চে যেন বাড়ীতে ডেকে এনে আমার সঙ্গে কি একটা প্রকাণ্ড তামাসা কোরচ ষোড়শী। এ বিশ্বাস করা যেন সেই মরফিয়া খাওয়ার চেয়েও শক্ত ঠেক্‌চে।

এতক্ষণ পরে নির্ম্মল তাহার পানে চাহিয়া একটু হাসিল, কহিল, আপনি ত তবু এই কয়েক পা মাত্র হেঁটে এসে তামাসা দেখ্‌চেন, কিন্তু আমাকে কাজ-কর্ম্ম বাড়ী-ঘর ফেলে রেখে এই তামাসা দেখ্‌তে আটশ মাইল ছুটে আস্‌তে হয়েচে। এ যদি সত্য হয় ত, আপনি যা' চেয়েছিলেন অন্ততঃ সেটা পেয়ে গেলেন, কিন্তু আমার ভাগ্যে ষোলো আনাই লোক্‌সান। একে তামাসা বোল্‌ব কি উপহাস বোল্‌ব ভেবেই পাচ্চিনে। এই বলিয়া সে লোকটার মুখের প্রতি আর একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতে, দেখিতে পাইল তাহার দুই চক্ষু আকস্মিক বেদনার ভারে যেন ভারাক্রান্ত। সে জবাব কিছুই দিল না, শুধু একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল।

নির্ম্মল ষোড়শীকে প্রশ্ন করিল, এ সকল ত আপনার পরিহাস নয়?

ষোড়শী বলিল, না নির্ম্মলবাবু, আমার এবং আমার মায়ের কুৎসায় দেশ ছেয়ে গেল, এই কি আমার হাসি-তামাসার সময়? আমি সত্যসত্যই অবসর নিলাম।

নির্ম্মল কহিল, তা'হলে বড় দুঃখে পড়েই এ কাজ আপনাকে করতে হোলো।

ষোড়শী উত্তর দিলনা, নির্ম্মল নিজেও একটু স্থির থাকিয়া বলিল, আমি বাঁচাতে আপনাকে এসেছিলাম, বাঁচাতেও হয় ত পারতাম, তবু কেন যে তা হতে দিলেন না তা' আমি বুঝেচি। বিষয় রক্ষা হোতো, কিন্তু কুৎসার ঢেউ তাতে তেম্‌নি উত্তাল হয়ে উঠ্‌ত। এবং সে থামাবার সাধ্য আমার ছিলনা। এই বলিয়া সে যে কাহাকে কটাক্ষ করিল তাহা উপস্থিত সকলেই বুঝিল। কিন্তু জীবানন্দ নীরব হইয়াই রহিল এবং ষোড়শী নিজেও ইহার কোন প্রতিবাদ করিলনা।

নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করিল, এখন তা'হলে কি করবেন স্থির করেছেন?

ষোড়শী বলিল, সে আপনাকে আমি পরে জানাবো।

কোথায় থাকবেন?

এ সম্বাদও আপনাকে আমি পরে দেবো।

বাহিরে হইতে সাড়া আসিল, মা? ষোড়শী গলা বাড়াইয়া দেখিয়া কহিল, ভূতনাথ? আয় বাবা, ঘরে নিয়ে আয়। মন্দিরের ভৃত্য আজ একটা বড় ঝুড়ি ভরিয়া দেবীর প্রসাদ নানাবিধ ফলমূল ও মিষ্টান্ন আনিয়াছিল। ষোড়শী হাতে লইয়া জীবানন্দর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্নিগ্ধ হাসিমুখে কহিল, সেদিন আপনাকে পেট ভরে খেতে দিতে পারিনি, কিন্তু আজ সে ত্রুটি সংশোধন করে তবে ছাড়্‌ব। নির্ম্মলের প্রতি চাহিয়া বলিল, আর আপনি ত ভগিনীপতি, কুটুম্ব,—আপনাকে শুধু শুধু যেতে দিলে ত অন্যায় হবে। অনেক তিক্ত কটু আলোচনা হয়ে গেছে, এখন বসুন দিকি দুজনে খেতে। মিষ্টিমুখ না করিয়ে ছেড়ে দিলে আমার ক্ষোভের সীমা থাক্‌বেনা।

নির্ম্মল কহিল, দিন্; কিন্তু জীবানন্দ অস্বীকার করিয়া বলিল, আমি খেতে পারবনা।

পারবেননা? কিন্তু পারতেই যে হবে।

জীবানন্দ তথাপি মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

ষোড়শী হাসিয়া কহিল, মিথ্যে মাথা নাড়া চৌধুরী মশায়। যে সুযোগ জীবনে আর কখনো পাবোনা, তা' যদি হাতে পেয়ে ছেড়ে দিই ত মিছেই এতকাল ভৈরবী-গিরী করে এলাম। এই বলিয়া সে জলহাতে উভয়েরই সম্মুখের স্থানটা মুছিয়া লইয়া সালপাতা পাতিয়া মিষ্টান্ন পরিবেশন করিয়া খাওয়াইতে বসিল।

মিষ্টান্ন যে আজ যথার্থই জীবানন্দর গলায় বাধিতেছিল, ইহা লক্ষ্য করিতে ষোড়শীর বিলম্ব হইলনা। সে গলা খাটো করিয়া কহিল, তবে থাক্; এগুলো আর আপনার খেয়ে কাজ নেই, আপনি শুধু দুটো ফল খান্। এই বলিয়া সে নিজেই হাত বাড়াইয়া তাঁহার পাতার একধারে উচ্ছিষ্ট খাবারগুলা সরাইয়া দিয়া বলিল, কি হোলো আজ? সত্যিই ক্ষিদে নেই নাকি? না থাকে ত জোর করে খাবার দরকার নেই। দেহের মধ্যে যে অসুখের সৃষ্টি করে পুষে রেখেছেন, সে মনে হলেও আমার ভয় হয়।

নির্ম্মল একমনে খাইতেছিল, হঠাৎ সে মুখ তুলিয়া চাহিল। এই কণ্ঠস্বরের অনির্ব্বচনীয়তা খট্ করিয়া তাহার কানে বাজিয়া অকারণে বহুদূরবর্ত্তিনী হৈমকে তাহার স্মরণ করাইয়া দিল। দুজনের অনেক হাস্য-পরিহাসের বিনিময় হইয়া গেছে, আজ সকালেও এই ষোড়শীর কথায় ও ইঙ্গিতে সর্ব্বশরীরে তাহার পুলকের বিদ্যুৎ শিহরিয়া গেছে; কিন্তু এ গলা ত' সে নয়। মাধুর্য্যের এরূপ নিবিড় রসধারা ত' তাহাতে ঝরে নাই। মিষ্টান্নের মিষ্ট তাহার মুখে বিস্বাদ এবং ফলের রস তিতো লাগিয়া আহারের সমস্ত আনন্দ যেন তাহার মুহূর্ত্তে তিরোহিত হইয়া গেল। খানিক পরে লক্ষ্য করিয়া ষোড়শী সবিস্ময়ে কহিল, আপনারও যে ওই দশা হ'ল নির্ম্মল বাবু, খেলেন কই?

নির্ম্মল বলিল, যা' খেতে পারি তা' আপনার বলবার আগেই খেয়েচি, অনুরোধের অপেক্ষা করিনি।

খাবারগুলো আজ বুঝি তা'হলে ভাল দেয়নি?

তা' হবে। অন্যদিন কেমন দেয় সে তো জানিনে। এই বলিয়া সে হাত ধুইবার উপক্রম করিল। এ বিষয়ে তাহার কৌতূহলের একান্ত অভাব শুধু ষোড়শীর নয়, জীবানন্দরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিল; কিন্তু এ লইয়া কেহ আর আলোচনা তুলিল না। বাহিরে আসিয়া ষোড়শী মুখ-হাত ধুইবার জল দিল এবং সাজা পান হাতে দিয়া তাহা ঠিক আছে কিনা দেখিয়া লইতে অনুরোধ করিল, কিন্তু নিজের বা তাহার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিল না।

নির্ম্মল কহিল, আমি এখন তা'হলে যাই—

আপনি বাড়ী ফির্‌বেন কবে ?

আমার আর ত' কোন প্রয়োজন নেই, হয় ত কালই ফির্‌তে পারি।

ছেলেকে, হৈমকে আমার আশীর্ব্বাদ দেবেন।

নির্ম্মল এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমাকে আর বোধ হয় কোন আবশ্যক নেই ?

ষোড়শী নিজেও ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, এত বড় অহঙ্কারের কথা কি আমি বল্‌তে পারি নির্ম্মল বাবু? তবে, মন্দির নিয়ে আর বোধ হয় কখনো আপনাকে দুঃখ দেবার আমার আবশ্যক হবেনা।

নির্ম্মল ম্লান মুখে একটু হাসিয়া কহিল, আমাদের শীঘ্র ভুলে যাবেন না আশা করি ?

ষোড়শী মাথা নাড়িয়া শুধু কহিল, না।

নির্ম্মল নমস্কার করিয়া কহিল, আমি চোল্‌লাম। যদি সকালের গাড়ীতেই যাওয়া হয় ত' আর বোধ হয় দেখা করবার সময় পাবো না। হৈম আপনাকে বড় ভালবাসে; যদি অবকাশ পান, মাঝে মাঝে একটা খবর দেবেন। এই বলিয়া সে আর কোন প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বাহির হইয়া গেল। প্রবঞ্চিতের লজ্জা ও জ্বালা অত্যন্ত সংগোপনে তাহার বুকের মধ্যে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। এবং বিফল-মনোরথ মাতাল যেমন করিয়া তাহার মদের দোকানের রুদ্ধ দুয়ার হইতে ফিরিবার পথে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে থাকে, ঠিক তেম্‌নি করিয়া সে যাইবার সমস্ত পথটা মনে মনে সহস্রবার করিয়া বলিতে লাগিল, আমি বাঁচিয়া গেলাম, আমি বাঁচিয়া গেলাম,—স্বেচ্ছাচারিণীর মোহের বেষ্টন হইতে বাহির হইতে পারিয়া আমার হৈমকে আবার ফিরিয়া পাইলাম। কথাগুলা কেবলমাত্র বারম্বার আবৃত্তি করিয়াই সে তাহার পীড়িত, আহত হৃদয়ের কাছে যেন সপ্রমাণ করিতে চাহিল, যে এ ভালই হইল যে ষোড়শীর গৃহের দ্বার তাহার মুখের উপর চিরদিনের মত বন্ধ হইয়া গেল।

মিনিট দুই তিন পরে জীবানন্দ বাহিরে আসিয়া দেখিল অন্ধকারে একটা খুঁটি ঠেস দিয়া ষোড়শী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; কাছে আসিয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, নির্ম্মল বাবু কি চলে গেলেন ?

এ প্রশ্নের উত্তর দিবার প্রয়োজন ছিল না, ষোড়শী তেম্‌নি চুপ করিয়াই রহিল। জীবানন্দ কহিল, ভদ্র-লোকটিকে ঠিক বুঝ্‌তে পারলাম না।

ষোড়শী পথের দিকে চাহিয়া ছিল, সেই দিকেই চক্ষু রাখিয়া বলিল, তাতে আপনার ক্ষতি কি ?

আমার ক্ষতি ? না, তা' বোধ করি কিছু নেই, কিন্তু তোমার ত' থাক্‌তে পারে ? তুমিই কি তাঁকে বুঝ্‌তে পেরেছ ?

ষোড়শী কহিল, আমার যতটুকু দরকার তা' পেরেছি বই কি।

তা'হলে ভাল। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া যেন নিজের মনেই কহিল, তাঁকে মনে রাখবার জন্যে কি রকম ব্যাকুল প্রার্থনা জানিয়ে গেলেন। দরখাস্ত মঞ্জুর করলে ত'? বলিয়া মুখ তুলিয়া চাহিতে সেই অন্ধকারেও দুজনের চোখে চোখে মিলিল। ষোড়শী দৃষ্টি অবনত করিল না, বলিল, আমি তাঁকে যতখানি জানি, তার অর্দ্ধেকও যদি আমাকে জান্‌বার তাঁর সময় হোতো, এত বড় বাহুল্য আবেদন আমার কাছে তিনি মুখে উচ্চারণ করতেও পারতেন না। আমার যা কিছু কল্পনা, যত কিছু আনন্দের ভাবনা, সে তো কেবল তাঁদের নিয়েই। তাঁদের দেখেই ত' আমি সে ষোড়শী আর নেই। এই যে চণ্ডীগড়ের ভৈরবী পদ, যা ভাগ করে নেবার লোভে আপনাদের ছেঁড়া ছিঁড়ির অবধি নেই,—যে জন্যে কলঙ্কে দেশ আপনারা ছেয়ে দিলেন, সে যে আজ জীর্ণ বস্ত্রের মত ত্যাগ করে যাচ্চি সে শিক্ষা কোথায় পেয়েছি জানেন ? সে ওইখানে। মেয়ে মানুষের কাছে এ যে কত ফাঁকি, কত মিথ্যে, সে কথা ওঁদের দেখেই বুঝ্‌তে পেরেছি। অথচ এর বাষ্পও তিনি জানেন না, কোনদিন হয় ত' জান্‌তেও পারবেন না।

জীবানন্দ অবাক্ হইয়া চাহিয়া ছিল, সহসা সেইদিকে দৃষ্টি পড়ায় ষোড়শী নিজের উচ্ছ্বসিত আবেগে লজ্জিত হইয়া নীরব হইল। কিছুক্ষণ উভয়েই মৌন থাকার পরে জীবানন্দ ধীরে ধীরে কথা কহিল। বলিল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে আমার ভারি লজ্জা করে, কিন্তু যদি পারতাম, তুমি কি তার সত্যি জবাব দিতে পারতে অলকা?

জীবানন্দের মুখে এই অলকা নামটা ষোড়শীর সব চেয়ে বড় দুর্ব্বলতা। তিন অক্ষরের এই ছোট্ট কথাটি

তাহার কোন্ খানে গিয়া যে আঘাত করিত, সে ভাবিয়া পাইত না। বিশেষ করিয়া তাহার প্রশ্ন করার এই কৌতুককর ভঙ্গীতে ষোড়শীর হাসি পাইল ; কহিল, আপনি যদি কোন একটা আশ্চর্য্য কাজ করতে পারতেন, তার পরে আমি আর কোন একটা তেম্নি অদ্ভুত কাজ করতে পারতাম কি না, এত বড় সত্য করবার শক্তি আমার নেই। কিন্তু সে কাজ করবার আপনার আবশ্যক নেই,—আমি বুঝেচি। অপবাদ আপনারা দিয়েছেন বলেই তাকে সত্যি করে তুল্‌তে হবে, তার অর্থ নেই। আমি কিছুর জন্যেই কখনো কারও আশ্রয় গ্রহণ কোরব না। আমার স্বামী আছেন, কোন লোভেই সে কথাটা আমি ভুলে যেতে পারব না। এই ভয়ানক প্রশ্নটাই না আপনাকে লজ্জা দিচ্ছিল চৌধুরী মশায় ?

তুমি আমাকে চৌধুরী মশায় বল কেন ?

তবে কি বোলব ? হুজুর ?

না। অনেকে যা' বলে ডাকে,—জীবানন্দবাবু।

ষোড়শী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, বেশ, ভবিষ্যতে তাই হবে।

অন্ধকারে এই হাসি জীবানন্দ দেখিতে পাইল না, কহিল, ভবিষ্যতে কেন, আজকেই বল না ?

ষোড়শী ইহার কোন উত্তর দিল না। ভিতরে প্রদীপ স্তিমিত হইয়া আসিতেছিল ; সে ঘরে আসিয়া তাহা উজ্জ্বল করিয়া দিল। জীবানন্দ ফিরিয়া আসিয়া বসিতেই ষোড়শী বিস্মিত হইয়া কহিল, রাত্রি হয়ে যাচ্চে, আপনি বাড়ী গেলেন না ? আপনার লোকজন কই ?

আমি তাদের পাঠিয়ে দিয়েচি !

একলা বাড়ী যেতে আপনার ভয় করবে না ?

না, আমার পিস্তল সঙ্গে আছে।

তবে, তাই নিয়ে বাড়ী যান, আমার ঢের কাজ আছে।

জীবানন্দ কহিল, তোমার ঢের কাজ থাক্‌তে পারে, কিন্তু আমার কোন কাজ নেই। আমি এখন যাবো না।

ষোড়শীর চোখের দৃষ্টি হঠাৎ প্রখর হইয়া উঠিল, কিন্তু শান্তভাবে বলিল, রাত হয়েছে, আমি লোক ডেকে আপনার সঙ্গে দিচ্চি, তারা বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আস্‌বে।

জীবানন্দ বুঝিল কথাটা তাহার ভাল হয় নাই। অপ্রতিভ হইয়া কহিল, ডাক্‌তে কাউকে হবে না, আমি আপনিই যাচ্চি। যেতে আমার ইচ্ছে হয় না, তাই শুধু আমি বল্‌ছিলাম। তুমি কি সত্যই চণ্ডীগড় ছেড়ে চলে যাবে অলকা ?

আবার সেই নাম। জীবানন্দর মুখের পানে চাহিয়া তাহার ক্লেশ বোধ হইল, ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে সত্যই সে চলিয়া যাইবে।

কবে যাবে ?

কি জানি, হয় ত কালই যেতে পারি।

কাল ? কালই যেতে পারো ? এই বলিয়া জীবানন্দ একেবারে স্তব্ধ হইয়া বসিল। অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আশ্চর্য্য ! মানুষের নিজের মন বুঝ্‌তেই কি ভুল হয়। যাতে তুমি যাও, সেই চেষ্টাই প্রাণপণে করেছি,—অথচ, তুমি চলে যাবে শুনে চোখের সাম্‌নে সমস্ত দুনিয়াটা যেন শুক্‌নো হয়ে গেল। নির্ম্মল-বাবু মস্ত লোক, মস্তবড় ব্যারিষ্টার,—তিনি আসছেন তোমার পক্ষ নিয়ে,—হাঙ্গামা বাধবে, লড়াই সুরু হবে,—আমরাই জিতবো, ওই যে জমিটা দেনার দায়ে বিক্রী করেচি, ও নিয়ে আর কোন গোলমাল হবে না—কতকগুলো নগদ টাকাও হাতে এসে পড়বে, আর তোমাকে ত যা' বল্‌বো তাই কর্‌তে হবে, এই দিক্‌টাই কেবল দেখতে পেয়েচি,—কিন্তু আরও যে একটা দিক আছে, তুমি নিজেই সমস্ত ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে বিদায় নিলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে, তামাসাটা কোথায় গিয়ে গড়াবে, এ আমার স্বপ্নেও মনে হয়নি ;—আচ্ছা অলকা, এমন ত হতে পারে, আমার মত তোমারও ভুল হচ্চে,—তুমিও নিজের মনের ঠিক খবরটি পাওনি।

ষোড়শী সহজেই সায় দিয়া বলিল, হতে পারে বই কি। শুধু এই খবরটা নিশ্চয় জানি, যা' আমি স্থির করেচি, সে আর অস্থির হবে না।

জীবানন্দ বলিয়া উঠিল, বাপ্‌রে বাপ্! আমার মেয়ে-মানুষ, আর তোমার পুরুষ মানুষ হওয়া উচিত ছিল,—আচ্ছা সেখানেই বা তোমার চল্‌বে কি করে ?

ষোড়শী পূর্ব্বের মতই সহজ গলায় উত্তর দিল, এ আলোচনা আমি আপনার সঙ্গে কোনমতে করতে পারিনে।

জীবানন্দ রাগ করিয়া বলিল, তুমি কিছুই পারো না, তুমি পাথর। চুলে আমার পাক ধরে এলো, আমি বুড়ো

আদি ও অকৃত্রিম আদর্শ নারী-চিত্র !

মাসিক সম্পাদক। ওহে, ছবি নিয়ে তোমরা এ অনধিকার-চর্চ্চা ক'র্‌ছো কেন ?

দৈনিক সঃ। আজ্ঞে, নারী-চরিত্রের চেয়ে নারী-চিত্র যাতে বিশুদ্ধ থাকে সেটা আগে দেখা দরকার, কারণ চিত্র দেখে চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় কি না !......

মাঃ সঃ। সেটা চিত্রের দোষ না চিত্তের দোষ ?—আরে ও কি ছবি ওটা ওখানে ?—

দৈঃ সঃ। আজ্ঞে ওইটি হ'চ্ছে একেবারে আমাদের আদর্শ বিশুদ্ধ পবিত্র মাতৃ-মূর্ত্তি ! অশ্লীলতার চিহ্ন পর্য্যন্ত কোথাও নেই !

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত রহস্যলহরী সিরিজের রূপসী কারা-বাসিনী ও বিশ্বাসঘাতক প্রকাশিত হইল, মূল্য প্রত্যেকখানি বার আনা।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র এম-এ বি-এল প্রণীত নূতন প্রহসন যম-জব্দ প্রকাশিত হইল, মূল্য ১৲।

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত নূতন উপন্যাস নিষ্কর্ম্মা প্রকাশিত হইল, মূল্য ১।০।

শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ প্রণীত নূতন গীতাভিনয় দ্বারাবতী প্রকাশিত হইল, মূল্য ১৷০।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত নূতন নাটক "কুমারিল ভট্ট" প্রকাশিত হইল, মূল্য ১৲।

শ্রীযুক্ত মাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত আট আনা সংস্করণের ৮৪ সংখ্যক গ্রন্থ, কালো বৌ প্রকাশিত হইল।

Publisher—**Sudhanshusekher Chatterjea,**
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, Calcutta.

Printer—**Narendranath Kunar,**
The Bharatbarsa Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta.

দিবাস্বপ্ন

শিল্পী—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার

ভারতবর্ষ

চৈত্র, ১৩২৯

দ্বিতীয় খণ্ড | দশম বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

বঙ্গ ভাস্কর্য্য-নিদর্শন

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি-আই-ই

রাজসাহী-নগরের সাত মাইল পশ্চিমোত্তরে দেওপাড়া নামে একটি পুরাতন স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা এক খণ্ড উচ্চ-ভূমির উপর অবস্থিত। তিন দিকে গভীর পরিখার আকারে একটি খাড়ি, এবং একদিকে সমতল নিম্নভূমি, এই স্থানকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। খাড়ির উপর ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ড যে সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছে, তাহার সাহায্যে এই উচ্চভূমির উপর দিয়া উত্তরাঞ্চলে, যাতায়াত করিবার একটি পথ চলিয়া গিয়াছে। এখন একাংশে অল্পসংখ্যক কুটীরে একটি কৃষক-পল্লী স্থাপিত হইয়াছে; অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে সকল স্থানই বিজন অরণ্যে সমাচ্ছন্ন ছিল। তাহার মধ্যে কতকগুলি সুবৃহৎ পুরাতন পুষ্করিণী পূর্ব্ব সমৃদ্ধির মূক সাক্ষীরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া, এই স্থানকে শিকার-প্রিয় সাহেবসুবার সুপরিচিত শিকার-ক্ষেত্রে পরিণত করিয়া রাখিয়াছিল। একটি পুষ্করিণী "পদুম-সহর" নামে কথিত হইত; কিন্তু সে নাম-রহস্য কেহই উদ্ঘাটিত করিতে পারিত না।

অর্দ্ধ শতাব্দীর কিঞ্চিৎ অধিককাল পূর্ব্বে মেট্‌কাফ নামক রাজসাহীর এক কালেক্টার শিকার উপলক্ষে এখানে উপনীত হইয়া জানিতে পারেন,—পদুম-সহর-পুষ্করিণীর জলতলে অনেক প্রস্তরখণ্ড লুক্কায়িত আছে। পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত একখণ্ড প্রস্তরে অনেক পংক্তি ক্ষোদিত-লিপি দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি লিপিযুক্ত শিলা-ফলকখানি

রাজসাহীতে আনয়ন করিয়া, রাজসাহীর ধর্ম্ম-সভাচার্য্য স্বর্গীয় রামধন তর্করত্ন মহাশয়ের দ্বারা পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা করাইয়া, একটি ইংরাজি অনুবাদ সহ কলিকাতার এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে প্রেরণ করেন। সেখানে উহা এখন যত্নবে রক্ষিত হইয়াছে; এবং স্বনামখ্যাত ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা-সুসংস্কৃত হইয়া, পরলোকগত অধ্যাপক কিল্হর্ণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এইরূপে জানিতে পারা গিয়াছে,—সেন রাজ-বংশের প্রথম রাজা বিজয় সেন দেব দেওপাড়ায় একটি সুগভীর পুষ্করিণী খনিত করাইয়া, তাহার তীরে এক অত্যুচ্চ দেব-মন্দির নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন, এবং তাহাতে প্রদ্যুম্নেশ্বর নামক হরিহর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত করাইয়া, রাজ-পদোচিত সেবাপূজার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। সে প্রদ্যুম্নেশ্বরের মূর্ত্তি নাই; তাহার মন্দিরও লোক-লোচন হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে; কিন্তু পুষ্করিণীটি তাহারই স্মৃতি রক্ষা করিয়া, এখনও "পদুম-সহর" নামে কথিত হইয়া আসিতেছে।

এই শিলালিপিখানি বাঙ্গলার ইতিহাসের এক সংশয়-শূন্য ঐতিহাসিক বিবরণের সন্ধান প্রদান করিয়া, সেন রাজবংশের অভ্যুদয়-কাহিনীর পরিচয় প্রদান করিয়াছে। ইহাতে বিজেতা বিজয় সেন দেবের "বংশ-বীর্য্য-শ্রুতানি" বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে; তিনি যে সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, তাহার ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বের পরিচয়ও অন্তর্নিবিষ্ট আছে, এবং প্রসঙ্গক্রমে প্রশস্তি-রচয়িতা কবির এবং সুনিপুণ ভাস্করের নাম ও গুণ-গ্রাম উল্লিখিত আছে; সমসাময়িক লোক-ব্যবহারেরও নানা বিস্ময়-পূর্ণ বিস্তৃত বিবরণ স্থানলাভ করিয়াছে। ইহা ধরিয়া যে ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের সূত্রপাত হইয়াছিল, অর্দ্ধ শতাব্দীর বিবিধ বিচার-বিতণ্ডায়, অদ্যাপি তাহা পরিসমাপ্ত হয় নাই। বাঙ্গালী যখনই প্রকৃত আন্তরিকতার সহিত তাহার পুরা-কীর্ত্তির যথাযোগ্য আলোচনার আয়োজন করিবে, এবং তাহার প্রয়োজন অনুভব করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে, তখনই এই প্রশস্তির এবং দেওপাড়ার ভগ্নাবশেষের সন্ধান লইতে হইবে। প্রত্যেক বাঙ্গালীর কথা দূরে থাকুক, বহু সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকটেও দেওপাড়া অদ্যাপি অজ্ঞাত, অখ্যাত; অথবা অপরিচিতের ন্যায় অযথা অবজ্ঞাত!

আধুনিক শিক্ষা-প্রণালী বাঙ্গালীকে ঘর অপেক্ষা পরের দিকে অধিক আকর্ষণ করিতেছে। যখন এই শিক্ষা প্রণালীর সূত্রপাত হয়, তখনকার অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল; তখন ইহা স্বদেশ-প্রীতিকে স্ফূর্ত্তি দান না করিয়া, স্বদেশ-বিরক্তিই ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। সুতরাং দেওপাড়ার ধ্বংসাবশেষ যে দীর্ঘকাল বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। বহু কালের পর, ১৯১০ খৃষ্টাব্দে, কতিপয় বাঙ্গালী যুবক দেওপাড়ায় সমবেত হইয়া, তথ্যানুসন্ধানের সূত্রপাত করিয়া, বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির প্রতিষ্ঠা সাধন করেন। তাঁহারা প্রদ্যুম্নেশ্বর-সরোবরে কোনও প্রস্তরখণ্ড লুক্কায়িত থাকিবার সন্ধান না পাইলেও, তাহার পূর্ব্বতীরে প্রদ্যুম্নেশ্বর-মন্দিরদ্বারের বৃহদায়তন পাষাণনির্ম্মিত একটি উডুম্বরের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া, তাহাকে মৃত্তিকা খনন করিয়া বাহির করিয়াছিলেন; কিন্তু তত বড় পাষাণখণ্ড স্থানান্তরিত করিতে সমর্থ হন নাই। দশ বৎসরের চেষ্টায়, উক্ত সমিতির ও রাজসাহী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অর্থসাহায্যে, দ্বি-সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে, সমিতির সদস্যগণ প্রদ্যুম্নেশ্বর-সরোবরের পূর্ব্বাংশের পঙ্কোদ্ধার-কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া, ইষ্টক-রচিত ঘাট এবং তাহার উপর হইতে মৃত্তিকা-নিহিত বহুসংখ্যক ভাস্কর্য্য-নিদর্শনের ভগ্নাবশেষ বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার বিবরণ জ্ঞাত হইয়া, গবর্ণমেণ্ট এখন ঐ স্থান সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এইরূপে যে সকল ভাস্কর্য্য-নিদর্শনের ভগ্নাবশেষ বাহির হইয়া সে-কালের বঙ্গ-ভাস্কর্য্যের পরিচয় উদ্ঘাটিত করিয়াছে, তন্মধ্যে একটির প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল। ইহা মকরবাহিনী গঙ্গা-দেবীর লীলা-মূর্ত্তি,—বাঙ্গালীর শিল্প-লালিত্যের রমণীয় নিদর্শন। ইহা যে প্রদ্যুম্নেশ্বর-মন্দিরের দ্বার-শোভা সম্পাদন করিত, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

প্রশস্তি পাঠে জানিতে পারা যায়, সৌভাগ্যের দিনে এই পুষ্করিণী পুর-রমণীগণের অবগাহন-বিধৌত স্তন-চন্দন-সৌরভে ভ্রমরগণকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিত। যে ইষ্টক-রচিত ঘাট বাহির হইয়াছে, তাহা এত বৃহৎ যে, একসঙ্গে বহু সংখ্যক লোকের অবগাহনের সুব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যেই তাহা ঐরূপ বৃহদায়তনে নির্ম্মিত হইয়াছিল। উৎসব-দিবসে মন্দির-সমীপে আরও কত নর-নারী নানা

দিগ্‌দেশ হইতে আসিয়া সমবেত হইত। জয়দেবের সমসাময়িক উমাপতি ধর এই প্রস্তর-প্রশস্তি রচনা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য ইহা নানা ঐতিহাসিক ব্যাপারের সুদীর্ঘ নির্ঘণ্ট হইলেও, কাব্যরসে অভিষিক্ত, রচনা-লালিত্যে উপভোগ-যোগ্য। যে যুগে ইহা রচিত হইয়াছিল, তাহা গৌড়ীয় রচনা-রীতির গৌরব-যুগ। তখনকার প্রধান-প্রধান কবিগণের নাম গীতগোবিন্দে উল্লিখিত আছে। যথা,—

বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তর সৎপ্রমেয়রচনৈ রাচার্য্য গোবর্দ্ধনঃ
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবি-ক্ষ্মাপতি॥

ইঁহাদের কোন-কোন কবিতা "সদুক্তি কর্ণামৃত" নামক সংগ্রহ-গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল; এবং কোন-কোন কবিতা মুখে-মুখে বাঙ্গালার চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণের মধ্যে অদ্যাপি আলোচিত হইয়া আসিতেছে। দেওপাড়া-প্রশস্তির দুই-একটি কবিতা এইরূপে সুবিদিত ছিল, কিন্তু প্রশস্তির কথা অপরিচিত হইয়া পড়িয়াছিল। জয়দেব লিখিয়া গিয়াছেন,—"উমাপতি ধর বাক্যকে পল্লবিত করিতেন।" এই প্রশস্তিতে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথাপি ইহা রচনা-শক্তির বিলক্ষণ বিচক্ষণতার উদাহরণ। পুষ্করিণীটির পরিচয় এইরূপ :—

বিলেশয় বিলাসিনী-মুকুট কোটিরত্নাঙ্কুর-
স্ফুরৎ কিরণ মঞ্জরীচ্ছুরিত বারিপূরং পুরঃ।
চখান পুরবৈরিণঃ স জলমগ্নপৌরাঙ্গনা-
স্তনৈণ মদ সৌরভোচ্ছালিত চঞ্চরীকং সরঃ॥

প্রদ্যুম্নেশ্বর-মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারের যে উড়ুম্বর-ফলক বাহির হইয়াছে, তাহার অনুপাত অনুসারে হিসাব করিলে জানিতে পারা যায়, পুরীধামের জগন্নাথ দেবের মন্দির অপেক্ষাও এই মন্দির বৃহত্তর ছিল। প্রশস্তি পাঠে জানা যায়, তাহার শীর্ষদেশে একটি স্বর্ণ-কুম্ভ সংস্থাপিত ছিল। মন্দির যে অসাধারণ আয়তনের, তাহার পরিচয় প্রকাশের জন্য, বাক্যকে পল্লবিত করিয়া, উমাপতি লিখিয়া গিয়াছেন :—

স্রষ্টা যদি প্রক্ষ্যতি ভূমিচক্রে
মূলেন মৃৎপিণ্ড বিবর্ত্তনাভিঃ।
তদা ঘটঃ স্যাদুপমানমস্মিন্
সুবর্ণকুম্ভস্য তদর্পিতস্য॥

এই মন্দির-মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রদ্যুম্নেশ্বর দেবের বর্ণনা করিতে গিয়া উমাপতি এক অপূর্ব্ব রচনা-কৌশলের পরিচয় দান করিয়া গিয়াছেন। তাহার উদ্দেশ্য সেনরাজকুলের গৌরব-কীর্ত্তন, কিন্তু তাহার বাহ্য আবরণ ভগবদ্‌গুণ-কীর্ত্তন। হরিহর-মূর্ত্তিধর মহাদেব প্রকৃত পক্ষে দিগম্বর, তিনি অর্দ্ধনারীশ্বর-মূর্ত্তিধর বলিয়া তাঁহার নাম অর্দ্ধাঙ্গনাস্বামী, শ্মশানই তাঁহার বসতি-স্থান, ভিক্ষাই জীবন-ধারণের অবলম্বন, সুতরাং তাঁহার মত দরিদ্র আর কোথায় আছে? সেনরাজবংশ দরিদ্র-পালনে অভিজ্ঞ বলিয়াই বিজয় সেন দেব সেই শ্মশানবাসী ভিক্ষান্ন-ভোজী দিগম্বর প্রদ্যুম্নেশ্বরকে উচ্চিত্রবসনে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন, অর্দ্ধাঙ্গনাস্বামীর সেবার জন্য রত্নালঙ্কার-বিভূষিতা একশত দেবদাসী নিযুক্ত করিয়াছিলেন, শ্মশানবাসীর বসতির জন্য পৌরজনাঢ্য পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, ভিক্ষান্ন-ভোজীর জন্য অক্ষয় লক্ষ্মীর ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। যথা,—

উচ্চিত্রাণি দিগম্বরস্য বসনান্যর্দ্ধাঙ্গনাস্বামিনো
রত্নালঙ্কৃতিভি র্ব্বিশেষিতবপুঃ শোভাঃ শতং সুভ্রুবঃ।
পৌরাঢ্যাশ্চ পুরীঃ শ্মশানবসতে র্ভিক্ষাভুজোঽপ্যক্ষয়াং
লক্ষ্মীং স ব্যতনোদ্দরিদ্রভরণে সুজ্ঞোহি সেনান্বয়ঃ॥

এই স্থান—দেওপাড়া—যে মহানগরীর পল্লী-বিশেষ ছিল, তাহা এখনও "বিজয়নগর" নামে পরিচিত, পদ্মাতীরে এক সমুচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর অবস্থিত, বহুশত পুরাতন পুষ্করিণীর ও অট্টালিকাদির ধ্বংসাবশেষ-চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে। তাহার মধ্যে পূর্ব্ব-সমৃদ্ধি-সূচক নানা ভাস্কর্য্য-কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে; খনন কার্য্যের সুব্যবস্থা হইলে, আরও অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হইবার আশা আছে।

বিজয় সেন দেবের প্রস্তর-প্রশস্তিতে যে শিল্পীর পরিচয় উল্লিখিত আছে, তাঁহার নাম শূলপাণি; তিনি "রাণক" বলিয়া কথিত; এবং "বারেন্দ্র-শিল্পিগোষ্ঠীচূড়ামণি"—উপাধি-ভূষিত ছিলেন। একদা বাঙ্গালী যে প্রস্তর-শিল্পেও কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া অমর কীর্ত্তি লাভ করিয়াছিল, একালের অনেক বাঙ্গালী তাহা মানিয়া লইতে ইতস্ততঃ করেন। তাঁহাদের জিজ্ঞাসা—বাঙ্গালী যে ভাস্কর্য্য-বিদ্যায়

অনুশীলনে কৃতিত্বলাভ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ কি? তাহার প্রধান প্রমাণ—বাঙ্গালাদেশের নানা-স্থানে প্রাপ্ত পুরাতন ভাস্কর্য্য-নিদর্শন। তাহার বিশিষ্টতা তাহাকে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের ভাস্কর্য্য-নিদর্শন হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। বাঙ্গালীর আচার-ব্যবহারে, ধ্যান-ধারণায়, আশা-আকাঙ্ক্ষায়, অভিজ্ঞতায় উচ্চাকাঙ্ক্ষায় যে বিলাসলীলা পল্লবিত হইয়া, বাঙ্গালীকে সমগ্র ভারতবর্ষে এক অতুলনীয় বিশিষ্টতা দান করিয়াছিল, বাঙ্গালার শিল্পেও তাহার অভিব্যক্তি দেদীপ্যমান। নানা যুগের নানা দেশের শিল্প-নিদর্শনের তুলনায় সমালোচনা করিতে যাঁহাদের চক্ষু অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, সেরূপ পরিদর্শক মাত্রেই রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির সংগ্রহালয়ে আসিয়া, সংগৃহীত শিল্প-নিদর্শনগুলিকে বাঙ্গালীর নিজস্ব বলিয়াই অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহার বিশিষ্ট লক্ষণ কি,—সম্প্রতি বিদুষী স্টেলা ক্রামরীশ তাহার ব্যাখ্যাকার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

এ সকল বিষয়ের একটি সুপরিচিত প্রধান প্রমাণ দেশের লোকের স্মৃতি, অর্থাৎ বংশ-পরম্পরা-প্রচলিত জনশ্রুতি। বাঙ্গালী দুর্ভাগ্যক্রমে স্মৃতিহীন, জনশ্রুতিহীন,—অতীত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আস্থাহীন হইয়াছে বলিয়া, বাঙ্গালীর পক্ষে এই শ্রেণীর প্রমাণও দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। মদনপালদেবের রাজ্যকালে কলিবাল্মীকি-উপাধিধারী বারেন্দ্র কবি সন্ধ্যাকর নন্দী, (রামচরিত কাব্যে) শিল্পকৌশলে তাঁহার জন্মভূমি কিরূপ গৌরব লাভ করিয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কলা-লালিত্য বাঙ্গালীকে যে বিশেষভাবে বিশিষ্ট চর্চ্চায় নিবিষ্ট করিয়াছিল, তাহার নানা কারণ বর্ত্তমান ছিল। বাঙ্গালীর ন্যায় আর কেহ এত অসংখ্য মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিত না;—আর কাহাকেও প্রতিমা সাজাইবার জন্য বাঙ্গালীর ন্যায় অগণ্য শিল্প-কৌশলের উদ্ভাবনা করিতে হইত না। কিন্তু প্রস্তর-শূন্য বাঙ্গালার সমতলক্ষেত্রে প্রস্তর-শিল্পের অভ্যুদয় বাঙ্গালীর পক্ষে বিস্ময়-জনক বলিয়াই প্রতিভাত হইবার কথা। কতকগুলি কারণে এই অসম্ভব ব্যাপারও স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

বাঙ্গালী-চরিত্র কঠোর-কোমলের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমি স্বভাব-কোমলা হইলেও, আততায়ীর অত্যাচার হইতে নিয়ত আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইয়া, তাহাকে কষ্ট-সহিষ্ণুতা এবং কঠোরতা অবলম্বন করিতে হইত। বঙ্গভূমি যখন ইহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছিল, তখন বাঙ্গালীর একটি স্বতন্ত্র সাম্রাজ্য গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার প্রবল প্রভাব কাশী কান্যকুব্জে, মগধে উৎকলে, কামরূপে হিমালয়-ক্রোড়ে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। ন্যূনাধিক চারিশত বৎসর বাঙ্গালীর এই বিজয়-রাজ্য বাঙ্গালীর স্বভাবগত স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তার ক্রমবিকাশ সাধিত করিয়া, শিক্ষা-দীক্ষায়, ধ্যান-ধারণায়, আশা-আকাঙ্ক্ষায়, সাহিত্যে-শিল্পে, আচারে-ব্যবহারে এক নূতন শক্তিস্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিল। এই সুদীর্ঘ স্বতন্ত্র-শাসনযুগে বাঙ্গালীর রচনা-প্রতিভা কঠোর-কোমলের অপূর্ব্ব মিশ্রণে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইতিহাসে ইহাই পাল-সাম্রাজ্য-যুগ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতেছে। ইহার কথা এখন আর স্বপ্ন-কাহিনী নহে; তথাপি এখনও ইহার সকল অবস্থার যথাযোগ্য বিশ্লেষণ সাধিত হয় নাই বলিয়া, অনেক কথা লোকসমাজে সুপরিচিত হইতে পারে নাই। তাহার মধ্যে প্রধান কথা শিল্পের কথা।

লামা তারানাথের তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে প্রসঙ্গ-ক্রমে এতদ্বিষয়ক যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লিখিত আছে, তাহা ক্রমে অধিক পরিমাণে সুধী-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। তাহাতে লিখিত আছে,—ভারতবর্ষে স্মরণাতীত পুরাকাল হইতে পর্য্যায়ক্রমে দেব-যক্ষ-নাগ নামক তিনটি শিল্প-পদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছিল; তাহার পর কিয়ৎকাল শিল্পচর্চ্চা বড় অধোগতি লাভ করে। পুনরায় দুই স্থানে দুই বার শিল্পের পুনরুজ্জীবন সাধিত হইয়াছিল। মগধে বিম্বিসার নামক শিল্পীর প্রতিভায় দেব-শিল্পরীতির এবং বরেন্দ্রে (ধর্ম্মপাল ও দেবপাল নামক নরপতিদ্বয়ের শাসন সময়ে) ধীমানের প্রতিভায় যক্ষ-শিল্প-রীতির পুনরুজ্জীবন সাধিত হইয়াছিল। ধীমান ও তাহার পুত্র বীতপাল বরেন্দ্রে ও মগধে এই রীতি প্রচলিত করিবার পর, ইহার প্রভাব নেপালাদি দেশের ভিতর দিয়া দূর-দূরান্তরেও ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছিল। এই শিল্পরীতির প্রকৃতি কিরূপ ছিল, ক্রমশঃ তাহার নানা নিদর্শন আবিষ্কৃত হইতেছে। নালন্দার বিশ্ববিখ্যাত বৌদ্ধ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষের খননকার্য্য আরব্ধ হইবার পর, তাহার মধ্যে

ধর্ম্মপাল-দেবপাল-শাসনসময়ের লিপি-সংযুক্ত যে সকল নিদর্শন বাহির হইয়াছে, তাহা এখনও প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কুক্ষিগত ;—ঐ বিভাগ হইতে প্রকাশিত না হইলে, বাহিরের লোকের পক্ষে তাহা প্রকাশিত করিবার বা অনুমতি ব্যতীত পরীক্ষা করিবারও অধিকার নাই। লেখক এবং বিদুষী স্তেলা ক্রামরীশ সেগুলি এক সঙ্গে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার যে সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, বরেন্দ্রে আবিষ্কৃত ভাস্কর্য্য-কীর্ত্তির সহিত নালন্দায় আবিষ্কৃত এই সকল ভাস্কর্য্যকীর্ত্তির কুলপ্রথানুগত সাদৃশ্য দেদীপ্যমান।

ইহাকে একটি আকস্মিক সৃষ্টি বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। ইহা একটি ধারাবাহিক শিল্পচর্চ্চার ক্রমাভিব্যক্ত পরিণাম বলিয়াই বর্ণিত হইতে পারে। সেই অভিব্যক্তি অনেক দিন হইতে একটি স্বতন্ত্র ধারা অবলম্বন করিয়াছিল ;—তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রাচ্য, পরপ্রভাবশূন্য, বিশুদ্ধ ভাস্কর্য্য-ধারা,—গুপ্তযুগের সরল সৌম্য প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য স্থিতিভঙ্গীর ভিতর দিয়া যে শিল্পসৌন্দর্য্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করিয়াছিল, ইহা গতিভঙ্গীর ভিতর দিয়া তাহা ব্যক্ত করিতে গিয়া এক স্বতন্ত্র—অনন্যসাধারণ—রচনা-রীতি প্রচলিত করিয়া, বাঙ্গালীর বিজয় ঘোষণা করিয়াছিল। ইহার কথা এখন ক্রমশঃ আলোচিত হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

বিদুষী স্তেলা ক্রামরীশ বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির মন্তব্য পুস্তকে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এবং বিজয়সেন দেবের প্রদ্যুম্নেশ্বর-সরোবরের পঙ্কোদ্ধারকালে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি কর্ত্তৃক গঙ্গামূর্ত্তি প্রভৃতি যে সকল নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিলে, সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে,—বঙ্গশিল্পের অধোগতির প্রকৃত কাল মুসলমান-শাসনকাল ; তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ক্রমবিকাশের ধারাই অব্যাহত ছিল। যাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে ভারত-শিল্পের ইতিহাস-রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের যে সকল নিদর্শন পরীক্ষা করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল, তাহার উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহারা সিদ্ধান্ত প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা ফার্গুসনের প্রথম সিদ্ধান্তকেই শেষ কথা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। সে কথা, তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন অস্বীকার করিয়া, এইরূপ ঘোষণা প্রচার করিয়াছিল যে,—"ভারত-শিল্পের ইতিহাস ক্রমাবনতির ইতিহাস।" সুতরাং তাঁহার মতান্ধতার অনুকরণ করিয়া, পরবর্ত্তী লেখকগণের মধ্যে অনেকেই লিখিয়া গিয়াছেন যে,—"গুপ্তযুগই শেষ শিল্পযুগ,—তাহার পর ভারত-শিল্প ক্রমে অবনতির দিকেই অগ্রসর হইয়াছে!" তারানাথের গ্রন্থে ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না ; বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সংগৃহীত শিল্প-নিদর্শনে ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না ; নালন্দার খননকার্য্যে যে সকল লিপি-সংযুক্ত শিল্প-নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না ; খৃষ্টীয় নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পাল সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ে প্রাচ্য ভারতে যে নবজীবন স্ফূর্ত্তি-লাভ করিয়া নানা বিষয়ের অভ্যুদয় সাধন করিয়াছিল, এবং স্থলপথে-জলপথে বহুদূরদেশেও আত্মপ্রভাব ব্যাপ্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহাতেও ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং নূতন উদ্যমে ভারত-শিল্পের ইতিহাস সঙ্কলনের আয়োজন করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে।

তাহার প্রধান কথা বরেন্দ্রের কথা,—ধীমান-বীতপালের কথা,—বাঙ্গালীর শিল্প-প্রতিভা-বিকাশের কথা,—এবং সেই শিল্পের বিশিষ্ট লক্ষণের কথা। তজ্জন্য সেই গৌরবোজ্জল বিজয়-যুগের শিল্প-নিদর্শনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরীক্ষার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। যাঁহারা এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়া, অক্লান্ত চেষ্টায় দীর্ঘকাল হইতে তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, তাঁহারা অশোভন ব্যস্ততার ও অধীর বিজ্ঞাপন-লোলুপতার বশবর্ত্তী হইয়া, ছাপাখানার দিকে দৌড়াইয়া যাইতে অসম্মত বলিয়া, তাঁহাদের অনুসন্ধান-ফল প্রকাশিত হয় নাই। এখন তাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে ; এবং বিদুষী স্তেলা ক্রামরীশ তাহার অগ্রদূতী হইয়া, কোন-কোন কথা আকারে-ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিয়া দিয়া, আলোচনার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

শিল্প-প্রতিভার সঙ্গে উপাদানের সম্বন্ধ আছে। অনেক সময়ে প্রতিভা উপযুক্ত উপাদান নির্ব্বাচন করিয়া লয়, কখনও বা উপাদানই প্রতিভার বিকাশ-সাধনের সহায় হইয়া থাকে। বাঙ্গালার ভাস্কর্য্য-চর্চ্চার সঙ্গে উপাদানের এইরূপ একটি বিশিষ্ট সম্বন্ধ সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টিপথে পতিত হয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ভাস্কর্য্য-নিদর্শন দর্শন করিলে জানিতে পারা যায়,—বালুকা-প্রস্তরই প্রধান উপাদানরূপে

নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার ভাস্কর্য্যের উপাদান পৃথক্;—তাহা একপ্রকার প্রস্তরীভূত কর্দ্দম, কষ্টিপ্রস্তর নামে পরিচিত—স্নিগ্ধ এবং কৃষ্ণবর্ণ। ইহা প্রস্তরীভূত বলিয়া কঠিন; কর্দ্দমমূলক বলিয়া কোমল; প্রস্তরীভূত কর্দ্দম বলিয়া কঠিন-কোমলের মিশ্রণোৎপন্ন অনন্যসাধারণ উপাদান। এই উপাদানে যে ভাস্কর্য্যলীলা আত্মপ্রকাশ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল, তাহা বিশিষ্টতা-বিমণ্ডিত; তাহার জন্যই অন্যান্য প্রদেশের ভাস্কর্য্য-নিদর্শন হইতে সহজেই ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া প্রতিভাত হয়। এই বিশিষ্ট লক্ষণগুলি অবনতির লক্ষণ নহে, উন্নতির লক্ষণ,—কোন-কোন বিষয়ে সমগ্র ভারত-শিল্পের মধ্যে অতুলনীয় উন্নতির লক্ষণ প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছে। ভারত-ভাস্কর্য্যের ইতিহাস নামধেয় প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে ইহার কথা এখনও যথাযোগ্যরূপে আলোচিত হয় নাই; বাঙ্গালীও অদ্যাপি তাহার জন্মভূমির এই পূর্ব্বগৌরব-নিদর্শনের যথাযোগ্য আলোচনার জন্য যথোপযুক্ত আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হয় নাই। তাহা যেরূপ বহুব্যয়সাধ্য, সেইরূপ অসীম-অধ্যবসায়-সাধ্য কঠিন তপস্যা। বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী বাঙ্গালীকে তাহার উপযোগী করিয়া না তুলিয়া, দিন-দিন অধিক অনুপযোগী করিয়া তুলিতেছে।

এ পর্য্যন্ত যে সকল বঙ্গভাস্কর্য্য-নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সকলগুলির ছবি প্রকাশিত হয় নাই, সকলগুলি এক স্থানেও সংগৃহীত হয় নাই। সুতরাং অধ্যয়নার্থীর পক্ষে নানা অসুবিধা এখনও বিষয়টিকে জটিল করিয়া রাখিয়াছে। ছবি দেখিয়া বিচার করিতে হইলে যেরূপ অভিজ্ঞতা আবশ্যক, অল্প দিনে বা অল্প আয়াসে তাহা অধিগত হইবার নহে। সুতরাং অনুসন্ধান-কার্য্য এখনও ধারাবাহিক বিশিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করিতে না পারিয়া, আকস্মিক আবিষ্ক্রিয়ার উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। বঙ্গ-ভাস্কর্য্যের বিশিষ্ট লক্ষণ কি, এই সকল কারণে, তাহা আলোচিত হইতে পারিতেছে না। শিল্পচর্চ্চার বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া যে সকল সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে অনুসন্ধান-স্পৃহা এবং অধ্যয়ননিষ্ঠা অপেক্ষা রচনা-লোলুপতা অধিক উৎসাহ লাভ করিতেছে। তাঁহারা পুরাতনের প্রতি যৎকিঞ্চিৎ দৃষ্টি রাখিয়া সৃষ্টিকার্য্যে কুশলতা প্রকাশ করিতে পারিলে, পুরাতন শিল্পকৌলিন্যধারা অব্যাহত থাকিতে পারিত।

যাঁহারা ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের জন্য পুরাতন ভাস্কর্য্য-নিদর্শনের আবিষ্কার ও সংগ্রহ-কার্য্যে নিবিষ্ট রহিয়াছেন, তাঁহারা মূর্ত্তি-পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করিয়া বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে তাহার বর্ণনা-বিজ্ঞাপক রচনাবলী উদ্ধৃত করিবার জন্যই অবসর-শূন্য। কি শিল্পচর্চ্চা-সমিতি, কি ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধান-সমিতি, কেহই পুরাতন বঙ্গ-ভাস্কর্য্য-নিদর্শনের প্রতি সাধারণ পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিতেছেন না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, বঙ্গভাস্কর্য্য-নিদর্শন যাহার বাহ্যবিকাশ মাত্র, সেই পুরাতন বাঙ্গালী-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিচয় উদ্‌ঘাটনের জন্য প্রয়াস প্রকাশে সকলেই সমান উদাসীন। ভাস্কর্য্য-নিদর্শনের মধ্যে বাঙ্গালীর আত্মপরিচয় প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। সমগ্র ভারতবাসীর মধ্যে বাঙ্গালী যেমন নানা বিষয়ে বিশিষ্টতার পরিচয় প্রদান করে, বাঙ্গালীর ভাস্কর্য্যের অবস্থাও সেইরূপ। ইহার মধ্যে বাঙ্গালী তাহার আত্মকথা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে; ইহার মধ্যেই তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রহিয়াছে।

কি ইতিহাস-চর্চ্চা, কি শিল্প-চর্চ্চা কিছুই অদ্যাপি দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই; অল্পদিন মাত্র উভয়ের যৎকিঞ্চিৎ সূত্রপাতের সূচনা হইয়াছে। কিন্তু অধঃপতিত বাঙ্গালার দুর্ভাগ্যক্রমে এই অল্পদিনের মধ্যেই ইতিহাসের সঙ্গে শিল্পের একটি অমূলক বিরোধভাব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহাদের মধ্যে বিরোধ নাই এবং থাকিতে পারে না। কারণ উভয়ের আলোচনা ক্ষেত্র অভিন্ন,—তাহা স্বদেশ এবং স্বজাতি।
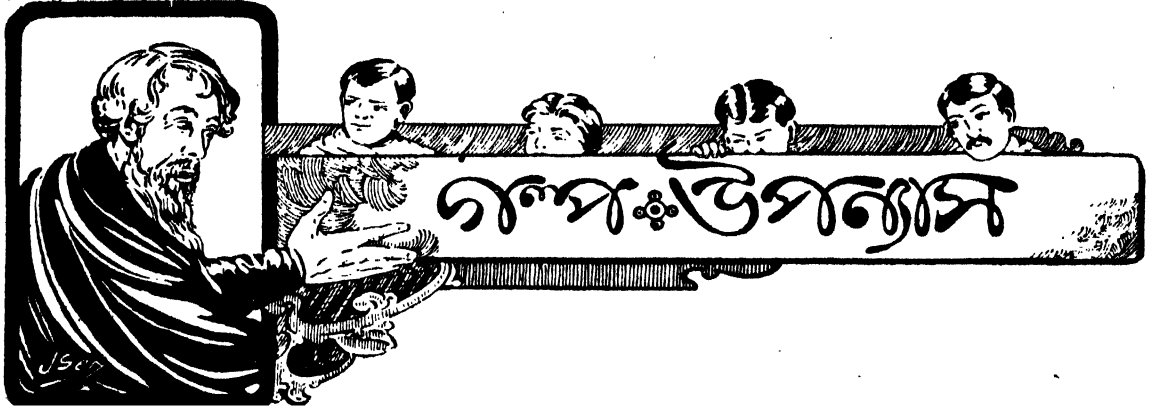
বিপর্য্যয়

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন এম-এ-ডি-এল

(২৪)

কথাটা খুব বেশী রটিয়া গেল—ভয়ানক হৈ-চৈ লাগিল। সব কাগজে লিগুলের মুণ্ড তলব করা হইল। ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন হইল। ডিরেক্টার লিগুলেকে ডাকাইয়া খুব খানিক ধমক দিয়া, তাহাকে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বদলী করিয়া চট্টগ্রামে এসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্টার করিয়া পাঠাইলেন। বাঙ্গালী প্রফেসাররা খুব গোলযোগ উপস্থিত করিলেন; ছাত্রেরা জোট করিয়া লিগুলের ক্লাশ কামাই করিল; আর এমনও গতিক দেখা গেল যে, বুঝি বা তারা লিগুলেকে মারিবে।

অমল সমস্ত শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেল। লিগুলে তাহার কাছে যাহা বলিয়াছিল, তাহাতে ইন্দ্রনাথের উপর তাহার ক্রোধ হইবার কোনও কারণ নাই; অথচ সেই লিগুলেই গিয়া ইন্দ্রনাথকে এমন ভাবে আক্রমণ করিল! ইহার হেতু কি?

লিগুলে লজ্জায় আর অমলের কাছে গেল না,—অমলই ৪।৫ দিন ঘুরিয়া তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিল। অমল জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি!"

লিগুলে বলিল, "আমাকে আর জিজ্ঞাসা করো না ভাই, আমি একটা পশুর মত ব্যবহার ক'রেছি। তা'তে আমার একটা উপকার হ'য়েছে অমল! বইয়ে পড়েছি যীশুখৃষ্টের কথা, সেদিন দেখলাম যীশুরই মত ক্ষমার জীবন্ত মূর্ত্তি। টলষ্টয়ের Christ lawর কথা নিয়ে আমরা কত না ঠাট্টা তামাসা ক'রেছি; সেদিন দেখ্‌লাম, Christ law একটা সম্পূর্ণ সত্য ও সম্ভব বস্তু! ইন্দ্রনাথ সত্য সত্যই দেবতা!"

অমল বলিল, "সে তো আজকাল শুন্‌তে পাচ্ছি; কিন্তু তুমি তা'কে মারতে গেলে কেন? হঠাৎ তুমি কি এত বড় Iconoclast হ'য়ে উঠেছ, তাই অ্যাস্ত দেবতাকেও মেরে ফেলাটাই শাস্ত্রসঙ্গত সাব্যস্ত ক'রেছ।"

"কেন? আমি বুঝতে পারছি না ঠিক অমল। ইন্দ্র যে কথাগুলো বললে, তা'তে আমার তখন খুব রাগ হ'য়েছিল। কিন্তু এখন মনে হ'চ্ছে, এ একটা প্রকাণ্ড হেঁয়ালী! সে বল্লে, অনীতা যা ব'লেছে, তা সম্পূর্ণ সত্য নয়—সে নিজেই দোষী!"

অমল চমকাইয়া উঠিল, "সে এই কথা ব'লেছে?"

"হাঁ।"

"তবে এই কথাই সত্যি। টম, ইন্দ্রনাথ আর যাই করুক, ও মিথ্যা বলবে না—ও মিথ্যা ব'লতে পারে না।"

"কিন্তু অনীতা, অনীতাই কি মিথ্যা করে নিজের ঘাড়ে কলঙ্কের বোঝা নিতে পারে ?"

"বলতে পারি না ঠিক। কিন্তু প্রেমমুগ্ধা নারী তার প্রেমাস্পদের জন্যে এমন অনেক কাজ ক'রতে পারে, যা' স্বাভাবিক অবস্থায় তাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব !"

অন্যমনস্ক ভাবে লিণ্ডলে ইন্দ্রনাথের আহত মূর্ত্তির ধ্যান করিতে-করিতে বলিল, "আমার মনে হয় অমল, যে, এ বিষয়ে ইন্দ্রনাথও হয় তো ঠিক স্ত্রীলোকেরই মত। সে যে মিথ্যা ব'লবে, এ কথা বলছি না। সে অনীতাকে দোষমুক্ত ক'রবার জন্য আত্মবঞ্চনা করে নিজেকেই হয় তো বুঝিয়েছে যে দোষ তারই—সে যে অনীতাকে ভালবাসে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই।"

"Scoundrel, তার ভালবাসবার কোনও অধিকার ছিল না।"

দুজনেই অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

তাহাদের কথাবার্ত্তা হইতেছিল লিণ্ডলের ঘরে। লিণ্ডলে রাসেল ষ্ট্রীটের একটি বোর্ডিং-হাউসের দ্বিতলের একখানা ঘরে বাস করে। সেইটিই তাহার শুইবার এবং পড়িবার ঘর। ঘরটি যেমন ছিমছাম ফিটফাট হইতে হয় তেমনি। ঘরের একপাশে একখানা খাট, তাহার পশ্চাতে একটি ড্রয়ার-চেষ্ট—এক দিকে একখানি ড্রেসিং টেবিল ও তা'র উল্টা দিকে একটি ওয়ার্ড-রোব। মধ্যস্থলে একটি সেক্রেটেরিয়াট টেবিল ও একটি বুক-কেস,—টেবিল ও বুককেসের উপর গাদাগাদা বই। দেয়ালে খানকয়েক ফটোগ্রাফ, এবং পড়িবার টেবিলের উপর অমল, অনিতা, ও লিণ্ডলের মায়ের ফটোগ্রাফ। ইহাই তাহার এই গৃহের সজ্জা। টেবিলের পাশে মুখোমুখী হইয়া দুটী চেয়ারে বসিয়া অমল ও লিণ্ডলে আলাপ করিতেছিল।

লিণ্ডলে অন্যমনস্ক ভাবে অনীতার ফটোটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল। অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া সে বলিল, "অমল, এটা কি বড়ই দুঃখের কথা নয় যে, এরা দুজন পরস্পরকে এত ভালবাসে, অথচ এদের মিলন হ'বার কোনও উপায়ই নেই, কেন না, আর একটি স্ত্রীলোক মধ্যখানে তার vested interestএর একটা দেয়াল গেঁথে রেখেছে ?"

অমল অবাক্ হইয়া বলিল, "তুমি কি বলছ টম ? একে তুমি ভালবাসা ব'লতে চাও বল, আমি বলি এটা কেবলমাত্র কাম! ইন্দ্রর স্ত্রীকে তুমি জান না; আমি জানি। সে একটি রত্ন!"

"হ'তে পারে—তোমার কাছে! তোমার সঙ্গে যদি ইন্দ্রের স্ত্রীর বিয়ে হয়, আর ইন্দ্র যদি অনীতাকে পায়, তবে বোধ হয় সব চেয়ে ভাল বন্দোবস্ত হয়।"

"থাম, থাম, অত তাড়াতাড়ি করো না। শোন। ইন্দ্রের স্ত্রী ইন্দ্রকে যে কি রকম ভালবাসে, তা' তুমি কল্পনাও ক'রতে পারবে না। সে ঠিক দেবতার মত ইন্দ্রকে পূজা করে। আর ইন্দ্রও তাকে ঠিক তেমনি ভালবাসতো। সত্যি-সত্যি ইন্দ্র যদি কোনও দিন পবিত্র প্রেম অনুভব ক'রে থাকে, তবে সরযুর প্রতিই তার সে ভালবাসা জন্মেছিল। জান, আমি ছেলেবেলা থেকেই ইন্দ্রের প্রেমের সমস্ত খবর রাখতাম।"

"ইন্দ্র ভালবাসতো তা' ঠিক। কিন্তু তাই ব'লে চিরদিনই সে ভালবাসতে থাকবে, এ যে বড় জবরদস্তী!"

"ওঃ, এই কথা! দেখ, আমি অত্যন্ত সেকেলে লোক। বার্ণার্ড শ'র মতামতের উপর আমার খুব বেশী আস্থা নেই। মানুষের মধ্যে যেটুকু পশু সে বহু-পত্নীক হ'তে পারে—কিন্তু ভালবাসা এই পশু-মানবের সম্পত্তি নয়,—এ হ'চ্ছে মানুষের মধ্যে যেটুকু দেবতা তারই;—সে ভালবাসা একজনকেই আশ্রয় করে এবং একজনের সঙ্গেই সমাধি লাভ করে, এই আমার বিশ্বাস।"

"এ কথা নিছক কাব্যের কথা—এমন ভালবাসা দেখেছ কোথাও কোনও দিন ?"

"দেখেছি, নিত্যই দেখছি! আমাদের হিন্দু বিধবার বেশীর ভাগের মধ্যে এই ভালবাসা জাজ্বল্যমান। তার একটা জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখতে চাও তো ইন্দ্রের বিধবা ভগ্নীকে দেখ গিয়ে। আজ আট বৎসর হ'ল সে বিধবা হ'য়েছে, এখন পর্য্যন্ত একদিনের তরেও তার প্রেম তার স্বর্গীয় স্বামীর স্মৃতি থেকে একচুল নড়ে নি।"

এ কথার কোনও উত্তর লিণ্ডলে দিল না। বেয়ারা একখানা কার্ড লিণ্ডলেকে দিল,—সে চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিল। তার পর, একটু ভাবিয়া, সে তাড়াতাড়ি দুয়ারের কাছে গিয়া, দুয়ার খুলিয়া কাহাকে নমস্কার করিল। অমল দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিল—অনীতা।

(২৫)

মনোরমার মন হঠাৎ ভয়ানক বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। একটা ভয়ানক বিষাদ ও অতৃপ্তি তার সমস্ত মন ছাইয়া ফেলিল। কোনও কিছুই তার ভাল লাগে না, কোনও কিছুতেই তার মন বসে না।

মনোরমার ছেলে 'টুকু' তার নয়নের মণি। তার প্রতি অঙ্গ-সঞ্চালনে মনোরমার হৃদয়ে অমৃতের প্রস্রবণ ঢালিয়া দেয়। সে ছেলের উপরও সে যেন অযথা বিরক্ত হইয়া উঠিল; তার মেজাজটা ভয়ানক খিটখিটে হইয়া উঠিল।

চিত্ত শান্ত করিবার আশায় সে একাগ্রচিত্তে গীতা পাঠ করিতে লাগিল। সে খুব নিবিষ্টের মত নবম অধ্যায়ের সমস্তটা পাঠ করিয়া গেল। তার এক বর্ণও তা'র মস্তিষ্কের ভিতর প্রবেশ করিল না—তার মন চারিদিকে ছড়াইয়া গেল। হতাশ হৃদয়ে সে গীতাখানা বন্ধ করিয়া রাখিল। সকল বিষয়েই তার এমনি হইত, কিছুতেই মন বসিত না। লেখা-পড়া, গান-বাজনা, সেলাই—সবই তার ভাসিয়া গেল।

শেষে একদিন অনেক ভাবিয়া সে তাহার মালা লইয়া জপ আরম্ভ করিল। মনকে জোর করিয়া বসাইয়া সে সহস্রবার বীজমন্ত্র জপ সমাপ্ত করিল;—কিছুই হইল না।

কিসের এ অতৃপ্তি? কিসের হাহাকার? মনোরমা মনের ভিতর হাতড়াইয়া ইহার হেতু পাইল না। কিন্তু সে পাকা ডুবুরী নয়, মনের তলায় বেশী দূর ডুব মারিতে তাহার সাহসও হইল না। সেখানে এমন সব সত্য লুকান ছিল, যে, তা'দের সম্মুখে দাঁড়াইতে তার সাহস হইত না।

সে কেবল অনুভব করিল যে, তার জীবনটা বড় শূন্য; বড় লক্ষ্যহীন, স্বার্থহীন তার সমস্ত সত্তা। কিসের জন্য তা'র বাঁচিয়া থাকা? ছেলেটা? তা' বটে,—কিন্তু সে আর ক'দিন? কয়েক বছর বাদেই তো ছেলে বড় হইয়া উঠিবে। তার পর তো মায়ের আঁচলের আশ্রয় তা'র আবশ্যক হইবে না। তার পর? তার পর একটা বৃহৎ বিরাট শূন্য; তার গোড়াও নাই, শেষও নাই—এমন জীবন কি বহিয়া বেড়াইতেই হইবে?

'এত দিন সে দর্শনের পথে নিবিষ্ট ভাবে সত্যের সন্ধান করিয়াছে,—তার দাদার কাছে অনেক বই পড়িয়াছে;—পড়িয়া-পড়িয়া যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছে, তাই জীবনে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। এই চেষ্টার ফলে তার সবগুলি পুরাতন সংস্কার একটি-একটি করিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে। শেষে সে সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, মানুষ মরিয়া গেলে আর তার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না,—শরীর-বিযুক্ত আত্মার সত্তা অসম্ভব,—জগতাতীত কোনও সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর থাকা খুবই সন্দেহের বিষয়। অথচ, তার সমস্ত জীবনটা কেবল এই কয়টা অসত্য বা মহাসন্দেহজনক বিষয় আশ্রয় করিয়া চালাইতে হইয়াছে। বৈধব্যের কোনই মানে থাকে না, যদি পরলোকে স্বামীর সত্তা না স্বীকার করা যায়,—যদি পুণ্যের পারলৌকিক ফলের কোনও অস্তিত্ব না থাকে,—আর যদি সমস্ত জগৎ একটা দৈবী শক্তির দ্বারা শাসিত ও রক্ষিত না মনে করা যায়। তার সমস্ত জীবনের মূলে যে সব কথা, সেইগুলি যেদিন সে অসত্য বলিয়া সাব্যস্ত করিল, সেদিন কাজেই তার জীবনটা একেবারে অসহনীয় ভার বলিয়া মনে হইল।

কিন্তু তার অস্বস্তির কেবল এইটাই তো একমাত্র হেতু নয়। আসল কথা, তার জীবনটায় হঠাৎ একটা মস্ত বড় ফাঁক পড়িয়া গিয়াছিল। অনীতা ও অমল এ পরিবারের সবারই জীবনের খুব একটা বড় জায়গা ভরিয়া রাখিত। তারা যতক্ষণ কাছে থাকিত, ততক্ষণ তারাই ইহাদের সবার মন ভরিয়া রাখিত। তারা আড়ালে গেলেও তাদের স্মৃতি, তাদের ভবিষ্যতের জন্য ফরমায়েস, তাদের জন্য উপহার সৃষ্টির কল্পনা, তাদের খাওয়ানর আয়োজন, তাদের শোনাইবার জন্য গান শেখা—ইত্যাদি কত কিছুকে এই পরিবারের দিনগুলি ঠাসাঠাসি হইয়া ভরিয়া থাকিত। আর বোধ হয় সব চেয়ে বেশী ভরিয়া থাকিত মনোরমার হৃদয়! কেন না—যাক, 'কেন না'র আলোচনায় বিশেষ কোনও ফল নাই।

মোটের উপর অমল ও অনীতা—লজ্জার সহিত মনোরমা মাঝে-মাঝে স্বীকার করিত, অমলই মনোরমার মনের অনেকটা জুড়িয়া বসিয়া ছিল। তাই ছিল বলিয়াই, সে তার বৈরাগ্যের ঝোঁকে ইহাদের উপর বিশেষ করিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল, এবং শেষাশেষি সে ইহাদের যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিত।

কিন্তু যখন বৈরাগ্যের ঝোঁক কাটিয়া গেল, আর সঙ্গে-সঙ্গে অমল ও অনীতার সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেল, তখন

তার জীবনটা একেবারে ভয়ানক ফাঁকা হইয়া গেল। এতটা ফাঁক সে কিছুতেই ভরিয়া তুলিতে পারিল না। তাই ক্রমে তার স্বভাব খিট্‌খিটে হইয়া উঠিল; তাই সে ক্রমে ভয়ানক নাস্তিক হইয়া উঠিতে লাগিল।

সে এক-একবার ভাবিত যে, এ বড় সর্ব্বনাশের কথা! সে জীবনের সকল আশ্রয় হারাইয়া একেবারে পথে বসিবার জো হইয়াছে। এমন হইলে তো চলিবে না, এমন নিঃশেষে বিশ্বাস হারাইলে তো চলিবে না। তাকে এই বিশ্বাসগুলিই আঁকড়িয়া ধরিতে হইবে—তার ধর্ম্ম-বিশ্বাস পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে। সেই চেষ্টায় সে একবার সন্ধ্যা করিত, বীজ মন্ত্র জপ করিত; একবার গীতা পড়িত, উপনিষদ পড়িত, একবার বা Theodore Parkerএর বই পড়িত! কিছুতেই মন ভরিত না। শেষে সে ভাবিল সুকুমার বাবুর কথা—তাঁর সঙ্গে উপাসনার জন্য তা'র মন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

অমলদের সঙ্গে ইন্দ্রনাথের যে কি গোলমাল হইয়াছে, তাহা মনোরমা কিছুই জানিত না। দাদার কাছে সে তাদের কথা মোটেই জিজ্ঞাসা করে নাই। বৌদিদির কাছে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কোনও সন্তোষজনক উত্তর পায় নাই। সরযু কেবল অনীতা ও অমলকে এমন কতকগুলি গালাগালি দিল, যা'তে মনোরমা অবাক্ হইয়া গেল। তার পর সে এ বিষয়ে বেশী ঘাঁটাইল না; আপনার মনে নানারকম সম্ভব ও অসম্ভব কল্পনা গড়িতে লাগিল,—কোনটাই তার কাছে সন্তোষজনক মনে হইল না।

একটা কথা তার মনের ভিতর বিদ্যুতের মত ঝলক দিয়া গেল—এক মুহূর্ত্তে তার সমস্ত শরীর অবশ হইয়া গেল। এ বিচ্ছেদের হেতু মনোরমা নিজে তো নয়? দাদা কি এমন কোনও সন্দেহ করিয়াছেন যে, সে ও অমল পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে? ভাবিতে সে লজ্জায় মরিয়া গেল! কথাটা বার-বার ভাবিতে তার মনের ভিতর এমন সব আশ্চর্য্য কল্পনার স্রোত প্রবাহিত হইত যে, সে নিজে-নিজেই লজ্জায় মরিয়া যাইত।

ইন্দ্রনাথের সঙ্গে হঠাৎ কলেজে একটা সাহেবের মারামারি হইয়া গেল কেন, তাও সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। ইন্দ্রনাথ মুখ-চোখ ফুলাইয়া যেদিন বাড়ী ফিরিল, সেদিন ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া সরযূ ও মনোরমা অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। ইন্দ্রনাথ বেশী কিছু বলে নাই; কেবল বলিয়াছিল, একটা সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া হইয়া গিয়াছে! তার পর খবরের কাগজে এ ব্যাপারের যে নানা শাখা-পল্লবিত বৃত্তান্ত বাহির হইয়াছিল, তাহা পড়িয়া মনোরমা দেখিল যে, ইন্দ্রনাথের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণের মধ্যেও কয়েকটা কথার সঙ্গে খবরের কাগজের বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ খাপ খায় না। সবই তার কাছে হেঁয়ালী বলিয়া বোধ হইল। তার নিজের মনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল; তাই সে সব বিষয়েই নানারকম বিভীষিকা দেখিতে পাইল। যা' দেখিল, তাহাতেই তার মন আরও বেশী বিষণ্ণ হইয়া পড়িল।

হঠাৎ চার-পাঁচ দিনের মধ্যে কেন এমন হইল? কেন তাদের জীবনের মধ্যে হঠাৎ এমন জটিলতা আসিয়া পড়িল, তাই ভাবিয়া মনোরমা অস্থির হইল। সঙ্গে-সঙ্গে তাদের আগেকার সুখের দিনগুলির চিত্র তার মনে ফুটিয়া উঠিল। অমল যে বাড়ীতে আসিয়া নিত্য কত অফুরন্ত হাসির লহর ছড়াইত, তাহা স্মরণ করিল। হাঁ, তা, অনীতারও শান্ত-স্নিগ্ধ মূর্ত্তি স্মরণ করিল। শেষাশেষি সে যে তাদের উপর অযথা বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সদা সর্ব্বদা যে তাহাদিগকে এড়াইয়া চলিয়াছে, তাহা স্মরণ করিল; আর সেই সব সুখের, সেই সব অপরাধের পাশে বর্ত্তমান অভাবের চিত্র ধরিয়া, সে তখনকার সেই সুখটাকে কতকটা অতিরঞ্জিত করিয়াই মনের ভিতর আঁকিয়া লইল,—একটা গভীর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস তার মনের তলা হইতে বাহির হইল।

ইন্দ্রনাথের অসুখ একটু ভাল হইতেই, মনোরমা একদিন তার এক মামাত ভাইয়ের সঙ্গে যোগাড় করিয়া নববিধান সমাজে গেল। সেদিন সুকুমার বাবু উপাসনা করিবেন, এ সংবাদ সে পাইয়াছিল। সমাজে যাইয়া দেখিল যে, সেদিনকার গায়িকা অনীতা! তা'র শরীরের ভিতর রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল,—ছুটিয়া গিয়া অনীতার গলা জড়াইয়া ধরিবার জন্য সে ব্যাকুল হইল। কিন্তু অনীতা তখন ছিল অনেকটা দূরে,—আর তার গান আরম্ভ হইয়া গিয়াছে;—তাই সে কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বহুকষ্টে বসিয়া রহিল।

সুকুমার বাবু গভীর, প্রাণস্পর্শী ভাষায় প্রার্থনা করিলেন। পাপীর হইয়া, শোকার্ত্তের হইয়া, তিনি

ভগবানের কাছে করুণ নিবেদন করিলেন ; তাঁর দয়ার, ক্ষমার, সান্ত্বনার মঙ্গল-স্পর্শ ভিক্ষা করিলেন।

মনোরমার মন উপাসনার দিকে ছিল না ; সে দুই চক্ষু একেবারে অনীতার মুখের উপর বসাইয়া রাখিয়াছিল। সে দেখিল, অনীতা চক্ষু বুজিয়া একাগ্রচিত্তে উপাসনা করিতেছে,—তার দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রুর নির্ঝর বহিয়া গিয়াছে। দেখিয়া হঠাৎ তার মনে ধিক্কার উপস্থিত হইল। উপাসনায় আসিয়া তার চিত্ত এত বিক্ষিপ্ত হইতেছে দেখিয়া সে নিজের উপর রাগ করিল। তখন সে সুকুমার বাবুর মুখের পানে চাহিয়া শুনিল,—দুই হাত তুলিয়া উর্দ্ধদৃষ্টি উপাসক বলিতেছেন, "ওগো আমাদের সর্ব্বদর্শী পিতা, তোমার কাছে কি লুকাব। আমি নিজে যা' জানি না, তুমি তো তা জান ভগবান। আমার মনের তলায় অতি গোপনে যে পাপ আছে, যে আমার মনের চক্ষে দিনরাত ধূলা দিয়া আমার নিজের কাছেই আত্মগোপন করে' র'য়েছে—তা' তো তোমার কাছে দিনের মত সুপ্রকাশ! তুমি তো সব জান হরি—জান তো, আমরা সবাই কত বড় পাপী—তাই তো তোমার দয়াল নাম, তাই তো তুমি পাতকী-তারণ। তুমি তোমার পাতকী সন্তানের ভিতর তোমার মঙ্গল অঙ্গুলি-স্পর্শে ধর্ম্মজীবন উজ্জ্বল করে' তোল', তোমার অপার করুণার স্নিগ্ধ ধারায় পাপের সব ক্ষোভ, সব মলা ধুয়ে ফেল ; শান্তির প্রলেপে জীবন শীতল করে দাও—দয়া করে মায়ের মত কোলে তুলে নেও, তাই তো তুমি দয়াময়—তাই তো তুমি দেবতা! ওগো পাপীর ভগবান, আর্ত্তের নারায়ণ, তোমার চরণ-প্রান্তে সমস্ত মানুষ তা'দের দুঃখ-জ্বালা এনে নিবেদন ক'রে দিচ্ছে—তুমি দয়া কর দেবতা, ক্ষমা কর মঙ্গলময়—শান্ত কর হে শান্তির অনন্ত আকর!"

সুকুমার বাবুর সুকণ্ঠ, তাঁর বক্তৃতার ভঙ্গী, তাঁর আবেগ ও ঐকান্তিকতায় এই কথাগুলি যেন একটা অপূর্ব্ব প্রাণশক্তিতে ভরিয়া দিল। মনোরমা হঠাৎ মাতিয়া গেল। সুকুমার বাবু কেমন করিয়া তার মনের কথাটা টানিয়া আনিয়া বলিলেন, তাই ভাবিয়া সে অবাক্ হইয়া গেল। সে একান্ত মনে উপাসকের সঙ্গে সমস্ত হৃদয়-মন জুড়িয়া দিয়া প্রার্থনায় যোগ দিল।

তার পর সুকুমার বাবু তাঁর ওজস্বিনী ভক্তিময়ী ভাষায় উপদেশ দিলেন। তাতে সাধনার ক্রম, সাধনার উপায় ও আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে নানা কথা এমন সরল, সহজ ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া গেলেন যে, তাহাতে মনোরমা যেন নূতন আলোক দেখিতে পাইল। সুকুমার বাবু বলিলেন, "অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালী বিশ্বপতিকে ভক্তগণ কাঙ্গাল বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন! তিনি কি পূজার কাঙ্গাল? এমন কথা মনে করিতেও পাপ আছে! সামান্য মানুষের মধ্যে যে অভিমান আমরা দোষের মনে করি, সেটা সেই সকল মঙ্গল-নিদানের ভিতর আরোপ করিব কেমন করিয়া। তিনি পূজা চান না, বলি চান না, উপহার চান না। তবু তিনি কাঙ্গাল,—মানুষের দ্বারে-দ্বারে তাঁহার অনন্ত ভিক্ষার বাক্য ধ্বনিত হইতেছে ;—যুগ-যুগ ধরিয়া এ কাঙ্গালের ভিক্ষা আমরা শুনিতেছি। কি সে ভিক্ষা? কি চান ভগবান ক্ষুদ্র মানুষের কাছে? কি চায় মা তার ছেলের কাছে? তার কাছে কোন্ দান পেলে পিতার হৃদয় গর্ব্বে ফুলে ওঠে? তা কি ব'লতে হ'বে? বাপ চান, মা চান,—ছেলে মানুষ হ'ক, ভাল হ'ক,—দশের একজন হ'ক। তাতে যে সুখ,—রাশি-রাশি উপহারে, নিরন্তর নমস্কার বা সেবায় তার মত সুখ হয় না। এই বিশ্বের পিতাও তাঁর সমস্ত সন্তানের কাছে এই ভিক্ষাই ক'রে বেড়াচ্ছেন, তোরা ভাল হ', তোরা মানুষ হ', তোরা দেবতা হ'। দিনরাত কাণ পেতে শুনতে পাও কি কাঙ্গালের এই করুণ আবেদন, বিশ্ববাসী? তোমার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে তোমার সৃষ্টিকর্ত্তাকে এই দান দিবার জন্য উন্মুখ থাকে কি? ছোট-বড় সব কাজে তুমি কি ভাল হ'বার জন্য, মানুষ হ'বার জন্য চেষ্টা কর? তবে তোমার কোনও চিন্তা নাই, কোনও দুঃখ নাই? সাধনার বিস্তীর্ণ রাজপথে তুমি অধিষ্ঠিত হ'য়েছ। সকল জ্ঞানের যিনি আধার, সেই মহাগুরুর কাছে তবে তোমার দীক্ষা হ'য়ে গেছে। তাঁর সঙ্গে তোমার হৃদয়ের এমন একটা যোগ হ'য়ে গেছে, যাতে তিনি তোমাকে সাধন-মার্গে ধাপে-ধাপে অভ্রান্ত পদক্ষেপে অগ্রসর করে নিয়ে, তাঁর আপনার কাছে নিয়ে যাবেন।"

এমনি করিয়া তিনি সাধনার পথের নানা সহজ সন্ধান তাঁর শ্রোতৃবর্গের মনের ভিতর গাঁথিয়া দিতে লাগিলেন। সুকুমার বাবুর উপদেশের এই বিশেষত্ব যে, তাঁর মুখে সাধন অত্যন্ত সহজ হইয়া উঠে। উপাসককে তিনি কোনও

কঠোর পরীক্ষায় পীড়িত করেন না। তাঁর শ্রোতারা তাঁর কথা শুনিয়া আনন্দের সঙ্গে অনুভব করে যে, সাধন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়,—এটা কেবল যোগী সাধুর সাধ্য ব্যাপার কিছু নয়; প্রত্যেকেই অতি সহজে সাধনা করিতে পারে,—এমন কি সিদ্ধিলাভও এমন কিছু গুরুতর রকম কঠিন কাজ নয়। তাঁর কথায় সকলে উৎসাহিত হইয়া উঠে, এবং তাঁর উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে।

মনোরমারও আজ তাই মনে হইল। মনে হইল, সে বেদান্ত ও উপনিষদের পরস্পর বিরোধের মধ্যে, তাদের কটমট উপদেশের মধ্যে বৃথাই আত্মহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! এই তো সহজ, সরল সাধনার পথ পড়িয়া রহিয়াছে। কোথাও ইহার কোনও বিরোধ নাই, অসঙ্গতি নাই! এই তাহার পথ! সে স্থির করিল, সুকুমার বাবুকে আশ্রয় করিয়াই সে সাধনা করিবে।

উপাসনা শেষ হইলে সে ছুটিয়া গিয়া অনীতাকে ধরিল। অনীতা তাহাকে দেখিয়া ভয়ানক চমকাইয়া উঠিল। তার গোলাপফুলের মত টুকটুকে মুখখানি হঠাৎ সাদা হইয়া গেল। পরমুহূর্ত্তে সমস্তটা মুখ রক্তজবার মত লাল হইয়া উঠিল। সে কোনও কথা বলিতে পারিল না।

অনীতাকে পাইয়া মনোরমার হঠাৎ যেন বুকটা ঠেলিয়া কান্না আসিতে লাগিল; যেন রাজ্যের অভিমান তার বুকের ভিতর জমিয়া উঠিল। সেও কিছুক্ষণ কোনও কথা বলিতে পারিল না। দুজনে এক মুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সুকুমার বাবুর কন্যা সুলতা আসিয়া অনীতাকে বলিল, "এস অনি, গাড়ী এয়েছে, বাবা দাঁড়িয়ে র'য়েছেন।"

অনীতা যেন এতক্ষণে ভাষার দেখা পাইল। সে বলিল, "আসছি ভাই, মনোর সঙ্গে গোটা দুই কথা বলে' আসি।" সুলতা চলিয়া গেলে, অনীতা বলিল, "কেমন আছিস মনো, তোরা সব?"

চোখ মুছিয়া মনোরমা বলিল, "আর কেমন আছি! তোরা তো একবার খোঁজও নিস নে? তোদের হ'য়েছে কি?"

অভিমানে মনোরমার চক্ষে জল আসিল। অনীতাও একটু গলা পরিষ্কার করিয়া বলিল, "অদৃষ্ট মনো, অদৃষ্ট! তুই কি কিছুই জানিস না?"

"না ভাই। কেউ আমায় কিছু বলে নি। কি হ'য়েছে জানবার জন্যে প্রাণ ছট্‌ফট্ ক'রছে, অথচ কেউ কিছু বলে না। কি হ'য়েছে বল না।"

এবার অনীতার চক্ষু ভরিয়া আসিল। এত অপমান, এত লাঞ্ছনা সহিয়াও ইন্দ্রনাথ তাহার ভগ্নীর কাছেও কোনও কথা প্রকাশ করিয়া বলে নাই! এত তার ক্ষমা!

সে জিজ্ঞাসা করিল, "এই যে কাগজে দেখছিলাম, তোর দাদার সঙ্গে লিওুলের কি মারামারি হ'য়েছে। তিনি কি খুব বেশী আঘাত পেয়েছেন?"

"আঘাত! বল কি? ঘণ্টা খানেক তো তিনি একেবারে অজ্ঞান হ'য়ে ছিলেন। বাড়ীতে এসে তাঁর ভয়ানক জ্বর, নাক মুখ চোখ ফোলা, মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা,—এ ক' দিন যে আমাদের কি কষ্টে গেছে!"

অনীতা চোখে রুমাল দিল,—সে কিছুতেই আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। মনোরমা কিছু আশ্চর্য্য হইল।

একটু পরে অনীতা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "এখন কেমন আছেন?"

"এখন অনেকটা ভাল, যন্ত্রণা সেরে গেছে। আজ জ্বরও নেই। বোধ হয় কাল ভাত খাবেন। হাঁ ভাই, তুই কাঁদছিস কেন? আর কেনই বা তুই আমাদের দেখতে আসিস না? কি হ'য়েছে আমায় বলবি না?"

"না ভাই, তোর দাদা যখন বলেন নি, তখন আমি বলবো না। সুধু এইটুকু বলি যে, আমার মত দুঃখী কেউ নাই। আমায় তোরা ভাল বাসিস না মনো! আমাকে ঘৃণা করিস। তোর দাদার সব দুঃখ কেবল আমার পাপে! আসি ভাই—আর তোর সঙ্গে আমার দেখা হ'বে না। মনে রাখিস।" বলিয়া অনীতা মুখ ফিরাইল।

মনোরমা তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "এ কি কথা, অনীতা, আর দেখা হ'বে না কেন? আমায় খুলে বল ভাই, আমায় আর দগ্ধে মারিস না।"

সুলতা আবার দূর হইতে বলিল, "এস অনি, বাবা বড় তাড়াতাড়ি কচ্ছেন।"

মনোরমা মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "এটি কে?"

"সুকুমার বাবুর মেয়ে।"

মনোরমা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া রহিল সুলতার দিকে। কি সৌভাগ্যবতী সে, যে দিনরাত সুকুমার ঘোষের চরণ প্রান্তে বসিয়া শিক্ষালাভ করে! শেষে সে বলিল, "তুমি ওদের সঙ্গে এসেছ? তোমার দাদা কোথায়?"

অনীতা হঠাৎ দীপ্ত হইয়া বলিল, "দাদা! মনো, দাদা আমার নেই! তার সঙ্গে আমার কোনও সম্বন্ধ নেই! সে আমার শত্রু!"

"আসি ভাই! ক্ষমা করিস, মনে রাখিস।" বলিয়া অনীতা তাড়াতাড়ি সুলতার সঙ্গ ধরিল। মনোরমা একটা মহা সমস্যার গভীরতম গর্ত্তের ভিতর পড়িয়া গেল। এই কয় দিনের ভিতর তার চারিদিক দিয়া এমন একটা অবোধ্য, অমীমাংস্য হেঁয়ালী কেমন করিয়া রচনা হইয়া গেল, সে ভাবিয়া পাইল না।

বাড়ী ফিরিবার পথে এবং তার পরে তার মনের ভিতর দুইটী বিষয় ঘুরিয়া-ফিরিয়া ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। আজ সুকুমার বাবুর প্রার্থনা ও উপদেশ তার মনের ভিতর একটা পাকা রকমের ছাপ রাখিয়া গিয়াছিল। সেই কথাগুলি বারেবারে ঘুরিয়া-ফিরিয়া তার মাথার ভিতর জাগিতেছিল। তার পাশে ভাসিয়া উঠিতেছিল অনীতার ছবিখানি,—তা'র আশ্চর্য্য ব্যবহার। সুকুমার বাবুর কথাগুলি যেমন জলের মত স্বচ্ছ ও সরল, অনীতার ব্যবহার ও কথাগুলি তেমনি ভীষণ, জটিল ও অবোধ্য! সুকুমার বাবুর কথাগুলি তাহাকে তাহার নূতন সাধনার পথে টানিয়া লইতেছিল। এ সাধনার দীক্ষাদাতা সুকুমার বাবু;—সাধনায় নিরন্তর তাঁর সহায়তা পাইবার জন্য তার অন্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অনীতার ব্যবহার তাহার জিজ্ঞাসার প্রবৃত্তিকে প্রবল ভাবে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। এ সমস্যার সমাধান না করিয়া সে চিত্ত স্থির করিতে পারিল না।

এই দুইটি বিভিন্ন বিষয় তার চিত্তকে শেষ এক পরিণতির দিকে ঠেলিয়া লইল। সে স্থির করিল, সে সুকুমার বাবুর সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে দেখা করিবে। সেখান হইতে অনীতার সন্ধান পাইতে পারিবে—সেখানে সে সাধনায় সহায়তা লাভ করিবে।

(ক্রমশঃ)

প্রার্থনা

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী

১

প্রভাত তপন না হ'তে উদয়
　　জাগি' মা বিহগ-গানে
যপি যেন তব নাম সুধাময়
　　ধরি ও মূরতি ধ্যানে।

২

করমের স্রোতে দিবসে যখন
ভাসি মা, তোমার স্মৃতি
চিন্তা-লহর যেন অনুখন
　　আলোকিত করে নিতি।

৩

অন্ন জননি! মুখে যবে তুলি,
　　নিরন্ন কোটী তোর
তনয়ের ছবি যেন নাহি ভুলি
　　তুলিতে গরাস মোর।

৪

মলিন তোমার মুখ-চন্দ্রমা
　　যেন মনে পড়ে সাঁঝে,
নিরমল তব মুক্ত সুষমা
　　নিশীথ-স্বপনে রাজে।

স্বপ্ন

ডাঃ শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু, ডি-এস্‌সি, এম-বি

(৪)

স্বপ্নের রুদ্ধ ইচ্ছা

মনের অনেক অপূর্ণ ইচ্ছা স্বপ্নে কাল্পনিকভাবে পরিতৃপ্ত হইবার চেষ্টা করে, একথা পূর্ব্বে একাধিকবার বলিয়াছি। এই অপূর্ণ ইচ্ছাগুলিকে আমরা কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি :—

(১) যে-সকল ইচ্ছা চেতনায় আছে, এবং যাহার পূর্ণতালাভের পথে আমাদের কোন আপত্তি নাই। যেমন, মনে করিয়াছি বই লিখিব। কিন্তু লেখা এখনও ঘটিয়া উঠে নাই।

(২) যে-সকল ইচ্ছা চেতনায় আছে, অথচ তাহাদের পূর্ণতালাভের পক্ষে মনে বাধা। ধরুন, পরের কোন্ ভাল জিনিষ দেখিয়া আত্মসাৎ করিবার লোভ হইয়াছে। এরূপ ইচ্ছা মনে উঠিবামাত্র তাহা অন্যায় বলিয়া মন হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছি।

(৩) যে-সকল ইচ্ছার অস্তিত্ব আমাদের নিকট অজ্ঞাত। এগুলিকে আমরা অজ্ঞাত রুদ্ধ ইচ্ছা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি।

স্বপ্নে এই তিন প্রকার ইচ্ছারই পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক স্বপ্নেই আপাতদৃষ্টিতে কেবল প্রথম দুই প্রকার ইচ্ছার অস্তিত্ব আছে বলিয়া আমরা মনে করি; কিন্তু বিশ্লেষণ করিলে তাহাতে শেষোক্ত অজ্ঞাত রুদ্ধ ইচ্ছারও সন্ধান মিলিবে। বাস্তবিকপক্ষে এই অজ্ঞাত রুদ্ধ ইচ্ছাই স্বপ্ন-দেখার প্রধান কারণ। পূর্ব্বের তিন প্রকার ইচ্ছা ছাড়াও নিদ্রাকালে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম প্রভৃতি শারীরিক বৃত্তিগত যে-সকল ইচ্ছার উদ্রেক হয়, স্বপ্নে সেগুলিরও কাল্পনিক পরিতৃপ্তিলাভ ঘটে। আমাদের দৈনন্দিন যে-সকল কাজ অসমাপ্ত থাকিয়া যায়, তাহার কোন-না-কোনটির আভাস প্রায় প্রত্যেক স্বপ্নেই পাওয়া যায়। এই অসমাপ্ত-কার্য্যজনিত অতৃপ্ত ইচ্ছাকে আশ্রয় করিয়া অন্যান্য অজ্ঞাত রুদ্ধ ইচ্ছা স্বপ্নে প্রকাশ-লাভের চেষ্টা করে। তাই অনেকে মনে করেন, দৈনন্দিন ঘটনাই বুঝি আমাদের স্বপ্ন-দেখার মূল কারণ;—স্বপ্নে বুঝি বা কেবল দৈনিক ঘটনারই ইঙ্গিত থাকে। দৈনন্দিন ঘটনামূলক স্বপ্ন প্রথমটা অতি সাদাসিদে ঠেকিলেও, বিশ্লেষণ করিলে তাহাদের মূলে অনেক অজ্ঞাত রুদ্ধ ইচ্ছারই সন্ধান পাওয়া যাইবে।

স্বপ্নে কি ধরণের অজ্ঞাত ইচ্ছা আত্মপ্রকাশ করে, পাঠককে তাহার কিছু আভাস দিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ক্ষুধাতৃষ্ণা কাম-জনিত ও অন্যান্য শারীরিক বৃত্তিগত অনেক ইচ্ছার অস্তিত্ব স্বপ্নে যথেষ্টই থাকে। নানা সদ্ ইচ্ছাও স্বপ্নে দেখা দিতে পারে। যে-সকল ইচ্ছা আমাদের চক্ষে অন্যায়, অথচ যাহা জাগ্রত অবস্থাতেও মাঝে মাঝে মনে উঠিয়া থাকে, তাহাও স্বপ্নে অভিব্যক্ত হয়। এই শ্রেণীর ইচ্ছা এমন কিছু বৈচিত্র্যপূর্ণ নহে যে তাহার বিশেষ পরিচয় আবশ্যক। কিন্তু কি কি অজ্ঞাত রুদ্ধ ইচ্ছা স্বপ্নে প্রকাশিত হয়, তাহা জানিবার জন্য পাঠকের স্বভাবতঃই কৌতূহল হইবে। এই অজ্ঞাত রুদ্ধ ইচ্ছাগুলির বিশেষত্ব এই, আমরা সাধারণতঃ তাহাদের অস্তিত্ব ত জানিই না, পরন্তু কেহ তাহা দেখাইয়া দিলেও সেগুলিকে নিতান্ত অদ্ভুত, উৎকট, অসম্ভব, অশ্লীল ইত্যাদি বিশেষণে বিশিষ্ট করিয়া, মানিতে অস্বীকার করি। সুতরাং এই সকল অজ্ঞাত রুদ্ধ ইচ্ছার বিবরণ দিলেও স্বপ্নে যে সেগুলি প্রকৃতপক্ষে প্রকাশ পাইতে পারে, পাঠকের তাহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইবে না। তবে এখানে বলা আবশ্যক যে, অনেক মনো-বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত বহু ব্যক্তির স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিয়া এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। অনেকে আপত্তি করেন, কেবল মানসিক-বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির মধ্যেই

এরূপ উৎকট অশ্লীল বীভৎস ভাব থাকা সম্ভব। কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থচিত্ত ব্যক্তির স্বপ্নেও এই অজ্ঞাত রুদ্ধ ইচ্ছাগুলির সন্ধান পাওয়া যায়। অতএব শুনিতে বীভৎস ঠেকিলেও পাঠক যেন সিদ্ধান্ত না করেন যে, তাঁহার মনে এরূপ ইচ্ছার অস্তিত্ব থাকা একেবারেই অসম্ভব। আমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যেই যে অনেক বীভৎস' কুটিল ও অশ্লীল ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, নানা দিক হইতে আমরা তাহার প্রমাণ পাই।

আমি যে-সকল অজ্ঞাত রুদ্ধ ইচ্ছার বিবরণ দিব, কিরূপ প্রমাণের বলে তাহাদের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা বলিতে গেলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। প্রমাণের উল্লেখ না করিয়া বিভিন্ন দেশের মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণ যে-সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, এখানে তাহাই বলিবমাত্র।

পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন, অধিকাংশ অজ্ঞাত রুদ্ধ ইচ্ছাই কামজ। জনসাধারণের ধারণা, কাম-প্রবৃত্তি বুঝি কেবল স্ত্রীপুরুষের মিলনেচ্ছাতেই পর্য্যবসিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কামের অধিকার বহুবিস্তৃত। এই কাম-প্রবৃত্তি সম্বন্ধে কিছু ধারণা না জন্মিলে, অজ্ঞাত রুদ্ধ ইচ্ছার বিষয় কিছুই বুঝা যাইবে না। এই কারণে কাম-প্রবৃত্তির উন্মেষ ও বিকাশ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা দরকার।

মানুষের কাম-প্রবৃত্তি একটি স্বাভাবিক বা সহজ-প্রেরণা (instinct). বংশ সংরক্ষণের মূলে এই প্রেরণার অস্তিত্ব বিদ্যমান। অধিকাংশ লোকেরই ধারণা, যৌবনেই বুঝি কাম-প্রবৃত্তি প্রথম উন্মেষিত হয়; বাল্যে বা শৈশবে ইহার কোনই লক্ষণ থাকে না। এ কথা অবশ্য সত্য, যৌবনে যে-ভাবে কাম-বৃত্তির প্রকাশ দেখা যায়, বাল্যে সেরূপ দেখা যায় না। কিন্তু মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণের মতে, কাম-বৃত্তি বহুমুখী,—নিতান্ত শৈশবেও নানাভাবে ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ফ্রয়েড্ বলেন, কাম-বৃত্তির বিশ্লেষণ করিলে, তাহার তিনটি অঙ্গ দেখা যায়:—(১) কাম-ভাব (Sexual feeling), (২) কাম-চেষ্টা (Sexual aim), ও (৩) কাম-পাত্র (Sexual object). সাধারণ স্ত্রীপুরুষের কাম-বৃত্তি আলোচনা করিয়া আমি এই অঙ্গ তিনটি বুঝাইতে চেষ্টা করিব। পরস্পর পরস্পরের প্রতি যে অনুরাগ ও পরস্পরের সঙ্গলাভে যে সুখ—তাহাই **কাম-ভাব**। পরস্পরের আলিঙ্গন, সহবাসাদির যে চেষ্টা, অর্থাৎ যে উদ্দেশ্য লইয়া কাম-ভাব বিকশিত হয়,—তাহাই **কাম-চেষ্টা**। পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোক, এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষই **কাম-পাত্র**। ফ্রয়েড্ বলেন, কাম-বৃত্তির তিনটি অঙ্গের প্রত্যেকটির বিকাশ ভিন্ন ভিন্ন রূপে হইতে পারে। রতি-সুখ হইতে আরম্ভ করিয়া স্ত্রীপুরুষের পরস্পর কথোপকথনের আনন্দ পর্য্যন্ত—সকল প্রকার অবস্থাতেই কাম-ভাব ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশ পায়। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, স্ত্রীপুরুষের কথোপ-কথনের যে আনন্দ—তাহা রতি-সুখ হইতে বিভিন্ন। কিন্তু এই সকল-প্রকার সুখই সেই একই কাম-ভাবের রূপান্তর মাত্র। কাম-চেষ্টাও এইরূপ বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। স্ত্রীপুরুষের মিলনের উদ্দেশ্য—কখন বা পরস্পরের সঙ্গলাভ, আবার কখন বা রতি-ক্রিয়া। এই-সব বিভিন্ন প্রকার চেষ্টার মূলে কিন্তু সেই একই কাম-প্রেরণা বর্ত্তমান। কাম-পাত্রও সকল সময় এক না হইতে পারে। পুরুষ আজ যে স্ত্রীলোককে ভালবাসে, কাল তাহাকে ভাল না বাসিয়া অপর এক স্ত্রীলোকে আসক্ত হইতে পারে। স্ত্রীলোকের ভালবাসার পাত্রও সেইরূপ একাধিক ব্যক্তি হওয়াও অসম্ভব নহে। একই সময়ে একই পুরুষ বা একই স্ত্রীলোক—দুই বা ততোধিক ব্যক্তিতে আসক্ত হইতে পারে।

তাহা হইলে দেখা গেল, কাম-বৃত্তির বিকাশ কোন একটা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে। মনোবিজ্ঞানবিদেরা বলেন, 'কামগন্ধহীন' পবিত্র প্রেমও সেই আদি কাম-ভাবেরই রূপান্তর মাত্র। সেইরূপ সখীত্ব, বন্ধুত্ব ইত্যাদির মূলেও কামগন্ধ রহিয়াছে। সাধারণতঃ দেখা যায়, কাম-বৃত্তি বিকাশিত হইলে পুরুষ স্ত্রীলোককে, এবং স্ত্রীলোক পুরুষকে ভালবাসে। কিন্তু আবার পুরুষে পুরুষে, নারীতে নারীতে স্বামি-স্ত্রীর ন্যায় প্রেমও বিরল নহে। কোন পুরুষ বন্ধুকে উদ্দেশ করিয়া লিখিত কতকগুলি সনেটে শেক্‌স্-পীয়ার স্বামি-স্ত্রীর ন্যায় প্রেমভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে অস্কার ওয়াইল্‌ডের একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ আছে। প্রভাতকুমারের 'ষোড়শী' পুস্তকের "প্রিয়তম" গল্পেও দুই সখীর মধ্যে এইরূপ প্রেমভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ফ্রয়েড্ বলেন, এরূপ স্থলে কেবল কামের পাত্র-ভেদ

হইয়াছে। সাধারণ বন্ধুত্ব ও সখীত্বকেও কাম-প্রেরণার রূপান্তর বলিয়া ধরিলে বলা যায়, তাহাতে কাম-পাত্র ও কাম-চেষ্টা—এই দুই অঙ্গের প্রকার-ভেদ হইয়াছে মাত্র। এই বন্ধুত্ব ও সখীত্ব-বন্ধনের মধ্যে অতি দূষণীয় সমলৈঙ্গিক-প্রীতি (homo-sexual relationship) হইতে আরম্ভ করিয়া, পবিত্র বন্ধুভাব পর্য্যন্ত, সকল প্রকার স্তরই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে বুঝা যায়, সমলিঙ্গ-রতি (homo-sexuality) ও বন্ধুত্বের মূলে একই ভাব বর্ত্তমান। ফ্রয়েড্ কামের অধিকার কত বিস্তৃতভাবে দেখিয়াছেন, পাঠক এখন তাহার কিছু আভাস পাইলেন। আমরা বলিতে পারি, ভ্রাতৃপ্রেম, ভগিনীপ্রেম, মাতৃপ্রেম, সন্তান-প্রেম, পিতৃভক্তি, ঈশ্বরভক্তি প্রভৃতি সকল প্রকার প্রেমই কামজ। আমাদের শাস্ত্রকারেরাও কামকে 'আদিরস' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই-সব পবিত্র স্নেহবন্ধনের মধ্যে যে আবার কাম-ভাব থাকিতে পারে, এ কথা অনেকে হয় ত হঠাৎ বিশ্বাস করিবেন না; কিন্তু সংসারে এই সকল পবিত্র বন্ধনও কখন কখন কলুষিত হইতে দেখা গিয়াছে। মানব-মনের অন্তরালে কলুষ-ভাব প্রচ্ছন্ন না থাকিলে, কখন তাহা ফুটিয়া বাহির হইত না। মনুসংহিতায় (২য় অধ্যায়, শ্লোক ২১৫ Jolly—Text of Manu, p. 35). আছে,—

'মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।'

অর্থাৎ,—মাতা, ভগিনী বা কন্যার সহিত কখনও নির্জ্জনে অবস্থান করিবে না। কারণ ইন্দ্রিয়গ্রাম বলবান্; বিদ্বান্ ব্যক্তিও তাহার দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইতে পারেন। ফ্রয়েড্ বলেন, আমাদের প্রত্যেকেরই মনে এইরূপ স্নেহ-বন্ধনের সহিত কাম-ভাব বিজড়িত। এই কামভাব আমাদের মনে অজ্ঞাত থাকায়, তাহার অস্তিত্ব আমাদের নিকট অবিদিত থাকে। কেহ তাহা দেখাইয়া দিলেও মানিতে চাহি না। স্বপ্নে এইরূপ অজ্ঞাত ইচ্ছা সময়ে সময়ে প্রকাশ পাইয়া থাকে, আর তাহার ফলে মনে দারুণ ক্ষোভ ঘৃণা ও লজ্জার সঞ্চার হয়। মানুষের কাম-পাত্র যে কেবল মানুষই হইবে, এমন কোন কথা নাই। আমরা নানা জন্তু-জানোয়ারকেও ভালবাসিয়া থাকি। এই ভালবাসা আবার কেবলমাত্র চেতন বস্তুতেই আবদ্ধ নহে; আমরা অচেতন ঘরবাড়ী, আসবাবপত্র ইত্যাদিও ভালবাসি। এই সকল-প্রকার ভালবাসাই কিন্তু মূলে এক। ভাষাতত্ত্ব এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। একই কথা—'ভালবাসা'—আমরা সকল ক্ষেত্রেই ব্যবহার করিয়া থাকি।

ফ্রয়েড্ বলেন, শিশুর মনের মধ্যে সকল প্রকার কাম-ভাবেরই বীজ রহিয়াছে। শিশুকে তিনি Sexually polymorpho-perverse বা 'বহুরূপী কামবিকারগ্রস্ত' বলেন; অর্থাৎ শিশুকে যেরূপ কামের শিক্ষা দেওয়া যাইবে, তাহার প্রবৃত্তিও তদনুরূপ হইয়া উঠিবে। সকল প্রকার কাম-ভাবের উন্মেষের সম্ভাবনা তাহার মধ্যে রহিয়াছে। ফ্রয়েডের মতে, শিশুর মাতৃস্তন্য পান করা, আঙ্গুল চোষা প্রভৃতিও কামজ-ব্যাপার। শিশুর ভালবাসার প্রথমতঃ কোন পাত্র থাকে না। নিজের ক্ষুদ্রা-তৃষ্ণা ইত্যাদি কষ্টের লাঘব হইলেই সে সন্তুষ্ট। ক্রমশঃ নিজের সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান জন্মে; তখন পারিপার্শ্বিক দ্রব্যাদি হইতে সে নিজেকে পৃথক বলিয়া মনে করে। পরে বিষয় বা বস্তুজ্ঞান জন্মিলে ক্রমে ক্রমে তাহার মন পরিণতি লাভ করে। কোন ব্যক্তির ভালবাসা বিশ্লেষণ করিলে যদি আমরা দেখি যে, তিনি কেবল ভালবাসিব বলিয়াই ভালবাসেন, তবে তাঁহার ভালবাসাকে অবিষয়ী-প্রীতি বলা যাইতে পারে; যদি তাঁহার মন ভালবাসার পাত্রের জন্য উৎসুক হইয়া থাকে, তবে সেই ভালবাসাকে বিষয়-রতি (object love); আর ভালবাসা জনিত নিজের সুখের দিকেই যদি তাঁহার মন ধাবিত হয়, তবে তাহাকে আত্ম-রতি (narcissism, সংক্ষেপে narcism) বলিতে পারি। একমাত্র সুখের জন্যই শিশুর যে আকাঙ্ক্ষা, ফ্রয়েড্ তাহাকে auto-eroticism, সংক্ষেপে auto-erotism, বা অবিষয়ী প্রীতি বলিয়াছেন। এস্থলে শিশু কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে ভালবাসিতেছে না—সে কেবল সুখের সন্ধানেই ব্যস্ত।

নিজ সুখের জন্য যে চেষ্টা, বা নিজেকে ভালবাসিবার যে ইচ্ছা, তাহাকে স্বকায়-প্রীতি (narcism, গ্রীক-পুরাণে নার্সিসাস্ দর্পণে নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া নিজেকে ভালবাসিয়াছিলেন) বলা হয়। বস্তুজ্ঞান জন্মিলে সমলৈঙ্গিক ব্যক্তির উপর শিশুর যে ভালবাসা, তাহাকে সমলিঙ্গ-প্রীতি (homo-sexuality) এবং অপর-লৈঙ্গিক ব্যক্তির উপর

যে ভালবাসা, তাহাকে ইতরলিঙ্গ-প্রীতি (hetro-sexuality) বলা হয়। এই ইতরলিঙ্গ-প্রীতি সর্ব্বশেষে বিকাশলাভ করে। প্রথমে অবিষয়ী-প্রীতি, পরে স্বকায়-প্রীতি, তৎপরে সমলিঙ্গ-প্রীতি, সর্ব্বশেষে ইতরলিঙ্গ-প্রীতি বিকশিত হয়। পুত্র শৈশবে মাকে নিজেরই সমলিঙ্গ মনে করে। পরে জ্ঞান হইলে নিজের ভুল বুঝিতে পারে। বহু পর্য্যবেক্ষণের ফলে এই সকল সত্য নির্ণীত হইয়াছে। অনেক সময় কাম-প্রবৃত্তির উন্মেষের পথে নানারূপ বাধা জন্মে: তখন পূর্ব্বের চারি প্রকার প্রীতির মধ্যে কোন-কোনটির সম্পূর্ণ বিকাশ হয় না, আবার কোন-কোনটি অতিমাত্রায় বিকশিত হইয়া থাকে। যাঁহার মধ্যে অবিষয়ী-প্রীতি প্রবল, তিনি কেবল সকল প্রকার সুখের জন্যই ব্যস্ত। এই সুখের নেশায় তিনি নিজের শারীরিক অনিষ্টকেও ভ্রূক্ষেপ করেন না! যাঁহার মধ্যে স্বকায়-প্রীতি পরিস্ফুট, তিনি আত্মসুখপরায়ণ হন; কিন্তু আপাতঃ সুখের জন্য তিনি এমন কোন কাজই করেন না, যাহাতে নিজের শারীরিক অনিষ্ট হইতে পারে। যাঁহার মধ্যে সমলিঙ্গ-প্রীতির প্রভাব সমধিক, তিনি বন্ধুবান্ধব লইয়াই থাকিতে ভালবাসেন। যাঁহার মধ্যে ইতরলিঙ্গ-প্রীতি পূর্ণমাত্রায় বিকশিত, তাঁহার পারিবারিক জীবনে আসক্তি প্রবল। পাঠক মনে রাখিবেন, আমাদের সকলের ভিতরেই অল্পবিস্তর সকল রকম প্রীতিরই অস্তিত্ব রহিয়াছে। তবে তাহার মধ্যে কোন একটি বিশেষ প্রবল হইলেই উপরিউক্ত প্রকার একদেশী বিশেষত্ব দেখা যায়। যেমন, কোন পুরুষের মনে যদি সমলৈঙ্গিক ভাব প্রবল থাকে, তবে কখনই তিনি নিজ স্ত্রীকে ভালবাসিতে পারিবেন না; ইত্যাদি।

উপরে যে চারিটি প্রীতির কথা বলিলাম, তাহার সকলগুলি অল্প-বিস্তর পরস্পর বিরোধী, কাজেই আমাদের চেতনায় সবগুলির একত্র সমাবেশ হওয়া সম্ভবপর নহে। মানুষের মধ্যে ইতরলিঙ্গ-প্রীতিই স্বাভাবিক। কিন্তু কাহারও মধ্যে ইতরলিঙ্গ-প্রীতি পরিস্ফুট হইলেই যে আর কোনও প্রীতি থাকিবে না, এমন কোন কথা নাই। অন্য প্রীতিগুলির কামজ-রূপ আমাদের অজ্ঞাতে মনোমধ্যে রুদ্ধ ইচ্ছারূপে অবস্থান করে। এই প্রকার রুদ্ধ ইচ্ছা স্বপ্নে প্রায়ই আত্ম-প্রকাশে সচেষ্ট হয়। স্বপ্নে সমলিঙ্গ-প্রীতি, স্বকায়-প্রীতি ও অবিষয়ী প্রীতি-মূলক ইচ্ছার আভাস প্রায়ই পাওয়া যায়।

আমি এইবার কাম-চেষ্টা সম্বন্ধে আরও কিছু বলিব। কাম-চেষ্টার অর্থ যে কেবল রতি-ক্রিয়ার ইচ্ছা, তাহা নহে। ভালবাসার পাত্রকে নিজের রূপ দেখাইবার ইচ্ছা (exhibitionism) ও তাহার রূপ দেখিবার ইচ্ছাও (observationism) কাম-চেষ্টামূলক। অনেকে হয় ত শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন, প্রেমাস্পদকে পীড়ন করা (sadism), কিংবা তাহার দ্বারা নিপীড়িত হওয়ার ইচ্ছাও (masochism) কাম-চেষ্টা রূপে দেখা দিতে পারে। রতিকালে চুম্বন, আলিঙ্গন, দংশন ও প্রেমপাত্র বা পাত্রীর অন্যবিধ নির্যাতন স্বাভাবিক। বাৎসায়ন এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। এগুলি সমস্তই পীড়নেচ্ছা-প্রসূত। অপর পক্ষে প্রেমপাত্র বা পাত্রীর দ্বারা নিপীড়িত হওয়াও সময় সময় সুখকর বোধ হইতে পারে। এই সুখ—নিপীড়িত হইবার ইচ্ছা হইতে উদ্ভূত। আমাদের সকলের মধ্যেই এই সকল ইচ্ছা বর্ত্তমান আছে। কিন্তু এই পরস্পর-বিরোধী ভাবগুলি—যেমন, প্রেমাস্পদের রূপ দেখা বা তাহাকে নিজ রূপ দেখান, তাহাকে পীড়ন করা বা তাহার দ্বারা নিপীড়িত হওয়া,—চেতনায় যুগপৎ প্রকাশ পাইতে পারে না। এই দুইটি বিরুদ্ধ ভাবের কোন একটি রুদ্ধ ইচ্ছারূপে মনের মধ্যে থাকিয়া যায়। মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে, পুরুষের নিপীড়িত হইবার ইচ্ছা, স্ত্রীলোকের পীড়নের ইচ্ছা, পুরুষের রূপ দেখাইবার ইচ্ছা ও স্ত্রীলোকের রূপ দেখিবার ইচ্ছা—অজ্ঞাতভাবে মনের মধ্যে থাকে। এই দুই শ্রেণীর ইচ্ছার মধ্যে যেটি মনে রুদ্ধ থাকে, স্বপ্নে তাহা আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে। এই রুদ্ধ ইচ্ছাগুলি কেবল যে স্বপ্নেই প্রকাশলাভের চেষ্টা করে, তাহা নহে;—আমাদের অজ্ঞাতে অনেক কাজেই তাহা চরিতার্থতালাভ করে। পুরুষের পরের অধীনে চাকরী করিবার ইচ্ছা—নিপীড়িত হইবার ইচ্ছার রূপান্তর মাত্র। স্ত্রীলোকের আড়ি পাতিয়া দেখার ইচ্ছা—রূপ দেখিবার ইচ্ছার রূপান্তর। সেইরূপ স্বামীকে বশে রাখিবার ইচ্ছাও স্ত্রীলোকের পীড়নের ইচ্ছার ভিন্ন রূপমাত্র। অপর পক্ষে বলা যাইতে পারে, পুরুষের বাহুবল বা বীরত্ব দেখাইবার ইচ্ছা—নিজের রূপ দেখাইবার ইচ্ছার রূপান্তর।

শিশুর কাম-ইচ্ছা উন্মেষিত হইলে তাহা পাত্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়; তখন প্রথমেই তাহার সেই পাত্র—মাতা-পিতা,

ভাই-বোন ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মাতৃভক্তি পিতৃভক্তি ইত্যাদির মূলে কামজ-ইচ্ছা বিদ্যমান। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নানা কারণে শিশুর আত্মীয়-স্বজনের উপর কাম-ভাব ভক্তি, স্নেহ ইত্যাদিতে পরিণত হয়। অনেক মনোবিজ্ঞানবিদের মতে শিক্ষা, সামাজিকতা, শাসন ইত্যাদি প্রিয়-পরিজনের উপর শিশুর কাম-ভাব সঞ্চারের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। স্বভাবতঃ মানুষের মনে এমন কোনই বাধা নাই যাহাতে সে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কামভাবাপন্ন না হইতে পারে। কেবল শিক্ষা ইত্যাদির ফলেই তাহার নিকট এরূপ ইচ্ছা—অসদ্ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই ব্যাখ্যা যথেষ্ট নহে। আমার মতে, কামেচ্ছার এক বিরুদ্ধ ইচ্ছাই আমাদিগকে নিকট আত্মীয়ের প্রতি কামাসক্ত হইতে দেয় না। আগেই বলিয়াছি, বাধা যদি কেবল বাহিরের হইত, তবে ইচ্ছা আমাদের চেতনায় উঠিত; কেননা বাহিরের বাধা মনের কোন ইচ্ছাকে চেতনা হইতে নির্ব্বাসিত করিতে পারে না। নির্ব্বাসিত করিতে হইলে দরকার—অপর একটি ইচ্ছা। এখানেও সেইরূপ প্রিয়-পরিজনের প্রতি কামাসক্ত না হইবার মূল কারণ—একটি বিরুদ্ধ ইচ্ছা। এ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে বিস্তারিত আলোচনা করিব। যে প্রকারেই হউক, অধিকাংশ স্থলেই নিকট-আত্মীয়ের প্রতি কাম-ভাব আমাদের মনের মধ্যে উঠে না,—অজ্ঞাত রুদ্ধ ইচ্ছারূপেই মনে থাকিয়া যায়। অনেক স্বপ্নে এই প্রকার রুদ্ধ ইচ্ছা চরিতার্থতালাভের চেষ্টা করে। সময়ে সময়ে মনের প্রহরীর অসাবধানতার ফলে এইরূপ ইচ্ছা সোজাসুজিভাবেই স্বপ্নে দেখা দেয়; তাই নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই দারুণ ক্ষোভ, ঘৃণা বা আতঙ্কে মন ভরিয়া উঠে।

আরও এক প্রকারের অজ্ঞাত ইচ্ছা প্রায়ই স্বপ্নে প্রকাশিত হইবার চেষ্টা করে। জীবতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায়, অনেক প্রাণীর মধ্যে লিঙ্গ-ভেদ নাই। একই প্রাণীর শরীরে পুরুষ ও স্ত্রীর উভয়বিধ লক্ষণই আছে। ইংরাজীতে এই-সকল প্রাণীকে বলে Hermaphrodite বা উভলৈঙ্গিক। অনেকের মতেই ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে পুরুষ ও নারী-প্রকৃতি ক্রমশঃ পৃথক হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য প্রত্যেক নারী-দেহে কিছু কিছু পুরুষের লক্ষণ, এবং প্রত্যেক পুরুষের দেহে কিছু কিছু স্ত্রীলোকের লক্ষণ দেখা যায়। শারীরবিদ্‌গণের মতে, প্রত্যেক মানুষের শরীরেই স্ত্রীলোক ও পুরুষের উভয়বিধ লক্ষণই রহিয়াছে। অবশ্য পুরুষ-শরীরে স্ত্রীলোকের লক্ষণ, ও স্ত্রীলোকের শরীরে পুরুষ-লক্ষণ স্পষ্ট পরিস্ফুট নহে। মনোজগতের দিক্ দিয়া দেখিলে বলা যায়, প্রত্যেক পুরুষের মনে স্ত্রীলোকের ভাব, ও প্রত্যেক নারীর মধ্যে পুরুষ-ভাব বর্ত্তমান আছে। আমাদের ভাষায় বলিতে গেলে, পুরুষের স্ত্রীলোক হইবার ইচ্ছা ও নারীর নর হইবার ইচ্ছা আমাদের মনে অজ্ঞাত রহিয়াছে। স্বপ্নে এই শ্রেণীর ইচ্ছাও প্রকাশিত হইতে দেখা যায়।

মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে, নিম্নের এই অজ্ঞাত ইচ্ছাগুলি স্বপ্নে প্রকাশ পাইয়া থাকে :—

(১) অবিষয়ী-রতি-ইচ্ছা—Auto erotic wish
(২) স্বকায় রতি-ইচ্ছা—Narcistic wish
(৩) সমলৈঙ্গিক রতি-ইচ্ছা—Homo-sexual wish
(৪) কামার্থ পর-পীড়ন-মূলক ইচ্ছা—Sadistic wish.
(৫) কামার্থ আত্মপীড়নমূলক ইচ্ছা—Masochistic wish.
(৬) কামার্থ নিজরূপ-প্রদর্শনেচ্ছা—Exhibitionism
(৭) কামার্থ-পররূপ দর্শনেচ্ছা—Observationism
(৮) নিকট আত্মীয়ের প্রতি কামেচ্ছা—Incestual wish.
(৯) নরের নারী হইবার, ও নারীর নর হইবার ইচ্ছা—Opposite wish.
(১০) নানা প্রকারের কাম-বিকৃতিজনিত ইচ্ছা; যেমন বিযোনিজ মৈথুনেচ্ছা, অন্য প্রাণীর প্রতি কামেচ্ছা, কামার্থ বস্তুপ্রীতি (Fetichism) ইত্যাদি—Perverse wishes.

পূর্ব্বোক্ত ইচ্ছাগুলির কথা ছাড়িয়া দিলেও, আরও অনেক প্রকার ইচ্ছা স্বপ্নে প্রকাশ পাইতে পারে। এগুলি সাধারণতঃ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত না হইলেও মনে অপরিস্ফুট আকারে থাকে; যেমন,—

(১১) পর-স্ত্রী বা পর-পুরুষের প্রতি কামেচ্ছা—Hetro-sexual wish.
(১২) প্রিয়পাত্রের প্রতি শত্রুতার

(১৩) যে-সকল ইচ্ছা মনে পরিস্ফুট, অথচ সামাজিক বা নৈতিক-শাসনে চরিতার্থ হইতে পায় না।

(১৪) নিদ্রাকালে শারীরবৃত্তিমূলক—মলমূত্র ও রতিবেগ-জনিত ইচ্ছা, শীতগ্রীষ্মাদি নিবারণের ইচ্ছা, ইত্যাদি।

স্বপ্নের উৎপত্তি

প্রায়ই দেখা যায়, অজ্ঞাত রুদ্ধ ইচ্ছা কোন-না-কোন কিছুকে আশ্রয় করিয়া স্বপ্নে প্রকাশ পায়। রুদ্ধ ইচ্ছার এই অবলম্বন নানারূপ হইতে পারে। প্রাত্যহিক কার্য্যে আমাদের অনেক চিন্তা—অনেক ইচ্ছাই অপরিতৃপ্ত থাকিয়া যায়। নিদ্রাকালে এই সকল চিন্তা আমাদের মনে উঠিয়া থাকে, আর এই চিন্তাধারাকে আশ্রয় করিয়া মনের অনেক অজ্ঞাত রুদ্ধ ইচ্ছাও প্রকাশলাভের সুযোগ পায়। এই প্রবন্ধের প্রথম কিস্তিতে, ক-বাবুর স্বপ্নের উদাহরণে "ষ্টুডিও ভাঙ্গিয়া পড়িবার" কথা আছে। আমরা অনুমান করিতে পারি, ক-বাবু যে-রাত্রিতে এই স্বপ্ন দেখেন, সেদিন দিনের বেলা হয় ত ষ্টুডিও মেরামতের কথা তাঁহার মনে উঠিয়াছিল। অবশ্য এক্ষেত্রে এ কথার কোনই প্রমাণ নাই। কিন্তু বিশ্লেষণ করিলে প্রত্যেক স্বপ্নেই দৈনন্দিন কার্য্যের বা ঘটনার কোন-না-কোন ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে। দিনের বেলা আলিপুরের চিড়িয়াখানা দেখিয়া আসিয়া রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম, বাঘে তাড়া করিয়াছে। অনেকে মনে করিতে পারেন, আলিপুরে বাঘ-দেখাই এরূপ স্বপ্ন-দেখার কারণ হিসাবে যথেষ্ট। কিন্তু কেবল বাঘ-দেখাকেই স্বপ্নের কারণ বলিয়া মানিলে, বাঘে কেন তাড়া করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না। এস্থলে বুঝিতে হইবে, বাঘ দেখা-রূপ বাস্তব ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া মনের কোন রুদ্ধ ইচ্ছা আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করিয়াছে। দৈনন্দিন ঘটনার আভাস যেমন প্রত্যেক স্বপ্নে বিদ্যমান থাকে, নিদ্রাকালের অনুভূতিও সেইরূপ অল্পবিস্তর স্বপ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে। দৈনিক ঘটনা বা নিদ্রাবস্থার অনুভূতি মনের রুদ্ধ ইচ্ছার সহিত মিলিত হইয়া, স্বপ্নে বিকৃত হইতে পারে। রুদ্ধ ইচ্ছার আত্মপ্রকাশে সুবিধা হয় বলিয়াই দৈনন্দিন ঘটনার এইরূপ বিকৃতি ঘটে। মনের প্রহরী সজাগ থাকায় রুদ্ধ ইচ্ছাও সোজাসুজি-ভাবে স্বপ্নে প্রকাশিত হইতে পারে না। কেন পারে না, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যে যে প্রক্রিয়ার ফলে স্বপ্নের অব্যক্ত অংশগুলি (latent content) পরিবর্ত্তিত আকারে স্বপ্নে প্রকাশ পায়, ফ্রয়েড্ তাহাদের নামকরণ করিয়াছেন,—Dream work বা স্বপ্নের ক্রিয়াশক্তি। সময় সময় একই অজ্ঞাত ইচ্ছা ভিন্ন ভিন্ন আকারে বিভিন্ন স্বপ্নে প্রকাশ পাইয়া থাকে। মনোবিজ্ঞানবিদেরা বলেন, একই রাত্রে একাধিক স্বপ্ন দেখিলেও, সব স্বপ্নগুলিতেই একই রুদ্ধ ইচ্ছার পরিচয় পাওয়া যায়। রাত্রের প্রথম স্বপ্নটি বিশ্লেষণ করিলে হয় ত দেখা যাইবে, তাহাতে সেই রাত্রেরই পরবর্ত্তী স্বপ্নের কারণের ইঙ্গিত বর্ত্তমান রহিয়াছে; অথবা একই ভাব দুইটি স্বপ্নে দুই রকমে প্রকাশ পাইয়াছে। একই রাত্রের দুই বা ততোধিক স্বপ্নে বিভিন্ন প্রকারের দুইটি অজ্ঞাত ইচ্ছাকে স্বতন্ত্রভাবে পরিতৃপ্তিলাভের চেষ্টা করিতে আমি দেখি নাই। মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীর চিকিৎসাকালে, সময় সময় তাহার অধিকাংশ স্বপ্নই বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন হয়; এরূপ ক্ষেত্রে আমি প্রায়ই লক্ষ্য করিয়াছি, রোগী উপর্য্যুপরি কয়েকরাত্রে যে-সব স্বপ্ন দেখিয়াছে, তাহা দেখিতে প্রথমটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন রকমের ঠেকিলেও, সেগুলির মধ্যে কিন্তু একই অজ্ঞাত ইচ্ছার ইঙ্গিত রহিয়াছে। অতি অল্পক্ষণের মধ্যে সময়ে সময়ে আমরা অতি বৃহৎ স্বপ্ন দেখিতে পারি। পরলোকগত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'ভূত ও মানুষ' পুস্তকের 'বীরবালা' গল্পটির আখ্যানভাগও এই ধরণের একটি স্বপ্ন। কিরূপে এ প্রকার স্বপ্ন দেখা সম্ভব হয়, সে সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা হইয়াছে। অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানবিদের মতে, পূর্ব্ব হইতেই এরূপ স্বপ্নের সমস্তটাই আমাদের মনের অজ্ঞাত প্রদেশে থাকে; তারপর অকস্মাৎ প্রকাশের বাধা সরিয়া যায়, আর সেই সুযোগে সম্পূর্ণ স্বপ্নটাই একেবারেই মনে জাগিয়া উঠে।

স্বপ্নে বাল্যস্মৃতি

দৈনিক ঘটনা ও নিদ্রাকালের অনুভূতির মত, বাল্য-ঘটনার স্মৃতিও অজ্ঞাত রুদ্ধ ইচ্ছার আত্মপ্রকাশে সহায়তা করিতে পারে। বিশ্লেষণ করিলে বেশির ভাগ স্বপ্নেই শৈশবের কোন-না-কোন ঘটনার স্মৃতির সন্ধান পাওয়া যায়। বাল্যকালে অনেক রুদ্ধ ইচ্ছাই জ্ঞাতসারে আমাদের

মনে স্থান পাইয়া থাকে। পরবর্ত্তীকালে নিরোধের (repression) ফলে এই-সকল ইচ্ছার অস্তিত্বের কথা আমরা বিস্মৃত হই। শৈশব-জীবনের ঘটনা-সমূহের সহিত রুদ্ধ ইচ্ছা নানারূপে জড়িত। এইজন্যই পরবর্ত্তীকালের স্বপ্নে বাল্যকালের ঘটনার সমাবেশ অধিক। অনেকে লক্ষ্য করিবেন, শৈশবে তাঁহারা যে গৃহে বসবাস করিয়াছেন, স্বপ্নে তাহারই দৃশ্য অধিক দেখিতে পান। এই কারণে বাল্যকাল এক বাড়ীতে কাটাইয়া, পরবর্ত্তীকালে বাসা বদল করিলেও যে বাটীর সহিত শৈশব-স্মৃতি বিজড়িত, সেই বাটীর দৃশ্যাবলীই স্বপ্নে বেশি থাকে।

সার্ব্বজনীন স্বপ্ন

এমন কতকগুলি স্বপ্ন আছে, যাহা প্রায় সকলেই দেখিয়া থাকেন; যেমন উড়ার স্বপ্ন। এই ধরণের স্বপ্ন সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে, অথবা সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবে একই ব্যক্তি প্রায় কিছুদিন অন্তর দেখিতে পারে। এই-রূপ স্বপ্নকে ইংরেজীতে বলে Typical dreams বা সার্ব্বজনীন স্বপ্ন। আকাশে উড়ার মত আরও কতক-গুলি স্বপ্ন প্রায় সকলেই দেখিয়া থাকেন। যেমন, উচু হইতে পড়া, নগ্ন অবস্থায় বেড়ান, দাঁত তুলিয়া ফেলা; প্রস্তুত না হইয়া পরীক্ষা দেওয়া; চোর-ডাকাত দেখা; জন্তু-জানোয়ারে তাড়া করা; সাপ দেখা; জলে ডোবা, বা জল হইতে তোলা; প্রিয়পরিজনের মৃত্যু,—ইত্যাদি। এই ধরণের স্বপ্ন সকল দেশের লোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়, আর তাহাদের অর্থেরও বড় একটা ব্যতিক্রম দেখা যায় না। আমি এই-সকল স্বপ্ন বিশ্লেষণ না করিয়া, কেবল তাহাদের অর্থগুলি এখানে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। বহু মনোবিজ্ঞানবিদের সমবেত চেষ্টায় এই সকল অর্থ নির্ণীত হইয়াছে। তবে সকল ক্ষেত্রেই যে তাঁহারা যথার্থ অর্থ নির্দ্দেশ করিতে পারিয়াছেন,—এ কথা বলা চলে না।

শূন্যে উড়িবার স্বপ্ন

সকলের মধ্যে ঠিক একই আকারে দেখা যায় না। কেহ বা দেখেন, তিনি লাফাইয়া লাফাইয়া আকাশে উঠিতেছেন; আবার কেহ বা দেখেন, তাঁহার শরীর সোলার মত হাল্কা হইয়াছে—তিনি পাখীর মত হু হু করিয়া উড়িয়া চলিয়াছেন, ইত্যাদি। মনো-বিজ্ঞানবিদ্‌ পণ্ডিতেরা এই শ্রেণীর স্বপ্নের অর্থ সম্বন্ধে একমত নহেন। খুব সম্ভব, সকলের আকাশে উড়িবার স্বপ্নের অর্থ সকল ক্ষেত্রে সমান নহে। এরূপ স্বপ্নের সঙ্গে প্রায়ই একটা আনন্দের ভাব মিশ্রিত থাকে। আমরা অনেক সময় খেলার ছলে ছোট ছেলেকে শূন্যে ছুঁড়িয়া লুফিয়া থাকি। ছেলেরা ইহাতে বেশ আনন্দ পায়। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, শৈশবের এইরূপ খেলাধূলার আনন্দ-স্মৃতি, প্রায়ই আকাশে উড়ার স্বপ্নের সহিত জড়িত থাকে। এই কারণে কেহ কেহ মনে করেন, আমাদের বাল্যজীবন ফিরিয়া পাইবার আকাঙ্ক্ষা, আকাশে উড়ার স্বপ্নে কাল্পনিকভাবে চরিতার্থ হয়। উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিরা প্রায়ই এই ধরণের স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। স্বপ্নের ঘোরে জনসাধারণকে পশ্চাতে ফেলিয়া আকাশে উড়ায়, মনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা কাল্পনিকভাবে পরিতৃপ্ত হয়। আবার অনেকে বলেন, কামজ-ইচ্ছা হইতেই এরূপ স্বপ্নের উৎপত্তি। অনেক সময় দেখা যায়, দোলনায় দোল খাইবার সময় ছোটছেলে বা বয়স্ক ব্যক্তিদের মনে কামভাবের সঞ্চার হয়। পূর্ব্বকালে বসন্তোৎসবে দোলনায় দোল খাওয়ার খুব প্রচলন ছিল। এই বসন্তোৎসব মদনোৎসবেরই রূপান্তর মাত্র। দোল খাইবার আনন্দ, ছুঁড়িয়া লোফায় ছেলেদের আনন্দ ও স্বপ্নঘোরে শূন্যে উড়িবার আনন্দ,—সবগুলিই একই জাতীয়। আমি কতকগুলি আকাশে উড়ার স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিয়া, সবগুলির মূলেই গুরুজনের প্রতি কাম-ভাবের ইঙ্গিত পাইয়াছি। ভাষার দিক্‌ দিয়া দেখিলেও, এরূপ স্বপ্নের মূলে কাম-ভাবের আভাস আছে বুঝিতে পারা যায়। যেমন, কাহারও চরিত্র-দোষ ঘটিলে আমরা চল্‌তি কথায় বলি,—'অমুক আজকাল উড়তে শিখেছে।'

উঁচু হইতে পড়ার স্বপ্ন

উঁচু হইতে পড়িয়া যাইবার স্বপ্ন, আকাশে উড়িবার স্বপ্নের মত সকলেই অল্পবিস্তর দেখিয়া থাকেন। আকাশে উড়ার স্বপ্নে একটা আনন্দের ভাব থাকে, কিন্তু এই স্বপ্নে থাকে—ভয়ের ভাব। এরূপ স্বপ্নের অর্থ লইয়াও মতভেদ আছে। কাহারও কাহারও মতে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যখন বাঁদর ছিলেন, তখন গাছের উপরেই তাঁহারা বাস করিতেন। মাঝে মাঝে ঘুমন্ত অবস্থায় গাছ হইতে পড়িয়া তাঁহাদের কেহ কেহ পঞ্চত্ব পাইতেন; কেহ কেহ বা মাটিতে পড়িয়া যাইবার পূর্ব্বেই গাছের ডালপালা আঁকড়িয়া

মকরবাহিনী গঙ্গাদেবীর লীলামূর্ত্তি

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের "বঙ্গ ভাস্কর্য্য-নিদর্শন" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

আত্মরক্ষা করিতেন। আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে এরূপ অব্যাহতি পাওয়া বড় যা-তা ব্যাপার নহে। তাই এই ঘটনা তাঁহাদের মনে দৃঢ় রেখাপাত করিত। এই বাঁদরের বংশধরদের, অর্থাৎ আমাদের, মনে বংশ-পরম্পরা হইতে সেই পতনের ধারণাই চলিয়া আসিয়াছে। এই কারণে আমরা ঘুমের ঘোরে উঁচু হইতে নীচে পড়িয়া যাইতেছি—এইরূপ স্বপ্ন দেখি; কিন্তু কখনই মৃত্তিকা স্পর্শ করি না। স্বপ্নের এরূপ ব্যাখ্যা জীবতত্ত্বমূলক (biological);—মনোবিজ্ঞানের হিসাবে ইহার বিশেষ কোন মূল্য নাই। কেহ কেহ বলেন, নিদ্রাকালে পা দুইটি একটু সরিয়া গেলেই না কি আমরা উঁচু হইতে পড়িয়া যাওয়ার স্বপ্ন দেখি। এ ব্যাখ্যাও মনোবিজ্ঞান-সম্মত নহে। অনেক মনোবিজ্ঞানবিদের মতে, স্বপ্নে উঁচু হইতে পড়া—নৈতিক-পতনেরই প্রাতীক-রূপ। আমাদের প্রত্যেকের মনেই নানা গর্হিত কাজের ইচ্ছা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। উঁচু হইতে পড়িয়া যাওয়ার স্বপ্নে এই অধঃপতনের ইচ্ছাই কাল্পনিক-ভাবে পরিতৃপ্ত হয়।

নগ্ন অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়ান

এই স্বপ্নের নানা প্রকার-ভেদ আছে। অবিকৃত অবস্থায় স্বপ্নটি এইরূপ:—'স্বপ্নদ্রষ্টা উলঙ্গ রহিয়াছেন;—ইহাতে তিনি বিশেষ লজ্জিত। কিন্তু নগ্নতা ঢাকিবার কোনই উপায় নাই। লোকজনের মধ্যে তিনি ঘুরিতেছেন, অথবা তাঁহার চারিপাশে লোকজন রহিয়াছে।' এরূপ স্বপ্নের বিশেষত্ব এই, স্বপ্নদ্রষ্টা নগ্নতার জন্য নিজে লজ্জিত বটে, কিন্তু অন্যান্য লোকজন তাঁহার উলঙ্গ অবস্থা গ্রাহ্যই করিতেছে না। কেহ বা এই স্বপ্ন একটু অন্য রকম ভাবে দেখেন। স্বপ্নদৃষ্টার বস্ত্রাদি অসম্বৃত; এই অবস্থায় তাঁহাকে অপরের সাম্নে বাহির হইতে হইয়াছে। অথবা, যে-পোষাকে যেখানে যাওয়া উচিত নয়, সেই পোষাকেই তিনি যেন সেখানে গিয়াছেন। ফ্রয়েড্ বলেন, এই শ্রেণীর স্বপ্ন দেখেন না, এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু আমার ত মনে হয় বিলাতের তুলনায় এদেশের বড় বেশি লোক এরূপ স্বপ্ন দেখেন না। এই শ্রেণীর স্বপ্নের উৎপত্তি—নিজ রূপ দেখাইবার ইচ্ছা হইতে। শিশুরা স্বভাবতঃ উলঙ্গ থাকিতে ভালবাসে। সমাজ ও শিক্ষার গুণে ক্রমে এই নগ্নতা তাহাদের মনে একটা লজ্জার ভাব আনিয়া দেয়। স্বপ্নে উলঙ্গ হওয়ার অর্থ এই, আমরা যেন বাল্যকালের সেই অসঙ্কোচ নগ্নতাকেই ফিরিয়া পাইতে চাই। এই কারণে, স্বপ্ন-দ্রষ্ট অন্যান্য লোকজন—অর্থাৎ গুরুজনেরা—স্বপ্নদ্রষ্টার উলঙ্গ অবস্থা গ্রাহ্যই করিতেছেন না। বিলাতের তুলনায় আমাদের দেশে নিজ রূপ দেখাইবার সুযোগ রেশি বলিয়াই, এই ইচ্ছার রুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা কম। পাঠক এখন বুঝিবেন, কেন বিলাতের মত অধিকসংখ্যক লোক আমাদের দেশে এরূপ স্বপ্ন দেখেন না।

দাঁত তোলার স্বপ্ন

এই স্বপ্নও বিলাতের তুলনায় আমাদের দেশে কম লোকই দেখেন বলিয়া মনে হয়। স্বপ্নদ্রষ্টা নিজের দাঁত তুলিয়া ফেলিতেছেন, বা অপর কেহ তাঁহার দাঁত তুলিয়া দিতেছে, অথবা আপনা হইতেই দাঁত পড়িয়া গেল। ফ্রয়েড্ বলেন, এই শ্রেণীর স্বপ্নের উৎপত্তি—অযৌনিজ কাম-ইচ্ছা হইতে। স্ত্রীলোকের পক্ষে কিন্তু এই স্বপ্নে সন্তানলাভের ইচ্ছাই সূচিত হয়।

পড়া তৈয়ারী হয় নাই, অথচ পরীক্ষা দিতে হইবে

এরূপ স্বপ্নও অনেকেই দেখিয়া থাকেন। ফ্রয়েড্ বলেন, যাঁহারা পূর্ব্বে পরীক্ষায় ফেল হইয়াছেন, তাঁহারা কিন্তু এ স্বপ্ন দেখেন না। তাঁহার মতে, হাতে কোন কঠিন কাজ থাকিলেই আমরা এরূপ স্বপ্ন দেখিয়া থাকি। এই স্বপ্নের উদ্দেশ্য—স্বপ্নদ্রষ্টা নিজেই নিজেকে আশ্বাস দিতেছেন 'মন! আগে-আগেও পরীক্ষার সময় যেমন তুমি অনর্থক চিন্তিত হইয়াছিলে, এবারও সেরূপ তোমার চিন্তার কোন কারণ নাই।' স্বপ্নে করণীয় কার্য্যের সাফল্যের ইঙ্গিতই পাওয়া যায়। আমি কিন্তু এই প্রকার স্বপ্নের অর্থ সম্বন্ধে ফ্রয়েডের সহিত সম্পূর্ণ একমত নহি। এমন অনেককে আমি জানি, যাঁহারা পরীক্ষায় ফেল হওয়া সত্ত্বেও এরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছেন। সুতরাং করণীয় কার্য্যের সাফল্যের ইঙ্গিতই এই ধরণের সকল স্বপ্নেই থাকিবে, এমন কোন কথা নাই। আমি একজনকে জানি, যিনি এই স্বপ্ন প্রায়ই দেখিয়া থাকেন। শীতের রাত্রে নিদ্রাকালে মূত্রত্যাগের চেষ্টা হইলে, অনেক সময় বিছানা ছাড়িয়া উঠিব, না নিদ্রা যাইব, এই লইয়া মনে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। এই দ্বন্দ্ব মনে একটা অশান্তি আনয়ন

করে। মূত্রত্যাগ করা দরকার, অথচ করা যাইতেছে না—এই ভাবটাই স্বপ্নে প্রকাশ পায়। পরীক্ষা দিতে হইবে, অথচ পড়া তৈয়ারী নাই। শারীরিক বৃত্তিগত ইচ্ছাই এই স্বপ্নের মূল কারণ। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমি এরূপ ইচ্ছার সহিত কাম-ইচ্ছাও জড়িত থাকিতে দেখিয়াছি।

ট্রেন ফেল হওয়া

স্বপ্নের অর্থও পূর্ব্বানুরূপ।

চোর ডাকাত ও হিংস্র জন্তুর স্বপ্ন

বিশ্লেষণ করিলে চোরের স্বপ্নের মূলে পিতার প্রতি বৈরীভাবের সন্ধান পাওয়া যায়। ডাকাতের স্বপ্নের অর্থ অন্যরূপ। স্বপ্নে ডাকাতের আক্রমণের অর্থ—কামজ আক্রমণ। হিংস্র জন্তুতে তাড়া করার অর্থও তাই। পুরুষের পক্ষে কিন্তু সমলিঙ্গ-প্রীতিই এরূপ স্বপ্নের মূল কারণ।

জলে ডোবা, বা জল হইতে তোলার স্বপ্ন

এই স্বপ্নের অর্থ—সন্তানলাভের ইচ্ছা। পৌরাণিক উপকথায় দেখা যায়, অনেক নায়কেরই উৎপত্তি জল হইতে; যেমন, কর্ণ। রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারায়' রাজপুত্রকে জলের ধারেই পাওয়া গিয়াছিল।

প্রিয়পরিজনের মৃত্যু স্বপ্ন

আমরা প্রায় সকলেই সময়ে সময়ে নিকটাত্মীয়ের মৃত্যু-স্বপ্ন দেখি। ফ্রয়েড্ এরূপ স্বপ্নের বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। এই স্বপ্নগুলিকে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে :—(১) স্বপ্নে পিতামাতা বা অপর কোন আত্মীয়ের মৃত্যু ঘটিল, কিন্তু এই দুর্ঘটনায় স্বপ্নদ্রষ্টার মনে এতটুকু শোক-দুঃখের সঞ্চার হইল না। (২) আত্মীয়-বিয়োগের স্বপ্ন দেখিয়া মনে দারুণ শোক ও দুশ্চিন্তার উদ্রেক হইল; এমন কি ঘুম ভাঙ্গিবার পরও কিছুক্ষণ মনটা খারাপ হইয়া রহিল।

প্রথম শ্রেণীর স্বপ্নে বাস্তবিকপক্ষে কোন মৃত্যু-ইচ্ছা থাকে না। লোকবিশেষের পক্ষে এরূপ স্বপ্নের অর্থ নানারূপ হইতে পারে। ফ্রয়েড্ একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়াছেন।—'একটি স্ত্রীলোক স্বপ্ন দেখিলেন, তাঁহার ভগিনীর ছেলেটি মরিয়া রহিয়াছে,—তাহাকে শবাধারে শোয়ান হইয়াছে।' স্বপ্নটিতে কিন্তু কোনরূপ দুঃখের ভাব ছিল না। বিশ্লেষণে দেখা গেল, কিছুদিন পূর্ব্বে সে ভগিনীর আরও একটি সন্তান যখন মারা যায়, সেই সময় বাটীতে বহু আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবের সমাগম হয়। এই স লোকের মধ্যে উক্ত স্বপ্নদর্শনকারিণীর প্রণয়ীও উপস্থিত ছিল। এই ঘটনার পর প্রণয়ীর সহিত অনেকদিন তাঁহার আর দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই। একবার যেমন বাড়ীতে মৃত্যু-উপলক্ষে প্রেমাস্পদকে দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল, পুনরায় তেমনি বাটীতে আর কাহারও মৃত্যু হইলে, তাঁহার সাক্ষাৎ মিলিবে,—এই ইচ্ছাই উক্ত স্বপ্নের আকারে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। স্বপ্নের উদ্দেশ্য বালকের মৃত্যু নয়,—প্রণয়ীর সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা। যে সকল মৃত্যু-স্বপ্নে দুঃখের ভাব জড়িত, তাহার মূলেই মৃত্যু-ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকে। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, জ্ঞানতঃ যাহাকে ভালবাসিতেছি, ভিতরে কি করিয়া তাহার প্রতি বৈরীভাব থাকা সম্ভব? স্বপ্নে যে-সকল রুদ্ধ ইচ্ছা চরিতার্থতালাভের চেষ্টা করে, তাহাদের অনেকগুলিই যে শৈশবাবস্থার ইচ্ছা,—একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আত্মীয়স্বজনের প্রতি শত্রুভাবের উৎপত্তিও শৈশবে। বাল্যকালে ভাই-বোনের মধ্যে হিংসার ভাব স্বাভাবিক। যে-কেহ বিশেষভাবে বালক-বালিকাদিগকে লক্ষ্য করিবেন, তিনিই দেখিবেন একথা কতদূর সত্য। আমরা অনেকেই মনে করি, মানুষের জীবনে শৈশবকালই বুঝি সর্ব্বাপেক্ষা মধুর,—এহেন সোনার শৈশবে বুঝি হিংসাদ্বেষ ও স্বার্থের কলকোলাহল নাই। কিন্তু শিশুর মন যে কতটা কুটিল হইতে পারে, তাহা চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। অনেকে আবার এই কুটিলতা দেখিয়াও দেখেন না,—ছেলেখেলা বলিয়া উড়াইয়া দেন। শিশু নিজ সুখের সন্ধানেই ব্যস্ত। তাহার আদর-যত্ন বা খেলনা প্রভৃতির ভাগীদার জুটিলে সে ভারি বিরক্ত বোধ করে। এই কারণেই সে ভাই-বোনের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়। পিঠোপিঠি ভায়ে-ভায়ে, বা বোনে-বোনে ঝগড়ার কথা সকলেই জানেন। আমি আবার এমন শিশুও দেখিয়াছি, যে তাহার নবজাত ভাইটিকে গলা টিপিয়া মারিতে উদ্যত হইয়াছে। শিশুর পক্ষে মৃত্যু-সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা সম্ভব নহে। তাহার নিকট মৃত্যুর অর্থ—স্থানান্তরে যাওয়া মাত্র। বাড়ীতে কাহারও মৃত্যু হইলে শিশুকে বুঝান হয় যে, মৃতব্যক্তি

স্বর্গে গিয়াছে। শিশুর নিকট স্বর্গ একটি ভিন্ন দেশমাত্র। এইজন্য তাহার পক্ষে ভাই-বোনের মৃত্যু-কামনার উদ্দেশ্য—তাহাদিগকে অন্যত্র সরাইয়া দেওয়া হইতে পারে। অবশ্য শিশুর মনে কেবলই যে ক্রূরভাব থাকে, একথা বলিতেছি না। শিক্ষা, শাসন ও স্বভাবের ফলে তাহার মনে ভালবাসা ইত্যাদি সদ্‌গুণসমূহেরও উন্মেষ হয়। কিন্তু একই সময়ে কাহারও প্রতি বৈরীভাব এবং ভালবাসা থাকা অসম্ভব। এইজন্য শৈশবে ভাই-বোনে যে বিরোধের ভাব থাকে, তাহা ভালবাসার পরিপন্থী বলিয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদের মনের অজ্ঞাত প্রদেশে চলিয়া যায়। কিন্তু এই বৈরীভাব চেতনার অগোচর হয় বলিয়াই যে নষ্ট হইয়া যায়, তাহা নহে;—অনুকূল ঘটনার মধ্যে পড়িলে বয়স্ক অবস্থাতেও তাহা পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। ভায়ে-ভায়ে বিরোধ যে কতটা উৎকট হইতে পারে, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং বাহিরের মনে ভালবাসা, অথচ ভিতরের মনে আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে বৈরী-ভাব থাকা অসম্ভব নহে। এই বৈরীভাবই প্রহরীর চোখে ধূলি দিয়া, স্বপ্নে আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু-ইচ্ছারূপে প্রকাশ পায়। চেতনায় কিন্তু আমরা দেখি, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি ভালবাসার ইচ্ছাই রহিয়াছে। স্বপ্নের মৃত্যু-ইচ্ছা এই ভালবাসার বিরোধী বলিয়া, মনে এত কষ্টের উদ্রেক হয়।

বাপ-মার প্রতি ছেলেমেয়ের কিরূপ ভাব থাকিতে পারে, সে সম্বন্ধেও আলোচনা আবশ্যক। অনেকেই হয় ত লক্ষ্য করিয়াছেন, ছেলে মাকে, এবং মেয়ে বাপকে বেশি ভালবাসে। অতি অল্প বয়সেই এই ইতরলিঙ্গ-প্রীতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বাপ, মায়ের ভালবাসার অংশীদার বলিয়া ছেলে বাপের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়। সেইরূপ মা, বাপের ভালবাসার ভাগীদার বলিয়া মেয়ে মাকে ঈর্ষার চক্ষে দেখে। পিতামাতার মৃত্যু-স্বপ্ন আলোচনা করিলে তাহার একটি বিশেষত্ব সহজেই আমাদের নজরে পড়ে। ছেলেরাই বাপের, আর মেয়েরাই মায়ের মৃত্যু-স্বপ্ন বেশি দেখে। ছেলের পক্ষে মায়ের, অথবা মেয়ের পক্ষে বাপের, মৃত্যু-স্বপ্ন অতি বিরল। পাঠক বোধ হয় ইহার কারণ এখন বুঝিতে পারিলেন। অনেক সময় মনের প্রহরী সজাগ থাকে বলিয়াই বাপ-মার মৃত্যু-স্বপ্ন সোজাসুজিভাবে দেখা দেয় না। যেমন, ক-বাবু তাঁহার বাপের মৃত্যু-স্বপ্ন অবিকৃত অবস্থায় দেখেন নাই। আমার এক রোগী একবার স্বপ্ন দেখেন, তিনি যেন খালি পায়ে গায়ে চাদর দিয়া বেড়াইতেছেন। অবাধ-অনুবন্ধ-প্রণালীর সাহায্যে স্বপ্নটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গেল—ইহা অশৌচের চিহ্ন। তিনিও পিতার মৃত্যু-কামনা করিয়াছেন। অনেক সময় পিতা-মাতার পরিবর্ত্তে আমরা অন্যান্য গুরু-জনেরও মৃত্যু-স্বপ্ন দেখি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই মৃত্যু-দর্শন যে মূলতঃ পিতা মাতার মৃত্যু-কামনারই ফল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

স্বপ্ন-প্রতীক

স্বপ্নে অনেক জিনিষই সোজাসুজিভাবে দেখা না দিয়া প্রতীক (symbol) রূপে দেখা দেয়,—একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই প্রতীকের অর্থ সহজে ধরিবার যো নাই বলিয়াই প্রতীক সহজেই মনের প্রহরীকে এড়াইতে পারে। প্রতীকের অর্থ নির্দ্ধারণ করা সোজা কাজ নহে। কোন একটি স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিয়া এই অর্থ নির্ণয় করা অসম্ভব। বহু স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিলেও অনেক সময় প্রতীকের যথার্থ অর্থ বাহির করা দুরূহ হইয়া পড়ে। ভাষাতত্ত্ব, পুরাণ, প্রবাদ-বাক্য ইত্যাদির আলোচনা দ্বারা প্রতীকের অর্থ নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়। প্রতীক সার্ব্বজনীন; তাহার অর্থের বড়-একটা তারতম্য হয় না; সকলের স্বপ্নেই একই প্রতীক একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য এই নিয়মের যে একেবারেই ব্যতিক্রম হয় না, একথা জোরের সহিত বলা চলে না। সেইজন্য কেবলমাত্র প্রতীকের অর্থ-সাহায্যে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া নিরাপদ নহে। ফ্রয়েড্ বলেন, প্রতীকের ধারণা কোন ব্যক্তিবিশেষের অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ নহে। মনে করুন, আমি কখন দেহতত্ত্বের গান শুনি নাই, অথবা দেহের সহিত ঘরের যে কোন সাদৃশ্য থাকিতে পারে, তাহাও কোনদিন আমার মনে উঠে নাই। এরূপ অবস্থায় স্বপ্নে আমি গৃহ দেখি-লাম। এখানেও গৃহের অর্থ—দেহ। এই দেহ ও গৃহের সাদৃশ্য আমার মনে কোনদিন উদিত না হইলেও কি করিয়া যে গৃহ দেহের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হইল, তাহা বুঝা দুষ্কর। ফ্রয়েড বলেন, প্রতীক সহজাত সংস্কারের ন্যায় মানুষের মনে স্বতঃই স্ফূর্ত্ত হইয়া থাকে। আমি এই ব্যাখ্যায় সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে পারি না। কারণ মনোজগতে

জীবতত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা সমীচীন নহে। কি করিয়া যে সকলেই একই প্রতীক কোন একটা বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেন, তাহা একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার,—এখনও ইহার সদুত্তর পাওয়া যায় নাই। বর্ব্বর ও আদিম অধিবাসীদের ভাষাতত্ব অলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহাদের চিন্তা-ধারার সহিত সভ্যজাতির চিন্তাধারার একটু তফাৎ আছে। আদিম জাতি রূপক বা প্রতীকের সাহায্যেই অনেক বিষয়ের চিন্তা করিয়া থাকে। শিশুদের চিন্তাতেও রূপকের প্রভাব বেশি। স্বপ্ন-দেখার সময় আমাদের মনের অবস্থা অনেক বিষয়েই শিশুদের মত হইয়া পড়ে। এইজন্য শিশুর চিন্তাধারার বিশেষত্বগুলি আমাদের স্বপ্নের মধ্যে প্রকাশ পায়। স্বপ্নে প্রতীকের প্রাদুর্ভাবের ইহাও একটি কারণ।

রূপক ও প্রতীকে কিছু প্রভেদ আছে। দেহতত্ত্বের গানে যখন আত্মাকে পাখী, বা দেহকে পিঞ্জর বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তখন তাহা রূপক মাত্র। এই রূপকের অর্থ আমাদের নিকট অজ্ঞাত নহে। কিন্তু যদি কেহ সাপের উপাসনা করেন, অথচ কেন যে সাপকে দেবতা ভাবিতেছেন তাহা যদি তাঁহার জানা না থাকে, তবেই সাপকে প্রতীক বলা চলে। অবশ্য সকল প্রতীকেরই আমরা একটা মন-গড়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। প্রতীকের বিশেষত্বই এই, তাহার প্রকৃত অর্থ বলিয়া দিলেও মন তাহা মানিতে চায় না। মনোবিজ্ঞানবিদেরা স্থির করিয়াছেন, সাপ পুং-লিঙ্গের প্রতীক। স্বপ্নে সাপ এই অর্থেই প্রকাশ পায়। প্রতীকের অর্থ ধরা পড়িলে দেখা যাইবে, প্রকৃতপক্ষে প্রতীক যে বস্তু নির্দ্দেশ করিতেছে, সেই বস্তুর সহিত তাহার অনেক বিষয়েরই মিল আছে। রাজা—পিতার প্রতীক। রাজার কাজ—শাসন ও পালন; পিতাও শাসন ও পালন করেন। রাজা ও পিতা উভয়েই অপরাধের দণ্ড দেন; উভয়েই শ্রদ্ধা ভক্তির পাত্র। সাধারণের পক্ষে রাজার রাজৈশ্বর্য্য যেমন কাম্য, বালকের পক্ষেও তাহার পিতার গুণাবলীও সেইরূপ আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী, ইত্যাদি। অনেক ক্ষেত্রে রূপক ও প্রতীকের তারতম্য ধরা কঠিন। স্বপ্নে রূপক ও প্রতীক দুই-ই দেখা যায়। প্রতীকের অর্থ জানা থাকিলে স্বপ্ন-বিশ্লেষণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া পড়ে। স্বপ্নে যে-সকল প্রতীক সচরাচর প্রকাশ পায়, আমি তাহাদের অর্থ নির্দ্দেশ করিতেছি;—

স্বপ্নে রাজা, শাসনকর্ত্তা, পুলিস ইত্যাদি পিতার প্রতীক। সেইরূপ রাণী—মাতার প্রতীক। রাজপুত্র—স্বপ্নদ্রষ্টা স্বয়ং। ছড়ি, লাঠি, ছাতা, সাপ ইত্যাদি দীর্ঘবস্তু—পুং-জনন-ইন্দ্রিয় নির্দ্দেশ করে। বাক্স, পেটিকা প্রভৃতি—স্ত্রী-জনন-ইন্দ্রিয়জ্ঞাপক। গৃহ শরীরের প্রতীক। মসৃণ প্রাচীর-বিশিষ্ট গৃহ—পুরুষ-দেহবাচক। আলিসা-সংযুক্ত বা বন্ধুর প্রাচীর-বিশিষ্ট গৃহ—স্ত্রী-শরীরকে বুঝায়। পক্ষী, মৎস্য ইত্যাদি পুং-জনন-ইন্দ্রিয়জ্ঞাপক। জটিল যন্ত্রাদি স্ত্রী চিহ্নের প্রতীক। প্রাকৃতিক দৃশ্য—কখন বা পুং-চিহ্ন, কখন বা স্ত্রী-চিহ্ন জ্ঞাপন করে। শ্রেণীবদ্ধ পরস্পর দ্বার সংযুক্ত গৃহ, অর্থাৎ যাহার একটির ভিতর দিয়া অপরটিতে যাওয়া যায়,—চরিত্র-হীনতার ইঙ্গিত করে। সিঁড়িতে উঠা বা নামা—রতি-ক্রিয়ার প্রতীক। জল—সন্তান জন্মের সূচনা করে। অগ্নিও খুব সম্ভব তাই। চরকা, মাকড়সা, ইত্যাদি—মাতার প্রতীক। নুন, বিষ, ঔষধ ইত্যাদি অনেক সময়েই শুক্রের প্রতীক। ক্ষত—স্ত্রী-চিহ্ন জ্ঞাপক। অঙ্গুরীও তাহাই। স্বপ্নে জনতা—স্বপ্ন-দ্রষ্টার গুহ্যভাব বা গুহ্যকথার নির্দ্দেশ করে।

স্বপ্নে একাধিক ব্যক্তির সমাবেশ থাকিলে, তাহার মধ্যে কোন্‌টি স্বপ্নদ্রষ্টা, তাহা অনেক সময় নির্ণয় করা কঠিন। এরূপ স্থলে যিনি নায়ক, বা যাঁহার মনে শোক দুঃখ হর্ষ ইত্যাদির তরঙ্গ উঠিতেছে, তিনিই স্বপ্নদ্রষ্টা। এক্ষেত্রে বলা আবশ্যক, স্বপ্ন Ego-centric অর্থাৎ আত্মকেন্দ্রিক।

স্বপ্নে দ্রষ্টা স্বয়ং কোন-না-কোন মূর্ত্তিতে নিশ্চয়ই আছেন। আমরা কেবলমাত্র অপরের ব্যাপার সংক্রান্ত স্বপ্ন কখনও দেখি না। অনেক সময় যে ভাব বা যে বস্তু স্বপ্নের মূলে নিহিত, তাহা একেবারেই স্বপ্নে প্রকাশ না পাইয়া তৎসংক্রান্ত কোন একটি ভাবের অংশ বিশেষের আভাস থাকে মাত্র। এগুলি ঠিক প্রতীক না হইলেও, অনেকটা প্রতীকের মতই কাজ করে। ক-বাবুর স্বপ্নে ভাঙ্গা দেওয়ালের সহিত কবরের ধারণা বা চিন্তার সংযোগ ছিল। সুতরাং স্বপ্নটিতে ভাঙ্গা দেওয়াল যে কবরের প্রতীকের অনুরূপ কাজই করিয়াছে, একথা বলা যাইতে পারে।

অমূল তরু

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(১০)

তাহার পর মাসখানেকের মধ্যে সুবোধ আরও দুই-তিনবার সুনীতিদের বাড়ী আসিয়াছে ; এবং আরও পাঁচ-ছয়বার সুনীতির সহিত তাহার পত্র-ব্যবহার চলিয়াছে। সুবোধের পত্র পাইলে এখন আর সুনীতি তাহা লইয়া বিচার-বিশ্লেষণ করিতে বসে না ; তাহার যথোপযুক্ত উত্তর লিখিয়া পাঠায় ; এবং যথাসময়ে সুবোধের নিকট হইতে প্রত্যুত্তর না আসিলে, মনে-মনে একটু ব্যস্ত হইয়া উঠে।

রাত্রে আহারের পর যোগেশ তাহার শয্যায় শয়ন করিয়া ছিল। সুনীতি আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া ডাকিল, "যোগেশ !"

"কি সেজদিদি ?"

"জেগে আছিস্ ?" সুনীতি যোগেশের খাটের এক-পার্শ্বে গিয়া বসিল।

যোগেশ একটু সরিয়া শুইয়া, সুনীতির বসিবার স্থান করিয়া দিল। প্রসঙ্গ কি হইবে, তাহা যোগেশ অনুমানেই বুঝিয়াছিল ; কারণ, আজ এই প্রথম নয়—রাত্রে ঘরে-ঘরে দ্বার বন্ধ হইয়া গেলে, নির্ব্বিঘ্নে ভাই-ভগিনী দুজনের মধ্যে এ প্রসঙ্গ প্রায়ই হইয়া থাকে। তাই যোগেশ বলিল, "সেজদি, কাল সুবোধবাবু আসবেন, না ?"

সুনীতি বলিল, "হ্যাঁ, তাই ত লিখেছেন।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "কাল তোকে সুবোধবাবু আর মেজজামাইবাবু এক জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাবেন লিখেছেন। কাল বোধ হয় মেজ জামাইবাবুরা সুবোধ-বাবুকে একটা কোন নতুন রকমে ঠকাবার ফন্দী করেছেন।"

একটু ভাবিয়া যোগেশ বলিল, "বোধ হয়।" তাহার পর সোৎসাহে খানিকটা মাথা তুলিয়া বলিল, "কি লিখে-ছেন, সেখানটা পড়ে শোনাও না সেজদি।"

ঘরের স্তিমিত আলোকেও সুনীতির মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল ; বলিল, "কি আর শুনবি ভাই, শুধু ঐ কথাই লিখেছেন, খুলে কিছু লেখেন নি।" একটু নীরব থাকিয়া বলিল, "যে ফন্দীই থাকুক না কেন যোগেশ, তুই কিন্তু তাঁকে বেশী রকম কিছু অপ্রস্তুত করিস নে।"

যোগেশ ব্যস্ত হইয়া কহিল, "তা ত আমি করি নে সেজদি, আমি নিজের ইচ্ছেয় কিছু ত করি নে।"

সুনীতি বলিল, "সুবোধবাবু তোকে অত ভালবাসেন যোগেশ, অত আদর-যত্ন করেন ; তাঁকে ঠকাতে তোর মনে কষ্ট হয় না ?"

"আজ কাল হয় সেজদি।"

"তবে ঠকাস্ কেন ?"

যোগেশ অর্দ্ধোত্থিত হইয়া, বাহুর ভরে ঠেস দিয়া বসিয়া কহিল, "আমি কি আজকাল ইচ্ছে করে করি—আমাকে যেমন করতে বলেন, আমি তাই করি। তুমি কেন চিঠি লেখ ? বল ?—"

সুনীতি একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সত্যি !"

যোগেশ হৃদয়ের মধ্যে একটা অব্যক্ত বেদনা বোধ করিল ; স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, "তুমি যদি বল সেজদি, আমি একেবারে এ সব বন্ধ করে দিই। তুমি যদি বল, তা'হলে কালকে থেকে আমি আর এক দিনও মেয়ে সেজে সুবোধ-বাবুকে ঠকাই নে।"

সুনীতি হাসিয়া কহিল, "সে কি রে—মাঘ মাসের দোশরা সুবোধবাবুর সঙ্গে তোর বিয়ে হবে ঠিক হয়েছে। তখন তুই কত জিনিস পাবি, মেজজামাইবাবুর বন্ধুরা তোকে সোণার মেডেল দেবে স্থির করেছে—"

যোগেশ প্রবল ভাবে কহিল, "আমি সে সব কিছু চাইনে সেজদি, আমার আর এ ভাল লাগে না। তা'ছাড়া বিয়ের পর সুবোধবাবু যখন জান্‌তে পারবেন যে তাঁকে ঠকান হয়েছে, সব মিথ্যা, তখন তিনি এত রেগে যাবেন যে, জীবনে আর এ বাড়ীতে পা দেবেন না। সুবোধবাবুর

সঙ্গে আমাদের আলাপ থাক্‌বে না, এ কথা ভাবলেও আমার কষ্ট হয়।”

সুনীতি হাসিয়া উঠিয়া কহিল, “কেন্ রে?—সুবোধবাবুকে তুই ভালবেসেছিস না কি?—”

যোগেশ একটু ইতস্ততঃ করিয়া ঢোঁক গিলিয়া কহিল, “তা বেসেছি।”

সুনীতি তেমনি হাসিয়া কহিল, “তা বেসেছিস ত তুই মনে করিস কি?—বরাবর সুবোধবাবুকে এই রকম করে ভুলিয়ে আট্‌কে রাখবি? আর ছমাস পরে ত তোর গোঁফের রেখা দেবে—তখন কি করবি?”

সুনীতির হৃদয়ের সন্ধান, এবং সেখানে কোন্ কাঁটা কতখানি ফুটিয়া ব্যথা দিতেছিল, এই চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালকটি যেমন করিয়াই হউক না কেন, যতটুকু বুঝিয়াছিল, তেমন এ বাড়ীর আর কেহই বুঝে নাই। তাই ভয়ে-ভয়ে সাহস করিয়া সে কহিল, “একটা উপায় ত' হতে পারে সেজদি? তোমার ত গোঁফের রেখা দেবে না—তুমি যদি আমার বদলে—” তাহার পর কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া, যোগেশ নীরব হইয়া গেল।

সুনীতি হাসিয়া উঠিয়া কহিল, “কি বোকা তুই! আমি যদি তোর বদলে গিয়ে দাঁড়াই, তাহলে ত' সুবোধবাবু সব কথা বুঝতেই পারবেন!”

সাহস পাইয়া যোগেশ সবেগে কহিল, “কিন্তু রাগ করবেন না,— এ আমি জোর করে বলতে পারি। তুমি যদি বল সেজদি, আমি একদিন লুকিয়ে সব কথা সুবোধবাবুকে জানিয়ে দিতে পারি। তখন ঠকাতে গিয়ে মেজজামাইবাবুরাই উল্টে ঠকে যাবেন, আর সুবোধবাবুই জিতে যাবেন।”

নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে সুনীতি জিজ্ঞাসা করিল, “জিতে যাবেন কেন?”

“তোমার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবে। বলব সেজদি? সত্যি বলছি তোমাকে, এক-এক সময়ে আমার মনে হয়, সব কথা সুবোধবাবুকে বলে দিই!”

আরক্ত মুখে শশব্যস্ত হইয়া সুনীতি কহিল, “খবরদার, যোগেশ, খবরদার, এ সব যা-তা কথা কখ্‌খন তুই সুবোধবাবুকে বলিস নে! লক্ষ্মী ভাই আমার, বিনা অনুমতিতে কোন কথা তুই তাঁকে বলিস নে। তাতে আমারও খারাপ হবে, তোরও খারাপ হবে।”

যোগেশ বলিল, “তোমার কি খারাপ হবে?”

একটু ভাবিয়া সুনীতি কহিল, “মেজজামাইবাবুরা আমাকে ভারি ঠাট্টা করবে, বলবে যোগেশকে দিয়ে লুকিয়ে নিজের বিয়ে ঠিক করে নিলে।”

“আর আমার খারাপ কি হবে?”

“তোর সোণার [illegible]টা ফস্কে যাবে।”

যোগেশ হাসিয়া কহিল, “তাতে কিছু ক্ষেতি হবে না, —সুবোধবাবু আমাকে আরও বড় মেডেল গড়িয়ে দেবেন।”

সুনীতি যোগেশের দুই হাত চাপিয়া ধরিল; “তুই আমার হাত ছুঁয়ে বল যোগেশ, আমাকে না জানিয়ে কোন কথা বল্‌বি নে। তা নইলে আমি ভারি রাগ করব!”

যোগেশ প্রতিশ্রুত হইল সুনীতিকে না জানাইয়া কোন কথা বলিবে না।

“আচ্ছা সেজদি, সুবোধবাবুকে তোমার ভাল লাগে না?”

সুনীতি বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িয়া কহিল, “ঘুমো যোগেশ, ঘুমো! অনেক রাত হয়েছে—ঘুমিয়ে পড়।” বলিয়া অকারণে তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া অজস্র অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে যোগেশকে সাজাইয়া দিতে-দিতে সুনীতি বলিল, “এমন কিছুই করিস নে যোগেশ, যাতে তোর নিন্দে হয়। যদি কিছু ভাল জিনিস কিনে দিতে যান, কখ্‌খন কিন্‌তে দিসনে; যদি বায়োস্কোপ কিম্বা সার্কাস-টার্কাসে নিয়ে যেতে চান, তাও সহজে যাস্ নে। আর একটা কথা বিশেষ করে বলে দিচ্ছি। যদি তাঁদের মেসে তোকে নিয়ে যেতে চান, কিছুতেই যাবি নে। কখনও না, বুঝিছিস যোগেশ, মেসে কিছুতেই যাবিনে।”

মেসে যাইতে সুনীতি এত বেশী করিয়া কেন নিষেধ করিতেছে, তাহা জানিবার জন্য যোগেশের অতিশয় আগ্রহ হইল। সে বলিল, “মেসে ত' কখনই যাব না। কিন্তু তুমি এত করে মানা কেন করছ সেজদি? কি ক্ষতি হবে মেসে গেলে?”

সুনীতি কহিল, “তোর সঙ্গে সুবোধবাবুর মালা বদল করার মধ্যে অনেক হাঙ্গামা আছে। তাই সে ফন্দী ছেড়ে দিয়ে, আজ তোকে মেসে নিয়ে গিয়ে, তুই মেয়ে নয় ছেলে,

সকলের সামনে প্রকাশ করে দিয়ে, সুবোধবাবুকে ঠকান,—তাও ত' হতে পারে? তা হলে ত' আজ থেকেই তোর সঙ্গে সুবোধবাবুর মনান্তর হয়ে যাবে।"

যোগেশ ব্যগ্র হইয়া বলিল, "তা'হলে বেড়াতে গিয়েই কাজ নেই সেজদি—আমি বাড়ীর বার হব না।"

একটু ভাবিয়া সুনীতি বলিল, "তিনি যখন অত বেশী অনুরোধ করে লিখেছেন, তখন না যাওয়াটা ভাল হবে না। তোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ সুবোধবাবু করবেন না। তুই একটু শক্ত হয়ে চলিস, তা'হলেই হবে।"

আজ রতনমণির বাত বাড়িয়াছিল বলিয়া, সুমতি তাঁহার পায়ে ঔষধ মালিস করিয়া দিতেছিল। তাই যোগেশকে সাজাইবার ভার সুনীতির উপর পড়িয়াছিল। গৃহদ্বারে একটা গাড়ী দাঁড়াইবার শব্দ শুনা গেল।

যোগেশ বলিল, "সুবোধবাবুরা বোধ হয় এলেন সেজদি।"

সুনীতি বলিল, "বোধ হয়।"

কিছু পরেই বিনোদ আসিয়া কহিল, "কত দেরী সুনীতি? তয়ের ত?"

সুনীতি যোগেশের কপালে টিপ পরাইয়া দিতে দিতে বলিল, "হাঁ, তয়ের। আজ আপনাদের প্ল্যান কি মেজ জামাইবাবু? আজই যবনিকা পতন না কি?"

বিনোদ হাসিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই নয়—যবনিকা পতন দোশরা মাঘ সন্ধ্যাবেলায়। মালা বদলের সমস্ত মতলব আমাদের পাশ হয়ে গিয়েছে সুনীতি, তার মধ্যে আর কোন গোলযোগ নেই।"

সে বিষয়ে কোনপ্রকার ঔৎসুক্য না দেখাইয়া সুনীতি বলিল, "আজ আপনাদের মতলব কি?"

"সে এখন বলব না; যোগেশ ফিরে এলেই জানতে পারবে। চল যোগেশ, দেরী করে কাজ নেই—সুবোধকে গাড়ীতে বসিয়ে এসেছি।" বলিয়া বিনোদ যোগেশকে লইয়া প্রস্থান করিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে বিনোদ যোগেশকে লইয়া ফিরিয়া আসিল,—সুবোধ বরাবর মেসে চলিয়া গিয়াছিল।

সুমতি ও সুনীতি উভয়েই ঔৎসুক্যের সহিত অপেক্ষা করিতেছিল; কারণ, যোগেশকে লইয়া বাটীর বাহিরে যাওয়া আজ এই প্রথম। সুতরাং আজ যে একটা নূতন রকমের ফন্দী, ছিল তদ্বিষয়ে উভয়েরই কোন সন্দেহ ছিল না।

বিনোদ সহাস্যে কহিল, "আজ খুব মজা হয়েছে দিদি, বর-কনের ফটো তোলা হয়ে গিয়েছে। মালা বদলের পালাটা যদি একান্ত না পেরে ওঠা যায়, ত' সুবোধকে ক্ষেপাবার জন্যে এটাও বেশ চলবে। মেসের প্রত্যেক মেম্বররা একএকখানা করে কপি নেবে ঠিক করেছে।" বলিয়া কি প্রকারে তাহাদের এক বন্ধু ফটোগ্রাফারের বাটী গিয়া সুবোধ ও যোগেশের একসঙ্গে ফটো তোলা হইয়াছে, তাহা সবিস্তারে বিবৃত করিল।

যৎপরোনাস্তি পুলকিত হইয়া সুমতি কহিল, "চমৎকার হয়েছে! আমরা কবে ফটো পাব বিনোদ?"

"কালকেই পাবেন।" তাহার পর সুনীতিকে লক্ষ্য করিয়া বিনোদ কহিল, "প্রথমে তুমি যেরকম বিদ্রোহের ভাব দেখাতে সুনীতি, তাতে মনে হত যে, তোমাকে সামলানই কঠিন হবে। কিন্তু এখন দেখছি যে যোগেশ না হলেও চলতে পারত; কিন্তু তুমি না হলে চলত না। ভাগ্যে তুমি তোমার নাম আর হাতের লেখা দিয়ে এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলে!"

ফটো তোলার কথা শুনিয়া সুনীতি মনে-মনে অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। বিনোদের কথা শুনিয়া সবিদ্রূপে সে কহিল, "তা'হলে যোগেশকে বাদ দিয়ে দিন না। তাকে নিয়ে ফটো তোলান, মালা বদল করা—ওসব আর করছেন কেন?"

বিনোদ হাসিয়া কহিল, "ফটো তোলা ত হয়েই গেছে। তুমি যদি রাজী হও ত মালা বদলটা তোমাকে দিয়েই করি। কিন্তু ঠাট্টা নয় সুনীতি, সুবোধকে তুমি যতটা মুগ্ধ করেছ, যোগেশ তার অর্দ্ধেকও করে নি। সে প্রাণে-প্রাণে দুটি পৃথক সুনীতির সত্তা বেশ যেন বুঝতে পারে। সে কি বলে জান? সে বলে, চোখের সুনীতিকে তার যত ভাল লাগে, তার দশগুণ ভাল লাগে চিঠির সুনীতিকে। আমি শুনে হাসি, আর মনে-মনে ভাবি, যতই করা যাক্ না কেন, দুধে আর ঘোলে তফাত হবেই।"

সুমতি ব্যগ্র হইয়া বলিল, "সুবোধবাবুর মনে কোন রকম সন্দেহ হয়েছে না কি?"

বিনোদ কহিল, "আসলে কোন সন্দেহই হয় নি। তবে যে কথাগুলো বলে, তা ভারি মারাত্মক। বলে, সুনীতির মুখের কথা শোনার চেয়ে সুনীতির চিঠির কথা শুনতে

তার অনেক ভাল লাগে; সুনীতির সঙ্গে কথা কওয়ার চেয়ে, সুনীতিকে চিঠি লেখাতে সে বেশী আনন্দ পায়। তোমার চিঠিগুলি দেখতে দাও না বলে, প্রথমে আমরা একটু দুঃখিত হয়েছিলাম সুনীতি, এখন কিন্তু দেখছি, না দেখে ভালই হয়েছে। আমাদের চোখের ওপর দিয়ে গেলে, সেগুলোতে তুমি কখন এমন জীবন-শক্তি দিতে পারতে না।"

সুনীতির মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু তখনি সামলাইয়া লইয়া হাসিয়া কহিল, "যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর। এ তাই হোল মেজ জামাইবাবু।"

বিনোদ হাসিয়া কহিল, "তুমি আমার জন্যে, কি তোমার জন্যে চুরি কর, তা জানি নে; কিন্তু সুবোধের মনটিকে যে তুমি চুরি করেছ, তাতে আর সন্দেহ নেই। সে যাই হ'ক, চিঠি দেখাতে তুমি যখন রাজী হওনি, তখন ভারি ভয় হয়েছিল যে, কি করতে তুমি কি করবে। বিশ্বাসের মর্য্যাদা এতটা যে তুমি রাখবে, সে ভরসা তখন সম্পূর্ণ হয় নি।"

সুনীতি হাসিয়া কহিল, "এখন কি ভরসা হয়?"

বিনোদ কহিল, "এখন ভয়ও হয় না। রোগ হয় নি বলে কি আর রুগী চিনতে পারি নে সুনীতি? এই যে মাঝে-মাঝে মুখ লাল হয়ে ওঠা, এই যে কথা কইতে চোখ ছল্‌ছলিয়ে আসা, এই যে গলা কাঁপা—"

বিনোদের বাক্য শেষ হইতে না দিয়া সুনীতি সহাস্যে কহিল, "এই যে মাঝে-মাঝে দীর্ঘশ্বাস পড়া, হা-হুতাশ করা! বলে যান মেজ জামাইবাবু, বলে যান। আপনার বন্ধুর কাছে গিয়ে এই রকম অভিনয় করে বলবেন। তা'হলে যতটুকু পাগল হতে বাকি আছে, তাও আর থাকবে না।" বলিয়া হাসিতে-হাসিতে সুনীতি চলিয়া গেল।

যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল, সুমতি ও বিনোদ নিঃশব্দে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর সুমতি বলিল, "কিছু বুঝতে পারো বিনোদ?"

বিনোদ মৃদু হাসিয়া কহিল, "কিছু নয়! ভারি শক্ত মেয়ে; একটি কথাও ধরবার যো নেই। অথচ মুখেও ত' কথার কামাই নেই।"

সুমতি কহিল, "আমার ত' মনে হয় রং ধরেছে!"

বিনোদ হাসিয়া কহিল, "তা হবে। আপনারা আমাদের চেয়ে ভাল সমঝদার। সে যাই হ'ক, আমাদের নক্সাটা ত' আগে হয়ে যাক্। তার পর আসল পালায় হাত দেওয়া যাবে।"

রাত্রে শয়ন করিতে আসিয়া সুনীতি দ্বার বন্ধ করিলে, যোগেশ তাহার শয্যা হইতে বলিল, "আমার ওপর রাগ করেছ সেজদি?"

সুনীতি স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, "একটুকুও না যোগেশ!"

যোগেশ ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া কহিল, "কেন?"

সুনীতি কহিল, "আমি জানি, তুই অনিচ্ছায় ফটো তুলিয়েছিস্,—অনেক ওজর-আপত্তি করেছিলি।"

বিস্মিত হইয়া যোগেশ কহিল, "কেমন করে জানলে! মেজ জামাইবাবু বলেছেন বুঝি?"

সুনীতি হাসিয়া কহিল, "তা নয় রে! আমি জানতাম, তুই তোর সেজদিদির মান নষ্ট করবি নে!" বলিয়াই কিন্তু সুনীতি সবিস্ময়ে থামিয়া গেল। অন্যমনস্ক হইয়া এ সে কি বলিতেছে!

ধীরে-ধীরে এ দুইটি ভাই-ভগিনীর হৃদয় সম-সুখে ও সমবেদনায় একটানে বাঁধিয়া আসিতেছিল।

যোগেশ বলিল, "ফটো তোলার সব গল্প শুনবে সেজদি?"

সুনীতি স্নিগ্ধ স্বরে কহিল, "কাল শুনব ভাই, আজ রাত হয়েছে, ঘুমো।"

সুনীতি আজ আর কোন কার্য্যে না বসিয়া, একেবারে শয্যায় যাইয়া আশ্রয় লইল। আজ সন্ধ্যা হইতে তাহার কর্ণে কেবলই বাজিতেছিল বিনোদের কয়েকটা কথা— চোখের সুনীতির চেয়ে চিঠির সুনীতিকে সুবোধের ভাল লাগে। কি সুন্দর, কি চমৎকার! তবে ত' চিঠি সামান্য ব্যাপার নয়! তবে ত' চিঠি দিয়াও মানুষকে মানুষ বুঝিতে পারে, ধরিতে পারে!

নিদ্রায় সুনীতি স্বপ্ন দেখিল সে চিঠির রাজ্যের রাণী হইয়াছে। সেখানে রাজার সহিত কথাবার্ত্তা হয় চিঠিতে, প্রেমালাপ চলে চিঠিতে। রাজা আকাশে-আকাশে চিঠি পাঠান, রাণীর উত্তর বাতাসে-বাতাসে উড়িয়া চলে।

[১১]

তিন দিন পরে সুনীতি একখানা রেজেষ্ট্রী-করা বাণ্ডিল পাইল। খুলিয়া দেখিল, দুইখানা ফটো ও একটা চিঠি

সুবোধ পাঠাইয়াছে। একটা গোল টেবিলের উপর একটা ফুলদানীতে ফুলের তোড়া; তাহারই পার্শ্বে সুবোধ ও যোগেশ পাশাপাশি বসিয়া। সুবোধের মুখ-চক্ষু দিয়া উল্লাস ও আনন্দের দীপ্তি ঝরিয়া পড়িতেছে। দেখিয়া সুনীতির চক্ষু সজল হইয়া আসিল। আর কত ছলনায় তুমি লাঞ্ছিত হবে? আর কত উৎপীড়ন তোমার উপর চলিবে? কত দিনে কেমন করে তোমার প্রতি এ উপদ্রবের শেষ হবে?

পদশব্দ পাইয়া সুনীতি তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া একখানা ফটো লুকাইয়া ফেলিল।

সুমতি প্রবেশ করিয়া সাগ্রহে বলিল, "নীতি, সুবোধের কাছ থেকে ফটো এল বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"কই দেখি?"

সুনীতি ফটোখানা সুমতির হস্তে দিল। ফটোখানা কিছুক্ষণ সপুলকে নিরীক্ষণ করিয়া সুমতি বলিল, "আহা, এ যদি যোগেশ না হয়ে তুই হতিস নীতি, তা'হলে কত আনন্দের হোত!"

সুনীতি কহিল, "তা'হলে ত' এত মজার হোত না দিদি।"

সুমতি নীরবে ক্ষণকাল সুনীতির দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "তা তুই রাগই করিস, আর ঠাট্টাই করিস্ নীতি,—তুই যদি রাজি হোস, তা'হলে আমরা এখনই মজা বন্ধ ক'রে দিয়ে আনন্দের ব্যবস্থা করি।"

সুনীতি সহসা সমস্ত ধৈর্য্য হারাইয়া দৃঢ়স্বরে কহিল, "দিদি, আমাকে কি তোমরা ময়লা-ফেলা গাড়ী পেয়েছ যে, যত নোংরা কাজ আমাকে দিয়েই করাতে হবে?—এতদিন তোমাদের মজা দেবার জন্যে ত' একজন পর-পুরুষকে প্রেম-পত্র লিখে এলাম—এখন তোমাদের মনের গতি বদলাল বলে আমাকে অন্য রকমে রাজি হ'তে হবে?"

সুমতি তাহার দক্ষিণ বাহু দিয়া সুনীতিকে অর্দ্ধ-বেষ্টিত করিয়া ধরিয়া, স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিল, "বলিস্ নে নীতি, বলিস্ নে! এ কথা বললেও পাপ হয়! সুবোধকে বিয়ে করতে রাজী হওয়া কি নোংরা কাজ রে? আচ্ছা, প্রেম-পত্র লেখার কথাই যখন অমন করে তুললি, তখন বল্ দেখি, এর পর সুবোধ ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে তোর শ্রদ্ধা হবে?"

সুনীতি এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া কহিল, "তা যদি না হয়, তা'হলে আমার অবস্থাটা কি রকম দাঁড়িয়েছে, একবার ভেবে দেখ। সুবোধবাবু সব কথা জেনে যদি আমাকে বিয়ে করতে রাজী না হন, তিনি যদি মনে করেন যে, যে মেয়ে এমন একটা অন্যায় চক্রান্তে যোগ দিতে পারে, যে পরিহাসের জন্যে অজানা পুরুষকে প্রেম-পত্র লিখ্‌তে পারে, সে স্ত্রী হবার যোগ্য নয়; তখন আমার শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধা কোথায় থাক্‌বে বল?"

সুনীতির কথা শুনিয়া সুমতি বাস্তবিকই চিন্তিতা হইয়া উঠিল। সে তাহার এই অভিমানিনী প্রবল-মনা ভগিনীটিকেও চিনিত, এবং সে যে রঙ্গ-কৌতুকের স্রোতে ভাসিতে-ভাসিতে কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা বুঝিতেও তাহার বাকি ছিল না। এই অকিঞ্চিৎকর হাস্য-পরিহাসের মূল্য অবশেষে যদি দুইটি জীবনের সুখ-দুঃখ দিয়া পরিশোধ করিতে হয়, তাহা হইলে আর পরিতাপের সীমা থাকিবে না! সুমতি উৎকণ্ঠিত চিত্তে কহিল, "আচ্ছা নীতি, তা'হলে নকল বিয়ের বদলে আসল বিয়ে হ'য়ে যাক না। শুভদৃষ্টির সময় যোগেশের জায়গায় তোকে দেখে সুবোধ অবাক্ হ'য়ে যাবে। তাতে মজাও হবে, আর সব দিক রক্ষাও পাবে?"

সুনীতি প্রবল ভাবে বলিল, "তা কখনই করব না,—মরে গেলেও নয়। অত বড় একটা মিথ্যার ওপর দিয়ে জীবন আরম্ভ করব না,—তা সে কোন সুবোধেরই জন্যে নয়!"

সুমতি কহিল, "তবে চিঠিতে সব কথা লিখে, সুবোধকে জানিয়ে দে না; তা'হলেই সব সহজ হ'য়ে যাবে।"

সুনীতি কহিল, "তাই বা কি করে করব? তোমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি যে, চিঠিতে এমন কোন কথা লিখব না, যাতে তোমাদের ক্ষতি হ'তে পারে।"

সুমতি হাসিয়া কহিল, "আমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করে-ছিস্, আমরাই ত' লিখ্‌তে বলছি; তবে আর দোষ কোথায়?"

সুনীতি সুমতির বাহুপাশ হইতে নিজেকে ধীরে-ধীরে মুক্ত করিয়া লইয়া কহিল, "প্রতিজ্ঞার নিয়মই তা নয় দিদি, প্রতিজ্ঞা একবার করলে আর ভাঙ্গা যায় না। মহাভারত এরি মধ্যে ভুলে গেছ কি? সত্যবতীও ত' ঠিক তোমার মত ভীষ্মকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবার অনুমতি দিয়েছিলেন; কিন্তু ভীষ্ম তাতে রাজি হয়েছিলেন কি?"

সুনীতির দিকে ক্ষণকাল একদৃষ্টে চাহিয়া

থাকিয়া হাসিয়া কহিল, "বাপ্ রে—তুইও কলিকালের ভীম্ হলি না কি ?"

সুনীতি সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল, "আর আমিই বা ওপর-পড়া হয়ে ও-কথা লিখ্‌তে যাব কেন ? আমার অধিকারই বা কি, আর গরজই বা কি ?"

সুমতি প্রস্থান করিলে সুনীতি সুবোধের পত্রখানা খুলিল। অগ্যকার পত্রের সম্বোধন দেখিয়া সুনীতির কর্ণ-মূল পর্য্যন্ত রক্তাভ হইয়া উঠিল। সুবোধ লিখিয়াছেন, "প্রিয়তমে সুনীতি", এবং পত্রে সর্ব্বাগ্রে প্রিয়তমে সম্বোধন করার কারণ দিয়াছিল। "তুমি যখন আমার বাস্তবিকই প্রিয়তমা, তোমার চেয়ে বা তোমার মত প্রিয় যখন আর আমার কেউ নেই, তখন তোমাকে প্রিয়তমে বলে সম্বোধন না করাই অন্যায়। আশা করি, আমার এই অকপট আন্তরিক সম্বর্দ্ধনা তুমি সহজ ভাবে গ্রহণ করবে।"

ফটোগ্রাফ তোলার বিষয়ে সুবোধ লিখিয়াছিল, "তোমার আপত্তি এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফটো তুলিয়েছি ; সে জন্যে তোমার কাছে আমি ক্ষমা ভিক্ষা কর্‌ছি। অত বড় লোভটা আমি সম্বরণ করতে পারলাম না,—বিশেষতঃ বিনোদই যখন সে বিষয়ে উদ্যোগী এবং অগ্রণী হোল। দু'খানা ফটো তোমাকে পাঠালাম ; আর একখানা আমার বউদিদিকে পাঠিয়েছি। বউদিদিকে পাঠিয়েছি, ব'লে রাগ কোরো না সুনীতি। তাঁর স্নেহ-দৃষ্টি পড়লে আমাদেরও মিলন চিরদিনের জন্য অক্ষুণ্ণ ও শুভ হবে। বউদিদিকে যে ফটোখানি পাঠিয়েছি, তার নীচে তোমার নাম লিখে দিয়েছি ; আর কি লিখেছি শুনবে ? না, এখন থাক। সেটা মাঘ মাসে তুমি বউদিদির কাছ থেকে নিয়ে দেখো। আর সেটা পড়তে-পড়তে তোমার নির্ম্মল মুখখানি কি অপূর্ব্ব শোভায় প্রত্যুষের আকাশের মত রক্তাভ হ'য়ে উঠবে, আড়াল থেকে তাই দেখবার লোভে এখন থেকে লুব্ধ হ'য়ে রইলাম।"

"বউদিদিকে ফটো পাঠিয়েছি,—অনেক করে সে বিষয়ে বিনোদের মত নিয়ে তার পর। তোমার সঙ্গে আমার মিলনের কথা আমার কোন আত্মীয়-বন্ধুকে এখন জানতে বিনোদ বিশেষ করে নিষেধ করে দিয়েছে। কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলে, এখন বল্‌লে ভয়ানক ক্ষতি হবে। বিনোদের এই কথা শুনে সময়ে সময়ে একটা অজ্ঞাত, অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায় আমার হৃদয় কেঁপে ওঠে। যে অসীম সৌভাগ্যের আশ্বাস শুনে আমার কাণ ধন্য হয়েছে,—মনে হয়, যদি কোন কারণে তা পূর্ণ না হয়! তখন কি করি জান সুনীতি ?—তখন তোমার চিঠিগুলি বার করে একে একে পড়ি—সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের মত সমস্ত সংশয় নিঃশব্দে অন্ত-র্হিত হয়ে যায়। তোমার চিঠির প্রতি বাক্য, প্রতি অক্ষরগুলি হীরক-খণ্ডের মত সত্যের আলোকে ঝিক্‌ঝিক্ করে—যার মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, অসত্যের কোন সংস্রব থাকতে পারে না। তোমার পত্রগুলি ছত্রে-ছত্রে যে আনন্দ আর আশ্বাস বহন করে এনেছে, আমার ঐকান্তিক বিশ্বাস, তা একটুও অসম্ভব বা কল্পিত নয়। অমন দৃঢ়, সুগঠিত হস্তাক্ষরের মধ্যে কোন অসত্যের স্থান হতে পারে না। তোমার চিঠিগুলি আমার কাছে এমন অমূল্য সম্পদ বলে মনে হয় যে, আমি সমস্ত জীবনই শুধু তোমার চিঠির উপর নির্ভর করেই কাটিয়ে দিতে পারি।"

চিঠিখানা খামে ভরিয়া, বাক্সর ভিতর রাখিয়া দিয়া, সুনীতি টেবিলের একটা কোণ ঠেস দিয়া, অপলক-নেত্রে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। অনাহত সূর্য্য-কিরণে সমস্ত কক্ষ ভরিয়া গিয়াছিল। সেই আলোক-প্লাবনের মধ্যে দাঁড়াইয়া সুনীতি তাহার চতুর্দ্দিকে এমন একটা দুর্ভেদ্য অন্ধকার দেখিতেছিল, যাহা অতিক্রম করিয়া কোন ক্ষীণতম রশ্মিও তাহার নিকট পঁহুছিতেছিল না। সুবোধ লিখিয়াছে, তাহার চিঠির প্রতি বাক্য, প্রতি অক্ষর-গুলি সত্যের আলোকে হীরক-খণ্ডের মত ঝিক্‌ঝিকে ; কিন্তু হায়, সেগুলা যে কি নিবিড় মিথ্যার কালিমায় লেখা, তাহা ত' সুবোধ জানে না! এই যে আশ্বাস, এই যে বিশ্বাস, এই যে সোহাগ, এই যে সাধনা,—ইহার অধি-কারিণী হইবার তাহার কোনই দাবীই নাই ; অথচ প্রাণ যে ইহার একবিন্দুও ছাড়িতে রাজী হয় না! মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার ইন্ধনে সুবোধের হৃদয়ে যে অগ্নি সে জ্বালিয়াছে, তাহা ত' মিথ্যা,—তাহা হয় ত' অচিরেই এক দিন সহসা নিবিয়া যাইবে ; কিন্তু সুবোধের হৃদয় হইতে সংযুক্ত হইয়া তাহার নিজের হৃদয়ে যে অগ্নি জ্বলিয়াছে, তাহা ত' মিথ্যা নহে। তাহা যদি চিরদিন তাহার হৃদয়কে দীপ্ত না করিয়া দগ্ধ করে! দুঃখে ও নৈরাশ্যে সুনীতির দুই চক্ষু দিয়া টপ্‌টপ্ করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

আলবেনীয়া

শ্রীনরেন্দ্র দেব

বল্কান্ উপদ্বীপের পূর্ব্বার্দ্ধভাগে—বস্‌ণীয়া, সার্বিয়া, মন্টেনিগ্রো আর আল্‌বেনীয়া প্রদেশে এখনও একটা অতি প্রাচীন জাতির অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। তাদের প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনেক কীর্ত্তি-কলাপেরও সন্ধান পাওয়া গেছে। য়ুরোপের মধ্যে এরাই ব্রঞ্জ-শিল্পে সকলের চেয়ে সুদক্ষ হ'য়ে উঠেছিল, আর লৌহাস্ত্রের ব্যবহার য়ুরোপে এরাই সর্ব্বপ্রথম প্রচলিত করেছিল।

খৃঃ পূঃ ৬০০ শতাব্দীতে উত্তর দিক থেকে কেল্‌ট্‌রা এসে এদের আক্রমণ করেছিল এবং সেই সময় থেকে কেল্টের প্রভাব এদের মধ্যে কিছু কিছু প্রবেশ করেছিল; কিন্তু তার পর উপর্য্যুপরি রোমানরা, বুল্‌গেরীয়ানরা, সার্‌বিয়ানরা এবং তুরস্কেরা বারম্বার এদের আক্রমণ করেছিল, কিন্তু তবু আল্‌বেনীয়ানরা কোনও দিন নিজেদের বিশিষ্টতাটুকু হারায়নি।

বল্কান্ উপদ্বীপের মধ্যে অল্‌বেনীয়াই সকলের চেয়ে পুরাতন অধিবাসী। এখনও এদের মধ্যে এমন কতকগুলো পদ্ধতি আছে, যেগুলোকে প্রাচীন রীতি বলা যেতে পারে। আলবেনীয়ার অধিবাসীরা অনেকটা স্কটীশ্‌দের মতো দুভাগে বিভক্ত। উত্তর আল্‌বেনীয়ার অধিবাসীদের বলে 'ঘেগ্' আর দক্ষিণের লোকদের বলে 'টস্ক্'। ঘেগেরা উত্তরের দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে থাকে, আর টস্ক্‌রা দক্ষিণের সমতল ভূমিতে বাস করে; এইজন্যে টস্কদের চেয়ে ঘেগেদের মধ্যে একটু সেকেলে ভাবটা বেশী রকম আছে। তাছাড়া ওদের আর সবই একরকম, ভাষারও কোনও তফাৎ নেই; সেই একই আলবেনীয় ভাষায় দুদিকের লোকেই কথা বলে।

আলবেনীয়ানদের মধ্যে অনেকেই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী এবং গোঁড়া রোমান-ক্যাথলিক আছে বটে, তবে বেশীরভাগ্ হ'চ্ছে মুসলমান। তাদের জাতীয় পোষাক হচ্ছে খুব আঁট-আঁট সাদা পায়জামা, তার উপর গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের বুনোট বসানো; লাল টক্‌টকে কোমর-বন্ধ; বক্ষস্থল রজত-শুভ্র শৃঙ্খল পরিশোভিত। মেয়েদের পরিপাটি কৃষ্ণ পরিচ্ছদ, উজ্জ্বল ওড়না, এবং বিবিধ অলঙ্কার। আলবেনীয়ান রমণীরা এমন ছবির মত সুন্দর দেখ্‌তে যে, একবার দেখ্‌লে আর ভুল্‌তে পারা যায় না।

আল্‌বেনীয়ায় সহরের লোকদের সঙ্গে পল্লীবাসীদের কিছুই মেলে না। তারা সব সুদক্ষ শিল্পী; একান্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে খাটে। বল্কান্‌দের সমস্ত শল্মাচুম্‌কীর কাজ-করা পোষাক আল্‌বেনীয়ার কারিগরদের তৈরী। মন্টেনিগ্রোর অমন জম্‌কাল রাজ পোষাক আলবেনীয়ার দর্জ্জিদের হাতেই প্রস্তুত। বল্কানের অলঙ্কার নির্ম্মাতারা অধিকাংশই আলবেনীয়ান এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তারা এখনও যেসব ছাঁচের আলঙ্কার নির্ম্মাণ করে, ঠিক সেই ধরণের অলঙ্কার অনেক প্রাগৈতিহাসিক যুগের কবরশায়ী শবের দেহে দেখ্‌তে পাওয়া গেছে!

প্রত্যেক সহরেই চরকা আর তাঁতের প্রাদুর্ভাব দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তারা হরেক রকম রেশ্‌মী পশ্‌মী আর সূতির কাপড় বোনে। প্রাচ্য দেশের প্রত্যেক সহরের অধিকাংশ বাড়ীই যেমন একটুখানি বাগান বা বাগিচা এবং খানিকটা প্রাঙ্গণ-সংযুক্ত, তেমনি আল্‌বেনীয়ারও অধিকাংশ বাড়ী উদ্যান ও প্রাঙ্গণ-পরিশোভিত এবং চারিদিক প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। গৃহস্থেরা সকলেই প্রায় বিলাস-বিবর্জ্জিত জীবন যাপন করে। ঘরে আস্‌বাব-পত্র তারা অতি যৎসামান্যই রাখে। কলি-ফেরানো বাড়ী সব বার-বার চূণকাম ক'রে তারা ধব্‌-ধবে ক'রে রেখে দেয়। ঘরের কাঠের মেঝে তারা অনেকবার ক'রে ধুয়ে-মুছে তকতকে ক'রে রাখে, কার্পেটখানিকেও ঝেড়ে-ঝুড়ে ঝক্‌ঝকে ক'রে রেখে দেয়। এদের মত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন জাত খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়।

আলবেনীয়ায় বড় বড় সহরগুলোতে গির্জ্জে আর মস্‌জিদ দুই-ই আছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে তুরস্ক যখন আলবেনীয়া জয় করে, সেই সময়ে থেকে আলবেনীয়ায় মুসল্মান-ধর্ম্ম প্রচার হ'তে আরম্ভ হয়; কিন্তু মুসল্মান ধর্ম্ম

সে দেশে বহু লোক গ্রহণ করলেও তারা স্বদেশ ও স্বজাতির বিশেষত্ব কোনও দিনই পরিত্যাগ করে নি। জন্মভূমিকে স্বাধীন করবার জন্য খৃষ্টান ও মুসল্মান আল্‌বেনীয়ানরা একত্র হ'য়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তুরস্কের সঙ্গে লড়াই করেছে!

আল্‌বেনীয়ান মুসল্মানেরা অন্যান্য প্রদেশের মুসল্মানদের মত ধর্ম্মের গোঁড়ামীকে প্রশ্রয় দেয় না। তারা অধিকাংশই বেখ্‌তাশী সম্প্রদায়ভুক্ত উদার দরবেশ-শ্রেণীর মুসল্মান। ধর্ম্ম-শাস্ত্র ও ধর্ম্মযাজকদের নিষেধ সত্ত্বেও আল্‌বেনীয়ার মুসল্মান ও খৃষ্টানদের মধ্যে মিশ্র-বিবাহ প্রচলিত আছে। কেবল আল্‌বেনীয়াতেই একই পরিবারের মধ্যে কেউ বা খৃষ্টান, কেউ বা মুসল্মান ধর্ম্মাবলম্বী; অথচ তারা নির্ব্বিবাদে একত্রে বসবাস ক'রছে, এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আল্‌বেনীয়ানরা মুসল্মানই হোক্ বা খৃষ্টানই হোক্, উভয় সম্প্রদায়ই একই রকম জাতীয় আচার-পদ্ধতি মেনে চলে।

কুসংস্কার তাদের মধ্যে খুবই প্রবল। ভুতে পাওয়া, যাদু করা, ডাইনের দৃষ্টি লাগা, নিশি ডাকা, আলেয়া, এ সমস্তই তারা বিশ্বাস ক'রে। যদিও আল্‌বেনীয়ানরা কেউ উচ্চ-শিক্ষিত নয়, তবু তাদের একেবারে মূর্খ বলা চলে না। লেখা পড়া না জান্‌লেও তারা পুরুষপরম্পরা মুখে-মুখে অনেক জ্ঞান লাভ করে। আল্‌বেনীয়ার একজন সামান্য চাষাও ছোট-খাটো অনেক ব্যায়রাম কেমন করে আরাম করতে হয় তা জানে। সে দেশের বদ্যিরা অনেকে অস্ত্র-চিকিৎসায় বেশ সুনিপুণ। কাটা ঘা বিষাক্ত না হ'য়ে সেরে যেতে পারে কিসে, সে তথ্য আল্‌বেনীয়ানরা স্মরণাতীত কাল থেকে অবগত আছে। মাথার খুলি ফেটে গেলে, কি হাড়-গোড় ভেঙে গেলে কি ক'রে আবার জোড়া লাগতে পারে, সে উপায় সে দেশের যে কোনও একজন হেতুড়ে চিকিৎসকও জানে।

কচি ছেলেদের পাছে ডাইনে পায়—এই ভয়ে সে দেশের মায়েরা তাদের ছেলে-মেয়েদের গলায় সুতো দিয়ে রশুণ বেঁধে দেয়। তাদের বিশ্বাস এইতেই ছেলে-পুলেরা ডাইনের হাত থেকে রক্ষা পাবে। সে দেশের মায়েদের আরও অনেক কাজ ক'রতে হয়। তারা ভুট্টার আটা থেকে মোটা-মোটা রুটি বানিয়ে কাঠের জালে আগে লোহার তাওয়ার উপর সেঁকে নিয়ে পরে আগুনে ভেজে তুলে রাখে। কাঠের ছাইগুলো তারা ফেলে দেয় না, যত্ন ক'রে সংগ্রহ ক'রে রাখে, কারণ সেই ছাই দিয়ে তারা কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করে। সেগুলো তাদের কাপড়-কাচা সাবানের কাজ করে। ভুট্টার আটা তৈয়ার করবার জন্য পেষণ-যন্ত্রটিকে চালাতে তারা নদী-বেগে পরিচালিত শয়ান-চক্রের (Turbine) সাহায্য নেয়। মেয়েরাই সে দেশে মোটা মোটা পশমের কাপড় বুনে তাকে পেটাই-যন্ত্রে ফেলে নেম্‌দা বানিয়ে নেয়। এই পেটাই-যন্ত্রটিও সেখানে জল-স্রোতের বেগে পরিচালিত শয়ান-চক্রের সাহায্যে চলে। নেমদায় লাগাবার জন্য মেয়েরা কালো বুনোট বুনে চুনোট ক'রে রেখে দেয়।

প্রত্যেকের ঘরেই অগ্নি-কুণ্ড আছে; সে আগুন কখনও নেভানো হয় না। দিনরাত সেই অগ্নি-কুণ্ডকে প্রজ্জ্বলিত রাখবার জন্য মেয়েরা তাতে ইন্ধন যোগায়; কেবল যখন বংশের শেষ পুরুষ-মানুষটি পর্য্যন্ত মরে যায়, সেই সময় ঐ অগ্নি-কুণ্ড একেবারে নির্ব্বাপিত ক'রে দিয়ে মেয়েরা শোক প্রকাশ করে।

ছোট-খাটো নদী তারা এখনও চামড়ার থলেয় চ'ড়ে কিম্বা কাঠের গুঁড়ির ভেতরটা খোঁদোল ক'রে নিয়ে তাইতে চড়ে পার হয়। অন্যান্য সভ্য দেশের তুলনায় এরা যে এখনও সকল বিষয়ে পেছিয়ে পড়ে আছে, তার কারণ আর কিছুই নয় কেবল শিক্ষার অভাব। বহুদিন তুরস্কের অধীনে থাকায় সে দেশে শিক্ষা-বিস্তারের সুযোগ হয় নি।

কসোভোর প্রান্তর থেকে আরম্ভ ক'রে আটা উপ-সাগর পর্য্যন্ত যে আল্‌বেনীয় ভাষার প্রচলন রয়েছে, সে যে কোন্ ভাষা থেকে উৎপত্তি হ'য়েছে—ভাষাতত্ত্ববিদেরা এখনও পর্য্যন্ত তার কোন সন্ধান ক'রে উঠ্‌তে পারে নি। সে ভাষা গ্রীকও নয়, শ্লাভ্ও নয়, অথচ তার মধ্যে আর্য্য ভাষার কতকটা ব্যাকরণের অস্তিত্ব রয়েছে, আর সেই সঙ্গে প্রাচীন ইলিরীয় এবং ম্যাসিদোনীয় শব্দেরও কিছু কিছু সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে! সার্বিয়ান, গ্রীক, এবং তুরস্কেরা অনেক চেষ্টা ক'রেও তাদের এই অদ্ভুত ভাষাকে লুপ্ত ক'রে দিতে পারেনি। কোনও ইস্কুলে আল্‌বেনীয় ভাষা শিক্ষা দিতে পাবে না এবং কোনও বই আল্‌বেনীয় ভাষায় ছাপতে পাবে না, এই রকম কঠোর আইন থাকা
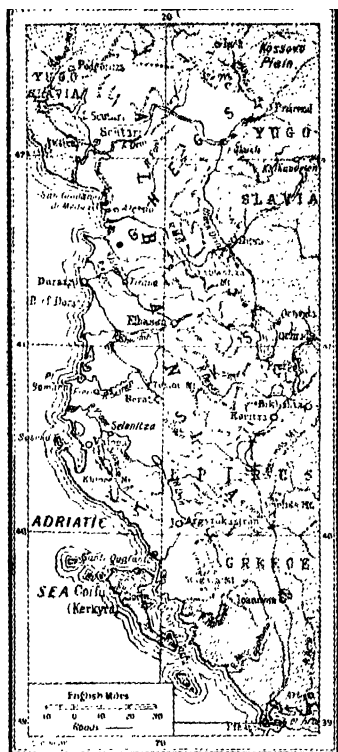
আল্‌বেনীয়ার মানচিত্র

আল্‌বেনীয়াবাসী রোমানী রূপসীরা।—(বহুকাল আগে রুমানীয়া থেকে একদল লোক এসে আল্‌বেনীয়ার পার্ব্বত্য প্রদেশে আস্তানা গেড়েছিল, এই সুন্দরী মেয়েরা তাদেরই বংশ-জাত। এরা এখন আচারে, ব্যবহারে, ভাষায়, ভূষায় একেবারে আল্‌বেনীয়ান হ'য়ে উঠেছে)

আল্‌বেনীয়ার পূর্ব্ব সীমান্তের মেয়েদের সুসজ্জিত হ'য়ে নাচ

দক্ষিণ আল্‌বেনীয়ার মেয়েরা

উত্তর আল্‌বেনীয়ার একশ্রেণীর মেয়েদের পোষাক

আল্‌বেনীয়ার রাখাল বালিকা তাদের খোড়োঘরের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে আছে

স্কুটারী সহরবাসিনী আল্‌বেনীয় সুন্দরীগণ

(এই স্কুটারী সহরকে খৃষ্টান ও মুসলমান আল্‌বেনীয়দের মিলন-ক্ষেত্র বলা চলে। এখানে মেয়েরা তুর্কী রমণীদের মতো রেশমী বাহুঁতির ঢিলে পায়জামা পরেন। পুরো হাতাওলা সিল্কের সেমিজ ব্যবহার করেন; তার ওপোর আবার হাতকাটা কারুকার্য্য করা কাঁচুলি আঁটেন এবং কটিদেশে হরেক রকম রঙের লম্বা কোমরবন্ধ বাঁধেন। কেউ কেউ আবার কোমরবন্ধের নীচেয় পায়জামার ঠিক সাম্‌নেদিকে এক একখানা লেশ্‌ বসানো বাহারী রুমাল ঝুলিয়ে রাখেন। রাস্তায় বেরুবার সময় এঁরা মুসলমান রমণীদের মতই বোরখা ব্যবহার করেন।)

আল্‌বেনীয়ার খৃষ্টানদের ধর্ম্মোৎসব উপলক্ষে শোভাযাত্রা

ভালোনার বাজার

(ভ্যালোনা সমুদ্রোপকূলের একটী প্রাচীন আল্‌বেনীয় সহর এবং প্রসিদ্ধ বন্দর। এখানকার বাজার সবচেয়ে বড়। এই বাজারে সব-রকম জিনিস কিনতে পাওয়া যায়।)

সত্ত্বেও সে দেশের খৃষ্টান ও মুসল্মানআল্‌বেনীয়ানরা আশ্চর্য্য উপায়ে তাদের মাতৃ-ভাষাকে এখনও পর্য্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছে।

আল্‌বেনীয়ান্ যুবকেরা উচ্চ-শিক্ষা লাভের জন্য প্যারিস বা ভিয়েনার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ক'রতে যায়। আমেরিকান মিশ্‌নারীরা সে দেশে 'রবার্ট কলেজ' নামে একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করেছে। সেখানে দলে দলে আল্‌বেনীয়ান ছাত্রেরা গিয়ে ভর্ত্তি হ'য়েছে। ১৯২০ সালে

দক্ষিণ আল্‌বেনীয়ার যোদ্ধারা (এরা পায়জামার ওপোর হাইল্যাণ্ডারদের মত ঘাগ্‌রা পরে)

আল্‌বেনীয়ানরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ ক'রেছে। এরই মধ্যে তারা দেশে প্রায় সাড়ে পাঁচশ' নূতন ইস্কুল খুলে দিয়েছে। সমস্ত সহর প্রায় নূতন ক'রে গড়ে ফেলেছে। প্রত্যেক সহরে এক একটি হাসপাতাল ক'রেছে, পোষ্ট আফিস বসিয়েছে। পুলিশ পাহারার বন্দোবস্ত ক'রেছে। দু'বছর আগে যারা আল্‌বেনীয়ার শোচনীয় অবস্থা দেখেছে, তারা এখন গিয়ে সে দেশ দেখ্‌লে অবাক্ হ'য়ে যাবে! স্বাধীনতা পেলে একটা জাত যে কত শীঘ্র কেমন উন্নতিলাভ ক'রতে পারে, তা প্রত্যক্ষ ক'রে তারা বিস্মিত হ'য়ে যাবে!

আল্‌বেনীয়ার পুলিশ প্রহরী

আল্‌বেনীয়ার গরুর গাড়ী।
(ঘাস এবং খড় নিয়ে যাবার সুবিধা হয় বলে চারিদিকে গজাল আঁটা আছে।)

আল্‌বেনীয়া নদী-বহুল দেশ; সেখানকার জমী খুব উর্ব্বরা। সেকেলে হাল গরু দিয়ে লাঙল চষেও সেখানে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়; তার মধ্যে ভুট্টা আর তামাক প্রধান। জলপাই, আঙুর প্রভৃতি সব রকম ফল এবং নানাবিধ শাক-শব্জীও সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে জন্মায়। গরু, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি গৃহ-পালিত পশুও সেখানে অপ্রতুল নয়। এক রকম ছোট আকারের টাট্টু ঘোড়া সে দেশের একটা বিশেষ সম্পদ ব'লে গণ্য। অনেকটা আরব দেশের খচ্চরজাতীয় ঘোড়ার মত। এ ঘোড়াগুলিও কষ্ট-সহিষ্ণু এবং কঠোর পরিশ্রমী।

আল্‌বেনীয়ার খনিজ সম্পদের এখনও সম্পূর্ণ সন্ধান পাওয়া যায় নি, কেবল তামা, কয়লা; শিলাজতু এবং পেট্রো-লিয়ম পাওয়া গেছে। রেশমী ও তুলা-বস্ত্রের কারবার, লোনা মাছ,

আড্রিয়াটিক্ সমুদ্রকূলের দুরাজো বন্দর।
(এই দুরাজো বন্দর আল্‌বেনীয়ার ব্যবসা বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র; এখানে অনেক ঘর খৃষ্টান ও মুসলমান আল্‌বেনীয় সওদাগরের বাস আছে।)

মাছের ডিম এবং গাঁজার ব্যবসা সেখানে খুব বেশী প্রচলিত।

আল্‌বেনীয়া দেশটা ঠিক বল্কান্‌ রাজ্য, আড্রিয়াটিক্‌ সমুদ্র, যুগোশ্লাভ্‌ রাজ্য এবং গ্রীক-রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত। পরিমাণ

দক্ষিণ আল্‌বেনীয়ার 'টস্ক' জাতি—(এরা পায়জামার ওপোর ঘাগ্‌রা পরে—এবং মাথায় তুর্কী টুপী দেয়।)

প্রায় এগার হাজার বর্গ মাইল, লোক-সংখ্যা মাত্র সাড়ে আট লক্ষ ! আল্‌বেনীয়ায় যদিও একজন রাজা আছেন কিন্তু শাসন-প্রথা রাজতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, বরং তাকে অনেকটা গণতন্ত্রই বলা যেতে পারে, কারণ চারজন

আল্‌বেনীয়ার পাহাড়ী অধিবাসীরা—(এরা একেবারে জংলী, কিন্তু ছাতা ব্যবহার ক'রতে খুব ভালবাসে !)

রাজ-প্রতিনিধি নিয়ে একটী শাসন-পরিষদ্‌ গঠিত হ'য়েছে ! এই চারজন রাজ-প্রতিনিধি আল্‌বেনীয়ার চারটী প্রধান প্রধান সম্প্রদায় থেকে নির্ব্বাচিত হ'য়ে এসেছেন। একজন গোঁড়া মুসল্মানদের তরফ থেকে, একজন উদার মুসল্মানদের

স্কুটেরী হ্রদবক্ষে আল্‌বেনীয় নৌকা—(এই নৌকাগুলি খুব দীর্ঘ বটে কিন্তু বস্‌বার আসনের বন্দোবস্ত নেই মাল নিয়ে যাবার পক্ষে এই নৌকা বেশ উপযুক্ত। যাত্রীদের যেতে হ'লে দাঁড়িয়েই যেতে হয়।)

তরফ থেকে, এক-জন রোমানক্যাথালিক তরফ থেকে, এবং একজন নব্য খৃষ্টানদের তরফ থেকে।

আল্‌বেনীয়ার বিখ্যাত টাট্টু ঘোড়া

উক্ত চারজন রাজ-প্রতিনিধি আবার সাধারণ প্রতিভূদের নিয়ে একটি মন্ত্রণা-সভা গঠিত করেছেন। এই মন্ত্রণা-সভার কাজ শুধু রাজ-কার্য্য পরিচালনে উপদেশ ও পরামর্শ দেওয়া। রাজকার্য্য পরিচালন করেন—দেশের প্রধান মন্ত্রী এবং এক কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি। রাজ-প্রতিনিধিরাই প্রধান মন্ত্রী মনোনীত ক'রে দেন। জন-সাধারণের প্রতিভূরা প্রত্যেকে ভোট অনুসারে নির্ব্বাচিত হ'ন এবং তাদের মধ্য হ'তে আবার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যেরা নির্ব্বাচিত হ'য়ে আসেন।

দক্ষিণ আল্‌বেনীয়ার অশ্বারোহী সৈনিক

আল্‌বেনীয়ায় এখনও রেল-পথ বিস্তৃত হয়নি, এবং ভাল বড় রাস্তাও সে দেশে একটিও নেই। তবে যে ভাবে তারা উন্নতির পথে অগ্রসর হ'য়েছে, তাতে আশা করা যায় যে আল্‌বেনীয়া শীঘ্রই একটা বিংশ শতাব্দীর উপযুক্ত সভ্য দেশ হ'য়ে উঠ্‌বে।

বিজিতা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

২০

বিকাল বেলা সবেমাত্র নৃপেন পান চিবাইতে-চিবাইতে, হাতের ছড়িখানা ঘুরাইতে-ঘুরাইতে বাহির হইতেছিল, সেই সময় "মেজদা" বলিয়া শৈলেন আসিয়া পড়িল।

লোকে বলে পাপ কাজ করিলেই মানুষ একটু বেশী রকম সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। যতক্ষণ ধর্ম্ম হৃদয়ে থাকে, লোকে ততক্ষণ সতেজ থাকে; পাপ তাহাকে স্পর্শ করিলেই, সে নিস্তেজ হইয়া মাথা অবনত করে। অনেক সময় চোখে-মুখে তাহার মনের ভীত ভাবটা ফুটিয়া উঠে। যাহার সর্ব্বনাশ করা যায়, সে যদি সামনে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে তো আরও সর্ব্বনাশ।

শৈলেনকে দেখিয়াই নৃপেনের মনে হইল—খানিকটা পান তাহার গলায় আটকাইয়া গেল। খুব খানিকটা কাসিয়া সে সেই বদ্ধ পানকে বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু সে পান কিছুতেই নামিল না বা উঠিল না।

শৈলেন তাহার স্তম্ভিত মুখখানার পানে চাহিয়া বলিল, "কোথাও যাওয়া হচ্ছে না কি?"

নৃপেন একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল, "হ্যাঁ, একটু উপেনবাবুর বাড়ী যেতে হচ্ছে। কি দরকার তোমার শিগ্‌গীর করে বলে ফেল।"

শৈলেন গম্ভীর ভাবে বলিল, "দরকারটা একটু বেশী গোছেরই। যাই হোক, উপেনবাবুর কাছে দরকারটা কি তোমার?"

রুষ্ট হইয়া নৃপেন বলিল, "আমার কি দরকার, তা শুনে তোমার লাভ কি?"

শৈলেন তেমনিই গম্ভীর স্বরে বলিল "অবশ্য বিশেষ কিছু দরকার নেই। এখন আমার দরকারটা শোন।"

নৃপেন বলিল, "এখন আমার সময় নেই।"

শৈলেন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "সময় না থাকে, করে নিতে হবে। তোমার যে কোন সময়েই সময় হবে না, তা আমি বেশ জানছি। যখনই আসব, তুমি বল্‌বে সময় নেই। দাঁড়াও বলছি মেজদা, যাবার জন্যে পা বাড়িয়ো না।"

নৃপেন সবে পা-খানা তুলিয়াছিল,—শৈলেনের কথা শুনিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল; বলিল, "কি বল্‌তে চাস তুই বল্ দেখি? যে রকম ভাব করে এসেছিস, যেন মারবি।"

শৈলেন সে কথায় কাণ দিল না; বলিল, "সত্যি এতবড় স্বার্থপর হয়েছ মেজদা, ভাইদের দিকে একটু তাকাতে পারলে না? তোমার জন্যে আমরা কতদূর স্বার্থত্যাগ করলুম, তা একটু ভেবে দেখলে না? তোমাকে কি বলতে ইচ্ছে করে বল দেখি? তুমি নরপিশাচ, না পশু?"

গর্জ্জিয়া নৃপেন বলিল, "মুখ সামলা শৈলেন,—যা-তা বলিস্ নে,—মনে রাখিস্ আমি তোর মেজদা।"

আরক্ত মুখে শৈলেন বলিল, "হ্যাঁ, তা জানি। শুধু সেই জন্যেই তুমি আজ বেঁচে গেলে মেজদা! নচেৎ দেখতে পেতে, এতক্ষণ তোমার কি করতুম আমি। তুমি এত বড় সয়তান মেজদা,—সম্পত্তি সমান ভাগ করা হল, সমান বখরা পেলে—আবার আমাদেরটাও ঠকিয়ে নিলে। তোমার ভাল হবে ভে'বেছ? সর্ব্বনাশ হবে যে! এত পাপ মানুষে কখনও সইতে পারে না। আমাদের কথা আমি তোমার কাছে বলতে আসি নি। সেজদার উপযুক্ত দণ্ড হয়েছে। যেমন পৃথক হ'বার জন্যে কোকিয়েছিল, তেমনি ফল পেয়েছে। আমি চাকরি করে অনায়াসে আমার খরচ চালাতে পারব। কিন্তু বড়দার কি করলে বল দেখি? এমন করেও তাঁকে সর্ব্বস্বহারা করতে হয়? তাঁর দয়ার দানে তোমার মন উঠল না মেজদা, ছি ছি! এমন ঘৃণিত কাজ করেছ তুমি, যে, তোমায় নিজের ভাই বলে পরিচয় দিতেও লজ্জা বোধ হয়।"

নৃপেন যেন দমিয়া গিয়াছিল, রাগটা হঠাৎ নিবিয়া গিয়াছিল। শৈলেন থামিলে সে ধীরে-ধীরে বলিল, "কে বললে আমি সব ঠকিয়ে নিয়েছি?"

শৈলেন বলিল, "সত্যি কথা কখনও গোপন থাকে মেজদা? তুমি লুকিয়ে রাখবে বলে তো এ কাজ কর নি। তোমার অন্তর ঠিক জানছে, এ কথা একদিন প্রকাশ হবেই, তার জন্যে তুমিতো অনেকটা প্রস্তুত হয়েই আছ; এখন আবার বলছ কে বললে? তুমি যে পৃথক হবার দিনই কলকাতায় গেছলে, কলকাতা বয়ে আর এলাহাবাদ হতে লাখটাকা নিয়েছ, তা কি—"

বাধা দিয়া নৃপেন বলিল, "বাড়ী যা শৈলেন, বেশী বকাস নে আমায়। আমার মাথার ঠিক নেই মোটে।"

শৈলেন রুক্ষ ভাবে বলিয়া উঠিল, "বাড়ী যাব কি? যাতে-তাতে কথাটা চাপা দিয়ে রাখতে চাও তুমি এখন? বড়দা হ'লে, তাঁর মুখে হাত দিয়ে কথাটা চাপা দিয়ে, তাঁকে বাড়ী পাঠাতে পারতে তুমি,—আমায় পারবে না। তুমি তিন ভাইয়ের সর্ব্বস্ব নিয়ে বড়লোক হ'য়ে বসলে,—আমরা ভিখারীর মত পথে-পথে ঘুরে বেড়াব, তবু একটী কথা বলতে পারব না? তুমি কতটা সহ্য করতে মেজদা, যদি তোমার কপাল আমাদের কপালের সঙ্গে মিশে যেত?"

নৃপেন ঘৃণার ভাবে বলিল, "এখন তুই করতে চাস কি? ধর, আমি যেন সব টাকাই নিয়েছি, তোরা যেন পথের ভিখারীই হয়েছিস,—কি করতে পারিস তুই আমার?"

শৈলেন স্থির দৃষ্টি তাহার মুখের উপর ন্যস্ত করিয়া বলিল, "আমি আমাদের ন্যায্য টাকা আদায় কোরব।"

নৃপেন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া শৈলেন বলিল, "হাসলে যে বড়?"

নৃপেন হাসি সামলাইয়া বলিল, "তোর কথা শুনে হাসি সামলানো যায় না। শোন্ শৈলেন, আমার একটা কথা শোন্; তোর ভালর জন্যই অবশ্য আমি সে কথাটা বলছি। শুনলেই বুঝতে পারবি'খন।"

শৈলেন অনিচ্ছা সত্বেও বলিল, "কি বলতে চাও বল।"

নৃপেন পার্শ্বের বাঁধানো বেদীটার উপর বসিয়া বলিল, "উঃ, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়ে গ্যাছে। এখানে বস, বলি।"

শৈলেন মাথা নাড়িয়া বলিল "থাক্, আমি দাঁড়িয়েই শুনছি।"

তাহার অবাধ্যতা দেখিয়া নৃপেন জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু সে চালাক ছেলে,—রাগ প্রকাশ করিয়া নিজের স্বার্থ নষ্ট করিতে সে রাজি নয়,—তাই একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, "তা না বসলি, তাতে কিছু আসে-যায় না। আমি বলছি কি,—তুই বড়দার কাছে পড়ে আছিস কেন, আমার কাছে এসে থাক। বাস্তবিক, আমি তোকে ভালবাসি বলেই এ কথা বলছি। আমার যা কিছু আছে, যা আমি এ পর্য্যন্ত জমিয়েছি, দুটি ভাইয়ে ভাগ করে নিয়ে বেশ থাকব, এই বাড়ীটা আমাদের দুটি ভাইয়ের থাকবে। রমেন খুব কড়া করে পত্র দিয়েছে যে, সে আর বাড়ী আসবে না। না আসলেই বা; বয়ে গেল তাতে। দেখছিস তো,—বাড়ী ভাগ হল, বিষয় ভাগ হ'ল,—সে একবার এল না, দেখলে না। আমি গেছলুম সেদিন তার সঙ্গে দেখা করতে, দেখা পর্য্যন্ত করলে না; উল্টে আবার এক কড়া পত্র লিখেছে, 'কেন তোমরা আমার বিষয় আলাদা করলে? আমি একদিনও এ কথা মুখে আনি নি, কেন তোমরা এ রকম করে বড়দার কাছে আমার মুখ দেখানো বন্ধ করলে?' শোন শৈলেন, তার কথা,—আক্কেলটা তার দেখ। আমি যে শুধু তারই জন্যে এত করলুম,—এখন কি না তার আবার জবাবদিহি চায়। হতভাগা সেটা,—মদ খেয়ে সেটার মনুষ্যত্ব কিছু নেই। তার থাকবার যায়গাও তো জানিস। সেই সব ছোট জাতের সঙ্গে মিশে তাদেরই স্বভাব পেয়েছে সে—নইলে আমায় চিনলে না! যাক - মরুক গে। সেজভাই-ই যখন এল না,—বিষয় নিলে না,—তখন সেজ বউমার তো কোনও স্বত্ব নেই এতে। তাকে একদিন দূর করে দেব। এতদিন যে দূর করি নি, সে কেবল ধর্ম্মভয়ে। আর বড় বউদি এই যে কতকগুলো কুপোষ্য—কে বাবার মামী, বাবার শ্যালী, বাবার পিসী, তাদের গুষ্টি সমেত এনে রেখেছেন,—এখন আমার ঘাড়ে সব ভার পড়েছে। এসব আমি রাখতে পারব না। অনর্থক কে তাদের ভাত-কাপড় যোগায় বল দেখি? আমি এসব দূর করে দেব;—বড় বউদির ইচ্ছে হয়, নিজে নিয়ে গিয়ে রাখবেন। পৃথক যখন হ'লেন, তখন পোষ্যগুলি ঘাড়ে নিতে পারলেন না? আমার ঘাড়ে এ সব চাপাবার মানে কি? যাক গে সে কথা, সে সব আমি পরে দেখব। এখন আমি তোকে যা বলছি, বল্ তার কি করবি? আমরা দুটি ভাইয়ে এক থাকলে কাউকে ডরাইনে,—একলা বলে একটু-একটু ভয় পেয়ে যাই। তোর তা হ'লে আসছে অগ্রহায়ণ মাসের

২রা তারিখে বিয়েটা দিয়ে ফেলি। আমার শ্যালিটীকে দেখেছিস বোধ হয়? এবার সে ফার্ষ্ট ডিবিসানে ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করেছে,—নামটা বোধ হয় গেজেটে পেয়েছিস। সুপ্রভাকে দেখলে তোর একটুও অপছন্দ হবে না। সে তোর মেজ বউদির চেয়েও সুন্দর। আমার শ্বশুর এই মেয়েটীর বিয়ে দিয়ে জামাইকে বিলাতে পাঠাতে চান। তুই যদি বিয়ে করিস ভাই, কয়েকটা বছর বাদে একজন নামজাদা ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে ফিরতে পারবি। আমার আর তোর মেজবৌদির খুব ইচ্ছে, যাতে তোর সঙ্গেই এই বিয়েটা হয়ে যায়। আর আমার শ্বশুর, সুপ্রভা—সবারই এতে মত আছে। দেখ ভাই, আমার কাছে থাকলে তোর লাভ ছাড়া লোকসান হবে না।"

চারটা যে খুবই ভাল ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুন্দরী শিক্ষিতা স্ত্রী, শিক্ষিতের বাঞ্ছিত বিলাত গমন, নিজের অতুল ঐশ্বর্য্য সমান ভাগে দান। নৃপেন ভাবিয়াছিল, শৈলেন এই অর্দ্ধেক রাজত্ব ও সুন্দরী রাজকন্যাকে কিছুতেই হাতছাড়া করিবে না। এমন কে মূর্খ আছে যে, আকাঙ্ক্ষার বস্তু লাভ করিবার এমন স্বর্ণ সুযোগ ত্যাগ করিয়া, দারিদ্র্যকে সাদরে বরণ করিয়া লইতে চায়?

কিন্তু দুর্ভাগ্য তাহার,—শৈলেন তার চার গিলিল না। তাহার বড়-বড় চোখ দুটী লাল হইয়া উঠিল, কাণ দুইটা লাল হইয়া গেল; রুদ্ধ কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, "তুমি কি আমায় তোমার মত স্বার্থপর ভেবেচ মেজদা? মনে ভেবেছ, তোমার সহায় রূপে দাঁড়িয়ে,—লোকের নিন্দা মাথায় বইতে তোমার মতে মত দিয়ে, তোমার প্রলোভনে ভুলে বড়দাকে ত্যাগ করে আমি তোমার কাছে আসব? ভগবান যে আমায় তোমার মত নীচ জঘন্য হৃদয় দিয়ে জগতে পাঠান নি, তার জন্যে—কখনও তাঁকে না ডাকলেও,—আজ এই মুহূর্ত্তে তাঁকে ডেকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমি তোমায় আরও ভাল করে চিনলুম মেজদা; তোমার কাছে থাকার চেয়ে বিষধর গোখরো-কেউটের কাছে থাকা হাজার গুণে ভাল। উঃ! তুমি আমাকে ভুলাতে চাও? তুমি ন্যায়-অন্যায়ে যা হস্তগত করেছ, আমাকে তার অর্দ্ধেক দেবে, তোমার সুন্দরী শিক্ষিতা শ্যালীর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে, তোমার শ্বশুর আমায় বিলাত পাঠাবেন,—কথাগুলো বড়ই চিত্তাকর্ষক মেজদা! আমায় মাপ কর, আমি তোমার এ সদ্যুক্তিগুলো নিতে পারছি নে। আমি অত আশা নিয়ে আসি নি, সামান্যই চাচ্ছি। যা তুমি আমাদের তিনভাইয়ের প্রতারণা করে নিয়েছ, সেইটুকু আমাকে ফিরিয়ে দাও, তোমার অতুল ঐশ্বর্য্য আমি চাই নে।"

নৃপেন খানিকক্ষণ জ্বলন্ত নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। এই অর্ব্বাচীন ভাইয়ের কাছে মনের কথা অতখানি ব্যক্ত করিয়া সে একটু অনুতপ্তও হইতেছিল। তাহার পর বলিয়া উঠিল, "চাস্ নে? আমার দেওয়া এতগুলো জিনিস তুই চাস নে?"

শৈলেন উত্তর করিল "না।" তাহার কণ্ঠস্বর তখন গর্ব্বপূর্ণ।

ঘৃণাপূর্ণ কণ্ঠে নৃপেন বলিল, "বড়দার কাছে সেই চির-দারিদ্র্যের মধ্যে থাকাই তা হ'লে তোমার বাঞ্ছনীয়?"

সতেজে শৈলেন বলিল "হ্যাঁ, সেখানে থাকাই আমার বাঞ্ছনীয়! বড়দাকে ছেড়ে রাজ-ঐশ্বর্য্য গ্রহণ আমি তুচ্ছ জ্ঞান করি।"

নৃপেন উঠিয়া দাঁড়াইল। আর একটা কথাও না বলিয়া সে অগ্রসর হইল। শৈলেন বলিল "যাচ্ছ কোথায়?"

নৃপেন গম্ভীর মুখে বলিল, "যখন আমার প্রস্তাবই নিলি নে তুই, তখন এখানে আমার থাকার দরকার দেখছি নে কিছু। ফিরে যা বড়দার কাছে, বেশ সুখে থাকবি'খন।"

ক্রোধে শৈলেনের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছিল। যথাসাধ্য নিজেকে সামলাইয়া সে শান্ত ভাবে বলিল, "যেখানেই সুখে থাকি, তা ভাববার কিছু দরকার নেই তোমার। তুমি যা জিজ্ঞাসা করলে, আমি তার উত্তর দিলুম। এখন আমার প্রশ্নের উত্তর কি?"

নৃপেন বলিল "কি তোমার প্রশ্ন?"

বিরক্ত হইয়া শৈলেন বলিল, "কতবার করে তা বলতে হবে তোমায়? বারবার বলতে আমার মুখ ব্যথা করে না?"

নৃপেন বলিল, "বেশ তো, মুখ ব্যথা যদি করে, বলে কাজ নেই। রাস্তা ছেড়ে দাও, আমি কাজে যাই। তুমিও যেখানকার মানুষ, সেখানে আস্তে-আস্তে সরে পড়।"

শৈলেন আর সহ্য করিতে পারিল না; এক পা অগ্রসর হইয়া গর্জ্জিয়া বলিয়া উঠিল, "দেখ মেজদা, বেশী কথা বল না বলছি।"

উত্তেজিত হইয়া নৃপেন বলিল, "তোকেও বলছি শৈলেন, মুখ সামলে কথা বলবি। ভুলে যাসনে যেন,—তোকে আমি এখনোও ছুটো চড় মারতে পারি, কিন্তু তুই উল্টে একটা কথাও বলতে পারবি নে আমাকে।"

শৈলেন পিছাইয়া গেল; নরম সুরে বলিল, "আমি তোমায় অপমান করতে আসি নি মেজদা; আমাদের যা নিয়েছ, ফিরে দাও। দারিদ্র্যের কঠোর আক্রমণ হ'তে বড়দাকে রক্ষা করতে দাও। আমার পড়া এখনও শেষ হয় নি যে, চাকরী করব। তাতেও কিছুকাল দেরী হবে। দারিদ্র্যের কষ্টে বড়দা তা'হলে আত্মহত্যা করবেন। ছোট ভাই আমি,—তোমার পায়ে ধরছি মেজদা, কি বলতে কি বলে ফেলেছি,—মাপ কর, আমাদের সব দাও।"

নৃপেন ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "যা—যা, ঢের কথা বলেছিস, সব সহ্য করে গেছি। আমি এক পয়সাও দেব না। কি করবি, কর গে যা।"

আহত হইয়া শৈলেন বলিল, "এক পয়সাও দেবে না?"

দৃঢ়স্বরে নৃপেন বলিল, "একটা পাইও না।"

শৈলেন স্থির হইয়া খানিকক্ষণ নৃপেনের পানে চাহিয়া রহিল। বুকটা তাহার ভিতরে-ভিতর ফাটিয়া যাইতেছিল; কিন্তু বাহিরে সে বড় স্থির; যেন কিছুই তাহাকে দমাইতে পারে নাই, পারিবেও না।

একটু পরে সে বলিল, "বাড়ীতে আমার যে অংশ আছে, আমি বোধ হয় তার দাবী করতে পারি?"

নৃপেন মাথা নাড়িয়া বলিল, "সে রাইট তোমার লোপাট হয়ে গেছে।"

শৈলেন শান্ত ভাবে বলিল, "কিসে?"

নৃপেন অতিরিক্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, "সে সব কথা তোমায় আমি বলতে পারিনে এখন। মোট কথা বলছি, তোমার যদি ক্ষমতা থাকে, রাইট বজায় করতে পার। কোর্ট খোলা আছে, বরাবর সেখানে যাও,—তোমার কশ্চেনের অ্যানসার সেখানেই শুনবে।"

শৈলেন আবার স্তব্ধ হইয়া রহিল। মেজদার প্রকৃতির পরিচয় সে যত পাইতে লাগিল, ঘৃণায় ততই তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। কেবল নিজের জন্য যদি হইত, তবে কখনও সে এই ভ্রাতৃরূপী পিশাচের নিকট আসিত না,—মেজদার জন্যও নয়। সে আসিয়াছে কেবল পিতৃসম বড়দার জন্য। তাঁহার ভবিষ্যৎ কষ্ট কল্পনা করিয়া সে ভারী ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার জন্যই সে আজ ভিখারীর মত নৃপেনের কাছে অঞ্জলি পাতিয়া দণ্ডায়মান।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে অগ্রসর হইল। আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "তাহলে তুমি কিছুই দেবে না?"

দর্পভরে নৃপেন বলিল, "একটা পাইও না।"

শৈলেন পাংশুমুখে বলিল, "আমি কিন্তু সহজে ছাড়ব না মেজদা। এর শেষ পর্য্যন্ত দেখব, কতদূর তুমি এগুতে পার।"

নৃপেন বলিল, "আমি তো সোজা বলেই দিয়েছি—কোর্ট খোলা আছে,—তুমি, উইদাউট ডিফিকাল্‌টী সেখানে আমার অ্যানসার পাবে।"

শৈলেন হঠাৎ ঘুরিয়া তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া জোরের সঙ্গে বলিল "তাই হবে মেজদা, তাই আমি করব। ব্যাপারটা যে কোর্ট পর্য্যন্ত গড়াবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তোমায় আজ এই-খানেই দেখিয়ে দিতে পারতুম আমার বডিলি আর মেণ্টাল পাওয়ারের অভাব আছে কি না;—কেবল ঐ একটা বাধা জেগে আছে যে, তুমি আমার সহোদর ভাই। স্বার্থের মোহে তুমি সেটা ভুলে গেছ,—আমরা সেটা ভুলি নি। কেবল সেই জন্যেই আজ তুমি বেঁচে গেলে, মনে রেখো।"

সে শূন্যে বার-কতক হাত দুইটা আন্দোলিত করিয়া সগর্ব্বে চলিয়া গেল। বাস্তবিকই সে যখন হাতখানা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া, মুখখানা আরক্তিম করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন নৃপেনের প্রাণটা আশঙ্কায় দুলিয়া উঠিয়াছিল। শৈলেন রীতিমত বলবান। বয়সে ঢের ছোট হইলেও, সে লম্বে ও প্রস্থে নৃপেনের অপেক্ষা ঢের বড়। রীতিমত পালোয়ান রাখিয়া সে কুস্তি শিখিয়াছে। একবার সে বহুদিন আগে নৃপেনের হাতখানা চাপিয়া ধরিয়াছিল, সেই হাতের ব্যথায় নৃপেনকে প্রায় মাসখানেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। আজ নৃপেনের ভয় হইতেছিল, রাগের মাথায় শৈলেন পাছে তাহাকে দুইহাতে টানিয়া তুলিয়া একটা আছাড় দিয়া ফেলে। যখন শুনিল সে তাহার অনিষ্ট করিতে পারিবে না, কারণ, নৃপেন তাহার বড় ভাই, তখন নৃপেনের লুপ্ত সাহস ফিরিল।

শৈলেন চলিয়া গেলে সে একটা স্বস্তি নিঃশ্বাস ফেলিল। কে জানে, রাগের মাথায় বড় ভাই জ্ঞানটা যদি না থাকিত, তাহা হইলেই নৃপেনের অর্থ সঞ্চয় করা হইত আর কি। অস্ফুট স্বরে সে বলিল, "ভাল আপদ হয়েছে সব।"

দ্বারোয়ানকে ডাকিয়া কড়া স্বরে সে আদেশ দিল, কেহ যেন বিনা এত্তেলায় বাড়ীতে প্রবেশ করিতে না পারে। এমন কি—বড়বাবু, সেজবাবু, ছোটবাবুও নয়।

আজকাল বড়মানুষিটা বেশী করিয়া জাঁকাইয়া তুলিবার জন্য সে দ্বারে দুটি হিন্দুস্থানী দ্বারোয়ান নিযুক্ত করিয়াছিল।

ক্রমশঃ

বিবিধ-প্রসঙ্গ

তাজমহল-নির্ম্মাণ

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি-এ

অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বে কর্ণেল আর, পি, স্যান্ডার্সন পারস্য ভাষায় রচিত একখানি হস্তলিখিত পুস্তক হইতে আগ্রার সুবিখ্যাত তাজমহলের নির্ম্মাণ-কাহিনী সঙ্কলন করিয়া "কলিকাতা রিভিউ" পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় ইতঃপূর্ব্বে তাজমহল সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় তাঁহার Historical Essays নামক গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন।

কর্ণেল স্যান্ডার্সনের প্রবন্ধের মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বিজয়ী সম্রাট শাজাহানের চারিটী পুত্র এবং চারিটী কন্যা ছিল। প্রথম পুত্রের নাম দারাশুকো (অথবা মর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ), দ্বিতীয়ের নাম শাহসুজা (বীর রাজা), তৃতীয়ের নাম মহম্মদ মোরাদ বক্স, চতুর্থের নাম আরাঞ্জেব আলমগীর (বা পৃথ্বীজয়ী এবং পৃথ্বীভূষণ)। শাজাহানের কন্যাদিগের নাম—প্রথমা কন্যার নাম আঞ্জুমান-আরি বেগম (অথবা সভার শোভা), দ্বিতীয়ার নাম—গিতি-আরি বেগম (অথবা পৃথ্বীভূষণ), তৃতীয়ার নাম—জাহান্-আরি বেগম (বা সম্রাজ্ঞীদিগের শোভা), চতুর্থার নাম—দহ্‌রু-আরি বেগম (বা সম্রাজ্ঞী-দিগের শোভা)।

দহ্‌রু-আরি বেগম ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই জননী-জঠরে রোদন করিয়াছিলেন। শিশুর রোদন শুনিবামাত্র তাহার জননী মুমতাজ-ই-মহল স্বীয় জীবনে হতাশ হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ শাজাহানকে পার্শ্বে ডাকিয়া অত্যন্ত রোদন করিতে-করিতে কহিলেন—(কবিতা)

তোমার নিকট হইতে যাইবার সময় আজ আসিয়াছে। আজি বিদায়ের দিন। আমাদের ভাগ্যে আজ দুঃখ ও বিচ্ছেদ লিখিত রহিয়াছে। হায়, হায়, এই চক্ষুঃ অতি অল্পদিনের জন্যই একজন প্রিয়তম বন্ধুকে দর্শন করিল। আজ রুধিরের অশ্রু বর্ষণ কর—আজই যে আমাদের বিচ্ছেদের দিন। ইহা সকলেই জানে যে, শিশু মাতৃ-জঠরে রোদন করিলে, মাতার জীবন-হানি হয়। এই ক্ষণভঙ্গুর জগৎ হইতে সেই জরামৃত্যুহীন দেশে আজই যখন আমাকে যাইতে হইবে, হে সম্রাট, আমার সকল ত্রুটী ও অপরাধ মার্জ্জনা কর। আমার বিদায়ের ক্ষণ নিকট হইয়াছে।

বিজয়ী সম্রাট শাজাহান পত্নীর মুখে মহাযাত্রার বিষাদপূর্ণ এই করুণ বাণী শুনিয়া অত্যন্ত বিহ্বল হইলেন। তিনি পত্নীকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। দারুণ দুঃখে তিনি উচ্চরবে রোদন করিতে লাগিলেন। বৃষ্টির ধারার ন্যায় বৃহৎ-বৃহৎ অশ্রুবিন্দু তাঁহার নয়ন হইতে ঝরিতে লাগিল। হায়, সম্রাটের সেই দুঃখ আমি কিরূপে বর্ণনা করিব। তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার নহে। 'হায় হায় হায়!' শুধু ইহাই যেন বিষাদের একমাত্র বর্ণনা।

সর্ব্বগুণযুতা এবং প্রিয়তমা বানুবেগম অত্যন্ত রোদন করিয়া পুনরায় কহিলেন—হে সম্রাট, আমার আত্মা যতদিন এই পৃথিবীতে বদ্ধ ছিল, সেই দীর্ঘ দিন আমি কেবল তোমার বেদনার অংশই গ্রহণ করিয়াছি। আজ যেমন বিধাতার অনুগ্রহে তুমি সম্রাট, তিনি বিশ্বের সাম্রাজ্য তোমাকে অর্পণ করিয়াছেন—সেইজন্যই আজ পৃথিবী হইতে বিদায় লইতে আমার অত্যন্ত অধিক দুঃখ হইতেছে। এই কারণেই আমার মনে দুইটী সাধ উপস্থিত হইয়াছে। আমি ভরসা করি, উহা তোমার অভিপ্রায়ের অনুমত হইবে এবং তুমি সে সাধ পূর্ণ করিবে।

পৃথ্বীপতি তখন সেই সাধের কথা সম্রাজ্ঞীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সম্রাজ্ঞী কহিলেন—সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর আমার গর্ভে তোমাকে চারিটী পুত্র ও চারিটী কন্যা দিয়াছেন। আমাদের বংশরক্ষা করিতে ইহারাই যথেষ্ট। ভগবানের ইচ্ছায় অন্যান্য রাণীর গর্ভে তোমার যেন আর সন্তান-সন্ততি না হয়। কারণ, তাহা হইলে সে সকল সন্তান আমাদের পুত্র কন্যাদিগের সহিত নিরন্তর কলহ ও

যুদ্ধই করিবে। আমার দ্বিতীয় সাধ এই যে, আমার দেহের উপর তুমি এমন মনোমোহন, সুন্দর ও দুর্লভ সমাধি-মন্দির রচনা করিবে, যেন, লোকে দেখিলেই বলে—ইহার তুলনা নাই। সম্রাজ্ঞীর দুইটী সাধই পূর্ণ করিবেন বলিয়া সম্রাট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রতিশ্রুত হইলেন। দহ্‌র-আরি বেগম যখন ভূমিষ্ঠ হইলেন, তখন তিনি তাঁহার মাতার আত্মাকে নিজের মুষ্টির মধ্যে বদ্ধ করিয়া আনিলেন। জননীর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটিল। তিনি স্বর্গের পরীদিগের সহিত যাইয়া মিলিলেন।

(কবিতা)

পৃথিবীতে কেহই অমর নহে।
মৃত্যুর কবল হইতে কেহই নিজের জীবনকে উদ্ধার করিতে পারে না।
মায়াবী ভাগ্য-বিধাতা কখনই তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না।

ইত্যাদি

সম্রাজ্ঞীর মৃত্যুর পর ছয়মাস পর্য্যন্ত তাঁহার মৃতদেহ চৌকের (চকের) একটী মুক্ত স্থানে রক্ষিত হইয়াছিল,—বর্ত্তমান সমাধিক্ষেত্রে নহে। প্রখ্যাত শিল্পীগণ সমাধি-মন্দিরের চিত্রাদি অঙ্কন করিয়া পরীক্ষার জন্য উপস্থিত করিতে লাগিলেন। একটী চিত্র যখন মনোনীত হইল, তখন প্রথমে কাষ্ঠের দ্বারা তদনুরূপ একটী মন্দির রচিত হইল। পরে দুর্লভ এবং বহুমূল্য প্রস্তরাদি দ্বারা এই সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা নির্ম্মাণ করিতে সপ্তদশ বর্ষ ব্যয়িত হইয়াছে। (কবিতা)

[শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার লিখিয়াছেন—মুমতাজমহলের মৃতদেহ প্রথমে বুরাহানপুরের নিকটে তাপ্তী নদীর তীরে একটী উদ্যানবাটিকায় রক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর ১লা ডিসেম্বর তারিখে মৃতদেহ ভূগর্ভ হইতে তুলিয়া শাহাজাদা সুজার তত্ত্বাবধানে আগ্রা নগরীতে প্রেরিত হইয়াছিল। সুজা ২০শে ডিসেম্বর তারিখে আগ্রায় পৌঁছিয়াছিলেন।—Historical Essays ; Page 148]

[সম্রাট শাজাহান ও সম্রাজ্ঞী মুমতাজমহলের বিদায়কাহিনী সমসাময়িক ঐতিহাসিক আবদুলহামিদ-ই-লাহারির গ্রন্থে নাই। তাঁহার গ্রন্থের নাম পাদিশানামা।]

সমাধি-মন্দির প্রস্তুত করিতে এবং প্রস্তর খুদিয়া ফুল-লতা-পাতা বসাইতে (mosaic work) যে সকল প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহার তালিকা :—

প্রস্তরের নাম	কোন্ স্থান হইতে সংগৃহীত	প্রস্তরের পরিমাণ (মণ)
কর্ণেলিয়ান Cornelian)	বাগদাদ	১১০
ঐ	এরেবিয়া ফেলিক্স (Yemen)	২৪০
টার্কিস্ (Turquoise)	তিব্বত (Grand Thibet)	৪৪০
লেপিস্ লজোলি (Lapis Lazuli)	সিংহল	২৮০
প্রবাল	সমুদ্র	১১০
Agate and onyx	দাক্ষিণাত্য	৫৪০
পোর্সিলেন (Porcelain)	কানাড়া (Canara)	এত অধিক যে পরিমাণ হয় না।
Lahsunia	নীল নদ (Nile)	১১৫
স্ফটিকের ন্যায় নকল প্রস্তর	গঙ্গা নদী	২৪৫
সুবর্ণের ন্যায় প্রস্তর (Gold Stone)	পর্ব্বত মালা	১৭০
Pie- Zahur	কুমায়ুঁ	১০১০
গোয়ালিয়রের প্রস্তর	গোয়ালিয়র	এত অধিক যে পরিমাণ হয় না।
দুর্লভ প্রস্তর (The Rare Stone)	সুরাট	৫০১০
কৃষ্ণ প্রস্তর	জেহেরি (Jeheri)	৮৪৫
ওপাল (Opal)	ঐ	৪৫
শ্বেত প্রস্তর (Alabaster)	মক্‌রান	এত অধিক যে পরিমাণ হয় না।
রক্ত প্রস্তর	নানা স্থান	৪৫
Agate	Khamach	৪৫
নাখুদ্ (Sung Nakhud)	....	২২৫

প্রতি ঘন গজে যে পরিমাণ প্রস্তরাদি ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহার তালিকা—

মর্ম্মর প্রস্তর—প্রতি ঘন গজে—		৪০ মণ
পোর্সিলেন	ঐ	৭১ ঐ
কৃষ্ণ প্রস্তর	ঐ	৪৮ ঐ
Jasper এবং Agate	ঐ	১৫ ঐ
রক্ত প্রস্তর	ঐ	৩০ ঐ
Pie-Zahur	ঐ	৪৫ ঐ
ফ্লিন্ট প্রস্তর	ঐ	৫৭ ঐ
অত্যাশ্চর্য্য প্রস্তর	ঐ	৪২ ঐ
দানাদার প্রস্তর (Crystal)		৮৫ ঐ
Sung Khutoo	ঐ	৮৫ ঐ

Lapis Lazuli	ঐ	৩১২ ঐ
Solomon's Stone	ঐ	২৪ ঐ
Freckled Stone	ঐ	৪২ ঐ
Balni	ঐ	২৪ ঐ
গুলাব বর্ণের প্রস্তর	ঐ	৪৫ ঐ

অন্যান্য বহুমূল্য প্রস্তরের তালিকা—

রুবি—৫৪ মণ; এমারেল্ড—৯৭ মণ; সবুজ বর্ণের প্রস্তর—১২৫ মণ; Saphire—৭৪৫ মণ; Porphyry—১০৪ মণ; Turquoise—৮৫৭ মণ; গোয়ালিয়রের প্রস্তর—১৪৫ মণ; দ্যুতি মান প্রস্তর—৭৫ মণ; চুম্বক (Load Stone)—৭৭ মণ; রুচির স্থায় নকল প্রস্তর—১৭৫ মণ; Petoneea—৩১ মণ; কাশ্মীরের মর্ম্মর প্রস্তর—(পরিমাণ পাওয়া যায় না)

[শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তরগুলিরও নাম উল্লেখ করিয়াছেন—

Ajuba—কুমায়ুঁর পার্ব্বত্য নদী হইতে সংগৃহীত।

Makiana—বসোরা নগর হইতে আনীত।

Badl-Stone—বামাস্ নদী হইতে আনীত।

Yamini—Yemen হইতে আনীত।

Mungah—আটলান্টিক সমুদ্র হইতে আনীত।

Ghai—Ghore দেশ হইতে আনীত।

Tamrah—গণ্ডক নদী হইতে সংগৃহীত।

Beryl—কান্দাহারের Babu Budhan পর্ব্বত হইতে সংগৃহীত।

Musal—সিনেই পর্ব্বত হইতে আনীত।

গোয়ালিয়র—গোয়ালিয়র নদী হইতে আনীত।

রক্ত প্রস্তর—নানা দেশ হইতে সংগৃহীত।

Jasper—পারস্য দেশ হইতে আনীত।

Dalchana—আসান নামক নদী হইতে আনীত।

তাজমহল নির্ম্মাণকারীদিগের নাম ও মাসিক বেতন :—

১। রোম নগরের একজন খৃষ্টান। ইনি নক্সা (plan) প্রস্তুত করিতে ও চিত্রাঙ্কনে অদ্বিতীয় ছিলেন—মাসিক বেতন ১০০০৲ মুদ্রা।

২। আমানত খাঁ—শেরাজ নিবাসী। ইনি রাজকীয় লিপিদার। মাসিক বেতন ১০০০৲ মুদ্রা।

৩। মহম্মদ জনক খাঁ—স্থপতিদিগের কার্য্য পরিদর্শক ও পরিচালক। মাসিক বেতন ৫০০৲ মুদ্রা।

৪। মুহম্মদ শারিফ নামক একজন খৃষ্টান শিল্পী—মাসিক বেতন ৫০০৲ মুদ্রা।

৫। গম্বুজ-নির্ম্মাতা—ইস্মাইল খাঁ—মাসিক বেতন ৫০০৲ মুদ্রা।

৬। মুহম্মদ খাঁ (বাগ্দাদের অধিবাসী)—একজন কুশলী লিপিদার—মাসিক বেতন ৯০০৲ মুদ্রা।

৭। মোহনলাল—তক্ষণ শিল্পী (mosaic worker) মাসিক বেতন ৫৯০৲ মুদ্রা।

৮। মনোহরলাল—(লাহোরের অধিবাসী)—মাসিক বেতন ৫০০৲ মুদ্রা।

৯। মোহনলাল—(লাহোরের অধিবাসী)—মাসিক বেতন ৯৮০৲ মুদ্রা।

১০। খতম্ খাঁ—(লাহোরের অধিবাসী)—ইনি গম্বুজ-নির্ম্মাতা। মাসিক বেতন ২০০৲ মুদ্রা।

তাজমহল নির্ম্মাণ করিতে মোট চারিকোটী একাদশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার আটশত ছাব্বিশ টাকা সাত আনা ছয় পাই ব্যয় হইয়াছিল।

আর, পি, স্যাণ্ডার্সন।

[শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় নিম্নলিখিত শিল্পীদিগের নামোল্লেখ করিয়াছেন—

কার্য্য-পরিদর্শক—মুকারম্মাত্ খাঁ এবং মীর আবদুল করিম।

শিল্পীগণ—আমনত্ খাঁ শিরাজী। কান্দাহার হইতে আনীত।

ওস্তাদ মিস্ত্রী—ঈশাখ ও আগ্রার স্ববাতি।

ওস্তাদ সূত্রধর—পীরা (দিল্লীনিবাসী)

তক্ষণকারী—বান্নুহার, ঝাট্মল্ এবং জোয়াওয়ার (দিল্লী নিবাসী)

গম্বুজ নির্ম্মিতা—ইস্মাইল খাঁ রুমী

উদ্যান রচয়িতা—রায়মল্ (কাশ্মীর দেশবাসী)

মুম্‌তাজমহলের মৃত্যুর দ্বাদশ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে সম্রাট শাজাহান তাজমহল দর্শন করিতে আসিয়া তাজমহলের রক্ষা ও তথায় অবস্থানকারী পীর ফকিরদের ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত আগ্রা ও নগরচীন্ পরগুণার ৩০টী গ্রাম ওয়াক্ফ স্বরূপ দান করিয়াছিলেন। এই গ্রামগুলি হইতে প্রতি বর্ষে একলক্ষ মুদ্রা কর আদায় হইত। তাজমহলের নিকটবর্ত্তী সরাই এবং দোকানগুলিও এই কার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এই সকল সরাই ও দোকান হইতে প্রতিবর্ষে লক্ষ মুদ্রা আদায় হইত।

১৬৪৮ খৃঃ অব্দে একটী টাকার মূল্য ৩ শিলিং, ৩ পেন্স্ ছিল। এখন একটী টাকার মূল্য যাহা, তখন উহার মূল্য সাতগুণেরও অধিক ছিল। শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় তাঁহার Historical Essays ১৫৭ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে, তাজমহল নির্ম্মাণ করিতে ৫০ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছিল। পাদিশানামা, মুন্তাখুব-উল্‌লুবার প্রভৃতির মতে ইহাই তাজের সমগ্র ব্যয়। দেওয়ানই-আক্রিদির মতে ৯ কোটী ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। স্যান্ডার্সন সাহেব যে পারস্য পুস্তকের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার মতে মোট ব্যয়—৪ কোটী ১১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৮২৬ টাকা সাত আনা ছয় পাই।]

গৌড়বঙ্গে ষোড়শ শতাব্দী

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী এম-এ, বি-এল

বাঙ্গালার অনেক শতাব্দী আছে। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পরের বাঙ্গালী তাহার অতীত-শতাব্দীগুলিকে অতি আশ্চর্য্য রকমে ভুলিয়া

গিয়াছে। বাঙ্গালীর আত্ম-বিস্মরণ শুধু তাহার বৌদ্ধ-যুগ সম্বন্ধে নহে,—বৈষ্ণব-যুগ সম্বন্ধেও।

বাঙ্গলার ষোড়শ শতাব্দীকে বৈষ্ণব-যুগ বলা যায় কি না, ইহা লইয়া বহু বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। এই শতাব্দীর স্মরণীয় ঘটনাগুলির যথাযথভাবে আলোচনার পূর্ব্বে সহসা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুঃসাহসের কার্য্য।

বাঙ্গলার ষোড়শ শতাব্দীর যখন প্রথম প্রভাত—তখন চৈতন্যদেব টোলে শাস্ত্রাধ্যয়নে ব্যাপৃত, তাঁহার বয়ঃক্রম তখন পঞ্চদশ বর্ষ। গৌড়ের তক্তে হোসেন খাঁ সমুপবিষ্ট, দিল্লীর সিংহাসনে শিকন্দার লোদী। পঞ্চদশ শতাব্দীতে চণ্ডীদাস যে অমর-গীতি গাহিয়া গিয়াছেন, ষোড়শ শতাব্দীর প্রভাত সেই গীতধ্বনিতেই মুখরিত। চৈতন্যদেব ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে ২৪ বৎসর বয়স সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। ইহার অনতিকাল পরেই পূর্ণানন্দগিরি পরমহংস ও কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ নবদ্বীপে তন্ত্রের উদ্ধার কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন; রঘুনন্দন স্মৃতির সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিলেন। রঘুমণি, গঙ্গেশ উপাধ্যায় কৃত "চিন্তামণি" গ্রন্থের টীকা করিলেন। এই সর্ব্বজনবিদিত টীকার নাম দীধিতি,—ইহাই বাঙ্গলার নব্য ন্যায়। সমগ্র ষোড়শ শতাব্দী এবং তাহার পরেরও ব হু শতাব্দী আলোক পথ দেখাইয়া চলিবে, এই কালের মধ্যেই তাহার উন্মেষ আমরা দেখিতে পাই। বাঙ্গালী-সভ্যতার যাহা কিছু বিশেষত্ব,—এই কালের মধ্যেই তাহা নূতন সুরে ও নূতন রূপে ফুটিতে আরম্ভ করে। ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে বাঙ্গালী সভ্যতার একটা বিশেষত্ব আছে। বাঙ্গালী-সভ্যতার প্রত্যেক বিভাগেই এই বিশেষত্বের ছাপ এই শতাব্দীর উন্মেষ-কাল হইতে পরিস্ফুট হইয়া শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রকট হয়। যে শতাব্দী শ্রীচৈতন্যদেবের শৈশব ও কৈশোর লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, সে শতাব্দীর অন্তর্নিহিত শক্তি অপরিমেয়।

কুলুক ভট্ট ও জীমূতবাহন চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমে ও শেষে প্রাচীন স্মৃতির যে টীকা গৌড়বঙ্গে প্রচলিত করিয়া যান, ষোড়শ শতাব্দীতে পুনরায় তাহার পরিবর্ত্তন ও সংস্কারের প্রয়োজন হয়। জীমূতবাহন স্মৃতির সংস্কারে ব্যবহার অধ্যায়ে বাঙ্গালীকে দায়ভাগ উপঢৌকন দিয়া গিয়াছেন। মিতাক্ষরা হইতে দায়ভাগের বিশেষত্বই ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে বাঙ্গলার বিশেষত্ব। পরিবারের মধ্যে ব্যক্তির স্বাধীনতা মিতাক্ষরা হইতে দায়ভাগে অনেক বেশী। যে কার্য্য জীমূতবাহন আরম্ভ করিয়াছিলেন, ষোড়শ শতাব্দীতে রঘুনন্দন তাহা অনেকদূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। ব্যবহার-ক্ষেত্রে আইনের দুইটী বিভাগ—প্রথম, বিধি নিবদ্ধ করা, অর্থাৎ আইন গঠন করা; দ্বিতীয়, সেই আইন কিরূপে বিচারালয়ে প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা নিরূপণ করা। এই দ্বিতীয় বিভাগে রঘুনন্দন সাক্ষীর পরীক্ষা, অপরাধীর বিচার, রাজ-কর্ম্মচারীর ব্যবহার অতি সূক্ষ্ম রূপে আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু ব্যবহার অপেক্ষা আচার ও প্রায়শ্চিত্ত বিভাগে তিনি অধিকতর ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতের অন্য কোন প্রদেশের কোন স্মার্ত্ত পণ্ডিত এই ক্ষেত্রে রঘুনন্দন অপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। পঁচিশ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হয়। বৌদ্ধ-বিপ্লবের পর বাঙ্গালী হিন্দু এই গ্রন্থের বেদীর উপরই তাহার প্রাচীন বর্ণাশ্রমের নবকলেবর প্রতিষ্ঠা করে। এই গ্রন্থের আদেশ পালন করিয়াই বৌদ্ধ বাঙ্গালী আজ হিন্দু বলিয়া নিজের পরিচয় দিতে পারে। রঘুনন্দন তাঁহার অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে কাশী, মিথিলা প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মের বড়-বড় কেন্দ্র পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে অনেক প্রাচীন মতের খণ্ডন আছে, দেশ-কালের উপযোগী অনেক নূতন মতেরও প্রবর্ত্তন দেখা যায়। এই গ্রন্থে বাঙ্গালী-সমাজের সমস্ত ক্রিয়া-কলাপই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গর্ভাধান হইতে শ্রাদ্ধ, জলাশয় হইতে মঠ প্রতিষ্ঠা—কিছুই বাকী থাকে নাই। ইহা কর্ম্মকাণ্ড, সন্দেহ নাই। সকাম কর্ম্মের অবসর থাকিলেও যেমন মন্বাদির স্মৃতিতে নিবৃত্তিমূলক কর্ম্মকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, এই গ্রন্থেও পরিশেষে সেই নিষ্কাম কর্ম্মের উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে, ইহা জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয়।

বাঙ্গলার স্মৃতি তাহার দার্শনিক ভিত্তির জন্য বাঙ্গলার ন্যায়-দর্শনের আশ্রয় লইয়াছে। ইহা বাঙ্গলার ন্যায়,—জৈমিনীর পূর্ব্ব-মীমাংসা নহে। বাঙ্গলার ন্যায়, আস্তিক্য দর্শন—ইহার মূলে ঈশ্বরে বিশ্বাস নিহিত। এই ন্যায়-দর্শন কেবল পদার্থ-বিদ্যা নহে,—কেবল প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান নহে;—কেবল দ্বৈতবাদমূলক নহে। ইহাতেও মিথ্যা জ্ঞান দূর করিয়া, পরিণামে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করাই জীবের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। বাঙ্গলার ন্যায় বাঙ্গলার স্মৃতির সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে আবদ্ধ। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই ন্যায়-দর্শনকে মৈথিলি ন্যায়ের দাসত্ব হইতে বাঙ্গালী উদ্ধার করিয়া আনিয়াছে।

যিনি এই কার্য্য করিয়াছেন, তিনি একচক্ষুহীন ছিলেন। এইজন্য তিনি কানাভট্ট শিরোমণি বলিয়া কথিত হইতেন। রঘুমণির অপূর্ব্ব ন্যায়গ্রন্থ দীধিতি প্রচারিত হইবার পর, নবদ্বীপ সরস্বতীর পীঠস্থান হইয়া উঠিল। এই একখানি গ্রন্থ পাঠ করিবার জন্য কাশী, মিথিলা, কাঞ্চী, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, তৈলঙ্গ ও পাঞ্জাব তাহাদের বিশিষ্ট অধ্যাপক-দিগকে নবদ্বীপে পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। এই মহাগ্রন্থের মঙ্গলা-চরণের প্রথম শ্লোকটী এইরূপ:—

"ও নম সর্ব্বভূতানি বিষ্টভ্য পরিতিষ্ঠতে।
অখণ্ডানন্দ বোধায়, পূর্ণায় পরমাত্মনে।"

প্রাচীন ন্যায়কে ভাঙ্গিয়া যে অমানুষিক প্রতিভা বাঙ্গলায় নব্য-ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছে, সেই প্রতিভার পরিমাণ আজ কে করিবে। এই প্রতিভা বৈশেষিক দর্শনে "পদার্থতত্ত্ব নিরূপণ" করিয়া গিয়াছে, মনোবিজ্ঞানে 'আত্মতত্ত্ববিবেক' লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া, নঞর্থবাদ, প্রামাণ্যবাদ, নানার্থবাদ, ক্ষণভঙ্গুরবাদ, আখ্যাতবাদ প্রভৃতি দার্শনিক তত্ত্বের উদ্ভাবন ও মীমাংসা করিয়া গিয়াছে।

এই শতাব্দীর প্রথমেই হরিদাস ন্যায়ালঙ্কার উদয়নাচার্য্য-প্রণীত 'কুসুমাঞ্জলীর' পদ্যাংশের টীকা প্রণয়ন করেন। 'কুসুমাঞ্জলীর'

কারিকা-ব্যাখ্যা 'হরিদাসী টীকা' বলিয়া বিখ্যাত। ইহা ব্যতীত পক্ষধর মিশ্র কৃত 'চিন্তামণি' পুস্তকের 'আলোক' নামক টীকাও তিনি প্রণয়ন করেন। পুরীর শঙ্করমঠে হরিদাসের অনুমানালোক, শব্দালোক ও প্রত্যক্ষালোক নামে তিনখানি পুঁথি আছে।

শতাব্দীর শেষভাগে ন্যায়ের ভূমিতে আমরা রঘুমণির দুইটী উপযুক্ত ছাত্রকে দেখিতে পাই। রামভদ্র 'কুসুমাঞ্জলীর' টীকা করেন এবং মথুরানাথ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারিখণ্ড চিন্তামণির টীকা ও পক্ষধর মিশ্রের ময়ালোক প্রভৃতি টীকা করেন।

জগদীশ ও গদাধর ষোড়শ শতাব্দীর এই আলোক সপ্তদশ শতাব্দীতে মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের মত প্রজ্বালিত করিয়া তোলেন।

স্মৃতি ও দর্শনের ভূমি অতিক্রম করিয়া আমরা বাঙ্গালীর সাধন-ধর্ম্মের ভূমিতে পৌঁছিবার পথেই দেখিতে পাই, তন্ত্র সমস্ত বঙ্গভূমিকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। বৌদ্ধ-সম্মানের শেষ জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ড নির্ব্বাপিত হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই বাঙ্গলার মহা ভৈরবগণ শবসাধনায় উপবিষ্ট হইয়া যান। ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতেই বাঙ্গালী তন্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু আমাদের আলোচ্য ষোড়শ শতাব্দী। এই শতাব্দীর প্রারম্ভেই পূর্ণানন্দগিরি পরমহংস ষট্‌চক্রভেদ, বামাকেশ্বর তন্ত্র, শ্যামারহস্য তন্ত্র ও শাক্তক্রমতন্ত্র প্রণয়ন করেন। পরে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ বৃহৎ তন্ত্রসার গ্রন্থ সঙ্কলন করেন, শ্রীতত্ত্ববোধিনীও তাঁহারই রচিত। ইহারা উভয়েই সিদ্ধপুরুষ ছিলেন; তন্ত্রে সিদ্ধপুরুষ ব্যতীত কেবল পাণ্ডিত্যের অবসর বা প্রশ্রয় নাই। কৃষ্ণানন্দ আগম-বাগীশ কার্ত্তিকী অমাবস্যায় শ্যামাপূজার প্রবর্ত্তক। কথিত আছে যে, জগদ্ধাত্রী ও কার্ত্তিক পূজাও তাঁহার সময় হইতেই প্রচলিত হইয়াছে। কার্ত্তিকী অমাবস্যার শ্যামাপূজা পূর্ব্বে ঘটে হইত। মূর্ত্তির প্রচলন আগমবাগীশের কীর্ত্তি। তথাপি, তান্ত্রিক মাত্রেই জানেন, মূর্ত্তি অপেক্ষা ঘট অধিক প্রয়োজনীয়। মূর্ত্তি না হইলেও চলিতে পারে, কিন্তু ঘট অপরিহার্য্য। সাত্ত্বিকমতে তান্ত্রিক পূজার প্রবর্ত্তনও আগমবাগীশ মহাশয় করেন। বাঙ্গলায় সমস্ত পূজা-পদ্ধতির মধ্যে বোধন, তত্ত্বশুদ্ধি, ধ্যান, ন্যাস, তান্ত্রিক মতেই হইয়া থাকে। দীক্ষা ও উপাসনা তান্ত্রিক মতে চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং তন্ত্রই বাঙ্গালীর ধর্ম্মের সাধারণ ভিত্তি, তন্ত্রই বাঙ্গালীর বেদ। তন্ত্র ছাড়িয়া বৈষ্ণবের ভূমিতে আসিলে দেখা যাইবে যে, ইহা এক প্রবল প্রচণ্ড প্রবাহ, যাহা একদিন ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে নবদ্বীপ হইতে উত্থিত হইয়া, বাঙ্গলার সীমা অতিক্রম করিয়া, কাশী জয় করিয়া, বৃন্দাবন প্রতিষ্ঠা করিয়া, দ্রাবিড় আক্রমণ করিয়া, উৎকলে গুরুর আসন গ্রহণ করিয়াছিল। বৌদ্ধ-তরঙ্গের পর নিখিল-ভারতে এতবড় ধর্ম্ম তরঙ্গ আর উত্থিত হয় নাই। ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালী ইহা করিয়াছিল, বাঙ্গালী ইহা পারিয়াছিল। এক শ্রেণীর শাক্ত ও মুসলমান কাজীর নিকট এই তরঙ্গ প্রথমতঃ বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু তৃণ হইতেও সুনীচ হইয়া, তরু হইতে সহিষ্ণু হইয়া, অমানীকে মান দিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতে-করিতে এ যৌবন-জল-তরঙ্গ ধর্ম্মজগতে মাতালের কলসীর কানার আঘাতে, পরাক্রমশালী ভিন্নধর্ম্মী রাজশক্তির তরবারির আঘাতে, রক্তাক্ত কলেবরে স্মিতহাস্যে অশ্রু-স্বেদ-পুলক-কম্প লইয়া ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিল।

রায় রামানন্দ সংবাদে, রায় রামানন্দকে মহাপ্রভু প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। রামানন্দ কহিতে লাগিলেন, জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি সকলই বাহিরের কথা; দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ইহাও বাহিরের; কান্তভাব ইহা উত্তম। ইহার পরেও প্রশ্ন হইল। রায় কহিলেন, ইহার পরের কথা জিজ্ঞাসা করে, জগতে এমন লোক আছে বলিয়া জানিতাম না। 'রায় কহে আর বুদ্ধি-গতি নাহিক আমার।' বুদ্ধির অগম্য, রাধাকৃষ্ণের বিলাস বিবর্ত্তের সেই কথা ভাবে বিভোর হইয়া রায় বলিতে লাগিলেন, মহাপ্রভু শুনিতে লাগিলেন।

"পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল
না সো রমণ, না হয় রমণী
দুহুঁ মন মনোভব পেশল জানি"।

ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গলার ইহাই মর্ম্মকথা। সাহিত্য-পদকর্ত্তাগণ—গোবিন্দদাস ও লোচনদাস—এই প্রেমধর্ম্মের নীতি বাঙ্গালীর ঘরে-ঘরে বিলাইতে লাগিলেন। করচা, চৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্য-মঙ্গল মহা-প্রভুর জীবনের লীলা প্রকাশিত হইল। চৈতন্যচরিতামৃত ইহার পরবর্ত্তী শতাব্দীতে প্রকাশিত হইলেও এই শতাব্দীর রচনা। এই শতাব্দীর শেষভাগেই ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে সন্তোষদত্ত ছয়টী বিগ্রহ স্থাপন করিয়া খেতুরীতে যে উৎসব করেন, তাহাই ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গলার "কুম্ভ", তাহাই বাঙ্গালী-বৈষ্ণবের ইতিহাসে স্মরণযোগ্য সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ধর্ম্মমেলা। সাহিত্যে, এই শতাব্দীর বাঙ্গালী, কবিকঙ্কণের চণ্ডীপাঠ করিতে পাইয়াছিল, মনসার ভাসান গাহিয়াছিল।

রাষ্ট্রক্ষেত্রে, গৌড়ের তক্তের উপর পাঠান ও মোগল দিল্লী ও আগ্রা ছাড়িয়া আসিয়া কয়েক দিনের জন্য বসিয়া গিয়াছেন। সাম্রাজ্যের সিংহাসন ছাড়িয়া গৌড়ের তক্তে বসিবার প্রয়োজন হুমায়ুন ও শেরশা উভয়েই অনুভব করিয়াছিলেন। বাঙ্গলায় তখন রাজনীতি ছিল। শতাব্দীর প্রথমে হুসেন সাহ, রূপ ও সনাতন এই দুই বাঙ্গালী মন্ত্রী দ্বারা বাঙ্গলা শাসন করিয়া গিয়াছেন। শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে শেরশা'র রাজত্ব শেষ হইবার পর, আকবর, টোডরমল্ল ও মানসিংহ দ্বারা বাঙ্গলার পাঠান ও বাঙ্গলার হিন্দু জমীদারদিগকে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য লক্ষাধিক শ্রেষ্ঠ সৈন্য পাঠাইয়া অর্দ্ধশতাব্দী ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গলার জমীদার তখন সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। রাষ্ট্রক্ষেত্রে ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালী যে যুদ্ধ করিয়াছে, তাহা ইতিহাসে ছোট যুদ্ধ নহে।

যে শতাব্দীতে প্রতাপাদিত্য যুদ্ধ করিয়াছেন, কবিকঙ্কণ চণ্ডী গাহিয়াছেন, বৈষ্ণবাচার্য্যগণ অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, মহাপ্রভু ধর্ম্ম বিলাইয়াছেন, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তন্ত্রসার গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, রঘুমণি দীধিতি প্রণয়ণ করিয়াছেন এবং রঘুনন্দন অষ্টা-বিংশতিতত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সে শতাব্দীর আলোচনার জন্য

একখানা বৃহৎ পুঁথি লেখার প্রয়োজন, কোন এক বক্তৃতায় প্রবন্ধে তাহা সম্ভবপর নহে।

ষোড়শ শতাব্দীর বিশেষত্ব এই যে, ইহা বাঙ্গালী সভ্যতার বৈশিষ্ট্যকে সমস্ত বিভাগেই সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছিল। যদি কেহ বাঙ্গালী বা বাঙ্গলার সভ্যতার বিষয় জানিতে চাহেন, তবে তাঁহাকে এই শতাব্দীর ইতিহাসই অধ্যয়ন করিতে হইবে।

এই শতাব্দীতে এমন সমস্ত বড়-বড় আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে, এমন সমস্ত সমস্যা উদ্ভাবন করা হইয়াছে, যাহা আজ এই বিংশ শতাব্দীকেও পরিচালিত করিতেছে। এই শতাব্দীতে বাঙ্গালী সভ্যতার সমস্ত দিক একসঙ্গে পরিপুষ্ট হইয়া, এক বিরাট সত্বায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এমন সমস্ত নূতন আদর্শ এই শতাব্দীর নিকট হইতে বাঙ্গালী পাইয়াছে, যাহা আয়ত্ত করিতে পরবর্ত্তী চারিটী শতাব্দী ব্যয়িত হইতে চলিল, অথচ বাঙ্গালী জীবন অদ্যাপি তাহা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারিল না। এই শতাব্দীর আদর্শ লইয়া পরবর্ত্তী চারিটী শতাব্দীতে যে সমস্ত ঐতিহাসিক আন্দোলন হইল, যে সমস্ত কৃতী মহাপুরুষ আসিয়া দেখা দিলেন, তাঁহারা কেহই এই শতাব্দীর আদর্শকে কোন্ দিক হইতে অতি সামান্য পরিমাণেও মলিন বা নিষ্প্রভ করিতে পারিলেন না।

প্রশ্ন উঠিয়াছে, এই শতাব্দীকে বৈষ্ণব যুগ বলিয়া অভিহিত করা যায় কি না? মহাপ্রভুর লীলা যে কোন জাতির মধ্যে যে কোন শতাব্দীতে প্রকাশিত হইলে ঐতিহাসিকগণ নিশ্চয়ই তাহাকে বৈষ্ণব-যুগ বলিয়া নিঃসন্দেহে অভিহিত করিতেন। কিন্তু বাঙ্গালী-সভ্যতার দর্শন ও স্মৃতি অধ্যায় এই শতাব্দীতে যে অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে, তাহার ঐতিহাসিক গুরুত্বও কম নহে। তথাপি ইহাকে রঘুমণির বা রঘুনন্দনের যুগ বলিয়া অভিহিত করিলে, এই শতাব্দীর উপর সুবিচার করা হইবে না। কোন জাতির বিশেষ শতাব্দীকে তাহার সম্পূর্ণ ইতিহাস হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আলোচনা করা না গেলেও, ঐ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য লইয়া আলোচনা চলিতে পারে। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর বিশেষত্ব এই যে, এই শতাব্দীতে বাঙ্গালী-সভ্যতার প্রত্যেক বিভাগই পরিপূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। সভ্যতার বিভাগগুলির একটি হইতে অন্যটি বিচ্ছিন্ন নহে; জীব-শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত একাঙ্গ ও অবিচ্ছিন্ন। জীবদেহে যৌবন আসিলে যেমন সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একসঙ্গে পরিপুষ্ট ও বলীয়ান হইয়া উঠে, এবং সমস্ত দেহ-সৌন্দর্য্য যেমন এক অখণ্ড সত্তায় প্রতিভাত হয়, ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে তেমনই এক যৌবনের জোয়ার আসিয়াছিল। জাতীয় জীবনের সমস্ত বিভাগই সম্যক্ পরিপুষ্ট হইয়া এক অখণ্ড বাঙ্গালী-সভ্যতাকে বাঙ্গলার ইতিহাসে অমর করিয়া গিয়াছে। সভ্যতার কোন বিশেষ বিভাগের যুগ বলিয়া এই শতাব্দীকে অভিহিত করিলে, সভ্যতার প্রত্যেক বিভাগের মধ্যেই যে এক অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে, তাহাকে অস্বীকার করা হইবে এবং বাঙ্গালী-সভ্যতার যে এক অখণ্ড পূর্ণ রূপ আছে, তাহাকেও অবমাননা করা হইবে। আমার মনে হয়, এই শতাব্দী কেবল বৈষ্ণবের নহে, কেবল শাক্তের নহে, কেবল নৈয়ায়িকের নহে, কেবল স্মার্ত্তের নহে, কেবল সাহিত্যিকের নহে, কেবল রাষ্ট্রীয় বীরেরও নহে, অথচ ইহা পূর্ণ রকমে প্রত্যেকের, এবং এক অখণ্ড সত্তায় ইহা পরিপূর্ণ রূপে সকলের। বাঙ্গলার ষোড়শ শতাব্দী বাঙ্গলার জাতীয় জীবনে স্বরূপের আত্মপ্রকাশ এবং এই আত্মপ্রকাশের গৌরবে বাঙ্গালী এক জগৎবরেণ্য মহিমময় জাতি।

চণ্ডীদাসের পদ

(জিজ্ঞাসার উত্তর)

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম-এ

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন মহাশয় গত পৌষের "ভারতবর্ষে" "চণ্ডীদাসের পদ" নাম দিয়া একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদিগের সম্পাদিত "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী" গ্রন্থের ভূমিকায় আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের সনাতন গোস্বামী প্রণীত বৈষ্ণব-তোষণী টীকা হইতে চণ্ডীদাসের 'দানখণ্ড' ও 'নৌকাখণ্ড' সম্বন্ধে মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া বসন্ত বাবুর আবিষ্কৃত "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" পুঁথির অকৃত্রিমতার আর একটি বিশিষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন এবং চণ্ডীদাসের ভণিতা-যুক্ত প্রচলিত পদাবলির কৃত্রিমতা সিদ্ধান্ত করিয়া, উহার উৎপত্তি সম্বন্ধে—"শ্রীচৈতন্য-প্রভুর প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের সহিত সহজিয়াদিগের পরকীয়া-সাধনা মিশিয়া বাঙ্গালায় যে অজ্ঞাতনামা কবি-সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছিল, আমা-দিগের বিশ্বাস তাঁহারাই আদি ও শ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তা চণ্ডীদাসের নামে এই পদগুলি চালাইয়া গিয়াছেন।" মন্তব্য লিখিলে, হরেকৃষ্ণ বাবু আমা-দিগের ঐ মন্তব্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"এই ভয়াবহ বিশ্বাস যে রায় মহাশয়ের কিরূপে হইল, তিনি তাহার কোন প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই। আমরা তাঁহার ন্যায় প্রাচীন পণ্ডিত ব্যক্তিকে এইরূপ দায়িত্বহীন মত প্রকাশ করিতে দেখিয়া বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছি। যে সূত্রের বলে তিনি পদাবলী সাহিত্যের স্বরূপ-নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন, এখানে তাহার কোনটীর প্রয়োগ চলিতে পারে? শ্রীচৈতন্যের প্রেম-ধর্ম্ম প্রচারের পর উদ্ভূত ঐ তথাকথিত অজ্ঞাতনামা কবি-সম্প্রদায়ের কোন্ পরিচয় উহাতে পাওয়া যায়? রাগাত্মিকা পদগুলি ভিন্ন নীলরতন বাবুর সংগৃহীত পদে সহজিয়ার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় কি? উহা ভক্ত-ভাব অথবা সখী-ভাব, কোন্ ভাবের দ্যোতনা প্রকাশ করে, এবং সে হিসাবে পদগুলি শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী না পরবর্ত্তী কালের রচিত? পণ্ডিত ও রসজ্ঞ কীর্ত্তনিয়ার হাতে পড়িয়া ক্রমশঃ মার্জ্জিত হওয়ার যে মন্তব্য রায় মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন, সব ক্ষেত্রেই কি তাহা প্রয়োগ করিতে পারি? নীলরতন বাবুর সংগৃহীত প্রায় ছয় শত পদ তো ইতঃপূর্ব্বে অপ্রকাশিতই ছিল; সুতরাং পণ্ডিত ও কীর্ত্তনিয়ার হাতে সেগুলি যে মার্জ্জিত হয় নাই, ইহা ত স্বীকার করিতেই হইবে। এখন প্রাচীন গ্রন্থে সংগৃহীত তথাকথিত ক্রমশঃ মার্জ্জিত ঐ পদগুলির সঙ্গে

নীলরতন বাবুর সঙ্কলিত পদাবলীর অন্ততঃ অধিকাংশেরও যদি ভাষা ও ভাবের একটা সামঞ্জস্য পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেগুলিকে উক্ত অজ্ঞাতনামা কবি-সম্প্রদায়ের একটা দলের রচনা না বলিয়া একজন কবির রচনা বলা যাইতে পারে কি না? চণ্ডী-মঙ্গল, মনসা-মঙ্গল, ধর্ম্ম-মঙ্গল প্রভৃতি যে কোন বিষয়েই একাধিক কবি লেখনী চালনা করিয়া গিয়াছেন, সেই-সেই বিষয়েই একজন আর একজনের অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়াছেন, ইহা সত্য। তথাপি মাধবাচার্য্য ও মুকুন্দরাম, ক্ষমানন্দ, কেতকাদাস ও বিষ্ণু পাল, ময়ুরভঞ্জ, (ময়ুরভট্ট?) মাণিক গাঙ্গুলী ও ঘনরাম প্রভৃতির পার্থক্য নির্ণয় করা যায় না, এমন কথা বোধ হয় কেহই বলিবেন না। দেশ ও কালগত পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সমসাময়িক সাহিত্য, কবির জীবন-কথা ও রচনার ধারা ইত্যাদি বিষয় একটু অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করিলেই, মৌলিকতার, কবিত্বের এবং অনুসরণ-অনুকরণের মীমাংসা হইতে পারে। এই হিসাবে চণ্ডীদাসের বৈশিষ্ট্য নির্ণীত হইতে পারে কি না? আরও জিজ্ঞাস্য—শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের মত বিরাট গ্রন্থের সমস্ত পদই বিলুপ্ত হইয়া গেল কখন এবং কি প্রকারে? শ্রীচৈতন্য প্রভুর প্রেম-ধর্ম্ম প্রচারের পর সহজিয়া ও পরকীয়ায় মিলিয়া যদি তথাকথিত চণ্ডীদাস ছদ্ম-নামধেয় কবি-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়া থাকে, তাহা হইলে জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতির পদাবলী ক্রমশঃ মার্জ্জিত হইবার কারণ কি? শ্রীচৈতন্য দেব চণ্ডীদাসের পদাবলী শ্রবণ কীর্ত্তনে আনন্দলাভ করিতেন। সুতরাং ইহা অনুমান করা অন্যায় নহে যে, তিনি যে চণ্ডীদাসের পদের অনুরাগী ছিলেন, তাঁহার ভক্তগণের পক্ষে সেই চণ্ডীদাসের প্রতি প্রীতি প্রকাশই স্বাভাবিক। এবং এই ভক্ত-পরম্পরায় চণ্ডীদাসের দুই-চারিটী সংগীতও সে সুপ্রচলিত হইয়া আসিতেছিল, এ অনুমানও বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। সুতরাং প্রাচীন পদকর্ত্তাগণ যে খাঁটী চণ্ডীদাসের পদই সংগ্রহ করিয়াছিলেন, ইহা একরূপ দৃঢ়তার সহিতই বলিতে পারা যায়। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের একটি পদও আমাদের এই অনুমানের সমর্থন করিতে পারে। নীলরতন বাবুর পদাবলীর ২৬৭ সংখ্যক পদের এক-স্থানে আছে—

"মিলাইছে শিলারাজি চকিত হইল শশী,
মোর কাছে নাচিছে আসিয়া।
নারীর যৌবন ধন তাতে তার আছে মন
তেঁই পুরে হাসিয়া হাসিয়া॥"

এইবার শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের "নারীর যৌবনধন যাতে কৃষ্ণের হরে মন" স্মরণ করুন। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের একটীও পদ প্রাচীন সংগ্রহ-গ্রন্থে স্থান লাভ করিল না কেন? পদাবলীর দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের পদের সহিত শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের পদের এত পার্থক্য কেন? ইহার মধ্যে কোন্ রচনা আসল চণ্ডীদাসের বলিয়া মনে হয়? আশা করি, সুপণ্ডিত রায় মহাশয় এবং শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের সমর্থকগণ আমাদের জিজ্ঞাসার সদুত্তর দানে অনুগৃহীত করিবেন।"

হরেকৃষ্ণ বাবু তাঁহার প্রবন্ধের স্থানান্তরে লিখিয়াছেন—"অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলীর পাণ্ডিত্য ও গবেষণা-পূর্ণ ভূমিকায় রায় মহাশয়—সুপ্রসিদ্ধ "বৈষ্ণব-তোষণী"-টীকাকার সনাতন গোস্বামীর "কাব্যশব্দেন পরম বৈচিত্রী তাসাং সূচিতাশ্চ গীতগোবিন্দাদি প্রসিদ্ধাস্তথা শ্রীচণ্ডী দাসাদি দর্শিত দানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদি প্রকারাশ্চ জ্ঞেয়া" এই উক্তি উদ্ধৃত করিয়া, পদামৃত-সমুদ্র, পদ-কল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহ-গ্রন্থে চণ্ডীদাসের দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের কোন পদ নাই, অথচ শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের প্রথমেই দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের বহু পদ সন্নিবেশিত আছে; অতএব শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন খাঁটী চণ্ডীদাসের—এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য, নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসে দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের যে সমস্ত পদ রহিয়াছে, সেগুলি কি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই? দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের পদই যদি প্রাচীন তত্ত্ব (প্রাচীনত্ব?) ও খাঁটী চণ্ডীদাসত্বের প্রমাণ হয়,—তবে তো নীলরতন বাবুর "চণ্ডীদাসই" তাহা সর্ব্বাগ্রে দাবী করিতে পারে। "চণ্ডীদাসে" দানখণ্ডের ৪০টী এবং নৌকাখণ্ডের ৭টী পদ রহিয়াছে। পদগুলির প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোনরূপ অসামঞ্জস্য বা অসঙ্গতি নাই। সুতরাং সেগুলিকেও দুইটী স্বতন্ত্র পালা রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। দানখণ্ডের "পসরা নামাও রাধা" এবং "সোণার বরণখানি, মলিন হয়েছে তুমি" পদ দুইটী এতই কবিত্বপূর্ণ যে, পাঠ করিয়া কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের "ওগো পসারিণী দেখি আয়" কবিতাটী মনে পড়ে।

আমরা এখানে হরেকৃষ্ণ বাবুর সকল জিজ্ঞাসারই সদুত্তর দিবার চেষ্টা করিব; কিন্তু তৎপূর্ব্বে এই চণ্ডীদাস-সমস্যার উৎপত্তির কথাটা সংক্ষেপে একটু বলিয়া লওয়া আবশ্যক।

বসন্ত বাবুর আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন" সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বে চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে কাহাকেও বড়-একটা সন্দেহ করিতে দেখা যায় নাই। কিন্তু "চণ্ডীদাস" ভণিতাযুক্ত পদাবলীর মধ্যে অনেকগুলি অতি অকিঞ্চিৎকর পদ আছে,—সেগুলির মধ্যে চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠ পদাবলীর লক্ষণ মোটেই লক্ষিত হয় না—ইহা বহুকালব্যাপী আলোচনার ফলে আমাদিগের উপলব্ধি হওয়ায়, আমরা সর্ব্বপ্রথমে ১৩২০ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২য় সংখ্যায় "প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্ত্তৃগণ" শীর্ষক প্রবন্ধের অন্তর্গত "চণ্ডীদাস" প্রসঙ্গে চণ্ডীদাসের পদাবলীর সংখ্যা ও প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করি। সে সময়ে শ্রীযুক্ত নীলরতন বাবুর সম্পাদিত "চণ্ডীদাস" প্রকাশিত হয় নাই; তবে আমাদিগের ঐ আলোচনা "পদামৃত-সমুদ্র" "পদ-কল্প-তরু" প্রভৃতি প্রাচীন সংগ্রহ-গ্রন্থের উদ্ধৃত এবং রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলী-বিষয়ক বটে। চণ্ডীদাসের কোন্‌গুলি খাঁটী পদ ও কোন্‌গুলি কৃত্রিম পদ তাহা নির্ণয় করিবার জন্যে ছয়টি মূল-সূত্রে স্থির করিয়া সূত্র অনুসারে "চণ্ডীদাস-ভণিতার বহু সংখ্যক পদই আমরা কৃত্রিম বলিয়া সিদ্ধান্ত করি। ১৩২১ সালের পরিষৎ-পত্রিকার ২য় সংখ্যায় স্বর্গ-গত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় তাঁহার "চণ্ডীদাসের

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মলীলা শীর্ষক প্রবন্ধে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত 'শ্রীকৃষ্ণ জন্মলীলা" নামক একখানা প্রাচীন পুঁথির পরিচয় সবিস্তারে প্রদান করিয়া, উপসংহারে লিখেন—"শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম-এ মহাশয় ২৮শে ভাগ ২য় সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকায় চণ্ডীদাসের কবিত্ব সমালোচনায় বলিয়াছেন যে, চণ্ডীদাসের রচনায় অনেক ভেল চলিয়া গিয়াছে। সেগুলি ধরিবার উপায়ও তিনি কতক-কতক বাহির করিয়াছেন। পরিষৎ হইতে চণ্ডীদাসের সমগ্র পদাবলী প্রকাশিত হইলে, সে সকল পরীক্ষার সুবিধা হইবে। "ভাষার যে নমুনা দিলাম, তাহাতে জন্মলীলায় কবি চণ্ডীদাসকে কবিকঙ্কণের পাশাপাশি লইয়া গেলে অন্যায় হইবে না। পুঁথিখানিরও বয়স দেড়শত বর্ষের অধিক হইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্য প্রমাণ পাওয়া না যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পদাবলীর চণ্ডীদাস, কলঙ্কভঞ্জনের চণ্ডীদাস ও জন্মলীলার চণ্ডীদাসকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়াই ধরিয়া রাখা উচিত। কৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাস ও পদাবলীর চণ্ডীদাসকে যত ঘনিষ্টভাবে এক বলিয়া অনুভব করিতে পারা যায়, এবং উভয় শ্রেণীর পদাবলীতে রচনা-রীতি ও পদ-বিন্যাসের যতটা সাদৃশ্য দেখা যায়, ততটা অন্য চণ্ডীদাসদিগের মধ্যে দেখা যায় না।

"যাহা হউক, বাঙ্গালা সাহিত্যে এতদিন চণ্ডীদাস নামের কবির যোড়া ছিল না, এই কয় বৎসরের মধ্যে একবারে দেড় জোড়া অর্থাৎ তিনজন অথবা দুই যোড়া বা চারিজন চণ্ডীদাস পাওয়া গেল।"

অতঃপর পদাবলী-সাহিত্যের যুগান্তরকারী "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন" প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থের মুখ-বন্ধে মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়া লেখেন—"তবে সত্যই কি এই ভাষাই চণ্ডীদাসের ভাষা? যে চণ্ডীদাসের ভাষার ধ্বনি এতকাল আমাদিগের কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া আকুল করেছে মোদের প্রাণ—এই ভাষা কি সেই চণ্ডীদাসের? এতকাল তবে আমরা সে ভাষার সুরে মুগ্ধ, অভিভূত, অবসন্ন হইতেছিলাম. সে ভাষা কি চণ্ডীদাসের নিজের ভাষা নয়? একই চণ্ডীদাস কখনও এই দুই ধরণের ভাষায় কথা কহিতে পারেন না। তবে কি আমাদের চির-পরিচিত চণ্ডীদাস, আর এই নবাবিষ্কৃত চণ্ডীদাস, এক চণ্ডীদাস নহেন? চণ্ডীদাস কি দুইজন ছিলেন? দুইজনেই বড়ু চণ্ডীদাস, বাশুলীর আদেশে গান-রচনায় নিপুণ, রামী রজকিনীর বঁধু। তাহা ত হইতে পারে না। একজন তবে কি আসল, আর একজন নকল? কে আসল, কে নকল? ইত্যাদি নানা সমস্যা, নানা প্রশ্ন, বাঙ্গলা সাহিত্যে উপস্থিত হইবে। সেই সকল সমস্যার মীমাংসায় আমার অধিকার নাই। বসন্তবাবু মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছেন। আমার মতে—কৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাসই যে খাঁটি চণ্ডীদাস, তাহা অস্বীকারের হেতু নাই। সেই চণ্ডীদাসের ভাষাই এই কৃষ্ণ-কীর্ত্তন গ্রন্থে নূতন আবিষ্কৃত হইল—সেই ভাষাই কালে গায়কের মুখে রূপান্তরিত হইয়া প্রচলিত পদাবলীতে এ কালের ভাষায় দাঁড়াইয়াছে, ইহাতে সংশয়ের আমি হেতু দেখি না।"

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের সম্পাদক বসন্তবাবু তাঁহার "সম্পাদকীয় বক্তব্যে" লিখিয়াছেন—"বঁধু, কি আর বলিব আমি" পদের ভাষা অত্যন্ত আধুনিক—একবারে হালী। উহা বাঙ্গলা ভাষার ইতিহাসে আদৌ খাপ খায় না। সুতরাং কোন ক্রমেই চণ্ডীদাসের ভাষা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। বহুল-প্রচলিত পদের ভাষা গায়ক ও লিপিকরগণের কৃপায় পুনঃপুনঃ রূপান্তরিত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। চণ্ডীদাসের গোঁড়া ভক্তেরা অবশ্য তাহা স্বীকার করিতে রাজি হইবেন না।" বসন্তবাবু তাঁহার পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ সম্পাদকীয় বক্তব্যে ও ভাষা-টীকায় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার প্রাচীনতা ও অকৃত্রিমতা বিশেষ রূপেই প্রমাণিত করিয়াছেন; কিন্তু চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদাবলীর কিরূপে উদ্ভব হইল, আর উহার মধ্যে কতটুকু অকৃত্রিম, কতটুকুই বা কৃত্রিম, সে সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের প্রসঙ্গে প্রচলিত পদাবলীর সবিস্তার আলোচনা বোধ হয় তিনি অপ্রাসঙ্গিকই বিবেচনা করিয়াছেন। যাহা হউক, ১৩২৫ সালের পরিষৎ-পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় "চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" নামক প্রবন্ধে আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা, আখ্যান-বস্তু, রস ও কবিত্বের ধারার সহিত চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর ভাষা প্রভৃতির তুলনায় সমালোচনা করিয়া, চণ্ডীদাস-ভণিতাযুক্ত প্রচলিত পদাবলী কবিশ্রেষ্ঠ, বাশুলী-সেবক, বড়ু চণ্ডীদাসের খাঁটী পদাবলী, কিংবা উহার রূপান্তর বলিয়া কোন হিসাবেই গণ্য করা যাইতে পারে না বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি। হরেকৃষ্ণবাবু অনুগ্রহ করিয়া আমাদের উক্ত প্রবন্ধের ১৩০ পৃষ্ঠা হইতে ১৩৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত করিবেন। সে সকল যুক্তির আবার এখানে পুনরুক্তি করার স্থানাভাব। "বৈষ্ণব-তোষণী" টীকার প্রমাণটী পরে সংগৃহীত হওয়ায় উক্ত প্রবন্ধে প্রদর্শিত হয় নাই। তদ্রূপ পণ্ডিত তারাপ্রসন্ন কাব্যতীর্থ মহাশয়ের লিখিত ১৩২৬ সালের "নারায়ণ" পত্রিকার কার্ত্তিকের সংখ্যায় প্রকাশিত "সংকীর্ত্তনামৃত" নামক প্রবন্ধে প্রাচীন পদ-কর্ত্তা দীনবন্ধু দাসের সংকলিত "সংকীর্ত্তনামৃত" নামক বৃহৎপদ-সংগ্রহ পুঁথিতে "চণ্ডীদাস" ভণিতার একটি পদও না থাকায়—চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর সুপ্রাচীনতা ও অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে যে, বিলক্ষণ সন্দেহের কারণ জন্মিয়াছে—তাহাও উল্লেখ করিতে পারি নাই। এজন্য "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী" গ্রন্থের ভূমিকায় আমাদিগের অনুমানের পোষকতায় ঐ প্রমাণ দুইটীর উল্লেখ করিয়াছি। *

রায় যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি বাহাদুর অতঃপর "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের" প্রাচীনতার আলোচনা করিতে যাইয়া প্রসঙ্গক্রমে আমাদিগের উক্ত সমালোচনারও সমালোচনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীনতা ও অকৃত্রিমতার সম্বন্ধে সম্পাদক বসন্তবাবু ও আমাদের সিদ্ধান্তে কতকগুলি সন্দেহের আরোপ করাই রায় বাহাদুরের "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে সংশয়" নামক প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বটে। ভাষা-তত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্-এ মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে রায় বাহাদুরের

* অপ্রকাশিত পদ রত্নাবলীর ভূমিকা ১৸৵০ ও ২৫৵০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যুক্তি খণ্ডন করার জন্যই যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ শাস্ত্রী মহাশয় চণ্ডীদাসের কিংবদন্তী-মূলক আকস্মিক অপঘাত মৃত্যু-বিষয়ক কয়েকটী প্রাচীন পদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত চণ্ডীদাস-সমস্যা সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ কোনও মতামত প্রকাশ করেন নাই। তবে তিনি একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্বই সম্ভবপর ও তদ্দ্বারা এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে—এরূপ আভাষ দিয়াছেন।

চণ্ডীদাস-সমস্যার এই ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝা যাইবে যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনই বাশুলী ভক্ত কবিশ্রেষ্ঠ বড়ু চণ্ডীদাসের খাঁটি রচনা; 'চণ্ডীদাস'-ভণিতাযুক্ত প্রচলিত পদাবলী নকল—এই ভয়াবহ (?) মতটী স্বর্গগত মনীবী রামেন্দ্র বাবুই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার সংক্ষিপ্ত অথচ সার-গর্ভ মুখ-বন্ধে প্রচারিত করেন। সম্পাদক বসন্তবাবুর সম্পাদকীয় বক্তব্যেও তিনি ঐ মতের পরিপোষক প্রমাণই প্রদর্শন করিয়াছেন। তৎপরে আমরাও স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিয়া—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা, ভাব ও রসের ধারার বৈশিষ্ট্য হেতু উহাই শ্রীচৈতন্য দেবের প্রায় এক-শতকের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি চণ্ডীদাসের খাঁটি রচনা বলিয়া গণ্য হইতে পারে, চণ্ডীদাস-ভণিতাযুক্ত প্রচলিত পদাবলীকে কিছুতেই সেরূপ মনে করা যাইতে পারে না—এই সিদ্ধান্তের অনুকূল কতকগুলি প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছি। সুতরাং বন্ধুবর হরেকৃষ্ণবাবু এই "ভয়াবহ" মতের প্রচারক বলিয়া আমাদিগকে যে সম্মান প্রদান করিয়াছেন, ন্যায্য ভাবে স্বর্গ-গত রামেন্দ্রবাবুই সেই সম্মান-লাভের যোগ্য। তবে যদি বলেন যে, চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলী নকল বলিয়া সিদ্ধান্ত করা 'ভয়াবহ' নহে—ঐ পদাবলী শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেম-ধর্ম্মের চেলা ও পরকীয়া ভক্ত সহজিয়াদিগের সমবেত চেষ্টায় উদ্ভূত ও প্রচারিত হইয়াছে—এইরূপ একটা প্রমাণ-শূন্য মত প্রকাশ করাই আমাদিগের পক্ষে 'ভয়াবহ' ও 'দায়িত্বহীন' কার্য্য হইয়াছে, তাহা হইলে অগত্যা আমরাই সেই মত প্রচারের দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লইতেছি; কিন্তু আমাদিগের এইরূপ মত-প্রকাশ যে কিরূপে 'ভয়াবহ' বা 'দায়িত্ববিহীন' হইল, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। কেহ যদি জন-সমাজের অকল্যাণজনক কোন মত প্রচার করে—তাহা হইলেই উহাকে 'ভয়াবহ' বা 'দায়িত্বহীন' বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। আমাদিগের এই মত প্রচারেও কি হিন্দু সমাজের বা তদন্তর্গত বৈষ্ণব-সমাজের সেইরূপ কোনও অকল্যাণের আশঙ্কা আছে? কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক ও স্থানাভাব হেতুই আমরা "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলীর" ভূমিকায় আমাদিগের এই মতের সমর্থক প্রমাণের উল্লেখ করি নাই। এখন বুঝিতেছি করিলেই ভাল হইত,—তাহা হইলে বোধ হয় বর্ত্তমান কৈফিয়ৎ দিবার প্রয়োজনই উপস্থিত হইত না।

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন প্রকাশিত হইবার পরে যাঁহারা সামান্য একটু অনুধাবনাশক্তি লইয়া ঐ গ্রন্থের সহিত তুলনা করিয়াই "চণ্ডীদাস"-ভণিতা-যুক্ত প্রচলিত পদাবলী পাঠ করিবেন, তাঁহাদিগকে একবাক্যে স্বীকার করিতেই হইবে যে, প্রচলিত পদাবলী শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের রচয়িতা চণ্ডীদাসেরই রচনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইলে, রামেন্দ্র বাবু ও বসন্ত বাবুর মতে মত দিয়া বলিতে হইবে যে, প্রচলিত পদাবলী প্রথমে এরূপ ছিল না; উহা গায়ক ও লিপিকরগণের দ্বারা পুনঃ পুনঃ রূপান্তরিত হইয়াই বর্ত্তমান নব্য আকার ধারণ করিয়াছে। কাহার দ্বারা কোন্ সময়ে কতটুকু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে—তাহার নিশ্চিত প্রমাণ দেওয়া যে সম্ভবপর নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। তবে হরেকৃষ্ণ বাবুর উল্লিখিত 'দেশ ও কালগত পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সমসাময়িক সাহিত্য, কবির জীবন-কথা ও রচনার ধারা' ইত্যাদি বিষয়ের পর্য্যালোচনা দ্বারা এই জটিল ও অনালোচিত বিষয়টীর যে কিয়ৎপরিমাণে মীমাংসা না হইতে পারে তাহা নহে। আমরা আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধের নানাস্থলেই এই আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছি; কিন্তু কথাগুলি গুছাইয়া না বলায়, অনেকেই বুঝিতে গোলযোগ করিতেছেন; তাই এখানে বিষয়টা একটু খুলিয়া বলিতে হইতেছে।

পদাবলীর রূপান্তরের অনেক ভাল দৃষ্টান্ত পদাবলী-সাহিত্যে বর্ত্তমান আছে। বিদ্যাপতির মৈথিল পদাবলীর বঙ্গীয় রূপান্তরের দৃষ্টান্ত অল্লাধিক পরিমাণে পদাবলীর অধিকাংশ পাঠকই জ্ঞাত আছেন। এই সকল পদের রূপান্তরে বহুলরূপে শব্দেরই রূপান্তর ও কদাচিৎ পদের দুই চারিটী কলির (Stanze) রূপান্তরই দৃষ্ট হয়। ভাষা ও ভাবের সম্পূর্ণ অনৈক্য প্রায় কোন স্থলেই দেখা যায় না। সেরূপ অনৈক্য স্থলে—উহাকে রূপান্তর মনে করার কোন কারণই থাকিতে পারে না। চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদগুলির মধ্যে যদি বিদ্যাপতির মৈথিল ও বঙ্গীয় পদাবলীর ন্যায় রূপান্তরের দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইত, তাহা হইলে আমরা আহ্লাদের সহিত সেই পদগুলিকে চণ্ডীদাসের খাঁটি পদেরই পরবর্ত্তী রূপান্তর বলিয়াই গণ্য করিতে পারিতাম; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, চণ্ডীদাসের প্রচলিত প্রায় তিন শত পদের মধ্যে সেরূপ পদ আমরা একটাও পাই নাই। নীলরতন বাবুর সংগৃহীত তদতিরিক্ত প্রায় ছয় শত পদের মধ্যে কেবল "প্রথম প্রহর নিশি" পদটী চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের "দেখিলোঁ প্রথম নিশি" পদের পরবর্ত্তী নব্য রূপান্তর বলিয়া ধরা পড়িয়াছে; তদ্ভিন্ন আর একটী পদও সেইরূপ রূপান্তর বলিয়া বুঝা যায় নাই। এ অবস্থায় চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলী চণ্ডীদাসেরই খাঁটি প্রাচীন পদের নব্য রূপান্তর বলিয়া মনে করার কোনই কারণ নাই। চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর সহিত নীলরতন বাবুর সংগৃহীত পদাবলীর ভাষাগত কিংবা ভাবগত এমন কোন অসামঞ্জস্য নাই—যাহাতে সেগুলিকে প্রাচীনতর ও চণ্ডীদাসের খাঁটি রচনা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। এজন্যই আমরা নীলরতন বাবুর সংগৃহীত পদাবলীর সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কোন উল্লেখ করি নাই। তাঁহার সংগৃহীত দানখণ্ডের ও নৌকাখণ্ডের পদগুলির সহিত শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের পদাবলীর ভাষাগত ও ভাবগত কোনই সাদৃশ্য নাই; উহার একটী পদও শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের পদের নব্য রূপান্তর বলিয়া লক্ষ্য করা যায় নাই। এ অবস্থায় চণ্ডীদাসের "গোঁড়া"দিগের মনস্তুষ্টির জন্য চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলী অথবা নীলরতন বাবুর সংগৃহীত পদাবলীর মধ্যে পূর্ব্বোক্ত "প্রথম প্রহর নিশি" ইত্যাদি পদটী ব্যতীত বাকি পদগুলি চণ্ডীদাসেরই খাঁটি

রচনার পরিবর্ত্তিত সংস্করণ—এইরূপ একটা অমূলক মত প্রকাশ না করিয়া, আমরা স্পষ্টাক্ষরে ঐ পদাবলী জাল অর্থাৎ তাহা বাশুলী-ভক্ত, কবিশ্রেষ্ঠ, বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা নহে—সিদ্ধান্ত করিতেই বাধ্য হইয়াছি। আরও ২।৪ জন চণ্ডীদাস থাকা কিছুতেই বিচিত্র নহে; কিন্তু সেই চণ্ডীদাসগণের মধ্যে আরও একজন সুপ্রসিদ্ধ চণ্ডীদাসের ন্যায়ই বাশুলী-সেবক ও বড়ু উপাধিধারী ছিলেন; তিনিই পরবর্ত্তী কালে অপেক্ষাকৃত আধুনিক ভাষা ও ভাবের প্রচলিত পদগুলি রচনা করিয়া গিয়াছেন—এইরূপ মনে করা যায় কি? বৈষ্ণব সাহিত্যে পরবর্ত্তী এই মহাকবি চণ্ডীদাসের কোন উল্লেখ না থাকার কারণ কি? সুতরাং এই অসম্ভবও অদ্ভুত অনুমানটীকেও রামেন্দ্র বাবুর মত অগ্রাহ্য না করিয়া উপায় নাই। এমন কথাও কেহ বলিতে পারেন যে, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের রচয়িতা চণ্ডীদাস কবি-শ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাস নহেন। কবি-শ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাসের খাঁটি রচনা এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু উঁহারই রূপান্তরিত নব্য-সংস্করণ-প্রচলিত পদাবলী বর্ত্তমান আছে। আমাদিগের মতে এরূপ অনুমান করারও কোনই কারণ নাই; কারণ শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী পদাবলীর প্রেমোচ্ছ্বাস ও প্রেম-তন্ময়তার উৎকর্ষ দৃষ্ট না হইলেও—উহার রচয়িতা যে একজন শ্রেষ্ঠ কবি—তিনি যে জয়দেব, বিদ্যাপতি প্রভৃতি মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদিগের অবলম্বিত কাব্য-রচনা পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াও নিজে অসাধারণ উৎকর্ষ ও বিশেষত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সনাতন গোস্বামীর বৈষ্ণব-তোষণীর মন্তব্য অনুসারে "দানখণ্ড" ও নৌকাখণ্ড" যে কবিশ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাসের কাব্যের প্রধান বর্ণনার বিষয় এবং ঐ দুই বিষয়ের পদাবলী যে প্রচলিত পদাবলীতে নাই ইহাও স্বীকার্য্য বটে। সুতরাং চণ্ডীদাসের দেশ, কাল, পাত্রের উপযোগী শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনকে গায়ের জোরে তাঁহার খাঁটি রচনা বলিয়া অস্বীকার করিয়াও আপত্তিকারীর কার্য্য-সিদ্ধি হইবে না। তাঁহাকে অগত্যা ইহাও বলিতে হইবে যে, চণ্ডীদাসের প্রধান বর্ণনীয় দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের পদাবলী রূপান্তরিত হওয়ারও সুযোগ পায় নাই—উহা সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছে। নীলরতন বাবুর সংগ্রহের দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড কখনও প্রসিদ্ধ কীর্ত্তন গায়কগণ কর্ত্তৃক গীত বা প্রচারিত হয় নাই; হইলে উহার কোন না কোন পদ অবশ্যই পদামৃত-সমুদ্র, পদ-কল্পতরু প্রভৃতি প্রাচীন সংগ্রহে স্থান পাইত... স্থান না পাওয়ায় এবং উহার ভাষা ও ভাব আধুনিক বলিয়া, উহা অপর কোন আধুনিক চণ্ডীদাসের রচনা কিংবা চণ্ডীদাসের নামে জাল রচনা,—ইহা ব্যতীত আর কিছুই মনে করা যাইতে পারে না।

চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে যদি অতুলনীয় গীতি-কবিতার লক্ষণযুক্ত বহু পদ না থাকিত—তাহা হইলে আমরা সেগুলি কোনও অজ্ঞাত-নামা নগণ্য চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতাম; কিন্তু উহাতে এরূপ উৎকৃষ্ট বহুসংখ্যক পদ আছে যে, উহার তুলনা সমগ্র পদাবলী-সাহিত্যে সুদুর্লভ; সুতরাং উহা কোন অজ্ঞাত-নামা চণ্ডীদাসের রচনা হইতে পারে না। জ্ঞানদাস, বলরাম দাস প্রভৃতির উৎকৃষ্ট' পদের সহিত সাদৃশ্য দর্শনে—এগুলি চণ্ডীদাসের নামে তাঁহাদেরই জাল-রচনা, এরূপ অনুমান আপাততঃ কতক অংশে সম্ভবপর বোধ হইলেও—একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, ইহাঁরা অসত্যের পন্থা অবলম্বন করিয়া নিজেদের অত্যুৎকৃষ্ট পদাবলী একজন প্রাচীন মৃত কবির নামে প্রকাশিত করিবেন, এরূপ মনে করার কোনই কারণ নাই। প্রাচীন প্রসিদ্ধ পূর্ব্বতন পদ-কর্ত্তার উৎকৃষ্ট পদাবলী আত্মসাৎ করাই বরং পরবর্ত্তী পদ-কর্ত্তাদের পক্ষে অধিক সম্ভবপর। কিন্তু বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তারা যে কেহ ইচ্ছা করিয়া এরূপ অন্যায় কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন—এরূপ দৃষ্টান্তও নিতান্ত বিরল। প্রায় সর্ব্বত্রই কীর্ত্তন-গায়কদিগের ভ্রম প্রমাদ হেতুই ভণিতার বিপর্য্যয় হইতে দেখা গিয়াছে। সুতরাং এ অবস্থায় এক কিংবা একাধিক অজ্ঞাত-নামা (কিন্তু তা বলিয়া নগণ্য নহে) পদ কর্ত্তার রচনা পণ্ডিত লিপিকর ও রসজ্ঞ কীর্ত্তন-গায়কদিগের দ্বারা পুনঃপুনঃ মার্জ্জিত হইয়া, এই "চণ্ডীদাস"-ভণিতাযুক্ত পদাবলীর আকার ধারণ করিয়াছে—ইহা ব্যতীত আর কি অনুমান করা যাইতে পারে?

'রাগাত্মিক' পদাবলীর মধ্যেও কয়েকটি অতি উৎকৃষ্ট পদ ("শুন রজকিনি রামি" "এক নিবেদন করি পুনঃপুনঃ" ইত্যাদি) দেখা যায়; মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেম-ধর্ম্মে এইরূপ সহজিয়া মত স্থান পায় নাই। সুতরাং এই পদগুলিতে সহজিয়া মতের প্রভাব আছে—এরূপ সিদ্ধান্তই অপরিহার্য্য নহে কি?

এখন আমরা হরেকৃষ্ণ বাবুর জিজ্ঞাসাগুলি সংক্ষেপে উত্তর দিব।

(১) আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত "ভয়াবহ" ও "দায়িত্বহীন" মত প্রকাশের কারণ ইতিপূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে; পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

(২) হরেকৃষ্ণ বাবুর উল্লিখিত—দেশ ও কালগত পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সমসাময়িক সাহিত্য ও রচনার ধারা—ইহার সকলগুলি সূত্রের প্রয়োগ দ্বারাই আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। চণ্ডী-দাসের দেশ বীরভূম মিশ্র-হিন্দী-ভাষী জন বহুল মানভূম প্রভৃতির সন্নিহিত; তাঁহার কাল বিদ্যাপতির সম-কালবর্ত্তী; শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের ভাষার সহিত মিশ্র-হিন্দী ও বিদ্যাপতির মৈথিল ভাষার সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। প্রচলিত পদাবলীতে সাদৃশ্যের যথেষ্ট অভাব। তৎপরে বিদ্যাপতির শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকার সহিত কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের শ্রীকৃষ্ণরাধিকার সাদৃশ্য [illegible]র্ষ্য। মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসে কাব্যের প্রাচ[illegible] একরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে জয়দেব ও বিদ্য[illegible] আদর্শ সুস্পষ্ট। প্রচলিত পদাবলীর শ্রীকৃষ্ণের, বিশেষতঃ শ্রীরাধার আদর্শ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মহাপ্রভু স্বীয় জীবনে শ্রীরাধার এই প্রেমোচ্ছ্বাস ও প্রেম-তন্ময়তার আদর্শ প্রদর্শিত করার পূর্ব্বে বৈষ্ণব-সাহিত্যে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। সুতরাং পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সমসাময়িক সাহিত্য ও রচনার ধারা—সমস্ত সূত্রগুলির দ্বারাই প্রচলিত পদাবলীর প্রচার-কাল মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী বলিয়াই প্রমাণিত হয়।

(৩) প্রচলিত পদাবলী যে, অজ্ঞাত-নামা কবি-সম্প্রদায়ের কৃতিত্বের ফল—ইহার অনুকূল যুক্তি পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

(৪) নীলরতন বাবুর সংগৃহীত পদাবলীতে সহজিয়ার কোন্ চিহ্ন না থাকিলেও (২) দফার উল্লিখিত সূত্রগুলির সাহায্যে বিচার করিলে, সেগুলিও প্রচলিত পদাবলীর ন্যায় মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী রচনা বলিয়াই সাব্যস্ত হয়। হরেকৃষ্ণ বাবু নীলরতন বাবুর সংগ্রহের দুইটী দান-খণ্ডের পদের কবিত্বের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। ঐ সংগ্রহে দুই চারিটি ভাল পদও আছে, অস্বীকার করি না; কিন্তু উহার অধিকাংশ পদই অতি নগণ্য, অর্থাৎ প্রচলিত পদাবলীর তৃতীয় শ্রেণীর পদের ন্যায় ভাব-বৈচিত্র্যহীন ও পুনরুক্তি-দুষ্ট,—ইহা আমরা না বলিয়া পারিতেছি না। ভাষার ও ভাবের আধুনিকতা সত্ত্বেও যে সেগুলি কীর্ত্তন-গায়ক-গণ কর্ত্তৃক সমাদৃত না হইয়া কীট-দষ্ট প্রাচীন পুঁথির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, মোটের উপর পদগুলির অনুপাদেয়তাই উহার প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের পদাবলীর বিলুপ্ত প্রচারের কারণ সম্পূর্ণ অন্যবিধ। "চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" প্রবন্ধের ১৩২।১৩৩ পৃষ্ঠায় আমরা বিস্তৃতভাবে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এস্থলে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন ও উহার স্থানাভাব।

(৫) নীলরতন বাবুর সংগৃহীত পদাবলীর প্রায় বিলুপ্ত-প্রচার হেতু উহা পণ্ডিত ও কীর্ত্তনিয়াদিগের হাতে মার্জ্জিত হইতে পারে নাই, এবং উহার ভাষা ও ভাবের সহিত প্রচলিত পদাবলীর ভাষা ও ভাবের সামঞ্জস্য আছে—তর্কস্থলে ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও, তদ্দ্বারা ঐ উভয়বিধ পদাবলী একজন পদ-কর্ত্তার রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না। চণ্ডীদাসের প্রচলিত প্রায় তিন শত পদাবলীর মধ্যেই এমন অনেক অপকৃষ্ট ও ভিন্ন প্রকৃতির পদ আছে যে, সেগুলি কোনমতেই উৎকৃষ্ট পদগুলির সহিত একই শ্রেষ্ঠ কবির রচনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না। ইহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত আমাদের পূর্ব্বোক্ত "চণ্ডীদাস" প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে। নীলরতন বাবুর সংগ্রহের মধ্যেও উত্তম, মধ্যম ও অধম—ত্রিবিধ পদ দৃষ্ট হয়; এই সকল পদ একজনের রচনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা কঠিন। নীলরতন বাবুর সংগৃহীত পদাবলী হয় ত খুবই আধুনিক অর্থাৎ ১২৫ কি ১৫০ বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে। তাহা হইলে কবিত্বের পার্থক্য থাকিলেও, সাধারণতঃ ভাষা ও ভাবে এই উভয়-বিধ পদের মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য থাকিবে বই কি? কিন্তু ইহা দ্বারা ঐ সমস্ত পদের "প্রাচীনতা" প্রমাণিত হয় না।

(৬) হরেকৃষ্ণ বাবুর উল্লিখিত দেশ, কাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পার্থক্য ইত্যাদি সূত্রগুলির প্রয়োগ ও পর্য্যালোচনা দ্বারাই কেবল বিষয়-রূপে কোন রচনার মৌলিকতা ও কবিত্ব ইত্যাদির নির্ণয় হইতে পারে। এরূপ ভাবে বিচার করিতে হইলে সকল প্রকার গোঁড়ামি ও পূর্ব্ব-সংস্কার ত্যাগ করা আবশ্যক। চণ্ডীদাসের প্রচলিত উৎকৃষ্ট পদাবলীতে আমরা ভাষা ও ভাবের যে আদর্শ পাই, উহাই কবি-শ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাসের খাঁটি আদর্শ—এই বদ্ধ-মূল সংস্কারটি ত্যাগ করিতে না পারাতেই, হরেকৃষ্ণ বাবুর ন্যায় সুধী ব্যক্তিও উভয়-সঙ্কটে পতিত হইয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়াছেন। তিনি যদি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইয়া মহা-প্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী জয়দেব ও বিদ্যাপতির আদর্শ লইয়া শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের আলোচনা করিতেন, তাহা হইলে তথ্য-নির্ণয়ে এরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইত না।

(৭) শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কখন এবং কিরূপে বিলুপ্ত-প্রায় হইল, ইহার উত্তর অল্প কথায় দেওয়া অসম্ভব। আমাদিগের "চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন" প্রবন্ধের ১৩০—১৩৩ পৃষ্ঠায় উহা সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। এ স্থলে তাহার পুনরুক্তির স্থানাভাব।

(৮) গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাস প্রভৃতির পদাবলীর ভাষা কীর্ত্ত-নিয়াদিগের মুখে যে মার্জ্জিত হইয়াছে, তাহার কোন দৃষ্টান্ত হরেকৃষ্ণ বাবু প্রদর্শন করেন নাই। পুঁথিগুলির মধ্যে স্থানে-স্থানে শব্দ ও বাক্যের পাঠান্তর ব্যতীত শব্দ মার্জ্জিত হওয়ার যে দৃষ্টান্ত দেখা যায়, তাহা এইরূপ; যথা।—'করিলুঁ' 'দেখিলুঁ' ইত্যাদি স্থলে 'করিনু' 'দেখিনু' ইত্যাদি। 'করোঁ' 'দেখোঁ' ইত্যাদি স্থলে 'করি' 'দেখি' ইত্যাদি 'যাঙ' 'খাঙ' ইত্যাদি স্থলে 'যাই' 'খাই' ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের ভাষার সহিত পরবর্ত্তী পদাবলীর ভাষার যে পার্থক্য আছে, সেই পার্থক্যের সহিত এই পার্থক্যের তুলনাই হয় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদ ঘষিয়া-মাজিয়া চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলী রূপে পরিণত করা হইয়াছে—যদি কেহ চণ্ডীদাসের "গোঁড়া"-দিগের মন-রক্ষার জন্য এ কথা বলেন, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই রূপান্তরে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা ও ভাবের ক্ষীণ ছায়াও লক্ষিত হয় না। ইহাকে রূপান্তর বলিলে রাত্রিকেও দিবসের রূপান্তর বলা যাইতে পারে।

(৯) মহাপ্রভুর প্রিয় পাঠ্য বলিয়াই হউক কিংবা অন্য কোন কারণেই হউক, প্রাচীন পদ-সংগ্রহকারগণ অবশ্যই চণ্ডীদাসের খাঁটি পদ সংগ্রহের জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা চণ্ডীদাসের যে সকল পদ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা খাঁটি বিশ্বাসেই সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু অনুমান করা যায় যে, প্রায় ১৫০ কি ১৭৫ বৎসর পূর্ব্বে পদামৃত-সমুদ্র, পদ-কল্পতরু প্রভৃতি সঙ্কলিত হওয়ারও বহু পূর্ব্বে, অর্থাৎ বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় ৩০০ কি ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বেই এই জাল পদগুলি চণ্ডীদাসের খাঁটি পদ বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল। এই পদগুলির ভাষার প্রাঞ্জলতা ও উচ্চ রস-ভাবের আদর্শ তৎকালীন শ্রোতৃ-সমাজের বিশেষ প্রীতিকর হওয়ায় এবং চণ্ডীদাসের খাঁটি পদের ভাষার কটমট ও প্রেম-ধর্ম্মের অপেক্ষাকৃত হীন আদর্শ শ্রোতৃবর্গের প্রীতিকর না হওয়ায়, জীবন-সংগ্রামে পরবর্ত্তী পদগুলি জয়ী হওয়াতেই বোধ হয় চণ্ডীদাসের খাঁটী পদগুলি বিলুপ্ত-প্রায় হইয়াছিল; কিন্তু তথাপি চণ্ডীদাসের প্রসিদ্ধির ফলে লোকে তাঁহার পদগুলিতে চাওয়ায়—বান্ধা-পালার আকারে সজ্জিত নাট-প্রধান কৃষ্ণ-যাত্রার উপযোগী চণ্ডীদাসের দানখণ্ড" ও "নৌকাখণ্ড" তৎকাল পর্য্যন্ত প্রচলিত থাকায়—উহা পরিবর্ত্তন করার সুযোগ ও সাহস না পাইয়া, তাঁহার নামে পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের সম্পূর্ণ বহির্ভূত বিষয়ের পদ সৃষ্ট হইয়া শ্রোতৃবর্গের কৌতূহল চরিতার্থ করিয়াছিল।—পরে জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস প্রভৃতির সময় দান-লীলা ও নৌকাবিহারের পদাবলীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চণ্ডীদাসের লুপ্তাবশেষ দান- ও নৌকাখণ্ডও বিলুপ্ত-প্রচার হইয়াছে,—এই জটিল সমস্যায় ইহাই তো

সম্ভবপর সমাধান বলিয়া আমাদের বিবেচনা হয়। যদি হরেকৃষ্ণ বাবু ইহা অপেক্ষা অধিক সঙ্গত কোন মীমাংসা উপস্থাপন করিতে পারেন, আমরা সাদরে উহা গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইব না।

(১০) নারীর যৌবন-ধন চিরকালই রসিক নাগরদিগের মন মুগ্ধ করিয়া আসিতেছে; ইহা এমন একটি চিরন্তন সত্য বিষয় যে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-কার কিম্বা পদ-কর্ত্তা—একজনে অন্যজনের উক্তির অনুকরণ না করিয়াও এই ভাবের একটা কথা বলিতে পারেন। অনুকরণ করা সম্ভবপর ধরিয়া লইলেও, পরবর্ত্তী পদ-কর্ত্তা যে ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী চৈতন্যচরিতামৃত হইতে গ্রহণ করেন নাই—ইহার কি প্রমাণ আছে? ইহা দ্বারা নীলরতন বাবুর সংগৃহীত পদটীর চৈতন্যচরিতামৃত হইতে পূর্ব্ববর্ত্তিতা প্রমাণিত হয় না।

(১১) নীলরতন বাবুর সংগ্রহে দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের কতকগুলি পদ পাওয়া গিয়াছে বটে,—কিন্তু ঐ পদগুলির ভাষা, কিংবা ভাবের সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের পদাবলীর কোনই সাদৃশ্য নাই। এমন কি, এতগুলি পদের মধ্যে দুই-একটি পংক্তিও একরূপ দৃষ্ট হয় না। নীলরতন বাবুর সংগৃহীত দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের পদ চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত অন্যান্য পদের ন্যায়ই আধুনিকতার লক্ষণাক্রান্ত; সুতরাং সেগুলিকে কোন মতেই শ্রীচৈতন্যদেব ও সনাতন গোস্বামী প্রভৃতির সময়ে প্রচররূপ চণ্ডীদাসের দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের পদাবলী বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

উপসংহারে বক্তব্য যে, হরেকৃষ্ণ বাবু কেবল জিজ্ঞাসা করিয়াই নিরস্ত হইলেন কেন? তাঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত ব্যক্তির নিকট আমরা কি এ বিষয়ের একটা সুমীমাংসার প্রত্যাশা করিতে পারি না? ভরসা করি, তিনি অতঃপর এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মীমাংসা কি, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যের এই জটিল সমস্যার সমাধানে সহায়তা করিবেন।

দ্বিধা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি এ

গায়ে আবার লাগলো এ কোন্
অবিশ্বাসীর হাওয়া;
হয় না তেমন ব্যাকুল হয়ে
নামটী তাঁহার গাওয়া।

যায় না যে নাম দাগটী এঁকে
নয়ন-জলের অভিষেকে,
পরশমণির পরশ কেন
যায় না বুকে পাওয়া!

অনন্ত নির্ভর রে আমার
অনন্ত বিশ্বাস,
কমালো হায় কোন্ কালিমার
জলন্ত নিঃশ্বাস।

সন্দেহ পাপ হেথায় কেনে
হঠাৎ গেল বজ্র হেনে,
চকোরে হায় ভুলাতে চায়
চাঁদের পথ চাওয়া।

শ্রীকুলিয়ার পাটের ধূলি
মাখ্‌তে আবার সাধ,
ভঞ্জন হ'ক ভঞ্জন হ'ক
দারুণ অপরাধ।

ব্রজের রজের অধিকারী
জন্মে যেন হতে পারি,
মাধুকরীর উপর যেন
জন্মে এবার দাওয়া।
গায়ে আবার লাগলো এ কোন্
অবিশ্বাসীর হাওয়া।

ঘরে ঘরে গোপাল

শ্রীসুন্দরীমোহন দাস এম-বি

ভাদ্রের শেষ। এখনও বর্ষা নামিল না কেন, তাই ভাবিতেছি। দিনের বেলায় তাল-পাকা রৌদ্রে যেন হাড়-মাংস পাকিতেছে। ছেলেদের সর্ব্বাঙ্গে ফোড়া! সকালে স্কুল বসিয়াছে; কিন্তু বাড়ী ফিরিবার সময় রৌদ্রে ছেলেদের মাথা ফাটিতেছে। এক টাকায় এক সের বরফ পাওয়া যায় না। একটা ছোট ডাবের দাম চৌদ্দ পয়সা। রাত্রে গ্রীষ্ম-বিলাসী ছারপোকার দংশনে অস্থির হইয়া, শয্যা পরিত্যাগ করিয়া, মাদুর পাতিয়া সাড়ে পোনর আনা কলিকাতাবাসী ছাদে বা রাজপথে নিদ্রা যাইতেছে। আধ আনা অধিবাসী টানা-পাখার বাতাস খাইয়া কষ্টে দিন-যাপন করিতেছেন, আর নিদ্রালস পাখা-টানা লোককে ঘন-ঘন সতর্ক করিতেছেন। সে সময় বৈদ্যুতিক পাখার রেওয়াজ হয় নাই। প্রকৃতি রুদ্ধ-খাসে কুম্ভক সাধনে প্রবৃত্ত। এমন সময়ে অকস্মাৎ আকাশ কাল মেঘে আচ্ছন্ন হইল। ঘন-ঘন বিজলীর চমকে এবং মেঘের কড়-কড় নাদে গৃহিনীদের আর ভয় নাই। তাঁহারা বাজ পড়িবার ভয়ে আর থালা, বাসন সরাইতেছেন না, বরং আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিতেছেন 'আঃ বাঁচা গেল'। পাশের বাড়ীর একটি মেয়ে হার্মোনিয়ম-যোগে গান ধরিল:—

* কেন ঘন গরজনে ভীত চিত।
শীতল বরষণে হৃদয় তাপিত॥
প্রেমে ঘন ঘন, ডাকে ঘন ঘন,
হাসি ক্ষণ ক্ষণ চপলা চমকিত॥ ১॥
বহে প্রবল বায়, পাষণ্ড কাঁপায়,
ভকত চালায় তরী কি ত্বরিত॥ ২॥

বিলম্বের ক্ষতিপূরণ মানসে, পর্জ্জন্যদেব অবিরল ধারে বর্ষণ করিলেন। রাজপথ এক একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী হইল। কালীতলার যে স্থানে "শঙ্করের হৃদি-মাঝে কালী বিরাজে" সেই স্থানে আত্মবলি-দানোৎফুল্ল একটী প্রকাণ্ড অশ্ব মন্দিরের সম্মুখে জলে ভাসিতেছে। শ্বেতাঙ্গ-প্রভু-ভ্রূকুটী-ভীত মসিজীবিগণ চর্ম্ম-পাদুকা করে ধারণ করিয়া বিষণ্ণ মনে কর্ম্মস্থলাভিমুখে গমন করিতেছেন। দু' একজন মৎস্যজীবী এবং ফল-বিক্রেতা ঝাঁকা মাথায় লইয়া আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া বাজারের দিকে যাইতেছে। বাজারে ক্রেতার অভাবে বড় ইলিশ দুই আনায় বিক্রয় হইতেছে। বিদ্যালয়-মুক্ত বালকবৃন্দ জলে কেলি করিতে-

* মেঘ—কাওয়ালী।

করিতে এবং শ্বেতখানাচ্যুত ভাসমান মৃদ্‌ভাণ্ডে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে-করিতে গৃহাভিমুখে ছুটিয়াছে। কেহ বা বড় কাঠের গামলায় বসিয়া দুই হাতে দাঁড় টানিয়া জল-স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। বাদুড়বাগানের একজন সৌখীন বাবু সখের যাত্রাদল সহ পানসীতে উঠিয়া ক্ষেপনী-ক্ষেপের তালে-তালে নাচিতেছেন এবং গাহিতেছেন—

গোপীর কুলে থাকা হ'ল দায়।
ভাসায়ে গোকুলে তরী যাচ্ছে যমুনায়॥
(হিড়্ হিড়্ হো)

বাবুরা দোতালার বারান্দায় বসিয়া পথিকদের জল-কেলি দেখিতেছেন,—অর্দ্ধ-নিমগ্ন গাড়ী ও আরোহীদের অবস্থা দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন; গরম-গরম চানাচুর ও চা খাইতেছেন, এবং খিচুড়ী ও নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করিবার আদেশ প্রদান করিতেছেন। পাশের বস্তি গরীবদের হাহাকারে মুখরিত হইয়াছে। তাহাদের মৃৎ প্রাচীর ধসিয়া পড়িয়াছে, চালা দিয়া জল পড়িয়া বিছানা-পত্র ভিজিতেছে। উঠান, রান্নাঘর একহাঁটু জলের নীচে। শুচি-বায়ু-গ্রস্তা গৃহিণীরা কোথাও একটু উচ্ছিষ্ট বা নর্দ্দামার জল দেখিলে লম্ফ প্রদান করিয়া চলিয়া থাকেন; তাঁহারা আজ শ্বেতখানার এবং ভূমধ্য প্রণালীর মল-মিশ্রিত জলে আধানিমজ্জিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন। তাঁহাদের অপরাধ কি? তাঁহাদের কর্ত্তারা কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া এই ভূমধ্য প্রণালী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এঞ্জিনিয়ার মহাত্মারা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছেন, "অতি-বৃষ্টির সময় গঙ্গার দিকে নর্দ্দামার পাঁচটী মুখ যখন খুলিয়া দেওয়া হইবে, সেই সময় যদি জোয়ার আসে, নর্দ্দামার জল তখন গঙ্গায় না পড়িয়া জোয়ারের ঠেলায় সহরের দিকেই আসিবে; আর ধাপার দিকে যে নর্দ্দামার মুখ আছে, সেই দিকেও জোয়ারের ঠেলায় নর্দ্দামার ময়লা জল সহরের দিকে ধাবিত হইবে; সুতরাং দুই বিপরীত দিকের প্রবল তাড়নায় নর্দ্দামার জল গত্যন্তর রহিত হইয়া রাজ-পথের বক্ষ-স্থলস্থিত 'ম্যান-হোল্' নামক গবাক্ষ ভেদ করিয়াই প্রস্রবণের ন্যায় ঊর্দ্ধে উত্থিত হইবে। এই প্রস্রবণের জলের সঙ্গে বৃষ্টির জল মিশ্রিত হইয়া — হর ডুবাইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার — নাই। সমুদায় সভ্য দেশেই এই প্রকার মল-প্লাবন হইয়া থাকে। সভ্যতার স্বর্গরাজ্যে গমন করিতে হইলে, মলমূত্রনিষ্ঠীবন-মিশ্রিত জল পঞ্চগব্যের ন্যায় পান করিতে হয়।" বিশেষজ্ঞের কথা, হাসিয়া উড়াইবার যো নাই। সুতরাং গৃহিণীগণ গঙ্গাজলে স্নানের পর মুন্সিপাল কর্ত্তাদের ব্যবস্থা-অনুসারে নর্দ্দামাময়লে স্নান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন।

২

এই দুর্যোগে নীচে কে "বেহারা, বেহারা" বলিয়া হাঁকিলেন; এবং উড়িয়া বেহারারা "পাল্‌কী কোথা রখিব বাবু" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে একজন খর্ব্বকায় ভদ্রলোক উপরে আসিয়া বলিলেন, "আমার বড়ই বিপদ, তাই এই দুর্যোগেও আপনাকে ডাক্‌তে এসেছি; ৭৲ ভাড়া স্বীকার করে পালকী এনেছি।" বাবুটীর সমুদায় কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে। তাঁহার একটা নেশা বড়ই প্রবল। এই কষ্টের সময়ও তিনি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া তামাক চাহিলেন। তামাক আসিলে "ক্ষমা করুন" বলিয়া টানিতে লাগিলেন এবং রোগ বর্ণনা করিতে গিয়া দেশীয় প্রথা-অনুসারে দীর্ঘ ভূমিকার অবতারণা করিলেন।

"স্বর্ণলতা পিতার আদরে-পালিতা একমাত্র কন্যা;— ভ্রাতার একমাত্র ক্রীড়া-সঙ্গিনী! পিতা দরিদ্র হইলেও কন্যাকে কাটা পোষাক পরাইয়া বেথুন স্কুলে পাঠাইতেন। পোষ্ট-আফিসে চাকুরী, আয় অল্প,—কিন্তু মাতৃহীনা কন্যার প্রত্যেক আব্‌দার রক্ষা করিতে হইত। কথায়-কথায় রাগ, কান্না, অভিমানের পালা অভিনয় করিতে-করিতে স্বর্ণ যখন চতুর্দ্দশ বর্ষে পদার্পণ করিল, পিতা আমার উপরে তাহার এবং একরাশি ঋণের বোঝা চাপাইয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লতাবিশেষের ন্যায় স্বর্ণলতা পিতৃশোকের তাপে যেন দিন-দিন অধিক বাড়িয়া উঠিল। একদিন কোন কারণ বশতঃ পিসিমা অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'মরণ নাই মেয়ের, দিনকে দিন ধিঙ্গী হ'য়ে উঠচেন। সাত জন্মে ত বর জুটবে না। যদিই বা জোটে, খাশুড়ীর ঝাঁটা খেয়ে-খেয়ে প্রাণটা যাবে। ওলো, বই পড়লে কি বর জুটবে? রান্না-বাড়া হ'য়ে গেছে। যা স্নান টান ক'রে দুটো গেলবার উদ্যোগ কর।' রাত্রি তিনটার সময় পিসিমা ডাকিলেন, 'অমি, অমি,

শীগগির ওঠ ত বাবা, শনি কি রকম ক'রচে।' উঠিয়া দেখিলাম, সর্ব্বনাশ! স্বর্ণ আফিম খাইয়াছে! সেই রাত্রে ডাক্তার ডাকিয়া অনেক কষ্টে তাহাকে বাঁচান গেল। পিসিমাকে বলিলাম, 'পিসিমা, স্বর্ণকে অমন ক'রে বকবেন না। তার কি দোষ? দোষ আমাদের শিক্ষা-প্রণালীর। লেখাপড়া শিখিয়ে আমরা একরাশি বায়ু সৃষ্টি করচি, যাকে ইংরাজীতে বলে 'এক গোছা স্নায়ু।' এরা সামান্য তাপে তেতে যায়, সামান্য আঁচে গলে যায়; বেতসীলতার ন্যায় সামান্য বাতাসে কাঁপে, আর আলগা খুঁটির ন্যায় সামান্য আঘাতে পড়ে। কাজ-কর্ম্মের পিটনীতে তোমাদের মনটা শক্ত হ'য়ে ঘরকন্নার গায়ে বসে গিয়েছে, সামান্য ঝড়ে তাকে কি কাঁপাতে পারে? যদি কিছু বলতে হয়, আমাকে বলো; বর না জোটার অপরাধটা ত তার নয়। কেন তাকে বক?' স্বর্ণকে অতি সন্তর্পণে চক্ষে-চক্ষে রাখিয়া একমাস কাটাইয়াছি, এমন সময় একজন ঘটকী আসিয়া একজন 'যোগ্য পাত্রের' সন্ধান বলিয়া দিল। 'একটী পয়সা খরচ করিতে হইবে না, বরং মেয়ের গা আগাগোড়া সোণায় মুড়িয়া দিবে। বয়স একটু বেশি—দুকুড়ি বই ত নয়; তা হোক, মেয়েও ত বাড়ন্ত। হোক গে 'দোজবরে'—সতীনের কাঁটা ত নাই। রাজার নায়েব; কোম্পানীর কাছে নগদ লাখ টাকা মজুত আছে।' বন্ধু-বান্ধবের পরামর্শে এই লক্ষপতির নিকটেই ভগ্নীকে বলিদান করা হইল। এ হেন গুণবান বরের পোনর দিন হইল উৎকট রোগ হইয়াছে। পুত্রাভাবে দুই ভাগিনেয়ই তাঁহার উত্তরাধিকারী। তাহারাই বৃদ্ধের সেবা করিতেছিল। যাহাতে রোগীর ইহলোকের সমুদয় কষ্টের শীঘ্রই অবসান হয়, তাহারা সেই মানসে একটি হাতুড়ে ডাক্তারকে দিয়া চিকিৎসা করাইয়াছে। রোগের ক্রমশই বৃদ্ধি। অবশেষে যখন প্রলাপ ও হিক্কা মৃত্যুর আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করিল, তখন খিদিরপুরে সংবাদ গেল। আমরা আসিয়া সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিলাম। বৃদ্ধের রোগের উপশম হইয়াছে; কিন্তু তরুণী ভার্য্যার হিষ্টিরিয়া, ফিট্ ঘন-ঘন হইতেছে। কল্য হইতে তলপেটে ভয়ানক বেদনা, আর অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব। আপনার নিকট আসিবার কারণ তাহাই। রোগিনীকে পরীক্ষা করিতে হইবে এবং শুশ্রূষার জন্য একজন ভাল নার্স্ দিতে হইবে; কারণ, মাতুলের মৃত্যু সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, উপযুক্ত ভাগিনেয়দ্বয় লোকজন লইয়া পলায়ন করিয়াছে।"

আমার পাচক ঠাকুরের বাড়ীতে তিনটী গৃহস্থ-পরিবার দুই দিন অনাহারে আর্দ্রবসনে কাটাইতেছে। তাহাদের জন্য একহাঁড়ি খিচুড়ী লইয়া এবং শুষ্কবস্ত্র পরিপূর্ণ একটী গামলা ভাসাইয়া লইয়া পাচক গৃহাভিমুখে যাইতেছিল। তাহাদের বাড়ীর সন্নিকটস্থ একজন ধাত্রীকে তাহাকে দিয়া ডাকিয়া পাঠাইলাম এবং স্বয়ং পাল্কীতে উঠিলাম। পাল্কী বেহারাদের স্কন্ধে নাই, কিন্তু তাহাদের উৰ্দ্ধহস্তে ধৃত হইয়া ধীরে-ধীরে চলিতেছে। একবার দেখিয়াছিলাম এক অসূর্য্যম্পশ্যা রাণীকে পাল্কীশুদ্ধ গঙ্গাস্নান করাইয়াছিল। প্রতি মুহূর্ত্তেই ভাবিতেছি, বুঝি বা আমাকেও সেই রাণীর ন্যায় পুণ্যসঞ্চয় করিতে হয়।

৩

রোগিনী বিংশবর্ষীয়া। ফিটের অবস্থা। সমস্ত দিন আহার হয় নাই। ঘরটী বেশ পরিপাটী। কিন্তু সর্ব্বত্র নৈরাশ্যের চিহ্ন। নায়েব বাবু নানাবিধ অত্যাচারের দরুন অকালবার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং পিতৃত্বের অধিকার হারাইয়াছেন; যুবতী ভার্য্যার বিষাদের এই হেতু। গৃহের দ্বারদেশে লেখা "নৈরাশ্য কুটীর।" দেয়ালে গৃহিণীর স্বহস্তাঙ্কিত চিত্র। এক দিকের চিত্রে একখানি জাহাজ জলমগ্ন হইতেছে, নিম্নে লেখা "ডুবিল জীবন-তরী"। অপর দিকে একটী আভরণহীনা যুবতী উপুড় হইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে, নিম্নে লেখা "পরিত্যক্তা"। আর একদিকে একজন আলুলায়িতকেশা রমণী ঊর্দ্ধনেত্রা হইয়া আকাশের চাঁদপানে তাকাইয়া আছেন, দূরে আম্রবৃক্ষশাখায় কূজন-পরায়ণ কোকিল বসিয়া আছে, নিম্নে লেখা "বিরহিণী"। কাঁচের আলমারায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শকুন্তলা, কপালকুণ্ডলা, দুর্গেশনন্দিনী এবং বহু সংখ্যক উপন্যাস সাজান রহিয়াছে। এই প্রকার গৃহের বায়ু সেবনে হিষ্টিরিয়া রোগ যে ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, রোগিনীর ভ্রাতাকে স্পষ্টতঃ বলিলাম। তাঁহারা বলিলেন, রোগিনী অজ্ঞান, মুখে দুগ্ধ দিলে গড়াইয়া পড়ে। আমি গরম দুগ্ধ এবং দুইখানা চামচ আনিতে বলিলাম। একখানা চামচ দ্বারা জিহ্বা চাপিয়া অন্য চামচে করিয়া দুগ্ধ ঢালিয়া দিলাম; এবং এক মিনিট দুই নাসারন্ধ্র টিপিয়া

ধরিলাম। রোগিনীর পিতা ও ভ্রাতা ভীত হইলেন; আমি সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া চামচ দ্বারা জিহ্বার পশ্চাত ভাগ বেশ করিয়া চাপিলাম। রোগিনী ঢক করিয়া দুগ্ধ গিলিয়া ফেলিল। এই উপায়ে এক পোয়া দুগ্ধ গলাধঃকরণ করিয়া রোগিনী চক্ষু মেলিল। তখন তাহাকে বুঝাইলাম, তাহার সেবার উপর তাহার স্বামীর জীবন নির্ভর করিতেছে। হিষ্টিরিয়া স্নায়বীয় রোগ; মানসিক বলে এই রোগ তাড়ান যায়। মন দুর্ব্বল হইলেই রোগ শরীরকে পাইয়া বসে। ফিটের দরুন নাড়ী উল্টিয়া যাইতে পারে। ঋতুর অবস্থায় ফিট হইয়াছে, তাই এত অধিক রক্তস্রাব। এই অবস্থায় স্থির হইয়া শুইয়া থাকা আবশ্যক। এই বলিয়া তাহাকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য গল্প জুড়িয়া দিলাম। ইতিমধ্যে নার্সের গাড়ী ঝপ্ ঝপ্ শব্দ করিতে-করিতে সদর দরজায় আসিল। নার্স আসিলে তাহাকে সমুদায় অবস্থা বুঝাইয়া দিয়া এবং ডাক্তারের ব্যবস্থা অনুসারে ঔষধ খাওয়াইতে বলিয়া আমি চলিয়া আসিলাম।

৪

সাত দিবস পরে রোগিনীকে দেখিতে আসিয়াছি। তাহার স্বামী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। গৃহিণীর গৃহসজ্জা আমার পরামর্শে সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পুরাতন চিত্রগুলি আর নাই। তৎপরিবর্ত্তে তিনখানা গোপালের চিত্র। এক দিকে মা যশোদা গোপালকে ক্রোড়ে লইয়া চুম্বন করিতেছেন। অন্য দিকে গোপাল উদুখল-লগ্ন রজ্জু দ্বারা অর্জ্জুন-বৃক্ষদ্বয় বেষ্টন করিয়াছেন। অন্য চিত্রে গোষ্ঠলীলা। চিত্রগুলি দেখিতেছি, এমন সময় খোল করতালের বাদ্যে এবং হরি সংকীর্ত্তনের রোলে গৃহ মুখরিত হইল। বারান্দায় গিয়া দেখিলাম, প্রাঙ্গণে বহুলোকের সমাগম হইয়াছে। একজন গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণের মস্তকোপরি রেশমী ছাতা ধরা হইয়াছে। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ, গলদেশে ফুলের মালা। তাঁহার পশ্চাতে আটটী খোল বাজিতেছে, আর ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর অনুকরণে নৃত্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন। রোগিনীর নিকট শুনিলাম, ইনি তাঁহাদের গুরু বিনোদলাল গোস্বামী। দলীল জাল অপরাধে সাত বৎসর হরিণবাড়ী জেলে মেয়াদ খাটিয়া সম্প্রতি মুক্ত হইয়াছেন। চিরন্তন প্রথা অনুসারে তাঁহাকে কীর্ত্তন সহকারে গৃহে আনা হইয়াছে। বারান্দার নিকটেই বৈঠকখানা। গুরু সশিষ্য সেই ঘরেই আসিয়া বসিলেন। গৃহস্বামীর অনেক বন্ধু-বান্ধবও আসিয়া জুটিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন মদ্যপানে বিভোর,—তাঁহার নৃত্য এখনও থামে নাই। একে-একে সকলেই প্রণাম করিলেন। বীরু মাতাল নৃত্য অবসানে বসিয়া পড়িলেন। গোস্বামী মহাশয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কি বাবু।"

বীরু। বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, কিন্তু শালারা বলে বীরু মাতাল।

গোস্বামী। ঘোষের সন্তান, কুলিন কায়স্থ, অথচ ব্রাহ্মণে ভক্তি নাই, এ কি রকম বাবু?

বীরু। গোঁসাই প্রভু, আমাকে এখনও চিন্‌তে পারলে না বাবা। আমার মতন তোমার ভক্ত এ দুনিয়ায় কোথা পাবে? সেই ভবানীপুর থেকে তোমাকে দেখতে এসেছি। দেখ গোঁসাই প্রভু, তিন দিন গঙ্গাস্নান করি নি।

গোস্বামী। তা ব্রাহ্মণে যত ভক্তি, গঙ্গায়ও ততোধিক।

বীরু। ঐ ত, ভক্তের দুঃখ বুঝলে না প্রভু! আমার বাড়ীর কাছে হরিণবাড়ী জেল। জেলের সামনের রাস্তা দিয়ে রোজ গঙ্গাস্নানে যাই। একদিন দেখি রাস্তায় খোয়া। অমনি ফিরে এলাম, গঙ্গাস্নান হল না। প্রভুর স্বহস্তে ভাঙ্গা ইঁট, আহা, আমি কি তার উপর পা দিতে পারি? তিন দিন ত কেঁদেই কাটালাম। তার পর যখন দেখি রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, তখন গঙ্গাস্নান করে বন্ধুর বাড়ী এসেছি। এসেই প্রভু দর্শন।"

সকলেই নিস্তব্ধ। বীরু কথা শেষ করিয়া, গোস্বামীর পা জড়াইয়া ধরিয়া ভেউ-ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমি গৃহিনীর ঘরে গিয়া, তাঁহাকে শরীর ও মন সুস্থ রাখিবার জন্য অনেক কথা বলিলাম। নিজের সন্তানের আশা নাই, তাহাতে কি? ত্রিভুবনময় গোপাল। কত দরিদ্র অনাথ বালক অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে, অর্থাভাবে শিক্ষায় বঞ্চিত হইতেছে। তাহাদের মাতা হইয়া দুই হাতে অন্ন ও ধন বিতরণ করার মতন আনন্দ কি আর জগতে আছে? যে দেহের প্রতি অত্যধিক দৃষ্টিবশতঃ রোগের ভাবনা আসিয়া অবসন্ন করিতেছে, সেই তুচ্ছ দেহ জনসেবায় নিযুক্ত করিলে তাহাতে যে স্ফূর্ত্তি আসে,

তাহার তুলনা কোথায়? রাত্রি জাগরণ করিয়া কতকগুলি উপন্যাস গ্রাস না করিয়া, যদি সুসময়ে সুশাস্ত্র ও সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করা যায়, তাহাতে দেহ মনের যে সুস্থতা আসিবে, শিশি-শিশি ঔষধ সেবনে কি সেই স্বাস্থ্য লাভ করা যায়? কর্ম্মই স্নায়ু রোগের মহৌষধ।' যুবতী ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "মা, আজ তোমার কথায় নব-জীবন পেলাম। আশীর্ব্বাদ কর, যে ধনের জন্য স্বামীর প্রাণ যাবার উপক্রম হয়েছিল, সেই ধন যেন দরিদ্র নারায়ণের সেবায় লাগাতে পারি। কোল গোপাল-শূন্য মনে ক'রে ম'রতে বসেছিলাম; আজ তুমি চোখের আবরণ খুলে দিয়েছ। আমি দেখ্‌ছি, ঘরে-ঘরে গোপালরা আদর পাবার জন্য হাত বাড়িয়ে রয়েছে।"

তিন মাস পরে একদিন তাহাদের বাড়ী গিয়া দেখি, বাড়ীটী অনাথাশ্রম হইয়াছে। প্রায় পঁচিশটী অনাথ বালক সেইখানে থাকিয়া পড়াশোনা করিতেছে। অনাথদিগের জননী আপনার ঘরের এক কোণে এক অপূর্ব্ব গোপাল মূর্ত্তির দিকে অশ্রুসিক্ত নয়নে চাহিয়া গাহিতেছে:—

বল হে কেমনে তোমায় পারি আমি ছাড়াতে।
(যখন) শিশু বেশে, কোলে এসে,
হাস কাঁদ আদর কাড়াতে॥

নারী কি চায়?

শ্রীরমলা বসু

নারী কি চায়?

নারী আর দেবীও হ'তে চায় না, খেলনার জিনিষও শুধু সে আর নয়। কবির চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে এক সাথে সুর মিলিয়ে মন তার এখন বলতে আরম্ভ করেছে,—

"দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই; অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি।"

—কিন্তু যুগ-যুগ বর্ষ-বর্ষ যে অবস্থাতে সন্তুষ্ট হয়ে নারী তার গৃহ-ধর্ম্ম ও সমাজ-ধর্ম্ম পালন করে এসেছে, আজ সেই ভারত-নারীই কেন যে এই পরিবর্ত্তনের জন্যে মনে-প্রাণে উন্মুখ হয়ে উঠেছে, ভারতের পুরুষ-সমাজ তা সম্যক উপলব্ধি করতেই পারছেন না। আর সেই জন্যই অনেক ক্ষেত্রে এ সম্বন্ধে তাঁহাদের সহানুভূতি তো নেই-ই; বরঞ্চ অবজ্ঞা-মিশ্রিত বিদ্বেষের ভাবই বেশী প্রকাশ পায়।

কিছুদিন আগে ভারতবর্ষে "নারীর দেবীত্ব" নামে একটি ছোট প্রবন্ধে, অতি অক্ষমতার সঙ্গেই আমি এ সম্বন্ধে একটু কিছু বলবার চেষ্টা করেছিলাম; কিন্তু তা সত্বেও পুরুষ-সমাজে দু'এক যায়গায় সেই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা ও বাদানুবাদ হয়ে গেছে শুনেছিলাম। আমার এক আত্মীয় সেটী 'ভারতবর্ষে' পড়ে আমাকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন,—"দেখ তোমার বৌ-ক্ষেপান এ সব লেখা আর লিখো না,- আমাদের তা'হলে বৌ সামলান দায় হবে।" হাসি-ঠাট্টার মধ্যে তিনি এই কটী কথা বলে থাকলেও, নারীর এই জাগরণের ব্যাকুলতা অনেক স্থলেই আমার আত্মীয় প্রমুখ পুরুষের কাছে "অন্যায় ক্ষেপামী বা বিদ্রোহ" বলেই প্রতীয়মান হয়।

কিন্তু এই যে জাগরণের স্রোত কিম্বা নূতন পরিবর্ত্তনের জন্য একটা অদম্য আগ্রহ,—তা' আজ-কাল সকলেই জানেন,—শুধু ভারত-নারী-সমাজেই বইতে সুরু করে নি; অন্যান্য দেশের নর-নারীর সম্বন্ধ ও অধিকার নিয়েও—তা নয় শুধু,—কি রাজ-নৈতিক, কি সমাজ-নৈতিক,—কি কর্ম্ম-ক্ষেত্রে, কি শিক্ষা-ক্ষেত্রে জগতের সর্ব্বত্রই তার সাড়া আজ পাওয়া যাচ্ছে। কোথাও বা তা সামান্য আন্দোলনের আকারে দেখা দিয়েছে; আর কোথাও বা তা বিপুল বিপ্লবের সৃষ্টি করে তুলছে। কেনই বা মানুষ শত-শত বৎসর একই নিয়ম-ধারায় সন্তুষ্ট থেকে, আবার তার প্রতি সম্পূর্ণ বীতরাগ হয়ে পড়ে। যখন সেই একই নিয়ম ও সংস্কারাবলী তার

কাছে একান্ত অসহনীয় হয়ে ওঠে,—কোন্ আমূল পরিবর্ত্তন তার প্রকৃতির ভিতর থেকে কাজ করে ও তাকে নূতনের দিকে টেনে নিয়ে যায়, তা বিশ্লেষণ করে বলা বড়ই কঠিন। তবে অনেক সময় অবশ্য তাহা শাসন ও নিয়মের অপব্যয় ও যথেচ্ছাচার দ্বারা কর্ত্তৃপক্ষ বা সবল পক্ষ হতে বাহ্যিক ভাবে প্রণোদিত হয়, তাতে সন্দেহ নাই। শাসন-ক্ষেত্র ও রাজ-নৈতিক ক্ষেত্রে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু আবার অনেক স্থলে, বিশেষতঃ সামাজিক নিয়মকানুন ইত্যাদি সম্বন্ধে, যুগ-যুগ-ব্যাপী যে সকল রীতি-নীতি মানুষ অন্তরের সঙ্গে পালন করে এসেছে, তাহাই তার কাছে সংস্কারের অন্যায় অত্যাচার বলে মনে হতে থাকে। কিন্তু কেন যে এ রকম হয়, পূর্ব্বেই বলেছি, নির্ণয় করে বলা শক্ত। কিন্তু হয় যে এ রকম, তাতে কোন ভুল নেই। কালের ফেরে সমাজের শান্ত-শিষ্ট মানুষই আবার সমাজ-বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, সর্ব্বত্রই এই ব্যাপার দেখা যায়। সমাজ ও সংস্কারের অত্যাচারে মানুষ যখনই নিজেকে ভুক্তভোগী বলে মনে করে, তখনই মন তার সেই সমাজ-বিশেষকে কিম্বা তার কোন্ কোন অনুশাসনগুলিকে একটা স্বতন্ত্র অত্যাচারী বিচারক বা শাসন-কর্ত্তার পদে অভিষিক্ত করে তোলে। তখন মন তার নির্ব্বিকার ও পক্ষপাত-শূন্য ভাবে আর বিচার করে তলিয়ে দেখতে পারে না যে, যে সমাজ এখন তার কাছে একটা ভয়াবহ প্রকৃতি-বিরুদ্ধ জিনিষ, যেন তার ক্রূর শাসনজালে দেশ-বিশেষে সম্প্রদায়-বিশেষকে আবৃত করে তাকে সংস্কার-শৃঙ্খলে বদ্ধ করে রেখেছে বলে মনে হচ্ছে, সেই সমাজটার সূচনার মূল কি? সে সমাজের অস্তিত্ব যে নিগূঢ় ভাবে তারই মনের বৃত্তিগুলির সঙ্গে সংস্পৃষ্ট, তা তখন আর তার মনেই হয় না।

এ কথাগুলি বল্লে আবার সমাজ ও তার সৃষ্টি কি করে সত্যি করে হয়, তার একটু আলোচনা দু' এক কথায় করতে হয়। যে দেশে যে ভাবেই যত অন্যায় দাবীকর সমাজেরই অস্তিত্ব থাক না কেন, এক সময় না এক সময় মানুষেরই মনের নিগূঢ় অভিলাষ ও প্রকৃতির অভাব নিয়ে তার সৃষ্টি। আজ যা অন্যায় দাবীকর বন্ধন বলে মনে হচ্ছে, এক কালে সেই বন্ধন, সেই চাপ, সেই দাবীগুলিই তার কাছ থেকে সে চেয়েছিল ব্যক্তিগত বা সমাজগত ভাবে; সম্পূর্ণ না হোক, আংশিক ভাবে অন্ততঃ তার মনের সঙ্গে সেই সব রীতি-নীতির আন্তরিক যোগ ও সায় ছিল। অন্তর তার সেগুলিই করেছিল; কিম্বা তার মনের ধারা অনুযায়ী জীবন-যাত্রার অভাব মেটাবার জন্যে সেগুলির প্রয়োজন হয়েছিল। এক কথায়, সমাজ একটা স্বতন্ত্র কিম্বা বাহিরের জিনিষ নয়,—সে শুধু পরোক্ষ ভাবে তাহারই মনের অভিব্যক্তি মাত্র। যে দেশে যে রকম ভাবে তা ফুটে ও গড়ে ওঠে, সে দেশের মানুষের মন ও জীবন-যাত্রার প্রয়োজন অনুসারেই তার রীতি-নীতি ও সংস্কারের বৈচিত্র্য ও বন্ধনের দৃঢ়তা ও শিথিলতা। কোন দেশের কোন সমাজের কোন সংস্কারই টিঁকে থাকতে পারত না, যদি তা সেই দেশের মানুষের মনের সঙ্গে এক তারে না বাঁধা থাকত। কারণ, কোন মনস্তত্ত্ববিদেরই অবিদিত নেই যে, বাহিরের কোন বন্ধনই স্থায়ী হইতে পারে না। এমন কি, জোর করে চাপিয়ে দেওয়া দায়িত্ব বা আদর্শেরও বেশী দিন প্রাণ থাকে না, যদি না ভেতর থেকে সে আদর্শের মর্ম্ম বুঝতে পেরে মন তার সার্থকতা উপলব্ধি করে। এই জন্যেই স্থান-বিশেষে সমাজের আইনকানুন সংস্কারে পরিণত হয়ে পড়ে, যেখানে তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহের সাড়াও পাওয়া যায় না। তা'হলেই বোঝা যাচ্ছে, যখন যে দেশে যে প্রথার সৃষ্টি ও প্রচলন হয়েছে, তখন তা সে দেশের মর্ম্মস্থল থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। এই-ই হচ্ছে সমাজ ও সমাজের সৃষ্টির কারণ। আর মানুষের মনের যে অভাব নিবারণের জন্য কিম্বা যে প্রকৃতি অনুযায়ী তার সৃষ্টি—মানুষের সে অভাব ও প্রকৃতি আবার গড়ে ওঠে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা-বিশেষে। তাই সমাজের কোন শাসনই মানুষের বৈরী রূপে সৃষ্ট হয় না। এ সকল কথা কারুরই অস্বীকার করলে চলবে না। কিন্তু তেমনি অন্য পক্ষে এ কথাও কারুর ভুলে থাকলে চলবে না যে, এ জগতের সমস্তই পরিবর্ত্তনশীল;—রক্ষণশীলদিগের প্রতি আমার এই অনুরোধ যে, তাঁরা এই তত্ত্বটি বিশেষ করে মনে রাখেন; এমন কি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনাচক্রে পড়ে, প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরও পরিবর্ত্তন হ'য়ে থাকে,—প্রাণীতত্ত্ববিদের কাছে এ কিছু অজানা তথ্য নয়।

সমাজের রীতি-নীতিগুলিও যেমনি সময়োপযোগী পারিপার্শ্বিকতার ভিতর গড়ে উঠে,—তেমনি ভাবেই আবার তাহাদের পরিবর্ত্তিত হওয়াও কিছুই অসম্ভব নয়।

আমাদের দেশে অবরোধ-প্রথা ইত্যাদি অত্যাচারী দুর্দ্দান্ত বিদেশীদিগের হস্ত হতে দুর্ব্বল হিন্দুদের একমাত্র সম্বল হয়ে উঠেছিল গৃহের নারীর রক্ষার্থে;—পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোকের সংখ্যার তারতম্য হিসাবে বহুবিবাহ ইত্যাদি প্রথা দেশ-বিশেষে সময়-বিশেষে নর-নারীর মধ্যে প্রচলিত ছিল ও আছে, নানা বিষয় সংক্রান্ত এ রকম দৃষ্টান্ত ইতিহাস ইত্যাদিতে কতই না পাওয়া যায়। তেমনি মানুষের মনের ও তার মানসিক ও বাহ্যিক অভাবগুলির অবস্থানুযায়ী পরিবর্ত্তিত হয়ে যাওয়া কিছুই অসম্ভব ও অস্বাভাবিক নয়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে, আট দশ বৎসর পূর্ব্বেও যে অবস্থা তার সংসারযাত্রার পক্ষে কোন রকম প্রতিকূল বলে মনে হয় নি,—আজ যদি ঠিক সেই রকম ভাবেই তাকে চলতে হয়, তা'হলে সদ্যোজাত জাগরণের অনুযায়ী পথে না চলতে পেয়ে, মনের মধ্যে যদি বিদ্রোহ ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

রাজনৈতিক ও সমাজের অন্য-অন্য ক্ষেত্রে যে পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা স্বাভাবিক ও সম্ভব ব্যাপার, নারীর মনেও বা সেই পরিবর্ত্তনের আকাঙ্ক্ষার হিল্লোল জাগরণের সাড়া দিয়ে কেন না দেখা দেবে? পুরুষদিগের ভিতর কেহ-কেহ মনে করেন, বুঝি বা পাশ্চাত্য জগতের শিক্ষার বাতাস আজ প্রাচ্য নারীর মনে এই অসন্তোষ ও চাঞ্চল্যের কুফল প্রসব করছে। কিন্তু তা নয়। কত প্রকার আন্দোলনের জল-ঝড় তো পৃথিবীময় অনবরত বয়ে যায়; কিন্তু তার প্রতিধ্বনির শব্দ তো সব সময় সবার মনে সাড়া দেয় না—তার নিজের মনও ভিতর থেকে ব্যাকুল হয়ে যদি তারি সঙ্গে না সায় দেয়? ভিতরের আজ্ঞা না পেলে শুধু বাহিরের সাধ্য কি মনের মধ্যে এ ভাব বিস্তার করে। কিন্তু আমাদের একটা বড় ভুল অভ্যাস আছে—বাহিরকে আমরা আমাদের কার্য্যকলাপের জন্যে দায়ী বা দোষী সাব্যস্ত করতে সর্ব্বদাই ব্যস্ত। কিন্তু আগেই তো বলেছি, অন্তরের সঙ্গে সায় না থাকলে, কারুরই জীবনের উপর স্থায়ীভাবে কোন প্রভাব বিস্তার করতে বাহিরের সাধ্যই থাকে না।

এই যুক্তিমতে "দেবীত্বের" নামে আবহমান কাল হতে নারীর প্রতি যে অবিচারের কথা পূর্ব্ব প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছিল, তা ভাল করে ভেবে দেখলে বলতে হয় যে, সেই নামে সেই ভাবে সে যে ব্যবহার সমাজের ও পুরুষের কাছ থেকে পেয়ে এসেছিল, বুঝি বা তার প্রাণ এতদিন তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে পেরেছিল এবং এর বেশী তার অন্তরের ক্ষুধা মেটাবার পক্ষে দরকার হয় নি। যেটুকু স্থান সে জগতের বিস্তৃত ক্ষেত্রের মধ্যে অধিকার করে মাত্র ছিল, ও পুরুষ ও সমাজের যে কর্ত্তৃত্ব সে অবনত মস্তকে চিরদিন মেনে নিয়ে নির্ব্বিবাদে ও সন্তোষপূর্ণ হৃদয়ে তার গৃহকোণে কাটিয়ে এসেছিল, তাতেই সে তার নারী-জীবনের চরম উপলব্ধি লাভ করেছিল, নইলে যুগ-যুগ-ব্যাপী বাহিরের এ শাসন ও বন্ধনের সাধ্যই থাকত না জগতের মুক্ত ক্ষেত্র থেকে তাকে অপসৃত করে রাখতে;—জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত করে—কুসংস্কার বদ্ধ গৃহকোণের অন্ধকারে তাকে চির-নিমজ্জিত করে রাখতে।

কিন্তু আজ? আজ সে তার বদ্ধ গৃহকোণ থেকে জেগে উঠেছে। আজ গৃহের জানালা-দ্বার মুক্ত করে দিয়ে, বাহিরের মুক্ত আলো ও বাতাস সে সাদরে আহ্বান করে নিতে চায়। যদি দরকার হয় বাহিরে গিয়ে তা সংগ্রহ করে নিয়ে আসতে চায়—তাতে যদি কখন পথের ধূলো গায়েই লাগে তার—তবে সে ধূলোকে ঝেড়ে নিয়ে নিজেকে বাঁচাবার ও চালাবার শক্তি যে আপনা থেকে তার ভিতরে সঞ্চিত হয়ে উঠবে। আজ সে সত্যি জগতের বিস্তীর্ণতর কর্ম্ম-ক্ষেত্রে নেমে আসবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে যদি, তাহলে পুরুষ-সমাজে এ নিয়ে এতো আশঙ্কা ও সমস্যার সৃষ্টি কেন যে হবে, তা বুঝতে পারা যায় না। এতে তো সমাজ থেকে নারীকে দূরে নিয়ে যায় না, তার গৃহ-ধর্ম্ম থেকেও তাকে অপসৃত করে না। তার ভিতরের সব শক্তিগুলি প্রস্ফুটিত হতে দিয়ে তাকে পূর্ণতরা নারীতে পরিণত করে। প্রথম এই নূতন ও পুরাতনের সংঘর্ষণ কালটা অনেক সময় একটা দ্বন্দ্বে পরিণত হয়ে বিপ্লবের মত সৃষ্টি করে। বিপ্লব অর্থই হচ্ছে তাই—পুরাতন ও নতুনের সংঘর্ষ। কিন্তু যখন মানুষের মন আমূল নূতনের দিকে অগ্রসর হয়ে পড়ে, তখন পুরাতন সংস্কার মুছে গিয়ে নূতনই জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে, সমাজের রীতি হিসাবে পরিগণিত

হয়। এ ক্ষেত্রেও তাই হবে কি না, কে জানে। যদি ক্ষণিক উত্তেজনা না হয়ে সত্যি প্রাণের অন্তরতম স্থান থেকে এ ব্যাকুল আগ্রহ জেগে থাকে নারীর মনে, তাহলে নিশ্চয়ই হবেই হবে। বাহিরের কোন বাধাই তাকে থামিয়ে রাখতে পারবে না ; অন্তর তার গেয়ে উঠবে,—

যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর'
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর' সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়।

জগতের কর্ম্ম-পথে, ধর্ম্ম-পথে সমাজের প্রাণের মাঝে প্রকৃত নারীর এই রকমেই পরিচয় ও বিকাশ হয়। সে দেবীও নয়, খেলনাও নয়,...সে শুধু নারী হ'তে চায়।

জিজ্ঞাসা

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল্

হে জলধি, নিরবধি তব কাছে এ মোর জিজ্ঞাসা
রহস্য-নিগূঢ় কোথা পেলে তুমি এ নিজস্ব ভাষা !
আলোড়িয়া আন্দোলিয়া নিষ্পীড়িয়া হৃদয় তোমার
অর্দ্ধ-উদ্‌ঘাটিত করি গুপ্ত তব মর্ম্মের দুয়ার
উচ্ছ্বসিছে দিশি-দিশি, দিবা-নিশি সায়াহ্নে-প্রভাতে
ধ্বনি সাথে প্রতিধ্বনি তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে,
অব্যক্তরে ব্যক্ত করি অপ্রকাশে করিতে প্রকাশ
ধারণা অতীত যাহা কিছু দিতে তাহারি আভাষ
এ মহা প্রয়াস কি হে, ও হে সিন্ধু, ও হে অম্বুনিধি,
কি মায়া-রহস্য ঘোরে ঘেরা তব সুগম্ভীর হৃদি,
সৃষ্টির প্রারম্ভ হ'তে কি অজানা বেদনার ভারে
বিক্ষোভিত বক্ষ তব আপনারে চাহে টুটিবারে,
তরঙ্গে তরঙ্গে দুলি' উঠে ফুলি' ফেলে দীর্ঘ-শ্বাস,
ফুটে না টুটে না তবু,—চিরকাল বিফল প্রয়াস !
লৌহ কি প্রস্তর হ'লে কোন্ কালে দীর্ণ হ'ত হিয়া
ভাঙ্গিয়া গেল না শুধু সুকোমল তরঙ্গ বলিয়া ;
বাহিরে শীতল রহি', মর্ম্মে সহি' দুর্ব্বিষহ তাপ,
যুগ-যুগ ধরি সিন্ধু, বহিতেছে কা'র অভিশাপ ?

ধনী বনাম মজুর

একহাত খেলা

তুষানল

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

কত শোচনীয় জীবন-কাহিনী তোমরা শুনেছ। আমার মহাপাপের—যে পাপের কথা মুখে আন্‌লেও মহাপাপ হয়, করা ত দূরের কথা—সেই পাপের কাহিনী আজ তোমাদের কাছে বলি। তাতে পাপের ভার লাঘব হবে না, তা জানি;—তবুও এতকাল পরে আজ বলতে হচ্চে। কেন? আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে। মহাপাপের মহা প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয়েছে—আমি উন্মাদ হতে বসেছি। হবে না! আরও কত হবে। তাই অমার কথাগুলো বলে নিই।

আমার নাম মহিম গঙ্গোপাধ্যায়। পিতার বাড়ী ছিল ঢাকা জেলার মধ্যমগ্রামে। সে বাড়ী আমি দেখি নাই—পিতাকেই হয় ত জ্ঞান হবার পর তিন-চার বার দেখেছি কি না সন্দেহ। আমি মামাবাড়ীতেই অ-মানুষ হয়েছিলাম—মানুষ হই নি। কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে; বাবা যিনি ছিলেন, তাঁর না কি বার-তেরটা বিবাহ। আমরা,—আমি আর মা, তাই মামার সংসারেই প্রতিপালিত হয়েছিলাম।

এক মামা, তিনিও নিঃসন্তান ছিলেন! আমিই ছিলাম আদুরে গোপাল; সুতরাং বিদ্যাচর্চ্চা অপেক্ষা অবিদ্যার চর্চ্চাই আমার বেশী হয়েছিল,—ষোল বছর বয়সেই নানা কুকার্য্যে লায়েক না হই, তালিম দিতে আরম্ভ করেছিলাম; আঠারো বছর বয়সে লেখাপড়া থার্ড ক্লাস অবধি, কিন্তু আবগারি বিভাগের পরীক্ষায় একেবারে এম-এ পাশ; তার আনুষঙ্গিক যা সব, তা ত আছেই।

তার পর আরও সুবিধা হোলো। গ্রামে এল ওলাওঠা; অনেক লোক মারা গেল। একমাসের মধ্যে মামা, মামী, মা, তিনজনেই গেলেন। ব্যস্, সব সাফ। থাক্‌লাম আমি। আমি যাব কেন? আমি গেলে মহাপাপ করত কে? আমি গেলে প্রেতের অভিনয় করত কে? আমি সে সময় গেলে যে একটা সয়তান কমে যেত! আমি থাক্‌লাম মামার ধনসম্পত্তি দুই হাতে উড়িয়ে দেবার জন্য! একাকী হব কেন? এ সময় অনেক সাথী মিলেছিল,—পাপের সঙ্গীর কি অভাব হয়? নায়েব মহাশয়,—মাতামহের আমলের বুড়া নায়েব মহাশয়—একটা জীবন-সঙ্গিনী আন্‌তে চেয়েছিলেন। 'এখনই তাড়াতাড়ি কি' বলে তাঁর আদেশ অগ্রাহ্য করেছিলেন। তখন যে আমি সুখের সাগরে, বিলাসের পাথারে হাবুডুবু খাচ্চিলাম; সে সময় কি বিবাহের চিন্তাও মনে আসে!

দেশে যা করবার, করেও আশা যেন মিটল না; তখন ইয়ারেরা পরামর্শ দিলেন কাশী যেতে। কাশী না কি ভারি মজার স্থান। সেখানে বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা ত আছেনই, আরও অনেকে আছেন। কাশী যেতেই হবে। যেদিন কাশীতে গেলাম, সেদিন চন্দ্রগ্রহণ। অসংখ্য নরনারী গ্রহণ উপলক্ষে গঙ্গাস্নান করে, বিশ্বনাথ দর্শন করে জীবন সার্থক করতে কাশী উপস্থিত। আর আমরা—; সে কথা পরেই জান্‌তে পারবেন।

গ্রহণের পরদিন প্রভাতে আমরাও গঙ্গাস্নান করে বিশ্বনাথ দর্শন করতে মন্দির-পথে অগ্রসর হচ্ছিলাম। দরজার সুমুখে যেখানে মস্‌জিদ ও মন্দিরের অপূর্ব্ব সম্মিলন মহাকালের মহান কীর্ত্তি ঘোষণা করছে, সেখানে গিয়ে কি দেখলাম! দেখলাম, সহস্র-সহস্র নরনারী কি এক আকর্ষণে, কি এক আবেশে আত্মহারা হয়ে ছুটে চলেছে। সারা বিশ্বজগৎ যেন বিশ্বনাথের সঙ্গে একত্র নেচে উঠে, কি এক বিশ্বপ্রেমে মানুষকে সেই শিলাখণ্ডের দিকে টেনে নিয়ে এসেছে। পুরুষ প্রিয়জনকে ছেড়ে, নারী লজ্জা-সরম ভুলে, বৃদ্ধ প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করে 'জয় বিশ্বনাথ' বলে সেই পূর্ণ ব্রহ্মের মাহাত্ম্য প্রচার উদ্দেশ্যে বিজয়-নিনাদে চারিদিক মুখরিত করছিল। দেখবার জিনিষ বটে। অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে সেই মহিমময় দৃশ্য দেখছিলাম। সঙ্গী বন্ধুরা সেই জনস্রোতে কে কোথায় ভেসে গিয়েছে টের পাইনি,—একলাই সে দৃশ্য প্রাণভরে দেখতে-দেখতে, এক মুহূর্ত্তের জন্য বোধ হয় আত্মবিস্মৃত হয়েছিলাম। সেই পুণ্যময় ক্ষণে স্থান-মাহাত্ম্যে প্রাণ বুঝি কি এক অদৃশ্য মহাশক্তিতে আচ্ছন্ন

হয়েছিল। আত্মহারা হয়ে সেই দৃশ্য দেখছি—ঠিক সেই সময় নিকটে শিশুর ক্রন্দন-ধ্বনি শুনে চমকিত হয়ে ফিরে দেখলাম, এক সুন্দরী যুবতী ৪।৫ বছরের শিশু পুত্রকে নিয়ে ভীড়ের ভেতর চাপা পড়বার মত হয়েছে। মানুষের চাপে সুন্দরীর মুখ আরক্ত, শিশু অজ্ঞান-প্রায়। যুবতীর পশ্চাতে কয়েকজন আমাদেরই মত হৃদয়হীন, সেই অসহায় অবস্থাতে তাকে আরও বিপদগ্রস্ত করে তুলেছে। যুবতী আপনাকে ঠিক রেখে, পুত্রকে সামলাতে একেবারে নিরুপায় হয়ে পড়েছে। মাতা ও পুত্রের অশ্রুজলসিক্ত সেই করুণ মূর্ত্তি মুহূর্ত্তের জন্য আমার হৃদয় জয় করে ফেলল,—মুহূর্ত্তের মধ্যে আমি সেই ভীড় ঠেলে রমণীর কাছে গিয়া উপস্থিত হয়ে, অতি কষ্টে তাঁদের বাইরে টেনে আনলাম। মুক্ত বাতাসে এসে শিশু একটু সুস্থ হল, রমণী বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে পুত্র-সম্বোধনে আশীর্ব্বাদ করে, সেইখান থেকেই বিশ্বনাথের চরণোদ্দেশে প্রণাম করে, বাসার দিকে অগ্রসর হলেন। রমণীকে যেতে দেখে, আমি তাঁকে বাসা পর্য্যন্ত পৌঁছে দিতে পারি কি না জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বললেন, "আবশ্যক নেই বাবা—তুমি আমার যে উপকার আজ করলে, তার চেয়ে বেশী আর কিছু আমি প্রত্যাশা করি না।" কি জানি কি শক্তির আকর্ষণে আমার মুখ দিয়ে আমার অজ্ঞাতেই বের হল, "এ ত মানুষেরই কাজ মা, আমি এমন কিছুই করি নাই। কাশীর মত জায়গায় আপনি একলা স্ত্রীলোক"—"না বাবা, আমার সঙ্গে আমাদের দেশের একটা স্ত্রীলোক ছিলেন, কিন্তু ভীড়ের ভেতর কোথায় যে হারিয়ে গেলেন, আর খুঁজে পেলাম না।"

"সঙ্গে পুরুষ কেউ নাই"—

"না বাবা"—এই পর্য্যন্ত বলে, তিনি মাটীর দিকে তাকালেন। এতক্ষণে তাঁর বেশভূষার দিকে আমার নজর পড়ল। গৈরিক বসনের ভেতর থেকে শুভ্র রূপজ্যোতিঃ কি এক করুণ আবেগে আছড়ে পড়ছে। রমণী বিধবা। আমি আর কোনও প্রশ্ন করতে পারলাম না। শুধু শেষবার অনুরোধ করলাম, কিছু উপকার করতে পারি কি না। রমণী একবার আমার মুখের ওপর তাঁর সজল বড় বড় চক্ষুদুটী ফেলে, কোমল স্বরে বললেন "যদি কিছু অসুবিধা না হয়, আমাদের বাঙ্গালীটোলার কালীবাড়ীর কাছে যদি রেখে এস।"

"কোন অসুবিধা হবে না" বলে শিশুকে বক্ষে তুলে নিয়ে আমি ভীড় ঠেলে অগ্রসর হলাম।—রমণীকে বাঙ্গালীটোলার এক অন্ধকারময় গৃহে পৌঁছে দিয়ে ফিরতে প্রায় বেলা বারোটা বেজে গেল। বাসায় ফিরে সঙ্গীদের কাউকে কোন কথা বললাম না। তার পর, চার পাঁচ দিন কেটে গেল। রমণীকে আর দেখতে পেলাম না। বিলাস স্রোতের অন্তরালে রমণীর কথা ঢাকা পড়ে গেল।

কয়েক দিন পরে, কি তিথি ঠিক মনে নেই, অন্ধকার রাত্রে গঙ্গার উপর বজরায় আমোদ করে বেড়াচ্ছিলাম। ঘাটের উপর অগণ্য আকাশ-প্রদীপ নক্ষত্রের মত জলজল করে, জাহ্নবীর বক্ষে প্রতিচ্ছবি ফেলে, চারিদিক উদ্ভাসিত করে তুলেছিল। নৌকার ছাদের উপর বসে প্রাণ খুলে লোকে গান ধরেছে। কূলে ঘাটের উপর কীর্ত্তন হচ্ছে। চারিদিকেই প্রাণোন্মাদকারী আনন্দ-কলরব। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়েছিল। ঘাটের লোক এক-এক করে গৃহে ফিরে গেল, ক্রমে নিস্তব্ধতার অবসাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। দশাশ্বমেধ-ঘাটে নৌকা লাগিয়ে আমার সঙ্গী কয়েকজন নেমে পড়ল। যে আগে নেমেছিল, সে তাড়াতাড়ি এসে খবর দিল যে, ঘাটে এক শিকার আছে। অতি সুন্দরী এক যুবতী সিঁড়িতে বসে জপ করছে। তার কথায় আর একজন বলল "ওসব ফাঁদে ফেলার জাল! ভাল হলে এত রাতে একলা এসেছে জপ করতে!" তার কথায় দু'জন অগ্রসর হল। আমি সেদিন এত মদ খেয়েছিলাম যে, আমার নড়বার শক্তি ছিল না; আমি সুধু বললাম, "ওহে, দেখ না।" মাঝিদের আগেই মুখ বন্ধ করা ছিল; কারণ, তারা রোজই আমাদের কাছে প্রচুর অর্থ পেত, এবং তাদের বজরায় এমন শিকার প্রায়ই ধরা পড়ত। বজরার সব আলো নিবিয়ে দিয়ে, ধীরে-ধীরে-রমণী যেখানে বসে জপ করছিল, তার সুমুখে দাঁড় করান হল। আমার একটু-একটু মনে পড়ে, আমার সঙ্গীরা রমণীকে পাঁজা-কোলা করে বজরায় টেনে তুলল,—বজরা গঙ্গার বক্ষে ভেসে চলল। সে রাত্রে আমি নেশায় এমন অবশ হয়ে পড়েছিলাম যে, আমার জ্ঞানই ছিল না। সঙ্গীরা না কি আমাকে অজ্ঞান অবস্থায় বাসায় এনেছিল। বজরায় কি হয়েছিল, কিছুই আমি দেখ্‌তে পাই নি, বা জান্‌তেও পারি নি। সকালে উঠে দেখলাম, বাসার শয্যায় শুয়ে আছি—অবসাদে সমস্ত দেহ আচ্ছন্ন। সমস্ত দিন কিছু ভাল লাগল না। সন্ধ্যার সময়

মন্দিরে গেলাম। মন্দিরে তখন আরতির দামামা বেজে উঠেছে। মন্দিরে ঢুকে নাট-মন্দিরের এক পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আরতি দেখছি,—হঠাৎ কে পেছনদিক হতে ডাকল, "বাবা, শোন।"—ফিরে দেখি, সেদিনকার সেই রমণী—যাঁকে ভীড় থেকে উদ্ধার করে বাসায় পৌঁছে দিইছিলাম। কিন্তু আজ তাঁর মূর্ত্তি দেখে চেনবার উপায় নেই। সমস্ত মুখে কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে! মাথার চুল তৈলহীন। সমস্ত শরীর কি এক দুঃখের আবরণে আবরিত। কি এক দারুণ বেদনা এই কয়দিনের মধ্যেই তাঁকে যেন জরাজীর্ণ করে দিয়েছে। বাইরে এসে দেখলাম, শিশুটি সঙ্গে নেই। মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠল—তবে কি রমণী পুত্র-শোকে অস্থির। রমণীর দিকে মুখ ফেরাতে, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "বাবা, আজ সকাল থেকে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি। সেদিন মা বলে ডেকেছ, তাই এ হতভাগিনী তোমায় একটা অনুরোধ করতে—" কি এক তীব্র যাতনা এসে রমণীর কণ্ঠরোধ করে দিল। আমি সান্ত্বনাবাক্যে বললাম, "আপনি নিঃসঙ্কোচে বলুন। আমার দ্বারা যদি কিছু হয়, তবে অনুরোধ করতে হবে না মা—বলুন।" "বাবা, কাল সকালে একবার আমার বাড়ী যদি যাও,—আমার বিশেষ অনুরোধ,—আমার আপন সন্তান অজ্ঞান—অক্ষম, তুমি সন্তানের কাজ করবে'—রমণীর দুই গণ্ড ছাপিয়ে বারিধারা ঝরে পড়ল। আমি বললাম, "নিশ্চয় যাবো মা,—এর জন্য চোখের জল ফেলবেন না। কাল সকালে ৮।৯টার ভেতরে গেলে হবে কি?"

"হ্যাঁ হবে——এখন তবে যাই।"

"আরতি দেখবেন না?"

"না, অসুস্থ ছেলে বাসায় ঘুমুচ্ছে। শুধু একবার তোমার সন্ধানে এসেছিলাম, যদি দেখা পাই মনে করে। বিশ্বনাথ আমার কান্না শুনতে পেয়ে তোমায় টেনে এনেছেন।" রমণী বিশ্বনাথের মন্দিরে মাথা ছোঁয়াইয়া প্রণাম ক'রে চলে গেলেন। আমি সেইখানে দাঁড়িয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলাম।

পরের দিন সকালে উঠে তাড়াতাড়ি চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বাঙ্গালীটোলায় বাড়ীটা খুজে নিতে আমার একটু দেরী হ'য়ে গেল; কারণ, সেদিন রমণীর সঙ্গে একবার এদিকে এসেছিলাম; কাজেই, প্রথমটা একটু ধাধা লেগেছিল। যাই হোক, অল্প চেষ্টাতেই তাঁর বাসার সন্ধান করে, বাড়ীর ভেতর প্রবেশ করলাম। বাড়ীটা প্রকাণ্ড; অনেকগুলো ঘর—সবই যাত্রীতে পূর্ণ। রমণীর ঘর নীচের তলায়। ঘরের সুমুখে অনেকগুলি স্ত্রী-পুরুষ ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে। আমায় সে দিকে অগ্রসর হ'তে দেখে, একজন বৃদ্ধা বলে উঠ্‌ল, "তোমারই কি বাবা, আসবার কথা ছিল? আহা হতভাগী তোমার জন্যেই এখনও বেঁচে আছে—সকাল থেকে কেবলই আমার ছেলে এল—ছেলে এল করছে"—

বৃদ্ধার কথায় আমি বিস্মিত হ'য়ে গেলাম।—বেঁচে আছে! তবে কি রমণী মৃত্যু-মুখে? আমি দ্রুতপদে ঘরের ভেতর প্রবেশ করে যা দেখলাম, তাতে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠ্‌ল। রমণী একখানা দড়ির খাটিয়ায় নিমীলিত নেত্রে শুয়ে আছে—পার্শ্বে সেই শিশু "মা মা" বলে আছড়া-পিছড়ি করছে। সামান্য অনুসন্ধানেই জানতে পারলাম, হতভাগিনী আফিং খেয়েছেন। কখন খেয়েছেন, তা কেউ জানে না। সকালে উঠে বৃদ্ধা তাঁর এই অবস্থা দেখে জানতে পেরেছে। আমার কণ্ঠ-স্বর শুনে রমণী চোখ চেয়ে বলল, "বাবা এসেছ—আমি জানতাম তুমি আসবে। তোমার মুখে আমি যে ছায়া দেখতে পেয়েছি, তাতে আমার দৃঢ় ধারণা ছিল, তুমি আসবে,—মায়ের ডাক ছেলে কি ঠেলতে পারে।" রমণীর কথায় বাধা দিয়ে আমি বললাম, "এ কি সর্ব্বনাশ করেছেন মা, কি দুঃখে এমন সোণার পুতুল ছেলে ফেলে আত্ম-হত্যা করলেন!" "বড় দুঃখে বাবা—বড় দুঃখে—উঃ"—

"ডাক্তার! এখানে ডাক্তার কোথায়' থাকে কেউ যদি ডেকে আন—"

"ডাক্তার ডেকো একটু পরে। যা বলতে তোমায় ডেকেছি, শোন। লোকগুলোকে একটু সরিয়ে দাও"—

আমি দার-সমীপস্থ লোকদের সরে যেতে বলায়, সকলেই যে যার ঘরে চলে গেল। শুধু বৃদ্ধা দোরের কাছে বসে কাঁদতে লাগল।

সকলে চলে গেলে, রমণী আমায় তাঁর কাছে সরে আসতে বললেন। আমি খাটের নিকট গিয়ে বসতে, রমণী ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, "বাবা, আজ মা হয়েও বড় লজ্জার কথা বলছি, কি করব উপায় নেই। ঐ হতভাগাটার জন্যেই তোমায় এত কষ্ট দিচ্ছি। ওর কেউ নেই"—

বলতে-বলতে রমণীর দুচক্ষু জলে ভরে এল। একটু সামলে পুনরায় বলতে লাগলেন, "বাবা, পরশু রাত্রে বিশ্বনাথের আরতি দেখে ফিরতে দেরী হয়ে পড়েছিল; তাই ফেরবার সময় গঙ্গার ঘাটে বসে আহ্নিকটা করে নিচ্ছিলাম। সেই সময় আমার সর্ব্বনাশ করতে জনকতক বদমায়েস জোর করে আমায় ধরে একটা বজরায় নিয়ে যায়। আমি তখন অজ্ঞান হয়ে পড়ি। জ্ঞান হয়ে দেখি, তখনও রাত আছে; আমি গঙ্গাতীরে একটা ঘাটে পড়ে আছি। আর কি বলব বাবা! আমি তখনই গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে এ জীবন ত্যাগ করতাম, কিন্তু পারি নি—শুধু ঐ হতভাগার জন্য পারি নি। ওকে এই বিশ্ব-সংসারের মাঝে অনাথ করে ফেলে যেতে পারি নি। কিন্তু আমার কোন অপরাধ নেই;—পিশাচ—নরপিশাচ শয়তানরা আমার সর্ব্বনাশ করেছে,—নিঃসহায় অবলাকে হত্যা করেছে। উঃ, ভগবান, এ মহাপাতকের কি বিচার হবে না—এ নরপিশাচদের কি দণ্ড নেই!" সে সময় যদি আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ত, তা হলেও আমি তত কাতর হতাম না। রমরণীর কথায় আমার হৃদপিণ্ডটা কে যেন মুচড়ে দিল। আমার সমস্ত শরীর ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠ্‌ল। খাটখানা দৃঢ় হস্তে চেপে ধরে, আমি রমণীর মুখের পানে চেয়ে বসে রইলাম। রমণী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পুনরায় বললেন, "বাবা আমার কেউ নেই,—স্বামীর চিহ্ন ঐ একমাত্র সম্বল বুকে ধরে, আজ চার বছর সংসারের সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছি। বুড়ো বয়সে স্বামী আমায় বিবাহ করে আমাকে সুখী করতে চেয়েছিলেন। তাঁর আরো অনেক স্ত্রী ছিল, কিন্তু তাদের ছেড়ে তিনি বুড়ো বয়সে আমায় নিয়ে সংসার পেতেছিলেন। আমার অদৃষ্টে সইল না—ঐ হতভাগাকে তাঁর স্মৃতির সাক্ষ্য দিতে রেখে তিনি স্বর্গে গেলেন। মরবার সময় বলেছিলেন—'ভিক্ষা করে খেও, তবু নারীর সম্মান হারিয়ো না। ভগবানের উপর নির্ভর কোরো, তিনিই সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন।' কিন্তু সর্ব্বনাশীর রূপই কাল হল। স্বামীর মৃত্যুর পর অসহায় পেয়ে হৃদয়হীন পুরুষের দল ঝাঁকে-ঝাঁকে এসে আমায় অতিষ্ঠ করে তুলল। দু-বছর, রমণী হয়েও, সেই ডাকাতদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, শেষে বাধ্য হয়ে স্বামীর ভিটে ছেড়ে বাপের বাড়ী পালিয়ে গেলাম। বাপ মা নেই, ভাই আছে—বড় গরীব। একটা বোঝা এসে ঘাড়ে পড়ায়, সে বিরক্ত হল। তবে মায়ের পেটের বোন—ফেলতে পারে না—তাই লাথি-ঝাঁটা মেরেও একবেলা এক মুঠো খেতে দিত। কিন্তু দুর্ভাগ্য সঙ্গে-সঙ্গে ফেরে;—সেখানেও নিস্তার পেলাম না,—গ্রামের জমিদার এসে এই রূপের কাঙ্গাল হয়ে দাঁড়ালেন। ভগবান এই নিঃসহায় হতভাগীকে রূপ দিয়েছেন কেন, তা তিনিই জানেন! এই কদর্য্য দেহ, যা আর দুঘণ্টা পরে ছাই হয়ে যাবে, তার ঘাড়ে এ রূপের বোঝা চাপিয়ে এ ব্যঙ্গ-পরিহাস কেন!—যাক্, যা বলছিলাম—একটু জল দাও"—রমণীর মুখে কম্পিত হস্তে জল দিলাম। জল পান করে একটু সুস্থ হয়ে আবার বললেন, "জমিদারের হাত এড়াতে শেষ সম্বল দুগাছা রুলী বেচে ঐ মেয়েমানুষটির সঙ্গে কাশী পালিয়ে এলাম। শুনেছিলাম, বিশ্বেশ্বরের স্থানে কেউ অভুক্ত থাকে না—তাই বাবার স্থানে শেষ জীবনটা এই ছেলেটাকে বুকে করে কাটাব ভেবেছিলাম। জানি না বিশ্বনাথের চরণে কি অপরাধ করেছি যার জন্য আমার এই সর্ব্বনাশ হল।—বাবা, আমি চল্‌লাম। আমার স্বামীর আর এক ছেলে রামনগরে আছে। সে বড়লোক,—তার মামার বিষয় পেয়েছে। যদিও আমি তাকে কখনও দেখি নি, তবু এই হতভাগা তারই পিতার সন্তান। তারই পিতার রক্ত ওর শরীরে বইছে। সে ওকে ফেলতে পারবে না।—আর এই তার অভাগিনী বিমাতার শেষ অনুরোধ। ওর পিতার নাম—স্বামীর নাম স্ত্রীলোকের মুখে আনতে নেই, কিন্তু না আনলে উপায় নেই" "স্বামীর উদ্দেশে দুহাত যোড় করে রমণী প্রণাম করে বললে—"ওর পিতার নাম ৺রামদুর্ল্লভ গঙ্গোপাধ্যায়—নিবাস ঢাকা মধ্যমগ্রাম। তাঁর মুখে শুনেছিলাম তাঁর সেই ছেলের নাম মহিম। ও কি বাবা, তুমি কাঁপছ কেন? ও কি, তোমার কি হোলো!"

* * * * * * *

আমার যখন জ্ঞান ফিরে এল, তখন চোখ চেয়ে দেখি, আমার পাশে দুইটী মৃতদেহ;—একটী আমার দেবীস্বরূপিণী বিমাতার, আর একটী তাঁরই কোলের ছেলে—আমার ভাইয়ের। সব শেষ হয়ে গেছে।

তার পর এই দশ বৎসর কি করে কেটেছে, শুনবে? আমার চক্ষের সম্মুখে দিনরাত একটা ছবি জলজল করেছে এই দশ বছর,—গেরুয়া-পরা, গলায় রুদ্রাক্ষমালা, আলুলায়িত-

কেশা, মলিন-বদনা এক দেবী-মূর্ত্তি। এক দিনের জন্যও এ মূর্ত্তি আমার চক্ষের সম্মুখ থেকে যায় নাই। আর আমি তারস্বরে 'মা, মা' বলে চীৎকার করেছি। দীর্ঘ দশ বছর গিয়েছে—কিছুই ভুলি নাই; বুদ্ধিভ্রংশ হয় নাই;—পাগল হই নি। এরই নাম কি তুষানল? কি জানি! এখন কিন্তু মনে হচ্চে, আমার আর দেরী নেই; এখন এক-একবার তন্দ্রা আস্‌ছে,—এক-একবার ভুল হচ্চে। তাই, সময় থাকতে আমার মহাপাপের কথা বলে গেলাম। বিশ্বনাথ, অনাথনাথ, মহাপাপীর জন্য আর কি শাস্তি তোমার আছে, নিয়ে এস। তুষানলে পাপ মুছে গেল না প্রভু! আরও দণ্ড দেও,—আরও দেও। তোমার দণ্ড-দাতা দয়াময় নাম সার্থক হোক!

ধূলি

শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী

আমায় ধূলি করে দাও—ধূলি গো!
কঠিন আঘাতে গুঁড়ায়ে হিয়ার
গুপ্ত কামনা গুলি গো!

যেদিন বুঝব তোমার বিশাল বিশ্বে
আমি তো তুচ্ছ কণা;
তৃণ হ'তে নিচে, সেদিন আমার
সার্থক উপাসনা!

আমায় সব চেয়ে নিচে, সকলের পিছে
সবার চরণতলে,
সর্ব্ব-সহা এ ধরার ধূলায়
মিশাও শাসন ছলে!

তোমার, চরণ-আঘাতে প্রতি পলে পলে
(এই) বুকের কাঁকর গুলি গো;
(প্রভু) গুঁড়ো হ'য়ে থাক্‌, করে দাও মোরে
অসীম পথের ধূলি গো।

শাসন-সংস্কার

চাবুকের মাহাত্ম্য

নিজামুদ্দীন্ আউলিয়া

শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র

সাধু মহাত্মা শেখ নিজামুদ্দীন আউলিয়ার স্মৃতিমণ্ডিত সমাধিভূমি ভারতীয় মুসলমানগণের পবিত্র তীর্থস্থান। পুণ্যাত্মা ফকিরের নামানুসারে গ্রামটীও নিজামুদ্দীন বা নিজামপুর নামে অভিহিত। রাজধানী দিল্লীর চারি মাইল দক্ষিণে মথুরা যাইবার রাজপথের পার্শ্বেই নিজামুদ্দীন গ্রাম। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীত হইয়াছে,—আজিও ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় সেখ নিজামুদ্দীন নাম শুনিলে সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিয়া থাকেন। তাঁহার মৃত্যুতিথি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য এখনও প্র'তবৎসর নিজামুদ্দীন গ্রামে দুই দিন ব্যাপিয়া মহাসমারোহে মেলা বসিয়া থাকে। এই উপলক্ষে নানা স্থান হইতে অসংখ্য যাত্রী তাঁহার সমাধিস্থানে সমবেত হইয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দিয়া নিজেদের কৃতার্থ মনে করেন।

নিজামুদ্দীনের পিতৃদত্ত নাম মহম্মদ। ফকিরী লইবার পর তাঁহার নূতন নামকরণ হয়—সুলতান-ই-মশাইথ নিজামুদ্দীন আউলিয়া। তিনি চিশ্‌তী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। আজমীরের খাজা মুইনুদ্দীন চিশ্‌তী এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। শেখ ফরিদুদ্দীন মসুদ শকরগঞ্জ চিশ্‌তী সম্প্রদায়ের তৃতীয় পীর বা গুরু। নিজামুদ্দীন ইঁহারই শিষ্য।

নিজামুদ্দীনের পূর্ব্বপুরুষগণ বুখারার সৈয়দ সম্প্রদায়ভুক্ত অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতামহ সৈয়দ আলি অল্‌বুখারী ও তদীয় পিতৃব্যপুত্র সৈয়দ খাজা পাঠানগণের ভারতবিজয়ের প্রাক্কালে জন্মভূমি বুখারা পরিত্যাগ করিয়া ভাগ্যান্বেষণে ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহারা প্রথমে কিছুকাল লাহোরে থাকিয়া, পরে বদায়ুনে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে লাগিলেন। সৈয়দ আলির পুত্র সৈয়দ আহ্‌মদ বদায়ুনের কাজীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। খাজা আরব ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রভূত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হন। তাঁহার কন্যা বিবি জুলেখার সহিত সৈয়দ আহ্‌মদের বিবাহ হয়। নিজামুদ্দীন এই বিবাহের সন্তান। বদায়ুন নগরে ইই অক্টোবর ১২৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এই সাধু মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন।

পাঁচবৎসর বয়সের সময় নিজামুদ্দীন পিতৃহীন হন। বিধবা জননীর তত্ত্বাবধানে তাঁহার লালনপালন ও শিক্ষা চলিতে লাগিল। ১৬ বৎসর বয়সে তিনি উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য বদায়ুন হইতে দিল্লী গমন করেন। এখানে তিনি তিন চারি বৎসর কাল খাজা সামসুদ্দীনের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তৎকালে সামসুদ্দীনের পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবত্তার খ্যাতি ভারতব্যাপী ছিল।

দিল্লীতে অবস্থান কালে চিশ্‌তী সম্প্রদায়ের তৃতীয় পীর শেখ ফকিরুদ্দীনের কনিষ্ঠ সহোদর শেখ নজীবুদ্দীন মুতবাক্কীলের সহিত নিজামুদ্দীনের পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। শিক্ষা সমাপ্তির পর নিজামুদ্দীন দিল্লীর কাজী পদের জন্য প্রার্থনা করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রিয় সুহৃদ্ নজীবুদ্দীনের পরামর্শে তিনি সে চেষ্টা হইতে বিরত হন। বদায়ুনে থাকিতেই তিনি সেখ ফরিদুদ্দীন শকরগঞ্জের নাম শুনিয়াছিলেন। এক্ষণে বন্ধুর মুখে সাধুর ধর্ম্মজীবনের পবিত্র কাহিনী শুনিয়া তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মপিপাসা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। এই সময়ে তাঁহার মাতা বিবি জুলেখার মৃত্যু হওয়ায় নিজামুদ্দীন সংসারের সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিলেন।

১২৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিংশবর্ষীয় যুবা নিজামুদ্দীন সাধু-দর্শনাশায় পাকপাটান নামক স্থানে গমন করিলেন। শেখ ফরিদুদ্দীন এই ধর্ম্মপিপাসু যুবককে সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন ও অত্যল্প কাল পরেই দীক্ষা দান করিয়া তাঁহাকে শিষ্যদলভুক্ত করিয়া লইলেন। ইহার আট বৎসর পরে নিজামুদ্দীন ফরিদুদ্দীনের প্রধান শিষ্য ও উত্তরাধিকারীর পদে উন্নীত হইলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে ফরিদুদ্দীন তাঁহাকে গুরুপরম্পরা-প্রাপ্ত চিশ্‌তী পীরের পবিত্র নিদর্শন—একটী অঙ্গরাখা, নমাজ করিবার জন্য কার্পেটের আসন ও একটী দণ্ড অর্পণ করিয়া যান।

নিজামুদ্দীন রাজধানীর কর্ম্ম-কোলাহল আদৌ পছন্দ করিতেন না। রাজদরবারের আহ্বান তিনি অকুতোভয়ে প্রত্যাখ্যান করিতেন। কয়েক বৎসর দিল্লীতে অবস্থান করার পর নির্জ্জনে ভগবদারাধনার সুবিধার জন্য তিনি নগরের উপকণ্ঠে ঘিয়াসপুর নামক একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে বাস করিবার সঙ্কল্প করেন। স্থানীয় অধিবাসীগণের বিশ্বাস, ঘিয়াসপুরে বাস করিবার জন্য তিনি ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তিনি ঘিয়াসপুর গ্রামে যমুনার তীরে একটী ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই ঘিয়াসপুর এক্ষণে নিজামুদ্দীন বা নিজাপুর নামে পরিচিত। কয়েক বৎসর পরে নিজামুদ্দীনের অন্যতম শিষ্য জিয়াউদ্দীন ইমাদুল মুল্ক্ এই স্থানে তাঁহার জন্য একটী খান্কা (আশ্রম) নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। তিনি এই আশ্রমে জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করেন এবং জীবনান্তে এই স্থানেই সমাহিত হন।

১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে ৮৯ বৎসর বয়সে নিজামুদ্দীন পরলোক-গমন করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি সঞ্চিত সমুদয় অর্থ দীন-দরিদ্রগণের মধ্যে নিঃশেষে বিতরণ করিয়া গিয়াছিলেন। নিজামুদ্দীন অকৃতদার ছিলেন। শেখ ফরিদুদ্দীন তাঁহাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়া যান। জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, তিনি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভগিনীর বংশধরগণ এখনও বর্ত্তমান। ইঁহারা পীরজাদা নামে খ্যাত। নিজামুদ্দীনের সমাধিস্থানের তত্ত্বাবধানের ভার আজিও ইঁহাদের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে।

চিশ্তী ও সুফীমতের সামঞ্জস্য করিয়া নিজামুদ্দীন "চিশ্তীয়া নিজামিয়া" নামে এক নূতন ধর্ম্মমতের প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় বহু আমীর উমরা ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক পাঠান সুলতানগণের অনেকেই তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য ও ধর্ম্মপ্রাণতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী বিপদে-আপদে দৈবানুগ্রহ লাভের জন্য প্রায়ই তাঁহার শরণাপন্ন হইতেন। যুগ-যুগান্ত পরেও মোগল-সম্রাট্ শাহ্জহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারা শুকো ও প্রিয়তমা কন্যা জহান্-আরা তাঁহার প্রচারিত "চিশ্তীয়া নিজামিয়া" মত আদর্শ ধর্ম্মমত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নিজামুদ্দীন গ্রামের চতুর্দ্দিক পূর্ব্বে প্রস্তর প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল; এবং ইহার পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিকে তিনটী তোরণ ছিল। প্রাচীর ও তোরণগুলি এক্ষণে ভগ্নস্তূপে পরিণত। গ্রামের দক্ষিণাংশে সমাধিস্থান রক্ষক পীরজাদাগণের বাসগৃহ। উত্তরদিক চাবুত্রা নামে অভিহিত। এই অংশে নিজামুদ্দীনের শিষ্য ও অনুরাগী ভক্তগণের বহু সমাধি বর্ত্তমান। এই সমস্ত সমাধিভবন ও স্মৃতিসৌধ মুসলমান যুগের স্থাপত্যশিল্প ও বিচিত্র কারু-কার্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। কালের নিষ্ঠুর প্রভাবে এই স্থানের বহু সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুখের বিষয় ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ ও অন্যান্য সহৃদয় ভক্তের অর্থানুকূল্য ও যত্নে এক্ষণে বহু সমাধির সংস্কার সাধন হইয়াছে।

গ্রামের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে সমাধি-স্থানের প্রধান প্রবেশ-দ্বার। এই স্থানে প্রবেশ করিলে, প্রথমেই একটী অনতিবৃহৎ বাওলী অর্থাৎ পুষ্করিণী দৃষ্ট হয়। ইহার দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম তীর প্রস্তর-মণ্ডিত, ও সমস্ত উত্তর দিক সুবিস্তৃত প্রস্তর-সোপান শ্রেণীর দ্বারা সুশোভিত। মুসলমান-গণের চক্ষে বাওলীর জল অতি পবিত্র—ইহার স্পর্শে না কি সকল প্রকার ব্যাধি ও পাপ বিদূরিত হয়। এই বাওলী সম্বন্ধে একটী কৌতুকাবহ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। যে সময়ে নিজামুদ্দীন বাওলী নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন ঐ সময়ে তোঘলকাবাদে সুলতান ঘিয়াসুদ্দীন তোঘলকের নূতন দুর্গ নির্ম্মিত হইতেছিল। সুলতানের আদেশে রাজধানী ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের সমস্ত শ্রমিক দুর্গনির্ম্মাণকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল—তাহাদিগকে অন্য কোথাও কার্য্য করিতে দেওয়া হইত না। নিজামুদ্দীনের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ শ্রমিকগণ রাত্রিকালে দীপালোকে বাওলী খনন করিতে লাগিল। সুলতান ইহা জানিতে পারিয়া আদেশ প্রচার করিলেন যে, কোনও ব্যবসায়ী নিজামুদ্দীনকে তৈল বিক্রয় করিতে পারিবে না। কিন্তু ইহাতেও বাওলীর নির্ম্মাণ কার্য্য বন্ধ হইল না। দৈবশক্তিপ্রভাবে বাওলীর জলে তৈলের অভাব মোচন হইতে লাগিল।

বাওলীর পশ্চিমতীরে চিনি-কা বুরুজ নামক সমুন্নত দ্বিতল মস্জিদ। সংস্কার ভাবে মস্জিদটী এক্ষণে লুপ্তশ্রী হইয়া পড়িয়াছে। পশ্চিম তীরের আর একটী দর্শনযোগ্য

স্থান বাই কোকাল্‌দীর সমাধি। ইহা মর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত ও ইহার ছাদ খিলান করা। বাওলীর পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিক্ ঘুরিয়া একটি সঙ্কীর্ণ পথ নিজামুদ্দীনের সমাধি-ভবন পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই পথটী সম্প্রতি এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারক দিল্লীনিবাসী মিঃ মহম্মদ রফিকের ব্যয়ে রক্তপ্রস্তর-বিমণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে।

সমাধিস্থানের প্রায় মধ্যস্থলে নিজামুদ্দীন আউলিয়ার পবিত্র স্মৃতি-সৌধ। সুবিস্তৃত বেষ্টনীর মধ্যে উচ্চ গম্বুজ ও মিনার-শোভিত এই সুদৃশ্য সমাধি-মন্দির দর্শকগণের মনে যুগপৎ বিস্ময় ও ভক্তির উদ্রেক করে। ইহার চত্বর ও কক্ষতল মর্ম্মর-মণ্ডিত ও উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্বদিকে রক্তপ্রস্তরের জালায়ন। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ফিরোজপুরের নবাব আহ্‌মদ বক্‌শ খাঁ ইহার চতুর্দ্দিকের বারাণ্ডার সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। বারাণ্ডার বিচিত্র শিল্পকার্য্য-সমন্বিত প্রস্তর-স্তম্ভগুলি ও স্তম্ভশীর্ষবর্ত্তী সুদৃশ্য খিলানগুলি প্রশংসমান চক্ষে দেখিতে হয়।

সমাধি-মন্দিরের মধ্যবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্রায়তন কক্ষে নিজামুদ্দীনের দেহ সমাহিত। কক্ষের প্রাচীর জাফরী-কাটা মর্ম্মর-প্রস্তরে নির্ম্মিত—দ্বার রৌপ্য-খচিত। সমাধির উপর মূল্যবান্ মুক্তা-খচিত সুদৃশ্য কারুকার্য্য সমন্বিত কাষ্ঠের চন্দ্রাতপ। কক্ষ মধ্যস্থ গম্বুজের সোণালি কাজ ও সুরঞ্জিত চিত্রগুলি কাল-প্রভাবে মলিন হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুরের অর্থ সাহায্যে এগুলি পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। সমাধি-কক্ষে একটী কাষ্ঠাসনের উপর মুসলমানগণের পবিত্র ধর্ম্ম-গ্রন্থ কোরাণ রক্ষিত। অনেকে বলেন, এই কোরাণখানি সম্রাট্ আওরংজীবের স্বহস্ত-লিখিত।

নিজামুদ্দীনের সমাধির পশ্চিম-দিকে সুপ্রাচীন মসজিদ—"জমায়ৎখানা" ফেরিশ্‌তার মতে নিজামুদ্দীনের পরম-ভক্ত ও শিষ্য যুবরাজ খিজির খাঁ ইহার প্রতিষ্ঠাতা। কোন-কোন ঐতিহাসিক বলেন, নিজামুদ্দীন জীবদ্দশায় স্বয়ং এই মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে মোগল-সম্রাট্ আকবর বহু অর্থ-ব্যয়ে মস্‌জিদটীর আমূল সংস্কার করাইয়া দিয়াছিলেন। আকারে ক্ষুদ্র হইলেও শিল্প-সৌন্দর্য্যে জমায়ৎখানা ভারতের অন্যান্য অনেক প্রসিদ্ধ মস্‌জিদের সমকক্ষ। লাল প্রস্তরে নির্ম্মিত মস্‌জিদটী পাঠানযুগের স্থাপত্য-নৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ইহার প্রাচীর-গাত্রে ও খিলানের উপর কোরাণের অনেক পবিত্র বয়েৎ খোদিত আছে।

জমায়ৎখানার দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে প্রাচীর-বেষ্টিত স্বল্পায়তন স্থানে মোগল সম্রাট্ শাহ্‌জাহানের প্রিয়তমা জ্যেষ্ঠা কন্যা ও কারা-সঙ্গিনী জহান্-আরার মর্ম্মর সমাধি। জহান্-আরা নিজামুদ্দীনের ধর্ম্মমতের অনুরাগিনী ছিলেন। তিনি জীবিত কালে এই সমাধি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। জহান্-আরার সমাধি সর্ব্বপ্রকার আড়ম্বরশূন্য—সমাহিতা বাদ্‌শাহ-দুহিতার ঐশ্বর্য্যে বিতৃষ্ণা ও নিরহঙ্কারিতার পরিচায়ক। সমাধির উপর একখণ্ড প্রস্তর-ফলকে পারসী ভাষায় নিম্নলিখিত কবিতাটী খোদিত আছে ;—

"গৌরবের আবরণে
সজ্জিত করো না মোর
সমাধির স্থল
মম সম দীনা তরে
অন্তিমের শ্রেষ্ঠ সাজ
শ্যাম তৃণদল।" *

জহান্-আরার সমাধির পূর্ব্বদিকে হতভাগ্য মোগল-সম্রাট্ মহম্মদ শাহর সমাধি-ভবন। ইহা মর্ম্মর-প্রস্তরে নির্ম্মিত ও ইহার চতুর্দ্দিকে প্রস্তরের বেষ্টনী। এই সমাধি-ভবনটী জহান্-আরার সমাধি-ভবনেরই অনুরূপ। ইহার পূর্ব্বদিকে কিছু দূরেই সম্রাট্ দ্বিতীয় আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র মির্জ্জা জহাঙ্গীরের সমাধি। এই সুদৃশ্যসৌধ মির্জ্জা জহাঙ্গীরের জননী নবাব মমতাজ মহল বেগম কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহার সন্নিকটে স্বতন্ত্র বেষ্টনীর মধ্যে একটী ক্ষুদ্র অট্টালিকা। মির্জ্জা জহাঙ্গীর এই অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া এখানে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। অট্টালিকার প্রাঙ্গণে মির্জ্জা জহাঙ্গীরের পত্নীর ও নিজামুদ্দীনের অন্যতম শিষ্য খাজা আব্‌দর রহমানের সমাধি।

নিজামুদ্দীনের সমাধি-ভবনের বেষ্টনীর বাহিরে পূর্ব্ব-দিকে আরও কতকগুলি সমাধি দৃষ্ট হয়। ইহার মধ্যে মোগল-কুল-তিলক সম্রাট্ আকবরের প্রিয় সভাসদ আবুল

---

* শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "জাহানারা" হইতে গৃহীত।
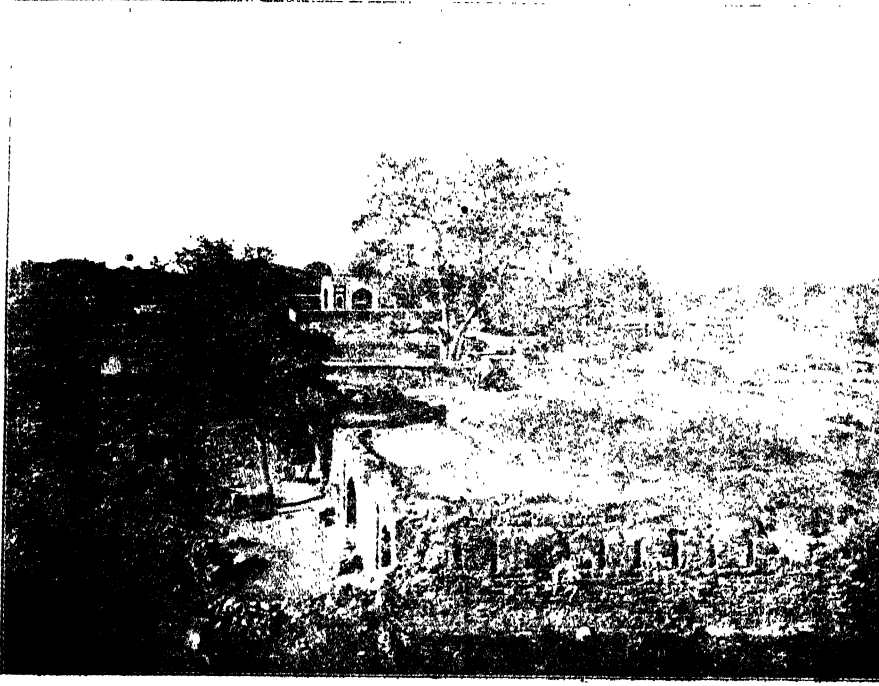
নিজামুদ্দীন পল্লীর দৃশ্য

ফজ্জলের সমাধিটী উল্লেখ-যোগ্য। আরও পূর্ব্বে কিছু দূরে সুবিস্তৃত একটী বেষ্টনীর মধ্যে আট্‌কা খাঁর সুদৃশ্য সমাধি-ভবন। শামসুদ্দীন মহম্মদ আটকা খাঁ সম্রাট আকবরের ধাত্রী-পুত্র। শামসুদ্দীনের পুত্র মির্জ্জা আজিজ কোকা এই সমাধি-ভবন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

নিজামুদ্দীনের প্রধান শিষ্য সুপ্রসিদ্ধ পারসী কবি আমীর খসরুর সমাধি-ভবন এখানকার আর একটী প্রধান দর্শন-যোগ্য স্থান। এই সুন্দর সমাধি-মন্দির একটী সুপ্রশস্ত বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত। ইহার প্রাঙ্গণ ও কক্ষতল রক্ত প্রস্তরে বাঁধানো। যে কক্ষে আমীর খসরুর দেহ সমাহিত, তাহার চারিদিকে জাফরী-কাটা রক্ত-প্রস্তরের প্রাচীর। মুসলমানদিগের চক্ষে এই সমাধি অতি পবিত্র স্থান। আমীর
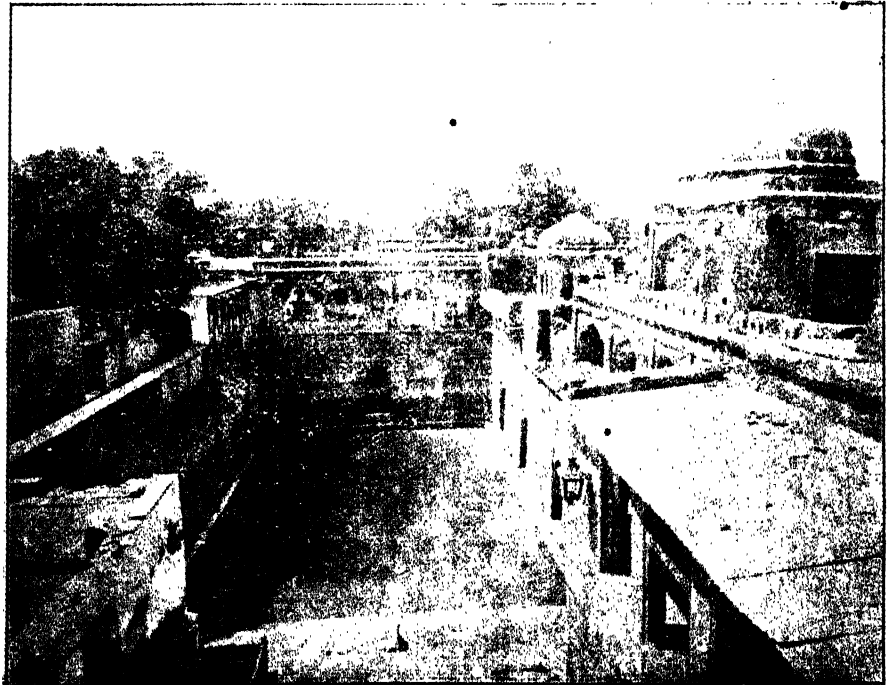
নিজামুদ্দীনের বাউলির দৃশ্য

খসরুকে তাঁহারা 'পীর' বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন। তাঁহার মৃত্যু-তিথিতে এখানে প্রতি বৎসর ধূমধামের সহিত মেলা বসিয়া থাকে। নিজামুদ্দীনের সমাধি-রক্ষক পীরজাদাগণ আমীর খসরুর সমাধি-ভবনেরও তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন।

জহান্‌-আরার সমাধি-ভবন

আমীর খসরু নিজামুদ্দীনের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। নিজামুদ্দীনের ইচ্ছা ছিল খসরুর ও তাঁহার মৃত দেহ যেন একই স্থানে কবর দেওয়া হয়। তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল পরেই আমীর খসরুও দেহ-ত্যাগ করেন। তাঁহার সমাধির আয়োজন করা হইলে, দিল্লীর সুলতান-বংশীয় একজন উমরা তাহাতে আপত্তি উথাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার আপত্তির কারণ — নিজামুদ্দীনের সমাধির নিকট খসরুর সমাধি হইলে, ভবিষ্যতে কোন্‌টী কাহার সমাধি, চিনিয়া লইতে লোকের গোলমাল হইতে পারে।
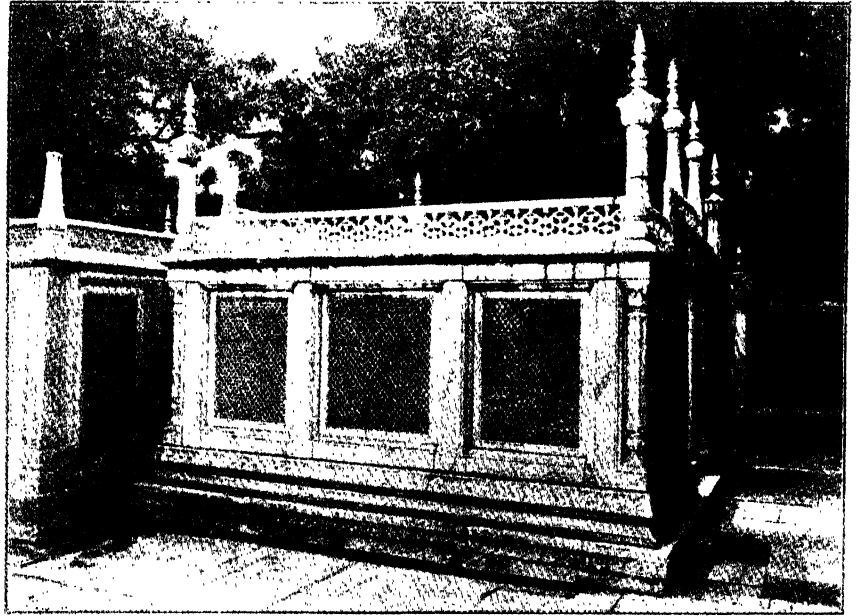
লঙ্গরখানা ও 'আমীর খসরু'র পূর্ব্বদ্বার
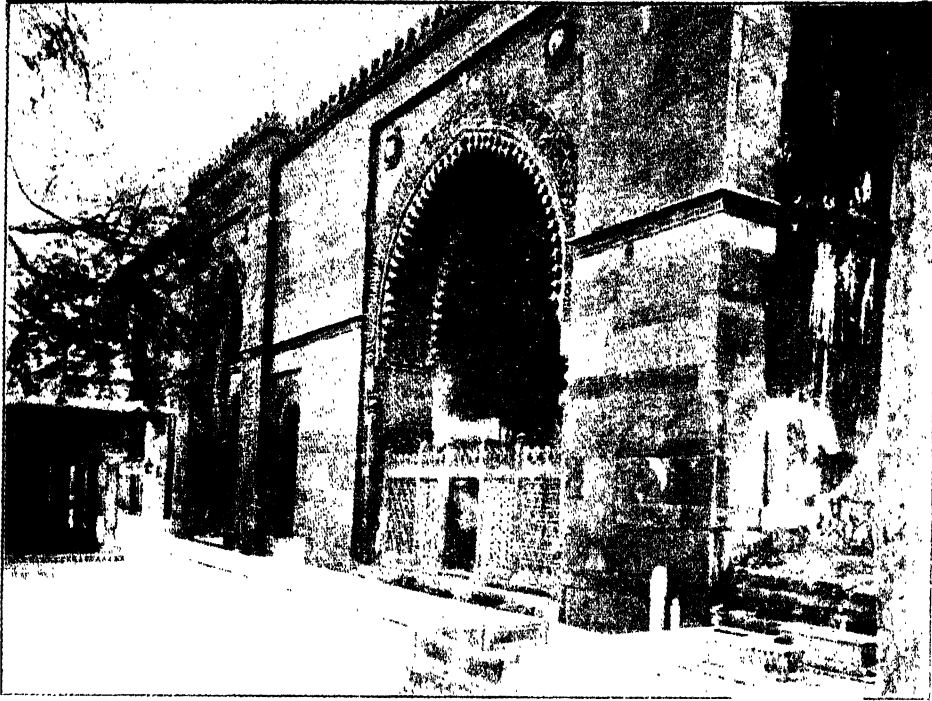
জমায়াৎখানার পূর্ব্বদিক

এই কারণে আমীর খসরুর দেহ বর্ত্তমান স্থানে সমাহিত। কিন্তু উমরার প্রকৃত অভিপ্রায় ছিল অন্য প্রকার। তিনি নিজের জন্য নিজামুদ্দীনের সমাধির নিকটেই একটী সমাধিভবন নির্ম্মাণ করাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, এই দুই সমাধির মধ্যস্থলে কাহারও সমাধি না থাকে, ভাগ্যবিধাতা কিন্তু তাঁহার সে ইচ্ছা অপূর্ণই রাখিয়াছিলেন।

আমীর খসরুর সমাধি-বেষ্টনীর পশ্চিম দিকে খান্-ই দৌরান খাঁর মস্‌জিদ। ইহার অভ্যন্তরে খান্-ই দৌরান খাঁর সমাধি। মস্‌জিদটী মোগল স্থাপত্য-শিল্পের আদর্শে রক্ত-

জমায়াৎখানার অভ্যন্তরভাগ
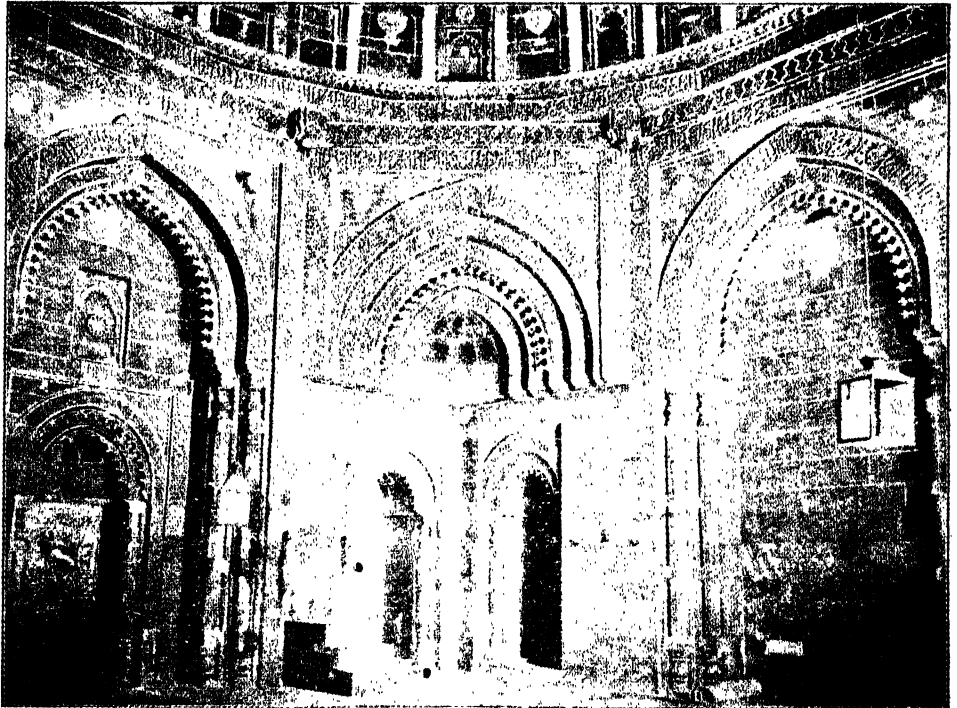
লাল মহাল

নিজামুদ্দীনের সমাধি-ভবন

চৌষট্ খাম্বা
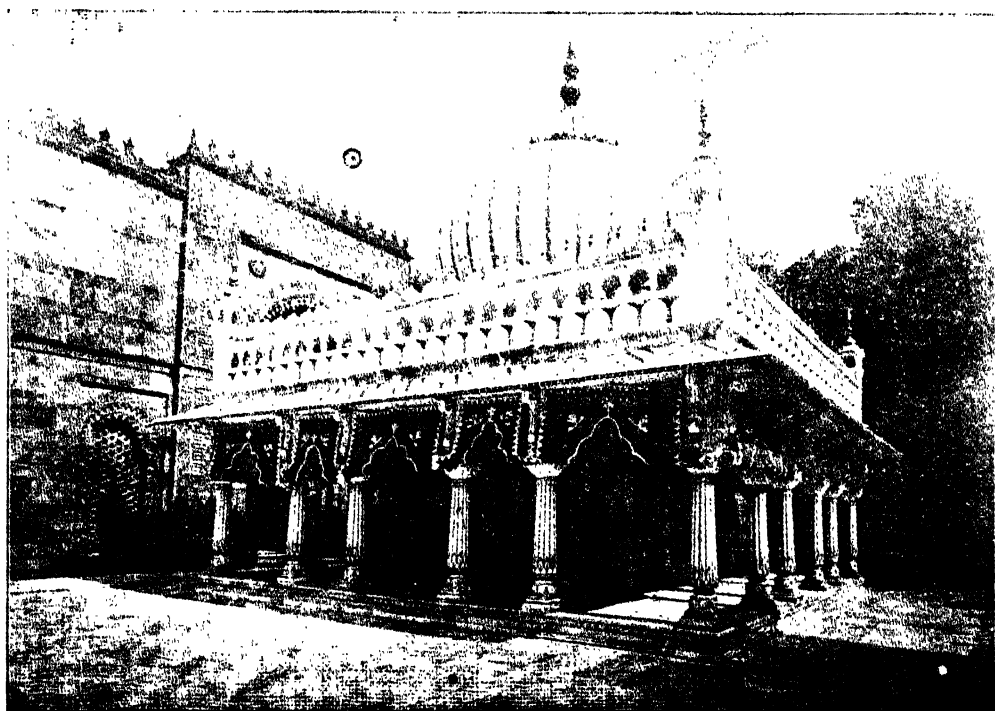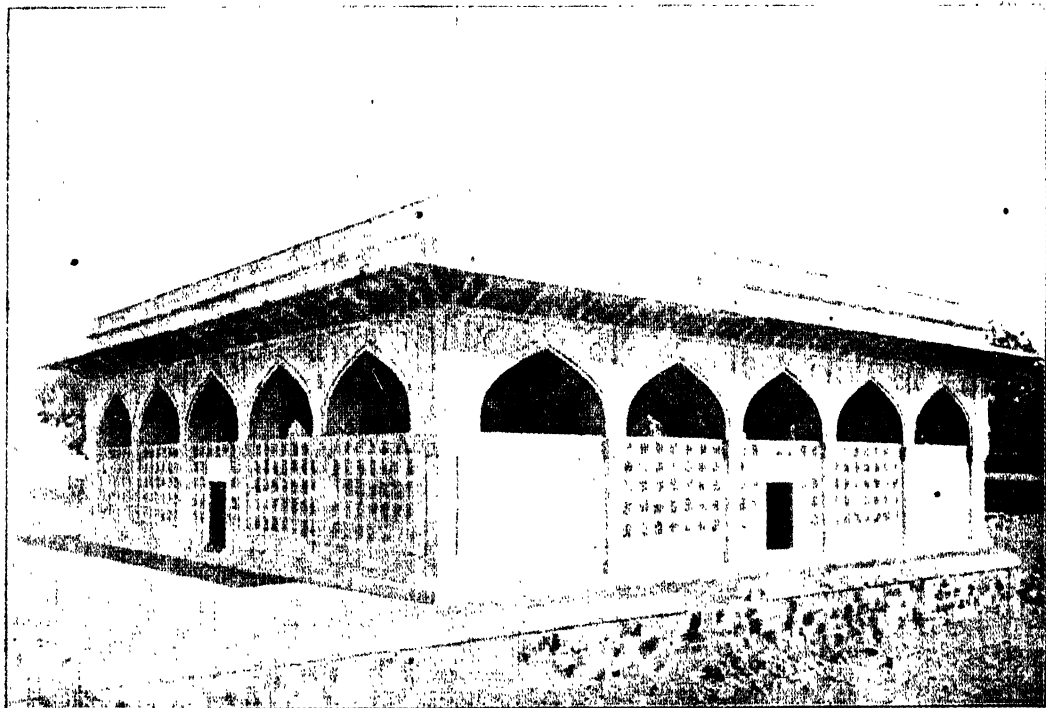
আমীর খস্রুর সমাধি-ভবন

বর্ণ প্রস্তরে গঠিত। খান্-ই দৌরান খাঁ মোগল সম্রাট্ ফররুখ্‌শিয়ার ও মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে দিল্লীর প্রধান উজীর ছিলেন।

আমীর খসরুর সমাধির পূর্ব্বদিকে "লঙ্গড়খানা" নামক সুবৃহৎ হর্ম্ম্য। এখানে পূর্ব্বে অনাথ, আতুর ও দরিদ্রগণআশ্রয়-লাভ করিত।

আট্‌কা খাঁর সমাধি হইতে পঞ্চাশ গজ দূরেই "চৌষট্ খাম্বা" নামক সুদৃশ্য মর্ম্মর-সৌধ। চতুর্দ্দিকের বারাণ্ডায় চৌষট্টিটী স্তম্ভ থাকায় ইহা "চৌষট খাম্বা" নামে প্রসিদ্ধ। এই অট্টালিকার অভ্যন্তরে একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে আট্‌কা খাঁর পুত্র মির্জ্জা আজিজ কোকার সমাধি।

চৌষট্ খাম্বার উত্তর দিকে কিছু দূরে উচ্চ চাবুত্রার উপর প্রতিষ্ঠিত লালমহল প্রাসাদ। রক্ত-প্রস্তর নির্ম্মিত সুবৃহৎ প্রাসাদের মধ্যস্থলে একটী সুদৃশ্য উচ্চ গম্বুজ লালমহলের পূর্ব্ব-গৌরব ঘোষণা করিতেছে। এক সময়ে সৌন্দর্য্য ও শিল্প-নৈপুণ্যের জন্য লাল-

জহান-আরার সমাধি-ভবনের অভ্যন্তর ভাগ
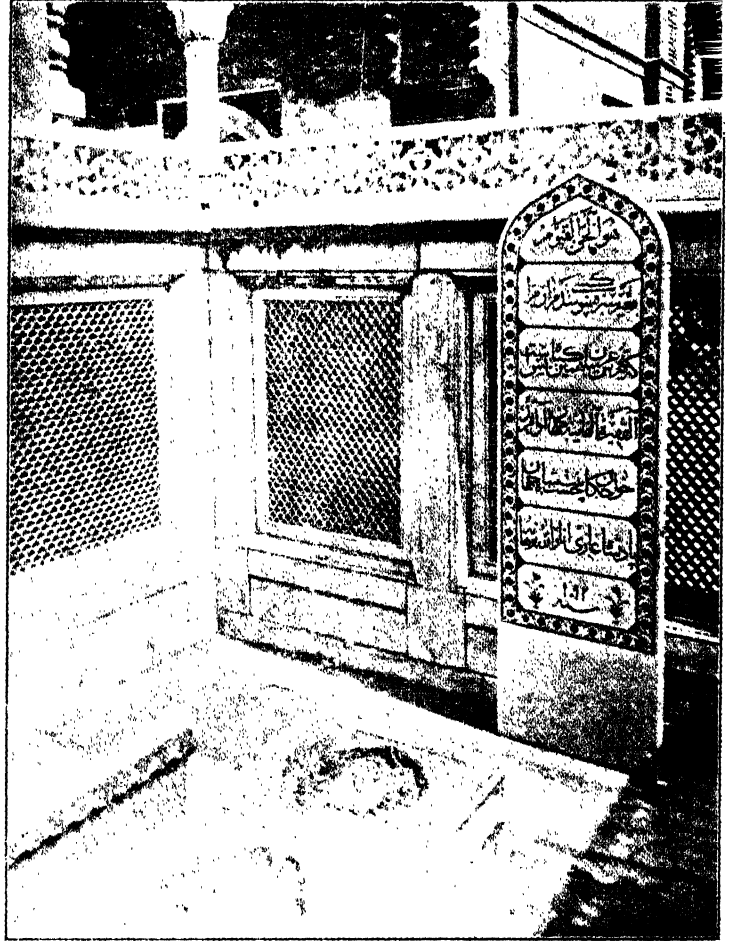
মহলের খ্যাতি ছিল, এক্ষণে ক্রমশঃ ইহার পূর্ব্বশ্রী বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে। এই প্রাসাদ খিল্‌জি সম্রাট্‌গণের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হয়।

নিজামুদ্দীন গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে খান্-ই-জহানের মস্‌জিদ। পাঠান-সম্রাট্ ফিরোজ শাহের প্রধান মন্ত্রী খান্-ই-জহানের পুত্র এই প্রকাণ্ড মস্‌জিদ মৃত পিতার স্মরণার্থ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মসজিদটী এক্ষণে ধ্বংসের পথে অগ্রসর।

নিজামুদ্দীন গ্রামে আরও অনেক সমাধি-ভবন ও মস্‌জিদ আছে। বাহুল্য ভয়ে সেগুলির উল্লেখ করিলাম না। *

* মৌলভী জাফর হাসান বি, এ প্রণীত "Guide to Nizamu-d Din" নামক গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত।

ওয়াটসনের পদপ্রান্তে শৃঙ্খলিত বন্দী চন্দননগর ও কলিকাতা

শ্রীহরিহর শেঠ

ভারতবর্ষে বৃটীশ সাম্রাজ্যের বনিয়াদ গঠনের অন্যতম নির্ম্মিতা চালস্ ওয়াট্‌সনের বীরত্ব, সাহসিকতা ও সম্মান জাগরূক রাখিবার উদ্দেশ্যে বিলাতের ওয়েষ্টমিনষ্টার্ য়াবিতে একটী মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ওয়াট্‌সনের বীরত্ব দেখাইবার জন্য এদিকে ভারতীয় গুণ্ডা পুরুষরূপী চন্দননগরকে বন্দী করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হইয়াছে। অপর

ওয়াট্‌সনের পদপ্রান্তে শৃঙ্খলিত বন্দী চন্দননগর ও কলিকাতা

দিকে সালঙ্কৃতা ঐশ্বর্য্যবতী সুন্দরী যুবতীরূপী মুক্ত কলিকাতা নগরী, সতরুজ্জভাবে নতজানু হইয়া জেতার দিকে চাহিয়া আছে।

চন্দননগরে ইংরাজ ফরাশির যুদ্ধের ফলে ইংরাজ ফরাশিকে পরাজিত করিয়া চন্দননগর অবরোধ করেন। প্রায় সেই সময়েই নবাব সিরাজদ্দৌলার কবল হইতে ইংরাজ কলিকাতাকেও মুক্ত করেন। এ উভয় কার্য্যই এড্‌মিরাল্ ওয়াট্‌সনের অধিনায়কত্বে সংসাধিত হইয়াছিল। এই সুবিশাল ভারত সাম্রাজ্যের পত্তনের সময় যাহাদের হাত ছিল, তাঁহাদের এমনই ভাবে মূর্ত্তি স্থাপনের দ্বারা সম্মানিত করা স্বাভাবিক। কিন্তু বাঙ্গালার চন্দননগরকে মূর্ত্তি দিতে এমন একটা অবাঙ্গালী ডুসমনের বল্পনা আসিল, আর সে বাঙ্গালার কলিকাতাকে একটা সুন্দর রমণী মূর্ত্তিতে গঠিত করিবার প্রবৃত্তি আসিল কেন, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না ইহা বাণিজ্য-লক্ষ্মীর কাল্পনিক মূর্ত্তি বলিয়া মনে হয়। যদি তাহাই হয় তখন চন্দননগরও বণিজ্যের স্থান ছিল আমার ন্যায় একজন চন্দননগরের নাগরিকের পক্ষে এ পার্থক্যের কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন মনে হওয়া স্বাভাবিক।

সুপ্রসিদ্ধ ভূপ্রদক্ষিণ গ্রন্থে এই প্রতিমূর্ত্তির উল্লেখ দেখিয়া, বিলাতের ওয়েষ্টমিনষ্টার্ য়্যাবি হইতে উহার ফটো তোলাইয়া আনা হইয়াছে। উহারই প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল।

নিখিল ভাষা

শ্রীরমেশচন্দ্র জোয়ারদার বিদ্যাবিনোদ

মাঘ মাসের "ভারতবর্ষে" দেখিলাম যে Mr. Biss. বাঙ্গালীর ছেলেদের বৃথা পরিশ্রম লাঘব করিবার জন্য, বহু আবর্জ্জনা-(যুক্ত গত্ব যুক্তাক্ষর প্রভৃতি) যুক্ত বাঙ্গালা অক্ষরের পরিবর্ত্তে নির্ম্মল ইংরাজি বর্ণমালার সাহায্যে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

আজ প্রায় ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে "নিখিল ভারতে একভাষা" শীর্ষক একটী প্রবন্ধে আমি দেখাইয়াছিলাম যে সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য কথা ভাষা সংস্কৃত ভাঙ্গা (সাধু) হিন্দী হওয়াই সঙ্গত। কিন্তু লিখা ভাষা বাঙ্গলা হওয়াই উচিত, কেননা হিন্দী অক্ষর অপেক্ষা বাঙ্গলা অক্ষর শীঘ্র লেখা যায়। এখন পুনরায় উপযুক্ত সময় হইয়াছে মনে করিয়া বিশদভাবে উহার আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বলা বাহুল্য সহরের পথ অবলম্বন করিলে কালে কালে ভারতের জাতীয় ভাষাও লোপ পাইবে। কিন্তু আমার প্রস্তাব জানিয়া লইলে, জাতীয় ভাষা লোপ না পাইয়া নূতন জীবনে সঞ্জীবিত হইবে।

নিখিল ভাষার বর্ণমালায় স্বর সংখ্যা ৭টী থাকিবে যথা ;—

অ	আ	অী	অ৷	অে	অৈ	অী
অ	আ	ই(ঈ)	উ(ঊ)	এ	অ্যা	ও

ঋ ঌ ঐ ঔ গুলির কোনও প্রয়োজন নাই, রি, লি, ওই, ওউ, দ্বারা কার্য্য চলিবে। 'অ্যা' নামক পৃথক একটি স্বরের খুবই প্রয়োজন, যথা "তু ক্যা করতা হ্যায় ? ওগুলি ছাপিতেও নূতন টাইপের প্রয়োজন নাই, 'অী'র 'ী' দীর্ঘ ঈকার অথবা ব্রহ্মদেশীয় "ইয়েচ্চ" দ্বারাও কার্য্য চলিতে পারে 'অ৷' '৷' ব্রহ্মদেশীয় '৷' ট্ চ্চাউঙ্গীন্ বা '[' বন্ধনীর উপরকার অংশ কাটিয়া দিলেও চলিবে। ˋ, ˋ, ˌ৷, এগুলি ত দেবনাগরী টাইপেই পাওয়া যাইবে ; কাযেই নূতনত্ব ও বিশেষত্ব কিছু নাই। বানানের সময় এইরূপে লেখা হইবে ;—

ক	গা	চী	জ৷	টে	ডৈ	তী
ক	গা	চি(চী)	জু(জূ)	টে	ড্যা	তো

ইত্যাদি। টাইপ রাইটিংএর কোন গোলযোগ নাই, ইংরাজির মত পর পর বসাইয়া গেলেই চলে।

ব্যঞ্জনবর্ণ এইরূপ ;—

ক	গ	চ	জ	ট	ড	ড়
ত	দ	ন	প	ব	ম	য়
র	ল	স	হ	ং	ঁ	।

খ ও ঘ প্রভৃতি পৃথক অক্ষর না দিয়া কহ = খ, গহ = ঘ, এই ভাবেই লিখা চলিবে। ইহার নাম থাকিবে "হ ফলা।" যুক্তাক্ষরও এইরূপে লেখা হইবে, ফলাগুলি মাত্রাশূন্য ছোট আকারের টাইপ দিয়া চলিবে ; যথা, বিলম্ব = বিলম্ব, কর্ম্ম = কর্৷, শ্রী = সরী, বিজ্ঞ = বীগগঁ, যাচঞা = জাচং, আজ্ঞা = আগগাঁ। প্রথম প্রথম কিছু অসুবিধা সকলেরই হইবে কিন্তু এই ভাষায় শিক্ষা দীক্ষা আরম্ভ হইলে যে সুবিধা হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। চিহ্নাদি যথা—

, ; । ? ! ( ) ⋯ — ... + × ÷ * " " / মোট ১৭টি এবং সংখ্যা বা পাটি ১০টি এই সাকুল্যে ৭ + ২০ + ১৭ + ১০ = ৫৪টি চিহ্ন দ্বারাই নিখিল ভাষার কার্য্য চলিবে। ইংরাজিও ইহার কম নহে। Type writerএ মোট ৩৩টি keyতেই shift keyর সাহায্য সমস্তগুলি অক্ষর লেখা চলিবে। ইংরাজিতেও ইহার কম নহে।

সভাপতির অভিভাষণ *

মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম-এ, সি-আই-ই

রীতি আছে, বার্ষিক অধিবেশনের দিন সভাপতিকে একটা বক্তৃতা করিতে হয়। কিন্তু সাহিত্য-পরিষদে কাজ এতই বাড়িয়া গিয়াছে যে, সেদিন আর সভাপতির অভিভাষণ কিছুতেই হইতে পারে না। তাই গত বৎসর আমার বক্তৃতা হয় নাই। বৎসরের মধ্যে বক্তৃতার জন্য চেষ্টা হইয়াছিল, কখন আপনারা সময় করিয়া উঠিতে পারেন নাই, কখন আমি পারি নাই। সুতরাং হয় নাই। আমার সে দেনাটা শোধ করা দরকার। তাই আজকার আয়োজন।

কিন্তু বলিব কি? গত বৎসরে ইচ্ছা ছিল, বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের কথা বলিব। আপনাদেরও তাই ইচ্ছা ছিল। সুধু সামাজিক ইতিহাসের কথা বলিতে গেলেই জাতির কথা বলিতে হয়। জাতির উপর এখন বড় রাগ। ওটা একটা পুরান জিনিস; কখন হয় ত উহাতে কিছু উপকার হইয়াছিল, এখন কেবল অপকার—কেবল অপকার; ভারতের সর্ব্বনাশের কারণই জাতি। জাত ভাঙ্গ—সব একত্রে খাও—পরস্পর বিয়ে কর—অনাচরণীয়দের আচরণীয় করে নাও, তাদের সঙ্গে খাও দাও, তাদের সঙ্গে বিয়ে থা দাও—সব একাকার হয়ে যাক—সব ডিমক্রাসি হয়ে যাক। এ সব ত বেশ কথা—ভাল কথা, উন্নতির কথা। কিন্তু জাতির কথা উঠিলেই সবাই চটিয়া যায়। এমন চটা নয়—একেবারে চটিয়া লাল। সেবার বাঙ্গালার গৌরবের কথা বলিতে গিয়া, কায়স্থ ব্রাহ্মণের কিছু সুখ্যাতি করিয়াছিলাম। তাই বৈদ্য মহাশয়েরা আমার উপর চাবুকের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কাল একজন জাতি-সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ লেখক আমায় লিখিয়াছেন, "আমি অমুকের জাতিকে তাঁহার মনের মত করিয়া বড় করিতে পারি নাই, তাই তাঁহার সঙ্গে আমার পত্র-ব্যবহার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাই আমি আর ও-গোলযোগের ভিতর যাইতে চাহি না। আমি একটা কিছু বলিতে চাই। কি বলিব? এক বৎসর ধরিয়া ভাবিলাম। শেষ স্থির করিলাম, বাঙ্গালার গৌরবের আর একটা অধ্যায় বাড়াইয়া দিব। বাঙ্গালা সাহিত্যে আর একটা আর প্রাচীন পাতা উল্টাইয়া দিব। বাঙ্গালার একটা পুরান কাহিনী বলি।

নগেন বাবু ও দীনেশ বাবু দুজনেই প্রমাণ করিয়াছিলেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ইংরেজি ১১ শতকে আরম্ভ। তাঁহাদের প্রমাণ শূন্যপুরাণ আর ধর্ম্মমঙ্গল শূন্যপুরাণ রামাই পণ্ডিতের লেখা। নিরঞ্জনের উষ্মা নামে রামাই পণ্ডিতের একটি ছড়া আছে। সে ছড়ায় রামাই পণ্ডিতের ভণিতা দেওয়া আছে। সুতরাং সেটি যে রামাই পণ্ডিতের, তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই। সে ছড়াটি কিন্তু বাঙ্গালা দেশের কোন জায়গায় মুসলমান আক্রমণের ছড়া। সুতরাং মুসলমান আক্রমণের অনেক পরে লেখা। অনেক পরে বলি কেন? যেহেতু সে ত নবদ্বীপ অধিকারের কথা নয়, গৌড় অধিকারেরও কথা নয়। একটা কোন ছোট গ্রাম, নগর বা জায়গা অধিকারের কথা। এটা এখন স্থির যে, মুসলমানেরা একেবারে সারা বাঙ্গালাটা দখল

* ১৩২১ বঙ্গাব্দের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৮শ বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বদিবস (১১।৩।২১) পঠিত।

করিতে পারেন নাই। তাঁহাদিগকে ধীরে ধীরে অধিকার করিতে হইয়াছিল। সুতরাং এ "উম্মা" গৌড় ও মালদহ অধিকারের বেশ একটু পরে হইয়াছিল। শ খানেক বৎসর বলিলে বোধ হয়, বেশীও বলা হয় না, কমও বলা হয় না। কারণ, প্রথম এক শ বৎসরের ইতিহাসে দেখিতে পাই, মুসলমানরা আপনা আপনি লড়াই-ঝগড়া করিতেছেন। সুতরাং "উম্মাটা" ইংরাজী ১৪ শতকের লেখা বলিয়াই বোধ হয়। ১১ শতকের নহে। উহাকে ও শূন্যপুরাণকে ১১ শতকের লেখা বলিলে একটু বেশী পুরান বলা হয়।

ধর্ম্মমঙ্গলের গল্পটা একটু পুরাণ বটে। ধর্ম্মপালের ছেলে—নাম দেওয়া নাই, গৌড়ের রাজা। কিন্তু ধর্ম্মমঙ্গল বইখানা তত পুরাণ নহে। "হাকন্দপুরাণমতে ময়ূর ভট্টের পথে" উহা রচিত হইয়াছে। হাকন্দপুরাণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। ময়ূরভট্টের পুথি পাওয়া গিয়াছিল। ময়ূরভট্ট যে বেশী পুরান লোক, তাহা বোধ হয় না। তাঁহার পুথিতে বর্দ্ধমান মঙ্গলকোট রাঢ়দেশের প্রধান জায়গা। সেটা ১৪ শতকের বেশী আগে হইবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং শূন্যপুরাণে ও ধর্ম্মমঙ্গলে প্রমাণ হয় না যে, বাঙ্গালা সাহিত্য ১১ শতকে আরম্ভ হইয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি কতকগুলি বৌদ্ধ গান ও দোহা ছাপাইয়াছিলাম। সেগুলি খৃষ্টের ১০ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ১১র শেষ পর্য্যন্ত আসিয়াছিল বোধ হয়। সেগুলি সিদ্ধাচার্য্য-সম্প্রদায়ের গান। লুই আদি সিদ্ধাচার্য্য। লুই ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান দুইজনে "লুই অভিসময়" নামে একখানি সংস্কৃত বই লিখিয়াছিলেন। হীনযানে যাহাকে "অভিধর্ম্ম" বলে, মহাযানে তাহাকে "অভিসময়" বলে—অর্থাৎ দর্শনশাস্ত্র। লুই যে ধর্ম্ম প্রচার করেন, লুই ও শ্রীজ্ঞান দুজনে মিলিয়া তাহার দর্শনশাস্ত্র প্রস্তুত করেন। লুইয়ের সময় জানা নাই। শ্রীজ্ঞানের সময় জানা আছে। তিনি ৯৮০ সালে জন্মান, ৫৮ বৎসর বয়সে ১০৩৮ সালে ভোটের রাজার অনুরোধে ভোটদেশে যান। সেখানে ১৪ বৎসর ধর্ম্মপ্রচার করিয়া ১০৫২ সালে মরেন। সুতরাং লুই যখন একটা ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালা গান লেখা হইয়াছে, তখনই শ্রীজ্ঞানের আবির্ভাব। শ্রীজ্ঞান নাড় পণ্ডিতের শিষ্য এবং লুইএরও শিষ্য। কাজেই লুইএর যখন অনেক বয়স হইয়াছে, তখন শ্রীজ্ঞানের বয়স অল্প। "লুই অভিসময়" যদি ১১ শতকের প্রথম ভাগে লেখা হয়, তাহা হইলে লুইএর গানগুলি তার আগে লেখা হইয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম, সিদ্ধাচার্য্যদের গানগুলি ১০ম শতকে আরম্ভ হইয়া ১১শ শতকে শেষ হইয়াছে।

অনেকে বলেন যে, সিদ্ধাচার্য্যদের গানগুলি বাঙ্গালা নয়। কেহ বলেন, উহা অপভ্রংশ ভাষা; কেহ বলেন, উহা প্রাকৃত; কেহ বলেন, উহা বৌদ্ধ-প্রাকৃত; আবার একজন আছেন ও তিনি বলেন, উহা ভাষাই নয়; নানা ভাষা হইতে কথা সংগ্রহ করিয়া কোন রকমে সাজাইয়া দিয়াছে মাত্র। আরংজীবের সময় যেমন একটা তৈরী ভাষায় কোরাণ লেখা হইয়াছিল, সে ভাষাটাই তৈয়ারী; এও সেই রকম। আমি বলি, তা হয় হউক; আমার তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু লুই বাঙ্গালী ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; তাঁহার চেলারাও অনেকে বাঙ্গালী ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেই কালে বাঙ্গালা দেশে চলিত ভাষায় গান লেখা হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে ভাষাকে বৌদ্ধ-প্রাকৃতই বল, প্রাকৃতই বল, অপভ্রংশই বল, আর যা-ই বল; ওটা ত নাম দেওয়া মাত্র। আমি না হয়, বাঙ্গালা দেশের ভাষাকে বাঙ্গালা নাম দিলাম, তাহাতেই বা দোষ কি?

কিন্তু এ বিষয়ে কাশীদাস আমার বড় সাহায্য করিয়াছেন। তিনি মহাভারতের গোড়াতেই বলিয়াছেন,—

শ্লোকচ্ছন্দে সংস্কৃত রচিলেন ব্যাসে।
গীতিচ্ছন্দে কহি তাহা শুন অনায়াসে॥

এখানে "গীতি" শব্দ বাঙ্গালা গান অর্থে ব্যবহার হইয়াছে। তাহার উল্টা—সংস্কৃত কবিতা অর্থে "শ্লোক" শব্দ ব্যবহার হইয়াছে। শ্লোক ও গীতি যখন এক জায়গায়ই ব্যবহার হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, একটা সংস্কৃত ও একটা বাঙ্গালা ছন্দ। তাহা হইলে গীতি শব্দটার অর্থ—বাঙ্গালা ছন্দ। গীতি শব্দ কাশীরাম দাস এই অর্থে অনেক জায়গায় ব্যবহার করিয়াছেন। যে পুথিখানি হইতে আমরা এ কথা বলিতেছি, সে পুথিখানি বাঙ্গালা ৯৮৫ সালে লেখা, অর্থাৎ খৃঃ ১৫৭৯। তাহা হইলে আমাদের বুঝিতে হইবে, ১৬ শতে বাঙ্গালায় "গীতি" শব্দ বাঙ্গালা গান অর্থে ব্যবহার হইত। সিদ্ধাচার্য্যদের গানের বইএর নাম—গীতি। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের নাম চর্য্যাগীতি। অনেকগুলি সিদ্ধাচার্য্যের "গীতি" আছে। সুতরাং আমরা এই "গীতি"কে বাঙ্গালা গান বলিতে কুণ্ঠিত হইব কেন?

যাহা হউক, এতক্ষণ যাহা বলিলাম, সবই পুরান কথা। পাঁচ বৎসর আগে বলিয়াছি, তাহাই আবার আপনাদের মনে করিয়া দিবার জন্য বলিলাম। বৌদ্ধ গান ও দোহায় ৫০টি গান আছে, ২টি দোহা-সংগ্রহ আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, বৌদ্ধদের মূল তন্ত্রের বই-ই হউক, তাহার টীকাই হউক বা তাহাদের তন্ত্রসংগ্রহই হউক, পড়িতে পড়িতে মাঝে মাঝে এই ভাষায় এইরূপ গান, এইরূপ দোহা বা এইরূপ গাথা পাওয়া যায়। যেখানে পাইয়াছি, আমি টুকিয়া টুকিয়া রাখিয়াছি। এবার নেপালে গিয়া দেখিলাম ও শুনিলাম যে, প্রত্যেক বিহারেই ২।৪টি করিয়া এই ভাষায় এইরূপ গান হয়। একজন বলিলেন, ৩০০।৪০০ গান এখনও চলিত আছে। আমি যখন গানগুলি সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম, তাঁহারা বলিলেন, পাইবেন না। কারণ, ওগুলি গুহ্য। আমরা অর্থাৎ বৌদ্ধেরা অতি অন্তরঙ্গ ভিন্ন আর কাহাকেও শুনাই না। যেখানে একটিও শিবমার্গী থাকে, সেখানে গাই না। কেবল তান্ত্রিক পূজায় এ সকল গানের ব্যবহার হয়। আমি বলিলাম—সে কথা ত সত্য। আমি ত ৫০টা গান ছাপাইয়া দিয়াছি। আর তোমাদের অতি গুহ্য যে হেবজ্রতন্ত্র, তাহাতে ২।৩টি গান পাইয়াছি। একটি যথা,—

রাগ ভৈরবী।

শূন্য নিরঞ্জন পরম প্রভু শূন্যমায় সহাবে
ভাব চিঅ সহাব উ।
নো জো ভাবই মন ভাবই সো পর সোহই কজ্জ॥
ন উত্তবউ নির্ব্বাণ তহি এহু সো মহাসুখবজ্জ।
জো ভাবই মন ভাবই সো পর সো হই কজ্জ॥
অকথক্ক মন্ত নিবদ্ধ জো নো সোধিন্দু ন চিত্ত।
এহু সো পরম মহাসুহনো জো ভেদি ন চিত্ত॥
জিম পদি বিন্দু সহাবউ তিমি ভাবই মন ভাবে।
শূন্য নিরঞ্জন পরম প্রভু নো তই পুণ্য ন পাউ॥
জিম জল মাঝে চন্দ্র সহি নো সোচ্ছ ন মিচ্ছ।
তিমি সো মণ্ডল চক্র উ তণয় সহাবে সচ্চ॥

আরও একটি দিলাম।—

রাগ বলাড়ি।

কল্লই রে টিঠঅ বোলা মুম্মুনি রে কক্কোলা।
ঘণ কি পি দিহো কজ্জই করুণো কিঅনে রোলা॥
এহি বলু খাজ্জই নাটেমঅ না পিজ্জই।
হলে একা লিঞ্জন পণি অহি ইন্দু রুতহি বজ্জিঅই॥
চউ সম কস্তুরি সিল্লা কর্পূর লাই।
অই মা লেই ইন্ধন সালি অতহি মরু খাই॥
অগি পেখনে খেট্ট করন্তে সুদ্ধাসুদ্ধ মুনি অই।
নিরংসুঅ অঙ্গ চউবিঅই জসরাব শনিআই॥
মলয়াজ কুণ্ডুর বাট্টেই ডিণ্ডিম তহি ন বজ্জিঅই।

এই দুইটি গান হেবজ্রতন্ত্রে আছে। হেবজ্রতন্ত্রখানি বুদ্ধবচন। বুদ্ধ ত নিজে কোন বই লেখেন নাই। সুতরাং বুদ্ধবচনের বইগুলি তাঁর কোন চেলায় লিখিয়াছে। এখন যেমন চেলারা গুরুর বই চুরি করিয়া নিজ নামে প্রকাশ করে, তখনকার চেলারা তত সেয়ানা ছিল না। অই তারা বই লিখিতে গুরুর দোহাই দিত; বলিত,—"এবং ময়া শ্রুতমেকস্মিন্ সময়ে ভগবান্ শ্রাবস্ত্যাং বিহরতি স্ম জেতবনে অনাথপিণ্ডদস্যারামে সার্দ্ধত্রয়োদশভিঃ ভিক্ষুশতৈঃ" ইত্যাদি। তারা গুরুর মুখ দিয়াই বলাইত। ইদানীং যখন তন্ত্র আরম্ভ হইল, ক্রমে মহাযান, তন্ত্রযান, সহজযান, বজ্রযান, কালচক্রযানে আসিয়া পড়িল, তখনও ঐ এক কথা—একটু বিশেষ আছে। তখন লিখিত,—"এবং ময়া শ্রুতমেকস্মিন্ সময়ে ভগবান্ কায়বাক্‌চিত্তযোগযোগিনীভগেষু বিজহার।"

যে হেতু হেবজ্রতন্ত্র বুদ্ধ-বচন, সেই জন্য ঐ দুইটি গানে কোন কবির ভণিতা নাই। দুটিই বাঙ্গালা। শূন্য নিরঞ্জন বেশ বোঝা যায়। "কল্লই রে টিঠঅ" মোটেই বোঝা যায় না। কিন্তু না বোঝা যাওয়ার দোষ আমারও নও, এখনকার বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরও নয়, দোষ পুঁথি-লেখকের। পুঁথি-লেখকেরা বৌদ্ধ, তারা জানে না—এটা কি ভাষা। জিজ্ঞাসা করিলে বলে—ঐ এক রকম সংস্কৃত। তাহাদের যে গুরুপুস্তক, তাহাও অশুদ্ধ কথা। তালপাতার পুরান বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা পুঁথি পাওয়া যায় না। সুতরাং ইহার যে কোন কালে উদ্ধার হইবে, তাহা বোধ হয় না। কিন্তু "কল্লই রে টিঠঅ" অনেক বিহারে প্রায়ই গায়। আমাদের সামগানের মতন হইয়া গিয়াছে,—মানে বোঝা যায় না, কিন্তু হাত নাড়াটি ঠিক আছে, সুর দেওয়া ঠিক আছে, স্তোভ দেওয়া ঠিক আছে।

আমি হেবজ্রতন্ত্রের এই দুইটি গান তাহাদিগকে দেখাইয়া দিলে একজন ৫।৭টি গান আমায় লিখিয়া আনিয়া দিল। কিন্তু বড় সাবধান, অন্য কোন বৌদ্ধ যেন টের না পায়। কিন্তু অতি নির্জ্জনে একটি গান ঠিক রাগ-রাগিণী দিয়া, সকলরূপ মুদ্রা দেখাইয়া, গাইয়াও দিল। এবং আশা দিল যে, ডাকের চিঠিতে এক আধটি গান আমি ঢাকায় বসিয়া পাইব।

যে ৫০টি গান ছাপা হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটি একজন গান করিল। "তিঅড্ডা চাপি দে অকবালি," কিন্তু তারা "তিঅড্ডা" বলিল না—"তিঅণ্ডা" বলিল। ভণিতায় আমাদেরই গানের ভণিতা দিল।

একজন বলিল,—প্রত্যেক বিহারেই একটা করিয়া বংশাবলী আছে এবং বংশাবলীর অনেকগুলি এক একজন সিদ্ধাচার্য্য হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমি কিন্তু কোন বংশাবলীই দেখিবার সময় পাই নাই। তাহারা বলে,—যে প্রসিদ্ধ ৮৪ জন সিদ্ধ ছিলেন, তাঁহাদের অনেকের বংশ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ভিতর পাওয়া যায়। এখন ভিক্ষু বলিতে গেলে সন্ন্যাসী একেবারেই বুঝায় না—সকলেই "প্রজ্জ্য" লয় অর্থাৎ বিবাহ করে। তাহাদের ছেলেপিলেদের ৫ বছরে একটা দীক্ষা হয়, দীক্ষা হইলেই তাহারা ভিক্ষু হয়। ১৭ বছরে আর একটা দীক্ষা লয়, এ দীক্ষা লইলে তাহারা পূর্ণমাত্রায় পুরুতের কাজ করিতে পারে। তাহাদের বংশাবলীগুলি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, তাহাদের অনেকে বাঙ্গালা দেশ হইতে নেপালের ললিতপত্তনে গিয়া বাস করিয়াছে। তাহারা এই ৮৪ জন সিদ্ধাচার্য্য ছাড়া আরও কয়েকজন সিদ্ধাচার্য্যের নাম করে। তাহারা বলে,—৮৪ সিদ্ধ ১০০০ বছরের লোক; বাকী সিদ্ধারা ৫০০ বছরের লোক। এই সব নূতন সিদ্ধাদের নামে বজ্র শব্দ প্রায়ই আছে;—বাগ্‌বজ্র, সুরত-বজ্র ইত্যাদি। ৫00 বৎসর পূর্ব্বে একজন বজ্রনামধারী সিদ্ধ পুরুষ কাঠমুণ্ডা হইতে ৫ ক্রোশ উত্তরে শাঁখু সহরের দুই মাইল দূরে একটু উঁচু পাহাড়ের উপর বজ্রযোগিনীর মন্দির স্থাপনা করেন।

৮৪ সিদ্ধা নাম লইয়া খুব গোলে পড়িয়াছি। ১৩২৫ সালে মিথিলার রাজা হরিসিংহের সভাপণ্ডিত জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখরাচার্য্য তাঁহার বর্ণনরত্নাকর নামক গ্রন্থে ৮৪ সিদ্ধার নাম দিয়াছেন। গণিয়া ৮৪টি পাইলাম না—৭৬টি পাইলাম। সংপ্রতি হল্যাণ্ড হইতে যাভা দ্বীপের ৮৪ সিদ্ধার নাম বাহির হইয়াছে। মিলাইয়া দেখিলাম, ১৬টি কি ১৭টি মিলিল। শ্রীযুক্ত ভন ম্যানন সাহেব এই হল্যাণ্ডের বইখানি এবং ইহা হইতে তিনি যে তালিকা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা দিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন। আমি যে টেঙ্গুর হইতে ৬৩ জন গীতিকারের নাম দিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে ২৪টি মিলিল, বাকী মিলে না।

আমার বোধ হয় অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়েই বহুসংখ্যক সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। নাথপন্থ যোগীদিগের মধ্যে এইরূপ অনেকগুলি সিদ্ধ পুরুষের নাম পাইয়াছি। তাই মনে হয় যে, ৮৪ সদ্ধা একটা পুরান কথা মাত্র। কোন সম্প্রদায়েই এত সিদ্ধ পুরুষ থাকা সম্ভব নয়, সকল সিদ্ধ পুরুষের তালিকায়ই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আসিয়া জুটিয়াছে। তাই একটি তালিকা আর একটি তালিকার সঙ্গে মেলে না। এই সব তালিকা সংশোধন অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার। কখন হইয়া উঠিবে বলিয়া বোধ হয় না।

আমি নেপালে একটি ভুটিয়া ছবি দেখিয়াছিলাম। উহাতে ৮৪ সিদ্ধার ছবি আছে এবং আরও কিছু বেশী আছে। ছবির ফটোগ্রাফ আনিয়াছি। বড় জিনিস ছোট করিতে গিয়া ফটোগ্রাফ বিশেষ স্পষ্ট হয় নাই। নামগুলি ভুটিয়া অক্ষরে ভুটিয়া ভাষায় লেখা, সংস্কৃত তর্জ্জমা এখন করিয়া উঠিতে পারি নাই। প্রথমেই লুইপাদের চিত্র। লুইপাদের আর এক নাম মৎস্যান্ত্রাদ-পদ। তিনি একটি বড় মাছের পেট চিরিয়া, তাহাতে একটা পা দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমি আবার তাঁহার নেওয়ারি ছবিও আনিয়াছি। তাঁহার পাশে অনেকগুলি বড় বড় রুই মাছ পড়িয়া আছে। উহার একটির পেট চিরিয়া তিনি কাঁচা নাড়ী খাইতেছেন। দুটিই কল্পনার চিত্র। নামের মানে হইতে চিত্র কল্পনা করা হইয়াছে। মৎস্যান্ত্রাদপাদ, সুতরাং মাছের পোটায় পা দেওয়া হইয়াছে। অথবা । দিয়া মাছের পোটা খাইতেছেন। নেওয়ারীরা মৎস্যান্ত্রাদ মানে করিয়াছে, মাছের আঁতরি কাঁচা খায়। দুটি দেশই পাহাড়ের উপরে, মাছের সঙ্গে লোকের বড় সম্পর্ক নাই; মাছ কেমন করিয়া খাইতে হয়, জানে না। নামের ব্যাখ্যায় এক অদ্ভুত চিত্র তৈয়ার করিয়াছে। আমরা মাছ খাই, আমাদের দেশে মাছ অনেক আছে। আমরা মৎস্যান্ত্রাদের অর্থ করিয়াছি—মাছের পোটা এবং মাছের পোটায় তৈরী তরকারী খাইতে ভালবাসিতেন।

কুক্কুরীপাদ—একটা কুকুর লইয়া বসিয়া আছেন। এটার নামের মানে হইতে ছবির কল্পনা করা মাত্র। কিন্তু কুক্কুরীপাদের মুখের চেহারাটা ঠিক উড়েদের মত। টেঙ্গুরে বলে, তিনি উড়ে ছিলেন। তাঁহার গানের শব্দ দেখিয়া আমার ত বোধ হয়, তিনি উড়ে ছিলেন।

নেওয়ারীতে ৮৪ সিদ্ধার ছবি পাইলাম না—অষ্টসিদ্ধার ছবি আনিয়া দিল। তাহার মধ্যে ৪ জন সিদ্ধ পুরুষ ঠিক। কিন্তু আর ৪ জন মহারাজিকগণের মহারাজা। বৈশ্রবণ, ধৃতরাষ্ট্র, বিরূপাক্ষ, বিরূঢ়ক। সুতরাং এ সিদ্ধের ছবি আমরা পরিত্যাগ করিলাম। আবার আর এক সেট আনিয়া দিল। এবার সবগুলিই সিদ্ধ পুরুষ। আমরা সবগুলিরই ফটোগ্রাফ লইয়া আসিয়াছি। কিন্তু ছাপাইয়া উঠিতে পারি নাই। ছাপাইলেও তাহাতে চারিজনের নাম আছে, আর চারিজনের নাম নাই। এ সব ফটোগ্রাফ ছবি হইতে হইয়াছে। একখানি মাত্র ফটোগ্রাফ পাথর হইতে আনিয়াছি—সেখানি দারিক সিদ্ধার। ফটোগ্রাফ লইতে বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে দারিক বসিয়া আছেন। মূর্ত্তি খুব পুরান। দারিকের একটি গান আমাদের ছা- আছে। আর একটি দিতেছি,—

কোই রে বংশা বাজি রে বীণা।
অনুহত সর্ব্বদেব তিহুঅন রিণা।
অনুপম বুঝি রে দারক লই আ।
ভেদি যে রিদ্ধি সিদ্ধি রোহি প্রসাদা।
গঙ্গা যমুনাএ দইরন্তি সখি রে
রবি শশি গগন দুআরে।
উদি গের চন্দ্রা রবি অষ্টাঙ্গে
গগন শেখর মাঝে পবন হেওারে।
পবন পঞ্চাশত একুরে বদ্ধা।
বিপরীত করণে দারক সিদ্ধা।

আপনারা দেখিবেন, কোন কাজটাই পুরা হয় নাই। বহুসংখ্যক গানও সংগ্রহ হয় নাই। বংশাবলীও সংগ্রহ হয় নাই, ছবিও সংগ্রহ হয় নাই। কিন্তু পূর্ণমাত্রায় সংগ্রহ হইবার আশা আছে। তবে আমার এইমাত্র বলার কথা যে, খৃঃ ১০ম ১১শ শতে বাঙ্গালা সাহিত্যটা খুব বিস্তৃত ছিল। লেখকদের জীবনচরিত লেখার রীতি ছিল। তাঁহাদের চিত্র রক্ষার রীতি ছিল। কিন্তু আমরা সে সব ভুলিয়া গিয়াছি। নেপালে বৌদ্ধ নেওয়ারদিগের নিকট খুঁজিলে সবটাই মিলিতে পারে। খোঁজাটা বড় দরকার। বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যার সাহিত্যের ইতিহাস এখন নেওয়ারদিগের হাতেই বেশী আছে। নেওয়ারী ভাষায় কি আছে, জানি না। কারণ, নেওয়ারী লিপি নাই। সংস্কৃত ভাষাতেই অনেক আছে। কৃষ্ণাচার্য্য হেবজ্রতন্ত্রের টীকা করিয়া ছন, হেবজ্রতন্ত্রেই বাঙ্গালা গান অনেক রহিয়াছে। সুতরাং সেগুলি কৃষ্ণাচার্য্য এবং হেবজ্রতন্ত্র, দুইএরই আগে;—কত আগে, জানি না; অন্ততঃ ১০০ বছর আগে ত হবে। তাহা হইলেই সাহিত্যটা গিয়া খ্রীঃ নবম শতে পড়িল। এইরূপ অভয়াকর গুপ্ত বুদ্ধকপালতন্ত্রের টীকা করিয়াছেন। তিনি যখন টীকা লেখেন, তখন পালবংশের রামপালদেব ২৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া ২৫ বৎসরে পড়িয়াছেন। তিনি অনেকগুলি বাঙ্গালা গান তুলিয়াছেন। এক জায়গায় খানিকটা বাঙ্গালা তুলিয়া সংস্কৃতে তাহার টীকা করিয়াছেন। সুতরাং এটা বুদ্ধকপালতন্ত্রেরই বাঙ্গালা। তাহা হইলে বুদ্ধকপালতন্ত্র লেখার পূর্ব্বেই সেটা ছিল, নহিলে যে তন্ত্রটা লিখিয়াছে, সে বুদ্ধের মুখে সে কথা দিতে পারিত না।

আর একটা কথা। মহাকৌলজ্ঞানবিনির্ণয় নামে একখানি বই আছে। বইখানি মৎস্যেন্দ্র-পাদাবতারিত। শিব পার্ব্বতীকে অতি গোপনে সম্ভোগকালে যে সব গূঢ় কথা বলিয়াছিলেন সে ত আর কেহ শুনিতে পায় নাই। কেবল উভয়ের ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতারাই শুনিয়াছিলেন। তাঁহারাই ইহা অবতারিত করিয়াছিলেন, অর্থাৎ কৈলাস হইতে পৃথিবীতে নামাইয়া আনিয়াছিলেন। মৎস্যেন্দ্রনাথ তাঁদেরই একজন। মৎস্যেন্দ্রনাথের আর একটা নাম মচ্ছন্দনাথ। আমি ভাবিলাম—তবে কি তিনি কৈবর্ত্ত? শেষ পড়িতে পড়িতে দেখি, তিনি সত্যসত্যই

কৈবর্ত্ত ছিলেন—তাঁহাকে অনেক জায়গায় কেবট পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে, ধীবরও বলা হইয়াছে। পার্ব্বতী একবার মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কেওটের বাড়ী কেন গেলে? বইখানি পড়িতে পড়িতে আমার মনে হইল, কোনও ব্রাহ্মণের ছেলে যতই মূর্খ হউক, এরূপ সংস্কৃত লিখিবে না। শেষ দাঁড়াইল যে, উহা কেওটের লেখা। তার পর আবার দেখি, মৎস্যেন্দ্রের বাড়ী চন্দ্রদ্বীপে ছিল। চন্দ্রদ্বীপ হইতে সাগর বেশী দূর নয়। এ সব কথাই পুঁথিতে লেখা আছে। এ চন্দ্রদ্বীপ যে বরিশালের চেঁদো, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ করিবার কারণ নাই। ইঁহাদের গ্রন্থেও অনেক সময় বাঙ্গালা পাওয়া যায়। সে বাঙ্গালাও সিদ্ধাচার্য্যদের আগে, বৌদ্ধ তন্ত্রগুলিরও আগে; কত আগে, জানা যায় না। নাথদের তারিখ ওয়াশীলজু ৮০০ খৃঃ বলিয়া গিয়াছেন। আমি বলি, বরং আগে হইবে ত পরে নয়। কারণ, চন্দ্রদ্বীপ অনেককাল তান্ত্রিকদের একটা বড় আড্ডা এবং উহারই নিকটে নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলার গ্রামকে গ্রাম লইয়া নাথপন্থী যোগীরা বাস করে।

(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা)

বীরবলের পত্র

মানুষ ইচ্ছে করলে তার চোখকে দূরবীক্ষণও করতে পারে, ইচ্ছে করলে অনুবীক্ষণও করতে পারে, অর্থাৎ দূরের বড় জিনিষকে ছোট করেও দেখতে পারে, কাছের ছোট জিনিষকে বড় করেও দেখতে পারে।

কিছু দিন থেকে আমরা সকলে আমাদের চোখকে দূরবীণ করে বসে আছি। দূরের জিনিষকে নিকট করা অতি উত্তম কার্য্য, কেননা এক হিসাবে ও হচ্ছে পরকে আপন করা। বসুধাকে কুটুম্ব করবার মুসার এই যে, তাতে আমাদের আত্মা উচু হয়, আমাদের হৃদয় চৌড়া হয়। ও অবস্থায় আমরা যত বিদেশী "পাতানো মিতের" দুঃখে কাঁদতে পারি, সুখে হাসতে পারি। আর পৃথিবীতে কোথাও না কোথাও মানুষের সুখ দুঃখ লেগেই আছে, সুতরাং পরকে আত্মীয় করলে, আমরা পালায় পালায় নিত্য কাঁদবার ও নিত্য হাসবার এবং সেই সঙ্গে দীপ্ত হবার ও ক্ষিপ্ত হবারও সুযোগ পাই। কেন না রয়তারের তার হচ্ছে বিশ্বের সঙ্গে আমাদের জীবাত্মার যোগ-সূত্র। তাই আজ বাঙলা দেশে খবরের কাগজ খুললেই দেখতে পাই যে Ruhrয়ে ফরাসীরা কি করেছে, Lauzanneয়ে তুর্কির কি হল, এই সব নিয়ে দেশের লোকের আজ মহা মাথাব্যথা হয়েছে।

এখন আমি লজ্জার সহিত স্বীকার করছি যে এই সব বড় ব্যাপারের ফলাফল জানবার জন্য আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই। কেন জানেন? ও সব ক্ষেত্রে কি হবে তা না জানলেও, কি যে হবে না তা আমি ঠিক জানি। ইউরোপে আর যাই হোক, যুদ্ধ হবে না। আর একবার World War করবার শক্তি ইউরোপের লোকের আজ নেই। শক্তি যে নেই তার প্রমাণ Bernhardiর শিষ্যেরা অর্থাৎ জার্ম্মাণরা আজ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে non-violent non-co-operation অবলম্বন করেছে। জার্ম্মাণরা হঠাৎ যে এতবড় আধ্যাত্মিক হয়ে উঠল, তার কারণ জার্ম্মাণ-টাকা মার্ক এখন, এক গিনিতে দুলাখ পাওয়া যায়। উপবাসের প্রসাদে যে মানুষ আধ্যাত্মিক হয়, এ ত সনাতন সত্য। আর তুর্কির সঙ্গে যে ইউরোপের চার মহারথী লড়বেন না তার প্রমাণ তাঁরা তুর্কির সঙ্গে Co-operation করতে চাচ্ছেন। লর্ড কার্জ্জন যখন একজন ঘোর মডারেট হয়ে উঠেছেন, তখন ইউরোপের শান্তিভঙ্গ যে হবে না, এ কথা নিশ্চিত। আর তুর্কি extremist হয়ে উঠেছে কেন জানেন? ইউরোপ মডারেট হয়েছে বলে।

(২)

এই সব কারণে আমি বলি, কিছুদিনের জন্য আর কোনও কারণে না হোক, শুধু বদলের খাতিরেও, আমাদের চোখকে অনুবীক্ষণ করা শ্রেয়। আমি আগে বলেছি যে পরকে আপন করা অতি উত্তম কার্য্য। কিন্তু এই উত্তম কার্য্য করবার একটা বিপদ আছে, তার ফলে মানুষ আপনাকে পর করে ফেলতে পারে। পরের ভাবনা বেশী ভাবলে নিজের ভাবনা ভাববার অবসর পাওয়া যায় না। এ জ্ঞান অবশ্য সবারই আছে। তাই "বিশ্ব-প্রেম" দেশের লোকের কাছে একটা ঠাট্টার জিনিষ হয়েছে। কিন্তু "বিশ্ব-বিদ্বেষ"ও যে তার চাইতে হাস্যকর জিনিষ, এ জ্ঞান দেখছি লোকের নেই। সুতরাং আমরা যদি লোক হাসাতে না চাই, তাহলে, "বিশ্বপ্রেম" ও "বিশ্ববিদ্বেষ" এই দুই কথাকে শিকেয় তুলে রেখে, হাতের গোড়ায় যে সব ছোট খাটো জিনিষ আছে, সেই সব নিয়েই আমাদের উত্তেজিত ও ব্যতিব্যস্ত হওয়া কর্ত্তব্য। আর আমরা চোখকে অনুবীক্ষণ করলেই দেখতে পাব যে এই বাঙলা দেশে এমন অনেক ছোটখাটো জিনিষ আছে যার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ট। দুটো চারটে উদাহরণ দেওয়া যাক্।

প্রথমতঃ ধরুন, এই Rent act জিনিষটে। যাদের বাড়ীভাড়া দিতে প্রাণ বেরিয়ে যায়, আর বেশির ভাগ লোকেরই তাই হয়,—তাদের পক্ষে, জর্ম্মাণীর কত কয়লা ফ্রান্স নিচ্ছে, তার চাইতে বাড়ীর কত ভাড়া বাড়ীওয়ালা নিচ্ছে, সেটা ঢের বেশি ভয়ানক কথা। এ অবস্থায় যিনি Rent actকে তুচ্ছ জ্ঞান করে জার্ম্মাণীর দুঃখে কাঁদতে বসবেন, তাঁর স্ত্রীপুত্র বারোমাস কাঁদবে। তবে যদি কেউ বলেন, কেবা পুত্র কেবা দারা, তাহলে অবশ্য তাঁর কর্ত্তব্য হচ্ছে জার্ম্মাণী ও তুর্কির চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দেওয়া।

তার পর ধরুন, Tenancy Act জিনিষটে। গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টে প্রকাশ যে গত দশ বৎসরে, বাঙলায় অতিশয় লোকক্ষয় হয়েছে; সাদা কথায় বাঙলার চাষা মরে ভূত হয়ে গিয়েছে। আর উক্ত রিপোর্টেই দেখা যায় যে এই অসংখ্য অপমৃত্যুর কারণ, চাষার অন্নকষ্ট। ঘটনা যখন এই, তখন দেশের লোকের কর্ত্তব্য Tenancy Actএর এমন বদলের জন্য উঠে পড়ে লাগা, যার ফলে, বাঙলার চাষার অন্নকষ্ট দূর হয়। এ অবস্থায় যিনি Tenancy Actকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, Mass এর দুঃখে ভাবের কান্না কাঁদতে বসবেন, তিনি দেশের লোকের অপমৃত্যুর সহায় হবেন। তবে যদি কেউ বলেন যে আমি স্বদেশীর ভাবনা

ভাবতে পারি নে, কেন না আমি এখন স্বরাজের ভাবনা ভাবছি, তাহলে অবশ্য তাঁর কর্ত্তব্য হবে দেশের লোকের স্বর্গপ্রাপ্তির সহায় হওয়া, তাতে স্বরাজপ্রাপ্তির সুবিধা হবে। যদি দেশের লোক সব মরে যায়, তাহলে বিদেশের লোকও সব সরে যাবে।

(৩)

তার পর ধরুন, শিক্ষার কথা। কিছুদিন থেকে, বাঙলার রাম শ্যাম যদু হরি প্রভৃতি দেশের শিক্ষার উপর আক্রমণ করছে। কেউ বলছে, এই শিক্ষার প্রভাবে জাত গেল, কেউ বলছে পেট ভরল না, আবার কেউ বলছে জাতও গেল পেটও ভরল না। এখন এ বিপদ থেকে উদ্ধার হবার উপায় কি? রাম শ্যাম যদু হরির মতে, একমাত্র উপায় হচ্ছে শিক্ষা বন্ধ করে দেওয়া। তা করবামাত্র আমাদের গোলায় আর ধান ধরবে না, পেঁটরায় আর কাপড় ধরবে না, সিন্দুকে আর টাকা ধরবে না। অর্থাৎ সরস্বতীকে বার করে দিলেই তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মী এসে ঘর জুড়ে বসবেন। অশিক্ষিতপটুত্ব বলে পৃথিবীতে একটা জিনিষ আছে। আর সে জিনিষ এ দেশে যত আছে তার শতাংশের একাংশ আর কোথাও নেই। শিক্ষার চাপে সেই অশিক্ষিত-পটুত্ব মাথা তুলতে পারছে না। শিক্ষা দূর করো, অমনি দেখতে পাবে, দেশের যত অশিক্ষিত-পটুত্ব সব ফণা ধরে উঠেছে, আর তার ফলে দেশ ধনধান্যে পুষ্পে ভরা হয়ে উঠেছে। সংক্ষেপে, সরস্বতীকে অর্দ্ধচন্দ্র দেওয়া মাত্র, বাঙলা সোণার বাঙলা হয়ে উঠবে। এই ত গেল একদিকের কথা।

আর একদিকে কাউনসিলে ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণরাও সব সরস্বতীর উপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছেন। তাঁদের কথা হচ্ছে এই যে, যে ভিক্ষে করে খায় সে আবার বীণা বাজায়! সরকারের টাকা পেয়ে ওর বড় বাড় বেড়েছে। এখন ওকে দস্তুরমত শাসন করা দরকার। সব প্রথমে বীণাপাণির মাসহারা বন্ধ করে দেওয়া, তারপর ওর কাণমলা হচ্ছে শাসনকর্ত্তাদের কর্ত্তব্য। তাই বাঙলার দিক্‌পালরা সব প্রস্তাব করেছেন যে স্কুলের শিক্ষার বাবদ তাঁরা চল্লিশ লাখ টাকা বাজেয়াপ্ত করে নেবেন, আর কলেজি শিক্ষার বাবদ তাঁরা একপয়সাও দেবেন না, উপরন্তু সে শিক্ষার তাঁরা কর্ণধার হবেন। এই হচ্ছে কাউনসিলের দেবতাদের মত, আর কাউনসিলের উপদেবতারা সব এই মতে সায় দেবেন। নিম্নশিক্ষা তাঁরা বন্ধ করতে চান এই কারণে যে, শিক্ষার ফলে দেশের লোকের election সম্বন্ধে অশিক্ষিত-পটুত্ব নষ্ট হয়ে যাবে এবং তখন তাঁরা আর elected হবেন না। আর উচ্চশিক্ষার তাঁরা বিরোধী এই কারণে যে, পৃথিবীতে যা কিছু উচ্চ তাঁরা তার বিরোধী। রাম শ্যাম যদু হরি, ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ ছাড়া বাঙলায় মাঝারি গোছের লোক ঢের আছে এবং তাঁদের কর্ত্তব্য হচ্ছে, এই দু'দলের হাত থেকে স্কুল কলেজ রক্ষা করা।

(৪)

তার পর আরও অনেক ছোটখাটো জিনিষ আছে, যথা গোঁড়বিল, নারীভোট, প্রভৃতি। এ সকলের উপর অনুবীক্ষণী দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ এদের উপর কতটা নির্ভর করছে।

কিন্তু দূরবীণের নেশা যে সহজে কেউ ছাড়বেন বা ছাড়তে পারবেন, সে ভরসা আমার হয় না। রয়তারের তারের খবর গলাধঃকরণ করবামাত্র, আমরা যে উত্তেজিত হয়ে উঠি এবং তার ঝোঁকে চেঁচামেচি বকাবকি করতে সুরু করি, এ ত সবাই জানে। এই নেশা যোগানই হচ্ছে খবরের কাগজের পেশা। লেখকদের পেশা ও পাঠকদের নেশা এক সঙ্গে যাতে মারা যায়, তা করতে সহজে কেউ রাজি হবে না।

আর এক কথা। আমরা বিদেশের ভাবনা এত ভাবি কেন জানেন? বিদেশের প্রতি আমাদের কোন কর্ত্তব্য নেই বলে। আর হাতের গোড়ায় যে সব ছোটখাটো জিনিষ আছে, সে সবের সঙ্গে আমাদের কর্ত্তব্য জড়িত। কর্ত্তব্য জিনিষটে আসলে ছোটখাটো ব্যাপারের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে। বড় কর্ত্তব্য যথা কাম্য কর্ত্তব্য মানবজীবনে ক্বচিৎ আসে। নৈমিত্তিক কর্ত্তব্য বছরে দু একবার। মানুষের জীবনের কারবার হচ্ছে যত ছোটাখাটো নিত্য-কর্ত্তব্য নিয়ে, আর এই নিত্য-কর্ত্তব্যের উৎপাতে ভাব-বিলাসী হওয়া দুর্ঘট। কেন না ভাব-বিলাস হচ্ছে অশ্রু-বিকাশ আর দন্ত-বিলাস। আর কর্ত্তব্য হচ্ছে সেই জিনিষ যা হাসি-কান্নার বাইরে। সুতরাং ভাববিলাসী লোক সকল কর্ত্তব্যের দিকে পিঠ ফেরাতে বাধ্য, নয় ত খুব-একটা বড় কাম্য কর্ত্তব্যের দোহাই নিয়ে, নিত্য-কর্ত্তব্যকে পরিহার করতে বাধ্য।

চোখকে দূরবীণ করার আরাম এইটুকু যে ত-করায় আমরা দর্শক মাত্রই থেকে যাই কিন্তু চোখকে অনুবীন্‌ করার বিপদ, এই যে তা করায় আমাদের অভিনেতা হতে হয়। ফুটবল খেলা আর তা দেখার ভিতর কোন্‌টা বেশী আরামজনক তা-কি বলা প্রায়োজন? যারা ফুটবল খেলে, তারা চেঁচাবার হাততালি দেবার অবসরটুকু পর্য্যন্ত পায় না। অপর পক্ষে আমরা চেঁচাতে চাই, বাহবা দিতে চাই, দুয়ো দিতে চাই বলেই ত, বিদেশের ফুটবল খেলা দেখতে এত ভালবাসি। আর ওই একই কারণে আমরা "স্বরাজলাভ" নামক একটা কাম্য কর্ত্তব্যের দোহাই দিয়ে, আমাদের সকল প্রকার জাতীয় নিত্য কর্ত্তব্য থেকে অব্যাহতি লাভ করি। এ কথাটা আমরা' চব্বিশ ঘণ্টা ভুলে থাকতে চাই যে বিশ্বে যা কিছু বড়, তা-হচ্ছে বহু ছোটর সমষ্টি, এমন কি এই বিশ্বটা হচ্ছে অসংখ্য পরমাণুর সমষ্টি।—

ইংলেণ্ডের বিদ্যার দুটি পৃথক্‌ অঙ্গ আছে, তার একটি হচ্ছে জড়জগৎ, অপরটি প্রাণী। এই জড়-বিদ্যার সবার উপরে হচ্ছে astronomy, আর এই প্রাণবিদ্যার সবার উপরে হচ্ছে biology। দূরবীক্ষণ কাজে লাগে astronomyতে, অনুবীক্ষণ কাজে লাগে biologyতে।

এখন আমার কথা হচ্ছে এই যে মানুষকে যাঁরা জড়পদার্থ হিসেবে দেখেন, তাঁরা দূরবীক্ষণ নিয়ে থাকুন, কিন্তু যাঁরা তাকে প্রাণী বলে স্বীকার করেন, তাঁদের দৃষ্টি অনুবীক্ষণী করতেই হবে, নচেৎ তাঁরা মুখে যখন বলবেন জাতীয় প্রাণের কথা, তখন তাঁরা মনে বলবেন জাতীয় জড়তার কথা। আর সেই জড়তাকে আধ্যাত্মিকতা বলে মহা-আস্ফালন করবেন—আজ তাঁরা যা মহোল্লাসে করেছেন। আর এক কথা। জাতীয় নিত্যকর্ত্তব্যের প্রতি উদাসীন হলে, আমাদের সুধু ব্যক্তিগত নিত্য কর্ম্ম নিয়ে পড়ে থাকতে হবে। ভাব-বিলাসে যে ক্ষুৎপিপাসার হাত এড়ান যায় না, এ ত হাড়ে হাড়ে জানা সত্য। (বিজলী)

আল্পস্ পাহাড়

অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম-এ

(২৫)

পল্লীগ্রামে সৎকার-সমিতি কায়েম করিতে হয় না। পাড়ার প্রত্যেক লোক—ধনী, দরিদ্র, মজুর, বা আপামর সকলেই মৃত্যুর সময়ে গৃহস্থের সেবা করিতে বাধ্য। এই সনাতন রীতি আল্পসের খৃষ্টান-সমাজে যেরূপ দেখিতেছি, বোধ হয় কোনো-না-কোনো আকারে জগতের সকল জনপদেই সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এটা খৃষ্টানি, মুসলমানি, হিন্দু-য়ানি, প্রাচ্যামি, পাশ্চাত্যামি নয়। এটা পল্লীমাত্রের স্বধর্ম্ম।

শহরের জটিল জীবনে এই হিসাবে ইয়োরোপীয়ায় তথা ইয়োরামেরিকায় এইরূপ সহযোগিতা দুর্লভ ভেবে, বিংশ শতাব্দীতেও যাঁহারা অন্ততঃ কাগজে-কলমে, কবিতায়, কেতাবে এবং বক্তৃতার কসরতে পল্লী-সভ্যতা পছন্দ করেন, তাঁহারা পশ্চিম মুল্লুকের প্রত্যেক দেশেই সমবায়পন্থী হামদর্দ্দিওয়ালা আধ্যাত্মিকতাবহুল গণ্ডা-গণ্ডা পল্লী-স্বরাজ পাইবেন। সেইগুলা আবিষ্কার করাও যুবক এশিয়ার রিসার্চ-"ডাক্তার"-গণের পক্ষে "বিজ্ঞান-সম্মত" কার্য্যই বিবেচিত হইবে।

আল্পস চাষীদের "পোষাকী" বেশ

এশিয়ায় একটা কথার প্রচার আছে যে, পশ্চিম দেশের বিধবারা বিবাহ করে। আইনে এবং সমাজে বিধবা-বিবাহ নিন্দিত হয় না। তাহা সত্ত্বেও এত দিন লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যে, খৃষ্টান-মুল্লুকের বহু বিধবাই পুনর্ব্বার বিবাহ করেন না। তাঁহাদের অনেকেই আবার মৃত স্বামীর স্মৃতিকেই জীবনের একমাত্র সহায় বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। এই সকল বিধবাদের চিত্ত নাড়িয়া-চাড়িয়া, উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া, চুলচেরা করিয়া বিশ্লেষণ করিলে, পরীক্ষা-সিদ্ধ-চিত্ত বিজ্ঞানের

অধ্যাপকগণ হয় ত কালে দেখিতে পাইবেন যে, ভারতের সতীসাধ্বী বিধবা নারীরা আর এই পশ্চিমা বিধবা নারীরা, "সু-কু"র যে কোনো মাপকাঠিতে অভিন্ন।

ইতিমধ্যে একটা বস্তু-তন্ত্রের পরখ করা যাউক। মধ্যবিত্ত, উচ্চশিক্ষিত ভদ্রঘরের বিধবারা জার্ম্মাণিতে গৃহস্থালীর এক প্রধান স্তম্ভ। পুত্র-কন্যা, পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী ইত্যাদির "সেবা" করাই খৃষ্টান বিধবাদের একমাত্র কার্য্য। লেখাপড়ার কাজে, সামাজিক লেনদেনে, রাষ্ট্রনৈতিক প্রপাগাণ্ডায়, অথবা আফিসী জীবনে হিস্‌সা লওয়া ইহাদের কোষ্ঠীতে লেখা নাই। এই জন্যই নারী-স্বাধীনতা-পরিষদের পাণ্ডাস্থানীয় স্ত্রীপুরুষগণ ইয়োরা-মেরিকান বিধবাদিগকে মোটের উপর পরিবার "ভেস্ল্" অর্থাৎ ঝী চাকর-দাসী ছাড়া আর কিছু বিবেচনা করেন না।

চীন, জাপান ও ভারতের মামুলিপন্থী বিধবারা অন্য কোনো কিম্ভুত-কিমাকার জীবন যাপন করে কি? দফায়-দফায় তথ্যগুলার তুলনা সুরু হউক। সমাজ-বিজ্ঞান-বিদ্যাটা এই ধরণের সমালোচনায় একটা নয়া ভিতের উপর দাঁড়াইতে পারিবে। সেই সকল ভিত আবিষ্কার করা যুবক এশিয়ার বিজ্ঞান-সেবীদিগের কালে অমরতার কারণ হইবে।

(২৬)

জনরবে প্রকাশ, ইতালীর ফাসিষ্টরা টিরোলের দিকে ধাওয়া করিতেছে। শুনা যাইতেছে, ইহারা না কি অষ্ট্রিয়ান কমিউনিষ্ট বোলশেহ্বিকদের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র চালাইতেছে। শীঘ্রই ইন্‌স্‌ব্রুককে রক্তারক্তির সম্ভাবনা। বার্গ ইজেলের হোফার-মূর্ত্তি রক্ষা করিবার জন্য যুবক টিরোলী প্রাণ হাতে করিয়া দিনরাত পাহারায় লাগিয়া গিয়াছে।

অথচ ফাসিষ্টরা ইতালীতে কমিউনিষ্ট, বোল্‌শেহ্বিক, সোশ্যালিষ্ট ইত্যাদি জাতীয় সকল প্রকার সাম্যবাদী মজুর-দলের যম-বিশেষ। ইহারা মজুরদের দলে আনিতে চায়, কিন্তু রুশ-মতে না। রুশরা "আন্তর্জ্জাতিক"। রুশদের চিন্তায় রুশ ধনীরা রুশ নির্দ্ধনদের শত্রু। কিন্তু বিদেশী নির্দ্ধনরা রুশ নির্দ্ধনদের মিত্র। অতএব ইহাদের খেয়ালে রুশিয়া নামক কোনো বস্তু নাই। রুশিয়ার মজুর-চাষী ইত্যাদি নির্দ্ধন জাত জগতের যে-কোনো নির্দ্ধন জাতকে আপনার বিবেচনা করিয়া রুশিয়ার এবং দুনিয়ার যে-কোনো ধনী মহাজন জাতের বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করুক। এ এক নূতন বেদ।

কিন্তু ফাসিষ্টরা স্বদেশ বলিয়া একটা সত্তা স্বীকার করে। ইহাদের চিন্তায় ইতালী একটা নিরেট সমষ্টি। ধনী-নির্দ্ধন, মজুর-মহাজন, কিষাণ-জমিদার ইত্যাদি জাত বা শ্রেণী-বিভাগ আছে সত্য। এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থও বিভিন্ন, সত্য। কিন্তু গোটা দেশের কল্যাণ এবং গোটা দেশের অকল্যাণ নামক দুইটা বস্তু ফাসিষ্টরা জাতি-নির্ব্বিশেষে, ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে, রোজগার-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ইতালীয়ানের নজরে আনিয়া ধরিতেছে। আন্তর্জ্জাতিকতা ইহাদের চোখে মহাবিষ। ইহারা কট্টর স্বদেশী, ন্যাশন্যালিষ্ট ইতালী জননীর সন্তান, ইতালীয়ান।

টিরোলী আল্‌পসের পল্লী-কুটীরের সাদা দেওয়ালগুলা যে-কোনো লোকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। সবুজ বনের ফাঁকে-ফাঁকে ধব্‌ধবে ঘর সব চিত্তাকর্ষক। কিন্তু গির্জ্জার গড়নে কোন বিশেষত্ব বা রূপ-লাবণ্য পাইতেছি না।

শুনিতাম, আল্‌পসের রেলপথের নমুনাই হিমালয়ের রেলপথে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু হিমালয়ে রেলের রাস্তা ধাপে-ধাপে সিঁড়ির মত উঠিয়াছে। আল্‌পসের যতখানি টিরোলে দেখিলাম, ততখানিতে সেরূপ সিঁড়ির ধাপ পাইলাম না। এখানে আঁকা-বাঁকা—ক্রমশঃ উঁচিয়ে যাওয়া রেলপথ নাই।

তাহার কারণ, পাহাড়ের মাথায় উঠাই এই জনপদে রেল-এঞ্জিনিয়ারদের উদ্দেশ্য ছিল না। শিমলা দার্জ্জিলিঙে সেই উদ্দেশ্য। টিরোলী রেলের উদ্দেশ্য অন্যান্য মামুলি রেলের উদ্দেশ্যের অনুরূপ,—এক স্থান হইতে অন্য এক দূর স্থানে যাওয়া। পথের মধ্যে পাহাড় পড়িয়াছে, যেমন ভারতের বিন্ধ্য,—সেইগুলা কোনো মতে পার হইতে পারিলেই হইল। কাজেই যেখানে-যেখানে উঁচু পথ ভাঙিতে হইয়াছে, সেখানে রেলের রাস্তা আস্তে-আস্তে গড়াইয়া উঠিয়াছে, দেখিতে পাই।

(২৭)

দক্ষিণ টিরোলের এক যুবা চিকিৎসক বলিতেছেন,—"জাতে আমি জার্ম্মাণ,—চৌদ্দপুরুষ আমার জার্ম্মাণ। অথচ লড়াই হারার ফলে এখন আমি ইতালীর প্রজা,—

ইতালীয়ান। কাজেই দেশত্যাগী হইয়া যে কোন মুল্লুকে প্রবাসী হইতে প্রস্তুত আছি। পারশ্য, আফগানিস্থান, চীন ইত্যাদি দেশের হাঁসপাতাল গড়ার কাজে চাকরি ঢুঁড়িতেছি। যে সকল লোক টাট্‌কা "নিজবাসভূমে পরবাসী" হইয়াছে, তাহাদের মেজাজ "বাগী" গোলাম ভারত-সন্তানেরা সহজে বুঝিতে পারিবে কি? চিত্ত-প্রবৃত্তিতেও মরচে ধরে যে!

ইন্‌স্‌ব্রুকের একজন প্রসিদ্ধ ইলেক্‌ট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারের নিকট শুনিলাম, ইতালীয়ানরা যে-কোনো মুহূর্ত্তে ইন্‌স্‌ব্রুক দখল করিতে পারে। দক্ষিণ টিরোলের এতখানি আজ ইতালীর পকেটস্থ যে, ইতালীয়ান সীমানা হইতে ইন্‌স্‌ব্রুকে আসিতে পথে কোন বাধাই পড়ে না। ইনি অষ্ট্রিয়ার প্রত্যেক পাহাড়ের খুঁটিনাটি সবিশেষ অবগত আছেন।

এক অষ্ট্রিয়ান যুবার মত—"ইতালীয়ানরা একদম 'ভেতো' জাত। লড়াইয়ের ধাত ইহাদের নাই। বাদশাহী আমলে অষ্ট্রিয়ানদের চেহারা দেখিলেই ইতালীয়ানরা ভয়ে জড়সড় হইত। এমন কি, আজও একবার যদি ইহাদিগকে একা পাই, তাহা হইলে ইহাদের লড়াইয়ের সাধ মিটাইয়া ছাড়িব।"

ইঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় বুঝা গেল, অষ্ট্রিয়ানরা যুগো-স্লোভিয়ার লোকদিগকে বেশ শক্ত, কর্ম্মক্ষম, সাহসী এবং যুদ্ধ-নিপুণ বিবেচনা করে। ইঁহার মতে স্লাভেদের সঙ্গে লড়াই বাধিলে, যদি ইতালীয়ানরা আঁতাতের সাহায্য না পায়, ইতালীয়ানদের হাড় গুঁড়া হইয়া যাইবে। আর ইতালীয়ানদের অতিবৃদ্ধি এইবার তাহার সর্ব্বনাশের কারণ হইতে চলিল।

(২৮)

গাড়ীর ভিতর কয়েকজন "পাহাড়ী" যুবা ও স্ত্রীলোক কথাবার্ত্তা বলিতেছে। বুঝে সাধ্য কার? ভাষাটা যে জার্ম্মাণ, তাহাই আন্দাজ করা কঠিন। অধিকন্তু ইহারা আল্প্‌সের ভিন্ন ভিন্ন তালের বুলি লইয়া হাসিঠাট্টা করি-তেছে। 'সিল্লারতালের লোক এ্যাট্‌স্ তালের লোককে "বাঙাল" বলে। আবার এ্যাট্‌স্ তালের লোক আর্লবার্গের লোককে বাঙাল বলে। অথচ এক তাল হইতে অপর তালে পৌছিতে হাঁটিয়া লাগে ঘণ্টা কয়েক মাত্র।

পোষাক-পরিচ্ছদও উপত্যকায়-উপত্যকায় বিভিন্ন। টিরোল ও সুইটসার্ল্যাণ্ডের আল্প্‌স্ পল্লীর বিভিন্ন পোষাকগুলা পশ্চিমা নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণা আকৃষ্ট করিয়াছে। পাহাড়ী ছড়া, পাহাড়ী রুচি, পাহাড়ী সংস্কার ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া টিরোলের অনেক লেখক প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। জার্ম্মাণদের "ফোল্‌কারকুন্ডে" বিদ্যার মিউজিয়ামে এবং পরিষদে এই সকল অনুসন্ধানের কদর অনেক।

পাহাড়ী লোকেরা সমুদ্র দেখে নাই। কেমন করিয়া বুঝান যায়? বলিলাম—"পাহাড়ের মাথায় উঠিয়া অগণিত উঁচু-নীচু গিরিশৃঙ্গের লহর দেখিয়াছ? আর সেই সব লহরের কোথাও সবুজ, কোথাও নীল, কোথাও সাদা রংয়ের লুকাচুরি দেখিয়াছ? সমুদ্রে জলের তালগুলা এই সকল ফিপ্টেট পাথুরি ঢেউয়েরই জুড়িদার।" কিন্তু যাহারা সাগরও দেখে নাই, পাহাড়ও দেখে নাই, তাহাদিগকে রূপ-রংয়ের খেলা বুঝান যায় কি করিয়া?

(২৯)

ফাসিষ্টরা ইতালীর মালিক হইতে চলিল। ফ্লোরেন্স, ক্রেমোনা, পিসা ইত্যাদি বড়-বড় শহর ইহাদের হাতে আসিয়াছে। রোম পর্য্যন্ত ইহাদের তাঁবে। যেখানে যায়, সেইখানেই ইহারা আবালবৃদ্ধ-বনিতাকে ফাসিষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত দেখিতে পাইতেছে। সরকারী পুলিশ ও ফৌজ ইহাদের গতি রুধিতে অসমর্থ। বস্তুতঃ অনেকেই ইহাদের দলে। শেষ পর্য্যন্ত ফাসিষ্টদের সরদার শ্রীযুক্ত মুসোলিনি রাজ-নিমন্ত্রণে রাজার মোলাকাৎ লাভ করিলেন। ইনি এখন ইতালী-রাষ্ট্রের কর্ণধার।

বর্ত্তমান জগতে এই ধরণের ঘরোয়া লড়াই বড় বেশী দেখা যায় নাই। ফাসিষ্টদল সশস্ত্র আন্দোলন চালাইয়া গবমেণ্টকে শাসাইল! এ যে মধ্যযুগের ইতিহাস! অথচ বৎসর তিনেক আগে ফাসিষ্টরা নেহাৎ নগণ্য, পরস্পর বিচ্ছিন্ন দল মাত্র ছিল। ম্যাটসিনি-গ্যারিবল্ডির যুগের কার্ব্বোনারি আর দামুনৎসিও-মুসোলিনির যুগের এই "ফাসি"-সভ্য "মাসতুত ভাই"। ইতালীয় সমাজে বিপ্লব এই ধরণের গুপ্ত (পরে প্রকাশ্য) সমিতির কর্ত্তৃত্বেই সাধিত হইয়া আসিতেছে।

মুসোলিনির জীবন-কথাও রগড়ের। ইহাঁকে বিশ-পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ইতালী এবং সুইটসার্ল্যাণ্ডের পুলিশ

"আনার্কিষ্ট" অর্থাৎ গবমের্ণ্টমাত্রের মুগুর বলিয়া জানিত। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ইনি ইতালী ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাহার পর সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের নানা নগরে কোন মতে কায়ক্লেশে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। ১৯০৫ সাল পর্য্যন্ত অনেকবার ইহাঁকে সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের জেলে-জেলে পচিতে হইয়াছে। ইতালীয় গবমের্ণ্টের সরকারী "হুলিয়া" ইহাঁর বিরুদ্ধে সর্ব্বদাই প্রচারিত ছিল। এদিকে সুইস গবমের্ণ্টও ইহাঁকে একাধিকবার সুইট্‌সার্লাণ্ড হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। জাল পাসপোর্ট ব্যবহার করিয়া ছলে-বলে-কৌশলে ইনি এদেশ হইতে ওদেশে—অধিকাংশ সময়েই নেহাৎ নিঃস্ব ও নিরন্ন অবস্থায়—চলা-ফেরা করিয়াছেন।

আজ "গুণ্ডার দল" অথবা ডাকাইতের "ফাসি"গুলা সফলতা লাভ করিয়াছে। ইতালীর সর্ব্বত্র চলিতেছে ফাসি-ধর্ম্মের জয়-জয়কার। কাজেই ডাকাইতের সর্দ্দার ফাসি-বীর মুসোলিনি সাহেবকে এখন "ফেরার" বলে সাধ্য কার? তাই সুইস্ গবমের্ণ্ট রাতারাতি, বিনা বিলম্বে, মুসোলিনির বিরুদ্ধে যে হুলিয়া বিশ বৎসর ধরিয়া জারি ছিল, সেইটা তুলিয়া লইলেন। এখন মুসোলিনির সঙ্গে সুইস গবমের্ণ্টের টেলিগ্রামে-টেলিগ্রামে কোলাকুলি চলিতেছে।

(৩০)

সকালে ইনস্‌ব্রুক ছাড়িলাম। উত্তর-পূর্ব্বে যাত্রা করিয়াছি। কয়েক মিনিটের ভিতর পথে পড়িল, ইন-দরিয়ার উপর এক পল্লী। এখানে সাবেক কাল হইতে নুন তৈয়ারি করা হইয়া আসিতেছে। হ্রদের জল শুকাইয়া নুন প্রস্তুত করা হয়। নোনা জলে স্নান করিবার জন্য স্বাস্থ্যান্বেষীরা এই গ্রামে বেড়াইতে আসে।

পাহাড়ে-পাহাড়ে তীর্থক্ষেত্র অবস্থিত। মন্দির বিরাজ করিতেছে। প্রায় চল্লিশ মাইল ধরিয়া ইনের পাশে-পাশে রেল চলিল। মাঝে-মাঝে পুরানা দুর্গের বাড়ী-ঘর। ইন্‌তাল ওৎসিল্লার তাল ছাড়াইবামাত্র অপূর্ব্ব পাহাড়ী দৃশ্য নজরে পড়িতেছে। গাড়ী উঠিতেছে গড়াইয়া সোজা, অতএব কষ্টে। বিন্ধ্যপর্ব্বত অথবা মহারাষ্ট্রের "ঘাট"গুলা ভেদ করিয়া যেন চলিতেছি।

উত্তরে বাহেবেরিয়ার "কাইজার-গেবির্গে" (বাদ্‌শাজ-গিরি) পাহাড়ের ন্যাড়ের তরুমালা দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে। পাহাড়ী সুড়ঙ্গ জুটিল গণ্ডা কয়েক। এপাশে ওপাশে চাষবাসের কোনো সম্ভাবনা নাই। দুই-একটা গরু-ছাগল চরিবার ঠাঁইও নাই। কেবল পাহাড়ের পর পাহাড়। উত্তর-জার্ম্মাণির হ্যাগ্রোফার প্রদেশে দেখিয়াছি—সেইরূপ কেবল বনের পর বন। অতি দুর্গম পথে অষ্ট্রিয়ার এই রেল-পথ নির্ম্মিত।

নুনের ভাটি আর নোনা জলের স্নানাগার,—এই অঞ্চলের পাহাড়ী পল্লীর বিশেষত্ব। ইন্‌স্‌ব্রুক হইতে প্রায় আশী মাইল আসিবার পর টিরোলের সীমানা শেষ হইল। এইখানে পূর্ব্ব আল্পসের সর্ব্বোচ্চ রেলষ্টেশন হোখফিল্‌ৎসেন অবস্থিত। প্রায় ৩২০০ ফিট উচু। টিরোলী রেলে পশ্চিম আল্পসের সর্ব্বোচ্চ খুঁটা স্যাঙ্কট্‌ আণ্টন্।

(৩১)

টিরোল ফুরাইয়াছে,—কিন্তু এখনো আল্‌প্‌স্ মণ্ডলেই নামিয়া চলিতেছি। চারিদিককার দৃশ্যগুলা চিত্রকর-দিগকে নয়া নয়া রূপ সৃষ্টির ইঙ্গিত দিতে পারে। দেখিতেছি আর মনে হইতেছে, "আশ্চর্য্যের কথা! অষ্ট্রিয়ার প্রাকৃতিক গৌরব সম্বন্ধে দুনিয়ার লোক এক-প্রকার অজ্ঞ বলিলেই চলে।"

কিন্তু এইখানেই আবার অষ্ট্রিয়ার দুর্দ্দশার খনি। পাহাড়ী ভূমিতে সৌন্দর্য্য-লাবণ্য উপভোগ করা যায় সত্য; কিন্তু চাষআবাদের জমিন ত ঢুঁড়িয়া পাইতেছি না কোথাও। এই হিসাবে—দুই তরফ হইতেই অনেকটা জাপানের কথা মনে পড়া স্বাভাবিক।

"ষ্টাইন গেবির্গে" (বা প্রস্তর-গিরি) নামক পাহাড়-শ্রেণী একদম "অন্বর্থনামা"। অর্থাৎ খাঁটি পাথরের চাপ ছাড়া এই শৈলে আর কিছু মিলে না। নিকটবর্ত্তী পল্লীগুলায় টুরিষ্টদের আনাগোনা যথেষ্ট। পাহাড়ে উঠা বনে-জঙ্গলে ঘুরা, আর নোনা জলে নাওয়া,—কাজ এখানে এই তিন। সর্ব্বত্রই সবাই আছে।

মাইল তিনেক লম্বা একটা হ্রদ দেখাইল মনোরম। নাম—ৎসেল। এইটা জাপানী হাকোনে হ্রদের মত প্রায় আড়াই হাজার ফিট উঁচু। ভীমতালও এইরূপ। আশে-পাশের পাহাড়গুলা উঁকি মারিয়া জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিতেছে।

(৩২)

আল্‌পসের আবেষ্টনগুলা আজকাল ভারত-সন্তানের অপরিচিত নয়। ইতালীর পথে, জার্ম্মাণির পথে, ভিয়েনার পথে, সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডের পথে,—কোনো-না-কোনো পথে এই সকল দৃশ্য বহু ভারতীয় পর্য্যটকের চোখে পড়িয়াছে। আগে-কার দিনে কালে-ভদ্রে হয় ত দু-একজন ভারত-সন্তান এই সকল পথে মোসাফিরি করিয়াছেন। ঘটনাচক্রে আজকাল গণ্ডায়-গণ্ডায় ভারতীয় আল্‌প্‌স-পর্য্যটক দেখা যায়।

অধিকন্তু, এই কয় বৎসর ভারতীয় মুদ্রার হিসাবে ফরাসী, ইতালীয়ান, জার্ম্মাণ ও অষ্ট্রীয়ান টাকাগুলা নেহাৎ শস্তা। কাজেই ভারতীয় ব্যবসাদার, উকীল ডাক্তার, অধ্যাপক, ছাত্র, রিসার্চ্চ স্কলার,—স্ত্রী এবং পুরুষ—ডজনে-ডজনে ইয়োরোপ দেখিতেছেন। এবারকার গ্রীষ্মকালে বোধ হয় পাঁচশ ভারতীয় মোসাফির একবার করিয়া বার্লিনে ঢুঁ মারিয়া গিয়াছেন। "বৃহত্তর ভারতের" দিকে স্রোত জোরের সহিতই বহিতেছে।

এইরূপে বিশ্ব-শক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ভারত-সন্তানের ঘনিষ্ঠতর পরিচয় লাভ ভারতের পক্ষে মঙ্গলের কথা। কিন্তু এই সূত্রে দু'একটা জনরব রটিয়াছে। বিদেশী—ফরাসী, মার্কিণ, ইতালীয়ান, জার্ম্মাণ—নরনারীদের সঙ্গে এই সকল ভারতীয় পর্য্যটকের মধ্যে কাহারো কাহারো মোলাকাৎ হইয়াছে। অনেকেই না কি বিদেশীদের সম্মুখে নিজের ইজ্জৎ বজায় রাখিয়া কথাবার্ত্তা চালাইতে পারেন নাই। কেহ ব্যবসায়ের স্বার্থে, কেহ কোন ব্যক্তি-বিশেষের অনুগ্রহ লাভের স্বার্থে, কেহ পয়সা রোজগারের স্বার্থে, কেহ আর কিছুর স্বার্থে নিজেকে পশ্চিমাদের নিকট "খেলো", নীচাশয়, অথবা "ছোট লোক", কিম্বা পর-নিন্দুক, খোসা-মোদপ্রিয় এবং স্বদেশদ্রোহী সপ্রমাণ করিয়া ছাড়িয়াছেন। ভবিষ্যতের পর্য্যটকগণ একটু সতর্ক ভাবে চলিলে, দেশের সম্মান ত' বাড়িবেই, নিজেরও আত্মবৃদ্ধি হইবে।

(৩৩)

ভারতে সাদা-চামড়াওয়ালা লোকজনের সংস্পর্শে আসা আমাদের অভ্যাস নয়। কাজেই ইয়োরামেরিকায় আসিয়া আমরা অনেকটা কাঁচা কাজ করিব, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অ্যাপ্রেন্টিসি বা শিক্ষানবিশী করা সকল ক্ষেত্রেই দরকার হয়। নিজস্ব, ব্যক্তিত্ব, স্বাধীনতা, দেশের ইজ্জৎ, ও জাতির সম্মান, বিশ্বের আসরে রক্ষা করিয়া চলার কারবারেও খানিকটা পাকিয়া উঠা আবশ্যক। বিদেশী লোকেরা ভারত-সন্তানের গোলামী স্বভাব ও হাত-যোড় করিবার অভ্যাস ভারতের বাহিরেও লক্ষ্য করিয়া মনে-মনে বেশ হাসিতেছে।

বিদেশের নর-নারী ভারত-সন্তানের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া গোটা ভারতের অবস্থা বুঝুক বা না বুঝুক, সেই ব্যক্তি-বিশেষের চরিত্র বেশ সহজেই পাকড়াও করিয়া ফেলে। তোমার-আমার সঙ্গে কোনো লোক যখন কথা বলে, তখন তোমার-আমার চোদ্দ-পুরুষের এবং জ্ঞাতি-কুটুম্বের খবর লইতে তাহারা ব্যতিব্যস্ত হয় না। সকলেই তোমাকে-আমাকে বাজাইয়া দেখিতেছে, তুমি আমি ব্যক্তি হিসাবে মানুষ কি না। তোমার-আমার আত্ম-সম্মান জ্ঞান আছে কি না।

যেন তেন প্রকারেণ একটা সওদা, একটা কলকব্জা, একটা চাপরাশ, একটা প্রশংসা, একটা চিঠি বা কতক-গুলা ঠিকানা বোঁচ্‌কায় বাঁধিয়া লইয়া গেলেই, স্বদেশকে বৃহত্তর করা সম্ভব নয়। শির খাড়া করিয়া, মানুষের সঙ্গে মানুষের মতন সমান ভাবে হাতাহাতি করিয়া, দুই ঘা খাইয়া এবং দুই ঘা মারিয়া, পশ্চিমাদের মুল্লুকে চলা-ফেরা করিবার ক্ষমতা যুবক ভারতে অল্পে-অল্পে দেখা দিতেছে। এই কথাটাও আমাদের জানিয়া রাখা আবশ্যক। সাদা-চামড়াওয়ালা নামজাদা লোকের সঙ্গে "বৃহত্তর ভারত" "আম্‌তা আম্‌তা" না করিয়া "আজ্ঞে যো হুকুম" না বলিয়া, ভারত-মাতাকে বেকুব প্রমাণিত না করিয়া, কথা বলিতে অভ্যস্ত হইতেছে।

সেল হ্রদের পর সাল্‌ৎসাক দরিয়ার পাশে-পাশে রেল ছুটিয়া নামিতেছে। দেখিতেছি কেবল সুড়ঙ্গ ও পার্ব্বত্য পাস, আর শুনিতেছি মাত্র ঝোরার ঝরঝর। পাহাড়ী দরিয়াগুলা প্রায় কোথাও শোওয়া নদী নয়। ইন্‌স্‌ব্রুকের নিকট অবশ্য অনেকটা সমতলে গড়াইয়া চলে।

এক-একটা বিস্ময়জনক দৃশ্য ছাড়াইয়া যাইতেছি, আর ভাবিতেছি,—বোধ হয় ইহার পর ইহার জুড়িদার আর কিছু জুটিবে না। কিন্তু পরক্ষণেই আর একটা নয়া সৌন্দর্য্যের আবেষ্টনে আসিয়া পড়িতেছি। আল্‌প্‌সের গরিমা জীবনে ভুলিবার জিনিস নয়।

বিশকস্‌হাফেন পল্লীর নিকট উচ্চ শির খাড়া দেখিলাম হোফক্যোনিগ। এইটা "এহ্বিগ্‌শ্নে গেবির্গের" (অর্থাৎ চিরতুষার শৈল-মালার) সর্ব্বোচ্চ শিখর। প্রায় দশ হাজার ফিট উঁচু। কুয়াশার ফাঁকে-ফাঁকে প্রস্তরময় পাহাড়ের মাথায় বরফের পোঁছ দেখিলাম।

(৩৪)

গাড়ীতে গল্প চলিতেছে জার্ম্মাণ মার্ক সম্বন্ধে। ঘণ্টায়-ঘণ্টায় মার্ক নামিয়া আসিতেছে। পাউণ্ডে পনর হাজার বিশ হাজার। অর্থাৎ এক টাকায় বারশ'র চেয়েও বেশী। লড়াইয়ের পূর্ব্বে এক মার্কের দাম ছিল মাত্র বার আনা।

অপর দিকে সকলেই পড়িতেছে ফাসিষ্টদের রাতারাতি সালৎসাক-তালই চলিতেছে। এখনো সমতল ভূমি দেখিতেছি না। "লুয়েগ পাস" নামক পার্ব্বত্য পথের দৃশ্য বহুকাল মনে থাকিবে। বিকালে সাত ঘণ্টায় সালৎসবুর্গ শহরে পৌঁছিলাম। এই শহরটা অষ্ট্রিয়ার নাম-জাদা,—ইন্‌স্‌ব্রুকের চেয়ে ছোট। দেখিবার-শুনিবার অনেক বস্তুই আছে। চারিদিক্‌কার আবেষ্টন মনোরম। ব্যাহ্বেরিয়া ও অষ্ট্রিয়ার সীমানায় সন্নিকটে এই শহর অবস্থিত।

এইখানে আল্‌প্‌স্‌ পাহাড় হইতে বিদায় লইলাম বলিতে পারি। ক্রমশঃ সমতল কৃষি-যোগ্য ভূমি চোখে পড়িল। প্রায় আশী মাইল পরে পড়িল লিন্‌ৎস শহর।

হ্বিয়েন্‌

রাজ্য লাভের কথা। কালো কুর্ত্তা পরিয়া ইতালীর ভদ্র-ঘরের মেয়েরাও না কি ফাসিষ্টদলের সঙ্গে ভিড়িয়া যাইতেছে। এক জার্ম্মাণ সংবাদদাতা খবর পাঠাইয়াছেন,—ফাসিষ্টরা অতি উচ্চ আদর্শ লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছে। ইহারা যুবক ইতালীকে স্বার্থ-ত্যাগী, কর্ত্তব্য-পরায়ণ, সংযমী ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ করিয়া তুলিতে চায়। প্রাচীন রোমের যুগে ইতালীতে যে সকল দেশ-হিতকর অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, সেইগুলা পুনরায় প্রবর্ত্তিত করা হইতেছে। ম্যাট্‌সিনির আমলেও ঠিক এই ধরণে মধ্যযুগের দান্তে এবং আদি যুগের হ্বার্জিলের আদর্শ ইতালীর স্বদেশ-সেবক-মহলে প্রচারিত হইয়াছিল।

লিৎন্‌স ডানিউবের ধারে। এই নদীর জার্ম্মাণ নাম ডোনাও। ইতিমধ্যে সোডা, অ্যাসিড ইত্যাদি তৈয়ার করিবার ছোটখাটো দু' একটা কারখানা চোখে পড়িয়াছে।

সাল্‌ৎসবুর্গ, লিন্‌ৎস ইত্যাদি শহরে প্রাচীন ও মধ্য যুগের ইমারৎ অল্প-বিস্তর আছে। কিন্তু রেলপথে কোথাও নয়া জীবনের চটকদার্‌ কোনো লক্ষণ পাইলাম না। ঐশ্বর্য্য ধন-সম্পদ ইত্যাদির নিশানা এক প্রকার বিরল।

রাত্রি দশটার সময় চোদ্দ ঘণ্টায় হ্বীন শহরে পৌঁছিলাম। এই শহরকে আমরা জানি হ্বিয়েনা বলিয়া। ফরাসীরা বলে হ্বিয়েন। বাদশাহী শহর বটে।

জাতি-বিজ্ঞান

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

(৯)

নাসিকা যে শুধু মানব-শরীরের একটী অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ তাহা নহে, মানব-শরীরের সৌন্দর্য্য-বিধান-কার্য্যেও নাসিকা অনেক সহায়তা করে। চক্ষু, ভ্রূ, ওষ্ঠাধর, গণ্ড ও ললাট মানব-মুখের সৌন্দর্য্য-প্রতিষ্ঠার জন্য নিজ নিজ শক্তি প্রয়োগ করিলেও, একমাত্র নাসিকার গঠন-বৈরূপ্য তাহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেয়। পৃথিবীর মধ্যে যাঁহারা আদর্শ চিত্রকর বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহারা সকলেই সৌন্দর্য্যানুভূতির বৃত্তি-সম্পন্ন। কবি ও চিত্রকরের এমন এক বৃত্তি আছে, যাহার সাহায্যে তাঁহারা ভাব-জগতের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন। বাহ্যেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পরিদৃশ্যমান জগৎ যেমন সাধারণ লোকের নিকট আপন অস্তিত্ব অকাট্যভাবে প্রতিপন্ন করিয়া থাকে, কবি ও চিত্রকরের নিকট ভাব-জগতের অস্তিত্ব ঠিক সেইরূপ প্রামাণিক। তাঁহারা তাঁহাদের অনন্তসাধারণ বৃত্তির সাহায্যে ভাব-জগতের অস্তিত্বের যে অকাট্য প্রমাণ প্রাপ্ত হন, কোন প্রকার যুক্তিই তাহা খণ্ডন করিতে সমর্থ নহে। চক্ষুষ্মান্ অন্ধকে বুঝাইয়া দিতে পারে না যে, বর্ণ কি, অথচ অন্ধও যুক্তি সহকারে তাহার দর্শনেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুপ্রমাণ খণ্ডন করিতে পারে না। যাঁহারা সকলই উড়াইয়া দেন, তাঁহাদের সঙ্গে তর্ক নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু যাঁহারা বলেন, সৌন্দর্য্যের আদর্শ বলিয়া কিছুই নাই, তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাস্য—তবে কি পৃথিবীর আদর্শ কবি ও চিত্রকরেরা এক মিথ্যা কল্পনাকে প্রশ্রয় দিয়া জগৎকে মুগ্ধ করিতে পারেন? আদর্শ কবি ও চিত্রকরের ভাব-জগৎ সৌন্দর্য্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সৌন্দর্য্যের বস্তুগত অস্তিত্ব না থাকিলে কবি ও চিত্রকর জগতে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিতে পারিতেন না। পক্ষান্তরে পরিদৃশ্যমান জগৎ পরিণামী—নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু কবি ও চিত্রকর এই নিয়ত পরিণামশীল—সুতরাং অলীক জগতের ভিত্তিস্বরূপ যে অপরিণামী, নিত্য এবং শাশ্বত সৌন্দর্য্য-রূপ ভাব, এই

মিথ্যাভূত জগৎ হইতে উপলব্ধি করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদের কাব্যে ও চিত্রে পরিস্ফুট হয়; সুতরাং আমরা সৌন্দর্য্যকে অলীক বলিতে পারি না। এই সৌন্দর্য্যের আদর্শস্বরূপ যে কিছু আছে, তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে বাধ্য। কেহ কেহ বলেন, ইতর প্রাণীরও সৌন্দর্য্যানুভূতির ক্ষমতা আছে। সে যাহাই হউক, মানবে যে এই অনুভূতির পরাকাষ্ঠা সাধিত হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

শরীরের অন্যান্য অবয়বের ন্যায় নাসিকাও যে মানব-শরীরের সৌন্দর্য্য-বিধানে নিযুক্ত, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু কিরূপ নাসিকা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে এবং কিরূপ নাসিকা সৌন্দর্য্য-লাঘবের হেতু, সে বিষয়ে জন-সমাজে মতের বিভিন্নতা দেখা যায়। নাসিকাকে উন্নত, নাত্যুন্নতাবনত ও অবনত—এই তিন শ্রেণীতে প্রধানতঃ বিভক্ত করা যায়। যে সকল জাতির নাসিকা স্বভাবতঃ উন্নত, উন্নত নাসিকা যে সৌন্দর্য্যের নিদান, তাহারা এই মতের পক্ষপাতী। মাটো নাসিকা যে অনেকের মুখের শোভা বর্দ্ধন করিয়া থাকে, তাহা অনেকে লক্ষ্য করিয়াছেন। যে সকল জাতির নাসিকা স্বভাবতঃ অবনত, তাহারা হয় তো অবনত নাসিকারই সৌন্দর্য্য-বিধান-শক্তি উপলব্ধি করিতে পারে। অনেকের মত এই যে, সৌন্দর্য্য-বোধ অভ্যাসমূলক। যাঁহাদের এইরূপ ধারণা, তাঁহাদের ধারণার অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে এই প্রসঙ্গ লিখিত হয় নাই। সৌন্দর্য্যতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ তাঁহাদের দ্রষ্টব্য। বর্ত্তমান প্রসঙ্গের অনুরোধে আমাদিগকে আপাততঃ অপেক্ষাকৃত নীরস তত্ত্বের আলোচনা করিতে বাধ্য হইতে হইতেছে।

জাতি-তত্ত্ব নির্দ্ধারণ পক্ষে গাত্র-বর্ণ, করোটীর গঠন ও পরিমাণ আদর্শ বোধে যেমন কোন কোন নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের মতে আলোচ্য, সেইরূপ কোন কোন পণ্ডিত আবার সে বিষয়ে নাসিকার গঠন ও মাপকে আদর্শ-স্থানীয় বিবেচনা করেন। এই মত কতদূর সঙ্গত, তাহারই আলোচনা করিব।

নাসিকাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়; যথা—প্রশস্ত (Platyrrhine), নাতিপ্রশস্ত (mesorrhine) ও সূক্ষ্ম (leptorrhine)।

নৃতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন যে, Proto-man এর নাসিকা ক্ষুদ্র, প্রশস্ত ও উদগ্রপ্রশস্ত অর্থাৎ নিগ্রিটো জাতীয় মানুষের নাকের মত চ্যাপ্‌টা। সদ্যঃ-প্রসূত শিশুর নাকের গঠনও ঠিক এইরূপ।

বিশেষজ্ঞেরা স্বীকার করেন না যে, নাসিকার বিশেষ বিশেষ গঠন, বিশেষ বিশেষ জল-বায়ুর প্রভাবের অধীন। তাঁহারা বলেন, এই মতের স্থাপন পক্ষে বিশেষ কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই লোকের ধারণা যে, বর্ণ-বিশেষের ন্যায় নাসিকার গঠনবিশেষ জাতিবিশেষের পরিচায়ক। ঋগ্বেদ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, ঋগ্বেদেও এ দেশের কৃষ্ণ-বর্ণ জাতিরা 'অনাস' ও 'বিসিপ্র' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, অনাস বলিতে নাসিকাহীন এবং বিসিপ্র বলিতে কদাকার নাসিকাযুক্ত বুঝায়। যাহাদের নাসিকাকে তাহারা কদাকার দেখিত, তাহাদিগকেই তাহারা অনাস বলিত।

Topinard লক্ষ্য করিয়াছেন যে, মুখ-মণ্ডলের গঠন নাসিকার গঠনের উপর প্রভাব-সম্পন্ন; অর্থাৎ মুখ-মণ্ডলের গঠনবিশেষ নাসিকার গঠনবিশেষের কারণ। কাহারও কাহারও মত, শরীরের উচ্চতা-বৃদ্ধির সহিত নাসিকার সূক্ষ্মতা-বৃদ্ধির সম্বন্ধ আছে। শরীরের উচ্চতা ও গঠন কতকটা যে প্রাকৃতিক এবং সামাজিক অবস্থা-সাপেক্ষ, বৈজ্ঞানিকেরা তাহা স্বীকার করেন; সুতরাং নাসিকার গঠন প্রত্যক্ষ ভাবে প্রাকৃতিক ও সামাজিক অবস্থা-সাপেক্ষ না হইলেও অন্ততঃ গৌণভাবে কতকটা তাহাই, কোন কোন নৃতত্ত্ববিদের মতানুসারে এ কথা স্বীকার করিতে হয়।

নাসিকার বিস্তারের মাপকে একশত দিয়া গুণ করিয়া, সেই গুণ-ফলকে নাসিকার উচ্চতার মাপ দিয়া ভাগ করিলে নাসিকার 'অঙ্ক' (index) বাহির হয়। 'অঙ্ক' অনুসারেও নাসিকাকে প্রধানতঃ সূক্ষ্ম বা টিকল, মাটো ও প্রশস্ত, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। নাসিকার অঙ্ক সত্তরের নিম্নে হইলে নাসিকাকে টিকল (leptorrhine) শ্রেণীভুক্ত করা হয়; যে সকল নাসিকার অঙ্ক সত্তর হইতে পঁচাশী পর্য্যন্ত গণিত হয়, সেই সকল নাসিকাকে মাটো বা mesorrhine শ্রেণীভুক্ত করা হয় এবং অঙ্ক পঁচাশী অতিক্রম করিলে নাসিকাকে প্রশস্ত বা platyrrhine বলা হয়।

যে নাসিকা যত উন্নত হয়, সেই নাসিকা তত সূক্ষ্ম হয় এবং যে নাসিকা যত অবনত, তাহা তত প্রশস্ত হইয়া থাকে। নাসিকার সমুন্নতি (prominence) ও সূক্ষ্মতা অনুসারে নাসিকার গভীরতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; যে নাসিকা যত অবনত ও প্রশস্ত, তাহার গভীরতা তত অল্প হয়। কিন্তু আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদিগের ও এস্কিমোদিগের নাসিকা কিছু অদ্ভুত ধরণের। আমেরিকায় ইণ্ডিয়ানদের নাসিকা গভীর ও উন্নত, অথচ প্রশস্ত। এস্কিমোদের নাক চ্যাপ্‌টা এবং প্রশস্ত, অথচ গভীর। এই দুই জাতির নাসিকার ন্যায় নাসিকা আর কোথাও দেখা যায় না।

কলিগ্‌ননের (Collignon) হিসাব অনুসারে আমেরিকার ইণ্ডিয়ান ও এস্কিমোরা মাটো (mesorrhine) নাসিকা-বিশিষ্ট। আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের নাসিকার অঙ্ক ৭০·৬ এবং এস্কিমোদের নাসিকার অঙ্ক ৭০·৩।

কলিগ্‌ননের হিসাবে শ্বেতকায় জাতিদের নাসিকার অঙ্ক ৬২ হইতে ৭৬; শ্বেতকায় জাতিরা প্রধানতঃ উন্নত নাসিকা-বিশিষ্ট (leptorrhine)। পীত জাতিদের নাসিকার অঙ্ক ৬৯ হইতে ৮১। পীত জাতিরা প্রধানতঃ মাটো নাসিকা-বিশিষ্ট (mesorrhine)। আমেরিকার জাতি-সকল একেবারেই মাটো নাসিকাবিশিষ্ট। আফ্রিকার নিগ্রোদের নাসিকার অঙ্ক ৭৮ হইতে ১০১। মেলানেসীয়দের নাসিকার অঙ্ক ৯৩ হইতে ১০৯। আফ্রিকার নিগ্রো, পশ্চিম প্রশান্ত সাগর জাতি এবং অষ্ট্রেলেসিয় জাতির নাক একেবারেই চ্যাপ্‌টা।

ব্রোকা (Broca) প্রথমে আবিষ্কার করেন যে, নাসিকা জাতি-নির্ণয়ের একটী প্রকৃষ্ট ও প্রয়োজনীয় সূত্র। নাসিকার গঠনের সাহায্যে জাতি-নির্ণয় নৃতত্ত্ববিদের নিকট সাধারণতঃ সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালী বলিয়া আদৃত। রিজলী ভারতবর্ষের জাতি-নির্ণয়ের জন্য একটী বাঁধাবাঁধি নিয়ম করিয়া দিয়াছেন।

ভারতবর্ষে যে জাতি-বিভাগ প্রচলিত আছে, তাহা সামাজিক বিভাগ। ইহাকে race বিভাগ বলা যাইতে পারে না। রিজলী দেখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষীয় সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকের নাসিকার মাপ বিভিন্ন। সেই জন্য তিনি প্রতিপন্ন করেন যে, ভারতবর্ষীয় সমাজ বিভিন্ন raceএর মানব-জাতিতে গঠিত। ভারতবর্ষীয় সমাজের সর্ব্বোচ্চ স্তরের লোকের নাসিকা সমুন্নত এবং সর্ব্বনিম্ন স্তরের লোকের নাসিকা অবনত। উন্নত নাসিকা অপেক্ষা অনবত নাসিকার বিস্তারের মাপ অধিক। রিজলী লক্ষ্য করিয়াছেন যে, এ দেশের উন্নত জাতিদিগের নাসিকা উন্নত। কিন্তু এ দেশের যে জাতি যত অবনত, সে জাতির নাসিকা তত প্রশস্ত। এ দেশের ব্রাহ্মণদের নাসা প্রধানতঃ উন্নত। গোয়ালা ও কৃষিজীবী কুর্ম্মিদের জল এ দেশের ব্রাহ্মণেরা গ্রহণ করেন; সুতরাং অন্ততঃ সামাজিক হিসাবে তাহারা অন্যান্য নীচ জাতি হইতে উন্নত। গোয়ালা ও কুর্ম্মিদের নাসিকা কিঞ্চিৎ প্রশস্ত, মেছুয়া জাতিরা—বাউরী, বিন্দ ও কেয়ট তন্নিম্নবর্ত্তী। তাহাদের নাসিকাও গোয়ালা ও কুর্ম্মিদিগের নাসিকা অপেক্ষা অধিকতর প্রশস্ত। মুসহর ও চামারেরা আরও নিকৃষ্ট জাতি; তাহাদের নাসিকা আরও প্রশস্ত। কোল, কোরোয়া, মুণ্ডা প্রভৃতি জাতিরা হিন্দু-ধর্ম্মান্তর্গত জাতি নহে। ইহারা হিন্দুদের নিকট হেয় বলিয়া পরিগণিত। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ইহাদের নাসিকা অত্যন্ত প্রশস্ত।

করোটীর অঙ্ক (Index) হিসাবে দ্রাবিড়েরা আর্য্যদিগের সমতুল্য হইয়া পড়ে; কিন্তু নাসিকাঙ্কের হিসাবে তাহারা যে আর্য্য-জাতি হইতে অনেক পৃথক্ তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। আর্য্য-জাতির নাসিকা বেশ সমুন্নত। কিন্তু দ্রাবিড় জাতিদিগের নাসিকা পুরু এবং প্রশস্ত; তাহাদের নাসিকাঙ্ক নিগ্রোজাতির সমতুল্য।

কাহারও কাহারও অনুমান এই যে, অষ্ট্রেলিয়দিগের সহিত দ্রাবিড়দিগের সম্বন্ধ আছে; নাসিকাঙ্ক অনুসারে ইহা প্রতিপন্ন হইতে পারে। ঋগ্বেদে দস্যু ও দৈত্যদিগের সম্বন্ধে 'অনাস' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

মাদ্রাজ সহরে চারিজন ব্রাহ্মণের নাসিকাঙ্ক ৬০ হইতে ৭০ পর্য্যন্ত গণনা করা হইয়াছে; বার জন ব্রাহ্মণের নাসিকাঙ্ক ৭০ হইতে ৮০, আটজনের ৮০ হইতে ৯০ এবং একজনের ১০০ পর্য্যন্ত গণিত হইয়াছে। পত্তর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে চারিজনের অঙ্ক ৬০ হইতে ৭০, পনরজনের ৭০ হইতে ৮০, চারিজনের ৮০ হইতে ৯০, এবং দুইজনের ৯০ হইতে ১০০ গণিত হইয়াছে। উল্লিখিত গণনানুসারে দাক্ষিণাত্যের অতি অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণদিগের নাসিকা উন্নত; মাটো নাসিকার সংখ্যা উহাদের মধ্যে বেশী; কয়েকটী

অবনত (platyrrhine) নাসিকাও উহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণদিগের শরীরে অল্পাধিক দ্রাবিড়-রক্ত সংমিশ্রিত হইয়াছে।

জাপানের অধিবাসীদিগের মধ্যে ভদ্রবংশের নাসিকা অভদ্রবংশের নাসিকা অপেক্ষা সমুন্নত।

সভ্যসমাজে সমুন্নত নাসিকা সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু যে সকল জাতির মধ্যে সমুন্নত নাসিকা দুষ্প্রাপ্য বা অপ্রাপ্য, তাহারা হয় তো তাহাদের স্বাভাবিক নাসিকাতেই সন্তুষ্ট।

নাসিকাঙ্ক অনুসারে জাতি-বিভাগ করিতে হইলে, মানবজাতিকে তিনটী মূল জাতিতে বিভক্ত করিতে হয়। শ্বেতাভ বা গৌরাঙ্গ জাতিরা প্রায় সমুন্নত নাসিকাবিশিষ্ট। পীতাভ জাতিদিগের নাসিকা প্রায় মাটো এবং কৃষ্ণজাতি-দিগের নাসিকা প্রায় অতি প্রশস্ত (platyrrhine)। আর্য্যজাতিরা গৌরাঙ্গ, তাহাদের নাসিকাও টিকল; মঙ্গোলীয় জাতিরা পীতাভ, তাহাদের নাসিকা মাটো; নিগ্রোজাতিরা কৃষ্ণ, তাহাদের নাসিকা অতিপ্রশস্ত। আপাততঃ মনে হইতে পারে, অন্যান্য জাতিরা এই তিন জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে।

ভারতবর্ষ ও ইউরোপে যেমন এক সময়ে আর্য্যজাতি বিস্তৃত হইয়াছিল, মিসরেও সেইরূপ একসময়ে এক সুসভ্য জাতির আবির্ভাব হইয়াছিল। ম্যাসপেরোর (G. Maspero) "Dawn of Civilization" নামক পুস্তকে এই মিসরবাসী-দিগের বর্ণনা পাঠে মনে হয়, দৈহিক গঠন ও আকৃতিতে ইহারা আর্য্যজাতির সমতুল্য। আর্য্যজাতির ন্যায় ইহারা সমুন্নতকলেবর। ইহাদের মস্তক দীর্ঘকপালিক (dolichocephalic) এবং ইহাদের নাসিকা উন্নত। খৃষ্টজন্মের ২০০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে অন্য একজাতি মিসর জয় করে। এই জাতির গণ্ডাস্থি উন্নত এবং প্রশস্ত, ইহাদের মুখ চ্যাপটা। স্যর উইলিয়ম ফ্লাওয়ার (Sir William Flower) ইহাদের আকৃতিতে মঙ্গোলীয় ভাব লক্ষ্য করিয়াছেন। এই জাতি মিসরে চারি শত বৎসর প্রভুত্ব করিবার পর, মিসর হইতে বিতাড়িত হয়।

ফরাসী দেশে যাহারা অত্যন্ত প্রাচীন যুগ হইতে বাস করিয়া আসিতেছে, তাহাদের নাসিকাঙ্ক বহুকালাবধি সমভাবে থাকিতে দেখা গিয়াছে। ব্রোকা (Broca) আইজি (Eyzies) হইতে অতিকায় (mammoth) যুগের দুইটি করোটী পাইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে একটীর অঙ্ক ৪৮·৯৮ এবং আর একটীর ৪৫·০৯ গণিত হইয়াছিল। সুতরাং করোটীদ্বয়ের মধ্যমান (mean dudet) ৪৭। কিন্তু ব্রোকার° মতে অঙ্কের মধ্যমান (mean), অঙ্কের গড়-পড়তার হিসাব নয়, মধ্যমানের (mean) অঙ্কই ঠিক গড়পড়তার হিসাব। এই দুইটী করোটীর উচ্চতার মাপ ক্রমান্বয়ে ২৪ ও ২২ এবং উচ্চতার মাপের মধ্যমান (mean) ২৩; উহাদের বিস্তারের মাপ ক্রমান্বয়ে ৫১ ও ৪৯, এবং বিস্তারের মাপের মধ্যমান (mean) ৫০। ২৩কে ১০০ দিয়া গুণ করিয়া গুণফলকে ৫০ দিয়া ভাগ করিলে ৪৬ হয়। সুতরাং মধ্যমানের (mean) অঙ্ক ৪৬।

জীবিত মনুষ্যের নাসিকাঙ্কের (nasal index) পরিমাণ ও কঙ্কাল-নাসিকাঙ্কের (cranial nasal index) পরিমাণ একরূপ নয়। কঙ্কাল-নাসিকাঙ্ক ৪৮ এর কম হইলে নাসিকাকে সূক্ষ্ম (leptorrhine) বলা হয়; অঙ্ক ৪৮ হইতে ৫৩ গণিতে হইলে, নাসিকাকে নাতিপ্রশস্ত (mesorrhine) শ্রেণীভুক্ত করা হয়; অঙ্কের পরিমাণ ৫৩ অতিক্রম করিলে নাসিকাকে প্রশস্ত (platyrrhine) বলা হইয়া থাকে।

অতিকায় (mammoth) যুগের করোটীদ্বয়ের মধ্যমানের (mean) অঙ্ক ৪৬ কিলমিটার বলিয়া গণিত হইয়াছে; সুতরাং ব্রোকার হিসাব অনুসারে উক্ত নাসিকা সূক্ষ্ম (leptorrhine) শ্রেণীভুক্ত।

তারপর ফ্রান্সের আধুনিক প্রস্তর-(neolithic) যুগের কথা; এই যুগে ফ্রান্সে জাতিসঙ্কর ঘটিয়াছিল। কিন্তু তবুও যতদূর জানা গিয়াছে, ঐ যুগেও ফ্রান্সে সূক্ষ্ম (leptorrhine) নাসিকারই প্রাচুর্ভাব ছিল।

অতঃপর ব্রোঞ্জ যুগেও ফ্রান্সের নাসিকাঙ্ক সমভাবই ছিল। ব্রোকা ফ্রান্সের লৌহযুগের ১৫টী গলদেশীয় করোটী পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, এই করোটীগুলি সিজারের জয়ের অন্ততঃ এক শতাব্দ পূর্ব্বের। তিনি দেখিয়াছেন যে, লৌহযুগের গলদেশীয় করোটীর নাসিকাও সূক্ষ্মশ্রেণীভুক্ত (leptorrhine) ফ্রান্সে রোমানদিগের জয়পতাকা উড্ডীন হইবার পরেও ফ্রান্সদেশবাসীর নাসিকার পরিবর্ত্তন সংঘটিত

হয় নাই। কিন্তু উক্ত দেশে পরবর্ত্তী যুগের চেলীর ও মেরোগভিনগিয়ান্ করোটী সকল পরীক্ষা করিয়া বিশেষজ্ঞগণ দেখিয়াছেন যে, ঐ সকল করোটীর কঙ্কাল-নাসিকাঙ্ক সূক্ষ্ম (leptorrhine) সীমা অতিক্রম করিয়াছে। কিন্তু শাম্প্লিয়ঁ (Champlien) নামক স্থানে প্রাপ্ত কতকগুলি মেরোগভিনগিয়ান (Merovingian) করোটীর কঙ্কাল-নাসিকাঙ্কের পরিমাণ অনুসারে নাসিকাকে (leptorrhine) হইতে দেখা গিয়াছে।

বানরজাতীয় প্রাণীর নাসারন্ধ্রতল উপর চোয়ালের সহিত সোজাভাবে সম্মিলিত। ইহা দ্বারা এই বোঝা যাইতেছে যে, বানরজাতীয় প্রাণীর নাসারন্ধ্রতল ও উপর চোয়ালের অস্থি একটী সরল রেখার উপর অবস্থিত। শিশুদিগের নাসারন্ধ্রতল ও উপর চোয়ালের অস্থি ঠিক সরলরেখার উপর অবস্থিত না হইয়া উভয়ের সন্ধিস্থলে রেখাটী একটু বক্রগতি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সেইজন্য সন্ধিস্থলে একটী কোণ (angle) নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ণবয়স্ক মানবের নাসারন্ধ্রতল এরূপ সরলরেখার উপর চোয়ালের সহিত মিলিত হয় নাই; তাহারা নাসারন্ধ্রতলের নিম্নপ্রান্ত একটা পাতলা পিণ্ডাকারে (ridge) পরিণত হইয়াছে; আর সেইজন্য তাহার উপর চোয়ালের অস্থি নাসারন্ধ্রতল হইতে স্পষ্টভাবে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু নাসারন্ধ্রতল নিম্নপ্রান্তে কিছু অবনত হইয়া উপর চোয়ালের সহিত মিলিত হইয়াছে, মানব-করোটীতে এরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। পণ্ডিত-প্রবর হভরকা (Hovorka) বহুজাতীয় মনুষ্যের মস্তক পরীক্ষা করিয়া মানবের মুখমণ্ডলে উক্ত চারিপ্রকার রন্ধ্র-বিশিষ্ট নাসিকার সন্ধান পাইয়াছেন।

যাহাদিগের নাসারন্ধ্র বানরজাতীয় প্রাণীর নাসারন্ধ্রের অনুরূপ, তাহাদিগের নাসারন্ধ্র "সিমিয়ান গ্রুভ" (Simian groove) নামে অভিহিত। নাসারন্ধ্র শিশুর নাসারন্ধ্রের অনুরূপ হইলে তাহাকে "Infantile groove" বা "Forma infantilis" বলা হয়, মানবের সাধারণ নাসারন্ধ্র "forma anthropina" নামে অভিহিত। শেষোক্ত প্রকার নাসারন্ধ্রকে "fossae prenasales" বলা হয়।

হভরকা-লিখিত বিবরণ পড়িয়া জানিতে পারা যায় যে, নিগ্রো,অষ্ট্রেলিয় প্রভৃতি ঘোর কৃষ্ণকায় জাতির অধিকাংশের নাসিকা "Simian Groove" বিশিষ্ট। Forma infantilis"ও নিগ্রোদের মধ্যে খুব বেশী দেখা যায়। মঙ্গোলীয় জাতীয় মনুষ্যের অনেকের নাসিকা forma infantilis শ্রেণীভুক্ত; কিন্তু তাহাদের মধ্যে প্রায়ই fossae prenasales শ্রেণীর নাসিকাও দেখা যায়। ইউরোপের দক্ষিণাঞ্চলের কতকগুলি জাতির infantile groove বিশিষ্ট নাসিকা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইউরোপের উত্তরাঞ্চলের অধিবাসিগণের অধিকাংশের নাসিকা "forma anthropina"

সোম

শ্রীব্রজলাল মুখোপাধ্যায় এম-এ, এম-আর-এ-এস্, এটর্ণী-এট-ল

সোম কি লতাবিশেষ?

এ প্রশ্ন সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই কিছু বলিয়াছি। সায়নাচার্য্য (14th Century A. D.) "লতাত্মকঃ সোমঃ," "উধঃ সোম-বল্লী-লক্ষণং" ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যের কোন অংশেই সোমকে লতাবিশেষ বলিবার পক্ষে কারণ বা যুক্তি দেখান নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ঋগ্বেদে লিবুজা শব্দ ব্যবহার আছে। লিবুজা শব্দের অর্থ লতা (Creeper, climber অথবা twiner) যথা "পরিষজাতে লিবুজেব বৃক্ষং" (ঋ ১০।১১।০,১৪) কিন্তু সোমকে লিবুজা বলা হয় নাই। পরন্তু সোমকে বনস্পতি ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই শব্দের অর্থ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বনস্পতি দণ্ডায়মান তরু। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদে ওষধি ও বনস্পতি দুইটাই দণ্ডায়মান তরু; একটী ছোট ও অপরটী অপেক্ষাকৃত বড়। (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৭।৩।১৯; ৭।৩।২০)। সুশ্রুত গ্রন্থে সোমবল্লী,

সোমবল্কল ইত্যাদির উল্লেখ আছে। বস্তুতঃ পক্ষে সোম শব্দ অবলম্বনে অন্যান্য বৃক্ষ লতাদির নাম হইয়াছে; যথা—সোমযোনি, সোমরাজী, (সোমরাজিকা), সোমলতা, সোমলতিকা, সোমবল্কঃ, ইত্যাদি। সোমযোনি অর্থে চন্দনবিশেষ, সোমরাজী অর্থে হাকুচ বা বাকুচী, সোমলতিকা অর্থে গুড়ূচী ইত্যাদি। সোমলতা সম্বন্ধে ভাবপ্রকাশ বলেন "সোমবল্লী সোমলতা সোমাক্ষীরা দ্বিজপ্রিয়া। সোমবল্লী ত্রিদোষঘ্নী কটুস্তিক্তা রসায়নী।" রাজনির্ঘণ্ট মতে "সোমবল্লী মহাগুল্মা যজ্ঞশ্রেষ্ঠা ধনুর্লতা। সোমার্হা গুল্মবল্লীচ যজ্ঞবল্লী দ্বিজপ্রিয়া। সোমক্ষীরা চ সোমা চ যাজ্ঞাঙ্গা রুদ্রসংখ্যয়া। সোমবল্লী কটুঃ শীতা মধুরা পিত্তদাহহৃৎ। কৃষ্ণা বিশোষ শমনী পাবণী যজ্ঞসাধনী।" সোমবল্লী বা সোমবল্লরী অর্থে অমরকোষ অনুসারে ব্রাহ্মী বুঝায়। "ব্রাহ্মী তু মৎস্যাক্ষী বয়স্থা সোমবল্লরী।" এ সকল শব্দের মধ্যে কোন্‌টী যে বৈদিক সোমের প্রকৃতি, সে বিষয় কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, সোমবল্লী বা সোমলতা অর্থে ব্রাহ্মীশাক। ইহাই যে বৈদিক যজ্ঞের সোম, তাহার প্রমাণ কি আছে? সোমকে আমি যদি লতা বলিয়া স্বীকার না করি, তাহা হইলে সোম ও ব্রাহ্মীশাকের ঐক্য প্রমাণ করার কোনও উপায় দেখিতে পাই না। সায়নাচার্য্য সম্ভবতঃ আয়ুর্ব্বেদের সোমলতা ইত্যাদি নাম দেখিয়া বৈদিক সোমকে লতাত্মক বলিয়াছেন। বেদবেত্তা চতুর্ব্বেদের ভাষ্যকার সায়নাচার্য্যের উক্তি বা মত আমরা সহজে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি না; কিন্তু যে সকল মত বৈদিকপ্রমাণমূলক নহে, সে সকল মত শিরোধার্য্য করাও উপযুক্ত নহে। কিন্তু তাঁহার নামের মাহাত্ম্যে আমরা অনেক সময়ে তাঁহার স্বকপোলকল্পিত মতগুলিও শিরোধার্য্য করিয়া থাকি, ইহা আমাদের প্রকৃতিগত দোষ। ইহাকে তর্কশাস্ত্রে argumentum ad hominem বলা যায়। যুক্তি ও তর্ককালে এই দোষ হইতে সর্ব্বদা সাবধান না থাকিলে, সত্যের অনুসন্ধানে আমরা প্রায়শঃ বিফলমনোরথ হই। যুক্তি ও প্রমাণ সাহায্যে সোমের লতাত্মকতা যদি প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে সায়ন-মত আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য থাকিব। যেমন সায়নের মত সম্বন্ধে সাবধান হওয়া উচিত, তেমনই অন্যান্য খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের সম্বন্ধেও সাবধান হওয়া আবশ্যক। বিশেষরূপে সাবধান না হইলে, কোন বিষয়ের সত্যাসত্য বিচার করা অসম্ভব। পণ্ডিত-মাত্রেই অবগত আছেন যে বৈদিক সোম ও আবেস্তায় হেওম একই বস্তু এবং Sirozah (২।৩০) নামক গ্রন্থে হেওমকে দাঁড়াগাছ বলা হইয়াছে। Prof Rothও স্বীকার করিয়াছেন যে, বৈদিক গ্রন্থে সোমকে লতাত্মক বলা হয় নাই।

Prof eggelingএর মত।

Prof Eggeling বলেন যে, সোমের আকৃতি কি প্রকার, তাহা আমাদের নিশ্চিতভাবে জানা নাই; কিন্তু অনুমান করা যায় যে পার্শীগণ যে তরু হইতে হুমরস প্রস্তুত করেন, সেই তরুই বৈদিক সোম। এই অনুমান-মূলে কয়েকটী যুক্তি তিনি প্রদর্শন করেন।

১। কর্মান দেশীয় পার্শীগণ Houtum Schindlerকে একটী তরু দেখাইয়াছিলেন এবং তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে ঐ তরু তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রোল্লিখিত হুম্ বটে।

২। হুম্ ও সোম ভাষাতত্ত্ব প্রমাণে একই শব্দ ও সমানার্থক।

৩। যে তরু দেখান হইয়াছিল, তাহা উচ্চে প্রায় ৪ ফুট্ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহার ডালগুলি একটু গোল ভাবের এবং ইহাতে একটু লাল বা হরিৎ আভাযুক্ত লম্বা দাগ আছে; ইহার রস দুগ্ধের ন্যায়, কিন্তু একটু সবুজ আভাযুক্ত এবং সুস্বাদু; কিছুদিন রাখিলে অম্লরস হয়। গাঁটগুলি সহজেই ভাঙ্গা যায়। পত্র ক্ষুদ্রাকৃতি এবং বিরল।

৪। ধূর্ত্তস্বামিধৃত শ্লোকের বর্ণনার সহিত উপরিউক্ত বর্ণনার কতকটা সাদৃশ্য আছে। কারণ ঐ শ্লোকে দেখা যায় যে সোম লতাত্মক, কৃষ্ণবর্ণ, অম্লাস্বাদ বিশিষ্ট, নিষ্পত্র, ক্ষিরিণী এবং তাহার ত্বক্ মাংসলা; ইহা শ্লেষ্মা নিবারক, বমনী এবং ছাগগণের প্রিয় খাদ্য।

৫। দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণগণ যে সোম ব্যবহার করেন, তাহা বৈদিক সোম নহে, কিন্তু সমজাতীয় বটে।

৬। সোম কোমল এবং সক্ষীরা।

৭। সুতরাং সোম ও Sarcsteemma কিংবা Asclepias জাতীয় অন্য কোনও উদ্ভিদ্ যথা Periplca একই বটে।

৮। এ বিষয় নিশ্চিত ভাবে সিদ্ধান্ত করা দুরূহ;

কারণ বৈদিক শব্দের প্রকৃত অর্থ আমরা অবগত নহি; যথা অংশু-শব্দ।

Prof. Eggelingএর অনুমান-মূলক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। পার্শী-ব্রাহ্মণগণ যে হুম Houtum Schicdlerকে দেখাইয়াছিলেন, তাহাই যে আন্দাজ পাঁচ সহস্র বৎসরের পূর্ব্বের হুম এবং সেই হুমই প্রকৃত হুম, তাহার প্রমাণ কি? এটা প্রবাদ-মূলক এবং এই প্রবাদ যে প্রমাণ-মূলক, তাহা আমরা কি প্রকারে জানিতে পারি? হুমের পরিচয় পার্শীগণের ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে Prof. Spiegel সাহেব সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তাহা এই; ইহা উজ্জ্বলবর্ণ; ইহার ডালপালাগুলি সরস; ইহা স্ফূর্ত্তিদায়ক ওষধি। ইহা পর্ব্বত উপরে জন্মায়। জলে এবং বৃষ্টিতে স্ফূর্ত্তি পায়। ইহার তীব্র গন্ধ আছে। ইহা দুগ্ধের সহিত পান করা বিধেয়। গোজাতির প্রিয় খাদ্য। ইহা দাঁড়া গাছ বিশেষ। (Sirozah 2.30) এই বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, পত্র, রস ও বর্ণ এবং ডালগুলি সম্বন্ধে Houtum Schindler যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রমাণ ধর্ম্মশাস্ত্রে নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, বেদ ও বৈদিক গ্রন্থেও সেই বা তদনুরূপ বর্ণনা আমরা পাইয়াছি। সুতরাং Kerman দেশীয় পার্শী-ব্রাহ্মণগণ যে প্রবাদ বিশ্বাস করেন, সে প্রবাদটী অনেকাংশে ভ্রমাত্মক। ধূর্ত্তস্বামি-ধৃত বচনটীতে যে বর্ণনা পাওয়া যায় এবং Houtum Schindler যে বর্ণনা করিয়াছেন, এই দুইটীর মধ্যে যে বিশেষ বৈষম্য রহিয়াছে, তাহা বর্ণনা দুইটী পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। Prof. Haug বলিয়াছেন, তিনি যে সোমের রস পান করিয়াছিলেন, তাহা বৈদিক সোম না হইলেও সমান জাতীয় বটে। এ বিষয়ের প্রমাণ কি? ইহার মূলে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না; ইহা ipse dixit মাত্র। কথিত হইয়াছে যে Asclepias acida বা Sareostemma Brevistigma বা Periploca aphyllaর সহিত বৈদিক সোমের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। Asclepias acida (Roxburgh) এবং Sarcostemma Brevristigma একই উদ্ভিদের নামান্তর মাত্র। Roxburgh সাহেব কৃত বর্ণনায় দেখা যায় যে, ইহা নিষ্পত্রা। ইহার স্বদেশী নাম ব্রাহ্মী বা সোমলতা।

"Stems twining, woody, branches and branchlets most numerous, cylindric and smooth particularly the youngest shoots, and they are generally pendulous when not supported, naked and succulent, leaves, scarcely the rudiments of any to be seen. Flowers small, pure white, fragrant, pedicelled, collected round the extremities of the branchlets, calyx small, fine parted, starlike Carol flat seemingly fine petiolled as the figures are continned close to the base. Nectary enlarged at the base in form of a cup, on which rests 5 large fleshy white segments."

"This plant yields a larger portion of very pure milky juice than any other I know, and what is rare, is of a mild nature and acid taste, the native travellers often suck the tender shoots to allay their thirst." Sarcosteemma Brevistigmaর লক্ষণ-সকল Brandis (Indian trees p 468) সাহেবের মতে যথা:—"A trailing jointed leafless shrub with thick rough bark and green pendulous branches flowers pale greenish in corymbic form cymes at the nodes or at the ends of branches pedicels 1/2 in long corolla ratate 1/3 inch in diamcter, lobes broad, overlapping to the right."

এই দুইটী বর্ণনাতে দেখা যায় যে, বর্ণিত উদ্ভিদ্‌টী নিষ্পত্র লতাবিশেষ, ইহার ত্বক্ মোটা এবং অমসৃণ; কিম্বা Roxburgh সাহেবের মতে মসৃণ। কিন্তু পাঠকবর্গ দেখিবেন যে এই সকল লক্ষণ সোমে বর্ত্তমান নাই। বৈদিক সোম লতাবিশেষও নহে এবং নিষ্পত্রও নহে। এই বর্ণনাগুলি ব্রাহ্মীশাক বা সোমলতার এবং ধূর্ত্ত-স্বামিধৃত শ্লোকোক্ত সোমবল্লীর উপযুক্ত বটে। ইহা হইতে প্রমাণ হইল যে, ধূর্ত্ত-স্বামীর সোমবল্লীই সোমলতা ও ব্রাহ্মীর নামান্তর মাত্র; পরন্তু ইহা বৈদিক সোম নহে। কথিত হইয়াছে যে

Periploca বোধ হয় বৈদিক সোম। কিন্তু Periplocaর লক্ষণ কি ?

"An erect shrub, stems green, surface covered with gum, usually leafless, at times with a few minute thick ovate leaves. Flowers 1/2-2/3 inches across, scented, dark purple in short lateral rounded, cymes. Follicles on short thick peduncles, divaricate, rigid, three in inches long."

এই বর্ণনাতেও সোমের লক্ষণ পাওয়া যায় না। সোম-পুষ্পে যে সুগন্ধ আছে তাহার প্রমাণ নাই, বরং সোমে উগ্র গন্ধ আছে এবং সোম নিষ্পত্রও নহে। আরও দেখুন, ধূর্ত্ত-স্বামিধৃত শ্লোকে সোমবল্লীর বিবরণ যদি বৈদিক সোমের বর্ণনা বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে সুশ্রুতের উল্লিখিত সোম বা ঐ সোম-শব্দযুক্ত ওষধি সকল বৈদিক সোম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সুশ্রুত বলিয়াছেন,

সোমামৃতাশ্বগন্ধাসু কাকোল্যাদৌ-গণে তথা।
ক্ষীরিপ্ররোহেষ্বপি চ বর্ত্তয়ো রোপণাঃ স্মৃতাঃ।
সমঙ্গা সোমসরলা সোমবল্কা সচন্দনা।
কাকোল্যাদিশ্চ কল্কঃ স্যাৎ প্রশস্তো ব্রণরোপণে।

ডল্লনকৃত টীকা যথা :—(সূত্র স্থান ৩৬ অং) সোমঃ সোম এব, সোম বল্কল ইত্যন্যে। অপরে সোমা ব্রাহ্মীত্যাহুঃ। অমৃতা গুড়ূচী, ক্ষীরিপ্ররোহাঃ ন্যগ্রোধোড়ুম্বরাদীনামঙ্কুরঃ। শেষং প্রসিদ্ধম্। রোপণং কল্কদ্রব্যং নির্দিশন্নাহ। সমঙ্গা অঞ্জলিকারিকা নজাম্লুকীতি লোকে প্রসিদ্ধা, বরাহক্রান্তা অপরে। সোমঃ সোমএব, সরলা সরলঃ বিশংশিকামন্যে, সোমবল্কঃ, কট্ফলম্। শেষং প্রসিদ্ধম।

পুনশ্চ—সোমবল্ল্যমৃতা শ্বেতা ইত্যাদি (কল্পস্থান ১ অং) এস্থলে সোমবল্লী অর্থে ডল্লনমতে গুড়ূচী।

পুনশ্চ - সোমরাজী ফলং পুষ্পং ইত্যাদি। এস্থলে ডল্লন মতে—সোমরাজী বাকুচী।

উপরিউক্ত প্রমাণে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, যে বচনটী অবলম্বনে আজ পর্য্যন্ত অনেক মনীষী পণ্ডিতগণ বৈদিক সোমের অনুসন্ধান করিতেছিলেন, সে বচনে এই পর্য্যন্ত প্রমাণ হয় যে, যে বল্লীর সোম আখ্যা দেওয়া হয়, সেই বল্লীর বর্ণনাই ঐ বচনে আছে। অন্য সোমের কথা ঐ বচনে নাই অর্থাৎ ঐ বচন সোমবল্লীর বা সোমলতার পরিচায়ক মাত্র।

Eggeling সত্যই বলিয়াছেন যে, বৈদিক শব্দের অর্থ দুরূহ হওয়ায় সোমের যথার্থ পরিচয় পাওয়া প্রায় অসম্ভব হইয়াছে। কিন্তু আমরা বলি যে এই কারণে চেষ্টা স্থগিত করা উপযুক্ত নহে; পরন্তু আরও বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক। অংশু শব্দটী আবশ্যক শব্দ। অংশু শব্দের অর্থ কি ? বৈদিক মন্ত্র মধ্যে অংশু শব্দের ব্যবহার অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়,—অংশু শব্দ দুইটী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। একটী অর্থ রশ্মি, দ্বিতীয় অর্থ সোম। এই শব্দের প্রয়োগগুলি বিচার করিলে বোধ হয় যে অংশু শব্দের আদিম অর্থ চন্দ্রকিরণ বা সূর্য্যরশ্মি। Sumerian ভাষায় en-zu (অংশু) শব্দের অর্থ sin (সোম)। যেমন চন্দ্ররূপী সোমকে অংশু বলা হইল, তেমনই ওষধিরূপী সোমকেও অংশু বলা হইল। অংশু সোমের বা সূর্য্যের রশ্মি, সুতরাং ওষধি-বিশেষ যে সোম, তাহার রশ্মিকেই অংশু বলা যায়। ওষধি-বিশেষের রশ্মি অর্থে তাহার যে সব সূক্ষ্ম লম্বা রশ্মি আছে তাহাই বুঝাইবে। এবং উদ্ভিদ সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে যে উহা কোমল; পত্র বা অন্যান্য অংশে কোমলতা ও জ্যোতিঃ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এ শব্দটীর বৈদিক ভাষায় যে অর্থ ছিল, অমরসিংহের সময়েও প্রায় তাহাই ছিল এবং আধুনিক বাংলা ভাষায়ও প্রায় তদ্রূপ আছে। অংশু বলিতে আমরা এঁসো বা সাঁয়া বুঝিয়া থাকি অর্থাৎ সূক্ষ্ম সূত্র। সুতরাং তৎসদৃশ বস্তুকেও প্রশংসা করিয়া অংশু আখ্যা দেওয়া যায়। Prof Roth বলেন যে অংশু শব্দের দ্বারা দুইটী গাঁটের মধ্যবর্ত্তী স্থানটীকে বুঝায়। কিন্তু এই মতের মূলে কোন যুক্তি বা প্রমাণ পাওয়া যায় না। আরও একটী কথা এই যে সোমের সম্বন্ধে গাঁট বা গ্রন্থির উল্লেখ নাই।

সুতরাং গ্রন্থিদ্বয়ের মধ্যগত স্থানকে অংশু বলা যায় না। যদি গ্রন্থিদ্বয়মধ্যগত স্থানকে অংশু বলিতে হয়, তাহা হইলে সোমের নাম অংশু হইতে পারে না। সোমের নাম অংশু বটে, কিন্তু ইহাকে অংশুমানও বলা হইয়া থাকে। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, অংশুপ্রাচুর্য্য হেতু সোমের নাম অংশুমান্ এবং অংশু বটেই (অংশুরেব) এই অর্থে উহার নাম অংশু। কোন কোন ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন যে অংশু অর্থে Shoot কিন্তু Shoo

শব্দের অর্থ পল্লব, কিশলয়, প্ররোহ, অংকুর ইত্যাদি। সুতরাং অংশু অর্থে যে Shoot তাহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। হেমচন্দ্রের মতে অংশু অর্থে সূত্রাদি-সূক্ষ্মাংশ। সর্ব্বদাই আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, ব্রাহ্মণগ্রন্থ হইতে বৈদিক শব্দের বা বৈদিক মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। সে চেষ্টা, পণ্ডশ্রম মাত্র। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে মন্ত্রাদির অর্থ-বিকৃতি করিতে হইয়াছে এবং অনেক সময় কাল্পনিক ব্যাখ্যাও স্বীকার করিতে হইয়াছে। মন্ত্রার্থ হইতে বিনিয়োগ স্থির করা সম্ভবপর বটে, কিন্তু, বিনিয়োগ হইতে মন্ত্রার্থ স্থির হইতে পারে না। সুতরাং "অংশু না তে অংশুঃ পৃচ্যতাং ইত্যাদি মন্ত্রের বিনিয়োগ (তৈ সং ১।২।৬) হইতে যদি অংশু শব্দের অর্থ নিদ্ধারণ করিতে যাই, তাহাতে আমরা নিশ্চয়ই নিষ্ফল হইব। সোম অজ্ঞাত; অংশুও অজ্ঞাত, পদ্ধতি ও বিনিয়োগ অজ্ঞাত সুতরাং তাহার মধ্য হইতে জ্ঞান লাভের আশা দুরাশা মাত্র। আর একটী শব্দ—অন্ধঃ। অন্ধঃ অর্থে সাধারণতঃ অন্ন বুঝায়। যাহা খাওয়া যায় তাহাই অন্ধঃ, অন্ন। সোম অন্ধঃ, কারণ সোম খাওয়া যায়। নিঘণ্টুও এই অর্থই প্রকাশ করিয়াছেন। Oldenberg অন্ধঃ অর্থে Sap বলিয়াছেন; কিন্তু সাধারণ অর্থ ত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে অর্থান্তরের কল্পনা করার বিশেষ কারণ না থাকিলে করা উচিত নহে। ঋগ্বেদ ৪।১।১৯ মন্ত্র অনুবাদে অংশোঃ অন্ধঃ Sap of soma shoot বলিয়াছেন, কিন্তু এ স্থলে সাধারণ অর্থ করিলে কোন ব্যাঘাত ঘটে না। প্রকৃত অর্থ স্বীকার করিয়া ব্যবহারস্থলে তাহার বিশেষ প্রয়োগ স্বীকারে কোন বাধা নাই। সুতরাং অন্ন শব্দের প্রয়োগ-ভেদে অন্ন শব্দে রস স্বীকার করিতে কোন বাধা নাই। চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, ভক্ষ্য ভোজ্য এ সকলই অন্নবিশেষ; সুতরাং অন্ধঃ শব্দের অর্থ পেয়-রস মাত্র বলাও ঠিক নহে। অন্ধঃ শব্দে অন্ধকারও বুঝা যায়। সুতরাং প্রয়োগ দেখিয়া অর্থ বুঝিতে হইবে এবং যে স্থলে যে অর্থ উপযুক্ত, সে স্থলে তদুপযুক্ত অর্থ স্বীকার করিতে হইবে। ত উ সুতস্য সোমস্যান্ধসোহংশোঃ (ঋ ১০।৯৪।৮) স্থলে সায়ন অন্ধঃ শব্দে অন্ন স্বীকার করিয়াছেন। "প্রজাপতের্বা এতে অন্ধসী যৎ সোমশ্চ সুরাচ" (শত ব্রা ৫।১।২।১০) স্থলে অন্ধসী অর্থে নিশ্চয় অন্ন। ঐ স্থলে বলিতেছেন যে প্রজাপতির দুইটী খাদ্য (অন্ন) যথা সোম ও সুরা। (অর্থাৎ সিদ্ধি ও সুরা) প্রসঙ্গক্রমে বলি, সিদ্ধি ও মদ এখনও মাদক বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং পুরাকাল হইতেই প্রসিদ্ধ। কিন্তু ব্রাহ্মীশাক বা গুড়ূচী মাদক দ্রব্যরূপে ব্যবহারের প্রথা কখনও শুনা যায় নাই। আর এক কথা, ব্রাহ্মী খুব বড় ও ঘনলতা নহে। অথচ রাশি রাশি ব্রাহ্মীলতা সংগ্রহ করিয়া শকটে করিয়া আনাইয়া যজ্ঞ সম্পাদন অর্থাৎ সমারোহ করিয়া নেশা করা, কি সম্ভবপর?

বৈদিক ভাষায় অনেক শব্দের অর্থবোধ কঠিন বটে। কিন্তু আপাততঃ পাশ্চাত্য প্রণালী অনুসরণ করিয়া শব্দগুলি আমরা যতদূর দুর্ব্বোধ্য করিয়া তুলিয়াছি, বস্তুতঃ পক্ষে শব্দগুলি তেমন দুর্ব্বোধ্য নহে। বৈদিক লক্ষণ-গুলি যথারীতি সংগ্রহ না করিয়া সোমের পরিচয় স্থির করিতে হইলে নিশ্চয়ই হাস্যাস্পদ হইতে হয়। যদি উপরিলিখিত লতাগুলিকে সোম বা সোমজাতীয় অনুমান করিয়া একটা বৃহৎ ব্যাপার ঘটান হয়, তাহা হইলে অন্য অনেক লতাবৃক্ষাদিকেও সোম আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। Brandis (Indian Trees P. 531) বলিয়াছেন, Machilus Bombycina (Machilus adoratissima নামে যে বৃক্ষ আছে তাহাই সোম। এই তরুটীর সোমাখ্যা পাওয়ার দাবী বরং কিছু থাকিতে পারে, কারণ ইহা প্রমাণিত করা যাইতে পারে যে মুগা বা তজ্জাতীয় বস্ত্র পুরাকালে ব্যবহৃত হইত।

পণ্ডিতগণ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া অনেক রকম সিদ্ধান্তই করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন—সোম একপ্রকার সারগম্ বিশেষ। আর একজন বলিয়াছেন যে সোম—দ্রাক্ষাবিশেষ। আর একজন বলিয়াছেন যে সোম—রাগি ধান্য মাত্র। কেহ বলেন ইহা মাদার। আর একজন সোমকে চা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। এই সকল নানা প্রকার উদ্ভট মতের মধ্যে কতকগুলির বিশেষ প্রতিবাদ আবশ্যক।

য়ুরোপে

শ্রীদিলীপকুমার রায়

এই শান্তি-সম্মিতিতে যাঁর সঙ্গে আমি সব চেয়ে বেশী মনের মিল খুঁজে পেয়েছিলাম (ও যাঁর সঙ্গে পরে তাঁদের বাটীতে অতিথি হয়ে আরও একটু ঘনিষ্ট পরিচয় লাভ করার সুযোগ পেয়েছিলাম), তিনি ছিলেন একজন ফরাসী রমণী। বয়স ২৫।২৬ বৎসর—য়ুরোপে যাকে তরুণ বয়স বলেই মনে করে,—যদিও আমাদের মতে মেয়েদের কুড়ি পার হ'লেই বুড়ি বলে গণ্য হওয়া শাস্ত্রসম্মত। ইনি দেখতে ভালই ছিলেন বলা যেতে পারে, যদিও তাঁকে ঠিক্ সুন্দরী বলা চলে না। কিন্তু এঁর প্রকৃতির এমন একটা আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, এঁকে প্রথম থেকেই আমাদের প্রায় সকলের ভাল লেগে গিয়েছিল। মানুষের স্বভাবটি, সব সময়ে না হ'লেও, বেশীর ভাগ স্থলেই, মুখে-চোখে অনেকটা প্রতিফলিত হয়—বিশেষতঃ যদি এ স্বভাবের মধ্যে কিছু বিশিষ্টতা থাকে। এঁর সম্বন্ধে আমার প্রথম ধারণা মনে পড়ে, যখন ইনি বর্ত্তমান কালের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক ও আদর্শবাদী জর্জ্জ ডুহামলের "ব্যক্তিত্ব ও মানবতন্ত্র" বক্তৃতাটির পর একটি ছোট্ট অথচ হৃদয়-গ্রাহী প্রতিবাদ করেন। ডুহামেল মহোদয় যা বলেছিলেন তার মোট কথাটি এই:—"য়ুরোপে আমরা যুথবদ্ধ হ'য়ে কাজ করাটাকে একটা মস্ত জিনিষ বলে মনে করে থাকি; কিন্তু এতে আমাদের মুক্তি-লাভের সম্ভাবনা নেই। কারণ, যুথ-মতের দ্বারা চালিত হয়ে মোটের উপর মানুষ মানুষের অনিষ্টই করেছে। শুধু বিশ্ব-মানবত্ব প্রচার করে বিশেষ ফল নেই, যদি সঙ্গে-সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ সাধন করার তাকে সুযোগ ও অবকাশ দেওয়া না হয়। জগতের মুক্তি শুধু মাত্র কয়েক জনের ব্যক্তিত্বের বিকাশে নয়,—জগতের মুক্তি মিলতে পারে শুধু আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণতা সাধনে—যখন যুথ-মতের প্রভাব আমাদের স্বাধীন চিন্তাকে বেশী আচ্ছন্ন করে ফেলতে পার্ব্বে না।" উত্তরে এই ফরাসী তরুণী এই বলে প্রতিবাদ করেন যে, "ব্যক্তিত্বের বিকাশই সব নয়, যদিও তা যে প্রয়োজনীয়, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কারণ, ব্যক্তিত্বের বিকাশ সব সময়ে যে ঐক্যের দিকেই হবে, এমন কোনও কথা নেই। এই জন্য শুধু ব্যক্তিতন্ত্রতা (individualism) একটু বেশী বিপজ্জনক, যদি তার মূলে আত্ম-বিস্মৃতির বা সেবার একটা প্রেরণ না থাকে।" মনে আছে, শুধু ডুহামেল মহোদয় নয়, আমরা অনেকেই এই সুচিন্তিত প্রতিবাদটি শুনে একটু impressed হয়েছিলাম। আমি নিজে ত অন্ততঃ—হয় ত পুরুষ-সুলভ অহমিকার গুণেই—এক তন্বী তরুণী রমণীর মধ্যে এতটা চিন্তার ও বিচারের প্রবণতা দেখতে পেয়ে যে একটু বেশী রকমই প্রীত হয়েছিলাম এ কথা বেশ মনে পড়ে। কারণ, আমাদের মধ্যে বোধ হয় একটা বদ্ধমূল ধারণা আছে—যাকে দূর করা শক্ত—যে, চিন্তায় স্থৈর্য্য ও তীক্ষ্ণতা আমাদের পুরুষজাতিরই এক-চেটে। যদি উদারপন্থী হয়ে নারীজাতির প্রতি সত্য-সত্যই শ্রদ্ধাবান হওয়া যায়, তাহ'লেও তাদের সঙ্গে যখন তর্ক কর্ত্তে যাই, তখন এ তর্ককে বোধ হয় আমরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই একটু সস্মিত কৌতুকের চোখে না দেখেই পারি না। এমন কি, অনেক সময় নারীজাতির বুদ্ধিমত্তা স্বীকার করে নিলেও, তারা যে আমাদের দৈনিক যুক্তি-তর্কের মধ্যেও গভীর কিছু দিতে পারে, তা আমরা সম্ভবপর বলে যেন মনে কর্ত্তেই পারি না। কিন্তু এঁর সেদিনকার কয়টি কথার মধ্যেই আমার এরূপ ধারণার একটা দৃঢ় প্রতিবাদ পেয়েছিলাম বলে মনে পড়ে। কাজেই যেদিন এঁর স্বামী তার পরে একদিন এক উৎসব দেখে ফেরবার পথে আমার সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর আলাপ করিয়ে দেন, তখন মনটা যে বেশ খুসী হয়েছিল, তা বেশ মনে আছে।

সংসারে আমরা অনেক সময়েই কোনও কোন নারী দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে থাকি—তার মুখে কোন বৈশিষ্ট্যের ছায়াপাতের আকর্ষণে নয়—একটা নিহিত piquancy of sexএর আকর্ষণের দরুণ। সুখের বিষয়, একটু আন্তরিক ভাবে বিচার করে দেখবার প্রবণতা থাকলে, অন্ততঃ আমাদের

নিজেদের কাছে ত' এরূপ আকর্ষণের যথার্থ রূপটি ধরা পড়ে—অবশ্য হয় ত' অনেক সময়ে একেবারে প্রথমেই পড়ে না। আবার কোনও কোনও সময়ে আমরা আকৃষ্ট হই অনেকটা এই বিশিষ্টতার আকর্ষণে—যদিও সঙ্গে সঙ্গে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বিশেষতঃ অল্প বয়সে এই আকর্ষণের কতখানি যে মনোমিলের উপর প্রতিষ্ঠিত ও কতখানি পুরুষ ও নারী সহজ সংস্পর্শাকাঙ্ক্ষা হ'তে প্রসূত, তা যথাযথভাবে নির্ণয় করাটা একটু কঠিন। সে যাই হোক্, যেখানে এই আকর্ষণটার অনেকটা এই পরস্পরের বিশিষ্টতার ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত, সেখানে আবার কোনও কোনও স্থলে দেখি যে, এই বৈশিষ্ট্য একটা সত্যকার বৈশিষ্ট্য হলেও, তার সঙ্গে আমাদের কোনও আসল মিলের সুর খুঁজে পাওয়া যায় না। এরূপ ক্ষেত্রেও এ সংস্পর্শে হয় ত' শিখি অনেক, কিন্তু তাতে সমস্ত মনটা ভরে ওঠে না। কিন্তু যে ক্ষেত্রে দেখি যে এই আকর্ষণ মাত্র piquancy of sex এর উপর নির্ভর করে না, বা একটা বৈশিষ্ট্য মাত্রের উপরও নির্ভর করে না,—করে একটা আসল মনের মিলের উপর—তখনই আমরা মানুষের মধ্যে মিলের সুরটির তৃপ্তির পরম পরশ যে কত সুন্দর, কত মনোজ্ঞ, তার পরিচয় পাই। আমাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে এই মিলের সুরটি ক্রমেই বিরলতর হয়ে আসে বলেই হয় ত' যখন এটা আসে তখন তার রসও আমাদের কাছে সমধিক দীপ্ত হয়ে ধরা দেয়। এঁর সঙ্গে পরে একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করার পর, আমি আর একবার এই সত্যটির পরিচয় পাই। "আর একবার" বল্লাম এই জন্য যে, প্রত্যেক সত্য বন্ধুত্বের ক্ষেত্রেই এই সত্যটির পরিচয় পাওয়া যায়, যদিও প্রত্যেকবারই সে তার সঙ্গে একটু নূতন কিছুর পরশ নিয়ে আসে, যাতে অভাবনীয় ও অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব কোনও উপাদান থাকেই থাকে।

এঁর স্বামী ছিলেন ভারি ধীর-প্রকৃতির লোক ও স্ত্রীর মতনই আদর্শবাদে বিশ্বাসবান্। তিনি খুব উদার ও হৃদয়বান্ লোক ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধেও পরে লেখ্‌বার ইচ্ছা রইল, কারণ, এঁর সঙ্গেও বেশ একটা প্রীতির বন্ধন খুঁজে পাওয়া গিয়াছিল। ইনি এক সময়ে খুব nationalist ছিলেন। বর্ত্তমানে এঁদের দুজনেরই মত এই যে, nationalismএ জগতের সমস্যার কোনও সমাধান মেলবার আশা নেই। আশা কেবল বিশ্ব-মানবত্বের (internationalism) প্রচারে। এ সম্বন্ধে এঁদের সঙ্গে আমার বড় কম আলোচনা হয় নি।

লুগানো সমিতির পর আমরা তিনজনে একত্রে অপূর্ব্ব শোভাময়ী ভেনিস নগরীতে ৭।৮ দিন ছিলাম। সেখানে একদিন আমার বন্ধু-পত্নী আর একটি ফরাসী মহিলার সঙ্গে আলোচনাচ্ছলে বলেন:—"আমরা, জর্ম্মাণীর সঙ্গে যে ব্যবহার কর্চ্ছি, তা ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকি, যেহেতু, তারা যে আমাদের ক্ষতিপূরণ কর্ত্তে বাধ্য, এ কথা আমরা স্বতঃসিদ্ধবৎ ধরে নিয়ে থাকি। কিন্তু আমাদের এরূপ মনোভাব আমাদের নিজেদের কাছে যত স্পষ্ট ও ন্যায়সঙ্গত বলে মনে হয়, বস্তুতঃ এটা তার চেয়ে একটু গুরুতর সমস্যা। এটা সঙ্কীর্ণতারই পরিচায়ক। এ পথে চল্‌লে শুধু যে জগতের দুঃখের নিরাকরণ হবে না, তাই নয়,—আজকের দিনে জগতের সমস্যা থেকে ফরাসী দেশকে আলাদা বিবেচনা করে অগ্রসর হলে, সেটা আমাদের আত্মহত্যারই সামিল হবে।' সেই ফরাসী মহিলা একটু উত্তপ্ত হয়ে বল্‌লেন:—"আমরা এ যুদ্ধটার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না; যুদ্ধ করার আমাদের ইচ্ছাও ছিল না। অতএব আমাদের বাঁচতে হলে, অপর পক্ষকে অন্ততঃ নিছক্ সুবিচারের দাবী মেনে ত' চল্‌তে হবে?" বন্ধু-পত্নী উত্তর দিলেন—"আমরা যে ঠিক্ ১৯১৪ সালে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না, এ কথা সত্য হলেও, আমাদের যে যুদ্ধ কর্ব্বার ইচ্ছা ছিল না, এ কথা সত্য বলে মনে হয় না।" এ কথায় সে ফরাসী মহিলাটি অত্যন্ত আহত হয়েছিলেন, মনে আছে।

য়ুরোপে শুধু যে রোলাঁ, রাসেল, বারবুস প্রমুখ আদর্শবাদীদের মধ্যে নয় জনসাধারণের মধ্যেও এই বিগত কুরুক্ষেত্রের জন্য একটা তোলপাড় হয়ে গিয়েছে, তা আমরা ইংলণ্ডে অনেক সময়েই উপলব্ধি কর্ত্তে পারি না। কারণ, দ্বীপাবদ্ধ (insular) ইংরাজ জাতির সঙ্গে য়ুরোপের বস্তুতঃ কোনও নাড়ীর সম্বন্ধ নেই বল্লেই চলে।* কিন্তু

* মহামতি John Maynard Keynes তাঁর বিখ্যাত Economic Consequences of this Peace নামক বিখ্যাত বইখানিতে এই বলে আক্ষেপ করেছেন যে, য়ুরোপে যে কি কুরুক্ষেত্র হয়ে গেছে, দ্বীপাবদ্ধ আমরা তার কোন খবরই রাখি না; তাই আমরা এখনও এটা সম্ভব ভাবি যে, য়ুরোপে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের খরচ আবার যুদ্ধের

যদি ইংলণ্ড ছাড়া য়ুরোপে কিছুকাল তার জনসাধারণের সঙ্গে মেশা যায়, তাহ'লে সভা-সমিতিতে ও আন্দোলনাদিতে এ সত্যটা বড়ই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, য়ুরোপে এমন অনেক উচ্চ-হৃদয় লোক আছেন, যাঁরা এজন্য ব্যথিত ও ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ কি করে থামান যেতে পারে, সেজন্য যে এখানে কত হৃদয়বান্ লোক ভাব্‌তে ও তদর্থে নানারূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপন কর্ত্তে সচেষ্ট, তার একটা খোঁজ রাখা আমাদের পক্ষে উচিত বলে আমি মনে করি। কারণ, আমার মনে হয় যে জগতের নাড়ীর সঙ্গে আমাদের যোগ স্থাপন করার সময় এসেছে, ও তা হবেই,—আমরা তা রাজী হই বা না হই। এ কথা মনে হয়েছিল আমার এই বান্ধবী-টির কথা মনে করে। ইনি এতদর্থে একটি শান্তিপ্রতিষ্ঠান (Acadeime de la Paix) গড়ে তোল্‌বার কাজে নিজের প্রায় সমস্ত অবসরটাই নিয়োগ করেছেন। ইনি আমাকে একটি চিঠিতে একটু ব্যথিত ভাবে লিখেছিলেন :—"On arrivons nous ? Je ne sais encore. Notre but est de chercher le moyen d'arriver a' une paix permanente, ce qui vent dire naturellement la libèration èvolutive. Je crois recevoir la collaboration des vrais hommes des sciences et d'expèrience. Ma tâche est senlement de maintenir la direction de ces recherches, de dénoncer le nationalisme élroit et de trouver daus be nationalisme large ce qui crèe l'intérnation alisme noble."

এর ভাবার্থ এই "আমরা কোথায় যাচ্ছি? আমি ত বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা স্থায়ী শান্তি স্থাপন করা ; অর্থাৎ যাতে আমাদের স্বাধীনতা ক্রম-বিকাশের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। আমার বিশ্বাস, এ কাজে আমি বৈজ্ঞানিক ও অভিজ্ঞ লোকের সাহায্য পাব। আমার কাজ হবে, শুধু আমাদের প্রচেষ্টার এই দিক্‌টা ঠিক্ রাখা, ও সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাকে হেয় করে তোলা, এবং উদার জাতীয়তার মধ্যে মানবতন্ত্রের বীজ বপন করা।" এ সম্পর্কে ভারতের কাছ থেকে যে এঁরা সাহায্য প্রত্যাশা করেন, তাও পরে লিখেছিলেন, "এ বিষয়ে আমি ভারতের নৈতিক শান্তির কাছ থেকে খুব বেশি সাহায্যই আশা করি।" এ বিষয়ে ভারতের কাছ থেকে এঁরা যে ঠিক কি রকম ভাবে সাহায্য আশা করেন, তা তিনি আর একটি পত্রে লিখেছিলেন : "Naturellement je n'attends pas de l'Inde une solution économique â proprement parler pour l'Europe, mais ce que les idées de l'Inde apportent â la solution de ceur question." অর্থাৎ "ভারতের কাছ থেকে ঠিক যে আমি একটা অর্থনৈতিক সমাধান আশা করি তা নয় ; ভারতের চিন্তাধারার এর সম্বন্ধে কি বলার আছে সেইটুকু মাত্র আমি তার কাছে প্রত্যাশা করি।" য়ুরোপে অনেক শিক্ষিত নরনারী যে সমগ্র য়ুরোপের সমস্যাকে নিজেদের সমস্যা বলে ভাবেন, এরূপ দুচারজন হৃদয়বান্ লোকের সঙ্গে সম্পর্শে এলে তার অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ, অন্যথা আমরা সচরাচর য়ুরোপের চিন্তাশীলতার দিক্‌টার সম্বন্ধে অন্ধ থেকে, শুধু তার বাহ্য ঐশ্বর্য্য, ক্ষমতা প্রভৃতির সম্বন্ধেই মতামত পোষণ করে থাকি।

তখন আমরা সুন্দর মিলানো সহরে। মিলানোর অপূর্ব্ব বিরাট্ গির্জ্জা ও নানান্ চিত্রশালা দেখে একদিন সন্ধ্যায় আমরা সেখানে একটি সান্ধ্য পার্টিতে নিমন্ত্রিত হই। আমাদের পরিচিত এক ধনী ইতালীয়ান-দম্পতী আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সেখানে একটি তুর্কী মহিলা ছিলেন। তাঁর বেশভূষা ও চেহারা দেখে তাঁকে য়ুরোপীয় ছাড়া অন্য কোনও জাতীয় বলে মনে করা সম্ভব ছিল না। কথায় কথায় তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা কর্লেন, আমরা উৎসবাদিতে একত্র নৃত্য করি কি না। আমি বল্‌লাম "না"। তুর্কী মহিলাটি তাতে বল্লেন : "আমি এটা ধারণা কর্ত্তে পারি না যে, একটা সভাজাতি নৃত্য না করে কেমন করে থাক্‌তে পারে!" আমি কোনও উত্তর দিলাম না। এ সম্বন্ধে সেদিন আর কোন কথা হয় নি ; কিন্তু পরে আমার বন্ধুপত্নী আমার সঙ্গে তর্ক কর্ত্তে আরম্ভ করেন এই বলে যে, আমি যে এ অসার কথাটিরও প্রতিবাদ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করে চুপ করে ছিলাম, সেটা ঠিক উচিত হয় নি। আমি বলে-

---

আগেকার মত কম হতে পারে, যেখানে য়ুরোপে অন্যত্র আমরা দেখতে পাই যে, তাদের কাছে সমস্যাটা কম-বেশী নিয়ে নয়,—জীবন-মরণ নিয়ে। (তিনি যা লিখেছেন তার ভাবার্থটা এই।)

ছিলাম : "আমার মনে হয়েছিল যে, তিনি শুধু দুই একটা শূন্যগর্ভ কথা বলার জন্যই বলেছিলেন—আমার মতামত জান্‌বার জন্য বলেন নি।" উত্তরে তিনি বলেছিলেন ; "দেখ, তোমার কি মনে হয় না যে, কাউকেই অবজ্ঞা করার অধিকার আমাদের নেই ? তোমরা তোমাদের দেশের কোনও গভীর ভাব বা চিন্তার ধারা আমাদের কাছে মুখ ফুটে বল না কেন ? তোমরা জান না, কিন্তু আমি নিজে জানি, বর্ত্তমান যুরোপে কত হৃদয়বান্ লোক একটা গভীর বাণী শোন্‌বার জন্য পিপাসু হয়ে আছে। আমার মনে হয় যে, আমরা জীবনে প্রতি ছোটবড় পদক্ষেপে নিজেদের মত বল্‌তে বাধ্য ; কারণ, কে জানে, কখন্ কোন্ কথা কি উপায়ে কার মনের উপর একটা গভীর ছাপ অঙ্কিত করে ? সেই তুর্কী মহিলার অসার কথাটির আমি নিজেও সে সময়ে কোনও প্রতিবাদ করি নি, কিন্তু সেটা আমার পক্ষেও দোষের হয়েছিল, এবং আমি নিজে এরকম দোষ প্রায়ই করে থাকি। আমি যে নির্ব্বিবাদে কালাতিপাত করে যাওয়ার ইচ্ছার বশবর্ত্তী হয়েই চুপ করে ছিলাম, এ কথা আমি স্বীকার কর্ত্তে বাধ্য, এবং এ প্রবৃত্তিটি একটা চমৎকার জিনিস নয়।" আমি বল্‌লাম : "দেখ, সমাজে অনেক সময়েই লোকে অনেক কথা বলে একটা কিছু বল্‌বার জন্যেই, কিছু শেখ্‌বার জন্য নয়।" তিনি বল্‌লেন : "কে যে কখন্ কোন্ কথায় শেখে ও কোন্ কথায় শেখে না, তা কি তুমি বল্‌তে পার ? আমার এক রুষ বন্ধু আছেন। তিনি খুব গভীর-হৃদয়, কিন্তু কাউকে অণুমাত্রও অবজ্ঞা করেন না ; এবং তিনি যেখানেই যান না কেন, নিজের শ্রোতা পেয়ে থাকেন।" আমি বল্‌লাম : "দেখ, বার্লিনে একটা সান্ধ্যভোজে এক ভদ্রলোক আমাকে একবার প্রশ্ন করেছিলেন, আমি সকল প্রকার মাংস খাই কি না। আমি সম্মতিজ্ঞাপক ঘাড় নাড়তে না নাড়তে, আমার গৃহকর্ত্রী আমাকে খুব আপ্যায়িত কর্ব্বার মানসে বলে উঠেছিলেন : 'Oui oui, monsieur mange tout, il est tout-à-fait civilize' (অর্থাৎ রায় মহাশয় সবই খান, তিনি সম্পূর্ণ সভ্য হয়ে উঠেছেন)। এখন তুমি কি মনে কর যে, এ ক্ষেত্রে আমার কর্ত্তব্য ছিল, আমাদের সভ্যতার মহনীয় আদর্শ সম্বন্ধে একটা লম্বাচোড়া বক্তৃতা জুড়ে দেওয়া ? যিনি মনে করেন যে সভ্যতার অভ্রান্ত চিহ্ন সর্ব্বভুক্ হওয়া- যেখানে কি খাই বা না খাই সেটা একটা অত্যন্ত তুচ্ছ ব্যাপার—তাঁকে সভ্যতার আসল চিহ্নটির সম্বন্ধে কিছু বল্‌লেই কি তিনি কাণ দিতেন ? যেখানে আন্তরিকতা ও একটা অনুসন্ধিৎসা আছে, সেখানে আমাদের স্ব স্ব মতামত ও পরস্পরের ভাব বিনিময় করে লাভ আছে বলে আমি মনে করি ; কিন্তু যেখানে লোকে শুধু একটা কিছু বল্‌বার জন্যই কথা বলে, সেখানে উত্তর দেওয়া না দেওয়া সমান ভেবেই আমি মৌনী হয়ে থাকি,—অপরকে অবজ্ঞা করার অভিপ্রায় নিয়ে নয়। যদিও আমাদের অহমিকা বস্তুটি এতই সূক্ষ্ম ও বিশ্বাসঘাতক যে, আমরা কদাচ অহমিকাপরবশ হয়ে চুপ করে থাকি না, এমন কথাও জোর করে বলা চলে না।" উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "তোমার সঙ্গে এ ক্ষেত্রে আমি একমত হতে পার্‌লাম না। যদি আমি স্বীকার করি যে, অনেক ক্ষেত্রেই হয় ত আমাদের বলাটা বৃথা হতে পারে, কিন্তু তোমার কি মনে হয় না যে, এরূপ বাক্‌সংযমে হয় ত আমাদের লাভের চেয়ে লোক্‌সানের সম্ভাবনাই বেশী ? আর তা ছাড়া, হয় ত আমরা এ সব যুক্তির বশবর্ত্তী হয়েই যে মৌনী হয়ে থাকি তা সত্য নয়, বরং হয় ত আমরা এইটেই সহজ পন্থা ভেবে তার অনুবর্ত্তী হয়ে থাকি। আমার ত মনে হয় il est mieux donner trop que donner peu. (অর্থাৎ আমাদের দরকারের চেয়ে কম দেওয়ার অপেক্ষা দরকারের চেয়ে একটু বেশি দেওয়াও বোধ হয় ভাল)।" যদিও এ বিষয়ে আমি আমার বন্ধুপত্নী মহোদয়ার সঙ্গে একমত হতে পারি নি, কিন্তু তাহলেও, তিনি যে আদর্শবাদের অনুবর্ত্তী হয়ে ও শুধু অপরের কথাটাই ভেবে এরূপ মত ব্যক্ত করেছিলেন, তাকে আমি শ্রদ্ধা না করেই পারি নি। তাই এ আলোচনাটি আমার মনের উপর একটা ছাপ এঁকেছিল। এবং আমার মনে হয়েছিল যে, যদিও নিজ মত প্রকাশ করে অপরের উপকার কর্ব্ব এরূপ আদর্শের বশবর্ত্তী হয়ে চলার এই একটা মস্ত বিপদ্ আছে যে, এতে আমরা নিজেদের বাণীকে একটু অত্যধিক বড় করে দেখ্‌তে অভ্যস্ত হয়ে পড়তে পারি, কিন্তু আমি পরে এঁর চরিত্রের সঙ্গে একটু নিকট সংস্পর্শে এসে বুঝেছিলাম যে, ইনি সেরূপ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হয়ে ওরূপ কথা বলেন নি। কারণ, তিনি শান্ত নম্রতা, ও দৃঢ় স্বাতন্ত্র্যের একটা সুন্দর সামঞ্জস্য সাধন কর্ত্তে অনেক

পরিমাণে সফল হয়েছিলেন বলে আমার মনে হয়েছিল। এ দৃশ্যতঃ সামান্য ঘটনাটিকে আমি এত বিস্তারিত ভাবে লিখ্‌লাম এইজন্য যে, এই সব ছোটখাট আলোচনাতে আমরা পরস্পরের আসল মন বস্তুটির বড় কম পরিচয় পাই না। এঁর অধিকাংশ দৈনিক কথাবার্ত্তার মধ্যেই আমি এরূপ একটা বিশিষ্ট ও দৃঢ় চিন্তাধারার স্ফুট হয়ে উঠ্‌বার চেষ্টা লক্ষ্য কর্ত্তাম।

এঁর একত্রে কাজ কর্ব্বার ক্ষমতা ছিল যথেষ্ট। প্রাগে (Prague, Czecho Slovakiaর রাজধানী) ইনি নারী-মহামণ্ডল, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে ছিলেন একজন প্রধান উদ্যোগী। তাছাড়া, খুব উচ্চ শিক্ষিত হয়েও ইনি শ্রমজীবীদের সঙ্গে যথেষ্ট মিশ্‌তেন ও তা নিতান্ত উপর-উপর ভাবে নয়, কারণ এঁর তাদের সঙ্গে যে সহানুভূতি ছিল তা patronizing গোছের ছিল না, সত্যই অকৃত্রিম ছিল। একদিন আমাকে বলেছিলেন : "দুঃখের বিষয় তুমি চেক্‌ভাষা জান না, কারণ, তাহলে তোমাকে এখানকার একজন সাধারণ শ্রমজীবীর সঙ্গে পরিচয় করে দিতাম, যার হৃদয়বত্তা, গভীরতা ও চিন্তা-শীলতা দেখে তুমি আশ্চর্য্য না হয়েই পার্ত্তে না। এ রকম অশিক্ষিত হয়েও গভীর লোকদের দেখ্‌লে আমরা বুঝ্‌তে পারি যে, কত মহৎ হৃদয় আমরা হৃদয়হীন কলের চাপে নিষ্পিষ্ট করে রাখি। এবং এ রকম দুচারটি লোককে দেখ্‌লে আমাদের চোখ ফোটে যে, আমাদের শিক্ষিত সমাজের এটা একটা কতবড় কলঙ্ক যে, উচ্চ শিক্ষা লাভ করার পর আমরা শুধু নিজের সুখ ও স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ নিয়েই ব্যস্ত থাকি, আমাদের নিজেদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে অশিক্ষিত ও দুস্থদের কোনও উপকার কর্ত্তেই অগ্রসর হই না।" এ ভাবটা অবশ্য সম্পূর্ণ নূতন নয়। বর্ত্তমান যুগে মহাত্মা টলষ্টয় শিক্ষার এই অহমিকা ও স্বার্থপরতার কথা ভেবে প্রায় সর্ব্বপ্রকার উচ্চশিক্ষা ও সুকুমার কলারই বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বলেছেন : "যা মানুষকে পৃথক করে, তাই মন্দ; যা তাকে মিলিত করে তাই সত্য। তাই তথাকথিত culture মন্দ ও দৈহিক শ্রম প্রত্যেকের কর্ত্তব্য।" শুধু য়ুরোপে নয়, জগতে সর্ব্বত্রই, বর্ত্তমান সময়ে উচ্চশিক্ষা যে মানুষকে একটু পৃথক্ করেছে, তা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। কিন্তু তাই বলে সেটা যে শিক্ষার দোষ, তা আমার মনে হয় না, এ কথা আমি এঁকে প্রায়ই বল্‌তাম। এটা একটা খুব বড় সমস্যা; তাই এ আলোচনা এখন থাকুক; আমি শুধু উপরের কথাগুলির দ্বারা এইটুকু মাত্র দেখাতে চেয়েছি যে, বর্ত্তমান য়ুরোপের নিম্নশ্রেণীর লোকের দুরবস্থা ও সচ্ছল অবস্থার লোকের হৃদয়হীনতা এঁকে কতখানি ব্যথা দিত। তবে বুদ্ধির বেশি বিকাশ হলে, তাতে যে সচরাচর হৃদয়ের কোমল রাগনিচয়ের বিকাশের একটু-না-একটু ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে, এ কথা আমি এঁকে মাঝে মাঝে বল্‌তাম। ইনি তাতে বল্‌তেন; "এটা য়ুরোপে প্রায়ই দেখা গেলেও, হয় ত সত্যসত্যই অবশ্যম্ভাবী নয়। তার প্রমাণ—রুষ জাতি। তাদের কাছে য়ুরোপ এ বিষয়ে অনেক শিখ্‌তে পারে। রুষ জাতি অনেক স্থলেই তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, ও হৃদয়ের কোমল প্রবৃত্তির বিকাশের একটা চমৎকার সামঞ্জস্য কর্ত্তে পারে দেখা যায়। আর সেটা সবচেয়ে বেশি দেখ্‌তে পাওয়া যায় রুষ নারীর মধ্যে। এ বিষয়ে তার কাছে পাশ্চাত্য নারীর বিস্তর শেখ্‌বার আছে। এই জন্যই গত সমিতিতে আমি রুষ নারীর অভাব বড়ই বেশি অনুভব করেছিলাম। এই সমিতিতে যদি তুমি কোনও উচ্চহৃদয়া রুষ নারীর আলোচনা শুন্‌তে, তা'হলে দেখ্‌তে পেতে, তাদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ কোন্‌খানে। পাশ্চাত্য নারীর সব ব্যবহারে ও কথাবার্ত্তাতেই এই সত্যটি স্ফুট হয়ে ওঠে যে, 'elle pense à soi-même' (অর্থাৎ সে নিজের কথা একটু বেশি ভাবে); যে স্থলে রুষ নারী তার আলোচনা, কথাবার্ত্তা, ব্যবহারাদির মধ্য দিয়ে donne de soi-même (অর্থাৎ নিজেকে বেশি চিনিয়ে দেয়)।" এ বিশ্লেষণটি আমার কাছে একটু বেশি রকমই ভাল লেগেছিল এইজন্য যে, রুষ জাতির শ্রেষ্ঠ মনের আমি নিজে একজন ভক্ত। আরও এঁর এই কথাগুলির মধ্যে যে অনেকখানি সত্য আছে তা মনে হল—জারের নির্ম্মম রাজত্বকালে শত শত রুষ নারীর আত্মত্যাগের কাহিনীর কথা * মনে করে—যেটা বিখ্যাত টুর্গেনিভ তাঁর Virgin Soil উপন্যাসটির মধ্যে মারিয়ানার চরিত্রে বড় সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন।

* Prince Kropotkinএর Memoirs of a Revolution দ্রষ্টব্য।

বিশ্বমানবতায় এঁর বিশ্বাস ছিল গভীর। ইনি আমাকে একদিন তাঁদের বাটীতে বলেছিলেন : "দেখ, এই সমিতিতে গিয়ে আমার এ ধারণা আরও দৃঢ় হয়েছে। কারণ, এখানে ত পৃথিবীর প্রায় সব জাতির লোকের সঙ্গেই মেলামেশার সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল, নয় কি? এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমার কি এটা মনে হয় নি যে, যদি আমরা চেষ্টা করি, তবে আমাদের সকলের মধ্যেই একটা মিলের ভিত্তি সুদৃঢ় করে তোলা মোটেই অসম্ভব নয়? আমাদের মধ্যে একটা মূলগত পার্থক্য আছে—এটা আমাদের ছেলেবেলা থেকে শেখান হয়েছে। আমাদের কাণে অনবরতই বলা হয়েছে যে, আমাদের মধ্যে গরমিলটাই বেশি, তাই যেখানে মিলের অস্তিত্ব আছে, সেখানটা সচরাচর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্ত্তে পারে নি। ফলে, আমরা বিশ্বমানবত্ব সম্বন্ধে আদর্শ-পন্থী বাণীর প্রতি একটু শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়েছি। কিন্তু ভেবে দেখ্‌লে দেখ্‌তে পাই যে, এই শ্রদ্ধার অভাবটা, আমাদের পার্থক্যের দরুণ ততটা নয়, যতটা আমাদের প্রচলিত শিক্ষার দরুণ—যে শিক্ষা আমাদের শেখায় যে, আমাদের স্বীয় ভৌগোলিক গণ্ডীর ভেতরকার মানুষই আমাদের কাছে প্রিয়তম হওয়া উচিত, তার বাইরের লোকেরা পর।" মানুষের মনোরাজ্যে এই গভীর মিল সম্বন্ধে আমরা অনেক বড় বড় কথাই পড়ে এসেছি বটে, এবং এতে বিশ্বাস রাখ্‌তে পারলে বোধ হয় যথেষ্ট লাভ আছে, কিন্তু জগতের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদের প্রাচুর্য্যে এ বিশ্বাসে বরাবর আস্থা স্থাপন করে রাখ্‌তে পারা বোধ হয় একটু কঠিন হয়ে ওঠে। কিন্তু সে যাই হোক্‌, বর্ত্তমান য়ুরোপেও এ বিশ্বাস কারুর মধ্যে উজ্জ্বল দেখ্‌লে, তাতে মনটা বোধ হয় একটু তৃপ্তিবোধ না করেই পারে না। এঁর মধ্যে অনেক আদর্শপন্থী বিশ্বাসের কথা মনে করে চীনজাতির সম্বন্ধে কোনও মনীষীর কথা মনে হয় : "They have a touching belief in the efficacy of moral forces." * এখানে touching কথাটির মধ্যে যে করুণ পরিহাস আছে, সেটা বর্ত্তমান য়ুরোপের চিন্তা-জগতে অবিশ্বাসের স্রোতের একটা যথার্থ পরিচয় দিতে পারে বলে মনে হয়। কিন্তু বিশ্বমানবত্বে বিশ্বাস যে এঁর কাছে বাস্তবিকই সত্য হয়ে উঠেছিল, তা এঁর নানান্‌ আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রত্যহই পরিস্ফুট হয়ে উঠ্‌ত। তার আর একটা উদাহরণ দিয়ে ক্ষান্ত হব। আমাকে তিনি একদিন বলেছিলেন : "দেখ, তোমার কি মনে হয় না যে, আমরা ছেলেবেলা থেকে পিতামাতাকে সবচেয়ে আপনার লোক মনে করার যে উপদেশ পাই, সেটা মোটের উপর অসত্য? কৃতজ্ঞতা বা সহজপ্রীতির দাবী—মানি। কিন্তু শুদ্ধ তাঁরা পিতামাতা বলে যে তাঁদের আমরা সবচেয়ে বেশি ভালবাস্‌তেও বাধ্য, এ কথায় অন্ততঃ আমার মন ত কোনও মতেই সাড়া দেয় না। রক্তের সম্বন্ধটা যে সংসারে সবচেয়ে বড় সম্বন্ধ, এ কথা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেওয়ার দরুণই এ ক্ষেত্রে আমরা ভুল করে বসি। আমাদের বাল্যকাল থেকে শেখান হয় যে, পিতামাতার তুল্য ভালবাসা সংসারে নেই, কারণ সেটা ঈশ্বরদত্ত বা সংস্কারজাত বা সৃষ্টির ভিত্তিস্বরূপ বা অম্‌নি কোনও কথা। কিন্তু সত্যই কি তাই? কার্য্যক্ষেত্রে আমরা বরং সচরাচর উল্টোটাই কি দেখি না? কয়টা পিতামাতা সন্তানকে বোঝেন বা বুঝ্‌তে চেষ্টা করেন? কয়টা পিতামাতা সন্তানের প্রকৃত বন্ধু? কত পিতামাতাই না সন্তানের মনের গতি না বুঝে তাকে স্বেচ্ছামত চালাতে চেষ্টা করে থাকেন! অথচ এ সব প্রত্যক্ষ সত্যকে আমরা দেখেও দেখি না, অথবা দেখ্‌লেও তা থেকে পিতামাতার ভালবাসার যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারণের কোনই ইচ্ছাবোধ করি না, নয় কি? ফলে আমরা কোনও বন্ধুর নিঃস্বার্থ ভালবাসা পেয়েও, অভ্যাস বশে মুখে আওড়াই যে, পিতামাতার তুল্য ভালবাসা জগতে নেই। কাজেই বন্ধুর নিঃস্বার্থ ভালবাসার মধ্যে আমরা অনেক সময়ে আমাদের ব্যক্তিত্বের নানান্‌ দিক্‌কে বোঝবার যে প্রয়াস দেখি, তার যথেষ্ট দাম দেই না। আমরা ছেলেবেলা থেকে বুঝে রাখি যে, পিতামাতার ভালবাসা সংস্কারজাত। কিন্তু অপরিচিতের সঙ্গে অল্প পরিচয়েও অনেক সময়ে যে সত্য বন্ধুত্ব হয়, সেটা ঠিক্‌ এ হিসেবে যদি সংস্কারজাত না-ই হয়, তবে তাতেই বা কি প্রমাণ হয়? আমি অবশ্য এ কথা বল্‌ছি না যে, পিতামাতার ভালবাসার একটা দাম নেই; অবশ্য আছে—সংসারে কোন্‌ ভাল-বাসার নেই? কিন্তু আমি শুধু বল্‌তে চাই এই কথা যে, এই ভালবাসা অধিকাংশ স্থলেই শুদ্ধ সংস্কারজাত (in-

* The Problem of China by Bertrand Russel.

stinctive) বলে, কার্য্যক্ষেত্রে হয় এই যে, এর মধ্যে অনেক সময়েই সেই গভীর সহানুভূতির পরশ থাকে না, যা প্রকৃত বন্ধুত্বের ভালবাসার একমাত্র ভিত্তি বল্লেই চলে।" য়ুরোপে শুধু শিক্ষকবৃন্দ নন, পিতামাতারাও সচরাচর সন্তানের মনের মধ্যে একটা গোঁড়া সঙ্কীর্ণতার বীজ বপন করে দেন ও অনেক সময়েই সন্তানের স্বাধীন চিন্তার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করেন না, এই সত্যটি বোধ হয় এঁর সুকুমার অথচ তেজস্বী মনকে একটু বেশি ব্যথা দিয়েছে। কিন্তু সে যাই হোক্, আমার বোধ হয় যে, মনুষ্যত্বের উপর একটা সত্যকার শ্রদ্ধা না থাক্‌লে, যথার্থ ভালবাসার যে জাতি নেই, এটা নির্ভীক ভাবে বিশ্বাস করে, পিতামাতার ভালবাসাকেও তার চেয়ে ছোট বলে স্বীকার কর্ত্তে পারা সম্ভব নয়।

এঁর মধ্যে একটা নির্ভীক ও খোলাখুলি ভাবে কথা-বার্ত্তা কইবার প্রবণতা ছিল। সেটা এতই স্বাভাবিক ছিল যে, তাতে আম'কে প্রথমটা একটু আশ্চর্য্য হ'তে হয়েছিল। কারণ, একজন তরুণী রমণী যে অল্প দিনের আলাপের পরেই একজন বিদেশী বন্ধুর সঙ্গে এতটা সরল ভাবে একটু অসামাজিক বিষয় নিয়েও আলোচনায় অগ্রসর হতে পারেন, এটা য়ুরোপে আমার অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ অভিনব না হলেও, বিরল ছিল। এর একটা উদাহরণ দেওয়া বোধ হয় মন্দ নয়। একদিন আমরা কোথায় যেন যাচ্ছিলাম। আমাকে হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক দেখে ইনি জিজ্ঞাসা কর্লেন: "তুমি কি ভাব্‌ছ বলতে পার?" অপরে কি ভাব্‌ছে এরূপ প্রশ্ন করা য়ুরোপে দস্তুর নয়, তাই আমি এরূপ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। যাই হোক্ উত্তর দিলাম "না"। তিনি সস্মিত মুখে জিজ্ঞাসা কর্লেন: "সব সময়ে কি ভাব্‌ছ তা কি অপরকে বলতে পার না?" আমি বল্লাম: "পুরুষ বন্ধু হলে বোধ হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পারি, কিন্তু কোনও বান্ধবীকে সব সময়ে নিজের চিন্তা বলাটা কঠিন; কারণ, আমাদের কার্য্যকে অনেক সময়ে ইচ্ছাধীন রাখ্‌তে পারা গেলেও হয় ত যেতে পারে, কিন্তু চিন্তার উপর আমাদের বোধ হয় সে পরিমাণে হাত নেই। তাই অনুচিত চিন্তা আমরা অনেক সময়ে অনুচিত জেনেও করি—যেটা কাজে কাজেই খুলে বলা একটু সঙ্কোচের কারণ হয়ে পড়ে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের কাছে।" তিনি বলেছিলেন: "আমি নিজেও যে এটা পারি তা বলতে পারি না, কিন্তু এ জন্য আমার বোধ হয় আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির ও প্রচলিত আচারের দোষ খুব বেশি। যদিও আমি স্বীকার করি যে, পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে একটা অনির্দ্দেশ্য রহস্যের আড়াল আছে, সেটার সবটা আচারজ (conventional) নয়, ও তাই তাকে সম্পূর্ণ সরিয়ে দেওয়া একটু শক্ত; কিন্তু তবু আমার মনে হয় যে, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির একটা আমূল পরিবর্ত্তন হলে, ও স্ত্রীজাতির মন একটু কম আড়ষ্ট হলে, সম্পূর্ণ আন্তরিক ভাবে না হলেও এখনকার চেয়ে ঢের বেশি আন্তরিক ভাবে কথাবার্ত্তা কইতে আমরা অত সহজে শিউরে উঠ্‌ব না।" আমি উত্তরে বলেছিলাম: "প্রশংসা পাবার লোভ আমাদের মনে এতই বেশি ও বদ্ধমূল যে, সমাজে তা হারাবার ভয়ে কথাবার্ত্তায় আমরা প্রায় প্রতি পদে আমাদের আন্তরিকতাকে কম বেশি বিসর্জ্জন দিয়ে থাকি, নয় কি? তাই আমি এ কথা সহজে মনে কর্ত্তে পারি না যে, কোনও শিক্ষাপদ্ধতিবিশেষের পরিবর্ত্তনে এর কোনও আমূল নিরাকরণ হওয়া সম্ভব। কারণ, আন্তরিকতা গুণটি শিক্ষাপদ্ধতির উপর যতটা নির্ভর করে, তার চেয়ে বেশি করে নিজের একটা প্রবণতার উপর, ও ওদিকে একটা সতর্ক দৃষ্টি রাখার উপর। খাঁটি আন্তরিকতা আমরা যতটা দুর্ল্লভ মনে করে থাকি, বস্তুতঃ ও-বস্তুটি তার চেয়ে ঢের বেশি দুর্ল্লভ। কারণ, অনেক সময়ে আমরা নিজের কোনও অসামাজিক চিন্তা প্রকাশ করি আন্তরিকতার খাতিরে নয়—এজন্য মোটের উপর অপরের প্রশংসা পাওয়া যাবে এই নিহিত লোভের বশবর্ত্তী হয়ে। যদিও আত্ম-প্রতারণা জিনিষটি এতই সহজে আসে যে, এরূপ স্থলে আমরা শেষ পর্য্যন্ত নিজেকে পরীক্ষা না করেই নিজেকে খুব sincere মনে করে আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টা করি।"

এঁর মধ্যে কোন্ গুণের কি দাম, সে সম্বন্ধে একটা প্রবুদ্ধ বিচারের চেষ্টা আমি প্রায়ই লক্ষ্য কর্ত্তাম। একদিন আমি বলেছিলাম:—Einstein সম্বন্ধে এক রুষ ভদ্রলোক একটি বই লিখেছেন। তাতে না কি তিনি লিখেছেন যে, Einsteinএর মত এই যে, স্ত্রীলোকের পুরুষের সমান অধিকার পাওয়া বাঞ্ছনীয় হলেও, তিনি মনে করেন না যে, স্ত্রীজাতির মধ্যে কোনও বিষয়ে কোনও সত্যকার প্রতিভার

বিকাশ সম্ভব।" Einsteinএর মত উদারপন্থী লোকও যে এরূপ মত পোষণ কর্ত্তে পারেন, এতে আমি একটু বিস্ময় প্রকাশ করেছিলাম। আমার বন্ধু-পত্নী মহোদয়া এই মতটির আলোচনাচ্ছলে বলেন:—"স্ত্রীজাতির মধ্যে প্রতিভার জন্ম সম্ভব কি না, এ সম্বন্ধে এখনই জোর করে কোনও মত প্রকাশ করা একটু অর্থহীন নয় কি? কম বেশি স্বাধীনতার অভাবে যে কোনও বিরাট্ প্রতিভাও নিজেকে স্ফুট করে তুল্‌তে পারে না, এ কথা বোধ হয় মুখে আমরা প্রায় সকলেই মানি; অথচ নারীর মধ্যে বিরাট্ প্রতিভা বড় একটা দেখতে না পেয়ে, আমরা এই সাদা কথাটি ভুলে গিয়ে বসে থাকি যে, বর্ত্তমান সময়ে যে কয়জন মুষ্টিমেয় স্ত্রীলোক একটু আধটু লোকচক্ষুর সাম্‌নে এসেছেন, তাঁরা মোটেই স্বাধীনতার সুযোগের মধ্য দিয়ে পালিত হন নি—তাঁরা একটা বিদ্রোহের ফল। কারণ, এরূপ ক্ষেত্রে প্রায় সকল স্থলেই তাঁরা যে বিকাশ লাভ করেছেন, তা করেছেন বাধা ঠেলে ও লোক-মতকে উপেক্ষা করে—অনুকূল পারিপার্শ্বিকের সাহায্যে নয়। অথচ এরূপ বাধা ঠেল্‌তেই যদি আমাদের অধিকাংশ শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়, তাহ'লে বাকী পঙ্গু শক্তিটুকু দিয়ে একটা মহৎ কাজ তোমরা কেমন করে আশা কর্ত্তে পার? য়ুরোপে বাইরের স্বাধীনতা দেখে তুমি মনে কোরো না যে সমাজে তাদের মন আজ যথেষ্ট ছাড়া পেয়েছে। সত্যকার স্বাধীনতা সে আজও পায় নি। আর যদি ধরেই নেওয়া যায় যে, স্ত্রীজাতির মধ্যে প্রতিভার বিকাশ সম্ভবপর নয়, তাহলেই বা কি অধিকারে তোমরা তাদের অবজ্ঞা কর্ত্তে পার? দেখ, আমাদের দেশের (Czecho—Slovakia) প্রেসিডেন্ট মহামতি মাজারিকের কন্যা শান্তির সময়েও Red-cross প্রতিষ্ঠানটিকে বিভিন্ন সুন্দর সুন্দর প্রণালীতে চালিত করার কাজে কিরূপ অনন্যসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়েছেন। গরীব দুঃখীর মধ্যে তাদের কাজ যদি তুমি দেখ, তাহলে তার প্রশংসা না করে তুমি কখনই থাকৃতে পার্ব্বে না। এরূপ একটা মহান্ organisationএর কাজকে কোন্ মাপকাটিতে তোমরা সর্ব্বপ্রকার মৌলিক প্রতিভার কাজের চেয়ে হীন মনে কর্ত্তে পার, আমি জান্‌তে চাই। কারণ, এ কাজের প্রভাব কি মানুষের জীবনের উপর কম? এতে উদ্যোক্তার মনে কি কম আনন্দের পরশ আসে?"

এঁর সঙ্গে একটু ঘনিষ্ট পরিচয়ের পর আমি অন্য অনেক জিনিষের মধ্যে এই সত্যটিরও যেন নূতন করে পরিচয় পেয়েছিলাম যে, শিক্ষা ও স্বাধীনতা পেলে যদি অনেক নারীরই ভুলচুকের সম্ভাবনা বেড়েও যায়, তাহলেও যদি কয়েকজনও এঁর মতন বিকাশ লাভ করেন, তবে ঐ বিপদ্ সত্ত্বেও এ শিক্ষা ও স্বাধীনতা অভিনন্দনীয়। কথা উঠতে পারে, শিক্ষার বহুল বিস্তারেও কয়জন নারীই বা সত্যকার শিক্ষা লাভ করেন, অর্থাৎ কি না কয়জনই বা স্বাধীন ভাবে চিন্তা কর্ত্তে শেখেন? কথাটা হয় ত সত্য। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, এ কথা পুরুষের পক্ষেও সমান খাটে। সত্যকার উচ্চশিক্ষিত বল্‌তে আমরা যা বুঝি, তা তথাকথিত শিক্ষিত পুরুষের মধ্যেও বিরল নয় কি? তা ছাড়া স্ত্রীজাতির উচ্চ শিক্ষার বিরুদ্ধে আমি আর একটি যুক্তি প্রযুক্ত হতে শুনেছি যে, উচ্চ শিক্ষার ফলে নারীর নারীত্ব ও কমনীয়তা হারানর আশঙ্কা আছে। য়ুরোপে আমি অনেকগুলি সত্য সত্যই চিন্তাশীলা উচ্চশিক্ষিতা নারীর সংশ্রবে এসেছি, কিন্তু তাঁদের প্রায় কারুর ক্ষেত্রেই ত তাঁদের শিক্ষা—শুধু শিক্ষার দরুণই তাঁদের কমনীয়তার হানি সাধন করেছে বলে মনে হয় নি। বরং আমি ত অনেক স্থলেই দেখেছি যে, শিক্ষার ফলে তাঁদের কল্যাণী মূর্ত্তির মধ্যে একটা দৃঢ় অথচ কম্র আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস মনোজ্ঞ ভাবে ফুটে উঠেছে, যেটা অন্ততঃ আমার কাছে ত অতি সুন্দর বলে মনে হ'ত। শিক্ষা জিনিষটি আমি উত্তম বলে মনে করি; তাই শিক্ষার অপব্যবহার হ'তে পারে ব'লে নারী জাতিকে তার প্রভাব থেকে দূরে রাখাটা বাঞ্ছনীয় বলে মনে কর্ত্তে পারি না। শিক্ষাটাকে আমরা ভাল মনে করি কেন, এই প্রশ্নের উত্তর আমি আমার এ বান্ধবীর চরিত্রের বিকাশের মধ্যে বড় সুন্দর পেয়েছিলাম। সভ্যতার একটা মহান্ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—মানুষের মধ্যে মহৎ ও সুন্দর যা-কিছু সাধন কর্ব্বার ক্ষমতা নিদ্রিত হয়ে রয়েছে, তাকে জাগরিত করা। পুরুষের ক্ষেত্রে এ কথা যদি সত্য হয়, তবে নারীর ক্ষেত্রে এ কথা কেন সত্য হবে না, তা অন্ততঃ আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধির ত অতীত। নারীর মধ্যে এই যে বাহিরকে দেবার বস্তু রয়েছে, যা অনেক স্থলেই কেবল সুযোগের অভাবেই ফুটে উঠ্‌তে পারে না, সেটা আমরা আমাদের পুরুষো-

চিত কাজকর্ম্মে বেশ চমৎকার ভুলে থাকি। কিন্তু যখন নারীর মধ্যে এই potentialityর খোঁজ একবার পাই, তখন হাজার যুক্তিতর্ক প্রয়োগেও মনকে এ কথা আর ভোলান যায় না।

স্ত্রীশিক্ষার ফলে কি হয়, এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা স্বতঃই প্রথমটা য়ুরোপের হাস্যমুখরা লজ্জাহীনা প্রগল্ভা নারীর কথা ভাবি। আমাদের নারীর সহিত পাশ্চাত্য নারীর এই বাহ্যপ্রভেদ অনেক সময়ে এতই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আমরা এ কথা না ভেবেই পারি না, ও তখন মনটা একটু সংশয়াকুল হয়ে ওঠে যে, তাহলে বাস্তবিকই কি স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষা প্রশস্ত? কিন্তু এরূপ সময়ে আমরা যে বাহ্য প্রভেদটা বেশী স্পষ্ট তাকেই বড় করে দেখি—নারী জাতির মনোজগতে এ শিক্ষার ফলে যে কতটা সুন্দর পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়ে থাকে তার কথা ভাবি না। কিন্তু আমার এ বান্ধবীর অনেক গভীর, চিন্তাশীল কথা শুনে আমার এটা খুবই মনে হয় যে, যদি আমরা আমাদের ও ওদের নারীর মধ্যে এ বাহ্য স্থূল প্রভেদটাকে একটু ছোট করে দেখে, তাদের মনোজগতের বিকাশের দিকে একটু দৃষ্টিপাত কর্ত্তাম, তাহ'লে দেখতে পেতাম যে কোথায় ওরা আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আমরা হয় ত আমাদের দেশের কোনও শিক্ষিতা নারীর সহিত নানান্ গভীর বিষয় আলোচনা কর্ত্তে পারি এবং হয় ত বড় জোর তাদের কাছে একটা যথার্থ আন্তরিক তারিফও পেতে পারি, কিন্তু তাদের কাছে দৈনিক কথাবার্ত্তার মধ্যে কিছু কি পেয়ে থাকি? আমার ত মনে হয় যে খুব বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পাই না, ও তার একটা প্রধান কারণ এই যে, তাদের কাছে প্রত্যাশাও করি না। তাই শুধুই তারিফ ছাড়া আর কিছু পাই না বলে, ও একতরফা কথাবার্ত্তা বেশীক্ষণ চালান যায় না বলে, মনটা খুসিতে ভরে ওঠে না। এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় যে আমাদের দেশের নারীর মনের গভীরতা বা বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা মূলতঃ ওদের দেশের নারীর চেয়ে কম। আমার মনে হয়, উপযুক্ত শিক্ষা ও যথেষ্ট স্বাধীনতার সুযোগ পেলে, আমাদের নারীজাতিও আমাদের প্রত্যহ তাদের স্বাতন্ত্র্য থেকে কিছু দিতে পার্ব্বে। কিন্তু এজন্য শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন আছেই আছে। আমরা যতই কেন না মুখে আওড়াই যে শিক্ষা মানে কি বইপড়া? গৃহকন্নার মধ্যে সেবা, দৈনন্দিন ছোটখাট স্বার্থত্যাগ কর্ত্তে শেখাটা কি শিক্ষা নয়? একটা সংসার চালানর জন্য কি যে বুদ্ধি বিবেচনা দরকার হয়, তার পরিচালনে কি কম শিক্ষা হয়? ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এ সব কথার মধ্যে অনেকটা সত্য থাকলেও, এ সব কাজে বুদ্ধির যে ভাবে বিকাশ হয়, সে বুদ্ধির বিকাশে জগতের নানান্ সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামান চলে না, ও তাতে হৃদয়ের সকল সুকুমার প্রবৃত্তিগুলির একটা মনোহর বিকাশ হতে পারে বলেও বোধ হয় না। এ সংশয় অবশ্য মনে জাগতে পারে যে, জগতের নানান্ সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানতে লাভ কি, যখন তার চেয়ে আশু প্রয়োজনীয় কাজের ত জীবনে অভাব নেই। কিন্তু জীবনকে এরূপ সঙ্কীর্ণ প্রয়োজনের মাপ-কাটিকে মাপলে, তার অপমানই করা হয়ে থাকে বলে আমার মনে হয়। আমাদের মধ্যে যে সব নিঃস্বার্থ কর্ম্মের প্রবৃত্তির ও গুণের বীজ উপ্ত আছে, তাকে পুষ্পিত ও পল্লবিত করে তোলার মধ্যে একটা মস্ত সার্থকতা আছে, সেটা আপাতঃ-প্রয়োজনবাদের উপাসকেরা ঠিক্ বুঝে উঠ্তে অক্ষম। তাই আমার বোধ হয় যে, প্রয়োজনের ওজরে কাউকেই তার সত্তাটা খুঁজে বাহির কর্ত্তে বাধা দেওয়া উচিত নয়। তাছাড়া যখন কেউ নিজের এ সত্তাটা অনেক পরিমাণে খুঁজে পেয়ে থাকেন, তখন তজ্জনিত তৃপ্তি যে তাঁর একারই ভোগে আসে তা নয়, তা অনেককে নানান্ উপায়ে জীবনের সার্থকতার আস্বাদ যোগাতে পারে। যথার্থ উচ্চশিক্ষার ও গভীরতার সংস্রবে এলে, আমরা এ কথাটা এক মুহূর্ত্তেই বুঝ্তে পারি, যেমন আমি এক্ষেত্রে পেয়েছিলাম।

অস্কার ওয়াইল্‌ড্‌ বিরচিত সালমে

(একাঙ্কের বিয়োগনাটিকা)

(মূল ফরাসী হইতে বঙ্গানুবাদ)

শ্রীসুরেন্দ্র কুমার

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

হেরদ। না, না, সেটা তুমি চাও না। সমস্ত সন্ধ্যাটা আমি তোমার দিকে চেয়েছিলাম কি না, তাই তুমি আমাকে ব্যথিত করবার জন্য এ কথা বল্‌চ। সত্য বটে, সমস্ত সন্ধ্যাবেলা আমি তোমার দিকে চেয়েছিলাম। তোমার সৌন্দর্য্য আমার প্রাণে আঘাত করেছিল। তোমার সৌন্দর্য্য আমার প্রাণে বড় নির্ম্মমভাবে আঘাত করেচে, আর আমিও তোমার পানে বড় বেশীরকম চেয়েচি। আর আমি তোমার পানে চাইব না। কোনও জিনিষের পানে হক, বা লোকের পানে হক, কারও দিকে চেয়ে থাকা উচিত নয়। সকলে কেবল আয়নার দিকে দেখ্‌বে, কারণ আয়নায় মুখস্‌ দেখা যায় না। ওহে, শোন, মদ নিয়ে এস! আমার পিপাসা পাচ্চে।...সালমে, সালমে, এস আমরা ভাব করে নি! এস, এখন!...আঃ! কি বল্‌তে যাচ্ছিলাম। ঐ যে গো, কি বল্‌ছিলাম ওটা? আঃ! মনে হয়েচে!...সালমে!—না, আমার আরও কাছে এস; তা'নইলে তুমি শুন্‌তে পাবে না—সালমে, তুমি আমার সাদা ময়ূরগুলি জান?—আমার সুন্দর শ্বেত ময়ূরগুলি?—যেগুলি মার্ট্‌ল্‌ আর সুদীর্ঘ সাইপ্রেস্‌ বৃক্ষের মধ্যে বেড়িয়ে বেড়ায়? তাদের ঠোঁটগুলি স্বর্ণাভ, আর যে দানাগুলি তারা খায়, সেগুলি সুবর্ণমণ্ডিত, আর তাদের পাগুলি নীলাভ লোহিত। যখন তারা কেকারব করে, তখন বৃষ্টি আসে, আর যখন তারা পেখম ধরে, তখন আকাশে চাঁদ ওঠে। ছুটি-ছুটি করে তারা সাইপ্রেস ও কৃষ্ণবর্ণ মার্ট্‌লের মধ্যে বেড়ায়, আর তাদের প্রত্যেকের সেবার জন্যে একজন-করে দাস নিযুক্ত আছে। কথনও-কখনও তারা গাছের উপর দিয়ে উড়ে যায়, কখন বা ঘাসের উপর শুয়ে থাকে, আবার কখনও বা তারা হ্রদের চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়। সমস্ত জগতে তাদের মত চমৎকার পাখী আর নেই। জগতে আর কোনও রাজার এমন চমৎকার পাখী নেই। আমি নিশ্চয় জানি যে, আমার পাখীর মত এত সুন্দর পাখী সিজারেরও নেই। আমার পাখীর মধ্যে থেকে পঞ্চাশটে আমি তোমাকে দেব। তুমি যেখানে যাবে, তারাও সেখানে তোমার অনুসরণ কর্‌বে। তোমাকে তাদের মাঝখানে শ্বেতবর্ণ মেঘের মধ্যে চাঁদের মত দেখাবে।...আমি তার সবগুলিই তোমাকে দেব। আমার একশটি মাত্র আছে; সমস্ত জগতে আর কোনও রাজার আমার ময়ূরের মত ময়ূর নেই। কিন্তু, আমি সে সবগুলিই তোমাকে দেব। কেবল তুমি আমাকে আমার কৃত-শপথ থেকে অব্যাহতি দেবে, আর তুমি আমার কাছে যা চেয়েচ, তা আর চাইবে না। [হেরদ মদ্যপাত্র নিঃশেষ করিলেন।]

সালমে। আমাকে ইওকানানের মাথাটা দিন।

হেরদিআস। বেশ বলেচ, কন্যা! আর তুমি, তোমার ময়ূর নিয়ে বড়ই উপহাসাস্পদ হয়ে পড়্‌লে।

হেরদ। চুপ্‌ কর! তুমি কেবল চেঁচাচ্চ; তুমি হিংস্রজন্তুর মত চেঁচাচ্চ। ও রকম চেঁচিও না। তোমার স্বর আমার বড় বিরক্তিকর লাগ্‌চে। চুপ্‌ কর, আমি বল্‌চি।...সালমে, ভেবে দেখ, তুমি কি কর্‌চ। এই ব্যক্তি বোধ হয় ঈশ্বর-প্রেরিত লোক। ইনি সাধুপুরুষ। ঈশ্বরের আঙ্গুল এঁকে স্পর্শ করেচে। ঈশ্বর এঁর মুখে ভীষণ কথা প্রদান করেচেন। প্রাসাদে ও মরুভূমিতে, সর্ব্বস্থানে ঈশ্বর এঁর সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ আছেন।...অন্ততঃ, এটা সম্ভব। এটা সর্ব্বজন জ্ঞাত না হতে পারে। এটা সম্ভব যে ঈশ্বর এঁর সহায়, আর ঈশ্বর এঁর সঙ্গে আছেন। আরও, যদি এঁর মৃত্যু হয়, তাহলে হয় ত আমার কোনও দুর্ঘটনা ঘটতে

পারে। যে প্রকারেই হক তিনি বলেচেন যে, যেদিন তাঁর মৃত্যু হবে, সেদিন কারও কোনও দুর্ঘটনা ঘটবে। সেটা কেবল আমারই হতে পারে। মনে করে দেখ, আমি যখন এখানে প্রবেশ করি, তখন রক্তে আমার পা পিছলে গিয়েছিল। আর আমি আকাশে পক্ষপুটের আঘাতশব্দ শুনেছিলাম, সে প্রকাণ্ড পক্ষপুটের আঘাতশব্দ। এগুলো বড় কুলক্ষণ; এগুলো ছাড়া আরও অনেক ব্যাপার হয়েছিল। আমি নিশ্চয় জানি যে, এগুলো ছাড়া আরও অনেক কুলক্ষণ দেখা দিয়েছিল, যদিও সেগুলো সব আমি দেখি নি। আচ্ছা, সালমে, তোমার ত ইচ্ছা নয় যে, আমার কোনও প্রকার অমঙ্গল হয়? তুমি সেটা ইচ্ছা কর না। আচ্ছা, তবে আমার কথা শোন।

সালমে। আমাকে ইওকানানের মাথাটা দিন।

হেরদ। আঃ! তুমি আমার কথাটা শুনচ না। শান্ত হও! আমি—আমি শান্ত আছি। আমি বেশ শান্ত আছি। শোন! আমার রত্নসমূহ এই প্রাসাদের গুপ্তস্থানে নিহিত আছে—সে সকল রত্ন তোমার মাও কখন দেখে নি; সে রত্নগুলি বড় চমৎকার। আমার একছড়া চার নলির মুক্তার কণ্ঠহার আছে। সেটা দেখ্‌তে যেন চাঁদগুলি রজত-কিরণে গাঁথা। সেটা দেখে মনে হয় যেন, পঞ্চাশটে চাঁদ একটা সোণার জালে ধরা পড়েচে। একজন রাণী তাঁর হস্তিদন্তের ন্যায় অমল-ধবল বক্ষে এই হার ধারণ করেছিলেন। তুমি এটা ধারণ কর্‌লে, তোমাকেও রাণীর মত সুন্দরী দেখাবে। আমার দু' রকমের অমত্ত মণি আছে। এক রকম হচ্চে মদের মত কৃষ্ণাভ, আর এক প্রকার হচ্চে জল মিশান মদের মত লোহিতাভ। আমার অনেক রকমের গোমেদক মণি আছে, এক প্রকার হচ্চে বাঘের চোখের মত হরিদ্রাভ, আর এক রকম হচ্চে বুনো পায়রার চোখের মত গোলাপী, আর এক রকম আছে যেগুলির রং বিড়ালের চোখের মত সবুজ। আমার অনেক প্রকারের গোদন্ত মণি আছে, তার মধ্যে কতকগুলি বরফের ন্যায় শিখায় জ্বলে, আবার কতকগুলি মানুষের মনকে বিষণ্ণ করে, আর ছায়ায় পরিম্লান হয়। মৃত রমণীর আঁখি-তারার ন্যায় শ্বেতমণি আমার অনেকগুলি আছে। আমার অনেকগুলি চন্দ্রকান্ত মণি আছে; চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে সেগুলির জ্যোতিরও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়ে থাকে, আর সূর্য্যের কিরণে সেগুলি ম্লান হয়ে যায়। ডিমের মত বড়, আর নীলফুলের মত নীলবর্ণ নীলকান্তমণি অনেকগুলি আমার আছে। তাদের মধ্যে সমুদ্র আবদ্ধ থাকে, আর চাঁদ কখনও তাদের সেই আবদ্ধ সাগরের তরঙ্গরাশির সুনীলতার বিক্ষোভ করে না। আমার স্বর্ণরাগ ও হরিন্মণি-আছে, আমার স্বর্ণদারু ও পদ্মরাগ মণি আছে। আমার সার্দশ্বেতমণি, ধূম্ররাগমণি ও চাল্‌সিডনের বহুরাগমণি-সমূহ আছে, আমি তার সবই তোমাকে দেব, সব, আর তার সঙ্গে আরও অনেক জিনিস দেব। প্রাচীর রাজা শুকপাখীর পালকে নির্ম্মিত চারখানা পাখা, আর নুমিদিআর রাজা উঠপাখীর পালকের একটা পোষাক আমাকে সবেমাত্র পাঠিয়ে দিয়েচেন। আমার একটি স্ফটিক আছে, কিন্তু যুবতীর পক্ষে তার মধ্যে চোখ দিয়ে দেখা নিয়ম-বিরুদ্ধ, যুবকগণেরও তা দেখা উচিত নয়; আর এই দেখ্‌বার জন্যেই অনেক যুবক লগুড় প্রহারও খেয়েচে। একটি মৌক্তিক রত্নাধারে আমার তিনটি চমৎকার ফিরোজামণি আছে। সেগুলি যে মস্তকে ধারণ করে, সে অভূতপূর্ব্ব পদার্থসমূহ কল্পনা কর্‌তে পারে, আর যে হাতে তাদের ধারণ করে, সে স্ত্রীলোকদের বন্ধ্যা কর্‌তে পারে। এ কয়টি বহুমূল্য মহারত্ন। অমূল্যরত্ন এ কয়টি। কিন্তু কেবল যে শুধু এই, তা নয়। একটি আবলুষের রত্নাধারে আমার দুটি চন্দরুষের পাত্র আছে, তারা সুবর্ণ আপেলের মত। যদি কোনও শত্রু এই দুটিতে বিষ ঢেলে দেয়, তাহলে তারা রজত আপেলের মত হয়ে যায়। ভিতরে, চন্দরুষ-মণ্ডিত একটা রত্নাধারে আমার কাচমণ্ডিত পাদুকা আছে। সেরেসদিগের দেশে সংগৃহীত আমার অনেকগুলি আংরাখা আছে; আর য়ুফ্রাতের তীরবর্ত্তী নগরে নির্ম্মিত, রক্তমাণিক্য ও বৈদূর্য্য-খচিত আমার অনেকগুলি কঙ্কণ আছে। এর চেয়ে বেশী তুমি কি পেতে ইচ্ছা কর, সালমে?...তোমার যা ইচ্ছা তা তুমি আমাকে বল, আমি তা তোমাকে দেব। তুমি যা চাইবে, তাই আমি তোমাকে দেব, কেবল একটি জিনিষ ছাড়া। আমার যা আছে, আমি তাই তোমাকে দেব, কেবল একটি জীবন ছাড়া। আমি শ্রেষ্ঠ যাজকের আংরাখা তোমাকে দেব। মন্দিরের গর্ভগৃহের পর্দাখানা আমি তোমাকে দেব।

ইহুদীগণ। ওঃ! ওঃ!

সালমে। আমাকে ইওকানানের মাথাটা দিন।

হেরদ। [তাঁহার আসনের পৃষ্ঠে হেলিয়ে পড়িয়া] ও যা চায় তাই ওকে দেওয়া হক! যথার্থই ও ওর মাএর সন্তান। [১ম সৈনিক নিকটে আসিল। হেরদিআস্ টেট্রার্কের হস্ত হইতে মৃত্যুর আদেশ-জ্ঞাপক অঙ্গুরী খুলিয়া লইয়া সৈনিককে দিলেন। সে তাহা গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ জল্লাদের হস্তে দিল। জল্লাদকে সন্ত্রস্ত দেখাইল।] কে আমার আংটি নিলে? আমার ডানহাতের আঙ্গুলে একটা আংটি ছিল। কে আমার মদ খেলে। আমার পাত্রে মদ ছিল। পাত্রটা মদে পূর্ণ ছিল। কেউ তা পান করেচে! ওঃ! নিশ্চয়ই কারও কোনও অমঙ্গল হবে। [জল্লাদ জলাধারের মধ্যে নামিল।] আঃ! কেন আমি শপথ করেছিলাম? রাজারা যেন কখনও কোন বিষয় সম্বন্ধে দিব্য না করেন। যদি তাঁরা তা রক্ষা না করেন, তাহলে সেটা ভয়ানক; আর যদি তা রক্ষা করেন, তাহলে সেটাও ভয়ানক।

হেরদিআস। আমার মেয়ে বেশ করেচে।

হেরদ। আমি নিশ্চয় জানি যে, কোনও একটা অঘটন ঘট্‌বে।

সালমে। [জলাধারের উপর ঝুঁকিয়া শুনিতে লাগিলেন।] কৈ কোনও শব্দ নেই ত। কিছুই ত আমি শুন্‌তে পাচ্চি না। চেঁচিয়ে উঠ্‌চে না কেন, ঐ লোকটা? আঃ! যদি কেউ আমাকে মেরে ফেল্‌তে আসে ত আমি চেঁচাই, ঝটাপটি করি, অমন নীরবে আমি সহ্য করি না...মার! মার! নামান্! মার! আমি বল্‌চি!... না, কিছুই শুন্‌তে পাচ্চি না ত। একটা নীরবতা, একটা ভয়ানক নীরবতা। আঃ! কি যেন একটা মাটিতে পড়ে গেল। আমি একটা কি যেন পড়ে যেতে শুন্‌লাম। ওটা জল্লাদের তরবার। ও ভীত হয়েচে, ঐ ক্রীতদাসটা! ও তার তরবার ফেলে দিয়েচে। ও তাকে মেরে ফেল্‌তে সাহস করে না। ও কাপুরুষ, ঐ ক্রীতদাসটা! সৈনিক প্রেরিত হক! [তিনি হেরদিআসের অনুচরকে দেখিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন] দেখ, এদিকে এস, যে মরে গিয়েচে তুমি তার বন্ধু ছিলে, নয় কি? বেশ, তা তোমাকে বল্‌চি যে যথেষ্ট লোক এখনও মরে নি। যাও! সৈনিকদের আদেশ কর যে নেমে গিয়ে আমি যা চাই তা যেন তারা এনে দেয়, যা টেট্রার্ক আমাকে অঙ্গীকার করেচেন, আর যা এখন আমার। [অনুচর পিছাইয়া গেল। সালমে সৈনিকদের দিকে ফিরিলেন।] সৈনিকগণ, এদিকে এস! এই জলাধারের মধ্যে নেমে গিয়ে ঐ লোকটার মাথাটা এনে দাও! [সৈনিকগণ পিছাইয়া গেল।] টেট্রার্ক! টেট্রার্ক! আপনার সৈনিকদের আদেশ করুন যেন তারা ইওকানানের মাথাটা আমাকে এনে দেয়! [একটা প্রকাণ্ড বাহু, অর্থাৎ জল্লাদের বাহু, জলাধার হইতে বাহির হইল, আর তাহাতে একখানা রূপার ঢালের উপর ইওকানানের ছিন্ন মস্তক। সালমে তাহা গ্রহণ করিলেন। হেরদ তাঁহার আংরাখায় মুখ লুকাইলেন। হেরদিআস স্মিতমুখে আপনাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। নাজারৎবাসীগণ জানু পাতিয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন।]

আঃ! তুমি আমাকে তখন তোমার মুখচুম্বন করতে দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলে। এখন আমি তোমার মুখচুম্বন কর্‌ব। আমি এখন তাতে দংশন কর্‌ব, যেমন লোকে সুপক্ক ফলে দংশন করে। হাঁ, আমি তোমার মুখচুম্বন কর্‌ব ইওকানান! তা ত আমি বলেছিলাম। বলিনি? আমি ত তা বলেছিলাম। আঃ আমি এখন এই মুখচুম্বন কর্‌ব।...কিন্তু আমার দিকে চাইচ না কেন, ইওকানান? তোমার যে চোখ এত ভয়ানক ছিল, যা এত রাগ ও ঘৃণায় পূর্ণ ছিল, এখন তা মুদিত। তা মুদিত কেন? চোখ খোল তোমার! তোমার চোখের পাতা তোল, ইওকানান্! কেন তুমি আমার পানে চাইচ না? তুমি কি আমাকে ভয় কর, ইওকানান? তাই কি তুমি আমার পানে চাইবে না?...আর তোমার জিভ্ যা লাল সাপের মত বিষ বর্ষণ কর্‌ছিল, তা এখন নিশ্চল হয়ে পড়েচে, সেটা আর এখন কিছুই বলে না, ইওকানান! এই লোহিত বিষধর আমার উপর বিষবর্ষণ করেছিল। বড়ই আশ্চর্য্য! নয় কি? এ কি হল? এই লোহিত বিষধর আর নড়েনা কেন?...তুমি আমাকে চাওনি, ইওকানান! তুমি আমাকে দূরে পরিহার করেছিলে। তুমি আমার বিরুদ্ধে অনেক মন্দ কথা বলেছিলে। তুমি আমাকে পতিতা, উচ্ছৃঙ্খলা মনে করে আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিলে। তবে ইওকানান, আমি এখনও জীবিতা। কিন্তু তুমি? তুমি মৃত, আর তোমার মাথাটা আমার আয়ত্তে। আমি

এটা নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। আমি এটা কুকুরের আর আকাশের পাখীর সামনে ফেলে দিতে পারি। কুকুরের উচ্ছিষ্ট পাখীতে খেয়ে ফেলবে।...আঃ! ইওকানান, ইওকানান, তুমিই একমাত্র ছিলে যাকে আমি ভালবেসেছিলাম। আর সকল পুরুষই আমার নিকট ঘৃণ্য। কিন্তু তুমি? তুমি সুন্দর ছিলে। তোমার দেহখানি রূপার আধারে বসানো একটি হস্তিদন্তের স্তম্ভের মত ছিল। কপোতিকা নিবেসিতা ও রৌপ্যবর্ণ লিলি-সুশোভিত উপবনের মত ছিল। হস্তিদন্তের ফলক-বিভূষিত রূপার বুরুজের মত ছিল। তোমার দেহের মত শ্বেতবর্ণ জগতে আর কিছুই ছিল না। তোমার কেশের মত কৃষ্ণবর্ণ জগতে আর কিছুই ছিল না। সমস্ত জগতে তোমার মুখের মত লাল আর কিছুই ছিল না। তোমার স্বর সুগন্ধাধারের মত অপরিজ্ঞাত সৌরভ বিকীরণ করত। আর আমি যখন তোমার পানে চেয়েছিলাম, তখন একটা অজানা সঙ্গীত শুনেছিলাম। আঃ! তুমি আমার পানে কেন চেয়ে দেখনি, ইওকানান? তোমার হাতের ও তোমার অভিসম্পাতের আড়ালে তুমি তোমার মুখ লুকিয়েছিলে। যে তার দেবতাকে দেখতে চায় তার আবরণ তোমার চোখে দিয়েছিলে। বেশ; তুমি তোমার দেবতাকে দেখেচ, ইওকানান! কিন্তু আমাকে? আমাকে তুমি কখনও দেখনি। যদি তুমি আমার পানে দেখতে, তা হলে তুমি আমাকে ভালবাসতে। আমি? আমি তোমাকে দেখেছিলাম, ইওকানান! আর ভালবেসেছিলাম। ওঃ! আমি তোমাকে কত ভালবেসেছিলাম! এখনও আমি তোমাকে ভালবাসি, ইওকানান! আমি কেবল তোমাকেই ভালবাসি।...আমি তোমার সৌন্দর্য্য পান করবার জন্যে পিপাসিতা; তোমার দেহের জন্যে আমি ক্ষুধার্ত্ত; আর মদে কিংবা ফলে আমার এ ক্ষুধাতৃষ্ণা মিটাতে পারে না। এখন আমি কি করব ইওকানান? বন্যা কিংবা সুবিপুল জলরাশি আমার এ লালসার আগুন নিভাতে পারে না। আমি ছিলাম রাজকুমারী, আর তুমি আমাকে ঘৃণা করেছিলে। আমি কুমারী ছিলাম, আর তুমি আমার কুমারীত্ব হরণ করেছিলে। আমি শুদ্ধা ছিলাম, আর তুমি আমার শিরায় শিরায় আগুন ঢেলে দিয়েছিলে।...আঃ! আঃ! তুমি আমার পানে কেন চেয়ে দেখনি, ইওকানান? তুমি যদি আমার পানে চেয়ে দেখতে, তা হলে তুমি আমাকে ভালবাসতে। আমি বেশ জানি যে তুমি আমাকে ভালবাসতে, আর প্রেমের রহস্য মৃত্যুর রহস্যের চেয়েও মহত্তর। প্রেমই কেবল বিবেচনার যোগ্য।

হেরদ। ও রাক্ষসী, ঐ তোমার মেয়ে, ও একেবারে রাক্ষসী। বাস্তবিক ও যা করেচে তা একটা ভয়ানক পাপ-কর্ম্ম। আমি নিশ্চয় জানি যে এক অজ্ঞাত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে এটা পাপানুষ্ঠান।

হেরদিআস। আমার কন্যা যা করেচে তাতে আমার সম্মতি আছে। আর আমি এখন এখানেই থাকব।

হেরদ। [উঠিয়া] আঃ! এই অগম্যগামিনী নারী আপনার স্বরূপের পরিচয় দিচ্চে! এস! আমি এখানে থাকব না। এস, আমি তোমায় বলচি। নিশ্চয়ই কোনও একটা ভয়ানক ব্যাপার ঘটবে। মানাস্‌সেঃ, ইস্‌সাকার, ওজিআস, মশালগুলো নিভিয়ে দাও! আমি আর কারও পানে চাইব না, কাকেও আর আমার পানে চাইতে দেব না। মশালগুলো নিভিয়ে দাও! চাঁদটাকে ঢেকে দাও! তারাগুলো ঢেকে দাও! হেরদিআস, এস, আমরা প্রাসাদে গিয়ে লুকিয়ে থাকি। আমার এখন ভয় করচে।

[দাসগণ মশালসমূহ নিভাইয়া দিল। তারকাসকল অদৃশ্য হইল। একখানা কৃষ্ণমেঘ চাঁদের উপর দিয়া যাইতে যাইতে চাঁদকে সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া ফেলিল। মঞ্চ অত্যন্ত অন্ধকারময় হইল। টেট্রার্ক সোপানশ্রেণী দিয়া উঠিতে লাগিলেন।]

সালমের স্বর। আঃ! আমি তোমার মুখচুম্বন করেচি, ইওকানান, আমি তোমার মুখচুম্বন করেচি। তোমার ওষ্ঠের উপর তিক্তস্বাদ অনুভূত হচ্ছিল। সেটা কি রক্তের স্বাদ?...হয় ত সেটা প্রেমের স্বাদ।...লোকে বলে যে প্রেমের স্বাদ তিক্ত।...কিন্তু তাতে কি? তাতে কি? আমি তোমার মুখচুম্বন করেচি।

[একটু জ্যোৎস্না সালমের উপর পড়িয়া তাহাকে আলোকে প্লাবিত করিল।]

হেরদ। [ফিরিয়া সালমের দিকে দেখিয়া] বধ কর ঐ নারীটাকে!

[সৈনিকগণ দৌড়াইয়া গেল এবং তাহাদের ঢালকের নিম্নে হেরদিআস-দুহিতা, ইহুদার রাজকুমারী সালমেকে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিল।] যবনিকা।

সারেঙ্গের সুর

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস গুপ্ত বি-এ

জঙ্গলী গরীব বিধবার মেয়ে। বাপের মৃত্যুর সাত দিন পরে তার জন্ম। দারুণ শোকের মধ্যেই মাতৃত্বের ক্লেশ!—মা সন্তানের জন্মের সঙ্গে-সঙ্গেই সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। তিনি যে আবার চোখ মেলিয়া মেয়ের মুখ দেখিতে পাইবেন, কিংবা জন্মমাত্রেই মা-ছাড়া হইয়াও মেয়েও যে মায়ের জলাপোড়া বুকে বাড়িয়া উঠিতেই বাঁচিয়া থাকিবে, কেহই তাহা ভাবে নাই। কিন্তু দুঃখীর জীবন অত সহজে তো যায় না! স্বামী হারাইয়া নিজের কোথায় স্থান হইবে, শোকের প্রথম জ্বালায় সে প্রশ্নের মীমাংসা না হইতেই, বিধবার মনে আর একটা নূতন চিন্তা জাগিয়া উঠিল,—এখন তো শুধু একটা প্রাণের কথা নহে,—আর একটা ক্ষুদ্র প্রাণকেও বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে, তাঁর নিজের বুকেও যে রক্ত জমান চাই! কিন্তু অনাথা হইয়াও জীবনের মায়াই রাখিতে হইল তো,—কোলে আসিল কি না একটা মেয়ে!

মেয়েটি বয়সে বাড়িতেছিল যতখানি, গায়ে হইল না তার অর্দ্ধেকও; তার উপর, রোগ তো বারমাস লাগিয়াই আছে! এই চামড়া-ঢাকা কঙ্কালটি যখন হাঁটিয়া, ছুটিয়া কথা শিখিয়া, সত্যই জীবনের পরিচয় দিল, তখনও কেহ আশা করে নাই যে, সে আর দুইটি দিনও বাঁচিবে!

তবু এই বালিকাই দিনে-দিনে হইয়া উঠিল সাত বছরের। মা ঘরের পৈঁঠায় মেয়েকে বসাইয়া রাখিয়া হেঁসেলের কাজে যান, মেয়ে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে আকাশের দিকে। চারিদিকে গুমোট বাঁধিয়া আকাশের ঈশান-কোণে কাল মেঘ যখন জমিতে থাকে, তখন জঙ্গলীর মুখে হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া যায়,—আর একটু পরে ঝড় উঠিবে, তারই প্রত্যাশায় ময়ূরের মত ডানা মেলিয়া নাচিতে ইচ্ছা করে! ঘরের পিছনে বাঁশগাছের এক ঝোপ, আর ঘোষেদের দীঘির পাড়ে ঝাউয়ের সার,—কোন্ গাছের তলায় আগে যাইবে ভাবিয়া পায় না,—তাই সে উভয় স্থানেই ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, আর গাছের দিকে চাহিয়া-চাহিয়া শোঁ-শোঁ, শন্-শন্, শব্দ শোনে। দক্ষিণা হাওয়ায় এই রব যেদিন বেশী করিয়া পাতায়-পাতায় বাজিয়া উঠে, সেদিন আর খাওয়া-দাওয়া মনে থাকে না—বসিয়া বসিয়া শব্দই শুধু শোনে।

পাড়ায় এই জন্য নাম হইল তার—জঙ্গলী। মা যদি কখনও ধমক দিয়া জিজ্ঞাসা করেন—'বনে-জঙ্গলে ঘুরে' এ কেমন তোর পাগলামো রে?'—জঙ্গলি মার হাঁটু জড়াইয়া মুখের পানে ফ্যাল-ফ্যাল চাহিয়া জবাব দেয়—'মা, সেখানেই যে বাবা সারেঙ্ বাজান। তুমিও যদি শুন্‌তে!' স্বামীর স্মৃতি জাগিয়া বিধবার কণ্ঠে তখন আর ভাষা যোটে না—উবু হইয়া বসিয়া পড়িয়া মেয়েকে তিনি বুকের পানে টানিয়া লন।

বাপের সঙ্গে জন্মে দেখা নাই—জঙ্গলী তাঁর সারেঙ্গের কথা কি জানে? বাপ তার ওস্তাদ সারেঙ্গী ছিলেন বটে; কিন্তু জঙ্গলী তো কখনও তাঁর বাজনা শোনে নাই। চালের বাতায় বাপের একটা ভাঙ্গা সারেঙ্গের খোল ঝুলানো, তাহা দেখিয়াই তার সারেঙ্গের নামের সহিত পরিচয়। ঝড়ের রাত্রে খোলের ছিদ্র-পথে বায়ু ঢুকিয়া যখন শোঁ—ন্ শোঁ—ন্ ধ্বনি উঠে, তখন মা মেয়েকে বুঝাইয়া বলেন—তার বাপের হাতেরও সুর ঐ রকমেই মুখ খুলিয়া সারেঙ্গের তারে গলা ছাড়িয়া ঝঙ্কার তুলিত। মেয়ে বোঝে—তবে তো এই ঝড়ের হাওয়াই সারেঙ্গের তারে সুর বাঁধিয়া দেয়, আর এই হাওয়াই ঝাউগাছে ও বাঁশবাগানে সারেঙ্গের বুকে সুরের লহর তোলে। ঝাউ-গাছের শোঁ-শোঁ রব আর বাঁশের পাতার শন্-শন্ ধ্বনি—তাই তো তার বাপের সারেঙ্গের সুর।—তবে, কে বলে তার বাপ নাই!—কিন্তু বাপই বা কেমন মানুষ—বাঁশ-ঝোপ আর ঝাউগাছ ছাড়া কি সারেঙ্ বাজাইবার জায়গা পান না!

ইহারই মধ্যে হঠাৎ একদিন সারেঙ্গের খাঁটী সুরের সহিতও জঙ্গলীর পরিচয় হইয়া গেল। ঘোষেরা সকলেই

মধুপুরে গিয়াছেন; বাড়ী আগ্‌লাইতে রহিয়া গেছে দরোয়ান ও মালী। দরোয়ানটী হিন্দুস্থানী পাঁড়ে; তুলসী-দাসের দোঁহা কণ্ঠস্থ। গুণ্‌ গুণ্‌ করিয়া দোঁহা আওড়াইয়া মনের তৃপ্তি হয় না, তাই সারেঙ্গের সুরে গলার সুর মিশাইয়া ভজনের আখ্‌ড়াই চলে। বাবুরা কেহ না কেহ এ পর্য্যন্ত বাড়ীতেই থাকিতেন,—দরোয়ানজীর নিশুতি রাত্রি ছাড়া ভজন গাহিবার সুবিধা হয় নাই,—তাহাও গলা ছাড়িয়া নহে। ততক্ষণে জঙ্গ্‌লী মায়ের কোলে ঘুমে বিভোর থাকিত। কাজেই এতদিন পাঁড়েজীর সারেঙ্গের খবর পায় নাই।

বাবুরা কেহ বাড়ীতে নাই, দরোয়ান এখন বে-পরোয়া। রুটী সেঁকিবার আগে, দিন থাকিতেই, প্রত্যহ সে একবার সারেঙ্গের তালে গলা ছাড়িয়া ভজন গাহিয়া লয়। ঘোষেদের ঝাউগাছ-তলায় গিয়া জঙ্গ্‌লী হঠাৎ একদিন এই সারেঙ্গের সুর শুনিতে পাইল। আনন্দে উৎসাহে ছুটিয়া গিয়া, দরোয়ানের ঘরের পিছনে লুকাইয়া সে সারেঙ্গের বাজনা শুনিতে লাগিল। বাজনা যতই কাণে যায়, ততই সে ভাবে—আহা, এমন মিঠা সারেঙ্গের সুর! তার বাপের ভাঙ্গা সারেঙ্গটায়ও তার থাকিলে যে এমনই সুরে তাহা বাজিত!

সন্ধ্যার আগে সারেঙ্গের বাজনা শোনা এখন তার নিত্যকার কাজ। শুনিতে-শুনিতে এক-একবার উঁকি মারিয়া দেখিয়া লয়—এ সুর ফোটে কিসে, আর কেমন করিয়া তারের বুকেই বা সুর ফোটান যায়।

জ্বরে পড়িয়া জঙ্গ্‌লী কয়দিন বিছানায় পড়িয়া রহিল। ইহারই মধ্যে ঘর খুঁজিয়া একটা ভাঙ্গা হুঁকা বাহির করিল। হুঁকার দুইদিকে দুইটা কাঠ জুড়িয়া, তারের বদলে সূতা বাঁধিয়া, এক সারেঙ্গ্‌ তৈরী হইল; ঝাঁটার শলায় দড়ি বাঁধিয়া হইল—ধনুকের মত সারেঙ্গের ছড়। কিন্তু ছড় সূতার তারে যতই জোরে বুলাক্‌ না, সারেঙ্গে তো সুর খেলো না!

বিফল চেষ্টায় সারা বিকাল কাটাইয়া, সন্ধ্যার আগে দরোয়ানজীর বাজনা শুনিতে জঙ্গ্‌লী ঘোষেদের বাড়ী ছুটিল। ঘরের পিছনে অনেকক্ষণ সে দাঁড়াইয়া রহিল; কিন্তু, কই,—সারেঙ্গ্‌ কেন বাজে না! জঙ্গ্‌লী অস্তে আস্তে জানলার গোড়ায় দাঁড়াইয়া দেখিল—ঘরে তো কেহই নাই, মেজের মোটা মাদুরটার উপর সারেঙ্গটী শুধু পড়িয়া আছে।...তবে কি আজ পাঁড়েজীর গান হইবে না না কি?

নিজের সারেঙ্গের ত্রুটী শোধরাইতে বাজনা যে আজ শোনা চাই-ই। আশায় আশায় সে কতক্ষণ তো দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু এখনও তো সারেঙ্গ বাজে না!

জঙ্গ্‌লী ভাবিল—আচ্ছা, কেহই যদি সারেঙ্গ্‌ না বাজায়, সে নিজেই কি তারের উপর আঙ্গুল বুলাইয়া একটু সুরের টুম্‌ টুম্‌ শুনিতে পায় না?...কিন্তু, ভয় করে যে! কেন? তাহা বুঝিতে পারে না, অথচ ঘরের সাম্‌নে পা বাড়াইতেও বুক কাঁপে!...কিন্তু ঘর তো খালি—কতক্ষণেরই বা কাজ, আর কে-ই বা দেখিতে গিয়াছে! জঙ্গ্‌লী সাহস করিয়া রেলীং ধরিয়া জানালার গায়ে উঠিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, সারেঙ্গটী সেই ভাবেই পড়িয়া আছে—বাজাইবার লোক নাই।...তিন হাতও দূরে নয়—ঘরের ভিতর গিয়া এক-বার—শুধু একটীবার—তারের টুম্‌ টুম্‌ শুনিয়াই সে ফিরিয়া আসিবে।...ঘর তো খালি—কতক্ষণেরই বা কাজ, আর কে-ই বা দেখিতে গিয়াছে!

এদিক-ওদিক চাহিতে-চাহিতে জঙ্গ্‌লী পিছন ছাড়িয়া ঘরের সাম্‌নে আসিল। চৌকাঠের কাছে গিয়া পা চলে না—এক দৌড়ে চৌকাঠ ডিঙ্গাইয়া ঘরের ভিতর গিয়া সে সারেঙ্গের তারে আঙ্গুল ছোঁয়াইল।

ঠিক তখনি দরজার বাহির হইতে কে গর্জ্জন করিয়া উঠিল—'কোন্‌ হ্যায়?' জঙ্গ্‌লী চমকাইয়া উঠিয়া সারেঙ্গ ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। গালপাট্টাওয়ালা এক লম্বা জোয়ান হেলিতে-দুলিতে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া জঙ্গ্‌লীর হাত ধরিয়া এক ঝাঁকি দিল; বলিল—'এ্যা লেড়্‌কি, চুরি কর্‌নে আয়া!—কি চুরি করিয়াছিস্‌ রে, বদ্‌মাস?' ভয়ে জঙ্গ্‌লীর মুখ দিয়া কথা সরিতেছিল না, সে ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করিয়া চাহিয়া রহিল। প্রথমবারের দৃষ্টিতেই তার বোধ হইল—এ তো পাঁড়েজী নয়,—এ যে একেবারেই অচেনা মুখ।

জঙ্গ্‌লী ঠিকই দেখিয়াছে। পাঁড়েজী বাবুদের কাজে বড়বাবুর জামাতার সঙ্গে দুই দিন হইল কলিকাতায় গিয়াছে। মধুপুরে তেওয়ারী তার স্থানে এ কয়দিন ঘোষবাড়ী আগ্‌-লাইতেছে। তেওয়ারী, বাবুদের মধুপুরের দরোয়ান, বার মাস সেখানেই থাকে; সুতরাং জঙ্গ্‌লীরও সে অচেনা, আর জঙ্গ্‌লীও তার অপরিচিত।

কি চুরি করিছিস্‌ রে, লেড়্‌কী?'—তিন-চারিবার

জিজ্ঞাসা করিয়াও যখন কোন উত্তর মিলিল না, তখন তেওয়ারী হাতের থাবা পুরা মেলিয়া জঙ্গলীর দুই গালে বসাইয়া দিল—দুই থাপ্পড়, পরে সঙ্গে সঙ্গে গলাধাক্কা দিয়া তাকে ঘরের বাহিরে ঠেলিয়া দিল। জঙ্গলী পড়িতে-পড়িতে ছিটকাইয়া গিয়া দরজার গোড়ায় পাথরের উপর উবুড় হইয়া পড়িল। তার মাথা ফাটিয়া রক্ত বাহির হইল। দুই হাতে মাথা চাপিয়া টলিতে-টলিতে বাড়ীতে গিয়া সে ঘরের দাওয়ায় অচেতন হইয়া পড়িল।

'আহা রে!'—বলিয়া মা ছুটিয়া আসিয়া মেয়েকে কোলে তুলিলেন। স্ত্রীলোকের যাহা সাধ্য সকলই তিনি করিলেন, কিন্তু মেয়ের হুঁস হইল না।

শেষরাত্রে জ্বরের সঙ্গে মাথার বিকার প্রকাশ পাইল। জঙ্গলী বিকারের ঘোরে প্রলাপ বলিয়া উঠিল—'পাঁড়েজী, তোমার পায়ে পড়ি, মেরো না আমায়, আমি তো কিছু চুরি করতে আসি নি।' মা বুঝিতে পারিলেন না, মেয়ে এ কি বলিতেছে।

বিকার ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল। যম মা-মেয়ে বুঝে না, হাতের সামনে যাহাকে পায় তাহাকেই ধরিয়া টানে। দুই দিন দুই রাত্রির টানাটানি সহিয়া সন্ধ্যার আগে জঙ্গলী হঠাৎ হাতে ভর দিয়া উঠিয়া বসিল। মায়ের চোখের দিকে আরক্ত চোখের দৃষ্টি দিয়া সে বলিয়া উঠিল—'মা, মা, আর পাঁড়েজীর সারেঙ্গ্ শোনায় কাজ নেই—বাবার ঐ ভাঙ্গা সারেঙ্গেই তার জুড়িয়া দেও—ঘরে বসিয়া টুম্‌টুম্ শব্দ শুনি।'

মা হয় ত বলিতে চাহিলেন—'আচ্ছা, মা, সারিয়া ওঠ, —তোমার জিনিস তুমিই নেবে।' কিন্তু মায়ের মুখের ভাষা না যুটিতেই মেয়ে আবার চাঁচাইয়া উঠিল—'পাঁড়েজী, আমায় আর মেরো না,—আমার বাবারও সারেঙ্গ্ আছে, আমি এখন তাই বাজাব টুম্‌টুম্—' বলিতে-বলিতে ছুম্ করিয়া জঙ্গলীর মাথা বালিশের উপর পড়িয়া গেল। বিধবা ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাকিতে লাগিলেন—'মা! মা!' কিন্তু কোথায় তখন জঙ্গলী? সে তখন স্থির চোখে চাহিয়া আছে—চালের বাতায় ঝুলানো সেই সারেঙ্গের খোলের দিকে,—কিন্তু দেহে তখন তার প্রাণ নাই।

ইঙ্গিত

শ্রীবিশ্বকর্ম্মা

অঙ্গরাগ

অঙ্গরাগের কতকগুলি উপকরণ এখন এখানে অনেকে প্রস্তুত করিতেছেন; সেই জন্য আমি এ যাবৎ এই বিষয়ে নীরব ছিলাম। বিশেষতঃ আমি নিজে কখনও কোন প্রকার অঙ্গরাগ ব্যবহার করিতে উৎসাহশীল নহি; সে জন্যও এদিকে আমার তেমন ঝোঁক ছিল না। কিন্তু আমার বহু পাঠক, বিশেষতঃ মাননীয়া পাঠিকা মহোদয়াগণ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, এবং অনেক দিন ধরিয়াই বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতেছেন। আর তাঁহাদের অনুরোধ ঠেকাইয়া রাখিতে সাহস হইতেছে না। সেইজন্য সহজ সহজ দুই চারিটী জিনিসের উল্লেখ করিয়া নিষ্কৃতি লাভের প্রয়াস পাইতে হইল। গত বারে বোধ হয় দুই একটী দিয়াছি এবার আরও কয়েকটি দিতেছি।

প্রথমে আমরা অঙ্গরাগ প্রস্তুত করিবার মশলাগুলির পরিচয় লইব। তার পর তাহাদের যোগ-বিয়োগের দ্বারা দ্রব্যগুলির প্রস্তুত প্রণালীর আলোচনা করিব। তাহা হইলে কাজের বিশেষ সুবিধা হইতে পারিবে।

অঙ্গরাগের উপকরণগুলিকে কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়; যথা, কেশ-তৈল, পমেটম, এসেন্স, আতর, পাউডার, আলতা, কসমেটিক, ক্রীম, সুর্ম্মা, অঞ্জন, টিপ, রুজ, নাট্যশালার অভিনেতা-অভিনেত্রীগণের ব্যবহার্য্য রং, সাবান, দন্তমঞ্জন, প্রভৃতি।

মশলাগুলিরও কতকগুলি শ্রেণী-বিভাগ আছে; যথা, তৈলজাতীয়, অর্থাৎ তিল তৈল, রেড়ীর তৈল, বাদাম তৈল, জলপাইয়ের তৈল, নারিকেল তৈল, আন্তব তৈল

প্রভৃতি। চর্ব্বিজাতীয়, যথা, স্পার্ম্মাসেটি, ভেড়ার চর্ব্বি, ছাগলের চর্ব্বি, শূকরের চর্ব্বি, গোরুর চর্ব্বি প্রভৃতি। গন্ধ-জাতীয়, যথা, ফুলের আতর, চন্দন তৈল, এসেন্স মৃগনাভি। উদ্বায়ী পদার্থ যথা, কর্পূর, স্পিরিট প্রভৃতি। জলীয় পদার্থ, যথা, গোলাপজল। খনিজ পদার্থ, যথা, প্যারাফিন, ভেসেলিন, প্রভৃতি। রঞ্জন পদার্থ, যথা, কার্ম্মাইন্, এলকানেট রুট, লাল পাতা, টিঞ্চার গ্রাস প্রভৃতি। রাসায়নিক পদার্থ, যথা, সোডা, ফটকিরি, সোহাগা, প্রভৃতি। এইরূপ আরও নানা শ্রেণী আছে।

ভিন্ন-ভিন্ন মশলা সংযোগে এক-এক শ্রেণীর অনেক রকম জিনিস প্রস্তুত হইতে পারে। অঙ্গরাগের উপকরণের মধ্যে কেশ তৈলই সর্ব্বপ্রধান; এবং ইহার ব্যবহার যেমন অধিক, তেমনি ইহার বিস্তৃত ব্যবসায়ও চলে।

তৈল শব্দের আভিধানিক অর্থ তিলের স্নেহ। অর্থাৎ তিলকে পেষণ করিয়া যে স্নেহ-জাতীয় পদার্থ বাহির হয়, তাহাই তৈল। কিন্তু কালক্রমে আরও নানাবিধ পদার্থ নিঃসৃত স্নেহ তৈল নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

কেশ তৈলের মধ্যে ফুলল তৈলই সর্ব্ব প্রধান। এবং কেবল তিল হইতেই প্রকৃত স্থায়ী গন্ধযুক্ত ফুলল তৈল তৈয়ার হইতে পারে; এবং তাহা কিয়ৎ পরিমাণে স্বাভাবিক; কারণ, একমাত্র তিলেরই প্রকৃত পক্ষে ফুলের সুগন্ধ গ্রহণ করিয়া নিজেকে সুবাসিত করিবার ক্ষমতা আছে। তিল ভিন্ন অপর কোন দ্রব্যের এই গুণ নাই। কি প্রণালীতে ফুলের সহযোগে তিলকে সুবাসিত করিয়া তাহা হইতে তৈল নিষ্কাশন করিয়া আসল ফুলল তৈল প্রস্তুত করিতে হয়, সে বিষয়ে পূর্ব্বে একবার আলোচনা করিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে। সুতরাং এখানে তাহার পুনরাবৃত্তি করার দরকার দেখিতেছি না। অপর সকল প্রকার তৈলে আতর মিশাইয়া তাহাদিগকে সুরভিত করা হয়। সে জন্য তাহাদের গন্ধ স্থায়ী হইতে পারে না। সুতরাং অঙ্গরাগের উপযোগী তৈল ক্রমশঃ দুই শ্রেণীতে পরিণত হইতেছে—ইহাদের মধ্যে দুইটী জাতির সৃষ্টি হইতেছে। এক, আসল ফুলল তৈল; অপর আতর মিশ্রিত তৈল। প্রথম শ্রেণীর তৈল প্রস্তুত করিতে কিছু আয়াস স্বীকার করিতে হয়। এবং ফুলল তৈলের গন্ধ স্থায়ী হয় বটে, কিন্তু তৈলটি তত উৎকৃষ্ট হয় না। ফুলল তৈল বেশী দিন ব্যবহার করিলে চুল উঠিয়া যায়; তেলটা ঘন বলিয়া চট্‌চট্ করে এবং মাথায় জটা পড়ে। সেই জন্য ফুলল তৈলের ব্যবহার ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। তৎপরিবর্ত্তে আতর মিশ্রিত কেশতৈল বাজার ছাইয়া ফেলিতেছে। বিজ্ঞাপনের জোরে ইহাদের বিক্রয়ও খুব বাড়িয়া যাই-তেছে। ফুলল তৈল অপেক্ষা আধুনিক কেশ-তৈল প্রস্তুত করা অপেক্ষাকৃত সহজ। ইহাতে হাঙ্গামা অনেক কম।

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কেশ-তৈল প্রস্তুত করিবার উপ-যোগী তৈলগুলির মধ্যে জলপায়ের তৈল বা অলিভ অয়েলই সর্ব্ব প্রধান ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট। জলপাইয়ের তৈলের নিজের গন্ধ তেমন উগ্র নয়। ইহার নিজস্ব গন্ধ কোমল হওয়ায় ইহাতে যে আতর বা অটো মিশানো যায়, তাহার গন্ধ বেশ স্পষ্ট ও কতকটা স্থায়ী হয়। তৈলের নিজের গন্ধ উগ্র হইলে তাহা আতরের গন্ধকে কতকটা ঢাকিয়া ফেলে। জলপায়ের তৈল বেশ লঘু ও পাতলা। ইহা সহজে পরিষ্কার (refine) করা যায়; এবং refine করিবার পর তাহা দেখিতে বেশ স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল হয়। এই রিফাইন করার উপর কেশ তৈলের ভাল-মন্দ ও গুণাগুণ প্রধানতঃ নির্ভর করে।

সাধারণতঃ অলিভ অয়েল কেশ-তৈলের পক্ষে সর্ব্বা-পেক্ষা উপযোগী হইলেও, ভাল করিয়া শোধিত করিয়া লইলে অন্য তৈলেও এক রকম কাজ চলে।

প্রসাধনের উপকরণ হিসাবে কেশ-তৈলের পরই পমেটম উল্লেখযোগ্য। পমেটম বাঙ্গলা দেশের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উপযোগী নয়। তবে শীতকালে একটু-আধটু ব্যবহার করা চলে। কিন্তু তা হইলে কি হয়! পমেটম ব্যবহার করা, তত্ত্ব-তাবাসে কন্যা-জামাইকে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে পমেটম উপহার দেওয়া অনিবার্য্য ফ্যাসানে পরিণত হইয়াছে। চা জিনিসটি এ দেশের পক্ষে একেবারেই উপযোগী নয়—বরং অনিষ্টকর। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যেমন চা পান করা আজকাল ঘরে ঘরে মেয়ে-পুরুষের সমান ভাবে নেশার জিনিস হইয়া দাঁড়াই-য়াছে, পমেটম প্রভৃতি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বিলাস-দ্রব্যের ব্যবহারও সেইরূপ আমাদের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে।

তবে ব্যবসায়ের হিসাবে পমেটম প্রস্তুত করা অসঙ্গত নহে। কারণ, ইহার উপকরণগুলি প্রায় দেশী; এবং ইহার ব্যবসায়ে লাভও যথেষ্ট হইতে পারে। পমেটমের প্রধান মশলা চর্ব্বি—গোরু ও শূকরের চর্ব্বি—এ দেশে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ভেড়ার চর্ব্বিও কখন-কখনও পমেটম প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। আবার কখনও কখনও শূকর ও মেষের চর্ব্বি মিশাইয়াও পমেটম প্রস্তুত হয়। আবার, চর্ব্বি বর্জ্জন করিয়াও—শুধু তৈল ও মোম একত্র মিশাইয়াও পমেটম প্রস্তুত করা যায়।

কেশ-তৈল, পমেটম প্রভৃতি পদার্থে যে সুগন্ধ ব্যবহৃত হয়, তাহা যথাসম্ভব দেশী ও স্বাভাবিক হওয়া উচিত। আজকাল কৃত্রিম রাসায়নিক গন্ধ-দ্রব্য খুব বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। এগুলি অপেক্ষাকৃত সুলভ, সহজ-লভ্য এবং পরিমাণেও প্রচুর। স্বভাবজাত গন্ধ-দ্রব্য এত বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হয় না। একে ত বিলাস-দ্রব্য মাত্রেই স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। তাহার উপর কৃত্রিম রাসায়নিক উগ্র-গন্ধ দ্রব্যগুলি আমাদের দেশের আবহাওয়া এবং দেশের লোকের কোমল প্রকৃতির ঠিক উপযোগী নহে। এই জন্যই বলিতেছি, যথাসম্ভব দেশী আতর ব্যবহার করিতে পারিলে সকল দিকেই ভাল,—সখও মিটিবে, স্বাস্থ্যেরও ততটা ক্ষতি হইবে না।

কেশ-তৈল, পমেটম, এসেন্স প্রভৃতি অঙ্গরাগের উপকরণ প্রস্তুত করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কয়েকটি দ্রব্য একত্র মিশাইয়া শিশিতে বা কৌটায় পুরিয়া লেবেল আঁটিয়া দিলেই হইল। ইহা প্রস্তুত করিতে অগাধ বিদ্যাবুদ্ধি, অনেক মূলধন, কিম্বা বড় বড় কলকব্জার দরকার নাই। সেইজন্য কতকগুলি স্বয়ম্ভু শিল্প এইগুলিকে আশ্রয় করিয়া এ দেশে গজাইয়া উঠিয়াছে। কোন রকমে কয়েকটি recipe বা formula যোগাড় করিয়া লইয়া যে-সে এই কাজে প্রবৃত্ত হইতেছে। কোনরূপ ভাবনা-চিন্তা নাই, বিচার-বিবেচনা নাই, মশলাগুলির গুণাগুণ ও ব্যবহার জানিবার জন্যও তেমন আগ্রহ নাই; চোখ-কাণ বুজিয়া বিক্রয়োপ-যোগী যে কোন রকমের দুই-একটা জিনিস তৈয়ার করিয়া ফেলিতে পারিলেই হইল, এবং কিছু পয়সা ঘরে আসিলেই হইল। ইহার পরিণাম ভাল হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না। এই সকল কারণেই আমি এরূপ বিলাস-দ্রব্যের তেমন পক্ষপাতী নহি, এবং এজন্যই এত দিন এ বিষয়ে নীরব ছিলাম। যাহা হউক, আজ যখন উপরোধে ঢেঁকি গিলিতেই বসিয়াছি, তখন আর কি করা যায়। দু'একটা recipe দিয়া বিদায় লইতেছি।

সিম্পল বা প্লেন পমেটম Simple or plain Pomade।

চিনিতে উপযুক্ত পরিমাণে জল মিশাইয়া জ্বাল দিয়া যে চিনির রস প্রস্তুত হয়, তাহা যাবতীয় ফলের সিরাপের মূল উপাদান। এই চিনির রসকে Simple syrup বা সিরাপের base বলা যায়। ইহার সহিত ভিন্ন-ভিন্ন ফলের রস কিম্বা ফলের এসেন্স ও অন্যান্য জিনিস মিশাইয়া বিভিন্ন প্রকার সিরাপ প্রস্তুত হয়।

তদ্রূপ, সমান পরিমাণ গোরু ও শূকরের চর্ব্বি, অথবা মেষ ও শূকরের চর্ব্বি vapour bathএ গলাইয়া উত্তম রূপে মিশাইয়া লইলে simple pomade প্রস্তুত হয়। প্রয়োজন ও অবস্থা বুঝিয়া এই তিন প্রকার চর্ব্বিই একত্র মিশাইয়া লওয়া যাইতে পারে, এবং ইহাদের পরিমাণের ইতর-বিশেষ করা যাইতে পারে। কিম্বা ইহাদের সঙ্গে কিছু রেড়ীর বা জলপায়ের বা অন্য তৈলও মিশাইতে পারা যায়। এইটা হইল base। ইহাকে সাদাও রাখিতে পারা যায়, রঞ্জিতও করিয়া লইতে পারা যায়। তার পর ইহার সহিত একটা দুইটা বা তিনটি গন্ধ-দ্রব্য মিশাইয়া লইলেই বিভিন্ন প্রকারের পমেটম প্রস্তুত হইতে পারে। স্পার্ম্মাসেটি (spermaceti) বা তিমি মাছের তৈল বা চর্ব্বিও পমেটম প্রস্তুত কার্য্যে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

খুব সোজাসুজি একটা কম-দামী পমেটম এইরূপে প্রস্তুত করা চলে। উনুনের উপর একটা পাত্রে কিঞ্চিৎ জল গরম করিতে দিন। সেই পাত্রের ভিতর অপর একটা পাত্রে (এনামেল বা চীনা মাটীর পাত্র হইলেই ভাল হয়) সমান ওজনের মেষ ও শূকরের চর্ব্বি রাখুন। জল কিছু গরম হইয়া আসিলে চর্ব্বি গলিয়া মিশিয়া যাইবে। সেই দ্রবীভূত মিশ্রিত চর্ব্বিতে সেরকরা এক কাঁচ্চা এসেন্স অব লেমন অথবা সেরকরা দুই কাঁচ্চা এসেন্স অব বার্গমট যোগ করিয়া একটা হাতা দ্বারা উত্তম রূপে নাড়িতে থাকুন। এসেন্সটি চর্ব্বির সঙ্গে বেশ করিয়া মিশিয়া যাওয়া চাই; তা না হইলে পমেটম ভাল হইবে না। সেইজন্যই খুব ভাল

করিয়া নাড়িয়া দেওয়া দরকার। জিনিসগুলি উত্তমরূপে মিশিয়া গেলে চর্ব্বির পাত্রটি জল হইতে নামাইয়া লউন। ঠাণ্ডা হইলে উহা জমিয়া যাইবে। তরল থাকিতে-থাকিতে চওড়া-মুখ ছোট শিশির ভিতর পুরিয়া রাখিলে, ঠাণ্ডা হইয়া শিশির ভিতরই উহা জমিয়া যাইবে। ইহা সাদা পমেটম হইবে। ইহাকে রঞ্জিত করিতে হইলে, এসেন্স মিশাইবার পূর্ব্বেই রং করা উচিত। সিম্পল পমেডের সহিত রং ও গন্ধদ্রব্য মিশান পমেটম-প্রস্তুত-কারকের বা খরিদদারের রুচির উপর নির্ভর করে। যে মশলার সহিত যে রং মিশাইলে দেখিতে সুন্দর হইবে, সেই রং ব্যবহার করা উচিত। সে জন্য প্রথম-প্রথম দুই একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়,—কোন্ মশলায় কোন্ রং ভাল খোলে।

চর্ব্বিহীন পমেটম

বিলাতে প্রস্তুত যে সব পমেটম এদেশে আমদানী হয়, তাহাদের প্রধান উপাদান চর্ব্বি; কারণ, চর্ব্বি সে দেশে খুব সুলভ ও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু গোরু বা শূকরের চর্ব্বিতে প্রস্তুত পমেটম এ দেশবাসী হিন্দু মুসলমানের স্পর্শযোগ্য নহে। সে জন্য চর্ব্বি দিয়া পমেটম প্রস্তুত করা এ দেশে বাঞ্ছনীয় নহে। চর্ব্বি না দিয়াও পমেটম প্রস্তুত করা যায়; কিন্তু তাহা চর্ব্বিযুক্ত পমেটমের মত অত উৎকৃষ্ট হয় না; তবে এক রকম কাজ চলিয়া যাইতে পারে। খুব একটা সহজ ফর্দ্দ দেখুন।

রিফাইন করা রেড়ির তৈল এক পোয়া; সাদা ধবধবে মোম (রিফাইন করা) দেড় ছটাক; গোলাপী আতর ৫ ফোঁটা; এবং অন্য যে কোন একটা আতর ১০ ফোঁটা। রং করিতে হইলে টিঞ্চার গ্রাস। Vapour bathএ মোম গলাইয়া তাহার সহিত ক্যাষ্টর অয়েল উত্তমরূপে মিশাইতে হইবে। ভালরূপে মিশানো না হইলে, ঠাণ্ডা হইবার পর যেখানে মোমের অংশ বেশী থাকিবে, সেখানটা কঠিন, আর যেখানে তেলের অংশ বেশী থাকিবে, সেখানটা নরম থাকিয়া যাইবে—সমস্ত জিনিসটি একই ভাবের হইবে না। মোম ও তেল বেশ মিশিয়া গেলে তাহার সঙ্গে রং মিশাইতে হইবে। রং মিশানো হইলে তেল ও মোম ঠিক মত মিশ্রিত হইয়াছে কি না, তাহা সহজে ধরিতে পারা যায়। এই সময়ে রংয়ের স্পিরিটের ভাগ উড়িয়া গিয়া রংটি তেলের সঙ্গে মিশিয়া যায়। ইহার পর পাত্রটিকে তাপ হইতে নামাইয়া কিছু শীতল হইতে দিবেন। একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া যাইবার পূর্ব্বেই গন্ধ-দ্রব্য মিশাইতে হইবে। গন্ধ মিশাইবার সময় এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে যে, তৈল ও মোমের মিশ্রণ খুব গরম থাকিতে-থাকিতে যদি গন্ধ মিশানো হয়, তাহা হইলে গন্ধ-দ্রব্য প্রায় volatile (উদ্বায়ী) বলিয়া অনেকটা গন্ধ বাষ্পাকারে উড়িয়া গিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে আর একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গেলে, মিশ্রটি জমিয়া যাইবে তাহার সঙ্গে গন্ধ ভালরূপ মিশিবে না। সেই জন্য মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করিতে হয়,—গন্ধও বেশী নষ্ট না হয় এবং ভাল করিয়া মিশানোও যায়।

ক্যাষ্টর অয়েলের পরিবর্ত্তে বাদাম তৈলও ব্যবহার করা যায়। নারিকেল তৈল গন্ধ ও বর্ণহীন করিয়া লইলে তাহাও ব্যবহার করা চলে। গন্ধদ্রব্যের মধ্যে চাঁপা, বকুল, চন্দন প্রভৃতি উগ্রগন্ধ আতরই পমেটমে ব্যবহার্য্য। বিলাতী পমেটমে হোয়াইট রোজ, বার্গমট, ভার্ব্বেনা প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। গোলাপ, মতিয়া, বেলা, চামেলী প্রভৃতির গন্ধ বড় মৃদু ও কোমল—পমেটমে ব্যবহার করা সুবিধাজনক নহে। প্রথম শ্রেণীর উগ্রগন্ধ আতরগুলি অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যের এবং অল্প পরিমাণে কাজ চলে। দ্বিতীয় শ্রেণীর মৃদুগন্ধ আতরগুলি মূল্যবান, এবং তাহা বেশী পরিমাণে ব্যবহার না করিলে গন্ধ ভাল খোলে না। কারণ, কেশ তৈলের অপেক্ষা পমেটম আতরের গন্ধ অনেকটা বেশী খাইয়া ফেলে।

এসেন্স

কেশ-তৈল ও পমেটমের ন্যায় আর একটা জিনিস সৌখিন নরনারীরা বেশী পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকেন। সে জিনিসটি এসেন্স। যে কোন রকম আতর বা অটোর সঙ্গে স্পিরিট মিশাইয়া এসেন্স প্রস্তুত হয়। আগে আমাদের দেশে আতরের চলন বেশী ছিল। ছেলেবেলায় আমরা আতরই ব্যবহার করিতাম। আজকাল দেখিতে পাই, আতর আর লোকে তেমন পছন্দ করে না। আতর অপেক্ষা এসেন্স ব্যবহার করা বেশী সুবিধাজনক মনে করিবার কারণ আছে। আতরে সুগন্ধটা ঘনীভূত অবস্থায় থাকে। আতরের গন্ধ সম্যকরূপে উপভোগ করিতে হইলে, আতরটিকে গায়ে একটু মৃদুভাবে মর্দ্দন

করিয়া লইতে হয়। তবেই আতরের গন্ধ-অণুগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া গন্ধ বিস্তার করিতে পারে। কিন্তু কে অত হাঙ্গাম করে। তদপেক্ষা আতরের সঙ্গে স্পিরিট মিশাইয়া লইলে মর্দ্দনের কাজটা স্পিরিটের সাহায্যেই সম্পন্ন হয়,—গন্ধের অণুগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকায় সহজে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে পারে। সেইজন্য আতর মাথার অপেক্ষা রুমালে অথবা চাদরে একটু এসেন্স ঢালিয়া দিলে অতি শীঘ্র গন্ধটা চারিদিকে বেশী পরিমাণে ছড়াইয়া পড়ে। তা'ছাড়া, স্পিরিটে দুই তিন রকম আতর একসঙ্গে মিশাইয়া লওয়া চলে। কিন্তু এসেন্স ব্যবহারের একটা অসুবিধাও আছে। এসেন্সের গন্ধ আতরের অপেক্ষা অল্পকাল স্থায়ী। আপনি একটা খুব ছোট্ট একটা তুলার মুটি (একটা মটরের আকারের) আতরে ভিজাইয়া তাহার উপর আর একটুখানি তুলা জড়াইয়া কাণে গুঁজিয়া রাখুন কিম্বা আপনার কোটের বুক পকেটের ভিতর রাখিয়া দিন। আর ঠিক ঐ পরিমাণে আতরের সঙ্গে যথা পরিমাণ স্পিরিট মিশাইয়া এসেন্স তৈয়ার করিয়া আপনার বন্ধুর চাদরে ঢালিয়া দিন। দেখিবেন, আপনার পকেট অপেক্ষা আপনার বন্ধুর চাদর হইতে গন্ধটা বেশী পরিমাণে বাহির হইবে বটে, কিন্তু প্রথমে স্পিরিটটি উড়িয়া যাইবে, এবং তাহার কিছুক্ষণ পরে আতরের গন্ধটুকুও উড়িয়া যাইবে। কিন্তু আপনার পকেট হইতে তিন চারি দিন পর্য্যন্ত গন্ধ বাহির হইতে থাকিবে।

আতর অপেক্ষা এসেন্সে খরচও বেশী পড়ে। আতরের মূল্যের উপর স্পিরিটের দাম আছে, এবং স্পিরিট জিনিসটা বিলক্ষণ দামীও বটে। তা' ছাড়া, গন্ধের স্থায়িত্বের হিসাবে আতর হইতে যতটা কাজ পাওয়া যায়, এসেন্স হইতে ততটা দাম আদায় হয় না। সে যাহা হউক, অল্প সময়ের জন্য হইলেও আতরের অপেক্ষা এসেন্স ব্যবহার করা যখন বেশী সুবিধাজনক, তখন লোকেও এসেন্স ব্যবহার করিবেই; মূল্যের তারতম্য কিম্বা উপকারিতার অল্পাধিক্য কেহই বুঝিবে না।

এইখানে এসেন্স কথাটির অর্থ ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া দরকার; কেন না, নানা স্থলে কথাটির নানা রকম অর্থ হয়। সাধারণ ভাষায় Essence কথাটির অর্থ সার-ভাগ। ইহাকেই ভিত্তি করিয়া প্রয়োগ ও ব্যবহার-ভেদে ইহার বিভিন্ন অর্থ হইয়াছে। কোন জিনিসের যেটুকু বিশেষত্ব, তাহা সেই জিনিসের Essence। প্রক্রিয়া বিশেষে কোন বস্তুর সার ভাগ বাহির করিয়া লওয়া হইলে তাহাকে Essence বলা হয়। কোন ফলের essence বলিতে প্রধানতঃ তাহার স্বাদ, কিম্বা কোন একটা বিশেষ গুণ বুঝায়। আবার ফুলের essence বলিলে প্রায় তাহার গন্ধ বুঝিতে হয়। এখানে আমরা এই শেষোক্ত অর্থেই essence কথাটি ব্যবহার করিতে যাইতেছি। কারণ, ফুলের গন্ধ লইয়াই এখানে আমাদের কারবার।

Essence কথাটির অর্থ পরিষ্কার হইল কি? আচ্ছা, দুই একটা দৃষ্টান্ত লইয়া আরও একটু পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা যাক। Essence of peppermint বলিলে কি বুঝিব? Peppermint গাছ হইতে মৃদু তাপে যে তৈল বা তৈলবৎ পদার্থটি চোয়াইয়া লওয়া হয়, তাহাই essence of peppermint। রাসায়নিক উপায়ে কোন কোন বস্তু হইতে চোয়াইয়া, কিম্বা শুধু তাপ-প্রয়োগে, অথবা জল কি অন্য কোন তরল পদার্থে দ্রবীভূত করিয়া কিছু বাহির করিয়া লইলেও তাহাকে essence বলা হয়। এইরূপ এসেন্স কখনও কখনও extract কিম্বা tincture নামেও অভিহিত হইয়া থাকে।

এ সকল গেল আভিধানিক ও রসায়ন-বিজ্ঞান-সম্মত অর্থ। কিন্তু কোন perfumerএর laboratoryতে essence কথাটি আর একটু বিভিন্ন রকম অর্থে প্রযুক্ত হয়। এখানে spirit বা alcoholএ কোন ফুলের আতরকে দ্রবীভূত করিয়া লইলে যে বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহাকেই এসেন্স বলে; এবং বাজারেও এই অর্থেই এই কথাটি প্রচলিত। এসেন্স কথাটি লইয়া এখানে যে একটু ঘাঁটাঘাঁটি করিতে হইল, তাহার কারণ, ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় গন্ধ-দ্রব্য সম্বন্ধে যে সমস্ত পুস্তক পাওয়া যায়, তাহাতে essential oils, ottos, essence, প্রভৃতি কথাগুলি বড় গোলমেলে ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। ফার্ম্মাকোপিয়া বা ঔষধ প্রস্তুত বিষয়ক গ্রন্থেও essence, extract প্রভৃতি কথার বহু প্রকার ব্যবহার আছে, এবং তাহাদের অর্থও আবার নানা রকম। আবার essence নামে অনেক প্রকার রসনার তৃপ্তিকর পানীয়ও প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হয়।

আর একটা কথা। কেবল ফুলের গন্ধের কথা বলিতেছি বটে, কিন্তু গন্ধ-দ্রব্য কেবল মাত্র ফুল হইতে আহৃত হয় না; তবে প্রধানতঃ উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে সংগৃহীত হয় বটে। উদ্ভিজ্জ ছাড়া, যে সব গন্ধ-দ্রব্য আছে তন্মধ্যে আমাদের দেশে মৃগনাভি ও খট্টাস প্রধান। এ দুইটী জৈব পদার্থ। Ambergris নামে বিলাতী এক প্রকার গন্ধদ্রব্য আছে। তাহা তিমি মাছের দেহ হইতে উৎপন্ন হয়। আর আফ্রিকা দেশজাত এক জাতীয় বিড়ালের দেহ হইতে civet নামক এক প্রকার জৈব গন্ধদ্রব্য সংগৃহীত হয়। এই চারি প্রকার জৈব গন্ধদ্রব্য ছাড়া, প্রায় সমস্ত গন্ধদ্রব্যই উদ্ভিদ হইতে জাত। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি গাছের মূল হইতে উৎপন্ন হয়, যেমন iris। কোনটী কাষ্ঠ হইতে পাওয়া যায়, যেমন চন্দন। কোনটী ফুল হইতে সংগৃহীত হয়, যেমন গোলাপ। কোনটী বীজ হইতে, যথা, tonquin bean। কোনটী গাছের ছাল হইতে, যথা, দারুচিনি। আবার কোন কোন গাছের বিভিন্ন অংশ হইতে ভিন্ন ভিন্ন রকমের গন্ধদ্রব্য পাওয়া যায়। কমলা লেবুর ফুল হইতে নিরোলি আতর উৎপন্ন হয়। কমলা লেবুর গাছের পাতা হইতে যে গন্ধদ্রব্য বাহির হয় তাহার নাম petit grain। আর কমলা লেবুর খোসা হইতে essential oil of orange বা Portugal নামক গন্ধদ্রব্য সংগৃহীত হয়। গাছের যে অংশ হইতেই গন্ধদ্রব্য সংগৃহীত হউক না কেন, প্রধানতঃ তাহা উদ্বায়ী তৈল জাতীয় পদার্থ। তৈল জাতীয় ও উদ্বায়ী বলিয়াই গন্ধ আপনাকে বায়ুমণ্ডলে ছড়াইয়া বিলাইয়া দিতে পারে, এবং আমাদের নাসিকার তৃপ্তিসাধন ও মন-প্রাণ প্রফুল্ল করিতে পারে। স্পিরিট তাহাকে এ বিষয়ে কিছু বেশী সাহায্য করে মাত্র।

এসেন্সের কথায় অনেক কথা বলিবার আছে। এবার মাত্র গৌরচন্দ্রিকা করিয়া রাখিলাম। বারান্তরে আসল পালা গাহিতে চেষ্টা করিব।

সম্পাদকের বৈঠক

প্রশ্ন

১। গৌরচন্দ্রিকা (পূর্ব্বভাব বা ভূমিকা) কোন্ ভাষার শব্দ? তাহার অন্য কোন অর্থ আছে কি? তাহার ব্যুৎপত্তি কি?

শ্রীসরযূপ্রসাদ পাঠক, কাব্যতীর্থ

২। বাঁকুড়ার একজন বিচক্ষণ ডাক্তারের কাছে সেদিন শুনিলাম যে, জনৈক সম্ভ্রান্ত উকীলের একমাত্র পুত্রকে এক বিষাক্ত সর্পে দংশন করিলে, স্থানীয় বহু প্রবীণ ডাক্তার, বৈদ্য এবং ওঝার দ্বারা চিকিৎসাতেও কোন ফল না হইয়া রোগী যখন মৃতকল্প, এমন সময় এক অপরিচিত মহানুভব ব্যক্তি রুদ্রজটা ও পণ্ডিত-গরুড় এই দুইটী গাছের পাতার রস সেবন করাইয়া, ২৩ ঘণ্টার মধ্যে ঐ রোগীকে আরোগ্য করিয়াছিলেন। কেহই ঐ গাছগুলি মনোযোগ করিয়া দেখেন নাই। রোগীর আরোগ্য লাভের পর ঐ নাম দুইটী জানা গিয়াছিল, এবং পণ্ডিত-গরুড় গাছ মাটীর টবে লাগানো যায় তাহাও জানা গিয়াছিল। জিজ্ঞাস্য এই যে, রুদ্রজটা ও পণ্ডিত-গরুড় গাছ দেখিতে কি কি প্রকার, এবং ঐ গাছ দুইটীর অপর সাধারণ নাম কি আছে? এবং তাহা কোথায় জন্মে।

শ্রীশশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় (এম-এ, বি-এল)

৩। সূর্য্য অস্ত যাইবার সময় আকাশে বর্ণের যে বিচিত্র সমাবেশ হয়, পৃথিবীর কাজে তাহা কতটুকু আসে? উক্ত বর্ণ-সমাবেশ-জনিত সৌন্দর্য্যের কথা কবি ও সাহিত্যিক প্রভৃতিরা ঢের লিখিয়া থাকেন; আর্টের আলোচকরাও সে সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে কম নাড়া-চাড়া করেন না। সে সকল কথা এ প্রশ্নটির উত্তরে দরকারে লাগিবে না। লাগিবে—বিজ্ঞান কি বলে—তাহাই। বিভিন্ন প্রকারের বিজ্ঞান বলে যে, রৌদ্র বিস্তর বৈজ্ঞানিক ও অপরাপর কাজে লাগে। ঠিক্ সেই হিসাবে, সূর্য্যাস্তের সময় বর্ণের ঐ বিচিত্র সমাবেশ কোন্-কোন্ বৈজ্ঞানিক ও অপরাপর কাজে লাগে? কেবল খাঁটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়া কেহ অনুগ্রহ পূর্ব্বক সাধ্যমত বিস্তারিত উত্তর দিলে উপকৃতা হইব।—

শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা

৪। স্রোতস্বিনী গঙ্গা সম্বন্ধে কোন মেয়েলী গল্প কাহারও জানা থাকিলে প্রকাশ করিবেন। গল্পটী পুস্তক লিখিত হইলে চলিবে না।

৫। নারিকেল তৈল, চুণ ও সাজিমাটীর কিরূপ পরিমাণে কাপড় খুব পরিষ্কার হয়। সাবান কি উপায়ে সাদা হইবে? শ্রীকালীপদ সরকার

৬। রামচন্দ্রের অনুষ্ঠিত পূজাই আশ্বিন মাসের দুর্গাপূজা, এবং এই

পূজাই বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রচলিত। কিন্তু বাঙ্গালাদেশে দেবীপুরাণ, কালিকাপুরাণ ও বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ—এই ত্রিবিধ পুরাণ-মতে পূজার প্রচলন দেখা যায়। রামচন্দ্রের অনুষ্ঠিত পূজায় এই ত্রিবিধ মত দৃষ্ট হইবার কারণ কি? রামচন্দ্র তবে কোন্ মতে পূজা করিয়াছিলেন?

৭। পুনর্ব্বিবাহ উপস্থিত হইলে স্বামী-স্ত্রীতে দেখা-শুনা নিষিদ্ধ। দেখিলে না কি উভয়ের মধ্যে উত্তরকালে মনোবাদের সূত্রপাত হয়। এই কিংবদন্তীর মূলে বৈজ্ঞানিক বা পৌরাণিক কোন কারণ আছে কি না?

৮। মাঘমাসে মূলা না খাইবার কারণ কি? বৈজ্ঞানিক ও পৌরাণিক কারণ সহ জানাইলে সবিশেষ বাধিত হইব।

৯। কোন কোন জিলার লোকের কালাশৌচের কাল পর্য্যন্ত খড়ম পায়ে দেওয়া, কাঁসার পাত্রে আহারাদি করা এবং নারায়ণ পূজা ভিন্ন অন্যান্য পূজা করিবার অধিকার নাই। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় কোন প্রমাণ আছে কি না? না কি উহা কেবল দেশাচার মাত্রে পর্য্যবসিত?

১০। ভাদ্র বিশেষতঃ পৌষ ও চৈত্র মাসে বিবাহ হইতে দেখা যায় না। এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক বা পৌরাণিক কোন যুক্তি আছে কি না?

১১। উক্ত তিন মাসে স্ত্রীলোকের যাতায়াত দেখা যায় না। ইহার ভিত্তি কোথায়? শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

১২। বর্ষার জলে কিম্বা লোহার দাগে কাপড়ে যদি হলদে দাগ হয়, তাহা হইলে তাহা উঠাইবার উপায় কি?

১৩। কোন কঠিন রোগ বশতঃ দাঁত যদি নড়ে, কিম্বা দাঁতের উপর ময়লা দাগের মত পড়ে, তাহা হইলে কোণ সহজ নিয়ম পালন করিলে কি তাহার নিবারণ হইতে পারে? শ্রীমতী নিরুপমা দেবী

১৪। কোন সদনুষ্ঠান অথবা শুভকর্ম্মে হিন্দু নারীগণ হুলুধ্বনি করিয়া থাকেন, ইহার কারণ কি? শাস্ত্র অথবা পুরাণে এরূপ কোন ব্যবস্থা আছে কি?

১৫। 'যত দোষ নন্দ ঘোষ' কথাটার তাৎপর্য্য কি?

১৬। দালানে চুণ-বালির কাজ (white-washing) না করিলে অথবা অধিক দিনের পুরাতন দালানের গাত্র ভেদ করিয়া অনেক সময় অনেক বট অশ্বত্থ প্রভৃতি নানা গাছ জন্মিতে দেখা যায়, উহাতে দালানের যথেষ্ট ক্ষতি করে। ঐ গাছ সকল বারবার কাটিয়া দিলেও পুনরায় উ। ডাল-পালা ছাড়িয়া বড় হইয়া উঠে। চুণ-বালির কাজ না করিয়া এমন কোন উপায় আছে কি, যাহা দ্বারা উক্ত ক্ষতির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়?

১৭। মশারি দ্বারা মশার উপদ্রব হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়; কিন্তু বিছানায় ছারপোকা হইলে উহার উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার কোন উপায় আছে কি?

১৮। অনেক সময় পরিশ্রম করিলে অথবা মস্তিষ্ক পরিচালন না করিলে চোখে ঝাপসা দেখা যায়। উহার কোন বৈজ্ঞানিক কারণ আছে কি? শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

১৯। বরফ তৈয়ারীর কি কোন সহজ ও অল্পব্যয়সাধ্য উপায় আছে? যদি থাকে তাহা কি? (কোন কাগজে পড়েছিলাম যে, একটী পাত্রে খুব Weak solution of sulphuric Acid রেখে, তন্মধ্যে অন্য একটী জলপূর্ণ পাত্র রাখিয়া Acidপূর্ণ পাত্রে একটু Glauber's Salt দিলে ২।৪ মিনিটে বরফ হয়। আমি নানারূপে নানা ভাগে Acid ও Glauber's Salt দিয়ে বরফ জমাতে পারি নাই।)

২০। চুয়াডাঙ্গার নিম্ন দিয়া যে মাথাভাঙ্গা নদী প্রবাহিত হ'য়ে যাচ্ছে, তার জলে (যেখানে বেশী শেওলা আছে) আইওডোফরমের গন্ধ পাওয়া যায় কেন? শেওলাতে কি Iodoform আছে? যদি থাকে, কোন উপায়ে চোলাই করিয়া লওয়া যায় কি? ১৯০২ সালে বাঙ্গালা দেশে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের সংখ্যা ছিল ১৩০০। এখন কত?

শ্রীচণ্ডীচরণ বিশ্বাস

২১। এতদঞ্চলে (মধুনগর, রাজসাহী) দাঁড়াচ নামে এক রকম কাল রংএর সাপ প্রায়ই গরুর পিছনের 'পা জড়িয়ে ধ'রে বাঁট থেকে দুধ খেয়ে যায়। তাতে করে গরুর বাঁট এমন ক্ষত-বিক্ষত হয় যে, আর দোহন করবার কোন উপায় থাকে না। মোট কথা, সাপের এই উপদ্রব নিবারণ না করতে পারলে, দুধ পাওয়ার আশা করা বৃথা। কিন্তু ইহার প্রতিকারের উপায় কি? শ্রীদলীলউদ্দিন মোল্লা

২২। বাঙালী বিবাহিতা নারীর সিঁথিতে সিন্দূর পরিবার তাৎপর্য্য কি? ইহার কোন শাস্ত্রীয় যুক্তি আছে কি না। কতদিন হইতে এই প্রথা এদেশে চলিয়া আসিতেছে? লৌহবলয় সম্বন্ধেও কোন যথার্থ কারণ আছে কি না? সম্প্রাত আমি ২১১টী বাঙালী হিন্দু পরিবারে বিবাহিতা নারীকে সিন্দূর ও লৌহবলয় শূন্য দেখিয়াছি। তাঁহারা বলেন, "সিন্দূর ও লৌহবলয় ব্যবহার বাহুল্য মাত্র।" শ্রীরতনমালা দেবী

২৩। পল্লীগ্রামে দশহরার দিন ঘরের গৃহিণীরা কাঁঠালের রোয়া পাতি নেবু আর উচ্ছে খণ্ড খণ্ড করিয়া একত্রে সকলকে খাইতে দিয়া থাকেন কেন?

২৪। নষ্টচন্দ্রের দিন চাঁদ দেখিলে কলঙ্কিত হইবার ভয় থাকে কেন

২৫। গৃহিণীরা দুধে নুন দিয়া খেতে দেন না। ইহার কারণ কি?

২৬। রিণ্যাল্ কলিক্ পেন্ আক্রান্ত ব্যক্তির আশু যন্ত্রণার উপশম হয় এবং প্রস্রাব বৃদ্ধি করে এমন কোন টোট্‌কা জানা থাকলে কেহ দয়া করে জানাবেন কি? শ্রীবিশ্বরঞ্জন কুণ্ডু

উত্তর

সূতার নম্বর

কার্পাস নির্ম্মিত সূতার নম্বর কিরূপে নির্ণয় করিতে হয়, নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া গেল।—

১২০ গজ পরিমিত সূতার নাম এক লী (Lea)

৭লী অর্থাৎ ৮৪০ গজে এক হ্যাঙ্ক (Hank)

যত হ্যাঙ্কের ওজন এক পৌণ্ড, সূতার নম্বর তত বুঝিতে হইবে।

মনে করুন, এক হ্যাঙ্কের অর্থাৎ ৮৪০ গজের ওজন ১ পৌণ্ড; সূতার নম্বর হইবে ১। ৬ হ্যাঙ্ক অর্থাৎ ৫০৪০ গজের ওজন ১ পৌণ্ড হইলে, সেই সূতার নম্বর ৬; ১০ হ্যাঙ্ক অর্থাৎ ৮৪০০ গজের ওজন ১ পৌণ্ড হইলেও, সেই সূতার নম্বর ১০; ১০০ হ্যাঙ্ক অর্থাৎ ৮৪০০০ গজের ওজন ১ পৌণ্ড হইলে সেই সূতার নম্বর ১০০; এইরূপ বুঝিতে হইবে।—

৭০০০ গ্রেণে ১ পৌণ্ড হয়। তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে, যত লীর ওজন ১০০০ গ্রেণ, সূতার নম্বর তত। কোনও সূতার নম্বর জানিতে হইলে বাণ্ডিল অথবা "টোকা" হইতে কিয়দংশ লইয়া তাহা মাপিয়া ওজন করিতে হইবে। মাপ গজে ও ওজন গ্রেণে থাকিবে। মনে করুন, মাপ ১৫ গজ ও ওজন ৫ গ্রেণ। ১৫ গজে হইল $\frac{১৫}{১২০}$ লী। $\frac{১৫}{১২০}$ লীর ওজন ৫ গ্রেণ হইলে, কত লীর ওজন ১০০০ গ্রেণ হইবে?

অর্থাৎ ৫:১০০০::$\frac{১৫}{১২০}$:লী

$$লী = \frac{১০০০ \times ১৫}{১২০ \times ৫} = ২৫$$

এই সূতার নম্বর বুঝিতে হইবে ২৫। কেন না, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যত লীর ওজন ১০০০ গ্রেণ, সূতার নম্বর ৩০।

এইরূপ ১ হইতে ২০০ নম্বর পর্য্যন্ত সূতা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ২০০ নম্বরের অধিকও হয়, কিন্তু বিরল। উপরি-প্রদর্শিত অঙ্কে ভাগ-ফলে ভগ্নাংশ থাকিলে, অর্দ্ধ নম্বর করিবার রীতি আছে। যেমন ভাগ ফলে ২৫.৫৬ হইলে নম্বর হইবে ২৫½।

ভারতবর্ষীয় মিলের সাধারণ কাপড়ে ২২ নম্বরের "টানা" ও ২৬ নম্বরের "পড়েন" থাকে। তদপেক্ষা কিছু সূক্ষ্ম কাপড়ে ৩২ নম্বরের "টানা" ও ৪০ নম্বরের পড়েন থাকে।

আমাদের পরিধেয় বিলাতী কাপড়ে ৬০ ও তদূর্দ্ধ নম্বরের সূতা থাকে। রেলীব্রাদারের প্রসিদ্ধ ৪১ নম্বরের থান ৬০ নম্বরের সূতায় প্রস্তুত। উঁচু নম্বরের সূতা ভারতবর্ষে প্রায় প্রস্তুত হয় না। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে কুণ্ডু মিলের শাড়ী বাংলা দেশে যথেষ্ট বিক্রীত হইত। এখন ওরূপ কাপড় হয় না কেন? ভারতবর্ষে ঐরূপ কাপড় প্রস্তুত হইতে এখনও অনেক সময় লাগিবে। এ সম্বন্ধে অধিক না বলাই শ্রেয়ঃ।

শ্রীজয়চন্দ্র সান্যাল

এণ্ডি রেশম পালন

এণ্ডি পোকার গুটী (cocoon) হইতে প্রজাপতি বাহির হইয়া সাধারণতঃ ৭ হইতে ১৫ দিন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। প্রজাপতির আহার্য্য দ্রব্য কি তাহা জানি না, কিন্তু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, প্রজাপতি গুটী (cocoon) হইতে বাহির হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত কিছুই খায় না। দিনের বেলা বসিয়া থাকে, বিকাল বেলা ৮টার পর হইতে ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়ায়।

প্রজাপতি গুটী (cocoon) হইতে বাহির হইয়া পালক শুকনা ও সম্পূর্ণ রূপে প্রসারিত না হওয়া পর্য্যন্ত বসিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ জাতি চিনিয়া লইতে হয়। স্ত্রীজাতীয়গুলি বড় ও লম্বা; কিন্তু পুরুষ জাতীয়গুলি ছোট ও খর্ব্ব; দেখিলেই সহজে চেনা যায়। স্ত্রী ও পুরুষ জাতীয় প্রজাপতি একটী পরিষ্কার টুক্‌রী (Basket)তে পুরিয়া রাখিতে হয়; এবং উহার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়, যেন প্রজাপতি বাহির হইয়া চলিয়া না যায়। পর দিন প্রাতে টুক্‌রীর মুখ খুলিয়া দেখিতে পাইবে, স্ত্রী ও পুরুষ জাতিয় প্রজাপতিরা জোড় লাগিয়া রহিয়াছে। এই ভাবে সেই দিন বেলা ২টা পর্য্যন্ত থাকিতে দিয়া পরে পুরুষ জাতীয় প্রজাপতিকে পৃথক করিয়া ফেলিয়া দিবে; অন্যথায় বেশী সময় থাকার জন্য ডিম ভাল হয় না। স্ত্রী জাতিয় প্রজাপতিগুলিকে একটী টুক্‌রী (Basket)তে রাখিয়া টুক্‌রির মুখ বন্ধ করিয়া দিবে, যাহাতে উড়িয়া চলিয়া যাইতে না পারে। পরদিন প্রাতে টুক্‌রী খুলিলে দেখিতে পাইবে, টুক্‌রীর গায়ে ডিম পাড়িয়া রাখিয়াছে। ডিমগুলি একটী কাঠি বা অঙ্গুলির দ্বার যত্নপুর্ব্বক বাহির করিয়া একখানা পরিষ্কার নেকড়ায় পুঁটলী বান্ধিয়া ঘরের মেঝেয় ঝুলাইয়া রাখিয়া দিতে হয়। দ্বিতীয় দিনের ডিমও সংগ্রহ করিয়া লওয়া যায়। তাহার পর যে সব ডিম পাড়িবে, উহা ফেলিয়া দিতে হয়; কারণ, ঐ ডিম হইতে যে পোকা হয়, তাহা ভাল হয় না। ডিম সংগ্রহের পর প্রজাপতিকে ফেলিয়া দিবে; কারণ, উহা রাখার আবশ্যকতা নাই, কিছুদিন পরে প্রজাপতি মরিয়া যাইবে।

ডিম হইতে ৭ দিন হইতে ১৫ দিন মধ্যে পোকা বাহির হয়। চতুর্থ দিনের পর প্রত্যহ প্রাতে ও বিকালে একবার ডিম খুলিয়া দেখা আবশুক। ডিম হইতে যখন পোকা বাহির হইতেছে কিম্বা হইয়াছে দেখিতে পাইবে, সে সময় পুঁটলীর নেকড়া সহ একখানা বাঁশের ডালায় রাখিয়া কোমল ভেরেণ্ডা (এরণ্ড) পাতা ঐ পোকার উপর রাখিয়া দিবে। পোকা সকল ক্রমশঃ পাতায় উঠিয়া যাইবে ও পাতা খাইতে আরম্ভ করিবে।

আমাদের বঙ্গদেশে ঘরে-ঘরে আসামের ন্যায় এণ্ডির সূতা প্রস্তুত করিয়া স্বীয়-স্বীয় ব্যবহারের উপযোগী কাপড় বুনাইয়া অনেকে শীত-বস্ত্রের অভাব সহজে মোচন করিতে পারেন। ইহা বিশেষ পরিশ্রম বা কষ্টসাধ্য কাজ নহে। স্ত্রী, পুরুষ ও ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে পর্য্যন্ত সকলেই নিজ-নিজ অবসর মত এণ্ডি পোকা প্রতিপালন করিতে পারেন। বিশেষতঃ দরিদ্র গৃহের মেয়েদের জীবিকা নির্ব্বাহের ইহা একটী সহজ ও সুন্দর উপায়। দৈনিক গৃহকর্ম্ম করিয়া অবসর মত এণ্ডি পোকা প্রতিপালন করা যায়, বিশেষ কষ্টের কিছুই নহে। আমি নিজ হস্তে বিশেষ যত্ন-সহকারে পোকা পালন করিয়াছি ও ঐ এণ্ডির যে সূতা আমি নিজ হাতে কাটীয়াছি তাহা খুব সরু সূতা বলিয়া আমার আসামের বন্ধুবর্গও মুক্তকণ্ঠে তাঁহাদের কাটা সূতা হইতেও সরু হইয়াছে বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে বাংলার প্রতি জেলাবোর্ড ও লোকেল বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা প্রতি ঘরে-ঘরে এণ্ডি পোকার প্রতিপালন, প্রচার ও সহানুভূতি করিলে, দেশের দরিদ্রদিগের একটী অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। আমি এইজন্য এ দিকে দেশের নেতৃবর্গের করুণা-দৃষ্টি আকর্ষন করিতেছি।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ডাক্তার

আদি দম্পতি

শিল্পী—ম্যাক্স পীস্‌মান

BHARATVARSHA HALFTONE & PTG. WORKS

খদ্দরের কাপড়ে রংয়ের ছাপ

সমস্ত কাপড়ে কালর স্থায় সমস্ত রংএর ছাপা দেওয়া যাইতে পারে। উহা কালর ন্যায়ই স্থায়ী হইয়া থাকে। এইরূপ কার্য্য লাহোরে বহু পরিমাণে হইয়া থাকে। কাঠের ছাপ লাহোরেই পাওয়া যায়।

ছুলীর ঔষধ

গোরস্তণের (মধ্যবঙ্গে ইহাই চলিত নাম) পাতার রস প্রতি দিন ২।৩ বার, সপ্তাহখানেক "ছুলির" স্থানে মর্দন করিলে, দাগ অক্ষুণ্ণ রূপে মিলাইয়া যায়। আমি নিজে ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছি। শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়

হলসঞ্চালন ও শকটযোজন

ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ স্বহস্তে লাঙ্গল ধরিয়া ভূমিকর্ষণ ও শকটযোজন করিতে পারেন না। তবে কৃষিকার্য্য ও পশুপালন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। কৃষিকার্য্য, পশুপালন এবং ব্রাহ্মণদের সেবা করিবার জন্যই বিধাতা শূদ্রগণের সৃষ্টি করিয়াছেন। যথা :—

"অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ ॥
প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ ॥
পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিক্‌পথং কুসিদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ ॥
একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া ॥ মনু

উক্ত শ্লোকগুলি পর-পর আবৃত্তি করিলে সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, অধ্যাপন (Act of teaching) অধ্যয়ন (Study) যজন, যাজন (offering sacrifices on own behalf and others) দান (gift) ও প্রতিগ্রহ (acceptance) এই ছয়টী ব্রাহ্মণদিগের জন্য, প্রজারক্ষণ, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন এবং ভোগশক্তির পরিবর্জ্জন—এ কয়েকটী ক্ষত্রিয়ের জন্য, পশুরক্ষণ, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য (Commerce), কৃষিকর্ম্ম (Husbaudry) ইত্যাদি—বৈশ্যদিগের জন্য এবং অখিন্ন চিত্তে উপরিউক্ত তিন বর্ণের সেবা করা শূদ্রগণের প্রধান কর্ত্তব্য, ইহাই লোক-পিতামহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা ;—

দানমধ্যয়নং যজ্ঞো ব্রাহ্মণস্য ত্রিধা মতঃ।
নাস্যশ্চতুর্থো ধর্ম্মোঽস্তি ধর্ম্মস্তস্যাপদং বিনা ॥
যাজনাধ্যাপনে শুদ্ধে তথা পূতপ্রতিগ্রহঃ।
এষা সম্যক্ সমাখ্যাতা ত্রিবিধা চাস্য জীবিকা ॥
দানমধ্যয়নং যজ্ঞ ক্ষত্রিয়স্যাপ্যয়ং ত্রিধা।
ধর্ম্মঃ প্রোক্তঃ ক্ষিতে রক্ষা শস্ত্রাজীবশ্চ জীবিকা ॥
দানমধ্যয়নং যজ্ঞো বৈশ্যস্যাপি ত্রিবৈধ সঃ।
বাণিজ্যং পশুপাল্যঞ্চ কৃষিশ্চৈবাস্য জীবিকা ॥
দানং যজ্ঞোঽথ শুশ্রূষা দ্বিজাতীনাং ত্রিধা মম।
ব্যাখ্যাতঃ শূদ্রধর্ম্মোঽপি জীবিকা কারুকর্ম্ম চ ॥
তদ্বদ্দ্বিজাতিশুশ্রূষা পোষণং ক্রয়-বিক্রয়ৌ।
বর্ণধর্ম্মাস্ত্বিমে প্রোক্তাঃ শ্রূয়স্তাং চাশ্রমাশ্রয়াঃ ॥ মার্কণ্ডেয় পুরাণ

এখন বুঝিতে হইবে যে, যাহা যে বর্ণের জীবিকা তাহা ব্যতীত অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিলেই ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। যথা :—

সবর্ণধর্ম্মাৎ সংসিদ্ধিং নরঃ প্রাপ্নোতি ন চ্যুতঃ।
প্রয়াতি নরকং প্রেত্য প্রতিষিদ্ধানিষেবণাৎ ॥ মার্কণ্ডেয় পুরাণ

যদি স্ব স্ব বৃত্তি দ্বারা জীবিকা না চলে, তবে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম শস্ত্রধারণাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। তদভাবে বৈশ্যকর্ম্ম পশুপালন, কৃষি-বাণিজ্যাদিতে রত হইবেন। ক্ষত্রিয়ও বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবেন, পরন্তু কদাচ শূদ্রের বৃত্তি দাসত্বে রত হইবেন না। যদি কোনরূপে কোন উপায় থাকে তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শূদ্রের কর্ম্ম অবলম্বন করিবেন না; কিন্তু উপায়ান্তর বিদ্যমান না থাকিলে বাধ্য হইয়া শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবেন। যথা :—

"ক্ষাত্রংকর্ম্ম দ্বিজস্যোক্তং বৈশ্যকর্ম্ম তথাপদি।
রাজন্যস্য চ বৈশ্যোক্তং শূদ্রকর্ম্মন বৈ তয়োঃ।
সামর্থ্যে সতি তৎ ত্যাজ্যমুভাভ্যামপি পার্থিব।
তদেবাপদি কর্ত্তব্যং ন কুর্য্যাৎ কর্ম্ম সঙ্করম ॥ বিষ্ণু

অতএব বৈশ্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়—ইঁহারা উভয়েই হিংসাবহুল গবাদি—পশ্বধীন কৃষি কার্য্য যত্নতঃ পরিত্যাগ করিবেন। যদিও কেহ কেহ কৃষিংজীবিকার প্রশংসা করিয়া থাকেন—"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষি-কর্ম্মনি" (Fortune resides in commerce) ইত্যাদি-ইত্যাদি, তথাপি ইহা সজ্জননিন্দিত; কারণ এতদ্রূপলক্ষে হল-কুদ্দালাদি সঞ্চালন দ্বারা ভূমিস্থিত বহু প্রাণীর প্রাণনাশ সম্ভাবনা। এই প্রাণি হিংসাই একমাত্র মহাপাতকের নিদান। যথা :—

"অহিংসা সমতো তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্‌বিধাঃ ॥" গীতা

নিজবৃত্তির অসম্ভাবনা ঘটিলে এবং ধর্ম্মনিষ্ঠার ব্যাঘাত হইলে, নিষিদ্ধ-বস্তুর পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক বৈশ্যের বিক্রেতব্য বস্তুজাত বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন।*

এখন আমাদের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, স্বহস্তে হলসঞ্চালন ও শকটযোজন করিতে হইলে প্রাণি হিংসা করা, অথবা প্রাণিকে ক্লেশ দেওয়া হয়, যাহা সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্র-অসঙ্গত। যথা :—

"হিংসাপ্রায়াং পরাধীনাং কৃষিং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ
কৃষিং সাধিবতি মন্যন্তে সা বৃত্তিঃ সদ্বিগর্হিতা।
ভূমিং ভূমিশয়াংশ্চৈব হন্তি কাষ্ঠময়োমুখম ॥ মনু

সুতরাং স্পষ্টই অনুভব করা যাইতেছে যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ স্বহস্তে হলসঞ্চালন ও শকটযোজন করিতে পারেন না। পরন্তু ভৃত্যদ্বারা

করাইয়া লইতে পারেন ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্র সঙ্গত। জানিনা প্রশ্নকর্ত্তা ইহাতে সন্তুষ্ট হইবেন কি না? পাঠকবর্গের প্রতি আমার বিনিত নিবেদন এই যে ভুল ভ্রান্তি যেন তাঁরা নিজগুণে সংশোধন করিয়া কৃতার্থ করেন।

শ্রীঅতুল্যকুমার ঘোষ

মাঘ মাসের ৫ হইতে ১১নং পর্য্যন্ত প্রশ্নের উত্তর

বর্ত্তমানে এতৎসম্বন্ধে কোন পুস্তক আছে বলিয়া মনে পড়ে না। তবে শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সান্যালের বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ও রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে (কাশীনাথ চৌধুরী কৃত) সামান্য বিবরণ আছে। বাংলাদেশের একমাত্র সংস্কৃত ইতিহাস "লঘুভরাত", বারেন্দ্র কুলগ্রন্থ হইতে এবং রাজসাহী ও পাবনা জেলার জমীদারবর্গের দলীলাদি হইতে অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। আমি এতদ্বিষয়ে বহুদিন হইতে ইতিকথা সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছি।

সাঁতৈল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দামনাশের শিখাই সান্যাল। ইনি প্রথম গৌড়-বাদশাহ সামসুদ্দিনের নিকট বিল চলনের দক্ষিণ একলক্ষ বিঘা জমীর জায়গীর ও উপাধি খাঁ সাহেব দ্বারা ভূষিত হইয়া একজন সেনাপতি পদে নিযুক্ত হন।

বাংলা ১১১৭ সালে (১৭১০ খৃঃ) সাঁতৈলরাজ রামকৃষ্ণের পত্নী সর্ব্বাণীর মৃত্যু হইলে তাঁহাদের একমাত্র উত্তরাধিকারী কৃষ্ণরামের ভ্রাতুষ্পুত্র বলরাম জন্মান্ধ ও বধির উল্লেখে জমিদারী কার্য্য পরিচালনে অসমর্থ বলিয়া ঐ বিস্তীর্ণ জমিদারীর ভার তৎকালিন একমাত্র সমর্থ (নাটোরে) রঘুনন্দনের হস্তে পতিত হয়।

প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসর কাল এই রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল।

সাঁতৈল রাজারা বাংলার দ্বাদশ ভৌমিকের এক ভৌমিক ছিলেন।

হরিপুরের চৌধুরীরা সাঁতৈলের কোনদিন সামন্ত ছিলেন বলিয়া জানা যায় নাই। ১৩৫৬ খৃষ্টাব্দে এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।

নাটোরের রাইরাঁইয়া রঘুনন্দনের চক্রান্তে যখন রাণী সর্ব্বাণীর মৃত্যুর পর বলরাম চৌধুরী সাঁতৈলের জমীদার সেই সময় মহম্মদ রেজা খাঁ সাঁতৈল রাজধানী আক্রমণ করতঃ দেশ পুরুষ-শূন্য করিয়াছিলেন। তজ্জন্য এখনও ঐ যুদ্ধক্ষেত্রের নাম "ভাতার মারির মাঠ" নামে পরিচিত।

জলযুদ্ধ হইয়াছিল বটে। কিন্তু রাজার প্রাণবিয়োগ তাহাতে হয় না। বলরাম চৌধুরীর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়। জলযুদ্ধে তৎকালীন এক মিরজাফর মহেশ্বর রায় (চাটমোহর) সাঁতৈল সৈন্য কর্ত্তৃক নিহিত হয়।

১১। হরিপুরের রামদেব চৌধুরী সাঁতৈল রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। রেজাখাঁর আক্রমণকালে সাঁতৈলের বিগ্রহ ও গুপ্তধন তিনি না কি হরিপুরে লইয়া গিয়াছিলেন। আজও সাঁতৈলের বিগ্রহ আছে। এই রামদেব চৌধুরী হরিপুরের চৌধুরী জমিদারের আদি পুরুষ। রামদেবের কার্য্য গুছাইয়া লইবার পর সাঁতৈলের আর কোন অস্তিত্ব থাকে না।

শ্রীনৃত্যগোপাল রায়

মিশরেশ্বরের কবরে

শ্রীনরেন্দ্র দেব

লর্ড কার্ণারভন্ এবং শ্রীযুক্ত হাওয়ার্ড কার্টার মিশরের অষ্টাদশ নরপতি মহারাজ তুতুনখামনের সমাধি-কক্ষ ও তদভ্যন্তরে সুরক্ষিত মিশরের যে অতুলনীয় রাজ-ঐশ্বর্য্য আবিষ্কার করেছেন, তাই নিয়ে পুরাতত্ত্ববিদের জগতে একটা মহা হৈ চৈ পড়ে গেছে! য়ুরোপ, আমেরিকা এমন কি ভারতবর্ষেরও অনেক কাগজে এ সম্বন্ধে প্রতিদিন বিশদ আলোচনা চল্‌ছে।

প্রায় ষোলবৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় এবং অসাধারণ পরিশ্রমের ফলে মিশর ইতিহাসের তিনসহস্র বৎসর পূর্ব্বের যে পৃষ্ঠা আজ জগতের সমক্ষে উন্মোচিত হ'য়েছে, তার অপূর্ব্ব পরিচয় পেয়ে বিংশশতাব্দীর সভ্যতাভিমানী পাশ্চাত্য দেশ বিপুল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছে! লর্ড কার্ণারভন্ এবং তাঁর সহকারী মার্কিণ যুবক হাওয়ার্ড কার্টার ষোল বৎসর পূর্ব্বে মিশরের প্রাচীন রাজধানী থীব্‌সের উপকণ্ঠস্থ লাক্সর নামক স্থানে মিশরের নরেন্দ্রমণ্ডলীর সমাধি-তীর্থে কোনও অনাবিষ্কৃত রাজ-কবরের সন্ধানে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এতদিনে তাঁদের সেই ঐকান্তিক যত্ন চেষ্টা ও অধ্যবসায়, সেই অসীম উৎসাহ, পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হয়েছে! মিশরের বিংশতি নরপাল চতুর্থ রামেসেসের লুণ্ঠিত সমাধিগর্ভের নিম্নে তাঁরা অষ্টাদশ নৃপতি তুতুন্-

খামনের যে কবরগৃহের সন্ধান পেয়েছেন, তিনসহস্র বৎসরের মধ্যে কোনও মানুষের সেখানে পদার্পণ কর্‌বার সৌভাগ্য হয়নি! তুতুন্‌খামনের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী নৃপতি-গণের সমাধির অধিকাংশই কবর-দস্যুগণ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয়েছে, কেবল সৌভাগ্যক্রমে এটির তারা সন্ধান পায়নি।

লর্ড কার্ণার্‌ভন্ ইংলণ্ডের এক প্রাচীন আভিজাত্য বংশের সন্তান। ১৮৬৬ সালে তাঁর জন্ম হয়; পরে ১৮৯০ সালে তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে লর্ড উপাধিতে ভূষিত হন এবং ১৮৯০ সালে বিবাহ করেন। কার্ণার্‌ভন্-বংশের তিনি পঞ্চম আর্ল্। প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী। একবার একটা মোটর দুর্ঘটনায় তিনি আহত হ'য়ে শয্যাগত হ'ন। সেরে উঠ্‌বার পর তিনি অন্যান্য কাজ ছেড়ে দিয়ে মিশরের পুরাতত্ত্ব আলোচনায় নিযুক্ত হ'য়েছিলেন। আমেরিকান্ যুবক হাওয়ার্ড কার্টার এই কাজে তাঁর প্রধান সহযোগী। ১৯১৩।১৪ সালে তিনি কার্টারের সঙ্গে একত্রে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন, বইখানির নাম "পাঁচ বৎসর থীব্‌সে অনুসন্ধান!" তার পর ১৯২১ সালে তিনি মিশরের পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধানে প্রাপ্ত দ্রব্যাদির একটি প্রদর্শনী করেছিলেন। লর্ড কার্ণার্‌ভনের একটী পুত্র ও একটী কন্যা। পুত্র সৈন্য বিভাগে কাজ করে। কন্যা ইভেলীন্ পিতার সঙ্গে মিশরীয় পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণায় নিযুক্ত।

হাওয়ার্ড কার্টার যখন নৃপতি তুতুন্‌খামনের সমাধির সন্ধান পান তখন লর্ড কার্ণার্‌ভন ইংলণ্ডে ছিলেন। কার্টারের টেলিগ্রাম পাবামাত্র তিনি ইভেলীন্‌কে সঙ্গে করে মিশরে এসে উপস্থিত হ'ন। কার্টার তাঁর আগমন প্রতীক্ষায় কাজকর্ম্ম বন্ধ রেখে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে অপেক্ষা কর্‌ছিলেন। কার্ণার্‌ভন এসে পৌঁছতেই তাঁরা সমাধি-গৃহের ভিত্তি-গাত্র খনন ক'রে অতি কষ্টে—নৃপতি তুতুন্-খামনের কবরে প্রবেশ করেন, কারণ কবরে যাবার সোজা পথটা তাঁরা প্রথমে আবিষ্কার ক'র্‌তে পারেন নি।

নৃপতি তুতুন্‌খামনের সমাধিকক্ষে প্রবেশ ক'রে তাঁরা মিশরেশ্বরের বহু মূল্যবান দ্রব্যাদি দেখ্‌তে পেলেন বটে, কিন্তু নৃপতির শবাধারটি খুঁজে পেলেন না। শবাধার অনুসন্ধান ক'র্‌তে ক'র্‌তে তাঁরা দেখ্‌তে পেলেন যে সেই কক্ষের অপরদিকে ভিত্তি-গাত্রে একটি রুদ্ধ দ্বার র'য়েছে! তখন আশায় উৎফুল্ল হ'য়ে তাঁরা মনে ক'র্‌লেন যে এই রুদ্ধ দ্বারের ওপাশে বোধ হয় আর একটি কক্ষ আছে এবং সেই কক্ষে নিশ্চয় নৃপতি তুতুন্‌খামনের শবাধার দেখ্‌তে পাওয়া যাবে! কিন্তু দ্বিতীয় কক্ষে প্রবেশ করেও তাঁরা হতাশ হ'লেন। সে ঘরে আরও অধিকতর মূল্যবান বহুবিধ দ্রব্যাদি দেখতে পাওয়া গেল বটে কিন্তু কই তুতুন্-খামনের শবদেহ কই? সে যে পাওয়া গেল না! তখন আবার দ্বিগুণ উৎসাহে অনুসন্ধান সুরু হোলো এবং কার্টার দ্বিতীয় কক্ষের পর আবার একটি তৃতীয় কক্ষের সন্ধান পেলেন। এবার আশায় আনন্দে তাঁদের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল। বহু চেষ্টাতেও প্রবেশদ্বার খুঁজে না পেয়ে শেষে তাঁরা বাধ্য হ'য়ে ভিত্তিগাত্র খুঁড়ে চোরের মত সিঁধ কেটে সেখানে প্রবেশ কর্‌লেন। এবার তাঁদের আশা পূর্ণ হ'ল! তৃতীয় কক্ষে মহারাজ তুতুন্‌খামনের বহুমূল্য শবাধার তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বের অদ্ভুত রাজ-ঐশ্বর্য্য নিয়ে তাঁদের বিস্মিত ও বিমুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে অতুল গৌরবে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌ল!

লর্ড কার্ণার্‌ভন স্বয়ং এই অদ্বিতীয় আবিষ্কারের অতি সুন্দর বর্ণনা বিলাতের টাইমস্ পত্রে লিখে পাঠিয়েছেন। তিনি লিখ্‌ছেন—"প্রথম কক্ষে প্রবেশ করেই সর্ব্বাগ্রে আমাদের চ'খে পড়্‌ল তিনখানি অতি চমৎকার রাজ-পালঙ্ক! উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণে সুরঞ্জিত এবং আগাগোড়া অপরূপ রমণীয় তক্ষণ-শিল্পে সমাবৃত। সিংহ সর্প ও মিশরের সৌন্দর্য্য দেবী হাথোরের মূর্ত্তি পরিশোভিত। এই সুবর্ণ পালঙ্কোপরে যে শয্যাপীঠ বিস্তৃত র'য়েছে, তাতে অপূর্ব্ব মনোহর কারুকার্য্য উৎকীর্ণ করা, সোনালী রংয়ে সমুজ্জ্বল এবং গজদন্ত ও মূল্যবান্ প্রস্তরাদি খচিত। এ ছাড়া সে কক্ষে অতিরম্য কারুকার্য্য-খচিত অসংখ্য পেটিকাও পাওয়া গেছে। তার মধ্যে একটি বাক্সে বিশেষ ভাবে আবলুশ্ ও গজদন্তের কাজ করা রয়েছে এবং তার উপর কোনও লিপি স্বর্ণাক্ষরে উৎকীর্ণ করা আছে। আর একটি বাক্সের মধ্যে পাতালের প্রীতিক্ পাওয়া গেছে। অন্য একটির মধ্যে রাজপরিচ্ছদ রয়েছে, অতি সুন্দর চিকণের শিল্পকার্য্য তাতে, তার মধ্যে বহুমূল্য মণিমাণিক্য এবং নৃপতির স্বর্ণ পাদুকাও পাওয়া গেছে!

'একটি আবলুশের চৌকী পাওয়া গেছে তাতে গজ-দন্তের কারুকার্য্য করা এবং সুদক্ষ শিল্পীর হাতের অতি

নিপুণ ভাবে খোদাই করা চারটি হংস-পদাকৃতি পায়া সংযুক্ত। সূক্ষ্ম কারুকার্য্য-খচিত একখানি ছেলেদের ব্যবহারোপযোগী চৌকীও পাওয়া গেছে। নৃপতি তুতুন্‌-খামনের একখানি রাজ সিংহাসন পাওয়া গেছে যার শিল্প-সৌন্দর্য্য জগতে অতুলনীয়! পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত এমন অনুপম কারুকার্য্যের নিদর্শন কোথাও দেখ্‌তে পাওয়া যায় নি! এমন একখানি সোনার চমৎকার চেয়ার পাওয়া গেছে যার অপরূপ শিল্প-শোভা দেখে বিস্ময়ে অবাক্‌ হ'য়ে যেতে হয়। চেয়ারখানির পৃষ্ঠদেশে রাজা রাণীর প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ করা আছে। চেয়ার-খানিতে আগাগোড়া নীলা, চুনী, বৈদূর্য্যমণি প্রভৃতি জহরতের কাজ করা!

মিশরেশ্বরের দুটি প্রমাণ মাপের শিলাঙ্গনে নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গেছে তাতেও সোনার কাজ করা। রাজ-প্রতিমূর্ত্তিদ্বয়ের একহাতে স্বর্ণ-দণ্ড এবং আর একহাতে সুবর্ণ গদা! উভয় মূর্ত্তিই যেন পরস্পরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে! মূর্ত্তিদ্বয়ের অতি অপরূপ গঠন-পারিপাট্য। হস্ত-পদের লীলায়িত ভঙ্গী সুচারু ভাস্কর্য্য-শিল্পের পরিচয় দিচ্ছে! রাজ-প্রতিমূর্ত্তির কাচ-নির্ম্মিত আঁখি যেন জীবন্ত চক্ষের মতো উজ্জ্বল! প্রতিমূর্ত্তির মস্তকে মণি-মুক্তা খচিত শিরস্ত্রাণ! কটিদেশে মণি খচিত নিবীবন্ধ ও সুবর্ণ কটিবাস।

চারখানি রথ পাওয়া গেছে তার চারধারেই স্বর্ণ মণ্ডিত ও মণি খচিত কারুকার্য্য করা। রথচক্রগুলি খুলে রাখা হয়েছে। সারথীর আসনে শার্দ্দূল চর্ম্মের একটি পোষাক ঝোলানো আছে, সম্ভবতঃ সেটি সারথিরই পরিচ্ছদ। আরও অন্যান্য অসংখ্য জিনিসের মধ্যে রাজার কয়েক গাছা ছড়ি পাওয়া গেছে, তার মধ্যে একটি আবলুশ্‌ কাঠের তৈরী; হাতোলের কাছে একটি পশ্চিম এসিয়াবাসী মানুষের মাথা আঁটা, সেটি সোনার তৈরী। আর একটি ছড়ি আগা-গোড়া সোনা রূপার তারে তৈরী অতি চমৎকার কারু-কার্য্যের নিদর্শণ! সিংহাসনে বস্‌বার চৌকিটিতে পশ্চিম এশিয়াবাসীদের মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করা আছে। নৃপতি তুতুন্‌-খামন্‌ যে পশ্চিম এশিয়াবাসীদের জয় ক'রেছিলেন এটি তার আর একটি পরিচয়।

কয়েকটা অদ্ভুত রকমের বাদ্যযন্ত্র; রাজবেশ পরচুলো ও উষ্ণীষ খুলে পরিয়ে রাখবার একটি কাঠের পুত্তলিকা, অনেকগুলি অপূর্ব্ব শিল্প-চাতুর্য্যের পরিচায়ক স্ফটিকঝারী, কয়েকটি উজ্জ্বল নীলবর্ণের মীনের কাজ করা সুগঠিত মিশরীয় মৃৎপাত্র, এবং মৃত মহারাজের উদ্দেশে রক্ষিত প্রচুর খাদ্য-দ্রব্য যথা-ডানা বাঁধা হাঁস, হরিণের রাং ইত্যাদি সমস্তই তৎকালীন প্রথামত বাক্সের মধ্যে প্যাক্‌ করা। কতকগুলি ফুলের মালা পাওয়া গেছে সেগুলি দেখ্‌বার মতো! তিন হাজার বছর পরেও মনে হচ্ছে যেন এইমাত্র টাট্‌কা তাজা ফুলের মালা গেঁথে রেখে গেছে! একটি বাক্সের মধ্যে কাগজের গুটি পাওয়া গেছে, আশা করা যাচ্ছে যে, ওই কাগজ-পত্র থেকে সমাধি শায়িত নৃপতি তুতুন্‌খামনের অনেক কথাই জান্‌তে পারা যাবে।

দ্বিতীয় কক্ষের গৃহতল থেকে ছাদ পর্য্যন্ত এতো মাল বোঝাই করা আছে যে, সে ঘরে প্রবেশ করাই দুঃসাধ্য। অসংখ্য আবলুশ্‌ কাঠের আস্‌বাব, সোনার খাট পালঙ্ক, চমৎকার কারুকার্য্য-খচিত বাক্স পেটিকা, মর্ম্মর ও স্ফটিক-ঝারী ইত্যাদি প্রথম কক্ষে প্রাপ্ত দ্রব্যাদির অনুরূপ জিনিসই প্রচুর পাওয়া গেছে। এই সব জিনিসের অনেকগুলি একেবারে নূতন অবস্থায় আছে। কেবল গোটা কয়েক জিনিসের অবস্থা একটু সঙ্কটাপন্ন হ'য়ে পড়েছে। সেগুলি যাতে ভেঙে চূরে গুঁড়ো হ'য়ে না যায়, এজন্য অতি সাবধানে ও সযত্নে কার্টার সাহেব সেগুলিকে নাড়াচাড়া কর্‌ছেন এবং সুরক্ষিত ক'রে রাখ্‌বার ব্যবস্থা করেছেন।

অনেক অনুসন্ধান ক'রেও এই দুই কক্ষের মধ্যে কোথাও নৃপতি তুতুন্‌খামনের শবাধার দেখ্‌তে পাওয়া গেল না। সমাধি কক্ষে মৃত রাজার ব্যবহারের সমস্ত জিনিসই রয়েছে অথচ তাঁর 'মমী' বা অক্ষয় শব দেহটি নেই, দেখে লর্ড কার্ণারভণের দল যখন প্রায় হতাশ হ'য়ে পড়ছিলেন সেই সময় নজর পড়্‌ল যে এ দুটি ঘরই সব নয়, পাশে আরও ঘর নিঃসন্দেহ আছে এবং তারই কোনও একটির মধ্যে তুতুন্‌খামনের শবদেহ নিশ্চয়ই রক্ষিত আছে।

আশা নিরাশার দোদুল দোলায় দুরু দুরু বুকে ও কম্পিত করে কার্টার যখন প্রাচীর ভেদ ক'রে সেই কক্ষের প্রবেশ পথ উন্মোচন করলেন এবং বাতির আলোয় উঁকি মেরে দেখ্‌লেন সেখানে কি আছে—কার্টার আনন্দে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন!

মিশরেশ্বর তুতুন্‌খামনের অন্তিম শয্যা দেখ্‌তে পাওয়া গেছে!

দৈর্ঘ্যে প্রস্থে চৌদ্দ ফুট এক চতুষ্কোণ কক্ষ। আগা-গোড়া পরিপাটি রূপে সুসজ্জিত। সেই গৃহতল পরিব্যাপ্ত এক বিরাট স্বুবর্ণ বেদী, সমুজ্জল সুনীল মণি খচিত, চারু কারু বিমণ্ডিত। বেদীর উপর সুবৃহৎ সমাধি স্তূপ,—শীর্ষ-প্রতীক অঙ্কিত আছে। বেদীর মাথার চারদিকে চমৎকার কার্ণিশের কাজ করা এবং তার উপর সুবর্ণ চন্দ্রাতপ বিস্তৃত।

এই স্বর্ণ-চন্দ্রাতপতলে মণিবেদিকার উপর সুবর্ণ

লর্ড কার্ণারভন

দেশ তার প্রায় গৃহের ছত্রতল স্পর্শ ক'র্‌ছে! চারি পার্শ্বের পরিধি প্রায় ভিত্তিগাত্রের নিকটে এসে প'ড়েছে। বেদীর চারপাশে ধর্ম্ম শাস্ত্রের শ্লোক এবং প্রেত-লোকের ভয়াবহ সমাধি-স্তূপের মধ্যে নৃপতি তুতেনখামেনের বহুমূল্য শবাধার সুরক্ষিত। নৃপতির পরপারে যাত্রার জন্য গৃহতলে ৭খানি নৌকা বাওয়া দাঁড় রাখা হয়েছে। এই কক্ষসংলগ্ন আর
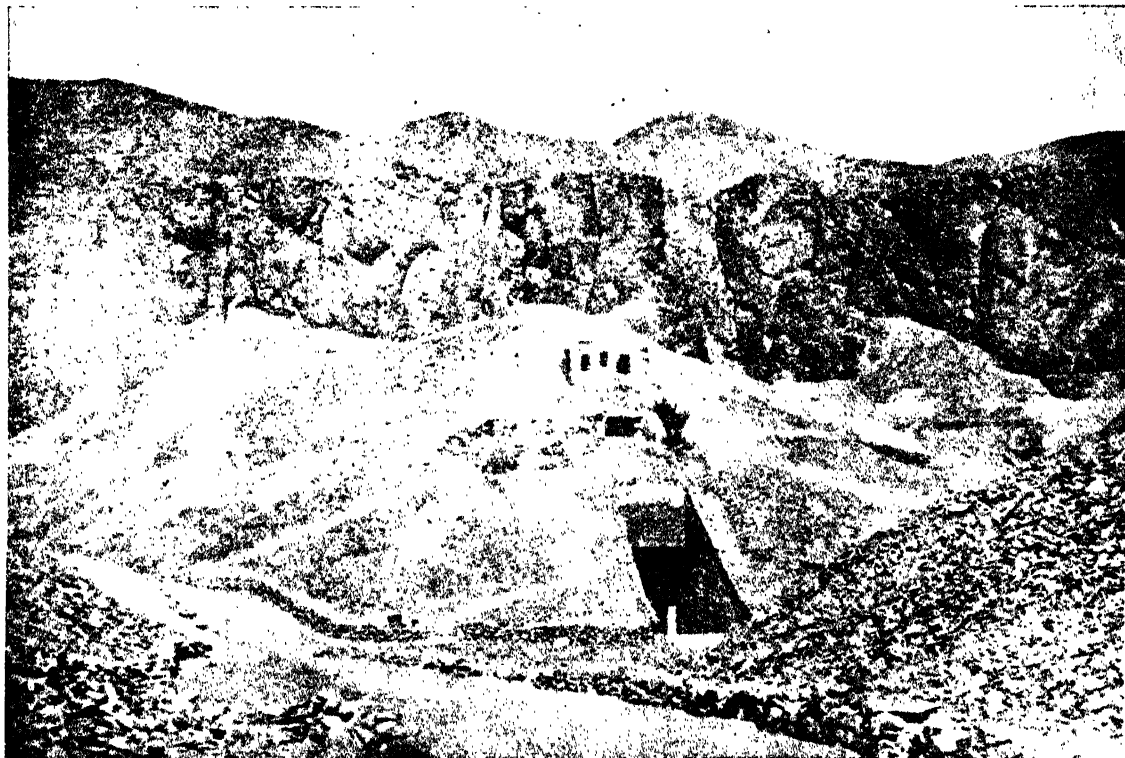
সমাধিগর্ভের প্রবেশপথ—(এই পথে মিশর নৃপতি ষষ্ঠ রামেশেসের সমাধি-কক্ষে যাওয়া যায়। এঁরই সমাধি-কক্ষের নিম্নতলে নৃপতি তুতুনখামেনের সমাধিগৃহের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রবেশপথের শীর্ষদেশে কবর-রক্ষীদের বাসস্থান।)

মিশরেশ্বর তুতুনখামেনের প্রতিকৃতি
(নিম্নে রাজার তিনটি শীলমোহর)

মিঃ হাওয়ার্ড কার্টার
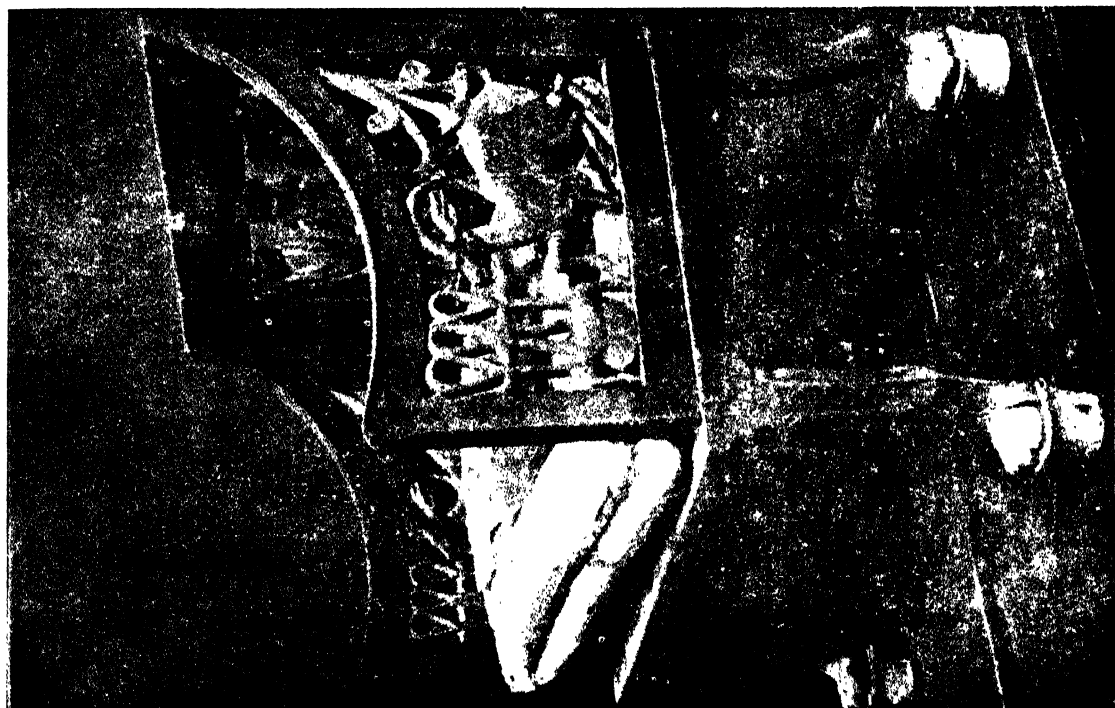
স্বর্ণমণ্ডিত উচ্চাসন

আর একখানি উচ্চাসন

রাজার স্বর্ণ-পালঙ্ক
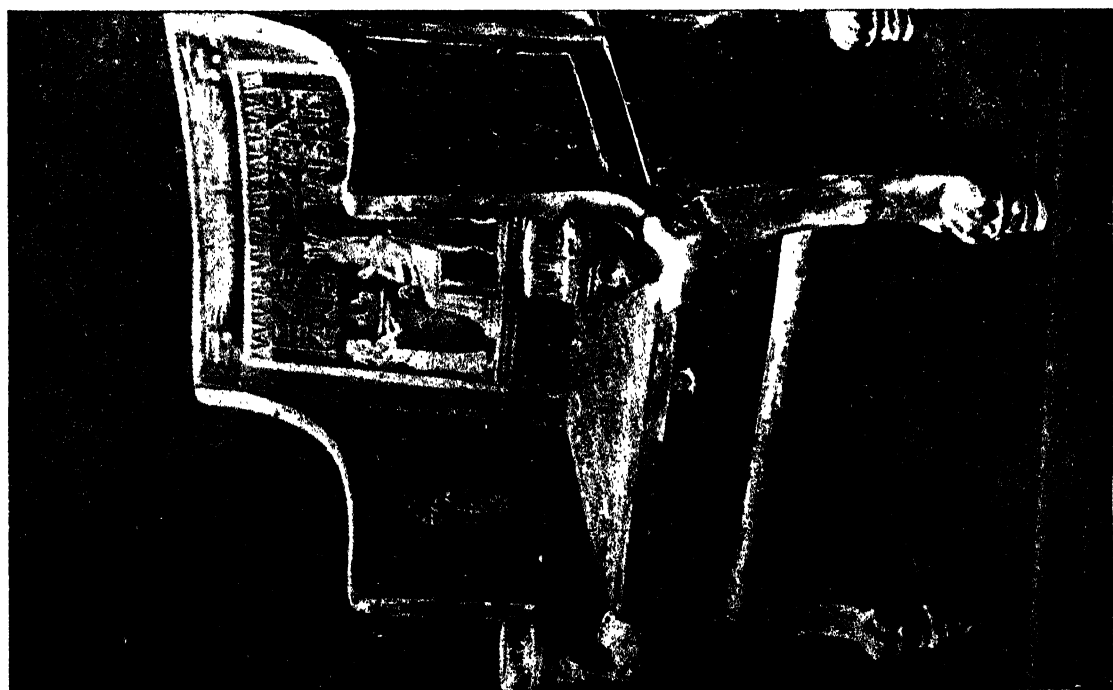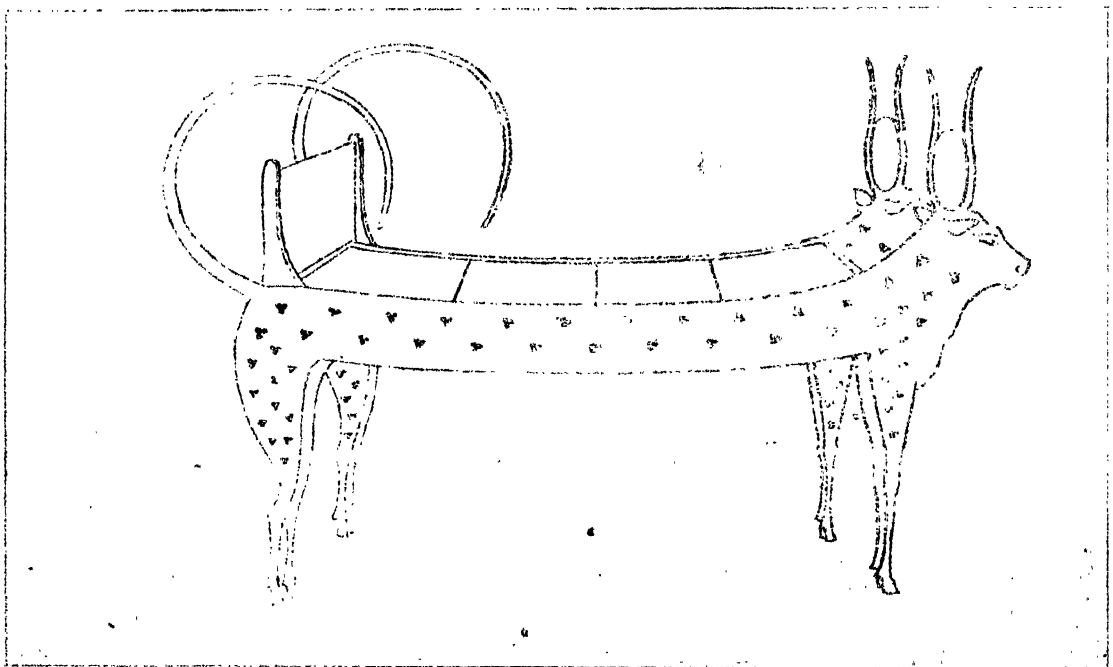
একটি ঘরে রাজ-কবরের ভাণ্ডার দেখতে পাওয়া গেছে। এই কক্ষে একটি স্বর্ণ-মণ্ডিত অপরূপ সুন্দর শিল্প কাজ করা শবপীঠ আছে। সেই পীঠস্থানের দুই পার্শ্ব রক্ষা ক'রছেন দু'হাত প্রসারিত করে অতি নিপুণ শিল্পীর গঠিত দুটি দেবীমূর্ত্তি! তাঁদের চখে মুখে ভয়চকিত সকরুণ ভাব! তাঁরা পিছন দিকে তাঁদের উৎকণ্ঠিত মুখ ফিরিয়ে যেন আক্রমণকারীদের দিকে চেয়ে আছেন। এই শবপীঠের উপর চন্দ্রাতপতলে চারটি বহু-

রাজভেট
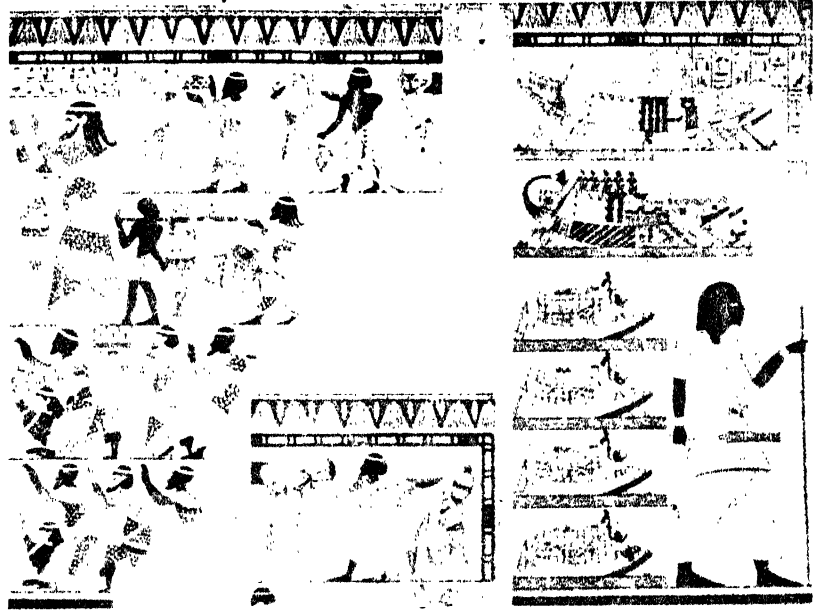
(পশ্চিম এশিয়ার অধীন রাজন্যবর্গ নৃপতি তুতুনখামেনকে যে সব ভেট পাঠিয়েছেন)।

রাজদর্শনে

(এথিয়োপীয়ার রাজকুমারী বৃষভযানে বহু উপহার সঙ্গে নিয়ে রাজদর্শনে এসেছেন)।

মূল্য আধারে সম্ভবতঃ নৃপতির রাসায়ন-সিক্ত দেহাবশেষ অর্থাৎ হৃদ্‌পিণ্ড ও নাড়িভুঁড়ি ইত্যাদি র'য়েছে!

এই কক্ষের প্রবেশপথেই একটা কৃষ্ণবর্ণ শৃগাল দাঁড়িয়ে আছে, তার গায়ে সোনালী কাজ করা। ভিতরে একটি অদ্ভুত বেদীর উপর মিশরীয় দেবতা আনুবীশের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত।

মূর্ত্তির পশ্চাতে পাতাল-পুরীর প্রতীক স্বরূপ বৃহৎ বৃষ-মুণ্ড স্থাপিত। ঘরের চারিদিকে নানা আকারের অসংখ্য বাক্স, পেটিকা, বেদিকা, শবাধার ও শবপীঠ। সব বাক্স পেটিকাগুলোই বন্ধ এবং একেবারে শীলমোহর করা। একটি বেদীর উপর নৃপতির একটি স্বর্ণ প্রতিমূর্ত্তি আছে।

নৃপতি তুতুনখামেনের বৈতরণী পার হওয়া অনায়াস-সাধ্য হবে বলেই বোধ হয়, খানকয়েক ছোট ছোট তরণী

নির্ম্মাণ ক'রে সমাধি-কক্ষে রাখা হ'য়েছে! তরণীগুলি আকারে ক্ষুদ্র হ'লেও একেবারে পাল, দাঁড়, হাল সমেত নিখুঁত ও সম্পূর্ণ। মিশর সভ্যতা যে তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে সমুদ্র-পথেও অভিযান ক'র্‌তো, এই তরণীগুলি তা সপ্রমাণ ক'রছে। একটি অতি সুগঠিত চমৎকার বৃহৎ মার্জ্জার উৎকর্ণ হ'য়ে ব'সে মিশরপতি ফ্যাবারের শবদেহ যেন এই তিনশত শতাব্দী ধ'রে পাহারা দিচ্ছে! নৃপতি তুতুনখামেনের স্বর্ণ-শবাধারের উপর মিশর রাজ-বংশের শক্তি-চিহ্ন সেই চির-পরিচিত বিষধর ভুজঙ্গ উৎকীর্ণ করা আছে। তার গায়ে অতি সুন্দর নীল মিনের কাজ করা!

তুতুনখামেনের সিংহাসন

(এই প্রাচীর চিত্রে উৎকীর্ণ সিংহাসনখানির কারুকার্য দেখে মনে হয় তুতুনখামেনের সমাধিকক্ষে যে আশ্চর্য্য সিংহাসনখানি পাওয়া গেছে শিল্প-সৌন্দর্য্যের সেরূপ নিদর্শন জগতে দুর্ল্লভ হওয়া কিছু বিচিত্র নয়।)

মিশরেশ্বরের কবরে আজ যে প্রচুর ঐশ্বর্য্য সম্পদ দেখ্‌তে পাওয়া গেছে, পৃথিবীর কোনও ভাগ্যবান নৃপতির কবরেই তার শতাংশের এক অংশও দেখা যায় না। আর সকলের চেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে যে, আজ এই তিন সহস্র বৎসর পরেও সমাধিগর্ভের প্রত্যেক জিনিসটি যেন একেবারে ঝক্‌ঝকে, নূতনের মত রয়েছে! কয়েকটি স্ফটিক গন্ধঝারীর মধ্যে যে ফুল-নির্য্যাস পাওয়া গেছে; তার অমৃত সুরভি এখনও সন্ত-প্রস্ফুটিত পুষ্প-গন্ধের স্নিগ্ধ ও সুমধুর সুবাস বিকীর্ণ ক'রছে।

সিংহাসনারূঢ় নৃপতি তুতুনখামেন

(রাজপ্রতিনিধি 'হুয়াই' নৃপতি তুতুনখামেনকে নানা উপঢৌকন দিচ্ছেন। হুয়াইয়ের সমাধি কক্ষের প্রাচীরগাত্রে এই চমৎকার চিত্রগুলি উৎকীর্ণ করা আছে। এই চিত্রে অঙ্কিত অনেক দ্রব্য তুতুনখামেনের সমাধিগর্ভে পাওয়া গেছে।)

মিশরেশ্বর তুতুনখামেনের কবর আবিষ্কার হওয়ায় সভ্য-জগতে এই যে একটা হুলস্থূল প'ড়ে গেছে, এ কেবল সমাধি-গর্ভে প্রাপ্ত বহু মূল্যবান ঐশ্বর্য্য বা উহার অপরূপ শিল্প-সৌন্দর্য্যের জন্য নয়, এর একটা মস্ত বড় ঐতিহাসিক মূল্য আছে।
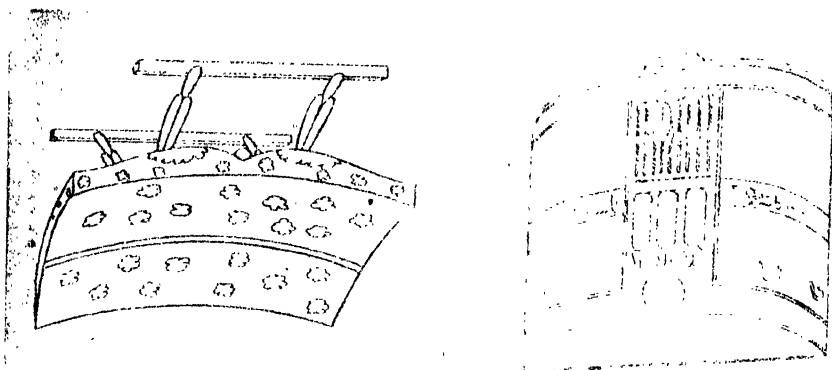
মণিমুক্তা-খচিত স্বর্ণ পেটিকা (রাজার শিরস্ত্রাণ রক্ষার জন্য)

আবলুশ ও গজদন্ত বিনির্ম্মিত চৌকী ।

রাজা রাণীর মোহরাঙ্কিত আর একটি পরিচ্ছদ পেটিকা
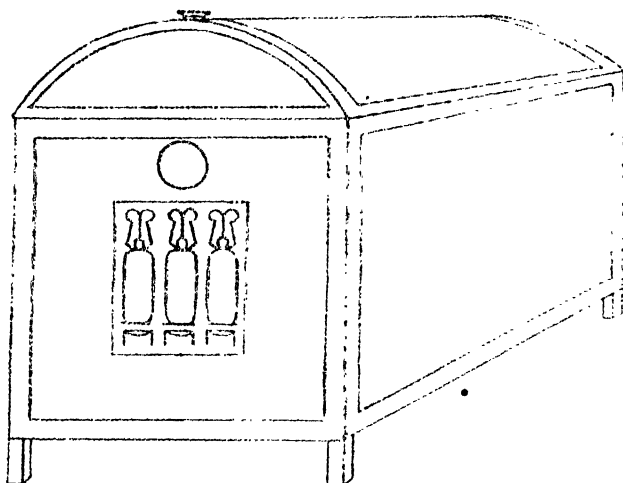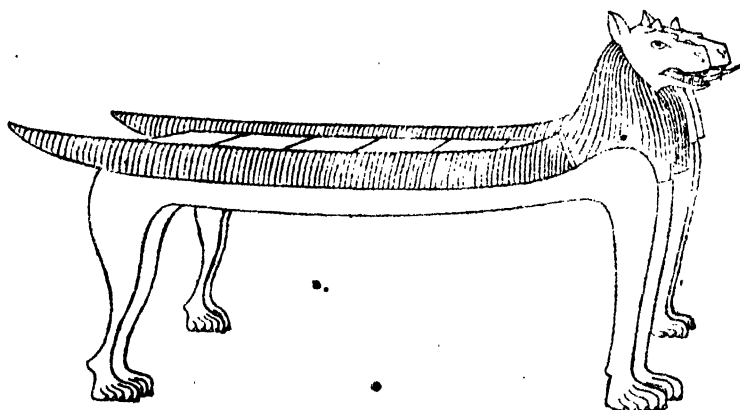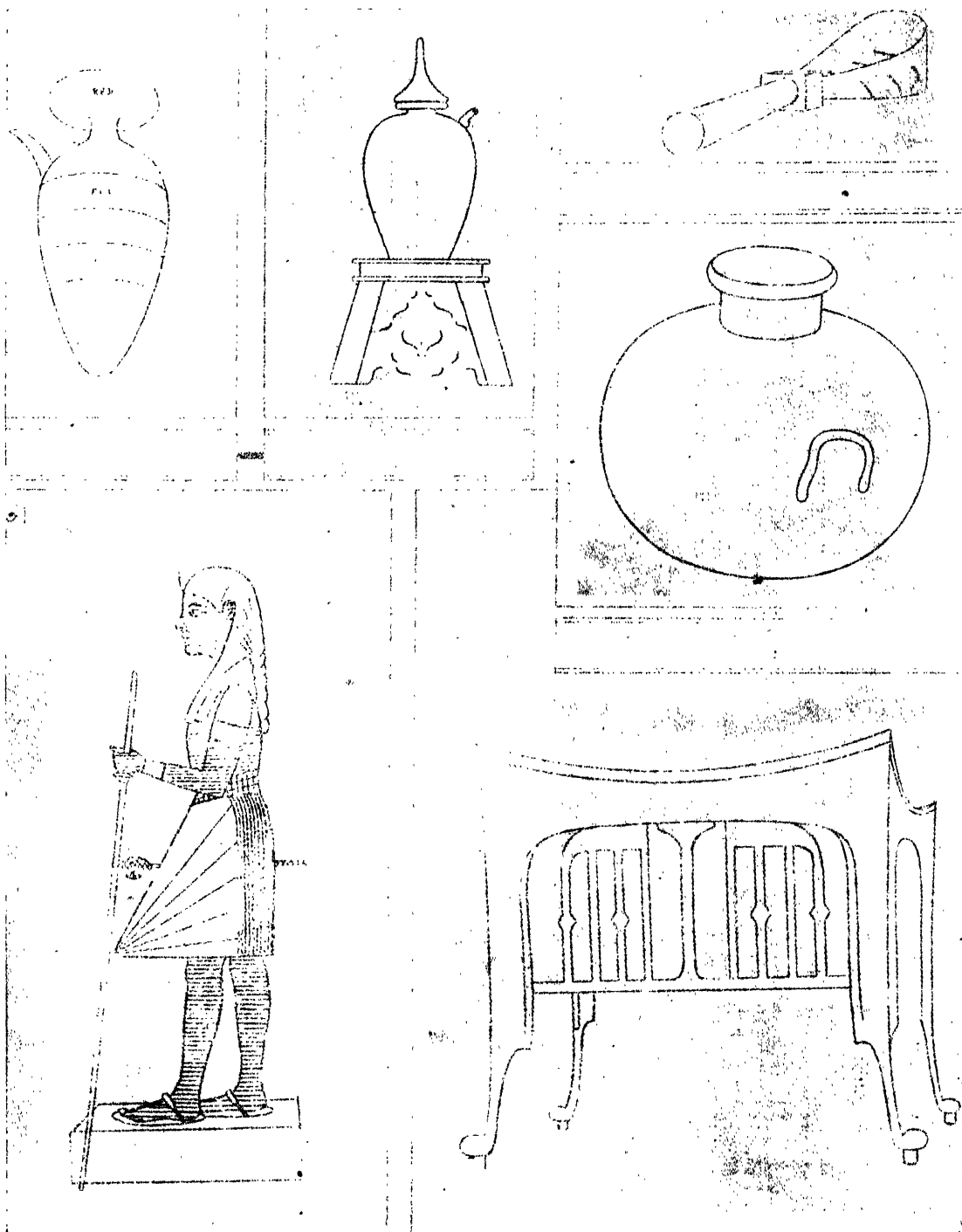
সুরঞ্জিত মৃত্তিকার ঘট, স্ফটিক সুগন্ধ-পাত্র—(জালিকাটা স্ফটিক আধার সমেত), দেবপূজার সুবর্ণ ঘণ্টা, স্ফটিক কলস, মর্ম্মরশুভ্র উচ্চাসন,
নৃপতি তুতুন্‌খামেনের প্রতিমূর্ত্তি

উপঢৌকনের দ্রব্যাদি—(দ ন, দামী, পালঙ্ক, উচ্চাসন, চৌকী রথ, পেটিকা ইত্যাদি পাওয়া গেছে)

সুবর্ণ রথ

মাদার পরিচ্ছদ-পেটিকা
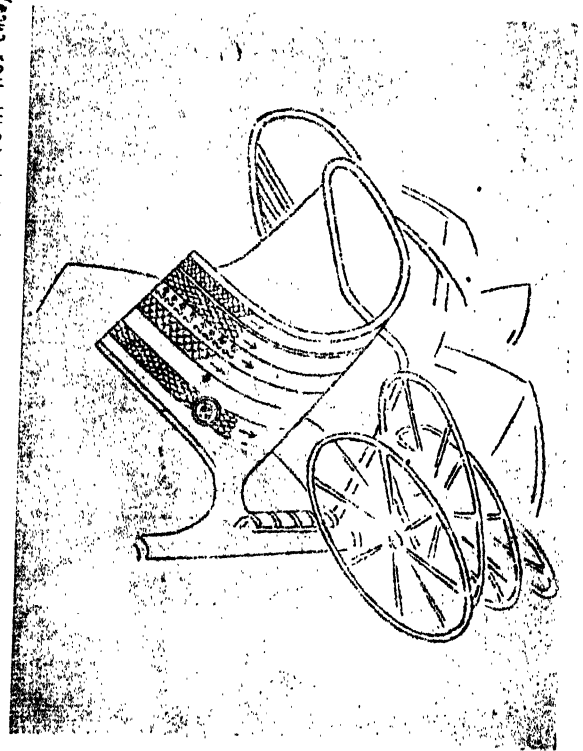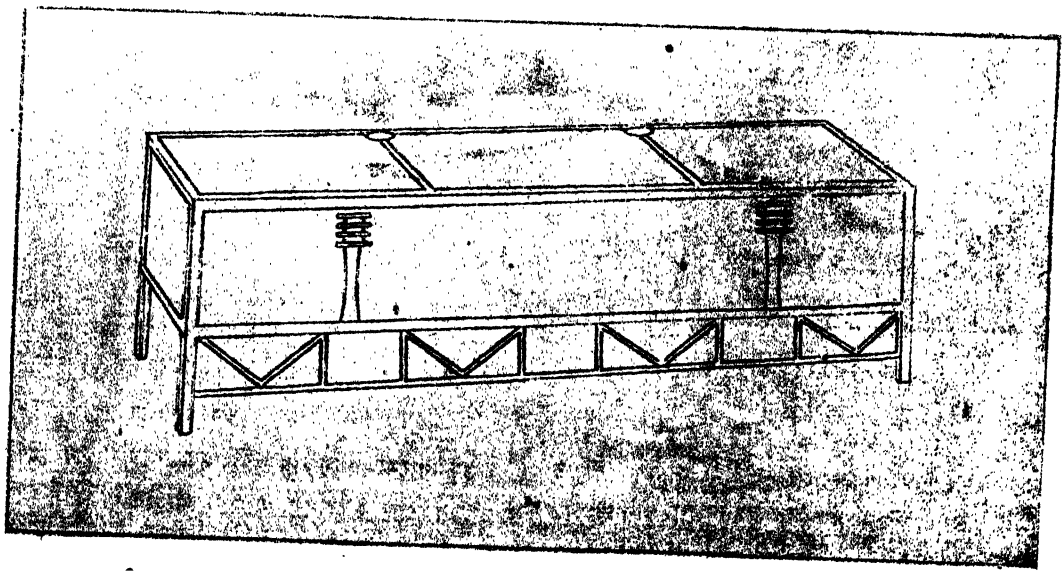
খৃঃ-পূর্ব্ব চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মিশরের ইতিহাস এ পর্য্যন্ত অনাবিষ্কৃত পুরাতত্ত্বের মধ্যেই লুপ্ত হয়েছিল,অথচ দেখা যাচ্ছে

যে সেই যুগটাই প্রাচীন মিশরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বর্ত্তমান জগত এ পর্য্যন্ত মিশর-সভ্য
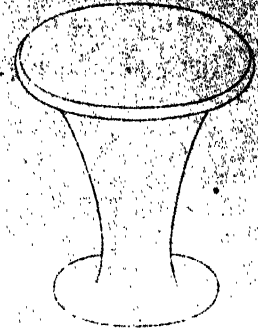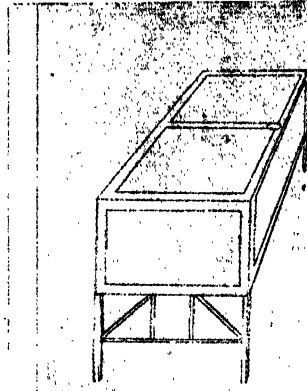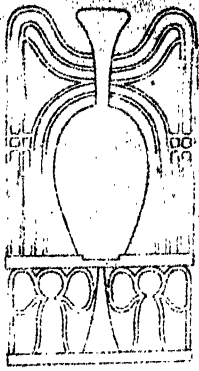
স্ফটিক খারী
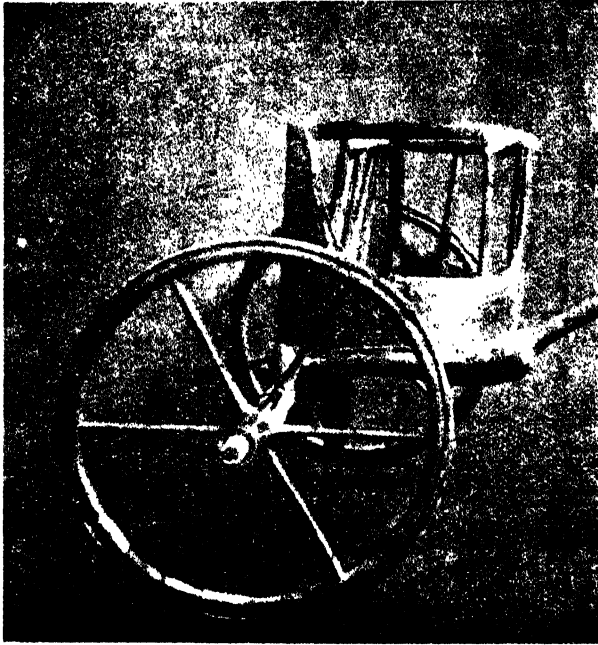
মিশরের প্রাচীন রথ
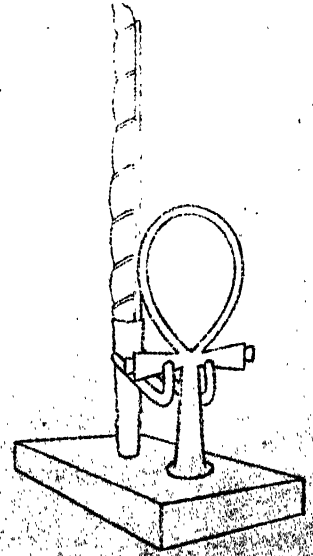
স্বর্ণ দীপাধার

সেই চরমোৎকর্ষ লাভের কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখ্‌তে পায় নি। আজ তুতুন্‌খামেনের কবর আবিষ্কার হওয়ায় ও তন্মধ্যে নিহিত ঐশ্বর্য্য ও শিল্প-সম্পদের পরিচয় পাওয়া যেতে বোঝা যাচ্ছে যে, এই নৃপতির রাজত্বকালে প্রাচীন মিশরের শক্তি, সম্পদ, কলা-নৈপুণ্য ও সভ্যতা, গৌরব ও মহিমার তুঙ্গ শৃঙ্গে পৌঁছে সমস্ত মিশরকে সমুজ্জ্বল ক'রে তুলেছিল।

তুতুন্‌খামেনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই যে মিশরের অধঃপতন সুরু হ'য়েছিল, এ কথা প্রাচীন ইতিহাস-পাঠক-মাত্রেই অবগত আছেন। *

---

* এই প্রবন্ধের চিত্রগুলি Sphere, Graphic, Illustrated London News ও Times পত্রিকা হইতে গৃহীত।

আব-হাওয়া

সভা-সমিতি

আলীগড় জাতীয়বিশ্ববিদ্যালয়-উপাধি-বিতরণ-সভা।—গত ৭ই ফেব্রুয়ারী আলীগড়ে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া অর্থাৎ জাতীয় মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-বিতরণ-সভা মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই সভার সভাপতি ছিলেন বঙ্গগৌরব আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। এই সভায় সমগ্র ভারতবর্ষ এমন কি ব্রহ্মদেশের প্রধান-প্রধান মুসলমান নেতৃগণ উপস্থিত ছিলেন। উপাধি-বিতরণ সময়ে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহা তাঁহার উপযুক্তই হইয়াছিল। অভিভাষণটি নানা ভাবে বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ। যুগবার্ত্তা

ঢাকায় পঞ্চায়েৎ কন্‌ফারেন্স।—বর্ত্তমান বর্ষের পঞ্চায়েৎ কন্‌ফারেন্স বিগত ২০শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা নগরীতে হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ববারের ন্যায় এবার মনিপুর সরকারী কৃষি ফারমে কন্‌ফারেন্স না হইয়া ঢাকা নূতন সহরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্ট-গৃহে হইয়াছে। পঞ্চায়েৎ

সরস্বতী-কর্ম্মমন্দির।—রাণীগঞ্জের কতিপয় ভদ্র-সন্তান "সরস্বতী কর্ম্মমন্দির" নামে একটী সমিতি গঠন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ দাস সেন মহাশয় ইহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া সমিতির কার্য্য সুচারু রূপে চালাইতেছেন। অনাথের উপকার ইঁহাদের প্রধান লক্ষ্য। এই কর্ম্ম-মন্দিরের কর্ম্মিগণ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া প্রায় দুই হাজার টাকা উত্তরবঙ্গ রিলিফ ফণ্ডে পাঠাইয়াছেন। এই সব ভদ্র-বংশীয় যুবক সংবাদ পাইবামাত্র মৃতের সংকার যথারীতি সম্পাদন করিয়া থাকেন। কয়েকদিন পূর্ব্বে ইঁহারা প্রায় ৪০০০ চারিহাজার দরিদ্র সেবা করিয়াছেন। বর্দ্ধমান

সিংপাড়া বাজারে বিরাট সভা—গত ২৩শে মাঘ মঙ্গলবার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত সিংপাড়া বাজারে জনসাধারণের এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বরিশালের সুযোগ্য বক্তা মৌলবী মহম্মদ ইসলাম ৩ ঘণ্টা কাল শিক্ষা, ধর্ম্ম ও দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থা ও তৎপ্রতিকার সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। মৌলবী সাহেব ১৫।২০ দিন যাবৎ বিক্রমপুরের নানা স্থান ঘুরিয়া সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিতেছেন। ইতিমধ্যেই ২টী মাদ্রাসা স্থাপন করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন—একটী দক্ষিণ চারিগাঁ ও অপরটী সিংপাড়া গ্রামে। উভয় মাদ্রাসাই মুষ্টি ভিক্ষা-সংগৃহীত তণ্ডুলে পরিচালিত হইবে। মৌলবী সাহেবের এই অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা ধন্যবাদার্হ। আশা করি, মৌলবী সাহেবের এই আহ্বানে দেশবাসী সাড়া দিবেন। এতদঞ্চলে চরকা তাঁত প্রভৃতি গঠনকার্য্য যাহাতে পুনরায় নব উদ্যমে চলিতে পারে, তজ্জন্য গত ২০শে ও ২২শে মাঘ আরও ২টী সভা হইয়া গিয়াছে। প্রতি ঘরে-ঘরে চরকা প্রচলনের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। যুগবার্ত্তা

সংস্কৃত-সাহিত্য সম্মিলন।—সংস্কৃত-সাহিত্য মণ্ডলের আগামী অধিবেশন কাশীধামে বসিবে। আগামী ২৫শে এপ্রিল কাশী বিশ্ববিদ্যালয় গৃহে এই সভা বসিবে। কাশীর মহারাজা সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এই সভার উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন। আশা করা যায়, তাঁহার তত্ত্বাবধানে এই সভার কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হইবে। যুগবার্ত্তা

প্রাদেশিক সাধু-সম্মিলন।—গত ১লা ফেব্রুয়ারী করাচীতে সিন্ধু প্রাদেশিক সাধু-সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। হরিদ্বারের সুপ্রসিদ্ধ সাধু মোহান্ত আত্মপ্রকাশ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, আমাদিগের জীবনের সকল প্রকার অবস্থার প্রারম্ভে গার্হস্থ্য জীবন পরিচালনা করা দরকার। গার্হস্থ্য জীবনে উন্নতি করিতে পারিলেই আমাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার অবসান হইবে। আকালী এবং উদাসীদিগের মধ্যে গোলযোগ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, ধর্ম্মাচরণের অপব্যবহার করিলে, সে যে কোন সম্প্রদায়ের লোক হউক না কেন তাহার সহকর্ম্মিগণ তাহার নিকট হইতে ধর্ম্ম-পরিচালনার ভার সরাইয়া লইতে পারে। আনন্দবাজার পত্রিকা

সিন্ধু সংস্কৃত মণ্ডল।—সিন্ধুদেশে সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারের জন্য সেখানে একটী সংস্কৃত মণ্ডল স্থাপিত হইয়াছে। করাচী এই মণ্ডলের প্রধান কেন্দ্র। এই কেন্দ্রের উদ্যোগে দেশের বিভিন্নস্থানে সংস্কৃত বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে, এবং স্থানে স্থানে সভাসমিতি এবং এই বিষয়ে বক্তৃতা করিবার বন্দোবস্ত এই মণ্ডল করিয়াছেন। সম্প্রতি এই মণ্ডলের উদ্যোগে করাচীতে একটী সভা হইয়া গিয়াছে। আবু পাহাড়ের সাধু শ্রীস্বামী পরমানন্দ ভারত ভিক্ষু "জীবন-সমস্যা" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতায় তিনি, আমাদের দেশের গৃহস্থদিগের এখন কিরূপ জীবনধারণ করা উচিত, তাহা বিশেষ-রূপে বুঝাইয়া দেন। আনন্দবাজার পত্রিকা

বোম্বাই সহরে ছাত্র সভা।—ভারতবর্ষের কলেজ-সমূহের ছাত্ররা যাহাতে নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করিতে সমর্থ হয়, এবং সকল প্রদেশের ছাত্রদের মধ্যে যাহাতে একটা মেলা-মেশা হয়, সেজন্য একটি সমিতি গঠিত করিবার কথা হইয়াছিল। সমিতি গঠিত হইবার পূর্ব্বে সেদিন বোম্বাই সহরে ছাত্রদিগকে লইয়া এক সভা হয়। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার-

শ্রুর চিমনলাল শীতলবাড় সভাপতির আসনগ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় বোম্বাইয়ের শিক্ষা-মন্ত্রী পুরুষোত্তম পরাঞ্জপেও উপস্থিত ছিলেন। সমিতি গঠনের কথা যখন হইতেছে, সেই সময় সভাপতি বলেন যে, ছাত্ররা রাজনীতিতে যোগ দিতে পারিবে না। এই প্রস্তাব শুনিয়া ছাত্ররা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠে, এবং সভাপতিকে উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে বলে। সভাপতি তাহা না করায়, ছাত্ররা এমন গোলমাল সুরু করে যে সভা বন্ধ করিতে হয়। হিন্দুস্থান

সভা।—গৌরীপুরের রাজেন্দ্রকিশোর হাই স্কুলের শিক্ষকগণ সভা করিয়া এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব করিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট সরকারী স্কুল উঠাইয়া দিয়া ও পরিদর্শন-কর্ম্মচারীর সংখ্যা হ্রাস করিয়া যে অর্থ বাঁচাইবেন, তাহা যেন মধ্য ও প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদিগের আর্থিক অবস্থার উন্নতি বিধানে ব্যয়িত হয়। প্রত্যেক বে-সরকারী স্কুলে যাহাতে অচিরে প্রভিডেণ্ট ফণ্ড হয়, তাহার যেন ব্যবস্থা করা হয়।

এডুকেশন গেজেট

সাহিত্য-সম্মেলন—বিগত এক মাসের মধ্যে নানাস্থানে কয়েকটী সাহিত্য-সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ফরিদপুর সাহিত্য-সম্মেলন, কুষ্টিয়া মোহিনী মি কর্ম্মচারীদিগের সম্মেলন, বীরভূম সাহিত্য-সম্মেলনের বার্ষিক উৎসব, মেদিনীপুর শাখা-সাহিত্য-পরিষদের দশম বার্ষিক উৎসব ও গোবর্দ্ধন-সঙ্গীত সমাজের বার্ষিক উৎসব বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে দেশের মধ্যে সাহিত্য-প্রচারের বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছে।

উলেমা কনফারেন্সের নতন খলিফাকে স্বীকার—চাঁদপুরের খবরে প্রকাশ, ২রা ফেব্রুয়ারী চাঁদপুরে নিখিল বঙ্গের "জামিয়াৎ-উল-উলেমার" বাৎসরিক বৈঠক আরম্ভ হয়। হুগলীর মহলানা আবুবকর, ফরিদপুরের পীর বাদশা মিঞা, কুমিল্লার শাহ সৈয়দ এমদাদ উল হক, মওলানা রসুল আমিন, আবুল হাকিম, আহম্মদ আলি সাহেব, মৌলবী হবির উর রহমান এবং আরও অনেক মৌলবী বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সভার কেন্দ্রস্থলে মঞ্চের উপর দুইখানি চেয়ার ছিল। তাহার একখানি সভাপতির জন্য এবং অপরখানি মওলানা আবুবকরের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ এবং সহরের আরও নেতৃস্থানীয় অনেক হিন্দু কনফারেন্সে উপস্থিত হইয়াছিলেন। একজন কাজী কোরাণের বয়ান আবৃত্তি করিবার সঙ্গে-সঙ্গে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। তৎপর একটী মুসলমান ছাত্র বাঙ্গালা ভাষায় রচিত একটী কবিতা পাঠ করেন।

অতঃপর সভার কার্য্যের জন্য পীর বাদশা মিঞাকে সভাপতির পদে নির্ব্বাচিত করা হয়। সভাপতি মহাশয় তিনটী প্রস্তাব উপস্থিত করেন। তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রথম প্রস্তাবে খলিফার পদে আবদুল মজিদ খাঁর নির্ব্বাচন অনুমোদন করা হইয়াছে। এবং ভূতপূর্ব্ব সুলতানের আচরণের সমর্থন করা যায় না বলিয়া মত প্রকাশ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রস্তাবে মুসলমান ধর্ম্মজগতের পুনরায় শৃঙ্খলা সম্পাদনে এঙ্গোরা গবর্ণমেণ্টের কার্য্য সমর্থন করা হইয়াছে। তুরস্কের নষ্ট রাজ্য পুনর্দখল করিয়া মুস্তাফা কামাল পাশা মুসলমানগণের প্রভাব প্রতিপত্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তাঁহার কার্য্য সমর্থন করা হইয়াছে এবং খোদা কামালপাশার বিজয় লাভে তাঁহার সাহায্য করিয়াছেন বলিয়া খোদার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইয়াছে। এই কনফারেন্সে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, খেলাফৎ আন্দোলন সম্পূর্ণ ধর্ম্মমূলক আন্দোলন, রাজনীতির সহিত ইহার কোনই সংস্রব নাই। কাজেই এই খেলাফৎ আন্দোলনে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যাহাতে হস্তক্ষেপ না করেন, সেই জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

গোবধ সমর্থন

আর একটী প্রস্তাবে মুসলমানগণের গোবধ সমর্থন করা হইয়াছে। কলিকাতা মিউনিসিপাল আইনের পাণ্ডুলিপির যে উপদফায় মিউনিসিপালিটীর সীমার ভিতরে গরু ও বাছুর হত্যা বন্ধ করিবার সর্ত্ত আছে, সেই উপদফার বিরুদ্ধে আবদুল হাকিম তীব্র প্রতিবাদ করেন। মৌলভী সৈয়দ এমদাদউল হক এই প্রস্তাবটী সমর্থন করিয়া বলেন যে, ঐ উপদফাটী পাস হইবে না বলিয়াই তিনি আশা করেন।

কাউন্সিল প্রবেশ সমস্যা

কাউন্সিলে প্রবেশের সমস্যা একটী সাবকমিটীর হাতে অর্পণ করা হইয়াছে। সেই কমিটী তিন মাসের মধ্যে একটী রিপোর্ট পেশ করিবেন। সেই রিপোর্ট পেশ না করা পর্যন্ত গয়ার উলেমা কন্‌ফারেন্সে গৃহীত অসহযোগের নীতি অনুসারে চলাই স্থির সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

ত্রিপুর হিতৈষী

দেশ

তিলক কর্ম্মমন্দির।—হুগলী জেলায় ভাণ্ডারহাটী নামক গ্রামে "তিলক কর্ম্মমন্দির" নামে একটি গৃহশিল্প দ্রব্য প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এই কারখানায় বাঁশের চটা দ্বারা দিয়াশলাইয়ের বাক্স ও ঝেঁটার কাঠি দ্বারা উহার শলাকা প্রস্তুত করা হইতেছে। এই দিয়াশলাই বিলাতী দিয়াশলাই অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নহে। পাঠকবর্গ পরীক্ষা করিতে পারেন। পল্লীবার্ত্তা

বাঙ্গলার বজেট—গত বৎসর ও আগামী বৎসরের আয়-ব্যয়।—ব্যবস্থাপক সভায় বাঙ্গালার অর্থ-সচিব অনারেবল মিঃ জে, ডোনাল্ড বাঙ্গালায় বজেট বা আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করিয়াছিলেন। উহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

গত বৎসরে বজেট

পূর্ব্ব বৎসরের মজুত জমা	৬৭,০৩,০০০৲
মোট আয়	১০,৩১,২৯,০০০৲
মোট ব্যয়	১০,৪১,৯৮,০০০৲
হাত মজুত	৫০,৮৪,০০০৲
ফাজিল	১৬,৬১,০০০৲

আগামী বর্ষের বজেট

পূর্ব্ব বৎসরের মজুত জমা	৫০,৮৪,০০০৲
আনুমানিক আয়	১০,১৫,৫৭,০০০৲
আনুমানিক ব্যয়	১০,২১,৬৬০০০৲
আনুমানিক ফাজিল	৬,৯০,০০০৲

বিগত বর্ষে বজেট-বক্তৃতা প্রসঙ্গে অর্থসচিব মহাশয় বলিয়াছেন,—আমাদের আশা হইতেছে, মোটের উপর ১২০লক্ষ টাকা ফাজিল হইবে; অর্থাৎ আয় অপেক্ষা ব্যয় ১২০ লক্ষ টাকা বেশী হইবে। তবে নূতন টেক্স বসাইয়া আমরা তাহা একরূপ সামলাইয়া লইতে পারিব। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটে নাই।

কেন ঘটে নাই?

দলিলাদির ষ্টাম্প হইতে যত টাকা আয় হইবে বলিয়া বজেটে ধরা হইয়াছিল, কার্য্যতঃ তাহা হয় নাই; ৭৫ লক্ষ টাকা কম হইয়াছে। থিয়েটার, বায়স্কোপ প্রভৃতির উপর যে প্রমোদ কর ধার্য্য হইয়াছিল, তাহা হইতে যত টাকা পাইবার আশা করা গিয়াছিল তাহা অপেক্ষা ১০ লক্ষ টাকা কম পাওয়া গিয়াছে।

দলিল ও আদালতের ষ্টাম্প হইতে আয় কম হইয়াছে, এই জন্য যে, ষ্টাম্পের খরচ বেশী পড়িবে বলিয়া অনেকে টেক্স বাহাল হইবার পূর্ব্বে মামলা রুজু করিয়াছিল।

প্রমোদ কর এদেশে সম্পূর্ণ নূতন। এই জন্য ইহার আয় সম্বন্ধে অনুমান ঠিক হয় নাই। অনুমান করা হইয়াছিল, ইহা হইতে ৩০ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় নাই, পাওয়া গিয়াছিল মাত্র ২০ লক্ষ টাকা।

নায়ক

মহিলা ম্যাজিষ্ট্রেট।—"ভারতীয় মহিলা এসোসিয়েশনের" জয়েণ্ট সেক্রেটারী শ্রীমতী মার্গারেট কাজিন মাদ্রাজের সৈদাপেট নামক স্থানের বিশেষ ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতে ইনিই সর্ব্বপ্রথম মহিলা ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন।

দেশের বাণী

বিলাতী বস্ত্র।—গত ২০এ জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বিলাতী বস্ত্র আমদানীর হিসাব।

কোরা কাপড়

	এই বৎসর		গত বৎসর	
কলিকাতা	৮৩১১০০০	গজ	১০৭৭১৬০০	গজ
বোম্বাই	৩১২০০০০	„	৩ ৩৭০০	„
মাদ্রাজ	৬১১০০০	„	৫২২০০০	„

ধোয়া কাপড়

	এই বৎসর		গত বৎসর	
কলিকাতা	৫৬১১০০০	গজ	৪৫৬২০০০	গজ
বোম্বাই	২ ৬০ ০	„	২৭১৫০০০	„
মাদ্রাজ	১৬৩০০০	„	১০০৩০০০	„

হিন্দুস্থান

প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ।—বীরভূম জেলায় এক স্থানে এক পুষ্করিণীর পার্শ্বে একটী গাছের গোড়ায় দুটী প্রাচীন স্তম্ভ বাহির হইয়াছে। ইহার একটীতে চেদিরাজ কর্ণের এবং অপরটীতে তদানীন্তন বঙ্গাধিপতি বিজয় সেনের খোদিত লিপি আছে বলিয়া প্রকাশ। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট এই মর্ম্মে আদেশ দিয়েছেন যে বীরভূমের কালেক্টরের অনুমতি না লইয়া কেহ এই স্তম্ভ দুইটী স্থানান্তরিত করিতে পারিবে না।

২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ

নারায়ণ শিলা চুরি।—বারাসাত থানার এলাকাধীন সাইমনা গ্রামের সুবিখ্যাত শ্রীশ্রী৺নন্দদুলাল জিউর মন্দির হইতে সম্প্রতি একদিন রাত্রে সমস্ত নারায়ণ শিলা চুরি গিয়াছে। মন্দিরে বহু টাকার অলঙ্কার থাকা সত্ত্বেও তাহা চোর স্পর্শ করে নাই। এইরূপ নারায়ণ শিলা চুরি এতদঞ্চলে আরও কোন কোন স্থানে হইয়া গিয়াছে বলিয়া শুনা যাইতেছে। বারাসাত পুলিশ তাহার তদন্ত করিতেছে।

২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ

নূতন ডাক্তারখানা।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে মাননীয় স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন যে, গত ১৯২২ সালে বাঙ্গালা দেশে ৬৩টি নূতন ডাক্তারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ২৫টি ডাক্তারখানা জেলা বোর্ড কর্তৃক, ১৭টি ইউনিয়ন বোর্ড, এবং ১০টি প্রাইভেট লোকের দ্বারা, কিন্তু সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত, ৭টি প্রাইভেট সাহায্যপ্রাপ্ত ও ৫টি অধীনস্থ ডাক্তারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

হিন্দুস্থান

মাদ্রাজে শিশু প্রদর্শনী।—মাদ্রাজ-লাট-পত্নী লেডী উইলিংডন মাদ্রাজে শিশুদের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। গত বৃহস্পতিবার তিনি একটি শিশু প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। সেই শিশু প্রদর্শনীতে মাদ্রাজ সহরের ৫ হাজার শিশু প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রদর্শনীতে ঘোষণা করা হয় যে, মাদ্রাজ কর্পোরেশন তাঁহাদের আগামী বৎসরের বাজেটে, যে সমস্ত পরিবার খাটি দুধ কিনিয়া সন্তানদিগকে দিতে পারে না, তাহাদিগকে বিনামূল্যে দুধ যোগাইবার জন্য ৫০ হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন।

হিন্দুস্থান

বাঙ্গালা দেশে জ্বর রোগ।—১৯২০ ও ১৯২১ সালে জ্বর রোগেই বাঙ্গলা দেশে যথাক্রমে ১,১৪৪,৪২১ ও ১০৭০৩৬৮ লোকের মৃত্যু হইয়াছিল; অর্থাৎ জ্বরে হাজারকরা মৃত্যুসংখ্যা ঐ দুই সালে যথাক্রমে ২৫.২ ও ২৩.৫। ১৯২০ ও ১৯২১ সালে মোট মৃত্যু সংখ্যার তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, অধিকাংশ লোকই জ্বর রোগে মরিয়াছে। জ্বর রোগ বলিতে কালাজ্বর, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া জ্বর প্রভৃতি সবই বুঝায়। কিন্তু ম্যালেরিয়াই যে বাঙ্গালী জাতির ধ্বংসের প্রধান কারণ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই ম্যালেরিয়াই সোণার বাঙ্গলাকে উজোড় করিয়া দিতেছে; বাঙ্গালী জাতিকে ধরা পৃষ্ঠ হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে আছে, বাঙ্গালীর ঘোর দারিদ্র্য। বাঙ্গালার শিল্পবাণিজ্য আজ লুপ্ত—তাহার কৃষক-শ্রমিক আজ অনাহারে কঙ্কালসার—তাহার ভদ্রসম্প্রদায় নিরন্ন, জীবিকা-সমস্যায় কাতর। সুতরাং এক দিকে কঙ্কালসার জরা-জীর্ণ

দেহ—অন্যদিকে ম্যালেরিয়া-রাক্ষসীর রক্ত শোষণ—বাঙ্গালী জাতি আর কতদিন টিকিতে পারে! আনন্দবাজার পত্রিকা

কলিকাতায় কুষ্ঠ বিদ্যালয়।—কলিকাতায় শীঘ্রই কুষ্ঠ ব্যাধি চিকিৎসার জন্য একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহার নাম হইবে "কিং এডওয়ার্ড রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট।" সপ্তম এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল ফণ্ড হইতে ইহার জন্য কলিকাতা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের কর্ত্তৃপক্ষকে আড়াই লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ দেওয়া হইয়াছে। কলুটোলা ষ্ট্রীট ও সেণ্ট্রাল এভেনিউ রাস্তার মোড়ে ট্রপিক্যাল মেডিসিন স্কুলের ঠিক উত্তরে এই নূতন কুষ্ঠ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। জমি খরিদ এবং বাড়ী তৈয়ারীতে খরচ পড়িবে অনুমান একলক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা। দোতালা বাটী হইবে। ইহা কুষ্ঠ রোগীর থাকিবার হাসপাতাল হইবে না। ইহাতে বাহিরের রোগীদের পরীক্ষা ও চিকিৎসাদির ব্যবস্থা থাকিবে বটে, কিন্তু কোন রোগীকে এখানে থাকিতে দেওয়া হইবে না। ২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ

ভারতে কুষ্ঠ রোগী।—ভারতে কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত আদম সুমারীর রিপোর্টে প্রকাশ, ভারতের ১,২০,০০০ লোক এই ভয়ানক ব্যাধিগ্রস্ত। তন্মধ্যে এক বাঙ্গালা দেশেই ১৫৪৫০ জন। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গালার সংখ্যা অতিশয় ভয়াবহ। এই ভয়ানক ব্যাধি শরীরে প্রবেশ করার পর ৬ হইতে ৮ বৎসরের মধ্যে প্রকাশ পায়। অপ্রকাশিত রোগীর সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। এই শত্রুর কবল হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হইলে, যাহাতে এই সমুদয় রোগীগণ প্রকাশ্য রাস্তায়, জনবহুল বাজারে অবাধে চলাফেরা করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সহরে দুই একজন কুষ্ঠ রোগীকে বাজারে প্রকাশ্য স্থানে বসিয়া তাহাদের ভিক্ষালব্ধ চাউল প্রভৃতি নিজ হস্তে ওজন করিয়া বিক্রয় করিতে দেখিতে পাই। মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি আমরা এ বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি। ময়মনসিংহ সমাচার

নারী-নির্য্যাতন।—ফরিদপুর জেলার বালিয়াকান্দি থানার অন্তর্গত রামদিয়া গ্রামের কোনও ব্রাহ্মণ পরিবারের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থী ছাত্র তাহার বালিকা বধূকে শ্বাশুড়ীর নিকট হইতে টাকা আনাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করে। বালিকাটী ইহাতে অস্বীকৃত হওয়ায় সে বালিকাটিকে বেত মারিতে থাকে। স্বামীর এই নিষ্ঠুর অত্যাচারে বালিকাটী অজ্ঞান হইয়া পড়ে। বালিকার ভাসুর একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তিনিও নাকি ভ্রাতার এই অত্যাচার সমর্থন করেন। বালিকাটী বেত্রাঘাতে যখন অজ্ঞান হইয়া পড়ে, তখন তাহার স্বামী দেবতা বালিকার সর্ব্বাঙ্গে কেরোসিন তেল ছিটাইয়া দিয়া আগুন ধরাইয়া দেয়। আগুন জ্বলিয়া উঠামাত্র বালিকার জ্ঞান হয়, তখন সে প্রাণভয়ে চীৎকার করিয়া উঠে। প্রতিবাসীরা সাহায্য করিতে আসিলে উক্ত প্রধান শিক্ষক নাকি তাহাদিগকে বাধা দেয়। যন্ত্রণার জ্বালায় হতভাগিনীর শীঘ্রই মৃত্যু হয়। বাঙ্গালার কথা।

মেটেবুরুজে বাজার লুট। শতাধিক লোকের হানা। পুলিশের সমক্ষেই ঘটনা।—গত ২১শে ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে মেটেবুরুজের বাজার লুট হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ,—গত ২১শে তারিখে রাত্রিতে একদল লোক লাঠি ও অন্যান্য হাতিয়ার লইয়া বাজারে উপস্থিত হয়। সেই সময়ে বাজারের দোকান পাটে খুব কেনা-বেচা চলিতেছিল। উহারা দোকানদারদিগকে আক্রমণ ও দোকানপাট লুট করিতে আরম্ভ করে। পুলিশ আসিবার পুর্ব্বেই উহারা ৪টা দোকান লুট করে এবং পুলিশ আসিতেই সরিয়া পড়ে। পুলিশ প্রহরীরা বাজারে পাহারা দিতে থাকে। পরদিন সন্ধ্যার সময়ে আবার একদল লোক লাঠি সোঁটা লইয়া বাজারে হানা দেয়। পুলিশ তখন বাজারে পাহারা দিতেছিল। পুলিশ থাকা সত্ত্বেও তাহারা অনেকগুলি দোকান লুট করিয়া বিস্তর টাকার মালপত্র লইয়া যায়। পুলিশের কর্ত্তারা এখন বন্দুকধারী পুলিশ বাজারে ও বাজারের আশেপাশে মোতায়েন করিয়াছে। পুলিশ লুটের কারণ অনুসন্ধান করিতেছে। নায়ক

ভারতে সামরিক ব্যয়; রাষ্ট্রীয় পরিষদে আলোচনা; দীনশা ওয়াচার প্রস্তাব।—দিল্লীর ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখের সংবাদে প্রকাশ, ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের অদ্যকার অধিবেশনে স্যর দীনশা ওয়াচা এই মর্ম্মে একটী প্রস্তাব করেন যে, ভারতের সামরিক ব্যয় যে ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে ভারতের পক্ষে ঐ ব্যয়ভার বহন করা কষ্টকর ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থায় ১৮৫৯ সালের প্রবর্ত্তিত সৈন্য বিভাগ একীকরণ সম্বন্ধীয় স্কীমটী একেবারে প্রত্যাহার করা হউক, অথবা রীতিমত ইহার সংস্কার সাধন করা হউক।

প্রধান সেনাপতি এই প্রস্তাবের উত্তরে বলেন যে, তিনি স্যর দীনশা ওয়াচার প্রস্তাবটী গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। কারণ, ইহাতে ব্যয়সংক্ষেপ ত হইবেই না, বরং আরও ব্যয় বৃদ্ধি করা হইবে। যদি একটী ভিন্ন বৃটিশ সৈন্যবিভাগ সৃষ্টি করা হয়, তাহা হইলে তাহাতে অনেক ব্যয় পড়িবে। সভার অনেক সদস্য স্যর দীনশা ওয়াচার প্রস্তাব সমর্থন করিয়া সেনাধ্যক্ষকে ১৮৫৯ সালের স্কীমটী প্রত্যাহার করিতে বলেন। কিন্তু ইহাতে ব্যয় বৃদ্ধি হইবে এই অজুহাত দেখাইয়া তিনি এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। প্রস্তাবটী ভোটে চড়াইয়া দেখা গেল ১৬ জন উহার বিপক্ষে এবং ১২ জন পক্ষে আছেন। কাজেই প্রস্তাবটী নাকচ হইয়া গিয়াছে। হিন্দুস্থান

গুরুদ্বারে মোহান্তের অধিকার নাই।—রণজিৎ সিংহের আমলের নজীর; পণ্ডিত মদনমোহনের বক্তৃতা, অমৃতসরের ১০ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, আজ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য তাঁহার বক্তৃতা শেষ করেন। তিনি তিন ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি মহারাজ রণজিৎ, দিলীপসিং এবং তাঁহাদের উত্তরাধিকারীদের শীলমোহর করা দলিল পত্র হইতে দেখাইয়া দেন যে, গুরু-কা-বাগ গুরুদ্বারকে প্রদত্ত হইয়াছিল। তিনি বলেন, মোহান্ত কেবল ম্যানেজার স্বরূপ গুরুদ্বারের সম্পত্তির তদারক করিতেন, ঐ সম্পত্তিতে তাঁহার মালিকী স্বত্ব থাকিতে পারে না। হিন্দুস্থান

ভুপালে স্বরাপান একদম বন্ধ।—বেগম সাহেবার আদেশে ভুপালে কতকগুলি সংস্কার ব্যবস্থা হইয়াছে। সেই সকল সংস্কারের মধ্যে একটা এই যে, বেগম সাহেবা তাঁহার রাজ্যে সুরাপান একদম নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। সুরার কনট্রাক্টে এই রাজ্যের বাৎসরিক চারি লক্ষ হইতে পাঁচ লক্ষ টাকা আয় হইত। কিন্তু ভুপাল রাজ্যের প্রজাগণের বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি সাধন হইবে বলিয়া এই আয় ত্যাগ করা হইয়াছে। নায়ক

কুকুরের উপর টেক্স।—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে কলিকাতা মিউনিসিপাল আইন আলোচনা উপলক্ষে দেশবাসীর প্রতিনিধিগণ স্থির করিয়াছেন,—কলিকাতা কর্পোরেশন কুকুরের উপর টেক্স ধার্য্য করিতে পারিবেন, কিন্তু সে টেক্সের পরিমাণ বার্ষিক ৫৲ টাকার উপর হইবে না। নায়ক

বারবনিতা-উচ্ছেদ।—সম্প্রতি ব্যবস্থাপক সভায় অধ্যাপক এস, সি মুখোপাধ্যায় কলিকাতায় বারবনিতাদিগকে উচ্ছেদ করা সম্বন্ধে একটি বিলের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়াছেন। এদিকে গত নবেম্বরে শাহ সৈয়দ এমদাদুল হক সমগ্র বাঙ্গলা দেশ হইতে বারবনিতাদের ব্যবসা বন্ধ করিয়া দিবার জন্য এক আইনের খসড়া ভারত সরকারের নিকট পাঠাইয়াছেন। এই পাপপ্রথা বাঙ্গলা দেশে যে কিরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছে, তাহা ব্যবস্থাপক সভায় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তৃতা হইতে বেশ বুঝা যায়। তিনি এক কলিকাতার কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, এক কলিকাতা সহরে নাম-লেখান বেশ্যার সংখ্যা ১৮ হাজার, আর নাম না লেখান বেশ্যার সংখ্যা ১৬ হাজার,—একুনে ৩৪ হাজার বেশ্যা কলিকাতায় ভোগের উপাদান যোগাইতেছে। বৎসরে হাজারের উপর ১০ বৎসরের অনধিক বয়স্কা বালিকা কলিকাতায় বেশ্যাগিরি শিখিবার জন্য মফঃস্বল হইতে আনীত হয়। এই সর্ব্বনাশকর প্রথা দেশের যে কি সর্ব্বনাশই করিতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আইন বলে যদি ইহার প্রতিরোধ করা যায়, তবে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবল নিষেধাত্মক আইন দ্বারাই যে এই প্রথার উচ্ছেদ করা যাইবে, ইহা আমাদের মনে হয় না। অনেক হতভাগিনী উদরের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া নিজের সতীত্ব বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। আবার অনেকে প্রবৃত্তির তাড়নায় কিম্বা পরের প্রলোভনে পড়িয়া স্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিলেও পরে অনুতপ্ত হইয়া এই পাপ ব্যবসা ছাড়িয়া দিবার প্রয়াস পায়। কিন্তু অন্নসমস্যা তাহাদের প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং এই পাপপ্রথার গতিরোধ করিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে অন্নসমস্যার সমাধান করাও আবশ্যক। যুগবার্ত্তা

নূতন হাওড়া-পুল।—হাওড়া ও কলিকাতার মধ্যে গঙ্গার উপর আর একটী নূতন পুল নির্ম্মাণের উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ১৯২১ সনের নবেম্বর মাসে ইঞ্জিনিয়ার কমিটীর হস্তে ভারদেওয়া হইয়াছিল। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কমিটির রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। 'বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স' জানান যে খরচের পরিমাণ না জানিলে এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা চলে না। এক্ষণে ইঞ্জিনিয়ারগণ উহার খরচ আন্দাজে একটা ঠিক করিয়া দেওয়ায়, ঐ খরচ কিরূপে সংগ্রহ করা যাইবে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। পুলের প্রকৃতি, তাহার খরচ ও খরচ আদায়ের উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য একটি কমিটী গঠিত হইয়াছে। যুগবার্ত্তা

আহম্মদাবাদে হিন্দু ও মুসলমানে বিরোধ।—আহম্মদাবাদের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখের তারের খবরে প্রকাশ:—সিধাপুর হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, তথায় হিন্দু এবং মুসলমানগণের মধ্যে বিষম বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে। গত ২৩শে জানুয়ারী তারিখ রাত্রিতে দুইটী হিন্দুমন্দিরে কয়েকটী লোক প্রবেশ করিয়া দেবদেবীর মূর্ত্তিগুলি ভাঙ্গিয়া দেয়। তাহার ফলে কয়েকজন হিন্দু তিনজন বোড়া এবং একজন ইরাণীর বিরুদ্ধে দরখাস্ত দাখিল করে। আসামীদিগকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী তাহাদের মামলার শুনানী হইবে। এদিকে গত ৩০শে জানুয়ারী তারিখ রাত্রিতে প্রায় পনের জন লোক একজন বাদীকে ও তাহার সঙ্গীকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে বিষম মারধর করে। নায়ক

পতিতা নারী উদ্ধারে ঝালকাটি কংগ্রেস।—ঝালকাটী মহকুমা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে গত ২৫শে মাঘ বুধবার—শ্রীযুক্ত বল্লভদাস মোহন্তের বাড়ীতে স্থানীয় পতিতা রমণীগণের এক সভা হয়। বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবীশ মহাশয় ইহাদিগের অধঃপতনের কারণ ও উদ্ধারের উপায় সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া একদিকে চরকা, তাঁত, শিল্প, সাহিত্য সেবা ও চিকিৎসাদিতে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে এবং অন্যদিকে যে সকল কারণে রমণীগণ সমাজদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এইরূপ কুৎসিত জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়, তাহার সাধ্যমত প্রতিকার করিবার জন্য সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গকে বদ্ধপরিকর হইতে উপদেশ দেন। মৃত্যুর পর ইহাদিগের সম্পত্তি যাহাতে গভর্ণমেণ্টের হাতে না গিয়া দেশের কোনও সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইতে পারে, প্রত্যেক রমণীকে তজ্জন্য অনুরোধ করেন। ইহাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করা হইবে। চরকা খদ্দর প্রচলিত হইতেছে। বাঙ্গলার কথা

বাঙ্গালায় শিশু-মৃত্যু।—বাঙ্গালা গবর্মেণ্টের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের সাধারণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় যে রিপোর্ট পাইয়াছি তাহা হইতে কিয়দংশ ও কয়েকটি সংখ্যা উদ্ধৃত করিয়া দিলে বাঙ্গালা দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি যে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইবে:—

চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশ ব্যতীত সমগ্র বাঙ্গালা দেশের লোক সংখ্যা ১৯২১ সনের আদম সুমারীতে ৪, ৭৫, ২২, ২৯৩ চার কোটি পঁচাত্তর লক্ষ বাইশ হাজার দুইশত তিরনব্বই জন হইয়াছে। ১৯১১ সনে ছিল ৪, ৫৩, ২৯, ২৪৭ চার কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ উনত্রিশ হাজার দুইশত সাতচল্লিশ। গত দশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র লোকবৃদ্ধি সমানভাবে হয় নাই।

১৯২০ এবং ১৯২১ সনের কাগজে কলমে লিপিবদ্ধ মৃত্যুর সংখ্যা

দেখিতে পাই ১৪,৮১,৬১২ এবং ১৪,৩৩,০০০; কিন্তু ঐ ঐ বৎসরে জন্মের সংখ্যা দেখিতে পাই ১৩,৫১,৯১৩ এবং ১৩,০১,০০১।

জন্মের অপেক্ষা মৃত্যুর সংখ্যা অধিক, এ কিছুতেই শুভ লক্ষণ নহে।

ডিরেক্টর অব পাবলিক হেলথ বলেন, স্বাভাবিক নিয়মে মৃত্যুর তুলনায় জন্মের হার বাড়িয়া যাওয়া হইতেছে দেশের স্বাস্থ্যের লক্ষণ। এই সত্য অনুসরণ করিয়া আমরা দেখিতে পাই, ১৯২০ সনে বাঙ্গালা দেশ সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর প্রদেশ। ডিরেক্টর মহোদয়ের বিবেচনায় আর্থিক হীনতাই না কি এ অস্বাস্থ্যের কারণ।

কিন্তু ইহা একটি কারণ হইলেও আরো অনেক কারণ আছে। দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির বা ব্যাধি নিবারণের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছে কি?

১৯২০ এবং ১৯২১ সনে ২,৮২,০৯০ এবং ২,৫৯,১৬২ জন শিশু এক বৎসর না হইতেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তাহা হইলে এই দুই বৎসরের অনুপাত যথাক্রমে হাজারের মধ্যে ২০৭ এবং ২০৬ দাঁড়ায়। মুর্শিদাবাদ জেলার একটি ৫০০০ পাঁচ হাজার লোকের ক্ষুদ্র সারকেলে যথাযথ গণনা রেজেষ্টারী করার ফলে দেখা গিয়াছে যে, সেইখানে প্রতি হাজারে ৭০০ সাতশজন শিশুরই মৃত্যু হইয়াছে। শতকরা পঞ্চাশটী শিশুর মৃত্যু জন্মকালীন দুর্ব্বলতা হইতে হইয়া থাকে। শতকরা প্রায় ১১ জন ধনুষ্টঙ্কারে মরিয়া থাকে। কি ভীষণ!

আলোচ্য রিপোর্টে প্রকাশ যে, লোকসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি রেজিষ্টারী দ্বারা সকল জেলার যথাযথরূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই, মৃত্যু সংখ্যা গণনা যতদূর হইয়াছে জন্মের ততদূর হয় নাই। সে যাহা হউক, মৃত্যুর হার যে পরিমাণে বাড়িয়া যাইতেছে, তাহা নিতান্তই আতঙ্কের বিষয়।

কলিকাতা কর্পোরেশনের উদ্যোগে শিক্ষিত ধাত্রী ও মেয়ে ডাক্তারদের পর্য্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানে শিশুরক্ষার দিকে সুফল ফলিতেছে, রেড-ক্রশ-লীগের যত্নে কলিকাতায় এবং ঢাকায় শিশুদের মঙ্গলের পথ প্রশস্ত হইতেছে, কিন্তু মৃত্যুর হার যেরূপ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে এ বিষয়ে কিছুতেই দেশবাসী ও গবমেণ্টের ঔদাসীন শোভা পায় না। যত প্রকারে দেশের এ কলঙ্ক দূর হয় সেজন্য সকল রকম প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন ও গ্রহণ করিতে হইবে। হিন্দুস্থান

বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি আবিষ্কার।—'বাঁকুড়া দর্পণ' পত্রে প্রকাশ,—সোণামুখী থানার অধীন দামোদর নদের দক্ষিণ উপকূলে, অমৃতপাড়া নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। সেই গ্রামের উত্তরেই নদী, সেই নদী তীরে গুড়ডাঙ্গায় মানা নামক এক মৌজা। কৃষকেরা শস্যক্ষেত্রে জল সেচনের নিমিত্ত জ্যৈষ্ঠ মাসে কূপ খননে প্রবৃত্ত হয়। ৫।৬ হাত মৃত্তিকা খননের পর একটী প্রস্তর খণ্ড লাগায় তাহারা কূপ খনন বন্ধ করে। কিন্তু দামোদরের গত বন্যায় মৃত্তিকা ধুইয়া গিয়া প্রস্তরটী প্রায় বাহির হইয়া পড়ে। তখন লোক সহজেই ঐ প্রস্তরটী বাহির করে। উহা একখানি অখণ্ডশীলা বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি। ঐ প্রস্তর খণ্ডের নিম্ন ও উচ্চভাগে অনেকগুলি মনোহর মূর্ত্তি খোদিত আছে, মধ্যস্থলের মূর্ত্তিটী মহৎ এবং বুদ্ধ মূর্ত্তিরই অনুরূপ। প্রস্তরটীর উচ্চতায় প্রায় ৬ ফুট এবং ব্যাস প্রায় ৩ ফুট।

এক সময়ে বুদ্ধদেবের পূজা প্রায় বঙ্গদেশের সকল স্থানে হইত। দামোদর নদের দক্ষিণতীরে যে স্থানে ঐ মূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, সেই স্থানটী পূর্ব্বে একটী সমৃদ্ধিশালী নগর বলিয়া খ্যাত ছিল। ঐ স্থানের পূর্ব্ব নাম রূপই সহর। কালবশে বহু সহর ধ্বংস হইয়া যেমন জনশূন্য স্থান হইয়া পড়িয়াছে, রূপই সহরেরও সেই দশা। এমন কি নামটী পর্য্যন্ত লোপ পাইতে বসিয়াছে। মূর্ত্তিটী এখন নাসিরাবাদের মানাদের যোল আনার দুর্গা মেলার ঈশান কোণে একটী বেদীতে রাখা হইয়াছে। নানা স্থান হইতে লোক আসিয়া প্রতিদিন উহা দেখিয়া যাইতেছে। ঐ মানারা জাতিতে মাহিষ্য; তাহাদের কুলপুরোহিতকে আনাইয়া ঘটা করিয়া সেই মূর্ত্তিটীর অভিষেক করিয়াছে। ঐ সুন্দর মূর্ত্তিটীর দুই এক ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। মানারা উহার মেরামত করাইয় সুদৃশ্য করিয়াছে। এতদুপলক্ষে মানাদের দুর্গা মণ্ডপের আটচালায় পঞ্চরাত্রি উৎসব এবং বিবিধ মূর্ত্তিও নানা সং প্রস্তুত হইয়াছে। এই মহোৎসবে বহু লোককে প্রতিদিন ভোজন করান হইতেছে। মধুর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে গ্রামখানি মুখরিত হইয়াছে। নায়ক

ব্যবস্থাপক সভায় তুমুল তর্ক

কলিকাতার চৌহদ্দী। মুন্সীপালের গণ্ডী বাড়িল।—কলিকাতা মিউনিসিপাল বিল সিলেক্ট কমিটির হস্তে রিপোর্টের জন্য অর্পিত হইয়াছিল। সেই রিপোর্ট বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করা হইয়াছে।

মাণিকতলা মিউনিসিপ্যালিটি

মিঃ মাহবুব আলি, সৈয়দ এমদাদ উল হক এবং শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্কর প্রস্তাব করেন যে, মাণিকতলা মিউনিসিপ্যালিটিকে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির বাহিরে রাখা হউক। কিন্তু তাঁহাদের প্রস্তাব ভোটে টিকে নাই। সুতরাং মাণিকতলা মিউনিসিপ্যালিটি কলিকাতা কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হইল।

গার্ডেনরীচ মিউনিসিপ্যালিটী

মিঃ এস-সি ষ্টুয়ার্ট-উইলিয়াম্‌স্ প্রস্তাব করেন যে, গার্ডেনরীচ মিউনিসিপ্যালিটী কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্ভুক্ত হউক। তাঁহার এই প্রস্তাব অধিকাংশ সদস্য গ্রহণ করায় ইহা ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হয়। সুতরাং গার্ডেনরীচ মিউনিসিপ্যালিটী কলিকাতা কর্পোরেশনের গণ্ডীর ভিতরে আসিল।

খিদিরপুরের নূতন ডক

নিউ ডক এক্সটেনসন অর্থাৎ খিদিরপুরের নূতন ডক অঞ্চলকে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর চৌহদ্দীর বাহিরে রাখা হউক—এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ রায়। কিন্তু ভোটে তাঁহার প্রস্তাব টিকে নাই। অতএব নূতন ডক অঞ্চলও কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর এলেকাভুক্ত হইল।

কাশীপুর-চিৎপুর

শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ও রাজা হৃষীকেশ লাহা প্রস্তাব করেন যে, কাশীপুর-চিৎপুর মিউনিসিপ্যালিটি কলিকাতা কর্পোরেশনের

অঙ্গীভূত করা হউক। এই প্রস্তাবও ব্যবস্থাপক সভায় পরিগৃহীত হয়।

সিলেক্ট কমিটি কিন্তু কাশীপুর-চিৎপুর মিউনিসিপ্যালিটীকে কলিকাতা মুন্সীপালের গণ্ডীর বাহিরে রাখিতেই বলিয়াছেন। নায়ক

ময়মনসিংহ হাসপাতালে নার্সিং ও ধাত্রীবিদ্যা।—ময়মনসিংহ সূর্য্যকান্ত হাসপাতালে নার্সিং এবং ধাত্রীবিদ্যার ক্লাশ খুলিবার প্রস্তাব গবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিয়াছেন, এই সংবাদ আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। তিন বৎসরে এই শিক্ষা সমাপ্ত হইবে। ছাত্রীগণ শিক্ষা লাভ কালে খোরাকি ও হাসপাতালে বাসস্থান ইত্যাদি পাইবেন। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরে যথাক্রমে মাসিক ১০, ১২ এবং ১৫ টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইবেন। শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হইবেন।

অনেক অনাথা ভদ্রমহিলাগণের আত্মীয় স্বজনের গলগ্রহ না হইয়া সৎপথে স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার পক্ষে এরূপ অনুষ্ঠান যে মঙ্গলকর, সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। শিক্ষালাভ কালে ছাত্রীগণের ব্যয় নির্ব্বাহের ব্যবস্থা থাকায় আমাদের বিশ্বাস যে ক্লাসে ছাত্রীর অভাব হইবে না। ময়মনসিংহ সমাচার

নিমজ্জমান লোককে উদ্ধার।—বেঙ্গল পাবলিসিটি অফিস হইতে জানান হইয়াছে, গত ১৯২২ সালের ৯ই আগষ্ট বেলা ৭—৩০ মিনিটের সময় "বাকলাণ্ড" নামক ষ্টীমার চাঁদপাল ঘাট হইতে নদী পার হইবার জন্য নোঙ্গর তুলে। কিছুদূর যাইবার পর হাওড়ার দিক হইতে একখানি ডিঙী আসিয়া বাক্‌লাণ্ড সেতুর মধ্যে ডুবিয়া যায়। নৌকায় পাঁচজন আরোহী ছিল, তন্মধ্যে চারিজন সাঁতার জানে; তাহাদিগকে বাক্‌লাণ্ডে তুলিয়া লওয়া হয়। পঞ্চম লোকটি সাঁতার না জানায় স্রোতে ভাসিয়া যাইতে থাকে। তখন এ-ম্যামুয়েল নামে ১৯ বছরের একটি শ্বেতাঙ্গ যুবক বাক্‌লাণ্ড হইতে নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া সেই লোকটিকে অতি কষ্টে উদ্ধার করে। রয়াল হিউমেন সোসাইটি মিঃ এ-ম্যামুয়েলকে প্রশংসাপত্র দিয়াছেন। হিন্দুস্থান

প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন।—সম্প্রতি প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনের জন্য খসড়া প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য যাহার হাতে লাঙ্গল থাকিবে, তাহাকেই ভূমির স্বত্বে স্বত্ববান্ করা। গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে যাহার হাতে লাঙ্গল থাকিবে না, সে ব্যক্তি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভূমির মালিক হইবার অযোগ্য। হয়ত বা গভর্ণমেণ্ট মনে করিয়াছেন যে এইরূপ ব্যবস্থায় ভূম্যধিকারিগণ জমী চাষের বিষয়ে অধিকতর উদ্যোগী হইবে; সুতরাং দেশে কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইবে। ধনী ভূম্যধিকারীরা কি করিবেন তাহা বলা যায় না, কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ও চাষীপ্রজার ইহাতে বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। কেহ কেহ বলিতেছেন যে এই আইন সংশোধনের প্রস্তাবে গভর্ণমেণ্টের একটা রাজনীতিক উদ্দেশ্য আছে। তাঁহারা জানেন যে, দেশের মধ্যবিত্ত লোকেরা সমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপ, দেশের সামাজিক ও রাজনীতিক আন্দোলনে অগ্রণী। তাই গভর্ণমেণ্ট প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধনের শাণিত অস্ত্র দ্বারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উচ্ছেদসাধন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। যে সকল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকে নিজে চাষ করেন না, কেবল চুক্তি ধান্য লইয়া জমীদারী প্রজার হাতে দিয়া থাকেন, তাঁহাদের আর সে ব্যবস্থা করিবার উপায় রহিল না। অথচ দেশে এমন মধ্যবিত্ত জোতদার অনেক আছেন, যাহাদের চাষ করিবার উপযুক্ত লোক, অর্থ বা জমি নাই ও সেই সকল ব্যক্তি অপরের সাহায্যেই জমি চাষ করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিয়া থাকেন। এখন এই অবস্থায় তাঁহাদের উপায় কি হইবে? হয় তাঁহাদিগকে ভূমির স্বত্ব ছাড়িতে হইবে, না হয় জমী পতিত ফেলিয়া রাখিয়া সপরিবারে অনাহারে মরিতে হইবে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্বন্ধে ত এই কথা; এখন চাষা প্রজার অবস্থা কি হইবে তাহাই দেখা যাউক। চাষী প্রজার মধ্যে এমন অনেক আছে, যাহাদের নিজের কোনও স্বতন্ত্র জোত নাই, তাহারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জোতদারের জমিতে চুক্তি ধান্যের বন্দোবস্ত করিয়া চাষ করে এবং তাহাতেই পরিবার প্রতিপালন করে। ইহাই অনেক চাষী প্রজার একমাত্র উপায়; তাহাদের এইবার আহারের ব্যবস্থা চলিয়া যাইবে। যে সকল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকে নিজে চাষ করেন না, অথচ যাহাদের কিছু অর্থ আছে, তাঁহারা এখন নূতন আইন সংশোধনের ভয়ে নিজেরা চাকর রাখিয়া জমী চাষ করিবার বন্দোবস্ত করিবেন এবং চাষী প্রজার নিকট হইতে জমী ছাড়াইয়া লইবেন। সুতরাং নিঃস্ব চাষী প্রজার ইহাতে অল্প ক্ষতি হইবে না। একজন জোতদারের জমী চাষী প্রজা চাষ করিয়া সপরিবারে প্রতিপালিত হইত, সে সুবিধা তাহার রহিল না; আর যে চুক্তি ধান্যের বন্দোবস্তে সে জমী চাষ করিত, তাহাতে সর্ব্বপ্রকার উৎপন্ন দ্রব্যই তাহার থাকিত, কেবল নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ধান্য জমীর পরিবর্ত্তে দিয়াই সে মুক্তি পাইত। এই জন্যই মনে হয়, প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধনের ব্যবস্থায় কৃষিকার্য্যের অবনতিই হইবে। বাঙ্গলার কথা

পোলো খেলোয়ারের মৃত্যু।—রেঙ্গুনে ২৩শে ফেব্রুয়ারী:—মন্দালয়ের জঙ্গী পুলিশের সুবাদার পীরবক্স ব্রহ্মদেশের উৎকৃষ্ট পোলো খেলেয়ার। গত কল্য পোলো খেলিবার সময়ে আর একজন খেলোয়াড়ের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়া পীর বক্স ঘোড়া সমেত পড়িয়া যান। ফলে তাঁহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া যায়। যখন তাঁহাকে লোকে তুলিতে যায়, তখন দেখা যায় যে, তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে। নায়ক

চীন সীমান্ত আক্রমণ। তিনজনের প্রাণদণ্ড—রেঙ্গুণের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখের তারের খবরে প্রকাশ:—গত মার্চ্চ মাসে চীনসীমান্তের নিকটবর্ত্তী মিউস নামক গ্রাম আক্রমণ করিবার পর অঙ্গ নিদান (ওরফে তিন পু), জিন কো দিন, এবং সালো নও নামক তিনটী লোক গ্রেপ্তার হয় এবং তাহাদের প্রতি প্রাণদণ্ডের হুকুম হয়। সপারিষদ লাট মহোদয় দয়া করিয়া প্রাণদণ্ড মাপ করিয়াছেন এবং যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ করিয়াছেন। অঙ্গ নে দান নিজেকে রাজা মিন নন মিনের প্রপৌত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল এবং সে একজন রাজকুমার ও যুবরাজ বলিয়া দাবী করিয়া তাহার প্রাণদণ্ড হইতে পারে

না বলিয়া প্রতিবাদ উপস্থিত করিয়াছিল। সে আরও বলিয়াছিল যে মিউস আক্রমণ করিবার পূর্ব্বেই সে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। সরকার পক্ষ হইতে এই বিষয়ে যে কমিউনিক জারি করা হইয়াছে, তাহার কিন্তু রাজকুমার রূপে তাহার সিংহাসনের দাবী স্বীকার করা হয় নাই। তাহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, এই লোকটীর বাজে দাবীর দরুণ তাঁহার প্রাণদণ্ড মাপ করা হয় নাই; কেবল অনুকম্পার হিসাবে তাহার প্রাণদণ্ড মাপ করিয়া তাহার প্রতি যাবজ্জীবন দীপান্তর দণ্ডের হুকুম করা হইয়াছে। নায়ক

পুলিশে ডাকাতে লড়াই।—রেঙ্গুন হইতে প্রেরিত গত ২৩শে ফেব্রুয়ারীর খবরে প্রকাশ,—গত ১৫ই তারিখে টংগোয়াও নামক স্থানে ডাকাতী হইতে সংবাদ পাইয়া সশস্ত্র পুলিশ তথায় রওয়ানা হয়। ডাকাতেরা আসিলে পুলিশের লোকেরা উহাদের উপর গুলি চালায়। ডাকাতেরাও গুলি চালাইয়া পাল্টা জবাব দেয়। পুলিশের গুলিতে একজন ডাকাত বধম হয়, কিন্তু অন্যান্য ডাকাতেরা তাহাকে লইয়া জঙ্গলের আড্ডায় সরিয়া পড়ে। নায়ক

রাজদ্রোহের মামলা।—রেঙ্গুনের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখের তারের খবরে প্রকাশঃ—গত ২৮শে এবং ৩০শে জুন তারিখের দুইটি বক্তৃতার জন্য পুঙ্গী দামৈন্দয়ার বিরুদ্ধে দুইটি রাজদ্রোহের অভিযোগ উপস্থিত করা হয়। মিয়াউঙ্গমিয়ার দায়রা জজের বিচারে তাহার দুই প্রতি বৎসর সশ্রম কারাবাস দণ্ডের হুকুম হয়। তাহা বক্তৃতায় না কি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ঘৃণার ভাব সৃষ্টি করিবার ইঙ্গিত ছিল। সেই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়। গত ২২ শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বিচারপতি মিঃ মে গাংএর নিকট সেই আপীলের বিচার আরম্ভ হয়। নায়ক

বোম্বায়ে মুসলমান মালসী গ্রেপ্তার।—বোম্বায়ের ২২ শে ফেব্রুয়ারী তারিখের তারের খবরে প্রকাশঃ—বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার মুসলমান সদস্য খাঁ সাহেব শের মহম্মদ খাঁ করম খাঁ বিজারাণীকে গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ২২ শে তারিখে কাউন্সিলের সভা বসিলে মিঃ হাজী তাঁহার গ্রেপ্তার ও তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করার ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য সভা মুলতবি রাখিতে বলেন। তিনি আরও বলেন যে, খাঁ সাহেবকে বেআইনী ভাবে এবং অন্যায় রকমে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে। তাঁহাকে অবিলম্বে খালাস দেওয়া হউক এবং কাউন্সিলের নিযুক্ত একটী কমিটী দ্বারা তাঁহার মামলার খোলাখুলি স্বাধীন তদন্তের ব্যবস্থা করা হউক। এই বিষয়ের সকলকথা হোম মেম্বর জানেন না বলিয়া প্রস্তাবটীর আরও আলোচনা মুলতবি রাখা হইয়াছে। নায়ক

বিদেশ

জার্ম্মাণ বিদ্যালয়ে বিদেশী ছাত্র।—জর্ম্মণীর উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ে বৈদেশিক ছাত্রগণের প্রবেশলাভ করিতে হইলে যে সমস্ত বিধি প্রতিপালন করিতে হইবে, তাহা কলিকাতায় জার্ম্মাণ কন্সাল জেনারেল প্রকাশ করিয়াছেন। বিধানগুলির সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল—১। স্থান খালি থাকিলে বিদেশী ছাত্র জার্ম্মাণ হাইস্কুলে ভর্ত্তি হইতে পারিবে। ২। প্রবেশার্থী ছাত্রগণকে সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরেক্টরের নিকট আবেদন করিতে হইবে। (ক) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার উপযুক্ততা সম্বন্ধে প্রশংসাপত্র অথবা তাহার প্রামাণ্য প্রতিলিপি' আবেদন পত্রের সহিত প্রেরণ করিতে হইবে। (খ) জার্ম্মাণ ভাষাজ্ঞান সম্বন্ধে বিবরণী দিতে হইবে। বিদ্যালয়ে প্রবেশের সময় জার্ম্মাণ ভাষাজ্ঞান সম্বন্ধে পরীক্ষা লওয়া হয়। (গ) ছাত্রের আত্মজীবনীও দিতে হইবে। (ঘ) জার্ম্মণীতে অবস্থান কালীন ব্যয় বহন করিবার শক্তি আছে ইহারও একটী সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে। ভারতীয় ছাত্রগণ কলিকাতার জার্ম্মাণ কন্সালের পাসপোর্ট অফিসে অনুমোদন জন্য স্ব স্ব পাসপোর্ট পাঠাইবেন। জার্ম্মাণ দেশে প্রবেশের জন্য সাত টাকা ফিস পসেপোর্টের সঙ্গে পাঠাইতে হইবে। হিন্দুস্থান

প্যারী এসিয়াটিক সোসাইটী।—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ইতিহাসের লেক্চারার এবং প্যারী এসিয়াটিক সোসাইটির সভ্য ডাক্তার গৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর্ণেষ্ট সেনা সমিতির সভাপতির মসিয়ে চা গুইবাট এবং প্যারীতে আহূত আন্তর্জ্জাতিক ধর্ম্ম মহাসভার সপ্তম উৎসবে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। এডুকেশন গেজেট

* * *

আয়র্লণ্ডের অবস্থা।—আয়র্লণ্ডে বর্ত্তমান ফ্রি ষ্টেটের আমদানীর সময়ে যখন সাধারণ তন্ত্রের লোকেরা ইহাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিল, তখন বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বলিয়াছিলেন যে সাধারণ তন্ত্রের দলে লোকসংখ্যা অতি সামান্য এবং আয়র্লণ্ডের বুদ্ধিমান লোকেরা সকলেই ফ্রি-ষ্টেট মানিয়া লইয়াছে। আয়র্লণ্ডের ফ্রি-ষ্টেট অনিচ্ছুক দেশবাসীর উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়ার পর, সাধারণ তন্ত্রের এত লোককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিবার পরেও সাধারণ তন্ত্র লুপ্ত হওয়ার কথা দূরের কথা, এখন শোনা যাইতেছে যে, দিন দিন ঐ স্থলে লোকসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। আসল কথা, আয়র্লণ্ডে এখন সাধারণ তন্ত্রের দলই সংখ্যায় অধিক। সেই জন্যই ফ্রি-ষ্টেটের কর্ত্তারা নিতান্ত অসহায় হইয়া ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছেন এবং আয়র্লণ্ডের বর্ত্তমান অবস্থায় ব্রিটিশ সৈন্য আয়র্লণ্ডে আনা সম্বন্ধে বিচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অবশ্য এই প্রস্তাবটি ব্রিটীশ মন্ত্রিসংসদ হইতেই উদ্ভূত—আয়র্লণ্ডের আইরিশের রক্ত প্রবাহ বহাইবার জন্য ব্রিটিশ সৈন্যও আনা হইবে। বাঙ্গলার কথা

কেনিয়া-সমস্যা।—লণ্ডনের ১১ই ফেব্রুয়ারীর খবরে প্রকাশ, "টাইমসের" নৈরবিস্থ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, গবর্মেণ্ট উপনিবেশিক দপ্তরের উপদেশ অনুসারে বর্ত্তমান কাউন্সিল আগামী বৎসর ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত এরূপ থাকিবে যেন নির্ব্বাচনের সময় ভারতবাসীরাও তাহাতে যোগদান করিতে পারেন—এই মর্ম্মে একটি বিল উপস্থিত করিয়াছেন। ইউরোপীয়ানেরা ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

লর্ড ডেলামিয়ার বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ঐ বিল ইউরোপীয়ানদের অধিকারের উপর অযথা ও অন্তরূপে হস্তক্ষেপ করিতেছে। তাঁহার মতে এই বিল উপস্থিত করিলে মীমাংসা আরও শক্ত হইবে। হিন্দুস্থান

অগ্নি-বরণ

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল্

(১)

মেয়ে বিবাহযোগ্যা হইয়াছিল, সেই জন্য ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ সুরেশবাবু মাস ছ'য়েকের ছুটি লইয়া কলিকাতায় কন্যার বিবাহের চেষ্টায় আসিলেন।

বাদুড়-বাগানে যে জায়গাটায় তাঁহার বাড়ী, তাহার অনতিদূরেই আবাল্য-বন্ধু মহেশবাবু ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ী। ইনি তখন শিয়ালদহে কাজ করিতেন; সেই জন্য বাড়ী হইতেই যাওয়া-আসা চলিত।

সুরেশবাবু লোকটি মোটা-সোটা, ঢিলে-ঢালা গোছের। মেয়ের বিবাহ না দিলে নয়, বিশেষ অন্দর-মহলে তিষ্ঠান ভার। অথচ, আজকাল মেয়ের জন্য সুপাত্র খুঁজিয়া বাহির করা যে কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কার অপেক্ষা অল্প কঠিন নহে, এ কথা তাঁহার জানা ছিল; এবং এই খোঁজা-খুঁজি এবং দর-দস্তুরের ব্যাপারকে তিনি কিঞ্চিৎ ভয়ও করিতেন। সুতরাং এই দুঃসাধ্য ব্যাপারকে কৌশলে, সহজ উপায়ে সম্পন্ন করিবার দিকে তাঁহার যে লক্ষ্য এবং চেষ্টা ছিল না, এমন নয়।

চাকুরীর একটা সুবিধা ছিল এই যে, দিবসের বেশীর ভাগ সময়েই বাহিরে থাকিতে হইত; কিন্তু ছুটি লইয়া বিপদ এই হইল যে, চব্বিশ ঘণ্টাই স্ত্রীর অনুযোগ শুনিতে হয়। মোটা লোকের রাস্তায় বাহির হওয়া যে সব সময়ে নিরাপদ নহে, মোটর চাপা পড়িবার ভয়, ট্রামের ধাক্কা খাওয়া ইত্যাদি নানা প্রকারের আশঙ্কা আছে, ইঙ্গিতে স্ত্রীকে এ কথা বুঝাইয়া দিলেও, তিনি কোনও প্রকার করুণাই প্রকাশ করিতেন না; এবং ছুটির এই ছ'টা মাস যে সুরেশবাবু অবহেলায় কাটাইয়া দিতে মনস্থ করিয়াছেন, এই নিশ্চিত ধ্রুব সত্যকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে অবিরত গঞ্জনা দিতেন।

বৈশাখের এক খর রৌদ্রের দিনে স্থির হইল যে, সুরেশবাবু হাওড়ার মার্টিন-কোম্পানির খাটো লাইনের বেলা বারটার গাড়ীতে বাহির হইয়া, ডুমজুড় থানার অন্তর্গত একটি পরম সুপাত্রের সন্ধান করিয়া আসিবেন। এ টাইম্-টেবলের নড়চড় করা সুরেশবাবুর সাধ্য ছিল না; কিন্তু এই গ্রীষ্মের দিনে, মার্টিন-কোম্পানীর উনানের মত উত্তপ্ত গাড়ীতে নিরুদ্দেশ যাত্রার কল্পনা তাঁহার নিকট অগস্ত্য যাত্রার মতই বোধ হইল।

গাড়ীর সময় যত নিকট হইয়া আসিতে লাগিল, ততই ঘন-ঘন হাই উঠিতে লাগিল, এবং শরীরটা ঝিমঝিম করিতে লাগিল। অবশেষে শয্যাশ্রয় করিলেন। স্ত্রী কাত্যায়নী স্বামীর জন্য দু'একটা প্রয়োজনীয় জিনিষ গুছাইয়া দিতে আসিয়া, তাঁহার সেই অবস্থা দেখিয়া নিরতিশয় রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "এ কি, যাবে না? তোমার দ্বারা—"

সুরেশবাবু কহিলেন, "দেখো, একটা মতলব ভেবেছি। মহেশদা'র ছেলে ফণীর সঙ্গে কমলার বিয়ে দিলে কেমন হয়? ফণীকে ত' তুমি জানই,—সুস্থ, সুন্দর ছেলে, এম্-এ পড়ছে—ভাল না?"

কথাটা শুনিয়া কাত্যায়নীর মুখের ভাব যেন অনেকটা নরম হইল। থানিকটা ভাবিয়া কহিলেন, "হাঁ, মন্দ হয় না।"

সুরেশবাবু সোৎসাহে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, "আশ্চর্য্য, হাতের কাছে এমন একটি পাত্র,—আর আমাদের চোখেই পড়ে নি! মনে করছি, ওর সঙ্গেই চেষ্টা করবো।"

কাত্যায়নী কহিলেন, "তা করে দেখো না।"

সুরেশবাবু খাটের বাজুর উপর একটা ছোট গোছের চড় মারিয়া কহিলেন, "ওই জন্যেই ত' আজ ডুমজুড় যাওয়াটা স্থগিত রাখলাম। বল কি, এমন সুপাত্র যদি পাওয়া যায়,—"

কাত্যায়নী কহিলেন, "তা হ'লে আজ সেইখানেই যেও।"

সুরেশবাবু কহিলেন, "হাঁ, আজই তো যাব। একটু বিশ্রাম ক'রে নিয়ে সকাল-সকাল বেরোবো।"

কাত্যায়নী কহিলেন, "বেশ।"

সুরেশবাবুর বুকের ভিতর হইতে একটা মুক্তির দীর্ঘ-নিঃশ্বাস বাহির হইল।

(২)

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সুরেশবাবু মহেশবাবুর বাটীতে আসিয়া ডাকিলেন, "মহেশদা, মহেশদা আছ?"

মহেশবাবুর কন্যা বিনু আসিয়া কহিল, "কাকাবাবু যে! বাবা ত' এখনও কাছারী থেকে আসেন নি, কাকাবাবু! একটু বসুন না, এখনি আস্‌বেন।"

একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিতে বসিতে সুরেশবাবু কহিলেন, "হাঁ, বসছি মা। তোদের চাকরকে ডাক্ না, একটু তামাক্-টামাক্ দিক। আর তুই চট্ ক'রে দুটো পাণ নিয়ে আয় দিকিনি।"

পাণ লইয়া আসিয়া বিনু কহিল, "কাকাবাবু, কম্‌লির বিয়ের কি হোল?"

সুরেশবাবু সদ্য-আগত হুঁকাটার হেফাজত করিতে-করিতে কহিলেন, "কই আর কিছু হোল। যা দিন-কাল পড়েছে।"

বিনু কহিল, "একটা কিছু ঠিক ক'রে এই বোশেখের মধ্যে দিয়ে দিন না কাকাবাবু,—তা হ'লে বিয়েটা আমার দেখা হয়।"

সুরেশবাবু কহিলেন, "কেন, তুই কি বেশী দিন থাকবি নে?"

বিনু মাটির দিকে চাহিয়া কহিল, "বোধ করি বোশেখের বেশী ওঁরা রাখবেন না। খোকার শরীরটা খারাপ, তা নইলে ত' এখনই যেতে হ'তো। ওদিকে আবার আমার শাশুড়ীর শরীর গরম পড়তেই খারাপ হ'তে সুরু হয়। আর জানেন ত' কটকের গরম, কাকাবাবু! আমাকে বোধ হয়। জ্যষ্ঠির গোড়াতেই যেতে হবে, তাই ত' বলছিলাম যে, এই মাসেই দিন।"

সুরেশবাবু নির্ব্বিকার চিত্তে তামাক খাইতে লাগিলেন, যেন এ কথাগুলো কাণেই পৌছায় নাই। তাহার পর হঠাৎ তাহার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "হাঁ মা বিনু, একটা কথা ভাবছিলাম। ফণীর সঙ্গে কমলার বিয়ে হয় না? এইটে করে দে না মা!"

বিনু কহিল, "মেজদা'র সঙ্গে?"

সুরেশবাবু কহিলেন, "হাঁ মা, জানা-শোনা ঘর—দু'জনই দু'জনকেই জানি; তোর বাবা আর আমি ছেলেবেলাকার বন্ধু, জানিস ত'? আর এ সব তোদের দ্বারা যতটা সম্ভব হয়, আর কেউ এমন পারবে না। কি বলিস্?"

বিনু কহিল, "কাকাবাবু, তা' বুঝি জানেন না। মেজ-দা'র যে ধনুর্ভঙ্গ পণ, উনি এখন বিয়ে করবেন না। এম্-এ পাশ করবেন, ল' পাশ করবেন। তার পর আরও সব কি-কি পাশ করবেন, না করবেন, ভগবান জানেন। তার পর উপার্জ্জন করবেন, টাকা জমাবেন,—তার পর বিয়ে! তা নইলে, বিয়ের কথা ত' এর আগেই হ'য়েছিল।"

সুরেশবাবু কৌতুকের স্বরে কহিলেন, "ও পণ আজকাল সব ছেলেরাই ক'রে থাকে,—ওর জন্যে ভয় করিস্ নে মা! আমাদের কাল থেকেই ওটা সুরু হ'য়েছে,—এখন কিছু বেশী-বেশী হ'চ্ছে। মনে নেই, তোর যখন বিয়ে হয়, তখন পরিমলকে একটি আস্ত কুমার-সভার মিটিং থেকে ধ'রে আনা হ'য়েছিল?"

শুনিয়া বিনু ঈষৎ হাস্য করিয়া অধোবদন হইল।

এমন সময় মহেশবাবু কাছারী হইতে ফিরিয়া, সুরেশ-বাবুকে দেখিয়া কহিলেন, "সুরেশ যে, বড় গুড্ বয় দেখ্‌ছি। আচ্ছা, একটু বোস ভাই,—কাছারীর কাপড়-গুলো ছেড়ে আসি।"

কাছারীর কাপড় ছাড়িয়া, হাত-মুখ ধুইয়া মহেশবাবু আসিয়া কহিলেন, "কি মনে করে হে! মেয়ের বিয়ের কতদূর কি করলে?"

সুরেশবাবু হাসিয়া কহিলেন, "প্রা কিছুই নয়। ওই জন্যেই তোমার কাছে আসা।"

মহেশবাবু কহিলেন, "আমার কাছে কি?"

বিনু কহিল, "উনি মেজদা'র সঙ্গে কমলার বিয়ে দেবার কথা বলছিলেন, বাবা।"

সুরেশবাবু সোৎসাহে মহেশবাবুর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এটা তোমাকে ক'রে দিতেই হবে মহেশদা।"

মহেশবাবু ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার বালকের ন্যায় সরল উদার মনে সুরেশবাবুর এই একটি কথাই ঘা দিয়া-ছিল; কেন না, গুটি ছয়েক মেয়ে পার করিয়া তিনি সবিশেষ

মধুর শৈশব

শিল্পী—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু

জানিতেন, মেয়ের সৎ-পাত্র যোগাড় করা কত কঠিন! তাঁহার কোমল মন করুণায় ভরিয়া উঠিল।

সুরেশবাবু বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "দাদা, তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছেলে-বেলাকার। সেই স্নেহ-বন্ধন যখন আত্মীয়তায় পরিণত হবার সুযোগ এসেছে, তখন দয়া ক'রে অমত ক'রো না।"

মহেশবাবু কহিলেন, "দেখ সুরেশ, তোমার মেয়ের সঙ্গে ফণীর বিয়ে হয়, এতে আমার কোন অমত নেই; কেন না, ছেলে-মেয়েদের বিয়েতে আমি একটি জিনিস বিশেষ ক'রে দেখি,—ভদ্র ঘর। সে হিসাবে তোমার সঙ্গে এ সম্বন্ধ করতে আমার কোনও দ্বিধা নেই। কিন্তু একটা কথা। শুনেছি, ফণী এখন বিয়ে করতে রাজী নয়। সে নিজের ভাল-মন্দ বিবেচনা করতে শিখেছে; সুতরাং আমি জোর-জবরদস্তি ক'রে আমার মতে তাকে কাজ করাতে প্রস্তুত নই। বিশেষ, যে কারণে সে উপস্থিত বিবাহ করতে রাজী নয়, তা একটা সঙ্গত কারণ। সুতরাং, তাকে যদি তোমরা রাজী করতে পার, ত' আমার অমত নেই।"

সুরেশবাবুর উৎসাহ অনেকটা কমিয়া গেল। তিনি কহিলেন, "তোমাকে রাজী করার চেয়ে সে কাজ সহজ হবে না বোধ হয়; অথচ শুধু একটা সেন্‌টিমেণ্ট মাত্র! দেখা যাক্ কি হয়!"

(৩)

সেই দিন রাত্রে কমলার বড় বোন বিমলার নিকট হইতে বিনু চিঠি পাইল,

"ভাই বিনু দি,

মা বললেন যে, কাল তোমার মেজদাদা এইখানে খাবেন। অন্যথা । ইতি

তোমার ভগ্নী বিমলা।"

বিনু বুঝিতে পারিল যে, ফণীকে রাজী করিবার চক্রান্ত সুরু হইল। সে তাহার মেজদাকে গিয়া কহিল, "মেজদা, তোমার নেমন্তন্ন, এই দেখ।"

মেজদাদা মিশর দেশের একটা বিরাট ইতিহাস হইতে চশমা ফিরাইয়া চিঠি পড়িল। চিঠিটা মন্দ লাগিল না। কারণ, প্রাণহীন মমি যতই কেন কৌতূহল-প্রদ হোক না, তার চেয়ে চর্ব্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় যে ঢের বেশী মনোরম, এ কথা সে অনেক দিন হইতেই বুঝিয়াছে।

কিন্তু শুধু সু-ভোজ্য ছাড়া যে ইহার ভিতর আরও কথা ছিল, তাহার ইঙ্গিত সে ইতিমধ্যেই পাইয়াছে। সুতরাং চিঠি পড়িয়া সে বিনুর দিকে চাহিয়া কহিল, "হঠাৎ নেমন্তন্ন কেন রে বিনু?"

বিনু হাসি চাপিয়া কহিল, "আমি কি ক'রে বলবো মেজদা,—ওঁরা জানেন।"

ফণী কহিল, "ওদের লিখে দে, আমি যেতে পারবো না। আমার একজামিনের পড়া।"

শুনিয়া বেনু ব্যথিত হইল; কারণ, পরিণয়ের আভাষেই নারীমাত্রেরই মনের মধ্যে ভবিষ্য বধূর প্রতি অগাধ স্নেহ সঞ্চারিত হইয়া উঠে; এবং সেই শুভদিনটি যাহাতে অচিরে আগত হয়, ইহার জন্য সাগ্রহ চেষ্টারও অভাব হয় না। বন্ধনের একটা নেশা আছে। যে বন্ধনের গণ্ডীর মধ্যে পড়িয়াছে, সে চায়,—দিকে-দিকে এই বন্ধনের মেলা বসিয়া যায়।

বিনু কহিল, "কিন্তু বাবা বলেছেন যেতে।"

ফণী কহিল, "আমি জানি, কেন।"

বিনু হাসিয়া কহিল, "বল ত'।"

ফণী মোটা হিষ্ট্রী কেতাবখানা কাছে টানিতে-টানিতে কহিল, "আমার বিয়ে দেবার চেষ্টা! না রে!"

বিনু কহিল, "ঠিক। আচ্ছা মেজদা, রাজী হ'য়ে যাও না?"

ফণী কহিল, "দূর বোকা! বিয়ে হ'য়ে গেলে ত' চুকেই গেল,—ঠকেই গেলাম। তখন আর কেই বা খাতির ক'রবে, কেই বা নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াবে! আমি যে নেমন্তন্ন জিনিষটা বিয়ের চেয়ে বেশী পছন্দ করি, ভাগ্যিস এ কথা বেশী লোকে জানে না। তাই যখন তারা তাদের মেয়ের সম্বন্ধে মন ভেজাবার জন্যে উত্তরোত্তর খাওয়ার আয়োজন রুচিকর ক'রে তুলতে থাকে, তখন আমার মন তার সমস্ত রস আকর্ষণ ক'রে ভিজে ওঠে ওই সুভোজ্যের সম্বন্ধে, এবং ঠিক সেই অনুপাতেই বাকি দিকটা খটখটিয়ে ওঠে! এগ্‌জামিনের পড়াটার দিকে যখন বেশী-বেশী ক'রে মন দিতে হ'চ্ছে, তখন তার সঙ্গে ভগবান যে এ রকম রসদেরও যোগাড় ক'রেছেন, এ তাঁর বিশেষ দয়া বলতে হবে।"

বিনু কহিল, "এ তোমার অন্যায় মেজদা। এমন নেমকহারামি করা!"

ফণী কহিল, "না। সেইজন্যে নুনের ভাগটা যৎসামান্য খেয়ে, মিষ্টিটাই বেশী ক'রে খাই আমি। আর আমার দোষই বা কি? আমি গোড়াতেই ত' আল্টিমেটাম দিয়ে দি যে, আমি বিয়ে করবো না। তা' সত্ত্বেও যদি তাঁরা আমাকে নেমন্তন্ন করেন, ত' আমি এত বোকা নই, যে সেটাও ছেড়ে দেব। বারদুয়েক ত' এ রকম হোল।"

বিনু কহিল, "তা হ'লে কাল যাবে?"

ফণী কহিল, "নিশ্চয়ই!"

(৪)

গতবার পূজার তত্ত্বে দাদা যে ভাল জিনিষগুলি পাইয়াছিল, অর্থাৎ জড়িপাড়-কাপড়, দামী রেশমের কোট, বহুমূল্য পাম্প-সু, সব-গুলি লইয়া সে অনেকক্ষণ ধরিয়া সাজিয়া-গুজিয়া বৌদিকে বলিল, "বউদি, সেই রেশমের রুমালটা দাও দিকিনি; আর তাতে একটু এসেন্স মাথিয়ে দিও,—সেই যে সবচেয়ে ভাল এসেন্স যেটা আছে—দাদা বুঝি তাকে এখনও খোলেও নি।"

বউদিদি সহাস্যে দেবরের সব ফর্ম্মায়েসগুলিই প্রতিপালন করিল। কহিল, "ঠাকুরপো, সার্থক হোক তোমার সাজ-গোজ করা।"

ফণী কহিল, "বাঃ, ক্রীমের কৌটাটা ভুলে গেলে বুঝি! ক্রীম শুধু বৌদিদিদের জন্যে তৈরী হ'য়েছিল, এ কথা মনে ক'রো না,—এ অধমমের ও মাথতে আছে।"

বৌদিদি কহিল, "ঠাকুরপো, বৌদিদি একদিনও ক্রীম মাখে নি। তুমিই ত' মেখে শেষ করেছো,—তবে এ খোঁটা দেওয়া কেন?"

ফণী ক্রীমের কৌটার দিকে চাহিয়া কহিল, "না—না, ওটা ত' শেষ হ'য়ে এসেছে,—পুরানো হ'য়ে গেছে। একটা নতুন কৌটো বার ক'রো, লক্ষ্মী বৌদি' আমার!"

ক্রীম মাখিতে-মাখিতে ফণী কহিল, "সত্যি বউদিদি, এর চেয়ে মানুষের সুখের অবস্থা কি হ'তে পারে? কাপড় জামা, জুতো, ক্রীম যোগাচ্ছ তুমি, আর ভাল ভাল রসদ যোগাচ্ছে আর একজনেরা। ফাঁকি দিয়ে এ রকম ক'রে যদি চালিয়ে যেতে পারি, তবে ত' কেল্লা ফতে!"

এই রকম করিয়া সাজিয়া-গুজিয়া যখন ফণী যাত্রা করিল, তখন দাদা একবার বিরস বদনে আড় নয়নে তাহার দিকে চাহিল মাত্র।

* * * * *

কাত্যায়নী নিজে বসিয়া থাকিয়া ফণীকে খাওয়াইলেন। যদিচ ফণী একটু মাত্রও লজ্জা করে নাই, তবু বারংবার বলিতে লাগিলেন যে, লজ্জা করিয়া কিছুই খাওয়া হইল না, এবং এ কথাও বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহাদের মত পরমাত্মীয়দের নিকট এতটা লজ্জা করা উচিত হয় নাই; বিশেষ যে সন্দেশ-রসগোল্লা কমলা নিজে হাতে যত্ন করিয়া তৈয়ার করিয়াছে, তাহাদের এমন অবহেলা করা ঠিক হয় নাই।

খাওয়া হইলে বলিলেন, "যাও ওই ঘরে, একটু বিশ্রাম ক'রে যেও, বড্ড রোদ্দুর।"

ঘরে যাইতেই বিমলা আসিয়া হাজির হইল। কহিল, "কমলা পাণ দিয়ে যা।"

এ সকল ব্যাপারে ফণী অভ্যস্ত ছিল; এবং এ কথা সে জানিত যে, এই পাণ দেওয়ার জন্যই তাহার নিমন্ত্রণ। কিন্তু তাহার জন্য সে কোনও দিন পাণ বা নিমন্ত্রণ খাইতে দ্বিধা বোধ করে নাই।

যে মেয়েটি পান লইয়া আসিল, তাহাকে ইতিপূর্ব্বেও ফণী দেখিয়াছে। সুন্দরী না হইলেও, দেখিতে মন্দ নয়। পাৎলা ছিপে্ছিপে, রং মার্জ্জিত, এবং মুখ কোমল, সুশ্রী। এক বাটা পাণ আনিয়া সে টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া চলিয়া যাইতে চাহিলে, বিমলা তাহাকে ধরিয়া বসাইল, কহিল, "দেখ দেখিনি ফণী, পছন্দ হয়?"

ফণী পাণ চিবাইতে-চিবাইতে তাহার দিকে দেখিল, কহিল, "ও-বেচারাকে কেন লজ্জা দেওয়া। ওকে ত' অনেকবার দেখেছি; এবং দেখিতে মন্দ, এ কথা ত' একবারও বলি নি।"

শুনিয়া কমলা জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেল।

বিমলা কহিল, "তা হ'লে,—"

ফণী কহিল, "তা হ'লে আমাকে উঠতে হয়। খাওয়াটা যে রকম গু হ'য়েছে, তাতে দিব্য আরাম ক'রে খানিকটা বিশ্রাম না করলে চলবে না। সুতরাং চল্লাম। মাঝে মাঝে এমন ক'রে নেমন্তন্ন খেতে আমি

অরাজী নই, এ কথাটা জানিয়ে যাচ্ছি।" বলিয়া সে চলিয়া গেল।

(৫)

তাহার পর আরও বার ২।৩ দিন এইরূপ খাওয়া-দাওয়া এবং আলাপের পর সেদিন সন্ধ্যা-বেলা বিনু এই পত্র পাইল—

"ভাই বিনুদি,

তোমার মেজদার সঙ্গে কমলার বিয়ের কথা বাবা তোমার বাবাকে বলেছিলেন। আমরা সবাই খুব আশা করছি যে, এ বিয়েতে তোমাদের সবাইকার মত হবে। সেটা জানতে পারলেই, বিয়ের দিন আর বাকী কথা সব ঠিক করে ফেলা যাবে। কি আমোদই হয় তা হ'লে।

ইতি তোমার বিমলা।"

বিনু এই চিঠি লইয়া ফণীর নিকট গেল। কহিল, "মেজদা, বাকী কারও অমত নেই,—শুধু তোমার মত হ'লেই আমি লিখে দি। ওঁরা খুবই আশা করছেন।"

ফণী চিঠিটা পড়িয়া কহিল, "আমি ত' বরাবরই বলে আসছি যে, আমি এখন বিয়ে করব না। সে মত আমার বদলায় নি—তাঁদের লিখে দেও।"

বিনু কহিল, "মেজদা, বড় দুঃখিত হবেন ওঁরা।"

ফণী কহিল, "বিনু, অপরের সুখ-দুঃখ ত' আমার হাতে নেই। ওঁরা যদি দুঃখিত হন, ত' অন্ততঃ তাতে আমি সুখী হব না। কিন্তু এ ত' আর ছেলেখেলা নয়, বা সন্দেশ খাওয়া নয় যে, বল্লেই টপ্ ক'রে খাওয়া চলে। দুনিয়ার অনেক জিনিষই হেসে-খেলে উড়িয়ে দেওয়া যায়; কিন্তু দু' একটা কঠিন জিনিষ আছে, যেখানে সত্য কথা বলা ছাড়া উপায় নেই। সুতরাং তুমি সত্যি কথাই খুলে লিখে দেও।"

বিনু অনেক করিয়া বলিল,—দু'একবার চোখের জলও ফেলিল, কিন্তু কোন ফল হইল না—

সুতরাং সে লিখিল—

"ভাই বিমলা,

মেজদাদা কিছুতেই রাজী নয়। সুতরাং মাপ ক'রো ভাই। আমার যে কি দুঃখ হ'চ্ছে, তা যদি জানতে।

ইতি তোমার বিনুদি।"

চিঠিটা ও-বাড়ীতে শেলের মত বাজিল। সুরেশ বাবু মনে করিয়াছিলেন যে, তরুণ-তরুণীরা এই ব্যাপারটা তাহাদের মধ্যেই ঠিক করিয়া লইবে; এবং কাত্যায়নীও কতকটা সে আশা করিয়াছিলেন। বিমলা নিশ্চিন্ত ছিল যে, তাহার দৌত্য নিষ্ফল হইবে না; কিন্তু এই চিঠি পাইয়া সকলেই ম্রিয়মান হইয়া পড়িল।

কিন্তু যাঁহাকে লইয়া এই খেলা, সেই কমলার মনের ভাব কি হইল, তাহা কেহ জানিতেও চাহিল না,—এমন কি ফণীও নয়। বোধ করি বাঙ্গালা দেশের এই রীতি! মানুষের মন লইয়া এই খেলায় যে তাহার সমস্ত অন্তর বেদনায় রক্ত-লোহিত হইয়া উঠিতে পারে, মর্মীর ব্যবসায়ী ফণীর সে কথা একবারে মনেও হইল না!

(৬)

সুতরাং ভুমজুড়ের সেই সুপাত্রটির সন্ধান আবার করিতে হইল। এবার আর ছোট গাড়ীর হাত হইতে পরিত্রাণ নাই। বিশেষ, পাশের বাড়ীর বড়লোকের ঘরের বিবাহের জমকালো আয়োজন দেখিয়া, এবং বিবিধ বাজী ও সানাইয়ের শব্দ শুনিয়া, আর স্থির থাকা চলে না। আজ কাত্যায়নীর অনুযোগের প্রয়োজন হইল না,—সুরেশ বাবু নিজে হইতেই যথাসময়ে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া, বেলা এগারটা আন্দাজ ব্যাগ-হস্তে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

সন্ধ্যার সময় হইতে সেই বড়লোকের বাড়ীতে বাজী পোড়ানোর ধুম লাগিয়া গেল। ছুঁচা-বাজী, তারা-বাজী, উল্কা-বাজী, আরও কত কি বাজী! পাড়ার ছেলেরা এই আনন্দের আয়োজনে ভাঙ্গিয়া পড়িল; এবং ছাদের উপর নর-নারীর সারি দাঁড়াইয়া গেল।

মহেশ-বাবুরও বাড়ীর সকলে ছাদের উপর হইতে এই বাজী পোড়া দেখিতেছিলেন। এই বাজীর বাবদ ওই বড়লোকটি কত টাকা খরচ করিয়াছেন, তাহার আলোচনা চলিতেছিল; এবং দিল্লী হইতে যে বাজীগুলা আসিয়াছিল, তাহা কলিকাতার বাজীকে হার মানাইতে পারিয়াছে কি না, সে বিষয়ে সকলেই মতামত প্রকাশ করিতেছিল।

এমন সময়ে একটা অভাবনীয় ব্যাপারে সকলেরই মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। একটা প্রকাণ্ড ফানুস ওই বড়লোকটির বাড়ী হইতে খানিকদূর উঠিয়া হঠাৎ

খানিকটা স্থির হইয়া বাঁকিয়া পড়িল, এবং পর মুহূর্ত্তেই জ্বলিয়া উঠিল। তাহার পর সেই জ্বলন্ত ফানুসটা পড়িতে লাগিল, এবং অবিলম্বে যে খড়ের চালের উপর উহা পড়িল, সকলে সভয়ে দেখিল, উহা সুরেশ বাবুদের।

রান্নার সুবিধার জন্য উপরের ছাদের উপর এই খড়ের ঘরটি সুরেশ বাবু ছুটি লওয়ার পর নূতন তৈয়ারী করাইয়াছিলেন। বৈশাখের রৌদ্রে খড় বারুদের মত হইয়া ছিল, এবং সেই ফানুসকে উপলক্ষ্য করিয়া মুহূর্ত্তে দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

মহেশ বাবু কহিলেন, "সুরেশদের চাল জলে উঠল, বোধ হ'চ্ছে।" ছেলেদের লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "তোমরা সব যাও—দেখগে।"

এ সকল কার্য্যে ফণীর মত অগ্রণী কেহ নয়। সে মুহূর্ত্তে দৌড়াইল, এবং মিনিট-দুয়েকের মধ্যেই সুরেশ বাবুর বাড়ী গিয়া পৌছিল। ফণীর দাদা ফায়ার ব্রিগেডে টেলিফোঁ করিতে দৌড়াইল।

বাড়ীর অবস্থা তখন শোচনীয়। সুরেশ বাবু ডুমজুড়ে, সুতরাং তাঁহার অনুপস্থিতিতে বাড়ীর মেয়েরা এবং ছোট ছেলেরা ভয়ে চীৎকার করিতেছে, এবং লেলিহান অগ্নির দীপ্তিতে সমস্ত বাড়ীর চেহারা ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছে।

পাড়ার লোক জড় হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছিল।

ফণী আসিয়া কহিল, "তোমরা চেঁচামেচি করো না, ভয় নেই।" সমবেত পাড়ার লোকদের কহিল, "মশায়, আসুন না। দাঁড়িয়ে থাকলে কি হবে।"

বলিয়া নিজে একটা বাঁশ লইয়া চালের আগুনের উপর সজোরে মারিতে লাগিল। কারণ, সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, চালটা পুড়িয়া যাওয়া তেমন ক্ষতিকর নহে; কিন্তু এই আগুনকে বিস্তৃতি লাভ করিতে দিলে, পরিণাম ভয়ানক।

যাহারা সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের দিকে সানুনয়ে কহিল, "মশায়, জলের চেষ্টা দেখুন।"

এমন সময় একটা কাণ্ড হইল। চালের কতকাংশের বন্ধন-দড়ি পুড়িয়া গিয়া, সেই জ্বলন্ত অংশটা সচল হইয়া নীচে নামিয়া আসিতে লাগিল; এবং সকলেই দেখিল, যদি তাহার গতিরোধ না করা যায়, ত অবিলম্বে সমস্তটা ফণীর উপর আসিয়া পড়িবে।

তখন সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল, "পালাও, পালাও।"

ফণীর দৃষ্টি যখন সে-দিকে পড়িল, তখন আর পালাইবার সময় নাই। মুহূর্ত্তে যদি তাহার গতিরোধ করা না হয়, ত' উহা তাহার উপর পড়িয়া তাহাকে দগ্ধ করিয়া দিবে।

চারিদিকে হৈ হৈ শব্দ উঠিল, 'গেল, গেল,' অথচ এই নিশ্চিত বিপদের মধ্যে কেহ যাইতেও চাহিলেন না, এবং উদ্‌ভ্রান্তের মত ফণীও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল।

ঠিক এমনি সময় দেখা গেল, দুটি কোমল হস্ত ভবিষ্যৎ বিচার না করিয়া, দাহের ক্ষতিকে অবহেলা করিয়া, সেই জ্বলন্ত চালের অংশটাকে ঠেলিয়া তাহার গতিরোধ করিল।

চারিদিক হইতে শব্দ উঠিল 'পুড়ে গেল, পুড়ে গেল'—কে এ মেয়ে!

সেই লেলিহান আগুনের অপূর্ব্ব দীপ্তির মধ্যে ফণী চাহিয়া দেখিল, অপরূপ! দুই অনাবৃত হস্তে কমলা ফণীর মাথার নিকট সেই চাল ধরিয়া তাহার গতিরোধ করিয়া আছে, তাহার নিজেকে রক্ষা করিবার কোন চেষ্টা নাই,—এবং যে হাত দুটো নিশ্চিত দগ্ধ হইতেছে, তাহাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই! মুহূর্ত্তে ফণীর মনে হইল, এই দিগ্বি-দিক-প্রসারী জ্বলন্ত বিনাশ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং জগদ্ধাত্রী অবতীর্ণা হইয়াছেন, এবং তাহার মুখে-চোখে যে অপূর্ব্ব বিভা দেখা যাইতেছে, তাহার নিকট আগুনের আলোও নিষ্প্রভ! সে করুণ স্বচ্ছ চোখে আছে অভিমান, করুণা, আর অপূর্ব্ব প্রীতি।

এই অপূর্ব্ব দৃশ্যে সমবেত জনমণ্ডলী বিচলিত হইয়া পড়িল। তখন তাহারা হৈ হৈ করিয়া নামিয়া পড়িল, এবং মুহূর্ত্তে ফণী এবং কমলাকে সরাইয়া দিয়া আগুন নিভাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এমন সময় দমকল আসিয়া পড়িল, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই আগুন নিভিয়া গেল।

আগুন নিভিয়া গেলে দেখা গেল, ফণীর বিশেষ কিছু হয় নাই, কিন্তু মেয়েটির হাত দুটি বেশ পুড়িয়াছে। বিস্মিত জনমণ্ডলী কহিল, ধন্য মেয়ে! সেই রাত্রেই ডাক্তার ডাকিয়া তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল।

(৬)

তাহার পরদিন ফণী আর বাহির হইতে পারে নাই। নিজের শরীরটা ভাল ছিল না। পরদিন কমলাকে দেখিতে আসিল।

তখনও দুই হাত বাঁধা, সে বিছানায় পড়িয়া আছে—এবং বোধ হয় যে অসহ্য বেদনাও ভোগ করিতেছে।

ফণী তাহার নিকট বসিয়া কহিল, "কি আশ্চর্য্য কমলা! এমন ক'রে অবহেলায় নিজেকে পোড়াতে হয়, আমার জন্যে!"

উত্তরে কমলা তাহার দিকে তাহার দুই চোখ তুলিল—সে চোখে কোন বেদনার চিহ্ন নাই, আছে শুদ্ধ মাত্র অপার অনন্ত প্রীতি!

ফণী তাহার বাঁধা হাত দুটো ধীরে-ধীরে আপনার হাতের মধ্যে লইল। তাহার মনের মধ্য হইতে ইতিহাস ভাসিয়া গেল, মমি মুছিয়া গেল, শুধু মনে হইতে লাগিল, অপার অগ্নিরাশির মধ্যে তাহার রক্ষাকর্ত্রীর অপরূপ রূপ!

ফণী কহিল, "মাপ্ করো, বুঝতে পারি নি কমলা!".

দেখিতে-দেখিতে কমলার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, এবং দু'-এক ফোঁটা করিয়া গণ্ড বাহিয়া পড়িতে লাগিল।

ফণী কহিল, "সব সময় মানুষ বুঝ্তে পারে না, কমলা! কিন্তু আর ভুল হবে না। যতদিন বেঁচে থাকবো, আর ভুল করবো না। যা করেছি, তার জন্যে মাপ ক'রো।" বলিয়া মাথা নীচু করিয়া সেই দগ্ধ দুই হাত চুম্বন করিল।

কমলা এবার হাসিল, কহিল, "না, আমার আর কোন যন্ত্রণা নেই!"

* * *

বিবাহের রাত্রে যখন বর-বধূ পরস্পরের হাতের উপর হাত রাখিল, তখনও সে দাহের দাগ কমলার হাত হইতে মিলায় নাই! হয় ত' কালে সে দাগ মিলাইয়া যাইতে পারে; কিন্তু ফণী ভাবিল, তাহার অন্তরের মাঝখানে ঐ দশটি আঙ্গুলের যে আগুনের শিখার ছাপ বসিয়াছে, তাহার সুবর্ণ কান্তি কোনও দিন ম্লান হইবে না।

দেনা-পাওনা

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(২৩)

ব্যারিষ্টার সাহেব চলিয়া গেছেন, ষোড়শী চলিয়া যাইতেছে,—মন্দিরের চাবি-তালা সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতি যাহা কিছু মূল্যবান সমস্ত আদায় হইয়া গেছে,—ইত্যাদি সম্বাদ রাষ্ট্র হইয়া পড়িতে কিছু মাত্র বিলম্ব ঘটিলনা। শিরোমণি আনন্দের আবেগে মুক্ত-কচ্ছ আলু-থালু বেশে রায় মহাশয়ের সদরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নির্ম্মল সেইমাত্র চলিয়া গেল; বিদায়ের পালাটা বিশেষ প্রীতিকর হইলনা, বোধ করি, মনে মনে এই সকল আলোচনাতেই জনার্দ্দনের মুখ-মণ্ডল গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল; কিন্তু, সেদিকে লক্ষ্য করিবার অবস্থা শিরোমণির ছিল না, তিনি আশীর্ব্বাদের ভঙ্গীতে ডান হাত তুলিয়া গদ্গদ কণ্ঠে কহিলেন, দীর্ঘজীবী হও, ভায়া, সংসারে এসে বুদ্ধি ধরেছিলে বটে!

জনার্দ্দন মুখ তুলিয়া কহিলেন, ব্যাপার কি?

শিরোমণি বলিলেন, ব্যাপার কি! দশখানা গাঁয়ে রাষ্ট্র হ'তে বাকি আছে না কি? বেটি চাবি-পত্র যা কিছু দিয়ে দিয়ে চলে যাচ্চে যে! বলি, শোন-নি না কি?

যে ভদ্রলোক সকাল হইতে বসিয়া এ মাসে সুদের কিছু টাকা মাপ করিতে অনুনয় বিনয় করিতেছিল, সে কহিল, বেশ! যজ্ঞেশ্বর জানলেননা, আর খবর পেলেন ঘেঁটু-মনসা? এ সব করলে কে শিরোমণি খুড়ো, সমস্তই ত' রায় মশায়।

শিরোমণি আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, কিন্তু আসল চাবিটা শুন্‌চি না কি গিয়ে পড়েছে জমিদারের হাতে? ব্যাটা পাঁড় মাতাল,—দেখো ভায়া, শেষকালে মায়ের সিন্দুকের সোনারূপো না ঢুকে যায় শুঁড়ির সিন্দুকে। পাপের আর অবধি থাক্‌বেনা।

ক্রমশঃ, একে একে গ্রামের অনেকেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন; স্থির হইল, জমিদারের হাত হইতে চাবিটা অবিলম্বে উদ্ধার করা চাই। বেলা তৃতীয় প্রহরে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া হুজুর যখন মদ খাইতে আরম্ভ করিবেন, তাঁহার মাতাল হইয়া পড়িবার পূর্ব্বেই সেটা হস্তগত করা প্রয়োজন। সেটা তাঁহার হাতে যাওয়ার সম্বন্ধে জনার্দ্দন নিজের সামান্য একটু ত্রুটি ও অবিবেচনা স্বীকার করিয়া লইয়াই কহিলেন, সমস্তই স্থির কোরে রেখে-ছিলাম, হঠাৎ উনি যে মাঝে থেকে চাবি হাত করবেন সেটা আর খেয়াল ক'রনি। এখন, সহজে দিলে হয়। দশ দিন পরে হয় ত বলে বস্‌বে, কই কিছুই ত সিন্দুকে ছিলনা! কিন্তু আমরা সবাই জানি, ভায়া, ষোড়শী আর যাই কেন না করুক, মায়ের সম্পত্তি অপহরণ কর্‌বে-না,—একটি পাই পয়সা না।

সকলেই এ কথা স্বীকার করিল। অনেকের এমনও মনে হইল, ইহার চেয়ে বরঞ্চ সে-ই ছিল ভাল।

এই দল যথাসময়ে এবং যথোচিত সমারোহে যখন জমিদারের শান্তিকুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইল, জমিদার তখন বাহিরের ঘরে বসিয়া। মদের বোতল ও গ্লাসের পরিবর্ত্তে জমিদারীর মোটা মোটা খাতা-পত্র তাঁহার সম্মুখে। একধারে বসিয়া তাঁহার সহচর প্রফুল্লচন্দ্র খবরের কাগজ পড়িতেছিল; সেই সকলকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল।

শিরোমণি সকলের অগ্রে কথা কহেন, এবং সকলের শেষে অনুতাপ করেন, এ ক্ষেত্রেও তিনিই কথা কহিলেন; বলিলেন, হুজুরের পাছে নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, তাই একটু বিলম্ব ক'রেই আমরা সকলে—

জীবানন্দ খাতা-পত্র একপাশে ঠেলিয়া রাখিয়া সহাস্যে কহিলেন, বিলম্ব না ক'রে এলেও হুজুরের নিদ্রার ব্যাঘাত হোতো না শিরোমণি মশায়, কারণ, দিনের বেলা তিনি নিদ্রা দেননা।

কিন্তু আমরা যে শুনি হুজুর—

শোনেন? তা' আপনারা অনেক কথা শোনেন যা সত্য নয়, এবং অনেক কথা বলেন যা মিথ্যে। এই যেমন আমার সম্বন্ধে ভৈরবীর কথাটা—বলিয়া বক্তা হাস্য করিলেন, কিন্তু শ্রোতার দল থতমত খাইয়া একেবারে মুসড়িয়া গেল। জীবানন্দ কহিলেন, কিন্তু যে জন্যে ত্বরা করে আস্‌তে চেয়েছিলেন তার হেতুটা শুনি?

জনার্দ্দন রায় নিজেকে কথঞ্চিৎ সাম্‌লাইয়া লইলেন, মনে মনে কহিলেন, এত ভয়ই বা কিসের? প্রকাশ্যে বলিলেন, মন্দির সংক্রান্ত গোলযোগ যে এত সহজে নিষ্পত্তি কর্‌তে পারা যাবে তা আশা ছিল না। নির্ম্মল যে রকম বেঁকে দাঁড়িয়েছিল—

জীবানন্দ কহিলেন, তিনি সোজা হ'লেন কি করে?

এই ব্যঙ্গ জনার্দ্দন অনুভব করিলেন, কিন্তু শিরোমণি তাহার ধার দিয়াও গেলেননা, খুসি হইয়া সদর্পে কহিলেন, সমস্তই মায়ের ইচ্ছা, হুজুর, সোজা যে হতেই হবে। পাপের ভার তিনি আর বইতে পারছিলেননা।

জীবানন্দ ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, তাই হবে। তারপরে?

শিরোমণি বলিলেন, কিন্তু পাপ ত দূর হল, এখন,—বলনা জনার্দ্দন, হুজুরকে সমস্ত বুঝিয়ে বলনা? এই বলিয়া তিনি রায় মহাশয়কে হাত দিয়া ঠেলিলেন। জনার্দ্দন চকিত হইয়া কহিলেন, মন্দিরের চাবি ত আমরা দাঁড়িয়ে থেকেই তারাদাস ঠাকুরকে দিইয়েচি। আজ তিনিই সকালে মায়ের দোর খুলেচেন, কিন্তু সিন্দুকের চাবিটা শুন্‌তে পেলাম ষোড়শী হুজুরের হাতেই সমর্পণ করেছে।

জীবানন্দ সায় দিয়া কহিলেন, তা' করেচে। জমা-খরচের খাতাও একখানা দিয়েচে।

শিরোমণি বলিলেন, বেটি এখনো আছে, কিন্তু কখন্ কোথায় চলে যায় সে তো বলা যায়না।

জীবানন্দ মুহূর্ত্তকাল বৃদ্ধের মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু সে জন্যে আপনাদের এত উদ্বেগ কেন?

উত্তরের জন্য তিনি জনার্দ্দনের প্রতি চাহিলেন; জনার্দ্দন সাহস পাইয়া কহিলেন, দলিলপত্র, মূল্যবান তৈজসাদি, দেবীর অলঙ্কার প্রভৃতি যা' কিছু আছে গ্রামের প্রাচীন ব্যক্তিরা সমস্তই জানেন। শিরোমণি মশায় বল্‌ছেন যে

ষোড়শী থাক্‌তে থাক্‌তেই সেগুলো সব মিলিয়ে দেখ্‌লে ভাল হয়। হয়ত—

হয়ত নেই? এই না? কিন্তু না থাক্‌লেই বা আপনারা আদায় কর্‌বেন কি করে?

জনার্দ্দন সহসা জবাব খুঁজিয়া পাইলেননা, শেষে বলিলেন, তবু ত জানা যাবে হুজুর।

কিন্তু আজ আমার সময় নেই রায় মশায়।

জনার্দ্দন মনে মনে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন, প্রায় এই প্রকার ফন্দি করিয়াই তাঁহারা আসিয়াছিলেন। শিরোমণি ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, চাবিটা জনার্দ্দন ভায়ার হাতে দিলে আজই সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমরা সমস্ত মিলিয়ে দেখ্‌তে পারি। হুজুরেরও আর কোন দায়িত্ব থাকেনা,—কি আছে না আছে সে পালাবার আগেই সব জানা যায়। কি বল ভায়া? কি বল হে তোমরা? ঠিক না?

সকলেই এ প্রস্তাবে সম্মতি দিল, দিলনা কেবল যাহার হাতে চাবি। সে শুধু একটু ঈষৎ হাসিয়া কহিল, ব্যস্ত কি শিরোমণি মশায়, যদি কিছু নষ্ট হয়েই থাকে ত, ভিখিরির কাছ থেকে আর আদায় হবেনা। আপনারা আজ আসুন, আমার যেদিন অবসর হবে, মিলিয়ে দেখ্‌তে আপনাদের সকলকেই আমি সম্বাদ দেব।

ফন্দি খাটিলনা দেখিয়া সবাই মনে মনে রাগ করিল। রায় মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, কিন্তু দায়িত্ব একটা—

জীবানন্দ তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া কহিলেন, সে তো ঠিক কথা রায় মশায়। দায়িত্ব একটা আমার রইল বই কি।

দ্বারের বাহির হইয়াই শিরোমণি জনার্দ্দনের গা টিপিয়া কহিলেন, দেখ্‌লে ভায়া, ব্যাটা মাতালের ভাব বোঝাই ভার। গুয়োটা কথা কয় যেন হেঁয়ালি। মদে চুর হয়ে আছে। বাঁচবেনা বেশি দিন।

জনার্দ্দন শুধু বলিলেন, হুঁ। যা ভয় করা গেল, তাই হল দেখ্‌চি।

শিরোমণি কহিলেন, এবার গেল সব শুঁড়ির্ দোকানে। বেটি যাবার সময় আচ্ছা জব্দ করে গেল।

একজন কহিল, হুজুর চাবি আর দিচ্চেননা।

শিরোমণি উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, আবার? এবার চাইতে গেলে গলা টিপে মদ খাইয়ে তবে ছাড়বে। কথাটা উচ্চারণ করিয়াই তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

ঘরের মধ্যে জীবানন্দ খোলা দ্বারের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া স্থির হইয়া বসিয়া ছিল; প্রফুল্ল কহিল, দাদা, আবার একটা নতুন হাঙ্গামা জড়ালেন কেন, চাবিটা ওঁদের দিয়ে দিলেই ত হোতো।

জীবানন্দ তাহার মুখের প্রতি চক্ষু ফিরাইয়া কহিলেন, হোতোনা প্রফুল্ল, হলে দিতাম। পাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলেই সে কাল রাতে আমার হাতে চাবি দিয়েছে।

প্রফুল্ল মনে মনে বোধ হয় ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিলনা, জিজ্ঞাসা করিল, সিন্দুকে আছে কি?

জীবানন্দ একটু হাসিয়া কহিল, কি আছে? আজ সকালে তাই আমি খাতাখানা পড়ে দেখ্‌ছিলাম। আছে মোহর, টাকা, হীরে, পান্না, মুক্তোর মালা, মুকুট, নানা রকম জড়োয়া গয়না, কত কি দলিল-পত্র, তাছাড়া সোনা-রূপোর বাসন-কোশনও কম নয়। কত কাল ধরে জমা হয়ে এই ছোট্ট চণ্ডীগড়ের ঠাকুরের যে এত সম্পত্তি আছে, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। চুরি-ডাকাতির ভয়ে ভৈরবীরা বোধ করি কাউকে জান্‌তেও দিতনা।

প্রফুল্ল সভয়ে কহিল, বলেন কি! তার চাবি আপনার কাছে? একমাত্র পুত্র সমর্পণ ডাইনির হাতে?

জীবানন্দ রাগ করিলনা, কহিল, নিতান্ত মিথ্যে বলনি ভায়া, এত টাকা দিয়ে আমি নিজেকেও বিশ্বাস করতে পারতাম না। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, অথচ, এ আমি চাইনি প্রফুল্ল। আমি যতই তাকে পীড়াপীড়ি কোরলাম জনার্দ্দন রায়কে দিতে, ততই সে অস্বীকার করে আমার হাতে গুঁজে দিলে।

প্রফুল্ল নিজেও ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এর কারণ?

জীবানন্দ কহিল, বোধ হয় সে ভেবেছিল, এ দুর্নামের ওপর আবার চুরির কলঙ্ক চাপ্‌লে তার আর সইবেনা। এদের সে চিনেছিল।

প্রফুল্ল বলিল, কিন্তু আপনাকে সে চিন্‌তে পারেনি।

জীবানন্দ হাসিল, কিন্তু সে হাসিতে আনন্দ ছিলনা; কহিল, সে দোষ তার, আমার নয়। তার সম্বন্ধে অপরাধ আমার আর যত দিকেই থাক্, আমাকে চিন্‌তে না পারার

অপরাধ গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত আমি একটা দিনের তরেও করিনি। কিন্তু আশ্চর্য্য এই পৃথিবী, এবং তার চেয়েও আশ্চর্য্য এর মানুষের মন। এ যে কি থেকে কি ঠিক করে নেয়, কিছুই বল্‌বার যো নেই। এর যুক্তিটা কি জানো ভায়া, সেই যে তার হাত থেকে একদিন মরফিয়া নিয়ে চোখ বুজে খাওয়ার গল্পটা তোমার কাছে করেছিলাম, সেই হল তার সকল তর্কের শেষ তর্ক, সকল বিশ্বাসের বড় বিশ্বাস। কিন্তু, সে রাত্রে আর যে কোন উপায় ছিলনা, এদিকেও মরি, ওদিকেও মরি—সে ছাড়া আর কারও পানে চাইবার পথ ছিলনা,—এ সমস্ত ষোড়শী একদম ভুলে বসে আছে, শুধু একটি কথা তার মনে জেগে রয়েছে, যে নিজের প্রাণটা নিঃসংশয়ে তার হাতে দিতে পেরেছিল, তাকে আবার অবিশ্বাস করা যায় কি কোরে? ব্যস, যা' কিছু ছিল, সমস্ত দিলে চোখ বুজে আমার হাতে তুলে। প্রফুল্ল, দুনিয়ার ভয়ানক চালাক লোকেও মাঝে মাঝে মারাত্মক ভুল কোরে বসে, নইলে সংসার একেবারে মরুভূমি হয়ে দাঁড়াতো, কোথাও রসের বাষ্পটুকু জমবার ঠাঁই পেতনা।

প্রফুল্ল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, অতিশয় খাঁটি কথা দাদা। অতএব অবিলম্বে খাতাখানা পুড়িয়ে ফেলে তারাদাস ঠাকুরকে ডেকে দুটো ধমক দিন,—জমানো মোহরগুলোয় যদি সলোমন সাহেবের দেনাটা শোধ যায় ত, শুধু রসের বাষ্প কেন, ফোয়ারা খুল্‌বে আশা হয়।

জীবানন্দ কহিল, প্রফুল্ল, এই জন্যেই তোমাকে এত পছন্দ করি।

প্রফুল্ল হাত জোড় করিয়া বলিল, এই পছন্দটা এইবার একটু খাটো করতে হবে দাদা। রসের উৎস আপনার অফুরন্ত হোক্, কিন্তু মোসাহেবী কোরে এ অধীনের গলার চুঙ্গি পর্য্যন্ত কাঠ হয়ে গেল। এইবার একবার বাইরে গিয়ে দুটো ডাল-ভাতের যোগাড় করতে হবে। কাল-পরশু আমি বিদায় নিলাম।

জীবানন্দ হাসিয়া কহিল, একেবারে নিলে? কিন্তু এইবার নিয়ে কবার নেওয়া হ'ল প্রফুল্ল?

বার চারেক। এই বলিয়া সে নিজেও হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, ভগবান মুখটা দিয়েছিলেন, তা' বড়লোকের প্রসাদ খেয়েই দিন গেল; দুটো বড় কথাও যদি না মাঝে মাঝে বার করতে পারি ত নিতান্তই এর জাত যায়। নেহাৎ অপরাধও নেই দাদা। বহুকাল ধরে আপনাদের জলকে কথনো উঁচু কখনো নীচু বলে বলে এ দেহটায় মেদ-মাংসই কেবল শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেচে, সত্যিকারের রক্ত বল্‌তে বোধ করি ছিটে ফোঁটাও আর বাকি নেই। আজ ভাবৃছি এক কাজ কোরব। সন্ধ্যার আবছায়ায় গা ঢাকা দিয়ে গিয়ে থপ্ কোরে ভৈরবী ঠাকরুণের এক খাম্‌চা পায়ের ধুলো নিয়ে গিলে ফেল্‌ব। আপনার অনেক ভাল-মন্দ দ্রব্যই ত আজ পর্য্যন্ত উদরস্থ করেচি, এ নইলে সেগুলো আর হজম হবেনা, পেটে লোহার মত ফুট্‌বে।

জীবানন্দ হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, আজ উচ্ছ্বাসের কিছু বাড়াবাড়ি হচ্ছে প্রফুল্ল।

প্রফুল্ল পুনশ্চ হাত জোড় করিয়া কহিল, তা'হলে রমুন দাদা, এটা শেষ করি। মোসাহেবির পেন্সন বলে সেদিন যে উইলখানায় হাজার পাঁচেক টাকা লিখে রেখেচেন সেটার ওপরে দয়া করে একটা কলমের আঁচড় দিয়ে রাখ্‌বেন,—চণ্ডীর টাকাটা হাতে এলে মোসাহেবের অভাব হবেনা, কিন্তু আমাকে দিয়ে অতগুলো টাকার আর দুর্গতি করবেন না।

জীবানন্দ কহিল, তা'হলে এবার আমাকে তুমি সত্যি-সত্যিই ছাড়লে?

প্রফুল্ল তেম্‌নি করজোড়ে কহিল, আশীর্ব্বাদ করুন এই সুমতিটুকু শেষ পর্য্যন্ত যেন বজায় থাকে।

জীবানন্দ মৌন হইয়া রহিল, প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করিল, কবে যাচ্চেন তিনি?

জানিনে।

কোথায় যাচ্চেন তিনি?

তাও জানিনে।

প্রফুল্ল কহিল, জেনেও লাভ নেই দাদা। সহসা তাহার মুখের চেহারা বদ্‌লাইয়া গেল, কহিল, বাপ্ রে! মেয়ে-মানুষ ত' নয়, যেন পুরুষের বাবা। মন্দিরে দাঁড়িয়ে সে দিন অনেকক্ষণ চেয়েছিলাম, মনে হ'ল যেন পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত একেবারে পাথরে গড়া। ঘা মেরে মেরে গুড়ো করা যাবে, কিন্তু আগুনে ফেলে হাপর বসিয়ে যে গলিয়ে নিয়ে ইচ্ছেমত ছাঁচে ঢেলে-গড়ে নেবেন, সে বস্তুই নয়। পারেন ত' ও মতলবটা পরিত্যাগ করবেন।

জীবানন্দ কতকটা বিদ্রূপের ভঙ্গিতে প্রশ্ন করিল, তা'-হলে প্রফুল্ল, এবার নিতান্তই যাচ্চো ?

প্রফুল্ল সবিনয়ে জবাব দিল, গুরুজনের আশীর্ব্বাদের জোর থাকে ত' মনস্কামনা সিদ্ধ হবে বই কি !

জীবানন্দ কহিল, তা' হতে পারে। কিন্তু কি করবে স্থির করেচ ?

প্রফুল্ল বলিল, অভিলাষ ত আপনার কাছে ব্যক্ত করেচি। প্রথমে চারটি ডাল-ভাতের যোগাড়ের চেষ্টা কোরব।

জীবানন্দ কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া প্রশ্ন করিল, ষোড়শী সত্যই চলে যাবে তোমার মনে হয় ?

প্রফুল্ল কহিল, হয়। তার কারণ, সংসারে সবাই প্রফুল্ল নয়। ভাল কথা দাদা, একটা খবর আপনাকে দিতে ভুলেছিলাম। কাল রাত্রে নদীর ধারে বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি সেই ফকীর সাহেব। আপনাকে যিনি এক দিন তাঁর বটগাছে ঘুঘু শিকার করতে দেননি—বন্দুক কেড়ে নিয়েছিলেন—তিনি। খুশি করে কুশল প্রশ্ন কোরলাম, ইচ্ছে ছিল মুখ-রোচক ছটো খোষামোদ টোষা-মোদ করে যদি একটা কোন ভাল রকমের ওষুধ-টষুধ বার করে নিতে পারি ত আপনাকে ধরে পেটেন্ট নিয়ে বেচে দু পয়সা রোজগার কোরব। কিন্তু, ব্যাটা ভারি চালাক, সে দিক দিয়েই গেলনা। কথায় কথায় শুনলাম তাঁর ভৈরবী মাকে দেখতে এসেছিলেন, এখন চলে যাচ্চেন। ভৈরবী যে সমস্ত ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্চেন, তাঁর কাছেই শুনতে পেলাম।

জীবানন্দ কৌতূহলী হইয়া উঠিল, কহিল, এঁর সদুপ-দেশেই বোধ করি তিনি চলে যাচ্চেন ?

প্রফুল্ল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না। বরঞ্চ এঁর উপদেশের বিরুদ্ধেই তিনি চলে যাচ্চেন।

জীবানন্দ উপহাস করিয়া কহিল, বল কি প্রফুল্ল, ফকির সাহেব শুনি যে তাঁর গুরু। গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন ?

প্রফুল্ল কহিল, এ ক্ষেত্রে তাই বটে।

কিন্তু এত বড় বিরাগের হেতু ?

প্রফুল্ল কহিল, বিরাগের হেতু আপনি। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কি জানি এ কথা আপনাকে শোনানো ভাল হবে কি না, কিন্তু ফকিরের বিশ্বাস, আপনাকে তিনি মনে মনে অত্যন্ত ভয় করেন,—পাছে কলহ বিবাদের মধ্যে দিয়েও আপনার সঙ্গে মাখামাখি হয়ে যায়, এই তাঁর সকলের চেয়ে বড় ভয়। নইলে দেশের লোককে তিনি ভয় করেননি।

জীবানন্দ বিস্ফারিত চক্ষে তাহার প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। প্রফুল্ল একটুখানি হাসিয়া কহিল, দাদা, ভগবান আপনাকেও বুদ্ধি বড় কম দেননি, কিন্তু সর্ব্বস্ব সমর্পণ করে কাল তিনিই মারাত্মক ভুল করলেন, কি হাত পেতে নিয়ে আপনিই মারাত্মক ভুল করলেন, সে মীমাংসা আজ বাকি রয়ে গেল, যদি বেঁচে থাকি ত একদিন দেখতে পাবো আশা হয়।

জীবানন্দ এ কথারও কোন উত্তর দিলনা, তেমনি নীরবে বসিয়া রহিল।

সন্ধ্যা হয়-হয়, বেহারা পাত্র ভরিয়া মদ আনিয়া উপস্থিত করিল, জীবানন্দ হাত নাড়িয়া কহিল, নিয়ে যা,—দরকার নেই।

ভৃত্য বুঝিতে না পারিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, প্রফুল্ল কহিল, কখন্ দরকার সেইটে বলে দিন্‌না ! জীবানন্দ সহসা কখন্ যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, প্রফুল্লর প্রশ্নে চোখ তুলিয়া কহিল, এখন ত' নিয়ে যা,—দরকার হলে ডেকে পাঠাবো। সে চলিয়া যাইতেছিল, জীবানন্দ ডাকিয়া কহিল, হাঁ রে, তোদের চা আছে ?

প্রফুল্ল কহিল, শোন কথা। চা নেই ত আমি বেঁচে আছি কি কোরে ?

তবে, তাই এক বাটি নিয়ে আয়।

বেহারা প্রস্থান করিলে প্রফুল্ল প্রশ্ন করিল, অকস্মাৎ অমৃতে অরুচি যে ?

জীবানন্দ বলিল, অরুচি নয়,—কিন্তু আর খাবোনা।

প্রফুল্ল হাসিল। এবং ক্ষণেক পূর্ব্বে তাহারই প্রতি প্রযুক্ত বিদ্রূপ ফিরাইয়া দিয়া কহিল, এই নিয়ে ক'বার হল দাদা ?

জীবানন্দ রাগ করিলনা সেও হাসিয়া তাহারই অনুকরণ করিয়া কহিল, এ মীমাংসাটাও আজ না হয় বাকি থাক্ প্রফুল্ল, যদি বেঁচে থাকো ত একদিন দেখতে পাবে আশা করি।

প্রফুল্ল মুখ টিপিয়া শুধু একটু হাসিল, প্রত্যুত্তর করিলনা।

চাকর আলো দিয়া গেল। ক্রমশঃ সন্ধ্যার অন্ধকার যখন বাহিরে গাঢ় হইয়া আসিতেছিল, জীবানন্দ হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, যাই একটু ঘুরে আসি—

প্রফুল্ল আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, কই কাপড় ছাড়লেন না?

থাক্ গে।

আপনার সহচর? গাদা পিস্তলটি?

সেও থাক্। আজ একলাই ঘুরতে চোল্‌লাম।

প্রফুল্ল ভয়ানক আপত্তি করিয়া বলিল, না না, সে হয়না দাদা। অন্ধকার রাত, পথে ঘাটে আপনার অনেক শত্রু। এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি দেরাজ হইতে পিস্তল বাহির করিয়া হাতে গুঁজিয়া দিতে গেল।

জীবানন্দ দুই পা পিছাইয়া গিয়া কহিল, ওকে আর আমি ছুঁচিনে প্রফুল্ল—

প্রফুল্ল বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া কহিল, হঠাৎ হ'ল কি দাদা? না হয় পাইকদের ডেকে দিই, তাদের কেউ সঙ্গে যাক্।

জীবানন্দ মাথা নাড়িয়া কহিল, না তাও না। আজ থেকে আমি এম্‌নি একলা বার হব, যেন কোথাও কোন শত্রু নেই আমার। আমার থেকেও কারও কোন না ভয় হোক্;—তারপরে যা হয় তা আমার ঘটুক,—আমি কারও কাছে নালিশ কোরবনা। এই বলিয়া সে অন্ধকারে ধীরে ধীরে একাকী বাহির হইয়া গেল।

সাময়িকী

কি কুক্ষণেই কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় আয়ের অপেক্ষা বেশী ব্যয় করিয়া পাঁচ লাখ টাকারও উপর অনটনে পড়িয়াছেন! সেই হইতে চারিদিকে সোরগোল উঠিয়াছে। কেহ স্বপক্ষে, কেহ বিপক্ষে বক্তৃতা করিতেছেন; গালাগালি পরনিন্দা, পরকুৎসা প্রচারের আর অন্ত নেই। ঋণভার হইতে মুক্তি লাভের জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরিচালকগণ সরকারের কাছে আবেদন করিয়া গোলটা আরও পাকাইয়া তুলিয়াছিলেন। ব্যবস্থাপক সভায় অনেক বাদ্‌বিতণ্ডার পর কোন প্রকারে আড়াই লক্ষ টাকা ঋণ শোধের জন্য যদি বা মঞ্জুর হইল, শিক্ষা-মন্ত্রী মহাশয় তাহাতে জুড়িয়া দিলেন কয়েকটি সর্ত্ত। বিশ্ব-বিদ্যালয় এই সর্ত্ত দেখিয়া একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন। মন্ত্রীপক্ষ বলিলেন, টাকা লইতে হইলে সর্ত্ত স্বীকার করিতে হইবে, অপব্যয়ের জন্য টাকা দিতেছি না। বিশ্ব-বিদ্যালয় বলিলেন, এত হীনতা স্বীকার করিয়া টাকা লইব না, ভিক্ষা করিয়া ঋণ শোধ করিব, সেও ভাল। এই লইয়া অনেক কথা-কাটাকাটি, অনেক ব্যক্তিগত আক্রমণ পর্য্যন্তও হইয়া গেল। সে গোল সেদিন মিটিয়াছে; সরকার পক্ষ সর্ত্ত তুলিয়া লইয়াছেন, আড়াই লাখ টাকা বিনা সর্ত্তেই দেওয়ার আদেশ প্রচারিত হইয়াছে। আগামী বর্ষের বজেটেও তিন লাখ টাকা দাম ধরা হইয়াছে; এখনও সে সম্বন্ধে কোন সর্ত্তের কথা শোনা যাইতেছে না। বজেট-বিচার চলিতেছে, দু চারটা কথা যে একেবারেই উঠিবে না, তাহা বোধ হয় না।

এই ত' গেল এক পর্ব্ব; কিন্তু এখানেই গোল মিটিল না। একেবারে গোড়া ধরিয়া টানিবার আয়োজন হইয়াছে। বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় একেবারে দুই-দুইখানি আইনের খসড়া উপস্থাপিত হইয়াছে;—এক-খানির জনক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়, আর একখানি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়ের চিন্তা-প্রসূত। দুই-খানিরই উদ্দেশ্য অতি মহৎ—কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্কার-সাধন। এই বিল দুইখানি লইয়াও বাদানুবাদ আরম্ভ হইয়াছে। একদল বলিতেছেন, বেশ হইয়াছে। এই আইন পাশ হইলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অপব্যয় লোপ হইবে, কাজ-কর্ম্ম ঠিক চলিবে, একেশ্বরবাদ লোপ পাইবে, ঋণ-ভার দূর হইবে। আর একদল বলিতেছেন, ইহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সাধিত হইবে না, সংহার হইবে; কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় সরকারের খাসমহল হইবে। আমরা কিন্তু এই 'খাসমহল' কথাটার অর্থ বুঝিতে পারি না। এ দেশের শাসন-ব্যাপারে দেশের লোকের যে কতটুকু স্বাধীনতা আছে, তাহা ত' আমরা মোটেই অনু-ধাবন করিতে পারি না। পূর্ব্বতন মিণ্টো-মর্লি বিধানই

বল, আর দুই বৎসর পূর্ব্বে প্রাপ্ত 'রিফরম'ই বল, ইহার মধ্যে স্বাধীনতা কতটুকু আছে? সবই ত খাসমহলের ব্যাপার। কথার মার-পেঁচে যে একটু আদটুকু বাদ্-বিতণ্ডার অধিকার পাওয়া গিয়াছে, তাহার মূল্য যে কতখানি, তাহা এই দুই বৎসরের পরীক্ষাতেই জানা গিয়াছে। অন্য কথা থাকুক, লর্ড কর্জ্জনের আমলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্কারের জন্য যে আইন পাশ হইয়াছিল এবং যে আইন অনুসারে এখন পর্য্যন্ত বিশ্ব-বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে, তাহাতেই বা কতখানি স্বাধীনতা ছিল। সব ব্যবস্থাই ত সরকারের মঞ্জুরীর অপেক্ষা করিত। তবে ভারত গবর্ণমেণ্ট একটু প্রশ্রয় দিয়াছিলেন এই যে, বাপু যা করিতে হয় কর, কিন্তু টাকাকড়ি চাইও না। তাহার পর যেই ঋণ-ভার আসিয়া পড়িল, অমনি সরকারের কাছে হাজির। এইটুকু অধিকারের গর্ব্বে অধীর হইলে যাহা হয়, তাহাই হইল। খাসমহলের কার্য্য যেমন ভাবে চালান উচিত, তাহারই ব্যবস্থা হইতে চলিল; সামান্য যে একটু ফাঁক ছিল, যাহার জন্য এই বিপত্তি, এই ঋণ-ভার, তাহারও পথ বন্ধ হইবার ব্যবস্থা হইতেছে। সুতরাং বিশ্ব-বিদ্যালয় 'খাসমহল' হইতে চলিল বলিয়া তারস্বরে চীৎকার করিবার কোন অর্থ নাই। যিনি যতই বলুনা কেন, অধিকারের বড়াই যতই করুক না কেন, শাসন-ব্যবস্থার চাবীকাঠী কিন্তু 'steel frame'—ইস্পাতের কাঠামোর জিম্বা; তাহার নড়ন-চড়ন নাই। আমরা শুধু আন্দোলন করিব, ব্যবস্থাপক সভায় বক্তৃতা করিব, হয় ত' বা দুই একটা প্রস্তাব পাশ করিয়াও লইতে পারি, কিন্তু ঐ 'পাশ' পর্য্যন্তই। এই সার সত্য বুঝিয়াই আমরা চুপ করিয়া থাকি। এই আইন সম্বন্ধে একটী আপত্তির কারণ কিন্তু আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। যাঁরা এই আইন সম্বন্ধে আপত্তি করিতেছেন, তাঁহাদের প্রধান কথাই এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যানসেলর আছেন, আইন-চ্যানসেলর আছেন; এই দুইয়ের মাঝখানে আবার একজন রেক্টর কেন? আর সে রেক্টর বাঙ্গালার শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ই বা হইবেন কেন? পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রেক্টর ছিলেন না, কারণ তখন স্বয়ং চ্যানসেলর বড়লাট বাহাদুর এই কলিকাতা নগরীতে হাতের কাছেই থাকিতেন। তাহার পর যখন রাজধানী চলিয়া গেল, বড়লাটও দূরে গেলেন, তখন একজন রেক্টরের দরকার হইল, বাঙ্গালার গবর্ণরই রেক্টর হইলেন। এ ব্যবস্থাও থাকিল না; বড়লাট আর চ্যানসেলর থাকিলেন না, বাঙ্গালার গবর্ণরই চ্যানসেলর হইলেন, রেক্টর পদ উঠিয়া গেল। মল্লিক-বিলে সেই রেক্টরের পুনরাবির্ভাবে আপত্তি হইয়াছে। রেক্টর পদ শিক্ষামন্ত্রীরই প্রাপ্য হইবে, এ কথাতেও আপত্তি। অর্থাৎ সাদা কথা এই যে, আমাদের দেশেরই একজন লোকের, আমাদেরই একজন প্রতিনিধির হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার দিতে আপত্তি। ইহার কোন সঙ্গত কারণ নাই। আলোচনা-প্রসঙ্গে একজন বলিয়াছেন, শিক্ষামন্ত্রী ত আমাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি নহেন, তিনি উক্ত পদে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক মনোনীত হন; সুতরাং তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভার প্রাপ্ত হইলে বিশ্ব-বিদ্যালয় একেবারে 'খাসমহল' হইবে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, যিনি ভাইস-চ্যানসেলর হন, তিনি কি আমাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি? তাঁহাকেও ত সরকারই মনোনীত করেন; তাহাতে ত আপত্তি হয় না। আজ সার আশুতোষ ভাইস চ্যানসেলর আছেন, প্রভাস মিত্র মহাশয় শিক্ষামন্ত্রী আছেন; কা'ল আর একজন হইবেন। শিক্ষাবিভাগের ভার তাঁহারই উপর থাকাই ত স্বাভাবিক। তিনি অনুপযুক্ত হন, তাঁহাকে সরাইয়া দেও, তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য কর; উপযুক্ত ব্যক্তিকে সেই পদে মনোনীত করিবার চেষ্টা কর। লাট-সাহেব বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তা, ইহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু তিনি যদি সেই ভারের কিয়দংশ আমাদের দেশেরই এক-জনের উপর ন্যস্ত করেন, তাহাতেই আপত্তি। আমরা কিন্তু স্বায়ত্বশাসনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইয়াছি, আমরা স্বরাজ-লাভের কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছি!

ভারত-শাসনের ব্যয়-লাঘবের ব্যবস্থা করিবার জন্য এক কমিটী গঠিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ইঞ্চকেপ মহোদয় সেই কমিটীর সভাপতি। এই কমিটীর অধীনে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশেও এক একটা কমিটী বসিয়াছিল। সকল প্রাদে-শিক কমিটীর রিপোর্টই পূর্ব্বে বাহির হইয়াছিল; মূল কমিটীর রিপোর্ট সেদিন প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমস্ত কমিটী তাড়াতাড়ি রিপোর্ট দাখিল করিলেও আগামী বর্ষের বজেটে এই কমিটীর প্রস্তাব গৃহীত হইবার সুবিধা

হয় নাই, কারণ রিপোর্ট দাখিল হওয়ার পর দুই চারিদিনের মধ্যেই বজেটসমূহ ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত করিতে হইয়াছে। ইঞ্চকেপ কমিটীর রিপোর্ট সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার অবকাশ ভারত গবর্ণমেণ্ট বা প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের সময়াভাবে হইয়া উঠে নাই। তাহা হইলেও প্রত্যেক গবর্ণমেণ্ট, এমন কি ভারত গবর্ণমেণ্টও কমিটী নিরপেক্ষ হইয়া কিছু-কিঞ্চিৎ ব্যয় সংক্ষেপ করিয়াছেন। তাহাতেও কিন্তু আয়ে কুলায় নাই—কয়েক কোটী টাকা নাকাই। সুতরাং লবণের উপর ট্যাক্স বাড়িবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সে বৃদ্ধিও বড় কম নহে, একেবারে ডবল—পাঁচসিকার স্থলে আড়াই টাকা। তথাস্তু! তবুও মন্দের ভাল এই যে, বাঙ্গালাদেশের বজেটে আয় অপেক্ষা ব্যয় কয়েক লক্ষ টাকা বেশী হইলেও আমাদের রাজস্ব-সচীব মহাশয় এবার আর কোন নূতন ট্যাক্সের কথা বলেন নাই। বিগত বৎসরে যে কয়টা ট্যাক্স বাড়িয়াছিল, তাহার কোনটাতেই আশানুরূপ আয় হয় নাই। প্রায় সকল দিকেই আয় কম হইয়াছে; বাড়িয়াছে শুধু এক বিষয়ে। সেটা মাদক-বিভাগ। আমাদের রাজস্ব-সচীব মহোদয় আশ্বাস দিয়াছেন যে, মাদক দ্রব্যের কাটতি বৃদ্ধি হয় নাই; তবুও যে আর বাড়িয়াছে, তাহা উক্ত বিভাগের ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের ফলে। ভাল কথা। আগামী বৎসরও কোন প্রকারে যাইবে, তাহার পরই ব্যয়-সঙ্কোচের ফলে যথেষ্ট অর্থ উদ্বৃত্ত হইবে; তখন যে সমস্ত হিতকর কার্য্য এখন অর্থাভাবে বন্ধ রাখিতে হইয়াছে, তাহাতে হস্তার্পণ করা হইবে এবং দেশের প্রকৃত উন্নতিমূলক কার্য্যের জন্য অধিক অর্থব্যয় ও মনোযোগ করা হইবে। ভগবান করুন তাহাই হউক।

———

ইঞ্চকেপ কমিটী ব্যয়-সংক্ষেপ সম্বন্ধে কি প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার সামান্য আভাস নিম্নে দিলাম। সর্ব্বশুদ্ধ ১৯ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়-সংক্ষেপ করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। সামরিক বিভাগে প্রায় ১০ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা, রেলওয়ে বিভাগে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ এবং পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগে ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয়-সংক্ষেপ করিবার কথা হইয়াছে। সাধারণ শাসন-কার্য্য বিষয়ে ৫১ লক্ষ টাকা ব্যয়-সংক্ষেপ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। অবশিষ্ট টাকা অন্যান্য বিভাগ হইতে কমাইবার কথা হইয়াছে। রেলওয়ে এবং পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগ মিশাইয়া এক বিভাগে পরিণত করা হইবে। এবং অন্যান্য বিভাগগুলি একত্র করিয়া মোটের উপর দুইটী বিভাগে পরিণত করা হইবে যথা, সাধারণ এবং বাণিজ্য বিভাগ।

সাহিত্য-সংবাদ

॥০ আনা সংস্করণের ৮৫ সংখ্যক পুস্তক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিত-কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "মোহিনী" প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ প্রণীত "প্রাচীন শিল্প পরিচয়" প্রকাশিত হইল, মূল্য ২॥০

মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নূতন গীতিনাট্য "নজরে নাকাল" প্রকাশিত হইল, মূল্য ৸০

রায় শ্রীযুক্ত তারকনাথ সাধু বাহাদুর প্রণীত সুবৃহৎ উপন্যাস "ভোলানাথের ভুল" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ২৲

অধ্যাপক ডাক্তার রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত ভূমিকা সহ অধ্যাপক সমাদ্দারের "সমসাময়িক ভারতের পঞ্চম খণ্ড" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ২॥০ টাকা।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র দাস চৌধুরী এম-এ প্রণীত "মাতৃহারা" ও "গ্রহচক্র" প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য প্রত্যেকখানির ৷৴০

॥০ আনা সংস্করণের ভিক্ষুসুদর্শনের "চতুর্ব্বেদের" দ্বিতীয় সংস্করণ ও হিন্দী সংস্করণ যন্ত্রস্থ হইয়াছে।

বাঁশবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগার-প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা।—"পল্লীর শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সাধারণ পাঠাগারের উপযোগিতা" বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য একটি রৌপ্যপদক উপহার দেওয়া হইবে। মনোনীত প্রবন্ধ চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহে পাঠাগারের বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত হইবে। প্রবন্ধগুলি ১৫ই চৈত্রের মধ্যে সাহিত্য শাখার সম্পাদকের হস্তগত হওয়া আবশ্যক। ঠিকানা:—বাঁশবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগার, বাঁশবেড়িয়া, জেলা হুগলি।

আগামী ১লা বৈশাখ হইতে 'বাঁশরী' নামে একখানি নূতন ধরণের সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইবে।

Publisher—**Sudhanshusekhar Chatterjea,**
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—**Narendranath Kunar,**
The Bharatvarsa Printing Works.
203-1-1, Cornwallis Street. CALCUTTA.

আকুল আহ্বান

Soul of the Solitude

শিল্পী—শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরীর চিত্র-প্রদর্শনী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

BHARATVARSHA HALFTONE & PTG. WORKS.

বৈশাখ, ১৩৩০

দ্বিতীয় খণ্ড | দশম বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

স্বপ্ন

ডাঃ শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু, ডি-এস্‌সি, এম্-বি

(৫)

স্বপ্নে অতিপ্রাকৃত বিষয়

স্বপ্নে অতিপ্রাকৃত ঘটনার আভাস পাওয়া যায় কিনা, তাহা জানিবার জন্য সাধারণের যথেষ্ট কৌতূহল আছে। স্বপ্নে প্রত্যাদেশ, প্রবাসী প্রিয়পরিজনের মৃত্যু, পীড়া, বা দুর্ঘটনার ইঙ্গিত, ভবিষ্যৎ ঘটনার বিবরণ, অজ্ঞাত অতীত ঘটনা-দর্শন, এবং মৃতব্যক্তির আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই।

অতিপ্রাকৃত ঘটনায় বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে প্রবল। এই কারণে যথেষ্ট প্রমাণ না থাকিলেও সময় সময় আমরা অতি সামান্য কারণেই অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করিয়া বসি। কোন ঘটনার সত্যাসত্য সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হইতে হইলে সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন। অনেকেই হয় ত স্বপ্নদৃষ্ট অনেক অলৌকিক ঘটনার উদাহরণ দিতে পারেন। কিন্তু সেগুলি ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে সপ্রমাণ হইবে যে, তাহার অধিকাংশই বৈজ্ঞানিক হিসাবে গ্রাহ্য নহে। আমি ভূত বিশ্বাস করি। অন্ধকার রাত্রে গাছের গুঁড়ি দেখিয়া ভয় খাইলাম; বৈঠকখানায় আসিয়া বন্ধুবান্ধবদের বলিলাম,—'এইমাত্র স্বচক্ষে ভূত দেখিয়াছি।' এখানে জ্ঞানতঃ মিথ্যা না বলিলেও আমার কথা প্রামাণ্য নহে। ভূত বিশ্বাস করার ফলে এক্ষেত্রে

আমার পর্য্যবেক্ষণে ভুল হইল। রুদ্ধ ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমরা কেমন করিয়া ভুল করি, সে কথা কিছুদিন পূর্ব্বে 'কারণ-তত্ত্ব' প্রবন্ধে বিশদ্‌ভাবে আলোচনা করিয়াছি। স্বপ্নে রুদ্ধ ইচ্ছার প্রভাব বেশী; তাই স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনা বর্ণনা করিবার সময় ভুল হইবার সম্ভাবনাও অধিক। আরও অনেক কারণে অলৌকিক ঘটনার বর্ণনায় ভুল হইতে পারে। আমি ইচ্ছাকৃত মিথ্যা-বর্ণনার আলোচনা এ প্রবন্ধে করিব না;—যদিও এ কথা দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে, অলৌকিক ঘটনা বর্ণনাকালে ইচ্ছাকৃত অতিরঞ্জনের প্রয়াস প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়। আমি স্বপ্নদৃষ্ট কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিব—সেগুলি অতিপ্রাকৃত কিনা।

কেহ কেহ স্বপ্নে এমন সব ঘটনা দেখেন যাহা বহুপূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছে; কিন্তু স্বপ্নদ্রষ্টার পক্ষে তাহা প্রত্যক্ষ করিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। এই ধরণের স্বপ্ন আমি নিজেও কখন দেখি নাই, বা এরূপ স্বপ্নদ্রষ্টার কোন স্বপ্ন বিশ্লেষণ করিবার সুযোগও আমার ঘটে নাই। এরূপ স্বপ্ন দেখা সম্ভব কি না, তাহাও আমি জোর করিয়া বলিতে পারি না। তবে স্বপ্নদৃষ্ট অলৌকিক ঘটনার প্রামাণিকতা পরীক্ষা করিতে হইলে কি কি বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত, তাহাই এখানে নির্দ্দেশ করিব। নিতান্ত শৈশবাবস্থার অনেক ঘটনা স্মৃতি হইতে একেবারে মুছিয়া গেলেও মনের অজ্ঞাত প্রদেশে তাহাদের অবস্থিতি অসম্ভব নহে এবং স্বপ্ন দেখিবার সময় শৈশবের অন্যান্য ঘটনার সহিত বিজড়িত হইয়া সেগুলি আমাদের স্মৃতিপথে আসিতে পারে। এক 'হিষ্টিরিয়া' গ্রস্ত স্ত্রীলোক ফিটের সময় বিশুদ্ধ হিব্রু অনর্গল উচ্চারণ করিত, অথচ স্বাভাবিক অবস্থায় হিব্রুভাষার সহিত তাহার পরিচয়ের কোনই লক্ষণ কখন দেখা যায় নাই। ঘটনাটিকে 'ভুতাবেশ' বলিয়া অনেকে মনে করিলেন। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধানে দেখা গেল, শৈশবে স্ত্রীলোকটি এক পাদ্রীর ঘরে প্রতিপালিত হয়। পাদ্রী প্রত্যহ প্রাতে উচ্চৈঃস্বরে হিব্রুভাষায় বাইবেল পাঠ করিতেন। স্ত্রীলোকটির সেই শৈশব-স্মৃতি মন হইতে একেবারে নির্ব্বাসিত হয় নাই। সুস্থ অবস্থায় তাহার অস্তিত্বের পরিচয় না পাইলেও ফিটের সময় তাহা আত্মপ্রকাশ করিত। একবার আমি এক 'ভুতে-পাওয়া' রোগিনীর চিকিৎসার জন্য আহূত হই। স্ত্রীলোকটি অল্পবয়স্কা—ফিটের সময় 'বক্তার' হইত। তাহার মুখে প্রকাশ, নাম তাহার—ধাম—গ্রাম। স্বামীর সহিত কলহের ফলে সে গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করে; এই রোগিনীকে অশুচি অবস্থায় পাইয়া তাহার উপর ভর করিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, রোগিনীর পিতা Postal Guide দেখিয়া সেই গ্রামের সন্ধান করেন; এবং তথাকার পোষ্টমাষ্টারকে লিখিয়া সংবাদ পান যে, চার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে সেই গ্রামে সত্যসত্যই ঐ নামের একটি স্ত্রীলোক স্বামীর সহিত ঝগড়া করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। রোগিনীর পক্ষে সেই আত্মঘাতিনীর নামধাম জানার কোনই সম্ভাবনা ছিল না; তাই 'ভূতাবেশ' বলিয়া রোজার দ্বারা প্রথমে ইহার চিকিৎসা করান হয়। রোগিনীর এক আত্মীয় ভূতে অগাধ বিশ্বাসী; তিনি আমাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি যদি ইহা হিষ্টিরিয়া বলেন, তবে এই সকল আশ্চর্য্য ঘটনা কিরূপে ঘটিল? রোগিনীকে সুস্থ অবস্থায় অনেকবার প্রশ্ন করিয়াও কোন ফলোদয় হয় নাই। সত্য কথা বলিতে কি, অনেকদিন পর্য্যন্ত আমি এই ব্যাপারের প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিতে পারি নাই। হঠাৎ একদিন রোগিনীর ফিটের সময় উপস্থিত হই। ফিট্ না ছাড়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেছিলাম। ঘরের দেওয়াল-আলমারীর একটি তাকে 'বঙ্গবাসীর' কতকগুলি পুরাতন সংখ্যা ছিল। সময় কাটাইবার জন্য সেগুলি উলটাইতেছি, এমন সময় হঠাৎ রোগিনীর মুখে শোনা সেই গ্রামটির উল্লেখ দেখিয়া কৌতুহলাবিষ্ট হইলাম। পাঠ করিয়া দেখি, 'বঙ্গবাসীর' সংবাদ-দাতা লিখিতেছেন যে,... নাম্নী স্ত্রীলোক স্বামীর সহিত কলহ করিয়া আত্মঘাতিনী হইয়াছে। সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে জলের মত পরিষ্কার হইয়া গেল। হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগিনী কোন-না-কোন সময়ে সেই ঘটনা পাঠ করিয়াছে, আর অজ্ঞাতসারে ঘটনাটি তাহার মনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ফিটের সময় কল্পনায় সে নিজেকে ঐ আত্মঘাতিনীর প্রেতাত্মা দ্বারা অভিভূত মনে করে। ফিট ছাড়িয়া গেলে, রোগিনীকে 'বঙ্গবাসী'খানি দেখাইবার পর আর কখনও তাহার ফিট হয় নাই। দৈবক্রমে কাগজখানি হস্তগত হইয়াছিল বলিয়াই প্রকৃত রহস্য প্রকাশ পাইল, নতুবা অন্য কোন প্রকারে ঘটনার সঠিক তথ্য নির্ণীত হইত কিনা সন্দেহ।

পাঠক দেখিলেন, কোন ঘটনার সন্তোষজনক কারণ দিতে না পারিলেই যে তাহাকে অলৌকিক বলিয়া সাব্যস্ত করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। উপরিলিখিত দুইটি ঘটনার মূলে স্মৃতিরোধ বর্ত্তমান। অতীত ঘটনা স্বাভাবিক অবস্থায় মনে না পড়ায়, আপাতঃদৃষ্টিতে দুইটি রোগীরই আচরণকে অলৌকিক ঘটনা বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। আরও একপ্রকার স্মৃতিবিভ্রম দেখা যায়। ইংরাজীতে ইহাকে বলে—Paramnesia. এরূপ স্মৃতিবিভ্রমের ফলে যে-বিষয় বা যে-ঘটনা প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বপ্রথম দেখিতেছি বা শুনিতেছি, তাহা যেন আর কখনও দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয়। মনে করুন, এক ব্যক্তি পূর্ব্বে কখনও বিলাত যান নাই। কিন্তু প্রথমেই লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে নামিয়া তাঁহার মনে হইল, এ স্থান যেন তিনি আর কখনও দেখিয়াছেন। এইরূপ স্মৃতিবিভ্রম কেন হয়, সে সম্বন্ধে Bergson প্রমুখ বড় বড় মনোবিজ্ঞানবিদ্ বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। সকল প্রকার Paramnesiaর তথ্য এখনও নির্ণীত হয় নাই। এখানে আমার নিজের মত ব্যক্ত করিব।

ধরুন, আমি রবিবার বৈকালে যাদুঘর দেখিতে গিয়াছিলাম। পরদিন এই ঘটনার স্মৃতি আমার মনে উঠিল। এক্ষেত্রে কেবল যে যাদুঘর-দর্শনরূপ ঘটনাই আমার স্মৃতি-পথে উঠিয়াছে, তাহা নহে। কোন্ স্থানে ও কোন্ সময়ে যাদুঘর দেখিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে তাহাও আমার মনে পড়িয়া গেল। স্মৃতিতে অতীত ঘটনার বিকাশ ত হয়-ই, পরন্তু স্থান ও কালের নির্দ্দেশ থাকে। অনেকদিন পরে কোন পরিচিত বন্ধুকে দেখিলাম। এক্ষেত্রে বন্ধুর পূর্ব্বেকার মূর্ত্তি মনে উঠিল, আর সেই মূর্ত্তিই যে আমার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া, তাহাও বুঝিলাম। আবার সময় সময় এমনও হয় যে, কাহাকেও দেখিয়া পরিচিত মুখ বলিয়া বোধ হইল, অথচ তিনি কে, কোথায় তাঁহাকে দেখিয়াছি, কিছুই মনে আসিল না। এরূপ অবস্থার স্মৃতির স্থান ও কাল-নির্দ্দেশের অন্তরায় ঘটিয়াছে। তবে তিনি যে পরিচিত—এই ভাবটি এখনও মনে আছে। হঠাৎ তিনি কে, মনে পড়িল;—অর্থাৎ পূর্ব্বপরিচয়ের সহিত স্থান ও কাল-নির্দ্দেশের সংযোগ ঘটিল। সাধারণের ধারণা, কালের ব্যবধানের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতির বিকৃতি ঘটে। প্রথমটা হয় ত আমরা পূর্ব্বপরিচিত ব্যক্তি কে, কোথায় তাঁহাকে দেখিয়াছি, একথা ভুলিয়া যাই; ক্রমে তাঁহার মূর্ত্তিও স্মৃতিপথ হইতে লুপ্ত হইয়া যায়; তখন তাঁহাকে পুনরায় দেখিলে, আর কখনও যে তাঁহাকে দেখিয়াছি তাহা মনে পড়ে না। কিন্তু এই স্মৃতির বিলোপ যে কেবল কালের ব্যবধানেই সম্ভব তাহা নহে,—নানা মানসিক কারণেও এরূপ ঘটিতে পারে। আজ যাঁহার সহিত পরিচিত, কাল তাঁহাকে ভুলিয়া যাইতে পারি। কেহ কেহ আবার অতি সহজেই নাম ভুলিয়া যান, কেহ বা ভুলিয়া যান—চেহারা, ইত্যাদি। আমি অতি নিবিষ্টচিত্তে কোন কাজে ব্যাপৃত আছি। আমার পাশে বসিয়া দুই ব্যক্তি কথোপকথন করিতেছেন। তাঁহাদের কথা আমার কাণে আসিলেও আমার মন কিন্তু সেদিকে নাই। মনে করুন, আমার অজানা কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে তাঁহাদের কথা হইতেছে; আর এই অজানা লোকটির নামও কিছু অদ্ভুত রকমের,—যেমন, সোমসুন্দর। কিছুক্ষণ পরে অপর এক ব্যক্তি আসিয়া যদি 'সোমসুন্দর' নাম উচ্চারণ করেন, তবে আমার মনে হইবে, নামটি যেন আমার পরিচিত, অথচ কোথায় এই নাম শুনিয়াছি, তাহা স্মরণ করিতে পারিব না। সেইরূপ অন্যমনস্ক অবস্থায় যদি আমরা কোন কিছু প্রত্যক্ষ করি, আর পরে যদি তাহা পুনরায় আমাদের নয়ন বা শ্রুতিগোচর হয়, তবে তাহা আমার নিকট পরিচিত বলিয়া মনে হইবে, অথচ পূর্ব্বে আর কোথায় দেখিয়াছি, তাহা না-ও মনে পড়িতে পারে। উপরের সব উদাহরণগুলিতেই প্রথমবার ও দ্বিতীয়বার দেখা বা শোনার মধ্যে কালের দূরত্ব আছে। কোন বিষয় অন্যমনস্ক অবস্থায় দেখিলে, তাহার প্রথম-দর্শনের ছাপ সঙ্গে সঙ্গে মন হইতে লুপ্ত হইতে পারে, এবং পর মুহূর্ত্তেই সেই বিষয় পূর্ব্বে আর কোথাও দেখিয়াছি, মনে হওয়া অসম্ভব নহে। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত অবস্থায়, নানা মানসিক উদ্বেগের মধ্যে প্রথমে লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে নামিলাম। ষ্টেশনের প্রথম ছাপটি সঙ্গে সঙ্গে মন হইতে মুছিয়া গেল। সেইজন্য পর মুহূর্ত্তেই মনে হইল, বুঝিবা ইহা আর কখনও দেখিয়াছি। এইরূপে Paramnesia বা স্মৃতিবিভ্রমের উৎপত্তি হয়। এইজন্য কোন কিছু দেখিয়া বা শুনিয়া কেহ যদি বলেন যে, তিনি তাহা পূর্ব্বে স্বপ্নে দেখিয়াছেন, তবে সে কথার উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না।

অজ্ঞাত অতীত ঘটনা যে একেবারেই মনে উঠিতে পারে না, এমন কথা বলিতেছি না। তবে সাধারণতঃ এরূপ ঘটনার যে-সকল বিবরণ পাওয়া যায়, সেগুলি বিচার-সহ নহে—ইহাই বলিতে চাই। কোন অতীত ঘটনা—যেমন আত্মীয়-বিয়োগ আদি—শুনিবার পর যদি আমার মনে হয় যে তাহা পূর্ব্বে স্বপ্নে দেখিয়াছি, তবে তাহাতে অলৌকিকত্ব আরোপ করিবার কারণ নাই;—স্মৃতিবিভ্রমের ফলে এরূপ হওয়া সম্ভব।

স্বপ্নে ভাবী ঘটনার ইঙ্গিত

স্বপ্নে আমাদের অনেক অতৃপ্ত ইচ্ছা কাল্পনিকভাবে চরিতার্থ হয়—একথা অনেকবার বলিয়াছি। মনে মনে আমার বিলাত যাইবার ইচ্ছা থাকিলে স্বপ্নে বিলাত যাইতেছি বা বিলাত গিয়াছি, এরূপ দেখা বিচিত্র নহে। যে ইচ্ছার ফলে বিলাত যাওয়ার স্বপ্ন দেখিলাম, সেই ইচ্ছাই হয় ত কালে আমাকে প্রকৃতপক্ষে বিলাতে লইয়া যাইতে পারে। অতএব স্বপ্নে ভাবী ঘটনার আভাস থাকা আশ্চর্য্য নহে। সময় সময় কোন কোন ইচ্ছা, মনে অজ্ঞাত থাকার ফলে, কেবলমাত্র স্বপ্নেই আত্মপ্রকাশ করে। এইরূপ ইচ্ছা কোন কারণবশতঃ পরবর্ত্তীকালে মনে উঠিয়া, আমাদিগকে তদনুরূপ কার্য্য করাইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রেও স্বপ্নে ভবিষ্যৎ ঘটনা সূচিত হয়। এইজন্য আমরা বলি, যখন স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, তখন ত জানিতাম না যে সেইমত কার্য্য করিতে হইবে। আমার এক রোগী স্বপ্ন দেখিল, তাহার হাতে বাত হইয়াছে। কিছুদিন পরে সত্যসত্যই তাহার হাতের কব্জীতে বাত দেখা দিল। জাগ্রত অবস্থায় নানা কাজে মন ব্যাপৃত থাকে বলিয়া শরীরের অল্পবিস্তর অস্বাচ্ছন্দ্য আমরা অনুভব করিতে পারি না। নিদ্রাকালে এই অস্বচ্ছন্দতার কথা স্বপ্নে উদিত হওয়া সম্ভব। রাতের ব্যথা হয় ত পূর্ব্ব হইতেই অল্পস্বল্প ছিল—কাজের ঝঞ্চাটে দিনের বেলায় রোগী তাহা টের পায় নাই। রাত্রে সেই ব্যথার ফলেই বাতের স্বপ্ন দেখিয়াছে, আবার দিনের বেলা পুনরায় তাহার অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়াছে। বাত বৃদ্ধি হওয়াতেই পরে তাহার স্বপ্নের কথা মনে পড়িল। স্বপ্নের বাত বাস্তবে পরিণত হওয়ায়, এরূপ স্বপ্ন তাহার কাছে আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া বোধ হইল। বলা বাহুল্য এরূপ স্বপ্নেও কোন-না-কোন অজ্ঞাত ইচ্ছার ইঙ্গিত থাকে। আর এক রোগী স্বপ্ন দেখিল, তাহার appendicitis হইয়াছে। পরদিন দেখা গেল, তাহার পেটে ব্যথা হইয়াছে মাত্র। এক্ষেত্রেও বাস্তব ব্যথা স্বপ্নে appendicitis-রূপে দেখা দিয়াছে। জ্বরের স্বপ্ন দেখিয়া ঘুম ভাঙ্গিবার পর সত্যসত্যই জ্বর অনুভব করা বিচিত্র নহে।

মনে করুন, আমার কোন আত্মীয় বিদেশে আছেন; সপ্তাহে সপ্তাহে তাঁহার চিঠি পাই। কিন্তু সব সময়েই যে চিঠি নিয়মিতরূপে আসে, তাহা নহে। চিঠি আসিবার সময় উত্তীর্ণ হইলেই আমার মনে বিপদ-আপদের আশঙ্কা হওয়া স্বাভাবিক। এই নিকট-আত্মীয়ের মৃত্যু-কামনাও অজ্ঞাতসারে আমার মনে থাকিতে পারে। সুতরাং আমার পক্ষে তাঁহার কোন কঠিন ব্যাধি বা মৃত্যুর স্বপ্ন দেখা আশ্চর্য্য নহে। এই সকল স্বপ্ন আমরা প্রায়ই ভুলিয়া যাই, এবং পরে কুশল সংবাদ পাইলে এরূপ অমঙ্গল স্বপ্ন মনে পড়িবারও কোন কারণ থাকে না। কিন্তু বাস্তবিকই যদি অসুস্থতার জন্য আত্মীয়ের চিঠি দিতে বিলম্ব হইয়া থাকে, আর পরে যদি তাঁহার অসুখের খবর পাই, তবে দুঃস্বপ্নের কথা তখনই মনে পড়িয়া যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে আমি ভাবী ঘটনা স্বপ্নে দেখিয়াছি বলিয়া আশ্চর্য্য হইব। এইরূপ স্বপ্নের ভবিষ্যৎ নির্দ্দেশকতা প্রামাণ্য বলিয়া মানিতে হইলে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই স্বপ্ন-বিবরণ লিখিয়া রাখা কর্ত্তব্য। স্বপ্ন লিখিয়া রাখিবার অভ্যাস করিলে পাঠক দেখিবেন, কত অমঙ্গল-ইঙ্গিতপূর্ণ ভবিষ্যৎ-নির্দ্দেশক স্বপ্ন মিথ্যা প্রমাণিত হয়। গণৎকারের গণনার যে যে বিষয়গুলি মিলিয়া যায়, তাহাই আমাদের মনে থাকে, আর তাহাই আমরা লোকের কাছে গল্প করি। যাহা মেলে না, তাহার কথা একেবারেই ভুলিয়া যাই—ইহাই আমাদের স্বভাব। মনে করুন, কাহারও পুত্র হইবে, কি কন্যা হইবে, গণৎকার গণনার সাহায্যে বলিয়া দিল। গণনা ব্যর্থ হইলে গণৎকারের কথাই মনে উঠিল না; অথচ মিলিয়া গেলে গণৎকারের গণনার তারিফ করিলাম। কিন্তু এইরূপ মিল গণনার কৃতিত্বের প্রমাণ নহে। যদি আমি সকল ক্ষেত্রেই বলি—'পুত্র হইবে', তবে দেখা যাইবে, শতকরা প্রায় ৫০টি ক্ষেত্রে আমার কথা ঠিক। কাজেই শতকরা ৫০-এর বেশি ক্ষেত্রে আমার গণনার মিল দেখাইতে

না পারিলে, গণনা শক্তির অস্তিত্ব মানা চলে না। গণনা বা স্বপ্নদৃষ্ট কোন কিছুর সহিত বাস্তব ঘটনার মিল হইলেই তাহাকে অদ্ভুত আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। প্রবাসী আত্মীয়স্বজনের বিপদ-আপদের স্বপ্ন আমরা প্রায়ই দেখি; আর কোন ক্ষেত্রে দৈবাৎ যদি তাহা ফলিয়া যায়, তবে সেরূপ স্বপ্ন যে ভবিষ্যৎ-নির্দ্দেশক তাহা বলা চলে না। এরূপ স্থলে Law of Probability অনুসারে প্রামাণ্য স্থিরীকৃত হইবে। উদাহরণ দিয়া কথাটা বুঝাইব। অনেকেরই ধারণা, তিথি হিসাবে বাত-ব্যাধি কমে বাড়ে। মনে রাখিতে হইবে, বাত-ব্যাধি অন্য কারণে বা আপনা হইতেই কমিতে বাড়িতে পারে। অতএব তাহা তিথির প্রভাবে বাড়িল, কি আপনা হইতেই বাড়িল, তাহা বলা সুকঠিন। অমাবস্যার পূর্ব্বদিন কি পরের দিন রোগ বাড়িলেও, আমরা তাহার মূলে অমাবস্যা তিথির প্রভাব স্বীকার করিয়া লই; আর অমাবস্যার দিন বাড়িলে ত কথাই নাই। সেইরূপ পূর্ণিমার বেলা তিনদিন ও একাদশীর বেলা তিনদিন তিথির প্রভাব মানি। তাহা হইলে দেখা গেল, মোটের উপর ১৫ দিনের ভিতর এই ৯ দিনের যে-কোন দিন রোগ বৃদ্ধি পাইলেই, তিথির প্রভাবকেই আমরা তাহার কারণ স্বরূপ ধরি। যে রোগ আপনি কমে বাড়ে, তাহারও পক্ষে ঐ নয় দিনে কমা-বাড়া সম্ভব। অতএব তিথির প্রভাব প্রতিপন্ন করিতে হইলে দেখান চাই যে, ১৫টা অমাবস্যার মধ্যে অন্ততঃ নয়টার অধিক অমাবস্যায় রোগ বাড়িয়াছে; অর্থাৎ শতকরা ৬০এর অধিক ক্ষেত্রে অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও একাদশীতে রোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যদি শতকরা মাত্র ৫০টি ক্ষেত্রে এরূপ দেখা যায়, তবে তিথির প্রভাব প্রমাণিত হইবে না। সুতরাং যে-সকল স্বপ্ন আমরা প্রায়ই দেখি, তাহা যে সময়ে সময়ে ভাবী ঘটনা সূচিত করে,—এরূপ মত প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, রীতিমত হিসাব রাখা প্রয়োজন। অতীত ঘটনার ন্যায়, স্বপ্নে অজ্ঞাত বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ ঘটনার ইঙ্গিত থাকাও একেবারে অসম্ভব নহে।

মৃতব্যক্তির আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার

মৃতব্যক্তির আত্মা আছে কি না ও তাহা দেখা সম্ভব কি না,—তাহার আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে। তবে স্বপ্নে এমন কোন ঘটনা আমরা দেখি কি না যাহা ব্যাখ্যা করিতে হইলে মৃতব্যক্তির আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হয়—এখানে সেই কথাই আলোচনা করিব। এ সম্বন্ধে ফ্রয়েড্ সম্প্রতি একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এরূপ ঘটনা যে একেবারে ঘটিতে পারে না, এমন কথা তিনি বলেন নাই। তবে এরূপ ঘটনা যে পূর্ব্বে কখনও ঘটিয়াছে, তাহারও কোন সন্তোষজনক প্রমাণ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। ফ্রয়েডের *Interpretation of Dreams* পুস্তকে একটি শিক্ষাপ্রদ উদাহরণ আছে। এক ব্যক্তির সন্তান মারা যায়। প্রচলিত রীতি অনুসারে মৃত-সন্তানের চারিদিকে বাতি জ্বালাইয়া রাখা হয়; রাত্রে মৃতদেহ পাহারা দিবার জন্য একজন লোক নিযুক্ত ছিল। পিতা পাশের ঘরে নিদ্রিত; দুই ঘরের মাঝের দরজা ঈষৎ উন্মুক্ত। পিতা স্বপ্নে দেখিলেন, মৃতপুত্র তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া বলিতেছে,—'বাবা, দেখিতেছ না, আমি পুড়িয়া যাইতেছি!' পিতার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; তিনি ছুটিয়া পাশের ঘরে গিয়া দেখেন, যে-লোক পাহারায় ছিল, সে গভীর নিদ্রিত। একটি জ্বলন্ত বাতি উল্টাইয়া পড়ায় শবাস্তরণে আগুন লাগিয়াছে, আর তাহার ফলে মৃত বালকের একটি হাত পুড়িয়া গিয়াছে।

অনেকে হয় ত বলিবেন, মৃত বালকের আত্মা আসিয়া পিতাকে সাবধান করিয়া দিল। কিন্তু এরূপ স্বপ্নেও বাস্তবিকপক্ষে যে মৃতব্যক্তিরই আত্মা আসিয়াছিল, তাহা প্রমাণিত হয় না। কারণ পাশের ঘরে শবাস্তরণে আগুন লাগায় সেই আলোক নিদ্রিত পিতার চক্ষে পড়িয়া আগুন-লাগার স্বপ্ন সৃষ্টি করিয়া থাকিতে পারে। শোকার্ত্ত পিতার পক্ষে মৃতসন্তানকে সঞ্জীবিত দেখিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। সেইরূপ ইচ্ছার ফলে স্বপ্নে বালকের আবির্ভাব ঘটিয়াছে—এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। হয় ত দায়িত্বহীন ব্যক্তি পাহারায় থাকায়, পিতার মনে এইরূপ দুর্নিমিত্ত কল্পনা পূর্ব্ব হইতেই স্থান পাইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত মৃত-ব্যক্তির আত্মার দর্শন-সংক্রান্ত যতগুলি স্বপ্ন বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, তাহার কোনটিতেই মৃতব্যক্তির আত্মার আবির্ভাবের কথা স্বীকৃত হয় নাই।

আগামীবারে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। *

* দীপালী সম্মিলনে পঠিত।

অমূল তরু

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(১২)

বড়দিনের ছুটির পূর্ব্বে সুবোধের অনুপস্থিতিকালে ও অজ্ঞাতসারে মেসে আর একটা গুপ্ত-মন্ত্রণার অধিবেশন হইয়া, ২রা মাঘ কি উপায়ে ও কৌশলে যোগেশের সহিত সুবোধের মাল্যবদল করিয়া তাহাকে ঠকাইতে হইবে, সে বিষয়ে সবিস্তারে পরামর্শ হইয়া গেল।

প্রত্যূষে উঠিয়া বিনোদ তাহার দ্রব্যাদি গুছাইয়া লইতেছিল। বেলা ১১টার গাড়ীতে সে গৃহে গমন করিবে। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার মধ্যে মেসের আর সকলেই বাড়ী চলিয়া গিয়াছিল,—কেবল সুবোধ যায় নাই, সে ইতস্ততঃ করিতেছিল।

দ্রব্যাদি গুছান হইয়া গেলে, বিনোদ সুবোধের কক্ষে উপস্থিত হইল। সুবোধ গায়ে একটা গাত্রবস্ত্র জড়াইয়া, অলস ভাবে শয্যায় শুইয়া ছিল।

"কি সুবোধ, কি ঠিক করলে? আজ বিকেলের গাড়ীতে যাচ্ছ ত?"

সুবোধ উঠিয়া বসিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "না যাওয়াই প্রায় ঠিক করেছি। দেহ আর মন দুই-ই বল্‌ছে, গিয়ে কাজ নেই।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বিনোদ কহিল, "হঠাৎ দেহ আর মন দুই-ই একযোগে এ রকম বলতে আরম্ভ করলে কেন বল দেখি?"

সুবোধ পূর্ব্ববৎ হাস্য করিয়া কহিল, "মন ত ভাই কিছুতেই সুনীতির রাজ্য ছেড়ে এক পা যেতে চায় না। তার ওপর দেহও অচল হয়ে পড়েছে। কাল রাত থেকে বোধ হয় আমার জ্বর হয়েছে।"

"জ্বর হয়েছে?" বলিয়া বিনোদ তাড়াতাড়ি সুবোধের গাত্র পরীক্ষা করিয়া বলিল, "বোধ হয় কি বল্‌ছ? একশ' দুই কি তিন হবে!"

সুবোধ মৃদু হাসিয়া বলিল, "তা হবে।"

সুবোধের অসুখের জন্য বিনোদ বাড়ী যাওয়া বন্ধ করিয়া দিল। কিন্তু সুবোধ তাহাতে প্রবল ভাবে আপত্তি করিয়া, তাহাকে নিরস্ত করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে করিতে লাগিল। অবশেষে যখন দেখিল যে, সে কথা লইয়া বিনোদ তাহার সহিত যুক্তি-তর্ক করিতে প্রবৃত্ত না হইয়া, তাহার রোগ-পরিচর্য্যায় নিরত হইল, তখন সে ক্ষুণ্ণ স্বরে কহিল, "সুনীতির দেশ ছেড়ে যেতে আমার এত কষ্ট হচ্ছে ভাই!—সুরমার দেশে তোমাকে যেতে বাধা দিলে, আমাকে তার দণ্ডভোগ করতে হবে না কি?"

বিনোদ হাসিয়া কহিল, "মাঘ মাসের একটা কোন দিনে তোমাকে সে দণ্ড দেবার চেষ্টায় ত' আমরা আছি।"

সুবোধ ব্যগ্রভাবে কহিল, "তা'ও আছ! কিন্তু আমার প্রাণ যেন মাঝে-মাঝে কেঁপে ওঠে! কেমন মনে হয়, হয় ত' তোমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হবে। এত সহজে এত সুখ কারো অদৃষ্টে ঘটে না! তাই মনে হয়, এই যে সৌভাগ্যের অনুকূল হাওয়ায় তর্‌তর্‌ করে বেয়ে চলেছি, এক দিন না জেগে উঠে দেখি, সব স্বপ্ন, সব মিথ্যে! তা হলে ত' বিনোদ, পাগল হয়ে যাব ভাই!'

রোগ-শয্যায় শায়িত পীড়িত সুবোধের মুখ হইতে এই সভীতি সংশয়ের বাণী, যাহা অচিরে এক দিন নির্ম্মম সত্য হইয়া নিঃসংশয়ে দেখা দিবে, শুনিয়া বিনোদের মন সহসা অনুকম্পা ও অনুশোচনার তীক্ষ্ণ বেদনায় ব্যথিত হইয়া উঠিল। শরাহত হইবার পরে মৃগের যে আকৃতি হইবে, শরাহত হইবার পূর্ব্বেই তাহা দর্শন করিয়া মৃগয়ার প্রতি ব্যাধের একটা নিস্পৃহা জাগিল। প্রকাশ্যে কিন্তু মৃদু হাস্য করিয়া বলিল, "পাগল হতে ত' আর বাকি কিছু নেই সুবোধ! এর বেশী আর কি পাগল হবে?"

সুবোধ হাসিয়া বলিল, "তা সত্যি। কিন্তু কেন এ রকম হয় বল্‌তে পার? তুমি হয় ত' মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে বলবে যে, আশার সঙ্গে যে আশঙ্কা, কিম্বা আনন্দের সঙ্গে যে উদ্বেগ অবিচ্ছিন্ন ভাবে লেগে থাকে, এ তাই। কিন্তু আমার ঠিক ততটুকুই মনে হয় না। এর অনুভূতি আমি সুনীতির চিঠির মধ্যেই পাই। তার চিঠি পড়ে দেখলে দেখবে, আনন্দ আর উৎসাহের কথাতেই তা ভরা। কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারি, তার সঙ্গেই একটা যেন গোপন ইঙ্গিত আমার আশায় আটক দিতে চায়, আমার আনন্দকে সংযত করবার চেষ্টা করে।"

বিনোদ অন্যমনস্ক ভাবে ধীরে-ধীরে বলিল, "সে ভারি শক্ত, ভারি সাবধানী; তাই বোধ হয় সম্পূর্ণ আশ্বাস তোমাকে দিতে চায় না।"

সুবোধ ব্যগ্র হইয়া বলিল, "কেন চায় না? তা'হলে কি এখনও সন্দেহ আছে?"

বিনোদ সহানুভূতির শান্ত স্বরে বলিল, "আমার ত' বিশ্বাস, নেই ভাই।"

সুবোধ ধীরে-ধীরে শয্যায় শুইয়া পড়িয়া বলিল, "তোমার বিশ্বাসেই আমার বিশ্বাস, বিনোদ, তোমার ভরসাই আমার ভরসা। তা'ছাড়া আমার আর কিছুই নেই।"

বৈকালের দিকে সুবোধের জ্বর এবং যন্ত্রণা দুই-ই বাড়িয়া চলিল। মাথার যন্ত্রণার জন্য একটা রুমাল শক্ত করিয়া মাথায় বাঁধিয়া সুবোধ নিঃশব্দে পড়িয়া ছিল। বিনোদ তাহার মস্তকে হাত বুলাইয়া কহিল, "একটু টিপে দেব?"

"না। চুপ করে পড়ে থাকলেই ভাল থাকব।"

সুবোধের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া বিনোদ বলিল, "কিছু ইচ্ছে করছে সুবোধ?"

ম্লান হাসি হাসিয়া সুবোধ বলিল, "যা ইচ্ছে করছে, তার উপায় নেই ভাই। কিন্তু একবার যদি দেখাতে, বিনোদ, তা হলে সব যন্ত্রণা ভাল হয়ে যেত!"

ক্ষণকাল সুবোধের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, চিন্তা করিয়া বিনোদ কহিল, "একবার নিয়ে আসব?"

শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া সুবোধ বলিল, "না,—না, বিনোদ, ক্ষেপেছ তুমি? এই মেসের মধ্যে, অসুখ-বিসুখের ভেতর কখন আন্‌তে আছে? কিন্তু ভারি দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে ভাই। ফটোখানাই না হয় দাও না বিনোদ? আমার মনে হচ্ছে, আমার পক্ষে অত বড় ডাক্তার কলিকাতা সহরে আর নেই।"

বিনোদ মৃদু হাসিয়া বলিল, "বড় ডাক্তার রোগ বাড়াবাড়ি হলে ডাকলেই হবে,—আপাততঃ পাড়ার বেহারী ডাক্তারকে একবার ডেকে নিয়ে এসে ব্যবস্থা করে নিই।"

সুবোধ ব্যগ্র ভাবে বলিল, "কিছু দরকার নেই, বিনোদ। আমার এ জ্বর আজ রাত্রেই ছেড়ে যাবে। তুমি অনর্থক ব্যস্ত হয়ো না।"

বিনোদ কিন্তু সুবোধের নিষেধ-বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া, বিহারী ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিল। ডাক্তার সুবোধকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, সাধারণ জ্বর, আশঙ্কার কোন কারণ নাই।

সন্ধ্যার সময়ে নব-নিযুক্ত বালক ভৃত্য যদুকে সুবোধের পথ্য ও ঔষধের বিষয়ে সমস্ত উপদেশ দিয়া, বিনোদ অল্পক্ষণের জন্য সুবোধের নিকট হইতে বিদায় লইল; এবং

পথে বাহির হইয়া একটা ঠিকা গাড়ী লইয়া তাহার শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইল।

বিনোদকে দেখিয়া সুমতি সবিস্ময়ে বলিল, "কাল বলে গেল যে, আজ রাত্রে সুবমার কাছে পৌঁছবে।—আর আজ এখনও এখানে? মতলব বদলে গেল কেন বল দেখি।"

সুনীতি হাসিয়া কহিল, "নিজের ভালর চেয়ে পরের মন্দটা মিষ্টি লাগে, তাই বোধ হয় বদলে গেল। সুবোধবাবুর পিছনে লাগবার একটা নতুন কোন মতলব হয়েছে বোধ হয়।"

বিনোদ হাসিয়া কহিল, "এবার তোমার আন্দাজে ভুল হচ্ছে সুনীতি। এবার সুবোধের ভালর জন্যেই রয়ে গেলাম। যতক্ষণ না সে ভাল হচ্ছে, ততক্ষণ যেতে পাচ্ছি নে! তার কাল রাত থেকে জ্বর হয়েছে।"

উৎকণ্ঠিত স্বরে সুমতি জিজ্ঞাসা করিল, "জ্বর হয়েছে? বেশী না কি?"

"বিকেল বেলাটা বেশীই হয়েছিল,—এখন একটু কমেছে।"

সুনীতি কোন প্রকারে তাহার উদ্বেগ অবরুদ্ধ রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "যন্ত্রণা আছে—?"

বিনোদ বলিল, "যন্ত্রণা ছিল বই কি; সমস্ত দিনই মাথার যন্ত্রণা ছিল। দুপুরবেলা যখন মাথায় হাত বুলিয়ে দেবার কথা বললাম, তখন কি বললে শুনবে? বললে, 'বিনোদ, আমার বাক্স থেকে সুনীতির একখানা চিঠি বার করে, তাই আমার মাথায় বুলিয়ে দাও,—আমার মাথার যন্ত্রণা ভাল হয়ে যাবে'। পাগল আর কাকে বলে বল দেখি? উত্তাপ নিবারণের জন্য সংস্কৃত কাব্যে পদ্মপত্রের ব্যবস্থা আছে; চিঠিপত্রের ব্যবস্থা—এ নিতান্তই মৌলিক!"

সুমতি হাসিয়া কহিল, "কলকাতা সহরে বেচারা পদ্মপত্র কোথায় পায় বল? চিঠিপত্র ত বাক্স-ভরা আছে। ডাক্তার দেখান হয়েছে?"

বিনোদ কহিল, "হয়েছে। ডাক্তার বলেছে, কোন ভয় নেই, সহজ জ্বর।" তাহার পর সহাস্যে কহিল, "ডাক্তার দেখানর কথায় কি বলছিল শুনবেন? বলছিল, তার পক্ষে সুনীতির চেয়ে বড় ডাক্তার কলকাতা সহরে আর কেউ নেই। সুনীতি তাকে দেখলেই সব যন্ত্রণা তার ভাল হয়ে যাবে।"

সুমতি হাসিয়া কহিল, "তুমি কি বললে?"

"আমি বললাম, 'বল ত তাকে নিয়ে আসি'। তাতে কিন্তু ব্যস্ত হয়ে বললে, 'না—না, মেসের মধ্যে অসুখ বিসুখের ভেতর কখখন তাকে এনো না'। কি বল সুনীতি ডাক্তারি করতে যাবে?"

সুনীতি মৃদু হাসিয়া কহিল, "যদি আপনি নিয়ে যান আর গেলে উপকার হয়, তা হলে নিশ্চয় যাব। কিন্তু মেজ জামাইবাবু, আমি ত খালি প্রেসক্রিপসনই লিখে পাঠাতে পারি; রোগী দেখা ত আমার কাজ নয়,—সে ত যোগেন করবে।"

বিনোদ স্মিতমুখে কহিল, "এখন বড় ডাক্তারের দরকার রোগীর অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, তুমি নিজে গিয়ে দেখে ওষুধ না দিলে, আর রক্ষা নেই। সে কি বলছিল জান? বলছিল, হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যদি দেখে, এতদিন যা দেখছিল সব স্বপ্ন, তা হলে পাগল হয়ে যাবে।"

সুনীতি স্মিতমুখে কহিল, "তুবার করে না কি? তা'হলে ত' ভালই হবে; বিষে বিষক্ষয় হয়ে যাবে!"

বিনোদ হাসিয়া কহিল, "তোমাদের বিষের কি প্রতিষেধক বিষ আছে সুনীতি, যে ক্ষয় হবে? এর রোজাও নেই, ডাক্তারও নেই। বাঁধন দিয়ে যে বিষ আটকান যাবে, তারও উপায় নেই,—কারণ, তোমাদের দংশন একেবারে হৃদ্‌পিণ্ডের মধ্যস্থলে!"

সুনীতি কহিল, "কিন্তু এ বিষে মানুষ মরে না।"

বিনোদ হাসিয়া কহিল, "ছটফট্ ক'রে মরে। সেটা মরারও বাড়া।"

বিনোদ গমনোদ্যত হইলে, সুমতি হাসিয়া কহিল, "তা' হলে সুবোধের চিকিৎসার জন্যে ছোট ডাক্তারকে নিয়ে যাবে না কি?"

বিনোদ কহিল, "যোগেশকে?"

সুমতি উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সুনীতি ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে কহিল, "না,—না, দিদি, অন্ততঃ এ অসুখের সময়ে ঠাট্টাটা বন্ধ থাক্।"

সুমতি ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "আমি কি ঠাট্টা করবার জন্যে বলছি রে? যাতে বেচারা একটু আরাম পায়, সেই জন্যেই বলছি।"

একটু চিন্তা করিয়া সুনীতি কহিল, "তা-ও থাক

দিদি, অসুখের সময়ে অভিনয়টা একেবারেই বন্ধ রাখা যাক্‌।"

সুবোধের রোগ-যন্ত্রণার কথা শুনিয়া, সুনীতির অন্তঃকরণে এমন একটা বাস্তব করুণা জাগিয়া উঠিয়াছিল যে, তাহাতে একটা মিথ্যা ঔষধের প্রলেপ দিবার প্রস্তাবে তাহার একেবারেই প্রবৃত্তি হইল না।

বিনোদ মৃদু-মৃদু হাসিয়া বলিল, "সুনীতি, আমার ভাই চণ্ডীদাসের একটা বিখ্যাত গান বারবার মনে পড়ছে। শুনবে ?"

সুনীতি স্মিতমুখে কহিল, "বলুন ?"

বিনোদ বলিতে লাগিল,

রাধার কি হোল অন্তর ব্যথা !
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহার কথা।
সদাই কি ধ্যানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়নের তারা ;
বিরতি আহারে, রাঙ্গা পদ পরে,
যেমন যোগিনী পারা,
এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি
দেখায় খসায়ে চুলি
হসিত বয়ানে চাহে মেঘপানে
কি করে দুহাত তুলি।
একদিঠ করি ময়ূর ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে
চণ্ডীদাস কয়, নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে।

সুনীতি মৃদু হাসিয়া বলিল, "কিন্তু এ ক্ষেত্রে শেষের পদটা একটু বদলে দিতে হয় মেজজামাইবাবু! 'নব পরিচয় কালিয়া বঁধুর সনে'র জায়গায় করতে হয় 'চিঠি বিনিময় সুবোধবাবুর সনে।' পরিচয় আর হোল কই ?"

বিনোদ হাস্যমুখে কহিল, "এই যদি তোমার আপত্তি হয়, তা হলে আমি একজন আধুনিক কবির নজির দেখাব। 'এখনও তারে চোখে দেখিনি শুধু বাঁশী শুনেছি—মন প্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি'! এবার তুমি কি বলবে বল !"

সুনীতি একটু ভাবিয়া বলিল, "বলব 'শুনেছি সে আস্ত পাগল, তারে না দেখাই ভাল'।" বলিয়া হাসিতে-হাসিতে সে প্রস্থান করিল। কিন্তু পরক্ষণেই সে যখন নিজকক্ষে পদার্পণ করিল, তখন মুহূর্ত্তের মধ্যে কেমন করিয়া তাহার মুখের হাসি চোখের জলে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, তাহা নারী-হৃদয়ের বহুবিধ বিচিত্র রহস্যের মধ্যে একটি।

সেদিন গভীর রাত্রি জাগিয়া সুনীতি দুইখানি পত্র লিখিল,—একখানি সুবোধকে এবং অপরখানি সুরমাকে। সুবোধকে পত্র লিখিবার সময়ে তাহার মনে পড়িল না যে, আজই সন্ধ্যায় সে সুমতিকে বলিয়াছিল যে, যতদিন সুবোধ অসুস্থ থাকে, ততদিন অভিনয়টা বন্ধ রাখা উচিত। চক্রান্তের হিসাবে সুবোধের পত্রের উত্তর দিবার সময় হইয়াছিল বটে, কিন্তু, সুবোধের রোগ-সংবাদে সুনীতির মনের মধ্যে এমন একটা উদ্বেগ ও ক্লেশ দেখা দিয়াছিল যে, চিঠি লিখিবার সমস্ত সময়টাই সে একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিল যে, চিঠি লিখিয়া প্রবঞ্চিত করা ভিন্ন তাহার আর কোন কর্ত্তব্য নাই; একজন নিকট এবং প্রিয় আত্মীয়ের রোগ-সংবাদ পাইয়া যেমন করিয়া চিঠি লিখিতে হয়, ঠিক তেমনি করিয়া চিঠি লিখিয়া সুনীতি শেষ করিল।

সুরমাকে আজ সুনীতি সুবোধের বিষয়ে প্রথম পত্র লিখিল। বেদনা ও করুণায় সন্দ্রব তাহার হৃদয়খানি কতকটা অজ্ঞাতে এবং কতকটা স্বেচ্ছায় ধীরে-ধীরে দীর্ঘ পত্রের মধ্যে ঝরিয়া পড়িল। অপরিচ্ছন্ন চক্রান্ত হইতে সুবোধকে মুক্ত করিবার জন্য কয়েক দিন হইতে, এবং বিশেষ করিয়া আজ, তাহার মনে যে আগ্রহ জাগিয়া উঠিয়াছিল, তদ্বিষয়ে সে সুরমার নিকট সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা করিল। সে লিখিল, "এ নিষ্ঠুর খেলা বন্ধ করার ফলে যদি আজ থেকে চিরদিনের জন্য সুবোধবাবুর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়, সেও বোধ হয় ভাল,—কিন্তু এ অবস্থা অসহ্য হইয়াছে। সুবোধবাবু এমন কোন অপরাধই আমাদের কাছে করেন নি, যাতে তাঁর এতবড় দণ্ডের ব্যবস্থা আমরা করতে পারি। তুমি মেজদিদি এ বিষয়ে চিঠি লিখে মেজজামাইবাবুকে নিরস্ত কর।"

দুইখানি চিঠি শেষ করিয়া, খামে মুড়িয়া, ঠিকানা লিখিয়া যখন সুনীতি শয়ন করিল, তখন রাত্রি দুইটা বাজিয়া গিয়াছিল।

(১৩)

পরদিন অপরাহ্নে সুবোধের জ্বর কতকটা অল্প ছিল

বটে, কিন্তু মাথার যন্ত্রণা সে হিসাবে একটুও কমে নাই। জ্বরের চেয়েও একটা কোন কঠিনতর রোগ হয় ত গুপ্ত ভাবে ভিতরে রহিয়াছে, অপরিমিত মাথার ব্যথা যাহার পরি-নিদর্শন,—এমনই একটা আশঙ্কা সকালে ডাক্তার করিয়া গিয়াছিলেন। বৈকালে বিনোদ ডাক্তারকে সমস্ত দিনের সংবাদ দিতে গিয়াছিল।

মাথায় একটা রুমাল বাঁধিয়া, শয্যায় পড়িয়া সুবোধ নিঃশব্দে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল,—পাশে একটা ছোট টেবিলে সকাল হইতে দুধ সাগু, বেদানা মিশ্রি এবং অন্যান্য পথ্য অভুক্ত পড়িয়া ছিল; আহারে তাহার কিছুমাত্র রুচি ছিল না। নিঃশব্দে মুদ্রিত নেত্রে পড়িয়া থাকিয়া, সে অসংলগ্ন ভাবে নানা প্রকার চিন্তা করিতেছিল; কোনও একটা বিষয়ে যথোচিত রূপে চিন্তা করিবার শক্তি আজ তাহার মনের ছিল না।

"বাবু, চিঠি এসেছে।"

চক্ষু উন্মীলিত করিয়া সুবোধ দেখিল একখানা নীলাভ খাম হাতে লইয়া যদু দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আজ প্রাতঃ-কাল হইতে রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ—কোন বিষয়েই তাহার কিছুমাত্র আগ্রহ বা রুচি দেখা যায় নাই; কিন্তু যদুর হস্তে ওই নীলবর্ণের শুষ্ক কাগজটি দেখিয়া, তাহার ব্যাধি-বিরূপ মনে সমস্ত লুপ্ত প্রবৃত্তি যেন যাদুমন্ত্রে একযোগে ফিরিয়া আসিল। সে সোৎসাহে হাত বাড়াইয়া চিঠিখানা লইয়া, একমুহূর্ত্ত পরিপূর্ণ তৃপ্তির সহিত তাহার নাম ও ঠিকা-নার উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ করিল। তাহার পর তাড়াতাড়ি নখ দিয়া খামখানা ছিঁড়িয়া চিঠিখানা বাহির করিল। চিঠির ভাঁজ খুলিতে, খুলিতেই, কয়েকটা অনুপেক্ষনীয় শব্দ, এমন কি, ছত্র-বিশেষের প্রতি তাহার দৃষ্টি এবং মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। তাহার পর পত্রের প্রথমেই সম্বোধন বাক্য দেখিয়া, বিস্মিত হইয়া, সে পত্রখানা পুনরায় ভাঁজ করিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিল। কিন্তু সেই দৃষ্টিপতিত শব্দগুলির অর্থ ও অর্থের গুরুত্ব স্মরণ করিয়া যখন তাহার ঔৎসুক্য ও আশঙ্কা অপরের চিঠি পড়িবার নৈতিক বাধাকে অতিক্রম করিয়া গেল, তখন সে পুনরায় ভাঁজ খুলিয়া চিঠিখানি আদ্যন্ত পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইল। চিঠিখানি এইরূপ—

পূজনীয়া শ্রীমতী মেজদিদিমণি শ্রীচরণকমলেষু"

ভাই মেজদিদি, অনেক দিন তোমার চিঠি পাই নি। মেজজামাইবাবুর কাছে তোমার খবর সর্ব্বদা পাই বলে আমিও তোমাকে অনেক দিন চিঠি-পত্র লিখি নি। হঠাৎ আজ তোমাকে চিঠি লেখবার কথা মনে হোল, মনে হোল, তোমাকে চিঠি লিখলে, যে জটিল অবস্থার মধ্যে আমি ক্রমে-ক্রমে জড়িয়ে পড়েছি, তা থেকে উদ্ধার হলেও হতে পারি। এ দু' তিন মাসের মধ্যে আমি অনেক চিঠিই লিখেছি,—আশ্চর্য্য, তোমাকেই দুই-একখানা লিখি নি। লিখলে বোধ হয় আজ আমার এ দুরবস্থা হোত না।

দু' চার কথায় তোমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিই। মেজজামাইবাবুর এক বন্ধু আছেন—সুবোধবাবু; পুরো নাম সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তিনি না কি একজন কাব্য-প্রিয় ভাবুক লোক। তাঁর কাব্যোচ্ছ্বাসের অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়ে, তাঁর মেসের বন্ধুরা তাঁকে নাকাল করবার জন্য একটা ষড়যন্ত্র করেছেন। মাস তিনেক হোল, মেজজামাই-বাবু একদিন সুবোধবাবুকে আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে নিয়ে এসে, যোগেশকে মেয়ে সাজিয়ে, তাঁর ছোট শালি বলে আলাপ করিয়ে দেন। বাইরের ঘরের টেবিলের উপর আমার একখানা বই পড়ে ছিল, তাতে আমার নিজের হাতে আমার নাম লেখা ছিল। সুবোধবাবু বালিকা বেশে যোগেশকে দেখবার আগে সেটা পড়েছিলেন। তার পর যোগেশ যখন তাঁর সমুখে উপস্থিত হোল, তিনি তাকেই সুনীতি মনে করে, সুনীতি বলে সম্বোধন করতে আরম্ভ করেন। যোগেশও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে অগত্যা তার সুনীতি নামই স্বীকার করে নেয়। তার পর খুব সহজেই আর খুব সত্বরেই সুবোধবাবু জালের মধ্যে ধরা পড়লেন। নকল সুনীতিকে তিনি ভালবাসতে আরম্ভ করলেন। এখন ক্রমশঃ তিনি একেবারে উন্মত্ত! নিঃসন্দেহে, চোখ-কাণ বুজে, সুনীতির প্রেমে ডুবে রয়েছেন।

এই চক্রান্তের উদ্‌যাপন হবে মাঘ মাসের কোন একটা বিয়ের তারিখে। মেসের বন্ধুরা, মেজজামাইবাবু, আর দিদি—সকলে মিলে স্থির করেছেন যে, যোগেশের সঙ্গে সুবোধবাবুর মালা বদল করে, এ প্রহসনের যবনিকা পড়বে। মালা বদলটা একটা যে বিশেষ কিছু কঠিন ব্যাপার হবে, তা মনে কোরো না; লগ্নের দুঘণ্টা আগে একটা যা হয় কোন কারণ দেখিয়ে বিয়ে করতে ডাকলেও

সুবোধবাবু কোন রকম দ্বিধা দ্বন্দ্ব না করে এ বাড়ীতে এসে হাজির হবেন।

এই কপট খেলা প্রথম দিনই আমার কাছে অতিশয় নিষ্ঠুর মনে হয়েছিল; আর সেই দিনই আমি আমার শক্তি ও সামর্থ্য মত এ বিষয়ে আপত্তি করেছিলাম; কিন্তু মেজ-জামাইবাবু, দিদি প্রভৃতিকে নিরস্ত করতে পারি নি। সকলের চেয়ে দুঃখের কথা কি জান? শুধু যে তাঁদের নিরস্ত করতে পারি নি, তা নয়;—নিজেও এই হৃদয়হীন খেলার মধ্যে বেশ ভাল রকমেই জড়িয়ে পড়েছি,—নামে শুধু নয় কাজেও। আমার সেই বইখানার পাতার পাশে-পাশে সুবোধবাবু আমার হাতের লেখা দেখেছিলেন বলে, আমাকে দিয়েই এ চক্রান্তের চিঠিপত্র লেখান চলছে। সুনীতিকে লেখা সুবোধবাবুর সমস্ত চিঠির সুনীতি স্বাক্ষর করে আমি উত্তর দিচ্ছি।

আমার এ আচরণ কত দিক থেকে যে কত অসঙ্গত হচ্ছে, তা তুমি একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে। একদিকে একজন নিরীহ, নির্ব্বিরোধ ভদ্রলোক অসংশয়িত মনে প্রাণ ঢেলে তার ভালবাসা জানাচ্ছে, আর একদিকে একজন কাণ্ডজ্ঞানহীন মেয়ে কপট চিঠি লিখে-লিখে, তাকে পাগল করে তুলছে। আমার বয়সের একজন অবিবাহিতা মেয়ের পক্ষে এ যে কত বড় লজ্জা ও নিন্দার ব্যাপার হচ্ছে, তা আমি মর্ম্মে-মর্ম্মে বুঝছি; অথচ ক্রমে-ক্রমে এমন কঠিন ভাবে এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি যে, ইচ্ছা সত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত এ থেকে কাটিয়ে উঠতে পারলাম না।

কিন্তু মেজদিদি, এই কুৎসিত অভিনয়ে যোগ দিয়ে, ক্রমশঃ আমার মনে এমন ঘৃণা ও বিরক্তি ধরে গেছে যে, আমার আর একটুও এতে লিপ্ত থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে না—এমন কি, সুবোধবাবুকে রক্ষা করবার জন্যও নয়। দিদি, মেজজামাইবাবুকে নিরস্ত করবার ভার যদি দয়া করে তুমি নাও, তা' হলে আমি বেঁচে যাই! লক্ষ্মীটি! আর যদি কারও জন্য না কর,—আমার জন্য তুমি এ ব্যাপারে মনোযোগ দাও।

এ নিষ্ঠুর খেলা বন্ধ করবার ফলে যদি আজ থেকে চিরদিনের জন্য সুবোধবাবুর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়, সেও বোধ হয় ভাল,—কিন্তু এ অবস্থা অসহ্য হয়েছে। সুবোধবাবু এমন কোন অপরাধই আমাদের কাছে করেন নি, যাতে তাঁর এতবড় দণ্ডের ব্যবস্থা আমরা করতে পারি। তুমি এ বিষয়ে চিঠি লিখে মেজজামাইবাবুকে নিরস্ত কর।

অনেক রাত হয়েছে, আজ আর থাক। আশা করি, তুমি বেশ ভাল আছ। এখানে মা তেমনি ভাবে ভুগছেন। আর সব ভাল।

আমার প্রণাম জানবে ও গুরুজনদের দিবে। ইতি

স্নেহের সুনীতি।

চিঠিখানা হস্তের মধ্যে নির্দ্দয় ভাবে চটকাইয়া, সুবোধ সজোরে তাহা দূরে নিক্ষেপ করিল। তাহার পর কয়েক মুহূর্ত্ত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নীরব, নিস্পন্দ ভাবে পড়িয়া থাকিয়া, হঠাৎ সে ধড়্ মড়্ করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া যদুকে ডাকিল। যদু নিকটেই ছিল। সে উপস্থিত হইলে, তাহার দ্বারা একখানা চিঠির কাগজ, খাম ও দোয়াত কলম সংগ্রহ করিয়া, সুবোধ প্রবল ঝোঁকের সহিত দ্রুত বেগে একখানা চিঠি লিখিয়া ফেলিল। তাহার পর চিঠিখানা যদুর হস্তে দিয়া কহিল, "এখ্‌খনি ডাকঘরে গিয়ে ডাকে দিয়ে আয়। ভারি দরকারি চিঠি।"

যদু প্রস্থান করিলে, সুবোধ টলিতে-টলিতে উঠিয়া, সুনীতির চিঠিখানা কুড়াইয়া, টেবিলের উপর একটা চিঠির প্যাডের ভিতর রাখিয়া দিল। তাহার পর এক গ্লাস জল খাইয়া পুনরায় টলিতে টলিতে শয্যায় আসিয়া একেবারে শুইয়া পড়িল।

ঘণ্টাখানেক পরে বিনোদ যখন সুবোধের কক্ষে প্রবেশ করিল, তখন চৈতন্যহত হইয়া সুবোধ অনর্গল প্রলাপ বকিতেছিল এবং যদু তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া একটা হাত-পাখা দিয়া মাথায় হাওয়া করিতেছিল।

বিনোদ সভয়ে স্তম্ভিত হইয়া, ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া, সুবোধের নিকট আসিয়া, তাহার গায়ে হাত দিয়া কয়েকবার উচ্চ স্বরে ডাকিল, কিন্তু কোন উত্তর পাইল না।

"কখন থেকে এ রকম হোল রে যদু?"

সুবোধের চিঠি পাওয়া ও চিঠি লেখার কথা যদু কিছু বলিল না, অথবা বলিবার কথা মনে হইল না; শুধু বলিল, "এই খানিকক্ষণ থেকে।"

বিনোদ আর বিলম্ব না করিয়া, তখনই বাহির হইয়া গিয়া, ডাক্তার লইয়া আসিল। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া

কহিলেন, ব্রেন ফিভার হইয়াছে ; এবং রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলিয়া, আত্মীয়দিগকে সংবাদ দিতে বলিলেন।

ঔষধ, বরফ এবং অন্যান্য বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়া যখন বিনোদের অন্য বিষয়ে মনোযোগ দিবার অবকাশ হইল, তখন রাত্রি আটটা বাজিয়া গিয়াছে,—সুবোধের ভ্রাতাকে সে রাত্রে তার করা হইয়া উঠিল না।

সমস্ত রাত্রি বিনোদের অনাহারে ও অনিদ্রায় সুবোধের পার্শ্বে বসিয়া কাটিয়া গেল। অসংলগ্ন ও অসম্বদ্ধ প্রলাপ বাক্যের মধ্যে সুবোধ কতবার সুনীতি ও বিনোদের নাম লইয়াছিল, তাহার সংখ্যা ছিল না। শুনিয়া-শুনিয়া দুঃখে ও উৎকণ্ঠায় বিনোদ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এক রাত্রির বিভীষিকা তাহার গত দুই-তিন মাসের সমস্ত কৌতুক ও পুলক সুদ শুদ্ধ পরিশোধ করিয়া দিয়াছিল। সহসা যে ভয়াবহ দুঃখের মধ্য দিয়া প্রহসনের যবনিকা পড়িবার উপক্রম করিয়াছিল, বিনোদের মনে হইতেছিল, তাহার জন্য এক মাত্র সে-ই দায়ী। একটা অক্ষমনীয় অপরাধের চেতনায় ও বেদনায় তাহার শুশ্রূষা করিবার শক্তি পর্য্যন্ত নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছিল। (ক্রমশঃ)

কপিলাবস্তুর অশোক-স্তম্ভ

শ্রীঅম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

প্রাচীন শাক্য-রাজধানী কপিলাবস্তুর অবস্থান কোথায় ছিল, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। পূর্ব্বে সকলে বস্তিজেলার অন্তর্গত নগরখাস বা ভুইলা গ্রামকে কপিলাবস্তুর নিদর্শন বলিয়া মনে করিতেন। বিগত শতাব্দীর শেষভাগে রুম্মিণী ও নিগ্লীভার অশোক-স্তম্ভদ্বয় এবং পিপরাবা গ্রামে শাক্যগণ-প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধদেবের শরীর-ধাতু-গর্ভ স্তূপ আবিষ্কারের ফলে পূর্ব্ব-গৃহীত মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে; এবং কপিলাবস্তুর আনুমাণিক অবস্থান জানা গিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখনও অনেক বাঙ্গালা পুস্তকে ভুইলা বা নগরখাসকে কপিলাবস্তু বলিয়া উল্লেখ করিতে দেখা যায়। (১) বলা বাহুল্য, পুরাতন গ্রন্থাদি অবলম্বন করিতে গেলেই, এই ভ্রম অবশ্যম্ভাবী। এখনও কানিংহামের Ancient Geography এবং Archæological Survey Reports ব্যতীত আধুনিকতম তথ্যের সাহায্য না লওয়ার ইহাই ফল। বর্ত্তমান প্রবন্ধে, কপিলাবস্তুতে অশোক যে সকল স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহাদের পরিচয় দেওয়া যাইবে কারণ, ঐরূপ দুইটি স্তম্ভ আবিষ্কারের ফলেই প্রধানতঃ কপিলাবস্তুর যথার্থ অবস্থান জানা যায়। পিপরাবা স্তূপের কথা অন্য সময়ে বলা যাইবে। কাহার-কাহারও মতে উহা বুদ্ধদেবের দেহাবশেষের উপর নির্ম্মিত নহে,—বিরুড়ক রাজা কর্তৃক নিহত শাক্যগণের স্মরণার্থ উহা তাহাদের ভস্ম-ধাতুর উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও, প্রাচীন শাক্য-রাজধানীর স্থান-নির্দ্দেশের পক্ষে উহার মূল্য কিছুমাত্রই কমে না।

কপিলাবস্তুর বিবরণ-প্রসঙ্গে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সঙ্গ অশোক-নির্ম্মিত তিনটী প্রস্তর-স্তম্ভের উল্লেখ করিয়াছেন। সেগুলি যথাক্রমে ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি ও গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থানে অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমানে তন্মধ্যে শেষোক্ত স্তম্ভ দুইটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল স্থান নেপাল রাজ্যের দুর্ভেদ্য তরাই প্রদেশের অরণ্যের মধ্যে অবস্থিত, এবং এখনও ইহাদের সম্বন্ধে ভালরূপ অনুসন্ধানাদি হয় নাই। চীনা পরিব্রাজকগণের বিবরণ মধ্যেও পরস্পর যথেষ্ট অসামঞ্জস্য এবং ভ্রম-প্রমাদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাই প্রাচীন শাক্য-রাজধানীর ও বস্তুসমূহের অবস্থান ও এখনকার ভৌগোলিক বিবরণাদি এখনও সুপরিস্ফুট হয় নাই।

(১) চারুচন্দ্র বসু, "অশোক", ১৬৮ পৃঃ; "পৃথিবীর ইতিহাস" ২য় খণ্ড, ১৯৫-২০২; বিশ্বকোষ ৩য় খণ্ড।

বর্ত্তমান ফৈজাবাদ হইতে গণ্ডকী ও ঘর্ঘরা নদী পর্য্যন্ত এবং উত্তরে হিমালয়ের পাদমূল হইতে দক্ষিণে সরযূ নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থান বা আধুনিক বস্তি ও গোরখপুর জেলাদ্বয়ের উত্তরাংশ ও নেপাল রাজ্যের তরাই প্রদেশের কিয়দংশ প্রাচীন কপিল-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন। (২) এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের মধ্যেই বুদ্ধদেবের জীবনী সম্পর্কে পূত বহু স্থান অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমানে এখনও ইহার নানা স্থানে প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহের অসংখ্য নিদর্শন দেখা যায়। আধুনিক কালে পণ্ডিতগণ ইহাদের মধ্য হইতে প্রাচীন স্থানগুলির পরিচয় নির্ণয়ের যথেষ্ট প্রয়াস পাইতেছেন। Führer এর Monumental Antiquities of N. W. Provinces and Oudh এবং কানিংহামের Archaeological Survey of India Reports ১২শ, ১৮শ ও ২২শ খণ্ড ও স্মিথ, পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের Explorations in the Nepalese Terai এতৎ সম্পর্কে দ্রষ্টব্য।

চীনা পরিব্রাজক-বর্ণিত বিবরণ ও বর্ত্তমানে প্রাপ্ত ধ্বংস-নিদর্শন হইতে পূর্ব্বে কানিংহাম ও কারলাইল যে ভাবে কপিল নগর ও সন্নিকটবর্ত্তী জনপদসমূহের অবস্থান নির্ণয় করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী কালের আবিষ্কারের ফলে তাহা একেবারেই ভ্রান্ত বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। কানিংহাম বস্তি জেলার দক্ষিণাংশে অওরঙ্গাবাদ-নগর পরগণার অন্তর্বর্ত্তী নগরখাস নামক গ্রামটীকে কপিলাবস্তুর সহিত অভিন্ন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। (৩) ১৮৭৫-৭৬ অব্দে তাঁহার অন্যতম সহকারী কারলাইল, ঐ জেলারই মনসুর-নগর পরগণার অন্তর্গত ভুইলা নামক স্থানের ধ্বংসরাশি যে প্রাচীন শাক্য-রাজধানীর নিদর্শন, তাহা সবিশেষ যুক্তি-সহকারে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। (৪) ঐ স্থান ফৈজাবাদের ২৫ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে, বস্তির ১৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ও নগরখাসের ১৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে, অনুমান ৮২·৫৯´ ও ২৬·৪৫´রেখায় অবস্থিত। কানিংহামও তাঁহার স্থান-নির্ণয় ত্যাগ করিয়া এ সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়াছিলেন।

চীনা পরিব্রাজকদ্বয়ের বিবরণ হইতে প্রকাশ, শ্রাবস্তীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে কপিলাবস্তু অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমানে এই দুই স্থানের যে নিদর্শন (৫) পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে, উহা ঠিক দক্ষিণ-পূর্ব্ব নহে; বরং তাহাকে পূর্ব্ব-দক্ষিণপূর্ব্ব-অর্দ্ধ-পূর্ব্ব বলা চলে। ফাহিয়ান ও হিউয়েন সাঙ্গের এই দিঙ্‌নির্ণয় হইতেই সকলে শ্রাবস্তীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে কপিলাবস্তুর অবস্থান খুঁজিতেন। হিউয়েন সাঙ্গের মতে শ্রাবস্তী হইতে কপিলাবস্তুর দূরত্ব ৫০০ লি বা ৮৩⅓ মাইল। ফাহিয়ানের হিসাবে শ্রাবস্তী হইতে ১২ যোজন বা প্রায় ৮৪ মাইল দূরে ক্রকুচ্ছন্দ-বুদ্ধের জন্মস্থান 'না-পি-ক'; তাহার এক যোজন উত্তরে কনকমুনি বুদ্ধের জন্মস্থান; এই স্থান হইতে পূর্ব্বদিকে এক যোজন অপেক্ষা অল্প দূরে কপিলাবস্তু অবস্থিত। তাহার প্রায় ৫০ লি বা ৮ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত লান-মিং বা লুম্বিনী উদ্যানে শাক্যবুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

হিউয়েন সঙ্গ উহাদের এইরূপ অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন,—কপিলাবস্তু নগরের ৫০ লি দক্ষিণে ক্রকুচ্ছন্দ বুদ্ধের জন্মস্থান, তাহার ২০ লি উত্তর-পূর্ব্বে কনকমুনি বুদ্ধের জন্মস্থান (মহাবংশ-মতে তাহার নাম শোভাবতী নগরী); রাজধানীর ৩০ লি বা ৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত শরকূপ নামক উৎস ও স্তূপ হইতে বুদ্ধদেবের জন্মস্থান লুম্বিনী কাননের দূরত্ব উত্তর-পূর্ব্ব দিকে ৮০।৯০ লি বা ১৩।১৫ মাইল। তিন বুদ্ধের জন্মস্থানেই অশোক লিপিযুক্ত স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, বলিয়া হিউয়েনসাঙ্গ লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে কনকমুনির স্তম্ভ ও লুম্বিনী উদ্যানে স্থাপিত স্তম্ভ বর্ত্তমানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই দুইটি স্তম্ভের অবস্থান হইতে ও ইহাদের কয়েক বৎসর পরে আবিষ্কৃত পিপরাবা স্তূপ হইতে (৬) কপিলাবস্তুর অবস্থান কতকটা জানা গিয়াছে।

(২) Early History of India, p. 29; Buddhist India, p. 17.

(৩) Ancient Geography of India.

(৪) A. S. R. vol, XII

(৫) বলরামপুরের ১২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে রাপ্তী নদীর দক্ষিণ তটে সাহেঠ মাহেঠ গ্রামই শ্রাবস্তীর নিদর্শন। তাহার কথা অন্য সময়ে বলা যাইবে।

(৬) বস্তিজেলার উত্তরাংশে নেপাল-সীমায় অবস্থিত পিপরাবা গ্রামে একটি প্রাচীন স্তূপ হইতে ১৮৯৮ অব্দে শাক্যগণ-সংরক্ষিত বুদ্ধদেবের ভস্মাস্থি বাহির হইয়াছিল।

কানিংহাম ও কারলাইল-অনুমিত কপিলাবস্তুর অবস্থান হইতে এই স্থানের দূরত্ব প্রায় ৫০ মাইল হইবে।

বৃটিশ ভারতের বস্তীজেলা হিমালয় পর্ব্বতের ঠিক পাদ-মূলেই তরাই প্রদেশে অবস্থিত। তাহার উত্তরে নেপাল-রাজ্যের ভগবানপুর জেলা। তাহার প্রধান নগরের নামও ভগবানপুর। বৃটিশ সীমানা হইতে ইহার দূরত্ব এক মাইল হইবে। ভগবানপুরের ৩ মাইল উত্তরে ও বস্তি জেলার দুলহার গ্রাম হইতে ৩৬ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে তিলার নদীর পশ্চিম তট হইতে অদূরে অনুমান অক্ষা ৮৩·১১´ ও ২৭·৫৮´ রেখায় "রুম্মিণীদেই" নামক ক্ষুদ্র গ্রামটি অবস্থিত। বলা বাহুল্য, তাহা লুম্বিনী শব্দেরই অপভ্রংশ। এই স্থানে এক উচ্চ ভূখণ্ডের উপরে রুম্মিণী দেই বা দেবীর মন্দির অবস্থিত। চতুষ্পার্শ্বস্থ জমি হইতে স্থানটী অনেকটা উচ্চ, এবং চারি দিকে জঙ্গলসমাচ্ছন্ন। ঐ উচ্চ ভূমিখণ্ডকে হিউয়েন সাঙ্গ-বর্ণিত অন্যতম স্তূপ-নিদর্শন বলিয়াই মনে হয়। রুম্মিণীর অদূরে পড়েরিয়া একটি ছোট গ্রাম ;—তাই তাহার নামেও স্তম্ভটি পরিচিত হইয়া থাকে।

মন্দিরের পশ্চিমে অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিতে অশোক-স্তম্ভ অবস্থিত। ইহা সর্ব্বাংশে অশোকের অন্যান্য স্তম্ভের অনুরূপ ; তবে বজ্রাঘাতে ইহার উপরিদেশের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে স্তম্ভটীর উপরে অশোকের অন্যান্য স্তম্ভের মত কোনও পশু-মূর্ত্তি দেখা না গেলেও, এককালে যে ইহার উপরে একটি অশ্ব-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা হিউয়েন সাঙ্গের লেখা হইতে জানা যায়। (৭)

রুম্মিণীদেই গ্রামে একটি প্রস্তর-স্তম্ভের অবস্থান অনেক দিন হইতেই নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের লোকেরা অবগত ছিল। ১৮৯৫ অব্দে রুম্মিণীর ১৩ মাইল উত্তর-পশ্চিমে নিগ্লীভা পল্লীতে অশোকের একটি প্রস্তর-স্তম্ভ আবিষ্কৃত হওয়ায়, সকলে মনে করিলেন, এই অপর স্তম্ভটীও তাহা হইলে একটি অশোক-স্তম্ভ,—খুব সম্ভব হিউয়েন সাঙ্গ-দৃষ্ট-স্তম্ভ-গুলির মধ্যে একটি হইবে। আবিষ্কার-কালে স্তম্ভটীর তল-দেশের অনেকাংশ মৃত্তিকা-গর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। ভারত-গভর্ণমেণ্টের অনুরোধে নেপাল সরকার তাহার উদ্ধার সাধন করেন। অল্প কাল পরেই প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের অন্তত-কর্ম্মচারী Dr. Furher অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দীর্ঘকাল মৃত্তিকা-গর্ভে প্রোথিত থাকার ফলে অশোকের অনুশাসনটী বেশ অক্ষত ও সম্পূর্ণ অবস্থাতেই পাওয়া গিয়াছে। সমগ্র অশোক অনুশাসন মধ্যে এই লিপিটীই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও অক্ষত অবস্থায় আছে। দেখিলে মনে হয়, বুঝি শিল্পী এখনই কার্য্য সমাপ্ত করিয়া চলিয়া গেল। অক্ষরগুলি প্রায় এক ইঞ্চি দীর্ঘ হইবে, এবং পরিষ্কার ও গভীর ভাবে খোদিত লিপিটী পাঁচ লাইনে সম্পূর্ণ এবং এইরূপ :—

১—দেবান পিয়েন পিয়দসিন লাজিন বীসতিবসা ভিসিতেন

২—অতন আগাচ মহীয়িতে হিদবুধে জাতে সক্য মুনীতি

৩—সিলা বিগ্যভীচা কালাপিত সিলাথভে চ উস পাপিতে

৪—হিদ ভগবং জাতেতি লুমিনি গামে উবলিকে কটে

৫—অঠভাগিয়েচ (৮)

কয়েকটী শব্দের অর্থ লইয়া মতভেদ হইলেও এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, এই স্থানই সেই লোক-বিশ্রুত লুম্বিনী উদ্যানের নিদর্শন ; এবং রাজত্বের বিংশতি বর্ষে স্বয়ং আসিয়া অশোক এইখানে স্তম্ভ উত্থাপিত করিয়াছিলেন।

এই লিপিতে দুইটি নূতন কথা পাওয়া যাইতেছে "সিলা বিগ্যভীচা" ও "অঠভাগিয়েচ"। এই দুইটি কথার অর্থ লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। প্রথমে ইহার এইরূপ অনুবাদ করা হইয়াছিল—"King Piyadas came here in the twenty-first year of hi reign and paid reverence. And, on th ground, that Buddha, the Sakya sage, wa born, he (the king) had a flawless stone cu and put up a pillar. And, further, since th

(৭) T. Walters "On Yuan Chavang vol II p 14-15 S Beal "Buddhist Records of the Western World vol 2.

(৮) Epigraphia Indica, vol 5., V. A Smith "Asoka এবং চারুচন্দ্র বসু প্রণীত "অশোক" এবং "অশোক অনুশাসন" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

Exalted one was born in it, he reduced taxation in the village of Lumbini and established the dues at one-eighth part (of the crop).

অনেকে আবার ইহার অনুরূপ অনুবাদ করিয়াছিলেন; এখানে তাহারা শুধু শেষাংশ দেওয়া যাইতেছে * * * Because here was born Buddha, the Sakya sage, he had a stone horse made and set up a stone pillar. Because here the venerable one was born, the village of Lumbini has been made revenue-free and has partaken of the king's bounty.

এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা গ্রন্থের ৫ম খণ্ডে বুলহার কৃত অনুবাদ এবং স্মিথের অশোক গ্রন্থে "সংশোধিত" অনুবাদ দেখা যায়। চারুচন্দ্র বসুর "অশোক" এবং "অশোক অনুশাসন" ও "পৃথিবীর ইতিহাস" ৭ম খণ্ডে (২৮৮ পৃষ্ঠা) এবং J. R. A. S. ১৮৯৭ পৃ ৪ এবং ১৯০৮ পৃ ৪৭১-৯৮ এবং ৮২৩; কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত "অনুশাসন" এবং E. Hultzsch কৃত অনুশাসন সংগ্রহ ইত্যাদি নানা গ্রন্থে এতৎ সম্বন্ধে নানা আলোচনা ও অর্থনির্ণয় দেখা যায়। যাহা হউক, এখানে রুম্মিনী-লিপির একটি অবিকল অনুবাদ দেওয়া যাইতেছে—

"দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা অভিষেকের বিংশতি বর্ষে আপনি আসিয়াছিলেন ও পূজা করিয়াছিলেন—অত্র শাক্যমুনি বুদ্ধ (হইয়াছিলেন), (এই জন্য) বৃহৎ শিলাবেষ্টনি কৃত (হইল) ও শিলাস্তম্ভ উত্থাপিত (হইল)—অত্র ভগবান জাত (হইয়াছিলেন) লুম্বিনী (উবলিকে=অপবলিক) করা (কটে=কৃত) হইল ও অষ্টভাগী (উৎপন্ন দ্রব্যের অষ্টভাগ মাত্র রাজকর নির্দ্ধারিত) করা হইল।"—

স্তম্ভের গাত্রে দর্শক ও পরিব্রাজকাদির দ্বারা উৎকীর্ণ অনেকগুলি লেখা আছে। তন্মধ্যে কয়েকটা নাগরী অক্ষরে ও অনেকগুলি প্রাচীন যুগের অক্ষরে। অধিকাংশ লেখাই ছোট-ছোট কথায় সমাপ্ত, এবং শুধু ব্যক্তি-বিশেষের নাম।

দিব্যাবদানে ও অশোকাবদানে প্রিয়দর্শীর তীর্থ-যাত্রার বিবরণ দেখা যায়। ভগবান তথাগতের জীবনী ও কাহিনী সম্পর্কে পবিত্র তীর্থস্থানসমূহ দর্শন মানসে অশোক ধর্ম্ম-গুরু উপগুপ্ত সমভিব্যাহারে তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হইয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ ও তাঁহার পুণ্য-স্মৃতি চির-জাগরূক রাখিবার জন্য ঐ সকল স্থানেই অশোক, স্তূপ, স্তম্ভ, বিহারাদি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, লুম্বিনী উদ্যানে একটা স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া অশোক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা বিতরণ করিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেবের জন্ম-কথা সর্ব্বজন-পরিচিত কাহিনী। বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে তাহার সুদীর্ঘ বিবরণ দেখা যায়। সুপ্রাচীন পালিগ্রন্থ সুত্তনিপাতের ৫৮৩ শ্লোকে লুম্বিনী কাননে বুদ্ধজন্মের উল্লেখ আছে। জাতক-কাহিনী ও মঝ্ঝিম নিকায়ের টীকা হইতে জানা যায় যে বুদ্ধ-জননী পূর্ণ গর্ভাবস্থায় প্রসবের নিমিত্ত কপিলনগর হইতে পিতৃ-গৃহ কোলিয়-রাজধানী ব্যাঘ্রপুরে যাইতেছিলেন। ঐ স্থান কপিলাবস্তু হইতে ১১ মাইল পূর্ব্বে রোহিনী নদীর অপর তটে অবস্থিত। পথিমধ্যে প্রসব বেদনা উপস্থিত হওয়ায়, তিনি দেবদহের অদূরবর্ত্তী লুম্বিনী উদ্যানে আশ্রয় লয়েন; এবং তথায় এক শাল-তরুমূলে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। প্রস্তরে খোদিত বুদ্ধ-জন্মের রাশি-রাশি চিত্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে বাহির হইয়াছে। পূর্ব্ব-কথিত রুম্মিণীদেই মন্দিরে এই ধরণের একটি মূর্ত্তি (bas-relief) আজও রক্ষিত দেখা যায়। তবে জনসাধারণ এক্ষণে বুদ্ধদেবকে ভুলিয়া গিয়াছে; এবং তাহাদের কল্যাণে মায়াদেবী একটি দেই বা গ্রাম্যদেবতায় পরিণত হইয়াছেন; এবং তৈল-সিন্দুর-চর্চ্চিত হইয়া পূজা পাইতেছেন!

হিউয়েন সাঙ্গ ও তাঁহার কাহিনীমধ্যে কপিলাবস্তু প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের জন্মের দীর্ঘ বিবরণ দিয়াছেন। বৌদ্ধগ্রন্থসমূহের সহিত তাহার যথেষ্ট সামঞ্জস্য দেখা যায়। তিনি বলেন, "লুম্বিনী উদ্যানে শাক্যগণের স্নানের পুষ্করিণী অবস্থিত। তাহার ২৪।২৫ পদ দূরে একটি মৃত শাল-বৃক্ষ। এইখানে বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করেন। * * * ইহার দক্ষিণে অন্য একটি স্তূপ। এইখানে শক্র বোধিসত্ত্বকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। যে স্থানে স্বর্গীয় চারিজন রাজা বোধিসত্ত্বকে কোলে করেন, তাহার স্থান-নির্দ্দেশের জন্য চারিটা স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল স্তূপের নিকটেই রাজা অশোক নির্ম্মিত প্রস্তর-স্তম্ভের উপরে অশ্ব-মূর্ত্তি

স্থাপিত। পরে দুষ্ট কর্তৃক বজ্রাঘাতে স্তম্ভটীর মধ্যদেশ ভগ্ন হওয়ায়, তাহা ভূমিসাৎ হইয়াছে।" (৯)

অশ্বটীর কোনই নিদর্শন এ যাবৎ বাহির হয় নাই। চীনপরিব্রাজক-বর্ণিত স্তূপগুলির অস্তিত্ব এখনও আছে বটে, তবে এতদঞ্চলে যথেষ্ট অনুসন্ধানের অভাবে ঐগুলি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় নাই।

বিগত শতাব্দীর শেষভাগে ৺পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই অশোক-স্তম্ভের নিকটে অনুসন্ধান কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া দেখিয়াছিলেন যে, স্তম্ভের চারিদিকে একটি পুরাতন, ও একটি অপেক্ষাকৃত নূতন ইষ্টক-প্রাচীর বর্ত্তমান আছে। শেষোক্তটিকে মুখোপাধ্যায় মহাশয় পাল-রাজগণ কৃত সংস্কার-কার্য্যের নিদর্শন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। ভিনসেণ্ট স্মিথ আবার পাল-রাজগণকে ইহা অপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব দিতে চাহেন, তাঁহার মতে, সপ্তম শতাব্দীতে ভূপতিত স্তম্ভটী ১১শ বা ১২শ শতাব্দীতে পালবংশীয় কোন বৌদ্ধরাজা কর্তৃক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। (১০) স্মিথ সমগ্র স্তম্ভটীর ভূপতিত হওয়ার প্রমাণ কোথায় পাইয়াছেন, তাহা কিন্তু বলেন নাই। হিউয়েন সাঙ্গ ও ধরণের কথা একবারও বলেন নাই। বজ্রাঘাতে স্তম্ভটী ভাঙ্গিয়া, উপরি অংশ মাটিতে পড়ার কথাই তিনি বলিয়াছিলেন—তাঁহার লেখা হইতে তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায়। বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ স্তম্ভের অবস্থা হইতেও তাহা সমর্থিত হইতেছে। পাল-রাজগণ যে পূর্ব্বতন যুগের কীর্ত্তিসমূহের সংস্কার করিতেন, তাহা তাঁহাদের লিপি হইতেই প্রকাশ। তবে লুম্বিনী বনে তাঁহাদের সংস্কার-সাধনে অনুমানগত; কারণ, নলন্দার অগ্নিদাহে বিনষ্ট মন্দিরের সংস্কার বা সারনাথের সাঙ্গ ধর্ম্মচক্র ও ধর্ম্মচক্রের "পুনবং" ও গন্ধ-কুটীর "নবীনা" করার ন্যায় লুম্বিনীতে সংস্কারের কথা কোনও খোদিত লিপি হইতে সমর্থিত হইতেছে না। অবশ্য লুম্বিনীতে সন্তোষজনক অনুসন্ধান এ পর্য্যন্ত করা হয় নাই। তাই এখানে খননের ফলে কি যে বাহির হইতে না পারে, সে সম্বন্ধে কিছু বলা চলে না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারত গভর্ণমেণ্ট নেপাল দরবারের নিকট এই স্থানে খননের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু দরবার তাহাতে সম্মতি দেন নাই। দরবার হইতে একবার খননের চেষ্টা হইয়াছিল; কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে ঐ অঞ্চলে ওলাউঠার প্রকোপ হওয়ায়, অজ্ঞ জনসাধারণ—খনন চেষ্টায় দেবতার কোপই তাহার কারণ বলিয়া মনে করে; এবং তাহাদের চেষ্টায় ঐখানেই খনন কার্য্য স্থগিত হয়। তাহার পর এখানে আর কোন অনুসন্ধানাদি হয় নাই।

রুম্মিণীদেই হইতে ১৩ মাইল উত্তর-পশ্চিমে নিগ্লীভা পল্লী অবস্থিত। তাহার সন্নিকটে নিগাইলসাগর বা নিগ্লীভা-সাগর নামক জলাশয়ের পশ্চিমতটে অপর স্তম্ভটী অবস্থিত। নিকটবর্ত্তী পল্লীর নামেই এই স্তম্ভটী পরিচিত। স্তম্ভের শীর্ষদেশ ভগ্ন এবং ফাটিয়া গিয়াছে। তাই মনে হয়, ইহাও বজ্রাগ্নিধ্বস্ত। অক্ষরগুলি অস্পষ্ট এবং লিপিগুলি অসম্পূর্ণ। রুম্মিনীলিপি যেমন অক্ষত অবস্থায় আছে, নিগ্লীভালিপি তেমনিই নষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, লিপিটী এই প্রকার:—

দেবানং পিয়েন পিয়দসিন লাজিন চোদসবসা (ভিসিতেন)
বুধ স কোনাকমনস থুবে দুতিয়ং বঢ়িতে (বিসতিব)
সাভিসিতেন চ অতন আগাচ মহীয়িতে (সিলাথবেচউস)
পাপিতে

অর্থাৎ—"দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা অভিষেকের চতুর্দ্দশ বর্ষে কনকমুনি বুদ্ধের স্তূপ দ্বিতীয়বার বর্দ্ধিত করাইলেন। অভিষেকের বিংশতিবর্ষে স্বয়ং আসিয়া পূজা ও প্রস্তর-স্তম্ভ উত্থাপিত করিলেন।"

বৌদ্ধ মতে গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্বে বিভিন্নকল্পে চতুর্ব্বিংশ-জন বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কনকমুনি তাঁহাদের অন্যতম—প্রথম হইতে ত্রয়োবিংশতি সংখ্যক। মহাবংশ মতে তাঁহার জন্মস্থানের নাম শোভাবতী নগরী।

ঐতিহাসিকের নিকট নিগ্লীভা স্তম্ভ সমধিক মূল্যবান। শাক্যবুদ্ধ ব্যতীত পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধগণের প্রতিও যে অশোক শ্রদ্ধা ও আস্থাসম্পন্ন ছিলেন, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। নিগ্লীভা লিপি হইতে মনে হয়, অশোক একাধিকবার তীর্থ-পর্য্যটনে গিয়াছিলেন।

চীনা পরিব্রাজকদ্বয় প্রদত্ত এই সকল স্থানের বিবরণ নিতান্তই পরস্পর-বিরোধী। সকল স্থানের অর্থ লইয়াও অনুবাদকগণ একমত নহেন। তাই আজ এতকাল পরে

(৯) Walter's On Yuan Chwang, p. 14-15.

(১০) Prefatory Note to a Report on a Tour of Exploration in the Nepalese Terai.

এ অঞ্চলের প্রাচীন কীর্ত্তিগুলির স্বরূপ নির্ণয় যে নিতান্ত সহজসাধ্য নহে, তাহা অনেকবারই বলা হইয়াছে। ফাহিয়ান ও হিউয়েন সাঙ্গ কনকমুনির জন্মস্থানের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহার সহিত নিগ্লীভা-স্তম্ভের অবস্থানের অসামঞ্জস্য দেখিয়া, কেহ-কেহ আবার মনে করেন যে, অশোক যে স্থানে স্তম্ভটী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেখান হইতে স্তম্ভটী স্থানভ্রষ্ট হইয়াছে। (১১) ফাহিয়ানের মতে কনকমুনির জন্মস্থান ক্রকুচ্ছন্দের জন্মস্থান নাপিকের এক যোজন (প্রায় ৭ মাইল) দক্ষিণে (Remusat এর অনুবাদে) ও কপিলাবস্তুর প্রায় এক যোজন পশ্চিমে এবং কপিলাবস্তুর প্রায় ৫০ লি পূর্ব্বে লুম্বিনী উদ্যান। অর্থাৎ লুম্বিনী হইতে কনকমুনির জন্মস্থানের দূরত্ব পশ্চিমদিকে প্রায় ১৪। ১৫ মাইল। ইহার সহিত, আধুনিক দূরত্বের—পশ্চিম-উত্তর পশ্চিম দিকে ১৩ মাইল,—যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে। বীলের অনুবাদে কনকমুনির জন্মস্থান না-পি-কের এক যোজন উত্তরে। সে হিসাবে ক্রকুচ্ছন্দের জন্মস্থান কপিলাবস্তুর দক্ষিণ-পশ্চিমে পড়ে। হিউয়েন সাঙ্গও উহাকে কপিল নগরের দক্ষিণে বলিয়াছেন। তাঁহার মতে উভয়ের দূরত্ব ৫০ লি। তিনি বলেন, "এই স্থান হইতে ২০ লি উত্তর-পূর্ব্বে একটি প্রাচীন নগরে ভদ্রকল্পে কনকমুনি জন্মগ্রহণ করেন। সেই ঘটনার স্মৃতি-রক্ষার্থ তথায় একটি স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। উত্তরদিকে কিঞ্চিৎ দূরস্থ একটি স্তূপে তাঁহার শরীরের অবশিষ্ট অংশ রক্ষিত। ইহার সম্মুখে ২০ ফিট উচ্চ সিংহমূর্ত্তিযুক্ত একটি প্রস্তরস্তম্ভ আছে। স্তম্ভগাত্রে তাঁহার নির্ব্বাণ সংক্রান্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ। স্তম্ভটী রাজা অশোক কর্তৃক নির্ম্মিত।" নিগ্লীভা বা কনকমুনি স্তম্ভের সিংহমূর্ত্তির কোনই নিদর্শন এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই।

ক্রকুচ্ছন্দবুদ্ধের জন্মস্থান কনকমুনি স্তম্ভের কোন্ দিক অবস্থিত ছিল, তাহা বলা শক্ত। Remusat অনূদিত ফাহিয়ানের গ্রন্থানুসারে তাহা এক যোজন দক্ষিণে হয়; বীল কৃত গ্রন্থে তাহা এক যোজন উত্তরে হয়; এবং হিউয়েন সাঙ্গ কৃত গ্রন্থে তাহা ২০ লি দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং কপিলাবস্তুর ৫০ লি দক্ষিণে পড়ে। হিউয়েন সাঙ্গ লিখিয়াছেন, "ক্রকুচ্ছন্দবুদ্ধ যে নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেখানে একটি স্তূপ আছে। নগরের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে অপর একটি স্তূপে তাঁহার শরীর-চিহ্ন আছে; ইহার সম্মুখে ৩০ ফিট উচ্চ একটি প্রস্তর-স্তম্ভে তাঁহার নির্ব্বাণ বিবরণ খোদিত। স্তম্ভটীর উপরে একটি সিংহ-মূর্ত্তি আছে, এবং ইহা রাজা অশোক নির্ম্মিত।"

এই স্তম্ভ বা তাহার কোন নিদর্শন এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। এই সকল স্থান তরাইয়ের দুর্গম আরণ্য প্রদেশে অবস্থিত এবং নেপালরাজ্যভুক্ত। এখানে অনুসন্ধানকার্য্য সহজ নহে। তাই মনে হয়, স্তম্ভটী বা তাহার কোন চিহ্ন হয় ত কখনও বাহির হইতেও পারে।

কানিংহাম ও কারলাইল কৃত কপিলাবস্তুর স্থান-নির্দ্দেশ বর্ত্তমানে পরিত্যক্ত হইলেও, এবং বর্ত্তমানে শাক্য-রাজধানীর আনুমানিক অবস্থান জানা গেলেও, তাহা ঠিক কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল, তাহা এখনও সবিশেষ নির্ণীত বা খননাদি অনুসন্ধান দ্বারা প্রমাণিত হয় নাই। লুম্বিনীর ১২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে পিপরাবার শাক্যস্তূপ ও ১৩ মাইল উত্তর-পশ্চিমে কনকমুনি বা নিগ্লীভা-স্তম্ভ অবস্থিত। মনে হয়, এই ত্রিকোণ ভূখণ্ডের মধ্যেই কোন স্থানে প্রাচীন শাক্য-রাজধানী অবস্থিত ছিল। এই অঞ্চল এখনও প্রাচীন যুগের ধ্বংসরাজি-সমাচ্ছন্ন। তন্মধ্যে কোন্‌গুলি প্রাচীন কপিল নগরীর নিদর্শন, তাহা নির্ণয় করা নিতান্ত সহজ নহে। ভবিষ্যতে খননের ফলেই তাহা বলা সম্ভব। (১২) আমাদের মনে হয় যে, পিপরাবার ১০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে নেপালদেশীয় তরাই প্রদেশের অন্তর্গত তিলৌড়াকোট নামক স্থানেই পুরাতন কপিলাবস্তু অবস্থিত ছিল। ইহার অবস্থান ২৭.৩৭´ ও ৮৩.১১´ রেখা হইবে। বিরুঢ়ক রাজা প্রাচীন নগরী ধ্বংস করিবার পর পিপরাবাতে নব নগরী নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। (১৩)

(১১) Early History of India. p. 169.

(১২) See Buddhist India, pp 17-18

(১৩) Purna Chandra Mukherji "Report of a Tour Exploration in the Nepalese Terai; V. A. Smith" "Early History of India" p 159; Buddhist India, p 18.

বিজিতা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(২১)

দুই ভাইয়ে এক সঙ্গে বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। শৈলেন একজামিন দিতে যাইবে; যোগেন্দ্র ব্যবসায়-ক্ষেত্র গুলি পরিদর্শন করিয়া দিন দশেকের মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন, কথা রহিল।

অমিয় যাইবার জন্য বায়না ধরিয়াছিল। সুষমা তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন, শৈলেন একজামিন দিয়া আসিয়া তাহাকে পুরী লইয়া যাইবে। অনেক বুঝানর পর অমিয় শান্ত হইল।

পরদিন অমিয় কিছুতেই স্কুলে গেল না। সুষমা যখন তাহাকে তাড়না করিয়া গেলেন, তখন পিসীমা তাহাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইলেন, "থাক না বাছা, একদিন স্কুলে না গেলে কি হবে। কখনো বাপের কাছ-ছাড়া হয় নি, হঠাৎ কাছ-ছাড়া হয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেছে, তাই যেতে চাচ্ছে না।"

সুষমা বলিলেন "তবে বাড়ীতে পড়ুক। সমস্ত দিন যে এই রোদে ছুটোছুটি করে বেড়াবে, তা আমি করতে দেব না।"

পিসীমা বলিলেন "কার কাছে পড়বে?"

সুষমা বলিলেন, "কেন, প্রতিভা তো রয়েছে,— ওর কাছে পড়ুক না কেন। প্রতিভা বেশ পড়াতে পারবে'খন।"

পিসীমা অনিচ্ছার সঙ্গে বলিলেন, "ইংরিজি-ফিংরিজি-গুলো পড়বে কার কাছে? ও সব কটমটে কথা তো প্রতিভা জানে না যে পড়াবে।"

সুষমা বলিলেন "সে সব প্রতিভা জানে। সে পড়াতে পারলে তো হল। যা অমিয়, তোর কাকাবাবুর ঘরে পড়তে বস গিয়ে।"

অমিয় চলিয়া গেল। শিক্ষয়িত্রীও অনতিবিলম্বে একটা বালিশের ওয়াড়, ও পিসীমার একখানি ছিন্ন কাপড় লইয়া গিয়া সেখানে সেলাই করিতে বসিল।

শিক্ষয়িত্রীকে স্তম্ভিত করিয়া দিবার জন্য, ছাত্র খুব মনোযোগের সহিত বইখানাকে আঁকাড়াইয়া ধরিয়া, সেদিনকার নির্ব্বাচিত পদ্যটি অর্গেনের ন্যায় আবৃত্তি করিয়া চলিল।

"অ্যা-মিড্ প্লেজার অ্যান্ড্ প্যালেসেস্ দো উই মে রোম,
বি ইট এভার্ সো আম্বল দেয়ার'স নো প্লেস লাইক হোম।

প্রতিভা শেলাই হইতে মুখ তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "ও আবার কি পড়ছিস? তোর নিজের বই—সে কিং রীডার-খানা গেল কোথা? এ পড়া এখনকার নয় যে পড়বি।"

গর্ব্বের সহিত অমিয় বলিল, "বাঃ, তুমি কিছু জান না দেখছি। কাকাবাবুর কাছ হ'তে আমি যে প্রাইজ পেয়েছি এইটা বলে—জানো তা?"

প্রতিভা বিস্ফারিত নেত্রে বলিল "প্রাইজ? না, কই, কি প্রাইজ পেয়েছিস, দেখি।"

অমিয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। সেই কক্ষেরই এক কোণে তাহার ছোট লাল টিনের বাক্সটী শোভা পাইতেছিল। বাক্সটা নানা বস্তুতে পরিপূর্ণ থাকায় এত ভারি হইয়াছিল যে, সেটাকে টানিয়া আনিতে অমিয়কে একেবারে হাঁপাইয়া যাইতে হইল। কোনও মতে সেটা টানিয়া প্রতিভার সামনে আনিয়া, মাদুরের উপর একেবারে উপুড় করিয়া দিল। তাহার মধ্যে নাই এমন জিনিসই নাই। ভাঙ্গা কাঁচের টুকরা, স্বল্পাবশিষ্ট লেড পেনসিল, কয়েকটা মার্ব্বেল, ভাঙ্গা ছাতার শিক, রং-বেরংয়ের অনেক-গুলি পাথরের টুকরা, পিতার অব্যবহার্য্য ভাঙ্গা চশমা জোড়া, ছেঁড়া জুতার ফিতা, কোথায় কুড়াইয়া পাওয়া দুইটা কাঁচের পুতুল, বল প্রভৃতি এমন অনেক অনেক জিনিস ছিল, যাহা দেখিয়া বয়স্ক দর্শকের পক্ষে হাসি সামলানো অত্যন্ত দায় হইয়া উঠে। কিন্তু অমিয়ের সমবয়স্ক-দের কাছে এই বাক্সের প্রত্যেক জিনিসই যে অত্যন্ত লোভনীয় ছিল, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই; এবং তাহারা

এই গৃহে খেলিতে আসিয়া, দুই-একটা মহার্ঘ জিনিস হস্তগত করিয়া বিধিমতে দণ্ডিতও হইয়াছিল।

ক্ষিপ্র-হস্তে সবগুলি সরাইয়া ফেলিয়া, একটা কৌটা বাহির করিয়া সগর্ব্বে অমিয় বলিল, "এই—এরই মধ্যে আছে সেটা।"

এতটুকু কৌটার মধ্যে যে কত বড় প্রাইজ থাকিতে পারে, তাহা কল্পনা করিয়া প্রতিভার চোখ মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "জিনিসটা কি ?"

অমিয় তাড়াতাড়ি মাসীমাকে বিস্মিত করিয়া দিবার জন্য বাক্স খুলিল। শৈলেনের বড় আদরের পাথর-বসানো সোণার ব্রোচটা দেখিয়া, প্রতিভা স্তম্ভিত হইয়া, বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল। তাহার পর আস্তে-আস্তে সেটা তুলিয়া লইল।

অমিয় তাহাকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিল, "দেখো, তেল-টেল লেগে নেই তো হাতে ? হাত-খানা না হয় একটু মুছেই নাও কাপড়খানাতে। দেখছ না, হীরেগুলো কেমন জ্বলছে,—ময়লা হাত লাগলেই ময়লা হয়ে যাবে।"

প্রতিভা হাত মুছিয়া ব্রোচটা হাতে লইল ; একদৃষ্টে সেই ব্রোচটার পানে তাকাইয়া রহিল। হাঁ, এ হীরাই বটে। এই হীরার উজ্জ্বল দ্যুতিতে সমস্ত জগৎ একদিন আলোকিত হইয়া উঠিবে বটে।

প্রতিভার চক্ষু হঠাৎ জলভরে নমিত হইয়া পড়িল। কেন, সে জানে না—আজ আবার নূতন করিয়া সে হৃদয়ের মধ্যে শূন্যতা অনুভব করিতে লাগিল। বোধ হয় এই ব্রোচটা একবার ললাটে স্পর্শ করাইলে সে শান্তি পাইতে পারে,—বুকের উপর এটা রাখিলে বুঝি বুকের জ্বালা জুড়াইয়া যায়। সে অমিয়ের পানে একবার চাহিয়া দেখিল, সে লুব্ধ নেত্রে ব্রোচটার পানে চাহিয়া আছে।

প্রতিভা নির্নিমেষ নেত্রে সেটার পানে খানিক চাহিয়া থাকিয়া, চোখ তুলিয়া বলিল, "আমায় আজকের মত এটা দিবি অমিয়, কাল সকালেই আবার ফিরিয়া দেব তোকে ?"

ব্যস্ত হইয়া অমিয় বলিল, "বাঃ, তা আমি দেব কেন ? তুমি কেন ছোটকাকার কাছে রিডিং পড়তে পার না,—তা হ'লে কত প্রাইজ পাও ? এ আমি কক্ষণোই দেব না মাসী মা। এবার ছোটকাকা আসুক, আসলে পরে তুমি—ছোট কাকা যে পৈট্রিটা আগে আমায় মুখস্থ করতে বলেছিল, সেইটি মুখস্থ বলো দেখি তুমি, তা হলে নতুন একটা প্রাইজ পেয়ে যাবে ! ওটা আমাকে দাও মাসীমা, আমি কাল ছোটকাকাকে লিখব, খুব ভাল দেখে একটা ব্রোচ কিনে আনতে—সেইটে তুমি নিয়ো। এটা কি-ই বা ভাল ? ভারি খান-কত কাঁচ-বসানো বই তো নয়।"

প্রতিভার লুব্ধ দৃষ্টি হইতে ব্রোচটাকে বাঁচাইবার জন্য অমিয় অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এখন যেমন-তেমন করিয়া এটা প্রতিভার নিকট হইতে আদায় করিতে পারিলে হয়। আরও কয়েকবার প্রতিভা কয়েকটা জিনিস এমনই করিয়া তাহার নিকট হইতে লইয়া আত্মসাৎ করিয়াছে,—দেব, দিচ্ছি করিয়াও সে দিতে পারে নাই,—তাই অমিয়ের এত ভয়।

প্রতিভা চুপ করিয়া রহিল। এই যে ব্রোচটা শৈলেন ব্যবহার করিয়াছে, এটা তাহার নিকট অমূল্য। নূতন সে একটা গড়াইয়া দিবে, তাহার চিহ্ন তাহাতে কিছু থাকিবে না,—তাহার আবার মূল্য কি ? আর বিধবা যে সে, এ সব বিলাস-দ্রব্যের দিকে তাহার দৃষ্টি কেন ?

বাহিরে সুষমার কণ্ঠ শোনা গেল "কি রে অমিয়, তোর গলা যে শুনতে পাচ্ছি নে আর। প্রথমটা তো খুব চেঁচালি, এখন কি স্বরটা গলায় আটকে গেল ?"

"দাও, দাও—মাসীমা, শিগ্‌গীর দাও, মা এখনি এল বলে। এ সব ছড়ানো দেখলেই বকবেন।" প্রতিভার হাত হইতে ব্রোচটা থাবা দিয়া লইয়া, সে তাড়াতাড়ি কৌটায় বন্ধ করিয়া ফেলিল। তাহার পর দুই হাতে খেলার জিনিসগুলি বাক্সে ফেলিতে-ফেলিতে ব্যগ্র কণ্ঠে সে বলিতে লাগিল, "তোমার পায়ে পড়ি, তোল মাসীমা, মা এসে এ সব দেখলেই—"

তাহার ব্যগ্রতা দেখিয়া প্রতিভা একটু হাসিয়া তাহার সাহায্য করিল। বাক্সটা যথাস্থানে রাখিয়া আসিয়া অমিয় আবার বই লইয়া বসিল। মানের বই মুখস্থ করিতে লাগিল, ও মাঝে-মাঝে প্রতিভাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে লাগিল।

প্রতিভার মনটা চিন্তায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। বালিশের ওয়াড়টা সেলাই করিতে কত জায়গায় ভুল হইয়া গেল।

অমিয় এক সময় কখন জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ মাসীমা, ম্যালাড্‌মিনিষ্ট্রেশান মানে কি ?"

প্রতিভা কিছুমাত্র না ভাবিয়াই উত্তর করিল, "সেনাপতি।"

অমিয় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, "বাঃ, খুব মানে বলেছ মাসীমা,—ম্যালাড্‌মিনিষ্ট্রেশান মানে সেনাপতি! আচ্ছা, আসুক ছোটকাকা, আমি সব বলে দেব।"

অপ্রস্তুত হইয়া হাতের ওয়াড় ফেলিয়া দিয়া প্রতিভা রাগের ভাব দেখাইয়া বলিল, "এক সঙ্গে কি দুই কাজ হয় না কি? সেলাই করব, না তোর পড়া বলে দেব? তুই মানের বই দেখ্‌ না কেন বাপু, না হয় ডিক্সনারীখানা খুলে এমের জায়গা বার কর,, পাবি'খন। আমি আর বকতে পারব না, তা বলে দিচ্ছি।"

সুষমা গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "প্রতিভা, পিসীমা তোকে সাবিত্রী-সত্যবানখানা পড়ে শুনাবার জন্যে ডাকছেন, চল। অমিয় পড়ুক না কেন একলা।"

প্রতিভা সঙ্কুচিত হইয়া বলিল "সেলাই—"

বাধা দিয়া পিসীমা বলিলেন, "সেলাই রাতে করলেই হবে'খন। রাত্রে তো আজকাল কোন কাজই নেই। নেহাৎ সন্ধ্যে বেলা শোওয়াও যাবে না। এখন সেলাইটা এই ঘরেই রেখে, বই পড়বি চল্‌।"

প্রতিভা সেলাই তক্তপোষের উপর রাখিয়া উঠিল। নিজের সেই বই দু'খানাকে বাহির করিতে তাহার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। সেইদিন সেই যে বই দু'খানাকে সে বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহার পরে আর একদিনও তাহাতে হাত দিবার সাহস পর্য্যন্ত তাহার হয় নাই।

আজ সুষমার কথায় বাধ্য হইয়া তাহাকে বাক্স খুলিয়া সেই বই দু'খানি বাহির করিতে হইল। বই হাতে লইতেই তাহার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল,—হাত হইতে সেখানা একবার পড়িয়াও গেল।

গভীর কষ্টে নিজেকে ধিক্কার দিয়া সে উঠিয়া পড়িল। বইখানি হাতে লইয়া সে পিসীমার কাছে আসিয়া দেখিল, তিনি ঠাণ্ডা মেঝেয় অঞ্চল বিছাইয়া শুইয়া আছেন,—চোখ দুইটা বেশ মুদিয়া আসিয়াছে,—নাকটাও ঘুমের আবেশে ডাকিয়া উঠিতেছে।

প্রতিভা যেন বাঁচিয়া গেল; তাহার আর সে বইখানা পড়িতে হইবে না ভাবিয়া, সে সন্তর্পণে ফিরিতেছিল,—সেই সময়েই পিসীমা জাগিয়া উঠিলেন। অপ্রতিভের হাসি হাসিয়া, একটা আড়মোড়া ভাঙ্গিয়া গোটাকত দীর্ঘ হাই তুলিয়া, তিনি উঠিয়া বসিলেন, "যাচ্ছিস যে প্রতিভা, এদিকে এসে বস। বইখানা এনেছিস না কি? বড় বউমা বলছিল, তোর কাছে সাবিত্রী-সত্যবান বইখানা আছে। আ পাগলী, আমার কাছে তা বলতে হয়; আমার বড় ভাল লাগে এসব বই শুনতে। বস, পড় দিকিনি বইখানা।"

প্রতিভা বসিয়া বইখানার প্রথম পৃষ্ঠা উল্টাইয়াই চমকাইয়া উঠিল। এ কার নাম লেখা? সোণার মত অক্ষরে খুব বড় বড় করিয়া লেখা আছে "শ্রীমতী প্রতিভা রায়কে স্নেহ-উপহার প্রদত্ত হইল।" নীচে নাম লেখা—শৈলেন্দ্রনাথ বসু।

প্রতিভার বুকের মধ্যে ঢিপ-ঢিপ করিতে লাগিল। বইয়ের মাঝে এমন দাগ দিবার কি দরকার ছিল? এ যে এখনি সকলের চোখে পড়িয়া যাইবে,—তখন সে লুকাইবে কোথায়? আহা, আগে যদি সে ইহা দেখিত, উপহার-পৃষ্ঠাটা ছিঁড়িয়া তখনি আগুনে পোড়াইয়া চিহ্ন একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিত।

লজ্জার অরুণিমা তাহার কাণ, গলা পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি সে পাতাটা চাপা দিয়া সে বই পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল।

ও-ঘর হইতে পড়া শুনিতে পাইয়া সুষমা আসিয়া পড়িলেন; সহাস্য মুখে বলিলেন, "এই যে পড়া আরম্ভ হয়ে গেছে।"

পিসীমা বলিলেন, "বস না বড় বউমা, মন দিয়ে শোন। এ বই শুনলেও পুণ্যি আছে। আহা, এমন সতী যে, মরা স্বামীকেও ফিরিয়ে এনেছিল। আঃ, আজকাল যদি এমনি একজন থাকত।"

ভাবের আবেশে তিনি চুপ করিয়া গেলেন।

প্রথমটা পড়িতে গিয়া প্রতিভার কণ্ঠ কাঁপিতেছিল। ক্রমে ক্রমে সে জড়তা দূর হইয়া গেল। তাহার অজ্ঞাতে কখন যে সে সেই বইখানার মধ্যে ডুবিয়া গেল, তাহা সে জানে না। তাহার কণ্ঠস্বর ক্রমে উচ্চ হইয়া উঠিল। এ-ঘরে গল্প হইতেছে শুনিয়া, অমিয় আর স্থির থাকিতে পারিল না,—আস্তে-আস্তে আসিয়া, প্রতিভার গা ঘেঁসিয়া বসিয়া, হাঁ করিয়া শুনিতে লাগিল।
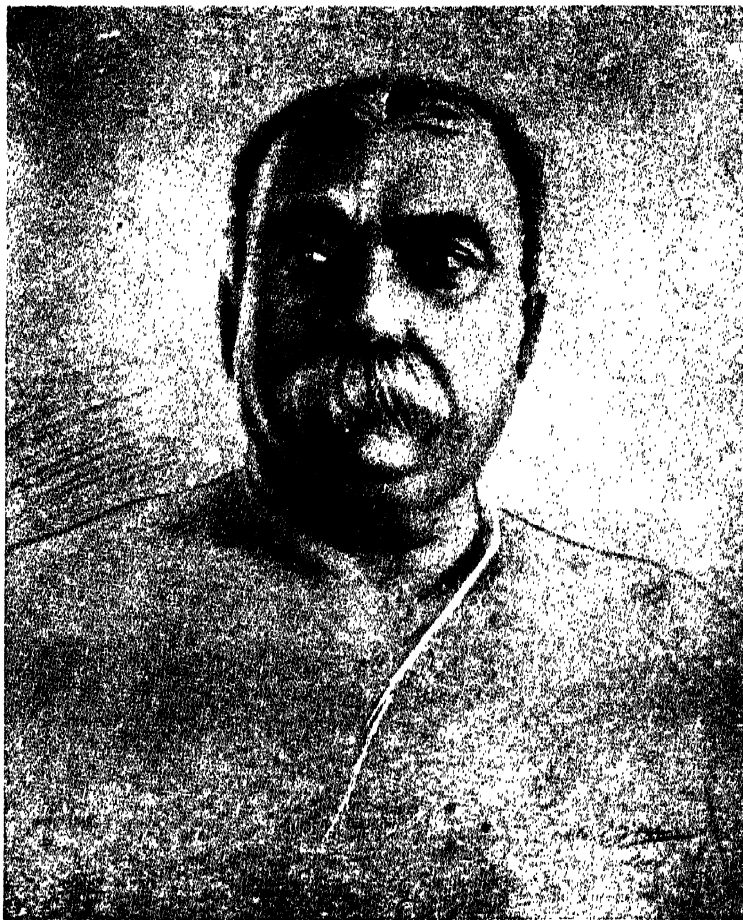
"THE BENGAL TIGER"

শিল্পী — শ্রীযুক্ত অতুল বসু

শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরীর লিখিত চিত্র-প্রদর্শনী দ্রষ্টব্য

BHARATVARSHA HALFTONE & PTG. WORKS.

সুষমা প্রতিভার পানে চাহিয়া দেখিলেন, সে অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। তিনি তাহাকে কোন কথাই বলিলেন না,—বেশ জানিলেন, তাহার হৃদয়ে একটা ঘাত-প্রতিঘাত আরম্ভ হইয়াছে। তিনি কেবল মাত্র বলিলেন, "বই নিয়ে যা প্রতিভা! আগে কাপড়খানা কেচে আয় গে, বেলা গেছে।"

প্রতিভা বই লইয়া চলিয়া গেল। নিজের কক্ষে গিয়া বাক্স খুলিয়া বইখানা রাখিতে-রাখিতে তাহার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া অবিশ্রান্ত ধারে জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

ওগো, তোমার দান ফিরাইয়া লও তুমি,—যাহাকে দিয়াছ, সে তো এ দানের যোগ্য পাত্রী নহে। তাহার হৃদয় যে মসী-কলঙ্কিত, বড় অন্ধকার;—এ আলোতে কি সে অন্ধকার বিদূরিত হইতে পারিবে? সতীত্ব-কিরণ কি সেথায় বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িবে? প্রতিভা এ দান গ্রহণ করিতে যে সাহস করিতেছে না! তুমি যাহা দিয়াছ, তাহা তাহাকে যে মোটে মানাইতেছে না,—এই বই দুখানা বড় যন্ত্রণা দিতেছে। ওগো দেবতা, তোমার দান তুমি ফিরাইয়া লও, তাহাকে মুক্তি দাও।

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া, উচ্ছ্বসিত হইয়া খানিকটা সে কাঁদিয়া লইল। সেই ব্রোচটা দেখা অবধি যে গুরু ভার তাহার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, এবার প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে পাইয়া সে ভারটা কাটিয়া গেল।

সে যখন গৃহ হইতে বাহির হইল, তখন তাহার হৃদয় পাতলা হইয়া গিয়াছে। সুষমা কার্য্যান্তরে অন্য গৃহে যাইতে যাইতে তাহাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন; তাহার আরক্ত মুখখানার পানে চাহিয়াই বুঝিলেন, সে কাঁদিতে-ছিল। করুণায় করুণাময়ীর প্রাণটা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাহার রোদনের কথা তুলিয়া তাহাকে তিনি লজ্জা দিলেন না; বলিলেন, "ঘাটে যাস্ নি প্রতিভা?"

ব্যস্ত ভাবে প্রতিভা বলিল, "এই যে যাচ্ছি।"

"অমিয়কে সঙ্গে নিয়ে যাস,—একলা যাস নে" বলিয়া সুষমা চলিয়া গেলেন।

(২২)

সেদিন পোষ্টম্যান খানকতক পত্র দিয়া গেল। সুষমা উৎকণ্ঠিত হইয়া অমিয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার পত্র রে?"

অমিয় পত্রকয়খানা কুড়াইয়া আনিয়া সুষমার হাতে দিল। প্রতিভার নামে একখানি এনভেলাপ ছিল; সুষমা খানিক সেখানা উল্টাইয়া দেখিলেন,—হাতের লেখাটা সুপরিচিত; কিন্তু পত্র দেখিবার উপায় নাই। পত্রে কি লেখা আছে তাহা জানিবার জন্য তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেও, তিনি সে ব্যগ্রতা দমন করিলেন।

পিসীমা উৎসুক কণ্ঠে বলিলেন, "হ্যাঁ গা বড় বউমা, শৈল, যোগিন পত্র দেছে কি? আজ সাত-আট দিন হ'ল গেছে তারা, একখানা পৌঁছানো চিঠিও দিল না, মানে কি?"

সুষমা নিজের নামীয় পত্রের কভারটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন "হ্যাঁ, দুজনেই দেখছি পত্র দেছে। এই নে প্রতিভা, তোর এই পত্র এসেছে।"

"আমার পত্র!" প্রতিভা চমকাইয়া উঠিল। সে তখন তরকারী কুটিতেছিল। চমকাইয়া উঠিবার সঙ্গেসঙ্গেই আঙুলটা কাটিয়া গিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল,—সেদিকে তাহার দৃষ্টিই রহিল না।

তাহার বিবর্ণ মুখখানার পানে চাহিয়া সুষমা বলিলেন "হ্যাঁ তোর পত্রই তো,—দেখ্ না, তোর নাম লেখা আছে। পেছনে আবার অনুরোধ করে লিখেছে, কেউ যেন না খোলে।" প্রতিভা কম্পিত হস্তে পত্রখানা গ্রহণ করিল। এনভেলাপে তাহাকে পত্র দিবার মত লোক তো জগতে কেহই নাই। শৈলেন আগে পত্র দিত, সে বউদির পত্র মধ্যে স্বতন্ত্র একখানি কাগজে করিয়া। এরূপ স্বতন্ত্র পত্র পাওয়া জীবনে তাহার এই প্রথম।

পত্রখানা সেখানে খুলিতে প্রতিভার সাহস হইল না; নিজ কক্ষে গিয়া সে ব্যগ্র ভাবে এনভেলাপ ছিঁড়িয়া পত্রখানা বাহির করিল। হস্তাক্ষরের পানে দৃষ্টি পড়িতেই সে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল, নিঃশব্দে শুধু খানিক চাহিয়া রহিল।

একটু পরে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সে পত্রের ভাঁজ খুলিল,—এই তো, বাস্তবিকই শৈলেন তাহাকে পত্র লিখিয়াছে।

পত্রে লেখা ছিল এই—

"প্রতিভা!

আজ আমাকে তোমায় আলাদা পত্র দিতে দেখে বোধ হয় ভারি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছ; কিন্তু না, জগতে আশ্চর্য্য হবার মত জিনিস কিছুই থাকতে পারে না। নিত্য যা জগতে ঘটছে, এও তাই মাত্র,—নূতনত্ব কিছুই নেই এতে। আজ একটা কথা জানবার জন্যে বসেছি তোমায় পত্র লিখতে।

সেদিন বড়-বউদির মুখে শুনলুম, তুমি না কি তোমার ভাসুরের বাড়ী যাবে। আমি এই কথাটা শুনে এতদূর স্তম্ভিত হ'য়ে পড়েছিলাম যে, বড় বউদি বোধ হয় আমার মুখ দেখে আমায় সন্দেহ করেছেন। আমি তার পরে ভাবলুম তোমায় একবার জিজ্ঞাসা করব—সত্যই কি তুমি এতকাল পরে আবার ফিরে যেতে চাও সেখানে? কিন্তু প্রতিভা, আমার সঙ্কোচ আমায় কিছুতেই এগুতে দিলে না। আমি এই ভেবে থেমে গেলুম, এ কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করার কি অধিকার আছে আমার? কিন্তু এখানে এসে চুপ করে থাকতে পারলুম না; কিছুতেই অশান্ত হৃদয়টাকে দমন করে রাখতে পারছি নে প্রতিভা,—আমায় মাপ কর এর জন্যে।

কেন তুমি সেখানে যেতে চাও প্রতিভা? কিসের ভয়ে তুমি পালাতে চাচ্ছ? আমার মুখ দেখে কি আমার অন্তরের ভাব বুঝতে পেরেছ? সত্যি কথা বলবে—মিথ্যা বল না,—আমায় কি তুমি এতই ভয়ানক বলে জেনেছ? তা যদি জেনে থাক প্রতিভা, তবে এটাও জেনো, মস্ত ভুল করেছ তুমি।

না প্রতিভা, তোমার যাওয়া হবে না,—কোথাও যাওয়া হবে না। আমি তোমায় চিনেছি, তুমি আমায় চিনেছ। আমি তোমায় আকর্ষণ করেছি বলেই, তুমি আমার এত কাছে এসে পড়েছ,—দোষ যে আমারই, পাপ যে আমারই প্রতিভা! আমার জন্যে তুমি যে মাথা পেতে সকল দণ্ড অকাতরে সইবে, তা আমি হ'তে দেব না,—তা আমি সহ্য করতে পারব না। আমি তোমায় যেতে দেব না, তোমায় ওইখানেই থাকতে হ'বে। যদি তুমি আমায় বিশ্বাস করে থাক, তবে আমি আবার ওখানে ফিরব; আর যদি আমায় অবিশ্বাসী জেনে থাক, আমি আর যাব না। পত্র পাঠ তোমার মত লিখবে। তোমার পত্র পেলে, আমি শান্তি পাব, নচেৎ নয়। তোমার কথাটির উপরে আমার জীবন নির্ভর করছে, এইটুকু জেনে পত্র দিয়ো। শৈলেন।

প্রতিভা পত্রখানা বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া সেখানে লুটাইয়া পড়িল,—তাহার হৃদয়ের আবেগ অশ্রুধারা রূপে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

কে বলে সংসার সুখের? এ সংসার যে দুঃখে ভরা,—বিষ যে নিরন্তর উথলাইয়া ইহাকে প্লাবিত করিয়া দিতেছে। ভগবান, ভগবান, রক্ষা কর প্রতিভাকে, রক্ষা কর, বাঁচাও। বিষে তাহাকে জর্জ্জরিতা করিয়ো না।

এতদিন প্রতিভা নিজেকে চিনিতে পারিয়াছিল, আজ সে শৈলেনকেও চিনিতে পারিল। আজ সে ভাবিতে লাগিল, কি করিল সে?

হায়, কাল পত্রখানা আসিল না কেন? কালই সে অপরিচিতা বড়-যাকে পত্র দিয়াছে—সেখানে সে যাইবে। সুষমাও সে সংবাদ জানেন না। কাল সাবিত্রী উপাখ্যান-খানা পড়িয়া পর্য্যন্ত বুকের মধ্যে সে এক অসহ্য, অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করিতেছিল; সন্ধ্যা-বেলা বসিয়া, খুব অনুনয়-বিনয় করিয়া বড়-যাকে পত্র লিখিয়াছে,—আজ সকালেই দাসীকে দিয়া সেখানা পোষ্ট করিয়া দিয়াছে। এতক্ষণ সে পত্র কোথায়?

দেবতা! কেন তুমি এই পতিতা—ঘৃণিতাকে ভাল-বাসিলে? তোমার ভালবাসা লাভ করিবার মত কি গুণ আছে তাহার? ওগো, তোমার এ প্রেম ফিরাইয়া লও,—বিধবাকে ভালবাসিয়া মহাপাতক সঞ্চয় করিয়ো না।

প্রতিভা চোখ মুছিতে-মুছিতে স্থির করিল, এখানে থাকা কোন মতেই হইবে না। তাহার নিজেকে রক্ষা করা যেমন আবশ্যক, শৈলেনকে রক্ষা করাও তেমনি প্রয়োজন। সে দূরে সরিয়া গেলে, শৈলেন নিশ্চয়ই তাহাকে ভুলিয়া যাইবে, বিবাহ করিবে, সুখী হইবে। ভগবান! প্রতিভার হৃদয়ে বল দাও,—এখান হইতে যাইবার সময় তাহার বুক যেন না কাঁপে, পা যেন না টলে।

তখনও সেই পত্রখানা সে বুকের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া-ছিল,—শৈলেনের প্রচ্ছন্ন হৃদয়ের ভাষা সে যেন হৃদয়ের মধ্যে স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিতেছিল। পত্রখানা আবার সে পড়িল,—আবার মুখের উপর সেখানা চাপা দিয়া, নীরবে অশ্রুজল ফেলিতে লাগিল।

কখন যে সুষমা নীরবে আসিয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া-ছিলেন, তাহা সে জানিতেও পারে নাই। সুষমা নিঃশব্দে

দাঁড়াইয়া প্রতিভার পানে চাহিয়া রহিলেন,—তাঁহার মুখ তখন অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল।

মুখের কাগজখানা সরাইয়া চোখ মুছিতে গিয়াই প্রতিভা চমকাইয়া উঠিল; চোখটা সে মুছিতেও পারিল না, বিস্ফারিত নেত্র তুলিয়াই সে তাড়াতাড়ি মুখ নীচু করিল!

সুষমা গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন "প্রতিভা!"

প্রতিভা আর একবার মুখ তুলিয়াই মুখ নত করিল।

সুষমা তেমনিই স্বরে বলিলেন "ওখানা কার পত্র, দেখি।" প্রতিভা পত্রখানা সুষমার পদতলে ফেলিয়া দিয়া, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সেখানে লুটাইয়া পড়িল।

সুষমা পত্র পড়িলেন; সেখানা নিজের অঞ্চলে বাঁধিতে-বাঁধিতে বলিলেন, "তুমি তা'হলে এখানেই থাকতে চাও?"

কি কর্কশ সে কণ্ঠস্বর! কে জানে, সুষমার চির শান্ত, চির মধুর কণ্ঠ এমন কর্কশ স্বরও সৃজন করিতে পারে?

প্রতিভা তেমনি ভাবেই পড়িয়া রহিল।

সুষমা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "পোড়ামুখী তুই, রাক্ষসী তুই। যথার্থই আমাদের চির-শান্তিময় সংসার তোর বিষাক্ত শ্বাস-প্রশ্বাসে জ্বালিয়ে দিতেই এসেছিস। আমি আজ বলছি, তোর মরণই ভাল প্রতিভা। সে দিন যখন মরতে গেছলি, তখন আমিই বাধা দিলুম; আজ সেই আমিই বলছি, তুই এখনই যদি মরতে পারিস প্রতিভা, তা হ'লে যথার্থই আমি বড় সুখী হই,—আমার ভাঙ্গা এ সংসার আবার আমি নূতন করে গড়ে তুলতে পারি।"

প্রতিভা তথাপি উত্তর দিল না।

সুষমা বলিলেন, "আমি বুঝেছি, তোকে কিছুতেই আমি বাঁচাতে পারব না। এ স্রোতের মুখে কুটোর মতই ভেসে চলেছিস তুই,—আমার কি ক্ষমতা আছে যে, টেনে তুলব তোকে। তুই সেদিন আমার হাতে না নিজেকে সঁপে দিয়েছিলি? সবটা দিতে পেরেছিলি কি হতভাগী? যদি অন্তর-বার সবটা দিতে পারতিস, তা হ'লে এই পত্রখানা পেয়ে আবার তোর মরা গাঙ্গে বান ডেকে উঠবে কেন? রাক্ষসী, নিজে মরছিস মর, আবার তাকে টানছিস কেন? সে তোর কি করেছে? ভুলে গেছিস—তুই কি?"

প্রতিভা উচ্ছ্বসিত রোদনের সুরে বলিয়া উঠিল, "ভুলি নি দিদি, ভুলি নি! আমি বিধবা, এ কথাটা আমার মনে জেগে আছে বলেই আমি বেঁচে আছি। যদি সে কথাটা ভুলতুম দিদি, নিশ্চয়ই আমি আত্মহত্যা করতুম। আমায় মাপ কর দিদি—"

বাধা দিয়া সুষমা বলিলেন, "না, আর মাপ করব না। তোকে এ পাপের শাস্তি দেওয়া দরকার।"

প্রতিভা চোখ মুছিতে-মুছিতে উঠিয়া বলিল, "শাস্তি দেবে দিদি? আমিও তাই চাই। ভালবেসে আমায় ফিরাতে পারবে না, ওতে আমার মন মানা মানবে না; আমায় এমন শাস্তি দাও, যা চিরকাল আমার মনে গাঁথা থাকবে।"

সুষমা বলিল, "কি শাস্তি নিতে চাস তুই?"

প্রতিভা তাঁহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আজীবন নির্ব্বাসন।"

সুষমা স্তব্ধ হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পরে বলিলেন, "আমি তোকে নির্ব্বাসনই দিচ্ছি প্রতিভা! যে পর্য্যন্ত না ঠাকুর-পোর বিয়ে হয়, সে সুখী না হয়, সে পর্য্যন্ত তুই ফিরতে পাবিনে এখানে,—এই কথাটা মনে রাখতে পারবি তো?"

প্রতিভা বলিল, "কেন পারব না দিদি? আমি তো চিরকালের বিদায়ই চাচ্ছিলাম,—তুমি আমায় এত কম দণ্ড দিলে কেন? আমি যে মহাপাপ মনের কোণে সঞ্চয় করেছি, তার জন্য কঠিন দণ্ডের ব্যবস্থা করাই তো উচিত ছিল দিদি!"

সুষমা বসিয়া পড়িয়া, তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া বুকের মধ্যে আনিলেন; অঞ্চলে তাহার প্রবহমান অশ্রুধারা মুছাইয়া দিতে-দিতে, ভগ্ন কণ্ঠে বলিলেন, "না বোন, ততদূর কঠিন হ'তে পারলুম না। তোকে কোথাও পাঠিয়ে আমিই কি স্থির থাকতে পারব, ছোট বোনটি আমার? আমি যে বুকে করে তোকে মানুষ করেছি। চিরকাল আমার সাথী তুই, তোর সাথী আমি। কত কষ্টে পড়ে তোকে বিদায় দিতে চাচ্ছি, তা কি তুই জানছিস নে প্রতিভা? এ চেষ্টা আমার শুধু তোদের দুজনকে রক্ষা করবার জন্যে। ভগবান যদি তোকে কুমারী করে রাখতেন, আমিই যে তোকে বরণ করে ঘরে তুলতে পারতুম। তোর কপাল যে পোড়া হতভাগি, নিজের দোষে সব হারিয়েছিস। আমাকে বড় কঠিন বলে ভাবছিস প্রতিভা? ওরে, বাধ্য হয়ে আমায় যে কঠিন হ'তে হচ্ছে।

তোর ভাল-মন্দের ভার যে সম্পূর্ণ আমার হাতে,—ছোট-ঠাকুর-পোর অনেক ভারও যে আমার হাতে ! আমার কর্ত্তব্য আমি কঠিন হয়েই পালন করব। সেই কর্ত্তব্যের বাইরে—আমায় কঠিন ভাবিস নে বোন! সেখানে—সেই গণ্ডীর বাইরে আমি তোর সেই দিদি।"

সুষমার চোখ দিয়া জল ঝরিয়া প্রতিভার মাথায় পড়িতে লাগিল। প্রতিভার তখন কথা কহিবার ক্ষমতা ছিল না।

সুষমা একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আজ সকালে তোর বড়-মাকে পত্র দেছিস কি সেখানে যাবার জন্যে ?"

যথাসাধ্য গোপনে পত্র দিলেও তাহা কেমন করিয়া সুষমার চোখে পড়িয়া গেল, তাহা ভাবিয়া প্রতিভা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। রুদ্ধ কণ্ঠে যথাসম্ভব পরিষ্কার করিয়া সে উত্তর করিল "হ্যাঁ।"

সুষমা বলিলেন, "আমাকে না জানিয়ে কেন সেখানে পত্র দিলি প্রতিভা ?"

প্রতিভা একটু নীরব থাকিয়া বলিল, "আর কোথায় যাবার মত জায়গা আছে আমার দিদি ?"

সুষমা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সে কথা ঠিক। এমন কপাল তোর যে, কোথাও যাবার মত একটা জায়গা নেই। আমি যে তোকে চিরকাল আমার কাছে রাখব বলেই মাসীমার কাছ হ'তে নিয়েছিলুম, আমার সে প্রতিশ্রুতির কথা ভেবে এক-এক সময় চোখের জল বাধা মানছে না। আবার ভাবছি, তোকে সৎপথে রাখবার জন্যে আমায় সকল ক্ষতিই সইতে হবে। আমি ভেবেছিলুম, তোকে দাদার কাছে পাঠাব।"

প্রতিভা মলিন হাসিয়া বলিল "হ্যাঁ, দাদা আবার আমাকে নেবে। পাছে খরচ হয়, সেই ভয়ে একটা ঝি-চাকর পর্য্যন্ত রাখে না—"

সুষমা আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "আমি তোকে প্রতি মাসে খরচ পাঠাতুম,—দাদার কোনও আপত্তি করবার কারণ থাকত না তাতে। আর বছর-খানেক বই তো নয়,—তার মধ্যেই ঠাকুর-পোর বিয়ে দিয়ে ফেলব,—তখন আনব তোকে।"

প্রতিভা মাথা নাড়িয়া বলিল, "না দিদি, ছোড়দা এ বাড়ীতে থাকতে, আমি আর আসব না, তা বলে দিচ্ছি।"

সুষমা কোমল স্বরে বলিল, "কেন আসবি নে ? মানুষ কত অসাধ্য-সাধন করছে, আর তুই এই সামান্য চিত্ত জয়টা করতে পারবি নে প্রতিভা ? তবে মানুষ হয়ে জন্মিয়েছিস কেন বল তো ? প্রত্যেক মানুষই জন্মায় একটা উদ্দেশ্য নিয়ে,—কারও সৎ, কারও অসৎ। তোর উদ্দেশ্য যাতে সৎ হতে পারে, তার চেষ্টা করবি নে ? তোর মধ্যে কে আছে, তা ভেবে দেখ দেখি। চিন্ময়ী মা যে তোর মধ্যে,—তাঁকে ভুলে মিছে মোহে ভুলে রয়েছিস,—অহং জ্ঞানটাকেই দেখছিস। তুই সাধন কর দেখি সেই মাতৃ-শক্তিকে জাগিয়ে তোলবার; যতক্ষণ না সাধনা করবি, ততক্ষণ তোর এ অহঙ্কার যাবে না। সর্ব্বদাই মনে জাগিয়ে রাখ—তুই মা; তুই মেয়ে নস, বোন নস, কেউ নস,—তুই কেবল মা। তুই নির্দ্দিষ্ট কারও নস,—তুই জগতের মা। ওরে, জানবি কি তুই,—এই মাতৃত্ব পদটা কত মধুর, কত শান্তি-দায়ক। এতে ছোট-বড়, ভেদাভেদ জ্ঞান, সব দূর করে দেয়; লক্ষ্য সেই একের পানে নির্দ্দিষ্ট থাকে। জাগ প্রতিভা, জেগে ওঠ একবার, এমন করে ঘুমিয়ে থাকিস নে,—নিজের মায়ায় নিজে ভুলে থাকিস নে। বিস্তার করে দে নিজেকে,—অনন্তকে কাছে পেয়ে যাবি। মাতৃজ্ঞান লাভ করলে, ওই ছোটঠাকুর-পোকেই বড় কাছে পাবি। যতক্ষণ না সে জ্ঞান লাভ হয়, ততক্ষণ তোর ছোট-বড় ভেদাভেদ জ্ঞান থাকবে। দেখ, ঠিক সাধনা করতে পারবি তো ? তোকে সাধনা করবার জন্যে, সিদ্ধিলাভ করবার জন্যে, আমি এক বছর কেন, দুই-তিন বছরও ছেড়ে থাকতে পারি। পারবি কি আমার কথা রাখতে, চেষ্টা করবি কি ?"

প্রতিভা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "পারব দিদি।"

কেন যে সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল সুষমা তাহা বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার কথা রাখিতে তাহাকে আপনাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে; নিজেকে বিসর্জ্জন না দিলে যে সে মাতৃত্ব পদ লাভ করিতে পারিবে না।

বাহির হইতে অভয় ডাকিল "বড় মা—"

কণ্ঠস্বরটা কেমন দোসুরো হইয়া গিয়াছিল,—তাই সেটাকে খুব কাসিয়া ঠিক করিয়া লইয়া সুষমা বলিলেন, "কেন রে ?"

অভয় বলিল, "গাছে এই আমটা পেকে উঠেছিল, পেড়ে এনেছি।"

"আয় এখন বাইরে, তার পর যা হয় তাই করা যাবে" বলিয়া সুষমা প্রতিভাকে টানিয়া বাহিরে লইয়া আসিলেন।

পিসীমা রন্ধন-গৃহ হইতে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া, আমটা দেখিয়া সদুঃখে ললাটে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "আ আমার পোড়াকপাল রে! আচ্ছা অভয়, এই নীল রঙ্গের আঁবটা কে পাড়তে বললে বল্ দেখি তোকে? এই না কি তোর পেকে ওঠা! মরণ আর কি! বলি, চোখ দুটো তোর কোন্ তেপান্তর মাঠে গেছল রে ডেকরা? আহা, বাছা যোগিন কত আশা করে আঁবটাকে দেখে রেখেছিল,—পোড়ারমুখো আবাগের বেটা তার আশার আঁবটাকে এমন করেও নষ্ট করলে গা?"

সুষমা অভয়ের শুষ্ক মুখের পানে তাকাইয়া বলিলেন, "এই তো বেশ আধ পাকা হয়েছে, পিসীমা?"

পিসীমা বিকৃত মুখে বলিলেন, "অমনি গলে গেলে বাছা? তোমার জ্বালায় চাকর-বাকরদের যদি কিছু বলবার যোটা থাকে; এমন করে এসে পড়, যেন তোমারই কে আত্ম-স্বজন হয় ওরা। এমনি করেই তো চাকর বাকর সব গোল্লায় গেল। একটা কথা বললে অমনি উড়িয়ে দেও। তোমায়—আথেরে বাছা অনেক সইতে হবে। কেউ মানবে না,—সবাই যদি মুখের পরে পষ্ট জবাব না দিয়ে যায়, তবে আমার নামই সত্যি নয়।"

সুষমা অপরাধিনীর ন্যায় নত বদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। খানিক পরে অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "আমিই আজ সকালে বাগানে গিয়ে অভয়কে বলেছিলুম পাড়তে—না অভয়? আমার তখন কি মনে হ'ল জানি নে। ওর কি সাধ্যি আছে, কেউ না বললে অমনি গাছ হ'তে পেড়ে আনে!"

অভয় কোনও জবাব দিল না। সুষমা অনেক সময় দাসী ও ভৃত্যদের বাঁচাইবার জন্য তাহাদের অপরাধ নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইতেন; ইহাতে তাহারা বাঁচিয়া যাইত। সুষমা তাহাদের বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিতেন,—কৃতজ্ঞতায় আর্দ্র হইয়া যদি তাহারা কোন দিন সত্যকে ব্যক্ত করিয়া ফেলে, তাহা হইলে সেই দিনই তাহাদের দূর করিয়া দিবেন। শুধু এই মিষ্ট শাসনটুকুর বাধা সকলকে বিশেষ জব্দ করিয়া রাখিত। অভয়ের চোখ ছলছল করিতে লাগিল। সে সুষমার পানে মুখ তুলিয়া চাইতেই দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। সে তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিল, মুখ দিয়া কথা ফুটিল না।

পিসীমা সুষমার কথা শুনিয়া অবজ্ঞাভরে বলিলেন, "বলে থাক ভালই। তুলে রাখগে আমটা একটা হাঁড়িকুড়ির মধ্যে; বেশ করে কাপড়ে জড়িয়ে গরমে রাখ গে, দেখ যদি পাকে। যোগিন আসবার পরে পেকে ওঠে তো বড় ভাল হয়। খুব সাবধানে রেখো বাছা, অমিয় যদি দেখতে পায় একটীবার, তা হ'লে আর রাখবে না। ছেলেটাকেও অতিরিক্ত আদর দিয়ে মাটি কর্লে বাছা,—ছেলে যেন আহ্লাদে গোপাল হয়ে নেচে-নেচে বেড়াচ্ছে। কিছু না বললে কি ছেলেপুলে বশে থাকে?"

কিন্তু বাস্তবিক ইহাতে তিনি বড় খুসী ছিলেন; অপরের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সহিত সুষমার তুলনা করিয়া তিনি বড় গর্ব্ব অনুভব করিতেন।

আপন মনে বকিতে-বকিতে তিনি রন্ধন-গৃহে চলিয়া গেলেন,—অভয় বাহিরে চলিয়া গেল। প্রতিভা বলিল "বড়দাদাবাবু কবে ফিরবেন দিদি?"

সুষমা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ঠিক করে কিছু তো লেখেন নি। লিখেছেন, দুদিন বাদেও ফিরতে পারি, দশদিন বাদেও ফিরতে পারি।"

প্রতিভা বলিল "কারবারের কথা কিছু লিখেছেন?"

সুষমা বিষণ্ণ মুখে বলিলেন, "তিনি এলাহাবাদ হ'তে পত্র দিয়েছেন,—সেখানকার কারবার ফেল পড়ে গ্যাছে; তিনি সেখানকার কারবার তুলে দিয়ে দিল্লী যাবেন লিখেছেন। দিল্লী গিয়েই বা কি ফল হবে, তা বুঝতে পারি নে। সব জায়গার কারবারই যে ফেল পড়ে গেছে, তাতে আমার একটুও সন্দেহ নেই।"

আর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি আমটা উঠাইয়া লইয়া গৃহে চলিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

স্বামী বিবেকানন্দ

অধ্যাপক শ্রীকামাখ্যানাথ মিত্র, এম-এ

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব গত ৯ই জানুয়ারী তারিখে ভারতের সর্ব্বত্র, এবং ভারতের বাহিরে মেসোপটেমিয়ায়, অষ্ট্রেলিয়ায়, নিউজিলণ্ডে ও ষ্ট্রেটস্ সেট্‌লমেণ্টে, এবং পাশ্চাত্য জগতেরও প্রায় সর্ব্বত্র অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই যে জগদ্ব্যাপী অনুষ্ঠান, ইহার কারণ কি? এই প্রশ্ন অদ্যকার দিনে স্বতঃই মনে উত্থিত হয়। এই প্রকার বৃহৎ অনুষ্ঠান রামকৃষ্ণ ব্যতীত বর্ত্তমান ভারতের আর কাহারও স্মৃতি উপলক্ষে আমরা দেখি নাই বা শুনি নাই। তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, বর্ত্তমান ভারতের ও বর্ত্তমান বাংলার বিবেকানন্দ বর্ত্তমান জগৎকে ও বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান ভারতকে এমন কিছু দিয়াছেন, যাহার জন্য আমরা চির-কৃতজ্ঞ;—এমন কোন আদর্শ আমাদের সম্মুখে তিনি স্থাপন করিয়াছেন, যাহার আকর্ষণী-শক্তি আমরা মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিতেছি, এবং যাহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা ও আয়োজন সর্ব্বত্র লক্ষিত হইতেছে।

কিন্তু তাঁহার দান ও আদর্শ উপলব্ধি করিবার পূর্ব্বে, তাঁহার ব্যক্তিত্ব-ব্যাপারটী হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। যিনিই তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তিনিই যুগপৎ হর্ষে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছেন। বিবেকানন্দের অভ্যুদয় ভারতের ও জগতের ইতিহাসে একটী স্মরণীয় ঘটনা। তাঁহার বীর-মূর্ত্তি দেখিয়া, তাঁহার জ্বালাময়ী বাণী শুনিয়া, তাঁহার জীবনের মহত্ব, পবিত্রতা, উৎসাহ, শৌর্য্য, বীর্য্য, ত্যাগ, সত্যনিষ্ঠা ও প্রেমের স্পর্শ পাইয়া কত লোকের যে জীবনের স্রোত ফিরিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আর যেদিন হইতে তাঁহার বীরবাণী প্রচারিত হইয়াছে, সেইদিন হইতেই এদেশে নবযুগের উন্মেষ হইয়াছে,—স্বদেশে-বিদেশে শত-শত লোক তাঁহার মহত্ব সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন ও করিতেছেন।

বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই মহাপুরুষের খ্যাতির সূচনা এদেশে নয়,—সুদূর আমেরিকায়। কবি বায়রণ বলিয়াছিলেন, "I woke one fine morning and found myself famous"। স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে এ উক্তিটী সর্ব্বতোভাবে প্রযুজ্য। একজন অজ্ঞাত-কুল-শীল, সহায়-সম্বলহীন বিদেশী শ্যামকায় সন্ন্যাসী চিকাগো ধর্ম্ম-মহাসভায় দাঁড়াইয়া "Sisters and brothers of America" বলিয়া সম্বোধন করিবামাত্র, সহস্র-সহস্র শ্বেতকায় নরনারী আসন ত্যাগ করিয়া, টুপি ও রুমাল আন্দোলন করিয়া, তাঁহাকে অভিবাদন করিল; তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইবামাত্র তিনিই ধর্ম্ম-মহাসভার প্রধান নায়ক হইলেন; এবং সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। Julius Caesar-এর ন্যায় তিনিও বলিতে পারিতেন, "I came, I saw, I conquered"।

তাঁহার মহত্ত্বের সর্ব্বপ্রথম পরিচয় পাই তাঁহার গুরুদেবের শ্রীমুখে, পরমহংসদেব তাঁহাকে "খাপখোলা তলওয়ার" বলিতেন। আরও বলিতেন, "এত বড় আধার এ যুগে আসে নাই। আমার সমস্ত কাজ একে দিয়ে করিয়ে নেব।" তার পর চিকাগো ধর্ম্ম-মহাসভার পর শত-শত গণ্যমান্য ও পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহার মহত্ব উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। Maxim Gun-এর আবিষ্কারক Sir Hiram Maxim তাঁহাকে ধর্ম্মজগতের Nepoleon আখ্যা দিয়াছেন। প্রসিদ্ধ দার্শনিক Prof William James তাঁহার Pragmatism নামক সুবিদিত গ্রন্থে বলিয়াছেন, "The paragon of monistic systems is the Vedanta philosophy of Hindustan, and the paragon of Vedantic missionaries was the Swami Vivekananda who visited our country some time ago." New York-এর প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র লিখিল, "He is an orator by divine right. After hearing him we feel how foolish it is to send missionaries to this learned nation."

এত বড় কাণ্ড যখন সংঘটিত হইল, তখন স্বামী বিবেকানন্দের বয়স মাত্র ত্রিশ বৎসর। ২৯ বৎসর বয়সে তিনি

মানবলীলা সংবরণ করেন। আচার্য্য শঙ্কর, শুনা যায়, ত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁহার জীবনের কার্য্য সমাপ্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের দিগ্বিজয় শঙ্কর-দিগ্বিজয় অপেক্ষাও বৃহৎ ব্যাপার। আমেরিকা ও ইংলণ্ডে ৪।৫ বৎসর থাকিয়া ধর্ম্ম-প্রচার ও ধর্ম্মসঙ্ঘ গঠিত করিবার পর, তিনি ভারতে পদার্পণ করেন; এবং অনেক স্থলে বক্তৃতা ও স্থানে-স্থানে মঠ, সেবাশ্রম ও প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন করেন; এবং 'উদ্বোধন' ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' নামক দুইখানি মাসিকপত্র পরিচালন করেন। তাঁহার অধিকাংশ বক্তৃতা ও রচনা ইংরাজীতে লিপিবদ্ধ; বাংলা ভাষায়ও কিছু-কিছু আছে। বাঙ্গালা দেশের যুবকমণ্ডলীকে আমি এই সমস্ত রচনা পাঠ করিতে বিশেষ রূপে অনুরোধ করি। আমার বিশ্বাস, এই সকল রচনা পাঠ করিলে তাঁহারা নবজীবন লাভ করিবেন। তাঁহার মনস্বিনী ইংরাজ শিষ্যা Sister Nivedita রচিত "The Master as I saw him" এবং তাঁহার "Eastern and Western Disciples" রচিত চারিখণ্ডে সমাপ্ত তাঁহার জীবনচরিত পাঠ করিতেও সকলকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি।

স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত-প্রতিপাদ্য হিন্দুধর্ম্মের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে যে-যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, এবং যেরূপ প্রাঞ্জল ও ওজস্বিনী ভাষায় ও তুলনামূলক সমালোচনা দ্বারা সনাতন সত্য প্রচার করিয়াছেন, এবং সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন, সে বিষয়ে আমি বিশেষ কিছু বলিব না। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বৃন্দ সে ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং নানা ভাবে প্রচার করিতেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ কেবল ভারতের নহেন—তিনি সমগ্র জগতের, এ কথা স্বীকার করি; কিন্তু ইহাও স্বীকার্য্য যে, বিশেষ ভাবে তিনি ভারতের; তিনি এ অধঃপতিত দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। সভ্যতাভিমানী, বলদৃপ্ত পাশ্চাত্য জাতিবর্গের মধ্যে ভারতের মহিমা ও গৌরব তিনি তেজের সহিত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; এবং এই মুমূর্ষু জাতির মধ্যে তিনি নূতন সঞ্জীবনী-শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মের ভিতর দিয়া এই মৃতপ্রায় জাতিকে জাগাইতে চাহিয়াছিলেন। এ জাতির সামাজিক-সমস্যা, শিক্ষা-সমস্যা, অর্থ-নৈতিক-সমস্যা ও রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধান তিনি ধর্ম্মের ভিতর দিয়া সুন্দর ভাবে করিয়া গিয়াছেন। যদি কেহ এই পাশ্চাত্য-সভ্যতা-মোহ-মুগ্ধ ভারতবাসীকে স্বদেশাভিমুখে ফিরাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি এই বীর-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। তাঁহার পূর্ব্বে এ বিষয়ে যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারাও আমাদের নমস্য; কিন্তু স্বামীজির চেষ্টার পার্শ্বে তাঁহাদের চেষ্টা ম্লান ও নিষ্প্রভ হইয়া যায়। তাঁহার বীরবাণী এ যুগের মোহ-মুদ্গর। তাঁহার ঋণ আমরা কখনও পরিশোধ করিতে পারিব না। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে অবশ্য তিনি কিছুই করেন নাই; কারণ, তাঁহার কার্য্য-প্রণালী সাধারণ সমাজ-সংস্কারক ও রাজনৈতিক আন্দোলনকারীর কার্য্য-প্রণালী হইতে স্বতন্ত্র ছিল। তিনি কেবল প্রেরণা দিয়াছেন। দেশের চারিদিকে নবজাগরণের যে সকল লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহার মূলে আর কেহই নহেন,—স্বামী বিবেকানন্দ। ধর্ম্ম-প্রচারক ও ধার্ম্মিক বলিতে আমরা সচরাচর যাহা বুঝি, তিনি কেবল তাহাই ছিলেন না। দেশের চিন্তা তাঁহার প্রধান চিন্তা ছিল। এই চিন্তায় তাঁহাকে আত্মহারা ও অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। তাই মহামতি স্বর্গীয় বালগঙ্গাধর তিলক তাঁহাকে "Patriot saint" সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন।

হিন্দু ও ভারতবাসী নামে স্বামী বিবেকানন্দ অতিশয় গৌরব বোধ করিতেন। অথচ হিন্দু বলিতে আমরা সচরাচর যেরূপ মানব বুঝি, স্বামী বিবেকানন্দ তাহা ছিলেন না। তিনি যদি তাহা হইতেন, তাহা হইলে তিনি আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে যাইতেন না; এবং আমেরিকান্ ও ইংরাজকে তাঁহার শিষ্য শ্রেণীভুক্ত করিতেন না। তাঁহার ন্যায় স্বদেশ-প্রেমিক আমরা কল্পনাও করিতে পারি না; কিন্তু স্বাদেশিকতার সঙ্কীর্ণতা তাঁহাকে কূপমণ্ডুকে পরিণত করে নাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তিনি সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ের কথা আরও অনেকে বলিয়াছেন, এবং এখনও বলিয়া থাকেন; কিন্তু স্বামীজির সমন্বয়ের মধ্যে এমন একটা বিশেষত্ব ছিল, যাহা আর কাহারও মধ্যে আমি সেরূপ লক্ষ্য করি নাই। সমন্বয়ের মধ্যেও জাতীয় বিশিষ্টতা ও জাতীয় গৌরব তিনি সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণে একটা সঙ্কর ভাব অনেক সমন্বয়কারীর মধ্যে দেখা যায়; কিন্তু স্বামীজির প্রণালীর মধ্যে তাহার স্থান আদৌ নাই। তিনি নিজে যেমন হিন্দু ও স্বদেশপ্রেমিক থাকিয়া পাশ্চাত্য ভাবকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত ও নিজস্ব করিয়াছিলেন, তেমনি তিনি চাহিয়াছিলেন যে তাঁহার স্বদেশবাসীও সেইরূপ করুক। ইংরাজ যেমন French ও German culture হজম করিয়াও ইংরাজই থাকে, German যেমন English ও French culture হজম করিয়াও Germanত্ব হারায় না, স্বামীজিও সেইরূপ চাহিয়াছিলেন যে, আমরা পাশ্চাত্য culture হজম করিয়াও ভারতবাসীই থাকিব। হিন্দু-মুসলমান-প্রীতির কথা আমরা রাষ্ট্রীয় স্বার্থের চাপে এখন অনেকে বলিতেছি বটে, কিন্তু স্বামীজি ধর্ম্মের দিক দিয়া সে কথাটা অনেক পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন। "India must have an Islamic body and a Vedantic soul"—তাঁহার উদার হৃদয় হইতে এই মহাবাক্য উত্থিত হইয়াছিল। "অস্পৃশ্যতা দূর কর, নতুবা হিন্দুজাতি ধরা-পৃষ্ঠ হইতে লোপ পাইবে," এ কথাও আমরা এখন বলিতেছি সত্য; কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ অনেককাল পূর্ব্বে যেরূপ মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় সমাজ-শরীর হইতে এই কলঙ্ক দূর করিতে তাঁহার স্বদেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেরূপ জীবন্ত ভাষা আর কাহারও মুখে শুনিলাম না। বর্ত্তমান কালে "ছুঁৎমার্গ" বলিয়া যে কথাটি সংবাদপত্রের স্তম্ভে ও বক্তৃতা-মঞ্চে ঘন-ঘন শুনা যাইতেছে, তাহা সর্ব্বপ্রথম স্বামীজির মুখেই উচ্চারিত হইয়াছিল। ছুঁৎমার্গের উপর তিনি যেরূপ তীক্ষ্ণ শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা শুনিয়াও, দুঃখের বিষয়, আমাদের চৈতন্য এখনও হইল না। আমাদের স্ত্রীজাতির শিক্ষার একটী আদর্শও তিনি আমাদের সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছেন, যাহা আমরা বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষার জন্য স্থাপিত ইংরাজী স্কুল-কালেজেও দেখি না, এবং যাহা গতানুগতিক দেশাচার ও লোকাচার-পীড়িত হিন্দু-সমাজেও দৃষ্ট হয় না। তিনি বেদান্ত প্রচার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সাধারণ বেদান্ত-প্রচারকের ন্যায় তাহা প্রচার করেন নাই; এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন হইতে পাশ কাটাইয়া অরণ্যে ও গিরিগুহায় আমাদিগকে আশ্রয় লইতে বলেন নাই। সে পথ সকলের জন্য নহে। তিনি বেদান্তের সত্যকে সম্পূর্ণ নূতন ধরণে প্রচার করিয়াছিলেন; এবং বাস্তব জীবনে তাহার কার্য্য-কারিতা দেখাইবার জন্য "Practical Vedanta" নামক বহুমূল্য উপদেশ দান করিয়া গিয়াছেন। বেদান্তের এই যে নূতন প্রকারের interpretation বা নব্য ভাষ্য,—ইহা স্বামী বিবেকানন্দের মৌলিক প্রতিভা-উদ্ভূত, এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিজস্ব। সেজন্য কেহ-কেহ ইহাকে Neo-Vedantism আখ্যাও দিয়া থাকেন। আবার বেদান্তের সত্য যেখানে দেশ, কাল অথবা মায়ার রাজ্য অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, সেখানেও তিনি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেন; কারণ সেই রাজ্যটাই প্রকৃতপক্ষে তাঁহার স্বরাজ্য। তাঁহার বেদান্তবিষয়ক বক্তৃতা ও রচনা পাঠ করিলেই তাহা জানা যায়; আর বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম রূপে জানা যায়, তাঁহার গভীর ও মহান্-ভাবপূর্ণ "Song of the Sonnyasin" নামক ইংরাজী কবিতায়। এরূপ ইংরাজী কবিতা আমি কোন ইংরাজ কবির লেখনী হইতেও পাই নাই। পরলোকগত মনস্বী পণ্ডিত ডাক্তার প্রিয়নাথ সেন তাঁহার বেদান্ত সম্বন্ধে যে নিবন্ধ লিখিয়া প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পাইয়াছিলেন, এই কবিতা উদ্ধৃত করিয়া তিনি সেই নিবন্ধের উপসংহার করিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ইংরাজী ভাষাতেই অধিকাংশ বক্তৃতা করিয়াছেন, এবং ইংরাজী ভাষাতেই অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; কারণ, তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র বঙ্গদেশে সীমাবদ্ধ ছিল না। কিন্তু বঙ্গভাষাতেও তিনি "বর্ত্তমান ভারত", "ভাববার কথা," "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" প্রভৃতি গ্রন্থ, এবং অনেকগুলি সুন্দর ও গভীর ভাবোদ্দীপক কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে তিনি এক নূতন রচনা-প্রণালী, নূতনলিখন-ভঙ্গী ও নূতন প্রকারের তেজস্বিতা দান করিয়া গিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বিশদ ভা ব কোন কথা বলা অনেক সময়সাপেক্ষ। সেজন্য আমি মাত্র কয়েকটী সঙ্কেত দিয়া গেলাম। তাহা হইতেই আপনারা তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় পাইবেন। আমি অনেক বড়লোককে আমার জীবনে দেখিয়াছি, এবং স্বামীজির দর্শন লাভও আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত বড়লোক যে কাহাকে বলে, তাহা তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি,—আর

কাহাকেও দেখিয়া নয়। আমি পৃথিবীর কয়েকটী মহাপুরুষের নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী। তাঁহারা ইংল্যাণ্ডের কার্লাইল, ইটালীর ম্যাট্‌সিনি ও রুশিয়ার টলষ্টয়; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঋণী আমি স্বামী বিবেকানন্দের নিকটে।

স্বামীজির ধর্ম্মমত ও অন্যান্য মত কিরূপ ছিল—এই প্রশ্নের উত্তর আমি অতি সংক্ষেপে প্রদান করিব। তিনি অদ্বৈতবাদকেই চরম সত্য বলিয়া মানিতেন, এবং এই চরম সত্যকে সাধনা দ্বারা তিনি লাভ করিয়াছিলেন। অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকের ধারণা এই যে, ইহা এক প্রকার নাস্তিকতা মাত্র,—শুষ্ক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত,—ভক্তি ও কর্ম্মের পরিপন্থী। তদুপরি আবার মায়াবাদ নামক যে বস্তুটী ইহার সঙ্গে জড়িত,—মায়াবদ্ধ জীবের সে নামটী শুনিলে একেবারেই চক্ষুঃস্থির হইয়া যায়। কিন্তু স্বামীজির অদ্বৈতবাদে সেরূপ কোন আশঙ্কার কারণ নাই, যেহেতু তিনি প্রকৃত ভক্ত ও অশান্ত কর্ম্মী ছিলেন; এবং গীতোক্ত ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগের তিনি যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, সেরূপ ব্যাখ্যা কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। সমস্ত মার্গকে এবং বিভিন্ন ধর্ম্মকে তিনি চরম সত্য অদ্বৈতের সোপানাবলী বলিয়া মনে করিতেন; এবং এইরূপে সমস্ত বিরোধের মীমাংসা করিয়াছিলেন। গুরুগত-প্রাণ স্বামী বিবেকানন্দ গুরুর আবশ্যকতা অবশ্যই স্বীকার করিতেন; কিন্তু আমাদের দেশে এই গুরুবাদের যে ব্যভিচার ঘটিয়াছে, এবং গুরুবাদের নামে যে কুল-গুরু-প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, ইনি তাহার সমর্থন করিতেন না। তিনি দেবদেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন, এবং পুনর্জ্জন্মবাদ মানিতেন। অবতারের অস্তিত্বও স্বীকার করিতেন; কিন্তু আমাদের দেশে অবতারের যেরূপ বাড়াবাড়ি ও ছড়াছড়ি, তাহা দেখিয়া এ বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। সকলেই বোধ হয় জানেন, এক সময়ে তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, এবং সে সময়ে তিনি প্রতিমা-পূজা মোটেই সহ্য করিতে পারিতেন না; কিন্তু তাঁহার গুরু পরমহংস দেবের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার এই বিদ্বেষ দূরীভূত হইয়াছিল। যদিও মূর্ত্তি-পূজা তিনি কোথাও প্রচার করেন নাই, তথাপি সরল ও অকপট মূর্ত্তি-পূজককে তিনি সম্মান করিতেন; তাহার ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে আঘাত করিতেন না। তবে মূর্ত্তি-পূজাকে তিনি হিন্দুর অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন না; এবং যে হিন্দুর মূর্ত্তি-পূজায় আস্থা নাই, তাহাকে [illegible] করিয়া মূর্ত্তির সম্মুখে মস্তক অবনত করিতে বলিতেন [illegible] যাহারা মূর্ত্তির প্রতি শ্রদ্ধার অভাব সত্ত্বেও [illegible] লোকমতের ভয়ে মস্তক অবনত করে, তাহাদিগকে [illegible] কপটাচারী মনে করিতেন। মোটের উপর, রামকৃ[illegible] ভাষায় বলিতে গেলে, তিনি ভাবের ঘরে চুরি দেখি[illegible] পারিতেন না। অন্য দিকে, যদি আবার কেহ পা[illegible] সাহেবের অনুকরণে মূর্ত্তি-পূজাকে অন্যায় রূপে আক্র[illegible] করিত, তাহা হইলে তিনি ক্রুদ্ধ হইতেন, এবং [illegible] হঠকারীকে বেশ করিয়া দু'কথা শুনাইয়া দিতেন। অধিকা[illegible] ভেদের সারতত্ত্ব তিনি মানিতেন; কিন্তু অধিকার-ভে[illegible] দোহাই দিয়া সমাজে যে অত্যাচার, অবিচার [illegible] আত্মম্ভরিতার তাণ্ডব নৃত্য হইতেছে, তাহার প্রতি তি[illegible] খড়্গহস্ত ছিলেন। বর্ণাশ্রমের মূল তত্ত্ব তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীক[illegible] করিতেন; কিন্তু যে বর্ণাশ্রমে গুণকর্ম্মের কোন লক্ষণ না[illegible] তাহা তিনি স্বীকার করিতেন না। বরং এই চাতুর্ব্বর্ণে[illegible] নামে দেশের মধ্যে যে সহস্র জাতির গঠন হইয়াছে, এ[illegible] পরস্পরের মধ্যে যে চৈনিক প্রাচীর সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলি[illegible] করিয়া হিন্দু-সমাজকে দুর্ব্বল ও বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, তি[illegible] তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। খাদ্যাখাদ্য সম্ব[illegible] তিনি কোন কথাই বলেন নাই। ও ব্যাপারটা[illegible] তিনি উদাসীনতার দৃষ্টিতেই দেখিতেন। আর [illegible] ধর্ম্মটা হিন্দুধর্ম্ম নামে ভাতের হাঁড়ির মধ্যে আশ্র[illegible] লইয়াছে, সেটাকে তিনি একটা উপহাসের বস্তু ভি[illegible] আর কিছুই মনে করিতেন না। অন্তশুদ্ধি-সাধন [illegible] নিষ্পাপতাকেই তিনি ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ মনে করি[illegible]তেন। পরমহংসদেবের কথায় বলিতে গেলে, "কাম কাঞ্চনে আসক্তি যে জয় করিয়াছে, সে যদি শূকর-মাংস ভক্ষণ করে, তাহাতেও কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু মন যাহার কামকাঞ্চনে পূর্ণ, সে হবিষ্যান্ন ভোজন করিলেও তাহাকে ধার্ম্মিক বলা যায় না।" সমুদ্র-যাত্রা ও বিদেশ-ভ্রমণ তিনি উচিত বিবেচনা করিতেন। বাল্য-বিবাহের তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, একদল যুবক-যুবতী চিরকৌমার্য্যব্রত পালন করিয়া 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিবে।

তাঁহার রাজনৈতিক মত সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বা স্বরাজ তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করিতেন।

যাঁহার মতবাদ এইরূপ,—গোঁড়া বা সঙ্কীর্ণমনা হিন্দুরা তাঁহাকে হিন্দু বলিতেই হয় ত আপত্তি করিবেন। তাঁহারা ঘরের কোণে বসিয়া সকলেই বলেন, "আহা! হিন্দুধর্ম্মের মত কি আর ধর্ম্ম আছে? এ যে সনাতন ধর্ম্ম। আমাদের ন্যায় আধ্যাত্মিক জাতি আর কোথায়?" আর যখন শুনেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ ইয়োরোপ ও আমেরিকায় হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য সপ্রমাণ করিয়াছেন, তখন মনে-মনে খুব আত্মপ্রসাদ লাভ করেন,—যেন এ কাযটা তাঁহারাই করিয়াছেন। কিন্তু এ কথাটা ভাবিয়া দেখেন না যে, ঘরের কোণে বসিয়া "আমি বড়" বলায় এবং বিশ্ব-সভায় বিশ্বমানবের সঙ্গে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসভ্যতার একটা বোঝা-পড়া করিয়া তাহার গৌরব প্রতিষ্ঠিত করায় কত তফাৎ। এ কাযটা করিতে হইলে যে কতটা সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী অতিক্রম করিতে হয়, এবং কতটা মনস্বিতা, সাধনা, সাহস ও পাণ্ডিত্য আবশ্যক, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। ভারতের এক সুদূর বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ভারত অতিক্রম করিয়া দেশ-বিদেশে খাঁটি ভারতের ধর্ম্ম প্রচার করিতে যাইতেন। আর তারপর স্বামী বিবেকানন্দ সাতসমুদ্র পার হইয়া খাঁটি ভারতের ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। বোধ হয় দেড় সহস্র বৎসরের মধ্যে ভারতের ইতিহাসে এত বড় ব্যাপার সংঘটিত হয় নাই। তথাপি আমি জানি, এরূপ লোকও আছেন, যাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দের কার্য্য-কলাপে আত্মপ্রসাদ লাভ করা সত্ত্বেও, তাঁহার সমস্ত মতবাদ শুনিয়া এবং আচার ব্যবহার দেখিয়া, তাঁহাকে হিন্দু বলিতে কুণ্ঠিত হন। কুণ্ঠিত হউন, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় উদার ধর্ম্ম যেমন জগতে নাই, তেমনই হিন্দু-সমাজের ন্যায় সঙ্কীর্ণ সমাজও জগতের আর কোথাও নাই,—অর্থাৎ হিন্দু-সমাজ ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হইয়াছে। তাহা হইলেও, স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি যাহারা শ্রদ্ধা-সম্পন্ন, তাঁহাদিগকে এই পতিত হিন্দু-সমাজের মধ্যে থাকিয়াই তাঁহার আদর্শ জীবনে পালন করিতে হইবে; এবং তাঁহার যে কথাগুলি মনোহারী নয়, অপ্রিয়, অথচ সত্য ও হিতকর, সে কথাগুলি তাড়াতাড়ি চাপা না দিয়া, সেগুলির প্রতি বিশেষ নিবিষ্ট চিত্ত হইতে হইবে। তাঁহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে, এবং তাঁহাদের মধ্যে একপ্রাণতা আনয়ন করিতে হইবে। আর তাঁহাদের চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন দ্বারা তাঁহাদের আদর্শের দিকে হিন্দু-সমাজের অপর সকলকে আকৃষ্ট করিয়া হিন্দু-সমাজকে ক্রমশঃ উন্নত, সবল ও সুস্থ করিতে হইবে। সেজন্য যদি কাহারও বিরাগভাজন হইতে হয়, তাহাতেও দুঃখিত হইবার কারণ নাই। আমাদিগকে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে হইবে এবং দৃঢ়পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ ধৈর্য্য হারান নাই। ধৈর্য্য হারাইলে তিনি নূতন সম্প্রদায় গঠন করিতেন। সে শক্তিও তাঁহার ছিল। আর তিনি নূতন সম্প্রদায় গঠন করিলে, আমার বিশ্বাস, সেই সম্প্রদায় অন্যান্য আধুনিক সম্প্রদায় হইতে সংখ্যাধিক্যে ও তেজ-বীর্য্যে অনেক অধিক পরিমাণে বলীয়ান্ হইত। কিন্তু নূতন সম্প্রদায় গঠন করিবার ইচ্ছা তাঁহার মোটেই ছিল না। কারণ, যে সমস্ত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, সে সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল; এবং সে অভিজ্ঞতা তাঁহাকে নূতন সম্প্রদায় স্থাপন সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান করিয়া দিয়াছিল। তিনি সমগ্র হিন্দু-সমাজকে উত্তোলন করিতে চাহিয়াছিলেন। আমরাও যেন তাঁহার আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, হিন্দু-সমাজ হইতে বিচ্যুত না হইয়া, সকলের সঙ্গে যতদূর সম্ভব সদ্ভাব রাখিয়া, দৃঢ়পদে অগ্রসর হই। এই অচলায়তনকে সচল করা দু দিনে সাধ্য নয়, এবং যার-তার কর্ম্ম নয়। তথাপি এই কায আমাদিগকে করিতে হইবে, এবং এই আদর্শ আমাদের সম্মুখে রাখিতে হইবে। এই আদর্শ যদি আমরা জীবনে কিঞ্চিন্মাত্রও পালন করিতে পারি, তবেই স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি-সভার সার্থকতা আছে। নতুবা ইহা একটা ফ্যাসান মাত্র।

স্বামী বিবেকানন্দের মতবাদ যাহা বর্ণনা করিলাম, তাহা শাস্ত্র-সম্মত ও যুক্তিসঙ্গত হইলেও, বর্ত্তমান দেশাচার ও লোকাচার-সম্মত নয়, এবং ব্রাহ্মসমাজের মতবাদ ও মনের ভাব হইতেও সম্পূর্ণ পৃথক। কেহ-কেহ সেজন্য ইহাকে neo-Hinduismও বলিয়া থাকেন। এক কথায়, যদি আমাকে কেহ বলিতে বলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম্মটা কি? তাহা হইলে আমার উত্তর,—শক্তিপূজা, আত্মপ্রত্যয়, স্বাবলম্বন, শৌর্য্য ও বীর্য্য। এই যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে

আমরা স্বাবলম্বনের কথা শুনিতে পাইতেছি, ইহার মূলে স্বামী বিবেকানন্দ। বার বার তিনি বলিয়াছেন, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"; বারংবার তিনি বলিয়াছেন, "উত্তিষ্ঠতঃ, জাগ্রত" এবং "অভীঃ অভীঃ"। প্রচণ্ড ঐশী শক্তি ও বিরাট পুরুষকার স্বামী বিবেকানন্দরূপে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিল। দার্শনিক Bergson তাঁহার "Creative Evolution" নামক গ্রন্থের একস্থানে বলিয়াছেন, "Life is a cavalry charge." এ কথাটা সর্ব্বতোভাবে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে প্রযুজ্য। তাঁহার কার্য্যপ্রণালী cavalry chargeএর অনুরূপই ছিল। আর আমেরিকানরা তাঁহার নাম দিয়াছিল "cyclonic monk";—কারণ বক্তৃতা ও যুক্তির মুখে ঝড়ের ন্যায় তিনি সমস্ত উড়াইয়া লইয়া যাইতেন। বাঙ্গলাদেশ Bengal Royal Tigerএর জন্মদাত্রী; কিন্তু পুরুষসিংহের জন্মদাত্রীও যে তিনি হইতে পারেন, স্বামী বিবেকানন্দকে দেখিয়া তাহা উত্তমরূপে বুঝিয়াছি। তাঁহাকে দেখিয়া বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যৎসম্বন্ধে আশান্বিত হইয়াছি। তাঁহাকে দেখিয়া বাঙ্গালীকে আর "dying race" বলিয়া মনে হয় না। আমরণ স্বামী বিবেকানন্দ শক্তিমন্ত্রেরই সাধনা করিয়া গিয়াছেন। এত বড় নির্ভীক ও তেজস্বী সন্ন্যাসী এ জগতে আর কখনও আবির্ভূত হন নাই। এ যুগের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক আর কেহই নহেন,—কেবল রামকৃষ্ণ শিষ্য বিবেকানন্দ। সে ধর্ম্মে দুর্ব্বলতা নাই, নিরীহ ভালমানুষী নাই, নাকি-সুরে কান্নার চিহ্নমাত্রও নাই। আর ঐ যে আধ্যাত্মিক নামে একপ্রকার স্ত্রীজাতি-সুলভ "কাব্যিরসের" ঢং উঠিয়াছে, তাহার নাম-গন্ধও সে ধর্ম্মে বিদ্যমান নাই। এ জাতির রোগ তিনি যথাযথভাবে নির্ণয় করিয়াছিলেন। সে রোগ দুর্ব্বলতা, সে রোগ তমোগুণকে সত্বগুণ মনে করিয়া আত্মপ্রবঞ্চনা, সে রোগ কপটতা ও ভণ্ডামী, সে রোগ পরপদলেহন ও পরানুচিকীর্ষা। সে রোগ "Slave Mentality." তাই সদর্পে মস্তক উত্তোলন করিয়া জগতের সমক্ষে বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইতে তিনি আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাই তিনি বলিয়াছেন, "আর দাসোঽহম্, দাসোঽহম্ নয়;—ঢের হইয়াছে,—এখন শিবোঽহম্, শিবোঽহম্।" তাঁহার শক্তির উৎস ব্রহ্মচর্য্যে, ত্যাগে ও বৈরাগ্যে। আসক্তিই ভয়, বৈরাগ্যই অভয়,—এ কথা জলদ-গম্ভীর স্বরে পুনঃ-পুনঃ তিনি আমাদিগকে বলিয়া গিয়াছেন। যে শক্তি তিনি প্রচার করিয়াছেন, তাহা আসুরিক শক্তি নয়,—দেব-শক্তি; অগ্নিমন্ত্রে তাঁহার দেশবাসীকে তিনি দীক্ষিত হইতে বলিয়াছেন। তিনি যথার্থই বলিয়াছেন, "চালাকী দ্বারা মহৎ কার্য্য হয় না,—প্রেম, সত্যানুরাগ, ও মহাবীর্য্যের সহায়তায় সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়।" বজ্র-নির্ঘোষে তিনি আত্মতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। গভীর প্রেম ও বেদনার সহিত ত্যাগে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দরিদ্র নারায়ণের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিতে দেশকে উদ্বোধিত করিয়াছেন। এখনও কি আমরা ঘুমাইয়া থাকিব? শ্রবণ করুন, মহাপুরুষ কি বলিতেছেন—

"হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরাণুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্ব্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা;—এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না...তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না...তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না...তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই "মায়ের" জন্য বলি-প্রদত্ত; ভুলিও না,—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মুর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর,—সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল,—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল,—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ; ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর; ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ; ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিন রাত—হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।" *

---

* ফরিদপুর বিবেকানন্দ উৎসবে পঠিত।

নিখিল প্রবাহ

শ্রীনরেন্দ্র দেব

১। গাড়ী বোঝাইয়ের কল

মটোর লরীতে মাল নিয়ে যাবার ভারি সুবিধে; কারণ তাতে অনেক মাল ধরে এবং শীঘ্র পৌছে যায়, কিন্তু প্রকাণ্ড
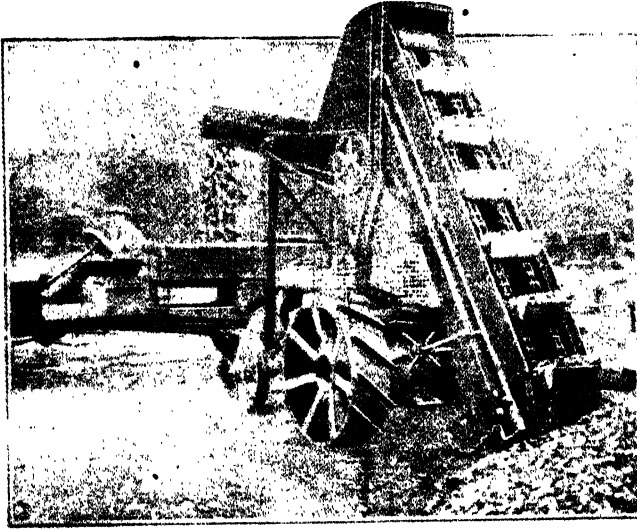
গাড়ী বোঝাই দেওয়া কল

গাছ রং করা

লরী বোঝাই ক'রতে অনেক সময় লাগে এবং বিস্তর মুটের দরকার হয়। মুটে বাদ দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে কি ক'রে লরী বোঝাই দিতে পারা যায়, এইটে অনেকের চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছিল। ফলে ফিলাডেল্ফিয়ার একজন কারিগর অনেক মাথা খেলিয়ে এমন একটি কল তৈরী করেছেন যে, তাতে মিনিটে প্রায় তিরিশ মণ মাল বোঝাই দিতে পারা যাবে, অথচ একটিও মুটের দরকার হবে না।
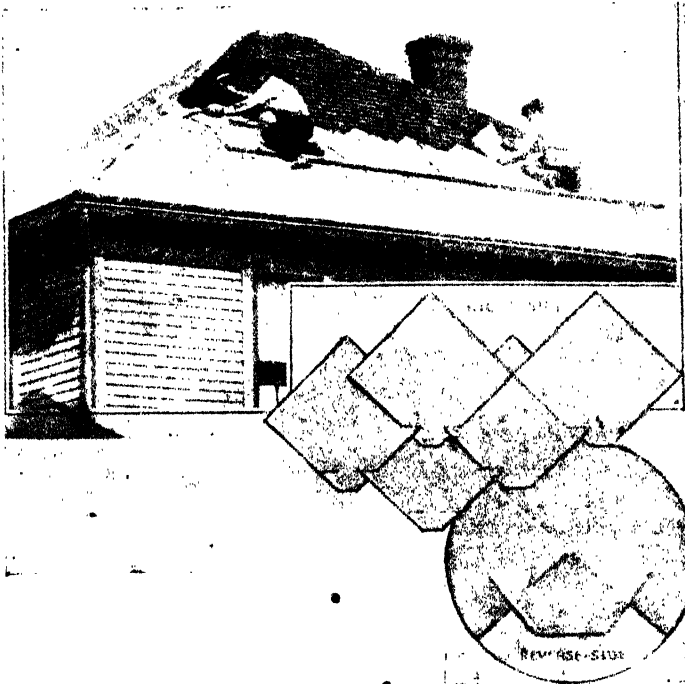
এই গাড়ী বোঝাইয়ের কলটি মটোর লরীর ইঞ্জিনের সাহায্যেই চ'ল্বে। মাল তোল্বার জন্য কতকগুলো 'ফেরা' পরের পর

ছাদের টালি

সিঁড়ির ধাপের মতো দু'খানা লোহার বীমের ওপর এক-জোড়া মোটা চেনের গায়ে সাজানো আছে। চেন জোড়াটা ইঞ্জিনের সাহায্যে অনবরত ঘুরতে থাকে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে 'ফেরা'গুলো ক্রমাগত ওঠানামা ক'রতে থাকে। 'ফেরা'গুলো এমন কৌশলে চেনের গায়ে আঁটা যে প্রত্যেকটি প্রত্যেকবার ওপরে উঠ্‌বার সময় আপনিই মাল বোঝাই করে নিয়ে উঠে যায় এবং ঘুরে নামবা মুখে লরীর ভিতর মাল খালাস করে দিয়ে নেমে আসে।

(Popular Science)

২। ছাদের টালি

এ্যাশফ্যাল্টের এক রকম টালি তৈরী হ'য়েছে, পুরানে কাঠের ছাদের ওপর এই টালি বসিয়ে নিলে ঘরে আ-

নূতন রঙ্গমঞ্চ
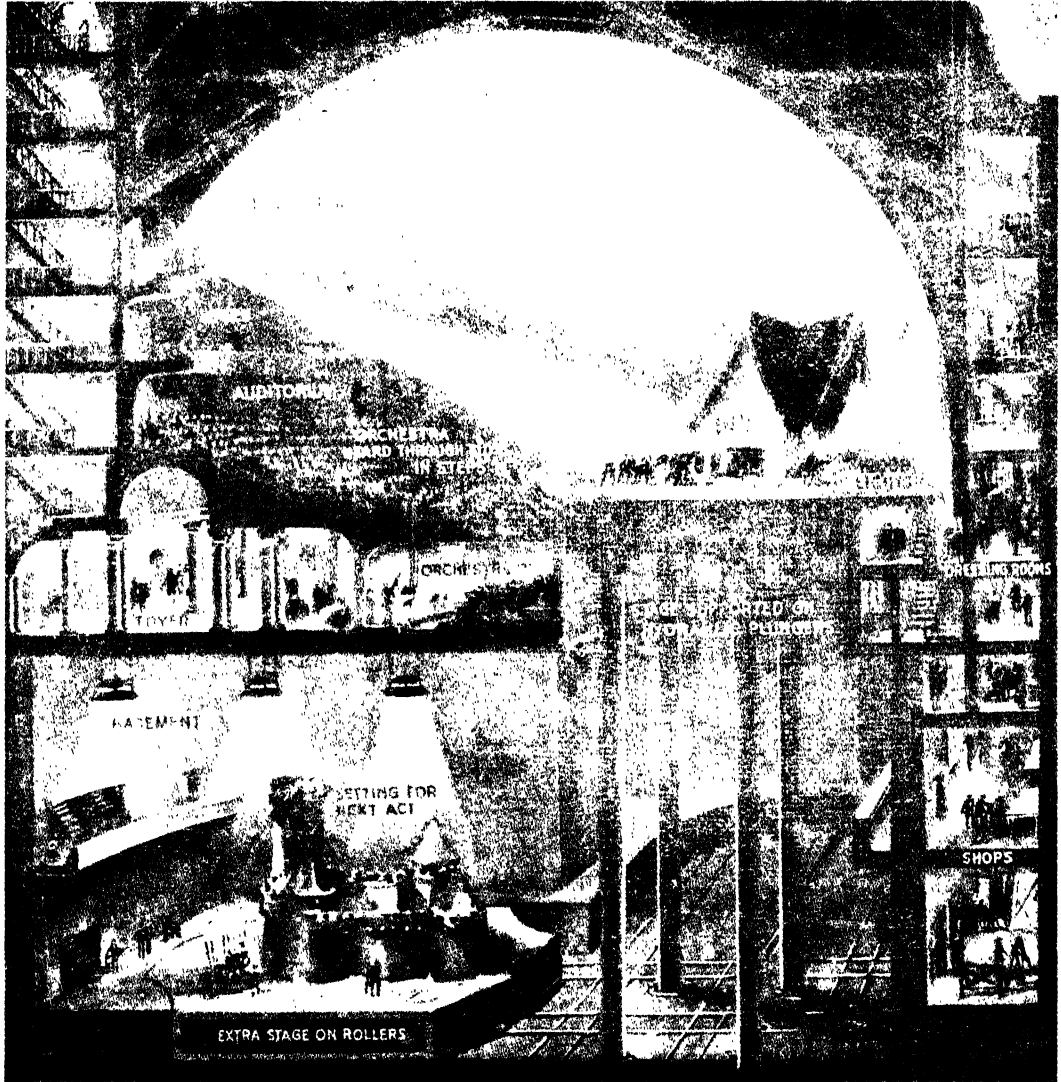
(দ্বিতলের এককোণে বেদীর উপর জলবেগে পরিচালিত যন্ত্রের সাহায্যে উত্থিত রঙ্গমঞ্চ। সামনে দর্শকদের আসন। দর্শকদের আসনের পশ্চাতে টঙের উপর হইতে রঙ্গমঞ্চে আলোক-রশ্মি ফেলা হইয়াছে। বাঁমদিকে সিঁড়ি। ডানদিকে সাজ-ঘর। দর্শকদের আসনের নিচের নিম্নতলে একদিকে ঐক্যতান বাদকদের আসন, একদিকে রঙ্গালয়ের উপপ্রকোষ্ঠ। তার নিচেয় আবার দ্বিতীয় অঙ্কের জন্য প্রয়োজনীয় দৃশ্যটি সুসজ্জিত করে রাখা হয়েছে।)

জল পড়বে না। টালিগুলি দেখ্‌তে পাতলা পেসড্‌বোর্ডের মতো এবং খুব হাল্‌কা বটে, কিন্তু বেশ মজবুদ। ঝড়ে ভেঙে যাবার ভয় নেই, রোদে তেউড়ে যায় না, বৃষ্টিতেও নষ্ট হয় না। কাঠের ছাদের ওপোর এই টালি বসাতে কোনও মিস্ত্রী ডাক্‌বার দরকার নেই, বাড়ীওয়ালা নিজেই একটু চেষ্টা করলে অনায়াসে বসিয়ে নিতে পারে, কারণ

নূতন রঙ্গমঞ্চের নক্সা—(এক কোণে অভিনয়মঞ্চ এবং তাহার সম্মুখে দর্শকদের আসন।)

আলোকের দৃশ্যপট

(কাঁচের উপর অঙ্কিত দৃশ্য ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে রঙ্গমঞ্চের পশ্চাতে লম্বিত পর্দার গায়ে অপরূপ দৃশ্য উদ্ভাসিত করিয়া দিতেছে।)

প্রত্যেক টালিখানির একটি কোণ এমনভাবে দুদিকে চেরা আছে যে, সেই ফাঁকে পরের পর টালি এঁটে যাওয়া খুব সহজ, কেবল মাথার দিকের কোণটিতে একটা করে কাঁটা মেরে দিতে হয়। (Popular Science)

৩। গাছ রং করা

জার্ম্মেনীতে যারা কাঠের আসবাব তৈরি ক'রে, তারা বুদ্ধি ক'রে কাঠ রং কর্‌বার এক সহজ উপায় উদ্ভাবন করেছে। গাছ কেটে শুকিয়ে সেই কাঠে কোনও জিনিস তৈরি ক'রে তারপর তাকে রং না ক'রে, তারা একেবারে সজীব গাছটাকেই রং ক'য়ে ফেল্‌ছে! একটা কোনও পাত্রে পছন্দমত রং জলে গুলে গাছের গুঁড়িরই গায়ে হাত আষ্টেক দশ ওপরে ঝুলিয়ে রাখা হয়। সেই পাত্র-সংযুক্ত একটা সরুনল গাছের শিকড় পর্য্যন্ত নামিয়ে দেওয়া হয়। গাছের শিকড় সেই রং-করা জল মাসখানেক পেলেই সমস্ত গাছটাকে একেবারে ডাল, পালা, পাতা সমেত রঙীন ক'রে দেয়। তখন গাছটা আপনিই মরে যায়। রংটা গুলে দেবার কিন্তু একটু কায়দা থাকা চাই, কারণ যে কোনও রকমের রং গাছে ধরে না। এমনভাবে রংটুকু গুলে দিতে হবে, যাতে গাছ মৃত্তিকাজাত রস আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে রংটুকুও টেনে নিতে পারে। (Popular Science)

৪। রঙ্গমঞ্চে নূতনত্ব

আমেরিকার রঙ্গমঞ্চ সজ্জাকর মিঃ নর্ম্যান বেল্‌গেডিস্ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে একেবারে যুগান্তর নিয়ে এসেছেন।

কাগজের ছাতা
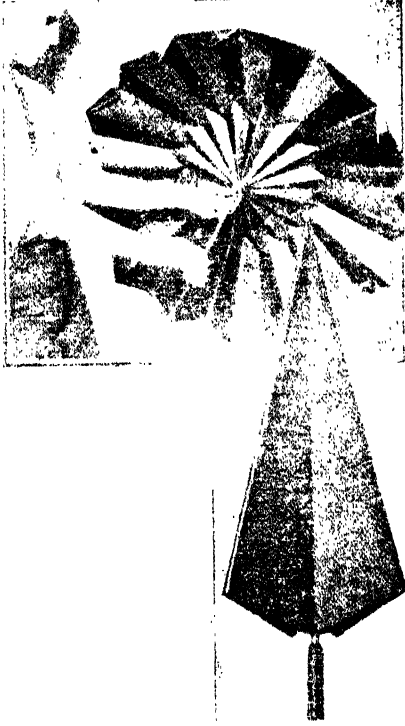
একটি অর্দ্ধ-বৃত্তাকার বেদী মাত্র। বেদীর গায়ে কেবল তিন চার ধাপ সমস্ত বেদী ঘেরা গোল সিঁড়ি আছে। প্রত্যেক সিঁড়ির ধারে জাল-আঁটা অসংখ্য ফোকর কাটা আছে। যবনিকা নেই, দৃশ্যপট নেই, দুধারে কোনও প্রকার পার্শ্ব-দৃশ্য নেই; কেবল পিছনে একখানি সাদা পর্দ্দা টাঙানো আছে। সেই বেদীর সাম্‌নে অর্দ্ধবৃত্তাকারে সমস্ত দর্শকদেরই বস্‌বার আসন। মাথার উপর দর্শকদের বস্‌বার আর অলিন্দ কি বারান্দা আসন নেই। (Box or Dress Circle) রঙ্গমঞ্চের সাম্‌নে ঐক্যতান বাদকদের

আয়নার্ জন্‌সন (তুষার-দ্বীপের ভাস্কর৷)
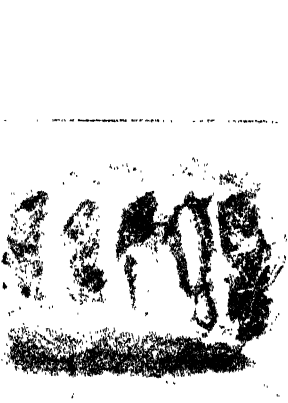
বোল্‌তার চাকে বন্দী মাকড়্‌সা

গুহাবাসী মাকড়্‌সা
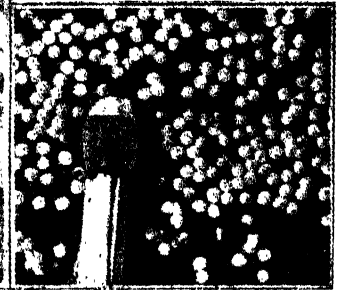
মাকড়্‌সার ডিম

তিনি যে রঙ্গালয় নির্ম্মাণ করিয়েছেন, সেখানে প্রবেশ করে অবাক্ হ'য়ে যেতে হ'বে! তাঁর রঙ্গমঞ্চ দ্বিতলের উপর এবং হলের ঠিক মাঝখানে নয়, হলের এক কোণে। রঙ্গমঞ্চটী বস্‌বার কোনও বন্দোবস্ত নেই—অথচ ঠিক সেইখান থেকেই ঐক্যতান বেজে উঠে দর্শকদের বিস্মিত ও মুগ্ধ করে দেয়, কারণ নিম্নতলে দর্শকদের দৃষ্টির অন্তরালে ব'সে

টারাণ্টুলা

অভিব্যক্তি

আয়নার্ জনসনের কলাভবন

সাধারণ মাকড়সা (বর্দ্ধিত চিত্র)

"তুষার-দ্বীপের তাপস !"
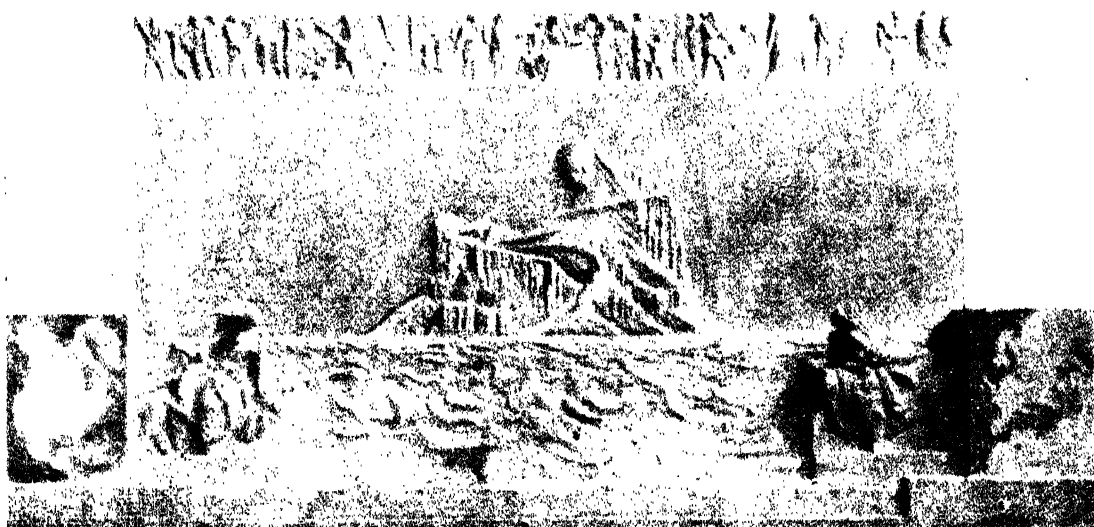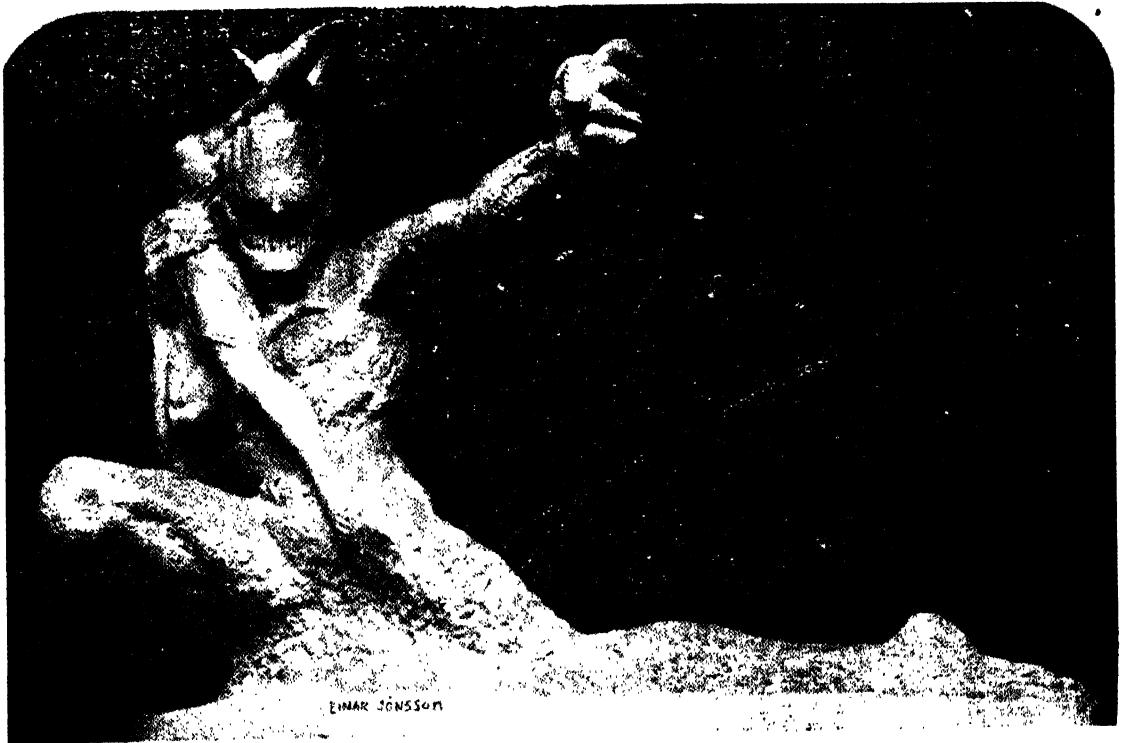
"নিশাবসান"

(এই মূর্ত্তিটি তুষার-দ্বীপে প্রচলিত একটি রূপকথার উপর প্রতিষ্ঠিত। একদিন রাত্রে এক নিশাচর পাহাড়ের গর্ত্ত থেকে নেমে এসে এক রাখালের বাড়ীতে উপস্থিত হ'য়েছিল। রাখাল সেদিন রাত্রে বাড়ী ছিল না। রাখালের সুন্দরী মেয়ে একলা ঘরে ছিল। নিশাচর এসে দোর ঠেলে গান গেয়ে তাকে ডাকতে লাগল। রাখালের মেয়ে বুঝতে পেরে তাকে মিষ্ট কথায় বিদেয় করবার চেষ্টা করতে লাগল। নিশাচর শেষে অধীর হ'য়ে তাকে জোর ক'রে ধরে কাঁধে তুলে নিয়ে পাহাড়ের দিকে চলল। কিন্তু রাত আর তখন বেশী নেই; নিশাচর ভোর হবার আগেই তাকে নিয়ে গর্ত্তে গিয়ে ওঠবার জন্য সমস্ত রাস্তাটা ছুটে ছুটে সেই পাহাড়ে এসে পৌছেচে, অমনি ভোর হ'য়ে গেল! আর সঙ্গে সঙ্গে নিশাচরটাও পাহাড়ের গায়ে পাষাণ হ'য়ে গেল! আয়নার নিশাচরের ঠিক্ এই অবস্থাটা পাথরে ফুটিয়ে তুলেছেন? ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিশাচর পাষাণে পরিণত হ'য়ে আসছে, আর ক্রোধে ক্ষোভে নিষ্ফল আক্রোশে সে আসন্ন প্রভাতকে তার বজ্রমুষ্টি প্রদর্শন করছে!)
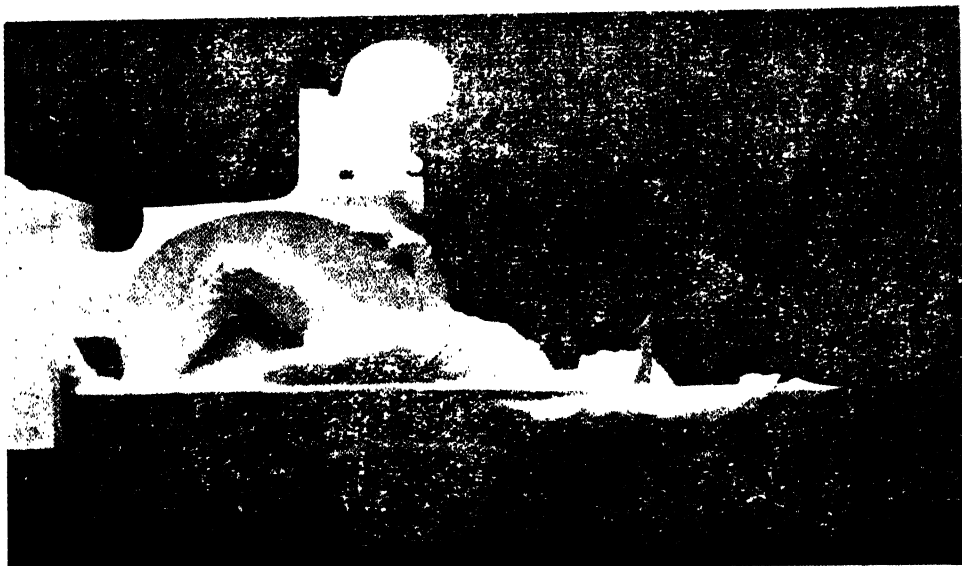
কার্ল সেক্রী ও তাঁহার স্ত্রী-পুত্র — (এই মূর্ত্তি গড়বার জন্যই আয়নার আমেরিকায় আহূত হয়েছিলেন)

"প্রকৃতি-জননী।"—(শিল্পী এই পাথরের মূর্ত্তিতে প্রকৃতি জননীকে নর-সিংহিনী (sphinx) রূপে কল্পনা করেছেন। এই অর্দ্ধ সিংহিনী নারী মূর্ত্তির সুন্দর অথচ ভীষণ মুখে যেন নিখিল জননীর বিরাট মাতৃভাব ফুটে উঠেছে। নর-নারী তাঁর সন্তান মাতৃ-বক্ষের পীযূষ-ধারা আকণ্ঠ পান ক'র্‌ছে।)
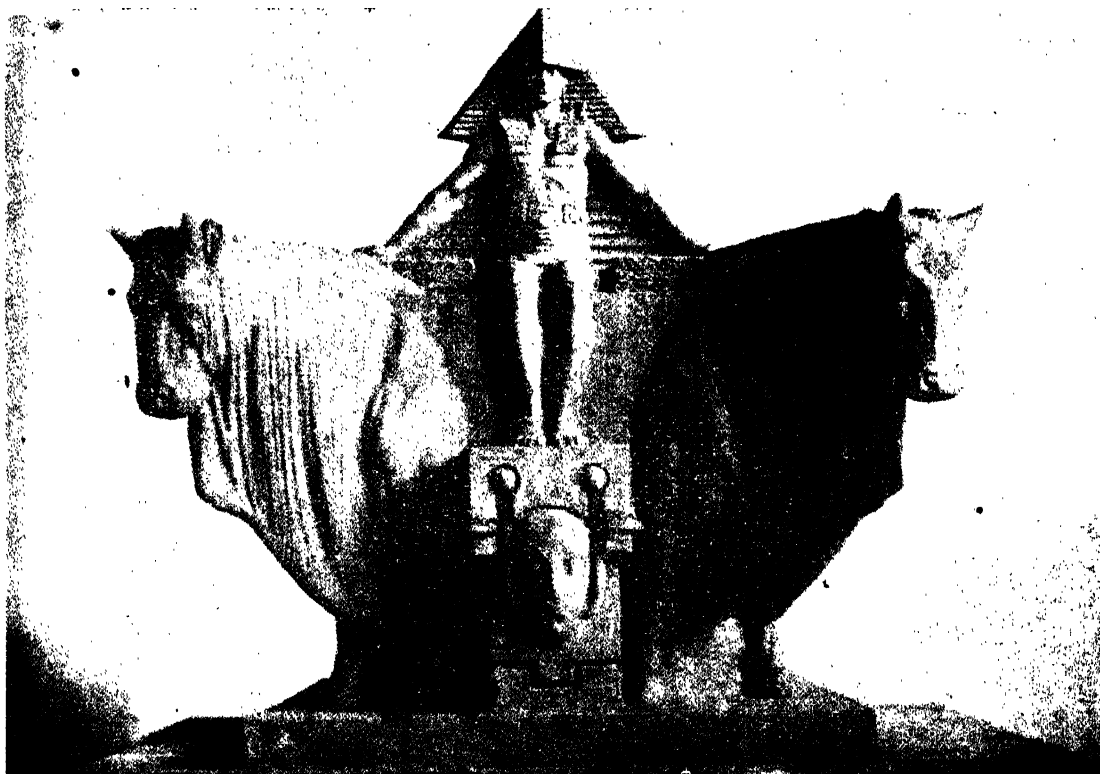
"কালের ঢেউ"—(অনন্ত প্রবাহিত কালের রহস্যাবৃত মূর্ত্তিটি শিল্পী এক প্রতীক্ অবলম্বনে ফুটিয়ে তুলেছেন। তারই তরঙ্গে তরঙ্গে এমন এক অবগুণ্ঠিতা নারী-মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, যার অফুরন্ত গতি বসনাঞ্চল-প্রান্তে হিল্লোলিত হয়ে উঠ্‌ছে।)

"অতলান্তেশ্বর"

কলাভবনের শিল্পাগার

"জীবন দেবী"

কাল সেফ্‌নী ও তাঁহার স্ত্রী-পুত্র

"ভারতেশ্বরীর মর্ম্মর স্মৃতি"

ঐক্যতান-বাদকেরা তাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করে এবং বাদ্যধ্বনি রঙ্গমঞ্চের সিঁড়ির গায়ের ফোকরের ভিতর দিয়ে এসে তাদের কর্ণগোচর হয়।
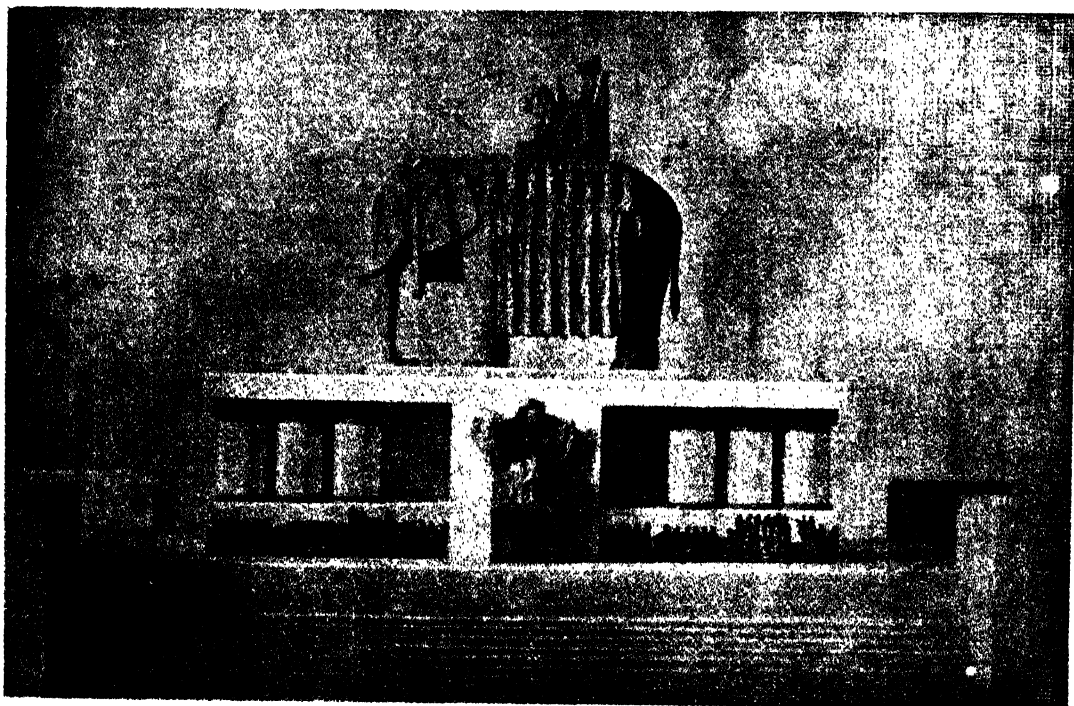
অভিনয় আরম্ভ হবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই রঙ্গালয়ের সমস্ত আলোক নিবিয়ে দেওয়া হয় এবং সেই অন্ধকারের পরিচলিত যন্ত্রের সাহায্যে (Hydraulic lift) সেটি আবার ওপরে উঠে যায়।

এই ওপোরে ওঠ্‌বার পথে একবার কেবল রঙ্গমঞ্চটি সাজঘরের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের বেদীর ওপোর তুলে নেয়। এই ওঠা-নামা ক'র্‌তে
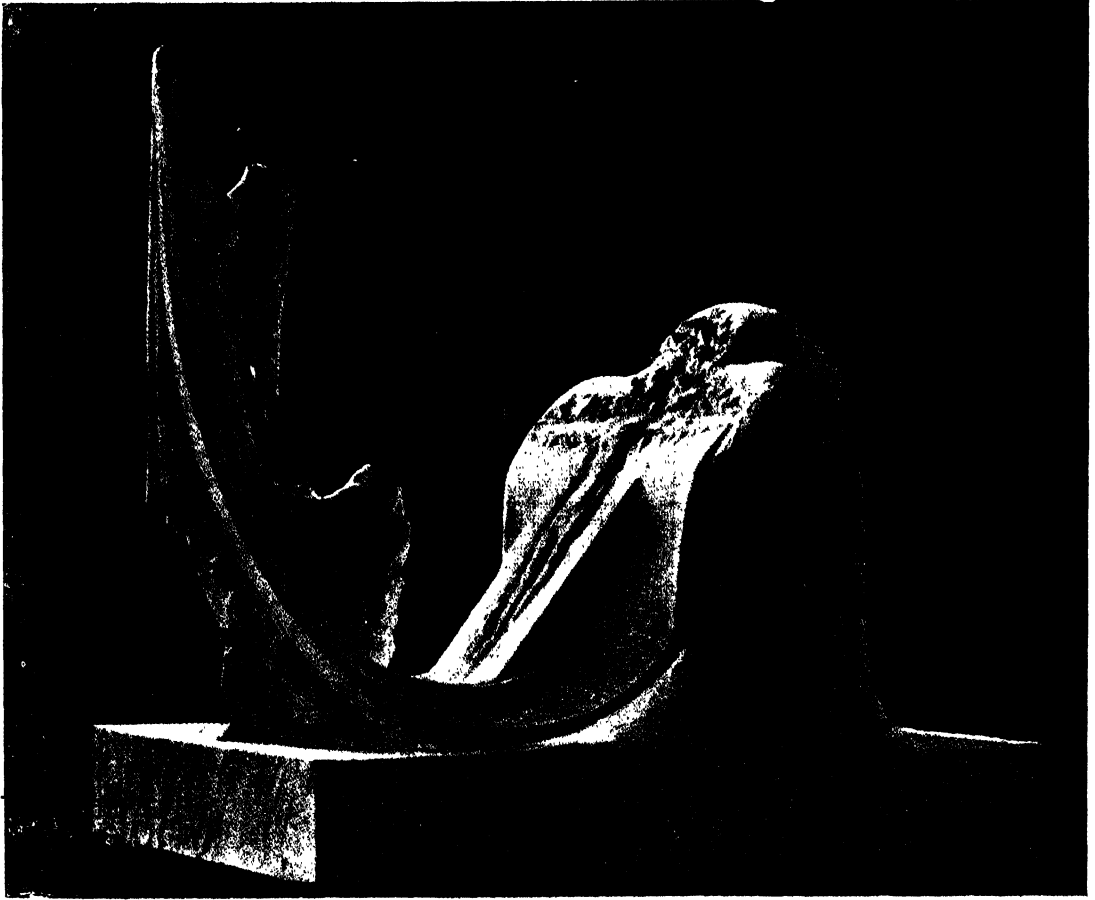
"নবযুগের আবাহন"

(বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ আয়নারের মনে যে ভাবের ছাপ দিয়েছিল, এটি পাষাণ-ফলকে তারই মনোহর বিকাশ! সমর-ক্রুশে একটা যুগের মানব-জীবন হত হ'য়ে ধূলায় পরিণত হ'চ্ছে! সেই ধ্বংসাবশেষ থেকেই আবার এক নব যুগ উত্থিত হ'য়ে স্বর্গের দিকে দু'হাত তুলে করযোড়ে তার ক্রোড়ে নবাগত মানব-জীবনের জন্য জ্ঞানালোক প্রার্থনা ক'র্‌ছে!)

মধ্যে দর্শকদের উৎসুক দৃষ্টির সম্মুখে বেদীর উপর এক রঙীন আলোকোজ্জ্বল সুসজ্জিত দৃশ্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। আলো নিবিবার সঙ্গে সঙ্গে বেদীটি নিচেয় নেমে আসে। তৎক্ষণাৎ তার ওপোর নাটকোল্লিখিত একটি সুসজ্জিত দৃশ্য ঠেলে তুলে দেওয়া হয় এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে জলবেগে বারো সেকেণ্ডের বেশী সময় লাগে না। এক অঙ্ক অভিনয় শেষ হয়ে যাবার পর যখন দৃশ্যপট পরিবর্ত্তন করবার দরকার হয়, তখন আবার সমস্ত আলোক নিবে যায় এবং অভিনেতা ও অভিনেত্রী সমেত সুসজ্জিত রঙ্গমঞ্চটি নিচেয় নেমে যায়। সেখানে দ্বিতীয় অঙ্কের জন্য প্রয়োজনীয় দৃশ্যটি

"বিকৃত বিবেক"

"পরিত্রাণ"

একবারে প্রস্তুত ক'রে রেখে দেওয়া হয়। প্রথম অঙ্কের দৃশ্যটাকে ঠেলে নামিয়ে রেখে সেখানে দ্বিতীয় অঙ্কের দৃশ্য ঠেলে বসিয়ে দিয়ে চক্ষের নিমিষে ওপরে তুলে দেওয়া হয়। এই সব দৃশ্যে রাজপ্রাসাদ, কেল্লা, ঘর, বাড়ী সমস্তই কৃত্রিম তৈরি করা থাকে; কেবল আস্‌বাবপত্রগুলো সত্যিকারের জিনিসই ব্যবহার হয়।
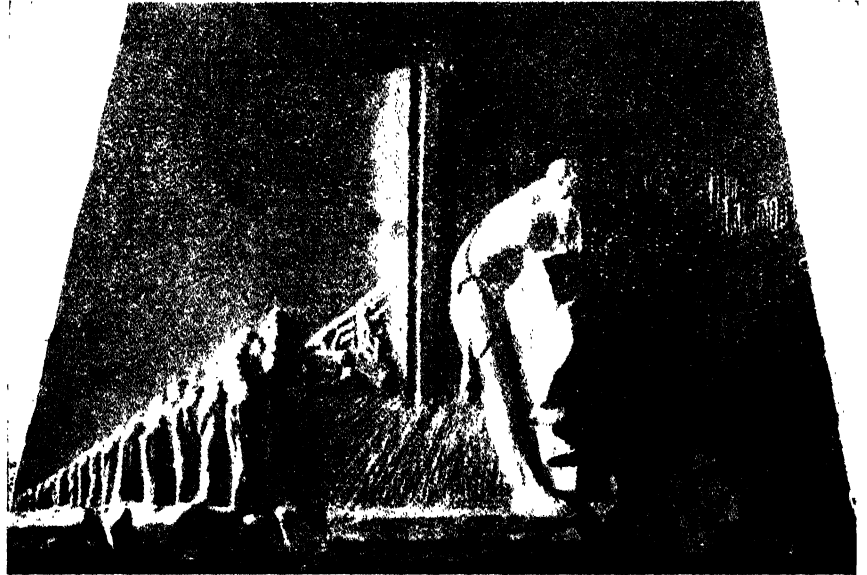
"আদি শিল্পী"

(জগতে যিনি সর্ব্বপ্রথম শিল্প সৃষ্টি করেছিলেন, আয়নার কল্পনা ক'রে সেই আদি-শিল্পীর মর্ম্মর স্মৃতি গড়ে রেখেছেন।)

রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপট কিছুই খাটানো নেই বটে, কিন্তু দর্শকগণের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে প্রত্যেক বারই নব নব দৃশ্য উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠে পেছনের সেই সাদা পর্দ্দাখানার উপর আলোক-রশ্মিপাতের কৌশলে। নর্ম্যান্ বেল্‌গেডিস্ কাপড়ে আঁকা দৃশ্যপটের পরিবর্ত্তে ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে রঙ্গমঞ্চে দৃশ্য পরিবর্ত্তন প্রচলন করেছেন। নাটকে বর্ণিত দৃশ্যগুলি

"বিধি বহির্ভূত !"

বিভিন্ন কাঁচের প্লেটের উপর আঁকা থাকে, অভিনয়ের সময় আবশ্যকমত সেগুলি ব্যবহার করা হয়। কাপড়ে আঁকা দৃশ্যপট অপেক্ষা এই আলোকোদ্ভাসিত রঙীণ দৃশ্য দেখ্‌তে অতি সুন্দর, এবং অনেকটা স্বাভাবিক বলে মনে হয়। চক্ষের সাম্‌নে অপরাহ্ন বেলা ধীরে ধীরে গোধূলি ও সন্ধ্যার ভিতর দিয়ে চন্দ্রকরোজ্জ্বল নিশিথিনীতে পরিণত হ'য়ে গেল, এ দৃশ্য কাপড়ে আঁকা সীনের সাহায্যে কিছুতেই দেখান সম্ভব হয় না; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্লেটের সাহায্যে ম্যাজিক লণ্ঠনের ভিতর দিয়ে এই রূপান্তর সহজেই দেখান যায়।

৫। কাগজের ছাতা

কাপড়ের ছাতার দাম এত বেড়ে গেছে যে গরীবের পক্ষে ছাতা ব্যবহার করা প্রায় অসম্ভব হ'য়ে উঠেছে। তাদের জন্যে আজকাল কম দামের এক রকম কাগজের ছাতা তৈরী হ'য়েছে। এ ছাতাগুলি দেখ্‌তে বেশ। বারি-বারণ (Waterproof) কাগজে তৈরী বলে বৃষ্টিতে নষ্ট হয় না এবং ঘণ্টায় তিরিশ মাইল বেগে ঝড় বইলেও টিকে থাক্‌তে পারে। কাগজের ছাতার একটা কাঠের বাঁট আছে বটে, কিন্তু লোহার শিক বা স্প্রীং নেই; তার পরিবর্ত্তে কাগজখানি এমনভাবে তেশিরে আকারে ডবল ভাঁজ করা থাকে যে, ইচ্ছেমত খোলা যায়, আবার মুড়ে বন্ধ করে নিয়ে যাওয়া চলে। (Popular Science)

৬। মাকড়সার কামড়

মাকড়সাকে মানুষ সব দেশেই চিরকাল ভয় করে চলে, তার বদ্ চেহারার জন্যে যতটা না হোক্ তার গরলের ভয়েই প্রধানতঃ। দক্ষিণ আমেরিকায় 'তারান্তুলা' বলে এক রকম প্রকাণ্ড লোমশ মাকড়সা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সে দেশের লোকের বরাবর ধারণা ছিল যে এ মাকড়সা একবার কামড়ালে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু একেবারে অনিবার্য্য! এ ধারণাটা তাদের হ'য়েছিল সম্ভবতঃ ঐ মাকড়সার বিকট চেহারা দেখে। কারণ বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিদ্ বেয়ার্গ সাহেব সম্প্রতি প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন যে 'তারান্তুলা' কাম্‌ড়ালে মানুষ মরে না! তিনি নিজে এই মাকড়সার মুখের মধ্যে আঙুল দিয়ে কামড় খেয়ে বলেছেন যে 'তারা-ন্তুলা' কামড়ালে একটা ছুঁচ ফোটার চেয়ে বেশী লাগে না এবং ঘণ্টা দুইতিন মাত্র জ্বালা করে ও ঈষৎ ফোলে; এ ছাড়া আর কিছু হয় না। মাকড়সা সম্বন্ধে ইনি অনেক অনুসন্ধান করে বলেছেন, যে মাকড়সাকে পোকা বলা সম্পূর্ণ ভুল। এরা পোকার জাত নয়, বরং এদের কাঁক্‌ড়ার জাতভাই বলা যেতে পারে। এরা চতুর ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী। পুরুষ মাকড়সার চেয়ে স্ত্রী মাকড়সারা দেখতে বড় এবং অধিক শক্তিশালী হয়। স্ত্রী মাকড়সার খোস্ মেজাজ না হ'লে পুরুষ মাক-ড়সা তাদের কাছে ঘেঁস্‌তে সাহস করে না, কারণ চটে

গেলে তারা পুরুষ মাকড়সাকে একেবারে মেরে ফেলে এবং খাদ্যের একান্ত অভাব হ'লে চাই কি খেয়েও ফেল্‌তে পারে; কারণ এদের মধ্যে রাক্ষসী প্রবৃত্তি খুব প্রবল। এক একটা স্ত্রী মাকড়সা পাঁচশতেরও অধিক ডিম পাড়ে; তবে সৌভাগ্যের বিষয় যে, তার সবগুলো থেকেই বাচ্ছা হয় না; একচতুর্থাংশ মাত্র ফোটে! যারা ফোটে তারা আফোটা ডিমগুলো খেয়ে বড় হয়। ডিম লুকিয়ে রাখবার জন্যে এরা এক রকম রেশ্‌মী খোলস তৈরি কর্‌তে পারে; এবং শীকার ধরবার জন্যে নানা রকমের ছোট বড় বিচিত্র জাল বুন্‌তে একেবারে সিদ্ধহস্ত। একরকমের মাকড়সা আছে, তারা আবার বাসা বানিয়ে থাকে। মাটিতে গর্ত্ত ক'রে তার চারপাশে রেশ্‌মী দেওয়াল বুনে একটি দরজার মতো ঢাকনা তৈরী করে রাখে। বাসায় ঢুকে যখন ঢাকনাটি এঁটে দেয়, তখন বাইরে থেকে আর কিছুতেই বোঝা যায় না যে এটা আবার খোলা যায়। ভয় পেলে বা তাড়া খেলে একছুটে তারা বাসায় এসে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে লুকিয়ে থাকে। মাকড়সা মানুষের শত্রু নয় বরং বন্ধু; কারণ সে মানুষের কোনও অপকার না ক'রে উল্টে বাড়ীর কীট পতঙ্গ বিনাশ ক'রে তাদের উপকারই করে। মাকড়সার প্রধান শত্রু হচ্ছে বোল্‌তা। বোলতা মাকড়সা দেখলেই ধরে নিয়ে এসে 'চাকে' পূরে রাখে এবং অবসর মত তাদের ধীরেসুস্থে ভোজন ক'রে।

৭। তুষার-দ্বীপের ভাস্কর

গত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে তুষার-দ্বীপে (Iceland) যেসব শিল্পী ও সাহিত্যিক জন্মেছেন, তাঁরা সকলেই বিশ্ব-বিশ্রুত খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। আয়নার্‌ জন্‌সন তাদেরই মধ্যে একজন। ভাস্কর্য্য-বিদ্যায় ইনি জগতের যে কোনও শ্রেষ্ঠ ভাস্করের সমকক্ষ বল্‌লে একটুও অত্যুক্তি করা হবে না।

আয়নার্‌ জন্‌সন তুষার-দ্বীপের এক চাষার ছেলে। বাপের সঙ্গে তিনি ক্ষেতেরই কাজকর্ম্ম দেখ্‌তেন; কিন্তু আশৈশব শিল্পবিদ্যায় তাঁর একটা প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। কাঠের ওপোর তাঁর কারুকার্য্য দেখে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁর বন্ধু-বান্ধবেরা তাঁকে কোপেন্‌হেগেনের কারু-বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তখন আয়নার্‌ জন্‌সনের বয়স আঠারো বৎসর মাত্র। কোপেনহোগেনে এসে সৌভাগ্যক্রমে তিনি জগদ্বিখ্যাত ভাস্কর সিন্‌ডিঙের শিষ্যত্ব লাভ করেছিলেন। সেখানকার শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে তিনি রোম ও গ্রীস প্রভৃতি য়ুরোপের অন্যান্য প্রদেশের কলা-পদ্ধতি অনুশীলন ক'র্‌তে বেরিয়েছিলেন এবং পরে স্বদেশে ফিরে এসে ভাস্কর্য্য-বিদ্যাকেই জীবনের অবলম্বন স্বরূপ গ্রহণ ক'রেছিলেন। কিন্তু তুষার-দ্বীপের এই প্রতিভাবান ভাস্করকে বহুকাল দারিদ্র্য ও অবহেলার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে হ'য়েছিল; কারণ বরাবরই তিনি নিজের কল্পনা ও আদর্শের অনুরূপ মূর্ত্তি গঠন ক'রতেন, জীবনে কখনও কারও অনুকরণ করতেন না। তাঁর নির্ম্মিত মূর্ত্তিগুলির মধ্যে যে নূতনত্ব ও মৌলিকত্ব দেখা যেতো, সেটা প্রচলিত ভাস্কর্য্য-শিল্পের এতই বিরোধী যে ১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত তাঁর হাতের কাজের কোনই আদর হয়নি। আমেরিকায় তাঁর যশঃ দুন্দুভি প্রথম নিনাদিত হ'য়েছিল। থর্ফিনার কার্লসেফ্‌নীর একটা মর্ম্মর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মানের জন্য তিনি নিমন্ত্রিত হয়ে আমেরিকায় গেছলেন। কার্লসেফ্‌নী আমেরিকার সর্ব্বপ্রথম শ্বেতাঙ্গ অধিবাসী। তাই আমেরিকা তাঁর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করেছিল এবং আয়নার্‌ জন্‌সন কার্লসেফ্‌নীর স্বদেশবাসী শিল্পী ব'লে তাঁর উপরেই এ কার্য্যের ভার অর্পণ করা হয়েছিল। আমেরিকা আয়নার্‌ জন্‌সনকে ধরে রাখবার অনেক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু স্বদেশ-ভক্ত শিল্পী নিজের তুষারদ্বীপ ছেড়ে স্বর্গে থাকতেও রাজী নয় বলে স্বদেশে ফিরে এলেন, খ্যাতির অক্ষয় কণ্ঠহার গলায় পরে বিশ্ব-যশস্বী হ'য়ে।

আয়নার্‌ জন্‌সনের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও অনুরাগী ভক্তদের চেষ্টায় এবং আইস্‌ল্যাণ্ড গভর্মেণ্টের বদান্যতায় তিনি তুষার-দ্বীপের এক মনোরম স্থানে অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মাঝখানে তাঁর থাকবার জন্য একখানি সুন্দর গৃহ এবং একটী বৃহৎ কলাভবন নির্ম্মাণ করে নিতে পেরেছিলেন। রেক্‌জাভিকের সেই কলাভবনে আয়নারের ভাস্কর্য্য-বিদ্যা-শিক্ষার প্রারম্ভ থেকে আজ পর্য্যন্ত তিনি যেসব মূর্ত্তি গঠন করেছিলেন, তার একটা সম্পূর্ণ সংগ্রহ রাখা হ'য়েছে। এই সংগ্রহ দেখে শিল্পীর অদ্ভুত শক্তির ক্রমবিকাশ ও চরম উৎকর্ষতার একটা ধারাবাহিক পরিচয় পাওয়া যায়। আমেরিকার বিখ্যাত শিল্প-সমালোচক ডাঃ ব্রিন্টন্‌ বলেন যে একমাত্র সেই মহা শক্তিমান শিল্পী আইভান্‌ মেষ্ট্রোভিকের (Ivan Mestrovic) অদ্ভুত ভাস্কর্য্য-শিল্পের সঙ্গে তুষার-দ্বীপের এই অদ্বিতীয় ভাস্করের কলা-নৈপুণ্যের তুলনা হ'তে পারে; আর কেউ এর সমকক্ষ হ'তে পারে কিনা সন্দেহ। রেক্‌জাভিকের কলাভবনে রক্ষিত আয়নার জন্‌সনের যে কয়েকটী অপরূপ ভাস্কর্য্য-নিদর্শনের আলোক-চিত্র এই সঙ্গে প্রদত্ত হ'ল, তা থেকে শিল্পানুরাগীরা তাঁর শক্তির কতকটা পরিচয় পাবেন।

আটলাণ্টিকের ওপারে

শ্রীকৃষ্ণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

ধীর, মন্থর গতিতে বিদায়-সঙ্গীত বাজাতে-বাজাতে, সেই প্রকাণ্ড জাপানী জাহাজ "ফুসিমি মারু" যেদিন ওয়াসিংটন রাজ্যের সিয়াটল বন্দরে এসে পৌছিল, তখন সে এক সুন্দর সন্ধ্যা। সমুদ্রের নীল জল ব্যাণ্ডের তালে-তালে নাচতে লাগল। আর সেই মধুর সান্ধ্য-সঙ্গীত যেন এই কথা কেবলই জানাতে লাগল, "সুখে ছিলে, আবার এস।" দূরে পাহাড়ের গায়ে সাঁঝের আলো; সেখানে যেন অসংখ্য নক্ষত্র ফুটেছে। আর তারি গায়ে মানুষের ঘর-সংসার।
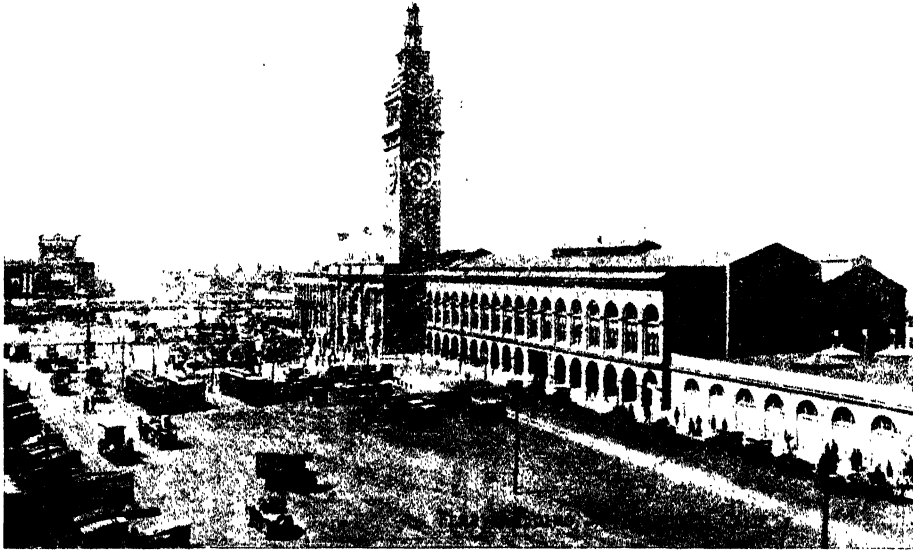
ফেরি বিল্ডিং—সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো

চায়না টাউন—সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো

জাহাজ থেকে নামবামাত্র, ট্রান্সফার কোম্পানির এজেণ্ট এসে বল্লে, সে আমার বুঁচকি-বোঁচকা যথাস্থানে পৌঁছে দেবে। লগেজ-গুলিতে এক-একটা লেবেল মেরে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কোন্ হোটেল, কত নম্বর।
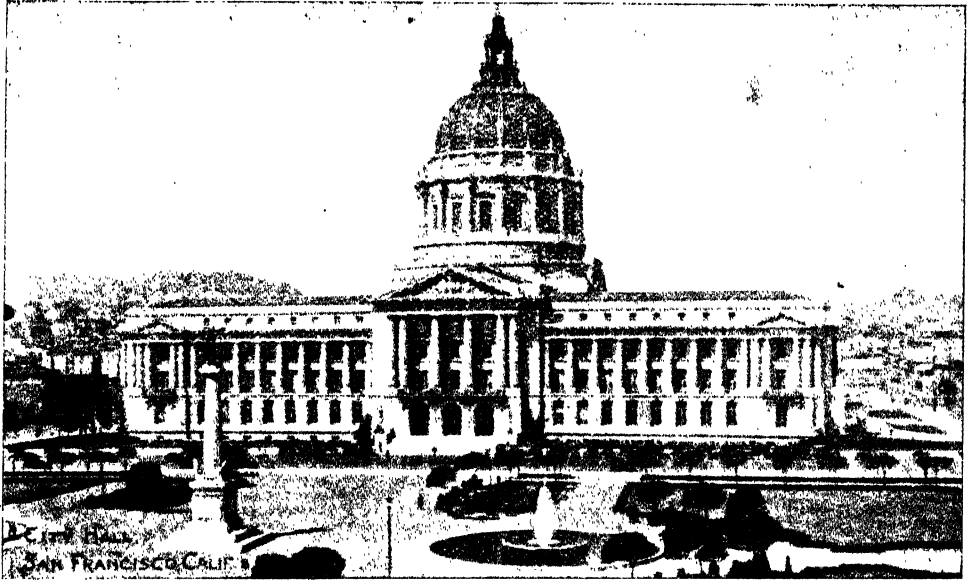
সিটি হল—সান্‌ফ্রান্সিসকো
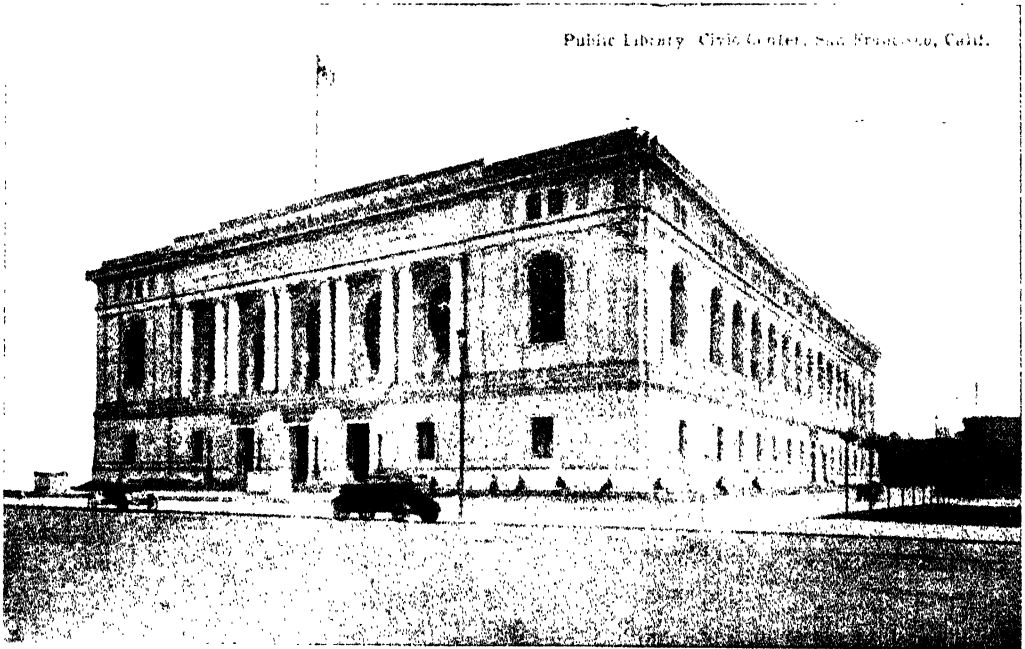
সাধারণ পুস্তকালয়—সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো

সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো যাব, এই কথা মুখ থেকে ভাল ক'রে বেরুতে না বেরুতে সে অমনি এক হাতে ঘড়ি, আর এক হাতে টাইম্ টেব্‌ল দেখে, চট্‌পট্ ব'লে দিলে, রাত নটায়; চার দিন রেলপথেই কাটাতে হবে। পরক্ষণেই আর একটী ফুট্‌ফুটে ছোকরা লম্বা একটা চুরুট মুখে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল; আর বলে কি না, "চমৎকার সন্ধ্যা। আমি ট্যাক্‌সিক্যাব চালক। আমি ষ্টেসনে পৌঁছে দেব।" ষ্টেসনে এসে দেখি, যাত্রীরা সব চুপ-চাপ ব'সে আছে,—কোন রকম
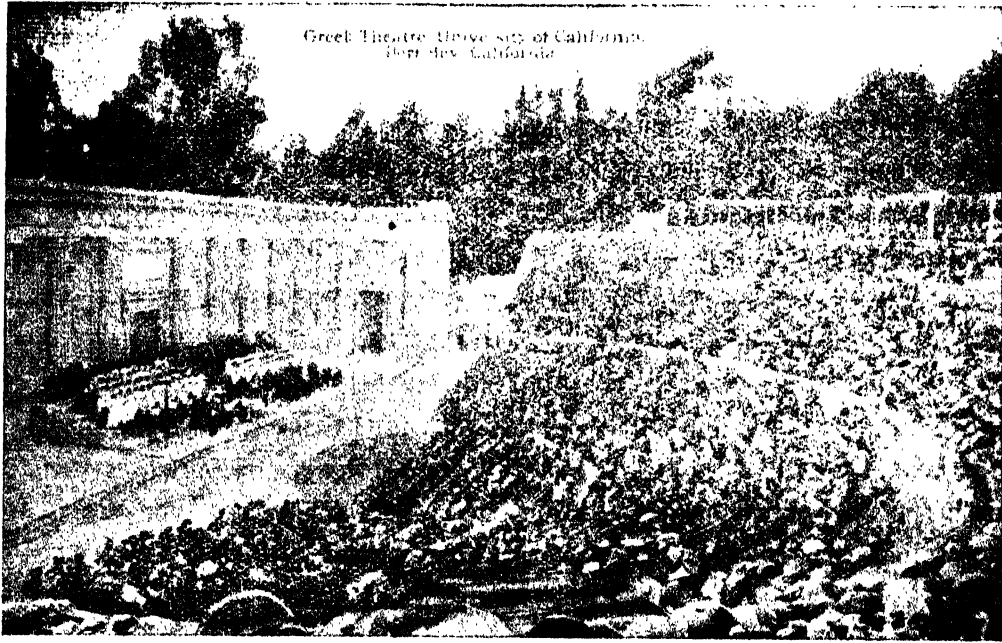
গ্রীক থিয়েটার—কালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

সাড়া নেই, শব্দ নেই। প্রকাণ্ড এক হল, আর মার্ব্বেল-পাথরের মেজের উপর বড়-বড় বেঞ্চ পাতা। প্রথম শ্রেণী বা দ্বিতীয় শ্রেণীর ওয়েটিং রুম ব'লে এদেশে কিছুই নেই। ট্রেণেও সমস্ত প্রথম শ্রেণী,—ছোট-বড় সকলকেই এক জায়গায় ব'স্‌তে হবে। যাত্রীদের হুড়োহুড়ি, দৌড়োদৌড়ি, চেঁচামেচি, বুঁচকি-বোচকা ঘাড়ে ক'রে তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠে যায়গা দখল করা—এসব কিছুই নেই। একটা মাত্র ছোট ব্যাগ যাত্রীর হাতে থাকে; বাকি সব এক্‌স্‌প্রেস কোম্পানি নিজেদের ঝক্কিতে নিয়ে যাবে। গাড়ী ছাড়বার ঠিক ৫ মিনিট আগে ষ্টেসনের এক কর্ম্মচারী মস্তবড় এক চোঁঙা মুখে দিয়ে, কোন্‌-কোন্‌ ষ্টেসনে গাড়ী থামবে, তাই ব'লে দিলে। ষ্টেসনের যে যেখানে ছিল, সকলের কাণেই সেই আওয়াজ পৌঁছে গেল। তার পর সকলে গিয়ে গাড়ীতে উঠল। ট্রেণের মধ্যে মখমলের গদি-আঁটা চেয়ার, নীচে কার্পেট দেওয়া, উপরে সুন্দর কারু-কার্য্য-খচিত খিলান ও মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল আলোকমালা। দুই দিকে দুইখানা সুন্দর পালিস-করা মেহগনি কাঠের ফ্রেমে-আঁটা বড়-বড় আয়না। আর গাড়ীকে গরম করবার জন্যে চারিদিক বেড়িয়া 'হিটার' সংলগ্ন রহিয়াছে। এক-এক কম্পার্টমেণ্টের মধ্যে একজন ক'রে রেলের কাল-পোষাক-পরা কন্‌ডাক্টার থাকে। ষ্টেশনে টিকিট না লইলেও, গাড়ীতে ব'সে টিকিট পাওয়া যায়।

কন্‌ডাক্টরের কর্ত্তব্য—তোমার বসবার যায়গা ঠিক ক'রে দেওয়া,—ষ্টেসনে নামবার আগে জানিয়ে দেওয়া,—ঘুম পেলে শোবার ঘর দেখিয়ে দেওয়া,—ক্ষিদে পেলে খাবার যায়গা বাত্‌লে দেওয়া। দারজিলিং মেলের মতন এদেশের সমস্ত ট্রেণগুলির ভিতর দিয়ে অন্যান্য কম্পার্টমেণ্টে যাবার রাস্তা আছে। গাড়ীতে ব'সে প্রথম জিনিষ আমার চোখে পড়ে—এ দেশের দেয়াশালাই। জুতার তলায় ঘষে, কাঁচে ঘষে, কেউ বা বুড়া আঙ্গুলের নখের উপর ঘষে দেয়াশালাই জ্বালতে লাগল। এমন সুন্দর দেয়াশালাই বোধ হয় পৃথিবীর আর কোথাও তৈরী হয় না। জাপানে যে রকম দেয়াশালাই হয়, সে রকম ত আমাদের কোন্নগরেও তৈরী হ'য়েছিল,—তাতে বেশ কাজও চ'লত। সেই কারখানাটা নদীর ধারে আজও পড়ে আছে। মহারথীরা কিসে কি যে গোঁজা-মিল দিয়ে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করলেন, তা আমার জানা নেই।

চার দিন রেলে ছিলাম। প্রতিদিনের প্রত্যেক ঘটনাটি

ছবির মতন একে-একে আজও মনে পড়ে। সমস্তই এ দেশের সুন্দর ব্যবস্থার পরিচয়। এ দেশের দরিদ্র লোকেরাও যে ভাবে থাকে, তা দেখে কেবলই মনে হয়,—ভারতবর্ষে উপায় থাকৃতেও মানুষকে কি দীনহীনের মত থাকতে হয়! আমাদের দেশেও ত সোণা, রূপা, হীরা জহরতের খনি আছে; কিন্তু তবু কেন পিপীলিকা-শ্রেণীর মত রাত্রি-দিন কাড়াকাড়ি, মারামারি!

এ দেশের মুটেরা কখনও মাথায় করে কোন জিনিষ নিয়ে যায় না। আর বইতেই বা হবে কেন? সমস্তই মোটর ট্রাঙ্কে ক'রে নিয়ে যায়। দশ গজের বেশী কোন ভারি বোঝা বইতে হয় না। ভারি জিনিষ মাথার বদলে এরা ঘাড়ে চাপায়।

সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কোয় এসে কয়েক দিনের মধ্যেই মনে হ'ল, এ যেন একটা মেয়েমানুষের রাজত্ব,—এখানে মেয়েদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ।

সকালে অফিস-বেলায় দেখা যায়, রাস্তার দুই ধারে মোটরে, ট্রামে, ষ্টীমারে, রেলওয়ে ট্রেণে, ইলেক্‌ট্রিক কারে মেয়েরা কেরাণীগিরি কাজে চ'লেছে। হাতে সব এক-একটি পাউডার পফ্ আর লিপ-ষ্টিকের বাক্স। মাঝে-মাঝে পথে যেতে-যেতেই এক-একবার বাক্স খুলে আয়নায় মুখ দেখে নেয়। সবার সামনেই হয় ত মুখে খানিক পাউডার ও ঠোঁটে রং লাগিয়ে নেয়। রাস্তায় তাদের চলা দেখলে মনে হয়, ঠিক যেন ক্ষেত্র সাহার মেলায় পুতলো-নাচ, ঘোড় সহরের ট্রটের চাল। আস্তে-আস্তে চলা এরা মোটে জানেই না। কলিকাতার রাস্তায় নাদুস-নুদুস কেরাণী পল্টনদের গদাই-লস্কর চাল এদের কাছে আবার ভয়ানক আশ্চর্য্যের বিষয় ব'লে মনে হবে।

এদেশে এমন কোন ব্যবসা নাই, যাতে মেয়েমানুষ নাই। মোটরের কারখানায় যেখানে কলকজা ঠেলে-ঠুলে গায়ের জোরে কাজ কর্ত্তে হয়, সেখানেও দেখি, কতক মেয়েমানুষ কাজ শিখতে যায়।

আর বাণিজ্য-বিদ্যালয়ে ত সবই মেয়েমানুষ। বালকেরা সেখানে বড় বেশী ঘেঁসেও না। কেন না তারা জানে, সেখানে গেলে কল্কে পাবে না। সওদাগরি অফিসের কেরাণী সব মেয়েমানুষ। দুই-চারিটা ম্যানেজার সেক্রেটারিগোছের পুরুষ মানুষ সাধারণতঃ অফিসে দেখা যায়। থিয়েটারে যাও, সামনেই টিকিট-বিক্রয়কারিণী এক মেয়েমানুষ। গেটের সামনে এক পুরুষমানুষ; গেট পার হ'য়ে লিফ্‌টে ওঠবার সময়, আর এক বালিকা কল চালিয়ে উপরে তুলে দেবে। সেখান থেকে নামবামাত্রই, থিয়েটারের পোষাক-পরা আর এক বালিকা তোমায়, বাঁয়ে যেতে হবে, না ডাইনে যেতে হবে, তাই বলবার জন্যে সঙ্গিনধারী পাহারার মত দাঁড়িয়ে আছে। সেখান থেকে দুই-চার পা এগিয়ে গেলেই, আর এক বালিকা, হাতে এক Punch Light নিয়ে, থিয়েটারের কাটা সিনের মত এক দরজা খুলে, সেই বিরাট অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে পথ দেখিয়ে, তোমার বসবার যায়গা পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবে।

২৫ সেণ্ট দিয়ে তুমি এক টিকিট কিনবে—আর তোমার জন্যে এতগুলি লোক পর-পর কাজ কর্ব্বে। ঐ কয়টা পয়সা দিয়ে তুমি যেন তাদের ছাতা দিয়ে মাথা রক্ষে করেছ, এমনই তাদের ব্যবহার। কিন্তু এতটা ব্যবহার চকিতের মধ্যে হ'য়ে যাবে। যে মুহূর্ত্তে টিকিট-ঘরের সামনে পয়সা ফেলেছ, সেই মুহূর্ত্তেই খটাং ক'রে এক শব্দ,—অমনি সঙ্গে-সঙ্গে তোমার টিকিট আর ভাঙ্গান পয়সা কলের ভিতর দিয়ে তোমার হাতে এসে প'ড়বে। প্রথম মওড়াতেই এই রকম চট্‌পটে ব্যাপার নিশ্চয় তোমাকেও একটু চট্‌পটে ক'রে তুলবে; আর তুমিও তাড়াতাড়ি কলের মতন চলতে থাকবে। এ দেশের কোন সহরের কোন থিয়েটারের সামনে পুরুষকে টিকিট বেচতে দেখেছি বলে মনে হয় না। সমস্ত সহজসাধ্য কাজগুলি মেয়েরাই দখল ক'রে বসেছে। মেয়েরা পরিশ্রমের কাজ কর্ত্তেও পশ্চাৎপদ নয়। এখানে এক উকীলের বউকে কুড়ুল নিয়ে সমস্ত দিন কাট কাটতে দেখেছি। সন্ধ্যাকালে সেই কাট জ্বালিয়ে ঘর গরম ক'রে, দোলা-চেয়ারে ব'সে যখন ভারতবর্ষের গল্প শুনতে ব'সবে, তখন আর সে মানুষ নয়। যত-রাজ্যের পুস্তক, খবরের কাগজ, মাসিক প্রভৃতি টেনে বার করবে,—সব থেকেই কিছু কিছু শিখতে হবে। তাঁর স্বামী আবার যুদ্ধের সময় আকাশে কাজ কর্ত্তে গিয়েছিলেন—অর্থাৎ উড়ো জাহাজ থেকে বোমা ফেলার কাজে ছিলেন। সেই সময় তাঁর স্ত্রী বাসন মাজার কাজ করে কিছু টাকা জমিয়ে ফেলেন। ওরকম কাজে এরা কোন অপমানই বোধ করে না। অবশ্য পয়সাও তেমনি পায় যথেষ্ট।

আমাদের দেশে কোন রকমে কোন দিকেই যে পয়সা রোজগারের পথ নাই। এদের খাওয়া-দাওয়াও আবার তেমনি। বারমাসে যত রকমের ফল পাওয়া যায়, সমস্তই প্রচুর পরিমাণে খায়। দুধ, মাছ, মাংস, ডিম, শাকসব্‌জি প্রভৃতি সমস্তই দিনে তিনবার করিয়া খায়। আমাদের বাঙ্গালীর ছেলেরা এদেশে এসে অমন রাক্ষসের মতন খেতে পারে না। কেমন করেই বা পারবে? শুধু ডাল আর আলু-ভাতে ভাত খেয়ে যাদের নাড়ী তৈরী হয়েছে, তারা এই সুদূর প্রবাসে এসেও সেই ভাত-রান্নাই সুরু ক'রে দেয়। বাংলা দেশের উকীলের বউ ২২ বছরেই ৫টি লেণ্ডি-গেণ্ডির মা! নাকের সামনে এক কাঁদি নথ টেনে গজেন্দ্র-গমনে, গুমরে-পা-পড়ে-না ইত্যাকার ভাবে চলেন। সকালবেলা বাড়ীতে মেছুনি এলে, ভাগা দেওয়া মাছ এক পোয়া নেন,—আবার বলেন, আহা বাছা, ঐ পোঁটাটুকু দিয়ে যাও। মাছের ঐ পোঁটাটুকু খেয়েই যে উর্ব্বর-মস্তিষ্ক গর্ব্বিত বাঙ্গালীর কাটামো তৈরী হয়েছে। এমন ভাবে প্রতিপালিত হ'য়ে, ভাই-ভগিনীর বিবাহ দিয়ে, সংসারের শত অভাব-অভিযোগ তুচ্ছ ক'রে ভীষণ দরিদ্রতার মধ্য দিয়ে সমাজ-বন্ধন মাথায় ক'রে একটা প্রকাণ্ড জাতি যে আজও পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে আছে, ইহাই অতি-বড় বিস্ময়জনক ব্যাপার।

বাংলা দেশের পুলিশের দারোগার মাইনে ৮০৲ টাকা; আর এখানে একটা সামান্য কনেষ্টবল, যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পাহারা দেয়, আইন কানুনের ধার ধারে না, কেবল ধর-পাকড় ক'রে বেড়ায়, সেও মাসে ১৭৫ ডলার অর্থাৎ ৫২৫৲ টাকা মাইনা পায়! বি-এ পাশ ক'রে সাহেব-সুবোর দোরে দোরে ঘুরে সেলাম ঠুকে, একবৎসর ট্রেনিং খেটে সাহেবের দাঁত-খিঁচুনি ও গালাগালি খেয়ে, ফৌজদারী আইনের ধারা মুখস্থ ক'রে তবে দারোগাগিরি চাকরি হয়! দশখানা গ্রামের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা,—মাইনে কিন্তু ৮০৲ টাকা। এ দেশে ৮।১০ বৎসরের শিশুও মাসে ৮০ ডলার রোজগার করে। রাস্তার ধারে খবরের কাগজ বিক্রয় ক'রে ছোট-ছোট বালকেরা মাসে ৮০।৯০ ডলার অর্থাৎ ২৪০।২৭০ টাকা অতি সহজেই পায়। এই সব বালক এতই অল্প বয়সের যে, তাদের Chronicle Examiner প্রভৃতি কাগজের নাম উচ্চারণ করতে শিখিয়ে দিতে হয়,—তবে তারা হাঁক দিয়ে ফেরি করে বেড়ায়। আর আমার "সোণার বাংলা" দেশে, পাড়ায় এক ভদ্রঘরের ছেলে রিসড়ার পাটের কলে নলি-ফুড়ান কাজ কর্ত্তে গিয়েছিল,—তারি মাইনা ছিল হপ্তায় ২৲ টাকা। সেই সুকোমল-কান্তি শিশুর মুখ-চোখ দুই দিনেই কালিমালিপ্ত হ'য়ে, অস্থি-চর্ম্ম-সার হ'য়ে গেল। তার পর একদিন তার জ্বর হল। ক্রমে বিকারের লক্ষণ। সেই বিকারগ্রস্ত শিশু মরণ যন্ত্রণায় ছট্‌-ফট্‌ ক'রতে-ক'রতে, তার সেই নলিফুড়ান কাজ হাত নেড়ে দেখাতে লাগল,—আর মরবার আগে বলে গেল, "ওগো, আর আমার কলে কাজ কর্ত্তে পাঠিও না।"

আমেরিকায় হিন্দুদের নাম যেন খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে। বাপে-তাড়ান, মায়ে-খেদান ছেলেরা যেন এ দেশে আর না আসে। ভাল ছেলেদের আসা দরকার। ভাল ছেলে বলতে আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাঁদরেল গোছের উপাধিধারী চোখের মাথা খাওয়া চসমাধারীদের কথা বলি না। তারা এ দেশে কিছুই কর্ত্তে পারে না। একেবারে ষণ্ডামার্ক পালোয়ান অথচ লেখা-পড়া-জানা ভদ্রঘরের লোক হওয়া চাই। একবার শান্তিনিকেতনের ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে গিয়ে, সেখানে যে রকম গুণ্ডাগোছের ছাত্রদের দেখেছিলেম, সেই রকম ছাত্র এ দেশে পাঠান দরকার। তারা যে ভাবে তৈরি হয়, তাহা আমেরিকার উপযুক্ত।

আমেরিকায় কাল রংয়ের লোকের মহা মুস্কিল। কাল বরণের আদর এক ভারতবর্ষেই,—বাইরে আর কোথাও নাই। আমাদের এক বাঙ্গালী বন্ধু এখানে আছেন,—তাঁর গায়ের রংটি যেন একেবারে পি, এম, বাক্‌চীর কালি। সঙ্গীতবিদ্যায় তিনি একজন অসাধারণ; কিন্তু হ'লে কি হয়,—ঐ এক দোষেই মার্কিন সভায় তাঁর আদর হয় না। এ দেশে মধ্যে-মধ্যে একটা সপ্তাহ কেবল সঙ্গীতের জন্য রাখা হয়। সেই সপ্তাহে চারিদিকে কেবল সঙ্গীতের আলোচনাই হইয়া থাকে। এইরূপ এক music weekএ আমাদের বন্ধুর এসরাজ বাজান Radioর সাহায্যে শুনান হয়েছিল। সকালবেলা Examiner কাগজে খবর দেওয়া হইল—সন্ধ্যা ৫টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত Indian music তারবিহীন যন্ত্রের সাহায্যে বাজান হবে। সন্ধ্যাকালে যে যার ঘরের ছাদে Radioর নল কাণে দিয়ে ব'সে রইল। ৫টা

থেকে ৬টা পর্য্যন্ত ঘরে বসে অনেকেই Indian music শুনল।

আমেরিকায় সমগ্র ইউরোপের লোক আছে; চীনা ও জাপানীতে পশ্চিম উপকূল ছেয়ে ফেলেছে। সমস্ত জাতিরই এ দেশে দাঁড়াবার, বসবার ও টাকা রোজগার করবার সুবিধা আছে, নাই কেবল ভারতবাসীর। ভারতবাসী এ দেশে অনেক বাধা-বিপত্তির মধ্যে দিয়ে কোনরকমে নিজেকে দাঁড় করায়। শুধু দাঁড় করায় মাত্র,—অন্যান্য জাতির মত নিরেট মাটিতে পা দিয়ে দাঁড়াতে পারে না। কোন্ মান্ধাতার আমলে স্বামী বিবেকানন্দ এ দেশে এসেছিলেন,—সে সব কথা মার্কিনেরা আজ ভুলে গেছে। হিন্দু আজ এ দেশে যে সুনাম হারাতে বসেছে, তা পুনরধিকার কর্ব্বার জন্যে আরও অনেক ভারতীয় মহাপুরুষের আসা দরকার। আমাদের রবীন্দ্রনাথ এ দেশে চুপি চুপি এসে চুপি চুপি চলে গেলেন। কোথায় কোন্ অসীমের কোলে তাঁর পুষ্পাঞ্জলি গীতাঞ্জলি ছড়িয়ে গেলেন, তা কেউ জানতেই পারল না। দলে-দলে ছাত্রদের আসা দরকার। মেয়েদেরও আসা উচিত। তাঁরা শুধু একবার এসে, এ দেশের মেয়েদের দেখে যেন ফিরে যান। একবার কর্ম্মময়, বাণিজ্যবহুল রাস্তায় দাঁড়ালেই দেখবে, এ দেশের ছোট-ছোট বালিকারা বড়-বড় মোটরগাড়ী সচ্ছন্দে হাঁকিয়ে যাচ্চে। আকাশে উড়ে যাচ্চে মেয়েমানুষে। শুধু তাই নয়,—চামড়ার পোষাক ও চামড়ার ফ্রেমে আঁটা চসমা পরে উড়ো জাহাজের কল চালাচ্চে মেয়ে-মানুষে। আর জাহাজের ইন্‌জিনিয়ার হ'য়ে উত্তাল তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্র-পথে নাবিক-বেশে বিচরণ ক'র্চ্চে কুসুম-পেলব কমনীয়-মূর্ত্তি নারী। এ যেন একটা স্বপ্নরাজ্য;—কিন্তু স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়েছে। নূতন জিনিষ শেখবার এদের যে কি উৎসাহ, কি স্ফূর্ত্তি, কি আগ্রহ, তা দেখে সমস্ত জগৎ স্তম্ভিত। পাঁচ বছরের শিশু উপসাগরের খেয়া জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে কাপ্তেনকে দেখে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে তার সঙ্গী শিশুকে বলে, "ঐ দেখ কাপ্তেন,—ও হুইসিল বাজালে জাহাজ থেমে যাবে।" আর আমার ভারতের শিশু ও-বয়সে ঘরে ব'সে বউ-বউ খেলা করে,—বাহিরের জল বাতাস তার গায়ে লাগতে পারে না। অনাহারের দেশে আর কি বা আশা করা যেতে পারে।

বিবেকানন্দ

শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বদেশ বিদেশ উজলি' উঠিছে তোমারি নবীন তন্ত্র,
আকাশ বাতাস ধ্বনিয়া তুলিছে তোমারি মোহন মন্ত্র,
নন্দিত-ধরা-মন্দির-মাঝে ধর্ম্মের স্রক্-গন্ধ,—
মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো,—বিশ্ব-বিবেকানন্দ।

অরুণ-কিরণ উছলি উঠিল, উদিলে যেদিন বঙ্গে,
স্বরগ করিল সুরভি-বৃষ্টি বরষি আশীস্ সঙ্গে,
প্রেমের পুণ্য প্রবাহে সাজিলে গৌর-নিত্যানন্দ,
মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো,—বিশ্ব-বিবেকানন্দ।

দ্যুলোকের ছবি হেরিলে পুলকে গুরুর চরণ-তলে,
আর্ত্তের সেবা মর্ত্ত্যে আনিলে ভাসিয়া নয়ন-জলে,
বিশ্ব-প্রেমের বিকসিত-খনি চিত্তে হরষানন্দ
মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো,—বিশ্ব-বিবেকানন্দ।

ভূধরে-সাগরে গহনে-কাননে যাপিলে কত না নিশি,
তুষার হিমানি গিরি-কন্দর ভ্রমিলে কত না দিশি,
অঙ্কুর পুনঃ শঙ্কর-জ্ঞান শাক্যের ত্যাগানন্দ,
মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো,—বিশ্ব-বিবেকানন্দ।

জ্ঞানের-গরিমা গৌরব গান,—ভারত-মর্ম্মবাণী,
পাশ্চাত' শোনা, বেদান্ত গাথা, শুনি বিস্ময় মানি,—
স্নিগ্ধ-ভাবের-সিক্ত-মাধুরী-মুগ্ধ-নূতন-ছন্দ,
মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো,—বিশ্ব-বিবেকানন্দ,

—শিকাগো-সঙ্ঘে সঙ্গীত তব শীর্ষে উঠিল ভাসি,
শুনিল বিশ্ব—শুনিল নিঃস্ব, শুনিল প্রাসাদবাসী;
সৃজিলে "শ্রী-মঠ" কুঞ্জ-কুটীর তীর্থ-মুখরানন্দ,
মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো,—বিশ্ব-বিবেকানন্দ।

বিপর্য্যয়

ডাক্তার শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র সেন এম-এ, ডি-এল্‌

(২৬)

লিণ্ডলে ও ইন্দ্রনাথ-ঘটিত সংবাদ খবরের কাগজে পড়িয়াই অনীতা লিণ্ডলেকে চিঠি লিখিয়াছিল,—তাহাকে অবিলম্বে দেখা করিতে অনুরোধ করিয়াছিল। লিণ্ডলে তার উত্তরে অনীতাকে লিখিয়াছিল যে. অনীতার সঙ্গে দেখা করিতে সে অক্ষম। আর সে এ জন্মে কোনও দিন অনীতাকে মুখ দেখাইবে না।

অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন সে লিণ্ডলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কোনও উপায় করিতে পারিল না, তখন একবার তার মনে হইল যে, লিণ্ডলের বাড়ীতে গিয়াই সে তার সঙ্গে দেখা করিবে। অবিবাহিত পুরুষের ঘরে একাকিনী গিয়া সাক্ষাৎ করার অবৈধতা স্মরণ করিয়া সে সঙ্কুচিত হইল,—অথচ, এ সাক্ষাতে সঙ্গী লইতেও সে মোটেই সম্মত নয়। কাজেই কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে বিলম্ব হইল।

মনোরমার কাছে ইন্দ্রনাথের অবস্থা শুনিয়া অনীতা ক্ষেপিয়া উঠিল। ইন্দ্রনাথের রোগ-শয্যায় শায়িত মূর্ত্তির কল্পনা করিয়া সে হিতাহিত জ্ঞান হারাইল। সে সমস্ত তুচ্ছ করিয়া, পরের দিন বৈকালে একখানা ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া লিণ্ডলের ঘরে আসিয়া হাজির হইল।

যখন সে লিণ্ডলের দুয়ারের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন উত্তেজনায় তার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতেছে,—বুকের ভিতর হাতুড়ি পিটিতেছে,—সে ঘন-ঘন শ্বাস লইতেছে। একবার ভাবিল সোজা যাইয়া তার দরজায় ঘা দেয়। কিন্তু একটু ভাবিয়া সে তাহার কার্ড বাহির করিয়া বেহারাকে দিল। অনীতা বেহারার অপরিচিতা নয়,—লিণ্ডলের ঘরেও সে আজই প্রথম আসে নাই।

অনীতা অমলকে দেখিয়া দ্বারের কাছে থমকিয়া দাঁড়াইল। অমলও অনীতাকে দেখিয়া লাফাইয়া উঠিল। এ কি! অনীতা একা নিরিবিলি দেখা করিতে লিণ্ডলের ঘরে! কি লজ্জা! কি অপমান! অমলের মাথা কাটা গেল! সে নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অনীতা তীব্র দৃষ্টিতে অমলের বুকের ভিতর আঘাত করিয়া, দৃষ্টির ভিতর আগুন ছিটকাইয়া, লিণ্ডলের দিকে চাহিল। লিণ্ডলে মাথা নীচু করিয়া, একখানা চেয়ার বাড়াইয়া দিয়া, অনীতাকে বসিতে অনুরোধ করিল।

অনীতা দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়াই বলিল, "আমি ব'সতে আসি নি লিণ্ডলে, কেবল একটা কথা তোমার নিজের মুখ থেকে জানতে এসেছি। কাগজে যা বেরিয়েছে তোমার সম্বন্ধে, সে সত্যি?"

লিণ্ডলে মাটির দিকে চাহিয়া বলিল, "সব সত্যি নয়।"

"কি সত্যি? তুমি ইন্দ্রনাথকে মেরেছ, এ কথা সত্যি?"

"অত্যন্ত দুঃখের সহিত স্বীকার ক'রতে হ'চ্ছে, এ কথা সত্য।"

"কেন, ইন্দ্রনাথ তোমাকে কোন রকম অপমান ক'রেছিল?"

"না—"

"বস্, এই যথেষ্ট! আমি চল্লাম, তোমায়-আমায় জন্মের মত এই দেখা! আর দাদা, তুমি, তুমি কি এতই মনুষ্যত্ব-হীন হ'য়েছ যে, তোমার বাল্য-বন্ধুকে যে অপমান করে, আঘাত করে শয্যাগত করে এসেছ, তারই কাছে এসে নির্ব্বিবাদে ব'সে তুমি আমোদ-প্রমোদ ক'রছো! ধিক!"

বলিয়া সে ধাঁ করিয়া মুখ ফিরাইল।

লিণ্ডলে বলিল, "অনীতা,"—

অনীতা তাহাকে ধমকাইয়া বলিল, "সাবধান! আমার নাম ধ'রে ডেকে আমার অপমান করবার তোমার কোনও অধিকার নেই! তুমি কে? তোমাকে আমি চিনি না।"

"কিন্তু তুমি আমার সব কথা শোন।"

"শোনাও তোমার ঐ প্রাণের বন্ধুকে! তাকে জিজ্ঞাসা কর তিনি কি ইন্দ্রনাথের সব কথা শুনেছিলেন, না, আমার সব কথা শুনেছিলেন? তুমি নিজে কি

শুনেছিলে ইন্দ্রনাথের সব কথা? যা'ক, তোমার উত্তর দেবার আবশ্যক নেই! কাগজ পড়ে কথাটা ভাল বিশ্বাস ক'রতে পারি নি, তাই একবার সত্যি কথাটা তোমার কাছে শুনতে এসেছিলাম। শুনে তৃপ্তি-লাভ ক'রলাম। তোমাদের দুজনকেই আমি সমস্ত প্রাণ-ভরা অনন্ত অটল ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করে জন্মের মত চললাম।" বলিয়া অনীতা বিপুল বেগে নীচে নামিয়া একেবারে ট্যাক্সিতে গিয়া বসিল।

অমল ও লিণ্ডলে পরস্পরের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। তাহাদের আর কথা সরিল না।

বাড়ী ফিরিয়া অনীতা দ্বার বন্ধ করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল। তার সকল রুদ্ধ আবেগ অশেষ অশ্রু-ধারায় প্রবাহিত করিয়া দিয়া, শান্ত মুখে আবার সে বাহির হইল।

এ বাড়ীতে আসিয়া অনীতা সুকুমার বাবুর কাছে ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠ ও ধর্ম্মালোচনা ও উপাসনা করিয়া একটা নূতন আনন্দের রাজ্যের সন্ধান পাইয়াছিল। তাহার প্রেম-পিপাসিত হৃদয়, স্নেহের চিরন্তন আশ্রয়-গৃহটি ছাড়িয়া আসিয়া এত স্নেহ, এত প্রীতি ও এত আনন্দ দেখিতে পাইল যে, তাহাতে সে তখনকার মত তন্ময় হইয়া গেল।

কিন্তু প্রথম মোহটা কাটিয়া যাইতেই, তার মনে অতৃপ্তির ছায়া দেখা দিল। সে দেখিতে পাইল যে, সে মদিরার তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া আসিয়া যাহা পাইয়াছে, তাহাতে তৃষ্ণা দূর হয় বটে, কিন্তু প্রাণ ঠিক তাতাইয়া মাতাইয়া তোলে না।

এমনি সময় সুকুমার বাবুর কন্যা সুলতা তাহাকে তাহার অন্তরঙ্গ করিয়া লইল। সুলতা অনীতার প্রায় সমবয়সী। সে কলেজে-পড়া মেয়ে,—কিন্তু বলিতে কি, সুকুমার বাবুর মেয়ের যেমনটি হওয়া লোকে প্রত্যাশা করে, সে ঠিক তেমনটি নয়। সে রীতিমত মন্দিরে যায়, গান ও উপাসনায় যোগদান করে, তার পিতার বক্তৃতা ও উপাসনা যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাহা খুব বড় গলায় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু ধর্ম্মটাই তার প্রাণের খুব বড় জিনিষ নয়। তার হৃদয় যে রসে খুব টস্‌টস্‌ করিতেছিল, সেটা ভগবৎপ্রেম নয়। এক কথায়, সে যুবতী,—যৌবন-সুলভ প্রেম-লালসায় সে ভরা।

এ প্রেম-লালসা পরিতৃপ্ত করিবার অবসর সে পায় নাই। সে শারীর-সম্পদে ধনী ছিল না, কাজেই লুব্ধ ভ্রমরের মত যুবকের দল তার দিকে ছুটিয়া আসে নাই। তা' ছাড়া, তার পিতার কতকগুলি অভ্যাস ও সংস্কারের জন্য সে আরও আওতায় পড়িয়া গিয়াছিল। সুকুমার বাবু কেশবচন্দ্রের এক রকম অন্ধ ভক্ত! তিনি কেশবচন্দ্রকে প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিতেন। ধর্ম্ম ও সমাজ সকল বিষয়েই তিনি কেশবচন্দ্রের পন্থানুসরণের চেষ্টা করিতেন। নারীর শিক্ষায় তাঁর মত ছিল; কিন্তু মেয়েছেলেরা যে পুরুষদের সঙ্গে সমানে-সমানে অবাধ ভাবে মিশিবে, এটা তাঁর গুরুর মত তিনিও বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। কাজেই সুলতা যুবকদের সঙ্গে মিশিবার তেমন খুব বেশী সুযোগ পায় নাই। আর উপযুক্ত বুদ্ধিমতী পত্নী না থাকায়, তিনি বুদ্ধি যোগাইয়া ঠিক তাঁর অভীপ্সিত যুবকের সঙ্গে সুলতার পরিণয় সম্পাদনের উদ্যোগ করিতেও পারেন নাই। এ রকম কোনও চেষ্টা করিতেই তিনি কুণ্ঠিত হইতেন। তাঁর মনে হইত, এ যেন তাঁর মেয়ে লইয়া ব্যবসায়ীর মত খরিদ্দার ধরিবার ফাঁদ পাতা। কোনও কাজই তিনি নিজের পক্ষে ও নিজের কন্যার পক্ষে এত অপমানকর মনে করিতেন না।

কাজেই সুলতা আপনার অন্তঃপুরে বন্দিনী হইয়া তাহার প্রেম-লালসা পরিতৃপ্তির অবসর পাইল না। কিন্তু বাস্তব জীবনে যাহা সে পাইল না, কল্প-লোকে সেই প্রেমই তাহাকে পাইয়া বসিল। তার আলমারী প্রেমের কবিতায় ও গল্পে বোঝাই হইয়া গেল। সমবয়সীদের সঙ্গে সত্য ও কল্পিত প্রেম-কাহিনী লইয়া আলোচনা তাহার একটা প্রধান কাম্য বস্তু হইয়া উঠিল।

অনীতাকে ঘরে পাইয়া সুলতা বাঁচিল। ঘরের ভিতর একটা রসের কথা কহিবার মত লোক পাওয়া গেল ভাবিয়া সে খুসী হইল। অনীতা যে সুকুমার বাবুর কাছে এত বেশীক্ষণ পড়িয়া থাকিত, তাহা সুলতার ভাল লাগিত না। ফাঁক পাইলেই সে তাহাকে লইয়া রস-চর্চ্চা করিতে বসিত। অনীতার সে-প্রসঙ্গ মোটেই অপ্রীতিকর ছিল না,—কারণ, এই রসেই তার জীবন এখন ভরিয়া ছিল। কিন্তু অনীতার সঙ্গে সুলতার একটা প্রকাণ্ড প্রভেদ ছিল। সুলতার কাছে প্রেম ছিল একটা সুন্দর কল্পনা;—সে সেই কল্পনায়

বিভোর হইয়া তাহা উপভোগ করিত। অনীতার কাছে প্রেম ছিল একটা অনুভূত বেদনা,—তাই সে ঠিক রস-ভাবে রসের আলোচনা করিতে পারিত না,—প্রায়ই কাঁদিয়া ভাসাইত।

রস-সাহিত্যের ভাণ্ডার খুলিয়া একদিন সুলতা বিদ্যাপতির একটা পদ গাহিল,

"কি কহসি মোহে নিদান,
কহইতে দহই পরাণ ॥
তেজলুঁ গুরুকুল সঙ্গ।
পূরল দুকুল কলঙ্ক ॥
বিহি মোহে দারুণ ভেল।
কানু নিঠুর ভই গেল ॥
হাম অবলা মতি বাম।
না গণলুঁ ইহ পরিণাম ॥
কি করব ইহ অনুযোগ।
আপন করমক ভোগ ॥
বহু কি পুছসি সখি আর।
উছলল সিন্ধু অপার ॥

অনীতার অশ্রু-সিন্ধু সত্য-সত্যই উছলিয়া উঠিল। এ যে তার আপন অন্তরের কথা। এই সাদা সরল কথাগুলির ভিতর অনীতা নিজের প্রাণের উপভুক্ত সকল রস ঢালিয়া দিয়া কাঁদিয়া ভাসাইল।

সুলতা বলিল "আহা, এ আবার একটা গান! এতেই তুমি কাঁদ!"

অনীতা বলিল, "এর ভিতর আর্ট কতখানি আছে, জানি না ভাই; কিন্তু ভেবে দেখ, এই গানের ভিতর কি একটা কান্না-ভরা নরম প্রাণ আছে।"

"তবে শোন," বলিয়া সুলতা মৃদুস্বরে গাহিল,

সুখের লাগিয়া,　　এ ঘর বাঁধিনু
　　আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে　　সিনান করিতে
　　সকলি গরল ভেল।
　　সখি কি মোর কপালে লেখি।
শীতল বলিয়া　　ও চাঁদ সেবিনু
　　ভানুর কিরণ দেখি।
উচল বলিয়া　　অচলে চড়িনু
　　পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে　　দারিদ্র্য বেড়ল
　　মাণিক হারানু হেলে।
নগর বসানু　　সাগর বাঁধিনু
　　মাণিক পাবার আসে।
সাগর শুকাল　　মাণিক লুকাল
　　অভাগী করম দোষে।
পিয়াস লাগিয়া　　জলদ সেবিনু
　　বজর পড়িয়া গেল।
চণ্ডীদাস কহে　　শ্যামের পিরীতি
　　মরমে রহল শেল।

অনীতা বিহ্বল হইয়া অশ্রু-প্লাবিত মুখে শুনিয়া গেল।

এমনি করিয়া পদাবলী-সাহিত্যে তাহার হাতে-খড়ি হইল। অনীতা পাশ্চাত্য বিদ্যায় অনেক শিক্ষা লাভ করিলেও, প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের অনুশীলন কখনও করে নাই। সুলতার মুখে পদাবলীর গান শুনিয়া সে ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া, অল্পদিনের মধ্যে সমস্ত পদকল্পতরু পড়িয়া নিঃশেষ করিল। ইহার মধ্যে সে রসের এক অফুরন্ত খনির সন্ধান পাইল। ক্রমে সে এই মানুষী প্রেমের কাব্যের ভিতর বৈষ্ণব-সাহিত্যের সাধন-তত্ত্বের—তাহাদের মধুর রসের দার্শনিক ভিত্তির সন্ধান পাইল। কথাটা তাহার বড় ভাল লাগিল। তার মনে হইল যে, ভগবানকে পাইবার এই তো সদুপায়;—তাঁকে ভালবাসিতে হইলে, প্রিয়তমের মত তাকে ভালবাসা চাই,—সমস্ত জগৎ ভাসাইয়া দিয়া, কুল-মানে জলাঞ্জলি দিয়া, দুইকুল ছাপাইয়া, এই "গোপত পীরিতি" আপনার সর্ব্বস্ব ভগবানের পায়ে নিবেদন করে। এ যে কি বস্তু, তাহা সে তো খুব ভাল করিয়াই জানিয়াছে। সেও যে রাধিকারই মত গাহিতে পারে,

তেজনু গুরুকুল সঙ্গ
পূরল দুকুল কলঙ্ক—

সে বাঁধ ভাঙ্গিয়া, দুই কুল ভাসাইয়া দিয়া প্রেমের বন্যায় যে কি আনন্দ, কি পরিপূর্ণ সার্থকতা, তাহা তো সে নিজের প্রাণের ভিতর অনুভব করিয়াছে। তার সাধন ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে,

কানু নিঠুর ভই গেল—

কিন্তু তবু সেই এক মুহূর্ত্তের চুরি করা আনন্দ যে তার সমস্ত সত্তাকে এখনো রসে ভরপূর করিয়া রাখিয়াছে! এই তো প্রেম, এই প্রেমেই তো আনন্দ, এই দানই তো শ্রেষ্ঠ দান! ভগবানকে যদি এই দান দিতে পারে সে, তবেই তো তার সবচেয়ে বড় দান করা হইবে—তবেই না ভগবানে তার সত্য-সত্য প্রেম হইবে। তার যেন মনে হইল, এই সাধনের পথ।

এই নূতন তত্ত্বের আলোকে অনীতা পড়িল মীরাবাইর অপূর্ব্ব মধুর প্রেমপূর্ণ গীতাবলি। তার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে গদ্গদচিত্তে কানুর জপ ধ্যান করিতে লাগিল। ইন্দ্রনাথকে কানু করিয়া ধ্যান করিল, নারায়ণকে ইন্দ্রনাথ করিয়া ভাবিল। একটা অপূর্ব্ব আলোকে তার সমস্ত চিত্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সসীম ও অসীম, জীব ও নারায়ণ—সব একাকার হইয়া গেল, সব সীমাগুলি যেন ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ভাসিয়া গেল; তার দিব্য দৃষ্টির সামনে আসিতে লাগিল এক সীমাশূন্য, ভেদশূন্য, অখণ্ড, অপার প্রেম-সাগর;—সেই অনন্ত সাগরের মাঝখানে পদ্মদলের উপর বংশীবদন মদনমোহনরূপে তার ইন্দ্রনাথ—মরি মরি, কি সুন্দর!

সুকুমারবাবু আসিতেই তার মোহ ভাঙ্গিয়া গেল। সুকুমারবাবু তাহার হাতে মীরাবাইর গীত-সংগ্রহ দেখিয়া বলিলেন, "কি পড়া হচ্ছে? মীরাবাই? তোমারও কি রণছোড়কে নিয়ে উধাও হ'বার ইচ্ছা হ'চ্ছে না কি?"

এ কথায় অনীতার সমস্ত মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। সে আপনাকে সামলাইয়া বলিল, "দেখুন, আমি ভাবছিলাম যে, সাধনার এই পন্থাটা আমরা একেবারেই অগ্রাহ্য ক'রেছি। কিন্তু অনেক বিষয়ে আমার মনে হয়, এই সাধনা অন্যপ্রকারের সাধনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ভগবানকে আমরা পিতা রূপে, মাতা রূপে দেখি, কিন্তু প্রেমাস্পদ বলিয়া দেখি না।"

সুকুমার বাবু বলিলেন, "তাতে কোনও বাধা নেই,—রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসিনীরা ঠিক এইভাবে ভাবিত ছিলেন। Tennyson, St Agnes' Eveএতে এই ভাবের একটা সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ভগবানকে যে ভাবে দেখে আমাদের আত্মা তৃপ্ত হয়, সেই ভাবেই তাঁকে দেখা দরকার।"

"কিন্তু এইটাই কি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ভাব নয়—বৈষ্ণবের যাকে মধুর রস বল্‌ছেন।"

সুকুমার বাবু হাসিয়া বলিলেন, "বৈষ্ণবের মধুর র ঠিক এ জিনিষ নয় অনীতা,—সেটা মানুষের হৃদয়ের একট নিকৃষ্ট বৃত্তির apotheosis।"

কথাটায় অনীতা মনে বড় ব্যথা পাইল। তার ম হইল, সুকুমার বাবু যেন তার প্রেমের একটা দারুণ অপমা করিলেন।

সুকুমার বাবু বলিয়া গেলেন, "ভগবান আমাদের সম সত্তা পরিব্যাপ্ত ক'রে র'য়েছেন। তাঁকে আমরা জীবনে যে কোনও দিক থেকে গ্রহণ ক'রতে পারি। এবং আমাদের নিজেদের মনের মতন ক'রে তাঁকে কল্পনা ক'রতে পারি। কতটা anthroponeorphism হয় তো অপরিহার্য্য। তাঁকে আমরা মানুষের আকাঙ্ক্ষা দিয়ে যখন গ্রহ করি, তখন যা'তে সেই আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করে, সেই আকা তাঁর হ'য়ে পড়ে। কিন্তু এইসব তাঁর নানা রূপ-কল্পনার মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনটা—যেটা আমাদের সবচে উচ্চস্তরের প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত করে। মধুর রসে ভগবানকে খু ছোট ক'রে দেখে, তাঁর মহিমা খর্ব্ব ক'রে দেয়,—কেননা যে প্রবৃত্তি থেকে আমাদের এই ধারণার উৎপত্তি, সেটা খুব উচ্চ অঙ্গের প্রবৃত্তি নয়। তাঁকে পিতা বলে, রাজা বলে, বিচারক ও শাস্তা ব'লে, পিতার মত, মাতার ম স্নেহময় ব'লে কল্পনা ক'রলে, আমরা তার চেয়ে অনেকটা উচু ধাপে উঠি, এবং তাঁর সত্যস্বরূপের অনেকটা কাছাকাছি অগ্রসর হই।"

অনীতা এ কথার সব বুঝিতে পারিল না; তা বুঝিতে ইচ্ছাও হইল না। এই সমস্ত বক্তৃতার মূল সূত্র, বুঝিল, প্রেমের অপমান,—প্রেমকে একটা নিকৃষ্ট বৃত্তি বলিয়া তাহাকে খেলো করা। সে তার অন্তরে-অন্তরে অনুভ করিল, ইহা অসত্য! সে বুঝিল যে, যখন তার হৃদয় প্রেমর অভিষিক্ত থাকে, যখন সে তার প্রেমের আরাধ্য দেবতা ইন্দ্রনাথের ধ্যান করে, তখন তার হৃদয়ে যে অপূর্ব্ব রসে সঞ্চার হয়, সেটা ছোট নয়, নীচ নয়,—কোনও কিছু চেয়েই সেটা নিকৃষ্ট নয়। এ যে কি আনন্দ, এ যে আত্মা কি একটা বিরাট তৃপ্তি, তাহা এই শুষ্ক বৃদ্ধ কি বুঝিবে যখন এই প্রেমে তাহার হৃদয় ভরিয়া থাকে তখন যে

নিজে সব চেয়ে মহৎ, সব চেয়ে বৃহৎ, সব চেয়ে মহিমময় হয়! তখন সে কোনও ত্যাগে কুণ্ঠিত হয় না, তার যথা-সর্ব্বস্ব সে অনায়াসে বিলাইয়া দিতে পারে, হাসিতে হাসিতে প্রাণ বলি দিতে পারে! যা' কিছু ক্ষুদ্র, যা' কিছু নীচ, যা' কিছু স্বার্থপর আছে, তার ভিতর সব যে খসিয়া পড়ে। যে মানুষ মহত্বের তুঙ্গতম শিখরে আরোহণ করে, আত্মা তার বিমানচারী বিহঙ্গের মত পবিত্র নির্ম্মল আবহাওয়ার ভিতর বিচরণ করিয়া বেড়ায়! একে বল নীচ! সুকুমার বাবুর উপর অনীতার মনটা বিরক্ত হইয়া উঠিল।

ইহার পর ক্রমশঃ তার সুকুমার বাবুর উপর শ্রদ্ধা কমিয়া আসিল। তফাৎ হইতে অনীতা সুকুমার বাবুকে দেখিয়াছিল দেবতা! কাছে আসিয়া দেখিল তিনি মানুষ! তাঁরও খাওয়া পরা শোওয়া প্রভৃতি সমস্ত কাজই আছে; এবং তার আনুষঙ্গিক সব দুর্ব্বলতাই আছে। তাঁর জামা খুলিলে দেব-দেহ বাহির হয় না, ঠিক নগ্ন মানুষের শরীর দেখা যায়;—অধিকন্তু তাহা অতিরিক্ত রকম লোমশ। আরও একটা কথা এখন সে আবিষ্কার করিল যে, সুকুমার বাবুর ভিতর আত্মাভিমানের অভাব নাই। তাঁর নামে কোনও কাগজে কিছু সুখ্যাতি বাহির হইলে, কোনও ভক্ত উপাসক তাঁর কাছে আসিয়া তাঁহার স্তুতি করিলে, তিনি তাহা ঠিক দেবতার মত নির্লিপ্ত ভাবে গ্রহণ করেন না, তাঁর পরিবার মধ্যে বেশ পুলকিত চিত্তে তা'র আলোচনা করেন। বিলাতী কোনও কাগজে তাঁর বইয়ের সুখ্যাতি বাহির হইলে, সেটা তাঁর দেশের লোকের কাছে প্রকাশ না করিলে তৃপ্তি হয় না। তিনি তাঁর ভক্তদের দিয়া, কখনও কখনও নিজেও বা এই সব বার্ত্তা লিখিয়া দেশীয় সংবাদপত্রগুলিতে পাঠাইয়া দেন। তা' ছাড়া, তাঁর ভক্ত শিষ্যদের মধ্যে যারা তাঁর অভিমত সম্পূর্ণ নির্ব্বিচারে বেদবাক্যের মত মানিয়া লয়, তাহাদিগের প্রতি তাঁর পক্ষপাত সুস্পষ্ট ছিল। যাহারা খুব বিনীত ভাবেও তাঁহার কোনও মতামতের সমালোচনা করিত, সে শিষ্যরা তাঁর সম্পূর্ণ অন্তরঙ্গ হইতে পারিত না।

এই সব বিষয় অনীতা পূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়াছিল। এই সব বিষয়ের মধ্যে যে হীনতা ও দুর্ব্বলতা আছে, তাহা সে এখন একটু বড় করিয়া দেখিতে লাগিল। তা' ছাড়া, তাঁর মতামতের সঙ্গেও এখন তার বিরোধ স্পষ্ট হইয়া উঠিল। সুকুমার বাবু কেশবচন্দ্রের পরম ভক্ত শিষ্য। কেশবচন্দ্র দেশীয় সংস্কার ও আচারের যতটুকু ভাঙ্গচুর করিয়াছিলেন, ততটুকুই সুকুমার বাবু সমীচীন মনে করিতেন; তার অতিরিক্ত কিছু ভাঙ্গচুর করা তাঁর সম্পূর্ণ মত-বিরুদ্ধ। এই কারণে তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে মেয়েদের পুরুষদের সঙ্গে বসাইতে একেবারে অসম্মত। মেয়েরা বিধান-পল্লীর বাহিরে কোনও পুরুষের সঙ্গে অবাধে মেলা-মেশা করে, তাহা তিনি পছন্দ করিতেন না। এবং আজকালকার বিলাত-ফেরত সমাজে যে অবাধ-স্বাধীনতা প্রচলিত, তাহা তাঁহার কাছে নিছক স্বেচ্ছাচারিতা বলিয়া মনে হইত। অনীতার সমস্ত সংস্কার ও শিক্ষা এ সব বিষয়েই তাহাকে সুকুমার বাবুর বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়াছিল। সে সুকুমার বাবুকে সেকেলে ও গোঁড়া বলিয়া অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

যে দিন অনীতা লিগুলে ও অমলকে তিরস্কার করিয়া অপ্রসন্ন চিত্তে বাড়ী ফিরিয়া আসিল, সে দিন সমস্ত দিনটাই তার প্রাণের ভিতর একটা আগুন খাঁ-খাঁ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। এই আগুন লইয়া সে অপ্রসন্ন চিত্তে সমস্ত বাড়ী ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল,—কোনও কিছুতেই সে মন বসাইতে পারিল না। সেই দিন সে দেখিতে পাইল যে, সুকুমার বাবু তা'র উন্মনা অবস্থাটা বেশ করিয়া লক্ষ্য করিতেছেন। তাঁর মুখের জিজ্ঞাসু কৌতূহল-পূর্ণ অবস্থা দেখিয়া সে ক্ষেপিয়া উঠিল। সে যে সুকুমার বাবুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে তাহার চিত্তের বিকৃতি লক্ষ্য করিবার অধিকার দিয়াছে, সে কথা সে ভুলিয়া গেল। সে সুকুমার বাবুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে অভদ্রোচিত বলিয়া বিবেচনা করিল। সন্ধ্যাবেলায় সুকুমার বাবু তাকে ডাকিয়া অত্যন্ত স্নিগ্ধ শান্ত ভাবে উপদেশ দিলেন। সে উপদেশের ভিতর ভাল কথা বোঝাই ছিল,—সে কথাগুলি স্মরণ রাখিলে অনীতার ভাল বই মন্দ হইত না। কিন্তু অনীতা তা'র হৃদয়ের উদ্যত বিদ্রোহ লইয়া, সে বক্তৃতা হইতে এই সার সংগ্রহ করিল যে, এই সেকেলে বুড়ো তা'র এই রকম একা যেখানে-সেখানে যাওয়াটা অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখে,—এবং স্ত্রীলোকের ঠুনকো মানের জন্য তার বড় ভয়। বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে অনীতা সুকুমার বাবুর চেয়ে ঢের বেশী জানে; এবং তার বিলাতী ও ভারতীয় অভিজ্ঞতা ঢের বেশী! সে তার ইজ্জত রাখিতে

জানে, এবং সেজন্য এই old booby'র কোন সাহায্য দরকার হয় না। কাজেই, তাঁর এই সব জ্যাঠামো অত্যন্ত অন্যায়, অভদ্র ও অযাচিত।

অনীতা নীরবে সব কথা শুনিয়া উঠিয়া গেল। কিন্তু তার অন্তর ক্ষেপিয়া উঠিল। তার মন বলিল, এখানে তার বাস করা চলিবে না। সে স্থানান্তরের সন্ধান করিতে লাগিল; কিন্তু অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া, আপাততঃ কিছুদিন এখানে টিকিয়া যাওয়াই সাব্যস্ত করিল।

ইহার দুই-তিন দিন পর সকালবেলায় সে নিজের ঘরে বসিয়া চোখের জলে ভাসিয়া পদকল্পতরু পড়িতেছিল, এমন সময় পাশের ঘরে পরিচিত কণ্ঠ শুনিয়া উৎকর্ণ হইয়া লাফাইয়া উঠিল। না, সে ভুল করে নাই,—এ মনোরমারই কণ্ঠ বটে। পাশের ঘর ছিল সুকুমার বাবুর পড়িবার ঘর। অনীতা স্থির করিল, মনোরমা সুকুমার বাবুর কাছে আসিয়াছে তাহারই সন্ধানে। তার সমস্ত হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল—মনোরমাকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিতে তাহার প্রাণ ছুটিল।

সে সুকুমার বাবুর ঘরের দরজার সামনে আসিয়া, নিজের অভ্যাস ও শিক্ষামত বলিল, "May I come in."

সুকুমার বাবু বলিলেন "এসো।"

পরদাটা তুলিয়াই অনীতা দেখিতে পাইল মনোরমার মুখ। চারিচক্ষু সম্মিলিত হইতে, দুজনেরই মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। অনীতা মনোরমার দিকে দুই পা অগ্রসর হইল। কিন্তু ও কে? মনোরমার পাশে ওই রোগ-পাণ্ডু, শান্ত, সৌম্য মূর্ত্তি, ও—কে! অনীতা থমকিয়া দাঁড়াইল। কে যেন তার পায়ে বেড়ী লাগাইয়া দিল,—সে মাটির দিকে চাহিয়া স্থির নিশ্চল হইয়া রহিল। তার বুকের ভিতর দিয়া ভাবের বন্যা বহিয়া গেল। এই যে তার অপরাধীর স্বর্গ সশরীরে তার সম্মুখে! এই তাহার দেবতা—অথচ কি অভাগী সে, তার সাধ্য নাই যে ছুটিয়া গিয়া তার পায় পড়ে; সাধ্য নাই, তার বুকের ভিতর লতাইয়া থাকে। তার মনে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল সেই এক মুহূর্ত্তের প্রিয় স্পর্শ—যখন সে ইন্দ্রনাথকে তারে দুই হাতে চাপিয়া তার হৃদয়ের কাছে ধরিয়াছিল। তার সমস্ত শরীর তার এই চিরপ্রিয় স্মৃতিতে কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

ইন্দ্রনাথেরও মুখ একদম ফ্যাকাসে হইয়া গেল। এ কি! এই কি সেই মহিমময়ী অনীতা! এই পাণ্ডু, কৃশ অশ্রুপ্লাবন মলিনমুখী দীনবেশা নারী—এই কি অনীতা! তার হৃদয় আনন্দে একবার লাফাইয়া উঠিল, পর মুহূর্ত্তেই দারুণ বেদনায় মুশড়িয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। সেও নীরবে মাটির দিকে চাহিয়া রহিল।

এক মুহূর্ত্তের জন্য অনীতার মাথাটা ঘুরিয়া উঠিল; এক পলকের জন্য পৃথিবী তার চোখের সম্মুখে অন্ধকার হইয়া উঠিল। তার পর সে চিত্ত স্থির করিয়া, শান্ত ভাবে মনোরমার কাছে আসিয়া বলিল, "কি মনো, এখানে কি মনে করে!"

মনোরমা এই দু'জনেরই ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া, অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতেছিল। সে অন্যমনস্ক ভাবে বলিল, "কেমন আছ তুমি?"

সুকুমার বাবু কিছুই লক্ষ্য করেন নাই—কেন না, সাধারণতঃ লক্ষ্য করা তাঁর অভ্যাস নয়; এবং বিশেষতঃ তিনি অনীতার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া ছিলেন। তিনি অনীতার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "উনি এসেছেন আমার সেদিনকার উপদেশ সম্বন্ধে আলোচনা ক'রতে। ওঁর কাছে ভারী আশ্চর্য্য ঠেক্‌ছে অনীতা, যে, সাধনটা সত্যি-সত্যিই এত সহজ!"

মনোরমা বলিল, "সেদিন আপনার কথা শুনে তত আশ্চর্য্য বোধ হয় নি,—কেন না, আপনার মুখ থেকে কোনও কথা শুনলে আপনিই মনে হয়, এ তো হ'বেই,—এ আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু যখন আপনার উপদেশ কার্য্যে পরিণত ক'রতে চেষ্টা ক'রলাম, আর দেখলাম যে আপনার কথা অক্ষরে-অক্ষরে ফলে যাচ্ছে,—ভগবানকে যেন খুব কাছে পাচ্ছি, তখন ভারি আশ্চর্য্য লাগলো! তাই আপনার কাছে ছুটে এলাম।" সুকুমার বাবুর মুখ কৃতার্থতায় ভরিয়া গেল। খুব স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া তিনি বলিলেন, "খুব আশ্চর্য্য, না? চাবীর গোছা হারিয়ে সমস্ত বাড়ী খুঁজে শেষে নিজের আঁচলে বাঁধা র'য়েছে দেখলে যেমন হয় তেমনি না? ব্রহ্মানন্দ আমাকে বলতেন যে, সেকালের সব সাধন-পদ্ধতি ভুল নয়, অনেক সময় তাতে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিত; কিন্তু সে যেন সমস্ত রাজ্য ঘুরে পাশের ঘরে যাওয়ার মত!"

মনোরমা বলিল, "আমি আপনাকে গুরু বলে বরণ

করে নিয়েছি,—আপনিই আমাকে এতদিনে সত্যের পথ দেখিয়েছেন,—আপনি আমার হাত ধরে নিয়ে যান।"

অনীতা উঠিয়া দাঁড়াইল,—এ সব তার ভাল লাগিল না। মনোরমা যে তাহার সন্ধানে এখানে আসে নাই,—ভগবানের সন্ধানে আসিয়াছে, এ তাহার ভাল লাগিল না। তা ছাড়া, মনোরমা যে সুকুমার বাবুকে এতটা শ্রদ্ধার সঙ্গে গুরু বলিয়া বরণ করিয়া লইল, তাও তাহার ভাল লাগিল না। তার গলা খুলিয়া বলিতে ইচ্ছা হইল,—এ মেকী,—মেকী, এ আসল মালের কোনও খবর রাখে না। তা'ছাড়া, তার সবচেয়ে বেশী খারাপ লাগিল এই যে, মনোরমা তাহাকে একেবারে ডিঙ্গাইয়া, অগ্রাহ্য করিয়া সুকুমার বাবুর সঙ্গে কথা কহিতে লাগিল।

এ ঘরে আসিবার পর হইতেই তার বুকের ভিতর ঝড় বহিতেছিল,—এখন তার অসহ্য হইল। সে উঠিয়া বলিল, "আমার একটু কাজ আছে ভাই, আমি আসি; যাবার আগে একবার ভিতরে এসো।" বলিয়া সে একরকম ছুটিয়া পলাইল। সে তার সমস্ত সত্তা দিয়া অনুভব করিল যে, ইন্দ্রনাথের দুটি চক্ষু তাহার পিঠের উপর বিঁধিয়া রহিয়াছে এবং তার পায়ের তলায় লুটোপুটি খাইতেছে। কিন্তু সে একটি বারও ইন্দ্রনাথের দিকে চাহিল না, বা তার সঙ্গে কোনও কথা বলিল না।

মনোরমা যাইবার সময় দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া বলিয়া গেল, "অনীতা, চল্লুম ভাই,—আবার পরশুদিন আসবো।" আর কোনও কথা না বলিয়া চলিয়া গেল। (ক্রমশঃ)

ব্যর্থতা

শ্রীবীরকুমার-বধ-রচয়িত্রী

কত কথা মনে ছিল
কিছুই হ'ল না বলা,
ব্যর্থ, সে তমিস্রা মাঝে
দুই জনে পথ চলা।
ছুটিল উধাও বায়ু
স্বন্ স্বন্ রব করি,
ত্রস্ত তরু-শাখা-পত্র
পড়ি গেল মর্মরি।
নীরবে বহিয়া গেল
মল্লিকার আর্দ্র বাস,
নিদ্রিতা প্রকৃতি যেন
ফেলিল মৃদুল শ্বাস
সে নগ্ন আঁধার যেন
আঁধার আছিল ধরি,
আঁধারে আঁধারে শুধু
করেছিল জড়াজড়ি।
সে নিশায় যেতেছিনু
পথহারা দুইজনে।

বিমুগ্ধা সুষুপ্তা স্মৃতি
লুকি' ছিল নিরজনে!
শুধু দুটি অশ্রুধারা
নীরবে পড়িল ঝরি,
মরমের কথা যত
রহিল মুরছি পড়ি।
তার পরে উষা যবে
কাটিয়া তিমির-রেখা,
কনক অচল শিরে
হাসি মুখে দিল দেখা,
সে দিল জুড়িয়া কর
বিদায়ের নমস্কার,
তখনি উঠিল জাগি
নিরাশার হাহাকার!
আঁধারে সে এসেছিল
আলোকে মিলায়ে গেল,
আমারি জগৎ-ভরা
বিষম ব্যর্থতা এল।

নারী-প্রসঙ্গে পুরুষের কর্ত্তব্য

শ্রীহরিহর শেঠ

বিগত ১০ই কার্ত্তিকের "বিজলী" পত্রিকাতে জনৈক বঙ্গ মহিলা লিখিয়াছেন,—"আজ যে যুগের আবহাওয়া বইছে, তাতে মহামান্য ত্যাগী পুরুষজাতি বুঝতে পাচ্চে, তাদের উন্নতির প্রধান পরিপন্থীটা কোথায়? আজ যেন কোন অদৃশ্য শক্তি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্চেন, কেন তোমরা এত পিছনে পড়ে। * * * * * দার্শনিক ও সুপণ্ডিত পুরুষ এটা এতদিন বাদে বুঝতে পেরেছে যে, তাদের সমস্ত বড় যে কোন কাজের পূর্ণতা আনতে গেলে যে শক্তির প্রয়োজন, তা নিতে হবে এই নারীর কাছ থেকে। * * * * * সমস্ত জাতির ভিত্তিও নারীজাতি। কিন্তু পরদুঃখকাতর পুরুষ এতই পরের দুঃখে ব্যস্ত ছিল যে, তাহাদের জাতীয় ভিত্তি-স্বরূপিনী নারীজাতি যে ক্রমিক অন্ধকারে কোণঠাসা হয়ে যাচ্চে, তার প্রতি দৃষ্টি রাখার তার সময় হয়ে উঠে নি, বা অন্ততঃ পক্ষে এটা যে একটা কর্ত্তব্যের মধ্যে তাহাও ন্যায়ের নিক্তিতে ওজন করবার সময়ও হয়ে উঠে নি। নারী ও পুরুষ দুইয়ের পূর্ণতা যেখানে বিরাজ করে, সেইখানেই কর্ম্মের স্ফুরণ, জ্ঞানের জ্যোতির্ম্ময়ী দীপ্তি ও উন্নতির পবিত্র আলো দেখতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে অনেক পুরুষ মাথা চুলকুচ্চেন, কেউ বা শুঁড় নাড়চেন, তার মধ্যে মধ্যে কলমবাজী করে নিজের মনকে না হোক, অন্ততঃ নারীর উত্তপ্ত হৃদয়কে শীতল করবার চেষ্টা করচেন। * * * * * অনেকে হয় ত বলবেন, আমরা অবলা নারী-জাতি—তাঁদের যদি ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাই, তা হলে কি কাঁধে মাথা থাকবে! এ সব দুর্ব্বল চিত্তের যুক্তি। এ সব মানসিক দাসত্বের পরিণাম। এই অবস্থা থেকে উঠতে গেলে চাই নারী-বিদ্রোহ। * * * * * এই নারী-সঙ্ঘই দেশের সমস্ত সামাজিক প্রাধান্য নিজের হাতে নেবে। তার পর কোন্ প্রণালী নিয়ে অগ্রসর হতে হবে, সেটা সেই সঙ্ঘই স্থির কর্ব্বেন।"

স্বাধীনচেতা, চিন্তাশীলা, উন্নতিকামী, বিদুষী রমণীর এই বাণী যদি সত্য হয় ত কথাই নাই। নচেৎ যদি ইহা আমাদের নারী-সম্প্রদায়ের কথা বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলেও, যাহার মধ্যে নারীজাতির শিক্ষা, নারীজাতির উন্নতির আলোচনা আছে, নারীদের উল্লিখিত মন্তব্য প্রকাশের পর, সে কথা বা সে লেখায় প্রবৃত্ত হওয়া একজন পুরুষ, বিশেষতঃ আমার মত সামান্য পুরুষের পক্ষে অনধিকারচর্চ্চা কি না তাহা এখন চিন্তা-সাপেক্ষ। সমাজের সম্প্রদায় বিশেষের মনে যেমন বলশেভিক মতবাদ একটা বিভীষিকার উদ্রেক করিয়াছে, এ দীনের মনেও আজ সেই প্রকার একটু ভয়ের কারণ উপস্থিত হইয়াছে। ইহার কারণ আর

কিছু নয়,—এ অধম কিছুকাল যাবৎ,—কার্য্যে কিছু করিবার সাধ্য এ পর্য্যন্ত না হইলেও, স্ত্রী-শিক্ষার পথ নির্দ্দেশ করিবার উচ্চাভিলাষ হৃদয়ে পোষণ না করিলেও,—উক্ত বিষয় লইয়া চিন্তা ও আলোচনায় বিশেষ ভাবে ব্যাপৃত আছে। কলমের মুখে কিছু না বাহির হইয়া পড়ে, এ বিষয়ে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা সত্বেও, লেখিকার কথায় 'শুঁড় নেড়ে' পরদুঃখ-কাতরতার পরাকাষ্ঠা না দেখাইলেও, সময়-সময় পাণ্ডিত্য দেখাইতে যাওয়া যে না হইয়া থাকে, তাহা বলিতে পারি না।

আমাদের স্ত্রীলোকদিগের উপযোগী শিক্ষা কি, এবং কি উপায়ে সে শিক্ষা সহজে দেশমধ্যে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, কয়েক বৎসর ধরিয়া ইহাই আমার চিন্তার বিষয় হইয়াছে। এখন সে কথা ছাড়িয়া দিয়া, শ্রদ্ধেয়া লেখিকা ও অন্যান্য সমমতাবলম্বী মহিলাদের নিকট অতি বিনীত ভাবে অনুমতি প্রার্থনা করিয়া, উল্লিখিত উদ্ধৃতাংশের প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করিতেছি। পুরুষ জাতির আত্মরক্ষা বা আত্মপক্ষ সুদৃঢ় করিবার মানসেই এই আলোচনা, ইহা বিবেচনা করিয়া, আমার এই পাণ্ডিত্য-প্রকাশ, অনধিকার মনে হইলেও, হয় ত মার্জ্জনীয় হইতে পারে। অবশ্য অধিকাংশ পুরুষই যে আমার এই কথায় সায় দিবেন না, সে বিষয়ে আমি কতকটা নিশ্চিত।

স্মরণাতীতকাল হইতে যে বঙ্গ রমণী পুরুষকে রমণীর গতি-মুক্তি ভাবিতেন,—পুরুষকেই রমণীর যথাসর্ব্বস্ব মনে করিতেন,—এমন কি, পুরুষ-চরিত্রের সমালোচনাও তাঁহাদের অধিকারের বাহিরে, এইরূপ যাঁহাদের ধারণা ছিল, সেই বাঙ্গলার নারী আজ অকস্মাৎ এ সুরে যন্ত্র বাঁধিলেন কেন? যে রমণী আপনা ভুলিয়া পুরুষকে পূজা করিয়াও নিজেকে পরিতৃপ্ত মনে করিতে পারিতেন না,—পুরুষ কায়া, রমণী তাহার ছায়া, এক কথায় পুরুষহীন নারীর জন্ম বৃথা ইহাই যে জাতির জন্মগত ও মজ্জাগত ধারণা ছিল,—আজি হঠাৎ তাঁহাদের এ মনোভাব-বিপর্য্যয়ের কারণ কি? যে ললনা-কুল, শুধু পুরুষ কেন—স্ব-সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠাদের সম্মুখে মুখ তুলিয়া কথা কওয়া দোষের মনে করিতেন এবং এখনও কোথাও-কোথাও করিয়া থাকেন,—আজ সেই নারীই তাঁহাদের চির-প্রসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য ভুলিয়া, নিতান্ত দম্ভ সহকারে পুরুষকে মহামান্য, ত্যাগী, দার্শনিক, সুপণ্ডিত, পরদুঃখ-কাতর ইত্যাদি বিদ্রূপাত্মক বিশেষণ প্রয়োগ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন না। এক দিন, শুধু এক দিন বলি কেন, যুগ-যুগান্তর হতে বা অতীতের সেই লুপ্ত যুগ হতে যে কোমলা সরলা লতিকা পুরুষকেই একমাত্র আশ্রয়-তরু, জীবনের ধ্রুব-তারা জ্ঞানে, তাঁহাদেরই চরণে সম্পূর্ণ স্বত্বশূন্য হয়ে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, আজি কিসের আকাঙ্ক্ষায়, কোন্ দৈবলব্ধ-বলে শুধু তাঁদের সাহায্য প্রত্যাহার নয়, তেজোদ্দীপ্ত ভৈরব রবে বলেন;—নারী-সঙ্ঘই দেশের সমস্ত সামাজিক প্রাধান্য নিজের হাতে নেবে। তাঁদের পথ তাঁরা নিজেই করিয়া লইবেন। সত্যই কি তাঁহারা একটা অলক্ষিত দৈবশক্তি প্রভাবে বলীয়ান, না পুরুষের অত্যাচার অবিচারের অব্যাহত পীড়ন জন্য দুর্ব্বলের অসহিষ্ণু অভিলাষ বা আত্মমর্য্যাদার ক্রমিক আঘাত জনিত মরিয়া হওয়া।

দুর্ব্বল কথাটির ব্যবহারও এখানে চিন্তা-সাপেক্ষ। পুরুষের কৃতকর্ম্মের ফলে এ দৌর্ব্বল্য হইতে পারে; কিন্তু রাজধানী বা সহর অঞ্চলের মহিলাদের লেখনী-মুখে দেখার পরিবর্ত্তে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সে বিদ্রোহের বাস্তব দৃশ্য চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাওয়া যাইবে, ততক্ষণ পুরুষের অভিমান লইয়া, পুরুষ-প্রদত্ত দীর্ঘকালের বিশেষণ ত্যাগ করিতে পারিব কি? তবে দুর্ব্বল অতএব অধীন, এবং বলবান সুতরাং স্বাধীন,—সর্ব্বক্ষেত্রেই সকল স্তরের মানুষের পক্ষে ইহা প্রযোজ্য হওয়া উচিত, এ কথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারিব না। কিন্তু ইঁহারা যে দুর্ব্বল, তাহার একটা মীমাংসা এইখানে না হইলে, এ আলোচনায় অগ্রসর হইবার সুযোগ থাকে না। মীমাংসা প্রয়োজন হইলেও, সূক্ষ্মতম চুলচেরা মীমাংসার আবশ্যকতা নাই। পুরুষ কর্ত্তৃক অন্যথা দাবিয়া রাখার জন্যই হোক বা যে জন্যই হোক, শুধু বাঙ্গালার নয়, প্রায় সমস্ত জগতের নারী-সমাজ যে এখনও পুরুষের অধীন, তাহা তাঁহাদের চিন্তা ও কার্য্য প্রণালী, এমন কি, লেখিকার বাক্য হইতেই বুঝা যাইতেছে। আমাদের নারীরা যে কোণঠেসা হইয়া রহিয়াছেন, তাহা প্রবন্ধ-লেখিকাও বলিয়াছেন! তাঁহারা বাস্তবে কি ছিলেন বা কি আছেন, সে কথা এক্ষণে নির্ভুল রূপে নির্ণীত না হইলেও, অন্ততঃ আমাদের মহিলারা নিজে যে এখন পর্য্যন্ত নিজেদের পরাধীন ও দুর্ব্বল মনে করিয়া থাকেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। সৃষ্টিকর্ত্তার বিধানেও তুলনায় তাঁহারা দুর্ব্বল।

যাক্‌, যে কথা বলিতেছিলাম; এ আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কারণ কি? কোন শক্তি-প্রভাবে বা অভিমানে—যে কারণেই হোক, পরিবর্ত্তনের যে তাঁহারা প্রয়াসী, তাহা যে আবশ্যক, অন্ততঃ তাঁহারা অর্থাৎ লেখিকা ও তাঁহার সদৃশা মহিলাবৃন্দ যে ইহা মনে করেন, এ বিষয়ে দ্বিতীয় কথা হইতেই পারে না। আবশ্যক যদি হয়, তবে এতাবৎ যাহা ছিল না, তাহা এখনই বা হইল কেন? ইহার দুইটী মাত্র উত্তর হইতে পারে। হয় এক্ষণে পুরুষের দুর্ব্যবহার বা অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়া তাঁহাদের অসহিষ্ণু করিয়াছে, নয়, অত্যাচার পূর্ব্ববৎ থাকিলেও, তাঁহারা ক্রমে এমন বল সঞ্চয়ে সমর্থা হইয়াছেন বা নিজেদের অবস্থা পুরুষের অলক্ষ্যে এমন করিয়া উন্নত করিতে পারিয়াছেন, বা কাল প্রভাবে স্বতঃই উন্নত হইয়াছেন, যে, আর তাঁহারা এ অন্যায় সহিতে প্রস্তুত নন। আত্মমর্য্যাদার আঘাত-বেদনা পুরুষের প্রভুত্বের অহমিকা-বৃত্তির প্রশ্রয় দিতে নারাজ। অবস্থার বিবর্ত্তনের সহিত আভ্যন্তরীণ এমন পরিবর্ত্তন বিচিত্র নহে।

প্রাচীন যুগে বঙ্গের মাতৃজাতির প্রতি পুরুষের ব্যবহার যাহা ছিল, তাহা অত্যাচার নামে অভিহিত হইত, বা তাহাকে তখন তাঁহারা অত্যাচার বা দুর্ব্যবহার বিবেচনা করিতেন—ইতিহাস সে সাক্ষ্য দেয় না। অবশ্য নারী ইহার উত্তরে বলিতে পারেন, অত্যাচার নামে অভিহিত হইতে না দেওয়ার মালিকও ছিল পুরুষ, যে হেতু ইতিহাস তাঁদের দ্বারাই রচিত। এ কথার উত্তর নাই; তা বলিয়া এ উক্তি মিথ্যা, এমন বলিবার সামর্থ্যও নাই। যাহাই হউক, যখন ইহার অন্য প্রমাণও কিছু পাওয়া যায় না, তখন ধরিয়া লইলাম—সে ব্যবহারকে অন্ততঃ পূর্ণভাবে অত্যাচার বলিয়া ধরা চলে না। আর যদি উহার নাম অত্যাচারই হয়, তবে তাহা এখন বৃদ্ধি পাইয়াছে কি না, ইহা ভাবিবার বিষয়। মনের ধারণা বা স্বপ্ন অভিজ্ঞতার কথা ছাড়িয়া দিই,—যখন প্রমাণ করা বড় সহজ নয়, তখন রমণীদের প্রতি পুরুষের পীড়নের মাত্রা পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে, ইহা ধরিবার আবশ্যকতা নাই। তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে অকস্মাৎ আমাদের মহিলা-সমাজ মধ্যে এমন কোন অমিত দৈববললাভের প্রমাণ কিছু না পাওয়া গলেও, তাঁহাদের নিজেদের বা যাঁহাদের চেষ্টাতেই হউক কাল প্রভাবে স্বতঃই হউক,—মধ্য যুগের তুলনায় বর্ত্তমানে তাঁহাদের মানসিক অবস্থা যে উন্নত হইয়াছে, উন্নত চিন্তায় অনেক নারী নিজের বিশিষ্টতা সমাজে সপ্রমাণ করিয়াছেন, এ কথা স্বীকার করিতেই হয়।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, উভয় দিকের মধ্যে পরিবর্ত্তনের হিসাবে পুরুষ নব অত্যাচারী হয় নাই ধরিয়া লইলেও, নারীগণের আভ্যন্তরীণ উৎকর্ষ লাভ হইয়াছে। সুতরাং সেই সঙ্গে আত্মমর্য্যাদাবোধ জাগরিত বা উন্মেষিত হওয়া স্বাভাবিক। আত্মমর্য্যাদাবোধ জন্মিলেই কোন ব্যক্তি, জাতি বা সম্প্রদায় যে একেবারে তাহাদের চির-বিশিষ্টতা ত্যাগ করিয়া স্বভাবের বিপরীত দিকে ধাবিত হইবেন, এমন কথা যখন নাই, তখন আমাদের মাতৃজাতি কি কারণে সহসা এতাদৃশ ভিন্নভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবে চিন্তা করিলে, তাঁহাদের আত্মসম্মান কোন বিশেষ আঘাত অনুভব করিয়া থাকিবেন বলিয়াই সন্দেহ হয়। এক্ষণে তাঁহাদের এই অনুভব অমূলক কি কি সমূলক, তাহারই বিচার আবশ্যক।

আত্মমর্য্যাদা জিনিষটা স্বপ্ন হোক আর অলীক হোক, সকলেরই কিছু না কিছু আছেই। তাহা কতকটা নিজস্ব, এবং অপরের সহিত তাহার তুলনা করা চলে না। সমষ্টিভাবে দেখিলে, সমাজের চক্ষে কেহ অধিক, কেহ বা অল্প মর্য্যাদা-সম্পন্ন হইতে পারেন, এবং তদনুসারে গৌরবের তারতম্যও থাকিতে পারে; কিন্তু সমাজের চক্ষে ছোট হইলেও, নিজ-নিজ গণ্ডীর মধ্যে সকলেই সমান। ব্রাহ্মণের দেবত্ব যত অধিকই হোক, বা ব্রাহ্মণ যত মর্য্যাদাসম্পন্নই হোন, চণ্ডালদেরও একটা নিজস্ব মর্য্যাদা থাকিতে পারে; তাহাতে আঘাত প্রাপ্ত হইলে সহ্য করা তাহাদের পক্ষেও অসম্ভব হয়। সেই হিসাবে স্ত্রীজাতির আত্মমর্য্যাদা,—পুরুষ সে সম্বন্ধে যাহাই মনে করুন না,—তাঁহাদের কাছে তাহার মূল্য আছে; এবং তাহা ক্ষুণ্ণ হইলেও আঘাত সমানই লাগিয়া থাকে। এ কথা বলার অর্থ এই নয় যে, তাঁহাদের আত্মমর্য্যাদার কথা এক আমি ছাড়া আর অন্যসব পুরুষের কাছে অজ্ঞাত। এইখানে পুরুষদের পক্ষ হইতে আর একটা কথা উঠিতে পারে যে, প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদের দ্বারা নারীর মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইতেছে কি না? নারী, দৌর্ব্বল্য বশতই হোক বা যে জন্যই হোক, পুরুষের অধীন,—সুতরাং প্রবল পুরুষজাতির দ্বারা দুর্ব্বলের সম্মান সকল সময় রক্ষা না হওয়া

অসম্ভব নহে। পরন্তু, কখন-কখন সম্মানে আঘাত প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব ; যে হেতু, দুর্ব্বলের উপর প্রবলের আধিপত্য অত্যাচার প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়, এমন কি, ইহা স্বাভাবিক ধর্ম্মের মত বলিলেও হয়। তাই বলিয়াই যে ইহা ভাল, তাহা বলা যায় না, বা দুর্ব্বলের পক্ষে স্বাধিকার ও স্বাতন্ত্র্য লাভ যে ন্যায়-গর্হিত ও অকল্যাণকর, তাহাও বলা যায় না।

নারী দুর্ব্বল,—এই দৌর্ব্বল্যের সুবিধা লইয়া পুরুষ এতাবৎ কাল তাঁহাদের বহুপ্রকারে অধীন ও বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন,—ইহা যে পুরুষের স্বার্থপরতা এবং প্রভুত্বের অহমিকা হইতে উদ্ভূত, তাহা মনে করিবার যে কারণ আছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? যে জাতির পুরুষগণ নিজেদের আদিম সভ্যতার গৌরব করেন, আর্য্যজাতির বংশধর বলিয়া আত্মশ্লাঘা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই তাঁহাদের মাতৃজাতিকে হীন স্বার্থের জন্য কি এমন করিয়া চাপিয়া রাখিয়াছেন? নারী চিরদিনই পুরুষের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। তাঁহাদের নিজের প্রতি চাহিবার অবসর পুরুষ কখন দেন নাই। মনীষাসম্পন্না গরীয়সী রমণীও নিজ ক্ষমতার প্রতি অন্ধ থাকিয়া সংস্কার-বশে নিজেকে আজন্ম হীনা ও দুর্ব্বলা ভিন্ন আর কিছু ভাবিতে পারিতেন না। এ হেন নারী যতদিন এ কথা বুঝেন নাই, সে স্বতন্ত্র কথা ; কিন্তু কাল-প্রভাবে বা শিক্ষা-প্রভাবে যখন ইহা তাঁহারা বুঝিতেছেন, দেখিতেছেন—তখন তাহা যে প্রকাশ করিয়া বলিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? ইন্দ্রিয়ভোগমূলক কৃত্রিম সভ্যতা, বহিরাবরণ ও অলীক বাকপটুতা পৃথিবীর ভিন্নাংশের সভ্যতার চিহ্ন বা আদর্শ হইতে পারে, উহা আমাদের সভ্যতার অঙ্গ হইতে পারে না।

যদি আত্মমর্য্যাদার জাগরণ বা উন্মেষের ফলে তাঁহাদের বেদনা-বোধের অনুমান প্রকৃত হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের এ ঘৃণার ভাব ব্যক্ত হওয়া, এমন কি, সমষ্টি-ভাবে তাঁহাদের বিদ্রোহী ভাব ধারণ করা আদৌ বিচিত্র নহে,বরং স্বাভাবিক। সমগ্র ভারতবাসী সরল প্রজাবৃন্দ ইংরাজরাজের অধীনতাকে দেবতার অর্ঘ্য সম মাথায় তুলিয়া লইয়া, দীর্ঘ দেড়শতাধিক বৎসর তাঁহাদের স্তুতি দশ-মুখে করিয়া আসিবার পর আজ অকস্মাৎ তাঁহাদের এ পরিবর্ত্তন আসিল কোথা হইতে? যে সরল, স্বল্পে সন্তুষ্ট প্রজা, পরাধীনতার কঠিন নিগড় হেমহারের ন্যায় গ্রহণ করিয়া, রাজাকে দেবতা জ্ঞানে নিশ্চিন্ত মনে আপন কাযেই নিবিষ্ট ছিল, আজি তাহাদের অকস্মাৎ এ দারুণ ভাব-বিপর্য্যয় কিরূপে হইল? এ ভাবের তরঙ্গ প্রবল বন্যার ন্যায় কি ভীষণ নহে? শিখদের অসীম আত্মদান, শত-শত দেশ-প্রেমিকের স্বেচ্ছায় কারাবরণ—এ সব জ্বলন্ত সত্য বিশ বৎসর পূর্ব্বে কি স্বপ্ন ছিল না? যে দেবতার ইঙ্গিতেই হোক, যে বলে বলীয়ান হইয়াই হোক, শুধু বাঙ্গালা নয়, সমগ্র ভারতবর্ষ আজ উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। এই নবজাগরণ যেমন সমস্ত বিশ্বের কাছে বিস্ময়কর হইলেও প্রকৃত, তেমনই আমাদের মহিলাকুলের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন, যাহা, জাগরণ নামে অভিহিত হইতেছে, তাহা আমাদের বিস্ময়ের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে অপ্রকৃত বলিব কিরূপে? বাহ্যদৃষ্টিতে ভারতবাসীর ব্যষ্টি বা সমষ্টির মধ্যে নূতন করিয়া দৈহিক বলসঞ্চয়ের কোন লক্ষণ দেখিতে না পাওয়া গেলেও, যদি তাহাদের এই উত্থান ও আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টার সাহস হইতে ক্রমে উহা গণমধ্যে পৌঁছিবার পথে অগ্রসর হইতে থাকে,—নিজের জন্মগত অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকা অপেক্ষা বরং মৃত্যুও শ্রেয়ঃ, এমন কথাও যখন এই সহস্র বন্ধনাবদ্ধ জাতির মধ্যে কাহারও কাহারও মানসে উদয় হইয়া থাকে, তখন আমাদের ললনাগণের এরূপ ফিরিয়া দাঁড়ানয় বিচিত্রতা কি আছে? এ জাগরণও সত্য।

ক্ষমতাবানের নিজ স্বার্থের জন্য দুর্ব্বলের নিকট হইতে তাহার প্রাপ্যের অধিক আদায়ের চেষ্টা স্বাভাবিক হইতে পারে ; কিন্তু জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ আত্মতৃপ্তির জন্য দুর্ব্বল মানুষকে অত্যাচার পীড়িত করিয়াও নিজেদের শ্রেষ্ঠ মানুষ বলিয়া গর্ব্ব করিবে, তাহা হইতে পারে না। অসভ্য বর্ব্বর নামে যাহারা পরিচিত, তাহাদের কথা ছাড়িয়া দিই। সভ্যতার কথা, মনুষ্যত্বের কথা তুলিলে এ কথা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, যে ক্ষমতা দুর্ব্বলকে করায়ত্ত করিবার অস্ত্রস্বরূপ, যে ক্ষমতার পরিচালনা অধীনকে পীড়ন দ্বারা নিজের দেহ-মনের ভোগ-লিপ্সা চরিতার্থ করিবার সহায়ক, সে ক্ষমতা মানুষের শত্রু, জাতির শত্রু, দেশের শত্রু। তাহা ক্ষমতা নয়, ক্ষমতার ব্যভিচার মাত্র। নিজেদের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কায় দুর্ব্বলকে মাথা তুলিতে না দেওয়ার

অপেক্ষা বড় দুর্ব্বলতা খুব কমই আছে। এই অপরাধে শুধু বাঙ্গালা নয়, ভারত নয়, সমস্ত জগৎ আজি শান্তিকে বিদায় দিতে বসিয়াছে। সংসারে, সমাজে, বেশী না হোক, যাহার যা প্রাপ্য, তাহাকে তাহা দিতেই হইবে। প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা হৃদয় মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়া বা নিজের স্বার্থের জন্য, যে দান তাহা দানই নহে,—সে ত্যাগ ভোগের নামান্তর মাত্র। অধীনকে প্রকৃত স্বাধীনতা দিয়া তুলিবার প্রবৃত্তি সংসারে খুব কম লোকেরই দেখা যায়। কিন্তু সময় আসিলে কেহ কাহাকেও রোধিতে পারে না। তখন যে যেমনই হোক, সুদে আসলে সকলেই তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য আদায় করিয়া লয়। তৎপূর্ব্বে কর্ত্তব্য-জ্ঞানে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত যে দান, তাহাই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। কিন্তু মনুষ্যত্বের পরিচায়ক হইলেও ইহাই শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য নহে,—ইহাই অধীন বা দুর্ব্বলের প্রতি মানবের শেষ কাজ নহে। দীনের দীনত্ব অপসারণের দানই যথেষ্ট নহে। যাহার যাহা অধিকার, তাহা স্বচেষ্টায় করায়ত্ত করিবার পক্ষে তাহাকে উপযুক্ত ও চেষ্টিত করিয়া তাহাদের প্রস্তুত করাই হইতেছে বড় কাজ। সকলের স্বাধীন ভাবে অর্জ্জন দ্বারা নিজ-নিজ অধিকার ভোগ করিবার মত যে দিন সামর্থ্য লাভ হইবে, সেইদিনই এই মর-জগতে যথার্থ স্বর্গের সৃষ্টি হইতে পারে।

সংসারের নিয়ম,—বাহ্যজগতের কার্য্যাদি দেখিয়াই সাধারণতঃ মানুষে বিচার করিয়া থাকে। এইরূপেই আমাদের বল, বিদ্যা, সাহস, বুদ্ধি প্রভৃতি গুণাবলীর সিদ্ধান্ত করা হয়। অবশ্য কার্য্য না দেখিলে কর্ম্মীর ক্ষমতা নির্ণয়ের সুযোগ হয় না, ইহা ঠিক। কিন্তু ইহাও ঠিক যে, সুযোগ ও সময় ভিন্ন তাহাদের কার্য্য দেখান বা ক্ষমতা প্রকাশ করারও অনেক ক্ষেত্রে উপায় হয় না। এইগুলির অভাবে বহু বুদ্ধিমান, বীর্য্যবানেরও অনেক ক্ষমতা চিরদিনের জন্য তাহাদের মস্তক ও দেহের মধ্যে থাকিয়া দেহের সহিতই বিলীন হইয়া যায়। একটা কথা প্রচলিত আছে,—কস্তুরী মৃগ গন্ধে আমোদিত হইলেও, নিজ নাভি সঞ্চিত গন্ধের কথা তাহারা জানে না। সেইরূপ আমরা আমাদের প্রকৃত ক্ষমতার কথা অনেক সময়েই জানি না। এই সে-দিনের সন্তরণ-প্রতিযোগিতার পূর্ব্বে কে জানিত যে, বাঙ্গালীর ছেলে ৪॥ ঘণ্টায় ২২ মাইল গঙ্গা সাঁতার দিয়া যাইতে পারে? কেহ এ-সব না জানিলেও যেমন দেখা যাইতেছে ইহা চাক্ষুষ সত্য, সেইরূপ আমাদের বা মহিলাগণের অজ্ঞাত থাকিলেও, তাঁহাদের ভিতর যে অদ্ভুত শক্তি লুকান থাকিতে পারে, তাহাতেও বিস্ময়ের কিছুই নাই।

পুরুষ তাহাদের একমাত্র সুবিধাকে লক্ষ্য করিয়া, সময়-সময় মনুষ্যত্ব ভুলিয়া রমণীদের প্রতি যে ভয়ানক অত্যাচার করিয়া থাকে, নিজেদের নীচ স্বার্থের জন্য তাঁহাদের যে গভীর অব্যক্ত বেদনার কারণ হইয়া থাকে, তাহার বর্ণনা করা যায় না। সমাজের ব্যবস্থায় তাহারাই নারীদের মালিক; নারী তাহাদের অনুগৃহীত জীব। আর রমণী—পুরুষের সর্ব্বপ্রকারে বশীভূতা, অনুগ্রহ-ভিখারিণী রমণী—তাহার কি আছে? সে জানে যে, সহিবার জন্যই সে সংসারে আসিয়াছে। সহিতেছে,—যখন পারিতেছে না, ত্রিসংসারে কাহাকেও যখন আপনার বলিয়া দেখিতে পাইতেছে না,—তখন অন্য উপায় না দেখিয়া স্বেচ্ছায় দেহবসান করিয়া, ভব-যন্ত্রণার হাত হইতে চির-নিষ্কৃতি লাভ করিতেছে। কিন্তু হায়, তাহাতেও অভাগীর আত্মার তৃপ্তি নাই। তখনও পরলোক হইতে পুরুষের মুখে শুনিতে হইতেছে,—মেয়েগুলোর আজকাল বেশ সখের মরণ হয়েছে,—কেরোসিনে পুড়ে মরা একটা ফ্যাসান হয়ে দাঁড়াল।—মেয়েরা আর সখ করিবারও কিছু পায় নাই, তাই নিজের প্রাণ লইয়া খেলা করে, প্রাণের বিনিময়ে সখ মিটাইয়া থাকে। তাহাদের মুক্তির উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিবার বা উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা মনকে ঘাতসহ করিবার মত শিক্ষিতা করিবার অবকাশ পুরুষের নাই। সুতরাং মরা ভিন্ন তাহাদের আর কি উপায় আছে, এ কথা কে ভাবিবে? এমনই যে জাতির অবস্থা, তাহাদের পক্ষে এই মৃতিকাপুরুষোচিত মরণকে বরণ করার রণাঙ্গনে নামিয়া কিছু কাজ হয় ভালই,—নচেৎ বীর-নারীর মত যদি একেবারে বিলীন হইয়া যাইতে হয়, কালধর্ম্মে তাহাও শ্রেয়ঃ মনে হওয়া বিচিত্র নহে। ইহাও মানুষেরই ধর্ম্ম। সুতরাং মেয়েরা তীব্র ভাষায় মন্তব্য প্রকাশ করিলেও তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই।

বিরুদ্ধমতাবলম্বীদের নিকট একটা কথা উঠিতে পারে,—প্রবন্ধারম্ভে উদ্ধৃত কথাগুলি আমি যে আমাদের সমস্ত নারী-সম্প্রদায়ের কথা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি, তাহা প্রকৃত

নহে। সমগ্র বাঙ্গালী মহিলাদের যে উহাই মনের কথা, ইহা অবশ্যই বলা যাইতে পারে না,—এ বিষয়ে প্রমাণও কিছু নাই। কিন্তু তা বলিয়া, অধিকাংশ নারীর, ঠিক অতটা বিরূপ ভাব না হইলেও, মনের ভাব যে অংশতঃ প্রায় ঐ রূপ, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার বিরুদ্ধে তেমন কোন কারণ দেখা যায় না। সত্য বটে, বাঙ্গালার সমস্ত রমণী-সমাজের তুলনায়, যে কয়জন রমণী নারী-সমস্যা লইয়া তাঁদের দুঃখ, অভিমান ও কষ্টের কথা লেখনী-মুখে ব্যক্ত করিতেছেন, তাহা অতি নগণ্য,—কিন্তু ইহাও কি সত্য নয় যে, তাঁহাদের বক্তব্য পুরুষ-সমাজকে জানাইবার, বলিবার মত বিদ্যা, সুযোগ এবং অবসর একরূপ নাই বলিলেই হয়? এমন কি, শিক্ষার অভাবহেতু অনেকে তাঁহাদের নিজের বিষয়ও সব গুছাইয়া বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। সেই সঙ্গে এ কথাও কি বলা যায় না যে, উক্ত বিদ্যা, সুযোগ ও অবসর বা গুছাইয়া বুঝিবার সামর্থ্য না থাকার জন্য যদি দায়িত্ব কাহারও থাকে, তবে অনেকাংশে তাহা পুরুষের। যাহাদের নিকট যে বিষয় বা যে অভাব শুনিতে পাইবার সুযোগ নাই, তাহাদের যে সে অভাব নাই ইহাও ধরিয়া লওয়া চলে না। আরও এক কথা, কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও, সংখ্যায় এখনকার মত না হইলেও, এমন চিন্তাশীলা বিদুষী মহিলার অভাব ছিল না, যাঁহারা তাঁহাদের মনের কথা, বেদনার কথা বিবৃত করিতে না পারিতেন। তখনও অনেকে তাঁহাদের রচনাদিতে বিলক্ষণ চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কৈ, তাঁহাদের মধ্যেও ত এমন ভাব দেখা যাইত না! বরং বলিতে পারা যায়, বিপরীত ভাবই পরিলক্ষিত হইত। কেহ-কেহ এমন কথাও বলিতে পারেন যে, এখনকার তুলনায় তখন কয়জনই বা সাময়িক পত্রিকাদিতে লিখিতেন? স্বীকার করি, তখনকার তুলনায় এখন সাময়িক পত্রিকাদিতে লেখিকার সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে; কিন্তু যে হারে লেখিকার সংখ্যা বাড়িয়াছে, তাহার অপেক্ষা বহুগুণে যে তাঁহাদের এইরূপ মনোভাব-জ্ঞাপক রচনাদির প্রাচুর্য্য ঘটিয়াছে, এ কথা তাঁহারা ত অস্বীকার করিতে পারেন না। তবেই দেখা যাইতেছে, যাঁহাদের বলিবার সুযোগ ও ক্ষমতা আছে, বর্ত্তমানে তাঁহাদের অনেকেই এই প্রকারের কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছেন, যাহা পূর্ব্বে করিতেন না।

কোন-কোন লেখিকার ভাষার উগ্রতার সুযোগ লইয়া বিপক্ষবাদীদিগের মধ্যে কাহার-কাহারও আসল কথাটা চাপা দিবার চেষ্টাও দেখা যায়। স্বীকার করি চির-স্নেহময়ী মাতৃজাতির পক্ষে কোনরূপ অসংযত ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিজেদের দুঃখ-কাহিনী বা জ্বালার কথা বিবৃত করা অশোভন। কিন্তু তাঁহাদের সমস্ত সম্প্রদায়ের পক্ষে এইরূপ মর্য্যাদা-হানিকর বা কলঙ্ককর বিষয়টার বিরুদ্ধে দুই-একজন ভিন্ন অন্য ভগিনীদের সামান্য প্রতিবাদ বা তদ্বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিতে না দেখিয়া এমনও মনে করিতে পারা যায় যে, আসল ব্যাপারে সত্যের অপলাপ যদি না হইয়া থাকে, তবে সামান্য অবাস্তব একটা বিষয়ে মনোযোগ দিয়া লেখিকাকে নিরুৎসাহ করা হয় ত তাঁহারা আবশ্যক মনে করেন না। তাহা হইলে ইহাই প্রতীয়মান হয় না কি, যে, যাঁহারা এরূপ বিষয় রোধের চেষ্টায় ক্ষমতা থাকিতেও বিরত, তাঁহারা, অন্ততঃ তাঁহাদের অনেকেই, উক্ত মতের পরিপোষক?

অনেকের মুখে শুনিতে বা লেখায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের ললনাগণ জাগিয়াছেন। এ কথা শুধু রমণী নয়, পুরুষদের মুখেও এমনই ভাবে বহু স্থলে ব্যক্ত হইয়াছে যে, উহা একটা সরল মন্তব্য ভিন্ন আর কিছু মনে করিবার অবসর নাই। জাগরণ কথাটা এখানে ঠিক কি না, সে বিষয়ের আলোচনার এখানে আবশ্যকতা নাই। কিন্তু সাধারণ সংজ্ঞাই যখন সকলে এইরূপই দিতেছেন, তখন উহাই বলা যাক। এই কথাটা যে দোষের নয়, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। বড় জোর সময়-অসময়ের কথা আসিতে পারে, এই পর্য্যন্ত। যেখানে মেয়েদের জাগরণের সহিত পুরুষের স্বার্থের সম্পর্ক, সেখানে পুরুষের ইচ্ছায় যদি উহা সংঘটিত না হইয়া থাকে, তবে তাহা স্বাভাবিক ভাবেই হইয়াছে বলিতে পারা যায়। সুতরাং স্বাভাবিকের মধ্যে আর অসময়ের কথা আসিতে পারে না। অতএব মেয়েদের মনোভাবের পরিবর্ত্তন বা ভাব-বিপর্য্যয় স্বাভাবিক, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

নারীদের স্বাধিকার বিষয়ক প্রবন্ধ সকলের প্রসঙ্গে, কোন-কোন লেখককে, তাঁহাদের সহিত একটা আপোষ মীমাংসা দ্বারা যেন বিবাদ-নিষ্পত্তির মত যুক্তি উত্থাপন করিতে দেখা যায়। ইহাতেও কতকাংশে

তাঁহাদের আন্দোলনের সার্থকতা স্বীকার করিয়াই লওয়া হয়।

তাহা হইলে, এই সকল বিষয় হইতে বলিতে পারা যায়, বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালার অধিকাংশ, সুতরাং প্রায় সমগ্র নারীসমাজের অভিমতই এই, অন্ততঃ এই ভাবের। সুতরাং তাঁহাদের বা আমাদের, যাহাদের দিক দিয়াই হউক, এ বিষয়ে পুরুষ-সমাজের কিছু ভাবিবার বা করিবার আছে কি না, অচিরে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। বিরাট হিন্দু-সমাজের অঙ্কশায়িত আমাদের বাঙ্গলার পুরুষ-সমাজ যদি আপন বুকে হাত দিয়া নারীদের এ জাগরণ, এ আন্দোলন, এ মন্তব্য প্রকাশ অসঙ্গত বা অসাময়িক বলিতে পারেন—তাঁহাদের প্রতি পুরুষদের ব্যবহারে কোন বিশেষ দোষ নাই, এ কথা যদি জোর করিয়া বলিতে পারেন, তবে স্বতন্ত্র কথা। নচেৎ বিষয়টী যেরূপ প্রয়োজনীয়, তাহাতে ইহার সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া অতি শীঘ্র কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা একান্ত বিধেয়। যখন হিন্দু-মুসলমান চির-বিদ্বেষ ভুলিয়া আজি এক হইতে অগ্রসর হইতেছে, যখন সমগ্র ভারত এক মনে এক চিন্তায় অনুপ্রাণিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, যখন সমগ্র এসিয়ার বিভিন্ন জাতিতে মিলিয়া এক সঙ্ঘবদ্ধ হইবার কথা উঠিতেছে, তখন আমাদের নিজের ঘরের মধ্যে এমন অমিল, অনৈক্য, বা ঠিক ভাষায় বলিতে হইলে, একের অপরকে এমন করিয়া চাপিয়া রাখিবার প্রয়াস, একান্তই অশোভন। শুধু অশোভন নয়, আমাদের সভ্যতার বাহিরে।

পুরুষ বলিয়া থাকেন, অবলা প্রবলা হইলে বিঘ্ন পদে পদে। অবলা আজি উচ্চকণ্ঠে বলিতেছেন,—"পুরুষদের যে কোন বড় কাজে পূর্ণতা আনতে গেলে যে শক্তির প্রয়োজন, তা নিতে হবে নারীর কাছ থেকে।" নারী প্রবলা হইলে, অর্থাৎ পুরুষদের গণ্ডীর মধ্যে যাইবার চেষ্টা করিলে, বিশ্বের আর কাহার কি হয় দেখিবার প্রয়োজন নাই,—পুরুষের বিঘ্ন অর্থাৎ যথেচ্ছাচারিতায় বাধা পদে পদে—ইহাই চিন্তার কথা। কিন্তু পুরুষ প্রবল হইলে নারীদের অবস্থার কথার উল্লেখ যদি নাও করা যায়, নর-সমাজে তাহার অধীনস্থ অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থার লোকেদের কি বিঘ্ন, কি অভাবনীয় অনিষ্ট সাধিত হইয়া যাইবে, তাহা তাহার দেখিবার এখন অবসর নাই। প্রবল হওয়ায় যদি ক্ষতি থাকে, তবে তাহা স্ত্রীলোকের পক্ষে যেমন, পুরুষের পক্ষেও সেইরূপ, বরং কিছু অধিক—যেহেতু পুরুষের প্রবল হওয়ায় বহু লোকের সর্ব্বনাশের কারণ হয়। কিন্তু তাহাতে কি হয়,—পুরুষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া, তাহার সে প্রবলতায় দোষের কিছু হয় না, বরং উহাই তাহার প্রশংসার কারণ হয়। একই কাজ, যাহা বলবানের পক্ষে শোভন, তাহা দুর্ব্বলের অপরাধের কারণ হইয়া থাকে। এরূপ অন্য বড় উদাহরণেরও অভাব নাই।

এক্ষণে কথা হইতেছে—পুরুষের কথা, নারী প্রবল হওয়া দোষের,—আর নারীর কথা, তাঁহারা ভিন্ন পুরুষের কোন বড় কাজে সাফল্য অনিশ্চিত। এ হেন মানসিক পার্থক্যের অবসান না হইলে, আমাদের মঙ্গল নাই। এ বিপরীত ভাব চলিতে থাকিলে, নর ও নারী উভয় সমাজের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য্য। নারীদের দিক দিয়া যদি নাও দেখা যায়, তথাপি এই সংঘর্ষের ফলে পুরুষদের যে অনিষ্টের আশঙ্কা আছে, তাহা অবহেলার বিষয় নহে।

ঠিক বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, পুরুষ যে মেয়েদের শুধু প্রবলা দেখিতে চায় না তাহা নহে, তাহারা নারীদিগকে দুর্ব্বলা, হীনা হইয়াই প্রস্তুত হইতে দেখিতে চায়। মেয়েদের জন্মের পর যখন হইতে তাহাদের জ্ঞানের উন্মেষ হইতে আরম্ভ হইতে থাকে, তখন হইতেই সে যে দুর্ব্বল, অকর্ম্মণ্য, সকল বিষয়ে হীন, এমন কি সংসারের ভার স্বরূপ, ইহা তাহাদের মাথায় প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। এ কার্য্যে যে সংসারের বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলাদেরও হাত না থাকে, তাহা নহে; কিন্তু তাহা হইলেও, সংসারের কর্ত্তা যিনি তিনিই কি প্রকারান্তরে সেজন্য দায়ী নহেন? পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রবলের প্রায় এই আচরণ। পাশ্চাত্য গুরুও আমাদের কর্ণে এমনই ইষ্টমন্ত্রের দ্বারা দীক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহারাও বলিয়া থাকেন, আমাদের রক্ষার জন্যই তাঁহাদের ন্যায় বৃহৎ বটচ্ছায়ার প্রয়োজন। কিন্তু কে বিচার করিবেন,—সেই আওতাতেই আমাদের রৌদ্র-বাতাস রোধ হইয়া ক্রমে আমাদের মৃত্যু না আনিবে! পুরুষ নিজে যাহাই বলুন, আমাদের নারী-লতিকাদের পক্ষেও পুরুষরূপী মহাবটের ছায়া যে ঠিক তেমনই কার্য্য করিতেছে না, এ কথা জোর করিয়া বলিবারই বা অধিকার কাহার আছে?

জানি, আমার এ সকল মন্তব্যের মূল্য বড় বেশী বলিয়া কেহ মনে করিবেন না। এ সব অনেকের কাছে সৃষ্টিছাড়া কথা মাত্র বিবেচিত হইবে। জানি, আমার এই বক্তব্য যোগ্য মুখ হইতে নিঃসৃত হইলে, কাজে যদি কিছু নাও হইত, একটা আলোচনা আন্দোলনের সৃষ্টি করিত, যা আমার কথায় করিবে না। তথাপি, বিষয়ের গুরুত্ব ভাবিয়া, আমি আমার মনে যাহা হয়, তাহা সসঙ্কোচে বলিলাম। আমার বলিবার কথা ইহা নয় যে, লেখিকাগণ যাহা কিছু বলিতেছেন, তাহাই বর্ণে-বর্ণে সত্য বা মিথ্যা; অথবা তাঁহাদের মধ্যে কাহার-কাহারও রচনা ঔদ্ধত্য-দোষে দুষ্ট নয়, কিম্বা নারী-জন-সুলভ শ্লীলতার সীমা অতিক্রম করে নাই। নারীর নারীত্ব, বিশেষত্ব বা স্বাতন্ত্র্য ঘুচাইয়া, ঠিক পুরুষদের মত একই প্রকারের স্বাধীনতাই যে বাঞ্ছনীয় হইয়াছে, তাহাও আমার বক্তব্য নয়। আমার কথার মধ্যে ভুল থাক, ধৃষ্টতা থাক, রমণী-সমাজের অনুগ্রহ বা স্নেহ লাভের কৌশল বলিয়া কাহারও দ্বারা নির্দ্দেশিত হোক, তথাপি আমি বলিতে চাহিতেছি, তাঁহাদের যুগ-যুগান্তর এক ভাবে কাটিতে-কাটিতে, অকস্মাৎ এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে সত্যের অংশ কতটা, তাহা ভাল করিয়া না দেখিয়া উহা উপেক্ষা করা চলে না। উক্ত শ্রেণীর লেখাগুলির সম্বন্ধে পুরুষ কর্ত্তৃক যেথানে যাহা কিছু উক্ত হইতেছে, তাহার অধিকাংশই নারীদের লক্ষ্য করিয়া,—তা ভৎর্সনা, ভয়-প্রদর্শন, ব্যঙ্গ বা পরামর্শ, যে ভাবেই হোক। নারীদের প্রতি পুরুষদের ব্যবহার সম্বন্ধে কি কোন ত্রুটীই নাই? এ সম্বন্ধে তাঁহাদের নিজেদের দিকে চাহিয়া দেখিবার কি কিছুই নাই? ভাষার দৈন্য বা উগ্রতার ত্রুটির দিকেই কেবল মাত্র লক্ষ্য না করিয়া, তাঁহাদের কথার মধ্যে কোন সত্য আছে কি না, ইহাই সকলকে ভাবিয়া দেখিতে আমি অনুরোধ করি।

উদ্ধৃত কথাগুলি, বা বর্ত্তমানের ঐ ভাবের অন্য প্রবন্ধগুলির কথা,—ইহা সমগ্র বঙ্গনারীর কথা কি না, সে বিষয়ে এখনও সন্দেহ থাকিলে, তাহার সত্য নির্দ্ধারণ বিষয়ে আর নিশ্চেষ্ট থাকা মূঢ়ের কার্য্য। যদি সন্দেহ থাকে, ইহার জন্য একটা কমিশনের মত কিছু নিযুক্ত করিয়াও, বা অন্য কোন উপায়ে সমগ্র নারীদের তাঁহাদের বক্তব্য বলিবার অবসর দিয়া যদি সত্য নির্দ্ধারণ সম্ভব মনে হয়, দেশের হিতৈষীগণের সে চেষ্টা করা উচিত। এ সব বিষয় ভাবিয়া কেহ কি উদ্যোগী হইবেন না? এখনও এ বিষয়ে অমনোযোগী থাকিলে, এ প্রবল তরঙ্গ রোধ করিবার সামর্থ্য কোন দিনই পুরুষের হইবে না। সময় থাকিতে উপায় না করিলে, শিশুর আব্দারের সময় তাহার হাতে মিঠাই না দিলে যেমন সে উহা পাইয়া সজোরে দূরে নিক্ষেপ করিয়া থাকে, উহাও তেমনই প্রক্ষিপ্ত হইবে। প্রবল ইংরাজ-রাজের শাসন-সংস্কার-দানের মত দশা উহাও হয় ত প্রাপ্ত হইবে।

ভাল হোক, মন্দ হোক, যতদিন চলিয়াছে, চলিয়াছে। তাঁহাদিগকে অন্দরের অধিকার ছাড়িয়া দিয়া, সে রাজ্যের রাণী বলিয়া অযথা স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া রাখা এখন আর চলিবে না। নারী ও পুরুষের কাজ সাধারণতঃ বিভিন্ন হওয়া দোষের নয়, বরং হওয়াই সম্ভব এবং উচিত, যেহেতু তাঁহারা যে পার্থক্যের মধ্যে ও যে সকল শারীরিক উপাদানে গঠিত হইয়াছেন, তাহাতে পুরুষের সকল কাজ নারীর দ্বারা সম্ভব না হইবারই কথা। আমাদের অন্দর-রাজ্যের কর্ত্তব্য এবং কাজও কম নহে। কিন্তু তাঁহারা সে কাজ করিয়াও যদি অন্য কাজ করিতে চান এবং পারেন, তাহাতে বাধা দেওয়ায় অপরাধ আছে; এবং স্বার্থের দিক দিয়া দেখিলে, তাহাতে ক্ষতিও আছে। যদি প্রকৃত পক্ষে অন্দর রাজ্যের রাণী রূপেই তাঁহাদের রাখিতে ও দেখিতে হয়, তবে তাঁহাদের মর্য্যাদাকে তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ না করিয়া, মনুষ্যোচিত ব্যবহারে অভ্যস্ত হওয়া আবশ্যক; নচেৎ শত নির্য্যাতনের পর দুটো মৌখিক পরামর্শ বা মত জিজ্ঞাসা করিয়া, কিম্বা তাঁদের নামে সঙ্কল্প করিয়া একটা দেবকার্য্য বা বারব্রত করাইলেই যথেষ্ট হয় না। আমরা চির-যথেচ্ছাচারী থাকিব, আর তাঁহারা সর্ব্বদা আমাদের জন্য ত্রস্ত-ভীত হইয়া দিন কাটাইবেন; আমাদের দানবোচিত ব্যবহারের প্রতিবাদ করা দূরে থাকুক, তাহা তাঁহারা মনে আনিতেও পারিবেন না, আর আমরা তাঁহাদের মধ্যে সীতা সাবিত্রীর আদর্শ না পাইলেই কথায়-কথায় নেত্র আরক্ত করিব, তাহা হইতে পারে না। ইংরাজ অতি প্রবল রাজা। তাঁহারাও যতদিন পারিয়াছিলেন, ততদিন তাঁহাদের পক্ষে ভারতবাসীদের কিছু অধিকার দিবার আছে, তাহা না ভাবিয়া থাকা চলিয়াছিল। যখন আর সে দিকে লক্ষ্য না করিলে চলিতেছে না বলিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, তখন তাঁহারা সে বিষয়ে মন

দিলেন। কিন্তু সময়ে হয় ত স্বল্পেই অনেক কাজ হইতে পারিত। তখনকার কৃপণতার ফলে এখন ফলও তেমনই হইতেছে। অতি শান্ত ভারতবাসী অশান্তির উচ্চশীর্ষে উঠিতেছে। আজি ভারতবাসী যে জন্য লালায়িত, তাহা তাহারা যেমন তাহাদের জন্মগত অধিকার মনে করে, একটা আব্দার নহে,—মেয়েদেরও সেইরূপ এটা আব্দার নহে, ভিক্ষা নহে,—জন্মগত অধিকারও হইতে পারে। ইহা তাঁহাদের সহিত আপোষ-নিষ্পত্তিরও বিষয় নহে। তাঁহাদের সকল কথায় কাণ না দিলেও, তাঁহাদের যথাপ্রাপ্য তাঁহাদিগকে দিতেই হইবে। উদাসীনতা বা অমনোযোগিতার সুযোগ চিরদিন পাওয়া যায় না। মহিলাগণ যতদিন সেরূপ ছিলেন, ততদিন আমাদের ব্যবহার শোভা পাইলেও, এখন যদি প্রকৃতই তাঁহারা পুরুষের এতটা অধীনতা না চান, তাহা হইলে এ অবস্থায়, এ সন্ধিস্থলে, তাঁহাদের সহিত একটা বিশেষ সংঘর্ষ হওয়া বিচিত্র নহে।

নিজের স্বার্থকে পার্শ্বে রাখিয়া অপরের উন্নতি চাহেন বা অপরের সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হন, এরূপ লোক সংসারে বড় বিরল। যে মাতৃস্নেহের জগতে তুলনা নাই,—পুত্রের জন্য মা বুক চিরিয়া রক্ত দিতে পারেন,—সেই মাকেও, তাঁহার হৃদয়ের ধন পুত্রকে, পরের একটা ছোট মেয়ে দুদিন আসিয়াই ভালবাসিয়া পাছে আত্মসাৎ করিয়া লয়, এই আশঙ্কায় দুর্জ্জয় হিংসা করিতে দেখা যায়। ইহাই জগতের নিয়ম। বলবান দুর্ব্বলকে, অধীনকে ততক্ষণই সহায়তা করিয়া থাকেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত দুর্ব্বল ও অধীন নিজেকে দুর্ব্বল মনে করিয়া অধীনতার ভিতর থাকিবার প্রবৃত্তি অটুট রাখিয়া চলিতে পারে। যে স্থানে ইহার ব্যতিক্রম হয়, সেখানে প্রবল শুধু যে সহায়তা করিতেই বিরত থাকেন তাহা নহে, অত্যাচার, পীড়নও করিয়া থাকেন। বলহীনের উপর সামর্থ্যবানের আধিপত্য অত্যাচার কতকটা স্বাভাবিক। অন্যদিকে সামর্থ্যহীন ততদিনই প্রবলের অধীনে থাকিতে পারে, যতদিন না সে অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হইবার মত সামর্থ্য অর্জ্জনে সক্ষম হয়।

এই নব আন্দোলন বা জাগরণের বহু পূর্ব্বে শুধু বাঙ্গলায় নয়, ভারত ললনার জাগরণ, যে ভাবেই হোক কবি ছিলেন। বিধাতার বিধানে সেই শুভ মুহূর্ত্ত আসি; উভয়ের হিতার্থে সম্ভব হইলে উভয়ে মিলিয়া আত্মনিয়োগ পূর্ব্বক এই জাগরণকে, অন্যভাব ছাড়িয়া, দেবতার ইঙ্গিত, মায়ের আশীর্ব্বাদ জ্ঞানে বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া বরণ করিয়া লইয়া অগ্রসর হওয়া উচিত। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সে চিহ্ন খুব কমই দেখা যায়। মুখে যাহাই বলি না, নারীদের সে ঘুমঘোর ভঙ্গ দেখিতে কয়জন চান; তাহাও বুঝিতে পারি না। রমণী দুর্ব্বল, রমণী পরাধীন ইহা পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়া লইলেও, দুর্ব্বল এবং পরাধীন যে স্বাধীনতা চাহিতে পারে, স্বাধীনতা ভিন্ন জীবন বৃথা, ইহা যে ভাবিতে পারে এবং তাহা অপেক্ষা বড় কথা, তাহারা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়া যে জয়ী হইতে পারে ইহার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নূতন নহে। একটা কথা হইতে পারে; মেয়েদের যখন সে বল হইবে, দেখা যাইবে। কিন্তু মানুষ বিশেষতঃ সভ্য মানুষদের ত এ কথা হইতে পারে না।

ললনাগণ তাঁহাদের অগ্রসর হইবার পথ নিজেরাই স্থির করিতে চাহিয়াছেন। যদি তাঁহাদের জন্য আমাদের কিছু করিবার না থাকে, বা অতঃপর আর সে চিন্তা আবশ্যক নাই ইহাই স্থির হয়, তবে না হয় আমাদের স্বার্থের জন্যই আমাদের করিবার কিছু থাকে, কালক্ষেপ না করিয়া সর্ব্বাগ্রে তাহাতে মনোযোগী হওয়া উচিত; কিন্তু আত্মতৃপ্তির জন্য নিজেদের অর্দ্ধেকটাকে এমনই অন্ধকারে নিক্ষেপ করিয়া রাখিয়া নিজেদের জন্মগত অধিকার লাভের আকাঙ্খায় প্রমত্ত হওয়া বাতুলতা মাত্র, ইহাই প্রমাণিত হইবে। আরও এক কথা, একটা দিক একেবারে ভুলিয়া কেবল নিজেদের জন্য এমন চিন্তা ধ্বংশেরই পথি-প্রদর্শক। দুর্ব্বলের হিতাহিত চিন্তা উপেক্ষার বিষয় নহে, কিন্তু এরূপ অবস্থায় রমণী সমাজের প্রকৃত হিতের উপায় করা শুধু পুরুষদের দ্বারা বড় কঠিন। ক্ষণিকের ইচ্ছা বা উত্তেজনায় স্বার্থ-বেষ্টনি ভেদ করিয়া যে কাজ করা, তাহা প্রায় নিষ্ফল হইয়া থাকে। তাঁহাদের প্রকৃত উন্নতির দিকে মনোযোগী হইতে হইলে যোগ্যা রমণীদের সহিত পরামর্শ করিয়া একযোগে যাহা কিছু করাই উচিত মনে হয়। এই মহাসন্ধি সময়ে নীচ স্বার্থের দিকে এখনও চহিয়া থাকিলে আর চলিবে না। যুগধর্ম্ম তাহা আর সহিবে না, তাহাতে পুরুষদের ঠকিতে হইবে, ঘৃণিত হইতে হইবে। উভয়ের পতনের সহিত জাতির পতনই আনয়ন করিবে, নিজেদের মরণ-শয্যা নিজেদের দ্বারাই রচিত হইবে।

নায়েব মহাশয়

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

"এক রাজা যাবে পুনঃ অন্য রাজা হবে,
বাঙ্গলার সিংহাসন শূন্য নাহি রবে।"

কবিবর নবীনচন্দ্রের এই উক্তি মুচিবাড়িয়া কানসার্ণের অগণ্য প্রজাপুঞ্জের অন্তরে পুনঃ-পুনঃ ধ্বনিত হইতে লাগিল, যখন—বিদ্যাহীন দরিদ্র শ্রীনাথ গোঁসাই মুরুব্বি ও 'খুড়ো মশায়' ভুবন রায়ের সুপারিসে এবং তাহার জামিনের জোরে এই সুবিস্তীর্ণ কানসার্ণের নায়েবী-পদে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। অতি-ভক্তিটা যে সাধুর লক্ষণ নহে, যেন এই প্রচলিত প্রবচন ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যেই শ্রীনাথ গোঁসাই নায়েবী-পদে বাহাল হইয়াও, কিছুদিন পর্য্যন্ত ভুবন রায়কে তাহার ইষ্টদেবতা অপেক্ষা অধিক ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিল। সে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী সদরের নায়েব, আমলাকুল-চূড়ামণি,—আর ভুবন রায় তাহার অধীন একটা নীল কুঠির দেওয়ান মাত্র। সদরের একজন সাধারণ তহশীলদার অপেক্ষা ভুবন রায়ের পদগৌরব এক কড়াও অধিক মনে করিবার কারণ ছিল না; অথচ গোঁসাই তাহার সহিত ব্যবহারে এমন ভাব দেখাইত যে, ভুবন রায়ই কানসার্ণের ডেপুটী ম্যানেজার, আর সে তাহার পদানত ও আশ্রিত সামান্য কারপরদাজ মাত্র! ভুবনকে কার্য্যানুরোধে মধ্যে মধ্যে অশ্বারোহণে কানসার্ণের কাছারীতে আসিতে হইত। ভুবনের ঘোড়া বহু দূরে থাকিতেই, শ্রীনাথ নায়েব শতকার্য্য ফেলিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে কাছারীর বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইত। ভুবন বারান্দার নীচে আসিয়া ঘোড়া হইতে নামিবার পূর্ব্বেই, শ্রীনাথ ভুবনের ঘোড়ার পাশে গিয়া, তাড়াতাড়ি তাহার (ঘোড়ার নহে, ভুবনের) এক পায়ের পদরেণু অর্থাৎ জুতার ধূলা হাতে লইয়া, ব্রজের রজের মত তাহা ওষ্ঠে ও মস্তকে স্পর্শ করাইত। তাহার পর অশ্বটির অর্দ্ধেক প্রদক্ষিণ করিয়া, সেই ভাবে অন্য পদের পবিত্র রেণু সঞ্চয় ও তাহার সদ্ব্যবহার করিত! ইহা লক্ষ্য করিয়া হাম্‌ফ্রি সাহেবের আরদালী এব্রাহিম্ তাহার চাচাতো ভাই বরকতুল্লা হাল্‌সানাকে বলিয়াছিল, "সুমুন্দির ভিটকিলোমি দেখ্‌লে গা জলে' যায়,—ইচ্ছে হয়, মারি গালে এক থাপ্পোড়! দেওয়ান্‌জির ঘোড়াটা যদি আর আদ হাত উচু হতো, তা'হলে নায়েব বেটা তার পেটের তলা দিয়ে গিয়েই উনার আর এক পায়ের ধূলো নিয়ে চাঁট্‌তো! আরে তুই হলি কানসার্ণির নায়েব, আর রায়জি হ'লো তোরই এলাকার এট্টা ক্ষুদে নীলকুঠির দেয়ান; তুই যাস্ তার পায়ের ধূলো চাঁট্‌তে? কি ঘেন্নার কথা! হাঁ, নায়েব ছেলো বটে সব্বঙ্গ সান্‌ডেল, কদ্দিন সে সায়েবকে পর্য্যন্ত রুলপেটা করতে গিয়েলো। কি দাপটেই সে নায়েবী ক'রে গিয়েচে! তার যায়গায় হ'লো কি না এই মেটো আমিন নায়েব?. 'ছুঁচোর গোলাম চাম্‌চিকে, তার মাইনে চোদ্দ শিকে!' আপ্‌শোষের কতা আর কি বুল্‌বো, ভাইজান?"

সামান্য আরদালীর মনের ভাব যখন এইরূপ, তখন শ্রীনাথের ব্যবহার দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে কানসার্ণের আমলারা কি ভাবিত, তাহার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

নায়েবী লাভ করিয়া শ্রীনাথের ধারণা হইল, নায়েবী-কার্য্যদক্ষতার সর্ব্বপ্রধান নিদর্শন ম্যানেজার সাহেবের মনস্তুষ্টি-সাধন! সুতরাং ইহাই তাহার কর্ম্মজীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইল। কানসার্ণের সকল কর্ম্মচারীই ধর্ম্মজ্ঞান বিসর্জ্জন দিয়া, নানা অবৈধ কার্য্যে মিঃ হাম্‌ফ্রির মনোরঞ্জন করিয়া চাকরী বজায় রাখিত। কেহ বিবেক বা কর্ত্তব্যজ্ঞানের সম্মান রক্ষার চেষ্টা করিলে, সাহেব যে ভাষায় তাহাকে গালি দিতেন,—অতি ইতর চোয়াড়ও সে ভাষা ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হয়! দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা-ফলে সাহেবের ধারণা হইয়াছিল, চাকরীর খাতিরে বাঙ্গালী সর্ব্বপ্রকার হীনতা ও অপমান পরিপাক করিতে পারে। নায়েব সর্ব্বাঙ্গ সান্যালকে পদচ্যুত করা সাহেবের সাধ্যাতীত ছিল বলিয়া, তিনি সাহেবকে তত ভয় করিতেন না,—সময়ে-

সময়ে তেজস্বিতারও পরিচয় দিতেন; সাহেবও তাঁহাকে কতকটা খাতির করিয়া চলিতেন। কিন্তু সাহেব অনুগ্রহ করিয়া শ্রীনাথকে নায়েবী দিয়াছিলেন। ভূতপূর্ব্ব নায়েবের পন্থার অনুসরণ করিলে শীঘ্রই তাহাকে অপদস্থ ও বিতাড়িত হইবে হইবে বুঝিয়া, বিশেষতঃ সান্যাল নায়েবের মত তাহার বিদ্যাবুদ্ধি ও বহুদর্শিতা না থাকায়, সে মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা, জাল-জুয়াচুরী প্রভৃতি অসদুপায় অবলম্বনে প্রভুর প্রশংসাভাজন হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। শ্রীনাথ গোঁসাই সাহেবের নিকট এতই হীনতা ও দৈন্য প্রকাশ করিত যে, হাম্‌ফ্রি সাহেব সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় বাঙ্গালী-চরিত্র, বিশেষতঃ কুঠির আমলাদের ফন্দী-ফিকির নখ-দর্পণে পাঠ করিতে সমর্থ হইলেও, শ্রীনাথের ন্যাকামীর আবরণ ভেদ করিয়া তাহার কপটতা ও কুটিলতার সন্ধান পাইতেন না। সরলতাই যে তাহার 'বক্রতার নির্ভরের দন্ত' ইহা সে কোন দিন সাহেবকে বুঝিতে দেয় নাই! সর্ব্বাঙ্গ সান্যালের মত মহা অত্যাচারী, ও অপকর্ম্মে অকুণ্ঠিত নায়েব যে সকল হীন কার্য্য করিতে লজ্জা বোধ করিতেন,—সম্ভ্রমের লাঘব হইবে মনে করিয়া যে সকল অপমানজনক কার্য্য সাহেবের আগ্রহ সত্ত্বেও প্রত্যাখ্যান করিতেন,—শ্রীনাথ গোঁসাই সেই সকল কার্য্য নায়েবের অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিত, এবং তাহা সুসম্পন্ন করিয়া গৌরব অনুভব করিত! যে কোন হেয়, হীন, জঘন্য কাজ করিয়া সে হাম্‌ফ্রি সাহেবের নিকট প্রতিপন্ন করিত—সে সাহেবের ক্রীতদাস ভিন্ন আর কিছুই নহে; সে সাহেবের হাতের চাবুক, শ্রীচরণের বুট, এবং ঘোড়ার জিনের রেকাব-দল।

সুতরাং শ্রীনাথ গোঁসাই কিছু দিনের মধ্যেই হাম্‌ফ্রি সাহেবকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ বশীভূত করিয়াছে দেখিয়া কেহই বিস্মিত হইল না। বিদ্যাবুদ্ধিহীন, গৃহহীন, নিঃস্ব শ্রীনাথ সহসা যেন আলাদীনের প্রদীপ হস্তগত করিয়া অল্প দিনেই বিস্তীর্ণ এলাকার মধ্যে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী হইয়া উঠিল। এমন কি, সে-দিগরের ভদ্রসমাজও শ্রীনাথের কার্য্যদক্ষতার পরিচয় পাইয়া, পরম গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, 'কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ! ভাতের হাঁড়ি নামাইতে লোহার বেড়ি ধরিয়া যাহার হাতে কড়া পড়িয়া গিয়াছে, তাহার কড়া হুকুমে এত বড় কান্‌সারণের সকল কাজ কলের মত চলিয়া যাইবে, ইহাতে আর বিস্ময়ের কি কারণ আছে?"

গোলোক রায় ও ভুবন রায় ভ্রাতৃযুগলের অভ্যুদয় কালে—তাহাদের বংশের সকলেই হাম্‌ফ্রি সাহেবের অনুগ্রহে কারসারণে চাকরী পাইয়া অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিয়া লইয়াছিল; ম্যানেজার সাহেবকে বশীভূত করিয়া শ্রীনাথও এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কালী গোঁসাইকে আনিয়া সে কান্‌সারণের একটি কাছারীতে গোমস্তা নিযুক্ত করিয়া দিল; এবং অন্য সহোদর হৃষীকেশ গোঁসাইকে আমিনীপদ প্রদান করিল। ইহা যে শ্রীনাথের ভ্রাতৃবৎসলতার প্রমাণ, এরূপ যেন কেহ মনে করিবেন না। তাহার ন্যায় স্বার্থপর, পরশ্রীকাতর ও কুটিল লোক যে আত্মীয়-স্বজনগণকে প্রীতির চক্ষে দেখিবে, ইহা আশা করা যায় না। ভ্রাতৃদ্বয়কে বশীভূত রাখিয়া পরিজনবর্গের উপর প্রভুত্ব সংস্থাপনের জন্য ইহা তাহার একটি অনিন্দ্য-সুন্দর চাল মাত্র!

সর্ব্বাঙ্গ সান্যাল যখন নায়েবীপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময় তিনি প্রভুত্ব বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে, অন্যান্য ভূস্বামীগণের স্থায়ী সম্পত্তি, পত্তনীদার, দরপত্তনীদার বা ছে-পত্তনীদাররূপে—যে কোন উপায়েই হউক, কান্‌সারণের অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন; এতদ্ভিন্ন তিনি নানা কৌশলে কান্‌সারণের সন্নিকটবর্ত্তী জমীদারদের সম্পত্তি দখলে রাখিবারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দুর্ব্বল জমীদারেরা মামলা-মকদ্দমা রূপ শোণিত-শোষণের সংগ্রামে তাঁহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইতে সাহস করিবে না। সেই সকল জমীদারের কর্ম্মচারীরা গণ্ডগোলের সূত্রপাত করিলে সান্যাল নায়েব কুকুরের সম্মুখে মাংসখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া চীৎকারের পথ বন্ধ করিতেন। কুকুরগুলা মহানন্দে সেই মাংস চর্ব্বণ করিতে থাকিত; তিনিও সেই সুযোগে প্রাজ্ঞের ন্যায় স্বকার্য্য উদ্ধার করিতেন। কূটনীতিবিশারদ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সান্যাল নায়েব যতদিন স্বপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এই ভাবেই কাজ চালাইয়া আসিয়াছেন। শ্রীনাথ গোঁসাই—গোঁসাই-গোবিন্দ মানুষ হইলেও, কুকুরকে বঞ্চিত করিয়া সেই মাংসখণ্ডগুলি নিজের কণ্ঠসংলগ্ন ঝুলির ভিতর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ইহাতে গৃহস্থের কুকুরগুলা অসন্তুষ্ট হইয়া তীব্র চীৎকারে নিদ্রিত গৃহবাসীদের

তর্ক করিতে লাগিল। গৃহস্থদের নিদ্রাভঙ্গ হইলে, তাঁহারা য়ন উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন, 'ঘোল খায় হরিদাস, াধাই দেয় কড়ি!'—এ অতি চমৎকার ব্যবস্থা।

প্রতিবেশী ভূস্বামীগণ দুর্ব্বল হইলেও, ঘরের কড়ি দিয়া নির্ব্বিবাদে হরিদাসকে ঘোল খাওয়াইতে রাজী হইলেন না,—খাল খাওয়াইবার জন্য রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন; রাজ-ঙ্টুম্বের বিরুদ্ধে তাঁহারা আদালতে অভিযোগ উপস্থিত রিলেন।

এই 'মাধাই' সম্প্রদায়ের মধ্যে মতিলাল বেহানীর নাম বশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মতিলালের পূর্ব্বপুরুষেরা বহারাঞ্চল হইতে বাণিজ্য করিতে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। সকালে যে সকল বণিক ব্যবসায়-বাণিজ্যে কমলার প্রসন্নতা াভ করিতে সমর্থ হইতেন, তাঁহারাই ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া মীদার হইয়া বসিতেন। স্বয়ং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই খন তুলাদণ্ডের কল্যাণে রাজদণ্ড লাভ করিয়াছিলেন, খন দেশী বণিকেরাও সুযোগ পাইলে সেই উচ্চ আদর্শের নুসরণ করিবেন, ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। মতিলালের র্ব্বপুরুষ বাণিজ্যে বিস্তর অর্থসঞ্চয় করিয়া, জাফরগঞ্জ জলায় জমীদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। মতিলালের সম্পত্তি মুচিবাড়িয়া কান্‌সার্ণের সম্পত্তি পদ্মাতীরবর্ত্তী ও পরস্পর ংলগ্ন।

মতিলাল মুচিবাড়িয়া কান্‌সারণের বিরুদ্ধে আদালতে ভিযোগ উপস্থিত করিলে, ফৌজদারী হাকিম ঘটা করিয়া বচার আরম্ভ করিলেন। পদ্মাতীরবর্ত্তী মাণিকচর গ্রামে াকিমের 'ক্যাম্প' পড়িল; মতিলালকে সংবাদ দেওয়া ইল—ধর্ম্মাবতার এই ক্যাম্পের এজলাসে বসিয়া ায়দণ্ড পরিচালন করিবেন। কিন্তু ইহাতে মতিলালের থেষ্ট অসুবিধা হইল; তিনি বলিলেন, বিচারের স্থান-র্ব্বাচনে ধর্ম্মাবতার মহাশয় নিরপেক্ষতার পরিচয় তে পারেন নাই; কারণ, মাণিকচরের সান্নিধ্যে াহার কোন প্রজার বসতি নাই,—সেই স্থানের যাবতীয় ধিবাসীই কান্‌সারণের প্রজা।—সুতরাং আসামীর রিবর্ত্তে ফরিয়াদীকেই ঘোল খাইবার জন্য প্রস্তুত তে হইল! ইহাতে তিনি নিরুৎসাহ না হইয়া সদর হইতে কজন বি-এল মার্কা উকীলকে তাঁহার পক্ষে মামলার বির করিতে ফৌজদারী ক্যাম্পে পাঠাইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, কান্‌সারণের উকীল মোক্তার ও আমলার দলও মহাসমারোহে এই মামলার তদ্বিরে প্রবৃত্ত হইলেন।

ধর্ম্মাবতার সদর হইতে মামলা করিতে আসিয়া কান্‌সারণের এলাকায় শিবির-সন্নিবেশ করিয়াছেন,—অতিথি-সৎকারের কোন ত্রুটি না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হাম্‌ফ্রি সাহেব এবং নায়েব শ্রীনাথ গোঁসাই তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য বলিয়াই মনে করিলেন। সুতরাং ধর্ম্মাবতার ক্যাম্পের এজলাসে বিচার আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, কান্‌সারণের পক্ষ হইতে পানাহারের যেরূপ আয়োজন হইল, তাহা দেখিলে কোন অনভিজ্ঞ আগন্তুক নিশ্চয়ই অনুমান করিত—কোন সম্ভ্রান্ত জমীদার তাঁহার কন্যার বিবাহ উপলক্ষে সমাগত বরযাত্রীদের পোলাও কালিয়া দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতেছেন! ধর্ম্মাবতারের মনোরঞ্জনের জন্য পান-ভোজনের কোন উপচারই বাদ পড়িল না। কিন্তু বিচারক মহাশয় সুচতুর 'প্রাজ্ঞ' হাকিম,—তিনি পেটে খাইয়াই পিঠে সহিবার লোক ছিলেন না; তিনি হাম্‌ফ্রি সাহেবের নিমকের সম্মান রাখিলেন না; আহারাদির পর ক্যাম্পের এজলাসে বসিয়া যে সুর বাহির করিলেন, কান্‌সারণের আমলা ও উকীল মোক্তারগণের তাহা নিতান্ত বেসুরো বোধ হইল! মতিলালের উকীল যথাযোগ্য উৎসাহের সহিত মক্কেলের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। কান্‌সারণের কার্য্যকারকেরা শঙ্কিত ভাবে 'মুখ চাওয়াচাওয়ি' করিতে লাগিল। কিন্তু নায়েব শ্রীনাথ গোঁসাই কেবল একটি শর লইয়াই রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় নাই,—

"অকস্মাৎ তূর্য্যধ্বনি হইল তখন,
নবাবের অনুমতি কালি হবে রণ!"

ধর্ম্মাবতার পরদিন মামলা করিবেন বলিয়া সেদিনের জন্য বিচার মুলতুবি রাখিলেন। পরদিন যথাসময়ে মামলা আরম্ভ হইল; কিন্তু কান্‌সারণের পক্ষ হইতে সেদিন এমন চমৎকার তদ্বির হইয়াছিল, এরূপ অভ্রান্ত ও অকাট্য নজীর দাখিল করা হইয়াছিল যে, এই মামলায় কান্‌সারণের জয়-লাভ সুনিশ্চিত—এ বিষয়ে কাহারও কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। এমন কি, নজিরের প্রভাবে মতিলালের উকীল পর্য্যন্ত অভিভূত হইয়া আপন-পর ভুলিয়া গেলেন,—তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল।

এজলাসে অনেকেই মামলা দেখিতে আসিয়াছিল। অকাট্য নজীরের মহিমা উপলব্ধি করিয়া তাহারা মুগ্ধ হইলেও একজন নির্ব্বোধ ভদ্রলোক বিবেচনার অভাববশতঃ ধর্ম্মাবতারের অনিন্দ্যসুন্দর বিচারপদ্ধতির অনুমোদন করিতে পারিলেন না; ইহা বিচারের অভিনয়মাত্র অনুমান করিয়া অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন, এবং নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইলেন!

এই ভদ্রলোকটির নাম ডাক্তার যোগেন্দ্র বিশ্বাস। তিনি কান্‌সারণের প্রজা ছিলেন, এবং বাসগ্রাম মাণিকচরেই স্বাধীন ভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেন। যোগেন্দ্র বিশ্বাস মামলার গতি ও প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া তাড়াতাড়ি মতিলালকে একখানি পত্র লিখিলেন; সেই পত্রে তিনি মতিলালের উকীলকে সেনাপতি মীরজাফরের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই কয়েক ছত্র কবিতা উদ্ধৃত করিলেন,—

"দেখিছ না সর্ব্বনাশ সম্মুখে তোমার!
যায় বঙ্গসিংহাসন, যায় স্বাধীনতা ধন,
যেতেছে ভাসিয়া সব,—কি দেখিছ আর?
ভেবেছ কি রণে শুধু করি পরাজয়
'কুঠীয়াল' শত্রুগণ ফিরে যাবে ত্যজি রণ,
আবার 'বেহানী' বঙ্গে হইবে উদয়?"

বলা বাহুল্য, যোগেন্দ্র ডাক্তার কিঞ্চিৎ সাহিত্য-রসাসক্ত ছিলেন বলিয়া, তাঁহার পত্রে কবিত্বরস খয়রাৎ করিয়া বসিলেন। লোকটি সরল, এইজন্য তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে, এই পত্র লিখিয়া বৃথা খাল কেটে কুমীর আনিলেন! বিশেষতঃ তিনি কান্‌সারণের প্রজা! মতিলাল দীর্ঘকাল বঙ্গদেশে বাসহেতু বাঙ্গলাভাষা ভালই বুঝিতেন; কিন্তু তিনি সাহিত্য-রসে বঞ্চিত ছিলেন; সুতরাং পত্রখানির মর্ম্ম ঠিক বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহার বরকন্দাজ মারফৎ তাহা মাণিকচরে তাঁহার উকীল বাবুর নিকট পাঠাইলেন, এবং তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন—তিনিই যেন যোগেন ডাক্তারের প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাঁহার অজ্ঞতা দূর করেন।

মতিলালের উকীল তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে আসিয়া তাঁহার বিপক্ষ দলের সহিত মিশিয়া পড়িয়াছিলেন। বরকন্দাজ যখন মতিলালের পত্র লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল, তখন তিনি কান্‌সারণের কর্ম্মচারীদের নিমন্ত্রণে ভোজের মজ্‌লিসে সমুপস্থিত! মক্কেলের পত্র ও সেই পত্রের মধ্যে ডাক্তারের পত্রখানি পাঠ করিয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। কিন্তু অবিলম্বেই তিনি কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলেন; এবং বরকন্দাজকে বিদায় দিয়া সেই পত্র দুইখানি ধর্ম্মাবতার ডেপুটী হাকিমকে ও হামফ্রি সাহেবের প্রতিনিধি শ্রীনাথ নায়েবকে দেখাইলেন। কথাটা যখন ফরিয়াদীর কাণে উঠিয়াছে—তখন সতর্ক থাকাই কর্ত্তব্য মনে করিয়া, উকীল বাবু সে যাত্রা পান-ভোজনের লোভ ত্যাগ করিয়া ক্ষুণ্ণ মনে প্রস্থান করিলেন। ডেপুটী বাবুও মামলার শেষ মীমাংসা না করিয়া, মাণিকচর হইতে ক্যাম্প উঠাইয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন। মতিলালের শ্রাদ্ধ অধিকদূর গড়াইল না বটে, কিন্তু নায়েব শ্রীনাথ গোঁসাই ক্রোধে তক্ষকের ন্যায় গর্জ্জন করিতে-করিতে প্রতিজ্ঞা করিল—যোগেন ডাক্তারকে সে জেলে না পুরিয়া ছাড়িবে না। ক্রুদ্ধ নায়েব অতঃপর যোগেন ডাক্তারের নির্য্যাতনের যে ব্যবস্থা করিল, মুচিবাড়িয়ার এলাকাতেই তাহা শোভা পাইত। নায়েব শ্রীনাথ গোসাইয়ের নায়েবী চালের পরিচয় প্রদানের জন্যই এই অত্যাচার কাহিনী প্রকাশ করিতে হইল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে শ্রীনাথ নায়েব 'সরকারী কার্য্যে' মাণিকচরে উপস্থিত হইয়া, থানার দারোগাকে নৈশ ভোজনের জন্য কাছারী-বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিল।—আহারাদির পর দারোগাকে অনুরোধ করা হইল, শান্তিরক্ষার জন্য পরস্বাপহারী যোগেন ডাক্তারের হাতে হাতকড়ি দিয়া চালান দিতে হইবে; এবং সে যাহাতে দীর্ঘকাল কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া চরিত্র সংশোধনের সুযোগ পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দারোগা প্রথমে কথাটা কাণেই তুলিল না। নায়েব দেখিল, উপযুক্ত মুষ্টিযোগ ভিন্ন দারোগার বধিরতা নিবারণের আশা নাই। সুতরাং অবিলম্বে অব্যর্থ মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা হইল। স্বর্ণঘটিত মুষ্টিযোগের ক্রিয়া অতি চমৎকার! 'গোপনে বিরলে বসি নিশি দ্বিপ্রহরে' মাণিকচরের দুই বিধাতাপুরুষ, নায়েব ও দারোগা দীর্ঘকাল ধরিয়া পরামর্শের পর স্থির করিল, নায়েবের আশ্রিতা একটি বিধবা পরদিন থানায় গিয়া যোগেন ডাক্তারের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ উপস্থিত করিবে। এই অভিযোগ সপ্রমাণ করিবার জন্য কিরূপ তদ্বির করিতে হইবে, এবং কোথায় কি ভাবে ডাক্তারকে গ্রেপ্তার করা হইবে,—পরামর্শ-সভায় তাহাও স্থির হইয়া গেল।

যোগেন্দ্র ডাক্তার জাতিতে মাহিষ্য। সেকালে অধিকাংশ নীল কুঠীই মাহিষ্য কর্ম্মচারিবর্গ দ্বারা পরিচালিত হইত। কুঠীর কাজকর্ম্ম, এবং তাহার কার্য্য-পরিচালকগণের স্বভাব-চরিত্র, রীতি-নীতি সম্বন্ধে যোগেন্দ্র ডাক্তারের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। বিশেষতঃ শ্রীনাথ নায়েব যে কি 'চিজ', তাহা তাঁহার অবিদিত ছিল না। যোগেন্দ্র ডাক্তার যে মুহূর্ত্তে শুনিলেন, নায়েব 'সরকারী কার্য্যে' মাণিকচরে আসিয়াছে, এবং জমীদারের কাছারীতে দারোগার নৈশভোজনের নিমন্ত্রণ হইয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি সরকারী কার্য্যটার স্বরূপ অনুমান করিতে সমর্থ হইলেন; এবং দারোগা নিমন্ত্রণ-রক্ষার জন্য জমীদারী কাছারীতে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই, ডাক্তার কাছারীঘরের পশ্চাদ্বর্ত্তী জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। কাছারী-ঘরের পশ্চাতে সেই বনের দিকে একটি বাতায়ন অর্দ্ধোন্মুক্ত ছিল। তাহার আড়ালে দাঁড়াইয়া ডাক্তার নায়েব-দারোগার সকল পরামর্শই শুনিতে পাইলেন; কারণ, স্বাভাবিক স্বরেই তাঁহাদের পরামর্শ চলিতেছিল। যাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, সে যে সেই রাত্রি-কালে জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিয়া তাহাদের সদালাপ শ্রবণ করিতে পারে,—এরূপ সম্ভাবনা কাহারও মনে উদিত হয় নাই।

যোগেন্দ্র ডাক্তারের বাড়ীতে তাঁহার স্ত্রী ও একটি শিশুপুত্র ভিন্ন অন্য কোন আত্মীয়-পরিজন ছিল না। নায়েবের আগমন-সংবাদ পাইয়া তিনি পূর্ব্বেই তাহাদিগকে কোন আত্মীয়ের গৃহে পাঠাইয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া-ছিলেন। কিন্তু বিপদ অনিবার্য্য বুঝিয়া, সঙ্গতিপন্ন ও পদস্থ লোক হইলেও গ্রামে থাকিতে তাঁহার সাহস হইল না,— সেই রাত্রেই তিনি গ্রামত্যাগ করিলেন!

কিন্তু গ্রাম হইতে নিরাপদে পলায়ন করাও তাঁহার অসাধ্য হইয়া উঠিল। নায়েব শ্রীনাথ গোঁসাই তাঁহাকে হাজতে পুরিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া পূর্ব্বেই পাকা বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। যোগেন্দ্র ডাক্তার গ্রামের যে পথ ধরিয়া গ্রামান্তরে যাইবার চেষ্টা করেন, সেই পথেই দেখিতে পান কুটির লোক পাহারায় আছে! ক্রমে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল; কিন্তু কোন দিক দিয়াই তিনি নায়েবের দৃষ্টি অতিক্রম-পূর্ব্বক গ্রামের বাহিরে যাইতে পারিলেন না! তখন তিনি নিরুপায় হইয়া বন জঙ্গল ভাঙ্গিয়া নদীর ধারে উপস্থিত হইলেন, এবং উলঙ্গ হইয়া পরিধেয় বস্ত্র মাথায় বাঁধিয়া, অতি কষ্টে নদী পার হইলেন। সেই অবস্থায় সাহেবের কোন কোন প্রহরী তাঁহাকে দেখিতে পাইলেও, তাহাদের ধারণা হইল, রাত্রিশেষে কোন জেলে মাছ ধরিবার জন্য জলে নামিয়াছে; সুতরাং তাহারা তাঁহারা অনুসরণের চেষ্টা করিল না।

যোগেন্দ্র ডাক্তার বন জঙ্গল, খাল বিল ও বিস্তীর্ণ প্রান্তর অতিক্রম করিয়া পর দিন প্রভাতে ভিন্ন জেলার একখানি গ্রামে উপস্থিত হইলেন। একে সারা রাত্রি তাঁহার নিদ্রা হয় নাই, তাহার উপর অনাহারে কঠোর পরিশ্রম! তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনায় হইয়া উঠিল। কিন্তু তখনও তাঁহার আতঙ্ক দূর হইল না; কারণ, ভিন্ন জেলা হইলেও, সেই গ্রামখানি তাঁহার জমিদারদেরই সম্পত্তি। এই গ্রামে যোগেন্দ্র ডাক্তারের পরিচিত কয়েক ঘর সম্পন্ন গৃহস্থ বাস করিত। তিনি তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার বিপদের কথা বলিলেন, এবং কাতর ভাবে তাঁহাদের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তাঁহার কাহিনী শুনিয়া কেহই তাঁহাকে এক বেলার জন্যও আশ্রয় দান করিতে সম্মত হইল না! সকলেরই আশঙ্কা হইল, তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছে—এ কথা নায়েবের কর্ণ-গোচর হইলে, নায়েব তাহাদের সর্ব্বস্বান্ত করিতে কুণ্ঠিত হইবে না!

যোগেন্দ্র ডাক্তারের মনের অবস্থা তখন কিরূপ হইয়াছিল, সহৃদয় পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন কি না সন্দেহ! সেরূপ অবস্থায় না পড়িলে কেহই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। পল্লীর কোন গৃহেই আশ্রয় না পাইয়া তিনি ক্ষোভে দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিলেন; কিন্তু স্থির হইয়া কাঁদিবারও অবসর ছিল না। ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় তিনি চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন; এবং ক্ষুধা নিবৃত্তির অন্য উপায় না দেখিয়া গ্রামস্থ এক মুদীর দোকানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে কিছু পয়সা ছিল। সেই দোকান হইতে তিনি কয়েক পয়সার মুড়ি মুড়কী কিনিয়া লইয়া গ্রামপ্রান্তস্থ একটি বটবৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেখানে বসিয়া মুড়ি-মুড়কীগুলি চর্ব্বণ করিয়া অদূরবর্ত্তী জলাশয়ে অঞ্জলি ভরিয়া জলপান করিলেন। এই ভাবে ক্ষুধা-তৃষ্ণা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে, তিনি সেই বৃক্ষতলেই কিছুকাল বিশ্রাম করিলেন।

অতঃপর তিনি কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। অনেক চিন্তার পর তিনি স্থির করিলেন, জাফরগঞ্জে উপস্থিত হইয়া তাঁহার হিতৈষী জমীদার মতিলাল বেহানীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, এবং এই দারুণ বিপদে তাঁহারই শরণাগত হইবেন।

কিন্তু জাফরগঞ্জে যাওয়াও তাঁহার পক্ষে সহজ হইল না। তিনি বুঝিতে পারিলেন, সেখান হইতে যে বাঁধা সড়ক দিয়া জাফরগঞ্জে যাওয়া যায়, সেই পথে চলিতে আরম্ভ করিলে, অবিলম্বেই তাঁহাকে জমীদারের পাইকের হাতে ধরা পড়িতে হইবে। নায়েব তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য চারিদিকে পাইক-বরকন্দাজ পাঠাইয়াছে, এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল না। সুতরাং তিনি সেই বৃক্ষমূল হইতে উঠিয়া সোজাপথে জাফরগঞ্জ অভিমুখে অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না। অনেক বনজঙ্গল ভাঙ্গিয়া দুর্গম ঘোরা পথে চলিয়া একদিনের পরিবর্তে তিনদিনে জাফরগঞ্জে উপস্থিত হইলেন। তিনি মতিলালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহাকে তাঁহার বিপদের কথা আদ্যোপান্ত বলিলেন।

জাফরগঞ্জের সদর ষ্টেসন হইতে কিছু দূরে মতিলালের বাস। মতিলাল যোগেন্দ্র ডাক্তারের বিরুদ্ধে নায়েবের ষড়যন্ত্র-কাহিনী শুনিয়া দুঃখিত হইলেন; এবং ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া সদরে গিয়া জানিতে পারিলেন, ডাক্তারকে চুরি মামলার আসামী করিয়া 'পুলিশ কেস' হইয়াছে। মতিলাল অগত্যা ডাক্তারকে এজলাসে হাজির করাইয়া স্বয়ং তাঁহার জামিন হইলেন।

ডাক্তার জামিনে মুক্তি-লাভ করিয়া মাণিকচরে যাত্রা করিলেন; কিন্তু তাঁহার বন্ধনের উপর বন্ধন পড়িবে, ইহা তিনি তখন কল্পনাও করিতে পারিলেন না!—মুচিবাড়িয়া কানসার্ণের সদর-কুঠীর পাশ দিয়াই মাণিকচরে যাইবার পথ। যোগেন্দ্র ডাক্তার প্রভাতে কুঠীর সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া সম্মুখেই দেখিলেন এক হাতী!

এই হস্তীর আরোহী খগেন মুকুয্যে সম্পন্ন ব্যক্তি,—মাণিকচর-সন্নিহিত সহদেবপুরে তাঁহার বাস। হাম্ফ্রি সাহেবের সহিত প্রত্যক্ষতঃ তাঁহার কোন স্বার্থ-সম্বন্ধ না থাকিলেও, তিনি সাহেবকে তাঁহার মুরুব্বি মনে করিতেন, এবং সাহেবের 'মাই ডিয়ার' হইয়া থাকিবার উচ্চাভিলাষে তাঁহার ও তাঁহার কুঠীর আমলাদের প্রত্যেক অপকর্ম্মের সমর্থন করিতেন। এই মুখোপাধ্যায়-নন্দন যোগেন্দ্র ডাক্তারের দুর্ম্মতির ইতিহাস পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন; এবং চুরির অভিযোগে পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করিতেছে, তাহাও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং তিনি সহসা যোগেন্দ্র ডাক্তারকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে সম্মুখে দেখিয়া, আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন, এবং হাম্ফ্রি সাহেবের গোয়েন্দাগিরির লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না! অথচ এই মুকুজ্যে আমাদের পল্লী-সমাজের একজন সম্ভ্রান্ত—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি!

খগেন মুকুজ্যে ডাক্তারকে দেখিয়া হাতী হইতে নামিলেন; এবং ডাক্তারের বিপদ সম্বন্ধে যেন কিছুই জানেন না, এইরূপ ভাব দেখাইয়া, তাঁহার কুশলাদি-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার পর বলিলেন, "তবে ভায়া, এ পথে এখন বাড়ীতেই চলেছ না কি?"

ডাক্তার বলিলেন, "হাঁ, কুটুম্বিতে শেষ করে এখন বাড়ী যাচ্ছি; সামান্য কয়েক ক্রোশ পথ বৈ ত নয়,—বেলা এগারটার মধ্যেই মাণিকচরে পৌঁছাতে পারবো।"

মুকুজ্যে বাবু পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া বলিলেন, "বিলক্ষণ! তাও কি হয়? এখন বেলা সাড়ে আটটা; রোদ্দুরে কেন অনর্থক কষ্ট ভোগ করবে? মুচিবাড়িয়ায় আমার একটু কাজ আছে, তা শেষ করে' এই হাতীতেই বেড়িয়ে পড়বো। তোমাকে তোমার বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে আমি বাড়ী যাব। মধ্যাহ্নে আহারের ব্যবস্থার জন্যে কোন চিন্তে নেই; আমি তার বন্দোবস্ত করে দেব। আমাকেও ত' চাট্টি খেতে হবে। চল, বেশ গল্প-গুজবে সময় কাটবে।"

ডাক্তার এই প্রস্তাবে যথেষ্ট আপত্তি করিলেন; কিন্তু তাঁহার কোন আপত্তিই গ্রাহ্য হইল না। খগেন মুকুজ্যে মহা সমাদরে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

শ্রীনাথ নায়েব সেই সময় কান্সারণের কাছারী হইতে বাহির হইয়া বাড়ী যাইতেছিল; পথিমধ্যে সে খগেন মুকুজ্যের সঙ্গে যোগেন্দ্র ডাক্তারকে দেখিয়া এতই বিস্মিত হইল যে, তাহার গতি-শক্তি রহিত হইল! সে বিস্ফারিত নেত্রে খগেন মুকুজ্যের মুখের দিকে চাহিতেই, চোখে-চোখে পরস্পরের মনের কথা ব্যক্ত হইল। ডাক্তার সঙ্কুচিত ভাবে

নতমস্তকে এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন; তাঁহার তখন মনে হইল, "মুকুজ্যের অনুরোধে তার সঙ্গে এসে কি কুকর্ম্মই করেচি !"

মুকুজ্যে তাঁহার সঙ্কুচিত ভাব লক্ষ্য করিয়া নায়েবকে বলিলেন, "আমি পথ দিয়ে আস্‌তে আস্‌তে হঠাৎ যোগীন ভায়ার সঙ্গে দেখা ! উনি না কি কয়েক দিন বাড়ী-ছাড়া,—কোথায় কুটুম্বিতে করতে গিয়েছিলেন। তা আমি বল্‌লাম, এত বেলায় আর বাড়ী গিয়ে কাজ নেই, রোদ্দুরে ভারি কষ্ট হবে। আমার হাতে একটু কাজ আছে, কাজ-কর্ম্ম শেষ করে দুই ভায়ে হাতীতেই যাওয়া যাবে। ওঁকে মাণিকচরে নামিয়ে দিয়ে আমি সহদেবপুরে যাব। মাণিকচর দিয়ে যেতে না হয় দশ মিনিট দেরী হবে।"

শ্রীনাথ নায়েব তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া, ডাক্তারের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বলিল, "এসো ভায়া, এসো ! এদিকে অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নেই। তুমি যা-ই মনে করো ভায়া, আমি চিরদিনই তোমাদের 'শুভো' কামনাই করে' থাকি ; দু'বেলা আশীর্ব্বাদ করচি, স্ত্রী-পুত্তুর নিয়ে সুখে সচ্ছন্দে সংসার-ধর্ম্ম কর। তা যখন ভায়া এখানে এসেই পড়েছ, তখন এ বেলা আর তোমাকে ছাড়চি নে ; আমার ওখানেই চাট্টি 'পেসাদ' পেয়ো। হাঁ, হাঁ, ভায়া ! বামুন-বাড়ীর প্রেসাদ—এ না বলবার যো নেই। বিশেষ, খগেন ভায়া কি তোমাকে ফেলে আমার বাড়ী খেতে পারেন ? না, সেটা ওঁর উচিত ? এক যাত্রায় পৃথক ফল, হাঃ, হাঃ !"

স্ফূর্ত্তির চোটে হাসিতে-হাসিতে গোঁসাই নায়েবের চোখে জল বাহির হইয়া পড়িল। যোগেন্দ্র ডাক্তার কিছুই ভুলিয়া যান নাই ; মাণিকচরে সাহেবদের কাছারী-ঘরে গভীর রাত্রে দারোগার সহিত নায়েবের ষড়যন্ত্রের কথা তাঁহার মনে পড়িল। তাহার পর এই কয়দিনের কষ্ট, অপমান, লাঞ্ছনা !- তিনি 'বিষকুম্ভ পয়োমুখ' নায়েবের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন ; কিন্তু শ্রীনাথের অভিনয়-কৌশলে তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল ! তাঁহার অনিচ্ছা বুঝিতে পারিয়া, শ্রীনাথ উভয় হস্তে তাঁহার দুই হাত জড়াইয়া ধরিয়া সাগ্রহে বলিল, "আমি ব্রাহ্মণ, তুমি শূদ্র ; আমার অনুরোধ তোমাকে রক্ষে করতেই হবে। তুমি যদি আজ আমার বাড়ীতে না খাও, তবে আমি এই পৈতে ছুঁয়ে দিব্বি করচি—আমিও আজ জলগ্রহণ করবো না। আজ তুমি আমার অতিথি,—অতিথি হচ্ছে সাক্ষাৎ নারায়ণ। অতিথিকে অভুক্ত রেখে যে পাষণ্ড জলগ্রহণ করে, নরকেও তার স্থান হয় না ! আমাকে নরকে ঠেলো না ভাই !"

অনন্তর, কাচপোকা যেমন তেলাপোকাকে ধরিয়া টানিয়া লইয়া যায়—নায়েব শ্রীনাথ গোঁসাই সেই ভাবে যোগেন্দ্র ডাক্তারকে তাহার বাড়ীতে টানিয়া লইয়া গেল। খগেন মুকুজ্যে তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন। নায়েব মহা উৎসাহে মধ্যাহ্নে অতিথি-সৎকারের আয়োজন করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে নায়েবের ইঙ্গিতে মুকুজ্যে "চট্ করে' একটু কাজ শেষ করে আসি" বলিয়া নায়েবের বৈঠকখানা হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন ; হাত মুখ ধুইবারও বিলম্ব সহিল না !

মানুষ কেবল বাহবার লোভে কতদূর প্রতারক, কপট ও বিশ্বাসঘাতক হইতে পারে, পাঠক-পাঠিকাগণ কি তাহা ধারণা করিতে পারেন ? এই খগেন মুকুজ্যে ও শ্রীনাথ নায়েব তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত !—খগেন মুকুজ্যে যোগেন্দ্র ডাক্তারকে কৌশলে ফাঁদে ফেলিয়া, তাড়াতাড়ি কান্‌সারণের কুঠীতে উপস্থিত হইলেন ; এবং হাম্‌ফ্রি সাহেবের সহিত দেখা করিয়া, তিনি কি কৌশলে হুজুর সরকারের মহা-শত্রু ফেরারী আসামী যোগেন্দ্র ডাক্তারকে ভুলাইয়া আনিয়া নায়েবের গৃহে আটক করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা সবিস্তার বিবৃত করিয়া বলিলেন, "হুজুর, থানায় খবর দিয়া অবিলম্বে সেই শয়তানকে গ্রেপ্তার করিবার ব্যবস্থা করুন। নায়েব মশায়ের অভিপ্রায় অনুসারেই আমি আপনাকে সংবাদ দিতে আসিলাম। হুজুরকে খুসী করিবার জন্যই আমার এই আকিঞ্চন।"

সাহেব বোধ হয় খগেন মুকুজ্যের বিশ্বাসঘাতকতা ও ইতরতার বহর দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিলেন, "ওয়েল মুকার্জি, টুমি কান্‌সার্ণের কর্ম্মচারী না হইলেও সেই 'রাস্‌কেলকে' কৌশলে আটক করিয়াছ,—এজন্য টুমি ঢন্যবাডের পাট্র ; কিন্তু সেই হারামজাদ এখন নায়েবের গেষ্ট, নায়েব টাহাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছে, বলিটেছ। এখন টাহাকে গ্রেপ্টার করিলে নায়েবকে লজ্জা ডেওয়া হইবে। টাহার আহারের পূর্ব্বে টাহাকে গ্রেপ্টার করা হইটেই পারে না।

আমি নায়েবকে এ ভাবে অপডষ্ট্ করিতে ইচ্ছা করি না। তাহার গ্রেপ্টারের বেবষ্টা পরে করিব।"

মুকুন্দো বলিলেন, "হুজুর, এই যোগীন ডাক্তারটা পাজীর পা ঝাড়া! শত্রুকে জব্দ করিবার সুযোগ পাইলে, তাহা কি ত্যাগ করিতে আছে? তার আহার হোক না হোক, হুজুরের তাতে কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। শ্রীনাথ বাবুর ইঙ্গিত বুঝেই আমি হুজুরকে সংবাদ দিতে এসেছি; এখন হুজুরের যা মর্জ্জি।"

সাহেব বলিলেন, "উট্টম কর্ম্ম করিয়াছ, মুকাজ্জি! অতি প্রশংসার কার্য্য করিয়াছ; এখন টুমি যাইটে পার। সেই বজ্জাট যাহাটে টোমাডের চোখে ঢুলা ডিয়া সট্‌কাইতে না পারে, টাহা করিবে; নাউ গুড্ বাই!"

সাহেব উঠিলেন। খগেন বাবু কার্য্য শেষে নায়েবের বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া স্নানান্তে আহ্নিক করিতে বসিলেন। মধ্যাহ্নে নায়েবের অতিথি-সৎকার সুচারু রূপে সম্পন্ন হইল। কিন্তু ডাক্তারের গ্রেপ্তারে বিলম্ব হওয়ায় নায়েবের মন বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল! সে সাহেবের নিকট সংবাদ পাঠাইল, আসামীর আহার শেষ হইয়াছে, আর বিলম্ব করা উচিত নহে।

সাহেব প্রস্তুত ছিলেন। তিনি মুচিবাড়িয়া থানার দারোগাকে সকল কথা লিখিয়া, যোগেন্দ্র ডাক্তারকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করিতে আদেশ দিলেন; এবং পাছে গ্রেপ্তারে বিলম্ব হয়, এই আশঙ্কায় তিনি নায়েবের বাড়ীতে দুইজন বরকন্দাজ পাঠাইলেন। তাহারা আদেশ পাইল—পুলিশ ডাক্তারকে গ্রেপ্তার করিতে না আসিলে, তাহাকে কুঠীতে ধরিয়া আনিতে হইবে।

আহারান্তে যোগেন্দ্র ডাক্তার নায়েবের বৈঠকখানায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় বরকন্দাজদ্বয় লাঠী ঘাড়ে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ম্যানেজার সাহেবের আদেশ জ্ঞাপন করিল। কি ভাবিয়া তাঁহার হাত ধরিল না।

চুরির অভিযোগে ডাক্তারকে গ্রেপ্তার করিবার হুকুম হইয়াছে শুনিয়া, খগেন বাবু যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। তাঁহার আক্ষেপের সীমা রহিল না! নায়েব হতাশ ভাবে টিকি নাড়িয়া বলিল, "আমার বাড়ী থেকে আমার অতিথিকে ধরে নিয়ে যাবার জন্যে সাহেব বরকন্দাজ পাঠিয়েছে? আমার এত অপমান! এমন মনিবের চাকরী করার চেয়ে অনাহারে থাকা, দুয়ারে-দুয়ারে ভিক্ষে মেগে খাওয়া অনেক ভাল।—আজই যদি আমি চাকরীতে ইস্তফা না দেই ত আমি ব্রাহ্মণ থেকে খারিজ! কি অন্যায়!"—

ক্রোধে নায়েবের কাল মুখ লাল হইল,—যেন টিকেয় আগুন লাগিল।

যোগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "গোস্বামী প্রভু, আপনি কুম্ভীরের অশ্রু সংবরণ করুন; 'মাছ মরেছে বিড়াল কাঁদে, শান্ত করলে বকে!'—আপনার বন্ধু পরম ধার্ম্মিক বক,—আপনার পাশেই বসে' আছেন,—তিনি আপনাকে শান্ত করবেন। আপনারা আশ্বস্ত হোন্,—সাহেব আমাকে কুঠীতে ধরে নিয়ে গিয়ে আস্ত গিলে ফেল্‌বে, সে ভয় নেই।"

যোগেন্দ্র ডাক্তার বরকন্দাজদ্বয়ের সহিত সাহেবের কুঠীতে উপস্থিত হইলেন। কয়েক মিনিট পরে মুচিবাড়িয়া থানার দারোগাও ধড়াচূড়া পরিয়া কুঠীতে দর্শন দিলেন। হাম্‌ফ্রি সাহেব তৎক্ষণাৎ ডাক্তারকে গ্রেপ্তার করিতে আদেশ করিলেন। যেন তিনিই দারোগার উপরওয়ালা,—পুলিশের বড় সাহেব!

যোগেন্দ্র ডাক্তার এই দারোগা বাবুর সুপরিচিত বলিলেই যথেষ্ট হইল না,—ডাক্তার সুচিকিৎসক বলিয়া, দারোগা বাবু একাধিক বার মাণিকচর হইতে তাঁহাকে মুচিবাড়িয়ায় আনাইয়া, তাঁহার পরিবারবর্গের চিকিৎসায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ডাক্তারের চিকিৎসা-গুণে তাহাদের কঠিন রোগ আরোগ্য হইয়াছিল। অথচ ডাক্তার দারোগার নিকট কোনবার একটি পয়সাও পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই। দারোগা আজ কি সেই উপকারের ঋণ পরিশোধ করিতে আসিয়াছেন! ডাক্তার প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে দারোগার মুখের দিকে চাহিলেন।

কিন্তু দারোগা অকৃতজ্ঞ নহেন; নলিনী দারোগার মত তিনি হাম্‌ফ্রি সাহেবের অন্যায় আদেশ শিরোধার্য্য করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি ডাক্তারকে গ্রেপ্তার না করিয়া সাহেবকে বুঝাইয়া দিলেন,—আইনানুসারে তিনি বিনা ওয়ারেণ্টে ডাক্তারকে গ্রেপ্তার করিতে পারেন না। ডাক্তার মাণিকচর থানার এলাকার আসামী। গর্ এলাকার আসামীকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করিলে, কাজটা বে-

নাইনী হইবে। হুজুরের আদেশে ইহা করা হইয়াছে,—এরূপ কৈফিয়ৎ কর্ত্তৃপক্ষ গ্রাহ্য করিবেন না।

হাম্‌ফ্রি সাহেব দারোগার কথা শুনিয়া আর তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিতে পারিলেন না; তিনি অগত্যা ডাক্তারকে মুক্তিদান করিয়া, তাঁহার গ্রেপ্তারের জন্য মাণিকচর থানার দারোগাকে সংবাদ পাঠাইলেন। পাছে ডাক্তার অন্য দিকে সরিয়া পড়েন, এই আশঙ্কায় খগেন বাবু ডাক্তারের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিলেন। কিন্তু ডাক্তারের পলায়ন করিবার ইচ্ছা ছিল না,—মাণিকচরের দারোগাকে ভয় করিবারও কারণ ছিল না। ডাক্তার মাণিকচরে আসিয়া বাসায় পদার্পণ করিবামাত্র, মাণিকচরের দারোগা তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিল। তিনি তাহাকে জানাইলেন, তাহার আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই; কারণ, সদর হইতে তিনি জামিনে মুক্তিলাভ করিয়াই বাড়ী ফিরিতেছেন!

দারোগা তাঁহার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিলেও, তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে সাহস করিল না। সে একজন কনষ্টেবলকে ডাক্তারের পাহারায় রাখিয়া, সদরে রিপোর্ট করিল। পরদিন ডাকে সদর হইতে খবর আসিল, যোগেন্দ্র ডাক্তারকে উপযুক্ত জামিনে খালাস দেওয়া হইয়াছে। অগত্যা দারোগাকে পাহারা উঠাইয়া লইতে হইল। মাণিকচরের জনসাধারণের বিদ্রূপে বেচারা বড়ই মর্ম্মাহত হইল।

যথাসময়ে ডাক্তারের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের বিচার হইল। বিচারে ডাক্তার নিরপরাধ প্রতিপন্ন হওয়ায়, সসম্মানে মুক্তিলাভ করিলেন; কিন্তু নায়েবের পৈশাচিক ব্যবহার তিনি জীবনে ভুলিতে পারিলেন না।

ডাক্তারের মুক্তিলাভের সংবাদ মুচিবাড়িয়ায় প্রচারিত হইলে, নায়েব শ্রীনাথ গোঁসাই ক্রোধে, ক্ষোভে গর্জ্জন করিতে লাগিল। নায়েবের দুঃখ দেখিয়া, অধিকাংশ আমলা তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ পূর্ব্বক, বিচারকের নির্ব্বুদ্ধিতার নিন্দা করিতে লাগিল। কেবল দেওয়ান হীরালাল সরকার নায়েবকে বলিলেন, "এখনও মাথার উপর ধর্ম্ম আছেন,—এখনও দিনের পর রাত্রি হচ্ছে। দারোগার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে' মিথ্যে মামলা খাড়া করলেই কি আসামীর শাস্তি হয়? ইংরাজের আদালত ত আর নায়েবের সেরেস্তা নয়,—জেরায় মিথ্যা কথা টেকে না।"

নায়েব হীরালালের শ্লেষোক্তিতে অপমান বোধ করিয়া, ম্যানেজার সাহেবকে বলিল, "হুজুর, আমি জীবনে কখন এতদূর অপদস্থ হই নি! এত যোগাড়যন্ত্র বিলকুল ফেঁসে গেল! লজ্জায় আমার মুখ দেখানো ভার হয়ে উঠেছে। লোকের ঠাট্টা-বিদ্রূপে কাণ পাতা যাচ্ছে না। বাহিরের লোক ত দশ কথা বল্‌বেই,—হুজুরের নিমকের চাকর হীরেলাল সরকার—সে পর্য্যন্ত আমাকে আর হুজুরকে ঠাট্টা করতে ছাড়চে না! আমার ত আর মান সম্ভ্রম বজায় থাকে না, হুজুর,—দেওয়ানের কথার খোঁচায়।"

মামলার বিচারফল শুনিয়া হুজুর একেই মেজাজ খারাপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। নায়েবের কথা শুনিয়া তিনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন; এবং হীরালাল দেওয়ানকে তৎক্ষণাৎ ধরিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। হীরালাল তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি তাঁহাকে আত্ম-সমর্থনের অবকাশমাত্র না দিয়া, 'রেকাবদলে'র প্রহারে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিলেন। স্পষ্টবাদিতার উপযুক্ত পুরস্কার লাভ করিয়া, দেওয়ান বেচারা আর্ত্তনাদ করিতে-করিতে কুঠী পরিত্যাগ করিলেন। তাহার পর হইতেই তিনি নিরুদ্দেশ!

—(ক্রমশঃ)

দাক্ষিণাত্যে

কবিশেখর শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ

নিদাঘে নিষ্ঠুর তৃষা রৌদ্রদীপ্ত দেশে,
জুড়াতে বহেন তাপী তরুণা তটিনী;
তবুও জীবের কণ্ঠ শুষ্ক তৃষাক্লেশে,
প্রখর তপন তাপে দিবস-যামিনী!
দূর-দূর পাহাড়ের নির্ঝরের জলে,
প্রবাহিত অবিরল শীত-স্নিগ্ধ বারি;
গঠি' মৃত্তিকার নল অপূর্ব্ব কৌশলে,
আনীত নগরে নীর গ্রীষ্মতাপহারী;
পথিপার্শ্বে স্তম্ভ সম দীর্ঘ জলাধার,
ভরিছে বিহানে সাঁঝে সোরাই গাগরী;
উদ্যানে সহস্র-ধারা ছুটে ফোয়ারায়;
গোলাপী কারাবা-বাসে লয় চিত্ত হরি!
সায়াহ্নে প্রাঙ্গণে সুখে বিছায়ে শয়ন;
সৌরভে সমীরে আসে মুদিয়া নয়ন।

বেদ ও বিজ্ঞান

অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

পদার্থসমূহের অভিব্যক্তিতে মোটামুটি তিনটি স্তর আমরা ভাবিতে পারি। গোড়ায় একটা অব্যক্ত (undifferentiated) অবস্থা। ইহা অখণ্ড বিভু অবস্থা। ইহাই কারণ-সমুদ্র বা অদিতি। ১০।১৯০ সূক্ত যে "ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ"এর কথা বলিতেছেন, তাহা এই কারণ-বারি। মনু প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রে এবং পুরাণে এই সমুদ্র লইয়াই সৃষ্টি আরম্ভ। এই অবস্থার পর একটা দ্বিধাকৃত (differentiated) প্রায় অব্যক্ত অবস্থা। চাণার মধ্যে দুইটি দানা যেমন সম্মিলিত ভাবে থাকে, কতকটা যেন সেইরূপ। ইহাই সম্মিলিত দ্যাবা পৃথিবী। তার পর, তাহারা আলাদা-আলাদা হইয়া তফাৎ হইয়া গেল। এটা ওটাকে নিজের আলিঙ্গনের মধ্য হইতে মুক্ত করিয়া সরাইয়া দিল। এই যে সুস্পষ্ট পৃথক্‌ত্ব বা ব্যবধান, তাহাই অন্তরীক্ষ। 'অন্তরীক্ষ' শব্দটার মর্ম্মবাণী এখন আর বেশি শুনিব না। এখন দেখুন, "সোম অন্তরীক্ষকে বিস্তীর্ণ করিয়াছেন"—এই বেদবাণী শুনিয়া বিজ্ঞানজ্ঞ সম্মতি জ্ঞাপন করিতে পারেন না কি—যদি বিজ্ঞানকে 'সোম' ও 'অন্তরীক্ষ' এই কথা-দুটিকে তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা মত বুঝিয়া লইতে অনুমতি দিই? আমরা সোম সম্বন্ধে গোটা দুই মন্ত্র লইয়া বিজ্ঞানের সঙ্গে বোঝাপড়া করিলাম। ফলে পাইলাম যে, ঋষিরা সোমকে শুধু লতাবিশেষের রসই ভাবিতেন না; সেই লতার রসকে প্রতীক রূপে লইয়া যে সর্ব্বব্যাপী তেজোময় বস্তুকে ধরিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেন, তাহার অন্ততঃ একটিও মূর্ত্তি হইতেছে বিজ্ঞানের ইলেক্‌ট্রন। আবার বলিতেছি ইহা আধিভৌতিক স্তরের ব্যাখ্যা। বেদবিদ্যা আধিভৌতিক স্তরেতেই পরিসমাপ্ত নহে; সেরূপ ভাবিতে গেলে বড়ই বোকামি হইবে। পক্ষান্তরে আবার শুধু আধ্যাত্মিক বা আধিদৈবিক ব্যাখ্যা দিয়া নিশ্চিন্ত হইলে, নিখিল জ্ঞানাশ্রয় বেদের প্রতি অবিচার করা হইবে। 'নিখিল জ্ঞানাশ্রয়' এই কথাটার মানেও আড়ষ্ট করিয়া দেখিবেন না।

যাহা হউক, বেদে সোমরস সত্যকার একটা জিনিষ হলেও একটা বড় রহস্যের প্রতীক বা সঙ্কেত ভাবে স্থানে-স্থানে কীর্ত্তিত হইয়াছে। শুধু কি সোম? যজ্ঞ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। সত্যকার যজ্ঞ অবশ্যই ছিল। কিন্তু 'যজ্ঞ' বলিতে ঋষিরা শুধু স্থূল যজ্ঞই বুঝিতেন না। ১০।৮১ সূক্তের দুটো-একটা মন্ত্র শুনুন:—"সে কোন্ বন? কোন্ বৃক্ষের কাষ্ঠ? যাহা হইতে দ্যুলোক ও ভূলোক গঠন করা হইয়াছে? হে বিদ্বান্‌গণ! তোমরা একবার নিজেকে জিজ্ঞাসা কর—তিনি (বিশ্বকর্ম্মা) কিসের উপর দাঁড়াইয়া ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করেন? হে বিশ্বকর্ম্মা! তোমার যে সকল উত্তম, মধ্যম ও অধম ধাম আছে, যজ্ঞের সময় সেগুলি আমাদিগকে বলিয়া দাও। তুমি নিজে নিজের যজ্ঞ করিয়া নিজ শরীর পুষ্ট কর। হে বিশ্বকর্ম্মা, কি পৃথিবীতে, কি স্বর্গে, তুমি নিজে নিজে যজ্ঞ করিয়া নিজ শরীর পুষ্টি কর। চতুর্দ্দিকের সব লোক নির্ব্বোধ। ইন্দ্র আমাদের বুদ্ধি-স্ফূর্ত্তি করিয়া দিন।" বিশ্বকর্ম্মা দ্যুলোকে-ভূলোকে সর্ব্বত্র যে যজ্ঞ করিয়া নিজ শরীর পুষ্টি করিতেছেন, সে যজ্ঞ যে বিশ্বযজ্ঞ, তাহা বুঝিবার মতন বুদ্ধিটুকু ইন্দ্র আমাদের স্ফূর্ত্তি করিয়া দেন নাই কি? সেই বিশ্বযজ্ঞ বুঝিবার জন্যই স্থূল-ক্ষুদ্র যজ্ঞের প্রতীক। ইন্ধন পোড়াইয়া যজ্ঞ হয়, কিন্তু ঋষিরা সুধাইতেছেন—কে বলিবে, দ্যুলোকে-ভূলোকে যে যজ্ঞ অবিরত চলিতেছে, তাহার ইন্ধন কি এবং কোন্ বন হইতে সে কাষ্ঠ সংগ্রহ করা হইয়াছে? ১০।৮৮।১ কি বলিতেছেন, তাহাও শুনুন:—"আমাদের পিতা সেই ঋষি, যিনি বিশ্ব-ভুবনে হোম করিতে বসিয়াছিলেন; যিনি ধনের কামনা করিয়া, প্রথমাগত ব্যক্তিসমূহকে আচ্ছাদন করিয়া পশ্চাদাগতদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিলেন।" সেই পুরান ঋষি এবং তাঁহার পুরান যজ্ঞের কথা ভাবিতে আমাদের অঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে না কি? 'ধন' কথাটাও রূপক, তাহা আপনারা লক্ষ্য করিয়া যাইবেন। অনেক বেদমন্ত্রে 'ধনের' কথা আছে দেখিয়াই সেটাকে ধন-দৌলত ভাবিয়া বসিবেন না। 'ধন' কথাটা অভ্যুদয়ের একটা সঙ্কেত মাত্র। তার পর 'অন্ন' কথাটা। এটাও একটা প্রতীক মাত্র। ১।৪৬।৬ বলিতেছেন—"হে অশ্বিদ্বয়! যে জ্যোতির্ম্ময় অন্ন অন্ধকার বিনাশ করিয়া আমাদিগকে তৃপ্তি দান করে, সেই অন্ন আমাদের প্রদান কর।" এ অন্ন কি ভাত, ডাল, রুটি, মাখন? মূলে "জ্যোতিষ্মতী" ও "তমস্তিরঃ" এই পদ দুইটি আছে। সায়ণাচার্য্য সোজাসুজি অন্ন পক্ষেই একরূপ মানে করিয়া দিয়াছেন। 'জ্যোতিঃ' কি না আহারের রসবীর্য্যাদিরূপ জ্যোতি; 'তমঃ' কি না দারিদ্র্যরূপ অন্ধকার। কিন্তু মন্ত্র পড়িয়া স্বতই কি মনে হয় না যে, ইহার অর্থ আরও গভীর স্তরে খুঁজিতে হইবে? আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ত আছেই,—তা ছাড়া, বিজ্ঞানের দিক্ হইতেও এ অন্ন মানে বোধ হয় এমন সব রেডিয়েসন, যাহা আহার, অর্থাৎ নিজের মধ্যে টানিয়া লইতে পারিলে, বাক্, কায় ও মন এই ত্রিবিধ ধাতুর ময়লা কাটিয়া গিয়া সত্বস্ফূর্ত্তি হয়। সূর্য্যের অনেক রেডিয়েসন রোগের বীজাণু ধ্বংস করিতে পারে, শরীরে স্বাস্থ্য দিতে পারে। রেডিয়াম-জাতীয় পদার্থগুলি যে তেজোবিকীরণ করে, সে তেজ চোখে না দেখা গেলেও, শরীরের উপর তাহাদের ক্রিয়া অনেক সময় কল্যাণপ্রদ। X ray প্রভৃতি নানা জাতীয় যে সকল অদৃষ্ট রেডিয়েসন আছে, তাহাদেরও এই হিসাবে পরীক্ষা হওয়া দরকার। মোট কথা, 'আহার' মানে এখানে মোটের উপর, বাহির হইতে বস্তুজাতের তেজোময় সারটি সংগ্রহ করা। ইলেক্ট্রিক বাথে রোগ আরাম হইতেছে,—আর আমরা এবংবিধ বৈদিক তৈজস আহারের কথা শুনিয়া হাসিব কি? বিজ্ঞানের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে, 'অন্ন' ও 'আহার' এই দুইটা absorption of radiations-এরই বিশেষ বা প্রকারভেদ হয়। এ সূক্ষ্ম তথ্যটি বেদমন্ত্রে প্রচ্ছন্ন ভাবে রক্ষিত রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কাজেই 'জ্যোতিষ্মতী' 'তমস্তিরঃ' প্রভৃতিকে শুধু ঘি-দুধের তেজে পরিণত করিয়া ছাড়িয়া দিলে চলিবে কেন? প্রতীকের কথা আজ আর বলিব না। তবে স্মরণ রাখিবেন যে, বেদে জল, অগ্নি, সূর্য্য, বায়ু, সোম, মরুৎ—এসবগুলিকে শুধু স্থূল ভাবে দেখা হয় নাই। স্থূল ভাবে লইলে (অর্থাৎ সাধারণ চলিত জল, আগুন, বাতাস, ঝড় প্রভৃতি ভাবিলে) মন্ত্রের বেশ সুন্দর, সুসঙ্গত ও সহজ অর্থই দেওয়া যায় না। ধরুন জল। ১০।১১১।৮ ঋক্ বলিতেছেন—"ইন্দ্রের আজ্ঞায় যে সকল জল চলিত হইল, সেই সর্ব্বপ্রথম জলগুলি অতি দূরে গিয়াছিল। সেই জলদের অগ্রভাগ কোথায়? মস্তকই

বা কোথায়? হে জলগণ! তোমাদের মধ্য স্থান বা চরম স্থান কোথায়?" এ বর্ণনা শুনিয়া সাধারণ জল মনে হয় কি? সে কারণ-সলিল বা চরম-সলিলের কথা আমরা আজ প্রথমেই বলিয়া রাখিয়াছি, সেই অনির্ব্বচনীয় সলিল-রাশি কি এই মন্ত্রে স্পষ্টতঃ লক্ষিত হইতেছে না? "হে ইন্দ্র! বৃত্র যখন জলদিগকে গ্রাস করিতেছিল, তুমি তাহাদিগকে মোচন করিয়া দিলে। তখনই জলগুলি সর্ব্বত্র বেগে ধাবিত হইল।" এখানে না হয় এইরূপ একটা মানে লাগাইয়া দিতে পারি:—বৃত্র এমন একটা শক্তি যাহা মেঘের জলবিন্দুগুলিকে পরস্পর সংহত হইয়া বৃষ্টিবিন্দুতে (rain drops এ) পরিণত হইতে দিতেছে না। ইহা যেন মেঘের দানাগুলিকে ছাড়া-ছাড়া করিয়া রাখিয়াছে। ইন্দ্র বিদ্যুৎরূপ বজ্র দ্বারা দানাগুলিকে সংহত করিয়া দিলেন। বৃত্রের যে কাজ, এ কাজ অবশ্য তাহার বিপরীত কাজ। ইন্দ্র বজ্র দ্বারা বৃত্রকে বধ করিয়া তবে বৃষ্টি হইবার পথ করিয়া দিলেন। এ মানে লাগসই সন্দেহ নাই। কিন্তু এই মেঘের ব্যাপারটাকে একটা প্রাকৃতিক বিপুল রহস্যের সঙ্কেত না ভাবিলে বোধ হয় ঋষিদের প্রতি অবিচার করা হইবে। আমার মনে হয় যে, আদিম মহামেঘ (cosmic cloud) হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে। সেই মহামেঘের রহস্য এই বৃত্রসংহার-কাব্যের অভিপ্রায়। মহামেঘ মানে ঠিক nebula বুঝিবেন না। সেই "রাত্রি" বা primordial chaos, যাহা সৃষ্টি-ব্যাপারের গোড়ার কথা বলিয়া মনে করিতে পারি, তাহাই আমাদের মেঘ। Sir J. J. Thomsonএর মতে ইহা কিরূপ শুনিবেন?—"The primordial chaos is filled with corpuscles, in positive and negative pairs, scattered throughout space. By mutual forces, due to the accompanying strains in the æther, they attract each other, and produce mutual accelerations." ইত্যাদি। ক্রমে তাহারা—এই কর্পাসল্‌গুলি দলবদ্ধ হইয়া রাসায়নিক এটম্, মলিকিউল প্রভৃতি গড়িয়া তোলে। গোড়ায় যে অবস্থা, সেইটাকে সঙ্কেতে বলিতেছি মেঘ। প্রথমতঃ, সেই বিশ্বব্যাপী মেঘে কর্পাস্‌লগুলি যুগ্ম বা মিথুন ভাবে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। একটা মিথুন আর একটা মিথুনের কোনও তোয়াক্কা রাখে না। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সংহতি নাই। যে কারণে নাই, সেই কারণটার নাম বৃত্র। সাধারণ মেঘের দানাগুলিকে পরস্পর সংহত হইয়া বারিবিন্দু হইতে দিতেছে না যেরূপ বৃত্র, সেইরূপ, সেই প্রাচীন কারণ-মেঘের তাড়িত-মিথুনগুলিকে সংহত হইয়া এটম্, মলিকিউল, জল, বাতাস, আগুন প্রভৃতি হইতে দিতেছে না বৃত্র। কোনও উপায়ে সেই মিথুনগুলিকে এক-যোট করিতে না পারিলে, এই যেমনটা জগৎ দেখিতেছি তেমনটা জগৎ হয় না। শুধু গতি হইলেই ত জগৎ হয় না; গতিতে ছন্দ থাকা দরকার। গ্রহ উপগ্রহগুলা যদি ছন্দোবদ্ধ ভাবে না ঘুরিয়া এলোমেলো ভাবে ছুটিত, তবে পরস্পরে ঠোকাঠুকি করিয়া কোন্ দিন পঞ্চত্ব পাইত! ইন্দ্র গতির মধ্যে শৃঙ্খলা ও ছন্দ আনিয়া দেন। অথবা যে অনির্ব্বচনীয় কারণে শৃঙ্খলা ও ছন্দ আসিয়া পড়ে, সেই কারণকে চেতন কারণ মনে করিয়া, তাহার নামকরণ করিতেছি ইন্দ্র। আর বেশী বিস্তার করার সময় আমাদের আজ নাই; তবে মেঘ, বিদ্যুৎ, বৃত্রসংহার এ সমস্ত ব্যাপারকেই একটা মস্ত-বড় নিগূঢ় জাগতিক রহস্যের সঙ্কেত বলিয়া আমার মনে হইয়াছে। বৃত্র সম্বন্ধে যে সমস্ত ঋক্ আছে, সেগুলি সূক্ষ্ম ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে, আপনাদেরও তাহাই মনে হইবে। যাহা হউক, শেষ পর্য্যন্ত ইহাই দাঁড়াইতেছে যে, জলকে সব সময়ে সাধারণ জল ভাবিলে চলিবে না। যে জলকে "মহেরণায় চক্ষসে" আমি প্রার্থনা করিতেছি, "উশতীরিব মাতরঃ" যে জলের কাছ হইতে তাহার "শিবতম রস" যাচিতেছি, সে জল নিশ্চয়ই সামান্য জল নহে। জল সম্বন্ধে যে কথা, অগ্নি প্রভৃতি সম্বন্ধেও সেই কথা। অগ্নিকে সামান্য আগুন ভাবিতে কোন মতেই পারা যায় না। রাশি-রাশি ঋক্ উদ্ধার করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, অগ্নি নিখিল ভূতে, এমন কি জলের মধ্যেও, নিগূঢ় ভাবে বর্ত্তমান; অগ্নি অজর, অমর। আমরা যাহাকে আগুন বলিতেছি, সেটা সেই বিশ্বব্যাপী অগ্নি বা তেজেরই স্থূল অভিব্যক্তি। অগ্নিকে ভাল করিয়া পূজা আমাদের করিতে হইবে,—আজ শুধু ইঙ্গিতেই কথাটা বলিয়া রাখিলাম। ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি বায়ু, মরুৎ, রুদ্র প্রভৃতি পাইয়া আমরা যেন বহুদেববাদ ভাবিয়া না বসি। একই অখণ্ড, বিভু, মৌলিক বস্তুকে নানা ভাবে বুঝিবার চেষ্টা এই সব দেবগণের মধ্য দিয়া। স্থূল দৃষ্টিতে ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু ইঁহাদিগকে যতই স্বতন্ত্র মনে

করি না কেন, বেদমন্ত্রগুলি তলাইয়া পর্য্যালোচনা করিলে, শেষকালে একই মূল উৎসের বা কারণের আবিষ্কার না করিয়া আমরা পারি না। সেই মূল উৎসের নাম অদিতি। ইনি দেবগণের প্রসূতি। ইঁহার সঙ্গে মোটামুটি পরিচয় আমাদের এক রকম হইল। ইঁহার সন্তান-সন্ততির কীর্ত্তি-গাথাই বেদ; সুতরাং তাঁহার সন্তান-সন্ততির তল্লাস আমাদের ধীরে-সুস্থে লইতে হইবে।

আজ মাত্র দুইটি কাজ বোধ হয় আমরা করিতে পারিলাম। প্রথমতঃ, বেদের রূপক, উপাখ্যান প্রভৃতিকে ভাল করিয়া তলাইয়া দেখিতে গিয়া, তাহাদের মধ্যে অনেক নিগূঢ় তথ্যের স্পষ্ট ভাস আমরা পাইতে পারি,—এ কথাটি প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত দিয়া খোলসা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। শুধু "সরল ব্যাখ্যা" সব যায়গায় "হালে পাণি" পায় না। বেদের এক যায়গায় সে সরল ব্যাখ্যা বেশ লাগসই হইল, অন্য যায়গায় সে সরল ব্যাখ্যা তুচ্ছ হইয়া পড়ে। লতার রস ভাবিয়া একটা সূক্তে হয় ত সোমের হিসাব দিলাম; কিন্তু আবার আর পাঁচটা সূক্তে হয় ত এমন সব কথা আছে, যাহাতে সোমকে আর লতার রসরূপে কিছুতেই খাটো করিয়া রাখা যায় না। অগ্নি, জল ইত্যাদি সম্বন্ধেও এই কথা। এ সব দেখিয়া স্বভাবতঃ মনে হয় যে, মন্ত্রদ্রষ্টাদের দৃষ্টি স্থূল জিনিষগুলিকে আপাততঃ সাম্‌নে উপস্থিত রাখিলেও, তাহার দৌড় স্থূলেতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। স্থূলকে, ব্যক্তকে, প্রতীয়মানকে প্রতীক ভাবে লইয়া তাঁহারা সূক্ষ্ম, অব্যক্ত, অপ্রতীয়মানকে ধরিতে-বুঝিতে গিয়াছেন। ইহাই ভারতবর্ষীয় দৃষ্টি। মূর্ত্তিমান জ্ঞানরাশি স্বরূপ সাধু-সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে বসিয়া শুনিয়াছি—তাঁহারাও নানা রকম সর্ব্বজন-পরিচিত মোটা-মোটা জিনিষের দ্বারাই আমাদিগকে ভিতরের গূঢ় কথাগুলি ধরাইয়া দিতে চান। দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেব জ্ঞানে অবশ্য শিশু ছিলেন না; সরু, মোটা, মাঝারি নানা রকম উপদেশই তিনি দিয়া গিয়াছেন; কিন্তু উপদেশ দিবার ভঙ্গী ছিল সেই সনাতন বেদ-পুরাণ-প্রসিদ্ধ ভারতবর্ষীয় ভঙ্গী—বাহিরের দৃষ্টান্ত দিয়া ভিতরকে বুঝিবার প্রয়াস। সাহেব পণ্ডিতেরা এইটুকু বুঝেন না বলিয়া, বেদের মধ্যে নানান স্তর বা থাক্ কল্পনা করেন। প্রথমে ঋষিরা শিশু, কথাগুলাও শিশুর মতন। তার পর যত বুদ্ধি-শুদ্ধি হইতেছে, ততই কথাগুলি সুসঙ্গত, স্পষ্টার্থ, মার্জ্জিত ও গভীর হইতেছে। বহুদেববাদ ও স্থূলের উপাসনাই গোড়ার কথা; এক ইন্দ্র, অগ্নি, বিশ্বকর্ম্মা বা পুরুষে সকল দেবতার পূর্ণাহুতি দেওয়া, আধ্যাত্মিক রহস্য মন্ত্রে প্রকাশ করা, এসব বেদের প্রাচীন স্তর নহে, অর্ব্বাচীন স্তর। বেদে যেখানেই গূঢ়ভাবের কথাবার্ত্তা শুনিব, সেইখানেই সে কথাবার্ত্তাকে টাট্‌কা ভাবিব—ইহাই সাহেব পণ্ডিতদের বেদব্যাখ্যান-পদ্ধতি। বেদকে শিশু মনে করিয়া, সেই থিওরি লইয়া যে তাঁহারা ব্যাখ্যায় হাত দিয়াছেন। তাঁহারা আমাদের ধাত্ মোটেই ধরিতে পারেন না। তাঁহাদের দৃষ্টিতে, বেদ একরাশি ঋকের স্তূপ মাত্র। তাহাদের মধ্যে ঐতিহাসিক ধারা (historical development) হয় ত আছে; কিন্তু তাহাদিগকে এক কেন্দ্রের, একলক্ষ্যের আশ্রয়ে শৃঙ্খলার সঙ্গে সাজান যায় না; অর্থাৎ সেগুলি একটা system নহে। পাঁচ জনের পাঁচ কথা,—গরমিল হওয়ারই কথা। যিনি যেমন বুঝিয়াছেন, তিনি তেমনই রচিয়াছেন। ইহাই বিলাতী মত। এ থিওরির ভূত স্কন্ধে চাপিয়া থাকিলে সবই মাটি—আমাদের বেদবিদ্যা ভয়ঙ্করী হইয়া উঠিবে। এই গেল আজিকার একটা কথা। আর একটা কথা এই যে, বেদের মর্ম্মানুধাবন করিতে যাইয়া সাত্‌কাণার মত লাঠালাঠি করিলে চলিবে না। আমি আধিভৌতিক (physical) ব্যাখ্যা দিলাম বলিয়া, আরও উপরের স্তরের ব্যাখ্যাগুলিকে 'তুচ্ছং' করিয়া দিলাম, এমন মনে করার কোনই কারণ নাই। আমি শুধু এইটুকু দেখিতে চাহিতেছি যে, হালের বিজ্ঞানের অভিনব সূত্র হাতে করিয়া বেদায়তনের কোন্ কোন্ গুপ্ত প্রকোষ্ঠে গিয়া আমরা উপনীত হইতে পারি। ইহার মানে এ নয় যে, আমি যে-যে অংশে ঘুরিয়া আসিতে পারিব, সেই-সেই অংশই ষোলআনা বেদ-রহস্য। এ কথাটি আমি আপনাদের কাণে বারবার শুনাইয়া আসিতেছি। আবার আধিভৌতিক ব্যাখ্যা (physical interpretation) আড়ষ্ট (rigid) ভাবে দেওয়া আমার কল্পনা নহে। এইজন্য আগে-আগে সিরিজের কথা ও লিমিটের কথা অত করিয়া বলিয়াছি। বিজ্ঞানের ঈথার ইলেক্‌ট্রনকে ধরিয়া মোটামুটি (approximate) একটা বিবৃতি ও ব্যাখ্যান চলিতে পারে,—শুধু এইটুকুই আমার আকার। বিজ্ঞানের দিক্ হইতেও সিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সাজিয়া বসিলে চলিবে না;—যত বড় বৈজ্ঞানিক

হউন না কেন, তিনি চিরদিনই সাধক; তাঁহাকে সদাই কাঁচিয়া গণ্ডূষ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কিছু দিন আগে লোকে শুনিলে হাসিত,—এখন খোদ Frerch Academy ঘোষণা করিতেছেন—যে কেহ এই বৎসরে অন্য কোনও গ্রহের সঙ্গে আমাদের পৃথিবীর খবরাখবর চলার কোনও বিহিত উপায় করিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে লাখটাকা পারিতোষিক দিব। "অপরন্থা কিং ভবিষ্যতি ?"

জাতি-বিজ্ঞান

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

(১০)

মানুষের গাত্রে ও মস্তকে কেশ উৎপন্ন হয়। কেশ মস্তকের শোভা সম্পাদন করে এবং কেশের দ্বারা শরীরের অনেক উপকার সাধিত হয়। সকলেই কেশের সহিত পরিচিত। কিন্তু এই কেশ কি, তাহা সকলে জানে না।

যে সকল প্রাণীর শরীরে উষ্ণ রক্ত প্রবাহিত, সেই সকল প্রাণীর শরীরেই কেশ উৎপন্ন হয়। ইহা স্থিতি-স্থাপক, সূত্রবৎ পদার্থ। যে উপকরণে গো মহিষাদির শৃঙ্গ নির্ম্মিত, কেশও সেই উপকরণে নির্ম্মিত। রন্ধ্রময় ঝিল্লি বা সূক্ষ্ম ত্বগাবরণের উপর কেশ উৎপন্ন হয়। কেশমূল চোঙ্গের মত এবং ইহা যে বীজকোষের দ্বারা পরিবেষ্টিত, তাহা পলাণ্ডুবৎ। ঝিল্লিমধ্যস্থ রসের দ্বারা ইহা পরিপুষ্ট হয়।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে মানব-শরীরের কেশের সহিত আমাদের সম্পর্ক। আমরা ভিন্ন ভিন্ন জাতির মানব-শরীরে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের কেশ লক্ষ্য করিয়া থাকি, এবং নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কেশের বর্ণানুসারে জাতিবিভাগ করিতে প্রয়াস পান। মানব-শরীরে এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা কেশের বর্ণ উৎপাদন করে। ইহা এক চর্ব্বিময় পদার্থ। ভোকেলিনের (Vauckuelin) মতানুসারে এই চর্ব্বিময় পদার্থ শুধু যে কেশের বর্ণের কারণ, তাহা নয়, ইহা কেশের স্থিতিস্থাপকতা ও নমনীয়তা বৃদ্ধি করে, এবং কেশের সমভাব রক্ষা করে। এই পদার্থ অত্যন্ত দাহ্য এবং ক্ষারের সহিত সংযুক্ত হইলে ইহাতে সাবান প্রস্তুত হয়। কেশ, শৃঙ্গ, নখ, পালক প্রভৃতি সবই মূলে এক পদার্থ, ইহাদের সকলগুলিই অল্পাধিক পরিমাণে স্থিতিস্থাপক ও নমনীয়। ইহা সাধারণের পক্ষে বিস্ময়ের বিষয় হইতে পারে যে, কেশ, শৃঙ্গ, নখ, পালক প্রভৃতি আপাততঃ ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে গঠিত বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও ইহাদের মূল উপাদান, প্রাণি-শরীরজাত উক্ত তৈলময় পদার্থ ও আর এক প্রকার শ্লৈষ্মিক পদার্থ। একই প্রকার তৈলময় ও শ্লৈষ্মিক পদার্থে প্রাণি শরীরের কেশ, শৃঙ্গ, নখ ও পালক যে নির্ম্মিত, তাহা বিশেষভাবে নিরূপিত হইয়াছে। অত্যধিক উত্তাপের সাহায্যে কেশকে গলাইয়া জলের সহিত মিশ্রিত করা যাইতে পারে। কেশের উপাদান-বিশেষরূপ উক্ত তৈলময় পদার্থে লৌহ ও গন্ধক মিশ্রিত থাকে। কৃষ্ণবর্ণ কেশে লৌহের পরিমাণ অন্যান্য কেশের অপেক্ষা অধিক। লোহিত ও ধূসর বর্ণের কেশে কৃষ্ণবর্ণাভার প্রভাব দেখা যায়। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, কৃষ্ণ-বর্ণাভার এই প্রভাব কেশ-নিহিত গন্ধকের সাহায্যেই হইয়া থাকে।

করতল ও পদতল ব্যতীত শরীরের সর্ব্বত্রই কেশ উৎপন্ন হয়। শরীরের সকল স্থানের কেশ সমান দীর্ঘ ও সমান পুরু নয়, সকল স্থানের কেশের গঠন এবং বর্ণও সমান নয়। জাতিবিশেষে, বংশবিশেষে ও বয়সবিশেষে কেশের প্রকারবিশেষ লক্ষিত হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কেশ শুধু শরীরের শোভা বর্দ্ধন করে না, কেশের দ্বারা শরীরের অনেক উপকারও সাধিত হয়। কেশের একটী বিশেষ গুণ এই যে, কেশ উত্তাপ পরি-চালনের বিঘ্ন উৎপাদন করে; সুতরাং যে শরীর যত কেশ-বহুল, সে শরীরের উত্তাপ তত উত্তমরূপে রক্ষিত

হয়। বাহিরের অত্যধিক উত্তাপ বা শৈত্য, এবং বৈদ্যুতিক প্রভাব হইতে কেশই শরীরকে রক্ষা করিয়া থাকে। শরীর-ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যাবিৎ পাজে (Paget) বলেন, প্রাণি-শরীরের বর্দ্ধনশীল কেশের সাহায্যে শোণিতস্থ Bisulphate of protein ও অন্যান্য পদার্থ নিঃসারিত হইয়া থাকে; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শরীরের নিঃস্মরণ-ক্রিয়াও কেশের দ্বারা সাধিত হয়। কেশের দ্বারা এই সকল উপকার সাধিত হয় বলিয়া অনেকে অনুমান করিতে পারেন, কেশ যথোচিত বর্দ্ধিত হওয়াই ভাল, কেশকে ছাঁটিয়া ছোট করিবার আবশ্যকতা নাই, গুম্ফ শ্মশ্রুকেও ছাঁটিবার আবশ্যকতা নাই বা তাহাদিগের উপর ক্ষৌরকার্য্যেরও কোন আবশ্যকতা নাই। কিন্তু আমরা যে অবস্থা-বিশেষে কেশ, গুম্ফ ও শ্মশ্রুর অতিশয় বর্দ্ধন, সৌন্দর্য্য-লাঘব ও অস্বচ্ছন্দতার হেতুবোধে ইহাদিগের খর্ব্বতা সাধন করি, তাহা অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলিয়া বিবেচিত হওয়া তো দূরের কথা, তাহা যে বিশেষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, তাহা অনেকে এখন বিবেচনা করিতেছেন। ইহা এখন একরূপ নিরূপিত হইয়াছে যে, কেশের উপর ক্ষৌরকার্য্য বা কেশের কর্ত্তন, শরীর হইতে Carbon ও hydrogen নিঃসারণের সহায়তা করে। কেশ, শরীরের পক্ষে যতই উপকারক হউক না কেন, কেশের অত্যধিক বর্দ্ধন শরীরের পক্ষে অনিষ্টদায়ক। যাহা হউক, এ বিষয়ে ব্যবস্থার ভার উপযুক্ত চিকিৎসকের উপর ন্যস্ত করিয়া, এখন প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, শরীরের স্থানবিশেষে কেশের দৈর্ঘ্যের তারতম্য লক্ষিত হয়, জাতিবিশেষেও শরীরস্থ কেশের দৈর্ঘ্যের তারতম্য হয়। কুরিলিয়ান (Kurilian) জাতির কেশবহুলতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহাদিগের শরীরের প্রায় সর্ব্বাঙ্গ কেশময়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, মনুষ্য-জাতির শ্মশ্রুর দৈর্ঘ্য গড়ে দশ ইঞ্চি, কিন্তু কোন কোন মনুষ্যের আভূমি-লম্বিত শ্মশ্রুও দেখা গিয়াছে, মনুষ্যের মস্তকের কেশের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ ২০ হইতে ৪০ ইঞ্চি হয়, কিন্তু এমন স্ত্রীলোকও দেখা গিয়াছে, যাহাদের কেশ আগুলফলম্বিত (অর্থাৎ মাথার চুল পায়ে ঠেকে)।

কেশের বর্ণের তারতম্যে ইহার গুণেরও তারতম্য লক্ষিত হয়। যে কেশের বর্ণ শণের মত, তাহা সাধারণতঃ অতি সূক্ষ্ম হয়, কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ কেশ কর্কশ ও স্থূল হয়; চুল যত পাকিতে থাকে, তাহার কর্কশতা তত বাড়িতে থাকে। জর্ম্মণীদেশীয় শরীর-ব্যবচ্ছেদবিদ্যাবিৎ বিটফ (Withof) বলেন, মস্তকের প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৫৯৮টী কৃষ্ণবর্ণের কেশ থাকিতে পারে; বর্গ ইঞ্চি পরিমাণ শিরস্তকের উপর বাদামী বর্ণের অর্থাৎ লোহিতাভ পিঙ্গল বর্ণের (chest-nut) কেশ ৬৪৮ সংখ্যক থাকিতে পারে, কিন্তু বর্গ ইঞ্চি পরিমাণ শিরস্তকের উপর শণবর্ণের চুল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক থাকিতে পারে। তিনি বর্গ ইঞ্চি পরিমাণ শিরস্তকের উপর ৭২৮ সংখ্যক শণবর্ণবিশিষ্ট কেশ গণনা করিয়াছেন।

পৃথিবীতে নানা জাতীয় লোকের বাস এবং এক এক জাতির কেশের গঠন ও বর্ণ এক এক প্রকার।

আফগানদিগের কেশ কৃষ্ণবর্ণের। আরবদিগের কেশ লাল ও কুঞ্চিত, কিন্তু তাহাদের শ্মশ্রু আধূসর বর্ণবিশিষ্ট। আরমেনিয়ানদিগের কেশ ঘোর কৃষ্ণ না হইলেও কাল। বারবেরিণ (Berberines) বা নীলনদ-তীরবাসী নিউবিয়ানদিগের কেশ কাল এবং ঘন কুঞ্চন-বিশিষ্ট। কালিফর্ণিয়াবাসীদিগের কেশ কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘ ও অত্যন্ত দৃঢ়। চীন ও ইণ্ডো চীনদিগের কেশ, কাল, পুরু ও কর্কশ। ইহাদের কেশ একেবারেই মজবুত নয়। ইহারা বিরলশ্মশ্রু। মিসরবাসীদিগের কেশ কাল এবং কুঞ্চিত। এস্কিমোদিগের কেশ কয়লার মত কাল, সরল, দৃঢ় এবং দীর্ঘ। গ্রীকদিগের মধ্যে কাল, ধূসর এবং শণবর্ণের কেশ দেখা যায়। কুরিলিয়ান বা আইনুদিগের কেশ অত্যন্ত কাল। মেক্সিকান-দিগের কেশ পুরু, কাল, কর্কশ এবং চিক্কণ, ইহাদিগের দাড়ি পাতলা। মঙ্গোলিয়ানদিগের কেশ কাল, কঠিন, সরল এবং বিরল। পাটাগনীয়ানদিগের কেশ কাল কিন্তু মজবুত; ইহারা শ্মশ্রুবিরল। সিংহলীদিগের কেশ কাল।

চক্ষুর তারকার চতুর্দিকস্থ রঞ্জিতমণ্ডল বা Iris ও গাত্রচর্ম্মের বর্ণের সহিত কেশ বর্ণের সম্পর্ক আছে। অনেকে এইরূপ বিশ্বাস করেন যে, শরীরের বলের সহিত কেশবর্ণের সম্পর্ক আছে। কাহারও কাহারও বিশ্বাস, কেশ যত কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট হয়, শরীর তত বলবান্ হয়।

ভোকেলিন (Vaucquelin) কেশবর্ণের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিয়াছেন যে, এক প্রকার তৈলময় পদার্থ কেশবর্ণের কারণ। তাঁহার মতে নিম্নলিখিত উপকরণগুলি কেশের কৃষ্ণতা বৃদ্ধি করে;—১। অল্প পরিমাণ একপ্রকার শ্বেততৈল, ২। এতদপেক্ষা অধিক পরিমাণ এক প্রকার অধূসর সবুজ বর্ণের তৈল, ৩। লৌহ, ৪। কিঞ্চিৎপরিমাণ Oxide of Manganese, ৫। Phosphate of lime, ৬। Carbonate of lime, (অতি অল্প পরিমাণ), ৭। Silex এবং গন্ধক (পরিমাণে কিঞ্চিৎ অধিক আবশ্যক, ৮। ইহাদিগের সহিত আর এক প্রকার শরীরজাত পদার্থ।)

কেশের দৃঢ়তাও উল্লেখযোগ্য। আট বৎসর বয়স্ক বালকের একগাছিমাত্র কেশ ৭.৮,:২ গ্রেণ ওজনের ভার সহিতে পারে, এবং ২১ বৎসরবয়স্ক যুবকের একগাছিমাত্র কেশ ১৪.২৮৫ গ্রেণ ওজনের ভার সহনক্ষম। বেবের (Weber) বলেন, ১০ ইঞ্চি দীর্ঘ কেশকে টানিয়া ১৩ ইঞ্চি করা যাইতে পারে।

যাহা হউক, মানবশরীরের কেশকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। Leiotrichous, Cymotrichous এবং Ulotrichous, প্রধানতঃ এই তিন শ্রেণীর কেশ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। যে কেশ খাড়া বা সোজা, তাহা Leiotrichous. যে কেশ তরঙ্গায়িত, তাহা Cymotrichous, এবং যে কেশ পশমী, তাহা Ulotrichous। উক্ত তিন প্রকারের কেশ মোটামুটি তিনটী জাতি সূচনা করে। যে জাতীয় মানুষের কেশ সোজা, সে জাতীয় মানুষের গাত্রবর্ণ পীত; যে জাতীয় মানুষের কেশ তরঙ্গায়িত, তাহাদের বর্ণ শ্বেতাভ এবং যে জাতীয় মানুষের কেশ পশমী, সে জাতীয় মানুষের গাত্রবর্ণ কাল। মস্তকের কেশের গঠনের সহিত গাত্রবর্ণের সম্বন্ধ আছে। বর্ণ অনুসারে জাতিকে যে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, কেশের অনুসারেও জাতিকে ঠিক সেই তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। বর্ণানুসারে মানবসকল প্রধানতঃ ককেসীয়, মঙ্গলীয় ও ইথিয়পীয়, এই তিন জাতিতে বিভক্ত। একটু চিন্তা করিলেই কেশের গঠন অনুসারে মানুষকে ঐ তিন জাতিতে বিভক্ত করা যায়। আমরা কেশের গঠন অনুসারে ককেসীয়দিগকে Cymotrichous শ্রেণীভুক্ত করিতে পারি, সেইরূপ মঙ্গোলীয়দিগকে Leiotrichous, ও ইথিয়পীয়দিগকে Ulotrichous শ্রেণীভুক্ত করিতে পারি। কিন্তু কেশের গঠন অনুসারে এই তিন শ্রেণীর মানব ছাড়া, আর এক শ্রেণীর মানব দেখা যায়। তাহাদিগকে frizzy type এর মানব বলা যাইতে পারে। কিন্তু বিশেষরূপ বিবেচনা করিলে এই frizzy type একটী স্বতন্ত্র type নহে। Cymotrichous type এর মনুষ্যজাতির মধ্যে অনেকের কেশের কুঞ্চনপ্রবণতা দেখা যায়। এই শ্রেণীর কেশ ও পশমী কেশের মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর কেশই, frizzy type এর কেশ। আমরা যাহাকে কোঁকড়া চুল বলি, তাহা ঠিক frizzy type এর চুল নহে। যে কেশের অগ্রভাগ মাত্র বক্র, তাহাকেই কোঁকড়া চুল বলা যায়, কিন্তু frizzy type এর চুল গোড়া হইতে আগা পর্য্যন্ত স্ক্রুপের মত পাকান।

গঠনের ন্যায় কেশের বর্ণও মোটামুটি তিন প্রকার। আমরা মোটামুটি কৃষ্ণবর্ণ, পিঙ্গলবর্ণ ও শণবর্ণের কেশ দেখিতে পাই। পিঙ্গল বর্ণের কেশ, কৃষ্ণাভ ও লোহিতাভ ভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যাহা হউক, বর্ণানুসারেও আমরা তিন শ্রেণীর কেশের সহিত পরিচিত। অনেকে অনুমান করেন,—প্রত্ন-মানবের (Proto-man) কেশ কৃষ্ণাভ বর্ণবিশিষ্ট ও সরল ছিল।

যে সকল জাতির কেশ সোজা, সাধারণতঃ তাহাদের মস্তকের কেশের দৈর্ঘ্য বেশী হয়; তরঙ্গায়িত কেশযুক্ত জাতির কেশ নাতিদীর্ঘ নাতিহ্রস্ব; কিন্তু পশমী কেশযুক্ত জাতির কেশ বেশী দীর্ঘ হয় না।

চিত্র-প্রদর্শনী

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী এম-এ

আর বৎসরের মত এবারেও গবর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলের উপরকার কয়টি ঘর লইয়া Society of Fine Artsএর তরফ হইতে একটি চিত্র-প্রদর্শনী বসিয়াছিল। এই প্রদর্শনীতে সর্ব্বসমেত সাড়ে পাঁচশতেরও অধিক ছবি দেখান হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা কেবল বাছা-বাছা কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য ছবির সম্বন্ধে দু' চার কথা বলিব; এবং সেই ছবি কয়খানিকে কেন ভাল বলা হইয়াছে, যথা-সাধ্য তাহারও একটা জবাব এবং হিসাব দিবার চেষ্টা করিব। এই প্রবন্ধে কেবল সেই ছবিগুলিরই উল্লেখ করিয়াছি, যেগুলির মধ্যে রসবস্তুর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; অর্থাৎ যে ছবিগুলির মধ্যে চিত্রকরের শক্তি এবং প্রাণ, দুইয়েরই পরিচয় পাইয়াছি। শক্তিকে প্রাণ হইতে আলাদা করিয়া দেখিয়া আমরা চিত্রের বিচার করিব না; আবার শুধু প্রাণটুকু লইয়াই নাচিতে থাকিব না। আমরা এই দুটি জিনিষকেই পাশাপাশি দেখিতে চাই, অঙ্গাঙ্গী ভাবে। আমরা শক্তিকে চাই, কেন না, প্রাণকে ফুটাইয়া তুলিতে হইলে, প্রকাণ্ড শক্তির দরকার। অমুক চিত্রকরের শক্তি আছে, এ কথার অর্থ এই যে, নিজের ideaকে বাহিরে আনিতে হইলে যে সব উপায় এবং কৌশল অবলম্বন করিতে হয়, তাহা তিনি ভালরূপে জানেন। কিন্তু যাঁহারা শক্তির জন্যই কেবল শক্তির পরীক্ষা দিতে বসেন, তাঁদের চিত্রকে আমরা Artএর কোঠায় স্থান দিতে পারি না। আবার শুধু প্রাণের পরিচয় পাইলেই একটা ছবিকে খুব বড় স্থান দিব না। চিত্রকলায় formএর মূল্য অত্যন্ত বেশী। Idea বড় হইলেই কোন ছবি উতরায় না। সেই ideaটাকে চিত্রকর কতখানি রূপ দিতে পারিয়াছেন, তাহারি উপর চিত্রের বিচার নির্ভর করে; এবং ideaকে রূপ দিতে গেলেই শক্তির দরকার। তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, শক্তি না থাকিলে idea ফোটে না; আবার idea না থাকিলেও শুধু শক্তি একটা রসবস্তু খাড়া করিয়া তুলিতে পারে না। তাই আমরা শক্তি এবং idea এই দুটিকেই মাপকাঠি করিয়া ছবির বিচারে প্রবৃত্ত হইব।

প্রথমেই আমরা পাইতেছি, শ্রীযুক্ত অতুল বসুর আঁকা স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের একখানি প্রতিকৃতি। এই ছবিখানি charcoal * দিয়া আঁকা।

প্রত্যেক মানুষের মুখের মধ্যে এমন একটি ভাব আছে, যাহা বিশেষ করিয়া তাঁহারই। সেই ভাবটি কাহারও হয় ত হাসির মধ্যে বেশি করিয়া ধরা পড়ে; কাহারও হয় ত কপাল-কুঞ্চনের মধ্য দিয়াই স্পষ্ট করিয়া প্রকট হইয়া উঠে; আবার কাহারও হয় ত গাম্ভীর্য্যের মধ্য দিয়াই সবচেয়ে পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ হইয়া উঠে। তাই সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই, কোন একজন লোকের চেহারা ভাবিতে বসিলেই, সেই লোকটির বিশেষ একটি অবস্থার বিশেষ একটি ভঙ্গী আমাদের মনে পড়িয়া যায়। পাঠক এ জিনিষটি নিজেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। নিজের যে কোন পরিচিত লোকের চেহারাখানা (তা তিনি মৃতই হোন্ আর জীবিতই হোন্) চোখ বুজিয়া একবার ভাবিবার চেষ্টা করিয়া দেখুন—দেখিবেন, সেই লোকটি একটি বিশেষ ভঙ্গী লইয়া আপনার মনের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন; এবং যখনই তাঁর চেহারাখানা মনে করিতে চেষ্টা করিবেন, দেখিবেন, অধিকাংশ স্থলেই সেই একই ভঙ্গিতে তিনি আপনার মনে উদিত হইয়াছেন। এই যে বিশেষ একটি প্রকাশ-ভঙ্গী, এইটুকুই মানুষের শাশ্বত চেহারা; এবং এইটুকু যে ছবির মধ্যে যত বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়, সেই ছবি তত বেশী সুন্দর এবং প্রাণবান। অনেক সময় দেখা যায়, একটি লোককে দেখিয়া অপর একটি লোকের মুখ মনে পড়িয়া গেল;—অথচ আমরা যদি খুঁটাইয়া দেখিতে চেষ্টা করি—কোন্‌খানটায় তাহার সহিত সেই লোকটির মুখের মিল, তাহা হইলে হয় ত খুঁজিয়া পাইব

* ছবি আঁকিবার জন্য একপ্রকার কয়লা।

না। নাক, মুখ, চোখ—কোন জায়গাতেই ঠিক মিল নাই,—অথচ দূর হইতে দেখিলে, সেই লোক বলিয়া অনেক সময় ভুল হয়। এর কারণ কি? এর কারণ আর কিছুই নয়,—সেই লোকটির সহিত এই লোকটির সেই বিশেষ ভঙ্গীটুকুর মিল আছে, যা' নাক, চোখ, মুখ প্রভৃতির বৈষম্য সত্ত্বেও, পরস্পরের সহিত মিলিয়া এক হইয়া যাইতে চায়। এই যে নাক-চোখ-মুখের বাহিরেও মানুষের চেহারা নিজেকে সপ্রমাণ করিতে চায়, ইহাই তাহার শাশ্বত চেহারা। তাই দেখিতে পাই, যাঁরা ভালো caricature আঁকিতে পারেন, তাঁরা ব্যক্তিবিশেষের নাকটা হয় ত তাঁর স্বাভাবিক নাকের চেয়ে চতুর্গুণ বড় করিয়া আঁকিলেন,—চোখ দুটো হয় ত দশগুণ বাড়াইয়া দিলেন;—অথচ লোকে ছবির দিকে তাকাইয়াই বুঝিল—অমুককে ঠাট্টা করা হইয়াছে। এই যে নাক-মুখ-চোখ সমস্ত বদলাইয়া গেল, অথচ লোকটিকে চেনা একটুও কষ্টকর হইল না, ইহার কারণ আর কিছুই নয়;—কেবল এই যে, নাক-চোখ-মুখ বদলাইয়া গেল বটে, কিন্তু যে স্থানটিতে সেই ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ ভঙ্গীটি এবং বিশেষ চেহারাখানি ধরা পড়ে, চিত্রকর সেখানটি অটুট রাখিয়াছেন। এই যে প্রত্যেক লোকের বিশেষ একটি প্রকাশ-ভঙ্গী, ইহার মধ্যে তার প্রকৃতির চেহারা কতকটা উঁকি মারিতে থাকে। যাঁরা খুব ভালো portrait. আঁকিতে পারেন, তাঁরা আবশ্যক বুঝিলে অনেক সময়ে এই ভঙ্গীটুকুকে (exaggerate করিতে) বাড়াইয়া তুলিতেও ছাড়েন না। তাহার দ্বারা সেই ব্যক্তিবিশেষের ভিতরের চেহারাখানি বেশী করিয়া ফুটিয়া উঠে। এই যে মানুষের মুখের বিশেষ একটি ভঙ্গিমাকে খানিকটা বাড়াইয়া তুলিয়া সেই লোকটির ভিতরকার চেহারাখানাকে স্পষ্টতর করিয়া ফুটাইয়া তোলা, এইখানেই portrait-painterএর বাহাদুরী, এবং এইখানেই photoর সঙ্গে portraitএর তফাৎ। অতুলবাবু স্যার আশুতোষের এই বিশেষ ভঙ্গীটুকু ধরিয়া ফেলিতে পারিয়াছেন এবং সেই ভঙ্গীটুকুকে তিনি অতি সাবধানে আবশ্যক মত একটু বাড়াইয়া তুলিতেও কসুর করেন নাই। তাঁর বাড়াইয়া তোলাটা সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে।

ইহাতে করিয়া আশুবাবুর ভিতরকার দৃঢ়সংকল্প এবং তেজস্বিতা এত বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, যে কোন লোক, যিনি কখন আশুবাবুকে দেখেন নি, তিনিও বলিবেন, এই যে লোকটি, যাঁর ছবি সুমুখে দেখিতেছি, ইনি নিশ্চয়ই একজন মস্তবড় কর্ম্মী এবং তেজস্বী পুরুষ। চিত্রকর ছবিখানির নাম দিয়াছেন—"The Bengal Tiger" ছবির নামকরণ সার্থক হইয়াছে।

ইহার পরই শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ অঙ্কিত "পাতালকন্যা" নামক একখানি চিত্র বিশেষ করিয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানি Black and Whiteএ আঁকা (কালি কলমে আঁকা)। চিত্রটি প্রদর্শনীর একটি রত্নবিশেষ। ছবিখানির বিষয়বস্তুটি হইতেছে এই,—একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে একটা অন্ধকার গুহার তলায় শুইয়া আছে,—খনির তলাকার হীরকখণ্ডের মত আপনার প্রভায় আপনি সমুজ্জ্বল। মেয়েটির মুখে এবং শয়নভঙ্গীর মধ্যে বেশ একটু romance আছে—সে যেন আমাদের কল্পলোকেরই কোন্ স্বপ্ন-কন্যা। এই মেয়েটিকে চিত্রকর অতি সূক্ষ্ম গুটিকতক রেখার টানে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইহার দেহে বা মুখে কোথাও shade-lightএর চিহ্নমাত্র নাই; অথচ মেয়েটি যে কোমল এবং পেলব, তাহা যিনি একবার চিত্রের দিকে চাহিবেন, তিনিই স্বীকার করিবেন। শুধু দেহের চারিদিকের সীমারেখাটুকু মাত্র আঁকিয়া একটি মেয়েকে এমন কোমল এবং জীবন্ত করিয়া তোলা বড় সহজ কাজ নয়। রেখার উপর খুব বেশী দখল না থাকিলে, এ কাজে বড় একটা কেউ সহজে সফলকাম হইতে পারে না। এই ছবিখানির মধ্যে চিত্রকরের ক্ষমতা সবচেয়ে বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছে—গুহার ছাদ হইতে লম্বমান একরাশ পার্ব্বতীয় লতার মত শত-সহস্র নাগনাগিনীর একত্র সমাবেশের মধ্যে। এই যে সাপের ঝাঁক ছাদ হইতে নীচের অন্ধকারের দিকে জড়াইয়া-জড়াইয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে, ইহাদের একত্র সমাবেশের মধ্য দিয়া চিত্রকর যে মনোরম রেখাবিন্যাসের অদ্ভুত সুষমা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা decorationএর দিক হইতেও যেমন সুন্দর হইয়াছে, কল্পনার দিক হইতেও তেমনি বা ততোধিক মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে। দূর হইতে হঠাৎ এগুলিকে সাপ বলিয়া ধরা যায় না। মনে হয় যেন গুহার গাত্র বাহিয়া উপরিস্থিত কোন একটা পার্ব্বতীয় বিটপীর অসংখ্য শিকড় ঝাঁকড় মাকড় হইয়া চাবড়া বাঁধিয়া নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে, এবং গুহার ভিতর জড়াইয়া পাকা-

ইয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে। অথবা কোনও জলপ্রপাতের নিয়ত সংস্পর্শে পর্ব্বতগাত্রে যুগ-যুগ ধরিয়া যে সব শেওলা জমিয়া উঠিয়াছে, তাহারাই ক্রমে নানান আকারে পরিবর্ত্তিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইয়া, এলোমেলো ভাবে ঝুলিয়া রহিয়াছে। একটা বাতি অনেকক্ষণ ধরিয়া জ্বলিলে, তার গা দিয়া গড়াইয়া-গড়াইয়া গলিত মোম শুকাইয়া যেমন নানান আকার ধারণ করে, যাহার সহিত প্রকৃতির অনেক জিনিষেরই সাদৃশ্য দেখা যায়, অথচ ঠিক করিয়া বলা যায় না বিশেষ করিয়া কোন্ জিনিষটির সহিত মিলে,—সতীশ বাবুর আঁকা এই সাপের ঝাঁক অনেকটা সেই ভাবের জিনিষ। এ যেন একই সঙ্গে নানান জিনিষের ইঙ্গিত করে, অথচ বিশেষ করিয়া কোনও একটা জিনিসের ভিতর দিয়া নিজেকে ধরা দিতে চায় না। এ অনেকটা ভাষাহীন নিছক সুরের মত (absolute music); শুধু ইঙ্গিতই করে—কিছুই স্পষ্ট করিয়া বলে না। বিশেষ কোনও বস্তুর আকার না দিয়াও শুধু রেখার সুষমা যে আমাদের মনে সঙ্গীতের মতই সুর জাগাইয়া তুলিতে পারে—সতীশ বাবুর এই সাপের পরিকল্পনা তাহারই একটি সুন্দর নিদর্শন। এইরূপ করায় ছবিখানি decoration-এর দিক হইতেও যেমন সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে, পাতাল-পুরীর স্বপ্ন-রহস্যটুকুও তেমনি খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। চিত্রকর রেখাচিত্রে সত্যসত্যই সুদক্ষ।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ-অঙ্কিত আর একখানি চিত্রও আমাদের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে। এই ছবিখানির নাম—"মন্দির-পথে।" একটি স্ত্রীলোক পূজার সরঞ্জাম প্রভৃতি লইয়া মন্দিরাভিমুখে চলিতেছেন—ইহাই ছবিখানির বিষয়-বস্তু। স্ত্রীলোকটির সুমুখে যে প্রকাণ্ড প্রান্তর পড়িয়া রহিয়াছে—গোটাকতক হিজিবিজি রেখার টানে দক্ষ চিত্রকর তাহার উপর এমনি একটি রহস্য-কুহেলিকা মাখাইয়া দিয়াছেন, যাহা রসিক মাত্রেরই উপভোগ্য।

ইহার পরেই মিঃ কার্লটন স্মিথ-অঙ্কিত একখানি রঙ্গিন ছবি আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে। একটি পাশ্চাত্য রমণী তাঁর শিশু পুত্রটিকে কোলের উপর লইয়া, মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন—ইহাই হইল ছবিখানির বিষয়-বস্তু। মায়ের অন্তঃকরণটি চিত্রকর এমনি নিপুণ করিয়া এই স্ত্রীলোকটির মুখে-চোখে ফলাইয়া তুলিয়াছেন, যাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। এই ছবিখানির সবচেয়ে বাহাদুরী এই যে, মার প্রাণ ফুটাইয়া তুলিতে গিয়া, সাধারণ শিল্পীর মত ইনি ছবিখানিকে শুধু শুধু অনর্থক উচ্ছ্বাসময় করিয়া তুলেন নাই—যে লোভ অনেকেই সামলাইতে পারেন না। ইনি মার মুখে জোর করিয়া কোনরূপ স্বর্গীয় বা অপার্থিব ভাব ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করেন নাই; অথচ প্রত্যেক দর্শককেই স্বীকার করিতে হইবে যে, চিত্রকর এই পুত্র-স্নেহাতুরা জননীটির মুখে যে ভাবটুকু ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা ঠিক এই পৃথিবীর জিনিষ নয়। তাহার কাছে আপনা হইতে মাথা নত হইয়া যায়।

ইহার পরেই শ্রীযুক্ত অতুল বসুর আঁকা একখানি তৈলচিত্র আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দুইটি লোক গুণ টানিতেছে—ইহাই ছবিখানির বিষয়-বস্তু। লোক দুটির গুণ-টানার ভঙ্গীটুকুর মধ্যে চিত্রকর যে অলস-মন্থর গতিটুকু ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা অদূরবর্ত্তী মাল-বোঝাই কোন একটা গাধাবোটের চিত্র অতি সহজেই দর্শকের চোখের সামনে কল্পনায় ভাসাইয়া তোলে (যদিও ছবির মধ্যে আমরা উক্ত গাধাবোটের কোন চিহ্নই দেখি না)। ইহা বড় কম ক্ষমতার পরিচয় নয়।

ইহার পর সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়-অঙ্কিত একখানি Landscape আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিল্পী ছবিখানির নাম দিয়াছেন Clearing after rain—Ranjit river. শুধু একটা মেটে রং এবং তাহার সহিত খানিকটা নীল মিশাইয়া এমন সুন্দর একখানি ছবি খাড়া করিয়া তোলা যার-তার কর্ম্ম নয়। ছবিখানির মধ্যে এমনি একটা ভিজে-ভিজে ভাব আছে, যা আমাদের মনকে পর্য্যন্ত ভিজাইয়া দেয়। এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যাওয়ার পর আকাশ একটু-একটু করিয়া ফরসা হইয়া আসিতেছে—এই ভাবটি অতি চমৎকার ভাবে ছবিখানিতে ফুটিয়া উঠিতেছে। ছবিখানির মধ্যে বেশ একটি করুণ সুর আছে—যে সুরটি বর্ষারই বুকের জিনিষ।

ইহার পরেই মিস্ ফিলিস্ বার্টনের আঁকা একটি ছবি আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে। ছবিখানির নাম Illumination in Delhi Fort garden during Pofw's visit, 1922. শিল্পী ছবিখানির মধ্যে এমনি একটি সুর দিয়াছেন,

যাহা এই ছবিখানিকে কোনও বিশেষ একটি উৎসব-রজনীর মধ্যে ধরিয়া রাখে নাই—বিশ্ব-ছনিয়ার সকল উৎসবের সঙ্গে তাহাকে মিলাইয়া দিয়াছে। এইখানেই চিত্রকরের দরদী প্রাণের পরিচয়। এই ছবিখানির দিকে তাকাইলে মনে হয়, এ যেন একটা কাল্পনিক উৎসব-রজনী—বাস্তবের সহিত ইহার যেন কোন সম্পর্কই নাই,—এমনি চমৎকার করিয়া চিত্রকর ইহার গাছপালা, আকাশ, ফোয়ারা প্রভৃতি জিনিসগুলিকে সাজাইয়াছেন; অথচ ইহা যে Delhi Fort garden, তাহাও কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। গভীর রাত্রে যখন সমস্ত ছনিয়াটা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়, তখন একলা ছাদে উঠিয়া পাড়ার একটা অতিবড়-পরিচিত উঁচু বাড়ীর দিকে তাকাইয়া যেমন মনে হয় ওটা একটা কালো দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া আছে, অথচ ওটা যে প্রতিদিনকার দেখা অমুকচন্দ্র অমুকের বাড়ী, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ থাকে না;—ঠিক তেমনি করিয়া এই উৎসব-রজনীটিকে চিত্রকর এমন একটা Stand-point হইতে দেখিয়াছেন, যেথান হইতে ওটাকে একটা অপরূপ স্বপ্ন-রাজ্য বলিয়া মনে হয়; অথচ ওটা প্রতিদিনকার দেখা সেই Delhi Fort garden ছাড়া আর কিছুই নয়। এক কথায়, চিত্রকর কেবল শক্তির পরিচয় দেন নাই—তাহার সহিত একটি সরস প্রাণের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁর রংএর বেশ সুর ধরিয়াছে।

ইহার পরেই আমরা পাইতেছি শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের কয়েকখানি ছবি। এই অনাড়ম্বর শিল্পীটি তাঁর ছবিগুলিকে ছবি করিয়া তুলিবার জন্য যে একটুও চেষ্টা করেন নাই, এ সত্যটি তাঁর প্রত্যেক তুলির আঁচড়টি বলিয়া দিবে। যামিনীবাবুর আঁকিবার ক্ষমতা যথেষ্ট আছে; কিন্তু আমাদের মনে হয়, তাঁর প্রাণটি হাতের ক্ষমতার নাগালের বাহিরেও অনেকখানি এখনও রহিয়া গিয়াছে, যাহা হয় ত আমরা কড়ায়-গণ্ডায়, সুদে আসলে একদিন পাইব। এঁর ছবিগুলির একটা মস্ত বড় গুণ এই যে, সেগুলি বাংলাদেশের প্রাণটিকে ছুঁইয়া যায়। আমাদের নিশ্চয়ই কিছু বলিবার আছে—যে বলা আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক বলা-কওয়াকে ছাড়াইয়াও বর্ত্তমান—তাই আমরা কবিতা লিখি, গান গাই, ছবি আঁকি। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে—আমরা যে কথা বলিব, তা যেন আমাদের নিজের ভাষায়, নিজের ভঙ্গীতে বলিতে পারি। তবে সেটা আমার বলা হইবে, এবং তবে সেই বলাটা অপরের প্রাণে সারা দিবে। জগতে নূতন কিছুই কেহ দিতে পারে না—দেয় কেবল সেই চিরপুরাতনকে নূতন করিয়া বলিবার, নূতন করিয়া প্রকাশ করিবার ভঙ্গী এবং শক্তিকে। আমরা আজ সেই শক্তির অধিকারী হইতে চাই। পাশ্চাত্যের নকল করিয়া ছবি আঁকা আর চলিবে না, এ কথাও যেমন সত্য, অজন্তা বা মোগল-চিত্রের নকল করিয়া ছবি আঁকাও যে চলিবে না, এ কথাও প্রায় তেমনই সত্য। ভারতবর্ষের নিজস্ব সঙ্গীত ত রহিয়াছে,—ধ্রুপদ আছে, খেয়াল আছে, ঠুংরী আছে, টপ্পা আছে;—তবুও বাংলাদেশ যেদিন চৈতন্যদেবকে পাইয়া প্রাণবন্ত হইয়া উঠিল, সেদিন তাহারা নিখিল ভারতের সঙ্গীতেও সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না—তাহারা আবিষ্কার করিয়া ফেলিল কীর্ত্তন,—বাংলার নিজের প্রাণের ভিতর হইতে—একেবারে মর্ম্মস্থল হইতে। ভারতবর্ষের একটা নিজস্ব অঙ্কন-পদ্ধতি আছে, স্বীকার করি; কিন্তু সে ঐ ধ্রুপদ-খেয়ালের মতই ভারতবর্ষের জিনিষ বটে, কিন্তু বাংলার নিজস্ব সৃষ্টি নয়—যাতে করিয়া বাংলার নাড়ীর স্পন্দনটুকু পর্য্যন্ত আমরা শুনিতে পাই। আমরা সঙ্গীতে কীর্ত্তন পাইয়াছি, চিত্রেও কীর্ত্তন পাইতে চাই। এই কীর্ত্তনের সুরটুকু, আমার মনে হয়, প্রথম পাইয়াছি—শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের চিত্রে। এ যেন বৈরাগীর গান—এ যেন প্রেমিকের একতারার সহজ সরল সুরটুকু। এর মধ্যে লালসা নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই,—আছে কেবল একটি আত্ম-নিবেদনের একাগ্রতার সুর—নির্ম্মল এবং পবিত্র। ছবিগুলির মধ্যে কোথাও জাঁকজমক নাই—কোথাও রংএর কায়দা দেখাইবার চেষ্টা নাই;—আছে কেবল সেইটুকু, যেটুকু না হইলে প্রাণের আবেগটুকু ফোটান যায় না।

এঁর ছবিগুলির মধ্যে "বংশী" নামক ছবিটি আমাদের অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছে। চাষাদের একটি ছেলে—মাঠের মাঝখানে একটা মাটির ঢিবির উপর বসিয়া আপনার মনে বাঁশী বাজাইতেছে—ইহাই এই ছবিটির প্রতিপাদ্য বিষয়। কোথাও একটু সাজাইবার চেষ্টা নাই,—অনাড়ম্বর ছবিখানি ছোট ছেলেটির খেয়ালে বাঁশীর মেঠো সুরের মতই এলো-মেলো, অথচ প্রাণময়। ঘষিয়া-ঘষিয়া wash করিয়া-

করিয়া, ছবিখানাকে আচ্ছা করিয়া তুলিয়া, সস্তায় একটা sentiment সৃষ্টি করিবার দিকে চিত্রকরের একটুও চেষ্টা নাই। তিনি সামান্য দু'একটি bold তুলির টানে একটি ভাবময় ছবি খাড়া করিয়া তুলিয়াছেন, যা বাস্তবিকই সুরের মত আবেশময় এবং ব্যঞ্জনাপূর্ণ। ছেলেটি যে তন্ময় হইয়া বাঁশী বাজাইতে-বাজাইতে কখন এক সময় নিজের অজ্ঞাতসারে বিশ্ব-দুনিয়াটাকে ভুলিয়া গিয়াছে, এ সংবাদটি চিত্রকর রেখা এবং রংএর ভাষায় কি চমৎকার করিয়াই না ব্যক্ত করিয়াছেন! ছেলেটির বাঁশী ধরিবার ভঙ্গী, এবং বিশেষ করিয়া চোখের ভঙ্গীটি তার সরল প্রাণের সরল সহজ ভাবপ্রবণতাটিকে কি চমৎকার করিয়াই না বাহিরে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে!—ছবিখানি যেন একটুকরা সঙ্গীত। তার পরই যামিনীবাবুর "Left to the fate" নামক ছবিটির দিকে নজর পড়িয়া যায়। একটি ষাঁড় পাঁকে পড়িয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না—ইহাই হইল ছবিখানির মূল ঘটনা। চিত্রকরের দরদী প্রাণটি এইখানে একেবারে মূর্ত্তিমান হইয়া ধরা দিয়াছে। তাঁর sympathy জানোয়ারদের উপরেও সমান ভাবে গিয়া পড়িয়াছে। ষাঁড়টি উঠিতে পারিতেছে না—এই যে একটা ভয়, ভাবনা, উৎকণ্ঠা—চিত্রকর এইগুলিকে ষাঁড়টির বেদনাতুর করুণ চোখে কি মর্ম্মান্তিক করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ষাঁড়টির বেদনা-মাখান করুণ চোখের দিকে চাহিয়া অতিবড় বেচারার নিষ্ঠুর লোকও একবার অন্ততঃ বলিয়া উঠিবে, "আহা, কি কষ্ট!" আসল কথা, চিত্রকর তাঁর ছবিতে শুধু Windsor Newtonএর রং দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—নিজের বুকের রংও তাহার সহিত মিশাইয়া দিয়াছেন—তাই তাঁর ছবিগুলি অত সুরময় হইয়া উঠিয়াছে।

স্থানাভাবে চিত্রকরের আর একখানি মাত্র ছবির উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইব। ছবিখানির নাম "বিধবা।" এটি একটি বৃদ্ধা বিধবার ছবি। চিত্রকর বিধবাটির মুখে-চোখে এমন একটি শান্ত এবং উদার ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, যাহার দিকে চাহিলে শ্রদ্ধায় মন ভরিয়া উঠে। জগতের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত বাসনা যেন এই বৃদ্ধাটির চিত্ত হইতে ধুইয়া-মুছিয়া সাফ হইয়া গিয়াছে। বর্ষার আকাশ যেমন ক'টা মাস ধরিয়া হাসিয়া-কাঁদিয়া, ভ্রূকুটি করিয়া, দাপাদাপি করিয়া, অবশেষে হঠাৎ একদিন শরতের কোন্ এক শুভ মুহূর্ত্তে নিজেকে ধুইয়া-মুছিয়া, নির্ম্মল করিয়া তুলিয়া, শান্ত এবং সংযত হইয়া উঠে—তখন তার সেই উদার, স্বচ্ছ, মেঘশূন্য, নির্ম্মল ললাটে যে একটি শান্ত সমাহিত মহিমা আপনা হইতে জাগিয়া উঠে;—জীবন-সংগ্রামের সমস্ত ঝড়-ঝাপ্টার পর এই বিধবাটির মুখে-চোখে ঠিক তেমনই একটি নির্ম্মল শান্তি এবং আত্মনির্ভরতা জাগিয়া রহিয়াছে। সামান্য একটু হলদে রং এই ছবিটির সমস্ত সুর একাই বহন করিতেছে। এ যেন এক তারার একটি মাত্র তারে একটা গোটা রাগ ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা।

ইহার পরই শ্রীযুক্ত রামরাও অঙ্কিত একটি Landscape আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে। একটি পর্ব্বত এবং তারি গা দিয়া একটি ঝরণা উপলখণ্ডে ধাক্কা খাইয়া, গুড়ি-গুঁড়ি অসংখ্য ফেণায় বিভক্ত হইয়া, নীচের দিকে ঝিরঝির করিয়া নামিয়া আসিতেছে—ইহাই ছবিখানির বিষয় বস্তু। এই ছবিখানির মধ্যে পাহাড়ের অসীম বিরাটত্ব খুব চমৎকার করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। পাহাড়ের ভিতরকার আসল সুরটিই তাই। এই বিরাটত্বটুকু পাহাড়ের প্রাণ। চিত্রকর পাহাড়ের এই প্রাণেরে সন্ধান পাইয়াছেন।

ইহার পরই শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী অঙ্কিত "The soul of the solitude" নামক ছবিখানি আমাদের মন্দ লাগে নাই। ছবিটির Backgroundটি আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে। বেশ একটি করুণ এবং নির্জ্জন ভাব ছবিখানিকে ঘেরিয়া আছে। কিন্তু ছবিখানির মধ্যে অনেক দোষ আছে। প্রথমতঃ যে ছেলেটি বাঁশী বাজাইতেছে, তার পাদুটির মধ্যে এমন একটা চাঞ্চল্য এবং কম্পপ্রবণতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, যা বিষয়বস্তুর সহিত একেবারেই খাপ খায় না। ছেলেটির বসিবার ভঙ্গী দেখিলে মনে হয়, সে যেন কিছুতেই নিজেকে স্থির রাখিতে পারিতেছে না; অথচ চিত্রকর তার হাতে বাঁশী দিয়াছেন। নির্জ্জনতার প্রাণটি (Soul of the solitude) চকিত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু অস্থির হইতে কখনই পারে না। শুধু তাই নয়,—এই শিশুটির পায়ের গঠন বৃদ্ধের মত হইয়াছে। শিশুর পাও সরু হইতে পারে, কিন্তু তার সেই সরুত্বটা বৃদ্ধের ক্ষয়-প্রাপ্ত জরাজীর্ণ পা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিষ। তার পর, বাঁশী বাজাইবার সময় কোন মানুষই বোধ হয় অমন অস্থির হইয়া উঠে না। এই ছবিটির সহিত শ্রীযুক্ত যামিনী

রায়ের বংশী নামক ছবিটি তুলনা করিয়া দেখিলেই, পাঠক আমার বক্তব্য আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিবেন।

এবার এই প্রদর্শনীতে যে সব ভাস্কর-মূর্ত্তি আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে মিঃ ফড়কের Farmer's Luxury নামক মূর্ত্তিটি আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে। একটি কুলি-মজুর গোছের লোক অর্দ্ধ নিমীলিত নয়নে বেশ একটু আরাম করিয়া একটি বিড়ি ধরাইতেছে—এইটুকুই হইল শিল্পীর প্রতিপাদ্য বিষয়। লোকটির মুখে চোখে এমনি একটি সহজ সরল তোয়াজ এবং মৌতাতের ভাব আছে, যাহা বাস্তবিকই দেখিবার জিনিষ। এই জনমজুরটি তার এই নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনের উদয়াস্ত-পরিশ্রমের একঘেয়ে-মিটাকে একটিমাত্র বিড়ির বিলাসিতাটুকুর নূতনত্ব দিয়া কিঞ্চিৎ সরস এবং মোলায়েম করিয়া লইতে চায়। মূর্ত্তিটির মুখে-চোখে এই ভাবটি খুব চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে। মূর্ত্তিটি বাস্তবিকই চমৎকার হইয়াছে।

মিঃ ভি, পি, কর্ম্মকার-নির্ম্মিত স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মূর্ত্তিটিও উল্লেখযোগ্য। এই মূর্ত্তিটি খুব সজীব হইয়াছে।

নারদ ঋষি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

তুমি দেবর্ষি, তুমি মহর্ষি,
করুণার তুমি পান্থশালা;
কেহ নাহি যার, তুমি আছ তার,
জুড়াতে দারুণ বক্ষজ্বালা।
অভিশাপে তুমি ভস্ম কর না,
রোষ নাহি দেব তোমার দেহে;
হরি নামে তুমি রোশনাই কর,
আশা-আলোহীন দীনের গেহে।
মেনকা পারে না মোহিত করিতে,
উর্ব্বশী কভু হানে না আঁখি;
পায় যে পতিতা মমতা তোমার
চরণের ধূলা অঙ্গে মাখি।
হাজার হাজার শিষ্য নাহিক
পারণ করাতে হয় না ভীতি;
তুমি শুধু হরি প্রেমের পিয়াসী,
পীযূষ বিলানো তোমার রীতি।
ফের গোলোকের অন্তঃপুরে,
কৈলাসে তব অগাধ গতি;
করুণ কপট-কলহ লাগাতে
চিরদিন তুমি অগ্ররথী।
মহাকালে তুমি বিদ্রূপ কর,
পাষাণীর মুখে ফুটাও হাসি;
লক্ষ্মীর কাছে নারায়ণে তুমি
নিত্য সাজাও অবিশ্বাসী।

কৌতুকে ধরি কমলার পেঁচা
ফেলাও আকাশ গঙ্গাজলে;
কমলের বনে কোটর খোঁজে সে,
মরালেরা মরে কৌতূহলে।
সবার সঙ্গে হাস্য রঙ্গে
মুনিবর তুমি দক্ষ জানি;
ব্রজের ফাগুন ফাগুয়ায় রাঙা
চিরদিন তব বক্ষখানি।
ভগবানে তুমি টলাও, গলাও,
মাধবের তুমি মধুব্রত;
অমৃতের ভোজে ত্রিলোকে ডাকিতে
পারগ কে আছে তোমার মত।
ব্যাকুল তোমার বীণার গমক
সপ্তসাগর আকুল করে;
দ্যুলোকেতে আনে ভূলোকের স্মৃতি
বাঁশরী স্মরায় পীতাম্বরে।
তুমি যে অপার সিন্ধু ক্ষমার,
যেথা সেথা ফের গোপনচারী;
বুঝিতে পারি নে কখন যে এসো,
কোন্ ছলে এসো কাহার বাড়ী।
আসিবে বুকের বন্দরে যবে
ওপার হইতে খেয়ার তরী,
সাথে যেন তার তোমার বীণার
হরিগুণগান শ্রবণ করি।

বেতিয়া ও সীতামাঢ়ী

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

বিহারের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে, হিমালয়ের পাদদেশে, চম্পারণ জেলা অবস্থিত। চম্পারণের প্রাচীন নাম চম্পক-অরণ্য। গণ্ডকনদ হিমালয় হইতে অবতীর্ণ হইয়া, এই জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছেন। গণ্ডকের অপর নাম শালগ্রামী বা নারায়ণী। নদীগর্ভে বহুসংখ্যক শাল-গ্রাম-শিলা পাওয়া যায় বলিয়া ইহার নাম শালগ্রামী। পুরাকালে চম্পক অরণ্য নিবিড় বনসমাচ্ছন্ন ছিল। এথানে বহুসংখ্যক ঋষি-মুনি নিভৃত-বাস করিতেন। বেদের আরণ্যক অংশ এখানে রচিত হইয়াছিল, এইরূপ প্রবাদ আছে।

নন্দনগড়

চম্পারণ জেলার সদরের নাম মোতিহারি। সুদীর্ঘ জলাশয়ের তীরে ক্ষুদ্র নগরটি অবস্থিত। নগরের গৃহ, উদ্যান, মন্দির জলমধ্যে প্রতিফলিত হইয়া ঝলমল করে;—এজন্য ইহার মোতিহারি নাম সার্থক হইয়াছে। মোতিহারি জেলার সদর বটে, কিন্তু মোতিহারি অপেক্ষা বেতিয়া নগর অনেক বড়, এবং বেতিয়ার স্বনামখ্যাত রাজবংশের রাজধানী বলিয়া সমধিক প্রসিদ্ধ। বেতিয়া চম্পারণ জেলার একটী মহকুমা। বেতিয়ার জমিদারীর বাৎসরিক আয় ২৫।২৬ লক্ষ টাকা। সম্পত্তির অধিকাংশ ইংরেজ কুঠিয়ালদিগকে বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বেতিয়া-রাজগণ ভূমিহার ব্রাহ্মণবংশীয়। বেতিয়ার শেষ মহারাজ স্যার হরেন্দ্রকিশোর সিংহের মৃত্যুর ২।৩ বৎসর পর হইতে জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে। মহারাণী প্রকৃতিস্থ নহেন বলিয়া গবর্ণমেন্ট প্রচার করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে লাট সাহেবের সভাতে, এই বন্দোবস্ত সন্তোষজনক নহে বলিয়া, এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটী মন্তব্য গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু লাট সাহেবের অনুমোদন না হওয়াতে, মন্তব্য অনুসারে কার্য্য হয় নাই। মহারাণী নিঃসন্তান। তিনি বেতিয়াতে থাকেন না,—সচরাচর প্রয়াগে থাকেন।

বেতিয়াতে রাজার একটা স্কুল আছে। রাজার হাসপাতালটী খুব বড়, এবং বহু উন্নতপ্রণালীর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রসমন্বিত। পাটনা ব্যতীত এ প্রদেশে এত বড় হাসপাতাল আর নাই। বেতিয়াতে বৈদ্যুতিক কারখানা আছে। সেখান হইতে রাজবাড়ী, হাসপাতাল, এবং কয়েকটি রাজপথ ও ইংরেজ কর্ম্মচারীর গৃহে বিদ্যুৎ সরবরাহ হইয়া থাকে। বেতিয়া নগরে বহুসংখ্যক দেবালয় আছে। কতকগুলি মন্দিরের গঠন নৈপুণ্য অতি মনোহর। বলা বাহুল্য, মন্দিরগুলি বেতিয়া রাজগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। নগরের পার্শ্ব দিয়া চন্দ্রাবতী নদী প্রবাহিতা। এককালে এই নদীতে যথেষ্ট জল থাকিত,এবং সর্ব্বদা নৌকা চলিত। এক্ষণে অযত্নে নদী অতিশয় সঙ্কীর্ণা; প্রবাহ শৈবাল-সমাচ্ছন্ন;—শীর্ণ-কায়া, ছিন্নবসনা-বৃতা-দরিদ্রা রমণীর ন্যায় একপার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে।
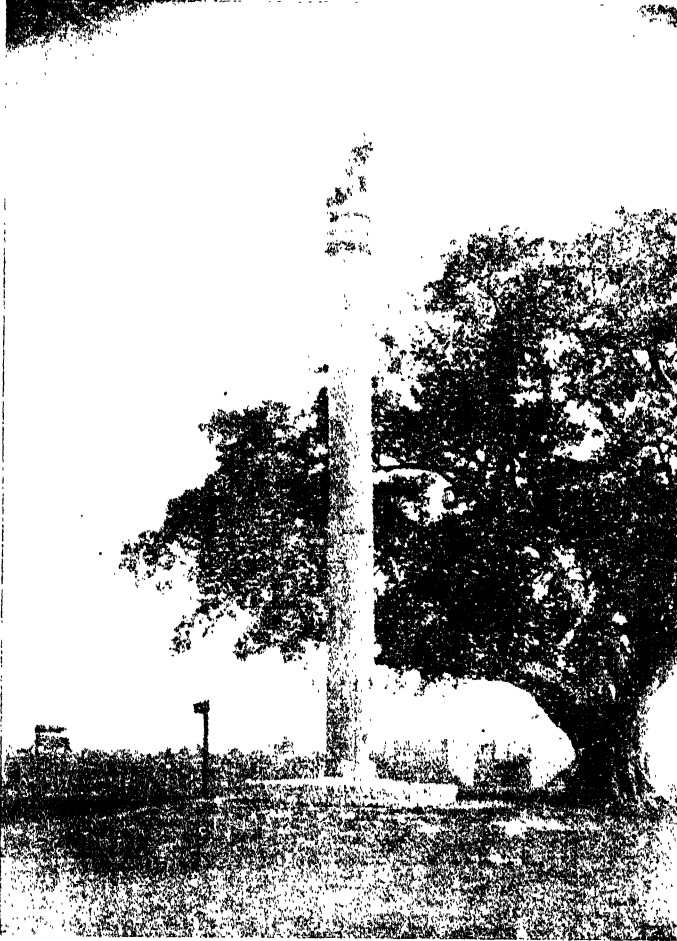
অশোক স্তম্ভ—(লউড়িয়া নন্দনগড়)

বেতিয়া হইতে তিন মাইল দূরে গণ্ডকনদের একটী পরিত্যক্ত প্রবাহ আছে। ইহাকে উদয়পুরের হ্রদ বলে,—প্রচলিত ভাষায় হ্রদের নাম 'মণ'। জলাশয়টি ৩।৪ মাইল দীর্ঘ, অতিশয় গভীর, এবং সুমিষ্ট, স্বচ্ছ জলে পরিপূর্ণ। হ্রদে মধ্যে-মধ্যে কুম্ভীর দেখা যায়। হ্রদের মধ্যস্থলে একটী দ্বীপ আছে। শীতকালে ইংরেজগণ এই হ্রদের তীরে শিকার খেলিতে যান। হ্রদের তীরে জঙ্গলের মধ্যে হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়। নীলগাই নামক এক জাতীয় হরিণ এখানে থাকে। শীতাগমে যখন হিমালয়ের উপর অতিরিক্ত বরফ পড়ে, তখন মানস সরোবরের হংসগুলি দলে-দলে পাহাড় ছাড়িয়া দক্ষিণ দিকে উড়িতে থাকে। উদয়পুরের হ্রদ তখন এই সকল মানস বিহারী হংস-সমাচ্ছন্ন হইয়া যায়। হংসগুলির গলদেশ লোহিত বর্ণের; এজন্য তাহাদের নাম লালসর। শীতকালে হ্রদের জল লালসরগুলিতে লাল হইয়া যায়।

বেতিয়া হইতে ১৪ মাইল দূরে লউড়িয়া নামক গ্রাম আছে। এই গ্রামের নিকটে একটী অশোক-স্তম্ভ বর্ত্তমান। স্তম্ভটিকে স্থানীয় লোকে ভীমসেনের লাঠি বলিয়া থাকে। লাঠি বা লগুড় শব্দের অপভ্রংশ হইতে গ্রামের নাম লউড়িয়া হইয়াছে। স্তম্ভটি অনুমান ২৫ হাত উচ্চ। ব্যাস ২হাত। স্তম্ভ-দেহ একটিমাত্র প্রস্তর নির্ম্মিত (monolyth)। ইহার উপর পদ্মাকারে উৎকীর্ণ একখণ্ড প্রস্তর নিম্নমুখে অবস্থিত। ইহার পর একটা বৃত্তাকার বেদী,—বেদীর উপর একটি সিংহ-মূর্ত্তি-বেদীর চারিপাশে খাদ্য সংগ্রহ নিরত হংসমূর্ত্তি-সকল উৎকীর্ণ রহিয়াছে। সিংহের মুখের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। নীচে স্তম্ভের গায়ে একটী গোলার চিহ্ণ। গোলার

আঘাতে উপরবর্ত্তী সিংহমূর্ত্তি কিয়ৎ পরিমাণে স্থানচ্যুত হইয়া সরিয়া বসিয়াছে। এতদ্ভিন্ন স্তম্ভটির অপর কোন ক্ষতি হয় নাই। জনপ্রবাদ এই যে, ঔরঙ্গজেবের সময় স্তম্ভের উপর গোলা নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। স্তম্ভের উপর ফার্সি ভাষায় ঔরঙ্গজেবের নাম এবং সন ১০৭১ (১৬৬০ খৃঃ) খোদিত আছে। অন্যান্য অশোক-স্তম্ভের ন্যায় এই স্তম্ভের উপর উৎকৃষ্ট পালিশ বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুদীর্ঘ ২০০০ বৎসর ধরিয়া বৃষ্টি, বায়ু এবং ধূলিতে সে সুন্দর পালিশের কিছুই ক্ষতি করিতে পারে নাই। স্তম্ভের উপর অশোকের অনুশাসন উৎকীর্ণ আছে। অনুশাসনের পালি অক্ষরগুলি অতিশয় সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। স্তম্ভের চারিদিকে আজকাল-রেলিং দিয়া ঘেরা হইয়াছে। প্রতি বৎসর এই স্থানে একটি মেলা বসিয়া থাকে।

অশোক স্তম্ভ হইতে প্রায় এক মাইল দূরে একটি বৃহৎ ভগ্নস্তূপ আছে। তাহা নন্দনগড় নামে পরিচিত। স্তূপটি প্রায় ৬০ হাত উচ্চ। স্তূপের উপর নিবিড় জঙ্গল হইয়াছে। জঙ্গলের মধ্যে দিয়া স্তূপের শিরোদেশে উঠিবার সঙ্কীর্ণ পথ। বন্য গুল্মগুলি পথের উপর তাহাদের কণ্টকময় বাহু প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। স্তূপটি ভগ্ন ইষ্টকখণ্ডে পরিপূর্ণ। কিছুদূর আরোহণ করিয়া অল্প একটু সমতল পৃষ্ঠ। তাহার পর পুনরায় অল্প পথ আরোহণ করিয়া স্তূপ-শীর্ষে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানটি একটি বিপুলকায় প্রাসাদের শিরোভাগ বলিয়া বোধ হইল। এখান হইতে চারিদিকের বৃক্ষাবৃত বনভূমি এবং শস্যক্ষেত্রগুলি অতিশয় রমনীয় দেখাইতেছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, ইহা একটী বৌদ্ধস্তূপ ছিল। বুদ্ধদেবের দেহাবশিষ্ট ভস্মরাশির উপর যে প্রসিদ্ধ স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহাই সেই স্তূপ। বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণের পর তাঁহার দেহ অগ্নিসাৎ করা হইয়াছিল। অগ্নিদাহের পর যে অস্থিগুলি অবশিষ্ট ছিল, তাহা আট ভাগ করা হয়। পিপ্পলিবান্নার মৌর্য্যগণ এক ভাগ চাহিয়া দূত পাঠাইয়াছিল। কিন্তু দূত যখন কুশীনারাতে উপস্থিত হইল, তখন অস্থিসকল বিতরিত হইয়া গিয়াছে। দূত বিষণ্ণ-হৃদয়ে চিতাভস্মগুলি মাত্র সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিল। এই ভস্মগুলির উপর একটি সুবৃহৎ স্তূপ নির্ম্মিত

একটি ক্ষুদ্র স্তূপ—লউড়িয়া

হইয়াছিল। যুয়ান চোয়াং তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীতে এই স্তূপের বর্ণনা করিয়াছেন। এই স্তূপটিই নন্দনগড়ের ভগ্নস্তূপ কি না, তাহা এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। এখানকার লোক প্রবাদ এই যে, এখানে জনক রাজার ভগিনীপতি বাস করিতেন। জনকমহিষীর ননদের বাসস্থান বলিয়া ইহার নাম ননদগড় বা নন্দনগড় হইয়াছে।

লউড়িয়া গ্রামের নিকট নন্দনগড় ব্যতীত আরও কয়েকটি ক্ষুদ্রতর স্তূপ আছে। সেগুলি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। এই ছোট স্তূপগুলি সংখ্যায় ১৫টি। স্তূপগুলি তিনটি সারিতে নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রত্যেক সারিতে পাঁচটি করিয়া স্তূপ আছে। একটি সারি পূর্ব্বপশ্চিমে লম্বা। এই সারিটির পূর্ব্ব প্রান্তের নিকটে অশোক স্তম্ভটি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সারিটির পশ্চিমে উত্তর-দীর্ঘ লম্বা অপর দুইটি সারি স্তূপগুলি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত; কিন্তু সে মৃত্তিকা চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ভূমির মৃত্তিকা হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন প্রকৃতির। স্তূপের মৃত্তিকা হরিদ্রাবর্ণের এবং দৃঢ়,—নিকটের ভূমির মৃত্তিকা শ্বেতবর্ণ এবং ধূলিবহুল। স্তূপের মৃত্তিকার মধ্যে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র উপলখণ্ড পাওয়া গিয়াছে; তাহা হইতে মনে হয় যে,এই মৃত্তিকা গণ্ডকনদের গর্ভ হইতে আহৃত হইয়াছিল। গণ্ডকনদ এক্ষণে এখান হইতে ১০ মাইল দূরে অবস্থিত। পূর্ব্বে হয় ত কাছে ছিল। স্তূপগুলির কোনটি ছোট, কোনটি কিছু বড়। ইহাদের উচ্চতা ২০ হইতে ৫০ ফিটের মধ্যে। ইহাদের নিম্নভাগ গোলাকার। উপরের দিকে ইহারা ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এ স্তূপগুলি কিসের—এ বিষয়ে বহু আলোচনা হইয়াছে। কেহ-কেহ মনে করেন, এগুলি বৌদ্ধ চৈত্য। কিন্তু অপর প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌গণ মনে করেন যে, এগুলি মৃত ব্যক্তির স্মরণার্থ বৌদ্ধ-যুগের বহু কাল পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখানে একটি রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল। তাহার তারিখ খৃঃ পূঃ ১০০০ বৎসর বলিয়া অনুমিত হয়। অপর একটি স্তূপের মধ্যে খনন করিয়া একটি লৌহনির্ম্মিত শবাধারের মধ্যে মনুষ্য-কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। ডাক্তার ব্লক আরও কয়েকটি স্তূপ 'খনন করিয়াছিলেন। দুইটি স্তূপের মধ্যে মনুষ্য-কঙ্কাল এবং ক্ষুদ্র সুবর্ণ পত্রের (gold leaf) উপর স্ত্রী-মূর্ত্তি

হাসপাতাল—বেতিয়া

পাওয়া গিয়াছে *। ডাক্তার ব্লক অনুমান করেন যে, সূত্র-গ্রন্থে মৃত ব্যক্তির স্মরণার্থ যে শ্মশানচিতা নির্ম্মাণ করিবার উল্লেখ আছে, এই স্তূপগুলি তাহারই নিদর্শন। প্রভেদের মধ্যে—শ্মশানচিতাগুলি মনুষ্য-দেহের ন্যায় উচ্চ হইবার কথা, কিন্তু এগুলি তদপেক্ষা অনেক বড়।

সুদূর অতীতের এই সকল নিদর্শন দেখিয়া শীতের অপরাহ্ণে আমরা বেতিয়া অভিমুখে ফিরিয়া চলিলাম। ক্ষেত্রে কোথাও অরহর বা ইক্ষু উৎপন্ন হইয়াছে,—কোথাও হরিদ্রা ও তিলের চাষ হইয়াছে,—কোথাও বা সোনালি

উদয়পুরের হ্রদ—বেতিয়া

রংয়ের সরিষাপুষ্প মন্দ বায়ুতে আন্দোলিত হইতেছে। এক সময় ইহা সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল। তখন বিদেহগণ এখানে রাজত্ব করিতেন। তাহার পর বৌদ্ধ নরপতিগণ এখানে কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আজ ক্ষেত্রের মধ্যে ঐ যে সব কৃষক কাজ করিতেছে,—অপর্য্যাপ্ত মলিন বসন, রুক্ষকেশ, শীর্ণকায়—উহারা সেই অতীত সমৃদ্ধির কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছে।

* আমার স্মরণ হয় যে, এই ক্ষুদ্র স্ত্রী-মূর্ত্তি কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে।

বেতিয়া হইতে সীতামাটী যাইতে হইলে, নরকটিয়াগঞ্জে গাড়ী বদলাইতে হয়। সীতামাটী মজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত একটা মহকুমা। ইহা লক্ষ্মণদেই নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। প্রবাদ এই যে, এখানে সীতাদেবী ক্ষেত্রের মধ্যে রাজর্ষি জনক কর্ত্তৃক আবিষ্কৃতা হইয়াছিলেন। জানকী-কুণ্ড নামে একটি কুণ্ড সেই স্থান নির্দ্দেশ করিতেছে। এই কুণ্ডটি জনক না কি স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কুণ্ডের চারিদিক বাধান। কিন্তু কুণ্ডের জল অতিশয় অপরিষ্কার। কুণ্ডের নিকটে একটি প্রাচীন মন্দির আছে। মন্দিরের মধ্যে সীতা, রাম ও লক্ষ্মণের মূর্ত্তি। মূর্ত্তিগুলি কৃষ্ণ প্রস্তর-নির্ম্মিত,—মাত্র মুখ ও বক্ষ পর্য্যন্ত আছে দেখিয়া প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। প্রবাদ এই যে, জনক কর্ত্তৃক এই বিগ্রহগুলি স্থাপিত হইয়াছিল, ও মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। কালক্রমে স্থানটি বিস্মৃত ও পরিত্যক্ত হইয়াছিল। প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে একজন সাধু অযোধ্যা হইতে এখানে আসেন; এবং ঐশী প্রেরণায় স্থানটি আবিষ্কার করিয়া, জঙ্গল কাটিয়া বাস করিতে থাকেন। মন্দিরটি অনুচ্চ। ইহার দ্বারদেশ ও সিংহাসন রৌপ্যমণ্ডিত। প্রাঙ্গণে মহাদেব, গণেশ ও হনুমানের

তিনটি স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র মন্দির আছে; এবং বীরবলদাস প্রভৃতি সাধুর সমাধি আছে। নিকটে আরো কয়েকটি আধুনিক মন্দির আছে। বাজারে কতকগুলি বড় বাড়ী ও দোকান দেখিলাম। স্থানটি বর্দ্ধিষ্ণু।

সীতামাঢ়ী হইতে মজঃফরপুর ৩৬ মাইল পথ। মন্দিরাদি দর্শন করিয়া আমরা মজঃফরপুর রওয়ানা হইলাম। উভয় পার্শ্বে দিগন্তবিস্তৃত উর্ব্বর ভূমি। ক্ষেত্রে অড়হর, সরিষা, ইক্ষু, ধান্য প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়াছে। স্থানে-স্থানে নীলকুঠি (ইদানীং সেগুলি ইংরেজ জমিদারী কুঠি হইয়াছে), চিনির কল প্রভৃতি দেখা যাইতেছে। চারিদিকে ক্ষেত্রের শস্য-সম্পদ এবং ক্ষেত্রবেষ্টিত কুটীরগুলির এবং কুটীরবাসীদের অত্যন্ত পরিস্ফুট একান্ত নিঃস্বতা বড়ই আশ্চর্য্য। মলিন বসন পরিয়া কৃষক-রমণীগণ ক্ষেত্রের মধ্যে কাজ করিতেছিল; মোটরের শব্দ পাইয়া তাহাদের ক্লান্ত, বিষণ্ণ চক্ষু দুইটি আমাদের দিকে তুলিয়া ধরিল। তৈলসম্পর্কবিহীন রুক্ষ কেশ চোখের উপর আসিয়া পড়িল। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এই অতিশয় উর্ব্বর ভূমিতে পরিশ্রম করিয়া ইহারা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না,—ক্ষুধায় কাতর শিশু সন্তানের রোদন নিবারণ করিতে মুখে খাদ্য তুলিয়া দিতে পারে না,—শীতের সময় একখণ্ড বস্ত্র গায়ে তাহাদের দিতে পারে না। কে এই সমস্যার মীমাংসা করিবে? *

* এই প্রবন্ধের আলোকচিত্র কয়েকখানি শ্রীযুক্ত প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক গৃহীত।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

গ্রামের উপায় *

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র পুরকায়স্থ এম-এ

সমবায় "শব্দটা" নূতন-নূতন বোধ হইলেও, সমবায় "জিনিষটা" শুধু কাছাড়ে কেন, সমস্ত ভারতবর্ষেই খুব প্রাচীন, এবং সেইজন্য সমবায় আন্দোলন ভারতবর্ষে যেমন শীঘ্র বাড়িয়া উঠিয়াছে, তেমন আর কোথাও দেখি না। আমরা ক্ষেতে লাঙ্গল দিই "দিন" দেখিয়া,—হাল লড়া (কামাই) দিই "তিথি" দেখিয়া,—ধান কাটা আরম্ভ করিবার জন্য পঞ্জিকা দেখি। ফলে, সকলে এক সঙ্গে এক জোটে কাজ করি। তা'তে সকলের ধান এক সঙ্গে বোনা হয়,—গরু এক সঙ্গে চরান যায়,—একের গরুতে অন্যের ধান নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে না, ইত্যাদি। ঘর তৈয়ার করিতে একে অন্যকে সাহায্য করি; তা'তে ঘর তৈয়ার করিবার খরচ খুবই কমিয়া যায়। এমন আরো অনেক কাজ করি। এবং এসকল আমরা বেশ বুঝি। এরই নাম যে সমবায় (বা মিলিয়া কাজ করা)—খালি এই কথাটা হয় ত কারো-কারো কাছে নূতন।

কাছাড়ের ধাতই যেন সমবায়ের; এদেশের জলবায়ুতে ঐ জিনিষ-টাই যেন ফলে ভাল। এককালে এখানে প্রায় সকল কাজই—ইস্তক জমি বন্দোবস্ত—সমবায় নিয়মে চলিত। প্রাচীন কাছাড় রাজ্যে কোন একজনকে জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইত না। গ্রামের সকলে মিলিয়া জমি বন্দোবস্ত করিতে হইত। রহিম যদি খাজনা দিতে না পারিত, তাহা হইলে রামনাথ, দীনমণি, চৌবা সিং প্রভৃতি আর আঠারো জনকে তাহা পুরাইয়া দিতে হইত। একজনকে জমি দিলে খাজনা আদায় করা ছিল কষ্টকর—কেউ দিত, কেউ দিত না। দশজনকে এক জোটে দিলে সে সন্দেহ থাকিত না, আজও থাকে না। সুতরাং অল্প খাজনায় জমি বন্দোবস্ত দিলেও আসলে রাজার লাভ বেশীই থাকিত! এখন একে গ্রাম্য মহাজনী (ঋণদান) সমিতির সঙ্গে মিলাইয়া দেখুন দেখি। একজনকে টাকা ধার দিলে কখনও টাকা উসুল হয়, কখনও হয় না। দশজনকে একত্র করিয়া এক সঙ্গে দশগুণ টাকা দিলেও উসুল সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকে না। সুতরাং যাদের টাকা আছে, তাহারা অল্প সুদেই সমিতিকে ধার দিতে প্রস্তুত।

কাছাড়ের রাজারা শেষদিকে আর কোন একটা গ্রামের সঙ্গেও জমি বন্দোবস্ত করিতেন না; বন্দোবস্ত দিতেন গ্রামের মণ্ডলীকে। কতকগুলি গ্রাম মিলিয়া হইত এক "রাজ" বা গ্রামের মণ্ডলী—এই মণ্ডলী বা "রাজকে" রাজা জমি বন্দোবস্ত দিতেন। গ্রামের কেহ খাজনা দিতে না পারিলে যেমন ঐ গ্রামের অন্যেরা সেই টাকা পুরাইয়া দিত, পরে তাহা আদায় করিয়া লইত, তেমনি যদি কোন এক গ্রাম ফসল নষ্ট

* কাছাড় জিলার সমবায়-সম্মিলনীর হাইলাকান্দি অধিবেশনে ৭ই জানুয়ারী, ১৯২৩ ইং পঠিত।

হইয়া যাওয়া বা অন্য কোন কারণে খাজনা দিতে না পারিত, তাহা হইলে ঐ "রাজের" বা মণ্ডলীর অন্য প্রামেরা তাহা ভাগ করিয়া দিত; এবং পরে তাহা আদায় করিত। এতে কি রাজা কি প্রজা উভয়ের সুবিধা হইত না কি? ঠিক এই ভাবে আপনারা মহাজনী সমিতিগুলিকে চালাইতেছেন না কি? যাহাদের টাকা আছে, তাহারা আর করিম বা কটুকে টাকা ধার দেয় না, টাকা আমানত রাখে কাছাড় কেন্দ্র (সেণ্ট্রাল) ব্যাঙ্কে। কেন্দ্র ব্যাঙ্ক যেন সেই আগেকার "রাজ' বা গ্রাম্য মণ্ডলী। কেন্দ্র-ব্যাঙ্ক টাকা ধার দেন গ্রামের সমিতিকে। গ্রাম্য সমিতি যেন প্রাচীন "খেল"। সমিতি ধার দেন রাম, শ্যাম, আব্দুল, জব্বার, ও খেলেন্দ্র সিংকে। এতে যাদের টাকা আছে, তাদেরও সুবিধা, আর যা'রা টাকা চায় তা'রাও সস্তায় (কম সুদে) টাকা পায়।

টাকা ধার নেওয়া ও ধার লওয়া, জমি বন্দোবস্ত লওয়া ও দেওয়া—এই রকম ২।১টা কাজ, লাভের জন্য এক সঙ্গে করাই শুধু সমবায় নয়। সমবায় মিলনের মধ্যে, একত্র হইয়া কাজ করার মধ্যে। বাজারে যে হাজার লোক হাজির হয়, তাহাদের মধ্যে সমবায় নাই; তাহারা নিজে নিজে, পৃথকভাবে কাজ করে, তাহাদের কথার গোলমাল হইয়া দাঁড়ায়। এমন কি গোলমাল শুনিলে আমরা রাগ করিয়া বলি "মাছহাটা"। কিন্তু নগর সংকীর্ত্তনে যে হাজার লোক জোরে কীর্ত্তন করে, তাহাকে আমরা বলি "গান"। হাজার লোক জমায়েৎ হইয়া যে জুম্মার নমাজ পড়ে, তাহা অ-মুসলমান প্রতিবেশীও নিশ্চল হইয়া শুনে। সুতরাং শুধু একত্র হইলেই হইল না,—একত্র হইয়া কাজ করিবার প্রণালী বা নিয়ম বা কায়দা জানা চাই—যেন "মাছহাটা" না হইয়া "কীর্ত্তন" হয়। এইভাবে দশজনের "ভালর" জন্য মিলিত হইয়া যে কাজ করা তারই নাম সমবায়। মিলিত হইলে শুধু কম সুদে টাকা পাওয়া যায়, তাহাই নয়,—আরো সহস্র উপকার পাওয়া যাইতে পারে। আপনারা, যাঁরা গ্রামের মিলন-কীর্ত্তনের "গায়ন" হইবেন, তাঁরা যদি সমবায়ের খাঁটি সুরটা ধরিতে পারেন, তাহা হইলে, যাহারা "দোহার" দিবে, তাহারা যে ভুল গাইবে না, এটা আমার খুব বিশ্বাস আছে। পূরবী রাগিনীর গান যেমন শুধু "দিবা অবসান হ'ল" ইত্যাদি নয়, তেমনি সমবায় সমিতি শুধু অল্প সুদে ঋণদান নয়,—এই কথাটা আপনারা সহস্রকণ্ঠে প্রচার করুন—এই আমার প্রথম নম্বরের আর্জি।

আপনারা হয় ত বলিবেন, সমবায়ের দ্বারা আর কি হয় তা' ত আমরা জানি না। আমাদের কত অভাব, কত ক্লেশ—সমবায়ের দ্বারা কি তাহা ঘুচিবে?

গ্রামের অভাব কিসের, কি তা'দের নাই আর কি তাদের চাই—আমরা কি ঠিক-ঠিক তাহা জানি? আমাদের দেশে জ্বর হইলে লোকে ডাক্তার ডাকে না। কেন না, জ্বর জ্বরই। তার জন্য দুই ব্যবস্থাই মাত্র হ'তে পারে—এক বাজারের পেটেণ্ট ঔষধ, না হয় পোষ্টাপিসের মহাজেবের কুইনাইন। কোন বোতলের সামগ্রী "জ্বরের যম" কোনটি রোগীর যম, তাহা আমরা বিবেচনা করি না—জ্বরে জ্বরের ঔষধ খাই। ফলে, কেউ অদৃষ্টগুণে বা শরীরের গুণে ভাল হই; আর কেউ বোতলের কৃপায় স্বর্গলাভ করি। গ্রামের কিসে উন্নতি হইবে—জিজ্ঞাসা করিলে, বক্তার দলের জিহ্বার ধার জুড়িয়া যায়। কেউ বলেন "যাও গ্রামে; গ্রামে গিয়া বাস কর, তোমাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া গ্রাম ভাল হইবে।" সহরের ফেরৎ যে যুবক গ্রামে যান, সে ত মোটে গ্রামে টিকিবার মত কোন গুণই পুঁজি করে নাই,—সে আবার দৃষ্টান্ত কি দেখাইবে? কেহ বলে, "আর কিছু নয়—গ্রামে-গ্রামে চরকা আর তাঁত চালাও,—এতে সকল কষ্ট দূর হইবে।" এক "হিত সাধিনী" সভার এক প্রচণ্ড প্রচারক বক্তৃতা করিতে আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন, "আমরা থাকি বড় নোংরা। গ্রামে-গ্রামে যদি এক এক ঘর সাহেব বসান যায়, তাহা হইলেও আমরা দেখিয়া শিখিতে পারিতাম; তবে হাঁ, টাকার অভাব।" কেউ বলেন "দেশ মূর্খ,—আগে স্কুল কর, লোকেরা পড়িতে শিখুক,—তার পর অন্য কথা।" কেহ-কেহ বলেন "গ্রামে জল নাই, চাঁদা করিয়া পুকুর কেন কাটাও না?" বক্তাদের লম্বা ফর্দ্দের জ্বালায় আপনারা হয় ত জ্বালাতন হইয়া আছেন। আমি ফর্দ্দ করিতে বসিব না।

পল্লী-জীবনের সহিত সামান্য ঘনিষ্টতাও যাঁ'দের আছে, তাঁরাই স্বীকার করিবেন যে, গ্রামের অভাব প্রধানতঃ:—

১। লোক বাড়িতেছে, সুতরাং গড়পড়তা জমি কমিতেছে।

২। অজন্মা ও গোমড়ক প্রায় প্রতি ২।৩ বৎসরে একবার হইতেছে।

(৩) টাকার অভাবে লোকে কৃষির বা গরুর উন্নতি করিতে পারিতেছে না।

(৪) কার্য্যক্ষম লোকের অবসর সময়ের জন্য কাজের বা পড়া (পতিত) জায়গা কাজে লাগাইবার কোন ব্যবস্থা নাই।

(৫) গ্রামে-গ্রামে স্কুল ও উপযুক্ত বাসগৃহের অভাব। ইত্যাদি

অভাবের লিষ্ট লম্বা করিয়া লাভ নাই। মানুষের সংখ্যা বাড়িবেই এবং প্রত্যেক পরিবারের ভাগে জমি কম পড়িবেই, যদি না আমরা নূতন জায়গায় গিয়া বসবাস করি। তবে এক উপায়, নূতন প্রণালীতে, সার দিয়া চাষ করা ও অল্প জমিতে বেশী ফলানো। ইহা ব্যয়সাধ্য—টাকার দরকার। টাকা পাইবার উপায়—একমাত্র উপায়, সচ্চরিত্র ১০ জন লোক একত্র হইয়া সমবায়-ঋণদান-সমিতি স্থাপন করা। "সচ্চরিত্র"—এটা সমবায়ের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় কথা। যে কোন মহাজনকে জিজ্ঞাসা করুন, দেখিবেন, তাঁহারা জমা-জমির চাইতে "লোক" (মানে লোকের চরিত্র) দেখিয়া টাকা দেন। চরিত্র যে ধন, সেটা শুধু কথার কথা নয়। চরিত্র যে সকলের চেয়ে বড় মূলধন, এই কথার উপরই গ্রাম্য-মহাজনী-সমিতির ভিত্তি—এই মূলধন দেখিয়াই অন্যেরা আপনাদের সঙ্গে কারবার করিবে। সমবায়-মহাজনীতে চরিত্রই মূলধন—এই কথাটা মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিলে চলিবে না। আপনারা মনে করিয়া দেখুন, সমবায়-সমিতিতে যত গোলমাল হইয়াছে, তাহা এই কথাটি ভুলিয়া যাওয়ার জন্য। সুতরাং আমরা

যদি সৎ হই,—ইমান যদি আমাদের খাঁটি থাকে,—তাহা হইলে আমাদের সম্পত্তি নাই বলিয়া আমরা গরীব নই। আমরা যে দিন সমবায় করিব, সমবেত হইব, সেই দিন হইতে আমরা ধনী, সেই দিন হইতে আমরা কম জমিতে বেশী ফসল ফলাইতে পারিব—পড়া জমিতে, জংলা জায়গায় সোণা ফলিবে।

বৃষ্টি ত সমবায় করিয়া বাড়ানও যায় না, কমানও যায় না। বন্যার জল ত মসজিদ-আখড়াও মানে না,—আমাদের ত কথাই নাই। তবে উপায়? সমবায় বন্যা বন্ধ করিতে না পারিলেও, বা বৃষ্টি বাড়াইতে না পারিলেও, তাহার কষ্ট দূর করিতে জানে। ধরুন, প্রতি তিন বৎসরে আপনাদের একবার করিয়া ফসল নষ্ট হয়। এখন, যদি চাষের উন্নতি করিয়া, এখন যা ফসল হয় তাহার চারিভাগের একভাগ ফলন বাড়াইতে পারেন, এবং এই অতিরিক্ত ফলনটা যদি আপনারা কয়েক বৎসর ঘরে না লইয়া এক জায়গায় জমা রাখেন, তাহা হইলে এই ধান ধার দিয়া বা বিক্রয় করিয়া যে লাভ হইবে, তাহা একত্র করিলে তিন বৎসর পর, পুরা এক বৎসরের ফসলের সমান দাঁড়াইবে। তখন ফসল নষ্ট হইলে, ঐ জমা ধানই ত আপনাদের বৎসরের খোরাক জোগাইতে পারিবে। যদি আপনারা দশজন সৎ লোক মিলিয়া এই ভাবে কার্য্য করেন, তাহা হইলে ফসল নষ্ট হইলেই ঘরে ঘরে হাহাকার উঠিবে কি? সমবায়ের দ্বারা এই ভাবে যে খারাপ বৎসরের জন্য ধান জমা রাখা, এর নাম "ধর্ম্মগোলা"। আপনারা হয় ত ভাবিতে পারেন, জমা না দিয়া আমরা নিজেরাই ত বিক্রী করিয়া টাকা জমা রাখিতে পারি। যাঁরা পারেন, তাঁদের জন্য আর কারো মাথা ঘামাইতে হয় না। কিন্তু ১০ জনের মধ্যে ৯।০ জনই ত তাহা পারেন না। আমার মনে হয়, এই ভাবে জমা দিতে গিয়া যদি প্রত্যেক বৎসর কিছু-কিছু ধান কিনিতে হয় তাহাও ভাল, তবু এই প্রকার ধর্ম্মগোলার সভ্য হওয়া উচিত।

ঠিক এই প্রণালীতে "গো-বীমা" সমিতি স্থাপন করিতে পারা যায়। আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, বহু পরিবার এক গরু মড়কে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে;—গরু কিনিতে যে টাকা ধার হইয়াছে, তাহা আর শোধ করিতে পারে নাই। ধরুন, এক ব্যক্তির ৪টি গাই মরিয়াছে। তার দাম ১০০৲। তাহাকে ৪টি খারাপ গাইয়ের পরিবর্ত্তে ১৫০৲ দিয়া দুইটি ভাল গাই কিনিবার জন্য সমিতি হইতে টাকা ধার দেওয়া হইল। এই দু'টি ভাল গাই নিশ্চয়ই অনেক বেশী দুধ দিবে এবং এদের রাখ্‌বার খরচও কম হইবে। হাঁ, তবে যদি এর একটা মরে তাহা হইলে খারাপ তিনটা গরু মরে যাওয়ার মত অনিষ্ট হইবে। সুতরাং লাভের টাকা হইতে তাহাকে দুইটি কাজ করিতে হইবে—(১) ধারের টাকা শোধ করিতে হইবে, আর (২) গরু হঠাৎ মরিয়া গেলে যা'তে ক্ষতি না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মানুষের যেমন জীবন-বীমা হয়, এই ভাবে গরুরও জীবন-বীমা করা যায়। এই প্রকারে যে গরুর জীবন-বীমা করিয়া রাখে, গো-মড়ক আসিলে সে সাবধান হইবে, ভয় পাইবে না। জানি না, কবে সেই শুভ দিন আসিবে, যখন এই অঞ্চলে সমবায়-গো-বীমা সমিতি স্থাপিত হইবে।

নলের কূয়া অল্প টাকায় হয়, ঐ কূয়াগুলি বসানও সহজ। তার থেকে বেশ জল পাওয়া যায়। যদি এই ভাবে দশজনে মিলিয়া ঐ কূয়ার নলগুলি বন্ধক দিবার সর্ত্তে সমিতি হইতে টাকা কর্জ্জ নেয়, তাহা হইলে অতি শীঘ্র গ্রামের প্রতি ঘরে আমরা ভাল জলের ব্যবস্থা করিতে পারিব। লোকেল বোর্ডের "সু"-ব্যবস্থায় গ্রামের বাইরে, যেখানে জল আনবার জন্য কেউ যায় না, এমন জায়গায় এক-একটা পুকুর স্থানে-স্থানে আছে। তার আবার তদ্বির করিবার কোন চৌকিদার নাই। এর জলের যে কি অবস্থা তা' বলে লাভ নাই। পুকুর কাটাবার খরচ যদি পাঁচ শ' টাকার, তার চারিদিকে লোহার 'পিঞ্জিরা' (তারের বেড়া) গড়াইবার খরচ হয় হাজার টাকা! এতে যে টাকার ব্যয় (বা শ্রাদ্ধ) হয়, তাহা যদি সমবায় 'জলদান সমিতি' গুলিকে দেওয়া হয়, আর সমিতি যদি আরো তত টাকা কেন্দ্র-ব্যাঙ্ক হইতে ধার করিয়া আনেন, তাহা হইলে একটা পুকুরের খরচ ও সমিতির ধার করা টাকার সাহায্যে প্রায় ১০০টি নলকূয়া বসাইয়া ২০০ ঘর লোকের একটা গ্রামের সমস্ত জলকষ্ট দূর করা যাইতে পারে।

যে ব্যক্তির মূলধন কেবল শরীর, তার মূলধন যা'তে ভাল থাটে, পড়িয়া না থাকে, তার প্রতি দৃষ্টি রাখা দরকার। 'চরকা কাটা'—বলিলেই, চরকা চলে না। তার চলিবার ব্যবস্থা চাই। যার অবসর কাটে না, তার চরকা চলিতে পারে। কিন্তু যে তার চাইতে বেশী লাভের কাজ করিতে পারে, তাহার পক্ষে চরকার ব্যবস্থা পেটেণ্ট ঔষধের মত—শেষে চলিবে না। যা'র চাল-চলন বড়, তার শুধু তাঁত বুনিয়া চলিবে কি না বিবেচ্য। আঠারো বৎসর আগে যখন "ভদ্র" লোকেরা শুদ্ধ "দেশের উপকারের" জন্য তাঁত ধরিয়াছিলেন, তখন তাঁরা অভিভাবকের অর্থ নষ্ট করিয়া তাঁতে ইস্তাফা দিলেন ও স্থির করিয়া বসিলেন, তাঁতটা কিছু নয়। কিন্তু যাদের ওটা জাত-ব্যবসা,—চাষের সঙ্গে বয়নের কাজ যা'রা করে,—আর যা'দের বাড়ীর সকলে সে কাজে সাহায্য করে,—তারা তাঁতের কৃপায় কি করিতে পারিয়াছে, তার প্রমাণ—করিমগঞ্জের "নাথের বাজার"—যেখানে প্রতি বৎসর ৬ লক্ষ টাকার তাঁতের কাপড় বিক্রয় হয়। কিন্তু সেখানেও তারা যথেষ্ট লাভ করিতে পারে না। তার কারণ, তারা সমবেত নয়। তারা যদি গ্রামে-গ্রামে (ক্রয় ও বিক্রয়ের জন্য) সমবায় সমিতি স্থাপন করত, যদি নাথ সমিতিগুলির একটা মণ্ডলী থাকত, আর ঐ মণ্ডলী যদি তাদের জন্য মিল থেকে সূতা কিনত ও তৈরী মাল আবশ্যকমত দূর দেশে চালান দিবার ভার নিত, তাহা হইলে আজ এক-এক পরিবারের যা' লাভ হয়, তার দ্বিগুণ, হয় ত বা তিনগুণ লাভ তারা করতে পারত। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, এই উপায়ে এক তাঁত হইতে একটি পরিবারের মাসে ৫০৲ টাকা আয় হইতে পারে। কিন্তু আজকালে গড়ে ১৫৲।২০৲ টাকার বেশী লাভ মিলিতেছে না।

কুটীর-শিল্পের লাভ নির্ভর করে পরিবারের সকলের সাহায্যের

উপর। তথা-কথিত "ভদ্র" পরিবারে তাহা হয় না, তাই কুটীর-শিল্প সেখানে শিকড় গাড়িতে পারিতেছে না। কুটীর-শিল্প পরিবারের শিল্প; কারখানার মত রোজী কামলা দিয়া তাহা চালান যায় না। আর কুটীর-শিল্প সুস্থ শরীরে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, যদি না তারা সমবেত হয়।

আমি এমন কুটীর শিল্পের কথা জানি, যেখানে শিল্পীরা (কারিকর) সারা মাস খাটিয়া যে লাভ করে, অনায়াসে পাইকার, ফড়িয়া বা "পাইয়াদার" মাল নাড়া চাড়া করিয়া, ঠিক তত, এমন কি তার বেশীও লাভ করে।

এখন একটি কথার দোহায় দিয়া আমার "নাচাড়ী" শেষ করি—এ কথা বহুবার শুনিয়াছেন তবুও আর একবার বলি—গ্রামে বাঁচিয়া থাকার, টিকিয়া থাকার একমাত্র উপায় সমবায়।

স্যাইডেরিক দোলন। (Sideric Pendulum)

শ্রীপ্রমোদচন্দ্র গুপ্ত বি-এস্‌সি

আমাদের বাস্তব জ্ঞানের পরপারেও অনেক রকম আশ্চর্য্য শক্তি নিয়ত খেলা করছে। তাদের অদ্ভুত কীর্ত্তি আমাদের চিরন্তন বিশ্বাসকেও শতধা বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে, আমাদের জ্ঞানের সীমা কত সঙ্কীর্ণ, তাই দেখিয়ে দিয়ে, আমাদের আশ্চর্য্য করে দিচ্ছে। জড়বাদীদের আজকালকার বিশ্বাস, যা তারা বৈজ্ঞানিক যন্ত্র দিয়ে, কি বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রতিপন্ন করতে অক্ষম হবে, সে সব বস্তু কি বিষয়ের কোন অস্তিত্ব নাই। কিন্তু যখনই কোন পণ্ডিত একটা নূতন কিছু আবিষ্কার করেন, অমনি জগতের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত জ্ঞানিগণ বিস্মিত নেত্রে চেয়ে থাকেন।

সাইডেরিক দোলন (Sideric pendulum) এতদিন ভৌতিক জগতে একজন ভবিষ্যদ্বক্তা বলে পরিগণিত হচ্ছিল। বৈজ্ঞানিক জগতে কিরূপে এর প্রতিষ্ঠা হলো,—কি করে জগতের মাঝে এ একটা নূতন ধরণের চিন্তা-স্রোত প্রবাহিত করলে, অজ্ঞাত এক মহাশক্তি কিরূপে প্রত্যক্ষ প্রমাণের বশবর্ত্তী হয়ে, জড়বাদীর চিরন্তন সংস্কারকে ক্ষুণ্ণ করে দিলে,—এই প্রবন্ধে আমরা তাই বলতে চেষ্টা করবো।

সেদিন ছিল দারুণ গ্রীষ্মের রাত;—চারিদিক নিস্তব্ধ, প্রকৃতির মাঝে নীরব, নিথর ভূতের কালো ছায়া—দীর্ঘাকার একজন প্রৌঢ় বৈজ্ঞানিক তাঁর গবেষণাগারে বসে-বসে চিন্তা করছিলেন—সাইডেরিক দোলন দিয়ে অতঃপর কি করা যেতে পারে। সুমুখে টেবিলের উপর নানা দ্রব্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত—দোলনটী হাতে করে তিনি একমনে বসে আছেন—ডান পার্শ্বে সদ্যমৃত জীবন-সঙ্গিনীর প্রতিচ্ছবি—সেই মুখখানি, যা এতদিন তাঁর জীবনকে সুরভিস্নিগ্ধ করে রেখেছিল। হঠাৎ কি খেয়াল হলো,—দোলনটি তিনি ফটোর উপর ধরলেন। এক মিনিট,—দু মিনিট,—কি আশ্চর্য্য!—দোলনটী সাড়া দিল,—ডিম্বাকারে ঘুরতে লাগলো। সেই মুহূর্ত্ত হতে বৈজ্ঞানিক জগতে এক নতুন বার্ত্তার আবিষ্কার হলো—সাইরেডিক দোলন শুধু ভবিষ্যদ্বক্তা নয়,—এ অতীতকে পর্য্যন্ত জাগিয়ে দেয়। ফটো যে শুধু জীবনের নিৰ্জ্জীব প্রতিনিধি, এমন নয়; এর মাঝেও জীবনের অস্তিত্ব সংগুপ্ত আছে। শত শত বছরের আগের তোলা ফটোর মাঝেও সেই স্মৃতিবিলীন হতভাগ্যের জীবনের একটী স্বরূপ মূর্ত্তিমান হয়ে আছে।

এই প্রৌঢ় বৈজ্ঞানিকই উত্তরকালে X'ray, Radium প্রভৃতির আবিষ্কর্ত্তা মহাপণ্ডিত কেলেনবার্গ (Frederick Kallenberg) নামে জগতে অভিহিত হ'ন। জড় বৈজ্ঞানিক এতদিনে তাঁদের মাথা হেট কল্লেন।

কেলেনবার্গের এই আবিষ্কারের আগেও আংশিক ভাবে সাইডেরিক দোলনের অস্তিত্ব পৃথিবীতে ছিল। রোমক সম্রাট ভ্যালেন্সের (Emperor Valens A. D 364-378) সময় রোম নগরের কয়েকজন প্রসিদ্ধ নাগরিক রাজদ্রোহের অপরাধে ধৃত হন। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তাঁরা ভৌতিক ক্রিয়া দ্বারা রাজাকে হত্যা করতে সচেষ্ট। তাঁরা সুতায় বাঁধা একটা সোণার আংটী দোলনরূপে ব্যবহার করে বৃত্তাকারে অক্ষর খোদা একটা পাত্রের উপর ধরলেন,—দোলনটা ঘুরে ফিরে একটা অক্ষরের উপর দাঁড়াল এবং এই ক্রিয়া দ্বারা সম্রাট ভ্যালেন্সের পর কোন্ ব্যক্তি সিংহাসনে অধিরোহণ করবেন তা তাঁরা জান্‌তে পারলেন। অবশ্য এজন্য ঐ সমস্ত নাগরিকদের হত্যা করা হয়।

পৃথিবীর জীব জন্তু জড় সকলকেই প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—এক পুং-বাচক অপর স্ত্রীবাচক। প্রত্যেক জীবজন্তু কি জড় পদার্থ হতে এক রকম কিরণ (emanation) বহির্গত হয়। আমরা কোন-কোনটার অস্তিত্ব খোলা-চোখেই অনুভব করি—যেমন চুম্বকের আকর্ষণী-শক্তি, রেডিয়াম প্রভৃতি ধাতুর কিরণ-জ্যোতিঃ। এদের অধিকাংশের কিরণ আমরা এতদিন অস্বীকার করে আসছিলাম—সাইডেরিক দোলন আমাদের এতদিনকার ধারণাটাকে উল্টিয়ে দিচ্ছে। সব সময়েই সকল বস্তু কি সকল প্রাণী হতে এই কিরণ বহির্গত হচ্ছে। কাজেই এই সব বস্তু কি প্রাণীর নিকটস্থ কি নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্য সকল পাশ্বস্থ বস্তুর সমভাবাপন্ন হয়। কোন লোকের ব্যবহৃত জামার কি কোন স্ত্রীলোকের সেমিজের মাঝে ঐ বিশেষ লোক কি স্ত্রীলোকের বিশেষ কিরণ প্রচ্ছন্ন আছে। আলোক-রশ্মি যেমন একটা ইথার-মিডিয়ামের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করে—এই কিরণের যাতায়াতের জন্যও সেই রকম একটা ইথার-মিডিয়াম কল্পনা করা হয়েছে।

আপনি যদি ফটো তোলেন, আপনার ফটোর মাঝেও আপনার বিশেষ কিরণ থাকবে। ক্যামেরার eye piece ভেদ করে, এই কিরণ নেগেটিভের মধ্যে ঢুকবে—ধোয়া মোছা করলেও এই কিরণ আর নেগেটিভ ছেড়ে পালাবে না। আর এই নেগেটিভ থেকে হাজার ছাপ তুল্লেও প্রত্যেক ছাপে আপনার বিশেষ কিরণ থেকে যাবে। তবে বই কি খবরের কাগজে যে ফটো তোলা হয়, তা নেগেটিভের ছাপ নয় বলে, এ ফটোতে কোন কিরণ প্রবেশ করতে পারে না।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে, জড়পদার্থের মধ্যে সোণা, প্রভৃতি কয়েকটা ধাতু জল ইত্যাদি পুং এবং রূপা সীসা প্রভৃতি স্ত্রী-বাচক। সাইডেরিক দোলন পুং-বাচক পদার্থের উপর বৃত্তাকারে ও স্ত্রী-বাচক

পদার্থের উপর ডিম্বাকারে ঘোরে। এই সকল জ্যামিতিক বৃত্তের তারতম্যানুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর পদার্থ নিরূপিত হয়। স্থির, নিশ্চল জলের উপর দোলনটী পরিষ্কার বৃত্তাকারে ঘুরিতে থাকে—জলের ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে অনায়াসেই দোলনের কম্পন দেখা যাবে। নায়েগ্রার সেই চঞ্চল জলপ্রবাহের উপর, কিম্বা তার ফটোর উপর দোলনের কম্পন সেই উচ্ছ্বসিত বারিরাশির গতিক্রিয়ার পরিচায়ক। প্রাণীদের মধ্যে কার কি রকম স্বভাব, তা পর্য্যন্ত এই দোলন ধরিয়ে দিবে। শত-শত বছরের মৃত ব্যক্তির আদত স্বভাব এই দোলনের সাহায্যে পরীক্ষা করতে পারা যাবে। দোলন যদি সরল রেখা কি সরু ডিম্বাকারে পূব থেকে পশ্চিমে ঘোরে, তা হলে বুঝতে, হবে এ লোক পাপী, মিথ্যাবাদী কিম্বা ভয়ানক দুষ্ক্রিয়াসক্ত। এমন কি, আপনার ছেলে কি কোন আত্মীয় যদি মিছা করে আপনার কাছে টাকার জন্য চিঠি লেখে—সেই চিঠির উপর দোলনের কম্পন দেখে আপনি লেখকের মনোভাব বুঝতে পারবেন। অনেক সময় দেখা যায় যে, কোন পুং-বাচক দ্রব্য অধিক দিন স্ত্রী-বাচক কোন দ্রব্যের সন্নিহিত থাকলে স্ত্রীভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। কেলেনবার্গ তাঁর স্ত্রীর বিশ বছরের ব্যবহৃত একটা সোণার আংটীর উপর পরীক্ষা করে দেখ্‌তে পেলেন, সোণার আংটীটা স্ত্রীভাবাপন্ন হয়ে পড়েছে।

সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে যে, অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রতিক্রিয়ার মত সাইডেরিক দোলনের ব্যবহার খুব কঠিন নয়,—যে কেহ অনায়াসে যেথায় সেথায় এই পরীক্ষা করতে পারেন।

ইঞ্চি পনর লম্বা একগাছি সরু রেশমী সুতার মাথায় একটী সোণার আংটী বেঁধে তর্জ্জনীর মাথায় ঝুলাতে হবে;—কিরণগুলি না পালাতে পারে, এজন্য সুতার গিরেগুলি ছেঁটে দিতে হবে। মেরিডিয়ান লাইনের ওপর দক্ষিণমুখী দাঁড়িয়ে বা হাত হইতে পিছনের দিকে রেখে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মুষ্টিবদ্ধ করে শুধু তর্জ্জনী বাড়িয়ে দোলনটী পরীক্ষার জন্য আনীত দ্রব্যের উপর ধরতে হবে। সাধারণতঃ একখণ্ড অব্যবহৃত কাগজ কি সংবাদপত্রের উপর জিনিষটী রাখা হয়। আংটীটী এই জিনিষের এক ইঞ্চি কি দু ইঞ্চি উপরে ধরলে দু-এক মিনিট পরেই দোলনের সাড়া পাওয়া যায়। যদি কোন পুংবাচক দ্রব্যের কি কোন পুরুষের ব্যবহৃত দ্রব্য কি ফটোর উপর দোলনটী ধরা হয়, তবে কিছুক্ষণ পরেই ইহা বৃত্তাকারে দুলতে থাকে। এই বৃত্তের আকারের বৈষম্য হলে দ্রব্যের অধিকারীর স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কেলেন-বার্গ একজন আত্মহত্যাকারীর ফটোর উপর দোলনটী ধরে দেখতে পেলেন, দোলনের কম্পন ঠিক তার মনের বিকৃত অবস্থা জানিয়ে দিচ্ছে।

কাজেই দেখ্‌তে পাচ্ছি এই অজ্ঞাত সংগুপ্ত শক্তির আশ্চর্য্য ক্রিয়া বর্ত্তমান জগতে এক নূতন ভাবান্তর উপস্থিত করেছে—একটা অদ্ভুত শক্তি লোক-চক্ষুর অন্তরালে অজ্ঞাত থেকে বৃথা নষ্ট হচ্ছিল—আমরা সেই শক্তিকে ধরে ফেলেছি। আমার বিশ্বাস, এই দোলন সম্বন্ধে বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিক সার আর্থার কনন ডয়েলের নিম্নলিখিত মত উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

"The Sideric pendulum has been known to Spiritualists as a medium of communication. There was an account in the papers about a year ago of how a jewel was lost at a garden-party and how the daughter of the host by this method was able to indicate where it could be found. But these indications as to sex ect., are, so far as I know, new, and of very great interest. I tried it fourteen times, without a failure, upon photography in several cases concealing the photograph so that I did not myself know, until after the ring had given the circle or the ellipse what the sex was. It never failed. I find on testing other materials apart from sex that one gets a constant result e. g., gold and amber are circular or male, silver is oval, steel and bronzel are almost longitudinal. Photographs are on the whole, better than letters, and recent letters better than old ones, but the latter respond for a long time, I had a male circle from a letter of 1776............

......I agree that this bears strongly upon the Divining rod. Even more strongly does it bear upon psychometry when a person with sensitive perceptions takes, we will say, a lock of hair and derives from it much knowledge about the owner.......

One cannot, so far as I can see, claim the matter as bearing directly upon Spiritualism, but it strongly supports the existence of forces outside one present scientific knowledge. These seem to be of a very subtle personal and psychic nature, which brings them into the same class with those other forces of etherealized and refined matter forming the basis of the physical phenomena which inexperienced people have for so long derided and denied.

হোমিয়োপ্যাথিক ঔষধের কার্য্যকরীশক্তি পরীক্ষা

ডাক্তার শ্রীরাইমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

(Testing the potentiality of Homeo : Drugs)

প্রায় দেড়শত বর্ষ হোমিয়োপ্যাথির জন্মকাল হইলেও, বিগত পঞ্চাশ বৎসর এই নবচিকিৎসা-প্রণালীর নববল প্রায় সমস্ত পৃথিবী পরিব্যাপ্ত

শিল্পী—শ্রীযুক্ত অতুল বসু

শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরীর চিত্র-প্রদর্শনী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

সাথী

Comrades

BHARATVARSHA HALFTONE & PTG. WORKS.

হইয়া পড়িয়াছে; দিন দিন সহরাদি অতিক্রম পূর্ব্বক, সুদূর পল্লীগ্রামেও এই চিকিৎসার স্রোত প্রবল ভাবে প্রবাহিত হইতেছে;—এই সত্য স্রোতের প্রতিকূলে বাধা দিতে যাইলে ঐরাবতের মত হাবুডুবু খাইতে হইবে। কতিপয় সম্প্রদায় এই চিকিৎসার সুফল দেখিয়া, ইহার আশ্রয় গ্রহণ করেন; কিন্তু শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিগণ, যাঁহারা প্রতি কথায়, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা চাহেন, তাঁহাদের জন্যই বর্ত্তমান বিজ্ঞান এতদবিষয়ে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, আমরা এই প্রবন্ধে তাহারই সমালোচনা করিতেছি।

ক্ষুদ্রমাত্রা, ক্ষুদ্র বটিকা, উচ্চতম ক্রমাদির কথা শুনিলেই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার উপর একদল চিকিৎসক বা গৃহস্থ সন্দেহ করেন। কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, গ্যাংগ্রিণ (ক্ষত), বিসর্প, ডিপ্‌থিরীয়া প্রভৃতি বড় বড় রোগ, সাংঘাতিক রোগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বটিকায়, বা কয়েক মাত্রায়, আরোগ্য লাভ করিতে পারে, বা করিতেছে, একথা যেন কেমন বোধ হয়। লাল, নীল, কটু, তিক্ত, গাদা গাদা ঔষধ সেবন, বাহ্য প্রয়োগ, অধস্ত্বাচ প্রয়োগ (Injection) দ্বারা কিছুই হয় না, আর সূক্ষ্মমাত্রা সুমিষ্ট ক্ষুদ্র বটিকা সেবনে এতাদৃশ রোগ সহজে সারিবে? ইহা কি করিয়া সহজে বিশ্বাস হয়?

মহাত্মা ডাল্টনের জড়বাদের প্রবলতার দিনে, এরূপ সন্দেহ বা অবিশ্বাসের মন্তব্য সহনীয় ছিল; কিন্তু বিজ্ঞানের সমুন্নতির দিনে, এরূপ সন্দেহ সহজেই অপনোদিত হইবে, এইজন্যই হোমিওপ্যাথিক ঔষধের সূক্ষ্মমাত্রার কার্য্যকরী শক্তি বা শক্তিবিকাশবাদ Dynamization) সম্বন্ধে বিজ্ঞানের অনুমোদিত সমালোচনা করাই আমার অদ্যকার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সমুন্নত জার্ম্মাণবাসী মহাত্মা সামুয়েল হানিমান এই নব চিকিৎসার আবিষ্কর্ত্তা; সত্য চিরদিনই সত্য, এই আদি গুরু মহাত্মা হানিমানের পূর্ব্বেও, ভারতবর্ষে ঋষিমস্তিষ্কে এই সত্য সমুদ্ভাষিত হইয়াছিল। "বিষস্য বিষমৌষধম," "সমঃ সমং শময়তি" প্রভৃতি শ্লোকার্দ্ধ বলিয়া নহে, চরকাদি গ্রন্থে এইহেতু ও ব্যাধি সদৃশ চিকিৎসার কথা বিশেষ করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সদৃশ লক্ষণযুক্ত রোগে, সদৃশ লক্ষণ সমুৎপন্নকারী ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্যানয়ন (Similia Similibus curantor or Like cures Like) নূতন নহে। কিন্তু হানিমানের সূক্ষ্মমাত্রা, এক সময়ে একটী ঔষধ প্রয়োগ, সদৃশনিয়মে ঔষধ নির্ণয় এই তিনটী অভ্যুগম (Theories) অতীব সত্যময় (Three cardinal points of Homeopathy), এতন্মধ্যে ঔষধ প্রস্তুতির নূতন প্রণালীতে ঔষধের যে অপূর্ব্ব শক্তির সমুৎপত্তি হয়, ইহা নিশ্চয়ই আদিগুরু হানিমান আবিষ্কৃত মহাসত্য!

হোমিওপ্যাথির আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই এক সময়ে একটী ঔষধ প্রয়োগ, সূক্ষ্মমাত্রা প্রভৃতি দেখিয়া জার্ম্মানীর তদানীন্তন এপথিকারীরা (ঔষধ বিক্রেতাগণ) তাঁহার ব্যবস্থামত ঔষধ দিতে অসম্মত হইয়া রাজদ্বারে আশ্রয় লইলেন। এই সকল কারণে মহাত্মা হানিমানকে তখন নিজ হস্তে ঔষধাদি প্রস্তুত করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। কিন্তু এইরূপ অমঙ্গল হইতেই মহামঙ্গলের আবির্ভাব হইল! কেন না নিজহস্তে তিনি ঔষধ প্রস্তুত করিতে করিতে দেখিলেন, তাঁহার এই নব প্রণালীতে ঔষধপ্রস্তুতকালে ঔষধের মধ্যে একটী অপূর্ব্ব শক্তি উৎপত্তি হইতেছে। ঔষধের এই নবোত্থিত শক্তিস্বরূপ কি, এবং মহাশক্তির সহিত উহার কিরূপ সম্বন্ধ, পরে বিজ্ঞানজগৎ যে শক্তি লইয়া মোহিত হইয়াছেন, এক শত বৎসর পূর্ব্বে এই মনীষির মস্তিষ্কে তাহা সমুদিত হইয়াছিল!

জীবাণুতত্ত্ব (Bacteriology), রাসায়নিক পরিবর্ত্তন, পারদ সম্বন্ধে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার অতি সহজে তাঁহার মস্তিষ্কে যাহা স্থান পাইয়াছিল, বর্ত্তমান বিজ্ঞান সেই সকল বিষয় লইয়া মহা আন্দোলন করিয়া ধীরে ধীরে শেষ মীমাংসায় উপনীত হইতেছে।

দুগ্ধ শর্করা, সুরাসার, জল প্রভৃতি সহজাবস্থায় ভেষজবিহীন পদার্থের সহিত কোনও ঔষধদ্রব্য ক্রমাগত চূর্ণ ও বিচূর্ণিত করিতে করিতে, উহাতে যে এক প্রকার নূতন শক্তির স্ফুরণ হইয়া থাকে, ইহাকেই মহাত্মা হানিমান ডায়নামেজেশন বা শক্তিবিকাশবাদ (Dynamazation) আখ্যা দিয়াছেন।

ডায়নামিস্ শব্দে (Dynamis—Life priniciple—power, শক্তি বা influence বুঝায়) এই পরমাণুবাদ বা জড়ের শক্তিবাদ প্রাচ্যের মহাত্মা কণাদ হইতে প্রতীচির ডালটন্ পর্য্যন্ত সপ্রমাণিত করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে পরমাণুর পরমাণু বা "আয়ন" (Electron or Ions) আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই অণুকা ব্যাণুকাদি (Ions) বিচূর্ণিত হইলে (Percussed), উহাদের অন্তর্নিহিত যে এক অদ্ভুত শক্তির বিকাশ হইতেছে, যাহাকে বর্ত্তমান বিজ্ঞান—"Intra-atomic Energy" আখ্যা দিয়াছেন। সূর্য্যের তেজ, তাড়িৎ, প্রভৃতির উৎপত্তি বা সেই মহাশক্তিবাদ নিত্য পরিচয় প্রদান করিতেছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, কুরী-দম্পতি (R. Crurre) এই নূতন ইলেক্‌ট্রন বা র‍্যাডিয়ম (Radium) আবিষ্কার দ্বারা সমস্ত জড়জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছেন। এই মূল পদার্থেই ব্রহ্মাণ্ড রচিত। এই মূল পদার্থের আয়তন জ্যামিতির দৈর্ঘ্য-বিস্তারবিহীন মানসিকবিন্দুর সদৃশ! অঙ্কশাস্ত্রে উহার ডায়েমেটার (ব্যাস) স্থির হইয়াছে। উহা ১০০০০০ One hundredth thousand part of an atom. ইহার গতি (motion) এক সেকেণ্ড লক্ষ মাইল। ইহার আকারের অনুমান করিতে হইলে এইরূপে বুঝা সহজ যে,—একটী গৃহ, যাহার আয়তন ২০০ বর্গ ফিট, উচ্চতা ৩৫০ ফিট্ তাহাকে পরমাণু (atom) ধরিলে, ইলেক্‌ট্রনটী একটী ক্ষুদ্র পীনের মস্তকের বা কমার আকারের মত।

অধ্যাপক Milikan সপ্রমাণিত করিয়াছেন যে অদ্ভুত শক্তিময়ী আয়ন বা ইলেক্‌ট্রনময় হোমিওপ্যাথিক ঔষধে ক্রিয়াশীলতা বৃদ্ধি পাইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? ক্রমাগত বিচূর্ণনদ্বারা হোমিওপ্যাথিক ঔষধে Radio activity ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। মহাত্মা Abraham পরীক্ষা করিয়াছেন যে হোমিওপ্যাথিক ঔষধে (Polarity) বা মেরু প্রবণতা বৃদ্ধি পায় (As Measured by Bio-dynamic reaction of human reflexes)

ইলেকট্রন বা র‍্যাডিয়োএক্টিভিটি প্রভৃতির সূক্ষ্ম শক্তির পরিমাপকে যন্ত্রের নাম "Ohmmeter" বা Biodynameter। মহাত্মা Abrahm-পরীক্ষার দ্বারা এই সূক্ষ্ম শক্তিময় (হানিমানের বিচূর্ণ প্রণালীর) ঔষধে উহার অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। ইহাকে কেহ কেহ Reflexophone বলিয়াছেন। বিট্রেনে (In Britain) ইহাকে Emanometer নামে অভিহিত করিয়াছেন। নিম্নে যন্ত্রের প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল। ডায়নামাই জেশন দ্বারা ঔষধের পরমাণুর পরমাণু বা Electron বা (Ions) বিশ্লেষিত হয়। এইরূপ পরিণতিকে মহাত্মা কেণ্ট ultimatum or simple Substance বলিয়াছেন।
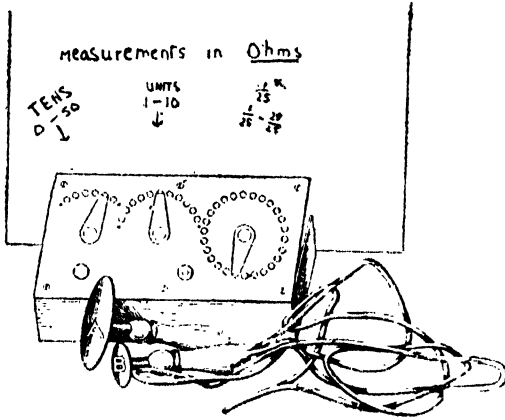
ইমানোমিটার

শক্তিকৃত ঔষধ তাড়িৎ প্রভায় প্রভান্বিত (Charged with Electricity) হয়। মহাত্মা Abraham এই মৌলিক শক্তির যেরূপ মীমাংসা বা পরীক্ষা করিয়াছেন, নিম্নে উহার আভাস প্রদত্ত হইল ;—

প্রযুক্ত ঔষধ (Employed Drug)………Radio-activity or potentiality.

টিঞ্চার একোনাইট…………১০ হইতে ২৫ (of an OHM)

টিঞ্চার বেলাড……………৮ হইতে ২৫ (of an OHM)

যখন একোনাইট ১০০ বার আলোড়িত করা হয়, তখন ৭৮ বার র‍্যাড়িয়ো একটিভিটী শক্তির বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু ৫০ বার আলোড়িত হইলে (percussed) ২৪ বার বৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যেক ইলেকট্রনে একটী বিশেষ শক্তি (od force) যাহাকে অধুনা ওজঃ শব্দে আখ্যায়িত করিয়াছেন। এই শক্তি পরীক্ষার জন্য ডাক্তার জেগারের (Dr. Jagers) "Neural apparatus"। এতদ্বারা স্নায়ুর উত্তেজনা, সচৈতন্যানুভূতির ব্যবধান, তরল দ্রব্যাদির পার্থক্য, তারল্যের পারস্পরিক সম্বন্ধ, ও পার্থক্য নির্ণীত হয়। অধ্যাপক জেগার হোমিওপ্যাথিক ঔষধের আঘ্রাণ পরীক্ষায় উহাদের পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারিয়াছেন। এল্‌কোহলে প্রস্তুত ৩য় শক্তি হইতে ৩০ শক্তির কি পার্থক্য, এবং ২০০ শক্তিতে কিরূপ ব্যত্যয় ঘটে, তাহা পরীক্ষা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। পরবর্ত্তী এই যন্ত্রের নাম মহাত্মা Hipp's chronscope রাখিয়াছেন। প্রথমে ইহা জ্যোতিষশাস্ত্র (কল্পিত জ্যোতিষ) জন্য আবিষ্কৃত হয়, ইহার দ্বারা একোনাইট ১৫০, থুজার ২০০ শক্তি এবং অরম ৫০০ শক্তি পরীক্ষিত হইয়াছে। ইহার পরে ডাং ফিঙ্ক (Dr. Fincke) পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, নিম্ন শক্তি সেবনে Nerve-time বাধা প্রাপ্ত হয় (Ratarded) এবং উচ্চতর শক্তিতে (২০০শ ইত্যাদি) দ্রুতত্ব বৃদ্ধি পায়। আঘ্রাণাদির দ্বারা এই সকল ফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

ম্যাডেম্ কুরী Radium Bromeide এর ৬০ শক্তির ঔষধ দ্বারা আলোকচিত্র (Photograph) কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

হানিমানের ক্রম প্রস্তুতির বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা ঔষধে যে Radio-activityর সম্যক্ বিকাশ হয় তাহাকে ইলেক্‌ট্রিক করেণ্ট (Electric current) বা ইলেক্‌ট্রনের অবিরাম স্রোত বা সঞ্চালন বলিয়া বর্ণনা করা যায়। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ একটী শাদা কাগজের মোড়ক (foldod) করিয়া ডায়ানামাইজারে রাখিলে (যে ভাবে রক্ত কণিকা পরীক্ষা করা যায়),—বোতলটী কর্ক সমেত বাহিরে থাকে; কয়েক সেকেণ্ড পরে, একটী প্রতিক্রিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়। ডায়ানামাজারে ঔষধ রাখিয়া নিম্নোদয় দিকে যথানিয়মে ধীরে ধীরে সংঘাত (percussion) করিতে হয়। ইলেক্‌ট্রীক প্রক্রিয়ায় যেমন তারটী যত ক্ষুদ্রতর হইবে, প্রতিরোধিকাশক্তি (Power of Resistence) ততো বৃদ্ধি পাইবে, সেইরূপ যত বেশী শক্তির ঔষধ হইবে, ততই তাহাতে শক্তির অধিক সমুৎপত্তি ঘটিবে (the more we potentise the remedy the more power of resistence or potentiality increases

ডাঃ রেকারের পরীক্ষা ফল :—

Drug	Vibratory rate	Potentiality
Vaccin 6	57·	9
Vaccinum	57·	210
1m		ইত্যাদি

Abram's (এবরামের শেষ মন্তব্য বা মীমাংসা) **conclusions** ;—মহাত্মা হানিমানের আবিষ্কৃত বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বনে ঔষধের ক্রম (attenuation or potency) প্রস্তুত হইলে, ঔষধের পরমাণুর পরমাণুর বা ইলেক্‌ট্রনের বিদ্যমানতা ঘটে বা ঔষধ ইলেক্‌ট্রনময় হয়, ইহার অসাধারণ ক্রিয়া বা শক্তির স্ফুরণেও শারীরিক প্রতিক্রিয়া আশু আনীত হয়—এতদর্থে এল কেহ দুগ্ধশর্করা প্রভৃতি ভেষজবিহীন পদার্থের নিজ নিজ ক্ষেত্র বা area আছে। পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে সুরাসার নিজ আসরে যে প্রতিক্রিয়া প্রদান করে উহার সংখ্যা তিন (৩) মাত্র। ডাং এনেজ (Enos) বলিয়াছেন,—যে সকল শক্তি ফলপ্রদ নহে, তাহাদিগকে ইলেক্‌ট্রন্ পরীক্ষা সমাধান করিলে, উহার প্রতিফলিত ক্রিয়া (Reflex action) প্রকাশ পায় না।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের নানা শক্তির এইরূপ পরীক্ষা করা অত্যাবশ্যক (Important task) কর্ত্তব্য ডাক্তার বয়েড (Dr Boyd of Glassgow) আবরামের যন্ত্রের ভাব লইয়া কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া হোমিওপ্যাথিক ঔষধের যেরূপ পরীক্ষা সাধন

করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ঔষধের উপযুক্ত শক্তি নির্ণয়ও সম্ভব হইবে। পরীক্ষতব্য ঔষধ বা পরীক্ষা সিদ্ধ ঔষধের পার্থক্য নির্ণীত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে। এতদ্‌সম্বন্ধে ডাঃ বেকারের বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

"বিগত এপ্রেল মাসে যখন আমি ডাঃ এবরামের চিকিৎসালয়ে (Abrams clinic) রোগী পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলাম, তখন ভ্রমক্রমে আমার পকেটে Syphilinum Imএর একটী পাউডার থাকে। তখন আমি উক্ত পাউডারটীকে ডাঃ আবরামের যন্ত্রে (Dynamizer) পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করাতে তিনি উহা পরীক্ষা করিয়া যে ফল পাইলেন, তাহা এইরূপ ;—জন্মজাত উপদংশিক দোষের প্রবল প্রতিক্রিয়া পাইলেন, স্বোপার্জ্জিত উপদংশ দোষের কিছুই পাইলেন না—(Obtained a strong reacton for congenital Lues but none for acquired ones), তৎপরে প্রত্যাবর্ত্তনকালে উক্ত যন্ত্রে উক্ত ঔষধের সমস্ত শক্তির পরীক্ষা করিয়া সেইরূপ ফল পাইলাম। কিন্তু ডাঃ বেরিক এণ্ড ট্যাফেলকেলিথিয়া সিফিলিনমের ত্রিংশ শক্তি হইতে সি, এম (From 30th to the C. M) পর্য্যন্ত সমস্ত আনাইয়া পরীক্ষা সমাধান করিলাম এবং শেষ মীমাংসায় উপনীত হইলাম যে,—

"The ohmage increasing with the potency i,e ohmage increases as the potency rises"—

এক্ষণে যদি সমস্ত ঔষধ এইরূপ যন্ত্র সাহায্য পরীক্ষা করিতে পারা যায়, তাহা হইলে কোনটীর কত শক্তি, কোনটী কৃত্রিম, কোন ঔষধের কোন শক্তিতে বেশ কাজ হইবার সম্ভাবনা সমস্তই জানিতে পারা সম্ভব, এতৎ সম্বন্ধে পরবর্ত্তী বহুদর্শন এবং ব্রিটিশ হোমিওপ্যাথগণের পরীক্ষার ফল পরে লিখিত হইবে।

"It certainly offers a positive means of determining, whether a potency is reliable or not"—

[*The Hom: Recorder, Dec. 1922.*]

বেশী দিনেরকথা নহে, বিজ্ঞানবীর স্বর্গীয় মহেন্দ্রলালসরকারের মৃত্যুর পরেই আবার মেডিকেল বোর্ডে হোমিওপ্যাথির বিরুদ্ধে একটী প্রস্তাব উত্থিত হয়, তখন স্বনামখ্যাত শ্রদ্ধেয় ফাদার লাঁফো (Rev. Father Lafont) প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিলেনবিজ্ঞান সম্মত সত্যাপূর্ণ হোমিয়োপ্যাথিই ভাবিষ্যৎ চিকিৎসাপ্রণালী রূপে পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমাদরে গৃহীত হইবে (Homœopathay......will be the future therapeutic)। ডাঃ বি, ভন্ বলিয়াছেন "বর্ত্তমান Jnjection প্রভৃতি দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে হোমিওপ্যাথি ও এলোপ্যাথি ক্রমশঃ পরস্পর সম্মিলিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে (Joining their hands)। সম্প্রতি মহাপ্রতিদ্বন্দী (Lancet) ল্যান্সেট্ পত্রিকা স্পষ্টতঃ হোমিওপ্যাথির সত্য স্বীকার করিয়া সাধারণ্যে উহা অবগত করিয়াছেন।

হোমিয়োপ্যাথির অনুকূলে আর একটী সুসমাচার,—ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ ডাক্তার উইর (Dr. Weir) এই বৎসর আমাদের রাজকুমারের গৃহচিকিৎসকপদে (ordinary personal physician) নিযুক্ত হইয়াছেন। দৈনন্দিন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে হোমিয়োপ্যাথিও সমুন্নত হইতেছে। যেহেতু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুমোদিত—"সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী।"

উপাসনা !

নিখিল জাতি সঙ্ঘ (League of Nations.) বৈঠক শেষ করে ভোজে ব'সেছেন। সভাপতি মহাশয় আহার আরম্ভ হবার আগে উঠে দাঁড়িয়ে ব'লছেন "বন্ধুগণ! মনুষ্যত্বের নামে আমি আজ আপনাদের অনুরোধ করছি যে, রুষিয়ার লক্ষ-লক্ষ দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অনাহারী ভ্রাতাদের ক্ষুধার জ্বালায় মৃত্যুর কথা স্মরণ ক'রে, ভোজনে বস্‌বার পূর্ব্বে আমরা মুহূর্ত্তকাল সকলে নীরবে দণ্ডায়মান হয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করি আসুন! (Simplicissimus, Munich)

নূতন দেবতা !

বর্ত্তমান রুষের হর্ত্তাকর্ত্তা লেনীন্‌কে বিদ্রূপ ক'রে এই চিত্রে তাঁকে বুদ্ধদেবের মত পদ্মাসনে বসানো হয়েছে। সমস্ত রুষ আজ তাঁর পদতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণত !

নূতন দেবতা পদানত রুষকে সম্বোধন করে ব'লছেন—"খবরদার, এ কথা ভুলিস্ নি নরাধমেরা, যে, 'সোভিয়েট' রাজ্যের সকল লোকই পরস্পরের ভাই!"

(—La Victoire, Paris)

ভারত-চিত্রচর্চ্চার নববিধানের "অন্তর-বাহির"

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি-আই-ই

ফাল্গুনের 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় ভারত-চিত্রচর্চ্চার নব-বিধানের "অন্তর বাহির" বাহির হইয়াছে। মূল বক্তব্য এই যে,—শিল্পী এবং শিল্প শিল্প-শাস্ত্রের অতীত; তাহাকে মানিয়া চলিতে বাধ্য নয়। এই বক্তব্যটুকু অল্প কথায় সুব্যক্ত হইতে পারিত; কিন্তু তাহাতে অন্তর বাহির হইত না।

শিল্প-শাস্ত্র না মানিলে, তাহার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না। কারণ, শিল্পের সঙ্গে শিল্প-শাস্ত্রের সম্বন্ধ কাহারও মানা-না-মানার উপর নির্ভর করে না। সংগীত-শাস্ত্র না মানিলেও, সঙ্গীত শব্দায়মান হইতে পারে;—ব্যাকরণ না মানিলেও, রচনা অবলীলাক্রমে ছুটিয়া চলিতে পারে;—শিল্পশাস্ত্র না মানিলেও, শিল্পচর্চ্চা রচনা-বিকাশ করিতে পারে। কিন্তু তাহা সুধীসমাজে মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে না। লোকে যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া মনের ভাবের ভাষণ করে, তাহার নাম ভাষা। তাহা সরব-নীরব-ভেদে দ্বিবিধ। শিল্প এক শ্রেণীর নীরব ভাষা। ভাষা মাত্রেই ব্যাকরণের সাহায্যে "ব্যাকার" লাভ করে। শিল্পের ব্যাকরণ শিল্প-শাস্ত্র। তাহার অবস্থাও সেইরূপ। আগে ভাষা, তাহার পরে ব্যাকরণ;—আগে শিল্প, তাহার পরে শিল্প-শাস্ত্র। ভাষার সঙ্গে ব্যাকরণের সম্বন্ধের ন্যায় শিল্পের সঙ্গে শিল্প-শাস্ত্রের সম্বন্ধ অভেদ্য। একটিকে ছাড়িয়া অন্যটিকে গ্রহণ করা চলে না। কারণ, ভাষা যাহার ভাব-সূত্র, ব্যাকরণ তাহারই ভাষ্যগ্রন্থ;—শিল্প যাহার সৌন্দর্য্য-সূত্র, শিল্প-শাস্ত্র তাহারই ভাষ্য-বিকাশ। তাহার উদ্দেশ্য ব্যাকার,—বিশ্লেষ,—বিবৃতি-ব্যবস্থা। এই কারণে, ইংরাজী গ্রামার এবং আমাদের ব্যাকরণ এক শাস্ত্র নয়;—ইংরাজী ক্যানন এবং আমাদের শিল্প-শাস্ত্রও এক শাস্ত্র নয়। উপযুক্ত প্রতিশব্দের অভাবে, আমরা ব্যাকরণকে গ্রামার বলিতেছি, শিল্প-শাস্ত্রকে ক্যানন বলিতেছি। তাহাতে আমাদের ব্যাকরণের বা শিল্প-শাস্ত্রের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয় না। আমাদের শিল্প-শাস্ত্রকে শিল্প হইতে পৃথক্ করিয়া দর্শন করিবার উপায় নাই;—তাহাকে অমান্য করিবার উপায় নাই;—উপহাস করিবারও উপায় নাই। করিলে, পদে পদে উপহাসাস্পদ হইতে হয়।

ভারত-শিল্পের সকল নিদর্শন বর্ত্তমান থাকিলে, নিদর্শন ধরিয়াই তাহার ভাষা বুঝিয়া লওয়া যাইতে পারিত;—প্রয়োজন বোধ করিলে, তাহার ব্যাকরণও সঙ্কলন করিয়া লওয়া চলিত। সে পথ লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া, ব্যাকরণকে উপেক্ষা করিয়া, প্রাচীন ভাষার মর্ম্মবোধ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং শিল্প-শাস্ত্রকে মানিতে হইবে;—মানিবার জন্য জানিতে হইবে;—জানিবার জন্য বুঝিতে হইবে;—বুঝিবার জন্য অধ্যয়নশীল হইতে হইবে।

উপহাস যত সহজ, বুঝিবার চেষ্টা অর্থাৎ অধ্যয়ন তত সহজ নয়। কল্পনা অনেক অঘটন ঘটাইতে পারে, অনেক কলা-লালিত্য বিস্তার করিতে পারে,—বিদ্যমানকে ঢাকিয়া ফেলিয়া, তাহার উপর অবিদ্যমানের আবরণ টানিয়া দিতে পারে। কিন্তু কল্পনার দৌড়ের সীমা আছে;—তাহা অধ্যয়নের অভাব পূরণ করিতে পারে না। সেখানে কল্পনার প্রবেশ নিষেধ।

ভারত-শিল্পশাস্ত্রে "সাদৃশ্যই" শিল্প; "দৃশ্য" শিল্প নহে। ফটোগ্রাফ "দৃশ্য", তাহা "সাদৃশ্য" হইতে পৃথক্। তাহা সৃষ্টি নহে; অনু-কৃতি। অনু-কৃতি এবং প্রতি-কৃতি এই দুইটি শব্দ দুইটি পৃথক উপসর্গ-যোগে একই ধাতু হইতে দুইটি পৃথক্ অর্থ দ্যোতিত করে। যথা,—

ইবে প্রতিকৃতৌ ॥

এই সূত্রে (৫।৩।৯৬) পাণিনী তাহার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এই সূত্রোক্ত "ইব" আমাদের শিল্পের সর্ব্বস্ব। ইহাকে বাদ দিলে, আমাদের শিল্প উড়িয়া যায়। ইহারই অন্য নাম "সাদৃশ্য"। অনু-যোগে "দৃশ্য";—প্রতি-যোগে "সাদৃশ্য";—একটা নকল, আর একটা সৃষ্টি। এই পার্থক্য অতি পুরাকালেই অনুভূত, স্বীকৃত, ও ব্যাখ্যাত হইয়া, আমাদের শিল্প-শাস্ত্রকে বিজ্ঞানের মর্য্যাদা দান করিয়াছিল। এইটুকু বুঝিলে অনর্থ উৎপন্ন হয় না;—না

বুঝিলে, পদে পদে অনর্থ। 'অন্তর বাহির' যে আমাদের শিল্প-শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে নাই, তাহা বুঝিবার জন্য এই পুরাতন পাণিনী-সূত্রের একটু আলোচনা আবশ্যক। ইহার কাশিকা-বৃত্তি এইরূপ ;—

"ইবার্থে সৎ প্রাতিপদিকং বর্ত্ততে, তস্মাৎ কন্-প্রত্যয়ো ভবতি। ইবার্থঃ সাদৃশ্যং। তস্য বিশেষণং প্রতিকৃতি-গ্রহণং। প্রতিকৃতিঃ প্রতিরূপকং প্রতিচ্ছন্দকম্। অশ্ব ইবায়ং অশ্ব প্রতিকৃতিঃ। অশ্বকঃ। উষ্ট্রকঃ। গর্দ্দভকঃ। প্রতিকৃতাবিতি কিং? গৌরিব গবয়ঃ।"

ইহার অর্থ এই যে,—যে শব্দে ইবার্থ দ্যোতিত হয়, তাহাতেই কন্-প্রত্যয় হয়। ইবার্থের অর্থ কি? সাদৃশ্য। তাহারই বিশেষণ প্রতি-কৃতি শব্দ। প্রতিকৃতির আরও প্রতিশব্দ আছে। যথা,—প্রতিরূপক, প্রতিচ্ছন্দক। ইহাতে অশ্বের সাদৃশ্য আছে, এইরূপ লক্ষণযুক্ত বস্তুর নাম অশ্বক। তাহা অশ্ব নহে, অশ্ব-প্রতিকৃতি। এইরূপ অর্থে অশ্বক, উষ্ট্রক, গর্দ্দভক শব্দ ব্যবহৃত হয়। এ সকল স্থলে প্রতিকৃতি বুঝায়। তাহা না বুঝাইয়া, ইব-শব্দে যদি তুল্যতামাত্র দ্যোদিত,করে, তবে গরুর তুল্য এই অর্থে "গবয়" হইবে, কন্-প্রত্যয় হইবে না। এই বৃত্তি স্পষ্টই বুঝাইয়া গিয়াছে,—নানা অর্থে ইব-শব্দ ব্যবহৃত হয়, একটি অর্থ সাদৃশ্য; প্রতিকৃতি-শব্দ তাহারই বিশেষণ। যেখানে সেই অর্থ বুঝায়, সেখানে কন্ প্রত্যয় হয়। তাহার ফলে অশ্বের প্রতিকৃতি অশ্বক-নাম প্রাপ্ত হয়। তাহা অশ্ব নহে, অশ্বের আকারের অনুকৃতি নহে, তাহা শিল্প-সৃষ্ট সাদৃশ্য অর্থাৎ প্রতি-কৃতি। সাদৃশ্য-বিজ্ঞাপক এই ইব-শব্দকে ছাড়িবার উপায় নাই; ইহাকে ছাড়িলে, আমাদের শিল্পের নাড়ি ছাড়িয়া যায়। কিন্তু অন্তর বাহির এই "ইবকে" ছাড়িয়া দিবারই উপদেশ দান করিয়াছে! উদাহরণ-প্রত্যুদাহরণ তুল্যতার এবং সাদৃশ্যের পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছে, তুল্যতা শিল্প নহে, সাদৃশ্যই শিল্প। "সাদৃশ্য" ইংরাজী 'সিমিলিটিউড' নহে,—তাহা ইবার্থঃ।

"সশ্বাসমিব যচ্চিত্রং তচ্চিত্রং শুভলক্ষণম্।"

এই কারিকাংশের ব্যাখ্যায় অন্তর বাহিরে এক অট্টহাস্য ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। একটা বিলাতী নজীর উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে,—to make a thing which is obviously stone wood or glass speak, is a greater triumph than to produce wax-works or peep-shows. ইহার সহিত কাহারও বিরোধ নাই। কিন্তু ইহার উপর নির্ভর করিয়া বলা হইয়াছে,—"শিল্পের প্রাণ হচ্চে কল্পনা; অবিদ্যমানের নিশ্বাস। চৌরঙ্গীর মার্কেটে যে মোমের পুতুলগুলো বিক্রি হচ্চে তারা একেবারে "সশ্বাস ইব"—চোখ নাড়ে, ঘাড় ফেরায়, হাসে কাঁদে, পাপা মামা বলেও ডাকে। কিন্তু ইব পর্য্যন্তই তার দৌড়। কোন শিল্পী যদি শিল্প-শাস্ত্র লিখতে চায়, তবে এই ইব-কথাটি তার চিত্রশব্দকল্পদ্রুম থেকে বাদ দিয়ে, তাকে লিখতে হবে—সশ্বাস মিব নয়, "সশ্বাসং যচ্চিত্রং তচ্চিত্রম্।"

"ইব" কথাটা বাদ দিয়া শিল্প-শাস্ত্র রচনা করিলে, চৌরঙ্গীর মোমের পুতুলগুলিকে শিল্প বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। "ইব" আছে বলিয়াই, তাহারা শিল্প নয়। কারণ, তাহারা "সশ্বাস ইব" নয়,—পুরাপুরী "সশ্বাস।" চিত্র কখন "সশ্বাস" হইতে পারে না; তাহা প্রাণি-ধর্ম্ম; অপ্রাণীতে অনভিব্যক্ত। সুতরাং চিত্র "সশ্বাস" হইতেই পারে না; চিত্র হইতে পারে—"সশ্বাস ইব।" চিত্র শ্বাসের আভাস দিতে পারে, শ্বাস দিতে পারে না। সুতরাং "কোন শিল্পী যদি শিল্প-শাস্ত্র লিখতে চায়, তবে এই ইব-কথাটা তার চিত্রশব্দকল্পদ্রুম থেকে বাদ দেওয়া" চলিতে পারে না। "সশ্বাসং যচ্চিত্রং তচ্চিত্রং"—ইহা নববিধানের অন্তর বাহিরের নূতন কথা। ভারত-শিল্পশাস্ত্রের কথা—"সশ্বাসং ইব"। নববিধানী নমুনায় ইহা কতদূর পরিস্ফুট হইতেছে, তাহার সন্ধান লইতে হইলে, অধিকাংশ স্থলে, দর্শকগণকেই "সশ্বাস" হইয়া পড়িতে হয়,—সেখানে "ইব" নাই, একেবারে "সশ্বাস";—তাহার সঙ্গে ঋতুবিশেষে কিঞ্চিৎ গলদ্‌ঘর্ম্ম!

জ্ঞান-মার্গ স্বভাবতই বড় পিচ্ছিল। একবার পদস্খলন ঘটিলে, ক্রমে অধিক মাত্রায় কর্দ্দমলিপ্ত হইতে হয়। কল্পনা সে বিড়ম্বনা হইতে রক্ষা করিতে পারে না। "বর্ণ-সঙ্কর"—কথার ব্যাখ্যায় অন্তর বাহিরে সেই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। শিল্প-শাস্ত্রে "বর্ণ-সঙ্করতা" একটি চিত্রদোষ বলিয়া উল্লিখিত। তাহার প্রকৃত মর্ম্মবোধের অভাবে, শিল্পশাস্ত্রকে অগ্রাহ্য করিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। বলা হইয়াছে,—"বর্ণসঙ্কর না হলে মেঘলা আকাশ সূর্য্যোদয় এমন কি কোন কিছুই আঁকা চলে না। অমিশ্র বর্ণ সে এক ছবি

দেয়, মিশ্রবর্ণ সে অন্য ছবি দেয়।" এইটুকু পড়িলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়,—এখানে বর্ণসঙ্কর-শব্দটি বর্ণ-মিশ্রণ অর্থেই গৃহীত হইয়াছে, এবং তাহার জন্যই শিল্প-শাস্ত্র নাস্তানাবুদ হইয়াছে। ইহার উপর টিপ্পনী চড়িয়াছে,—"এটা একটা লোকের মত; মন্ত্রের মতো খুব সাচ্চা জিনিস নয়।" ব্যাখ্যা যথাযোগ্য হইলে, সিদ্ধান্ত ঠিক হইত। কিন্তু আমাদের শিল্প-শাস্ত্র যে যুগযুগান্তের শিল্পাচার্য্যদিগের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া এতকাল ধরিয়া এত বড় একটা "অ-সাচ্চা জিনিস" চালাইয়া আসিয়া, বর্ত্তমান সালে কলিকাতার গলির মধ্যে ধরা পড়িয়া গিয়াছে,—ইহা একটু বিস্ময়ের ব্যাপার বলিয়াই বোধ হয়। যে শিল্প-শাস্ত্র একস্থানে বর্ণমিশ্রণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছে, সেই শিল্প-শাস্ত্রই যে অন্যত্র তাহার নিন্দা করিবে, এরূপ অব্যবস্থিতচিত্ততায় আস্থা স্থাপন না করিয়া সঙ্কর-শব্দের তাৎপর্য্য-বোধের জন্য চেষ্টা করিলে, এরূপ অনর্থ উৎপন্ন হইত না। সঙ্কর শব্দ সর্ব্বত্র মিশ্রণ-অর্থ দ্যোতিত করে না, জাতি-প্রসঙ্গেই মিশ্রণ-অর্থ দ্যোতিত করিয়া থাকে। এখানে বর্ণ-অর্থে যেমন জাতি বুঝিতে হইবে না, রঙ্গ বুঝিতে হইবে,—সঙ্কর-অর্থেও সেইরূপ মিশ্রণ বুঝিতে হইবে না, অ-যথাবিন্যাস বুঝিতে হইবে। * যেখানে যে রঙ্গের ব্যবহার যথাযোগ্য,—অমিশ্র রঙ্গ হউক বা মিশ্র রঙ্গ হউক,—সেখানে তাহার ব্যবহার না করিয়া, অন্যথাচরণ করিলে, অ-যথাবিন্যাস হয়,—তাহা যে একটি চিত্রদোষ, তাহা "একটা লোকের মত" নয়, বিজ্ঞানের সর্ব্ববাদিসম্মত সার সিদ্ধান্ত। তাহা "মন্ত্রের মতো সাচ্চা।" যাহাতে এই দোষ চিত্রকে দোষদুষ্ট করিতে না পারে, তজ্জন্য কোথায় কিরূপ রঙ্গের ব্যবহার যথাযোগ্য, শিল্পশাস্ত্রে তাহার নানা উদাহরণ উল্লিখিত হইয়াছে। একালের শিল্পাচার্য্যের কথা যাহাই হউক, সেকালের শিল্পাচার্য্যদিগের এবিষয়ে অজ্ঞতা ছিল না। তাঁহারা এই কারিকা শিখিতেন এবং শিখাইতেন;—বংশের পর বংশ সযত্নে নকল করিয়া রাখিতেন,—তজ্জন্যই এতকাল পরেও আমরা ইহার সন্ধান লাভ করিতেছি। মূল কারিকাটি এই,—

দৌর্ব্বল্যং স্থূলরেখত্ব মবিভক্তত্ব মেব চ।
বর্ণনাং সঙ্কর শ্চাত্র চিত্রদোষাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

ইহাঁর সকল কথাই "মন্ত্রের মতো সাচ্চা",—বুঝিবার ত্রুটিতে সকল কথাই উপহাস লাভ করিয়াছে। অথচ আর একটি কারিকা উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে,—"এইবার শিল্পের একটা মন্ত্র দেখ,—পরিষ্কার সত্য কথা।" ভাষাটা যাদুকরের ভাষার মত হইলেও, ভেল্‌কী লাগ্ লাগ্ করিয়াও, লাগিতে পারিতেছে না। কারিকাটি এই,—

রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্য-যোজনম্।
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্॥

এই কারিকা-মন্ত্রে যেগুলিকে "গুণ" বলা হইয়াছে, প্রথমোক্ত কারিকায় তাহারই অন্যথাচরণকে "দোষ" বলা হইয়াছে। রূপভেদ চাই; তাহার অন্যথাচরণ ঘটিলে, অ-বিভক্ততা ঘটিয়া থাকে। রূপভেদ যেমন চিত্রগুণ, অ-বিভক্ততা (অ-রূপভেদ) সেইরূপ চিত্রদোষ। এইরূপে এই দুইটি কারিকা এক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তই ভিন্ন ভাবে সংস্থাপিত করিয়াছে। একটিকে প্রশংসা করিয়া, "এইবার শিল্পের একটা মন্ত্র দেখ" বলিয়া ডাক হাঁক ছাড়িলে অন্যটির সম্বন্ধেও সেই একই কথা বলিতে হয়, নিন্দা করিবার উপায় থাকে না। এরূপ ক্ষেত্রে উপহাসের অশোভন দশন-বিকাশ অদৃষ্টের নিদারুণ পরিহাস!

"চিত্রে সাদৃশ্য করণং প্রধানং পরিকীর্ত্তিতম্।"

ইহা "একটা লোকের মত" নয়;—এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মতের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ষড়ঙ্গক চিত্রের ইহা একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। যে কারিকাকে মন্ত্র বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহাতেও ইহার উল্লেখ আছে। এই "সাদৃশ্য" যে ইব-শব্দের প্রতিশব্দ মাত্র, কারিকাকার তাহার ব্যাখ্যা করিয়া, সকল সংশয় নিরস্ত করিয়া গিয়াছেন। সাদৃশ্য-করণ কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইবার জন্য শিল্প-শাস্ত্র সমগ্র চিত্র-বস্তুকে দৃষ্টাদৃষ্ট দুইটি পৃথক্ ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছে। দৃষ্ট হউক, আর অদৃষ্ট হউক, উভয়ের পক্ষেই সাদৃশ্য-করণ তুল্য ভাবে

---

* সঙ্করোঽস্থানবস্থিতিঃ—সঙ্কর-শব্দ অনবস্থিতি বুঝায়। যেখানে যাহার অবস্থিতি অসম্ভব, সেখানে তাহার অবস্থিতি কল্পনাকে সঙ্কর বলে। আকাশে মূর্ত্তত্ব নাই; তাহাতে মূর্ত্তত্ব-কল্পনা অনবস্থিতি। সিদ্ধান্তমুক্তাবলীকার ইহা বিশদভাবে বুঝাইয়া গিয়াছেন। সঙ্কর-শব্দ দেখিলেই সর্ব্বত্র মিশ্রণ-অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে না।

অপরিহার্য্য। সে সকল চিত্র-বস্তু বাস্তবজগতে বর্ত্তমান অপিচ সুপরিচিত, তাহার নাম "দৃষ্ট"। যাহা সর্ব্বথা কাল্পনিক অথবা বাস্তব-জগতে বর্ত্তমান থাকিলেও অ-পরিচিত, তাহার নাম "অ-দৃষ্ট"। মনুষ্য, গো, অশ্ব, "দৃষ্ট";—দেবতা কল্পলতা সিংহ "অ-দৃষ্ট"। এই উভয় শ্রেণীর চিত্র-বস্তুই কোন না কোন স্থায়িভাবের আধার-রূপে দৃষ্ট অথবা কল্পিত। তাহাই ইহাদিগের "দৃশ্য।" তাহার সহিত ইব-সংযোগের নাম "সাদৃশ্য"। তজ্জন্য ভারত-চিত্র আকারানুকরণ নহে,—সৃষ্টি। সে সৃষ্টি স্বেচ্ছাচার নহে, তাহা সুসংযত সাদৃশ্যপ্রকটন-পদ্ধতি। বস্তু-কল্পনায় স্বাধীনতা আছে; কোন্ বস্তু কিরূপ ভাব দ্যোতিত করিবে, তাহাতেও স্বাধীনতা আছে;—কিন্তু সাদৃশ্যপ্রকটন-পদ্ধতি বিধি-নিষেধে সুসংযত। সকল দেশের সকল যুগের সকল মানবের মধ্যে একটি একত্ব আছে, তাহা মানবত্ব। সকল শিল্পের মধ্যেও একত্ব আছে, তাহা শিল্পত্ব। কিন্তু বিকাশ-ব্যবস্থার পার্থক্যে এক দেশের সহিত অন্য দেশের, এক যুগের সহিত অন্য যুগের, শিল্পের পার্থক্যের জন্য মানব-শিল্প বিভিন্ন নামে কথিত হইয়া আসিতেছে। ভারত-শিল্প এই কারণে একটি বিশিষ্টতার আধার। নববিধান সেই বিশিষ্টতার অনুসরণ করিতে অসম্মত। নববিধান কেবল বস্তু-কল্পনার ও ভাব-দ্যোতনার স্বাধীনতা লইয়াই পরিতৃপ্ত থাকিতে চাহে না,—বিকাশ-ব্যবস্থাকেও স্বাধীনতা দান করিবার জন্য লালায়িত। তাহা অবশ্যই এক শ্রেণীর চিত্র-চর্চ্চা; কিন্তু ভারত-চিত্র চর্চ্চা হইতে পৃথক্। সুতরাং সে পুরাতন নামে পরিচিত হইবার পক্ষে নববিধানের ন্যায়-সঙ্গত অধিকার দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার জন্য নূতন নাম আবশ্যক। সেরূপ নামকরণ করিতে হইলে, বলিতে হয়,—তাহার যথাযোগ্য নাম—ইঙ্গবঙ্গ-অঙ্গরঙ্গ।

ইহা বিচার-বিমুখ হইতে বাধ্য। তজ্জন্য অধিক সমালোচনা ইহাকে অধিক অসহিষ্ণু করিয়া তুলিবে। ইহা প্রকারান্তরে সমালোচনার অতীত বলিয়া ঘোষণা প্রচার করিতে লালায়িত। যে চিত্রকর নহে, সে চিত্র-সমালোচনার অনধিকারী,—এই কথা আকারে ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিয়া, ইহা আপনাকে আপন গণ্ডীর স্তুতি-স্তুতির মধ্যে ঢাকিয়া রাখিতে যত্নশীল। সেকালে দুই শ্রেণীর চিত্র-সমালোচক ছিল। এক শ্রেণী আচার্য্য-নামে, আর এক শ্রেণী বিচক্ষণ-নামে কথিত হইত। আচার্য্যগণ শিল্পী ও শিল্প-শিক্ষক;—বিচক্ষণগণ বিশেষ-দর্শন-পটু সমঝদার। সুতরাং অশিল্পী সমালোচকগণকে মৃদঙ্গের খোলের সঙ্গে তুলনা করিয়া, উপহাস করিলে, অন্তরটাই বাহির হইয়া পড়ে। কবি ভিন্ন অ-কবির পক্ষে কাব্য-সমালোচনার অধিকার থাকে না; এবং এই নজীর ধরিয়া, বিশ্ব-সাহিত্যের ভাল ভাল কাব্য-সমালোচনাকে অনধিকার-চর্চ্চা বলিয়া উপহাস করিতে হয়। সামঞ্জস্যই সকল রচনার অন্তরাত্মা। দেশকালপাত্রের সহিত তাহার অভেদ্য সম্বন্ধ। দেশকালপাত্র ছাড়িয়া, কেবল রচনা ধরিয়া, সকল ব্যঞ্জনা, সকল অভিব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। কিন্তু অধ্যাপক হাভেল বলেন,—It has been always my first endeavour in the interpretation of Indian ideals, to obtain a direct insight into the artists' meaning, without relying on modern Archaeological conclusions, and without searching for the clue which may be found in Indian literature. এই অহমিকাপূর্ণ অধ্যয়ন-বিমুখতা যে মূল মন্ত্র প্রচারিত করিয়াছে, তাহার প্রভাবে নব-বিধান শিল্প-শাস্ত্রের আলোচনা অনাবশ্যক বলিয়াই স্থির করিয়াছে। তাহার পক্ষে ইহা অনাবশ্যক হইলেও, ইহার প্রয়োজন তিরোহিত হয় নাই। আর একদল শিল্প-সাধক নবাবতারণা-কণ্ডূয়ন পরিহার করিয়া, পুরাতন শিল্প-ধারাকে প্রবাহিত রাখিবার উদ্দেশ্যে, আশার দীপালোক-হস্তে পথের সন্ধানে বাহির হইয়াছেন। ইঁহারা নামগোত্রহীন নীরব সাধক, মৃদঙ্গের খোল বলিয়া উপহসিত হইবার অযোগ্য। ইঁহাদের জন্য ভারত-শিল্প-শাস্ত্রের আলোচনার প্রয়োজন আছে।

দেশের সর্ব্বসাধারণের জন্যও আলোচনার প্রয়োজন আছে। যে সকল পাশ্চাত্য বিধি-ব্যবস্থা টিকিতে না পারিয়া, বিলীন হইয়া গিয়াছিল, তাহাদের ধ্বংসাবশেষের উপর আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কার মস্তকোত্তোলন করিয়া, এখন আবার ভূমিচুম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। ভারতবর্ষ পুরাতনকে সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই; কিন্তু তাহারও পরিবর্ত্তনের যুগ-সন্ধিকাল উপস্থিত হইয়াছে। তাহার প্রভাবে আমাদের মধ্যে অনেক বিষয়ে ইঙ্গবঙ্গ-

অঙ্গরঙ্গ প্রবেশ লাভ করিয়াছে; নববিধানী শিল্প তাহারই বাহ্য-বিকাশ মাত্র। যে শক্তি পুরাকালে ভারতবর্ষকে সমগ্র প্রাচ্য-ভূমণ্ডলে ভাবের মাতৃভূমি বলিয়া মর্য্যাদা দান করিয়াছিল, তাহার মধ্যে শিল্প একটি উল্লেখযোগ্য শক্তি। শিল্পের এই অন্তর্নিহিত মহাশক্তি ভাবিষ্যতেও লোকের ধ্যান-ধারণার গতিনির্দ্দেশের সহায়তা সাধন করিবে। সুতরাং কেবল অতীতের জন্য নহে, ভবিষ্যতের জন্যও অতীতের আলোচনা আবশ্যক। এক শ্রেণীর বিলাতী শিল্প-গ্রন্থ শিল্পকে স্বেচ্ছাচারের মুক্তক্ষেত্রে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছে; নববিধানের অন্তর বাহিরে তাহার কথাই প্রতিধ্বনিত। বিলাতী-বিধান তাহার অকৌলিন্যে অকুণ্ঠিত থাকিয়া, আপন অভিনবত্বের পরিচয় দান করিতেছে;—আমাদের নববিধান, সে পথ অবলম্বন না করিয়া, আপনাকে ভারত-শিল্প নামে পরিচিত রাখিবার জন্যই আড়ম্বর প্রকাশ করিতেছে। তজ্জন্য ইহা না ইঙ্গ, না বঙ্গ,—সুতরাং ইঙ্গ-বঙ্গ। ইহা আমাদের শিল্প-শাস্ত্রের বাঁধন ছিঁড়িয়া ছুটিয়া বাহির হইয়াছে; তাহার পক্ষ-সমর্থনের জন্যই বলিতে চাহিতেছে,—আমাদের শিল্প-শাস্ত্র নানা মুনির নানা মত; সত্য-মিথ্যার আধার; শিল্প এবং শিল্পী তাহার অতীত; তাহাকে মানিয়া চলিতে বাধ্য নয়।

অবাধ্যের কথা স্বতন্ত্র। তাহার সম্বন্ধে শাস্ত্র অনাবশ্যক। সকল শাস্ত্র-শাসন উল্লঙ্ঘন করিয়া, এক শ্রেণীর বাঙ্গালা রচনা অবলীলাক্রমে ছুটিয়া চলিতেছে; শিল্প সেরূপ উচ্ছৃঙ্খল রচনা-বিকাশ করিবে না কেন? তাহাকে কেহ বাধা দিতে চাহে না; কিন্তু তাহাকে সুধীসম্মত বিশুদ্ধ রচনা বলিয়া সকলে স্বীকার করিতে পারিতেছে না। যখন পারিবে, তখন একাকার,—তখন সমস্তই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া, উচ্ছৃঙ্খলতাকেই রীতি বলিয়া মর্য্যাদা দান করিবে। কিন্তু তখনও পুরাতন রচনাগুলি ভাসিয়া যাইবে না। তাহার মর্ম্মবোধের জন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন থাকিয়া যাইবে। ব্যাকরণের সাহায্য না লইয়াও জীবিত ভাষা শিক্ষা করা যায়; মৃত ভাষার পক্ষে ব্যাকরণ অপরিহার্য্য। ভারত-শিল্প যদি তাহার বিশিষ্টতা হারাইয়া, নববিধানী শিল্পে পর্য্যবসিত হয়, তখনও খাঁটি ভারত-শিল্পের নিদর্শন সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত হইবে না; এবং তাহাকে বুঝিবার জন্য তাহার ব্যাকরণের অর্থাৎ শিল্প-শাস্ত্রের প্রয়োজন থাকিয়া যাইবে। এই সকল কারণে, ভারত-শিল্প-শাস্ত্রের আলোচনার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

নববিধানের অন্তর বাহির উপহাস-পরায়ণতার পরিচয় দিবার সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ অনুকম্পা-পরায়ণতার প্রক্ষেপ দিয়া লিখিয়াছে,—"শিল্প-শাস্ত্র খাঁটিতেই যদি হয়, তবে গোড়াতেই আমাদের দুটো বিষয়ে সজাগ থাক্‌তে হবে,—কোন্‌টা মত, কোন্‌টা মন্ত্র, এ দুয়ের সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণাটি নিয়ে কাজ কর্ত্তে হবে। মত জিনিসটা একজনের, দশজনে সেটা মান্‌তে পারে, নাও মান্‌তে পারে; একের কাছে যেটা ঠিক, অন্যের কাছে সেটা ভুল, নানা মুনির নানা মত। মন্ত্রগুলি সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস।" অন্তর বাহির এ বিষয়ে বিলক্ষণ "সজাগ" থাকিয়া, মতের এবং মন্ত্রের পার্থক্যের যে সকল উদাহরণের উল্লেখ করিয়াছে, তাহা কিন্তু উপদেশের অনুরূপ মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। শিল্প-শাস্ত্রে নানা মুনির নানা মত হইলে, কথা ছিল না। মত থাকিলেই মত-ভেদ থাকে। কিন্তু যেটা মনঃপূত নয়, সেইটা মত; এবং যেটা মনঃপূত, সেইটা মন্ত্র,—এরূপ ভাবে শিল্প-শাস্ত্রকে ভাগাভাগি করিতে গেলে, কিরূপ গোলযোগ ঘটে, অন্তর বাহিরে তাহা পুনঃ পুনঃ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। শিল্প-শাস্ত্র সূত্র ভাষ্য এবং উদাহরণযুক্ত শিল্প-বিবৃতি। অধ্যয়ন ভিন্ন তাহার সমালোচনা চলিতে পারে না। যাবৎ নীরব, তাবৎ নিরাপদ;—কথা কহিবামাত্র ধরা পড়িতে হয়!

কলা-সমূহের মধ্যে চিত্র-কলাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লিখিত। তাহা লইয়া অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার অবতারণা করা হইয়াছে। ইহাকে মত বলিয়াই ব্যক্ত করা হইয়াছে; কিন্তু এ বিষয়ে যে সত্য সত্যই নানা মুনির নানা মত আছে, তাহার প্রমাণ উল্লেখের চেষ্টা করা হয় নাই। শিল্প-শাস্ত্রে এমন কথা স্থান লাভ করিয়াছে কেন, তাহারও কোনরূপ রহস্য প্রদর্শিত হয় নাই। এখানে সিদ্ধান্ত মাত্রই উদ্ধৃত; তাহার হেতু কি, তাহা অন্য কারিকায় উল্লিখিত আছে। যথা,—

কান্তি ভূষণ ভাবাত্মা শ্চিত্রে যস্মাৎ স্ফুটং স্থিতাঃ।
অতঃ সান্নিধ্য মায়াতি চিত্রজাসু জনার্দ্দনঃ।

যে সকল কলার মধ্যে চিত্রকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে, তাহা এক জাতীয় কলা,—সাদৃশ্য-বিজ্ঞাপক কলা,—চিত্র, ভাস্কর্য্য

ইত্যাদি। সঙ্গীতাদি ভিন্ন জাতীয় কলার প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপিত হইতে পারে না। সাদৃশ্য-প্রকটন যে সকল শিল্পের লক্ষ্য,—কান্তি, ভূষণ, ভাবাদি যাহাতে পরিস্ফুট,—সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুব্যক্ত,—তাহাই যে শ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়ে নানা মুনির নানা মত উৎপন্ন হইতে পারে না। চিত্রে এই সকল বিষয় বর্ণের সাহায্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুব্যক্ত হয় বলিয়াই চিত্রকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। ইহা মত নহে, মন্ত্র। কিন্তু অন্তর বাহির ইচ্ছামত একটিকে মত, অন্যটিকে মন্ত্র বলিবার জন্যই লালায়িত। অতএব অলমতি বিস্তরেণ।

এক রাত্রির অতিথি

শ্রীনির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় কবিভূষণ

প্রফুল্ল আসনসোলের হোটেল হইতে মদে চুরচুরে হইয়া তাহার মোটরে করিয়া ফিরিতেছিল। নেকটাইটা একপাশে সরিয়া গিয়াছে; বড় চুলের মধ্যে অঙ্গুলি-চালনা করিলে যেরূপ দেখিতে হয়, চুলের অবস্থা সেইরূপ, রুমালটা তিন ভাগেরও বেশী পকেট হইতে বাহির হইয়া আছে। পরিধানে পুরা সাহেবী পোষাক রহিয়াছে বটে, কিন্তু এখন তাহা পারিপাট্যশূন্য। এই অবস্থাতে সে সেই গভীর রাত্রে, সেই দারুণ দুর্য্যোগে, তীব্র হেড্‌লাইট দুটীর সাহায্যে নিজেই গাড়ী চালাইয়া আসিতেছিল। তাহার নেশা যে অতিরিক্ত রকমের হইয়াছিল, সে ধারণা তাহার ছিল; সেই জন্য চেষ্টাকৃত অতিরিক্ত সাবধানতায় চক্ষু অসম্ভব রকম বিস্ফারিত এবং মুখের ভাব কি এক রকমের হইয়াছিল। স্থানে স্থানে রাস্তায় জল জমিয়াছে। তাহার উপর দিয়া মোটরের চাকা পার হইবার সময়, সেই কাদ-মিশ্রিত জল এমন ভাবে ছিট্‌কাইয়া উঠিতেছিল যে কলিকাতার রাস্তা হইলে পথিকের গালি খাইয়া তাহার পেট ভরিয়া যাইত; গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে জনমানব ছিল না বলিয়া তাহার রক্ষা।

হেড্‌লাইটের তীব্র আলো এমন সময় অপর একটী দণ্ডায়মান মোটরকারের উপর পড়িল। মদ্যপ হইলেও প্রফুল্ল পেঁচীমাতাল ছিল না। এমন সময় পথের উপর 'কার' দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে তাহার পাশেই গাড়ী থামাইল এবং রোড এটিকেট হিসাবে জিজ্ঞাসা করিল "May I help you in any way" (আমি আপনার কোন সাহায্য করিতে পারি কি?)

গাড়ীর ভিতর হইতে বামাকণ্ঠে উত্তর আসিল (যদি আপনার অনুগ্রহ হয়) "If you please।"

প্রফুল্ল নিজের গাড়ী একটু পিছাইয়া লইয়া এমন ভাবে দাঁড় করাইল, যাহাতে হেড্‌লাইটের আলো দুইটা অপর গাড়ীর ভিতর পড়ে। সেই আলোক সাহায্যে দেখিল গাড়ীর ভিতরে একটী স্ত্রীলোক বসিয়া আছে। প্রফুল্ল নামিয়া নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েচে?" রমণী উত্তর করিল "ট্যাক্সীওয়ালা ব'লছিল এ্যাক্‌সেল না কি ভেঙ্গে গেছে। গাড়ী নিয়ে যাবার জন্যে সে নিকটের কোন গ্রামে হয় গরু নয় কুলির সন্ধানে গেছে।"

প্রফুল্ল।—আপনি কোথায় যাবেন জিজ্ঞাসা করতে পার কি?

রমণী।—আমি পঞ্চকোট পাহাড়ের ধারে নওয়াডিহি কলিয়ারীতে যাব।

প্রফুল্ল।—নওয়াডিহি, সে তো দামোদরের ওপারে—চুরাশিপরগণায়। দামোদরে যে কাল থেকে বিষম বান, ডাক-পারাপার বন্ধ। কি ক'রে যাবেন?

রমণী।—সে কি? তারপর যেন অর্দ্ধস্বগত ভাবেই বলিল "সেক্রেটারীবাবু তো সে কথা কিছুই লিখেননি। এমন জান্‌লে যে বর্ষার পরেই জয়েন কর্ত্তুম।" পরে প্রফুল্লকে বলিল, "আমি যে গার্লস্ স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হয়ে যাচ্ছি, তার সেক্রেটারী তো আমায় বানটানের কথা কিছুই লেখেননি। বরং লিখেছিলেন, কোন্ দুটো বড় বড় কোল কোং নদীর উপর অস্থায়ী রাস্তা ক'রে দিয়েছেন, তাতে নওয়াডিহি পর্য্যন্ত মোটর চল্‌বে। মোটর-

পাওয়া যাবে বলেই ত আসানসোলে নামা, নইলে তো বরাকরে নামতুম।”

প্রফুল্ল।—সে কথা ঠিক; সে রাস্তা এই পরশু পর্য্যন্ত ছিল। কা'লকে বান এসেছে, সে রাস্তাও ডুবে গেছে।

রমণী।—তাই তো, তা' হ'লে উপায়! এই দুর্য্যোগে—ফিরিই বা কি ক'রে? রাত্রে কলকাতা ফেরবার ট্রেণ কখন জানেন?

প্রফুল্ল।—ট্রেণে আনাগোনা আমার খুবই কম, ঠিক জানি না, তবে বোধ হয় রাত্রি ২৷৩টার সময় একটা মেল না কি আছে। আমি বল্‌তে সাহস পাচ্ছি না—আমার বাসায় রাত্রিটার মত বিশ্রাম ক'রে কা'ল বান কমলে সকালে নওয়াডিহি নয় কলকাতাই ফির্‌তে পারতেন।

রমণী।—তা' সেও মন্দ হয় না। কিন্তু আপনার স্ত্রীকে অনর্থক বিরক্ত করা হ'বে।

প্রফুল্ল।—না না সে সব হাঙ্গামা আমার নেই। আমি অবিবাহিত।

রমণী।—আপনি অবিবাহিত! তাই তো তাহ'লে—

প্রফুল্ল।—আপনার একটু অসুবিধা হবে, সে বুঝতে পারছি, কিন্তু অন্য উপায় ত নেই। আমি বলি কি, আজকের রাত্রিটার মত আমার বাংলাতেই চলুন।

প্রফুল্ল রমণীর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া তাঁহার গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিল এবং তাঁহার অবতরণের অপেক্ষা করিয়া সেই বৃষ্টিতেই দাঁড়াইয়া রহিল।

রমণী।—ও কি, আপনি বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছেন যে। আপনার গাড়ীতে উঠুন।

প্রফুল্ল।—আর আপনি?

রমণী।—আমি আসনসোলেই ফিরে যাব।

প্রফুল্ল।—তাহ'লেও তো আমারই সঙ্গে আস্‌তে হবে। ও গাড়ী ত আর চল্‌বে না। আমার গাড়ীতে চলুন রেখে দিয়ে আসি।

রমণী।—আপনাকে আর কষ্ট দেব না, আমি যেমন ক'রে হোক যাব।

প্রফুল্ল একটু বিরক্তি একটু রসিকতার সুরে বলিল "সে যেমন ক'রেটা কেমন ক'রে তা' জান্‌তে পারি কি?"

রমণী।—ট্যাক্সিওয়ালা বোধ হয় শীঘ্রই ফির্‌বে। ট্রেণ যখন দেরীতে, তখন আস্তে গেলেও কোন ক্ষতি হবে না।

প্রফুল্ল বিরক্তভাবে বলিল, "বেশ, তাহ'লে আমি যেতে পারি?"

রমণী।—নমস্কার। আপনার সৌজন্যে বাধিত হলুম। আপনার অনুরোধ রাখ্‌তে পারলুম না বলে মাপ করবেন।

"তার দরকার নেই।" বলিয়া প্রফুল্ল তাহার ক্লীনারকে অনর্থক ধমকাইয়া বলিল, "এই ব্যাটা জগুয়া, ষ্টার্ট কর্ না।"

জগুয়া গাড়ী ষ্টার্ট করিল এবং প্রফুল্ল গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। কয়েক গজ গিয়া সে আবার গাড়ী থামাইল এবং সেইখান হইতেই হাঁটিয়া পুনরায় রমণীর গাড়ীর নিকট আসিয়া কোন রকম ভূমিকা না করিয়াই বলিল, "দেখুন আমি একটা কথা ভেবে আবার ফিরে এলুম। আমার মুখে মদের গন্ধ পেয়ে যদি আপনার ভয় হ'য়ে থাকে, আর সেজন্যই যদি আমার বাংলোয় যেতে অস্বীকার ক'রে থাকেন, তবে এই পর্য্যন্ত কর্‌তে পারি যে, আপনাকে আমার বাংলায় রেখে আমি আমার কোন বাবুর বাসায় রাত্রিটা কাটাতে পারি। বাংলোয় রাখ্‌তে আমিও না যেতে পারতুম; কিন্তু আমার ত ড্রাইভার নাই, আমি নিজেই বরাবর গাড়ী চালাই। ঐ জগুয়া বেটা যে একদম চালাতে পারে না; নইলে ওকে দিয়েই আপনাকে পাঠিয়ে দিতুম। আপনার কষ্ট হবে বলেই বলছিলুম।"

প্রফুল্ল যে মদ খাইয়াছিল তাহা রমণী বুঝিতে পারে নাই। কারণ প্রফুল্ল বরাবর দূরে দাঁড়াইয়াই কথা কহিয়াছিল। বাড়ীতে কোন স্ত্রীলোক নাই, আর প্রফুল্ল যুবা পুরুষ, এই জন্যই সে না যাওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছিল। এখন তাহারই মুখে তাহার মদ খাওয়ার কথা শুনিয়া চমকিত ও ভীত হইল; কিন্তু তাহার সরল কথা এবং তাহার উপকারের চেষ্টা দেখিয়া তাহার উপর একটু শ্রদ্ধাও হইল। একটা লোক অযাচিতভাবে তাহার সাহায্যের জন্য ব্যাকুল, অথচ কথার ভাবে মনে হইতেছে, কোন স্বার্থবশে এরূপ অনুরোধ করিতেছে না; এমন লোককে প্রত্যাখ্যান দ্বারা ক্ষুণ্ণ করিতে তাহার মনের কোন্ কোণে যেন একটু খোঁচা বাজিতেছিল। এমন সময় দূরে একটা অশ্লীল গান শোনা গেল; এবং ক্ষণেক পরেই রীতিমত রাস্তা জরিপ করিতে করিতে ট্যাক্সিওয়ালা আসিয়া হাজির হইল। বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না যে, গন্ধ এবং কুলি সম্বন্ধে

হতাশ হইয়া সে নিরাশা-ক্লিষ্ট মনকে মদের নেশায় তাজা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। সে সেলাম করিল কি কপাল চাপড়াইল বুঝা গেল না ; তবে ঐরূপ একটা কিছু করিয়া টলিতে টলিতে জড়িতস্বরে বলিল "মেম স্তাব, কুলি উলি কুচ নাই মিলা" বলিয়াই গান ধরিল "গাড়ুয়ান ভাড়া যাবিরে" কিন্তু প্রফুল্লর ধমক খাইয়া "সমে" না পৌছিতেই গান শেষ করিল এবং তাহার সাহেবী পোষাক লক্ষ্য করিয়া আর একবার কপাল চাপড়াইল। দেখিয়া শুনিয়া এই ইতর মাতালের সঙ্গে অপেক্ষা এই ভদ্র মাতালের সঙ্গে যাওয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদ বলিয়া রমণীর মনে হইল। সে তখন নিজেই গাড়ীর দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল এবং প্রফুল্লকে জিজ্ঞাসা করিল "আপনার গাড়ীতে আমার বাক্স আর বেডিংটা ধর্‌বে কি ?" প্রফুল্ল কোন উত্তর না দিয়া বেডিংটাকে নিজেই গাড়ী হইতে উঠাইয়া, বাক্সটা লইয়া যাইবার জন্য হাঁক দিল। পরে রমণীর দিকে ফিরিয়া বলিল "তাহ'লে আসুন।"

গাড়ী বেশী দূরে ছিল না। গাড়ীর নিকটে পৌঁছিয়া বিছানাটা পিছনের দিকে রাখিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া রমণীকে বলিল "উঠুন।"

রমণী ইতস্ততঃ করিয়া বলিল "তাই তো, আপনি চালিয়ে যাবেন, আর আমি পেছনে বসব সেটা কি ভাল হবে ?"

প্রফুল্ল।—খুব ভাল হবে।

তবুও রমণী ইতস্ততঃ করিতে লাগিল দেখিয়া প্রফুল্ল বলিল, "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে না ভিজ্‌লে কি আপনার চলছে না ?"

প্রফুল্লর বলিবার ভঙ্গীতে রমণী হাসিয়া ফেলিল এবং আর বাক্যব্যয় না করিয়া পেছনেই উঠিয়া বসিল। জগুয়া বাক্স লইয়া আসিলে তাহাকে সামনে উঠাইয়া লইয়া প্রফুল্ল গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

২

বাংলোটার আয়তন এবং সাজসজ্জা দেখিয়া রমণী প্রফুল্লের অবস্থা বুঝিতে পারিল। সে পূর্ব্বে ভাবিয়াছিল, অবস্থা তেমন হইলে নিজে গাড়ী চালাইলেও একজন ড্রাইভার সঙ্গে থাকিত। হয় তো সে কোন কলিয়ারীর ম্যানেজার হইবে। কারণ সে শুনিয়াছিল যে সাধারণতঃ কলিয়ারীর ম্যানেজারেরা সুবিধার জন্য মটর রাখে ; কিন্তু ব্যয় সংক্ষেপের অভিপ্রায়ে গাড়ী পরিস্কার করিবার জন্য একজন ক্লীনার রাখিয়া নিজেরাই গাড়ী চালায়। বাংলোর সামনে গাড়ী দাঁড়াইবামাত্র চতুর্দ্দিক হইতে যে সমস্ত পোষাক পরা ভৃত্যের দল ছুটিয়া আসিল এবং যে ভাবে তাহারা তটস্থ হইল, তাহা রমণীকে কম বিস্মিত করে নাই।

প্রফুল্ল রমণীকে ড্রইংরুমে লইয়া গিয়া বলিল "বসুন" ; কিন্তু পরক্ষণেই বলিল "না, না, কাপড় চোপড় আপনার ভিজে গেছে, একবার বেডরুমে গিয়ে কাপড় চোপড় ছেড়ে এসে বিশ্রাম করুন।" বলিয়া নিজেই বেডরুমের দিকে অগ্রসর হইল। রমণীর বাক্স এবং বিছানা তৎপূর্ব্বেই সে ঘরে পৌঁছিয়াছিল। কক্ষটী দেখাইয়া দিয়াই প্রফুল্ল বাহিরে আসিল এবং নিম্নস্বরে একজন ভৃত্যকে বলিল "এই জল্‌দী একঠো বড়া পেগ্ লাও।" নিম্নস্বরে বলিলেও সে কথা রমণীর কর্ণে পৌঁছিল। পেগ খাইয়া পোষাক পরিবর্ত্তন করিয়া চিন্তিতভাবে সে ড্রয়িংরুমটার চারিদিকে অকারণেই ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এমন সময় রমণী ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিল এবং প্রফুল্ল কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া আসন গ্রহণ করিতেই একজন ভৃত্য একটী ছোট টিপয়ে করিয়া চা, বিস্কুট, টোষ্ট প্রভৃতি আনিয়া তাহার সম্মুখে স্থাপিত করিল।

প্রফুল্ল বলিল, "চা খান।"

রমণী চা পান করিতে আরম্ভ করিলে প্রফুল্ল বলিল "আপনি রাত্রে কি খান জানি না ; সাহেবী এবং বাঙ্গালী দুই রকমের খাবারই তৈরী করতে বলেছি ; যেমন আপনার অভ্যাস তাই দিতে বলবেন। আমাকে অনুমতি করুন, আমি এখন তা হ'লে যাই।"

রমণী।—কোথায় যাবেন ?

প্রফুল্ল।—খাদে

রমণী।—তবে যে বলছিলেন আপনার কোন বাবুর বাড়ীতে যাবেন ?

প্রফুল্ল।—ভাবলুম যাঁর বাড়ীতেই যাই, তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করা হবে। তাই ঠিক করলুম খাবার তৈরী হ'লে খাদেই আমাকে দিয়ে আসবে, রাত্রিটা খাদেই কাজকর্ম্ম দেখে কাটিয়ে দেবো।

"সে কি ? সারা রাত্রিটা কি লোকে না ঘুমিয়ে কাজ দেখে কাটাতে পারে ?"

"কেন পারবে না? আমার সারা জীবন তো এমনি করেই কেটেছে।"

"আপনি এত ঐশ্বর্য্যের মালিক, আর আপনার সারাজীবন এমনি করে কেটেছে।"

"ঐশ্বর্য্য—? সে তো কাল'কের কথা।"

"বলেন কি? আপনার সব কথা শোনবার জন্যে যে আমার আগ্রহ হচ্ছে।"

"মাতালের আবার জীবনী!"

"কেন আপনি বারবার নিজেকে মাতাল ব'লছেন। আমি তো আপনাকে মাতাল বলি নাই। আপনি নিজেই বললেন যে আপনি মদ খান, কিন্তু মাতলামি তো কিছুই করেন নাই। বিপন্নাকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে আশ্রয় দেওয়া কি মাতলামীর কাজ?"

এই স্নেহের সুরে প্রফুল্লের বুকের মধ্যে ধক করিয়া কোথায় একটা ঘা লাগিল এবং আত্মীয়হীন যুবকের এই অপরিচিতার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনের জন্য একটা বিষম আগ্রহ হইল। তবু রমণীর পূর্ব্বভীতি স্মরণ করিয়া, তিনি যে এখানে নিরাপদ, এই ধারণা জন্মাইয়া দিবার জন্য বাংলো ত্যাগে কৃতসংকল্প হইল; বলিল "আমি একটা পথের কুকুর। এখন আমি শুধু এইটুকু জানাতে চাই যে, আপনি এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ। আমি যাই হই, মানুষের চামড়া গায়ে দিয়ে আছি, আমার দিক্ হ'তে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা করবেন না।"

"আবার যদি আপনি ও কথা বলেন, তাহ'লে আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। আমি যতটুকু আপনাকে দেখেছি, তাতে বিশ্বাস করেছি, আর বিশ্বাস করেছি বলেই আপনার সঙ্গে সাহস ক'রে এসেছি। আপনি খাদে যাবেন না, এই বাংলাতেই কোন একটা ঘরে থাকুন। আপনি বসুন। আপনার কথা বলুন।"

"আচ্ছা আমি আসছি" বলিয়া প্রফুল্ল বাহিরে আসিয়াই ভৃত্যকে ডাকিল এবং নীচু সুরে পুনরায় একটা "বড়া পেগ" দিতে বলিল। পেগ খাইয়া ফিরিয়া গিয়া একটু দূরে বসিতেই রমণী জিজ্ঞাসা করিল "আপনি এত ঘন ঘন মদ খান কেন?"

"ঐ তো আমার জীবনী মিস্—"নাম না জানায় প্রফুল্ল থামিয়া গেল। রমণী বলিল "আমার নাম নীলা। মিস্ চক্রবর্ত্তী বলিতে এখন আপনার জিভ্ জড়িয়ে যাবে, আপনি নাম ধরেই আমাকে ডাক্‌বেন।"

হেড-লাইটের তীব্র আলোক যখন গাড়ীর মধ্যে পড়িয়াছিল, তখন আলোকের তীব্রতার জন্যই হউক, কিম্বা ব্যস্ততার জন্যেই হউক, ভাল করিয়া নীলার রূপ দেখিবার সুবিধা তাহার ঘটে নাই। তখন সে কেবলমাত্র এইটুকু বুঝিয়াছিল যে রমণী যুবতী। নিজের গাড়ীতে তুলিবার সময়, আলো-আঁধারে সে তাহার মুখ ভাল করিয়া দেখিতে পায় নাই। কক্ষের উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকে সুরারঞ্জিত চক্ষে নীলাকে এই সে প্রথম দেখিল। হাঁ, যুবতী সুন্দরী বটে!

প্রফুল্ল বলিল, "যখন জেনেছেনই আমি মদ খাই, তখন যদি অনুমতি করেন, তবে বোতল গেলাস এইখানেই আনিয়ে নি, নইলে আমাকে বারবার উঠে গিয়ে রসভঙ্গ করতে হবে, যদিও আমার জীবনীতে রস কিছুই নাই।"

নীলা ঈষৎ হাসিয়া বলিল "আপনার যদি একান্তই অসুবিধা হয় আনান।"

বোতল গেলাস আসিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই একটা 'বড়পেগ' এক নিঃশ্বাসে শেষ করিয়া প্রফুল্ল বলিতে আরম্ভ করিল—

"কিই বা জীবন, তার আবার জীবনী! আমার বাবা এক দয়ালু সাহেবের সামান্য কেরাণী ছিলেন। সাহেবের খুব বড় কয়লার কারবার এবং কুঠী ছিল। আমার বয়স যখন দশ বৎসর, তখন একই দিনে বাপ, মা উভয়েই কলেরায় মারা যান। দয়ালু সাহেব তাঁহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু ভগবানের উপর ত তাঁহার হাত ছিল না। বাপ, মা গেলেন ভাই ভগিনী কেউ ছিল না; নিকট আত্মীয়, মামা, জ্যাঠা, খুড়ো, পিসে যাঁরা ছিলেন, পাছে তাঁদের ঘাড়ে পড়ি, এই ভয়ে খোঁজখবর পর্য্যন্ত কেউ নিলেন না। সাহেব নিজের ছেলের মত আমায় পালন করতে লাগলেন, পড়াতে লাগলেন। শিবপুর থেকে ইঞ্জিনিয়ার হ'য়ে বেরোবার পর তিনি আমাকে মাইনিং শেখ্‌বার জন্যে বিলেত পাঠিয়ে দিলেন। ছ'বছর বিলেতে থাকার পর ভগবানের অনুগ্রহে ভাল ভাবে পাশ ক'রে দেশে ফিরে এলুম। সাহেব আহ্লাদে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

তাঁরই কুঠীতে আমি ম্যানেজার নিযুক্ত হলুম; মাইনে হ'ল হাজার টাকা। সাহেবের সাথেই থাকতুম, খেতুম, পরতুম; মাইনের টাকা তাঁরই কাছে জমা থাকতো। অতিরিক্ত দান-খয়রাতে এবং নানারকম কারবারের জন্যে সাহেবের যে অত দেনা হ'য়েছিল, তা আমরা কেউ জানতুম না। বিষয়পত্র, কুঠী প্রভৃতি সব যখন নীলামে ওঠবার উপক্রম হ'ল, তখন হঠাৎ একদিন সাহেব আত্মহত্যা করলেন। সাহেব বিবাহ করেন নাই। সুতরাং তাঁর কেউ ছিল না। পুলিসে তদন্ত করতে এসে তাঁর দলিলের বাক্স থেকে একটা উইল বা'র করলে। তাতে তাঁর কতক সম্পত্তি স্কুল, হাসপাতাল এই সমস্ত সংকার্য্যে দান করে গিয়েছিলেন এবং দুটো বড় বড় কুঠী আমাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। তার মধ্যে এটা একটা। বাকী সম্পত্তি দেনা শোধের জন্য দেন।"

এই সময় বাধা দিয়া লীলা জিজ্ঞাসা করিল "ঐ সম্পত্তিতেই যদি সব দেনা শোধ হ'ল, তবে তিনি আত্মহত্যা করলেন কেন?"

প্রফুল্ল উত্তরে বলিল "সাহেব যদিও লোক ভাল ছিলেন, কিন্তু এদিকে মহা দাম্ভিকও ছিলেন। দুর্নামের ভয়েই বোধ হয় আত্মহত্যা করেছিলেন। বুঝুন না, আমাকে পর্য্যন্ত দেনার কথা জানান নাই।"

লীলা বলিল, "কত রকমের যে মানুষ থাকে!" ক্ষণপরে আবার বলিল—"কিন্তু তার জন্যে আপনার এমন ছন্নছাড়া জীবন কেন হ'ল? গরীব ছিলেন ভগবানের অনুগ্রহে বড়লোক হলেন, এতো সুখেরই কথা। তা'তে এত মদই বা খেতে আরম্ভ করলেন কেন, আর এমন সঙ্গতি থাকতে বিবাহই বা করেন নাই কেন?"

প্রফুল্ল করযোড়ে বলিল, "ঐ বিষয়টায় আমাকে মাপ করবেন। ক্ষত আরাম হ'য়ে আসছে, সে সমস্ত কথা বলতে গেলেই আবার স্মরণ করতে হবে,—ক্ষতে আবার খোঁচা লাগবে।"

কথাটা এমন কাতরতার সহিত উচ্চারিত হইল যে লীলার আগ্রহ চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল। কি এমন কথা—যাহার জন্য এমন একটা শিক্ষিত, মহৎজীবন একরকম নষ্ট হইতে বসিয়াছে। বুঝিল, যখন নিজের গোপনীয় কথা প্রকাশ করিতে প্রফুল্ল নারাজ, তখন এত অল্প পরিচয়ে সেই কথাটা জানিবার জন্য পুনরায় অনুরোধ করিলে ভদ্রতার এবং নারীত্বের গাম্ভীর্য্যের বাহিরে যাওয়া হইবে। তবু এই শিক্ষিতা নারী কৌতূহল দমন করিতে পারিল না। প্রফুল্লর সেই সময়কার সেই কাতরতা-মাখান সুন্দর মুখ তাহার কোমল নারী-হৃদয়কে সহানুভূতিতে পূর্ণ করিয়া দিল। একরাত্রির আশ্রয়দাতা, না হয় বন্ধুই হইল, তাহার নিকট কতই আর দাবী আছে যে, বন্ধুর অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার গোপন কথা জানিবার জন্য সে পীড়াপীড়ি করিতে পারে? সকলই সে ভাবিল; ভাবিয়াও কিন্তু সে কৌতূহল দমন করিতে পারিল না। ক্ষণেক থামিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল "আমাকেও বলবেন না?" কথাটা বলিয়াই সে অপ্রতিভ হইল; মনে মনে বলিল,—ছিঃ ছিঃ আমি ওঁর এমন কে, যার জন্যে আর কাহাকেও না ব'লে আমাকে অন্ততঃ ওঁর বলা উচিত।

প্রফুল্ল ঐ "আমাকেও বলবেন না" কথাটা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া ফেলিল। লীলা সেই হাসিতে আরও অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল "না, না, আপনাকে বলতে হবে না।"

প্রফুল্ল গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল—"আমি বলছিলুম কি, আপনি ক্লান্ত। আপনার শুনতে কষ্ট হ'বে; তার চেয়ে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। নইলে আমার আর বলতে কি?"

এমন সময় ডিনারের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। প্রফুল্ল বলিল—"আপনি খেয়ে আসুন, তার পর সব বলব। কেবল এক অনুরোধ, সব কথা শুনে এ হতভাগ্যকে ঘৃণা করবেন না।"

নানা রকমের চিন্তা একসঙ্গে মনে উদিত হওয়ায় লীলা এমন ভাবাভিভূত হইয়া পড়িল যে ভদ্রতার খাতিরেও সে কিছু বলিতে পারিল না, মন্ত্র-চালিতের ন্যায় ডিনারের টেবিলে গেল। গিয়া দেখিল, শুধু তাহার খাবার টেবিলে দেওয়া হইয়াছে। দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল "আপনার?"

প্রফুল্ল। আমি যে ঘরে শোব, সেই ঘরেই খেয়ে নেব এখন।

"না, না, তা কি হয়?"

প্রফুল্ল —কেন হবে না ? আর অপরিচিতের সামনে আপনার খেতে সঙ্কোচবোধ হতে পারে।

লীলা।—আচ্ছা, সঙ্কোচ করবার কথা আমার। আমি সঙ্কোচ বোধ করছি না আপনি করছেন কেন ?

উত্তরে প্রফুল্ল যে কি বলিল, সে কথাগুলা বুঝা গেল না বটে ; কিন্তু তাহার অর্থ লীলা স্পষ্টই বুঝিল যে প্রফুল্ল না, না বলিয়া তাহার উক্তির প্রতিবাদ করিতেছে এবং পাছে লীলা কোন কারণে বিন্দুমাত্র আঘাত পায়, সেই জন্য শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

চতুর বাবুর্চ্চি তৎক্ষণাৎ প্রফুল্লরও খাবার আনিয়া দিল।

খাইতে-খাইতে লীলা বলিল "যদি কোন আপত্তি না থাকে, তা হলে আপনার কাহিনীটা এখনই শেষ করে ফেলুন না।"

প্রফুল্ল বলিল, "কথাটা তা হলে শুনবেনই! দেখুন, মিস্ লিলি বলে একজন ইংরাজ যুবতী তার বাপ মার সঙ্গে আমার সাহেবের কাছে প্রায়ই বেড়াতে আস্‌তেন। সেই সূত্রে আমার সঙ্গে তার এবং তার বাপ মায়েরও পরিচয় হয়। বয়সের দোষে লিলি এবং আমার পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় এবং ঘনিষ্ঠতা ক্রমে বিবাহ প্রস্তাবে গড়ায়। লিলির বাপ মার নিকট যখন আমরা এই প্রস্তাব করলাম, তখন তাঁরা আনন্দের সঙ্গে সম্মত হলেন। আমরা তখন যেন স্বর্গের অধিবাসী, মর্ত্ত্যের মৃত্তিকার সঙ্গে যেন আমাদের কোনই সম্বন্ধ নাই। যাক্, সে প্রেমের চিত্র আপনার সম্মুখে ধরা আমার পক্ষে ঠিক হবে না,—"

লীলা অত্যধিক আগ্রহ বশতঃ কি বলিতেছে তাহা খেয়াল না করিয়া বলিয়া ফেলিল, "না, না তুমি অসঙ্কোচে বল।" পরক্ষণেই ভ্রম বুঝিয়া অতিরিক্ত লজ্জিত হইয়া পড়িল এবং নতমুখে বলিল "না, না, আমি বলছি আপনি বলতে পারেন, আমি কিছুই মনে করব না।"

প্রফুল্ল ঈষৎ হাসিয়া বলিল—''তুমি' সম্বোধনটা আবার তুলে নিলেন! হিন্দু-সমাজ থেকে চ্যুত হয়ে ঐ সম্বোধনটারই যে বড় অভাব হয়েছে। আজকাল হয় ইংরাজী সম্বোধন, নয় "আপনি" "হুজুর"—এই সব লেফাফা-দোরস্ত প্রাণহীন সম্বোধন শুনে শুনে কাণ শুদ্ধ বেসুরো হয়ে গেছে! যদিই একটা ভালবাসার—I mean, আত্মীয়তার সুর দৈবাৎ লেগে গিয়েছিল, সে সুরটাও নামিয়ে নিলেন!"

বড়ই করুণ এ স্বর! অন্তরের অন্তরতম স্থান হইতে উচ্চারিত, তাই হঠাৎ লীলার অজ্ঞাতে তাহার চোখের পাতা দুইটা ভিজিয়া উঠিল। সে উত্তরে কিছুই বলিতে পারিল না ; কেবল প্রফুল্লের অজ্ঞাতে অশ্রুধার কি করিয়া মুছিয়া ফেলিবে, সেই উপায় উদ্ভাবনেই ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

প্রফুল্ল এই স্নেহের দাবী আর তোলা সঙ্গত বিবেচনা করিল না। পূর্ব্বসূত্র অনুসরণ করিয়া বলিতে লাগিল— "বিশেষত্ব কিছুই নাই, প্রথম আবেগে সকলেরই মনের যে অবস্থা হয়, সকলেই যে সমস্ত কথা বলে থাকে, সকলেই যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে অর্থাৎ এ জীবনে তুমিই আমার সর্ব্বস্ব, তোমা বই আর কারও এ হৃদয়ে স্থান নাই ইত্যাদি, ইত্যাদি আমাদের মধ্যেও তাই হয়েছিল। তারপর স্ত্রীলোকের ভালবাসার গভীরতা বোঝা গেল, যখন সাহেবের দেনার কথা মহাজনদের দ্বারাই প্রচারিত হয়ে পড়ল। সেই সময় লিলির সঙ্গে দেখা হ'ল। ভালবাসার উত্তাপ তখন একদম কমে গিয়েছে, প্রেমালাপ ত দূরের কথা। কথাবার্ত্তাও ছাড়াছাড়া হ'তে লাগল; পাছে ঘনিষ্ঠতায় আমি মনে করি লিলির উপর আমার পূর্ব্ব দাবী অব্যাহতই আছে। তারপর লিলির মা আমাকে জানিয়ে গেলেন, বাঙ্গালীর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলে তাঁদের সমাজে তাঁরা হীন হয়ে পড়বেন—এমনি আভাষ তাঁরা পেয়েছেন। এ কৈফিয়তের প্রয়োজন ছিল না, কারণ তাঁহার কন্যাই তার ব্যবহারে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছিল।

"নারীজাতির সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মেশা সেই আমার প্রথম, সেই আমার শেষ। তার ফলে নারীকে এখন দূর হ'তেই নমস্কার করে থাকি। আর তার ফলে, আমি এখন মাতাল।''

লীলা একটু হাসিয়া বলিল "তবে যে আমাকে দূর হতে ডেকে ঘরে আনলেন ?"

"আপনাকে বিপন্না দেখে ঘরে ডেকে এনেছি, ও-ভাবে তো আর—" বলিয়াই থামিয়া গেল, বুঝিল কথাটা সত্য হইলেও বলা অশোভন হইবে।

লীলাও তাহা বুঝিল, কিন্তু তাহার মন তখন সহানুভূতিতে ডুবিয়া গিয়াছে ; কাজেই গণ্ডী অতিক্রম করিয়া আরও অগ্রসর হইয়া বলিল "কিন্তু সবাই আপনার লিলি নয়। ইংরাজ লিলি অমন করতে পারে, কিন্তু সকলেই কি তা পারে ?"

এইবার প্রফুল্ল মুখ তুলিয়া পূর্ণ দৃষ্টিতে লীলার মুখের পানে চাহিল। লীলা সে দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া চক্ষু অবনত করিল।

প্রফুল্ল বলিল, "না, বেশ আছি। যে কয়দিন বেঁচে আছি, এই মদই আমাকে সব ভুলিয়ে রাখবে। আপনি এক রাত্রির অতিথি ; কালই চলে যাবেন। এক অনুরোধ, এই হতভাগ্য মাতালকে মনে রাখবেন ; আর যদি পারেন, ত একটু ভাল—— না না, আর কিছু না। আমি কিছুরই যোগ্য নই।"

লীলা অতি ধীরভাবে বলিল, "যদি ক্ষমা করেন ত একটা কথা বলি। আমি বলি কি, অনেক দিনরাত্রির অতিথি ঐ বোতল-গ্লাসগুলোকে চিরজীবনের মত বিসর্জন দিয়ে, এই একরাত্রির অপরিচিতা অতিথিকে সেই স্থানে বসিয়ে দিতে কি পারেন না ?"

প্রফুল্ল সহাস্যে বলিল "একরাত্রের অতিথিকে চিরজীবনের জন্য স্থান দিতে পারি, কিন্তু বহুদিনের অতিথির বিসর্জ্জনের ভার নবাগতা অতিথিকেই যে তা হ'লে নিতে হয়।"

বাহিরে ঠিক সেই সময়ে একটা পাখী ডাকিয়া উঠিল ; লীলা বলিল "ঐ শুনুন, পাখী বলিতেছে তথাস্তু।"

সম্পাদকের বৈঠক

প্রশ্ন

১। পৃথিবীর আজকাল কাহারা শ্রেষ্ঠ লেখক ?

২। কোন্ কোন্ বই পৃথিবীর ভাবজগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ?

শ্রীমণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী

৩। বাঙালিদের অশৌচ ব্যবস্থা তিন ভাগে বিভক্ত,—যেমন ব্রাহ্মণের দশদিন, বৈদ্যের পনেরদিন, কায়স্থ ও অন্যান্য জাতির একমাস করিয়া। আবার হাড়ীরা ব্রাহ্মণের মত দশদিন মাত্র অশৌচ গ্রহণ করে শুনিয়াছি। কিন্তু বিহারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকল শ্রেণীর লোকেরই মাত্র দশদিন অশৌচ গ্রহণের প্রথা আছে। বাঙালি হিন্দু এবং বিহারি হিন্দুদের মধ্যে এরূপ পার্থক্য কেন ? ভারতের অন্যান্য প্রদেশে কিরূপ অশৌচ গ্রহণের প্রথা, এবং বাঙালির এরূপ নিয়ম কাহারা করিল ?

৪। মুখাগ্নি করার মানে কি, এবং তাহ পুত্র বা পুত্রস্থানীয়ের দ্বারাই হয় কেন ? আকস্মিক কারণে মৃত্যু ঘটিয়া মৃতব্যক্তির দেহ না পাওয়া গেলে কুশের পুতুল করিয়া তাহার মুখাগ্নি করা হয় কেন ?

শ্রীউমা দেবী

৫। ঘড়ি কতদিন পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে ? আবিষ্কর্ত্তার নাম কি ? কোন্ দেশে উহা সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয় ? সাধারণতঃ যে ঘড়ি ব্যবহৃত হয়, প্রথম আবিষ্কারের সময় হইতেই ঐরূপ ছিল, না ক্রমিক উন্নতির ফলে ঐরূপ দাঁড়াইয়াছে ?

[এস্থলে ঘড়ি বলিতে, clock বা watch বলিলে যাহা বুঝায় তাহাই বুঝিতে হইবে। ছায়াঘড়ি বা এতাদৃশ অন্য ঘড়ির কথা আমি বলিতেছি না]

৬। Photography আমাদের দেশে পূর্ব্বে ছিল কি না ? সর্ব্বপ্রথম উহা কোন্ দেশে আবিষ্কৃত হইয়াছিল ? কবে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং আবিষ্কর্ত্তার নাম কি ? শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়

৭। ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথমে কোন্ সংবাদ-পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল ? সেই সংবাদ-পত্র কোন্ ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল ? তাহার সম্পাদক কে ছিলেন এবং কোন্ স্থানে প্রকাশিত হইয়াছিল ?

৮। পালোয়ানেরা কুস্তি করিবার সময় মাটী মাখে কেন ? ইহা কি কেবল ঘাম মারবার জন্য ? না ইহাতে কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আছে ?

৯। জলছবি প্রস্তুত হয় কি প্রকারে ?

১০। অনেকে একাদশীর দিন উপবাসের পরিবর্ত্তে রুটি, লুচি, ফল প্রভৃতি খাইয়া থাকেন। একাদশীর দিন রুটি প্রভৃতি খাওয়া সম্বন্ধে কোন শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা আছে কি ? একাদশীর দিন অন্ন গ্রহণ নিষেধ ; অথচ অনেক নিষ্ঠাবান হিন্দুরাও একাদশীর দিন অন্নের পরিবর্ত্তে রুটি খাইয়া থাকেন ? উহার অর্থ কি ? শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য

১১। হনুমান ও বানরাদির যমজ সন্তান হয় কি না ? হইলে তাহাদিগকে তাহার মাতা পালন করে কেমন করিয়া ? শ্রীমহারাণী রায়

১২। কখন এবং কাহার সময় হইতে বঙ্গাব্দের গণনা আরম্ভ হয় ? (১৯২৩—১৩২৯ =) ৫৯৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে বা ভারতে

কোন্ রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন; যাহার সময় হইতে অনুমান করা যায়, বঙ্গাব্দের প্রচলন আরম্ভ হয়?

হাতের কাছে যে কয়খানা বঙ্গদেশের তথা ভারতের ইতিহাস পাইয়াছি, তাহাতে এই বিষয়ের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। আশা করি, বাংলার সম্পাদকের বৈঠক হইতে বঙ্গাব্দের ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যাইবে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষাল

১৩। বিজয়ার পরে ইলিস মাছ খেতে নাই কেন?

১৪। কচি শশা প্রভৃতিকে অঙ্গুলী দ্বারা দেখান নিষেধ কেন? ইহার ভিতর কোন পৌরাণিক বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আছে কি না?

১৫। জৈষ্ঠ এবং ভাদ্রমাসে লাউ খেতে নাই কেন?

১৬। টিকটিকিতে টিক্ টিক্ শব্দ করিলে লোকে তিনবার "সত্য সত্য" বলে কেন?

১৭। ওক্‌ড়াইলে বলিষ্ঠ ও সুস্থ বালক বালিকাগণ কাহিল হইয়া যায় কেন? ইহার কোন বৈজ্ঞানিক কারণ আছে কি না?

১৮। কোন ঝগড়া আরম্ভ হইলেই লোকে "নারদ নারদ" বলে কেন?

শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

১৯। আমাদের দেশে নদী হইতে ছোট ছোট গল্‌দা চিংড়ি ও অন্যান্য মাছের পোনা লইয়া পুষ্করিণী বা ডোবায় ছাড়িয়া দেওয়া হয়, কিছুদিন পরে দেখা যায় অন্যান্য মাছগুলি বড় হইয়াছে ও জীবিত আছে, কিন্তু চিংড়ি মাছ বড় হইয়া আপনা হই তই মরিয়া যাইতেছে, সাধারণ কথায় তাহাকে "গাঁধি লাগা" বলে। উহা নিবারণের কোন উপায় আছে কি?

২০। ভাল কমলা নেবুর চারা বা কলম আনিয়া আমাদের এদিকের মাটীতে পুঁতিলে কালে উহা ফলবান হইলে দেখা যায়। আসল কমলা নেবুর মত উহার গঠন বা আস্বাদ হয় না, অনেকটা গোঁড়া নেবুর আকার ধারণ করে। ইহার কারণ কি? এবং প্রকৃত কমলা নেবুর মত আকৃতি ও মিষ্ট হইবার কোন উপায় আছে কি?

শ্রীভূতনাথ প্রধান

২১। পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র দেশ কোথায়—ইহার বর্ত্তমান নাম কি—কোন্‌জাতি ইহার প্রতিষ্ঠাতা—কোন্ অব্দ হইতে কোন্ অব্দ পর্য্যন্ত ইহা বিদ্যমান ছিল—ইহার সর্ব্বপ্রথম রাজার নাম কি—তিনি কোন্ বংশজাত—অর্থাৎ সূর্য্য না চন্দ্রবংশের এবং তাঁহার নামানুসারে কি এই দেশের নামকরণ হয়—তাঁহার অধস্তন কত পুরুষ এখানে রাজত্ব করেন—তাঁহার বংশধর আজিও জীবিত আছে কি না—যদি থাকে তবে সে কোন জাতি—তাহাদের উপজীবিকাই বা কি—কোন্ দেশের কোন্ নৃপতি কর্তৃক কোন্ সময় এই রাজ্যটী বিধ্বস্ত হয়—এতদ্ সম্বন্ধে কোন পুস্তকাদি আছে কি না? থাকিলে কোথায় পাওয়া যায়?

শ্রীশর্ম্মারাম দেববর্ম্মা

২২। ডান্ হাতের তালু (Hollow of the palm) চুল্‌কাইলে টাকা অথবা চিঠি আসিবে, এই ধারণার কারণ কি?

২৩। পায়ের তলা চুল্‌কাইলে বিদেশে অথবা গ্রামান্তরে যাইতে হইবে, ইহারই বা কারণ কি?

২৪। ভোজনে বসিয়া ক্রন্দন শুনিলে স্ত্রীলোকেরা থালার নীচে জল ঢালিতে বলেন কেন?

২৫। দক্ষিণ নাসারন্ধ্র দ্বারা যখন শ্বাস প্রশ্বাস চলিতে থাকে তখন ভোজন করিলে অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ হয় না, ইহার মূলে কোন কারণ নিহিত আছে কি না?

২৬। দুইজনের মনে একই ভাবের অথবা একই প্রশ্নের উদয় হইলে গৃহে অতিথি কিম্বা কুটুম্ব আসিবে, এ ধারণার তাৎপর্য্য কি?

২৭। কাহারও বিষয়ে কোনরূপ আলোচনা করিবার সময় সেস্থানে তাহার আগমন হইলে সে দীর্ঘজীবী হইবে, এই ধারণার কারণ কি?

ডাক্তার শ্রীআনন্দগোপাল বেনার্জ্জী

২৮। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুদের মধ্যে অনেকে বৈশাখ মাসে নিরামিষ ভোজন করিয়া থাকেন, ইহার কারণ কি? শাস্ত্রে এরূপ নিরামিষ ভোজনের কোন বিধি ব্যবস্থা আছে কি না জানাইলে বাধিত হইব।

২৯। "চোরের ধন বাটপাড়ে খায়" কথাটার ভিত্তি কোথায়?

৩০। কোন কথার পর টিকটিকির ডাক পড়িলে সে কথাটাকে আমরা সত্য বলিয়া ধরিয়া লই, ইহার কারণ কি? এবং অন্য কোথাও এরূপ প্রথার প্রচলন আছে কি না?

৩১। নক্ষত্রখচিত আকাশ হইতে সময় সময় দুই একটী নক্ষত্র স্থানচ্যুত হইয়া পরমুহূর্ত্তেই কোথায় মিলাইয়া যায়; নক্ষত্রটীর ঐরূপ স্থানচ্যুত হইবার কারণ কি এবং কোথায়ই বা মিলাইয়া যায়, বৈজ্ঞানিকেরা বলিতে পারেন কি? উল্কাপাতের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ আছে কি? এতদঞ্চলে (খুলনা, যশোহর প্রভৃতি স্থানে) ঐরূপ নক্ষত্র স্থানচ্যুত হইতে দেখিলে ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় দ্বাদশটী ব্রাহ্মণ ও দ্বাদশটী নদীর ও কুলের নাম স্মরণ করিবার কথা অনেকেই বলিয়া থাকেন। ইহার কারণ কি এবং অন্য কোথাও এরূপ প্রথার প্রচলন আছে কি?

৩২। অধিক পরিমাণে কুইনাইন সেবন করিলে কাণে তালা লাগে ও মাথার মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করিতে থাকে, উহার কারণ কি? এমন কোন উপায় আছে কি যাহাতে উক্ত উপসর্গের তাড়না হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়?

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

৩৩। অনেক দালানে চুণ বালির কাজ করিলে কিছুদিন পরে নোনা ধরিয়া চুণ বালি খসিয়া পড়িয়া যায়। পুনরায় ঐ স্থানে চুণ বালির দ্বারা পূরণ করিলে তাহাও পূর্ব্বাবস্থাপন্ন হয়। উহা নিবারণের উপায় কি?

শ্রীকালিপদ সরকার

৩৪। "নাসিকায় সরিষার তৈল দিয়া ঘুমান" ইহার মূল অর্থ কি?

শ্রীরামমোহন রায়

৩৫। Castor oil কি ভাবে পাত্‌লা করা যাইতে পারে? ইহার কোন সহজ উপায় আছে কি?

৩৬। নারিকেল তৈল, একটু ঠাণ্ডা লাগিলেই জমিয়া যায়, উহা সর্ব্বদা তরল রাখিবার কোন উপায় আছে কি?

৩৭। Whitish chalk Powder reddish করিয়া দন্ত মঞ্জন তৈয়ার করিতে হইলে কোন দেশীয় রঞ্জন দ্রব্য কি ভাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে? (ঐ দ্রব্য যেন দাঁতের অনিষ্টকর না হয়)

শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

উত্তর

চৈত্রমাসের ১৬ নং প্রশ্নের উত্তর। গাছ কাটিয়া তাহার গর্ত্তে পাথুরিয়া কয়লার গুঁড়া দিয়া কেরাসীন তৈল ঢালিয়া দিলে গাছটী মরিয়া যায়।

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর। ছোট পেঁয়াজের একছটাক রস বাহির করিয়া সৈন্ধব লবণ সহ খাইলে বেদনা কমিয়া যায়।

শ্রীলালা আনন্দলাল হাণ্ডে

ছারপোকার ঔষধ

তামাক চূর্ণ ৮ ভাগ কপূর চূর্ণ ৩ ভাগ গামবেঞ্জাইন চূর্ণ ৮ ভাগ একত্র করিয়া বিছানার উপর ছড়াইয়া দিলে ছারপোকা থাকিতে পারে না।

চৈত্রের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর

১২। কাপড়ে বর্ণায় কিংবা লোহার দাগ পড়িলে তাহা উঠাইবার দুটি উপায় আমার জানা আছে :—

১—বৃষ্টির কিংবা বরফের দু ফোঁটা জলের সহিত এক ফোঁটা nitric acid মিশাইয়া সেই দাগটা ধুইয়া ফেলিতে হয়।

২—নেবুর রস ও ভাতের ফেণ মিশাইয়া সেই দাগে রগড়াইতে হয়।

২১। দাঁড়াচ" নামক সাপ তাড়াইবার একটা উৎকৃষ্ট উপায় আছে। যে ঘরে গরু বাছুর থাকে সেই ঘরের চারিদিকে Carbolic acid ছড়াইয়া দিতে হয় এবং তিন চার দিন ছড়াইলে পর সাপ কিছুতেই সে ঘরে ঢুকিতে পারে না।

২২। কোন কোন দেশে কে কুমারী, কে অকুমারী, তাহা তাহাদের পোষাক কিংবা চেহারা দিয়া বুঝা যায় না। কিন্তু এই ভেদ-টুকু বুঝাইবার জন্য বাঙ্গালী বিবাহিতা নারীরা সীমন্তে সিন্দূর ও হাতে লোহা পরিয়া থাকেন। ইহার শাস্ত্রীয় যুক্তি বড় একটা নাই, তবে ইহার প্রচলন হয়,—যখন শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে বিবাহ করেন এবং হিন্দু সমাজ মতে রুক্মিণীই প্রথম সীমন্তে সিন্দূর দেন বলিয়া এখনও ইহা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

২৪। নষ্টচন্দ্রের দিন চাঁদ দেখিলে কলঙ্কিত হইবার ভয় থাকে—ইহা জ্যোতিষীদিগের মত, এবং রাশি অনুসারেই ইহা সংঘটিত হইয়া থাকে বলিয়াই বিশ্বাস। কথিত আছে—সীতা নষ্টচন্দ্রের দিন চাঁদ দেখিয়াছিলেন এবং সিংহরাশি ছিল বলিয়াই তাঁর মিথ্যা কলঙ্ক রটিয়াছিল।*

২৫। গৃহিনীরা বলেন যে দুধে নুন দিয়া খাওয়া আর গো-মাংস খাওয়া এক। কিন্তু ইহার আসল কারণ হচ্ছে—দুধে নুন দিয়া খাইলে জিভে ও গলায় কঠিন ক্ষত হইয়া ভীষণ রোগে দাঁড়ায় এবং তাহা নিবারণের জন্যই পূর্ব্বকালের লোকেরা পূর্ব্বলিখিত প্রবাদটি চলিত করিয়া গিয়াছেন।

২৬। কলিক পেনে আক্রান্ত ব্যক্তির আশু যন্ত্রণা উপশমের ও প্রস্রাব বৃদ্ধি করিবার একটি ঔষধ—ঘোল। যখনই যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয় তখনই এক পাইণ্ট উৎকৃষ্ট ঠাণ্ডা ঘোল খাইয়া ফেলিলে কিছুক্ষণের মধ্যেই যন্ত্রণার উপশম হয়। কিন্তু ঘোল radical cure করিতে পারে না, কেবলমাত্র temporary colic relief আনিয়া থাকে।

শ্রীহরিপদ রায়

চৈত্রের ২১নং প্রশ্নের উত্তর

দুগ্ধবতী গাভীকে রাত্রিতে তাহার বাছুরের নিকট হইতে পৃথক করিয়া রাখা হয়। সাধারণতঃ রাত্রিতে গৃহস্থের আহারের পরে এঁটো হাত (মুখ ধুইবার পূর্ব্বে) এক নিশ্বাসে গাভীর বাঁটের সহিত তিনবার স্পর্শ করিয়া দিলে, তাহার পরদিন দেখিতে পাইবেন সাপে তাহার দুধ খায় নাই। এইরূপ পর পর সাত দিন করিয়া রাখিলে, ঐ গাভীর দুগ্ধ সর্পের নিকট হইতে রক্ষা পাইবে। শ্রীমতী সেফালিকা দেবী

চৈত্রের ১৬নং প্রশ্নের উত্তর :—দালানে চূণ বালির কাজ (plastering) না করিলে কতক বৎসর পর তাহাতে বট অশথ ইত্যাদি গাছের বীজ বাতাসের সহিত অথবা কাক ইত্যাদি পক্ষীদ্বারা আনীত হইয়া তাহাতে গাছ উৎপন্ন হয়। দালানে চূণ বালির কাজ অথবা বিলাতী মাটী দ্বারা pointing করিলে ঐরূপ হইতে পারে না। ঐ সব না করিলে অন্ততঃপক্ষে প্রয়োজন মতে ৮।১০ বৎসর পর ইটের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যে স্থান তাহাতে নূতন করিয়া সুরকী ও চুনা মিলাইয়া লাগাইলে তাহাতে কোনও গাছ জন্মিতে পারে না।

১৭নং প্রশ্নের উত্তর :—মশারী বা বিছানায় ছারপোকা হইলে বিছানার নীচে ঝাউ গাছের পাতা প্রচুর পরিমাণে বিছাইয়া কতক দিন রাখিয়া দিলে অথবা মশারির যে-সব স্থানে ছারপোকা থাকে ঐ ঐ স্থানে কপূর অথবা Naptheline ঘষিয়া দিলে এবং বিছানার নীচে স্থানে স্থানে কপূর অথবা Naptheline রাখিয়া দিলে ঐ মশারি অথবা বিছানায় ছারপোকা থাকিতে পারে না।

২১নং প্রশ্নের উত্তর :—গোয়ালের বেড়ায় কি দেয়ালের স্থানে স্থানে কার্ব্বলিক এসিড ছিটাইয়া দিয়া বা ছোট ২।৩টী শিশিতে কার্ব্বলিক এসিড ভরিয়া গরুর পেছন দিকের বেড়ায় কি দেয়ালের স্থানে স্থানে উন্মুক্ত অবস্থায় ঝুলাইয়া রাখিয়া দিলে ঐ ঘরে আর দাঁড়াচ সাপ যাইবে না। শঙ্খিনী সাপকে দাঁড়াচ সাপ অত্যন্ত ভয় করে। কাল বর্ণের যে কোন মোটা লতা অথবা তদভাবে মোস্তাগ অর্থাৎ যাহা হইতে পাটী তৈয়ার করায় চেটী প্রস্তুত হয়, তাহা ৪।৫ হাত লম্বা লইয়া এক ইঞ্চি অন্তর এক ইঞ্চি মোটা করিয়া চূণ বা কোনও সাদা

* নষ্টচন্দ্র দেখিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের কলঙ্ক রটিয়াছিল যে তিনি স্যমন্তক মণি চুরি করিয়াছেন।—ভাঃ সঃ।

রং দিয়া মাড়িয়া তাহাতে ছোট একটু কাঠি দিয়া গরুর পেছন দিকের দেওয়ালের নিম্ন ভাগে মাটী হইতে অনুমান ১ফুট উপরে রাখিয়া দিলেও দাঁড়াচ ঐ ঘরে আর যাইবে না। এই উভয় প্রকারের মধ্যে প্রথমোক্ত উপায়ই ভাল।

২৬নং প্রশ্নের উত্তর :—Renal colic pain আক্রান্ত ব্যক্তি Thelspi Barsa Pastores নামক হোমিওপ্যাথিক মাদার টিংচার এক ফোটা জলের সহিত সেবন করিলে বেদনার কিছু উপশম হয়। অথবা হঠাৎ অসহ্য বেদনা আরম্ভ হইলে সাবান মিশ্রিত সহমত গরম জল দ্বারা ডুস দিলে তাহাতে বেদনা উপশম হয় এবং প্রস্রাব হয়। ঐরূপ ডুস দিয়া তৎপরই যতটা সম্ভব ডাব নারিকেলের জল পান করিলে প্রচুর প্রস্রাব হইয়া যাইবে। যাহারা ঐরূপ বেদনায় কষ্ট পাইতেছেন তাহারা দুইমাস কাল প্রত্যহ ২ বেলা ২টী ডাব নারিকেলের জল এবং এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ পাতলা বালির জল ও বেলা ২টার সময় মিশ্রীর সরবত এবং রাত্রি শোয়ার সময় আধ সের শীতল জল ও প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া একটী ডাবের জল অথবা ডাব অভাবে আধ সের শীতল জল সেবন করিলে নিশ্চয়ই রোগ মুক্ত হইবেন। তবে যাহাদের পেটের পীড়া আছে তাহাদের সম্বন্ধে এত সহ্য হইবে না বলিয়া ভিন্ন ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। শ্রীরমেশচন্দ্র সোম

চৈত্র সংখ্যার ১৭নং প্রশ্নের উত্তর :—বিছানায় ছারপোকা হইলে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করিলে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে :— দুই টুকরা কাপড়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে কর্পূর বাধিয়া বিছানার মধ্যে শিয়রে ফেলিয়া রাখিলে ছারপোকা মরিয়া যায়। (২) ৩।৪ দিন অন্তর বিছানাগুলি রৌদ্রে দেওয়া উচিত। মাদুর, মশারি প্রভৃতি যেগুলি সম্ভবপর, খুব গরম জলে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিয়া শুকাইয়া লইলে ছারপোকা থাকিবে না। শ্রীকালিপদ সরকার

চৈত্রের প্রশ্নের উত্তর

১৭। চৌকি বা খাটের নিম্নে কর্পূরের পুটলি বাঁধিয়া রাখিলে ছারপোকা থাকে না চারি কোনে চারিটা বাঁধিয়া রাখিবেন।

২৫। দুগ্ধে নুন খাইলে হজমের ব্যাঘাত হয়।

শ্রীগৌরমোহন ঘোষ

চৈত্রমাসের ১৫শ প্রশ্নের উত্তর

শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে অতিশয় দুর্দ্দান্ত ছিলেন। তাঁহার উৎপাতে ব্রজপুরে সকলে অস্থির থাকিত, তাঁহার স্বভাব সুলভ উৎপাতে ব্রজবাসীর মনে এমন একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, অন্য কাহারও দ্বারা কোন অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান হইলেও তাহারা বলিত এ কাজ নন্দের বেটার, হক্-না হক্ কারণে নন্দ ঘোষের নিকট এইরূপ অভিযোগ হইত বলিয়া তিনি বিরক্ত হইয়া বলিতেন—

"যত দোষ নন্দঘোষ।"

শেখ আব্দুল গফুর জালালী

ছন্ন-ছাড়া

শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায়

(১)

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে গয়লা-পাড়ার দোকান হইতে গ্রামের পথ ধরিয়া মালতী বাড়ী ফিরিতেছিল ;—তার এক হাতে কয়েকটা পানের গোছা, আর এক হাতে কাগজে বাঁধা কয়েকটা জিনিস। পথে ক্ষুদিরামকে আসিতে দেখিয়া ভাবিল, একটু পাশ কাটিয়া চলিয়া যাইবে ; কিন্তু তাহার চোখ এড়াইয়া নিষ্কৃতি পাওয়া সহজ কথা নয়! মালতীকে দেখিতে পাইবামাত্র মুচকি হাসিয়া সে তাহার মুখের নিকটে হাত দুইটা যথাসম্ভব বিস্তৃত করিয়া গাহিয়া উঠিল,—

'মালতীর মালা শুকায়ে গিয়েছে,
কি দিব তোমারে আজ,—
রাজ-অধিরাজ !'

......এই খামখেয়ালী পাগল ক্ষুদিরামের অনাচার অত্যাচার, সময়ে অসময়ে গ্রামের প্রায় সকলকেই সহিতে হইত ; তবে মালতীর উপরেই, মনে হইত, তাহার নজর একটু প্রখর!

মালতী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া একটু বিকৃত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, আ মর্! আমার সঙ্গে তোর কি আছে রে মুখ্-পোড়া ? .....তোর মামীকে বলে' ঠ্যাং খোঁড়া করে' দিচ্ছি, ছাখ্ তবে!

ক্ষুদিরাম গান বন্ধ করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল,—এই ভর্ত্তি সাঁজের বেলা একমাথা এলো চুল ঝুলিয়ে তুই ওই ক্ষ্যাপা কালী-মন্দিরের পাশ দিয়ে যাবি তো ? কাল দেখে নিস্ তোকে ভূতে পাবে তা'হলে!

—তা পা'ক্, তোর কি ? বলিয়া মালতী চলিয়া গেল। ক্ষুদিরামও ঈষৎ হাসিয়া আপন মনে গান গায়িতে গায়িতে সোজা রাস্তা ধরিল।

গ্রামের এক প্রান্তে তালপাতার একটা কুঁড়ে বাঁধিয়া ডোমেরা মনসা পূজা করিতেছিল। কয়েকজন বেদে প্রতিমার সম্মুখে সারি দিয়া বসিয়া ঢাক বাজাইয়া মনসার 'গাত' গাহিতেছিল। তড়াক্ করিয়া ক্ষুদিরাম তাহাদের হাত হইতে একটা ঢাক কাড়িয়া লইয়া বাজাইতে বাজাইতে তন্ময় হইয়া গায়িতে লাগিল,—

—সুতার সঞ্চারে মাগো, প্রবেশিয়া ঘরে,
লখিন্দরে দংশিলে মা, বল কেমন করে—!

প্রায় আধঘণ্টা পরে গান বন্ধ করিয়া ঢাকটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ক্ষুদিরাম সেখান হইতে উঠিয়া পড়িল। আকাশ ভাঙিয়া জ্যোৎস্নার শুভ্র আলোক তখন সারা গ্রামের উপর ঝরিয়া পড়িতেছে। ক্ষুদিরাম গুন্ গুন্ করিয়া গান গায়িতে গায়িতে বাড়ীর দিকে চলিতেছিল; শুঁড়িদের ভোলা তাহাকে আসিতে দেখিয়া চট্ করিয়া পথের ধারে একটা বকুল গাছের আড়ালে গিয়া লুকাইল। সে তাহা দেখিতে পাইয়াছিল। তাড়াতাড়ি তাহার কাণ ধরিয়া খানিকটা হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া আনিতেই ভোলার কোঁচড়্ হইতে প্রায় সেরখানেক ছোট ছোট মাছ ঝর্ ঝর্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

ক্ষুদিরাম বলিল, চুরি ক'রে মাছ ধর্‌তে গিয়েছিলি বুঝি, শুয়ার! নদীতে মাছ ধর্‌তে যাব বলেছিলাম না কা'ল রেতে। আমাকে উঠিয়ে নিয়ে যাস্‌নি কেন,—বল্।

কাণের যন্ত্রণায় খানিকটা উঃ, আঃ, করিয়া ভোলা বলিল, আজ কোন্ শালা ডেকে' নিয়ে না যায়। ..... আজকার মত ছেড়ে' দাও, মাইরি! .....

ক্ষুদিরাম তাহার কাণটা ছাড়িয়া দিয়া মাথায় একটা চড় বসাইয়া বলিল, আজ না গেলে কিন্তু জান্‌তেই পার্‌বি।... ..

আর কিছু না বলিয়া সে চলিয়া গেল। ভোলা একবার পিছন ফিরিয়া দেখিয়া লইয়া, কাঁদ কাঁদ মুখে মাছগুলা তাড়াতাড়ি কুড়াইতে লাগিল।

বাড়ীর নিকট পৌছিতেই ক্ষুদিরাম চীৎকার করিয়া গান ধরিল,—

"গোঠে হইতে আইল, নন্দদুলাল—"

মামীমা ব্রজসুন্দরী তাহারই অপেক্ষায়, বাড়ীর চালার খুঁটিতে ঠেস্ দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। তাহার গলার আওয়াজ কাণে আসিতেই, উঠিয়া কেরোসিনের ডিবেটা তাড়াতাড়ি জালিয়া লইয়া মনে-মনেই বলিল, এই যে নন্দদুলাল আস্‌ছেন আমার, দেখি আজ আবার কার কার সর্ব্বনাশ করে' এলেন!

বাড়ীর উঠানে আসিয়া গান থামাইয়া ক্ষুদিরাম কহিল, আজও কি পান্তা ভাত না কি?

ব্রজসুন্দরী রান্নাঘরের দরজাটা খুলিয়া বলিল, তা বই আর গরম ভাত দুবেলা কে রাঁধে বাবা!

—আচ্ছা, তাই, তা-ই! কুছ্ পরোয়া নাই,—দে, চট্ করে দে, ঘুমোতে হবে। সকালেই আবার নদী ছুট্‌বো........ ...দেখবে মামী, কাল ইয়া বড় বড় মাছ!

ভাত বাড়িয়া দিয়া মামী-মা বলিল, আজ কিন্তু এম্‌নিই খাও, মাছ-টাছ্ কিছু নেই বাবা!

একটু ভাবিয়া সে বলিল, ভোলা শালার কাছে দুটো চুনো পুঁটি আন্‌লেও যে হতো,—ভেজে দিতিস্ তাহলে তড়াক্ করে।.........মরুগ্ গে,—

......আহারের পর, মনের আনন্দে শিশ্ দিতে দিতে ক্ষুদিরাম বিছানায় গিয়া শুইল; কিন্তু নদীতে মাছ ধরিতে যাইবার আনন্দে সে রাত্রে তাহার আর ঘুম হইল না।

শেষ রাত্রে ভোলা আসিয়া ডাকিতেই, তড়াক্ করিয়া বিছানা হইতে উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। ভোলা ভয়ে-ভয়ে একটু রাত্রি থাকিতেই উঠিয়া আসিয়াছিল। ক্ষুদিরাম বাহিরে আসিয়া দেখিল, জ্যোৎস্না ডুবিয়া গেছে,—চারিদিকে একটা ঘোলাটে অন্ধকার!

সেই নিঝ্‌ঝুম ঘুমন্ত পল্লীর রাস্তা ধরিয়া ভোলাকে সঙ্গে লইয়া ক্ষুদিরাম নদীর দিকে চলিতে লাগিল। হাড়িদের কয়েকটা বস্তির মধ্যে যে সরু পথটা নদীর কিনারে গিয়া পৌঁছিয়াছে, সেই রাস্তা ধরিয়া গেলে শীঘ্র শ্মশান-ঘাটায় পৌছিতে পারিবে ভাবিয়া, ক্ষুদিরাম সেই পথটা ধরিয়াই চলিতেছিল। ভোলা ধীরে-ধীরে কহিল,—এ পথে না গেলেই ভাল হতো ক্ষুদিরাম, হাড়িপাড়ায় কলেরা হচ্ছে।

ক্ষুদিরাম কথাটা গ্রাহ্য না করিয়া বলিল,—ধেৎ, ও-সব আমি পরোয়া করি না। চলে' আয় তুই,—কোন ভয় নেই।

নিরুপায় দেখিয়া ভোলা তাহার পাশ ঘেঁসিয়া অতি সাবধানে মনে মনে রাম নাম করিতে করিতে অগ্রসর হইল।

......কিছুদূর গিয়া পথের পাশে একটা অস্ফুট কাতর গোঙানির শব্দে ক্ষুদিরাম চমকিয়া দাঁড়াইল। ভোলাকে ইঙ্গিত করিয়া বলিল, একটা কিসের শব্দ হচ্ছে নয় ভোলা? শোন্ দেখি?

চারিদিকের ছোট ছোট ঘরগুলার আশে-পাশে, গাছপালার ঝোপে-ঝোপে তখনও জমাট-বাঁধা অন্ধকার! এখানে-ওখানে দু' একটা জোনাকী পোকা জ্বলিতেছে, আবার নিবিয়া যাইতেছে। ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা সুর কেবলই রিম্ ঝিম্ করিতেছিল। আর মাঝে-মাঝে সেই আর্ত্ত চীৎকার!......

ভোলা শব্দ শুনিবে কি, ভয়ে তখন তাহার যা হইবার হইতেছিল। ক্ষুদিরামের মনে হইল, পাশেই একটা বৃক্ষের নীচে বোধ হয় কোন মানুষ সকাতরে অস্পষ্টভাবে গোঙাইতেছে! খানিকটা অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে রে এখানে?

কাতর কণ্ঠে উত্তর আসিল,—আমি মানকে হাড়ি, হুজুর!

ক্ষুদিরাম স্তব্ধভাবে দাঁড়াইল পড়িল!

সে আবার অতি কষ্টে বলিল, কাল সন্ধ্যা থেকে ভেদ বমি। পেবাসী ঘর থেকে' টেনে ফেলে' দিয়েছে হুজুর! জল খাব।

বৃদ্ধ মাণিক হাড়ি এবং তাহার কন্যা প্রবাসীকে ক্ষুদিরাম এবং ভোলা উভয়েই বেশ ভাল করিয়া চিনিত। ভোলার হাত ধরিয়া একটা টান মারিয়া ক্ষুদিরাম কহিল, আয় আমার সঙ্গে।

রাস্তার উপরেই মানিকের খড়ো বাড়ী। ক্ষুদিরাম দরজায় গিয়া এক ধাক্কা মারিয়া ডাকিল, প্রবাসী, প্রবাসী!

কোন সাড়া-শব্দ নাই।

রাগে তখন তাহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিতেছিল; আবার ডাকিল,—পেবাসী!

এবারেও ভিতর হইতে কোন উত্তর পাইল না।

সে আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। দরজায় সজোরে কয়েকটা আঘাত করিতেই সশব্দে দরজাটা ভাঙ্গিয়া গেল।...

ঘন অন্ধকারে গা ঢাকিয়া একটা লোক ঘর হইতে চুপিচুপি বাহির হইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল। ক্ষুদিরাম চট্ করিয়া তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিল; গুড়ুম্ করিয়া তাহার পিঠের উপর একটা রাম কিল বসাইয়া দিতেই লোকটা ভয়ে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে অতি মৃদুস্বরে বলিল, ছেড়ে দে ভাই ক্ষুদে' আজকার মতন। আমি আর কখনও.........

অন্ধকারে তাহাকে ভাল চিনিতে না পারা গেলেও গলার স্বরে জানিতে পারা গেল, লোকটা কে! সে তাহাদেরই পুরোহিত বনমালী চক্রবর্ত্তী। তাহাকে সে একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বলিয়াই জানিত। সেই কিনা এই বিসূচিকা-রোগাক্রান্ত পল্লীতে একটা কুলটা নীচ স্ত্রীলোকের সহিত রাত্রিবাস করিতেছে এবং সেই হতভাগীর জন্মদাতা বৃদ্ধ পিতা রাস্তার ধারে পড়িয়া সমস্তটা রাত্রি মরণের সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে ক্লান্ত পরিশ্রান্তভাবে শেষ মুহূর্ত্তের অপেক্ষায় ছটফট্ করিয়া মরিতেছে! এসব দিকে ক্ষুদিরাম যদিও তত বেশী লক্ষ্য করিত না, তথাপি আজ স্বচক্ষে এই ব্যাপারটা দেখিয়া তাহার মাথা রিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। বনমালীর হাতটা ধরিয়া থাকিতেও তাহার ঘৃণাবোধ হইতেছিল; তাই তাহাকে আর কোন কথা না বলিয়া হাতটা ছাড়িয়া দিয়া প্রবাসীর সন্ধানে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রবাসী তখন দরজার এক পাশে আপাদমস্তক কাপড়ে ঢাকিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

গলাটা একটু পরিস্কার করিয়া লইয়া ধীর গম্ভীর স্বরে ক্ষুদিরাম ডাকিল, প্রবাসী!

প্রবাসী যেমন দাঁড়াইয়া ছিল, তেম্‌নি দাঁড়াইয়া রহিল। সে আর অপেক্ষা করিতে পারিল না। প্রবাসীর হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া বাহিরে আনিয়া বলিল, আচ্ছা তোর আক্কেল যা হোক্, হারামজাদী! বুড়ো বাপ রাস্তায় পড়ে' মরে যাচ্ছে, আর ঢং ত্থাখ্ ছুঁড়ির।......আয় আয়, মানকেকে ঘরে তুলে নে!......লজ্জাও নেই। বলিয়া প্রবাসীকে টানিতে টানিতে বৃদ্ধ মানিক যেখানে মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছিল সেইখানে লইয়া গিয়া বলিল, ধর্,—তুই একধারে আমি একধারে—চল্,বাড়ীর ভিতর নিয়ে চল্।

অতি কষ্টে উভয়ে মানিককে তুলিয়া আনিয়া, ঘরের ভিতর যে মলিন শয্যা পাতা ছিল, তাহারই উপর শোয়াইয়া দিল।

মানিকের অপরিস্কার কাপড়টা ছাড়াইয়া বেশ করিয়া মুছিয়া অন্য একটা কাপড় পরাইবার উপদেশ দিয়া ক্ষুদিরাম ছুটিয়া সে স্থান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ডাকিল, ভোলা! ইস্, অনেক দেরী হয়ে গেল রে!

ভোলা তখন প্রাণের ভয়ে দূরে একটা অশ্বত্থগাছের নীচে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। ক্ষুদিরাম নিকটে যাইয়া বলিল, দেখলি, হারামজাদী বেটিদের কাজ। আমরা না এলে বুড়ো রাস্তাতেই মর্‌তো।

সদ্য কলেরার রোগীকে ছুঁইয়া আসিয়াছে বলিয়া ক্ষুদিরামের সঙ্গে যাইতেও ভোলার তেমন সাহস হইতেছিল না, কিন্তু কি করিবে গত্যন্তর না দেখিয়া যাইতে হইল।

(২)

ক্ষুদিরামের মামী ব্রজসুন্দরী ছিল নিঃসন্তান এবং ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা। গ্রামের লোকের এটা-ওটা-সেটা কাজ করিয়া এবং বিঘা দুই জমির চাষ হইতে কোনরকমে দুইজনের দিন চলিত। ব্রজসুন্দরী ভাবিত, ক্ষুদিরামের সংসার পাতিয়া দিয়া এইবার মরিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হইবে। কিন্তু কপাল-গুণে ক্ষুদিরামও আবার তেমনি! আপ্-খুসী-মাফিক্ কাজ করে, যেথানে-সেখানে যার-তার সাথে ঘুরিয়া বেড়ায়, যা তা বলে, আর সমস্তটা দিন গান গায়িয়া, শিশ্ দিয়া কাটাইয়া দেয়। কোনদিন বিবাহের নাম করিলে তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠে! ব্রজসুন্দরী মনে করিত, এমন খাম্-খেয়ালী ছেলে তো জগতের লোকের কত হয়, তাই বলিয়া কি আর সংসার করে না? সেও নিশ্চয় করিবে, এখনও ছেলেমানুষ বই তো নয়! কিন্তু ক্ষুদিরাম সংসার করুক্ আর নাই করুক, অদৃষ্টের ফেরে সে সব দেখিবার অবসর ব্রজসুন্দরীর হইল না।

......সেই যে সেদিন হাড়িপাড়ায় কলেরা রোগ দেখা দিয়াছিল, রোগটা ক্রমে-ক্রমে চাষা-পাড়া, ডোম-পাড়া, নাপিত-পাড়া হইতে অবশেষে বামুন-পাড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রথমেই আক্রান্ত হইল ব্রজসুন্দরী।

সমস্তটা দিন এদিক ওদিক ঘুরিয়া সন্ধ্যার পর ক্ষুদিরাম বাড়ী ফিরিয়াই দেখিল, তাহার মামী বারকয়েক ভেদ-বমি করিয়া একেবারে শয্যাশায়িনী হইয়া পড়িয়াছে। গ্রামে ডাক্তার কবিরাজের বালাই নাই। ভিন্ন গ্রাম হইতে ডাক্তার আনিবার সঙ্গতিও তাহার ছিল না; কাজেই ভগবানের উপর নির্ভর করা ছাড়া অন্য উপায় নাই দেখিয়া, ক্ষুদিরাম প্রাণপণে মামীর সেবা যত্ন করিতে লাগিল। খানিকটা রাত্রি পর্য্যন্ত মামীমার শিয়রে বসিয়া থাকিয়া, সে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

ঘুম ভাঙ্গিতেই দেখিল, বাহিরে সে কি প্রলয় উন্মাদনা! আকাশ ভাঙ্গিয়া ঝর ঝর ধারে বাদল নামিয়াছে, মেঘ ডাকিতেছে, বিদ্যুৎ চম্‌কাইতেছে, এবং সেই অবসরে কয়েকবার বিছানার উপরেই ভেদবমি করিয়া তাহার মামীমাও মরিয়া গিয়াছে! কেরোসিনের আলোটা তুলিয়া ধরিয়া, বেশ ভাল করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ক্ষুদিরাম দেখিল, তাহার মামীর হাত-পাগুলা কাঠির মত শক্ত হইয়া গিয়াছে, দাঁতগুলা বিকৃতভাবে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

বাহিরে ঝড়জলের ভীষণ মাতামাতি, আর ঘরের মধ্যে সে একাকী তার আশ্রয়দাত্রী স্নেহময়ী মামী-মায়ের মৃতদেহ লইয়া কি করিবে খানিক ভাবিল। তারপর বাড়ীর বাহিরে আসিয়া শিকলটা টানিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া, আসিয়া দাঁড়াইল ঠিক উঠানের মাঝখানে! মাথার উপর দিয়া বজ্র হাঁকিয়া গেল, চোখ ধাঁধাইয়া বিদ্যুৎ চম্‌কাইল তীরের মত বারিধারা গায়ে আসিয়া বিঁধিতে লাগিল। কোথায় যাইবে সে?......কোথায়, কাহার আশ্রয়ে?......

হঠাৎ একজনের কথা মনে হইতেই, অন্ধকার রাত্রে জলে ভিজিয়া ক্ষুদিরাম আসিয়া দাঁড়াইল বিধবা মালতীর দরজার পাশে!

সিক্ত কণ্ঠে ডাকিল, মালতী! মালতী!

গুম্ গুম্ করিয়া দরজায় কয়েকটা কিল মারিয়া বলিল, আর তোকে কখনো কিছু বল্‌ব না মালতী, একবারটি শুধু সাড়া দে আজ!

বারিবর্ষণের সন্ সন্ শব্দে হয় তো বা তাহার নিজের ডাক নিজেই শুনিতে পাইল না! ধীরে ধীরে আবার সেই জল সপ্‌সপে পথের উপর নামিয়া ভিজিতে ভিজিতে বাড়ী ফিরিল। দেখিল, সবই তেমনি নিস্তব্ধ!

কেবলমাত্র পাড়ায় কার বাড়ীতে দুইটা বিড়াল কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছিল; তাদেরই করুণ সুর জলো হাওয়ায় ক্ষীণ অস্পষ্ট হইয়া কাণে আসিয়া বাজিতেছে।......

ক্ষুদিরাম আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া ঘরের শিকল খুলিয়া ভিতরে ঢুকিল। ব্রজসুন্দরীর শিয়রে কেরোসিনের ল্যাম্পটা বাতাসে কাঁপিয়া কাঁপিয়া তখনও জ্বলিতেছিল! সে যেন কোন্ ধ্বংস-দেবতার রুদ্রদৃষ্টি ঘরের মধ্যে জাগিয়া রহিয়াছে!

বিছানার চাদরে বেশ করিয়া জড়াইয়া, মৃতদেহটা কাঁধের উপর অতিকষ্টে তুলিয়া লইয়া, ক্ষুদিরাম একেবারে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। একবার জোরে নিঃশ্বাস লইয়া, সেই স্তব্ধ বাদলের অজস্র ধারার মাঝে প্রান্তরের উপর দিয়া সে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল একেবারে নদীর কিনারায়! ভাদ্রের ভরা-নদী তখন দুকুল ছাপাইয়া বহিয়া চলিয়াছে। ক্ষুদিরাম কাঁধ হইতে মৃতদেহটা নামাইয়া ধীরে-ধীরে সেই নদীর জলে ছাড়িয়া দিল। বন্যার প্রবল স্রোত কাগজের নৌকার মত সেটা কোন্‌দিক দিয়া ভাসাইয়া লইয়া গেল, কে জানে? একবার ভাবিল, সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেও ঝাঁপাইয়া পড়িবে কি না!... ..পশ্চাতে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, বিদ্যুৎ চমকিল,—কে যেন বলিল, না, না, না!

ক্ষুদিরাম আপন মনেই গ্রামের দিকে ফিরিল। পথে ঘাটে তখনও রাত্রির অন্ধকার। বৃষ্টির জোর খানিকটা কমিয়া আসিলেও মেঘের গর্জ্জন তখনও থামে নাই। প্রান্তরের উপর বাঁশগাছের প্রকাণ্ড ঝাড়গুলার উপর প্রবল বাতাস যেন আর্ত্তনাদ করিয়া ঘুরিয়া মরিতেছিল। এই উন্মুক্ত প্রকৃতির তাণ্ডব লীলার মধ্যে দাঁড়াইয়া ক্ষুদিরাম যেন হঠাৎ আপনাকে চিনিতে পারিল। খেয়ালী বিধির ছন্নছাড়া সৃষ্টির মধ্যে তাহার নিজের জীবনটাও তো এমনি একটা বেদন-বেহাগের করুণ সুর-মূর্চ্ছনা!...

ক্ষুদিরাম যখন গ্রামে প্রবেশ করিল, তখন রাত্রির অন্ধকার কাটিয়া গেছে। কি প্রলয় মাতামাতিতেই না রাত্রিটা পার হইয়া গেল!...

পথের মাঝে যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল, ক্ষুদিরাম তাহারই সম্মুখে মাথায় হাত দিয়া হাসিতে হাসিতে 'হরি-বোল' 'হরিবোল' বলিয়া ধেই ধেই করিয়া নাচিতে লাগিল। সকলে ভাবিল, ছেলেটা একেবারে পাগল হইয়া গিয়াছে!...

......মালতী সবেমাত্র বিছানা হইতে উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া উনানে আগুন দিতে যাইবে, এমন সময় পা টিপিয়া টিপিয়া ক্ষুদিরাম তাহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

আপাদমস্তক জলে ভিজিয়া এত সকালে সে আবার কোথা হইতে, কি জন্য আসিল, জানিবার জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মালতী জিজ্ঞাসা করিল,—কি রে?

মালতীকে দেখিয়াই তাহার মুখের হাসি মিলাইয়া গিয়াছিল; আর্দ্র কণ্ঠে বলিল, শুনেছিস্ মালতী?

ব্যগ্র উৎসুক দৃষ্টি লইয়া মালতী জিজ্ঞাসা করিল,—কি?...

সারা জীবন ভরিয়া যে অশ্রুর পাথার বুকের কোন্ নিভৃত কলিজার নীচে জমাট বাঁধিয়া বসিয়াছিল, এতক্ষণে দর দর ধারায় ক্ষুদিরামের দুই চক্ষু বহিয়া তাহা ঝরিয়া পড়িল। দাঁতে দাঁত চাপিয়া স্তব্ধভাবে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, মাসী-মা মারা গেছে রে।

মালতী বজ্রাহতের মত ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—এ্যাঁ, তা কি রে?

ক্ষুদিরাম সেখানে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া সেখান হইতে পলাইয়া গেল।

তাহার পর সেই যে ক্ষুদিরাম গ্রাম ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেছে, সে সংবাদ আর কেহই বলিতে পারে না!

বাঙ্গলার বর্ত্তমান

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

যাঁর সঙ্গে দেখা হয়, তাঁর মুখেই শুনতে পাই যে, পলিটিক্সে বাঙ্গালী জাতটা দুই-তিন ক্লাস নেবে গিয়েছে।

বাঙালীর বিরুদ্ধে বাঙালীর এ অভিযোগ একেবারে নূতন নয়। শ্রীমতী আনি বেসান্ত দেশে যখন Home Ruleএর আন্দোলন তোলেন, তখনও এ অভিযোগ নানা লোকের মুখে শুনেছি। তার পর মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনে বাঙালী যে তেমন স্ফূর্ত্তি করে যোগ দেয় নি, এ কথা ত গোটা ভারতবর্ষ জানে। উক্ত আন্দোলনে বেহারও যে বাঙলার উপর টেক্কা দিয়েছে, তাও ত অস্বীকার করবার যো নাই।

এখন পর্য্যন্ত আমাদের দেশে পলিটিক্স মানে পলিটিকাল আন্দোলন; এবং সম্ভবতঃ সকল দেশেই তাই। সুতরাং পলিটিকাল আন্দোলনে বিধিমত আন্দোলিত না হওয়ার অর্থ অবশ্য পলিটিক্সে পিছু হটা।

এ রকম হওয়ার অবশ্য অনেক কারণ আছে,—যেমন পৃথিবীর সব ঘটনারই থাকে। তবে কি কারণে বাঙালী জাতির এ দশা ঘটেছে, তা নির্ণয় করবার ভার ইতিহাসের হাতে। আর আজ আমি বর্ত্তমানের ইতিহাস, অর্থাৎ অন্তরে পুরাতত্ত্ব লিখতে যাচ্ছি নে বলে, আমাদের পলিটিকাল অন্যমনস্কতার কারণ আবিষ্কার করবার চেষ্টা করব না। তবে এ কথা ঠিক যে, অধিকাংশ বাঙালীই এখন পলিটিকাল Sceptic হয়ে উঠেছে। যে কোন বাঙালীর সঙ্গে কথা কন, পাঁচ মিনিটে ধরা পড়বে যে, তিনি কোন রকম প্রচলিত পলিটিকাল মতে বিশ্বাস করেন না, এমন কি পলিটিকাল নাস্তিকতাতেও নয়। আমি sceptismকে ভয় করি নে, কেন না ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, scepticismএর জমি থেকেই নূতন বিশ্বাস জন্মলাভ করে, আর পুরোনোর তুলনায় সে নূতন বিশ্বাস হয় ঢের বেশী টেঁকসই।

বাঙলা আজ পর্য্যন্ত দাবী করে এসেছে যে, সে হচ্ছে ভারতবর্ষের নবযুগের নেতা। সুতরাং পলিটিক্সে তার নেতৃত্বপদ হারানোটা অনেকে দুঃখের বিষয় মনে করেন। তাতে না কি তার প্রাণ শক্তির হ্রাসের পরিচয় পাওয়া যায়। বছর আড়াই পূর্ব্বে জনৈক অ-বাঙালী নেতা (ইতিমধ্যে তিনি নন-কো-অপারেশনের জনৈক উপনেতা হিসেবে খুব নাম করেছেন) আমাকে বিদ্রূপ করে বলেন যে, আমি হচ্ছি সেই শ্রেণীর বাঙালীর অন্যতম, যারা মনে ভাবে, "Bengal first, Bengal second, Bengal last"। কথাটা শুনে আমি ঈষৎ বিরক্ত হই। কেন না উক্ত মন্তব্যটি প্রথমতঃ অযথা, দ্বিতীয়তঃ অভদ্র। উক্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। আমি অপর আর এক ব্যক্তির সঙ্গে কথা কচ্ছিলুম; সে কথা উক্ত পলিটিকাল নেতার শ্রবণগোচর হবামাত্র, তিনি অনাহূত তেড়ে এসে আমার কাছে উক্ত বাঙ্গালী-বিদ্বেষ প্রকাশ করলেন। এরূপ ব্যবহারকে অবশ্য বাঙলায় সৌজন্য বলে না। তারপর যে কথা আমি বলছিলুম, তার ভিতর আমার বাঙালী পেট্রিয়টিজমের গন্ধ মাত্রও ছিল না। কাজেই প্রত্যুত্তরে আমি বলতে বাধ্য হলুম যে, Second ও last এর বিষয় আমি কিছু জানি নে, কিন্তু Bengal যে first, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। এ ঘটনার এখানে উল্লেখ করবার প্রয়োজন এই যে, সত্য হোক, সত্যাভাস হোক, Bengal first, এ ধারণা বাঙালীমাত্রেরই থাকা উচিত। যে ছেলে আগে থাকতে মনে ঠিক দিয়ে বসে যে, ক্লাসে সে last, সে

কস্মিনকালেও first হতে পারে না। আর যে মনে করে সে first, সে অন্ততঃ first হবার চেষ্টা করে। অপরের মত বাঙালী জাতেরও আত্মবিশ্বাস থাকা ভাল। এই বিশ্বাসবশতই আমি সহজে মানতে চাই নে যে, বাঙালী জাতির প্রাণ-শক্তির দিন-দিন ক্ষয় হচ্ছে। অতএব দেখা যাক্, বাঙালী আর কোনও বিষয়ে প্রাণের সাড়া দিচ্ছে কি না?

সকলেই লক্ষ্য করেছেন যে, বাঙলার সাহিত্যে ও সংবাদপত্রে একটা নূতন সুর আছে।

সেকালে এ দেশে যাকে social reform বলত, সে বিষয়ে দেখতে পাওয়া যায়, দেশের লোকের মত বদলেছে। স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা প্রভৃতির পক্ষপাতীরা কিছুদিন আগে সাহিত্যে ও সংবাদপত্রে ঠাট্টার পাত্র ছিলেন। এখন হয়েছেন ঠাট্টার পাত্র—যাঁরা ও-সকলের বিরোধী। গৌড়ের অসবর্ণ বিবাহ বিলের বিরোধী পক্ষের উপর কি রকম বিদ্রূপ বর্ষণ হচ্ছে, তা বাঙলা সংবাদপত্রের পাঠকমাত্রেই জানেন। আর যাঁরা হিন্দু-সমাজের চিরাগত রীতি-নীতির পক্ষপাতী, তাঁরাও এ দেশের স্ত্রীজাতি ও নিম্নশ্রেণীকে দাসদাসী করে রাখবার সপক্ষে আজ কোনরূপ বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক অথবা আধ্যাত্মিক যুক্তি দেখাচ্ছেন না। পূর্ব্বে যে তা নিত্য দেখাতেন, তার সাক্ষী ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লাখ কথার এক কথা—"Huxley, শশধর আর goose"। এই তিনের মিশ্রণেই যে সেকালের সনাতনী মত গড়ে তোলা হয়েছিল, তা তিনিই জানেন, যাঁর বিশ বৎসর আগেকার বাঙলা সাহিত্য ও সংবাদপত্রের সঙ্গে পরিচয় আছে। কোনরূপ সামাজিক মুক্তির নাম শুনলে যাঁদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, তাঁরা সমাজের সনাতন আচার বজায় রাখবার সপক্ষে এখন একমাত্র পলিটিকাল যুক্তি দিতে বাধ্য হচ্ছেন। তাঁরা বলেন, সমাজের এ সকল সংস্কার তাঁরা ইংরাজের আইনের সাহায্যে করতে চান না। যে দিন তাঁরা স্বরাজ্য পাবেন, অর্থাৎ যেদিন তাঁরা দেশের রাজা হয়ে বসবেন, সেদিন তাঁরাই সমাজকে মুক্তি দেবেন।

অতএব দেখা যাচ্ছে, এঁরাও মনে করেন যে, এ সব সংস্কার এক দিন না এক দিন করতেই হবে। সেই Evil day তাঁরা যত দিন পারেন, তত দিন পিছিয়ে দিতে চান। স্বরাজ পেলে তাঁরা নিজে অবশ্য দুর্দ্দান্ত সমাজ-সংস্কারক হয়ে উঠবেন; তবে কবে যে তাঁরা তা পাবেন, এখন আর তার তারিখ ফেলা নেই।

এই নূতন মনোভাবের আর একটি লক্ষণ বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। স্ত্রীলোকের স্বাধীনতার দাবী আজকের দিনে প্রধানতঃ স্ত্রীলোকেই তুলেছে। এ বিষয়ে আজকাল লেখকের চাইতে লেখিকার সংখ্যাই বেশী। অনেকে এই ব্যাপারের নাম দিয়েছে নারী বিদ্রোহ। সত্য কথা বলতে গেলে, বর্ত্তমান সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে অন্তঃপুরবাসিনীরা যে মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছেন, সে মনোভাব সামাজিক evolutionএর নয়, সামাজিক revolutionএর পূর্ব্বাভাস। এঁরা ভবিষ্যতে কি নূতন ব্যবস্থা চান, সে বিষয়ে এঁদের কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই; কিন্তু সমাজের বর্ত্তমান ব্যবস্থা যে নষ্ট করা দরকার, সে বিষয়ে এঁরা সকলেই একমত; এবং সে মত তাঁরা খুব স্পষ্ট করেই ব্যক্ত করছেন। আর পরিস্ফুট হৃদয়াবেগ ও অস্পষ্ট আশা—এ দুয়ের যোগেই revolution জন্মলাভ করে।

বাঙলা সাহিত্য ও বাঙলা সংবাদপত্রের এই সব ধস্তাধস্তি পড়ে অনেকে হাসেন। তাঁরা বলেন, সমাজ যেমন চলছিল তেমনিই চলচে, তার এক চুলও বদল করবার সাহস কারও নেই। সুতরাং ঐ লেখালেখি হচ্ছে মুখের কথা মাত্র,—ওর কোনই ফল হবে না। ভবিষ্যতে কি হবে আর না হবে তা বলা অসাধ্য।

সম্ভবতঃ স্ত্রীজাতির এই সব বলা-কওয়া একটা সাহিত্যিক খেলা মাত্র। বাঙালী পুরুষদের কাছ থেকে বাঙালী মেয়েরা হয় ত এই বক্তৃতা-রোগ পেয়েছে। তা যদি হয়, তা'হলে অবশ্য সমাজ যেখানে আছে সেখানেই থাকবে, অর্থাৎ কোনখানেই থাকবে না।

আবার এও হতে পারে যে, যে মনোভাব আজ কথায় ব্যক্ত হচ্ছে, কাল তা কাজে ব্যক্ত হবে। ইতিহাসে এর যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে, মানুষের আগে মনের বদল হয়, তার পর তার জীবনের বদল হয়। আর এ কথা নিশ্চিত যে, মানুষের মন না বদলালে, তার জীবন বদলাবার চেষ্টা একেবারেই ব্যর্থ। আমাদের রাজনৈতিক অনেক চেষ্টা যে অদ্যাবধি পণ্ড হয়েছে, তার কারণ, পঞ্জিকা-শাসিত মন নিয়ে আমরা স্বরাট্ হতে চেয়েছি। সামাজিক জীবনে দাসত্বের আদর্শ শিরোধার্য্য করে রাষ্ট্রীয় জীবনে স্বাধীনতা লাভ করবার আকাঙ্ক্ষা যে ভাববিলাসমাত্র, এ ধারণা আজ বহু লোকের মনে স্থান পেয়েছে। সে যাই হোক, এই ব্যাপারেই প্রমাণ যে, বাঙালী জাতির প্রাণ-শক্তির হ্রাস হয় নি, বৃদ্ধি হয়েছে।

মানুষ জড় পদার্থ নয়, সচেতন জীব। আমরা যাকে বলি প্রাণের সাড়া, মানুষের পক্ষে বস্তুতঃ তা মনের সাড়া। আর আমাদের নিজের পাতা ফাঁদে যে আমরা পড়ে রয়েছি, এ জ্ঞান হবামাত্র, মুক্তির কামনা মানুষের অন্তরে জন্মাতে বাধ্য। আর মুক্তির কামনার বলেই মানুষের প্রাণ যুগে যুগে স্ফূর্ত্ত হয়ে এসেছে। ও প্রবৃত্তির অভাবে মানুষ জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। দেহের মত মনেরও একটা জড়তা আছে। এবং সে জড়তাকে অতিক্রম করবার শক্তির নামই আধ্যাত্মিকতা। আত্মা স্বাধীন; তাই মনের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আত্মারই ধর্ম্ম। যে সমাজের লোকে এই স্বাধীনতার প্রবৃত্তি হারায়, সে সমাজ একটা জড় পদার্থ হয়ে উঠতে বাধ্য; যেমন আমাদের সমাজ হয়ে উঠেছে। সুতরাং সমাজ সম্বন্ধে বাঙালী আজ যে মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছে, তাতে জাতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভীত হবার কারণ নেই,—আশান্বিত হবারই কথা। Know thyself—এ আদেশ লঙ্ঘন করে' মানুষ কখনো মানুষ হতে পারবে না। আত্মপরীক্ষা ব্যতীত সে আত্মবশ হতে পারবে না,—এই হচ্ছে ভগবানের নিয়ম।

এই সত্য আমি সকল মন দিয়ে বিশ্বাস করি বলে, বাঙালী জাত যে আজ আত্মপরীক্ষা করতে ব্রতী হয়েছে, এটা আমি স্বজাতির উন্নতির মহা সুলক্ষণ বলেই মনে করি।

আমাদের সমাজ ভবিষ্যতে কিরূপ বাহ্য আকার ধারণ করবে, সে

বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ; কিন্তু আশা করি যে, তা যে আকারই ধারণ করুক, বর্ত্তমানের চাইতে তা শতগুণে প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। এবং সেই জীবন্ত সমাজের পলিটিক্সও তার প্রাণের অনুগামী হবে। অতএব দেশে আজ পলিটিকাল আন্দোলনের বড়-বড় ঢেউ উঠছে না বলে হতাশ হবার কোন কারণ নেই। বাঙলা ভারতবর্ষের আবার একটা নবযুগের অগ্রদূত হবে। (বিজলী)

ব্রাহ্মবিবাহের বৈধতা

শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ

তিন আইন বর্জ্জিত ব্রাহ্মবিবাহের কথা উঠিলেই কেহ কেহ বলেন যে আমরা ত তিন আইনের গোঁড়া নহি ; আমরা চাহি যে বিবাহ বৈধ হয়। রেজেষ্ট্রি না করিলে বিবাহ বৈধ হইবে না, আমরা ত অবৈধ প্রশ্রয় দিতে পারি না। বিবাহ বৈধ করিবার জন্য বাধ্য হইয়া তিন আইন স্বীকার করিতে হয় ; ব্রাহ্মবিবাহবিধি পাশ হইলে তিন আইন বর্জ্জন করিতে আমাদের কোন আপত্তি হইবে না। কিন্তু যতদিন ব্রাহ্মবিবাহবিধি পাশ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তিন-আইন বর্জ্জন করায় সম্মতি দিতে পারি না।

ইঁহারা অবশ্য সমাজের মঙ্গলের জন্যই এরূপ কথা বলেন। ইঁহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই, কিন্তু ইঁহাদের আশঙ্কা যে অমূলক, তাহা অল্প আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ধর্ম্মবিধি ও আইনের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে ধর্ম্মবিধিকেই প্রাধান্য দিতে হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যথার্থই সেরূপ কোন বিরোধ উপস্থিত হইতেছে না। রেজেষ্ট্রী করিলে ব্রাহ্ম বিবাহ বৈধ হয়, কিন্তু তিন আইন বর্জ্জন করিলেই ব্রাহ্ম বিবাহ অবৈধ হইয়া যাইবে, এরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ নাই।

বিবাহের বৈধতা সম্বন্ধে আটটি মূল নিয়ম

(১) "*Fixity of the sect* :—নূতন সমাজ বা সম্প্রদায়ের স্থিরতা।

(২) *Stability of the marriage ceremony* :—বিবাহ-পদ্ধতির স্থিরতা ; হঠাৎ কোন একটি নূতন পদ্ধতিকে সুপরিচিত পদ্ধতি বলা যায় না।

(৩) "*Definite character of the marriage ceremony—to prevent confusion between marriage and concubinage* :—বিবাহ-পদ্ধতির সুনির্দিষ্টতা, যাহাতে বিবাহ এবং রক্ষিতা-অবস্থার মধ্যে প্রভেদ স্পষ্টরূপে নির্ণয় হইতে পারে অর্থাৎ বিবাহ-পদ্ধতির মধ্যে এমন কিছু থাকা আবশ্যক যাহাতে বুঝা যায় যে ইহা যথার্থ বিবাহ।

(৪) *Propriety of the form of marriage* :—বিবাহ-পদ্ধতির শোভনীয়তা।

(৫) *Propriety of the terms of marriage—not offending against rules which would render any other marriage—invalid in accordance with justice eqnity and good conscience* :—বিবাহ সর্ত্তগুলির অনিন্দনীয়তা। এমন কোন সর্ত্ত থাকিবে না যে নীতিবিরুদ্ধ অথবা বিচার-বুদ্ধি, ন্যায়-বুদ্ধি ও বিবেক-বুদ্ধির বিপরীত।

(৬) *Absence of statutory prohibitions* :—রাজ-নিয়ম-বিরোধী হইবে না। আইন দ্বারা স্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ বিবাহ সামাজিক প্রথা দ্বারা বৈধ হইতে পারে না।

(৭) *Recognition of validity by the sect or community* :—সমাজ অথবা সম্প্রদায় কর্ত্তৃক বিবাহ বিবাহ বলিয়া স্বীকৃত হওয়া আবশ্যক, অর্থাৎ নূতন পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন বিবাহকে সমাজের পক্ষে গ্রহণ করা আবশ্যক।

(৮) *Recognition of validity by society at large* :—দেশীয় সমাজ কর্ত্তৃক বিবাহ বিবাহ বলিয়া স্বীকৃত হওয়া বাঞ্ছনীয় ; তবে ইহা সর্ব্বত্র একান্ত আবশ্যক নহে।

উপরোক্ত আটটি নিয়ম বজায় থাকিলে বিবাহের বৈধতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে আইনজ্ঞগণের মধ্যে মতভেদ নাই।

তিন আইন ব্রাহ্মবিবাহের অবশ্যকর্ত্তব্য অঙ্গ নহে

আচার্য্য কেশবচন্দ্র তিন আইনকে মাত্র "অবান্তর অঙ্গরূপে" স্বীকার করিয়াছিলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিন আইন সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ যে পুস্তিকা প্রকাশিত করেন, তাহাতে স্পষ্ট লেখা আছে :—

"The Bill is entirely of a permissive character. It seeks to legalise marriages between Brahmos when solemnized in accordance with the provisions of this act, but it does not say that such marriage would be illegal if otherwise solemnized".

ভাবার্থ :—"এই আইন গ্রহণ করা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়ত্ত। এই আইন গ্রহণ করিলে বিবাহ কি প্রকারে বৈধ হইবে তাহাই ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে। এই আইন গ্রহণ না করিলে ব্রাহ্ম বিবাহ অসিদ্ধ হইবে এরূপ কোন কথা ইহার মধ্যে নাই।"

সাধারণতঃ বিবাহ বিধিগুলি অবশ্য কর্ত্তব্য (compulsory) বিধিরূপে পাশ হইয়া থাকে। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে "পার্শী বিবাহ-বিধি" (১১) ও ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের "ক্রিশ্চান বিবাহ-বিধির" (২০) মধ্যে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, এই সকল বিধি অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। কিন্তু তিন আইনের মধ্যে শুধু যে এরূপ কিছু উল্লেখ নাই তাহাই নহে, বরঞ্চ ১৯ সংখ্যক ধারায় স্পষ্ট লেখা আছে যে তিন আইন সর্ব্বত্র অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবার আবশ্যকতা নাই। এই ধারাটির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

"Section 19. Nothing in this act contained shall

affect the validity of any marriage not solemnized under its provisions; nor shall this act be deemed or indirectly to affect the validity of any mode of contracting marriage; but, if any such mode shall hereafter come into question before any Court, such question shall be decided as if this act had not been passed."

(১৯) Act XV of 1865 (Parsee Marriage and Divorce) Sections 2, 4......."and every marrigae contrary to the provisions of this section shall be void."

(২০) Act XV of 1872 (the Indian Christian Marriage Act) Section 4 :—

"Every marriage between persons, one or both of whom is or are a Christian, or Christians shall be solemnised in accordance with the provisions of the next following section; and any such marriage solemnixed otherwise than in accordance with such provisions shall be void."

যাঁহারা মনে করেন রেজেষ্ট্রী না হইলে ব্রাহ্ম-বিবাহ অসিদ্ধ তাঁহাদের মতে বিবাহ তিন আইন পাশ হইবার পূর্ব্বে হইয়াছে কি না তাহাতে কিছুই আসে যায় না, কারণ পূর্ব্বে হইয়া থাকিলেও ২০শ ধারা অনুসারে তাহা রেজেষ্ট্রি করা যাইতে পারিত এবং রেজেষ্ট্রী করা না হইয়া থাকিলে, তাঁহাদের মতে তাহা অসিদ্ধ।

সার গুরুদাস ব্যানার্জি

লিখিয়াছেন যে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদিগের জন্য বিশেষ কোন বিধি নাই; অর্থাৎ তিনি তিন আইনকে ব্রাহ্মদিগের জন্য অবশ্য কর্ত্তব্য বিধি বলিয়া স্বীকার করেন নাই। "...the validity of the form of marriage among Progressive Brahmos, not being expressly provided for Hindu Law of Marriage and Stridhan. p. 276)।

ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ সম্পন্ন হইবার একদিন দুইদিন অথবা এমন কি এক সপ্তাহ পরে তিন আইন অনুসারে রেজেষ্ট্রী হইল এরূপ দেখা গিয়াছে। আবার রেজেষ্ট্রী করিয়া বিবাহ সম্পন্ন হইবার এক সপ্তাহ পরে ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হইল এরূপও দেখা গিয়াছে। ব্রাহ্মপদ্ধতির মধ্যে তিন আইনের কোন উল্লেখমাত্র নাই। তিন আইনের মধ্যেও ব্রাহ্মধর্ম্ম, ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রাহ্মপদ্ধতির কোন উল্লেখ নাই। অতএব তিন আইনকে কোনমতেই ব্রাহ্মপদ্ধতির অঙ্গ বলা যাইতে পারে না। বস্তুতঃ তিন আইনের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের তথা কোন ধর্ম্মের আদৌ কোন সম্বন্ধ নাই; তিন আইন সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্ম-সম্পর্ক-বিবর্জ্জিত সিভিল বিবাহবিধি মাত্র।

উপরের আলোচনা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে ব্রাহ্মসমাজ কখনও তিন আইনকে বিবাহ অনুষ্ঠানের অবশ্য কর্ত্তব্য অঙ্গ বলিয়া মনে করেন নাই বা অন্য কেহও করে নাই।

(৮) *Recognition by Society at large* :—দেশীয় সমাজ কর্ত্তৃক স্বীকৃত :—

আজকাল দেশের অবস্থার সম্যক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ব্রাহ্মদিগের সম্বন্ধে সনাতন সমাজের বিরুদ্ধভাব লোপ পাইয়াছে; ব্রাহ্মদিগের সহিত সকলেরই সহজ সামাজিক আদান প্রদান চলিতেছে। দেশীয় সমাজ ব্রাহ্ম বিবাহকে আজকাল সম্পূর্ণরূপেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

আমরা দেখিতেছি যে বর্ত্তমানকালে ব্রাহ্ম বিবাহ সম্বন্ধে আটটি মূল নিয়মের একটিরও ব্যতিক্রম ঘটিতেছে না। অতএব

আটটি মূল নিয়ম অনুসারে ব্রাহ্মবিবাহ বৈধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

আইন সম্বন্ধে আরও দু একটি কথা

আমাদের দেশে প্রচলিত প্রথাই যে বিবাহের বৈধতার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ তাহা সর্ব্বজনবিদিত। তিন আইন আন্দোলনের সময় ব্রজসুন্দর মিত্র ও রাজনারায়ণ বসু এ কথা বারংবার বলিয়াছেন। সত্য সত্যই আমাদের দেশে যাহা শিষ্ট-জন-অনুমোদিত তাহাই সিদ্ধ।

Ratanlal and Thakore তাঁহাদের "The Law of Crimes" নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকে লিখিয়াছেন (১৯১০এর সংস্করণ, ১০১৪ পৃষ্ঠা) :—

"There is no statutory marriage law among the Hindus, and the validity of any particular marriage depends chiefly on the usage of the caste to which the parties belong. Subbarayan (1885) 9 Mad. 9. "

ঐ পুস্তকের ১০১২ পৃষ্ঠায় আছে :—"A marriage may be established by a preponderating repute and by conduct, even though the repute may be divided."

Sir Sankarau Nair মান্দ্রাজে Muthusami Mudaliar v. Musatimani (1909, 33 Mad. p. 350.) মকদ্দমায় নূতন সমাজের প্রথা অনুসারে সম্পন্ন বিবাহকে বৈধ বলিয়া রায় দিয়াছেন।

এ সম্বন্ধে আর অধিক প্রমাণ উপস্থিত করিবার আবশ্যকতা নাই।

(নব্যভারত)

প্রতিমা-পূজা

শ্রীমনীষিনাথ বসু সরস্বতী এম-এ, বি-এল

প্রতিমা-পূজা কতদিন অস্মদ্দেশে প্রচলিত হইয়াছে এই বিষয় লইয়া বিদ্বদ্‌বৃন্দের মধ্যে নানা মতভেদ দৃষ্ট হয়। বাস্তবিক এ বিষয়ে সুমীমাংসা করা কঠিন। প্রতিমা-পূজা কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য তাহা বিচার

করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। প্রতিমা-পূজার স্থূল কয়েকটী বিষয় বিচার জন্য এই প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে।

প্রতিমা পূজা যে খুব প্রাচীন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রাচীন কবি হোমরের প্রণীত ইলিয়ড্ গ্রন্থে মূর্ত্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় (৬।৩০১)। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে হোমর খৃষ্ট-পূর্ব্ব একাদশ বা দ্বাদশ শতকে বিদ্যমান ছিলেন। রোমনগরস্থিত ডায়না দেবীর প্রাচীনতম মূর্ত্তি খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকে নির্ম্মিত হইয়াছিল। আমাদের ভারতবর্ষে তৎপরবর্ত্তী কালে প্রতিমা বা মূর্ত্তি পূজার উদ্ভব হইয়াছিল কিনা তাহাই বিচার্য্য।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে "the workship of idol is a secondary formation, a later degradation of the more primitive workship of idol gods" (M Muller). ইহাদের মতে বুদ্ধদেবের জন্মের পরবর্ত্তীকালে মূর্ত্তি-পূজার উদ্ভব হইয়াছে।

আমাদের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ সংহিতার দ্বিতীয় মণ্ডলে রুদ্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে দেখিতে পাই—

"স্থিরেভিরঙ্গৈঃ পুরুরূপ উগ্রো বভ্রুঃ শুক্রেভিঃ
পিপিশে হিরণ্যৈঃ।
ঈশানাদস্য ভুবনস্য ভূরের্ন বা উ যোষদ্রুদ্রাদসুর্য্যং॥" (৩৩।৯)

দৃঢ়াঙ্গ, বহুরূপ, উগ্র, বভ্রুবর্ণ দীপ্ত হিরন্ময় অলঙ্কারে পরিশোভিত হইতেছেন। রুদ্র সমস্ত ভুবনের অধিপতি এবং ভর্ত্তা, তাঁহার বল পৃথক কৃত হয় না। এই মন্ত্রের পূর্ব্বমন্ত্র ও পরবর্ত্তী মন্ত্রসমূহ পর্য্যালোচনা করিলে রুদ্রমূর্ত্তির পূজা উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। অষ্টম মন্ত্রে রুদ্রকে নমস্কার করার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

ঋগ্বেদ সংহিতার পঞ্চম মণ্ডলের ৫১ সূক্তেও মরুদ্গণকে তাহাদের প্রতিমূর্ত্তি হইতে পৃথক করিবার ভাব বিবৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

উপরোক্ত দ্বিতীয় মণ্ডলের ত্রয়স্ত্রিংশৎ সূক্তে উল্লিখিত হইয়াছে।

আ তে পিতর্মরুতাং সুম্নমেতু মা নঃ সূর্য্যস্য সংদৃশো যুযোথঃ।

এই মন্ত্রে "সন্দৃশো" শব্দের অর্থ কি? সায়ন বলেন "সন্দর্শনাৎ"। কিন্তু ঐ শব্দের অর্থ যদি "মূর্ত্তি" বলা যায়, তাহা হইলে অর্থ-সঙ্গতি হয় কিনা তাহা সুধীগণ বিবেচনা করিবেন।

ঋগ্বেদ সংহিতা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, দেবতাগণের রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। বরুণ হিরন্ময়বর্ম্মে আচ্ছাদিত, ক্ষমতাশালী ও সুপাণি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইন্দ্র ইচ্ছামত সর্ব্ব প্রকার আকার গ্রহণ করিতে পারেন; সাধারণতঃ তাঁহার দেহ রক্তবর্ণ বা হিরণ্যবর্ণ; তাঁহার বাহুদ্বয় দীর্ঘবিলম্বী ও দূরপ্রসারিত; তাঁহার হস্তদ্বয়, কেশ, শ্মশ্রু প্রভৃতি রক্তবর্ণ; তিনি সুন্দর, যুবক, বলবান, সমরকুশল, বীর্য্যবান্ দীপ্তিসম্পন্ন এবং জয়শীল। বায়ু মনোহর, আকাশস্পর্শী, মনের ন্যায় বেগবান্ এবং সহস্রচক্ষুর্বিশিষ্ট। সবিতা সুবর্ণচক্ষু সুবর্ণহস্ত এবং সুবর্ণজিহ্ব; তিনি কামরূপী এবং সুবর্ণ-জ্যোতির্বৃত। পূষা অপ্রতিরোদ্ধবা ক্ষমতার বলবান্, পুরুবসু, বদান্য, অন্নপ্রদ, কপর্দ্দী এবং জ্যোতিষ্মান্। উষাকে সুদৃশীকসন্দৃক্ অর্থাৎ মনোহর মূর্ত্তিবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণণা করা হইয়াছে। এইরূপ অন্যান্য দেবগণেরও বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সকল রূপের ধ্যান বা উপাসনার জন্য মূর্ত্তিনির্ম্মাণ বৈদিক যুগেও অসম্ভব বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। কারণ, চিত্তের সমুন্নতি বা ধারণার দৃঢ়তা না হইলে মনের প্রাথমিক বা অপরিণত অবস্থায় রূপ কল্পনা করিয়া তাহার উপাসনা বা তাহাকে নমস্কার করা অসম্ভব ও অসঙ্গত হয়। বাহ্য পদার্থে তাদৃশ রূপ কল্পনা করিয়া তাহারই পূজায় অভ্যস্ত হইবার পর মানসপটে রূপের ধ্যান করা সঙ্গত হয়। "বৃক্ষো বধ্রিঃ প্রতিমানং বুভূষন্" (ঋক্ ১।৩২।৭) এই মন্ত্রে প্রতিমান শব্দের অর্থ সুধীগণ বিবেচনা করিবেন। সায়ন বলেন প্রতিমান অর্থে সাদৃশ্য।

বৈদিকযুগে প্রতীকোপাসনার বাহুল্য দেখা যায়। "ন প্রতীকে ন হি সঃ" (বেদান্তসূত্র ৪।১।৪) এই সূত্রের ব্যাখ্যানাবসরে শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন "মন ব্রহ্ম এইরূপ উপাসনার নাম আধ্যাত্ম উপাসনা; আকাশ ব্রহ্ম—এইরূপ উপাসনার নাম অধিদৈব উপাসনা; নামরূপে ব্রহ্মোপাসনারই নাম নামব্রহ্ম উপাসনা"—প্রতীকোপাসনা এই তিন প্রকার; উক্ত বেদান্তসূত্রে কথিত হইয়াছে—প্রতীকে অহং জ্ঞান করিবে না। প্রতীকোপাসক কোনও প্রতীককে আত্মভাবে দেখেন না। শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—"ঈদৃশং চাত্র ব্রহ্মণঃ উপাস্যত্বং যৎ-প্রতীকেষু তদ্দৃষ্ট্যধ্যারোপণং প্রতিমাদিম্বিব বিষ্ণ্বাদীনাম্" যেমন প্রতিমাদিতে বিষ্ণুর উপাসনা তেমনই আদিত্যাদিতে ব্রহ্মের উপাসনা। প্রতীকোপাসনার বিষয় ছান্দোগ্যশ্রুতিতে বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

এইবার পাণিনীর ব্যাকরণ আলোচনা করা যাউক। আমরা এই প্রসঙ্গে যদি দুইটি সূত্র "রাল্লোপঃ" (৬।৪।২১ এবং 'ন ধ্যাখ্যা পৃমূর্চ্ছিমদাম্' (৮।২।৫৭) আলোচনা করি, তাহা হইলে তৎকালে মূর্ত্তি শব্দ প্রচলিত ছিল বেশ বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য মূর্ত্তি শব্দের অর্থ দেহ এবং কাঠিন্যও হইতে পারে। কিন্তু মূর্ত্তি শব্দ দেবদেহে প্রযুক্ত হইলেই আমরা "প্রতিমা" এই অর্থে উপনীত হইতে পারি।

মহাভারতের আদপর্ব্বে কথিত হইয়াছে—

"গিরিপৃষ্ঠে তু সা সুম্মিন্ স্থিতা সস্মিতলোচনা।
বিভ্রাজমানা শুশুভে প্রতিমেব হিরণ্ময়ী॥ (১৭১।২৭)

এই শ্লোকে সুবর্ণময়ী প্রতিমার বিষয় স্পষ্ট উক্ত হইল। মহাভারতের প্রাচীনতা সম্বন্ধে গোলযোগ করিলে চলিবে না। আশ্বলায়ন ও সাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্রে মহাভারতের প্রসঙ্গ আছে। পাণিনীতে 'ভারত', 'বাসুদেব' 'যুধিষ্ঠির' প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেবকীপুত্র কৃষ্ণের নাম দেখা যায়। যদিও মহাভারতে অনেক প্রক্ষিপ্ত শ্লোক দেখা যায়, তথাপি মূল মহাভারতও খৃষ্টপূর্ব্ব দশম শতকের পর বিরচিত হয় নাই ইহা অনেকেই স্বীকার করেন। এবং বর্ত্তমান

আকার যে অন্ততঃ খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতকে প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার সন্দেহ করিবার কারণ দেখা যায় না। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের উৎকীর্ণ তাম্রশাসনাদিতে মহাভারতের নাম পাওয়া যায় এবং তৎকালে যে মহাভারতের বর্ত্তমান আকার প্রচলিত ছিল এবং তাহার বহুকাল পূর্ব্বে হইতেই বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল তাহাও স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। মহাভারতে আরও যে যে স্থলে মূর্ত্তিপূজার বিষয় উল্লেখ আছে বাহুল্যভয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল না।

পুরাণসমূহের মধ্যে মৎস্য ও বায়ু পুরাণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই উভয় পুরাণই জন্মেজয়ের প্রপৌত্র অধিসীমকৃষ্ণের রাজত্বকালে বিরচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যদিও তাহাতে ভবিষ্যরাজবংশের প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু তাহা পরবর্ত্তীকালে সংযোজিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রে ভবিষ্যৎপুরাণের উল্লেখ দেখা যায়। আপস্তম্বধর্ম্মসূত্র খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম বা ষষ্ঠশতকে বিরচিত বলিয়া ধরা যায় (ডাক্তার বুহ্লারের মতে তাহা পাণিনীর পূর্ব্বে বিরচিত হইলেও হইতে পারে) তাহাতেও পুরাণের প্রাচীনতা পাওয়া যায়। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ যদি খৃষ্টপূর্ব্ব ত্রয়োদশ শতকে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলেও খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বাদশশতকে মূল মৎস্য পুরাণ ও বায়ু পুরাণ বিরচিত হইয়াছিল বলিতে হইবে। বায়ু পুরাণে মূর্ত্তিপূজার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে এবং যে অংশে মূর্ত্তিপূজার বিষয় বলা হইয়াছে, তাহা উত্তরকালে বিরচিত বা প্রাক্ষিপ্ত নাহ বলিয়াই বোধ হয়। বায়ু পুরাণের ২১ অধ্যায় ৫৫ অধ্যায় দেখুন।

মৎস্যপুরাণের ২৫৮ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে—

প্রতিষ্ঠায়াং সুরাণাস্ত দেবতার্চ্চানুকীর্ত্তনম্।
দেবযজ্ঞোৎসবঞ্চাপি বন্ধনাৎ যেন মুচ্যতে॥

যে কর্ম্মযোগ দ্বারা ভববন্ধন ছিন্ন হয়, দেবপ্রতিমা প্রতিষ্ঠায়, দেবগণের অর্চ্চন, দেবগণের নামকীর্ত্তন এবং দেবযজ্ঞোৎসবই সেই কর্ম্মযোগ জানিবেন।

মৎস্যপুরাণের ২৮৫ হইতে ২৬১ অধ্যায়ে দেবপ্রতিমা নির্ম্মাণের বিধি উপদিষ্ট হইয়াছে। বিস্তারিত ভাবে উদ্ধৃত করিয়া আপনাদের ধৈর্য্য-চ্যুতি করিব না।

মৎস্যপুরাণে কয়েক প্রকার প্রতিমার বিষয় কথিত হইয়াছে—

সৌবর্ণী রাজতী বাপি তাম্রী রত্নময়ী তথা।
শৈলদারুময়ীবাপি লৌহ শঙ্খময়ী তথা॥
রীতিকা ধাতুযুক্তা চ তাম্রকাংস্যময়ী তথা।
শুভদারুময়ী বাপি দেবতার্চ্চা প্রশস্যতে॥

বৌধায়ন বলিয়াছেন—

দ্রব্যবৎ কৃতশৌচানাং দেবতার্চ্চনাং ভূয়ঃ প্রতিষ্ঠাপনম্।
দেবতার্চ্চা শব্দের অর্থ দেবপ্রতিমা।

অগ্নিপুরাণে দেব প্রতিমা, জীর্ণোদ্ধার বিধি প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। বরাহপুরাণে দেবমন্দিরনির্ম্মাণের প্রকার ও মঠস্থাপনের নিয়ম বর্ণিত হইয়াছে। অগস্ত্য-সংহিতায় দেবমন্দিরকর্ত্তা স্বর্গলাভ করিবেন বলা হইয়াছে।

যজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন।—

তাম্রকাৎ স্ফটিকাৎ রক্তচন্দনাৎ স্বর্ণকাদুভৌ।
রজতাদায়সঃ সীসাৎ কাংস্যাৎ কার্য্যা গ্রহাঃ ক্রমাৎ॥

দ্বৈবর্ণৈর্বাপটে লেখ্যা গন্ধৈর্ম্মণ্ডলকেঽথবা।
যথাবর্ণং প্রদেয়ানি বাসাংসি কুসুমানি চ॥

বিষ্ণু সংহিতার উক্ত হইয়াছে।—

ন দেবপ্রতিষ্ঠাবিবাহয়োঃ পূর্ব্বসংস্কৃতয়োঃ জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রে।—
চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।

রঘুনন্দন বলে"রূপকল্পনা" শব্দের অর্থ রূপশূন্যানাং দেবতানাং পুংস্ত্রাংশাদিকল্পনা। যদি উপাসকের কাব্যার্থ অশরীরীব্রহ্মের রূপকল্পনা হয়, তাহা হইলে অতি প্রাচীনকাল হইতেই মূর্ত্তির কল্পনা ও পূজা প্রচলিত হইয়াছে বলিতে হইবে।

মহাকপিল পঞ্চরাত্রে —

প্রতিষ্ঠাশব্দ সংসিদ্ধিঃ প্রতিপূর্ব্বাচ্চ তিষ্ঠতেঃ।
বহ্বর্থত্বান্নিপাতানাং সংস্কারাদৌ প্রতেঃ স্থিতিঃ॥
অর্থস্তদয়মেতস্য গীয়তে শাব্দিকৈর্জনৈঃ।
বিশেষসন্নিধেয়া তু ক্রিয়তে ব্যাপকস্য তু।
যন্মূর্ত্তৌ ভাবনা মন্ত্রৈঃ প্রতিষ্ঠা সা বিধীয়তে॥

রামায়ণে—

তত্র তাং মাতরমের প্রবণাং ক্ষৌমবাসিনীন্।
বাগ্ যতাং দেবতাগারে দদর্শাযাচতীং শ্রিয়ম্॥
অযোধ্যাকাণ্ড চতুর্থ দর্গ ৩০ শ্লোক

* * * *

বাগ্যতঃ সংবৈদেহ্যা ভূত্বা নিয়তমানসঃ।
শ্রীমত্যায়তনে বিষ্ণোঃ শিস্যে নরবরাত্মজঃ॥
অযোধ্যাকাণ্ড ষষ্ঠ সর্গ ৪র্থ শ্লোক

অধ্যাপক যাকবির মতে অযোধ্যাকাণ্ড হইতে লঙ্কাকাণ্ড পর্য্যন্ত মূলরামায়ণ রচনার সময়ে রচিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট কাণ্ডদ্বয় পরবর্ত্তী কালে সংযোজিত হইয়াছে। পালি দশরথ জাতক পড়িলে বেশ বুঝা যায় যে এই জাতক রামায়ণ রচনার পরবর্ত্তী। মূলরামায়ণের একটি শ্লোক রূপান্তরিত হইয়া উক্ত জাতকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যে শ্লোকে বুদ্ধের বিষয় উল্লিখিত আছে তাহা পরবর্ত্তী কালে সংযোজিত। যবন শব্দের দুইবার উল্লেখ আছে; দুইটি শ্লোকই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। রামায়ণ পর্য্যালোচনা করিলে তাহা যে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে বিরচিত, তৎবিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। সুতরাং রামায়ণে দেবপূজা ও দেবমন্দিরের উল্লেখ দেখিয়া তাহা যে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে প্রচলিত ছিল, তদ্বিষয় সন্দেহ করিবার কারণ দেখা যায় না।

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র নামক গ্রন্থে দেবপূজা জীর্ণোদ্ধার বিধি প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক বিধান লিপিবদ্ধ থাকা দৃষ্ট হয়। অগ্নিপুরাণেও দেবমন্দিরাদি নির্ম্মাণ সম্বন্ধে উপদেশ লিখিত আছে।

আমার সিদ্ধান্ত এই যে অস্মদ্দেশে বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রতিমাপূজা প্রচলিত আছে। বৌদ্ধযুগের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী-কালে ইহা প্রচলিত হইয়াছে। গ্রীক বা রোমানগণ যে সময়ে প্রতিমা পূজা আরম্ভ করিয়াছেন তাহার পূর্ব্ব হইতেই অস্মদ্দেশে প্রতিমা পূজা প্রচলিত হইয়াছে। —(মাধবী)

লেখার জন্মপত্রিকা

শ্রীনরেন্দ্র দেব

মানব-সভ্যতার প্রথম যুগে তিনটে প্রয়োজন একেবারে একান্ত প্রবল হ'য়ে উঠেছিল, এবং তারই উপায় নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে সর্ব্বপ্রথম লেখার সৃষ্টি হয়।

সেই তিনটি প্রয়োজনের মধ্যে প্রথমটি হ'চ্ছে—একটা কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ে এমন একটা কিছু করা দরকার, যেটা ঠিক পূর্ব্বেও একবার সেইরূপ অবস্থায় করা হ'য়েছিল। দ্বিতীয় প্রয়োজনটি হ'চ্ছে, যে লোক কোনও দূরদেশে আছে এবং যার শীঘ্র ফিরে আসবার সম্ভাবনাও কম, তাকে কোনও জরুরী সংবাদ জানানো যায় কেমন করে! তৃতীয় প্রয়োজন হ'চ্ছে, যেখানে দু'জন প্রতিবেশীর পরস্পরের একই রকম কতকগুলি জিনিসপত্র আছে, সেগুলি কোন্‌টা কার জানা যাবে কেমন ক'রে?—ভিন্ন ভিন্ন মালিকের গরু, ছাগল, ভেড়া চেনা যায় কি দেখে? বিভিন্ন কারীগরের নির্ম্মিত একই রকম বস্তুর শিল্পীবিশেষকে সনাক্ত করা যায় কিসে?

এই শেষোক্ত সমস্যার সমাধান করতে গিয়েই সর্ব্ব প্রথম বিশেষ বিশেষ 'চিহ্ন' ব্যবহারের সূত্রপাত হয়। হরি তার জিনিস পত্রে 'ত্রিশূল' চিহ্ন ক'রে নিলে দেখে শ্যাম তার জিনিসে দিলে 'ধনুকের' দাগ, যদু দিলে সাপের 'ফণা', মধু দিলে 'ঢেঁড়া' চিহ্ন রাম দিলে 'রথের চাকা', দীনু দিলে 'পতাকার' নিশানা! এমনি ধারা কত কি।

পুরাকালে কোনও বিশেষ ঘটনা বা বিশেষ দিন স্মরণ ক'রে রাখবার জন্যে পরিধেয় বস্ত্রে বা উত্তরীয়প্রান্তেগ্রন্থি দিয়ে রাখা হতো। এখনও দেখতে পাওয়া যায়, যাদের একটু ভুলো মন, তাঁরা অনেকে কোনও কিছু মনে ক'রে রাখবার জন্যে কাপড়ে গিঁট দিয়ে রাখেন। এটা মানুষের সেই পুরাতন যুগের অভ্যাস! বিবাহের দিন কন্যা ও বরের বস্ত্র ও উত্তরীয়প্রান্তে যে 'গাঁটছড়া' বেঁধে দেওয়া হয়, সেও সম্ভবতঃ ওই বিশেষ দিন ও বিশেষ ঘটনাটি স্মরণ করে রাখবার জন্যে সেই অতি প্রাচীন পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি বা গতানুগতিক অনুসরণ মাত্র। গ্রীস্, পেরু, চীন, ও তীব্বতের প্রাচীন ইতিহাসেও দেখতে পাওয়া যায় যে, এসব দেশেও মানুষ—তাদের লুপ্ত স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে তোলবার জন্য সেকালে এই 'গ্রন্থি'-সঙ্কেতের সাহায্য নিতেন।

কিছুকাল পরে এই একই প্রয়োজনে 'সাঙ্কেতিক-যষ্ঠি'র প্রচলন হ'য়েছিল। সাঙ্কেতিক-যষ্ঠি আর কিছুই নয়, একটা গাছের ডাল ভেঙ্গে নিয়ে তাতে কতকগুলি ছেদ কেটে রাখা হোতো। দূরদেশস্থ কোনও আত্মীয়কে সংবাদ দেবার প্রয়োজন হ'লে একজন লোককে তার কাছে পাঠানো হোতো; এবং পাছে সে সকল কথা ব'লতে ভুলে যায়, এই জন্য তার হাতে একটি সাঙ্কেতিক-যষ্ঠি তার সামনেই কথাগুলি বলে বলে দাগ কেটে দেওয়া হোতো!

এই দূরদেশে সংবাদ পাঠাবার জন্য আর একটা উপায়ও সেকালে অবলম্বন করা হোতো, যেটা থেকে পরে লেখার সূত্রপাত হয়েছিল। সেটা হ'চ্ছে হাড় কিম্বা পাথরের গায়ে কোনও বিশেষ চিহ্ন বা জীবজন্তুর মূর্ত্তি খোদাই ক'রে দেওয়া। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অরণ্যবাসী বা পর্ব্বত গুহাশ্রয়ী আদিম মানুষেরাই সর্ব্বপ্রথম এইরূপ সংবাদ আদান-প্রদানের উপায় প্রবর্ত্তন করেছিলেন। এইরূপ সাঙ্কেতিক চিহ্ন ও মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করা যে সব অস্থি বা শিলাখণ্ড খুঁজে পাওয়া গেছে, সেগুলি পরীক্ষা ক'রে জান্‌তে পারা গেছে যে সে সময় এমন কতকগুলি বিশেষ বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করা হোতো যার অর্থ সেকালের সকলেই জানতেন, অর্থাৎ একালের অক্ষর বা বর্ণপরিচয়ের মতো সেকালের লোকদেরও সেই সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলি শিখ্‌তে হোতো এবং মনে করে রাখ্‌তে হোতো। ফিনিশীয় ও সাইপ্রীয় প্রভৃতি কয়েকটি প্রাচীন ভাষার একাধিক অক্ষরের সঙ্গে উক্ত প্রস্তরোৎকীর্ণ কয়েকটা চিহ্ন

পাষাণ-ফলকে

(খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় বিংশতি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মানুষ এই উপায়ে প্রথম লিখতে শিখেছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের বনবাসী মানুষ তার পার্ব্বত্য গুহা-গৃহের দেয়ালে যে রঙীন চিত্রাবলি অঙ্কিত ক'রে রেখেছিল, তা এই এতকাল পরেও অবিকৃত অবস্থায় দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে। এই সকল চিত্র অঙ্কনে তারা যে রং ব্যবহার ক'র্‌তো তা গাছ-গাছ্‌ড়া থেকেই তৈরী। একটা কাঠির মুখে একগুচ্ছ কেশ বেঁধে নিয়ে তার তুলির মতো ব্যবহার করতো। পর্ব্বত-গুহার মধ্যে শৃঙ্গাধারে রক্ষিত সেকালের রংও খুঁজে পাওয়া গেছে এবং সে রং ব্যবহার ক'রে দেখা গেছে যে, হাজার হাজার বছর আগের প্রাচীর-চিত্র তাতে যেমন উজ্জ্বলভাবে রঞ্জিত হোতো এখনও তার ঠিক সেই গুণটি বজায় আছে!)

পত্র-পত্রিকায়

(খৃষ্ট পূঃ ২৫০০ অব্দে অর্থাৎ প্রায় সাড়ে চার হাজার বৎসর পূর্ব্বে মিশরবাসীরা পেপীরুস্ তৃণ-পত্র থেকে একপ্রকার লেখার উপযোগী পত্রিকা প্রস্তুত ক'রেছিল। সেই পত্র-পত্রিকার উপর তারা শর কাঠিতে কালি মাখিয়ে লেখবার রীতি প্রবর্ত্তন করেছিল। কালি রাখবার জন্য তারা কাঠের মস্যাধার ব্যবহার ক'রতো।)

মৃত্তিকা-ফলকে

(খুব বিশেষ প্রয়োজনীয় সংবাদ এবং বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্য সেকালের বাবিরুষ প্রভৃতি মধ্য এসিয়াবাসীরা কাঁচা মাটির ফলকের উপর সেগুলি উৎকীর্ণ করে নিয়ে পরে তাকে পুড়িয়ে চিরস্থায়ী করে রাখতে। কতকগুলি মৃত্তিকা-ফলকের পাঠ উদ্ধার করে দেখা গেছে যে সেগুলি প্রেমপত্র; সুতরাং সেকালের প্রেমিকেরা তাদের প্রণয়িনীদের নিকট প্রেম-নিবেদনের জন্যও যে এই মৃত্তিকা-ফলকের সাহায্য গ্রহণ ক'রতো সে বিষয়ে আর কোনও ভুল নেই।)

মোমের পাটা

(গ্রীক্ ও রোমানরা সেকালে পত্র লেখবার জন্য এই মোমের পাটা যথেষ্ট ব্যবহার ক'রতো। খৃষ্টযুগের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই মোমের পাটার বহুল প্রচলন ছিল। কাঠের টুকরোর উপর এক-পুরু মোম জমিয়ে নিয়ে তার ওপোর আঁচড় কেটে চিঠি লেখা হোতো। চিঠি বড় হ'লে সময়ে সময়ে তিনচারখানা কাঠের টুকরো কব্জা দিয়ে এঁটে দেওয়া হোতো। এই চিত্রে দেখানো হ'য়েছে একজন বিজয়ী বীরকে সম্মান-সূচক উষ্ণীষ পরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং তার কীর্ত্তিকলাপ লিখে রাখা হচ্ছে।)

চর্ম্ম-পটে

(মধ্য এশিয়ার পার্গানাম প্রদেশের মাইসিয়া সহরে সর্ব্বপ্রথম ছাগ ও মেষচর্ম্মকে লিখনোপযোগী পত্রিকায় পরিণত ক'রে তদুপরি তুলিকার সাহায্যে লিখনপ্রথা প্রচলিত হয়েছিল। গ্রীসের নিকট রোমানরা মোমের পাটায় লেখার উপায় শেখ্‌বার পরই মধ্য এশিয়া থেকে এই চর্ম্ম-পটের সন্ধান পায় এবং য়ুরোপকে উহা ব্যবহার ক'রতে শেখায়।)

তালপত্রে

(ভারতের হিন্দু ব্রাহ্মণরা সর্ব্বপ্রথম তাল ও ভূর্জ্জপত্রে লেখার প্রথ প্রচলন করেছিলেন। প্রথমে তালপত্রের উপর লৌহসূচীর সাহায্যে লিপি উৎকীর্ণ করা হোতো; পরে কালি ও শরকাঠির লেখনী সৃষ্টি হ'তে তালপত্রের সঙ্গে ভূর্জ্জপত্রে লেখারও প্রচলন হ'য়েছিল।)

পেশাদার লেখক

(পরাস্ত দেশের বোগ্দাদ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সহরে সেকালে একদল পেশাদার লেখকের সম্প্রদায় ছিল। তারা সাধারণের নিকট পারিশ্রমিক নিয়ে ও লেখার সরঞ্জামের মূল্য গ্রহণ ক'রে, চর্ম্ম-পটে ভারতীয় মসীর দ্বারা পত্র রচনা ক'রে দিত। ভারতে প্রস্তুত লেখার কালি তখন এমন সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল যে, সবদেশের লোকেই উহা ব্যবহার ক'রতে ভালবাসতো।)

স্বর্ণাক্ষরের যুগ

(মধ্যযুগের ধনী অভিজাত সম্প্রদায়ের বীর্য্যাভিমানী ব্যক্তিরা স্ব স্ব বীরত্বের কীর্ত্তিকলাপ সমুজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে বা রজত-দীপ্ত হরফে লিপিবদ্ধ ক'রে রাখ্‌তো। পাদ্‌রী সন্ন্যাসীরা তাদের খ্রীষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র এইরূপ স্বর্ণাক্ষরে বা রজতোজ্জ্বল হরফে অথবা নানা দীপ্তবর্ণে অনুরঞ্জিত করে রাখ্‌তো। এই কাজে তারাই সব চেয়ে সুদক্ষ ছিল বলে বীরত্বের বিবরণ লিপিবদ্ধ করবার জন্য সেকালের গর্ব্বিত বীরেরা এঁদেরই সাহায্য গ্রহণ ক'রতে আস্‌তো।)

রেড ইণ্ডিয়ানদের লিখনপ্রথা

(এরাও লেখবার জন্য পশুচর্ম্ম ব্যবহার ক'রতো ; কিন্তু এদের লেখার বর্ণমালার পরিবর্ত্তে বিবিধ চিত্র ও সাঙ্কেতিক চিহ্নই দেখতে পাওয়া যায়। যেমন যুদ্ধে কারুর মৃত্যু হ'য়েছে এই শোক-সংবাদ জ্ঞাপন করবার জন্য এরা তীরবিদ্ধ রক্তাক্ত-হৃদয় এঁকে দেয় ; মনের গভীর দুঃখ জানাবার জন্য এরা পত্রে দু'ট সজল আঁখি এঁকে দেয়।)

চিত্রিত প্রেম-পত্র

(যে সময় সম্ভ্রম ও সৌন্দর্য ছিল মানুষের প্রধান লক্ষ্য, সেই যুগে তাদের প্রেম-পত্রও সর্ব্বপ্রকার সুচারু সৌষ্টবসম্পন্ন হ'য়ে উঠেছিল। প্রেমপত্রের কাগজখানির প্রান্তভাগে ছিল তখন পরিপাটি চিকণের কাজ করা। পত্রিকাখানি ছিল মনোমুগ্ধকর সুরভি সুবাস-সিক্ত ও সুনিপুণ উৎকীর্ণ কারুকার্য্যখচিত।)

হংস-পুচ্ছের লেখনী

(শরকাঠির পরই হংসপুচ্ছ ও ময়ূরপুচ্ছের লেখনীর প্রচলন হ'য়েছিল। পরে ষ্টিল-পেন বা লৌহ লেখনীর সৃষ্টি হয়।)
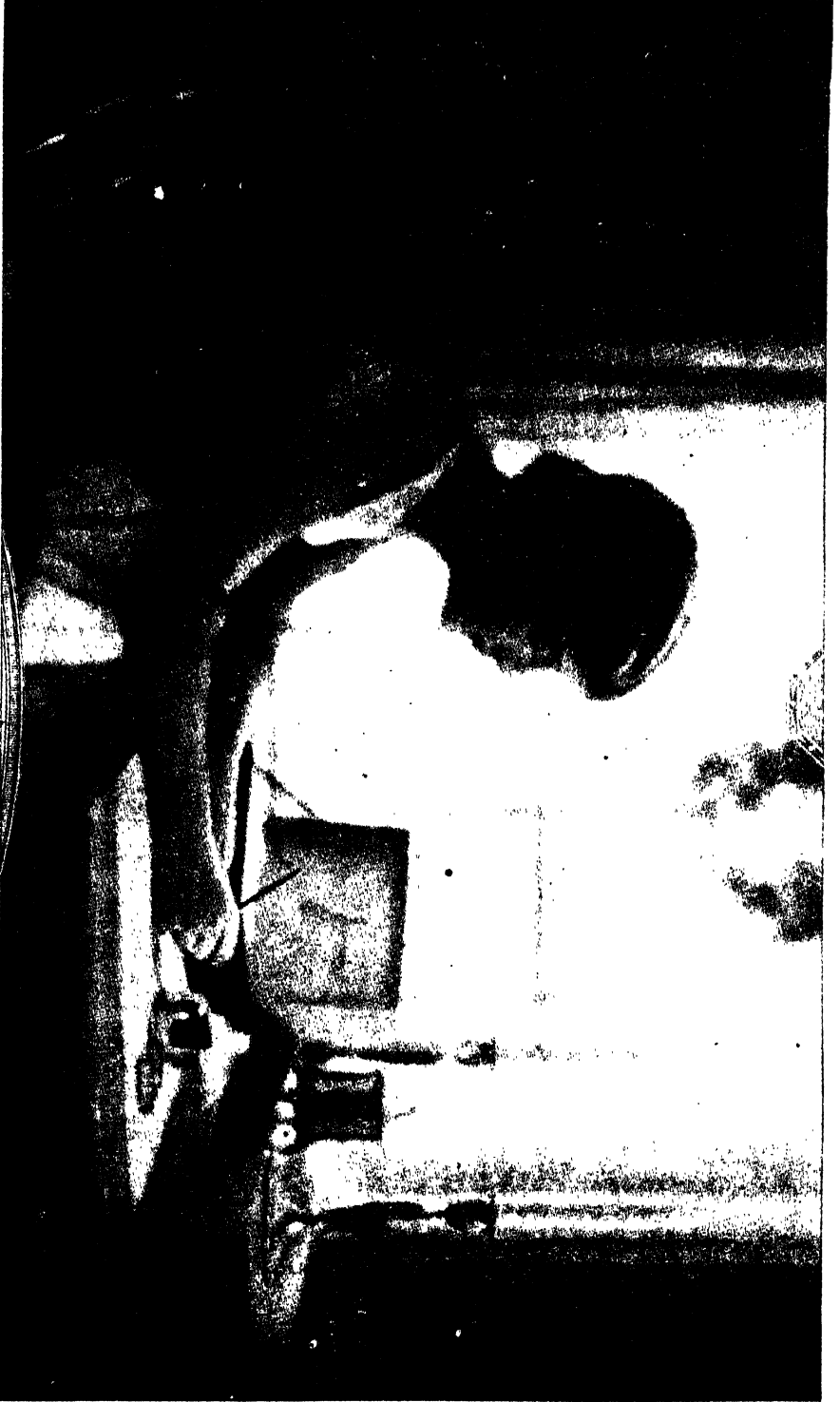
বিংশ শতাব্দীর লেখিকা

(ইনি বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বপ্রকার উন্নত ধরণের লেখার সরঞ্জাম ব্যবহার করবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। টেবিল, চেয়ার, নোটবই, ফাউণ্টেন পেন, ব্লটিং প্যাড, কোনও অনুষ্ঠানেরই ত্রুটী নেই।)

একেবারে অবিকল মিলে গেছে বলে অনেকেই অক্ষর বা বর্ণের এইখানেই প্রথম জন্ম বলে নির্দ্দেশ করেন।

আমেরিকার অসভ্য 'রেড্ইণ্ডিয়ান' জাতের মধ্যে এখনও চিত্রলিপির প্রচলন আছে; তারা জীব-জন্তু ও মূর্ত্তি এঁকে মনের ভাব প্রকাশ ক'রে। তবে তারা কোনও দিনই সভ্যতার আলোকে এসে পৌঁছতে পারেনি বলে আসূরীয়, মিশরীয় বা চীনেদের মতো চিত্রলিপি থেকে ক্রমে অক্ষর-লিপিতে এসে পৌঁছতে পারেনি। অসূরীয় মিশর ও চীনবাসীরাই যে সর্ব্বাগ্রে জগতে লেখার সৃষ্টি করেছে, এ বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই। চিত্রলিপি কেমন করে ধীরে-ধীরে অক্ষর লিপিতে পরিণত হয়েছিল, তার ইতিহাস পর্য্যালোচনা ক'রলে দেখা যায় যে বহু শতাব্দীর সঞ্চিত চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে চিত্র ক্রমে সাঙ্কেতিক চিহ্নতে পরিণত হয়েছিল এবং সেই সাঙ্কেতিক চিহ্ন পরে অক্ষরে রূপান্তরিত হ'য়েছিল। মিশরীয় লেখার পদ্ধতিই জগতের সব চেয়ে প্রাচীন হস্তাক্ষরের প্রমাণ। টলেমীর যুগ পর্য্যন্ত উহাই ছিল একমাত্র লেখার রীতি। পরে অপেক্ষাকৃত সহজ গ্রীক অক্ষরের সৃষ্টি হবার পর মিশরীয় পদ্ধতির প্রচলন বন্ধ হ'য়ে যায়।

ক্রমে কথোপকথনের শব্দের অনুসরণ ক'রে উচ্চারণ হিসাবে বর্ণমালার সৃষ্টি হয়। দেবনাগরী বা সংস্কৃত বর্ণমালা অক্ষর-বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতম আলোচনার ফল। ঐতিহাসিকেরা বলেন বর্ণমালার চরম উন্নতি এবং লেখার পূর্ণ পরিণতি এই প্রাচ্য ভূ'খণ্ডেই সর্ব্বাগ্রে সম্ভব হ'য়েছিল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ভাষা এখনও অপরিণত অবস্থায় আছে, কারণ তাহারা প্রাচ্য ভাষার তুলনায় অতি অল্পদিন মাত্র জন্মলাভ ক'রেছে।

লেখার জন্মের এই একটা মোটামুটি হিসাব দেওয়া গেল। কি ভাবে লেখা ধীরে-ধীরে বর্ত্তমান অবস্থায় এসে দাঁড়িয়াছে, তার ইতিহাস অত্যন্ত দীর্ঘ হ'লেও বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক ও চিত্তাকর্ষক। সময়ান্তরে তার আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

ইঙ্গিত

শ্রীবিশ্বকর্ম্মা

অঙ্গরাগ

রাত্রিকালে থিয়েটারে অভিনয়ের সময় যেসব পরী, অপ্সরা, বিদ্যাধরীর রূপ-মাধুরী দেখিয়া বিস্ময়ে আপনাদের চক্ষু বিস্ফারিত হয়, দিনের বেলায় স্বাভাবিক বেশে যদি তাহাদের দেখেন তাহা হইলে আপনারা কখনঃ বিশ্বাস করিতে পারিবেন না যে, ইহাদেরই রাত্রে থিয়েটারে অভিনয় করিতে দেখিয়া আসিয়াছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে একদিন সকালবেলা আমি একটা রাস্তা দিয়া যাইতে-ছিলাম। একটী বাড়ীর সদর দরজায় একটী স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া ছিল। একটী ভদ্রলোক সেইখানে আসিলেন। উভয়ে পরস্পরের পরিচিত। স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়া ভদ্র-লোকটি বলিলেন, "ঈস্! বড় যে বাহার দেখ্ছি!" "স্ত্রী-লোকটি বলিল, "আর আধঘণ্টা আগে আসিলে না কেন? আমার রূপ দেখিয়া তোমার মুণ্ড ঘুরিয়া যাইত। এখন ত এই মাত্র স্নান করিয়া আসিলাম।" সেদিন ছিল রবি-বার, এবং স্ত্রীলোকটি ছিল থিয়েটারের বিখ্যাত অভিনেত্রী। এবং তখন প্রায় সকল থিয়েটারেই সমস্ত রাত্রি এমন কি সকাল ৭টা পর্য্যন্ত অভিনয় চলিত। ইহা হইতেই ঐ স্ত্রীলোক ও পুরুষটির আলাপের মর্ম্ম আপনারা সম্ভবতঃ বুঝিয়া লইতে পারিবেন। বস্তুতঃ সৌখিন যুবক যুবতীর অঙ্গরাগের এত অসংখ্য উপকরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, এই পরিণত বয়সে তাহা দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য না হইয়া পারি না। এই সব অঙ্গরাগ শ্রীঅঙ্গে ধারণ করিলে সৌন্দর্য্য এত বৃদ্ধি পায় যে, মানুষের স্বাভাবিক চেহারা একেবারে বদলাইয়া যায়। কালো কুৎসিত মেয়েকেও পরমা সুন্দরী ও সুশ্রী বলিয়া বোধ হয়। তবে ইহা ব্যবহারের কৌশল আছে। পরিমাণ মত ব্যবহার করিতে পারিলেই তবে ইহাদের দ্বারা সৌন্দর্য্য খোলে—ছদ্মবেশ সম্পূর্ণ হয়। আর পরিমাণের কমবেশী হইলে কুৎসিত চেহারা আরও বিশ্রী

দেখায়। সেইজন্য ভাল থিয়েটারে অভিনেতা ও অভিনেত্রী-দের পোষাকের সহিত মানানসই করিয়া সাজাইবার জন্য চতুর, বহুদর্শী অভিজ্ঞ লোক থাকে, অন্ততঃ থাকা উচিত।

রুজ (Rouge)

হরিদ্রা গ্রামের জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায়ের অর্দ্ধেক সম্পত্তির অধিকারী কালো ভোমরার জীবিত-সর্ব্বস্ব, রূপতৃষাতুর যুবক জমীদার তনয় গোবিন্দলাল বারুণী পুকুরের বাঁধা ঘাটে জলমগ্না সংজ্ঞাহীনা রোহিণীর যে ফুল্ল রক্তাধরে স্বীয় অধর স্পর্শ করাইতে ভয় পাইয়াছিলেন, তদপেক্ষাও সুন্দরতর ওষ্ঠাধর রুজের সাহায্যে সৃষ্টি করা যায়। একটা ফর্দ্দ—

কারমাইন	৪ ভাগ
তীব্র এ্যামোনিয়া	৪ ভাগ
উৎকৃষ্ট গোলাপ জল	৫০০ ভাগ
গোলাপের এসেন্স	১৫ ভাগ

কারমাইন এক রকম লাল, রক্তের মত রং। কোসিনীল নামক এক রকম পোকা আমাদের দেশের লাক্ষার মত আমেরিকার মেক্সিকো দেশে ডুমুর জাতীয় এক শ্রেণীর গাছ ছাইয়া বাস করে। সেই পোকা ঐ গাছের ছাল চাঁচিয়া সংগ্রহ করিয়া এক যায়গায় জমা করা হয়। তার পর তাপ দিয়া পোকাগুলাকে মারিয়া ফেলিয়া তাহা হইতে রং বাহির করিয়া লওয়া হয়। আসল রুজ কিন্তু স্বতন্ত্র জিনিস,—safflower (কুসুম ফুল) হইতে উৎপন্ন হয়। সেই রংটির নাম carthamine। এই খাঁটি রুজ এ্যালকোহলে দ্রব করিয়া তাহার সঙ্গে কিঞ্চিৎ acetic acid মিশাইয়া লইয়া মুখে মাখিবার রং প্রস্তুত হয়। ইহা বড় চমৎকার রুজ—ঠোঁটে ও গালে মাখিতে হয়। মেম সাহেবরা ইহা বড় পছন্দ করেন; এবং ইহার ব্যবহারে যেমন তেমন রূপসী মেমের রূপ শতগুণ খুলিয়া যায়। কারমাইন রং আমাদের দেশের আলতার মত তুলা ভিজাইয়া শুকাইয়াও ব্যবহার করা হয়।

এই রং মুখে মাখিবার পর মুখ ভিজা থাকিতে থাকিতে যদি বাছিয়া বাছিয়া উপযুক্ত রকমের পাউডার ছিটাইয়া দিতে পারা যায়, তাহা হইলে সোণায় সোহাগা হয়। পাউডার মাখিতে হইলে রংটির একটু পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হয়। আড়াইতোলা টিঞ্চার কারমাইনের সঙ্গে সমপরিমাণ গ্লিসারিণ, লাইকর এ্যামোনিয়া সওয়া তোলা ও গোলাপজল ৫ পাইট মিশাইয়া লউন। অন্য কোন একটা মৃদুগন্ধ আতরের এসেন্স ইহার সঙ্গে মিশাইয়া লইলে গন্ধের একটু বৈচিত্র্য ঘটিবে। কয়েকটা পাউডারেরও ফর্দ্দ দিতেছি। ইহার মধ্যে একটা বাছিয়া লইতে পারেন। খুব সোজাসুজি একটা পাউডার—সাদা ট্যালকম্ সূক্ষ্ম চূর্ণ, এক ভাগ; কাওলিন সূক্ষ্ম চূর্ণ অর্দ্ধভাগ মিশাইবার পর একবার ছাঁকিয়া লইতে হইবে। তাহা হইলে মিশ্রণ ভাল হইবে—কোনরূপ খিঁচ থাকিবে না। ইহার সঙ্গে যে কোন রকম একটা বা একাধিক আতর দু'চার ফোঁটা মিশাইয়া লইতে পারেন।

আর একটা তালিকা এইরূপ,—ম্যাগনেসিয়াম কার্ব্বনেট ৬ ভাগ, অক্সাইড অব জিঙ্ক ৩৫ ভাগ, ট্যালকম ৫৯ ভাগ। ইহার সহিত মনের মতন আতর বা অন্য কোন গন্ধ মিশাইয়া লউন। ইহাকে যদি রঞ্জিত করিতে চান, তবে ইহার সঙ্গে এমোনিয়ার জলে দ্রবীভূত কিঞ্চিৎ কারমাইন মিশাইতে পারেন।

জিঙ্ক অক্সাইড ৪ ভাগ, চাউলের সূক্ষ্ম চূর্ণ ১৪ ভাগ, খড়িচূর্ণ ৪ ভাগ, ট্যালকম চূর্ণ ২ ভাগ, ওরিসরুট চূর্ণ ২ ভাগ। ইহার সহিত যথাপরিমাণ গন্ধদ্রব্য।

কস্‌মেটিক্‌স (Cosmetics)

কস্‌মেটিক্‌কে বাঙ্গালায় কি বলা যায়, তাহা আমি ঠাহর করিতে পারিতেছি না। কস্‌মেটিক্‌স নামেই ইহা সাধারণ্যে পরিচিত। মহিলাগণের মুখেও এই নামই শুনিতে পাই; এবং বুঝিতে পারি, মহিলারা ইহার খুবই ভক্ত। যাহা হউক, ইহা অঙ্গরাগের একটা আদরণীয় উপকরণ বটে।

আপনারা কেহ কস্‌মেটিক ব্যবহার করেন কি? যদি করেন, তাহা হইলে ইহার মামলা জানিয়া রাখিলে আপনাদের কিছু সুবিধা হইতে পারে।

একটা গ্লেজ করা মাটীর পাত্র যোগাড় করুন। গ্লেজ করা পাত্র না পাওয়া গেলে সাধারণ মাটীর পাত্রেও হয়; তবে কিছু লোকসান হয়। চিনা মাটীর পাত্র হইলে অবশ্য ভালই হয়। স্পার্ম্মাসেটি ৫ তোলা, বিশুদ্ধ সাদা মোম ১০ তোলা, পরিষ্কার বাদামের তেল ২৫ তোলা লইয়া ঐ পাত্রে রাখুন। আর একটা বড় পাত্রে উনুনে জল গরম করিতে দিন; এবং ঐ জলের উপর মসলার পাত্রটী বসাইয়া

দিন। জল যেমন গরম হইতে থাকিবে, মসলাগুলিও গলিয়া পরস্পর মিশিয়া যাইতে থাকিবে। তিনটি মসলাই উত্তমরূপে মিশিয়া গেলে পাত্রটি নামাইয়া রাখুন। মিশ্রণটি একটু ঠাণ্ডা হইলে তাহার সহিত Essential oil of almonds পাঁচ আনা আন্দাজ, জয়িত্রীর তৈল সাড়ে সাত আনা আন্দাজ মিশাইয়া লউন। মিশ্রণটি যেন খুব ভাল হয়। ক্রমে উহা যেমন ঠাণ্ডা হইয়া আসিবে, অমনি জমিয়া আসিবে। এইবার উহাকে ছাঁচে ঢালিয়া লউন। ইচ্ছা করিলে ইহাকে রং করিয়া লইতে পারেন।

আর এক প্রকার। কঠিন বিশুদ্ধ চর্ব্বি ৩৫ তোলা, বিশুদ্ধ সাদা মোম ৫ তোলা পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে water bathএ গলাইয়া মিশাইয়া লউন। পরে bath হইতে নামাইয়া একটু ঠাণ্ডা হইলে Essential oil of almonds পাঁচ আনা আন্দাজ এবং লবঙ্গের তৈল অথবা পিমেণ্টো ৩০ ফোঁটা মিশাইয়া লউন। রং যদি করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তরল থাকিতে রং করিয়া লইবেন। ইহার অল্প পরিমাণ গায়ে মর্দ্দন করিতে হয়।

চুল কোঁক্‌ড়াইবার ঔষধ

সুকেশের অধিকারী হওয়া ভাগ্যবন্তের লক্ষণ। কুঞ্চিত, ঘন, কৃষ্ণ কেশ লাভ করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। সেরূপ হতভাগ্য ব্যক্তি সকলের উপহাসের পাত্র হইয়া থাকেন। মোটকথা, যাঁহাদের চুল স্বভাবতঃ কোঁকড়ান নয়, তাঁহাদেরও চুল কোঁকড়াইবার সাধ যায়। বিজ্ঞান তাঁহাদের সাধ মিটাইবার উপায় বাহির করিয়াছে;—Mechanical ও Camical উভয়বিধ উপায়ই আবিষ্কৃত হইয়াছে। Hair curler নামে একপ্রকার যন্ত্র বাজারে পাওয়া যায়। তাহা আগুনে পোড়াইয়া তদ্দারা চুলের গোছা খানিকক্ষণ টিপিয়া ধরিয়া থাকিলে, চুল কোঁকড়াইয়া গিয়া দেখিতে বেশ সুন্দর হয়। কিন্তু এই যন্ত্র ব্যবহার করিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়। অনেক হাঙ্গামাও করিতে হয়। অথচ ফল তেমন স্থায়ী হয় না। উত্তপ্ত লৌহ দিয়া চুল কোঁকড়াইবার সময় কিছু চুল এবং মাথার চর্ম্ম কিছু কিছু পুড়িয়া যায়। তা ছাড়া, স্নান করিবার পর চুল নরম হইয়া কোঁকড়ানটুকু নষ্ট হইয়া, চুল পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে। চুল কোঁকড়াইবার যে রাসায়নিক ঔষধ আছে, তাহাতে চুলের কুঞ্চিত অবস্থা স্থায়ী হয় কি না তাহা বলিতে পারি না; তবে এই ঔষধ ব্যবহার করা সহজ—ইহাতে কোন হাঙ্গামা পোহাইতে হয় না; তৈয়ারী জিনিস সর্ব্বদা হাতের কাছে মজুত পাওয়া যায়, এবং যখন তখন অতি সহজে যথেচ্ছভাবে ব্যবহারও করা যায়। অকুঞ্চিত সরল কেশ কোঁকড়াইবার বাতিক যাঁহাদের খুব প্রবল, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয় ত দুইটী উপায়ই অবলম্বন করিয়া থাকিবেন। সুতরাং কোন্ উপায় অবলম্বন করা সহজ এবং কোনটি ব্যবহার করিলে স্থায়ী সুফল পাওয়া যায় তাহা তাঁহারা বলিতে পারেন। আমি যত লোককে চুল কোঁকড়াইবার চেষ্টা করিতে দেখিয়াছি, সে চেষ্টায় পরিণামে তাঁহাদিগের মাথায় টাকই পড়িয়া গিয়াছে। যাহা হউক, চুল কোঁকড়াইবার ঔষধের বাজারে খুব চাহিদা আছে।

সাড়ে সাত তোলা সোহাগা ও পাঁচ আনা পরিমাণ গঁদ এক বোতল ফুটন্ত জলে ভিজাইয়া গলাইয়া মিশাইয়া লউন। জলটা ঠাণ্ডা হইয়া আসিলে অর্থাৎ কুসুম কুসুম গরম থাকিতে থাকিতে আড়াই আউন্স স্পিরিট ক্যাম্ফর তাহার সঙ্গে মিশাইয়া দিন। রাত্রে শয়নের অব্যবহিত পূর্ব্বে এই ঔষধে মাথা ভিজাইয়া লইয়া যেমন ইচ্ছা ঢেউ খেলাইয়া লউন। ইহা কিছুদিন ব্যবহার করিলে, শুনিতে পাই, চুল স্থায়ীভাবে কোঁকড়াইয়া যায়।

স্পিরিট ক্যাম্ফর জিনিষটি ওলাউঠা রোগের পরম ঔষধ। হোমিওপ্যাথিক এবং এলোপ্যাথিক (অবশ্য গোঁড়ারা নহেন) চিকিৎসকেরা এই ঔষধটি সমভাবে পছন্দ করেন। আসলে ইহা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ। হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসক রুবিনী ইহার আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া ইহা রুবিনীর ক্যাম্ফর নামেও প্রসিদ্ধ। ওলাউঠা রোগের প্রথম অবস্থায় একডেলা চিনিতে এই আরকের ৫ হইতে ১০ ফোঁটা মিশাইয়া রোগীকে খাইতে দিলে অধিকাংশ স্থলেই রোগী বাঁচিয়া যায়। ঔষধটি প্রস্তুত করা কিন্তু খুব সহজ, অতি উৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ রেক্‌টিফায়েড স্পিরিটের ৬ ড্রামের সহিত একড্রাম কর্পূর মিশাইয়া শিশির ছিপি আঁটিয়া কিছু গরম যারগায় বা রৌদ্রে খানিকক্ষণ রাখিয়া দিলে কর্পূরটুকু স্পিরিটে গলিয়া যাইবে। ইহারই নাম স্পিরিট ক্যাম্ফর।

দেনা-পাওনা

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(২৪)

পরিপূর্ণ সুরাপাত্র অসম্মানে ফিরিয়া গেল, দেখিয়া প্রফুল্ল ব্যঙ্গ করিয়াছে। করিবারই কথা। লিভারের দুঃসহ যাতনায় ও চিকিৎসকের তাড়নায় শয্যাগত-জীবানন্দর জীবনে এ অভিনয় আরও হইয়া গেছে; কিন্তু স্বেচ্ছায়, সুস্থদেহে মদের বদলে চা খাইয়া বাটীর বাহির হওয়া খুব সম্ভব এই প্রথম। সমস্ত জগৎটা তাহার বিস্বাদ ঠেকিল, এবং শান্তিকুঞ্জের ঘন ছায়ায় ঘেরা পথের মধ্যে যে দিকে চাহিল, সেই দিক হইতেই একটা অস্ফুট কান্নার সুর আসিয়া যেন তাহার কানে বাজিতে লাগিল। তাহার অভ্যস্ত জীবনের নিচে তাহারই যে আরও একটা সত্যকার জীবন আজও বাঁচিয়া আছে এ খবর সে জানিতনা। গেট পার হইয়া যখন মাঠের পথে বাহির হইয়া আসিল, তখন সন্ধ্যার ধূসর আকাশ ধীরে ধীরে রাত্রির অন্ধকারে পরিণত হইতেছিল; একদিকে শীর্ণ নদীর বালুময় শুষ্ক সৈকত আঁকিয়া বাঁকিয়া দিগন্তে অদৃশ্য হইয়াছে, আর একদিকে বৈশাখের শষ্প শস্যহীন বিস্তৃত ক্ষেত্র চণ্ডীগড়ের পদমূলে গিয়া মিশিয়াছে। পথে পথিক নাই, মাঠে কৃষকদের আর দেখা যায় না, রাখাল বালকেরা গোচারণের কাজ আজিকার মত শেষ করিয়া গৃহে ফিরিয়া গেছে,—সান্ধ্য আকাশতলে জনহীন ভূখণ্ডের এই স্তব্ধ বিষণ্ণ মূর্ত্তি আজ তাহার কাছে অত্যন্ত করুণ ও অদ্ভুত মনে হইল। এই পথে, এমনি নির্জ্জন সন্ধ্যায় সে আরও কতবার যাতায়াত করিয়াছে; কিন্তু এতদিন ধরিত্রী যেন এই তাঁহার শান্ত দুঃখের ছবিখানি মাতালের রক্তচক্ষু হইতে একান্ত সঙ্কোচে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। ওপারের রৌদ্র দগ্ধ প্রান্তর বহিয়া উষ্ণ বায়ু আসিয়া মাঝে মাঝে তাহার গায়ে লাগিতেছিল;—কিছুই নূতন নয়,—কিন্তু সেই দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ রুদ্ধ অভিমানের কান্নায় যেন আজ তাহার বুক ভরিয়া উঠিল। মনে মনে বলিতে লাগিল, মা পৃথিবী, তোমার দুঃখের তপ্ত নিঃশ্বাসটুকুও কি লজ্জায় এতদিন চেপে রেখেছিলে, পাষণ্ড বলে জানতে দাওনি? সংসারে আপনার বলতে আমার কেউ নেই, নিজের ছাড়া কারও সুখ দুঃখের কখনো ভাগ পাইনি,—সেও কি মা, আমারই দোষ? আজ আছি, কাল যদি না থাকি, দুনিয়ায় কারও ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, এ কথা কি তুমিই কোনদিন ভেবেচ মা?

এ অভিযোগ যে সে কাহার কাছে করিল, মা বলিয়া যে সে বিশেষ কাহাকে লক্ষ্য করিয়া ডাকিল, বোধ হয় সে নিজেই ঠিক মত উপলব্ধি করে নাই; তথাপি গিরি-গাত্র-স্খলিত উপলখণ্ড সকল যেমন নির্ঝরের পথ ধরিয়া আপনার ভারবেগে আপনিই গড়াইয়া চলে, তেমনি করিয়াই তাহার সদ্য উৎসারিত আকস্মিক বেদনার অনুভূতি চোখের জলের পথ ধরিয়া কথার মালা গাঁথিয়া গাঁথিয়া নিরন্তর বহিয়া চলিতে লাগিল। মাঠের জল নিকাশের জন্য চাষারা একবার এই পথের উপর দিয়া নালা কাটিয়া দিয়াছিল। নন্দী মহাশয়ের আদেশ অর্জ্জন করিবার মত প্রচুর দক্ষিণা যখন তাহারা কোনমতেই সংগ্রহ করিতে পারে নাই, তখনই শুধু সর্ব্বনাশ হইতে আত্মরক্ষা করিতে এই কাজ করিয়াছিল; কিন্তু দরিদ্রের এই দুঃসহ স্পর্দ্ধা এককড়ি হুজুরের গোচর করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, নিরুপায়ের অশ্রুজলে ভ্রুক্ষেপ মাত্র করেন নাই। স্থানটা তখন পর্য্যন্ত অসমতল অবস্থাতেই ছিল। দরিদ্র-পীড়নের এই উৎকট চিহ্ন এই পথে কতবারই ত তাহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, কিন্তু আজ ইহাই চোখে পড়িয়া দুই চোখ অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠিল। মনে মনে কহিল, আহা! কত ক্ষতিই না জানি হয়েছে। কত ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে হয়ত পেটভরে দুবেলা খেতেও পাবেনা। কেনই বা মানুষে এ সব করে? যায়গাটা অন্ধকারেই ক্ষণকাল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কহিল, হাতে টাকা থাকলে কালই মিস্ত্রী লাগিয়ে এটা বাঁধিয়ে দিতাম, প্রতি বৎসর এ নিয়ে আর তাদের দুঃখ পেতে হোতোনা। আচ্ছা,

কত টাকা লাগে? সে পথ ছাড়িয়া মাঠে নামিয়া গেল, এবং সমস্তটা মন দিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। এ সম্বন্ধে কোন ধারণাই তাহার ছিল না, কত ইঁট, কত চুণ-বালি, কত কাঠ, কি-কি আবশ্যক কিছুই সে জানিতনা, কিন্তু কথাটা তাহাকে যেন পাইয়া বসিল। সেইখানে ভূতের মত অন্ধকারে একাকী দাঁড়াইয়া সে কেবলই মনে মনে হিসাব করিতে লাগিল এই ব্যয় তাহার সাধ্যাতীত কিনা! পথের ওধার দিয়া কি একটা ছুটিয়া গেল। হয়ত, কুকুর কিম্বা শিয়াল হইবে, কিন্তু তাহার চমক্ ভাঙ্গিল। পরের জন্য দুঃখ বোধ করা এম্‌নই অভ্যাস-বিরুদ্ধ যে, চমক্ ভাঙার সঙ্গেসঙ্গেই ইহার সমস্ত তামাসাটা এক মুহূর্ত্তে ধরা পড়িয়া তাহার ভারি হাসি পাইল। তাড়াতাড়ি রাস্তায় উঠিয়া আসিয়া শুধু বলিল, বাঃ! বেশ ত কাণ্ড! কেউ যদি দেখে ত কি ভাবে? জীবানন্দ আজ মদ না খাইয়াই বাহির হইয়াছিল, তাহার আজিকার এই মনের দুর্ব্বলতার হেতু সে বুঝিল, অবসাদগ্রস্ত চিত্তের মাঝে কেন যে আজ অকারণে কেবল কান্নার সুরই বাজিয়া বাজিয়া উঠিতেছে ইহারও কারণ বুঝিতে তাহার বিলম্ব ঘটিলনা। আরও একটা জিনিস নিজের সম্বন্ধে আজ তাহার প্রথম সন্দেহ হইল যে দীর্ঘদিনের অভ্যাস আজ তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘেরিয়া একেবারে স্বভাবে রূপান্তরিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আপনাকে আপন বলিয়া দাবী করিবার দাবী হয়ত তাহার চিরদিনের মত হাতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। কিসের জন্য বাটীর বাহির হইয়াছিল ঠিক স্মরণ করিতে পারিল না, ঝোঁকের মাথায় জোর করিয়া যখন ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছিল, তখন স্থির সঙ্কল্প হয়ত কিছু ছিলনা, হয়ত, অগোচরে অস্পষ্টরূপে অনেক কথাই ছিল,—যাহা এখন একেবারে লেপিয়া একেকার হইয়া গেল। গৃহত্যাগের কোন উদ্দেশ্যই মনে পড়িল না। কিন্তু গৃহে ফিরিতেও ইচ্ছা করিলনা। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া রাস্তা ছাড়িয়া পায়ে হাঁটা যে পথটা মাঠের উপর দিয়া কোনাকুনি চণ্ডীগড়ের দক্ষিণ ঘুরিয়া গিয়াছে অন্ধকারে সেই পথেই সে পা বাড়াইল। পথটা দীর্ঘ এবং বন্ধুর, প্রতি পদক্ষেপেই বাধা পাইতে লাগিল, কিন্তু ধাকা খাইয়া, হোঁচট খাইয়া পথ চলিতে চলিতে বিক্ষিপ্ত চিত্ততল তাহার কখন যে ইঁট ও কাঠ ও চুন ও সুরকির চিন্তায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, সে জানিতেও পারিল না। জিনিসটা কিছুই নয়, ছোট একটা সাঁকো, বীজগ্রামের জমিদারের কাছে তাহার চেয়ে তুচ্ছ বস্তু আরত কিছু হইতেই পারেনা। সেটা তৈরী করার মধ্যে না আছে শিল্প, না আছে সৌন্দর্য্য; তবুও এই শিল্প-সৌন্দর্য্যহীন সামান্য বস্তুটাই যেন কত দুঃখীর সুখ দুঃখের সঙ্গে মিশিয়া তাহার মনের মধ্যে আজ এক নূতন রসে ভরিয়া অসামান্য হইয়া দেখা দিল। তাহাকে কতপ্রকারে ভাঙিয়া কত রকমে গড়িয়া সে যেন আর শেষ হইতেই চাহিল না। অথচ, এ সকল যে শুধু তাহার অবসন্ন-মনের ক্ষণস্থায়ী খেয়াল, সত্য বস্তু নয়, কাল দিনের বেলা ইহার চিহ্নমাত্র রহিবেনা, এ কথাও সে বিস্মৃত হইলনা,—উৎসবের মাঝে গোপন শোকের মত কোথায় যেন বিঁধিয়াই রহিল, কিন্তু আজ রাত্রির মত এই ছেলেমানুষিটাকে সে কোন মতেই ছাড়িতে পারিলনা, প্রশ্রয় দিয়া দিয়া কল্পনার পরে কল্পনা যোজন করিয়া অবিশ্রাম চলিতে লাগিল। সহসা কালো আকাশপটে চণ্ডী-মন্দিরের চূড়া দেখা দিল। এতদূরে আসিয়াছে তাহার হুঁস ছিল না; আরও কাছে আসিয়া মন্দিরের ছোট দরজাটা তখনও খোলা আছে দেখিতে পাইয়া নিঃশব্দে ভিতরে প্রবেশ করিল। দেবীর আরতি অনেকক্ষণ শেষ হইয়া গেছে, মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ, সমস্ত প্রাঙ্গণে ঘোর অন্ধকার, শুধু নাটমন্দিরের একধারে মিট মিট করিয়া একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে। জীবানন্দ নিকটে গিয়া দেখিল জন চার পাঁচ লোক মশার ভয়ে আগাগোড়া মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে, শুধু কে একজন থামের আড়ালে চুপ করিয়া বসিয়া মালা জপ করিতেছে। জীবানন্দ আরও একটু কাছে গিয়া লোকটিকে দেখিবার চেষ্টা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে তুমি?

লোকটি জীবানন্দের ধপ্‌ধপে শাদা পরিচ্ছদ অন্ধকারেও অনুভব করিয়া তাঁহাকে ভদ্র ব্যক্তি বলিয়া বুঝিল, কহিল, আমি একজন যাত্রী বাবু।

ওঃ—যাত্রী! কোথায় যাবে?

আজ্ঞে, আমি যাবো শ্রীশ্রী পুরীধামে।

কোথা থেকে আস্‌চো? এরা বুঝি সব তোমার সঙ্গী? এই বলিয়া জীবানন্দ ঘুমন্ত লোকগুলিকে দেখাইয়া দিল।

লোকটি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আজ্ঞে না, আমি

একাই আস্‌চি মানভূম জেলা থেকে। এদের কারও বাড়ী মেদিনীপুর, কারও বাড়ী আর কোথাও,—কোথায় যাবে, তাও জানিনে। দু'জন ত কেবল আজ দুপুর বেলাতে এসেছে।

জীবানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, কত লোক এখানে রোজ আসে? যারা থাকে তারা দু'বেলা খেতে পায়, না?

লোকটা বিব্রত হইয়া পড়িল। লজ্জিতভাবে কহিল, কেবল খাবার জন্যেই সবাই থাকেনা বাবু। পায়ে হাঁটা আমার অভ্যাস ছিলনা, তাই ফেটে গিয়ে ঘায়ের মত হল। মা ভৈরবী নিজের চোখে দেখে হুকুম দিলেন যতদিন না সারে এখানে থাকো।

জীবানন্দ কহিল, বেশ ত থাকোনা। যায়গার ত আর অভাব নেই হে।

কিন্তু মা ভৈরবী ত আর নেই শুন্‌তে পেলাম।

জীবানন্দ হাসিয়া কহিল, এরই মধ্যে শুন্‌তে পেয়েচ? তা' না-ই তিনি থাক্‌লেন, তাঁর হুকুম ত আছে। তোমাকে যেতে বলে সাধ্য কার? তোমার যতদিন না পা সারে তুমি থাকো। এই বলিয়া জীবানন্দ তাহার কাছে আসিয়া বসিল। লোকটা প্রথমে একটু ভয় ও সঙ্কোচ অনুভব করিল, কিন্তু সে ভাব রহিল না। এবং দেখিতে দেখিতে অন্ধকারে এই নির্জ্জন নিস্তব্ধ দেবায়তনের একান্তে পরাক্রান্ত এক ভূস্বামী ও দীন গৃহহীন আর এক ভিক্ষুকের সুখ দুঃখের আলোচনা একেবারে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। লোকটির নাম উমাচরণ, জাতিতে কৈবর্ত্ত, বাটী আগে ছিল মানভূম জেলার বংশীবট গ্রামে। গ্রামে অন্ন নাই, জল নাই, চিকিৎসক নাই,—এ যাঁহার ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি, তিনি পশ্চিমের কোন্ এক সহরে ওকালতী করেন। রাজায় প্রজায় প্রীতি নাই, সম্বন্ধ নাই, আছে শুধু শোষণ করিবার বংশগত অধিকার। এই ফাল্গুনের শেষে বিসূচিকা রোগে তাহার স্ত্রী মরিয়াছে; উপযুক্ত দুই পুত্র একে একে চোখের উপর বিনা চিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে, সে কোন উপায় করিতে পারে নাই; অবশেষে জীর্ণ ঘরখানি সে তাহার এক বিধবা ভ্রাতুষ্কন্যাকে দান করিয়া চিরদিনের মত গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। এ জীবনে আর তাহার ফিরিবার আশা নাই, ইচ্ছা নাই,—এই বলিয়া সে ছেলেমানুষের মত হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। জীবানন্দর চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। পরের কান্না তাহার কাছে নূতন বস্তু নয়; এ সে জীবনে অনেক দেখিয়াছে, কিন্তু কোন দিন এতটুকু দাগ পর্য্যন্ত ফেলিতে পারে নাই, আজও সে ছাড়া আর কেহ জানিতেও পারিলনা, কিন্তু অন্ধকারে জামার খুঁট দিয়া মুছিতে মুছিতে তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল কোথাও ছুটিয়া গিয়া যে স্ত্রী তাহার মরে নাই, যে ছেলে তাহার জন্মে নাই, যে গৃহ তাহাকে ত্যাগ করিয়া আসিতে হয় নাই, তাহাদেরই জন্য এই অপরিচিত লোকটার মতই ডাক ছাড়িয়া কাঁদে। খানিকপরে সে কতকটা আত্ম সম্বরণ করিয়া কহিল, বাবু, আমার মত দুঃখী আর সংসারে নেই।

জীবানন্দ কহিল, ওরে ভাই, সংসারটা ঢের বড় যায়গা, এর কোথায় কে কি ভাবে আছে বল্‌বার যো নাই।

ইহার তাৎপর্য্য সম্যক উপলব্ধি করিবার মত শিক্ষা বা শক্তি এই সামান্য লোকটার ছিলনা, জীবানন্দ নিজেও তাহা আশা করিলনা. কিন্তু থামিতেও পারিলনা। তাহার অশ্রুসিক্ত কণ্ঠস্বরের অপূর্ব্বতা তাহার কানে কানে এমন অমৃত সিঞ্চন করিল যে সে লোভ সে সাম্‌লাইতে পারিলনা। বলিতে লাগিল, দুঃখীদেরও কোন আলাদা জাত নেই দাদা, দুঃখেরও কোন বাঁধানো রাস্তা নাই। তা'হলে সবাই তাকে এড়িয়ে চল্‌তে পারত। হুড়মুড় করে যখন ঘাড়ে এসে পড়ে তখনই মানুষে তাকে টের পায়। কিন্তু কোন্ পথে যে তার আনাগোনা আজও কেউ তার খোঁজ পেলেনা। আমার সব কথা তুমি বুঝবেনা ভাই, কিন্তু সংসারে তুমি একলা নও,—অন্ততঃ একজন সাথী তোমার বড় কাছেই আছে, তাকে তুমি চিন্‌তেও পারোনি।

লোকটি চুপ করিয়া রহিল। কথাও বুঝিলনা, সাথী যে কে আছে তাহাও জানিলনা। জীবানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তুমি মায়ের নাম করছিলে ভাই, আমি বাধা দিলাম। আবার সুরু কর, আমি চোল্‌লাম। কাল এম্‌নি সময়ে হয়ত আবার দেখা হবে।

লোকটি কহিল, আর ত দেখা হবেনা বাবু, আমি পাঁচ দিন আছি, কাল সকালেই আমাকে চলে যেতে হবে।

চলে যেতে হবে? কিন্তু এই যে বল্‌লে তোমার পা সারেনি, তুমি হাঁটতে পারোনা?

সে কহিল, মায়ের মন্দির এখন রাজা বাবুর। হুজুরের হুকুম তিনদিনের বেশি আর কেউ থাকতে পাবেনা।

জীবানন্দ হাসিয়া কহিল; ভৈরবী এখনও যায়নি, এরই মধ্যে হুজুরের হুকুম জারি হয়ে গেছে! মা চণ্ডীর কপাল ভাল! এই বলিয়া হঠাৎ তাহার একটা কথা মনে পড়িয়া ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, আজ অতিথিদের সেবা হ'ল কি রকম? কি খেলে ভাই?

সে কহিল, যারা তিনদিন আসেনি তারা মায়ের প্রসাদ সবাই পেলে।

আর তুমি? তোমার ত তিনদিনের বেশি হয়ে গেছে?

লোকটি ভালমানুষ, সহসা কাহারও নিন্দা করা স্বভাব নয়, বলিল, ঠাকুর মশাই কি কোরবেন, রাজাবাবুর হুকুম নেই কিনা?

তাই হবে! বলিয়া জীবানন্দ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল। খুব সম্ভব অনাহুত যাত্রীদের সম্বন্ধে পূর্ব্বে হইতেই এম্‌নি একটা নিয়ম ছিল, কিন্তু ষোড়শী তাহা মানিয়া চলিতে পারিতনা। এখন তারাদাস এবং এককড়ি নন্দী উভয়ে মিলিয়া জমিদারের নাম করিয়া সেই ব্যবস্থা অক্ষরে অক্ষরে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই যদি হয়, অভিযোগ করিবার খুব বেশি হেতু নাই, কিন্তু মন তাহার কোন মতেই এ কথা স্বীকার করিতে চাহিলনা। অন্তর হইতে সে বার বার করিয়া কহিতে লাগিল, এমন হইতেই পারেনা! এমন হইতেই পারেনা! বুভুক্ষুকে আহার দিবার আবার বিধিব্যবস্থা কি! ওই যে ক্ষুধার্ত্ত অতিথি ওইখানে অনাহারে বসিয়া রহিল, ক্ষুধাকে তাহার বাঁধিয়া রাখিবে ইহারা কোন্ আইন-কানুনে? কহিল, ওহে ভাই, কাল আবার আমি আস্‌বো, কিন্তু চুপি চুপি চলে যেতে পাবেনা তা' বলে যাচ্ছি।

কিন্তু ঠাকুরমশাই যদি কিছু বলে?

জীবানন্দ কহিল, বল্‌লেই বা। এত দুঃখ সইতে পারলে আর বামুনের একটা কথা সইতে পারবেনা? ধীরে ধীরে বাহির হইয়া যাইতেছিল, হঠাৎ মন্দিরের বারান্দায় থামের আড়ালে মানুষের চাপা গলা শুনিয়া বিস্মিত হইল। প্রথমে মনে করিল, নিভৃতে কেহ আরাধনা করিতে আসিয়াছে, কিন্তু কথাটা তাহার কানে গেল। কে একজন বলিতেছে, আমাদের মায়ের সর্ব্বনাশ যে করেছে তার সর্ব্বনাশ না কোরে আমরা কিছুতে ছাড়বনা বলে দিচ্চি।

অন্য জন জবাব দিল, মায়ের চৌকাট ছুঁয়ে দিব্যি কোরলাম খুড়ো,—ফাঁসি যেতে হয়, তাও যাবো।

আর একজন বলিল, হঃ—আমাদের আবার জেল! আমাদের আবার ফাঁসি! মা চলে যেতে চাচ্চে, আগে যাক্—

অন্ধকারে না চিনিল মানুষ, না চিনিল গলা, তবুও মনে হইল একজনের গভীর কণ্ঠস্বর সে কোথায় যেন শুনিয়াছে, একেবারে অপরিচিত নয়। চেষ্টা করিলে হয় ত মনে করিতেও পারিত, কিন্তু আজ তাহার সে দিকে মনই গেলনা। সে তো অনেকের অনেক সর্ব্বনাশ করিয়াছে,—অতএব, নিজেই ত সে ইহার লক্ষ্য হইতে পারে, কিন্তু আজ তাহা নির্ণয় করিবার ইচ্ছাই হইলনা। মনে মনে হাসিয়া কহিল, বাস্তবিক, ঠাকুর দেব্‌তার মত এমন সহৃদয় শ্রোতা আর নেই। হোক্‌না মিথ্যা দম্ভ, তবু তার দাম আছে। দুর্ব্বলের ব্যর্থ পৌরুষ তবু একটু গৌরবের স্বাদ পায়। আহা!

অলক্ষ্যে, নিঃশব্দে যখন বাহির হইয়া আসিল তখন রাত্রি বোধ হয় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। নির্ম্মল, কালো আকাশ তারায় তারায় ঠাসা। সেই অসংখ্য নক্ষত্রলোক হইতে ঝরিয়া অদৃশ্য আলোকের আভাস অন্ধকার পথের মাটিকে ধূসর করিয়া দিয়াছে। তাহারই মাঝে মাঝে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কঠিন মাটির স্তূপ পথশ্রান্ত পথিকের মত কতকাল ধরিয়া যে নিঃশব্দে বসিয়া আছে তাহার ইতিহাস নাই, তাহারই একটির পাশে গিয়া সে ঠিক তেম্‌নি করিয়াই ধূলার উপর বসিয়া পড়িল। সুমুখের কতকটা পতিত জমির একধারে ষোড়শীর কুটীর, গাছের আড়ালে বেশ স্পষ্ট দেখা না গেলেও তাহার মনে হইল অনেকগুলি মানুষ যেন সার বাঁধিয়া বাহির হইয়া আসিল, এবং অনতিদূর দিয়া যখন চলিয়া গেল, তখন ইহাদেরই কথাবার্ত্তা হইতে জীবানন্দ এইটুকু সংগ্রহ করিল যে ষোড়শীর গো-যান আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং আজই রাত্রিশেষে সে চণ্ডীগড় ত্যাগ করিয়া যাইবে। ভক্ত প্রজার দল তাহার শেষ পদধূলি গ্রহণ করিয়া ঘরে ফিরিতেছে। নিষেধ করিবার পথ নাই, নিষেধ করিলে সে শুনিবেনা, এই কয়দিনে এতটুকু তাহাকে

সে চিনিয়াছে,—কিন্তু, মন তাহার ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। সজ্ঞানে ও অজ্ঞানে ইহার বিরুদ্ধে যত অন্যায় করিয়াছে, একটি একটি করিয়া এতকাল পরে তাহার তালিকা করা অসম্ভব, কিন্তু সেই সকল অগণিত অত্যাচারের সমষ্টি আজ তাহার চোখের উপর স্তূপাকার হইয়া উঠিল। ইহাকে সরাইয়া রাখিবার স্থান সংসারে সে কোথাও দেখিলনা। স্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিতে যাহাকে সে লজ্জা বোধ করিয়াছে, গণিকা বলিয়া তাহাকেই কামনা করিবার শয়তানী সে যে কোথায় পাইয়াছিল ভাবিয়া পাইলনা। আজ সমস্ত হৃদয় তাহার ষোড়শীকে একান্ত মনে চাহিতেছে, এ তাহার অধিকারের দাবী, অথচ, চিরদিন ইহাকেই উপেক্ষা করিয়া, অপমান করিয়া, মিথ্যার পরে মিথ্যা জমা করিয়া সে যে প্রাচীর গড়িয়া তুলিয়াছে, আজ তাহাকে লঙ্ঘন করিবার পথ তাহার কই?

হঠাৎ সম্মুখেই দেখিতে পাইল কে একজন দ্রুতপদে চলিয়াছে। তাহাকে অন্ধকারে চিনিতেও বিলম্ব হইলনা, ডাকিল, অলকা?

ষোড়শী চমকিয়া দাঁড়াইল। এ যে জীবানন্দ তাহা সে ডাক শুনিয়াই বুঝিয়াছিল। একটু সরিয়া আসিয়া তিক্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এখানে কেন?

জীবানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, কি জানি, এম্‌নিই বসে ছিলাম। তুমি যাত্রার আগে ঠাকুর প্রণাম করতে যাচ্ছো, না? চল, আমি তোমার সঙ্গে যাই।

এই একটা বেলার মধ্যে তাহার কণ্ঠস্বরে কি যে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ষোড়শী বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া রহিল। ক্ষণেক পরে কহিল, আমার সঙ্গে যাবার বিপদ আছে, সে তো আপনি জানেন?

জীবানন্দ বলিল, জানি। কিন্তু, আমার পক্ষ থেকে একেবারে নেই। আজ আমি একা এবং সম্পূর্ণ নিরস্ত্র,—একগাছা লাঠিও সঙ্গে নেই।

ষোড়শী কহিল, শুনেচি। প্রফুল্লবাবু আপনাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন, তাঁর কাছেই খবর পেলাম আজ আপনি নিরস্ত্র বাড়ী থেকে একলা বেরিয়ে গেছেন, এবং—

এবং, ঝোঁকের উপর মদ না খেয়ে বার হয়ে গেছি, না?

ষোড়শী কহিল, হাঁ। কিন্তু চণ্ডীগড়ে এ কাজ আর আপনি ভবিষ্যতে করবেননা।

জীবানন্দ কহিল, এ কাজ আমি প্রত্যহ কোরব, এবং যতদিন বাঁচ্‌বো,—কোরব। প্রফুল্ল তোমাকে এত কথা বলেছে, এ কথা বলে নি যে এ জীবনে আর যাই কেন না স্বীকার করি পৃথিবীতে আমার শত্রু আছে এ কথা আর আমি একদিনও স্বীকার কোরবনা?

ষোড়শী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ইহার যুক্তি লইয়াও তর্ক করিলনা, এ কথার স্থায়িত্ব লইয়াও প্রশ্ন করিলনা। জীবানন্দর মুখের চেহারা অন্ধকারে সে দেখিতে পাইলনা, কিন্তু এই তাহার অদ্ভুত কণ্ঠস্বর নিশীথে এই নির্জ্জন প্রান্তরের মধ্যে তাহার দুই কান ভরিয়া এক আশ্চর্য্য সুরে বাজিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে কহিল, আমার সঙ্গে মন্দিরে গিয়ে আপনার কি হবে?

জীবানন্দ কহিল, কিছুই না। শুধু যতক্ষণ আছো, সঙ্গে থাক্‌বো, তারপরে যখন যাবার সময় হবে তোমাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আমি বাড়ী চলে যাবো।

ষোড়শী তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে পারিলনা। জীবানন্দ কহিল, যাবার দিনে আজ আর আমাকে তুমি অবিশ্বাস কোরোনা অলকা। আমার জীবনের দাম তুমি ত জানো, আর হয়ত দেখাও হবেনা। আমাকে যে তুমি কত রকমে দয়া করে গেছ, আমার শেষ দিন পর্য্যন্ত আমি সেই সব কথাই স্মরণ কোরব।

ষোড়শী কহিল, আচ্ছা, আসুন,—এই বলিয়া সে অগ্রসর হইল। মিনিট দুই নিঃশব্দে চলার পরে জীবানন্দ কহিল, লোকে বলে, ও দয়ার যোগ্য নয়। আচ্ছা অলকা, দয়ার আবার যোগ্যতা অযোগ্যতা কি? দয়া যে করে সে তো নিজের গরজেই করে। নইলে, দয়া পাবার যোগ্যতা আমার ছিল এতবড় দোষারোপ করতে ত শুধু অতিবড় শত্রু নয়, তুমি পর্য্যন্ত পারবেনা।

ষোড়শী মৃদুস্বরে বলিল, আমার চেয়ে আপনার বড় শত্রু সংসারে বুঝি আর কেউ নেই?

জীবানন্দ বলিল, না।

মন্দিরে প্রবেশ করার পরে জীবানন্দ হঠাৎ বলিয়া উঠিল, মজা দেখ অলকা, যাদের নিজের অন্ন নেই, সংসারে তারাই অপরের অন্নে সব চেয়ে বড় বাধা। ষোড়শী জিজ্ঞাসু মুখে ফিরিয়া চাহিতে কহিল, আজ আমি এতক্ষণ পর্য্যন্ত এই মন্দিরেই বসে ছিলাম। ভৈরবী নেই এখন জমিদার

কর্ত্তা। হুজুরের নাম করে তাই এরই মধ্যে যাত্রীদের উপর তেরাত্রির আইন জারি হয়ে গেছে। তোমার সেই যে খোঁড়া অতিথিটি, পা না সারা পর্য্যন্ত যাকে তুমি থাক্‌তে অনুমতি দিয়েছ, তার মুখেই শুন্‌তে পেলাম হুজুরের কড়া হুকুমে আজ তার অন্ন বন্ধ। সে বেচারা অভুক্ত ব'সে চণ্ডীনাম জপ করছিল,—হুজুরের কল্যাণ হোক্‌, কাল সকালেই না কি আবার তাকে চলে যেতে হবে, পা দুটো তার থাক আর যাক্‌।

ষোড়শী কহিল, আমার বাবা বুঝি হুকুম দিয়েছেন?

জীবানন্দ বলিল, শুধু তোমার বাবা কেন, গরীব দুঃখীর প্রতি দয়া দাক্ষিণ্য করতে অনেক বাবাই এ গ্রামে আছেন, আর হুজুরের সুনামে ত' স্বর্গ-মর্ত্ত ছেয়ে গেল। লোকটার কাছে বসে বসে তাই ভাব্‌ছিলাম অলকা, তোমার যাবার পরে সন্ন্যাসিনীর আসনে বসে এই সব বাবার দল যে তাণ্ডব-কাণ্ড বাধাবে তাকে আমি সাম্‌লাবো কি করে?

ষোড়শী চুপ করিয়া রহিল। জীবানন্দ নিজেও বহুক্ষণ অবধি মৌন থাকিয়া মনে মনে কত কি যেন ভাবিতে লাগিল, অকস্মাৎ একসময়ে বলিয়া উঠিল, তোমাকে আমার বড় প্রয়োজন অলকা। দুটো দিনও কি আর তোমার থাকা চলেনা?

ষোড়শী শান্ত কণ্ঠে শুধু কহিল, না। তার পরে সে উঠিয়া গিয়া রুদ্ধ মন্দিরের দ্বারে অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিয়া যখন ফিরিয়া আসিল, জীবানন্দ কহিল, আর একটা দিন?

ষোড়শী বলিল, না।

তবে সকল অপরাধ আমার এইখানে দাঁড়িয়ে আজ ক্ষমা করে যাও?

কিন্তু তাতে কি আপনার খুব বেশি প্রয়োজন আছে?

জীবানন্দ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, এর উত্তর আজ দেবার আমার শক্তি নেই। এখন কেবল এই কথাই আমার সমস্ত মন ছেয়ে আছে অলকা, কি করলে তোমাকে একটা দিনও ধরে রাখ্‌তে পারি। উঃ—নিজের মন যার পরের হাতে চলে যায় সংসারে তার চেয়ে নিরুপায় বুঝি আর কেউ নেই। আমার সব চেয়ে বড় দুঃখ লোকে জান্‌বে আমি তোমাকেই শাস্তি দিয়েছি, তুমি সহ্য করেছ, আর নিঃশব্দে চলে গেছ। তুমি যাবার আগে তোমার মা চণ্ডীকে জানিয়ে যাও, যে এর চেয়ে মিথ্যে আর নেই।

ষোড়শী কোন উত্তর না দিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিবার মুখে সহসা জীবানন্দ দুই হাত প্রসারিত করিয়া কহিল, তোমার ঠাকুরের সুমুখে দাঁড়িয়ে আজ এই কথাটি আমাকে বলে দাও কি করলে তোমাকে আমি কেবল একটি দিন কাছে রাখ্‌তে পারি? তার পরে তুমি—

ষোড়শী দুই পা পিছাইয়া গিয়া কহিল, কিসের জন্যে এত কাতর হচ্চেন চৌধুরী মশায়, আপনার পাইক-পিয়াদারা কি কেউ নেই? এই কাজটুকু কি আপনার কাছে এতই শক্ত যে এত অনুনয় বিনয়? আপনি ত জানেন, আমি কারও কাছে নালিশ কোরবনা।

জীবানন্দ পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল। রাগ করিল-না, আঘাত খাইয়া প্রতিঘাত করিলনা, সবিনয়ে ধীরে ধীরে কহিল, তুমি যাও, অসম্ভবের লোভে আর তোমাকে আমি পীড়ন কোরবনা। পাইক-পিয়াদা সবাই আছে অলকা, কিন্তু সে ভুল আর আমার হবেনা। এই ক'দিনে অনেক শিক্ষা হয়েছে,—যে নিজে ধরা দেবেনা, জোর করে ধরে রেখে তার সমস্ত বোঝা অহোরাত্র বয়ে বেড়াবার জোর আর আমার গায়ে নেই।

এবার কিন্তু ষোড়শী পথ ছাড়া পাইয়াও পা বাড়াইল-না, কহিল, আমি কোথায় যাচ্চি সে কৌতূহলও বোধ করি আর আপনার নেই?

জীবানন্দ কহিল, কৌতূহল? বোধ হয় তার সীমা নেই,—কিন্তু তাতে জ্বালাও আর নেই অলকা। আমি কেবল এই কামনা করি, সেখানে কষ্ট তোমাকে যেন কেউ না দেয়! তোমার প্রতি যারা বিরূপ, তারা যেন তোমাকে সম্পূর্ণ ভুলে থাক্‌তে পারে। হঠাৎ গলাটা যেন তাহার ধরিয়া আসিল, কিন্তু নিজের দুর্ব্বলতাকে আর সে প্রশ্রয় দিলনা, মুহূর্ত্তে সাম্‌লাইয়া ফেলিয়া কহিল, আমি জানি, যে লোক স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে যায় তার সঙ্গে লড়াই চলেনা। যেদিন আমাদের হাতে তোমার চাবি ফেলে দিলে সেই দিন তোমার কাছে আমাদের একসঙ্গে সকলের হার হ'ল। তোমার জোরের আজ আর অবধি নেই,—তবু ত মানুষের মন বোঝেনা। যতদিন বেঁচে থাক্‌ব, এ আশঙ্কা আমার কোনদিন ঘুচবেনা।

ষোড়শী সেইখানে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া জীবানন্দর পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইয়া কহিল, আপনার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ,—

কি অনুরোধ অলকা ?

ষোড়শী মুহূর্ত্ত কাল নীরব থাকিয়া কহিল, সে আপনি জানেন।

জীবানন্দ একটুখানি ভাবিয়া বলিল, হয়ত জানি, হয়ত ভেবে দেখ্‌লে জান্‌তেও পারব,—কিন্তু সেই যে একদিন বলেছিলে সাবধানে থাক্‌তে,—কি জানি, সে বোধ হয় আর পেরে উঠবনা। আজই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে এই মন্দিরের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কে দু'জন দেবতার চৌকাট ছুঁয়ে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করে শপথ করে গেল তাদের মায়ের যে সর্ব্বনাশ করেছে তার সর্ব্বনাশ না কোরে তারা বিশ্রাম করবেনা,—আড়ালে দাঁড়িয়ে নিজের কানেই ত সমস্ত শুন্‌লাম,—দুদিন আগে হলে, হয়ত মনে হত, সে বুঝি আমি,—দুশ্চিন্তার সীমা থাক্‌তনা, কিন্তু আজ কিছু মনেই হলনা,—কি অলকা ?

না কিছুনা, বলিয়া ষোড়শী জোর করিয়া আবার সোজা হইয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারে জীবানন্দ দেখিতেও পাইলনা, তাহার মুখে রক্তের রেশ পর্য্যন্ত নাই, একেবারে যেন ছাইয়ের মত সাদা। কহিল, চলুন আমার ঘরে গিয়ে একটুখানি আজ বস্‌তে হবে। আমাকে গাড়ীতে তুলে না দিয়ে সত্যিসত্যিই বাড়ী যেতে আপনাকে আমি দেবনা। আসুন— (ক্রমশঃ)

সাময়িকী

এই সংখ্যার 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী এম-এ মহাশয়ের লিখিত 'চিত্র-প্রদর্শনী' প্রবন্ধে ৭২৭ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে দ্বিতীয় প্যারার পর নিম্নলিখিত অংশ পঠিতব্য।—"ইহার পরই আমরা পাইতেছি, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের একখানি water colour ছবি। একটি মেথরাণী ঝাড়ু এবং বাল্‌তী হাতে লইয়া সহরের একটা সঙ্কীর্ণ গলিপথ দিয়া যাইতেছে. ইহাই হইল এই ছবিখানির বিষয়-বস্তু। চিত্রকর মেথরাণীটিকে দেখিতে নেহাত মন্দ করেন নাই—তাই বোধ হয় তিনি ইহার নাম দিয়াছেন "গোবরে পদ্মফুল"।

"চিত্রটির মধ্যে রং দিবার কায়দা, ছবিখানির উপর রৌদ্রের আলোক ফেলিবার কায়দা—সবই ভাল। কিন্তু তথাপি' ছবিখানি চিত্রকর নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। আমার মনে হয়, এই চিত্রকরের অঙ্কন-শক্তি থাকিলেও, প্রাণের অভাব তাঁর ছবিগুলিকে রসঘন করিয়া তুলিতে দেয় না। চিত্রকর তাঁর ছবিতে কি কি দিতে হইবে তা জানেন বটে, কিন্তু কি কি দিতে হইবে না, তা আদবেই জানেন না। এই ছবিখানির প্রধান দোষ হচ্ছে এই যে, চিত্রকর ফটোগ্রাফারের মত এই ছবিখানিতেআবশ্যক অনাবশ্যক কোন জিনিষকেই বাদ দিতে পারেন নাই।

"ছবি এবং ফটোগ্রাফের মধ্যে যে সব পার্থক্য সাধারণতঃ দেখা যায়, তার মধ্যে মস্তবড় একটা পার্থক্য হচ্ছে এই যে, ফটোগ্রাফের মধ্যে নির্ব্বাচনের অবসর অত্যন্ত অল্প, আর ছবির মধ্যে নির্ব্বাচনের ভাগ খুব বেশী। আমি যদি একটি মেথরাণীর ফটো তুলিয়া লই, যখন সে একটা নির্দ্দিষ্ট গলিপথ ধরিয়া চলিতেছে, তাহা হইলে পাশেই একটা বড়বাড়ীর দেউড়ীর সামনে যে প্রকাণ্ড মোটার গাড়ীটা বাবুদের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে, তাকে বাদ দিতে পারিব না ; কিন্তু ছবিতে ও জিনিষটা আমি অনায়াসেই বাদ দিয়া যাইব,—যদি আমার মনে হয় যে, উক্ত জিনিষটা ছবির বিষয়-বস্তুর সহিত ঠিক সুরে মিলিতেছে না। বাস্তব-জগতের মেথরাণী, তার নিজের সহিত যে সব জিনিষ সুরে মিলে, কেবল সেই সব আনুসঙ্গিক জিনিষগুলি লইয়াই আমাদের চোখের সামনে আসে না, তাই মানুষ বাস্তব-জগতের দৃশ্য দেখিয়াও সন্তুষ্ট হয় না—তার পরও ছবি আঁকে, গান গায়, কবিতা লেখে। অর্থাৎ তারা তাদের বিষয়-বস্তুকে চারিপাশের প্রকৃতির সঙ্গে সুরে মিলাইবার

চেষ্টায় বসিয়া যায়, এবং যে সব জিনিষ তার সহিত ঠিক সুরে মিলে না, সেগুলিকে মনে মনে বাদ দিয়া লইয়া তবে ছবি আঁকিতে বসে। প্রকৃতিকে ত সকলেই দেখে; কিন্তু আমরা যা দেখি, তাই ত আর আর্ট নয়—আমরা যা দেখিতে চাই, তাই হচ্ছে আর্ট ("Not what we see but what we like to see.")

"হেমেন্দ্রবাবু মেথরাণীর ছবি আঁকিতে বসিয়া অনর্থক একটা গোটা সহরের miniatnre আঁকিয়া বসিয়াছেন। মেথরাণী গলি দিয়া যায় ইহা সত্য, এবং সেই গলির মধ্যে সহরের অসংখ্য লোকের বাস, ইহাও সত্য; কিন্তু চিত্রকরের সত্যের সঙ্গে এ সত্যের অনেক তফাৎ আছে। এ কথা বোধ হয় সত্য যে, উর্ব্বশীকেও জীবনধারণের জন্য প্রতিদিন দুইবেলা পেট পুরিয়া খাইতে হইত; কিন্তু তাই বলিয়া কোন চিত্রকর যদি, "উর্ব্বশী দাওয়ায় বসিয়া ভাত খাইতেছে" এমনি ধারা একটা কিছু আঁকিয়া বসেন, তাহা হইলে তাঁর জন্য মধ্যমনারায়ণের ব্যবস্থাই বোধ হয় সবচেয়ে সমীচীন হইবে। উর্ব্বশী খায় এ কথা সত্য; কিন্তু তার এই খাওয়াটা তার বিশেষ প্রকাশের অঙ্গ নয়,—এটা সমস্ত প্রাণীর সাধারণ স্বভাব। আর্টের কারবার typicalকে নিয়ে—কেন না একটা জিনিষের বিশেষ প্রকাশ-ভঙ্গিটুকুই হচ্ছে তার typicality। সহরের যে কোন একটা গলি দিয়া মেথরাণী যাইতে পারে; কিন্তু এ যাওয়াটা তার typical যাওয়া নয়; এবং এ স্থানটাও মেথরাণীর পক্ষে আদবেই typical স্থান নয়। হেমেন্দ্রবাবুর এই মেথরাণীর হাত হইতে কেহ যদি ঝাড়ু আর বাল্‌তী কাড়িয়া লয়, তাহা হইলে চিত্রকর নিজেই বোধ হয় ভুল করিয়া বসিবেন,—কোন বারবিলাসিনী সহরের মধ্য দিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে করিতে চলিয়াছে। তার কারণ, ঝাড়ু এবং বালতী ছাড়া মেথরাণীর atmosphere ছবির মধ্যে আর কোথাও নাই।—এ যেন একটা ফোটোগ্রাফ; কোথাও চিত্রকরের চিন্তা-শক্তি এবং নির্ব্বাচন-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না—এ যেন প্রাণহীন একটা যন্ত্রের mechanical production."

উপরিউক্ত প্রবন্ধে যে কয়খানি চিত্রের বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার অনেকগুলি আমরা সংগ্রহ করিয়াছি; তন্মধ্যে কয়েকখানি বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইল, অবশিষ্ট আগামী সংখ্যায় যাইবে।

লবণের শুল্ক দ্বিগুণ হইল,—পূর্ব্বে ছিল মণপ্রতি পাঁচসিকা, এখন হইল আড়াইটাকা। এ ব্যাপার লইয়া বড় কাউন্সিলে অনেক বাদ্‌বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। প্রথমে লেজিস্‌লেটিব এসেম্ব্লিতে যখন এই প্রস্তাব উঠে, তখন অধিকাংশ সদস্যের ভোটে শুল্ক-বৃদ্ধি রদ হয়। তখন বড়-লাটের খাস কাউন্সিলে অর্থাৎ কাউন্সিল অব ষ্টেটে প্রস্তাব উপস্থিত হয়; সেখানে অধিকাংশের বিচারে শুল্ক বৃদ্ধির মন্তব্য গৃহীত হয়। রিফর্ম্ম-আইনের বিধান অনুসারে তখন প্রস্তাবটি পুনরায় লেজিস্‌লেটিব এসেম্ব্লিতে ফিরিয়া আসে। এবারও এসেম্ব্লির সদস্যের অধিকাংশের মতে শুল্ক-বৃদ্ধি অগ্রাহ্য হয়। তখন বড় লাটের কাছে ব্যাপারটি উঠে। এসেম্ব্লিই হউক আর ষ্টেটই হউক, বড়লাট ইচ্ছা করিলে 'হাঁ' কে 'না' করিতে পারেন, 'না' কে 'হাঁ' করিতে পারেন; এ ক্ষমতা তাঁর আইন অনুসারে আছে। তিনি বলিলেন 'হাঁ' শুল্ক ডবল হইবে।' ব্যস্, সব শেষ হইয়া গেল। এত বাদ্‌বিতণ্ডা, এত আইন কানুন, এত স্বায়ত্ত-শাসনের আড়ম্বর, এখানেই সবারই সমাধি। মণকরা পাঁচসিকা বৃদ্ধি বই ত নয়,—সেরে দুই পয়সা মাত্র। এত সয়, আর এটুকু সহিবে না। নিমকহারামী আর কাহাকে বলে?

সম্প্রতি রাজসাহী জেলার অন্তর্গত পাহাড়পুরের সুবৃহৎ গড় ও স্তূপের খননকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। এতদুপলক্ষে দীঘাপতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় ২৫০০৲ টাকা ও ভারতগবর্নমেণ্ট ২০০০৲ টাকা এবারের কার্য্যের জন্য দিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজসাহীর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির উপর একযোগে খননের ভার দেওয়া হইয়াছে। সান্তাহারের নিকট জামালগঞ্জ ষ্টেশনের কিছুদূর পশ্চিমে পাহাড়পুরের স্তূপ। এই স্তূপটী চারিধারে সুবিস্তীর্ণ গড় দিয়া বেষ্টিত। এই গড় মাটী হইতে প্রায় আট ফিট উচ্চ ও দৈর্ঘ্যে এক-এক দিকে প্রায় পাঁচ ছয় শত হাত হইবে। স্তূপের উচ্চতা প্রায় আশী ফিট। সমগ্র ধ্বংসাবশেষ সর্ব্বসমেত ৮১ বিঘা জমি লইয়া—

বিস্তৃত। একশত বৎসর পূর্ব্বে সাধারণ লোকের নিকট স্তূপটী 'গোপালের চিতা' নামে পরিচিত ছিল; এখন লোকে উহাকে গোয়ালভিটের পাহাড় বলে।

বহুকালপূর্ব্বে ডাঃ বুকানন্ হ্যামিল্টন, মিঃ ওয়েষ্টম্যাকট ও স্যর আলেকজাণ্ডার কানিংহাম স্থানটী পরিদর্শন করিয়াছিলেন। কানিংহাম সাহেব না কি এখানে একখানি নক্সার ইটের উপর কঙ্কালী কালী-মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন; এবং তাহাতেই তিনি স্তূপটীকে কোন হিন্দু মন্দিরের অবশেষ বলিয়া স্থির করেন। তিনি এখানে খননকার্য্যও আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু স্থানীয় জমিদার বাধা দেওয়ায় তাঁহাকে নিবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। পূর্ব্বে অনেক লোকেই এই জায়গায় গুপ্তধনের সন্ধানে খনন করিয়া নিরাশ হইয়াছিল। তার পর কয়েক বৎসর হইল, সমীর মণ্ডল নামক পাহাড়পুরের একটী লোক গড়ের একস্থানে খুঁড়িতে খুঁড়িতে একটী প্রস্তর-স্তম্ভের দুটী ভগ্না শ পাইয়াছিল; তার একটীতে একটী শ্লোক খোদিত ছিল। শ্লোকার্থ এই—ত্রিরত্ন অর্থাৎ ধর্ম্ম, বুদ্ধ ও সঙ্ঘের প্রমোদের জন্য সৃষ্টির হিতকামনায় দশবলগর্ভ কর্ত্তৃক এই সুন্দর স্তম্ভটী নির্ম্মাণ করান হইল। এই খোদিত শিলালিপি দেখিয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় সিদ্ধান্ত করেন যে, ঐ স্তম্ভ একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল; আর শূন্য স্তম্ভটী কোন পীঠস্থানেই প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায়, তিনি অনুমান করেন যে, স্থানটী একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতেই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। (লেখাঙ্কিত স্তম্ভ খণ্ডটী এখন বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।

পাহাড়পুর—খননারম্ভে দিঘাপাতিয়া রাজকুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়

গত ১লা মার্চ্চ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ডাঃ ভাণ্ডারকর ও বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির পক্ষে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে খননকার্য্যের সূত্রপাত হয়। শ্রীযুক্ত মৈত্রেয় মহাশয় প্রাচীন ভারতে মন্দিরাদি প্রাচীন-কীর্ত্তির জীর্ণ-সংস্কার বিষয়ে পাণ্ডিত্য ও মৌলিক গবেষণাপূর্ণ নাতিদীর্ঘ একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। অনন্তর তিনি, ডাঃ ভাণ্ডারকর ও কুমার মহোদয় কিছু কিছু বলিলে কুমার শরৎকুমার প্রথম কোদালি মাটী তুলিলে কার্য্যারম্ভ হয়। এই উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপকত্রয় শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার এম-এ শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় এম-এ এবং বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সভার শ্রীযুক্ত শ্রীরাম মৈত্র, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার এম-এ (রাজসাহী কলেজ ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় ও অনেক গ্রামের লোক উপস্থিত ছিলেন।

পাহাড়পুর অল্প স্থান নয়,—প্রায় দেড়শত বিঘা জমী গভর্ণমেণ্ট লইয়াছেন,—হয় ত তাহার বাহিরেও যাইতে হইবে। সুতরাং এই খনন-কার্য্য সারনাথ ও নালন্দার ন্যায় দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিতে থাকিবে। এবার কেবল মঙ্গলাচরণ মাত্র—এখনও কোন কথা বলিবার সময় আসে নাই। সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের মধ্যস্থানে যে ৮০ ফিট উচ্চ পর্ব্বতাকার ধ্বংসাবশেষ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে এখন হস্তক্ষেপ না করিয়া, পুরী-প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষের পশ্চিম দক্ষিণের একটি সামান্য অংশে খনন-কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। খনন-স্থান চারিটি সেক্‌সনে বিভাগ করিয়া চারজনের অধীনে কুলীদিগকে কাজ করিতে দেওয়া হইয়াছে। প্রাতে ৭টা হইতে ১১টা, বৈকালে ৩টা হইতে ৬টা কাজ হইতেছে। মধ্যাহ্নে গরম এত বেশী যে, পট্টাবাসে বাস করা কঠিন। জল নাই—কূপ খনন করিয়া জলের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। পুরী-প্রাচীরের বাহিরের পৃষ্ঠ বাহির করা হইতেছে—বর্ত্তমান মাঠান জমীর নীচে ৯ ফিট পর্য্যন্ত নামিয়াছে। ভিতরের দিকে যতদূর খনন করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, একযুগের প্রোথিত ভিত্তিমূলের উপর আর এক যুগের মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইষ্টক-নির্ম্মিত সমাধি-স্তূপ বাহির হইতেছে। পাহাড়পুর যে কত পুরাকীর্ত্তি লুকাইয়া রাখিয়াছে, তাহা এখনও জানা যায় না; তবে ইহা যে সারনাথের ন্যায় শিক্ষাপ্রদ হইবে তাহার আভাস পাওয়া গিয়াছে।

পাহাড়পুর—খননারম্ভ-স্থানে সমবেত খননকারী দল

শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনাহারী চাকরীর মেয়াদ শেষ হইয়া গিয়াছে; তাঁহার স্থানে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ভাইস-চ্যান্‌সেলর হইলেন। এ মনোনয়নে কাহারও হাত নাই, কাহারও স্বাধীনতা নাই; স্বয়ং লাট সাহেব যাঁহাকে ইচ্ছা তাঁহাকেই এইপদে বসাইয়া দিতে পারেন। সার আশুতোষকে পুনরায় এই পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল; তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। যাহা হউক, এই বিষম গোলযোগের সময় যে অমুক-তমুককে এই পদে না বসাইয়া, লাট সাহেব শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র বাবুকে এই পদ দিয়াছেন, এবং ভূপেন্দ্রবাবুও যে এই সঙ্কট সময়ে এ ভার গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের

হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি মাত্রেই আশ্বস্ত হইবেন। উপযুক্ত পাত্রেই ভার অর্পিত হইয়াছে ! আমরা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু

বসু মহাশয়কে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি ; ভরসা হয়, তিনি এই সংক্ষুব্ধ উত্তাল তরঙ্গময় সাগরের মধ্য দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়-তরণীকে নিরাপদ বন্দরে পৌছাইয়া দিতে পারিবেন।

কলিকাতা সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ এটর্ণী শ্রীযুক্ত নিমাইচরণ বসু মহাশয় পঞ্চাশ বৎসরকাল বিশেষ যোগ্যতার সহিত এটর্ণীর কার্য্য সম্পাদন করায় তাঁহার গুণমুগ্ধ উকিল এটর্ণী, জজ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার সমুচিত সংবর্দ্ধনার

শ্রীযুক্ত নিমাইচরণ বসু

জন্য উক্ত বসু মহাশয়ের বাগমারীর উদ্যান-ভবনে একটী পঞ্চাশ-বার্ষিকী উৎসবের আয়োজন করেন। অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করিয়া শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়ের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধার পরিচয় প্রদান করেন। আমরা শ্রীযুক্ত বসু মহাশয়ের সুদীর্ঘ জীবন ও অটুট স্বাস্থ্যের জন্য শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।

শোক-সংবাদ

৺নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন

স্বর্গীয়, প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পরলোক গমনের সংবাদ আমরা শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি। নারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় পিতার ন্যায় দেশ-বিখ্যাত হইতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু তিনি তাঁহার পিতা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন। তিনি নিজে পণ্ডিত ছিলেন ; পণ্ডিতগণের যথাযোগ্য সম্মান রক্ষার জন্য তিনি সর্ব্বদা অবহিত ছিলেন ; কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের বার্ষিক উৎসবের অনুষ্ঠানে তিনি অগ্রণী ছিলেন। বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি কোথায়ও বক্তৃতা করিতে যান নাই ; কিন্তু হাতে-কলমে কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া-

ছিলেন; তাঁহার গৃহে তিনি বয়ন-শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন; অনেক যুবক-যুবতী তাঁহার এই বয়ন-বিদ্যালয়ে যথারীতি শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। তিনি নানা ভাবে খদ্দর প্রচলনে উৎসাহ প্রদান করিতেন।

৺নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন

তাঁহার পরলোক গমনে এই দেশহিতকর প্রতিষ্ঠানটীর অস্তিত্ব যাহাতে বিলুপ্ত না হয়, তাহার চেষ্টা করিলে তাঁহার পরলোকগত আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হইবে। আমরা তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পুত্র-কন্যা ও আত্মীয়-স্বজনের গভীর শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

৺মনোজমোহন বসু

আমাদের পরম বন্ধু, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক মনোজমোহন বসু মহাশয়ের অকালে পরলোক গমনে আমরা বড়ুই শোকার্ত্ত হইয়াছি। মনোজবাবু কিছুদিন হইতেই ডিস্‌পেপ্‌সিয়া রোগে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু, তিনি যে এত শীঘ্রই সকলের মায়া কাটাইয়া চলিয়া যাইবেন, এ কথা আমরা কোন দিনই ভাবি নাই। শরীর সুস্থ করিবার জন্য তিনি জামতাড়ায় গিয়াছিলেন; সেখানেই তাঁহার

৺মনোজমোহন বসু

দেহান্ত হইয়াছে। তাঁহার সরস ব্যঙ্গপূর্ণ প্রবন্ধ আর আমরা 'ভারতবর্ষে'র পাঠক-পাঠিকাদিগকে উপহার দিতে পারিব না। রঙ্গমঞ্চের জন্য তিনি যে কয়েকখানি ব্যঙ্গচিত্র লিখিয়াছিলেন, সেগুলি এখনও অনেক রঙ্গালয়ে, অভিনীত হইয়া থাকে। তাঁহার ন্যায় বন্ধুবৎসল, সুধী, পরদুঃখ-কাতর বন্ধুকে হারাইয়া আমরা বড়ই ব্যথিত হইয়াছি। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু ও তাঁহার পুত্র-কন্যা আত্মীয় স্বজনের শোকে কি সান্ত্বনা দিব, ভাবিয়া পাইতেছি না। ভগবান এই শোক-সন্তপ্ত পরিবারে শান্তিধারা বর্ষণ করুন।

৺বিমলা দাস

আমরা শোক-সন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, পরলোকগত সত্যরঞ্জন দাস মহাশয়ের পত্নী বিমলা দাস

অকালে পরলোকগত হইয়াছেন। 'ভারতবর্ষে'র পাঠক-পাঠিকাগণ এখনও বিমলা দাসের লিপিচাতুর্য্য ও বর্ণনা-কৌশলের কথা বিস্মৃত হন নাই ; তিনি 'ভারতবর্ষে' তাঁহার 'নরওয়ে ভ্রমণ কাহিনী' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন। বঙ্গরমণীর মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম নরওয়ে ভ্রমণে গিয়াছিলেন। শুধু নরওয়ে কেন, পৃথিবীর অনেক দেশে তিনি গমন করিয়াছিলেন ; এবং সে সকল স্থানের কাহিনী 'ভারতবর্ষে' লিখিবেন বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিশ্ব-বিধাতার বিধানে তিনি সকল কাজ অসমাপ্ত রাখিয়া অকালে চলিয়া গেলেন।

৺ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহচৌধুরী

গোয়ালপাড়া জেলার রূপসীর সুপ্রসিদ্ধ জমিদার, লেপ্টেনাণ্ট ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহচৌধুরী আর ইহজগতে নাই! গত ৩০শে ফাল্গুন ইংরাজী ১৪ই মার্চ্চ গোয়ালপাড়া জেলান্তর্গত লক্ষ্মীপুর শিকার ক্যাম্পে অতীব শোচনীয় ভাবে ইহাঁর প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। ইনি মাত্র পঁচিশ বৎসর অতিক্রম করিয়া ছাব্বিশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই তিনি স্বীয় সচ্চরিত্রতা, সদাশয়তা, সহৃদয়তা ও বদান্যতাদি সদ্‌গুণাবলী দ্বারা লোকসমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। ইনি শৈশবাবধিই মৃগয়া-ব্যসন-প্রিয় ছিলেন। এই মৃগয়া কৌতূহল চরিতার্থ করার মানসে তিনি গতই ১১ই মার্চ্চ শিলং হইতে জনৈক খাসিয়া জাতীয় যুবক বয়স্য ও স্বীয় অষ্টমবর্ষ বয়স্ক জ্যেষ্ঠ পুত্র সমভিব্যাহারে লক্ষ্মীপুরে গমন করেন। ইনি ও লক্ষ্মীপুরের অন্যতম জমীদার ও ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত এস, এন, চৌধুরী মহাশয় গত ৩০শে ফাল্গুন চৌদ্দটী হাতী সহ শিকারে বাহির হইবার অব্যবহিত পরেই একটী বন্য হরিণ দেখিতে পাইয়া, অর্দ্ধ-বৃত্তাকারে হরিণটাকে ঘেরাও করার সময়, পার্শ্ববর্ত্তী খাসিয়া যুবকটির হস্তস্থিত বন্দুকের গুলি হঠাৎ মহা শব্দে বিদীর্ণ হইয়া জমিদার মহা-

৺ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহচৌধুরী

শয়ের বক্ষ ভেদ করিয়া চলিয়া যায় এবং তৎক্ষণাৎ জমিদার মহাশয়ের প্রাণবায়ু নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অমর ধামে চলিয়া যায়! আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত আত্মীয়-স্বজনের এই গভীর শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

আব-হাওয়া

দেশ

শিক্ষা

বয়স্কাউটের অপূর্ব্ব সাহস।—জলমগ্না বালিকার জীবন রক্ষা। লক্ষ্ণৌসহরের ২৯শে মার্চ্চ তারিখের খবরে প্রকাশ যে গত বৎসর এপ্রেল মাসে সিতাপুর স্কুলের একজন বয়স্কাউট একটী জলমগ্ন বালিকাকে কূপের ভিতর হইতে তুলিয়া তাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছে বলিয়া, সেদিন স্যর উইলিয়ম ম্যারিস তাহাকে একটী সিলভার ক্রশ পুরস্কার দিয়াছেন। ভারতের বয়স্কাউট এসোসিয়নের ইতিহাসে ইহার পূর্ব্বে কোন বয়স্কাউটের ভাগ্যে সিলভার ক্রশ প্রাপ্তি ঘটে নাই। নায়ক

গোখেল মেমোরিয়ল বালিকা বিদ্যালয়।—পুরস্কার বিতরণী সভার অধিবেশন। গত বৃহস্পতিবার ২৯নং ল্যানসডাউন রোডে গোখেল মেমোরিয়েল বালিকা বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পুরস্কার

বিতরণী সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শিক্ষা-সচীব অনারেবল মিঃ পি, সি, মিত্র এম-এ বি-এল সি, আই ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কলিকাতার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। নায়ক

স্কুলের জন্য দান।—শ্রীযুত লালমিঞা চৌধুরী কদলপুর মধ্যইংরেজী স্কুলের মেম্বর আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত কদলপুর মধ্যইংরাজী স্কুলের উন্নতিকল্পে স্থানীয় শ্রীযুত হাসমত আলী সারাং এককালীন নগদ ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা প্রদান করিয়াছেন, স্কুলের ব্যবহারের জন্য প্রতি বৎসর স্থানীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ একখানা জ্যোতিঃ পত্রিকার ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইয়া স্কুল কমিটিকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। তাঁহার নিরাময় সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি। জ্যোতিঃ

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্করণ।—গত পরীক্ষার সময় মোসলেম হাই স্কুল কেন্দ্র হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থী শ্রীমান অনিলচন্দ্র চৌধুরী বাস হইতে জ্যামিতির পৃষ্ঠা ছিঁড়িয়া সঙ্গে করিয়া পরীক্ষার হলে নিয়াছিল বলিয়া হলের গাড অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়া শ্রীমানকে সুপারিটেন্‌ডেন্টের আদেশমত পরীক্ষার হল হইতে বাহির করিয়া দেন। শ্রীমান নাকি স্থানীয় জে, এম, সেন ইনসষ্টিটিউটের অন্যতম পরীক্ষার্থী। এরূপ কুপ্রবৃত্তি ও অবৈধ কার্য্যের দ্বারা এই বালক ছাত্রসমাজের মুখে যে কালিমা লেপন করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। জ্যোতিঃ

শিক্ষার জন্য দান।—আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, জেলা ২৪ পরগণা মথুরাপুর থানার অন্তর্গত কাশীনগর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের জন্য খাঁড়ী হালদারপাড়া নিবাসী বাবু ঈশানচন্দ্র সর্দ্দার মহাশয় সম্প্রতি উক্ত স্কুল কর্তৃপক্ষের হস্তে সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। দাতা দীর্ঘজীবী হউন। ২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ।—নূতন বিশ্ববিদ্যালয় গৃহের ভিত্তি-স্থাপন। আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, ২৪ পরগণা জেলার যাদবপুর গ্রামে বাঙ্গলার জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রধান কলেজ ভবনের ভিত্তিস্থাপিত হইয়াছে। বহু গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ঐ সময় তথায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া পরিষদের সভাপতি সার আশুতোষ চৌধুরী ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন—তিনি ঐ সময় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ইতিহাস বিবৃত করিয়াছিলেন। তিনি বলেন,—গত বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে ছাত্রগণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিলে এই জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। তখন হইতে নিম্নলিখিত রূপ টাকা পাওয়া গিয়াছে :—

ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী—৫ লক্ষ বার্ষিক আয় ২০ হাজার।

মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য—আড়াই লক্ষ বার্ষিক আয় ১০ হাজার।

সুবোধচন্দ্র মল্লিক—১ লক্ষ বার্ষিক আয় ৩৬ শত।

সার রাসবিহারী ঘোষের নিকট প্রাপ্ত বাড়ী—মূল্য আড়াই লক্ষ।

সার রাসবিহারীর নিকট প্রাপ্ত কোম্পানীর অংশ ও ডিবেঞ্চার—৮ লক্ষ্য ১৩, হাজার।

উহার বর্ত্তমান আয় বার্ষিক ২০ হাজার টাকা—কিন্তু উহা হইতে ৫০ হাজার টাকা আয় হইবে।

ভবানীপুরের গোপালচন্দ্র সিংহ—কৃষি শিক্ষার জন্য ১ লক্ষ টাকা দিয়াছেন—তাহার বার্ষিক আয় ৪৫০০ টাকা।

কলিকাতা কর্পোরেশন মাসিক ২১০ টাকা খাজনায় ১০০ বিঘা জমী দিয়াছেন ও আরও ৫০ বিঘা দিবেন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে ও সহস্র ছাত্র ও ১৯২২ এ ২ সহস্র ছাত্র এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার জন্য আবেদন করিয়াছিল ; বর্ত্তমানে ছাত্র-সংখ্যা সাড়ে ৬ শত।

বক্তৃতার উপসংহারে সভাপতি স্যার আশুতোষ চৌধুরী বলেন,—আমাদের আর্টস কলেজ নানা কারণে টিকে নাই এখন মাত্র টেকনিকাল কলেজের কাজ চলিতেছে। আমাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য বাঙ্গলার সকলকে আমি আহ্বান করিতেছি। ২৪ পরগণা বার্ত্তাবহ

ভিক্টোরিয়া কলেজে নূতন ক্লাস—স্থানীয় ভিক্টোরিয়া কলেজটীতে বি এ অনার্স ক্লাস ও আই এ তে রসায়নের ক্লাস খুলিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে বলিয়া শুনিতেছি। এই দুইটী ক্লাস একেবারে খুলিতে পারিলে ভালই। তাহা না হইলে অন্ততঃ—রসায়ন বিভাগ যাহাতে খুলিতে পারা পারা যায় সে,সম্বন্ধে বিশেষ চেষ্টা করা প্রয়োজন। এখন দেশের লোকের মনের ভাব যেরূপ তাহাতে প্রায় সকলেরই বিজ্ঞান এবং কার্য্যকরী শিক্ষারদিকেই ঝোঁক বেশী। এতদ্ব্যতীত অনার্স ক্লাস খুলিলে দুই চারিটী ছাত্র মাত্র উহা দ্বারা উপকৃত হইতে পারে, কিন্তু সেই খরচে রসায়নের ক্লাস খুলিলে তাহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক ছাত্রের সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয়। এই সকল বিবেচনা করিলে একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিজ্ঞানের ক্লাস যাহাতে খুলিতে পারা যায় তৎসম্বন্ধে চেষ্টা করাই সর্ব্বাগ্রে যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ত্রিপুরা হিতৈষী

কৃষি—শিল্প—বাণিজ্য

রৌমারীতে কুলের জঙ্গল।—রংপুর জেলার রৌমারী থানাটি যমুনা নদীর (ব্রহ্মপুত্র) পরপারে অবস্থিত। ইহা ময়মনসিংহ ও গারোহিল জেলার সংলগ্ন। ঐ অঞ্চলে বুনো কুলের বিশাল জঙ্গল আছে। হাজার হাজার কুল গাছে হাজার হাজার মণ কুল পাকিয়া নীচে পড়িয়া প্রতি বৎসর নষ্ট হইয়া থাকে। সেগুলি একটু রৌদ্রে শুকাইয়া কলিকাতায় চালান দিলে খরচ-খরচা বাদ মণ প্রতি ।০—৮০—বা ১৲ পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে। তা' ছাড়া সে অঞ্চলে গালা ও রেশমের (এণ্ডি-মুগা জাতীয় মোটা রেশম) চাষ করিলে প্রভূত লাভ হইবার কথা। কুলের পাতা খাইয়া রেশম কীটগুলি জীবন-ধারণ ও পরিপুষ্টি লাভ এবং প্রচুর রেশম উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়। এইরূপ কুলের বিস্তৃত জঙ্গল পূর্ণিয়া জেলায়ও আছে। একটা কথা আছে "জঙ্গলে মঙ্গল"। গবর্ণমেন্টের ফরেষ্ট বিভাগের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা বুঝা যায়। যাঁহারা পরিশ্রমী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যাঁহাদের অর্থোপার্জ্জনের ইচ্ছা আছে, তাঁহারা ঐ সকল অঞ্চলে গিয়া গালা ও রেশমের চাষ করিয়া লাভবান হউন। অতি সামান্য খাজনায় কুলের জঙ্গলগুলি বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিবেন। নবযুগ

বঙ্গে কার্পাস চাষ।—কার্পাস চাষের সময় আসিতেছে। গত কয়েক বৎসরের তুমুল আন্দোলনে ও বঙ্গদেশের অলস ও নির্জ্জীব অধিবাসিগণ অদ্যাপি কার্পাস চাষে মনোযোগী হয় নাই। তাহারা যদি অন্ততঃ স্ব স্ব বাসগৃহের পার্শ্বে, পতিতজমি সমূহে কতকগুলি গাছ কার্পাসের (বৃহজ্জাতীয় ও দীর্ঘজীবি কার্পাস) বৃক্ষ রোপণ করিত, তবে এত দিনে দেশময় কার্পাসের গাছ দৃষ্ট হইত ; কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা কিছুই হয় নাই। দেশবাসীর মধ্যে যা একটু উত্তেজনা দৃষ্ট হইয়াছিল, আস্তে আস্তে তাহা ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। চরকার প্রচলন এবং তাঁত প্রতিষ্ঠারও সেই অবস্থা। আর যে কার্পাস চাষে দেশবাসী যথাযথরূপে আত্ম-নিয়োগ করিবে, তাহার তেমন আশা করা যায় না। যাহা হউক, কার্পাস চাষের সময় আসিয়াছে, যাঁহারা কংগ্রেস ও খেলাফতের কর্ম্মী বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করেন, তাঁহারা আর কোন কাজের জন্য ? আমরা সহযোগী ও অসহযোগী সকল শ্রেণীর দেশবাসীকেই কার্পাস চাষে মনোযোগী হইতে এবং দেশের অশিক্ষিত কৃষক ও শ্রমজীবিদিগকে ঐ কার্য্যে ব্রতী করিবার জন্য চেষ্টা পাইতে অনুরোধ করি। নবযুগ

রেশম শিল্প। একদিন আমাদের বাঙ্গলাদেশ রেশম শিল্পের জন্য পৃথিবীর মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। ভারত হইতেই পাশ্চাত্য প্রদেশে রেশম রপ্তানী হইত। শুনা যায় তখন ইউরোপে সোণার মূল্যে রেশম বিক্রীত হইত। আমাদের এই মুর্শিদাবাদ জেলাটীও রেশমের জন্য বিখ্যাত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কাশিমবাজারে কুঠি স্থাপন করতঃ এদেশীয়দিগের নিকট হইতে রেশম গ্রহণ করিয়া বাণিজ্যে লাভবান হইতেন। কিন্তু এখন আর সেদিন নাই। মুর্শিদাবাদের রেশম শিল্প মৃতপ্রায়। শিল্পিগণ অর্থাভাব ও যথোচিত উৎসাহ অভাবে বিদেশীদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় পারিয়া উঠিতেছে না। এখন ভারতবাসীকে রেশম শিল্প শিক্ষার নিমিত্ত জাপানে যাইতে হইতেছে, জাপানও রেশম শিল্পে অসম্ভাবত উন্নতি করিয়াছে। পৃথিবীতে যত রেশম বর্ত্তমানে ব্যবহৃত হয়, তাহার একশত ভাগের মধ্যে ৫৪ ভাগ এক জাপান সরবরাহ করিয়া থাকে। জাপানীগণ সুক্ষ্মশিল্পে ধৈর্য্যশীল এবং জাপান গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়া আসিতেছেন। ইহারই ফলে, জাপানে অল্পকালেই রেশম বিজ্ঞানে এত অধিক উন্নতিলাভ করিয়াছে। এখন এদেশ হইতে অনেক যুবক জাপানে থাকিয়া রেশমশিল্প শিক্ষা করিতেছেন; ইহা সুখের বিষয়। কিন্তু ভারতের রেশমশিল্প পুনরুজ্জীবিত হইবার আকাঙ্ক্ষাই আমাদের ঐকান্তিক বাসনা। প্রতিকার

সুন্দরবনে মৎস্যের কারবার।—ইতিপূর্ব্বে সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, খুলনা জেলার অন্তর্গত সুন্দরবন অঞ্চলে প্রচুর মৎস্য বৃথা নষ্ট হইতেছে। সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, এক ইউরোপীয়ান কোম্পানী সুন্দরবন হইতে মোটর যোগে হাসনাবাদে মৎস্য চালান দিতেছে, সেখান হইতে রেলযোগে ঐ মৎস্য কলিকাতায় আনিয়া বিক্রয় করা হইতেছে। এই দীর্ঘকালব্যাপী আন্দোলনেও কোন দেশবাসী এই লাভজনক ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিলেন না। অবশেষে যে জাতি প্রকৃত ব্যবসায়ী, যথার্থ কাজের মানুষ, তাহারাই সেই কাজে হাত দিল। আমরা যে কবে কাজের মানুষ হইব বলিতে পারি না। নবযুগ

চরকা।—অনেকে অর্থাভাব বশতঃ নগদ মূল্যে চরকা ক্রয় করিয়া প্রচারকার্য্য অভিপ্রায় মত করিতে পারিতেছেন না। কয়েকটী কংগ্রেস কমিটী চরকা লইয়া গিয়া বিক্রয় করিয়া মূল্য পাঠাইয়া দিতেছেন এবং অনেকেই এরূপভাবে চাহিতেছেন। একজনের পক্ষে তৈয়ার (দুই টাকা মূল্যে) ও আদায় কার্য্য কষ্টকর। যদি কেহ আদায়ের ভার লন, তাহা হইলে আমি সকলকেই চরকা অথবা চরকা সম্বন্ধীয় কাষ্ঠাদি সরঞ্জাম বাকীতে দিতে প্রস্তুত আছি। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির আফিসে (৩৮।১ বি, সুকিয়া ষ্ট্রীটে) আমরা চরকা বিক্রয়ার্থ মজুত আছে। তথায় বাকীর ব্যবস্থা করিয়া লইলে উভয়-দিকের আদান-প্রদানের সুবিধা। বলা বাহুল্য, বাকীর জন্য কোনরূপ মূল্য বৃদ্ধি হইবে না। আনন্দবাজার পত্রিকা

কার্পাসে কীট।—কার্পাসে অনেক সময় ভয়ানক কীট লাগে। কার্পাসের খেতের মধ্যে মধ্যে বন্য সিদ্ধিগাছ লাগাইলে তাহার তীব্র গন্ধে কীট সকল পলায়ন করে। ক্ষেত্রে তামাক ও গন্ধকের ধূম দিতে হয়। প্রবাহমান বাতাসের দিকে ধূম পাত্রটী বসাইয়া দিলে, কীটাদি মরিয়া যায়। অন্ধকার রাত্রে ক্ষেত্রে মশালাদি জ্বালিলে তাহাতে পড়িয়া অনেক কীট মারা যায়। বর্দ্ধমান

বিদেশ

বিলাতের বাণিজ্য বৃদ্ধি।—ভূতপূর্ব্ব ব্রিটিশ মন্ত্রী সার এরিক্ গেডিস্ বলিয়াছেন—গত বৎসরের তুলনায় বিলাতের ব্যবসায় বাণিজ্য বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে গত দশ বৎসরে লোকসংখ্যা ১৩০০০০০ জন বাড়িয়া যাওয়াতে এবং আমেরিকাকে বৎসরে ৩০০০০০০০০ পাউণ্ড প্রদান করাতে ইংলণ্ডের বাণিজ্য আর ১৯১৩ সনের মত হওয়া সম্ভব নয়।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে যত বিলাতী কাপড় ভারতে আসিয়াছিল, এ বৎসর উক্ত মাসে উহার দ্বিগুণেরও বেশী মাল আসিয়াছে। গত এপ্রিল মাসের পর হইতে গ্রেটব্রিটেন ভারতবর্ষ হইতে ১৬০২০০০ পাউণ্ড মূল্যের রেলের সাজসরঞ্জামের অর্ডার পাইয়াছে।

নব্য খলিফার সমর্থনে ভূতপূর্ব্ব খলিফা।—মিশরের সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র "আল্ আখ্বারের" কনষ্টাণ্টিনোপলস্থ প্রতিনিধি সম্প্রতি নব-নির্ব্বাচিত খলিফা সুলতান আবদুল মজিদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, এবং নানা কথার পর মহামান্য খলিফাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ইংলণ্ডের কতিপয় সংবাদপত্র ভূতপূর্ব্ব খলিফা ওহিদুদ্দিন সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছে যে, হেজাজের রাজা শরিফ হোসেনকে খিলাফৎপদে অভিষিক্ত করিবার জন্যই তিনি মক্কাধামে গমন করিয়াছেন, কারণ তিনি এখনও নিজেকে ধর্ম্ম ও ন্যায়সঙ্গত খলিফা বলিয়া মনে করেন। ঐ সকল সংবাদপত্র কি আপনি পাঠ করিয়াছেন?" আমার প্রশ্নে মহামান্য খলিফা আবদুল মজিদ সহাস্যবদনে বলিলেন, "যখন আমি পবিত্র খিলাফৎপদে বরিত হই, তখন ভূতপূর্ব্ব খলিফা আমার খিলাফৎ-পদ প্রাপ্তিতে আমাকে অভিনন্দিত করিয়া এক তার প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অভিনন্দনসূচক তারই প্রমাণ করিয়া দিতেছে যে, তিনি আর নিজেকে খলিফা বলিয়া বিবেচনা করেন না, পরন্তু আপামর সাধারণ মুসলমান স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া যাঁহাকে নির্ব্বাচন করিয়াছেন, তাঁহাকেই তিনি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ইংরেজী সংবাদপত্র এই প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছে, তাহার মূলে কোন ভিত্তি নাই। বরং তাঁহার পবিত্র তীর্থস্থান মক্কাতে যাওয়ার তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে সেখানে গিয়া তিনি বিশ্বপ্রভু আল্লাহ-তালার নিকট তাঁহার অতীত জীবনের ভুলভ্রান্তি ও দোষ ত্রুটির মার্জ্জনার জন্য একান্ত মনে প্রার্থনা করিবেন এবং সেইখানে অবশিষ্ট জীবন কাটাইবেন। (আল্ আখবার)

নেটালে ভারতবাসী। মিঃ এণ্ড্রুজের মত। করাচি, ২৩ মার্চ্চ।—একজন সংবাদদাতা ২৩শে মার্চ্চ তারিখে করাচি হইতে বোম্বাই ক্রনিকেল এই খবর লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, ২১শে মার্চ্চ তারিখে সকালে আটটার সময় করাচিতে মিঃ জামসেদ এন, আর, মেটার বাড়ীতে মিঃ সি, এফ, এণ্ড্রুজের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছিল।

প্রশ্ন। চুক্তিবদ্ধ কুলী প্রথা এখনও বর্ত্তমান আছে কি?

মিঃ এণ্ড্রুজের উত্তর। পুরাতন প্রথার চুক্তিবদ্ধ কুলী এখন আর আমদানী হয় না। পুরাতন প্রথায় ভারতে কাহাকেও কুলীর কাজের জন্য চুক্তিতে আবদ্ধ করিলে সেটা এখন অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। তবে নেটালে এখন আর একটা তথাকথিত স্বেচ্ছামূলক চুক্তিপ্রথা প্রচলিত আছে। ক্ষুধার তাড়নায় কিম্বা ধূর্ত্ত আড়কাটির প্ররোচনায় বাধ্য হইয়া ভারতবাসী মজুরেরা চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া ইক্ষুক্ষেত্রে গমন করে এবং চুক্তি অনুযায়ী দুই তিন বৎসর কার্য্য করিয়া থাকে। আমি জানিতে পারিয়াছি, চার হাজারেরও অধিক ভারতবাসী এই ভাবে চুক্তিবদ্ধ হইয়া নেটালে গমন করিয়াছে। তাহাদের অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে। তাহাদের বেতন আমেরিকার কাফ্রিদিগের অপেক্ষা কম। প্রত্যেক চারিজনের মধ্যে তিনজন ভারতবাসী তাহাদের মদ্য পানের নেশার ফলে পুনরায় চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হয়। আড়-কাটিরা তাহাদিগকে ৪০ টাকা বা ২ পাউণ্ড ১০ শিলিং অর্থাৎ চুক্তির মেয়াদের অর্দ্ধেক টাকা আগাম দিবার প্রস্তাব করে, এবং এইরূপ প্রলোভন দেখাইয়া তাহাদিগকে চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে প্রবৃত্ত করে।

এই কুৎসিত প্রথা বন্ধ করিবার জন্য আমি নিজে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু ইহা বন্ধ করা অত্যন্ত কঠিন।

প্রঃ। কেনিয়ার সমস্যার প্রধান প্রধান বিষয়গুলি কি কি?

উঃ। চারিটী প্রধান বিষয় আছে। (১) নির্ব্বাচনাধিকার। ইয়োরোপীয়ানরা বলে, ইয়োরোপীয়ানদের সঙ্গে সমান ভাবে ভোট দিবার অধিকার ভারতবাসীদের কিছুতেই দেওয়া যাইতে পারে না। ইয়োরোপীয়ানদের আপত্তির একমাত্র কারণ এই যে ইহাতে ভারতবাসীদের ইয়োরোপীয়ানদের সঙ্গে সমান বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়। (২) উচ্চ ভূমি সংক্রান্ত প্রশ্ন। ইয়োরোপীয়ানরা সমস্ত উচ্চ ভূমি আগে হইতে দখল করিয়া রাখিয়াছে। ভারতবাসীরা এই অবস্থা স্বীকার করিয়া লইয়াছে। তবে তাহারা এই দাবী করিতেছে যে, যখন, ইয়োরোপীয়ানরা উচ্চ ভূমিতে জমি বিক্রয় করিতে চাহিবে, তখন ভারতবাসীদের সেই জমি কিনিবার অধিকার থাকা চাই। ইয়োরোপীয়ানরা বলে ভারতবাসীদের কখনই এ অধিকার দেওয়া হইবে না। (৩) স্বতন্ত্রীকরণ। ভারতবাসীরা দাবী করে করে যে, নগরের খোলা বাজারে তাহারা ভূসম্পত্তি ক্রয় করিবার অধিকারী। কিন্তু ইয়োরোপীয়ানরা তাহাদের নিজেদের জন্য অনেক জমি আলাদা করিয়া রাখিতে চায়। সেই চিহ্নিত স্থানের মধ্যে ভারতবাসীদের জমি কিনিবার কোন অধিকার তাহারা দিতে চায় না। (৪) উপনিবেশ স্থাপনের জন্য ইয়োরোপীয়ানরা যে কোন উপয়েই হউক বহু পরিমাণে ইয়োরোপীয়ানের আমদানী করিতে চায়। ভারতবাসীরা যে ট্যাক্স দেয় তাহার একটা অংশ ইয়োরোপীয়ানরা এই উদ্দেশ্যে খরচ করিতেছে। পক্ষান্তরে তাহারা এইরূপ জেদ ধরিয়াছে যে অতঃপর আর কোন ভারতবাসী ঐ উপনিবেশে প্রবেশ করিতে পাইবে না। পূর্ব্ব আফরিকা হইতে ভারতবাসীদের সম্পূর্ণরূপে তাড়াইয়া দেওয়াই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে, ইয়োরোপীনরা একমাত্র উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া কাজ করিতেছে—প্রথমে তাহারা ভারতবাসীদের স্বতন্ত্র করিয়া দিতে চায়। তারপর এখন যে সব ভারতবাসী আফরিকায় বাস করিতেছে, তাহাদের আফ্রিকা হইতে তাড়াইয়া দিতে চায়, এবং ভবিষ্যতে যাহাতে আর কোন ভারতবাসী আফ্রিকায় যাইতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে চায়। ভারতবাসীরা এখন যে সব অধিকার ভোগ করিতেছে, তাহা তাহারা ভোগ করিতে পারিবে। কিন্তু এই অধিকার ভোগের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া গেলেই তাহারা সে অধিকারে বঞ্চিত হইবে—নূতন করিয়া তাহাদের সে অধিকার দেওয়া হইবে না। ইহাই ইয়োরোপীয়দের মনের কথা।

প্রঃ। অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে আপনার মত কি?

উঃ। আমি বরাবরই বলিয়া আসিতেছি যে, উপনিবেশে ভারতবাসীদের বেলায় অস্পৃশ্যতা দোষের বলিয়া গণ্য করা, এবং ভারতবর্ষে প্রবলভাবে অস্পৃশ্যতা চালানো—এই দুইটী ব্যাপারের মধ্যে মোটেই খাপ খায় না। আফ্রিকার ভারতবাসী ও ইয়োরোপীয়ানগণের মধ্যে যদি আমরা অস্পৃশ্যতা পরিহার করিতে চাই, তবে ভারতে ভারতবাসীদের আপনাআপনির মধ্যে অস্পৃশ্যতাও বর্জ্জন করিতে হইবে। এই কারণেই বোম্বায়ের অস্পৃশ্যজাতির সহিত ভোজন করিবার সুবিধা পাইয়া আমি আনন্দিত হইয়াছিলাম। ভারতে ভ্রমণকালে ইহাই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ।

অতঃপর এই অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে সংবাদদাতার সঙ্গে মিঃ এণ্ড্রুজের আরও দুই একটী প্রশ্নোত্তর হইয়াছিল।

সাহিত্য-সংবাদ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্ শ্রীযুক্ত রায় জলধর সেন বাহাদুরের গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিতেছেন। প্রথম খণ্ড যন্ত্রস্থ। উৎকৃষ্ট কাগজে, নূতন আকারে এই গ্রন্থাবলী মুদ্রিত হইতেছে। এই গ্রন্থাবলী যাহাতে সুন্দর ও সুদৃশ্য হয় তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে।

—

॥০ আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার ৮৬নং গ্রন্থ শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত 'অকালকুষ্মাণ্ডের কীর্ত্তি' প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'নবদ্বীপের বৈষ্ণবী' প্রকাশিত হইল, মূল্য ১৲।

—

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত নূতন নাটক 'বিদূরথ' প্রকাশিত হইয়াছে, মূল্য ১৲।

—

শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন গুপ্ত প্রণীত নূতন কবিতা গ্রন্থ 'অরুনিমা' প্রকাশিত হইল, মূল্য বার আনা।

—

শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'চারুশিল্পি' প্রকাশিত হইল, মূল্য ১॥০।

Publisher—**Sudhanshusekhar Chatterjea,**
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—**Narendranath Kunar,**
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street. CALCUTTA.

দিব্যগঠনা, লজ্জাভরণা, বিনতভুবনবিজয়িনয়না,—দ্বিজেন্দ্রলাল

শিল্পী—শ্রীভবানীচরণ লাহা

BHARATVARSHA HALFTONE & PTG. WORKS

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০

দ্বিতীয় খণ্ড | দশম বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

ভারতীয় সঙ্গীতের পাশ্চাত্যে প্রতিপত্তি অর্জ্জন সম্ভব কি না

শ্রীদিলীপকুমার রায়

এ সন্দেহটি য়ুরোপে আমার মনে প্রথম প্রথম প্রায়ই উদয় হত। তার কারণ, আমি বিলেতে লক্ষ্য করেছিলাম যে, আমাদের সঙ্গীত ইংরাজদের মনে খুব বেশির ভাগ স্থলেই কোনও সাড়া তুলতে পার্ত্ত না। এতে মনটা স্বতঃই একটা আঘাত পেয়েছিল। তার কারণ, "সঙ্গীতের আবেদন বিশ্বজনীন," "আর্টের মাধুর্য্য মানুষের অনৈক্য সত্ত্বেও তাকে তার আসল ঐক্যের স্থানটা নির্দ্দেশ করে দিতে সক্ষম", ইত্যাদি আদর্শপন্থী (idealistic) বাণী এখন মনে একটা বড় রকমের আশা ভরসা জাগিয়ে রেখেছিল। এরূপ সময়ে যে সঙ্গীতে আমরা এতখানি আনন্দ ও রসের পরশ পাই, সে সঙ্গীত অপরের মনে অনুরূপ অনুরণন তুলতে অসমর্থ দেখলে, মনটা বোধ হয় একটু দুঃখিত না হয়েই পারে না। এ দুঃখটা আসে তার কারণ এ নয় যে আমাদের সঙ্গীতের মধ্যে একটা গভীর রসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ওদের সার্টিফিকেট আমাদের একান্ত প্রয়োজন। তার কারণ এই যে, মানুষ প্রায় সব নির্ম্মল আনন্দই অপর দশজনকে নিয়ে একত্রে ভোগ কর্ত্তে ভালবাসে। তাই এই মিলনের ক্ষেত্রে আমাদের যত বেশি লোকের সঙ্গে আদানপ্রদান হয়—আমাদের আনন্দরসটি আমাদের কাছে ততই বেশি সত্য ও উজ্জ্বল

হয়ে ধরা দেয়। তাই বিদেশীর কাছে এই সাড়া পাবার প্রত্যাশার মধ্যে পরমুখাপেক্ষিতা কিছু আছে বলে মনে করলে একটু ভুল করে বসা হবে। মানুষের কাছে মানুষের এটা একটা সহজ দাবী। তাই এই সত্য ও সরল দাবীর মর্য্যাদা যদি অপরে না রাখে, তবে তার জন্য একটা ব্যথার প্রতিক্রিয়া (reaction) আসা বোধ হয় অসঙ্গত নয়। তবে এতে এই একটা আশঙ্কা আছে যে এর ফলে আমরা অনেক সময়ে মনের সে সহজ স্থৈর্য্য ও নিরপেক্ষতা হারিয়ে বসি, যার অভাবে কোন বড় সত্য নির্দ্ধারণই আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অন্ততঃ বিলাতে এটা আমার ক্ষেত্রে ঘটেছিল, তাই এতটা ভূমিকার অবতারণা কর্ত্তে আমি বাধ্য হ'লাম। সেটা কেমন করে হয়েছিল তা একটু সবিস্তারে বিবৃত করা বোধ হয় এ সম্পর্কে অবান্তর হবে না। ব্যাপারটা হয়েছিল এই :—

ইংলণ্ডে সভাসমিতি প্রভৃতিতে প্রথম প্রথম আমাদের সঙ্গীতে ইংরাজদের সোৎসাহ করতালিতে মনটা ভারি খুসি হত, এ কথা বেশ মনে আছে। কিন্তু য়ুরোপে আমরা এ করতালিকে অনভিজ্ঞ অবস্থায় একটু অত্যধিক বড় করেই দেখে থাকি, এবং প্রত্যেক করতালিকে আন্তরিক বলে ভুল করে বসে থাকি। তবে এতে আমাদের অপরাধ যে খুব গুরুতর তা মনে হয় না, কারণ, আমরা যখন য়ুরোপে যাই, তখন আমরা সচরাচর থাকি তরুণ, ও সুতরাং সভ্যতার কপট আদব-কায়দায় অনভিজ্ঞ। কাজেই তখন প্রথমটায় এ কথাটি আমাদের কাছে স্পষ্ট থাকে না যে, খুসি না হ'লেও আহ্লাদে আটখানা হয়ে পড়েছি, এটা ভাবে-ভঙ্গীতে জ্ঞাপন করাটা হচ্ছে সভ্যতার একটা অপরিহার্য্য চিহ্ন। তাই এরূপ অভিব্যক্তিকে আমরা বেশির ভাগ স্থলেই আন্তরিক বলে বিশ্বাস করে প্রায়ই ভুল করে বস্‌তাম।

তবে কোনও কপটতাই আমাদের খুব বেশি দিন ধরে প্রবঞ্চিত করে রাখ্‌তে পারে না। তাই আমরা এ কথাটা শীঘ্রই বুঝতে পেরেছিলাম যে, ইংরাজেরা আমাদের সঙ্গীত শুনে ঘরকে করতালির চটাপটে মুখর করে তুললেও, সেটা ভাল-লাগার দরুণ নয়। তখন মনে একটা ব্যথার প্রতিক্রিয়া এসেছিল, এ কথা আজ বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে— যার দরুণ আমরা অনেক সময়ে পরে "ব্যাঘ্র আসিলে"ও তার আগমনকে বিশ্বাস কর্ত্তে মনকে রাজী করাতে পার্ত্তাম না; অর্থাৎ, যদি কখনও ওদের কারুর সত্য-সত্যও আমাদের সঙ্গীত ভাল লাগ্‌ত, তখনও বঞ্চিত মন সহজে সে তারিফে বিশ্বাস স্থাপন কর্ত্তে সম্মত হ'ত না। মনে হ'ত, বুঝি আমাদের সঙ্গীত ওদের ভাল লাগ্‌তেই পারে না। তার ওপর যখন দেখ্‌তাম যে, পক্ষান্তরে আমাদের মধ্যেও বড় কারুর ওদের গানবাজনা বিশেষ ভাল লাগ্‌ত না, তখন আমার মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে, যেমন ওদের সঙ্গীত আমাদের ভাল লাগ্‌তে পারে না, তেম্‌নি আমাদের সঙ্গীতেরও ওদের মনে অনুরণন তোলার সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত। কিন্তু তা সত্ত্বেও মন আমার কোনও মতেই এ কথা মেনে নিতে রাজী হত না যে, আমাদের একের সঙ্গীত অপরের কাছ থেকে কখনও কোনও সাড়া পেতে পারে না। মন বল্‌ত :— "না, এ অসঙ্গতি বাহ্যিক মাত্র। কারণ কোনও মহৎ, গভীর ও মনোজ্ঞ আনন্দের পরশই জাতি-বিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে মাত্র আবদ্ধ থাকতে পারে না। এবং যেহেতু আমাদের সঙ্গীতের মধ্যে একটা সত্যকার রস ও গভীর সৌন্দর্য্য আছে, যার পরশ আমাদের প্রাণকে এতখানি ঐশ্বর্য্য দান করে থাকে, সে হেতু এ আনন্দের পরশ সকলের কাছেই ধরা দেবে—দেবেই দেবে। কারণ, এইটেই সত্য বলে মনে হয়, এবং এতেই মানুষের মনোজগতে সৃষ্টির রাজ্যে একটা মিলের সুরের রেশ মেলা সম্ভব।"

কিন্তু জগতে দুঃখ, দৈন্য ও অবিচার এতই বেশি— যাকে কোনও মতেই অস্বীকার করা চলে না—যে, আমাদের মনের মধ্যে জগতের নিয়মকানুন সম্বন্ধে যে সৌষ্ঠবজ্ঞান ও সুবিচারে বিশ্বাস আপনা থেকেই জন্ম নেয়, তাকে প্রাণমন দিয়ে বিশ্বাস করে চলা মুস্কিল, যদি বাস্তব জগতে তার কোনও সমর্থনই খুঁজে পাওয়া না যায়। বহুদিনব্যাপী সাধনার ফলে হৃদয়ের কোনও গভীর পরিণতির আলোতে হয়ত আমরা কেউ কেউ এই দৃশ্যতঃ অসঙ্গতির মধ্যেও একটা মহত্তর ও পরম মিলের সুর খুঁজে পেয়ে থাকি, কিন্তু যৌবনে বোধ হয় আমরা অমিলকে ও অশিবকে একটু বড় করে না দেখেই পারি না। সত্য বটে যে আমরা যৌবনেই নিজেদের দৃষ্ট অনেকগুলি দুঃখ-কষ্টের কারণ ভেবেচিন্তে কতকটা নির্দ্দেশ কর্ত্তে পারি

বলে মনে করি, এবং ব্যক্তিবিশেষের জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্টকে তার স্বকৃত কর্ম্মফল বলে ভেবে নিয়ে একটু সান্ত্বনা পেতে চেষ্টা পাই; ও ভাবি—যে, তাহলে সৃষ্টি যে মূলতঃ সুন্দর ও সুমিল বলে আমাদের মনের মধ্যে একটা আদর্শপন্থী ধারণা আছে, সেটা হয়ত সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। কিন্তু আরও একটু ভেবে দেখ্‌লে যখন দেখি যে বাস্তব জগতে একের সুখ আবহমান কাল দশের দুঃখের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে এসেছে; যখন দেখি যে মানুষের সভ্যতার ক্রমবিকাশ শুধু যে লক্ষ লক্ষ নিরীহ জীবহত্যার অপচয়ের ওপর মাত্র প্রতিষ্ঠিত তাই নয়—নিত্য নরহত্যার রক্তের দ্বারা উর্ব্বর ভূমিতেই তার জন্ম; যখন দেখি যে দৈনিক জীবনে দোষীর কর্ম্মফল প্রত্যহই নির্দ্দোষের ওপর বর্ত্তায়;—তখন জগতের একটা অদৃশ্য ও অকাট্য মিলের সুরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয়ের হাত হতে মনকে মুক্ত কর্ত্তে পারা একটু কঠিন হয়ে ওঠে। তাই তখন আমাদের মন বস্তুটি একটু নিরাশ হয়ে, সংসারে যে কয়টি বোধগম্য সুখশান্তি ও মিলের সুরের রেশ পাওয়া যায়, তাদের নিয়েই একটু যেন উদাসভাবেই ঘরকন্নায় মনোনিবেশে রত হয়,—আর আদর্শবাদে তত সাড়া দেয় না।

এর প্রধান কারণ এই যে, বিশ্বাস করে যদি একবার ঠকা যায়, তবে পুনরায় বিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে সচরাচর একটু কঠিন হয়ে ওঠে। তাই এরূপ অবস্থায় আমাদের আহত মনটি কোনও বড় সত্য বা নীতিতে বিশ্বাস কর্ব্বার আগে বাস্তব জগতে তার সমর্থন না পেলে আর তাতে সহজে রাজী হয় না। এই জন্য সঙ্গীতের বা যে-কোনও কলার আবেদন বিশ্বজনীন, এরূপ আদর্শ-পন্থী বাণীকে বিশ্বাস কর্ত্তে হলে, বাস্তব জগতে তার প্রমাণ একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। ইংলণ্ডে অবস্থান-কালে আমাদের সঙ্গীত যে য়ুরোপীয়দের ভাল লাগ্‌তে পারে এ প্রমাণ বড় একটা পাইনি, পেয়েছিলাম কেবল তাদের হাততালির চটাপট, যার কপটতা খুব শীঘ্রই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এ প্রমাণ সর্ব্বপ্রথম আমি পেয়েছিলাম শ্রীযুক্ত রোমাঁ্যা রোলাঁ্যা (Romain Rolland) মহোদয়ের কাছে। এঁর সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা মন্দ নয়। সব জড়িয়ে এঁর মতন লোক বর্ত্তমান য়ুরোপে আর সেই মনুষ্যের চলে। মানুষকে এতখানি উঁচুতে উঠতে দেখ্‌লে আনন্দ না হয়েই পারে না। এঁর সমকক্ষ ঔপন্যাসিক বোধ হয় বর্ত্তমান জগতে নেই এবং ইনি আদর্শ-বাদীদের মধ্যে বর্ত্তমান জগতে কারুর চেয়েই কম নন। ১৯১৬ সালে ইনি তাঁর বিশ্ববিশ্রুত উপন্যাস জঁ ক্রিষ্টফারের (Jean Christophe) জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। শান্তি ও বিশ্বমানবের মধ্যে প্রীতির প্রচার সর্ব্বদাই বাঞ্ছনীয়, এ কথা যুদ্ধের মধ্যেও ফরাসীদেশে প্রচার করার দরুণ এঁর দেশদ্রোহী নাম রটেছিল। এঁর সম্বন্ধে অনেক কথাই লেখা যেতে পার্ত্ত, কিন্তু আজ আমি তাঁকে সঙ্গীতের সমালোচক হিসেবেই আপনাদের কাছে উপস্থাপিত কর্ত্তে চাই বলে অন্য সে সব কথা লিখ্‌লাম না। ইনি বর্ত্তমান য়ুরোপে য়ুরোপীয় সঙ্গীতের একজন শ্রেষ্ঠ সমালোচক—বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমালোচক। পারিসের বিশ্ববিদ্যালয়ে এঁর দৈনিক অধ্যাপনা শুন্‌তে ও পিয়ানো বাজান উপভোগ কর্ত্তে সেখানকার ছাত্র ছাড়াও অনেক সুধীবৃন্দ আস্‌তেন। সঙ্গীতের এঁর মত উদার সমালোচক জগতে খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছে। আমাদের সঙ্গীত শুনে ইনি অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন ও বলেছিলেন যে, আমাদের রাগরাগিনীগুলি পাশ্চাত্যে প্রকাশ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া ইনি আরও বলেছিলেন যে, য়ুরোপ বহুমিলে (harmony) এত বিকাশ লাভ করেছে যে, এখন প্রাচ্যের বিশুদ্ধ স্বর-বৈচিত্র্য (melody) থেকে তার বিশেষ লাভ হবার সম্ভাবনা খুবই বেশি। কিন্তু বিলাতে আমাদের সঙ্গীতের তারিফের যে অকাট্য প্রমাণ পেয়ে-ছিলাম, তাতে রোলাঁ মহোদয়ের এ আশ্বাসবাক্যে মনটা বড় সাড়া দেয় নি। কাজেই আমাদের সঙ্গীত য়ুরোপীয়দের কাছে যে কখনও প্রতিপত্তি লাভ কর্ত্তে পারে, এ বিষয়ে আমি তাঁর কাছে আমার সস্মিত সংশয় প্রকাশ করেছিলাম। উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, উচ্চতম সঙ্গীতের আবেদন দেশ-কাল-পাত্রের উপর বড় বেশি নির্ভর করে না; তা সকলকেই একটা-না-একটা কিছু দেবেই দেবে—যদিও হয়ত বিভিন্ন লোক একই সঙ্গীতকে বিভিন্ন ভাবে গ্রহণ কর্ব্বে। আরও একটি পত্রে তিনি আমাকে লিখে-ছিলেন, "তুমি ইংরাজ ও আমেরিকানদের সঙ্গীত রসজ্ঞতার দৃষ্টান্ত থেকে য়ুরোপের অন্য সব জাতির সঙ্গীতবোধের সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে বসে আছ; কিন্তু

সেটা তোমার ভুল হয়েছে, কারণ, জগতে ঠিক্ এই দুটি জাতিই সব চেয়ে কম সঙ্গীতজ্ঞ ;—তাদের সঙ্গীত নেই বল্‌লেই হয়। কিন্তু তুমি যদি জর্ম্মা'নর, রুষদেশের বা ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠসঙ্গীত-রসিকদের সংস্পর্শে আস্‌তে, তাহলে দেখ্‌তে পেতে তারা তোমাদের সঙ্গীতের সৌন্দর্য্য কতখানি বুঝতে পারে। অবশ্য এটা ঠিক্ যে তোমাদের সঙ্গীতের অনেকখানি সৌন্দর্য্য তাদের কাছে ধরা দেবে না, কারণ, এক—তোমাদের ভাষার বিভিন্নতা ও দ্বিতীয়তঃ তোমাদের সঙ্গীতের মধ্যে এমন একটা প্রাচীন জগতের আভাষ পাওয়া যায়, যা বর্ত্তমান কালে ধরা-ছোঁয়া শক্ত—যেমন একজন ফরাসী সেক্সপীয়রকে কখনই ঠিক্ একজন ইংরাজের মতন বুঝ্‌তে পার্ব্বে না, তা সে যতই কেন না তাঁর ভক্ত হোক্। কিন্তু তোমাদের সঙ্গীতের মধ্যে যে বিশ্বজনীন স্পন্দন আছে, তা আমাদের মনে সাড়া তুল্‌বেই তুল্‌বে।"

তখন—এটা হচ্ছে ১৯২০ সালের কথা—আমি রোলাঁর এ উক্তিটিকে কোনমতেই সত্য বলে গ্রহণ কর্ত্তে পারিনি; কিন্তু পরে যখন য়ুরোপের অন্যান্য জাতির সঙ্গে একটু নিকট-পরিচয় লাভ করার সুযোগ পেয়েছিলাম, তখন এটা যে কতবড় সত্য তা উপলব্ধি করেছিলাম। কারণ আমি দেখ্‌তাম যে, যদিও ওদের মধ্যে যারা নিজেদের (অর্থাৎ য়ুরোপীয়-সঙ্গীতের বিশেষ ভক্ত নয়, তাদের হৃদয় আমাদের সঙ্গীতে বিশেষ সাড়া দিত না, তবু যারা সত্যই নিজেদের সঙ্গীতের রসিক, তারা আমাদের সঙ্গীতের মধ্যেও একটা মহনীয় বিকাশ উপলব্ধি কর্ত্তে পার্ত্ত। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে হয়ত প্রথমটাতেই পার্ত্ত না, কিন্তু আমাদের সঙ্গীতের সঙ্গে অল্প পরিচয়ের পরেই তারা যে তা'হতে রসগ্রহণ কর্ত্তে পারত এটা আমি বার-বার দেখেছি। তাই আমার মনে হয়েছিল যে, সঙ্গীতকে যারা সত্য সত্য ভালবাসে—যদিও এরূপ লোক সর্ব্বত্রই কম—তারা অনভ্যস্ত সঙ্গীতের মধ্যেও মহত্ব থাক্‌লে কিছু না কিছু বুঝ্‌তে পারেই পারে। অথচ তাদের অভ্যস্ত সঙ্গীত থেকে তারা যে ভাবে রসগ্রহণ করে, অনভ্যস্ত সঙ্গীত হতে কখনই ঠিক্ সেরূপ প্রবুদ্ধভাবে রসগ্রহণ কর্ত্তে পারে না, কিন্তু তা সত্বেও এ সঙ্গীত তাদের মনে সাড়া তুল্‌তে বাধ্য, যদি তার মধ্যে কোনও সত্যকার গরিমা থাকে।

কিন্তু প্রথমটা ওদের অনেকের কাছে আমাদের সঙ্গীত একটা অদ্ভুত কিছুর বিকাশ মাত্র এই রকম মনে হ'লেও পরে একটু অভ্যস্ত হ'লেই তারা যেমন আমাদের সঙ্গীত থেকে অল্প-বিস্তর রস সংগ্রহ কর্ত্তে পার্ত্ত, তেম্‌নি পক্ষান্তরে আমরাও একটু অভ্যস্ত হলেই ওদের সঙ্গীতের দাম দিতে শিখতাম। এ থেকে আমি বুঝেছিলাম যে, যে কোনও বিদেশী কলার রসগ্রহণ কর্ত্তে হ'লে মনটাকে সেই কলা-বিশেষের সম্বন্ধে প্রচলিত আইন কানুনের পাশ হ'তে একটু মুক্ত কর্ত্তে হয়। এবং যতটা পরিমাণে মনকে মুক্ত করা যায়, বিদেশী কলা হ'তে ততটা রসবোধ হওয়াই সম্ভব। অবশ্য তাদের দেশীয় সঙ্গীত তাদের মনে যে ভাবে সাড়া তুল্‌ত, আমাদের সঙ্গীত কখনই ঠিক্ সে ভাবে সাড়া তুল্‌তে পার্ত্ত না। কারণ খুব স্পষ্ট—অর্থাৎ অভ্যাসের মনের ওপর প্রভাবের বশে এটা হয়ে থাকে। এতে দোষের অবশ্য কিছু থাক্‌তেই পারে না, কারণ কোনও কলার বিশেষ বিকাশের অনুরাগী হওয়ার মধ্যে অসত্য কিছু থাক্‌তেই পারে না। তবে এটা দোষের হয় তখনই যখন এই অভ্যাসের বশে আমরা আমাদের মনকে এই বিশ্বাস পোষণ কর্ত্তে প্রশ্রয় দেই যে আমাদের অভ্যস্ত কলার প্রচলিত দেশজ নিয়মকানুনই অভ্রান্ত ও অপৌরুষেয়—অন্য সব ধারণা ভুল। অভ্যাসের বশে এরূপ মনে হওয়াটা নিতান্তই স্বাভাবিক. কিন্তু যা স্বাভাবিক তাই যে সর্ব্বদা ভাল নয় এ কথা সর্ব্বজনবিদিত; এবং সত্য শিক্ষার একটা মস্ত আদর্শ—মনকে যথাসম্ভব অভ্যাসের বা সংস্কারের পাশমুক্ত করা ও তাকে একটা অসাম্প্রদায়িকভাবে বরণ কর্ত্তে উন্মুখ করে তোলা। তাই আমি য়ুরোপীয় বন্ধুদের প্রায়ই বল্‌তাম যে আমাদের সঙ্গীত বুঝ্‌তে হ'লে সঙ্গীত সম্বন্ধে কেবল যে তাঁদের প্রচলিত সংস্কারই ঠিক্, অন্য সব দেশের ধারণা ভুল এ সঙ্কীর্ণতা বর্জ্জন কর্ত্তে হবে। এ পক্ষে এই উদার শিক্ষার আশ্রয় নেওয়া দরকার যে জগতে কেবল আমরাই ঈশ্বরের বরপুত্র নই ও সত্যের উপলব্ধি কেবল আমাদেরই একচেটে নয়। কারণ এভাবে মনকে যথাসম্ভব নিরপেক্ষ করার চেষ্টা না কর্লে, শুধু সঙ্গীত ব'লে নয়, কোনও উচ্চ কলারই বিভিন্ন বিকাশের মধ্যে একটা বিশ্বজনীন মিলের সুরের আভাষ পাওয়া সম্ভব নয়। আমাদের পক্ষে য়ুরোপীয় সঙ্গীত বোঝা সম্বন্ধেও এ কথা সমান খাটে। তবে মনের এ নিরপেক্ষ অবস্থা লাভ করাটা একটু চেষ্টা-সাপেক্ষ ও অনেকটা অভ্যাস-সাপেক্ষও বটে। কারণ অনেক সময়ে শুধু

মনকে বোঝাবার চেষ্টা করে যে সত্য উপলব্ধি করা না যায়, চোখে দেখার বা কাণে শোনার অভ্যাসে তা অত্যন্ত সহজেই আমাদের কাছে স্পষ্ট এমন কি স্বতঃসিদ্ধও হয়ে ওঠে। ওদের সঙ্গীত শুন্‌তে শুন্‌তে আমার এ কথাটা আরও বেশি ক'রে মনে হয়েছিল যে, শুন্‌তে শুন্‌তে আমাদের মনবস্তুটি কেমন যেন আপ্‌না হতেই অভ্যাসের খাঁজ কাটিয়ে উঠ্‌তে শেখে ও উপলব্ধি কর্ত্তে পারে যে আমাদের নিজেদের ধারণাই সঙ্গীতরাজ্যে একমাত্র সত্য নয়। এ কথা শুধু আর্ট বলেও নয়; ধর্ম্মে, নীতিতে, দর্শনে—সর্ব্বত্রই, আমরা বিভিন্ন দেশের মনোজগতের একটু নিকট পরিচয় পেলেই দেখ্‌তে পাই বৈচিত্র্যের মধ্যে কেমন একটা মিলের সুর বাজে এবং অপরের মতের মধ্যে অনেক সময়ে বাহ্যতঃ অসঙ্গতি দৃষ্ট হলেও তারা মূলতঃ একই মিলের বিভিন্ন অভিব্যক্তি হ'তে পারে।

তবে এরূপ উদার ধারণা গড়ে তোলার পক্ষে বাস্তব দেখাশোনার একটা মস্ত দাম আছে ব'লে আমার মনে হয় যে এ পক্ষে "সঙ্গীত বিশ্বজনীন" রূপ বাণী আওড়ালেই চল্‌বে না। এ কথার প্রমাণ-প্রয়োগার্থে আমরা যাতে একে অপরের উচ্চতম সঙ্গীতের পরিচয় পাই তার সুযোগ সৃষ্টি করা দরকার। অর্থাৎ আমাদের এরূপ প্রচেষ্টা অভিনন্দনীয় যাতে আমাদের সঙ্গীত য়ুরোপীয়েরা বেশি শোন্‌বার সুযোগ পায়। এ বিষয়ে আরম্ভটা হয় ত একটু কঠিন হ'তে পারে, কিন্তু একবার আমাদের উচ্চতম সঙ্গীতে সামান্য অভ্যস্ত হবার সুযোগ পেলেই যে তারা তা হ'তে ক্রমেই বেশি রস সংগ্রহ কর্ব্বে এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। বোধ হয় এ কথা বলাই বেশি যে ওদের সঙ্গীতের আমাদের দেশে প্রতিপত্তি লাভ সম্বন্ধেও এ কথা সমান খাটে।

তা ছাড়া এ সূত্রে আমার মনে হয় যে সঙ্গীতের বা যে কোনও কলার মধ্য দিয়ে এ সংস্পর্শের পরিণামে আমাদের পরস্পরের একটা মস্ত লাভ হবার সম্ভাবনা। কথাটা একটু বিস্তারিত ভাবে বলা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক না হ'তেও পারে। কথাটা এই:—

এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের যে সম্বন্ধ আজ পাশ্চাত্যে খুব দরকারী বলে গণ্য হয়েছে—অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্যের বা দেনা-পাওনার সম্বন্ধ—সে সম্বন্ধের দাম খুব বেশি নয়। বর্ত্তমান য়ুরোপে এই সম্বন্ধটাকে খুব বড় করে দেখার ফলে জগতে দুঃখ কষ্ট যে বেড়েছে, তা যে কেউ য়ুরোপের বর্ত্তমান শ্মশানে একটু বেড়িয়ে এসেছেন তাঁরই চোখে পড়তে বাধ্য। য়ুরোপ আজ ভাবিত ও বিচলিত হয়ে পড়েছে "এমনটা কেন হ'ল?" তার প্রমাণ পাই আমরা মহামতি রাসেলের "চীনের সমস্যা" বইখানিতে যেখানে তিনি লিখ্‌ছেন:— "বিগত মহাযুদ্ধ আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে যে আমাদের সভ্যতার কোথায় একটা গভীর দোষ আছে।" এবং পরে তিনি দেখিয়েছেন যে এ বিষয়ে চীনদেশ য়ুরোপকে তার ভুল বোঝাবার পক্ষে কিরূপ সহায়তা কর্ত্তে পারে। জার্ম্মাণির Spengler নামক একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক তাঁর সুবিখ্যাত "প্রতীচ্যের পতন" (Untergang des Abendlandes) বইখানিতে য়ুরোপীয় সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধ প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছেন শুন্‌তে পাই। রোঁলার অনুপম Clerambault বইখানিতেও আমরা য়ুরোপের শাসনতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর গভীর নিরাশার পরিচয় পাই। ফলে য়ুরোপ আজ একটু তত্ত্বান্বেষী হতে আরম্ভ করেছে ও প্রাচ্যেরও যে এ বিষয়ে কিছু গভীর বাণী বল্‌বার থাক্‌তে পারে তা তার মনে উদয় হয়েছে। বর্ত্তমান য়ুরোপের সঙ্গে—(অর্থাৎ অবশ্য শুধু ইংলণ্ডের সঙ্গে হলে হবে না)—যাঁর একটু পরিচয় আছে, এ সত্য তাঁর কাছে স্পষ্ট না হয়েই পারে না। তাই এটা শুন্‌তে একটু বেশি আদর্শপন্থী ঠেক্‌লেও খুব সম্ভবতঃ এটা সত্য যে, বর্ত্তমান য়ুরোপ আজ এই সন্দেহে চঞ্চল হয়ে উঠেছে যে, স্থূল ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্বন্ধ একটা বড় সম্বন্ধ না হতেও পারে এবং এতে জগতের মানুষের কিছু লাভ হ'লেও এতে কোনও স্থায়ী বা গভীর লাভের আশা হয়ত সুদূরপরাহত। পক্ষান্তরে মানুষের মনোজগতে প্রীতির ও শ্রদ্ধার বন্ধন হচ্ছে একটা সত্যকার বন্ধন ও দুঃখবহুল সংসারে এতে নানান্ দুর্ব্বোধ্য সমস্যার সমাধান মিল্‌তে পারে। তখন, মনোজগতে এই ঐক্যের বীজ বপন করার পক্ষে সুকুমার কলা আমাদের একটা মস্ত সহায়। সুকুমার কলার ভিতর দিয়ে আমরা একটা জাতির মনের গতি, আদর্শ ও সভ্যতার বড় কম পরিচয় পাই না। কারণ আমাদের সভ্যতার মধ্যে যদি মহনীয় কিছু থাকে, আমাদের জীবনে যদি বরণীয় কিছু থাকে, নব নব সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির জন্য আমরা যদি জীবনে

কিছু করে থাকি, তবে শিল্পকলায় তার পরিচয় বড় কম মিলবে না। কোথায় পড়েছিলাম সুকুমার কলা জীবনের একটি ফুল। কথাটি বড় সুন্দর। আমাদের জীবনে যে অসারতা আছে, আমাদের চিন্তায় যে ক্ষুদ্রতা আছে, আমাদের প্রকৃতিতে যে পাশবিকতার অত্যাচার আছে, শিল্পকলার চর্চ্চা কর্ত্তে গেলে আমাদের অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যেও সে সব ভুলে গিয়ে সুন্দরের পূজারী হতে হয়। এতে জীবনের খাদকে পিছনে ফেলে আমরা বড় কম অগ্রসর হই না। তাই আমাদের জীবনে পরম ও চরম যেটুকু, সেটুকু আর্টে বড় মনোজ্ঞভাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং তাতে আমরা বাস্তব জীবনের ক্ষুদ্রতার ও নীচতার একটা মস্ত বড় অস্বীকার পেয়ে থাকি! ফলে আমাদের জীবনের মধ্যে যা-কিছু সুন্দর আছে তা ফুলের মতই শিল্পকলায় মূর্ত্ত ও পুষ্পিত হয়ে ওঠে। তাই কলায় প্রত্যেক জাতির ও সভ্যতারই একটা মহান্, গভীর ও সত্য পরিচয় পাওয়া যায় যা একটু আদর্শপন্থী (idealistic) হলেও অতিরঞ্জিত মনে করার কোনও কারণ নেই। তাই আমার মনে হয় আমাদের সঙ্গীত বা অন্যান্য কলাকে বিশ্বজগতে ছড়িয়ে দিলে তাতে একটা মস্ত লাভের সম্ভাবনা, যে হেতু তার মধ্য দিয়ে জগতের মানুষ আমাদের সেই পরম সৌন্দর্য্যটুকুর পরিচয় পাবে যা আমাদের হীনতাকে ছাড়িয়ে, এমন কি অস্বীকার করেও সগর্ব্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে উঠেছে, যেন বলছে :—"দেখ, দুঃখদৈন্যের গুরুভারও আমাদের নিষ্পিষ্ট করে ফেলতে পারে নি। দেখ, এই বিয়োগবহুল জীবনের মধ্যে আমরা কি ভাবে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি ও তাকে বহন করে এসেছি।" তাই যাঁরা শিল্পকলাকে ছোট করে দেখেন, যাঁরা তাকে অবসরের চিত্তবিনোদন ছাড়া অন্য কিছু মনে কর্ত্তে পারেন না, তাঁরা প্রত্যেক সভ্যতারই প্রাণপ্রতিষ্ঠার আসল স্থানটি সম্বন্ধে আজীবন অনেকটা অন্ধ থেকেই দিন কাটিয়ে যান বলে মনে করার কারণ আছে। আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের চিত্রকলা, সঙ্গীত, ও সাহিত্য আমাদের কলাচর্চ্চার একটা পরমসুন্দর পরিণতি আমাদের সৌন্দর্য্য-স্পৃহার একটা চমৎকার crystallization এবং য়ুরোপে অল্প সময়ের মধ্যেই আমি আমাদের অপেক্ষাকৃত নিম্নতর স্তরের সঙ্গীতেরও যে প্রতিপত্তি লাভ সম্ভব দেখে এসেছি (যেহেতু আমি নিজে আমাদের সর্ব্বোচ্চ সঙ্গীতের পরিচয় দিতে পারিনি) তাতে আমার খুবই মনে হয় যে, আমাদের উচ্চতম সঙ্গীতের য়ুরোপে আদরলাভ সুদূর নয়—যদি আমরা য়ুরোপে আমাদের সঙ্গীত ছড়িয়ে দেবার কোনও বন্দোবস্ত কর্ত্তে পারি। এবং এখনকার সময় এজন্য আরও উপযোগী যে, বিগত যুদ্ধের ভীষণ আলোড়নের পর থেকে য়ুরোপ প্রাচ্যের বাণী শুনবার জন্য একটু ব্যগ্র হয়েই উঠেছে বলা যেতে পারে। তাই আমার খুবই মনে হয় যে আমাদের ধর্ম্ম, কলা, নীতি ও দর্শনের উপলব্ধির মধ্যে যা কিছু সত্য আছে, তা শীঘ্রই য়ুরোপের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্ব্বে। আমাদের দর্শন ও সংস্কৃত সাহিত্য য়ুরোপের বিদ্বৎসমাজে ইতিমধ্যেই অনেকটা প্রতিপত্তি লাভ করেছে এ কথা অনেকেই জানেন, এবং আজকাল আমাদের সঙ্গীত নিয়েও ওরা সবেমাত্র নাড়া-চাড়া আরম্ভ করেছে। সেদিন অক্সফোর্ডের Strangways মহোদয় Music of Hindustan বলে একটি সুবৃহৎ বই ছাপিয়েছেন। তাতে আমরা দেখতে পাই—আমাদের সঙ্গীত ওদেশের বিশেষজ্ঞের কাছে কি ভাবে গৃহীত হতে পারে। যদিও তিনি (ইংরাজ বলে কি না জানি না) আমাদের সঙ্গীতের প্রাণটি ধর্ত্তে পারেন নি বলে আমার মনে হয়েছিল, কিন্তু তাহলেও, তিনিও যে আমাদের সঙ্গীতের মহত্ত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ, তা তাঁর মতামত হতে দেখা যায়। আমাদের উচ্চসঙ্গীত সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন যে, সত্য-সত্য উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীত ভারতে য়ুরোপের মতনই বিরল বটে, কিন্তু তা হলেও, "When it comes there is no mistaking it." একজন ইংরাজের কাছেও এরূপ তারিফ লাভটা প্রণিধানের যোগ্য, যেহেতু তারা প্রায় সর্ব্বত্রই আমাদের সঙ্গীত হতে সবচেয়ে কম রসগ্রহণ কর্ত্ত, এটা আমি বারবার দেখে এসেছি। য়ুরোপের অন্যান্য সব জাতির মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের সঙ্গীতের যে আদর লাভ সম্ভব দেখে এসেছি, তাতে রোলাঁ মহোদয়ের কথার বিলক্ষণ সমর্থন পেয়েছিলাম এ কথা বলে রাখা ভাল।

তবে আমাদের সঙ্গীতের—বা যে কোন সঙ্গীতের—আদর পেতে হ'লে একটা কথা আমাদের ভুললে চলবে না যে এজন্য আমাদের সঙ্গীতেরই রস-সঞ্চারের ক্ষমতার emotional appealএর দিকটাকে এযাবৎ আমরা যে রকম ছোট করে দেখে এসেছি, পরেও তা করে চললে

হবে না। কথাটা একটু স্পষ্ট করে বলা দরকার। আমাদের ওস্তাদী সঙ্গীতের বিকাশ এমন অনুপম সৌন্দর্য্য-শালী হওয়া সত্ত্বেও যে একটা মস্ত কারণের জন্য সে সঙ্গীত আজ সাধারণের কাছে অনাদৃত, ঠিক্ সেই কারণের দরুণই এ সঙ্গীত য়ুরোপে অনাদৃত হবে যদি আমরা এদিকে দৃষ্টি না রাখি। কথাটা এই যে, সঙ্গীতের দুটো বা দুরকম আবেদন (appeal) আছে: একটা intellectual, অপরটা emotional। এখানে intellectual আবেদন বল্‌তে আমি সেই আবেদনের কথা বল্‌ছি, যে আবেদন মাত্র সঙ্গীতের বিশেষজ্ঞদের প্রাণে অনুরণন তোলে, অর্থাৎ কিনা যে আবেদন আমাদের সঙ্গীতের গঠন-প্রকৃতির (technique) বিশ্লেষণের প্রবুদ্ধ উপভোগের উপর নির্ভর করে। সঙ্গীতের যে এরকম একটা আবেদন আছে, তা একটু অনুধাবন করলেই প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ আমরা একটু ভেবে দেখ্‌লেই দেখ্‌তে পাই যে, লোক যে সাধারণতঃ বলে "গান আমি ভালবাসি, কিন্তু তা-না-না আমার ভাল লাগে না ছাই!" সেটা তারা এই intellectual আবেদনটার দাম দিতে পারে না বলেই বলে। পক্ষান্তরে যে দুচারজন বিশেষজ্ঞ (connaisseur) সঙ্গীতের গঠন-প্রকৃতিটা (technique) একটু শিখেছেন, তাঁরা যে এই "তা-না-না"র মধ্যে একটা রস পেয়ে থাকেন, এটাও অকাট্য। এবং যেহেতু আমরা খুব বেশির ভাগ স্থলেই বাইরের দৈনিক সত্য (fact) থেকে সাধারণ সত্যে (truth) পৌঁছই, সে হেতু এরূপ দৃষ্টান্ত থেকে বোধ হয় এ সিদ্ধান্তে পৌঁছন যেতে পারে যে, সঙ্গীতের একটা intellectual আবেদন আছেই আছে। আর, সঙ্গীতের emotional আবেদন বল্‌তে আমি সেই আবেদন বুঝ্‌ছি, যা সঙ্গীতে অনভিজ্ঞের মনেও একটা ভাবের স্রোত তুল্‌তে সমর্থ হয়, যেটা সঙ্গীত শোনা-না-শোনার ওপর বড় নির্ভর করে না, যা শুনে কমলাকান্ত বলেছিলেন "কে গায় ওই! বহুকাল-বিস্মৃত সুখস্বপ্নের মত ইত্যাদি ইত্যাদি।" এখানে কমলাকান্ত মোটেই ঐ গানের technique নিয়ে মাথা ঘামান নি, তিনি তার সাধারণ বা ভাবপ্রবণ দিক্‌টাতেই মোহিত হয়েছিলেন। এখন একটু ভেবে দেখ্‌লেই আমরা দেখ্‌তে পাই যে, এই শেষোক্ত আবেদনের ক্ষেত্র বা পরিধি পূর্ব্বোক্ত অর্থাৎ intellectual আবেদনের ক্ষেত্রের চেয়ে অনেক বেশি উদার। আমি অবশ্য এ কথা বল্‌তে চাই না যে, কোনও আবেদনের ক্ষেত্র বা পরিধির পরিসরের উপরই গানের উৎকর্ষ নির্ভর করে বা করা উচিত—আমি প্রমাণ কর্ত্তে চেষ্টা কর্ব্ব যে, এই আবেদনের একটা খুব বড় intrinsic মূল্য আছে যার সম্বন্ধে আমরা এ যাবৎ মূঢ়ের মত অন্ধ হয়ে থেকে আমাদের সঙ্গীতের রসকে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ করে ফেলেছি। এখন, আমাদের পূর্ব্বোক্ত intellectual আবেদনের সংজ্ঞা-অনুসারে বোধ হয় এ সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, এর গণ্ডী অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ—যেহেতু জগতে সব বিষয়েই বিশেষজ্ঞের সংখ্যা নানা কারণে কম। এ কারণ নিয়ে মাথা ঘামানটা অবান্তর হবে বলে আমি এখানে শুধু এই কথাটি মাত্র বলে রাখ্‌তে চাই যে, এই intellectual আবেদনের একটা বড় দাম থাক্‌লেও, এটা একটু বেশি স্বার্থকেন্দ্র (egoistic) ও সুতরাং শুদ্ধ এই আবেদনের জোরে কোনও আর্ট হয়ত বড় হতে পারে, কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয় না। কথা উঠ্‌তে পারে বটে যে অনেক উচ্চতম জিনিষই ত অত্যন্ত intellectual; কিন্তু এখানে আমাদের একটা কথা ভুল্‌লে চল্‌বে না যে, আর্ট যে বিজ্ঞান, গণিত বা দর্শনের সঙ্গে এক শ্রেণীভুক্ত নয়, তার সর্ব্বপ্রধান কারণ হচ্ছে এই যে শ্রেষ্ঠ আর্টে এই একটা অকাট্য emotional আবেদন থাকেই থাকে যেটা দর্শন-গণিত-বিজ্ঞানে থাকে না। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আর্ট তাকেই বলা যায়, যার মধ্যে এই intellectual আবেদনের সঙ্গে emotional আবেদনের একটা সহজ ও স্বাভাবিক সামঞ্জস্য থাকে। কেমন করে এ সামঞ্জস্য সাধন কর্ত্তে হবে সে ভার শিল্পীর, বৈয়াকরণিকের নয়। তাই এ বিষয়ে ব্যাকরণ লিখ্‌তে না গিয়ে, এজন্য শিল্পীকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়াই বোধ হয় ভাল। সে যাই হোক্, এই emotional আবেদন থাক্‌লে একটা শ্রেষ্ঠ কলা—অন্ততঃ সঙ্গীত ত বটেই—অপেক্ষাকৃত অনেক বেশির ভাগ লোকের কাছে ধরা দেয়। এখানে একটা কথা একটু বিশেষ করে বলে রাখা বোধ হয় দরকার যে, এখানে emotional আবেদন বল্‌তে আমি গানের কথার আবেদন বল্‌ছি না, আমি বুঝ্‌ছি সুরের যে একটা প্রাণ আছে তারই আবেদন—যেটা গানের কথার অতিরিক্ত (যেমন গানের

তানকর্ত্তবাদি বা যন্ত্রসঙ্গীতের স্বর-বৈচিত্র্য)। এখানে কিন্তু প্রসঙ্গতঃ একটা কথা আমি বলে রাখ্‌তে চাই যে, গানের কথার আবেদনকে ওস্তাদদের মত অবজ্ঞা করাটাও সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক মাত্র, কারণ এ কথার আবেদনেরও একটা দাম আছে, যেহেতু তার মধ্যেও একটা সত্যকার আনন্দ আছে। তবে এই আবেদনটা সঙ্গীতের দিক্ থেকে অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর আবেদন বলে আমি সঙ্গীতের emotional আবেদনের আলোচনা কর্ত্তে আজ তার এই উদারতর উপাদানটিকে (অর্থাৎ সুরের আবেদন) নিয়ে একটু নাড়াচাড়া কর্ত্তে চাই। অবশ্য emotional appeal বল্‌তে এখানে কেবল সুরের আবেদন বুঝ্‌লেও এটা ঠিক্, যে, শুধু এরূপ আবেদনের জোরেও কোনও আর্ট মহান্ আর্ট হয়ে উঠ্‌তে পারে না; সেটা হয় rag-time বা চুট্‌কী হয়ে পড়ে—যেমন ছোট ছোট নৃত্যশীল তালের সঙ্গে ছোটখাট ভাবের গান—না হয় নিতান্ত sentimental মাত্র হয়ে পড়ে—যেমন কীর্ত্তন বা বাউলের গান। (এখানে পুনরায় একটা কথা বলে রাখা দরকার। এরূপ গানকেও আমি বিজ্ঞম্মন্য ও বিচারপরাঙ্মুখ ওস্তাদদের মত হেসে উড়িয়ে দিতে চাই না বা সাধারণ্যের অবজ্ঞা-ভাজন কর্ত্তেও প্রয়াসী নই, কারণ এরূপ গানের একটা আনন্দ আছে এবং কোনও সত্য আনন্দই মূল্যহীন নয়। আমি কেবল এ শ্রেণীর গানকে নিম্নতর শ্রেণীর গানের মধ্যে ফেল্‌তে চাই।) কিন্তু উচ্চতম intellectual appeal-এর সঙ্গে সুন্দর emotional appealএর একত্র সমাবেশে যে আর্টের সৃষ্টি, তার ক্ষেত্র বা পরিধি দেশ বা অভ্যাসের অনেকটা অতিরিক্ত, অর্থাৎ তার প্রভাব ঢের বেশি ব্যাপক—শুধু স্বদেশে নয়, বিদেশেও। তাই আমরা দেখি রুষ সঙ্গীত জর্ম্মানিতে, ইতালীয় সঙ্গীত ফ্রান্সে ও যেকোস্লোভাবিয়ার সঙ্গীত সুদূর সুইডেনেও আদর পেতে পারে; এবং এ আদর সম্পূর্ণ বিশেষজ্ঞদের মধ্যেই আবদ্ধ নয়। অবশ্য কোনও মহৎ আর্টই অনভিজ্ঞের কাছে ততটা সাড়া পেতে পারে না যতটা সাড়া সে অভিজ্ঞের কাছে পায়, কিন্তু তা হ'লেও এ দুরকম আবেদনের একত্র সমাবেশে যে অপূর্ব্ব সৃষ্টি তা অনভিজ্ঞকেও কিছু না কিছু দেয়ই—সে অনভিজ্ঞ স্বদেশীই হোক্ বা বিদেশীই হোক্। এটা আমি ব্যক্তিগত ভাবে বারবার অনুভব করেছি—গায়ক হিসেবেও বটে, শ্রোতা হিসেবেও বটে। তাই আমার মনে হয় যে, আমাদের সঙ্গীত নিশ্চয়ই য়ুরোপে প্রতিপত্তি লাভ কর্ব্বে, যদি সে মাত্র বিস্ময়কর স্বর-বৈচিত্র্যের সমষ্টি না হয়। অর্থাৎ, আমাদের সঙ্গীত পাশ্চাত্যে নিশ্চিত আদর পাবে, যদি আমাদের সুরের অফুরন্ত বৈচিত্র্যের সঙ্গে এই emotional আবেদন থাকে। "গানের সঙ্গে নাইক প্রাণ যার আমার কাছে সে গানই নয়" *। এ কথা স্বদেশে যদি সত্য হয়, তবে বিদেশে ত তার দশগুণ সত্য। এখন আমাদের তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর গানে আমরা সচরাচর কি দেখ্‌তে পাই?—তাতে দেখ্‌তে পাই গলাবাজির অদ্ভুত কায়দা, মুদ্রাদোষের অসম্ভব হাস্যকরতা, কণ্ঠস্বরের কর্কশতার অপূর্ব্ব প্রাদুর্ভাব, চুলচেরা "সমে" ফিরে আসার অরুন্তুদ দুশ্চিন্তা, কলের মত তানকর্ত্তবের মস্তিষ্কবিলোড়ক গোলকধাঁধা ইত্যাদি ইত্যাদি। তাতে অভাব কিছুরই নেই কেবল অন্নবস্ত্রের ছাড়া, অর্থাৎ তাতে আমরা সবই পাই কেবল প্রাণ ও মিষ্টতা ছাড়া। কিন্তু এই অত্যাশ্চর্য্য দক্ষতা ও স্বরবৈচিত্র্যের সূক্ষ্মতার সঙ্গে যদি মিষ্টতা ও প্রাণের সমাবেশ থাকৃত, তাহলে আমাদের ওস্তাদী সঙ্গীত এতটা ঔদাসীন্যের ভাজন হত না। অবশ্য আমি এ কথা মানি যে সাধারণ মানুষ আজ যেরূপ অসম্পূর্ণ শিক্ষা পেয়ে থাকে, তাতে উচ্চতম শ্রেণীর গান শীঘ্র অপেক্ষাকৃত নিম্নতর শ্রেণীর গানের মত—যেমন কীর্ত্তন বাউল প্রভৃতির মত—লোকপ্রিয় হ'তে পারবে না।—আমি এক্ষেত্রে বল্‌তে চাই শুধু এই কথাটি মাত্র যে, উচ্চতম ওস্তাদী গান আজ যে লোকের কাছে অনাদৃত তার সমস্ত দোষটা শ্রোতার নয়, এজন্য কলাবিৎও যে অনেকটা দায়ী এটা অস্বীকার কর্লে সত্যের অপলাপ করা হবে। এখন, এরূপ কলাবিৎ আমাদের দেশে দুচারজন বিশেষজ্ঞের কাছে তাঁর intellectual appealএর দরুণ আদর পেতে পারেন বটে, কিন্তু বিদেশে তিনি যে কল্‌কে পাবেন না এটা ধ্রুব। এবং এই সূত্রে আমাদের সঙ্গীতের emotional আবেদনের দাম আরও বেশি করে উপলব্ধি করতে পারি। কারণ, এই emotional আবেদন না থাকলে আমাদের

* মদীয় পিতৃদেব ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত "আলেখ্য" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

সঙ্গীতের দাম আমাদের দেশে একটা সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়ের মধ্যে থাকলেও থাকতে পারে—যদিও তাও যে বেশি দিন থাকবে এ বিষয়ে বিলক্ষণ সংশয়ের কারণ আছে—কিন্তু বিদেশে যে তার দাম প্রায় কিছুমাত্র নেই, একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। তা যদি হয়, তাহলে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমাদের মধ্যে, অনেকে প্রাণহীন ওস্তাদী গানকেও যেরূপ বিজ্ঞমন্য ভাবে বড় করে এসেছেন, তাঁদের মোটের ওপর ভ্রান্ত হবার সম্ভাবনাই পনর আনা। এখানে পাছে অপরে আমাকে ভুল বোঝেন তাই আমি আর একবার পুনরুক্তি করে বলতে চাই যে. ওস্তাদী সঙ্গীতকে আমি আমাদের দেশের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর সঙ্গীত বলে মনে করি; কিন্তু কেবল তখনই করি, যখন তার তানের সঙ্গে প্রাণ থাকে; অর্থাৎ যখন তার উদ্দেশ্য মাত্র একটা অপূর্ব্ব intellecual appeal নয়—যা কেবল বিশেষজ্ঞানের কাছে ছাড়া আর সকলের কাছেই অর্থহীন—সে উচ্চতম আসন পাবার যোগ্য কেবল তখনই যখন সে স্বরবৈচিত্র্যে ও ভাবসম্পদে গরীয়ান্।

আমি এ কথা অবশ্য বলতে চাই না যে, কেবল বিদেশে প্রতিপত্তি লাভ করার জন্যই গানের emotional দিক্‌টার দাম দিতে আমাদের শিখতে হবে, যেহেতু কোনও আদরের অপেক্ষা রেখে একটা কলার বিকাশসাধন করার আদর্শ কখনই একটা বড় আদর্শ হতে পারে না। আমি এতক্ষণ এই সাদা কথাটুকু বোঝাবার চেষ্টা পেয়েছি যে, এই সঙ্গীতের এই দিক্‌টা একটা বড় দিক্ বলে তার প্রতি দৃষ্টি রাখাটা সত্যসত্যই একটা বড় আদর্শ। তবে বিদেশীর আদর পাওয়া সম্বন্ধে আমি আরও এই কথাটি বলে রাখা দরকার মনে করি যে, প্রত্যেক দেশের সঙ্গীতই তৎসম্বন্ধে বিদেশের অভিমত থেকে তার যথার্থ বাণীর (mission) সম্বন্ধে যথেষ্ট আলো পেতে পারে, যেমন এ ক্ষেত্রে আমরা পেতে পারি বলে আমি মনে করি। অথবা এ সম্পর্কে আমার এ কথাটা খুব বেশি করেই মনে হয়েছে যে, যে emotional appealএর গুণে একটা আর্ট দেশের গণ্ডীকেও অনেক পরিমাণে অতিক্রম করে বিদেশীকেও আপনার করে তুলতে পারে, তার প্রতি একান্তভাবে অন্ধ থেকে সে আর্টের একটা উদার ও সত্য বিকাশ অসম্ভব।

সঙ্গীতের বিকাশকে শুধু জাতীয় দিক্ থেকে বিচার করার যে প্রবৃত্তি আমাদের প্রায় মজ্জাগত বললেই চলে, সেটাকে বর্জ্জন করে তাকে উদারতর বিশ্বজাতীয় রসবোধ-নীতির দিক্ থেকে বিচার করার সময় এসেছে; কারণ এ ভাবে সঙ্গীতকে বোঝবার চেষ্টা করাই হচ্ছে বড় সত্য। এ সম্পর্কে মহামতি রোলাঁর একটি চিঠির কিয়দংশ উদ্ধৃত করে আমি এ প্রবন্ধের শেষ করব। তিনি সেদিন (মাস দুই পূর্ব্বে) আমাকে লিখেছেন:—"য়ুরোপের ও এশিয়ার সঙ্গীতকলার ধারার মধ্যে মূলতঃ কোনই ভেদ নেই। মানুষের হৃদয় বিশাল বনস্পতির মত বহু হয়েও এক; সে তার শত শাখা-প্রশাখা নিয়ে অসীম অনধিগম্য জীবনকে আলিঙ্গন কর্ত্তে ছুটেছে। আমি সমগ্র বনস্পতিটিকেই চাই। তোমাদের মধ্য দিয়ে আমি তারই বিরাট শাখাপ্রশাখার মর্ম্মরধ্বনি শুনতে ভালবাসি ও আমার হৃদয়কে তার মিলিত ও হৃদয়স্পর্শী কলতানের মধ্যে হারিয়ে ফেলতে উন্মুখ।" (আসল চিঠিটির কথাগুলি এই:—"Il n'y a aucun fossé entre l'art musical d' Europe et celui d' Asie. C'est le même homme dont l'âme une et multiple comme un chêne touffu cherche avee ses cent bras à etreindre l'innombrable insaisissable vie. J'aime le chêne tout entier J'aime à entendre brure, de vous ses puissants rameaux. Je veux emplir mes oreilles et mon côeur de leur totale et mouvante harmonie. *

* এখানে আমি একটি কথা বলে রাখতে চাই যে, রোলাঁর এই গভীর ও সুন্দর বাণীটির সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত কেবল, তাঁর প্রথম কথাটি ছাড়া। অর্থাৎ আমি কোন মতেই তাঁর এ মতটির সঙ্গে সায় দিতে পাচ্ছি না যে, আমাদের ও পাশ্চাত্যের সঙ্গীতের ধারার মধ্যে মূলতঃ কোনই ভেদ নেই। কথাটা একটু বিস্তারিত ভাবে বলা হয়ত সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক না হ'তেও পারে। আমার মনে হয় যে, এ generalisationটি খুব আদর্শপন্থী (idealistic) হলেও সম্পূর্ণ সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আমার মনে হয় এরূপ কথা ভাবার মধ্যে একটা চমৎকার সান্ত্বনা আছে বলেই রোলাঁ একটু বেশি দূর চলে গেছেন। আদর্শবাদ জীবনে একটা খুব বড় জিনিষ হলেও, সত্য যে তার চেয়েও বড় এ কথা বোধ হয় নির্ভয়ে বলা যেতে পারে। তাই যেখানে মানুষের মিলিত অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি কোন আদর্শপন্থী

নীতির পরিপন্থী দেখা যায়, সেখানে সে আদর্শবাদকে একটু ধীরভাবে বিচার করে দেখাই বোধ হয় ভাল। কারণ নিছক্ আবেগের দ্বারা চালিত হয়ে শুধু যে patriotism বা জাতিগৌরবরূপ অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ আদর্শবাদই আমাদের পেয়ে বস্‌তে পারে তাই নয়, উদারতর আদর্শবাদও আমাদের অনেক সময়ে এমন পথে চালিত করে, যাকে সুন্দর হলেও ভ্রান্ত ছাড়া আর কিছু মনে করা একটু কঠিন হয়ে ওঠে। কারণ আমার মনে হয় যে জীবন ও সৃষ্টির উৎসের বৈচিত্র্য অফুরন্ত বলে কোনও একটা নীতিমাত্র দিয়ে (তা সে নীতি যত বড়ই হোক্ না কেন) মানুষের জীবনকে মাপ্‌তে পারা যায় না, বা তার সব প্রেরণাকে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। উদাহরণতঃ টল্‌ষ্টয়ের ক্ষেত্রে আমরা এরূপ ভ্রমের একটা দৃষ্টান্ত দেখ্‌তে পাই। সে মহাত্মা এক সাম্যনীতির বশবর্ত্তী হয়ে তাঁর "কলা কি ?" নামক গ্রন্থে সব শিল্পী ও cultureকে শুদ্ধ ঐ একটি মাত্র কষ্টিপাথরে যাচাই কর্ত্তে গিয়ে ভ্রমে পড়ে গিয়েছিলেন—যখন তিনি শেক্ষপীর, গেটে বা ওয়াগ্‌নারকেও উড়িয়ে দিতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। ফলে তিনি যদিও এক উদারনীতির প্রেরণায় জীবনকে বিচার কর্ত্তে বসেছিলেন, কিন্তু ফলে তিনি জীবনকে সঙ্কীর্ণ করে ফেলেছিলেন যখন তিনি আরও বলেছিলেন যে, জানা আমাদের আদর্শ নয়, সুখে থাকার জন্য ও ধর্ম্মপথে থাকার জন্য যা কিছু জানার দরকার তাই আমাদের জানা উচিত—অন্য সব জ্ঞাতব্য বিষয় নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই। একটা নীতিবাদ মানুষকে পেয়ে না বস্‌লে টল্‌ষ্টয়ের মত শিল্পী ও মহাপ্রাণ লোক কখনই এত সঙ্কীর্ণ প্রয়োজনবাদী (utilitarian) হয়ে পড়তে পার্ত্তেন না। তাই আমার মনে হয় যে, কোনও একটি মাত্র আদর্শবাদ যে আমাদের prima facie কোনও বড় সত্যে পৌঁছে দেবেই দেবে, এ কথা জোর করে না বলাই বোধ হয় ভাল। এ পক্ষে মানুষের অভিজ্ঞতা, প্রত্যক্ষজ্ঞান ও যুক্তিবিচারও সঙ্গে সঙ্গে দরকার। তাই আমরা যখন আমাদের নিজেদের অপিচ ওদের অভিজ্ঞতা বিচার ও অনুভূতি দিয়ে প্রত্যহ দেখ্‌তে পাই যে আমাদের সঙ্গীতের ধারা প্রতীচ্যের হতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তখন মানুষের মনোরাজ্যে মিলনের মহ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েও এ সত্যকে অস্বীকার করায় লাভের চেয়ে বোধ হয় পরিণামে লোকসানই বেশি হবার সম্ভাবনা, যেহেতু সত্যের স্থান সবার উপরে। তবে আমার মনে হয় আমাদের সঙ্গীতের সঙ্গে রোলাঁ মহোদয়ের যথেষ্ট পরিচয় নেই বলেই তিনি এরূপ ভ্রমে পড়েছেন।

বন্দনা

শ্রীসরলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

তোমারি রূপের আসরে হে সখা
তোমারি আরতি তরে,
লক্ষ চন্দ্র তপন ঘুরিছে
সুনীল সিন্ধু পারে।
সাম গান কত উঠিছে ধ্বনিয়া
তুষার শিখর হোতে,
দিবস রজনী ঝঙ্কারে বীণা
তটিনীর ভরাস্রোতে।
বন পল্লব মুখরিত করি
সমীর তোমারে বন্দে,
সুবাসিত হয় আকাশ বাতাস
স্নিগ্ধ অগুরু গন্ধে।
তোমার চরণে প্রণমে তোমার
অযুত ভকত বৃন্দ,
তোমারি কাননে ফুটে ওঠে সাঁঝে
প্রণব সে অরবিন্দ।
মহাসাগরের অতলের তলে
রাজিছে তোমারি সৃষ্টি,
ভুবনে ভুবনে অসীম গগনে
জাগিছে তোমারি দৃষ্টি।

বিপর্য্যয়

শ্রীনরেশচন্দ্র গুপ্ত এম-এ, ডি-এল

(২৮)

বাড়ী ফিরিবার সময় মনোরমা খানিকক্ষণ সম্পূর্ণ নীরবে রহিল। আজ যেসব কথাবার্ত্তা কাণ্ড-কারখানা হইল, তাই ভাবিতে লাগিল। তার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে তার টকটকে লাল ঠোঁটের একটা কোণ দাঁতে চাপিয়া ধরিল, তাহার গালে একটা ছোট্ট টোল বসিয়া গেল।

তার মনে হইল যে, তার বউদিদি সম্প্রতি একদিন অনীতার কথায় বলিয়াছিলেন, "মেয়ের কি দেমাক্! টাকার গরমে মাটিতে পা ফেলতে চান না! আমাদের মনিষ্যির মধ্যে গণ্য করেন না।" তখন কথাটা মনোরমার গায়ে বড় বাজিয়াছিল; কিন্তু আজ তার বুক ঠেলিয়া কেবল এই কথাটাই উঠিতে লাগিল, "কি দেমাক!"

অবশেষে সে বলিয়াই বসিল, "কি দেমাক দেখ!"

ইন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিল, "তা' বুঝতে পেরেছ? আমি ভাবলাম, তুমি বুঝি একদম গলেই গিয়েছ—আর কাণ্ডজ্ঞান নেই।"

"এতদিন তো অন্ধ হ'য়েই ছিলুম,—কিন্তু এমন ক'রে চোখে আঙুল দিয়ে দেখালে, অতি-বড় অন্ধ যে, তারও চোখে পড়ে।"

"আমি তো বরাবরই ব'লেছি, যেখানে সাধুতার বড় বেশী আড়ম্বর, সেখানে দেমাক কোথাও না কোথাও লুকিয়ে আছেই।"

"তা' বটে! সেদিন বউদিদি ব'লছিল, আমার বড় রাগ হ'য়েছিল; কিন্তু আজ দেখছি, বউদিদিই বুঝেছিল ঠিক।"

"কি ব'লেছিল সে?"

"ব'লেছিল, অনীতা দেমাকে আমাদের একেবারে মানুষ ব'লে গ্রাহ্যই ক'রে না।"

ইন্দ্রনাথ আকাশ হইতে পড়িল। সে এতক্ষণ সাব্যস্ত করিয়াছিল যে, সুকুমার বাবুর কথা হইতেছে! কথার বিষয় যে অনীতা, তাহা বুঝিয়া সে ভয়ানক বিব্রত হইয়া গেল।

সে বলিল, "ওঃ, তুমি অনীতার কথা বলছো!"

ম। তবে তুমি কি ভেবেছ?

ই। আমি ভেবেছিলাম অন্য কথা। যাক, অনীতার দেমাক কোথায় দেখলি মনো!

"দেমাক নয়,—তোমাকে এমনি ক'রে cut করবার কি তার অধিকার আছে? তার বাপের কতকগুলো টাকা আছে, এই না তার অহঙ্কার। নইলে সে কি তোমার পা ধোয়াবার যোগ্য?"

ইন্দ্রনাথ ধীরভাবে বলিল, "ভুল বুঝিস না মনোরমা। ও দেমাক নয়। তোর দাদাকে অনীতা বুঝি তোর চেয়েও বড় ক'রে দেখে।" ইন্দ্রনাথের কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, সে আর কিছু বলিল না।

মনোরমাও বিস্মিত হইয়া নীরব রহিল। দেমাক নয়, তবে কি? অনীতা যে ইন্দ্রনাথের অন্ধ ভক্ত, এ কথা মনোরমারও জানা ছিল। তবে আজকার আচরণের মানে কি?

অনেকক্ষণ পর ইন্দ্রনাথ বলিল, "মনো, এর পর যেদিন যাবি একলা যাস,—তবেই দেখবি, ও ভিন্ন মানুষ!"

মনোরমার একবার মুখ ফুটিয়া বলিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, "তবে কি? দেমাক নয়, তবে কি? আমাকে খোলসা ক'রে বল। এ হেঁয়ালী আমি সহ্য ক'রতে পারছি না।" কিন্তু জলভরা বর্ষার মেঘের মত ইন্দ্রনাথের মুখখানা দেখিয়া, তার কোনও কথা বলিতে সাহস হইল না।

এদিকে মনোরমা চলিয়া যাইবার পর অনীতা ভাবিতে বসিল। মনোরমা যে এত সংক্ষিপ্ত ভাবে বিদায় লইয়া গেল, সেটা অনীতা লক্ষ্য করিল না। এখন সে মনোরমার সংসর্গের জন্য বড় ব্যস্ত ছিল না, এখন খানিকক্ষণ নির্জ্জনে থাকাই তার খুব বেশী দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই মনোরমা কোনও হাঙ্গামা না করিয়া, চুপ-চাপ চলিয়া যাওয়ায় সে মোটের উপর খুসীই হইল। মনোরমার কথা বা কাজের ভিতর রাগ বা অভিমানের সন্ধান করার তার অবসর ছিল না।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে স্থির করিল যে, এ বাড়ীতে তার আর স্থান নাই। মনোরমা যখন সুকুমার বাবুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে, তখন সে এ বাড়ীতে খুব ঘন-ঘনই আনাগোনা করিবে। কারণ, অনীতা ইতিমধ্যেই জানিতে পারিয়াছে যে, মনোরমার মত অন্ধ-বিশ্বাসী ভক্ত শিষ্য-শিষ্যাদের উপদেশ দিতে সুকুমার বাবুর অত্যন্ত বেশী আগ্রহ। তিনি প্রায় রোজ একবার তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা না কহিলে তৃপ্ত হন না। মনোরমা আসিলে যে সঙ্গে-সঙ্গে ইন্দ্রনাথও আসিবে, সে কথা সে ধরিয়া লইল। কেন না মনোরমা একলা পথ চলিতে জানে না, আর তার পুরুষ আত্মীয় কলিকাতায় খুব বেশী নাই। কাজেই অনীতা ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ আর এখানে থাকিতে পারে না। ইন্দ্রনাথের সঙ্গে তার আর দেখা হওয়া তার পক্ষেও ভাল নয়, ইন্দ্রনাথের পক্ষেও নয়। শুধু ইন্দ্রনাথের সঙ্গে নয়, মনোরমার সঙ্গে দেখা করাও একরকম পরোক্ষভাবে ইন্দ্রনাথেরই সঙ্গে দেখা করা; কাজেই এদের সমস্ত পরিবারকে বর্জ্জন করাই তার দরকার।

ভাবিতে তার বুক ভাঙ্গিয়া গেল। আজ আবার ইন্দ্রনাথকে সম্মুখে দেখিয়া ত্যাগের বেদনাটা সে সম্পূর্ণ নূতন করিয়া অনুভব করিতে লাগিল। কি যে সে ছাড়িয়া যাইতেছে, তাহা আরও তীব্র ভাবে অনুভব করিয়া, তাহার হৃদয় দমিয়া গেল। একবার সে ভাবিল, ছাড়িয়া তো সে যাইবেই, তবে আর একবার জন্মের শোধ তাহাকে দেখিয়া, জন্মের শোধ তাদের সঙ্গে কথা কহিয়া—একবার ভালো করিয়া বিদায় লইয়া যাইবে না? ভাবিতেই কল্পনার ছবি নানারঙে রঙিন করিয়া আঁকিল;—সে দেখিল, সে চোখের জলে ভাসিয়া ইন্দ্রনাথকে বলিতেছে সে তার কতখানি, কতখানি সে স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া যাইতেছে, সরযুর হাতে ধরিয়া ক্ষমা চাহিতেছে, তার সর্ব্বস্বকে ভালবাসিবার স্পর্দ্ধা করিয়াছে বলিয়া। ইন্দ্রনাথকে বলিতেছে সে কত ত্যাগ করিয়াছে, কত সহিয়াছে, কি করিয়াছে তার প্রেমের জন্য। কেমন করিয়া ভাইকে ছাড়িয়াছে, সব বিলাস, সব ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়াছে, কেমন করিয়া নিজেকে নির্য্যাতিত, অপমানিত করিয়াছে! তার মনে হইল, এ কথা শুনিলে ইন্দ্রনাথের অপমানের বেদনা কতকটা প্রশমিত হইবে।

কল্পনাকে সংযত করিয়া সে ভাবিল, না, তার মনকে আর বিশ্বাস করিবার কোনও উপায়ই নাই। এই অবিশ্বাসী চিত্ত লইয়া ইন্দ্রনাথের সঙ্গে আবার দেখা করিলে, সে কি যে করিয়া বসিবে, তার কোনও ঠিকানাই নাই। কাজেই সে দেখা করার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিল।

তার পর সে ভাবিল, কোথায় যাইবে, কি করিবে? অনেক আকাশ-পাতাল ভাবিল। স্থির করিল, কলিকাতা ছাড়িয়া যাইবে। কোনও দূরবর্ত্তী স্থানে মেয়েদের স্কুলে সঙ্গীত-শিক্ষয়িত্রী হইয়া জীবনের একটা অবলম্বন স্থির করিবে। এই ভাবিয়া সে ঠিক করিল, খবরের কাগজে সে বিজ্ঞাপন পাঠাইয়া দিবে।

কিন্তু সে চাকরী জোটা পরের কথা! এদিকে পরশু

দিন মনোরমা আসিবে। ইতিমধ্যে তার কোনও খানে না যাইলেই নয়। তার পার্ক ষ্ট্রীটের বাড়ীতে ভাড়াটিয়া আছে, তাদের উঠাইতেও সময় লাগিবে। কোনও হোটেলে যাইতে তাহার মন চাহিল না—সে একেবারেই ভিড়ের মধ্যে যাইতে নারাজ। অনেক ভাবিয়া সে স্থির করিল, তার মাসী শ্যামাসুন্দরী দেবীর কাছে যাইবে।

শ্যামাসুন্দরী তার আপনার মাসী নন, মায়ের জ্ঞাতি-সম্পর্কে ভগ্নী। কিন্তু তার মা থাকিতে শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে তাঁর খুব হৃদ্যতা ছিল, এবং মাঝে-মাঝে যাওয়া-আসা চলিত। তখন অনীতা দুই-চারবার তাঁহাদের বাড়ী গিয়াছে। মাসীর বাড়ী বাগবাজারে। প্রকাণ্ড অট্টালিকা, কিন্তু সম্প্রতি বেমেরামত। শ্যামাসুন্দরীর স্বামীর পিতামহ কোম্পানীর আমলে কি একটা বড় চাকরী কি বেনিয়ানী করিয়া খুব কিছু টাকা করেন। অর্থ-সঞ্চয়ের প্রণালীতে ধর্ম্মের সঙ্গে যে বিরোধ ছিল, তাহা আপোষে মিটাইবার জন্য ঘোষ-মহাশয় চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। তিনি যে বাড়ী করিয়াছিলেন, তার বেশীর ভাগটাই ঠাকুরদালান ও দেবালয়, সামান্য একটুখানি তাঁহার বাস-গৃহ। বাল-গোপাল ও এক বৃহদাকার লক্ষ্মীনারায়ণ এই দুই বিগ্রহ বৃন্দাবন হইতে মাথায় করিয়া আনিয়া তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ। তার পর তার আশে পাশে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেক ঠাকুর জুটিয়া গিয়াছিল। ঘোষ মহাশয়ের যথাসর্ব্বস্ব এই সব বিগ্রহের সেবা পূজার জন্য নিরত দেবোত্তর ছিল।

শ্যামাসুন্দরীর স্বামী খুব যে একজন ভক্ত ছিলেন তা' বলা যায় না। তিনি তপ্ত যৌবনে দু'একটা অনাচার না করিয়াছিলেন এমন নহে। যদিও পরিণত বয়সে তিনি এসব ছাড়িয়াছিলেন, তবু, তাঁর স্ত্রীর মতে এই পাপেরই শাস্তি স্বরূপ তাঁর পুত্র একটি বিধবা বালিকা বধূ রাখিয়া হঠাৎ মারা যায়, এবং তিনিও তাহার অল্পদিন পরেই প্রাণত্যাগ করেন। আজ দশ বৎসর বিধবা শ্যামাসুন্দরী তাঁহার বধূ লইয়া এই সংসারে একা—তিনি শান্ত চিত্তে একা তাঁর ঠাকুরের সেবা-পূজা করিয়া দিনযাপন করিতে-ছেন। তাঁর অবস্থা এখন খুব স্বচ্ছল বলা যায় না। দুই পুরুষে পৈতৃক সম্পত্তির অনেকটাই বিনষ্ট হইয়াছে। দেবোত্তর সম্পত্তিরও অনেক অংশই হস্তান্তরিত হইয়াছিল—খরিদ্দার দাঁও বুঝিয়া অল্পমূল্যে কিনিয়া লইয়াছিল। শ্যামা-সুন্দরীর স্বামী অনেকবার আপশোষ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পিতামহ ঠাকুর-দালানটা এত বড় করিয়া রাখিয়াছেন। এখানে অন্ততঃ দশটা বাড়ী করিয়া ভাড়া দেওয়া যাইত। কিন্তু ভাড়ার জন্য ঠাকুর-দালানে সাবল বসাইবার সাহস তাঁর কোনও দিন হয় নাই।

শ্যামাসুন্দরী তাঁর অল্প আয়েই গুছাইয়া সংসার করিতেন, ঠাকুরের সেবা পূজার কোনও দিন কোনও ত্রুটি হইত না। তাঁহাদের দুটি বিধবার আর কি-ই বা খরচ! ঠাকুরের প্রসাদ খাইতেন, আর অত্যন্ত সাদাসিদে থান পরিয়া অন্তঃপুরের ভিতর অনাড়ম্বরে জীবনযাপন করিতেন। কিন্তু ঠাকুরের প্রসাদে পাড়ার অনেক অনাথা, বিধবা, ও দরিদ্রের অন্ন-সংস্থান হইত। এদিকে ঝুলন, দোল, রাসযাত্রা প্রভৃতি কোনও উৎসবেই যথাবিহিত আড়ম্বরের ত্রুটি হইত না। সেরা-সেরা কীর্ত্তনওয়ালা ও কীর্ত্তনওয়ালী আসিয়া প্রত্যেক উৎসবে আসর জমাইত, যোগে-যাগে বিরাট মহোৎসব হইত। ইহা ছাড়া কাঙ্গালী—ভোজন প্রভৃতি অনুষ্ঠান তো লাগিয়াই ছিল।

পুত্রহীনা শ্যামাসুন্দরীর পুরুষ আত্মীয় কেহই ছিল না। বাড়ীতে থাকিবার মধ্যে ছিলেন পদ্মলোচন চক্রবর্ত্তী—সপরিবার। পদ্মলোচন পূজারী ব্রাহ্মণ; দুই পুরুষ লক্ষ্মী-নারায়ণ ও বালগোপালের সেবা করিয়া আসিতেছেন; এবং বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাতার বিধান অনুসারে ঠাকুরদালানের পাশের একটি স্বতন্ত্র অংশে পরিবার সহ আরামে বাস করিতেছেন। বলিতে গেলে, তাঁহার অবস্থা শ্যামাসুন্দরীর চেয়ে অনেকটা ভাল, কেন না, শ্যামাসুন্দরীর যথাসর্ব্বস্ব ঠাকুরের পূজায়ই ব্যয় হইত, এবং কাজে-কাজেই সে যথা-সর্ব্বস্বের অধিকাংশই চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কুক্ষিগত হইত। তা' ছাড়া, চক্রবর্ত্তী মহাশয় ছিলেন শ্যামাসুন্দরীর সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক। সম্পত্তির মধ্যে কয়খানা ভাড়াটিয়া বাড়ী; ভাড়া আদায় করা ও মেরামতাদির তত্ত্বাবধান করার ভার ন্যস্ত ছিল চক্রবর্ত্তীরই উপর। শ্যামাসুন্দরী বা বধূ সরমা এসব কিছু দেখিতেনও না, খবরও রাখিতেন না। কাজেই যদিও পদ্মলোচন নামে শ্যামাসুন্দরীরই আশ্রিত ছিলেন, তবু কার্য্যতঃ শ্যামাসুন্দরীই এই বৃদ্ধের আশ্রিতার মত থাকিতেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সুব্যবস্থায় শ্যামাসুন্দরীর

বৃহৎ অট্টালিকার চুণ সুরকী লুপ্ত হইয়া ইট ঝুর ঝুর করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল, কিন্তু পদ্মলোচনের লোহার সিন্দুক বোঝাই হইয়া চলিল, এবং তাঁহার পুত্র রামলোচনের কাটাকাপড়ের দোকান, অত্যন্ত বেবন্দোবস্ত সত্ত্বেও ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতে লাগিল।

অনীতা শ্যামাসুন্দরীর আশ্রয় লওয়া স্থির করিয়া, সেই দিনই সুকুমার বাবুর নিকট বিদায় লইয়া চলিল। সুকুমার বাবুর মৃদু আপত্তি সে ভাসাইয়া দিল; সে বলিল, ভগবানের ইচ্ছায় তাহার কোনও জিনিষের অভাব নাই, তার এই প্রকারে সুকুমার বাবুর গলগ্রহ হইয়া থাকাটা ভাল দেখায় না, ইত্যাদি। এ কথার উত্তরে সুকুমার বাবু বেশী কিছু বলিতে পারিলেন না।

(২৯)

অনীতা যখনই শ্যামাসুন্দরীর কাছে গিয়াছে, তখনই সে যথেষ্ট সমাদর পাইয়াছে। আজও শ্যামাসুন্দরী ও সরমা তাহাকে পরম সমাদরে সম্ভাষণ করিলেন। অনীতা যে তার মোটরে না আসিয়া একখানা ভাড়াগাড়ীতে আসিয়াছে, তাহাতে তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। তার পর গাড়ীর উপর বাক্স ও বিছানাগুলির তাৎপর্য্যও বুঝিতে পারিলেন না।

অনীতা হাসিয়া বলিল, "মাসিমা, আমি আপনার কাছে থাকতে এসেছি।"

মাসী বলিলেন, "তা' বেশ তো, বেশ তো, এস মা! এ তো তোমারই ঘর দোর।"

অনীতা কিন্তু দেখিতে পাইল যে, তাঁরা দুজনেই বেশ একটু বিব্রত বোধ করিতেছেন। তাঁদের ধর্ম্মের সংসারে এই খৃষ্টান মেয়েটাকে কোথায় কেমন করিয়া যে রাখিবেন, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া পাইলেন না। অনীতা হিন্দুর সংসারের কোনও খোঁজ-খবরই রাখে না,—কোথায় কি করিলে যে সব অশুচি হইয়া যাইতে পারে, তা জানেই না। সে আসে, দু'দণ্ড থাকিয়া দেখা করিয়া যায়, সে বেশ। কিন্তু দিন-রাত মেয়েটা এখানে থাকিবে, চারিদিকে ঘুরিয়া-ফিরিয়া কোথায় কোনটা ছুঁইয়া ফেলিবে, কি ঠাকুর-ঘরে পা' দিয়া ফেলিবে, তাই ভাবিয়া তাঁরা অস্থির হইলেন। অথচ এসব স্থলে অনীতাকে কোনও বাধা দিতে গেলে যে অনীতা সেটা অভদ্রতা বলিয়া ধরিয়া লইবে, সেটাও তাঁহারা অনুমান করিলেন; কাজেই বেশ একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

অনীতা তাঁদের সঙ্কোচ কাটাইয়া দিয়া বলিল, "মাসিমা, আমি আপনার সামনের এই কোণের ঘরটায় থাকবো,—কোনও ছোঁওয়াছানা হ'বে না, সেই বেশ।"

মাসী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। এই ঘরটাই বাড়ীর ভিতর সব চেয়ে ভাল ঘর নয়। অনীতার মত বড় লোককে এ ঘরে ঠাঁই দিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন; কিন্তু সে যখন যাচিয়া এ বন্দোবস্ত করিল, তখন তিনি একটু মৃদু আপত্তি করিয়া নিরস্ত হইলেন!

বৈকালে গা ধুইতে যাইবার আগে সরমা আসিয়া বলিল, "অনি ঠাকুরঝি, একটা গান গাও না শুনি।"

অনীতা গাহিল,

"সখি কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥"

সরমা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। অনীতার মধুর কণ্ঠে কৃষ্ণনাম গান শুনিয়া তার সমস্ত অন্তর স্নিগ্ধ হইয়া গেল! গানের শব্দ শুনিয়া শ্যামাসুন্দরীও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সরমা উৎফুল্ল মুখে বলিল, "ও মা, শোন শোন, ঠাকুরঝি কি সুন্দর কীর্ত্তন গাইছে শোন! ঠাকুরঝি আর একটা গাও।"

অনীতা গাহিল,

"সখি কেমনে বাঁধিব হিয়া
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমারি আঙ্গিনা দিয়া—"

দুই বিধবা কাঁদিয়া ভাসাইলেন। তাঁরা দেখিয়া অবাক হইলেন, অনীতার দুই চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে।

মাসী ও সরমা গা ধুইতে গেলেন। তাঁহারা কলতলায় গিয়া, গা ধুইয়া কাপড় কাচিয়া আসিলেন,—অনীতা চাহিয়া দেখিল। কলতলায় কোনও আবরণ ছিল না। অনীতাকেও গা হাত পা ধুইয়া কাপড় ছাড়িবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কোথায় ধুইবে ভাবিয়া পাইল না। বাড়ীতে বাথরুম জাতীয় কিছু কোথাও নাই। অথচ যে কাণ্ডটা সরমা ও শ্যামাসুন্দরী করিয়া উঠিল, তাহা ভাবিতেও তা'র গা শিহরিয়া উঠিল। একেবারে মুক্ত আকাশের তলে গাত্রাবরণ উন্মোচন সে কেমন করিয়া করিবে! তা ছাড়া,

সে ওখানে গেলে হয় তো কিছু একটা অশুচিও হইতে পারে।

অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে সরমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কোথায় গা হাত পা ধোব বউদি!"

সরমা বলিল, "ধোও গে না কলতলায়। ওখানে গেলে কিছু হ'বে না।" যেন তাদের শুচিতাই এস্থলে একমাত্র বিবেচ্য! অনীতার পক্ষ হইতে যে কলতলায় গা ধুইতে কোনও আপত্তি থাকিতে পারে, তাহা তাহার খেয়ালই হইল না। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া অনীতা তার সাবান ও তোয়ালে লইয়া গিয়া কলতলায় মুখ হাত ধুইয়া ঘরে আসিয়া কাপড় চোপড় ছাড়িল। আতঙ্কের সহিত সে ভাবিতে লাগিল, কাল দিনের কথা, যখন তাকে ঐ কলতলায় গিয়াই স্নান করিতে হইবে।

কাপড় চোপড় ছাড়িয়া সে এদিক সেদিক ঘুরিতে ঘুরিতে বারান্দা দিয়া গিয়া হঠাৎ ঠাকুরদালানের দিকে গিয়া পড়িল। পদ্মলোচন চক্রবর্ত্তী সেখানে দাওয়ায় হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। অনীতাকে দেখিয়া "হাঁ, হাঁ" করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "আহা হা! ওদিকে যেও না, ওখানে ঠাকুরঘর।"

অনীতা সঙ্কুচিত হইয়া জুতাটা খুলিয়া ফেলিয়া অগ্রসর হইল। পদ্মলোচন চীৎকার করিয়া বলিল, "এ কি, কোথায় যাও, তুমি গেলে সব নষ্ট হ'য়ে যাবে; যেও না।"

অপমানে অনীতার চুলের গোড়া পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল! সে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল—তার কান্না পাইতে লাগিল।

পিছু পিছু সরমা আসিয়া উপস্থিত হইল। পদ্মলোচন যে কাণ্ডটা করিয়া বসিয়াছে, সরমা তাহা টের পাইল ব্যাপারটা হইয়া গেলে। সে ঠাকুরের বৈকালী ও আরতির জোগাড় দিতেছিল। এমন সময় পদ্মলোচনের চীৎকার শুনিতে পাইল। সে তখনি উঠিল না, ভাবিল, বুঝি বা কোনও অশুচি ভিখারী ঠাকুর-ঘরের দিকে আসিতেছে। হাতের কাজটা সারিয়া যখন সে বাহিরে আসিল, তখন অনীতা পিছু ফিরিয়া গস গস করিয়া চলিয়া যাইতেছে। সে তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া ছুটিল। ঘোমটাটা একটু টানিয়া ধরিয়া, সে পদ্মলোচনকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া গেল, "কাকে কি বলেন, তার আর ঠিকানা নেই!" সরমা গিয়া অনেক বলিয়া কহিয়া অনীতার আহত হৃদয়কে শান্ত করিল। সে নিজে অনীতাকে লইয়া ঠাকুরদালানে বসিয়া আরতি দেখাইল। সেদিন আর সে ঠাকুরঘরে গেল না। অনীতা লক্ষ্য করিল যে, অনেক রাত্রে সরমা স্নান করিয়া নিঃশব্দে তার নিজের ঘরে ঢুকিল।

সেইদিনের শিক্ষায় অনীতা নিজেকে সামলাইয়া লইল। আর তার এমন ভুলও হয় নাই, অপমানের হেতুও হয় নাই। তার পর তার দিনগুলি একরকম সুখেই কাটিতে লাগিল। শ্যামাসুন্দরী ও সরমা সমস্ত দিনই কেবল ঠাকুরের সেবায় লাগিয়া থাকিতেন, অনীতার কেবল তফাৎ হইতে তাঁহাদের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। অবসর সময়ে তাঁরা অনীতার কাছে আসিয়া গল্প করিতেন, আর অনীতার মুখে পদাবলী শুনিয়া চরিতার্থ হইতেন। বলা বাহুল্য, তাঁরা গোড়া হইতেই অনীতার কাছে তার হঠাৎ এখানে আসার কারণ জানিতে চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু অনীতা তাঁহাদিগকে খুব কৌশলে এড়াইয়া গিয়াছিল।

এই দুইটি নারীর দৈনিক জীবন আলোচনা করিয়া, অনীতা একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল যে, ভোরবেলা হইতে দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহাদের কার্য্যের শেষ নাই, অথচ, নিজের জন্য তাঁরা একটা কাজও করেন না। সবই তাঁদের গোপালের জন্য, লক্ষ্মীনারায়ণের জন্য! সে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিল যে, তাঁরা দিনের পর দিন এমন কোনও একটি কাজও করেন না—যাহার এ লক্ষ্য এই বিগ্রহ দুটি নয়।

নূতন মা যেমন তার শিশুটিকে লইয়া একেবারে তন্ময় হইয়া থাকে,—খাইতে, শুইতে, উঠিতে, বসিতে এই সন্তান ভিন্ন ভাবনার বিষয় থাকে না, শ্যামাসুন্দরী ও সরমারও ঠিক তেমনি ভাব ছিল এই বিগ্রহের প্রতি। ভাল খাইবার জিনিষটি দেখিলে তাঁহাদের মন চঞ্চল হইয়া উঠিত গোপাল ও লক্ষ্মীনারায়ণের জন্য সেটা সংগ্রহ করিতে। ভাল একখানা কাপড় দেখিলে তাহা কিনিয়া ফেলিতেন, গোপাল কি লক্ষ্মীনারায়ণের জন্য। অনীতার কাপড় চোপড় ও গহনার উপর তাঁরা লব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন। প্রত্যেকটির দাম জিজ্ঞাসা করিতেন, এবং দাম শুনিয়া,

প্রায়ই একটা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বসিয়া থাকিতেন। একদিন অনীতার একটা crepe de chineএর সাড়ী দেখিয়া সরমার ভারী লোভ হইল। দাম শুনিয়া সে হাঁ করিয়া ফেলিল—ও বাবা! কিন্তু তার পরই দেখা গেল, সে চক্রবর্ত্তীর কাছে খোসামুদী সুরু করিয়াছে—সত্বর টাকা তাহাকে না দিলেই হইবে না। এবার তার পূজার হাত-খরচা হইতে যেন চক্রবর্ত্তী টাকাটা কাটিয়া নেন! চক্রবর্ত্তী অনেক মুখ-ঝামটা দিয়া শেষ টাকা কয়টা বাহির করিয়া দিল। সরমা ছুটিয়া আসিয়া অনীতাকে বলিল, "হাঁ ভাই ঠাকুরঝি, এ সাড়ী কোথায় পাওয়া যায়? আমাকে একখানা আনিয়ে দিতে পার?" অনীতা সম্মত হইল। সরমা তার হাতে টাকাগুলি গুঁজিয়া দিল। সে দোকানে চিঠি লিখিয়া দিল, পরের দিন সাড়ী আসিয়া হাজির।

সরমার আনন্দ দেখে কে? সে সাড়ীখানা লইয়া ছুটিয়া চক্রবর্ত্তীর কাছে গেল। ঠাকুর বাড়ী ছিলেন না। সে তার ছোট ছেলেকে ধরিয়া আনিয়া সাড়ীখানা রাধিকার মূর্ত্তিকে পরাইল, আর আনন্দ-বিহ্বল দৃষ্টিতে তা'র দিকে চাহিয়া রহিল। অনীতা নাটমন্দিরে দাঁড়াইয়া এই খাও দেখিতেছিল। সরমা ছুটিয়া আসিয়া তার কাছে বলিল, "হাঁ ভাই, সুন্দর মানিয়েছে না? রাধিকাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে না? নারায়ণের মুখখানা যেন হাসি-হাসি হ'য়ে উঠেছে! হবে না?"

এক মাস আগে হইলে অনীতা এই ভাবকে একটা ভয়ানক ছেলে-মানুষী বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিত। আজ তার সরমার প্রতি ইহার জন্য শ্রদ্ধা হইল। ঘরে ফিরিয়া তাহার একটা খেয়াল হইল। তার গলার একটা হীরার নেকলেস্ দেখিয়াও একদিন সরমার এমনি লোভ হইয়াছিল—কিন্তু পাঁচশ টাকা দাম শুনিয়া সে অমনি চুপ করিয়া গিয়াছিল। সে দিন দুই পরে সরমাকে ঘরের ভিতর ডাকিয়া লইয়া বলিল, "আমি ভাই তোমার রাধিকাকে একটা জিনিষ দিতে চাই, তিনি নেবেন কি? এই সাড়ীর সঙ্গে চমৎকার মানাবে!"

উৎফুল্ল হৃদয়ে সরমা জিজ্ঞাসা করিল, "কি?" অনীতা একটা নূতন নেকলেস্ বাহির করিয়া বলিল, "এইটা। আমি আজ এটা দোকান থেকে আনিয়েছি দেখ বলে।"

আনন্দে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সরমা এই সুন্দর অলঙ্কারের দিকে চাহিয়া রহিল—তার অতিদূর দুরাশার এই অপূর্ব্ব সফলতায় সে নাচিয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তে বলিল, "এর দাম যে অনেক ঠাকুরঝি!"

"তা'তে কি? আমি কি এ দিতে পারি না? আর আমার কেই বা আছে?" বলিতে অনীতার গলাটা কাঁপিয়া উঠিল।

সরমা আনন্দে অধীরা হইল। তাহার এই গহনা লইবার জন্য প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। কিন্তু আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল, "তা ভাই, মাকে না ব'লে নিতে পারবো না।"

শ্যামাসুন্দরী কোনও আপত্তি করিলেন না। লক্ষ্মী-নারায়ণের গলায় হীরা-মুক্তার শোভা দেখিয়া সরমা ও শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে-সঙ্গে অনীতাও যেন মুগ্ধ হইয়া পড়িল।

সরমা অনীতাকে চুপি-চুপি বলিল, "নারায়ণ তোর ওপর ভারী খুসী হইয়াছেন, জানিস্। তোকে এত আদর করবেন তিনি, যে দেখিস্।"

অনীতাও তো তাই চায়! পাইবে কি সে সেই বিশ্বাস, সেই প্রীতি—যাতে নারায়ণকে সে তার রসিক নাগর রূপে পাইবে!

সে একদিন বলিল, "ভাই, কি হ'লে তোমাদের মত হওয়া যায়? আমি ঠিক কি রকম ক'রলে তোমাদের মত ঠাকুর-পূজা করতে পারব, ব'লতে পার? তোমরা আমায় তাই করিয়া দাও।" সরমা আনন্দিত হইয়া শ্যামাসুন্দরীকে বলিল। শ্যামাসুন্দরী ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "খৃষ্টান মেয়ে, জাত ফাত নেই, কেমন করে হ'বে?" শেষে বলিলেন "আচ্ছা গোসাঁই এলে জিজ্ঞাসা করবো।"

ইহার কিছুদিন পর ঝুলন-পূর্ণিমায় সে বাড়ীতে মহোৎসব হইল। দেশদেশান্তর হইতে বৈরাগীর দল আসিয়া মহাসমারোহপূর্ব্বক ভোজন করিলেন। শ্যামা-সুন্দরী গলবস্ত্র হইয়া অধিকারীদিগের কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সরমা, আড়াল হইতে যোগাড় দিতে লাগিলেন। যখন সমস্ত উঠান ভরিয়া বৈরাগীর দল খাইতে বসিয়া গেল, তখন সরমা জানালা হইতে উঁকি মারিয়া দেখিল—তার মুখ যেন আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। অনীতা নিজের অজ্ঞাতসারে বেশ মুগ্ধ হইয়া উঠিল। সন্ধ্যাবেলা এক সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তনওয়ালীর গান।

কীর্ত্তনওয়ালী গায় চমৎকার—যেমন সুকণ্ঠ, তেমনি প্রকৃত সঙ্গীতরসজ্ঞ। অনীতা তন্ময় হইয়া তার মুখে কৃষ্ণের প্রেম-লীলা শুনিতে লাগিল—তার যেন ভাব লাগিয়া গেল। সে প্রায় সমস্ত রাত্রি বসিয়া কীর্ত্তন শুনিল, মুগ্ধ হইয়া শুনিল।

গান শেষ হইলে অনীতা কীর্ত্তনওয়ালীকে ডাকিয়া বলিল, "ধন্যি গান শিখেছ বাছা! কার কাছে তুমি শিখেছ, ভাই!"

গায়িকা বলিল, "আমার ওস্তাদ স্বয়ং রাধাগোবিন্দ গোস্বামী" বলিয়া তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিল।

অনীতা শুনিল গোস্বামী প্রসিদ্ধ গায়ক এবং পদকর্ত্তা। তিনি মহাধার্ম্মিক পুরুষ, নবদ্বীপে বাস করেন।

সে চক্রবর্ত্তীকে ধরিয়া বসিল, রাধাগোবিন্দ গোস্বামীর কাছে সে কীর্ত্তন শিখিবে। চক্রবর্ত্তী উৎসাহের সহিত সম্মত হইল। পরের সপ্তাহে রাধাগোবিন্দ গোস্বামী আসিয়া লক্ষ্মীনারায়ণকে তাঁহার কীর্ত্তন শুনাইয়া গেলেন।

অনীতার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তিনি তাহাকে শিক্ষা দিতে স্বীকৃত হইলেন। (ক্রমশঃ)

স্বপ্ন

ডাক্তার শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু ডি-এস্‌সি, এম-বি

(৬)

স্বপ্নে প্রত্যাদেশ

প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়, স্বপ্নে অমুকের অমুক কাজ করিবার প্রত্যাদেশ হইয়াছে। এই প্রত্যাদেশ সাধারণতঃ কোন দেবতা বা কোন মৃতব্যক্তির আত্মার নিকট হইতে আসিয়া থাকে। কখন বা কেবল 'অমুক কাজ কর'—এইরূপ আদেশই পাওয়া যায়;—কে আদেশ করিতেছে, স্বপ্নে তাহার কোন ইঙ্গিতই থাকে না। দেবতা বা মৃতব্যক্তির আত্মার পক্ষে স্বপ্নে কোন কিছু আদেশ করা সম্ভবপর কি না তাহার আলোচনা করিব না। দেবতার আবির্ভাব না মানিয়াও যে প্রত্যাদেশের স্বপ্ন ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, এবার তাহাই বলিব। আমি এমন কোন প্রত্যাদেশের স্বপ্নের কথা জানি না, যাহাতে দেবতার আবির্ভাব অবিসংবাদীরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে। কেহ কেহ হয় ত জীবনে একবার মাত্র প্রত্যাদেশের স্বপ্ন দেখিয়াছেন। কেহ বা আবার প্রায়ই দেখিয়া থাকেন; এই শেষোক্ত শ্রেণীর স্বপ্নদ্রষ্টার সংখ্যাই অপেক্ষাকৃত অধিক। আমরা কেবল যে স্বপ্নেই দেবতার প্রত্যাদেশ পাই, তাহা নহে। আমি এমন লোকও জানি যিনি জাগ্রত অবস্থাতেও নানারূপ প্রত্যাদেশ পাইয়া থাকেন। কেহ কেহ ঠিক প্রত্যাদেশ না পাইলেও বলিয়া থাকেন যে, কে যেন প্রায়ই তাঁহাদের কানে কানে কথা বলিয়া যায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক ভদ্রসন্তান চিকিৎসার জন্য আমার নিকট আসেন। বাড়ী-বাড়ী সৌখীন কাপড়-চোপড় ফিরি করিয়া বেচাই তাঁহার পেশা। তিনি আমাকে জানাইলেন যে, ব্যবসা চালান তাঁহার দায় হইয়া উঠিয়াছে। যখনই তিনি খরিদ্দারকে কাপড়ের দাম বলিতে যান, তখনই কে যেন কাপড়ের কেনা-দাম বলিয়া দিতেছে, শুনিতে পান; কাজেই ব্যবসায়ে লাভ করা তাঁহার পক্ষে এক রকম অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

লোকটি বুদ্ধিমান্। ব্যাপারটা যে কাল্পনিক তাহা তিনি নিজেও বুঝেন; কিন্তু যখন এরূপ হয়, তখন বাস্তব ঘটনা বলিয়াই তাঁহার মনে হয়। এই ব্যক্তির কানে কানে কথা শোনা এবং জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় প্রত্যাদেশ শোনার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। উপরিউক্ত রোগীকে অনেক প্রশ্নের পর জানা গেল, তিনি 'কোকেন-খোর'। দীর্ঘকাল চিকিৎসার পর, তাঁহার কু-অভ্যাসও দূর হইয়াছিল—রোগের হাত হইতেও তিনি অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। কিন্তু সকল সময়েই এরূপ প্রত্যাদেশ শুনিবার মূলে যে কোকেন বা গাঁজার নেশা বর্ত্তমান,

তাহা নহে। এক ধরণের পাগল আছে, যাহারা কি জাগ্রত, কি স্বপ্নাবস্থায় প্রায়ই এইরূপ 'কানে কানে কথা' বা প্রত্যাদেশ শুনিয়া থাকে। এই শ্রেণীর পাগলের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। একবার এক পাগল আসিয়া আমাকে জানাইল যে, মা কালী তাহাকে দুনিয়ার পাপীদের খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিতে ক্রমাগত উত্তেজিত করিতেছেন। কিন্তু কে পাপী, আর কে পুণ্যাত্মা, এই লইয়া সে বিষম গোলে পড়িয়াছে। আর একজন পাগলকে জানি; তাহার অন্য কোন পাগলামী না থাকিলেও সে কেবলই শুনিতে পাইত, কে যেন তাহাকে অবিরত অশ্লীল কথা বলিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছে। সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থা ও পাগলামীর মধ্যে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা-রেখা টানা যায় না। এজন্য কোন ব্যক্তির অন্য সব আচরণ স্বাভাবিক বোধ হইলেও কোন একটা বিষয়ে তাহার মনোবিকার থাকিতে পারে; আর সেই কারণে তাহার পক্ষে নানা অমূলক ভ্রান্তি, অধ্যাস বা বিভ্রম (hallucination, illusion বা delusion) হওয়া বিচিত্র নহে। জনসাধারণ এই সব লোককে রোগগ্রস্ত বলিয়া মনে করেন না।

মনোবিকার অনেক সময়ে বংশগত। এজন্য সন্ধান করিলে অনেক সময় পাগলের আত্মীয়-স্বজন বা পূর্ব্বপুরুষের মধ্যে নানারূপ মানসিক ব্যাধির পরিচয় পাওয়া যায়। স্বপ্নাদিষ্ট ব্যক্তির বংশ পরিচয় আলোচনা করিয়া, যদি কোন মানসিক ব্যাধির সন্ধান পাওয়া যায়, তবে স্বপ্নদ্রষ্টার পক্ষেও যে মানসিক বিকারগ্রস্ত হওয়া সম্ভব, এ কথা ভুলিলে চলিবে না। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যাদেশ দেবতা-মুখনিঃসৃত না হইতে পারে। মনের অনেক অবরুদ্ধ ইচ্ছা কার্য্যকরী হইবার জন্য মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে; আর এরূপ ইচ্ছা প্রত্যাদেশ-রূপে স্বপ্নে প্রকাশ পাওয়া সম্ভব। পাঠক হয় ত আপত্তি তুলিবেন যে, অসামাজিক ইচ্ছাগুলিই ত কেবল অবরুদ্ধ থাকে। কিন্তু আমরা যে-সব প্রত্যাদেশ পাই—তাহা যে সৎকার্য্যমূলক। এখানে মনে রাখিতে হইবে, প্রত্যাদেশে যে কেবল সৎকর্ম্মেরই ইঙ্গিত থাকিবে, এমন কোন কথা নাই। আগেই এক রোগীর কথা বলিয়াছি, সে কেবল অশ্লীল কথা বলিবারই প্রত্যাদেশ পাইত। Compulsion psychoneurosis নামে এক রকম মানসিক ব্যাধি আছে। এই রোগে আক্রান্ত হইলে রোগীর মনে কোন একটা বিশেষ কাজ করিবার দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা জাগিয়া ওঠে। এইরূপ ইচ্ছা দমন করিবার জন্য রোগী অনেক চেষ্টা করে সত্য, কিন্তু সকল সময়ে কৃতকার্য্য হয় না। হয় ত মনে উঠিল, রাস্তা চলিবার সময় প্রত্যেক গ্যাস-পোষ্ট ছুঁইয়া চলিতে হইবে। কাহারও বা খেয়াল হইল, ১০৮ না গুণিয়া পথে বাহির হইলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। রোগীর কোথাও যাইবার তাগিদ থাকিলেও ১০৮ না গুণা পর্য্যন্ত তাহার বাহির হইবার যো নাই। হাজার চেষ্টা করিয়াও এইরূপ কার্য্য হইতে রোগীরা নিজেকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে না। যে-সব ক্ষেত্রে কার্য্যগত ইচ্ছাটি অসামাজিক, সেইখানেই এরূপ চেষ্টা অধিক। যে রোগীর মনে ক্রমাগত অশ্লীল কথা উঠিবার চেষ্টা করে, তাহাকে দিবানিশি ঠাকুর দেবতার নাম স্মরণ করিয়া সেই অশ্লীল ভাব চাপা দিতে হয়। এই ধরণের রোগীর পক্ষে স্বপ্নে হরিনাম সংকীর্ত্তনের প্রত্যাদেশ পাওয়া বিচিত্র নহে। কখন কখন আবার আমাদের অনেক অবৈধ ও উৎকট ইচ্ছা ধর্ম্মানুষ্ঠানের আবরণে চরিতার্থতা লাভ করে। অনেক মনোবিজ্ঞানবিদের মতে, ধর্ম্মানুষ্ঠানের মূলে বীভৎস ইচ্ছা বর্ত্তমান। ভারতের অনেক পুণ্যতীর্থে মন্দির-গাত্রে অশ্লীল মূর্ত্তিসমূহ খোদিত আছে। শাস্ত্রকারেরাও মন্দিরগাত্রে অশ্লীল মূর্ত্তি নির্ম্মাণের উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু এরূপ করিবার উদ্দেশ্য বা সার্থকতা সম্বন্ধে কোনই সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। নানারূপ অসদ্‌প্রবৃত্তির নিরোধ (repression) হইতেই যে ধর্ম্মানুষ্ঠানের উৎপত্তি—এ কথা মানিয়া লইলে মন্দির-গাত্রে কেন যে অশ্লীল মূর্ত্তি থাকে, তাহা বুঝা সহজ হইয়া পড়ে। শত্রুবিজয়ের স্মৃতিস্তম্ভে যেমন শত্রু ও বিজেতা উভয়েরই মূর্ত্তি খোদিত দেখা যায়, সেইরূপ ধর্ম্মের মূলগত অসৎপ্রবৃত্তির প্রতীক এবং দেবতা—উভয়ই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেবতার —যেমন মহাদেবের—মূর্ত্তিই লিঙ্গমূর্ত্তি। ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিষয় ভবিষ্যতে বিশদ্‌ভাবে আলোচিত হইবে।

পাঠক দেখিলেন, মনের মধ্যে অসৎপ্রবৃত্তি থাকিলে, তাহার ফলে কেবল যে অসৎ কার্য্যেরই প্রত্যাদেশ হয়,

তাহা নহে,—ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রত্যাদেশ পাওয়াও সম্ভব। অসৎকার্য্যমূলক প্রত্যাদেশের কথা সচরাচর আমাদের কানে আসে না। তাই জনসাধারণের ধারণা, প্রত্যাদেশ বুঝি কেবলই সৎকার্য্যমূলক হয়।

স্বপ্নে বস্তুলাভ

কেহ কেহ বলেন, তাঁহারা অনেক সময় স্বপ্নঘোরে দ্রব্যাদি পাইয়াছেন। স্বপ্নে দেখা গেল, 'অমুক স্থানে অমুক জিনিষ আছে।' ঘুম ভাঙ্গিবার পর স্বপ্নদ্রষ্টা সত্যসত্যই সেখানে গিয়া স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু দেখিতে পাইলেন। রোগী দেবতার স্থানে 'হত্যা' দিল; স্বপ্ন দেখিল, দেবতা তাহার হস্তে ঔষধ দিলেন। নিদ্রাভঙ্গে রোগী দেখিল, তাহার হাতের মুঠায় শিকড় রহিয়াছে। স্বপ্নাদ্য মাদুলীতে অনেকেই আস্থাবান্। যাঁহারা বিনামূল্যে বা মূল্যের বিনিময়ে স্বপ্নাদ্য মাদুলী বিতরণ করেন, তাঁহাদের মাদুলীগুলি সবই যে স্বপ্নে পাওয়া, তাহা নহে। মাদুলীর মধ্যস্থিত ঔষধাদির নাম স্বপ্নে পাইয়া পরে 'স্বপ্নাদ্য মাদুলী' প্রস্তুত হয়। স্বপ্নে ঔষধের নাম পাওয়া কিছু বিচিত্র ব্যাপার নহে। সুতরাং 'স্বপ্নাদ্য মাদুলী' সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা অনাবশ্যক। স্বপ্নাদ্য মাদুলীতে রোগ সারে—এ কথা আমিও মানি। অনেক পেটেণ্ট ঔষধের ব্যবসাদার হয় ত স্বীকার করিবেন, কেবল মাত্র জলে অল্প নুন দিয়া তাহা 'সর্ব্বব্যাধিহর অব্যর্থ ঔষধ'রূপে প্রচার করিয়া তাঁহারা প্রচুর অর্থোপার্জ্জন ত করিয়াছেনই —পরন্তু বহু গণ্যমান্য লোকের নিকট হইতে রোগ-আরোগ্যের ভাল ভাল প্রশংসাপত্রও পাইয়াছেন। সাধারণের ধারণা, দৈবের ফলে রোগের উৎপত্তি—ঔষধ সেবনে তাহা সারে। কাজেই রোগ আপনা হইতে সারিয়া গেলেও ঔষধের সুখ্যাতি। কোন ঔষধে যথেষ্ট আস্থা থাকিলে কেবলমাত্র বিশ্বাসের জোরেই রোগ নিরাময় হওয়া সম্ভব,—এ কথা সকলেই জানেন। কাজেই রোগ সারিবার মূলে যে স্বপ্নাদ্য ঔষধের কার্য্যকারিতা মানিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। অনুসন্ধান করিলে পাঠক জানিতে পারিবেন, কত ক্ষেত্রে স্বপ্নাদ্য ঔষধে কোনই ফল পাওয়া যায় নাই। গল্প করিবার সময় আমরা এই সকল ঘটনা ভুলিয়া যাই। আমি এমন ঘটনাও জানি যে ৮তারকনাথের ঔষধ পাইয়া, যথারীতি নিয়ম পালন করা সত্ত্বেও কোনও ফলোদয় হয় নাই। স্বপ্নাদ্য ঔষধ ব্যবহারে আরোগ্যলাভ বিশেষ আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার না হইলেও, বাস্তবিকই যদি স্বপ্নে ঔষধ হস্তগত হইতে দেখা যায়, তবে তাহাকে অতিপ্রাকৃত ঘটনা বলিয়া মানিতে হইবে। পাঠক মনে রাখিবেন, দেবতা লইয়াও ব্যবসা চলে। দেবস্থানের মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে অনেক সময় মোহান্ত বা দেবতার অধিকারী ছলকলার আশ্রয় গ্রহণ করেন। চিন্তাপীড়িত উপবাসক্লিষ্ট শ্রান্তক্লান্ত নিদ্রিত রোগীর হস্তে ঔষধ গুঁজিয়া দিয়া কৃত্রিম স্বপ্নাদেশ দেখান একেবারে অসম্ভব নহে। অত্যন্ত নিদ্রাতুর ক্লান্ত ব্যক্তির কর্ণে কোন কথা বলিয়া তাহার হস্তে ঔষধ গুঁজিয়া দিলে নিদ্রাভঙ্গে তাহার মনে হইবে, স্বপ্নে সে প্রত্যাদেশ শুনিয়াছে। বিশেষতঃ লোকটি যদি প্রত্যাদেশ আশা করিয়া থাকে, তবে এরূপ ভ্রমের সম্ভাবনাই অধিক। জাগ্রত অবস্থায় হস্তে ঔষধ দেখিলে তাহার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইবে। নিদ্রাকালে যে আমরা অন্যের কথা শুনিতে পারি, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। পাঠক মনে রাখিবেন, সকল ক্ষেত্রেই যে এইরূপ ঔষধ পাওয়ার মূলে চাতুরী বিদ্যমান,—আমি এমন কথা বলিতেছি না।

চাতুরীর কথা ছাড়িয়া দিলেও স্বপ্নে কোন বস্তু বা তাহার সন্ধান পাওয়া যে সম্ভব, এবার তাহাই বলিব।

আমি একবার 'হিষ্টিরিয়া' রোগের চিকিৎসার জন্য আহূত হই। স্ত্রীলোকটি প্রায় দশ বৎসর ধরিয়া রোগ ভোগ করিতেছিলেন। তাঁহার প্রায়ই ফিট হইত; আর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকিতেন। একটি মাদুলী ধারণ করায় তাঁহার রোগ সারিয়া যায়। তিনি প্রায় তিন বৎসরকাল ভালই ছিলেন। হঠাৎ মাদুলীটি হারাইয়া যায়; সঙ্গে-সঙ্গে রোগও পুনরায় দেখা দেয়। এইভাবে কিছুদিন ভুগিবার পর আমার উপর চিকিৎসার ভার পড়ে। কিছুদিন চিকিৎসার পর রোগিনী স্বপ্ন দেখিলেন, ভাঁড়ার-ঘরে একটী পুরাণ হাঁড়ির মধ্যে তাঁহার হারাণ মাদুলী পড়িয়া আছে। পরদিন সকাল-বেলা সেই হাঁড়ি হইতে সত্যসত্যই মাদুলীটি পাওয়া গেল, আর তাহা ধারণ করায় রোগ পুনরায় সারিল। আমি রোগিনীর স্বামীকে বলিলাম, রোগ সারে নাই—কিছুদিনের জন্য চাপা আছে মাত্র। অতএব চিকিৎসা চালান আবশ্যক। চিকিৎসা চলিতে লাগিল। কিছুদিন পরে পুনরায় ফিটের আক্রমণের

পূর্ব্ব লক্ষণ দেখিতে পাইলাম। আমি রোগিনীর স্বামীকে বলিলাম, পুনরায় মাদুলী হারাইবার সম্ভাবনা আছে; কারণ মাদুলীতে বিশ্বাসের ফলে মাদুলী-ধারণের অবস্থায় ফিট হইবে না, অথচ বুঝা যাইতেছে, ফিট হইবেই। অগত্যা মাদুলীতে বিশ্বাস বজায় রাখিতে হইলে মাদুলী হারাণ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। আমার কথা ফলিল। কিছুদিন পরে আবার মাদুলী হারাইল—সঙ্গে সঙ্গে রোগও দেখা দিল। রোগিনী যে ইচ্ছা করিয়া মাদুলী হারাইয়াছে, তাহা নহে; তাঁহাকে এক অজ্ঞাত ইচ্ছাই অসাবধান করিয়া মাদুলী হারাইবার সুযোগ দিয়াছে। এরূপস্থলে হারাণ মাদুলী কোথায় আছে, রোগিনীর অজ্ঞাত মন তাহা জানে। আমি বিশেষ উপায়-অবলম্বনে রোগিনীর স্মৃতি উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলাম; তাঁহাকে বলিলাম, হারাণ মাদুলী কোথায় আছে, পুনরায় স্বপ্নে জানিতে পারিবে। ফলেও তাহাই হইল। মাদুলী আবার পাওয়া গেল। স্বপ্নে হারাণ বস্তুর উদ্ধার বা নূতন দ্রব্যের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব নহে। কেহ অন্যমনস্কভাবে দেখিলেন একস্থানে কোন দেবমূর্ত্তি পড়িয়া আছে। ঘটনাটি তাঁহার মন হইতে লোপ পাইল। কিছুদিন পরে স্বপ্ন দেখিয়া সেই দেবমূর্ত্তির উদ্ধার সম্ভব। নিদ্রার ঘোরে চলিয়া বেড়ান বা কাজকর্ম্ম করা বিচিত্র নহে। ইহাকে 'নিশিতে' পাওয়া বা স্বপ্ন-বিচরণ (somnambulism) বলে। নিদ্রার ঘোরে যাহা কিছু করা যায়, ঘুম ভাঙ্গিবার পর তাহার কোন কিছুই মনে না পড়িতে পারে। কোন দ্রব্য নিদ্রাবস্থায় আনিয়া বা কোথাও রাখিয়া, সেইদিন বা অপর কোন দিন তাহা স্বপ্নে দেখা অসম্ভব নহে। স্বপ্নে ঔষধ পাওয়ার মূলে অনেক সময় এইরূপ স্বপ্ন-বিচরণ সম্ভব।

স্বপ্নে অতিপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছি, কিন্তু এ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য নির্ণয় করা বহু অনুসন্ধান-সাপেক্ষ, আর তাহা একজনের চেষ্টায় হইবার নহে। মোটের উপর বলিতে পারি, স্বপ্নে অতিপ্রাকৃত-ব্যাপারের অস্তিত্ব একেবারে অসম্ভব না হইলেও আজ পর্য্যন্ত তাহা নিঃসংশয়ে সপ্রমাণ হয় নাই।

(সমাপ্ত)

বিজিতা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(২৩)

নৃপেন্দ্র যেদিন সামান্য একটা ছল ধরিয়া আত্মীয়-আত্মীয়াগণকে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতে বলিল, সেদিন তাঁহাদের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল।

নৃপেন্দ্রের মাসী বলিলেন, "এখন তুমি আমাদের তাড়ালে বাছা, আমরা যাব কোথা বল দিকিনি।"

গম্ভীর মুখে নৃপেন বলিল, "তার আর আমি কি জানি? আমি স্পষ্ট কথা বলে দিচ্ছি, তোমাদের খেতে-পরতে দিতে আমি আর পারব না। নিজের-নিজের পথ দেখে নাও গে যাও, আমাকে আর জালিয়ো না।"

মাসী নিরুত্তর হইয়া গেলেন।

তাহার পর যখন মামী, মাসী, খুড়ি প্রভৃতি আত্মীয়াবর্গ ছেলে-মেয়ে লইয়া সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় ভাবে সুষমার কাছে গিয়া পড়িলেন, তখন পিসীমা কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না। ইঁহারা যে সুষমার খাইয়া-পরিয়া, পৃথক্ হইবার সময় অতিরিক্ত স্নেহবশতঃ নৃপেনের দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছিলেন, এই কথাটা মনে করিয়াই তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল; তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কেন গা, আবার তোমরা এখানে কি করতে এলে? নেপ খেতে-পরতে দিতে পারলে না, – এখন যে বড় দূর করে দিলে? তখন যে নেপর নিন্দে করলে তোমাদের বুকে বড্ড বাজত। ওই যে কথায় বলে 'মার পোড়ে না পোড়ে মাসী, ঝাল খেয়ে ম'ল পাড়াপড়সী' তোমাদেরও বাছা তাই। তখন

নেপর একটা নিন্দের কথা বললে বড় যে কোমরে কাপড় জড়িয়ে আসতে, এখন সেই নেপর নিন্দে করছ কোন্ মুখে গা? এখানে আবার কোন্ লজ্জায় এসেছ মুখ দেখাতে সব? মরণ আর কি, গলায় দড়িও একগাছা জোটে না তোমাদের? আমি হ'লে সাতজন্ম না খেয়ে মরলেও, এমন কাজ করতুম না। সেই বড়বউ, বড়বাবু নইলে যখন তোমরা তরবে না, তখন তাদের অতটা শত্রুতা না সাধলেই ভাল ছিল।"

মাসী কাতর কণ্ঠে বলিলেন, "মাপ কর দিদি, যা হয়েছে তার তো হাত নেই আর। এখন এতগুলো পুষ্যি না খেতে পেয়ে মারা যাবে; দু একদিন থাকতে দাও, তার পরে আমরা নিজেদের যায়গায় চলে যাব।"

সুষমা অনুনয়ের সুরে বলিলেন, "তাই হোক পিসীমা, দুটো দিন থাকুন ওঁরা, তাতে আর কি হ'বে?"

পিসীমা মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন, "হ'বে না তো কিছুই; এই কুড়ি বাইশ জনের খোরাক কত পড়বে, তার কি হিসেব আছে কিছু? যোগীনের চিঠি পেয়েই বামুন ঠাকরুণকে বিদায় দিলে, দুটো চাকর, একটা ঝি বিদায় করলে; এই এত লোকের রান্না রাঁধবেই বা কে, দেবেই বা কে বল দেখি?"

সুষমা একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, "তোমার আশীর্ব্বাদে পিসীমা, আমিই বেশ রাঁধতে পারব, ওতে আমার কিছু কষ্ট হ'বে না। আর খরচের কথা বলছ,— আমার কাছে টাকা আছে, তাই দেব।"

পিসীমা ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আহা! সেই একশো টাকা এতেই খরচ কর তুমি। যোগীন দেছল পুজো-আচ্ছা করবার জন্যে,—তুমি এদের পেট পুজোতে দাও।"

সুষমা তেমনি অনুনয়ের সুরেই বলিলেন, "পিসীমা, এও কি একটা পুজো নয়? আমি বলি প্রাণীকে—বিশেষ যারা ক্ষুধার্ত্ত, অনাথ, তাদের খেতে দেওয়া মহাপুজো, মহা পুণ্য। কাল রাত্রে তোমার চণ্ডী পড়া শুনছিলুম, 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেন সংস্থিতা'; আর গীতাতেও তো ভগবান বলেছেন, তিনি প্রত্যেক প্রাণীর দেহে আত্মা রূপে বাস করছেন। এই যে এরা অনাথ হ'য়ে শুধু দুটো খাবার জন্যে আমাদের দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে, এদের সুরে কি ভগবানেরই সুর বেজে উঠছে না? পিসীমা, এদের মুখে কি ভগবানের ছবিটিই ফুটে উঠছে না,—যখন তিনি কৃষ্ণ অবতারে মাঠে গিয়ে ক্ষুধায় অস্থির হয়ে তপস্বীদের দুয়ারে ভিক্ষা করেছিলেন? তোমার পায়ে পড়ি পিসীমা, এই কয়টা দিন আমায় ভগবানের সেবা করতে দাও।"

পিসীমা অবাক্ হইয়া সুষমার পানে চাহিয়া রহিলেন। হৃদয়টা একটু কোমল হইয়া আসিল, তথাপি মুখের কথা ছাড়িলেন না; বলিলেন, "যা বোঝ করগে যাও বাছা, আমি কিছু বলতে চাইনে। কখন ত হাতে হাঁড়ি কুড়া পড়েনি জীবনে,—এই আজ দুদিন রেঁধে হাঁফিয়ে উঠেছ। আর এতগুলি লোকের দুবেলা খাবার যোগান বড় মুখের কথা কি না। সব দিক ভেবেই আমি বলছিলুম; যাক, যা ইচ্ছে তোমার কর।"

সুষমা মহা উৎসাহে প্রতিভাকে লইয়া রন্ধনগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। উৎসাহের প্রবলতায় আজ অনেক আগেই রন্ধন শেষ হইয়া গেল। সকলকে খাওয়াইতে বেলা তিনটা বাজিয়া গেল।

পিসীমা রোয়াকে বসিয়া আপশোষ করিতেছিলেন, "যত সব আপদগুলো এসে জুটে বউমাটিকে আমার খাটিয়ে-খাটিয়ে মারলে। বাছা সেই সকালবেলা রান্নাঘরে ঢুকেছে, তিনটে বাজল, এখনো জলরত্তিটুকু মুখে দেয় নি। কি বিপদই হয়েছে আমার! মাগীদের এত করে দূর করতে চাইলুম, কিছুতেই তা হ'ল না। এখন খেটে-খেটে প্রাণ যাক্ আর কি। আবার বেলা পাঁচটায় যেয়ো রান্নাঘরে, বেরিয়ো রাত বারটার সময়। এমনি করে এই কয়টা দিন খেটে শক্ত গোছের একটা অসুখ বাধিয়ে বসবে যখন,— তখন প্রাণ বেরুবে আমারই। যারা খেয়ে যাবে, তারা তখন একটা খবরও নিতে চাইবে না। যোগীন আসলেই বা কি বলব তাকে—যখন সে জিজ্ঞাসা করবে ব্যাপারখানা কি? এই যে তিনটে বেজে গেল, এখনও খাওয়া হ'ল না।"

সুষমা নিজের ভাত বাড়িতেছিলেন; পিসীমার উক্তি কাণে যাইতেই তিনি হাসিয়া ফেলিলেন। আজ তাঁহাকে অন্নপূর্ণার মতই দেখাইতেছিল। নিজে যে এ পর্য্যন্ত অভুক্ত আছেন, তাহা তাঁহার খেয়ালেই নাই। প্রতিভার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "শুনছিস, পিসীমা কি বলছেন?"

প্রতিভা হাসিয়া বলিল, "পিসীমা কিন্তু বড্ড ভালবাসেন তোমাকে দিদি।"

সুষমা বলিলেন, "হাঁ, ভালবাসেন যথেষ্ট। তবে কথা হচ্ছে কি, সময়-সময় সেই অতিরিক্ত ভালবাসার চোটে আমার প্রাণ বড্ড অস্থির হয়ে ওঠে। যাক—তোর ভাত নিয়ে খেতে বসগে যা ও-ঘরে।"

প্রতিভা বিস্মিত হইয়া বলিল, "কেন, রোজ তো তোমার কাছেই বসে খাই,—আজ ও-ঘরে যাব কেন?"

সুষমা বলিলেন, "দেখছিস নে ওঁরা সব রয়েছেন? তুই যে বিধবা, আমাদের কাছ হ'তে অনেক দূরে তোকে থাকতে হবে যে। আমার কাছে বসে খেলে, ওঁরা কত কথা বলবেন, তার ঠিক নেই। সংসারের সব দিকই দেখে চলতে হয় বোন, একদিক দেখলেই চলে না।"

নিঃশব্দে প্রতিভা চলিয়া গেল।

রাত্রে সকলের আহারাদি যখন মিটিয়া গিয়াছে, আগন্তুকাগণ নিজেদের সন্তান-সন্ততি লইয়া একটা গৃহে শুইয়া পড়িয়াছেন, সুষমা ও প্রতিভা শয়ন করিতে যাইবেন মাত্র, সেই সময় ব্যস্তভাবে অভয় আসিয়া সংবাদ দিল "বড়বাবু এসেছেন।"

বিস্মিতা সুষমা বলিলেন, "কোথায় তিনি?"

অভয় বলিল, "বারাণ্ডায় চুপ করে বসে আছেন; এত বার বললুম ভেতরে আসতে, তিনি সাড়া দিলেন না।"

পিসীমার চোখ দুইটী তন্দ্রাভরে কেবলমাত্র মুদিয়া আসিয়াছিল, সেই সময় সুষমা ত্রস্তপদে গৃহে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন, "পিসীমা!"

পিসীমা বিরক্তভাবে চক্ষু মুদিয়াই উত্তর দিলেন, "কেন বাছা?" চক্ষু খুলিলেন না, তাহার কারণ তন্দ্রা ছুটিয়া গেলে, আর সহজে তাঁহার ঘুম হয় না।

সুষমা শুষ্কস্বরে বলিলেন, "তোমার বড়ছেলে নাকি বাড়ী এসেছেন?"

ধড়ফড় করিয়া পিসীমা উঠিয়া বসিলেন, দুই হাতে চোখ মুছিয়া বলিলেন, "কে—যোগীন, সে বাড়ী এসেছে? কোথায় আছে সে?"

সুষমা বলিলেন, "তাই তো বলতে এসেছি। বাইরের বারাণ্ডায় নাকি চুপ করে বসে আছেন; কি হয়েছে, কি করে বলব তা? তুমি গিয়ে ডেকে আন পিসীমা।"

"বাইরের বারাণ্ডায় বসে আছে?" পিসীমা তাড়াতাড়ি বাহির হইলেন। নিবিড় সে অন্ধকার, কিছুদূরের বস্তু একেবারেই দেখা যায় না। তাড়াতাড়ি বারাণ্ডা হইতে নামিতে গিয়া তিনি ধড়াস করিয়া প্রাঙ্গণে পড়িয়া গেলেন।

প্রতিভা আলো লইয়া ছুটিয়া আসিল। সুষমা ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে ধরিয়া তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বড্ড লেগেছে কি পিসীমা?"

পিসীমা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "না লাগেনি, বাইরে আলো আছে তো?"

সুষমা প্রতিভাকে আলো লইয়া যাইতে বলিলেন।

বাহিরের বারাণ্ডায় চুপ করিয়া বসিয়া যোগেন্দ্র। পিসীমা আলোটা সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, "এখানে বসে আছিস যে যোগীন, বাড়ীর মধ্যে গেলি নে কেন?"

যোগেন্দ্র একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "চল।"

তিনি বরাবর নিজের গৃহে প্রবেশ করিয়া, হাতের ব্যাগটা একদিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া গম্ভীর হইয়া বসিলেন।

পিসীমা আলোটা বারাণ্ডায় রাখিয়া সেই গৃহের মেঝেয় বসিলেন। যোগেন্দ্রের গম্ভীর মুখের ভাব দেখিয়া তিনি কোনও কথা কহিতে সাহস করিতে পারিতেছিলেন না। মুক্ত দ্বারপথে মুখ বাড়াইয়া সুষমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বড় বউমা, চারটী ভাত চাপিয়ে দাওগে। উনোনে এখনও বোধ হয় আগুন আছে। সারাদিনই উনোন জ্বলছে, আগুন আর থাকবে না? কাল সকালের জন্যে যে মাছ ক' খানা ভাজা আছে—অমিয়ের ঝোলের জন্যে, সেই কখানা দিয়ে একটু ঝোল করে দাওগে। আমি আজ দুধ খাইনি,—যে অবেলায় খাওয়া, ক্ষিদে আর হবে কি—সেই দুধটুকু দিয়ো।"

তিনি ভাবিয়াছিলেন এবার যোগেন্দ্র নিশ্চয়ই কথা কহিবেন,—নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করিবেন, সারাদিন কেন উনান জ্বলিতেছিল, এবং অবেলাতে আহার করিয়া অক্ষুধা উৎপন্ন করিবার কারণ কি? কিন্তু যোগেন্দ্র কোন কথাই জানিতে চাহিলেন না, কেবল সেইরূপ গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "আমি আজ আর কিছু খাব না, কিছু রাঁধতে হ'বে না।"

পিসীমা হাঁ করিয়া তাঁহার পানে খানিক চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "কলকাতা হ'তে খেয়ে এসেছিস বুঝি? শৈলেনের কাছে গেছলি?"

যোগেন্দ্র মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, সে জানেই না, আজ আমি বম্বে হ'তে ফিরে কলকাতায় আসছি।"

পিসীমা চুপ করিয়া রহিলেন, যোগেন্দ্রও আর কথা কহিলেন না। বারাণ্ডার দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সুষমা। গৃহখানি সম্পূর্ণ নীরব।

অনেকক্ষণ পরে যোগেন্দ্র একটু হাসিয়া বলিলেন, "জানো পিসীমা, নৃপেন এবার যথার্থই আমাদের পথের ভিখারী করেছে। তিন যায়গায় কারবার, সব ফেল। উল্টে শুনি দেনাও যথেষ্ট। সব আসবাবপত্র বিক্রী করে যা পেলুম, তাই কতক-কতক দিলুম, এখনও হাজার দেড়েক টাকা তারা পাবে।"

পিসীমা নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। খানিক পরে ধীরে-ধীরে বলিলেন, "ধর্ম্মে সইবে না—কখনও সইবে না। তিন ভাইকে ফাঁকি দিয়ে নিজে বড়লোক হলেন—"

বাধা দিয়া যোগেন্দ্র বলিলেন "ধর্ম্ম স'ক বা না স'ক, আমার তাতে কিছু এসে যায় না। আমার জীবন আগেও যেমন ছিল, এখনও তেমনি যাবে। যেমন-তেমন করে দিন কাটিয়ে দেওয়া বই তো নয়। আমি এখন দেনা শোধ করব কি করে? দেড় হাজার টাকা দেওয়া তো বড় মুখের কথা নয়।"

অদৃষ্ট! যে এক মাস আগে লক্ষ টাকা এক কথায় বাহির করিয়া দিতে পারিত, দেড় হাজার টাকার ভাবনা আজ তাহার অন্তরে দেড় কোটীর ন্যায় জাগিয়াছে। সংসার এমনিই বটে!

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া যোগেন্দ্র বলিলেন, "এখন বাধ্য হ'য়ে আমাকে এ বাড়ীটিও বিক্রি করতে হবে। দেনা শোধ আমি করবই, এতে যদি—"

কথাটা তিনি আর শেষ করিতে পারিলেন না। পিসীমা বলিলেন, "বাড়ীটা আছে, তাই মাথা রাখবার জায়গা আছে। বাড়ী গেলে দাঁড়াবি কোথা?"

যোগেন্দ্র একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উত্তর করিলেন, "গাছতলায়।"

পার্শ্বে নিদ্রিত পুত্র; পিতার বক্ষ আলোড়িত করিয়া কয়েকটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বহিয়া গেল। কঠোর পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করিলেন—তাহা মেজ ভাইয়ের জন্য! হতভাগ্য পিতা একমাত্র পুত্রের জন্য স্থির করিয়া যাইতেছেন বৃক্ষ-তলে বাস।

পিসীমা গভীর দুঃখে নীরব হইয়া গেলেন। যোগেন্দ্র বলিলেন "তাই বলে কি সত্যিই গাছতলায় পড়ে থাকব পিসীমা? তা নয়, একটা কুঁড়ে ঘর বেঁধে থাক্‌তে হবে আর কি।"

পিসীমা বলিলেন, "কেন, রমেন কিছু দেবে না?"

যোগেন্দ্রের মুখ ঘৃণায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল—"না পিসীমা, আমার প্রতিজ্ঞা,—যতদিন আমি বেঁচে থাকব, কোন ভাইয়ের দেওয়া দয়ার দান আমি নেব না। আমার ছেলেকে, স্ত্রীকে, তোমাকে কাউকেই নিতে দেব না। আমার মরণের পরে যা খুসি তাই তোমরা কোরো, আমি দেখতে আস্‌ব না।"

"বালাই, ষাট, অমন কথা বলিস নে যোগীন; আমায় আগে চিতায় দিবি, তার পরে যা হয় তাই করিস। ভগবানের কাছে দিনরাত প্রার্থনা করছি, যেন তাই হয়।"

পিসীমা চোখ মুছিলেন। তাহার পর বলিলেন, "শৈলে-নের দেওয়াও কিছু নিবি নে?"

যোগেন্দ্র দারুণ অভিমানে মাথা নাড়িলেন।

ব্যথিত কণ্ঠে পিসীমা বলিলেন, "সেটা বড্ড অন্যায় হবে তোর যোগীন! সে দাদা বল্‌তে অজ্ঞান,—তার দেওয়া কিছু নিবি নে? কি রকম অবিবেচনার কাজ হবে এটা ভেবে দেখ্‌ দেখি? যে তোর জন্যে জীবন পণ করেছে, তুই কি না তাকে এমন করে ফিরিয়ে দিবি?"

যোগেন্দ্র আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আমার প্রতিজ্ঞা অটল পিসীমা। আমি কখনও কারও কাছ হ'তে জীবনে একটা পয়সা দান বলে হাত পেতে নিই নি, সাহায্য বলেও নিই নি। খেটেছি, মজুরি পেয়েছি, বস,—সব ফুরিয়ে গ্যাছে। এখনও নিজে খাটব,—যা পাব, তাই দিয়ে সংসার চালাব। শৈলেনের ওপরে আমি কঠোর ব্যবহার করি নি, করবও না। আমি তারই হাতে অমিয়ের ভার দিয়েছি, বড় বউকেও তার হাতে দিয়েছি; আমার অবর্ত্তমানে সেই সব দেখবে শুনবে।"

পিসীমা রাগত হইয়া বলিলেন, "বারবার সেই একই কথা কেন বল্‌ছিস বল তো? মানুষের বাঁচা মরা কি

মানুষের হাতে? ও কথাগুলো বলিস্ নে বলছি, আমার শুনতে মোটে ভাল লাগে না।"

যোগেন্দ্র একটু হাসিয়া বলিলেন, "শুনতে এখন ভাল লাগছে না; কিন্তু যখন প্রত্যক্ষ দেখতে পাবে—যাক সে কথা, এখন কাজের কথা হোক। আমার যেমন অবস্থা হয়েছে, তাতে বেশী চাকর রাখা তো কোনমতেই চলবে না। আমি বল্‌ছি কি, তোমরা নিজেরাই কি ঘরের কাজকর্ম্মগুলো চালিয়ে নিতে পারবে না? অভয় বাইরের কাজ করবে, কেবল ঘরের কাজগুলো—"

বাধা দিয়া পিসীমা বলিয়া উঠিলেন, "সে সব বড়-বউমা এর মধ্যে ঠিক করে ফেলেছে,—তোর সে জন্যে মাথা ঘামাতে হ'বে না কিছু। বামনি, ঝি, চাকর, সব জবাব দিয়েছে, আছে কেবল অভয়। কাজকর্ম্ম কতক অভয়, কতক প্রতিভা, কতক সে নিজেই করে ফেলছে। আজকে যে লোকের মওড়াটা বড়-বউমা নিয়েছে, দেখে আমি একেবারে অবাক্ হয়ে গেছি। কেমন করে এত লোকের রান্না রাঁধলে, পরিবেশন করলে। সেজন্যে তোর কিছু ভাবতে হবে না।"

যোগেন্দ্র আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিলেন। পিসীমা বলিলেন, "যাচ্ছিস কোথা?"

যোগেন্দ্র বলিলেন, "হাত পা ধুয়ে আসি।"

ব্যস্ত হইয়া পিসীমা বলিলেন, "বাইরে যাবার দরকার কি? অভয় দু'ঘটি জল এনে দিক,—এখানেই হাত পা ধুয়ে ফেল্ না।"

হাসিয়া যোগেন্দ্র বলিলেন, "আর সেদিন নেই পিসীমা, মাঝখানের দিন-কয়টা স্বপ্ন দেখেছি বলেই ভেবে নিতে হবে। এখন আবার সেই দরিদ্র যোগেন বই আর কেউ নই আমি। এখন আমার সে বড়মানুষি চাল আর সাজবে না পিসীমা! এখন আবার সেই আগেকার চাল ফিরাতে হ'বে।"

পিসীমা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কপালে হাতখানা ঠেকাইয়া নীরব হইয়া গেলেন। যোগেন্দ্র গায়ের জামা খুলিতেছিলেন, সেই সময় অবগুণ্ঠনবতী সুষমা দুই ঘটি জল আনিয়া রাখিলেন। পিসীমার কাছে সরিয়া গিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "খাবেন কি সেটা জেনে—"

সে কথা যোগেন্দ্রের কাণে পৌঁছিল, তিনি বলিলেন, "আমি কিছু খাব না।"

পিসীমা ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "তাও কি হয় বাছা? বউ-মা, আমার ঘরের তাকের উপরে দুধ আছে, আর একটু মিষ্টিও আছে,—তাই এনে খেতে দাও।"

সুষমা চলিয়া গেলেন এবং খানিক পরেই দুধ ও সন্দেশ লইয়া ফিরিলেন। যায়গা করিয়া দিয়া জল, দুধ ও সন্দেশ দিয়া তিনি সরিয়া গেলেন।

হাত মুখ ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া, গা মুছিয়া যোগেন্দ্র আসনে বসিলেন; বলিলেন, "তুমি আর এত রাত জেগে আছ কেন, যাও শোওগে, রাত এদিকে বারটা বাজে। এত রাত পর্য্যন্ত তোমরা করছিলে কি?"

পিসীমা ললাটে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "আঃ আমার পোড়া কপাল! তবে আর বল্‌ছি কি? গাঁ-সম্পর্কে মাসী-মামীর দল কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঢুকেছেন যে তোর এই কুঁড়েতে! তাই দিইছি খুব গুচ্ছের কথা শুনিয়ে। তাদের কি লজ্জা আছে রে; যদি তা থাকত, তখ্‌খনি দূর হ'য়ে যেত। তখন তবু তো জানি নি তোর অবস্থা এমন হয়েছে। এই জানলুম, কাল সকালে উঠেই আগে তাদের দূর করব, তবে অন্য কাজ। তখনই দিচ্ছিলুম দূর করে, বাছা, বউমার প্রাণ অমনি গলে গেল। সেই একশো টাকা থাক্‌লে—যে টাকা রেখে গেছিস তুই বউমার কাছে, সেই টাকা-সংসারে কত সময় কত সাশ্রয় হবে বল্ দেখি তুই। ভূতের বাপের শ্রাদ্ধে এ টাকা ব্যয় করা নয়? সাধে বকি? বকুনি আসে এই জন্যেই তো। ঢের ঢের মেয়ে দেখেছি বাবা, আপন গণ্ডা সকলেই বুঝে নেয়, এর মত হাবলা মেয়ে যদি আর দুটি দেখতে পাওয়া যায়। অত নরম মন নিয়ে কখনও সংসারে বাস করা চলে গা? ওই যে সেদিন দিনু কাওরার মেয়েটা এসে বললে কাপড় নেই; একটু চোখের জল ফেলতে না ফেলতে অমনি সেই নিজের এক ধোপ মাত্র দেওয়া লাল কস্তাপেড়ে শাড়ীখানা তাকে দান হ'য়ে গেল। শুধু কি সেই দান বাছা? নিত্যি তোমার বাড়ী হ'তে যত ভিক্ষে পায় ভিখিরীতে, এত আর কারও বাড়ীতে পেতে হয় না। অবিশ্যি আমি নিন্দে করছিনে এতে, কাজটা খুবই ভাল স্বীকার করছি, তবে কি,—অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হয়। যখন যেমন অবস্থা থাকবে, তেমনি ভাবেই চলতে হবে, এই হচ্ছে মূল কথা। এতদিন

যেমন ভাবে দিন কাটিয়েছ, এখন আর তেমন ভাবে কাটালে চলবে না। এখন তোমাকেই কে কি ভিক্ষে দেয়, তার ঠিক নেই; এবার থেকে হাতটাকে একটু কমিয়ে রাখগে বাছা, এইটুকু আমার কথা।"

তিনি উঠিলেন, সুষমার পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রতিভা শুয়েছে বউমা ?"

সুষমা ঘাড় কাত করিয়া জানাইলেন, শুইতে গিয়াছে।

পিসীমা চলিয়া গেলেন। যোগেন্দ্র আহার শেষ করিয়া শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িলেন। সুষমা দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া স্বামীর পায়ের কাছে বসিলেন। পা দু'খানা কোলে টানিয়া লইতেই যোগেন্দ্র বলিলেন "না সুষমা, আর পা টিপতে হ'বে না, সারাদিন খেটেছ, এখন আর তোমাকে খাটাতে আমি রাজি নই।"

সুষমা বলিলেন, "এ আমার খাটুনী নয়, শাস্তি। যাক, তুমি টাকার জন্যে এত ভাবছ কেন বল তো ? টাকা আমি দেব, কিছু ভাবতে হ'বে না তোমাকে।"

অর্দ্ধোত্থিত হইয়া যোগেন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, "তুমি— তুমি দেবে বড় বউ ? কোথায় পাবে তুমি টাকা ? একশটি টাকা তোমার কাছে রেখে গেছলাম, তাও তো খরচ হ'য়েছে অনেক। আর যে টাকা আসবে কোথা হ'তে, তা তো জানি নে।"

সুষমা ধীর স্বরে বলিলেন, "আমায় তুমি গহনা দিয়েছ, তা মনে আছে ? তাই বিক্রি করে আগে দেনা শোধ কর।"

যোগেন্দ্র দুই হাত মুখে চাপা দিয়া আবার শুইয়া পড়িলেন ; রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "তোমার গহনা নিয়ে আমি দেনা শোধ করব,—তুমি বলছ কি সুষমা ?"

সুষমা দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "যা সত্য, তাই বলছি। আমি আদরের পুতুল নই যে, শুধু রাং দিয়ে সাজিয়ে তুলে রাখবে। আমি তোমার স্ত্রী, তোমার সহধর্ম্মিণী, তোমার সুখ-দুঃখের সমান অংশভাগিনী ; তোমার স্নেহই আমার একমাত্র সম্বল,—কতকগুলো সোণাকে আমি জীবনের সম্বল বলে মনে করিনে। আমার হাতের শাঁখা, মাথার সিঁদুর থাক, আমি আর কিছু প্রার্থনা করিনে। তোমার দেনা তোমায় যে যন্ত্রণা দেবে, আর আমি 'স্বর্ণলতার' শশিভূষণের স্ত্রী প্রমদার মত গহনা আগলাব, তেমন মেয়ে আমি নই। আর আমাকে দেখেছ কি সে গহনা ব্যবহার করতে ? অনর্থক সেগুলো তোলা পড়ে আছে, মনে ভেবেছিলাম—যখন অমিয়ের বিয়ে হবে, তখন বউমাকে সেই সব গহনা দিয়ে মনের মত করে সাজাব। সে এখনও অনেক দূরের কথা। অমিয় বড় হবে, লেখাপড়া শিখবে, তার পরে সে নিজেই উপার্জ্জন করতে পারবে, একটা মানুষ হ'য়ে যাবে। তার জন্যে আমি একটুও ভাবিনে। এ বাড়ী বিক্রী করতে দেব না, তা হ'লে আমরা সব দাঁড়াব কোথায় ? আমার গহনা বেচে দেনা শোধ দাও, নিজেকে মুক্ত কর।"

যোগেন্দ্র উঠিয়া বসিলেন, "তাই আমায় বাধ্য হ'য়ে করতে হবে সুষমা, নইলে উপায় নেই। কিন্তু এ কি করলুম সুষমা, তোমাদের একেবারে পথে বসালুম যে। এখন কেমন ক'রে আবার চাকরী করতে যাব,—অপমানে যে মাথাটা কাটা যাচ্ছে। চাকরী না করলেই বা তোমাদের খেতে দেব কি ?"

তিনি ব্যাকুলভাবে সুষমার হাত দুখানা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া র'হিলেন।

শান্ত কণ্ঠে সুষমা বলিলেন, "এতে অপমান কিসের ? মনের মধ্যে এ গর্ব্ব কখনও জাগিয়ে রেখো না : যখন যেমন অবস্থা, তখন তেমনি ভাবে চলতে হবে। লজ্জা কি, অপমান কি ? কোনও দিকে তাকিয়ো না, কারও কথা কাণে নিয়ো না, তোমার কর্ত্তব্য তুমি পালন করে যাও। যত দিন দেহে প্রাণ থাকবে, মনে করে রাখ, যিনি তোমায় ঐশ্বর্য্য দিয়েছিলেন, তিনিই আবার কেড়ে নিয়েছেন,—নিশ্চয়ই তোমার কোনও ত্রুটী হয়েছিল সেই জন্যে। তুমি হয় তো এ ধনের যোগ্য অধিকারী নও,—মেজ ঠাকুরপোকে যোগ্য অধিকারী দেখে তারই হাতে সব অর্পণ করলেন। এত ভেঙ্গে পড়ছ কেন বল দেখি ? তুমিই কি আমাদের খেতে পরতে দেবার কর্ত্তা ? একজন উপরে থেকে চালনা করছেন,— তুমি উপলক্ষ্য হয়ে আমাদের দিচ্ছ, তাঁরই হাতের জিনিষ নিয়ে। মনে বল আনো, ঈশ্বরের পরে ভক্তি হারিয়ো না ; তুমি যে উপলক্ষ্য মাত্র, এইটি মনে রেখে কাজ ক'রে যাও দেখি, মনের ময়লা দূর হয়ে যাবে, মিথ্যে অহঙ্কার দূর হয়ে যাবে, শান্তি পাবে।"

বিস্ফারিত নেত্রে যোগেন্দ্র অনিন্দ্যসুন্দর সেই মুখখানার পানে চাহিয়া রহিলেন। দেওয়ালের উজ্জ্বল আলো সেই

মুখে বিস্ফারিত হইয়া পড়িতেছিল; কি স্বর্গীয় দীপ্তি সে মুখে! ঈশ্বরে আত্মনির্ভরতার চিহ্ন যেন ফুটিয়া উঠিতেছে!

এ কি তাঁহার স্ত্রী, সুখ-দুঃখের অংশভাগিনী,—না স্বর্গের দেবী? যোগেন্দ্র সুষমার হাত দুখানা ছাড়িয়া দিলেন; রুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "এত দিন আমার কাছে আছ, তোমায় নিয়ত দেখ্‌ছি,—তবু তো চিনতে পারলুম না সুষমা, তুমি কে? কি দিয়ে ভগবান তোমাকে গড়েছেন? সত্যি কথা বল সুষমা—তুমি কে?"

"আমি তোমার চরণের দাসী।"

ভক্তি-গদ্‌গদ চিত্তে সুষমা স্বামীর পদধূলি লইয়া মাথায় দিলেন। উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে যোগেন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, "সুষমা, সুষমা!"

(ক্রমশঃ)

শুশুনিয়া শৈলে

শ্রীনিখিলনাথ রায় বি-এল

পশ্চিম-বঙ্গের একটি ক্ষুদ্র শৈল তীর্থস্থান রূপে নিকটবর্ত্তী জনসাধারণের নিকট পরিচিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু বহুদিন ধরিয়া সে একটি বিচিত্র চিহ্ন আপনার বক্ষে লুক্কায়িত রাখিয়াছিল; এমন কি, সেরূপ চিহ্ন সমগ্র বঙ্গদেশে আর কোথাও আছে বলিয়া অবগত হওয়া যায় না। এই শৈলটির নাম শুশুনিয়া, এবং সেই চিহ্নটি একটি খোদিত-লিপি। শুশুনিয়া শৈল বাঁকুড়া জেলায় এবং বাঁকুড়া সহর হইতে প্রায় ৬ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার উচ্চতা সমুদ্রতীর হইতে ১৪৪২ ফিট নির্ণীত হইয়া থাকে। শুশুনিয়া পূর্ব্ব পশ্চিমে আপনার দেহ বিস্তার করিয়া, নানাবিধ বৃক্ষে পরিশোভিত হইয়া রহিয়াছে। সেই বৃক্ষরাজির শ্যাম শোভা সকলকে মুগ্ধ করিয়া তুলে। দূর হইতে নীলাকাশের গায়ে যাহার গাঢ় নীলিমা নয়নপথে নিপতিত হয়, নিকটে আসিলে তাহা শ্যামলতায় পরিণত হইয়া চক্ষু শীতল করিয়া দেয়। এই বৃক্ষগুলি নিবিড় ভাবে সন্নিবেশিত হইয়া, আবার অরণ্যের আকারও ধারণ করিয়াছে। সেই অরণ্যমধ্যে পর্ব্বত-গহ্বরে হিংস্র জন্তুগণ আবাস স্থাপন করিয়া অবস্থিতি করিয়া থাকে। তাহা হইলেও শুশুনিয়া শৈলে আরোহণ করা একেবারে দুরূহ ব্যাপার নহে। শুশুনিয়া শৈলের গাত্র বাহিয়া, দু'ইটি নির্ঝরধারা ধীরে-ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। তন্মধ্যে যেটি সম্মুখভাগে রাস্তার নিকটে, সেই ধারাটিতে স্নান করিবার জন্য প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তির দিনে অনেক লোক আগমন করে; এবং সে সময়ে সেখানে একটি মেলাও বসিয়া থাকে। এই ধারাটির নিকটে নরসিংহ দেবের মন্দির আছে; এবং ইহার নিকটেই বর্দ্ধমান ষ্টোন্ কোম্পানীর (পরে বেঙ্গল ষ্টোন্ কোম্পানীর) আফিস অবস্থিত। শুশুনিয়া পাথরের কাজের জন্যও বিখ্যাত ছিল; এক্ষণে কিন্তু সে কাজ প্রায় নাই বলিলেই হয়,—সামান্য-সামান্য দ্রব্য প্রস্তুত হয় মাত্র।

আমরা এক্ষণে শুশুনিয়ার খোদিত-লিপির কথা বলিতেছি। এই লিপিটি শৈলের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত। ষ্টোন্ কোম্পানীর আফিস হইতে উত্তর দিকে কিছু রাস্তা অতিক্রম করিয়া, পূর্ব্ব মুখে অরণ্য-পথ দিয়া ন্যূনাধিক অর্দ্ধ ক্রোশ গমনের পর, পর্ব্বত-গাত্রে আরোহণ করিলে, সেই স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়। এই স্থানটিকে সাধারণে 'চন্দ্র সূর্য্য' বলিয়া থাকে। খোদিত-লিপির সঙ্গে উৎকীর্ণ একটি বৃহৎ ও একটি ক্ষুদ্র বিষ্ণুচক্রের লোকে 'চন্দ্র-সূর্য্য' নাম প্রদান করিয়াছে। অনেক দিন হইতে বঙ্গদেশের এই একমাত্র পর্ব্বত-লিপি দেখিবার ইচ্ছা হইতেছিল,—ঈশ্বরেচ্ছায় আমাদের সে ইচ্ছার পূরণ হইয়াছে; আমরা শুশুনিয়া শৈলের খোদিত-লিপি দেখিয়া আসিয়াছি। কিন্তু লিপিতত্ত্বে আমরা অভিজ্ঞ নহি, তাই আমরা তাহা প্রত্যক্ষ মাত্র করিয়াছি। লিপির উদ্ধারে আমাদের সেরূপ সামর্থ্য ঘটে নাই। তাহা হইলেও, শুশুনিয়া শৈল-লিপি লইয়া অনেক গবেষণা হইয়া গিয়াছে,—আমরা সেই সকল গবেষণার আলোচনা করিয়া, তাহা হইতে ইহার ঐতিহাসিক তথ্য কিছু-কিছু উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি; এবং উক্ত লিপি প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাদের সিদ্ধান্ত স্থির করারও

যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। নিম্নে আমরা সমস্তই আনুপূর্ব্বিক উল্লেখ করিতেছি।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় প্রথমে এই লিপির সংবাদ সাধারণের নিকট প্রকাশ করেন। ১৮৯৫ খৃঃ অব্দের এসিয়াটিক সোসাইটির কার্য্য-বিবরণীতে তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহার পর ৩০৩ সালের সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় তিনি 'মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মা' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া, শুশুনিয়া-লিপি ও চন্দ্রবর্ম্মা সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেন। বসু মহাশয় প্রথমে এই লিপির পাঠে—যিনি লিপি খোদিত করাইয়াছিলেন, তাঁহাকে 'পুষ্করাম্বুধিপতি' মহারাজ সিদ্ধবর্ম্মার পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন; পরে কিন্তু সিদ্ধবর্ম্মাকে 'পুষ্করস্তাধিপতি' বলেন। বসু মহাশয়ের মতে শুশুনিয়া লিপির চন্দ্রবর্ম্মা আজমীরের নিকটস্থ লৌহস্তম্ভে উল্লিখিত রাজা চন্দ্র ও এলাহাবাদের অশোক-স্তম্ভে খোদিত সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তিতে লিখিত আর্য্যাবর্ত্ত-নরেশ চন্দ্রবর্ম্মা হইতে অভিন্ন। ইহার পর মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় মালবের প্রাচীন দশপুর—বর্ত্তমান মন্দশোরে, একখানি খোদিত-লিপি আবিষ্কার করিয়া, তাহা হইতে সিদ্ধবর্ম্মার নামও প্রাপ্ত হন। কিন্তু শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শুশুনিয়ার খোদিত-লিপির প্রতিলিপি লইয়া, শাস্ত্রী মহাশয়কে দেখাইলে, তিনি শুশুনিয়া ও মন্দশোরের লিপি মিলাইয়া, উভয় লিপির সিদ্ধবর্ম্মা স্থলে সিংহবর্ম্মা এবং শুশুনিয়া লিপির 'পুষ্করস্তাধিপতি'র স্থলে 'পুষ্করণাধিপতি' পাঠ স্থির করেন। রাখাল বাবু শাস্ত্রী মহাশয়ের পাঠ ও তাঁহার অভিমত লইয়া, ১৩২০ সালের ফাল্গুন মাসের প্রবাসী পত্রে 'শুশুনিয়ার পর্ব্বত-লিপি' নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি শুশুনিয়া-লিপির 'পুষ্করণা'কে মাড়ওয়ার রাজ্যের কতকাংশের প্রাচীন নাম পোকরণা বা পুষ্করণার সহিত অভিন্ন স্থির করেন। পোকরণার কথা তিনি শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতেই অবগত হইয়াছিলেন; এবং শাস্ত্রী মহাশয় ভট্ট ও চারণদিগের গ্রন্থে পোকরণার উল্লেখ দেখিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ করেন। রাখাল বাবু শুশুনিয়া-লিপির সিংহবর্ম্মার পুত্র চন্দ্রবর্ম্মাকে মন্দশোর-লিপির সিংহবর্ম্মার পুত্র, এবং নগেন্দ্র বাবুর ন্যায় দিল্লীর লৌহ-স্তম্ভের চন্দ্র রাজা ও এলাহাবাদ অশোক-স্তম্ভে লিখিত সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তির চন্দ্রবর্ম্মার সহিত অভিন্ন স্থির করিতে যত্নবান্ হন। এই মত তিনি শেষে তাঁহার বাঙ্গলার ইতিহাস প্রথম ভাগেও প্রকাশ করেন। আমরা শুশুনিয়া-লিপি, মন্দশোর-লিপি, লৌহস্তম্ভ লিপি ও এলাহাবাদের অশোক-স্তম্ভে খোদিত সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তির উল্লেখ ও রাখাল বাবুর মত ও তাহার যথাযথ আলোচনা করিয়া, এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শুশুনিয়া লিপি সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় ও রাখাল বাবু এইরূপ পাঠ স্থির করিয়াছেন।

"১। চক্রস্বামিনঃ দাস [।] [ৎ] গ্রেণ [।] তি স্বষ্টঃ

২। পুষ্করণাধিপতের্ম্মহারাজ শ্রীসিংহ বর্ম্মণঃ পুত্রস্য

৩। মহারাজ শ্রীচন্দ্র বর্ম্মণঃ কৃতেঃ"

রাখাল বাবু ইহার এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন,—

"চক্রস্বামীর দাসগণের অগ্রণী কর্ত্তৃক উৎসর্গীকৃত, পুষ্করণাধিপতি মহারাজ শ্রীসিংহবর্ম্মার পুত্র মহারাজ শ্রী"চন্দ্রবর্ম্মার অনুষ্ঠান।"

এক্ষণে শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত মন্দশোরের খোদিত-লিপির রাখাল বাবু যে পাঠ প্রদান করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

(১) "সিদ্ধম্ সহস্রশিরসে তস্মৈ পুরুষায়মিতাত্মনে চতুস্ সমুদ্র-পর্য্যঙ্ক-তোয়-পিড়ালবেপমঃ শ্রীর্ম্মালবগণয়োতে প্রশস্তে কৃত সঙ্গিতে

(২) একষষ্ঠ্যাধিকে প্রাপ্তে সমাশত চতুষ্ট [ৎ] য় প্রাবৃক্কালে শুভে প্রাপ্তে মনস্তুষ্টি করেনৃণামময়ে প্রবৃত্তে শক্রস্য কৃষ্ণস্যানুমতেততটে

(৩) নিষ্পন্ন ব্রীহি-যবসা কাশপুষ্পৈঃ রলঙ্কৃতাত্যাভিরভ্যধিকং ভাতি মেদিনী সস্যমালিনী দিনে আশ্বোজ শুক্লস্য পঞ্চম্যা মথ সৎকৃতে

(৪) ঈদৃক্ কলেবরে রম্যে প্রশাসতি বসুন্ধরাম্ প্রাক্ পুণ্যোপচয়াভ্যাসাৎ সম্বর্ধিত মনোরথে জয়বর্ম্ম নরেন্দ্রস্য পৌত্রে দেবেন্দ্রবিক্রমে

(৫) ক্ষিতীশ সিংহবর্ম্মণস্ সিংহবিক্রগণ্ড-গামিনি সুৎ পুত্রে শ্রীর্ম্মহারাজ নর বর্ম্মণি-পার্থিবে তৎপালনগুণোদ্দেশাদ্ধর্ম্মপ্রাপ্ত্যর্থ বিস্তর:

(৬) পূর্ব্ব জন্মান্তরাভ্যাসাৎ বলাদাক্ষিপ্ত মানসঃ স্বযশঃ পুণ্যসংভারবিবর্দ্ধিত-কৃতোত্তমঃ মৃগতৃষ্ণা জল-স্বপ্ন বিদ্যুদ্দীপ-শিখাচলম্

(৭) জীবলোক মিমং জ্ঞাত্বা-শরণ্যং শরণঙ্গতঃ ত্রিদশো-দার ফলদং স্বর্গ স্ত্রী চারুপল্লবম্ বিমানানেক বিটপং তোয়-দাং কুমধুস্রাবম্

(৮) বাসুদেবং জগদ্ধাসমপ্রমেয় মজং বিভুম্ মিত্র ভৃত্য [া] র্ত্ত সংকর্ত্তা স্বকুলস্য [া] থ চন্দ্রমাঃ যস্য বিতং চ প্রাণাশ্ চ দেব ব্রাহ্মণ সাগতা [সাৎকৃতা]

(৯) মহাকারুণিকঃ সত্যোধর্ম্মার্জ্জিত মহাধনঃ সৎ-পুত্রোবধ্ন্ বৃদ্ধেস্ত সৎপৌত্রোথজয়স্তবৈ তুহেতু পুল শূরায়া সৎপুত্রোজয় মিত্রয়া”

রাখালবাবু এই লিপির আনুপুর্ব্বিক অনুবাদ প্রদান করেন নাই। তিনি সংক্ষেপে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

“এই খোদিতলিপি হইতে তিনটী বিষয় জানা যাইতেছে :—

(১) ৪৬১ বিক্রমাব্দে অর্থাৎ ৪০৪ খৃঃ অব্দে দশপুরে নরবর্ম্মা নামক একজন রাজা বর্ত্তমান ছিলেন।

(২) তাঁহার পিতার নাম সিংহবর্ম্মা ও পিতামহের নাম জয়বর্ম্মা।

(৩) গুপ্তবংশীয় সম্রাট প্রথম কুমারগুপ্তের সামন্ত-রাজা মালবাধিপতি বন্ধুবর্ম্মা, নরবর্ম্মার বংশসম্ভূত।”

শেষোক্ত বিষয়টি কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত উদ্ধৃত লিপির বিষয় নহে,—ইহা রাখাল বাবুর অনুমান মাত্র। তাহার পর রাখাল বাবু শুশুনিয়া-লিপির পুষ্করণাধিপতি সিংহবর্ম্মা ও তাঁহার পুত্র চন্দ্রবর্ম্মার সহিত উদ্ধৃত মালব-লিপির ঐক্য করিয়া বলিতেছেন, “অতএব ইহা প্রায় নিশ্চিত যে, চন্দ্রবর্ম্মা মালবরাজ সিংহবর্ম্মার পুত্র।” এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, রাখাল বাবু এই প্রকারে তাঁহাদের বংশপত্র প্রদান করিতেছেন।

মালবের রাজবংশ

বিশ্ববর্ম্মা (গঙ্গাধরের প্রস্তর-লিপি মালবাব্দ ৪৮০ = ৪২৩ খৃঃ অঃ)

|

বন্ধুবর্ম্মা (মন্দশোরের প্রস্তর-লিপি ৪৯৩ = ৪৩৭ খৃঃ অঃ)

তাহার পর শুশুনিয়া-লিপির চন্দ্রবর্ম্মাকে তিনি এলাহা-বাদের অশোক-স্তম্ভে উৎকীর্ণ সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তির চন্দ্র-বর্ম্মার সহিত অভিন্ন স্থির করিয়া, উক্ত প্রশস্তির কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা রাখাল বাবুর উদ্ধৃত অংশের সহিত উক্ত প্রশস্তির আরও কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

“রুদ্রদেব মতিল নাগদত্ত চন্দ্রবর্ম্ম গণপতি নাগনাগ সেনাচ্যুত নন্দিবল বর্ম্মাত্মনে কার্য্যাবর্ত্ত রাজপ্রসভো-দ্ধারণোদ্ধৃত প্রভাব মহতঃ পরিচারকী কৃত সর্বাটবিক রাজস্য সমতট ডবাক কামরূপ নেপাল কর্ত্তৃপুরাদিপ্রত্যন্ত নৃপতি-ভির্ম্মলে বাজুর্নায়ন যৌধেয় মাপ্রকাভীরপ্রার্জুন সনকানীক কাকখর পরিকাদিভিশ্চ সর্ব্বকর দানাজ্ঞাকরণ প্রণামাগমন পরিতোষিত প্রচণ্ডখাসনস্যানেকভ্রষ্ট রাজ্যোৎসন্ন রাজবংশ প্রতিষ্ঠাপনোদ্ভূত নিখিলভুবন বিচরণ শান্তযশসঃ দৈবপুত্র শাহিশাহানুশাহীশক মুরুণ্ডৈঃ সৈংহলকাদিভিশ্চ সর্বদ্বীপ বাসিভিরাত্মনিবেদন কন্যোপায়ন দান গরুত্ম-দঙ্কস্ব বিষয়ভুক্তি যাচনাদ্যুপায় সেবাকৃত বাহুবীর্য্য প্রসরধরণি বন্ধস্য * * * *”

রাখাল বাবু এই লিপির কেবল চন্দ্রবর্ম্মা নামটি গ্রহণ করিয়াছেন, অন্য কিছু বলেন নাই। তাহার পর তিনি দিল্লীর লৌহস্তম্ভের লিপির কথা বলিয়াছেন; কিন্তু তাহার কোন অংশ উদ্ধৃত করেন নাই। আমরা উক্ত স্তম্ভ লিপির সমস্তই উদ্ধৃত করিয়া, তাহা হইতে রাখাল বাবু কি কি বলিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিতেছি,—

“যস্যোদ্বর্ত্তয়তঃ প্রতীপমুরসা শত্রূন্ সমেত্যাগতান্।
বঙ্গেষ্বাহববর্ত্তিনোভি লিখিতা খড়্গেন কীর্ত্তির্ভুজে॥
তীর্ত্বা সপ্ত মুখানিযেন সমরে সিন্ধোর্জ্জিতা বাহ্লিকাঃ।
যস্যাদ্যাপ্যধি বাস্যতে জলনিধির্ব্বীর্য্যানিলৈর্দ্দক্ষিণঃ॥
খিন্নস্যেববিসৃজ্যগাংনরপতেগর্মাশ্রিতস্যেতরাং।
মূর্ত্ত্যাকর্ম্মজিতাবনিং গতবতঃ কীর্ত্ত্যাস্থিতস্যক্ষিতৌ॥
শান্তস্যেব মহাবনেহুতভুজো যস্য প্রতাপোমহান্।
নাদ্যাপ্যুৎসৃজতি প্রণাশিতরিপোর্যত্নস্য শেষঃ ক্ষিতিম্॥

প্রাপ্তেন স্বভুজার্জ্জিতঞ্চ সুচিরঞ্চৈকাধিরাজ্যংক্ষিতৌ।
চন্দ্রাহ্বেন সমগ্র চন্দ্র সদৃশীং বক্তুশ্রিয়ং বিভ্রতা ॥
তেনায়ংপ্রণিধায় ভূমিম্পতিনাধা (ভা) বেন বিষ্ণৌমতিম্।
প্রান্ (প্রাং) শুর্ব্বিষ্ণুপদেগিরৌ ভগবতোবিষ্ণোর্দ্ধ্বজঃস্থাপিতঃ॥"

এই লিপি হইতে রাখালবাবু তিনটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করিতেছেন,—

(১) "চন্দ্র বিষ্ণুপদপর্ব্বতে এই লৌহনির্ম্মিত বিষ্ণুধ্বজ স্থাপন করিয়াছিলেন।

(২) তিনি সমবেত বঙ্গবাসীগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া। এবং

(৩) সিন্ধুর সপ্তমুখ পার হইয়া বাহ্লিকগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন।"

তাহার পর রাখালবাবু—এই লৌহস্তম্ভের চন্দ্ররাজাকে যাঁহারা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বলিয়াছেন,—তাঁহাদের মত খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন যে, লৌহস্তম্ভের খোদিত লিপির অক্ষর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের খোদিত লিপিসমুহের অক্ষর অপেক্ষা বহু প্রাচীন; লৌহস্তম্ভের খোদিত লিপির অক্ষর ও শুশুনিয়ার খোদিত-লিপির অক্ষর একই প্রকারের; লৌহ-স্তম্ভের খোদিত-লিপিতে বঙ্গবিজয়ের উল্লেখ আছে এবং রাঢ়ে (পশ্চিমবঙ্গে) চন্দ্রবর্ম্মার দ্বিতীয় খোদিত-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। অতএব 'চন্দ্র' ও চন্দ্রবর্ম্মা, একই ব্যক্তি। তদ্ভিন্ন চন্দ্রবর্ম্মার পিতার নাম সিংহবর্ম্মা; সুতরাং তাঁহার সহিত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না। রাখালবাবু এই প্রবন্ধ শাস্ত্রীমহাশয়ের অনুমতি অনুসারে লিখিয়াছেন। এবং ইণ্ডিয়ান য়্যান্টিকোয়ারী নামক পত্রিকায় শাস্ত্রী-মহাশয় যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার সকল মতগুলিই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

রাখাল বাবু স্থির করেন যে, সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে চন্দ্রবর্ম্মা আর্য্যবর্ত্ত জয় করিয়াছিলেন, এবং গুপ্তবংশের প্রথম সম্রাট্ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত বা তাঁহার পিতা ঘটোৎকচ গুপ্ত চন্দ্রবর্ম্মার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন; বঙ্গবাসিগণ সমবেত হইয়া চন্দ্রবর্ম্মাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন; সমুদ্রগুপ্ত চন্দ্রবর্ম্মাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরবর্ম্মাকে সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন; নরবর্ম্মা, বিশ্ববর্ম্মা ও পরে বন্ধুবর্ম্মা গুপ্তসাম্রাজ্যের করদ রাজা হইয়াছিলেন। চন্দ্রবর্ম্মা সম্বন্ধে এইরূপ মত রাখাল বাবু তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথম ভাগেও প্রকাশ করিয়াছেন।

এক্ষণে এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য জানাইতেছি। শুশুনিয়ার চন্দ্রবর্ম্মা যে কে, তাহা রাখাল বাবু সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণ করিতে পারেন নাই।

(১) প্রথমে তিনি মন্দোশরে শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত লিপি সিংহবর্ম্মার সহিত শুশুনিয়া লিপির সিংহ-বর্ম্মার অভিন্নতা প্রমাণ করিতে যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা ফলবতী হয় নাই। শুশুনিয়া-লিপিতে লিখিত আছে যে, সিংহবর্ম্মা পুষ্করণাধিপতি, মন্দোশরের লিপিতে তিনি 'মালবগণাম্নাতো' অর্থাৎ মালবের রাজা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন; পুষ্করণা মাড়ওয়ারে পোকরাণা কিনা তাহার কোন প্রমাণ নাই। তাহা হইলেও তাহা যে তৎ-কালে মালবের অন্তর্গত ছিল, তাহার প্রমাণাভাব। তাহা মানিয়া লইলেও, শুশুনিয়ার চন্দ্রবর্ম্মা তাঁহাদিগকে মালবের রাজা না বলিয়া, পোকরণা নামে একটা ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের রাজা বলিয়া পরিচয় দিলেন, ইহারই বা কারণ কি? যদি এরূপ বলা হয় যে, সিংহবর্ম্মার জীবিতকালে চন্দ্রবর্ম্মা পোকরণার রাজা হইয়াছিলেন, এবং তিনি সেই সময়ে শুশুনিয়ার এই লিপি খোদিত করিয়াছিলেন, তাহা হইলে যে চিরপ্রসিদ্ধ বিস্তৃত মালবরাজ্যের সহিত তাঁহার পিতা-পিতামহের সম্বন্ধ ছিল, তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহার পিতাকেও কেবল পুষ্করণাধিপতি মাত্র বলার কোনই কারণ দেখা যায় না। মন্দোশরের লিপিতে চন্দ্রবর্ম্মার নাম নাই, সুতরাং তাহার সিংহবর্ম্মা যে শুশুনিয়ার চন্দ্রবর্ম্মার পিতা, ইহারও কোন প্রমাণ নাই। রাখাল বাবুর মতে, যে চন্দ্র-বর্ম্মা এত বড় দিগ্বিজয়ী সম্রাট্, তাঁহার ভ্রাতা নরবর্ম্মা তাঁহার নামটা পর্য্যন্তও উল্লেখ করিলেন না কেন? সমুদ্র-গুপ্তের ভয়ে কি তিনি ভ্রাতার নামটাও উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইয়াছিলেন? সমুদ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক ভ্রাতার পরাজয়ের উল্লেখ করিয়া, সমুদ্রগুপ্তের গৌরবও ত বাড়াইতে পারিতেন। তদ্ভিন্ন বিশ্ববর্ম্মা ও বন্ধুবর্ম্মা যে নরবর্ম্মার বংশধর তাহাও অনুমান মাত্র। ইহারও বিশেষ কোন প্রমাণ নাই।

(২) সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তির লিখিত চন্দ্রবর্ম্মা ও

শুশুনিয়ায় চন্দ্রবর্ম্মা নাম-সাদৃশ্যে এক ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণে অভিন্ন বলা যায় না। তবে শুশুনিয়ার অক্ষর ও সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তির অক্ষর একই সময়ের এবং একইরূপ বলিয়া যদি উভয় চন্দ্রবর্ম্মাকে অভিন্ন স্থির করার চেষ্টা হয়, সে বিষয়ে কোন উত্তর দিতে আমরা অসমর্থ, কারণ আমরা লিপিতত্ত্বে অভিজ্ঞ নহি। তাহাই যদি মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে এই দুই চন্দ্রবর্ম্মাকে এক বলিলেও বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই স্থির করিতে হয়। তাহারও বিশিষ্ট কোন প্রমাণ নাই। সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তিতে চন্দ্রবর্ম্মা ও মালবগণের নাম পৃথক্ আছে, সুতরাং চন্দ্রবর্ম্মা যে মালবগণের অধিপতি ছিলেন, তাহা স্থির করা যায় না। যদি তিনি মালবগণের কোন খণ্ড-রাজ্যের রাজা ছিলেন, এরূপ বলা হয়, তাহা হইলে দিগ্বিজয়ী রাজা বলা যায় না।

(৩) এক্ষণে দিল্লী লৌহ-স্তম্ভের চন্দ্রের কথা বলা যাইতেছে। রাখাল বাবুর প্রধান প্রমাণ এই যে, শুশুনিয়া-লিপির ও দিল্লী লৌহ-স্তম্ভ-লিপির অক্ষর একই প্রকারের, ইহার উত্তর দেওয়া কঠিন। যাঁহারা এই 'চন্দ্র'কে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত স্থির করিতে চাহিয়াছিলেন, রাখাল বাবু দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের খোদিত লিপিসমূহের অক্ষর হইতে লৌহস্তম্ভের লিপির অক্ষর প্রাচীন বলিয়া তাঁহাদিগকে নিরস্ত করার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এক পুরুষে বা দুই পুরুষে যে অক্ষরের প্রাচীনত্ব বা নূতনত্ব ঘটিয়া যায়, সেরূপ অক্ষর-বিজ্ঞানের কোন উত্তর আমরা দিতে পারি না। কাজেই সে বিষয়ে আমরা কোন কথা বলিব না। অক্ষর ভিন্ন যে অন্যান্য প্রমাণ থাকিতে পারে, আমরা এক্ষণে তাহারই আলোচনা করিতেছি। দিল্লী লৌহস্তম্ভের এ লিপিটি একটি প্রশস্তি। চন্দ্র নামে কোন রাজা স্বর্গগত হইলে, তাঁহারই স্থাপিত বিষ্ণুধ্বজে এই প্রশস্তিটি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই লিপি হইতে আবার 'চন্দ্রের' আর একটি নাম 'ধাব'ও হইতে পারে বুঝা যায়। সে যাহা হউক, এই চন্দ্র, যাঁহাকে দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি যে শুশুনিয়ায় আপনাকে কেবলমাত্র পুষ্করণাধিপতি বলিয়া পরিচয় দিলেন, ইহাই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? রাখাল বাবু চন্দ্রের দিগ্বিজয়কালে, শুশুনিয়ার লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করেন, কারণ, তিনি লিখিতেছেন, "লৌহস্তম্ভের খোদিত লিপিতে বঙ্গ-বিজয়ের উল্লেখ আছে, এবং রাঢ়ে (পশ্চিম বঙ্গে) চন্দ্রবর্ম্মার দ্বিতীয় খোদিত-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে; অতএব চন্দ্র ও চন্দ্র বর্ম্মা একই ব্যক্তি।" লৌহস্তম্ভে যে বঙ্গের কথা উল্লেখ আছে, তাহার সহিত পশ্চিম-বঙ্গ বা রাঢ়ের যে কোনই সম্বন্ধ নাই, রাখাল বাবু সে কথা বোধ হয় বিস্মৃত হইয়াছেন। লৌহস্তম্ভের বঙ্গ যে ভারতবর্ষের পূর্ব্ব-দিকের শেষ সীমায়, ইহা প্রাচীন গ্রন্থাদি ও লৌহস্তম্ভের শ্লোক হইতেও বেশ বুঝা যায়। সেই পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী বঙ্গ রাজ্য বিজয়ে 'চন্দ্র রাজা' গমন করিলেও, তাঁহাকে যে অরণ্যসঙ্কুল পশ্চিম বঙ্গে আসিতেই হইয়াছিল, ইহার প্রমাণাভাব। এই পশ্চিম বঙ্গ ঠিক রাঢ়ে ছিল কিনা, তাহাও বলা যায় না। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে এতদঞ্চলের নাম ঝারখণ্ডই দেখা যায়। সে যাহা হউক, এই প্রদেশ যে চিরদিনই অরণ্যসঙ্কুল, এবং কোন বিশিষ্ট রাজ্য যে এতদ-ঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ছিল না, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশেষতঃ, শুশুনিয়ার এমন কোন মাহাত্ম্যের কথা জানা যায় না যে, তাহা নিকটবর্ত্তী লোকদিগের নিকট ভিন্ন সমগ্র উত্তর ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়াছিল। সেইজন্য চন্দ্র রাজা এই অরণ্যসঙ্কুল প্রদেশে আসিয়া শুশুনিয়ার গাত্রে এই লিপি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন সেই দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ আপনাদিগকে কেবলমাত্র পুষ্করণাধিপতি বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। উভয় লিপির অক্ষর ভিন্ন রাখাল বাবু আরও একটা প্রমাণের কথা বলিতে পারিতেন। শুশুনিয়ার চন্দ্রবর্ম্মা ও লৌহস্তম্ভের চন্দ্র' উভয়েই বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। তবে সেটা ততটা প্রবল কথা নহে বলিয়া বোধ হয়, রাখাল বাবু তাহার উল্লেখ করেন নাই। তাহার পর, লৌহস্তম্ভের 'চন্দ্র' সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তির চন্দ্রবর্ম্মা হইতে পারেন না। লৌহস্তম্ভের প্রশস্তিটি চন্দ্র রাজার স্বর্গ-গমনের পর উৎকীর্ণ হয়। তিনি সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক পরাজিত হইলে, সমুদ্রগুপ্ত বা তাঁহার বংশধরেরা কি শত্রুর গুণকীর্ত্তন করিয়া, এই প্রশস্তি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন? এবং তাহাতে নিজেদের গৌরবের কোন কথাই উল্লেখ করেন নাই? সুতরাং লৌহস্তম্ভের 'চন্দ্র'ও সমুদ্রগুপ্তের 'চন্দ্রবর্ম্মার' অভিন্নতা প্রমাণের চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

(৪) এক্ষণে লৌহস্তম্ভ-লিপি সম্বন্ধে আমরা কয়েকটি কথা বলিতেছি। লৌহস্তম্ভ-লিপির অক্ষর কোন্ সময়ের, তাহার উত্তর দিতে আমরা অসমর্থ। কিন্তু তাহার শ্লোকার্থ হইতে আমরা দুইটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। উক্ত শ্লোকে লিখিত আছে যে, বঙ্গদেশে 'চন্দ্র' রাজা সমবেত শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন। এই বঙ্গ কথাটি আমরা প্রাচীন গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাই, তাহার পরবর্ত্তী গ্রন্থ সমূহেও তাহা দেখা যায়। কিন্তু মধ্যবর্ত্তী সময়ে বঙ্গ নামের উল্লেখ দেখা যায় না। সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তি হইতে হিউয়েন সিয়াংএর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পর্য্যন্ত আমরা বঙ্গের উল্লেখ দেখিতে পাই না। সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তিতে সমতট, ডবাক, কামরূপ ইত্যাদি আছে, কিন্তু বঙ্গ নাই। হিউয়েন সিয়াংএর ভ্রমণ বৃত্তান্তে সমতট, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, কামরূপ আছে, বঙ্গ নাই। আমরা অবশ্য বৃহৎ-সংহিতায় বঙ্গ নাম দেখিতে পাই, তাহাতে সমতটও আছে; আর বঙ্গ নাম এখনও পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। কিন্তু গুপ্ত-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সময় হইতে হর্ষ-বর্দ্ধনের সময় পর্য্যন্ত বঙ্গ নামের প্রাধান্য দৃষ্ট হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে চন্দ্ররাজা যে গুপ্ত-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, তাহা অনুমান করিয়া লইতেই হইবে। দ্বিতীয় কথা এই যে, তিনি সিন্ধুর সপ্তমুখ অতিক্রম করিয়া বাহ্লিকদিগকে জয় করিয়াছিলেন। মহাভারতে বাহ্লিক উত্তর দিকে এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণে তাহা অপরান্ত অর্থাৎ পশ্চিম দিগন্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বৃহৎ-সংহিতায়ও বাহ্লিকের উল্লেখ আছে। এই বাহ্লিক আফগানিস্থানের উত্তর বর্ত্তমান বল্‌খের সহিত অভিন্ন বলিয়া স্থির করা হয়। এবং এই বল্‌খে প্রাচীন ব্যাক্‌ট্রিয়া রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। Mr. John Allan তাঁহার Catalogue of the Gupta Dynasties and of Sasanka, king of Ganda নামক গ্রন্থে বাহ্লিক ও বল্‌খ একই বলিয়াছেন, এবং Mr. E. J. Rapson তাঁহার Ancient-India নামক গ্রন্থে বল্‌খেই ব্যাকট্রিয়া রাজ্যের প্রতিষ্ঠা এবং ব্যাকট্রিয়া হইতেই বল্‌খ নামের উৎপত্তি বলিতেছেন। সে যাহা হউক, বাহ্লিক, ব্যাকট্রিয়া ও বল্‌খ যে একই, ইহা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থির করিয়া থাকেন! সুতরাং চন্দ্ররাজা যে বাহ্লিকদিগকে জয় করিয়াছিলেন, এ বাহ্লিকগণ কাহারা, তাহা স্থির করিতে হইবে। আলান সাহেব বাহ্লিককে বল্‌খ বলিলেও চন্দ্ররাজার সিন্ধুর সপ্তমুখ অতিক্রম করিয়া বল্‌খে যাওয়া সম্ভব নহে মনে করিয়া, এই বাহ্লিকদিগকে পহ্লব যবন প্রভৃতির ন্যায় কোন এক দল বিদেশীয় আক্রমণকারী মনে করিয়াছেন। আলান সাহেব সিন্ধুর সপ্তমুখ অর্থে টলেমির লিখিত সিন্ধুর সপ্ত-সঙ্গম মনে করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইংরেজীতে যাহাকে নদীর মুখ বা mouth বলে, সংস্কৃতে মুখ শব্দে তাহা বুঝায় বলিয়া মনে হয় না; সংস্কৃতে মুখ শব্দে আরম্ভ। সুতরাং যে দিক হইতে সিন্ধুর সপ্তমুখ উদ্ভূত হইয়াছে, সেইদিক হইতে চন্দ্ররাজার বল্‌খে যাওয়া সম্ভব হইতে পারে। যদি সপ্তমুখকে সপ্ত-সঙ্গমও ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে যেখানে সিন্ধু সপ্তমুখে সমুদ্রে পড়িয়াছে, তথায় সিন্ধু অতিক্রম করিয়া ক্রমে ক্রমে যে বল্‌খে যাওয়া না যায়, এমন নহে। চন্দ্ররাজা দক্ষিণদিক্ হইতে দিগ্বিজয় আরম্ভ করিয়া ক্রমে উত্তর দিকে বল্‌খে গিয়া পঁহুছিয়া থাকিতেও পারেন। আমরা কিন্তু সিন্ধুর সপ্তমুখ অতিক্রম করার সরল অর্থ এই বুঝি যে, যে সকল নদী লইয়া সিন্ধু সপ্ত-সিন্ধু নামে অভিহিত হইত, সেই সাতটী নদী পার হইয়াই চন্দ্ররাজা বাহ্লিকগণকে জয় করিয়াছিলেন। উদ্ভব-স্থান বা সঙ্গম লইয়া মারামারির প্রয়োজন নাই। আলান সাহেব বাহ্লিকদিগকে যে একদল বৈদেশিক আক্রমণকারী বলিতেছেন, সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তিতে এই বাহ্লিকগণের কোন উল্লেখ নাই। তাহাতে শাহীশাহানশাহী, শক, মুরাণ্ড প্রভৃতির কথা আছে, কিন্তু বাহ্লিকগণের কোনই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না সুতরাং সে সময়ে বাহ্লিকগণের কোনই অস্তিত্ব ছিল না; ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, এবং গুপ্ত-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে যে চন্দ্ররাজা বিদ্যমান ছিলেন, ইহা অস্বীকার করিলে চলিবে না। আমরা র‍্যাপসনের গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি যে, ব্যাকট্রিয়া রাজ্য প্রায় খ্রীঃ পূর্ব্ব ১৩৫ বর্ষ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল; তাহার পর শকগণ কর্ত্তৃক তাহার ধ্বংস হয়। ব্যাক্‌ট্রিয়াবাসিগণ তাহার পর হিন্দুকুশের দক্ষিণে কাবুল উপত্যকায় আসিয়া বাস করেন; এবং খৃঃ পূর্ব্ব ২৫ বর্ষে কুষণগণকর্ত্তৃক তাঁহাদের অস্তিত্ব লোপ ঘটে। বাহ্লিক, ব্যাকট্রিয়া ও বল্‌খ একই হইলে, ব্যাকট্রিয়াবাসিগণকে বাহ্লিক বলা যাইতে পারে। এবং যতদিন পর্য্যন্ত

তাঁহাদের অস্তিত্ব ছিল, সেই সময়ে চন্দ্ররাজা তাঁহাদিগকে জয় করিয়াছিলেন, এইরূপ স্থির করিলে সকল বিষয়েরই সামঞ্জস্য হইয়া যায়। চন্দ্ররাজা বল্‌খে গিয়া বাহ্লিকদিগকে জয় না করিলেও কাবুল উপত্যকায় তাঁহাদিগকে যে জয় করিয়াছিলেন, ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কাজেই অন্ততঃ খৃঃ পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে যে চন্দ্ররাজা বিদ্যমান ছিলেন, ইহা স্থির করা যাইতে পারে। যাঁহারা চন্দ্ররাজাকে গুপ্তবংশের প্রথম চন্দ্রগুপ্ত বা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন,তাঁহাদের সেরূপ কারণ স্বীকারের আর প্রয়োজন হয় না। Mr. Fleet চন্দ্ররাজাকে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত স্থির করিতে গিয়া, শক বিজয়ের যে উল্লেখ পান নাই, চন্দ্ররাজাকে আরও কিছুদিনের পূর্ব্ববর্ত্তী মনে করিলে, তাঁহার আর কোনই সন্দেহ উঠিত না। কিন্তু অক্ষর-বিজ্ঞানানুসারে চন্দ্ররাজার সময় কিরূপ স্থির হয়, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে লৌহ-স্তম্ভলিপি যে গুপ্ত-লিপির মধ্যে প্রাচীন, তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ স্বীকার করিয়া থাকেন। কোন্ সময় হইতে কোন্ লিপি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা অক্ষর-বিজ্ঞানে কিরূপে স্থির হয়, তাহা আমরা অবগত নহি। তবে এটুকু বোধ হয় বলিতে পারি যে, কোন একটা লিপি সহসা প্রবর্ত্তিত হয় না, ইহা যদি কোন বিজ্ঞানে বলে, তবে সে বিজ্ঞানে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিতে অক্ষম। গুপ্ত সম্রাটগণ যে লিপি ব্যবহার করিয়াছিলেন, কয়েক শত বর্ষ পূর্ব্বে যে তাহা প্রবর্ত্তিত হয় নাই, এ কথা কে সাহস করিয়া বলিতে পারে? আর এক সময়ে বিভিন্ন প্রকারের লিপি যে থাকিতে পারে না, ইহাই বা কে বিশ্বাস করিবে? আমাদের কথা এই যে, অক্ষর-বিজ্ঞানের ন্যায় শব্দার্থ-বিজ্ঞানও আছে। একটাকে উড়াইয়া দিয়া আর একটার প্রাধান্য দিলে, সত্য নির্দ্ধারিত হয় না বলিয়া আমরা মনে করি। যেখানে দুইটার সামঞ্জস্য হয়, সেইখানেই সত্যের নির্দ্ধারণ হয়।

৫। এক্ষণে শুশুনিয়া-লিপির চন্দ্রবর্ম্মা সম্বন্ধে আমরা দুই একটী কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। উক্ত লিপির প্রথমে লিখিত আছে যে,'চক্রস্বামিনঃ দাসাগ্রেণাতিসৃষ্টঃ' অর্থাৎ চক্রস্বামীর দাসাগ্রণী কর্ত্তৃক উৎসর্গীকৃত এবং শেষভাগে লিখিত আছে, "শ্রীচন্দ্রবর্ম্মণঃ কৃতেঃ" অর্থাৎ শ্রীচন্দ্রবর্ম্মার অনুষ্ঠানে। এক্ষণে দেখা যাউক, চন্দ্রবর্ম্মার অনুষ্ঠানটি কি, এবং তিনি কি উৎসর্গ করিতেছেন? রাখাল বাবু লিখিয়াছেন যে, শুশুনিয়া শৈলের যেখানে লিপিটি খোদিত আছে, তথায় পূর্ব্বে একটি গুহা ছিল; ক্রমে সেটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমরাও সে স্থান দেখিয়া তাহাই মনে করি। চন্দ্রবর্ম্মা যাহা উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা সেই গুহাটি, এবং তাহাই তাঁহার কৃতি বা অনুষ্ঠান। অবশ্য খোদিত-লিপিকে তাঁহার অনুষ্ঠান বা তাহা তিনি উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এরূপ বলা যাইতে পারে না। শুশুনিয়া পর্ব্বতে একটি গুহা খোদিত করিয়া চন্দ্রবর্ম্মা তাহা উৎসর্গ করিয়াছিলেন, ইহাই খোদিত-লিপির প্রকৃত অর্থ। স্থানীয় প্রবাদও তাহার সমর্থন করে। স্থানীয় প্রবাদ আছে যে, পূর্ব্বে সেই স্থানে বশিষ্ঠ, পরাশরাদি ঋষি বাস করিতেন, এবং 'চন্দ্র সূর্য্যের' জন্য সেখানকার অন্ধকার বিনষ্ট হইত। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, সেই গুহা সাধুসন্ন্যাসীদের বাসস্থান ছিল, এবং তাঁহাদেরই বাসের জন্য চন্দ্রবর্ম্মা তাহা খোদিত করিয়া উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন। গুহাটি যদি স্বাভাবিকও হয়,চন্দ্রবর্ম্মা তাহাকে যে সাধুসন্ন্যাসীর বাসোপযোগী করিয়া দিয়াছিলেন, খোদিত-লিপি হইতে তাহাও বুঝিয়া লওয়া যায়। সুতরাং এ চন্দ্রবর্ম্মা কে, ইহা হইতে তাহাও বুঝা যায়। এই গুহাটি যাঁহার কৃতি, তিনি যে কোন দিগ্বিজয়ী রাজা, তাহা বুঝা যায় না। তাহা হইলে তাঁহার অন্যান্য কোন কৃতির কথা কি উল্লিখিত থাকিত না? একমাত্র এই গুহা-নির্ম্মাণের কথাটিই থাকিয়া গেল? আর শুশুনিয়ার এমন কি মাহাত্ম্য ছিল, যাহাতে একটি গুহা নির্ম্মাণের জন্য বহু দূরদেশ হইতে কোন দিগ্বিজয়ী রাজাকে আকর্ষণ করিয়াছিল? পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এই অরণ্যসঙ্কুল প্রদেশে এমন কোন রাজ্য ছিল না যে, তজ্জন্য কোন দিগ্বিজয়ী সম্রাটকে কষ্ট স্বীকার করিয়া সেখানে আসিতে হইবে। কাজেই কোন দিগ্বিজয়ী রাজার দিগ্বিজয়কালে শুশুনিয়ার ন্যায় একটি ক্ষুদ্র শৈলে যে এই গুহাটির অনুষ্ঠান হইয়াছিল এবং তিনি কেবলমাত্র এই অনুষ্ঠানটির কথা উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, এরূপ মনে করা যায় না। কাজেই বিবেচনা করিতে হইবে যে, চন্দ্রবর্ম্মা শুশুনিয়ার নিকটস্থ কোন রাজা; অবশ্য তিনি মহারাজ ছিলেন; কিন্তু শুশুনিয়ার গুহা ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন কৃতির পরিচয় নাই। অনুসন্ধান করিলে, শুশুনিয়ার নিকটেই পুষ্করণার আবিষ্কার হইতে পারে।

গৌরীশৃঙ্গের পথে

শ্রীগৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

“হিমালয়” ও “হিমাদ্রির” যিনি মালিক, তাঁহারই সম্পাদিত পত্রে “গৌরীশৃঙ্গের” অবতারণা স্বতঃই সঙ্গত। অতল সলিল-গর্ভে যেরূপ রাশি-রাশি অমূল্য দ্রব্যাদি লুক্কায়িত রহিয়াছে, অসীম হিমাদ্রি-ক্রোড়েও সেইরূপ মহামূল্য

পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত গৌরীশৃঙ্গ (দশমাইল দূর হইতে গৌরীশৃঙ্গকে এইরূপ দেখায়।)

অভ্রভেদী পর্ব্বতের পশ্চিম শিখর

মঠের দেওয়ালের নিকট হইতে শেখর জঙ্গের দৃশ্য [বামদিকে অভিযানের তাঁবু ও কৃষিক্ষেত্র ।]

গৌরীশৃঙ্গ (দক্ষিণে ৩ নং ক্যাম্প । এখান হইতে অভিযান গৌরীশৃঙ্গে আরোহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ।)

হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ—(২৯০০২ ফিট) [৩নং ক্যাম্প হইতে সকলে এক-সঙ্গে যাত্রা করেন। ২৩০০০ ফিট উচ্চে অভিযান দুই দলে বিভক্ত হইয়া পাশাপাশি থাকিয়াই স্বতন্ত্রভাবে যাত্রা করেন। ২৬০০০ ফিট উঠিয়া দুই দল ডাইনে ও বাঁয়ে দুই দিকে গমন করিতে থাকেন। দক্ষিণের দলে ব্রুস ও ফিঞ্চ ২৭৩০০ ফিট পর্য্যন্ত উঠিয়াছিলেন। বামদিকের দলে ম্যালরী, সমারভেল ও নর্টন ২৬৮০০ ফিট পর্য্যন্ত উঠিতে পারেন। পরে সকলে ২৩০০০ ফিট নীচে ৪ নং ক্যাম্পে ফিরিয়া আসেন)
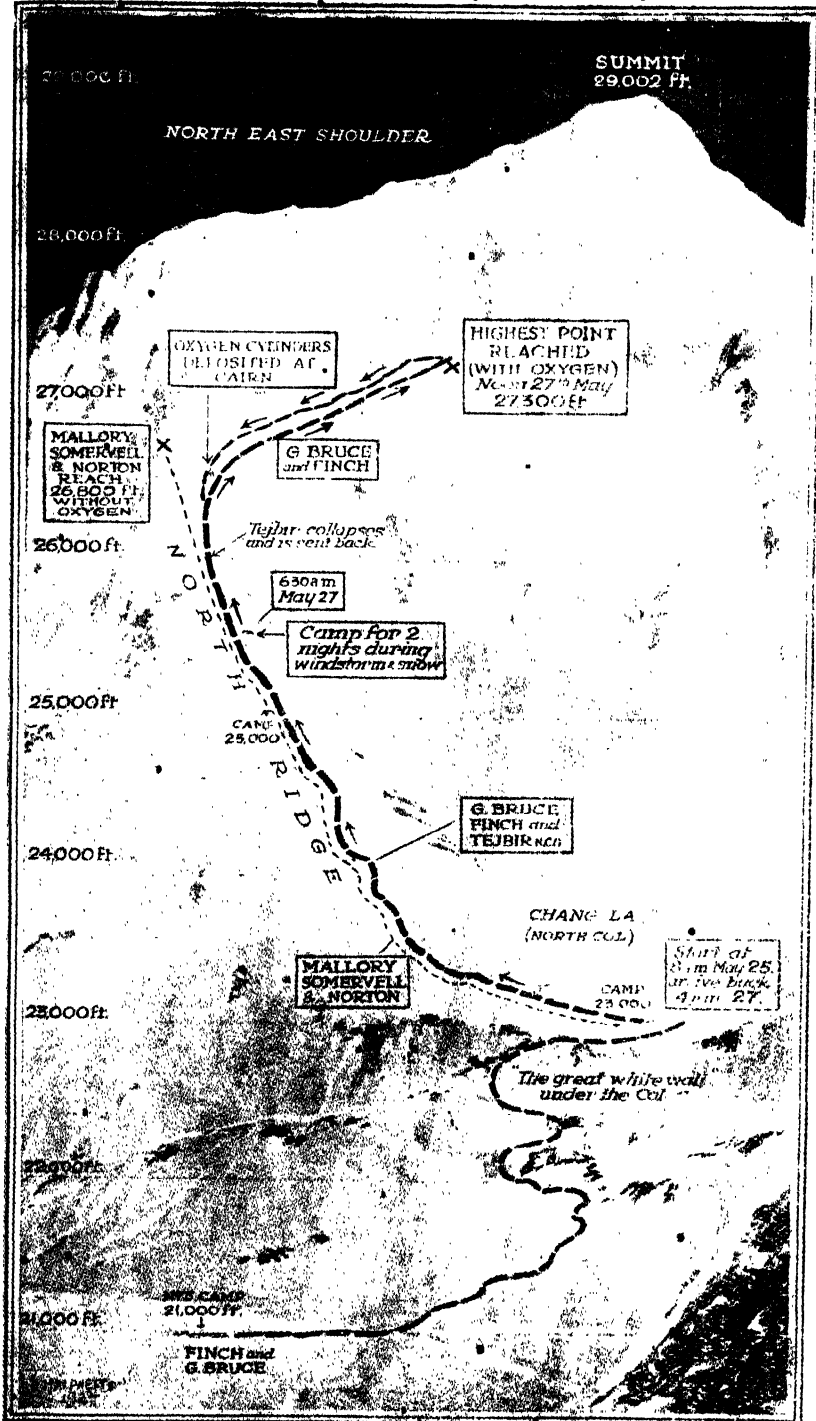
রত্নরাজি আশ্রয় লইয়াছে। সাগরের সৌন্দর্য্য-গান অনেকেই গাহিয়াছেন,—অনেকেই বলিয়াছেন সাগর সৌন্দর্য্যের খনি। তেমনি "হিমালয়ে"ও আমরা দেখিয়াছি যে, হিমালয়ও সৌন্দর্য্যের খনি।

জেনারেল ব্রুসের গৌরীশৃঙ্গ বা এভারেষ্ট-অভিযানের বিবরণ নিঃসন্দেহ অনেকেই পড়িয়াছেন ; কিন্তু এই অভিযানে এমন অনেক বিবরণ কোন-কোন সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, যাহা অন্য সকল সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হয় নাই। গত অভিযানে গৌরীশৃঙ্গের শিখরে তাঁহারা উপনীত হইতে পারেন নাই ; তাই এবার এখন হইতেই নূতন উদ্যমের সাড়া পড়িয়াছে। এবারকার অভিযানের প্রত্যাবর্ত্তনে পর যে বিবরণ-গ্রন্থ বাহির হইবে, তাহা সমগ্র জগতে সম্পূর্ণ অভিনব রূপে সকলের বিস্ময়-দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

অভিযান, কোন্ তারিখে কোথায় শিবির-সন্নিবেশ করিলেন, বা কোন্ দিন কত মাইল পার হইলেন, অথবা কোথায় ভোজনের পারিপাট্য কিরূপ, হইল তাহা অনেকেই পড়িয়াছেন ;

সুতরাং আমরা তাহা নির্ভয়ে নাকচ করিয়া, অন্য কথার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলাম।

অভিযান গৌরী-শৃঙ্গের শিখরে আরোহণ করিতে পারিলে, জগতকে বিস্মিত করিবেন, কারণ এরূপ "অভ্রভেদী ধবল-শৃঙ্গ" জগতে আর নাই। ইহার অধুনাতন উচ্চতা যৎকিঞ্চিৎ অধিক হইলেও, ইহার সর্ব্বজনবিদিত উচ্চতা ২৯০০২ ফিট। তন্মধ্যে গতবার ১৭০০ফিট মাত্র উঠিতে বাকী ছিল। প্রায় শতাব্দী পূর্ব্বে এই উচ্চতা নির্দ্ধারিত হয়; এবং তাহা করেন বাঙ্গালী রাধানাথ। তাই আমাদের কাছে ইহা বিচিত্র ও বিস্ময়কর। রাধানাথ, যোড়া-

অক্সিজেনের আধার সহ মেসার্স ক্রস ও ফিঞ্চ। [অক্সিজেনের সাহায্যে তাঁহারা ২৭২০০ ফিট পর্য্যন্ত উঠিয়াছিলেন।]

সাঁকো, কলিকাতায় ১৮১৩ খৃঃ এক ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা তিতুরাম শিকদার, প্রথমে মুসলমানের আমলে ও পরে কোম্পানীর আমলে কলিকাতায় কোতোয়াল ছিলেন। শিক্ষা শেষ করিয়া রাধানাথ ভারত-সরকারের জরিপ-বিভাগে প্রবেশ করেন; এবং মিঃ টিট্‌লার ও কর্ণেল এভারেষ্টের নিকট উচ্চাঙ্গের গণিত শিক্ষা করেন। এই জরীপ সংক্রান্ত কার্য্যে তিনি কখন স্বাধীন ভাবে ও কখনও বা কর্ণেল এভারেষ্টের সমভিব্যাহারে হিমালয়ের

পূর্ব্ব রংবাকের হিমশিলা। (তিব্বতী কুলীরা ২ নং ক্যাম্পে আসিতেছে)

তিব্বতের একটী উপত্যকার কষিত ক্ষেত্র। [এই স্থান এভারেষ্টের পশ্চিমোত্তর দিকে অবস্থিত। এখানে অভিযানের জন্য একটী ক্যাম্প স্থাপিত হইয়াছে। এখানে হইতে ডয়া লা প্রদেশ দেখা যায়।]

দড়ির সেতু। [একজন তিব্বতী এই দড়ীর সেতু ধরিয়া ঝুলিয় অভিযানের ব্যবহারের জন্য একটী দোলনা আনিতেছে। সেতুটী ধারখা গ্রামে একটী নদীর উপর অবস্থিত।]

দোলনা আরোহণে সেতু পার।

অভিযানের প্রাতরাশ।

নানা নিভৃত স্থান ও শিখরে-শিখরে পরিভ্রমণ করেন। এই সূত্রেই গৌরীশৃঙ্গের উচ্চতা নিরূপিত হয়, এবং ইহা পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ শিখর বলিয়া বিঘোষিত হয়। "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" নামক গ্রন্থে ও তৎপূর্ব্বে Great Trigonometrical Survey of Indiaর রিপোর্টের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে রাধানাথের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

সেদিন একখানি বিলাতী কাগজে পড়িতেছিলাম, নারীর দ্বারা জগতে কত মহাকার্য্য সাধিত হইয়াছে। এই দুরারোহ গৌরীশৃঙ্গে আরোহণ-অভিযানও নারী-প্রসঙ্গ-বিবর্জ্জিত নহে। এক তিব্বতীয়া-রমণী এই বাহিনী সমভিব্যাহারে অতি দুর্গম গিরিকন্দর অতিক্রম করিয়া, দুরন্ত শীত, তুষার-ঝঞ্ঝা তুচ্ছ করিয়া গৌরীপথের যাত্রী হইয়াছিলেন।

আমেরিকায় না কি পথিপার্শ্বে উপবিষ্ট 'তালি কর্ম্মে' অভিনিবিষ্ট চর্ম্মকার-নন্দনও দেশের 'শিরোমণি' হইবার আশা রাখেন। ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, এথেন্সের বাগ্মী-শ্রেষ্ঠ চর্ম্মকার-প্রবর ক্লেয়ন (Cleon the Tanner) স্বনামধন্য হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হিমাদ্রি অভিযানে এক ভারতীয় চর্ম্মকারও এভারেষ্ট আরোহণের যশের ভাগী। কারমা নামক দোভাষীও তুল্যরূপে উল্লেখযোগ্য। উভয়েরই প্রতিকৃতি পাঠকবর্গের গোচরার্থে এ স্থলেই প্রদত্ত হইল।

কামা উপত্যকার ঢালু পৃষ্ঠে ক্ষুদ্র অরণ্য। মধ্যস্থলে অভিযানের একটী শিবির। চিরতুষারের দেশ ছাড়াইয়া অভিযান এই তাঁবুতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

গৌরী-পথের যাত্রীগণের বর্ণনানুসারে, যে সকল মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁহাদের নয়ন-পথে নিপতিত হইয়াছে, সেরূপ জগতে দুর্ল্লভ। কোথাও "শীর্ষে শুভ্র-তুষার-কিরীট গিরিরাজ" আবার কোথাও রাশি রাশি পুষ্প-পত্রে অপূর্ব্ব শ্রী-মণ্ডিত উপত্যকা-অধিত্যকা। মাঝে-মাঝে বেগবতী ঝরণা বা ক্ষুদ্র তড়াগ, আর তাহারই মাঝে "কোথাও জলে বৃক্ষশাখায় ছোট-বড় বিহঙ্গের কাকলি, যেন কোকিল-মরাল চলে মরালী তা'র পিছে পিছে"। চারিদিকে কূজিত কল্পনার কাশ-কুসুমশোভিত কানন-কুঞ্জ। উপরে

আলো ও ছায়ার, রবিকর ও জলধরের নৃত্যক্রীড়া-বৃষ্টি,—আর "চরণে তাহার কুঞ্জকানন কুসুম-গন্ধ করিছে সৃষ্টি"।

অভিযানের সঙ্গী জুতাপ্রস্তুতকারক।

সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও অভিনব, হিমাচলের অত উর্দ্ধদেশে তাঁহাদের তাপসমণ্ডলীর সাক্ষাৎলাভ। আমাদের পক্ষে না হইলেও য়ুরোপীয়দিগের পক্ষে ইহা প্রায় অচিন্তনীয়। লোকচক্ষুর সম্পূর্ণ অন্তরালে, লোকালয়ের বহুদূরে, নির্জ্জন দুর্গম গিরিশ্রেণীর ঐরূপ নিভৃত কক্ষে এতগুলি তাপস-তাপসীর সমাগম তাঁহারা বিশেষ বিস্ময়ের বিষয় বলিয়া বোধ করেন; কারণ ইতঃপূর্ব্বে তাঁহারা এরূপ স্থানে লোকালয় পাইবার আশা করেন নাই। তথায় তাঁহাদের বিস্ময় আরও বাড়িয়া যায়—এই সকল সাধু-সন্ন্যাসীদের অমায়িক সরল ব্যবহার দর্শনে। তাঁহারা প্রায় সকলেই পলিতকেশ, অথচ বেশ সুস্থ ও সবল। সকলেই জপ-তপ-সাধনা-সঙ্গীতাদি লইয়া ব্যস্ত। তাঁহারা এই গৌরীযাত্রীর মৎস্য বধ করিতে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়াছিলেন; কারণ তাঁহাদের বিশ্বাস যে তপস্বীগণ মানবদেহ পরিত্যাগের পর মুক্তাত্মা হইবার পূর্ব্বে কিছুদিন মীনদেহ ধারণ করিয়া থাকেন। পত্রপুষ্প ফলমূল তথায় যথেষ্ট; গৃহপালিত গো-মৃগাদি পশুও আছে।' ফল, মূল, দুগ্ধই সাধারণতঃ সন্ন্যাসিগণের আহার্য্য।

তুষারপাত তথায় হয় বলিয়া বোধ হয় না; বরং মনে হয়, যেন বৎসরের অধিক সময়ই তথায় বসন্তকাল। অথচ ইহা অপেক্ষা নিম্নস্থানে তুষারপাত হইয়া থাকে। আমরা "হিমালয়ে" পড়িয়াছি যে, বদরিকা হইতে ব্যাস-গুহার পথ বরফাবৃত হইলেও গুহার নিকটবর্ত্তী স্থান তৃণজাতীয় উদ্ভিজ্জে আচ্ছাদিত; ও তাহাতে নানারূপ লাল ফুল ফুটিয়া থাকায়, স্থানটী দেখিতে অতি সুন্দর—যেন কার্পেটের উপর সবুজ লালের কাজ করা। সুতরাং গৌরী-পথের যাত্রিগণ কথিত এই তাপস-গ্রামের এইরূপ দৃশ্য সম্পূর্ণ ই সম্ভব। এ স্থানটীর দৃশ্য না কি অতি মনোহর।

আরও অধিক বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তথায় ব্যাঘ্রাদিও আছে কিন্তু তাহারা হিংসা জানে না—মৃগাদি বধও করে

অভিযানের সঙ্গী দোভাষী—কারমা

না। পক্ষান্তরে এই সকল মৃগ নূতন লোকজন দেখিয়া বা অন্য কারণে ভয় পাইয়া পলায়নও করে না। তবে ইহাই কি পুরাকালের তপোবনের ছায়া! আর এই সবই কি আশ্রম-মৃগ!

কোন বিলাতী সংবাদপত্র কিন্তু এই প্রসঙ্গে ভারতের

সন্ন্যাসিগণের Hypnotic powerএর বাহাদুরী দিয়া, 'বাঘ-বকরির' একত্র জলপানের ইঙ্গিত করিয়া, বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার অধিক ভাবিবার অবকাশ বোধ হয় তাঁহাদের নাই।

তিব্বতীগণের বিশ্বাস যে, বহু পূর্ব্বকালে তাঁহাদের ধর্ম্মগুরু একমাত্র রাম্পোচিই গৌরীশৃঙ্গে যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন,—তাহাও দৈববলে। প্রবাদ, একটী আলোর জ্যোতিঃর সাহায্যে তিনি তথায় উপনীত হন। দৈববল ব্যতিরেকে কেহ তথায় যাইতে সমর্থ নহে। পর্ব্বত ইহাতে শক্রতা সাধন করে। কিন্তু দৈববলে বলীয়ান মহাত্মগণের কোনরূপ অনিষ্ট করা ইহার সাধ্যাতীত। রাম্পোচি সম্বন্ধে তিব্বতীগণ বলে যে, ইনি একজন ভারতীয় পণ্ডিত এবং তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার কার্য্যের একজন প্রধান পাণ্ডা। যিনি পুনরায় গৌরীশৃঙ্গে পৌছিতে পারিবেন, তিনি হয় পূর্ব্বে রাম্পোচি ছিলেন, নতুবা তিনি রাম্পোচির বিশেষ অনুগৃহীত। যে সকল তিব্বতীয় এই অভিযানের সংবাদ রাখে, তাহারা জেনারেল ব্রুসের সুন্দর স্বভাবগুণে, ও এরূপ শিকারলভ্য স্থানে তাঁহার শিকার-বিমুখ অহিংস ভাব দেখিয়া, তাঁহাকে রাম্পোচির অনুগৃহীত বলিয়া অনুমান করে; ও বিশ্বাস করে যে পরবর্ত্তী, অভিযান নিঃসন্দেহ গৌরী-শিখরে উপনীত হইতে সমর্থ হইবে।

রাম্পোচি প্রসঙ্গে তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম্মে বাঙালীর প্রভাব উল্লেখযোগ্য। রাম্পোচিকে তাহারা ভারতীয় পণ্ডিত বলিয়া উল্লেখ করে। অনেক বাঙালী পণ্ডিত তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তারকল্পে যথেষ্ট সহায়তা করেন; এবং অনেকে তথায় গুরুপদে প্রতিষ্ঠিতও হন। তন্মধ্যে বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধদীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। ইনি স্বদেশে (বিক্রমপুরে) বৌদ্ধধর্ম্মে আস্থা হেতু নাস্তিক ভট্টাচার্য্য নামে অভিহিত হইতেন। বৎসরাধিক পূর্ব্বে "দৈনিক সংবাদপত্রে" একাধিক প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল ও তাহাতে তিব্বতের ধর্ম্ম, শিক্ষা ও সভ্যতায় বাঙালীর প্রভাব কতদূর বিদ্যমান, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছিল।

একটী ঘটনা ব্যতীত অভিযানের কার্য্যে কোনরূপ দুর্ব্বিপাক ঘটে নাই। সে ঘটনা সাত জন দেশীয় কর্ম্মীর আকস্মিক মৃত্যু। গৌরীশৃঙ্গের আরোহণ-ইতিহাসে তাহাদের নাম চিরদিন জাজ্জ্বল্যমান থাকিবে। পর্ব্বতের ঐ অংশের অভিভাবক রংবাকের লামা মহাশয় উপস্থিত থাকিয়া উহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করায়, এই অভিযান কার্য্যে অন্যান্য সকলের সহানুভূতি যথেষ্ঠ বর্দ্ধিত হয়। এরূপ স্থানে ও এরূপ ক্ষেত্রে লামার উপস্থিতি অশেষ মঙ্গলসূচক ও দৈবব্যবস্থিত। তাহাদের মতে পর্ব্বতও দেবতা এবং মধ্যে মধ্যে বলির প্রার্থী। এই বলির পর গৌরীশৃঙ্গের পথ আর তাঁহাদের নিকট দুরধিগম্য হইবে না।*

* এই প্রবন্ধের ছবিগুলি 'Illustrated London News' ও 'Sphere' হইতে গৃহীত হইয়াছে; এই জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

ব্রহ্মদেশে

কবিশেখর শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ

"In this delicious orient clime
Beauty flows around."—*Derozio.*

অপ্সরার লীলাভূমি ইরাবতী তীরে,
কে রচিল এ বিচিত্র শোভন উদ্যান?
নিকুঞ্জে দেউলে মঠে রাখিয়াছে ঘিরে,
মর্ত্ত্যে বৈজয়ন্ত সম অতি রম্য স্থান!
কুসুম-স্তবক-রূপী দারু হর্ম্ম্যাবলী,
অধিষ্ঠিতা শিল্পলক্ষ্মী ধরণী মাঝারে!
সঙ্গীত উচ্ছ্বাস—যেন বিহঙ্গ-কাকলী—
নাট্যের মণ্ডপে নিত্য উথলে ঝঙ্কারে!
তরুণী মোহিনী লক্ষ রূপসীর মেলা,
তরুণ যৌবন-রাগ অরুণ বরণ;
সুনীল আকাশে যেন বিদ্যুতের খেলা,
মরি কি উজ্জ্বল লোল কুরঙ্গী-নয়ন!
ফিরিনু স্বদেশে লয়ে স্মৃতির সম্ভার,
রবে আঁকা চিত্তপটে চিত্র সুষমার!

অমূল তরু

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(১৪)

বেলা নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। সুনীতি সবে মাত্র স্নানাগার হইতে আসিয়া তাহার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে, এমন সময় যোগেশ আসিয়া তাহার হস্তে সুবোধের পত্র দিল।

সুবোধের পত্র পাইয়া সুনীতির মন আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এত অসুখের মধ্যেও এত শীঘ্র উত্তর! হায় এ প্রেম যেমন অমূল্য,—তেমনি অমূলক! এ যদি মিথ্যা না হইত, অভিনয় না হইত!

সুবোধ কেমন আছে জানিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া তাড়াতাড়ি সুনীতি পত্র খুলিল। কিন্তু পত্র দেখিয়া ও পড়িয়া তাহার সরক্ত উজ্জ্বল মুখ শিশার মত পাংশু হইয়া গেল। সে ধীরে-ধীরে একটা নিকটবর্ত্তী চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

যোগেশ উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, "কি হয়েছে সেজদিদি? সুবোধবাবুর অসুখ বেশী না কি?"

সুনীতি তাহার ক্লিষ্ট-কাতর নেত্র যোগেশের প্রতি কোন প্রকারে তুলিয়া অন্যমনস্ক ভাবে কহিল, "হ্যাঁ, খুব বেশী।"

সুবোধের জন্য যত না হউক, সুনীতির জন্য যোগেশের মন বিষণ্ণ ও চিন্তিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সান্ত্বনার কোন বাক্যই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া যোগেশ কহিল, "আচ্ছা সেজদি, সুবোধ-বাবুকে দেখ্‌তে গেলে হয় না?"

এত দুঃখের মধ্যেও সুনীতির মুখে মৃদুহাস্য স্ফুরিত হইল। বলিল, "কে যাবে রে? তুই, না আমি?"

কথাটা যে একটা দুরূহ সমস্যা, যোগেশ তাহা বুঝিতে পারিল। সে কোন উত্তর না দিয়া নিঃশব্দে চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার পর সহসা চকিত হইয়া উঠিয়া কহিল, "সেজদি, একটা টাকা দেবে?"

সুনীতি মুখ তুলিয়া কহিল, "কেন?"

"কালীতলায় মানত করে আসব।"

এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া, সুনীতি উঠিয়া, তাহার বাক্স হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া আনিয়া, যোগেশের হস্তে দিয়া কহিল, "কিন্তু দেখিস ভাই, কেউ যেন টের না পায়।"

"না, কেউ পাবে না," বলিয়া যোগেশ সত্বর ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

যোগেশ চলিয়া গেলে সুনীতি পুনরায় সুবোধের চিঠি খুলিয়া পড়িতে বসিল। প্রথমবারে সে চিঠিখানার উপর অতি দ্রুতগতিতে দৃষ্টি বুলাইয়া গিয়াছিল,—এবার সে প্রত্যেক বাক্য ভাল করিয়া পড়িতে লাগিল।

"সুচরিতাষু,

ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়েছে,—আপনার দিদিকে যে চিঠি লিখেছিলেন, ভুলক্রমে সে চিঠি আমার নামের খামের মধ্যে আমার হাতে এসে পড়েছে। আমি সে চিঠি আদ্যন্ত পড়েছি।

আপনার চিঠি যে সংবাদ আমার কাছে প্রকাশ করেছে, তার দ্বারা আমার কতখানি লাভ-লোকসান হল, সে আলোচনা করবার উপস্থিত আমার সাধ্যও নেই, প্রবৃত্তিও নেই; আর সে বিষয়ে আমি নিজেও ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছিনে। শুধু এইমাত্র বুঝতে পারছি যে, আপনার চিঠি পড়ার পর থেকে আমার মাথার মধ্যে বুদ্ধি আর চৈতন্য এমনভাবে ওলট-পালট হয়ে আসছে, যে অনতি-বিলম্বে উভয়েই বোধ হয় আমার মস্তিষ্ককে পরিত্যাগ করবে। তার জন্যে দুঃখ নেই,—যদি চিরকালের জন্যে পরিত্যাগ করে যায়, তার জন্যেও দুঃখ নেই; দুঃখ শুধু তা হলেই হবে, যদি আপনার সহানুভূতির জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাবার আগেই তারা আমাকে পরিত্যাগ করে যায়। কিন্তু জগতের মঙ্গলের জন্য আজ আমি এই প্রার্থনা করছি যে, আর যেন কখনও কোন হতভাগ্যকে এমন নিষ্ঠুর নির্ম্মম সহানুভূতি না পেতে হয়! তবুও আপনাকে, ধন্যবাদ, আপনার ছুরীর মুখে যে একবিন্দু সুধা লাগিয়ে দিয়েছেন, তার জন্য আমার কৃতজ্ঞতা জানবেন!

আপনার সহিত আমার কোন দিক থেকেই কোন সম্পর্ক নেই—এ কথা জানার পর, শুধু এই ধন্যবাদ জানান ছাড়া আপনাকে চিঠি লেখবার আর আমার কোন অধিকারই রইল না। অতএব আমাদের অবাস্তব অলীক আত্মীয়তার এই হোল শেষ পত্র। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। ইতি——

নিবেদক—

শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বিস্ময়-বিহ্বল নেত্রে সুনীতি চিঠিখানার দীর্ঘ ও বক্র অক্ষরগুলার প্রতি চাহিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। দেহ ও মনের কত প্রবল বেদনায় সুবোধের পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষর অমন বিসদৃশ আকৃতি ধারণ করিয়াছে, সে কথা বুঝিতে তাহার একটুও বিলম্ব হইল না। তদুপরি, তাহারই অসাবধানতা ও অসতর্কতায় রোগ-যন্ত্রণার উপর সুবোধকে এই দুর্বিষহ মানসিক ক্লেশ ভোগ করিতে হইল ভাবিয়া, সুনীতির হৃদয় দুঃখ ও অনুতাপে ভরিয়া উঠিল। নিদ্রাচ্ছন্নতায় ভুল করিয়া পানীয় ঔষধের পরিবর্ত্তে মালিসের ঔষধ খাওয়াইয়া রোগীকে মারিলে শুশ্রূষাকারীর চিত্তে যেরূপ গ্লানি হয়, সুনীতির অন্তঃকরণেও ঠিক তদনুরূপ একটা গ্লানি উপস্থিত হইল। প্রতারণা এবং মিথ্যার সহায়তায় যে অবাস্তব এবং অলীক অবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল, এবং যাহা নষ্ট করিবার জন্য সে নিজেই কয়েকদিন হইতে ব্যগ্র হইতেছিল, তাহাকে এইরূপে নিজহস্তে বিনষ্ট করিয়া প্রথমটা তাহার মন সূক্ষ্ম কিন্তু দুর্ব্বার অনুশোচনা ও নৈরাশ্যে ভরিয়া গেল। হৃদয়ের কোন প্রদেশে, কেমন করিয়া যে এই দুঃখ ও গ্লানি মূল নিহিত ছিল, তাহা সে বুঝিল না; কিন্তু নিহিত যে ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করিয়া, একটা উপায়-বিহীন অনির্ব্বচনীয় বিমূঢ়তায় সে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তাহার পর ক্রমশঃ যখন সে এই সদ্যলব্ধ অপ্রত্যাশিত আঘাত হইতে আরোগ্য লাভ করিতে লাগিল, তখন, বহু দিবসের আশাহীন মুমূর্ষু রোগীর মৃত্যু ঘটিলে, শোকের মধ্যেও আত্মীয়বর্গ যেমন একটা মুক্তিলাভের ক্ষীণ আনন্দ বোধ করে, তেমনি সে তাহার এই দুর্ব্বহ ক্ষোভ ও লজ্জারই সহিত একটা স্বস্তিও বোধ করিতে লাগিল। চিঠি পাঠাইবার তাহার এই সামান্য ভুল এতদিনের বৃহৎ এবং বিকট ভুলকে কেমন অবলীলাক্রমে সংশোধিত করিয়া দিল! সুরমা তাহার পত্র পাইয়া বিনোদকে অনুরোধ করিয়া পত্র দিবে, এবং তদনুযায়ী বিনোদ কার্য্য করিবে, এই দীর্ঘ এবং অনিশ্চিত প্রণালী এত সহজে এবং শীঘ্র সম্পন্ন হওয়ায়, সুনীতি মনে-মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিল।

কিন্তু বেলা দশটার সময়ে যখন বিনোদ আসিয়া সুবোধের অবস্থা জানাইল, তখন সুনীতির মনে আর কোন শান্তি বা সান্ত্বনা রহিল না। সে দুঃখে এবং ভয়ে একেবারে কাঠ হইয়া গেল। সুবোধের এই আকস্মিক রোগবৃদ্ধির জন্য সে-ই যে দায়ী, তদ্বিষয়ে তাহার কোন সন্দেহই ছিল না।

চিন্তিত হইয়া সুমতি বলিল, "এ অবস্থায় সুবোধবাবুর বাড়ীতে খবর দেওয়াই ত উচিত বিনোদ?"

বিনোদ উদ্বিগ্ন ভাবে কহিল, "সুবোধের দাদাকে টেলিগ্রাম করেই আপনাদের এখানে আসছি। কিন্তু খুব শীঘ্র এলেও কাল সকালের আগে ত কেউ সেখান থেকে এসে পৌঁছচ্ছে না। সমস্ত রাত কি করে একা সামলাই, তা ভেবে পাচ্ছিনে। একজনের দ্বারা এ রোগীর সেবা হওয়া অসম্ভব। ডাক্তার বলেছেন, রীতিমত সেবা ভিন্ন এ রোগের আর অন্য চিকিৎসা নেই; তাই তিনি একজন নার্স ঠিক করতে বলেছেন। দুজন নার্সের কাছে গিয়েছিলাম, কিন্তু পুরুষ মানুষের মেস্—স্ত্রীলোক বাড়ীতে নেই বলে, তাদের মধ্যে একজনও রাত্রে থাকতে স্বীকার হ'ল না। তাই আপনাদের কাছে এসেছি; সেবার মার অসুখের সময়ে যে নার্স কয়েকদিন ছিল, সে ত আপনাদের চেনা,—তাকে যদি ঠিক করে দেন।"

সুমতি কহিল, "হ্যাঁ—সে লোকটিও ভাল ছিল, কিন্তু তাকে ত পাওয়া যাবে না,—সে এখন কোন্ হাঁসপাতালে চাকরী নিয়েছে।"

"আর কাউকে আপনারা জানেন না?"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সুমতি কহিল, "হ্যাঁ আরও একজনকে জানি, কিন্তু তাকে দিয়ে ভরসা হয় না। শুনেছি, তারই দোষে মিত্তিরদের বাড়ীর একটি রোগী মারা গিয়েছিল।"

সুমতির কথা শুনিয়া নৈরাশ্যব্যঞ্জক স্বরে বিনোদ কহিল, "তাই ত! তবে দেখছি আর কোন উপায় নেই।"

সুনীতি এতক্ষণ নীরবে সুমতি ও বিনোদের কথোপ-

কথন শুনিতেছিল; এবার সে কথা কহিল। মৃদু অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে সে বলিল, "উপায় আছে মেজজামাইবাবু। আমাকে নিয়ে চলুন, আমার দ্বারা আপনি অনেক সাহায্য পাবেন।"

সুনীতির প্রস্তাবে বিনোদ ও সুমতি উভয়েই বিস্মিত হইল। বিনোদ সবিস্ময়ে কহিল, "তুমি যাবে! তা কি করে হয় সুনীতি?"

অবিচলিত স্বরে সুনীতি কহিল, "নিয়ে গেলেই ত' হয়।"

একটু ইতস্ততঃ সহকারে বিনোদ কহিল, "নিয়ে গেলেই হয়, কিন্তু—" তাহার পর আর কোন কথা যোগাইল না।

সুনীতি আর্ত্ত-স্মিত মুখে কহিল, "কিন্তু নিয়ে যাবার কোন বাধা নেই।"

সুমতি চিন্তিত ভাবে ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "আমারও মনে হচ্ছে নীতি, তোর যাওয়া বোধ হয় ভাল হবে না।"

সুনীতির দুঃখ-মলিন চক্ষু নিমেষের জন্য একবার দীপ্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু তখনি সংযত হইয়া শান্তকণ্ঠে সে বলিল, "পরিচিত শঙ্কটাপন্ন রোগীর সেবা করা, আর অসহায় মেজ-জামাইবাবুকে সাহায্য করা—এ দুটো কাজের কোন্‌টা মন্দ, তা যদি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পার দিদি, তাহলে আমি নিশ্চয়ই যাব না।"

ব্যাপারটাকে এরূপ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখানর পর, সুমতির মুখে আর কোনও উত্তর আসিল না। তাহা ছাড়া, সুনীতির ব্যথিত-বিদ্ধ হৃদয়ের বেদনা উপলব্ধি করিয়া উত্তর দিতে তাহার প্রবৃত্তিও হইল না।

বিনোদ স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, "আর কিছু নয় সুনীতি! সেটা ত গৃহস্থের বাড়ী নয়, মেস্; মেসে তোমার যাওয়া ভাল হবে কি?"

এবার একটু উত্তপ্ত হইয়া সুনীতি কহিল, "মেস্, তা আমি জানি, মেজজামাইবাবু! কিন্তু, আমি ত আর অজানা নার্স নই যে, সে কারণে আমার আপত্তি হবে! তা ছাড়া, মেসে এখন আছে কে? এক আপনি, আর দ্বিতীয় সুবোধবাবু—যাঁর সেবার জন্যে যাওয়া।"

বিনোদ একটু চিন্তা করিয়া কহিল, "কিন্তু এর মধ্যে যে আর একটা কথা আছে। সুবোধ এখন অবশ্য অচৈতন্য রয়েছে,—কিন্তু তার যখন জ্ঞান হবে, তখন তোমার কি পরিচয় তাঁর কাছে দোব?"

সুনীতির বিষণ্ণ মুখে বিদ্রূপের ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠিল; কহিল, "এখনও কি সুবোধবাবুকে ঠকাবার মতলব রয়েছে মেজজামাইবাবু?"

বিনোদ ব্যগ্র হইয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "একটুও না সুনীতি, একটুও না! সুবোধ ভাল হয়ে উঠুক, এ ছাড়া আমি আর কিছু চাইনে। কিন্তু তার যখন জ্ঞান হবে, তখনি তোমার যথার্থ পরিচয় তাকে দেওয়া ভাল হবে না,—এ কথা বুঝতে পারছ ত?"

বিনোদের কথা শুনিয়া সুনীতি ঈষৎ চিন্তিত হইল। কথাটা শুধু সত্যই নয়,—সে এ যাবৎ এ কথা ভাবিয়াও দেখে নাই।

সুমতি কহিল, "সে অবস্থায় নার্স বলে পরিচয় দিলেও ত' চল্‌তে পারে।"

সুমতির কথায় একটা অপরিমেয় ঘৃণা ও বিরক্তিতে সুনীতির মন কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। ছি, ছি, আবার সেই প্রতারণা! একটা ছলনার অভিনয় শেষ হইতে না হইতে আবার আর একটা অভিনয় আরম্ভ করা!

মুখে কিন্তু সে কথার প্রতিবাদ না করিয়া সুনীতি কহিল, "আমার কোন পরিচয়ই দেবার দরকার হবে না। প্রথমতঃ, হঠাৎ সুবোধবাবুর জ্ঞান হলে, আর আমি তাঁর সামনে বার হব না! দ্বিতীয়তঃ, সুবোধবাবুর দাদা এসে পড়লে, আমার সেখানে থাকবার দরকার হবে না।"

আরও কিছুক্ষণ তর্ক ও আলোচনা করিয়াও সুনীতিকে নিরস্ত করা গেল না। তাহার সরল উক্তি ও সরল যুক্তির নিকট বিনোদ ও সুমতির প্রতিবাদ ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ এবং শক্তিহীন হইয়া আসিতেছিল; উদার এবং উন্মুক্ত আত্মোৎসর্গকে অস্পষ্ট সংশয় এবং অনুদার সম্ভাবনার আশঙ্কায় রোধ করিতে তাহারা অন্তরের মধ্যে একটা হীনতার বেদনা বোধ করিতে লাগিল। তাহা ছাড়া, মুখে আপত্তি করিলেও, নিতান্ত দুস্থ ও অসহায় অবস্থায় সুনীতির মত একজন বুদ্ধিমতী ও কার্য্যপটু বালিকার সাহায্য পাইবার লোভে বিনোদের আপত্তি করিবার প্রবৃত্তি ও শক্তি ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছিল; এবং সুমতিও সকল দিক বিবেচনা করিয়া, বিশেষতঃ সুনীতির দুঃখ ও ব্যথা উপলব্ধি করিয়া অবশেষে সম্মত হইয়া গেল। বাকি রহিল শুধু রতনময়ীর সম্মতি।

কিন্তু রতনময়ীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া যখন সুমতি
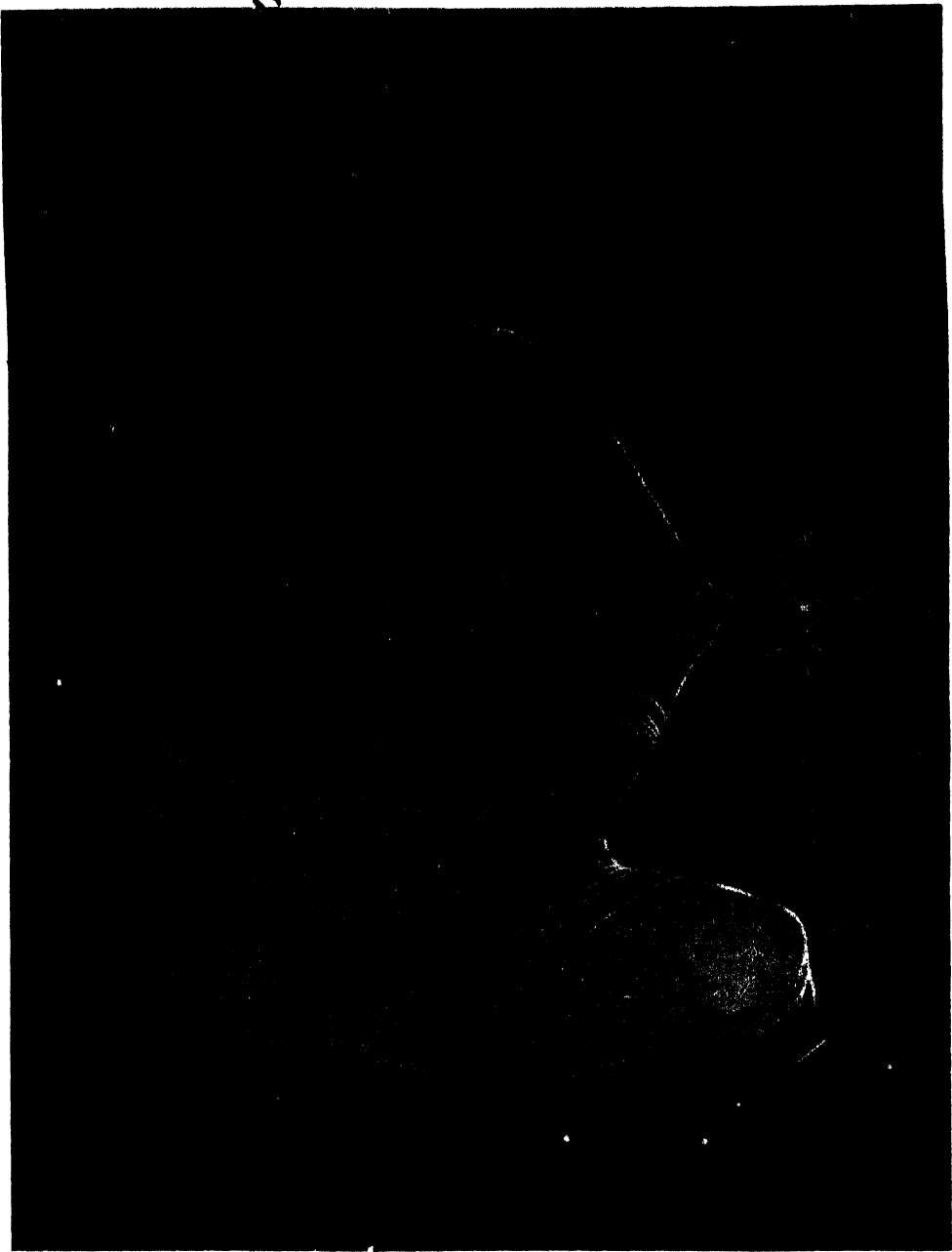
হরতাল

শিল্পী—শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন

Bharatvarsha Halftone & Ptg. Works.

দুই চারি কথায় বুঝাইয়া দিলি যে, সুবোধের পীড়ার জন্য শুধু সুবোধেরই নয় সুনীতিরও যথেষ্ট আশঙ্কার কথা আছে, এবং সুবোধের আরোগ্য লাভ শুধু সুবোধের পক্ষেই নয়, সুনীতিরও পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, তখন রতনময়ীও অগত্যা সম্মত হইলেন। তিনি তাঁহার কন্যাটিকে বিশেষ-রূপে চিনিতেন, তাই বুঝিলেন যে একপক্ষে যেমন অনুমতি দেওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না, অপর পক্ষে তেমনি অনুমতি দেওয়ায় কোনপ্রকার আপত্তি বা আশঙ্কার কারণও ছিল না।

মাতার নিকট হইতে অনুমতি লাভ করিয়া, প্রস্থানোদ্যত হইয়া সুমতি কহিল, "মা, তুমি নিশ্চিন্ত থেকো, নীতি কখনই এমন কোন কাজ করবে না, যা শুনে তুমি অসন্তুষ্ট হতে পার।"

কন্যার কথা শুনিয়া রতনময়ী হাসিয়া কহিলেন, "সে বিশ্বাস ত' তার ওপর আছেই মতি; তার উপর তুই যখন এসে বলছিস, এতে কোন ভয় নেই, তখন আমি নিশ্চিন্ত রইলাম।"

একটা ছোট চামড়ার ব্যাগে সুনীতি কয়েকখানা বস্ত্র ভরিয়া লইল। মেসে যাইবার জন্য একখানা ঠিকা গাড়ী দ্বারে আসিয়া লাগিয়াছে, সুনীতি বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে, এমন সময়ে যোগেশ আসিয়া উপস্থিত হইল।

সুনীতির বেশ পরিবর্ত্তন ও দ্বারে গাড়ী দেখিয়া, সবিস্ময়ে যোগেশ জিজ্ঞাসা করিল, "সেজদি, তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

সুনীতি মৃদু হাসিয়া কহিল, "মেজজামাইবাবুর মেসে।"

"কেন?"

সুনীতি তেমনি হাসিয়া বলিল, "সুবোধবাবুর সেবা করতে!"

যোগেশ এক মুহূর্ত্ত সুনীতির দিকে নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার পর সুমতির দিকে পিছন ফিরিয়া অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল, "তবে এইটে নিয়ে যাও।" বলিয়া পকেট হইতে ফুল ও বিল্বপত্র বাহির করিয়া সুনীতির হস্তে দিয়া, বাহিরে বিনোদের উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

যোগেশ কি দিয়া গেল বুঝিতে না পারিয়া, সুমতি কৌতূহল ভরে জিজ্ঞাসা করিল, "যোগেশ কি দিয়ে গেল রে?"

সুনীতি এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া বলিল, "ঠাকুরের ফুল।"

"কোথা থেকে পেলে?"

সুনীতি নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল,—তাহার চক্ষু সজল হইয়া আসিয়াছিল।

সুমতি আর কোন প্রশ্ন না করিয়া, সস্নেহে সুনীতিকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আমি আশীর্ব্বাদ করছি নীতি, সুবোধ ভাল হয়ে যাবে, তোর কোন ভয় নেই!" (ক্রমশঃ)

লীলাবতী

শ্রীমতী রাধারাণী দত্ত

হে শ্রদ্ধেয়া! বরণীয়া, জ্ঞান-গরীয়সী!
ভাস্করের সমতুল্য ভাস্কর-দুহিতা!
বহু আয়াসেও তব ললাটের মসী
মুছিতে নারিলা হবে জ্যোতির্ব্বিদ্ পিতা!
আপনার স্নেহ-ক্রোড়ে জ্ঞান-তরু-ছায়ে,
বর্দ্ধিয়াছিলেন তোমা, সযতনে অতি;—
সুকঠোর ব্রহ্মচর্য্যে ঢাকি আপনায়
যথার্থ বৈধব্য-ব্রত আচরিলা সতি!
জ্ঞান-আহরণ পিতৃ-সেবা করি সার,
জ্যোতিষী পিতার ক্ষুদ্র কুটীরের তলে,
অঙ্ক-শাস্ত্রে ঘুচাইলে তমিস্রার ভার,
গৌরবের মাল্য দিলে বঙ্গ-নারী-গলে।
বিধবার ম্লান-মুখে গৌরবের জ্যোতিঃ
ফুটে উঠে, স্মরি তোমা, অয়ি লীলাবতি

বৃদ্ধা ধাত্রীর রোজনামচা

ডাক্তার শ্রীসুন্দরীমোহন দাস এম-বি

ডাক্তার চিল

(১)

"কল্‌কাতার অনেক পরিবর্ত্তন! ইঃ, কত বড় রাস্তা! বুঝলে কি না, একটা কনেষ্টবলেরই বা কি ক্ষমতা! হাতটা যেন হুড়কো, বুঝলে কি না? হাত বাড়িয়ে দিচ্চে, আর রাস্তাটা বন্ধ হ'য়ে যাচ্চে! বড় বড় মোটর ঘুড়ী গাড়ী সব থেমে যাচ্চে; বুঝলে কি না, সাহেবরা পর্য্যন্ত দেখ্‌ছি ঐ হাতের হুকুম শুনবে। কি আশ্চর্য্য, বুঝলে কি না?"

"বুঝেছি, বুঝেছি। সব দেখে-শুনে আশ্চর্য্য হয়েছেন। মশাই, আরও আশ্চর্য্য হবেন বোধ হয় আপনার পকেট খুঁজলে। দেখুন ত, পকেট ঠিক আছে কি না।"

একজন প্রবীণ আগন্তুক হারিসন রোড ও চিৎপুর রোডের মোড়ে দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া রাস্তা দেখিতেছিলেন এবং পার্শ্বস্থিত একজন পথিকের সঙ্গে কলিকাতার পরিবর্ত্তনের কথা বলিতেছিলেন। ঐ ভদ্রলোকটী দেখিলেন, পাঁচ ছয়টী লোক ঐ আগন্তুককে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল, এবং কিয়ৎক্ষণ পরেই হাসিতে-হাসিতে চলিয়া গেল। তাঁহার মনে সন্দেহ হওয়াতে তিনি আগন্তুককে পকেট খুঁজিতে বলিলেন। পকেট খুঁজিতে গিয়া আগন্তুকের চক্ষুস্থির। পকেট-কাটা! একশত টাকার নোট সমুদায় চুরি হইয়াছে। বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া তিনি যে সময় কলিকাতার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছিলেন, গাঁটকাটারা তাঁহার পকেট কাঁচি দিয়া কাটিয়া, নোট চুরি করিয়া পলায়ন করিয়াছে। পুলিশে খবর দিবার জন্য পরামর্শ জিজ্ঞাসা করাতে, ঐ ভদ্রলোকটী বলিলেন, "মশাই, আপনার যদি কোন জরুরী কাজ থাকে, এমন কর্ম্ম করবেন না। আমার একটী ঘটী চুরি হয়েছিল। স্ত্রীর পরামর্শ শুনে পুলিশে খবর দিয়েছিলুম! ঘটীটী তাঁর বড় সখের জিনিস,—অনেক ছেঁড়া কাপড় দিয়ে কিনেছিলেন। কি দুষ্কর্ম্মই করেছিলুম মশাই! ভোরে, সন্ধ্যায় কন্‌ষ্টেবল এসে হাজির—বাবু, চলিয়ে থানামে, বড়া সাহেব বোলাতা।" পোনর দিন ত মশাই আমার ভাবনায়-ভাবনায় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ। শেষকালটা বল্লুম "জমাদার সাহেব! ছেড়ে দাও ত কেঁদে বাঁচি।" তিনি বল্লেন, "য়্যাসা বাত মত বোলো— চোরি মোকদ্দমা—ক্যায়সে ছোড়ি বাবু।" জমাদার সাহেবের হাতে-পায়ে ধরে, দশটাকা ঘুস দিয়ে বল্লুম, "জমাদার

সাহেব, লোটাটু যদি মিল্‌তা যায়, তো আপ নিয়ে নিও, হামারা কুচ প্রয়োজন নাই, হামকো ছেড়ে দাও বাবা, আর কভি মেয়ে মানুষকা বাত শুনে নালিশ করেঙ্গা নাই।" আগন্তুক পুলিশের আশ্রয় গ্রহণের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া বাবুটীকে বলিলেন, "মশাই. সৎপরামর্শের জন্য আপনাকে শত-শত ধন্যবাদ। যদি গাঁটকাটাদের কোন সন্ধান পান, বুঝ্‌লে কি না,—পুরের ডাক্তার ঘোষের বাড়ী—গোপেন্দ্র-কৃষ্ণ ঘোষকে দয়া করে জানাবেন।"

(২)

দ্বিপ্রহরে আহারান্তে শয়ন করিতে যাইব, এমন সময় দরোয়ান একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া আসিল। কম্পিতপদে গৃহে প্রবেশ করিয়া, ছল-ছল চক্ষে আমার দিকে চাহিয়াই, তিনি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন; এবং কাতর স্বরে বলিতে লাগিলেন, "বুঝ্‌লে কি না মা, আমি বড়ই বিপদগ্রস্ত। টাকা গেল তাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু আমার বৌমাকে কেমন ক'রে বাঁচাব, তাই ভেবে ব্যাকুল হচ্চি। বুঝ্‌লে কি না, তার যে বড় অসুখ। পাথেয়, ঔষধ, পথ্য এই সমুদায়ের জন্য এক শ টাকা নিয়ে এসেছিলাম। বুঝ্‌লে কি না, কি জোচ্চোরেরই দেশ মা! গাঁটকাটা একখানা নোটও রেখে যায় নাই। এখন কি করি? বুঝ্‌লে কি না, তোমাকে কেমন ক'রে নিয়ে যাই?" তাঁহার আহারের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে বলিলাম, "আপনি কিছু মাত্র চিন্তা করিবেন না। বিপদভঞ্জন যদি বিপন্নকে সাহায্য না করেন, লোকে তাঁকে ঐ নামে ডাকবে কেন? নামের prestige (গৌরব) হারাবার ভয় তাঁরও আছে।" তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে দিয়া সমুদায় প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আয়োজন করিলাম, এবং সেই রাত্রেই হাবড়ার গাড়ীতে উঠিলাম। মেয়েদের দ্বিতীয় শ্রেণীর সমুদায় গাড়ী পরিপূর্ণ। একখানি গাড়ীতে তাড়াতাড়ি প্রবেশ করিবামাত্র, একজন কৃষ্ণকায়া স্থূলাঙ্গী স্ত্রীলোক হাতমুখ নাড়িয়া বলিল, "চোকের মাথা কি খেয়েছ? দেখতে পাও না—আমাদের রাণী যে সমস্ত গাড়ী কিনে নিয়েছেন?" আমি শান্ত ভাবে এক-খানা বেঞ্চে বসিয়া বলিলাম, "তা রাণীমার এত বড় রাজ্যে কি এই বুড়ীর জন্য একহাত জায়গা হবে না? আমি ত বেড়াতে যাচ্চিনে মা; একটী মেয়ে মর-মর, তার চিকিৎসে করতে যাচ্চি।" রাণী বলিলেন, "কিছু মনে করো না মা, বিটি বড় মুখরা। তুমি ভাল হয়ে বসো। আজ শুনছি গাড়ীতে বড় ভিড়। তা আমার রিজার্ব্ব গাড়ীতে এসেছ, বেশ করেছ। গল্প কর্‌তে করতে যাব এখন।"

গাড়ী কিয়ৎক্ষণ চলিবার পর রাণী আমাকে বলিলেন, "মা, আপনি একজন প্রাচীন ডাক্তার, আমার এই মেয়েটী প্রথম পোয়াতি। আমরা থাকি দেওঘরে। কল্‌কাতা থেকে সেখানে নিয়ে যাচ্চি। যদি দরকার হয়, আপনাকে কোথায় খবর দেব?" আমার ঠিকানা লইয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করিতে যাইতেছিলেন; আমি তাঁহাকে বলিলাম, "প্রথম পোয়াতি সম্বন্ধে কতকগুলি কথা আছে— আপনাকে চুপি চুপি বলিব।" যাহাতে পোয়াতি শুনিতে না পায়—তাঁহার কাণে-কাণে বলিলাম, দেওঘরে গিয়াই যেন মেয়েটীর প্রস্রাব পরীক্ষা করান হয়। প্রস্রাবে কোন দোষ থাকিলে, প্রস্রাব কম কম হইলে, পা কি চোক ফুলিলে, ঘুম না হইলে, মাথা ধরিলে বা ঘুরিলে, চোকে ঝাপসা দেখিলে, পেটে শূল বেদনা হইলে, তখনই যেন ডাক্তার ডাকা হয়; কারণ তাহা হইলে তড়কার সম্ভাবনা। তড়কার পূর্ব্ব লক্ষণ দেখা দিলে, তড়কা নিবারণ করা যায়; কিন্তু তড়কা হইলে পোয়াতিকে নিয়ে টানাটানি— এইরূপ অনেক কথাবার্ত্তার পর তিনি শয়ন করিলেন। রাত্রি তিনটার সময় তাঁহারা নামিয়া গেলেন। ৫টার সময় গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে চক্ষের জল সম্বরণ করা অসাধ্য হইল।

(৩)

একটী শ্বেতাঙ্গী যুবতী শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। নিকটে কেহই নাই। আমাকে বসিতে বলিয়া জানাইলেন, তাঁহার স্বামী ডাক্তার। স্বামীর অনেক কাজ,—বাড়ীতে অতি অল্প সময়ই তিনি থাকিতে পারেন। তিনি পাঁচ মাসের পোয়াতি। পেটে অত্যন্ত ব্যথা, মাঝে মাঝে রক্তস্রাব হইতেছে। পেটের উপর পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, এক জায়গায় যেন রক্ত জমিয়া কালসিটা পড়িয়াছে। পরীক্ষার পর তাঁহার কামরা হইতে বাহির হইলাম। পাশে একটী বড় হল। হলের অপর পাশে একটী ছোট ঘরে চারিদিকে রেলিং দেওয়া একটী ছোট খাট। রেলিং ধরিয়া একটী শ্বেতাঙ্গ বালক দাঁড়াইয়া এক টুকরা রুটী খাইতেছে।

আমাকে দেখিয়া বলিল, "ডেজী ভেজী ঈল্" (Daddy very ill—বাবার বড় অসুখ)। এই বলিয়া অঙ্গুলী-সঙ্কেতে একটী ঘর দেখাইয়া দিল। ঘরটী ডাক্তার সাহেবের রোগী দেখিবার ঘরের পশ্চাতে। কৌতূহল বশতঃ সেই ঘরে গিয়া দেখিলাম, মেজের উপর পড়িয়া একজন বাঙ্গালী সাহেব বমি করিতেছেন। একজন খানসামা একটা চিলিমচা ধরিয়াছে। অবস্থা দেখিয়া বুঝিয়া সরিয়া পড়িলাম। আমার থাকিবার জন্য যে ঘরটী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তথায় ফিরিয়া আসিলে, গোপেন্দ্রবাবু অনেকবার "বুঝলে কি না" বুকনি দিয়া বলিলেন, "আপনাকে সব কথা খুলে বলা আবশ্যক, নতুবা ঠিক চিকিৎসা হবে না। ঐ ঘরের মেজেতে পড়ে যে বিলাত-ফেরতা বাঁদরটী বমি করচে দেখ্‌লেন, উনিই কীর্ত্তিমান ডাক্তার সাহেব, ঐ বউটীর স্বামী। লক্ষ্মীছাড়া আমার ভাইপো। দাদা সর্ব্বস্ব খুইয়ে তাকে বিলাতে পাঠিয়ে পড়িয়েছিলেন। সেখান থেকে ঐ ভদ্রলোকের মেয়েটীকে বে ক'রে এনেছে। মেম বে করেছে শুনে দাদা ত রেগেই খুন। আমি তাঁকে বুঝিয়ে সুজিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে ছেলেটাকে লিখলুম বউ নিয়ে আস্‌তে। দেশে যখন বউ নিয়ে এল, তখন ছেলে খুব ভালই ছিল। মেয়েটী মেম হলেও বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে বেশ মিলেমিশে চল্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু পল্লীগ্রাম তার ভাল লাগবে কেন? তারই পরিচিত এই—পুরের সিবিল সার্জ্জন তাকে লিখ্‌লেন, এখানে তোমার স্বামী আস্‌লে বেশ পসার হতে পারে। তাই শুনে সেই অবধি স্বামী স্ত্রী এখানে এসে রয়েছে। ডাক্তারেরও বেশ পসার জমেছিল। কিন্তু পসার জম্‌লে কি হবে? ঐ সিবিল সার্জ্জন ও এখানকার নীলকরদের পাল্লায় প'ড়ে মদ ধরলে। এতদিন বিলাতে ছিল, চুরুটটী পর্য্যন্ত ছুঁত না। কিন্তু পৈতৃক দোষ ত এড়াবার জো নাই। দাদারও আমার এ দোষ প্রথমে ছিল না। লোকেল বোর্ডের ভ্বাইস্ চেয়ারম্যান হওয়াই তাঁর উচ্ছন্ন যাবার কারণ। ম্যাজিষ্ট্রেট শিকারে এসে তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেত। শিকার ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে তাঁবুতে এসেছেন, অমনি সাহেব এক পেগ হুইস্কি মুখের কাছে ধ'রে বল্লেন "মিষ্টার ঘোষ, এই খেলে পরে দেখবে সব ক্লান্তি দূর হবে।" দাদা বল্লেন, "রাম, রাম, আমি ও জিনিস ছুঁই না সাহেব।" পরদিন সাহেব আড়ালে সরবৎ প্রস্তুত ক'রে, তার সঙ্গে অল্প হুইস্কি মিশিয়ে দিয়ে বল্লেন, "মিষ্টার ঘোষ, এই সরবৎ খুব ভাল, এতে মদ নাই, ষ্টিমিউলেন্ট আছে।" সাহেবের কথায় বিশ্বাস ক'রে দাদা সরবৎ খেয়ে বেশ আরাম পেলেন, একটু ফূর্ত্তিও হল। পরদিন ঐ সরবৎ চেয়েই খেলেন। তার পরদিন সাহেব বল্লেন "তুমি কি খাচ্ছ জান? ষ্টিমিউলেন্ট মানে মদ। ধর্ম্ম যখন একবার গিয়েছে, তখন আর এর জন্যে ভেবে শরীরকে কষ্ট দেওয়া কেন? প্রকাশ্য ভাবেই খাও। স্বার্থপর বামুনরাই বলে মদ খেলে ধর্ম্মনাশ হয়; তার কারণ মদ খেলে তোমাদের বুদ্ধিটা খুলে যাবে; বুদ্ধি খুল্‌লেই অপদার্থ বামুনগুলোকে আর মান্য করবে না। বারণ করবার আর একটা কারণ, মদ খেলে তোমরা দেবতা হ'য়ে যাবে, কারণ দেবতারা মদ অর্থাৎ সোমরস খেয়ে দেবতা হয়েছিলেন। তোমরা দেবতা হলেই তোমাদিগকে পূজো করতে হবে। তোমরা স্বাস্থ্য রাখ্‌তে জান না, তাই বেশি কাজও করতে পার না। স্বাস্থ্য রাখতে গেলেই একটু-একটু মদ খাওয়া চাই, ডাক্তারদের এই মত। তোমাদের বাঙ্গালী বাবুরা সমস্ত দিন গাধার খাটুনী খেটে বাড়ী গিয়ে এলিয়ে পড়েন, তখন আর কোন কাজ করবার শক্তি থাকে না। আমরা এক ঘণ্টায় যে কাজ করি, তোমরা দশ ঘণ্টায় সে কাজ করতে পার না। তার মানে এক ফোঁটা মদ পেটে পড়ে যখন মগজে উঠে, বুদ্ধির ফোয়ারা ছোটে, তখন অনেক কাজ করা যায়। তা ছাড়া আর একটা কথা। কিছুদিন পরেই তুমি রায় বাহাদুর হবে। তখন কি কমিশনরের সঙ্গে এক টেবিলে বসে যখন তোমাকে বল্‌ব তাঁর স্বাস্থ্য পান করতে, তুমি কি বল্‌বে, 'না, আমি ও গ্লাস ছোঁব না'?" এই সব সুযুক্তি শুনেই হউক, আর বরাতের দোষেই হউক, দাদা মদ ধরলেন। মদ ধরার এক বৎসরের মধ্যেই এই ছেলেটীর জন্ম। ছেলে যখন মদ ধরলে, বাপ তখন বাত-ব্যাধিগ্রস্ত। বাপের মৃত্যুর পর ছেলের মদ খাওয়ার মাত্রা ক্রমশ বাড়তে লাগল। বউমা অনেক চেষ্টা করেছিলেন মাত্রা কমাতে, কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠলেন না। দেখ্‌লেন ত মেয়েটী কেমন লক্ষ্মী? কিছুতেই স্বামীর নিন্দে করলে না। আপনাকে বল্লে, ডাক্তারের অনেক কাজ, তাঁকে দেখবার সময় নেই। কাজটা কি, তা ত স্বচক্ষে

দেখে এলেন। ঐ অবস্থায় পল্টা বউমার পেটে লাথি মেরেছিল। তাইতে পেট নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে।” পোয়াতির পেটে কালসিটা দাগের কারণ বুঝিলাম। হায় পাশ্চাত্য সভ্যতা! এক হাতে মদের বোতল, আর এক হাতে বাইবেল নিয়ে দেশে আসিয়াছিলে। বাইবেল কজন নিলে? বোতলটাই অনেকে ধরিয়াছে। সরকার স্বয়ং শুঁড়ী সাজিয়া ভাঁটিতে মদ চুয়াইয়া, স্থানে স্থানে দোকান বসাইয়া মদ বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতেছেন। হায় দুর্ভাগ্য!

(৪)

আফিংএর পিচকারী প্রভৃতি নানাবিধ চিকিৎসাতে গর্ভ রক্ষা করা গেল না। মেমটীর জরায়ুর একপাশে একটা শিংএর মতন ছিল। সেই শিংয়ের ভিতর ফুল আট্‌কাইয়া থাকাতে রক্তস্রাব হইতেছিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন ফুল পড়িল না, ডাক্তারকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। তিনি তখন নেশার ঘোরে বলে দিলেন, “ছেলে ধর্‌তে পারে না, কেউটে ধরতে যায়; একটা ফুল টেনে আন্‌তে পারে না, ছেলে টেনে আনে কেমন করে? যা, ঐ স্যাম্পেন্ নিয়ে যা; মাগীকে বল্, এক গ্লাস খেয়ে গায়ে জোর এলে ফুল টেনে আন্‌তে পারবে এখন। যদি না পারে, আমি গিয়ে সিজারিয়ান সেক্‌শন্ ক’রে (পেট কেটে) নিয়ে আস্‌ব।” যাহা হউক, অনেক সন্তর্পণে ভিতরে হাত দিয়ে ফুল বাহির করিয়া রক্তস্রাব স্থগিত করিলাম। যোল দিন পরে যখন মেম একটু সুস্থ হইল, সেই সহযাত্রিনী রাণীর নিকট হইতে তার আসিল, তৎক্ষণাৎ দেওঘরে রওয়ানা হইবার জন্য।

(৫)

যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিয়াছে। রাজ-কুমারীর তড়কা হইয়াছে। আমার পরামর্শ কিছুই গ্রাহ্য করেন নাই। পা ফোলা দেখিয়া গৃহিণীরা বলিয়াছেন, এমন ফোলা সকল পোয়াতিরই হইয়া থাকে। যখন তড়কা আরম্ভ হইল, তখন আমার কথা রাণীর মনে পড়িল। আমি যাইবার পূর্ব্বে পোয়াতির তিনবার ফিট হইয়াছে। আমি গিয়াই তাঁহাকে এক পাশে ফিরাইয়া শোয়াইলাম, এবং একখানা চায়েচের বাঁটে ন্যাকড়া জড়াইয়া তাহার দুই পাটি দাঁতের ভিতর ঢুকাইয়া দিলাম, যাহাতে জিভ না কাটিয়া যায়। রোগিনী তখনও দুধ গিলিতে পারে। দুধ কি অন্য কোন খাবার বন্ধ করিয়া দিয়া, মিশ্রি ও সোডা মিশান জল খাওয়াইতে ও মলদ্বারে ঐ জলের পিচকারী দিতে লাগিলাম। কলিকাতা হইতে যখন ডাক্তার আসিলেন, ফিট তখন স্থগিত হইয়াছে। প্রসব করাইবার পর আর ফিট হয় নাই।

(৬)

“উচ্ছন্ন যাবার লক্ষণ! ঘোর কলি! অদ্য স্বর্গীয় রাজার শ্রাদ্ধ-বাসর, অদ্যকার দিবসেই কি না এবম্প্রকার কদাচার!”

“দেখ বাবা গুরু, বেশি বাড়াবাড়ি করো না বল্‌চি। এখন আমাদের মিলিটারি মেজাজ। অত বড় তেজীয়ান গরুখেকো মৌলবী সাহেবকেই জব্দ ক’রে দিয়েছি,—তুমি ত চাল-কলাখেকো বামন। যে মৌলবী সাহেবের কাছে পারসী পড়তুম, সে কথায়-কথায় আমাদের শাসিয়ে বলত, ‘আন হাম আগ, হায়’। একদিন পড়াতে-পড়াতে ত মৌলবী ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি কল্লুম কি, কতকগুলো কাঁঠালের বীচি তার মলদ্বারে আস্তে-আস্তে গুঁজে দিলুম। খানিকক্ষণ পরে পেট যখন দম সম হয়ে উঠ্‌ল, মৌলবী সাহেব জেগে উঠে দেখ্‌লে, মলদ্বারটা কিসে বন্ধ হ’য়ে রয়েছে। তখন অনেক কষ্টে কাঁঠাল বীচি বার ক’রে নিয়ে বল্‌লে, “এ কাজ কে করেছে?” আমি বল্‌লুম, “মৌলবী সাহেব, তুমি বলেছিলে তুমি আগুণ! কাঁঠাল বীচি ভাজা খেতে ইচ্ছে হয়েছিল, তাই পরখ করে দেখ্‌তে গেলুম, তুমি সত্যি-সত্যি আগুণ কি না।” এই কথা শুনে মৌলবী সাহেব হেসে ফেল্‌লে। সেই থেকে আর কাউকে বকত না।”

—পুরের রাজবাটীর বৈঠকখানায় রাজার গুরু এবং রাজার একজন বন্ধুর মধ্যে উপরিউক্ত কথোপকথন হইতেছিল। রাজার পিতৃশ্রাদ্ধের দিনে রাজা দুই জন বন্ধুকে লইয়া মদ্যপান করিতেছেন শুনিয়া, তাঁহার গুরু রাজাকে শাসন করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। রাজ-বন্ধুর কথা শুনিয়া, তিলক-মণ্ডিত কপাল কুঞ্চিত করিয়া, গুরু যখন বলিলেন, “কি, এত বড় আস্পর্দ্ধা!” তৎক্ষণাৎ তিন বন্ধু মিলিয়া গুরুকে ভূতলশায়ী করিলেন; রাজা বলিলেন, “দেখ বাবা, তিলকং হরিমন্দিরং;—সকলে মিলে ঐ তিলক চেটে

খেয়ে ফেলা যাক। হরিমন্দির পেটে থাকলে হরি ব্যাটাকে তেত্রিশ কোটি নিয়ে আসতেই হবে।" এই কথা বলিয়া, যখন তিনজনে মিলিয়া গুরুর তিলক চাটিতে লাগিল, তিনি অনেক কষ্টে তাহাদিগকে ছাড়াইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন। রাজা আনন্দে বোতলের গলা ভাঙ্গিয়া এক নিঃশ্বাসে ক্রমাগত তিন বোতল নিঃশেষ করিয়া, যখন অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, বন্ধুরা বেগতিক দেখিয়া পলায়ন করিলেন। সংবাদ যখন অন্তঃপুরে পৌঁছিল, তাঁহার স্ত্রী আসিয়া ভূতলে মাথা খুঁড়িতে খুঁড়িতে বলিলেন, "হে হরি, এবার আমার স্বামীকে রক্ষা কর; ভাল হ'লে তাঁকে যদি আমি মদ না ছাড়াতে পারি, আমি সতী নই।" শ্রীহরি সতীর প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন। অনেক চিকিৎসার পর—চতুর্থ দিনে যখন রাজার চেতনা ফিরিয়া আসিল, তিনি দেখিলেন, অনাহারে ও রাত্রি জাগরণে রাণীর আকার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। দুই চক্ষে শতধারের চিহ্ন এখনও শুকায় নাই। সমুদায় বিবরণ জ্ঞাত হইয়া, রাজা তখনই প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর মদ স্পর্শ করিবেন না। অনুতাপের অশ্রুনীরে ভাসিতে-ভাসিতে বলিলেন, "সতী! তোমার সাধনায় সন্তুষ্ট হ'য়ে ভগবান আজ আমাকে সত্যবানের ন্যায় যমের হাত থেকে এনে তোমার হাতে ফিরিয়ে দিয়েছেন; কেবল ফিরিয়ে দিয়েছেন তা নয়, আমার দিব্য-চক্ষু খুলে দিয়েছেন। তাই অতীতের ঘটনাগুলি দেখ্‌তে পাচ্চি। তোমাকে কতই না অপমান করেছি। মনে পড়চে সে দিন, যে দিন তোমাকে বলেছিলাম, 'তুমি মেয়ে মানুষ ধর্ম্মের কি জান?' আমার পিতা শাক্ত ছিলেন। তিনি বলতেন 'কারণ' বিনা শক্তিপূজা হয় না।' তুমি প্রত্যুত্তরে বলেছিলে 'আমিও গুরু-কৃপায় একটু-আধটু শাস্ত্র জানি। গুরু একটী শ্লোক মুখস্থ করিয়েছিলেন;

"চিচ্চন্দ্রকুণ্ডলীশক্তি সামঞ্জস্য মদোদয়ঃ।
ব্যোমপঙ্কজ নিস্যন্দ-সুধাপান রতোনরঃ॥
মধুপান মিদং দেবি! চেতরং মদ্যপানকং।"

শাস্ত্র মদ্যপান ক'রতে বলেন না, কুণ্ডলী শক্তি-সাধন-জাত সুধা পান করতে বলেন। তাই ভক্ত রামপ্রসাদ বলেছিলেন—

সুরা পান করি নে মাগো
সুধা খাই জয় কালী বলে।

তোমার এই কথা শুনে আমি হেসে বলেছিলাম, 'আরে পাগলী বুঝলে না, বামনেরাই ত ঐ শ্লোক তৈরি করেছে। তাই বলচে, আর কারও কিছু চুরি করলে কিছু হবে না, গুরুর ধন চুরি করলে শাস্তি হবে; আর কাউকে মারলে কিছু হবে না, যত পাপ ঐ ব্রহ্মহত্যায়। আর শাস্তিটা কি? চারদিকে আগুন জ্বেলে পোড়াবে। দিক্ না জ্বেলে। পি, সি, রায়ের কারখানায় ঐ যে বরুণবাণ তৈরি হয়েছে, দেব একটা ছেড়ে, অগ্নি বাপ্‌ বাপ্‌ বলে পালাবে।' আর একদিন তুমি বলেছিলে

ভ্রষ্টাচারাশ্চ বামাশ্চ
তে যান্তি নরকং ধ্রুবং।

আমি বলেছিলেম, 'দেখ, সব জ্যাঠা সইতে পারি, মেয়ে জ্যাঠা সইতে পারিনে। আর নরকে যদি যেতে হয়, ভাল-ভাল লোকের সঙ্গেই যাব; ঈশ্বর গুপ্ত, হরিশ মুখুয্যে, হেমচন্দ্র, মধুসূদন, এরা কেও-কেটা নন।' আর একদিন যখন টের পেলুম, তুমি মদের বোতলে জল পুরে রেখেছিলে, ঐ বোতল তোমার উপর ছুঁড়ে ফেলে পালিয়ে গেলুম। ফিরে এসে শুনলুম, তোমার মাথা কেটে গিয়েছে, ডাক্তার সেলাই করেছে, আর তুমি বলেছ, পড়ে গিয়ে মাথা কেটেছে। তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, আর দেব না। তিন দিন তিন রাত্রি সেবা করে তোমার শরীর আধখানা হয়েছে। চল দেওঘরে গিয়ে থাকি। কপট মোসাহেব বন্ধুদের সংস্পর্শ ছেড়ে না গেলে নিস্তার নাই।"

রাজা সস্ত্রীক যখন দেওঘরে উপস্থিত হইলেন, একজন সন্ন্যাসী তেজঃপুঞ্জে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই দুজনে চরণে প্রণত হইলেন, এবং যন্ত্র-চালিতের ন্যায় তাঁহার সঙ্গে গিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। সতীর আকুল প্রার্থনা এবং সাধুর শিষ্যত্ব গ্রহণই রাজার জীবনের পরিবর্ত্তনের হেতু। সেই রাজার কন্যাকেই দেখিতে আসিয়াছি।

(৭)

প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে সারিয়াছে। আজ নগর পরিদর্শনে বাহির হইয়াছি। একটী এক বৎসরের বালককে "থান চাদে" শোয়াইয়া চড়্‌চড়াচড়্‌ বাজনায় আকাশ বিদীর্ণ করিতে-করিতে কতকগুলি লোক চলিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম ঐ অষ্ট-ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকাকে বিশেষরূপে বহন করিবার জন্য ঐ শিশুটী ঘটা করিয়া খশুরালয়ে যাইতেছে। সঙ্গী লোকটীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ঐ বিবাহের কন্যাটী যখন ৪০ বৎসরের বুড়ী হইবে, তখন ঐ পূর্ণযৌবন সম্পন্ন যুবা পুরুষটী কি করিবে? "দুনিয়াদারীতে লোকের যে হাল হয়, যুবা পুরুষটীর সেই হাল হইবে।" মন্দিরে দেব-দর্শন করিয়া, এবং উপস্থিত কপিবৃন্দকে পরিতুষ্ট করিয়া রাজবাড়ী ফিরিতেছি, এমন সময় সেই মাতাল ডাক্তারের একজন আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হইল। তাঁহার নিকট শুনিলাম, আজ দুই দিন হইল, ডাক্তারের অপঘাতে মৃত্যু হইয়াছে। আমি চলিয়া আসিবার পর উন্মাদ হইয়া ডাক্তার সকলকে বলিত, সে চিল হইয়াছে। চিলের মতন চি-চি করিয়া ডাকিত; লোকের হাতে মাছ-মাংস দেখিলে ছোঁ মারিয়া লইত, এবং একটা গাছের ডালে বসিয়া খাইত। একদিন ছাদের উপর উঠিয়া উড়িতে গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। ইংরাজ মেয়েটীর পরিণাম মনে করিতেই চক্ষে জল আসিল। হায় অভাগিনী! তোমাদের দেশীয় সভ্যতা প্রচলনের প্রায়শ্চিত্ত আজ তোমাকেই করিতে হইল! এক বৎসর পরে খ্রীষ্টমাস পর্ব্বের পূর্ব্বদিন হগ্ সাহেবের বাজারে গিয়া দেখিলাম, সেই—পুরের ইংরাজ-মহিলা একজন দীর্ঘকায় সাহেবের হাত আঁকড়াইয়া ধরিয়া চলিয়াছেন; তাঁহার পশ্চাতে একটী চতুর্থবর্ষীয় বালক একজন মান্দ্রাজী দাইয়ের সঙ্গে লজঞ্চুষ চুষিতে-চুষিতে চলিয়াছে। আমাকে দেখিয়া মহিলাটী করমর্দ্দন করিয়া সহাস্যবদনে বলিলেন, "আমাকে নিশ্চয়ই চিনেছেন, সেই—পুরে দেখেছিলেন, ইনি আমার স্বামী, সুন্দরবনের কমিশনর মিঃ...... ; ইনি মিসেস্—, ডিয়ার, আমাকে অনেক শুশ্রূষা ক'রে বাঁচিয়েছিলেন।" আমাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিয়া স্বামী-স্ত্রী দুজনে চলিয়া যাইতেছিলেন, ইতিমধ্যে মান্দ্রাজী আয়ার "ও ডার্লিং ও ডার্লিং" স্বরে চমকিয়া তাকাইয়া দেখি, বালকটী মাটিতে পড়িয়া গিয়া চক্ষু ঘুরাইতেছে, এবং মুখে ফেণা তুলিতেছে। যাহাতে দাঁত দিয়া জিভ্ না কাটিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলাম, এবং মাথায় বরফ দিতে লাগিলাম। দুই মিনিট পরেই তাহার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। তাহাকে গাড়ীতে তুলিবার সময় স্বামী-স্ত্রী উভয়েই আমাকে সঙ্গে যাইতে বলিলেন। চৌরঙ্গীতে ডাক্তার——র পাশের বাড়ীতেই তাঁহারা বাস করিতেন। সেই ডাক্তার আসিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। স্বামী-স্ত্রীর অনুরোধে আমাকে সেই স্থানে তিন দিন থাকিতে হইল। তৃতীয় দিন ডাক্তার——আসিয়া বলিলেন, এবারকার মতন বিপদ গেল, কিন্তু ছেলেটীর মাথার উপরে খাঁড়া উঠান রহিল। ছেলের মা-বাপেরা যদি জানত, মদ্যপায়ীর সন্তানদের মৃগী, বাতুলতা, হাবা ও বোবা-কালা দোষ, অঙ্গহীনতা প্রভৃতি নানাবিধ রোগ জন্মাবার বিশেষ সম্ভাবনা, তারা কখনই মদ খেত না। আমেরিকা ও বিলাতের বিশেষজ্ঞেরা বিশেষ ভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীসংক্রান্ত রোগের চারি আনা কারণ মদ্যপান। তাঁদের পুস্তকে লেখা আছে "Effects of alcoholic poisonings on the germ or sperm cells are transmitted to future generations." (মদের বিষ পিতা ও মাতার শুক্র শোণিতবিন্দুর ভিতর দিয়া অনেক পুরুষ পর্য্যন্ত ভ্রূণদেহে সঞ্চালিত হয়।" তাই তাঁরা বলেন, "drunkard is born" (জন্ম থেকেই শিশু-দেহে মাতাল হবার ব্যবস্থা থাকে; তার মগজটা এমন ভাবে গঠিত হয় যা থেকে সময় মত মদ্যপান পিপাসা জন্মায়)। ডাক্তার সাহেব অতি ধার্ম্মিক, স্পষ্টবক্তা এবং সুপণ্ডিত। এ দেশীয় শাস্ত্রে তাঁহার অধিকার ছিল। আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন; "আমি ইংরাজ, কিন্তু মাদক সম্বন্ধে ইংরাজ সরকারের ব্যবহারে আমি লজ্জিত। জানেন আপনি, আপনাদের বাঙ্গালীদের কাছে মদ, গাঁজা বিক্রয় করিয়া, সরকার বছর বছর কত টাকা আদায় করেন? ১৯০০ সালে এই সব বিষ বেচে বাঙ্গলা সরকার প্রায় দেড় কোটী (১, ৪৬, ০০০, ০০,) টাকা উপার্জ্জন করেছিলেন। আমাদের সভ্যতা যেখানে যত বেশি, সেখানে এই দরুণ তাঁদের আয় বেশি। বোম্বাই সহরে কল-কারখানা প্রভৃতি সভ্যতার চিহ্ন খুব বেশি, সেখানে আবকারীর দরুণ আয় বাঙ্গালা দেশের চেয়ে ৬ গুণ বেশি। আপনাদের দেশীয় শাস্ত্রে মদ্যপান মহাপাতক ব'লে লিখলেও অনুকরণের ফলে শিক্ষিতদের ভিতর মদ্যপায়ীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। আপনাদের একজন সুশিক্ষিত কবির নাকি বুদ্ধি

খুলত না মদ না খেলে। অথচ আপনাদের আয়ুর্ব্বেদ বল্‌চেন ঃ

"বুদ্ধিং লুম্পতি যদ্দ্রব্যং মদকারি তদুচ্যতে।
তমোগুণ প্রধানঞ্চ যথা৺মদ্যসুরাদিকং ॥"

এই ভারতবর্ষে আমার কুড়ি বৎসরের অভিজ্ঞতা থেকে বল্‌চি, যে সব ইউরোপীয় মদ খান্ না, তাঁরা এ দেশের গরম ও ঠাণ্ডা বেশি সহ্য ক'রতে পারেন, এবং নানাবিধ রোগের আক্রমণ হ'তে অব্যাহতি পান। অনেকে নিয়মিত মদ্যপানের দোহাই দেন। সে সব ফাঁকির কথা। কেহই নিয়ম রক্ষা করতে পারেন না। নিয়মিত মাত্রার কোন সীমা নাই। একজনের পক্ষে যা নিয়মিত, আর একজনের পক্ষে তা অতিরিক্ত। সে দিন মিঃ —কে দেখ্‌তে গিয়েছিলাম। তিনি একজন প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার। সর্ব্বদা "নিয়মিত মাত্রা" পান করিতেন এবং বন্ধুবান্ধবকেও ঐ মাত্রায় পান কর্‌তে বল্‌তেন। তাঁর পায়ে বাত হয়েছে, মস্তিষ্কের কিঞ্চিৎ বিকার হয়েছে; সন্ধ্যার পর তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে ভদ্রলোকের লজ্জা হয়। একদিন তাঁর খাস-কামরায় বসে আছি, তাঁর স্ত্রী আমার জন্য চা ও নানাবিধ খাদ্য নিয়ে উপস্থিত। স্ত্রীকে দেখেই ভূমিষ্ট হ'য়ে প্রণাম ক'রে মিঃ—স্তব জুড়ে দিয়ে বল্‌লেন;

"নমঃ কল্যাণদে দেবি
নমঃ শঙ্কর-বল্লভে।
নমঃ ভক্তপ্রিয়ে দেবি
অন্নপূর্ণে নমস্ততে॥"

ভদ্র-মহিলাটি মুখে কাপড় দিয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেলেন।" গল্প শেষ করিয়া ডাক্তার আমাকে বলিলেন, "সুরাসক্তির নূতন চিকিৎসা আরম্ভ হইয়াছে। কোন মাতাল যদি এই চিকিৎসার অধীন হইতে চায়, তাহাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন।"

স্ত্রী-পুরুষের শিক্ষাভেদ

পরশুরাম

নারীর অধিকার লইয়া আজকাল সাময়িক পত্রিকায় লাঠালাঠি চলিতেছে। কিছু তফাতে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ক্ষেত্রে থাকিয়া দু' একটি আনুষঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা করিতে চাই।

'নারীর অধিকার' বলিতে যিনি যাহাই বুঝুন, কেবল নিঃস্বার্থ জ্ঞান ও কর্ম্মের চর্চা দ্বারা নারী তাহা পাইবেন না। স্বাধীনতা বা স্বাবলম্বনই সকল অধিকারের প্রধান ভিত্তি। নারী যদি স্বাবলম্বন চান, তাঁহাকে অর্থকরী বিদ্যা শিখিতেই হইবে। ইহার ফলে নারীত্ব ক্ষুণ্ণ হইবে কি না, তাহা দেহ, মন ও সমাজ-তত্ত্ববিৎ বলিবেন। রোজগারের অধিকাংশ পন্থাই পুরুষের একচেটে হইয়া আছে,—পুরুষ সহজে তাহার দখল ছাড়িবে না। যদি কখনো আপোষে রফা-নিষ্পত্তি হয়, তবে হয় ত নারী এমন সব উপজীবিকা বাছিয়া লইবেন, যাহা শরীর-ধর্ম্মের প্রতিকূল নয়। অবশিষ্ট যাহা থাকিবে, পুরুষকে তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতে হইবে। দ্বন্দ্বের এই প্রকার চূড়ান্ত মীমাংসা কোন কালে হইবে কি না, জানি না। আপাততঃ এই দুরূহ কলহসঙ্কুল বিষয়টির অধিক আলোচনা না করিয়া অন্য কথা পাড়িব।

সাধারণ শিক্ষা বা আত্মোন্নতি-মূলক cultural শিক্ষায় স্ত্রী-পুরুষের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করার কোন সঙ্গত হেতু নাই; কিন্তু এখানেও পুরুষের প্রচ্ছন্ন স্বার্থহানির ভয় সমাজকে অনুদার করিয়াছে। রেল কোম্পানি যেমন গরীব নেটিভের জন্য থার্ডক্লাশ গাড়ি বরাদ্দ করিয়াছেন, অনেক সদাশয় নারীজাতির জন্য তেমনি বোধোদয় ব্যবস্থা করিয়াছেন। সত্তর আশী বৎসর পূর্ব্বে গরীবলোকে হাঁটিয়াই দেশ-বিদেশে যাইত; এখন থার্ডক্লাশ যতই কষ্টকর হউক, তবু ত দুয় দণ্ডে দু'দিনের পথ লইয়া যায়। সেকালে তোমরা চিঠি পড়াইবার জন্য পরের শরণাপন্ন হইতে, এখন স্বামীকে পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে চিঠি লিখিতেছ, আবার ধোপার হিসাবও লিখিতে পার। আর কি চাও?—সৌভাগ্যক্রমে এই প্রকার ধারণা দেশ

হইতে ধীরে-ধীরে দূর হইতেছে,—নারীর প্রাপ্য মুষ্টিভিক্ষার পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িতেছে। কিন্তু পুরাতন সংস্কার এ দেশে এমন মজ্জাগত হইয়া আছে যে, দাতার কার্পণ্য ও গ্রহীতার দৈন্ত সহজে আমাদের নজরে পড়ে না। আজকাল বাংলা সাহিত্যে স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক অনেক দেখা দিয়াছে। এগুলি ভিক্ষাদানের উপযোগী ফরমাসী লাড্ডু; কিন্তু দেশের মেয়েরা কৃতজ্ঞচিত্তে তাহা ভক্ষণ করিতেছেন। 'শিশুপাঠ্য ও শিশুখাদ্য বোঝা যায়; কারণ, শিশুর জীর্ণ করার ক্ষমতা কম; কিন্তু স্ত্রীপাঠ্য ও স্ত্রীখাদ্য অপূর্ব্ব জিনিষ, এবং বোধ হয় এ দেশেরই আবিষ্কার। সুস্থ সাবালক মানুষকে ছাগলের দুধ খাওয়াইয়া জব্দ রাখা যাইতে পারে; কিন্তু তাহার দুর্ব্বলতা অভিভাবককেও বিব্রত করে।

অনেকে বলিবেন—তবে কি মেয়েদের জন্য বিশেষ কোনো সাহিত্যের দরকার নাই? দরকার থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার মূল্য সাহিত্য হিসাবে বড় বেশী হইবে না। মেয়েরা বিশেষভাবে যে সকল সৌখিন বিষয়ের চর্চ্চা করেন, তাহার সাহিত্যকে স্ত্রীপাঠ্য বলিতে আপত্তি নাই। যেমন বিলাতী ফ্যাশন সংক্রান্ত পত্রিকাদি। যদি পুরুষরা গোঁফছাঁটার পদ্ধতি বা জামার ঝুল সম্বন্ধে গবেষণা করিতে চান, তাঁহাদের জন্যও পুরুষপাঠ্য পত্রিকা সৃষ্ট হইবে।

পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীর শিক্ষা ছাড়া আর এক রকম শিক্ষা আছে, যাহার উদ্দেশ্য ঠিক জীবিকা নির্ব্বাহ নয়, এবং কল্চারও নয়,—বরং দুয়ের মাঝামাঝি। এই শিক্ষা প্রদানের শৃঙ্খলিত ব্যবস্থা সামান্যই আছে,—মানুষ বাল্যবস্থা হইতে অপরের দেখিয়া এবং নিজে ঠেকিয়া শেখে। ইহার প্রভাবে আদিম মানুষ পশুত্ব পরিহার করিয়া ক্রমশঃ স্বপদে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এই শিক্ষার ফল—সাংসারিক অভিজ্ঞতা ও দায়িত্ব। আশ্চর্য্যের বিষয়, নারীর জন্য এই শিক্ষার বরং একটা নির্দ্দিষ্ট পন্থা আছে, কিন্তু পুরুষের বেলা কিছুই নাই।

নারীর উপর যে সন্তান পালন ও গৃহকর্ম্মের ভার পড়িয়াছে, তাহা এই শিক্ষার অন্তর্গত। এতদিন কেবল দেখিয়া, শুনিয়া, ঠেকিয়া এই দুই বিষয়ের জ্ঞান অর্জ্জিত হইত, এখন ভুল চুক বাদ দিয়া সুব্যবস্থিত প্রণালীতে শিখাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। উত্তম কথা। কিন্তু পুরুষ কি জন্মাবধি এতই পরিপক্ক যে তাহার সাংসারিক দায়িত্ব সে দেখিয়া, ঠেকিয়াই শিখিবে,—তাহার জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ শিক্ষার প্রয়োজন নাই?

নারীর এই কর্ত্তব্য-শিক্ষা বহুপরিমাণে সফল হইয়াছে। নারী কেবল বেতনভোগী ভৃত্যের উপর নির্ভর করেন না, তিনি স্বয়ং দক্ষ। কিন্তু সংসারের কাজ আরও অনেক আছে। পুরুষ কেন তাহা শিখিবেন না? বধূকে যদি গৃহিণীর এবং জননীর কর্ত্তব্য শিখিতে হয়, তাহার স্বামীটিকেও গৃহস্থের ও জনকের কর্ত্তব্য শিখিতে হইবে। যে নিপুণতা স্ত্রীজাতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য হয়, পুরুষে তাহার নিতান্ত অভাব দেখা যায়। গৃহস্থের অবস্থা যতই স্বচ্ছল হোক, একটা জামা ছিঁড়িলে, মেয়েরাই তাহা মেরামত করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু দেওয়ালের একটু বালি খসিলে পুরুষরা নিরুপায়! পুরুষ মাত্রেই যে এরূপ, তাহা নয়; কিন্তু সংসারের কার্য্যে সাধারণ পুরুষ নারী অপেক্ষা পরবশ। 'মেস' গুলির অবস্থা দেখিলে যে কোনো নারী নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন। গৃহিণী যদি খুব বিদুষী অথচ গৃহস্থালীর খুঁটিনাটিতে অনভিজ্ঞ হন, তবে সেটা নিতান্ত অশোভন বোধ হয়, কিন্তু গৃহকর্ত্তা যদি সাংসারিক বিষয়ে অকর্ম্মণ্য হন, তবে তিনি 'ভোলানাথ' উপাধি মাত্র লাভ করেন,—তিনি রোজগার করিতে পারিলেই গৃহস্থ ধন্য।

বাঙালী ভদ্রলোক কেবল সাধারণ বিদ্যা এবং অর্থ লাভের জন্যই ব্যস্ত; কিন্তু মানবের যে আদিম দক্ষতা তাহা ভুলিয়া যাইতেছেন। এ বিষয়ে পাশ্চাত্যগণ এবং এ দেশের নিম্নস্তরের লোকেরাও শ্রেষ্ঠ। একজন সুসভ্য বাঙালী যুবককে যদি রামচন্দ্রের মত বনবাসে পাঠানো যায়, তবে বেচারা বিঘোরে মারা যাইবে। কিন্তু একজন অসভ্য চাষা যেমন করিয়া হোক নিজের একটা ব্যবস্থা করিয়া লইবে। আমরা নগরের যন্ত্র-চালিত জীবন-যাত্রার ফলে ক্রমশঃ কলের পুতুল হইতেছি,—পরের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হইতেছি। ঘরকন্নার কিয়দংশ মাত্র মেয়েদের ঘাড়ে ফেলিয়া, বাকী সমস্তই চাকর, মিস্ত্রি অথবা বিলাতী বণিকের উপর বরাত দিয়াছি। আমরা অভাবের মাত্রা বাড়াইয়াছি, অথচ অভাব পূরণের জন্য যে সব জিনিষ চাই তাহা উৎপন্ন করিবার, এমন কি ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টাও করি না। যে অক্ষমতার ফলে বাঙালি ভদ্রলোক

জীবন-যুদ্ধে হঠিয়া যাইতেছেন, তাহার নিদর্শন সাংসারিক কার্য্যেও পুরামাত্রায় দেখা যাইতেছে। এই অসহায় ভাব আমাদের শিক্ষাকে অসম্পূর্ণ রাখিয়াছে, এবং সৌষ্ঠব বোধকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। Division of labour সভ্যতার মূল মন্ত্র বটে, কিন্তু ইহার অন্ধ সাধক হইলে পঙ্গুত্ব আসিবে। শিক্ষা আরও ব্যাপক করিবার সময় আসিয়াছে।

আজকাল যে boy Scout শিক্ষা-পদ্ধতি চলিয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়। কিন্তু এ প্রকার সংঘটন ব্যয়সাধ্য এবং সকল স্থলে সম্ভব নয়। যাঁহারা শিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তা করেন, তাঁহারা মনোযোগী হইলে অল্প আয়াসে বিনা আড়ম্বরে এই অভাব দূর হইতে পারিবে।

মোট কথা, নারী উপার্জ্জন করুন বা না করুন, তাঁহাকে বিদুষী হইতে হইবে, কেবল সুমাতা সুগৃহিনী হইলে চলিবে না। পুরুষকে সুজনক এবং কুশলী গৃহস্থ হইতে হইবে,—কেবল বিদ্বান ও উপার্জ্জক হইলে চলিবে না।

অতীতের আলো

(MOORE)

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী

কত না নিঝুম নিরালা নিশায়
না লাগিতে চোখে ঘুমের ঘোর
স্মৃতি মায়াময়ী নিভৃতে ফুটায়
অতীতের আলো মানসে মোর।

থেকে থেকে আজি মনে পড়ে যত
ছেলেবেলাকার খেলার সাথী,
তরুণ বৃন্তে পাপড়ীর মত
ছিনু বিজড়িত মিলনে মাতি।

কিশোর কালের হাসি সু-চপল
ক্ষণিকের দুখে অশ্রু তরল
প্রেমে গদগদ বচন বিভল
বাজায় আথর হৃদয়-বীণ;

ক্রমশঃ কঠোর হিমের পরশে
একে একে সবে পড়িয়াছে খসে,
আমি শুধু একা কাঁদিতেছি বসে
শিশির-সিক্ত বিরল-দল;

সখাদের সেই উজল নয়ন
নিষ্প্রভ এবে বিগত-স্বপন
ফুল্ল হৃদয় ফুলের মতন
ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে হরষ-হীন।

মনে হয় যেন সুগভীর রাতি
উৎসব শেষে নিভিয়াছে বাতি
বাসি ফুল-মালা বিমলিন কাঁতি
ভ্রমিতেছি এক ভবন-তল!

এমনি নিঝম নিরালা নিশায়
না লাগিতে চোখে ঘুমের ঘোর,
স্মৃতি বিষাদিনী নিভৃতে ফুটায়
অতীতের আলো মরমে মোর।

এমনি নিঝুম নিরালা নিশায়
না লাগিতে চোখে ঘুমের ঘোর
স্মৃতি বিষাদিনী নিভৃতে ফুটায়
অতীতের আলো মরমে মোর।

নায়েব মহাশয়

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীনাথ গোঁসাই মুচিবাড়িয়া কানসারণের নায়েব নিযুক্ত হইবার পর ম্যানেজার হামফ্রি সাহেবের মনোরঞ্জনের জন্য যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল, তাহার মনিব সরকারের নিকট কার্য্যদক্ষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবার ইহাই একমাত্র পন্থা। হামফ্রি সাহেব কিছুদিনের মধ্যেই তাহার পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন, তাহার যোগ্যতায় তাঁহার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। মনিব সরকারের স্বার্থরক্ষায় ভূতপূর্ব্ব নায়েব অপেক্ষা তাহার অধিকতর আগ্রহ আছে—ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য শ্রীনাথ কানসারণের অধীন সাধারণ কৃষক প্রজা ও ভদ্রলোক সকলকেই নানাভাবে উৎপীড়িত করিতে লাগিল। প্রজাবর্গ বিপন্ন ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া অবশেষে স্থানীয় পুলিশ-ইনেস্পেক্টরের শরণাগত হইল।

এই সময়ে যিনি মুচিবাড়িয়ায় পুলিশ-ইনেস্পেক্টরের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহার নাম হরিনাথ বসু। হরিনাথবাবু নলিনী দারোগার দলের পুলিশ কর্ম্মচারী ছিলেন না; তিনি শিক্ষিত, ধর্ম্মভীরু, নিরপেক্ষ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ 'অফিসার' ছিলেন। হামফ্রি সাহেব ও নায়েব তাঁহাকে বশীভূত করিবার জন্য চেষ্টা-যত্নের ত্রুটি করেন নাই; তিনি কিছুদিন মুচিবাড়িয়ায় থাকিলে মানুষ হইয়া যাইবেন, ভবিষ্যতের সংস্থানের জন্য তাঁহাকে ভাবিতে হইবে না,—এরূপ আশা-ভরসাও দিয়াছিলেন; কিন্তু কানসারণের সহস্র-সহস্র প্রজার সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করিয়া, জমীদারের পৈশাচিক ষড়যন্ত্রের সমর্থন করিয়া, অবৈধ উপায়ে ধনসঞ্চয় করা অতি গর্হিত কার্য্য বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইয়াছিল; প্রজাসাধারণেও তাঁহার নিস্পৃহতা ও কর্ত্তব্যানুরাগের পরিচয় পাইয়াছিল। এইজন্য তাহারা আশ্বস্ত হৃদয়ে তাঁহার শরণাগত হইলে, তিনি ম্যানেজার ও নায়েবের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কোন-কোন প্রজার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করিতে গিয়া, নায়েবকে দুই-একবার অপদস্থও হইতে হইল।

শ্রীনাথ নায়েব কিছুদিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিল—হরিনাথ বসু মুচিবাড়িয়া এলাকার ইন্‌স্পেক্টর থাকিতে, নির্ব্বিঘ্নে প্রজাপীড়ন করা ক্রমেই অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে; অথচ সঙ্গত উপায়ে ইন্‌স্পেক্টরকে জব্দ করিবার উপায় নাই। শ্রীনাথ নায়েব নায়েবী বুদ্ধি খাটাইয়া যখন কোন কৌশলেই ইন্‌স্পেক্টরকে বশীভূত বা বিপন্ন করিতে পারিল না, তখন সে একদিন গোপনে হামফ্রি সাহেবকে বলিল, "হুজুর, হরিনাথ বোস এখানকার ইন্‌স্পেক্টর থাকিতে হুজুর সরকারের স্বার্থ ষোল আনা বজায় রাখিবার কোনই উপায় দেখিতেছি না! এই কলিকালে সোজা আঙ্গুলে ঘি বাহির হয় না; কিন্তু আঙ্গুল একটু বাঁকা করিলে আর রক্ষা নাই,—ইনস্পেক্টর তৎক্ষণাৎ প্রজার পক্ষ লইয়া আমাকে অপদস্থ ও বিব্রত করিবার চেষ্টা করে। পুলিশ এ ভাবে জমীদারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে কি প্রজা-শাসন হয়, না জমীদারের মান-সম্ভ্রম বজায় থাকে? হুজুর পুলিশের বড় সাহেবকে একখান 'কন্‌ফিডেন্‌সাল' পত্র লিখিয়া এ এলাকা হইতে উহাকে সরাইবার ব্যবস্থা না করিলে, নায়েবী করা আমার পক্ষে ঝকমারী হইবে।"

হামফ্রি সাহেব পেন্সিলের পুচ্ছদেশ দংশন করিতে-করিতে দুই-এক মিনিট কি চিন্তা করিলেন। তাহার পর টেবিলের অন্য প্রান্তে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান নায়েবের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ডেখো গোন্‌সাই, টুমি সেই হারামজাড্‌ ইন্‌স্পেক্টরটাকে আমার এলাকা হৈটে নিকাল ডিটে যে প্রস্‌টাব করিলে উহা বুড্ডিমানের কটা নহে। আমি সাড়া কালোর মড্যে যাইতে অনিচ্ছুক। কলেক্টর বা সুপরণটিনডেণ্ট অব পোলিস্‌ মিঃ হেডষ্টং এর সঙ্গে ডেখা

হইলে ডু এক কটা বলিটে পারি ; কিন্তু টোমার মাটায় কি গোবর ভিন্ন অন্য পডার্ট নাই ? ইন্‌স্পেক্টরটাকে একটা ফেল্‌সানি টেল্‌সাগি কেসে নিক্ষেপ করিটে পার না ? এ সব বিষয়ে সাণ্ডেল নায়েবের মাটা খুব 'ক্লিয়ার' ছিল। আমি ডেকিটেছি টুমি নায়েবীর উপযুক্ট নও। একটা ইন্‌স্পেক্টরকে জব্‌ড় করিতে আমার সাহায্য চাহিটে তোমার সরম হইটেছে না ?"

সাহেবের তিরস্কারে নায়েব অপদস্থ হইয়া ম্লান মুখে খাস-কামরার বাহিরে আসিল, এবং প্রভুরউপদেশ কিরূপে কার্য্যে পরিণত করিবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল। সাহেবের মনোরঞ্জনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও তাঁহার তিরস্কার-ভাজন হইতে হইল। তিনি তাহাকে নায়েবী কার্য্যের অযোগ্য বলিলেন ; তাহার অতবড় মাথাটার মধ্যে কেবল গোবর ছাড়া আর কোন পদার্থ নাই বলিয়া উপহাস করিলেন ; ইহাতে সে বড়ই মর্ম্মাহত হইল।

দুই তিন দিনের চিন্তাতেই ইন্‌স্পেক্টরকে জব্দ করিবার একটি চমৎকার ফন্দী তাহার উর্ব্বর মস্তিষ্কে গজাইয়া উঠিল।

পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর হরিনাথ বসুর বাসার অদূরে চন্দোর ছুতোরের বাড়ী। চন্দোরের স্ত্রী চণ্ডীর কিঞ্চিৎ রূপ ছিল, বয়সও ছিল। সে পথে ঘাটে যাইবার সময় কখন কখন বসুজার প্রতি লোলুপ কটাক্ষপাত করিত ; কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না, বরং তাঁহার বাসার কাছে ছুতোর বাড়ীতে গ্রামের অসচ্চরিত্র নিষ্কর্ম্মা যুবকেরা মাথায় টেরি কাটিয়া ও মুখে সিগারেট গুঁজিয়া আড্ডা দিতে যাইত এবং প্রকাশ্য পথে দাঁড়াইয়া চন্দোরের রসিকা ভার্য্যার সহিত রসালাপ করিত—ইহার প্রমাণ পাইয়া তিনি দুই-এক দিন তাহাদিগকে 'খোঁয়াড়ে' পুরিয়া সায়েস্তা করিবার ভয়ও প্রদর্শন করিয়াছিলেন। নায়েব এই সংবাদ শুনিয়া একদিন সন্ধ্যার পর চন্দোরকে বাসায় ডাকাইয়া লইয়া গেল। নায়েব তাহাকে কিঞ্চিৎ লোভ দেখাইতেই সে নায়েবের গর্হিত প্রস্তাবে সম্মত হইল।

পর দিন সূত্রধর-গৃহিণী জেলার সদরে গিয়া ইন্‌স্পেক্টর হরিনাথ বসুর বিরুদ্ধে এই মর্ম্মে অভিযোগ করিল যে, হরিনাথ বাবু তাহার রূপ-যৌবন দর্শনে ক্ষিপ্তবৎ হইয়া দুই-তিন দিন পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া তাহাকে দেখাইয়াছিলেন, এবং তাহার নিকট কু-প্রস্তাব করিয়াছিলেন ; কিন্তু দরিদ্রের পত্নী হইলেও সে সতীশিরোমণি,—অর্থ বিনিময়ে সে সতীত্বরত্ন বিক্রয় করিতে সম্মত না হওয়ায় ইন্‌স্পেক্টর বাবু রাত্রিকালে তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া, তাহার পবিত্র অঙ্গ কলুষিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইন্‌স্পেক্টরের বিরুদ্ধে সাক্ষীরও অভাব হইল না।—কুঠীর একজন দরিদ্র প্রজার সাধ্বী পত্নীর প্রতি স্থানীয় পুলিশের বড়কর্ত্তার এইরূপ পৈশাচিক অত্যাচার! প্রজার দুঃখে প্রজার মা-বাপ করুণাময় হাম্‌ফ্রি সাহেবের করুণ হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল ; তিনি হরিনাথ বসুর প্রতি যথাযোগ্য দণ্ডের ব্যবস্থা করিবার জন্য মুক্তহস্তে তদ্বির আরম্ভ করিলেন। হরিনাথ বাবুকে এই কুৎসিৎ মামলার আসামী হইয়া অত্যন্ত বিব্রত হইতে হইল। বিশেষতঃ পুলিশের বিরুদ্ধে এরূপ মামলা জনসাধারণের অত্যন্ত মুখরোচক হইয়া উঠিল। হরিনাথ বাবু কর্ত্তব্য-পালন করিতে গিয়া এই ভাবে বিপন্ন হওয়ায় ঘৃণায়, লজ্জায় মৃতকল্প হইলেন ; কিন্তু তিনি বহুদর্শী পুলিশ কর্ম্মচারী ; মিথ্যা মামলা কিরূপে ফাঁসাইতে হয়, তাহা শ্রীনাথ নায়েব অপেক্ষা তিনি ভালই বুঝিতেন। তিনি বহু অর্থব্যয় করিয়া, চেষ্টা, যত্ন ও তদ্বিরের জোরে কোন রকমে উদ্ধার লাভ করিলেন। সে যাত্রা তাঁহাকে আর জেলে পচিতে হইল না। এই ঘটনার অব্যবহিত পরে জেলার কালেক্টর ও পুলিশ সুপারিণটেন্‌ডেণ্ট 'টুরে' মুচিবাড়িয়ায় আসিয়া হাম্‌ফ্রি সাহেবের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। হাম্‌ফ্রি সাহেব যোড়শোপচারে কুটুম্ব-সৎকার করিলেন। ইন্‌স্পেক্টর হরিনাথ বাবু অবিলম্বে বদলীর হুকুম পাইলেন। তাঁহারও আর জলে বাস করিয়া কুম্ভীরের লাঙ্গুলাকর্ষণের আগ্রহ ছিল না। মুচিবাড়িয়া ত্যাগ করিয়া তিনি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। কিন্তু উৎপীড়িতের আশ্রয়দাতা ও দুর্ব্বলের রক্ষক এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ন্যায়পর পুলিশ কর্ম্মচারীর অভাবে প্রজারা আপনাদিগকে নিরাশ্রয় মনে করিতে লাগিল। বাঙ্গলায় পুলিশ রাজত্বে এরূপ দৃষ্টান্ত একান্ত বিরল। হাম্‌ফ্রি সাহেবের অনুগত হইয়া শ্রীনাথ নায়েবের 'পেটেলী' করিলে, হরিনাথ বাবু সুদীর্ঘকাল মুচিবাড়িয়ায় থাকিয়া বেশ গুছাইয়া লইতে পারিতেন ; কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি ন্যায়ের সমর্থন ও কর্ত্তব্য-পথের অনুসরণ করিয়া বিধ্বস্ত হইলেন। জানি না পুলিশ বিভাগে এরূপ নির্ব্বোধের সংখ্যা কত!

ইনস্পেক্টর হরিনাথ বসুকে মুচিবাড়িয়া হইতে বিতাড়িত করিয়া, শ্রীনাথ নায়েবের সাহস ও উৎসাহ অনেক বাড়িয়া গেল। কিন্তু সে তখনও সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক হইতে পারিল না; কারণ মথুর বাবু নামক যে ভদ্রলোকটি ইনস্পেক্টর হরিনাথ বাবুর অধীনে মুচিবাড়িয়ায় দারোগা পদে নিযুক্ত ছিলেন, তিনিও হরিনাথ বাবুর ন্যায় ধর্ম্মভীরু, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, প্রজারঞ্জক কর্ম্মচারী ছিলেন। হরিনাথ বাবু যে প্রত্যেক কার্য্যেই উৎপীড়িত প্রজার পক্ষ সমর্থনে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহার কারণ তাঁহার সঙ্কল্প সাধনে মথুর বাবুর আন্তরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতা। মথুর বাবু নলিনী দারোগার মত হাম্‌ফ্রি সাহেবের ক্রীতদাস হইলে, উপর-ওয়ালা হইয়াও হরিনাথ বাবু সর্ব্বত্র ন্যায়ের সম্মান রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেন না, দারোগার সহিত তাঁহার সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠিত। হরিনাথ বাবু মুচিবাড়িয়া হইতে বদলী হইলে, মথুর বাবুর দক্ষিণ হস্ত যেন ভাঙ্গিয়া গেল। কারণ, হরিনাথ বাবুর পরিবর্ত্তে বসন্ত বাবু নামক যে ভদ্রলোক মুচিবাড়িয়ার ইনস্পেক্টর হইয়া আসিলেন, তিনি হরিনাথ বাবুর উচ্চ আদর্শকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। মান-সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অর্থোপার্জ্জন করাই তাঁহার চাক-রীর একমাত্র লক্ষ্য ছিল। বিশেষতঃ, হরিনাথ বাবুর পরি-ণাম দেখিয়া তিনি পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হইয়াছিলেন। মুচিবাড়িয়ায় আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই, তিনি হাম্‌ফ্রি সাহেবের মনোরঞ্জনে প্রস্তুত হইলেন; এবং শ্রীনাথ নায়েবের প্রত্যেক আদেশ তাহার তাঁবেদারের ন্যায় পালন করিতে লাগিলেন। একদিকে প্রজার ক্রন্দনোচ্ছ্বাস, অন্য দিকে কুঠীর উপহারের 'রাশ'; বসন্ত বাবু অল্প দিনেই বেশ গুছাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিলেন। ইনস্পেক্টরের এইরূপ মতিগতির পরিচয় পাইয়াও মথুর বাবু কর্ত্তব্য-পথ হইতে বিচলিত হইলেন না,—নায়েবের প্রজাপীড়ন কৌশলে সাধ্যানুসারে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এজন্য বসন্ত বাবুর সহিত তাঁহার মনান্তর আরম্ভ হইল। নায়েবও এই সুযোগে দারোগার বিরুদ্ধে তাঁহাকে উত্তেজিত করিতে লাগিল, এবং তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল, প্রজার নিকট যথেষ্ট উৎকোচ আদায়ের ফলেই তাঁহার তাঁবেদারের এই অবাধ্যতা। বসন্ত বাবু উপরওয়ালা হইয়া দারোগার এই ধৃষ্টতা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি মথুর বাবুর বিরুদ্ধে কতকগুলি মিথ্যা রিপোর্ট পেশ করিলেন। সরকারের সনাতন বিধানে উপরওয়ালাই সত্যবাদী, তাঁবেদার মিথ্যা-বাদী, বিশ্বাসের অযোগ্য। সুতরাং মথুর বাবুও মুচিবাড়িয়া হইতে স্থানান্তরিত হইলেন। নায়েব এতদিনে সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক হইয়া, প্রজার বুকের উপর দিয়া লাঙ্গল চালাইতে লাগিল। নিত্য নিগৃহীত হতভাগ্য অভিশপ্ত দরিদ্র প্রজা দীন নেত্রে উর্দ্ধে চাহিয়া নীরবে অশ্রু মোচন করিতে লাগিল।

শ্রীনাথ নায়েবের মান-সম্ভ্রম, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহার সকল সুখ-সৌভাগ্যের মূল এবং দুর্দ্দিনের অদ্বিতীয় বান্ধব 'খুড়ো মশায়' ভুবন রায়ের প্রতি তাহার ভক্তির স্রোতে ভাটা আরম্ভ হইল। এবং কার্য্যোদ্ধারের জন্য সে যে মাংসপিণ্ডের টোপ বঁড়শীতে গাঁথিয়া 'খুড়ো মশায়' রূপ রাঘব বোয়ালটিকে আয়ত্ত করিয়াছিল, 'খুড়ো মশায়ে'র কবলগত সেই মাংসপিণ্ডটার প্রতি তাহার লোলুপ দৃষ্টি নিপতিত হইল। খুড়ো মশায়' ভুবন রায়ের ব্রাহ্মণীর মত তাহারও সাধ্বী পত্নী একটি বয়স্ক পুত্র রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু খুড়োমশায়ের মত সে কেবল 'তলার কুড়াইয়া'ই ক্ষান্ত হইতে পারে নাই,—গাছেরও পাড়িয়াছিল, তলারও কুড়াই-য়াছিল। পরিণত বয়সে পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করিয়াও সে অবশেষে 'খুড়ো মশায়ে'র উদ্দেশে উৎসৃষ্ট সেই মাংসপিণ্ডের লোভ ত্যাগ করিতে পারিল না! সুতরাং এই নরপিশাচ ভুবন রায় অপেক্ষাও ঘোরতর পাপিষ্ঠ, বিশ্বাসঘাতক ও প্রতারক। এরূপ নরাধম ভিন্ন কুঠীর নায়েবীতে কোন্ ভদ্রলোক যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারে?

'খুড়ো মশায়' যখন জানিতে পারিল, তাহার উপযুক্ত 'ভ' ·· তাহার 'ভবজলধি রত্নং' আত্মসাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছে, ·· র মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তাহার দাদা গোলক রায়ের অন্তিমকালের উক্তি তাহার মনে পড়িল। সে নানা কৌশলে নায়েবের চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু শ্রীনাথ তখন প্রকাণ্ড কান্সারণের নায়েব,—মুচিবাড়িয়ার ডেপুটী গবর্ণর। আর ভুবন রায় তাহার অধীন একটি ক্ষুদ্র নীলকুঠীর 'দেওয়ান মাত্র। নায়েব উদ্দাম প্রবৃত্তি-স্রোতে বাধা

পাইয়া ক্রোধে অধীর হইল, এবং ভুবন রায়, 'সুখের লাগিয়া যে ঘর' বাঁধিয়াছিল,—এক দিন সত্য-সত্যই চণ্ডালিনীর সেই ঘর আগুনে পুড়াইয়া দিল। তাহার পর নায়েব গৃহহীনা বিপন্না চণ্ডালিনীকে মাণিকচরে লইয়া গিয়া, সেখানে তাহার জন্য নূতন ঘর বাঁধিয়া দিল। ভাইপো ওসমানের লাঠীর ভয়ে খুড়া জগৎসিংহ আর সেদিকে অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। ভুবন রায়ের 'আমও গেল, ছালাও গেল!'

কিন্তু নানা কারণে খুড়োর প্রতি ভাইপোর আক্রোশ দিন্‌-দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শ্রীনাথ নায়েব ভুবন রায়কে পদচ্যুত ও নিগৃহীত করিবার জন্য ক্রমাগত তাহার দোষ খুঁজিতে লাগিল। ভুবন রায়ের পক্ষে হামফ্রি সাহেব যখন কল্পতরু হইয়াছিলেন, সেই সময় সাহেবকে ধরিয়া ভুবন রায় তাহার বংশের অধিকাংশ কুপোষ্যকে এই সুবিস্তীর্ণ কানসারণে এক-একটা চাকরী জুটাইয়া দিয়াছিল। অযোগ্যতা বশতঃ তাহাদের কেহ-কেহ পরে পদচ্যুত হইলেও, শ্রীনাথ নায়েবের অভ্যুদয়কালে ভুবনের কনিষ্ঠ মথুর রায় ও ভ্রাতুষ্পুত্র মৃত্যুঞ্জয় রায় কান্‌সারণে চাকরী করিতেছিল। নায়েব ভুবন রায়ের ছিদ্র সংগ্রহের জন্য তাহার এই ভাই ও ভাইপোর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে লাগিল; তাহাদিগের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিল; এবং ভবিষ্যত উন্নতির আশা-ভরসাও দিল। মৃত্যুঞ্জয় রায় এই অল্প দিনে শ্রীনাথ নায়েবকে চিনিয়া লইয়াছিল; সে বুদ্ধিমান ও সতর্ক লোক,—সহস্র চেষ্টাতেও তাহার নিকট হইতে কোন কথা বাহির করিয়া লইতে পারিল না। মথুর রায় গৌড়েশ্বরীর উপাসক ছিল; নায়েবের অনুগ্রহে 'আবগারি দোকানে'র দ্বার তাহার পক্ষে অবারিত হইল; এবং সে নায়েবের হস্তের ক্রীড়া-পুত্তলিকায় পরিণত হইল। মথুর রায় সদানন্দে বিভোর হইয়া ঘরের কথা নায়েবের নিকট অসঙ্কোচে প্রকাশ করিতে লাগিল,—নায়েবও ভুবন রায়কে ফাঁদে ফেলিবার জন্য সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

এই সময় ভুবন রায় অসুস্থ হইয়া শয্যাগত হইল। কুঠীতে আসিয়া কাজকর্ম্ম করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হওয়ায় নায়েব সুযোগ বুঝিয়া তাহাকে কুঠীতে হাজির হইবার জন্য পুনঃ-পুনঃ হুকুম পাঠাইতে লাগিল। কিন্তু নায়েবের হুকুম তামিল করা দূরের কথা—ভুবন রায় তাহার কোন পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত লিখিতে পারিল না। নায়েব দেখিল, ভুবন রায়কে পদচ্যুত করিবার এরূপ সুযোগ শীঘ্র পাওয়া যাইবে না। সে হামফ্রি সাহেবকে ভুবন রায়ের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিয়া তাঁহাকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইহার মূলে একটু ইতিহাস আছে, তাহা এখানে বলা আবশ্যক।

জাফরাবাদের নবাব তাঁহার হাতীভাঙ্গা নামক একখানি তালুক নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কানসারণকে পত্তনী বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। পত্তনীর মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে নবাব তাহা খাসে রাখিতে উৎসুক হইলেন; কারণ, তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, খাসে রাখাই তাঁহার পক্ষে অধিকতর লাভজনক। নবাব তালুকখানি খাস করিয়া লইবেন শুনিয়া, তালুকের প্রজাপুঞ্জ অত্যন্ত আনন্দিত হইল; এবং তালুকখানি তিনি যাহাতে পুনর্ব্বার সাহেব সরকারের নিকট পত্তনী না দেন, সেজন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিল। তাহারা দীর্ঘকাল যাবৎ পত্তনীদার সাহেবদের শাসন ও শোষণ-কৌশলে জ্বালাতন হইয়াছিল। নবাব পত্তনীদারদের নোটীস দিলেন, তিনি তাঁহার তালুক খাসে রাখিবেন, তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার পত্তনী দিতে অনিচ্ছুক; তাঁহারা যেন দখল ছাড়িয়া দেন। কিন্তু প্রবল-প্রতাপ জমীদার কোম্পানী একবার যাহা গ্রাস করেন, তাহা নিঃশেষে পরিপাক করাই তাঁহাদের কুলধর্ম্ম। বিনা নালিশে তাঁহারা এরূপ লাভজনক তালুকের অধিকার ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। নবাবের নোটীস তাঁহারা বাজে কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহারা গায়ের জোরে মহাল দখলে রাখিলেন। ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত হইয়া নবাবও অবশ্যই হতাশভাবে গড়গড়ায় মনঃসংযোগ করিলেন না।

নায়েব শ্রীনাথ গোঁসাই হামফ্রি সাহেবকে বুঝাইয়া দিল, ভুবন রায়ের অসুখের কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা; সে অসুখের ভান করিয়া কুঠীতে যাওয়া বন্ধ করিয়াছে, কিন্তু সুস্থদেহে হাতীভাঙ্গা তালুকের প্রজাদের বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; ও তাহাদিগকে হুজুর সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া বিদ্রোহী হইবার জন্য উৎসাহিত করিতেছে।

ভুবন রায় কান্‌সারণের কার্য্যে অভিজ্ঞ ও বহুদর্শী কর্ম্মচারী, ইহা পূর্ব্বাপরই হাম্‌ফ্রি সাহেবের বিশ্বাস ছিল; ভুবন রায়কে তিনি যথেষ্ট বিশ্বাসও করিতেন। ভুবন রায়ের সুপারিসেই শ্রীনাথ নায়েবী পদে প্রতিষ্ঠিত—এ কথা শ্রীনাথ বিস্মৃত হইলেও, হাম্‌ফ্রি সাহেব এত অল্প দিনে তাহা ভুলিয়া যান নাই। সুতরাং ভুবনের বিরুদ্ধে নায়েবের এই 'ঠকামী' শুনিয়া সাহেব অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; কিন্তু অভিযোগের গুরুত্ব বুঝিয়া তিনি কথাটা উড়াইয়া দিতে পারিলেন না। সাহেবকে চিন্তিত দেখিয়া ধূর্ত্ত শ্রীনাথ মুহূর্ত্তে তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিল; এবং কাঁদ-কাঁদ হইয়া করযোড়ে বলিল, "হুজুর, ভুবন রায়ের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ,—তিনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহা হুজুরেরও অজ্ঞাত নহে। আমি তাঁহাকে খুড়া বলিয়া ডাকি, এবং আমার পিতার সহোদরের ন্যায় ভক্তি-শ্রদ্ধা করি। এ অবস্থায় তাঁহার বিরুদ্ধে হুজুরের নিকট এই সকল অপ্রিয় সত্য প্রকাশ করিতে আমার মনে কি মর্ম্মান্তিক কষ্ট হইতেছে, তাহা হুজুরকে বুঝাইতে পারিব না। কিন্তু আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ বলিয়া, হুজুর সরকারের প্রতি তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতা, কর্ত্তব্য কর্ম্মে তাঁহার গাফিলী প্রভৃতিকেও গোপন করিব—আমি সেরূপ নিমকহারাম নহি। হুজুর সরকারের যে অনিষ্ট চেষ্টা করিবে—আমার পিতা হইলেও তাহাকে আমি ক্ষমা করিতে পারিব না।"

নায়েবের বক্তৃতা শুনিয়া সাহেব মুগ্ধ হইলেন; কিন্তু নায়েবের কথা 'বাইবেল বাক্যের' ন্যায় সত্য বলিয়া শিরোধার্য্য না করিয়া, ভুবন রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র মৃত্যুঞ্জয় রায়কে ডাকিয়া তাহার কাকার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। মৃত্যুঞ্জয় নায়েবের ইঙ্গিতে মিথ্যা কথা বলিতে সম্মত হইল না। সে স্পষ্টই বলিল, তাহার কাকা অসুস্থ অবস্থায় শয্যাগত আছেন। নায়েব মৃত্যুঞ্জয়কে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিবার জন্য ভুবনের কনিষ্ঠ সহোদর মথুর রায়কে সাহেবের নিকট হাজির করিল। মথুর 'শ্রীনাথ ভাইপো'র দৌলতে বিস্তর বোতল উজাড় করিয়াছে; সে কি করিয়া সাহেবের নিকট উপরওয়ালা ভাইপোকে অপদস্থ করিবে? অথচ নির্জ্জলা মিথ্যা বলিতেও সাদা চোখে লজ্জা অনুভব করিল। অবশেষে 'হত ইতি গজ' ভাবের যে উত্তর দিল, তাহা হইতে সাহেব বুঝিলেন, অসুখের কথাটা সত্য, তবে অসুখ তেমন গুরুতর নয়।

কিন্তু নায়েবের আশা পূর্ণ হইল না। সাহেব ভুবন রায়কে 'ডিস্‌মিস্‌' বা 'সস্‌পেণ্ড', ত করিলেনই না, এমন কি, তাহার কৈফিয়ৎ তলপ করিবারও হুকুম দিলেন না! ভুবন রায় যেন হাতীভাঙ্গা মহালের প্রজাদের বশীভূত করিবার চেষ্টা করে, এই মর্ম্মে তাহাকে পত্র লিখিবার জন্য নায়েবকে আদেশ করিলেন। নায়েব ক্ষুণ্ণ মনে তাঁহার আদেশ পালন করিল; কিন্তু তাহার সাধু সঙ্কল্প ত্যাগ করিল না।

অতঃপর নবাবের আমলা, পাইক, হালসানারা হাতীভাঙ্গা তালুক দখল করিতে আসিল! কানসারণের আমলা, হালসানা, বরকন্দাজেরাও মহালের ভিতর সদর্পে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। উভয় পক্ষ হইতেই শান্তিভঙ্গের আশঙ্কার কথা মুচিবাড়িয়ার থানার দারোগার গোচর করা হইল।

এই সময় থানায় যিনি নূতন দারোগা আসিয়াছিলেন, তাঁহার নাম নরেন্দ্র চন্দ্র। এই চন্দ্র দারোগাটি একটি 'চিজ'। 'শস্যঞ্চ গৃহমাগত' এই মন্ত্রের তিনি উপাসক ছিলেন। শস্য-সঞ্চয়ের এরূপ সুযোগ তিনি কি করিয়া ত্যাগ করেন? কান্‌সারণের গোলামী করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তিনি শ্রীনাথ নায়েবের ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতে লাগিলেন,—যেন সরকার বাহাদুর কানসারণের স্বার্থরক্ষার জন্যই তাঁহাকে মুচিবাড়িয়া থানায় পাঠাইয়াছেন!

হাতীভাঙ্গা মহাল ভুবন রায়ের বাসপল্লীর সন্নিকটে অবস্থিত বলিয়া, হাম্‌ফ্রি সাহেবের ধারণা হইয়াছিল, ভুবন রায় এই মহাল সম্বন্ধে যথেষ্ট 'ওয়াকিব হাল'; তাহার সাহায্যে অনেক তত্ত্ব-সংবাদ সংগৃহীত হইতে পারে। এই জন্যই নায়েব তাহার অনিষ্ট চেষ্টায় তখনকার মত বিরত হইয়া, মধ্যে-মধ্যে চিঠি লিখিয়া তাহাকে 'মনিব সাহেব বাহাদুরের' গোপনীয় আদেশ জ্ঞাপন করিতে লাগিল। ভুবন রায় মহাল তদন্ত করিয়া যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিল, নায়েবকে লিখিয়া 'হুজুর বাহাদুরের' হুকুম তামিল করিল। চাকরী বজায় রাখিবার জন্য যতটুকু করা উচিত তাহার অধিক কিছুই করিল না।

নায়েবের আদেশে নরেন্দ্র দারোগা সরেজমিনে তদন্ত

করিয়া আসিয়া সাহেব সরকারের কোন উপকার করিতে না পারায় মর্ম্মাহত হইল।" অতঃপর কি ভাবে মামলা চালাইলে সুবিধা হইবে, এবং সাক্ষীদের দিয়া কি কথা বলাইতে হইবে, তৎসম্বন্ধে নায়েবকে যথাযোগ্য উপদেশ দিলে, নায়েব মহা উৎসাহে দুই মাস ধরিয়া মামলার তদ্বির ও সাক্ষীদের 'গড়িয়া পিটিয়া' ঠিক করিল। দুই মাস পরে দারোগা যেদিন শুনিল তাহার উপদেশানুসারে কাজ হইয়াছে—সেই দিন সে পুনর্ব্বার সরেজমিনে তদন্ত করিয়া আসিয়া, প্রভাতেই কুঠীতে হাজির হইল; এবং সাক্ষীরা আদালতে উপস্থিত হইয়া কি কি কথা বলিবে, তাহা নায়েবকে শিখাইয়া দিলে, নায়েব (স্থানীয় সাক্ষীদের দারোগার নিকট হাজির করিয়া জবানবন্দী দেওয়ার জন্য) ভুবন রায়কে যে গোপনীয় পত্র লিখিল তাহাতে দারোগাকে হস্তগত করিয়া নায়েব কি ভাবে কার্য্যোদ্ধারের ব্যবস্থা করিল, কুঠীর কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আজ পাঠক-পাঠিকাগণকে তাহার একটু নমুনা দেখাইবার জন্য আমরা সেই অনিন্দ্যসুন্দর পত্রখানির অনুলিপি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

শ্রীশ্রীদুর্গা (গোপনীয়)

প্রণাম সংখ্যাতীত নিবেদনমিদং, কুঠীতে অদ্য প্রাতে সব ইং বাবু আসিয়াছেন। যে সমস্ত লোককে তদন্তে সরজমিনে আসা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাদের নামের তালিকা 'বাবু' (*) দেওয়ায়, অত্রসহ পাঠাইলাম। আগামী কল্য অতি প্রাতে ফর্দ্দের লিখিত লোক সকলকে এবং 'দে দেওয়ায়' (†) আমাদের সাক্ষী সকল থানায় উপস্থিত হওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। সব ইং বাবু এখানে সাক্ষ্য লইয়া আগামী কল্য বৈকালে সদরে যাইবেন; সুতরাং প্রাতেই সাক্ষী আনার বিশেষ দরকার। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি—১৯১৫। ২মে।

মোং কুঠী মুচিবাড়িয়া সেবক

শ্রীশ্রীনাথ গোস্বামী।

যে সকল সাক্ষীকে কুঠীর অনুকূল জবানবন্দী দেওয়ার জন্য হাজির করা হইয়াছিল, তাহারা যে সকলেই সত্য কথা বলিয়া ন্যায়ের সমর্থনের উদ্দেশ্যেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মুচিবাড়িয়ায় আসিয়াছিল, এ কথা, আশা করি, কাহারও বিশ্বাস করিতে সাহস হইবে না। কতকগুলি সাক্ষী দরখাস্ত দ্বারা হাকিমকে জানাইয়াছিল 'ভয় প্রদর্শন করায়' তাহারা আসিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের দরখাস্তগুলি মাঠে মারা গিয়াছিল। যে হতভাগ্য দেশের ভ্যাড়ার দল 'ভয় প্রদর্শন করায়' মিথ্যা জবানবন্দী দিতে আসিতে কুণ্ঠিত হয় না, তাহারাই আবার তাহাদের সেই ভীরুতা ও চরিত্রগত দুর্ব্বলতার কলঙ্ক ডেমিতে মাখিয়া আদালতের করুণা উদ্রেকের চেষ্টা করিতে লজ্জা বোধ করে না। মিথ্যা জবানবন্দী দিতে তাহাদের কুণ্ঠা নাই, -ভয় প্রদর্শনেই তাহদের আপত্তি! কিন্তু অবস্থা বিবেচনায় তাহদের এই নির্লজ্জতা ও কাপুরুষতাও মার্জ্জনীয় মনে হয়। যখন আমরা দেখিতে পাই ভারত সরকারের লক্ষ-লক্ষ প্রজার ভাগ্যসূত্র যাঁহারা নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, এবং সরকারের দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন—তাঁহারা হইতে আদালতের সামান্য পেয়াদা আর্দ্দালী পর্য্যন্ত কুঠীর অনুগ্রহপ্রার্থী, তাহারই পক্ষপাতী, তখন এই সকল ভীরু, আত্মপ্রবঞ্চিত, অত্যাচার-প্রপীড়িত, সদাশঙ্কিত মূঢ় গ্রামবাসীদের ব্যবহার দেখিয়া মর্ম্মাহত না হইয়া থাকা যায় না। যে সকল দরখাস্ত কুঠীর বিরুদ্ধে আদালতে পেশ হইত, সেই সকল দরখাস্ত সম্বন্ধে হুকুমের জন্য এক পক্ষ অন্তর তারিখ পড়িত। সেই সুযোগে আদালতের আমলারা 'ফাইল' হইতে সেই সকল দরখাস্ত বাহির করিয়া, গোপনে দুই তিন দিনের জন্য কুঠীর আমলাদের হাতে ছাড়িয়া দিত! সেই সকল দরখাস্ত নায়েবের হস্তগত হইলে, সে তাহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিত। তাহার পর দরখাস্তকারীদের কুঠীতে ডাকাইয়া আনিয়া তাহাদিগকে সেই দরখাস্তগুলি দেখাইয়া বলিত, "তোরা হুজুর সরকারের বিরুদ্ধে এই দরখাস্ত দিয়াছিস? তোরা ভাবিয়াছিস্ কি বল্। ইংরাজ গবমেণ্ট হাম্‌ফ্রি সাহেবের কুটুম্ব না তোদের কুটম্ব? আর এদেশের আইন হাম্‌ফ্রি সাহেবের বাপ দাদা করিয়াছে, না তোদের বাপ দাদা করিয়াছে? তোদের এই সব দরখাস্ত আমাদের সাহেবের কাছে 'তদন্তের' জন্য জেলা হইতে ফেরত আসিয়াছে। সাহেব বাহাদুর কি তোদের গোস্তাকির শাস্তি দিবেন না মনে করিয়াছিস্? হুজুর হুকুম দিয়াছেন—তোদের ফৌজ-

(*) দারোগাবাবু।

(†) বাধ্য করা সাক্ষী।

দারীতে দিবেনই, তা ছাড়া তোদের জমিজমা সমস্তই সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে।"

দরখাস্তকারীরা জেলার সদরে ফৌজদারীতে যে দরখাস্ত দিয়াছে, তাহা কুঠীতে প্রেরিত হইয়াছে দেখিয়া প্রমাদ গণিত! তাহাদের ধারণা হইত, ম্যানেজার সাহেবের ইঙ্গিতে জেলার জজ ম্যাজিষ্টার পর্য্যন্ত উঠা বসা করে;—ম্যানেজার সাহেব যাহা বলিবে, তাহারা তাহাই করিবে!—সুতরাং 'রেকাবদল' এবং তদপেক্ষা সাংঘাতিক অস্ত্র 'জমা-জমি সরকারে বাজেয়াপ্ত' হইবার ভয়ে ভবিষ্যতে তাহারা কুঠীর বিরুদ্ধে দরখাস্ত করা ত বন্ধ করিতই,—অধিকন্তু, এক পক্ষ পরে দরখাস্তকারীদের আপত্তি শুনানীর যে দিন পড়িত, সে দিন তাহারা আদালতে হাজির হইতে সাহস করিত না। হাকিম নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহাদিগকে আদালতে অনুপস্থিত দেখিয়া তাহাদের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিতেন।

তদ্বির ও যোগাড়ের বলে মিঃ হাম্‌ফ্রি হাতীভাঙ্গা পরগণা জোর করিয়া দখলে রাখিলেন; নরেন দারোগা নায়েবের গোমস্তা বা বরকন্দাজের সর্দ্দারের স্থান অধিকার করিয়া নবাবকে প্রতিপদে বিপন্ন করিতে লাগিল,—দেখিয়া নবাব অবশেষে যে মুদ্গরের সহায়তা গ্রহণ করিলেন, তাহা হাম্‌ফ্রি সাহেবেরও দারুণ দুশ্চিন্তার বিষয় হইল! পাঠক আগামী বার কণ্টক দ্বারা কণ্টকোৎপাটনের সেই বিচিত্র কাহিনী শ্রবণ করিবেন।

নিনি ও পিবি

(বিদেশের গল্প)

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল্

১

রুশিয়া ও জর্ম্মানির মধ্যে যে সমতল দেশ, তাহারই নাম পোলাণ্ড; পোলাণ্ডের অর্থই সমতল দেশ। এই দেশের বাগ্ নদীর পূর্ব্বকূলের একটি নগরে বিপত্নীক সিয়েম্‌এর একখানি মনোহারীর দোকান ছিল; আর সেই দোকানে জিনিসপত্র বেচিবার কাজ করিত সিয়েমের একমাত্র মেয়ে নিনি ও নিনির পিস্‌তুত বোন পিবি। পিবি বেচারার বাপ মরিবার পর তাহার মা যখন আবার বিবাহ করিল, তখন পিবির মা পিবিকে সিয়েমের হাতে সঁপিয়া দিল। নিনি এক জন সঙ্গী পাইয়া বাঁচিল, আর পিবিও নানা কারণে এখানে সুখে রহিল। এই উপাখ্যান আরম্ভের সময়ে নিনির বয়স হইয়াছিল আঠারো; পিবি তাহার চেয়ে দুই বৎসরের ছোট ছিল। কিন্তু পিবিকে দেখিলে নিনির চেয়ে বড় মনে হইত। নগরের লোকেরা নিনিকে বড় সুন্দরী মনে করিত। কিন্তু পিবির সরল মুখশ্রীতেও সৌন্দর্য্য মাখা ছিল।

সিয়েম প্রথমে লেখাপড়া শিখিয়াছিল নিজের দেশের বিলনা শিশু-বিদ্যালয়ে, তাহার পর সেণ্টপিটার্‌স্‌বর্গে। আর বহুদিন ধরিয়া জর্ম্মানিতে রেলের চাকুরী করিয়াছিল। জর্ম্মানিতেই সিয়েমের পত্নীবিয়োগ হয়। তাহার পর সে চাকুরী ছাড়িয়া দেশে আসিয়া দোকান খোলে। ইচ্ছা করিলেই যে কোন দেশেই সে ভাল চাকুরী পাইতে পারিত; কিন্তু সে চাকুরী লইল না। কলকারখানার অনেক কাজে লোকে তাহাকে ডাকিত; তাই দোকানের আয় ছাড়া তাহার অন্য আয় ছিল। সংসারের কাজ করিয়াও সিয়েমের অনেক অবসর মিলিত; আর সেই অবসরে নিনি ও পিবিকে সে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিত ও নিজে কত কি পড়িত। দোকান পাতিয়া বসিবার পর কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। তাহার পর ১৯১৪ অব্দের আগষ্ট মাসে ইয়োরোপের মহা সমর বাধিল। তখন তাহার বয়স হইয়াছিল ৪৫। তবুও যুদ্ধের দারুণ প্রয়োজনে তাহার ডাক পড়া অসম্ভব

ছিল না; কিন্তু এই নগরেই রুশিয়ার সরকার তাহাকে যুদ্ধের আয়োজনের কাজে লাগাইলেন বলিয়া, আপাততঃ সিয়েমের অনেক দুর্ভাগ্য কাটিয়া গেল।

রুশিয়ার সৈন্যেরা প্রথম যেদিন যুদ্ধে নামিল সেদিন মধ্যাহ্নে নগরের সকল স্ত্রী-পুরুষ গির্জ্জার পিছনের মাঠে সমবেত হইবার আদেশ পাইয়াছিল। আদেশ ছিল, যদি কেহ শারীরিক অক্ষমতার বিশেষ প্রমাণ দিতে না পারে, তবে অনুপস্থিতির জন্য সে দণ্ডিত হইবে।

যথাসময়ে গির্জ্জায় আহ্বানের ঘণ্টা বাজিল, আর দলে-দলে স্ত্রী-পুরুষেরা আপনাদের কচি শিশুগুলি পর্য্যন্ত বহিয়া গির্জ্জার মাঠের দিকে চলিল। নগরপালের লোকেরা—যখন একে-একে লোক গন্তি করিয়া ফটকের পথে প্রবেশ করাইতেছিল, তখন জপের মালা হাতে করিয়া গির্জ্জার পুরোহিত সকলকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। নিনি ও পিবি এই জনতার কাহারও দিকে না তাকাইয়া, অতি মৃদুস্বরে পরস্পরে দুই একটি কথা কহিতে-কহিতে মাঠের দিকে যাইতেছিল,—আর গির্জ্জার পুরোহিত ঠাকুর অতি অস্বাভাবিক আগ্রহে তাহাদিগকে দেখিতেছিলেন। সে দৃষ্টির কথা তখন নিনিও জানিতে পারে নাই, পিবিও জানিতে পারে নাই।

বিধাতার কাছে জয়ের বর প্রার্থনা করিবার অনুষ্ঠানটি শেষ হইবার পরে, নিনি ও পিবি ধীরে-ধীরে জনতা এড়াইয়া যখন ঘরে ফিরিতেছিল, তখন গির্জ্জার অবরোধে একজন কুমারী মালা জপিতে-জপিতে তাহাদের সঙ্গ লইলেন ও তাহাদের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গলের প্রশ্ন করিয়া, নানা কথা কহিতে-কহিতে সিয়মের দোকানের সম্মুখ পর্য্যন্ত আসিলেন। কুমারী ঠাকুরাণীর বয়স ৩০ বৎসরের কিছু উপর; তিনি সুন্দরী। তিনি করুণা করিয়া মিনি ও পিবিকে জানাইলেন যে, সময়ে-সময়ে তিনি তাহাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য দেখা দিবেন ও সময়ে-সময়ে ধর্ম্মশিক্ষা দিবেন। নিনির কণ্ঠে আপত্তিব্যঞ্জক সুর,—কিন্তু ধর্ম্মের আধিপত্য বা অত্যাচার অতিক্রম করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। কুমারীর প্রস্তাব মাথা পাতিয়া লইতে হইল।

২

কুমারী ঠাকুরাণী রাস্তার মোড় ঘুরিয়া চলিয়া গেলেন, নিনি ও পিবি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। দোকানের দরজা খুলিয়া ঢুকিবার সময় দুই বোনেই লক্ষ্য করিল,—একজন যুবক যেন তাহাদের দোকানের দিকে আসিতে-আসিতে থামিয়া গেল, আর একবার পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া চলিয়া গেল; পিবি নিনির মুখের দিকে চাহিল—নিনি অল্প একটু ভাবিয়া দরজা বন্ধ করিল। সেদিন নগরের দোকান-পাট বন্ধ ছিল; সিয়েমের ঘরে ফিরিতেও বিলম্ব ছিল; দুই বোনে বাড়ীর ছোট সবুজি বাগানের ধারে বসিয়া কথা কহিতে লাগিল। নিনি শূন্যে তাকাইয়া বলিল,—একেই বলে ধর্ম্ম। পিবি তাহার মামার উক্তি স্মরণ করিয়া কহিল,—অসম্ভব নয়, যে, এই যুদ্ধের ফলে পোলাণ্ডের স্বাধীনতা ফিরিয়া আসিবে। নিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পিবির হাত ধরিয়া কহিল,—"বোন! পোলাণ্ডের লোকে কি স্বাধীনতা পাইলেও রাখিতে পারিবে? ধর্ম্মবিশ্বাসে কপটতা ও ভণ্ডামি, সামাজিক অপবিত্রতার প্রতি উপেক্ষা, আত্ম-প্রতিষ্ঠার দিকে দৃষ্টি,—এ সকল ব্যাধি থাকিলে কি স্বাস্থ্য বাড়ে?—পরাধীনতা যায়?" সিয়েমের মুখে শুনিয়া দুই বোনেরই জানা ছিল যে, বহুদিন ধরিয়া গোপনে-গোপনে একটি সাধকদল রুশিয়ার অত্যাচারকে পরাভূত করিতে উদ্যোগ করিতেছিল, আর সিয়েম ছিলেন সেই দলের একজন। পিবি সেই দলের কথা মনে করিয়া বলিল,—"এত সাধনায় কি সুফল ফলিবে না?"

সে কথা যেন মিনির কাণেই গেল না। সে অনেকক্ষণ গাঢ় চিন্তায় ডুবিয়া রহিল। তাহার পর তাহার মুখে নূতন দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল; সে প্রফুল্ল মুখে আনন্দের উচ্ছ্বাসে পিবিকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—"পাইয়াছি, বোন, পাইয়াছি।" অত দীপ্তি, অত প্রফুল্লতা, অত আনন্দ পিবি কখনও মিনিতে লক্ষ্য করে নাই; সে কথা কহিল না, কেবল মিনির মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

দোকানের সম্মুখের দরজায় কড়ার ঘা শুনিয়া দুইজনেই দৌড়াইয়া গেল; কবাট খুলিতেই সিয়েম একটি ছোট পুঁটুলি হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিল। পিবি সিয়েমের হাতের পুঁটুলিটি লইল, আর মিনি তাহার প্রদীপ্ত প্রসন্ন মুখে হাসি ছড়াইয়া সিয়েমকে খাইবার ঘরে লইয়া গেল। মিনির এই আনন্দের নূতন উচ্ছ্বাস সিয়েমের কাছেও নূতন মনে হইল। তাহাদের আহারের পরে সিয়েম তাহার তামাকের

চোঙ্গাটি মুখে দিয়া যেন "নূতন" কিছু শুনিবার প্রতীক্ষায় বসিল।

নিনি তাহার বোনের হাতখানি টানিয়া ধরিয়া সিয়েমের নীরব প্রশ্নের উত্তরে বলিতে লাগিল, "বাবা, তোমার এ কথা বড় সত্য যে খৃষ্টীয়ানীর সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মই মিথ্যা ; মানুষ যে Bibleএর আবরণে ও যিশুর আবরণে সত্যকে ঢাকিয়াছে, আর অজ্ঞানের জড়তায় সত্য দেখিবার ক্ষমতা হারাইয়াছে, তাহাও সত্য। কিন্তু ঐটুকুই সব নয় বাবা।" সিয়েম একটু জোরে জোরে তামাকু টানিয়া, অধিক আগ্রহে টেবিলে ভর করিয়া কথা শুনিতে লাগিল ; তাহারও চোখ দুটী তখন আলোকে উজ্জল। নিনি বলিল, "বিশ্বের পরিচালনার অটল ও অপরিবর্ত্তনীয় বিধানের মুখে যিনি, তিনি কর্ম্মহীন জড় নহেন,—তিনি জর্ম্মান দুঃখবাদী পণ্ডিতের কল্পনার একটি নিগুর্ণ অনাদি শক্তি নহেন।"

পিবির মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইল ; আর সিয়েমের মুখেও প্রসন্নতার হাসি ফুটিল। সিয়েম অতি কোমল কণ্ঠে কহিল,—"নিনি, তোমার প্রাণে তোমার মায়ের প্রাণ জাগিয়া উঠিয়াছে ; তুমি জান না তুমি তাঁহারই ভাষায় কথা কহিতেছ। আমিও বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছি, বিশ্বের প্রতি মুহূর্ত্তের বিকাশে, আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তের কর্ম্মে বিশ্বের অটল শক্তির নেতার খেলা চলিতেছে। কিন্তু যে খেলায় রুশিয়ার অত্যাচার বাড়িতে পায়, জর্ম্মানিতে ও অষ্ট্রিয়ায় আত্মদম্ভ ও পরপীড়ন জাগে, সে নিষ্ঠুর খেলাকে কেহ সাদরে বরণ করিতে পারে না ; সে খেলায় যদি আমাদের জাতীয় জাগরণ ও জাতীয় প্রতিষ্ঠা হয়, তবে মন্দের ভাল একটা কিছু হইবে. এই মাত্র।" মনে হইল, সিয়েম যেন মনের দুইএকটা আসল ভাব চাপিয়া, মেয়ের কথা ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য অত কথা বলিল।

নিনি এবারে সিয়েমের দিকে বেশি মাত্রায় ঝুঁকিয়া বলিতে লাগিল, "আমি বিশ্ব-ব্যাপী নীতিকে ধরিতে পারি নাই, বুঝিতে পারি নাই ;—ইতিহাসে ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের কথা যাহা পড়িয়াছি, তাহারও মূল ধরিতে পারি নাই। তবে আমার শরীরে ও মনে যে খেলা চলিয়াছে, তাহাই প্রত্যক্ষ করিতেছি। মহাপুরুষে ও শাস্ত্রে যেমন ধর্ম্মের মেঘ রচিয়া সত্যকে দেখিতে দেয় না, আর পড়া কথার বুলি শিখাইয়া মানুষকে জড়-বুদ্ধি করিয়া দেয়, আমাদের অনেক বাসনার আবদারের মেঘেও তেমনি জীবনের জলন্ত প্রদীপকে ঢাকিয়া রাখে।"

সিয়েম তাহার তামাকের চোঙ্গাটি রাখিয়া দিয়া, নিজের একখানি নোট-বই বাহির করিয়া বলিল,—"বাসনার কথা যাহা বলিয়াছ, তাহা খুব ঠিক। আমরা জীবনের আনন্দ হারাই সংযম হারাইয়া। যে বাসনা আমাদিগকে ক্ষয়ের পথে লইয়া যায়, যখন তাহার তাড়না আমাদের মধুর তাড়না মনে হয়, তখন যাহা কিছু যুক্তি-তর্ক করি, তাহা সেই বাসনার অনুকূল হইয়া ওঠে ; কি যে আত্মার ও বিশ্বের স্থিতির অনুকূল, তাহা বুঝিবার শক্তি হারাই।"

নিনির মুখ দীপ্ততর হইল ; সে ধ্যানে মগ্ন হইয়া কথা কহিবার মত কহিল, —"আমি বুঝিয়াছি, যতটুকু সংযম আনিতে পারিব, ততটুকুই আমার জীবনের আলোক ফুটিয়া উঠিবে ; আর সেই আলোকের মূলে যাঁহার খেলা, তিনি আমার মধ্যে জাগিয়া উঠিবেন। কোন শাস্ত্র, কোন পুরোহিত আমার এ বিকাশে বাধা দিতে পারিবে না।"

সকলে নীরব হইল ;—সিয়েম কোন কথা না কহিয়া তাহার note-bookখানি মেয়ের হাতে দিয়া লম্বা চেয়ারে পা ছড়াইয়া শুইল। নিনি ও পিবি এক সঙ্গে নোট-বই-খানি অনেকক্ষণ ধরিয়া যত্ন করিয়া পড়িল। তখন তাহাদের প্রাণে-প্রাণে আনন্দের ধারা বহিতেছিল ; নিনি যেন কিছু না ভাবিয়া কলের বাঁশীটির মত বাজিয়া বলিয়া উঠিল, "হে নেতা, তুমি আমার মধ্যে ফুটিয়া ওঠ,—তুমি জাগো, জাগো।"

সিয়েমের কাজের পদ্ধতিতে পরিবর্ত্তন ঘটিল। হাট-বাজার করা উঠিয়া গেল,—দোকানে পুরাতন মাল বেচা ছাড়া অন্য কাজ রহিল না। অন্য দিকে আগার সমর বিভা-গের আপিসে গিয়া কাজ না করিয়া, সিয়েম তাহার নিজের দোকানে বসিয়াই সে সম্পর্কের কাজগুলি করিবার ব্যবস্থা করিল। পোলাণ্ডের স্বাধীনতা-উদ্ধারের গুপ্ত দলের সঙ্গে সিয়েমের যোগ ছিল ; তবুও সে পুরামাত্রায় রুশিয়ার সরকারের কাজ করিতেছিল ; একা সিয়েম নহে. গুপ্তদলের সকলেই এই ভাবে কাজ করিত। বিজ্ঞাপন দিয়া লোক জুটাইয়া কাজ করিলে, অথবা কোন প্রকারে আকারে-ইঙ্গিতে সর-কারের প্রতি বিরুদ্ধভাব দেখাইলে, তাহাদের সকল কাজ

পণ্ড হইয়া যাইবে,—এই ছিল গুপ্তদলের লোকের বিশ্বাস। ইতিহাসজ্ঞরা জানেন যে, ১৭৯৫-এর দুর্দ্দিন হইতে এ পর্য্যন্ত পোলাণ্ডের হিতৈষীরা এই ভাবেই কাজ করিয়াছেন। ১৮৩৩ অব্দে যখন সহসা একদিন বিদ্রোহ জাগিয়াছিল, তখন পৃথিবীর লোকে বিস্মিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে যাহার একবিন্দু আভাস কেহ পায় নাই, তাহা একদিনে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

সিয়েমের কাজের পদ্ধতি বদলাইয়া যাওয়ায় চিরকুমারী ঠাকুরাণী নিনি ও পিবিকে উদ্ধার করিবার সুবিধা হারাইলেন। তিনি পূর্ব্বে কয়েকবার আসিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়াছিলেন যে, মাঝে-মাঝে পুরোহিত ঠাকুরের কাছে গোপনে পাপ স্বীকার করিতে যাওয়া উচিত; কিন্তু এখন সিয়েম সর্ব্বদা বাড়ী থাকে বলিয়া, তিনি আর ধর্ম্মের কথা শুনাইতে আসিতেন না।

সিয়েম একদিন সমর-বিভাগের একজন লোকের সঙ্গে বসিয়া দোকানের একটি কোণে নিবিষ্ট মনে কাগজপত্র উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে কথা কহিতেছিল, আর সেই সময়ে একজন যুবক দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, একবার দোকানের দিকে আর একবার রাস্তার দিকে তাকাইতেছিল। পিবি তখন জিনিস্ বেচিবার টেবিলের পাশে গিয়া নিনিকে গোপনে সেই যুবকটিকে দেখাইয়া বলিল:—"তোমার কি মনে আছে যে, এই লোকটি যুদ্ধ-ঘোষণার দিন আমাদের দোকানের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল?" নিনির সে কথা মনে পড়িল, আর দুই বোনে আড়চোখে তাহাকে দেখিতে লাগিল। দু-তিন মিনিট পরেই যুবকটি দোকানে টেবিলের কাছে আসিয়া অতি মৃদুস্বরে কয়েকটি জিনিস চাহিল। নিনি জিনিস কয়েকটি গুছাইয়া আনিয়া দিল। যুবকটি ধীরে ধীরে দামের হিসাব করিয়া টাকা বাহির করিতে করিতে অতি অস্ফুটস্বরে দুই বোনকে শুনাইল যে সেই দিনের সেই মুহূর্ত্ত থেকে এক মাস নয় দিনের দিন তাহাদের বিষম বিপদ উপস্থিত হইবে। এই কথাটুকু শুনাইয়াই যুবক তাহার জিনিষ লইয়া অদৃশ্য হইল। দুই-জনেই সিয়েমের দিকে তাকাইল; সিয়েম তখনও নিবিষ্টমনে কথা কহিতেছে।

সহসা পিবির মনে পড়িল যে, তাহার বাপ বাঁচিয়া থাকি-বার সময় ছেলে-মেয়েদের একদিনকার উৎসবে এই বিপদের সংবাদদাতা যুবকটি তাহার সঙ্গে নাচিয়াছিল। সে ধীরে-ধীরে সে কথা নিনিকে বলিল। নিনির মনে আনন্দ দেখা দিল; সেও মৃদুস্বরে পিবিকে বলিল যে, ঐ যুবককে সে জর্ম্মানিতে সিয়েমের সান্ধ্যসমিতিতে কয়েকবার যেন দেখিয়াছে। যুবকটি যে তাহাদের যথার্থ হিতার্থী, এ বিষয়ে তাহাদের মনে কোন সন্দেহ রহিল না।

সিয়েমের কাজ শেষ হইল; আর তাহার সহকারী চলিয়া গেল। সিয়েম উঠিয়া দোকানের কাজ বন্ধ করিতে বলিয়া নিজে দরজা বন্ধ করিল, ও অস্ফুটস্বরে মেয়ে দুইটিকে জানাইল যে, গির্জ্জার পুরোহিত তাহাদের নগরের সমর-বিভাগের কাজের সভাপতি হইয়াছেন। পিবি ভ্রূ কুঁচকাইয়া বলিল যে, রুশিয়ার ধ্বংস অনিবার্য্য। সিয়েম পিবির মাথায় আদরের হাত বুলাইয়া নিনির মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এদিনো যে জিনিস নিতে আসিয়াছিল, তাহাকে তাহারা চেনে কি না। এদিনো নামটা শুনিয়াই পিবির মনে পড়িল যে, ক্রেতা যুবকটির নাম এদিনো; সে সিয়েমকে এদিনোর সম্পর্কের কথা বলিতে আরম্ভ করিতেই সিয়েম জানাইল, যে তাহার মনে হইয়াছিল, এদিনো যেন তাহাদিগকে গোপনে কিছু জানাইতে আসিয়াছিল। সিয়েমের এই তীক্ষ্ণতা দেখিয়া দুই বোনেরই বিস্ময় হইল। এদিনোর বিষয়ে সকল কথাই সেখানে হইল। সে যে নগরপালের আপিসের বড় কেরাণী, আর সে যে গুপ্ত হিতৈষীদলের একজন বড় মন্ত্রী, সে কথাও হইল।

তিনজনে যখন আহারে বসিল, তখন পিবি একটি কথাও কহে নাই,—কেবলই যেন কি ভাবিতেছিল। আহার শেষ হইতেই সে বলিতে লাগিল যে, তাহার যেন মনে হইতেছে—পাপিষ্ঠ পুরোহিত এমন কোন উদ্যোগের মঞ্জুর চাহিয়া পাঠাইয়াছে, যাহাতে সিয়েমকে যুদ্ধের আয়োজনে দূরে যাইতে হইবে, আর তাহাদের দুই বোনকে গির্জ্জার অবরোধে রক্ষা করিবার নামে কোন একটা চেষ্টা করা হইবে। কথাটা শুনিবামাত্রই সিয়েম চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া দাঁড়াইল, আর পিবির অসাধারণ বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া তামাকের চোঙ্গাটি হাতে নিল। সিয়েম যে এই রকমের একটা বিপদের আশঙ্কা করিয়াই ধীরে ধীরে দোকান-পাট বন্ধ করিতেছে, তাহা বলিল।

নানা মন্ত্রণায় দিন কাটিয়া গেল; রাত্রি ১১টার সময়

যখন সকলে শুইতে যাইবে, তখন তিন জনে পরস্পরের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া, অতি গভীর ব্যাকুল স্বরে বলিল,—হে বল, হে, সম্বল, তুমি জাগো।

পুরোহিতের শিকার পলাইয়াছে। নিনি ও পিবি কবে, কি কারণে, কোথায় যে চলিয়া গেল, কেহ তাহা জানিত না,—অর্থাৎ কেহই সে সন্ধান দিতে পারে নাই। সিয়েমের নামে সরকারী আদেশ আসিয়াছিল,—সে সেই আদেশে একটা সৈন্যদলের সঙ্গে Warsawর দিকে চলিয়া গিয়াছিল। পুরোহিতের তখন সাধ্য ছিল না যে তাহার সম্বন্ধে কোন নূতন ব্যবস্থা করেন। আর একটি বিষয়ে তাঁহার কিছু ক্ষমতা নাই দেখিয়া পুরোহিতটি নিজের ক্রোধে নিজে জ্বলিতে লাগিলেন। সে কথাটি এই ;—

একদিন পুরোহিতঠাকুর গির্জার প্রাঙ্গণে আমাদের পরিচিতা কুমারী ঠাকুরাণীর সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন, ও কিছু দূরে লোকেরা বিস্ময়ে তাহাদের পিঠের দিকে চাহিয়াছিল। কুমারী নিজে যাহা পুরোহিতের পিঠে লেখা আছে পড়িলেন, কুমারীর পিঠেও পুরোহিত সেই কথা গুলি আঁকা দেখিলেন, কে যেন তাঁহাদের অজ্ঞাতে তাঁহাদের পোষাকের বহিরাবরণে দাগিয়া দিয়াছে,—এই পাপিষ্ঠ পদাঘাতের যোগ্য। কে, কি সুবিধায় এমন কাজ করিল, অনেক অনুসন্ধানেও তাহা ধরা পড়িল না। পুরোহিতটি গোটাকতক সংবাদ জুড়িয়া স্থির করিলেন,—এ কুকীর্ত্তির মূলে এদিনো আছে।

পুরোহিত ঠাকুর এদিনোর সন্ধানে নগরপালের কাছে গেলেন ; শুনিলেন যে এদিনো আগের দিনের রাত্রে রুশিয়ার এক নূতন সৈন্যদলে জুটিয়া Warsawর দিকে গিয়াছে ; তাহার নামে কোন দণ্ড প্রচার করা তাঁহাদের এলাকার বাহিরে।

ধার্ম্মিকদের কাগজে অধর্ম্মের উক্তির ছাপা হওয়ার সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইল, আর সকলেই সবিস্ময়ে কোন আলোচনা না করিয়া শুনিল। মনে হইল, নগরের অনেকেই খুসী হইয়াছে। পাঠকেরা মনে রাখিবেন যে, এখন যে গুপ্ত আন্দোলনের ফলে রুশিয়ার নূতন দলের লোকেরা যীশু, মোহম্মদ প্রভৃতির প্রতিকৃতি গড়িয়া সেগুলিকে ফাঁসীকাঠে ঝুলাইয়া প্রাচীন ধর্ম্মের অপমান করিতেছে, সে আন্দোলন অনেকদিন হইতেই গুপ্ত হইলেও বহুব্যাপী ছিল।

পুরোহিত একদিন প্রাতে এই কল্পী আঁটিতেছিলেন যে, পোলাণ্ডের হিতৈষী বীর কোশিউস্কোর স্মৃতি জাগাইবার জন্য যে পত্র বিলি হইয়াছিল জানা গিয়াছে, উহা এদিনোর রচনা বলিয়া প্রমাণিত করিতে পারিলে, হয়ত সৈন্য বিভাগের থেকে তাহাকে ফাঁসী দিতে পারে ; কিন্তু বিশ্বাসী বলিয়া পরিচিত এদিনোর বিরুদ্ধে প্রমাণ জোটান বড় শক্ত। এদিনো একটা সৈন্যদলের নায়ক হইয়া গিয়াছিল।

পুরোহিতের নিঃশ্বাসের জোরে প্রায় এক বৎসর উড়িয়া গেল। নিনি ও পিবি, তাহাদের নগরের শাসন-সীমার বাহিরে বহুদূরে একটি গ্রামে বাসা বাঁধিয়া, চারিদিকের গ্রাম হইতে যুদ্ধের রসদ জোটাইবার কাজে নিযুক্ত হইয়াছিল। কোন গ্রামেই প্রায় পুরুষ ছিল না,—সকলেই যুদ্ধে গিয়াছিল।

গ্রামের কাছের একটা বনের মধ্যে দুই বোনে তাহাদের নানা কথার আলোচনার আড্ডা পাতিয়াছিল। গ্রামের লোকেরা কোসিউশ্‌কোর স্মৃতি জাগাইবার বিজ্ঞাপনী পোড়াইয়া ফেলিয়া যে ভালই করিয়াছে, তাহাই ছিল সেদিনকার আলোচনার বিষয়। পিবি বলিতেছিল—"আমার মনে হয়, মহাপুরুষ মহাপুরুষ করিয়া আমাদের অনেক ক্ষতি হইতেছে। কোসিউশ্‌কোর মত খাঁটি লোক-হিতৈষী বীর খুব দুর্লভ তাহা জানি ; কিন্তু হয় ত বা আমরা এক-একজন মহাপুরুষে সকল গুণ খুঁজিতে গিয়া, একদিকে কল্পনায় অস্বাভাবিক মানুষ গড়ি, আর অন্যদিকে, যে সকল গুণ সকল মানুষেই সুলভ হইতে পারে, সেগুলিকে মহাপুরুষদের ঘাড়ে চাপাইয়া গুণগুলিকে দুর্লভ বলিয়া ভাবিতে শিখি।"

নিনি যে ফুলের তোড়াটি বাঁধিতেছিল, সেটি কোলের উপর রাখিয়া আনন্দের উচ্ছ্বাসে বলিল,—"ঠিক বলিয়াছিস পিবি। আমরা ইতিহাস পড়ি, মানুষের সঙ্গে কথা কই, আর নানাদিক হইতে, এখানকার মুক্ত বাতাসের মত, কত ভাব আসিয়া আমাদের মনে লাগে। কোন্ ভাবটি কোথায় পাইয়াছি খুঁজিতে বসিলে, ভাবের পুরাতত্ত্ব রচিতে পারি ; কিন্তু আপনাদের মনের ভাবের স্পর্শে নূতন ভাব ফুটাইতে পারি না ; কেবল তোলা ফুলের তোড়া বাঁধিয়া সেই তোড়ার সৌন্দর্য্য দেখি। ফুলের তোড়া

দেখিয়া যে মোহ জন্মে, তাহার মধুরতায় এই ভ্রান্ত বিশ্বাস জাগে,—আমরা বুঝি নিজেদের মনে উন্নততর ভাব-সম্পদ সৃষ্টি করিয়াছি। আমরা মহাপুরুষ খুঁজি, চিরকালের অভ্যস্ত গোলামি বুদ্ধিতে।"

নিনির কোলের উপরে ছোট একটি বলের মত একখানি রুটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, ও আর একখানি রুটি নিজে ভাঙ্গিয়া খাইতে-খাইতে পিবি বলিল,—"পাছে লোকে মনে করে যে, তাহারা গুণীর আদর জানে না,—সেই ভয়ে, অনেক কাপুরুষ, মহাপুরুষের নামের ধুয়া গাহিয়া বেড়ায়, এমন অনেক দেখিয়াছি। যাহার নিজের মনে গুণ আছে— নীচ স্বার্থের হিংসা নাই, সে গুণশালীকে আদর করিবেই। কর্ত্তব্যে যদি চাড় থাকে, তবে কর্ম্মপটু দক্ষ ব্যক্তিকে লোকে নেতা করিবেই।"

নিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া বলিল, "যাহারা ভাবে, কর্ত্তব্য কি তাহা না বুঝিয়া, লোকেরা বড়লোকের নামের মোহে ক্ষেপিয়া কাজ করিলেই কাজ হইবে, তাহারা এই গ্রামখানিতে আসিয়া বাস করুক।"

বনের বাহিরে একটি স্ত্রীলোকের চীৎকারে জানা গেল যে, একটা গরু ছুটিয়া পলাইয়াছে, কেহ ধরিতে পারিতেছে না। কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়া দুই বোনে গরু ধরিতে ছুটিয়া গেল। তাহারা খানিক দূর যাইতেই দেখিল, সৈন্যের পোষাক পরা একটি বলিষ্ঠ যুবক বনের দিক হইতে গরু তাড়াইয়া আনিতেছে। এ আবার কে? যুবকটি গ্রামের কাছে পৌঁছিতেই সকলে বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিল। যুবকের মুখে বিস্ময় নাই, আছে কেবল নির্ভাবনার হাসি। "এইখানে ত" বলিয়া একটা বেড়ার মধ্যে সে গরু ঢুকাইয়া দিল।

চাষার গৃহিণী তাহাকে ধন্যবাদ জানাইতে না জানাইতে সে এমনভাবে কথা কহিতে লাগিল যে, কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিবার অবসর পাইল না। কৃষক গৃহিণীর হাতে কিছু পয়সা দিয়া কহিল, "এই গাছতলাটায় আমাদের তিনজনের মত কিছু খাবার আনিয়া দাও।" চাষার ঘরের গৃহিণী চারিদিকে চাহিয়া যুবকের কোন সঙ্গী দেখিতে পাইল না, কিন্তু সে খাবার আনিতে গেল। নিনি যুবকের সঙ্গীদের কথা জিজ্ঞাসা করিল; যুবক বলিল, তাহারা কাছেই আছে।

চাষার গৃহিণী দূরে চলিয়া যাইবার পর, যুবকটি একখানি ছোট চিঠি বাহির করিয়া মেয়েদের হাতে দিল। চিঠিখানি ছিল বড়ই ছোট; ইচ্ছা করিলেই যুবতীরা একটি হাঁসপাতালে সেবা করিতে লাগিতে পারেন, আর পত্রবাহক বিশ্বাসী যুবক পটকির সঙ্গে কোথাও যাওয়ার বাধা হইবে না,—ইহাই ছিল সংক্ষেপে লেখা। যুবতীরা যুদ্ধ-বিভাগের প্রস্তাবে সম্মতি জানাইল, এবং পটকির সঙ্গেই তাহারা যাইতে পারিবে জানাইল।

যুবতীরা অন্য কোন কথা বলিবার আগেই পটকি সংবাদ দিল যে, রুশিয়ার সৈন্যেরা পলাইয়াছে, আর পোলাগুটা এখন জর্ম্মানির দখলে বলিলেই হয়। যুবতীরা নীরবে সকল কথা শুনিতে লাগিল। "চলুন, এই গাছের তলায় গিয়া বসি" বলিয়া যুবকটি গাছতলায় গিয়া বসিল; আর নানা সংবাদের জন্য উৎসুক হইয়া নিনি ও পিবি কিছু না ভাবিয়া যুবকটির কাছে গিয়া বসিল। যুবতীরা বসিবামাত্রই যুবকটি প্রথমেই বলিল যে, সেই গ্রামটির বনে নেকড়ে বাঘ নাই,—ঠিক যেন ইংলণ্ড দেশ। পিবি জিজ্ঞাসা করিল,"আপনি ইংলণ্ডে অনেক দিন ছিলেন বুঝি?" যুবক বলিল, সে ইংলণ্ডের কূলে নামে নাই, এই যুদ্ধ বাধিবার আগে একবার জাহাজ থেকে ইংলণ্ড দেখিয়াছিল। যুবতীরা হাসি চাপিতে পারিল না। যুবকটি তাহাতে উৎসাহিত হইয়া সারা বেল্‌জিয়মের যুদ্ধক্ষেত্রের কথা বলিয়া জর্ম্মানির কথা পাড়িল। পিবি হাসিয়া বলিল যে, তাহারাও জর্ম্মানি দেখিয়াছে। যুবক তখন অতি গম্ভীর মুখ করিয়া বলিল,— "ও! তাই না কি!" যুবক জানাইল যে, আর কেহ যে দেশ দেখিয়াছে, সে দেশের বর্ণনা সে করে না। এবারে উচ্চহাস্য উঠিল।

৫

তখন শরৎকাল। আমেরিকা যুদ্ধে নামিয়াছে, আর জর্ম্মানেরা হঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। হয় ত শীঘ্রই মহাসমর থামিবে, হয় ত বা থামিবে না; ইয়োরোপের যুদ্ধ-বিগ্রহ উপেক্ষা করিয়া রুশিয়ার সমতাবাদীরা রাজদ্রোহের প্রসার বাড়াইয়া চলিয়াছে। শরতের সতেজ বনের ছায়ায় আনন্দ যেমন নীরব, পোলাণ্ডের বিজ্ঞ হিতৈষীদের প্রাণের বিজনেও তেমনি অস্ফুট আনন্দ। আইভির জালা পাতায় রং ফলিতেছিল, প্রান্তরে-প্রান্তরে উপত্যকায় লিলি ফুটিতেছিল,

আর প্রতিদিনের নূতন সংবাদে পোলাণ্ডের ঘরে-ঘরে আশার ফুল ফুটিতেছিল।

একটী গিরি সঙ্কটের উপত্যকার সৈন্যনিবেশে ও হাঁসপাতালে এই আনন্দের স্পর্শ লাগিয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধের দিনের উৎকণ্ঠায় সেখানে সে আনন্দ শিহরিয়া জাগিতে পারে নাই। সৈন্যনিবেশ বাড়িয়া চলিয়াছে, হাঁসপাতালের কাজ বাড়িয়া চলিয়াছে, কিন্তু স্বাধীনতার আশা সন্দেহের ছায়ায় তেমন বাড়িতে পারে নাই।

নিনি একটি ১৬ বৎসরের আহত বালককে পথ্য দিবার উদ্যোগ করিতেছিল, আর প্রসন্ন মনে পিবির সুখের কথা ভাবিতেছিল। পটকি যেদিন পিবিকে বিবাহ করিবে, সে সময়ে যদি সিয়েম ঘরে না ফেরেন, তবে সে নিজে কি করিবে? চিন্তার নূতন স্রোত বহিল; নিনির প্রসন্নমুখে ছায়া পড়িল। সে কয়েক দিন পূর্ব্বে এদিনোর মুখে শুনিয়াছিল যে, সিয়েম যে ১১৭ নং সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত, সে দল এখন রুশিয়ায় কি পোলাণ্ডে,তাহা জানা যায় নাই। নিনি পথ্য প্রস্তুত করিয়া আহত বালকের কাছে বসিতেই, পাশের প্রকোষ্ঠের লোকদের একটি কথা তাহার কাণে গেল; নিনি পাথরের পুতুলের মত বসিয়া শুনিল যে, রুশিয়ার প্রাচীন ফৌজের সঙ্গে নূতন ফৌজের লড়াইয়ে পোলাণ্ডের ১১৭ নং দলের লোকেরা সকলেই মারা পড়িয়াছে। আহত বালক নিনির মুখের দিকে চাহিয়া ভয় পাইল, তাহার রুগ্ন দেহে অস্বাভাবিক বল আসিল,—সে উঠিয়া বসিয়া—নিনির গায়ে ধাক্কা দিয়া ডাকিল—"ভগিনী! ভগিনী!" নিনি চমকিয়া জাগিল, আর অস্ফুট-স্বরে বলিল,—"জাগো, জাগো!" তাহার পর সে আহত বালককে বিছানায় শোয়াইয়া খাওয়াইল, এবং কোন কথা না কহিয়া তাঁবুর বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। সে একবার ভাবিল, পিবিকে খুঁজিয়া তাহার কাছে যাইবে; কিন্তু তাহার নূতন সুখের দীপ্তির উপর এই গভীর শোকের ছায়া ফেলিতে মন উঠিল না। নিনি জানিত না যে পিবি এ সংবাদ আগেই পাইয়াছিল; আর সে কাজ-কর্ম্ম ফেলিয়া, একা একটা গাছের তলায় বসিয়া কাঁদিতেছিল। নিনি কতক্ষণ যে একা দাঁড়াইয়া ছিল, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই; একজন নূতন সেবিকা আসিয়া যখন তাহাকে জানাইল যে, এখন তাহার ছুটি, তখন সে চমকিয়া ঘড়ির দিকে চাহিল, এবং বিনালক্ষ্যে প্রান্তরের দিকে চলিয়া গেল।

নিনি যে কোন্ পথে, কোথায় যাইতেছিল তাহা তাহার জানা ছিল না। সে একটি সরু পথ দিয়া অগ্রসর হইবার সময়, একজন ধর্ম্ম-যাজক হাসিমুখে তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নিনি চিনিল, তাহাদের নগরের সেই পুরোহিত। নিনি অতি তীক্ষ্ণকর্কশ স্বরে বলিল,—"নীচাশয়, পাপিষ্ঠ, তুই এখানে আসিয়া জুটিয়াছিস!" পুরোহিত চমকিয়া পথ ছাড়িলেন, আর নিনি দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

একটি আঁকা-বাঁকা পথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে কত দূরে গেল, তাহা জানিতে পারে নাই। একটা গাছের ডাল পথের ধারে ঝুঁকিয়াছিল,—সে সেই ডালখানি দুই হাতে জোর করিয়া টানিয়া ধরিয়া, অতি কাতরস্বরে সেই বিজনে বলিতে লাগিল,—"হে বল, হে সম্বল, তুমি জাগো।"

সে সময়ে একজন যুবক আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল, কিন্তু সে তাহাকে দেখিতে পাইল না। যুবক অতি ধীর করুণ স্বরে কহিল, শীঘ্রই সন্ধ্যা হইবে, আর নিনি অনেক দূরে নূতন সৈন্যনিবেশের কাছে আসিয়াছে। নিনি দেখিল,—বক্তা এদিনো। সে গাছের ডাল ছাড়িয়া দিয়া, স্থির দৃষ্টিতে এদিনোর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ঐ আকাশের মত তোমার প্রাণকে উদাসী ও উদার কর,—আমাকে ভুলিয়া যাও। আমার জীবনে নূতন ব্রতের সঙ্কল্প জাগিয়াছে,—বাধা দিও না।" এদিনো কোন উত্তর দিল না। কলের পুতুলের মত দুইজনে পথ চলিতে লাগিল। পৃথিবী তখন গোধূলির উজ্জ্বল দীপ্তিতে ভাস্বর ছিল। নূতন ছাউনিতে নবাগতেরা বাসা পাতিতেছিল; তাহারা সেই ছাউনির ধার দিয়া যাইতেছিল। এদিনো এবং নিনি দেখিল,—পিবি ও পটকি দৌড়াইতে দৌড়াইতে তাহাদের দিকে আসিতেছে। তাহারা অগ্রসর না হইয়া দাঁড়াইল। পিবি ও পটকি চীৎকার করিয়া কি যেন বলিতে-বলিতে আসিতেছিল। নিনি ছাউনির সম্মুখে প্রান্তরে বসিয়া পড়িল। ছাউনির সেনারা কৌতূহলী হইয়া, তাহাদিগকে দেখিতে লাগিল।

পিবি ও পটকি হাঁপাইতে-হাঁপাইতে চেঁচাইয়া বলিল,—"আমরা গেজেট দেখিয়াছি; সিয়েমের দলের

নম্বর ১১৭ নয়, ১২৭। নিনি যেমন বসিয়াছিল, তেমনই বসিয়া রহিল। পিবি আবার চেঁচাইয়া বলিল, "নিনি! বাবা জীবিত কি না জানি না, তবে, তাঁহার দলের নম্বর ১২৭।" নূতন ছাউনি হইতে একজন ছুটিয়া আসিয়া বলিল—"সত্য কথা; নিনি! পিবি! আমি বাঁচিয়া আছি।" নিনি ও পিবি 'চকিতের মধ্যে সিয়েমকে জড়াইয়া ধরিয়া দাঁড়াইল,—আর গোধূলির দীপ্তিতে সকলে সেই মিলনের দৃশ্য দেখিতে লাগিল। সিয়েম শুনিল,—পিবি শুনিল,—নিনি কম্পিত কণ্ঠে বলিতেছে—"হে বল, হে সম্বল, তুমি জাগো।"

মড়ার মুলুক

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

গভীর গভীর ভারত-জলধি হা হা ক'রে তীরে লুটায়ে পড়ে,
রহিয়া রহিয়া কাঁদে হিমালয়, নিঃশ্বসি ঘোর তুষার-ঝড়ে!
পশ্চিমে হের, আহত রবির ঝুরিছে প্রাণের শোণিত-ধারা,
পূরবের দ্বার খুলিবে না শশী, আসিবে না হায় অযুত তারা।
শ্মশান-সভায় কারা শুয়ে আছে—কে তোরা, কে তোরা, দু-আঁখি ঢেকে?
শব-সাধনার শক্তি কোথায়! শোনো, শোনো, দ্বারে যেতেছি ডেকে।
জীবন চাই গো, জীবন চাই!
সকলি রয়েছে আমার স্বদেশে, খুঁজে দেখি সুধু—মানুষ নাই।

নাচিছে মশানে কালী-কপালিনী—জ্বল'-জ্বল' জ্বলে খড়্গ তাঁর,
এস তান্ত্রিক! শুনাও মন্ত্র, চণ্ডীকে দাও অর্ঘ-ভার!
জননী যাদের রমণী হ'লেও দানব-দলনী শক্তিময়ী,
পুত্রেরা তাঁর বেঁচে-ম'রে হা-হা—চিত্তে তাদের ভক্তি কই?
কাহারা আনিবে মাথার মুকুট, কাহারা গাঁথিবে গলার মালা,
কাহারা বুনিবে নূতন বসন, কাহারা বহিবে পূজার থালা?
জীবন চাই গো, জীবন চাই!
সকলি রয়েছে আমার স্বদেশে, খুঁজে দেখি সুধু—মানুষ নাই!

ভারতে এখন আছে বটে মেষ, আছে বটে গাধা, শৃগাল-দল,
তার মাঝে কোথা সারা-দিন খুঁজে, জ্যান্ত মানুষ পাইবি বল্!
নিতি-নিতি হেথা রাজনীতি নিয়ে ছেঁড়াছিঁড়ি করে শকুন-কাক,
বড় বড় কথা শুনি চারিভিতে, ভরিলনা তবু প্রাণের ফাঁক!
অন্ধ-যুগেতে গান্ধী আছেন— অমানুষ-মাঝে মানুষ একা,
কেগো আছ আর তাঁহার দোসর, থাকো যদি কেউ দাও গো দেখা!
জীবন চাই গো, জীবন চাই!
সকলি রয়েছে আমার স্বদেশে, খুঁজে দেখি সুধু—মানুষ নাই!

জেগেছে রুসিয়া, রাজার গোলামী প্রজার সেলামী ঘুচেছে আজ,
জেগেছে ফরাসী—নূতন তুর্কী, পরেছে মাথায় যশের তাজ,
জেগেছে জাপান—সবুজ যুগের তরুণ সাধক তুলেছে শির,
জেগেছে চীনের যত পীত ছেলে, ভুবন-আসরে করেছে ভিড়!
পৃথিবী জেগেছে—আমরা জাগি-নি, জাগা'র লগন যায় গো যায়,
হৃদয়-গঙ্গা বহাতে হেথায়, নব-ভগীরথ! আয় গো আয়!
জীবন চাই রে, জীবন চাই!
সকলি রয়েছে আমার স্বদেশে, খুঁজে দেখি সুধু—মানুষ নাই!

পাতালকন্যা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ

শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরীর লিখিত চিত্র-প্রদর্শনী দ্রষ্টব্য

BHARATVARSHA HALFTONE & PTG. WORKS.

বিবিধ-প্রসঙ্গ

চণ্ডীদাসের পদ

(পুনরালোচনা)

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

গত পৌষ মাসের "ভারতবর্ষে" "চণ্ডীদাসের পদ" প্রবন্ধের প্রথমাংশে আমরা "পদাবলী ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" সম্বন্ধে সুধি-সমাজের নিকট কয়েকটী প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলাম। 'ভারতবর্ষে'র চৈত্র সংখ্যায় পদাবলী-সাহিত্যে সুপরিচিত পরম শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম এ, মহাশয় তাহার উত্তর দানে আমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। তিনি আমাদের অশেষ ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা তাঁহার "উত্তরে" সংশয়হীন হইতে পারি নাই। তাই পুনরালোচনা করিতে বাধ্য হইলাম। আশা করি, এবারও এই আলোচনায় যোগদান করিয়া রায় মহাশয় আমাদিগকে অনুগৃহীত এবং উপকৃত করিবেন। পৌষের 'ভারতবর্ষে' আমাদের প্রবন্ধে কয়েকটী ছাপার ভুল ছিল। যথা প্রবীণ স্থানে প্রাচীন, 'ময়ূরভট্ট' স্থানে ময়ূরভঞ্জ এবং 'প্রাচীনত্ব' স্থানে প্রাচীনতত্ত্ব ইত্যাদি। এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

১। রায়মহাশয় আন্দাজে অনেক কথা বলিয়াছেন। স্বর্গীয় আচার্য্য ত্রিবেদী মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভূমিকায় এবং শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ মহাশয় পরিষৎ পত্রিকায় এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কবির রচনাই ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া পরবর্ত্তী পদাবলীতে পরিণত হইয়াছে। রায় মহাশয় এই মত মানিতে চাহেন নাই, অপিচ "গোঁড়া"দিগের উপর কটাক্ষ করিয়াছেন। এ বিষয়ে কাহারা "গোঁড়," কাহারা "পাতী"—আমরা বুঝিতে পারিলাম না, রায় মহাশয় বুঝাইয়া দিলে অনুগৃহীত হইব। তবে তাঁহার প্রবন্ধেও যে "পাতী"র ধর্ম্ম রক্ষিত হয় নাই, এ কথা আমরা সসম্ভ্রমেই নিবেদন করিয়া রাখিতেছি। তিনি আপত্তি তুলিয়াছেন, "নীলরতন বাবুর সংগ্রহের দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড কখনো প্রসিদ্ধ কীর্ত্তন-গায়কগণ কর্ত্তৃক গীত বা প্রচারিত হয় নাই; হইলে, উহার কোনো না কোনো পদ অবশ্যই পদামৃত-সমুদ্র, পদকল্পতরু প্রভৃতি প্রাচীন সংগ্রহে স্থান পাইত।" এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, সংগ্রহকারগণ রসের বিভাগ এবং কতকটা নিজ-নিজ রুচি অনুযায়ী পদ সংগ্রহ করিয়াছেন। সংগ্রহকালে জ্ঞানদাস, গোবিন্দের নৌকাখণ্ডের ও দানখণ্ডের পদ প্রচলিত থাকায়, এবং তাহাই তাঁহাদের সংগ্রহের উপযোগী বোধে তাঁহারা উক্ত কবিদের পদই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অথবা শ্রীজীব গোস্বামীর সময় যাহা প্রচলিত ছিল—সংগ্রহকারগণ যে কোনো কারণেই হউক, পরবর্ত্তী কালে তাহার সন্ধান পান নাই। পদামৃতসমুদ্র প্রভৃতি গ্রন্থে স্থান পায় নাই, এমন অনেক পদ রায় মহাশয় তাঁহার অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে প্রকাশ করিয়াছেন। অথচ পদরত্নাবলীর "বর্ণবর্ণ বিবর্ণ হৈ গেল" প্রভৃতি বহু পদ আমরা প্রসিদ্ধ অপ্রসিদ্ধ অনেক কীর্ত্তনিয়ার মুখেই শুনিয়াছি। পদরত্নাবলী সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনার ইচ্ছা রহিল। সব গান যে সকলেই সংগ্রহ করিবেন, এমন কোনো কথা নাই। সকল কীর্ত্তনিয়াও এক পালায় একই গান গাহেন না। আর রচনার কথা—নীলরতন বাবুর দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের অনেক পদই আমাদের চণ্ডীদাসের উপযোগী বলিয়া মনে হইয়াছে। দুইটী গানের সম্বন্ধে আমাদের মত পূর্ব্বেই দিয়াছি। সকল কবির সকল রচনাই কিছু শ্রেষ্ঠ হয় না। তবে পাঠকের রুচিবৈচিত্র্যও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ স্থলে বলিয়া রাখা ভাল—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও পদাবলী আমরা একই কবির রচনা বলিয়া মনে করি না।

২। রায় মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধের (৬) অনুবন্ধে স্বীকার করিয়াছেন,—আমাদের উল্লিখিত * * * "দেশে, কাল ও পরিপার্শ্বিক অবস্থার পার্থক্য ইত্যাদি সূত্রগুলির প্রয়োগ ও পর্য্যালোচনা দ্বারাই কেবল বিশ্বস্তরূপে কোনো রচনার মৌলিকতা ও কবিত্ব—ইত্যাদির নির্ণয় হইতে পারে।" কিন্তু—আমরা না কি "কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়" হওয়ায়, তাহা হইতে পারে নাই, "গোলযোগ" ঘটিয়াছে। রায় মহাশয়ের একটা অনুমান ঠিক যে আমরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি। নতুবা তাঁহার ন্যায় বিজ্ঞের নিকট জিজ্ঞাসু রূপে উপস্থিত হইতাম না। তবে ইহাও ঠিক্ যে, তিনি আমাদিগকে ফাঁকি দিয়াছেন, আমরা তাঁহার নিকট অনুযোগ করিতেছি। কেন—তাহা বলিতেছি, রায় মহাশয়ের ২ হইতে ৯ অনুবন্ধের প্রত্যুত্তরেই বলিতেছি।

৩। "দেশ ও কালগত পারিপার্শ্বিক অবস্থা।" ইহা প্রায় সর্ব্ববাদী-সম্মত যে, কবি বীরভূমের অধিবাসী ছিলেন। পদাবলীতে এমন অনেক ভাষা পাওয়া যায়, যাহা বীরভূম ব্যতীত অন্যস্থলে কচিৎ প্রচলিত আছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার আলোচনার জন্য সম্পাদককে আসাম হইতে মহারাষ্ট্র পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে যে লিপিকর-প্রমাদ আছে, পরিষদ পত্রিকায় রায় মহাশয় তাহা স্বীকার করিয়াছেন। সংস্কৃত শ্লোকগুলির পাঠ-বিকৃতি দূর করিতে না পারিয়া, সম্পাদক মহাশয়ও ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। অথচ—একই পুঁথির একই শব্দের বিভিন্ন বানান ও বিভক্তি যেখানে যাহা দেখিয়াছেন,

মানিয়া লইয়া তাহাই সপ্রমাণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। লিপিকর কালিদাস ইচ্ছামত আঙ্গুলের কসরৎ দেখাইয়াছেন, আর চণ্ডীদাসের নামের কুহকিনী ভানুমতী সম্পাদককে চাপিয়া ধরিয়া আপন মনোমত পাণ্ডিত্যপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। লিপিকরের যথেচ্ছাচারিতা অথবা বিভিন্ন কালের বিভিন্ন কবির রচনার কথা একবারও তাঁহার মনে সন্দেহ জন্মাইতে পারে নাই।

পুঁথিখানিতে তিন হাতের লেখা সুস্পষ্ট। কিন্তু কি লিপি-বিচারক, কি সম্পাদক—কেহই বলিয়া দেন নাই, বাকী দুই রকমের লেখার বয়স কত, এবং এই তিন রকম লেখার কি কৈফিয়ৎ থাকিতে পারে? আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয়—পুঁথির ২০৪—২০৫,২১৫—২১৬ পৃষ্ঠার লেখা এবং পুঁথির কাগজ বড় জোর তিন শত বৎসরের অধিক কালের পুরাতন বলিয়া মনে করিবার কোন হেতু নাই। আবার আরো রহস্যের বিষয়—পাতার এক পৃষ্ঠায় তথাকথিত "পুরাতন হস্তাক্ষর" এবং অপর পৃষ্ঠায় "অপেক্ষাকৃত আধুনিক" (এই কথাগুলি কৃষ্ণকীর্ত্তনেই দেখিয়াছি) হস্তাক্ষর! ঐতিহাসিক রাখালদাস বাবু যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, "ঐতিহাসিক সত্যের দিক হইতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মিলনের আলোচনা করিতে গিয়া তাহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বাবু লিপিকরের বয়স একটু (!) বাড়াইয়া দিয়াছেন, বলিয়াছেন "মানুষের পরমায়ু যদি শত বর্ষ ধরা যায়!" বসন্তবাবুর মতে ১৪০০ হইতে ১৪৭০ খৃঃ অঃ মধ্যে ঐ পুঁথির লিপিকাল। এদিকে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় বলেন পুঁথিখানি ১৩৬০ খৃঃ বা তাহারও পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। সম্প্রতি পরিষদে একটী প্রবন্ধে কৃষ্ণকীর্ত্তনকারকে তিনি জয়দেবের সমসাময়িক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। রায় মহাশয় এ সম্বন্ধে কি বলেন?

চণ্ডীদাসকে যদি শ্রীচৈতন্যের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, জয়দেব শ্রীমদ্ভাগবতের কবিত্বময় অভিনব ভাষ্য গীতগোবিন্দে তৎকাল-প্রচলিত সহজিয়া ধর্ম্মকে যে উন্নততম পরিবর্ত্তিত রূপ দান করিয়াছিলেন, দেশে ধীরে-ধীরে তাহা প্রসারলাভ করিতেছিল। সুদূর রাজপুতানায় মেবারপতি কুম্ভ রচিত "রসিকপ্রিয়া" তাহার প্রমাণ। এদিকে দেশের অবনত অবস্থায় অবলম্বিত লৌকিক ধর্ম্মের বিকৃত রূপও যে লোপ পায় নাই, শ্রীচৈতন্য ভাগবতের "দম্ভকরি বিষহরি পূজে কোনো জন" প্রভৃতি পয়ারেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। ইহারই উপরে একটা প্রবল ধাক্কা দিয়াছিল পশ্চিম হইতে আগত রাজদণ্ড রক্ষিত মুসলমানধর্ম্মের প্রবল আন্দোলন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসকে সমসাময়িক মানিয়া লইয়া আমরা বলি,—ইহাই ছিল চণ্ডীদাসের কালগত পারিপার্শ্বিক অবস্থা। এই অবস্থায় তিনি জয়দেবকেই অনুসরণ করিয়া দেশকে এক নবীন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিতেছিলেন। তিনি যে তাঁহার কালকে অতিক্রম করিয়া এক নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, মনসার পরিচারিকা বাসুলী কর্ত্তৃক প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির প্রবাদ তাহাই প্রমাণিত করিতেছে। এ কথা বহু জনে বহু বার বলিয়াছেন যে—চণ্ডীদাসের সঙ্গীত, রূপে মূর্ত্ত হইয়াছিল শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীনিত্যানন্দে; তাই বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের ইতিহাসে চণ্ডীদাসের স্থান অতি উচ্চে।

রায় মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন, জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের আদর্শ এক হওয়া উচিত। কেহই তাহা অস্বীকার করে না। কিন্তু তাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মামী ও ভাগিনেয়ের ঐ ইতর গালাগালি কি জয়দেব ও বিদ্যাপতির আদর্শের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে? আদর্শ যদি একই হইবে, তবে জয়দেব ও বিদ্যাপতিতে যাহা নাই, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে তাহা আসিল কোথা হইতে? রাধি[illegible]র মাশুকিল, বড়াইয়ের চপেটাঘাত প্রাপ্তি, শ্রীকৃষ্ণের মুণ্ডে মুণ্ডে ঢোসাইবার ভয় প্রদর্শন—এ সবের আদর্শ কে? জয়দেব ও বিদ্যাপতির সঙ্গে যিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকে একাসনে বসাইতে চাহেন, জানি না, তাঁহাকে গোঁড়া অথবা কি বলা যায়! শ্রীগোবিন্দের রাধিকার দুইটী বিভিন্ন মূর্ত্তি—যাহা চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে কোনো অসামঞ্জস্য আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। শ্রীগীতগোবিন্দের দুইটী ধারা নান্নুর ও বিসফীর নয়ন জলে কেমন পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছিল তাহা যে রায় মহাশয়কে বুঝাইতে হইবে, এ কথা মনে করাও আমাদের ধৃষ্টতা।

রায় মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন, নীলরতন বাবুর পদাবলীতে সহজিয়ার কোন চিহ্ন নাই। কিন্তু রাগাত্মিকা পদে সহজিয়ার প্রভাব আছে, অতএব ঐ পদ মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী কালে রচিত, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, ঐ পদগুলিই চণ্ডীদাসের মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তিতার সাক্ষী। মহাপ্রভুর প্রেম-ধর্ম্ম প্রচারের পর চণ্ডীদাসের মত কবির পক্ষে—যিনি স্বীয় রাধিকায় (রায় মহাশয়ের মতে) মহাপ্রভুর ছায়া লইয়াছেন—ওরূপ পদ রচনা আর সম্ভব কি? যে রায় মহাশয় চণ্ডীদাসের ধর্ম্মমত নির্ণয়ে পরিষদ পত্রিকায় তন্ত্রাদিকে উপেক্ষা করিয়া এক দিন বেদ হইতে শ্লোক সংগ্রহে উপদেশ দিয়াছিলেন, আজ সেই ধর্ম্মাবলম্বীকে তিনি মহাপ্রভুর আদর্শ অনুযায়ী এবং পরবর্ত্তী বলিয়া মত প্রকাশ করিতেছেন। আমাদের কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় না হইয়া উপায় কি?

৪। সমসাময়িক সাহিত্য।

চণ্ডীদাসের সমসাময়িক সাহিত্যের আলোচনা করিতে হইলে বিদ্যাপতি, কৃত্তিবাস, সঞ্জয়, বিজয়পণ্ডিত এবং কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী মালাধর বসু প্রভৃতিকে গ্রহণ করিতে হয়। তৎকাল-প্রচলিত-মঙ্গল গাথা, ছড়া, পাঁচালী এবং প্রবাদ প্রবচনাদিও এই আলোচনার বিষয়ীভূত হওয়া উচিত। এই সমস্তের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ইতর গালাগালি,—পূর্ব্বরাগাদির হাস্যোদ্দীপক প্রচেষ্টা, ভয় দেখাইয়া মিলনের প্রয়াস ও বিহার বর্ণনায় গ্রাম্যতা প্রভৃতি পাওয়া যায় কি না, অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। আমাদের মনে হয় গ্রাম্য গাথা ও ছড়া-পাঁচালীর মধ্যে উহার নিদর্শন মিলিলেও কাব্যাদিতে তাহা মিলিবে না। এইজন্যই চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কৃত্তিবাস, সঞ্জয় প্রভৃতির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাব ও রুচিগত ঐক্য এবং কল্পনার সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মালাধর বসুর দানখণ্ড ও পারখণ্ড আমাদের এই দৃষ্টান্তের প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত

হইতে পারে। পূর্ব্বকাল হইতে এদেশে এক প্রকারের ধুমুর প্রচলিত রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সম্বন্ধে মত প্রকাশের সময় অন্ত একদিন সে সম্বন্ধে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

৫। জীবন-কথা।

চণ্ডীদাসের রজকিনী-প্রবাদ চিরপ্রসিদ্ধ; সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী নরহরি সরকার তাঁহার পদে তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে রজক পিয়ারীর অঞ্চল-প্রান্তও পরিদৃষ্ট হয় না। এদিকে ইতিপূর্ব্বে পরিষদ পত্রিকায় চণ্ডীদাসের চিত্রবধ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় রজকিনীর যে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রবাদ-কাহিনীই সমর্থিত হয়। যে পুরানো পুঁথি হইতে চিত্রবধ-কাহিনী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহারও বয়স না কি দুইশত বৎসরের কম নহে। পদাবলী মধ্যে রজকিনীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এরূপ ক্ষেত্রে পদাবলীর বয়স কত নির্দ্ধারিত হইতে পারে?

আবার বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের মিলনের প্রবাদ ও তৎসম্বন্ধীয় পদ যেমন কবির কাল-নির্ণয়ে সাহায্য করে, শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে ঐ চিত্রবধ পুঁথিখানাও তেমনি কিছু সাহায্য করিতে পারে। সে সাহায্যে না কি, চণ্ডীদাসকে যদু—জেলালউদ্দীনের সময়ে লইয়া যাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের লিপিকাল বোধ হয় তাহারও পূর্ব্বে!

রচনার ধারা।

৬। রচনার ধারা সম্বন্ধে রায় মহাশয় পূর্ব্বে ছয়টী মূল সূত্র স্থির করিয়াছিলেন। তাহার পর ভক্তভাব ও সখীভাব আছে। এই সমস্ত সূত্রবলে পূর্ব্বে তিনি সেগুলিকে আসল চণ্ডীদাসের বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, এখন তাহা দেড়শত বৎসরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই রচনার ধারা নির্ণয়ে আমরা চরিত্রগত ঐক্যের কথা, সঙ্গতি অসঙ্গতির কথাও আলোচনা করিতে চাই। রায় মহাশয়ের সূত্র অনুসারে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বিচার হইয়াছে কি?

৭। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুঁথিখানা ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে বিষ্ণুপুর-রাজের পুঁথিশালায় রক্ষিত হইত। খৃঃ ১৭০০ অব্দে মহারাজ নন্দকুমারের জন্ম। শ্রীরাধামোহন ঠাকুর মহারাজের গুরু ছিলেন এবং তিনিই পদামৃত সমুদ্র সঙ্কলন করেন। তাহা হইলে বলিতে হয়—প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে পদামৃত-সমুদ্র সংকলিত হইয়াছিল। বিষ্ণুপুর রাজবাটীতে শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রতিপত্তির কথা সকলেই জানেন। তাঁহার পৌত্রেরও সে সংবাদ অজ্ঞাত ছিল না। রাজার পুঁথিশালার কথাও নিশ্চয়ই তিনি জানিতেন। তথাপি রাধামোহন ঠাকুরের সংগ্রহ গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের—অন্ততঃ তাহার দান ও নৌকাখণ্ডের স্থান হইল না কেন? পুঁথির বর্ত্তমান মালিক আপনাকে শ্রীনিবাস আচার্য্যের দৌহিত্র বংশ বলিয়া পরিচয় দেন। বিষ্ণুপুর রাজবাড়ী এবং আচার্য্যের দৌহিত্র বংশ—এই দুইয়েরই সংস্রবে পুঁথির কথা রাধামোহন ঠাকুরের অজ্ঞাত থাকিবার কথা নহে। শ্রীমহাপ্রভুর তিরোধানের পর হইতে রাধামোহনের আবির্ভাব কালের মধ্যে বৈষ্ণব-সমাজে কি এমনই স্মৃতিভ্রংশ ঘটিয়াছিল যে, মহাপ্রভুর আস্বাদিত গান আচার্য্য-পরম্পরায়ও কেহ স্মরণে রাখিতে পারেন নাই? যেমন জাল চণ্ডীদাস গজাইয়া উঠিলেন, অমনি সকলে নির্ব্বিবাদে তাহাকে মানিয়া লইলেন? নরহরি সরকার হইতে গোবিন্দদাস পর্য্যন্ত, তবে কোন্ চণ্ডীদাসের বন্দনা গাহিয়াছিলেন? তিনশত সাড়ে তিনশত বৎসর, পূর্ব্বে, মহাপ্রভুর তিরোধানের এক-দেড়শত বৎসরের মধ্যে জাল চণ্ডীদাসের জন্ম হইলে, তিনি কখনই আত্ম-গোপন করিয়া থাকিতে পারিতেন না। যে সময় খেতুরীর মহোৎসবের মত বৈষ্ণব-সম্মিলনের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, সেই সময়—"কেবা শুনাইল শ্যাম নাম"এর মত দুই চারিটী পদও রচিত হইয়া থাকিলে, পদাবলী-সাহিত্যে রচয়িতার নামে পৃথক বন্দনা-গীতির অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইত, অথবা ভক্তি-রত্নাকর প্রভৃতি বৈষ্ণব-ইতিহাসে অন্য পদকর্ত্তাগণের সঙ্গে তাঁহার নাম সগৌরবে উল্লিখিত থাকিত। নরহরি সরকারের চণ্ডীদাস-বন্দনা সংগ্রহ-গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে, সুতরাং রজকিনীর বঁধুকে অনেকেই চিনিতেন; তবে জাল চণ্ডীদাস জন্মিয়া থাকিলে, তাহার নাম পৃথক ভাবে অনুল্লিখিত থাকিবার হেতু কি?

দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড লোপ পাইল না, এদিকে জাল পদ চলিতে লাগিল; কেহ বিচার করিল না, তুলনা করিল না, আলোচনা করিল না! মহাপ্রভুর প্রিয়পাঠ্য বলিয়া সংগ্রাহকগণ সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিলেন, খাঁটী বিশ্বাসে (!) সংগ্রহও করিলেন—অথচ রায় মহাশয় অনুমান করিতেছেন, শ্রোতার রুচির নিকট মহাপ্রভুর আস্বাদন-গৌরবও জীবন-সংগ্রামে হার মানিয়া গেল, এমন কি আচার্য্যগণও হার মানিয়া গেলেন! তাঁহারা চণ্ডীদাসকে মনে রাখিলেন, দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড মনে রাখিলেন, কিন্তু তাহার ভাষা কট-মট বলিয়া জাল চণ্ডীদাসকে প্রশ্রয় দিলেন! তিনশত সাড়ে তিনশত বৎসর পূর্ব্বে, "কে—না বাঁশী বায়ে বড়াই মালিনী নই কূলে" পদ কট-মট শুনাইত, আর বড়ই মধুর লাগিত কেবল দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড!!

৮। আমরা নিম্নে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দুইটী পদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। কৃত্তিবাস ও সঞ্জয় প্রভৃতির দুইশত বৎসরের পুরাতন পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। উদ্ধৃত পদ দুইটীর সঙ্গে একবার দুইশত বৎসরের সঞ্জয় ও কৃত্তিবাসের তুলনা করিতে অনুরোধ করিতেছি। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বিভিন্ন কালের রচনার ছাপ সুস্পষ্ট। কয়েকটী পদে অপরের অনুবাদও আছে;—জয়দেবের তো আছেই, "লাবণ্যজল তোর মিহাল কুন্তল" (তায় খণ্ড ১১৫ পৃঃ) একটী প্রসিদ্ধ উদ্ভট শ্লোকের হুবহু নকল। এই সব বিষয়ের রীতিমত বিচার আলোচনা আবশ্যক। আমরা রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি এম-এ মহাশয়কেও এজন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দুইটী পদ—

(১)

কেশ পাশে শোভে তার সুরঙ্গ সিন্দুর
সজল জলদে যেন উইল নব সুর
কনক কমলরুচি বিমল বদনে
দেখি লাজে গেলা চান্দ দুইলাখ যোজনে"

মুনি মন মোহিনীর মণি অনুপামা
পদুমিনী আজার নাতিনী রাধা নামা
ললিত আলক পাঁতি কাঁতি দেখি লাজে
তমাল কলিকাকুল রাহ বনমাঝে
আলস লোচন দেখি কাজলে উজল
কণ্ঠদেশ দেখিআঁ শঙখত ভৈল লাজে
সত্বরে পসিলা সাগরের জল মাঝে
কুচ-যুগ দেখি তার অতি মনোহরে
অভিমান পাআঁ পাকা দাড়িম বিদরে
মাঝা খিনী গুরুতর বিপুল নিতম্বে
মত্ত রাজহংস জিনী চলএ বিলম্বে
দিনে-দিনে বাঢ়ে তার নহলী যৌবন
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥

(২)

আষাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ
মদনে কদনে মোর নয়ন ঝুরএ
পাখী জাতী নহোঁ বড়ায়ি উড়ী জাএঁ তথাঁ
মোর প্রাণনাথ কাহাঞি বসে যথা
কেমনে বঞ্চিব রে বারিষা চারিমাস
এ ভর যৌবনে কাহ্ন করিলে নিরাস
শ্রাবণ মাসে ঘন-ঘন বরিষে
সে জাত সুতিআঁ এ মোর নিন্দ না আইসে
কত না সহিব রে কুসুমশর জ্বালা
হেনকালে বড়ায়ি কাহ্ন সনে কর মেলা
ভাদর মাসে অহোনিশি অন্ধকারে
শিখি ভেক ডাহক করে কোলাহলে
তাত না দেখিবোঁ যবেঁ কাহাঞির মুখ
চিন্তিতে-চিন্তিতে মোর ফুট জায়িবে বুক
আশিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিষী
মেঘ বহিআঁ গেল্যো ফুটিবেক কাঁশী
তবে কাহ্ন বিনী হৈব নিফল জীবন
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ।

এইবার জিজ্ঞাস্য, রচনা দেখিয়া প্রথমটী অপেক্ষা দ্বিতীয়টী পুরাতন বলিয়া মনে হয় কি না ? 'কনক কমলরুচি বিমল বদনে' দেখিয়া যে কাশীদাসকে মনে পড়ে। ললিত আলোক পাঁতি কাঁতি দেখি লাজে, আলস লোচন দেখি কাজলে উজল' যদি ছয়শত বৎসরে গিয়া খুঁজিতে হয়, তবে পদাবলীর আর অপরাধটা কি? বঙ্গভাষার অতি বড় সৌভাগ্য যে, ছয়শত বৎসর আগে এমন নিখুঁত পরিকার পয়ার প্রস্তুত হইয়াছিল। একটা "মাসের" উপর চন্দ্রবিন্দুকে যদি বৈশিষ্ট্য বলিয়া মানিতে হয়, তবে তাহা অপেক্ষা কর্ম্মপাক আর কি হইতে পারে? ১মর অপেক্ষা ২য়টিতে চন্দ্রবিন্দুর বাহুল্য, ছন্দোহীনতা, ভাষা ও বিভক্তির বৈচিত্র্য প্রভৃতিও লক্ষ্য করিবার বিষয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে এমন উদাহরণ বহুতর আছে।

জন্মসংরোধে সংযম ও বিজ্ঞান

শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত বি-এ

যত রকমের চিন্তা আছে, তন্মধ্যে উদরের চিন্তাটাই মানুষকে সব চেয়ে বেশী ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। অবশ্য দারিদ্র্য না থাকিলে উদরের জন্য চিন্তা করিতে হয় না—তাই দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া, একটা উপায় আমরা বাহির করিয়াছি—'জন্মসংরোধ', অথবা সন্তানের সংখ্যা অবস্থানুযায়ী নিয়মিত করা। এ বিষয়ে দু'এক-খানি বহিও বাহির হইয়াছে,—সাময়িক পত্রিকাদিতেও একটু আধটু আলোচনা হইতেছে। গালাগালি দেওয়া যাঁহাদের অভ্যাস, তাঁহারা স্বকার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন। আমাদের দেশে কোন বিষয়ে একটু নূতনত্ব দেখিলেই বা নিজের মতের সহিত না মিলিলেই—আমরা যে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করি—তাহা গালাগালি। একটু ধীর ভাবে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক যে, "জন্মসংরোধ" সত্য-সত্যই নারকীয় ব্যবস্থা কি না।

আমি বলিয়াছি যে দারিদ্র্যের জন্যই আমরা জন্ম-সংরোধ উপায়ের শরণ লইয়াছি। প্রথমতঃ এই দারিদ্র্যের দিক দিয়াই দেখা যাউক। আমাদের দেশ যে দরিদ্র, এ কথা কেহই অস্বীকার করেন না। দু'বেলা দু'মুঠা ভাতের যোগাড় করিতেই আমাদের দেশের শতকরা নিরানব্বই জনের বিদ্যা, বুদ্ধি, মেধা, শক্তি সব ব্যয়িত হইয়া যায়; তথাপি 'হা অন্ন' রব থামে না। এরূপ অবস্থায় কেহ যদি নিজের সন্তান-সন্ততির সংখ্যা নিয়মিত করিতে চাহেন—পালে-পালে শিয়াল-কুকুরের জন্ম হেতু না হইয়া দু'একটী ছেলে মেয়ের সত্যিকারের পিতা হইতে চাহেন, তাহা হইলে কি খুব অন্যায় হইবে? যাহাদিগকে আমি সংসারে আনিব, তাহাদের শুধু ভরণ-পোষণ নয়, তাহাদিগকে মানুষ করিবার জন্য আমি দায়ী। তাহারা মানুষের সন্তান—পিতা-মাতার নিকট মনুষ্যত্ব-লাভের দাবী করিতে পারে,—আর পিতা-মাতা তাহাদের সেই ন্যায়সঙ্গত দাবী পূর্ণ করিতে বাধ্য। এ কথার অর্থ এই নহে যে, প্রত্যেক সন্তানকে রাজকুমার বা রাজকুমারী করিয়া দিতে হইবে। তাহাদের ভরণপোষণ করিতে আমি বাধ্য এবং তাহাদের জীবিকা-র্জ্জনের উপযোগী করিয়া তুলিতেও আমি বাধ্য; আরও বেশী বাধ্য তাহাদের মনুষ্যত্বের সাধনোপযোগী শিক্ষা দিতে। আমার যদি সে শক্তি না থাকে, তবে তাহাদের জন্মদান করিয়া শুধু যে অন্যায় করিব তাহা নয়—তাহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার জন্য পাপের ভাগীও হইব। তাই আমার সামর্থ্যানুযায়ী যদি সন্তানের সংখ্যা নিয়মিত করিতে চাই, তবে তাহা অন্যায় ত হইবেই না—অধিকন্তু একটা অন্যায় হইতে বাঁচিয়া যাইব।

এখানে একটা আপত্তি উঠিতে পারে যে, 'জন্মসংরোধ' করিলে সমাজের জনসংখ্যা হ্রাস হইতে পারে,—সমাজের শক্তি বৃদ্ধি হইবে না। "সমাজের শক্তি বৃদ্ধি" হয় কিরূপে? উহা কি শুধু মাথা গণনার সংখ্যা-বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে—না, তার জন্য আরও কিছুর দরকার? যদি সংখ্যায় বেশী হইলেই শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে আফ্রিকার অসভ্য জাতিরা বোধ হয় যথেষ্ট শক্তিশালী হইত, নিগ্রোদের সংখ্যা না কি মোট চল্লিশ কোটী। আমি অবশ্য এ কথা বলিতেছি না যে, সংখ্যার মোটেই দরকার নাই। আমার বক্তব্য এই যে, সংখ্যার সঙ্গে উৎকর্ষ থাকা দরকার; বরং উৎকর্ষের বেশী দরকার। একজন বিবেকানন্দ কোটী সাধারণ মানুষের চেয়ে বড়। "ধ্বংসোন্মুখ জাতি"—এ জাতি বাঁচিয়া থাকিবে না—প্রভৃতি যাঁহারা বলেন, তাঁহারা কি শুধু সংখ্যা চান? তাহা ত মনে হয় না। জাতিকে বাঁচাইয়া রাখে কাহারা? মহাপুরুষদের শক্তিতেই সমাজ শক্তিশালী হয় ও জগতে বাঁচিয়া থাকে—শুধু সংখ্যা দ্বারা নয়। যাহার পেটে ভাত নাই, পিঠে কাপড় নাই, সে আবার ডজন-ডজন ছেলে-মেয়েকে মানুষ করিবে কিরূপে? গণ্ডা দুই বুভুক্ষিত শক্তিহীন শেয়াল-কুকুর তুল্য ছেলে-মেয়েকে সমাজের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়ার পরিবর্তে, একটী প্রকৃত মানুষ সমাজকে দেওয়া সহস্র গুণে শ্রেয়। উহাতে সমাজের শ্রী ও শক্তি বৃদ্ধি হয়—বিপরীত পথে পঙ্গু অকর্ম্মণ্যের ভারে সমাজ নির্জীব হইয়া পড়ে।

তার পর শুধু জন্ম দিলেই সংখ্যা বৃদ্ধি হয় না—সন্তানকে পালন করা ও বাঁচাইয়া রাখা দরকার। কিন্তু বাঁচাবে কি করে? দারিদ্র্যের কশাঘাতে ত নিজেই মরছে—তার উপর পালে-পালে মা ষষ্ঠীর বাহনগুলি যদি আসিয়া ঘাড়ে চাপে, তবে কতকগুলি ত মরবেই—আর বাকীগুলি অতি চমৎকার জিনিষ হয়ে সমাজে বাহির হবে—অশিক্ষিত বুবুক্ষিত, অর্দ্ধ-উলঙ্গ। পৃথিবীর কোন দেশই আমাদের দেশের সঙ্গে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যায় পাল্লা দিতে পারিবে না। উহা খুবই স্বাভাবিক। শিশু-মৃত্যুর যতগুলি কারণ আছে, তাহার মূল অনুসন্ধান করিলে প্রায়ই গিয়া ঐ দারিদ্র্যে দাঁড়ায়। অবশ্য গোড়ামী ও অজ্ঞতাও আছে—কিন্তু প্রকৃত, শিক্ষা বিস্তার করিতে হইলেও টাকার দরকার। এই অকাল-মৃত্যুর জন্য অবিবেচক পিতা-মাতাই অনেকটা দায়ী।

বাল্য বিবাহ, অধিক সংখ্যক সন্তানের জন্মদান, প্রভৃতি কারণে (খাদ্যাভাবেও বটে) পিতা-মাতার বিশেষতঃ মাতার স্বাস্থ্যহানি ঘটে; সুতরাং সন্তানগণও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়াই পৃথিবীতে আসে এবং সংখ্যা বৃদ্ধির উপায় না হইয়া সংখ্যা হ্রাসেরই কারণ হয়। আর যে হতভাগিনী নারী তাহাদিগকে সংসারে আনেন, তাঁহাকেও জীবন্মৃত করিয়া যায়। যদি কোন নারী অধিক সন্তান প্রজননে অক্ষমতা বশতঃ তাঁহার সন্তানের জন্মসংখ্যা নিয়মিত করিতে চান, তাহা কি অন্যায়? সমাজ, পণ্ডিত যাহাই বলুন না কেন, প্রত্যেকেরই অন্যের অনিষ্ট না করিয়া আত্মরক্ষা করিবার অধিকার আছে। 'কুড়ী বয়সে বুড়ী'রা যদি মাতা হইবার অত্যধিক লোভ ত্যাগ করেন, তাহা হইলে শুধু তাঁহারাই যে সুখী হইবেন তাহা নয়, সমাজেরও মঙ্গল সাধন করিবেন। দশটী ছেলের মা হইয়া, আটটীকে যমালয়ে দিয়া, অর্দ্ধমৃত দুইটীকে সমাজে দেওয়া ও নিজের জীবন বলি দেওয়ার চেয়ে, দুইটীর মা হইয়া সত্যিকার দুইটী মানুষ সমাজকে দেওয়া কি শ্রেয় নয়?

আর একটী আপত্তি উঠিতে পারে যে, জন্মসংরোধ ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধ কার্য্য। যাঁহারা এ কথা বলেন, তাঁহাদের যুক্তি এই যে,'ভগবানের ইচ্ছাতেই সন্তানের জন্ম হয়; সুতরাং উহার বিরুদ্ধে কোন কাজ করা অন্যায়।' আমি উত্তরে শুধু এই বলিতে চাই যে, ডাক্তারগণও ভয়ঙ্কর অন্যায় করেন—কারণ, 'ভগবানের ইচ্ছাতেই রোগের জন্ম হয়; সুতরাং উহার বিরুদ্ধে কোন কাজ করা অন্যায়।' মানুষ তাহার মঙ্গলের জন্য বুদ্ধি-বৃত্তির চালনা করিতে পারে। তার পর আয়ুর্ব্বেদেও এমন অনেক উপায়ের উল্লেখ আছে, যাহাতে ইচ্ছামত কন্যা বা পুত্র উৎপাদন করা যায়। যাঁহারা এ উপায় অবলম্বন করিতেন বা উপদেশ দিতেন, তাঁহারাও পাপী; কারণ, 'ভগবানের ইচ্ছাতেই পুত্র বা কন্যার জন্ম হয়।' আর অধিক লেখার দরকার নাই।

অন্য এক বিরুদ্ধবাদী সম্প্রদায়—তাঁহারা চিরদিনই যে কোনও নূতনত্বের বিরোধী—বলিবেন, "বাপু হে, ওসব কথা ত কোন দিন শুনি নাই! এতদিন যাবৎ ত পৃথিবীটা চলিয়া আসিতেছে—আজ তোমরা কোন বুদ্ধিতে 'ত্রিকালদর্শী' মহাপুরুষদিগের সঙ্গে টক্কর দিতে চাও?" ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁহাদের সঙ্গে নূতন পুরাতন লইয়া তর্ক করিবার এই স্থল নহে—আর এ তর্কে আমাদের মূল বিষয়ের কিছু আসে যায় না। শুধু এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, নূতনই পুরাতন নহে, আর পৃথিবীটা চলে বটে, তবে একটু বাঁকা পথে চলে; আর সঙ্গে-সঙ্গে পরিবর্ত্তনও আনে, যে পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আমাদের যোগ না রাখিলে, পৃথিবীর সঙ্গে আমাদেরই বিয়োগের সম্ভাবনা।

যদি সন্তানের সংখ্যা নিয়মিত করার প্রয়োজন হয়, তবে কি উপায়ে তাহা সাধিত হইতে পারে? যতটুকু বুঝিতে পারা যায়,—এই 'উপায়' নিয়াই অনেকটা বাদবিবাদের উৎপত্তি (অন্ততঃ আমাদের দেশে)। দুইটা উপায়—এক সংযম, অন্য বৈজ্ঞানিক উপায়। সংযম যে শ্রেষ্ঠ উপায়, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সংযমের দ্বারা যদি সংখ্যা নিয়মিত করা যায়, তবে সব দিক দিয়াই তাহা খুব ভাল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে অটুট সংযমের উপর নির্ভর করা সম্ভবপর নহে। আমি সকলের সম্বন্ধে এ কথা বলিতেছি না। যাঁহারা পূর্ণ সংযমী, তাঁহারা আমার নমস্য। কিন্তু বাস্তব জগতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আলোচনা করা দরকার। পৃথিবীর সকলেই যদি পরমহংস হইতেন, তাহা হইলে কোন কথাই ছিল না। কিন্তু মানুষের প্রকৃতি ও বাস্তব জগতের অবস্থা দেখিয়া ইহাই বলা যায়,—শুধু মানসিক বলের উপর নির্ভর করা সহজ নয়। অবশ্য তাহা আদর্শ—কিন্তু বাস্তবকে উপেক্ষা করিয়া যদি আমরা শুধু আদর্শের পেছনে আকাশমার্গে ধাবিত হই, তাহা হইলে সত্যিকারের সমস্যার কোনও সমাধান হইবে না।

যাহারা পূর্ণ সংযমী—ঠিক শাস্ত্রোক্ত সংযমী—তাঁহাদের একটা

উদাহরণ ধরিয়া দেখা যাউক—সংযম দ্বারা সন্তান সংখ্যা নিয়মিত করা সম্ভবপর কি না।

আমাদের দেশে মেয়েদের বার বৎসর বয়সে যৌবনোদ্গম হয়। ধরুন, ষোল বৎসর বয়সের সময় কোন মেয়ে প্রথম সন্তানের জননী হইলেন,—যদিও আমাদের সমাজে ষোল বৎসর বয়সে ৩।৪ সন্তানের জননীর সংখ্যাই বেশী। সন্তানের জন্মের ছয় মাস পরে (কোনও কোনও স্থলে দুই মাস পরে) স্ত্রীলোকের আবার গর্ভধারণে ক্ষমতা জন্মে, অর্থাৎ স্বাভাবিক ঋতু হইতে থাকে। এখানে শাস্ত্রের বিধি এই যে, ঋতুবতী স্ত্রীর ঋতু রক্ষা করিতে হইবে। রজঃদর্শনের প্রথম দিন হইতে ষোড়শ দিন পর্য্যন্ত ঋতু সময় (Mense period)। প্রথম চারি দিন, অমাবস্যা প্রভৃতি নিষিদ্ধ দিন পরিত্যাগ করিয়া "সকামা" ভার্য্যার ঋতু রক্ষা করিতে হইবে। সব ছাঁটিয়া কাটিয়া পরবর্ত্তী ছয় মাসের মধ্যে অন্ততঃ ২।৩ দিনও ঋতু রক্ষার জন্য পাওয়া যাইবে। তাহা হইলে প্রথম সন্তানের জন্মের এক বৎসরের মধ্যে আবার গর্ভোৎপত্তি হইল—সংযমীরা অমোঘবীর্য্য হইবেন, ইহাই আশা করা যায়। দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দুই বৎসরের মধ্যে হইল। সাধারণতঃ পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত—কাহারও কাহারও ৪৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সন্তান ধারণের প্রাকৃতিক শক্তি থাকে। ৪০।৪৫ বৎসরের কথা (Menopause) ছাড়িয়া দিয়া ৩৫ বৎসর পর্য্যন্ত সন্তান ধারণের সময় ধরা যাউক। তাহা হইলেও একজন স্ত্রীলোক কম পক্ষে দশটী সন্তানের জন্ম দিতে পারেন। মনে রাখা দরকার, উহারা "চটক মিথুনের" সন্তান নয়—পূর্ণ সংযমীর (যিনি বৎসরে গড়ে ১২ দিনের বেশী স্ত্রীর সহিত এক শয্যায় থাকেন না, তাঁহার) ছেলে। উহাও যদি সংযম না হয় তবে আমি নাচার।

কিন্তু এরূপ সংযম সত্ত্বেও কমপক্ষে তাঁহার দশটী সন্তান হওয়া সম্ভবপর, এবং তন্মধ্যে আটটী মেয়ে হওয়া কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। আকাশের দিকে না তাকাইয়া, মাটীর দিকে চেয়ে যদি আমরা বিচার করি, তবে দেখিতে পাইব যে, এরূপ আদর্শ পুঁথিগতই থাকে। কিন্তু উহা প্রত্যেকের পক্ষে সম্ভবপর হইলেও, দশটী সন্তানের প্রতিপালন ও শিক্ষার ভার বহন করা অধিকাংশের পক্ষেই অসম্ভব। এরূপ অবস্থায় দুঃখ-দুর্গতির হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য আমরা যদি বিজ্ঞানের সাহায্য লই, তাহা কি শ্রেয়স্কর হইবে না?

প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক সমাজেরই আদর্শ-পুরুষ-প্রচারিত বাণী অতি উচ্চ। মহাত্মা গান্ধী, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি উচ্চ আদর্শ—নিজেকে উন্নত করিবার জন্য সম্মুখে ধরা যায় বটে, কিন্তু জনসাধারণ এরূপ আদর্শ অতীতেও উপলব্ধি করিতে (realised) পারে নাই, ভবিষ্যতেও পারিবে বলিয়া বিশেষ ভরসা হয় না—অন্ততঃ যে পর্য্যন্ত না মানুষের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইতেছে। ভবিষ্যতে যদি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে ত খুব ভালই; কিন্তু এখন ত বর্ত্তমানের হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া দরকার। বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনায় এই মনে হয় যে, সন্তান-সংখ্যা নিয়মিত করিবার জন্য প্রয়োজন মত বৈজ্ঞানিক উপায়ও অবলম্বন করা উচিত।

আরও দু'একটী ছোট-খাট আপত্তি আছে। কেহ-কেহ সন্তান-পালনে শক্তি থাকা সত্ত্বেও, শুধু বিলাসিতার জন্য জন্মসংরোধ করিতে পারেন। পাশ্চাত্য দেশে তাহার উদাহরণ পাওয়া যায়। ইহার উত্তরে এইমাত্র বলা যায় যে, আত্যন্তিক ভাল কোন জিনিষ নাই—ভাল ও মন্দ পরস্পর জড়িত। আগুণে পোড়ায় বলিয়া কেহ আগুণকে নির্ব্বাসিত করিতে বলেন না। কেহ-কেহ বলেন, বৈজ্ঞানিক উপায়ের কথা প্রচারিত হইলে, মানুষ অসদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইহা ব্যবহার করিতে পারে; ইহার উত্তরেও আগুণের উদাহরণ দেওয়া যায়।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। বৈজ্ঞানিক উপায় সম্বন্ধে আমি যাহা লিখিয়াছি, তাহা সমস্যা সমাধানের দিক দিয়া, theoryর দিক দিয়া। এই বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমার নাই। তবে একটা বিষয় মনে রাখা উচিত যে, এ বিষয়ে সংযম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায়। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের বেশী ব্যবহারে অনিষ্টের খুব সম্ভাবনা। Conjugal onanism হইতে পুরুষত্বহীনতা (Impotency) আসিতে পারে। এ বিষয়ে স্বাস্থ্যতত্ত্বের দিক দিয়া যদি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ আলোচনা করেন, তবে সাধারণের অনেক উপকার হইবে।

ভট্টাণু

অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এম-এস্ সি

গত গ্রীষ্মের ছুটীতে বাংলাদেশে এক বড়-গোছের শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। "নৃত্যন্তি ভোজনে বিপ্রাঃ"। সুতরাং নাচিতে-নাচিতে সেখানে গিয়া উপস্থিত। কিন্তু গিয়ে দেখি, তখনো আহারের কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে; কাজেই নিমন্ত্রিতেরা জায়গায়-জায়গায় ব'সে জটলা পাকাচ্ছেন। আমিও এক জায়গায় স্থান কোরে নিলাম। কিন্তু সর্ব্বনাশ, দেখি, সেখানে নন্-কো-অপারেশন্ (অথবা দেশী চলিত ভাষায় 'লঙ্কাপ্রাশন') সম্বন্ধে তুমুল আলোচনা চ'লেছে। এখন খালি পেটে এসব আলোচনা, লঙ্কার ঝাল, আমার মোটেই বরদাস্ত হয় না। সুতরাং সেখান থেকে উঠ্‌তে হোল। একটু ঘুরে ফিরে, দেখি, এক জায়গায় কয়েকজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হাত-মুখ নেড়ে, সতেজে শিখা আন্দোলন কচ্ছেন। তাঁদের অধিকাংশের স্থূল উদরের বিপুল বহর দেখে মনে হোল, সেখানে নিশ্চয় আহার সম্বন্ধে কোন বিশেষ পুষ্টিকর আলোচনা চলেছে। কিন্তু গিয়ে দেখি, সেখানে তর্ক চলেছে জাতিভেদ-প্রথা সম্বন্ধে। একজন কিছু সাপের মন্ত্র আওড়িয়ে এই প্রমাণ করবার প্রয়াস পাচ্ছেন যে, আমাদের ত্রিকালদর্শী ঋষিরা "গুণ-কর্ম্ম-বিভাগশঃ" এই যে জাতিভেদ প্রথার প্রতিষ্ঠা কোরে গেছেন, তারি জোরে এই সনাতন হিন্দু-সমাজ এখনও টিঁকে আছে; এবং reformerদের মুখে ছাই দিয়ে ভবিষ্যতেও টিঁকে থাকবে। এই সতেজ ভবিষ্যদ্বাণী শুনে অবশ্য আমার ন্যায় অনেকেরই বুক আর্শীর দশ হাত ফুলে উঠেছিল; কারণ, ব্রাহ্মণ-ভোজন প্রথাটা যে বর্ত্তমান সমাজের জাতিভেদ প্রথা-

অস্তিত্বের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, সেটা সকলেই বোঝেন।' যা হোক, আমি সেখান থেকেও স'রে পড়ব মনে করছি, এমন সময় আমার এক ভুঁইফোড় বন্ধু প্রশ্ন করে বসলেন, "আচ্ছা, আমি যদি এক শূদ্রের পাশে ব'সে খাই, তবে আমার গুণ ও কর্ম্মের কি এমন ব্যতিক্রম ঘট্‌বে, যাতে আমার জাত নিয়ে টানাটানি পড়তে পারে?" প্রশ্নটা শুনে আমার উত্তর শুনবারও কৌতূহল হ'ল। উত্তরে অনেকে অনেক বাজে তর্কের অবতারণা করলেন বটে, কিন্তু একজনের উত্তর বেশ সারবান্ ব'লে বোধ হোল। তিনি বললেন, "দেখ, আজকালকার দিনে তোমরা 'ব্যাসিলাস্' (জীবাণু) জিনিষটাকে মান ত? এখন নীচ জাতের লোকের শরীরে কত রকমের 'ব্যাসিলাস্' আছে, কে ব'লতে পারে? তুমি যদি তার হাতে কিম্বা তার পাশে বোসে খাও, তবে ঐ 'ব্যাসিলাস্'গুলি তোমার শরীরে প্রবেশ করতে পারে ত? ইত্যাদি, ইত্যাদি।" দুঃখের অথবা সুখের বিষয় এই যে, এই সময়ে খাওয়ার ডাক পড়াতে, এই তর্কটা আর অগ্রসর হোতে পারে নি। কাজেই এই জীবাণুগুলি "কিবা নাম, কিবা রূপ ধরে," অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখা যায় কি না, ইত্যাদি বিষয় জান্‌বার ইচ্ছা থাক্‌লেও জানতে পারি নি। সেদিন কিন্তু কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছিলাম জানি না, অত বড় শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণটা, আমার কপালে আরাম কোরে খাওয়া হোল না। খেতে ব'সে কেবল গা ঘিন্-ঘিন্ কোরতে লাগলো,—ভয় হোল, কি জানি, কখন্ কোন্ খাবারের সঙ্গে কার জীবাণু আমার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে!

যা হোক্, সেই হ'তে এই জীবাণুতত্ত্ব আমার একটী প্রধান ভাব্‌বার বিষয় হোয়ে দাঁড়ালো। অনেক ভেবে চিন্তে, নানা experimentএর মধ্য দিয়ে, অনেক গবেষণা দ্বারা, এ সম্বন্ধে যে সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য আমি আবিষ্কার করেছি, আজ অতীব বিনীত ভাবে সেগুলি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করছি। আশা করি, আপনারা এ বিষয়ে যথোচিত মনোযোগ দিতে ত্রুটি করবেন না; কারণ, আমাদের জীবন-তত্ত্বের সঙ্গে এই জীবাণু-তত্ত্বের বড় নিকট সম্বন্ধ।

প্রথমেই ব'লে রাখা দরকার, উক্ত শ্রাদ্ধ-সভায় জীবাণু সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত বা theoryটী আমি শুনেছি, তার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। এই প্রবন্ধে আমি ঐ theoryটীকে স্থির সত্য ব'লে মেনে নিয়েছি। কারণ, আমি এমন কোন যুক্তি বা theory জানি না বা ধারণা করতে পারি না, যার দ্বারা আমাদের সমাজের অস্পৃশ্যতা প্রথার সমর্থন করা যেতে পারে। যেহেতু এই প্রথাটী শাস্ত্রানুমোদিত, এবং চিরকাল অর্থাৎ বহুকাল ধ'রে আমাদের সমাজে চ'লে আসছে, অতএব এটা সত্য। এবং একমাত্র যে যুক্তির উপর এই সত্য প্রতিষ্ঠিত, তাও মিথ্যা হোতে পারে না। সুতরাং এটা নিঃসন্দেহ যে আমাদের নীচ জাতের লোকের শরীরে এমন একপ্রকার জীবাণু আছে, যা উঁচুজাতের শরীরে প্রবেশ করতে পারলে, তার ঘোর অনিষ্ট কোরে থাকে। এই স্থির সিদ্ধান্তটীকে সম্পূর্ণ ভাবে মেনে নিয়ে, আমি আমার বিদুষী গবেষণার দ্বারা কেবল এই জান্‌বার চেষ্টা করেছি যে, এই জীবাণুগুলি কি প্রকৃতির এবং কিরূপে তারা পাত্র হ'তে পাত্রান্তরে সঞ্চারিত হয়।

এই জীবাণুগুলির প্রকৃতি বোঝান একটু কঠিন; কারণ, এখন পর্য্যন্ত যত রকমের অণুবীক্ষণ যন্ত্র বের হয়েছে, তাদের একটার দ্বারাও এদের দেখা যায় না। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা অবশ্য দিব্যদৃষ্টি দ্বারা এদের দেখতে পেতেন। এখন কলিকালে সেটা অসম্ভব। আমাদের দেহে এবং আশে পাশে অনেক রকমের জীবাণু আছে, যাদের অণুবীক্ষণ-দ্বারা সহজেই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আমি যে তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করছিনে, এটা বোধ হয় আপনারা বুঝতে পেরেছেন। আমি যে জীবাণুর কথা বলছি, তার অস্তিত্ব জাতি-গত। ভিন্ন ভিন্ন জাতির শরীরে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জীবাণুর অধিষ্ঠান। অবশ্য জাতিভেদ থেকে জীবাণুভেদের উৎপত্তি হোয়েছে, অথবা জীবাণুভেদ থেকে জাতিভেদ প্রথার অনুষ্ঠান হোয়েছিল,—এই কূটতর্কের মীমাংসা ঐতিহাসিকেরা কিম্বা নৈয়ায়িকেরা করবেন। আমি সে সম্বন্ধে আলোচনা কোরে আমার মূল্যবান্ মস্তিষ্কের বৃথা অপব্যবহার কোরতে চাই না।

অন্য জীবাণু হ'তে পৃথক্ করবার জন্য এদের একটা আলাদা নাম দেওয়া দরকার। কিন্তু Latin ভাষা জানা না থাকায়, আমি এদের কোনো গালভরা বৈজ্ঞানিক নাম দিতে পারি নি। আপাততঃ আপনারা এদের "অস্পৃশ্য জীবাণু", কিম্বা আবিষ্কর্ত্তার নামানুসারে "ভট্টাচার্য্য-জীবাণু", অথবা সংক্ষেপে "ভট্ট-জীবাণু", কিম্বা আরও সংক্ষেপে "ভট্টাণু" ব'লে অভিহিত ক'রতে পারেন।

এই ভট্টাণুগুলি এক দেহ হ'তে অন্য দেহে যায়,—ঠিক electric currentএর মত। তবে electric current যখন যায়, তখন বেশ জানিয়ে দিয়ে যায়। কিন্তু এই জীবাণুর current মোটেই অনুভব করা যায় না। আমি মনে ক'রেছি, একবার সার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়কে লিখে দেখ্‌ব, যদি তিনি এমন কোনো যন্ত্র তৈরী ক'রতে পারেন, যাতে জীবদেহে এই ভট্টাণুর সাড়া পাওয়া যেতে পারে।

মানুষের জাতিধর্ম্ম অনুসারে এই জীবাণুগুলিরও জাতিনির্দ্দেশ ক'রতে পারা যায়। ব্রাহ্মণের দেহের আর শূদ্রের দেহের ভট্টাণু যে এক জাতীয় নয়, এটা বোধ হয় কষ্ট ক'রে বোঝাবার দরকার হবে না। সেই রকম হিন্দুর দেহের ভট্টাণু মুসলমানের ভট্টাণু হ'তে নিশ্চয় পৃথক্। এক হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে না কি ছত্রিশটী জাতি আছে। কাজেই হিন্দু জীবাণুদের মধ্যেও অন্ততঃ ছত্রিশ প্রকারের জাতি আছে। মোট কথা, কোনো এক প্রকার জীবাণুর জাতি নির্ণয় ক'রতে হ'লে, সে যার দেহে আশ্রয় নিয়েছে, সেই মানুষটীর জাতি জানা দরকার। আবার কোনো মানুষ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ক'রলে, তার ভট্টাণুরও ধর্ম্ম ও প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হ'য়ে থাকে। এই হিসাবে মানুষের দেহের ভট্টাণুকে তার সহধর্ম্মী বা সহধর্ম্মিণী বলা যেতে পারে।

এই জীবাণুদের জাতি-সংখ্যা যাই হোক না কেন, মোটামুটি তাদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে, যথা (১) উত্তম, (২) মধ্যম, এবং

(৩) অধম। উত্তম শ্রেণীর জীবাণুগুলি একমাত্র ব্রাহ্মণের একচেটে সম্পত্তি। আবার আমাদের হিন্দু সমাজের মধ্যে কতকগুলি অতি নীচ জাতি আছে, যাদের সাধারণতঃ 'অস্পৃশ্য' জাতি বলা হ'য়ে থাকে। যেমন বাংলাদেশে হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি, এবং মাদ্রাজ প্রদেশে তিয়া, নম্বুদ্রি প্রভৃতি। এদের দেহের জীবাণুকে অধম শ্রেণীর মধ্যে ফেলা যেতে পারে। কারণ এদের দেহ ত অস্পৃশ্য বটেই,—এদের ছায়াও, এমন কি, এদের আশ পাশের বাতাসও অস্পৃশ্য। এই জাতীয় লোকদের সর্ব্বদা একটা সম্মানজনক দূরত্বে রাখা দরকার।

হিন্দু সমাজের মধ্যে এই অস্পৃশ্য জাতি ছাড়া অনেকগুলি ব্রাহ্মণেতর জাতি আছে। সাধারণতঃ তাদের শূদ্র বলা হয়। এক আহার কিম্বা পূজার সময় ছাড়া এদের স্পর্শ করা যেতে পারে; তাতে কোনো দোষ হয় না। এদের জীবাণুকে মধ্যম শ্রেণীর মধ্যে ফেলা যেতে পারে। হিন্দু ছাড়া অন্য যে কোনো সভ্য জাতির ভট্টাণুও এই মধ্যম শ্রেণীর অন্তর্গত।

ভট্টাণু সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়ম দুইটী আপনারা স্বচ্ছন্দে স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে মেনে নিতে পারেন।

১। কোনো নিম্নশ্রেণীর লোকের দেহে যদি উচ্চতর শ্রেণীর জীবাণু প্রবেশ করে, তবে তাতে তার লাভ লোকসান কিছুই নেই। কেন না তার নিজের জীবাণুগুলি এই আগন্তুক জীবাণুদিগকে নিজেদের দলভুক্ত ক'রে নেয়।

২। নিম্নশ্রেণীর ভট্টাণু উচ্চতর শ্রেণীর লোকের পক্ষে ঘোর অনিষ্টজনক। উপযুক্ত প্রতিষেধকের ব্যবস্থা না করতে পারলে, জন্মগত পৈতৃক জাতি এবং আজীবন কর্ম্ম দ্বারা সঞ্চিত ধর্ম্ম, এই দুয়েরই নাশ অবশ্যম্ভাবী। এই প্রতিষেধকের প্রেস্ক্রিপ্‌সন্ সম্বন্ধে পরে বলা যাবে।

ভট্টাণুদের গতিবিধি বড় চমৎকার। অনেক পরীক্ষার দ্বারা আমি কতকগুলি নিয়মের আবিষ্কার করতে পেরেছি। প্রথমে মধ্যম শ্রেণী সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাক্। মনে করুন, আমি একজন ব্রাহ্মণ; এবং আপনি একজন শূদ্র, অথবা মুসলমান অথবা খৃষ্টান, অথবা অন্য যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী। আমি আপনাকে স্পর্শ করতে পারি, এমন কি, যতক্ষণ খুসী গলাগলি ক'রে ব'সে হাতে হাতে ঘষাঘষীও করতে পারি (গালাগালি, হাতাহাতি এবং ঘুষোঘুষী নয়); তাতে কোনো দোষ হ'তে পারে না। কিন্তু মনে করুন, আমি ডান হাত দিয়ে খাবার খাচ্ছি, —এখন যদি বাঁ হাত দিয়ে আপনাকে ছুঁয়ে ফেলি, তবেই সর্ব্বনাশ। আপনার জীবাণু তৎক্ষণাৎ আমার দেহের মধ্যে প্রবেশ ক'রে, আমার জাতিনাশ ঘটাবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মধ্যশ্রেণীর ভট্টাণু আমাদের দেহের বহিরাবরণের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সে আমার উদরে প্রবেশ লাভ করতে পারছে, ততক্ষণ সে আমার কোনো অনিষ্ট করতে পারে না। আবার কোনো উপযুক্ত খাদ্যের সঙ্গ ব্যতীত তার পক্ষে আমার উদরে প্রবেশ করাও অসম্ভব; কেন না, মুখ-বিবর ছাড়া অন্য কোনো দ্বার দ্বারা তার প্রবেশ নিষেধ।

এখন দেখা দরকার, কোনো খাবার জিনিষ কি-কি উপায়ে আপনার ভট্টাণু দ্বারা দূষিত হ'তে পারে। আপনি যদি নিজ হাতে আমায় স্পর্শ করেন, তবে যে তাতে জীবাণু-সংস্পর্শ ঘটবে, এটা অবশ্য সহজেই বোধগম্য হয়। কিন্তু আবার এটাও পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণীকৃত হয়েছে যে, আপনি যদি সোজাসুজি খাবার জিনিষটী স্পর্শ না ক'রে, তার পাত্রটী মাত্র স্পর্শ করেন, কিম্বা ঐ পাত্রটী যদি কোন টেবিলের উপর থাকে, এবং আপনি ঐ টেবিলটী মাত্র স্পর্শ করেন, তা হ'লেও ঐ খাবারটী আপনার জীবাণু দ্বারা দূষিত হ'য়ে আমার অখাদ্যে পরিণত হবে। এমন কি, আপনি যদি ঐ টেবিলে হাত না লাগিয়ে কোন একগাছি ছড়ি দ্বারা বা অন্য যে কোনো জিনিষ দ্বারা স্পর্শ করেন, তা হ'লেও ফল একই দাঁড়াবে। যদি আমি টেবিলটীকে ছুঁয়ে থাকি, এবং আপনি আমাকে ছুয়ে ফেলেন, তাতেও ফল একই। এই সব experiment হ'তে স্পষ্টই প্রমাণ হ'চ্ছে যে, যে কোনো নিরেট জিনিষ (solid material substance) এই ভট্টাণুদের conductor,—Electric currentএর সঙ্গে এর সাদৃশ্য বড় চমৎকার। আমি যদি আগে আপনাকে এবং পরে খাবারটী স্পর্শ করি, তাতে খাবার দূষিত হবে না,—এক সঙ্গে স্পর্শ করলেই হবে।

সকল রকমের খাদ্যদ্রব্যই যে ভট্টাণু দ্বারা দূষিত হতে পারে, তা নয়। কেবল কতকগুলি বিশেষ-বিশেষ খাবার বিশেষ-বিশেষ অবস্থায় দূষিত হ'তে পারে। চাউল কখনই ভট্টাণু দ্বারা দূষিত হয় না। কিন্তু যখন ঐ চাউল জল ও অগ্নি সংযোগে ভাতে পরিণত হয়, তখনই আপনার ভট্টজীবাণুগুলি সেখানে গিয়ে আড্ডা গাড়্‌তে পারে। তরকারী যতক্ষণ না রান্না হয়, ততক্ষণ তাতে ভট্টাণুর আশ্রয় মেলে না। আপনার-হস্তস্পৃষ্ট পান, কিম্বা আপনার নিজের হাতে ছাড়ান রসাল ফলও আমি খেতে পারি। কিন্তু রাঁধা ভাত কিম্বা তরকারী যদি আপনি অন্য কোনো medium দ্বারাও স্পর্শ করেন, তবে সেটা আমার অখাদ্য। শূদ্রের মধ্যে কতকগুলি লোকের জল চলে, অনেকের চলে না। যদি আপনার জল 'চল' হয়, তবে আপনি আমার ময়দা বা আটা মাখিয়া দিতে পারেন। যদি ঐ ময়দা ঠাসিতে-ঠাসিতে আপনার হাতের বা আঙ্গুলের একপুরু চামড়াও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাতেও কিছু এসে যায় না। আপনার ঐ অঙ্গুলিনির্য্যাস পুষ্ট ময়দা দিয়ে আমি যে কোনো খাবার নিজে তৈরী ক'রে খেতে পারি। কিন্তু ঐ তৈরী খাবার যদি আপনি কোনো medium দ্বারাও স্পর্শ করেন, তবে সেটা আপনার জীবাণু দ্বারা দূষিত হবে।

মাছ ও মাংসে কাঁচা অবস্থায় ভট্টজীবাণুর প্রবেশাধিকার নাই। কিন্তু উহা তেলে অথবা ঘিয়ে ভেজে নিলে কিম্বা জলে সিদ্ধ ক'রে নিলে, অন্য জীবাণুদের ধ্বংস হবে বটে, কিন্তু তখন ভট্টাণুরা সহজেই সেখানে যাবার passport পেতে পারে।

কোনো কোনো জাতির ভট্টাণু দ্বারা জল দূষিত হ'তে পারে। এখন দূষিত হওয়ার পর যদি ঐ জল আগুনে ফুটিয়ে নিয়ে filter ক'রে নেওয়া হয়, তবুও ঐ দুর্দ্ধর্ষ জীবাণুর হাত এড়ান যাবে না। আবার আরও

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জল দূষিত হলেও দুধের উপর ঐ জীবাণুর কোনো আধিপত্য নাই। অনেকে হিন্দু গয়লা অপেক্ষা মুসলমানের দুধ পছন্দ ক'রেন; কারণ, গয়লার হাতের জলে সাধারণতঃ জাত যায় না ব'লে, সে দুধে জল মিশাতে ইতস্ততঃ করবে না। কিন্তু মুসলমানের জলে জাত যায় ব'লে, সে নিশ্চয় জল মিশাতে সাহস করবে না। এতে একটা গল্প মনে পড়ে। শুনেছি, কোনো গৃহস্বামী তাঁর সমস্ত ধন-দৌলত না কি তাঁর ভাদ্রবধূর ঘরে রাখতেন; কারণ, বাড়ীতে চোর এলে সে ত আর ভাদ্রবধূর ঘরে যেতে পারে না।

আমরা দেখেছি, ভাত ভট্টাণু দ্বারা আক্রান্ত হ'তে পারে, কিন্তু চাউল হয় না। এখন প্রশ্ন এই হ'তে পারে, চাউলের এই দুটী অবস্থার মধ্যে line of demarcation কোথায়? মনে করুন, একটা হাঁড়িতে চাউল ও জল রেখে, তার নীচে অগ্নি-সংযোগ করা গেল, এবং ঐ হাঁড়ির সঙ্গে একটী তাপমান যন্ত্রও লাগিয়ে দেওয়া হ'ল। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে; ঐ তাপমানটী কত ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠ্‌লে, অথবা চাউলের ঠিক কোন্ অবস্থায় উহা আপনার ভট্টাণুর আশ্রয়োপযোগী হবে? এই কঠিন সমস্যার মীমাংসার ভার আমি অভিজ্ঞতর বৈজ্ঞানিকের হাতে দিতে চাই।

শাস্ত্রে না কি বলে "দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতি।" এই বচনের জোরে কোনো-কোনো খাবার জিনিষ মূল্য দিলে শুদ্ধ হয়,—অবশ্য সকল জিনিসই হয় না। লুচি, তরকারী প্রভৃতি নিজের পয়সা খরচ ক'রে বাজার হতে কিনে খেলে দোষ হয় না। অনেকের মতে চাঁদা দিয়ে অথবা return-partyর আশা দিয়ে, বন্ধু বান্ধবের মধ্যে 'পিক্‌নিকে'ও এ সব খাওয়া চলে। কিন্তু কোনো সামাজিক নিমন্ত্রণে এ সব চলে না, কারণ, সেখানে পয়সা খরচ নেই। শুনেছি না কি, শ্রীশ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে ভট্টজীবাণুর আধিপত্য মোটেই নেই। এর একটা কারণ বোধ হয়, সেখানে ঠাকুরের প্রসাদ পর্য্যন্ত কিনে খেতে হয়।

এবারে অধম শ্রেণীর ভট্টাণু সম্বন্ধে দুচার কথা বলেই এই প্রবন্ধ শেষ করব। আমাদের দেহের ভিতর ও বাহির দুয়ের উপরই এদের প্রভাব অসীম। প্রায় সকল রকম খাদ্যদ্রব্যই এদের দ্বারা দূষিত হ'তে পারে। বাংলাদেশে মানুষের দেহের ছায়াও এদের conductor; মান্দ্রাজ প্রদেশে বাতাস পর্য্যন্ত এদের conductor। তবে সেখানে প্রত্যেক মানুষটীর জাতি অনুসারে তার শরীরের জীবাণুর গতিবিধির এক-একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। সেই সীমাগুলি বৃত্তাকার। জীবাণুগুলি ঐ বৃত্তের বাইরে যেতে পারে না। চন্দ্রের সভামণ্ডলের ন্যায় এই জীবাণু-মণ্ডলীও তাদের আশ্রয়স্থল মানুষটীর সঙ্গে-সঙ্গে চল্‌তে থাকে। মানুষটীর জাতি অনুসারে কোনো বৃত্তের ব্যাস ১২ ফিট, কোনোটীর ২৪ ফিট, কোনোটীর বা ৫০ ফিট ইত্যাদি। কোনো উচ্চতর জাতির মানুষ ঐ বৃত্তের মধ্যে পদার্পণ করলেই, তাঁর দেহ অশুচি হোয়ে যাবে। কাজেই রাস্তায় বেরুতে হোলে, উভয় পক্ষকেই ফিরিওয়ালার ন্যায় চীৎকার কোরে নিজেদের গমন-বার্ত্তা জানিয়ে যেতে হবে।

আমাদের দেহের 'বহিরাবরণ' অধম শ্রেণীর ভট্টাণু দ্বারা দূষিত হোলে, সহজেই তার প্রতীকার করা যেতে পারে; কারণ, একবার অবগাহন স্নান ক'রলেই দেহ পুনরায় শুচি হ'য়ে যাবে। কিন্তু মধ্যম অথবা অধম যে কোনো শ্রেণীর ভট্টাণু যদি আহারের সঙ্গে উদরের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে, তবে তার প্রতীকার করা একটু কঠিন হ'য়ে পড়ে। শাস্ত্রানুমোদিত নানা রকমের প্রায়শ্চিত্ত করার দরকার হ'য়ে পড়ে। জীবাণু যদি একটু নম্র প্রকৃতির হয়, তবে বোধ হয় একটু গোবর এবং কিঞ্চিৎ গোমূত্র গলাধঃকরণ করলেই যথেষ্ট হবে। কারণ, তাতে stomach disinfect ত করবেই, চাই কি, বমন দ্বারা stomach-pumpএর কাজও করতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, যদি ঐ জিনিষ দুটী খাবারের সঙ্গে আগে হ'তেই মিশিয়ে নেওয়া হয়, তাতে ঐ জীবাণুর ধ্বংস হবে না।

যা হোক, যে কোন ভট্টাণু দ্বারাই আমাদের দেহ অশুচি হোক্ না কেন, আমরা কোন না কোন উপায়ে তার প্রতীকার করতে পারি। কিন্তু যে জন্মগত অশুচি, তার পক্ষে এমন কোনো উপায়ই নেই, যার দ্বারা সে তার দেহের জীবাণুর হাত এড়াতে পারে। তবে কোনো অধম শ্রেণীর ব্যক্তি যদি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে, তবে তার ভট্টাণুও মধ্যম শ্রেণীতে promotion পেতে পারে। যেমন, একজন চণ্ডাল খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করলে, তখন আমরা তাকে নির্ভয়ে স্পর্শ করতে পারি।

শাস্ত্রে বলে "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি"। কাজেই পুরাকালে অনেকের নীচজাতীয়া স্ত্রী ছিলেন। অবশ্য তাঁদের হাতের রান্না চ'লত কি না, জানা যায় না। তবে আজকাল নিম্নজাতীয়া স্ত্রীলোককে পত্নীত্বে বরণ করবার উপায় নেই; কারণ, আজকাল না কি পাকস্পর্শ প্রথাটা আমাদের সামাজিক বিবাহের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ হোয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে ঐ স্ত্রীলোককে উপপত্নীভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে; কারণ, দেখা যায়, তাতে সমাজে জাতিচ্যুত হ'তে হয় না,—বোধ হয় এতে জীবাণু-সংস্পর্শ ঘটে না।

আজকাল নব্য যুবকেরা যে জাতিভেদ অথবা জীবাণুভেদ মানে না, সেটা বিজাতীয় শিক্ষার ফল। তারা কুশিক্ষা ত পায়ই, অনেকে ভুল শিক্ষাও পায়। আজকাল না কি শেখান হয় যে, কোনো খাবার জিনিষ আগুনে ফুটিয়ে কিম্বা গরম কোরে নিলে জীবাণুর হাত এড়ান যায়। আবার সুস্থ শরীরের উপর না কি কোনো জীবাণু সহজে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, ইত্যাদি। অন্য জীবাণু সম্বন্ধে ব'লতে পারি না, তবে ভট্টাণু সম্বন্ধে যে এসব নিয়ম আদৌ খাটে না, এটা নিঃসন্দেহ। চাউল প্রভৃতি আগুণে ফুটিয়ে নিলেই ভট্টাণু দ্বারা আক্রান্ত হ'তে পারে, তা আগেই দেখিয়েছি। আবার সুস্থ শরীর অপেক্ষা রুগ্ন শরীরের উপর এই জীবাণুর আধিপত্য অনেক কম, একেবারে নেই বলিলেও চলে। প্রমাণ,—"আতুরে নিয়মো নাস্তি"। অর্থাৎ রুগ্ন বস্থায় ছোঁয়াছুয়ির অথবা খাদ্যাখাদ্যের বিচার না করিলে ক্ষতি নেই। আমাদের চতুর্থ অর্থাৎ 'সন্ন্যাস' আশ্রমেও বোধ হয় এই জন্যই কোনো বিধিনিষেধ মানতে হয় না; কারণ, তখন রক্তের তেজ ক'মে গিয়ে, শরীর দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে। এই সব প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্ত্বেও যে আজকালকার তথা-

'কথিত শিক্ষিতেরা বিজাতীয় শিক্ষার ভুল দেখতে পান না, সেটা নিশ্চয় তাঁদের slave mentalityর ফল, এবং এর একমাত্র প্রতীকার—আধুনিক স্কুল কলেজ বর্জ্জন।

আর একটা কথা, রুগ্ন অথবা দুর্ব্বল শরীরে ভট্টাণুর আধিপত্য কম; কাজেই সে অবস্থায় জাতিধর্ম্ম বজায় রাখা সহজ। আমার বোধ হয়, এইজন্যই দুর্ব্বল হিন্দুজাতি এখনও টিকে আছে। আমাদের উদার মতাবলম্বী নিরপেক্ষ গবর্ণমেণ্ট যে এতদিন আমাদের স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা করেন নি, সেজন্য তাঁরা আমাদের ধন্যবাদার্হ। আমাদের বর্ত্তমান প্রাদেশিক স্বাস্থ্য সচিবদেরও এ কথাটা মনে রাখা উচিত। লোকের প্রাণ আগে, না জাতিধর্ম্ম আগে? পণ্ডিত মদনমোহন যখন গত হিন্দু-সভায় হিন্দুজাতির শারীরিক বলবৃদ্ধির উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন নিশ্চয় তাঁর মনে এ কথাটা strike করেনি। "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ"।

এইবারে প্রবন্ধটী শেষ করা দরকার। কারণ, পাশের ঘর হ'তে যে রকম ঠুংঠাং আওয়াজ এবং মিষ্টান্নের গন্ধ এখানে এসে পৌছুচ্ছে, তাতে বোধ হয় আপনাদের অনেকেরই ধৈর্য্য রক্ষা করা কঠিন হোয়ে পড়েছে। তবে আপনাদিগকে একটা বিষয়ে সাবধান ক'রে দেওয়া দরকার। আপনারা ঐ মিষ্টান্নগুলি গলাধঃকরণ করবার পূর্ব্বে একবার ভেবে দেখবেন যে, ওর মধ্যে কত জাতির ভট্টাণু আছে, তা গণনা করা কঠিন। এখন জীবাণু-সঙ্কট সম্বন্ধে আমার এই বিকট প্রবন্ধটী শুনে যদি আপনারা 'খাই কি না খাই' রকমের উভয় সঙ্কটে পড়ে থাকেন, তবেই আমার শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব। তবে আপনাদিগকে আমি কিঞ্চিৎ ভরসাও দিতে পারি। কারণ, আপনারা অনেকেই ঐ মিষ্টান্নের খরচ বাবদে চাঁদা দিয়াছেন, এবং আপনাদের প্রায় সকলেই প্রবাসী। কাজেই "দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতি" এবং "প্রবাসে নিয়মো নাস্তি" এই বচন দুটীর ওকালতীতে আপনাদের জাতিরক্ষা সহজেই হোতে পারে। তবে যাঁরা চাঁদাও দেন নি, অথচ এখানে ঘর-বাড়ী করেছেন, তাঁদের জাতিরক্ষা সম্বন্ধে আমি guarantee হোতে পারি না। *

* গত ৩রা মার্চ (১৯২৩) 'ইন্দোর বাঙ্গালী ক্লাবের' পঞ্চম বার্ষিক সম্মিলনে পঠিত।

পাষাণ-দেবতা

শ্রীরমলা বসু

এক দেবী-মূর্ত্তি। নিপুণ ভাস্কর-গঠিত মর্ম্মর-নির্ম্মিত, পাষাণ-শুভ্র বেদীর ওপর পাষাণ-মন্দিরের শুভ্র দেবী মূর্ত্তি! সে পাষাণ-মন্দিরের সবই শুভ্র, সবই পবিত্র, সবই বিন্দু-মাত্রও আবিলতার লেশহীন, স্থানু, অচঞ্চল, গম্ভীর, অপূর্ব্ব! বৃদ্ধ পুরোহিতের শুভ্র-কেশ-মণ্ডিত, ধীর-শান্ত মুখ দীপ্তি হতে, স্তবকে-স্তবকে শুভ্র ফুলের গুচ্ছ—আরাধনার ডালিতে যা অর্ঘ্য হয়ে দেবীর পায়ের তলে রোজ শুকিয়ে মরে থাকত, —বুঝি বা তাদের সুন্দর সরস প্রাণটুকুও পাষাণের কঠিন প্রাণহীন স্পর্শে বেশীক্ষণ আর বেঁচে থাকতে পারত না। অর্ঘ্যের দীপসম্ভার হতে সুগন্ধি চন্দন ধূপ ও শুভ্র ধূমা-কারে, পাষাণ-নির্ম্মিত গবাক্ষ-পথ দিয়ে বাহির হয়ে পালিয়ে যেতে চাইত,—সে নিস্তব্ধ পাষাণত্বের গভীরত্ব সহ্য না করতে পেরে,—যখনই তার সুগন্ধি দেহ অগ্নি-স্পর্শে সুরভিত ও প্রাণবান হয়ে উঠত!

দিনের পর দিন, রাতের পর রাত-এমনি করে তার সারাটি বছর কেটে যায়। ক্ষুদ্র মন্দিরের সমস্ত কাজই অতি পরিপাটী ও সুন্দর করে বৃদ্ধ পুরোহিত নিজের হাতেই সম্পন্ন করে থাকেন, তাঁহার নীরব আরাধনার ডালি দিয়ে; শুধু দিনান্তে একটীবার সন্ধ্যার ঘন অন্ধকারের আগমনের সঙ্গে-সঙ্গে যখন মন্দিরের দুগ্ধফেণ-নিভ এত শুভ্র শ্বেত দীপ্তিও ছায়ামলিন হয়ে ওঠে, তখন বৃদ্ধ তাঁর গুরু-গম্ভীর কাল-প্রাচীন কণ্ঠস্বরে একটীবারের জন্যে সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ক্ষুদ্র মন্দির-কক্ষখানি দেবীর স্তুতি-মন্ত্র পাঠে মুখরিত করে তুলতেন। তাঁর নীরব শ্রোতা ছিল শুধু সেই পাষাণে-গড়া দেবীমূর্ত্তি, আর গবাক্ষ-পথ দ্বার দিয়ে বৃক্ষ-ছায়া-বহুল অদূর বনানী। আর বৎসরান্তে একটীবার শুধু কোন এক বিশেষ তিথি উপলক্ষে, সারা বৎসরের সঞ্চিত প্রতি দিনের সংস্কারজাত সমস্ত শুভ্রতা সেই মন্দিরের সম্মুখের পাষাণ-সোপান হতে আরম্ভ করে, তার পাষাণ কক্ষতল থেকে বেদীর সুমুখ পর্য্যন্ত—একেবারে মলিন করে দিয়ে, শত পদচিহ্নে—আর তার পুঞ্জীভূত নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে দিয়ে শত কণ্ঠের স্তুতি-মুখরতায়—একটী দিন আসত, যখন সেই বনপদ ধ্বনিত করে সমস্ত গ্রামবাসী বনপ্রান্তে এই পাষাণ-মন্দিরের পাষাণ-দেবতার পূজা দিতে আসত। বাকি সারাটা বৎসর তার

শুভ্র নির্ম্মলতা ও স্তব্ধ নীরবতা লয়ে সেই পাষাণ-মন্দির-কক্ষ ও পাষাণের দেবতাকে ঘিরে থাকত—বুঝি বা সেই পাষাণের প্রাণও আরও পাষাণ করে দিয়ে! তাই সেই সারা বৎসরান্তের একটী দিনের তাদের সে ধূলি-ধূসরিত পদ-চিহ্নগুলি আর কঠোর গ্রাম্য-ভাষা-মুখরিত ধ্বনি শোনবার জন্যে সেই শীতল, শুভ্র মর্ম্মর প্রাণেও বুঝি বা একটু কণা ব্যগ্রতা দেখা যেত—কে জানে? সেদিনকার সন্ধ্যা তাই বুঝি বা উৎসব-কলধ্বনি অন্তে, তার সেই মন্দির-কক্ষের নিস্তব্ধতা আরো ভীষণ, আরো গভীর জমাট করে নিয়ে আসত; আর তার পর দিন যখন দ্বিগুণ পরিশ্রমে বৃদ্ধ পুরোহিত একে-একে প্রতি কর্দ্দম-পদচিহ্ন মুছে ফেলে, পরম যত্নে মন্দিরখানিকে তার পূর্ব্ব শুভ্র নির্ম্মলতা দান করতেন, তখন অন্ততঃ একখানিও মলিন পায়ের চিহ্নের জন্যে তাঁর মন্দির কক্ষস্থিত পাষাণ দেবতারও বক্ষ ভেদ করে বুঝি বা দীর্ঘশ্বাস বার হয়ে আসত!

এমনি করে বৎসরের পর বৎসরের গতি বুঝি চলে যাচ্ছিল, সর্ব্বত্র তার চিহ্ন রেখে—শুধু সেইখানকার অচঞ্চল স্থিরতার মধ্যে, শুধু তার কালের ঢেউয়ের উত্থান-পতনের বিন্দুমাত্র লক্ষণ দেখা যেত না; কিন্তু এখানেও বুঝি বা ক্রমে বৃদ্ধ পুরোহিতের শুভ্র কেশগুচ্ছ আরো শুভ্র হয়ে উঠছিল, উন্নত কপালের রেখাগুলি তাঁর আরো দু'একটা সংখ্যায় বেড়ে উঠছিল, চোখের জ্যোতিঃ দিনান্তের নীড় গমনের প্রতীক্ষায় আরো দীপ্ত হয়ে ফুটে উঠছিল, কালের একমাত্র চিহ্ন স্বরূপ—কালাতীত পাষাণের দেবতার পাষাণের মন্দিরে!

তার পর একটী দিন মনে পড়ে, সেই বৎসরের বসন্ত তিথির উৎসবের অবসানে, বুঝি বা সেবার বৃদ্ধ পুরোহিতের অদম্য আরাধনার ভক্তি-স্রোতও দুর্দ্দমনীয় কালের অত্যাচারে মন্দীভূত হয়ে পড়ছিল, সেবা করবার অভাবে। দুর্ব্বল, ক্ষীণ হস্তে মন্দিরের পূর্ণ সংস্কার করবার মত শক্তি বুঝি বা সে এত দিনের জরা-বিস্মৃত হস্তে অবশেষে আর রইল না। সেদিন থেকে দেখা গেল, একটী তরুণ উজ্জ্বল মুখ তার সুগঠিত দেহ লয়ে তার প্রাণের সমস্ত নবীন শক্তি ও উদ্যম লয়ে,—মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিতের স্থান অধিকার করছে; শুধু তখনও দিনান্তে একটীবার এসে তিনি তরুণ উপাসকটীর হাত ধরে, তাঁর জরা-ভগ্ন কণ্ঠে দেবীর স্তুতি-বাদ পাঠ করে যান। কিছুদিন পরে তাও করবার যখন আর শক্তি রইল না, তখন শুধু এসে পাষাণ-প্রতিমার নীচে মাথা রেখে বসে থাকতেন, আর সেই নবীন উপাসক তার জলদ-গম্ভীর স্বরে মেঘ-মল্লারের সমস্ত সুধা সঞ্চয় করে, পাষাণ দেবতারও মর্ম্মে-মর্ম্মে শিহরণ জাগিয়ে দিয়ে বুঝি, সেই চির-পুরাতন স্তুতিবাদের প্রত্যেক ছন্দে-ছন্দে প্রাণের হিল্লোল বহিয়ে দিয়ে পাঠ করে যেত। তার দীপ্ত মুখের গঠনে, সমস্ত সুঠাম অবয়বের সংযত চালনায়—যেন প্রাণ মূর্ত্তিমান হয়ে ক্ষরে পড়ত—তাই যা সে স্পর্শ করত, সবই যেন প্রাণবান হয়ে উঠত। এত দিনের পাষাণ-প্রতিমাও "জাগি জাগি" করে এবার বুঝি বা সে স্পর্শে জেগে উঠল!

কিন্তু যার স্পর্শে প্রাণ তার জেগে উঠল, কই, তার সেই শুভ্র শ্বেত নবীন প্রতিভা-দীপ্ত মুখে একটুও তার প্রতিবিম্ব কই? সে মুখ যে সদাই দীপ্ত, কঠিন, অচঞ্চল। শুধু যখন তার উন্নত সুঠাম চক্ষের ওপর করপদ্ম দুখানি রেখে ভক্তি-গদগদ ভাবে তার নবীন জীবনের সমস্ত প্রাণের অর্ঘ্য সে নিবেদন করে দিত, তখনই শুধু সে চক্ষু তারকা দুটী ভাবে দ্রবীভূত হয়ে উঠত। কিন্তু অন্য-অন্য সময় তার আর সমস্ত আচরণ যেন বাণী হয়ে ফুটে উঠে—বলতে থাকতে;—

> তুমি রয়ো অচঞ্চল, আপন গৌরবে;—
> তুমি শুধু লয়ো পূজা, অর্ঘ্য ভকতের,—
> পাষাণ প্রতিমা মম, মন্দিরে আমার।
> অনুকম্পা শুধু দেবি! ক'র তারে দান।

এই শুধু যেন সে চায়! এর বাড়া আর কিছু সে চায় না তো! আর—

> মাঝে মাঝে মুখ তুলি শুধু ভকতের
> ভকতি অর্ঘ্যের দান, করিয়ো গ্রহণ;
> তাতেই কৃতার্থ ভক্ত, অন্য নাহি চায়।

শুধু বুঝি বা একটী ফলের জন্যে, পাষাণ দেবতার পাষাণ হৃদয়ের নব জাগরণের চঞ্চলতার আভাষের একটী মাত্র ক্ষুদ্র কম্পন গিয়ে তারও স্থির অচঞ্চল ভক্তি-নত মনের দ্বারে দেখা দিয়েছিল, তাই যেন ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে চোখ দুটী যেন তার ঈষৎ অনুযোগ ভরে মিনতি করে তার দেবীর দিকে চেয়ে বলেছিল, "ওগো, তুমি অমনই দূরে থেকো; দূরে থেকো; কাছে এসে আমার এ পূজার এ গাম্ভীর্য্য,

'এ মহত্ব, এ গরিমা একটুও হ্রাস করতে দিয়ো না, দোহাই তোমার! এ পূজা এমনি স্তব্ধ, এমনি প্রাণ হিল্লোল-হীন, এমনি ভক্তি-নত, নির্ব্বিকার চিত্তে করতে দাও।"

দেবী যদি কাছে আসে, করে প্রতিদান,
ক্ষুণ্ণ তাতে হয়ে যায় মহত্ব দেবীর—
তাই সেই প্রতিদান, চাহে না ভকত।

হায় রে দেবী! আর এই মহত্বের ভারই যে সে বইতে পারে না! তার পাষাণ প্রাণ যে এখন জাগরণের হিল্লোলে, উদ্দাম স্রোত বইয়ে চলেছে, তাই যখন—

একটী তরুণ মুখ, অরুণ বরণ
দুইটী নয়ন তারা, ভকতি উজ্জ্বল
উর্দ্ধমুখে যবে চাহি রহে তার পানে
জোড় করি' কর-পদ্ম হৃদয়ে রাখিয়া—
আপন মহত্ব ভারে, আপনি পীড়িত,
দেবী শুধু চেয়ে থাকে, নিশ্চল নির্ব্বাক!

সে উদাসী সংযত তরুণ ভক্তের মুখ দেখে মন তার তাই নিজেকে বোঝাতে থাকে ;—

পাষাণ প্রতিমা আমি! আমি যে দেবতা!
আমাতে যে প্রাণ নাহি, নাহি অনুভূতি!
আমি দিব প্রতিদান? ছিঃ ছিঃ সে কি কথা!

কিন্তু তবু মন তার মানে কই? প্রাণ তার কেঁদে ওঠে যে! কেঁদে ওঠে সেই ভক্তি-উজ্জ্বল নয়ন-তারকার মধ্যে নিজেকে সমাধিস্থ করে দিতে। কেঁদে ওঠে তার পাষাণ দেবীত্বের সব গৌরব লুটিয়ে ফেলতে—ঐ তার পদতল-নত ভক্তেরই পায়ের পরে। প্রাণ যেন তার মর্ম্মর ওষ্ঠ ভেদ্ করে বলে উঠতে চায়—"চায় না, চায় না যে সে এ নির্ব্বিকার প্রাণ-হীন পূজা—"সে বোঝাতে চায় যেন,—

হায় রে এ দেবীত্বের, এ কি আড়ম্বর?
মহত্বের এ কি গণ্ডী দিয়াছে আঁকিয়া,
পাষাণ প্রাচীর সম দুল্লর্ঙ্ঘ্য দুর্ভেদ?
দেবীর (ও) যে প্রাণ আছে, কি করে বুঝাব?

কিন্তু হায়, তা বুঝবে কে? তা শুনবে কে? দেবীত্বের প্রাচীর যে তার পাষাণ-কক্ষস্থিত প্রাচীরের চেয়েও সহস্র গুণে দুর্ভেদ ও দুল্লর্ঙ্ঘ্য! আর দেবীর প্রাণ থাকলেও সে প্রাণের প্রতিদান কে চায়? সে দানে যে তার ভক্তের পূজার মান ক্ষুণ্ণ হয়। দেবীর প্রাপ্য যে তার পদতলে ভক্তের ভক্তি অর্ঘ্য! সহস্রবার প্রাণের জাগরণেও যে দেবীকে দেবী থাকতে হবে, সহস্রবারও সে ভক্ত উপাসক, তার নবীন ভক্তি-উজ্জ্বল মুখে, তার প্রাণময় স্পর্শে আজ পাষাণ-প্রতিমার প্রতি মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভূতির রেখা ফুটিয়ে তুল্লেও! তার নিজের প্রাণের জন্যে নয় তো, ভক্তের মনের অভাব মেটাবার জন্যেই যে তার সৃষ্টি! তাই এর উপায় নেই! উপায় নেই!

যে দেবী সে দেবীই তুমি! পাষাণ-মন্দিরের পাষাণ দেবতা মাত্র! চির-স্থির, চির-অচঞ্চল!

লজ্জাহরণ

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর বি-এ

নিকষকুলীন-সন্তান তুমি দরিদ্র সজ্জন,
মুদির দোকান খুলেছ বলিয়া লজ্জিত কি কারণ?
চারিদিকে দেখ তোমারি সঙ্গে,
সব কর্ত্তারা নেমেছে বঙ্গে,
তোমারে ঘেরিয়া করিছে বিরাজ গৌরব পুরাতন।
হাতা বেড়ী হাতে হের' ঘরে ঘরে ছ্যাকছ্যাক তুলি রোল
"ঠাকুর" বিরাজে পাচকের রূপে, রাঁধে মাংসের ঝোল।
গ্রামে গ্রামে ঐ মূর্খ চোয়াড়,
ছাত্রদলন গুণ্ডা গোঁয়ার
গুরু মশায়ের রূপে নেমেছেন গুরু আচার্য্যগণ।

রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করি গণিকারা আজ দেবী',
সন্ন্যাসী নামে বিকায় লুব্ধ যত গঞ্জিকাসেবী।
দাড়ী পাকিলেই লভিছে উপাধি,
যোগী আচার্য্য মুনি ঋষি আদি,
চপকাট্‌লেট চায়ের হোটেল—"আশ্রম—তপোবন"।
বৈরাগী তিনি সেবাদাসী যাঁর ক্ষেমী রামী আর বামী—
ফেরার হলেন গেরুয়া ধরিয়া অমুকানন্দ স্বামী।
মূর্খ গ্রাম্য হাতুড়েরা আজ
'কবিরাজ' নামে করিছে বিরাজ
মঠমোহান্ত মটরে চড়িয়া মজা করে লুণ্ঠন।

আল্‌জিরীয়া

শ্রীনরেন্দ্র দেব

আরবেরা বলে আল্‌জীর যেন একখানি মরকতমণিবেষ্টিত হীরকখণ্ড!

আকাশস্পর্শী পর্ব্বতমূলে বিনির্ম্মিত হর্ম্ম্যরাজির শ্বেত-প্রাকার এবং সমতল সৌধশীর্ষগুলি যেন পূর্ব্বমুখী হ'য়ে সম্মুখের বিস্তৃত বিশাল উপসাগরের দিকে, আর দূরে তুষারাবৃত গিরিশিখরের দিকে চেয়ে আছে! ঘন-পল্লবিত কমলার বন, তালের কুঞ্জ আর নেবুর ঝোপের সমুজ্জ্বল শ্যামশোভার ভিতর থেকে মুর প্রাসাদসমূহের গম্বুজ ও সুগঠিত খিলেনগুলি যেন মুক্তাবলীর মত উঁকি মারছে!

আলজিরীয়া— সালঙ্কারা কাবাইল সুন্দরী

সাগর পথে আল্‌জীরে যাবার সময় দূর থেকে এই দৃশ্যই চখে পড়ে। কিন্তু আল্‌জিরীয়ার বন্দরে নেমে মনে হয় যেন য়ুরোপের কোনও সহরে এসে নেমেছি! সমুদ্রকূলের বাণিজ্যদ্রব্য রাখবার গুদামঘরগুলি এবং শুল্কশালা একেবারে য়ুরোপের ধরণের! বন্দরের উপর যে উচ্চ চাতালের মত সুদীর্ঘ প্রমোদ-সরণী চলে গেছে, তার দুধারের অট্টালিকাশ্রেণী অবিকল একটা সমুদ্রকূলের য়ুরোপীয় সহরের মতো! এখান থেকে সহরে যাবার যে সুন্দর বাঁধা রাস্তাটি, তার উপর দিয়ে বৈদ্যুতিক পান্থ-যান যাতায়াত করছে, তরুশ্রেণী সুশোভিত সেই প্রশস্ত বর্ত্মটি যেন ফরাসী রাজ-ধানী প্যারী সহরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়!

এই পথের আশেপাশে প্যারীর হালফ্যাসানে সুসজ্জিত ফরাসী সুন্দরী এবং চটুল ফরাসী ব্যবসায়ীদের দেখতে পাওয়া

পরিচারিকা

উত্তর সাহারাবাসী বার্ব্বার জাতি

(ইহারা ফরাসী ফৌজে যোগ দিয়া যুদ্ধে ও বিদ্রোহদমনে ফরাসীদের সাহায্য করিয়াছিল)

নিগ্রো যুবতী

যায়। পথের দু'ধারে গৃহসংলগ্ন স্তম্ভরাজির উপর অবলম্বিত তোরণশ্রেণীর নিয়ে বড় বড় আপণি বিপণী নানাবিধ মূল্যবান দ্রব্যসম্ভার নিয়ে পথিককে প্রলুব্ধ ক'রছে! পান্থনিবাস সমূহের সম্মুখে পথের উপর সারবন্দি চেয়ার ও ছোট ছোট পাথরের টেবিল পাতা। অবস্থাপন্ন লোকেরা সেখানে বসে কফি পান ক'রছে! দেখ্‌লে মনে হয় না যে আফ্রিকায় এসেছি বা আল্‌জিরীয়ায় নেমেছি! মনে হয় যেন ফ্রান্সে বেড়াচ্ছি!

কিন্তু এই পথের আশে পাশের যে কোনও একটা সঙ্কীর্ণ গলির ভিতর দিয়ে যদি খানিকটা চলে যাও, তাহ'লে চট্ ক'রে তোমার চমক ভেঙে যাবে! তোমার মনে হবে যেন কোনও যাদুমন্ত্রের প্রভাবে তুমি একেবারে হঠাৎ সেই আরব্য রজনীর কালিফ হারুণ উল্-রাশীদের রাজ্য বোগদাদে এসে পড়েছো! চিরপরিচিত প্রাচ্যের রহস্যময়ী মোহিনী সৌন্দর্য্য যেন তোমার চারিদিকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। অদ্ভুত বেশের অদ্ভুত আকৃতির নরনারী স্রোতের মত তোমার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে, তোমাকে তারা গ্রাহ্যই ক'রছে না! তারা যে যার নিজের কাজে চ'লেছে, যে যার নিজের দুর্জ্ঞেয় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ক'রছে আপন আপন হিসাব মতো! পাশ্চাত্য সভ্যতার আহ্বানকে উপেক্ষা ক'রে তাকে শত হস্ত দূরে রেখে তারা নিজেদের সেই প্রাচীন বৈশিষ্ট্য আঁকড়ে ধ'রে চলেছে নিশ্চিন্তভাবে বর্ত্তমানের বিরুদ্ধে!—

বিস্ক্রার নাচ্‌নাওয়ালী

অকলঙ্ক শুভ্র বস্ত্রাবৃতা ঘন-অবগুণ্ঠিতা নারী ছায়ার মত পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে; মুক্ত গৃহদ্বারে ঈষৎ অবগুণ্ঠিতা সুন্দরীরা অলসভাবে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেন তোমারই আগমনের প্রতীক্ষা ক'র্‌ছে তারা!

লাল্‌চে অ'ঙ্‌রাখা-ঢাকা মাথায় পাগ্, সূক্ষ্ম সুতির আচ্ছাদনে আবৃত আরব সর্দ্দারেরা চলেছে তোমার আশপাশ দিয়ে লম্বা লম্বা জোর পা ফেলে, যেমন ক'রে তাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মরুভূমির তপ্ত বালুরাশি অবলীলায় উত্তীর্ণ হ'য়ে যেতো! মূরেরা চলেছে তাদের সেই পায়ের গোছে আঁটা অথচ ঝল্‌ঝলে বিরাট পায়জামা প'রে; গায়ে কতরকমের কারুকার্য্য করা জমকালো ফতুয়া! ঝাঁকড়া-চুলো য়ুহুদীরা চ'লেছে, কেবাইল্ কারীগরেরা চলেছে, মোজাবাইত বণিকেরা চলেছে, ভিস্তিরা জলের মোশক পিঠে নিয়ে ছুটছে, ঝাড়ু-

বার-বিলাসিনী

সাহারার সিপাহী

দুর্জ্জয় অশ্বারোহী

দারেরা ঝাঁড়পোঁচ ক'র্‌ছে! নিগ্রো কাফ্রারা তাদের কালো মুখে এক গাল সাদা হাসি নিয়ে রাস্তা আলো ক'রে বেড়াচ্ছে।

আল্‌জিরীয়ানদের বাড়ী পাহাড়ের ঈষৎ গড়ানে দিকটায় ঘেঁসাঘেসি পাশাপাশি তৈরি। এক সার বাড়ীর পেছনে আবার আর এক সার বাড়ী, তার পিছনে আবার আর একসার বাড়ী যেন গ্যালারীর মতো মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে! প্রত্যেক দুখানা বাড়ীর মাঝখান দিয়ে এক একটা সরু পথ পিছনের বাড়ীতে যাতায়াত করবার জন্য খোলা আছে। এই পথগুলি প্রায় অনেকটা সিঁড়ির মতো; এপথ দিয়ে ঘোড়া যাতায়াত করতে পারে না বলে বাড়ীর মধ্যে জিনিস পত্র নিয়ে যেতে হ'লে বা বাড়ী থেকে কিছু বার ক'রে নামাতে হ'লে ছোট ছোট গাধার পিঠে মাল বোঝাই দিয়ে ওঠাতে নামাতে হয়।

গৌরাঙ্গী নর্ত্তকী। (য়ুরোপীয় ও দেশীয় রক্তের সংমিশ্রণে জাত)

ফরাসীপাড়ার বড় বড় দোকানের তুলনায় এ অঞ্চলের দোকানগুলোকে এক একটা চোর কুটরী বললেই চলে। আলজিরীয়া যখন তুরুস্কের অধীনে ছিল, তখন কোনও ব্যবসাদারের সঙ্গতিপন্ন খ্যাতিটা বিপজ্জনক হয়ে উঠ্‌ত ব'লে আর্থিক অবস্থাটা গোপন রাখাই এদের স্বভাব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এক একটা এই চোর কুটরীর মতো নগণ্য দোকানের মালিক হয়ত বছরে লক্ষটাকার কারবার করে! জুতোর দোকানে বা দর্জ্জির দোকানে এসে খরিদ্দারকে ফুটপাথে দাঁড়িয়েই জুতো পায়ে দিয়ে দেখে নিতে হয় বা জামার মাপ দিতে হয়। নাপিত, দন্তচিকিৎসক, মুচী এবং পেশাদার চিঠি-লিখিয়েদের ফুটপাথে বসেই কাজ ক'রতে হয়। রাস্তায় ধুলো আবর্জ্জনা নোংরা যথেষ্ট। চায়ের দোকানে বা কফি-খানায় গিয়ে খরিদ্দারকে মাটিতে বিছানো মাদুরের ওপর বসতে হয়। টেবিল চেয়ার বেঞ্চি খুব অল্প দোকানেই আছে। এই সব দোকানে কেবল কফি খাওয়াই নয়, তাশ, দাবা, পাশা প্রভৃতি খেলা ও হরেক রকম গল্পগুজবও চলে। মধ্যে মধ্যে নাচ গান প্রভৃতি আমোদেরও ব্যবস্থা আছে।

কাশ্‌বার কাছে যেখানে প্রাচীন আল্‌জীর বাদশার রাজপ্রাসাদ ছিল সেখানে একটি ছোট খাটো বাজার আছে। এই বাজারে ফলমূল তরিতরকারী এবং পুরানো কাপড়-চোপড় খুব বিক্রী হয়। বাজারের এক কোণে কাল্লা

মরুবাসী বালক-বালিকা

বংশীবাদক নিগ্রো বালক

তরুণী মরু-বাঈ (বিস্ক্রা সহরের পথিপার্শ্বে এই নর্ত্তকী বালিকারা সুবেশে সজ্জিতা হ'য়ে তাদের অটুট স্বাস্থ্য ও রূপযৌবন নিয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়ে অপেক্ষা করে। অর্থের বিনিময়ে এরা নৃত্যগীত ও নাচের দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন ক'রতে প্রস্তুত, কিন্তু দেহ বিক্রয় করে না, সেটুকু করে কেবল অকপট প্রেমের বিনিময়ে।)

সবজীওয়ালা ও নিগ্রো খরিদ্দারণী

খোঁড়া বুড়ো অক্ষম আল্‌জিরীয়ানরা সাধারণকে গল্প শুনিয়ে পয়সা উপার্জ্জন করে। আলজিরীয়ানদের মধ্যে লেখাপড়া জানা-লোক খুব কমই আছে। দেশ-বিদেশের খবর তারা বড় একটা রাখে না। তীর্থযাত্রী বা ভ্রমণকারীদের মুখে গল্প শুনেই অন্য দেশের সম্বন্ধে যা কিছু শিক্ষা ও জ্ঞানলাভ হয়। এদের বাড়ীগুলোর কোনও শ্রী সৌন্দর্য্য নেই। জানলার পরিবর্ত্তে কতকগুলো গরাদে আঁটা ঘুলঘুলি আছে মাত্র। বাড়ীর একটী মাত্র দরজা, তাও আবার জেলখানার দরজার মতো। আর বস্তুতঃ মুরেদের বাড়ীকে জেলখানা বল্‌লে কোনও অত্যুক্তি করা হয় না, কারণ এরই মধ্যে আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত অভাগিনী আল্‌জীর রমণীরা চিরকাল বন্দিনী হ'য়ে থাকে।

মুরেদের এই বাড়ীগুলির বাইরেটা দেখ্‌তে যতটা খারাপ, ভিতরটা তত নয়। ভিতরে নানা কারুকার্য্য করা, এবং প্রত্যেক ঘরখানি বিবিধ বিচিত্র বর্ণে অনুরঞ্জিত। বাড়ীর ভিতরের উঠানটি মার্ব্বেলপাথর বা টালি বসানো, মধ্যে একটি জলের ফোয়ারা এবং কারুর কারুর বা দু'একটা কম্‌লা লেবুর গাছও আছে। গাঢ় সবুজবর্ণ পাতার ফাঁকে ফাঁকে সুগোল, সোনালী ফলগুলি যেন গড়িয়ে রেখেছে বলে মনে হয়।

কাফ্রি মুসলমান

বাড়ীর ছাদের ওপর পুরুষেরা কেউ উঠতে পায় না; সেখানে মেয়েদের রাজত্ব। প্রত্যহ বিকেলে তারা যে যার ছাদে উঠে বেড়ায়। মুক্ত আলো বাতাসের সঙ্গে দিনান্তে একবার তাদের এইখানেই দেখাশুনা হয়। ছাদ দিয়ে ছাদ দিয়ে তারা যাওয়া আসা কোরে এ-বাড়ীর ও-বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে। এই ছাদে ওঠার ব্যাপার নিয়ে ওদের দেশে অনেক কাব্য উপন্যাস সৃষ্টি হ'য়ে গেছে। কত প্রেমিক যুবা গোপনে তাদের প্রণয়িনীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য ছদ্মনারী-বেশে ছাদের ওপর দিয়ে এসেছে। অনেকে ধরা প'ড়ে প্রাণও দিয়েছে।

জাপানে যেমন গেইশা নর্ত্তকীদের আবাসস্থান যোশী-বারা, তেম্‌নি আল্‌জিরীয়ার 'কাট্টারা-উজী'। মরুপ্রদেশের মেয়েরাই নাচনাওয়ালী হ'য়ে সহরে আসে এবং কিছুদিন নৃত্য-গীতের সাহায্যে অর্থ উপার্জ্জন ক'রে দেশে ফিরে যায় এবং সেখানে বিবাহ করে তারা সংসারী হয়। বিবাহের এই যৌতুক সংগ্রহ ক'রতে না পারলে মরুবাসিনী অভাগিনীদের অবিবাহিতা অবস্থায় জীবনযাপন ক'রতে হয়।

আলজিরীয়ানদের গান বাজনা এক অদ্ভুত রকমের;

কাচ্ছী চারণ

সাহারার নরসুন্দর

মোহিনীর নৃত্য-লীলা

মরু-প্রসূন
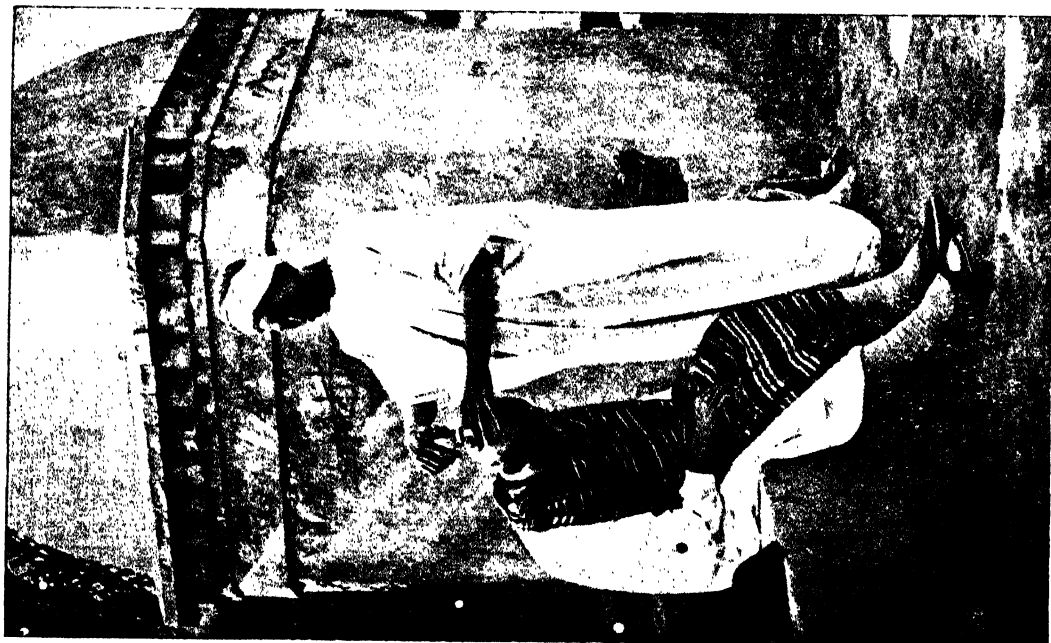
অনেকটা সেই আদিম যুগের বর্ব্বর মানুষদের সুর-তালহীন অশ্রাব্য ধ্বনির মতো! ঢোল আর বাঁশী ভিন্ন অন্য কোনও প্রকার বাদ্যযন্ত্র বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই ঢোল আর বাঁশী দু'একটা বাঁধা বোলই ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি ক'রতে থাকে। কাজেই সেটা অল্পক্ষণ শোনবার পরই কর্ণপীড়া উপস্থিত করে! অথচ সেই গান বাজনাই সে দেশের বিপুল জনতাকে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রাখে। দলে দলে শ্রোতারা সব ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে দুলে দুলে মাথা নেড়ে হাততালি দিয়ে—তন্ময় হ'য়ে সেই আনন্দ উপভোগ ক'রে।

আলজিরীয়ার সমস্ত মস্‌জিদেই খৃষ্টান প্রভৃতি বিধর্ম্মীদের প্রবেশ করতে দেওয়া হয় যদি তারা জুতো খুলে আসে। আলজিরীয়ানরা মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হলেও বিধর্ম্মীদের ঘৃণা করে না। সে দেশে যে যার বিশ্বাস মতো ধর্ম্মপথ অনুসরণ করতে পারবে, এ স্বাধীনতাটুকু আছে। তথাপি খৃষ্টান মিশনারীরা বহু চেষ্টা করেও সে দেশে খৃষ্টধর্ম্ম স্থাপন করতে পারেনি। স্বধর্ম্মে সে দেশের লোকেরা গভীর আস্থাবান। সেই রোমানদের আমল থেকে আজ পর্য্যন্ত অনেক য়ুরোপীয় জাতই উত্তর আফ্রিকার এই কোণটিতে আসা যাওয়া করেছে;

মোহিনী মরু-সুন্দরী। (এরা সহরে এসে নৃত্য-কৌশল, ছলা-কলা, হাবভাব, এমন কি কপট প্রেম অভিনয় করে ও বিদেশী লোকের মন ভুলিয়ে অর্থ উপার্জ্জন করে নিয়ে দেশে ফিরে যায় এবং মনোমত স্বজাতীয় পাত্রকে বিবাহ ক'রে)

সভ্যতা ও বর্ব্বরতার মধ্যের পার্ব্বত্য ব্যবধান—(আল্‌জীর সীমান্তের এই অভ্রভেদী আউরী ও চেলীয়া পর্ব্বতের অপরদিকে বর্ব্বার বা কাফি্‌দের বাস।)

নিগ্রো বাদ্যকর

দর্জ্জির দোকান

আল্‌জিরীয়ান বক্তা

ফরাসী স্কুলের ছাত্র।

করে এই বর্ব্বর দেশকে অনেকটা সভ্য ক'রে এনেছে।

খেজুর, আঙুর, ডুমুর, কমলানেবু, বাদাম, খোবানী, জলপাই, তামাকপাতা প্রভৃতি সেখানে প্রচুর জন্মায় এবং এ সবের চালানী ব্যবসা সেখানে অনেকেই করে। গম, ছোলা, বার্লি প্রভৃতিও সেখানে উৎপন্ন হয়। আল্‌ফাল্‌ফা বা এস্পার্টো ঘাসের কারবার সে দেশে একটা মস্ত লাভজনক ব্যবসা। এই ঘাসে অতি উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হয় বলে য়ুরোপে এ ঘাস যথেষ্ট পরিমাণে রপ্তানী হয়।

ঘোড়া, ছাগল প্রভৃতি গৃহপালিত পশুও সেখানে অসংখ্য পাওয়া যায়, তা ছাড়া উষ্ট্র আর ভেড়া তো অজস্র আছেই।

রোমানদের তরফ থেকে জুলিয়াস্ সীজারই সর্ব্ব প্রথম আলজিরীয়া জয় করেছিলেন; তারপর এ দেশ স্পেনের অধিকারভুক্ত হয়। স্পেনের হাত থেকে আরবদের হাতে এসে পড়ে এবং পরে তুরস্কের অধীন হয়। এই সময় আলজিরীয়ানরা এত বেশী জল-দস্যুতা করতে আরম্ভ করেছিল যে, তাদের অত্যাচারে অস্থির হয়ে জার্ম্মাণী, ইংরেজ, ফ্রান্স, অষ্ট্রীয়ান, এমন কি মার্কিনরা পর্য্যন্ত সবাই এক একবার এসে আলজিরীয়া আক্রমণ করে এক একটা কিন্তু কেউই তাদের প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। বরং তারাই উল্টে এদের সঙ্গে মিশে গেছে; কেবল আরব, য়ুহুদী প্রভৃতি এসিয়াবাসীরা কোনও রকমে আজ পর্য্যন্ত তাদের বিশেষত্বটুকু বজায় রাখতে পেরেছে! তবে মুর ব্যবসায়ীদের মধ্যে ধীরে ধীরে যে আরব মুসলমানেরা মিশে যাচ্ছে, সেটা বেশ স্পষ্ট চখে পড়ে। ফ্রান্স এখানে নূতন বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ-বাস করা, বড় বড় পথ ঘাট নির্ম্মাণ করা, খাল ও কূপ প্রভৃতি খনন করে জলাভাব দূর করা, রেলপথ বিস্তার, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন স্থাপন এবং উচ্চ শিক্ষার প্রবর্ত্তন

পাঁচদিন পরে! (প্রত্যহ পঞ্চাশ মাইল হিসাবে একাদিক্রমে পাঁচ দিন জলহীন মরুভূমির উপর দিয়ে চলে আসবার পর এই মরুবাহন দুটি প্রথম জলপান ক'রছে।)

রক্ষা করে গেছ্‌ল। তারপর ১৮২৭ খৃঃ অব্দে ফরাসী রাজদূতকে অপমান করার অছিলায় ফ্রান্স অসংখ্য সৈন্য

য়ুহুদী রমণী

খিক্রার মস্‌জিদ

শাবীয়া রমণী

কাস্‌বা সহরের একটি পথ

মরুরাজ ও তার বালক অনুচর

উষ্ট্রবাহনে মরু-সুন্দরী

বালক বাদকত্রয়
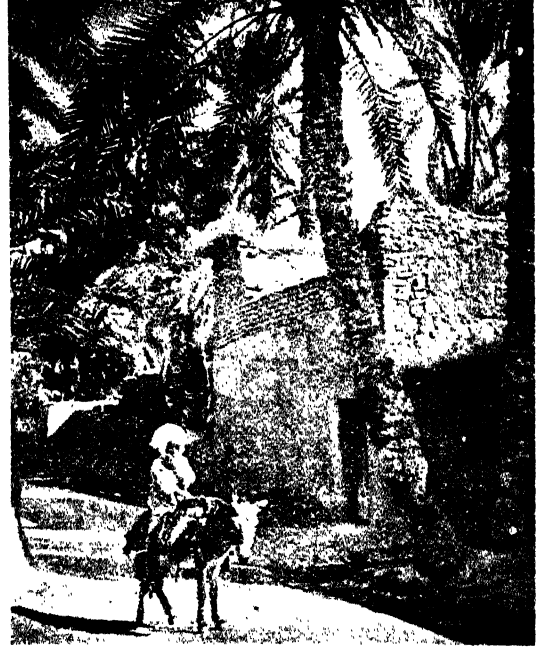
বিস্ক্রা সহরের খর্জ্জুর-ছায়াবিনী

আল্জীর সহরের একদিকে

আল্জীরে কাপড়ের দোকান

(ক্রেতারা আগে পোষাক পছন্দ করে নিয়ে হাটের মাঝখানে এসে প'রে এবং পোষাকের গুণাগুণ সম্বন্ধে পথিকদের মতামত নেয়, পরে দাম দস্তুর ঠিক ক'রে কেনে।)

দাসী বেগম (ফরাসীদের আমলে আলজিরীয়ায় দাসদাসী ক্রয় বিক্রয় আইন-বিরুদ্ধ কাজ বলিয়া ঘোষিত হওয়ায় সেখানকার অবস্থাপন্ন মুসলমানেরা নিগ্রো যুবতীদের হারেমে রাখিবে বলিয়া ক্রয় করে, কিন্তু অভাগিনীদের যৌবন অস্তমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা বেগম থেকে দাসীতে পরিণত হয়।)

রূপসী মরু-বাসিনী

আলজিরীয়ার মানচিত্র।
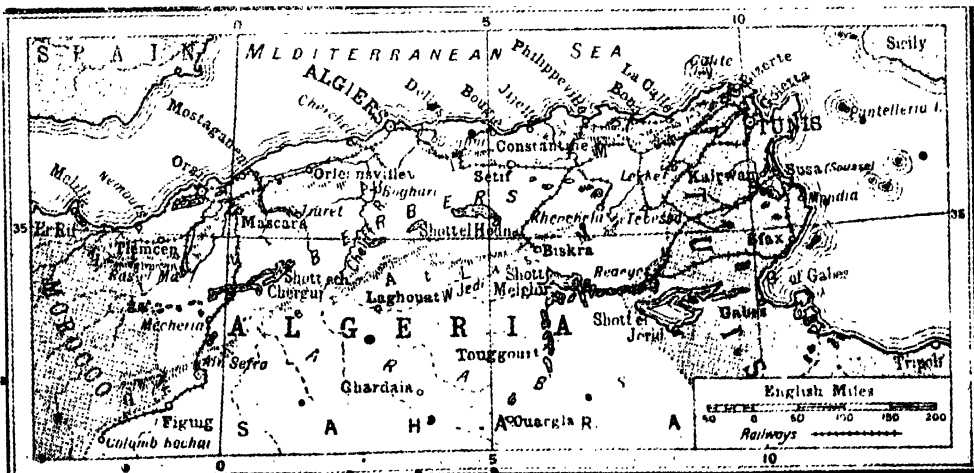
সামন্ত নিয়ে এসে আলজিরীয়া জয় করে তাকে ফরাসী রাজ্যের অধিকারভুক্ত করে নিয়েছে।

আলজিরীয়ার পরিমাণ ২,২২,১৮০ বর্গ মাইল, লোক-সংখ্যা ৫৫,৬ ,৮২৮। তারমধ্যে ফরাসীদের সংখ্যা ৪,৯২,৬৬০, অন্যান্য য়ুরেপীয় জাত ৩০,২৮৬২, দেশী লোক ৪৮,৬৭,৩০৬ জন।

আলজিরীয়াকে কতকগুলি প্রদেশে বিভক্ত ক'রে নিয়ে ফরাসীরা শাসন কর'ছে। প্রত্যেক প্রদেশ এক একজন ফরাসী সামরিক কর্ম্মচারীর অধীন এবং সকলের উপর একজন প্রধান শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত আছেন। তিনি প্যারিসের জাতীয় মহাসমিতির অধীন। ফরাসী প্রজাতন্ত্র অনুসারে তাঁকে রাজকার্য্য পরিচালন করতে হয় একটি শাসন পরিষদের পরামর্শ নিয়ে। প্রজা বর্গের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির দ্বারা এই শাসন-পরিষদ গঠিত। অনূন পঁচিশ বৎসর বয়স্ক দেশী লোক যাদের চাষবাস, ব্যবসা বাণিজ্য বা জমীদারী আছে, যারা লিখ্‌তে পড়তে জানে এবং যারা ফরাসী ফৌজে কাজ করে বা ফরাসীর পক্ষ নিয়ে কোনও যুদ্ধে যোগদান করে পদক বা উপাধিতে ভূষিত হয়েছে, তাদেরই কেবল ফরাসী প্রজাদের সঙ্গে সমান অধিকার দেওয়া হয়।

আলজীরের একটী পুরাতন রাজপথ।

প্রত্যেক আলজিরীয়ানকে অন্ততঃ তিন বৎসর কাল সমর-বিভাগে থেকে; যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করতে হয় কারণ সেখানে বাধ্যতা-মূলক সামরিক বিধি প্রচলিত আছে।

আলজিরীয়ানরা প্রতি বৎসর অন্ততঃ দেড়শ' কোটি টাকার মাল আমদানী করে এবং প্রায় পঁচাত্তর কোটী টাকার মাল সেখান থেকে রপ্তানী হয়। তার মধ্যে রবিশস্য, মদ, বাদামের তেল, ফল, ঘাস এবং মাছই প্রধান।

আলজিরীয়ার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সহর আছে পাঁচটি, আলজীর, ওরাণ, কন্সটাণ্টাইন, ট্রেমিন, ও ফিলিপ-ভীলে।

বেদের অগ্নি

শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

সকলেই জানেন, বোম্বাই-প্রদেশবাসী পারসিকেরা অগ্নির উপাসক। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ পশু´ (বর্ত্তমান 'পারস্য'; ঋগ্বেদে পারসিকেরা পশু´ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন) দেশের অধিবাসী ছিলেন। ইস্‌লাম ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে ইঁহারা প্রপীড়িত হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন; এবং ভারতবর্ষের পশ্চিমোপকূলে আশ্রয় লাভ করেন। অগ্নি-পূজা যে ইঁহাদেরই বিশেষ ধর্ম্ম ছিল, এরূপ নহে। এক কালে প্রাচীন আর্য্যজাতির সকল শাখা মধ্যেই অগ্নি-পূজা প্রচলিত ছিল। এখনও ভারতীয় আর্য্য-বংশধরগণের প্রায় সকল দৈবত কার্য্যেই অগ্নি-পূজার আবশ্যক হয়। প্রাচীন কালে অগ্নিই ভারতীয় আর্য্যগণের 'গৃহপতি' (Sutelary deity) ছিলেন। ঋগ্বেদে বহু স্থলে অগ্নি 'কবি গৃহপতির্যুবা' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। যবন (Jonian) ও রম্যক (Roman) জাতিগণের মধ্যেও অগ্নি Sutelary deity অর্থাৎ গৃহ-দেবতা ছিলেন; এবং অগ্নিরক্ষা করিবার জন্য ব্রতধারিণী কুমারীগণ (Vestal Virgins) নিযুক্তা থাকিতেন। আর্য্যজাতির অন্যতম শাখা কৈরাতিক (Celtic)গণের মধ্যেও অগ্নি-পূজা প্রচলিত ছিল। তাঁহাদের পুরোহিতগণ 'দ্রুইদ' (Druid) নামে অভিহিত হইতেন। 'দ্রু' শব্দের অর্থ 'কাষ্ঠ' এবং 'ইধ্‌' ধাতুর অর্থ 'প্রজ্বালন'। অগ্নিপূজা করিতেন বলিয়াই তাঁহারা 'দ্রুইদ' (Druid) আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ঋগ্বেদে আমরা পাই :—

> "প্র বো যহ্বম্ পুরূণাম্ বিশাম্ দেবযতীনাম্
> অগ্নিম্ সূক্তেভিঃ বচোভিঃ ঈমহে।
> যম্ সীম্ ইৎ অন্য ঈড়তে॥ ১ মণ্ডল ৩৬ সূক্ত ১ মন্ত্র॥

"দেবানুযায়ি পুরুজাতীয় মনুষ্যগণের পূজনীয় অগ্নিদেবকে সূক্ত-বচন দ্বারা পূজা করি—যাঁহাকে অন্য সকলেও পূজা করে।" অগ্নি-পূজা লইয়া বিভিন্ন শাখা সকলের মধ্যে কোন দিন যে কোনরূপ বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, এরূপ নিদর্শন আমরা বেদে পাই না। এই জন্যই বোধ হয় মহর্ষি বেদব্যাস ঋগ্বেদে সূক্ত-সংস্থানকালে মণ্ডলের সর্ব্বাগ্রেই

অগ্নিসূক্ত সকলের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তবে অগ্নির উৎপাদন-বিধি লইয়া আর্য্যগণের সহিত 'পণি'(Phœnicians)দিগের মতান্তর ও মনোমালিন্যের নিদর্শন আমরা বেদে পাই। আর্য্যেরা অরণি-কাষ্ঠদ্বয় হইতে ঘর্ষণোৎপন্ন অগ্নি দ্বারা যজ্ঞ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। পণিগণ (Phœnicians) প্রস্তর-খণ্ড ঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদন করিত, এবং তাহা আর্য্যগণের অভিমত ছিল না।

"তে বাহুভ্যাম্ ধমিতং অগ্নিম্ অশ্মনি
নকিঃ স অস্তি অরণঃ জহু হিঁ তম্॥"

২য় মং ২৪ সূঃ ৭ মন্ত্র॥

"পণিগণ বাহু দ্বারা প্রস্তর-খণ্ড হইতে অগ্নি উৎপাদন করিতেন। তাহা কি অরমণীয় নহে? এইজন্য আর্য্যগণ তাহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।"

সে যাহা হউক, ঋগ্বেদ স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন, "অগ্নিম্ বিশ্বা অভিপৃক্ষঃ সচন্তে" (১মং ৭১ সূঃ ৭ মন্ত্র)—'আর্য্য-শোণিত-সম্পর্কিত সকলেই অগ্নিপূজা করেন।' এই অগ্নি কিরূপে প্রথম আবিষ্কৃত হইলেন, এবং কিরূপে আর্য্যজাতি-গণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন, এতৎসম্বন্ধে বেদে কি নিদর্শন পাওয়া যায়, এক্ষণে আমরা সেই বিষয়ের আলোচনা করিব।

"দধুষ্ট্বা ভৃগবো মানুষেষ্বা
রয়িং ন চিত্রং সুহবং জনেভ্যঃ।"

১ মং ৫৩ সূঃ ৬ মন্ত্র

'হে অগ্নে! মনুষ্যদিগের মধ্যে ভৃগুরাই সর্ব্ব প্রথমে হোমের প্রধান সাধনভূত আপনাকে বিচিত্র রত্নের ন্যায় জন সকলের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছিলেন।

"যমপ্রবানো ভৃগবো বিরুরুচুঃ
বনেষু চিত্রম্ বিভ্বং বিশে বিশে।"

৪ মং ৭ম সূঃ ১ মন্ত্র॥

'ভৃগুরা বিচিত্র প্রভাশালী অগ্নিকে বনে প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্যগণের মধ্যে বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছিলেন।'

"মিত্রম ন যং সুধিতং ভৃগবো দধুঃ
বনস্পতৌ ঈড্যং ঊর্দ্ধ শোচিষম্॥"

৬ মং ১৫ সূঃ ২ মন্ত্র॥

'বনস্পতিতে নিহিত ঊর্দ্ধ জ্বালামালী পূজিত অগ্নিকে মিত্রের ন্যায় ভৃগুরা আহরণ করিয়াছিলেন।'

এই মন্ত্রগুলি দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয়, ভৃগুরা সর্ব্বপ্রথম বন হইতে অগ্নি আবিষ্কার ও চয়ন করেন। তৎপূর্ব্বে আর্য্যজাতিগণের মধ্যে অগ্নির প্রচলন ছিল না। অগ্নি প্রচলনের পর হইতেই আর্য্যগণের মধ্যে রাত্রিকালে গমনা-গমন ও কাজ-কর্ম্মের সুবিধা হইয়া উঠে। এই জন্যই ঋগ্বেদে ৪ মং ১১ সূঃ ৬ মন্ত্রে অগ্নিকে "দোষাশিব" অর্থাৎ রাত্রিকালের মঙ্গল-কর্ত্তা বলা হইয়াছে। ৬ষ্ঠ মণ্ডল ৩য় সূক্ত ৩ মন্ত্রে বলা হইয়াছে "শুরুধো নায়ং অক্তোঃ" অর্থাৎ অগ্নি রাত্রিকালের ক্ষিপ্র রোধয়িতার ন্যায়। স্মরণাতীত এক কালে অগ্নি যে আর্য্যজাতিগণের অপরিচিত ও তাঁহাদের মধ্যে অপ্রচলিত ছিল, তাহা 'অমাবস্যা' এই শব্দটী অনু-শীলন করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে। কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রোদয়-বিহীন শেষ তিথির নাম অমাবস্যা। এই শব্দটী 'অমা' এবং 'বস্যা' এই দুই শব্দের যোগে নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাস্ক মুনি প্রণীত নিঘণ্টুর ৩য় অধ্যায় ৪র্থ পর্য্যায়ে যে দ্বাবিংশতি গৃহ-বাচী শব্দ প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে 'অমা' শব্দটী অন্যতম। এই শব্দটী বর্ত্তমানে অপ্রচলিত হইলেও আর্য্যজাতীয় শব্দ-ভাণ্ডারের একটী প্রাচীন শব্দ। ইহা এখনও অঙ্গিরস (English) ভাষায় 'Home' এই আকারে নিরপেক্ষ ভাবে বিরাজ করিতেছে। 'বস্' ধাতুর অর্থ বাস করা। অতএব যে তিথিতে 'গৃহে বাস করিতে হইবে'—ইহাই 'অমাবস্যা' শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। অগ্নির আবিষ্কার ও প্রচলনের পূর্ব্বে দিবাভাগে সূর্য্যের আলোকের ন্যায় রাত্রিকালে চন্দ্রের আলোকই নৈশ গমনাগমনের প্রধান অবলম্বন ছিল। সুতরাং যে তিথিতে চন্দ্রোদয় হইত না, সেই তিথিতে বাধ্য হইয়া গৃহে বাস করিতে হইত, ও সেই তিথির 'অমাবস্যা' এই প্রসিদ্ধি হইল। কালে গৃহ-বাচী বৈদিক 'অমা' শব্দ অপ্রচলিত হইয়া গেল; এবং লোকেও বিস্মৃত হইল যে, এমন এক দিন ছিল যখন অগ্নির প্রচলন ছিল না। সঙ্গে-সঙ্গে 'অমাবস্যা' শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তিগত অর্থেরও লোপ হইল। আধুনিক পণ্ডিতগণ 'অমা' শব্দের 'সহ' বা 'সহিত' এই অর্থ নির্দ্দেশ করেন, এবং বলেন, 'যে তিথিতে চন্দ্রের সহিত সূর্য্য একত্র বা সম-সূত্রে অবস্থান করেন' তাহাই 'অমাবস্যা'। কিন্তু 'অমাবস্যা' শব্দের ব্যুৎপত্তি ইহা নহে, এবং হইতে পারে না। কোন্ মন্ত্রবলে তাঁহারা 'অমা' শব্দের 'সহ' এই অর্থ প্রদান

করিলেন, তাহা বুদ্ধির অগম্য। ফলতঃ, কি বৈদিক, কি লৌকিক, কোন যুগেই 'অমা' শব্দের এই অর্থে প্রসিদ্ধি ছিল না। অমরকোষে আমরা পাই "(কদাচিৎ জাতু) সার্দ্ধং তু সাকং সত্রা সমং সহ" অর্থাৎ সার্দ্ধ, সাক, সত্রা, সম এবং সহ এই পাঁচটী সহার্থক শব্দ। ঐ অর্থে 'অমা' শব্দের প্রসিদ্ধি থাকিলে, নিশ্চয়ই কোষে তাহার উল্লেখ হইত। এক্ষণে 'অমা' শব্দের ব্যুৎপত্তি কি দেখা যাক। 'অ' এবং 'মা' এই দুইটী শব্দের যোগে 'অমা' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'অ' ও 'মা' এই উভয় শব্দই নিষেধবাচী; অতএব 'যেখানে নিষেধ নাই'—'যেখানে কেহ বারণ করিতে পারে না'—ইহাই 'অমা' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অভিব্যক্তি। ইহাই অঙ্গিরস (English) ভাষায় 'Home' (হোম্) শব্দের প্রকৃত অর্থ। হইতে পারে; ঐ বিশেষ তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য্য সমসূত্রে অবস্থান করেন, কিন্তু তাহা বলিয়া যে ঐ গ্রহদ্বয়ের ঐ প্রকার অবস্থান 'অমাবস্যা' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেই হইবে, তাহার কোন কারণ বা সঙ্গতি নাই। স্মরণাতীত কালে অগ্নির অপ্রচলন নিবন্ধন, চন্দ্রালোকবিহীন অমাবস্যা নিশিতে গমনাগমন প্রতিষিদ্ধ হয়, এবং ঐ রীতি সমাজে বদ্ধমূল হইয়া যায়। অগ্নির আবিষ্কার ও প্রচলন হইবার পর, নৈশ গমনাগমনে চন্দ্রালোকের কোন আবশ্যকতা না হইলেও, শ্রাদ্ধে বিড়াল বন্ধনের ন্যায় অমাবস্যা তিথিতে গমনাগমন নিষিদ্ধ হইয়া গেল। এইখানে স্মৃতি তাঁহার শাসনদণ্ড লইয়া উপস্থিত হইলেন, এবং বলিলেন, পঙ্কাম্বু-বিধায় অমাবস্যায় গমন নিষেধ। অমাবস্যায় গমন নিষেধের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া, চন্দ্রমাশালিনী পূর্ণিমা তিথিতেও স্মৃতি গমন নিষেধের ব্যবস্থা করিয়া বসিলেন। মৎ-প্রণীত 'বৈদিক তত্ত্বে ভাষা বিজ্ঞান' নামক পুস্তকে এইরূপ অনেক দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক বিধায় তৎসমুদায়ের পুনরুল্লেখ করিলাম না।

বার্গসোঁর দার্শনিক মতবাদ

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন এম্-এ

এই পৃথিবী গমনশীল বলিয়া ইহার আর এক নাম জগৎ। গতি এই জগতের একটি অনস্ত সত্য। অণু-পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া, এই জগতে যাহা কিছু দেখিতেছি, সকলই গতিবিশিষ্ট। এই জন্যই অনেক বৈজ্ঞানিক স্থির করিয়াছেন যে, আদিতেই পরমাণুপুঞ্জ গতিবিশিষ্ট ছিল। প্রত্যেক পদার্থের অণুপরমাণুগুলি এত দ্রুত গতিশীল যে, প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক হেরাক্লাইটাস্ (Heraclitus) বলিয়াছেন, জগতের চরম সত্তাও পরিবর্ত্তনশীল বা গতিশীল। তিনি দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিয়াছেন যে, এক নদীতে কোন মানব দুইবার স্নান করিতে পারে না। কেন না, নদীও পরিবর্ত্তনশীল, মানবও পরিবর্ত্তনশীল। ভারতের বৌদ্ধ দার্শনিকগণও জগতের গতিশীলতা দর্শন করিয়া, গতিটাকেই চরম সত্তার স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক আজ এই বিংশ শতাব্দীতে আবার সেই প্রাচীন কথার প্রতিধ্বনি করিতেছেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, জগতের সকল পদার্থই যদি গতিশীল হয়, তবে গতির বাহিরে কিছু থাকে কি?

বৈজ্ঞানিক এই কথার কি উত্তর দিবেন, তাহা আমরা জানি। এই কথার উত্তরে বৈজ্ঞানিক একটি স্পষ্ট "না" বলিবেন। তাঁহারা বলিবেন, স্থিতি বলিয়া যে জিনিস তোমরা উপলব্ধি করিতেছ, সেটা তোমাদের ভ্রম। দুইটি রেলগাড়ী যদি সমান্তরাল রেখায় মধ্যে সমান গতিতে চলিতে থাকে, তবে এক গাড়ীর যাত্রীরা অপর গাড়ীটাকে স্থির মনে করিবে। এখানে গতিশীলতাই সত্য, স্থিতিশীলতাটা ভ্রমমাত্র। অথচ, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, আমাদের ইন্দ্রিয়-প্রতীতি আমাদিগকে স্থিতিশীলতার ধারণাই জন্মাইয়া দিতেছে। অতএব দেখা গেল, বৈজ্ঞানিকের মতেও ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান চরম জ্ঞান নহে। আমাদের ইন্দ্রিয়সকল সীমাবদ্ধ, অতএব ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের

উপর সকল সময়ে নির্ভর করা চলে না। ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের উপর নির্ভর করা চলে না বলিয়াই, আমাদের এমন কোন জিনিসের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, যাহা আমাদিগকে বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রদান করিতে পারে। দেখা যাক্, সে জিনিসটা কি।

দার্শনিক-প্রবর বার্গসোঁ বলেন, সে জিনিসটা সহজলব্ধ জ্ঞান বা Intuition। বার্গসোঁ এ কথা স্বীকার করেন যে, যুক্তি দ্বারাও আমরা কোন বিষয়ের চরম মীমাংসায় উপনীত হইতে পারি না। আমাদের ইন্দ্রিয়ের দৌড় অতি সামান্য, এবং যুক্তির দৌড় ইন্দ্রিয়ের দৌড়কে ছাড়াইয়া গেলেও উহাও আমাদিগকে চরম স্থানে পৌঁছাইয়া দিতে পারে না। আমাদের দেশে ইহা নূতন কথা নহে। আমাদের দেশের মনীষিগণ এ কথা চিরদিনই বলিয়া আসিতেছেন। আমাদের উপনিষৎসমূহ চরম সত্তার 'ব্রহ্ম'সংজ্ঞা নির্দ্দেশপূর্ব্বক, সেই 'ব্রহ্ম' সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

যতো বাচা নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ॥"

বাক্য তাঁহাকে না পাইয়া মনের সহিত ফিরিয়া আইসে, চক্ষু সেখানে যায় না, বাক্য সেখানে যায় না, মনও সেখানে যায় না। উপনিষদের অন্যত্রও এই মহান্ সত্য বিঘোষিত হইয়াছে।

"নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥"

"তাঁহাকে চক্ষু দ্বারা, বাক্য দ্বারা, অথবা মন দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে 'তিনি আছেন' ইহার অতিরিক্ত কিছু বলা চলে না।" উপনিষদ্‌সমূহের অনুসরণ করিয়া শঙ্করাচার্য্যও (যিনি অনেকের কাছে একজন Intellectualist বা যুক্তিবাদী বলিয়া পরিচিত) বলিয়াছেন, "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ"; এবং বৈষ্ণব শাস্ত্রসমূহ ঐ কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন :—"অচিন্ত্যা খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।" শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই জন্যই জীবব্রহ্মের সম্বন্ধকে অচিন্ত্য ভেদাভেদ বলিয়াছেন।

ইয়োরোপে মধ্যযুগে দর্শনশাস্ত্র বিশেষ উন্নতিলাভ করে নাই। তখন দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, ধর্ম্মশাস্ত্রগুলিকে কোনমতে দাঁড় করান। ঐ যুগের দার্শনিকগণ যুক্তিতর্কের বিশেষ ধার ধারিতেন না। যুক্তির প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে ধর্ম্মের জীর্ণ পুরাতন সৌধ কখন পড়িয়া যায়, এই ভয়ে তাঁহারা সতত ভীত ভাবে অবস্থিতি করিতেন। এই মধ্যযুগের পর যে Renaissanceএর যুগ আসিল, সেই যুগের অগ্রদূত ছিলেন বেকন। তিনি সর্ব্বসমক্ষে নির্ভীক ভাবে যুক্তির মাহাত্ম্য ঘোষণা করিলেন। তিনি বলিলেন, যুক্তির কষ্টি-পাথরে যাহা টিঁকিবে, তাহাই গ্রহণ করা হইবে; যাহা টিকিবে না, সেই আবর্জ্জনাগুলিকে সিন্ধুর অতল জলে নিক্ষেপ করিতে হইবে। বেকনের এই বিপ্লববাদ প্রচারের ফলে দর্শনশাস্ত্র অতি দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। বেকন হইতে আরম্ভ করিয়া জার্ম্মাণ দার্শনিক হিগেল পর্য্যন্ত সকলেই Intellectualism বা যুক্তিবাদের প্রাধান্য স্থাপন করিলেন। কিন্তু এই যুক্তিবাদ কাহাকেও শান্তির স্নিগ্ধ মন্দাকিনীধারায় অভিষিক্ত করিতে পারিল না, স্বচ্ছ শীতল জলের পরিবর্ত্তে কেবল কতকগুলি পঙ্কোদ্ধার হইল মাত্র। তাই এই যুক্তিবাদের বিরুদ্ধেও আবার বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে। তাই আজ দার্শনিক-প্রবর বার্গসোঁ যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে তাঁহার মত প্রচার করিতেছেন। ইটালীয় দার্শনিক ক্রোচেও (Benedetto Croce) তাঁহার মতাবলম্বী।

অতএব দেখা গেল যে, আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়-প্রতীতির উপর যেমন প্রত্যয় স্থাপন করিতে পারি না, যুক্তির উপরেও তেমনি সকল সময়ে নির্ভর করিতে পারি না। অন্ততঃ, যুক্তির উপর নির্ভর করাটা সকল সময়ে নিরাপদ নহে। অতএব জ্ঞানলাভের জন্য এমন একটা তৃতীয় জিনিসের প্রয়োজন, যাহা ইন্দ্রিয়-প্রতীতির চেয়েও শ্রেষ্ঠ, যুক্তির চেয়েও শ্রেষ্ঠ। ভারতবর্ষীয় দার্শনিকগণের মধ্যে সেই জিনিসের নাম প্রাতিভজ্ঞান, (প্রাতিভাদ্বা সর্ব্বম্—পাতঞ্জল)। বার্গসোঁর মতে তাহা Intuition; কিন্তু হিন্দু দার্শনিকগণের সঙ্গে বার্গসোঁর এক প্রধান বিষয়ে অনৈক্য আছে। হিন্দু দার্শনিকদের মতে প্রাতিভজ্ঞান দ্বারা আমরা যে চরম সত্তার উপলব্ধি করি, তাহা অপরিবর্ত্তনীয়, বিকার-রহিত, অজ, অনাদি, অনন্ত; কিন্তু বার্গসোঁর মতে তাহা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, নিত্য বিকার প্রাপ্ত হইতেছে। পরিবর্ত্তন বা বিকারই চরম সত্তার স্বরূপ। এই বিরোধের মীমাংসা হওয়া আবশ্যক।

বহুকাল পূর্ব্বে আর্য্য মনিষিগণ যে মহান্ সত্য প্রচার করিয়াছিলেন, আজ বার্গসোঁ সেই সত্যে উপনীত হইয়াছেন।' সে সত্যটি এই যে, যুক্তি দ্বারা আমরা কোন চরম সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি না। অতএব আমাদিগকে প্রাতিভ-জ্ঞানের আশ্রয় লইতে হইবে। কিন্তু চরম সত্তার স্বরূপ-নির্ণয় সম্বন্ধে বার্গসোঁ বাস্তবিক পক্ষে প্রাতিভ-জ্ঞানের আশ্রয় না লইয়া, বিজ্ঞানের আশ্রয় লইয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের ক্রমবিকাশবাদ তাঁহার দার্শনিক মতের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তিনি "Creative Evolution" নামক গ্রন্থে তাঁহার অভিব্যক্তিবাদ সুস্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন। বিজ্ঞান-দৈত্য আজ সকলের মুখ চাপিয়া ধরিয়া আছে; সুতরাং বিজ্ঞান যাহা প্রমাণ করিবে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। বিজ্ঞান প্রমাণ করিতেছে যে, সংসারে প্রতি বস্তুই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। ঐ যে গাছটি তুমি প্রতিদিন একরূপ দেখিতেছ, উহার অণুপরমাণুগুলিও ক্ষণে-ক্ষণে রূপান্তরি হইতেছে। তোমার দেহের পরমাণুগুলি পর্য্যন্ত প্রতি মুহূর্ত্তে পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে। যত কেন পরীক্ষা কর না, এই নিখিল বিশ্বে এমন একটি পদার্থও পাইবে না যাহা পরিণাম-ধর্ম্মী নয়। যুগযুগান্তরের পরিণামের ফলে বিশ্ব-সংসার ক্রমেই বিচিত্র আকার ধারণ করিতেছে। বিজ্ঞানশাস্ত্র তো এ-কথা অনায়াসেই প্রমাণ করিয়াছে। কিন্তু বিজ্ঞান প্রাতিভ-জ্ঞান নামে কোন জিনিসের অস্তিত্ব এ পর্য্যন্ত স্বীকার করে নাই। বিজ্ঞান যাহা প্রমাণ করিয়াছে, বার্গসোঁ তাহাই প্রাতিভ-জ্ঞানলব্ধ সত্য বলিয়াছেন। আমরা বার্গসোঁকে জিজ্ঞাসা করি, এই প্রাতিভ-জ্ঞান জিনিসটা কি?

বার্গসোঁ উত্তর করিবেন, যাহা দ্বারা কোন বস্তু দর্শনমাত্র সেই বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধ হয়, তাহাই প্রাতিভ-জ্ঞান। ইহা বিন্দুমাত্রও যুক্তির সাহায্যের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আমরা কি সকলেই কোন বস্তু দর্শনমাত্র তাহা পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারি? কখনই নয়। তবেই বোঝা গেল যে, এই প্রাতিভ-জ্ঞান সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি নয়। কিন্তু যাহা সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি নয়, তাহার উপর কিরূপে আস্থা স্থাপন করা যায়? বার্গসোঁর মতে এই Intuition সহজ; অর্থাৎ প্রতি মানবের সঙ্গে-সঙ্গে ইহা জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু ইহার স্থান যুক্তির উপর—, যেহেতু, যুক্তি আমাদিগকে কোন জিনিসের চরম স্বরূপ জানিতে দেয় না। অতএব বার্গসোঁর মতে জিনিসের স্বরূপ জানিবার জন্য আমাদিগকে Intuition-এর উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু বার্গসোঁর বিরুদ্ধে আমাদের আপত্তি এই, প্রতি দ্রব্য (অথবা ধর, চরম সত্তা) যে নিয়ত গতিবিশিষ্ট, Intuition বা প্রাতিভ-জ্ঞান দ্বারা আমরা কখনও তাহা বুঝিতে পারি না।

জগতের দুইটা দিক্ আছে,—একটা গতির দিক্, আর একটা স্থিতির দিক্; দর্শনের ভাষায় বলিতে গেলে, একটা লীলার দিক্, আর একটা নিত্যের দিক্। বার্গসোঁ জগতের এই গতির দিক্, এই পরিবর্ত্তনের দিক্, এই লীলার দিক্ লক্ষ্য করিয়াই তাঁহার দার্শনিক মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। জগতের গতিশীলতার দিক্টা আর্য্য মনীষিগণও অস্বীকার করেন নাই; তাই তাঁহারা ইহার 'জগৎ' নাম প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু যদি সকলই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল হয়, তাহা হইলে 'চরম সত্তা' কথাটার কোন অর্থ থাকে কি? কোন সত্তাই তাহা হইলে চরম বা 'ultimate' হইতে পারে না। সত্তার স্বরূপ যদি 'পরিবর্ত্তন'ই হয়, তবে তাহাকে সত্তা বলিয়াই বা স্বীকার করি কেন? মোট কথা, স্থিতি ভিন্ন গতির কোন অর্থ থাকে না, নিত্য ভিন্ন লীলার কোন অর্থ থাকে না। তাই আর্য্য মনীষিগণ লীলার দিক্ অনেকটা উপেক্ষা করিয়া, নিত্যের স্বরূপ-নির্ণয়েই ব্যাপৃত ছিলেন। আমরা নিত্য হইতে লীলায়, আবার লীলা হইতে নিত্যে পৌছিতে পারি। ব্রহ্ম হইতে জগতে, আবার জগৎ হইতে ব্রহ্মে পৌছিতে পারি। জগৎকে বাদ দিলে যেমন ব্রহ্মের কোন অর্থ থাকে না, ব্রহ্মকে বাদ দিলে আবার তেমনি জগতের কোন অর্থ থাকে না। তাই রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন:—

"সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর,
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর"।

সীমার মধ্যে তিনি অসীম, জগৎ সেই 'অরূপের রূপের লীলা'।' আকাশের অনন্ত নীলিমায় তাঁহারি দীপ্তি, চন্দ্র সূর্য্যে তাঁহারি জ্যোতিঃ, 'বসুধার মৃত্তিকার' প্রতি রোমকূপে' তাঁহারি প্রকাশ, আমাদের শিরায়-শিরায়,

ধমনীতে-ধমনীতে তাঁহারি নর্ত্তন। ওগো শান্ত, ওগো দীপ্ত, ওগো মৌন, ওগো রুদ্র, আমরা তোমায় প্রণাম করি। চিরসুন্দর তুমি, তাই তোমার এই জগৎ সুন্দর। চিরসত্য তুমি, তাই তোমার এই জগৎ সত্য। চির লীলাময় তুমি, তাই নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় রহিয়াও নিখিল বিশ্বের দৃশ্য-গন্ধ-গানের মধ্যে তুমি আত্মপ্রকাশ করিতেছ। তাই জগতের গতিশীলতা, পরিবর্ত্তনশীলতা সবই সত্য হইয়া, সার্থক হইয়া উঠিয়াছে।

দুলারী

শ্রীসনৎকুমার চক্রবর্ত্তী

অনেক দিন পরে মন্নু ও দুলারীকে—একদিন যে কলিয়ারী তারা বাপের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই ত্যাগ করেছিল,—সেই কলিয়ারীতে মাল কাটার জন্য এসে দাঁড়াতে দেখে, ম্যানেজার বাবু ও মালিকের নিকট সম্পর্কীয় খাজাঞ্চি বাবু—দুজনেই একটু আশ্চর্য্য হয়ে উঠ্‌লেন। মন্নুর বাপ 'মুল' চালাত; আর মন্নু ছিল একটা বেশ ভাল 'মালকাটা'। অনেকদিন আগেকার কথা—তখন সবে মাত্র ধানবাদ-কাতরাস ব্র্যাঞ্চ রেলগাড়ি চলতে আরম্ভ হয়েছে—সেই সময় কাতরাস ষ্টেসনের মাইল তিনেক দূরে একটা ছোট কলিয়ারীতে মন্নুর বাপ কাজ কর্ত্তে আরম্ভ করে। বছরখানেক পরে সে মন্নু আর দুলারীকেও এনে সেই কলিয়ারীতেই লাগিয়ে দেয়। বাপ-বেটায় কয়লা কাট্‌ত, আর মন্নুর স্ত্রী দুলারী তাই টবে বোঝাই করে দিত। একদিন মন্নু আর দুলারী সেই কলিয়ারীর পুবের একটা সুঁদে কাজ কর্চ্ছিল; আর মন্নুর বাপ পশ্চিম দিকে মুল চালাচ্ছিল। ৮০ ফুট মুল চলেছে, এমন সময় হঠাৎ মুলের মুখের কাছের চাল্‌টা খানিকটে ধ্বসে গেল। ওভারম্যান আর ইনচার্জ্জ মহাশয় মুলের মুখে গিয়ে, চীৎকার করে মন্নুর বাপকে ছুটে বেরিয়ে আসতে বল্লেন। সে এসেও ছিল প্রায় মুলের মুখ পর্য্যন্ত,—এমন সময় সশব্দে তার মাথার উপর প্রায় বিশ ফিটখানেক একটা কয়লার চাপ পড়ে, তাকে চিরদিনের জন্য কয়লাকাটা হ'তে অব্যাহতি দিয়ে গেল। পাগলের মত হয়ে মন্নু গাঁইতি দিয়ে সেই স্তূপ কেটে সরাতে লাগ্‌ল; মাথার উপর তার প্রকাণ্ড ফাট,—সে কোন মুহূর্ত্তেই চাল ধ্বসে তাকে শুদ্ধ সমাধিস্থ করতে পারে। তার কিন্তু সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই। সমস্ত দিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর সে টেনে বের কল্লে একটা মাংসপিণ্ডমাত্র,—মাথাটার কোনও চিহ্নমাত্র নাই। তিন দিন সে সেই মাংসপিণ্ডটাকে বুকে ধরে ধাওড়ার মধ্যে শুয়ে ছিল। অবশেষে যখন সকলেই সেটাকে ফেলে দেবার জন্য তাকে বল্‌তে লাগ্‌ল, আর যখন তার মানসিক উত্তেজনাটাও একটু কমে এল, তখন সে সেটাকে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেল্লে।

ম্যানেজার বাবু তাকে তার পর সেই কলিয়ারীতে রাখ্‌বার অনেক চেষ্টা করলেন; কিন্তু সে ম্যানেজার বাবুর কথার উত্তরে সুধু বলেছিল, "বাবু, আমার মরবার দিন ঘনিয়ে এলে আবার কলিয়ারীতে আস্‌ব। তার আগে নয়। আর যদি আমায় কয়লার কুঠিতেই কাজ কর্ত্তে হয়, তবে তোদের এই কুঠিতেই—যেখানে আমার বাবা রইলেন সেই খানেই—আস্‌ব।" এর পর আর ম্যানেজারবাবু তাকে আট্‌কাবার কোন চেষ্টা করেন নি। সেও দুলারীর হাত ধরে ধীরে-ধীরে কুঠি ত্যাগ করে, নিজেদের গাঁয়ে এসে এতদিন চাষ করে সংসার চালাচ্ছিল।

(২)

"হ্যাঁ রে মন্নু, তোর মরবার দিন ঘনিয়ে এল না কি?" মন্নু ও দুলারীকে দেখে হাস্‌তে-হাস্‌তে খাজাঞ্চিবাবু মন্নুকে এই কথা জিজ্ঞাসা কর্ল্লেন। মন্নু কোনও উত্তর দেবার পূর্ব্বেই দৃপ্তা সিংহীর মত গর্জ্জে উঠে দুলারী বল্লে "খবরদার খাজাঞ্চিবাবু, যা' তা' কথা বোলো না বলে দিচ্ছি। তোমাদের লোক গিয়ে হাতে-পায়ে ধরেও মন্নুকে এতদিন তোমাদের কুঠীতে আনুতে পারে নাই, জান? আজ মন্নু ইচ্ছে করে এখানে কাজ কর্ত্তে এসেছে বলে তাকে পেয়ে বসেছ, কেমন? কিন্তু ভুলে যাও কেন, যে মন্নু রোজ ৫।৬ টব

মাল একলাই দিতে পারে, আর সে এখনও ইচ্ছে কল্লে অন্য যে কোনও কুঠীতে যেতে পারে। বড় বাড় হয়েছে তোমার? আমি কিন্তু বলে রাখছি, যদি কয়লা কাট্‌তে গিয়ে আমার মন্নুর গায়ে একটু আঁচড়ও লাগে, তবে এক গাঁইতিতে তোমার ভুঁড়ি ফেড়ে দেব।" দুলারী আরও অনেকগুলা কথা খাজাঞ্চিকে শুনিয়ে দিতে যাচ্ছিল; কিন্তু মন্নু তাকে ধমক্ দিয়ে বল্লে, "আঃ, কি করিস্ দুলারী, বাবুদের অমনধারা কথা বল্‌তে আছে? ছিঃ, তোর কি কিছু বুদ্ধি নেই?" তার পর সে ম্যানেজার ও খাজাঞ্চির দিকে চেয়ে বল্লে, "বাবু, যদি আমায় কাজ দেবার ইচ্ছে থাকে ত বল্, আর 'চিঠা' দে, আমি গুদাম থেকে গাঁইতি, ঝোড়া, আর মগ্‌বাতি নিইগে। হ্যাঁ, আমায় কিন্তু বাবু, বাবা যে ধাওড়াতে থাক্‌তেন, সেই ধাওড়াটা দিতে হবে।" এতবড় মালকাটা পাছে হাতছাড়া হয়ে যায়, সেই ভয়ে হাত কচ্‌লাতে-কচ্‌লাতে খাজাঞ্চিবাবু বল্লেন, "দেখ্ দুলারী, তুই বাপু তামাসাও বুঝিস্ না,—মন্নু আমাদের যত পুরান লোক, অত পুরান কি আর কেউ এ কুঠিতে আছে? ঘরবাড়ী ছেড়ে এই মাঠে পড়ে রইছি—আজ অনেক দিন পরে তোদের সঙ্গে দেখা,—তাই ঠাট্টা করে ও-কথা বলেছিলাম। যাক্, যখন ওটা তুই বুঝলি না, তখন আমি না হয় তোদের কাছে মাপ চাচ্ছি।" দুলারী উত্তরে বল্লে, "বাবু, আমরা বোকা চাষার ঘরের মানুষ,—তোমাদের বাবুদের ঠাট্টা চালাকী আমরা বুঝতে পারি না। যাই হোক, আর এমনতর 'অনুক্‌ূলে' কথা বলে মন্নুর সঙ্গে কখনও ঠাট্টা কোরোনা। ও বাবুদের ঠাট্টা বাবুদের সঙ্গেই কোরো।" ম্যানেজার বাবু ততক্ষণ গুদাম বাবুকে একখানি স্লিপে লিখে দিলেন, মন্নু যা' যা' চাইবে তাকে তাই যেন দেওয়া হয়। তার পর সেখানা মন্নুর হাতে দিয়ে বল্লেন, "এই নে, চিট্‌ লিখে দিলাম। আর তুই সেই সাবেক ঘরেই থাক্‌বি, সেটা খালি আছে। যা—এই একটা টাকা নিয়ে গিয়ে হাঁড়ি, চাল, ডাল সব কিনুগে। কিন্তু কাল থেকে খাদে নামা চাই। দশ নম্বরের পশ্চিমা সুঁদে তুই কাজ কর্বি। এখন যা।"

(৩)

পুরান মালকাটা যারা ছিল, তারা মন্নুকে পেয়ে খুবই খুসী হল। মন্নু বেশী কথা কইত না,—'হাঁড়িয়া' খেত না,—আর তাকে দেখলে বোধ হত, যেন সে দৈত্যদের বংশধর? পেশীবহুল হাতখানা দিয়ে যদি কাউকে সে ধর্ত্ত, তবে তার সেই দৈত্যের কবল হ'তে মুক্তিলাভ করা বড় সহজ হ'ত না। এহেন মন্নুকে পেয়ে তারা খুসী হবে না ত হবে কাকে পেয়ে? মাস-খানেকের মধ্যেই সে মাল্‌কাটাদের পঞ্চায়েতের নেতা হয়ে উঠ্‌ল; আর হ'ল সকলেরই 'গুরুজী'। সে মালকাটাদের মধ্যে রবিবারে 'হাঁড়িয়া' খাওয়া বন্ধ করে, লাঠি খেলা শেখাবার চেষ্টা কর্চ্ছিল। কিন্তু সব মালকাটা তার হাতে-পায়ে ধরে বল্লে, "গুরুজী, এটা কোরো না। তা'হলে আমরা মরে যাব। আমরা না হয় রবিবারে সকাল হতে বেলা দশটা পর্য্যন্ত লাঠি চালানো শিখ্‌বো; তার পর আমাদের ছুটী দিতে হবে।" উপায়ান্তর না দেখে, সে তাতেই রাজী হল। সেই হতে প্রতি রবিবারে সকালে সে সদলবলে আফিসের সামনে এসে সাক্‌রেদদের লাঠিখেলা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলে।

সে যে আবার কুঠীতে কেন এল, এ কথাটা তাকে বার-বার জিজ্ঞাসা করায়, সে উত্তরে বল্লে, "ঘরে খেতে পেতাম না, তাই আবার কয়লা কাট্‌তে এসেছি।" কিন্তু সেটা ঠিক সত্যি কথা নয়। আসল কথাটা হচ্ছে, সে প্রায়ই স্বপ্নে দেখ্‌ত যে, তার বাপ যেন তাকে বল্‌ছে, "মন্নু যদি আমার সঙ্গে মিল্‌তে ইচ্ছে থাকে,—যদি আমায় আবার দেখ্‌তে চাস্—তবে যে কুঠিতে আগে কাজ কর্চ্ছিলি, সেইখানে যা।" তাই সে কয়লা কাট্‌তে এসেছে। স্বপ্নে ওদের না কি খুব বিশ্বাস—আর মন্নুর, বাপকে দেখবার ইচ্ছাটাও ছিল খুব প্রবল।

মন্নু কয়লা কেটে যা উপায় কর্ত্তো, তা থেকে তাদের দুজনের খাওয়া-দাওয়া হয়েও প্রতি সপ্তাহেই কিছু-কিছু বাঁচতো। তার নিজের কোনও ছেলেপিলে ছিল না; সে প্রতি রবিবারে, নিজেদের খাওয়া-দাওয়ার পর যা বাঁচত, তা ধাওড়ার ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের বখ্‌রা করে দিত। আর যখন সেই শিশুগুলি মন্নুর কাছে পয়সা পেয়ে আনন্দে লাফাতে লাফাতে তাদের মায়ের কাছে চলে যেত, তখন মন্নু দুলারীকে নিয়ে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে উৎফুল্ল-নয়নে তাদের দিকে চেয়ে থাকত।

সেই কলিয়ারীতে প্রায় পাঁচ ছ'মাস হল একটা 'পিট' খুঁড়তে আরম্ভ করা হয়েছে। পুরো দমে তিন পাল্লা কাজ চল্‌ছে। এঞ্জিনের ঘস্-ঘস্ শব্দে, আর ব্রারুদ দিয়ে পাথর

ফাটানোর শব্দে কাণে তালা লাগ্‌বার উপক্রম। প্রায় ৪৮ ফিট গর্ত্ত হয়ে গিয়েছে,—আরও ফিট ৩৫ হলে কয়লা পাওয়া যাবে। এমন সময় হঠাৎ জল বেরিয়ে পড়ল। যত জল তুলে ফেলে দেওয়া হয়, ততই আরও জোরে জল বেরিয়ে 'পিটে'র প্রায় অর্দ্ধেক ভরে যায়। কুঠীর সকল লোক যেমন জল মার্ত্তে বদ্ধপরিকর, জলও যেন তেমনিই তাদের শ্রমরাশি কর্ত্তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মাস দুই অক্লান্ত পরিশ্রমের পর চারিধার গেঁথে দিয়ে জল বন্ধ করা গেল। তার পর আবার পাথর কাট্‌তে আরম্ভ হল। মন্নু রোজ এই পিটে নাম্‌ত, আর সব কাজেই সে ছিল অগ্রণী। সকলে উঠে এলেও সে প্রায় আধঘণ্টাখানেক সেই পিঠের ভেতর থাকত। কারণ, ম্যানেজারবাবু তাকে হুকুম দিয়েছিলেন, যেন সে সেই পিটের কোথায় কি খারাপ আছে, সে সমস্ত রোজ রোজ দেখে তাঁকে রিপোর্ট করে। একদিন বেলা প্রায় ২॥০ টার সময় সে একলাই নেমে গিয়ে পিট্‌টা দেখ্‌ছিল। বিরক্তিভরে এঞ্জিন-খালাসী তাকে নামিয়ে দিয়ে ব্রেক্ টেনে রেখে ধাওড়ায় খেতে গিয়েছিল। সেখানে ছিল তার ছেলে—বছর বার বয়স হবে। মিনিট পনের খাদের ভিতর থাকবার পর হঠাৎ মন্নুর আলোটা নিবে গেল। হাতড়াতে হাতড়াতে সে আলোটা নিয়ে আবার তাকে জ্বালবার জন্য একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালল। জ্বালবামাত্র সেটাও নিবে গেল। ক্রমে-ক্রমে প্রায় দশ বারোটা কাঠি জ্বালামাত্রই নিবে গেল। ততক্ষণে সে যেন বুঝতে পার্‌লে, তার দম আট্‌কে যাচ্ছে; নিঃশ্বাস নিতে পার্চ্ছে না। এক মুহূর্ত্তে সে সমস্ত বুঝতে পারলে। 'পিটে' carbon dioxide গ্যাস হয়েছে,—আর সেই গ্যাস এখন আস্তে-আস্তে উপর দিকে উঠে তার দম বন্ধ করে দিচ্ছে। মাতালের মত সে হাতড়ে-হাতড়ে গিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে দিলে, টব নাবিয়ে দেবার জন্যে। কিন্তু নামাবে কে? খালাসীর ছেলেটা পিটের মুখে এসে চীৎকার করে বল্লে, "গুরুজী টব নামাতে বলছ! বাবাকে ডেকে দোব কি?" মন্নুর তখন আর কথা কইবার ক্ষমতা নাই। সে কোনও উত্তর দিতে পারলে না। তার সবল দেহটা থরথর করে তখন কাঁপছিল, আর বুকের ভেতরটা নিঃশ্বাস নেবার ব্যর্থ প্রয়াসে কেঁদে-কেঁদে উঠছিল। আবার ঘণ্টা-ধ্বনি, এবার আরও জোরে—যেন মন্নুর হৃদয়ের কথাগুলি ঘণ্টাধ্বনিতে জানিয়ে দিচ্ছে "ওগো দাও, দাও, টব নামিয়ে। এমন করে মেরোনা—দাও, দাও।" দু-তিনবার গুরুজীকে ডেকে সে যখন কোনও উত্তর পেলে না, কেবল শুনতে পেলে ঘণ্টাধ্বনি, তখন সে দৌড়ে গিয়ে বাপকে ভাতের থালার কাছ থেকে টেনে উঠিয়ে বল্লে, "বাবা, শীগ্‌গির এস, —শীগ্‌গির। গুরুজীর বোধ হয় কিছু হয়েছে। আমি যতবার জিজ্ঞাসা করলাম, টব নামাবো কি না, ততবারই গুরুজী কোন উত্তর না দিয়ে কেবল ঘণ্টা বাজাচ্ছিল; এখনও বোধ হয় বাজাচ্ছে।" এঞ্জিন-খালাসী দ্রুতপদে এসে সেই পিটের মুখে পৌঁছিল। তার পর ডাক্‌লে "গুরুজী"। ভিতর হতে মন্নু গায়ের সমস্ত শক্তিটা যেন এক লহমার জন্য হাতে এনে হাতুড়িটা দিয়ে লোহার পাতে আঘাত কল্লে "ঢং, ঢং"। উপর হতে খালাসী ঘণ্টার উত্তর দিলে; আর কোনও সাড়া নেই। ভয়ে খালাসী তার ছেলেকে ম্যানেজার বাবুর কাছে পাঠিয়ে দিল; বল্লে, যেন তিনি সংবাদ পাবামাত্রই সেখানে আসেন।

(৪)

ম্যানেজার বাবুর চাকরের অসুখ হয়েছিল বলে দুলারী সেদিন তাঁর বাসনগুলা মেজে দিচ্ছিল, আর মাঝে-মাঝে বাবুর ছোট ছেলেটীর সঙ্গে গল্প করছিল। এমন সময় খালাসীর ছেলেটা একেবারে ম্যানেজার বাবুর বাসার ভিতর ঢুকে চেঁচিয়ে বল্লে "ম্যানেজার বাবু, দৌড়ে আসুন; গুরুজীর পিটের ভেতর কি হয়েছে। খানিক আগে কেবল ঘণ্টা বাজাচ্ছিল; আমি এত করে ডাকলাম, তার কোন উত্তর দিলে না। থেকে থেকে খালি ঘণ্টায় ঘা দিচ্ছিল। শীগ্‌গির আসুন।" শোনা মাত্রই ম্যানেজারবাবু ছুটে বেরিয়ে এলেন। আর দুলারী 'ঝনাৎ' করে একখান থালা ফেলে দিয়ে খালাসীর ছেলেটাকে চেপে ধরে বল্লে "কি বল্লিরে সোমরা, আমার মন্নু খাদের ভেতর মরছে?" তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সোমরা ছুটে আস্‌তে-আস্‌তে দুলারীকে বল্লে "শীগ্‌গির আয়—বোধ হয় গুরুজী এতক্ষণে মরে গিয়েছে।"

তারা পিটের কাছে এসে যখন দাঁড়াল, তার আগেই ম্যানেজারবাবু ও কুঠির অন্যান্য সব বাবু সেখানে এসে পৌঁছেছেন। গ্যাস ততক্ষণ পিটের মুখের কাছ পর্য্যন্ত উঠেছে। একটু পরীক্ষা করেই ম্যানেজার বাবু বুঝতে

পারলেন যে মন্নু Carbon dioxideএ নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এতক্ষণ মারা গেছে। দুলারীকে উন্মাদিনীর ন্যায় আসতে দেখে ম্যানেজার বাবুর আজ্ঞায় পাঁড়ে তাকে আটকে ফেল্লে। সে ম্যানেজার বাবুর দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাইবামাত্রই তিনি বল্লেন "দুলারী ঘরে চ'।" দুলারী উত্তরে শুধু একবার পিটের দিকে আর একবার তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে "বাবুজী, আমার মন্নু? ঐ দেখ, এখনও ঘণ্টা বাজ্‌ছে ঢং ঢং। তোল বাবুজী ওকে"—ম্যানেজারবাবু বল্লেন, "না দুলারী, সে তার বাপের কাছে চলে গেছে। তুই আয়, আমার সঙ্গে বাড়ী চল্!" ম্যানেজারের দিকে একটু ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে সে চীৎকার করে বল্লে, "কি, মন্নুকে ফেলে আমি ঘরে যাব? ঐ শোন, মন্নু আবার ঘণ্টা বাজাচ্ছে। মন্নু, মন্নু, এরা ডাকাত, তোকে তুলতে টব নামাচ্ছে না, এরা খুনে। দাঁড়া, আমিই তোকে তুলব।" কথার সঙ্গে সঙ্গেই সে একটানে পাঁড়ের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই পিটের ভেতর। সকলেই নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শুধু মাঝে মাঝে পিটের ভেতর হতে শোনা যেতে লাগল দুলারীর কণ্ঠস্বর—"মন্নু, মন্নু আমার, এই দেখ্ আমি এসেছি। একবার কথা বল্ লক্ষ্মীটী আমার।"

গাঙ্ যে মোরে বোলায় *

শ্রীকামিনী রায় বি-এ

(১)

গাঙ্ যে মোরে বোলায়, মাগো, গাঙ্ মোরে বোলায়
"আয়রে মানিক, দোল খাবিরে, ধলা ঢেউ দোলায়।"
ঐ যে—ঢেউর পাছে ঢেউ, তোরা দেখ্‌ছ না কি কেউ?
মাথা তুল্যা, হাঁত বাড়ায়্যা, গাঙ্ মোরে বোলায়—
মাগো, গাঙ্গ যে মোরে বোলায়!

(২)

ঘুম ভাঙ্গল দুফর রাইতে, বুকটা ধড়ফড়ায়,
দুই চক্ষু আন্ধার ঠেল্যা, গাঙ্গের দিকে চায়,
বাঁশের খুঁটি নড়্যা ওঠে, বেড়ার বেতের বাঁধন ছোটে,
তোমার কাঁদন কাঁটার মত, ফোটে আমার গায়,
এমন কালে বোলায় গাঙ্গ—"আয়রে মাণিক, আয়।"
মাগো, গাঙ্গ যে মোরে বোলায়!

(৩)

কালাই নদীর জলে আস্‌ছে সমুদ্দুরের বান
হাজার মশাল মাথায় লৈয়া, করে কার সন্ধান?
মাগো,—তোর এই ভাঙ্গা ঘরে, আর কারে তালাস করে?
এক্‌লা মুই বাপের পুত, মোরেই বুঝি চায়।
মাগো, গাঙ্গ যে মোরে বোলায়।

(৪)

আমি যখন পুছি তোরে, কথায় বাপজান,
তুই কও যে পোড়া গাঙ্গে, গেছে তান পরাণ।
তাইথে তুই ডরে মোরে, ধর্যা রাখ ঘরে,
তাইতে মোরে যাইতে দেও না, রাঙ্গা মেঞার নায়।
তুইসেন মোরে যাইতে দেও না, কত পোলা যায়।
মাগো, গাঙ্গ যে মোরে বোলায়!

---

* বাখরগঞ্জের কোন মুসলমান মাঝি ঝড়ে নৌকা-ডুবি হইয়া মারা যাইবার পর, তাহার বিধবা পত্নী বালক পুত্রকে নৌকায় মাঝির কাজ শিখিতে দিত না। একরাত্রে যখন সমুদ্রের সন্নিহিত নদীতে জোয়ারের জল প্রবেশ করিতেছে, বানের ডাকে জাগিয়া উঠিয়া বালক এইরূপ বলিতেছিল।

বোলায়=ডাকে। ধলা=সাদা। তুল্যা=তুলিয়া, তুলে। বাড়ায়্যা=বাড়াইয়া, বাড়ায়ে। দুফর রাইতে=দ্বিপ্রহর রাত্রে। আন্ধার=অন্ধকার। ঠেল্যা=ঠেলিয়া, ঠেলে। নড়্যা=নড়িয়া, নড়িয়ী, নড়ে। ধর্যা=ধরিয়া, ধরে ইত্যাদি—অসমাপিকা ক্রিয়াগুলির ইয়া অংশ তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করিলে যেরূপ শোনায়, অথবা সংস্কৃত ও হিন্দীতে য্য যেরূপ উচ্চারিত হয় সেইরূপ। বলা বাহুল্য, পূর্ব্ববঙ্গে ঁ এবং ড় ঠিক উচ্চারিত হয় না। কিন্তু অস্পষ্টতা দোষ পরিহারার্থ এগুলির শুদ্ধ রূপ রাখা গিয়াছে।

লৈয়া=লইয়া, লয়ে। কথায়=কোথায়। তান=তাঁর। তাইথে=তাইতে, সেইজন্য। তুইসেন=তুই কেবল। পোলা=ছেলে। 'দেওনা' পশ্চিমবঙ্গেও দ্যাওনা উচ্চারিত হয় বলিয়া বানান পরিবর্ত্তিত হইল না।

সর্ব্বনাস্তা=সর্ব্বনেশে। ছুট্যা=ছুটে। ভাস্তা=ভেসে। উড়ায়্যা উড়াইয়া, উড়ায়ে। বেউথা=বৃথা। কম্‌=করিব। কাইল=আগামী কল্য, কাল।

(৫)

সেই সর্ব্বনাশ্যা ঝড়ে যখন, সমুদ্দুরের ঢেউ,
ধাইয়া আইল দেশে, ঘরে রৈলনা তো কেউ,
মরণ যখন ডাকে, যে যেখানে থাকে,
ছুটা আসে, ভাস্যা আসে, উড়ায়্যা আসে পা া,
হাজির হৈয়া সেলাম বাজায়, বেউথা ধর‍্যা রাখা ;
বেউথা যাইতে দেওনা মোরে, রাঙ্গা মেঞার নায়।
মাগো, গাঙ্গ যে মোরে বোলায় !

(৬)

আমি যখন নায়ে নায়ে, কমু আসা যাওয়া,
বাপ্‌জান যদি দোওয়া করে, থাম্‌বে তুফান হাওয়া,
মাগো, ধরছি তোর পায়ে, কাইল যাইতে দিও নায়ে,
শোন্ তো মা, ও কার গলা—আয়রে মাণিক আয়।"
মাগো, গাঙ্গ কি মোরে বোলায় ?

(৭)

আমি যখন সারেঙ্গ হমু, চালামু জাহাজ,
তোমার দিল্‌টা ঠাণ্ডা হৈবে দেখ্যা মোর কাজ।
আমার মনে লয়, বাপজান মোরে কয়—
"মায়ের দুঃখ ঘোচাবি তো ঘর ছাড়্যা আয়।"
মাগো, আবার শোনা যায়—
"আয়রে মাণিক, দোল খাবিরে, ধলা ঢেউ দোলায়।"
গাঙ্গই মোরে বোলায়, না কি বাপজানই বোলায় ?
মাগো, বাপজানই বোলায় !

ফকীরের কুকুর !

জার্ম্মানীর ফকীরের হাল দেখে লয়েড্ জর্জ্জ নিশ্চিন্ত হ'য়েছিলেন, কিন্তু ফকীরের পাশে আবার একটা ভাল্লুক (রুষিয়া) দেখে তিনি ভীত হ'য়ে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "ওটাকে আবার সঙ্গে নিচ্ছ কেন ?"

ফকীর বল্লে "কি জানেন, ফকীরের একটা কুকুর সঙ্গে রাখা দরকার !" (Evening News, London)

বিদ্রোহের ফল !

রাজতন্ত্রমূলক শাসন-প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে রুষেরা দেশে যে সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা কর্ব্বার চেষ্টা কর্‌ছে, তার ফলে ভীষণ অরাজকতা আর দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে তাদের আজ এই দুর্দশা হ'য়েছে !

(American Relief Committe for Russia)

হিন্দুর মুসলমান দেবতা

শ্রীসুকুমার দত্ত এম্-এ, বি-এল্

সাধারণ কথায় বলে, হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতা। এই দেবতাসজ্বের মধ্যে কোন্‌টি মুসলমানদিগের নিকট হইতে নেওয়া,—এ কথা আপাততঃ একটু আশ্চর্য্য রকমের শুনায় বটে। কিন্তু অবধান করুন।

স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা এই তেত্রিশকোটি দেবতার মধ্যে একজনের পরিচয় পাই—তিনি সত্যনারায়ণ। অবশ্য এই সত্যনারায়ণ বৈদিক কিম্বা প্রাচীন পৌরাণিক দেবতা-মণ্ডলীর অন্তর্গত নন, কিন্তু সত্যনারায়ণের পূজা না কি ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই প্রচলিত। বাঙ্গালা দেশে ত ঘরে-ঘরে সিন্নি দিয়া সত্যনারায়ণের পূজা হয়। এই সত্যনারায়ণ দেবতার বিগ্রহ-রূপটি কি, তাহা স্কন্দপুরাণে, কি অন্য কোথাও বর্ণিত নাই। কিন্তু স্কন্দপুরাণের ব্রতকথায় সত্যনারায়ণের আবির্ভাব ও সত্যনারায়ণ পূজা প্রচারের পৌরাণিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। গল্পটি বেশ মনোরম বটে। কথিত আছে, কাশীপুর গ্রামে একটী নির্ধন ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকের নিকট সত্যনারায়ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে আবির্ভূত হন। এই ভিক্ষুক ব্রাহ্মণই প্রথম সত্যনারায়ণের পূজার প্রবর্ত্তন করেন। তার পর এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট হইতে কাঠুরিয়ারা পূজা-পদ্ধতি শিক্ষা করেন। গল্পের শেষাংশে জনৈক বণিক, তাহার কন্যা কলাবতী, কলাবতীর স্বামী ও রাজা চন্দ্রকেতু বিষয়ক একটি গল্পচ্ছলে সত্যনারায়ণের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

এই ত গেল সত্যনারায়ণের পৌরাণিক বিবরণ। এই সত্যনারায়ণ দেবতা সম্বন্ধে বাঙ্গালা দেশে এক পাঁচালি-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহা নিতান্ত স্বল্পপরিসর নয়। সত্যনারায়ণের পাঁচালি-সাহিত্য সম্বন্ধে প্রধানতঃ অনুসন্ধান করিয়াছেন—চট্টগ্রামের মুন্সী আবদুল করিম বিদ্যা-বিশারদ মহাশয়। তিনি নানা স্থানে হাতের লেখা প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথির অন্বেষণ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের অনেক মালমসলা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার সঙ্কলিত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রকাশিত প্রাচীন পুঁথির বিবরণে আপনারা অনেক নূতন তথ্য পাইবেন। তিনি অনুসন্ধান করিতে-করিতে একখানি প্রাচীন সত্যনারায়ণের পুস্তক প্রাপ্ত হন। তিনি ঐ পুস্তকের বিবরণ তাঁহার ১৩২০ সালে প্রকাশিত 'প্রাচীন পুঁথির বিবরণের' ৯১ পৃষ্ঠায় দিয়াছেন। তাহাতে তিনি লেখেন, "সত্যপীরের মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক গ্রন্থ-রাজির মধ্যে ইহা একখানি অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তক বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থকার শ্রীকবি বল্লভ। পুঁথিখানি এ দেশী সম্পত্তি নহে। মুর্শিদাবাদ হইতে বৈষ্ণব-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সুলেখক শ্রীযুক্ত রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী মহাশয় সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। ইহাতে এমন কয়েকটি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহা এ দেশে কখনও শুনি নাই, বা কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় নাই। সত্যপীরের মাহাত্ম্য বর্ণনাচ্ছলে মদন সুন্দরের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। উহা বড়ই সুন্দর ও কৌতুহলোদ্দীপক। এই পুঁথির বয়স ১৬৪ বৎসর। অবশ্য কবে রচনা হয়, তাহা জানা যায় না। শ্রীকবি বল্লভের এই পুস্তকখানি দুই বৎসর পরে ১৩২২ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ হইতে মুন্সী বিদ্যা বিশারদ মহাশয় সম্পাদন করেন।

পুস্তকের ভূমিকায় মুন্সী সাহেব সত্যনারায়ণের পূজায় হিন্দু-ধর্ম্ম ও মুসলমান-ধর্ম্মের সংযোগ নির্দ্দেশ করেন। অবশ্য তিনি ভূমিকায় দুইটি theoryও দিয়াছেন,—প্রথমতঃ তিনি বলেন, সত্যনারায়ণের পূজা আকবরের প্রবর্ত্তিত দীন এলাহি ধর্ম্মের পরিণতি; দ্বিতীয়তঃ, সত্যনারায়ণ সত্যপীরের রূপান্তর মাত্র, এবং সত্যপীর সম্ভবতঃ বোগদাদের মুসলমান সাধক মনসুর—যিনি অনল হক্ বা আমি সত্য, এই ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। মুন্সী সাহেবের এই দুইটি theoryর বিস্তৃত সমালোচনা এই প্রবন্ধের প্রসঙ্গের বহির্ভূত। সত্যনারায়ণ সম্বন্ধে বাঙ্গালার প্রাচীন পাঁচালি-সাহিত্য হইতে কি জানা যায়, তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করিব।

প্রথমে এই পাঁচালি-সাহিত্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে চাই। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও লোকের ধারণা ছিল যে, বাঙ্গালা-সাহিত্য নিতান্তই আধুনিক। কিন্তু সে ধারণা এখন সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র সেন, নগেন্দ্রনাথ বসু, বসন্তরঞ্জন রায়, সতীশচন্দ্র রায়, স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী, মুন্সী আবদুল করিম প্রভৃতি মহোদয়গণের চেষ্টায় বাঙ্গালা-সাহিত্যের লুপ্ত ইতিহাসের অনেকটা সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। এই লুপ্ত এবং স্বল্পপরিচিত বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে এক শ্রেণীর সাহিত্য বাঙ্গালীর নিকট বিশেষ প্রিয় হইবার কথা—তাহা পাঁচালি-সাহিত্য। বাঙ্গালা দেশে নানা ধর্ম্মমতের নানা বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বহু প্রকার দেবতা ও পূজা-পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন; এবং আশা করা যায়, তাঁহার মৌলিক অনুসন্ধান ফলবান্ হইবে। কিন্তু এক শ্রেণীর দেবতা যেন কোন ধর্ম্ম-মতের অপেক্ষা না রাখিয়াই বাঙ্গালী হৃদয় হইতে স্বতঃ আবির্ভূত হইয়াছে—তাহারা লৌকিক দেবতা। তাহাদের কৌলীন্য নাই, বংশমর্য্যাদা নাই। স্মৃতিকারগণ তাহাদের জন্য মন্ত্রাভিষেক নিযুক্ত করেন নাই, মন্দিরে তাহাদের আরতি হয় না, তাহাদের জন্য যজ্ঞাহুতি নির্দ্দিষ্ট নাই। কিন্তু যেখানে বাঙ্গালী মাতা ব্যাকুল হৃদয়ে বিদেশগত পুত্রের জন্য বিষন্ন, উদ্বিগ্ন হইয়া বসিয়া আছেন, সেইখানে এই লৌকিক দেবতাদের একজন ষষ্ঠী-রূপে আবির্ভূত। যেখানে অমঙ্গলের আশঙ্কায় বাঙ্গালী ঘরের গৃহলক্ষ্মী কাতর প্রাণে মঙ্গল কামনা করিতেছেন, সেখানে শনিদেবতা উপস্থিত। যেখানে অল্পপ্রাণ বাঙ্গালী ঘরে বসিয়াই সুখ, সমৃদ্ধি ও অর্থের কামনা করিতেছেন, সেখানে সত্যনারায়ণ আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছেন। এই সকল লৌকিক দেবতাগণ সংখ্যায় নিতান্ত কম নহেন—তাঁহারা বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের নানা আশা-আকাঙ্ক্ষার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বাঙ্গালী গৃহকোণে বা বহিঃ-প্রাঙ্গণে তাঁহাদের পূজা করিয়া থাকেন। পূজায় সমারোহ বিশেষ কিছুই নাই। কিন্তু পূজার একটি অঙ্গ সাহিত্যিকের নিকট বিশেষ কৌতূহলপ্রদ—তাহা পাঁচালি-পাঠ। লৌকিক দেবতাগণের পূজার এই অঙ্গটি অবলম্বন করিয়া প্রাচীন বাঙ্গালার একটা বিশেষ সাহিত্যের স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। অধিকাংশ লৌকিক দেবতারই পাঁচালি আছে—যথা, শনির পাঁচালি, মনসার পাঁচালি, শীতলার পাঁচালি, সত্যনারায়ণের পাঁচালি প্রভৃতি। যে দেবতার যে পাঁচালি, তাহাতে সেই দেবতার মহিমা-কীর্ত্তনচ্ছলে একটি আখ্যান দেওয়া আছে। তাহাতে অনেক স্থলে পূর্ব্বেকার বাঙ্গালীর সামাজিক আচার-ব্যবহার ও গার্হস্থ্য জীবনের অতি নিখুঁত ছবি পাওয়া যায়। পাঁচালি সাহিত্যের এই দিক্‌টা বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। পাঁচালির আখ্যানগুলির মৌলিক ভাব একই ছাঁদের—হয় ত কোন সওদাগর বাণিজ্যে গিয়া বিপদ-আপদে পড়িয়াছেন—দেবতা তাঁহাকে রক্ষা করিলেন, কিম্বা কোন দেবতার শাপে কেহ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন, দেবতা তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন; কিম্বা গার্হস্থ্য জীবনে কেহ নানা অশান্তি ও শোক-দুঃখের মধ্যে পড়িয়াছেন, দেবতা তাঁহার মঙ্গল-বিধান করিলেন। পাঁচালির প্রতিপাদ্য দেবতাটী ঠিক গ্রীক নাটকের Deus ex machinaর কাজ করিতেছেন।

সত্যনারায়ণ যদিও স্কন্দপুরাণে স্থান পাইয়া কৌলীন্য-মর্য্যাদা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবপক্ষে তিনি বাঙ্গালীর লৌকিক দেবতাদের মধ্যেই একজন। স্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ড বোধ হয় খুব আধুনিক। এমন কি, বাঙ্গালীর বৈষ্ণব-সাহিত্যে,—ইহা অপেক্ষা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ত কথাই নাই—সত্যনারায়ণের কোন উল্লেখ নাই। অথচ বাঙ্গালীর ঘরে-ঘরে সত্যনারায়ণের পূজা। আরও দেখা যায় যে, সত্যনারায়ণের পাঁচালিগুলি সবই স্কন্দপুরাণের আখ্যান হইতে আসে নাই,—স্কন্দপুরাণের দেবতাকেই যে পাঁচালিকারেরা আদর্শ ধরিয়াছিলেন, তাহা মোটেই মনে হয় না; বিশেষতঃ শ্রীকবি বল্লভের পাঁচালি স্কন্দপুরাণকে একেবারে ছাড়াইয়া গিয়াছে, যদিও কবিবল্লভ বলিতেছেন—

"বেদ বিধিমত বল্লভ গান গীত,
হইয়া ব্রাহ্মণের দাস।"

অধিকাংশ সত্যনারায়ণের পাঁচালিতে স্কন্দপুরাণের সঙ্গে একটি প্রধান বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়—তাহা এই যে স্কন্দপুরাণে সত্যনারায়ণ ব্রাহ্মণবেশে আবির্ভূত হন, কিন্তু পাঁচালিতে তিনি মুসলমানের বেশে আবির্ভূত। শ্রীকবি বল্লভের সত্যনারায়ণের পুঁথিতে তাঁহার আবির্ভাবের বিবরণ এই প্রকার। সদানন্দ বিনোদ সদাগর নামক এক বণিককে রাজ-আজ্ঞায় বিদেশে রওনা হইতে হইল। যাইবার সময় তিনি সুমতি ও কুমতি নামে দুই স্ত্রীকে তাঁহার ভ্রাতা মদনসুন্দরের হস্তে ন্যস্ত করিয়া গেলেন। অদৃষ্টের ফেরে সদানন্দের বিদেশে কারাবাস ভোগ হইল। সে খবর তাঁহার বাড়ীতে কেহই জানিতে পারিল না। এদিকে সুমতি কুমতি স্বামীর কল্যাণার্থ ভক্তির সহিত নিত্য গঙ্গাস্নান ও শিবপূজা করিতে থাকিলেন। শঙ্কর তাঁহাদের হৃদয়ের ভাব জানিতে পারিয়া, একদিন গঙ্গাতীরে মুসলমান ফকিরের বেশে তাঁহাদের নিকট দেখা দিলেন—

"এইরূপে প্রতিদিন পূজে মৃত্যুঞ্জয়।
সত্যপীর নারায়ণ জানিল হৃদয়॥
কালীয়া দিস্তার শিরে ছেঁড়া কাঁথা গায়।
গঙ্গার কিনারে খাড়া হইল খোদায়॥"

শ্রীধর সত্যনারায়ণের সম্মুখীন হইয়া প্রণাম করিলে, তিনি হিন্দিতে তাহা-

Left to fate

কালের কবলে

শিল্পী—শ্রীযুক্ত যামিনী রায়

শ্রীযুক্ত বিশপতি চৌধুরী লিখিত চিত্র-প্রদর্শনী দ্রষ্টব্য

BHARATVARSHA HALFTONE & PTG. WORKS.

দের আশীর্ব্বাদ করিয়া, স্বামীর প্রত্যাগমনের জন্য সত্যপীরের সির্ণি দিতে উপদেশ দিলেন—"খোদায় কহেন ছুহে শুন মোর বাণী। সিতাবি করহ সত্যপীরের সিরিণী॥" আদেশ শুনিয়া ত সুমতি কুমতির চক্ষুস্থির। শেষে মুসলমান দেবতার পূজা করিতে হইবে!

"রাম রাম করি ছুহে কর্ণে দিল হাত।
তিনবার স্মরয়ে ঠাকুর জগন্নাথ॥
কোথাকার ফকির দেখ ছেণ্ডা কাঁথা গায়।
পীরের সিরিণী দিয়া জাতি নিতে চায়॥
কালাম কিতাব কোন কালে নাহি জা'নি।
গন্ধ বণিক হয়্যা হব মুছলমানি॥"

অতঃপর ফকির-বেশী সত্যনারায়ণ ঠাকুর সহসা শিবের রূপ ধারণ করিয়া সকলকে চমকিত করিয়া দিলেন—'সাক্ষাতে হইলা পীর মহেশ ঠাকুর'। তার পর সত্যনারায়ণের কৃপায় বিনোদ সওদাগরের কারাবাস-মোচন, ও ইতিমধ্যে মদনসুন্দরের নানা ক্রিয়া-কলাপের বর্ণনা আছে। পাঁচালির প্রথমত সত্যনারায়ণ আগাগোড়া Deus ex machinaর কাজ করিতেছেন; কিন্তু তাঁহার পোষাক ও কথাবার্ত্তা মুসলমানের মত—মাথায় পাগড়ী ও মুখে হিন্দি বাত্। যথা—মদনসুন্দর যখন রাজকন্যা লইয়া বাসর-গৃহে সুরত-প্রসঙ্গে নিযুক্ত আছেন, তখন সত্যনারায়ণ তাঁহাকে কারাবদ্ধ ভ্রাতার প্রতি কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া স্বপ্নাদেশ দিতেছেন—

"অচেতন নিদ্রা হল্য মদন সুন্দর।
দিলে গোসা হইল সাহেব পোকাম্বর॥
শুন রে বেইমান হিন্দু বাত্ কহু তোরে।
কত নিদ্রা যাও তুমি পুষ্পের মন্দিরে॥
রাজকন্যা কোলে করি দিলে হল্যে বোধ।
গর্দ্দান তুড়িব তোর শুন————————॥"

পাঁচালির লেখক শ্রীকবি বল্লভ হিন্দি ভাষায় বিশেষ পটু নন, তথাপি যথাসাধ্য সত্যনারায়ণের মুখ দিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দি বাত্ ঝাড়িয়াছেন। সত্যনারায়ণের মুসলমানত্ব দেখানই তাঁহার চেষ্টা,—যদিও তিনি নিজেকে ব্রাহ্মণের দাস বলিয়া পরিচয় দিতেছেন।

এই গেল শ্রীকবি বল্লভের পাঁচালি। তার পর ধরুন, শঙ্করাচার্য্যের পাঁচালি। শঙ্করাচার্য্যের পাঁচালি আখ্যানভাগে অনেকটা স্কন্দপুরাণের অনুসরণ করে বটে, কিন্তু স্কন্দপুরাণে সত্যনারায়ণের মুসলমানত্বের নাম-গন্ধ নাই, অথচ শঙ্করাচার্য্য স্কন্দপুরাণের অনুসরণ করিয়াই সত্যনারায়ণের মুসলমানত্ব স্বীকার করিয়াছেন।—'দয়ালু হইয়া মনে সত্যনারায়ণ। ফকির-বেশেতে দিলেন দরশন॥' এবং তিনি রাম-রহিমের একত্ব প্রচার করিলেন—

"ফকির বলেন দ্বিজ যাহ নিজ পুর।
আমারে পুজিলে তব দুঃখ যাবে দূর॥
দ্বিজ বলে নিত্য পূজি শিলা নারায়ণ।
তাহা ভিন্ন না করিব যবনাচরণ॥
ফকির কহেন আসি শুন দ্বিজবর।
পুরাণ কোরাণ কিছু নহে মতান্তর॥
যেই রাম সে রহিম নাম এক হয়।
ত্রিভুবনে নাহি দুই জানিবা নিশ্চয়॥
বলিতে বলিতে কথা অখিলের নাথ।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম হৈলা চারি হাত॥"

শঙ্করাচার্য্যের লিখন-ভঙ্গীতে বোঝা যায় যে, তিনি সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ; কিন্তু পাঁচালির শেষে তিনি মুসলমানদের মঙ্গল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন—

"শঙ্করাচার্য্যের মত প্রবন্ধ প্রাচীন।
অতঃপর বল সবে আমিন আমিন॥"

তার পর রামেশ্বরী পাঁচালি। এই পাঁচালিখানি অন্যান্য পাঁচালি হইতে বড়। গল্পটি স্কন্দপুরাণের আখ্যানের অনুকরণ না হইলেও, অনুসরণ বটে। তবে পাঁচালিকার গল্পটির অনেক নূতন ডালপালা বাহির করিয়াছেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, অধিকাংশ পাঁচালিতেই গল্পোল্লিখিত ব্যক্তিগণের নামের সহিত স্কন্দপুরাণের নামগুলির মিল হয় না। রামেশ্বর স্কন্দপুরাণের অনুসরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সত্য-নারায়ণের উপর শঙ্করাচার্য্যের মত মুসলমানত্ব আরোপ করিয়াছেন, এবং সত্যনারায়ণের মুখ দিয়া শঙ্করাচার্য্যেরই মত রাম-রহিমের একত্ব প্রচার করিয়াছেন। তিনি যদিও নিজেকে 'দ্বিজ রাম' বলিয়া ভনিতা করিয়াছেন, কিন্তু সকল হিন্দু দেব দেবী, অপ্সরী, কিন্নরী, ডাকিনী, যোগিনী, এমন কি ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনীর বন্দনা করিয়া অতঃপর রামরূপ রহিমের বন্দনা করিয়াছেন—

"অতঃপর বন্দিমু রহিম রামরূপ।
ত্রিদশের নাথ বন্দ ভুবনের ভূপ॥
কোরাণ কেতাব আর কলিমা সংহতি।
সুবিধা পীরের পায় প্রচুর প্রণতি॥"

গ্রন্থারম্ভে এইরূপ উদারতা দেখাইয়া, সত্যনারায়ণের মুসলমান রূপে আবির্ভাবের কারণ নির্দ্দেশ করিলেন এই—

"কলিতে যবন দুষ্ট হিন্দুকে করিতে নষ্ট, দেখিয়া রহিম হইল রাম।

* * * *

দ্বিজবরে দিতে বর, হন্তি হলেন সত্বর, শ্রীমাধব হইলেন পীর।
ফকিরের সাজে, জগতে বিরাজে, অদ্ভুত কৃষ্ণের শরীর॥"

তৎপর সত্যনারায়ণ ঠাকুর লম্বা চওড়া বহুৎ হিন্দিবাত্ বলিয়া ব্রাহ্মণকে সত্যপীরের পূজা করিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ ত সত্যপীরের পূজা করিতে হইবে শুনিয়া প্রমাদ গণিলেন—

"তাহা সত্যপীর মেফ্রি তাহা সত্যপীর
তেরা দুঃখ দূর কর কহেন ফকির॥
ঐসি কুছ হুমুর বাতলায়ে দেহ তোর।
কিয়া পিছে সেতাব খায়ের খুব হোর॥

জেস্কো তেঞি যো কহেগা সেই হোগা সহি।
পীর বরাবর হোকে কহকে এহি॥
দ্বিজ বসে কহিলেন দেওয়ান মহাশয়।
যবনের কার্য্য এ ত ব্রাহ্মণের নয়॥"

তার পর সত্যপীর প্রচার করিলেন—'মক্কায় রহিম আমি অযোধ্যায় রাম'।

ব্রাহ্মণ সত্যনারায়ণের পূজায় দীক্ষিত হইলেন ও তাঁহাকে সিন্নি মানত করিলেন।

তার পর দেখুন, কবি কৃপারাম শর্ম্মা প্রণীত 'সত্যনারায়ণ-কথা'। বর্দ্ধমান জিলায় কবি কৃপারামের সত্যনারায়ণ-কথা বিশেষ প্রচলিত। সত্যনারায়ণের পূজা উপলক্ষে কৃপারামের পাঁচালিই বর্দ্ধমানে ঘরে-ঘরে পঠিত হয়। কৃপারামের পাঁচালির প্রারম্ভেই কোথায় কোথায় জাগ্রত পীর-ঠাকুর আছেন, তাহার একটি বিবরণ দেওয়া আছে—

"প্রথমে বন্দিব পীর আমুয়া মোকামে।
কত শত পাতকী নিস্তার পায় নামে॥
রাই গ্রামের পীর বন্দ সাহাই গোরাই।
কার্য্যসিদ্ধি হয় যদি নাম করে যাই॥
তার পর বন্দিব পীর নবদ্বীপবাসী।
মগদম ঠাকুর বন্দ মনে অভিলাষী॥
মঙ্গল কোটের পীর বন্দ হরষিত মনে।
মগদম ঠাকুর বন্দ গ্রাম পলাশনে॥
একাগ্র হইয়া যদি সেবে সেই পীরে।
অন্ধকের চক্ষু হয় অন্য কিবা করে॥
সেই পীর বন্দি মুঞি মস্তকে করিয়া।
পাতশা সাহেব বন্দ অবনী লোটাইয়া॥"

রামেশ্বর নারায়ণের মুসলমানরূপে আবির্ভাবের যে হেতু দিয়াছেন, কৃপারামও সেই হেতুই নির্দ্দেশ করিতেছেন—

"শুন ভাই এক মনে, সত্যপীর যে কারণে, পৃথিবীতে হইল প্রকাশ।
প্রবল হইল কলি, যবন হইল বলী, হিন্দুদের করে উপহাস।
তাহা দেখি নারায়ণ দুষ্ট খল নিবারণ পীর মূর্ত্তি হইলা আপনি।"

ইহার পর কবি স্কন্দপুরাণের গল্পটিই কিছু-কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া ছন্দোবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু সত্যনারায়ণের মুসলমানত্ব আগাগোড়াই রক্ষিত হইয়াছে। প্রথমে ব্রাহ্মণ কিছুতেই পীর-নারায়ণের পূজা করিতে চান না। অবশেষে পীর ঠাকুর আপনার নারায়ণ-মূর্ত্তি প্রকাশ করিলে, সকল হিন্দুই তাঁহার পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। সত্য-নারায়ণ ও সত্যপীরের আরও অনেক পাঁচালি আছে; কিন্তু কবি বল্লভ, শঙ্করাচার্য্য, রামেশ্বর ও কৃপারামের এই চারিটী পাঁচালির বিবরণই যথেষ্ট। অন্যথা প্রবন্ধ বাহুল্যভারাক্রান্ত হইয়া পড়িবে।

এই সকল পাঁচালি সম্বন্ধে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। সত্যপীর ও সত্যনারায়ণে কোন দ্বৈত নাই। সমস্ত পাঁচালিতেই দেখিবেন, যিনি সত্যনারায়ণ তিনিই সত্যপীর। সত্যনারায়ণ হিন্দুর দেবতা ও সত্যপীর মুসলমানের দেবতা—এ রকম কোন কথা বা ইঙ্গিত কোথাও নাই; সত্যপীর ও সত্যনারায়ণ দুইটি নাম একার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। বরং পরিষ্কার বলিয়া দেওয়া আছে—'নারায়ণ হইলেন পীর'। কৃপারাম তাঁহাকে পীর-নারায়ণ বলিতেছেন। কবি বল্লভের পুঁথির শেষে পাই যে, হিন্দু ও মুসলমান উভয়ে এক সঙ্গে হইয়া এই পীর-নারায়ণের পূজা করিতেছে, যথা—

"সন্ধ্যাকালে আল্যা যত হিন্দু মুসলমান।
সহরের সকল লোক করি এক ধ্যান॥
নয়া হাড়ি পুরি রাখে মিঠাই সিরিণি।
সত্যনারায়ণ বল্যা দেই দ্বিজ মুনি॥
মমিন সকলে পড়ে পীরের কালাম।
উঠিয়া সকল লোক করিল সেলাম॥
পশ্চাত সিরিণী বাট্যা দিল সভাকারে।
চাটিয়া খাইয়া হাত মুছিলেক শিরে॥"

এই সকল পাঁচালিতে সত্যনারায়ণের বিবরণ পাঠে দুইটি প্রশ্ন স্বতঃই মনে হয়—প্রথমতঃ, এই পাঁচালিগুলি স্কন্দপুরাণের পরিণতি কি না, অর্থাৎ স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে সত্যনারায়ণের যে বৃত্তান্ত আছে, তাহাই এই সকল পাঁচালির মূল কি না? দ্বিতীয়তঃ, সত্যনারায়ণ হিন্দুদের পৌরাণিক দেবতা কি না?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমার মনে হয়, সত্যনারায়ণের পাঁচালি স্কন্দপুরাণে লিখিত সত্যনারায়ণের বৃত্তান্ত অপেক্ষা প্রাচীন ও পাঁচালি-গুলি পুরাণ হইতে উদ্ভূত হয় নাই। যদি তাহা হইত, তবে ব্রাহ্মণ পাঁচালিকারগণের লিখিত পাঁচালির সত্যনারায়ণে ও পৌরাণিক সত্যনারায়ণে এরূপ মূলগত পার্থক্য ও প্রভেদ থাকিত না। ব্রাহ্মণ কবিরাও কখনও পৌরাণিক দেবতাকে মুসলমান করিয়া পুনঃসংস্করণ করিতেন না। বিশেষতঃ অনেকগুলি সত্যনারায়ণের পাঁচালির সঙ্গে পুরাণের কোন যোগই নাই,—যেমন শ্রীকবি বল্লভের পাঁচালি। আমার মনে হয়, সত্যনারায়ণের পৌরাণিক বৃত্তান্ত লোক-সাহিত্য হইতে সংস্কৃত করিয়া তোলা হইয়াছে। সত্যনারায়ণ ঠাকুর পীরের পাগড়ী ও হিন্দিবাৎ ছাড়িয়া হিন্দুত্বের গঙ্গাজলে স্নান করিয়া পুরাণের শোধিত আসনে আসিয়া বসিয়াছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত ধর্ম্মজগতে বিরল নহে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে আমার মনে হয় যে, বাস্তব পক্ষে সত্যনারায়ণ হিন্দুদের কোন প্রাচীন দেবতাই নহেন। তিনি বাস্তবিক পৌরাণিক দেবতা নন, তিনি একজন লৌকিক দেবতা। আমরা প্রাচীন হিন্দু-যুগ হইতে সত্যনারায়ণ দেবতাকে পাই নাই, এ কথা স্থিরনিশ্চিত। তবে সত্যনারায়ণ দেবতা আসিলেন কোথা হইতে? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অধিকাংশ পাঁচালির মতে তিনি মুসলমানরূপে প্রথম আবির্ভূত হন। কৃপারাম ও রামেশ্বরের মতে যবনদিগের হস্ত হইতে হিন্দুদের রক্ষা করিবার জন্য নারায়ণ মুসলমানরূপে আবির্ভূত হন। কিন্তু উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নারায়ণের মুসলমানরূপ ধারণের কোন কারণ বা আবশ্যকতা দেখা যায় না। আসল কথা এই যে, পাঁচালি-সাহিত্যে

সত্যনারায়ণের আবির্ভাবের এই বৃত্তান্ত কোন প্রাচীন প্রবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই প্রবাদের কোন অর্থ না বুঝিয়া, পাঁচালিকারেরা তাহার যে কোন একটি কারণ নির্দ্দেশের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের ঐতিহাসিক জ্ঞানের দৌড় এতদূর ছিল না যে, তাঁহারা সমাজ-তত্ত্বের মধ্যে এই প্রবাদের মূল অনুসন্ধান করিবেন। সহজ বুদ্ধিতে ইহাই মনে হয় যে, মুসলমানদের পূজিত কোন পীর হিন্দুর দেবতায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন। তবে এই পীর কে হইতে পারেন, তাহা সম্পূর্ণ কল্পনার বিষয়। আবদুল করিম সাহেব মনে করেন, এই পীর সম্ভবতঃ বোগদাদের মনসুর ; কিন্তু তাহার কোনই প্রমাণ নাই।

মুসলমানের পীরকে হিন্দুরা দেবতা ভাবিয়া পূজা করিতেছেন, ইহা আপাততঃ অদ্ভুত শুনায় ; কিন্তু এইরূপ ধর্ম্ম-মিশ্রণের ঘটনা প্রাচীন ইতিহাসে যথেষ্টই পাওয়া যায়।

হয় ত বহু যুগ পূর্ব্বে হিন্দু ও মুসলমান সভ্যতাগত বিভিন্নতা বিস্তরই ছিল। কিন্তু কত শত বৎসর ধরিয়া হিন্দু ও মুসলমান একই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে গড়িয়া উঠিতেছে। সভ্যতায় তাহাদের যে পার্থক্য ছিল, তাহা এত বৎসরে ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে ; এবং আচার-ব্যবহারেও যে পার্থক্য, তাহা হিন্দু সমাজের মধ্যেই এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীর যে পার্থক্য তাহা হইতে বড় বেশী নয়। ভারতবর্ষের এই দুইটি সমাজের মধ্যে প্রধান বিরোধ ধর্ম্মগত। হিন্দুরা দেবদেবীর পূজা করেন ; মুসলমানের নিকট তাহা বিষম অপরাধ। কিন্তু এই বঙ্গদেশেরই প্রাচীন সাহিত্যে দেখিতে পাই, মুসলমান কবিরা বহু বৈষ্ণব গ্রন্থ ও পদাবলী লিখিয়া কৃষ্ণ-রাধার ভজন করিয়া গিয়াছেন। সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ধর্ম্মমত সম্বন্ধে হিন্দুরা অতিশয় উদার-মতাবলম্বী ;—এ কথা শুধু হিন্দুদের কথা নহে, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। মুসলমানের রাজত্বকালে প্রধান-প্রধান নগরগুলিতে অবশ্য হিন্দুর মূর্ত্তিপূজা ও মুসলমানের মূর্ত্তি-বিদ্বেষে ঠোকাঠুকি চলিতেছিল ; কিন্তু পল্লীর শীতল ছায়ার তলে গোপনে-গোপনে ধর্ম্মের মধ্য দিয়াই দুইটি বিরোধী সমাজে সম্প্রীতির ভাব গাঢ় হইতেছিল। যে বিদ্রোহের সুর নগরের কোলাহলে উগ্র হইয়া দুইটী সমাজকে দুই দিকে ঠেলিয়া দিতেছিল, তাহাই পল্লীর শান্ত নীরবতায় মৃদু ও মোলায়েম হইয়া মিলনের সুরে পর্য্যবসিত হইতেছিল। ইংরেজ ভারতবর্ষের রাজা হইবার পর আমাদের সামাজিক জীবনে একটি প্রধান পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যে কারণেই হউক, এই দেশে জীবন-সংগ্রাম (Struggle for Existence) বিষমরূপে বাড়িয়া গিয়াছে। পল্লী ছাড়িয়া আমাদের সকলকে সহরে আসিয়া জুটিতে হইতেছে। বাঙ্গালী জীবনের Centre of Gravity বা ভাব-কেন্দ্র পল্লী ছাড়িয়া সহরে সরিয়া আসিয়াছে। সেই সঙ্গে-সঙ্গে ফল হইতেছে এই যে, হিন্দু-মুসলমানের যে মিলনের সূত্র পল্লী-সমাজের স্নিগ্ধতায় পুষ্ট হইতেছিল, তাহা নাগরিক জীবনের কলরবের মধ্যে ছিঁড়িয়া যাইতেছে। সেইজন্য ইংরাজদের আমলেই Hindu-Mahomedan Problem বলিয়া এই একটা বিকট অস্বাভাবিক অপ্রিয় সমস্যা হিংস্র জন্তুর মত মাথা খাড়া দিয়া দাঁড়াইয়াছে। এ সমস্যা কিন্তু মুসলমানদের আমলে ছিল না।

সুখের বিষয় এই যে, পূর্ব্বে যেমন পল্লী-জীবনের দিক দিয়া হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য-বন্ধন গড়িয়া উঠিতেছিল, এখন আবার নূতন ভাবে নাগরিক জীবনের দিক দিয়া তাহা গড়িয়া উঠিতেছে। পূর্ব্বে যাহা সামাজিক সখ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, এখন তাহা রাজনৈতিক ঐক্যের উপর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে। সামাজিকতা পল্লী-জীবনের সূত্র, রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় আলোচনা সহরের জিনিষ। কিছুদিন পূর্ব্বে একটি সামান্য ঘটনার কথা শুনিয়াছিলাম। বাঁকিপুরের রাস্তা দিয়া দুই বন্ধু—একজন হিন্দু, অন্যজন মুসলমান—বেড়াইতে-বেড়াইতে চলিয়াছিলেন। নমাজের ওক্ত হইলে মুসলমানটি নমাজ পড়িবার জন্য আসন কোথায় পাইবেন ভাবিয়া একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তখন হিন্দু বন্ধুটি চট্ করিয়া মাথার পাগড়ী খুলিয়া ঘাসের উপর পাতিয়া দিলেন ; মুসলমান তাহার উপর হাঁটু গাড়িয়া নমাজ পড়িলেন। হিন্দু-মুসলমানের এই ঐক্য—যাহা এই সামান্য ঘটনাটি সূচিত করে—তাহা কেবল আজকালকার রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের চীৎকার নয়। তাহা বহুদিনের আরব্ধ স্থায়ী ঐতিহাসিক ব্যাপার। তাহা প্রাচীন সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, প্রাচীন সমাজ হইতে রসসংগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু প্রদোষের সন্ধ্যাতারা যেমন প্রভাতের শুকতারা রূপে পশ্চিম ছাড়িয়া পূর্ব্বে উদিত হয়, তেমনি এই মিলনের দিক বদলাইয়া গিয়াছে মাত্র। সত্যনারায়ণের পাঁচালি হইতে যদি আমি হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা সম্বন্ধে কিছু নূতন তথ্য দিতে পারিয়া থাকি, তবে এই দুইটী বিরোধী সমাজের মিলন-মন্দির-সংগঠনে আমিও একটু মসলা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি মনে করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইব। (তরুণ)

লুই পাস্তর

শ্রীব্রজবল্লভ সাহা

লুই পাস্তর ১৮২২ সালের ২৭ ডিসেম্বর Franche Comteএর Dole নামক পল্লীতে জনৈক চর্ম্মকার-গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ইহা যারা পর্ব্বতের সানুদেশে অবস্থিত। শৈশবে তিনি আরবোয়ার দৈনিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। এই তরুণ বয়সেই তাঁহার গুরুদেব উত্তরকালের পুরুষসিংহের প্রতিভার আভাস পাইয়াছিলেন ; এবং প্রায়ই বলিতেন Ecole normale (নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে) তাঁহার কি সৌভাগ্যের বিকাশ হইবে তাই শিশু-হৃদয় আলোড়িত হইয়াছিল—কবে তিনি Ecole normaleএ ভর্ত্তি হইতে পারিবেন। বেসাঁসোঁনের Royal College (রয়াল কলেজ) এ ভর্ত্তি হইয়া—en attendant l'heureux jour ou je serai admis a l'ecole normale—সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় ছিলেন।

অতি ধীর পদবিক্ষেপে তিনি তাঁহার লক্ষ্যে পৌঁছিয়াছিলেন। ১৮৪০ সালে bachelier es Letters ডিপ্লোমা পাইয়া ভীষণ দারিদ্র্যের জন্য অতি সামান্য বেতনে তিনি উক্ত কলেজে গণিতের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এজন্য তিনি স্বীয় অভিলষিত বিজ্ঞান ও রসায়নের গবেষণা-মূলক কার্য্যের অবসর পাইতেন না। ইহার দুই বৎসর পরে যখন baccalaureat es Sciences নামক বিজ্ঞানের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সনদ পান, তখন সেই সনদে জনৈক পরীক্ষক মহাশয় লিখিয়া দিয়াছিলেন যে, রসায়নে ইনি একজন অতি দুর্ব্বল অধিকারী। অথচ তিনি সমগ্র রসায়ন-সাগরে অতি নিকট-ভবিষ্যতে পর্ব্বত-প্রমাণ তরঙ্গ তুলিয়া সমগ্র সুধী-সমাজকে চকিত ও মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

রসায়নশাস্ত্রে তাঁহার দীক্ষা হয় প্রকৃত প্রস্তাবে Sorbonneতে J. B. A. Dumaর প্রথম রাসায়নিক আলোচনায়। A. T. Ballad তাঁহাকে এই সময়ে যন্ত্রাগারের সহচর নিযুক্ত করেন।

কোন্ দৈবশক্তি প্রভাবে তিনি ব্যাধির জটিল রহস্য ভেদ করিয়া তাহার কারণতত্ত্ব বিজ্ঞানের কঠিন নিগড়ে বন্ধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? ইহা জানিতে ইচ্ছা করিলে, আমরা মূলে দেখিতে পাই, পদার্থ-বিজ্ঞানের ও রসায়নের গভীর প্রশ্নের মীমাংসায় অক্লান্তকর্ম্মী বিশালধৈর্য্যশীল, নিয়ত কর্ম্মযোগ-নিরত অথচ ধ্যানী মহামতি পাস্তর, মাতৃবক্ষের সমগ্র সাধনা প্রয়োগে সকল বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া গোপনে অতি সন্তর্পণে হৃদয়শোণিতমোক্ষণে দিনের পর দিন গণিয়া বহুবর্ষ ধরিয়া স্বীয় সুচিন্তা-প্রসূত ভাবরাশিকে নিটোল সুঠাম কলেবরে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

"Travaile, travailer toujours"—ছিল তাঁহার জীবনের মন্ত্র। ইহা যে আমাদের গীতারই অমর প্রতিধ্বনি—নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্মজ্যায়োহ্য কর্ম্মণঃ।

নবীন রসায়নের যুগান্তর আনিল Isomerism। দুই জিনিষের সমান উপাদান হইলেও, অণু-পরমাণুর গঠন-বিপর্য্যয়ে তাহারা যে ভিন্ন গুণাক্রান্ত হয়, তাহা বীর বার্গেলিয় প্রমুখ পণ্ডিতগণের অবিদিত ছিল না। কিন্তু সেই রহস্যের পূর্ণ তথ্য তাঁহারা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। যেদিন তরুণ কিশোর পাস্তর অসামান্য প্রতিভায় মদিরাভাণ্ড-প্রাপ্ত টার্টারিক এসিডের স্ফটিকখণ্ডে আলোক রেখাপাত (deflection of polariged light) করিয়া অজ্ঞানের কুহেলিকা সরাইয়া নূতন পথ দেখাইলেন, সেদিন আনন্দে অধীর গুরুদেব বীয় মহোদয় বলিয়া উঠিলেন—Mon cher enfant, j'ai tant aime les sciences dans ma vie que cela me fait battre le cour.

প্রিয় বৎস, আমার জীবন দিয়া বিজ্ঞানকে এমন নিবিড়ভাবে ভালবাসিয়াছি যে, তোমার গরব কঠে আমার হৃদয় টেনে আনে।"

এই এক ব্যাপারেই তিনি তদানীন্তন সমগ্র পৃথিবীর রাসায়নিক সমাজে অগ্রণী হইয়া উঠিলেন এবং ১৮৫৪ সালে লাইলির (Lille) Faculte des Scienceএর অধ্যাপক এবং Dean নিযুক্ত হইলেন।

এই পদ গ্রহণের প্রথম অভিভাষণ-কালে প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলিয়াছিলেন যে, "পর্য্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে দৈব মাত্র তাঁহারই অনুকূল হ'ন, যিনি সে জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকেন।" ইহার কিছুকাল পরেই তিনি Mille Laureant (লরিয়াঁ) নামক বিদুষী ও গুণবতী মহিলার পাণিগ্রহণ করেন।

লুই পাস্তর

একদা ভাটিখানায় অণুবীক্ষণ সাহায্যে তিনি নির্দ্দোষ ও সদোষ মদিরার পরীক্ষা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাহা সমগ্র রসায়নশাস্ত্রে ও জীববিজ্ঞানে ভীষণ বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়া, এমন এক শ্রেণীর অনুসন্ধান চালাইল, যাহার ফলে জীবের জন্ম যে স্বয়ম্ভু নয়, ইহাই প্রতিপন্ন হইল (Idea of spontaneous generation of life) তিনি দেখাইলেন যে, অক্ষত দ্রাক্ষা মধ্যে অথবা সুস্থ জীব-শরীরাভ্যন্তরে কোন জীবাণু নাই। কিন্তু নিপীড়িত দ্রাক্ষাগুচ্ছ বা কর্ত্তিত জীবদেহ বাতাসে রাখিলে উচ্ছলন fermentative ও গলন putrefactive সম্বন্ধীয় পরিবর্ত্তন প্রকাশ পায়। অপর পক্ষে এই জিনিষগুলিতে জীবাণু না আসিতে পারে এমন অবস্থায় রাখিলে দেখা যায় যে, আঙুর ফলটি ও ক্ষত স্থান সমান ভাবে অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে।

এর পর তিনি তুলনামূলক ভাবপ্রভাবে (by analogy) এই

সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, ক্ষত স্থানের প্রদাহ ও বিভিন্ন প্রকারের জ্বরাদি ব্যাধি, জীবন্ত প্রাণিদেহে, এই রক্ত বীজের বংশধর, গণনাতীত বীজাণু বিশেষের প্রকাশমান সংহার-লীলা অর্থাৎ পচ্যমান-মাংস মদিরার পরিবর্ত্তননিচয়ের রূপান্তর মাত্র।

১৮৬৫ সালে দক্ষিণ ফ্রান্সে আলে (Alais) নামক জনপদে রেশমের আবাদে পেব্রীন (Pebrine) নামক ভীষণ ব্যাধিতে গুটিপোকার সর্ব্বনাশ করিতেছিল। বিপন্ন কৃষক সম্প্রদায় পাস্তরের শরণাপন্ন হইলে জুন মাসে তিনি সেখানে গিয়া ঘটনাবলি ক্রমান্বয়ে বহিষ্কার করিয়া সেপ্টেম্বরের শেষে সেই ভীষণ উপদ্রবের প্রকৃত কারণের তথ্য নিরূপণ করিয়া তাহাকে কবলিত করিলেন। তাঁহার পর্য্যবেক্ষণের ফল—Etude sur la maladie des vers a soie—তাঁর এক অমূল্য গ্রন্থ, ১৮৭০ সালে প্রকাশিত হয়।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর বিশ্বমানবের এই প্রকৃত বন্ধু St. Cloudএর নিকটে দেহত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু সমগ্র পৃথিবী শোকে অধীর হইয়া তাহার বিরাট অশ্রুরাশি জমাট করিয়া প্যারিসের বিশাল রাজপথে, তাঁহার মর্ম্মর মূর্ত্তির স্থাপনা করিয়াছে। (Marble statue of Louis Pasteur built on International Subscription at Boulvard Pasteur, Paris). (নব্যভারত)

জাতীয় শক্তি ও শিক্ষা

রায় শ্রীকুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর এম্-এ

পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশেই শিক্ষার ভার শাসক-সম্প্রদায়ের হস্তে ন্যস্ত। তাঁহারা বিশেষ ভাবে এ কথা উপলব্ধি করেন যে, জাতীয় উন্নতি, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় প্রাধান্য লাভ এবং আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা—সমস্তই উপযুক্ত শিক্ষার উপর নির্ভর করে। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে ফরাসীর সহিত যুদ্ধে জার্ম্মেণীর জয়লাভের পর ফিল্ডমার্সাল মল্টকেকে (Moltke) জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, কিরূপে তিনি ফরাসী বিরাট জাতীয় শক্তির দর্প চূর্ণ করিলেন। উত্তরে তিনি জার্ম্মাণীর স্কুল এবং অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির কথার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, শিক্ষা-ক্ষেত্রে তাঁহাদের জয়ের বীজ বপন করা হইয়াছিল। প্রত্যেক জার্ম্মাণ বালক বা বালিকাকে এমন শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল যে, পরিণত বয়সে তাহাদের প্রত্যেকেই আপন আপন কর্ত্তব্য সম্পাদনে যথার্থ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারে। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে তাহাদের ঐরূপ কার্য্যপটুতা এবং প্রবল ইচ্ছাশক্তির উন্মেষ কখনই সম্ভবপর হইত না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহাদের বিগত যুদ্ধের পরাভবের কারণ শিক্ষা-পদ্ধতির ত্রুটি বলিয়াই ইতিহাসে নির্দ্দিষ্ট হইবে। যে শিক্ষার ফলে নিরীহ প্রজাবর্গকে রণোন্মত্ত নরপতির চরণে আপনাদের সর্ব্বস্ব বলি দিতে হয়, তাহার পরিণাম কখনই শুভ হইতে পারে না।

প্রত্যেক সভ্যদেশেই মনস্বী ব্যবস্থাপকগণ আপন-আপন অভাব ও অবস্থা-অনুযায়ী শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতেছেন; দীর্ঘকাল-প্রচলিত নীতির সংস্কার বা কোন-কোন ক্ষেত্রে তাহার মূলোচ্ছেদ পূর্ব্বক, নূতন দেশ-কালোপযোগী শিক্ষার প্রচলন করিয়া, যাহাতে যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পূর্ণ দেশাত্মবোধ জাগরিত হয়, তজ্জন্য নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতেছেন। প্রকৃত পক্ষে বুদ্ধিমান, ধার্ম্মিক, সাহসী এবং আত্মসম্মান-জ্ঞানসম্পন্ন প্রজার সৃষ্টি করাই বিদ্যালয়ের একমাত্র কার্য্য।

গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে বীরশ্রেষ্ঠ নেপোলিয়নের নেতৃত্বে যখন ফরাসীর জয়লাভ এবং জার্ম্মাণ জাতির পরাজয় হইল, সেই সময় হইতেই জার্ম্মাণীতে ঐ অপূর্ব্ব শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন হয়। জ্বালাময়ী ভাষায় ফিচ (Fitche) জর্ম্মান জাতিকে শুনাইলেন—"তোমরা কি এক বিগতশ্রী জাতির নগণ্য শেষ অবলম্বন বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিবে? না, ভাবী কালে এক মহা গৌরবমণ্ডিত ভবিষ্য বংশের বংশধর যদি সগর্ব্বে শির উন্নত করিয়া দাঁড়াইবে?" ফিচের এইরূপ উক্তিতে সমস্ত জার্ম্মাণজাতির অন্তরে বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার হইল।

তিনি আরও বলিয়াছিলেন, "আমাদের নিদারুণ অপমানের ফলে এক্ষণে আমাদিগকে নানা প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। ইহার একমাত্র কারণ, লোকশিক্ষার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন। যদি বাস্তবিক কিছু কাজ করিতে চাও, এই বিষয়েই সর্ব্বাগ্রে মনোনিবেশ কর। আশা করি, আমার দেশবাসীর মধ্যে কেহ-কেহ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা ভিন্ন আমাদের উদ্ধারের আর উপায় নাই।"

এই কথার পর ভন হামবোল্ড (Humbold) শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার অক্লান্ত উদ্যমে বার্লিন ইউনিভার্সিটির সৃষ্টি হইল। বর্ত্তমান কালে এই বিদ্যাপীঠ আদর্শস্থানীয়। এক শতাব্দীর চেষ্টার ফলে জর্ম্মাণ জাতি কৃষি শিল্প বাণিজ্য সমস্ত বিষয়েই পৃথিবীর পরাক্রান্ত জাতিসমূহের শীর্ষস্থানীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, আমেরিকা প্রত্যেক রাষ্ট্রেই এক একটি স্বতন্ত্র জাতীয় শিক্ষাপদ্ধতি আছে। এই পদ্ধতির একমাত্র উদ্দেশ্য—নিজ-নিজ আদর্শ অনুযায়ী সুযোগ্য প্রজাপুঞ্জের সৃষ্টি করিয়া জাতীয় প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখা। এই সমস্ত দেশে বিদ্যালয় মাত্রই জাতীয় আদর্শ এবং রাজনীতি-শিক্ষা-বিস্তারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকে। কেবলমাত্র আপন-আপন বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া চলিলেই ঐ উদ্দেশ্য সাধন আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। বৈদেশিক নিয়মাদির প্রয়োজন-মত অনুকরণ এবং নিজ-নিজ স্বভাব মত তাহার পরিবর্ত্তনও আবশ্যক।

শাসনকার্য্যে দেশীয় লোকের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক—প্রধানতঃ ইহাই বিবেচনা করিয়াই এদেশে বৈদেশিক শিক্ষাবিধির প্রবর্ত্তন করা হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষায় আমাদের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বহু শতাব্দীর প্রগাঢ় নিদ্রার পর জাতীয় জাগরণের সূত্রপাত হইয়াছে। সমাজকে জাতীয় ভাবে প্রণোদিত করিবার ভার দেশের মনীষী এবং শিক্ষকগণের উপর দিতে হইবে, এবং এই পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিধিকে যাহাতে আমরা আপন প্রয়োজন-মত গড়িয়া লইতে পারি, সে চেষ্টাও তাঁহারাই করিবেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার

ফলে আমাদের প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতির যথেষ্ট বিকৃতি ও পরিবর্ত্তন হইলেও, আমাদের লাভ নিতান্ত মন্দ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আমরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখিয়াছি, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মর্য্যাদা বুঝিতে পারিয়াছি, প্রভুশক্তি বা শাসনকর্ত্তৃত্বের যোগ্যতা কতদূর, তাহা বুঝিতেছি, এবং পৃথিবীতে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিবার জন্য সকলের মনেই একটা আগ্রহ দেখা যাইতেছে। ঐহিক সুখকে উপেক্ষা করিয়া পরমার্থ চিন্তায় জীবনের নিয়োগ এক্ষণে আর কেহই কামনা করেন না। গুরুশিষ্যের সে সম্বন্ধও আর নাই; কাজেই শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার করা একান্ত আবশ্যক। দেশের শিক্ষাকর্ণধারগণকে এক্ষণে পাশ্চাত্য শিক্ষার সহিত দেশীয় শিক্ষার সংমিশ্রণ করিয়া এমন পদ্ধতির গঠন করিতে হইবে—যাহাতে আমাদের সর্ব্ববিধ জাতীয় অভাব পূরণ হইতে পারে।

ভারতবর্ষে আজকাল নূতন প্রণালীতে শিক্ষা-দানের কয়েকটি পরীক্ষা চলিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শান্তিনিকেতন, মহাত্মা গান্ধীপ্রতিষ্ঠিত শবরমতী আশ্রম, গুরুকুল বিদ্যা-পীঠ, এবং দাক্ষিণাত্য (Deccan Education Society) শিক্ষা-সমিতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

আমেদাবাদের উপকণ্ঠস্থিত শবরমতী নদীর তীরে মহাত্মা গান্ধী আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। আশ্রমে সামান্য কয়েকখানি কুটীর এবং কয়েকখণ্ড চাষের উপযুক্ত জমি আছে। আশ্রমের ব্যবহারোপযোগী শস্য ঐ জমিতে উৎপন্ন হয়। শিক্ষক ও ছাত্রগণ আপন-আপন প্রয়োজনমত বস্ত্রাদি বয়ন করেন। এখানে কেহই পাদুকা ব্যবহার করেন না। ছাত্র ও শিক্ষকদিগকে ব্রহ্মচর্য্য ও স্বদেশহিতব্রত পালনের শপথ গ্রহণ করিতে হয়। বোলপুরে এরূপ কোন নিয়ম নাই। সেখানে বিবাহিত বা অবিবাহিত জীবন যাপন শিক্ষকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এই উভয় স্থানেই গুরুশিষ্য একত্র বাস করেন, এবং সকলেই অস্পৃশ্যতা-আচার-দোষ-বর্জ্জিত। কার্য্যে এবং চিন্তায় অহিংসা শবরমতী-আশ্রমের মূলমন্ত্র। শবরমতী এবং বোলপুর উভয় স্থানেই নিরামিষ আহার প্রচলিত। মহাত্মা গান্ধীর অধীনে প্রত্যহ প্রাতঃকালে তাঁহার আশ্রমে উপাসনা হইয়া থাকে। বোলপুরে প্রতি বুধবারে উপাসনা হয়। ঐ সময়ে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ছাত্রগণকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। উপাসনা একত্রে এবং কখন-কখন পৃথক ভাবেও হইয়া থাকে। উপাসনাস্থলে সমবেত সকলেই ধর্ম্মসঙ্গীতে যোগদান করেন। বোলপুরে ছাত্রগণ নানা প্রকার আনন্দজনক এবং চিত্তাকর্ষক কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। শবরমতী আশ্রমে ছাত্রগণ প্রত্যহ প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ নদীতে স্নান করে; তার পর নদীতটে উপাসনা শেষ করিয়া কিছুক্ষণ ব্যায়াম করে; তারপর প্রাতরাশ শেষ করিয়া শাস্ত্র পাঠ করিয়া থাকে। মধ্যাহ্নে পুনরায় স্নান করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে। দিবানিদ্রা এখানে নিষিদ্ধ। বিশ্রামান্তে ছাত্রগণ সাধারণ জ্ঞানলাভের জন্য ভারতীয় ইতিহাস, অর্থনীতি, প্রাদেশিক ভাষা, বর্ত্তমান ও প্রাচীন সাহিত্য ইত্যাদি নানা বিষয় অধ্যয়ন করিয়া থাকে। অপরাহ্নে শিক্ষক, ছাত্র সকলেই বাঁশ বা বেতের নানা প্রকার দ্রব্য নির্ম্মাণ করিয়া আপন আপন ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কিছু-কিছু উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। সন্ধ্যাকালে পুনরায় স্নান করিয়া উপাসনায় যোগ দেন। তারপর নৈশ ভোজন সমাপ্ত করিয়া ছয় ঘণ্টা কাল ঘুমাইয়া থাকেন। গৃহস্থালীর সামান্য কাজসকল নিজেরাই করিয়া থাকেন; এজন্য কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা করেন না।

বিশাল এসিয়া মহাদেশে একমাত্র জাপানে নির্দ্দিষ্ট জাতীয় প্রণালীতে বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান করা হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য জাতিগণের সংস্পর্শে আসিবার পর জাপানের সম্রাট বুঝিতে পারিলেন যে, রণনীতি বা ব্যবসা-বাণিজ্যে বিজ্ঞান-সম্মত প্রথায় সুশিক্ষিত না হইলে, তাঁহার প্রজাবর্গ প্রতিযোগিতায় আপন মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিবে না। তদানীন্তন দূরদর্শী মিকাডো এক ঘোষণাপত্রে জানাইলেন যে,তাঁহার রাজ্যে কোন পরিবারে কেহ অশিক্ষিত থাকিবে না। সমস্ত জাতি সাগ্রহে এই ঘোষণানুযায়ী কার্য্য করিতে অগ্রসর হইল। দেশের চারিদিকে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল, এবং প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি সাম্রাজ্যের হিতকল্পে যথাসম্ভব সাহায্য করিতে লাগিল। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি বিশেষ লাভজনক উপজীবিকা পরিত্যাগ করিয়া সামান্য বেতনে শিক্ষকতা করিতে লাগিল। অনেকে স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন, আবার কেহ বা অবসর মত অশিক্ষিত প্রতিবেশিগণকে শিক্ষাদান করিতে আরম্ভ করিলেন। এই ভাবে বিশ বৎসর চলিবার পর, দেশে শিক্ষিত (Literate) ব্যক্তির সংখ্যা শতকরা নব্বই জন দাঁড়াইল, এবং অল্প দিনের মধ্যেই জাপান পৃথিবীর এক মহা শক্তিমান্ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইল। শিক্ষা-সংস্কার-কার্য্যে জাপান তাঁহার প্রাচীন বুসিদো নীতি (Busido code) কিছুমাত্র পরিত্যাগ করে নাই। তাহাদের শিক্ষা প্রগাঢ় রাজভক্তি, জন্মভূমির জন্য স্বার্থত্যাগ-স্পৃহা, এবং অপূর্ব্ব দেশভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ফিলিপাইন দ্বীপবাসীগণ মাত্র বিশ বৎসর কাল আমেরিকার অধীনে থাকিয়া শিক্ষা এবং সাধারণ অবস্থার যেরূপ উন্নতিসাধন করিয়াছে, তাহাতে জাতীয় উন্নতি বিষয়ে শিক্ষার প্রভাব স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। জাপান এবং ফিলিপাইন দ্বীপে যাহা সম্ভব হইয়াছে, অন্য দেশেও সেইপ্রকার কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করিলে পরিশ্রম কখনই নিস্ফল হইবে না। (শিক্ষক)

সম্পাদকের বৈঠক

প্রশ্ন

১। কাতা দড়ির প্রচলন আমাদের দেশে যথেষ্ট—উহা সহজে প্রস্তুত করিবার উপায় কি? এবং যদি কোনরূপ কল থাকে, তবে তাহা কোথায় ও কত দামে পাওয়া যাইবে। একটা কল চালাইতে কত মূলধনের আবশ্যক? শ্রীপ্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায়

২। মামাশ্বশুর ও ভাশুরের সম্মুখে হিন্দুবধূগণ বাহির হন না কেন? তাঁহাদিগকে, কি তাঁহাদের ছায়া স্পর্শ করিলে উভয় পক্ষকেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়—ইহার কোন কারণ আছে কি?

৩। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বেলডাঙ্গা গ্রাম হইতে ৪ মাইল দূরে একটী মাঠে "আদম তলা" নামক একটী মেলা বসে। ১লা বৈশাখ "আদম গাদম" নামক কাষ্ঠ নির্ম্মিত দুইটী মূর্ত্তির মহাসমারোহে পূজা হয়। ঐরূপ নামের ঐরূপ মূর্ত্তি আর কোথাও আছে কিনা ও পুরাণে উহাদের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় কিনা?

৪। কোন্ সময় হইতে চড়কপূজার প্রচলন? শ্রীনলিনাক্ষ হোড়

৫। কি গ্রীষ্ম, কি শীত সব সময়েই যাদের শরীর দিয়া অনবরত ঘাম বহিতে থাকে তাদের ঘাম নিবারণের কি কোন সহজ উপায় আছে?

৬। সমগ্র ভারতবর্ষে এতাবধি কতগুলি Film company খোলা হইয়াছে, তাহা কি কেহ আমায় জানাতে পারেন?

৭। পৌষমাসে কোন হিন্দু গৃহস্থের বাড়ী হইতে কাহাকেও বিদায় দেয় না, এমন কি বিড়াল কুকুর পর্য্যন্ত বাড়ী হইতে পৌষমাসে কেহ তাড়ায় না। ইহার কারণ কি এবং এই সংস্কার কখন হইতে প্রচলিত?

৮। ঝড়ের সময় বাজ পড়িলে অনেকের বাড়ীতে শাঁখ বাজিয়া উঠিতে দেখা যায়। কি হেতু এবং কখন হইতে ইহার প্রচলন হয়?

৯। প্রায় দেখা যায় যে, কখনও একটি নূতন বাড়ী নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হইলে, একটি খুব উঁচু বাঁশের ডগায় একটি ছেঁড়া জুতা, একটা ভাঙ্গা ঝুড়ি ও একটি ঝাঁটা লট্‌কাইয়া রাখা হয়। ইহার কারণ কি, এবং এই সংস্কার কখন হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে? শ্রীহরিপদ রায়

১০। কাঁকড়াবিছা কামড়াইলে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। সেই যন্ত্রণা তখনই যাহাতে কম হয়, এরূপ কোন ঔষধ বা কোন উপায় আছে কি না? শ্রীশীতলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১১। তালপাতার পাখা গায়ে ঠেকিলে মাটিতে ঠেকাইতে হয় কেন?

১২। সম্মার্জ্জনী হঠাৎ ঝাঁট্ দিতে দিতে গায়ে ঠেকিলে "পা" দিয়ে মারিতে হয় কেন? ইহার অর্থ কি?

১৩। হিন্দুধর্ম্মের অন্যতম শাখা বৈষ্ণব সম্প্রদায়। ভেকধারী বৈষ্ণবদের মৃতদেহ দাহ না করিয়া নদীর নিকটবর্ত্তী স্থানে পুঁতিয়া রাখে এবং কেহ-কেহ সমাজ দেয়। এরূপ বৈষম্যের কারণ কি? এবং এই নিয়ম কতদিন এবং কাহার সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে?

১৪। পণ্ডিত কৃত্তিবাস কোন্ সনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পিতার নাম কি? এবং তাঁহাদের বংশাবলী কেহ আছেন কি? যদি থাকেন কোথায়? শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায়

১৫। ভারতবর্ষে কোন্ কোন্ জায়গায় কৃষি বিদ্যালয় আছে? ও কোন্ কোন্‌টিতে Degree course শিক্ষা দেওয়া হয়? Degree ক্লাসে ভর্ত্তি হইবার মোটামুটি কি নিয়ম? শ্রীঅরুণকুমার বসু

১৬। মাদ্রাজী, নাগপুরী, হিন্দুস্থানী, ওড়িয়া, বাঙ্গালী—ভারতের প্রায় সমুদায় প্রদেশের বাজিকরেরা ভোজবাজি দেখাইবার সময় আত্মারাম সরকার নামক একটী অজ্ঞাত-পরিচয় ব্যক্তিকে তাহাদের সমুদায় গালাগালি ও নিন্দার ভাজন করিয়া থাকে। আত্মারাম নাকি খেলার কৌশল ফাঁস্ করিয়া দিয়া তাহার সমসাময়িক যাদুক্রীড়কদের হায়রাণ করিত।—এই জন্য সে ভারতের সমুদায় যাদুকরদিগের পুরুষানুক্রমিক নিন্দা ও অভিশাপভাগী হইয়া রহিয়াছে। খেলা জমাইবার জন্য এ দেশীয় যাদুকরেরা তাহাদের বক্তৃতায় (patter) আত্মারাম সরকারের চৌদ্দ-পুরুষান্ত করিয়া গালি দেয়, এবং তাহার বিকৃত মূর্ত্তিটীকে পদদলিত করে। আত্মারাম যে বাঙ্গালী, তাহার নামেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এইআত্মারামের পরিচয় ও জীবনী কি?

১৭। 'গদাই লস্করি চাল' এই প্রবচনে ব্যবহৃত গদাই লস্করের পরিচয় কি? শ্রীমহেন্দ্রনাথ করণ

১৮। পাউরুটি শব্দের ব্যুৎপত্তি কি? মুসলমানী আমলে এদেশে Loaf বা পাউরুটি তৈয়ারি হইত কি না? শ্রীপরিমল রায়

১৯। মুখে অনেক সময় ছিট্ ছিট্ তিলের মত দাগ পড়ে। ঐ দাগ সম্পূর্ণ উঠাইয়া মুখমণ্ডল উজ্জ্বল, পরিষ্কার ও কমনীয় করিবার উপায় কি?

২০। অনেক সময় শারীরিক দৌর্ব্বল্য বশতঃ এবং কখনও-কখনও বিনা কারণেও চুল উঠিয়া যায়। চুল দীর্ঘ এবং ঘন করিবার উপায় কি? বাহু এবং হাত পায়ের অনুজ্জ্বল চর্ম্ম উজ্জ্বল ও সুকুমার করিবার উপায় কি? শ্রীমতি নির্ম্মলবালা ঘোষ

২১। "পিতা দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলে, পূর্ব্ব সন্তানের সে বিবাহ দেখা নিষেধ" এই প্রবাদ বহুস্থানে শুনিতে পাই; ইহার কারণ কি?

২২। বিবাহে বরশয্যার বিধবা স্ত্রীলোক বসিতে পারে না এবং বরণডালা প্রভৃতি ছুঁইতে পারে না। অনেকে বলেন, "বিবাহের এই সব আমোদ-প্রমোদে বিধবাদের মনে ভোগ-লালসার উদ্রেক হইতে পারে।" এইজন্যই তাহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যগুলিতে যোগ দিতে দেওয়া হয় না। এতদ্ভিন্ন অন্য কোনও কারণ আছে কি না?

২২। "বরপণ" প্রথা কতদিন হইতে এদেশে প্রচলিত আছে? শ্রীপ্রিয়নাথ রাউত

২৩। কালীঘাট হইতে কিছু দক্ষিণে আদিগঙ্গার পশ্চিমপার্শ্বে বর্ত্তমান 'কালীঘাট' ষ্টেশনের দক্ষিণধারে কারুকার্য্য-শোভিত একটী প্রাচীন মন্দির দৃষ্ট হয়। প্রবাদ যে, ঐ মন্দিরের বৃহৎ প্রাঙ্গণে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অধিবেশন হইত। এই প্রবাদের সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ কি?

২৪। বসন্তকালে যখন চারিদিকে বসন্ত হয়, তখন যদি খুব এক পশ্‌লা জলঝড় হয়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, উহার প্রকোপ কমিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ কি? শ্রীহরিসাধন বসু

২৫। হিন্দুগণ বিবাহের সময় বরণডালা ব্যবহার করেন। বরণডালায় কি কি দ্রব্যের আবশ্যক? ইহা ব্যবহারের অর্থ কি?

২৬। হঠাৎ অপরিচিত লোক দেখিলে একজনের প্রতি মন আকৃষ্ট হয়, আবার একজনের প্রতি মনে ঘৃণার ভাব আসে। কারণ কি?

২৭। ব্রাহ্মণগণের মসুর দাইল ভক্ষণে নিষিদ্ধ কেন? প্রবাদ মসুর ভক্ষণে মন্ত্রশক্তি নষ্ট হয়। উহা সত্য কি?

২৮। মুনিশ্রেষ্ঠ উতঙ্কদেবের আশ্রম "মরুধন্ব" প্রদেশে ছিল। সেই প্রদেশের নিকটে উদ্দালক নামে বালুকা-সমুদ্র (মরুভূমি) ছিল। বর্ত্তমানে সেই মরুধন্ব প্রদেশটী কোন্ স্থান ও উদ্দালক মরুভূমির বর্ত্তমান নাম কি ও অবস্থান কোথায়? শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

২৯। ব্রণ খোঁটার নিমিত্ত মুখে যে দাগ হয়, তাহা কিরূপে উঠান যায়? যাঁহারা কোন কিছু ঔষধ ব্যবহার করিয়া উপকার পাইয়াছেন, তাঁহারা যেন উত্তর দেন। ভুক্তভোগী বা Nercolized wax এবং অন্যান্য বহুবিধ cream ব্যবহারে উপকার পান নাই। ব্রণের দাগগুলি বসন্তের দাগের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। পাতিনেবু ব্যবহারে সামান্য উপকার পাইয়াছে। কি বস্তু ব্যবহারে সত্বর দাগগুলি উঠে, জানিতে পারিলে উপকৃত হইবে। শ্রীযোগেন্দ্রমোহন সেন

উত্তর

চৈত্র ১৩২৯—৮, ১৫ ও ১৭ প্রশ্নের উত্তর

১। মাঘ মাসে মুলা ভক্ষণ নিষিদ্ধ কেন? মাঘমাসে মুলা ভক্ষণ করিলে শরীরস্থ পিত্ত বৃদ্ধি হয়। তজ্জন্য উক্ত মাসে মুলা ভক্ষণে গোমাংস ভক্ষণের সদৃশ ফল হয় বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। যথা:—

"কার্ত্তিকে সুরনাং চৈব, সিংহে চালাবুকং তথা
মকরে মূলকং চৈব সদ্যো গোমাংশ ভক্ষণং॥"

ছারপোকার ঔষধ

বিছানার নীচে চাঁপাফুল, বকুলফুল, কনকচাঁপা ফুল, রাখিয়া দিলে আর ছারপোকা হয় না। শ্রীঅতুল্যকুমার ঘোষ

রুদ্রজটা ও পাতাল গরুড়

চৈত্রের 'ভারতবর্ষে 'সম্পাদকের বৈঠকে' শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল মহাশয় 'রুদ্রজটা' বা 'শঙ্কর জটা' এবং 'পাতাল গরুড়' (পণ্ডিত গরুড় নহে) সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমরাও শ্রদ্ধেয় কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ কাব্যকণ্ঠ যোগ-বিশারদ মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি। প্রশ্নকর্ত্তা যদি উক্ত দুইটী গাছ দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকেন, ত অনুগ্রহ করিয়া চুঁচুড়ার উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের নিকট যাইলেই দেখিতে পাইবেন। তিনি এ সম্বন্ধে তাঁহাকে অনেক কথাই বলিতে পারিবেন। ইহা বর্দ্ধমানে এবং চুঁচুড়ায় 'বিনোদ বাবাজী' নামক এক বাবাজীর বাড়ীতে আছে। গাছও বাহারে। সখ করিয়া রাখিলেও চলে। শ্রীমনতোষ সান্যাল

দালানের গাছ মারিবার উপায়

১৬। দালানের গাত্রস্থ গাছ যতদূর সম্ভব ছোট করিয়া কাটিয়া দিয়া, যে অংশ দালান গাত্রে থাকে, তাহার কোন স্থানে (মূলে হইলেই ভাল হয়) একটী গর্ত্ত করিয়া, দুই এক ফোঁটা পারদ চাপিয়া দিলে আর গাছ জন্মায় না।

ছারপোকার ঔষধ

১৭। বিছানায় বা তক্তাতে ছারপোকা হইলে, রোদে দিলে ছারপোকা নষ্ট হয়। কিংবা যেস্থানে ছারপোকা হয়, সেই স্থানে কিছু গুড় রাখিয়া দিলে পিপীলিকা আসিয়া ছারপোকা নষ্ট করে। অথবা কাছিমের (কচ্ছপ) খোলার উপর আগুন রাখিয়া, কাছিমের খোলার ধুঁয়া দিলে ছারপোকা নষ্ট হয়।

দাঁতের রোগ

১৯। বাগা ভেরাণ্ডার (এরণ্ড) দাঁতন দিয়া মুখ ধুইলে দাঁতের গোড়া শক্ত হয়। সচরাচর দুই রকম ভেরাণ্ডা দেখিতে পাওয়া যায়; এক রকম সাদা, এক রকম লাল। সাদা ভেরাণ্ডা খুব ভাল। ঐ গাছ পল্লীগ্রামে পগারের ধারে লাগান হয়। ডাল ভাঙ্গিলে সাদা আটা বাহির হয়। টাট্‌কা ডাল হইলে অল্প দিনের মধ্যে সারিয়া যায়। শ্রীশ্রীদামচন্দ্র দাসগুপ্ত

১৬। দালানে চূণ বালির কাজ না করিলে, অথবা দালান অধিক দিনের পুরাতন হইলে, দালানের গাত্র ভেদ করিয়া বট অশ্বত্থ প্রভৃতি নানা গাছ জন্মিয়া গৃহের বিশেষ ক্ষতি করে। তাহাদিগের মূলোৎপাটন করিয়া কিম্বা উত্তমরূপে কর্ত্তন করিয়া উহার মূলে অর্থাৎ তৎস্থানে প্রায় একতোলা পরিমাণ হিং দিয়া উক্ত স্থানটী বন্ধ করিয়া দিতে হইবে, যেন উহার গন্ধ বায়ু দ্বারা শীঘ্র নষ্ট হইয়া না যায়। অন্ততঃ উক্ত স্থানটী চূণ বালির কাজ করিলে, আর সেখানে বৃক্ষ জন্মিবে না এবং ক্ষতির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে।

১৭। সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলে ছারপোকা জন্মিতে পারে না। অধিকাংশ সময়ে দেখা যায় যে, এই বিষয়ে ঔদাসীন্যই এই উৎপাত আনয়ন করে। চেয়ার, টেবিল, খাট প্রভৃতিতে ছারপোকা জন্মিলে, যোড়ের ফাঁকে-ফাঁকে মাঝে-মাঝে তারপিন তৈল দিলে উহারা মরিয়া যায়। মাঝে-মাঝে রৌদ্রে দেওয়া হইলে ছারপোকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। অত্যধিক ছারপোকা হইলে ফুটন্ত গরম জল (কেটলির ধারা) যোড়ের ফাঁকে-ফাঁকে ঢালিয়া দিলেও উহা বিনষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীপ্রফুল্লকুমার নন্দী

বিছানার তলায় ক্ষাপথাজিন গুঁড়াইয়া দিলে ছারপোকা মরিয়া যায়। শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

বৈশাখ মাসের ৩৩নং প্রশ্নের উত্তর

লোনাধরা স্থানটির চুণ বালি খসাইয়া তেঁতুল ভিজার জল দিয়া লোনা স্থানটী উত্তমরূপে ভিজাইয়া চুণ বালির কাজ করিয়া দিলে, লোনা ধরে না। শ্রীলালা আনন্দলাল হাণ্ড বিদ্যারত্ন এফ, আর, এইচ, এস

জলছবি প্রস্তুতের নিয়ম

ভাতের মাড় সরা কি হাঁড়ীতে লাগাইয়া শুকাইলে, অথবা কলার আঠা বা তাদৃশ দ্রব্য গাছের পাতায় লাগাইয়া শুকাইলে, কাগজের মত পাতলা বস্তুতে পরিণত হয়। ঠিক ঐ প্রকারে জিলাটিন গরম জলে গুলিয়া উহার মণ্ড কোন মসৃণ দ্রব্যের উপর পাতলা স্তরে ঢালিয়া শুকাইয়া লইলে, কাগজ প্রস্তুত হয়। এই কাগজে ডিমের চট্‌চটে অংশ (অণ্ডলাল) মাখাইয়া বাইক্রোমেট অব্ পটাসের জলে ডুবাইয়া লইতে হয়। তাহার পর কোন প্রকার অর্দ্ধস্বচ্ছ দ্রব্যের উপর অঙ্কিত বা মুদ্রিত ছবির নীচে ঐ কাগজে রাখিলে কাগজে উক্ত ছবিটী ছাপা যায়। তাহার পর ঐ ছবির যে যে স্থানে রং দেওয়ার ইচ্ছা হয়, তাহা তুলি দ্বারা অঙ্কিত বা যন্ত্র দ্বারা সুরঞ্জিত করিয়া গরম জলে ধৌত করিলে, যে সকল স্থান আলো লাগিয়া গাঢ় বর্ণপ্রাপ্ত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, সেই সকল স্থান ব্যতীত অপর অংশের জিলাটিন ও বর্ণ জলে দ্রব হইয়া যায়। তখন ঐ ছবিটাকে গরম জল হইতে উঠাইয়া সাধারণ বা গঁদযুক্ত কাগজে বসাইয়া লইলেই জলছবি প্রস্তুত হয়। এই ছবি প্রস্তুত করিবার অবশ্য নানাপ্রকার প্রক্রিয়া আছে। কিন্তু উহার আসল মর্ম্ম উপরে দিলাম। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১৫। আমাদের প্রবাদবাক্যে বলে জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্রমাসে লাউ খাইলে, গোমাংস ভক্ষণের ফল হয়।

১৬। কোনও শুভ কথার সময় টিকটিকিতে টিক্, টিক্, টিক্ (ঠিক্ ঠিক্ ঠিক) বলিলে, লোকে বলে সত্য, সত্য, সত্য, অর্থাৎ এই কথা সত্য হউক।

১৮। নারদ ঝগড়া বাধাইতে খুব ভালবাসেন। মহাভারত পড়িলে জানা যায়, নারদ দেবতাদের মধ্যে ঝগড়া বাধাইয়া মজা দেখিতেন। এ জন্য ঝগড়ার সময় লোকে নারদ নারদ বলে, যাহাতে ঝগড়াটা বেশী করিয়া হয়। শ্রীপ্রমীলা মিত্র

শ্রীহরিপদ রায়, শ্রীনলিনাক্ষ হোড়, শ্রীচৈতন্য

ক্যাষ্টর অয়েল পাতলা করিবার উপায়

Castor oil পাতলা করিবার উপায় হইতেছে, কড়াতে করিয়া Castor oil লইয়া ভাল করিয়া আগুনে জ্বাল দিয়া—Blotting paperএ ছাঁকিয়া লওয়া। এরূপ করিলেই Castor oil বেশ পাতলা হইয়া যায়।

১৬, ৩০। কথিত আছে যে খণার শ্বশুর খণার জিভ্ কাটিয়া একটি জায়গায় রাখিয়া দেন। কিছুদিনের মধ্যে সেই জিভটুকুর কিয়দংশ টিক্‌টিকিতে খাইয়া ফেলে, আর কিছু পিপড়াতে খায়। সেই জন্যই অনেকের ধারণা যে, টিক্‌টিকি ভবিষ্যৎবাণী করিতে পারে; অনেক সময় তাহা প্রায় ঠিক মিলিয়া যায় বলিয়া সকলের এই বিশ্বাস। আর পিপড়ের খাদ্য যত দূরেই থাকুক না কেন তারা ঠিক দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হয় বলিয়া উপরিউক্ত প্রবাদটি সকলের আরও বিশ্বাসযোগ্য হইয়া গিয়াছে। উপরন্তু ইহাও দেখা যায় যে, টিক্‌টিকিতে যে কথার উপর 'টিক্ টিক্' করিয়া উঠে, সে কথাগুলি প্রায় সত্য হইয়া যায়। সম্ভবতঃ হিন্দু ছাড়া আর কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার প্রচলন নাই।

৮। একটি বিখ্যাত পালোয়ানকে মাটী মাখিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, সে বলিল যে, প্রথমতঃ ইহাতে ঘাম হয় না; তার পর মাটী মাখিলে কুস্তি করিবার খুব সুবিধা হয়; সমস্ত শরীর খুব মসৃণ হয়, কখনও চর্ম্মরোগ হইবার আশঙ্কা থাকে না। এবং ইহাও সে বলিল যে, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ধার সে বড় একটা ধারে না। শ্রীহরিপদ রায়

বস্ত্র শিল্পের উন্নতি—যে কারণেই হউক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অত্যল্প লোকই খদ্দরের ধুতি ব্যবহার করিয়া থাকেন। যাঁহারা খদ্দর ব্যবহার করেন, তাঁহারাও কলের সুতার সাহায্যে তৈয়ারী খদ্দর ব্যবহার করেন। খাঁটি খদ্দর সাধারণতঃ দেখা যায় না এবং উহা ব্যবহারের যোগ্য কি না বলিতে পারি না। কোন শিল্পকে ব্যবসায় ক্ষেত্রে দাঁড় করাইতে হইলে, প্রতিযোগিতায় উহার টিকিয়া থাকার ব্যবস্থাও করিতে হয়। এ অবস্থায় আমার ধারণা, তিলক-স্বরাজ-ফণ্ডের সংগৃহীত কিছু টাকা দিয়া বঙ্গদেশে দুইটী সুতার কল (Spinning Mill) স্থাপন করিলে, দেশের স্থায়ী উপকার হইবে, এবং তাহাতে কুটীর শিল্পও নষ্ট হইবে না। তাঁতের সাহায্য অনায়াসে কাপড়ও বুনিতে পারা যাইবে। শুধু চরকার উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। কারণ চরকার সুতায় তৈয়ারী ধুতি ব্যয়সাধ্য ও পরিশ্রম সাধ্য। এবং ইহা বড় শীঘ্র ছিঁড়িয়া যায়। বিশেষতঃ সাধারণে ইহা পছন্দ করে না। শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ইঙ্গিত

শ্রীবিশ্বকর্ম্মা

গোড়ার কথা

রসায়ন-শিল্পীর ল্যাবরেটরী

যে কোন একটা কাজ করিতে গেলেই, কাজটি করিবার যে প্রণালী বা ধারা আছে, তদনুসারে সেই কাজ সম্পন্ন করিতে হয়। নচেৎ, কাজটি ভাল হয় না; কিম্বা হয় ত আদৌ হয় না। "কালি, কলম, মন—লেখেন তিনজন।" লিখিবার সময় কালি ও কলম লিখিবার উপযোগী অবস্থায় থাকা চাই; এবং মনোযোগ দিয়া লেখা চাই। নচেৎ লেখা ভাল, কিম্বা মোটেই হইবে না। কলমটি যদি ভোঁতা হয়, কিম্বা কলমের মুখ দিয়া যদি কালি না সরে, তাহা হইলে কাগজের উপর লেখা ফুটিবে কি?

কোন শিল্প-দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইলে, তাহার যথোপযুক্ত উদ্যোগ আয়োজন করিতে হয়—যন্ত্রতন্ত্র, পাত্র, মাল-মসলা প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে হয়। শিল্প-দ্রব্যটি প্রস্তুত করার প্রণালী সম্বন্ধে মনে-মনে একটা ধারণা থাকিলেই কেবল চলে না—হাতে-হেতেরে কাজ করিয়া, কোন্-কোন্ জিনিস কিরূপ অবস্থায় সংগ্রহ ও ব্যবহার করা দরকার, তাহা ঠিক করিয়া লইতে হয়। অর্থাৎ আসল কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, অল্প মাত্রায় সেই জিনিসটি প্রস্তুত করিয়া পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়। শিল্পী যদি কোন কারখানায় কিম্বা শিল্পবিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়াও আসিয়া থাকেন, তাহা হইলেও নিজের কারখানা খুলিবার পূর্ব্বে, কারখানার সাজ-সরঞ্জামের বন্দোবস্ত করিবার জন্য, গোড়ায় একবার তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। এই পরীক্ষা করিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র ঘর থাকা আবশ্যক। এই ঘরটিকে পরীক্ষাগার বা ল্যাবরেটরী বলা যায়। যাঁহারা কোন শিল্প-বিদ্যালয়ে, বা কারখানায় শিক্ষা-লাভের সুযোগ পান নাই,—কেবল বই পড়িয়া কোন কিছু শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিতে চাহেন,—একটী ল্যাবরেটরী প্রথমে প্রস্তুত করিয়া লওয়া তাঁহাদের পক্ষে অতীব আবশ্যক—একেবারে অপরিহার্য্য বলিলেও চলে। এই ল্যাবরেটরী তাঁহার পক্ষে শিল্প-বিদ্যালয়ের সমান হইবে—তিনি নিজেই হইবেন তাঁহার নিজের শিক্ষক; আর পরীক্ষার কাজটি হইবে—অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন। যিনি শিল্প-বিদ্যালয়ে কেবল পুঁথিগত বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া আসিয়াছেন—কারখানার অভাবে হাতে-হেতেরে প্র্যাক্টিক্যাল শিক্ষা লাভের সুযোগ পান নাই—ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে।

কোন শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইলে যে সব মাল-মসলার দরকার হয়, তাহা সব সময়ে বাজারে ঠিক উপযুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না। সেই জন্য বাজার হইতে কোন মাল কিনিবার পূর্ব্বে, তাহার একটু নমুনা সংগ্রহ করিয়া, সেটা আপনার কাজের ঠিক উপযোগী কি না, তাহা আপনাকে পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে। এরূপ পরীক্ষা করিবার পক্ষে ল্যাবরেটরী খুব কাজে লাগে।

তা ছাড়া আর একটী বিষয় আছে—অভ্যাস। আপনি প্রত্যহ দেখিতেছেন, শত-শত লোক আপনার সুমুখ দিয়া সাইকেলে চড়িয়া ছুটিতেছে। সাইকেলে উঠিয়া কিরূপে তাহা চালাইতে হয়, তাহা আপনি বেশ জানেন; এবং পল্লীগ্রাম হইতে নবাগত কোন ব্যক্তি—যে কখনও সাইকেল দেখে নাই, বা তাহার নামও শুনে নাই, তাহাকে আপনি সাইকেল চালাইবার প্রণালী বেশ সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিতে পারিবেন। কিন্তু সাইকেল চালাইবার প্রণালী জানা এবং সাইকেল চালানো আলাদা কথা। আপনি সাইকেল চালাইবার প্রণালী জানিলেও, একখানি নূতন সাইকেল কিনিয়া আনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা চালাইতে পারিবেন না। আপনাকে কিছুদিন ধরিয়া সাইকেলে চড়িতে ও সাইকেল চালাইতে অভ্যাস করিতে হইবে।

সাইকেল চালাইতে জানা আপনার পক্ষে theoretical জ্ঞান, এবং সাইকেল কিনিয়া আনিয়া চড়িতে ও চালাইতে অভ্যাস করা practical জ্ঞান। বই পড়িয়া যাহা শেখা যায়, তাহা theoretical; আর ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করিয়া যেটুকু আয়ত্ত করিতে হয়, তাহা practical।

তৃতীয় কথা,—ধৈর্য্য। জীবনের সকল কার্য্যেই ধৈর্য্যের উপকারিতা আছে বটে, কিন্তু কারখানার কাজে, বিশেষতঃ ল্যাবরেটরীতে শিক্ষানবীশের অবস্থায়, ধৈর্য্য অতীব আবশ্যক। যে কোন একটী পরীক্ষা আরম্ভ করুন,—প্রথম প্রথম-দুই-চারিবার সফলতা লাভ না হইতেও পারে। প্রথম-প্রথম দুই-একবার অকৃতকার্য্য হইয়াই, যদি আপনি পরীক্ষা করা ছাড়িয়া দিয়া, হতাশ হইয়া হাত পা গুটাইয়া বসেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে, আপনি অতি অপদার্থ—আপনার দ্বারা সংসারের কোন কাজ হইবে না—কোন বিষয়েই আপনি কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। কিন্তু যদি আপনার ধৈর্য্য থাকে, দৃঢ়তা থাকে, অধ্যবসায় থাকে তাহা হইলে এক দিন না এক দিন আপনি কৃতকার্য্য হইবেনই হইবেন। যাঁহারা জীবনের কাজে সফলতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই নিশ্চয়ই আমার এই কথায় পোষকতা করিয়া সাক্ষ্য দিবেন যে, সফলতা লাভের পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে অনেকবার নিষ্ফল হইতে হইয়াছে, অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছে। বস্তুতঃ, একটা কাজ করিতে গেলেই শত-সহস্র বাধা-বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই পর্ব্বত-প্রমাণ বাধা বিঘ্ন দেখিয়া যে পিছাইয়া যায়, সে চিরদিনই যে পিছনে পড়িয়া থাকিবে, তাহা আর বিচিত্র কি। যে দৃঢ় চিত্তে, অধ্যবসায় সহকারে সেই সব বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারিবে, সে-ই তাহার অভীষ্ট ফল লাভও করিবে। ল্যাবরেটরীর পরীক্ষায় আপনি অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে শিখিবেন।

চতুর্থতঃ, কেবল অধীত পুস্তকের অন্ধ ভাবে অনুসরণ না করিয়া,—পুঁথিগত বিদ্যার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া, নিজের মস্তিষ্ক, বুদ্ধি, বিবেচনা-শক্তি পরিচালনের চেষ্টা করিবেন। বইতে যে ভাবে কাজ করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, সে ভাবে কাজ করিবার আপনার সুবিধা না হইতে পারে। কিন্তু বইএর উপদেশমত কাজ করিবার সুবিধা নাই বলিয়া কি আপনার কাজ বন্ধ থাকিবে? তাহা কখনই হইতে পারে না। আপনি পুস্তকস্থিত উপদেশের মূল মর্ম্মটুকু বুঝিয়া লউন, এবং আপনার সুবিধামত তাহা কার্য্যে পরিণত করুন। মনে করুন, বইতে একটী বিষয়ের পরীক্ষার জন্য এক স্থলে কাচ-পাত্র ব্যবহার করিতে বলা হইয়াছে। আপনার কাচ-পাত্র নাই, এবং তাহা যোগাড় করিবারও সুবিধা নাই। তাহা হইলে হয় ত আপনার পরীক্ষা হইল না; কিম্বা কাচ-পাত্রের অভাবে আপনি একটী ধাতু-পাত্র লইয়া পরীক্ষা করিতে গেলেন, এবং জিনিসটা খারাপ হইয়া গেল। আপনি যদি একটু বিবেচনা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, যে-যে মসলা লইয়া পরীক্ষা করিতে হইবে, তাহাদের মধ্যে দুই-একটী অম্ল পদার্থ (acid) রহিয়াছে। সেই জন্য কাচ-পাত্র ব্যবহার করিতে বলা হইয়াছে। আপনার কাচ-পাত্র না থাকিলেও, চীনা-মাটীর বাসন রহিয়াছে; অন্ততঃ, একটা নূতন এনামেলের পাত্র যোগাড় করা আপনার পক্ষে কঠিন নহে। কিম্বা একটা পাথরের বাটীতে সে কাজ চলিতে পারে। নিদেন পক্ষে একটা মাটীর পাত্রও ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই রকম বিবেচনা করিয়া কাজ করিলে, অনেক সময়ে অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করা যায়। এবং এইখানেই ল্যাবরেটরীর প্রধান সার্থকতা ও উপযোগিতা।

অনেক সময়ে বইতে দ্রব্যাদির ভাগ নির্দ্দেশ করা থাকে না। সেস্থলে অনভিজ্ঞ নূতন শিক্ষার্থীকে মহা মুস্কিলে পড়িতে হয়। মনে করুন, কোন একটী পরীক্ষায় লবণ-জল (Solution of common salt) ব্যবহার করিবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। কি পরিমাণ জলে কি পরিমাণ লবণ মিশাইলে লবণ-জল প্রস্তুত হয়, তাহা আপনার জানা নাই। অথচ, অন্যান্য উপকরণগুলির ভাগ নির্দ্দিষ্ট থাকায়, লবণ-জলেও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ লবণ না থাকিলে পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হইতে পারে না। এ ক্ষেত্রে আপনি কি করিবেন? আপনাকে পরীক্ষা দ্বারা লবণের পরিমাণ স্থির করিয়া লইতে হইবে। আপনি এক গ্লাস জল লউন। গ্লাসটি ও জল আলাদা-আলাদা ওজন করিয়া খাতায় লিখিয়া রাখুন। তার পর অল্প-অল্প করিয়া ঐ জলে লবণ (প্রত্যেকবার ওজন করিয়া)

মিশাইতে থাকুন। দেখিবেন, লবণ জলে গলিয়া গিয়া অদৃশ্য হইতেছে। ক্রমে যখন দেখিলেন, লবণ আর জলে গলে না, খানিকটা লবণ অদ্রব অবস্থায় রহিয়াছে, তখন আপনাকে বুঝিতে হইবে যে, সাধারণ তাপে যে পরিমাণ গলে যে পরিমাণ লবণ গলিতে পারে, তদপেক্ষা বেশী লবণ গ্লাসের জলে মিশানো হইয়াছে। এখন একটী ফোনেলের গায়ে একখানি ব্লটিং কাগজ ঠোঙার মত করিয়া বসাইয়া দিয়া, লবণজলটুকু ছাঁকিয়া লউন। তখন দেখিবেন, লবণের যে অংশটুকু জলে গলে নাই, তাহা ব্লটিংয়ের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে, এবং বাকী দ্রবীভূত লবণ নিম্নে ধৃত পাত্রে জলের সঙ্গে-সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। এইবার যদি আপনি ছাঁকা লবণ-জলটুকু ওজন করিয়া লন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, ঐ লবণাক্ত জলে লবণের পরিমাণ জলের পরিমাণের প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ আছে। প্রায় বলিলাম এই জন্য যে, রাসায়নিকেরা নিখুঁত ভাবে গণনা ও ওজন করিয়া স্থির করিয়াছেন লবণ তাহার ঠিক পাঁচগুণ জলে সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হয়। এ ক্ষেত্রে ব্লটিং কাগজ কিছু লবণ-জল শুষিয়া লইয়াছে, এবং হয় ত জল ঢালিবার সময় দুই-চার ফোঁটা পড়িয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য ঠিক একগুণ লবণ ও পাঁচগুণ জল পাওয়া যাইতেছে না—একটুখানি তফাৎ হইতেছে। তাই 'প্রায়' কথাটি ব্যবহার করিয়াছি। কোন তরল দ্রব্যে যে পরিমাণ লবণ, চিনি বা অন্য দ্রবনীয় পদার্থ সম্পূর্ণ রূপে গলিয়া যায়, সেই পরিমাণ দ্রব্য ঐ তরল পদার্থে দ্রবীভূত করিয়া লইলে তখন ঐ তরল পদার্থের যে অবস্থা দাঁড়ায়, সেই অবস্থাকে saturated অবস্থা বলে। উক্ত তরল পদার্থে উক্ত দ্রবনীয় পদার্থের ভাগ উক্ত পরিমাণের অপেক্ষা বেশী হইলে, আর গলিবে না—কঠিন অবস্থাতেই থাকিয়া যাইবে। দুইটী পদার্থের এই যে মিলনের ধর্ম্ম (solubility), ইহার সাহায্যে রাসায়নিকেরা অনেক প্রয়োজন সাধন করিয়া থাকেন; এবং তাঁহারা কার্য্যের সুবিধার জন্য, ভিন্ন-ভিন্ন তরল পদার্থে ভিন্ন-ভিন্ন কঠিন পদার্থের দ্রবীভূত হইবার পরিমাণ ঠিক করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। যখন দুই-তিনটি ভিন্ন-ভিন্ন পদার্থ মিশাইয়া একটী নূতন পদার্থ প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়, এবং তাহাদের ভাগের অনুপাত জানা না থাকে, এবং ভাগ ঠিক না হইলে জিনিসটি যদি ঠিক মত তৈয়ার না হয়, তাহা হইলে ল্যাবরেটরীতে অল্প-অল্প করিয়া ঐ সকল দ্রব্য ভিন্ন-ভিন্ন ভাগে মিশাইয়া প্রয়োজনীয় ভাগের অনুপাত ঠিক করিয়া লইতে হয়। ল্যাবরেটরীতে প্রায় সর্ব্বদা এরূপ কাজ করিবার দরকার হইতে পারে।

ল্যাবরেটরীর সাজ-সজ্জা

গৃহ

যে ঘরে ল্যাবরেটরী স্থাপন করিতে হইবে, সে ঘরটি এমন ভাবের হওয়া চাই, যেন বৎসরের সকল ঋতুতে এবং দিনের সকল সময়ে যথেষ্ট আলো পাওয়া যায়। বর্ষাকালে বৃষ্টির জল যেন ঘরের মধ্যে আসিতে না পারে। সূর্য্যের কিরণ ও তাপ যেন প্রত্যক্ষ ভাবে রাসায়নিক দ্রব্যগুলির উপর আসিয়া না পড়িতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা চাই। কারণ, এই দুইটী জিনিস অনেক পদার্থের বিকৃতি ঘটায়—এমন কি পদার্থগুলি শিশির মধ্যে রক্ষিত হইলেও। অথচ, প্রয়োজন হইলে যাহাতে সূর্য্য-কিরণ ও তাপ রোধ করা যায় ও দরকার হইলে ব্যবহারও করা যায়, তাহারও ব্যবস্থা করিয়া রাখা চাই। ল্যাবরেটরীর ছাদে sky-light থাকিলে অনেক সময়ে সুবিধা হয়।

দেওয়ালের ধারে বুক সমান লম্বা একটী কি দুইটী টেবিল, সঙ্গে ড্রয়ার থাকিবে; পরীক্ষা কার্য্য প্রায় দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়াই করিতে হয়, এবং তাহাই সুবিধা-জনক। তবে অনেকক্ষণ পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলে বিশ্রাম করিবার জন্য দুই-একটী টুল রাখা যাইতে পারে। তবে চেয়ার, কেদারা, চৌকি প্রভৃতির আড়ম্বর না থাকিলেই ভাল। ছাদের নীচে দেওয়ালের গায়ে র‍্যাক বা ব্র্যাকেটে শিশি, বোতল, জার প্রভৃতি নিরাপদে রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। একটী টুলের উপর দাঁড়াইয়া হাত বাড়াইয়া নাগাল পাওয়া যায়—র‍্যাকগুলি এমনি উঁচুতে থাকিবে। বেশী উঁচু হইলে জিনিস-পত্র পাড়িবার জন্য মই কি কাঠের সিঁড়ির দরকার হয়। ল্যাবরেটরীতে বেশী বাজে আসবাব রাখা বাঞ্ছনীয়ও নয়, সুবিধা-জনকও নয়।

সহর হইলে ঘরের এক কোণে একটী জলের কল থাকিলে খুব সুবিধা হয়; কারণ, ল্যাবরেটরীতে সর্ব্বদা জলের দরকার হয়; আর আবশ্যক—তাপ। যে সকল সহরে গ্যাসের আলো আছে, সেখানে গ্যাসের পাইপ বসাইয়া তাপ পাওয়া

যাইতে পারে ; নচেৎ স্পিরিট ল্যাম্প। যে সব কাজে প্রবল তাপ দরকার, সে সকল কাজ ঘরের বাহিরে কেরোসিনের, বা গ্যাস, কিম্বা ইলেক্‌ট্রিক ষ্টোভে করাই ভাল।

দুই-একখানি তোয়ালে এবং সাবান ল্যাবরেটরীর অপরিহার্য্য সাজ-সজ্জা। পরীক্ষার সময় দ্রব্যাদি যতটা নিখুঁত ভাবে ওজন করিয়া লওয়া হয়, পরীক্ষায় ফল ততই সন্তোষজনক হয়। সুতরাং দুই-এক সেট কাঁটাওয়ালা দাঁড়ি-পাল্লা, এবং তদুপযোগী দেশী (মণ সের প্রভৃতি) ও বিলাতী (পৌণ্ড আউন্স প্রভৃতি) বাটখারা, গোটা-দুই-তিন নিক্তি এবং তদুপযোগী দেশী (ভরি, তোলা প্রভৃতি) ও বিলাতী (গ্রেণ স্ক্রুপল প্রভৃতি) বাটখারা থাকা চাই। তরল দ্রব্য মাপিবার জন্য মেজার গ্লাস (ভিন্ন ভিন্ন মাপের) দরকার।

কোন কিছু পরীক্ষা করিবার জন্য যে কয়টি জিনিস দরকার,—অন্ততঃ দুই-তিনবার পরীক্ষা করা যাইতে পারে, এমন পরিমাণে সেই জিনিসগুলি সংগ্রহ করা উচিত। পরীক্ষার পর সেই সব জিনিসের মধ্যে কোন কোনটি কিছু কিছু উদ্বৃত্ত হইতে পারে। জিনিসগুলি ফেলিয়া না দিয়া, কিম্বা নষ্ট না করিয়া, অথবা অবহেলায় এক কোণে ঠেলিয়া না রাখিয়া, শিশির মধ্যে পুরিয়া, ছিপি আঁটিয়া, লেবেল লাগাইয়া তাকের উপর তুলিয়া রাখিতে হইবে; সেগুলি ভবিষ্যতে অনেক কাজ দিতে পারিবে।

একটী বাঁধানো খাতা করিবেন। তাহাতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির যথাসম্ভব দেশী ও বিলাতী নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়, প্রাপ্তি স্থান, উৎপত্তি স্থান প্রভৃতি বিবরণ সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন। তাহা হইলে জিনিসগুলি কিনিবার সময় বোকার মত বেশী ঠকিতে হইবে না। অনেক জিনিস দেশী নামে বেণের দোকানে সস্তায় পাওয়া যায়। কিন্তু নাম-ধাম, জাতি-গোত্র প্রভৃতি না জানা থাকার দরুণ, বিরাট কটমট বৈজ্ঞানিক নামে সাহেবদের দোকান হইতে অগ্নি-মূল্যে কিনিতে হয়। আবার এক এক সময়ে এক নামে অনেক রকম জিনিস পাওয়া যায়। ঠিক মত জিনিস বাছিয়া কিনিতে না পারিলে অনেক লোকসান হয়। প্রথম প্রথম এই লোকসান অনিবার্য্য। ক্রমে জিনিসগুলির সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিলে, এবং কাজ করিতে-করিতে বহুদর্শিতা লাভ করিলে, এ অসুবিধা আর থাকিবে না।

পরীক্ষার সময় যে সব জিনিস ব্যবহার করিতে হইবে, সাধ্য পক্ষে তাহাতে হাত দিবেন না। চাম্‌চে, চিমটে, ছ্যাতা, পলা, সোন্না, সাঁড়াশি, প্ল্যাস প্রভৃতির সাহায্যে সে সব জিনিস ব্যবহার করিবেন। যদি কোন জিনিসে হাত দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইলে একটা জিনিসে হাত দিবার পর, দ্বিতীয় জিনিসে হাত দিবার পূর্ব্বে, হাত ধুইয়া তোয়ালেতে মুছিয়া তবে, অন্য জিনিসে হাত দিবেন। ল্যাবরেটরীতে এই সতর্কতাটি অত্যন্ত প্রয়োজন।

তরল দ্রব্যাদি ঢালিবার জন্য কয়েকটি ফোনেল দরকার। কাচের, টিনের ও এনামেলের ফোনেল পাওয়া যায়। প্রত্যেক রকমের দুই-একটা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া দিবেন—কোন্‌টার কখন দরকার হয়, বলা যায় না। একখানি বড় ছুরী, একখানি ছোট ছুরী, অন্ততঃ একখানি কাঁচি, কিছু টোয়াইন দড়ি, দোয়াত, কলম, কাগজ, ব্লটিং, লেড পেনসিল (কালো, লাল, নীল), চাই। প্রত্যেক পরীক্ষার আগাগোড়া বিবরণ (পরীক্ষা নিষ্ফল হইলেও) নিখুঁত ও বিস্তৃত ভাবে লিখিয়া রাখিবার জন্য আর একখানি বাঁধানো খাতা অত্যাবশ্যক।

ল্যাবরেটরীতে যাঁহারা পরীক্ষা করিবেন, তাঁহাদের প্রকৃতি একটু নারী-ভাবাপন্ন হইলে ভাল হয়। অর্থাৎ স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ যেরূপ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা-প্রিয় ও গোছাল—ল্যাবরেটরীর বৈজ্ঞানিককেও সেই রূপ হইতে হইবে। কোন একটী বিশেষ পরীক্ষা করিবার সময়, তাহার সমস্ত যন্ত্র-তন্ত্র ও উপাদান ল্যাবরেটরীতে সংগ্রহ করিয়া গোছাইয়া রাখিতে হইবে—যেন কাজ করিতে-করিতে কোন জিনিসের অভাব না হয়; হইলে, সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হইবে, হয় ত কিছু ক্ষতিও হইতে পারে। ল্যাবরেটরীতে যখনই যে জিনিসের দরকার হইবে, তখনই সেই জিনিসটি হাতের কাছে মজুত থাকা চাই।

দানাদার, শুষ্ক, কঠিন বা ডেলা জিনিস গুঁড়াইবার জন্য হামানদিস্তা, বা পাথরের কিম্বা চীনা-মাটীর খল অথবা মর্টার ল্যাবরেটরীতে প্রায় সর্ব্বদা দরকার হয়। এগুলি ল্যাবরেটরীর নিজের জিনিস হইলেই ভাল হয়। একখানি শক্তিশালী (powerful) আতসী কাঁচ (magnifying glass) সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন—অনেক সময়ে অনেক কাজে লাগিবে।

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীনরেন্দ্র দেব

১। শরীরের মাল মশলা

মানব-দেহের রাসায়নিক বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে যে সব পদার্থ পাওয়া যায়, তার বাজার-দর সাড়ে তিন টাকা আন্দাজ হ'তে পারে! এদেশের প্রাচীন হিন্দুরা সম্ভবতঃ এ খবরটা জানতেন, তাই বোধ হয় তাঁরা শবদাহের সময় দেহের মূল্যের অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুর করে যান নি! পাশের চিত্রখানি দেখলে পাঠকেরা অনায়াসে বুঝতে পারবেন যে, তাঁদের এত সাধের এত যত্নের দেহটি পরিমাণে কতটা এবং কি কি মালমশলায় তৈরী। একটি Test Tube অর্থাৎ রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য যে কাঁচের নল পাত্র ব্যবহার হয়, তার মধ্যে একটি পূর্ণ-গঠিত নরদেহ রেখে দেখানো হ'য়েছে দেহের মধ্যে কি কি পদার্থ কতখানি ক'রে আছে

শরীরের মালমশলা
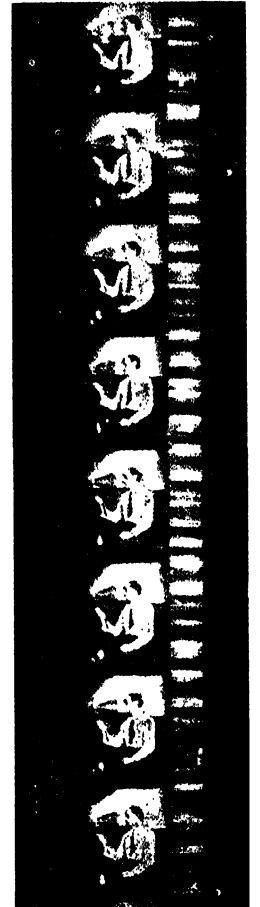
অভিনয় ও কথার চিত্র

(এই চিত্রে অভিনয়ের ও কথার চিত্র একসঙ্গে পাশাপাশি উঠেছে)

এবং পাশে উক্ত পদার্থসমূহের পরিমাণ সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা হবে ব'লে সে সবেরও একএকখানি চিত্র দেওয়া হয়েছে।

মানব দেহের প্রধান মশ্‌লা হচ্ছে 'জল'। প্রত্যেকের দেহের মধ্যে জল আছে শতকরা ৬৬ ভাগ! যবক্ষার জান (Nitrogen) আছে শতকরা ৩১ ভাগ। অব্‌জনন (Hydrogon) আছে শতকরা ২·১ ভাগ। অঙ্গার (Carbon) আছে শতকরা ১৫·৮ ভাগ। খটিক (Calcium) আছে শতকরা ২৫ ভাগ। স্ফুরক (Phosphous) আছে শতকরা ১·২ ভাগ। অম্লজান (Oxygen) আছে শতকরা ৬·৭ ভাগ। এ ছাড়া লোহা, চুণ, নুন, পত্রক (Potassium) প্লব (Fluorine) গন্ধক, মগ্নক (Magnesium) ইত্যাদি পদার্থও কিছু কিছু আছে।

(Popular Science)

২। নাকে দেখা ও হাতে শোনা

কথাটা শুনলে প্রথমটা গঞ্জিকাসেবীর খেয়াল বলেই মনে হবে বটে, কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই আজ্‌গুবি নয়। উইলেটা হগীনস্‌ বলে একটী সতেরো বছরের অন্ধ ও বধির মেয়ে তার দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের অভাব অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পূর্ণ করে নিয়েছে। মেয়েটি চ'ক্ষে কিছু দেখ্‌তে পায় না বটে, কিন্তু ঘ্রাণশক্তির দ্বারা কে কে তার কাছে এসেছে এবং কে কি রংয়ের পোষাক পরে এসেছে, তা পর্য্যন্ত বলে দিতে পারে! এমন কি সকলের অজ্ঞাতসারে কখন যে চুপিচুপি বাড়ীর পোষা বিড়ালটা সে ঘরে মুহূর্ত্তের জন্য উঁকি মেরে চ'লে গেল, অন্ধ উইলেটা সেটিও টের পায়!
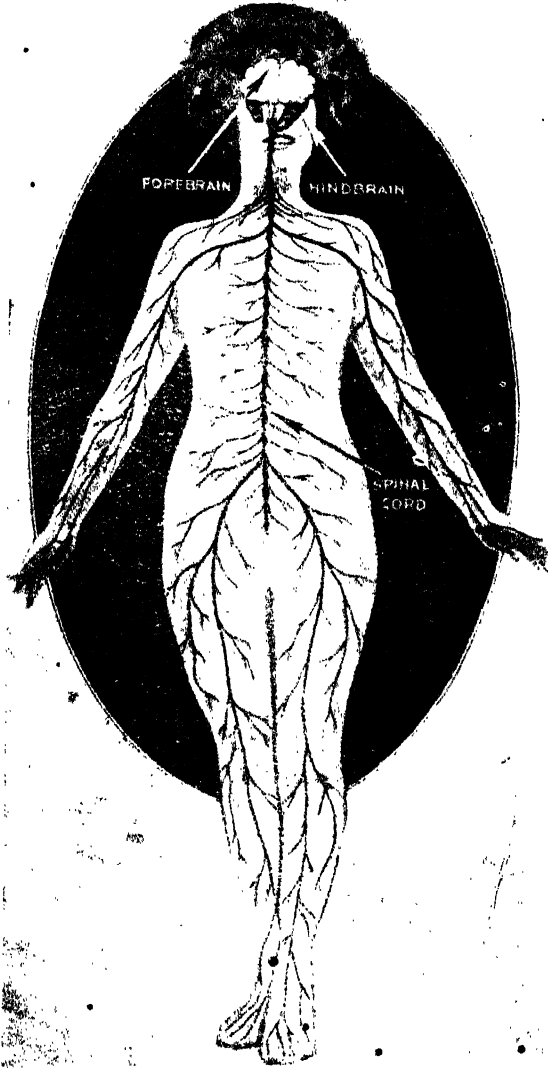
লক্ষ চক্ষু ও কোটী শ্রবণ—(মানব-দেহাচ্ছাদিত এই যে অগণিত স্নায়ুমণ্ডলী, অভ্যাসের দ্বারা এর প্রত্যেকটীই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কাজ দিতে পারে)

কে কি বলছে বধির উইলেটা বক্তার কণ্ঠদেশ অঙ্গুলী দ্বারা স্পর্শ ক'রে অনায়াসে তা বুঝ্‌তে পারে। টেলিফোঁর কথা সে টেলিফোঁ কলের শ্রবণযন্ত্রটির মুখে অঙ্গুলী স্পর্শ করে সহজেই বুঝ্‌তে পারে। উইলেটার কাছে সদা সর্ব্বদা একটী বধির-ত্রাণ যন্ত্র থাকে। এই যন্ত্রের সাহায্যে আলাপের স্বাভাবিক ধ্বনি উচ্চতর হ'য়ে ক্ষীণশ্রুতি ব্যক্তিদের শ্রবণ-ইন্দ্রিয়কে সাহায্য করে। উইলেটা কানে কিছুই শুনতে পায় না বলে সে যন্ত্রটিও সে কোন দিনই কানে লাগায় না, বরাবরই যন্ত্রটার মুখে অঙ্গুলী স্পর্শ করে সে শুধু বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কথা নয়, গান, বাজ্‌না এমন কি অভিনয় পর্য্যন্ত পরিস্কার বুঝতে পারে। শব্দতরঙ্গকে স্পর্শদ্বারা অনুভব করেই সে তরঙ্গ-বাহী বাণীও অনায়াসে ধরতে পারে! একগাছি ছড়ির দ্বারা সে বক্তার বক্ষঃস্থল স্পর্শ ক'রে তিনি কি বলছেন, তা সমস্তই বুঝ্‌তে পারে।

খবরের কাগজের যে সব প্রধান প্রধান সংবাদ বড়

বড় হরপে ছাপা হয়. উইলেটা সেই শিরোনামগুলির উপর হাত বুলিয়ে সেগুলি স্পষ্ট প'ড়তে পারে। বড় বড় ডাক্তাররা উইলেটাকে নানা রকমে পরীক্ষা ক'রে স্থির করেছেন যে, এই অন্ধ ও বধির মেয়েটি যে ভাবে তার দর্শন ও শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের অভাব দূর করেছে, প্রত্যেক লোকই চেষ্টা করলে সেই শক্তি অর্জ্জন করতে পারে। বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক গণ্ট তাঁর কয়েকটি ছাত্র ছাত্রীকে ঘ্রাণের দ্বারা দর্শনেন্দ্রিয়ের এবং স্পর্শের দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয়ের কাজ আদায় করতে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, মহীলতারা যেমন চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বিবর্জ্জিত হওয়া সত্ত্বেও কেবলমাত্র স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে দেখ্‌তে পায়, শুনতেও পায় এবং তার খাদ্যের আঘ্রাণও নিতে পারে, সেইরূপ মানুষও তার পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যে কোনও একটার দ্বারা অপর ইন্দ্রিয়ের কাজ চালিয়ে নিতে পারে! তিনি বলেন যে আমাদের পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ই শরীরস্থ স্নায়ুমণ্ডলীর সম্পূর্ণ অধীন। কেবল জন্মাবধি আমরা ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিভিন্ন কাজ আদায় ক'রতে অভ্যস্থ হই ব'লে আমাদের যে

ডবল ক্যামেরা—(একসঙ্গেই অভিনয় ও কথার দু'খানি পৃথক পৃথক চিত্র তোলা হ'চ্ছে)

অধ্যাপক জে-ন্ট, টাইকোসাইনার ও তাঁহার উদ্ভাবিত কথার চিত্রকে শব্দে রূপান্তরিত কর্ব্বার যন্ত্র

কোনও একটা ইন্দ্রিয় অপর কোনও বিশেষ ইন্দ্রিয়ের কাজ ক'রতে শেখে না। কিন্তু অধ্যাপক গল্ট্ এবং ফরাসী অধ্যাপক লুই ফ্যারিগোল্ তাঁদের ছাত্র ছাত্রীদের দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, চেষ্টা করলে উইলেটা হগিন্সের মত কেবল অন্ধ ও বধির লোক কেন, চক্ষুষ্মান্ ও প্রখর শ্রুতিধরেরাও কেবলমাত্র তাদের স্নায়ুমণ্ডলীর শক্তি বৃদ্ধি ক'রে নিয়ে যে কোনও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কাজ আদায় করে নিতে সক্ষম হবে। (Popular Science)

উইলেটা হগিন্স — যষ্টির সাহায্যে কথোপকথন

(এই বধির বালিকা একটি দীর্ঘ যষ্টির দ্বারা বক্তাকে স্পর্শ করে তার সমস্ত কথা অনায়াসে বুঝতে পারে)

৩। সবাক্-চলচ্চিত্র

বায়োস্কোপের নির্ব্বাক অভিনয়কে সবাক করবার জন্য বহুকাল ধরে য়ুরোপে অনেক চেষ্টা চল্‌ছিল কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেউ কৃতকার্য্য হ'তে পারেননি। প্রথমে বায়োস্কোপের ছবির সঙ্গে ফনোগ্রাফের সংযোগ ক'রে এই চেষ্টা আরম্ভ হ'য়েছিল; কিন্তু ছবির সঙ্গে সঙ্গে কথা ঠিক সমতালে চল্‌তে না পারায় সে চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে গেছ্‌ল। সম্প্রতি একজন জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক এক নূতন পথ ধরে এই দিকে অগ্রসর হয়ে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হয়েছেন। তিনি শব্দ-তরঙ্গকে আলোক-প্রবাহে রূপান্তরিত ক'রে ফিল্মের উপর অভিনয়ের ছায়াচিত্র গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে অভিনেতৃবর্গের মুখের কথাগুলিরও আলোকচিত্র গ্রহণ করেছেন। রঙ্গমঞ্চে এই চিত্র প্রদর্শনকালে নূতন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের কৌশলে চিত্রের কুশীলবগণের আলোকপটে গৃহীত কথা পুনরায় শব্দ-তরঙ্গে রূপান্তরিত হ'য়ে যায় এবং ঐ শব্দ-তরঙ্গ আবার তাড়িত-তরঙ্গে পরিণত হ'য়ে, রেডিয়ো-ফোনের সাহায্যে সমস্ত দর্শকবৃন্দের শ্রুতি-গোচর হয়।

জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক আর্ণষ্ট রুমারের এই নূতন উদ্ভাবনের কথা প্রচার হবামাত্র শোনা গেল যে, ইংলণ্ডের গ্রিণ্ডেল্ ম্যাথুজ ও আমেরিকার অধ্যাপক টাইকো সাইনারও ঠিক এই একই উপায়ে সবাকচিত্র উদ্ভাবনে

কৃতকার্য্য হয়েছেন এবং ফরাসী চলচ্চিত্রবিদ শ্রীযুক্ত লিয়ো গমণ্ট্ অন্য এক উপায়ে তাঁর চলচ্চিত্রকে সবাক্ ক'রে তুলেছেন।

ইংলণ্ডের গ্রিণ্ডেল ম্যাথুজ ও আমেরিকার প্রোঃ টাইকোসাইনার —জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক আর্ণষ্ট্ রুমারের উদ্ভাবিত উপায়ে সবাক্ চলচ্চিত্র প্রস্তুত করেছেন বটে, কিন্তু তাঁদের পরস্পরেব যন্ত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের।

জার্ম্মান্ বৈজ্ঞানিক আর্ণষ্ট্ রুমার এবং মার্কিণ প্রোঃ টাইকোসাইনারের উদ্ভাবিত উপায়ে একই ফিল্মের মধ্যে ছবি ও কথার চিত্র পাশাপাশি ওঠে, কিন্তু গ্রিণ্ডেল ম্যাথুজের যন্ত্রে ছবি ও কথার পৃথক পৃথক চিত্র গৃহীত হয়। তবে ডব্‌ল ক্যামেরায় একই সময়ে একত্রে দুখানি ফিল্ম্ তোলা হয় এবং ঠিক সেইভাবে প্রদর্শনও করা হয় বলে অভিনয় ও কথায় কোনও অগ্রপশ্চাৎ হয় না ঠিক সমতাল বজায় থাকে। লিয়ো গমণ্ট্ গ্রামোফনের সাহায্যেই তাঁহার চলচ্চিত্রকে সবাক্ করে তুলেছেন। ছবি
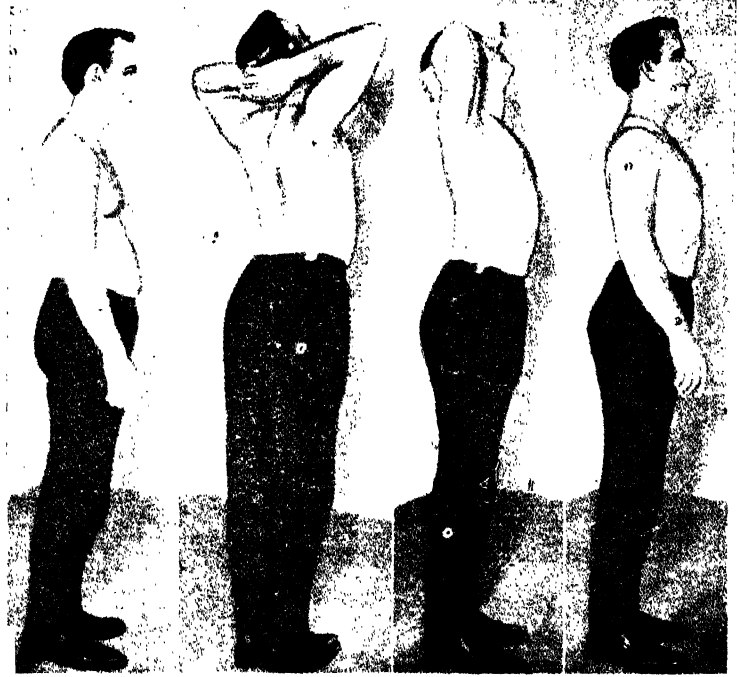
পাঁচ মিনিটের ব্যায়াম

তোল্‌বার সময় ক্যামেরা-সংলগ্ন ফিল্মের চাকা হাতে না ঘুরিয়ে তিনি বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে সেটা ঘোরাবার ব্যবস্থা করেছেন এবং সেই একই শক্তির বেগে সঙ্গে সঙ্গে গ্রামোফোনের রেকর্ড সমেত চাকতিখানিও ঘোরবার ব্যবস্থা থাকায় চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে সমতালে কথাও তুলে নেওয়া হয়। গমণ্টের সবাক্ চিত্র প্রদর্শনের সময় দুটি গ্রামোফোন রাখবার প্রয়োজন হয়, কারণ একটি যন্ত্রে একখানি রেকর্ড শেষ হবামাত্র অন্য যন্ত্রে আর একখানি রেকর্ড সুরু করতে হয়। রেকর্ড পরিবর্ত্তনের জন্য ছবি দেখানো তো আর বন্ধ রাখতে

বেঁটে কমলার গাছ

পারা যায় না। অন্য গ্রামোফনটির রেকর্ড শেষ হ'তে না হ'তে তৎক্ষণে আবার প্রথম যন্ত্রের রেকর্ডখানি বদল করে রাখা হয়। এইভাবে ছবি ও কথার রেকর্ড একই সময়ে একই শক্তির দ্বারা সমতালে পরিচালিত হয় বলে কথা ও ছবির কোনও অসামঞ্জস্য হয় না। তবে আলোক-তরঙ্গে

এক চাকার গাড়ী

পরিণত শব্দ-তরঙ্গ যখন আবার তাড়িত-প্রবাহে পরিবর্তিত হয়ে ব্লেডিয়োফোনের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, তখন সে ধ্বনি গ্রামোফোনের শব্দ অপেক্ষা যে অনেক স্পষ্ট ও স্বাভাবিক, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই।

৪। পাঁচমিনিটের ব্যায়াম

ব্যায়াম-চর্চা একেবারে নেই বলে আমাদের দেশের ছেলেদের মধ্যে সুস্থ, সবল ও সুগঠিত দেহ বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। অনেকে আলস্য বশতঃ ব্যায়াম-চর্চা আদৌ করতে চায় না, অনেকে ইচ্ছে থাকলেও সময়াভাবে নিয়মিত ব্যায়াম অভ্যাস করতে পারে না। ব্যায়ামের উপকারিতা সম্বন্ধে নূতন ক'রে কিছু বল্‌বার নেই, বালক পাঠ্য-পুস্তক পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই সে কথা শেখে, কিন্তু কোনও দিনই পালন করে না। সময়াভাবে যারা ব্যায়াম অনুশীলনে অক্ষম, তাদের জন্য আমেরিকার ডাক্তার ক্র্যাম্পটন এক নূতন ধরণের ব্যায়াম-বিধি প্রবর্ত্তন ক'রেছেন। তাঁর সেই ব্যায়াম-বিধির অনুসরণ ক'রলে অল্প সময়ের মধ্যে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। নিম্নে উক্ত ব্যায়ামের নিয়ম কটি দেওয়া গেল; যাঁরা তাঁদের খোঁদল বুক, ঝুঁকে পড়া মাথা এবং ঠেলে-ওঠা ভুঁড়িটির কিনারা ক'রতে চান, তাঁরা ডাক্তার ক্র্যাম্পটনের প্রবর্ত্তিত নিয়মগুলি প্রত্যহ অন্ততঃ পাঁচ মিনিট কাল পালন করলে সুফল পেতে পারেন।

১। মাথাটি সাম্‌নে এগিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে চিবুকের দ্বারা বক্ষস্থল স্পর্শ করা।

২। মাথাটি উঁচু ক'রে আকাশের দিকে চাওয়া

৩। মাথাটি পিঠের দিকে ঝুলিয়ে দেওয়া, বুকটা উঁচু করে তোলা, পেটটা ভিতরে ঢুকিয়ে নেওয়া, কিন্তু সাবধান, উরুদেশ যেন না বেঁকে।

৪। যতদূর সাধ্য পিঠের দিকে মাথা ঝুলিয়ে ঘাড়ের পিছনটা দেখবার চেষ্টা করা।

৫। দু'হাত দিয়ে মাথাটা টিপে ধরে প্রথমে ডাইনে তারপর বাঁয়ে মোচড় দেবার চেষ্টা করা।

৬। পাঁচ নম্বর ব্যায়ামেরই পুনরাবৃত্তি কর্‌তে হবে।

একচাকার গাড়ী

প্রফেসার ই, জে, ক্রিষ্টী একখানি একচাকার গাড়ী তৈরী করেছেন। গাড়ীর চাকাটি চোদ্দফুট উঁচু, ওজনে ভারী হবে প্রায় তিরিশ মণ! ক্রিষ্টি সাহেব বল্‌ছেন, তাঁর এই একচাকার গাড়ী ঘণ্টায় আড়াইশ থেকে চারশ মাইল পর্য্যন্ত বেগে চলবে। অবশ্য তাঁর এই একচাকার

অধ্যাপক গণ্ট্ ও তাঁর এক ছাত্রী

(অধ্যাপক গণ্ট্ তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের চোখকান বেঁধে, নাকে দেখ ও হাতে শোনা অভ্যাস করাচ্ছেন

সবাক্ চিত্র তোলবার ক্যামেরা
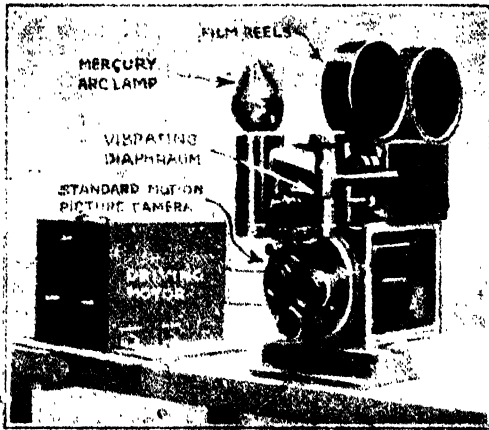
সবাক্ চিত্র প্রদর্শনের যন্ত্র

গাড়ীখানি মোটর-ইঞ্জিনের সাহায্যেই চল্‌বে। চাকাখানি দেখতে একটি প্রকাণ্ড বাইসাইকেলের চাকার মতো। চালকের আসন চক্রদণ্ডের উপর স্থাপিত। চক্রদণ্ডের দুপাশে দু'খানি দ্রুতভ্রাম্যমান ও গতি-নির্দ্দেশক (Gyroscopic) চক্র সংলগ্ন আছে। এই দুইখানি চক্রের সাহায্যেই একচাকার গাড়ী দাঁড়াতে পারে এবং তার গতির হ্রস্ব-দীর্ঘতাও নির্ভর করে। গাড়ীর মোটর-ইঞ্জিনটি বড় চাকার তলার দিকে ঝোলানো আছে। (Popular Science)

৬। বেঁটে কমলার গাছ
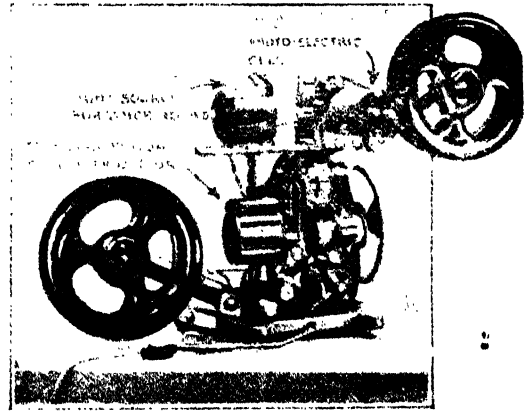
চিলিতে একরকম বেঁটেজাতের কমলা লেবুর গাছ পাওয়া যায়, সে গাছগুলি দু'ফুট আড়াইফুটের বেশী উঁচু হ'তে না হ'তে ফল দিতে আরম্ভ করে। এক একটি গাছে বছরে দুহাজার নেবুরও বেশী পাওয়া যায়। আমেরিকার সৌখীন লোকেরা অনেকে চিলি থেকে এই বেঁটে কমলার গাছ আনিয়ে নিজেদের বাড়ীর প্রাঙ্গনে রোপণ করে গাছ-পাকা কমলা লেবু খাবার ব্যবস্থা করে নিচ্ছেন। এদেশের সৌখীন লোকেরাও ইচ্ছে করলে সিলেট ও নাগপুরের মুখাপেক্ষী না হ'য়ে ঘরে বসেই গাছ-পাকা কমলা লেবু খেতে পারেন। (Popular Science)

বিশ্বাসঘাতক

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

(১)

দয়াল বরাহনগরের সিংহবাবুদের পুরাতন চাকর। সিংহবাবুদের আদি নিবাস বর্দ্ধমান জেলায় হলেও, জমিদারীর টাকা ছাড়া দেশের সঙ্গে তাঁদের খুব কম সম্পর্কই ছিল। তিন পুরুষ পূর্ব্বে ব্যবসায় উপলক্ষে কলিকাতায় এসে তাঁরা এইখানেই বাস করছেন। দয়াল এই পরিবারে যখন প্রথম এসে ঢুকেছিল, তখন তার বয়স ছিল কুড়ি-বাইশ বছর। সে আজ তিরিশ বছর আগেকার কথা। তার পর প্রভুর পরিবারে রঙ্গমঞ্চের অভিনেতার মত কত লোক এল—গেল, সংসারের কত পরিবর্ত্তন হল; সে কিন্তু ঠিক এক ভাবেই আছে। জীর্ণ মন্দিরোপরিস্থ বটবৃক্ষ যেমন তার আশ্রয়দাতার সমস্ত ঝঞ্ঝা মাথায় করে নিয়ে তাকে আঁকড়ে ধরে থাকে, সেও তেমনই প্রভুর পরিবারের সকল সুখ-দুঃখের সমান ভাগ নিয়ে মাথার চুল পাকিয়ে ফেলেছে।

বিশ্ব-সংসারের মধ্যে আপনার বলতে তার এক পিসি ছাড়া আর কেউ ছিল না। সেও ইহ-সংসারের কূলে এসে দাঁড়িয়েছে। বরাহনগরের এক প্রান্তে জীর্ণ একখানা কুটীরে বাস করে' সে দয়ালেরই পৈতৃক ভিটেয় প্রদীপ দিত। তার ভরণ-পোষণ দয়ালই চিরদিন করে আসছে; এবং সকল সময়ে না পারলেও, মাঝে-মাঝে পিসির কাছে গিয়ে দয়াল নানা কথায় তাকে ভুলিয়ে আস্‌ত। বাড়ীর কাছে হলেও মনিবের বাড়ী ছেড়ে তার একদণ্ড থাকলেও চলত না। আরও, তার নিজের বাড়ীতে গেলে, যৌবনের স্মৃতি তাকে বড়ই বেদনা দিত।

ছোটবেলাতেই দয়ালের বিবাহ হয়েছিল, কিন্তু ভগবান তার সুখের ঘরে সিঁদ দিয়ে তাকে সর্ব্বস্বান্ত করে দিয়েছিলেন। যৌবনের উন্মেষে যখন তার প্রাণ আশা-আকাঙ্ক্ষার রঙ্গিন নেশায় ভরপুর হয়ে উঠেছিল, সেই সময় তার স্ত্রী তার প্রেমের নিগড় ছিন্ন করে, কোন্ অজানা দেশে চলে গিয়াছিল। সেই বেদনার আঘাতে, সে তার পর থেকেই সন্ন্যাসী। পিসির সহস্র অনুরোধ, অনুনয়-বিনয়, তাকে পুনরায় বিবাহে সম্মত করতে পারে নাই। সেই সময় যখন সে উদ্দেশ্যবিহীন লক্ষ্যহীন, জীবন-ভারে ভারাক্রান্ত, তখন সিংহবাবুদের বাড়ী থেকে তার ডাক এসেছিল। সেই ডাকের মোহে সে এই পরিবারের ভিতর এমনই আপনাকে জড়িয়ে ফেলেছিল যে, তা ছিঁড়ে যাবার সামর্থ্য তার আর ছিল না। মনিবের ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনকে সে আপনার করে নিয়ে, সংসারের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গে একই ভাবে তার জীবন-তরী চালিয়ে চলেছিল।

মনিবের একমাত্র পুত্র কৃষ্ণনাথকে সে সকলের চেয়ে ভালবাসত; কারণ, সে ছিল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দুঃখী—মাতৃহীন। সাতটা মেয়ের পর কৃষ্ণনাথের জননীর অষ্টম গর্ভে যখন কৃষ্ণনাথের জন্ম হল, তখন সবাই বলল—এ ছেলে একটা অসাধারণ কিছু হবেই। কথাটা একেবারে মিথ্যাও হল না। জন্মের পর চব্বিশ ঘণ্টা কাট্‌ল না—মা চির-বিদায় নিলেন। ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাধি, দল বেঁধে এসে কৃষ্ণনাথের উপর পড়ল—সিংহবংশের লোপ করতে। কিন্তু মনিবের এই অসাধারণ ছেলেটাকে বাঁচাতে, সবাইকে পরাজিত করেছিল—এক দয়াল। প্রভুর বংশধরকে রক্ষা করতে, সে দধিচির মত নিজের জীবন পণ করে বসেছিল। কয়েক বছর যমে-মানুষে টানাটানির পর—যমরাজ দয়ালের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছিলেন।

কৃষ্ণনাথের পিতা নামজাদা কৃপণ হয়েও, একমাত্র দয়ালের অনুযোগে মাতৃহারা পুত্রের কোন আবদারই অপূর্ণ রাখতে পারতেন না। অত্যধিক আদরে বালক ক্রমেই দুর্দ্দান্ত হয়ে উঠ্‌ল। তার অত্যাচারে সকলে অতিষ্ঠ হলেও, দয়াল কিন্তু এই দুর্দ্দান্ত ছেলেটার সহস্র অত্যাচার নীরবে, হাসিমুখেই সহ্য করত। অনেকে, বলত—সেই তাকে আদর দিয়ে খারাপ করছে। দয়াল

সে কথা শুনে হাসত। তার কাছে কৃষ্ণনাথ যে কি—তাকে শাসন করলে যে তার নিজের বক্ষে কতখানি বাজে—তা লোকে বুঝত না, তাই অনুযোগ করত।

ষোল বছর পার না হতেই কৃষ্ণনাথের খুব জাঁকজমক করে বিবাহ হল। বিবাহের পর বছর দু'তিন না যেতেই, তার পিতা, পুত্রের হাতে যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ করে, চির-বিদায় নিলেন। কৃষ্ণনাথ স্বাধীন হয়ে প্রভুর গদিতে বসল।

(২)

এক-এক করে দুইজন মনিবের পর, দয়ালের বড় আদরের, বুকে করে মানুষ করা কৃষ্ণনাথ যেদিন মনিব হল, সে দিন তার কি আনন্দ। বৃদ্ধ বয়সেও তার সে দিন যৌবনের উদ্যম ফিরে এসেছিল। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর কৃষ্ণনাথের চরিত্রে যে সকল পরিবর্ত্তন দেখা দিল, তাতে সকলেই শঙ্কিত হল। কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলে কৃষ্ণনাথের চোখে ধূলো দিয়ে তাকে ঠকিয়ে যেতে মানুষকে বেশী পরিশ্রম করতে হত না। স্বার্থান্ধ মানুষ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য অনাচারের সাহায্যে কৃষ্ণনাথকে অতি শীঘ্রই পতনের পিচ্ছিল পথে টেনে নিয়ে গেল। যারা বাধা দিতে গেল, তারা সেই অদম্য স্রোতে কুটোর মত ভেসে গেল।

দয়ালের রাগ, অভিমান, ভগ্নীদের অশ্রুজল, পত্নীর রূপের ডালি সব উপেক্ষা করে, কৃষ্ণনাথ উচ্ছৃঙ্খলতাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করে, সংসারের বুকের ওপর দিয়ে স্বেচ্ছাচারের দুরন্ত ঘোড়া ছুটিয়ে দিল—লাগাম ছেড়ে দিয়ে। নিরুপায় পত্নী ভবিষ্যতের বিভীষিকা স্মরণ করে, বংশের দুলাল পুত্রের দোহাই দিয়ে, সুমুখে এসে দাঁড়াল বাধা দিতে,—অন্ধ কৃষ্ণনাথ মুখ ফিরিয়ে সরে দাঁড়াল। অভিমানিনী নারী, স্বামীর অবহেলার আঘাতে লজ্জার দুঃখে মর্ম্মাহত হয়ে, পুত্রকে বুকে ধরে জীবন্মৃত হয়ে দিন কাটাতে লাগল।

দয়ালের মন বুঝত না। পদে-পদে অপমানিত হয়ে, শত হেনস্থাতেও সে কৃষ্ণনাথের সর্ব্বনাশ প্রাণ ধরে দেখতে পারত না। জলমগ্নের শেষ প্রয়াসের মতন তাকে বাঁচাবার নিষ্ফল চেষ্টা করত। তার যে হাতে-গড়া দেবালয়! সে কি দাঁড়িয়ে থেকে তার ধ্বংস দেখতে পারে!

অত্যধিক অপব্যয়ে কৃষ্ণনাথের সম্পদ ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছিল; বিশেষতঃ কিছুকাল যাবৎ ঘোড়দৌড়ের মারাত্মক নেশা তাকে উন্মত্ত করে তুলেছিল। যতই তার ধন ভাণ্ডার শূন্য হতে লাগল, ততই তা পূর্ণ করবার বাসনা তাকে ক্ষিপ্ত করে তুলল। যে সম্পদ তার পিতৃ-পিতামহ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, আপনাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের গলা টিপে কত বৎসর ধরে সঞ্চয় করে গিয়েছিলেন, খোলামকুচির মত দু' হাতে তার ক্ষয় করে, কৃষ্ণনাথ তা পূর্ণ করতে অদৃষ্টের সঙ্গে জুয়াখেলা ধরেছিল। হায়রে মূঢ়! ভোজবাজীর ভেল্কিতে তুমি গিয়াছ ভাগ্য-বিধাতার কলমের আঁচড় মুছতে!

(৩)

সে দিন শুক্রবার। পরদিন বড় দরের ঘোড়দৌড় খেলা ছিল। হাতে অর্থ ছিল না,—সমস্ত দিন অনেক খোসামোদ করে, মহাজনের কাছ থেকে সারাদিনের পর পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগ্রহ করে, কৃষ্ণনাথ বাড়ী ফিরে এল, সন্ধ্যার পূর্ব্বে। অনাহারের অবসাদে তার দেহ, মন অবশ হয়ে পড়েছিল।

নোটের তাড়া পকেট থেকে বার করে আর একবার ভাল করে গুণে দেখল। এই টাকাই তার শেষ সম্বল—জীবন-মরণের ভরসা। মহাজন স্পষ্টই বলে দিয়েছে—সে তার ঐ সম্পত্তির উপর আর টাকা দেবে না। কাল ঘোড়দৌড়—এই ভাগ্য-পরীক্ষায় হয় সে আবার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবে—নয় ত' একেবারে ধ্বংসের বিরাট গর্ত্তে।

পরদিন বেলা দশটার সময় তাড়াতাড়ি স্নান-আহার সেরে, রেসে যাবার জন্য তৈরী হয়ে টাকা নিতে এসে দেরাজ খুলে সে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। সর্ব্বনাশ! টাকা? সারা ঘরের জিনিসপত্তর, বাক্স, আলমারী, দেরাজ ওলট-পালট করে ফেলল—টাকা কোথাও নেই। মাথার চুল ছিঁড়ে, চেঁচিয়ে, চাকর-বাকরদের গাল দিয়ে, মেরে, সে হাঁকিয়ে উঠল—তবু টাকার সন্ধান হল না। টেলিফোনে সংবাদ পেয়ে পুলিস এল, তদন্ত হল, নির্য্যাতন চলল—তবু কেউ স্বীকার করল না। দারোগা অবশেষে ক্লান্ত হয়ে কৃষ্ণনাথকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কার উপরি আপনি সন্দেহ করেন?" অর্দ্ধক্ষিপ্ত কৃষ্ণনাথ চীৎকার করে বলল, "দয়াল—হারামজাদা দয়াল ছাড়া আর কেউ নেয় নাই।"

দয়াল গ্রেপ্তার হল। কৃষ্ণনাথের বাড়ী ফেরবার পর সেই

তার শয্যাগৃহে এসেছিল,—সেই জানত টাকা কোথায় ছিল। লাথি, কিল, চড়—লাঞ্ছনার চূড়ান্ত অভিনয় হল;—দয়াল স্থির, ধীর,—একটা কথাও সে বলল না। সারা গা কেটে রক্ত-স্রোত প্রবাহিত হল, তবু, চক্ষু দিয়ে তার এক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল না। কেঁদে-কেঁদে তার চোখ মরুভূমি হয়ে গিয়েছে, বেদনার আঘাতে অঙ্গ পাষাণ হয়ে গিয়েছে—কিছুতেই তাকে বিচলিত করতে পারল না।

তিরিশ বছরের বিশ্বাসী দয়ালের হাতে হাতকড়ি পড়ল—বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে।

(৪)

বিশ্বাসঘাতকতার এবং চুরীর অপরাধে দয়ালের এক বৎসর সশ্রম কারাবাস-দণ্ড হল। পঞ্চাশ হাজার টাকা হারিয়েও কৃষ্ণনাথের নেশা ছোটে নাই,—অবশেষে সে তার পৈতৃক বাটী বন্ধক দিয়ে ঘোড়দৌড় খেলল। যে ভাগ্য ফেরাতে সে অন্ধ বিশ্বাসে আলেয়ার পেছনে ছুটেছিল, সেই ভাগ্যের তাড়নায়—ব্যর্থতার অবসাদে তার দেহ-মন ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে গিয়াছিল।

দেনার দায়ে বিষয়-সম্পত্তি সব নিলাম হয়ে গিয়েছে,—বাকি আছে পৈতৃক বাড়ীখানি; তাও পাওনাদারের কঠোর তাড়নায় যায় যায়। কখন যে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে তার ঠিক নেই। সিংহ-বংশের কুলবধূ—চন্দ্র সূর্য্যেও যার মুখ দেখতে পায় না, তাকে হয় ত পরের দুয়ারে আশ্রয় নিতে হবে, বংশের দুলাল একমাত্র পুত্র, যার সুখের দোলায় বসে দোল খাবার কথা, তাকে পিতার পাপের ফলভোগ করতে—বিশ্বের দ্বারে করুণা ভিক্ষা করে বেড়াতে হবে। উঃ—সে কি শোচনীয় দৃশ্য! মাঝে মাঝে তার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু কাপুরুষ মন তার, মৃত্যুর নামে শিউরে উঠে। দণ্ডে, দণ্ডে,—তিল, তিল করে মরছে—তবু মৃত্যু-ভয়ে ভীত। অনুতাপের দাবাগ্নি তাকে এক মুহূর্ত্ত সুস্থির থাকতে দেয় না। পত্নী সান্ত্বনার স্পর্শে তার শ্রান্ত ক্লান্ত প্রাণ শীতল করতে আসে,—সে লজ্জায় জড়সড় হয়ে পড়ে। হৃদয়-সর্ব্বস্ব পুত্র হাত বাড়িয়ে আসে, বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে,—ভয়ে কৃষ্ণনাথ তাকে স্পর্শ করতে পারে না—পাছে পাপীর স্পর্শে সেই নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক দেবকুমার দগ্ধ হয়ে যায়।

(৫)

সে দিন শারদীয়া পূজার বোধন। জগন্মাতা দশ হস্ত বিস্তার করে, পাপী, তাপী, দুস্থকে অভয় দিতে, সান্ত্বনা দিতে, সারা বৎসরের পর ধরায় অবতীর্ণা। নিরানন্দ ধরায় মা আনন্দময়ীর আগমনে উৎসবের উৎস ছুটে চলেছে। চারিদিক আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত। এমন দিনে কৃষ্ণনাথ চোরের মত ঘরের কোণে বসে ভীষণ কাণ্ডের অনুষ্ঠানে কৃতসঙ্কল্প। স্ত্রী, পুত্র সকলেই ভাবী বিপদাশঙ্কায় প্রতি মুহূর্ত্তে কম্পিত হচ্ছে।

কৃষ্ণনাথের বাটীর সম্মুখেই মুখুজ্জে-বাড়ী বোধনের বাদ্য রোলে মুখরিত হয়ে উঠেছে। আর কৃষ্ণনাথের দুয়ারে পাওনাদারের ঢোলে বিসর্জ্জনের বাজনা বাজছে। পাওনাদার দেনার দায়ে বাড়ী ক্রোক দিতে এসেছে—আজই তাকে উঠে যেতে হবে। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে এমন কেউ ছিল না যে, প্রায় বিশ হাজার টাকা সাহায্য করে বাড়ীখানি রক্ষা করে। পাড়ার দু'চারজন এসে মহাজনকে অনেক অনুরোধ করল—অন্ততঃ যাতে পূজার কটা দিনও সে নিষ্কৃতি দেয়। উত্তমর্ণের পাষাণ হৃদয় কিছুতেই বিচলিত হল না,—সে আজই দখল নেবে—এ বিষয়ে সে দৃঢ়-চিত্ত। আদালতের বেলিফ-পেয়াদা ভদ্রতার খাতিরে, মানী লোকটার সম্মান বজায় রাখতে, তখনও বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করে নাই। কৃষ্ণনাথকে বাড়ী ছেড়ে দিতে অনুরোধ করে, তারা বাইরে অপেক্ষা করছে। পাড়ার একজন ভদ্রলোক একখানা গাড়ীও ডেকে এনে দিয়েছে।

পিতৃ পিতামহের শত বৎসরের ভিটে জন্মের মত ছেড়ে যেতে হবে,—স্ত্রী-পুত্র নিয়ে পরের আশ্রয়-ভিক্ষা করতে হবে,—মনে করেই, কৃষ্ণনাথের বুকের দাবাগ্নি লকলক শিখায় তার সারা হৃদয়ে জ্বলে উঠেছে। উন্মত্ত কৃষ্ণনাথ সে দৃশ্য দেখবার আগে আপনাকে ধ্বংস করতে আজ স্থিরসঙ্কল্প হয়েছে। আজ আর সে কাপুরুষ নয়। স্ত্রী এক পাশে বসে কাঁদছে,—শিশু পুত্র ভয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। কৃষ্ণনাথের কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই—হাতে পিস্তল নিয়ে সে ঘরের ভিতর উত্তেজিত ভাবে পায়চারী করছে—মুখে কথা নেই

ভিতরে ও বাহিরে প্রলয়ের ঘন মেঘ যখন ঘনীভূত

হয়ে উঠেছে, তখন বিদ্যুতের মত ছুটতে-ছুটতে দয়াল এসে উপস্থিত হল। এক বৎসর পূর্ণ হওয়ায় তার মেয়াদ শেষ হয়েছে; আজই সকালে সে খালাস পেয়ে দৌড়ে এসেছে প্রভুর খবর নিতে। বাড়ীর সুমুখে আদালতের লোকজন দেখে সে ভীতিজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, "এ সব কি?"

তার কথার উত্তরে একজন বলল, "দেনার দায়ে ডিক্রি পেয়ে, মহাজন বাড়ীর দখল নিতে এসেছে!"

"বাবু কৈ?" বেলিফ্ উত্তর দিল, "ভিতরে।" "কত টাকা দেনা সাহেব?" বলে, দয়াল বেলিফের মুখের দিকে করুণ-দৃষ্টিতে চাইল। ভিখারীর মত একটা লোককে জজ সাহেবের মত জেরা করতে দেখে, ক্রোধে অধীর হয়ে মহাজন বলে উঠ্‌ল, "কে হে তুমি লাখপতির নাতি—দেনার খবর নিচ্ছ?"

"আমি যে কে, তা তুমি জানবে কি করে। এখন বল দেখি, তোমার কত টাকা পাওনা?"

"পনর হাজার! সুদে আসলে হাজার বিশেক দাঁড়িয়েছে! ঘুঁটে-কুড়ুনির ব্যাটা চন্দন-বিলাস—দিবি না কি টাকা?"

"খবরদার, মুখ সাম্‌লে কথা বোলো—টাকা নিতে এসেছ, টাকা নিয়ে চলে যাও"—মহাজনকে উত্তর দিয়ে, দয়াল বেলিফের কাছে হাতযোড় করে বলল, "সাহেব, দয়া করে আমায় আধ ঘণ্টা সময় দাও—আমি টাকা এনে দিচ্ছি!" বলেই, দয়াল ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলে গেল। মহাজন বিরক্তি-পূর্ণ স্বরে বলল, "ব্যাটা নিশ্চয় পাগল!" তার পর পেয়াদাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "নাও হে দেখ, দেখ, বাবুর বার হল কি না? বাড়ীতে আবার পূজো আছে। কতক্ষণ আর এখানে ধন্না দিয়ে পড়ে থাকব।"

পেয়াদারা হুকুমের চাকর, বিশেষ মহাজনের কাছে দু'পয়সা প্রত্যাশা করে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন বাবুর বাড়ী ছাড়ার কোন লক্ষণই দেখা গেল না, তখন তারা বাড়ীর ভিতর ঢুকে ডাকাডাকি করতে লাগল। আর বাইরে মহাজনের হুকুমে ঢোলওয়ালা খুব জোরে-জোরে ঢোলে ঘা দিয়ে পাড়া মাথায় করে তুলল।

(৬)

ছুটতে-ছুটতে দয়াল একখানা জীর্ণ কুঁড়ের সুমুখে এসে দাঁড়িয়ে, চীৎকার করে ডাকল, "পিসি!"—উত্তর নেই। দুয়ার ঠেলে সে ঝড়ের মত ঘরের ভিতর ঢুকে, বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াল। সন্দেহের আতিশয্যে তার হৃদ্‌পিণ্ড ধড়াস্-ধড়াস্ করে উঠ্‌ল।

রোগ-শয্যায় শুয়ে জীর্ণ-শীর্ণ পিসি তার বিছানার সঙ্গে মিশে আছে। কথা বলবার ক্ষমতা নেই। শুধু প্রাণ-পাখী তখনও বোধ হয় দয়ালেরই আগমন-প্রতীক্ষায় জীর্ণ বক্ষ-পিঞ্জরের দ্বারে ধুক্‌ধুক্ করে মাথা কুটছিল। কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কম্পিত কণ্ঠে দয়াল পুনরায় ডাকল, "পিসি, ও পিসি"—ধরা গলার স্বর কুঁড়ে ঘরখানা কাঁপিয়ে হাহাকারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

হঠাৎ হারান মাণিক ফিরিয়ে পাওয়ার মত পিসির পাণ্ডুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। অতি কষ্টে চোখ খুলে—অস্ফুট স্বরে বলল, "কে, দয়াল?"

"হাঁ পিসি, আমি ফিরে এসেছি। পিসি—টাকা—টাকা কোথায়?"

আঙুল দিয়ে একটা হাঁড়ী দেখিয়ে দিয়ে পিসি ক্ষীণস্বরে বলল, "কাছে এসে বোস্ টাকা ঠিক আছে—" কোটরগত চোখ দুটো পূর্ণ হয়ে, তার শুষ্ক গণ্ডে জল গড়িয়ে পড়ল।

হাঁড়িটা টান দিয়ে শিকে থেকে নামিয়ে তাড়াতাড়ি ভিতরে হাত পূরে দিয়ে দয়াল দেখল—কাপড়ে জড়ান কৃষ্ণনাথের অপহৃত পঞ্চাশ হাজার টাকার নোটের তাড়া ঠিক তেমনই রয়েছে। কাপড়ের খুঁটে নোটের তাড়া বাঁধতে বাঁধতে দয়াল বলল, "পিসি, চললাম, খোকাবাবুর বড্ড বিপদ। যদি ফিরে আসা পর্য্যন্ত বেঁচে থাকিস্—কথা কইব, নইলে তোর দয়াল এসে তোর মুখে আগুন দেবে"—

বুড়ী ক্ষীণকণ্ঠে কি যেন বলল,—কিন্তু দয়াল তখন বহুদূরে। বুড়ীর বাষ্পরুদ্ধ ক্ষীণ স্বর হাওয়ার সঙ্গে মিশে কোন্ সুদূরে চলে গেল—দয়াল শুনতে পেল না। বুড়ী আর একবার জোর করে তাকিয়ে, তার চিরপরিচিত ঘরখানা দেখে নিল; তার পর চিরদিনের মত চোখ বুজল।

* * * *

তীরের বেগে ছুটে এসে দয়াল যখন প্রভুর বাড়ীর সুমুখে এসে পৌছিল, তখন সেখানে হুলস্থুল পড়ে গিয়েছে। কৃষ্ণনাথের জন্য অপেক্ষা করে, অধীর মহাজন বাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়ে, চারদিকের ঘরে তালা দিতে সুরু

করেছে। সে দৃশ্য দেখে দয়ালের সর্ব্বশরীরের হিম রক্তস্রোত উষ্ণ হয়ে উঠ্‌ল। চীৎকার করে সে বলল, "বেরো হারামজাদা বেটারা—এই নে তোদের টাকা। সিংহ বাবুদের অন্দরে ঢুকিস—এত বড় তোদের বুকের পাটা! বেরো বল্‌ছি শিগ্‌গির, নইলে সব বেটাকে খুন করে ফেলব।" তার উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি দেখে ভয়ে সবাই বেরিয়ে এল। কম্পিত হস্তে টাকা গুণে মহাজনের সুমুখে ফেলে দিয়ে দয়াল রসিদ নিয়ে ভেতরে পা দিতেই ওপরে বন্দুকের শব্দ হল 'গুড়ুম'। সঙ্গে-সঙ্গে করুণ চীৎকারে সারা বাড়ী কেঁপে উঠল।

তাড়াতাড়ি স্খলিতপদে উপরে উঠে দয়াল যে দৃশ্য দেখল, তাতে তার সর্ব্বাঙ্গ হিম হ'য়ে গেল। থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে-কাঁপতে সে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে, কেঁদে উঠ্‌ল, "বাবু—বাবু—খোকাবাবু"—

পিস্তলের গুলিতে কৃষ্ণনাথের হৃদয় বিদ্ধ হ'য়েছিল। অতি কষ্টে সে দয়ালের দিকে তাকিয়ে বলল "ক্ষমা"—তার পর আর কথা বেরুল না। দুর্ব্বল হাতখানা জোর করে তুলে পুত্রের দিকে নির্দ্দেশ করে—কৃষ্ণনাথ সমস্ত পাওনাদারের হাত হতে নিষ্কৃতি লাভ করল।

কাঁপতে-কাঁপতে দয়াল কম্পিত শিশুকে বুকে চেপে ধরে, কৃষ্ণনাথের পত্নীর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে, বালকের মত কেঁদে বলে উঠল, "মা—মা—যার জন্য বিশ্বের কাছে বিশ্বাসঘাতক হলাম, তাকে ত রাখ্‌তে পারলাম না।"

মানস-সরোবর

শ্রীসত্যভূষণ সেন

মানস-সরোবর নাম শুনিলেই মনে হয়, যেন কোন্ কল্পলোকের কথা; এ যেন বাস্তব জগতের নয়, বর্ত্তমানের নয়—যেন কোন্ স্বর্গ-লোকের, কোন্ পৌরাণিক যুগের কাহিনী। প্রকৃত পক্ষে, পৌরাণিক যুগ হইতেই, এ দেশের কাব্যে, সাহিত্যে মানস-সরোবরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। স্কন্দ-পুরাণে ইহার সৃষ্টির একটা কাহিনীও আছে। দেবতারা কৈলাস পর্ব্বতে গিয়া ধ্যান-ধারণা করিতেন; সেখানে বৃষ্টিপাত খুব কম হওয়াতে, তাঁহারা জলের অভাবে বড়ই অসুবিধা বোধ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা ব্রহ্মার তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি চাও?" দেবতারা বলিলেন, "আমরা কৈলাস পর্ব্বতে ধ্যান-ধারণা করি; কিন্তু স্নানের জন্য আমাদিগকে মন্দাকিনী-তীরে যাইতে হয়। নিকটে কোন জলাশয় না থাকাতে, আমাদের বড়ই অসুবিধা হয়।" ব্রহ্মা তখন তাঁহার ইচ্ছাশক্তি হইতে এক সরোবরের সৃষ্টি করিয়া, দেবতাদের ব্যবহারের জন্য তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। ব্রহ্মার মানস বা ইচ্ছাশক্তি হইতে উদ্ভূত বলিয়া, ইহার নাম হইল মানস-সরোবর।

পুরাণাদির পরে কালিদাসের কাব্যেও মানস-সরোবরের নাম অমর হইয়া রহিয়াছে। মেঘদূতের ত কথাই নাই—কৈলাস পর্ব্বত এবং মানস-সরোবর লইয়াই তাহার ঘটনা-স্থল। মেঘদূত ছাড়াও কালিদাসের অন্যান্য কাব্যে মানস-সরোবরের উল্লেখ আছে। এই সকল কাব্য-কাহিনীতে যেটুকু প্রকাশ, তাহাতে দেখা যায় যে, হিমালয়ের উত্তরে কৈলাস পর্ব্বত—তাহার নিকটেই মানস-সরোবর। আর যেখানেই মানস-সরোবরের কথা, সেইখানেই তার সঙ্গে বলাকা-শ্রেণীর উল্লেখও অবধারিত। খুঁটিয়া দেখিলে, এইরূপ আরও দুই-চারিটা কথা যে বাহির করা না যায়, এমন নয়। কিন্তু কাব্য-সাহিত্যকে ভিত্তি করিয়া ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ করা চলে না। তবে এটুকু খুব স্পষ্টই বুঝা যায় যে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই মানস-সরোবরের কথা আমাদের দেশে জানা ছিল।

পৌরাণিক ও প্রাচীন সাহিত্যের যুগ ছাড়িয়া এইবার ঐতিহাসিক যুগে আসা যাউক। এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা দরকার যে, ভৌগোলিক তথ্য হিসাবে মানস-সরোবর সম্বন্ধে ভারতীয় সাহিত্যে কিছু

পাওয়া যায় না—অন্ততঃ পাওয়া যায় বলিয়া আমাদের জানা নাই। চীন-সাহিত্যে যাহা আছে, তাহাতেও আমরা প্রবেশ করিতে পারি না। যেটুকু ভাষান্তরিত হইয়া ইয়োরোপীয় সাহিত্যের ভিতর দিয়া আমাদের নিকট পৌছিতেছে, শুধু সেইটুকুই আমরা জানিতে পাইতেছি,—আর সব আমাদের নিকট অজ্ঞাত। কাজেই ইয়োরোপীয় পর্য্যটকদের বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া ইয়োরোপীয় সাহিত্যের উপরেই আমাদিগকে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইতেছে।

প্রথমেই দেখিতে পাই যে, ম্যাসিডনের বীরপুরুষ সেকেন্দর শাহের অভিযানের কাহিনীতে মানস-সরোবরের কোন উল্লেখ নাই। টলেমী (Ptolemy) এই সরোবরের কথা কিছু জানিতেন না। মার্কো পলো (Marco Polo) এবং মধ্য-যুগের অন্যান্য পর্য্যটকদের বৃত্তান্তেও ইহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তার পরেই বর্ত্তমান যুগে আসিতে হয়। মোস্‌লেম রাজের আধিপত্য তখন পূর্ণমাত্রায় চলিতেছে। ১৫৫১ খৃষ্টাব্দে ইয়ারকন্দের খাঁ (Khan of Yarkand) তিব্বতের লাসা নগরীতে বিগ্রহাধিষ্ঠিত দেবমন্দির ভূমিসাৎ করিবার জন্য সেনাপতি মিরজা হায়দারের অধীনে এক অভিযান প্রেরণ করেন। এই অভিযানের বৃত্তান্তে প্রকাশ যে, তাঁহারা এক মাসের পথ অতিক্রম করিয়া এক হ্রদের তীরে আসিয়া পৌছিলেন। সেখানে তাঁহারা এক রাত্রি অবস্থিতি করিলেন। এই হ্রদের যেটুকু বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে বুঝা যায় যে, এ হ্রদ মানস-সরোবর ছাড়া আর কোন হ্রদ নয়।

হিমালয় সম্বন্ধীয় পুরাবৃত্তে Father Antonio নামক Jesuit সম্প্রদায়ের এক পাদ্রীর উল্লেখ আছে। তিনি ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে কাবুল-অভিযানে সম্রাট আকবরের অনুচরবর্গের মধ্যে একজন ছিলেন। তাঁহার বিবরণে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না; শুধু এইটুকু প্রকাশ যে, তিনি লোক-পরম্পরায় মানস-সরোবর নামে এক হ্রদের কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। তার পরে ভারতে সুবিদিত ফরাসী পর্য্যটক বার্ণিয়ার (Bernier); ইনি ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পর্য্যটন করিয়া,তাহার বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। বার্ণিয়ার কাশ্মীরের উত্তরে পর্ব্বতের শ্রেণী পরম্পরা সম্বন্ধে অনেক প্রামাণিক তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; মানস-সরোবরের কথা কাহারও কাছে শুনিতে পান নাই।

১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে D'Anville তিব্বতের কতক অংশের এক মানচিত্র প্রকাশ করেন। তাহার মধ্যে মানস-সরোবর আছে। চীন-সম্রাট Kang Hi (১৬৬২-১৭২২ খৃঃ) একবার সমস্ত তিব্বত প্রদেশটা জরীপ করিবার জন্য লামাদের নিয়োগ করেন। তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া যে বিবরণ প্রকাশ করেন (১৭১৭ খৃঃ), তাহাই D'Anvilleএর মানচিত্রের ভিত্তি। Kang Hi'র লামারা মানস-সরোবরের ধারে অনেক সময় কাটাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়; কারণ, তাঁহারা তিব্বতের এই পশ্চিম দিকটাই বিশেষ যত্নের সহিত জরীপ করিয়াছিলেন। মানস-সরোবরের পশ্চিমে অনতিদূরে রাবণহ্রদ; ইহার অপর নাম রাক্ষসতাল। ইহাদের চারিদিকে যে পর্ব্বতের শ্রেণী-পরম্পরার কথা লামাদের বৃত্তান্তে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা অতিপ্রকৃত বিবরণ। মানস-সরোবরের উত্তরে কৈলাস পর্ব্বত। পূর্ব্বদিকে এক পর্ব্বত হইতে একটি স্রোতস্বতী বাহির হইয়া মানস-সরোবরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। মানস-সরোবরের উত্তর-পশ্চিম কোণ হইতে এক জলস্রোত বাহির হইয়া রাবণ-হ্রদে গিয়া পড়িয়াছে। এই স্রোত অনেক সময়ই শুষ্ক অবস্থায় থাকে। যে বৎসর বৃষ্টি বেশী হয়, শুধু সেই সময়েই এই প্রবাহ-পথে জলস্রোত দেখা যায়। যদি কোনও বৎসর বৃষ্টির পরিমাণ অত্যন্ত বেশী হইয়া পড়ে, তখন রাবণ-হ্রদ হইতেও অপর এক স্রোত বাহির হয়। Kang Hi'র লামাদের সময়ে এই অবস্থাই হইয়াছিল। তখন পূর্ব্বদিকের পর্ব্বত হইতে যে নদী আসিয়া মানস-সরোবরে প্রবেশ করিয়াছিল, যেন তাহারই অবিচ্ছিন্ন ধারা রাবণ-হ্রদের পশ্চিম দিক দিয়া বাহির হইয়া যাইত। লামাদের বৃত্তান্তে ইহাকে শতদ্রু নদী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

ইয়োরোপীয় সাহিত্যে D'Anville এর মানচিত্রেই এ প্রদেশের প্রথম প্রামাণিক বিবরণ পাওয়া যায়। বাস্তবিক পক্ষেও মানস-সরোবরের ইহার চেয়ে উৎকৃষ্টতর মানচিত্র পরবর্ত্তী দেড়শত বৎসরের মধ্যেও রচিত হয় নাই। কিন্তু তিনি একটী মস্ত ভুল করিয়া গিয়াছেন—লামাদের শতদ্রুকে তিনি গঙ্গা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ইয়োরোপীয়দের মধ্যে যিনি মানস-সরোবর সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম বিবরণ (মানচিত্র নয়) লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তিনি Jesuit সম্প্রদায়ের একজন পাদরী, Father Desi-

deri ;—Dr. Hedin ইহাকে incomparable Father Desideri বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। Desideri'র মতে কৈলাস পর্ব্বত শুধু সিন্ধুনদের নয়, গঙ্গা নদীরও উৎপত্তি-স্থান। তিনি বলেন কৈলাস পর্ব্বতই এ প্রদেশের সর্ব্বোচ্চ স্থান। ইহার পশ্চিম দিক হইতে যত জলস্রোত বাহির হইয়াছে, তাহাতেই সিন্ধুনদের সৃষ্টি হইয়াছে। আর পূর্ব্বদিকের সমস্ত জলধারা মানস-সরোবরে গিয়া পড়িয়াছে; এবং সেখান হইতে বাহির হইয়া গঙ্গানদীর সৃষ্টি করিয়াছে। সিন্ধুনদের উৎপত্তি-স্থান সম্বন্ধে অনুমান বরং অনেকটা ঠিক; কিন্তু গঙ্গার উৎপত্তি-স্থান কৈলাস পর্ব্বত এবং মানস-সরোবরে আনিয়া ফেলাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইহাতে প্রত্যক্ষ অনুসন্ধানের ভিত্তি ততটা দৃঢ় নয়, যতটা অনুমানের উপর নির্ভর করা হইয়াছে। Father Desideri এক তাতার রাজপুত্রীর সঙ্গে বাহির হইয়াছিলেন। কাজেই সকল স্থানে তাঁহার স্বাধীন ভাবে পর্য্যটনের সুবিধা হয় নাই। তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, অনেক তথ্য তিনি স্থানীয় লোক, অথবা তীর্থকামী ভারতবাসীদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দুরা অনেক আগে হইতেই গঙ্গার উৎপত্তি-স্থানের সন্ধান জানিতেন, আর তিব্বতীয়েরাও এটুকু খুবই জানিতেন যে, মানস-সরোবর হইতে যে নদী বাহির হইয়াছে, তাহা শতদ্রু নদী—গঙ্গা নয়; কাজেই গঙ্গার উৎপত্তি-স্থান ওরূপ ভাবে নির্দ্দেশ করিবার জন্য তিনি নিজেই দায়ী। মানস-সরোবর এবং রাবণ হ্রদের মধ্যে যে জল-প্রণালী—অন্ততঃ জল-প্রবাহের পথ আছে, তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে, এখন পর্য্যন্তও সেখানকার মঠের লোকেরা উহাকে গঙ্গা বা ঙ্গাঙ্গা (Nganga) বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহাও Father Desideri'র ভ্রান্তির একটা কারণ হইয়া থাকিতে পারে।

Father Desideri'র পরে Tiffenthaler'এর মানচিত্র। ইনিও Jesuit সম্প্রদায়ের একজন Father। ইনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি এত উচ্চপ্রদেশে যান নাই। মোগল-সম্রাট আকবর যে মানচিত্র তৈয়ার করাইয়াছিলেন,—Tiffenthalerএর মানচিত্র সম্ভবতঃ তাহারই প্রতিলিপি। এই মানচিত্র এবং তাহার আনুষঙ্গিক বিবরণ প্রচার করেন Anquetil.

Tiffenthalerএর মতে মানস-সরোবরের পরিধির পরিমাণ ৬০ ক্রোশ; এবং রাবণ-হ্রদের পরিধি ১১ ক্রোশ। Tiffenthalerএর বৃত্তান্তে ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তি-স্থান মানস-সরোবরে দেখান হইয়াছে। মানস-সরোবরের উত্তর পশ্চিম কোণ হইতে যে নদী বাহির হইয়াছে, মানচিত্রে পারস্য ভাষায় তাহাকে শতদ্রু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহা বোধ হয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগের কথা। Tiffenthealerএর মানচিত্র অবশ্যই ইহার অনেক পরের কথা। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের পরে Anquetil আবার ইহার উপর পণ্ডিতি করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নয়; বরং ইহাই বেশী সম্ভব যে, এই নদী পরে অলকনন্দার সহিত মিলিত হইয়াছে। Auquetil—D'Anvilleএর মানচিত্র লইয়াও আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু রাবণ-হ্রদ হইতে যে নদী বাহির হইয়াছে, তিনি তাহাকে Gogra বা সরযূ নদী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার মতে সাম্পূ এবং ব্রহ্মপুত্র একই নদী, এবং তিনি Tiffenthalerএর সঙ্গে একমত হইয়া বলেন যে, ইহার উৎপত্তি-স্থান মানস-সরোবরে। মানস-সরোবর হইতে যে কি করিয়া ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি-স্থান দেখান হয়, সেটা একটু আশ্চর্য্যের বিষয়; কারণ, মানস-সরোবরের পূর্ব্বতীরে মোটে একটি নদীর সহিত তাহার সংযোগ আছে; কিন্তু সেই নদী মানস-সরোবর হইতে বাহির হয় নাই, বরং মানস-সরোবরে আসিয়া পড়িয়াছে। কাজেই মনে হয় যে, খুব সম্ভব আকবরের প্রেরিত লোকেরা দেখিবার সময় দেখিয়া গিয়াছে যে, একটি নদী আছে; কিন্তু পরে মানচিত্র তৈয়ার করিবার সময় ভুলিয়া গিয়াছে যে, নদীর গতি বাস্তবিক কোন্ দিকে ছিল। তার পরে এই নদীকে ব্রহ্মপুত্র মনে করিবার, আর যে কোন কারণ থাকুক, একটা আনুমানিক কারণ এই হইতে পারে—বিশেষ জরীপকর্ত্তারা যদি হিন্দু হইয়া থাকে—যে, মানস-সরোবর যখন ব্রহ্মার মানস বা ইচ্ছাশক্তি হইতে জাত * তখন ব্রহ্মপুত্রও (ব্রহ্মার পুত্র) এই হ্রদ হইতে উৎপন্ন না হইয়া যায় না।

এই সব মানচিত্রে, মানস-সরোবরের উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে যে নদী বাহির হইয়াছে, তাহাকে একটি স্বতন্ত্র

* স্কন্দপুরাণের উপাখ্যান।

নদী বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। এই নদীই যে রাবণ-হ্রদে পড়িয়া, আবার সেখান হইতে বাহির হইয়া শতদ্রু নদী হইয়াছে, তাহা না জানিয়া, মানস-সরোবর হইতে একটি, এবং রাবণ হ্রদ হইতে স্বতন্ত্র আর একটি নদী বাহির হইয়াছে, এরূপ দেখান হইয়াছে। ইহা তাহাদের অনুসন্ধানের ত্রুটি ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে এই মানচিত্র হইতে একটা কথা নিশ্চিতরূপেই জানা যায় যে সেই সময়ে—ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে—দুটি হ্রদ পরস্পর সংযুক্ত ছিল এবং রাবণ হ্রদ হইতেও একটি জল-স্রোত প্রবাহিত ছিল।

এই সময়ের দুই-একজন তীর্থযাত্রীর কাহিনীও পাওয়া যায়। তাঁহারা তীর্থকামী—তীর্থ করিবার উদ্দেশ্যে মানস-সরোবরে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের বৃত্তান্ত হইতে ভৌগোলিক তথ্য বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। ইংরেজদের মধ্যে প্রথমে পাওয়া যায় Major Rennellএর মানচিত্র (১৭৮২ খৃঃ)—ইহাও D' Anvilleএর মানচিত্রের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। মোটের উপর D' Anvilleএর মানচিত্রই অনেক দিন পর্য্যন্ত তিব্বত সম্বন্ধে প্রামাণিক বিবরণ বলিয়া গৃহীত হইত। এই মানচিত্রের একটা বিষম ত্রুটি এই ছিল যে, গঙ্গানদীকে মানস-সরোবর হইতে উৎপন্ন বলিয়া দেখান হইয়াছে।

এই সমস্যার সমাধান হয় ১৮০৮ সালে, যখন বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ অনুসারে Lt Webb হিমালয়ের দক্ষিণ দিকের স্কন্ধের উপরে গঙ্গার উৎপত্তি-স্থান আবিষ্কার করেন। বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের আদেশ ছিল—গঙ্গোত্রীই গঙ্গার মূল উৎপত্তি-স্থান কি না, তাহা নির্ণয় করা। যদি তাহা না হয়, তবে জরীপ করিয়া যতদূর সম্ভব উহার মূল উৎসের সন্ধান করা; বিশেষ করিয়া এইটুকু সন্ধান করা যে Major Rennellএর বৃত্তান্তে যেরূপ প্রকাশ—মানস-সরোবর হইতেই গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে কি না। যদি তাই হয় তবে যতদূর সম্ভব, সেই হ্রদেরও তথ্য সংগ্রহ করা। Webb সাহেব শুধু গঙ্গার উৎপত্তি-স্থান নির্ণয় করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি তথাকার স্থানীয় লোকদের নিকট হইতে বিশ্বস্তসূত্রে খবর লইয়া আসিলেন যে, এক শতদ্রু নদী ছাড়া মানস-সরোবরের পশ্চিম তীর হইতে আর কোন নদী বাহির হয় নাই। ইহার পরে আর এক সময় (১৮১৬ খৃঃ) Webb সাহেব এক তিব্বতীয় সর্দ্দারের নিকট শুনিতে পান যে, শতাধিক স্রোতস্বতী মানস-সরোবরে আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু মানস-সরোবর হইতে বাহির হইয়াছে শুধু একটি—এইটি রাবণ হ্রদের সহিত তাহার সংযোগ-প্রণালী।

ইংরেজদের মধ্যে এ বিষয়ে William Moorecraf-এর নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। Moorecraft মানস-সরোবরের তীরে গিয়াছিলেন ৮১২ সালের ৬ই আগষ্ট তারিখে। তিনি যতটুকু দেখিয়াছিলেন, তাহাতে নিশ্চিত ধারণা করিয়া বসিয়াছিলেন যে, মানস-সরোবর হইতে কোন জলস্রোত বাহির হয় নাই। কিন্তু হরবল্লভ নামে তাঁহারই এক ভারতবর্ষীয় অনুচর অতি দৃঢ়তার সহিত বলিলেন যে ১৭৯৬ সালে চিউ গুম্ফার (Chiu-Gomfa) নিকটে যে পুল আছে, তাহা না থাকিলে তিনি হ্রদদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সংযোগ-প্রণালী অতিক্রম করিতে পারিতেন না। লাডাকের (Ladak) একটি লোক বলিল যে, আট বৎসর পূর্ব্বে (১৮০৪ খৃঃ) মানস সরোবর হইতে একটি স্রোতধারা প্রবাহিত ছিল; কিন্তু পরে তাহা শুষ্ক হইয়া যায়, এবং প্রবাহ-পথও বালুতে ভরিয়া যায়। Moorecraft সাহেবের ইহার সন্ধান না পাইবার কারণ ইহাই। Moorecraft বলেন যে, রাবণ-হ্রদ হইতে প্রবাহিত একটি জলধারা যেন তিনি দূর হইতে দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইহা বোধ হয় তাঁহার দেখা নয়—শুনা কথার উপর নির্ভর করিয়া একটা বিশ্বাস মাত্র; কারণ, ঐ সময়ে (১৮১২ খৃঃ) ঐ স্রোত শুষ্ক অবস্থায় ছিল। Moorecraft মানস-সরোবরের শুধু পশ্চিম তীর পর্য্যটন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে বিবরণটুকু রাখিয়া গিয়াছেন, Dr. Hedin তাহা অত্যন্ত নির্ভুল এবং বিশ্বাস্ত বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন; এবং প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহার নিজ দেশের লোকের নিকট তাঁহার যথাযথ সমাদর হয় নাই।

১৮১৭ ও ১৮১৮ সালে Capt. Gerard এবং Doctor Gerard হিমালয়ের পশ্চিমাংশে অনেক পর্যটন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা মানস-সরোবর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারেন নাই। Capt. Gerard বলেন যে, তিনি শতাধিক লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া খবর পাইয়াছিলেন যে, শতদ্রু নদী রাবণ-হ্রদের পশ্চিম কোণ হইতে বাহির হইয়াছে।

শিবাজীর মর্ম্মর মূর্ত্তি—পুণার ২০শে এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, গতকল্য শিবাজীর জন্মতিথি উপলক্ষে শিবাজী মন্দিরের সংলগ্ন মাঠে শিবাজীর একটি মর্ম্মর-মূর্ত্তির আবরণ মোচন উৎসব হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের ট্রাষ্টীদের অন্যতম মিঃ এন, সি, কেলকার একটি রিপোর্ট পাঠ করেন। এই রিপোর্টে প্রকাশ যে, পুণানিবাসী পরলোকগত গোখেল শিবাজী মন্দির ইনষ্টিটিউশন স্থাপন করিয়া লোকমান্য তিলক, অধ্যাপক লিখে এবং মিঃ কেলকারকে তাহার ট্রাষ্টি নিযুক্ত করেন। এখন পর্য্যন্ত ২৫ হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। বোম্বাইএর ভাস্কর মিঃ ফাদরকে এই মূর্ত্তিটি প্রস্তুত করেন, এবং ডাঃ গোখেল উহার আবরণ মোচন করেন। সাতারার মহারাজা, নাগপুরের রাজা, পান্থ প্রতিনিধি শ্রীশঙ্করাচার্য্য, পুরুষোত্তম বিশ্রাম মোরাজী প্রভৃতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া পত্র প্রেরণ করিয়াছেন; ট্রাষ্টির নির্দ্দেশ অনুসারে মন্দিরে পরলোকগত বালগঙ্গাধর তিলকের একটি মর্ম্মর-মূর্ত্তি স্থাপন করা হইবে। গত কল্য এই উদ্দেশ্যে ২০০০ টাকা চাঁদা পাওয়া গিয়াছে। (হিন্দুস্থান)

বঙ্গে নারী কমিশনার—বালী মিউনিসিপ্যালটীতে মিস্ জোসেফাইন ম্যাক্‌লিওড কমিশনার মনোনীত হইয়াছেন। ইনি আমেরিকাবাসিনী এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত সংশ্লিষ্ট। (সত্যবাদী)

মন্ত্রিগণের ইস্তাফা প্রদান—লক্ষ্ণৌ ২৭শে এপ্রিল তারিখের খবরে প্রকাশ:—স্যার ক্লড ডি লা ফস্ যে পণ্ডিত জগৎ নারায়ণ গুর্ত্তুর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করিয়াছেন, সেই মামলার ফলে যুক্তপ্রদেশের দুইজন মন্ত্রীই মন্ত্রিত্ব পদে ইস্তফাপত্র প্রদান করিয়াছেন। এরূপ প্রকাশ যে, স্যার ক্লড ডি লা ফস্ মামলাটী দায়ের করিবার পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌয়ে গমন করিয়াছিলেন এবং পণ্ডিত গুর্ত্তুর বিরুদ্ধে মামলা চালাইবার জন্য লাট সাহেবের অনুমতি পাইয়াছিলেন। প্রকাশ পাইয়াছে যে, লাট সাহেব এই মঞ্জুরী প্রদানের পূর্ব্বে শিক্ষা সচিব মাননীয় মিঃ সি, ওয়াই, চিন্তামণির সহিত পরামর্শ করেন নাই, অথচ শিক্ষাসচিবই শিক্ষা-বিভাগের বড় কর্ত্তা। ইহাও প্রকাশ পাইয়াছে যে, মামলা চালাইবার বিষয়ে মঞ্জুরী প্রদান করিবার পর যত শীঘ্র সম্ভব লাট সাহেব নাকি মন্ত্রীকে জানাইয়াছিলেন। কিন্তু লাট সাহেবের এই রকম উপরপড়া কার্য্য তিনি পছন্দ করেন নাই। ফলে ১৯শে এপ্রিল তিনি কার্য্যে ইস্তফা প্রদান করিয়াছেন। তাহার দুইদিন পরেই মাননীয় মিঃ চিন্তামণির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া মন্ত্রী মাননীয় পণ্ডিত জগৎ নারায়ণও ইস্তফাপত্র প্রদান করিয়াছেন। এদিকে লাট সাহেব তেরাই অঞ্চলে শিকারে গিয়াছেন। কাজেই এ ইস্তফাপত্র সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত স্থির করিতে কতকটা দেরী হইতে পারে। কিন্তু নাইনিতাল হইতে এইমাত্র সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, মাননীয় মিঃ চিন্তামণির ইস্তফাপত্র লাট সাহেব নাকি গ্রাহ্য করিয়াছেন। এখনও পর্য্যন্ত এই খবর সঠিক কিনা জানিতে পারা যায় নাই। (নায়ক)

বাঙ্গালার পুলিশের ব্যয়—

১৯১২—৬৭৩৭৫৮৬
১৯১৩—৭৫২৬৮১২
১৯১৪—৮৩০৬৬২২
১৯১৫—৮৭৮৬৩২১
১৯১৬—৯৩৮৩৬৫৫
১৯১৭—৯৯২২৬৫২
১৯১৮—১০৫৮৩০৯২
১৯১৯—১১৫৬১০৭৪
১৯২০—১৩১৬০৯৮০

ইহার উপর বিগত তিন বৎসরে আরও ৪০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। ময়মনসিংহ সমাচার

দান—সার বিপিনকৃষ্ণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে প্রতি বৎসর মাসিক ৪০ টাকা হারে একটী বৃত্তি প্রদান করার জন্য আট হাজার টাকার যুদ্ধ-ঋণের কাগজ দান করিয়াছেন। যে ছাত্র বি-এ অথবা বি-এস্‌সি পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারিবে তাহাকেই এই বৃত্তি দেওয়া হইবে। বৃত্তিধারী ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে এম-এ বা এম-এস্‌সি অধ্যয়ন করিতে হইবে। সার বিপিনকৃষ্ণের এই দান যথার্থই সুশিক্ষার প্রতি তাঁহার অনুরাগের পরিচায়ক। (ময়মনসিংহ সমাচার)

বাঙ্গলায় গুণ্ডা দমনের পালা—কলিকাতার সি, আই, ডি ডেপুটী কমিশনার মিঃ বার্ড, এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার মিঃ এম, এন, মুখার্জ্জি এবং কয়েক জন ইনস্পেক্টর তাঁহাদের অশেষ অধ্যবসায় এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রভাবে প্রায় একশত পঞ্চাশ জন গুণ্ডার নাম সংগ্রহ করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের বিষয় যথাযোগ্য বিচার করিয়া বাঙ্গলা দেশ হইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিতেছেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত এবং অনেকবার কলিকাতা সহরে অস্ত্রশস্ত্রাদি সহ নিরপরাধ লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে; এই অপরাধে উহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বাঙ্গলা দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশ করা হইয়াছে:—

(১) সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্গত শীকারপুর গ্রামের অধিবাসী রামচাঁদ শেলবারাই সাত বার গুণ্ডামি করার অপরাধে শাস্তি পাইয়াছিল। তাহাকে আগামী ৩০শে এপ্রেল হইতে পনের বৎসরের জন্য বাঙ্গলা দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র বাস করিতে হইবে।

(২) পেশয়ার নিবাসী গোলাম হাবিব পেশবারী পূর্ব্বে ৪ বার দণ্ড ভোগ করিয়াছে। গতকল্য ২৬শে এপ্রেল হইতে পনের বৎসরের জন্য তাহার প্রতি বাঙ্গলা দেশ হইতে নির্ব্বাসন দণ্ড প্রদানের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

(৩) পেশয়ার নিবাসী দাদু পেশবারীকে পূর্ব্বে তিনবার শাস্তি দেওয়া হইয়াছে। আগামী ১০ই মে হইতে পনের বৎসরের জন্য বাঙ্গলা দেশ হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়ার হুকুম হইয়াছে।

(৪) বারাণসী গুজাধর পুত্তুয়ার একজন নামজাদা পকেটকাটা। পনের বার তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হইয়াছে। অদ্য তারিখ হইতে ১০ বৎসরের জন্য তাহাকে বাঙ্গলা দেশের বাহিরে থাকিতে হইবে।

(৫) বারাণসীধাম নিবাসী নানক কাহারও একজন বিখ্যাত পকেট-কাটা। দশ বার সে দণ্ডভোগ করিয়াছে। অদ্য তারিখ হইতে দশ বৎসরের জন্য তাহাকে বাঙ্গলা দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করার হুকুম দেওয়া হইয়াছে।

(৬) মির্জ্জাপুরের বাখার খাঁ—পূর্ব্বে দশবার দোষী সাব্যস্ত হইয়াছিল—তন্মধ্যে অনেকবারই সে সদর রাস্তায় গুণ্ডামি করার অপরাধে। অদ্য তারিখ হইতে ১০ বৎসরের জন্য তাহার প্রতি বাঙ্গলা দেশ হইতে নির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

এই নির্ব্বাসন-দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ আজ্ঞা অমান্য করিলে, তাহাদিগকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে। (নায়ক)

এলায়েন্স ব্যাঙ্ক ফেল।—গত ২৭শে এপ্রিল তারিখে "এলায়েন্স ব্যাঙ্ক অব সিমলা লিমিটেড" বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ব্যাঙ্কের খুব লোকসান হইতেছিল বলিয়া ডিরেক্টরগণের শেষবারের রিপোর্টেই উল্লেখ করা হইয়াছিল। তাহার পর ব্যাঙ্কের গচ্ছিত টাকা এবং চলতি হিসাবের টাকা অবিরাম তুলিয়া লওয়া হইতেছিল। ব্যাঙ্কটীকে যাহাতে স্থায়ী করা যায়, সেই জন্য যত রকমে সম্ভব চেষ্টা করিয়া দেখা হইয়াছিল। এই ব্যাপারে গত পাঁচ মাস কাল ভারত ও বিলাতের মধ্যে অনেক চিঠিপত্র লেখালিখি হইয়াছিল। ইংলণ্ডের কোন বড় ব্যাঙ্কের সহিত মিলাইবার সম্ভাবনা আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার উদ্দেশ্যে ডিরেক্টরগণের বোর্ডের চেয়ারম্যান স্যার ডেভিড ইয়ুল গত জানুয়ারী মাসে ইউরোপে গমন করেন। তাহার পর হইতে এই ব্যাপারে তাঁহার সহিত পত্র ব্যবহার হইতেছিল; কিন্তু ২৭শে এপ্রিল তারিখে তাঁহার নিকট হইতে যে খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে তিনি শেষ খবর দিয়াছেন যে, তথায় কিছুই করিতে পারা গেল না। এই ব্যাঙ্কটি টিকাইয়া রাখিবার জন্য চেষ্টা করিয়াও সফল না হওয়ায় ডিরেক্টরগণ অবিলম্বে ব্যাঙ্কটি বন্ধ করিয়া দেওয়া সিদ্ধান্ত করেন। এই ব্যাঙ্কের সহিত যাঁহাদের সংস্রব আছে, তাঁহাদের ক্ষতি যতটা কম হয় তাহার বন্দোবস্ত করিবার জন্য ব্যাঙ্কের কার্য্য এখন পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের পরিচালনাধীন রহিয়াছে। এই ব্যাঙ্ক তুলিয়া দিবার পূর্ব্বে দেনা-পাওনার হিসাব মিটাইবার বন্দোবস্ত যদি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার পরিদর্শন ও পর্য্যবেক্ষণাধীন করিবার সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে এলায়েন্স ব্যাঙ্কের চলতি হিসাব ও সেভিংস ব্যাঙ্কের ডিপোজিট সহ সকল ডিপোজিটের বা গচ্ছিত টাকার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ পরিশোধ করিতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক প্রস্তুত আছেন। এইরূপ বন্দোবস্ত করিতে প্রায় এক পক্ষকাল সময় লাগিতে পারে।

ব্যাঙ্কের দেনা-পাওনার হিসাব চলিয়া অন্যান্য বিবেচনায় যখন অন্যান্য ডিভিডেণ্টের টাকা দিবার সম্ভাবনা হইবে তখনই তাহা দেওয়া হইবে। (বন্দেমাতরম্)

তিলক স্বরাজ্য ফণ্ডে দান।—ব্রহ্মদেশের শেঠ মানসিংহ ভোজওয়ালা তিলক স্বরাজ ফণ্ডে ১১ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। (হিন্দুরঞ্জিকা)

ম্যাজিষ্ট্রেটের কীর্ত্তি।—মাদ্রাজ কোকনদের ম্যাজিষ্ট্রেট কিছু দিন পূর্ব্বে এক ইস্তাহার জারী করেন যে, যাহারা অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিবে বা তিলক স্বরাজ্য ফণ্ডে চাঁদা দিবে, তাহাদের ক্ষেত্রে জল সরবরাহ করা হইবে না। লোকেরা ইহাতে আরও দ্বিগুণ উৎসাহে চাঁদা দিয়াছে। সম্প্রতি আবার ইনিই আর এক ইস্তাহার জারী করিয়াছেন যে, কোন ধর্ম্মঘটের সূত্রপাত হইলেই গ্রামবাসীর তৎক্ষণাৎ যেন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সংবাদ দেয়। হিন্দুরঞ্জিকা

১২০০ শিখ বন্দীর মুক্তি।—লাহোর, ২৭ এপ্রেল। পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট একটী প্রেস-কমিউনিকে বলিয়াছেন যে, সম্প্রতি অমৃতসরে হিন্দু মুসলমানে যে দাঙ্গা হইয়াছিল—শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটীর উপদেশে আকালীরা এই দাঙ্গা নিবারণে গবর্ণমেণ্টকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। এই ব্যাপারে আকালীদের সদাচরণ স্মরণ করিয়া বড়লাট বাহাদুর গুরুকাবাগের হাঙ্গামায় দণ্ডিত সকল শিখকে কারাগার হইতে মুক্তি প্রদানের আদেশ দিয়াছেন। তবে জেলে অবস্থিতি কালে যাহারা গুরুতর অপরাধ করিয়াছে, তাহারাই কেবল ছাড়া পাইবে না। ফলে ১১০০ কি ১২০০ শিখ কয়েদী খালাস পাইতে পারে। (নায়ক)

আন্তর্জ্জাতিক নারী সম্মিলনী।—গত ১৩ই এপ্রেল রোম সহরে আন্তর্জ্জাতিক নারী অধিকার সম্মিলনীতে যোগদান করিবার জন্য একটী ভারতীয় ডেপুটেশন বোম্বাই সহর পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই ডেপুটেশনটী প্রেরণ করিতেছেন ভারতীয় নারী-সমিতি। শ্রীমতী জিনরাজদাস এবং শ্রীমতী মতিদেবী পট্টবর্দ্ধন এই ডেপুটেশনে ভারতীয় নারীদের প্রতিনিধি হইয়া গমন করিতেছেন। বর্ত্তমানে দুনিয়ার সর্ব্বত্র রমণীরা আপনাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এ চেষ্টা তাঁহাদের বিশেষ নিষ্ফলও হয় নাই। সর্ব্বত্রই নারী জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। এই ভারতবর্ষেও অল্পদিনের ভিতরেই রমণীরা কতকগুলি এমন অধিকার লাভ করিয়াছেন, যাহা ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষের রমণীরা লাভ করার কল্পনাও করিতে পারেন নাই। তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচনের অধিকার পাইয়াছেন, কোনো কোনো স্থলে তাঁহারা মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারও নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তুরস্কে রমণীদের অবস্থা আমাদের দেশের রমণীদের অবস্থার মতই শোচনীয় ছিল। কিন্তু সেখানেও রমণীরা নিজেদের অধিকার কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইতে সুরু করিয়া দিয়াছেন—সেখানে শিক্ষা সচিবের পদ অধিকার করাও নারীদের পক্ষে আর অসম্ভব নহে। সর্ব্বত্র নারী জাগরণের যে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, এই আন্তর্জ্জাতিক নারী সম্মিলনীটী তাহারই বাহিরের অভিব্যক্তি মাত্র। এই সম্মিলনীর কার্য্য-

পদ্ধতি কোন্ পথ ধরিয়া চলে, তাহা দেখিবার জন্য আমাদের মত সমস্ত দুনিয়াই যে উৎসুক নেত্রে চাহিয়া আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। (স্বরাজ)

লবণ প্রস্তুতে রক্তগঙ্গা।—বরিশাল হইতে ১৬ই এপ্রিল তারিখে জনৈক সংবাদদাতা নিম্নলিখিত খবর পাঠাইয়াছেন :—পুলিশ খবর পায় যে, ভোলা মহকুমার মুজাকাল গ্রামে লবণ প্রস্তুত করা হইতেছে। এই খবর পাইয়া বরিশালের আবগারী বিভাগের ইনস্পেক্টর বাবু হেমচন্দ্র বসু সেই গ্রামে গমন করেন। গত কল্য ১৫ই এপ্রিল বরিশালে খবর পৌঁছিয়াছে যে, সেই গ্রামে পুলিশের সহিত একটা সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে এবং পুলিশের বন্দুকের গুলিতে তিনটী লোক হত হইয়াছে। আবগারী ইনস্পেক্টার হেমবাবুর দলের কয়েকটী লোক নাকি জখম হইয়াছে।

পরবর্ত্তী বিস্তারিত বিবরণ।—বরিশালের ১৭ই এপ্রিল তারিখের খবরে প্রকাশ :—মুজাকালা গ্রামে যে গুলিমারাকাণ্ড এবং খুন হইয়াছে সেই বিষয়ে পরে আরও যে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে, আবগারী বিভাগের ইনস্পেক্টর বাবু হেমচন্দ্র বসু নয় জন আগ্নেয়াস্ত্রধারী কনষ্টেবল এবং দশজন আবগারী বিভাগের পিয়ন সঙ্গে লইয়া পীরপুর গ্রামে গমন করে, একখানি বাড়ীতে খানাতল্লাস করে, লবণ প্রস্তুত করিবার যন্ত্র এবং প্রস্তুত করা লবণ সেই বাড়ী হইতে গ্রহণ করিয়া একখানি গরুর গাড়ীতে বোঝাই করে এবং তাহা লইয়া মুজাকালা গ্রামে গমন করে। তথায় একটা হাট বসিয়াছিল। হাটে সেই গাড়ী লইয়া উপস্থিত হইলে তাহার চতুর্দ্দিকে বহুলোক সমবেত হয়। তাহারা নাকি একজন পিয়নের কার্য্যে বাধা দেয়। কনষ্টেবলগুলিকে সেই গাড়ীর নিকট হইতে অন্যত্র পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল ; কিন্তু জনতার ভাব দেখিয়া এবং তাহাদিগকে কাঠের কুঁদো এবং একটা কামারশালা হইতে লোহার দাওা সমূহ লইতে দেখিয়া কনষ্টেবলদিগকে আবার ডাকা হয় এবং তাহার পর গুলি বর্ষণ করা হয়। তিনটী লোক হত হইয়াছে। তাহার ফলে জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া সরিয়া যায়। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, আবগারী বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং ভোলার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মুজাকালাতে গমন করিয়াছেন। (ত্রিপুরাহিতৈষী)

সীমান্তে ভীষণ উপদ্রব।—বৃটিশ নারী হত্যা ও নারী হরণ। ফরেন ও পোলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট হইতে নিম্নলিখিত মর্ম্মের একটী কমিউনিক প্রচারিত হইয়াছে—পশ্চিমোত্তর সীমান্ত প্রদেশের অন্তর্গত কোহাট হইতে একটী ঘৃণাজনক অত্যাচারের খবর আসিয়াছে। ঘটনাটি ১৩-১৫ই এপ্রেল তারিখে ঘটে। একদল দস্যু মেজর এ, জে, ও এলিসের বাংলাতে ঢুকিয়াছিল। মেজর এ, জে, এলিস ডি-এস বর্ডার রেজিমেণ্টের কর্ম্মচারী—কোহাট জেলার জেনারেল ষ্টাফে কর্ম্ম করেন। একটা গোলমাল হওয়ায় যখন লোকে ঘটনার কথা জানিতে পারিল, তখন দেখা গেল ডাকাতেরা মিসেস এলিসকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। পশ্চিমোত্তর সীমান্তের চীফ কমিশনার ভ্রমণে বাহির হইয়া তখন বন্নুতে ছিলেন। খবর শুনিবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ কোহাটে যাত্রা করেন। সৈনিক প্রহরীদিগকে সকল দিকে প্রেরণ করা হয়। যাহা হউক, অনেক অনুসন্ধানের পর কুমারী এলিসের উদ্ধার সাধন করা হইয়াছে। (ত্রিপুরাহিতৈষী)

চৌরীচৌড়ার আপীল।—উনিশ জনের প্রাণদণ্ড। একশত দশজনের দ্বীপান্তর।—এলাহাবাদের ৩০শে এপ্রিল তারিখের তারের খবরে প্রকাশ :—চৌরীচৌড়ার মামলায় একশত সত্তর জন আসামীর প্রতি ফাঁসীর হুকুম হইয়াছিল। তাহাদের পক্ষ হইতে যে আপীল করা হইয়াছিল, সেই আপীলের মামলায় প্রধান বিচারপতি স্যর গ্রীমউড মিয়ার্স এবং বিচারপতি পিগট অদ্য রায় দিয়াছেন। বেলা সাড়ে দশ ঘটিকার সময় তাঁহারা রায় পাঠ আরম্ভ করেন এবং বৈকাল ৪ ঘটীকার সময় রায় শেষ করেন।

রায় খুব লম্বা হইয়াছে। বিচারপতিদ্বয় প্রত্যেক আসামীর বিরুদ্ধে আরোপিত মামলার বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা প্রথমে মামলার সাধারণ অবস্থার আলোচনা করিবার পর, যে জনসঙ্ঘ পুলিশের থানা আক্রমণ করিয়াছিল, সেই জনসঙ্ঘের প্রকৃতি নির্ণয় করিয়া, এইরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, উহা সাধারণ জনতা ছিল না, উহা এমন একটা দল বা এমন কতকগুলি লোক ছিল, যাহারা মতলব ঠিক করিয়া থানায় অভিযান করিয়াছিল এবং তাহারা তথায় ভীষণ অত্যাহিতকাণ্ড করিয়াছিল। সেই জুলুমের কথা রায়ে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহার পর বিচারপতিদ্বয় এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আসামীগণের একত্র বিচার আইনসঙ্গত কার্য্যই হইয়াছিল। তদন্ত বেশ রকমের হইয়াছিল, এবং নিম্ন আদালতের বিচারও সন্তোষজনক হইয়াছিল। আপীলকারীদের পক্ষ হইতে এই আপত্তি উপস্থিত করা হইয়াছিল যে, আসামীগণের সকলের অভিযোগ একসঙ্গে লিপিবদ্ধ করা আইনসঙ্গত কার্য্য হয় নাই। এই সমস্যা সম্বন্ধে বিচারপতিদ্বয় এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সেসন্স জজ একসঙ্গে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করিয়া আইনসঙ্গত কার্য্য করিয়াছিলেন। অভিযোগ একত্র লিপিবদ্ধ করার দরুণ এমন কোন্ দোষ হয় নাই যে, আসামীদের সকলের দণ্ড রদ করিয়া দিতে হয়। দায়রার আদালতে যে প্রণালীতে বিচার হইয়াছে, তাহা কোনও রকমে বেআইনী হয় নাই। ফলে বিচারপতিদ্বয় রায়ে এইরূপ দণ্ডাজ্ঞার বিধান করিয়াছেন :—

(১) যে উনিশ জন আসামী সেই জনসঙ্ঘের চালক হইয়াছিল, এবং পুলিশগণকে সাঙ্ঘাতিক আক্রমণ করিয়া খুন জখম ঘটাইবার কার্য্যে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের প্রাণদণ্ডাদেশ বাহাল রাখা হইয়াছে।

(২) তিনজন আসামীকে কেবল দাঙ্গার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হইয়াছে এবং তাহাদের প্রত্যেকের প্রতি দুই বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম প্রদান করা হইয়াছে।

(৩) একশত দশ জনকে খুনের এবং অন্যান্য অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হইয়াছে ; কিন্তু তাহাদের প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে প্রত্যেকের

প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের হুকুম করা হইয়াছে এবং তাদের মধ্যে চৌদ্দ জন বাদে বাকী সকলের প্রতি দয়া করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে সুপারিশ করা হইয়াছে।

(ক) যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত একশত দশ জনের মধ্যে ১৯ জন আসামীর প্রত্যেকের আট বৎসর করিয়া, (খ) ৫৭ জন আসামীর প্রত্যেকের পাঁচ বৎসর করিয়া এবং (গ) ২০ জন আসামীর প্রত্যেকের তিন বৎসর করিয়া দ্বীপান্তর দণ্ডের জন্য বিচারপতিদ্বয় গবর্ণমেণ্টের নিকট সুপারিশ করিয়াছেন।

(৪) আটত্রিশ জন আসামীকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিয়া তাহাদিগকে খালাস দিবার জন্য হুকুম করা হইয়াছে।

তাহার পর বিচারপতিদ্বয় অসহযোগ আন্দোলনের খারাপ ফলের কথা রায়ে উল্লেখ করিয়াছেন এবং বর্ব্বরোচিত রকমের অপরাধের কথা এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের কথার উল্লেখ করিয়া তাঁহারা এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, নিরক্ষর ও মূর্খ কৃষকগণের নিকট প্রকৃত সত্য ঢাকিয়া তাহা রূপান্তরিত করিয়া তাহাদিগকে অন্যরূপ বুঝাইয়া দিবার ফলে এবং স্বরাজের অঙ্গীকার তাহাদিগকে করিবার ফলে এবং অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্তি লওয়াইবার ব্যাপারে মিঃ গান্ধীর অলৌকিক কার্য্যশক্তির ফলে তাহারা এই সকল ভীষণ কার্য্য করিয়াছে। যে উনিশ জন আসামীর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা বাহাল রাখা হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে বিচারপতিদ্বয় এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রাণদণ্ডই এই সকল আসামীর একমাত্র উপযুক্ত সাজা। (নায়ক)

কেরোসিনে আত্মহত্যা।—কুমিল্লা সহরের নিকটবর্ত্তী শালধর গ্রামের আনন্দচন্দ্র নন্দী বরপেটাতে সরকারী ডাক্তার। পূর্ব্বে তিনি মেসোপটেমিয়াতে ডাক্তার ছিলেন; বেশ সম্পন্ন অবস্থা। শৈলবালা তাঁহার চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া কন্যা। উচ্চশিক্ষিত ভাল পাত্রের সহিত শৈলবালার বিবাহ দিবার ইচ্ছায় আনন্দবাবু অনেক অনুসন্ধান করিয়া আসিতেছিলেন। অতঃপর ইলিয়টগঞ্জের নিকটবর্ত্তী মধ্যগ্রামনিবাসী সুরেন্দ্রনাথ দত্ত নামক একটী ধনীর সহিত শৈলবালার বিবাহে প্রস্তাব স্থির হয়। ছেলেটি আই-এ পড়িয়াছে, অবস্থা খুব ভাল। গত ২০শে চৈত্র প্রস্তাব পাকা হইয়া "মঙ্গলাচরণ" হইয়া ৭ই বৈশাখ বিবাহের দিন স্থির হইবার কথা ছিল। কিন্তু ঐ ছেলেটির অভিভাবক এই বিবাহে আপত্তি করিয়া ২৪শে তারিখে নিষেধ চিঠি পাঠাইয়াছেন। ২৯শে চৈত্র সন্ধ্যার সময় শৈলবালা পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া এবং একে একে ৪।৫ খানা কাপড় শরীরে বাঁধিয়া তাহাতে কেরোসিন মাখিয়া আগুন লাগাইয়া দেয়। ১২টার সময় তাহার মৃত্যু হয়। এই মৃত্যুতে অন্য কাহারও দোষ নাই, সে এরূপ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে। অন্যান্য স্থানে পিতামাতার আর্থিক অস্বচ্ছলতার কষ্টে যেরূপ আত্মহত্যার কথা শুনা গিয়াছে, এক্ষেত্রে তাহার কিছু নাই। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে শৈলবালা তাহার এই কার্য্যের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করিয়া গিয়াছে। নায়ক

ডাক্তারখানা প্রতিষ্ঠা—হুগলী জেলার চণ্ডিতলা গ্রামে সেদিন স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বামীজির। কুমার ঔষধালয় নামে একটি দাতব্য ঔষধালয়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। (বন্দেমাতরম্)

সৈন্য সংগ্রহ।—গত যুদ্ধের সময় (১লা আগষ্ট, ১৯১৪ হইতে ৩০শে নভেম্বর ১৯১৮ পর্য্যন্ত) ভারত সরকার বিভিন্ন সম্প্রদায় হইতে নিম্নলিখিত সৈন্য সংগ্রহ করেন।

পাঞ্জাবী মুসলমান	১৩৬০০০	প্রায়
শিখ	৮৯০০০	"
রাজপুত	৬২০০০	"
গুরখা	৫৬০০০	"
জাঠ	৫৪০০০	"
পাঠান	২৮০০০	"
দোগরা	২০০০০	"

(হিন্দুরঞ্জিকা)

সেওড়াফুলিতে ডাকাতি।—শ্রীরামপুর পুলিশের নিকট একজন ট্যাক্সি চালক এই বলিয়া এজাহার দিয়াছে যে সে মোটরে করিয়া ধানবাদ যাইবার পথে সেওড়াফুলী ও বৈদ্যবাটী রাস্তার মধ্যে ৩০।৪০ লোক রাস্তার মাঝে গাছ ফেলিয়া তাহার গাড়ী আটক করিয়া তাহার মোটরে আর কিছু না পাইয়া—একজোড়া জুতা লইয়া গিয়াছে। পুলিশ এখনও কাহাকেও গ্রেপ্তার করে নাই। (বন্দেমাতরম্)

মান্দ্রাজে বোমার কারখানা।—ষ্টেটসম্যানের সংবাদদাতা ২৭শে এপ্রেল তারিখে মান্দ্রাজ হইতে সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে, গত দুই বৎসর ধরিয়া কুডাপ্পার সেসন আদালতে অনেকগুলা খুনী মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। এই সব হত্যাকাণ্ড বোমার সাহায্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সম্প্রতি সর্ব্বশেষ মামলাটিতে টালারি এরয়া নাগাড়ু ওরফে নারিগাড়ু নামক একব্যক্তি আসামী ছিল। সে ভেন্দলা তালুকের অন্তর্গত গুরিজা থানার এলাকায় আগ্রাহারাম গ্রামে বাস করিত। একজন দারোগা তাহার বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া একটা বোমা, দুইটা গুলিভরা রিভলভার, ২৩টা অতিরিক্ত কার্টুজ, এবং বারুদ ওজন করিবার নিক্তি পাইয়াছে। পুলিশ দ্রব্যগুলি গ্রহণ করে ও আসামীকে গ্রেপ্তার করে। ঘরের মেঝে খুঁড়িয়া একটা মৃৎপাত্রে আরও তিনটা বোমা পাওয়া যায়। একজন লোক আসামীর কাছ হইতে বোমা, পিস্তল, বিষ প্রভৃতি চাহিয়া একখানি চিঠি লিখিয়াছিল, পুলিশ তাহাও হস্তগত করিয়াছে। বিচারে আসামীর প্রতি ৭ বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর দণ্ড প্রয়োগ করা হইয়াছে।

কুডাপ্পার সাম্প্রদায়িক দলাদলির দরুণ প্রায়ই দাঙ্গা হাঙ্গাম হয় ও তাহাতে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হয়। (নায়ক)

বন্যাপীড়িত স্থানে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র।—গত ১৭ই এপ্রিল আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, ডাঃ জে, এন, সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত এস দাস গুপ্ত এবং রাজশেখর বসু মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া বন্যাপীড়িত স্থানের সাহায্য কার্য্য পরিদর্শনার্থে আত্রাই গিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ৫০০ বর্গ মাইল পরিমিত স্থানে ১০টি বিভিন্ন কেন্দ্রে ১০ জন কর্ম্মচারী

দ্বারা রিলিফের কার্য্য চলিতেছে। বন্যাপীড়িত লোকদিগকে চাউল তৈয়ার করিবার জন্য ধান্য দেওয়া হইতেছে। এইরূপে প্রায় ১২০০০ লোক সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছে। এখনও লোকের অবস্থা শোচনীয়। পশু খাদ্যের অভাব। রিলিফ কমিটি দশহাজার টাকা মূল্যের পশুখাদ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। কলের লাঙ্গল দ্বারা কতক কতক জমি চাষ করান হইতেছে। আত্রাই নদী স্থানে স্থানে শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় জিনিষপত্র লইয়া যাতায়াতে বড়ই অসুবিধা হইতেছে। রিলিফের কার্য্য দেওয়ার জন্য কালিকাপুরে আত্রাই নদীর ধারে একটি বাঁধ দেওয়ার কথা হইতেছে। দুএক স্থানে কলেরা দেখা যাইতেছে। কূপগুলি সংশোধন করা হইতেছে। মেডিকেল ক্যাম্পের কাজ বেশ চলিতেছে। তারপর গত ৯ই তারিখে তাঁহারা আতাইকলা কেন্দ্রে গমন করিয়াছিলেন। সেখানেও এইরূপভাবে সাহায্য দেওয়া হইতেছে। খাদ্য ও পানীয় জলের অভাবেই অনেকের প্লীহা ও আমাশয় হইয়াছে। আত্রাইয়ে একটি নলকূপ বসান হইতেছে। অন্যান্য স্থানে আরও কয়েকটা বসান হইবে। স্ত্রীলোকের বস্ত্রাভাব এখনও আছে। (হিন্দুরঞ্জিকা)

খুলনা জেলা কন্‌ফারেন্স।—খুলনার ২৮শে এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় খুলনা জেলা কন্‌ফারেন্সের সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। প্রতিনিধিদের ফী যথাক্রমে ৪৲ ও ১৲ টাকা। কৃষাণ প্রতিনিধিদিগকে বিনামূল্যে কন্‌ফারেন্সে যাইতে দেওয়া হইবে। কন্‌ফারেন্সের সহিত একটী খদ্দর প্রদর্শনীও হইবে।

(বন্দেমাতরম্)

ত্রিবাঙ্কুরে সমবায়।—ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে সমবায় কিরূপ প্রসার লাভ করিয়াছে এবং দিন দিনই উহা কিরূপ উন্নতির দিকে চলিয়াছে, সেই সম্বন্ধে সেখানকার গভর্ণমেণ্ট একটী সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রকাশ করিয়াছেন। সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধি, সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি, মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রভৃতি কয়েকটা সাধারণ বিষয়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ত্রিবাঙ্কুরের সমবায় আন্দোলনের মধ্যে আমরা এমন দুই একটা জিনিষ দেখিতে পাই যাহা গঠনের দিক দিয়া একটী রাজ্য কিম্বা জাতির পক্ষে বড়ই উপকারী। এই দিক দিয়া ত্রিবাঙ্কুরের সমবায় আন্দোলনে অনেকটা নূতনত্বও আসিয়া দেখা দিয়াছে। রিপোর্টে প্রকাশ, গত বৎসর ত্রিবাঙ্কুরে সমবায় সমিতির মোট সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩৬৭; তৎপূর্ব্ব বৎসরের সংখ্যা ছিল ২৬৬; সদস্য সংখ্যাও পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়া আলোচ্য বৎসরে ১৭০০০ হইতে ২২০০০ হাজারে পরিণত হইয়াছে। কেবল অনুন্নত জাতির লোকদের জন্যই সেখানে ৬টী সমিতির সৃষ্টি হইয়াছে; তদ্ভিন্ন তাঁতী, কর্ম্মকার, কুম্ভকার কারখানার মজুর প্রভৃতিকেও এই সমবায়ের গণ্ডীর ভিতর টানিয়া আনিবার চেষ্টা হইয়াছে। এই স্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের ভিতর কেবল স্ত্রীলোকগণের জন্য তিনটী সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছে। নায়ার জাতির স্ত্রীলোকেরা তাহাদের নিজেদের চেষ্টায় একটী সমিতি স্থাপন করিয়াছে। সূচের কাজ, লেস তৈরী প্রভৃতি গৃহ-শিল্পের উন্নতি করাই এই সমিতিটীর উদ্দেশ্য। সমবায় সংশ্লিষ্ট লোকদের নিয়া দুইটী সমবায় কনফারেন্স ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে হইয়া গিয়াছে। দুইটী কনফারেন্সের প্রত্যেকটীর সঙ্গে একটা করিয়া প্রদর্শনীও খোলা হইয়াছিল। দেশের লোক এই রকমের কনফারেন্স এবং প্রদর্শনীতে বড়ই আমোদ পাইয়াছে। সমবায় আন্দোলন ত্রিবাঙ্কুরে এতটা দ্রুত অগ্রসর হইতেছে যে, তাহা লক্ষ্য করিয়া গভর্ণমেণ্ট ভবিষ্যতে উক্ত রাজ্য আর্থিক বিষয়ে সমধিক উন্নতি লাভ করিবে বলিয়া খুবই আশা করিতেছেন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ত্রিবাঙ্কুরে সমবায় সমিতি ছিল মোট ৪৫টী। এইরূপ সব দিক দিয়াই উক্ত রাজ্যে পাঁচ বৎসরের মধ্যে অনেক উন্নতি হইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি মাদ্রাজ অঞ্চলে সামাজিক অবস্থার দিক দিয়া অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের যে দুর্দ্দশা, উক্ত অঞ্চলের পক্ষে তাহা বাস্তবিকই একটা বড় কলঙ্কের কথা। আজ সমবায়ের প্রসাদে যদি অনুন্নত শ্রেণীর কিঞ্চিৎ উপকার হয়, তবে আমরা বড় সুখী হইব। সমবায়ের উত্তম অধম জ্ঞান দূর করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই, সেই অঞ্চলে সমবায়ের প্রসার দেখিয়া আমরা এতটা আশান্বিত হইয়াছি। মহীশূর রাজ্যে সমবায় আন্দোলন বেশ প্রসার লাভ করিয়াছে। গত বৎসর নাকি সমবায়ের পক্ষে মহীশূরে খুব একটী দুর্ব্বৎসর গিয়াছে—অর্থাৎ গোটা এক বৎসরে মোটে ৫০টী নূতন সমিতি গঠিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে নিরাশ হওয়ার কিছুই নাই; কারণ সমবায়ের গোড়ার উদ্দেশ্যটা দেশবাসী ধরিয়া উঠিতে পারিলে কোন বৎসর দুই দশটা সমিতি কম স্থাপিত হইলেই তাহাতে নিরাশ হওয়ার কিছু থাকে না। (ভাণ্ডার)

বিদেশ

মিশরে গণতন্ত্র শাসন-পদ্ধতি

রাজা এবং মন্ত্রী সভার সমস্যা।—সন্তোষজনক সমাধান। কাইরোর ২০শে এপ্রিলের সংবাদে প্রকাশ, মিশরের রাজার হাতে কতখানি ক্ষমতা থাকিবে; ইহা লইয়া গত সপ্তাহে মিশরের রাজা ও মন্ত্রি-সভার সদস্যদের মধ্যে খুব কথা-কাটাকাটি চলিয়াছিল; সম্প্রতি এই আলোচনার একটা মীমাংসা হইয়াছে, মিশরের জন্য গণতন্ত্রমূলক শাসন-পদ্ধতির একটি খসড়া বাহির হইয়াছে। এই ব্যবস্থা উভয় পক্ষেরই সন্তোষজনক হইয়াছে। ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট সুদানকে মিশরের অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে আপত্তি করিয়াছিলেন এবং এই বিষয় লইয়া গ্রেটব্রিটেন এবং মিশরের মধ্যে একটি সমস্যার সৃষ্টি হইবার আশঙ্কা ঘটিয়াছিল। মিশরের মন্ত্রিসভা ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের ঐ আপত্তি মানিয়া লইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। মিশরের রাজা ভূতপূর্ব্ব খেদিবের মাতাকে মিশরের আসিতে অনুমতি দিয়াছেন। সম্প্রতি একটি গুজব রটিয়াছে যে মিশরে বিদ্রোহ আসন্ন হইয়াছে। লণ্ডনের সরকারী মহল ঐ গুজবের সম্বন্ধে কোন খবর পান নাই। তাঁহারা বলেন, মিশরের রাজা এবং মন্ত্রী-সভার সদস্যদের মধ্যে একটা বিরোধ চলিতেছে। তাহার সহিত ইংরেজের

কোন সম্পর্ক নাই। মিশরে যখন স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়, তখন ব্রিটিশ পক্ষ চারিটা বিষয় নিজেদের হাতে রাখিয়া দিলেন। ঐ কয়েকটি বিষয় ছাড়া মিশরের লোকেরা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী শাসন-পদ্ধতি গঠনের অধিকার পাইয়াছে। যতদূর খবর পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, এই শাসন-পদ্ধতির খসড়া প্রণয়ন ব্যাপারে মন্ত্রিসভা অনেকটা দূর অগ্রসর হইয়াছেন। শাসন-পদ্ধতির একটা খসড়া কিছুদিন তৈয়ারী ছিল। মার্শাল ল জারি করিবার ক্ষমতা ইংরেজের হাতে আছে। মিশর গবমেণ্ট একটী ইণ্ডেমনিটি বা কর্ম্মচারীদের দোষ ক্ষালনের আইন পাশ না করা পর্য্যন্ত ঐ অধিকার ইংরেজের হাতে থাকিবে।

(হিন্দুস্থান)

রুষিয়ার দুর্দ্দশা।—সোভিয়েট রুষিয়ায় শিশুদিগের বড় দুরবস্থা ঘটিয়াছে। হাজার হাজার অর্দ্ধ-উলঙ্গ নিরাশ্রয় ছেলে মেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহাদের বেশীর ভাগ পিতৃমাতৃহীন অনাথ। ভিখারী ও ভবঘুরে লোকেরা রেলওয়ে ষ্টেশনে ভীড় জমাইতেছে। যাহাকে দেখিতেছে, তাহারই কাছে রুটি ভিক্ষা করিতেছে। সোভিয়েট আইন অনুসারে ১৪ বছরের কম বয়সের ছেলেরা রাস্তায় বুট-লেস বা সিগারেট বিক্রী করিতে পারে না। ছেলেরা এ আইন মানিতেছে না। প্রহরীরা তাহাদের প্রহার করিতেছে। কিম্বা ধরিয়া লইয়া গিয়া জেলে পুরিতেছে। ছেলেরা আজকাল ভারী চোর হইয়াছে—যা পাইতেছে তাহাই চুরি করিতেছে। ছেলে মেয়েদের নৈতিক দুর্গতি চরম সীমায় আসিয়া পৌছিয়াছে। কনষ্টাণ্টিনোপলের পুলিশ তথায় একটা ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে। বোলশেভিক বাণিজ্য প্রতিনিধিরা এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। মে-ডে'তে তাহাদের একটা হাঙ্গামা করিবার মতামত ছিল। পুলিশ অনেক রুষ ও তুর্ককে গ্রেপ্তার করিয়াছে ও অনেক কাগজপত্র পাইয়াছে। মোট কথা, সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট ও কেমালিষ্ট গবর্ণমেণ্ট এখনও পরস্পরকে বিশ্বাস করেন না। ককেসিয়ায় লাল সেনারা জমা হইতেছে। তুর্ক যুদ্ধমন্ত্রীও সসৈন্যে আর্জেরুমে যাইতেছেন। (নায়ক)

সীরিয়ায় গণ্ডগোল

তুর্ক সৈন্য সঞ্চালন।—প্যারী, ২৯ এপ্রেল। ফরাসী খবরের কাগজে প্রকাশ, জেনারেল ওয়েগাণ্ড বৃহস্পতিবার টুলোঁ বন্দরে জাহাজে চড়িয়া বেইরুট অভিমুখে যাত্রা করিবেন। সেখান হইতে সীরিয়া সীমান্তে গিয়া সীমান্ত রক্ষার বন্দোবস্ত করিবেন। কারণ, তুর্করা ঐ অঞ্চলে সৈন্য সমাবেশ করিতেছে। জেনারেল ওয়েগাণ্ড ৬০০০০ ফরাসী সেনা পাইবেন। দরকার হইলে আরও দুই ডিভিসন তাঁহার সাহায্যার্থ পাঠানো হইবে। তুর্করা সৈন্য সঞ্চালন করিতেছে বটে, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য যে সীরিয়া আক্রমণ করা—এমন কথা মনে করিবার কারণ এখনও ঘটে নাই। সম্ভবতঃ সৈন্য সঞ্চালন করিয়া তুর্করা লসানিতে সন্ধিপত্র লইয়া দর দস্তুর করিবেন। কনষ্টাণ্টিনোপলস্থিত ফরাসী হাই কমিশনার জেনারেল পেলী লসানীতে ইসমেত পাশার সঙ্গে ফ্রাঙ্কো-তুর্ক সম্বন্ধ বিষয়ে অনেকবার আলাপ করিয়াছেন। তিনি এখন এম, পয়কারের সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য প্যারীতে যাইতেছেন। লসানির কনফারেন্সে ইসমেত পাশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, তুর্করা টার্কো-সীরিয়ান সীমান্তে সৈন্য সঞ্চালন করে নাই; তাহারা স্বদেশেই চলাফেরা করিতেছে। সুতরাং ফ্রান্সের আতঙ্কিত হইবার কারণ নাই। তুর্ক প্রতিনিধিদের অন্য লোকদের মুখে প্রকাশ, আঙ্গোরার গবর্ণমেণ্ট সৈন্য সমাবেশ করিতেছেন, এ কথা সত্য, এবং তাহা ন্যায়সঙ্গতও বটে; কেন না, ফরাসীরা সীরিয়ায় আর্ম্মেনিয়ানদের হাতে হাতিয়ার দিয়াছে এবং আর্ম্মেনিয়ানরা সীরিয়াস্থিত তুর্কদের উপর অত্যাচার করিতেছে। এমন কি তাহারা তুর্ক অধিকারে অভিযান করিতেও ছাড়িতেছে না।

লসানির সন্ধি অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। অর্থনীতি সংক্রান্ত সর্ত্তগুলা সব প্রায় মিটমাট হইয়া আসিয়াছে। তুর্করা খুব ভাল ব্যবহার করিতেছেন।

সীরিয়ায় সীমান্তে তুর্ক সৈন্য সঞ্চালনের খবর পাইয়া বিচলিত হইয়া ফরাসীরা তথায় নূতন নূতন সেনাদল পাঠাইতেছে, এবং বৃটেনকে মেসোপটেমিয়াতেও সতর্কতাসূচক সামরিক ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিতেছে।

(নায়ক)

ডাবলিনে বোমা।—ডাবলিনের কাছে আমিয়েন্স ষ্ট্রীট ষ্টেসনের সিগন্যাল ক্যাবিনটি গত রাত্রে ১০টার সময় মাইন ফাটিয়া উড়িয়া গিয়াছে। দুইটী যুবক সিগন্যালম্যানকে ধরিয়া থাকে, তৃতীয় যুবক মাইন পাতে। যখন সৈন্যরা আসিয়া পড়িল তখন ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী বাড়ীগুলির ছাদ হইতে তাহাদের উপর গুলি বৃষ্টি হইয়াছিল। ডাবলিনের সকল স্থান হইতে মাইন ফাটার শব্দ শুনা গিয়াছিল। সহরের উত্তরাঞ্চলের বাড়ীগুলা কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। যখন ক্যাবিনটি উড়িয়া যায়, তখন তাহার কাছ দিয়া একখানি যাত্রী ট্রেণ যাইতেছিল। ক্যাবিনের ভগ্ন খণ্ডগুলা সজোরে আসিয়া গাড়ীগুলার জানালা ভাঙ্গিয়া দিয়া যায়। ১৫টি যুবতী, দুইটা সৈন্য ও কতকগুলি যাত্রী আহত হইয়াছে। লর্ড মিডলটনের ভগিনী মিস এ্যালবিনিয়া ব্রডরিক বিদ্রোহীর দলে মিশিয়াছেন। তিনি সাইকেলে চড়িয়া যাইতেছিলেন, সরকার পক্ষের লোকেরা তাঁহাকে থামিতে বলে, তিনি থামেন নাই, তাই তাঁকে গুলি করিয়া খোঁড়া করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

মিঃ ডি ভ্যালেরা যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য যে হুকুম দিয়াছেন, তদনুসারে ৩০শে এপ্রেল দুপুর হইতে যুদ্ধ বন্ধ হইবে। কিন্তু বিদ্রোহীরা যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেও ফ্রীষ্টেট গবর্ণমেণ্টও যে যুদ্ধে বিরত হইবেন, এমন কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। খুব সম্ভব গবর্ণমেণ্ট মিটমাটের কথাবার্ত্তা কহিবার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিবেন না। তাঁহারা বলিবেন, ডি ভ্যালেরার দল অস্ত্র ত্যাগ করিয়া ফ্রীষ্টেট গবর্ণমেণ্টের বশ্যতা স্বীকার করুক। মিঃ ডি ভ্যালেরা অগ্রসর হইয়া শান্তির প্রস্তাব করায় বুঝা যাইতেছে, বিদ্রোহের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই উত্তম সুযোগ উপস্থিত। এ সময়ে যদি মিটাইয়া ফেলা না হয়, তাহা হইলে দীর্ঘকাল অশান্তি ভোগ করিতে হইবে। ডাবলিনের অধিবাসীরা আশা করিতেছে যে, ফাঁড়াটা কাটিয়া গিয়াছে—এইবার দেশের অবস্থা শান্তির দিকে

ফিরিবে। এই সকল কথা ভাবিয়া শান্তির আশায় রাজনীতিকেরা ও জনসাধারণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। (নায়ক)

মিশরে ষড়যন্ত্র।—কাইরোর ৫ই এপ্রেল তারিখের সংবাদে প্রকাশ, সেখানে ১৫ জন মিশরীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনীত হইয়াছে। অভিযোগ,—গত ১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ঐ সকল আসামী বৃটিশ সৈন্য, সামরিক আদালতে বিচরাধীন মামলার সাক্ষী ও অন্যান্য ব্যক্তিকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। সামরিক আদালতে আসামীদের 'বিচার' চলিতেছে। আসামীরা বলিয়াছে, তাহারা অপরাধী নহে। আগামী ১৭ই এপ্রেল পর্য্যন্ত মামলা মুলতুবী আছে। (নোয়াখালি হিতৈষী)

ইংলণ্ডে নারীর জীবিকা।—ইংলণ্ডে মহিলারা নানারূপ ব্যবসা ও চাকুরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। মহিলারা যে কেবল ভদ্রজনোচিত ডাক্তারী এটর্নী বা পাদ্রীর কাজই করিয়া থাকেন, এমত নহে। যে সব কাজে "গতর খাটাইতে" হয় সেই সব কাজ দ্বারাও তাঁহারা জীবিকার সংস্থান করিয়া থাকেন। লণ্ডন সহরেই ৬ জন মেয়ে চিমনি তৈয়ার করেন, ২৮ জন স্ত্রীলোক শবাধার তৈয়ার করেন, ৭জন রিভেটের কাজ করেন, ৪ জন বৈতারিক বার্ত্তা আদান প্রদান দ্বারা টাকা রোজগার করেন। ইহা ছাড়া ডকের মজুর আছে ৩ জন। লণ্ডন সহরে মহিলারা অনেক উচ্চ পদেও নিযুক্ত আছেন। ১৬ জন মহিলা বিভিন্ন কোম্পানীর ডিরেক্টর। ৩৫১ জন ব্যবসায় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার, ১১ জন ব্যাঙ্কার এবং ২ জন কোম্পানীর দালাল। ৫০০ মহিলা নানা স্থানে ঘুরিয়া পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করেন, ৫০ জন নীলামওয়ালী। ৫ জন স্থপতি, ৯ জন উচ্চ শ্রেণীর রক্ষক এবং একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। (যুগবার্ত্তা)

সুইজারল্যাণ্ডের অবস্থা।—রূঢ় প্রদেশ ফরাসীরা দখল করায়, সুইজারল্যাণ্ডের আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ হীন হইতেছে। অল্পদিন মধ্যেই আবার ভীষণ শ্রমিকের কর্ম্মহীনতা উপস্থিত হইবে। রূঢ় হইতে যে কয়লা আসিতেছে না, সে জন্যই কেবল অসুবিধা নয়; লোহা, করোগেটের লোহা, পাত লোহা ইত্যাদি না আসায় দরুণ অসুবিধা অত্যন্ত বেশী হইয়াছে। সুইজারল্যাণ্ডের অর্ডারী ৬০০০ টন মাল রূঢ়ে পড়িয়া রহিয়াছে; ফলে সুইস বস্ত্র ব্যবসায় একেবারে বন্ধ। (হিন্দুরঞ্জিকা)

স্বাধীন শ্বেত মানব।—শ্রীযুক্ত ভাগবত সিং উচ্চবংশীয় পাঞ্জাবী হিন্দু,—পূর্ণ ভারতীয় রক্ত তাঁহার ধমনীতে প্রবাহিত। ওরেগণ জেলা আদালত তাঁহাকে মার্কিন নাগরিকের অধিকার দিয়াছিল। কিন্তু আমেরিকান সুপ্রিম আদালতের ফতোয়া বলে তিনি নাগরিক পদবাচ্য হইতে পারেন না, কারণ তিনি "স্বাধীন শ্বেত মানব" নহেন। (হিন্দুরঞ্জিকা)

মিশরী প্রেত।—লর্ড কার্ণারভণ মিশরের প্রাচীন রাজাদের সমাধি লাঞ্ছিত করিয়া মমি উঠাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক মেরী করেলী বলেন, এই মৃত্যুর সহিত প্রেতের সম্বন্ধ আছে। কোনান ডয়েল বলেন, কার্ণারভণের রোগের কারণ যে প্রেত-প্রভাব, তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্রিটিশ মিউজিয়মে একজন মিশর রাণীর মমি ছিল। যে কেহ তাহাকে স্পর্শ করিত তাহাকেই দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইত। যিনি এই মমি সোমালিল্যাণ্ড হইতে উদ্ধার করেন, তাঁহার অপঘাত মৃত্যু হয়। মমির বুকে লেখা থাকে যে, "যে আমাকে খুলিবে সে যেন শীঘ্র মরে, তার হাড় কখনারও যেন সমাধি না হয়।" এই ব্যাপার লইয়া প্রেততত্ত্ববিদমহলে বেশ হল্লা হইতেছে। (হিন্দুরঞ্জিকা)

জাপানের রাজনৈতিক দল।—বর্ত্তমান জাপানে তিন রাজনৈতিক দল। (১) সেউাই—যাহারা বর্ত্তমান মন্ত্রীসভাকে সমর্থন করে। (২) কেন সেকাই প্রধান প্রতিবাদী দল। (৩) কাকুশিন ক্লাব দ্বিতীয় প্রতিবাদী দল। সম্ভবতঃ শেষ দুইদল সম্মিলিত হইবে। সরকারের শক্তি নাই বলিয়া কাকুশিনদল বর্ত্তমানে সরকারকে দোষ দেয়। মন্ত্রিসভা সে আইন বলিয়া কেনসেকাইদল দল প্রতিবাদ করে, তাহারা মন্ত্রিদের বিশ্বাস করে না। ওয়াচি সেকি কেনসেকাইদলের নেতা। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে কেটো ক্যাবিনেট আমলাতন্ত্রের সভা সুযোগপ্রাপ্ত অভিজাতদের সভা মাত্র—এই সভার কোনও লোক জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন নয়। (হিন্দুরঞ্জিকা)

কোরিয়া ও ফিলিপাইন্‌স্।—আমেরিকা "জোন্‌স বিধিতে" যে স্বায়ত্বশাসনের অঙ্গীকার দিয়াছিল তাহা দাবী করিবার জন্য গত বছর ফিলিপাইন জাতি-নীতিমণ্ডলী যখন চেষ্টা করিয়াও তাহার সমর্থন পাইলেন না, তখন কতকগুলি রাজনীতিজ্ঞ মিলিয়া ভারতবর্ষের অসহযোগ নীতির অনুশীলন করিতে লাগিলেন। কোরিয়ার রাজধানী সেউল হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে বর্ত্তমানে কোরিয়ানরা অসহযোগ আন্দোলনের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। নানা আকারে এই আন্দোলন কোরিয়াতে দেখা দিয়াছে। কোরিয়ানরা সংকল্প করিয়াছে যে মাত্র কোরিয়ান প্রস্তুত দ্রব্য ভিন্ন তাহারা বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিবে না। এ সম্বন্ধে নানাস্থানে সভা সমিতি হইতেছে। প্রত্যহই স্বদেশী বস্ত্র ভূষিত কোরিয়ানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। (হিন্দুরঞ্জিকা)

ফরমোজার দাবী।—ফরমোজা দ্বীপ জাপানের অধিকার-ভুক্ত। সম্প্রতি ফরমোজা অধিবাসীগণ জাপান সরকারকে জানাইয়াছে যে আমাদের দেশের জন্য পার্লামেণ্ট চাই। ৩১ লক্ষ লোক এক প্রতিনিধি দিয়া শাসন করা যুক্তিসঙ্গত নয়। আরও জাপানের রীতি-নীতির সহিত ফরমোজানদের রীতিনীতির মিল নাই বলিয়া ইহার প্রয়োজন আরও বেশী। ফরমোজা অধিকার না পাওয়া পর্য্যন্ত লড়াই করিবে। (হিন্দুরঞ্জিকা)

উল্টো স্রোত

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম-এ,

(১)

জীবনের এই ত্রিশটা বছরের প্রথম ষোল সতের বছর বাদ দিয়ে বাঁকি সময় কি করে কাটিয়েছি—তার যদি হিসেব-নিকেশ করতে বসি, তা হ'লে মনে হয় ঠিক সাধারণ লোকের মতই আমার এ দিনগুলো কাটেনি। তাই যদি কাটবে—তবে বাড়ী-ঘর ছেড়ে আজ ভবঘুরে বৃত্তি অবলম্বন করবো কেন? ভগবান আমাকে অশেষ দাগা দিয়ে ঘরছাড়া করেছেন;—কিন্তু যে শাস্তি আমি পেয়েছি, আমার মত অনেক পুরুষেরই যে তাই পাওয়া উচিত—এ কথা আমি জোর করেই বল্‌তে পারি। যাক্—পর-চর্চ্চা ছেড়ে দিয়ে নিজের কথাই আজ বল্‌তে চলেছি।

সাধারণ পুরুষজাতির ম ছোটবেলা থেকেই আমি স্বার্থপর হয়ে উঠেছিলুম। সোনা না হোক রূপোর চাম্‌চে মুখে করে যে জন্মেছিলুম, এ কথা কারও অস্বীকার করবার উপায় ছিল না। আমি ছিলুম পিতামাতার একমাত্র পুত্র। তিনটি কন্যার পর যখন আমি জন্ম নিলুম—তখন তাঁদের আহ্লাদের আর সীমা পরিসীমা রইলো না। আমার বোনদের যে পরিমাণে আদর-যত্ন হ'তো—আমার তার চেয়ে যে অনেকগুণ অধিক হয়েছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য। আমাদের ভাই-বোনদের মধ্যে এই রকম ব্যবহারের পার্থক্য দেখে, প্রথম থেকেই এই ধারণা মনে বদ্ধমূল হয়েছিল—পুরুষ ও নারীর মধ্যে প্রভেদ অনেকখানি। তখনই বুকের পরতে পরতে আঁকা হয়ে গিয়েছিল—আমরা শুধু হুকুম করবো, আর ওরা তাই অম্লানবদনে পালন করে যাবে।

ছোটবেলায় দেখতুম—আমাদেরই ঠিক সাম্‌নের বাড়ীতে একজন তার কচি বৌটিকে এম্‌নি করে মারতো যে, সে বেচারী অনেক চেষ্টা করেও ক্রন্দনের বেগ রোধ করতে পারতো না। মাঝে মাঝে তার অস্ফুট আর্ত্তনাদের মৃদুধ্বনি তাদের বাড়ীর দেওয়াল ভেদ করে আমাদের কাণে এসে পৌঁছতো। বউটির দুঃখে সহানুভূতিতে আমার বোনদের চোখে জল টল্‌টল্ করে উঠ্‌তে দেখেছি;—কিন্তু তাই দেখে আমি মনে মনে ভারি আমোদ উপভোগ কর্‌তুম। পাশের বাড়ীর সেই লোকটি ছিল মাতাল। সে গভীর রাত্রে বাড়ী ফিরে স্ত্রীর উপর পাশবিক অত্যাচার সুরু করলে—প্রহারের শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে যেতো—আমি আমার ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে ঠিক সম্মুখে তাদেরই ঘরের খোলা জানলার ভিতর দিয়ে সেই অভিনয় দেখতুম। বউটি আমাকে দেখ্‌তে পেয়ে ব্যাকুলভাবে তার স্বামীকে বল্‌তো—"ওগো, জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে—।" সেই গুণধর স্বামী দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বিশ্রী কটূক্তি করে বল্‌তো—"ওঃ, লজ্জা দেখে মরে যাই চাঁদ! এখন তো ঘরে বসে ঠুক্‌ছি—আর দুদিন পর যখন রাস্তার লোকের সাম্‌নে লাথি মারবো, তখন—।" আমার সেই লোকটির বীরত্ব দেখে কি হাসিই যে পেতো!

যাঁদের আদরে ছোটবেলা থেকেই আমার মাথা বিগড়িয়েছিল—তাঁরা যে তাঁদের আদরের দুলালকে খুব বেশীদিন আহ্লাদ দিতে পেরেছিলেন, তা নয়;—কিন্তু যে মাত্রায় ধন-দৌলত, গাড়ী-মোটর রেখে ইহধাম ত্যাগ করেছিলেন—তাতে মাথা ঠিক করে চল্‌বার মত অবস্থা আমার মোটেই ছিল না।

বাপমার মৃত্যুর পর আমার অভিভাবিকা হলেন—আমার এক দূর-সম্পর্কীয়া পিসিমা। এঁর অভিভাকত্বের প্রথম স্মরণীয় ঘটনা—আমার স্কুল থেকে বিদায় নেওয়া। আমি কোন দিনই ও জিনিসটাকে ধরে ছিলুম না, বরং ওটাই আমাকে ধরে ছিল। বাপমায়ের বোধ করি ইচ্ছা ছিল—এণ্ট্রান্সটা পাশ করি। তাই বলে, আমাকে ফোর্থ ক্লাসেই বছর চার পাঁচ দেখে তাঁরা যে কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন—এমন অপবাদ তাঁদের বোধ করি অতি বড় শত্রুও দিতে পারতো না।

স্কুল কেন ছাড়লুম—সে কথাটা সংক্ষেপে বলি। দু' একবার নয় চার চার-বারে একই ক্লাসে থাকা সত্ত্বেও যখন

সেবারও প্রমোশন পেলুম না, উপরন্তু হেডমাষ্টার অতগুলো ছেলের সাম্‌নে ব্যঙ্গ করে বল্‌লেন—"কি হে ছোক্‌রা, আর কতদিন এম্‌নি করে জাব কাটবে শুনি? তোমার ক্লাশফ্রেণ্ডরা যে কলেজে পড়ছে।" তাঁর কথা শুনে লজ্জা হওয়া দূরে থাক্‌—রাগে আমার সমস্ত মুখ লাল হয়ে উঠ্‌লো। এ পাশ ওপাশ চেয়ে দেখি আমার সঙ্গী ছাত্রগুলো আমার দুর্দ্দশা দেখে মুখ টিপে টিপে হাস্‌ছে। আমি তখনই রাগে গম্‌গম্‌ করতে করতে বাড়ী ফিরে এসে পিসিমাকে সব কথা খুলে বল্লুম। পিসিমা মাইনের মাষ্টারের এক বড় আস্পর্দ্ধা দেখে বল্‌লেন। "এ কি ছোট লোকের ছেলে যে পড়াশুনা করে টাকা রোজগার করতে হবে? আর তোকে কক্‌খনো আমি পড়তে দেবো না বিমল। ইস্কুলে ঐসব ছোটলোকদের সঙ্গে মিশে যে বয়ে যাবি—এ আমি চোখে দেখ্‌তে পারবো না।" ব্যস্‌—আমার বিদ্যার্জ্জন পর্ব্বের এইখানেই পরিসমাপ্তি—আর জীবন-নাট্যের দ্বিতীয় ও বিচিত্র অধ্যায় এইখান থেকেই আরম্ভ।

(২)

যে সময় চোখের সামনে সমস্ত জগৎটাই রঙ্গিন হয়ে ফুটে ওঠে—এ আমার সেই বয়স। সাধারণ লোকের চেয়ে এই রঙ্গিন নেশা যে আমার আরও বিচিত্র রঙ্গে দেখা দিবে—এর আর আশ্চর্য্য কি? ছোটবেলা থেকেই নারীজাতিকে হীন ভাবেই দেখে এসেছি,—তাই এই সময় যখন সমস্ত শিরায় উপশিরায় যৌবনের উষ্ণ রক্ত চঞ্চল ভাবে ছুটে বেড়াচ্ছিল—তখনও তাদের ভোগের বস্তু ছাড়া অন্য ভাবে দেখ্‌তে পারিনি। তখন থেকেই মনে মনে এঁচে রাখ্‌ছিলুম—শুধু একটা নিয়েই আমার পোষাবে না। সেকালের নবাব-বাদশার মত আমার অন্তঃপুর নানা রকমের সুন্দরী রমণী দিয়ে পূর্ণ করে রাখ্‌তে হবে—তাদের নূপুর কঙ্কণের রুণুঝুণু শব্দে আমার সমস্ত প্রাসাদ মুখর হয়ে থাকবে। পিসিমাই যে আমার এই কল্পনার হেতু—তাতে আর ভুল ছিল না। যে পুরুষ একটা বিয়ে করেই ক্ষান্ত হয়—সে যে নিতান্তই অপদার্থ ও পুরুষত্বহীন, এমন যুক্তি তাঁর মুখে অনেকবার শুনেছি। আমি যখন হেসে বল্‌তুম—'আমি কিন্তু একটা বিয়ে করেই ছাড়ছি নে'—তখন তাঁর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। তিনি উৎসাহের সাথে বল্‌তেন—"এই তো মরদের মত কথা।"

কিন্তু কথা আমার যেমনই হোক—কাজে যে তার কিছুই হয় নি, সেই কথাই আজ বলছি।—ভগবান আমার এই অহঙ্কার দেখে নিশ্চয়ই মনে মনে খুব হেসেছিলেন—নইলে যাদের আমি নিতান্তই তুচ্ছ বলে ভেবে এসেছি, তাদেরই দিয়ে আমার সমস্ত অহঙ্কার চূর্ণবিচূর্ণ করে আমাকে ধূলির চেয়েও হীন করে দেবেন কেন?

এই সময় আমার বিয়ের জন্য পিসিমা একেবারে তাল ঠুকে লেগে গেলেন। কিন্তু আমার মন শুধু যে ভাবী শ্বশুরের অন্দর-মহলেই উঁকি মারতো, তা নয়—আরও অনেক বাড়ীর কক্ষে কক্ষে ছুটে যেতে চাইত। কিন্তু সত্যিসত্যিই যে আমার কল্পনাকে রূপ দিয়েছিল—সে একটি চোদ্দ-পনরো বছরের বালিকা। এরা থাক্‌তো—আমাদের বাড়ী থেকে খান দুই তিন বাড়ীর পর—রাস্তার ওপারে।—বেলা ১০টার সময় মেয়ে-স্কুলের গাড়ীতে চড়ে সে স্কুলে যেত—আর পাঁচটায় ফিরে আস্‌ত। এই সময় ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকা আমার নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিকেলবেলা সে বই হাতে করে ছাদে উঠে পায়চারি করতো, আর নিজের মনে বই পড়ে যেতো;—আমার প্রলুব্ধ দৃষ্টি তাকে কোনও দিনই সঙ্কুচিত, ম্লান করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। এই কৌতূহলহীনা বালিকাটির আমাকে ভ্রূক্ষেপ নাই দেখে আমার গা রাগে রি-রি করে উঠতো—ইচ্ছা হ'তো যদি আমাদের দুই বাড়ীর ছাদে ঝুলানো সেতু বা অম্‌নি একটা কিছু থাক্‌তো—তা হলে এক্ষুণি ওর কাছে গিয়ে দুলানো চুলের বেণী ধরে সজোরে নাড়া দিয়ে বলতুম—"ওগো, মেয়ে-মানুষের এত অহঙ্কার ভাল নয়!" কিন্তু সত্যিই সে রকম উপায় যখন ছিল না—তখন বাধ্য হয়েই চুপ করে থাক্‌তে হ'লো,—কিন্তু তার উপর রাগ করেও তাকে দেখ্‌বার লোভ ছাড়তে আমি পারিনি।

একদিন বিকেলে হাঁ করে ঐ বাড়ীর ছাদের দিকে চেয়ে আছি—এমন সময় পিছন থেকে পিসিমা হেসে বল্‌লেন—"ওই ছুঁড়িটাকে মনে ধরেছে বুঝি বিমল? তাই তো বলি, বিমলের আমার নিত্যি ছাদে ওঠা কেন! ওমা যে আমার সোনারচাঁদকে ধরবার জন্য এমন টোপ ফেলে রেখেছে—তাতো জানতুম না। যাক্‌, মনে যদি ধরেই থাকে, বল্লেই তো হয় বাপু—এখুনি সম্বন্ধ কচ্চে ফেলি।"

তাঁর কথায় অবশ্য একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিলুম—তবু হেসে বল্লুম—"তা মন্দ হয় না পিসিমা।"

কয়দিন পরে পিসিমা বল্লেন—"ওরা সম্মত হয়েছে বিমল—তুই একবার মেয়েটাকে দেখে আয়।" আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলুম–ওকে বিয়ে করে এনে আমার প্রতি অবহেলার শোধ যে কি করে নিতে হবে—মনে মনে তার একটা খসড়া প্রস্তুতও হয়ে গেল। সেদিন বিকেল-বেলা ছাদে উঠেই দেখলুম—মেয়েটির হাতে বই থাকা সত্বেও সেদিকে তার ততটা খেয়াল ছিল না, যতটা ছিল আমাদের বাড়ীর ছাদের দিকে। সেদিন সে মাঝে-মাঝে আমার দিকে চাইতে লাগ্‌লো। মনে মনে ঠিক করে নিলুম—এ নিশ্চয় প্রেমে পড়ার লক্ষণ! আমিও সুবিধা বুঝে তার দিকে চেয়ে মুচকি হাসি, নানা রকমের ইসারা আরম্ভ করে দিলুম। কিন্তু আমার এই রকম দেখে, তার মুখের ভাব যে খুব প্রসন্ন হয়ে উঠলো, তা মনে হ'লো না। হঠাৎ একটা খেয়াল মাথায় এলো—একখানি চিঠি লিখে ওদের ছাদে ফেলে দিলে ত বেশ হয়। যেদিন যে খেয়াল মাথায় এসেছে—তাই অম্লানবদনে করেছি, তা সে যেমনটাই হোক; খেয়াল দমন করতে কোনও দিনই শিখিনি—আজও পারলুম না। নীচে নেমে এসে ছাই-পাঁশ লিখে—ছাদ থেকে ছুড়ে ওদের ছাদে ফেলে দিলুম। সে চিঠিটা কুড়িয়ে নিল কি না জানি না—তবে সে যে ছাদ থেকে নেমে গেল, এটা বুঝলুম।—সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চিঠির উত্তরের প্রত্যাশায় ছাদে ঘুরে ঘুরে শেষটায় ক্লান্ত হয়ে নেমে এলুম।

পরদিন পিসিমা বল্‌লেন—"দুটো বন্ধুবান্ধব নিয়ে মেয়েটাকে দেখে আয় বিমল! ওরা আজ যেতে বলেছে যে।" পিসিমার কথায় মনে খুবই আহ্লাদ হয়েছিল—কিন্তু মুখে বল্লুম—"থাক্ পিসিমা—আমি আর যেতে চাইনে।"

পিসিমা বল্লেন—"তা কি হয় রে? আজকালকার দিনে নিজে দেখেশুনেই বিয়ে করা ভাল বাপু! বেশ করে বাজিয়ে নিবি, বুঝ্‌লি বিমল?"

ভাবলুম—বাজানো আমার হয়ে গ্যাছে পিসিমা—কিন্তু মুখে বল্‌লুম—"তা নিতে হবে বৈকি!" হায় রে আমার কপাল! তখন যদি জান্‌তাম যে বাজিয়ে নেবে, তার মূল্য বাজারে কতখানি! কিন্তু—থাক সে কথা।

বিকেলবেলা ঘণ্টাদুই ধরে সাজ করে—কয়েকজন, বন্ধু নিয়ে খুব উৎসাহের সাথে কনে দেখ্‌তে গেলুম। আদর-যত্নের কোনও ক্রটিই হ'লো না। জলযোগের পর কনে দেখানোর কথা উঠ্‌লে—কনের এক দাদা অন্দর থেকে ঘুরে এসে বল্‌লেন—"আমরা শুধু বরকে কনে দেখাবো—আর কেউ সেখানে থাক্‌তে পারবেন না।" আমরা সবাই এমন অদ্ভুত প্রস্তাবে রাগে অধীর হয়ে উঠ্‌লুম—কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা কন্যার দাদা তাতে একটুকুও ভয় পেলেন না। তিনি বল্‌লেন—"বেশ, তা যদি না হয়, আপনারা পথ দেখুন। কনে দেখ্‌বার দরকার নেই।" তাঁর কথা শুনে আমার ও বন্ধুদের মধ্যে চোখের ইসারা হয়ে গেল। ভাবটা এই, এখন তো কাজ উদ্ধার হোক, তারপর বিয়েটা হয়ে গেলে এর শোধ তোলা যাবে।

আমি বল্লুম—"বেশ, আমি একাই দেখ্‌বো।" তিনি তখন মুচ্‌কি হেসে আদর করে আমাকে অন্য একটা ঘরে বসিয়ে রেখে চলে গেলেন।—মিনিট পাঁচেক পর ফিরে এসে বল্লেন—"আমায় মাফ করবেন বিমলবাবু—আমার বোনটি কিছুতেই আপনার সম্মুখে আসতে রাজি হ'লো না। তবে সে এই চিঠিখানি পাঠিয়েছে—লজ্জা করবেন না, পড়ে দেখুন।" আমি অতিমাত্রায় আগ্রহের সাথে চিঠিখানি হাতে নিলুম—তখন বুঝিনি আমারই সেই ছুড়ে ফেলা চিঠি আবার আমারই হাতে ফিরে এসেছে। চিঠি খুলেই তো চক্ষুস্থির! দেখি, তাতে আমারই লেখা কয়েকটি শব্দের ওপর কালির আঁচড় রয়েছে—আর চিঠির মাথার উপর লালকালি দিয়ে লেখা—"নারীর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন বর্ব্বরতা ও কাপুরুষতার পরিচায়ক!' বুকটা যদিও ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগ্‌লো—তবু রাগের ভাব দেখিয়ে বল্লুম—"এ সব কি?"

তিনি হেসে বল্লেন—"ও বিশেষ কিছু নয়। বোনটি কিছু লেখাপড়া জানে কি না—তাই আপনার চিঠিতে ভুলভ্রান্তি সংশোধন করে মন্তব্য লিখে দিয়েছে।" তাঁর এই বিদ্রূপভরা সোজা কথা ঠিক আগুনের গোলার মতই বুকে এসে বাজলো। ক্রোধে অধীর হয়ে চিঠিখানি খণ্ড-খণ্ড করে ছিঁড়ে ফেলে বল্লুম—"ভদ্রলোকদের ডেকে এনে এমন অপমান।" কিছুমাত্র অধীরতা প্রকাশ না করেই তিনি বল্‌লেন—"আমাদের সাধ্য কি যে আপনাদের মত মহৎ ব্যক্তির অপমান করতে পারি।"

বল্লুম—"তবে কেন অনর্থক নিয়ে এসে—" বাধা দিয়ে তেম্নি ধীর ভাবেই তিনি বল্লেন—"শুধু একটু মিষ্টি-মুখ করানোর জন্য, আর কিছু নয়।" যাক্—ব্যাপার সুবিধা নয় দেখে সেখান থেকে বেরিয়ে এলুম। বন্ধুরা বল্লে—"কি রকম দেখ্‌লি বিমল?" আমি মুখ যথাসম্ভব গম্ভীর করে বল্লুম—"যাচ্ছেতাই।" তারা কি যেন সব ঠাট্টা-বিদ্রূপ আরম্ভ করতেই—তাদের এম্‌নি ধমক দিলুম যে, তারা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যে যার মত সরে পড়লো।

পিসিমার কাছে সব কথাই খুলে বল্‌তে হলো।—তিনি সব শুনে গালের চোটে ওদের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে তবে ছাড়লেন। কিন্তু তাতে যে তাদের কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পেরেছেন, তার পরিচয় কিছুই পাওয়া গেল না। যাক্—এরই দিন পনরো পর ওদের বাড়ীতে লোকজনের সমাগম ও রসুন-চৌকির আলাপে সরগরম হয়ে উঠ্‌লো। শুনলুম—কোন্ এক প্রফেসারের সঙ্গে সেই মেয়েটির আজ বিয়ে! সে রাত্রে আমি চোখের দুপাতা এক করতে পারিনি;—রাগ ও হিংসার জ্বালায় আমার সারাদেহে যেন আগুনের হল্‌কা ছুটছিলো! একটা তুচ্ছ বালিকার কাছে আমাকে এম্‌নি ভাবে পরাজিত হ'তে হবে—এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে!

(৩)

সেই থেকে ছাদে ওঠা বন্ধ হ'লো বটে—কিন্তু আর যে সব কাণ্ড করতে আরম্ভ করলুম—তাতে আমার সুনাম চারিদিকে প্রচার হতে বেশী দেরী হ'লো না। বন্ধুবান্ধবের আমার কোনও কালেই অভাব ছিল না;—কিন্তু এখন যারা সেই দলে ভুক্ত হলেন—তাঁদের জীবনের প্রধান অবলম্বন ছিল সুরা আর নারী। এই দলে মিশে আমি দিব্যি অক্লেশে ধাপের পর ধাপ নাম্‌তে লাগ্‌লুম।

পিসিমাও এবার বোধ করি আমার ভাব দেখে ভড়কে গিয়েছিলেন। আমার বদ্‌খেয়ালের মাত্রা ক্রমশঃ চড়েছে দেখে তিনি একদিন বল্লেন—"দেখ্ বিমল, ও সব নেশা টেশা পুরুষ-মানুষদের এক-আধটু করতে হয়—এ কথা জানি। কিন্তু একটু বুঝে-সুঝে করিস্ বাবা। আর সারা রাত্তির কি বাইরে বাইরে থাকাটা ভাল। ওতে শরীর খারাপ হয় যে!" শুধু এইটুকু বলেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না,—আরও জানালেন তিনি শিগ্‌গিরই এবার আমার বিয়ে না দিয়ে ছাড়বেন না।

তিনি তো বল্‌লেন—ছাড়বেন না,—কিন্তু মেয়ের বাপগুলো যে একজোট হয়ে আমাকে বয়কট করতে আরম্ভ করেছেন—এ কথাও বোধ করি তিনি মনে মনে ঠিক পেয়েছিলেন।—আমি ভাবি—এত বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার বাঙ্গালীর ঘরে কি করে সম্ভবপর হ'লো। সমাজতত্ত্ব নিয়ে কোনও দিনই মাথা ঘামাই নি;—কিন্তু শিশুকাল থেকে এই অতিবড় সত্যটা চোখের সাম্‌নে আপনি ফুটে উঠেছিল—এ সমাজে কোনও পুরুষেরই স্ত্রী জুটতে বাধে না, তা সে যেমন গুণধরই হোক। শুধু একটা জিনিসের প্রতি সমাজের লোভটা প্রবল দেখে এসেছি—সেটি হচ্ছে অর্থ। যশ, বিদ্যা ও বংশমর্য্যাদাকে আমল না দিয়ে এই অর্থের যূপকাঠে অনেক মেয়েকেই বলি দিতে দেখেছি। দৃষ্টান্তের জন্য বাইরে যেতে হবে না। আমার তিনটি বোনের দুইটির বিয়ে দেওয়া হয় ধন দেখে। প্রথমটি বছর বছর সন্তান প্রসব ও সেই সঙ্গে স্বামীর অত্যাচার সহ্য করে আজ কয়েক বছর হলো অব্যাহতি পেয়েছে,—আর দ্বিতীয়টিও গর্ভবতী হবার পর স্বামীর পদাঘাত সহ্য করতে না পেরে দিদির অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছে। তৃতীয়টির জন্য বোধ করি বাবা ধনীর সন্তান খুঁজে পাননি,—তাই বাধ্য হয়েই তাকে একটু লেখা-পড়াজানা স্বামীর হাতেই সঁপে দেওয়া হয়। তার খবর অবশ্য অনেকদিন নিইনি—তবে শুনেছি সে নাকি সুখেই আছে।

যাক্—অর্থের অপ্রতুল আমার ছিল না—কিন্তু আমারই ভাগ্যে কেন যে উল্টোস্রোত বইতে আরম্ভ করেছিল, বুঝ্‌লুম না। অবশ্য এ বিষয় নিয়ে খুব যে বুঝবার চেষ্টা করেছিলুম, তা নয়;—কেন না বাইরের নেশা আমাকে এম্‌নি উন্মত্ত করে রেখেছিল যে, এই সব ছোটখাট কথা ভাববার আমার সময়ই হয় নি।

কিছুদিন পর পিসিমা আবার বল্লেন—"আজ একবার কনে দেখ্‌তে, যেতে হবে বিমল।" আমি হেসে বল্লুম—"আবার?"

পিসিমা বল্লেন—"এরা তেমন নয় রে—খুব ভদ্রলোক। মেয়েটিও শুনেছি খুব বুদ্ধিমতী।"

মেয়েটি যে বুদ্ধিমতী, এ অবশ্য আমিও পরে ঠিক পেয়ে-ছিলুম;—কিন্তু কেমন করে, তাই বলছি। যথাসময়ে বন্ধুবান্ধব নিয়ে কনে দেখ্‌তে গেলুম। কনেও

আমাদের সমুখে আনা হ'লো। তাকে আমার অপছন্দ করবার মত কিছুই ছিল না ; —কিন্তু সেই যে আমাকে অপছন্দ করে বস্‌বে, এ কথা আমি মনেও ঠাঁই দিতে পারি নি।—

রূপ-দেখা-পর্ব্ব শেষ হলে আমরা তার হাতের লেখা দেখ্‌তে চাইলুম। আমার এক বন্ধু পকেট থেকে কাগজ-পেন্সিল বের করে আমার হাতে দিয়ে বল্‌লো—"তুই একটা নাম লিখে দে—তার নীচে ইনি নাম লিখ্‌বেন।" বন্ধুর উদ্দেশ্য এই উপলক্ষ্যে কিছু মজা করা।—আমি খুব আনন্দের সাথেই আমার নামটি লিখে বালিকাটির হাতে দিলুম। সে কাগজখানি হাতে নিয়ে ফিক্ করে একটু হেসে সেটা তার এক আত্মীয়কে দেখালে—তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমরা ভাবলুম বোধ করি আমাদের সামনে লিখ্‌তে লজ্জা করছে বলেই অন্য ঘরে লিখতে গেল ; কিন্তু ব্যাপারটা অত সোজা হলে তো কোনই গোল ছিল না। মিনিট কয়েক পর,—একজন সেই কাগজখানি নিয়ে এসে ফিরিয়ে দিয়ে বল্লেন—"ও নাম লিখ্‌লো না। বলল—যে নিজের নাম লিখ্‌তে গিয়ে তিনটি ভুল করে বসে, তাকে ও বিয়ে করতে পারবে না।" এরপর অবশ্য কোনও কথা বলবার ছিল না ;—তবু রেগে বল্লুম—"মেয়েমানুষের এত স্পর্দ্ধা।"

ভদ্রলোকটি বিরক্ত হয়ে বল্‌লেন—"এ তো স্পর্দ্ধা অহঙ্কারের কথা নয়—যা সত্য সে কথা বল্‌তে সঙ্কোচ করাই ভীরুতা। আমাদের বাড়ীর মেয়েদের এত হীন শিক্ষা নয় যে সত্য কথা বল্‌তে পিছোবে।" যাক্, অপমানের বোঝা নিয়ে, মুখটি হাঁড়ির মত করে এবারও বাড়ী ফিরতে হলো ; পিসিমা এদেরও চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করলেন। আমারও আবার সে রাত্রিতে রাগের জালায় ঘুম হ'লো না।

কিন্তু সত্যিকারের মর্য্যাদা-বোধ বলে যদি কোনও জিনিস মনে আমার থাকতো—তাহ'লে এইখানেই ক্ষান্ত হয়ে জীবনের ধারা অন্যদিকে ফিরানোর চেষ্টা করতুম। কিন্তু ভাগ্যে যার অশেষ দুঃখ—সে এত অল্পে রেহাই পেলে যে ভগবানের নিয়মকানুন সবই উল্টে যেতো।

মানুষের দেওয়া ভগবানের অনেকগুলো নাম আছে জানি ;—আর কোনও নামের সঙ্গে তাঁর কতদূর সামঞ্জস্য আছে জানিনে ;—কিন্তু তিনি যে দর্পহারী, এ কথা আমি আমার জীবনের কয়েকটা বছরের অভিজ্ঞতায় হাড়ে-হাড়ে বুঝেছি। নইলে বাঙ্গালী ঘরের মেয়ে,—যাদের মুখটি বুজে সব সহ্য করবার ক্ষমতা দেশবিশ্রুত—তারাই আমার বেলায় এমন মুখর হয়ে উঠ্‌বে কেন ?

এর পর আমার অধঃপতনের মাত্রা ও সেই সঙ্গে অপমানের হিসাব যদি দিতে বসি—তা হলে এ কাহিনী শেষ করা কঠিন হয়ে উঠ্‌বে ;—তার আর কাজ নেই। এইবার কিসে আমার মনের গতি উল্টোমুখে বইতে আরম্ভ করলো, সেই কথাটাই বল্‌ছি।

পিসিমা যখন ডজন দুই তিন ঘটক-ঘটকী লাগিয়েও কিছু সুবিধে করে উঠতে পারলেন না—তখন বাস্তবিকই একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি একদিন আমাকে বল্‌লেন—"কাল আমি বেনীপুর যাচ্ছি।" বেনীপুর তাঁর শ্বশুরবাড়ী। সেখানে তাঁর শ্বশুরকুলের কেউ নাই—এ কথা আমি শুনেছিলুম। হঠাৎ শ্বশুরের ভিটার প্রতি এই অহেতুকী আকর্ষণ দেখে হেসে বল্লুম—"হঠাৎ বনবাসে যাবার সাধ যে তোমার ?" পিসিমা কিন্তু গম্ভীর হয়ে রইলেন—কোনও উত্তর দিলেন না। বল্লুম—"যাবে যাও—কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরো পিসি-মা।"

তিনি উদাসভাবে বল্লেন—"ভগবান যদি দিন দেন, তবেই আবার ফিরবো।"

পিসিমা যে কিছুদিন হ'লো বিমর্ষ ও সেই সঙ্গে সঙ্গে খিট্‌খিটে হতে আরম্ভ করেছিলেন—এ আমি ঠিক পেয়েছিলুম। তাই তাঁর কথার আর কোনও উত্তর দিলুম না। তিনি সত্যসত্যই পরদিন বেনীপুর চলে গেলেন।

এর দিন-পনরো পর আমি নৈশ-ভ্রমণ শেষ করে যখন বাড়ী ফিরি, তখন রাত্রি বোধ হয় এগারো কি সাড়ে এগারোটা। দেখলুম—পিসিমা এসেছেন। লক্ষ্য করে দেখলুম—তাঁর মুখের হাসিটুকুও ফিরে এসেছে। ভাবলুম—এটা বোধ করি হাওয়া-পরিবর্ত্তনের ফল। কিন্তু এর সত্যি কারণ যে কি, তা ঠিক পেতে বেশী দেরী হ'লো না। তিনি বল্লেন—"এবার তোর জন্যে একটা জিনিষ নিয়ে এসেছি বিমল !" মনে করলুম—পিসিমার শ্বশুরের দেশের কোনও এক বিশেষ রকমের খাদ্যটাদ্য বা তেমনি আর কিছু তাঁর স্নেহের ভাইপোটির জন্য নিয়ে এসেছেন। আমার এই ভুল ভাঙ্গলো, যখন তিনি বেরিয়ে গিয়ে একটী তেরো চোদ্দ বছরের তরুণীর হাত ধরে আবার সেই ঘরে প্রবেশ করলেন।

বালিকার দুধে আল্‌তা রং। তার ঘুমে জড়ানো মুখের অপূর্ব্ব শ্রী আমার মদিরা-বিভল চোখে কত মধুর লাগ্‌লো, তা আমি বুঝিয়ে উঠ্‌তে পারবো না।

পিসিমা তাকে বল্লেন—"বিমলকে প্রণাম কর যুথি।" যুথিকা অগ্রসর হয়ে আমার পায়ের কাছে মাথা হেট করেই দুপা পিছিয়ে নাকে-মুখে কাপড় দিয়ে বলে উঠ্‌লো—"উঃ—কি বিচ্ছিরি গন্ধ!" তার এই সোজা স্পষ্ট কথায় আমি যেমন কেমন হয়ে গেলুম—পিসিমার মুখও গম্ভীর হয়ে উঠ্‌লো। তিনি বল্লেন—"ও এসেন্সেরই গন্ধ!"

বালিকা বলে উঠ্‌লো—"হুঁ, এসেন্স না আরও কিছু। এসেন্সের গন্ধে বুঝি বমি আসে?" এ কথার আর উত্তর দেওয়া চলে না। পিসিমা বালিকাটির উদ্ধত ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে তার হাত ধরে সজোরে টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আমিও শয্যায় আশ্রয় নিলুম;—কিন্তু মদিরার আবেশেও সেদিন অনেকক্ষণ আমার চোখে ঘুম এলো না—শুধু যুথিকার মুখই আমার চোখের সামনে ভেসে বেড়াতে লাগ্‌লো।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙ্গলো—তখন বেলা আটটা কি নয়টা। ঘুম ভাঙ্গতেই চোখে পড়লো—যুথিকা এক পেয়ালা চা নিয়ে দাঁড়িয়ে। আমাকে উঠ্‌তে দেখেই সে টিপয়ের উপর পেয়ালাটি রেখে বল্‌লো—"চা থাক্‌লো",—তার পর বেরিয়ে গেল। মনে ভাবলুম—এটাও পিসিমার কীর্ত্তি।

পিসিমা যে কি উদ্দেশ্যে এই প্রাণীটিকে এ বাড়ীতে এনেছেন—এ যে আমি না বুঝেছিলুম তা নয়—তবু জিজ্ঞেস করলুম—"এ কে পিসিমা?" পিসিমা পরিচয় দিলেন—যুথিকা তাঁর কোন দূরসম্পর্কীয় দেবরের মেয়ে। মেয়েটির বাপ মা কেউ না থাকায় তিনি সাথে করে এখানে এনেছেন। তাঁর মনের গূঢ় উদ্দেশ্যটাও আমাকে জানিয়ে বল্লেন—"পাড়াগাঁয়ের মেয়ে কি না, তাই ওর ধরণধারণ, কথাবার্ত্তা সবই একটু জঙ্গলি গোছের। বিয়েটা হয়ে গেলে এই সহরের হাওয়াতে ও একেবারে বদলে যাবে—এ আমি বলে দিচ্ছি বিমল!"

মনে মনে ভাবলুম—তা হোক পাড়াগেঁয়ে। আমি দুদিনেই তালিম দিয়ে ঠিক করে নেবো। বাইরে আমার আমোদের অভাব ছিল না—এবার ঘরেও যে নেহাৎ এক-ঘেয়ে ভাবে কাটবে না—এই কথা মনে করে মনটি আহ্লাদে নেচে উঠ্‌লো।

পিসিমার ইচ্ছা যুথিকা সব সময়ই আমার কাছে কাছে থাকে;—কিন্তু সে যে আমাকে এড়িয়ে চল্‌তে চায়, এ আমি প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলুম। ভাবলুম—যতই না কেন পালিয়ে বেড়াও—তোমাকে আমার হাতেই পড়তে হবে। এ যে বিধাতার লিখন!

ঘরের আকর্ষণে বাইরের টান শিথিল হতে দেখে বন্ধুরা আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লো—"ঘর ছেড়ে আজকাল বেরোতে চাওনা যে বড়,—বাড়ীতেই কি কিছু জুটিয়েছ না কি হে?" আমিও অস্বীকার করতে পারলুম না। তারা ধরে বল্‌লো—আমার ভাবী পত্নীকে দেখ্‌বে। পিসিমাকে বল্লুম—তিনি তাতে কিছুমাত্র আপত্তি করলেন না।

একঘর বন্ধুদের মধ্যে সুসজ্জিতা যুথিকা এসে দাঁড়ালো। সবাই তার আশ্চর্য্য রূপ দেখে বিস্মিত হয়েছিল—এ আমি তাদের ভাব দেখেই বুঝতে পেরেছিলুম। আমি যে এইবার তাদের হাতছাড়া হয়ে যাব—এ আশঙ্কাও বোধ হয় তাদের হয়েছিল। তাই তাদের মধ্যে একজন বল্‌লো—"মন্দ জুটাসনি বিমল—কিন্তু চঞ্চলার চেয়ে কি এ ভাল দেখ্‌তে?" আর একজন বল্‌লো—"পারুলের গায়ের রংএর কাছে এর গায়ের রং লাগবার যোগ্য?" যুথিকাও যে এ সমস্ত মন্তব্য না শুন্‌লো তা নয়; কারণ—তাকে শোনানোর জন্যেই যে এ সব কথা বলা—এ আমি বুঝেছিলুম।

সেদিন সন্ধ্যার সময় যুথিকা আমাকে জিজ্ঞাসা করলো—"এরাই কি আপনার বন্ধু?" তার প্রশ্নে যেন কেমন হয়ে গেলুম;—ঢোক গিলে বল্লুম—"হ্যাঁ—না—তা—"। আবার প্রশ্ন হ'লো—"চঞ্চলা, পারুল এরা সব কে?" এ কথার জবাব দেব কি? মুখ দিয়ে শুধু বেরুলো—"ওরা—ওরা—" যুথিকা বল্লো—"ওঃ বুঝেছি!" এই বলেই সে বেরিয়ে গেল।

বন্ধুদের অনেক জোর-জুলুম, অত্যাচার অনেকদিন সহ্য করেছি—কিন্তু কোনও দিন তাতে বিরক্তি বোধ হয়নি। সত্যি কথা বলতে গেলে, আজ প্রথম তাদের উপর রাগ হ'লো। জনসমাজে মাথা উঁচু করে চলবার মত চরিত্র-বল আমার ছিল কি না জানি না;—তবে কারো কাছেই যে এ পর্য্যন্ত মাথা নীচু করিনি, এ কথা ঠিক। কিন্তু আজ এই

"বালিকা যে ইঙ্গিতে জানিয়ে গেল—আমি চরিত্রহীন, এইটাই মনে বেশ একটু অসোয়াস্তি এনে দিল। মনের এই দুর্ব্বলতা কেন যে এলো তা জানিনে—তবে এই ভাবকে যে বেশীক্ষণ আমল দিই নি, সে কথা ঠিক।

বিয়ের আয়োজন খুব জোরে আরম্ভ হ'লো। কিন্তু দিন যতই এগিয়ে আসতে লাগলো—যুথিকাও ঠিক ঝরে পড়া যুঁইফুলের মত ম্লান হয়ে যাচ্ছে—মনে হলো। বিয়ের যখন মাত্র তিনটি দিন বাকি,—সে নিতান্ত ব্যাকুলভাবে আমাকে জানালো—তার একটা কথা বল্‌বার আছে।

জিজ্ঞাসা করলুম—"কি কথা?" সে বল্লে "আমাকে আপনাদের এই ফাঁদ থেকে মুক্তি দিন। জ্যেঠাইমার হাতে-পায়ে ধরেছি—কিন্তু তিনি শুন্‌লেন না। আপনি ইচ্ছে করলেই আমাকে ছেড়ে দিতে পারেন।"

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—"কোথায় যাবে তুমি?"

"আমাদের দেশের বাড়ীতে। সেখানে কেউ নাই বটে—কিন্তু তবু বড়লোকের বাড়ীতে থাকবার চেয়ে সেখানে শাস্তি পাব।"

আমি বল্লুম—"কিন্তু এ বাড়ী তো দুদিন পর তোমারই হবে যুথি।"

আমার এই সস্নেহ কথায় সে আর্ত্তনাদ করে বলে উঠ্‌লো—"আমায় ক্ষমা করুন—আমি আপনাকে কক্‌খ্‌নো বিয়ে করতে পারবো না।"

স্তম্ভিত হলুম! একি সত্যিই নারী-যুগ এসে উপস্থিত হ'লো! এতটুকু বালিকা কিনা অম্লানবদনে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা—যাক্।

পুরুষ আমি—আমার স্বার্থে ঘা পড়তেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলুম—আমার স্নেহের আবরণ মুহূর্ত্তের মধ্যে খসে পড়লো—ক্রূর হাসি হেসে বল্লুম—"কিন্তু তোমার ইচ্ছাতেই তো হবে না যুথিকা!"

সে তার দৃষ্টি আমার মুখের উপর স্থাপন করে দৃপ্ত ভঙ্গীতে বলে উঠ্‌লো—"হ্যাঁ—আমার ইচ্ছাতেই হবে। আমার অনিচ্ছায় জোর করে কোনও কাজ করিয়ে নিতে পারবেন না আপনারা।" এই বলেই সে দৃঢ় পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার এই পাগলামি দেখে আমি খুব হাসতে লাগলুম। হ্যাঁ হাসলুম বটে—কিন্তু এই হাসির পিছনে কতখানি কান্না লুকিয়ে ছিল, তা যদি জানতুম।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় পিসিমা হঠাৎ চীৎকার করে উঠ্‌লেন—"সর্ব্বনাশ হয়েছে রে বিমল—শীগ্‌গির আয়।" তাঁর চীৎকারে বাড়ীর সবাই ছুটে গেল—আমিও গেলুম। কিন্তু কি দেখ্‌লুম? দেখলুম—আমারই হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য যুথিকা আত্মহত্যা করেছে। তার প্রাণহীন দেহ শূন্যে কড়িকাঠের সাথে সংলগ্ন কাপড় ঝুলছে! তার সেই মৃত্যুবিবর্ণ মূর্ত্তি দেখে শিউরে উঠলুম। কে যেন আমার সর্ব্বাঙ্গে অসংখ্য কশাঘাত করতে লাগলো। এ মৃত্যুর জন্য দায়ী কে?—আমি—আমি—আমি! সে ঘরে আর থাকতে পারলুম না—ছুটে বেরিয়ে এলুম।

* * * *

জীবনে উল্টোস্রোত বইতে আরম্ভ করেছে। যাদের এতদিন হীনভাবেই দেখে এসেছি—এখন সেই নারী-জাতির মঙ্গলের জন্য আমার স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি দান করে ভবঘুরে বৃত্তি অবলম্বন করেছি। দেশের দুস্থ নারী সেই অর্থে সাহায্য পাবে—তাদের এমন শিক্ষা দেওয়া হবে, যাতে পুরুষের স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে তারা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

পুস্তক-পরিচয়

ভোলানাথের ভুল।—শ্রীতারকনাথ সাধু প্রণীত, মূল্য দুই টাকা। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত সাধু মহাশয়কে যাঁহারা জানেন, তাঁহারা বিস্মিত হইবেন যে, এই সম্পূর্ণ অনবসর ভদ্রলোক উপন্যাস লিখিয়াছেন। কিন্তু বিস্ময়ের কারণ নাই, বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিবার বাসনা প্রথম যৌবন হইতেই তাঁহার ছিল, এ কথা আমরা জানি; এতদিনে সে বাসনা ফলবতী হইল। 'ভোলানাথের ভুল' সাধু মহাশয়ের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা প্রসূত; তাঁহাকে প্রতিদিন নানা শ্রেণীর অপরাধীর সংস্পর্শে আসিতে হয়; তিনি সেই সকল দেখিয়া-শুনিয়া এই ভুলের পরিচয় দিয়াছেন। ইহা সর্ব্বাংশে তাঁহার উপযুক্ত হইয়াছে; আমরা এই গ্রন্থের বৈচিত্র্য দর্শনে আনন্দিত হইয়াছি। এই বইখানি আদরলাভ করিবে, সুতরাং সাধু মহাশয় অতঃপর আরও লিখিবেন, এ আশা করা যাইতে পারে।

কালো-বৌ।—শ্রীমাণিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি-এ, বি-টি প্রণীত, মূল্য আট আনা। এখানি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালার চতুরশীতিতম গ্রন্থ। শ্রীমান মাণিকচন্দ্র আমাদের সুপরিচিত, এই 'কালো বৌ'তে লিখিত তিনটী ছোট গল্পও আমাদের সুপরিচিত। মাণিকের লেখাও মাণিকেরই মত উজ্জ্বল। এ বইখানি পড়িয়া সকলেই আনন্দিত হইবেন।

মোহিনী।—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ প্রণীত, মূল্য আট আনা। এখানিও উপরিউক্ত গ্রন্থাবলীর পঞ্চাশীতিতম গ্রন্থ। প্রবীণ লেখক গ্রন্থারম্ভে একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন; কিন্তু তাহার কোনই প্রয়োজন ছিল না; তিনি এই গল্প-সাহিত্যের আসরে নামিবার সম্পূর্ণ অধিকারী। আমরা তাঁহাকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। যে কয়টা ছোট গল্প দিয়া এই 'সংগ্রহ' প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সবগুলিই আমাদের পড়া; তবুও আবার পড়িলাম, পরে আরও দুচারবার পড়িব। পাঠকেরাই দেখিবেন, একবার পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করিবেন না, দুচারবার পড়িতে হইবে এবং লেখকের বাহবা দিতে হইবে। সুতরাং ললিত বাবুর কৈফিয়ৎ বাজেখরচ হইয়াছে।

অকাল কুষ্মাণ্ডের কীর্ত্তি।—শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত, মূল্য আট আনা। এখানিও উপরিউক্ত গ্রন্থাবলীর ষড়শীতিতম গ্রন্থ। এখানি উপন্যাস নয়, চিত্র। যিনি এই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাঁহার দক্ষতা যে অসাধারণ, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। এই বইখানি পড়িয়া যদি আমাদের দেশের অকাল কুষ্মাণ্ডদের জ্ঞান লাভ হয়, তাহা হইলেই লেখিকার শ্রম সফল হইবে; আমরাও আনন্দিত হইব।

স্রোতের তৃণ।—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ শাসমল প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা। স্বনামধন্য স্বদেশসেবক শ্রীযুক্ত শাসমল মহাশয় আট মাস কারাবাসে ছিলেন; এই 'স্রোতের তৃণ' সেই সময়ের বিবরণ। কারা-কাহিনী অনেকেই লিখিয়াছেন, এবং সে সকলই একই ধরণের। কিন্তু 'স্রোতের তৃণ' তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন; ইহাতে কাহিনী অল্পই আছে; কিন্তু আর যাহা আছে, তাহা উপভোগ্য; শ্রীযুক্ত শাসমল মহাশয় প্রাণ খুলিয়া তাঁহার আশা আকাঙ্ক্ষার বিবরণ দিয়াছেন; কি শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি স্বদেশীর কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহার যে আভাস দিয়াছেন, তাহা মর্ম্মস্পর্শী। বইখানি সকলকেই পড়িবার জন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি।

আমেরিকা ভ্রমণ।—শ্রীসত্যশরণ সিংহ প্রণীত, মূল্য দুই টাকা। শ্রীযুক্ত সিংহ মহাশয় শিক্ষালাভের জন্য আমেরিকায় গিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহাই মনোজ্ঞ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই বইখানি পড়িলে ঘরে বসিয়াই আমেরিকা ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করা যায়। বইখানিতে অনেকগুলি চিত্র আছে।

পল্লী-বৈচিত্র্য।—শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত, মূল্য আড়াই টাকা। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্র বাবুর এই 'পল্লীবৈচিত্র্যের' আবার কি পরিচয় দিব? এই সর্ব্বজনপরিচিত, সর্ব্বজন-আদৃত পুস্তক যে এতদিন পরে লেখক মহাশয়ের অলসতার কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া আজ ১৭ বৎসর পরে তৃতীয় সংস্করণ হইতে পারিল, ইহাই পরম লাভ। বিগত ১৭ বৎসর কতজন এই পুস্তকখানি চাহিয়াও পান নাই। আমরা আজ তাঁহাদের এই সংবাদ প্রদান করিলাম মাত্র, পরিচয় সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

ফুলের ব্যথা।—শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায় প্রণীত, মূল্য এক টাকা। এখানি পাঁচ ফুলের সাজি; ফুলগুলি বাছিয়া দিয়াছেন প্রসিদ্ধ মালাকর শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়। এত বাছাবাছির দরকার ছিল না, সুকবি হেমেন্দ্রলালের যে কোন কবিতাই উপভোগ্য, সবগুলিই দেবার্চ্চনার উপযুক্ত। এই সংগ্রহে যে কয়টী ফুল গ্রথিত হইয়াছে, তাহার সুষমায় আমরা মুগ্ধ হইয়াছি, পাঠকপাঠিকাগণও হইবেন।

চিঠি।—শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রণীত, মূল্য পাঁচ সিকা। এগুলি অনেকদিন পূর্ব্বে 'নারায়ণে' 'চিঠির গুচ্ছ' নাম দিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন আমরা এই চিঠিগুলি পরম আগ্রহে পাঠ করিয়াছিলাম এবং লেখককে প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করিয়াছিলাম। এতদিন পরে সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া গ্রন্থকার আমাদের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। এ বইখানি জনাদর লাভ করিবেই।

আলোকের পথে।—আজহারুল ইস্‌লাম প্রণীত, মূল্য পাঁচ সিকা। লেখক সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই প্রথম আসিলেন, কিন্তু ইঁহাকে আমরা অনেকদিন হইতেই জানি; বাঙ্গালা ভাষার প্রতি এই মুসলমান যুবকের প্রাণের টান আছে। তাহারই ফল এই উপন্যাস। আমরা তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্য ক্ষেত্রে সাদরে আহ্বান করিতেছি। তাঁহার এই লেখা পড়িয়া বুঝিতে পারিয়াছি, তিনি সাধনপথে অগ্রসর হইলে পরিণামে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন।

উড়ো চিঠি।—শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা। এই সংগ্রহের নাম 'উড়ো চিঠি' দেওয়াতে আমরা ক্ষুণ্ণ হইয়াছি। এগুলি উড়ো কথা নহে; প্রত্যেক চিঠিখানি শুধু পড়িয়াই অব্যাহতি নাই; ভাবিতে হয়, চিঠি-লেখকের চিন্তাশীলতার প্রশংসা করিতে হয়, ধন্যবাদ করিতে হয়। আমরা অসঙ্কুচিত চিত্তে বলিতে পারি, বই পড়িয়া এত আনন্দ উপভোগ করিবার সৌভাগ্য আমাদের অতি কমই হয়; কত কথাই যে সুরেশ বাবু বলিয়াছেন, কেমন সুন্দর করিয়াই যে বলিয়াছেন। বইখানি সবাইকে পড়িবার ও দশজনকে পড়াইবার জন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীভরত।—শ্রীমতী মানময়ী দেবী প্রণীত, মূল্য পাঁচ সিকা। শ্রদ্ধেয়া লেখিকা ভরতের কাহিনী অতি সরল, সুন্দর ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যাঁহারা রামায়ণ পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগকেও পুনরায় এই বইখানা পড়িতে বলি। আমাদের আনন্দ এই যে, লেখিকা নাটক নবেল না লিখিয়া পুরাণকাহিনী লিখিয়াছেন। বইখানি বেশ হইয়াছে।

স্রোতের ঢেউ।—শ্রীহরিহর শেঠ প্রণীত। এই ছোট পুস্তিকাখানিতে লেখক মহাশয় ছোট ছোট অনেকগুলি উপদেশ সংগ্রহ করিয়া

দিয়াছেন।' বইখানি ছোট হইলেও উপদেশগুলি খুব বড় ও অমূল্য। আমরা এই উপদেশগুলি পড়িয়া তৃপ্তি ও শক্তি লাভ করিলাম। বইয়ের মূল্য লেখা নাই কেন বলিতে পারি না; বোধ হয় চন্দননগর লাইব্রেরী এই অমূল্য রত্নের মূল্য স্থির করিতে পারেন নাই।

মোকামের বাণিজ্য-তত্ত্ব।—শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ প্রণীত, মূল্য ২৲ টাকা। এখানি মোকামের বাণিজ্য-তত্ত্বের দ্বিতীয় ভাগ। এখনকার দিনে এই রকম বইয়েরই বিশেষ দরকার। শ্রীযুক্ত সন্তোষ বাবুর 'মহাজন-সখা' ও এই পুস্তকের প্রথম খণ্ড জনসাধারণ বিশেষ আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়াছেন; আমাদের বিশ্বাস, এ বইখানিও তেমনই আদর লাভ করিবে।

সাময়িকী

কলিকাতা রাণী ভবানী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পুরস্কার-বিতরণ সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নব-নিযুক্ত ভাইস-চ্যান্সেলর মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতা লইয়া কথাবার্ত্তায় ও কাগজে-পত্রে বেশ একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল এবং সে আন্দোলনের জের এখনও ভাল করিয়া মিটে নাই। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রবাবু কিন্তু বক্তৃতা করিতে উঠিয়াই প্রথমেই বলিয়াছিলেন যে, তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ভাবে কোন কথা বলিতেছেন না, দেশের একজন নাগরিক হিসাবেই তাঁহার মনের কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন। তবুও অনেকে তাঁহার কথাগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারের বাণী বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছেন। অবশ্য, তাহাতে বিশেষ কিছু যাইতেছে আসিতেছে না।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রবাবু নূতন কথা কিছুই বলেন নাই। বাঙ্গালা সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে যে সকল মত প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে, তিনি তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির দোষ তিনিও অপর সকলের মত প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "Look at the depressed and scared faces of our young men, some of whom may have got a first class in some post-graduate subjects, haunted by the spectre of hunger and thronging the doors of those who are in authority for some humble employment as clerks" ইহার মর্ম্ম এই যে, কত সব সোনারচাঁদ ছেলে, যারা পোষ্ট-গ্রাজুয়েট পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে বিশেষ যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহারা মলিন মুখে, অনাহারক্লিষ্ট হৃদয়ে সামান্য একটা কেরাণীগিরির জন্য কর্ত্তাব্যক্তিদের দ্বারে দ্বারে দরখাস্ত-হস্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং নিষ্ফল বেদনায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছে। কথাটা বড়ই ঠিক। আর তাহাদের পিতা-মাতা যথাসর্ব্বস্ব খোয়াইয়া এই সকল বংশ-প্রদীপদিগকে এমন শিক্ষা দিয়াছেন যে, তাহারা কার্য্য-ক্ষেত্রে কোন কাজেরই লায়েক নহে। তাই, ভূপেন্দ্রবাবু আক্ষেপ করিয়া এই সকল ছাত্রের অবস্থার কথা সাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন। এ কথার কেহই প্রতিবাদ করিতে পারেন না। সত্যসত্যই অন্ন-সমস্যা এখন সকল সমস্যাকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে; বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত গৃহস্থ যুবকগণের অন্ন-সংস্থান করিয়া দিতে পারিতেছে না; তাহারা জ্ঞান লাভ করিতেছে, কিন্তু, কি হবে সে জ্ঞানে যাতে পেটে অন্ন জোটে না।

এই ত গেল এক কথা। তাহার পর শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র বাবু আর একটা কথা বলিয়াছেন। সেটা অতিরিক্ত পাশের কথা। তিনি বলিয়াছেন "Are you astonished that twenty thonsand boys or more should present themselves at this (Matriculation) examination and 80 per cent of them should pass and by far the great majority of them in the

first class? The parents are grateful at the phenominal success of their children, the boys are pleased and the University which the Government compels to live on its fee-income is also naturally pleased and we all go along merrily on the road to intellectual bankrupcy." অর্থাৎ প্রতি বৎসর বিশ হাজার কি তারও বেশী ছেলে প্রবেশিকা পরীক্ষার উপস্থিত হয়; তাহার মধ্যে শতকরা আশিজন পাশ হয়;—শুধু পাশ নয়, তাহাদের অধিকাংশই প্রথম বিভাগে পাশ হয়; ইহাতে অবাক্ হইতে হয় না কি? অবশ্য ছেলেদের কৃতিত্ব দেখিয়া বাপ-মা খুব খুসী হন; ছেলেরাও খুসী হয়; আর গবর্ণমেণ্ট যে বিশ্ব-বিদ্যালয়কে ছাত্রদত্ত-ফি'র উপর নির্ভর করিতেই বাধ্য করিয়াছেন, সেই বিশ্ব-বিদ্যালয়ও স্বভাবতঃই খুব খুসী হন; আর আমরা দশজন মনের আনন্দে জ্ঞান-ভাণ্ডারের দেউলিয়ার পথে অগ্রসর হই। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রবাবু এ কথাগুলি বড় দুঃখেই বলিয়াছেন; আর কথাগুলি খুব শক্ত হইলেও সত্য কথা। ইহাতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সুনামে কলঙ্কপাত হইয়াছে। এই প্রবেশিকা পরীক্ষা যে একটা ব্যবসাদারী ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এ কথা অনেকেই বলিয়াছেন; আজ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রবাবুও বলিলেন, এবং তিনিই এই প্রকাণ্ড ব্যবসাদারী আড়তের গদীয়ান হইয়া বসিলেন। এখন দেখা যাইবে, এই গদীয়ান কি করিতে পারেন? ব্যবসাই চালাইবেন, না দোকানদারী বন্ধ করিয়া দিবেন, না দুইদিন পরে বলিবেন 'ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি'।

বিশ্ব-বিদ্যালয় কল্পতরুর আর এক শাখার ফল সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র বাবুর মন্তব্য বড়ই কঠোর হইয়াছে, এবং তাহারই জন্ম নানাদিকে গাত্রজ্বালা উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র বাবু নিজে একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যবহারাজীব; এই আইন ব্যবসায়ে তিনি প্রভূত ধন উপার্জ্জন করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও করিতে থাকিবেন। কিন্তু, তিনি রাণী ভবানীর কৃপায় নিজের দলকে কঠোর ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "We are licensed free-booters living on the fat of the Land." অর্থাৎ আমরা (ব্যবহারাজীবেরা) সরকারের লাইসেন্স-প্রাপ্ত ডাকাত; আমরা দেশের চর্ব্বি খাইয়া মোটা হইতেছি। কথাটার এক বর্ণও মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত নহে। এই কথা লইয়াই তাঁহার সম-ব্যবসায়ী মণ্ডলীতে খুব আন্দোলন হইতেছে, অনেক লেখালেখি হইতেছে। কিন্তু, কথাটার কেহ প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইবেন কি? বাহিরের লোকে, পথ-চল্‌তি লোকে বলিলে হয় ত এতদিন মাননাশের মামলা উঠিত; কিন্তু উক্ত ব্যবসায়ের শীর্ষস্থানীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রবাবুর এ যে বৃদ্ধ বয়সের কবুল-জবাব।

কিন্তু মজার কথা এই যে, এই 'ডাকাতি'র ফ্যাকড়া লইয়া কথা-কাটাকাটিতে আসল কথা চাপা পড়িয়া গেল। বর্ত্তমান শিক্ষা-সমস্যার কি সমাধান হইবে, সে কথা লইয়া কোন উচ্চবাচ্য নাই। কেহ কেহ বলিতেছেন, কৈ ভূপেন্দ্রবাবু ত এত কথা বলিলেন, একটা ধারা ত দেখাইয়া দিতে পারিলেন না। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রবাবু হাটের বক্তা নহেন; হাটে দাঁড়াইয়া সাময়িক উত্তেজনায় রাজা-উজির মারা তাঁহার কাজ নহে। তিনি স্থিরধী, বিজ্ঞ ব্যক্তি; তিনি ব্যাপারটা বলিলেন; এখন দেশের দশজনে তাঁহাকে লইয়া এ কথার মীমাংসা করুন না, পথ নির্দ্দেশ করুন না, সমস্যার মীমাংসা করুন না। দাদার উপর বরাত দিয়া সকল দায়িত্ব ঝাড়িয়া ফেলা আমাদের অনেকেরই স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পরলোকগত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য তাঁহার জন্মভূমি মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জেমো-কান্দী গ্রামে একটী সরোবর ও হিন্দু মুসলমানের জন্য দুইটী পান্থশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লালগোলার বিদ্যোৎসাহী রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রাও বাহাদুর তাঁহার অকৃত্রিম সুহৃদ রামেন্দ্রসুন্দরের নাম স্মরণীয় করিবার জন্য নিজ ব্যয়ে এই সরোবর ও স্মৃতি-মন্দিরদ্বয় নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন এবং ইহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও যথেষ্ট অর্থদান করিয়াছেন। এই সরোবর ও পান্থশালাদ্বয়ের প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সেদিন জেমো-কান্দীতে মহাসমারোহে সুস-

হইয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই প্রতিষ্ঠা-কার্য্য করিয়া তাঁহার পরলোকগত বন্ধুর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কাশীমবাজারের মাননীয় শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর, তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, লালগোলের রাজা বাহাদুর এবং কলিকাতা হইতে রামেন্দ্রসুন্দরের গুণ-মুগ্ধ অনেক সাহিত্যিক বন্ধু এই স্মৃতি-উৎসবে যোগদান করিতে গিয়াছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস ত্রিবেদী মহাশয়, জেমোর রাজপরিবারের বর্ত্তমান বংশধর শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় মহাশয় এবং গ্রামের অন্যান্য ভদ্রমহোদয়গণের আদর-আপ্যায়নে সমাগত সাহিত্যিকগণ বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। সকলেই এক-বাক্যে লালগোলার রাজা বাহাদুরের এই বন্ধু-প্রীতির প্রশংসা করিয়াছিলেন; পরলোকগত সাহিত্যিকের স্মৃতি-রক্ষার জন্য এ প্রকার আয়োজন সত্যসত্যই প্রশংসনীয়। আমরা আশা করি, লালগোলার শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুর রামেন্দ্রসুন্দরের প্রধান কীর্ত্তি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের উন্নতি ও স্থিতির জন্য কোন ব্যবস্থা করিয়া সকলের অধিকতর কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। বলা বাহুল্য যে, লালগোলার রাজা বাহাদুর ও কাশীমবাজারের মহারাজা বাহাদুরের সাহায্যেই সাহিত্য-পরিষৎ এতদূর উন্নত হইয়াছে।

এইবার কংগ্রেসের কথা একটু বলি। বহুদিন পূর্ব্বে যখন বোম্বাই নগরীতে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়, সেদিনের কথা আমাদের বেশ মনে আছে; আমরা অবশ্য সে অধিবেশনে যোগদান করিতে যাই নাই; কিন্তু আমাদেরই একজন, পরলোকগত মহাত্মা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ডবলিউ, সি, বানার্জ্জি) এই প্রথম অধিবেশনে সভাপতি হন। তাহার পর অনেক দিন কংগ্রেস হইল; দেশের মধ্যে কংগ্রেসের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হইল, যে রাজপুরুষেরা এক সময়ে এই কংগ্রেসকে microscopic minority বলিয়াছিলেন, তাঁহারাও পরে কংগ্রেস শিক্ষিত জনসাধারণের প্রতিনিধি-স্থানীয়, এ কথা [illegible]ার করিয়াছিলেন; কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনও সম্পূর্ণ একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। তাহার পরই সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় মহা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইল। সেবারে আর অধিবেশনই হইতে পারিল না; দুইটী প্রকাণ্ড দলের সৃষ্টি হইল। কংগ্রেসে দলাদলির আরম্ভ এই প্রথম। কয়েক বৎসর এই দলাদলিই চলিল। তাহার পর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের চেষ্টায় লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সময় একটা তথাকথিত-রফা নিষ্পত্তি হইল; কিন্তু বেশীদিন সে মিলন টিকিল না; দুইদল আবার পৃথক হইয়া গেল। একদল নরম, আর একদল গরম। গরমেরা কংগ্রেস হইতে একেবারে সরিয়া দাঁড়াইলেন, গরম দল কংগ্রেস দখল করিলেন। বিগত গয়া কংগ্রেসে আবার এই গরম দলের মধ্যেও মতভেদ হইয়া আর একটা নূতন দলের সৃষ্টি হইয়াছে! সুতরাং এখন দেশের রাজনীতি-ক্ষেত্রে তিনটী দল। এক দল ত কংগ্রেস হইতে একেবারেই দূরে দাঁড়াইয়াছেন; আর দুইদল কংগ্রেসের নাম করিয়াই বিরোধ উপস্থিত করিয়াছেন। এই বিরোধের কারণ ব্যবস্থা-পরিষদে প্রবেশ লইয়া। গরমদের একদল বলেন (এবং ইঁহারাই সংখ্যায় অধিক) যে মহাত্মা গান্ধীর আদেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করিতে হইবে; তিনি ব্যবস্থা-পরিষদে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, সম্পূর্ণ 'নন-কো' হইতে বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আদেশ অমান্য করা যাইতে পারে না। গয়া কংগ্রেসে অধিকাংশের মতে এই প্রস্তাবই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু আর একদল (এই দলের নেতা হইতেছেন শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ; ইনিই গয়া কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন) বলিতেছেন যে, যে ভাবে কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালিত হইতেছে, তাহাতে কোন ফল হইতেছে না। তাঁহারা ব্যবস্থা-পরিষদে প্রবেশ করিয়া শাসন-ব্যবস্থাকে অচল করিয়া দিতে চান। অপর দলও অচলই করিতে চান, কিন্তু তাঁহাদের মত এই যে, কোন কিছুতে যোগ না দিয়া সমস্ত অচল করিয়া দিবেন। শ্রীযুক্ত দাশের দল আগামী নির্ব্বাচনে ব্যবস্থা-পরিষদে প্রবেশ করিবার আয়োজন আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রচার করিতেছেন যে, তাঁহারা পরিষদে প্রবেশ করিয়া সকল কার্য্যে বাধা দিয়া কার্য্য পরিচালন অসম্ভব করিয়া দিবেন, সমস্ত অচল হইয়া যাইবে। এই উপলক্ষে আমরা একটা কথা বলিতে চাই। আমাদের দেশে যাঁহারা নিজেদিগকে নেতৃস্থানীয় মনে করিয়া থাকেন, তাঁহারা উক্ত পদের দাবী

কৃতখানি করিতে পারেন, সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে; নরম, গরম, অতি-গরম সকল দল সম্বন্ধেই আমাদের এই কথা। আমরা জানি এবং বুঝি, যতদিন ভারতবর্ষের বহুকালাগত অচলায়তন সচল না হইবে, ততদিন সকল বাসনাই অরণ্যে রোদন হইবে। যাহারা দেশের মেরুদণ্ড, যাহারা রোগে জীর্ণ, অন্নাহারে শীর্ণ, তাহাদের শিক্ষার অভাব, তাহাদের নিত্য হাহাকার। যতদিন অচলায়তন না ভাঙ্গিতেছে, ততদিন কিছুই হইবে না। সে দিকে অগ্রসর হইতে হইলে যে ধীরতা, যে সহিষ্ণুতা, যে স্বার্থত্যাগ, যে কর্ম্মকুশলতা চাই, তাহা শুধু বক্তৃতায় অর্জ্জন করা যায় না; তাহার জন্য সাধনা চাই। সে প্রকার সাধক দুই একজন হইলে হইবে না, অধিক সংখ্যায় চাই; তাহা হইলে তখন কে অচল, কে সচল, তাহার বিচার হইবে, তাহার পরীক্ষা হইবে।

এইবার সহযোগী 'হিন্দুস্থান' হইতে একটী শোচনীয় ঘটনার বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি। গত ৯লা বৈশাখের দিন বরিশালে আবগারী বিভাগের লোকেরা মৃজাকালু গ্রামের হাটে যে তিনজন লোককে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছিল এবং কয়েকজনকে আহত করিয়াছিল সে সম্বন্ধে এখনও কোন সরকারী বিবরণ পাওয়া [illegible], যদিও ইহার বহু-পূর্ব্বেই তাহা সাধারণের নিকট [illegible] করা উচিত ছিল। যাহা হউক, এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য বে-সরকারী লোক নিযুক্ত হইয়া[illegible] তাঁহারা তদন্ত করিয়া যাহা প্রকাশ করিয়াছেন [illegible] অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারা যায়।

এই বে-সরকারী তদন্তকে [illegible] ছরের তদন্ত বলা যায় না। কারণ ভারতীয় ব[illegible] অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী [illegible] খাটিন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সহযোগী, তি[illegible] লে শ্রীদের উপর অযথা দোষারোপ করিয়া [illegible] র কিন্তু শোচনীয় করিয়া তুলিতে চেষ্টা ক[illegible] কা আও জানি, গবমেণ্টও জানেন। [illegible] শের সমস্যা যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, [illegible] হয়।

যোগেশচন্দ্র তদন্ত করিয়া কোনো মতামত প্রকাশ করেন নাই। কেন করেন নাই, তাহার কারণ তিনিই জানেন। তাঁহার তদন্তে প্রকাশ যে, আবগারীর লোকেরা যে গ্রামে গিয়া গৃহস্থদের বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া লবণ তৈয়ারি করার অপরাধে মালপত্র উঠাইয়া লইয়া আসিতে-ছিল, সে গ্রামের লোকেরা চিরকালই নিজেদের ব্যবহারের জন্য সমুদ্রের জল জ্বাল দিয়া লবণ তৈয়ারি করে। গবমেণ্ট ১৯১৪ অব্দে এক সার্কুলার জারি করিয়া জানাইয়া দেন যে, এরূপ লবণ তৈয়ার করা বে-আইনি নহে। এই ব্যবস্থা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে কি না তাহা গ্রামের লোকেরা জানে না। উঠাইয়া দেওয়া হইয়া থাকিলেও গ্রামের লোকদিগকে তাহা জানাইবার কোনো চেষ্টা করা না কি হয় নাই।

কিন্তু কথা হইতেছে যে, আবগারী লোকেরা যে গ্রামে গিয়া হানা দিয়াছিল, সে গ্রামে কোনো হাঙ্গামাই হয় নাই। ফিরিবার মুখে মৃজাকালু হাটে পুলিশের লোকেই প্রথমে মারপিট ও অত্যাচার করায় সেখানকার লোকেরা তাহাদের ঘা-কয়েক দিয়া দেয়। পুলিশের কাছে বন্দুক ছিল; তাহারা বন্দুক চালায়। পুলিশের তরফে দুইজন লোক আহত হয়। তাহাদের সে আঘাত তেমন সাংঘাতিক নহে। যোগেশ-চন্দ্রের তদন্তে এইটুকু জানিতে পারা গিয়াছে। এইবার সরকারী বিবরণ পাইতে বোধ হয় বেশী দেরী হইবে না। সে বিবরণে আশা করি অনেক অপ্রকাশিত ঘটনা প্রকাশ পাইবে।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। অতএব ভারতের সহিত বিদেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের আদান-প্রদান কিরূপ চলিতেছে, তাহা আমাদের খতাইয়া দেখা উচিত। গত ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে ১৯২৩ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরের বাণিজ্যের যে হিসাব বাহির হইয়াছে তাহা দেখিলে বুঝা যায় যে, এই বর্ষে পূর্ব্ব বৎসর (১৯২১-২২ সাল) অপেক্ষা মোটের উপর ৩৪ কোটি টাকার, অর্থাৎ শতকরা ২৮ টাকার মাল বিদেশ হইতে ক[illegible] আমদানি হইয়াছে। অপর পক্ষে ভারতবর্ষ হইতে মো[illegible]

৬৮ কোটী টাকার মাল অর্থাৎ শতকরা ২৯ টাকার মাল বেশি রপ্তানী হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ৩ কোটী, ৫২ লক্ষ, ৮৪ হাজার, ১৫৭ টাকার কাঁচা মাল, ১৭৯ কোটী, ৪০ লক্ষ ৪০ হাজার, ৫ শত ৪৫ টাকার তৈরি পণ্যদ্রব্য, আর ৩ কোটী, ৯৫ লক্ষ, ৭২ হাজার ৩শত ৯২ টাকার খাদ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে।

কার্পাসজাত সূতা এবং বস্ত্রাদিতে এদেশের বহু টাকা বিদেশে চলিয়া যায়; সুতরাং বাণিজ্যের এদিকের খবরও আমাদিগকে লইতে হইবে। গত বর্ষে ভারতে মোট ৭০ কোটী ১৩ লক্ষ ২ হাজার, ৩২ টাকার সূতা বিদেশ হইতে আসিয়াছে; আর এদেশ হইতে গিয়াছে ১ কোটী, ১২ লক্ষ, ১২ হাজার ৩ শত ৮২ টাকার কার্পাস। এই কাঁচা মাল বিদেশে রপ্তানী করিবার লোভ সামলাইতে পারিলে, সূতা আর বস্ত্রাদি বাবদ অনেক গুণ বেশি টাকা বিদেশী সওদাগরের হাত হইতে বাঁচাইতে পারা যাইত।

আলোচ্য বর্ষে বিদেশে মোট ৬৭ লক্ষ, ৩৮ হাজার ৯৮১ টাকার কাঁচা চামড়া বিদেশ রপ্তানী হয়, বিদেশ হইতে ইহারাই একাংশ তৈরি চামড়ার আকারে এদেশে আমদানি হইয়াছে—ইহার মূল্য ৫২ লক্ষ, ৩৯ হাজার ৩৪৩ টাকা। সুখের বিষয় এই যে বিদেশ হইতে তৈরি চামড়ার আমদানি ক্রমশঃই কম হইতেছে। ১৯২০-২১ সালে যত টাকার চামড়া আমদানি হইয়াছিল, আলোচ্য বর্ষে তাহার অর্দ্ধে- [illegible] হইয়াছে।

বিদেশী চিনির আমদানি যথেষ্ট কম হইয়াছে। ১৯২২ ২৩ সালে ১৫ কোটী ৪৮ লক্ষ, ৮৯ হাজার, ৯৬৮ টাকার চিনি আমদানি হয়, ১৯২১ ২২ সালে ২৭,৫০,২৮,২৫৮ টাকার এবং ১৯২০-২২ সালে ১৮,৫০,২৯ ৭৫৪ টাকার চিনি আমদানি হইয়াছিল। আমদানি কম হইবার কারণ কি, তাহা এখনও ঠিক করিয়া বলা যায় না। মজুত মালের জন্যও এরূপ হইতে পারে; দেশে চিনি অধিক উৎপন্ন হইলেও এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে।

ভারতের বেশির ভাগ ব্যবসায় বাণিজ্যই চলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে—এই সাম্রাজ্যের নানাস্থান হইতে ১৯২২ ২৩ সালে মোটের উপর ১৫৬ কোটি, ১৮ লক্ষ, ৫৮ হাজার ৬৫৫ টাকার মাল আমদানি, আর ভারতবর্ষ হইতে ঐ সকল দেশে রপ্তানি হয় ১১৮ কোটি ২৪লক্ষ, ৯৭হাজার ১৯৯ টাকার মাল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বাদে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের কারকারবার কিরূপ, এই স্থলে তাহাও খতাইয়া দেখা যাউক। আলোচ্য বর্ষে ঐ সকল দেশ হইতে ভারতে মোট ৭৬,৪০,৪৬,২৮০ টাকার মাল আমদানি, আর ভারত হইতে ঐ সকল দেশে ১,৮০,৫৯,৭০ ৫৪৪ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছে। বিদেশী ক্রেতাদের মধ্যে গ্রেটব্রিটেনের সওদাগরগণই সব চেয়ে বেশি মাল এদেশ হইতে ক্রয় করেন। তাঁহারা ভারতীয় কাঁচা মালে পণ্য তৈয়ার করিয়া ১৯২২-২২ সালে ৬৪ কোটি, ২৩ লক্ষ, ৫৫ হাজার ৭২০ টাকার জিনিস এদেশে আমদানি করেন, আর নিজেদের দেশী জিনিস পাঠান ১,৪০,০০,৮১ ৬৭৫ টাকার। গ্রেট-ব্রিটেনের পরেই জাপানের নাম উল্লেখযোগ্য। জাপান গত বছরে ভারতবর্ষ হইতে ৩৮ কোটি, ৮ লক্ষ ৯৯ হাজার ৯৯৪ টাকার মাল খরিদ করেন, আর ভারতের বাজারে ১৩,৪৬,৭৭,৪৪৩ টাকার মাল পাঠান। আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও জার্ম্মেনীতে ভারত হইতে যথাক্রমে ২৪০,৯০,৫০,৪১৫ এবং ১৬,২৭,৪৪৮ [illegible] মাল রপ্তানী হইয়াছে, আর ঐ দুই দেশ হইতে যথাক্র[illegible],২১,৪৭,৬৭০ এবং ১১,৮৯,৩৭, ৪৭৩ টাকার পণ্য আমদানি হইয়াছে। ক্ষুদ্র জাভা

পরিচালিত

গত বছর এদেশে [illegible] ৮৮ লক্ষ, ৬৫ হাজার ১৩১

তাঁহারা

টাকার মাল [illegible] এদেশের বাজার হইতে

অচল কা

কোন মাল ক্র[illegible]ই। চীন ভারতীয় মালে পণ্য

ন, কিন্তু

সাজাইয়া গত ব[illegible] ০৭, ১৭,০১৭ টাকা ঘরে লইয়া

দিয়া সমস্ত

যাইবার ব্যবস্থা[illegible], আর তার স্বদেশী পণ্য

গামী নির্ব্বাচ

পাঠাইয়াছে ২[illegible] ৪৯ হাজার ১৬৩ টাকার।

ন আরম্ভ করিয়

এই হিসাবটা সক[illegible] করিয়া দেখিবেন; এবং

তাঁহারা পরিষদে

এ সম্বন্ধে আমাদে[illegible] আছে কি না, তাহা এখন

য়া. কার্য্য পরিচালন

হইতেই বিবেচন[illegible] করুন। এই আমদানি-

য়া যাইবে। এই ট্রা[illegible]

রপ্তানির উপর দে[illegible]

ই। আমাদের দেশে য[illegible]

করিয়া থাকেন, তাঁহার

আমাদের সকল কাজেই তাড়াতাড়ি; আমরা রাতারাতি বড়মানুষ হইতে চাই, তিন মাসের মধ্যে স্বরাজ লাভ করিতে চাই, সাতদিনের মধ্যে পৃথিবীতে স্বর্গ আনিতে চাই। তাহা না হইলেই আমাদের উৎসাহে অমনি ভাটা পড়িয়া যায়। একজন দূরদর্শী ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন, আমরা খড়ের আগুন; আমরা দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠি, দেখিতে দেখিতে চারিদিক আলোকিত হয়; আমরা মনে করি, তবে আর কি? আমরা দিগ্বিজয় করিয়াছি। কিন্তু পরক্ষণেই খড়ের আগুন নিবিয়া যায়, আর আমরা যে তিমিরে পূর্ব্বে ছিলাম, সেই তিমিরেই ডুবিয়া যাই। আমরা একবারও মনে করি না, কোন একটা জাতির প্রচলিত সংস্কার বা অভ্যাস ত্যাগ দুই দিনেই হয় না, দশটা ওজস্বিনী বক্তৃতাতেই হয় না; তাহার জন্য ধীর ভাবে অপেক্ষা করিতে হয়, সহিষ্ণুতার সহিত একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতে হয়; পাঁচবার অকৃতকার্য্য হইলেও নিরাশ হইতে নাই। তাহা হইলেই ভবিষ্যতে, দশ বৎসরেই হউক আর ... বৎসরেই হউক, বিজয়লক্ষ্মী জাতির হৃদয়ে আসন গ্রহণ করিয়া থাকেন।

এতগুলি কথা বলিলাম কেন জানেন? এই যে কিছুদিন হইল আমাদের দেশে খদ্দর ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছিল, অনেকে চরকা ধরিয়াছিলেন ... [illegible] ন মারা পড়িল কেন? তাহার কারণ ... [illegible]; আমরা ধরিয়া লইয়াছিলাম, খুব আশা ক ... [illegible] তিন মাসের মধ্যেই গোটা ভারতবর্ষ চর ... [illegible] পাইবে, ঘরে ঘরে চরকা চলিবে, এই ভা ... [illegible] লোক বিলাতী বস্ত্র ত্যাগ করিয়া খদ্দর ধ ... [illegible] তাহা হইলেই বিলাতী কাপড়ের ব্যবসায় লোপ ... [illegible] হ আমরা স্বরাজ পাইব। তাহা যখন হইল না, ... [illegible] তাঁহারা বলিলেন, না, ওতে কিছু হইবে না; চর ... [illegible] স্বরাজ লাভ করা যায় না। তখন যে প্র ... [illegible] গোড়াতে বাড়ীতে চরকা ঘুরিতে আরম্ভ করিয়া ... [illegible] সে উঠিয়া গেল, চরকা ঘরের এক কোণে আ ... [illegible] । যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহারা বলিলেন, ... [illegible] কা প্র চেষ্টা একটা পাগলামী; কলের স ... [illegible] চরকা প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারে? আবার যিনি বড়-দরের হিসাবনবীশ, তিনি অঙ্ক কষিয়া বলিলেন, ঘরে তুলা জন্মাইয়া তাহা হইতে কাপড় বুনিয়া লইলে খরচায় পোষায় না। ফলে এই হইল যে, অন্ততঃ আমাদের এই বাঙ্গালা দেশে যেমন জোরে খদ্দর আর চরকা আসিয়াছিল, আবার তেমনি করিয়াই তাহারা চলিয়া যাইতে সুরু করিয়াছে।

আমরা ভাবি, দেশের লোকের এ কি মতিগতি হইল। চরকা যে কলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে না, এ কথা যে বালকেও বোঝে। কিন্তু, চরকা ও মোটা কাপড় কি আমরা প্রতিযোগিতার হিসাবে ধরিব? আমরা কি বিলাতী কাপড়ের দরের সঙ্গে তুলনা করিয়া খদ্দর ব্যবহার করিব? তাহা ত কথা নয়। চরকা অবসর সময়ের সদ্ব্যবহারে লাগিবে। যে সময় আমরা বৃথা কাজে কাটাই, যে সময় আমাদের মেয়েরা আলস্যে যাপন করেন, চরকা সেই সময়ের সদ্ব্যবহারে প্রযুক্ত হইবে, এবং তাহার ফলে এই হইবে যে, নিজের পরিধেয় বস্ত্র নিজের হাতে জন্মিবে। লাভ এইটুকু; এবং এই ভাবে যদি অনেকেই চরকা চালান, তাহা হইলে কিছুদিন পরে হিসাব করিয়া দেখিতে পাইবেন, তাঁহাদের কত লাভ হইল। কিন্তু চরকায় স্বরাজ আসিবে, চরকার শব্দে বিলাতের কল-কারখানা বন্ধ হইয়া যাইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি ভাবিয়াই যত অপূর্ব্ব সৃষ্টি হয়, এবং তাহার সাফল্য সদ্য সদ্য দেখিতে না পাইয়া আমরা ... হাল ছাড়িয়া দিই।

এই চরকা ও খদ্দর সম্বন্ধে একখানি ইংরাজী কাগজ কি বলিয়াছেন, তাহা এইখানে তুলিয়া দিতেছি। The Catholic Herald of India বলিতেছেন—"Economics had said that the Khaddar movement was hopeless and doomed to failure, though we always wondered why it should be economically wrong for peasants, who gossip and sleep and idle away three-fourths of the year, to spin their own cloths." কথাটার মর্ম্ম এই যে, অর্থনীতিবিশারদেরা বলেন খদ্দর চলিতে পারে

না। এ কথায় আমাদের আশ্চর্য্য বোধ হয়; কারণ যে দেশের চাষারা বছরের নয় মাস গল্প করিয়া, ঘুমাইয়া এবং আলস্যে কাটায়, তাঁহারা যদি ঐ সময়ে নিজের কাপড়খানি বুনিয়া লয়, তাহাতে অর্থনীতি হিসাবে কি বহুত লাভ হয় না? আমরা বক্তৃতায় সাহেবদের যতই নিন্দা করি না কেন, সাহেবী সার্টিফিকেট এখনও আমরা সকলেই মাথায় করিয়া লইয়া থাকি; তাই আমাদের কথার সমর্থনের জন্য সাহেবী মত তুলিয়া দিলাম।

এত কথা হইল, যুদ্ধের কথাটাই বা বাকী থাকে কেন? ভারি সুখবর। আমরা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হইব; সরকার বাহাদুর মেহেরবাণী করিয়া তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভারতের জঙ্গী লাট বাহাদুর হুকুম দিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে যে ১৪১ দল (Unit) দেশী পল্টন আছে, আগামী দশ বৎসরের মধ্যে তাহার ৮ দল দেশীয় লোকের পরিচালনাধীন হইবে, অর্থাৎ সেই আটটা দলের কর্ত্তা এদেশী লোক হইবে। সুখবর নহে কি? কিন্তু, আমরা ভাল কথাটাও ভাল ভাবে লইতে পারি না, এমনই আমাদের বদ্ স্বভাব। আমাদের একজন বহুদর্শী সহযোগী এই সংবাদ পাইয়াই ত্রৈরাশিক কষিয়া বলিতেছেন যে, হিসাব করিয়া দেখা গেল যে, আমরা এই ভাবে যোদ্ধ হইতে আরম্ভ করিলে দেশীয় সমস্ত পল্টনে সম্পূর্ণ ভার পাইতে আমাদের ১৭৬ বৎসর তিন মাস সময় লাগিবে। অত হিসাব করিতে নাই। ভিক্ষার চাল কাঁড়া কি আকাঁড়া, ভিক্ষুককে তাহার সমালোচনা করিতে নাই। শাস্ত্রেই আছে "ধীরে রজনী—" কিন্তু, ব্যাপার ত এই; ইহাতেই সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে টন কাড়িয়াছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসের ২০শে তারিখে বিলাতের কমনস মহাসভায় কে একজন সদস্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ভারতের জঙ্গী-লাট যে এই আটটী দলের, একটী-দুইটী নহে, একেবারে আটদলের অধিনায়কত্ব দিশী লোকের হাতে দিলেন, তাহার পর? সেই দলগুলিতে যে সব শ্বেতাঙ্গ চোরী আছেন, তাঁহাদের গতি কি হইবে? তাঁহারা কি ইঙ্গকেপের কুঠারাঘাত সহ্য করিবেন? তদুত্তরে আমাদের ভারত-সচিব আরল্ উইন্টারটন বলিয়াছেন "নভেষ্যম্, নভেতব্যম্, কোন ভয় নাই। সে ভদ্রলোকদের রুটি মারা যাইবে না; তাঁহাদিগকে সমাদরে অন্য দলে স্থান প্রদান করা হইবে।" একণে, পাঠকপাঠিকাগণ ব্যাপারটীর সারোদ্ধার করুন, আমরা সংবাদ দিয়াই খালাস।

সাহিত্য সংবাদ

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী প্রণীত সচিত্র '[illegible] ও জন্তু' প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ২

শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত নূতন উপন্যাস 'ভদ্রা' প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ২৲

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত 'মাধবী' প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১।০

শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র দাস প্রণীত 'প্রাণবিনিময়' প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য ১।০

শ্রীযু[illegible] [illegible] তুলহরী সিরিজের 'পরিত্যক্তা পত্নী' ও 'ট[illegible]' [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য প্রত্যেকখানি ৸০

শ্রীযুক্ত শরৎ[illegible] [illegible] নূতন নাটক 'পুষ্পরাজ' প্রকাশিত হইল; মূল্য [illegible]

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল রা[illegible] [illegible] 'গুরুদক্ষিণা' প্রকাশিত হইল; মূল্য ১৲

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সাহা [illegible] '[illegible]থিতা' প্রকাশিত হইল; মূল্য ১৲

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea,
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Narendranath [illegible]
The Bharatvarsha [illegible] Works,
203-1-1, [illegible] CALCUTTA.